সূচীপত্র

ডাবল ডিল

চব্বিশে মে, রবিবার।

সারা জায়গাটা জুড়ে শান্ত বিকেল নেমে আসছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে ভারী মোহময় পরিবেশ। একটা পাওয়ার বোট ব্যাভেরিয়ার 'লিন্ডাউ' বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে। কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে কোনট্যানজ লেক। বোটের চালক চার্লস ওয়ার্নার। একভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। প্রচণ্ড সাবধানী। হাওয়া বুঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ। তাকানো দেখে বোঝা যাবে না মনে কি আছে।

* * *

এর ঠিক দু'দিন পরে। জায়গাটা হচ্ছে লন্ডন। দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। একজন টুইড, অপরজন মার্টেল। কথা প্রসঙ্গে টুইড মার্টেলকে বলল, বুঝলে খুনটা বেশ নৃশংস। ঝুঁকি নিয়েই করা হয়েছে।

ওয়ার্নার পাওয়ার বোট-এ সাগরের বুক চিরে এগোতে এগোতে সবেমাত্র বন্দর ছাড়িয়েছে। সামনেই ডানদিকে পাথরের একটা সিংহমূর্তি আর বাঁদিকে বিরাট উঁচু লাইট হাউস। মাঝখান দিয়ে স্পীডে এগিয়ে চলেছে ওয়ার্নার-এর পাওয়ার বোট। হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো।

ওয়ার্নার-এর বয়স চল্লিশ। পাতলা—চেহারা। ছটফটে, হাসিখুশি স্বভাবের। পরনে একটা জার্মান স্যুট। মাথায় টুপী। সামনেই লেক। দূরে তাকালো ও। না, সন্দেহজনক কিছু নয়।

বিকেলের সোনালী সূর্যের আলোয় মাখামাখি সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল বালিয়াড়িতে। অদূরে ভেসে চলেছিল হাল্কা পালতোলা নৌকো। বেশ কিছু দূরে লিবেনটিন আর সুইজারল্যান্ডের বরফ ঢাকা পাহাড়ের দুটো অসমান চুড়ো। ওয়ার্নার দূরে তাকালো। তার চোখে পড়ল দুটো সাদা রঙের স্টীমার। যেগুলো ছুটে চলেছে জার্মান শহর কোনস্ট্যানজের দিকে।

সমুদ্রের স্বচ্ছ, নীলচে জল। বাতাসের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তার ওপরে নানা ধরনের নক্সা তৈরী করছে। রহস্যময়, ঠিক ঐ জায়গাটায় কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে। মোট ছ'জন। বাতাস কাটতে কাটতে ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'এই তোমরা চলে যাও।' ওয়ার্নার একভাবে তাকিয়ে চীৎকার করে ওদের বলল। নিজের ইঞ্জিনটা খানিকটা পিছিয়ে নিল। সবাই সুগঠিত চেহারার যুবক। পরনে স্নানের পোশাক। দু'জনের সোনালী চুল। ওদের নৌকোগুলো ধনুকের মতো। ওয়ার্নার অনুভব করল তার নৌকো তটরেখা থেকে আর আধমাইল। ওরা ছ'জন চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওয়ার্নার নিজের বোটটা থামিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, 'এই তোমরা চলে যাও এখান থেকে।'

চীৎকার করে বললেও, তখনও ওয়ার্নারের মনে কোন রকম বিরক্তির প্রকাশ ছিল না।

কিন্তু ওরা ক্রমশঃ আরো কাছে আসতে লাগল। তখন ওয়ার্নার তাড়া করে খানিকটা এগিয়ে গেল। সোনালী চুলের লম্বা যুবকটি বোটের একেবারে কাছে। তার বাঁহাতে পাল আর ডান হাতে ছুরি। ওয়ার্নার বিপদ বুঝে সাবধান হবার আগেই ওরা ওর বোটটাকে ঘিরে ফেলেছে। যুবকটি লাফিয়ে ওর পাওয়ার বোটে চলে এলো। আর ওকে লক্ষ্য করে মুহূর্তের মধ্যে কোণাকুনি ভাবে ছুরিটা চালালো। ইতিমধ্যে পাঁচখানা নৌকা ওকে মাকড়সার জালের মতো ঘিরে ফেলেছে। দূরে কোথাও জল পুলিশ আছে কিনা সে ব্যাপারে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

ওদের চক্রব্যূহ ভেদ করে পাওয়ার বোটটা নজরে আসা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। ততক্ষণে

সোনালী চুলের যুবকটি কসাই-এর কাজ সেরে লাফিয়ে নিজের নৌকোয় উঠে গেল। আর সবাই মিলে দ্রুত নৌকাগুলো চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদূরে অস্ট্রিয়ার সীমারেখা। দেখা যাচ্ছে শুধু ধূ ধূ তীরভূমি।

* * *

এতো অনেকবার ছুরি মারা হয়েছে। উন্মাদ না হলে এরকম ভাবে কেউ খুন করে না। শরীরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

কথাগুলো বলছিলেন পুলিশ সার্জেন্ট ডরনার। আর মৃত ব্যক্তিটি হলো চার্লস ওয়ার্নার। পাওয়ার বোটটার ভেতর ওর নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে ছিল।

সার্জেন্ট ডরনারের জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ওর সঙ্গে কমবয়েসী পুলিশটা লাশটার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করছিল।

হঠাৎ পায়ের কাছে কিসের একটা স্পর্শে ওর ভুরু কুঁচকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুড়িয়ে পকেটে চালান করল। ত্রিকোণাকৃতি অনেকটা ডেলটার মতো একটা ব্যাজ। ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে থাকা দেহটার দিকে আর একবার দেখলো। লাশটার পকেট থেকে বার করা ওয়ালেট থেকে ডরনার পাসপোর্টটা বার করলো। তারপর আবার বলে উঠলো—লোকটা ইংরেজ। আরে ব্যাগটায় তো অনেক টাকাও আছে দেখছি।

—ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি...।

অসমাপ্ত বাক্যটা ডরনারের সহকারী বুস বলে উঠলো। ততক্ষণে মৃতদেহের চোখ দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খানিকক্ষণ পরে ও আবার বলে উঠলো শয়তানগুলোর তো কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে...।

ডরনার বলল, কিন্তু এই ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে এক সেকেন্ডের বেশী লাগত না।

একটু থেমে বলল, অদ্ভুত রকমের খুন। কথা বলতে বলতে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ ব্যাগের মধ্যে একটা প্লাস্টিক কার্ড নজরে পড়ল। অনেকটা ক্রেডিট কার্ডের মতো। সবুজ আর লাল ডোরাকাটা। কার্ডটা দেখে ডরনার বুঝলো ওটা ক্রেডিট কার্ড নয়। আর পাঁচ অক্ষরের একটা কোড নম্বর, যেটা লন্ডন শহরকে বোঝায়।

বুস বলে উঠলো, ব্যাপার কি?

ডরনারের মুখ দেখে বুস অনুমান করছিল সমস্যা বেশ জটিল। ডরনার কার্ডটা ওয়ালেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে কি যেন ভাবছিল। খানিক পরে ও আর বুস দু'জনেই পাওয়ার বোটের একেবারে নিচে এসে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

—ব্যাপার গোপন রাখতে হবে। প্রথমেই আমাদের পুলাকে বি. এন. ডি-তে জানাতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি...।

—তার মানে ও...।

—আমি কিছুই মনে করতে চাইছি না। কিন্তু লন্ডনের লোকেরা রাতের আগেই সমস্ত কিছু জানতে চাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে, আর সেটাই আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।

* * *

পুলিশ লঞ্চের ওপরের দিকটায় সার্জেন্ট ডরনার দাঁড়িয়েছিল। লিন্ডাউ বন্দরে ওদের লঞ্চটা ক্রমশ এসে পৌঁছেছিল। লাশটা একটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। একটা শক্ত দড়ি দিয়ে পাওয়ার বোটটা লঞ্চটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। ডরনার চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

মৃতদেহের পিছন দিকটা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় ডরনার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কথাটা বুসকেও জানায়নি সে।

—ঐ ছয়জন অপরাধীকে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখো। ওরা সম্ভবত এখন এই তীরভূমিতেই এসেছে। খুব কাছাকাছি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাবধান ওরা সবাই সশস্ত্র।

ডরনার তার রেডিও অপারেটরকে সংকেতে কথাগুলো জানালো। ওরা ততক্ষণে লিন্ডাউ-এ

দ্বিতীয়বারের সফর আরম্ভ করেছে। এদিকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে তখন সংকেত পাঠানো হচ্ছে।

—আমার মনে হচ্ছে ওর পেছনে কয়েকটা অদ্ভুত চিহ্ন আছে।

ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে বুস মন্তব্যটা করলো। লঞ্চ ততক্ষণে বন্দরের কাছে এসে গেছে। বুস সাইরেন বাজালো।

—প্রায় অনেকটা, কিছু একটা চিহ্নের মতো। কিন্তু কিসের চিহ্ন কে জানে। জায়গাটায় এত বেশী রক্ত জমেছিল যে...।

—তুমি তোমার কাজ করে যাও, বিরক্তির সঙ্গে ডরনার কথাটা বলল।

সূর্য ক্রমশ নিম্নগামী। চমৎকার পরিবেশ। ওরা ছোট্ট বন্দরটায় আস্তে আস্তে পূর্ব দিকের অভিমুখে এগোতে লাগল। ওখানে লঞ্চ দাঁড়ানোর জায়গা। ডরনার সকলের চোখ এড়িয়ে মৃতদেহটাকে কিভাবে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যায় তাই ভাবছিল। চার্লস ওয়ার্নারের দেহটা ইতিমধ্যেই পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিয়েছে। সুতরাং উতলা হবারও প্রয়োজন নেই।

* * *

পুরানো ধাঁচের সিন্ডাই শহরটার বাড়িঘরগুলো মধ্যযুগীয় ধরনের। কোনট্যানজ লেকের শেষপ্রান্তে পূর্বদিকের দ্বীপটায় অনেক সরু সরু রাস্তা আছে। গাড়িতে বা ট্রেনে এ জায়গায় আসার জন্য দুটো আলাদা রাস্তা আছে। সৌখিন হোটেলও আছে।

পাতলা চেহারার তীক্ষ্ণ মুখের এক যুবক দাঁড়িয়েছিল। পরনে জিনসের প্যান্ট আর শার্ট, বয়স কুড়ি বছর। যুবকটি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত। আনমনে ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল সে। বন্দরের পুলিশ লঞ্চটার দিকে একবার তাকালো। হঠাৎ চোখ পড়ল পেছনের দিকে পাওয়ার বোটটার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দ্রুত একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। হাত ঘড়িটা দেখে নিল।

ফোনের বুথের সামনে পৌঁছে সে ঢোকার আগে আর একবার দেখে নিল সামনের অফিসটা থেকে কেউ আসছে কিনা।

নিশ্চিত হয়ে ও একটা নম্বর ডায়াল করল। কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটা যুবতী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ও বলল, আমি এডগার ব্রাউন বলছি।

অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো, আমি ক্লারা, হাতে একদম সময় নেই, এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি...।

যুবক 'হুঁ' বলে খানিকক্ষণ থেমে বলল, তোমাকে জানাচ্ছি যে আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারটা অবশেষে পৌঁছে গেছে।

—এত তাড়াতাড়ি?

পাওয়ার বোটের মধ্যে একটা দেহ রয়েছে শুনে ক্লারার কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

—তুমি নিশ্চিত তো, ক্লারা প্রশ্ন করলো।

—নিশ্চিত না হয়ে আমি কিছু বলিনা, তুমি কি সবকিছু জানতে চাও?

—না-না। অত তাড়াহুড়োর কি আছে? যাইহোক জানানোর জন্য ধন্যবাদ...। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ক্লারা।

—আমার ফি? ব্রাউন গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে দিল।

—দাঁড়াও, পোস্টঅফিস থেকে নিতে হবে। দিন দু'য়েক সময় লাগবে। মনে রাখবে তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাজটা অত সোজা ভেবো না। ব্রাউনের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে গেল।

ক্লারা ফোনটা ছেড়ে দিল। ফোনটার দিকে তাকিয়ে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বুথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। ব্রাউন নিজের লক্ষ্য রাখার ব্যাপারটা ভালই জানে। কিন্তু ক্লারার সঙ্গে ওর আলাপই হয়নি। যে সংস্থার হয়ে ও গুপ্তচরের কাজে নেমেছে, তাদের ব্যাপারে ও কিছুই জানেনা। ক্লারার নম্বরটা অবশ্য স্টাটগার্ট-এর।

* * *

স্টাটগার্টের চমৎকার পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। সাতাশ বছরের আকর্ষণীয়া ক্লারা ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখ পরখ করছিল। আগে মডেলিং পেশায় ছিল। শহরের সেরা পার্লারে চুলের পরিচর্যা করে। ওয়ারড্রোবে ওর যা পোষাক আছে তা অন্যের ঈর্ষার বস্তু।

ওর চোখ দুটো গভীর কালো, আবেদনময়ী।

ঠোঁটের সিগারেটটা নিয়ে নিজের সাদা ফোনটা ধরবে কিনা ভাবছিল, তারপর অ্যাপার্টমেন্টের মালিককে ডাকলো। এরপর আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ার একটা নম্বর ডায়াল করল।

ঠিক তারপরই উত্তর-পূর্ব লিন্ডাউ-এর কয়েক মাইল ভেতরে অনেকটা দুর্গের মতো একটা ফার্মের মধ্যের একটা কক্ষে চামড়ার একটা হাত রিসিভার তুললো। সেই হাতের আঙুলে একটা হীরের আংটি শোভা পাচ্ছে। বাঁদিকের রিস্টে নামকরা কোম্পানীর দামী রিস্টওয়াচ।

—হ্যাঁ, বলছি।

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঐ বাক্যটা উচ্চারণ করলো। এ প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, ক্লারা বলছি।

—হ্যাঁ। আমি যে লোমের পোষাকটা পাঠিয়েছিলাম পেয়েছেন তো? ভাল। আর কোন খবর?

ক্লারা খানিকটা ইতস্ততঃ করে ব্রাউনের খবরটা জানালো।

—তুমি বলছো তাহলে, ওটা এসে পৌঁছেছে?

—হ্যাঁ। আমি জানি এবার তুমি খানিকটা পেয়েছ।

কিন্তু ষাট বছরের বৃদ্ধ মানুষটা মনের প্রতিক্রিয়া গোপন করে গেল। ভীষণ সতর্কতার প্রয়োজন। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহটা খুঁজে পেয়েছে।

পরিকল্পনামত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ওটা ওয়ার্নার-এর দেহ এবং ওটা পুলিশের হেফাজতে। সূত্র অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

—তুমি নিশ্চিত? খুব তাড়াতাড়ি...।

একটু কাঁপা কণ্ঠস্বরে ক্লারা বলল, আমি তো ওখানে ছিলাম না ..। আমি তো তোমাকে বললাম পাঁচ মিনিট আগে আমাদের লোক কি বলল...।

সেই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, যাইহোক, তুমি মনে রেখো যে, আমার সঙ্গে কথা বলছো!

এই কথাটা বলে রিসিভার রেখে সোনার লাইটারে চুরুট ধরালো।

ওদিকে ক্লারা বিরক্তির সঙ্গে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ফোন কেটে গেল। ক্লারার সমস্ত খরচ-খরচা ওই বহন করে। তবুও...।

ক্লারা গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরিয়ে খানিক বাদে আয়নায় মুখ দেখতে লাগলো। সমস্যা এখন সেই মিলিওনিয়ার শিল্পপতি। ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদও বটে। ক্লারা জানে যে সে পশ্চিম জার্মানীর একজন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে যুক্ত।

* * *

মঙ্গলবার ছাব্বিশে মে ঃ

টুইড ওর অফিসের দোতলার ঘরে বসেছিল। অদূরেই রিজেন্টপার্ক। মোটা লেন্সের চশমা দিয়ে দেখছিল, চার্লস ওয়ার্নার-এর মৃতদেহটা থেকে লিন্ডাউ জলপুলিশ সবকিছু খুলে নিচ্ছে।

ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার কেন্দ্রস্থলটা ওয়াটারলু স্টেশনের একেবারে গায়ে কংক্রীট বিল্ডিং। ভেতরটা অবশ্য জর্জিয়ান বিল্ডিং-এর মত। বেশীরভাগ অংশই পেশাদার ইনস্টিটিউশনগুলোর এক্তিয়ারে আছে।

কিন্তু জায়গাটার একটা সুবিধে যে এই বিল্ডিং থেকে বাইরে এসে যে কোন দিকে চলে যাওয়া

যায়।

কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখার সবচাইতে ভাল উপায় হল রিজেন্ট পার্ক। রিজেন্ট পার্কে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কাউকে অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।

খানিক এগোলেই রিজেন্ট পার্কের প্রবেশ পথ মাটির নীচে চলে গেছে। কেউ যদি এখানে অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে লিফ্‌টে উঠতে হবে।

টুইড মৃদু স্বরে বলল, মানুষটা সঙ্গে কি বয়ে বেড়াচ্ছিল, সত্যিই মর্মান্তিক।

ও ছাড়াও ঘরে আরও একজন ছিল, নাম কেইথ মার্টেল। ও আপন মনে সিগারেট খাচ্ছিল। টুইড-এর মন্তব্যে ও খানিকটা অবাকই হলো।

ওদের দু'জনের মধ্যে বয়সের ফারাকটা অন্ততঃ বছর বিশেকের। মারটেল লম্বা সুগঠিত চেহারার। চোখমুখে একটা দৃঢ়তার ভাব। জেদী স্বভাবের। বয়স উনত্রিশ। নাকের গঠন রোমানদের মত।

—কালো রঙের হোল্ডারে পরপর সিগারেট খেয়ে যায়। কথা বলে জার্মান ভাষায়। এছাড়া ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষাতেও দক্ষ। হাল্কা বিমান ও হেলিকপ্টার চালানোয় পারদর্শী। সাঁতারও কাটে মাছের মত।

—স্বাভাবিক ভাবেই সবকিছু ঘটে। খারাপ হতেই পারে। এটাকেও ধরতে হবে বৈকি। ও বলে উঠল।

রহস্যময় স্বভাব, ওকে সঠিক আসনে বসিয়েছে। সমস্যা সমাধানে ওর খ্যাতি খুবই। কিন্তু ওর তীব্র আচরণেই ওকে এড়িয়ে নতুন একজনকে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রির প্রধান করা হয়েছে। নতুন সুপ্রীম ফ্রেডারিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড টুইডের সঙ্গে কিছু রহস্যাবৃত আলাপ হয়। তখন বেশ অপছন্দই করেছিল।

—এসব কি করে করলে কেইথ?

টুইড কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের ফাঁকে ওয়ার্নার-এর জিনিষপত্রের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। মার্টেল কতকগুলো কাগজের টুকরো তুলে নিলো। তার মধ্যে কিছু টিকিটও আছে। সবগুলোই ওয়ার্নারের ওয়ালেটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেছে।

ওয়ার্নারের ওয়ালেটে নানারকম অদ্ভুত সব জিনিসপত্র ভর্তি ছিল। সে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিল। মার্টেল জানে ব্যাপারটা মোটেই তুচ্ছ করবার নয়। ওয়ার্নার জানতো, তার যদি কিছু ঘটে বা সে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে তার কাছ থেকে কোনরকম 'ক্লু' যাতে কেউ না পায় সেরকমই করা উচিত।

—ও জার্মানীতে কি করত? মার্টেল জিজ্ঞেস করল।

—ঋণের ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল। আমি এবং এরিখ স্টোলারও রয়েছে। এরিখের কাছে আমি সত্যিই ঋণী। ওর প্রয়োজন ছিল এমন একজন বাইরের লোক যে একজন জার্মানীকে ব্যাভেরিয়ার ডেলটায় ঢুকিয়ে দিতে পারবে। এটা নয়া-নাজীদের ব্যাপার। ওরা খুব কৌশলেই নিজেদের আইনের ভেতর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেজন্যই ওদের ব্যান করা যায়নি।

বি. এন. ডি.—এটা জার্মান নামের আদ্যক্ষর। এটি জার্মান ফেডারেল সিক্রেট সার্ভিস। এদের হেডকোয়ার্টার মিউনিখের কাছাকাছি। টুইড পকেট থেকে কিছু একটা বের করতেই ডেস্কে পড়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হলো। ও সেটার দিকে তাকালো। অনেকটা ডেলটার মত দেখতে ত্রিভুজাকৃতি একটা রূপোর ব্যাজ।

—স্বস্তিকার আধুনিক সংস্করণ? টুইড মন্তব্য করলো। একটু ভেবে তারপর বলল, এই ব্যাজটা ওয়ার্নার-এর দেহ থেকে পাওয়া গেছে। খুনী অবশ্যই এটা না ভেবে-চিন্তে ফেলে দিয়েছিল।

—কেমন করে ও খুন হলো?

—খুবই নৃশংসভাবে। বলে টুইড নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। তারপর বললো, বি. এন. ডি. প্যাথোলজিস্ট-এর রিপোর্টে বলেছে, ওয়ার্নারকে এক বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে পঁচিশবার ওর দেহে আঘাত করা হয়েছে। তারপর ওর দেহের পেছনে ওদের ট্রেডমার্ক 'ডেলটা' এঁকে দেয়।

—এই ডেলটার ব্যাপারটা আমরা ভাবছি...।

—এটা একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী চিহ্নিত করেছে। তার নাম স্টোলার। এখনও আমার কাছে আসেনি ও। লিন্ডাউ-এর বন্দরে একটা উঁচু টেরাসে কিছু জার্মান ট্যুরিস্ট বসেছিল।

মার্টেল বলে উঠল, কিরকম যেন মনে হচ্ছে।

এরপর ও একটা জার্মান নাম উচ্চারণ করলো।

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি তো লিন্ডাউ বলে অদ্ভুত জায়গাটা চেন। ম্যাপে জায়গাটা আমি দেখেছি। ওপর থেকে জায়গাটা ভেলার মতো দেখতে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দুটো ব্রীজ দিয়ে যুক্ত রয়েছে...।

—একটা রোর্ড ব্রীজ আর একটা রেল চলাচলের রাস্তা আছে। অবশ্য ওখান দিয়ে সাইকেল, ট্রাকও যেতে পারে।

—বাঃ, তোমার দেখার প্রশংসা করতে হয়। টুইডের বক্রোক্তি মার্টেল খেয়াল করল না। টুইড তার প্রচণ্ড উদ্বেগ গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

—যা বলছিলাম..., একজন জার্মান ট্যুরিস্ট, ওয়ার্নার যখন বোট নিয়ে লেকে ঘুরছিল, তখন বাইনোকুলার দিয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। তারপর ও ছ'জন 'উইন্ড সার্কার'-কে এগিয়ে আসতে দেখল। ওয়ার্নারের কাছে এসে ওর পাওয়ার বোটটা থামালো। বাইনোকুলার দিয়ে একভাবে দেখে যাচ্ছিল ও। ওয়ার্নার হুইলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিপদ বুঝে সতর্ক হয়ে জলপুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। ওদের লঞ্চ টেরাসের নীচে।

এরপর ও স্টোলারের রিপোর্টটা দেখল। তারপর বলল, ভবনার তখন সমুদ্র দেখছিল...।

—বাকিটা অতীত, দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস, তাই না?

—হ্যাঁ তাই। আমি চাই তুমি এবার এগোও।

* * *

ফ্রেডরিখ অ্যান্টনী হাওয়ার্ড কোনরকম শব্দ না করেই হাওয়ার মতো অফিসে এলো।

ওর সঙ্গে ম্যাসন ছিল। নতুন কাজে লেগেছে। ম্যাসনের চোখদুটো তীক্ষ্ণ আর ক্ষুধার্ত। ও চুপচাপ ওর চীফ-এর পেছনে অনেকটা কমিশনার-এর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

—টুইড আমার মনে হয় তুমি জানো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভিয়েনাতে কনফারেন্সে যাচ্ছেন। সুতরাং ওর নিরাপত্তার জন্যে আমাদের সক্রিয় লোকের প্রয়োজন। তাই তো?

ও বলার সময় সক্রিয় কথাটার ওপর জোর দিল যার অর্থ মার্টেলকে রাখা যায় টুইডকে বাদ দিতে হয়। অসংযত মেজাজের হাওয়ার্ডের মুখটা চওড়া। বয়স পঞ্চাশ হলেও সুগঠিত চেহারা ও অত্যন্ত কুশলী। মেয়েদের কাছে শয়তান বলে খ্যাতি আছে।

আসল কথা ওর স্ত্রী সিনথিয়া দেশের একটা 'ছোট কুঠুরিতে' থাকে। ও নাইটব্রীজে 'পিয়েডএডেরা' ভাড়া নিয়েছে। ওটাও খুব একটা সুবিধেজনক নয়। টুইড-এর ব্যক্তিগত মন্তব্য উচ্ছন্নে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝায়।

—ঐ জায়গাটায় আমি একসময় ছিলাম। তাও সঙ্গে যখন মেয়ে আছে তখন একটা ঘর...।

—এইগুলো কি? হাওয়ার্ড ওয়ালেটটা দেখতে দেখতে বলল। মার্টেল ততক্ষণে কাগজের টুকরোগুলো পকেটে পুরে নিয়েছে। হাওয়ার্ড ঘরে ঢুকে এল।

—হুঁ। টুইড মৃদু হেসে বলল। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চার্লস ওয়ার্নার-এর নিজস্ব ব্যাপার-স্যাপার সব। বি. এন. ডি. যদি দয়া করে মিউনিখ থেকে লন্ডনে আসে, তবে আমরা তদন্তের কাজটা তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারি।

টুইড চশমাটা খুলে মুখে আবার পরে নিল। হাওয়ার্ড-এর সামনে চশমা ছাড়া ওর অস্বস্তি হয়।

—বুড়ো বয়সে আমরা একটুতেই রেগে যাই, হাওয়ার্ড হালকা মেজাজেই কথা বলল।

—লোকটা মৃত, টুইড আবার বলল।

—তোমার কাজ আমার পছন্দ হচ্ছে না। যতটা করেছ ততটাই ভাল। হাওয়ার্ড কথাগুলো বলে জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো।

—আমি জোর দিয়ে বলছি, আর এক সপ্তাহের মধ্যে প্যারিস থেকে ভিয়েনায় যে সমিট এক্সপ্রেস আসবে তাতে সক্রিয় কর্মীরা থাকবে। মঙ্গলবার দো'সরা জুন...।

টুইড-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমার কাছে ক্যালেন্ডার রাখবো।

হাওয়ার্ড প্রথমে টুইডকে ভুরু কুঁচকে তারপর মার্টেলকে দেখল। মার্টেল এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ সিগারেট টানছিল। হাওয়ার্ডের উপস্থিতিতে কেউ এরকম অভ্যাস করে এটা হাওয়ার্ডের পছন্দ নয়।

—আচ্ছা। ও জোর দিয়ে বললো।

মার্টেল হাওয়ার্ড-এর দিকে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

—আমি অন্য জায়গায় ব্যস্ত, ও বলে উঠলো। হাওয়ার্ড টুইডের দিকে ফিরল, শীতল দৃষ্টি।

—এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। আমি মার্টেলকে আমার নিরাপত্তা বিভাগে নিচ্ছি। ও ভাল জার্মান...।

—কেন ও ব্যাভেরিয়া যাচ্ছিল। টুইড বলল, আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল পৃথিবীর ঐ অংশে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে চলেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে ওয়ার্নার খুন হল কেন?

হাওয়ার্ড ম্যাসনের দিকে তাকাতে দেখল ও যেন কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করতে উদ্যত কমিশনারের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে।

—আমি কি ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে পারি?

বি. এন. ডি. এরিখ স্টোলার আর আমি নিজে। টুইড একটু জোর দিয়েই বলল কথাটা। 'হাওয়ার্ড'-এর কাছ থেকে এখন যাওয়া প্রয়োজন।

—মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ব্যাভেরিয়ান রহস্যের পুরো ভারটা আমি নিচ্ছি। আমি যেমন বুঝবো স্টাফকে নিয়ে পুরো ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করাবো। আর একটা ব্যাপার, সামিট এক্সপ্রেস ভিয়েনা থেকে চারজন উঁচু দরের পশ্চিমী নেতাদের নিয়ে আসছে। ব্যাভেরিয়া দিয়ে যাবার সময় ওরা কি সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবে?

* * *

ওরা আবার একা হয়ে গেল। মন্ত্রীদের বিশেষ আলোচনা শোনার জন্যে হাওয়ার্ড অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই ম্যাসনও নীরবে ওকে অনুসরণ করলো।

—আমার ব্যাপার ও মনে রেখেছিল, মার্টেল বলল।

—ঠিক আছে। কে?

—ঐ যে নতুন ছেলেটা, ম্যাসন। রাস্তা থেকে সে ওকে নিয়ে এসেছিল।

টুইড বলল, এক্স স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। থামলো। আবার বলল, হাওয়ার্ড ওকে রীতিমত ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়োগ করছে। আমার ধারণা ও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে আগে থেকে ওৎ পেতে ছিল।

—যে সব লোক আবেদন করেছিল তাদের আমরা নিইনি। মার্টেল হিসহিসিয়ে বলে উঠল।

—ওয়ার্নার এর হদিশ তুমি কিভাবে সংগ্রহ করছো? মন দিয়ে স্টোলার-এর লোকের তোলা এই ছবিগুলো দেখো। দুটোতেই ওয়ার্নারের পেছনে ডেলটা পার্টির প্রতীক পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে।

—ডেলটা অর্থাৎ নয়া নাজী।

মার্টেল ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, ডেলটা রেইনহাড দিয়েত্রিচ নামে একজন মিলিওয়নার ইলেকট্রনিক্স শিল্পটি চালাচ্ছে। এছাড়াও ব্যাভেরিয়ান স্টেটের ইলেকশান অফিস চালাচ্ছে যা...।

—চৌঠা জুন, বৃহস্পতিবার, সামিট এক্সপ্রেস যেদিন ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করেছিল তার আগের দিন।

টুইড বলে উঠলো, একটা কিছু আছে যা দিয়ে হাওয়ার্ড-এর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। তুমি জান কেইথ, আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, তা হলো সমস্ত ব্যাপারটার, পরস্পর

সংযুক্তি—এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করা, স্টেট ইলেকশান, আমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই ওয়ার্নারের খুন হওয়া। সমস্ত কিছু।

মার্টেল ডেস্কের ওপরে ছবিগুলো রেখে দিল। তারপর পকেট থেকে লুকানো কাগজের টুকরোটা বের করতেই হাওয়ার্ড ঘরে ঢুকল। ও ওটা লুকিয়ে ফেলেছিল।

—জুরিখ থেকে আরম্ভ করবো। কি কারণে ওয়ার্নার খুন হলো এটা বের করতে হবে।

—জুরিখ কেন? আমি তো তোমাকে দেখয়ে ছিলাম মিউনিখ থেকে জুরিখের একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর লিন্ডাউ থেকে মিউনিখ। কিন্তু...।

—হুঁ, এই ছেঁড়া কাগজের টুকরো। চালিয়ে যাও। লক্ষণ ভালই।

টুইড আতস কাঁচ দিয়ে টুকরোটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলো। এই টিকিটে প্রিন্ট করা আছে, লিজেন্ড ভি. বি. জেড. জুরি...লিনি। বেগুনী অংশটায় 'রেনওয়েগ—আগস্ট শব্দগুলো পাঞ্চ করা আছে। দামও লেখা আছে।

—প্রথমবার যখন আমি জুরিখে ছিলাম, আমি নিশ্চিত যে, তোমার কাছে একটা ট্রামের টিকিট ছিল। মার্টেল বলল, ট্রামের রুটটা ছিল বনহফট্র্যাসি থেকে রেনওয়েভা। হুঁ, ওয়ার্নার শহরের ভেতরে কেন ঘোরাঘুরি করছিল? কোথায় যাচ্ছিল? ও তো সময় নষ্ট করার লোক নয়।

টুইড ওর কথায় ঘাড়টা নাড়লো। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা ফাইলের ভেতর থেকে ছোট্ট কালো নোটবুক বের করল। ওর একটা পাতায় আঙুল টিপে ধরে ড্রয়ারের চাবিটা দোলাতে লাগল।

—আমার ধারণা তুমি জান যে হাওয়ার্ড, যতক্ষণ না সবাই বাড়ি যায়, বসে থাকে, তারপর ও ভ্রমণে বেরোয়। ভেবেছিল কিছু একটা পাবে যা ওকে বলা হয়নি। ও নিজের স্টাফ-এর পেছনেই গোয়েন্দাগিরি করতে বেশী সময় দেয়। তারপর অপর পক্ষের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে। ওর হাত শক্ত রাখতে ব্যাপারটা...।

—তুমি সব চাইতে দামী কাজটা করে ফেলেছ।

মার্টেল বলে উঠলো, অনুমানটা দারুণ। আমি কি তুরুপের তাসটা দেখতে পারি?

ওয়ার্নার-এর ব্যাপারে স্টোলার দ্রুতবেগে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। টুইড ছোট নোটবুকটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে উঠলো, একমাত্র আমিই জানি ওয়ার্নারের কাছে দুটো নোটবুক থাকত। বুকপকেটের ভেতর যে বড় নোটবুকটা থাকতো ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। যে বদমাইশটা ওকে আঘাত করেছিল, সেই ওটা হাপিস করেছে। অর্থহীন সব ব্যাপার। ব্যাটা গোপন পকেটে রেখেছিল। স্টোলার লিন্ডাউ থেকে যখন আসছিল তখন ও নিজে দেখেছে। এর আগে জলপুলিশের ডরনারের কাছে সব শুনেছিল।

—আমি কি ওটা একটু দেখতে পারি?

—তোমার জিভটা খুবই ধারালো, বলে টুইড নোটবুকটা ওকে দিলো। মার্টেল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কতগুলো খাপছাড়া টাইপের শব্দ দেখতে পেল। মিউনিক, জুরিখ, ডেলটা, ওয়াশিংটন ডিসি, অপারেশান ক্রোকোডাইল প্রভৃতি।

—চার্লস...?

—ওরা সবাই ওয়ার্নারকে চার্লস বলে। মনে হচ্ছে চার্লস মেইন স্টেশনগুলিতে ছিল। হাউপটব্যানহফ...মিউনিক...জুরিখ। কেন? যদি জুরিখের সঙ্গে 'ডেলটা'-র কোনরকম সম্পর্ক থাকে তাহলে অদ্ভুত ব্যাপার কোন্‌টা? বলতে পারো?

টুইড বলে উঠল, ডেলটা হচ্ছে অফিসিয়াল নয়া-নাজী পার্টি। এদেরই প্রার্থী ব্যাভেরিয়ান স্টেট ইলেক্‌শানে দাঁড়াচ্ছে।

—কিন্তু এরা আন্ডার গ্রাউন্ডেও কাজ করে। একটা গুজব আছে ডেলটা দলগুলো উত্তর-পূর্ব সুইজারল্যান্ডে অপারেশন চালাচ্ছে ; সেন্ট গ্যালেন আর অস্ট্রিয়ান বর্ডার-এর ঠিক মাঝখানে ওদের কারবার। সুইস কাউন্টার এসপিয়নেজ দার্দি অ্যার্নল্ড ব্যাপারটায় বেশ চিন্তিত...।

—আমাদের সমর্থন করাটাই অনেক? দিচ্ছে? মার্টেল জিজ্ঞেস করলো।

—খুব সতর্কভাবে। সুইস পলিসি তুমি তো জানো? নিরপেক্ষ থাকতে চায়। সেজন্য ওরা খুব

সাবধানে...।

—'ঐখুনেগুলো ওয়ার্নারের কি করলো দেখ। আর এই ক্লিন্ট লুসিসটা কে? ওয়াশিংটন ডি. সি.?

টুইড ঘোরানো চেয়ারটাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ক্লিন্ট আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু, প্রাক্তন সিয়া। পরে টিম ও মিয়েরা ওকে বার করে দিয়ে নিজেই এখন সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হয়েছে। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামিট এক্সপ্রেসে ভিয়েনা যাত্রার কোন নিরাপত্তা রইল না।

—হাওয়ার্ড যদি এর বিপক্ষে থাকে তাহলে বি. এন. ডি-র সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ফান্ডের বেশীরভাগটা কে দেবে?

—বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলার। প্রচুর পয়সাওয়ালা লোক ও। ডেলটা একটা ক্ষতচিহ্ন...।

—তাহলে চার্লস যেরকম গোপন স্বভাবের, সেই রকমই তোমাকে না জানিয়ে মিউনিক থেকে ওয়াশিংটনে দ্রুত...।

ওকে থামিয়ে দিয়ে টুইড সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি, কিন্তু কেন, বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু আমরা তো অন্যকিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তাই না?

ওয়ার্নারকে যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে এতো দেখাই যাচ্ছে।

কথাটা বলে নোটবুকটা দেখতে দেখতে বলল, সেন্ট্রালহক। হুঁ দেখা যাক্।

চেয়ারে বসা টুইডের দৃষ্টি চশমার মধ্যে নির্লিপ্ত। এর অর্থ মার্টেল জানে যে, এখন ও এমন কিছু বলতে যাচ্ছে যা ও পছন্দ করেনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল।

টুইড স্বাভাবিক ভাবে বলল, তুমি এই ব্যাপারটায় আমাকে কিছু সাহায্য কর কেইথ। ওয়ার্নারকে জীবিত দেখেছে যে সেই শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ফার্ডি আর্নল্ড ও আমাদের খুবই সাহায্য করেছে।

—ও অর্থাৎ মহিলা?

—হুঁ, মহিলা। ক্লেয়ার হফার। ও থাকে জুরিখে। মেয়েটার মা ইংরেজ বাবা সুইস। ও সুইস সার্ভিসে যোগ দিয়েছিল। সেন্ট্রালহক ৪৫। সুতরাং রেফারেন্স থেকে অনুমান করা যায়...।

—মনে হচ্ছে ওয়ার্নারের নোটবুক রাখার কারণ হচ্ছে ওর সন্দেহজনক ব্যাপারগুলো...।

—তুমি যা সাহায্য পেয়েছ সব কিছুই প্রয়োজনে লাগতে পারে...।

—সমস্ত সাহায্য আমি বিশ্বাস করতে পারি...।

টুইড একটু জোর দিয়েই বলে উঠলো, মেয়েটা একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

—ব্যাপারটা বোঝ...। মার্টেল বলে উঠলো, ওয়ার্নারকে এমন কেউ খুন করেছিল যাকে ও বিশ্বাস করেছিল এবং সে জানত ও সুইজারল্যান্ড অতিক্রম করছে।

একটু থেমে আবার বলে উঠল, এখন তুমি আমাকে আবার বলো যে, কেউ স্টোলার বাইরের সাহায্য চেয়েছে।

কারণ ওভাবে, বি. এন. ডি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। যেখানেই তুমি যাও না কেন সব জায়গাতেই একটা সন্দেহের মেঘ। দোসরা জুন, মঙ্গলবার, রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়ছে। আর সাতদিনে, রহস্য ভেদ হচ্ছে।

* * *

বুধবার, সাতাশে মে ঃ

'জেনেভাগামী মিঃ কেইথ মার্টেলকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি যেন তাড়াতাড়ি সুইস এয়ার রিসেপশনে ডেস্কে চলে আসেন...।

ট্যানর থেকে খবরটা এলো। মার্টেল হিথরো বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ছিল। যাবার সময় হয়ে এসেছে। ঠিক সেই সময় খবরটা শুনে ও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামলো। ওখান থেকে সুইস

এয়ারের রিসেপশন ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। ওখানে আরো দু'জন যাত্রীকে ডাকা হলো। ও উল্টোদিকে যাচ্ছিল।

সুইস এয়ার হোস্টেস তাকে জরুরী ফোন আসার খবরটা জানাতেই ও এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরতেই মেয়েটা সামনে থেকে চলে গেল।

টুইডের ফোন, কণ্ঠস্বরে সতর্কতা। প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সেরে মার্টেল কাজের কথায় এলো।

—কি ব্যাপার? তুমি আমার নাম ব্রডকাস্ট করেছ। এই টার্মিনালের প্রত্যেকটা হারামজাদা আমার নাম জেনে গেল...।

—আমি জেনেভায় যাওয়ার ব্যাপারটা পাল্টেছি। ওখানে কে...।

—অনেক ধন্যবাদ। আর দশমিনিট বাদে আমার ফ্লাইট...।

—আরে গতকাল যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম তখন আমার অফিসে ছারপোকা ছিল।

—তুমি কোথা থেকে বলছ?

—বেকার স্ট্রীট স্টেশনের একটা বুথ থেকে। বিল্ডিং থেকে কথা বলার মতো বোকা আমি নই। পরিষ্কার করার মেয়েটা আমাকে জানালো আমার লাইটের বাল্বটা গেছে। আমি ওটা চেক করতে গিয়ে হঠাৎই দেখি তখন শেডের ভেতর ছারপোকা...।

—তাহলে তো আমাদের কথা কেউ শুনেছে।

—টেপ করেও নিয়েছে। এটাও জেনেছে আমি কোথায় যাচ্ছি আর কেন যাচ্ছি।

—আমি ভেবেছি তোমার প্লেন ধরার আগেই এটা জানান উচিৎ—টুইডের গলা দিয়ে একধরনের শব্দ বার হলো আর কণ্ঠস্বরে আবেগ।

—ধন্যবাদ, আমি আমার চোখ খোলা রাখব,—মার্টেল ছোট্ট জবাব দিল।

—সম্ভবতঃ জুরিখ-এ তোমার সতর্ক থাকা উচিৎ। একটা রিসেপশান কমিটি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে...।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমাকে যেতে হবে...।

* * *

এগারোটা দশে সুইস এয়ার ফ্লাইট ছাড়ল। লন্ডনে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট। মার্টেল জানলার ধারে একটা সীটে বসেছিল। জানলা দিয়ে জারা পর্বতের শৃঙ্গগুলো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন ওগুলো ছোঁয়া যাবে।

প্লেন প্রথমে ব্যাসলের ওপরে এসে পৌঁছলো তারপর জুরিখের উদ্দেশ্যে পূর্বদিকে উড়ে চললো।

মেসিনের শব্দ হওয়ার সময় জানলার অপর প্রান্তে বরফে ঢাকা আল্পস-এর ওপর সূর্যের আলো পড়ে এক মনোরম দৃশ্য তৈরী করেছে। অবশেষে প্লেন নামলো।

ক্লেটেন এয়ারপোর্ট। জুরিখের দূরত্ব এখান থেকে দশ কিলোমিটার। প্লেন থেকে বেরোতেই উত্তাপের ঝলকানি ওকে গ্রাস করলো। লন্ডনে পঞ্চাশ ডিগ্রী আর জুরিখে পঁচাত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইট। এয়ারপোর্ট সুশৃঙ্খল আর শান্ত। কাস্টমস্ আর পাসপোর্ট কন্ট্রোল অতিক্রম করতে ওর রীতিমত সমস্যা দেখা দিলো।

এয়ারপোর্ট থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ওকে হাউপ্ট ব্যানহফ্-এর দিকে যেতে হবে। যেটা ওয়ার্নার-এর নোটবুকে লেখা দ্বিতীয় জায়গা। ট্রেনের বদলে ও একটা 'ক্যাব'-এ উঠলো।

সুইজারল্যান্ডের তিনটে বড় হোটেল-এর মধ্যে একটাতে ও উঠলো। ঘরের ভাড়া হাওয়ার্ডকে সন্ন্যাসী বানিয়ে দেবে। কিন্তু হাওয়ার্ড খরচ-খরচা দেয়নি। লন্ডন ছেড়ে যাবার আগে টুইডকে অনেকগুলো জিনিস টেলেক্স করলো। এতে এরিখ স্টোলারও আছে।

—জার্মানরাই তোমার খরচ বহন করছে। সুতরাং মেজাজে উপভোগ করে নাও, টুইড বললো। একটু থেমে আবার বলল, সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে ওরা সচেতন। ওরা জানে যে, এমন লোককে আমি সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলাম, সে আর নেই...।

—সেজন্য আমি পরবর্তী লোক হতে পারি? মার্টেল উত্তর দিলো, যাক ভালোই। ছোট্ট ঘরের থেকে শহরের ভাল জায়গাই পাওয়া যাবে...।

—'ভাল?' উদাসীন ভাবে শব্দটাকে ভাববার চেষ্টা করল ও।

ক্যাব দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে জুরিখের দিকে। ভাবতে লাগল টুইডের অফিসের ছারপোকার কথা, ওর হোটেল পরিবর্তন করা উচিত। বিরোধীরা যদি ওকে 'বাউর-অ্যা-ল্যাক'-এ খোঁজার চেষ্টা করে তাহলে ওর কাছে একটা দারুণ সুযোগ আসবে। প্রথমে তো ওদের সঙ্গে দেখা হোক। মার্টেল একটা সিগারেট ধরালো।

জুরিখে ফিরে যাওয়াই ভাল। নীলরঙের ট্রামগুলো শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার ওকে ব্যানহকপ্লেটজ-এর দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে লিমাট নদী বয়ে যাচ্ছে দেখতে লাগল মার্টেল। একটা ব্রীজ পড়ল এই নদীর ওপর। ওয়ার্নারের নোটবুকে কেন জায়গাটার নাম লেখা আছে এই ভেবে খুব আশ্চর্য হল আর ভালভাবে জায়গাটা দেখতে লাগলো।

বাঁদিকে সারি সারি গাছ। ইউরোপে এটাই ওর প্রিয় শহর আর এই রাস্তাটা। এখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় ব্যাংক আছে, যাদের আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টগুলোতে জমানো সোনার পাহাড়। প্রত্যেকটা ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন।

আস্তে আস্তে গাড়ি ট্যালটেলীর রাস্তায় এসে পড়ল। দূরে রাস্তার শেষপ্রান্তে 'বাউর-অ্যা-ল্যাক' দেখা যাচ্ছে। সামনে লেক।

ধূসর মেঘে ঢাকা আকাশ। আবহাওয়াটা গুমোট। শহরটা যেন বিপদে মেখে আছে। ধনুকের মত এক জায়গায় ক্যাবটা এসে থামল। সামনের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতেই হেড পোর্টার দরজা খুললো। মার্টেল দেখল একটা রোলস রয়েস আর পাঁচটা মার্সিডিজ পার্ক করা রয়েছে। প্রবেশ পথের ঠিক পেছনে সবুজ লন, ছোট্ট পার্কও বলা যায়।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত ওকে কেউ অনুসরণ করেনি। এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত। হোটেল প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। হেড পোর্টার ওকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে ফোনটা তুলে কিছু কথাবার্তা বলে অবশেষে ওকে একটা ডাবল বেডের ঘর দেওয়া হল। ঘরে পৌঁছে বেডরুম এবং বাথরুম ভালভাবে পরীক্ষা করে নিল কোন মাইক্রোফোন লুকনো আছে কিনা। যাইহোক কিছুই পাওয়া গেল না। ও কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হতে পারছিল না।

লিফট্ এড়িয়ে ও সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। লিফটে্ না চড়াই ভাল, ওটা একটা ফাঁদ। আবহাওয়া, স্বাভাবিক। খানিকটা এগোতেই দেখল একটা চাঁদোয়ার তলায় চা আর ড্রিংকস পাওয়া যাচ্ছে। পাশের ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে ও কফির অর্ডার দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনে এলিটদের আসা যাওয়া একভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। একটা ছায়া ওর সামনে ভেসে উঠলো।

ক্লেয়ার হফারের সঙ্গে ঠিক রাত আটটায় ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ওরই ফ্ল্যাটে। কিন্তু সময়টা এত বিশ্রী যে ও খানিকটা বিরক্তি বোধ করলো। স্বাভাবিক হলে জায়গাটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিতে পারতো। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। টুইডের অফিসের ছারপোকার ওপরে ও নিজের কৌশলে খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ও ভালভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্যেরা যখন রাতের খাবার খেয়ে নিচ্ছে ও তখন কফি খেল সাড়ে সাতটা নাগাদ। তারপর বিলে নিজের সই আর রুম নাম্বারটা লিখে ধনুকাকৃতি জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো। কাউকে দেখতে না পেলেও ওর মনের অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না।

রাস্তা ফাঁকা, জনমানবহীন। ও মেসিনের কাছে গিয়ে ওটাকে থামিয়ে কুড়ি সেন্টিমের একটা মুদ্রা ঢুকিয়ে দিল আর টিকিটটা নিয়ে জুরিখের একটা গোপন লোকের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

.ট্রামগুলো ওর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। টিকিটটা ওকে খানিকটা ঝামেলায় ফেলছিল। ওর বুকপকেটে একটা খামের ভেতর ওয়ার্নারের ওয়ালেটের সবকিছু আছে। ওর সঙ্গেই ট্রামের টিকিট আছে, তাতেও লেখা রেনওয়েগ—আগস্ট। জায়গাটা বেশীদূর নয়। ক্লেয়ার হফারের মুখটা মনে পড়তে সামনে দিয়ে আসা ট্রামটায় উঠে নামবার দরজার দিকে ঠিক পাশের সীটটায় বসে পড়ল।

হোটেল থেকে সেন্ট্রাল হক ৪৫এ আসতে মিনিট পাঁচেক লাগে। এখানেই ক্লেয়ার হফারের ফ্ল্যাট। ট্রামটা একটা স্টপ এগোতেই ওর মনে হলো কেউ যেন অনুসরণ করছে। পরের স্টপটায় উঠে দাঁড়ালো আর ট্রামটা থামলে একটা কালো বোতাম টিপল, তাতে দরজা দুটো আপনা হতেই খুলে গেল।

দরজা খুললো। নিজের টিকিটটা দেখে নিয়ে ও সামনের দিকে তাকালো। গন্তব্যস্থল সম্পর্কে এখনো ও কিছুটা বিভ্রান্তিতে ভুগছে।

কিছু লোক ট্রাম থেকে নামল। দরজা বন্ধ হতে আরম্ভ হল। ও লাফিয়ে ফুটবোর্ডে পা রাখলো। ও জানে ফুটবোর্ডে কেউ থাকলে দরজা হয় খুলে যাবে নয়তো খোলাই থাকবে।

এবারে পাশে নেমে ও খানিকটা দাঁড়ালো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ ওকে অনুসরণ করছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো। ট্রামের দরজা আবার আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল এবং ট্রাম নিজস্ব গতিতে চলতে লাগল।

সেন্ট্রালহক জায়গাটা অনেকটা চতুর্ভুজের মত। একদিকে বনহফট্রাসে আর চারদিকে বড় বড় বিল্ডিং। এই চতুর্ভুজের প্রত্যেক দিকের সামনেটা ধনুকের মত। প্রত্যেকটা দিকেই প্রবেশ পথ আছে। একটায় বনহফট্রাসে। ভেতরে বাগান।

মার্টেল দ্রুত রাস্তাটা পার হলো। পোট্রোট্যাসের দিকে এগিয়ে ডান দিকে পাশাপাশি ব্লকের তৃতীয় দিকে এগোতে লাগলো। ধনুকের মতো জায়গাটা হেঁটে যাবার সময় গাছগুলো, গাছের মূলগুলো ভাল করে দেখতে লাগল। ওর আগের কথা মনে পড়ল ' সবকিছু একই আছে, পাল্টায়নি কিছুই। ও একটা সীটে গিয়ে বসলো।

সেন্ট্রালহকে এই অ্যাপার্টমেন্টটায় ও আগে কখনও আসেনি। ঢোকার সময় কৌশল নিল। এমনভাবে দাঁড়ালো যাতে বাইরে ওর ছায়াটা দেখা যায়, সেভাবে দাঁড়ালো। তাহলে অনুসরণকারীকে ধরে ফেলা সহজ হয়।

জায়গাটা আলোআঁধারি। কেমন যেন সব অস্পষ্ট। সামনে গাছগুলোতে পাখীদের কিচিরমিচির আর ঝর্নার কুল-কুল শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এর থেকে শান্ত পরিবেশ আর হয়না। সামনের জানালা, তার পাশের জানলাটার দিকে ও তাকালো। তারের পর্দা দিয়ে জানলাগুলো ঘেরা। হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

নাঃ। শান্তির মরূদ্যানে ওকে কেউ অনুসরণ করতে আসেনি। এবারে ও উঠে দাঁড়িয়ে ধনুকাকৃতি জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার প্ল্যানটা টুইড ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সামনে দেখল নেমপ্লেট—সি. হফার। বেলটা টিপতেই জার্মান ভাষায় একটা মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ভাষাটা সুইস-জার্মান নয় বলে ও ঠিক বুঝতে পারল না।

—কে ওখানে?

—মার্টেল। কণ্ঠস্বরটা যথাসম্ভব নরম রেখে বলল। চোখদুটো গ্রীলের দিকে।

অপরপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমি 'ক্যাচটা খুলে দিয়েছি। দোতলায় আছি।

দরজা খোলার পর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে গেল। পেছনের দরজাটা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল। সামনে পুরোন আমলের লিফট্। লিফটে না উঠে ও বেশ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

উচ্চতা—পাঁচ ফুট 'ছয় ইঞ্চি।

ওজন—নয় স্টোন 'দুই পাউন্ড।

বয়স—পঁচিশ।

চুলের রং—কালো।

চোখের রং—ঘোর নীল।

হফারের বর্ণনা মোটামুটি এইরকম।

টুইড মার্টেলকে লন্ডনে এটা আগে থেকেই দিয়েছিল। ফার্ডি আর্নন্ড-এর দেওয়া তথ্য ওগুলো। ও জানে যে, টুইডের দুটো ব্যাপারে ঘৃণা আছে। একটা কমন মার্কেট আর একটা মেট্রিক সিস্টেম।

মার্টেল দোতলায় পৌঁছল। ওর কাছে কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ও আশা করেছিল যে

হফার একটা 'হ্যান্ডগান' অন্ততঃ দেবে। ওর সামনে বন্ধ দরজার কাঠের কাজগুলো ভারী অদ্ভুত। মাঝখানে একটা ছোট্ট গর্ত। বোঝা গেল মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

—জুরিখে স্বাগতম। মিঃ মার্টেল তাড়াতাড়ি ভিতরে এসো।

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে গেল। ও ভেতরে ঢুকতেই মহিলাটি ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলো। তারপর দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

ধনুকের মত জায়গার নীচে ও অপেক্ষা করতে লাগল। ওর আঙুলের মাঝখানে কালো হোল্ডার ধরা আছে। নির্লিপ্ত ভঙ্গীমায় ও মহিলাটিকে দেখতে লাগল।

মেয়েটার চোখে বড় আকারের বিদেশী কালো চশমা। মহিলার চুলগুলো ঘন কালো। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ওজন নয় স্টোন। সমস্ত কিছু মিলিয়ে মহিলাটি আকর্ষণীয়া। রঙীন ব্লাউজ আর স্কার্টে দেহটা আবৃত। রুক্ষ স্বরে মহিলাটি বলে উঠলো, সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?

—তুমি আর একটু সতর্ক হতে পারো না? মার্টেল বলল।

ছোট্ট হল ঘরটা থেকে বেরিয়ে ওরা একটা বসার ঘরে পৌঁছল।

—এখান থেকে জানলা দিয়ে 'সেন্ট্রাল হক' এর বাগানটা দেখা যায়। কথাটা বলে মার্টেল সিগারেট ধরালো মহিলাটির অনুমতি না নিয়েই।

মহিলাটি গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি অবশ্য এখানে সিগারেট খেতে পারো।

—চমৎকার। আসলে এটা না খেলে কোন কিছুতেই আমার মনোযোগ আসে না। এরপরে ও ঘরটার চারিদিকে ভালভাবে তাকাতে লাগল। বেশ কয়েকটা আর্ম চেয়ার আর সোফা রয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিক ওজনের সাইনবোর্ডও আছে। এই জার্মান-সুইসের ঘরের আসবাবপত্র দেখে ওর একগুঁয়ে মেজাজেরই পরিচয় দেয়।

মার্টেল ভাবল, হফার এই মুহূর্তে কি ভাবছে ও জানে। ও ভাবছে 'হায় এই বদমাসটার সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে?'

—আমি এক্ষুনি একটু কফি নিয়ে আসি। ও বন্ধুত্বপূর্ণ গলাতেই বলে উঠলো।

—তাহলে তো ভালই হয়...।

মার্টেল জানলার দিকে এগিয়ে গেল। মহিলাটি সুইংডোর দিয়ে জানলার দিকে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি দেখলে মনে হয় বেশ দামী জিনিষে ভর্তি। ও গতি পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে দরজার হাতলটা ঘোরাল। দরজা খুলে যেতে ভেতরটায় ও উঁকি মারল।

সামনেই বেডরুম। একটা বড় বেড, একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে। চারিদিকে পরিচ্ছন্নভাবে কস্‌মেটিক সাজানো। একটা বড় আকারের ওয়ারড্রোব। দরজা অর্দ্ধেক খোলা রেখে সরে এলো।

রান্নাঘরের মধ্যে হঠাৎ ও এসে দেখল পারকোলেটারে কিছু একটা করছে। কাউন্টারে কিছু আধ-খাওয়া খাবার পড়ে আছে। পাশে একটা অপরিষ্কার গ্লাস। এছাড়া অপরিষ্কার একটা ছুরি, দুটো কাঁচি, এক টুকরো স্টিকিং প্লাস্টার এসবও রয়েছে। মুখ বন্ধ অবস্থায় ও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

—বাড়িতে এসবও করো, মার্টেল...।

—সব সময়েই, বলে মৃদু হাসল। তারপর হপারের দিকে তাকিয়ে বলল, ওয়ার্নার কি এখানে ঘুমোতো?

কথাটা শুনতেই হপারের পারকোলেটার থেকে জিনিস ছিট্‌কে পড়ল। হপার দেওয়ালের কাপবোর্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওটা খুলল।

'জীবনের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্যে আমি অনেককিছু পাল্টাই...। ওখান থেকেই মহিলাটি বলে উঠল। তারপর পরের বোর্ডটা থেকে বড় বড় কটা কফির কাপ বের করল। মার্টেল ক্রীম খাবে না জেনে হফার দুটো কাপে কালো কফি ঢাললো।

তারপর ওগুলো একটা প্লেটে রেখে মার্টেলের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি আমাকে...।'

—অনুমতি দিচ্ছো...।

এরপর কাপ দুটো তুলে নিয়ে মার্টেল বসার ঘরের দিকে এগোলো। ঘরের মধ্যে মাদুর ঢাকা একটা টেবিল দেখল। হফারকে অনুসরণ করল।

ওরা পরস্পর কথা বলছিল। হফার কালো চশমার ফাঁক দিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকালো।

মার্টেল ওর চোখের ভাষা বুঝল না। কিন্তু মুখের বিবর্ণ ক্ষতটা দেখা যাচ্ছিল।

—তুমি বেডরুমে...

—আমি কারো সঙ্গে থাকাটা...।

—তোমার নার্ভ আছে বলতে হবে।

ওরা দু'জনে বেডরুমের দিকে এগোতে থাকল। মার্টেল হফারের হাতটা ধরে শোফায় গিয়ে বসল পাশাপাশি। একটা হাতে হফারের বাহু আর সেই বড় গ্লাসটা নিলো।

হফার হঠাৎ অন্য হাতে ওর বড় বড় নখ দিয়ে মার্টেলের মুখে আঘাত করল। মার্টেল কব্জি ধরার চেষ্টা করল।

হিস্‌হিস্ শব্দে হফার বলে উঠল, মার্টেল বুঝছো তো। আমরা যদি পরস্পর কাজ করি তাহলে কিছু ব্যাপারে আমাদের সোজাসুজি হওয়া দরকার...।

—তুমি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। ওয়ার্নার আর তোমার ব্যাপারটা।

কিছুক্ষণ বাদে হফারকে ছেড়ে দিয়ে কফিতে চুমুক দিল। একভাবে হফারের দিকে তাকিয়ে রইল। হফারও স্বাভাবিক হয়ে কফিতে চুমুক দিলো।

—শোনো কয়েকটা ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ তোমার এক্তিয়ারে ওটা পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ আমার উত্তর 'না'—না। আমি যতটুকু ওকে জানি ও আমার কাছে সব সময় থাকতো না। ব্যাপারটা কঠোরভাবেই ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ...।

—ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার। যাইহোক আমার কথা শোন। ওয়ার্নার খুন হবার আগে শেষ কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—লিন্ডাউ-এ যাবার দিন তিনেক আগে। ওকে দেখে আমার খুব হতাশ মনে হয়েছিল—বলেছিল ওর মনে হচ্ছে সব জায়গায় যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়...।

—ডেলটার সঙ্গে?

ক্লেয়ার হফার খানিকক্ষণ থামলো। মার্টেল ভাবলো ও কি ভাবছে তা যদি হফার বুঝতে পারে তাহলে ও অবাক করে দেবে। টুইডের মন্তব্য ওর মনে পড়ছিল যে, ব্যাপারটা মিথ্যে কখনই নয়। 'যদি ঘটনা তোমার চিন্তার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহলে ঘটনাকে সব সময় বিশ্বাস করবে।'

টুইড মার্টেলকে এটা বারবার বলেছিল।

হফার-এর উত্তরে মার্টেল সেটাই ভাবলো।

তুমি ওদের নয়া-নাজী পটভূমির কথা বলছো? আমি ডেলটার কথা বলছি যার সঙ্গে ও চলছিল।

মার্টেলকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে শান্ত কিন্তু ওর নার্ভগুলো ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত। প্রাণপণে উত্তেজনা থামাবার চেষ্টা করতে লাগল।

হফার এক নাগাড়ে কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। যখন মার্টেলকে অনুসরণ করে ও রান্নাঘরে এসেছিল তখন একটা ব্যাগও সঙ্গে এনেছিল। সেটা জানালার ধারের সোফার পেছনের চেয়ারে ফেলে এসেছে। কথা বলতে বলতে ও সোফার দিকে এগিয়ে এলো।

—ও আমার কাছে একটা নোটবুক ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাতে তো অনেককিছুই লেখা আছে কিন্তু ডেলটার কথা কিছু ছিল বলে তো মনে পড়ছে না...।

মার্টেল আধখোলা শোবার ঘরের কাছ থেকে অস্পষ্ট, অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। হফার ব্যাগটার মুখটা খুলতে খুলতে ওর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল।

—পরের দরজার লোকগুলো উৎপাত করছে। ঘরগুলো পরিষ্কার করার আগে এরকম করছে। যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে এরকম চলবে।

মার্টেল বসার জন্যে সোফাটাই বেছে নিয়েছে। কারণ ফায়ার প্লেসের ওপরে একটা আয়না আছে। তার সামনেটায় একটা বড় ফুলদানী। কিন্তু হফারকে এখান থেকে ভালই দেখা যাচ্ছে।

যখন ও সতর্কভাবে ভেবে দেখছিল যে ওকে কেউ অনুসরণ করছে না তখনই ও শোচনীয় একটা ভুল করে বসেছিল। ওর সামনেই বিপদ, পেছনে নয়। অ্যাপার্টমেন্টে ওর পৌঁছনোর জন্যেই শত্রু অপেক্ষা করছে।

—তুমি এলে যখন তখন আমি একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম, এজন্য আমি দুঃখিত। আসলে চার্লির মৃত্যুটা আমাকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে...। এরপরে মার্টেল ক্লিক ধরণের একটা শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারলো হফার ওর পেছনে আসছে। আয়নার সামনের ফুলদানীটার কাছে এসে দাঁড়ালো। দু'জনের দূরত্ব বেশী নয়। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মার্টেল ঘুরে দাঁড়িয়ে হফারের কব্জীটা ডানহাত দিয়ে চেপে ধরলো। ওর হাতে 'ফেল্ট-টিপ' ধরনের পেন-এর মতো একটা জিনিস ছিল।

আসলে ক্লিক শব্দটা হতেই ওটার ভেতর থেকে ব্লেডের মত লোহার শিক বের হয়ে এসেছিল। একেবারে গোড়াটা সুঁচের মত পাতলা। হফার ঐ সুঁচের মত জায়গাটা ওর ঘাড়ের মাঝখানে চেপে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল।

মার্টেল নৃশংসভাবে ওর কব্জীটা মুচড়ে দিল। হফার আর্তনাদ করে উঠতে ওর হাত থেকে অস্ত্রটা পড়ে গেল। মার্টেল নিজের দেহটা দিয়ে সজোরে ওকে ধাক্কা মারতে সোফার পেছনটায় পড়ে গেল। হফারের স্কার্টটা উরুর ওপরে উঠে গেছে। সুন্দর সুডৌল পা-জোড়া দেখা যাচ্ছিল। যৌন উত্তেজনায় অস্থির মার্টেল হফারকে ধরে শোওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

—-বেজন্মা কুত্তা কোথাকার। বলেই সজোরে একটা ঘুঁষি মারল। একেবারে স্থির হয়ে গেল। মার্টেল ওর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ঠিক তখন হফার চেতনা ফিরে পেয়ে শক্ত দুটো আঙুল ওর চোখে ঢুকিয়ে দিতে চাইল। ক্রোধে মার্টেল ওর গালে সজোরে এক থাপ্পড় কষালো।

—আমি তোমার ঘাড় একেবারে ভেঙ্গে দেব...।

এবার মার্টেল লক্ষ্য করল ওর চোখে ভয়ের কালো ছায়া। ওকে ওল্টাতে গেলে কোনরকম বাধা দিল না। মার্টেল নিজের বেল্ট খুলে ওর হাতের সঙ্গে পা দুটো বাঁধলো।

হফার যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

মার্টেল ভাবল এবার ওর চলে যাওয়া উচিত। ও হফারের মুখে রুমালটা ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে সোফায় বসিয়ে দিল।

দ্রুত বেডরুমের দিকে এল। ওখান থেকেই সেই শব্দটা ভেসে আসছিল। ওয়ারড্রোব কাপবোর্ডের দরজা দুটো খুলে ফেলে ভালভাবে দেখতে লাগল।

কালো চুলওয়ালা মেয়েটা মেঝেতে পড়ে ছটফট করছিল। মুখে স্টিকিং প্লাসটার আটকানো।

হ্যালো, ক্লেয়ার হফার। ও বলে উঠলো। মৃদু হাসল। আবার বলল, সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করছো।

বুধবার, সাতাশে মে ঃ

হফার প্রথম ধাক্কাটা কিছুটা সামলে নিয়েছে। ওর জিনিষটা কাপবোর্ডের ভেতর দেখে নিল। রান্নাঘরটা পরিষ্কার করলো।

—তুমি কেমন করে জানলে মেয়েটা এরকম করছে? ও জিগ্যেস করলো।

ওদের বন্দী তখন মেঝেতে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। মার্টেল ওর বেল্টটা খুলে ওকে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধলো। আগেকার প্লাস্টারটা খুলে নতুন একটা লাগিয়ে দিল।

মার্টেল বলে উঠলো, যদিও ওর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সবকিছু মিলে গিয়েছিল তবুও একটা ব্যাপার যে ওর চোখে কালো চশমা ছিল। এখন আমরা জানি কেন—ওর চোখ দুটো বাদামী।

—নিশ্চয়ই, অনেক...

যখন আমি শোবার ঘরে ঢুকি তখন তোমার কস্‌মেটিকস ড্রেসিং টেবিল একেবারে গোছানো অবস্থায় ছিল। একটা ব্যাপারে, কাঁচের সঙ্গে স্টিকিং প্লাস্টার এটাই আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। ওর এমন কোন কাটা ছিল না, যা দেখা যায়।

—কিন্তু অন্য ব্যাপারও ছিল...।

—যেমন...?

—সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা তাহলো ও একেবারেই জানত না কাপবোর্ডটায় কফির কাপ থাকে। ও ওয়ার্নারের আসার ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করল। ওয়ার্নার ওর মতো আকর্ষণীয়া মহিলাকে একবার চেষ্টা করবেই। সুতরাং ও চার্লিকে ডাকল। সব সময়ই চার্লসকে ও উৎসাহ দিত।

—তুমি দারুণভাবে লক্ষ্য করেছো। এখানে কফি আছে?

—না বসার ঘরে।

একটু থেমে আবার বলল, আমাদের প্রতারককে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে। কাপবোর্ডের মধ্যে তোমার শব্দের ব্যাপারটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তুমি ওখানে একটা সুযোগ নিয়েছিলে—

—আমি একটা মানুষের শব্দ শুনে বুঝেছিলাম তুমি এসে পড়েছ। ও আমাকে বোকা ভেবেছিল। ও কি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল?

এরপরে ওরা বসার ঘরে ফিরে গেল। ওখানে ওদের সঙ্গী ফায়ার প্লেসের সামনে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। যার ফলে মার্টেলের কণ্ঠস্বর ও শুনতে পায়নি। 'ও কি তোমাকে খুন করতে গেছিল?' কথাটা বলে সূঁচওয়ালা অস্ত্রটা হাতে নিল।

মনে হয় তাই। আমি যখন ওকে চেপে ধরলাম ও তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ওটা আমার ঘাড়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে। একটা বোতাম টিপলেই ওর ভেতর থেকে ফ্লুইড বেরিয়ে আসবে। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ওর ওপর দিয়েই দেখা যাক।

ও ভাল করে জিনিষটা ধরল। তারপরে মেয়েটার দিকে ঝুঁকে পড়ে মুখের প্লাস্টারটা মুখ থেকে ছিঁড়ে দিল। মেয়েটা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে মার্টেল বলল—একটা কথা নয়। আমি যা যা প্রশ্ন করবো ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। তোমার আসল নাম কি?

—মুর্খের মত প্রশ্ন কোরনা...।

—যদি এটা তোমার ঘাড়ে ঢুকিয়ে বোতামটা টিপে দিই কি ঘটবে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার...।

মার্টেল কথাটা বলে অস্ত্রটা হফারের ঘাড়ের দিকে এগোতে লাগল।

ওর বাদামী চোখ করুণ অসহায় হয়ে উঠলো— ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মেরো না।

মার্টেল ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো—তোমাকে আমি বাঁচাবো, তুমি আমায় এটাই করতে চেয়েছিলে। ভাল চাও তো বলে ফেল...।

—গিসেলা জোবেল।

—তোমার ঘাঁটিটা কোথায়?

—ব্যাভেরিয়া, মিউনিক! দোহাই... পিটির দিব্যি...!

—পিটি?

মার্টেল হফারের মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইল। হফারের দৃষ্টিও ওর দিকে।

—কেন না কথাটার মানে ও বোঝে না? এই ভাবে ও আমাকে পরীক্ষা করেনি। হফার অনেকটা মরিয়া হয়ে বলে উঠলো।

খানিকটা শ্বাস ফেলে আবার বললো,—তুমি ঠিক করে ফেলেছ...।

ও একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। মার্টেল সূঁচটাকে আরো কাছে এনে একভাবে প্রশ্ন করল, কার জন্যে তুমি কাজ করছো বলতো?

—ও আমাকে মেরে ফেলবে...।

—তুমি যদি ঠিকমতো জবাব না দাও এই যন্ত্রটা ঠিক তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে, আমিও সেইভাবে ব্যবহার করে দেখব। আমরা খবর পেয়েছি যে ওয়ার্নারকে গোপন রুটে পাঠানো হয়েছিল। বলো শিগগির...।

—রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ।

বলার পরেই আতঙ্কে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মার্টেল তখন ধীরে ধীরে সূঁচটা হফারের

কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল।

—আমাকে একটা ছিপি দাও যাতে এই বিচ্ছিরি জিনিষটা ঢাকা দেওয়া যায়।

ওর কথায় হফার রান্নাঘরের দিকে এগোতে থাকলো মার্টেল ভাবতে লাগল, এই অস্ত্রটা দিয়ে গিসেলা জোবেল ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

এখন ওর একটা 'কাউন্টার এসপিয়নেজ' কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া উচিত। ফরেনসিক এটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখবে।

* * *

রাত দশটা বেজে যেতে মার্টেল ঠিক করলো যে এবারে ওরা নিরাপদেই এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোতে পারবে। হফার একটা ব্যাগ প্যাক করল। ইতিমধ্যে মার্টেল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'বাউর-আ-ল্যাকে' সাদা পোষাকের গোয়েন্দা পাঠাতে বলল। বিলটা জমা দিয়ে ও স্ক্যাটকেলটা নিয়ে নেবে। ব্যাগটা হলঘরে রয়েছে।

—আমরা সেন্ট স্যলন থেকে ট্রেন নেবো। মার্টেল সুইস মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল।

—আমাদের কাজ ওয়ার্নারের ব্যাপারটা জানা। সামান্য মাত্রই এগোন গেছে।

মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, একমাত্র ওখানেই ও থামতো। এটাই ওর এখান থেকে ব্যাভিরিয়ার যাবার পথে কাজ...।

—যাক, তাহলে আমরা যতটুকু পেয়েছি, সেই ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করা যাক।

সন্ধ্যেবেলাটা নানা কাজে ভর্তি থাকে। হফারও পকেট থেকে ডায়েরী বার করে মার্টেলকে ফোন করলো। যখন ও ওর বস ফার্ডি আর্নল্ড -এর সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ও আয়নায় একভাবে দেখে যাচ্ছিল।

টুইডের বর্ণনানুযায়ী একেবারে এক।

মেয়েটা দেখতে সুন্দরী। লম্বা কালো চুল। নরম কণ্ঠস্বর আর ছন্দময় চলাফেরা, ইতিমধ্যেই মার্টেলের ওকে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ও এমন একজনকে খুঁজছিল যে আরও গতিশীল।

সুইস কাউন্টার এসপিয়েনজ-এর প্রধান জুরিখ থেকে নিজের এরোপ্লেনে এসেছে। ছোট-খাটো গম্ভীর মুখের মানুষ ফার্ডি আর্নল্ড। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়।

—আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্সে ওকে নিয়ে যাব বলে গিসেলা জোবেলকে দেখল। ও ততক্ষণে আরামদায়ক চেয়ারে বসে পড়েছে।

—ওকে একটা স্পেশাল হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওকে ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে সবকিছু জিজ্ঞেস করা যাবে। ও মার্টেলের দিকে তাকালো।

—আজ ঠিক দশটায় এই নাম্বারে আমাকে ফোন কোর। ছোট্ট প্যাডে ফোন নাম্বারটা লিখে ইংলিশম্যানের হাতে দিলো। খানিকক্ষণ তাকালো।

—আমার কাছে জুরিখ কোডও আছে। যদি তুমি কাগজটা হারিয়ে ফেল—।

আর্নল্ড মার্টেলের কথা শুনে মৃদু হাসল, বললো—আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করিনা, তা তো নয়।

কিন্তু একজন ইংরেজ এজেন্ট, ওয়ার্নার চিহ্নিত হয়ে গেছে। এমন কি জার্মানের মত আচরণ করেও—সুতরাং তুমি সমস্ত দিকগুলো দেখছ। আজ সকাল দশটায় তোমায় কেন ফোন করেছিলাম? নিশ্চিত তুমি কেবলমাত্র জোবেলের প্রাত্যহিক জিজ্ঞাসার ব্যাপারটা আরম্ভ করেছ। বিপরীত ভাবে বলতে হয় আমরা কেবলমাত্র শেষ করেছি। যেহেতু এ মহিলাকে সারারাত জিজ্ঞাসা করার আছে।

মার্টেলকে খুশী মনে হলনা। সত্যি ব্যাপারটা ধরা যাচ্ছেনা। ফার্ডি আর্নল্ড আরও 'দক্ষ চালক'—হফার এর সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা আছে। ওর তীক্ষ্ণ অনুমান শক্তি দিয়ে এটা বুঝছে।

—এসো, শোবার ঘরে এসো। গিসেলার দিকে তাকিয়ে বলল।

এরপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ওখানে আমি কথাগুলো জোবালকেই শোনাতে চেয়েছিলাম। ওরা যদি ওদের ভাগ্যে কি আছে

জেনে উদ্বিগ্ন হয় তাহলে আমাদের পরিকল্পনাটা সফল হতে পারে।

মার্টেল বলল, ও স্বীকার করেছে যে ও রেইনহার্ড দিয়াত্রিচের হয়ে কাজ করেছে।

—আচ্ছা।

আর্নল্ড-এর ঐ বিবৃতির ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। মার্টেলের মনে পড়লো লন্ডনে ওকে টুইড বলেছিল সুইসরা নিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে চলছে। সুইস পাল্টা গোয়েন্দারা জার্মান নয়া-নাজী মুভমেন্টের ব্যাপারে খোলাখুলি সংঘর্ষ চায়না। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে সাহায্য করা মোটেই যায়না। মার্টেলের অনুমান, আর্নল্ড সতর্ক নজর রেখেছে।

—বার্নে, গুজবের ব্যাপারে খুবই বিরক্ত। উত্তর সুইজারল্যান্ডে একটা গোপন সংগঠন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

—সেন্ট গ্যালন?

—তুমি কি করে ঐ জায়গার কথা জানলে?

মার্টেল স্বাভাবিক উত্তর দিলো, কারণ ঐ জায়গাটা উত্তর-পূর্ব সুইজারল্যান্ডের একটা অন্যতম বড় শহর। আমার কাছে ডেলটা শব্দটা খুব আকর্ষণীয়। রাইন ডেলটা, অষ্ট্রিয়ার কাছে তোমাদের যে সীমানা, ঠিক সেখানেই রয়েছে।

মার্টেল কথা বলতে বলতে আর্নল্ডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। ওয়ার্নারের নোটবুকে আরো একটা অস্টিয়ান বন্দরের নাম আছে 'ব্রে গেঞ্জ।'

—আমরা অস্টিয়ান পাল্টা গোয়েন্দার সংস্পর্শে এসেছি, আর্নল্ড বলল। বার্নে, এখানকার এই জুরিখের হালফিল অবাঞ্ছিত ছাত্র সংঘর্ষের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। মনে হয় ওরা গোপন ডেলটা চক্রের মাধ্যমেই সংগঠিত।

ও রিস্টওয়াচটা দেখে বলল, আমাকে এখন যেতে হবে।

ও এত দ্রুত বেরিয়ে গেল মেয়েটার দিকে তাকিয়েও দেখল না। মার্টেল শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল গিসেলা জোবেল নেই। কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হফার ওকে বুঝিয়ে দিল।

—অ্যাম্বুলেন্সের একটা টীম এসে ওকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেছে।

—আর্নল্ড খুব একটা সময় নষ্ট করেনি। ও যাবার সময় তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে? তুমি কি বলেছো যে আমরা 'সেন্ট গ্যালেন' যাচ্ছি।

ও অবাক হয়ে বলে উঠলো, না, কেন কোন গণ্ডগোল হয়েছে কি? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

মার্টেল ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে থাকা ব্যাগদুটো তুলে নিল।

—তুমি তো আমাকে জানো, আমি অনেক প্রশ্ন করি। আমাদের এখন 'হাউপ্টব্যানহফ'-এর ট্রাম ধরতে হবে।

—তাড়াতাড়ি করতে হবে। ট্রাম সোজা স্টেশনের দিকে যায়। নাম্বার আট। এটাই সবথেকে ভাল পথ।

ওয়ার্নারও তাই ভেবেছিল।

* * *

নির্মম অত্যাচার, উন্মত্ত বলে ওরা অ্যাপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিলো। রাত দশটা। ব্যানহফ ট্রামের খিলানটা ওদের চোখে পড়েছে। কিছু লোকের আনাগোনা। শান্ত পরিবেশ।

মার্টেলের সেন্ট্রাল হকের অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর নতুন একটা জিনিস সংযোজন হয়েছে। তা হলো কোল্ট ৪৫। ওর কাঁধে স্প্রিং-এর হোলস্টার। যেখানে ঐ মহিলাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই ওয়ারড্রোবের গোপন জায়গায় এটা ছিল। হফারই দিয়েছে।

মার্টেলের এই রিভালভার থাকাটা বে-আইনি। যাবার পথে সীমান্ত এলাকা পড়বে না, সুতরাং অসুবিধা খুব বেশী নেই।

ও ওকে জিজ্ঞেস করল যে, ওর কাছে যেটা আছে, তা ফার্ডি আর্নল্ড জানতে পারবে না তো?

ওকে না বলতে অনুরোধ করল কেন নিজেও বুঝতে পারল না।

—ওখানে টিকিট মেশিন আছে। হফার দুটো কেস নিয়ে ওকে অনুসরণ করলো।—আমি যখন ট্রামে উঠব আমার কেসটা আমিই নেব।

ও দেখলো মেয়েটা কয়েকটা পয়সা ঢোকালো। ল্যাম্পের আলোয় মেয়েটাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। মার্টেল বুঝতে পারল না মেয়েটা কেন কাজ করছে। ওকে আরো ভাল করে না জানলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।

লেকের দিক থেকে ট্রাম আসছে। ট্রামের আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে লাগল। ক্রমশ মার্সিডিসটা সামনে এসে ট্যাঙ্কের মতো সজোরে আঘাত করল। টিকিট মেশিনের কাছে যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে আঘাত করে থামলো।

আঘাতটা মার্টেলের কাছে একটা ঘুঁটির মত। ও দেখল, মার্সিডিস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোক হফারকে চেপে ধরেছে। তার একজন ওর মুখের ওপরের অংশটায় কাপড় ঢাকা দিচ্ছে। রাস্তার আলোয় ওদের ডিনোমিনেটার দেখা যাচ্ছে। ত্রিভুজাকৃতি ব্যাজ লাগানো। অনেকটা গ্রীক অক্ষর ডেলটার মত।

* * *

ও এবার ট্রামের ঘণ্টা শুনতে পেল। মার্সিডিসটা আড়াআড়িভাবে লাইনটা ব্লক করে দিয়েছে। এবারে একটা রোলস রয়েস এলো। আগের ড্রাইভার ক্রমাগত বেল বাজাতে লাগল।

মার্টেল ব্যাগগুলো ফেলে হাতে কোল্ট ৪৫ নিয়ে এগোতে লাগল। রোলসটা সামান্য বেঁকে গেল। তারপর হেডলাইটের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এক হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে আর এক হাতে ট্রিগার টিপল, পরপর দুবার। হেডলাইট নিভে গেল। কেউ একজন হঠাৎ মার্টেলকে লক্ষ্য করে গুলি করতে গেল।

ইংরেজটা শুট করতেই সে মার্সিডিজে এলিয়ে পড়ল, কপালে রক্তের ধারা।

মার্টেল দু'জন লোকের দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে হফার। ওর মুখের কাপড়টা সরালো। ক্লোরোফর্মের গন্ধ মার্টেলের নাকে এলো। একটা লোক মার্টেলকে সজোরে লাথি কষালো। আরো কিছু লোক এবারে বেরিয়ে এসে জড়ো হল।

জুরিখের রাস্তায় হানাহানি মার্টেলের দুঃস্বপ্ন মনে হল। আক্রমণকারীদের একজন মার্টেলকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলেছে। অন্য একজন মেয়েটাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু মার্টেলের বুলেট দ্রুত গিয়ে বিঁধল ওর বুকে আর ডিগবাজী খেয়ে ছিটকে পড়ল।

রোলস থেকে আরও কয়েকজন বেরিয়ে এল। মার্টেলের কোল্ট থেকে আবার গুলি ছুটে একজনের গালে লাগল।

ওদের সম্মিলিত আক্রমণে মার্টেলকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছিল। গুলি আর খরচ না করার জন্যে রিভালভারটা লাঠির মত ব্যবহার করতে লাগল। হঠাৎ মাথার ওপর ভারী আঘাতে চোখে ঝাপসা দেখল। খানিক পরে চোখ মেলতে দেখল হফারের মাথাটা মার্সিডিসে ঢোকানো আর পা দুটো একটা লোক মুচড়ে দেবার চেষ্টায় রত। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আতঙ্কে হফারের চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ওদের মধ্যে একজন স্মোক বোমা ছুঁড়ছে। চারিদিক ধোঁয়ায় একাকার। ট্রামকে লক্ষ্য করে আর একটা বোমা ছুঁড়ল। ওদের মধ্যে ক'জন হফারকে মার্সিডিসে ঢুকিয়ে নিয়েছে। ওকে হফারের কাছে পৌঁছতেই হবে। একজন ওর কাছাকাছি হতেই মার্টেল গুলি করলো।

মার্সিডিসও আরও দুটো গাড়িতে মৃত আর আহতদের তোলা হচ্ছিল। 'ব্যানহফস ট্রাসের' দিকে দুটোই এগোতে লাগল। সামনে মার্সিডিস। বেশ খানিকটা বাঁদিকে 'প্যারেজপ্লেজ'।

হঠাৎ একটা ট্রাম নিঃশব্দে ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে এলো। মার্টেলের দেহ রক্তে ভাসছে। একজন ওর দিকে এগিয়ে গেল, সামনাসামনি আর কেউ ছিল না। ওকে একজন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।

ওর মুখের সামনেই দেহটা পড়ে আছে। মার্টেল দ্রুত গিয়ে নাড়িটা দেখল।

বুঝল লোকটা আর বেঁচে নেই। ঘাসের মধ্যে নিজের রিভলভারটা রেখে দিল। লোকটার দিকে

ঝুঁকে আর বুকের কাছে কোটে রূপোর ব্যাজ আটকানো! মার্টেল ওটা খুলে পকেটে রাখলো।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছুই পাওয়া গেলনা, ব্যাজ ছাড়া পরিচয়ের আর কোন চিহ্নই নেই। মার্টেলকে বেশ হতাশ দেখাল।

ধোঁয়ায় ঢাকা ট্রামের ছায়াটা স্পষ্ট, ড্রাইভার নেই। ও ক্যাবের মধ্যে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা দুটো কেসের দিকে তাকালো।

যে কোন সময়ে ক্যাব থেকে ড্রাইভার অদৃশ্য হতেই পারে। মার্টেল ওর জুতোটা নাড়াচাড়া করতে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর স্যুটকেশ দুটো নিয়ে আতঙ্কের জায়গাটা ছেড়ে চলল। কোথাও থেকে পেট্রোল কারের সাইরেন ভেসে আসছিল।

হঠাৎ বিস্ফোরণে মার্টেল খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কোন উপায় না দেখে পুরনো শহরটার দিকে এগোতে লাগল। ভেবেছিল ট্রামে যাবে কিন্তু একজনকে দুটো স্যুটকেশ নিয়ে চলতে দেখলে সন্দেহ করারই কথা।

এই মুহূর্তে মার্টেলের তিনটে কাজ। এক, স্টেশনের লাগেজ লকারে স্যুটকেস দুটো লুকিয়ে রাখা। দুই, স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলের ব্যবস্থা করা। তিন, বার্নেতে আর্নল্ডের হেড কোয়ার্টারে ফোন করা।

* * *

মার্টেল অনুভব করলো যে, ও একটা ঝড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোনও ভুল-টুল হচ্ছে নাতো?

আর্নল্ডের দেওয়া নাম্বার ঘোরাতেই একজন মহিলার কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করল—

—তুমি কে বলছো? এখন রাত কটা বাজে জানো?

—আমি দুঃখিত। আমি চাইছি...। বলে ও নাম্বারটা একের বেশীবার বলে গেল। আর্নল্ড নামটা বলল।

—এখানে ঐ নামের কেউ থাকে না, সম্ভবতঃ তোমার রং নাম্বার হয়েছে। শুভরাত্রি।

সচওয়েইজারহফ্-এর ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ওর ভাড়া করা শোবার ঘরে মার্টেল বসেছিল। কিন্তু ওর মনটা ছিল হাউপ্টব্যানহফের দিকে। হফারের লকারের চাবিটা ওর পকেটেই আছে।

ফার্দি আর্নল্ড একটা বাজে নাম্বার কেন দিয়েছিল কে জানে। তাহলে ও প্রকৃত ফার্দি আর্নল্ড নয়। আসল ফার্দির সঙ্গে ওর এখনও দেখা হয়নি।

ঐ একই লোক যদি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে থাকে তাহলে হফার নিশ্চয়ই অ্যাপার্টমেন্ট তাড়াতাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে ওর কারণ ব্যাখ্যা করেছিল। ও জানতো বাইরে ওদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে। কিন্তু মার্টেল যখন হফারের সঙ্গে এসেছিল তখন হফারই বা কেন ওকে আর্নল্ড হিসাবে মেনে নিলো। অনুভূতি দিয়ে বুঝল-এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোথায়?

* * *

মার্টেল ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। রাস্তাটা পেরিয়ে সারি সারি টেলিফোন বুথ। একটায় ঢুকে টুইডের দেওয়া নাম্বারে আর্নল্ডকে ফোন করল। টুইডের দেওয়া নাম্বারটা আলাদা।

—কে? কণ্ঠস্বর ধারালো ও তীক্ষ্ণ।

—কোথা থেকে তুমি ফোন করছো?

—এই মুহূর্তে সেটা প্রয়োজনীয় নয়। আমি দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি যে, হফার, তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লেয়ার হফারকে 'ডেলটা'-রা অপহরণ করে নিয়ে গেছে...।

—জুরিখের ব্যানহফস্ট-এর হত্যা লীলায় তোমার অংশ ছিল?

—হত্যালীলা? মার্টেল বলল।

—ডেলটা, যদি ডেলটা হয়ে থাকে। একটা ব্যাংক রেড হয়েছে। ব্যাঙ্কের মূল দরজায় ছোট মাইন বসানো ছিল। ওটার বিস্ফোরণে ট্রামের কিছু লোক আহত হয়েছিল। ট্রামটা ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখনও জানতে চাই কোথা থেকে তুমি ফোন করছ?

—বাদ দাও। তোমার সুইচবোর্ডের মধ্যে দিয়ে এই কল করছি।

—উন্মাদের মতো কথা বোলনা। ফার্দির কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। আবার বলল ফার্দি, আমাদের নিরাপত্তা...। ব্যাঙ্ক রেইডের ব্যাপারে তুমি কিছু বলো।

মার্টেলকে একটু উত্তেজিত দেখাল, বললো, এই কল মাত্র দু'মিনিটের জন্যে, সুতরাং...

—আমি তো তোমাকে বললাম, একটা বোমা, বলা যায় টাইম বোমা, ব্যাঙ্কের দরজায় ফিট করা ছিল। ব্যাপার কি ঘটল তা কেউ বোঝেনি। ওটা ছিল স্মোক বোমা আর সেজন্য ট্রামের ড্রাইভার কিছু দেখতে পায়নি।

—রোলস রয়েসের ব্যাপারে কিছু বলো যেটা তুমি জানো।

—আমি ও ব্যাপারে কিছু জানিনা। রাস্তায় আমি রূপোর, অনেকটা ডেলটা আকারের একটা ব্যাজ দেখেছিলাম।

—ক্লেয়ার হফারের সতর্কতা সূচক একটা বুলেটিন পাঠাও যাতে সমস্ত পয়েন্ট থাকে।

মার্টেল কলের দৈর্ঘ্যটা দেখে নিল।

—ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়...।

—দুঃখ এখন থামাতে পারো। ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা মার্টেলের পছন্দ হলনা।

—আমরা জানি, ওর কি হয়েছে, এটাও গল্পের একটা অংশ।

—এখন খ্রীষ্টের দিব্যি, আমায় বলো এবং তাড়াতাড়ি...মেয়েটা...।

'লিম্মাট'-এ ওর দেহটা ভাসছিল। সেরকম অবস্থাতেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আধঘণ্টা আগের ব্যাপার। মেয়েটাকে নৃশংস ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তারপর নদীতে ফেলে দিয়েছে। আমি চাই তুমি এসো। মার্টেল তুমি বার্নের ঠিকনাতে এসো...।

আর্নল্ডের কথা থামতেই, মার্টেল ফোনটা ছাড়লো।

* * *

বুধবার, সাতাশে মে ঃ

আর্নল্ড যদি কথাবার্তা চালিয়ে যেত তাহলে ওর কলের উৎসটা জেনে যেতো। এ ব্যাপারে মার্টেল নিশ্চিত। প্রকৃত আর্নল্ডের চেয়ে নকল আর্নল্ডের কাজকর্মই বেশী ভাল।

বুথ ছেড়ে মার্টেল হাউপ্টব্যানহফের দিকে এগোলো। খানিকটা ঘোরাফেরা করল। ডিপারচার বোর্ডটা দেখল। মিউনিকে এর অংশটায় খুন হয়ে যাওয়া ওয়ার্নারের জন্যে একটা মোহ জড়িয়ে আছে।

মার্টেল জায়গাটার একটা তালিকা করলো। গ্লেইস এক থেকে ষোল। সবশুদ্ধ ষোলটা প্লাটফর্ম। রাস্তাগুলো এখানেই শেষ হয়েছে। সারি সারি ফোনবুথ। অনেকগুলো ঢোকার আর বেরোবার রাস্তা। স্ন্যাক বুথও আছে।

মার্টেল দ্রুত রাস্তায় নামল। হাঁটতে হাঁটতে লিমাট নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। এই জলের মধ্যেই ক্লেয়ার হফারের ক্ষত-বিক্ষত দেহ পড়েছিল। শোধ ওকে নিতেই হবে, কারণ নৃশংস ব্যাপারটা ওকে খুবই আঘাত করেছে।

চারিদিকে পুলিস কোয়ার্টার। এখানেই ওর বন্ধু ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ ইন্সপেক্টর ডেভিড নাগেল কাজ করে। ঘড়িতে দেখল পৌনে এগারোটা। শেষ ট্রেন ছাড়তে আর এক ঘণ্টাও বাকী নেই। জুরিখের এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

ও লিনডেনহফস্ট্রাসেতে গিয়ে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ঢুকল। সামনেই রিসেপশনিস্ট জানাল নাগেল অফিসে আছে, কিন্তু দেখা করতে হলে ফর্ম পূরণ করতে হবে।

মার্টেল তা না করে গম্ভীর মুখে জানালো, ওকে গিয়ে আমার নাম বলো। তাড়াতাড়ি, আমার সময় মূল্যবান।

লোকটা আমতা আমতা করতেই মার্টেল বলল, ও আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে...।

* * *

কয়েক মিনিটের মধ্যে ও নাগেলের খোলামেলা অফিসঘরে ঢুকে গেল।

—আমি তো তোমাকেই আশা করেছিলাম। করমর্দন করে নাগেল বলল, টুইড আমাকে লন্ডন থেকে জানিয়েছিল তুমি আসছো. কোন সাহায্যের দরকার?

ডেভিড জাতে সুইস। সুগঠিত চেহারা, কালো গোঁফ, কালো চুল, ধূর্ত—চোখ। অবিবাহিত, বুদ্ধিমান, স্পষ্টভাষী।

—তুমি তো ফর্মটা পূরণ করোনি, তাই না? নাগেলের চোখেমুখে যেন অস্বস্তি। মার্টেল চোখ থেকে সৌখিন চশমাটা খুলল। নাগেল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ফার্দি আর্নল্ডের সিকিউরিটির লোকেরা তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মার্টেল সিগারেট খেতে আরম্ভ করল। টুইড ওকে জানিয়েছিল, নাগেল আর্নল্ডকে অপছন্দ করে। নাগেল বলল, তোমার নামটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি কোড নাম ব্যবহার করবে আর কোন অফিসিয়াল রেকর্ড রাখবে না। আমি আমার রিসেপশানের লোকটাকে বলে দেবে, তুমি আমার বিশ্বস্ত লোক। তাহলে আর্নল্ডের লোকজনের হাত থেকে রেহাই পেতে সহজ হবে।

মার্টেল মাথা নাড়লো। নাগেল বলল, এখানে আমার ফোন নাম্বার আছে। জরুরী হলে অবশ্যই ফোন করবে।

দশ মিনিট আগে হফার আমাকে ফোন করেছিল। ও জানতো আমরা বন্ধু। ক্লেয়ারকে আমি বিশ্বাস—।

মার্টেল শরীরে শিহরণ বোধ করল। ওর সামনের ঘূর্ণাবর্ত আরো দ্বিগুণ জোরে ঘুরে চলেছে।

* * *

বুধবার, সাতাশে মে ঃ

সিগারেট হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল।

নাগেলের কথা ওর মনে পড়ল, দশ মিনিট আগে ও ফোন করেছিল।

আধঘন্টা আগে আর্নল্ড ওকে ফোনে বলেছিল ক্লেয়ারের মৃতদেহ লিমাট নদীতে পাওয়া গেছে। সুতরাং এই ঘটনার এক ঘণ্টা আগে হফার বেঁচেছিল। নাগেলের লেখা সেন্ট গ্যালেনের ফোন নম্বরের কাগজটা এখন ওর হাতে ধরা। নাগেলের কণ্ঠস্বর মার্টেল চেনে।

—কোথাও গণ্ডগোল একটা...? নাগালের নরম কণ্ঠস্বর মার্টেলের কানে গেল।

—হুঁ, বলে কাগজের টুকরোটা ও পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। জিজ্ঞেস করলো, রাতে কি করছো?

—রুটিন মাফিক কাজ।

মার্টেল ভাবতে লাগল গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ব্যক্তি। সে এখনও নিজেই জানে না ব্যানহফস্ট্রাসেতে কি ঘটেছে?

—ফার্দি আর্নল্ডকে তুমি অবিশ্বাস করো কেন?

—আচ্ছা তাহলে হফার, যে আর্নল্ড-এর হয়েই কাজ করে, তোমাকে আমার কথা বলেছিল ওই তো...?

—আসলে ক্লেয়ার জানে আমরা দু'জনে বন্ধু। ও পাল্টা গুপ্তচর হবার আগেই আমার কাজ করছিল।

—তুমি বললে, আজ রাতে রুটিন মাফিক কাজ আছে।

—না একটা অন্য কাজও আছে। লিমাট নদীর দিক থেকে একটা শব্দ পেয়েছিলাম, একটা লঞ্চে বিস্ফোরণে এক হতভাগা মারা গেছে। এই বলে নাগেল জানলার ধারে তাকালো।

মার্টেল নাগেলের দিকে তীক্ষ্মভাবে তাকালো। নাঃ ও কোনরকম মিথ্যে কথা বলছে না বলেই মার্টেলের মনে হল।

—আবার দেখা হবে? চলি। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলতে চাইছি, তুমি শুনছো না।

নাগেল ওকে তিনটে ফোন দেখিয়ে বলল, এর মধ্যে তোমাকে একটা ছেড়ে দিতে পারি...ঐখানে সুইচবোর্ডে সরাসরি লাইন আছে।

—না ডেভিড, তার দরকার নেই। আমার সময় কম।

—যাইহোক মার্টেল, জুরিখ সফর তোমার সুখের হোক এই কামনা করি।

* * *

ঠিক এগারোটায় মার্টেল পুলিস হেড কোয়ার্টার ছাড়ল। সেন্ট গ্যালেনের ট্রেনের আর আধ ঘণ্টা সময় আছে, ওকে ধরতে হবে। বাইরে এল। দুটো পেট্রল কার পার্ক করা আছে। দুজন ইউনিফর্মধারী বসে আছে। বন্‌হফসট্রাসের সেই শয়তানটা এখন কোথায়?

হাউপ্টব্যানহফ-এ যেতে হবে বলে ও মিথ্যে বলেছে। মার্টেল ভাবল এই সুইসটাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু ফোনের ব্যাপারটাতে নয়।

স্টেশনের সামনেই অনেকগুলো ফাঁকা বুথ। একটায় ঢুকলো ও। নাগেলের দেওয়া নম্বরে ডায়াল করলো ও।

সেন্ট গ্যালেনের হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলল, ক্লেয়ার হফার ওদের সঙ্গে ছিল। মেয়েটি ওকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

খানিক পরে একটা ফোন এলো, ওপারে মহিলা কণ্ঠস্বর। মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, কে বলছো?

জবাব এলো, আমাদের বন্ধু নাগেল, তোমার কথা আমাকে জানিয়েছে। আমি চাই দ্রুত ব্যবস্থা নাও। বাইরে যদি কোন ফোন পাও তাহলে এই নাম্বারে ফোন করো।

বলে ও বুথের নাম্বারটা বলে গেল। আরোও বলল, এটা জুরিখের ফোন নাম্বার। যাইহোক আমার হাতে সময় কম। গুডবাই...।

মার্টেল ঘামতে ঘামতে অনুভব করলো যে ও ক্রমশঃ ফাঁদে পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনল, সেই একই কণ্ঠস্বর।

—আমাদের বন্ধুর নামটা...।

—ডেভিড নাগেল...।

—ক্লেয়ার হফার কথা বলছি...।

—আমি যা বলেছি তুমি তাড়াতাড়ি করো। হোটেলে একটা যুক্তি খাড়া করে বিলটা মিটিয়ে দাও।

—শোনো, সেন্ট গ্যালোনে আর একটা হোটেল নিয়ে আমার জন্যে একটা ঘর রিজার্ভ করো। ওদের বলো আমি ঠিক ভোর একটায় পৌঁছবো। ট্রেনে যাবো।

মার্টেল ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ভাবল সময় অতি মূল্যবান। মেয়েটাকে ভালই লাগল। ওর মনে হল যেন ও কোন মৃতের সঙ্গে কথা বলেছে। আবর্তটা ওর চোখের সামনে আরো সজোরে ঘুরতে লাগল।

মার্টেল সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে রাখল। ওর মনের মধ্যে কেমন যেন অস্থিরতা। চারিদিকে তাকালো ফাঁকা জায়গা। কয়েন বক্সটা একবার দেখল। ও একটা ড্রাগ মুখে দিলো। আবার ফোন করলো। আবার সেই মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

—আমাদের বন্ধু...।

—নাগেল, আমি মার্টেল...।

—বাঃ, কপালটা ভালই। দোতলার ঘরে দুটো বিছানা। হোটেল মেট্রোপল। স্টেশনেব বাইরের দিকে মুখ। তুমি চলে এসো। আমার ঘরের নাম্বারটা খামের মধ্যে রেখে আসবো। কেমন—? ভালই হবে—। গুড বাই।

পরের কয়েক মিনিট মার্টেল দ্রুত কাজ সারলো। হোটেলে ও ঘর ভাড়া নিয়েছে যদিও বেশীক্ষণের জন্যে নয়। বাতিল করতেই হত।

হোটেলের রেজিস্ট্রেশান ফর্মে লিখল, আমি কনসালট্যান্ট মেডিক্যাল। আমার একটা রোগীর বাড়িতে যেতে হবে। লিখে সই করল।

* * *

ওর ব্যাগটা খোলাই আছে। যখন কোথাও যায় তখন এই ভাবেই ও সাবধান হয়। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এলো। স্টেশনের বাইরের প্রথম ট্যাক্সিতে চেপে ড্রাইভারকে 'প্যারোডিপ্লেসে' নিয়ে যেতে বলল। ওখানে আমি একজনকে একটা জিনিষ দিয়ে আবার তোমার গাড়িতেই আবার এখানে

আসবো। তুমি ট্রাম স্টপেজে অপেক্ষা করবে।

ড্রাইভার সম্মত হলো। গাড়ি এগোল। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা।

সেন্ট গ্যালেনের ট্রেন ছাড়বার কয়েক মিনিট বাকি। ওর বিশ্বাস ম্যানেজ করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। বিস্ফোরণের জায়গাটাও দেখেছে।

মার্টেল ড্রাইভারকে বললো, কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল, শুনেছিলে।

—হুঁ, শুনেছি। তবে গুজব নৌকোয় একজন ট্যুরিস্ট মারা গেছে।

মার্টেল বুঝলো ব্যাপারটায় এখন সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। ওরা এতক্ষণে 'প্যারোডিপ্লেসে' চলে এসেছে। ড্রাইভার বললো, একটু আগে পুলিশের মুখে শোনা...।

—পুলিশ? ভুরু কুঁচকে মার্টেল বলল।

—হুঁ, হাউপ্টব্যানহফে একটা পেট্রোল কার থেমেছিল। ওর ড্রাইভারটা এসে ট্যুরিস্টের ব্যাপারটা বলেছিল।

—চেনো নাকি?

—আমি এই শহরে কুড়ি বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি, শহরের প্রতিটা পুলিশকে আমি চিনি। কিন্তু একে আমি আগে কখনোও দেখিনি।

—সম্ভবতঃ নতুন...।

—না, বয়েস অনেক। যাইহোক আমি এখানেই দাঁড়াই?

'প্যারোডিপ্লেসে'র মধ্যেই গাড়িটা পার্ক করা হলো। মার্টেল এগোল।

রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। নিজের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সেই আবর্ত ওর চোখের সামনে আবার পাক খেতে লাগল।

দু-ঘণ্টা আগের সেই রক্তাক্ত ঘটনার চিহ্নমাত্র নেই। সঠিক জায়গায় যে সে এসেছে, সেই খিলানটা দেখে চিনলো। এখানেই ও আর মেয়েটা এসেছিল। ডানদিকে বড় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের দরজায় ডাবল প্লেটের কাঁচ লাগানো।

রাস্তার ধারে কোথাও কাঁচের চিহ্ন নেই। সুইসরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে নিপুণ। কিন্তু এখানে কেমন যেন বিবেচনার অভাব।

রাস্তায় এখন রক্তের কোন চিহ্নই নেই। ওর জুতোয় এখনও সেই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে আছে। বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া গাছটার বদলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নতুন একটা গাছ বসান হয়েছে। সুইসরা এমনই নিখুঁত।

* * *

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মে ঃ

ব্যাভেরিয়ার 'অ্যালগাও'তে একেবারে ভেতরের দিকের একটা জায়গা। নিজের লাইব্রেরীর ঘরের জানালার সামনে রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ দাঁড়িয়েছিল। মাঝ রাত অতিক্রম করে গেছে বৈদ্যুতিক সংকেত যন্ত্রটা একটানা বাজতে আরম্ভ করল।

ও এসে একটা ড্রয়ারের চাবি খুলল।

রিসিভারটা তুলল।

এরউইন ভিন্‌জ নিজের পরিচয় দিতেই দিয়েত্রিচের কণ্ঠস্বর সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে বলল, খবর আছে?

—ইংরেজটা জুরিখ ছেড়ে গেছে। হাউপ্টব্যানহফ থেকে এগারোটা উনচল্লিশের ট্রেন ধরেছে। আমাদের লোকেরা পৌঁছবার আগেই ও কম্পার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

—জুরিখ ছেড়ে গেল! কি বলছো? সেন্ট্রাল হক অ্যাপার্টমেন্টে কি হল?

—অপারেশন সম্পূর্ণ সফল হয় নি। ভিন্‌জ নার্ভাস গলায় বলে উঠল। দিয়েত্রিচের মুখটা কঠিন হয়ে গেল। কোথায় কি হয়েছে সঠিক ভাবে আমায় বল।

—মেয়েটা একেবারে ছুটি নিয়েছে। সুতরাং ওর কাজের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। আমাদের যেটা লাভ হল, ও কোনরকম খবর দিতে পারবে না। ওর ব্যাপারে তোমার ভয়ের কিছু

নেই।

—কিন্তু মার্টেলের বিষয়ে ভয়ের আছে বইকি! ও কোথায়? কোন্ ট্রেনে গেছে?

—ওর গন্তব্যস্থল সেন্ট গ্যালেন।

—দিয়েত্রিচ রিসিভারটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ভিন্‌জকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ফোনটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

ব্রান্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়েই গ্লাস শেষ করে বেলটা বাজাল।

একজন কুঁজো লোক ঘরে ঢুকল। মাথার দু'পাশের কানদুটো একেবারে চ্যাপটা। পরনে সবুজ পোষাক। প্রভুর গ্লাসটা হাতে নিল ও।

—অস্কার আরও ব্রান্ডি নিয়ে এসো। ভিন্‌জ আর ওর দলের লোকেরা কাজটা নষ্ট করেছে। মার্টেল এতক্ষণে সেন্ট গ্যালেনে। আমরা তো ইংরেজটার সঙ্গে—অস্কার বলল।

দিয়েত্রিচের বয়স ষাটের মত। নাকের নীচে মোটা গোঁফ, রূপোলী চুল, লম্বা সুগঠিত চেহারা। পোষাক-পরিচ্ছদে স্মার্ট লাগছিল।

ও প্রথমে ইলেকট্রনিক্‌সের লাইনে ঢুকেছিল। হেডকোয়ার্টার স্টাটর্গাটের। অ্যারিজোনাতেও ওর বিরাট ফ্যাক্টরী আছে। অস্কারের দিকে চেয়ে বলল, আমাদের লোকেদের সঙ্গে ভিন্‌জ সেন্ট গ্যালেনে যাচ্ছে। রাতের বেলা মার্টেলকে ধরা যাবে। কিন্তু রাতের বেলা মার্টেল কোথায় যাবে? সুইস রমনী ক্লেয়ারকে তো বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অপারেশন ক্রোকোডাইলকে কোনকিছুই ব্যাঘাত করবে না। তেসরা জুন সামিট এক্সপ্রেস জার্মানী অতিক্রম করবে। চৌঠা, ব্যাভেরিয়ায় নির্বাচন। ডেল্টা ক্ষমতায়—।

—কিন্তু মার্টেল—।

—নির্দেশ আছে—হত্যা।

* * *

সেন্ট গ্যালেনের রাতের ট্রেনে মার্টেল চেপে বসল। ও নিশ্চিত যে কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। জানলা দিয়ে তাকালো একবার। কোন যাত্রী এখনও ওঠেনি। প্রথম শ্রেণীর কামরা। ও ধারের একটা সীটে গিয়ে বসল।

সেন্ট গ্যালেনে ট্রেন থেকে নামার কথা। দ্রুত স্যুটকেসটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বেরোবার দিকে এগোলো। হফারের কথানুযায়ী স্টেশনের সামনের হোটেলে গিয়ে ঘরের ভাড়া জিজ্ঞেস করল। দু'রাতের জন্য ঘরের ভাড়া ও দিয়ে দিল। ক্লান্ত লাগা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল ওর কোন খবর আছে কিনা।

হোটেলের লোকটা ওর হাতে একটা খাম দিল। হোটেলের নিয়মানুযায়ী তিনটে ফর্ম পূরণ করে সময় উল্লেখ করতে হয়। রাতে পুলিশ এসে এক কপি নিয়ে যায়। কিন্তু মার্টেল ফর্ম পূরণের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালো না, কারণ ও এখানে আছে এটা অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা গোপন রাখতে চাইছিল।

অবশেষে ঘরে ঢুকে খামটা খুলল। মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা রুম-নম্বর বারো। ও দ্রুত গিয়ে দরজায় টোকা মারল। মেয়েটা দরজা খুলতে মার্টেল ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল।

—পরস্পর বন্ধু?

—ডেভিড নাগেল।

—আমি তোমাকে স্টেশনে জানালা দিয়ে আগেই দেখেছি। এজন্যে তুমি অবশ্য আমাকে দোষ দিতে পারো না।

—যাইহোক সাবধান হওয়া উচিত, আমি এখন ক্লান্ত...।

—দেখেই বুঝতে পারছি।

হাতে যে তোয়ালেটা ছিল ওটা সরাতেই মিলিমিটারের একটা পিস্তল দেখা গেল। ওটা বালিসের তলায় রেখে দিয়ে বলল, তোমার তেষ্টা পেয়েছে।

—আমি বোতলের জল খাবো।

বিছানায় উঠে বসে মার্টেল মহিলাকে ভালো করে একবার দেখে নিল। বেশ লম্বা, আকর্ষণীয় চেহারা, কালো চুল, চোখ দুটো নীল।

—তুমি আমার পরিচয়ের প্রমাণ চাইবে।

বলেই পাসপোর্টটা বের করে ওর হাতে দিল। মেয়েটাও ওর পরিচয়পত্র দেখাবার চেষ্টা করল। জুরিখের গিসেলা জোবেলকে ও নিজেই চেনে। যাইহোক অন্য একটা মেয়েকে ও বাঁচিয়েছে। ওর চোখের সামনে সেই আবর্ত দ্বিগুণ বেগে ঘুরে চলেছে। মেয়েটা চলে যেতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

খুব সাবধানী মেজাজে ওর ঘুম ভাঙলো। ও নিশ্চিত নয় যে ও এখন কোথায় আছে। চারিদিক অন্ধকার। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

হঠাৎ ওর গায়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। ওর মনে হল যেন কেউ ঘরে রয়েছে। ওর টাই, শার্ট, জুতো খুলে নিচ্ছে। কোন শব্দ না করে মাথাটা ঘুরিয়ে ডান হাতটা সামনের দিকে এগোল। আলো আসার আগেই একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলে উঠল,—তুমি ঠিকই আছো। সেন্ট গ্যালেনের মেট্রোপল হোটেলেই তুমি আছো। আমি ক্লেয়ার হফার। এখন ভোর চারটে। তুমি দু'ঘণ্টা মাত্র...।

—ঠিক আছে তাতেই হবে।

মার্টেলের গলা শুকিয়ে কাঠ। ও উঠে বসল। দেখল হফারের পরনে ধূসর রঙের টু-পিস্ স্যুট। বিছানার ধারের টেবিলে তোমার পিস্তল আছে, ওটা নিয়ে ভাল ঘুম হয়। যাই হোক দরজা একেবারে বন্ধ।

—তুমি সব কিছুই ভাবছো? মার্টেল হফারের কথায় বলে উঠল।

জুরিখ অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে আসতে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল মার্টেল।

—কি চিন্তা করছো?

—এই যে...। বলে মার্টেল থেমে গেল। তারপর শার্টের পকেট থেকে ডেলটা ব্যাজটা যেটা বন্‌হফস্ট্রাসেতে মৃতের পকেট থেকে পেয়েছিল, ওটা হফারের সামনে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল। হফার প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। আতঙ্কে চোখদুটো কেমন বড় হয়ে গেল।

—তুমি এটা কোথায় পেলে?

মেয়েটা সত্যিই চতুর আর চট্‌পটে। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই ওর দিকে পিস্তল তাক করলো।

—ব্যাজটা দেখে ভয় পেয়েছো?

—তুমিই তো এখন ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। গুলি করতে আমার কোনরকম দ্বিধা...।

—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

টেবিলের ড্রয়ারের দিকে ওর হাতটা সরিয়ে নিলো। মহিলার কথায় বা ব্যবহারে কোনরকম নম্রতা নেই।

—গতরাতে আমি বন্‌হফস্ট্রাসে একটা মৃতদেহের পকেট থেকে এটা পেয়েছি। আমি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কখন বেরোবো, এই ভরসায় অপেক্ষা করছিল। ডেলটা, তোমাদের কোন লোকেদের মুখোশ ছিল না। ওদের প্রত্যেকের পকেটে একটা করে ব্যাজ। জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

—তুমি বলছ 'রক্ত', আবার বলছো 'আমাদের'...।

—সেন্ট্রাল হক-এ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করনি কেন? ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

—ওয়ার্নারের খুনের পরে ডেলটা ইনভেস্টিগেশন থেকে আর্নল্ড আমাকে তুলে নিতে চেয়েছিল। সে কারণেই আমি আন্ডার গ্রাউন্ডে এসেছি। সম্ভবতঃ লিসবেথ তোমাকে এখানে এনেছে, তোমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা নিশ্চিত হতে। আর্নল্ডের অনুসরণকারীদের কাউকে কাউকে ও চেনে।

—এছাড়া ও স্বয়ং ফার্দি আর্নল্ডকেও চেনে?

—না, ওদের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। কেন বলতো?

ও এবার আর্নল্ডের বর্ণনা দিল। তিরিশের ওপর বয়েস। বাদামী চুল, ধূসর চোখ...।

—কিন্তু?

—আমরা অ্যাপার্টমেন্টে আছি এটা কেউ ওকে বলেছে বোধহয়। লিসবেথকে আমি সন্দেহ করি। কারণ ও নোটবুক থেকে নাম্বারটা নিয়েছিল। ব্যাপারটা ও জেনেছিল। আমার আসার আগেই সম্ভবতঃ আর্নল্ড ফোন করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা বুঝিয়েছিল। কে...?

খুব সতর্কভাবেই শব্দগুলো ব্যবহার করছিল। বললো, সেই মহিলা যে তোমাকে নামিয়েছিল।

—ওর বিয়ের আগে আমরা দু'জন ডেভিড নাগেলের কাছে আই. বি. পুলিশে কাজ করতাম। আমরা একদিন ওর সঙ্গে রসিকতা করি। একই পোষাক পরে অফিসে গিয়েছিলাম দশ মিনিটের তফাতে। ও তো তফাৎ ধরতেই পারেনি। আমরা ব্যাপারটা বলাতে ও ভীষণ রেগে গেল। তোমরা যে বোকা বনে যাবে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

ওর মধ্যে আস্থার ভাব দেখা গেল। পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে দিল। মৃদু হেসে ও প্রশ্ন করল, লিসবেথ কোথায়? ও কি জুরিখের ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করছে?

—ও এলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে ভাববে আমার বোন, কিন্তু ও আমার কেউই নয়।

*   *   *

এদিকে লন্ডনে টুইডের চোখ ফাইলে নিবদ্ধ। আতঙ্কজনক খবরটা কখন পেয়েছিল, সেটাই ভাবছিল। ওর-সহকারী মিস্ ম্যাকনেইল একটা খবর দিল।

একটা সুন্দরী মহিলার দিকে রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে দেখছিল; ও যে কে তা কেউই জানেনা। একমাত্র টুইডই চেনে। ওর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

—বেইরুট থেকে এসেছে।

অ্যালার্ম বেলটা বাজতে লাগল। টুইড ড্রয়ার খুলে কোড নম্বর দেখে নিল।

সেই মুহূর্তে সিগন্যালটা আবার স্বাভাবিক বাজতে লাগল।

বেইরুট হচ্ছে ব্যাভেরিয়ায়। লিন্ডাউ ওয়ার্নারের শেষ জায়গা।

ম্যাকেনেইল বলল, তোমাকে একটু একা পাওয়া যাবে?

—না, আমি এখন...।

কাজের শেষে টুইড ওর দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি একেবারে শূন্য।

—কোন খারাপ খবর?

—খুবই খারাপ।

—তুমি সেই পোষাক পরবে। পরো...।

—আমি ওরকম ঢাকা দেওয়া পোষাক পরি না। পূর্ব জার্মান থেকে ব্যাভেরিয়ার সীমান্ত ম্যানফ্রেড সবেমাত্র পেরিয়েছে। ওঃ।

টুইড সিগন্যাল পড়া মাত্রই কেমন হয়ে গেল। ও মানসচোখে রুটটা দেখতে পেল। স্টেটের সিকিউরিটির জন্যে প্রথমে মন্ত্রীসভার মধ্যে ওর এজেন্ট ঢোকানো আছে লিপজিগ অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীতে। ওর মোবাইল ট্রান্সমিটার থেকে একটা রেডিও ম্যাসেজ করা হল। বেইরুটের টুইডের স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা হলো।

বেইরুট থেকে একজন দূত দ্রুত গাড়িতে বসে বৃটিশ অ্যামবাসীতে এলো। সেখানে সিকিউরিটির কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সিগন্যালটা দেওয়া হলো। এরপরে ওটাকে পার্ক ক্রিসেন্টে ঘোরানো হলো। সিগন্যালটা কোনরকম কোড করা ছিল না। ওটাতে যা ছিল ঃ

ম্যানফ্রেড আজ বুধবার সাতাশে মে পশ্চিম জার্মানীর 'হফ'-এর কাছে পূর্ব জার্মান অতিক্রম করেছে। চরম গন্তব্য এখনও অজানা।

কোন কথা না বলে ম্যাকেনেইলকে সিগন্যালটা দিলো। এরপর দেওয়ালের মানচিত্রের দিকে এগিয়ে গেল। পরীক্ষা করে নিল যে ম্যানফ্রেড কোন্ রুটটা বেছেছে।

হফ-এর আঞ্চলিক সীমা থেকে একটা অটো দক্ষিণে দৌড়োচ্ছিল। নুরেমবার্গ হয়ে গন্তব্য ব্যাভেরিয়ার রাজধানীতে। এখান থেকেই হাউপ্টব্যানহফের ওপর বিশেষভাবে নজর রেখেছিল। কিন্তু কেন কে জানে? ও ওর ঘোরানো চেয়ারে ফিরে গেল।

—আমরা তো ম্যানফ্রেডের ব্যাপারে বেশী জানি না, তাই না? ম্যাকনেইল বলল।

—আমরা কিছুই জানি না এবং আমরা অনেক কিছুই জানি। টুইড ভ্রূ কুঁচকে বললো।

একটা ফাইল নাড়াচাড়া করছিল ও।

—বুড়ো বয়সে আমি মানসিক রোগী হয়ে যাবো। তুমি যখন সিগন্যালটা আনলে তখন আমি ওর দিকে দেখছিলাম।

—হ্যাঁ, ও হচ্ছে উঁচু দরের পূর্ব জার্মান এজেন্ট, তাই না। ওর জাতিগত বিষয়ে খোঁজখবর চলছে। প্রথম শ্রেণীর কুশলী গুপ্তঘাতক, নিখুঁত পরিকল্পনায় ওস্তাদ। সত্যিই অস্বাভাবিক গুণের।

কিন্তু কালেসি একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের। টুইড চশমাটা চোখের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল।

—তুমি কি সত্যিই ভাবো ও কালেসি? ওর ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি।

আমেরিকানরা অনুমান করছে কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি বুঝিনি ডেলটা হচ্ছে নয়া-নাজীদের...।

ম্যানফ্রেড হচ্ছে বেশীর ভাগ বড় ধরনের নাশকতামূলক অপারেশান ফ্রিল্যান্স কমিউনিস্ট এক্সপার্ট। তাহলে অপারেশান ক্রোকোডাইলের পেছনে কে আছে?

—তোমাকে সত্যিই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কফি করবো, খাবে?

টুইড ডেস্কের ফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

—ঈশ্বরের দোহাই, মার্টেল চলে এসো। দেরী হবার আগেই তোমার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নাজী আর কমিউনিস্ট দু'দিক দিয়েই তোমার বিপদ।

* * *

এটসট্রাসেতে মিউনিখ পুলিশের হেড কোয়ার্টারের কাছেই বড়ো বিল্ডিং। ওরই একটা অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে দস্তানা পরা একটা হাত ফোনটা তুলল। দস্তানাটা নাইলনের। ও একটা নাম্বার ডায়াল করলো। তখন ভো'র চারটে।

—কে বেজন্মা? সময় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই...? রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই ও রেগে গেছে। যদি ভিন্‌জ হয় তাহলে আবার ও কেটে...না।

—ম্যানফ্রেড বলছি।

কণ্ঠস্বর সংযত ও বিনয়ী। আবার বলল ম্যানফ্রেড, শুনলাম তোমার নাকি কি একটা সমস্যা যার ফলে আমরা অসুবিধেয় পড়েছি—।

দিয়েত্রিচ দ্রুত উঠে বসলো। জুরিখের ব্যাপারটা ও কিছুটা জানে। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, এমন কিছু নয় যে আমরা চালাতে পারবো না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি—

—কিন্তু জুরিখে ব্যাপারটা ভুলভাবে চালানো হয়েছে। তাহলে আমরা পরবর্তী সেন্ট গ্যালেনে কি আশা করতে পারি?

ম্যানফ্রেডের জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনে দিয়েত্রিচের মনে আতঙ্ক জেগে উঠল।

ম্যানফ্রেড যখন কম দামে স্টাটগার্টে অস্ত্রশস্ত্র আর পোষাক সাপ্লাই করার প্রস্তাব দিল তখন ও প্রায় সুযোগটা লুফে নিয়েছিল। কিন্তু ও এখন দুঃখিতভাবেই সিদ্ধান্ত নিলো যে, ব্যাপারটা অনেক দেরী হয়ে গেছে।

—তোমাকে সেন্ট গ্যালেনের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না।

অদ্ভুত স্বরে আবার বলল, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার সব বন্দোবস্ত ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।

—শুনে খুশী হলাম। একই ওয়ার হাউস থেকে কিন্তু সংগ্রহের জন্য আরো অস্ত্রশস্ত্র আর পোষাক পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় আর কখন তুমি এগুলো নেবে?

দিয়েত্রিচ ওকে বললো, এবারে একটা ক্লিক শব্দ হলো তার ফলে শিল্পপতি বুঝলো ম্যানফ্রেড আর লাইনে নেই। একগুঁয়ে, বদমাস, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মিলেছে। ঈশ্বর জানে যে ওরা অনেক নষ্ট করেছে। কেমন করে বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলার জায়গাটাকে অনুসরণ করল বুঝতে পারছেনা।

এদিকে মিউনিকে ম্যানফ্রেড ডেকের আলোটা নিভিয়ে দিল। পশ্চিমের ও যেখানেই থাকুক

না কেন সব সময় দস্তানা ব্যবহার করে। তাহলে এপার্টমেন্ট ছাড়ার পরে কোথাও আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। ওর মুখের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা হাসি। পরিকল্পনানুযায়ী অপারেশান ক্রোকোডাইল এগোচ্ছে।

* * *

লিসবেইথের খুনের ব্যাপারটা মার্টেল হফারকে বলতেই ও কেমন হয়ে গেল। মেট্রোপল হোটেলের শোবার ঘরে তখন ওরা দু'জনে। ও অবশ্য একটা ব্যাপার বললো না যে ওকে রীতিমত অত্যাচার করা হয়েছে।

হঠাৎ ক্লেয়ার ওকে চেপে ধরলো। বলল, ও তোমার জন্যেই ওদের হাতে ধরা পড়েছিল। হারামজাদা।

বলার পরেই ও মার্টেলের গালে একটা চড় মারলো। আবার মারতে যেতেই ওর হাতটা ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। হঠাৎ মার্টেলের মনে পড়ল গিসেলা জোবেলের সঙ্গেও ঠিক এরকমই একদিন হয়েছিল, সেন্ট্রাল হফের অ্যাপার্টমেন্টে।

কিন্তু এ মেয়েটা আলাদা। মেয়েটা রুক্ষ কিন্তু আবার ব্যবহার সংযতই বলা যায়। বিছানার পাশের আলোতে ওর চোখ দুটো বেশ বড় দেখাচ্ছে। ও ওর কপালে একটা চুমু খেলো, তাতেই মেয়েটা নরম হয়ে গেল।

—অন্ততঃ এক ডজন ডেলটা সশস্ত্র সৈন্য আক্রমণকারী ছিল; মার্টেল নরম স্বরে বললো। দুটো গাড়িতেই সবাই ছিল। আমি তিনজনকে গুলি করেছি। ওরা সবাই মার্সিডিসের মধ্যে লিসবেইথ-এর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি তখন ব্যবস্থা নিলাম...।

—এক ডজন সশস্ত্র...। মেয়েটার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কেমন করে লিসবেইথকে রক্ষা করতে পারলে? কেনই বা ঘটনাটা ঘটালো, ওকেই বা নিয়ে গেল কেন?

—ওরা তোমার ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল।

—আমি কেন?

—বড় একটা কিছু হচ্ছিল বোধহয়। তাহলে যে এজেন্টরা একটু অন্য গাইছে তাদেরই ডেলটা বিচ্ছিন্ন করছে। প্রথম নাম চার্লস ওয়ার্নার। তারপর তুমি, আমি ওদের তৃতীয় লক্ষ্য। লিন্ডাউ থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত কেনই বা ওয়ার্নার ট্রেন ব্যবহার করলো না, কেন নৌকতে গেল?

—ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন লোক ছিল, বলেছিল, ট্রেন ট্যাপ হতে পারে। আচ্ছা আমরা ঐ লোকগুলোকে প্রত্যাঘাত করতে পারিনা?

—আমরা সেটাই করতে যাচ্ছি। আর সেজন্যই আমার গন্তব্যস্থল সেন্ট গ্যালেন। ওখানে এমব্রডারী মিউজিয়াম খুবই কম তাই না?

—হুঁ, বলে চুলগুলো আঁচড়াতে লাগল ও। বললো, জায়গাটাকেই ডেলটার ব্যাপারে চার্লস 'রাঁদেভু' হিসাবে ব্যবহার করত, তুমি কিভাবে জানলে?

—আমরা ফিরে আসি। তুমি জানো ডেলটার কতখানি গভীরে ওয়ার্নার ঢুকে গিয়েছিল?

—আমি যেরকম বলেছি, সেইরকমই। ওর মনের ভেতরটা তো আমি জানিনা। চার্লস নিজেকে অনেকখানি পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

থেমে আবার বলল, ওর ছদ্মনাম স্ট্যাল। যাইহোক তুমি ডেলটার হালফিলের খবর দেখেছ।

ও একটা খবরের কাগজ ওকে দিল। আগের দিনের কাগজ। একটা হেডলাইন পড়েই ও রীতিমত চমকে উঠলো।

'এ্যালগাউতে নয়া-নাজীদের নতুন সংগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র আর তৈরি পোষাক পাওয়া গেছে।

খবরটা খুবই সাধারণ। বিশেষ সূত্র ধরে ব্যাভেরিয়ান পুলিশ ভোরে একটা খামার বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রের একটা ভাণ্ডার পায়। ফার্ম হাউস এখন কর্মব্যস্ত কিন্তু তল্লাসীর সময় তা ছিলনা।

ক্লেয়ার বলল, গত চার সপ্তাহে ওরা ডেলটার এরকম অস্ত্র রাখার সাত নম্বর ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছে।

—ব্যাপারটা যেন কিরকম!

—কি ভাবছো? তোমাকে আবার সেরকম দেখাচ্ছে—?

মার্টেল দেওয়ালের দিকে তাকালো। টুইডের সঙ্গে কথোপকথোনের দৃশ্যগুলো ওর মনে ভাসছিল।

ওয়ার্নারের দেহের মধ্যে ব্যাজ পাওয়া গেছে। ওরা কাজ শেষ করে ওর পেছনে ডেলটা প্রতীক এঁকে দিয়েছিল।

ভাবনা থামিয়ে মার্টেল বলে উঠলো, আমার মনে হচ্ছে কোন একটা ব্যাপার আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। বলে ঘড়ি দেখল, সাড়ে চারটে। আবার বলল, কিন্তু আমরা বদমাইশগুলোকে ফাঁদে ফেলতে পারি। সেন্ট গ্যালেনে এমব্রডারী মিউজিয়াম আছে। এখান থেকে আট ঘণ্টা কম সময়ে—

কথা শেষ হলো না। হফারের দিকে তাকালো ও।

* * *

বৃহস্পতিবার আঠাশে মে ঃ।

—হ্যাঁ, এই ব্যাপারেই আমরা কথা বলছি। আমি আশা করি।

ডাইনিংরুমে ব্রেকফাস্টের সময় মার্টেল ওকে কমলা রঙের একটা টিকিট দিল।

জার্মান ভাষায় কি যেন একটা সংখ্যা লেখা আছে।

—মরার সময়ে ওয়ার্নারের ওয়ালেটে এটা ছিল।

ক্লেয়ার বলল, এটা তো গ্যালেনের এমব্রডারী মিউজিয়ামে ঢোকার টিকিট। বিল্ডিংটা পুরোন শহরে। হেঁটে দশ মিনিট।

—পেছনে দেখ।

ক্লেয়ার টিকিট উল্টে লেখাটা দেখল। লিন্ডাউ যাত্রার সময়ে এটাই ওর শেষ হস্তাক্ষর।

এস. টি. এগারো পঞ্চাশ, মে আঠাশ।

—মে 'আঠাশ ....অর্থাৎ আজ...ঘড়িটা দেখল, বলে উঠল, ন'টা। এস. টি. অবশ্যাই স্ট্যাল-এর জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাদের ওখানে গিয়ে কথা বলতে অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক লাগবে।

—কিন্তু মার্টেল একাই যেতে চায়। বলল, ও গেলে কাজ নাও হতে পারে।

ক্লেয়ার পাল্টা জবাবে বলল, তোমাকে ও চিনবেনা।

মার্টেল শান্তভাবে বলল, শোন ক্লেয়ার, সংবাদ জোগাড়ের এর থেকে ভাল উপায় আর নেই।

একটু থেমে আবার বলল, আমি একা কাজ করতে ভালবাসি। আর আমি মনে করি এটাই উত্তম পদ্ধতি।

আবার থামলো, তারপর মার্টেল আবার বলল, জুরিখে এসেছি কিন্তু কোথাও কিছু ঘটেনি। সেন্ট্রালহকের অ্যাপার্টমেন্টে 'ডেলটা' একটা মেয়েকে দিয়ে আমাকে বাইরে বের করে দিয়েছিল। কাপবোর্ডের কাছে আরোও একজন মেয়েকে আমি ভেবেছিলাম হফার।

—আমি তো বলেছি কেন এরকম—, বলতে গিয়ে ক্লেয়ারের চোখ এড়ালো না। বললো, এরপর ব্যানহফস্ট্রাসেতে যা ঘটলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবকিছু উবে গেল?

ক্লেয়ার বলল, ঐ ফার্দি আর্নল্ডের স্কোয়াড।

—আবার আসবে?

—তুমি বলছো যে আগেই ভেবেছিলে ওরা সমস্ত কিছু পরিষ্কার করেছিল, যাতে ট্যুরিষ্টরা ভয় না পায়। আর্নল্ডের স্পেশাল টিম আছে যেমন ইঞ্জিনিয়ার, বিল্ডার সবাই। আর এরা সবাই পাকা লোক।

মার্টেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর্নল্ড এমন বলেছিল ব্যাপারটা কিছুই নয়।

—এইরকম বানানো গল্পতে নাগেলের গোয়েন্দারাও ভুল বুঝেছিল। তুমি কি সত্যিই মনে করো স্ট্যাল-এর সঙ্গে আমার কথাবার্তায় কিছু লাভ হবে?

—হুঁ, হফার বলল।

—আমি এগারোটা পঁয়তাল্লিশে আসবো। তুমি জায়গাটা দেখাবে।

—এগারোটা পঞ্চাশ।

—তাহলে আমি পাঁচ মিনিট আগে এসে অপেক্ষা করে দেখবো, ঘরে কেউ ঢুকেছে কিনা। ওয়ার্নারও অনুসরণ করতে পারে।

—ও সতর্কই। এখন ও একেবারেই মৃত তাই না।

* * *

মিউনিখের ম্যাক্স মিলিয়ানস্ট্রাসের রাস্তাটা বেশ চওড়া। ম্যাক্স জোসেফের দিকে হয়ে সোজা ব্যাভেরিয়ার স্টেট পার্লামেন্টের দিকে চলে গেছে। সামনে ইমার নদী। পূর্ব তীরে পৌঁছতে গেলে দুটো বড় ব্রীজ পেরোতে হয়। প্রথম ব্রীজটার তলাতেই দেহটা পাওয়া যায়।

সেন্ট গ্যালেনের মেট্রোপলে মার্টেল যখন ব্রেকফাস্ট করছিল তার ঠিক ঘণ্টা দুয়েক আগে দেহটা পাওয়া যায়। মার্টেল যখন ব্রীজটা পেরোচ্ছিল একজন উকিল ওর দিকে তাকিয়েছিল। নদীর চারটে বড় থামের একটার তলায় দেহটা ছিল।

একজন ডুবুরী খবর দিয়েছিল, মাথায় গুলি করা একটা মৃতদেহ এখানে আছে। তখন ক্রিমিনাল পুলিশ একজন ডাক্তার নিয়ে এলো। নদীর তীরেই প্রাথমিক পরীক্ষা হলো।

কয়েক মিনিট পর ইন্সপেক্টর ক্রুগার ডাক্তারের দিকে তাকালো।

ডাক্তার বলল, মাথায় তিনবার গুলি করা হয়েছে। পোড়া পাউডারও পাওয়া গেছে। দড়ি-টড়ি পায়নি। তাই দড়ির ফাঁস আটকে ওকে মারেনি।

—আমি ওকে সনাক্তকরণের জন্যে পোষাকগুলো দেখতে পারি ডাক্তার?

ক্রুগার অভ্যস্ত হাতে দ্রুত পরীক্ষা করতে লাগল। ওর সহকারী ওয়েইল চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। ওর চীফের পরীক্ষা শেষ হল। একটা রিষ্টওয়াচ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ঘড়ির পেছনে একটা মাত্র শব্দ এনগ্রেভ করা। শব্দটা হচ্ছে 'স্ট্যাল'।

* * *

মার্টেল আর ক্লেয়ার এমব্রডারী মিউজিয়ামে গায়েগায়ে এগেচ্ছিল আর নানারকম কথাবার্তা বলছিল। ডেলটার প্রসঙ্গ উঠেছিল। আর্নল্ড ওকে খুঁজছে এ ব্যাপারে দু'জনেই ওয়াকিবহাল।

মার্টেল একবার বলল যে, মিউজিয়ামের মধ্যে ওর সঙ্গে হফারের না যাওয়াই ভাল। সে কথা শুনে হফার রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠল। তারপর খানিকটা নরম হয়ে মার্টেলকে রিভালভার নিয়ে যাবার জন্যে বলল।

ওরা সেন্ট গ্যালনে যাবার সংকীর্ণ জায়গাটা দিয়ে এগোচ্ছিল। দু-পাশে ঢালু জায়গা। এলাকাটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গত শতাব্দীর।

বাতাসের গন্ধে ঝড় উঠবে বলে মনে হলো।

মার্টেল খুব আস্তে প্রবেশমুখের দিকে এগাচ্ছিল। চোখ দুটো সতর্ক। পাশের দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল একজন সুবেশা মহিলা বসে আছে।

ও বললো, পুলিশ স্টেশন সামনেই আছে তাই না?

হফার জবাবে জায়গাটা ওকে বলে দিলো। ওরা দ্রুত এগোতে লাগলো। এমার্জেন্সীর বিষয়টাও হফারের কাছ থেকে ভাল ভাবেই জেনে নিলো।

দোকান ছাড়িয়ে ও মিউজিয়ামের দিকে দ্রুত কথা বলতে বলতে এগোতে লাগল। জায়গাটায় পৌঁছল। গাড়িটা থামালো। ক্লেয়ার বলল, আমি এই জায়গাটাতে থাকি। কেউ ঢুকলেই দেখতে পাবো।

মিউজিয়ামের প্রবেশ মুখের ঠিক সামনেই জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালো। চওড়া রাস্তার ওপর কমলা রঙের একটা বুথ।

সামনে কালো পর্দা ঝুলছে। বুথের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা 'প্রনটোফট পাসফোটাস'।

ক্লেয়ার বলল, যাবে যখন, তখন আমাকে ডেকে নিও কিন্তু।

মার্টেল চারিদিকটা একবার দেখে নিল। মিলিয়ানস্ট্রাস অতিক্রম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে

গেল।

*　*　*

ক্রেয়ারের বর্ণনা মতো ব্যাপারটা এইরকম। সিঁড়ি দিয়ে গেলে বিরাট একটা হল। সামনের কাউন্টার থেকে একটা টিকিট নিলো ও। ওয়ার্নারও এই টিকিট নিয়েছিল। মুখটা খানিকটা রুমাল দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল, যাতে সামনের মহিলাটি ওকে চিনতে না পারে।

মিউজিয়ামের দোতলায় একটা নোটিশ। ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল ভীষণ ফাঁকা জায়গাটা। এজন্যই ওয়ার্নার ডেলটার সঙ্গে এখানে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। বাইরের প্লেটে খোলার সময় লেখা আছে। বাঁদিকে লাইব্রেরী। ও সন্তর্পণে গিয়ে দরজাটা ঠেলে দেখল, বন্ধ আছে। আবার দ্রুত মিউজিয়ামের দরজা খুলে ঢুকল। নিস্তব্ধ ঘর। ঢুকে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে এগিয়ে গেল।

কাঁচের বাক্সে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে।

জায়গাটা ফাঁকা দেখে দ্রুত সমস্ত কুলপীগুলো দেখতে লাগল। এরপর ও কোল্টটা খুলে মুখে সাইলেন্সার লাগালো। ঠিক যখন ঘড়িতে 'এগারোটা পঞ্চাশ', ও আস্তে আস্তে দরজার হাতল ঘোরালো।

চারিদিকটা দেখতে লাগল মার্টেল। পেছনে রিভলভার। দরজা খানিকবাদে খুলল। মার্টেল ভিতরে ঢুকল।

ওর কানে 'ক্লিক' জাতীয় একটা শব্দ এলো। খুব সন্তর্পণে ও নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ পাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়ে নতুন আগন্তুক স্ট্যাল চোখের সামনে আসছে। মার্টেল তাকালো। প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালরা সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনের লোকটার গায়ে ওভারকোট। কোটের কাছে একটা রূপোর ব্যাজ লাগানো, প্রতীক চিহ্ন 'ডেলটা'।

ওর ডানদিকে একটা ফেল্ট-টিপ, পেন জাতীয় বস্তু। লোকটা মার্টেলের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। মার্টেল হাত শক্ত করে সামনে এগোলো। লোকটা ছুঁচলো জিনিষটাকে মার্টেলের পেট লক্ষ্য করে ধরে আছে। হঠাৎ মার্টেল দুবার ফায়ার করলো। চারিদিকের নৈঃশব্দ ভেঙ্গে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এদিকে সেই লোকটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা ফেলে দিল। ছিটকে পড়লো কাঁচের বাক্সের ওপর। রক্তের ধারায় মুখমণ্ডল বীভৎস হয়ে উঠল।

মার্টেল না দেখেই জায়গাটা ত্যাগ করলো। রিভলভার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। কাউন্টারের মেয়েটা পিছন ফিরে আছে। দ্রুত রাস্তায় এসে পড়তে হবে।

কিন্তু রাস্তাতেই অপেক্ষা করছিল ডেলটা।

ওরা একটা লোককে ভিতরে পাঠিয়ে অনেকে বাইরে অপেক্ষা করছিল। এটাই ওদের সংস্থার কাজের ধারা।

ব্যানহফস্ট্রাসের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মার্টেল ভোলেনি। ও দরজাটা খুললো।

বাইরে এসে ক্রেয়ারকে খুঁজতে লাগল। কোথায় ও? আস্তে আস্তে এগোতে থাকল।

সমস্ত ব্যাপারটায় সতর্কতা প্রয়োজন। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বুথের সামনে এসে দাঁড়ালো। পর্দার ভেতরে চোখ রেখে দেখল, কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। কথা আরম্ভ হল।

—ওরা ডেলটা অপারেটিভ পাঠিয়েছিল। মিউজিয়ামের মধ্যে মরে পড়ে আছে। আমাকে দু-মিনিট সময় দাও। তারপর মেট্রোপলে যেও। ওখানে আমি যতক্ষণ না তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি—।

এরপরে ও চলে গেল। একটা পুরনো শহর ওর গন্তব্যস্থল। দোকানপাট নতুন। জায়গাটা প্রাচীন বলে ওর এখনও মনে আছে। ও রাস্তাটা ধরে এগোতে লাগল। 'নিউগ্যাসে পাঁচ' ক্রেয়ার বলেছিল।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ও এগোতে এগোতে জানলার দিকে একবার তাকালো। ওর ধারণা

নেই জায়গাটায় কি কি বিক্রি হয়। তাই চারদিকে দেখতে লাগলো। অপর দিক থেকে লেদে চামড়ার একটা লোক এসে দাঁড়ালো। হাতে বড় একটা ব্যাগ আর ঠোঁটে সিগারেট। ওর লাইটার জ্বলতেই মার্টেল এগিয়ে গেল।

ইংরেজের রক্ত ওর গায়ে। সেই লোকটার ছায়া ক্রমশ ওর দিকে এগোচ্ছিল। ও এগোতে লাগলো।

'স্ট্যাড পোলিজি'। এবড়ো-খেবড়ো ধূসর দেওয়াল। সাটারটা দেওয়াল ঘেঁষে। জায়গাটা দেখতে অর্ধগোলাকার। ও এগোল।

একটা বিশিষ্ট জায়গায় ও এলো যেটা ক্লেয়ার ওকে ম্যাপে দেখিয়েছিল। মনে পড়ল, জায়গাটা 'মার্কেট গ্যাসে'।

ও এবারে বাঁ দিকে বেঁকে গেল। মুখোমুখি দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। অন্য একটা দোকানের জানলা দিয়ে হলদেটে চামড়ার লোকটা তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে।

ব্যাপারটা আগেই গেঁজিয়েছে। একটা লোক অন্ততঃ একশো গজ দূরে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে। মার্টেল ধৈর্য সহকারে দেখল। ওদেরও ইচ্ছা মার্টেলের নজরে আসা।

অন্য সময়ে হলে না হয় কথা ছিল। সামনে বিপদ! সাবধান!

ও কাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে অর্থাৎ রাস্তার মাঝখানে ছেলেদের তৈরী একটা খেলনা ট্রেন। ড্রাইভারও আছে।

হলদেটে চামড়ার লোকটা একভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে মহিলাদের ব্যবহার করা পোষাক। মার্টেল দ্রুত এগিয়ে গেল। ট্রেন তখনও চলেনি। সামনে বড় বিল্ডিং। ওটা একটা হোটেল। ওখানেই ক্লেয়ার আছে। ও রাস্তা পেরিয়ে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতে লাগল।

ও খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হোটেলের পাশটা পেরোতেই হুইসেল শোনা গেল। ও ক্রমশঃ ট্রেনটার দিকে এগোতে লাগলো। একেবারে শেষ কোচটায় ও দেখতে পেল স্বয়ং ক্লেয়ার হফারকে।

ওদের দু'জনের পাশে একটি কমবয়েসী মেয়ে দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে। ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একি? ওর রিভলভারটা যেন ওরই দিকে তাক করা।

মার্টেলের মনে হল ওর বাঁদিকেও যেন কেউ আছে। ট্রেন থেকে অদূরে মার্টেলের চোখ পড়তে ওর মনে হল যেন একজন লম্বা মহিলা আছে। মাথায় কালো টুপি। মুখে একটা আবরণ। কাঁধে একটা ব্যাগ ধরা। ডানহাতে ছুঁচমুখো হাইপোডারমিক।

এদিকে সেই হলদেটে চামড়ার লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আড়ালে থাকতে। ও যথেষ্ট সতর্ক হলো।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা শব্দ হলো, গাড়ীর হর্নের শব্দ। শব্দ শুনে মহিলাটি পাশের দেওয়ালে আত্মগোপন করলো। ওর ভি-কাট পোষাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট গোল গর্ত।

মহিলাটি টুপীটা খুলে মুখের আবরণটাও সরালো। মার্টেল মুখে বিরক্তি নিয়ে এগোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একি! এ তো গিসেলা জোবেলের সেই মৃত মুখ।

ট্রেনটা এগোচ্ছিল। ক্লেয়ার একভাবে নিজের জায়গায় বসে। হলদে চামড়াকে দেখা যাচ্ছেনা। চলন্ত ট্রেন থেকে সুইস মেয়েটা তার সম্ভাব্য আক্রমণকারীর ওপর গুলি চালালো। মার্টেল এরকম এনকাউন্টার আগে করেনি। সামনেই মাটির ওপর কিছু যেন একটা পড়ে আছে আর হোটেলের সামনে হঠাৎ ভীড় জমে গেল।

* * *

বৃহস্পতিবার আঠাশে মে ঃ

মেট্রোপলের হোটেলে শোবার ঘরে মার্টেল প্রবেশ করতে ক্লেয়ারের কাঁপুনি কিছুটা কমলো। এবারে ও ভেঙ্গে পড়ল এবং মার্টেলের বুকের মধ্যে মুখ লুকোলো। মার্টেল ওর কালো চুলে হাত

বোলাতে লাগল।

পরম নিশ্চিন্ত লাগলো ওর নিজেকে।

—তুমি নির্দেশ না মেনে ফটো বুথে ছিলে অথচ আমি তোমাকে এখানে আসতে বলেছিলাম। তারপর দেখলাম ট্রয় ট্রেনটায়।

—তোমার হয়ে আমি একটা ভাল কাজই করেছি।

একটু থেমে কণ্ঠস্বর পাল্টে হফার বললো, তুমি বলেছিলে না মেয়েটা তোমাকে মারতে চায়নি কিন্তু আমি ওর হাতে ছুরি দেখতে পেয়েছি।

—না ওটা ছুরি নয়। ওটা সূঁচ মানে হাইপোডারমিক, ডেলটাদের অস্ত্র। তুমি আমাকে খুব জোর বাঁচিয়েছো। স্বাভাবিক গলায় মার্টেল বলল।

ক্লেয়ার খানিকটা শান্ত হলে মার্টেল বলল, তুমি কিভাবে এগিয়েছিলে আমি তো দেখিনি।

একটু থেমে মার্টেল আবার বললো, তুমি যাকে মারলে ওটা গিসেলা জোবেল, সেন্ট্রাল হকের লিসবেথের মেয়ে। ডেলটার নিষ্ঠুরতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। প্রথমে ওরা আমাকে মারবার জন্যে মিউজিয়ামে লোক পাঠিয়েছিল, পকেটে ডেলটার প্রতীকও আমি দেখেছি।

—তুমি ওকে ওখানে ছেড়ে দিলে।

—হ্যাঁ। আসলে ওদের একটা টীম আছে। ঐ টীমেরই লোক হলদেটে চামড়াটা আমাকে বরাবর অনুসরণ করে এসেছে। আর ঐ মেয়েটাতো আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

মার্টেল হফারের দিকে তাকাল।

—বুথের ফাঁক দিয়ে আমি ওদের দু'জনকেই দেখেছিলাম। সেজন্যই আমি তোমার পেছনে...। ক্লেয়ার বলল।

মার্টেল এবার বলল, নাও এবার আমরা সেন্ট গ্যালেনের ট্রেন ধরবো, সব ঠিকঠাক করে নাও। আমরা এখন পূর্ব ব্যাভেরিয়ার দিকে যাচ্ছি।

—এত তাড়া কেন?

ক্লেয়ারের কথার জবাবে বললো মার্টেল, পুলিশ। ওদের হাতে এখন দুটো খুন। একটা আমি মিউজিয়ামে মেরেছি আর তুমি একটাকে হোটেলের সামনে শেষ করেছো। ওরা ইতিমধ্যেই সেন্ট গ্যালেন ছেড়ে যাওয়া সব ট্রেনে তল্লাসী চালাচ্ছে।

* * *

মিউনিক এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওরা দু'জন বসেছিল। মার্টেল জানে যে ব্যাভেরিয়ায় ডেলটাদের হেড কোয়ার্টার। সেখানে আরও বিপদ।

সুইজারল্যান্ড ইউরোপের সবচেয়ে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানেও মরণ ফাঁদ পাতা। জুরিখ আর সেন্ট গ্যালেনে যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল ভবিষ্যতে তার চেয়েও কেমন ভয়াবহ হবে তা ওদের জানা নেই।

* * *

সেন্ট গ্যালেনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার ফাঁকে টুইডকে লন্ডনে ফোন করলো। সুইজারল্যান্ডে ফোনের অনেক সুবিধা আছে, অসুবিধা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া মার্টেল এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে যে কেউ তা টেপ করলেও কিছু বুঝবেনা। এই টেকনিকেই ও টুইডকে সব কিছুই জানালো।

আজকের তারিখ আঠাশে মে, বৃহস্পতিবার। মার্টেল ডেলটার ব্যাপারে টুইডকে সবকিছু জানালো। ডেলটা সুইজারল্যান্ডের ভেতরে খুবই সক্রিয়।...এজেন্টরা ব্যবসায়ীর পোষাক পরে থাকে...,ডেলটার প্রতীক পকেটে প্রকাশ্যে থাকে...,স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা একেবারেই নেই...,নকল আর্নল্ডও গ্রেপ্তার করে..., দু'জন হফারের মধ্যে প্রচুর মিল...মনে হয় যমজ বোন...,ফার্দি আর্নল্ড রিপোর্ট করেছিল ঐ একজনের দেহ লিমাট নদীর জলে পাওয়া গেছে...,এখন আসল ক্লেয়ারের সঙ্গে যাচ্ছি।

সেন্ট গ্যালেন ছেড়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছি ওয়ার্নারের খুনের সন্ধানে—অপারেশন ক্রোকোডাইল...নয়া-নাজী...অবশ্যই যাচ্ছি।

এই হলো টুইডকে পাঠানো মার্টেলের বক্তব্য। টুইড এবার ফোনে ওকে জানালো, বেইরুটের রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যানফ্রেড পশ্চিম জার্মানীর হ্রদের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করছে। বুঝতে পেরেছো?

—তাই নাকি?

রিসিভারটা রেখে মার্টেল স্যুটকেসটা নিয়ে দৌড়ে প্লাটফর্ম পেরিয়ে কামরার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার দরজাটা খুলে রেখেছিল। ঢুকে দরজাটা বন্ধ করলো। ট্রেন পূর্বদিকে ছুটে চললো। মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা সীটে গিয়ে বসলো।

* * *

সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। মিউনিখ অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের চারতলা। ঘরের ভেতর একজন ডেস্কের ম্লান আলোটা সরিয়ে রাখলো। ফোনের শব্দে ও ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। গ্লাভস জড়ানো হাতে রিসিভারটা তুললো।

—ভিন্‌জ, লিনডাউ থেকে বলছি।

—আমরা এখানেই আছি। ম্যানফ্রেড শান্ত গলায় বলল, সেন্ট গ্যালেনের ব্যাপারটা সফল হয়েছে?

—দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, হয়নি। এরউইন ভিন্‌জ বলে উঠলো, কোলহার ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে।

—কেন?

—যার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল তার তেমন সাহায্য পাইনি। এর ফলে আমাদের দু'জন লোক—।

ভিন্‌জের ফোন ধরা হাত ঘামতে লাগল।

সবটুকু শোনার পরে ম্যানফ্রেড রাগে ফেটে পড়ল। ওর চোখের মণিদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ভিন্‌জ কাঁপা গলায় আবার বলল, ইংরেজটা এবার মিউনিখের দিকে—।

ম্যানফ্রেড থমথমে গলায় বলে উঠলো, তুমি ওর সঙ্গে সবকিছু ব্যাপারটা সেরে ফেলেছো। যাই হোক মিউনিখে ঢোকার আগে ওর সঙ্গে যা করবার করে ফেলো।

—আমি ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু করেছি। সমস্ত ব্যাপারটা তুমি চেক করলে—।

—হ্যাঁ সবসময় আমার সঙ্গে চেক করে নেবে ভিন্‌জ সব সময়ে। এরপর সৌজন্যের খাতিরে মিঃ রেইনহার্ড দিয়েত্রিচকে একবার জানিও—.

—আমি এগোবার ব্যাপারটা জানাবো—।

ব্যাভেরিয়ার মূল ভূখণ্ডে ফোন বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিন্‌জ বুঝতে পারলো এবারে ফোনের সংযোগ কেটে গেছে। দ্রুত বেরিয়ে এসে অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে মিশে গেল ও।

* * *

লিনডাউ-এর একটা মধ্যযুগীয় শহর। চারিদিকে কুয়াশায় ঢাকা। পুরোনো শহর, নুড়িবিছানো রাস্তাঘাট। অন্ধকারে গলিগুলো এক ভয়ঙ্কর আকার নেয়।

আইন মেনে চলা লিন্ডাউতে কোন বিপদ নেই স্বাভাবিক অবস্থায়।

ম্যানফ্রেড ফোন ধরার পরেই তিনটে গাড়ি দ্রুত ব্রীজের ওপর দিয়ে হাউপ্টব্যানহফের দিকে ছুটে চললো। অস্ট্রিয়া আর জার্মানীর সীমান্ত এই লিন্ডাউ স্টেশনটা দেখবার মতো। লিন্ডাউ থেকে মিউনিকে যাবার পথে কোন সীমান্ত পেরোতে হয়না। কিন্তু সঠিক পাশপোর্ট না থাকলে জেলে যাবার সম্ভাবনা।

ভিন্‌জের নেতৃত্বে আটজন লোক তিনটে গাড়িতে হাউপ্টব্যানহফের দিকে এগিয়ে চলেছে। দু'জনের হাতে স্যুটকেস, তাতে ইউনিফর্ম আছে। এদিকে মিউনিখ এক্সপ্রেস লিন্ডাউ ছেড়ে চলে

যাবার পথে।

ওদের পরনে রেলওয়ে টিকিট ইন্‌সপেক্টর আর জার্মান পাশপোর্ট কন্ট্রোল অফিসিয়ালদের মতো। এদের বিশ্বাস এবং পরিকল্পনা যে পাশপোর্ট ডাবল চেক করলেই মার্টেলকে ধরা যাবে। আটত্রিশ বছরের ভিন্‌জই এর মূল চার্জে।

ভিন্‌জের পরনে পাশপোর্ট কন্ট্রোলের ইউনিফর্ম। ভিন্‌জের ভাবনায় মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যেই নিশ্চয়ই মার্টেলকে ধরা যাবে। নিশ্চয়ই দরজাটা খোলা—ভিন্‌জ জানে এই ট্রেনগুলো একেবারেই ফাঁকা যায়। ওর কামরায় অন্য কেউ থাকলেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এবার ট্রেন আসবে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে আটজন আলাদাভাবে নেমে এগোলো। ওদের অশরীরীর মতো মনে হচ্ছিল। ঠিক সময়েই এসেছে। আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকী।

* * *

আঠাশে মে, বৃহস্পতিবার ঃ

—কেইথ তোমার লিনডাউ পছন্দ হবে। ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে মার্টেল এক্সপ্রেসের জানলার দিকে তাকালো। হফারের কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল, এটা জার্মানীর খুব পুরোনো সুন্দর শহর।

—জানি অন্যমনস্কভাবে মার্টেল আবার বলল, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বি. এন. ডি-র এরিখ স্টোলারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ব্যাপারটা ওর একবার দেখার—

বলতে বলতে মার্টেল বাক্স থেকে একটা রুমাল বের করে তার মধ্যে থেকে নীলচে রঙের একটা বড় পেনের মতো বস্তু বার করল। ফেসিং-এ একটা বোতাম আর বেসের দিকে আর একটা বোতাম আছে।

'এমব্রডারী মিউজিয়ামে লোকটা যখন গুলি খেয়ে পড়ে গেল তখন ওর হাত থেকে ছিটকে পড়া ডেলটার এই খেলনাটা পেয়েছি। এতে একটা সূঁচ আছে আর তাতে বিষমাখানো আছে। স্টোলারের ফরেনসিকের লোকেরা বলতে পারবে বিষটা কি?

—ঐ মেয়েটা, যাকে আমি হোটেলের বাইরে গুলি করেছি—।

—ওটাও ঐ একই ব্যাপার। দিয়েত্রিচের কাছে ইলেকট্রনিক্স শুদ্ধ আছে। ব্যাপারটা দারুণ...।

—ওকি এই জিনিস তৈরী করে নাকি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাক্সের মধ্যে মার্টেল ওই সূঁচজাতীয় জিনিসটা ঢুকিয়ে রাখলো।

জানালার দিকে তাকিয়ে সুইজারল্যান্ডের চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। বাইরে সবুজ ক্ষেত আর পাহাড়, ট্যুরিস্টদের পক্ষে দারুণ।

এবারে দৃশ্যটা বদলাচ্ছে। কোনস্ট্যানজ লেকের ওপরে কুয়াশার ঘন পর্দা। কিছু কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। মার্টেল দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হফারকে জিজ্ঞেস করলো, এটাই তো রাইন ডেলটা?

—হুঁ, আমরা নদীটা পেরোচ্ছি। এরপরে এটা লেকে গিয়ে মিশেছে।

ডেলটা লেকের একেবারে পূর্বদিকের শেষপ্রান্তের ভৌগলিক অবস্থানটা বেশ রহস্যময়।

মার্টেল চশমাটা পরে নিয়ে সিগারেট ধরালো। ক্লেয়ার বলে উঠলো, আমরা একটু পরেই লিন্ডাউতে পৌঁছবো। আর আমরা নিশ্চয়ই দেখবো...। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ক্লেয়ার বলে ওঠে, এই জায়গাতেই ওয়ার্নারকে শেষ দেখা গিয়েছিল।

—কিন্তু আমরা অস্ট্রিয়ার ব্রেজেঞ্জে নামবো। একেবারে শেষ অবধি যাবো না।

—কেন?

—ওখানে নামাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ডেলটার অনুমান করার শেষ জায়গা...।

—হাউপ্টব্যানহফ। মিউনিখ...হাউপ্টব্যানহফ জুরিখের... ডেলটা... সেন্ট্রালহক... ব্রেজেঞ্জে... ওয়াশিংটন, ডিসি...কিলট লুমিস...পুলাখ, বি. এন. ডি...অপারেশান ক্রোকোডাইল।

সবগুলোই ওয়ার্নারের কালো ছোট্ট নোটবুকটায় লেখা ছিল। গোপন পকেটে এটা পাওয়া গেছে। এরিখ স্টোলার নোটবুকটা পেয়ে লন্ডনে টুইডকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

'ব্রেজেঞ্জ'।

এক্সপ্রেসের গতি কিছুটা কমলো। জানলা দিয়ে কোনস্ট্যানজ লেকের ধূসর জলরাশি দেখা যাচ্ছে। এক্সপ্রেস থামলে মার্টেল স্যুটকেস হাতে নিয়ে দরজা খুলল। কিন্তু কোন প্লাটফরম নেই। ও লাফালো। ক্লেয়ারের হাতেও স্যুটকেস। ও ক্লেয়ারের কনুই ধরে নামিয়ে রেললাইন পেরিয়ে একটা পুরোন একতলা বাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

—তুমি ভয় পেয়েছো...?

—কি ঘন কুয়াশা। ক্লেয়ার বলল।

ক্লেয়ারের দেহে রেনকোট থাকা সত্ত্বেও ওর ঠাণ্ডা লাগছে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে ক্লেয়ার শিউরে উঠলো। এটা ঠিক কুয়াশা নয় এক ধরণের ধূসর রঙের বাষ্প।

ব্রেজেঞ্জের পেছন দিকটা অস্পষ্ট জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে। স্টেশন ওরা পেরোতেই ক্লেয়ারের চোখে পড়ল কুয়াশার অস্পষ্টতা ভেদ করে একটা পাথরের দেওয়াল। অনেকদূর চলে গেছে। ওরা বেরিয়ে একটা স্বয়ংক্রিয় ধাতব কামরার মধ্যে নিজেদের লাগেজ জমা করে দিয়ে ব্রজেঞ্জের দিকে এগোতে লাগলো।

জায়গাটা একেবারে রবিবারের মতো ফাঁকা। স্টেশনের মুখোমুখি একটা পুরোনো ধাঁচের বাড়ি দেখে মার্টেল দাঁড়িয়ে চারিদিকটা ভাল করে দেখতে লাগল। ক্লেয়ার কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে দেখতে লাগল।

—চশমাটা পড়ে তোমার ব্যক্তিত্বই পাল্টে গেছে। যাইহোক আমরা এখানে কিজন্যে এসেছি?

মার্টেল টুইডের দেওয়া দু'খানা ফটো বের করে একটা ক্লেয়ারের হাতে দিল। ক্লেয়ার দেখল এই সেই নিহত লোক যার সঙ্গে ও ছ'মাসেরও বেশী কাজ করেছে আর যে জায়গায় ও দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে সামান্য দূরে ও নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

—আমরা এখন ওয়ার্নারের খোঁজ করছি। মার্টেল ওকে বলল, ওর স্ত্রী বোধহয় এখানেই কোথাও আছে, আর উনি খুব অসুস্থ। আমরা একটা ম্যাপ কিনে জায়গাগুলোকে ক'টা ভাগে ভাগ করে দু'ঘণ্টার মধ্যে...।

—ব্যাপারটা কাজের কাজ হবে। কথার মাঝখানেই ক্লেয়ার বলে উঠলো।

ওয়ার্নার যে এখানে ছিল সেটা ওর নোটবইতে আছে। লোকটার একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। যাই হোক আমরা ঠিক করে নেবো কোন্ জেলায় আমরা প্রত্যেকে যাবো।

* * *

মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে গ্লাভস পরা হাতটা ফোনের রিসিভারটা তুলল। ম্যানফ্রেড যাকে ভাবছিল সেই এরউইন ভিন্জ-ই ফোন করেছে।

—আমি মিউনিখের হাউনহফ থেকে বলছি।

ভিন্জ নিজের কোড নাম্বার দিয়ে পরিচয় দিল আর বললো, কয়েক মিনিট আগে ট্রেন ছেড়েছে—।

ভিন্জ কেমন যেন আমতা আমতা করছে বলে ম্যানফ্রেড ভাবলো পুরো ব্যাপারটায় হয়ত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। ম্যানফ্রেড ওকে আসল ঘটনা জানাতে বলল।

—চমৎকার! ভালই হয়েছে, চালিয়ে যাও।

—ইংরেজটা ট্রেনে ছিলনা। সম্ভবতঃ ও আগেই হয় রোম্যানর্শন নয় সেন্ট মারগারেথেন-এ নেমে গেছে। সুইজারল্যান্ডেই নেমেছে। সেন্ট গ্যালেনের এক্সপ্রেসে কোলহার ওকে দরজা বন্ধ করতে দেখেছে।

ম্যানফ্রেডের কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু জটিল। মনের ভেতরটা বাইরে থেকে বোঝা দায়। ভিন্জ এখন নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারটা অসহ্য! কিছুতেই মানতে পারছেনা ম্যানফ্রেড।

ও বললো, যদি ট্রেনটা সুইজারল্যান্ড দিয়ে বরাবর যেতো তাহলে কোলহার জানতে পারত...।

ম্যানফ্রেড আবার বলল, সুইস বর্ডার থেকে তোমার কাজ শুরু। লিন্ডাউতে তুমি ট্রেনে উঠেছো...।

—বদমাইসটা ব্রেজেঞ্জেই নেমেছে। কারণ জায়গাটা একেবারে খোলামেলা। বলতে গিয়ে ভিন্‌জ-এর গলা কাঁপছিল।

বেজেঞ্জের নামটা চিবিয়ে বলতে বলতে ম্যানফ্রেড সজোরে রিসিভারটা চেপে ধরলো। ম্যানফ্রেড একেবারেই চায়নি মার্টেল এই শহরটায় ঢুকুক। ওর গলা ফাটিয়ে চৎকার করতে ইচ্ছে করলেও ভিন্‌জের কাছে প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলো।

—যাইহোক, আমি ব্রেজেঞ্জে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা টীম পাঠাচ্ছি। ভিন্‌জের এই কথায় অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া এলো না।

খানিক বাদে ম্যানফ্রেড বলল, তোমার টীম আধঘণ্টার মধ্যেই যোগাযোগ করুক এটাই চাই। ব্যাপারটাতে তোমাকে সফল হতেই হবে।

ওর এই কথায় ভিন্‌জ কেঁপে উঠল। এটাই তাহলে ম্যানফ্রেডের সতর্কবাণী। যেমন করেই হোক ইংরেজটাকে খতম করতেই হবে।

* * *

সেন্ট গ্যালেন থেকে মার্টেলের ফোন পাওয়ামাত্র টুইড অফিস থেকে ফ্ল্যাটের দিকে নজর দিলো। কিন্তু হাওয়ার্ডের নতুন সহকারী ম্যাসন ওকে খানিকটা দেরী করে দিয়েছিল। অবশ্য টুইড মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

—স্যার চীফ আপনাকে একবার অফিসের দিকে ডাকছে। খুবই জরুরী দরকার।

—জরুরী কি সবসময়েই। ঠিক আছে। ফিরে এসে দেখা করবো।

টুইড ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে একটা ক্যাব নিলো এবং সঙ্গে সহকারিণী মিস ম্যাকনেইলকেও নিল। ওর হাতে ধরা হোল্ডেলে মার্টেলের টেপটা লুকোনো। ক্যাবের মধ্যেই ও একবার জিজ্ঞেস করলো, ম্যাসনকে নতুন নেওয়া হয়েছে। লোকটা কেমন?

—দেহরক্ষী হিসাবে ভাল। ম্যাকনেইল স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ও জুডো, ক্যারাটে এসবে দক্ষ। হাতবন্দুকও ভাল চালাতে পারে। হাওয়ার্ড ওকে নিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ভীষণ খুশী।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে ম্যাকনেইল মার্টেলের কথাবার্তার টেপটা চালিয়ে দিল আর মাঝে মাঝে নোট নিতে লাগলো। টুইডকে চা খাবার খেতে বলল। টুইড নিজের ব্যস্ততার জন্যে তা প্রত্যাখ্যান করল।

এই ফ্ল্যাটে টুইড একাই থাকে। নিজেই সব কিছু করে নেয়, তবে একটা দেহাতী সিসিলিয়ান আছে কাজকর্ম করে দেয়। টুইড নীচের রেস্তোরাঁ থেকে চা আনালো। চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলো, মার্টেলের তথ্যগুলোতে বিশেষ কিছু আছে?

—হ্যাঁ দুটো জিনিস আছে। প্রথমতঃ ডেলটাদের সংগঠনটা উন্মাদ আর রক্তপিশাচ বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ ডেলটা নয়া নাজীদের ব্যাপারে কিছু একটা মিথ্যে বা মেকি। আমি ঠিক বুঝতে...।

—ম্যাকনেইল তুমি সত্যিই সুন্দর। আমি নিশ্চিত যে, দোসরা জুনই হচ্ছে একেবারে শেষ দেখা। যেদিন সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়লো। কারণ সকালেই এটা ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করছে—।

—তুমি কি ব্যাভেরিয়াতে নির্বাচনের কথা ভাবছো?

—নিশ্চয়ই। তিনটে প্রধান দল ক্ষমতার জন্যে লড়ছে, কে রাজ্যের সরকার গড়বে। দিয়েত্রিচের ডেলটা, নয়া নাজী, চ্যান্সেলার ল্যাংগার-এর সরকারী দল এবং বামপন্থীরা যাদের সঙ্গে প্রাক্তন কম্যুনিস্টরা আছে। যদি তেসরা জুন অর্থাৎ নির্বাচনের আগের দিন নাটকীয় কিছু ঘটে, তাহলে নির্বাচনের ফল টফ্‌লারের হাতে চলে যাবে অর্থাৎ বামদের দখলে। থেমে আবার বলল, তার মানে পশ্চিমে একটা বিপর্যয়।

—কি নাটকীয় ঘটনা?

চায়ে চুমুক দিয়ে টুইড বললো, আমি স্থির নিশ্চিত যে, ডেলটার একটা গোপন—পরিকল্পনা আছে।

—আর ঐ মিথ্যে—?

ম্যাকনেইল চুপ করে বসেছিল। টুইড চশমার ফাঁক দিয়ে ওকে একবার দেখলো। তারপর খুব

আস্তে বলে উঠলো, ডেলটার মধ্যে একটা আলাদা গ্রুপ গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কার্যকলাপই এখন বলে দিচ্ছে যে, তাঁরা নির্বাচনে হারবে।

—হুঁ। ম্যাকনেইলের ছোট্ট জবাব।

* * *

—তোমরা দু'জন কোথায় ছিলে?

ম্যাকনেইল আর টুইডকে দেখে হাওয়ার্ড বলে উঠলো ও অফিসেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। হাওয়ার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছিল। পেটের ওপর দিয়ে ও একবার হাতদুটো জোড়া করলো। ওখানে একটা সোনার ঘড়ির চেন রয়েছে। টুইড ওকে খুব ভাল করেই লক্ষ্য করলো। বেশ হাসি খুশী স্বভাবের।

—এই একটু রিজেন্টপার্কে গিয়েছিলাম। এমনিই.. । টুইড ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল।

হাওয়ার্ড বলল, তোমরা একটা সমস্যার মধ্যেই কাজ করছো না?

ম্যাকনেইলের মনে হল এস. আই. এস-এর প্রধান কেমন যেন নার্ভাস। ওর হোল্ডেলটা এখন ফাঁকা। টেপটা ফ্ল্যাটে রেখে এসেছে।

হোল্ডেলের ভিতর কি আছে হাওয়ার্ড জানতে চাওয়াতে ও জবাব দিলো, এই বিশেষ কিছু নয়। স্যান্ডউইচ, চীজ এসব।

বলে ও বাইরের দিকে এগিয়ে গেল।

হাওয়ার্ড এবার বলে উঠল, তুমি কি কেইথ মার্টেলের ব্যাপারে কিছু শুনেছো? প্রশ্নটা টুইডের উদ্দেশ্যে।

—আমি তো ভেবেছিলাম ভিয়েনার সামিট কনফারেন্সে তুমি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাহলে মার্টেলের ব্যাপারে আর আগ্রহ কেন?

—হুঁ, এ তো প্রতিটা লোককেই করতে হবে।

—তবে আমাকে একটা কথা বলো। তুমি যদি ব্যাপারটা রেকর্ড রাখতে চাও, তাহলে আমাকে একটা মিনিট পাঠিয়ে দাও। ওটা মন্ত্রীকে দেখাবো।

টুইড চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। বললো, যাইহোক আমার মনে হয় সাধারণ লোক কি আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কিংবা জার্মানীর চ্যান্সেলারের নিরাপত্তার ভার নিতে পারবে?

—টিম ও মিয়েরা ওয়াশিংটনে আছে। অ্যালিন ফ্রান্ড্রেস প্যারিসে আর এরিখ স্টোলার বনে। এগুলো কি সত্যিই তোমার...?

—না, আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমার পুরোনো বন্ধুরা সবাই কাজে ব্যস্ত। টুইড ওর চীফের দিকে তাকালো। এরপরই হাওয়ার্ড গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ম্যাকনেইল একবার দরজার দিকে তাকালো।

—ও বেরিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, বৃটিশ সিংহ গর্জন করছে। এখন অবশ্য নিরাপদ।

এরপরে দ্য টাইমস অ্যাটলাসের কপিটা খুললো। তারপর বলে উঠল, ক্রোকোডাইল—এই কোডটার গন্ধ যেন আমার নাকেই লাগছে।

* * *

এরউইন ভিন্‌জ ওর 'একজিকিউশান স্কোয়াড'-কে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ব্রেজেঞ্জের দিকে রওনা হলো। আটজন লোক বিমান থেকে নেমেই তিনটে গাড়িতে তাড়াতাড়ি সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে চললো।

তিনটে নাগাদ ওরা স্টেশনের মুখোমুখি এসে হাজির হলো।

—আমার ধারণা মার্টেল এখানেই ট্রেন থেকে নেমেছে। ভিন্‌জ গাড়ির ভেতরের দু'জনকে বলল। চারিদিক তাকিয়ে আবার বললো, ও এখনও মনে হয় ব্রেজেঞ্জেই আছে। তোমরা এখানেই

থাকো, আমরা বাকী ক'জন শহরটা একবার চক্কর মেরে আসি যতক্ষণ না ওকে খুঁজে পাই।

—আমরা যদি ওকে ট্রেনে দেখতে পাই? একজন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—তাহলে ওর কপালে নির্ঘাত দুর্ঘটনা আছে। যাইহোক ও এখনো মিউনিকে পৌঁছায়নি। ভিন্জ বলল।

এরপরে ভিন্জ অন্য পাঁচজনের সঙ্গে খানিকটা পরামর্শ করলো। বললো, মার্টেলকে কেউ ধরতে পারলে বিশ হাজার ডয়েটমার্ক তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। জনসাধারণকে বলবে একটা পাগলাটে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বিপজ্জনক। এখন থেকে দু-ঘণ্টা পরে আমরা আবার এখানেই মিলিত হবো—। কেমন—?

* * *

মার্টেল চার্লস ওয়ার্নারের পদচিহ্ন সংগ্রহ করলো বলা যেতে পারে। কেইসারট্রোসেতে একজন মাঝবয়সী বই বিক্রেতার সঙ্গে রাস্তায় ক্লেয়ারও মার্টেলের সঙ্গে আধ ঘণ্টার জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হল। ওয়ার্নারের ফটো বই বিক্রেতাকে দেখাতেই ওর মুখে প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল।

বিক্রেতা বলল, আমি তোমার বন্ধুকে চিনি। গ্রিফ সম্ভবতঃ ওর সঙ্গী ছিল।

—গ্রিফ? মার্টেল সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, ওর প্রিয় বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছিল আর তখনই মারা যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল ভোরালবার্গ আর টাইরস ফরাসী মিলিটারী আসার সময়। যুদ্ধের পর ওর বন্ধুকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয় আর এতেই ওর মনে হয়েছিল বন্ধুকে যথোচিত সম্মান দেখানো হয়েছে।

—আচ্ছা...।

মার্টেল সতর্ক। লোকটা আবার বলতে লাগলো, এই ব্রেজেঞ্জে দুটো ক্যাথলিকদের, একটা প্রোটেস্ট্যান্টদের সমাধিস্থল আছে। ওর বন্ধুটার আবার বিচিত্র ব্যাপার। জন্মেছিল প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে। পরে হল ক্যাথলিক। আরো পরে কোন বিশ্বাসই ছিল না। আমার কাছে এসে তিনটে সমাধিস্থলই কোথায় জানতে চেয়েছিল। আমি ওকে স্ট্রীটের একটা ম্যাপে ওগুলো দেখিয়েছিলাম।

—কতদিন আগে?

—প্রায় সপ্তাহখানেক আগে। গত শনিবার।

—আমি একটা ওরকম ম্যাপ কিনবো।

বই বিক্রেতা একটা ম্যাপ খুলে ওকে তিনটে সমাধিস্থল বুঝিয়ে দিল।

* * *

ক্লেয়ার মার্টেলের জন্য সাবওয়ের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল। ক্লেয়ার মনোযোগ দিয়ে সামনের একটা প্রাচীন দেওয়ালের জানালার ধ্বংসাবশেষ নিরীক্ষণ করছিল।

হঠাৎ মার্টেল ওর মনোযোগ ভঙ্গ করে বলে উঠল, গত শনিবার আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, এখান থেকে একশো ফুটেরও কম দূরত্বে ও দাঁড়িয়েছিল।

শনিবার ছিল। তারপরই লেকে খুন হয়। দিনটা রবিবার।

—আচ্ছা কতদিন আগে অস্ট্রিয়াতে মিলিটারী ঢুকেছিল?

—অস্ট্রিয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়েছিল মে মাসের পনেরো তারিখে। সাল ১৯৫৫। কিন্তু ওয়ার্নার...।

—ব্যাপারটা তো অর্ধশতাব্দীর। তাহলে আজকে সেইরকম কিভাবে ঘটতে পারে?

—আমাদেরকে সব কিছুই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক।

—কিন্তু কোথা থেকে আমরা আরম্ভ করবো?

—ওয়ার্নার যে তিনটে সমাধিস্থল দর্শন করেছিল, আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে ঐ তিনটে সমাধিই দেখবো। আশা করি এগুলোর একটার মধ্যে কোনো গোপনতা...।

এদিকে কেইসারস্ট্রাচেতে সেই বইয়ের দোকানে এরউইন ভিন্জ এসে হাজির হল।

ব্রেজেঞ্জেতে ও দেরী করে পৌঁছনোয় মার্টেল সুবিধে পেয়ে গেছে। ও ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল।

এক তলাতে ভিন্‌জের সঙ্গে বিক্রেতার কথাবার্তা হল। বিক্রেতা মন দিয়ে সব শুনলো।

তারপর বিক্রেতা বলল, তুমি বলছ লোকটা উন্মাদ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছে?

কথাটা বলে অস্ট্রিয়ানটা ভিন্‌জের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

—হ্যাঁ, এমনিতে দেখলে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে, কিন্তু আসলে ও একটা ভয়ঙ্কর রকমের উন্মাদ। আর এটাই আরো বিপজ্জনক। দেখেছো নাকি লোকটাকে?

* * *

বৃহস্পতিবার আঠাশে মে ঃ

অ্যালিয়িস স্টোচর (১৯৩০-১৯৫৩)

'ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি...'

ব্লুমেন স্ট্রাচের সমাধির মূল ফলকটার দিকে মার্টেল, ক্লেয়ার আর একটা বুড়ো তাকিয়েছিল। মার্টেল ভাবল এই অ্যালিয়িস লোকটা আবার কে? বুড়োটাকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল এই লোকটা কি এখানে কবর দেখতে এসেছিল?

বুড়ো মার্টেলের কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। তাহলে বই বিক্রেতা আর বুড়োটা একই কথা বলছে। দিন জিজ্ঞেস করাতেও বলল শনিবার, বই বিক্রেতাও ঐ একই কথা বলেছে। কিন্তু ওয়ার্নারের সঙ্গে অ্যালিয়িসের সম্পর্ক কিরকম ছিল? অ্যালিয়িসের মৃত্যুর সময়টা জানা গেল ফরাসী অধিকারের শেষের দিকে।

ক্লেয়ার এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, আর কে এসেছিল ওর সঙ্গে? লোকটা চুপ করে থাকাতে ক্লেয়ার ওকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বলল খোলাখুলি সব কিছু জানালে ওর উপকারই হবে।

তখন লোকটা বলল বেশ খানিক পর, একজন মহিলা এখানে এসেছিল এবং তাকে ও চেনে না, তবে ও প্রতি সপ্তাহে বুধবার আটটা নাগাদ ঘোড়ার গাড়িতে করে এসে কবরে ফুল দিয়ে আবার ঐ গাড়িতেই ফিরে যায়।

এরপরে ওরা মহিলাটির পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ জেনে নিলো। এবং লোকটা যেন দ্রুত কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল।

—তুমি কি লোকটাকে দেখেছো?

মার্টেলের সঙ্গে যে বই বিক্রেতা কথা বলেছিল সেই আবার এডুইন ভিন্‌জ-এর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল। তারপর অস্বীকার করল। এডুইন তাকে পুলিশের লোক নয় বলে অভয় দিলেও লোকটা একই কথা বলল যে, ওরকম কোন লোক তার দোকানে কোনদিন আসেনি। অগত্যা বিফল হয়ে ভিন্‌জ গাড়ি নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হলো। বিক্রেতাটি অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল আর ভাবল একটু আগে যে লোকটা তার দোকানে এসেছিল, ও তাকে খুঁজছে। কিন্তু বিক্রেতা লোকটির সতর্ক চোখ দেখে ফেলেছে, ওর কোটের পকেটে ব্যাজ আছে। বুঝল নয়া-নাজীর লোক। এবার যদি আসে পুলিশ ডাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

* * *

সুন্দর বিকেল। ভিন্‌জ রেল স্টেশনে দু'জনকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে বলল। বাকীরা সবাই গাড়িতে করে খুঁজবে। ভিন্‌জের লোকেরা সমস্ত হোটেলে হানা দিয়েছে, কোন খোঁজ মেলেনি। এদিকে ভিন্‌জের দু'জন লোক সতর্ক দৃষ্টিতে গ্যালাসট্রাসেতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিক থেকে মার্টেল, ক্লেয়ারও সাবধানে গাড়িতে এগোচ্ছিল।

ঠিক স্টেশনের সামনেটায় এসে মার্টেল গাড়ি নিয়ে নিচে নেমে গেল। হঠাৎ ক্লেয়ারের, পেছনের দিকে লক্ষ্য পড়তে বলে উঠল, কেইথ, আমাদের ঠিক পেছনেই বি. এম. ডবলু। একজনের পকেটে ডেলটা ব্যাজ দেখছি।

মার্টেল মাথা না ঘুরিয়েই ফিসফিসিয়ে বলল, শোন স্পীড বাড়িও না বা ওদের দিকে তাকিও না। কোনরকম পরিবর্তন যেন ওদের চোখে না পড়ে।

ভিন্‌জ ওর স্কোয়াডের প্রতিটা লোককে মার্টেলের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে রেখেছে। সুতরাং ওকে চিনতে কারোর কোন অসুবিধা হবে না। বি. এম. ডবলুর সামনের লোকটার হাতে রিভালবার।

এখন এই জায়গাটা খুবই শান্ত। ক্লেয়ার খুব সন্তর্পণে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কোলের ওপর ম্যাপ নিয়ে মার্টেল মনযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ক্লেয়ারকে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে পাশ দিয়ে স্কোয়াডের লোকেদের গাড়িটা ওদের অতিক্রম করে গেল। মনে হল ওরা কোনরকমভাবে টের পায়নি। মার্টেল ক্লেয়ারকে বলল গাড়িটা যেন কোন মতেই লেক বা স্টেশনের সামনে না যায়। মার্টেল ভাবতে লাগলো বি. এম. ডবলুর লোকেরা কিভাবে এখানে চলে এল এবং ওরাই যে ডেলটা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না।

ম্যাপটা কোলের ওপর থেকে তুলতেই ক্লেয়ার দেখল যে মার্টেলের কোলের ওপর ম্যাপের নীচে ৪৫ কোল্ট রিভলভারটা রাখা আছে।

মার্টেল মৃদু হেসে ক্লেয়ারকে বলল, ওরা টের পাওয়া মাত্রই আমি ওদের দুজনের খুলি উড়িয়ে দিতাম।

মার্টেলের মাথায় লম্বা টুপি, দাঁতের মধ্যে চেপে ধরা সিগার পাইপ. চোখে চশ্মা এসব পড়ে ওকে বেশ অদ্ভুতই দেখাচ্ছিল। অন্য সময় এরকম দেখায় না।

যাইহোক, এবার ওরা সীমান্তের দিকে এগোতে লাগলো। এখন ওদের গন্তব্যস্থল 'লিন্ডাউ'।

* * *

বিকেল পেরিয়ে গেছে. ব্রেজেঞ্জ থেকে ভিন্‌জ দিয়েত্রিচকে ফোন করলো। সারা শরীরে ক্লান্তি, অবসন্নতা।

ভিন্‌জ ম্যানফ্রেড লোকটাকে এত ভয় পায় যে কোনমতে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। ওদিক থেকে ফোনে দিয়েত্রিচের গলা ভেসে এলো।

সমস্ত ব্যাপার ভিন্‌জ রিপোর্ট করে জানালো যে, কাজটা খুবই শক্ত। সম্ভবতঃ ইংরেজটা এখানে নেই।

দিয়েত্রিচ কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। বলল, হতেই পারে না, ওখানেই আছে। ব্রেজেঞ্জ ছোট্ট শহর, ভাল করে খোঁজ।

ভিন্‌জ জানালো, শহরটা খুব একটা ছোট্ট নয়। তার ওপর সারা শহরটা কুয়াশায় ঢাকা. কাছের লোককেও চেনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু কথাবার্তার পর ভিন্‌জ ফোন ছাড়লো। সারাদিন কিছু খেতেও সময় পায়নি, খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে. ওদিকে দিয়েত্রিচ ওদের সবাইকে গালিগালাজ করে ফিরে আসতে বলেছে।

ভিন্‌জ ভাবল ওয়ার্নারের থেকেও গুপ্তচর হিসেবে মার্টেল আরও বেশী সুচতুর। কিন্তু ধরা ওকে আমার হাতে পড়তেই হবে. ভুল ওকে করতেই হবে। ছ'দিনের মাথায় সামিট এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে। আর সেদিনই মার্টেল ধরা পড়বেই...পড়বে...।

দিয়েত্রিচের এস্টেটের দেওয়ালের বাইরের ঠিক সামনেটায় ছোট একটা জঙ্গল আছে। এস্টেটে ঢোকার মুখে লোহার গেট।

গেটের ভেতর একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরকে দেখা গেল মাঝে মাঝেই চীৎকার করছে। যেন অচেনা কাউকে দেখলেই ছিঁড়ে খাবে, টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

দূরের একটা গাছের নীচে একটা মার্সিডিস দাঁড়িয়ে আছে যার মালিক বি. এন. ডি-র চীফ এরিখ স্টোলার। তেতাল্লিশ বছরের লম্বা এরিখের অনুভব ক্ষমতা প্রচণ্ড রকমের তীক্ষ্ণ।

ওর পাশে বসে ওর চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট অটো ওয়াইল্ড। হাতে ছোট আকারের, টেলিলেন্স লাগানো একটা সিনে ক্যামেরা. কুকুরটার চেঁচানিতে ভয় পেয়ে চীফের দিকে তাকালে স্টোলার নির্বিকার চিত্তে গ্যাস পিস্তলটা বের করে ওর হাতে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, তেমন দেখলে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে। কুত্তাটার নাকে লাগলেই...।

—ওরা তো জানে আমরা এখানে, ওদের উচিত আমাদেরকে...।

—বোকার মত কথা বোলনা।

ওরা দিয়েত্রিচের লোহার গেটটার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ওদের চোখে পড়ল তিনটে গাড়ি আসছে, যার প্রথমটায় এড্ডুইন ভিন্‌জ। সমস্ত ব্যাপারটা অটোর ক্যামেরায় উঠে যাচ্ছে।

স্টোলার এই জায়গায় প্রথম এলো। বোঝা যাচ্ছে ভিন্‌জ মার্টেলের সাক্ষাৎ পায়নি। স্টোলার সর্ব শক্তি দিয়ে ডেলটার মূল বস-কে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

—ডেলটার হেডকোয়ার্টার এখানে কোথায় আছে?

—এরকম কেন মনে হল? অটো স্টোলারের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠল।

—কারণটা আর কিছুই নয়। রেইহার্ড দিয়েত্রিচ তো ব্যাভেরিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াবে। এই যে এস্টেট—এটা একটা বিরাট...।

—আমি তো তোমাকে ম্যাপ দেখিয়েছি।

এরপর কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা দেখল সে গেট খুলছে।

স্টোলার গাড়িটা চালিয়ে এবারে সামনের দিকে এগোলো। কুকুরটা রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা অচিহ্নিত পুলিশের গাড়ির পিছু নিল। স্টোলারের গাড়ির সামনে এসে একটা কুকুর জানলাতে আঁচড়াতে লাগল। এদিকে গাড়িতে করে অন্য দুটো কুকুর ওদের অনুসরণ করছে।

দিয়েত্রিচের ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হল। কুকুর গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে স্টোলার অটোকে বলল, দেখেছো কুকুরগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে ঐ—মানে উইন্ডসার্ফার।

যাইহোক ওরা সতর্কভাবে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ব্যাভেরিয়ার সবচেয়ে দ্রুত ড্রাইভার স্টোলারকে বলা চলে। ও এবার বলে উঠল, গ্যাস পিস্তলের দরকার হতে পারে। আমি রাস্তাটা বন্ধ করে দেবো।

স্টোলার সামনে একটা ফার্ম দেখে ব্রেক কষে দ্রুত পেছোতে লাগল। ওর উদ্দেশ্য গাড়িটা দিয়ে জায়গাটা আটকে রাখা। গ্যাস পিস্তলটা ওয়াইল্ডের হাতে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে আত্মগোপন করল।

ওয়ার্নার হেগেনের গাড়িটা কাছাকাছি এল, সঙ্গে আরো দু'জন। হেগেন একটা খালি মার্সিডিস দেখে গাড়িটা থামিয়ে দু'জনকে অপেক্ষা করতে বলে ও বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল।

দরজাটা খুলে সতর্কভাবে ভেতরে তাকালো হেগেন। পেছনের লোকটা তখন জানলা দিয়ে কি ঘটছে দেখছিল। স্টোলার গাছের গুঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে গ্যাস পিস্তল তাক করা। হঠাৎ ড্রাইভারের সীটের কাছে একটা মিসাইল সশব্দে ফাটলো। হেগেনের হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল। চারিদিকে ধোঁয়ায় কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

স্টোলার এরপরে আবার তৈরী হয়ে নিল। দ্বিতীয় মিসাইলটা জানলা দিয়ে ঢুকে একেবারে গাড়ির ভেতর ফাটলো।

স্টোলার নিজের সীটে ফিরে এল।

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হল আর কোন গাড়িই ওকে অনুসরণ করছিল না।

ওয়াইল্ড বলল, কি ব্যাপার?

—আমি মার্টেলের কথা চিন্তা করছি, টুইড আমাকে বলেছে যে ও ফিরে আসছে।

—ওয়ার্নারের মতো? সহযোগিতা করছে না?

—আরে না, ঠিক তার উল্টোটাই, প্রয়োজন বোধ করলেই ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে আমি ভাবছি, ঠিক এই মুহূর্তে ও এখন কোথায় আছে?

* * *

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মে ঃ

মার্টেল একটা গাড়ি ভাড়া করে ব্যাভেরিয়ার মূল এলাকা ধরে ছুটে চলেছে লিন্ডাউ দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

এখন ওর আর ছদ্মবেশ নেই। মাথায় টুপী নেই। হোল্ডারের সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাবছে

লিন্ডাউ-এ নিশ্চয় ওর ওপরে কেউ নজর রেখেছে।

—ক্লেয়ার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কি করছ ভেবে দেখছ তো? জার্মানীর সীমান্ত সবেমাত্র ওরা অতিক্রম করেছে।

মার্টেল বলল, বৃটিশ ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, ইউনিয়ন জ্যাক থাকলে আমার সুবিধা হতো—।

—ডেলটার নজরে আমরা পড়ে যেতে পারি।

ক্লেয়ারের কথায় মার্টেল জবাব দিল, মনে হয় তাড়াতাড়িই পড়বো।

—তুমি নিজে থেকেই ওদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছো তাই না? পাগল-টাগল হয়ে গেছো বোধহয়, তুমি কি জুরিখ, সেন্ট গ্যালেনের কথা ভুলে গেছো? ক্লেয়ার একটু জোর দিয়েই কথাটা বলল।

—আমাকে ওদের তো মনে আছে। আর একটা কথা, আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাজটা করতে হবে। তুমি বলেছিলে না 'বেয়ারিশচার হোটেল' এই দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে ভাল?

—হ্যাঁ। এরপরে হাউপ্টব্যানহফ...।

—আমরা ট্রেনেই পৌঁছবো, কিন্তু হোটেলে আমরা আলাদাভাবে নাম রেজিস্ট্রি করবো। আলাদা থাকব, আলাদা খাবো, যেন কেউ কাউকে চিনি না। এরকম ভাবেই তুমি আমাকে গার্ড দিতে পারবে। আর তুমি ওখানে সবসময় তোমার কালো চশমাটা পড়ে থাকবে। ওটায় তোমায় অন্যরকম দেখাবে।

ওরা গাড়িতে করে লেকের কিনারায় এসে পৌঁছলো।

কুয়াশা সরে গিয়ে সূর্য উঁকি মারছে, ক্লেয়ার ম্যাপটা একবার দেখে নিল। কিছুদূরে বিরাট হোটেল।

ওরা এখান থেকে ছাড়াছাড়ি হবার সিদ্ধান্ত নিল। ট্যুরিস্টদের একটা জায়গায় ওরা গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা ঠিক করলো।

এরপর ওরা দু'জন আলাদা হয়ে গেল। রাস্তার একধারে এক শিল্পী বসেছিল, তার নাম ব্রাউন।

মার্টেলকে চিনতে পেরে পেছনে অনুসরণ করলো ওর গাড়িটা।

* * *

ব্রাউন আজকে ভেরোনার অ্যাম্ফিথিয়েটারের ছবি এঁকেছিল। সামনের ছোট একটা কার্ডবোর্ড বাক্স, তাতে পয়সা রয়েছে। আসল কাজ হল হাউপ্টব্যানহফের সামনের দরজায় নজর রাখা। মার্টেলও ওকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। সুইজারল্যান্ড থেকে মেন লাইনে এক্সপ্রেস আসতে তখনও বাকী।

শিল্পী ব্রাউন ওকে দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে তারপর ভাবল, ঠিক আছে।

গাড়ি দুটো পাশাপাশি চলছিল।

মার্টেল এবার বলে উঠল, কি ব্যাপার বলো তো? বড্ড কৌতূহলী।

মার্টেলের রিভালভারও তখন প্রস্তুত। কাঁচের আয়নায় ও ব্রাউনের কাজকর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

বেশ খানিক পরে গাড়ি থেকে নেমে মার্টেল হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেল। মার্টেল কাউন্টারের মেয়েটার কাছে লেকের দিকে ডাবল বেড চাইল এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল।

মার্টেল নির্দিষ্ট ফরমে, পেশার জায়গায় 'কনসালট্যান্ট'—বলে লিখলো। এরপরে ওপরে উঠে বারান্দায় উঁকি মারতে দেখল স্টেশন থেকে ক্লেয়ার বেরিয়ে আসছে।

অদ্ভুত জমকালো পোষাকে ক্লেয়ারকে দারুণ দেখাচ্ছে। সেই শিল্পী ওকে দেখতে পাবেনা। হাউপ্টব্যানহফে ক্লেয়ার সামান্য অপেক্ষা করে একজনকে জার্মানভাষায় হোটেলটা কোথায় জিজ্ঞেস করল। লোকটার সঙ্গে স্ত্রী ছিল।

সে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। এদিকে মার্টেল নিজের কাজ ঠিকঠাক করে যাচ্ছে।

ব্রাউন মার্টেলের গাড়ির নাম্বারটা টুকতেই ব্যস্ত।

—এই যে হারামজাদা কি হচ্ছে? মার্টেল ওকে লক্ষ্য করে বলে উঠল। কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটা যন্ত্র নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। একেবারে নীচে এসে লক্ষ্য করলো ক্লেয়ারের

সবকিছু করা হয়ে গেছে। ক্লেয়ার উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসে দেখল ব্রাউন রাস্তা পেরোচ্ছে।

মার্টেল পাবলিক বুথের দিকে এগিয়ে গেল। একটা হলঘরে সারি সারি ফোন রাখা আছে। মার্টেলের আগে ব্রাউন ঢুকে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মার্টেল খানিকটা থেমে ডায়ালটা তুললো।

হঠাৎ একটা গোলমাল। মার্টেল একটা বুথে ঢুকে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে লোকটা চমকে গেল।

মার্টেলের মনে হল ঐ শিল্পী বেশ চালাক-চতুর। মার্টেল ডায়াল করলো কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে ভুল সিগন্যাল আসতে বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিল। কি ঘটছে এ-ব্যাপারে মার্টেল স্থির নিশ্চিত। পরের বুথে ঢুকলো। লোকটাও নিজের কর্তব্যে অটল।

মার্টেল একহাতে ফোন আর অন্য হাতে একটা যন্ত্র কোমর সমান কাঁচের জানলায় চাপ দিতে ওটা স্থিরভাবে বসে গেল। এরপরে "হিয়ারিং এড"—ঢুকিয়ে একটা তার এমনভাবে লাগালো যাতে লুকিয়ে রাখা যায়।

শিল্পীটার হাতে তখন মামুলি ক্যালিবার। যাই হোক মার্টেলের যন্ত্রটা যে ভালই কাজ করছিল সেটা বোঝা গেল পরের বুথের সমস্ত কথাবার্তা ও শুনতে পাচ্ছিল। অবশ্য ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর বোঝা যাচ্ছিল না।

শিল্পী বলল, এডগার ব্রাউন কথা বলছি, ক্লারা...।

হঠাৎ পরের বুথে মার্টেলের উপস্থিতিতে লোকটা কথাবার্তার ভারসাম্য হারিয়ে যা পারলো বলে যেতে লাগলো, যেমন ঃ জিনিসটা নিরাপদে "বৈরিশ্চার হফ" হোটেলে কয়েক মিনিট আগে দিয়ে আসা...।

—ঠিক কোথায়? ক্লারা নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করল অপর প্রান্তে।

—ঐ হাউপ্ট ব্যানহফ আর হারবারের মুখোমুখি। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা...। আচ্ছা আমি কি ডিউটি করবো?

—হ্যাঁ। তোমার ব্যাপারটা আমি রিপোর্ট...।

—শোনো...।

—ইতিমধ্যে সংযোগ ছিন্ন হল। মার্টেল জিনিপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলেছে। ব্রাউনের কণ্ঠস্বর এবার খানিকটা পাল্টে গেছে। মার্টেল এবার স্থির নিশ্চিত যে স্টোলারের ব্যাপারে সে ভালরকম তথ্য পেয়ে গেছে।

* * *

দিয়েত্রিচের হেডকোয়ার্টার থেকে মাইল খানেকের মত দূরত্বে এগারোতলা একটা বিল্ডিং। তারই একটা অ্যাপার্টমেন্টে ক্লারা সবেমাত্র ফোনটা নামিয়ে রেখেছে। সিগারেট ধরিয়ে নিজের মনেই বললো, ব্রাউনটা যে কি করবে...।

এবারে রেইনহার্ড দিয়েত্রিচকে ফোন করল! ক্লারার সৌন্দর্য দিয়েত্রিচের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। খানিক পরে ও দিয়েত্রিচকে 'স্কলস'-এর নাম্বারে ফোন করলে, ওপ্রান্ত থেকে দিয়েত্রিচের উচ্ছল-কণ্ঠস্বর ভেসে-এলো। কিছু মামুলি কথা হবার পর ক্লারা বলে উঠল, দ্বিতীয় চুক্তি দেওয়া হয়েছে, আমি শুনেছি। লিন্ডাউ-এর হোটেলে বৈরিশ্চারে...। দিয়েত্রিচ বলল, আজ সন্ধ্যেবেলা ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করবে। জেটে করে একেবারে লিন্ডাউ-এর কাছে এয়ার স্ট্রিপে নামবে। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে হোটেলে ঘর ঠিক করা থাকবে, ওখানে উঠবে। তোমার সাহায্য প্রয়োজনে লাগতে পারে, বলে দিয়েত্রিচ একটা গাড়ির রেজিস্ট্রেশান নাম্বার দু'বার পুনরাবৃত্তি করল, তারপর উভয়েই ফোন রেখে দিলো। কেইথ মার্টেলের ব্যাপারেও ক্লারা দিয়েত্রিচকে অবগত করল।

খানিক পরে ও শোবার ঘরে এসে একেবারে নগ্ন হয়ে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে ভাবলো, এতেই প্রলোভিত করা যাবে মার্টেলকে আর দিয়েত্রিচের ব্যাপারটা মেনে নিতে আপত্তি নেই। এবারে শুয়ে পড়লে, চোখের সামনে ভাসতে লাগলো নিজের কাজের পরিকল্পনা। একটা

ইনজেক্‌শানের সূঁচ। ওটাকেই ধীরে ধীরে...।

* * *

এদিকে দিয়েত্রিচ সারারাত কাটাবার জন্যে একটা বড় গোছের স্যুটকেশ নিয়ে আসতে বলল, ওর দেওয়ালের মধ্যে খোপে নানারকম আকারের সুটকেশ রয়েছে। ও ইন্টারকমে সদ্য ব্রেজেঞ্জ প্রত্যাগত ভিন্‌জকে ডেকে পাঠালো।

—শোন ভিন্‌জ তোমার কাজ একটা মেয়ে করছে। আমি এই মুহূর্তে লিন্ডাউ-এর বৈরিশ্চার হোটেলে যাচ্ছি। ওখানেই মার্টেল সদ্য উঠেছে। তুমি উপযুক্ত লোক সঙ্গে নিয়ে এই হোটেলে চলে এসো।

—আমরা এবার ওকে নিশ্চয়ই পাবো। ভিন্‌জ বলল।

দিয়েত্রিচ তার সৌখিন মার্সিডিসে চড়ে ড্রাইভারকে বলল, ঝড়ের মতো লিন্ডাউ-এর দিকে চলো।

* * *

লিন্ডাউ-এর হাউপ্টব্যানহফের হোটেল। মার্টেল একটা ফোন বুথের বাইরে খানিকক্ষণ থামল। একটা সিগারেট ধরালো।

ব্রাউন ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। মার্টেল অপেক্ষা করতে লাগল যদি জার্মানটাকে আবার দেখতে পায়। কিন্তু না ব্রাউনকে আর দেখা গেল না।

মার্টেল দ্রুত বাইরে এগিয়ে এলো। ব্রাউনকে এবার দেখা গেল। মার্টেল দ্রুত একটা গাড়িতে উঠে বললো পোস্ট অফিস। তাড়াতাড়ি...।

পোস্ট অপিসে পৌঁছেই ফোনের কাউন্টারে গিয়ে টুইডকে ফোন করল।

টুইডকে পাওয়াও গেল। এরপরে মার্টেল কোড নাম্বারে কাজ এগোতে লাগল। বাক্যগুলো এইরকম ঃ

ওয়ার্নারকে ব্রেজেঞ্জে দেখা গেছে—অ্যালিয়িস ষ্টোর-এর সমাধি—১৯৩০-১৯৫৩ ...ফরাসী অধিকারের সময়...বুধবার সকাল...সুবেশী রমণী...ওয়ার্নার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল...সমস্ত জায়গাতেই ডেলটা সক্রিয়...ব্রেজেঞ্জের একটা গাড়িতে দু'জন লোক...।

টুইড জিগ্যেস করলো, ওরা কি তোমায় দেখেছে? আবার কথা আরম্ভ হলো ঃ

আমরা দেখেছি...এখন লিন্ডাউ-এর হোটেল বৈরিশ্চার...ব্রাউন পেভমেন্ট আর্টিস্ট। ডেলটার লোক...স্টোলার...স্টার্টগার্ট-এর ফোন নাম্বার...ক্লারা...।

হঠাৎ টুইড ওকে থামতে বলে ফোন নামিয়ে রাখলো। রেকর্ডিং মেশিনটা বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকনেইল। মেয়েটা খুব চটপটে। জীবনে কখনও ট্যাক্সি নেয়নি।

টুইড ওকে বলল, শোন ম্যাকনেইল মার্টেল ভীষণ বিপদে পড়েছে। স্টোলারকে ফোনে তাড়াতাড়ি ডাক। ভীষণ জরুরী।

অকারণে তখন মেঘের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

* * *

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মে ঃ

মার্টেল আর ক্লেয়ারের মধ্যে সংকেতের ব্যাপারটা ঠিকঠাক রয়েছে। ওরা দু'জনে ডাইনিং রুমে এমনভাবে ঢুকবে যেন কেউ কাউকে চেনেনা।

ক্লেয়ার জানে কেউ ঢুকলে সিগারেট ধরিয়ে সংকেত দিতে হবে। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হলে ঢুকলো।

দিয়েত্রিচ হলে ঢুকে বসলো মার্টেলের একেবারে বিপরীত দিকের জানলাটার কাছে। ঢুকেই গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে প্রতিটা টেবিলের প্রত্যেককে দেখতে লাগলো। ও আসার পরই হলের পরিবেশটা পাল্টে গেল। সুসজ্জিতা মহিলারা মিলিওনিয়ার ব্যক্তিটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে।

মার্টেল ভাবতে লাগল টাকার গ্লামারই সবচাইতে বেশি।

মিনিট দুয়েক বাদে ক্লেয়ার টেবিল ছেড়ে রিসেপশান হলে গেল। মার্টেল লাউঞ্জে একটা আর্মচেয়ারে বসে ম্যাগাজিন দেখতে লাগল। এখন শুধুই প্রতীক্ষা।

আর এক নতুন অতিথি কুলি সঙ্গে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। ক্লেয়ার কাউন্টারে কেম্‌পটন-এর ট্রেন ক'টায় জিজ্ঞেস করার ভান করে জেনে নিল, ঐ যে মেয়েটা এল, মনে হয় চেনা। ওকি থাকবে...?

—সম্ভবতঃ এটাই ওর প্রথম আসা...।

ক্লেয়ার হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে মার্টেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওটা ফেলে দিল। হ্যান্ডব্যাগে পিস্তলটা নিরাপদেই আছে। মার্টেল কাগজটা কুড়িয়ে নিল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা খানিকক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে নিলো।

ক্লেয়ার বলল, ওই যে মেয়েটা এলো ওর নাম ক্লারা। স্টার্টগার্ট থেকে আসছে।

—হায়নারা একে একে জড়ো হচ্ছে। ডাইনিং রুমের লোকটা কুখ্যাত দিয়েত্রিচ। তাইতো?

—হ্যাঁ। ওর ছবি আমি কাগজে দেখেছি।

এরপরে ব্যাগের ভেতরে পিস্তলটা এমনভাবে রাখলো যাতে তাড়াতাড়ি বের করা যায়। দু'জন লোক রিসেপশানে এসে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার চিনত, একজন এরউইন ভিন্‌জ আর ওর সহকারী কল্ড গ্রস, সুটকেশ হাতে।

ক্লেয়ার পিস্তলটা বের করে কোলের ওপর কাগজের নীচে লুকিয়ে রাখলো। ব্রেজেঞ্জ গ্যালাস—স্ট্রাসেতে এই গ্রসই ডেলটার গাড়িটা চালাচ্ছিল।

এদিকে দু'জনে লাউঞ্জের চারদিকে তাকাতে লাগল। গ্রস একবার মনে হল মার্টেলের দিকে তাকালো, কিন্তু ভিন্‌জের সেদিকে দৃষ্টি নেই।

ওরা রেজিস্ট্রেশান ফরম পূরণ করছিল। ক্লেয়ার দেওয়ালে একটা ছবি দেখার ভান করে ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

ঠিক সেই সময়ে দিয়েত্রিচ করিডরের দিকে এগোচ্ছিল। মুখে বড় সিগারেট লাউঞ্জের ওপর দিয়ে যাবার সময় ও মার্টেলের একেবারে সামনাসামনি এসে পৌঁছালো।

* * *

—রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ তোমার কোন কাজে লাগতে পারে। তুমিই...?

মার্টেল হঠাৎ দেখল বিরাট হাত করমর্দনের ভঙ্গিতে ওরই দিকে এগিয়ে এসেছে। মার্টেল উপেক্ষা করে সিগারেট ধরালো।

দিয়েত্রিচ গায়ে মাখলো না। ওর হাতের কাছে ওয়েটার এক গ্লাস পানীয় রেখে গেল।

—তুমি ইংরেজ?

—হ্যাঁ, আমি ইংরেজ।

—আচ্ছা! আমাদের সুন্দর ব্যাভেরিয়াতে ছুটি কাটানো হচ্ছে নিশ্চয়ই?

মার্টেল এবার সেই বিখ্যাত শিল্পপতির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে খানিকটা অধৈর্যের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, তুমি তো একজন নাজী। এই নাজীদের পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

—যদি না পৃথিবীটার উত্তরাধিকার পাই। সামনের স্টেট ইলেকশানে নিশ্চিত যে টফলার জিতছে না। জার্মানীর মতো বড় রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট প্রভাব কেমন লাগবে? পশ্চিমের মূল কাজ হলো ওদের একেবারে শেষ করে দেওয়া...সোভিয়েট বিপক্ষে।

—আমি কমিউনিস্ট আর নাজীদের পার্থক্য দেখতে পাইনা। ওরা দু'জনেই সমান। এক নায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। দু'জনেরই গুপ্ত পুলিশ বাহিনী কে. জে. বি নয়তো গেষ্টাপো। এরা অপরিবর্তনীয়। এদের সিস্টেমটাই তাই। আমি চ্যান্সেলার ল্যাংগের পাটকেই বরং পছন্দ করি। আর এখন যদি কিছু না মনে করো...।

—নাও একটা সিগার। এগুলো হাভানার।

—কিউবার? মার্টেল উঠে দাঁড়ালো। কঠিন মুখভঙ্গীতে জার্মানটার দিকে তাকালো, বলে উঠল,

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি শুধু সিগারেটই খাই। যাই হোক আলাপ হয়ে ভাল লাগল। শুভরাত্রি।

বলে ও এগিয়ে গেল। দিয়েত্রিচ অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে রইল ওর যাওয়ার দিকে।

মার্টেল লিফটের সামনে পৌঁছতেই রিসেপশনিস্টের সঙ্গে যে মেয়েটা কথা বলছিল সে দৌড়ে গিয়ে হঠাৎই লিফটে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, দিয়েত্রিচের চোখের সামনে।

* * *

চারতলাটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। লিফট থেকে মার্টেল আর ক্লেয়ার বেরোলো। মার্টেল ক্লেয়ারকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। বাথরুমটা ভালভাবে দেখে নিল। পর্দাগুলো সমস্ত জানলায় টেনে দিল।

আধো অন্ধকারময় আলোর পরিবেশে ক্লেয়ার বলতে শুরু করল—

—আমি, ঐ দু'জন যখন রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করছিল তখন ওদের চিনেছিলাম একজন ভিনজ্ আর একজন ওর সহকারী ব্রেজেঞ্জ...।

—আমি জানি...। ওরা পেশাদার খুনী। আমার আশার চেয়েও দ্রুত কাজ হচ্ছে। দিয়েত্রিচ দেখতে এসেছে সেন্ট গ্যালেন, ব্রেজেঞ্জ আর জুরিখের মত এখানেও ওর সাকরেদরা আমাকে সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় কিনা। কাজটা সারবে ভিন্‌জ আর গ্রস। ক্লারা পেছনে আছে।

ক্লেয়ার বলল, ঐ মহিলাকে ভাল করে নজর রাখা প্রয়োজন..। আচ্ছা দিয়েত্রিচ কি আজ রাতে কিছু করতে পারে?

—না। কারণ ও নিজেও এই হোটেলে আছে। এরকম ঝুঁকি ও নেবেনা। আজ রাতে আমরা রিভালবার হাতে পালা করে ঘুমবো।

একটু থেমে মার্টেল অবার বলল, প্রথমে আগামীকাল লিন্ডাউকে জলপুলিশের সার্জেন্ট ডরনারকে সব বলবো। এই লোকটাই ওয়ার্নারের দেহটা এনেছিল। দ্বিতীয়তঃ ডেলটার এখানে একটা ফাঁদ আছে।

ক্লেয়ার গম্ভীর মুখে বলে উঠলো, আমার যেন কেমন নার্ভাস লাগছে। দুটো খুনী, একটা ভয়ঙ্কর মেয়ে আর স্বয়ং দিয়েত্রিচ। আমার মনে হচ্ছে তুমি যা ভাবছো তা থেকেও দ্রুত গতিতে সবকিছু এগোচ্ছে।

অস্পষ্ট—আলোয় ক্লেয়ারের মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

* * *

বৃহস্পতিবার, আঠাশে মে ঃ

ঠিক রাত এগারোট নাগাদ বোঝা গেল ক্লেয়ারের কথাই ঠিক। দিয়েত্রিচ বলা যায় আন্ডার এস্টিমেট করেছিল।

ঘরটা একেবারে অন্ধকার। মার্টেল পিস্তল হাতে বসে। কিছু একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো।

জানলার পর্দা সরিয়ে নিচে তাকালো। দেখল একটা মার্সিডিস দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে একটা সোফার। হঠাৎ দিয়েত্রিচ হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসতে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দরের দিক থেকে একটা গোঙানীর মত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

মার্টেল সুটকেশটার কাছে এগোলো। একটা হালকা রেনকোট গায়ে চাপিয়ে নিল। ক্লেয়ারকে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, কেন কিছু ঘটেছে?

মার্টেল বলে উঠল, দিয়েত্রিচ আমাদের সঙ্গে চালাকি করছিল। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন আজ রাতে এখানে থাকবে কিন্তু এইমাত্র গাড়িতে বেরিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

—আমরা কি করবো? ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল।

—আমাদের একমাত্র করণীয় হলো ওরা যেন মোটেই জানতে না পারে আমরা কোথায়?

—একটু থেমে মার্টেল বলল, যাও এবার শুতে যাও। কেউ যেন দেখতে না পায়।

ক্লেয়ার বলল, তুমি কি করবে?

মার্টেল বলল, আমি এখন স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট ডরনারের সঙ্গে দেখা করব। লিন্ডাউতে একমাত্র এই লোকটাকেই বিশ্বাস করা চলে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা নামছে। ক্লেয়ার শুতে গেল। মার্টেল দরজা খুললো।

*　　　*　　　*

রাতের অন্ধকারে মার্টেল বেরিয়ে এল। পাতলা কোট ভেদ করে মার্টেলের ঠাণ্ডা লাগছে! ও লুভউ ইগস্ট্রাসের দিকে এগোতে লাগলো। এদিক দিয়ে সোজা গেলেই পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু একটা শব্দ বারবার ভেসে আসছিল। সোজা এগোতে থাকল।

রাবার সোলের জন্যে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটা সত্ত্বেও কোন আওয়াজ হচ্ছেনা। রিভালবারটা যথাস্থানে আছে। সারা রাস্তা জুড়ে এক থমথমে ভাব।

কিছু একটা শব্দ শুনে ওর মনে হল কেউ যেন ওর পেছনে আছে।

হাউপ্টব্যানহফে চরটা ছিল, কিন্তু ও ওদের কিছু কথা শুনতে পায়নি। হঠাৎ ওর যেন মনে হল মার্টেল বেরিয়ে যাচ্ছে।

মার্টেল এবার দাঁড়িয়ে গেল, শব্দটাও থেমে গেল। মার্টেল সমস্যায় পড়লো। নিশ্চয়ই ওকে কেউ অনুসরণ করছে। হঠাৎ মার্টেল চলতে আরম্ভ করলো। ওর যেন মনে হলো কুয়াশার মধ্যে আরো কিছু লোক ওকে অনুসরণ করছে। ডেলটা সমস্ত কিছুই নিঁখুতভাবে করে থাকে। জুরিখের ব্যাপারটা ও ভোলেনি। রাস্তায় একটা লেখা চোখে পড়ল 'ক্রমডাম্প্যাসে'।

মার্টেল দ্রুত দরজার দিকে এগোতে লাগলো। মার্টেলের গুলি লোকটার মাথায় সজোরে লেগেছে। লোকটা পড়ে গেল।

মার্টেল এবার দৌড়ে গলিটা দিয়ে ঢুকে, ডানদিকে বাঁকলো। রাস্তার সামান্য আলোয় লেখাটা চোখে পড়তে দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা দ্রুত খুলতেই একটা পুলিশ প্রহরী ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

কাউন্টারে গিয়ে ও একটা কার্ড সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। পিস্তলটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো।

কাউন্টারের লোকটাকে বলল, সার্জেন্ট ডরনার তাড়াতাড়ি। বাড়িতে থাকলে বিছানা থেকে তুলে আনো। আমার চিহ্নটা দেখাও গিয়ে। ক্র্যাম্যাগসেতে দুটো লোক পাঠাও। ওখানে মৃতদেহটা আসার আগেই...।

*　　　*　　　*

ঊনত্রিশে মে,শুক্রবার ঃ

বৈরিশ্চার হফে রুদ্ধদ্বার শলা-পরামর্শ করলো তিনজনে—কেইথ মার্টেল, সার্জেন্ট ডরনার আর এরিখ স্টোলার।

এদিকে টুইড তার ফ্লাটে সেন্ট গ্যালেন থেকে মার্টেলের পাঠানো রিপোর্টের টেপ পরীক্ষা করছিল। মোট পাঁচবার শুনল ওর রেকর্ডটা।

ক্লেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী ওয়ার্নারের অপারেশন ক্রোকোডাইলের তিনটে দিক আছে।

সেদিনে আরও একটা ব্যাপার ঘটছিল। হাওয়ার্ডের প্যারিসে বিমানে করে যাবার কথা। ওখানে চারজন সিকিউরিটি চীফের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কারণ একজন 'ভি. আই. পি' প্যারিস থেকে সামিট এক্সপ্রেসে ভিয়েনার দিকে যাবে। আর পাঁচদিন বাকি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্লস ফ্যাডল এয়ারপোর্টে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে সোজা গেয়ার দ্য ইস্ট-এ চলে যাবে। ঠিক ঐ সময়েই ফরাসী প্রেসিডেন্ট এর গাড়ি একই গন্তব্যের দিকে রওনা হবে।

ফরাসী প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হলো এ্যানে ফ্লানড্রেস, ও টুইডের পুরোন বন্ধু।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে সোজা ওরাল এয়ারপোর্টে পৌঁছবে।

তারপর সেখানে থেকে দ্রুত গতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান টিম ও মিয়েরার ওপরে সমস্ত কিছু দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে। একে টুইড মাত্র একবারই দেখেছে। সাক্ষাৎকার সম্প্রতিই ঘটেছিল। চারনম্বর ভি. আই. পি হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার কার্ট ল্যাংগার। এর পরের দিন সকালেই থাকবার কথা।

ক্লারা বেক হাতে একটা বাইনোকুলার নিয়ে সীটে বসেছিল। ও কিন্তু একেবারেই ভোলেনি যে, মার্টেল ওর উপস্থিতির কথা সার্জেন্ট ডরনার আর স্টোলারকে আগের রাতেই জানিয়েছে।

মার্টেল ফোন করতেই ডরনার বলে উঠেছিল, আমার লোক আগেই জানিয়েছে ক্লারা বেক হোটেলে উঠেছে।

—হুঁ। মার্টেল বলেছিল।

এবারে স্টোলার বলেছিল, কেন?

কারণটা হচ্ছে ডেলটা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি যে আমি জানি যে ক্লারা ওদের চেনে। ক্লারা এখানে আসার পরে দিয়েত্রিচ বা ভিন্জ কিংবা রল্ড গ্রস কারোর সঙ্গেই ওর যোগাযোগ হয়নি। সুতরাং গুপ্তচর হিসেবে ঐ সবচাইতে উপযুক্ত। সকালবেলা আমি ওকে...।

সেই মতোই কাজ এগোচ্ছে। এখন মার্টেল ক্লারাকে ব্যবহার করতে চাইছে। ক্লেয়ার নির্দেশমত বাইনোকুলার দিয়ে চারিদিক দেখছিল। ক্লারাও তাই। এবার দু'জনেরই বাইনোকুলার সরাসরি মার্টেলের দিকে এগোতে লাগলো।

ক্লেয়ার আপন মনেই বলে উঠলো, প্রিয়তম তুমি খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছো।

ক্লেয়ার একসময় ওর জায়গা ছেড়ে বন্দরের সামনের জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালো। চারিদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ও বেকের সীটের একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। ক্লারা তখন উঠে বৈরিশ্চার হফের প্রবেশের মুখটায় এগিয়ে গেছে। মার্টেল তখন ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলছিল। এদিকে বেক রাস্তায় পৌঁছে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছে। তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাউপ্টবানহফ। দ্রুত এগিয়ে সামনের একটা দরজা খুলেই ক্লেয়ার বাঁ দিকে তাকালো। বেক তখন টেলিফোন বুথে ফোন করতে ব্যস্ত। ক্লেয়ার একটা বইয়ের স্টলে বই উল্টে দেখতে লাগল।

* * *

ক্লারা তখন ভেতরে স্থানীয় একটা নম্বরেই ডায়াল করেছে। বারবার ও স্টেশনের সামনের দিকটায় তাকাচ্ছে। ওখানে কেউ নেই।

ফোনের ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, হেগেন কথা বলছি...।

—ওয়ার্নবার, আমি ক্লারা।

—আমরা প্রস্তুত।

—মাল লঞ্চ ঠিকঠাক করে নিয়েছে। এবারে যাওয়াব পালা।

সংযোগ ছিন্ন করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে হোটেলের দিকে এগোল।

সামনে পেভমেন্টে শিল্পীটার কাছে একবার থামলো, ভাবখানা এমন যেন ওর আঁকা ছবি দেখছে। কিন্তু ও ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল যা তাহলো, পুলিশের ওপর নজর রাখো। লঞ্চ নিয়ে আসছে।

সিগারেট ধরিয়ে ক্লারা লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো। এবার দ্বিতীয় ইংরেজটারও শেষ হবার পালা।

লুডউইগস্ট্রাসেতে বন্দরের দিকে সার্জেন্ট ডরনার অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল।

আচমকাই একজন মহিলার সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগলো। লাগতেই দু'হাতে ও মহিলাটির কাঁধ দুটো ধরে চেঁচিয়ে বললো, কিছু মনে কোরনা। দোষ আমারই, দেখতে পাইনি। মহিলাটি ততক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও আর কেউ নয় স্বয়ং ক্লেয়ার হফার। ডরনারের পরনে সিভিলিয়ান ড্রেস।

এরপরে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে। এখন থেকে পনের

মিনিটের মধ্যে দ্বীপটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এরপরেই ডরনার ক্লেয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এবং ক্লেয়ারও বন্দরের রাস্তায় যাবার জন্যে সোজা রাস্তা ধরলো। মার্টিন তখন লঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত। বাঁধের সামনে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ও নামছিল লঞ্চের ভেতরে।

ক্লেয়ার একবার ডানদিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই শিল্পী ব্রাউন পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লেয়ার তখন মাথায় একটা লাল রুমাল জড়িয়েছে।

মার্টেল লাল রুমালের সংকেত পেয়েই বুঝলো সবকিছু ঠিকঠাক জায়গাতেই আছে। একবার দেখলো সার্জেন্ট ডরনার যে দিকে একটা বিরাট লঞ্চ রয়েছে ঠিক সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ও ক্লেয়ারকে লক্ষ্য করতে লাগল। ও তখন খোলামেলা গোছের স্নানের জায়গাটার দিকে এগোচ্ছিল। লেকের কাছে একটা পাঁচিলের আড়ালে স্নানের জায়গা।

পুলের কাছে পৌঁছে ও একটা ঘরে ঢুকলো। টিকিট আগেই কাটা ছিল। সেখানে সব কিছু খুলে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে পিস্তলটাও রাখলো। তারপর ব্যাগটাকে কব্জির সঙ্গে একটা চামড়ার ফালি দিয়ে আটকাল।

এরপরে ঘরের মধ্যে ওর আর একটা ব্যাগ ফাঁকা অবস্থাতেই পড়ে রইল। দরজাটা বন্ধ করলো। ঘড়িটা দেখে নিল। তারপর বাইরে এসে ধীরে ধীরে সরোবরের দিকে এগিয়ে গেল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা।

এদিকে মার্টেল দড়ি বেয়ে লঞ্চের ভেতরকার হুইল ঘরের মধ্যে ঢুকছে। ঘড়িটা একবার দেখল। ও আগেই ডরনার আর ক্লেয়ারের সঙ্গে ঘড়িটা মিলিয়ে নিয়েছে। আর দু'মিনিট বাকি ও একটা সিগারেট ধরালো।

কোনস্ট্রাঞ্জ লেকের কুয়াশায় অস্টিন উপকূল মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এদিকে মার্টেল, ডরনার আর স্টোলারের সঙ্গে পরিকল্পনা করে নিয়েছে।

এই মুহূর্তেই স্ট্যান্ড পোলিজির অফিস থেকে বি. এন. ডির. প্রধান ব্যক্তিটি অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে।

মার্টেল বন্দরের পূর্বদিকে তাকায়নি। দুটো লঞ্চ কাছি দিয়ে নোঙর করা। ঐ জলপুলিশের লঞ্চ দুটোর নেতৃত্বে আছে সার্জেন্ট ডরনার, ডেকের নীচে পোষাক বদলে ও দাঁড়িয়ে আছে। মার্টেল আবার ঘড়িটা দেখল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগোতে লাগলো।

এদিকে স্ট্যান্ডপোলিজির অফিসের মধ্যে এরিখ স্টোলার জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ট্যুরিস্টরা সব টেবিলে বসে খাচ্ছে। ওর ভারী টেবিলটার পেছনে একটা ট্রানস্কিভার। অপারেটরও আছে। চাবি কিন্তু স্টোলারের নিয়ন্ত্রণে।

ট্রানস্কিভারটা ব্যবহার করলে রাস্তা, ব্রীজের ওপরে পুলিশের গাড়িগুলো, রেলওয়ে এমব্যাকমেন্টের কাছে মূল রাস্তার গাড়িগুলোর খবরের ব্যাপারে সুবিধা হয়। এখন এটার যোগাযোগ সরাসরি একটা পুলিশ লঞ্চের সঙ্গে, যেখান থেকে ডরনার রিপোর্ট করল যে, মার্টেল এগিয়ে চলেছে।

উপকূল জায়গাটা বরাবর কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচজন উইন্ড সারফার তীর ধরে এগোচ্ছিল। ওরা লিন্ডাউ আর ব্রেজেঞ্জের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ওদের নেতা ওয়ার্নার হেগেন ওদের দিকেই আসছিল। ও ক্লারা বেকের একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—ও লিন্ডাউ বন্দর ছাড়ছে।

ও নৌকোয় এগোতে এগোতে বলল, ধূসর রঙের। মার্টেল একা।

আর যারা নৌকো চালাচ্ছিল তাদের পরনে সাঁতারের পোষাক, প্রত্যেকের কব্জীতেই একটা করে বেল্ট আর তাতে ছুরি আটকানো। বাতাস শান্তভাবে বয়ে চলেছে।

ওদের পোষাকে একটা করে ব্যাজ আটকানো আছে। লিন্ডাউ বন্দর থেকে আধ মাইল দূরে ওয়ার্নার হেগেনের নেতৃত্বে ঘাতক দলটা এগিয়ে চলেছে।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এত কুয়াশার মধ্যেও তোমাকে দেখতে পেয়েছি তার জন্যে...।

ক্লেয়ার ততক্ষণে মার্টেলের লঞ্চের ওপর বসে আছে। মার্টেল ওর চামড়ার থলিটা খুলে ওয়াটার

প্রুফ ব্যাগটা পাশে রাখলো।

লঞ্চটা এখন দাঁড়িয়ে আছে। মার্টেল বন্দর থেকে ঠিকঠাকই এটাকে বের করে নিয়ে এসেছে।

বাতাস বয়ে চলেছে। আইনভঙ্গ করেনি কোনরকম। ক্লেয়ার বেশ খানিকটা পরিশ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কি আসবে?

—দেখা যাক্।

ক্লেয়ার ব্যাগ থেকে পোযাক আর ন' মিলিমিটার পিস্তলটা বের করলো। বলে উঠলো, এটা পড়লে কি ভাল হবে...।

মার্টেল ওর নিজের ৪৫ কোল্টটা একবার দেখে নিয়ে কাঁধের আবরণীর মধ্যে রেখে দিলো।

ক্লেয়ার বলে উঠলো, পোষাকটা সিন্‌থেটিক...।

মার্টেল তখন অন্য জগতে। ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় লঞ্চটা ধীরে ধীরে হাওয়াতেই ভেসে চলেছে। ধূসর কুয়াশা আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে।

ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয় ওরা আসবে?

—এইটাই তীরভূমি থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বের। মিনিট খানেকের মধ্যে তুমি মুখোশটা পরে নাও, ওদের কেউ যাতে তোমাকে না চিনতে পারে।

—আরে এটা? স্টাইল হাউসের ছোট চার্ট টেবিলের ওপরে যন্ত্রটা পড়ে ছিল। বেশ বড়ো। আবার বলল, এটা রাডার নাকি?

—না। এটা একটা টেপ-রেকর্ড করা সিগন্যাল, যার দুটো ব্যাপার আছে। যখন আমি একটা বোতাম টিপবো তখন ওটা স্টোলারের হেড-কোয়ার্টারে সিগন্যাল দেবে, আর তখন ওরা বুঝবে আমরা বিপদে পড়েছি। আর সিগন্যালটা যখন অনবরত হবে তখন ডরনার পুলিশ লঞ্চ থেকে বুঝবে আমরা কোথায় আছি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যাপার।

—কেননা ওয়ার্নার মারা যেতেই বুঝেছি আমাদের বিপক্ষ ব্যক্তি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান...।

—রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ?

—না। ও আর একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী, নাম ম্যানফ্রেড।

মার্টেল হুইল হাউসের ভেতর ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার অপেক্ষায়।

মার্টেল এবার বললো, নাও মুখোশটা পরে চুপচাপ বসো।

বলেই মার্টেল ইঞ্জিন স্টার্ট করলো। পশ্চিমেব কুয়াশা সরে গিয়ে জলের রঙটা নীল দেখাচ্ছিল। লিন্ডাউ বন্দরের পূর্বদিকের পাঁচিলের ওপর ব্যাভেরিয়ার সিংহটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্লেয়ার মুখোশটা ঠিক করে নিলো। প্যান্টের ওপরের দিকে পিস্তলটা ঠিক রাখা আছে কিনা দেখে নিল।

—ওযার্নারের বেলাতে ওরা যেমন এসেছিল, ঠিক যদি ওরা তেমনই আসে তাহলে আমার একজনকে দরকার।

মার্টেল লঞ্চের স্পীডটা অল্প বাড়িয়ে দিতে লঞ্চটা ধীরে ধীরে নির্জন জায়গার ভেতর দিকে এগোতে থাকলো। ওয়ার্নার এখানেই এসেছিল।

মার্টেল একটা ব্যাপারে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। পূর্বদিকে লঞ্চ আর অস্ট্রিয়ান ঘাট বরাবর একটা ধূসর কুয়াশা যেন সবটা ঢেকে আছে। অন্য কারোর পক্ষে ওকে খুঁজে পাওয়া অসুবিধাজনক হবে। লঞ্চের ওপরে উঠলে তবেই দেখা পাবে, সেটাও আবার ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অস্ট্রিয়ার দিকে তাকিয়ে ও কুয়াশার মধ্যেই আবছা কিছু নড়াচড়া করতে দেখতে পেলো।

ওয়ার্নার হেগেন একহাতে পাল আর অন্যহাতে মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো যন্ত্রটা পরীক্ষা করছিল। জিনিসটা একটা রাডার। আরিজোনায় দিয়েত্রিচের ইলেকট্রনিক্স কারখানায় তৈরী। পর্দায় মার্টেলের লঞ্চের ছবিটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

হেগেন ভাবলো ও ওয়ার্নারের রুটটাই অনুসরণ করছে।

অপর পাঁচজন 'উইন্ড সার্ফারকে' ও সংকেত করলো। ওরা পরস্পর একে অন্যের কাছাকাছি রয়েছে, যাতে কেউ কাউকে না হারায়।

এবারে ওরা লক্ষ্যবস্তু দেখা যাচ্ছে বুঝতে পেরে এগিয়ে যেতে লাগলো। কুয়াশা তখন সরে যেতে আরম্ভ করেছে।

হেগেন সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক সময় মতো করছে। ওর একটা চোখ পর্দায় আর একাট চোখ দেওয়ালের দিকে। এবারে বাঁ-হাতে মাস্তুলটা আর ডানহাতে সেই বিশেষ ধরনের ছুরি যেটা ওয়ার্নারের পেছনে ডেলটা প্রতীক এঁকে দিয়েছিল।

এবার ও লঞ্চটা আসতে দেখেই অন্যদের আসতে সংকেত দিলো।

সমস্ত দলটা অর্ধচন্দ্রাকারে এমনভাব এগিয়ে আসতে লাগলো যাতে মার্টেলকে জোর করে আটকাতে পারে।

ব্যাপারটা ঘটছিল অত্যন্ত দ্রুতভাবে। মাঝে কুয়াশায় হুইল হাউসের মধ্যে থেকে আসা ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছ'জন 'উইন্ড সার্ফার'-এর মধ্যে তিনজন এমনভাবে এগোচ্ছিল যাতে মার্টেলকে যেন তেন প্রকারেণ আটকানো যায়।

—ধরো ঠিক এইখানে এখন। মার্টেল ক্লেয়ারকে বলতে বলতে বোতামটা টিপল।

—আমি ওদের দেখতে পেয়েছি। বলেই ক্লেয়ার পিস্তল বের করে সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরলো।

—ওরা আক্রান্ত।

রাডারের পর্দায় বেতার সংকেতটা ফুটে উঠেছে। সার্জেন্ট ডরনার পুলিশ লঞ্চের ভেতরে। সংকেত পাওয়ামাত্র ও ইঞ্জিনটা স্টার্ট করতেই বিকট শব্দ করে লঞ্চটা এগোতে থাকলো। এই সময় কোন লেক স্টীমার ভেতর ঢোকেনা, ডরনার একথা জানা সত্ত্বেও নিয়ম মেনেই ও সাইরেন বাজাতে বাজাতে এগোতে লাগলো।

বাইরের দিকটায় এসে গর্জন থামাল। ওর লঞ্চ নব্বই ডিগ্রি কোণ বরাবর ভেসে যেতে লাগলো। তারপর দুটো প্রাচীরের মাঝামাঝি এসে ইঞ্জিনটা আবার স্টার্ট করলো। সাইরেনও একটানা বেজে যেতে লাগল। পর্দায় তখন বেতার সংকেত হচ্ছে।

'ওখানে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবেই'—ডরনারের ঈশ্বরের কাছে এখন এই প্রার্থনা।

* * *

ক্লারা বেক ঠিক করেছিল যে ব্রাউনের সঙ্গে কোন উত্তেজনায় যাবে না। টেলিফোনটা করার পর সামনের দিকের সীটে বসে স্বচ্ছ মেজাজে ট্যুরিস্টের মতো চারদিক দেখছিল। হঠাৎ পুলিশ লঞ্চটা আসতেই ও দ্রুত রাস্তা পার হয়ে হাউপ্টব্যানহফের দিকে এগোতে লাগলো।

তারপর যে জায়গায় থামলো সেখানে সারি সারি টেলিফোন বুথ, কিন্তু সবগুলোতেই স্টিকার লাগানো "টেলিফোন খারাপ" বলে।

ঠিক সেই সময়ে একটা পুলিশকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ও খুব ভয় পেল।

পুলিশটা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ফোন করতে চাও?

—সব কটাই তো খারাপ। ক্লারা একটু জোরে বলে উঠল।

—হ্যাঁ। সেইরকমই তো দেখছি। পুলিশটা নরম স্বরে বলল, সবগুলোই খারাপ।

—ধন্যবাদ।

হাউপ্টব্যানহফ থেকে বেরিয়ে ক্লারা দ্রুত বৈরিশচার-এর দিকে এগোতে থাকলো। ঘরে পৌঁছে ফোনে একটা নম্বর ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—আমি দুঃখিত। ফোনগুলো সব হঠাৎই সাময়িক খারাপ হয়ে গেছে। তুমি চট্‌পট্ আমায় নম্বরটা দাও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...।

—ব্যাপারটা জরুরী নয়। উত্তেজনাকে প্রাণপণে দমন করে ক্লারা রিসিভারটা রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কি ব্যাপার ঘটছে। কে জানে। দিয়েত্রিচের কাছে না আবার ধমক খেতে হয়।

-মেনল্যান্ডের-এর সব লাইন কেটে দাও...।

মার্টেলের এই সংকেত পাওয়া মাত্রই এরিখ স্টোলার সমস্ত পুলিশ স্টেশনে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলো। লিন্ডাউ দ্বীপে টেলিফোনে যোগাযোগের আর কোন ব্যবস্থাই রইলনা। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লিন্ডাউ।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই দ্বিতীয় পুলিশটা ঘর থেকে বেরিয়ে রেডিও কন্ট্রোল অফিসে গেল। পেট্রোলকার গুলোতেও সংকেত পাঠিয়ে দেওয়া হল। মূল ভূখণ্ডে যাবার সেতুটা আটকে দেওয়া হলো। মূল ভূ-খণ্ডের রেলওয়ে এমব্যাংকমেন্টের একেবারে শেষ প্রান্তে আরও একটা পেট্রোলকার দেখা গেল। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

লিন্ডাউ-এর সিগন্যাল বক্স নিয়ন্ত্রণ, রেল ট্রাফিকে ত্রুটি বেরোনোর ফলে সমস্ত ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। এখন কি ঘটছে কে জানে?

*　　　　*　　　　*

ওয়ার্নার হেগেনের নিজের ওপর প্রচুর আস্থা। 'উইন্ড সার্ফার'-এর টীমটা ওর নেতৃত্বে আছে। লঞ্চটাকে সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরবে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই চমক।

সোনালী চুলের দৈত্যটা স্থির লঞ্চটার দিকে প্রথম পৌঁছলো। ঐ জায়গাটাতেই খালি পা-টা রাখলো। ডান হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে বড় ব্লেডের ছুরি।

প্রথমেই যা দেখে ও অবাক হলো। একটা মুখোশপরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্টেল খানিক পরে বেরিয়ে এলো। হুইল হাউসের মধ্যে নৌকোর হুকটা এমনভাবে আটকানো যে হেগেনের মাথাটা একপাশে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়েই মার্টেলের লঞ্চের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ল। আর মার্টেল ওর বন্দুকের কুঁদো সরাসরি ওর মাথায় আঘাত করতেই সঙ্গে সঙ্গে হেগেন চেতনা হারালো। এবারে দ্বিতীয় লোকটা ছুরি হাতে এগিয়ে এলো। ক্লেয়ার লোকটার বুকে তিনবার গুলি চালালো। রক্তে ভেসে গেল চারিদিক। মার্টেল চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। চারজন পালিয়েছে। তিনজন তখনও ঘিরে আছে। আর এগিয়ে আসার জন্যে উদ্যোগ নিচ্ছে। ও ক্লেয়ারকে সতর্ক করে দিয়ে হুইল হাউসে ঢুকে লঞ্চটাকে পূর্ণ বেগে চালিয়ে দিল।

তিনজন তখনও ওর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে। লঞ্চ দ্রুতবেগে এগোতে এগোতে হঠাৎ থেমে গেল তারপর এত জোরে এগোলো যে বাড়ানো অংশটাতে রীতিমত আঘাত সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিলনা। ধাক্কার আঘাতে একজন ছিটকে পড়ে যেতে যেতে আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল লোকটার পুরো শরীরটাই ভেঙ্গে গেছে। আর দু'জন লোক জলে ভাসতে লাগলো। সমস্ত জল রক্তে লাল। ওদের মাস্তুলগুলো ভেঙ্গে চুরমার।

—আমাদের পেছনে আর একজন...। ক্লেয়ার বলে উঠল।

মার্টেলের লঞ্চটা এবার পেছন দিকে এগোতে লাগলো ঠিক লোকটাকে লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড আঘাতে লোকটা ছিটকে প্রপেলারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মার্টেল বলে উঠলো, ক্লেয়ার চলো পালাই, এখুনি ডরনার এসে পড়বে। মনে হয়।

*　　　　*　　　　*

ঊনত্রিশে মে, শুক্রবার ঃ

প্যারিসের এক উজ্জ্বল দিন। হাওয়ার্ড চার্লস দ্যগলে উড়ে গিয়ে পৌঁছল। সামিট এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার ব্যাপারে আজই চূড়ান্ত কন্ফারেন্স। অদ্ভুতভাবেই ও দেশীয় পোষাকে ভ্রমণ করছে।

বিমানবন্দরে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেসের পাঠিয়ে দেওয়া গাড়িতে ও সারেটের অফিসিয়াল হেডকোয়ার্টার এগারো নং রু দ্য সাউসেইসে এসে পৌঁছলো। অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গা বলে ট্যুরিস্টদের কদাচিৎ দেখা যায়। খিলান আকৃতির প্রবেশপথে উর্দি পরা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধরনের মিটিং-এর জন্যে ফ্লান্ড্রেস একেবারে সুরক্ষিত পুরোন বিল্ডিংটাই ঠিক করেছে। সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের অবিরত আনাগোনা। তিনজন সিভিলিয়ান তিনটে পৃথক গাড়িতে আসায় তেমন একটা উত্তেজনার সঞ্চার হল না। ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান হাওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনতলার একটা টেবিলে বসে ছিল ও।

হাওয়ার্ড বলে উঠলো, অ্যালেন তোমাকে দেখে আমি ভীষণ আনন্দ পেলাম।

—প্রিয়তম বন্ধু। তোমাকে আমি প্যারিসে স্বাগত জানাচ্ছি।

ফ্লান্ড্রেস ওর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলে উঠলো।

পাশেই একজন বসেছিল। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলো, তুমি নিশ্চয়ই টিম ওমিয়েবাকে চেন। সবেমাত্র ওয়াশিংটন থেকে...।

—বাঃ, চমৎকার হবে। আমেরিকান ভদ্রলোক বলে উঠলো। চেয়ার থেকে না উঠেই হাওয়ার্ডের সঙ্গে করমর্দন করল। গোলাকার টেবিলের চারপাশে সবাই বসল। ফ্ল্যান্ড্রেস মদের গেলাসগুলো সাজাতে আরম্ভ করল। হাওয়ার্ড ওর সামনে একটা নতুন প্যাড আর পেনসিল রাখলো। ওমিয়েবার দেহটা সুগঠিত, চোখে চশমা আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। ওমিয়েবার মুখমণ্ডলে কোনরকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

টিম ও মিয়েরাই আমেরিক্যান সিক্রেট সার্ভিসের একমাত্র প্রধান যে গত একবছরে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল না।

ফ্ল্যান্ড্রেস মদের ব্যবস্থা করতে করতে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। লাউঞ্জ স্যুটে ওকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছিল। কালো সরু গোঁফ ও ব্রাশ করা চুলের সঙ্গে ফরাসীদের মতো মসৃণ দেহটা মানানসই লাগছিল ওকে।

—যে কোন মুহূর্তে জার্মানী থেকে এরিখ স্টোলার আসতে পারে। পরক্ষণেই গ্লাসটা সামনের দিকে তুলে ধরে বলল, ভদ্রমহোদয়রা সুস্বাগতম!

বিয়ারে এবার ও চুমুক দিল। হাওয়ার্ড ততক্ষণে এক চুমুকে সবটুকু সাবাড় করে দিয়েছে। ফ্ল্যান্ড্রেস লক্ষ্য করছে ক্রমশ সকলের মুখে একটা কঠিনভাব জেগে উঠছে আর প্রত্যেককেই কেমন যেন নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ দরজা খুলে এরিখ স্টোলার প্রবেশ করল আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

প্রথমেই দেরীতে আসার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

—একটা অবাঞ্ছিত সমস্যার ব্যাপারে বলা যাক...। বলা আরম্ভ করলও।

তখন সবে বিকেল হতে আরম্ভ করেছিল। সকালে যে সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন লিন্ডাউ দ্বীপে ও ছিল এটা প্রকাশ করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওর। প্যারিসে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে মিউনিক বিমান বন্দর থেকে প্লেন ধরে ওর এখানে পদার্পণ।

—খানিকটা বিয়ার খেয়ে ও আবার স্থির হয়ে গেলো। ও অসম্ভব মনঃ বিশেষজ্ঞ।

খানিকক্ষণ বাদে বলে উঠল, টুইড কোথায়? আমি আশা করেছিলাম।

হাওয়ার্ড নীরসভাবে উত্তর দিলো, টুইড এখন বাড়িতে।

—তাই নাকি? তোমরা দু'জন তো একই বয়েসী, বলে স্টোলার গ্লাসে আর একটু বিয়ার ঢেলে চুমুক দিলো।

হাওয়ার্ডের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, বললো, ব্যাপারটা ওর এক্তিয়ারে নয়। হতে পারে কোন বিষয়ে আমরা দু'জনেই এখন প্যারিসে...।

—ঠিক আছে। ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠলো। একটু থেমে আবার বলল, আমার কাছে সামিট এক্সপ্রেসের রুটটা আছে,—বলে ও একটা বড় আকারের উত্তর-ইউরোপের ম্যাপ খুলতেই সবাই ম্যাপটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। রুটটা লাল রঙে চিহ্নিত। এরপর ও একটা সিগারেট ধরাল।

অ্যালেন ফ্লানড্রেসের স্বভাব অনেকটা নাটকীয় ধরনের। ম্যাপটা দেখতে দেখতে ও হালকা কিছু মন্তব্য করলো।

—কার্লোসকে দেখা গেছে—ম্যানফ্রেড তুমি যা ইচ্ছে, সেরকম বলতে পারো। আজ সকালেই লন্ডন থেকে পাওয়া পিকাডিলী...।

—ম্যানফ্রেড। তুমি কি করে জানলে লন্ডনে কি ঘটছে? তাছাড়া কেউ কি আমাকে বলবে যে, ও সত্যিই কার্লোস কিনা?

হাওয়ার্ড একরকম কেটে পড়ায় ফ্লানড্রেস একটু আশ্চর্য হলো।

ফ্রেঞ্চম্যান এবার স্বাভাবিক স্বরেই বলতে লাগলো, আমার সহযোগী একটা মেয়ে, রেণী ডুভাল,

এই মুহূর্তে ফরাসী দূতাবাসে কাজ করছে। ওর কাছ থেকেই টেলেক্সটা পাওয়া গেছে। বাকিটা তোমার কাগজে।

ফেঞ্চম্যানের দেওয়া কাগজটা ও পড়তে লাগলো। এরিখ স্টোলার কার্লোস-এর ব্যাপারে বলতে লাগলো, কার্লোস-এর কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ম্যানফ্রেডেরও নেই। কার্লোস ও ম্যানফ্রেডের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। লোহার বেড়াজালের মধ্যে থেকে মাঝে মধ্যে কার্লোস বেরিয়ে আসে, ম্যানফ্রেডও তাই। দু'জনেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। কেবলমাত্র প্রয়োজনে ওরা অবশ্য কে. জি. বি-কে সহযোগিতা করে।

—তাহলে দু'জন? হাওয়ার্ড বলল।

—'অথবা', মিয়েরা বলে উঠলো এবার। 'প্রকৃত কার্লোস' তাহলে কে? তুমি এটা আমাকে বলো এরিখ, যদি দু'জনেই থাকে, তাহলে দুজনেই দুর্ধষ খুনী...।

ফ্লানড্রেস অ্যামেরিকান। পরবর্তী কথায় হাওয়ার্ড ভুরুটা কুঁচকালো।

—তুমি আমাকে লন্ডনের ব্যাপারটা ভালভাবে বলতে পারো? ও কেমন পোষাক পড়েছিল? কেনই বা ওকে এত সহজে চেনা যাবে?

হাওয়ার্ড অস্ফুটস্বরে বললো, ওর স্বাভাবিক পোষাক উইন্ডচিটার, জিনস্, কালোরঙের বেরেট আর বড় চশমা।

এবারে জার্মান ভদ্রলোক বলে উঠল, তুমি ঘটনাটা আমাকে একটু বিশদভাবে বল তো?

—রাস্তায় টহল দেবার সময় একটা পুলিশ ওকে চিনতে পারে কার্লোস বলে, অবশ্য ও যদি সত্যিই কার্লোস হয়ে থাকে। রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে গিয়ে সোয়ালো স্ট্রিটে ও কোথায় উধাও হয়ে যায়। পুলিশটা ওকে অনুসরণ করেছিল কিন্তু ও ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিশে যায়। পরে মার্টিন রোডের একজন সহকারী ওকে দেখতে পায়। উইন্ডচিটার চেয়ারে বসে, চশমাটা ওপরের দিকে। ঠিক আটত্রিশ তলায় স্মিথ অ্যান্ড ওয়েলসন। একেবারে লোডেড বুঝেছ ব্যাপারটা...।

পেট্রোল পুলিশ। লোকটা রাস্তার ঐ বিশেষ জায়গাতেই চলাফেরা করছিল? স্টোলার বলে উঠল।

—আমার মনে হয় তাই। আই. আর. এ. সন্দেহ করেই একটা চোখ অন্ততঃ খোলা রেখেছিল। তাতেই বা কি? হাওয়ার্ড বলে উঠল।

—কেউ যদি ওরকম পোষাকই পড়ে, তাহলেও পুলিশ কি করে নিশ্চিত হয় যে ওকেই দেখেছে অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে?

—এই একই কথা আমিও ভাবছি...।

ওমিয়েরা সিগারেট ধরালো। স্টোলার এতক্ষণ উত্তেজিত কথাবার্তা বলার পর একেবারে ঠাণ্ডা। ফ্ল্যানড্রেস দেখলো জার্মানটা একজনকেই গভীরভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু বি. এন. ডির প্রধান ..।

এবারে ওরা সবাই ভিয়েনা সামিটে রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে সব জায়গায় ট্রেনগুলোকে থামানো হবে, জায়গাগুলো ম্যাপে লাল রঙে চিহ্নিত করা আছে।

রুটটা এরকম। প্যারিস থেকে স্ট্রামবুগ। তারপর স্ট্রামবুর্গ থেকে স্টাটগার্ট আর মিউনিখ হয়ে স্যালজবুর্গ তারপর জার্মানী। একেবারে শেষ পর্যায়ে স্যালজবুর্গ থেকে ভিয়েনা...অ্যামেরিকা, এতে অস্ট্রিয়ানদের সামান্য সহযোগিতা প্রয়োজন। অ্যালেনই রসিকতার মেজাজে বেশির ভাগ কথা বলে যাচ্ছিল।

হাওয়ার্ডের ভ্রাম্যমান টাম তিনটে সেক্টর দেখবে। ফ্ল্যানড্রেস নিখুঁতভাবে ওর সেক্টরগুলো দেখে যেসব জায়গায় ও সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো 'বিপজ্জনক অঞ্চল' বলে চিহ্নিত করলো।

এবারে এরিখের পালা। ও' মিয়েরা এক্ষেত্রে গভীরভাবে আবির্ভূত। জার্মান ভদ্রলোক ম্যাপের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে থামলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাতাসহীন। ঘরে একটা উত্তেজনা ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

—ঠিক এই জায়গাতে এক্সপ্রেস ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে। এই জায়গাটা সম্পর্কে নিশ্চিত

হওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল ট্রেন এই অঞ্চলটা দিয়ে যাবার পরই স্টেটের নির্বাচন।

—এখানেই নয়া-নাজীদের তৎপরতা? ডেলটা? হাওয়ার্ড ভ্রূ কুঁচকে বললো।

—'টফলার'। ও'মিয়েরা বলল। অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীমায় বলে উঠল, ডেলটা পোষাক আর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সমর্থনও বেড়ে গাচ্ছে। টফলারকে প্রায় কমিউনিস্ট বলা যায়। ওর আসল উদ্দেশ্য হল পশ্চিম জার্মানী থেকে ব্যাভেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে অস্ট্রিয়ার মতো একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরী করা। এতে গ্যাটের প্রতিপত্তি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েটের হাতই শক্ত হবে।

স্টোলার শান্তভাবে বলে উঠল,

চ্যান্সেলার ল্যাংগারের পরামর্শদাতারা ভবিষ্যতবাণী করেছে যে টফলার জিততে পারবে না।

আলোচনা এইভাবে সন্ধ্যে অবধি গড়িয়ে চলল। একইসাথে খাওয়াদাওয়াও চলতে থাকলো। ফরাসী ভদ্রলোক গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পাশের বন্ধুদের দিকে তাকাচ্ছিল। বাতাসে একটা উষ্ণ, আঠালো ভাব। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর একটা মন্তব্যে ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটল।

—ভদ্রমহোদয়রা, আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাজের জন্যে আরও স্ট্যামিনার প্রয়োজন।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন সশস্ত্র প্রহরী ঢুকে ওকে একটা চিঠি দিতেই ও পড়ে হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। বলল, এতে লেখা আছে রাষ্ট্রদূত বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও একটা জরুরী সংকেত দেবে যা তোমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

—রাষ্ট্রদূত? তার মানে তুমি বলতে চাইছো ও একজন দূত পাঠিয়েছে?

ফ্ল্যান্ড্রেস দৃঢ়ভাবে বলে উঠলো, রাষ্ট্রদূত নিজে। তুমি যখন এই মিটিং-এ উপস্থিত আছো তখন আমাব ধারণা তোমার হাতেই ও সংকেতটা দেবে।

হাওয়ার্ড প্রহরীকে রাষ্ট্রদূতকে আনার জন্যে অনুরোধ করলো। খানিক বাদে সাদা গোঁফওলা, লম্বাটে একটা লোক হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো। রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরী ক্রফোর্ড কাগজটা হাওয়ার্ডের হাতে দিয়ে বলল, এটা আমার হাতে এসেছে আমার ব্যক্তিগত কোডে আন্টনীর মাধ্যমে। ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কেউ জানেনা। বিশেষ অনুরোধেই আমি নিজে এখানে এসেছি। অবশ্য তার পেছনে যুক্তিও আছে। পড়, পড়লেই বুঝতে পারবে।

ঘরের চারদিকে, সবার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, তোমাদের সবাইকে দেখে আমি আনন্দ পেলাম। এখন যদি তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ..।

—উঠে দাঁড়ানো অবস্থাতেই হাওয়ার্ড কাগজটা পড়তে লাগলো। তারপর সবার দিকে তাকালো। ওর অভিব্যক্তিতে কিছু বোঝা গেল না। ইংরেজ ভদ্রলোক কোন আবেগ প্রকাশ না করে শান্তভাবে বলল, লন্ডন থেকে টুইড এই সংকেত পাঠিয়েছে। ও নিশ্চিত। সোর্সের অবশ্য কোন প্রমাণ ও দেয়নি। শুধুমাত্র এই পরিস্থিতিতে এটা তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া...।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলল, যদি টুইড নিশ্চিত হয় তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে ওর এরকম করার পেছনে কারণ আছে। সবচাইতে সিরিয়াস হল, এটা প্রকাশ পেলে সংবাদদাতার জীবন বিপন্ন...।

—ঠিক তাই। হাওয়ার্ড সতর্কভাবে বলল। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে সবারদিকে তাকিয়ে খবরটা পড়তে আরম্ভ করল ঃ

"বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, একজন অজানা ঘাতক সামিট এক্সপ্রেসের চারজন ভি. আই. পি-র একজনকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। চারজনের মধ্যে লক্ষ্যটা কার ওপরে তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। টুইড।"

* * *

উনত্রিশে মে, শুক্রবার ঃ

পরেরদিন সকালবেলা। প্যারিসে বৈকালিক কনফারেন্সের জন্যে চারজন নিরাপত্তা প্রধান মিলিত হয়েছে। ঠিক তখনই মার্টেলের লঞ্চ কোনস্টানজ লেকের পূর্বদিকে তীরভূমিতে একটা

দুরুহ অবতরণের জায়গার দিকে এগিয়ে চলেছে।

উইন্ড সার্ফার এগজিকিউসান স্কোয়াডের প্রধান ওয়ার্নার হেগেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসহায়ভাবে লঞ্চের নীচে পড়েছিল।

মুখটা বাঁধা। একটা কাপড় দিয়ে চোখ দুটোও বাঁধা। তা সত্ত্বেও ও ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, মুখে সুর্যের উত্তাপ অনুভব করতে পারছিল।

মার্টেল প্রস্তুতি নিল। ক্লেয়ারও ওকে সাহায্য করছিল। কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সামনেই তীরভূমিতে পাথরের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামনে ভাঙা কাঠের সিঁড়ি।

—শব্দটা বন্ধ করে দাও। ক্লেয়ার বলে উঠল, এ জায়গাটা আমি চিনি। এখানেই আমি মিউনিখ থেকে যখন ওয়ার্নার এসেছিল দেখা করেছিলাম। এ সামনের গাছগুলোর তলায় আগের রাতে একটা গাড়ি ভাড়া করে এসেছিলাম। ওখান থেকেই কাছাকাছি স্টেশনে গিয়ে লিন্ডাউ পৌঁছানো যায়।

—আমি তো গাড়ি...।

—কি বলছো। ক্লেয়ার সামান্য কঠিন হয়ে বলল, জায়গাটা ঢালু, সমস্যাটা বুঝেছো তো মার্টেল?

—বুঝেছি। সমস্যাটা যখন আমার...

—কিন্তু, আমরা কোথায় ড্রাইভ দেবো বুঝতে পারছি না।

—সেই সোনালী চুলের যুবকটাকে সেখানে অভিনন্দন জানাবো...।

—ওয়ার্নার হেগেনকে বয়ে নিয়ে এসে ও গাড়ির মেঝেতে ফেলো দিলো। জানলা দিয়ে বাইরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারপর একটু বিশ্রাম নিতে লাগলো। দূরে একটা ওয়াটার মিলের ধ্বংসাবশেষ।

ক্লেয়ারের বর্ণনা মতো সবই ঠিকঠাক। এখানে মিলের উদ্দেশ্য কি কে জানে। কিন্তু বেশ কিছু ঘুরন্ত হুইল দেখা যাচ্ছে।

মার্টেল কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, ব্লেডগুলো বেশ ধারালো।

—হুঁ, ও নিশ্চিত বলে উঠল, এটা কাজ করবে...।

—কি কাজ করবে?

—পুরোনো চীনা 'ওয়াটার টর্চার'-এর আমার নতুন ব্যাখ্যা। সোনালী যুবক...।

ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জার্মানটাকে বয়ে নিয়ে আসতে দু'জনকেই পরিশ্রম করতে হলো। আর এগোনোর আগে মার্টেল ক্লেয়ারকে মুখোশটা পরে নিতে বলল।

মুখোশটা পড়ে নিয়ে ক্লেয়ার মার্টেলের কাছে গেল সাহায্যের জন্যে। মার্টেল তখন প্লাটফরমের হুইলটার দিকে তাকিয়েছিল। হুইলের যে অংশটা ঘুরে যাচ্ছিল সেখানে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে একটা ব্লেডের সঙ্গে আটকে দিলো। মাথাটা এমনভাবে রাখা হল জলের মধ্যে অর্দ্ধেকটা রইল। দেহটা ওপরদিকে। কাজটা শেষ করতে লাগল দশ মিনিট। ওর বাঁধা চোখ দুটো খুলে দেওয়া হলে সামনে মার্টেলকে দেখে ওব চোখ বিস্ফারিত হল। ক্লেয়ারের আঙুলগুলো ওর মুখের ওপর।

মুখে মুখোশ পরে, মার্টেলের জ্যাকেট পরে, হাতে পিস্তল নিয়ে ক্লেয়ারকে নৃশংস খুনীর মতো লাগছিল।

এরপরে হুইলটা জলের নীচে চলে যেতে হেগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

চাকাটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটাও ঘুরতে লাগলো। ও এবারে জ্ঞান হারাতে পারে।

মার্টেল নদীর তীরের দিকে এলো। হুইলটা একইভাবে ঘুরে চলেছে। আকাশটা ধূসর।

—আমরা এখন কথা বলতে পারি। ও আস্তে আস্তে ডুবছে। মার্টেল বলল।

—'ডুবুক।' কঠিন স্বরে বললো, মুখোশটা মুখ থেকে খুলে ফেলে বলল, চার্লসকে যারা নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল ও তাদেরই একজন.. ।

মার্টেল ওর দিকে তাকাতেই বলল, ওকে ছাড়বে কখন?

—যতক্ষণ না ওর প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে যাচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ও সব কথা বলছে। আমার এখনও আশা অনেক কিছুই...।

এদিকে হেগেনের অবস্থা অচৈতন্যের পর্যায়ে এসে গেছে। ক্রেয়ার মুখোশ পরে নিলে তারপর দু'জনে প্লাটফরমের দিকে চলল।

মার্টেল ওর পায়ের বাঁধন কেটে ওকে তীরে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। ক্রেয়ার বন্দুক তাক করে বসে।

খানিক বাদে মার্টেলের প্রশ্ন, তুমি কে বলতো?

—রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ভাইপো...।

—তোমার নাম?

—ওয়ার্নার হেগেন। তুমি তো জানো...।

—আমার প্রশ্নের শুধু ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যাও।

এরপর মার্টেল আবার জিজ্ঞেস করল, অপারেশন ক্রোকোডাইল ডেলটার দিন কবে ঠিক করা?

—তেসরা জুন। নির্বাচনের আগের দিন। ও থামল। আস্তে আস্তে ও ধাতস্থ হয়ে উঠছিল। ক্রেয়ার ওর দিকে পিস্তল তুলে ধরে রইল।

মার্টেলের দিকে তাকিয়ে হেগেন বলল, তুমি ওকে একটু থামাও। উত্তর তো দিচ্ছি। এই খারাপ ব্যাপারটা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। কোথাও একটা গোলমাল...।

—তুমি বলছ তেসরা জুন। কিন্তু তুমি আরো কিছু...।

মার্টেলের কথার মাঝখানে হেগেন বলে উঠল, জায়গাটা হলো সামিট এক্সপ্রেস যখন ব্যাভেরিয়া অতিক্রম করবে।

—সবই আমরা জানি। মার্টেল বলল, ওয়ার্নার লন্ডনের খবর। মার্টেল সিগারেট টেনে বলল, আমি ব্যাপারটা তোমার কাছে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

হেগেন বিস্মিত হয়ে বললো, তুমি সব জানো?

—হ্যাঁ, আর যা জানো বলো। সামিট এক্সপ্রেসে কি ঘটবে?

—চারজন পশ্চিমী নেতার মধ্যে একজন খুন হবে।

মার্টেল নিস্পৃহ অভিব্যক্তিতে জিজ্ঞেস করল, লক্ষ্যটা কে?

—লক্ষ্যটা কে সত্যিই জানিনা। ঈশ্বরই জানেন...।

হেগেন আতঙ্কে বলে উঠলে মার্টেল জিগেস করল, তুমি এসব জানলে কিভাবে?

—কারণ আমি দিয়েত্রিচের ভাইপো।

মার্টেল জিজ্ঞেস করল, তুমি আগে বলেছো কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে? কি সেই গণ্ডগোল?

—আমি নিশ্চিত নই।

—আমি কিন্তু জবাব চাই। কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল মার্টেল।

—আমার কাকা সম্ভবতঃ সামনের নির্বাচনে ব্যাভেরিয়াতে ফিরে আসছে। কারণ জনগণ আমাদের চায়। ওদের ভয় বলশেভিক উফলারকে।

ওর মুখের ভাব খানিকটা বিব্রত। আবার বললো, কিন্তু যত তাড়াতাড়িই মিলিশিয়াদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক এসব করতে যাবো, বি. এ. ডি খুঁজে তা বের করত, সম্ভবতঃ কেউ খবর দিচ্ছে...।

মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, ঐ নেতাকে কে খুন করবে?

হেগেন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল, তারপর বলল, আমি ঠিক জানিনা। তবে ওদের নিরাপত্তা প্রধানের চারজনের মধ্যে একজন...।

শুনেই মার্টেলের কেমন যেন মনে হচ্ছিল। স্বাভাবিক হয়ে সেই সুযোগে হেগেন ক্রেয়ারের মুখে সজোরে একটা ঘুষি মারতে ও ছিটকে পড়েও পিস্তলটা তাক করে রইল। লোকটাকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এবারে ওর মাথাটা মিলটার দিকে এগিয়ে যেতে সজোরে একটা পাথরে ধাক্কা খেল। আর্তনাদ করে উঠলো। মিলের ধাতব ব্লেড ওর মাথার একপাশে লাগতেই ও নির্জীব হয়ে গেল। মাথাটা জলের ভেতর। রক্তে জল লাল হয়ে উঠল।

ক্রেয়ার হেগেনের কাছে গিয়ে মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করবার পর মার্টেলকে বলল, মারা গেছে। আমরা এখন কি করব?

—ওকে নিয়ে যেতে হবে। এখনই স্টোলার আর ডরনারের সঙ্গে দেখা করা দরকার। টুইডকে ফোন করতে হবে।

লিন্ডাউ পুলিশ স্টেশনে ওরা পৌঁছলো। বর্ষাতি ঢাকা দেওয়া মৃতদেহটা গাড়ির পেছনে।

ডরনার জানালো, এবিখ স্টোলার তোমাকে একটা খবর জানাতে বলেছে। নিরাপত্তা বিষয়ক কনফারেন্সে ও প্যারিসে গেছে। আমি হেগেনের ব্যাপারে সমস্ত কিছু করবো। ওকে মিউনিখ মর্গে নিয়ে যেতে বলেছে। লন্ডনে ফোনের ব্যাপারে...।

ডরনার ওদের গাড়িতে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। জার্মান ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলো। ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা ওরই হাতে।

ডরনারের কথামতো লন্ডনে ফোন করল। টুইডের কণ্ঠস্বর শুনে মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিছু বলার আগেই টুইড প্রাথমিক ব্যাপারগুলো সেরে নিলো।

...অপারেশন ক্রোকোডাইল। কেইথ, তুমি ঠিক এখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো। দক্ষিণ জার্মানীর ম্যাপটা দেখ। কেপকোন্ট্যানজকে ভাল করে লক্ষ্য করো, দেখবে জায়গাটা কুমীরের মতো...তাইনা?

—হ্যাঁ। ঠিক। ব্যাভেরিয়াই কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। রেইনহার্ডের ভাইপো হেগেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অবশ্য ও এখন শেষ।

চারজন ভি. আই. পি-র একজন খুন হবে সামিট এক্সপ্রেসের মধ্যে। সব ঠিকঠাক। শুনতে পাচ্ছো।

—হুঁ। ওদের নাম্বার দাও। ফোন নাম্বার, লক্ষ্য বস্তু..।

—সেই ইনফরমার তা বলতে পারেনি।

—যাই হোক, আমাদের সাবধান হতে হবে। ও ব্যাপারটা আমি পেয়েছি। খুনির পরিচয়?

মার্টেল ওর প্রশ্নে থতমত খেলো। টুইড ওর সম্পর্কে কি ভাবছে? ডরনার সুইচ বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে, সুতরাং শোনার মত কেউ নেই।

—ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। হেগেনের খবর ঠিকই। আমার জাজমেন্টকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, চারজন সিকিউরিটির একজন সম্ভবতঃ খুনী। ভি. আই. পি-দের ওবাই গার্ড দেবে। কিন্তু না...।

—ঠিক আছে।

—আমার বিচারকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

—আচ্ছা।

টুইডেব কাজ সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে। এরপরে ও ক্যাবে চড়ে পার্ক ক্রিসেন্টে যাওয়ার উদ্যোগ করতে লাগল। এদিকে উচ্চাকাঙ্খী মনোভাবেব হাওয়ার্ড সিকিউরিটি মিটিং কে থায় হচ্ছে কাউকে কিছু না বলে প্যারিসে চলে গেছে। হাওয়ার্ড চারজনের মধ্যে একজন। সুতরাং সন্দেহ...।

নাঃ, টুইড সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই কাজ করে। ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্র্যাফোর্ড-এর সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ফরেন অফিসে বন্ধুকেই আগে ফোন করা দরকার।

—খুব জরুরী। টুইড বলল, আমি একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি। দু-ঘণ্টার মধ্যে ওটা রাষ্ট্রদূতের কাছে অবশ্যই পৌঁছবে।

—অ্যামবাসীতে ফোন করে আগে জেনে নাও ও আছে কি নেই। ও সঙ্গে সঙ্গে অ্যামবাসীতে ফোন করলো। রাষ্ট্রদূত অফিসেই ছিল। জানালো কোনরকম সমস্যা নেই। সিগন্যালটা আসা অবধি ওর নিশ্চয়ই ক্র্যাফোর্ডকে সহানুভূতিশীল মনে হলো। টুইড ফরেন অফিসে যোগাযোগ করার জন্যে ক্যাবে গিয়ে ঢুকল।

—আমি স্যার ক্র্যাফোর্ড-এর সঙ্গে কথা বলেছি। আরাম চেয়ারে বসতে বসতে ও বলে উঠলো ঘরের মধ্যে অন্য একজন জিজ্ঞেস করল, কিন্তু খবরটা কি?

—ঠিক হয়েছে ডিউটি থেকে অপদার্থ ক্লার্কটিকে বিছিন্ন করতে হবে। তুমি কিছু মনে করবেনা

নিশ্চয়ই।

—টুইড বিনীতভাবে ঢুকতে গেলো। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। বাইরে থেকে ঢুকলে সে প্রাইভেট ফোর্ড ব্যবহার করে। টুইড একেবারে নিশ্চুপ। চশমাটা ঠিক করতে লাগলো আর এগোতে লাগল।

—আমার সঙ্গে এসো। বলে উঠল।

দশ মিনিট পরে সিগন্যাল প্যারিসে যাত্রা করল। এবারে টুইডের পার্ক ক্রিসেন্টে যাওয়া দরকার। ক্যাবে উঠে বসলো।

দিনটা অত্যন্ত বর্ণময়। রাষ্ট্রদূত নিজেও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এরপর রাষ্ট্রদূত নিজে কনফারেন্স রুমে হাওয়ার্ডকে খবরটা জানাবার উদ্যোগ নিলো। এর পরে হাওয়ার্ড তিনজন সিকিউরিটি চীফকে খবরটা জানাতে বাধ্য হবে।

—আমার ধারণা আমি যদি থাকতাম তাহলে, খবর পড়ার সময় ওদের অভিব্যক্তি দেখতে পেতাম।

চ্যারিং ক্রস রোডে ঢোকার মুখে, টুইড বলে উঠল, একজনের অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই বদলে যেতো।

—চারজনের মধ্যে যে কোন একজন...।

টুইড ম্যাকনেইলকে সবকিছু বুঝিয়ে বলল। ওরা দু'জন রিজেন্ট পার্কে ঢুকছে। জায়গাটা আলোকিত। টুইডের পায়ের নীচে ঘাস। সবকিছু ঠিকঠাক, এখন সমস্যা সময়ের। এটার সমাধান করতেই হবে।

—ও'মিয়েরা, স্টোলার, আর ফ্ল্যান্ড্রেস।

—হাওয়ার্ডের কথাটা ভুলে যেওনা।

—আমি ঠিক খুঁজছি? ম্যাকনেইল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো।

—একটা গ্যাপ। টুইড একটা সবুজ গাছের নীচে থামল।

—জীবনের গ্যাপ রেকর্ড চারজন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে একজন। ও নিশ্চয়ই লোহার পর্দার আড়ালে চলে যাবে। আমি নিশ্চিত, অনেকদিন আগে থেকেই লোকটা...।

—হাওয়ার্ডের ব্যাপারটা একবার পরখ...।

—তোমার একটা কাজ আছে। সেন্ট্রাল রেজিস্টার ফাইলগুলো দেখবার একটা যুক্তি দেখাতে হবে। আমি চিন্তা করছি...।

হঠাৎ টুইডের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললো, ম্যাকনেইল মজার ব্যাপার। একটা ক্লু পাওয়া গেছে। যদি...।

—হাওয়ার্ড-এর থেকে টিম ও'মিয়েরা কোন অংশে কম নয়। এক বছরই কেবল ও প্রেসিডেন্ট সিক্রেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিল।

—সেজন্য আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে, যদি সীট পাই। আমি জানি ওখানে কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। ও ও'মিয়েরাকে পছন্দ করেনা। একটা ছোট ব্যাপার অনেক সময় দরজা খুলে দেয়।

—হাওয়ার্ড জানতে চাইবে, ও সতর্ক করে দিলো। এছাড়াও কনফোর্ড-এর টিকিট-এর খরচের ব্যাপারটা হিসাবে থাকবে।

—না, না হবেনা। আমার নিজের পয়সা দিয়েই টিকিট কিনেছি! আমার কাকার কিছু সম্পত্তি আছে। হাওয়ার্ড ফিরে আসার আগেই আমার কাজ হয়ে যাবে। ওকে বলবে আমার হাঁপানিটা বেড়েছে। সেজন্যে আমি 'ডেভেন কটেজে' গেছি।

—ও চেষ্টা করবে যোগাযোগের...। কিন্তু, অ্যামবাসাডারের পাঠানো সিগন্যাল? টুইড ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। চারিদিকে তাকিয়ে তারপর বলল, আমার কোন সন্দেহ নেই যখন ও ফিরে আসবে, তখন ওর প্রথম কাজের ব্যাপারটা আমার অফিসে পৌঁছে গেছে। কটেজের ব্যাপারটা আসলে ধোঁকা।

কথা শেষ হলে ওর অভিব্যক্তিটা কেমন কঠিন লাগলো। বললো আবার, ও ভাববে হয়ত, কয়েকদিনের জন্যে ওকে আমি পাশ কাটাচ্ছি। কিন্তু ও মোটেই ভাববে না যে, আমি অ্যাটলান্টিক

পেরিয়ে কোথাও গেছি।

ম্যাকনেইল সামনের দিকে তাকালো।

ঘুরে তাকিও না। ম্যাসন আমাদের ঠিক পেছনে। সঙ্গে আবার একটা কুকুর...।

টুইড চশমাটা খুললো। পরিষ্কার করে লোকটাকে একবার দেখল। ওর চশমার কাঁচে ভেসে উঠল পাতলা ডেপুটির প্রতিমূর্তি যাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়েছে। একটা গাছের তলায় ও থামলো।

—আমি তো কুকুরের চেয়ে মানুষ বেশি পছন্দ করি। টুইড চশমাটা পড়ে নিয়ে সামনের দিকে এগোলো। বললো, লিস্টে ওর নামটাও সোজা করো। যদি কেউ গুরুত্বপূর্ণ গরমিল খুঁজে পায়, তাহলে তুমি...।

মাঝপথেই থেমে গেল ও।

রাতের জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছে। হোটেলটা বড়ই। ফ্রান্সের অভিজাত হোটেলই বলা যায়। অতিথিদের জন্যে ও অপেক্ষা করছে। পার্ক ক্রিসেন্টে একটা কল করলো। নাইট ডিউটির অপারেটরটা ছিল।

—টুইডের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, একটু আবেগের সঙ্গে ও বললো।

—এক মিনিট স্যার। আমি একেবারে ওর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।

হাওয়ার্ড ঘড়িটা একবার দেখল। দশটা পঁয়তাল্লিশ। ও নিজেও খানিকটা ডিসটার্বড। টুইড পার্ক ক্রিসেন্টের মধ্যে রয়েছে। বিল্ডিং একেবারেই ফাঁকা। ফোন করবার পরেই ব্যাপারটা ও অনুভব করতে পারলো। তারপরেই ও প্রান্ত থেকে ম্যাকনেইলের কণ্ঠস্বর শুনে ও সতর্ক করে দিলো এটা প্রকাশ্য ফোন।

—আমি আমার হোটেলের ঘর থেকে ফোন করছি। টুইডের সঙ্গে আমার জরুরী দরকার...।

—আমি বলতে ভয় পাচ্ছি যে টুইড ভীষণ অসুস্থ। অবশ্য এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। হাঁপানির আক্রমণ। কয়েকদিনের জন্য ও একটু দেশে গেছে।

—তাহলে ওকে ফোনে পাওয়া সম্ভব নয়?

—এখন হবেনা বলেই মনে হচ্ছে। আবার কখন পাওয়া যাবে তোমাকে?

—বলা মুস্কিল। আচ্ছা শুভরাত্রি। কঠিন মুখে ফোনটা রেখে বিছানায় বসে রইল চুপচাপ খানিকক্ষণ। ওর ভবিষ্যতের গতিবিধি আগে থাকতে জানানো ওর ভীষণ অপছন্দ।

এদিকে পার্ক ক্রিসেন্ট অফিসে ফোনটা রেখেই মিস ম্যাকনেইল নিজের মনেই মৃদু হাসল। একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত যে শেষ প্রশ্নটা করবার আগেই হাওয়ার্ড লাইনটা ছেড়ে দিয়েছিল। ওর সামনে রাখা 'ডোসিয়াব'-টা পরীক্ষার জন্যে আবার ফিরে এলো। ওটার মধ্যে একটা লাল তারা রয়েছে। ক্লারিফিকেশানটা সত্যিই উচুঁদরের। কভারের ওপর নামটা লেখা আছে। ফ্রেডেরিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড।

ওদিকে প্যাবিসে হাওয়ার্ড অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। মাঝে মাঝেই ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারছে। টোকার সংকেত দেখেই বুঝতে পারছে, ও অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস। সিগন্যালের উত্তরে ফ্ল্যান্ড্রেস ওকে যে ৭.৬৫ এম. এম.-এর যে পিস্তলটা ব্যবহার করতে দিয়েছিল সেটা বের করে পকেটে গুঁজে রাখলো। তারপর দরজা খুলতেই কোডে একটা কথা বলে উঠল।

ও ঘরের মধ্যে ঢুকে কথা বলে খানিকটা মৃদু হাসলো। ওর কালো তীক্ষ্ণ চোখ ঘরের সর্বত্রই ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

—কে চেজ? হাওয়ার্ড জানতে চাইল।

—বেনেয়ট। ওরা প্যারিসের সমস্ত জায়গাতেই ভাল খাবার পরিবেশন করে। শেষ পরিবেশন ছিল রাত ন'টায়। কিন্তু আমার ব্যাপারে 'লে প্যাট্রন' ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। ওখানে অবশ্য পুলিশ আছে। তুমি প্রস্তুত। ভাল...।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠল, লন্ডন থেকে আমি টেলেক্স করেছিলাম। কার্লোসকে সকালে পিকাডিলীতে দেখা গেছে যে ব্যাপারে তুমি বিরক্ত হয়েছিলে? তুমি অবাক নয়? কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? সকালে তুমি লন্ডনে ছিলে তো?

এরপর ওরা পরস্পর টেলেক্স এর ব্যাপারে আলোচনা করলো। এখন ও মোটামুটি বুঝেছে যে কিছু একটা ব্যাপার ইংরেজটাকে বিব্রত করছে। কোথাও যেন একটা গোপনীয়তা...।

* * *

শনিবার, তিরিশে মে ঃ

ওয়াশিংটন ডিসি, ক্লিন্ট লুমিস... ওয়ার্নারের মৃতদেহের পোষাক থেকে যে নোটবুক পাওয়া গেছে তাতে আর বেশি এগোনো যায়না।

কনকেডি যখন সঠিক সময়ে ডালাস বিমান বন্দরে নামলো তখন টুইড জনতার মাঝখান দিয়ে নামতে লাগল। চশমাটা খোলা অবস্থায় মুখটা অনেকটাই বদলে গেছে।

টুইড ক্লিন্ট লুমিসকে নিয়ে সোজা একটা নীলচে সেডানে উঠে বসলো। লুমিস সবদিক দিয়েই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

রোদ ঝলমলে দিন। কিছু মামুলি কথাবার্তার পর লুমিস বললো, তুমি ওকে রিপোর্টটা দেবে, সে যাতে বোঝে তুমি কাজটা করে যাচ্ছো। লুমিস খানিক বাদে আবার বলে উঠল, বিমানবন্দরে আমাদের কেউ অনুসরণ করেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। লুমিসের অনেক কিছু ব্যাপার টুইডের ভাল লাগে। সবেগে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে টুইড বলে উঠলো, আমাদের পেছনে একটা সবুজ গাড়ি আসছে। আমরা কি...।

লুমিস দেখে নিল তার পেছনে দুটো গাড়ি। ডালাস থেকেই গাড়ি দুটো ওদের পেছনে আসছে। লুমিস খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লে টুইডই ওকে সাহস দিলো। খানিকটা বাদেই ট্রাকটা হুড়মুড়িয়ে প্রায় ওদের ওপরে এসে পড়লো। লুমিস চীৎকার করে উঠলো। আলো...।

রাবারের একটা আর্তনাদ। টুইড ততক্ষণে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আবার দ্বিতীয় আর্তনাদ। এবার ব্রেক জ্যাম হয়ে গেছে।

—আমরা প্রায় মারা পড়েছিলাম।

টুইড আয়না দিয়ে দেখল গাড়ি এগোচ্ছে। আর কোন বাধা আপাততঃ নেই।

মিটিং এর জায়গাটা অদ্ভুত। পটোম্যাক নদীর ওপরে বয়াতে বাঁধা একটা পাওয়ার ক্রুজার। টুইড প্রথমে সাইনপোস্ট দেখে পরে লুমিসের সহযোগিতায় রাস্তার পূর্বদিক ধরে এগোচ্ছিল। অবশেষে পৌঁছানোর পর ওকে নদীবক্ষে যেতে হবে।

—ওটা তোমার নাকি? ক্রুজারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে টুইড জিজ্ঞেস করল।

—হুঁ, ওটা আমার নিরাপত্তা বলতে পারো...।

টুইড আশ্চর্য হয়ে ভাবল ওয়াশিংটনে ওর সদর দপ্তরেই অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। ক্লিন্ট লুমিস সি. আই. এ-র অবসরপ্রাপ্ত। তবুও যেন কেমন নার্ভাস প্রকৃতির। একটা বিচিত্র নৌকোয় চেপে ক্রুজারের দিকে দু'জনে এগিয়ে চললো। ক্রুজারে একটা কুকুর আছে। কোন অনুপ্রবেশকারীকেই রেয়াৎ করে না। টুইড জিগ্যেস করল, এই কুকুরটা?

—ও নদীতে সাঁতার কাটতে পারে। লুমিসের মুখে বেশ স্বস্তির ভাব। বসার পর ও আবার বলতে শুরু করল, ওয়াডলো বিস্ফোরকের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। যে কারণে ওকে আমরা ডেকে দেখতে যাই। কোন অনুপ্রবেশকারীই ক্রুজারে থাকতে পারেনা। ওয়াডলো মারা যেতে পারে কিংবা কোনো লোকের দেহ পড়ে থাকতে পারে যার গলাটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। ঠিক আছে?

টুইড একটু ভয়ে শিউরে উঠে খানিকটা বিয়ার গলাধঃকরণ করলো আর কম্পিত স্বরে বললো, ঠিক আছে।

কথা প্রসঙ্গে টিম ও'মিয়েরার কথা উঠল। ও বলল, ঐ টিম যখন 'অপারেশন ডিরেক্টর' ছিল তখন আমাকে ও কোম্পানী থেকে বের করে দিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের বস হয়ে বসে।

—কিন্তু মিয়েরা এরকম কেন করেছিল?

কারণ, আমি জানি আফগানিস্তানের অস্ত্রশস্ত্রের বরাদ্দ বাবদ দুশো হাজার ডলার ও আত্মসাৎ করেছিল।

মিউনিকের অ্যাপার্টমেন্টে ম্যানফ্রেড একটা পরবর্তী কালের ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছিল।

কথাবার্তা প্রথমটা সবই কোডে হয়। কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, টুইড জানে যে লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট।

—লক্ষ্যবস্তু কি ও চিনতে পেরেছে?

ম্যানফ্রেড বিব্রত গলায় জিজ্ঞেস করল।

কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, না, একমাত্র একজনই। তুমি নিশ্চয়ই অ্যাকশন নিতে পারো।

—জানাবার জন্যে ধন্যবাদ। আমাকে আবার আগামীকাল এইসময়ে ফোন কারো। ম্যানফ্রেড রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবল, যে ওর সঙ্গে কথা বলেছে তার কণ্ঠস্বরে কোন অস্বস্তি ছিলনা। একটা নোটবুক খুলে লন্ডনের একটা নাম্বারে ও ডায়াল ঘোরাল।

টুইড-এর ওয়াশিংটনে যাবার আগের দিন উপরোক্ত ঘটনা ঘটলো। ঐ দিনই সন্ধ্যেবেলা চারজন নিরাপত্তা প্রধান প্যারিসের 'মুরেট বিল্ডিং'-এ একটা কনফারেন্সে মিলিত হলো।

* * *

টুইড-এর মনে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ও একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলোনা যে, ক্লিস্ট লুমিসের মানসিক রোগ আছে কিনা, তা না হলে ও সর্বত্রই ওর শত্রু দেখছে!

ওর আরো একটা কথা মনে পড়ল, ডালাস বিমানবন্দরে আসার সময় দুটো গাড়িতে চারজন ওদের অনুসরণ করেছিল।

—চার্লস ওয়ার্নার সপ্তাহ দু'য়েক আগে আমার কাছে এসেছিল ও'মিয়েরার ব্যাপারে ও খুবই আগ্রহী। তুমি স্টেশনে এসেছ আমার সঙ্গে কথা বলতে? ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছেনা।

—বিশ্বাস কর, যখন ও'মিয়েরা সি. আই. এ-র অপারেশন ডিরেক্টর ছিল তখন তোমার অবসরের ব্যাপারটা ঐ দেখেছিল। একটু নরম ভঙ্গীতে টুইড বলল।

একটু থেমে আবার বলল, ল্যাংলেতে ডিউটি করার পর ও পশ্চিম বার্লিনে বেশ ক'বছর ছিল? সত্যি?

—ঠিকই বলেছো। কিন্তু টুইড..।

—আমাকে বিশ্বাস করো। ও ওর কণ্ঠস্বরকে যথাসময়ে নরম করে লুমিসকে বোঝানোর বা একটা ব্যাপার মনোনিবেশ করানোর চেষ্টা করছিল।

—তুমি বলছো ওর পশ্চিম বার্লিনের রেকর্ড তুমি পরীক্ষা করে দেখেছো। ও জার্মান বলতে পারে?

—খুব ভাল বলতে পারে।

লুমিসের মাধ্যমে টুইড জানতে পারলো ও'মিয়েরা ছদ্মবেশে পূর্ব বার্লিনে লু-কারসন নামে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। টুইড কথার ফাঁকে লুমিসের দিকে একইভাবে তাকিয়ে ছিল। লুমিস একবার বলে উঠলো, শয়তানটা আমাকে মোটেই পছন্দ করেনা।

টুইড শান্তভাবে বসে রইল, লুমিস উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শান্ত-জলরাশির ওপর দিয়ে ধীর-গতিতে নৌকো এগিয়ে চলেছে।

লুমিস আবার কথা বলা শুরু করল, পশ্চিম বার্লিনের এই বিশেষ ইউনিটের ঐ দুজন পূর্ব জার্মানীর এসপিয়নেজ সেটআপের ওপরে নজর রেখেছিল। কার্লোস-এর রিপোর্টেই ব্যাপারটা জানা যায়।

—তাই নাকি?

—আমাদের কোড চেনার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। সে ভাবেই জানতাম লু-কারসনের মাধ্যমে ও'মিয়েরার সংকেত আসে।

একটু থেমে লুমিস আবার আরম্ভ করলো, ও'মিয়েরার কাছ থেকে সংকেত আসতো বটে কিন্তু কণ্ঠস্বর মোটেই ওর ছিলনা। বেশ কিছু পরে আমি আশা করেছিলাম একটা বিমান নিশ্চয়ই পশ্চিম বার্লিনে নামতে পারে। কিন্তু লুকারসন ধরা পড়ে আমার হাতে। ও নিজের...।

দম নিয়ে লুমিস আবার বলে উঠলো, ও পৌঁছেছিল দু'দিন পরে। এইভাবে ও'মিয়েরার আচরণ এবং কার্যকলাপ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে লুমিস ওকে বলে গেল।

টুইডের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক রহস্যময় জাল...।

পরের দিন ঠিক সময়েই ম্যানফ্রেড দ্বিতীয় বারের 'লং-ডিসট্যান্স' ফোন করলো। ম্যানফ্রেডই কথা বলা আরম্ভ করলো, ভাববার কিছু নেই। টুইড ওয়াশিংটনেই আছে।

—শয়তান। তুমি কেমন করে জানলে?

—আমার লোক সবজায়গাতেই আছে। যাই হোক সমস্যা একটাই। কাজের ব্যাপার।

—তুমি কি টুইডের সঙ্গে যোগাযোগ...।

—না। তাহলে ব্যাপারটা ভেস্তে যাবে। ক্রোকোডাইল ঠিক সময় এগোবে। আমি...।

ম্যানফ্রেড নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল। ভাবল, টুইডকে হত্যা করার কাজটা ভীষণ শক্ত। কোথায় যেন লোকটার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ও ওয়াশিংটনে যোগাযোগের জন্যে ফোনটা আবার তুলে নিল।

* * *

একত্রিশে মে, রবিবার ঃ

টুইড সারা রাত 'ওয়েসিস'-এ কাটালো। লুমিসকে বেশ খানিকটা নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিল।

লুমিস ক্রুজারটাকে বয়াতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, একভাবে অনেকদিন এক জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়। রাতের অন্ধকারে সব সময় সঙ্গে কোন আলো ছাড়া ঘোরাফেরা করবে।

—ব্যাপারটা বেআইনী নয়? নৌকোয় কোন আলো নেই? টুইড জানতে চাইলো।

—জীবন মরণের প্রশ্নে...।

এরপরে ওরা পুরানো কিছু কথাবার্তায় ফিরে গেল। ডালাসে পৌঁছবার পরে টুইডের লক্ষণীয় দুটো ঘটনা ঘটেছে।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। ডেকে সুটকেশ হাতে ও দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে চলেছে ওটা।

লুমিসকে একবার বললো ও, তোমার ফিল্ড গ্লাসটা আমাকে একবার দাও তো।

লুমিস দিতে টুইড ওটা চোখে লাগিয়ে ফোকাসটা ঠিকমত এ্যাডজাস্ট করে তট রেখার দিকে তাকালো। তারপর লুমিসকে ওটা দিয়ে দিল।

লুমিস জিজ্ঞেস করলো, কেউ নজর রাখছে?

—গাছের ওপর দু'জন। একজনের হাতে টেলিলেন্স ক্যামেরা...।

তখন ওরা দু'জনে ডিঙিতে নামলো। সিঁড়ির ওপর কুকুর ওয়ালডো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময়ে একটা হেলিকপ্টার চেসাসিক বে থেকে চ্যানেলের মাঝামাঝি উড়ে আসছে। ওটা যেই অতিক্রম করে গেল, টুইড গলাটা বাড়িয়ে দিল যাতে মেশিনটা দেখা যায়।

লুমিস ডিঙিটাকে তটরেখার দিকে নিয়ে চলেছে। টুইড একভাবে হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়েছিল। সূর্যের আলোর ঝলকানিতে হেলিকপ্টারের কেবিনটা একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না।

ডালাসে টুইড গাড়ি থেকে নেমেই সোজা বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে গেল। লুমিস গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে, টুইডের লুমিসের মুখে শোনা ও'মিয়েরার কার্যকলাপের কথা মনে পড়ছিল।

খানিক বাদে টুইড চোখ বুঝল, কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল জানে না।

পার্ক ক্রিসেন্টে অবশেষে যখন টুইড পৌঁছালো, ম্যাকনেইলের চোখ দেখেই বুঝল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে।

* * *

একত্রিশে মে, রবিবার ঃ

ডালাসে একা ফিরে আসার পথে ক্লিন্ট লুমিস অনেক জায়গায় গাড়িটাকে থামিয়েছিল। সমুদ্র উপকূলের সব কিছু ওর জানা।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। লুমিস ডিঙিতে উঠে মোটরে স্টার্ট দিলো। সামনেই ক্রুজার 'ওয়েসিস' দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হেলিকপ্টারের আওয়াজে ওর টুইডের কথা মনে পড়ল।

ওয়াডলো লুমিসকে দেখে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে উঠলো।

লুইস ডিঙিটা বেঁধে ক্রুজারে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময়ে ওর লক্ষ্য পড়ল ঠিক একই রকমের

আর একটা ক্রুজার ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ও সতর্ক হবার চেষ্টা করল।

ওয়াডলো কেমন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে গরগর শব্দ করতে আরম্ভ করলো।

—কি ব্যাপার ওয়াডলো...?

বলেই ওয়াডলো যেদিকে তাকিয়ে ছিল লুমিসও সেদিকে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর অভিব্যক্তির পরিবর্তন হলো। ক্রুজারটা সম্ভবতঃ ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে কিন্তু লুমিস ওটার ডেকের ওপরে কাউকে দেখতে না পেয়ে দ্রুত কেবিনের দিকে দৌড়লো।

সি. আই. এ-র প্রাক্তন লোক হিসেবে ও একটা ছোট অস্ত্রাগার ভরে রেখেছে। সেটা খুললো, একটা মেশিন পিস্তল দেখতে পেলো। ডাবল ব্যারেলের শর্টগান আর তিনটে হ্যান্ডগানও আছে। ও শর্টগানটা বের করলো।

ক্রুজারটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল। লুমিস ওটা নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবতঃ হুইলের কাছে কেউ যেন বসে আছে। ও ক্রুজারের গায়ে 'ওয়েসিস' নামটা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো।

ওয়াডলো তখনও মুখ দিয়ে গরগর করে যাচ্ছে। চারিদিকে শুধুই জল ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনা।

ও একটু নীচু হল, শর্টগানটা চোখের আড়ালে। যদি ওদিক থেকে কেউ কিছু ছোঁড়ে তাহলে ও সমস্যায় পড়বে। আবার এটাও হতে পারে হয়ত স্বাভাবিকভাবেই ক্রুজারটা পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে।

ও কি সজোরে চীৎকার করে জানতে চাইবে?

ও খানিকটা হিংস্র হয়ে পড়লো। সামনে ওয়াডলো রয়েছে।

লুমিস আগে দেখতে পায়নি, একটা টাস্ক পুরোপুরি তৈরী। ক্রুজারটা ওয়েসিসের একেবারে কাছাকাছি। ডেকের ওপর গ্রেনেড ও মিসাইলগুলো ঠিক জায়গায় ফিট্ করা আছে।

—হে যীশু...।

তারপরেই একজন একেবারে ওয়াডলোর কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাংসগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

লুমিস এই দেখে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, শুয়োরের বাচ্চা।

বলে শটগান সামনের দিকে ধরে ট্রিগার টিপতে যাবে ঠিক সেই সময়ে একটা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। পেছনের পাটা ওর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতিকষ্টে নামতে গিয়ে ঠিক সেই সময়ে আরো একটা গ্রেনেড এসে কেবিনের সামনে পড়ল। কেবিনটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। লুমিসের অবস্থা আরো শোচনীয় বলা যায় দেহটা একেবারে ছিন্নভিন্ন।

এরকম পরপর দশটা বিস্ফোরণ ঘটলো। তারপর একটা হুক দিয়ে ওয়েসিসকে আটকালো। প্রত্যেকের গায়েই ফগম্যান স্যুট। একজনের হাতে সাব মেশিনগান।

এদিকে একটা লোক কয়েকমিনিট জাহাজটা সার্চ করল। ভেতরে কেউ নেই। লুমিস তখন মৃত। ও নিশ্চিত হয়ে আবার ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলো।

ওপরে তখন একটা হেলিকপ্টারের পাইলট রেডিওতে বলে যাচ্ছিল, শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

হেলিকপ্টারের গন্তব্য ওয়াশিংটনের দিকে।

* * *

একত্রিশে মে, রবিবার ঃ

বি. এন. ডি-র হেড কোয়ার্টার যেটা জার্মান ফেডারাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আবিষ্কার করেছে সেটা হচ্ছে 'পুলাখ'। জায়গাটা মিউনিক থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে। এরিখ স্টোলারের 'নার্ভ সেন্টার' এর চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা। ভেতরের দেওয়ালে বৈদ্যুতিক বেড়া লাগানো। স্টোলার রসিকতা করে বার্লিনের দেওয়াল নাম দিয়েছে। এই মুহূর্তে মার্টেলের সঙ্গে বসে ও কফি খাচ্ছিল।

টুইড লন্ডনে ফিরে আসার জন্যে একটা পাঁচের ফ্লাইট ধরলো।

স্টোলারের অফিসের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হলো মার্টেল আছে। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী।

—আমি চার-বছর ওয়াইস বাডেনে ছিলাম। তারপর বি. এন. ডি-তে এসেছি। এক সময় আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম পূর্ব জার্মানীতে। স্টোলার জানালো, তারপর ব্যাভেরিয়াতে বছর কয়েক হল বসবাস করছে। এরই মধ্যে নয়া-নাজী আর বামপন্থীদের মধ্যেকার লড়াই শোচনীয় আকার ধারণ করেছে।

মার্টেল জানালো, স্টেটের নির্বাচন হলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

স্টোলার বলল, যদি ল্যাংগারের মডারেট পার্টি জেতে তাহলে হয়ত মিটবে। সমস্যা আসলে দিয়েত্রিচের পার্টি এবং ডেলটার অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার। এর ফলেই টফলার-এর বামদল জিতে যেতে পারে। ও তো আবার ব্যাভেরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র করার পক্ষপাতী। ফেডারাল রিপাবলিক থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

এরকম আলোচনা হতে থাকল ওদের দু'জনের মধ্যে।

এরপরে সামিট এক্সপ্রেসের কথা উঠল। ওতে পাশ্চাত্যের সব বড় নেতারা থাকছে। স্টোলারের দায়িত্ব হচ্ছে স্যালবার্গ থেকে সলিজবার্গ। স্টোলার মার্টেলকে বলে উঠল, মিউনিখে যাবার সময় ক্লেয়ার হফারকে পাওয়া যাবে কিনা। এরকম আলোচনায় কিছুক্ষণ কাটলো।

একসময়ে পার্ক ক্রিসেন্টের নাম্বারে ডায়াল করলো। খানিক বাদে ওপ্রান্তে ম্যাকনেইলের গলা শোনা গেল। ও ওকে চার প্রধানের ছবি দেবার কথা বললো।

ও প্রান্তে ম্যাকনেইল বলে উঠল, টুইড এখন বাইরে। ও একটা খবর দিতে বলেছে। আগামীকাল প্রথম ফ্লাইটে ওকে নাকি হিথরো বিমানবন্দরে যেতে বলেছে।

মার্টেলের কাছে ও ফ্লাইট নাম্বার চাইল। মিস্ হফারের একটা পাসপোর্ট ছবি দিয়ে ওকে বললো তাড়াতাড়ি ব্যাভেরিয়াতে যেতে।

* * *

প্যারিসের এক উষ্ণ রবিবার। হাওয়ার্ড সামিট এক্সপ্রেসের ব্যাপার নিয়ে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস আর ও'মিয়েরার সাথে আরো কিছু আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিরাপত্তার ব্যাপারটা আরো জোরদার করা দরকার। গেয়াফ্যে ইস্ট থেকে ট্রেন ছাড়বে জুনের দু'তারিখে। আর মাত্র তিন দিন বাকি আছে।

আলোচনার শেষে হাওয়ার্ড লন্ডনের ফ্লাইট ধরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় জানতে পারলো ও'মিয়েরাও লন্ডনে যাবে। খানিকক্ষণ থেকে ও কাউন্টাবেব দিকে এগিয়ে গেল। সামনেই কেতাদুরস্ত এক মহিলা কাগজ পড়ছিল। বাইরে যেতেই ফ্ল্যান্ড্রেস ওকে পথ দেখিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। গাড়িতে ঢুকতেই ও'মিয়েরাকে মনে পড়ল। বুঝল হাওয়ার্ডকে এখানে বাধ্য করে আনা হয়েছে। গাড়ি ছাড়তেই সেই মহিলাও পেছনে একটা ক্যাবে চড়ে বসলো।

সবাই নিশ্চুপ। হাওয়ার্ড দেখলো অ্যালেন হুইলের পেছনেই বসে আছে। চোখের সামনের আয়নায় দেখতে পেল কেউ ওদের অনুসরণ করছে। দ্যাগলে এসে অ্যালেন ওকে বিদায় জানালো। হাওয়ার্ড চারদিকে তাকাতেই দেখল অদূরেই দুজন লোক তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে সুটকেশ হাতে সেই মহিলা দ্রুত চলে গেল।

কোথাও যেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

* * *

মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফ। ব্যাভেরিয়ার সেই রাজধানী যেখানে চার্লস ওয়ার্নার এসেছিল। মার্টেল আর ক্লেয়ার স্টোলারকে বলল শহরের মাঝখানের হোটেলটায় ওদের নামিয়ে দিতে। যে মুহূর্তে ও নামিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্তেই মার্টেল কুলিকে বলল ওরা এই হোটেলে থাকবে না।

খানিকটা এগিয়ে একটা ক্যাবে উঠে হাউপ্টব্যানহফের কাছাকাছি একটা জায়গার ঠিকানা দিল। দু'জনে খানিকটা পৃথক বসেছে। স্টেশনে নেমে ক্লেয়ার মার্টেলের পেছন পেছন চলল। ক্লেয়ারের

হ্যান্ডব্যাগে লুকোনো পিস্তল। দু'জনে স্টেশনে জিনিষপত্র জমা রাখলো। এবার মার্টেলের খোঁজ করার পালা কেন ওয়ার্নার এখানে এসেছিল। ক্লেয়ার ওর পেছনেই চলতে লাগল। চারিদিকে ওদের এখন মাকড়সার জাল।

এডুইন ভিন্‌জ। দু'বার ভুল করে দিয়েত্রিচের কাছে ধমক খেয়েছিল। গ্রসকে যখন মার্টেল হত্যা করলো তুমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...।

ধমকানির জবাবে ভিন্‌জের বলার কিছুই ছিলনা। দু-দুবার মার্টেলকে বাগে পেয়েও কিছু করতে পারেনি। দিয়েত্রিচের হুকুম যেমন করে হোক ওকে মারতে হবে, না হলে খবর যেখানে পৌঁছোবার পৌঁছে যাবে।

হাউপ্টব্যানহফ জায়গাটা চীৎকার, চেঁচামেচিতে একেবারে নরকের মতো। মার্টেল জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো।

চারিদিকে শুধু ভীড়, যাত্রীদের ব্যস্ততা, ঘোষকের চীৎকার সব মিলিয়ে একটা গতিময় জীবন।

ক্লেয়ার মার্টেলের পেছনে। ব্যাগের নীচে লুকোনো পিস্তল। হঠাৎ ওর যাকে নজরে পড়ল সে হল স্বয়ং এডুইন ভিন্‌জ।

ক্লেয়ার নিশ্চিত ভিন্‌জ ওকে চিনতে পারেনি। ব্যাগ থেকে কালো চশমাটা বের করে পড়ে নিলো।

মার্টেল অন্যদিকে অন্যকিছু দেখছিল। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ও অনুভব করছিল যেন চারিদিক থেকে অনেকে ওকে ঘিরে ধরেছে। দূরে একজনের পকেটে দেখল ডেলটা ব্যাজ। জুরিখ থেকে মিউনিখ এক্সপ্রেসটা এসে যেখানে থামবে লোকটা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

মার্টেল সামনের টাইম বোর্ড দেখার ভান করে লোকটাকে দেখতে লাগল। আর একজন পকেটে ডেলটা চিহ্নিত লোক ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। ক্লেয়ার ইতিমধ্যে মার্টেলের কাছে এসে সন্তর্পণে সতর্ক করে দিলো যে, এডুইন ভিন্‌জ এখানেই আছে। মার্টেলের ওপর নজর রেখেছে। বাকি দু'জন কাফেতে ঢুকলো।

মার্টেলও ক্লেয়ারকে সাবধান করে দিল যে জায়গাটা ডেলটার লোকেরা ঘিরে রেখেছে। এরপর ক্লেয়ারের কাছ থেকে মার্টেল চলে যেতে ও ট্রেনটাইম লিখে নিল। মার্টেল গিয়ে ঢুকল ঐ ক্যাফেটেরিয়ায়।

একটা বসার টেবিলে বসে ও কফির অর্ডার দিলো। টেবিলটার সামনে একটা বন্ধ দরজা। কিছুটা দূরে ডেলটার লোকদুটো কথাবার্তায় ব্যস্ত। আগের লোকটা পরের লোকটাকে একটা খাম দিতে ও পকেটে পুরে নিলো।

মার্টেল যেন একটা ফাঁদের মধ্যে ঢুকল।

ঠিক বেরোবার মুখে ওরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা বন্ধ করে। পাঁচজনের চেহারাই ষণ্ডা মার্কা। তাদের একজন মার্টেলের টেবিলে এসে বসে একটা নোটবুক আর পেনসিল টেবিলের ওপর রাখলো। পেনসিলটার একটা বোতাম টিপতেই একটা ছুঁচ বেরিয়ে এলো। মার্টেল এতক্ষণ একটা পাত্রে মাথা নীচু করে কি যেন দেখছিল। সূঁচটা বার হতে মার্টেল পাত্রের তরলটা ওর চোখের ওপরে ছুঁড়ে দিল আর লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ বাতাসে ভেসে গেল।

মার্টেল লাফিয়ে উঠে টেবিলটা সামনের দিকে ঠেলে দিল, তারপরে চেয়ারটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলে। দরজার মুখের লোকগুলো অস্বাভাবিক আতঙ্কে পালাতে পারলে বাঁচে।

—এই দিকে পালাও।

মার্টেল দেখল দরজার সামনে ক্লেয়ার দাঁড়িয়ে পর পর তিনবার গুলি করলো। অবশ্য সবগুলোই মাথার ওপর দিয়ে গেছে।

মার্টেল দৌড়ে গিয়ে সামনের লোকটার মাথায় আঘাত করল। ক্লেয়ার পিস্তল লুকিয়ে ফেলেছে। মার্টেল ক্লেয়ারের হাত ধরে এগোতে লাগল। ওদের পেছনে তখন সবাই ভয়ে আতঙ্কিত। সবাই পালাতে চায়। 'ইউ-ব্যান' সিস্টেম একটা স্বয়ংক্রিয়, জটিল ব্যবস্থা। ওরা এই সিস্টেমে দ্রুত বেরিয়ে এসে ট্রেনে এসে বসল।

মার্টেল আর ক্লেয়ার পাশাপাশি বসল। মার্টেল নিশ্চিত যে কেউ ওদের অনুসরণ করছে না। মার্টেল ওকে জানালো ওরা সোজা 'ফ্লাউসেনে' যাবে। এখন রাস্তার ধারে ছোটখাটো হোটেলে ওঠা যাক। ব্যাগ-ট্যাগ পরে আনা যাবে।

*　　　　*　　　　*

ওয়াশিংটন থেকে রবিবারের ফ্লাইট হিথরোতে এসে পৌঁছবে রাত ন'টায়। পার্ক ক্রিসেন্টে টুইডের ক্যাব ছিল। ম্যাকনেইল অফিসেই অপেক্ষারত।

—খবরটা সবে টেলেক্সে এসেছে।

ম্যাকনেইল টুইডের রিসিভ করার খবর জানে কিনা জানে না। ও খবরটা জিজ্ঞেস করতেই ম্যাকনেইল জানালো, তোমার বন্ধু ক্লিন্ট লুমিস খুন হয়েছে।

টেলেক্সটা হাতে নিয়ে টুইড পরপর তিনবার সংকেতটা পড়ল। ম্যাকনেইলের হাতে নোটবুক।

টেলেক্সের সংকেতটা হল—

'প্রাক্তন সি. আই. এ এজেন্ট ক্লিন্ট লুমিস আজ আততায়ীর দ্বারা নিহত হয়েছে ক্রুজার ওয়েসিসেই আর একটা ক্রুজার—গ্রেনেডের আঘাতে নিহত লুমিসের কুকুরও নিহত—এস. বি. আই. সি. আই. এ-র সহযোগিতায় তদন্ত চালাচ্ছে।

টুইডের হেলিকপ্টারের কথা মনে পড়ল। চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ম্যাকনেইল জিজ্ঞেস করল, মার্টেলের কোন খবর আছে কিনা?

টুইড জানালো যে, ব্যাভেরিয়া থেকে ও ফোন করেছিল। কাল সকালে এসে পৌঁছবার কথা। জিহরোতে সাজানো হোটেল বুক করা হয়ে গেছে। ম্যাকনেইলকে ওর সমস্ত ব্যবস্থা করতে বললো। টুইড সামনের খোলা জানলায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। চিন্তাশূন্য মন। সামিট এক্সপ্রেস আর মাত্র দু'দিন বাকি।

মাঝরাতে মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে ম্যানফ্রেড যখন ঘুমোচ্ছিল, তখনই ওয়াশিংটন থেকে খবর এসে পৌঁছালো।

আলো জ্বালিয়ে গ্লাভস হাতে তুলতেই এক মার্কিনী কণ্ঠস্বর সংক্ষেপে খবরটা জানালো। 'লুমিস' ও সংবাদদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্রোকোডাইলকে থামানো সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আরো বড় খুন।

*　　　　*　　　　*

পয়লা জুন ; সোমবার ঃ

টুইড বলে উঠলো, আমরা আজ আর মঙ্গলবারে খানিকটা বিশ্রাম পাবো। আগামীকাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস থেকে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে।

মার্টেল চিন্তিত মুখে জবাব দিলো, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের 'আইডেন্টিফাই'-এর কাজটা সেরে ফেলতে হবে। সিকিউরিটির প্রধানের ফোনটা গুপ্তচর...।

লন্ডন বিমানবন্দরের হোটেলে ম্যাকনেইল তিনটে শোবার ঘর ভাড়া নিলো। প্রত্যেকটা পৃথক নামে। টুইড সমস্ত ঘরগুলো ভালো করে দেখে নিল। মার্টেল সবে মাত্র মিউনিখ থেকে ফিরেছে। ওরা মাঝের ঘরটাতেই আপাততঃ থাকবার ব্যবস্থা করেছে। লুমিসের হত্যা প্রসঙ্গে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত যখন সিকিউরিটি কনফারেন্সে লুমিস হত্যার ব্যাপারটা শোনাচ্ছিল তখন নাকি চারজন নিরাপত্তা প্রধানের একজন চমকে উঠেছিল।

এদিকে অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস-এর সমস্ত অতীত একটা ফাইলে রাখা। মিয়েরারও তাই। এদিকে এরিখ স্টোলারও দু'বছর অজ্ঞাতবাসে ছিল। এই সব চমকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এছাড়া হাওয়ার্ড আছে। মার্টেলের বক্তব্য আসল লোক দীর্ঘকাল ধরে এইরকম কাজে নিযুক্ত রয়েছে। মার্টেলের মতে হাওয়ার্ডের বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খানিকবাদে টুইড ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইলের ফটোকপি মার্টেলের হাতে দিল। ফ্রেডারিক

অ্যান্টনী হাওয়ার্ডের নাম ওপরেই লেখা। টুইড জানালো এটা পাওয়ার জন্যে ম্যাকনেইলকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। ওই সব সংগ্রহ করেছে। ফাইলের বারো পাতায় এসে ও থামলো। লেখা আছে বেশ কয়েক বছর আগে হাওয়ার্ড প্যারিস দূতাবাসে 'ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে দু-সপ্তাহ অসুখের জন্যে ছুটি নিয়ে ও ভিয়েনাতে ছিল।

মেডিক্যাল রিপোর্টও আছে। সমস্তটা ভালভাবে শেষ করে মার্টেল ওটা টুইডকে দিলো। এরপরে টুইড ওকে একটা খাম দিলো। ওর মধ্যে চারটে উজ্জ্বল ছবির প্রিন্ট ছিল। ফ্ল্যান্ড্রেস, ও'মিয়েরা, হাওয়ার্ড আর স্টোলার। মার্টেল খামটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর জানালো, সময় আর বেশি নেই এখন চারজন নিরাপত্তা প্রধানের ওপরেই চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ব্যাপারটা কড়া ভাবে ধরতে হবে। চারজনকেই এক কথা বলতে হবে। মার্টেল নিজে স্টোলারকে বলবে আর টুইড হাওয়ার্ড, অ্যালেন আর ও'মিয়েরার ভার নেবে। কথাটা হলো একটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, একজন পাশ্চাত্য নেতাকে এক্সপ্রেসেই খুন করা হবে। খুনী চারজন নিরাপত্তা প্রধানেরই একজন।

পকেট থেকে প্ল্যাস্টিকে মোড়া একটা কার্ড বের করে টুইড ওর হাতে দিলো। মার্টেল দেখল ও যখন ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারী করছিল, তখনকার ছবি। টুইড ওকে জানালো কাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস 'গেয়ার-দ্য-ইস্ট' ছাড়ার আগে ওদের দেখা হতে পারে কিনা। কার্ডটা দেখালে কেউই ওকে আটকাতে পারবেনা।

মার্টেল জিজ্ঞেস করলো, ও এই কার্ড কোথায় পেলো? টুইড জানালো, কার্ডটা পাওয়া গেছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। ওকে বলেওছে যে চারজন নিরাপত্তা প্রধানের মধ্যে একজন খুনী। ব্যাপারটা শুনে প্রধানমন্ত্রী মশাই বেশ চিন্তিত। কথা হতে হতে ক্লেয়ারের একটা পাশপোর্ট ছবিও মার্টেলের হাতে দিলো। ক্লেয়ার না থাকলে মার্টেল হয়তো শেষ হয়ে যেতো। চোখ বুঁজেই ওকে বিশ্বাস করা যায়। মার্টেলের কার্ডের মতো ক্লেয়ারেরও একটা কার্ড তৈরী হলো। বলা বাহুল্য, যে পেনে সইটা হলো সেটাও প্রধানমন্ত্রীরই পেন। টুইড হাসলো, তারপর আবার জানালো যে, একটা ব্যাপার আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো আমরা যাবার আগেই ম্যানফ্রেড...।

—তাহলে কিভাবে এগোনো উচিত? টুইড বলল, ও আমাদের কাছে আসল খুনীকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে পারে। ও জানে যে ব্যাপারটা আমরা জানি। ও চেষ্টা করবে ভুল লোককে যাতে আমরা সন্দেহ করি। সুতরাং—হ্যাঁ। আমরা চারজন নিরাপত্তা প্রধানের প্রত্যেককেই বলব যে তোমাদের মধ্যেই একজন দোষী ব্যক্তি রয়েছে।

* * *

ম্যানফ্রেড-এর জানানো মিটিং-এর জায়গায় যাবার জন্যে রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ ও অ্যাপার্টমেন্টের তলা থেকে মার্সিডিস গাড়িটা বের করল। এখনও অনেকটা সময় আছে।

মিটিং-এর জায়গাটা বেশ অদ্ভুত। সব দিকে ফাঁকা একটা গুপ্ত গ্যারেজ। ম্যানফ্রেড যে গাড়িটা'র মধ্যে বসেছিল সেটা মিথ্যে নাম আর ঠিকানায় কেনা। কাগজপত্র সবই জাল। দিয়েত্রিচ এল। ওর গাড়ির জোরালো আলোয় ম্যানফ্রেডের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আলোটা নিভতে ও দেখল কালো পোষাকে, গগলস্ পরা একজন আলোটা নিভিয়ে জানলা দিয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। ম্যানফ্রেডের কাছে এগিয়ে এল। সহাস্যে অভিনন্দন জানিয়ে ও বলল, তুমি যদি নির্বাচনে হেরে যাও, তাহলে তোমার পরিকল্পনা মতো এগোও। তোমার লোকেরা সবাই ইউনিফরম পড়ে প্রস্তুত। মিউনিখে মার্চ করো, হিটলারের উনিশশো তেইশের মার্চ যেরকম রিপাবলিক তৈরী হয়েছিল, ঠিক সেরকম তুমিও মিউনিখে কর।

—কিন্তু হিটলার তো সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডবার্গ-এর জেলে ওকে...। দিয়েত্রিচ বলে উঠল।

—নতুন অস্ত্রের জায়গাটা কোথায়? ম্যানফ্রেড বলে উঠলো, আমরা একেবারে শেষ সময়ে...। তুমি এখন জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে সশস্ত্র প্রহরী লাগাও...।

বলে ম্যানফ্রেড দ্রুত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে অর্থাৎ দু'মিনিট পর দিয়েত্রিচও যাবার জন্যে তৈরী হলো।

*　　　　*　　　　*

মিউনিখ বিমান বন্দরে ফিরে এসে মার্টেল শহরের একপ্রান্তে একটা ক্যাব নিলো। খানিকটা গিয়ে ক্যাবটা ছেড়ে দিয়ে চারশো গজের মতো হেঁটে ক্লসেন হোটেলে পৌঁছালো। ক্লেয়ার-এর কোন বিপদ হয়নি। মার্টেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

ক্লেয়ার বলল, তুমি ছিলেনা যখন আমি হাউপ্টব্যানহফেই বেশি সময় কাটিয়েছি। মার্টেল অবশ্য কাজটাকে সমর্থন করলো না। কারণ চিহ্নিত হয়ে যাবার বিপদ ছিল। অবশ্য ক্লেয়ার জানালো যে, ও বেশ সতর্কই ছিল। মার্টেল দুঃখ প্রকাশ করে বললো, আগামীকাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস ছাড়বে। এখনও পর্যন্ত আসল লোককে ধরা যায়নি।

ওদের মধ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের নানা বিষয়ে আলোচনা হতে লাগলো। সমস্ত বিষয়টার ওপরে একটা ধোঁয়াশার জাল তৈরী হয়েছে। মার্টেলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ক্লেয়ারেব চোখ এড়ালো না।

ক্লেয়ার বলল, জুরিখ হচ্ছে 'ডেলটা'র চলমান হেডকোয়ার্টার। সেজন্যই স্টোলার ওদের আসল ঘাঁটি খুঁজে পায়নি। দিয়েত্রিচের জায়গাটা একেবারে দুর্গম। হেড-কোয়ার্টারের উপযুক্ত জায়গাও বটে। সবরকম সুযোগ-সুবিধে আছে। সবসময়ে ভিড়, সুতরাং দু'জন বা আরও বেশি লোকের মিটিং-এ কোনও অসুবিধেই নেই। দূতেরা ট্রেনে করে এসে খবর দেয় আবার অন্য ট্রেনে চলে যায়। ওরা কেউই আসলে মিউনিখে যায়না। দু'একটা মিটিং যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে। অনেক নিরাপদ জায়গা এখানে। কাফে, সিনেমা এরকম অনেক। মার্টেল এবার ওয়ার্নার-এর গতিবিধির ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ও ক্লেয়ারকে বলল, তুমি কি বলতে চাইছো, দিয়েত্রিচ এখানে একটা বিশেষ ফোর্স পাঠাচ্ছে। সম্ভবতঃ এখানে হোটেলে জায়গা নেবে। এছাড়া ওদের লক্ষ্য থাকবে টিভি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের জায়গাগুলো।

—হ্যাঁ। এটাই আমার অনুমান।

মার্টেল অধৈর্য ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। এক সময় বলে উঠলো, আমাদের এখন স্টোলারেব সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য খুনী।

ক্লেয়ার ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরের মধ্যে সাময়িক নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো।

*　　　　*　　　　*

টুইড শান্তভাবে বললো, অ্যালেন, ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যে সামিট এক্সপ্রেস আগামীকাল রাতে ছেড়েছে, তাতে আমরা জানি, চারজন যাত্রীব মধ্যে একজন খুনের লক্ষ্য।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলে উঠল, আমাদেরও তাই অনুমান। সেন্ট হর্ন, একটা ছোটখাট রেস্তোরাঁয় ওরা খেতে খেতে আলোচনা করছিল। জায়গাটা নিরিবিলি।

টুইড বললো, ফ্লান্ড্রেস আমাদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের, এই বন্ধুত্বের বিশ্বাসে আমি তোমাকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

ফ্লান্ড্রেস খেতে খেতে পুবোনো দিনের গল্প আরম্ভ করলো। সেই উনিশশো তিপান্ন সালে ও সেনাবাহিনী ছেড়ে অন্য কাজে যোগ দেয়। এই ধরনের অনেক কথা। কথায় কথায় জানিয়ে দিল হাওয়ার্ডকে ওর পছন্দ নয়, কারণ ও নাকি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। ফ্লানড্রেস ওর জীবনের অদ্ভুত সব দুর্ঘটনার কথা জানালো। ও প্রথমে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সীতে চাকরী পায়। তার দু-সপ্তাহ পরে ও কমিশনড র‍্যাংকে চলে যায়, ওর ওপরওয়ালার দুর্ঘটনার ফলে। তারপর ও জেনারেল ডুমার স্টাফে ইনটেলিজেন্স অফিসার হয় এবং ব্যাভেরিয়াতে আসে। তারপর ওখান থেকে প্যারিসে ফিরে আসে। একমাত্র সম্বল ছিল জেনারেল ডুমার রেকমেন্ডেশন। ডিন. এন. টি-কে দেখাতে ওরা আবার ওকে নিয়ে নেয়।

এরকম কথা বলার পরে ফ্ল্যান্ড্রেস একসময় থামলো।

টুইড রেস্তোরাঁর চারদিকটা একবার তাকিয়ে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললো, একজন মৃত লোকের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে। লোকটা কে জানতে চেওনা। তবে আমার বিশ্বাস ও সত্যি কথাই বলেছে এবং সত্যি যে বলেছে সেটা আমি প্রমাণ করতেও পারবো না। ওর বক্তব্য, পাশ্চাত্যের যে চারজন নেতাকে চারজন নিরাপত্তা প্রধান নিয়ে আসছে সামিট এক্সপ্রেসে, তাদেরই মধ্যে একজন পাশ্চাত্যের একজন নেতাকে খুন করবে...।

ফ্ল্যান্ড্রেস শোনামাত্র বলে উঠল, সত্যিই এ তো ভীষণ ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কোন সূত্র পাওয়া গেছে সে কে...?

—না। টুইড জানালো।

—তাহলে তো তোমরা আমাকেও সন্দেহ করতে পারো? তোমার কাকে সন্দেহ হয়? এ ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করেছো কি?

ফ্ল্যান্ড্রেস লোকটা বড় বিচিত্র ধরনের। পাশ্চাত্যের নিরাপত্তা প্রধানদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন।

টুইড বললো, গত কয়েকদিন কথাটা আমি কাউকে বলিনি, এমনকি হাওয়ার্ডকেও নয়, তোমাকেই প্রথম। কারণ আমি তো সরকারীভাবে সামিট কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত নই...।

ফ্ল্যান্ড্রেস শুনে বললো, যে ব্যাপারটা ভেবে আমার ভয়ে ঘুম আসছেনা, সেটা হলো ট্রেন গেয়ার দ্য ইস্ট থেকে রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ-এ ছাড়বে। জার্মানীর সীমান্ত যখন অতিক্রম করবে, তখন সমস্ত জায়গা অন্ধকার।

ফ্ল্যান্ড্রেস ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, ট্রেনটা সাধারণ ট্রেন হলেও ভি. আই. পি যাত্রীদের জন্যে কিছু কোচ সংরক্ষিত, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব কড়া, এছাড়া ওদের নিজস্ব রেস্তোরাঁ।

টুইড বললো, ট্রেনটা মিউনিখে যাবার আগে ছ'জায়গায় থামবে। ওখানে মানে মিউনিখে চ্যান্সেলার ল্যাংগার থাকবেন। ফ্ল্যান্ড্রেস একটা হতাশার ভঙ্গিমা করল। ওর চোখে কিসের যেন প্রশ্ন উঁকি মারছে। টুইড ওকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছিল। তাহলে সন্দেহের তালিকায় কে? কে?...।

*　　　*　　　*

স্টোলারের হেডকোয়ার্টার। সোমবার, সন্ধ্যেবেলা। অপারেটরের কাছে একটা সাংকেতিক নামে ফোন এসেছে। বি. এন. ডি-র প্রধান দু'চোখে আশার-আলো নিয়ে নিজের অফিসে বসেছিল। এরিখ স্টোলার রিসিভার হাতে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এলো, অস্ত্রের বৃহত্তম গুদামে ডেলটার লোকেরা পাহারা দিচ্ছে...।

একটু থেমে বললো, যতক্ষণ না গুদাম সম্পূর্ণ তৈরী হয়... তোমারা আগামীকাল করবো 'রেইড', অর্থাৎ নির্বাচনের আগের দিন। গুদামটা...।

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচ ওকে গোপন গ্যারেজে যে খববটা দিয়েছিল, ম্যানফ্রেড সেটা স্টোলারকে জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

*　　　*　　　*

দোসরা জুন, মঙ্গলবার ঃ

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাভেরিয়া! টফলার... আগের রাত থেকেই ব্যানার আর পোস্টারে সর্বত্র ছেয়ে গেছে। ছোট ছোট বিমানগুলো থেকে আকাশপথে ঐ একই লেখার লিফলেট ফেলা হচ্ছিল। ব্যাভেরিয়ার নির্বাচনের দু'দিন আগে, ডেলটার প্রতীক পকেটে লাগানো, টুপী আর বাদামী শার্ট পরা ডেলটার লোকেরা সারা শহরের সব জায়গায় মার্চ করে বেড়াচ্ছিল। সব জায়গায় চরম—বিশৃঙ্খলা।

এদিকে টফলারের লোকেরাও সাদা পোষাকে সজ্জিত হয়ে ব্যানার সহযোগে পথ পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছে। ওরা ডেলটার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। সামনের সারিতে মেয়েরা ফুল হাতে

সারবেঁধে চলেছে আর এই মেয়েদের জন্যে পুলিশও কোনও অ্যাকশন নিতে পারছে না। মিউনিখ শহর মোটর সাইকেলে ছেয়ে গেছে। পুলিশ-হেডকোয়ার্টারে অফিসের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এরিখ স্টোলার। ওর অভিব্যক্তি ভয়ানক আকার নিয়েছে।

ও বললো, ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর একটা কাজ। আগামীকাল ডেলটার অস্ত্রগুদাম সীজ করা।

ঠিক সেই সময় ক্লেয়ার ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, তোমারই ইনফরমার আবার...।

—ফ্রাঞ্জ আবার ফোন করেছিল।

—তাই নাকি?

স্টোলার এক ধরনের ভঙ্গীমা করে বললো, ফ্রাঞ্জ আমার ইনফরমারের কোড নাম। আমি ওকে ঠিকমত জানিনা, কিন্তু ওর কাছ থেকে সমস্ত খবর পাওয়া যায়।

মার্টেল বললো, একদিকে সামিট এক্সপ্রেস, অন্যদিকে অস্ত্রের গুদাম। সময়টা দারুণ বেছেছে। ওয়ার্নার হেগেন মরার আগে একটা বিপজ্জনক কথা বলে তবেই মরেছে।

স্টোলার কৌতূহল প্রকাশ করায় ও বললো, আমি আর ক্লেয়ার দু'জনেই বিশ্বাস করি কথাটা, তা হলো ট্রেনে চারজন নেতার একজনকে যে খুন করবে সে চারজন নিরাপত্তা প্রধানদের মধ্যেই একজন...।

বড় ঘরটার মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছিল, উত্তেজনা বাড়ছিল। ক্লেয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে। স্টোলার কফিতে চুমুক দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্টোলার আর মার্টেল পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। স্টোলারের মুখ ক্রমশ বিবর্ণ হতে শুরু করেছে।

মার্টেল সেটা লক্ষ্য করে বললো, আমার কাজ হচ্ছে চারজনের মধ্যে একজনকে ঠিকমত চিহ্নিত করা। চারজন হচ্ছে ও'মিয়েরা, ফ্ল্যান্ড্রেস, হাওয়ার্ড ও তুমি। আজ রাতে ট্রেন প্যারিস ছাড়ছে।

একটু থেমে মার্টেল আবার বললো, হেগেনের কথা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য।

স্টোলারের তখন এমন অবস্থা যে সামনে যে কাউকেই অসহ্য মনে হচ্ছিল তার। সে একটু একা থাকতে চাইছিল। মার্টেল সেটা বুঝল।

*

ক্লেয়ার বলল, তুমি স্টোলারকে ঐরকম কথা কেন বললে? ও তো আমাদের সাহায্য করছে।

ব্লুসন হোটেলের ঘরে মার্টেল বিছানায় আর ক্লেয়ার অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। এক সময় ও মার্টেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, টুইড আর আমি ওর সঙ্গে লন্ডন বিমানবন্দরে যোগাযোগ করেছিলাম। এখন তো ভালো..। আর এখন...।

—এখন ওরা পরস্পরকে নজরে রাখবে।

ক্লেয়ারে বলল, তুমি নিজেকে স্টোলারের শত্রু বানিয়ে ফেললে।

মার্টেল বলল, ও দোষী হলে তবেই...।

*

প্যারিস থেকে টুইড আসছে। ওরা দু'জন অফিসে বসে ওর অপেক্ষাতেই। ম্যাকনেইল দু'চোখ বুঁজে ভাবছে, একটা বড় সমস্যা সামনে ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

'টিম ও'মিয়েরা" —হাওয়ার্ড পরিচয় করিয়ে দিল। টুইডের সঙ্গে করমর্দন না করে ও শুধু তাকিয়ে রইল।

—যখন ক্লিন্ট লুমিসের ক্রুজারে ছিলে তখনই কেউ ছবিটা তুলেছে।

টুইড ওর হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিয়ে দেখলো। সূর্যের দিকে টুইড তাকিয়ে আছে, ছবিটা এইরকম। ল্যাংগলের সি. আই. এ ল্যাবরেটরীতে অত্যন্ত চতুরভাবে ছবিটা করা হয়েছে।

—ভালো হয়েছে? হাওয়ার্ড বলে উঠল।

—এটা তুমি কি করে পেলে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

টুইড ও'মিয়েরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো। টুইডের প্রশ্নটা শুনে হাওয়ার্ডের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে গেল।

—হে ঈশ্বর, তুমি কি . ।

—না। টুইড বেশ কঠিন স্বরেই জবাব দিলো।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে তুমিই আক্ষেপ...।

—ফটো তোলার ব্যাপারটা আমি জানি, বলে ও'মিয়েরার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে, কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি এ ছবি কোথা থেকে পেলে?

—ল্যাংগলেতে একজন দূতের কাছ থেকে পাওয়া ..।

ও'মিয়েবা টুইডের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো।

টেলিফটো লেন্সে ছবিটা তুলে তারপর ওটাকে বাড়ানো হয়েছে। টুইড ধীরে ধীরে বলে উঠলো, সমস্ত কিছুই ম্যানফ্রেডের চালাকি। লুমিস আর আমাকে ও ডালাস থেকে অনুসরণ করেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।

খানিক পরে টুইড, হাওয়ার্ড আর কিছু জিজ্ঞেস কবার আগেই ড্রয়ার খুলে তিনটে জিনিস বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। একটা ৩৮ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশাল, কালো রঙের একটা ব্যারেট, আর একজোড়া বড় আকারের সানগ্লাস এব সঙ্গে একটা কালচে নীল উইন্ড চিটার।

—প্রশ্নটা খুবই ইন্টারেস্টিং, টুইড বলে উঠলো, গত শুক্রবার সকালে লন্ডনে কে ছিল, যখন ম্যানফ্রেড কার্লোস পিকাডিলিতে ছিল?

—আমরা সিকিউরিটি মিটিং-এ প্যারিসে ছিলাম। তারপর আমি মধ্যাহ্নের প্লেন ধরি। ও'মিয়েবা বলে উঠলো।

—আমি সকাল দশটার ফ্লাইটে...।

অন্য আমেরিকানদের মতো ও দ্রুত বলে থেমে গেল। টুইড প্রথমে ওদের দু'জনের দিকে তাকালো, তারপর বললো, এতেই তোমাদের নির্দোষ বলা যায় না। সকাল ন'টা নাগাদ পিকাডিলিতে একজন পুলিশ এক বন্দুকধারীকে দেখে। তারপরে সেখানে টেগারে জিনিস পাওয়া যায়। অস্টিন রীডা। এখন আমার প্রশ্ন এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে? যে এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে সাক্ষাৎ কবতে এসে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল?

হঠাৎ দরজাটা খুলতেই টুইড থেমে গেল। ঘরে ঢুকলো হাওয়ার্ডের ডেপুটি ম্যাসন।

টুইড বললো, ঘরে ঢোকার আগে তোমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি।

—কিন্তু আমি তো আমন্ত্রিত ..।

—তবু বলছি তুমি এখন যাও। টুইড ওর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো স্পষ্টভাবে বললো। ম্যাসন হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো, হাওয়ার্ড জানলার দিকে তাকিয়ে, ঘর নিস্তব্ধ। ম্যাসন দেখল, টুইড একই ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে। ম্যাসন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা। টুইড এবারে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, যাক, পিকাডীলির ঘটনায় আসা যাক। আমাব অনুরোধে স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চ ঐ আইটেমগুলো বিশ্লেষণ করার জন্যে ফরেনসিকে দিয়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারের কোন লেবেল নেই। বিশ্লেষণের রিপোর্ট, ব্যারেটটা গায়নার। উইন্ডচিটার আর গগলসটা হচ্ছে ভেনেজুয়েলাব। বন্দুকের ব্যাপারটা জানা যায়নি। এতে কি কিছু বোঝা যাচ্ছে?

—দক্ষিণ আমেরিকা। ও'মিয়েরা বলে উঠলো, আবার কার্লোস?

টুইড বলল, আমরা অনেক স্পষ্ট সংকেত পাচ্ছি , কিন্তু আমি এখন সংকেত খুঁজছি যেটা স্পষ্ট নয়।

হাওয়ার্ড ভুরু কুঁচকে বললো, কি বলতে চাইছো তুমি। তাছাড়া সামিট এক্সপ্রেসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?

—আসলে প্রশ্নটা সময় নির্বাচনের। টুইড ও'মিয়েরার দিকে তাকালো। বলল তোমার একটু ইতিহাস জানা দরকার। সেই উনিশশো উনিশে যখন জার্মানীর পতন হচ্ছে তখন সোভিয়েট রিপাবলিক ব্যাভেরিয়াতে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। এটাই হচ্ছে অপারেশন ক্রোকোডাইলের আগের ঘটনা। সৌভাগ্যবশতঃ তথাকথিত জনতার গভর্নমেন্ট অবশিষ্ট জার্মান সৈন্য আর ফ্রেইর্পদের দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিল। এবারে ম্যাপটা দেখ...।

টুইড একটা ম্যাপ খুললো। লেক কোন্সট্যাঞ্জ-এর আকারটা একেবারে কুমীরের মতো। এটাই ওদের চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল, ব্যাভেরিয়াই ওদের লক্ষ্য। ওদের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ গভর্নমেন্ট করা। টফলারের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগ আছে। কোন্সট্যানঞ্জ উপকূলেও ব্যাভেরিয়ার একটা ছোট্ট অংশ আছে। আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে তাতে ওখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা গোপন মোটর টরপেডো বোটের ফ্যাক্টরী...।

—কিন্তু চেকদের কোন সীমারেখা নেই।

—বুঝলাম। টফলার যখন ক্ষমতা পাবে তখন টর্পেডো বোট স্থলপথে এসে লেকে কোন্সট্যানঞ্জে পৌঁছবে। কয়েকটা মাত্র রাইন ডেলটাকে জব্দ করার জন্যে যথেষ্ট। এমনকি পরে অস্ট্রিয়া থেকে ভোরালবার্গ রাজ্যকেও হাতে পাবে।

—ব্যাপারটা তো খুবই উদ্বেগের...। ও'মিয়েরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টুইড বলল, ফেডারেল রিপাবলিকের থেকে ব্যাভেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস এতে পশ্চিম জার্মানীর এক তৃতীয়াংশ সোভিয়েটের প্রভাবাধীনে চলে যাবে। সমস্ত পরিকল্পনা ম্যানফ্রেডের। সুতরাং ক্রোকোডাইল ..।

ও'মিয়েরা বলে উঠলো, তুমি কি নাটক করছো।

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার্ড বলল, না ও ঠিকই বলেছে।

টুইডের ভুরু কুঁচকে গেল হাওয়ার্ডের কথায়।

হাওয়ার্ড আবার বলে উঠলো, রাজনৈতিক কারণে ফেডেরাল রিপাবলিক থেকে যদি ব্যাভেরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সোভিয়েটের দখলে পশ্চিম ইউরোপে ক্রেমলিনে ঢোকার চাবিকাঠি হয়ে উঠবে।

কিছুটা চুপ করে হাওয়ার্ড টুইডের কাছে জানতে চাইল, এবাবে বলো তোমার খবরের উৎসটা কি?

টুইড বলল, ওয়ার্নার হেগেন। রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের ভাইপো। ওরই কাছ থেকে খবব পাওয়া গেছে যে সিকিউরিটি চীফের চারজনের একজন খুনী...।

হাওয়ার্ডের মুখে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। ডেস্কের চারদিকে পায়চারী করতে করতে বলল, এর জন্যে তোমার চাকরী যেতে পারে জানো?

—যদি আমি ভুল করি তাহলে তুমি তা করতে পারো। আর আমার কাজ যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি তোমার কাছে জবাবদিহি...।

ও'মিয়েরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, প্রথমে ক্লিন্ট লুমিসকে হত্যা করার ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল, তারপর এখন সব পাগলামী কথাবার্তা।

টুইড ওদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলে উঠলো, ফ্ল্যান্ড্রেস কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই নিয়েছে। আমি ওর সঙ্গে প্যারিসে মাত্র একবারই দেখা করেছিলাম।

হাওয়ার্ড উত্তেজনায় কম্পিত হাতজোড়া পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। টুইড তীক্ষ্ণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, সামিট এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার বিবৃতি ঠিক নয। কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে...।

ও'মিয়েরা উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলো, ওয়াশিংটনের কানে এসব যাবে। একজন সিনিয়ার ব্রিটিশ এজেন্ট তার নিরাপত্তা প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে চমৎকার।

—আমি বলেছি চারজনের মধ্যে একজন। টুইড কঠিন চোখে বলে উঠলো, আগে থেকেই সব ঘটছে। এটা মনে রেখো চ্যান্সেলার উইলি ব্রানটের ঘনিষ্ঠ লোক গন্টার জিলামো সোভিয়েট প্ল্যান্ট বাতিল করে দিয়েছিল।

—তাতে ব্রানট্-এর ক্ষতিই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে ও হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো, অনেক বছর আগে থেকেই খুনী নিযুক্ত হয়েছে। ট্রেন আজ রাতে। অতএব প্রচণ্ডভাবে সতর্ক থাকলেই সবার মঙ্গল...।

* * *

দোসরা জুন, মঙ্গলবার ঃ

নাম ঃ অ্যালেন ডোমিনেকো ফ্ল্যান্ড্রেস।

জাতি ঃ ফরাসী

জন্ম তারিখ ঃ উনিশ'শ আঠেরোই জানুয়ারি।

জন্মস্থান ঃ স্ট্রাসবার্গ।

টুইড তার অফিসে বসে, ম্যাকনেইলের দেওয়া ফাইলটায় চোখ বোলাতে বোলাতে চেয়ারে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল।

ফ্ল্যানড্রেসের অতীত ইতিহাস সম্বলিত আছে এই ফাইলে।

ক্যারিয়ার রেকর্ড? ইংল্যান্ড থেকে পালিয়েছিল উনিশ'শ চুয়াল্লিশ এর এপ্রিলে। যুক্ত ফরাসী বাহিনীর লেফটান্যান্ট হয়েছিল। জার্মান ভাষায় দক্ষতার জন্যে পরে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সে নিযুক্ত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পরে জেনারেল ডুমার স্টাফ হিসেবে ওকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ফ্রান্স অধিকৃত ভোরালবার্গ আর টেরেলে।

এরপরে উনিশ'শ তিপান্ন তে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসে। সবশেষে উনিশ'শ আশি সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির স্পেশ্যাল গার্ড ইউনিট-এর সিক্রেট সার্ভিস-এর ইনচার্জ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

টুইড পুরো ফাইলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ম্যাকনেইলকে জিজ্ঞেস করলো, ওর বিবাহিত জীবন?

স্মৃতি হাতড়ে ম্যাকনেইল বলল, লিলির টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারের এক মেয়ে লুসিল ডুর‍্যান্ডকে ও বিয়ে করে।

টুইড বলে উঠলো, ক্লু যে কোথায় পাওয়া যায়...।

—ওর সাতজন মিস্‌ট্রেস, যতদূর জানি। ম্যাকনেইল বলল।

এরপর আলোচ্য ব্যক্তির নাম হচ্ছে ও'মিয়েরা। ফাইল দেখে টুইড বলল, এটা তো আরো বড় মনে হচ্ছে। টেনে নিল ওটাকে। পড়তে লাগল,

নাম ঃ টিমসি প্যাট্রিক ও'মিয়েরা।

জাতি ঃ মার্কিনী।

জন্মতারিখ ঃ উনিশ'শ ত্রিশ সালের তেসরা রা আগস্ট।

জন্মস্থান ঃ নিউইয়র্ক সিটি।

ক্যারিয়ার রেকর্ড ঃ উনিশ'শ ষাট থেকে উনিশ'শ পঁয়ষট্টি পর্যন্ত ল্যাংগলেতে সি. আই. এ-র 'ক্রিপটো অ্যানালিসিস' সেকশানের সঙ্গে যুক্ত। উনিশ'শ পঁয়ষট্টি থেকে উনিশ'শ বাহাত্তর অবধি ওখানেই যুক্ত ছিল। পরে উনিশ'শ বাহাত্তর থেকে উনিশ'শ চুয়াত্তর অবধি পশ্চিম বার্লিন স্টেশনে কন্ট্রোলার ক্লিন্ট লুমিসের সঙ্গে কাজ করেছিল। দু'জনের ইউনিট। অন্য জুনিয়ার মেম্বার লুজা কারসন। বার্লিনে আঠারো বছরের এক জার্মান মহিলার প্রেমে পড়ে, নাম ক্লারা বেক। এরপরে ইউনাইটেড স্টেটসে ফিরে ল্যাংগলেতে—অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়। সবশেষে সিক্রেট সার্ভিসে...।

টুইড হঠাৎ থামল বিয়ে করেনি?

—হ্যাঁ। ম্যাকনেইল একটা হলদে রঙের ফাইল এগিয়ে বলল, বিয়ে হয়েছিল ন্যানসি মার্গারেট চেজ, শিক্ষিকার সঙ্গে। ওর বাবা ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যাংকার। লোকটা একটাই বিয়ে করেছিল। এখন ওর সেনেটে দাঁড়াবার ইচ্ছে।

ম্যাকনেইল জানতে চাইল, ও ও'মিয়েরা আর হাওয়ার্ডের ওপরে এত উত্তেজিত হলো কেন?

টুইড সহাস্যে বলে উঠলো, এটা আমার খেলার সবে শুরু। আর আমার সহযোগী মার্টেল তো আছেই।

* * *

মার্টেল স্টোলারকে বলল, আমি রেইনহার্ড দিয়েত্রিচকে ফোন করতে যাচ্ছি। মিউনিখের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ওদের কথা হচ্ছিল। স্টোলার খানিকটা অবাক হয়ে বলল, তুমি পাগল হয়ে গেছ।

মার্টেল ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আমার ধারণা ভিন্‌জ ডেলটাব সঙ্গেই গুপ্তচক্র গড়ে তুলছে যা দিয়েত্রিচের অজানা। এই চক্রটা সরাসরি পূর্ব-জার্মানদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। এর অর্থ সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত। আমার কাজ দিয়েত্রিচের মনে সন্দেহ জাগানো। তাহলে শেষমুহূর্তে অন্তত অপারেশন ক্রোকোডাইল ভেস্তে যাবে। সামিট এক্সপ্রেস আজ রাতে ছাড়ছে। সুতরাং এই সুযোগ...।

* স্টোলার নির্বাক হয়ে মার্টেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মার্টেলকে চারবার আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবারেই ডেলটার প্রতীক এমনকি ওয়ার্নারের মৃতদেহেও তা পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা খুবই কাঁচা...।

মার্টেল জানালো যে ও বিদেশী সংবাদদাতা হিসেবে ব্যাপারটা দিয়েত্রিচকে জানাবে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে অপর প্রান্ত থেকে টুইডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ওদের সতর্ক কথাবার্তা স্টোলার টেপ করে যাচ্ছিল।

কথাবার্তার সারাংশ হলো, কেইথের জন্যে একজন দূত কিছু গোপন রেকর্ড নিয়ে যাচ্ছে, যা ওর কাজে লাগবে। ওরই সহযোগী দূত মিউনিখ বিমানবন্দরে পৌঁছবে।

স্টোলার মার্টেলের পদক্ষেপ একবারেই বুঝছিল না। দিয়েত্রিচের ডেরায় ও পৌঁছতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা নির্মম ভাবে ভয়ঙ্কর।

এদিকে স্টোলারকেও আজ রাতে জরুরী 'বন'-এ যাওয়া দরকার ..।

* * *

মার্টেল আর ক্লেয়ার বাড়িতে বসেছিল। ক্লেয়ার বলল, স্টোলারের অফিসে কি হচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনে হয়, কোড সংকেত বিনিময়।

মার্টেল বললো, যাই হোক স্টোলার-কে একটু বিষণ্ণ মনে হল। টুইড আজ সন্ধ্যোতে একটা দূত পাঠাচ্ছে। দেখা যাক কি হয়।

* * *

গাড়ি দ্রুত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে...।

—কখন ব্রিটিশ রিপোর্টার ফিলিপ জনসন আমার সঙ্গে দেখা কববে দিয়েত্রিচ? তুমি কেন রাজি হলে?

ম্যানফ্রেড কথাগুলো বলে রিসিভারটা শক্ত করে ধরে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর দিয়েত্রিচ বলে উঠলো খুব ধীরে ধীরে, কারণ আমি নিশ্চিত, সে হচ্ছে কেইথ মার্টেল যে আমার ভাইপোকে খুন করেছে।

একটু থেমে দিয়েত্রিচ আবার বলল, আমি সব খোঁজখবর এর মধ্যে নিয়েছি। আসল ফিলিপ জন্‌সন্ এখন প্যারিসে।

—সাবধানে এগিয়ো।

—বটেই তো। দিয়েত্রিচের কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

* * *

মিউনিখের রাস্তায় ম্যানফ্রেড উন্মত্তের মতো গাড়ি চালাচ্ছিল। কালো চশমায় দু-চোখ ঢাকা, মাথায় টুপী। সীটের পাশে ব্যাগের মধ্যে লুকোনো রিভালভার।

দিয়েত্রিচের এস্টেটের আধমাইল দূরে ও গাড়িটা থামালো। সামনেই একটা জীর্ণ গাড়ি।

ওখানেই ভিন্‌জের সঙ্গে গোপন আলোচনা হয়েছিল। গেটের ভেতরে উঁচু পাহাড়ের মত এলাকা, যেখান থেকে স্বচ্ছন্দে গুলি চালানো যায়। গাড়িটা আবার চালিয়ে গেটের সামনে নিয়ে গেল। ম্যানফ্রেডের দৈহিক—শক্তি প্রচণ্ড। গাড়ি দিয়ে রাস্তাটাকে আড়াল করে দিল। পরক্ষণেই কি ভেবে আবার রাস্তার অর্ধেকটা ফাঁকা করে দিল। নিজের গাড়িটা গাছের আড়ালে রেখে দিল। ফোনে দিয়েত্রিচের সঙ্গে কথামত হাতে বন্দুক নিয়ে উঁচু জায়গায় গিয়ে বসল। ওকে কেউ দেখতে পাবেনা। এরপর অপেক্ষার পালা।

খানিক বাদেই একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। দূরে মার্টেলের নীল গাড়িটা ওর চোখে পড়ল। বন্দুক তাক করে স্থির লক্ষ্যে...।

—ব্যাপারটা ঠিক হয়নি মনে হচ্ছে। গাড়ির ভেতর ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকালো। মার্টেল মুগ্ধ চোখে জায়গাটা দেখছিল। ম্যাপ দেখে মার্টেল বুঝলো যে ওরা মূল প্রবেশপথের দু-মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ব্যাভেরিয়ার উঁচু— প্রান্তর জুড়ে সবুজ ঘাস বিছানো রয়েছে। মার্টেল বলল, তোমার ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবেনা। তুমি এখানেই গাড়িটা নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা কর। একঘণ্টার মধ্যে যদি না আসি সোজা গিয়ে মিউনিখে স্টোলারকে খবরটা দেবে।

—কোন ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—তাহলে বিপদে পড়লে খবর দেবার যে কেউ থাকবেনা।

হঠাৎ সামনেই সেই জীর্ণ গড়িটা অর্ধেক রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে। আয়না দিয়ে পেছনে তাকালো মার্টেল। চারিদিক খাঁ খাঁ মরুভূমির মত। গেটটা বন্ধ। ভেতরে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের মতো অঞ্চল। এতই উঁচু যে ও পাশের জিনিস চোখে পড়েনা। ও খুব আস্তে গাড়িটা এগোতে লাগল।

ক্লেয়ার কালো চশমা খুলে সামনের দিকে তাকালো। হঠাৎ উঁচু জায়গাটায় চোখ আটকে গেল। মনে হচ্ছে কেউ রয়েছে ওখানটায়। সঙ্গে সঙ্গে মার্টেলকে বলল, ঐ জায়গাটায় কেউ রয়েছে।

ম্যানফ্রেডের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে গাড়িটা। মার্টেলের নীল গাড়িটা একেবারে নিশানার মধ্যে। ও ট্রিগারটা টিপল।

—একেবারে নড়োনা।

মার্টেল সজোরে ধাক্কা মারল জীর্ণ গাড়িটায়। ঠিক সেই ফাঁকে একটা শব্দ হলো। বুলেটটা সোঁ করে ঘাড়ের পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। ও নীচে নেমে পড়ে থাকা গাড়িটাকে সামলাতে চেষ্টা করল। তারপর একাই এগোল।

ম্যানফ্রেডের প্রথম গুলি ব্যর্থ। ব্যাপারটা অভাবনীয়। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই পজিশন নিয়ে ফেলেছে। ও দ্রুত জায়গা ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলো। গন্তব্য মিউনিখ।

*   *   *

মঙ্গলবার, দোসরা জুন ঃ

নাম ঃ ফ্রেডরিক অ্যান্টনী হাওয়ার্ড।

জাতি ঃ ব্রিটিশ।

জন্ম তারিখ ঃ বারই অক্টোবর, উনিশ'শ তেত্রিশ।

জন্মস্থান ঃ চেলসা, লন্ডন।

ক্যারিয়ার রেকর্ড ঃ উনিশ'শ আঠান্ন -তে বিদেশ দপ্তরে যোগ দেয়। ইনটেলিজেন্স সেকশনে যোগ দেয় উনিশ'শ বাষট্টির মে-তে। এরপরে উনিশ'শ চুয়াত্তর সালের মে মাসে ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে প্যারিস দূতাবাসে যোগদান। উনিশ'শ আটাত্তর জানুয়ারি মাসে ছ-সপ্তাহের স্পেশাল লিভ। শেষে উনিশ'শ আশির মে মাসে এস. আই. এন -এর প্রধান হিসাবে কার্যভার নেয়।

'ম্যায়ডা ভ্যালে'-তে নিজের ফ্ল্যাটে টুইড সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশেই ম্যাকনেইল। টুইড বলে উঠলো, এই বিশেষ ছুটি নিয়ে ও ভিয়েনাতে কাটিয়েছিল।

ভিয়েনার ব্যাপারেই ওর মনে পড়ল কিম ফিলবির কথা। ভিয়েনার এক মহিলার সংশ্রবে ফিলবি

সংক্রামক একটা রোগে আক্রান্ত হয়। এখানেই।

সমস্ত ফাইল দেখলেই বোঝা যাবে।

* * *

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের অট্টালিকায় প্রবেশের মুখে চীৎকারটা ছড়িয়ে পড়ল। একপাল শেফার্ড কুকুর মার্টেলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। প্রহরী—বেষ্টিত থাকায় তা সম্ভব হচ্ছেনা।

মার্টেলের দিকে তাকিয়ে ধূসর চোখজোড়া প্রশ্ন করল, কি চাই?

—আমি টাইম পত্রিকার ফিলিপ জনসন। মিঃ দিয়েত্রিচের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি এখানে আসতে বলেছেন।

ভিন্‌জ বললো, পায়ে হেঁটে এলে কেন?

ও জানালো, গাড়ি রাস্তায় খারাপ হতেই এই অবস্থা। এরপর মার্টেল ওর পরিচয়পত্র দেখাল।

দূরের আকাশে তখন হেলিকপ্টারের মৃদু শব্দ। ভিন্‌জ ওর কার্ডটা দেখে ফেরৎ দিলো।

—আমরা এখন মূল জায়গায় যাবো।

এরপর ওরা সামনের দিকে এগোল। প্রথম গেটটা পেরোতেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। কুকুরগুলো ওখানেই রয়ে গেল। সবার কোটের পকেটে ডেলটা আঁকা।

ভিন্‌জের গাড়ি এগোল। সামনে ও আর মার্টেল। মার্টেল দ্রুত পেছন ফিরে দেখল, দু'জন সশস্ত্র প্রহরী ঘড়ি দেখল। উঁচুতে হেলিকপ্টারের বিচরণ।

পাঁচ মিনিট স্বাভাবিক কাটলো। চোখে পড়ল মূল অট্টালিকা।

প্রবেশ পথটা ধনুকাকৃতি। গাড়িটা এগিয়ে অবশেষে মূল বিল্ডিংটার কাছে থামলো। সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন। একজন পুরুষ অন্যজন রমণী।

বেইনহার্ড দিয়েত্রিচ চমৎকার পোষাকে, মুখে সিগারেট নিয়ে যেন ওব জন্যেই অপেক্ষায় রয়েছে। কঠিন দৃষ্টি।। মহিলাটি অন্যরকম। মৃদু হাসলো। ইনিই স্বয়ং ক্লারা বেক।

সবাই মিলে হলঘরে প্রবেশ করল। ভিন্‌জ আর ওর দু'জন সশস্ত্র-প্রহরী বেষ্টিত হয়ে মার্টেল এগোতে থাকল। নিজের অস্ত্রগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখেশুনে 'হিটলারে'র কথা মনে পড়লো। দিয়েত্রিচ ও ভিন্‌জকে দাঁড়াতে বললো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, ঐ দু'জনকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।

ভিন্‌জেব হাতেও পিস্তল। মার্টেল তাকালো চারিদিকে, একটা বিরাট ডেস্ক সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

দিয়েত্রিচের মুখে ব্যঙ্গের হাসি। গমগমে কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, তুমি বসতে পারো মার্টেল। ফিলিপ জনসনের রহস্যটা সমাধান করা যাক। বরং আমি পরামর্শ দিই...।

ক্লারা বেক ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। মার্টেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে বসতে দেখল ক্লারা অপূর্ব সুন্দরী। শেষে দিয়েত্রিচ ওর বিশেষ চেয়ারে বসে বলল, তুমি এখানে এলে কেন? এতো আত্মহত্যার সামিল। এরপর আবার আমাকে বোলনা যেন আধঘণ্টা কেটে গেলে স্টোলার দলবল নিয়ে আসবে তোমাকে উদ্ধার করতে।

দিয়েত্রিচ থামলো। মনে মনে ভাবলো। আবার বললো, আমি কাগজপত্র পড়েছি। বি. এন. ডি. কমিশনার বন-এ উড়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে আমার জেতার সাক্ষী।

—তোমার পরাজয়। মার্টেল বলল।

—এই যে বেজন্মা শখের গোয়েন্দা, জার্মানীর রাজনীতি তুমি কি বোঝ? তুমি আশা করোনা এখান থেকে বেঁচে ফিরবে, কোন প্রমাণ আছে তুমি এখানে আছো? আমি ভেবে পাচ্ছিনা কেন তুমি এখানে...?

মার্টেল ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কিছুই পারবেনা দিয়েত্রিচ...।

ঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেল। ঘরের প্রত্যেকের ওপর ও নজর রাখছিল। ভিন্‌জ যেন নার্ভাস হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে পায়চারী করছিল। ক্লারাকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। দিয়েত্রিচ আবার ফেটে পড়ল, বেজন্মা, তুমি কি বলছো...।

মার্টেল স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলল, তুমি এমন একজনকে বিশ্বাস কর যে তোমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। তা না হলে স্টোলারের পক্ষে ডেলটা অস্ত্রাগার খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। ইনফরমার...।

ভিনজ উত্তেজিত হয়ে, হাতে লুগার, মার্টেলের দিকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার দাঁতগুলো আমরা একটা একটা করে...।

দিয়েত্রিচ গ্রাহ্য না করে ভিন্জের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, বেরিয়ে যাও।

ভিন্জ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। মার্টেল আবার আরম্ভ করলো, দিয়েত্রিচ, এমন একজন লোক তোমার অস্ত্রাগার চেনে, যে স্টোলারের ইনফরমার। সুতরাং ও তোমার নির্বাচনের আগে ক্ষতি করতে পারে।

হঠাৎ দরজা খুলে একজন প্রহরী ঢুকলো, দিয়েত্রিচ জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার কার্ল?

—গেটের সামনে একটা কনভয় এসেছে। সম্ভবতঃ পুলিশ।

দিয়েত্রিচ দু'জনকে ডেকে বললো, একে সার্চ করে গুপ্তঘরে ঢুকিয়ে দাও। সাবধান, এর কণ্ঠস্বর যেন কারোর কানে না যায়।

বলেই সামনের বুককেসের দিকে এগিয়ে বোতাম টিপল। একটা অংশ তৎক্ষণাৎ সরে গেল।

—ওঠো। কার্ল রিভালভার ঠেকিয়ে বলল। মার্টেল লক্ষ্য করেছে ঐ ফাঁকা অন্ধকার জায়গায় একটা গুপ্তঘর আছে আর তার সামনে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

মার্টেল এগোল। দু'পাশে গার্ড।

দিয়েত্রিচ বলল, এখন তোমাকে ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, কাল কথা হবে।

সিঁড়ির নীচে পাথরের গুপ্তঘরে ধাক্কা মেরে কার্ল ওকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

বি. এন. ডির কনভয়। তিনটে কালো মার্সিডিসের ভেতরে সাদা পোষাকের সশস্ত্র কিছু লোক। প্রহরী ভয় পেয়ে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতেই কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থা। কুকুরগুলোকে গুলি করার নির্দেশ দিল স্টোলার। গুলি চলল। কুকুরগুলো রাস্তার ধারে পড়ে রইল। স্টোলার গাড়ি থেকে নেমে বলল, গেটের যোগাযোগ ছিন্ন করে দাও।

দু'জন দৌড়ে ভেতরে গেল। একজন প্রহরীর হাতে রিসিভার দিয়েত্রিচকে মূল বিল্ডিং-এ ফোন করছিল। স্টোলার এর লোকেরা হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে আছড়ে ফেলল। স্টোলারের লোকজন অঞ্চলটা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

এরপরে স্টোলারের গন্তব্যস্থল দিয়েত্রিচের মূল বাসস্থান। তিনটে গাড়ি এগোতে লাগল। দিয়েত্রিচ একেবারে ওপরে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে চীৎকার করল, আমি যদি নির্বাচিত হই, তবে তোমাকে আমি লাথি মেরে ব্যাভেরিয়া থেকে তাড়াবো।

-- তোমার নামে ওয়ারেন্ট...।

দিয়েত্রিচ হলে ফিরে এলো। পেছনে স্টোলার। ও দেখল ডানদিকের দরজা দিয়ে লাইব্রেরিতে ঢোকা যায়। সোফায় একজন মহিলা বসে আছে। স্টোলাব ওর নাম জিজ্ঞেস করল। দিয়েত্রিচ দ্রুত ওকে গিয়ে বলল, তোমার নামে আমি মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করবো জানো?

—ফোন তো নেই। স্মিত হাস্যে আবার মহিলাটির দিকে তাকিয়ে, আমাদের সার্চ করার ক্ষমতা আছে। তোমার নামটা যদি...।

দিয়েত্রিচের নিষেধ অমান্য করে মহিলাটি বলল, আমার নাম ক্লারা বেক। আমি মিঃ দিয়েত্রিচের সেক্রেটারী আর পি. এ.। বলো তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

—এখানে ফিলিপ জনসন নামে একজন এসেছে। সে কোথায় জানাতে পারো?

ক্লারা বেকের নাম ও শুনেছে। হাউপ্টব্যানহফের ফোন বুথে। ওর ফাইল আছে।

ক্লারা বলল, ও নামের কাউকে জানিনা।

দিয়েত্রিচ চীৎকার করল, কি ব্যাপার, এসব বন্ধ হবে কিনা।

স্টোলার গ্রাহ্য না করে সারা ঘর দেখতে লাগল, তল্লাসী চলতে থাকল আর ক্লারাকে মাঝে মাঝে জেরা করতে লাগলো। উত্তরে ক্লারা জানালো, ওর স্টার্টগার্টে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল।

ক্লারার ঠোঁটে সিগারেট। মৃদু হাস্যে ও যেন স্টোলারকে আহ্বান জানাচ্ছে।

একজন ঘরে ঢুকতেই স্টোলার জিজ্ঞেস করল, পিটার কিছু পাওয়া গেল। ও মাথা নাড়াল আর বলল, ক্যামেরা. এছাড়া সহকারী পাইলটের ফিল্ডগ্লাস। ফিল্ম. নেওয়া গেছে। ডেভেলপ করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

—তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?

—হেলিকপ্টারের ভেতরে জনসন ছিল। সিনে ক্যামেরাতে সব কিছুই উঠেছে। সিগারেট খাবে দিয়েত্রিচ? তুমি কি সিগারেট খাও?

—হাভানা। ছটফট করতে করতে উত্তর দিল।

স্টোলার বুক কেসের দিকে এগোল। কার্পেটে আধপোড়া সিগারেট দেখে তুলে দেখল। এটা একেবারে আলাদা। এটা এখানে কেমন করে এলো।

বুককেস থেকে বইগুলো মেঝেতে ফেলতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল বোতাম। বোতামটা টিপতেই খানিকটা অংশ নেমে গেছে। পিটারকে নামার নির্দেশ দিলো। ঘরটা ভালভাবে দেখতে লাগল পিটার কিছু পরে ফিরে এলো। বললো, একটা ঘরের মধ্যে ওকে জঘন্য ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে তালা।

স্টোলার দিয়েত্রিচের দিকে তাকিয়ে বললো. কি ব্যাপার দিয়েত্রিচ?

—ও, একজন প্রতারক। আমি নিশ্চিত ও আমাকে খুন করতে এসেছিল। আমি খোঁজ নিয়েছি। শত্রু আমার অনেক।

মার্টেলকে সেই গুপ্তঘর থেকে মুক্ত করা হলো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

বি. এন. ডির তিনটে গাড়ি গেটের সামনে এসে পৌঁছালো। এখন গন্তব্যস্থল মিউনিখ।

স্টোলার মার্টেলের দিকে তাকিয়ে বলল, হফারকে তুমি যেখানে ছেড়ে দিলে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়। ও সব বলল আমাকে। কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন?

—ওকে বোঝাতে যে, ওর দলের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতক। এতে করে ওদের অপারেশন ক্রোকোডাইল এলোমেলো হয়ে যাবে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মার্টেল মিউনিখে ক্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলেছে। স্টোলারের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। ওরা বনে যাবার প্লেন ধরতে গেল।

—সম্ভাব্য খুনীর তালিকা থেকে স্টোলারকে বাদ দিতে পারিনা এখন?

ক্লেয়ার বলল, কেন বলতো?

দিয়েত্রিচের খপ্পর থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছে বলে?

মার্টেল বলল, এও তো হতে পারে আসল খুনীর দিক থেকে আমার চোখ সরিয়ে দেবার জন্যে এসব ওর সাজানো ঘটনা। যাতে ওকে এব্যাপারে সন্দেহ...। এখনও আমার তালিকায় এরিখ স্টোলার রয়েছে। গাড়ির গন্তব্যস্থল মিউনিখ বিমানবন্দর।

* * *

মঙ্গলবার, দোসরা জুন ঃ

বেলা দুটো থেকে দশটা।

নাম ঃ এরিখ হেইনজ স্টোলার।

জাতি ঃ জার্মানি।

জন্মতারিখ ঃ সতেরই জুন, উনিশ'শ পঞ্চাশ।

জন্মস্থান ঃ পলিজিতে।

উনিশ'শ চুয়াত্তর বি. এন. ডিতে, তারপরে পূর্বজার্মানীর মধ্যে আন্ডারভার এজেন্ট হিসেবে উনিশ'শ পঁচাত্তর-সাতাত্তর পর্যন্ত। উনিশ'শ আটাত্তর-এ বি. এন. ডির প্রধান।

টুইড কালচে লাল ফাইলটা ভালভাবে পড়ে ম্যাকনেইলকে জিজ্ঞেস করল, স্টোলার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তুমি কি কখনই ওকে দেখনি, এটা একটা সুবিধে, সুতরাং...।

—ও হচ্ছে চারজনের মধ্যে সবচাইতে তরুণ। বি. এন. ডি তে খুবই অল্প বয়েসে তাই না?

—চ্যান্সেলার ল্যাংগার প্রমোশন দিয়েছিল। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট।

সামনের একটা ফোল্ডারে সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিল ম্যাকনেইল। মার্টেল হয়ত এর মধ্যেই অনেক কিছুর হদিশ পাবে। মিউনিখে ফোল্ডারটা নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সবগুলোই গোপনীয় ও জরুরী। টুইড ম্যাসনকে ফোন করে বলে দিল ওর ওপর নির্ভর করা চলে। স্পেশাল সিকিউরিটি ব্রিফকেসে ম্যাকনেইল সমস্ত ফাইলগুলো ঢুকিয়ে রাখলো। ওর ছোট্ট ব্যাগটাতে আগেই জিনিষপত্র ঢোকানো হয়ে গেছে।

* * *

ঠিক ছ'টা বেজেছে।

স্থান ঃ মার্কিন দূতাবাস, গ্রসতেনর স্কোয়ার। তিনতলার অফিসে টিম ও'মিয়েরা দাঁড়িয়ে পাশে ডেপুটি জেমস ল্যান্ডিস রিসিভার হাতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রিসিভার রাখতেই মিয়েরা জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে?

—আটলান্টিকের ওপরে 'এয়ার ফোর্স ওয়ান' ঠিক সময়েই থাকছে। তারপর ঠিক সময়েই ওরলিতে পৌঁছাবে। ওখান থেকে প্রেসিডেন্ট সোজা গেয়ার দ্য-ইস্ট। তারপর সামিট এক্সপ্রেস...।

—তাহলে আমাদের এখন ওরলিতে যাওয়া জরুরী প্রয়োজন।

ডেপুটি বলল, স্যার, ক্লিন্ট লুমিসের ঘুমের ব্যাপারে একটা সন্দেহজনক রিপোর্ট...।

ওর কথার মাঝখানে ও'মিয়েরা বলল, এখন চলো...।

* * *

ঠিক ছ'টা। এলিসি প্রাসাদ, প্যারিস।

প্রবেশ পথের বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে অ্যালেন ফ্ল্যাড্রেস সমস্ত কিছু তীক্ষ্ণ নজরে রাখছে। এন্টিবোম্ব স্কোয়াডের দিকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়িতে ফরাসী প্রেসিডেন্ট গেয়ার-দ্য-ইস্টে যাবে। ফ্ল্যাড্রের কাউকে বিশ্বাস করেনা। হঠাৎ আয়নায় দু'জনকে দেখা গেল। একজনকে চেঁচিয়ে বলল, গাড়ির সবকিছু তল্লাসী কর, এমনকি নীচেও।

এরপরে ও নিজে ছুটে এলিসি প্রাসাদের অপারেশন রুমে ঢুকে গেল। দু'জন লোক শক্তিশালী ট্রানসিভারের ওপর ঝুঁকে আছে আর তৃতীয়জনের দৃষ্টি ক্রিপটোগ্রাফারের দিকে। সংকেত আদান-প্রদান হচ্ছে।

ফ্ল্যাড্রেসকে দেখেই ওর হাতে খবরের কয়েকটা গোছা দেবার চেষ্টা করলো। ওকে জানানো হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এগারোটায় ওরলিতে পৌঁছেছেন।

—তাহলে বিমানবন্দর থেকে ট্রেনে যেতে দেড় ঘণ্টার মত সময় লাগবে। সব চেয়ে ভাল হবে রুটগুলো সমস্ত বন্ধ করে দিলে। তাহলে ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আমেরিকান স্টাইল।

—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল ফ্লাইটে চার্লস শ্যেগল-এ পৌঁছোচ্ছে ঠিক দশটার সময়।

একটু থেমে বলল, আগামীকাল সকাল ন'টা তেত্রিশে জার্মান চ্যান্সেলার মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফে এক্সপ্রেসে...।

—এটা আমি জানি। ফ্ল্যাড্রেস বলল।

—কিন্তু বন থেকে একটা অদ্ভুত সিগন্যাল আসছে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। কিপটোগ্রাফার ওকে জানাল।

ফ্ল্যাড্রেস ঘর ছেড়ে করিডোরে গেল। বনের সিগন্যাল...সিগন্যাল। ওর উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

* * *

ঠিক ছ'টা। স্থান চ্যান্সেলারী। বন শহরের কিছুটা দূরে ছোট্ট শহরের আধুনিক বিল্ডিং। ল্যাংগারের সব দেখা শেষ হতে স্টোলারের মুখে প্রশান্তির হাসি।

মিউনিখ থেকে হেটে আসছে। অসুবিধা হয়নি।

স্টোলার এলিসি প্রাসাদে কোড সিগন্যাল পাঠিয়েছে। হেড কোয়ার্টার ওখানেই। রয়েছে

ফ্ল্যান্ড্রেস। সুতরাং চিন্তার কারণ নেই। এরপর ট্রেন যখন ছাড়লো দ্বিতীয় সংকেত পাঠালো।

স্টোলার ভাবল, কাজ প্ল্যানমাফিকই এগোচ্ছে...।

ট্রেন তখন চলেছে গন্তব্য অভিমুখে।

ছ'টা। হিথরো বিমান বন্দর। ফ্লাইট এল এইচ তিন'শ সাঁইত্রিশ মিউনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। শেষ মুহূর্তে দু'জন যাত্রী প্রথম শ্রেণীর সীটে বসেছে। স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট।

ম্যাকনেইল আর ম্যাসন সাধারণ চ্যানেলেই যাচ্ছিল। ওরা অফিসের মধ্যে ছিল। এরপর যখন ওরা এয়ারপোর্টের দিকে এগোলো, একজন মহিলা ওদের সীটের কাছে নিয়ে গেল। ভি. আই পি দের এটাই ভাল। ম্যাকনেইল বিড়বিড় করে বলল। বিমান উড়ে চলেছে।

ঠিক সাড়ে সাতটা। হিথরো বিমানবন্দর। নির্ধারিত সময়েই ফ্লাইট বি. ই ০২৬ প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ম্যাকনেইল জেনেছে হাওয়ার্ডও একই ফ্লাইটে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছে।

শেষ মুহূর্তে টুইড বিমান ধরতে পেরেছে। সামনে তাকালো টুইড। হাওয়ার্ড-এর মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে।

বিমান এল. এইচ. ০৩৭ ফ্লাইটের বিমান যে মুহূর্তে জার্মানীর সীমা অতিক্রম করছে ম্যাসন ম্যাকনেইলকে বলে উঠল, আমরা এই ফ্লাইটে যাচ্ছি এটা মার্টেলকে জানানো প্রয়োজন। পাইলট রেডিওতে...।

—কিন্তু ও তো আমাদের আশা করছে। ম্যাকনেইল বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা জানানোই উচিত। কোন সুযোগ, ম্যাসন বলল। পরিচয়পত্র দেখিয়ে পাইলট কেবিনে ঢুকে ওয়ারলেস অপারেটরের দিকে তাকালো। পাইলট ঠিক আছে জানাল। এজেন্ট প্যাডে খবরটা লিখতে বলল। মিউনিখ টেলিফোন নাম্বারে ফোন করতে হবে। কোড নামে সই করা আছে। অপারেটর সবটা পড়ল। ও কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

—টেলিফোন নাম্বার মিউনিখ। ম্যাকনেইল আর আমি...গুস্তাভ?

সংকেত সম্ভবত ঃ ঠিক জায়গাতে পৌঁছোচ্ছে। সেই সঙ্গে বিমানও।

মিউনিখের অ্যাপার্টমেন্টে একটা গ্লাভস পড়া হাত রিসিভারটা তুলল। ও প্রান্তের মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ম্যাকনেইল আর আমি ফ্লাইট...।

ধন্যবাদ জানিয়ে ম্যানফ্রেড ফোন রেখে, আবার তুলে ডায়াল করল। ও প্রান্তে এডুইড ভিন্জ

—তুমি এয়ারপোর্টে একটা টীম নিয়ে যাও।

সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল। এরপর ও ঘড়ি দেখল। ভিন্জ নিশ্চয় ঠিকসময়ে পৌঁছে যাবে। ম্যাসন এখন কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে। দু'জনের শেষ হওয়া দরকার।

—পুরুষ নারী দু'জনকে হত্যা করো।

* * *

মিউনিখ বিমানবন্দরের বেরোবার মুখে একটা বুকস্টলে মার্টেল দাঁড়িয়েছিল। অন্যপ্রান্তে কালো চশমা চোখে ক্লেয়ার।

অবশেষে বিমান নেমেছে। সুটকেশ হাতে ম্যাকনেইলকে মার্টেল দেখতে পেল। পাসে ম্যাসন। খানিকটা এগিয়ে দু'জনে আলাদা হয়ে যেতেই মার্টেল বিস্মিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্লেয়ারকে ও সংকেত করলো। ম্যাকনেইলকে ও চিনতে পেরেছে। ক্লেয়ার মার্টেলকে দেখে বুঝল কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

ব্যাগের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলো। সুটকেস হাতে ম্যাকনেইল এগিয়ে আসছে। পাইলটের ইউনিফরম পরা লোক হঠাৎ সাইলেন্সার পিস্তল বের করেছে। মার্টেল চীৎকার করে ম্যাকনেইলকে শুয়ে পড়তে বলল। ক্লেয়ার সতর্ক। সঙ্গে সঙ্গে ও শুয়ে পড়ল। মার্টেলের বুলেট ভিন্জের পিস্তল লক্ষ্য করে কয়েকবার ছুরতে ভিন্জ মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। পাইলটের ইউনিফরম পরা লোকটার লক্ষ্য ম্যাসন। সিগারেট মেশিনের কাছে ও দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বুলেট ছুটে এসে অ্যালেনের পেছনে লাগলো। মেশিনের ওপর পড়ে ম্যাসন নিশ্চল হয়ে গেল। ক্লেয়ারের পিস্তলের গুলি ম্যাসনের হত্যাকারীকে শেষ করে দিল। মার্টেলের চীৎকার শোনা গেল 'ম্যাকনেইল শুয়ে

থাকো।'

তিনজনের টীম, প্রত্যেকের হাতে হ্যান্ডগান। সমস্ত জায়গাটায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ, পরপর গুলির শব্দে তিনজন লুটিয়ে পড়ল।

* * *

ক্রুসল হোটেলে ওরা তিনজন। ম্যাকেনেইল, ক্লেয়ার আর মার্টেল। ম্যাকনেইলের দেওয়া ফটোকপি মার্টেল দেখছিল।

মার্টেল জানালো ম্যাসনই ম্যাকনেইলকে গুম করাতে চেয়েছিল। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ল। ও নিশ্চয়ই টুইডের অফিসে গিয়েছিল। ওর পরনেই উইচিটারের পোষাক ছিল। তারপর অস্টিন রীডের চেয়ারে সবকিছু ফেলে রেখে...।

আসলে সমস্ত কিছুই আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে। ম্যাসন বরাবর টুইডকে অনুসরণ করে ম্যানফ্রেডকে জানিয়েছে। ফাইল দেখা শেষ করে মার্টেল কাগজে একটা কিছু লিখে ম্যাকনেইলকে দেখালো। ও পড়ে ছিঁড়ে ফেলল। তারপরে বললো, তুমি নিশ্চয়ই টুইডকেও বিশ্বাস করো না।

—দেখা যাক। আমি এখন একটু অন্য জায়গায় যাবো। দরজায় পাহারা আছে। ভয় নেই।

* * *

দোসরা জুন

—রাত সাড়ে আটটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশ।

চার্লস দ্যগল বিমানবন্দর। সাড়ে আটটা। বি. ই ০২৬ ফ্লাইট সঠিক সময়ে অবতরণ করলো।

হাওয়ার্ড নামলো। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে ফ্ল্যান্ড্রেস।

ফ্ল্যান্ড্রেসের নির্দেশেই ফরাসী নিরাপত্তা বিভাগ ও'রিলি আর চার্লস দ্যগলে চেকিং জোরদার করেছে। চেনা মুখও বাদ পড়ছে না। কিন্তু একজনকে ওরা মিস করে গেল। সে এল. এইচ ৩৭ ফ্লাইটে মিউনিখ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে আসছিল। চার্লস দ্যগলে নামল দশটা পনেরোতে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সিকিউরিটি বিনা তল্লাশীতেই ছেড়ে দিল।

মহিলাটির পোষাক কালো। গলায় মুক্তোর হার, মাথায় টুপী। মহিলাটির গোটা মুখ আবৃত। পাসপোর্ট কন্ট্রোল একবার আবরণটা খুলে দেখল। তারপর ও বেরিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, এমিল ট্রেন ছাড়ার একঘণ্টা বাকি। আস্তে চালাও। সামিট এক্সপ্রেস ছাড়ার ঠিক পাঁচমিনিট আগে আমি পৌঁছতে চাই।

মহিলাটি স্বয়ং ক্লারা।

গেয়ার দ্য ইস্ট। এগারোটা। স্টেশনে বারো কোচের এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রধান ইঞ্জিন ড্রাইভার চেক করে নিচ্ছিল। কেবিনও চেক করে নিল।

ইঞ্জিনের পেছনের ছ'টা কোচ সংরক্ষিত। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লোকোমোটিভের পেছনের কোচে।

দ্বিতীয়টায় রয়েছে ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস দাঁড়িয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ঢোকার পরে ওর মুখমণ্ডলে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ফ্ল্যান্ড্রেস পাশের বুজারকে উদ্দেশ্য করে বলল, সামনের রাতটা অত্যন্ত দীর্ঘ, বুঝেছো।

তিন নম্বর কোচ অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের জন্য সংরক্ষিত। ওরলি থেকে ওর ওঠার কথা। চার নম্বরটা চ্যান্সেলার ল্যাংগারের জন্যে। তার পরেরটা যোগাযোগ রক্ষাকারী। একটা সেকশান পুরোটাই হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে রাখা হয়েছে। নিউক্লিয়ার সংযোগ ব্যবস্থা সুরক্ষিত। একটা রেস্তোরাঁ কারও যুক্ত আছে। সবারই একসঙ্গে আলোচনা করার কথা। চতুর্দিকে কড়া পাহারা।

খানিক পরেই ও'মিয়েরা এসে নামলো। স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই আমেরিকান নিরাপত্তার

লোকেরা গাড়িটাকে ঘিরে ফেলল।

ট্রেন ছাড়তে মিনিট তিনেক বাকি। ঠিক সেই সময়ে একটা লিমুসিন গাড়ি দ্রুতবেগে স্টেশনে ঢুকল। এক মহিলা নেমে টিকিট দেখিয়ে ঢুকলো। পাসপোর্টটা ভুলে গেছিল। শোফার নিয়ে এল ওটা। মহিলাটি জাতিতে সুইস। হাওয়ার্ড দূর থেকে মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিল। কেতাদুরস্ত মহিলা ট্রেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে কোচে। ঠিক তারপরেই হাওয়ার্ড ঢুকলো।

এরপরেই একটা ক্যাব এসে থামল। একজন চশমা, টুপী পরিহিত ব্যক্তি নেমে ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। হঠাৎ সেই যাত্রীকে দেখে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নেমে বলল,

—টুইড। তুমি এখানে কেন, এখানে তোমার আসা নিষিদ্ধ, তা বুঝি জানো...।

—তোমার বলার কোন অধিকার নেই. টুইড কার্ডটা দেখাল। ততক্ষণে ও'মিয়েরা এসে দাঁড়িয়ে বলল, কি হচ্ছে এখানে?

দূর থেকে ফ্ল্যান্ড্রেসও এগিয়ে আসছে, মিয়েরা পাসপোর্ট দেখে অবাক। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর। হাওয়ার্ড ফেটে পড়ল। আমি তো এসব জানি না।

টুইড বললো, কারণ জানানো নাও হতে পারে।

ফ্ল্যান্ড্রেস ততক্ষণে টুইডকে হাত ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। ওর সঙ্গে টুইড প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলো।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলল, স্লিপিং কামরা। একজন সুইস মহিলা আছে। নাম ইরমা রোমার। তুমি একবার বার্নেতে ফার্দি আরভের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নাও এই মহিলার পাসপোর্ট ও দিয়েছে কিনা কিংবা আদৌ ঐ নামের কেউ আছে কিনা।

সামিট এক্সপ্রেস দুলে উঠলো। গেয়ার-দ্য ইস্ট ছেড়ে এবার পূর্ব দিকের পথে।

এবারে ঐতিহাসিক ভ্রমণের শেষ পর্যায় অর্থাৎ ভিয়েনা। আর সাতশো মাইল দূর।

* * *

তেসরা জুন ঃ একটা থেকে আটটা দশ ঃ

টুইড জানলো হেইসের কাছে কোনরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে কিনা।

টুইডের প্রশ্নে সহকারী হেইস খানিকটা বিব্রত বোধ করল।

এক্সপ্রেস প্যারিস থেকে নব্বই মাইল দূরে। গতি ঘণ্টায় আশি। টুইডকে প্রথমটায় উপেক্ষা করতে হেইসকে ও পরিচয় জানালো।

হেইস ওকে জানাল, স্টোলার নাকি নিরুদ্দেশ। যখন ও এলিসিতে ছিল তখন ফ্ল্যানড্রেসের কাছে বন থেকে এই সতর্কবার্তা এসেছে।

হেইস আবার জানালো, কোথায় ওকে পাওয়া যাবে কে জানে। টেলিপ্রিন্টারে নিশ্চয়ই।

হাওয়ার্ড এদিকে টেলেক্সে পাওয়া খবর অকস্মাৎ টুইডকে জানালো, তোমার খবর পাওয়া গেছে ফার্দি আরভের কাছ থেকে। ইরমার পাসপোর্ট চারবছর আগে ওখানে ইস্যু করা হয়েছে।

ও' মিয়েরা ততক্ষণে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ার্ড ওকে দেখে চীৎকাব করে উঠল, তুমি কেন এখানে?

ও' মিয়েরা একবার জিজ্ঞেস করল,,ব্রিটিশ সিকিউরিটির চার্জে কে আছে? হাওয়ার্ড না টুইড?

টুইড বলল. এই মুহূর্তে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার ফ্ল্যান্ড্রেসের হাতে। আমরা ফরাসী অঞ্চল অতিক্রম করছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। কেউই ঘুমোয়নি। ও' মিয়েরা সিগারেট টানছে। টুইড স্টোলারের নিরুদ্দেশ নিয়ে ভাবছে।

ট্রেন জার্মানীর 'কেল'-এ পৌঁছাতে টুইড সোজা হয়ে বসল। ক্লার্কের কাছে খবরটা চাইল। ও' মিয়েরা ঠিক সেই সময়ে জেগে বলল, কি ব্যাপার?

ও মোটেই ঘুমায়নি। পিস্তল উঁকি মারছে। ইতিমধ্যে হাওয়ার্ডও এসে পড়ল। ল্যাংগার সামিটে উঠবেন কেল থেকে। আবার জানাচ্ছি 'কেল' মিউনিখ নয় 'কেল' স্টোলার।

—ও যে দুঃস্বপ্ন, ব্যাপারটা কি? হাওয়ার্ড বলল। অন্য তিনজন সিকিউরিটি চীফও রয়েছে।

ফ্ল্যানড্রেস এসে যুক্ত হলো।

ট্রেনের গতি মন্থর হলো। কেল-এ থামল।

ফ্ল্যান্ড্রেস চারনম্বর দরজা খুললো। ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাংগার ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ফ্ল্যান্ড্রেস গার্ডকে সংকেত দিয়ে দরজা বন্ধ করল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করলো। এবার ব্যাভেরিয়াগামী।

ফ্ল্যানড্রেস সবাইকে জানাল, স্টোলারের খবর চ্যান্সেলার দিতে পারলো না।

হাওয়ার্ডের এবার ডিউটি আরম্ভ হবে। টুইডের দিকে একবার তাকালো। টুইড সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে।

বার্ণেতে দ্বিতীয়বার সিগন্যালে এসে থামল।

বিষয়। ইরমা রোমার।

উচ্চচা ঃ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি।

ওজন ঃ একশ কুড়ি পাইন্ড।

চোখের রঙ ঃ বাদামী।

পরিচয় ঃ এক শিল্পপতির স্ত্রী।

নাম ঃ এক্সোল রোমার।

বয়স ঃ চৌত্রিশ বৎসর।

গন্তব্য ঃ লিসবন, আর্নল্ডি, বার্নে।

টুইড পড়ে হাওয়ার্ডের হাতে দিল। পড়ে বলল, ওর সঙ্গে মিলছে না।

ফ্ল্যান্ড্রেস বলল, এখুনি যাওয়া দবকার স্লিপার কোচে। পরে জানা গেল। ইরমা রোমার 'ভাল লাগছে না' এই কারণ দেখিয়ে স্টার্টগাটেই নেমে গেছে। স্টার্টগাটেই...পৌঁছানোর সময় ছ'টা একান্ন মিঃ, ছাড়বার সময় সাতটা তিন। মাত্র বাবো মিনিট স্টপেজ। প্রতি স্টপেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে কে নামছে, কে উঠছে, সমস্ত কোচগুলোতেই।

প্রথম শ্রেণীর ডেকোচে এক মহিলা যাত্রী নিবিষ্ট মনে অ্যামেরিকান ভোগ-এব একটা কপি পড়ছিল।

পরিষ্কার করে চুল আঁচড়ানো। চোখে চশমা, আমেরিকান পোষাক পরণে।

মহিলার পাসপোর্ট অ্যামেরিকান। পেশা উল্লেখ আছে, সাংবাদিক। তাহলে, 'ভালো লাগছে না' এই কারণ দেখিয়ে নেমে যাওয়া মহিলাটি হচ্ছে আসলে দিয়েত্রিচের মিসট্রেস স্বয়ং ক্লারা বেক? বর্তমানে সাংবাদিক।

সাংবাদিক পামেলা ডেভিস। স্টার্টগার্ট স্টপে অ্যাটেনডেন্টের চোখে ধূলো দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। আসলে ও ট্রেন থেকে মোটেই নামেনি। টয়লেটে কালো চুলের ওপর সাদা চুলের উইগ পড়েছিল। সুটকেশে ছিল দামী পোষাক। ঠিক পোষাক পড়ে নিয়েছিল : তারপর সুটকেস বন্ধ কবেছিল। ওটাকে ফেলে দেওয়াই সব চাইতে উপযুক্ত। ইরমার পাসপোর্টের জায়গায় ব্যাগে পামেলা ডেভিসের পাসপোর্টটা রেখেছিল ও। ব্যাগে ভিয়েনা যাবার একটা টিকিট ছিল।

পামেলা অর্থাৎ ক্লারার চোখে কিছুই এড়ায়নি। এখন ও অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত। বলা যায় শেষ পর্যায়।

'উলম' এ স্টপেজ দু-মিনিট। টুইড প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। হফারকে ওর চিনতে অসুবিধে হয়নি। মার্টেল শুধু যে 'সুইস মহিলার' কথাই বলেছে তা নয়। স্পেশাল কার্ডের সঙ্গে পাশপোর্ট ফটোও দিয়েছে।

সামিট এক্সপ্রেস আসার আগে থেকেই ক্রেয়ার প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিল। হাতে সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ। চোখে চশমা। ট্রেন থামতেই ওয়েটিং অফিসিয়ালকে টিকিট দেখাল। উঠবে প্রথম শ্রেণীর কোচে। কামরা ফাঁকা। দূরে একজন মহিলা বসে। ওর নাম পামেলা ডেভিস।

—আরে কি সৌভাগ্য মিস হফার। ও প্রায় লাফিয়ে উঠল। হ্যান্ডব্যাগ থেকে পিস্তলটাও বের করেছে ততক্ষণে। ঠিক সেই সময়ে লম্বা লোকটা নরম স্বরে বললো, ভয় নেই। আমি ক্ষতিকর

ব্যক্তি নই। ও সবিস্ময়ে দেখল এরিখ স্টোলার। এক্সপ্রেস পূর্বদিকে যাত্রা আরম্ভ করেছে।

* * *

তেসরা জুন, বুধবার।

সময় আটটা থেকে আটটা পঁয়তাল্লিশ মি.।

ব্রেজেঞ্জে ক্যাব ড্রাইভারকে 'ব্লুমনস্ট্রাসে সমাধি'-তে নিয়ে যেতে বলল। তাড়াতাড়ি।

সমাধি ক্ষেত্রে এসে সমাধি ফলকগুলো দেখে ও খানিকটা বিভ্রমে পড়ল। আজই তো ঠিক দিন। ঘড়িতে সকাল আটটা। প্রতি সপ্তাহে এই দিনে, এই সময়ে আসে ও।

বৃষ্টিতে রেনকোটটা ঠিক করে নিলো।

হঠাৎ মার্টেলের চোখে পড়ল, এক মহিলা মাথায় লাল রুমাল, হাতে একগুচ্ছ ফুল সমাধি ফলক গুলির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। মহিলা যে ফলকটির কাছে দাঁড়ালো তাতে লেখা আছে অ্যালাইস স্টোর, উনিশ'শ ত্রিশ উনিশ'শ াতিপ্পান্ন। মার্টেল ওর পিছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফুল দিয়ে মহিলাটি পেছন ঘুরতেই মার্টেলের মুখোমুখি। মার্টেল বলল, ভয়ের কিছু নেই। নিজের পরিচয় দিল ভিয়েনার সিকিউরিটি পুলিশ। অ্যালাইস স্টোরের সম্বন্ধে কিছু তথ্যের প্রয়োজন।

মহিলাটির পুরোন বন্ধু অ্যালাইস। তিরিশ বছর আগে মারা গেছে, যখন ফরাসী সৈন্যরা ডোরালবার্গ অধিকার করেছিল। মহিলাটির চোখে সতর্কতার আঁচ পেল মার্টেল। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, আর কথা সম্ভব নয় বলে চলে গেল।

* * *

ব্লুমস্টাসেতে বড় ভিলা। দরজায় আটটা নাম। প্রত্যেকের নামের পাশে বেল পুশ। মার্টেল দরজা খুলতে যে নামটা দেখলো তা ক্রিশ্চিনা ব্র্যাক।

মহিলার সঙ্গে কথাবার্তায় যা জানা গেল তা হল ঃ মিঃ স্টোর বলে এক ভদ্রলোককে ও ভালবাসতো। কিন্তু বিয়ের পরই ও মারা যায়। দু'জন সিকিউরিটির লোক এসে ওকে খবরটা দেয়। ওদের পরণে সিভিল পোষাক ছিল। ওরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল যে ব্যাপারটা গোপন কারণ ওর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েট বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। ও লেফটেন্যান্ট ছিল। মৃত্যুর পর নিয়মিত পেনসন্ ও পাচ্ছে। মৃতদেহ শনাক্ত করেছিল মহিলাই। তারপর ওকে অন্য নামে সমাধিস্থ করা হয়। কারণ সোভিয়েট বিরোধী অপারেশনে ঐ নামটা জীবিত রাখার প্রয়োজন ছিল।

মার্টেলের মনে পড়ল ওরা দুটো খুন করেছিল। একজনের ঘাড়টা ভাঙ্গা ছিল আর দ্বিতীয়জনের দেহটা লেকের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। মার্টেল একটা সম্প্রতি তোলা ফটো মহিলাটিকে দেখাতেই ক্রিশ্চিনা নিথর হয়ে গিয়ে বলল, এতো আমার স্বামী, মিঃ স্টোর। ব্যাপারটা তো কিছুই...।

মার্টেল শান্তভাবে জানালো, এ তোমার স্বামী নয়। অনেকটা ঐরকম দেখতে। তোমার স্বামী তিরিশ বছর আগেই মারা গেছে।

উঠে দাঁড়ালো মার্টেল, বলল, তোমার সামনে এখন একটা বিপদ আসছে। তুমি বরং আমার সঙ্গে কয়েকদিন নিরাপদ জায়গায়...।

মার্টেল ক্রিশ্চিনাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে ড্রাইভারকে ক্যাব নিয়ে কাছাকাছি 'এয়ারস্ট্রিপ'-এ নিয়ে যেতে বলল।

প্রথমে ওর হাউপ্টব্যানহফ-এ যাওয়া প্রয়োজন। ওখানে ক্রিশ্চিনাকে একটা হোটেলে রাখা প্রয়োজন। তারপর...।

* * *

তেসরা জুন, বুধবার ঃ মিউনিখ ঃ

এক্সপ্রেস 'উলম' ছাড়ার পর এরিখ স্টোলার কমিউনিকেশন কোচে উঠেছিল। হাওয়ার্ড তো রীতিমত ক্ষুব্ধ।

ওরা দু'জন কমিউনিকেশন কোচের একটা বক্সে বসলো। এরিখ জানালো মার্টেলের সহকর্মী

ক্লেয়ার হফার 'উলম' এ ট্রেনে উঠেছে ফার্স্ট ক্লাসে।। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। টুইড তাই জানালো ওর কাছে একবার যাওয়া প্রয়োজন। ওরা দু'জনেই মার্টেল যে কোথায় আছে এই নিয়ে চিন্তিত। এরিখ জানালো চ্যান্সেলার ল্যাংগারই খুনীর লক্ষ্য। ব্যাভেরিয়ার নির্বাচনে, ক্রেমলিনের পুতুল টফলার নাজীদের ব্যবহার করে জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে যাতে ভোট ওর পক্ষে যায়। সেই কারণেই ল্যাংগারকে সরানো প্রয়োজন। তাহলে ব্যাভেরিয়া উনিশ'শ উনিশ-এর মতো সোভিয়েটের হাতে চলে যাবে। মিউনিখেই ওকে খুনের ব্যবস্থা করেছিল, সেজন্যই স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য খুনী কে? টুইড জানালো বলা একেবারেই সম্ভব নয়। এরিখকে নতুন ধরনের 'অ্যালার্ম ডিফাইজ' এনে দিতে বললো। যন্ত্রটা প্লাস্টিক বাক্সর মতো। শক্তিশালী টর্চ, আবার বোতাম টিপলে সাইরেনেরও কাজ করে। টুইড হাতে নিয়ে এগোল।

*   *   *

মার্টেলের গাড়ি 'ইসার' নদীর পাশ দিয়ে চলেছে। ওখানেই 'স্টল' বলে একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছিল।

হাতের ঘড়িটায় লেখা ছিল, না হলে শনাক্ত করা অসম্ভব ছিল।

মার্টেল গাড়ি থেকে নেমে বাকিটা দৌড়ে এগোল। ঘড়িতে ন'টা তেইশ মিঃ। সুন্দর সকাল। স্টেশনে সামিট এক্সপ্রেস পৌঁছতে আর দশ মিনিট বাকি। চ্যান্সেলার যদি খুন হয় তাহলে টফলারের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার সম্ভাবনা।

*   *   *

শব্দ হতেই ম্যানফ্রেডের হাত রিসিভারের দিকে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ওর প্যাক করা সুটকেশ রাখা।

কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'এওয়ার্ড পোর্টজ' বলছি। আমি প্রস্তুত।

—সময়টা ঠিক রাখবে।

ওদিকে মিউনিখের হাউপ্টব্যানহফে একটা ফোন বুথে পোর্টজ ফোন করছিল। তরুণ—যুবক। ফোনটা রেখে দিল

এদিকে ম্যানফ্রেড সুটকেস হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ কবলো। হাতে গ্লাভস। পোর্টজ নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আছে। যে মুহূর্তে প্রকৃত খুনী চ্যান্সেলারকে গুলি করবে, ঠিক সেই সময়ে ও ফাঁকা আওয়াজ করবে। তারপর পালাবার ব্যবস্থা করবে। এই কৌশলে আসল খুনী পশ্চাতে থাকবে।

ফ্ল্যান্ডেসের গাড়ি পার্ক করা হল। চশমাটা ঠিক করে ও গুপ্ত গ্যারেজের দিকে রওনা হলো। ওখানেই দিয়েত্রিচের সঙ্গে ওব চূড়ান্ত আলোচনা পর্ব। শেষ প্রস্তুতি।

*   *   *

সমস্ত ব্যাপারটা হতাশাজনক। মার্টেলকে ট্রেনটা ধরতেই হবে। হাউপ্টব্যানহফে ট্রাফিক ব্যবস্থা জঘন্য। মার্টেল সামনের দিকে এগোতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যেই দ্রুত এগোচ্ছিল। সময় ঠিক ন'টা একত্রিশ। সামিট এক্সপ্রেস পৌঁছতে আর দু-মিনিট বাকি।

মার্টেল দ্রুত স্টেশনে ঢুকল। চারদিকে পুলিশ কর্ডন। চ্যান্সেলারের জন্যে সবাই অপেক্ষমান।। মার্টেল তাকালো। সামিট এক্সপ্রেস সবেমাত্র থামল। প্রাণপণে ছুটল ট্রেনের দিকে।

ক্লারাকে করিডর পেরিয়ে বাইরে আসতে দেখা গেল। হাতে সুটকেশ। হফারের কামরার দিকে ও তাকালো না। হফার ওর যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করতে লাগল। ওকে কোথায় দেখেছে! মনে পড়ল। বৈরিশ্চার হফের রিসেপশান হলে।

ক্লেয়ার প্লাস্টিক বাক্সটা হাতে নিয়ে কামরা থেকে নেমে ওর পিছু নিল। বেক খানিকটা এগিয়ে সুটকেশটা প্লাটফরমের ওপর রাখলো। তারপর ওর হাতলটা ঘুরিয়ে ওটা রেখে সোজা এগিয়ে গেল। রেস্তোরাঁ থেকে ফ্ল্যান্ড্রেস ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল। খুবই সন্দেহজনক।

ও দ্রুত স্টেশনের ধারের টিকিট নেবার জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল। এদিকে চ্যান্সেলার ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জনতার অভিনন্দন নিচ্ছিলেন।

ক্লেয়ার প্লাসটিকের বাক্সটা প্লাটফরমে নামিয়ে বোতামটা টিপলো। তীব্র স্বরে সাইরেনের শব্দের পর বাক্সটা থেকে ক্লেয়ার লাফিয়ে সরে গেল। ল্যাংগার হঠাৎ শব্দ শুনে অনিশ্চিতভাবে প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। এরিখ স্টোলার ওর পেছনে। হাতে পিস্তল। তার পেছনে ও'মিয়েরা। ক্লারা বেক পেছন ফিরে হফারকে চিনতে পারলো। হঠাৎ সারা প্লাটফরম জুড়ে তীব্র আলোর ঝলকানি। প্লাটফরমের ওপর রাখা সুটকেশটা ততক্ষণে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে। মাত্র পাঁচ সেকেন্ড। আসল খুনীকে আড়াল করার পরিকল্পনায় এওয়ার্ড পোর্টজ পিস্তলে ফাঁকা আওয়াজ করলো। সেই মুহূর্তে মার্টেল ওর পেছনে। হাতে কাল্ট ৪৫ রিভালভার।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টেশনের একপ্রান্তে ফ্ল্যান্ড্রেস নিজের 'লুগার'টা চ্যান্সেলারের দিকে তাক করেছে। মার্টেলের রিভলভার থেকে পরপর তিনটে গুলি বার হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। ফরাসী ভদ্রলোকের দেহ স্পর্শ করলো না। স্ট্যানবার্গার হফ স্টেশনের প্রবেশ মুখ দিয়ে ও অদৃশ্য হলো।

ওদিকে ক্লারা পিস্তলের ট্রিগার টিপতে উদ্যত। লক্ষ্য ক্লেয়ার হফার, ঠিক সেই মুহূর্তে স্টোলারের পিস্তল গর্জে উঠল আর বেক ছিটকে পড়ল।

অন্য প্রান্তে ও'মিয়েরা নিজের ৩৮ স্মিথ' ওয়েসন পিস্তল পোর্টজ-এর দিকে উদ্যত।

পোর্টজ ব্ল্যাংক ফায়ার করার পরে ইউ ব্যান-এর দিকে পালাতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে গুলিটা ওর পিঠে ঢুকল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর নিশ্চল দেহটা পড়ে রইল মাটিতে।

স্টানবার্গারহফ থেকে ট্রেন সবেমাত্র ছাড়ছে। অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস প্লাটফরমের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। কামরার কাছে এসে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে খুললো দরজাটা, ঠিক সেই সময় গার্ড চীৎকার করল। মার্টেল দৌড়ে আসছিল সেদিকে। ফ্ল্যান্ড্রেস অর্ধেক ঢুকছে ট্রেনের কামরায়। বাকি অর্ধেক বাইরে। মার্টেল পরপর দু'বার গুলি চালাল পিঠ লক্ষ্য করে।

এদিকে ট্রেনের গতিবেগ বেড়েছে। ফ্ল্যান্ড্রেসের দেহটা স্ট্যাচুর মতো খানিকটা দাঁড়িয়ে প্লাটফরমে আছড়ে পড়ল। মার্টেল ওর নিষ্প্রাণ—দেহটা পরীক্ষা করল।

* * *

তেসরা জুন, বুধবার ঃ

সামিট এক্সপ্রেসের রেস্টুরেন্ট কারে মার্টেল জার্মান চ্যান্সেলারের মুখোমুখি বসে, সিগারেট ধরিয়ে চ্যান্সেলারের উদ্দেশ্যে বললো, সোভিয়েট যখন তিরিশ বছর আগে ওদের লোক দিয়ে ব্রেজেঞ্জ অধিকার করেছিল, ঠিক তখনই পূর্ব জার্মানীকে প্রক্সি হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এক্সপ্রেস মিউনিখ ছাড়িয়ে এবার স্যালজবার্গ, তারপর ভিয়েনার পথে। মার্টেল স্বচ্ছন্দে বসে আছে। ওর সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী, অ্যামেরিকার আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বসে। আর রয়েছে টুইড, স্টোলার, ও' মিয়েরা আর হাওয়ার্ড।

ল্যাংগার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে ব্যাপারটা ধরতে পারলে?

—বলা যায় বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি। প্রত্যেকেরই ডাবল আছে।

আমি জানতাম আপনার ব্যক্তিগত সিকিউরিটি রয়েছে যদিও আপনি কখনও ব্যবহার করেননি। ওদের একজন লোক ছিল অ্যামেরিকান। হুবহু আসল ফ্ল্যান্ড্রেসের মত দেখতে। ওরা ফরাসী ফোর্সের মধ্যে 'ডাবল' খোঁজার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভোরালবার্গে, টারলর আর ভিয়েনাতে। অবশেষে পেয়েছিল ..।

একটু থেমে মার্টেল বলল, আসল ফ্ল্যান্ড্রেসকে কেউই খুব একটা ভাল চিনতো না। ওকে এমন একটা জায়গায় বদলী করা হয়েছিল যেখানে সবাই নতুন। তারপর...।

চ্যান্সেলার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো। কিন্তু ফ্ল্যান্ড্রেসকে চিনলে কি করে?

মার্টেল বললো, এটা একটা বেদনাদায়ক ঘটনা। আমাদের আগে চার্লস ওয়ার্নার এজেন্ট ছিল।

ও খুন হয়ে যায়। ওর নোটবুকে 'ব্রেজেঞ্জ'-এর নাম পাওয়া যায়। ওখানে ওর ফটো দেখিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছোই। এখানে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আসল ফ্ল্যান্ড্রেস খুন হবার আগে ওরই সাথে বিয়ে হয়েছিল। পূর্ব জার্মানরা মহিলাটিকে একেবারে বোকা বানিয়েছিল। ওর মৃত স্বামীকে অন্য নামে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এটা এই জন্যে করেছিল যদি সেই নকল ফ্ল্যান্ড্রেস ফ্রান্সে গিয়ে আবার সিকিউরিটি সার্ভিসে ঢোকে তখন যাতে...।

মার্টেল এরপর একটু থামলো। প্রত্যেকে বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে।

মার্টেল আবার শুরু করল, ও 'মিয়েরার ব্যাপারেও আমরা বাদ দিইনি। টুইড যখন ওর অতীত ব্যাপার খোঁজ করতে ক্লিন্ট লুমিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলো তখনই ও খুন হলো। ও' মিয়েরা দু'মাস পশ্চিম বার্লিনে ছিল অজ্ঞাতবাসে।

এরপর মার্টেল হাওয়ার্ডের দিকে তাকালো। তারপর বলল, প্রত্যেকটি নিরাপত্তা প্রধানের একই ব্যাপার। যা কে. জি. বি-র কর্নেল পেস্কোভস্কিরও চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়েছি। হাওয়ার্ড, তোমার ব্যাপারেও সমস্যা আছে। আমরা জানতে পেরেছি প্যারিস দূতাবাসের সঙ্গে তুমি যখন যুক্ত ছিলে তখন তুমি ছ-সপ্তাহ ভিয়েনায় ছুটি কাটিয়েছিলে। তুমি কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই জানাওনি।

এরপর মার্টেল আরম্ভ করলো, এবার অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেসের প্রসঙ্গে আসা যাক। অ্যালেন ফ্ল্যান্ড্রেস বরাবরই সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল, অপর তিনজন নিরাপত্তা প্রধানের থেকে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কিছুই ছিলনা...।

এরপর মার্টেল বলে উঠলো, এই হচ্ছে সমস্ত ব্যাপার। আমি এখন স্যালবার্গে নেমে ঘুমাবো।

* * *

রেইনহার্ড দিয়েত্রিচের সঙ্গে ম্যানফ্রেড দেখা করতে যখন আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে এসে পৌঁছলো তখনই ও সতর্ক হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে দেখলো ম্যানফ্রেড, দিয়েত্রিচের মার্সিডিস পৌঁছে গেছে। ম্যানফ্রেডের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল আগে পৌঁছনোর।

ঘড়িটা দেখে ম্যানফ্রেড বুঝল ও নিজে সঠিক সময়েই পৌঁছেছে, দেরী করেনি। দিয়েত্রিচই তাড়াতাড়ি পৌঁছেছে' চারপাশটা ফাঁকা।

এক হাতে হুইল ধরে অন্য হাতে জানলাটা খুললো ম্যানফ্রেড, তারপর পাশে রাখা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা নিলো। এরপর দিয়েত্রিচকে ও দেখতে পেল।

দিয়েত্রিচকে লক্ষ্য করে ও বলে উঠল, তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসেছো।

—আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নষ্ট করার জন্যে তুমিই দায়ী। কঠিন কণ্ঠে দিয়েত্রিচ বললো। গাড়ির মধ্যে বসেছিল। সামনের জানলাটা খোলা। ডান হাতে পিস্তল, বাঁ হাতে একটা গোলাকার ধাতব-পদার্থ।

ম্যানফ্রেড বলল, কারণ ল্যাংগার খুন হয়নি। আর ওর দল জিতে যাবে?

—হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তুমি চালাকি করেছো। তুমি ডেলটাকে অস্ত্র সরবরাহ করার কথা বলে কাজ করেছিলে। আমি তোমায় সব সময় 'ডাম্প' এর 'লোকেশান' বলে গেছি। তুমি আর আমি ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানতো না। এবার বুঝেছি স্টোলারকে তুমিই সব জানিয়েছো। তুমি——তুমি একজন বদমাইস— বেলশেভিক—।

দু'জনেরই মুখ কঠিন। ম্যানফ্রেড রিভালভারটা তুলে দু'বার গুলি ছুঁড়ল। দিয়েত্রিচ ডান পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা পুরো খোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সফল হলোনা। গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ল। ওর পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে ম্যানফ্রেডের বুলেট। প্যাসেঞ্জার সীটের ওপর পড়ে রইল ওর নিশ্চল—দেহটা।

এদিকে ওর হাত থেকে গড়িয়ে গোলাকার বস্তুটা কখন ম্যানফ্রেডের গাড়ির তলায় চলে গেছে ও খেয়াল করেনি। এটা নতুন একধরনের বোমা।

* * *

হাউপ্টব্যানহফের স্যালজবার্গ প্লাটফরমে তিনজন দাঁড়িয়েছিল। মার্টেল, টুইড আর হফার।

ওদের সামনে থেকে সামিট এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নিজের পরবর্তী গন্তব্যস্থলে। দূরে—দূরে—বহুদূরে। এবার গন্তব্যস্থল ভিয়েনা, তাহলেই যাত্রা শেষ। টুইড বলে উঠলো, আমি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তিন সপ্তাহ্ থাকবো। ক্লেয়ারের দিকে তাকালো টুইড। বললো, চলি—।

টুইডের দীর্ঘ শরীরটা আস্তে আস্তে ওদের চোখের সামনে থেকে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল।

ক্লেয়ার মার্টেলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, পরিস্থিতির সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় লড়াইয়ের ক্ষমতা ওর আছে।

মিউনিখে ট্রেনটা পৌঁছোবার আগে ও যখন আমায় প্লাস্টিকের বাক্সটা দিয়েছিল তখন তো রীতিমতো চাপা-উত্তেজনা ছিল, টেনশন ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর মধ্যে কোন আবেগ ছিলনা। অত্যন্ত শান্ত, ধীর আর স্থির ছিল ঐ পরিস্থিতিতেও।

মার্টেল শুনে হফারকে বললো, তুমি তো এখন বার্নেতে রিপোর্ট দিতে যাচ্ছো।

—হ্যাঁ—।

মার্টেল বললো, আমাকে এখন ক্লসন হোটেলে যেতে হবে। ওখানে ক্রিশ্চিনা ব্র্যাক রয়েছে। ওকে আবার ব্রেজেঞ্জে পৌঁছে দিতে হবে। ওকে জানাবো যে ওর স্বামীর ভূমিকায় যে কাজ করে যাচ্ছিল, সে মারা গেছে। সত্যিই ওর জীবনটা বড়ই দুঃখময়।

স্যালজবার্গের আকাশে রঙের ছটা লেগেছে।

কাম ইজি গো ইজি

।। এক।।

আমি লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনের নৈশ বিভাগের একজন কর্মচারী, রাত এগারোটার সময় আমার ছুটি। এখন এগারোটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সবে ভাবছি কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে এবার কেটে পড়বো, হঠাৎ নৈশ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ইচ্ছা না থাকলেও এটা ধরতে হলো কেননা এটা একটা টেপরেকর্ডারে যোগ করা থাকে, ফোন বাজতে আরম্ভ করাব সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং শুরু হয়ে যায়। এই অদ্ভুত রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করার কারণ, যাতে কর্মচারীরা কাজে কোনো ফাঁকি দিতে না পারে। অতএব রিসিভার তুলে নিলাম।

দূরাভাষে ঝংকৃত হলো বিরক্ত উদ্ধত কণ্ঠস্বর, কি ব্যাপার ফোন ধরতে এতো দেরী কেন?

আপনি কে কথা বলছেন?

হেনরী কুপার, অ্যাশলি আর্মস থেকে বলছি। খুব তাড়াতাড়ি এক জন লোক আমার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। কেননা, সিন্দুকটা নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি।

এ কথা শুনে আমার মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আজ রাতে জেনিকে সঙ্গে নিয়ে বের হবো, সে প্রোগ্রাম আর হলো না। আর এ নিয়ে এই এক মাসে তিন-তিনবার কথার খেলাপ করতে হলো ওর সঙ্গে। রাগে মুখ থেকে অপ্রিয় কথা বেরিয়ে আসছিল কিন্তু টেপটার কথা মনে করে নিজেকে সংযত করলাম।

একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম এই টেপের কথা। এক খদ্দেরকে কিছু অপ্রিয় কথা বলায় পরদিন বস আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই এবারে যাতে সে ভুল আর না হয় তাই নিজেকে সংযত করলাম। গলার স্বরকে মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করলাম, সিন্দুকটা নিয়ে কি অসুবিধায় পড়েছেন, যদি বলেন—

সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করবো কিছু ঠিক করতে পারলাম না। জেনিকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে সোয়া এগারোটার সময় ওর বাড়ির কাছ থেকে তুলে নেবো। তারপর দু'জনে মিলে একটা নতুন ক্লাবে নাচবার জন্য যাবো। এতোক্ষণে হয়তো ও সেজেগুজে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে অবস্থিত একটা বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি, অ্যাশলি আর্মস। এই বাড়িটিতে শহরের নামডাকওয়ালা ধনী মহাজনদের বসবাস, ওখানে গিয়ে সিন্দুক খুলে ফিরে এসে বাস ধরে জেনির বাড়ি যেতে যেতে সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। আর জেনি ততক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবে বলে মনে হয় না। ও আমাকে একদিন বলেছিলো, যদি আমি এইভাবে আবার কথার খেলাপ করি তবে আমার সঙ্গে ও আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না।

মনে মনে ভাবলাম, অফিস থেকেই জেনিকে ফোন করি। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে অফিসের ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তাই বাইরে থেকে জেনিকে ফোন করবো বলে ঠিক করলাম।

কোনো উপায় না থাকায় যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অফিস বন্ধ করে, যখন গ্যারেজ থেকে অফিসের ট্রাক বের করছি তখন বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কোনো বর্ষাতি ছিল না বলে অসুবিধায় পড়লাম।

ফোন-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। জেনির ফোন নম্বর ডায়াল করে হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন বাজে এগারোটা কুড়ি। ফোন বাজামাত্র ও-প্রান্ত থেকে জেনির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। মনে হলো ও যেন সারা সন্ধ্যে বসে বসে আমার এই ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমার বক্তব্যটা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলার আগেই ও রাগে একেবারে ফেটে পড়লো,

তুমি না এলে না আসবে, কোনো ক্ষতি নেই। আমি আর একজনকে চিনি, যাকে সিন্দুক সারাতে যেতে হচ্ছে না। শেট, আমি গত বারেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, রোজ রোজ তোমার এই কথার খেলাপ আর সহ্য করতে পারছি না। এটাই আমার শেষ বার।

কিন্তু —জেনি আমার—আর কোনো— —.। আমি আমার রিসিভারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বুঝতেই পারছিলাম অনেকক্ষণ আগেই লাইন কেটে দিয়েছে। ওকে আবার ফোন করলাম। কিন্তু বৃথা, ফোন বেজেই চললো, কিন্তু কেউ ধরলো না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করে ফোন নামিয়ে রাখলাম। শ্লথ পায়ে ট্রাকের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকে তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। অঝোর ধারায় ঝরে চলেছে বড় বড় জলের ফোঁটা। ভারাক্রান্ত মনে ট্রাক ছুটিয়ে চললাম অ্যাশলি আর্মসের দিকে। মনে মনে লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনকে আর হেনরী কুপারকে যথেচ্ছ গালাগাল দিলাম।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে বিশাল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাশলি আর্মস। ট্রাক থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম। সোজা এগিয়ে গেলাম দ্বাররক্ষীর ঘরের দিকে। তার কাছ থেকেই জানা গেল মিঃ কুপার চারতলায় থাকেন।

লিফটে চারতলায় পৌঁছে ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম। দরজা খুললেন স্বয়ং হেনরী কুপার। লম্বা বিশাল চেহারার পুরুষ। ভাবভঙ্গীতে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাবে মুখে ঈষৎ লালচে আভা। তাঁর স্ফীত উদর দেখে মনে হয় তিনি অত্যন্ত ভোজন বিলাসী। আমি দেরী করে আসায় তিনি একেবারে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি জানতে চাইলেন, এই সামান্য রাস্তা আসতে কেন আমার এতো বিলম্ব হলো।

আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম, বৃষ্টিতে রাস্তায় যে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আসতে হয়েছে সেই কারণেই আসতে দেরী হয়েছে বললাম।

কুপার দ্রুতপায়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেন্টিং-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। ছবিটা জনৈকা স্থূলকায়া মহিলার নগ্ন-মূর্তি। দেখে রুবেনস-এর আঁকা মনে হলেও সম্ভবতঃ নকল। ছবিটাকে একপাশে সরিয়ে ধরতেই চোখে পড়লো আমাদের কোম্পানিব তৈরী একটা সুপার-ডি-লাক্স দেওয়াল সিন্দুক।

যখন আমি যন্ত্রপাতির ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখছিলাম তখন আমার নজরে পড়লো পাশের লম্বা সোফাতে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। পরনে সাদা সান্ধ্য পোশাক। পোশাকের গলার কাছটা এতো বেশী উন্মুক্ত যে মেয়েটির উদ্ধত গোলাপী স্তনের ঊর্ধ্বাংশ সহজেই নজরে পড়ছে। তার মাদকতায় পরিপূর্ণ রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট, চোখ তুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো।

মেয়েটিকে দেখে আমার জেনির কথাই মনে পড়ে গেল। কারণ ওর চুলের রঙ ও পায়ের সুন্দর গড়ন অনেকটা জেনিরই মতো, কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করলাম যা জেনির মধ্যে নেই। এটা স্বীকার করতেই হয় যে জেনির দৈহিক গঠন চঞ্চল করে তোলে দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকাকে, ওর ব্যক্তিত্ব, ভারী নিতম্বের ছন্দোময় হিল্লোল, পুরুষের হৃদয়ে তোলে তুমুল ঝড়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই নিছক সস্তা চটক।

এই মেয়েটির মধ্যে সেরকম কিছু নজবে পড়লো না।

আমার চমক ভাঙলো কুপারের বাজখাই গলার আওয়াজে, এটা খুলতে তোমার কত সময় লাগবে?

প্রায় একরকম জোর করেই মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেলাম, কম্বিনেশনটা পেলে বেশী সময় লাগবে না।

তিনি একটুকরো কাগজে কম্বিনেশনটা খসখস করে লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন বিপরীত দিকের দেওয়ালে গাঁথা, ছোট একটা কাঠের আলমারির কাছে। পাল্লা সরাতেই চোখে পড়লো ভেতরের তাকে সাজানো সারি সারি মদের বোদল। একটা গেলাস টেনে নিয়ে নিজের জন্য হুইস্কি আর সোডা মেশাতে লাগলেন কুপার।

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করেছি এমন সময় পাশের কোনো ঘর থেকে টেলিফোনের শব্দ

ভেসে এলো। ক্রি-রি-রি-রিং——

মনে হয় জ্যাক ফোন করছে, মেয়েটিকে লক্ষ্য করে কুপার বললেন, এবং দরজা খোলা রেখেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কুপার বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি চাপা স্বরে হিসহিস করে উঠলো, তাড়াতাড়ি হাত চালাও চাঁদ। ব্যাটা বুড়ো আজ একটা মুক্তোর নেকলেস কিনে দেবে বলেছে। ভয় হচ্ছে, এর মধ্যে বুড়ো আবার মত না পরিবর্তন করে ফেলে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মেয়েটির কাছ থেকে এ ধরণের কথা আমি আশা করিনি। ও সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলো। আমি ওকে আশ্বাস দিলাম, মিনিট তিনেকের বেশী সময় লাগবে না।

কিছুক্ষণ পরেই সিন্দুকটা খুলে ফেললাম, সিন্দুকের ভেতরে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনটে তাকেই থরে থরে সাজানো একশ ডলার নোটের বাণ্ডিল। একসাথে এতো টাকা আমি জীবনে দেখিনি। সব মিলিয়ে মনে হয় পাঁচ লাখ ডলারের কম হবে না।

মেয়েটি সোফা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়ালো, ঠিক আমার পাশে। ওর গা থেকে সেন্টের একটা উগ্র গন্ধ আমার নাকে এলো। ও আমার এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে ওর বাহুর স্পর্শ অনুভব করলাম।

উফ, এতো টাকা! চাপা উত্তেজনায় মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরলো, তারপর হাত ছেড়ে আমার চোখে চোখ রাখলো, আচ্ছা, আমরা দুজনেই যদি এটা খালি করার ব্যবস্থা করি, তাহলে কি রকম হবে?

পাশের ঘরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম যে কুপারের কথা বলা শেষ হয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। মেয়েটিও চটপট সোফায় ফিরে গেলো।

কুপার এসে ঘবে প্রবেশ করলেন। কি হলো? এখনও ওটা খুলতে পারোনি? রাগ করলেন তিনি। এক সেকেন্ড, স্যার, লকটা সরিয়ে দিলাম, এই তো খুলে গেছে। কুপার এগিয়ে এসে হাতল ঘুরিয়ে সিন্দুকের দরজাটা ইঞ্চি কয়েক ফাঁক করলেন, হুম—তুমি বরং একটা নকল-চাবির ব্যবস্থা করে দিও, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বেরিয়ে আসার সময় সোফাতে বসে থাকা মেয়েটিকে শুভরাত্রি জানালাম। প্রত্যুত্তরে ও ঘাড় হেলালো, দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে কুপার দুটো এক ডলারের নোট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো অনিচ্ছা সত্বেও তিনি টাকাটা আমাকে দিচ্ছেন।

ট্রাক চালিয়ে আমি ফিরে চললাম অফিসে। কুপারের টাকায় ঠাসা সিন্দুকটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অফিসের সামান্য মাইনেতে আমি কোনো রকমে চালাই। আমি জানি ঐ মাইনেতে আমাকে চিরকাল এই একই ভাবে কাটাতে হবে। ভবিষ্যৎ বলে আমার কিছু নেই। মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো—ইচ্ছে করলে কুপারের ফ্ল্যাটে ঢুকে কতো সহজেই না হাতানো যায় ঐ টাকাগুলো! ভারী তো সিন্দুক!

বারবার মনকে বোঝালাম, এসব চিন্তা পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও মন থেকে চিন্তাটাকে দূর করতে পারলাম না।

পরদিন রাতে ডিউটি বদলের সময় ট্রেসি এলো আমার জায়গায়, তখনও ঐ একই সর্বনাশা চিন্তা উঁকি মারছে আমার মনের মধ্যে।

রয়কে আমি অনেকদিন ধরেই জানি। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এই সিন্দুক কোম্পানিতেই চাকরি করে। আমাদের দুজনের চেহারাতে মিল আছে, তাছাড়া আর যে ব্যাপারটায় দুজনের মধ্যে মিল আছে সেটা হলো অসীম অর্থলিপ্সা।

যে ব্যাপারটায় ওর সঙ্গে আমার অমিল সেটা হলো রয়ের জীবনে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। উনিশ বছরে রয় বিয়ে করেছিলো কিন্তু সুখী হতে পারেনি। বছর খানেক পরেই মেয়েটি ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওর যে নেশাটি রয়েছে তা হলো ঘোড়া রোগ। মাইনে পেয়ে সমস্ত টাকাই উড়িয়ে

দেয় ঘোড়ার পেছনে। যার জন্য সব সময় ওর পকেট খালি থাকে আর আমার থেকে ধার নেবার চেষ্টা করে।

ওকে কুপারের টাকার কথা বললাম। আমরা দু'জন ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ছাট এসে আছড়ে পড়ছে জানলার শার্সির ওপর। আমার বাড়ি যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। রয়কে কুপারের ফ্ল্যাটে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব বললাম। এমন কি মেয়েটার কথা বলতেও ভুললাম না।

রয়ের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, আমি জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। বর্ষণসিক্ত রাতের দিকে তাকালাম। বৃষ্টি তখনও অবিশ্রান্ত ভাবে ঝরে চলেছে। আমাদের মধ্যে ব্যাপারটি আলোচনা হলো।

রয় আমার দিকে তাকিয়ে বললো, পাঁচ লাখ ডলার?—তুই ঠিক জানিস?

তার চেয়ে কম বলে তো মনে হয় না,—তিনটে তাকই ভর্তি ছিলো। রয়ের চোখে দেখলাম উৎকণ্ঠার ছায়া। সে টেবিল-এ ঘুঁষি মেরে বললো, জানিস, মাত্র পাঁচশো ডলারেব জন্য আমাকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, যেমন করেই হোক কিছু টাকা আমাকে ব্যবস্থা করতেই হবে। শুধু সামান্য একটু হাতের কাজ—

অসম্ভব কিছু নয়। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো। আমি বহুদিন থেকে এই ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। উত্তেজনায় উঠে বসলাম ডেস্কের ওপর, সুতরাং—

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চললো। কাজটা খুবই সহজ বলে মনে হলো।

প্রথমেই আমাদের খোঁজ নেওয়া দরকার যে এই কুপার লোকটা রোজ ক'টার সময় ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে যায়, আর সময়টা জানতে পারলেই আমাদের কাজ শুরু হবে,—অর্থাৎ ফ্ল্যাটে ঢুকে সিন্দুক খুলে, তাড়াতাড়ি মাল হাল্কা করা। আত্ম প্রত্যয়ের একটুকরো বাঁকা হাসিতে রয়ের ঠোঁট নেচে উঠলো, সে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললো,ঐ নকল চাবিটা নিয়ে কুপারের বাড়িতে গিয়ে দরজায় যে দারোয়ানটা থাকে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে হবে, কথায় কথায় কুপার কখন বাড়ি থেকে বের হয় সেটা জেনে যেতে হবে। কাজটা মনে হয় খুব একটা শক্ত হবে না। ব্যাপারটা আলোচনার পর মনে হলো এর থেকে সহজ কাজ বোধ হয় আর হতে পারে না।

পর দিন রাতে নকল চাবিটা নিয়ে অ্যাশলি আর্মস-এ গেলাম, রয় বলেছে হাতের কাজ শেষ করেই ও অ্যাশলি আর্মসে ট্রাক নিয়ে চলে আসবে। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

যখন অ্যাশলি আর্মস-এ পৌছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্রাক ছেড়ে পায়ে পায়ে দ্বার রক্ষীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি লোকটা বসে বসে একটা পকেট বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। বই বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো, মিঃ কুপারের সঙ্গে দরকার বুঝি? কিন্তু উনি তো বেরিয়ে গেছেন। আধ ঘণ্টার আগে ফিরবেন না।

আমি বললাম, কি আর করা যাবে ওনার কাছে একটা জিনিস দেবার ছিল, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম, বললাম, তুমি ঠিক জানো আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ কুপার ফিরে আসবেন?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোনও দিন তাঁর দেরী হয় না। ঠিক আটটার সময় বের হন আর রাত এগারোটার সময় ফেরেন। ডিনার খেয়ে একটার সময় আবার বেরিয়ে যান। আমিও একটা বাজলেই কেটে পড়ি। এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছেই এ বাড়ির নকল চাবি আছে। উনি শেষ রাতে ফেরেন। একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে ও বললো, আরে তুমি বিশ্বাস করবে না দোস্ত, কতদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে টেনে তুলেছে, কি ব্যাপার? না কোন্ শালা নাকি দরজার চাবি হারিয়ে বসে আছে। এই তো গত সপ্তাহে দরজার চাবি হারিয়ে আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুললো। চাবি হারানোর আর সময় খুঁজে পেলো না।

কুপার কি পাঁচটার সময়েই ফেরেন নাকি?

হাঁ, তারপর সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। একেবারে অপদার্থ।

আনন্দে আমার চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। যতটুকু জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম লম্বা লম্বা পা ফেলে হেনরী কুপার এগিয়ে আসছেন। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক এগারোটা বাজে।

দ্রুত পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আপনার নকল চাবিটা নিয়ে এসেছি স্যার। আমি তাঁকে আরো বললাম যে, আমার মনে হয় চাবিটা ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা একবার পরখ করা দরকার, আপনি যদি বলেন—

তিনি আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে অনুসরণ করতে বলে তিনি লিফটের দিকে পা বাড়ালেন।

চারতলায় পৌঁছে কুপার তাঁর ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে আমাকে আহ্বান জানালেন। আর আমিও তাঁর পেছন পেছন বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম।

হেনরী কুপার ছবিটা সরিয়ে আমাকে চাবিটা পরীক্ষা করার জন্য ইশারা করলেন। আমি চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুক খোলার চেষ্টা করলাম। কুপার ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ছোট ছোট চোখ জোড়া সিন্দুকটির ওপর নিবদ্ধ।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই সিন্দুকের দরজা খুলে গেলো। চোখের সামনে আবির্ভূত হলো চোখ ধাঁধানো কুবেরের সম্পদ।

কিছুক্ষণ পরে সিন্দুক বন্ধ করে কুপারকে চাবিটা এগিয়ে দিলাম। তিনি চাবিটা নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। এবারে আমি কুপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিফটে পা দিলাম। রাস্তায় নেমে বৃষ্টির বেগকে উপেক্ষা করে ক্ষিপ্রপায়ে হেঁটে চললাম। বৃষ্টির ফোঁটায় ঝাপসা পর্দা ভেদ করেও দেখা যাচ্ছিলো অদূরে দাঁড়ানো ট্রাকটাকে। ট্রাকে বসে রয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমি ট্রাকে উঠতেই রয় স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছুটিয়ে চললো বৃষ্টিভেজা রাস্তা ধরে, আমি এবং রয় ঠিক করলাম রবিবার দিনটাকেই কাজে লাগাবো।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি। রয় আগে থেকেই একটা গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলো। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা ও আমার বাড়িতে এলো। আমি অবশ্য তৈরী হয়েই ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে রয় গাড়ি ছুটিয়ে দিলো অ্যাশলি আর্মসের দিকে। আমরা দু'জনেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। কেমন একটা নিঃশব্দ উৎকণ্ঠা অনুভূত হচ্ছিল। শুধু অনুভব করলাম বুকের মধ্যে অশান্ত হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি। বৃষ্টি পড়ার জন্য রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আমরা অ্যাশলি আর্মসে পৌঁছলাম।

সারি সারি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তাটায়, একটা ক্যাডিলাক এবং একটা প্যাকার্ডের মাঝে গাড়িটা ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলো রয়। এবার শুরু হলো আমাদের উদগ্রীব প্রতীক্ষা। আমরা পলকহীন চোখে চেয়ে রয়েছি অ্যাশলি আর্মসের সদর দরজার দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ পরিষ্কার ছন্দে শোনা যেতে লাগলো। উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটি স্নায়ু কাঁপছে।

ঘড়িতে তখন রাত একটা। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম একজন লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি রয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রয়ের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

কুপার রাস্তায় এসেই মাথা ঝুঁকিয়ে দৌড়তে শুরু করলো। আমাদের গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাখা ছিলো একটা সাদা জাগুয়ার। হাত দিয়ে বৃষ্টির বেগ প্রতিহত করতে করতে জাগুয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলো কুপার। গাড়িতে উঠেই গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকার গ্রাস করলো সাদা জাগুয়ারটাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বাররক্ষীকে আবার এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। তারপর চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলো সদর দরজা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো বাড়ির অপর প্রান্তে। সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলো।

রয় বললো, আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমি যন্ত্রপাতির ব্যাগটা শক্ত হাতে চেপে ধরলাম। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বাইরে আসতেই বৃষ্টির জল একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ে, মুখে, মাথায়। সদর দরজা লক্ষ্য করে আমরা ছুটে গেলাম। আগে থেকেই আমরা সব ঠিক করে

রেখেছিলাম। আমার কাজ হবে তালাটা খোলা, আর রয় চারপাশে লক্ষ্য রাখবে। কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমাকে সতর্ক করে দেবে।

দরজার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে পকেট থেকে চাবি ভর্তি রিংটা বের করলাম। চটপট রিংটা খুলে নিয়ে তালাটার দিকে মনোযোগ দিলাম।

এমনিতে এ ধরনের তালা খোলা আমার কাছে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু ভয়ে আমার হাত কাঁপছিলো। তাই তালা খুলতে একটু বেশী সময়ই আমার লেগে গেলো।

অতি সন্তর্পণে দরজাটা ফাঁক করলাম, তারপর আমি আর রয় নিঃশব্দে ভেতরে পা বাড়ালাম। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র গতিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করে ছিলাম যে লিফট ব্যবহার করবো না। কারণ দ্বাররক্ষী যদি হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, তবে লিফটের আলো দেখে ঠিক সন্দেহ করবে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যখন কুপারের ফ্লাটের সামনে পৌঁছলাম তখন আমরা রীতিমতো হাঁপাচ্ছি। পকেট থেকে চাবির রিংটা বের করে একটা চাবি লাগাতেই খুলে গেলো ফ্ল্যাটের দরজা। হাতের চাপে ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা। ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমাদের গ্রাস করলো। ঘরে ঢুকে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখার চেষ্টা করলাম। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম সামান্যতম শব্দ। উৎকণ্ঠায় স্নায়ু যেন ভেঙে পড়তে চাইছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ বোর্ডের কাছে এগিয়ে গেলাম, আলো জ্বাললাম। ধবধবে মার্কারী ল্যাম্পের চোখঝলসানো আলোয় ঘর ভেসে গেলো। রয় ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। এবারে আমরা দেরী না করে অয়েল পেন্টিংটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছবিটা একপাশে সরাতেই সামনেই সিন্দুক। রয় তাড়া লাগালো। কম্বিনেশন নম্বরটা আমার মখস্থ ছিল। তাছাড়া সঙ্গে ছিলো সিন্দুকের নকল চাবি। কুপারের চাবিটা তৈরী করার সময় এটাও তৈরী করিয়ে নিয়ে ছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে ফেললাম সিন্দুকের দরজা।

আমরা দু'জনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম টাকার পাহাড়ের দিকে। রয় আনন্দে বলে বসলো, তা হলে বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে কি বলো? সত্যিই পৃথিবীতে এর থেকে সহজ কাজ বোধ হয় আর হতে পারে না। আমার বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়লো। কতক্ষণ যে আমরা ঘোরের মধ্যে ছিলাম জানি না, একটা শব্দে আমাদের চমক ভেঙে গেলো। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো। আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালাম।

একটা চাবির অগ্রভাগ বেরিয়ে আছে চাবির ফুটো দিয়ে, চাবিটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। আমাদের আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখের সামনেই 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হলো এবং চাবিটা ফুটো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো, আমি তখন জড় পদার্থের মতন অচল-অনড়। দেহের সমস্ত অনুভূতি যেন জমে বরফে পরিণত হয়েছে, দেখলাম রয় হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে গেলো সুইচবোর্ড লক্ষ্য করে, আর একই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করলো দরজার হাতলটা। অর্থাৎ কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলছে।

রয় সুইচ অফ করার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। পর মুহূর্তে ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে লাগলো। বারান্দার একফালি আলো ঘরে এসে পড়লো। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেলো। রয়কে অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সেই আগের দিনের দেখা মেয়েটি। কিছুক্ষণ আমরা বারান্দা থেকে ঠিকরে আসা আলোয় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরক্ষণেই মেয়েটির তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকারে চমকে উঠলাম, চোর চোর।

হেনরী—ঘরে চোর ঢুকেছে—আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা দুটো যেন কেউ মেঝের সঙ্গে আটকে রেখেছে। দেখলাম, কুপার এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পিছনে। এক ঝটকায় মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কুপার আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। চোখের দৃষ্টিতে যেন আক্রোশের লেলিহান শিখা।

আমি তখন আতঙ্কে কি করবো ঠিক করতে পারছিনা।

মেয়েটি ঝড়ের বেগে সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটে গেলো। ওর তীক্ষ্ণ কানফাটানো আর্তচীৎকারে

গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠতে লাগলো। এবারে রয়কে আমি দেখতে পেলাম। জাগুয়ারের মতো গুঁড়ি মেরে দেওয়াল ধরে এগিয়ে চললো দরজার কাছে। কুপারের ঠিক পেছনে। কুপার রয়কে দেখতে পায়নি, সে সোজা এগিয়ে আসছিলো আমার দিকে। দু-হাত বাড়িয়ে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কিছু একটা ঝলসে উঠলো রয়ের হাতে। একটা জোরে শব্দ হলো। কুপারের বিশাল দেহ গোড়াকাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে।

লক্ষ্য করলাম, রয়ের দু'হাতে, বজ্র মুষ্ঠিতে ধরা রয়েছে সেই ভারী ফুলদানিটা। অর্থাৎ হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, ঐ ফুলদানিটাই কুপারের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে রয়।

আমি যেন এতক্ষণ দেখা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠলাম। এখন একটাই চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো, আমাকে পালাতে হবে। আমি আব দেরী না করে পাগলের মতো দৌড়োতে লাগলাম। আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চললাম। নীচ থেকে মেয়েটির গলা ফাটানো আর্তচীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা—যে করে হোক আমাকে গাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।

রয়ের চাপা গলা শুনতে পেলাম, শেট, নীচে নয়—ওপরে আয়—ওপরে—। ওর কথা আমার আচ্ছন্ন মনে কোনো রেখাপাত করলো না। এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে উন্মাদের মতো ছুটে চললাম।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনতলায় পৌঁছলাম। নীচের তলার সিঁড়ি লক্ষ্য করে দৌড়োতে শুরু করলাম। কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়লাম। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে আঘাত গ্রাহ্য না করে আবার দৌড়োলাম। ছুটতে ছুটতে অবশেষে দালানে এসে উপস্থিত হলাম।

মেয়েটি তখন দ্বাররক্ষীর অফিসের কাছে দাঁড়িয়ে, দরজার হাতল ধরে টানাটানি করছে। আমার দিকে নজর পড়ায় মেয়েটি আমাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তারপর শুরু করলো আর্ত চীৎকার। কিছুক্ষণ পরে দ্বাররক্ষী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপর। দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়লাম মেঝের ওপর। ওর শক্ত হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আমি শুধু কোনরকমে পালাতে পারলেই বাঁচি।

ভয়ে মরিয়া হয়ে লোকটার চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে সজোরে ঠুকে দিলাম। তাতেও যখন কোনো ফল হলো না তখন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। তারপর গায়ের জোরে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম সদর দরজা লক্ষ্য করে।

দরজা খুলে ঠিক বাইরে পা দিচ্ছি এমন সময় বেজে উঠলো কানফাটানো এক পুলিশি-হুইস্‌ল্। নিশ্চয়ই এটা দ্বাররক্ষীর কাণ্ড!

মেয়েটির বীভৎস চীৎকার, আর এই হুইস্‌ল্-এর কানফাটানো শব্দে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চমকে উঠলাম। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রাস্তা লক্ষ্য করে দৌড়তে লাগলাম।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে আর আমি সেই বৃষ্টির মধ্যে ছুটে চলেছি। কানে তখনও ভেসে আসছে সেই চীৎকার। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি দৌড়ে আসছে আমার পেছন পেছন। তার মাথায় টুপি, কোটের বোতামগুলো অন্ধকারেও ঝকমক করছে—পুলিশ। ভয়ে আমার শরীর অবশ হয়ে এলো—মনে মনে ভাবলাম একবার গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলেই হলো। সামনেই আমাদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। নতুন আশা নিয়ে প্রাণপণে গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে চললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেসে এলো রিভলবারের শব্দ—উঃ আমার গাল ছুঁয়ে একটা আগুনের হলকা বেরিয়ে গেলো।

মনে হলো যেন আমার গালের চামড়া পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলাম।

মাথা নীচু করে রাস্তার অপর প্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটে চললাম, সেদিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। যদি ওখানে পৌঁছতে পারি তবে পালাবার আশা আছে।

ছুটতে ছুটতে আবার শুনতে পেলাম সেই কালান্তক রিভলভারের শব্দ—উঃ—। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ভিজে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। মনে হলো কেউ যেন একটা

উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিঁধিয়ে দিয়েছে আমার পিঠে। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বরই বের হলো না। নিজের অজান্তেই একটা হাত চলে গেলো পিঠে। হাত সামনে আনতেই দেখলাম হাতময় রক্ত। সেই রক্ত বৃষ্টির জলে ধুয়ে টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়ছে—একে একে আমার প্রতিটি অনুভূতি অবশ হয়ে আসতে লাগলো—

কানে আসতে লাগলো কয়েক জোড়া ভারী বুটের শব্দ—খট—খট—খট—। মনে হলো কারা যেন আমার দিকে দৌড়ে আসছে তীর বেগে।

—উঃ—কী ভীষণ অন্ধকার—! মাগো—

এরপর আর আমার কিছুই মনে নেই।

।। দুই ।।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো কেউ যেন ফিসফিস করে কথা বলছে—অনেক—অনেক—অনেক দূর থেকে—

ক্রমশঃ চেতনা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। একে একে সেই যন্ত্রণাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। দুধ সাদা চার দেওয়ালে ঘেরা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি আমি। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। দু'টো উদ্গ্রীব চোখ স্থির লক্ষ্যে আমার দিকে চেয়ে আছে। এক সময় সেই মুখের ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেলো। বুকের মধ্যে তীব্রতর হলো সেই অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ বন্ধ হয়ে এলো। কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনের পর্দায় ছবির মতো একে একে ভেসে উঠতে লাগলো। মনে পড়ে গেলো পাগলের মতো সিঁড়ি ভেঙে দৌড়োনোর কথা, দ্বাররক্ষীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি, মেয়েটির বীভৎস আর্তচীৎকার, অন্ধের মতো রাস্তা লক্ষ্য করে আমার ছুটে যাওয়া—সব একে একে মনের পর্দায় ছবির মতো ফুটে উঠলো।

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এই হলো পরিণতি। আমি আজ আহত অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণাকৃতি এক পুলিশ সার্জেন্ট—একেই বলে ভাগ্য।

কিছু কিছু কথা আমার কানে আসতে লাগলো—আপনি তো বলছেন, এর আঘাত নাকি ততোটা গুরুতর নয়, তাহলে ব্যাটা নিশ্চয় মটকা মেরে পড়ে আছে। কলার ধরে তুলে এক লাথি ঝাড়লেই সুড়সুড় করে জ্ঞান ফিরে আসবে। সার্জেন্টের শ্লেষ ভরা অধৈর্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

না-না—তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না সার্জেন্ট, লোকটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। গুলিটা আর একটু বাঁদিকে ঘেঁষে গেলেই—। শান্ত ভদ্র কণ্ঠস্বর, সম্ভবতঃ ডাক্তারের।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বেশ ভালোরকম বুঝতে পারছি। চোখ পিট পিট করে তাকালাম। বিছানার পাশে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম জনের চেহারা মেদবহুল, মুখে প্রশান্তির ভাব, গায়ে একটি সাদা আলখাল্লা। নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার। দ্বিতীয় জন ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। ভোঁতা নাক পাতলা বেঁটে আর ছোট ছোট হিংস্র চোখ। পরনে তেলচিটে ময়লা পোশাক। কিন্তু তার টুপি পরার ধরণ দেখেই বুঝলাম যে এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক।

চুপচাপ শুয়ে বুকের যন্ত্রণা সহ্য করছি। হঠাৎ রয়-এর কথা মনে পড়লো। রয় যদি ঠিকমতো সবার অলক্ষ্যে অ্যাশলি আর্মস ছেড়ে পালাতে পেরে থাকে, তবে ওর আর জড়িয়ে পড়ার কোনো ভয় নেই। কারণ কুপারের টাকা প্রথম দিন আমার চোখেই পড়েছিলো, দ্বাররক্ষীর সঙ্গে আমিই গল্প করেছিলাম। আমাকেই লোকেরা সিঁড়ি ভেঙে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখেছে। সুতরাং মনে হয় রয়ের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

এক অজানা আতঙ্ক হঠাৎ মনের মধ্যে এসে ভিড় করলো।

কুপারের কিছু হয়নি তো? মনে পড়ে গেলো একটা ভারী ফুলদানি দিয়ে রয় এক আসুরিক শক্তি নিয়ে কুপারের মাথায় বসিয়ে দেয়।

একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এলো। ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখলাম এক সার্জেন্টের হিংস্র মুখ আমার

চোখের দিকে তাকিয়ে।

সার্জেন্টটি তার বীভৎস মুখ আমার মুখের ওপর নামিয়ে এনে বললো, ঢের হয়েছে। এবার দয়া করে মুখ খুলুন দেখি, আপনার শ্রী মুখের বাণী শোনার জন্য গত দু'দিন ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।—নেকড়ের মত দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলো সে। শুরু হলো পুলিশের হাতে নরক যন্ত্রণা।

ওদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল কাজটা আমি একা করিনি। তাই বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে ভয় দেখিয়ে আমার মুখ থেকে কথা বের করতে চাইলো। ওদের কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, রয়ের উপস্থিতির কোনো প্রমাণই পুলিশের হাতে নেই। এমনকি কুপারের খুনের দায়ে আমাকেই পড়তে হবে বলে ভয় দেখালেও আমি মুখ খুললাম না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ওরা ক্ষান্ত হলো। একথা বললো যে কুপার সেরে উঠেছে। আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে কুপারের সেরে ওঠাটা ওরা ভালো চোখে দেখছে না। সার্জেন্ট দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে তাকালো, কুপার বেঁচে গেছে বলে ভেবোনা যে, তুমিও বেঁচে যাবে। এ আঘাতে কুপার মারাও যেতে পারতো।—তবে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই বাছাধন, তোমার দশ বছরের ঘানি ঘোরানো কেউ আটকাতে পারবে না—হায়না হাসির সঙ্গে ওর বিশাল দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

হাসপাতাল থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেল হাজতে। সেখানে তিনমাস কাটানোর পর জানতে পারলাম, কুপার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

একে একে বিচারের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। চিরকাল আমার এই দিনটা মনে থাকবে। আদালতে এসে চারিদিকে চোখ বোলালাম। যদি কোনো পরিচিত মুখ নজরে পড়ে যায়। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়লো জেনি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ও হেসে হাত নাড়লো।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে জেনি এখানে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

তারপরই চোখ পড়লো, আমার বস—ফ্রাঙ্কলিনের ওপর ; আর তার পাশে ভিজে বেড়ালের মতো চুপটি করে বসে আছে রয়।

রয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো—ওর মুখ পাণ্ডুর। মনে হলো এই তিনমাস শুধু ভেবেছে সে, ওর নাম আমি পুলিশকে জানিয়েছি কি না।

এবারে বিচারপতির দিকে চোখ পড়লো, কোটরগত অনুভূতিহীন চোখ। সারা মুখ জুড়ে এক অদ্ভুত কাঠিন্য, দেখা গেলো যে সাক্ষীর কাঠগোড়ার দিকে কুপার এগিয়ে আসছে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখমুখ বিবর্ণ।

কুপার শপথ নিলো। তারপর সিন্দুক খোলার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো থেকে শুরু করে—নকল চাবির কথা, ওকে আক্রমণ করার কথা—একে একে সব বলে গেলো। কিছুই বাদ দিলো না।

এরপর কাঠগোড়ায় এসে উপস্থিত হলো, কুপারের ফ্ল্যাটে দেখা সেই মেয়েটি। ওর পরণে একটা চাপা আকাশ-নীল পোশাক। আদালতের সমস্ত লোক, এমন কি বিচারপতি পর্যন্ত ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

মেয়েটি যা বিবৃতি দিলো তার থেকে জানা গেলো যে, মেয়েটি কুপারের একটা নাইট ক্লাবে গান গায়। সেদিন একটা গানের রিহার্সাল দিতে ও কুপারের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলা, এরকম ও মাঝে মধ্যেই যায়। সেদিন কুপার ফোন ধরতে পাশের ঘরে গেলে, আমি যে সিন্দুক খুলে টাকাগুলো দেখেছিলাম, সেকথার ওপর মেয়েটা একটু বেশী জোর দিল।

আমাকে খুব অবাক করে দিলো ফ্রাঙ্কলিনের সাক্ষ্য! তিনি কাঠগোড়ায় উঠে আমার প্রশংসাই করলেন। আমি যে তাঁর কোম্পানির একজন বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্মচারী, সেকথা তিনি বিচারপতিকে বার বার জানালেন।

এরপর আমার উকিল উঠে দাঁড়িয়ে আদালতের কাছে আমার জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন।

অর্থাৎ এই আমার প্রথম অপরাধ, সুতরাং বিচারপতি যেন শাস্তির ব্যাপার একটু চিন্তা করে দেখেন। তাঁর কৃপা প্রার্থনার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, আমি দোষী সাবাস্ত হওয়াতে তিনি বেশ আনন্দিত হয়েছেন। এরপর তিনি চেয়ারে বসে কতকগুলো কাগজপত্র ওল্টাতে লাগলেন, মনে হলো ওগুলো তার পরবর্তী মামলার কাগজপত্র। এক কথায় উকিলটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার মামলা নিয়ে ফালতু সময় নষ্ট করে যে আর লাভ নেই, সেটা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন।

এরপর কানে এলো বিচারপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, শেট কারসন, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিচার করে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, তুমি দোষী। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু এটাই তোমার প্রথম অপরাধ, সেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে লঘুদন্ড দিতে আমি আইনসঙ্গত ভাবে বাধ্য। তুমি যেভাবে মিঃ হেনরী কুপারকে আক্রমণ করেছো, তাতে তোমার হিংস্র মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সুনাম তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছো। কারসন, যে কোম্পানিতে তোমার বাবা এবং ঠাকুরদা বিশ্বস্তভাবে কাজ করে গেছেন, তুমি তাদেরই বংশধর হয়ে এই হীন কাজ করেছো, একথা ভাবতেও তাঁরা লজ্জাবোধ করবেন—।

বিচারপতির কোনো কথাই তখন আমার কানে ঢুকছে না। আমি শুধু বিচারপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম আমার শাস্তির মেয়াদ কত বছরের? পাঁচ—দশ—না পনেরো?

—সমস্ত বিচার করে আমি তোমাকে ফার্নওয়ার্থ বন্দীশিবিরে দশ বছরের নির্বাসনদণ্ড দিলাম। বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো। প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আফশোসের রুদ্ধ কান্না সমস্ত সত্ত্বাকে ভেঙে খানখান কবে দিলো।

আগামী দশটা বছরের কথা চিন্তা করে হৃদপিণ্ড আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলো। মনে হলো গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠি। দোহাই হুজুর, আমাকে কুড়ি—পঁচিশ—.যত বছর খুশী কারদণ্ড দিন কিন্তু ফার্ণওয়ার্থ—ভাবতেই পারছিনা।

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে এক অদ্ভুত চিন্তা এসে ভীড় করলো—রয়ই তো এসবের জন্য দায়ী। ও যদি কুপারকে না মারতো তবে তো আমাকে ফার্ণওয়ার্থে যেতে হতো না। হয়তো পাঁচ বছর জেল খেটেই রেহাই পেতাম।—শুধু রয়ের জন্যই আজ আমাকে ফার্নওয়ার্থে যেতে হচ্ছে।

এখন মুক্তি পাবার একমাত্র পথ রয়ের নাম জানিয়ে দেওয়া। মনস্থির করে নিয়ে এক ঝটকায় সিধে হয়ে দাঁড়ালাম। মুখ তুলতেই চোখ পড়লো রয়ের চোখে।

ফ্রাঙ্কলিনের পাশে সোজা হয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে রয়। আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় ওর মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ! সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে।

রয়ের দিকে চেয়ে মনে পড়লো আমাদের ছেলেবেলার কথা। সেই যখন আমরা একসঙ্গে স্কুলে যেতাম—গাছ থেকে ফল পাড়তাম—মাছ ধরতাম। এমনি আরও কতো ছোট ছোট ঘটনা ছবির মত ভেসে উঠলো মনের পর্দায়।—রয়ই ছিলো আমার একমাত্র বন্ধু—এবং এখনও আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হাসলাম। বোঝাতে চাইলাম যে, তোর কোনো ভয় নেই রে, রয়। যতোক্ষণ আমি বেঁচে আছি, এতটুকু বিপদের ছোঁয়া তোর গায়ে লাগতে দেবো না। অবাধ্য চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। রয়ের দিকে চেয়ে হাত নাড়লাম। ওর মুখ ঝাপসা হয়ে এলো।

পেছন থেকে কনস্টেবলের ধাক্কা খেলাম। ধীরে ধীরে আদালত ছেড়ে এগিয়ে চললাম। শেষ বারের মতো জেনির দিকে তাকালাম, ও কাঁদছে—, হ্যাঁ সত্যিই ও আমার জন্য কাঁদছে—।

ডুকরে কেঁদে উঠলাম। জলভরা চোখে ফিরে তাকালাম রয়ের দিকে। ওর চোখেও জল। মুখে কৃতজ্ঞ হাসি। যেন মুক্ত—আমি ওকে রেহাই দিয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম সামনে অপেক্ষা করছে অন্ধকার ভবিতব্য আব অসীম নরক যন্ত্রণা—ফার্নওয়ার্থ—! রক্তজমানো একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেলো শিরদাঁড়া বেয়ে।

একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে আমার বন্ধু রয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

আমি ওকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছি। নিজের বিবেকের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। বারবার মনে হতে লাগলো—রয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—ও আমার বন্ধু ছিলো—আছে—এবং থাকবে—।

এই ফার্নওয়ার্থ বন্দীশিবির হলো জমাট দুঃস্বপ্নের কুৎসিত নরক। কাগজপত্রে এই বন্দীশিবিরের বীভৎসতা নিয়ে বহুবার লেখালেখি হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে এই শিবির বন্ধ করার জন্য। তিনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

জার্মান সৈন্যরা নাৎসী বন্দী শিবিরের জন্য আজও বিখ্যাত। সেখানে তারা অকথ্য অমানুষিক অত্যাচারের যেসব উপায় বের করেছিলো তা শুনে আজও সাধারণ মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু এহেন কুখ্যাত নাৎসী বন্দীশিবিরকেও হার মানতে হয়েছিলো ফার্নওয়ার্থের কাছে। এর বীভৎসতা নাকি কল্পনা করা যায় না।

খবরের কাগজের লেখা প্রবন্ধগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে ফার্নওয়ার্থকে নরকেরও নরক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সাধারণ জেলের মতো ফার্নওয়ার্থের চারিদিকে বিশাল উঁচু পাঁচিল এবং কয়েদীদের কুঠরি আছে, একথা ভাবলে ভীষণ ভুল করা হবে। ওসবের কোনো বালাই ফার্নওয়ার্থে নেই। এখানে কয়েদখানা বলতে ধূ ধূ করছে এক বিশাল তেপান্তরের মাঠ তার মাঝে একটা ঘর। পঞ্চাশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া। ঘরে ঢোকবার একটাই দরজা, নিরেট লোহার তৈরী। এছাড়া মোটা লোহার গরাদ বসানো একটা ছোট্ট জানলা আছে—তাও প্রায় মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। সেটা দিয়ে খুব সামান্যই আলো আসে।

পাহারাদার হিসেবে দিনের বেলায় আছে বন্দুকবাজ প্রহরীর দল, এদের মধ্যে ছ'জন অশ্বারোহী। তাদের শক্তিশালী রাইফেল দিয়ে দু-মাইল দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করা যায়। বহুদূরে দেখা যায় এক চিলতে রূপোলী রেখা—নদী। তার তীরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নলখাগড়াব ঝোপ। এছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ দিনেব বেলা ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চেষ্টা করা আত্মহত্যারই সামিল। দিনের বেলা ফার্নওয়ার্থ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আর রাতের প্রহরী হলো একপাল রক্তলোলুপ হিংস্র হাউন্ড। তাছাড়া কয়েদিরা যাতে পালাতে না পারে তাই তাদের পায়ে লাগানো থাকে ভারী লোহার শেকল।

সবকিছু জেনেও প্রথমদিন ফার্নওয়ার্থে পা দিয়েই ঠিক করলাম যেভাবেই হোক এই জীবন্ত নরক ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে। এখানে দশ বছর থাকলে পাগল হতে বাধ্য। এই নরককুণ্ডে দশ বছর কাটানোর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো। যে করে হোক—যেমন করে হোক—আমাকে পালাতেই হবে।

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেলো। সকাল হলেই প্রহরীরা এসে আমাদের মাঠে নিয়ে যায়। নাম ডাকা হয়ে গেলে পোশাক ছেড়ে খালি গায়ে আমাদের কাজে যেতে হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

সাতাত্তর জন বিভিন্ন চেহারার কয়েদী দল বেঁধে এগিয়ে চলেছি—আর আমাদের দু-পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে তিনজন করে প্রহরী।

এরপর চলে পাথর ভাঙার কাজ। কাঠফাটা রোদে, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথর ভাঙতে হয়। দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ছ'জন ঘোড়ায় চড়া প্রহরী। এছাড়া আর যে ছ'জন আছে, তারা পায়চারী করে বেড়ায়। হাতে তাদের ধরা থাকে শঙ্করমাছের লেজ দিয়ে তৈরী লিকলিকে চাবুক। কারো কাজে সামান্যতম ঢিলেমি দেখলেই সেই চাবুক সপাৎ করে আছড়ে পড়তো খোলা পিঠে। চামড়া ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা রক্তাক্ত দেহে ফিরে চলি কয়েদখানার দিকে। দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসতে থাকে। চারিদিকে কেমন এক ক্লান্ত অথচ স্নিগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে। দূরের কোন গির্জা থেকে ভেসে আসে ঢং ঢং আওয়াজ। সারা রাতের কথা মনে পড়লেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। কারণ ফার্নওয়ার্থের দিনগুলো যেমন বীভৎস, তার চেয়েও ভয়াবহ এর রাতগুলো।

কয়েদখানার ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে দেওয়ালে গাঁথা লোহার জালের তৈরী শোবার তাক। একটার নীচে একটা—তার নীচে আর একটা—এইরকম অসংখ্য তাক। ঘরে টিমটিম করে জ্বালা থাকে কয়েকটা মাত্র লণ্ঠন। যার আলো কয়েদখানার পরিবেশকে ভয়াবহ করে তোলে। লোহার জালের ছায়াগুলো ঘরের নোংরা তেলচিটে দেওয়ালে কেঁপে কেঁপে উঠে একটা অমানুষিক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সাতাত্তর জন কয়েদীকে গরু-ছাগলের মতো ঢোকানো হয় সেই ঘরে। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে গোটা ঘরটা। স্নানের অভাবে আর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রত্যেককেই এখন পাগলের মতো দেখায়, একরাশ ধুলো ভরা মাথার চুলে জট, গালভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চোখে-মুখে হতাশা।

যে যার তাকে উঠে পড়ে শোবার আশায়। প্রহরীরা এসে প্রত্যেকের পায়ে শেকল লাগিয়ে তালা এঁটে দেয়। তারপর লণ্ঠনগুলো নিয়ে চলে যায়। নিঃসীম, জমাট অন্ধকারে ঘর ভরে যায়।

তার বের করা লোহার জালের ওপরেই গা এলিয়ে দিতে হয়। এতোটুকু নড়বার কোনো উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকের পায়ের শেকলই একটা বিরাট লম্বা শেকলের সাথে বাঁধা। এই বিরাট শেকলটা, কয়েকটা আংটার সাহায্যে সেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা ঘরের চার দেওয়ালের গা দিয়ে আটকানো, এমনভাবে যে কেউ যদি একটুও নড়াচড়া করে তবে বড় শেকলে টান পড়ার জন্য অন্যান্য সমস্ত কয়েদীর পায়েই টান পড়ে, এবং তাদের ঘুম ভেঙে যায়। নরকেও বোধ করি এর চেয়ে আরামে থাকা যায়। ঘুমের ঘোরে কোনো কয়েদী যদি আচমকা পাশ ফেরে, তবে শেকলে টান পড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্যে পাশের কয়েদী হিংস্রভাবে তার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দেয়। অন্ধকারেই ভেসে আসে আর্ত চীৎকার।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে বারে বারেই আমার মনের মধ্যে পালিয়ে যাবার চিন্তাটা ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

ফার্নওয়ার্থে রক্ষীর সংখ্যা মোট বারোজন। রাত হলে ওরা সকলেই ঘরে ফিরে যায়—শুধু একজন ছাড়া। তার নাম বাইফ্লিট। ওর কাজ, কুকুরগুলোকে দেখাশোনা করা। বাইফ্লিটের চেহারায় এমন একটা আদিম হিংস্র ভাব আছে যে রক্ত লোলুপ হাউন্ডগুলো পর্যন্ত ওকে দেখলে ভয় পায়। দিনেরবেলা কুকুরগুলো একটা বড়সড় লোহার খোঁয়াড়ে বন্ধ থাকে আর ওদের খাওয়ানো হয় দিনে মাত্র একবার। যার জন্য হাউন্ডগুলো বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে থাকে।

রাত আটটার সময় অন্যান্য প্রহরীরা চলে গেলে বাইফ্লিট পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কুকুরের খোঁয়াড়ের দিকে। ওর হাতে তখন থাকে একটা ভারী মোটা লাঠি। সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে ও গিয়ে খুলে দেয় খোঁয়াড়ের দরজা। একে একে বেরিয়ে আসে হিংস্র হাউন্ডের দল।

বাইফ্লিটের চেহারা দৈত্যের মতো বিশাল। বীভৎস—কুৎসিত মুখ, ইচ্ছামতো ও কুকুরগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভোর চারটের সময় কুকুরগুলোকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে খোঁয়াড়ে।

রাত্রে আমার ঘুম আসে না। তাই রাতের পর রাত জেগে কাটাই আর শুনি ক্ষুধার্ত সারমেয় দলের রক্ত হিম করা গর্জন। রাতে শুয়ে পালাবার কথা চিন্তা করলেই নির্মম রসভঙ্গের মতো শুনতে পাই হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন। পায়ের তালা লাগানো শেকল বা ঘরের লোহার দরজা, এ দুটোর কোনোটাই আমার কাছে সমস্যা নয়। কারণ প্রথম রাতেই আমার লোহার জাল দিয়ে তৈরী শোবার তাক থেকে অতিকষ্টে ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটুকরো তার ভেঙে রেখেছিলাম। আঙুল কেটে রক্ত বের হলেও মন ভরে গিয়েছিলো আনন্দে। ঐ তার এবং সামান্য সময় পেলে ফার্নওয়ার্থের যে কোনো তালাই আমি খুলে ফেলতে পারি। সিন্দুক কোম্পানি আমাকে মন ভরার মতো পয়সা না দিতে পারলেও, পৃথিবীর কঠিনতম তালা কি ভাবে খুলতে হয় সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকেই পালাবার চিন্তাটা আরো জমাট বেঁধেছে আমার উর্বর মস্তিষ্কে। কিন্তু রাত্রিতে হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন মনটাকে দমিয়ে দেয়, পালাবার চিন্তা করতে ভয় হয়।

দিনরাত মনে হয়, কিভাবে কুকুরগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু কিছুই আর মাথায় আসে না।

রোজ ভোরবেলা নাম ডাকার সময়, খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অসহায় ভাবে অর্ধভুক্ত

কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে দেখি। আমাদের দেখেই ওরা শিকার দেখার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে খোঁয়াড়ের গরাদের গায়ে।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য ঃ একটা লোক রাতের অন্ধকারে ছুটছে আর তার পেছন পেছন নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে দশটা হাউন্ড। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেললো তার দেহ। ওঃ কি ভয়ানক!

ফার্নওয়ার্থে প্রায় একমাস কাটানোর পর আমাকে ঢোকানো হলো রান্নাঘরের কাজে। সেখানে আমাকে জল তুলতে হয়, বাসন মাজতে হয়, মশলা পিষতে হয়—মশলা বলতে শুধু মরিচ। প্রত্যেক কয়েদীই এই কাজটাকে ভীষণ ভয় করে। এর চেয়ে বাইরে পাথরভাঙা ওদের কাছে অনেক ভালো।

বন্দীদের জন্য যা খাবার তৈরী হয় সে আর বলার নয়। দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আসে। বিশ্রী গন্ধকে চাপা দেওয়ার জন্য পাচক ঐ মরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করে থাকে। ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। একদিন এই মরিচ পিষতে পিষতেই কুকুরগুলোকে বোকা বানাবার মতলব আমার মাথায় এলো। মনে মনে ভাবলাম রান্নাঘরের কাজটা নিয়ে বেশ ভালোই হয়েছে, বেশ উৎসাহ পেলাম। এতোদিনে একটা উপায়ের মতো উপায় খুঁজে পাওয়া গেল।

পর পর কয়েকদিন রান্নাঘরের কাজ করার পর কয়েদখানায় ফেরার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে পকেটভর্তি করে মরিচের গুঁড়ো নিয়ে এলাম। পাচক জানতেই পারলো না। সেই মরিচকে একটা ছোট্ট পুঁটলি করে আমার শোবার তাকের এককোণায় লুকিয়ে রাখলাম। কারণ এই মরিচই এখন আমার প্রাণ।

এইভাবে পালাবার পথে আমি দু-ধাপ এগিয়ে গেলাম।

প্রথমতঃ দরজা খুলতে আমার অসুবিধা হবে না আর দ্বিতীয়তঃ কুকুরগুলোকে অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে মরিচ। সুতরাং এ দুটো জিনিসের সাহায্যে আমি মাঠ ছাড়িয়ে অন্ততঃ দূরে নদীর কাছে পৌঁছতে পারবো। আর তারপর লুকোবার জন্যে নদীর পাড়েই তো রয়েছে ঘন নলখাগড়ার ঝোপ। সুতরাং ফাঁকা মাঠ পার হয়ে নদী পর্যন্ত আমাকে পৌঁছতে হবে। তারপরই ভরসা ঐ নলখাগড়া।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই কয়েকদিন পেরিয়ে গেলো। কোনো সমাধানেই পৌঁছতে পারলাম না। তারপর একদিন—রয়ের কাছে থেকে শেখা, কুপারের দারোয়ানকে পটানোর বুদ্ধির কথা মনে পড়লো—আর দেরী না করে পরদিন সকালে রান্নাঘরে পৌঁছেই রাধুনি ব্যাটার সঙ্গে সুযোগ বুঝে সুখদুঃখের গল্প জুড়ে দিলাম। আমি কায়দা করে জেনে নিলাম প্রহরার ব্যাপারটা। বাইফ্লিটের গতিবিধির কথা ওর থেকেই জেনে নিলাম।

প্রতিদিন রাত আটটায় অন্যান্য প্রহরীরা বাইফ্লিটের ঘাড়ে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ঘুমোতে চলে যায়। বাইফ্লিট কয়েদখানার দরজায় তালা দিয়ে খোঁয়াড়ে গিয়ে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। তারপর অদূরে এক কুঁড়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভোর চারটের সময় বাইফ্লিট কুঁড়েঘর ছেড়ে বেরিয়ে রান্নাঘরে যায়। সেখানে কুকুরগুলোর জন্যে দুটো ঝুড়িতে মাংসের ছাঁট রাখা থাকে। সেই ঝুড়ি দুটো নিয়ে বাইফ্লিট খোঁয়াড়ে যায়। কুকুরগুলোও ওকে অনুসরণ করে। খোঁয়াড়ের ভেতর ঢোকার পর ওদের খাওয়া শুরু হয়। শুয়ে শুয়েই শোনা যায় কুকুরগুলোর বীভৎস চীৎকার। কেঁউ কেঁউ শব্দ শুনলেই মনে হয় বাইফ্লিট লাঠি দিয়ে প্রয়োজন মতো মারছে। এমনি করে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সাড়ে চারটের সময় খোঁয়াড় বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেই শোনা যায় বৈদ্যুতিক বাঁশীর কানফাটানো শব্দ—এটাই ছিল বাইফ্লিটের প্রতিদিনের সংকেত। এরপরই কয়েদীরা জেগে যায়। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। ঠিক করে ফেললাম, যখনই বাইফ্লিট চারটের সময় কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে, তখনই কয়েদখানার দরজা খুলে ছুট লাগাবো—সোজা নদীর দিকে—।

হাতে সময় খুব কম পাওয়া যাবে পালাবার জন্য। তবুও তার মধ্যেই পালাতে হবে। ঠিক মতো

মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি দৌড়োতে পারি তবে নদী পর্যন্ত পৌঁছতে মিনিট ছয়েকের বেশী লাগবে না। তারপর থেকেই কুকুরগুলোকে ধোঁকা দেবার জন্য মরিচের গুঁড়ো কাজে লাগাবো। প্রহরীরা যদি খুঁজতে বের হয় তবে তখনকার মতো নলখাগড়ার ঝোপে গা ঢাকা দিলেই হবে। সকলের চোখ এড়িয়ে চলার পক্ষে রাতের অন্ধকার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এইভাবে শুধু রাতের অন্ধকারই আমাকে সাহায্য করবে রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছতে। ফার্নওয়ার্থ থেকে রেললাইনের দূরত্ব কুড়ি মাইল। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। যে কোনো ট্রেনে উঠে ওকল্যান্ডে নামলেই হলো। এই জেলার মধ্যে ওকল্যান্ডই সবচেয়ে বড় শহর। সেখানে লোকের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বেশী সময় লাগবে না।

আমার সামনে এখন একটা বিরাট সমস্যা রয়েছে। পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলতে আমার কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগবে। কিন্তু কয়েদখানার ভারী দরজা খোলা অতো অল্প সময়ে হবে না। ওই দরজা খোলার সময় অন্য কোন কয়েদী যদি জেগে ওঠে এবং চীৎকার শুরু করে দেয়, আর তা যদি বাইফ্লিটের কানে যায় তাহলেই সর্বনাশ হবে।

পালাবার পথে যখন এতোটা এগিয়ে এসেছি তখন এই সামান্য সমস্যার নিখুঁত কোনো সমাধান না করে এক পা-ও এগোচ্ছি না। তাতে যদি দু-একদিন দেরী হয় তো হোক।

হঠাৎ বয়েডের কথা আমার মনে পড়ে গেলো—ওকে দিয়েই কাজ হবে।

প্রত্যেক কারাগারেই এমন একজন কয়েদী থাকে যাকে অন্যান্য কয়েদীরা তার দৈহিক শক্তির জন্য ভয় পায়। এখানেও এমনি এক মস্তান আছে তার নাম জো বয়েড। বয়েড লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশী হবে না, কিন্তু চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। মুখভর্তি কাটা দাগ। সম্ভবতঃ ছুরির আঘাতেই হয়েছে। নাকটা মুষ্টি যোদ্ধাদের মতো চ্যাপ্টা। জ্বলজ্বল করছে কুতকুতে দুটো চোখ। মোট কথা বয়েডের চেহারা অনেকটা গরিলার মতো।

বয়েডের শোবার তাক আমার ঠিক নীচেই। জানতাম ওকে যদি পটিয়ে আমার সঙ্গে টানতে পারি তাহলে দরজার তালা খোলার ব্যাপারে আর অসুবিধা হবে না। তবে বয়েডকে বোঝানো একটু অসুবিধা হবে, কারণ ও কারো সঙ্গেই কথা বলে না। সবসময় নিজের মনে চুপচাপ বসে থাকে। এসব ভাবতে ভাবতে অর্ধেক রাত পার হয়ে গেলো। শুয়ে শুয়ে বয়েডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনতে লাগলাম। ভাবলাম ওকে আমার মতলবের কথা জানাবো। হাজার হোক ও বন্দী তো, মুক্তির স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা ওর নিশ্চয়ই হবে।

রাত তখন প্রায় দুটো। ঠিক করলাম বয়েডকে সব বলবো। এটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে না হলে পালানো সম্ভব হবে না।

মন ঠিক করে পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলে ফেললাম। উপুড় হয়ে লোহার জালের ফাঁক দিয়ে তাকালাম। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছুই চোখে পড়ে না। অ্যাই বয়েড! চাপা ফিসফিস স্বরে ওকে ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও বুঝলাম ওর সন্দেহঘন জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে চাপা স্বরে জানতে চাইলো, কি ব্যাপার!

আমি বললাম, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?

বয়েড যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না।

আমি বললাম, বাইফ্লিট যখন কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে সেই সময়েই সুযোগ বুঝে আমরা পালাবো নদীর দিকে। সেখান থেকে রেললাইন ধরে এগিয়ে যাবো। তুমি রাজী থাকলে বলো তোমার পায়ের শেকল খুলে দিই। আমারটা আমি খুলে ফেলেছি।

বয়েড সব শুনে রাজী হলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নীচে নামলাম তারপর তারের টুকরোটা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে তালাটা খুলে ফেললাম। শেকলটা খুলে ঠং করে জালের ওপর পড়লো।

আমরা দুজনে ঠিক করলাম বাইরে বেরিয়েই একসঙ্গে নদীর দিকে ছুটবো। সেখানে পৌঁছে

দুজনে দুদিকে যাবো। বাইফ্লিট সম্ভবতঃ কুকুরগুলোকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে ; কিন্তু কোনোরকমে যদি নদীটা পার হতে পারি তবে কুকুরগুলো আর আমাদের গন্ধ পাবে না।

আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম আসন্ন মহেন্দ্রক্ষণের জন্য।

কয়েদখানার দেওয়ালে ভোরের হালকা রূপোলী আলোর আভা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দরজার তালায় হাত লাগাবো। মরিচের পুঁটলিটা তাকের কোণা থেকে বের করে জামার ভিতর গুঁজে নিলাম। ভুলেও এর একটি কণাও আমি বয়েডকে দিচ্ছিনা। এর প্রতিটি কণাই আমার কাজে লাগবে। এই মরিচের গুঁড়োর ওপরেই আমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।

স্থির চোখে জানলার দিকে চেয়ে আছি সোনালী রোদের আশায়। কানে আসছে বয়েডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ।

কানে এলো হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন, ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

ঐ—ঐ হাউন্ডগুলো— বয়েডের স্বর ভয়ে কাঁপছে। বুঝলাম ও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আশ্চর্য! বয়েডের মতো বুনো গরিলা পর্যন্ত ঐ কুকুরগুলোকে ভয় পায়!

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ক্রমে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার অবসান হলো। কয়েদখানার ছোট্ট জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠিকরে পড়লো এক ফালি সোনালী রোদ। একসময় বুঝতে পারলাম যে আমাদের পালাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

উত্তাল হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়ছে বুকের খাঁচায়। আর অপেক্ষা করতে হলো না। কানে এলো কুকুরগুলোর উল্লসিত চীৎকার। অর্থাৎ বাইফ্লিট ওর কুঁড়েঘর ছেড়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে। না—আর দেরী নয়।

দুজনে তাক থেকে মেঝেতে লাফিয়ে নামলাম। ঘর ভর্তি সব কয়েদী ঘুমে অচেতন। নিঃশব্দে আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। তালাটা যতটা শক্ত ভেবেছিলাম ততোটা শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেলো। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কেননা কয়েদীরা কেউ জেগে উঠলো না। বাইরে বাইফ্লিটের ধমকানির শব্দ শুনে বুঝলাম কুকুরগুলো এখন খেতে ব্যস্ত।

আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পা রাখলাম। আমার পেছন পেছন বয়েড বাইরে এলো। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দূরে খোঁয়াড়ের দিকে তাকালো। ও ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে ওকে মারলাম এক ধাক্কা। 'বয়েড চটপট' বলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম দৌড়। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওয়ার বেগে ছুটে চললাম।

বয়েড আমার মতো জোরে দৌড়োতে পারছে না তাই ও আমার থেকে অনেক পিছনে রয়েছে। চারিদিকে ধূ ধূ প্রান্তর তার ওপর দিয়েই ছুটে চলেছি। লক্ষ্য দূরের নদী। নিজেকে বড়ো বেশী অসহায় মনে হতে লাগলো। জোরে দৌড়োবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ—ভোরের শান্ত পরিবেশের নিঃস্তব্ধ পর্দা বিদীর্ণ করে ভেসে এলো রিভলভারের শব্দ—ছুটতে ছুটতে চকিতে পেছনে তাকালাম।

বাইফ্লিট খোঁয়াড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা একটা ৪৫ বোরের রিভলভার।

বয়েড এঁকেবেঁকে দৌড়োচ্ছিলো। ওর ঠিক হাত পাঁচেক দূরে রিভলভারের একটা গুলি বেরিয়ে গেলো। আমি আরো জোরে ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে আর একবার পেছনে তাকালাম। বয়েড প্রায় দু'শো গজ পিছিয়ে পড়েছে।

পরমুহূর্তে কানে এলো সেই বৈদ্যুতিক বাঁশির কান ফাটানো শব্দ। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী রক্ষীরা আমাদের পেছনে ধেয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি ঝোপ ভেদ করে নদীর কিনারায় পৌঁছে বাঁদিকে এগিয়ে চললাম। পাড় ধরে একশো গজ মতো গিয়ে আবার ঢুকে পড়লাম দুর্ভেদ্য নলখাগড়ার ঝোপে, লুকিয়ে পড়লাম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে বয়েড ঝোপ ভেদ করে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। আমার থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ঝোপের মধ্যে আমাকে

খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না।

আমার একেবারেই ইচ্ছা নয় যে বয়েড আমার সঙ্গে আসুক। আমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম।

বয়েড নদীতে নামতে শুরু করলো। দু-একবার থেমে পিছনে তাকালো। তারপর জলে নেমে বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে সাঁতরে এগিয়ে চললো ওপারে।

এবারে মরিচের পুঁটলিটা বের করে প্যান্টের গোড়ালির ভাঁজগুলো ঐ গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি করলাম যাতে ছোটবার সময় মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে আমার পায়ের গন্ধ ঢেকে দেয়।

ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুটা যাবার পর ছুটতে শুরু করলাম। একটু পরেই কানে এলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ঝড়ের বেগে নদীর দিকে ছুটে আসছে প্রহরীরা। এখুনি গা ঢাকা না দিলে আর উপায় নেই। লুকোবার একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগলাম।

বুকের ভেতর কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে—ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে। ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম খস খস শব্দ। রক্ষীরা ঝোপ ভেদ করে নদীর দিকেই আসছে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড উল্লসিত চীৎকারে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই কানে এলো জলে কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। মনে হলো হয়তো কোনো প্রহরী ঘোড়া নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে।

রাইফেলের শব্দ পেলাম। আর একটি ঘোড়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কানে ভেসে এলো একাধিকবার গুলির শব্দ।—উৎকণ্ঠা আতঙ্কে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম।

ওরা কি তাহলে বয়েডকে দেখতে পেয়েছে?—অদম্য কৌতূহলে মাথা তুললাম। দেখি, একজন অশ্বারোহী প্রহরী ঘোড়া নিয়ে সাঁতরে ওপারে যাচ্ছে—হাতে তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। কানে এলো কানফাটানো শব্দ—হঠাৎ দেখি বয়েড ওর লুকোনো জায়গা ছেড়ে এক লাফে নদীতে এসে পড়লো। লক্ষ্য করলাম নদীর ওপাড়ের রক্ষীটি তার ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেল বাগিয়ে তাক করছে বয়েডকে লক্ষ্য করে। সাঁতার কাটতে থাকলেও বয়েড বোধহয় আন্দাজ করেছিলো এই আসন্ন বিপদের কথা। কারণ হঠাৎই ও জলের মধ্যে ডুব দিলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গর্জন—গুলির আঘাতে খানিকটা জল ছলকে উঠলো শূন্যে।

দেখলাম আর একজন প্রহরী দেরী না করে ঘোড়া নিয়ে জলে নেমে পড়লো। ঘোড়াটা সাঁতরে বেশ কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় বয়েড ভেসে উঠলো। প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পেয়েই ঘোড়াটাকে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। মুহূর্তের মধ্যে বয়েড আবার ডুব দিল।

বয়েড বোধহয় বুঝতে পারছিলো এভাবে সাঁতার কাটলে ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোতে পারবে না তাই ও ডুব সাঁতার দিয়ে প্রহরীটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। একটু পরেই দেখলাম লোকটার পেছনে ভেসে উঠেছে। মনে মনে বয়েডের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না।

প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পায়নি কিন্তু ওপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি ওকে দেখতে পেয়েই বিকট চীৎকার করে উঠলো, ওই যে তোব পেছনে। জলের অশ্বারোহী রক্ষীটি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে রাইফেলের বাঁট সজোরে নামিয়ে আনলো বয়েডের মাথায়। কিন্তু বয়েড অসামান্য ক্ষিপ্রতায় মাথা সরিয়ে নিলো। লোকটার কব্জি ধরে একটানে জলে নামিয়ে আনলো। জল তোলপাড় করে শুরু হলো ধস্তাধস্তি। কিন্তু লোকটা অসহায় হয়ে পড়লো বয়েডের পশু শক্তির কাছে, ভীষণভাবে জল তোলপাড় শুরু হলো!

একটু পরে বয়েড একা ভেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁতরে যাওয়া ঘোড়াটাকে ধরে এমনভাবে তার আড়ালে ভেসে এগিয়ে চললো, যাতে ওপাড়ের প্রহরীটি গুলি করতে না পারে। মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি সাঁতরাবার জন্য ঘোড়াটাকে খোঁচা মারতে লাগলো। লোকটা বয়েডের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু পরমুহূর্তেই একলাফে ঘোড়ায় চাপলো। তীরের বেগে ঘোড়া সমেত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বয়েডকে অনুসরণ করলো।

ওদিকে বয়েড ঘোড়াটাকে নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে মাঝে মাঝে খিস্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ধাক্কা মারছে।

হঠাৎ বয়েড ঘোড়া ছেড়ে জলের মধ্যে ডুব দিলো। ও ডুব দেওয়া মাত্রই অনুসরণরত অশ্বারোহী প্রহরীটি সতর্ক হয়ে হাতে রাইফেল তুলে নিলো। চারিদিকে নজর রাখতে লাগলো। কোথায় বয়েড ভেসে ওঠে।

বয়েড ডুব সাঁতারে প্রহরীর দূরত্বটা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। ভুলক্রমে ও লোকটার পাশেই ভেসে উঠলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝেড়ে বিদ্যুৎগতিতে তাকে ধরতে গেলো কিন্তু লোকটা খুব সতর্ক ছিলো। উদ্যত রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করলো মাথায়। বয়েড চেষ্টা করেও সে আঘাত এড়াতে পারলো না। সোজা তলিয়ে গেলো। একে একে সেখানকার জল ফিকে লাল—লাল—গাঢ় লাল হয়ে উঠলো।

লোকটা ঘোড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি পাড়ে এসে উঠলো। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বয়েডের ভেসে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই বয়েডকে দেখা গেলো। ওর দেহটা উপুড় হয়ে ভাসছে—এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে। ভাসতে ভাসতে কিছুদূর গিয়ে দেহটা নদীর পাড়ে ঠেকে রইলো। ওদিকে অন্য প্রহরীর মৃতদেহটা ওপাড়ে ভেসে উঠেছে।

অপেক্ষমান রক্ষীটি চোখ বুলিয়ে মৃতদেহ দুটো দেখলো। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটে চললো। ছুটে চললো ফার্নওয়ার্থের দিকে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় ততোক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর খুব সাবধানে লুকোনো জায়গা ছেড়ে বাইরে এলাম। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে পালাতে হবে।

আমার পালানোর কথা জানার পর জেলার প্রতিটি পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িকে আমার চেহারার বিবরণ জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হবে—নাঃ, দেরী করলে হবে না। যেমন করেই হোক একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে।

প্যান্টের ভাঁজে ছাড়া যে অবশিষ্ট মরিচটুকু পুঁটলিতে ছিলো, সেটাকে ভালো করে বাঁধলাম। এর মধ্যেই সূর্য মাথার ওপর চলে এসেছে। রোদের অসহ্য উত্তাপ এখনই অনুভব করতে পারছি। আর দেরী না করে ছুটে চললাম। প্যান্টের ভাঁজ থেকে মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যাক, কুকুরগুলোর জন্য আর চিন্তা নেই—অক্লান্তভাবে ছুটে চললাম।

নদীর পাড় ধরে ঘণ্টা দুই দৌড়বার পর ঠিক করলাম এবারে নদী পার হতে হবে। এখান থেকে রেললাইন প্রায় ষোলো মাইল দূরে। নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। মরিচের পুঁটলিটা ভাঁজ করলাম প্যান্টের মধ্যে, তারপর কোমরের বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধলাম। এবারে নদীর শীতল জলে গা ভাসালাম।

।। তিন ।।

বিকেল হয়ে গেছে। রোদের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। একটা বিশাল গাছের ছায়ায় অবসন্ন দেহে শুয়ে আছি। সামনেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে—তার কোল ঘেঁষে বড় রাস্তা। একজন পুলিশ অফিসার ঝড়ের গতিতে মোটর বাইক চড়ে ছুটে চলেছে। তার পেছন পেছন একটা ওয়্যারলেস ভ্যান। খুব সম্ভব আমাকেই খুঁজছে—।

রেললাইন এখনও পাঁচ মাইল দূরে। অপেক্ষা না করে দৌড়োলে হয়তো অনেক আগেই ওখানে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু দিনের বেলায় এ জায়গাটা পার হওয়া উচিত হবে না। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। অদূরে একটা গোলাবাড়ি ছাড়া লুকোবার আর কোনো জায়গাই নেই। অগত্যা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করলেই নয়।

এই গোলাবাড়িটা চারিদিকে বুকসমান উঁচু কাঠের বেড়ার মাঝখানে অবস্থিত। আর তার পাশেই টিনের চালা দেওয়া একটা গুমটিঘর। চারিদিকের বেড়ার এককোণে একটা কাঠের দরজা।

হঠাৎ চোখে পড়লো গোলাবাড়ি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে মেয়েটিকে

ততটা গুরুত্ব দিই নি—কিন্তু ওর হাতের দিকে নজর পড়তেই আমার জিভে জল এলো। অসম্ভব খিদে পেয়েছে। মেয়েটি তরমুজের ঝুড়িটা নিয়ে গুমটিঘরে ঢুকে পড়লো। একটু পরেই খালি হাতে বেরিয়ে এলো। আবার গোলাবাড়ির দিকে ফিরে চললো।

ঠিক করলাম অন্ধকারের মধ্যেই কয়েকটি তরমুজ শেষ করতে হবে। কারণ পেটে কিছু না পড়লে পথ চলা অসম্ভব।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এলো চারিদিকে। বড় রাস্তায় যানবাহন চলাচল ফিকে হয়ে এলো। গোলাবাড়ির ভেতর কতকগুলো ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে কারো নজরে পড়ার ভয় নেই দেখে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ী ঢালু জমি ধরে এক ছুটে গিয়ে পৌঁছলাম বড়রাস্তায়। এগিয়ে চললাম বাড়িটার দিকে। কাঠের বন্ধ দরজাটা টপকে ভেতরে নামলাম। ছুটে গিয়ে টিনের চালা দেওয়া গুমটি ঘরে আশ্রয় নিলাম। অন্ধকারেই নাকে এলো তরমুজের সুস্বাদু গন্ধ। খিদেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলাম, হাতে ঠেকলো তরমুজের স্তূপ। মনে হলো এরা তরমুজের চালানদার। একটা বড় দেখে তরমুজ তুলে নিয়ে দাঁত বসালাম। কয়েকটা তরমুজ খাওয়ার পর পেটের খিদে কিছুটা শান্ত হলো। কিন্তু ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে তরমুজের স্তূপের পেছনে আশ্রয় নিলাম। শুয়ে পড়তেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। একলাফে উঠে দাঁড়ালাম। গুমটিঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়লো দূরের ধূসর পাহাড়। তার পেছন থেকে উঁকি মারছে ভোরের সূর্য। ভোরের বিবর্ণ আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ঘরের ভিতরে।

একটা অজানা ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরলো। এতোক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি কেউ আমাকে দেখে ফেলেনি তো?

আমার পরনে কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাক। এই পোশাকে যদি দিনের বেলায় বের হই তবে নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে। সুতরাং রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই। ঘণ্টাখানেক কোনো রকমে কাটাবার পর হঠাৎ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে উঠলো—ঘরে কেউ ঢুকেছে।

কানে এলো নড়াচড়ার শব্দ। সাবধানে মাথা তুলে উঁকি মারলাম। দেখি, আগের দিনের মেয়েটি তরমুজগুলোকে বেছে সরিয়ে রাখছে একধারে। ওর বয়স হবে সতেরো, গায়ের রঙ বাদামী। দেখতে খুব একটা সুন্দরী না হলেও কেমন যেন একটা আলগা আকর্ষণ আছে। হয়তো ওর উদ্দাম সপ্তদশী যৌবনই এর জন্য দায়ী। চটপট অভ্যস্ত হাতে মেয়েটি কাজ করে চললো। আমাকে ও দেখতে পায়নি। ঝুঁকে পড়ে বড় তরমুজগুলো ও আলাদা করে রাখছে।

মেয়েটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে আমি মেয়েটির চোখে পড়ে গেছি। পলকের জন্য ওর হাত দুটো থেমে গেলো। মনে হলো ও ভয় পেয়ে গেছে। এখুনি কিছু করা দরকার। নয়তো বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি যে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর মুখে কেমন একটা চাপা উত্তেজিত ভাব।

আড়াল থেকে বাইরে এসে বললাম, ভয় পেয়োনা।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হলো না—ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার দিকে তাকিয়ে গোঁফ দাড়ির জঙ্গল দেখে মেয়েটা আরো ভয় পেয়েছে।

ভয় নেই, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। স্থির চোখে ওকে লক্ষ্য রেখে আশ্বাস দিলাম।

মেয়েটির পরনে একটা চাপা প্যান্ট, আর লাল সাদা চেক টানা শার্ট। ও দেওয়ালে হেলান দিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর উন্নত স্তনদ্বয় একবার উঠছে, একবার নামছে।

খবরদার আমার কাছে এসো না। চাপা তীক্ষ্ণস্বরে ও আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি আশ্বাসের নরম সুরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পুলিশ আমাকে খুঁজছে—আমি ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমার ভীষণ খিদে

পেয়েছে—তাছাড়া কিছু জামাকাপড় দরকার।

দেখলাম এতক্ষণে মেয়েটির ভয় অনেকটা কমে এসেছে। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো—আমি এখানে কেন এসেছি?

আমি জানালাম, দূর থেকে তরমুজগুলো দেখে খিদের জ্বালায় নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম রাতের অন্ধকারে রেললাইন পর্যন্ত গিয়ে কোনো ট্রেনে উঠে পালাবো, কিন্তু—পুলিশ রেললাইন পাহারা দিচ্ছে—

আমাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো, গত রাতে রেডিওতে বলেছে ; তুমি রেললাইনের দিকে যাবে বলেই পুলিশ সন্দেহ করছে—। কিন্তু ফার্নওয়ার্থে যাবার মতো তুমি কি করেছিলে?

আমি মেয়েটিকে একে একে সব কথা খুলে বললাম, কিছুই গোপন করলাম না। অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও সব কথা শুনতে লাগলো। ওর মুখে কেমন যেন করুণার ভাব ফুটে উঠলো। মমতায় ওর গভীর দুই চোখ ছলছল করে উঠলো।

সব বলতে পেরে মনটা যেন হালকা হলো।

ফার্নওয়ার্থে আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। তুমি যদি সাহায্য না করো, তাহলে আমার আর কোনো উপায় নেই। ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমি আত্মহত্যা করবো।

মেয়েটি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো। ফার্নওয়ার্থ সম্বন্ধে আমিও কাগজে পড়েছি। সব কথা শোনার পর তোমাকে ওখানে ফেরৎ পাঠাতে আমার বিবেকে বাধছে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো— ।

মেয়েটি গুমটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভয় এসে উপস্থিত হলো, ওকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? কিন্তু এছাড়াও তো আর কোনো উপায় নেই। ও যদি পুলিশে খবর দেয় তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

হঠাৎ দেখা গেলো মেয়েটি এগিয়ে আসছে, ডান হাতে ঝোলানো এক বালতি গরম জল, আর বাঁ-হাতে একটা তোয়ালে, সাবান, ক্ষুর আর কিছু জামা কাপড়। বালতিটা সামনে রেখে, জামাকাপড়গুলো ও আমার হাতে দিলো, হাত-পা ধুয়ে এগুলো পরে নাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

মিনিট দশ পরে ও ফিরে এলো, ততক্ষণে আমার হাত-পা ধোয়া, দাড়ি কামানো—সব হয়ে গেছে। কয়েদীর পোষাক ছেড়ে ওর দিয়ে যাওয়া পোষাকগুলো পরে ফেলেছি, লক্ষ্য করলাম ওর হাতে খাবারের ট্রে, তাতে মাংস, ডিম সেদ্ধ আর কফি, আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট মনে হলো।

খাওয়াদাওয়ার শেষে মেয়েটি আমার দিকে এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিলো। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম। নিজেকে বেশ সুস্থ-সতেজ মনে হলো।

মেয়েটি আমাকে বললো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই তরমুজগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা ছেলে ট্রাক নিয়ে আসবে, রোজ এই একই সময়ে এখানে আসে। এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সোজা যায় ওকল্যান্ডের বাজারে। সেখানে ট্রাক রেখে টাকার তাগাদায় যায়—। ও এসে যখন বাড়িতে খেতে ঢুকবে তখন তুমি গিয়ে ওর ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে পড়বে। তারপর ওকল্যান্ডে পৌঁছে, চুপিসাড়ে নেমে পড়বে—।

মেয়েটির কথায় রাজি হলাম। ওকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেলো।

একটু পরে ট্রাক এসে পৌঁছলো। চালক একটি অল্পবয়সী ছেলে, সে ট্রাক রেখে ভেতরে যেতেই গাড়ির পেছনে উঠে পড়লাম।

তারপর এক সময় ট্রাক ছেড়ে দিলো, একটু পরে দেখলাম বিকেলের রোদ তখন ঝিমিয়ে এসেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে সেই গোলাবাড়িটা, তার দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পড়ন্ত রোদ্দুর ওর লাল সাদা ডোরা কাটা শার্টের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে। মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে নাড়তে লাগলো। ট্রাক ক্রমশঃ এগিয়ে চললো— নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রু।

এই সুন্দর স্মৃতিটুকু একান্ত আমার করেই সযত্নে তুলে রাখবো মনের মনিকোঠায়। অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের পথে এ স্মৃতিটুকুই হোক আমার একমাত্র সঙ্গী।

ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চারদিন পরে লিট্‌ল্ ক্রীকে এসে পৌঁছলাম। ওকল্যান্ড থেকে একটা মালগাড়ি ধরে প্রায় এক হাজার মাইল পার হয়ে, এসে উপস্থিত হয়েছি এই লিট্‌ল্ ক্রীকে।

মাথার ওপর দুপুরের চড়া রোদ। রাস্তাঘাট নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী চোখে পড়ছে।

মেয়েটি যে পাঁচ ডলার দিয়েছিলো তা থেকে অবশিষ্ট মাত্র এক ডলার। ওকল্যান্ড থেকে ট্রেনে করে এখানে আসবার পথে কিছুই পেটে পড়েনি। অদূরেই একটা স্ন্যাকবার দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। দোকানে ঢুকে স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে বললাম। ভাবতে লাগলাম, এরপর কোথায় যাবো। ট্রপিকা স্প্রিংসের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দু'শো মাইল। সেখানে পৌঁছবার একমাত্র উপায় কোনো চলতি গাড়ি বা ট্রাকে আশ্রয় নেওয়া। একটি লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা পেট্রোল পাম্প আছে—তার নাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'। এর পরের পেট্রোল পাম্পটা একেবারে পাহাড়ের ওপারে—একশো ষাট মাইল দূরে সেই কারণে এর মালিক কার্ল জেনসন নাম দিয়েছে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'—অর্থাৎ 'শেষ সীমান্ত'। তাছাড়া এর সঙ্গে লাগোয়া একটা রেস্তোরাঁও আছে—জেনসনই তার মালিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকানের খোলা দরজায় আবির্ভূত হলো এক বিশাল চেহারার পুরুষ। সে কাউন্টারের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। মাইক আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলো, অর্থাৎ এই কার্ল জেনসন।

জেনসন লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট, গায়ের রঙ তামাটে, বয়স প্রায় পঞ্চান্নর কাছাকাছি হবে। মাইক কফির কাপ এগিয়ে দিলো জেনসনের দিকে, মিঃ জেনসন, এই লোকটি পাহাড় পেরিয়ে ট্রপিকা স্প্রিংসে যেতে চায়। আমি বলেছি, আপনার ওখানে যেতে,—সেখানে যদি কোনো ট্রাক ধরতে পারে ; এখানে তো আর কোনো গাড়ি থামবে না—।

জেনসন আমার দিকে ফিরে হাসলো, মাইক ঠিকই বলেছে ও ছাড়া তোমার উপায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো, কিন্তু ঐ পর্যন্তই—!

আমি বললাম কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

জেনসন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, পাগল নাকি। এতোখানি রাস্তায় যে একজন সঙ্গী পাবো, সেটাই অনেকখানি। হঠাৎ কি মনে করে জেনসন তার পেশীবহুল হাত আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, আমার নাম কার্ল জেনসন—।

জেনসনের হাতে হাত মেলালাম, আমি জ্যাক প্যাটমোর—।

প্রথমেই যে নামটা মনে এলো সেটাই বলে ফেললাম।

মাইককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। বাইরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিলো। জেনসন এগিয়ে গিয়ে তার চালকের আসনে বসলো।

ট্রাকের ভেতরটা অসহ্য গরম। আমরা দুজনেই গায়ের কোট খুলে ফেললাম। জেনসন সিগারেট বের করে ধরালো। আমার দিকেও একটা এগিয়ে দিলো। তারপর স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিলো।

শহরের বাইরে পৌঁছতেই চোখে পড়লো দিগন্ত প্রসারী মরুভূমি। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, মাঝের সরু পিচঢালা রাস্তা ধরে জেনসন ট্রাক ছুটিয়ে চলেছে। বহুদূরে চোখে পড়ছে পাহাড়—তার ওপারেই ট্রপিকা স্প্রিংস। মাথার ওপরে সূর্য কিছুটা ঢলে পড়লেও গরম কমেনি।

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে জেনসন আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথা থেকে আসছ? তুমি কোথায় কাজ করো?

আমি বললাম, আমি ওকল্যান্ড থেকে আসছি। আমাদের তালার ব্যবসা আছে। আমার বাবাও এই ব্যবসা করতেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় জেনসন প্রশ্ন করলো, আচ্ছা জ্যাক তুমি গাড়ির ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের ব্যাপার বোঝো?

খুব সামান্য—দু-একবার কয়েকটা গাড়ির কাজ করেছি।

জেনসন তার নীল চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে মেলে ধরলো আমার দিকে, জানতে চাইলো, তুমি

কি ট্রপিকা স্প্রিংসে থাকবে বলে ঠিক করেছো?

হ্যাঁ— জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা চিল।

ওখানে কোনো চাকরি নিয়ে যাচ্ছো নাকি?

এবার আমার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। সেটা লক্ষ্য করে জেনসন একটু বিব্রত হলো, মানে—যদি কোনো চাকরির ব্যাপার হয়, তবে আমিই তোমাকে একটা চাকরি দিতে পারি।

অবাক হয়ে আমি জেনসনের দিকে তাকালাম, আপনি আমায় চাকরি দেবেন?—কি চাকরি?

জেনসন বললো, লোহালক্কড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, গাড়ির কাজও জানে এমন একজন লোকই আমার প্রয়োজন। আমি আর আমার স্ত্রী লোলা সব কাজ সামলাতে পারি না। তোমার মতো একজন লোকই আমি খুঁজছি, তবে সপ্তাহে তিন চারদিন কিন্তু রাত্তিরে কাজ করতে হবে—অবশ্য দিনে বিশ্রাম পাবে। আমার স্ত্রী চমৎকার রান্না করে, সে তুমি খেলেই বুঝতে পারবে।

ভেবে দেখলাম গা-ঢাকা দেবার মতো এমন একটা সুযোগ ছাড়ি কেন। এই মরুভূমির দেশে পুলিশ আমার খোঁজও পাবে না।

আমি জেনসনের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিলাম যে আমি রাজি। জেনসন প্রচণ্ড খুশী হলো। অদ্ভুত ভাবে অদ্ভুত নামের এক পেট্রোল পাম্পে চাকরি পেয়ে গেলাম।

।। চার ।।

সামনের একটা উঁচু টিবি পার হতেই চোখে পড়লো পাহাড়ী ঢালু রাস্তা। যে দিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি। বিকেলের চড়া রোদ বালির সমুদ্রকে করে তুলেছে উজ্জ্বল, তার গা থেকে ঠিকরে আসা সোনালী আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। দূরে বহুদূরে চোখে পড়লো একটা অস্পষ্ট বিন্দু—জেনসন আঙুল তুলে দেখালো, ওটাই আমার পেট্রোল পাম্প—

পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন।

—ঘরগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ছোট্ট বাংলো। বাংলোর উল্টোদিকে রয়েছে একটা ঘর। রাস্তা একে একে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপিঠে—

সবকটা ঘরের রঙই আকাশ নীল। জেনসন বললো, ঐ ডানদিকের ঘরটা তোমার। আর এ দিকের বাংলোটায় আমি আর লোলা থাকি।—জায়গাটা এমনি নির্জন আর বিরক্তিকর, শুধু লোলা আছে বলেই সবকিছু ভুলে থাকতে পারি। এখন তুমি এসেছো—আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

আমরা পেট্রোল পাম্পে পৌঁছে গেছি। অদূরে চোখে পড়ছে বাংলো। বাংলোর সামনে একটা বারান্দা, তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। একটা মেঠো পথ এগিয়ে এসেছে রাস্তা পর্যন্ত।

জায়গাটা এতো সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

গাড়ির দরজা খুলে জেনসন নেমে পড়লো, পিছন পিছন আমিও নামলাম। জেনসন আমার ঘরটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো, জ্যাক তুমি আর দেরী করো না। হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি। তারপর সে বালিতে ঢাকা মেঠো পথ ধরে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো।

আমিও ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। দরজা খুলতেই বসবার ঘর, বেশ সুন্দর ভাবে সাজানো। ঘরের এককোণায় একটা টেলিভিশন সেটও রয়েছে। বসবার ঘর পার হলেই একটা ছোট্ট শোবার ঘর।

শোবার ঘরে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেলাম, হাত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলাম। দাড়ি কামানো হয়ে গেলে আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম! মনে মনে ভাবলাম খবরের কাগজে যদি আমার ছবি ছাপা হয়ে থাকে তবুও কারও পক্ষে আমাকে চেনা সম্ভব নয়।

জামাকাপড় পরে বেশ উৎফুল্ল চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ জেনসনের বাংলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সামনে আর পেছনে তাকালে বালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। পুলিশ হয়তো ওকল্যান্ডে বা অন্য কোনো শহরে আমার খোঁজ করবে, কিন্তু এই মরুভূমিতে নিশ্চয়ই খোঁজ করার কোনো চেষ্টাই করবে না। ঠিক করলাম যতদিন পারা যায় এখানেই থাকবো।

রাস্তা পার হয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের একপাশে সাজানো পাঁচটা টেবিল আর কতকগুলি চেয়ার। এছাড়া কাউন্টারের সামনে গোটা দশেক টুল। কাউন্টারের ওপর সাজানো সারি সারি বীয়ার ও সোডার বোতল। এক পাশে গোটা দুয়েক আচারের শিশি। তার সঙ্গে রয়েছে একগাদা কাচের গ্লাস, ছুরি, কাঁটা চামচ আর কাগজের রুমাল। প্রত্যেকটি জিনিষই পরিষ্কার ঝকঝক করছে। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো একটা ফলকে ছাপা হরফে লেখা রয়েছে খাদ্যের তালিকা। কাউন্টারের পেছনে আধ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে রান্নার সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছে। ভাবছি কাউকে ডাকবো কিনা। হঠাৎ কানে এলো জেনসনের গলা, এই লোলা—শোনো, অবুঝ হয়োনা, অনেক ভেবেচিন্তে আমি জ্যাককে এখানে নিয়ে এসেছি, ও এখানে কাজ দেখাশোনা করলে, আমরা সপ্তাহে দু-চার দিন করে ওয়েন্ট ওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারবো।

দ্যাখো কার্ল, একটা কথা তোমাকে হাজারবার বলেছি, আজও বলছিঃ কোনো উটকো লোককে আমি এখানে রাখবো না, ব্যস।

হ্যাঁ, জানি তুমি বলেছো, কিন্তু এটা বুঝতে পারছো না, একজন লোক রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ভেবে দ্যাখো তো, গতকাল রাত্রে তোমাকে কতবার উঠতে হয়েছে? বারে বারে তোমাকে উঠে এসে ঐ হতচ্ছাড়া ট্রাকগুলোকে পেট্রল দিতে হয়েছে। আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন লোলা,—জ্যাক যদি রাত্রিবেলা কাজ করে, তবে আমরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। তাছাড়া দু-চারদিন দেখতে ক্ষতি কি? তারপর যদি পছন্দ না হয়, তখন জ্যাককে বারণ করে দিলেই হবে।

তুমি কি করে জানলে লোকটা বিশ্বাসী? ওকে এখানে রেখে আমরা ওয়েন্ট ওয়ার্থে যাবো, আর ও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে মনে করেছো? সিন্দুক ভেঙে টাকা হাতিয়ে সোজা কেটে পড়বে।

লোলার মনোভাবে অস্বস্তি বোধ করলাম। সে যাই হোক পরে ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু আপাততঃ সাড়া দেওয়া দরকার। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম, দরজায় শব্দ করে ডাকলাম কেউ আছেন নাকি? রান্নাঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো।

একটু পরে দরজা খুলে জেনসন বেরিয়ে এলো, মুখে কেমন একটা অপ্রতিভ হাসি, এসো জ্যাক ঘর কেমন লাগলো? পছন্দ হয়েছে তো?

আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে জেনস্‌ন আশ্বস্ত হয়েছে মনে হলো। আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, পছন্দ হয়নি মানে? সত্যি মিঃ জেনসন আপনার 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এর তুলনা নেই। জেনসন সম্মতি জানালো।

তারপর সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো আমার খাবার ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু জেনসন রান্নাঘরে পা বাড়াতেই কানে এলো বাইরে থেকে ভেসে আসা কোনো গাড়ির হর্নের শব্দ।

ঘরের জানলা দিয়ে দেখা গেলো বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা জীর্ণ ধূলি মলিন প্যাকার্ড। চালকের নির্দেশে জেনসন গাড়িটার ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালতে লাগলো।

হঠাৎ পেছনে সামান্য শব্দ হতেই চমকে ফিরে দাঁড়ালাম। রান্নাঘরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। ওর চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে সীমাহীন কৌতূহল। মেয়েটির মাথা ভর্তি একরাশ লাল চুল, কামনা মদির পুরু ঠোঁট, তিরিশ বসন্তের শরীরে ভরন্ত যৌবন। তার পান্না সবুজ টলটলে চোখ রক্তে নেশা ধরায়, মেয়েটিকে দেখার পর কোনো পুরুষের পক্ষেই ওর যৌবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ওর পরনে একটা সাদা গাউন ঃ শরীরের সঙ্গে যেন ভেজা কাপড় হয়ে লেপটে আছে।

মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এলো। লক্ষ্য করলাম ওর গাউনের নীচে কোনো অন্তর্বাসের বালাই নেই।

অপলক দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

—কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানিনা। একসময় খেয়াল হলো জেনসন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, এই যে লোলা, তুমি এসেছো, আলাপ করিয়ে দিই—এই জ্যাক। —জ্যাক এ হচ্ছে লোলা—আমার স্ত্রী।

মেয়েটি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো, গভীর সবুজ চোখে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

জেনসন বললো, আর দেরী করো না লোলা, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

ভাবলেশহীন মুখে লোলা জবাব দিলো, অপেক্ষা করো, আমি আসছি। ও ফিরে চললো, চলার সময় স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর ভারী নিতম্বের সুডৌল রেখা। নিটোল ছন্দে হিল্লোল তুলে ও এগিয়ে চললো রান্নাঘরের দিকে।

আমার সারা মুখ তখন ঘেমে উঠেছে। একটা কাগজের রুমাল টেনে নিয়ে মুখ মুছলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে,—চোখের সামনে ভাসছে লোলার পাগল করা যৌবন।

খাওয়া দাওয়া সেরে আমি আর জেনসন বাইরে এলাম। আমাকে কোন্ কোন্ দিন কাজ করতে হবে সেটা তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। সপ্তাহে তিনদিন আমাকে রাতে কাজ করতে হবে। গাড়ি ব্রেকডাউনের ব্যাপার হলে আমাকেই সামলাতে হবে। আর গ্যারেজ আর পাম্পের কাছটা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

বাইরে এসে জেনসন আমাকে দেখিয়ে দিলো কিভাবে পাম্প থেকে পেট্রোল দিতে হয়। মোবিল আর পেট্রোলের দাম কিভাবে হিসাব করতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিলো। তারপর লোহা বোঝাই ট্রাকটা খালি করার জন্য আমাকে ডাকলো।

এর মধ্যেই সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দিনের অসহ্য গরম আর নেই। মরুভূমির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসছে অসংখ্য বালুকণা। গোধূলির আলোয় দূরের ধূসর পাহাড় হয়ে উঠেছে রক্তাভ। মনে হয় যেন একটা শান্ত সমাহিত ভাব নেমে এসেছে দিনের উত্তপ্ত মরুভূমিতে।

আমি আর জেনসন মিলে লোহালক্কড়গুলো একে একে নামাতে আরম্ভ করলাম। কাজ করতে করতে হঠাৎই জেনসন আমার দিকে তাকালো, লোলার ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না জ্যাক,—ও ওইরকমই। কেউ এখানে কাজ করুক, তা ও চায় না—কে জানে কেন? হয়তো সব মেয়েরাই এরকম— জেনসনের মুখে চিন্তার ছায়া।

কথা বলতে বলতে একটা পুরোনো মরচে পড়া গাড়ির ইঞ্জিন ও এক হ্যাঁচকায় মাটিতে নামালো। ওর শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অতো ভারী ইঞ্জিনটাকে এমনভাবে বয়ে নিয়ে চললো, যেন পালকের তৈরী খেলনা। গুমটি ঘরে সেটা রেখে সে ফিরে এলো। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমাকে বললো—প্রথম প্রথম লোলা হয়তো তোমাকে ভালো চোখে দেখবে না—কিন্তু দেখো কয়েকদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জেনসন আমাকে বলতে শুরু করলো যে, কিভাবে লোলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সে হেসে বললো, ভাবতে অবাক লাগে—ভীষণ মজার ব্যাপার বুঝলে জ্যাক। আজ থেকে বছর দুয়েক আগের কথা ঃ আমার প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায়, তখন একাই সব সামলাচ্ছি। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। থেকে থেকেই বউয়ের কথা মনে পড়ছে। সমস্ত পরিবেশ যেন আমার মতই বিষণ্ণ—নিঃসঙ্গ। চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় একটা বাস এসে দাঁড়ালো সামনের রাস্তায়। যাত্রীরা সব একে একে নেমে এলো, প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন হবে। তার মধ্যে লোলাও ছিল।

আমি রেস্তোরাঁর কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম যাত্রীরা সব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। একবার রান্নাঘর আর একবার খাওয়ার টেবিল—এই করে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাবার অবস্থা হঠাৎ দেখি, সবুজ পোশাকে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যস্ত হাতে যাত্রীদের দিকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে—।

যখন বাস ছাড়ার সময় হলো ততক্ষণে সবাইয়ের খাওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটি সাহায্য না করলে কি যে করতাম তাই ভাবি! বাস ছাড়ার সময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও আমার এখানে চাকরি করবে কিনা, মেয়েটি তো এক কথায় রাজি!—বাস ছেড়ে দিলো কিন্তু ও থেকে গেলো।

তারপর থেকে দু'জনে মিলে কাজ করি। বেশ ভালোভাবেই দিন কেটে যায়। কিন্তু আমাদের একসাথে থাকা নিয়ে লোকে নানা কথা বলে, তাই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বিয়ে করে ফেলি।

লোলা আমার থেকে যদিও তেইশ বছরের ছোট। এমনিতে মাঝে মাঝে মান-অভিমান করে বটে কিন্তু খুব কাজের মেয়ে। এখন হয়তো কদিন একটু অভিমান করে থাকবে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা ক্যাডিলাক এসে দাঁড়ালো। জেনসন আমাকে ওটা দেখতে বলে রেস্তোরাঁয় ফিরে গেলো। পেট্রল দিতে দিতে গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। কথায় কথায় জানিয়ে দিলাম এখানে রেস্তোরাঁও আছে। ইচ্ছে করলে তাঁরা খেয়ে নিতে পারেন। কারণ এরপর ট্রপিকা স্প্রিংস পর্যন্ত রাস্তায় কোনো দোকান নেই। আমার কথায় রাজি হয়ে ওরা গাড়ি থেকে নেমে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে চললো—এইভাবে আরম্ভ হলো আমার প্রথম কর্মব্যস্ত সন্ধ্যা। গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগলো—কাজ করে চললাম। একসময় জেনসন আমার কাজের প্রশংসা না করে থাকতে পারলো না।

এক নাগাড়ে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন কোনো গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়লো না, তখন ফিরে চললাম খাবার ঘরে।

গিয়ে দেখি, দু'জন ট্রাকচালক কাউন্টারের সামনে টুলে বসে। তাদের সামনে প্লেটে ফ্রুট পাই। রান্নাঘরের ভেতর থেকে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম লোলা রান্নাঘরে।

জেনসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জ্যাক তুমি আর দেরী করো না—আজ রাতে আমার পালা, কাল থেকে রাত্রিতে তোমাকে কাজ করতে হবে।

আমি আর দেরী না করে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চললাম ঘরের দিকে। তারপর ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও চোখে ঘুম নেই, অজস্র চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছে লোলার ছবি—ও যেন হেঁটে চলেছে রান্নাঘরের দিকে— পরনে সেই সাদা গাউন— আমি বুঝতে পারছি লোলা পরস্ত্রী- ওর কথা এভাবে আমার ভাবা উচিত নয়, কিন্তু তবুও ওর চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

ঘরের জানলার ঠিক পাশেই আমার শোবার খাট, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলোটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলাম বাংলোর দিকে—কিছুতেই ঘুম আসছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে শুয়ে থাকার পর একসময় বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। জানলার নীল পর্দা সরানো থাকায় আলোকিত ঘরটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোলা। ওর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। একটু পরে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে লাগলো। ওর একরাশি লাল চুল কোমরের কাছে আছড়ে পড়েছে।

আমি উত্তেজনায় উঠে বসে থাকলাম। অনুভব করলাম হৃদয় তোলপাড় করা মনের অবস্থা।

একটু পরে লোলা জানলার কাছে এসে গাউনের বোতাম খুলতে শুরু করলো..সাদা গাউনটা মেঝেতে খসে পড়লো। ও হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। ঘষা কাচের পাল্লায় ভাসতে লাগলো ওর নগ্ন শরীরের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

অন্ধকারে কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানিনা, একসময় খেয়াল হলো বাংলোর আলো নিভে গেছে।

অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম কিন্তু সে রাত্রে আমার চোখে আর ঘুম এলো না।

।। পাঁচ ।।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙাতে খাবার ঘরে এসে ঢুকলাম। তখন ঘড়িতে সাতটা বাজে। দেখি, লোলা একটুকরো কাপড় নিয়ে কাউন্টারের ওপরটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। ওর পরনে খুব ছোটো একটা লাল প্যান্ট। গায়ে হলদে চোলি। এই পোশাকে লোলা আরও আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। এই স্বল্প পোশাকের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করছে ওর উদ্ধত যৌবন। মনে মনে জেনসনকে হিংসা করলাম।

লোলা প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় লক্ষ্য করলাম মুখে বিরক্তির ভাব। কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও সামনের দিকটা ঘষতে লাগলো। ঝুঁকে পড়ায়

চোখে পড়লো ওর সুগঠিত দুই স্তন—অন্তর্বাসের অনুপস্থিতি—

রান্নাঘরের টেবিলের কাছে জেনসন বসেছিলো। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত নোট আর খুচরো পয়সা। একপাশে একটা খালি প্লেট, ছুরি, কাঁটা চামচ, আর এক কাপ কফি। আমাকে দেখে সে হাসলো, এসো জ্যাক, ভেতরে এসো। কি খাবে বল? স্যান্ডউইচ, ডিম?

না, মিঃ জেনসন, শুধু এক কাপ কফি।

জেনসন আমাকে বললো, এদিকের সব কাজ সারা হয়ে গেলে, আমি আর লোলা ওয়েন্ট ওয়ার্থে যাবো ; কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে। গতকাল যা বিক্রি হয়েছে, গত ক'বছরে কোনও দিন তার অর্ধেকও বিক্রি হয়নি। জ্যাক, এবারে ঠিক করেছি রেস্তোরাঁর বিক্রির ওপর তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দেবো। ওয়েন্ট ওয়ার্থ থেকে ফেরার সময় একটা অ্যাপ্রন নিয়ে আসবো—তোমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে।

কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পোশাক ইত্যাদি কেনার জন্য আমার হাতে একশো ডলার গুঁজে দিলো জেনসন।

আমি জেনসনকে ধন্যবাদ জানালাম। জেনসন বললো, আরে ধন্যবাদ জানাবার কি আছে। এ তো তোমার পাওনা টাকা থেকেই দিলাম। রেস্তোরাঁর কমিশন হিসাবে আগাম দিলাম।

জেনসন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, জ্যাক কাল যে পুরোনো ইঞ্জিনটা দেখলে ওটা ওজন দরেই কিনে এনেছি ; কিন্তু এখন ভাবছি, ইঞ্জিনটার পেছনে খাটলে হয়তো ওটাকে চালু করা যাবে। যাই হোক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি আর লোলা বেরিয়ে পড়ছি, তুমি কি একা থাকতে পারবে?

কেন পারবো না? আমার একা থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।

কফির কাপটা ধুয়ে রাখলাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

লোলা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্রুট পাই এর জারে লেবেল লাগিয়ে রাখছিলো,—আমি যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠলো, যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি গত রাত্রে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা লোলাকে। লোলা আমার উপস্থিতি টের পেয়েও ফিরে তাকালো না। আমি আর অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সকালের হালকা রোদে বেশ ভালোই লাগছে। রাতের ঠাণ্ডা আমেজটা যেন যেতে গিয়েও যায়নি। একটা ঝাঁটা নিয়ে পাম্পের কাছটা ঝাঁট দিতে শুরু করলাম। তারপর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে গুমটি ঘরে গেলাম। সেখানে ইঞ্জিনটা নিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে জেনসন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আমরা বেরোচ্ছি,—জ্যাক, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঠিক পারবো।

জেনসনের পিছন পিছন গুমটি ঘরের দরজা পর্যন্ত এলাম। দেখি, বাংলো থেকে লোলা বেরিয়ে আসছে। পরনে একটা সবুজ রঙের আঁটোসাঁটো সুতী পোশাক।

জেনসন আমার কোমরে এক খোঁচা মারলো, কি হে, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! দেখেছো কি রকম সেজেছে আমার বউ?

বোকার মত হেসে বললাম আপনার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী মিঃ জেনসন।

সবাই তো তাই বলে—! জেনসনের মুখে গর্বের হাসি, যাকগে, চলি আবার দুপুরে দেখা হবে—। ওদের গাড়ি একরাশ ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেলো—

একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকালাম ঃ দেখতে লাগলাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্নকে'। সত্যিই এরকম একটা জায়গা যদি আমার থাকতো। আর থাকতো লোলার মত সুন্দরী স্ত্রী।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আবার ইঞ্জিনটার কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই স্থির হয়ে কাজ করতে পারছিনা।—লোলার চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব। গত রাতের কথা বারে বারে মনে পড়ছে—

এইভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো। একসময় দেখি, একটা শেভ্রলে গাড়ি গুমটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার আরোহী গাড়ি থেকে নামলো। বয়স হবে বছর চল্লিশের মতো। লম্বা, রোগা চেহারা, পরনে রঙ ওঠা একটা নীল প্যান্ট, ময়লা কালো জামা। গলায় একটা লাল রুমাল বাঁধা,

মাথায় বাদামী রঙের টুপি।

আগন্তুক এসে গুমটি ঘরে ঢুকলো। কাছ থেকে আরো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। তাকে দেখেই আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো লোকটার চেহারায় কেমন যেন একটা পুলিশ পুলিশ ভাব, বিশেষ করে ঐ অন্তর্ভেদী সন্দেহ ভরা শিকারী চোখ জোড়ায়। আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো আমার ভিতরটা যেন তন্নতন্ন করে দেখছে। আমি ইঞ্জিনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কি চাই—?

লোকটা প্যান্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চাই তো অনেক কিছুই। যেমন ধরো জানতে চাই তোমার পরিচয় ; এখানে তুমি কি করছো,—হয়তো জানতে চাই মিঃ জেনসন এখন কোথায় আছেন,—হয়তো তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই, 'নিজের চরকায় তেল দিন' উপদেশটা—কি বলো?—লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠলো।

লোকটার কথা শুনে আমার সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠলো, কিন্তু মনে হলো লোকটার পরিচয় না নিয়ে লোকটার ওপর রাগ করাটা ঠিক হবে না।

ঠাণ্ডা স্বরেই জবাব দিলাম, মিঃ জেনসন ও মিসেস জেনসন ওয়েস্টওয়ার্থে গেছেন। আর আমি হলাম জ্যাক প্যাটমোর এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছি।

তাই নাকি! তার মানে কার্ল তোমাকে চাকরি দিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হুঁ—ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার!

আমি তো ভাবতেই পারিনি ওর স্ত্রীর অমতে কার্ল এখানে লোক রাখবে। কথা বলার সময় তার সন্দেহভরা চোখ আমার ময়লা পোশাক, ছেঁড়া জুতো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। একসময় নিজের মনেই মাথা নাড়লো, কি যেন ভাবলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কার্লের শ্যালক, আমার নাম রিক্স—জর্জ রিক্স।

আমি অনুমান করলাম এ নিশ্চয় জেনসনের মৃতা স্ত্রীর ভাই, লোলার কেউ নয়। সুতরাং বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই ভেবে ইঞ্জিনটার দিকে মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। গীয়ার বক্সের ওপর থমকে দাঁড়ালো আমার কর্মব্যস্ত হাত।

এসব পুরোনো মাল কেনাবেচার ব্যাপারে কার্লের বুদ্ধি আছে। কিন্তু মানুষ চিনতে ওর সময় লাগে, সেরকম বুদ্ধি ওর নেই।

চমকে উঠলাম। কি ইঙ্গিত করছে রিক্স?

কার্লের বউকে তোমার কেমন লাগে? ইঞ্জিনটার ওপর ঝুঁকে থাকায় সে আমার মুখের পরিবর্তন দেখতে পেলো না। কারণ রিক্স কিভাবে জানবে যে, সব সময় আমি শুধু লোলার কথাই ভাবছি!

ভালোই—, স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে ক্ল্যাচ-প্লেট খুলতে শুরু করলাম।

ভালো? তোমার তাই মনে হয়? কিন্তু জেনে রেখো চাঁদ, লোলা তোমাকে পছন্দ তো করেই না, এখানে কেউ কাজ করুক তাও সে চায় না—আমাকেই বলে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ঐ ধরনের একটা উটকো মেয়েকে বিয়ে করে বসবে তা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু লোলা খুব চালাক মেয়ে। কার্লের মতো পয়সাওয়ালা লোককে ও হাতছাড়া করতে চায়নি। তাই ওর সামনে যৌবনের মায়াজাল বিছিয়ে টোপ ফেলেছে। যাই হোক তুমি খুব সাবধানে থেকো বৎস, মনে রেখো তোমাকে বেশিদিন এখানে থাকতে হচ্ছে না। কার্লকে যেমন করে হোক রাজি করিয়ে ও তোমাকে তাড়াবেই।

আমি এমন একটা ভাব করলাম যেন খুব অবাক হয়ে গেছি, বোকা বোকা চোখ করে রিক্সের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে শুধু চাকরিতে ঢুকেছি।

রিক্স দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, তুমি চাকরিতে ঢুকেছো ঠিক কথা, কিন্তু অন্য কেউ কার্লের টাকায় ভাগ বসাক, তা লোলা চাইবে না। সমস্ত টাকা ও একাই নিতে চায়। আমার চোখকে ও ধোঁকা দিতে পারবে না। শুধুমাত্র টাকার জন্যই ও কার্লকে বিয়ে করেছে।

লোলাকে চিনতে তোমার এখনও অনেক বাকি।

তাছাড়া, তুমি হয়তো জানো না, কার্ল অত্যন্ত মিতব্যয়ী। বছরের পর বছর ও শুধু টাকা জমিয়ে গেছে ; বিনা প্রয়োজনে একটা পয়সাও খরচা করেনি। কিন্তু কারোর উপকার করার সময় ও কোনো দ্বিধা না করেই টাকা খরচ করে। আর লোলা সেটা ভালোভাবেই জানে। তাই স্বামীকে চোখে চোখে রাখে—যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বাজে খরচ না হয়। কার্ল যদি ওর অমতে কিছু করে তবে রাত্রিবেলা লোলা তার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই বলছি তুমি আর এখানে বেশি দিন নয়। লোলা হয়তো ভাবছে, ওর মতো তুমিও কার্লের টাকা হাতানোর ধান্দায় আছো।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে কাজ করে চললাম। ক্ল্যাচ-প্লেটগুলো পেট্রলে ভিজিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। রিক্স তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলো, কিন্তু আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

আচ্ছা—শুধু শুধু আর তোমার সময় নষ্ট করবো না, দরজা ছেড়ে রিক্স এগিয়ে এলো, বাড়িতে একটা কাজের জন্য আমার কয়েকটা যন্ত্রপাতি দরকার। অন্য সময় কার্লের থেকেই নিয়ে যাই—কিন্তু সে তো এখন নেই, কি আর করবো—বলতে বলতে সে যন্ত্রপাতির তাকের কাছে এগিয়ে গেলো, দেখি কোন্‌টা লাগবে—। হাত বাড়িয়ে রিক্স দু'টো স্ক্রু ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি তুলে নিলো, তারপর হাত বাড়ালো একটা ড্রিল এর দিকে।

মিঃ রিক্স ওগুলো আপনাকে দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। রিক্স থমকে দাঁড়ালো, ভাবলেশহীন মুখে ফিরে তাকালো।

আমি বললাম, মিঃ জেনসন তো এখানে নেই ; তাঁর অনুমতি ছাড়া যন্ত্রপাতি দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি অপেক্ষা করুন, তিনি ফিরে এলে তাঁকে বলে নিয়ে যাবেন।

আমার কথায় কান না দিয়ে ও ড্রিলটা তুলে নিলো। ওর জন্য ভেবোনা দোস্ত, আমি কার্লের আত্মীয়, আমি এগুলো নিলে কার্ল কিছু মনে করবে না।

আমি তাকে বললাম যে, আমি নিরুপায়। আর আপনার যদি সেরকম দরকার থাকে, তবে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, মিঃ জেনসন এসে পড়বেন।

রিক্সের সারা মুখ ঘেমে উঠেছে, মুখটা হয়ে উঠেছে আরো কুৎসিৎ, তাহলে তুমিও লোলার সঙ্গে ভিড়েছ? কার্লের টাকার লোভ তোমার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে কি লোলার সঙ্গে খাটবাজি করছো?

আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেলো, খামচে ধরলাম রিক্সের জামার কলার। দু-বার ঝাঁকানি দিয়ে এক ঝটকায় দরজার দিকে ছিটকে ফেলে দিলাম।

রিক্সের হাত থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ছিটকে পড়লো, গলায় হাত বোলাতে বোলাতে সে উঠে দাঁড়ালো। মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। চোখে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি, ঠিক আছে। দাঁড়া শালা কার্লকে বলে তোর ব্যবস্থা করছি—। কিন্তু আমি তেড়ে যেতেই ও গাড়ির দিকে ছুটে চলে গেলো। তারপর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ ব্যাপারটা জেনসনের কানে গেলে কি হবে কে জানে। তবে ভরসা এই রিক্সের নালিশ শোনার আগেই আমি সাফাই গাইতে পারবো।

দুপুরের দিকে মালপত্র কিনে জেনসন ফিরে এলো। গাড়ি থেকে মাল নামাতে নামাতে তাকে রিক্সের ব্যাপারটা বললাম। কিন্তু লোলার সম্বন্ধে যে কথাগুলো শুনেছি, সেগুলো চেপে গেলাম। আমি জেনসনকে বললাম, মিঃ রিক্স কিছুতেই আমার কথা না শোনায় তাকে আমি তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

জেনসন হাসতে আরম্ভ করলো, ঠিক করেছো। জর্জ ব্যাটা এক নম্বরের বদমাস। আগে যতবারই জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, একবারও ফেরৎ দেয়নি। এখন লোলা আসাতে ব্যাটা জব্দ হয়েছে।—তবে তোমাকে বলে রাখছি জ্যাক, আমি না থাকলে ওকে একটা জিনিসও দেবে না।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। জেনসন যে আমার ওপর রাগ করেনি তাতেই আমি খুশী। কিন্তু মনে হলো রিক্সকে রাগিয়ে আমি বোধহয় ভালো করিনি। এবার থেকে ওর ওপর নজর রাখতে হবে।

বলা যায় না, কোন দিন হয়তো আমার অজান্তেই ও আমার বিপদ ডেকে আনবে।

পুব আকাশে ভোরের সূর্য দেখা দিয়েছে। মরুভূমির আবহাওয়ায় একটা হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে। দূরের ধূসর পাহাড়ের ছায়া যেন পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে মরুভূমির বালির ওপর।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম গত তিন সপ্তাহের কথা— জেনসনের কথা—লোলার কথা। এই তিন সপ্তাহ এখানে কাটানোর পর ফার্নওয়ার্থকে মনে হয় এক মিথ্যে দুঃস্বপ্ন। জীবনের সেই অধ্যায়টা যেন কেউ সযত্নে মুছে ফেলেছে স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে।

লোলা এখনও আমাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু ওর প্রভাবকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পারবো কিনা জানি না।

জেনসনের মতো সহজ সরল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেছে।

একথা ঠিক যে জেনসন লোলাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য একজন পুরুষ সঙ্গী তার দরকার ছিল। তাই আমাকে পেয়ে একেবারে মেতে উঠেছে। আমি এইরকম লোকের প্রতি কিছুতেই অকৃতজ্ঞ হতে পারবো না।

জেনসনের মুখ থেকেই শুনেছি কি ভাবে আয়কর ফাঁকি দিয়ে বছরের পর বছর সঞ্চয় করে সে এক লাখ ডলার জমিয়েছে। ওর একমাত্র ইচ্ছা আরও কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে লোলাকে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। তবে লোলা জেনসনের ইচ্ছার কথা এখনও জানে না।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই নজরে পড়লো রেস্তোরাঁর বারান্দার দিকে। লোলা একটা চেয়ারে বসে ছুরি দিয়ে তরকারি কুটছে।

আজ আমার মাইনের দিন। বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবছিলাম কোথায় ফার্নওয়ার্থ আর কোথায় জেনসনের আন্তরিকতা— এইভাবে যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

প্রাতঃরাশ সেরে গুমটি ঘরে গেলাম। আগের দিন জেনসন একটা পুরোনো মোটর কিনে এনেছিলো, সেটা সারাতে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদেই জেনসন এসে উপস্থিত, হাতে একগোছা নোট, জ্যাক, নাও—ধরো, এখানে আড়াইশো ডলার আছে। মাইনের চল্লিশ, রেস্তোরাঁর কমিশন একশো দশ আর সেই ইঞ্জিনটার জন্য একশো।

কিন্তু—মিঃ জেনসন—এত টাকা—

আরে তোমার জন্যই তো আজ আমার ব্যবসা এতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তুমি আসার পর থেকেই লাভের অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আমি আর আপত্তি না করে হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিলাম। জেনসনকে আমি বললাম, এগুলো নিয়ে আমার কাছে মোট পাঁচশো দশ ডলার হলো, কিন্তু টাকাগুলো খরচ করার তো কোন উপায় দেখছি না। বরং যদি আপনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন, তাহলে টাকাগুলো ওখানেই রাখতে পারি—।

জেনসন তো আমার কথা শুনে হেসেই অস্থির, ব্যাঙ্কে কখনো কেউ টাকা রাখে? কখন কোন্ ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলবে কেউ বলতে পারে না। আমি আমার সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে রাখি। যখন ইচ্ছা, সুবিধা মতো খরচ করতে পারি। তাছাড়া আমার ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে লোলা সহজেই টাকাটা পেয়ে যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি ইচ্ছা করলে তোমারটাও আমার কাছে জমা রাখতে পারো জ্যাক। যখন খুশী চেয়ে নেবে।

হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে জেনসনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তার মানে—ঐ এক লাখ ডলার আপনি একটা সিন্দুকে রেখেছেন?

হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?—হুঁ হুঁ বাবা, সে যে-সে সিন্দুক নয়, রীতিমত লরেন্স কোম্পানির সিন্দুক—বাজারের সেরা। জেনসনের মুখে গর্বের হাসি আর ধরে না।

আমিও জেনসনের কথায় সায় দিলাম, সত্যিই, ওর চেয়ে আর ভালো সিন্দুক বাজারে নেই।

জেনসন আমার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললো, যাও টাকাগুলো নিয়ে এসো। সিন্দুকে জমা করে রসিদ দিয়ে দিই। দরকার পড়লেই চাইবে, লজ্জা করবে না সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি তোষকের তলা থেকে সব টাকা বের করে এনে জেনসনের হাতে তুলে দিলাম।

সে আমাকে পাঁচশো দশ ডলারের একটা রসিদ দিলো। রসিদটা এক পলক দেখে নিয়ে পকেটে ভরলাম।

টাকাগুলো পকেটে রেখে জেনসন ঘড়ি দেখলো, বেলা হয়ে এলো। একটু পরেই বাস এসে পড়বে। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যাক তুমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে লোলাকে সাহায্য করো। টাকাটা রেখে এসে আমি এদিকটা সামলাচ্ছি। যাও, এখন থেকেই লেগে পড়ো।

সম্মতি জানিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালাম।

লোলা ফ্রুট পাইগুলো জারে জারে সাজিয়ে রাখছিলো, আমি ঘরে ঢুকতেই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালো। ওর সবুজ চোখে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে। সারা মুখে একটা চাপা কৌতুক খেলা করছে

আমি জানতে চাইলাম কোনো কাজ আছে কিনা।

লোলা হাসলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো। আজ পর্যন্ত একদিনও আমাকে দেখে হাসেনি। তাহলে আজ—

লোলার হাসি আরও ক্রূর হয়ে উঠলো।

মুহূর্তে বিপদের লাল সংকেত ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

মিস্টার প্যাটমোর?—কথা বলার সুরটা যেন কেমন অদ্ভুত মনে হলো।

রান্নাঘরে যাও। সকালে যে জিনিসপত্রের বাক্সটা দিয়ে গেছে ওটা আমি টেবিলের ওপর তোমার জন্য খুলে রেখে এসেছি। গেলেই দেখতে পাবে।

রান্নাঘরে গেলাম। দেখি টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে কতক গুলো খাবারের টিন, পলিথিনে মোড়া দু'ডজন মুরগী, তাছাড়া অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র।

খাবারের টিনগুলোর ওপরে রাখা রয়েছে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ, সম্ভবত কোনো কিছু মোড়া ছিল। ওটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করলাম। অর্ধেকটা খুলতেই বুকের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটলো—চোখের সামনে যেন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে—

কাগজের প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে লেখা—

'কুখ্যাত সিন্দুক লুণ্ঠনকারী আজও পলাতক' তার নীচে আমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ছাপানো ফটোটার দিকে চোখ পড়তেই অনুভব করলাম মৃত্যুর অশরীরী স্পর্শ। এমনিতে ফটোটা অত্যন্ত বাজে ছাপা হয়েছে: বলতে গেলে আমাকে চেনাই যায় না। কিন্তু লোলার তাতে এতোটুকু অসুবিধে হয়নি। দেখি ফটোটার ওপর পেন্সিল দিয়ে ও আমার গোঁফটা নিখুঁত ভাবে এঁকে দিয়েছে।

ফার্নওয়ার্থকে আর মিথ্যে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো না। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার বীভৎস নারকীয় অত্যাচারের দৃশ্য।

ওকল্যান্ডের খবরের কাগজ কি করে ওয়েন্টওয়ার্থের দোকানে গেলো তা বলতে পারি না। আমার শান্তি নিরাপত্তার সুখ-স্বপ্ন এক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। লোলা নিশ্চয়ই জেনসনকে একথা বলেনি। যদি বলে থাকতো তবে জেনসনের কথাবার্তায় তা বুঝতে পারতাম। এখন তাহলে শুধু লোলার ফোন করার অপেক্ষা। ফোন পেয়েই পুলিশ ভ্যান এসে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ফার্নওয়ার্থে।

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা নিয়ে জ্বলন্ত স্টোভে গুঁজে দিলাম, দেখতে দেখতে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। ভাবলাম, লোলা যদি পুলিশকে জানিয়ে দেয় আমি এখানে ছিলাম, তাহলে প্রথমেই ওরা যে শহরে আমাকে খোঁজ করবে, তা হলো ট্রপিকা স্প্রিংস। আর ওকল্যান্ডে ফিরে যাবো সে সাহসও আমার নেই।

তাহলে এখন কি করা যায়? না, তার চেয়ে বরং ট্রপিকা স্প্রিংসে যাওয়া যাক। তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও পালানো যাবে, পাঁচশো ডলারের কথা ভাবতেই মনে হলো সেগুলো তো জেনসনের কাছে। আবার এখন যদি সে টাকা ফেরত চাই, তবে কি জেনসন সন্দেহ করবে না?

বিস্ময়-বিভীষিকায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

লোলা রান্নাঘরের দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকলো, ও আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো আমার মনোভাব।

আমিও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম।

ও হঠাৎ আমাকে বললো, আমাদের দু'জনের একটা আলোচনা হওয়া দরকার। আজ তো তোমাকে সারারাত কাজ করতে হবে তাই না? রাতে কার্ল ঘুমোলে আমি আসবো।

বুঝলাম ও পুলিসে খবর দেয়নি। আমার সঙ্গে আলোচনা করে কোনো রফা করতে চায়। কিন্তু মনে হলো আমার নিরাপত্তার বিনিময়ে ও কিছু চাইতে পারে? আমি এখন লোলার হাতের মুঠোর মধ্যে। ও যা বলবে তা করতে আমি বাধ্য। এবং লোলাও সেটা জানে। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে ওর কথামতো রান্নাঘর ছেড়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর হলদে চোলি আর লাল প্যান্টের ওপর।

ভারাক্রান্ত মনে বাইরে এলাম, ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না।

একটু পরে বাস এসে পড়ায় আমরা তিনজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের ভীড় বাড়তে লাগলো।

ঘণ্টাখানেক পর বাস চলে গেলে জেনসনের কথামতো পাম্পগুলোর দিকে খেয়াল রাখার জন্য বাইরের বারান্দায় এলাম। যাক্, এখানে বসে অন্ততঃ একটু ভাববার সময় পাওয়া যাবে। এতোক্ষণ পর সেই ভয়টা আবার আমাকে আঁকড়ে ধরলো। সম্ভব-অসম্ভব নানান চিন্তা এসে ভীড় করলো মাথার মধ্যে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি হতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখি, লোলা রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে একগাদা প্লেট।

এই অপগণ্ড লোকটাকে এখানে কি জন্য এনেছো? লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, কাজের নাম নেই, বসে বসে শুধু গেলা। আমাকে একাই সব কাজ করতে হবে নাকি?

লোলা—চাপা স্বরে ধমকে উঠলো জেনসন। আমি জ্যাককে বলেছি এখানে বসতে। পাম্পগুলো দেখতে।

আমি চেয়ার ছেড়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, ভুল হয়ে গেছে মিসেস জেনসন, এবারকার মতো মাপ করুন।

লোলা ঝড়ের বেগে চলে গেলো বাংলোর দিকে। ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

লোলা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম জেনসনের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। আমি যতদূর সম্ভব তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করে জেনসনকে বলি এ ব্যাপারটা পুরোটাই একটা সাজানো নাটক ; আজ রাতে আলাদা শোবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করার জন্যই লোলার এই অভিনয়।

রান্নাঘরে দু'জনে কাজ করছি। হঠাৎ কানে এলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম—লোলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরনে সেই সবুজ পোশাক। ও গাড়ি ছুটিয়ে দিলো ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে, চমকে উঠলাম! কোথায় যাচ্ছে লোলা? থানায় না তো?

জেনসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জানো জ্যাক, মাঝে মাঝে ওর জন্য আমার দুঃখ হয়, আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেই ও ওরকম করে। ভাবি প্রথম জীবনে হয়তো খুব কষ্ট করতে হয়েছে, তাই ওর ব্যবহার এরকম।— ভেবেছিলাম তুমি আসার পর আমরা দু'জনে একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবো, কিন্তু কোনদিনই কোথাও যাবার জন্য ওকে রাজি করাতে পারিনি। যাকগে ওসব কথা বাদ দাও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার কাজে মন দিলো।

এরপর গাড়ির ভীড় বাড়তে শুরু করায় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম—

রাত প্রায় সোয়া এগারোটায় লোলা ফিরলো। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। সশব্দে বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা।

জেনসন ভারী পদক্ষেপে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো। বিষাদের ছায়া তখনও ওর মুখ থেকে মিলিয়ে যায় নি।

রেস্তোরাঁর বারান্দায় বসে শ্রীমতীর অপেক্ষা করতে লাগলাম। জেনসন ঘুমিয়ে না পড়লে লোলা আসতে পারবে না। সুতরাং একটু সময় লাগবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম।

ভাবতে লাগলাম নিজের বর্তমান অবস্থার কথা।

যদি জেনসনের কাছে টাকাগুলো না রাখতাম, তাহলে কখন হাওয়া হয়ে যেতাম। কেউ আমার খোঁজও পেতো না। কিন্তু এই কপর্দকহীন অবস্থায় পালাবার চিন্তা করা শুধুই পাগলামি।

সুতরাং মাথায় চিন্তার পাহাড় নিয়ে লোলার আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। চোখদুটো আটকে রইলো বাংলোর আলোকিত জানলার দিকে।

।। ছয় ।।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত একটা চল্লিশ বাজে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম—হঠাৎ বাংলোর দরজায় চোখ পড়লো, লোলা চুপিসাড়ে বেরিয়ে আস ়ছে। অবসন্নভাবে পা ফেলে ও আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। পরনে একটা সাদা শার্ট আর ফিকে সবুজ রঙের স্কার্ট।

রেস্তোরাঁর বারান্দা অন্ধকারে ঢাকা। সামনের খোলা উঠোনে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। লোলা বারান্দায় উঠে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে বসলো।

মনকে তৈরী করলাম। বুঝতে পারলাম না, কি শর্তের বিনিময়ে ও আমার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

সিগারেটের হালকা লাল আলোয় লোলার মুখটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

তোমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি, কারসন। প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, তুমি ছদ্ম পরিচয়ে এখানে আছো। কিন্তু তুমি যে ফার্নওয়ার্থ থেকে পলাতক—শেট কারসন, তা ভাবতে পারিনি—আর তোমার সিন্দুক বিশারদ হওয়াটা নিতান্তই ভগবানের আশীর্বাদ।

আপনি কি পুলিশে খবর দিতে চান?

লোলা জানালো এখনও সে কিছু ঠিক করেনি। সেটা আমার মতামতের ওপরই নাকি নির্ভর করবে। আমি ওর কথায় রাজী হলে ভালো না হলে সোজা ফার্নওয়ার্থ—। ও আরো বললো যে, —কাগজে লিখেছে তুমি লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশন-এ কাজ করতে—তোমাকে একটা সিন্দুক খুলতে হবে কারসন! কার্লের একটা লরেন্স সিন্দুক আছে—তোমাকে সেটা খুলতে হবে।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। তাহলে রিক্স দেখছি মিথ্যে কথা বলেনি। লোলা শুধুমাত্র টাকার লোভেই জেনসনকে বিয়ে করেছে।

সিন্দুক থেকে কিছু যদি আপনার নেবার থাকে তো, মিঃ জেনসনকে বলছেন না কেন? আমি বোকা সাজার চেষ্টা করলাম, কারণ লোলার উদ্দেশ্যটা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

বেশী চালাক সাজবার চেষ্টা করো না, কারসন। বিকেলে কি বলেছিলাম তা আশা করি ভুলে যাওনি? এখন থেকে আমি যা বলবো, নয়তো—

রিক্সের কথাই দেখছি সত্যি! শুধু টাকার জন্যই এতোদিন এখানে পড়েছিলেন?

বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো, সিন্দুক তুমি খুলছো কিনা বলো?'

খোলার পর—?

লোলা নড়েচড়ে বসলো, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, তুমি এক হাজার ডলার পাবে, আর পালিয়ে যাবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দেওয়া হবে।

আমি মনে মনে লোলার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। আমি সিন্দুক খুলবো আর এক লাখ ডলার তুমি হাতাবে। তারপর দয়া করে আমাকে এক হাজার ডলার ভিক্ষে দেবে। আর পালাবার জন্য, কিছু সময়! আর তাও কিনা জেনসন থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত সবাই যাতে ভাবে, আমিই সিন্দুকের টাকাটা হাতিয়ে কেটে পড়েছি! চমৎকার—তোমার জবাব নেই সুন্দরী!

আমি লোলাকে বললাম, আপনি ঐ এক লাখ ডলার চুরি করার মতলবে আছেন, আর মিঃ জেনসন ভেবেছিলেন আপনাকে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে যাবেন। দু-হাতে খরচ করবেন, সব আপনারই জন্য—। শ্লেষে আমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। লোলাকে যেন আর সহ্য করতে পারছি না। আমার বেশী রাগ হলো জেনসনের মতো লোককে ও ঠকিয়েছে বলে।

অন্ধকারে অনুভব করলাম লোলা তাকিয়ে রয়েছে—কারসন, আমার মনে হয় সিন্দুকটা

খুললেই তোমার ভালো হবে।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম সিন্দুকটা আমাকে খুলতেই হবে। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু জেনসনের কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। সে আমার একমাত্র বন্ধু, শুভাকাঙ্খী—আমার কতো উপকার করেছে, আর তাকেই এভাবে পথে বসাবো? অথচ ফার্নওয়ার্থের কথা মনে পড়তেই ভয়ে একেবারে শিউরে উঠছি।

আমি লোলাকে প্রশ্ন করলাম, সিন্দুকটা কোন্ ঘরে আছে?

লোলা বললো, বাংলোর বসার ঘরে। আগামী শনিবার সন্ধ্যেবেলা কার্ল ওয়েস্টওয়ার্থে একটা মিটিং এ যাবে। তারপর রাত একটায় ফিরবে। ওর মধ্যেই কাজটা শেষ করতে হবে।

একটা সিগারেট ধরলাম। লাইটারের আলোয় দেখলাম, লোলার চোখ জোড়া লোভে চক্‌চক্ করছে। কারো আসন্ন মৃত্যুর প্রত্যাশায় যেন অপেক্ষা করছে এক বিশাল শকুনি।

আমি জানতে চাইলাম সিন্দুক খোলার সময় লোলা কোথায় থাকবে?

লোলা বললো, শনিবার তোমার জায়গায় আমি সারারাত কাজ করবো। তুমি যখন সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে হাওয়া হবে, তখন আমি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকবো।

টাকা যে চুরি গেছে সেকথা লোকে জানবে কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারবো না। অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝক করে উঠলো লোলার দাঁতের সারি।

আমিও মনে মনে এক মতলব ভাঁজলাম। এমনিতেই তো আমাকে পালাতে হবে, ক্ষতির মধ্যে শুধু চাকরিটা—তা যাকগে। কিন্তু জেনসন যাতে আমাকে ভুল না বোঝে, সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। মতলবটা যে কার্যকরী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি সিন্দুক খোলার পর লোলা যখন টাকাগুলো নিতে থাকবে তখন এক ঘুঁষিতে ওকে অজ্ঞান করে সমস্ত টাকা নিয়ে পালাবো। যাবার আগে টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে যাবো। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে জেনসনের সমস্ত টাকা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। সঙ্গে একটা চিঠিও লিখে পাঠাবো কি ধরনেব এক বাজারের মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই জেনসনের ভুল ভাঙবে।

মুখে খুব একটা কিছু বললাম না। শুধু বললাম দেখুন মিসেস জেনসন—মিঃ জেনসনকে ঠকানোটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। তিনি আমার জন্য কত করেছেন, তাছাড়া—।

ওসব ন্যাকামো রাখো, কারসন।

সোজাসুজি বলো সিন্দুক খুলছো, না ফার্নওয়ার্থে ফিরে যাবে?

আর যেখানেই যাই, ফার্নওয়ার্থে আমি ফিরছি না।

লোলার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, অতোবার করে আপনাকে বলতে হবে না। যখন বলেছি খুলবো, তখন খুলবো। তাই যেন হয়, মিস্টার শেট কারসন। লোলা বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো। দেখতে পেলাম, যেতে যেতে ও একবার পিছন ফিরে তাকালো, মুখে জয়ের হাসি।

সিগাবেটের টুকরোটা বালির ওপব ছুঁড়ে দিলাম, দেখা যাক সুন্দরী, কে হারে আর কে জেতে।

পরদিন লোলাকে রান্নাঘরে একা পেয়ে সিন্দুকের নম্বরটা এনে দিতে বললাম। কারণ ওটা না পেলে সিন্দুকটা কি ধরনের তা বোঝা যাবে না। আর সিন্দুক ভাঙতে হলে সেটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন, পরে জেনসনের অনুপস্থিতির সুযোগে ও এক টুকরো কাগজ এনে আমার হাতে দিলো। নম্বরটা দেখেই বুঝলাম সিন্দুকটা অত্যন্ত পুরনো মডেলের। বাজারে এখন আর পাওয়াই যায় না। লোকে এই ধরনের চাবি-ছাড়া সিন্দুক অপছন্দ করায় কোম্পানি এই সিন্দুক তৈরী বন্ধ করে দেয়, কেননা এ ধরনের সিন্দুকগুলোর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালা এঁটে যায়। এছাড়া এই সিন্দুকগুলো খুলতে চোর-গুণ্ডাদের খুব একটা কষ্ট করতে হবে না।

ভাবতে ভালো লাগলো যে সিন্দুক খুলতে বড় জোর আমার দশ মিনিট লাগবে। আর সময় যতো কম লাগবে, ততোই ভালো—পালাবার জন্য কিছু বেশী সময় পাওয়া যাবে।

পরদিন সকালবেলা আমি আর জেনসন গ্যারেজে কাজ করছি। হঠাৎ কাজ থামিয়ে ও বলে উঠলো জ্যাক, শনিবার সাতটায় আমাকে ওয়েস্টওয়ার্থে যেতে হবে,—একটা মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে একটা দেড়টা বাজবে।—লোলা সেদিন রাত্তিরে কাজ করবে বলছিলো, তুমি পারো তো

ওর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। বলা যায় না, কখন কোন মাতাল ড্রাইভার উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।

বুকের ভেতর একটা চাপা দুঃখ অনুভব করলাম। জেনসন আমাকে এতখানি বিশ্বাস করে? একবারও ভেবে দেখলো না যে লোলাকে একা পেয়ে আমিও তো কোনো মাতাল ড্রাইভারের মতো কাজ করতে পারি! আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিঃ জেনসন, আমি অবশ্যই নজর রাখবো।

জেনসন হেসে বললো, তোমার মতো একজন বিশ্বাসী লোক পেয়ে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে, জ্যাক—তোমাকে চিনতে আমি ভুল করিনি।

আমি জেনসনের থেকে ওর গাড়িটা চেয়ে নিলাম ট্রপিকা স্প্রিংসে কয়েকটা জিনিস কেনা কাটা করার জন্য আর চাইলাম একশো ডলার। জেনসন একটু অবাক হলেও আমার কথা রাখলো। জেনসনের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিয়ে আমি গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। লোলা রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করছে। যদি জানতো যে ওর জন্য আমি কি ফাঁদ পেতেছি, তবে ওখানে আর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতো না।

ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাচারেক সময় লেগে গেলো। সেখানে পৌঁছেই খোঁজ নিলাম ন্যু-ইয়র্কের ট্রেন ক'টায় ছাড়ে। প্লেনে করে পালানোর মতলব অনেক ভেবেচিন্তেই ত্যাগ করেছি। কারণ লোলা পুলিশে আমার খবর দেওয়া মাত্রই অর্থাৎ পুলিশ আমার পালানোর খবর পেলেই ট্রপিকা স্প্রিংসের এয়ারপোর্টে আমার খোঁজ করবে। তাছাড়া রাত্রিবেলা প্লেনে যাবো কিনা, তারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, রাত সাড়ে বারোটায় ন্যু-ইয়র্কে যাবার একটা ট্রেন আছে। অতএব চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। জেনসন সাতটায় ওয়েস্টওয়ার্থে রওনা হবে। আর সাড়ে সাতটার মধ্যে সিন্দুক খুলে লোলাকে ল্যাং মেরে আমিও কেটে পড়বো, তাহলে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছে ট্রেন ধরার জন্য আধঘণ্টারও বেশী সময় পাওয়া যাবে। সহজে যাতে পুলিশের চোখে না পড়ি তাই আমার সাজ-পোশাক পরিবর্তন করার কথা ভাবলাম। ঠিক করলাম ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।

তাই ট্রেনের খোঁজখবর নিয়ে একটা দোকানে গেলাম। একটা হালকা বাদমী প্যান্ট আর একটা ছাই রঙের কোট কিনলাম। কোটের সামনের পকেট দুটো গাঢ় সবুজ রঙের, যাতে বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। আরো কিনলাম একজোড়া জুতো, গাঢ় বাদামী রঙের একটা টুপি, এক শিশি কলপ ও একটা গগল্‌স্‌। এই জিনিসগুলো একটা সুটকেস কিনে তাতে ভরে ফেললাম। গাড়ির ক্যারিয়ারে সুটকেসটা বন্ধ করে ফিরে চললাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে মরুভূমিতে এসে পড়লাম। দূরের বালিয়াড়ির ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো ঘন ক্যাকটাসের ঝোপ। গাড়ি থামিয়ে ক্যারিয়ার থেকে সুটকেসটা বের করে এগিয়ে চললাম ক্যাকটাস ঝোপের দিকে। একটা ঘন ঝোপের মধ্যে ওটাকে লুকিয়ে ফেললাম। একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটা খুঁজে বের করা একেবারেই অসম্ভব।

'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' ছেড়ে পালাবার পথে এখানে নেমে চেহারা এবং বেশবাস সমস্ত পাল্টে নেবো। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে ট্রেন ধরে সোজা ন্যু-ইয়র্ক। লোলা আমার চেহারার বর্ণনা দিলেও পুলিশ আমাকে ছদ্মবেশে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না।

নিশ্চিন্ত মনে আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ফিরে এসেই কাজে মন দিলাম। যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় আমি জেনসন এবং লোলা—তিনজনেই কাজ করে চললাম। রাত প্রায় এগারোটার সময় রেস্তোরাঁ একেবারে ফাঁকা হয়ে পড়লো। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর জেনসন আমাকে পেট্রল পাম্পগুলো দেখতে বলে শুতে চলে গেলো।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে এসে বসলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'কে আর একবার ভালো করে দেখলাম। আর মাত্র একটা দিন তারপর এ জায়গা ছেড়ে আমাকে চিরকালের জন্য চলে যেতে হবে। আজই প্রথম অনুভব করলাম, 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'কে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এ জায়গা ছেড়ে যেতে আমার মন চাইবে না।

শনিবার সন্ধ্যে সাতটা। গুমটিঘরে সেই পুরোনো মোটরটা নিয়ে কাজ করছিলাম, পায়ের শব্দে

মুখ তুলে তাকালাম, সামনেই দাঁড়িয়ে জেনসন।

জ্যাক আমাকে এখনই যেতে হবে। সাতটা বাজে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। ফিরতে ফিরতে হয়তো দুটোও বেজে যেতে পারে।

জেনসন রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালো। সম্ভবতঃ লোলার কাছ থেকে বিদায় নিতে। একটু পরে সে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ঝড়ের বেগে ছুটে চললো জেনসনের মার্কারি, যতোদূর দেখা গেলো চেয়ে রইলাম।

আমি বাংলোর দিকে পা বাড়ালাম সেই অভিশপ্ত সিন্দুক খোলার জন্য। অভিশপ্ত এই কারণেই বললাম যে এর জন্যই তো আমাকে জেনসনের মতো লোকের বন্ধুত্ব হারাতে হচ্ছে।

লোলা বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো আমার জন্য উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় ওর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। আমাকে দেখেই চাপা স্বরে বলে উঠলো, তাড়াতাড়ি শুরু করো কারসন।

আমি সিন্দুকটা কোথায় আছে জেনে নিয়ে লোলাকে পাম্পের কাছে থাকতে বললাম কেননা তেল নেবার জন্য কোনো ট্রাক এসে পড়তে পারে।

লোলা চলে যাবার পর বসবার ঘরে গিয়ে সোফাটা সরিয়ে সিন্দুকটাকে এক নজরে দেখলাম। যা ভেবেছি তাই। শুধু কম্বিনেশন ঘোরালেই সিন্দুকটা খুলে যায়—চাবির আর প্রয়োজন হয় না। লোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। ওকে বললাম, গ্যারেজ থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি আনতে হবে। আপনি বরং রেস্তোরাঁটা বন্ধ করে দিন। নয়তো কোনো খদ্দের এসে চীৎকার শুরু করে দেবে।

লোলা জানালো যে, সে অনেক আগেই রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে ওকে পাশ কাটিয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গ্যারেজ থেকে গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগে ভরে বাংলোয় ফিরে চললাম। টাকাগুলো এই ব্যাগে নিয়েই পালাতে হবে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটা পুরোনো ঝরঝরে প্যাকার্ড এগিয়ে আসছে। লোলা গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে পাম্পের দিকে এগিয়ে এলো। আমি আর অপেক্ষা না করে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। নিছক কৌতূহল বশে গাড়িতে বসে থাকা লোক দু'টোর দিকে এক পলক তাকালাম—শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেলো। পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেলো। যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেঝেতে—

গাড়িতে বসে দু'জন পুলিস! আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। পায়ে পায়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

অ্যাই—শোনো— বাজখাঁই গলায় একজন ডেকে উঠলো। পুলিস দু'জন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় লক্ষ্য করছে।

লোলাও বুঝতে পেরেছিলো লোক দুটোর আসল পরিচয়। দেখলাম ও ভয়ার্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

আমি ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যতোখানি ভয় পেয়েছিলাম তা নয়। ওরা জানালো যে, ওদের একটা চাকা আসবার পথে ফেঁসে গেছে। গাড়ির ক্যারিয়ারের চাবিটা আমার হাতে দিল, এবং চটপট সারাবার ব্যবস্থা করতে বললো।

আমি আর দেরী না করে ক্যারিয়ার খুলে চাকাটা বের করলাম। ওরা লোলার দিকে তাকালো। আঙুল দিয়ে গাড়িটাকে দেখালো, এটাতে পেট্রল ভরার ব্যবস্তা করো ; আর দ্যাখো খাবার দাবার কিছু আছে কিনা।

লোলা একটু ইতস্ততঃ করলেও রেস্তোরাঁ যে বন্ধ সে কথা বলতে আর সাহস করলো না।

যাই হোক আটটা দশের সময় হতচ্ছাড়া পুলিশ দু'টোর হাত থেকে নিস্তার পেলাম। কিন্তু আসল কাজ আর হলো না। খদ্দেরের পর খদ্দের আসতে লাগলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে রেস্তোরাঁ খুলতে হলো। আমি আর লোলা অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে চললাম।

রাত প্রায় দশটার সময় নিঃশ্বাস ফেলার একটু সুযোগ পেলাম। সামনে এঁটো কাপ প্লেটেব স্তূপ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লোলা।

আমি এগুলো ধুয়ে রাখছি। তুমি গিয়ে সিন্দুক খোলো।

আমি লোলাকে বললাম যে, আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে। এর জন্য অন্য একটা দিন ঠিক করতে হবে।

লোলা আগুন ঝরা চোখে আমার দিকে তাকালো, আশা করি আমার কথাটা তোমার কানে গেছে কারসন।

আর ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই তো মিঃ জেনসন ফিরে আসবেন, তাহলে পালাবার সময়টা আমি পাবো কখন?

লোলা কোনো জবাব না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো এখনও ভেবে দেখো কি করবে।

বুঝলাম ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। পুলিশকে জানাতেও পারে। সুতরাং আর দেরী না করে গ্যারেজে গেলাম। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে আবার ফিরে চললাম বাংলোর দিকে।

এখন দশটা বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ তিনটের আগে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছনো অসম্ভব, সেখানে গিয়ে প্রথমেই আমাকে স্টেশন ওয়াগনটার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ জেনসন পুলিশকে যখনই জানাবে আমি স্টেশন ওয়াগনে করে পালিয়েছি ওরা ট্রপিকা স্প্রিংসে এসে আগে ওটারই খোঁজ করবে। তারপর আমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ভাগ্য সহায় থাকলে হয়তো পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারবো।

বসবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর যন্ত্রপাতি নিয়ে সিন্দুকের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম। নম্বর বসানো চাকতিটা একটু একটু করে ঘোরাতে আরম্ভ করলাম। ঝুঁকে পড়ে ইস্পাতের দরজায় কান চেপে রইলাম। একুট পরেই 'খুট' করে একটা শব্দ হলো। অর্থাৎ প্রথম নম্বরটা মিলে গেছে। সিন্দুক সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা ঐ সামান্য শব্দ শুনেই বুঝতে পারে নম্বরটা ঠিক মতো মিলেছে কিনা। এবার দ্বিতীয় সারির চাকতি নিয়ে পড়লাম—

মিনিট দশেক পর হাতল টেনে সিন্দুকের দরজা খুলে ফেললাম। চোখের সামনে থাকে থাকে সাজানো একশো ডলার নোটের একশোটা বাণ্ডিল। এক লাখ ডলার—জেনসনের সারা জীবনের সঞ্চয়।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা টেনে নিয়ে নোটের বাণ্ডিলের দিকে হাত বাড়ালাম।—একি! জ্যাক!! তুমি এখানে কি করছো!!!

একটা উত্তপ্ত ইস্পাতের ফলা যেন আমার বুকটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো—কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম—একটা হাত নোটের বাণ্ডিলের ওপর স্থির—সময়ের তরঙ্গ থেমে রইলো ঐ একটি বিশেষ মুহূর্তে—

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জেনসন, চোখ দুটো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তখন অসাড় হয়ে গেছি, ফ্যাল ফ্যাল করে জেনসনের দিকে তাকিয়ে রইলাম, জেনসন ভারী পা ফেলে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো, জ্যাক! এ তুমি করছো কি? সমস্ত যন্ত্রণা, হতাশা ঝরে পড়লো তার কণ্ঠে। লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো। জেনসনের বিশ্বাসের স্বর্গ আমি নিষ্ঠুর ভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ জেনসন। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার টাকা আমি চুরি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা নয়। যদিও জানি, একথা বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন, তবু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

এমন সময় ঘরের দরজায় লোলা এসে দাঁড়ালো। ওর সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। জেনসনকে দেখেই তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কি হয়েছে, কার্ল?—একি? ও সিন্দুক খুলছে? আমি আগেই জানতাম। তোমাকে বারবার সাবধান করেছি—অচেনা লোককে কখনো বিশ্বাস করো না। এখন বুঝতে পারছো তো?—

জেনসনের কানে লোলার কথাগুলো ঢুকলো কিনা কিছুই বোঝা গেলো না। সে তখন একই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে বললো, জ্যাক, তুমি এভাবে—তার অর্ধসমাপ্ত কথাগুলো চাবুকের মতো আমার বিবেকের ওপর আছড়ে পড়লো।

কিন্তু মিঃ জেন—

এর পরেও কি তোমার কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ আছে। আমার নাম জ্যাক প্যাটমোর নয়, শেট কারসন। মাস দেড়েক হলো আমি ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি। একটা কাগজে আমার ছবি দেখে মিসেস জেনসন আমাকে চিনতে পারেন, এবং আমি যদি সিন্দুক না খুলি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন বল ভয় দেখান।

লোলা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলো, চোর মিথ্যেবাদী কোথাকার! কার্ল! তুমি এই লোকটার কথায় কান দিও না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ও মিথ্যে কথা বলছে! আমি এখুনি পুলিশে ফোন করছি।

জেনসন ধীরে ধীরে লোলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। পুলিশ ডাকবো কি ডাকবো না, সেটা আমি বুঝবো, যেটা ভালো হয় আমিই করবো।

লোলা দেওয়ালে হেলান দিয়ে গোখরো সাপের মতো ফুঁসতে লাগলো। ওর সবুজ চোখের তারায় ভয়ার্ত সতর্ক দৃষ্টি।

আমি একে একে জেনসনকে সমস্ত কিছু জানালাম। টাকাটা যে তাকে ফেরৎ পাঠাতাম, তাও বললাম।

সব শুনে জেনসন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। মনে হলো এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। লোলার দিকে তাকিয়ে বললো, শুতে যাও লোলা। এ ব্যাপার নিয়ে কাল আলোচনা করা যাবে। আজ আর তোমাকে রাত জাগতে হবে না। যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।

লোলা পায়ে পায়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো পুলিশকে ফোন করার জন্য।

জেনসন এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো, ফোন করার ব্যাপারটা আমি ভাববো!

ঘর থেকে এক ধাক্কায় ওকে বের করে দিয়ে এসে সোফায় বসলো।

তখনও আমি খোলা সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

কি আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো, জ্যাক! আমাদের সভাপতি হঠাৎ হার্টফেল করায় মিটিং মাঝপথে ভেঙে গেলো। অদ্ভুত ব্যাপার একজন মারা গেলো, আর তার জন্য আমি আবিষ্কার করলাম আমার বউ একটা বাজারে মেয়ে।

তার কথায় চমকে উঠলাম, তার মানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?

জেনসন আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। একটা বিষণ্ণ বেদনার ছায়া ওকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। চোখের মণির ওপর অশ্রুর আস্তরণ। সে মৃদুস্বরে বললো, জ্যাক, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ। এখনই তা বুঝতে পারছি।

আমি মিঃ জেনসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বুঝতেই তো পারছেন, এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না—অনেকক্ষণ পরে বুক ভরে শ্বাস নিলাম। মনটা অনেক হাল্কা হলো।

জেনসন আমাকে জানালো যে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে কেননা এ জায়গাটা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। লোলা যে ভাবেই হোক পুলিশকে জানাবে। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বললো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কেননা যে কোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে। জেনসন আমাকে তিরিশ হাজার ডলার দিতে চাইল 'ন্যু-ইয়র্ক' গিয়ে ব্যবসা করার জন্য। আমি আপত্তি জানালাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। জেনসন বললো, জ্যাক, আমি যখন বলছি, এ টাকা তোমাকে নিতেই হবে। পৃথিবী ভ্রমণের শখ আমার মিটে গেছে। সুতরাং এ টাকা আমার আর কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু তোমার এখন টাকার প্রয়োজন, তাই তোমাকে দিচ্ছি।—আর একটা কথা মনে রেখো জ্যাক, তোমাকে আগে যেমন ভালোবাসতাম, এখনও তেমনি বাসি। জেনসনের চোখের কোণে চিকচিক করছে দু'ফোঁটা অশ্রু।

ঠিক তখনই লোলাকে দেখলাম। ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে একটা সবুজ পোশাক, মুখ শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ, চোখ দুটো বেড়ালের মতো জ্বলছে। আর—এক হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ·৪৫ বোরের রিভলভার।

।। সাত ।।

ঘরের পরিবেশে নেমে এলো মৃত্যুর নিঃস্তব্ধতা। শুধু টেবিল ঘড়ির টিকটিক আর লোলার উত্তেজিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ—

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জেনসন। লোলা কর্কশ স্বরে শাসিয়ে উঠলো খবরদার এক পা নড়বে না। সিন্দুকের সমস্ত টাকা আমি নেবো। কাউকে এর একটা পয়সাও আমি দিচ্ছি না!

লোলা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? গুলিভরা রিভলভার নিয়ে আর ছেলেমানুষি কোরো না—ওটা নামিয়ে রাখো। জেনসন আরো বললো, লোলা, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এ টাকা আমি তোমার জন্য সঞ্চয় করেছি। এখন ওসব পাগলামী ছেড়ে বন্দুকটা নামিয়ে রাখো।

ওসব বাজে কথায় আমার মন ভুলবে না। আমাকে আটকালে আমি পুলিশকে বলে দেবো, একজন জেল পালানো কয়েদীকে তুমি এতোদিন ধরে জেনেশুনে আশ্রয় দিয়েছো। আরো জানাবো যে আয়কর ফাঁকি দিয়ে জমানো এই একলাখ ডলারের কথা।

রাগে জেনসনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে এক পা এক পা করে লোলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সাবধান মিঃ জেনসন—তীক্ষ্ণ চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের দরজায় হাঁটু দিয়ে মারলাম এক ধাক্কা। দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বয়ংক্রিয় তালা 'ক্লিক' করে এঁটে গেলো।

লোলা আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালো। পলকে বুঝতে পারলো স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সিন্দুকের দরজায় তালা এঁটে গেছে। অন্ধ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে, হাত পা ছুড়তে ছুড়তে ও এগিয়ে এলো—তারপর রিভলভারের বিকট শব্দে জানলার শার্সিগুলো কেঁপে উঠলো ঝনঝন করে।

জেনসন লোলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ার্তচোখে তার দিকে তাকালাম। কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলো জেনসনের বিশাল দেহ, পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে দড়াম করে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। পড়বার সময় হাত দুটো পাশের টেবিলটা আঁকড়ে ধরায় সেটাও হুড়মুড় করে উল্টে পড়লো। গোটা বাংলোটাই থরথর করে কেঁপে উঠলো।

লোলার ভয়ার্ত চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তখন ওর হাত থেকে কুৎসিত দর্শন রিভলভারটা খসে পড়েছে। পেছন ফিরে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে—যেন নিষ্ঠুর বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইছে।

জেনসনের দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সামান্য একটা সীসের টুকরো ওর জীবনীশক্তি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। কার্ল জেনসন যে আর বেঁচে নেই এই কথাটা যেন আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

লোলা হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ করে অন্ধের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কানে এলো শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করার শব্দ।

জেনসনের মৃতদেহের কাছে চুপচাপ বসে রইলাম। কি করবো কিছু ভাবতে পারছি না। পুলিশে খবর দেওয়ার মতো বোকামির কাজ আমি কখনই করবো না, লোলা যদি বলে বসে জেনসনকে আমিই গুলি করেছি, আর আমার আসল পরিচয়টা জানিয়ে দেয়, তবে ওরা—আর কোনো প্রমাণ চাইবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে যেতে গিয়ে রিভলভারটা পায়ে ঠেকলো। শীঘ্র সেটা কুড়িয়ে পকেটে রাখলাম। বাংলো থেকে বেরিয়ে পাম্পের দিকে এগিয়ে চললাম।

বাইরে বের হতেই চোখে পড়লো একটা বিরাট সবুজ রঙের ক্রাইমলার পাম্পের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির আরোহী একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক ও তার সঙ্গিনী একটি অল্পবয়সী মেয়ে।

লোকটা আমাকে দেখেই হাজার রকমের কথা বলতে শুরু করে দিলো। বিশ লিটার পেট্রোল আর দু'লিটার মোবিল, খাবার-দাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

লোকটার একটা কথাও আমার কানে ঢুকলো না। আচ্ছন্নের মতো যান্ত্রিকভাবে গাড়ির ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে শুরু করলাম। তারপর অতি কষ্টে ওদের খেতে বসিয়ে বাইরে এলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায়

বসে একটু ভাববার সময় পেলাম।

যেভাবেই ধরা যাক না কেন, আমার অবস্থা এখন কলে পড়া ইঁদুরের মতো। অবশ্য লোলারও একই অবস্থা। তবে জেনসনের মৃত্যুটাকে নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। লোলা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসার সময় আচমকা ট্রিগার-এ চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি দুর্ঘটনা। কিন্তু পুলিশ কি তা স্বীকার করবে?

ওরা প্রশ্ন করবে লোলা রিভলবার: নিয়ে অতো রাতে কি করছিলো? তখনই লোলাকে টাকার কথা বলতে হবে ; আর তাহলেই একে একে সমস্ত কথাই বেরিয়ে পড়বে। লোলা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে। তবে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে লোলা যে জেনসনের হত্যার দায়টা স্রেফ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার ইচ্ছে করছিলো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এক্ষুনি পালিয়ে যাই। কিন্তু লোলা যদি পুলিশে জানিয়ে দেয়, তবে প্রথমেই ফোনের তার কাটতে হবে। তারপর ওর হাত পা বেঁধে রেখে কেটে পড়বো—কিন্তু না, তাতেও বিপদে আছে। হয়তো কোনো গাড়ির চালক তেল নিতে এসে কাউকে না দেখে বাংলোয় গিয়ে খোঁজ করতে পারে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো। লোলা যদি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়, দিক না আমিও তাহলে পুলিশকে ঐ এক লাখ ডলারের কথা জানিয়ে দেবো। বলবো, ঐ টাকার কোনো আয়কর জেনসন দেয়নি। তাহলেই লোলার বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আর লোলার যা টাকার লোভ সে কখনই এটা চাইবে না। এছাড়াও বন্ধ সিন্দুক খোলার জন্য এখন আমাকে লোলার প্রয়োজন হবে। কারণ সিন্দুকের কম্বিনেশনটা জেনসন ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমি ঠিক করলাম এই প্যাঁচেই লোলাকে জব্দ করবো। কিন্তু জেনসনের মৃতদেহটার কি হবে? দেখেশুনে কোনো একটা জায়গায় পুঁতে ফেলবো। আর সেই সঙ্গে ওর অনুপস্থিতির জন্য একটা ভালোরকম গল্প ফাঁদলেই হবে। খদ্দেরদের শোনাতে হবে, না হলে ওরা সন্দেহ করবে।

আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি লোলার হাতে টেলিফোনের রিসিভার—ও পুলিশে ফোন করছে।

আমাকে দেখেই ও থমকে গেলো। এর মধ্যেই লোলার চেহারা ভেঙে পড়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। পাথরের চোখের মতো স্থির দৃষ্টিতে একজন আর একজনের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হলো যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আসন্ন সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।

লোলার হাতে রিসিভার আর আমার হাতে ৪৫ রিভলবার ওরই দিকে তাক করা।

রিভলবারের দিকে চোখ পড়তেই লোলা চমকে উঠলো। মুহূর্তের জন্য ও হয়তো ভাবলো, আমি ওকে নৃশংসভাবে খুন করবো। ও কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

আমি বললাম, শোবার ঘরে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। রিভলবার নামিয়ে ওকে এগোতে ইশারা করলাম।

শোবার ঘরে ঢুকে লোলা খাটের ওপর গিয়ে বসলো, ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো আমার হাতের রিভলবারের দিকে।

আমি লোলাকে বললাম, তুমি কোথায় ফোন করছিলে? পুলিশে? হয়তো ভেবেছ জেনসনকে খুন করার দায়টা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে কি বলো? কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো যে পুলিশে খবর দিলে তোমার অবস্থাটা কি হবে? ওরা যদি আমাকে এই খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করে তবে ঐ টাকার কথা আমাকে বলে দিতে হবে। আর ওরা সমস্ত আয়কর হিসেব করে নেওয়ার পর তোমার কপালে কি থাকবে, একবার ভালো করে ভেবে দেখো।

লোলার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, আমার কথায় ও ভয় পেয়েছে। অতোগুলো টাকা হারাবার আশঙ্কায় ওর মনের ভেতর শুরু হয়ে গেছে সাইক্লোন।

এ ছাড়াও আর একটা উপায় আছে। তা হলো জেনসনের দেহটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। রটিয়ে দিতে হবে ও জরুরী কাজে হঠাৎ বাইরে গেছে। তারপর যখন নিরাপদ মনে করবো তখন সিন্দুক খুলে দিয়ে আমি চলে যাবো আর তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে। আমি আরও বললাম যে, তুমি

যদি টাকা না চাও তবে পুলিশে ফোন করো, আমি বাধা দেবো না। আর যদি টাকা পেতে চাও তবে আমার কথায় তোমাকে রাজি হতে হবে।

আমি লোলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানতাম এতো কিছুর পর ও কখনো পুলিশে খবর দেবে না। তবুও আমি রিভলবার হাতে সতর্ক হয়ে রইলাম।

একসময় লোলা মুখ খুললো, টাকাগুলো এখনই দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, কাউকে তোমার কথা বলবো না।

না। আমি যখন ভালো মনে করবো তখনই তুমি টাকাগুলো পাবে, তার আগে নয়। আর যদি এটুকু ধৈর্য ধরতে না পারো তবে গিয়ে পুলিশকে খবর দাও।

এতোক্ষণে বোধহয় লোলা নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলো। বুঝতে পারলো একটা অদৃষ্ট ফাঁদ ওকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে, যার হাত থেকে ওর আর মুক্তি নেই। ওর মুখের ওপর হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ একসাথে ছড়িয়ে পড়লো। ও বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আমি লোলাকে কিছুক্ষণ সময় দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আগে আঘাতটা সামলে উঠুক, তারপর দু'জন মিলে জেনসনের মৃতদেহটার ব্যবস্থা করবো।

যখন আবার বাংলোয় ফিরে এলাম তখন রাত একটা বাজে। লক্ষ্য করলাম, লোলার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। ঘরের দরজায় পৌঁছে হাতল ঘোরাতেই বুঝলাম, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

লোলাকে ডাকলাম চীৎকার করে, কিন্তু লোলা দরজা খুললো না।

বুঝতে পারলাম, ও এখনও প্রকৃতিস্থ হযনি। কিন্তু আর সময় নষ্ট করলে হবে না, তাই একাই বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে ঠিক করলাম যে গুমটি ঘরেই জেনসন-এর দেহ কবর দেবো। তাহলে কেউ যে দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা কম। একটা কোদাল আর একটা বেলচা নিয়ে গুমটি ঘরে গেলাম, কোণের দিকে, পুরোনো লোহা-লক্কড়ের স্তূপের পাশে একটা জায়গা দেখে খুঁড়তে শুরু করলাম—

প্রায় সাড়ে তিনটের সময় আমার কাজ শেষ হলো। অতি কষ্টে জেনসন-এর দেহ কবর দিলাম। আমি কি করছি না করছি লোলা একবারও দেখতে এলো না। গর্ত ভরাট করে ওপরটা সমান করতে প্রায় একঘণ্টা লেগে গেলো। এরপর কাজ করার যে বড় ভারী টেবিলটা ছিলো, সেটাকে টেনে নিয়ে এসে রাখলাম জেনসনের কবরের ওপর। কারো পক্ষে জানা তো দূরের কথা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়, যে ওটার তলায়—মাটির চার ফুট নীচে জেনসন শুয়ে আছে।

গুমটি ঘরের আলো নিবিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম, স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর আধঘণ্টাব মধ্যেই পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দেবে সূর্য।

সকাল সাড়ে ছ'টার সময় ট্রপিকা স্প্রিংসে যাবার প্রথম ট্রাকটা এসে দাঁড়ালো।

ট্যাঙ্কে তেল ভরছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, মিঃ জেনসনকে যে দেখছি না?

আমি বুঝতেই পেরেছিলাম যে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। এখন থেকে দিনের পর দিন এই একই প্রশ্ন আমাকে শুনতে হবে।

মিঃ জেনসন এখানে নেই। অ্যারিজোনায় গেছেন, ওখানে আর একটা পেট্রল পাম্প খুলবেন, তাই জায়গা দেখতে গেছেন।

গত রাত্রে ভেবে ভেবে গল্পটা তৈরী করেছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর আমার মাথায় আসেনি।

লোকটা বেশ কৌতূহলী বলে মনে হলো। তাহলে এটা এখন কে দেখাশোনা করবে, তুমি: হ্যাঁ—একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমি আর মিসেস জেনসন। লোকটা একটু চমকে উঠলেও কিছু না বলে রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাম মিটিয়ে ট্রাকে এসে উঠলো। তারপর তীক্ষ্ণ কান ফাটানো শব্দে শিস্ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

।। আট ।।

ট্রাকটা চলে যাবার পর রান্নাঘরে যেতেই লোলার সঙ্গে দেখা হলো। মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা অবসন্ন ভাব, চোখের কোলে কালি।

লোলার পরনে লাল প্যান্ট, গায়ে সাদা চোলি। ও আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো কার্লের কি করলে?

ওর দেহটা আমি পুঁতে ফেলেছি।—যাকগে শোনো—এখন থেকে আমরা দু'জনে মিলেই এ জায়গাটা দেখাশোনা করবো। কিন্তু কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবো না। যখন সময় হবে আমি চলে যাবো। যাবার আগে সিন্দুক খুলে দিয়ে যাবো।

লোলার চোখে ঝলক দিলো হায়েনার লোভাতুর দৃষ্টি, কিন্তু সেটা কবে? তাছাড়া কার্লের বন্ধুবান্ধব আছে তারা জানতে চাইবে কার্ল কোথায় গেছে!

সে সব আমার অনেক আগেই ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে সে অ্যারিজোনায় গেছে। মাস দুয়েকের আগে ফিরবে না। এই ক'মাস তুমিই এসব দেখাশোনা করবে, আর আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

সে না হয় হলো। কিন্তু দু'মাস পর কি হবে? কার্লকে তো ওরা আর ভুলবে না; তখনও একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করবে। কি উত্তর দেবো?

আমি লোলাকে বললাম, দু'মাস পর তুমি কার্লের একটা চিঠি পাবে। তাতে লেখা থাকবে, সে ওখানে গিয়ে আর একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। এবং তাকে শীগগিবই বিয়ে করছে। এখানে সে আর ফিরবে না। তোমাকে যাতে খাওয়া পরার কষ্টে না পড়তে হয়, সেইজন্য এখানকার পেট্রল-পাম্পটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে। এই দুঃসংবাদটা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। তারপর চারিদিক ঠাণ্ডা হলে আমিও কেটে পড়বো। তখন ইচ্ছে করলে এ জায়গাটা বেচে তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে।

তার চেয়ে এক কাজ করো; কার্ল তোমাকে যে তিরিশ হাজার ডলার দিচ্ছিলো সে টাকাটা তুমি এখনই সিন্দুক খুলে নিয়ে নাও, তাহলে ন্যু-ইয়র্কে পৌঁছে তোমার অসুবিধে হবে না। তারপর বাকি টাকাটা—

না। জেনসনের একটা টাকাও আমি ছোঁবো না। তাছাড়া এ জায়গাটা আমার পক্ষে বেশ নিরাপদ। আরো কিছুদিন না দেখে পালানোটা ঠিক হবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বের হতেই দেখি, একজন লম্বা, থলথলে চেহারার পুরুষ রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে, চুলের রঙ সোনালী, গাঢ় নীল চোখ বয়স প্রায় চল্লিশ।

লোকটা সরাসরি প্রশ্ন করলো, জেনসন কোথায়?

আমি থতমত খেয়ে জবাব দিলাম, তিনি বেরিয়েছেন। কিছু প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলতে পারেন।

আমাদের কথাবার্তা শুনে লোলা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি হাসিতে ওর মুখ ভরে গেলো ও, মিঃ ল্যাশ! এতো সকাল সকাল যে—কি ব্যাপার?

লোলাকে দেখে সে টুপি খুলে অভিবাদন জানালো গুড মর্নিং, মিসেস জেনসন। ওয়ালেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে কার্লের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ও বোধহয় আপনাকে বলেছে, আমাদের সভাপতি ওয়ালেস কাল রাতে হার্টফেল করে মারা গেছে। তাঁর শোকসভায় কার্লেরই বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু শুনলাম কার্ল এখানে নেই।

লোলা বললো একটু আগে এলেই কার্ল-এর সঙ্গে দেখা হতো। এই আধঘণ্টা হলো ও ট্রপিকা স্প্রিংসে রওনা হয়েছে।

ল্যাশ অবাক হয়ে তাকালো, অসম্ভব! এই তো ঢুকবার সময় দেখলাম, ওর গাড়িটা গ্যারেজেই রয়েছে, তাহলে—

দেখলাম মিথ্যে কথা বলার জুড়ি নেই লোলার। ল্যাশের কথায় ওর মুখের ভাবে এতোটুকু পবিবর্তন হলো না। ঠিকই দেখেছেন মিঃ ল্যাশ। কার্ল বলে গেছে, ফিরতে ওর মাস দুয়েক লাগবে।

এতোদিন গাড়ি ছাড়া আমার অসুবিধে হবে ভেবে গাড়িটা আর নিয়ে যায়নি। অ্যাডাম ওকে তার ট্রাকে করে ট্রপিকা স্প্রিংসে নিয়ে গেছে।

ল্যাশ চোয়ালে হাত বোলাতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। কার্লের হুট করে উধাও হয়ে যাওয়াটা তার কাছে ভালো ঠেকছে না।

একটা ক্ষীণ সন্দেহ যে ল্যাশের মনে উঁকি মারছে বেশ বুঝতে পারলাম : কেন গেছে কিছু জানেন?

গত রাতে মিটিং থেকে ফেরার পর কার্লের একটা ফোন আসে। কে যেন খবর দেয় অ্যারিজোনায় একটা পেট্রল পাম্প নাকি জলের দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস, ওই খবর পেয়েই ও সাত সবাইকেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। কাউকে জানাবার আর সময় পায়নি।

লোলার উত্তরে ল্যাশ যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হলো, মানে—ব্যাপার কি জানেন আমি ভাবতেই পারিনি, কার্ল এমনি না বলে হঠাৎ করে চলে যাবে।

ল্যাশ চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, ঘুরে তাকালো আমার দিকে, একে তো চিনলাম না, মিসেস জেনসন?

ওর নাম জ্যাক প্যাটমোর আমাদের এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে ; কার্লই ওকে এনেছে।

ল্যাশের চাউনি দেখে মনে হলো আমাকে তার একটুও পছন্দ হয়নি। ল্যাশ চলে যেতেই লোলা রান্নাঘরে ফিরে গেলো। এতোক্ষণে সাহস ফিরে পেলাম। জেনসনের অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা ল্যাশ যখন বিশ্বাস করেছে, অন্য লোকেও করবে। তবে একথা নিশ্চিত যে লোলাকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে অনেক কথা উঠবে। অতএব সাবধানে থাকাই ভালো।

আজ রবিবার। অত্যাধিক কাজের চাপ। সারা দিনে লোলা আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। রাত বারোটার সময় আমি কাজের হাত থেকে রেহাই পেলাম। একটু ফুরসত হওয়ায় গেলাম রান্নাঘরে।

গিয়ে দেখি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় লোলা ওর গাউনটা খুলতে শুরু করেছে। আমাকে দেখেই ও থমকালো। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আবার সে গাউন খোলায় মন দিলো।

হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম, শরীরে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেলো। বুকের মধ্যে লকলক করে জ্বলে উঠলো কামনার লেলিহান শিখা। অসীম প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম।

লোলা গাউনটা খুলে একটা বাক্সে রাখলো। তারপর রান্নাঘরের খিড়কি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

আমি আলো নিভিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। শোবার আগে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

লোলার শোবার ঘরের জানলা হাট করে খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে, শুধু তাই নয়, লোলা দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোর ঠিক নীচেই, পরনের চোলিটা ওর বাঁহাতে ঝুলছে। একটু পরেই ও ঝুঁকে পড়ে প্যান্টটা মেঝে থেকে তুলে নিলো। বোধহয় প্রয়োজনের একটু বেশিই অপেক্ষা করলো। তারপর লঘু ছন্দে এগিয়ে চললো বাথরুমের দিকে—

অবশ হাতকে আপ্রাণ চেষ্টায় জানলা বন্ধ করতে বাধ্য করলাম।

এইভাবেই দিন যায়। সারাদিন লোলার রান্নাঘরেই কাটে। আমার দিকে একবার তাকানো তো দূরের কথা একটা কথাও বলে না। রাতের নিয়মেরও কোনো হেরফের হয় না।

রাত এগারোটা বাজলেই লোলা বাংলোয় ফিরে যায়। ওর শোবার ঘরের জানলা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় না। এই চূড়ান্ত প্রলোভন এড়াবার জন্য ওই সময়টা রেস্তোরাঁ ছেড়ে একেবারে বের হই না। যখন দেখি বাংলোর আলো নিভে গেছে তখন শুতে যাই। কিন্তু শয়নে-স্বপনে জাগরণে চোখের সামনে যদি একই ছবি ভাসতে থাকে—ঘুমোবো কখন?

এইভাবে চারদিন কেটে গেলো। গরমটা যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। উত্তপ্ত মরুভূমির হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠলো। ট্রাক গাড়ির চলাচলও কমে আসতে লাগলো। স্বাভাবিক ভাবেই কাজের চাপ একেবারে কমে আসতে লাগলো।

জেনসন মারা যাবার আটদিন পর লোলা গাড়ি নিয়ে ওয়েস্টওয়ার্থে গেলো।

একদিন আমি কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম গুমটি ঘরের দরজায় একটা মানুষের ছায়া। মুখ তুলে তাকাতেই পায়ের নীচে মাটি যেন দুলে উঠলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জ রিক্স। আসন্ন বিপদের জন্য মনে মনে সতর্ক হলাম। রিক্সের পরণে সেই একই নোংরা জামাকাপড়।

গুড মর্নিং, আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কার্ল কোথায়?

ঘর্মাক্ত হাত দুটো মুছতে মুছতে আমি উত্তর দিলাম, মিঃ জেনসন এখানে নেই, বাইরে গেছেন। কি চাই আপনার?

শোন ছোকরা বেশী ফরফর কোরোনা। আমার দরকার আমি বুঝবো। তুমি এখানে চাকরি করো বলেই তো জানতাম। নাকি হঠাৎ মালিক হয়ে বসেছো?

আমি তো তা বলিনি। আপনার কি দরকার, তা জানতে চেয়েছি।

কার্ল কোথায় গেছে?

ব্যবসার ব্যাপারে অ্যারিজোনায় গেছেন।

কবে ফিরবে?

ঠিক জানিনা। হয়তো মাস দুয়েক লাগবে।

কার্লের ঠিকানাটা আমাকে দাও। আমার পেনসনের কাগজে সই দরকার। সব সময় কার্লই ওটা সই করে! তাই ওর সই না হলে পেনসনের টাকা পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম যে, আমার কিছুই করার নেই। ঠিকানা জানা থাকলে আমি দিয়েই দিতাম। একবারের বেশী দু-বার বলতে হতো না। মিঃ জেনসন না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

রিক্স টুপি খুলে মাথায় হাত বোলালো। চোখের মণি অচল, অনড়।—তার মানে দু-মাস অপেক্ষা করতে হবে?—তা এতদিন চলবে কি করে?

রিক্স দাঁত কিড়মিড় করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো, মনে করো যদি সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যায়? যদি লোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে? ধরো এই পেট্রল পাম্পে আগুন লেগে যায়? তখন কার্লকে তো অবশ্যই একটা খবর দেবে। জরুরী প্রয়োজনে খবর দেওয়ার জন্য কার্ল নিশ্চয়ই একটা ঠিকানা দিয়ে গেছে?

না। মিসেস জেনসনও অসুস্থ হচ্ছে না, আর এখানে আগুনও লাগছে না। অতএব ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো। আমার কাজ আছে।

এরপর স্টেশন ওয়াগানটার কাছে ফিরে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর হেডটা আটকে বনেট বন্ধ করে দিলাম।

মিসেস জেনসন কখন ফিরবে?

বলতে পারছি না—তবে মনে হয় দেরী হবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে রিক্সের ভাঙা স্বর কানে এলো।

আমাকে কুড়িটা ডলার ধার দিতে পারবে?

টাকা তো আমার নয় যে ইচ্ছামতো ধার দেবো। যাও আর বিরক্ত করো না।

কিন্তু রিক্সের যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। একটু চুপ করে থেকে ও বললো, ভাবছি অ্যারিজোনা পুলিশকে খবর দেবো। ওরা হয়তো কার্লের ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবে।

একটা শক্ত নাট আপ্রাণ শক্তিতে খোলার চেষ্টা করছিলাম। রেঞ্চটা নাটের গা থেকে পিছলে যেতেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রিক্স বলে কি!

ও কিন্তু কথাগুলো অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই বলেছে। হয়তো তেমন কিছু ভেবে বলেনি। কিন্তু পুলিশ যদি রিক্সের কথায় সত্যি সত্যি জেনসনের খোঁজ শুরু করে তাহলেই বিপদ। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেলো।

গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, তাই করো। পুলিশ দিয়ে খোঁজ করাচ্ছো শুনলে হয়তো মিঃ জেনসন বেশী খুশী হবেন— হয়তো তোমার কাগজে একটার জায়গায় দুটো সই করে দেবেন!

তা কি আর করা যাবে! তুমি যখন কার্লের ঠিকানা জানোই না তখন এছাড়া আর উপায় কি!

কার্ল যা খুশী ভাবে ভাবুক, ওর সই আমাকে পেতেই হবে।—তবে আমার কি মনে হয় জানো? লোলা হয়তো জানে। তোমার কাছে চেপে গেছে। লোলা ফিরে এলে ওকে বোলো। শেষ পর্যন্ত ও যদি ঠিকানা না দেয় তবে বাধ্য হয়ে অ্যারিজোনা পুলিশকে জানাবো। কার্লকে খুঁজে বের করতে ওদের বেশী সময় লাগবে না।

এবার রিক্সের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, ঠিক আছে লোলা ফিরলে আমি অবশ্যই তাকে বলবো। আমি যতদূর জানি—ঠিকানা মিসেস জেনসন জানেন না,—তবু একবার জিজ্ঞেস করবো।

রিক্সের মতো লোককে একথা বলা মানে হার স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু কি আর করা যাবে? কোনো পুলিশ অফিসার এখানে এসে জেনসনের খোঁজ করবে, একথা ভাবাই যায় না।

রিক্স যাবার আগে বলে গেলো যে কাল রাতে সে আবার আসবে। আর আমি যেন ঠিকানাটা জোগাড় করে রাখি।

রিক্স চলে যাবার পর নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হলো। তাড়াতাড়ি চাকাটা সারিয়ে রেস্তোরাঁয় গেলাম। একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিলাম। রিক্সের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। হুইস্কি শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম।

অ্যারিজোনা পুলিশ কি রিক্সের চিঠির কোনো গুরুত্ব দেবে? হয়তো দেবে না। কিন্তু ও যদি বলে দেয় যে, জেনসন উধাও, আর—তার স্ত্রী ওর কর্মচারীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, তাহলে? অনেক সময় এরকম সামান্য খবর পেয়েই পুলিশ তদন্ত শুরু করে দেয়। ওরা যদি জেনসনকে অ্যারিজোনায় খুঁজে না পায় তবে নির্ঘাত এখানে লোক পাঠাবে।

আমি ভাবতে লাগলাম যে, যেমন করেই হোক রিক্সের মুখ বন্ধ করতেই হবে। এবং তার একমাত্র পথ হলো ওকে টাকা দেওয়া। এভাবে টাকা দিয়ে হয়তো ওকে মাস দুয়েক ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তারপর? জেনসন যে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়েছে সে কথা কি বিশ্বাস করবে? রিক্স যে রকম স্বভাবের লোক তাতে নিঃসন্দেহে চিঠিটা দেখতে চাইবে। কিন্তু চিঠিটা জাল বলে কি বুঝতে পারবে? মনে হয় চিনে ফেলার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ ওর পেনসনের কাগজে সব সময় জেনসনই সই করতো। সুতরাং ও সহজেই বুঝতে পারবে চিঠিটা জেনসনের লেখা নয়। তারপর?

যতই ভাবতে লাগলাম পরিস্থিতি ততোই জটিল মনে হতে লাগলো। রিক্সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বুঝে শুনে প্রতিটি পা ফেলা উচিত। হঠাৎ করে সাময়িক উত্তেজনার বসে কিছু একটা করে বসা ঠিক নয়। ভাবলাম লোলা ফিরে এলে ওর সঙ্গে একটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাত দশটায় লোলা ফিরলো। লোলার গাড়ির শব্দে বাইরে এলাম। দেখলাম—

লোলা গাড়ি থেকে নেমেই হনহন করে বাংলোর দিকে হেঁটে গেলো। ছুটে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ও দরজা খুলে বাংলোয় ঢুকে পড়লো। পিছন পিছন আমিও ঢুকলাম। ওকে বললাম তোমার পেয়ারের দোস্ত,—রিক্স আজ সকালে এখানে এসেছিলো।

লোলার সবুজ চোখ জোড়ায় যেন আগুন ঠিকরে বের হলো। ও ভীষণ ভাবে চমকে উঠলো। ওর মুখের রেখা কঠিন হলো। রাগের বদলে ফুটে উঠলো এক সতর্ক ভাব। আমি নির্বিকার ভাবে বসবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, কার্পেটের ওপর যে রক্তের দাগ ছিল সেটা লোলা পরিষ্কার করে ফেলেছে। চোখ তুলে দেখি ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, রিক্স, মিঃ জেনসনের খোঁজ করছিলো। ওর পেনসনের কাগজে তার সই দরকার—তাই কার্লের ঠিকানা চাইছিলো।

লোলা নির্বিকার—যেন শুনতে হয় তাই শুনছে।

ঠিকানা জানিনা বলার পর ও বলছে, অ্যারিজোনা পুলিশকে জেনসনের খোঁজ করতে বলবে। কারণ তার সই না হলে রিক্স পেনসনের টাকা পাবে না।

লোলাকে একটু চিন্তিত দেখালো। ও দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসলো। আমি জানালাম যে রিক্স কাল রাতে আবার আসবে বলেছে। এর মধ্যেই আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে যে রিক্সকে নিয়ে কি করা যায়, যেহেতু রিক্স আমাদের দু'জনেরই শত্রু।

লোলা শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরালো, এতে ভাববার কি আছে? সিন্দুকটা খুলে তোমার টাকা নিয়ে তুমি ভেগে পড়ো, বাকী টাকাটা নিয়ে আমিও কেটে পড়বো। রিক্স এসে দেখবে, আমরা কেউ নেই—।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি কোনো লোক পেট্রল নিতে এসে যদি দেখে জায়গাটা খালি তবে কি হবে? রিক্স যখন দেখবে আমরা কেউ নেই তখন ও অবশ্যই পুলিশে খবর দেবে। আর তখনই আমাদের পেছনে ফেউ লাগবে।

জায়গাটা যে বিক্রী করে দেবে তারও কোনো উপায় নেই। কেননা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে জেনসন মৃত এবং সে উইল করে জায়গাটা তোমাকে দিয়ে গেছে। তখন আর জানতে কারো বাকি থাকবে না যে কার্লকে তুমি খুন করেছ।

লোলার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম যে ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে যে, কি ফাঁদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। লোলার দুহাতের চেটো চেয়ারের হাতল দুটোকে নিষ্ফল আক্রোশে নিষ্পেষিত করতে লাগলো।

তুমি এখানে থাকো, আর সিন্দুক খুলে আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও—আমি চলে যাবো। কেউ জানতে চাইলে বলবে যে আমি অ্যারিজোনায় কার্ল-এর কাছে গেছি—না ফেরা পর্যন্ত এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন',—এর দায়িত্ব তোমার ওপরেই আছে।

তুমি কি ভেবেছো রিক্সের মতো লোক সে কথা বিশ্বাস করবে? প্রথমে জেনসন উধাও হলো তারপর তুমি—পেট্রল পাম্পে আমি একা। ও সোজা পুলিশকে গিয়ে বলবে, আমি তোমাদের দু'জনকে খুন করে এখানকার মালিক হয়ে বসেছি। রিক্সের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও ওরা তদন্ত করতে এখানে আসবেই। তারপর হয়তো জানতে পারবে আমার পরিচয়—খুঁজে পাবে জেনসনের মৃতদেহ।

লোলা ভয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, কি? তুমি কার্লকে এখানে কবর দিয়েছো? পাগলামোর একটা সীমা থাকা দরকার।

আমি বললাম, আমার এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। তাছাড়া কোথায় বা কবর দেবো? তুমি কি আমাকে সাহায্য করেছিলে? ভেবেছিলে তিনমনী লাশটাকে আমি একা স্টেশন ওয়াগনে তুলে নিয়ে যাবো। চমৎকার! কার্লকে আমি গুমটি ঘরে পুঁতে ফেলেছি। পুলিশ যদি রিক্সের কথায় এখানে এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয় তবে নির্ঘাত ওর দেহ খুঁজে পাবে।

লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করে উঠলো, তার মানে? তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে চিরদিন থাকতে হবে?

চিরদিন কিনা জানিনা, তবে থাকতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।

অনেক সহ্য করেছি, আর নয়, তুমি থাকলে থাকো। আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকছি না, এক্ষুনি আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও।

হাত বাড়িয়ে সিন্দুকটা দেখালাম, তাহলে যাও, আর দেরী করছো কেন? সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে চলে যাও!—তবে আমার কথাগুলো আর একটু ভেবে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, এ ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।

বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। লোলা চেয়ারেই বসে রইলো, চোখে আতঙ্ক আর ঘৃণা নিয়ে।

রিক্সের চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। রাত বারোটা পর্যন্ত পাম্পের কাছে বসে রইলাম। চেয়ে দেখলাম বাংলোর আলোও জ্বলছে, অর্থাৎ লোলার মনেও একই ভাবনা।

অবশেষে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু বুঝলাম ঘুমোবার চেষ্টা নিরর্থক।

হঠাৎ ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দে চমকে উঠলাম। রিক্সের চিন্তা মন থেকে মিলিয়ে গেলো। কাঠ হয়ে শুয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম—

ঘরের মধ্যে ঢুকলো এক ছায়ামূর্তি। জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়া চাঁদেব আলোয় তাকে চিনতে আমার ভুল হলো না। সে হলো লোলা।

ওর গায়ে সবুজ সিল্কের চাদর। চাঁদের রুপোলী আলো ''টার গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে।

লোলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার পাশে বসলো। ওর চাপা ফিসফিস স্বর কানে এলো, শেট যদি আমাদের একসঙ্গেই থাকতে হয় তবে আর মিছিমিছি শত্রুতা করে লাভ কি?

—ও আমার দেহের ওপর ঝুঁকে এলো—আমার মুখের ওপর নামিয়ে আনলো ওর মুখ—ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো আমার ঠোঁটে—

।। নয় ।।

সকালের সোনা রোদ সরাসরি চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙলো। শরীরে এক বিচিত্র অবসাদ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিট। লোলা যে কখন চলে গেছে জানিনা, কিন্তু ওর সেন্টের নেশা ধরানো মিষ্টি গন্ধ এখনও বিছানায় মিশে রয়েছে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে জামাকাপড় পরে নিলাম। আজ সকালে লোলার মনোভাব কি রকম আছে জানার জন্য আর দেরী না করে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালাম।

রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়লো কর্মরত লোলাকে। ও কাজ করার সাদা গাউনটা পরে ডিমের ওমলেট করতে ব্যস্ত। পায়ের শব্দে ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, ও হুজুরের ঘুম তাহলে ভেঙেছে! আমি তো ভাবছিলাম, আজ সারাটা দিন বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোবে!

ধীরে ধীরে ওর পেছনে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, কাছে টেনে নিলাম, মুখ ডুবিয়ে দিলাম ওর আগুন রঙা চুলের বন্যায়।

লোলা মুখ সরিয়ে নেবার জন্য একটুও ব্যস্ত হলো না। বরং নিজেকে এলিয়ে দিলো আমার গায়ে, কাল রাতের জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছো?

ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড় করালাম, হেসে বললাম, তাহলে আরো একবার আমাকে রাগ করতে দাও।

এক ঝটকায় ওকে আমার বুকে টেনে নিলাম, ঠোঁট নামিয়ে আনলাম ওর ঠোঁটের ওপর। অনুভব করলাম ওর হৃৎস্পন্দন, ওর যৌবনের উষ্ণস্পর্শ। লোলার আঙুল খেলা করে বেড়াতে লাগলো আমার চুলে—

একসময় আমার বাঁধন ছাড়িয়ে ও প্রাতঃরাশের আয়োজন করতে লাগলো। একটা চেয়ারে বসে লক্ষ্য করছিলাম ওকে। কি রকম সুপটু হাতে ও একটার পর একটা কাজ করে চলেছে।

প্রাতঃরাশ তৈরী শেষ করে লোলা খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। তারপর আমার মুখোমুখি বসে একটা সিগারেট ধরালো। ওর চোখের দৃষ্টি আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—সম্পূর্ণ নতুন।

শেট, প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু কাল রাতেই আমার মত পরিবর্তন হয়েছে। ভেবে দেখলাম, কার্ল মারা যাবার পর আমরা যেভাবে এতোদিন কাটিয়েছি তার কোনো অর্থ হয় না ; বিশেষতঃ—তুমি, যখন একজন সুপুরুষ আর—কোনো মেয়ের জীবনে তোমার মতো পুরুষের সঙ্গলাভ—নিঃসন্দেহে একটা অভিজ্ঞতা। তুমি বরং তোমার জিনিসপত্র নিয়ে বাংলোয় চলে এসো—এখন আর আলাদা থেকে লাভ কি?

ঠিকই বলেছো—তুমি তো জানো, প্রথমদিন থেকেই তুমি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছো। তাছাড়া গত রাতের পর আলাদা থাকা কি আমার সাধ্যে কুলোবে? লোলা মিষ্টি হেসে লজ্জায় মুখ নামালো।

বাইরে থেকে ট্রাকের শব্দ ভেসে এলো। লোলা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

খাওয়া শেষ হতেই আমার মন সক্রিয় হয়ে উঠলো। লোলা অভিনয় করছে না তো! কে বলতে পারে ক্রূর সাপিনীর এ এক নতুন অভিসন্ধি।

কিন্তু অবচেতন মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারছিলো ঃ হয়তো ও সত্যিই আমাকে ভালোবাসে!

লোলা রান্নাঘরে ফিরে এলো। চোখে মুখে সামান্য পরিশ্রান্ত ভাব, কিন্তু ঠোঁটে মোহিনী হাসি। ও আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, রিক্সের কথা কিছু ভেবেছো?

ও তো রাত্রিতে আবার আসবে—

ওর জন্যে আমি একটুও ভাবছি না। কিছু টাকা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—ও আর আসবে না। রিক্সকে সামলানোর ভার আমার।

গত কয়েকদিনের অসহ্য আবহাওয়া বর্তমানে অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। মরুভূমির হাওয়ায় আগের মতোই অনুভূত হচ্ছে শীতল আমেজ। 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও, দু'এক মুহূর্তের অবসরে রান্নাঘরে গিয়ে লোলার উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করছি। প্রতিবারই ওকে আগের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়া বলে মনে হয়েছে। কাজের মাঝে ওকে ব্যস্ত করার জন্য অনেক কপট অনুযোগ শুনতে হয়েছে। কিন্তু কোনবারই আমাকে ও ফিরিয়ে দেয়নি। —তবুও কেন জানিনা, ও যে অভিনয় করছে, এ ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

সন্ধ্যে সাতটার সময় যানবাহন চলাচল একেবারে কমে এলো। সুতরাং একটুও সময় নষ্ট না করে রান্নাঘরে গেলাম।

লোলা আমাকে দেখেই বললো, কি চাই?

কোনো জবাব না দিয়ে ওকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিলাম, ও আমার বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করলেও পেরে উঠলো না। যেন একটা তুল তুলে নরম পালকে ঢাকা পাখি তার ছোট্ট ডানা ঝটপট করছে।

আমি ওকে জাপটে ধরে রইলাম। দেখি তুমি কেমন করে ছাড়াও—আমাদের এই একান্ত ব্যস্ততার মুহূর্তে একটা হাল্কা শব্দ কানে এলো, রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ।

চমকে উঠে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমরা দু'জনেই দরজার দিকে তাকিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিক্স। ও হাসছে, কুৎসিত মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ালকুটিল।

আমাদের আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করেছে। আমরা জানতাম রিক্স ঠিক এই সময়েই আসবে তবুও জেনেশুনেও কি বোকার মতো কাজ করেছি।

লোলার দিকে চেয়ে দেখলাম ও কিন্তু এতোটুকু বিচলিত হয়নি। মুখ ভাবলেশহীন চোখের ভাষায় এক নীরব প্রশ্ন।

মনের অপরাধবোধ সম্ভবতঃ প্রতিফলিত হয়েছিলো আমার মুখের দর্পণে। কারণ রিক্স কৌতূহলভরে একবার আমাকে দেখলো তারপর লোলার দিকে ফিরে তাকালো, তোমাদের বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। বলেছিলাম এই সময়ে আসবো তাই এসেছি।

মনে হলো আমার ঠোঁট দুটো কেউ যেন সেলাই করে দিয়েছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি।

লোলা স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করলো, এ সময়ে কি দরকার জর্জ?

রিক্সের ক্ষুদে চোখজোড়া আমাদের মুখের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। —আমি যে এ সময়ে এখানে আসবো বলেনি ও? আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালো।

লোলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কার্লের কোনো খবর পেয়েছো? আমার পেনসনের কাগজে ওর সই প্রয়োজন।

না এখনও পাইনি। হয়তো ওখানে গিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি তো এক কাজ করতে পারো ; কোনো উকিল বা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার কাগজে সই করাতে পারো।

রিক্স বললো, তা সম্ভব নয় কেননা কার্লের সই না হলে ওরা টাকা আটকে দেবে। আমার তাহলে চলবে কি করে?

লোল কাঁধ বাঁকালো, কি আর করা যাবে, কার্ল তো নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা দিয়ে যায়নি। ও না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

লোলার নির্বিকার দৃষ্টির কাছে রিক্স যেন অস্বস্তি বোধ করলো। যে কথাগুলো বলবে সেগুলো হয়তো মনে মনে একবার ভেবে নিলো।

রিক্স বললো, তাহলে অ্যারিজোনা পুলিশকে লিখে জানানোই ভালো। কারণ পেনসনের কাগজে কার্লের সই না হলে আমার চলবে না।

লোলা জানালো যে, ইচ্ছে হলে তাই করো, তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। তবে কার্ল অ্যারিজোনায় হয়তো না-ও থাকতে পারে। একবার কোলোরাজে যাবে বলেছিলো।—তা এ নিয়ে এতো ঝামেলা করবার কি আছে, জর্জ? আমার মনে হয় কোনো ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে দিলেই সে সই করে দেবে।—

—অবশ্য যদি তোমার টাকার খুব প্রয়োজন থাকে তো বলো দু-পাঁচ ডলার না হয় ধারই দেওয়া যাবে—।

লোলা এতো সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে ধারের প্রসঙ্গ তোলায়, রিক্স সন্দেহ করার কোনো সুযোগ পেলো না।

লোলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো একটু পরেই ফিরে এলো হাতে তিনটে পাঁচ ডলার এর নোট নিয়ে। লোলা তিনটে নোট নিয়ে রিক্সের হাতে গুঁজে দিলো, নাও, ধরো—। এই শেষ, এর চেয়ে বেশী আমার কাছ থেকে আর পাবে না, অতএব, শুধু শুধু আর এসো না। তোমাকে টাকা দিয়েছি শুনলে কার্ল হয়তো রাগ করবে।

রিক্স তাড়াতাড়ি টাকাগুলো পকেটে ভরে ফেললো, লোলা, তুমি বড় নির্দয়। ও দাঁত বের করে হাসলো, আমি যে তোমার স্বামী দেবতা নই, সেজন্য নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করি।

আমি আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই কার্ল ওর ভুল বুঝতে পারবে। তারপর চোখের জলে বুক ভাসাবে, রিক্স শেয়ালের মতো খিক খিক করে হেসে উঠলো।

লোলা চীৎকার করে উঠলো, কার্লের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

রিক্স ওর চোখ জোড়া আমার মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিলো। তারপর লোলার দিকে তাকিয়ে বললো. একটু সাবধানে থেকো। কার্ল হয়তো এতখানি বাড়াবাড়ি পছন্দ করবে না।

লোলা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললো, একে এক লাথি মেরে বাইরে বের করে দাও, জ্যাক,—অনেক সময় ধরে ওর বকবকানি সহ্য করেছি।

আমি রিক্সের দিকে এগিয়ে যেতেই ও ঘুরে দৌড় লাগালো। ওর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করে থাকলাম। তারপব লোলা টেবিলের কাছে গিয়ে আবার কাজে মন দিলো।

লোলা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না. রিক্সকে আমি সামলাবো।

একদিন দুদিন করে দুসপ্তাহ কেটে গেলো, রিক্স আর এলো না। কিন্তু রিক্স না এলেও জেনসনের অনুপস্থিতির জন্য প্রায় একশো জন লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। দু-একজন সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করলেও, অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা মোটামুটি সকলেই বিশ্বাস করেছে। কয়েক জন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে।

প্রতিদিন রাতে একটার সময় রেস্তোরাঁ বন্ধ করে আমি আর লোলা শুতে যাই বাংলোয়। মাঝে মধ্যে জেনসনের কথা ভেবে অস্বস্তি হয়। ওরই বিছানায় ওরই বৌকে নিয়ে শুয়ে আছি। কিন্তু লোলার দুর্নিবার আকর্ষণের কাছে এসব চিন্তা ধুয়ে মুছে বিলীন হয়ে যায়। ওকে সোহাগে আদরে জড়িয়ে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলি। সমস্ত পৃথিবী কেন্দ্রীভূত হয় আমাদের—একান্ত অস্তিত্বে—

একসময় পূর্ণ পরিতৃপ্তির অবসাদ নিয়ে ক্লান্ত দেহে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় মায়াময় পরিবেশে আরো একবার মনে পড়ে কবরে শুয়ে থাকা জেনসনের কথা। তখন নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয়। কিন্তু লোলাকে কখনই অপরাধ বোধের স্বীকার হতে দেখিনি। বরং ওকে দেখে মনে হয়—কার্ল জেনসন নামে ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষটি ওর স্মৃতিভাণ্ডার থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে—কার্ল-এর অস্তিত্ব ওর কাছে নেহাতই অবাস্তব!

তবে এই দুটো সপ্তাহে একটা জিনিসই উপলব্ধি করেছি যে, লোলাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। যেভাবে আমরা দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তাতে হয়তো এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।

যদিও লোলাকে দেখার প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছিলাম ওর প্রতি অনিবার্য দুর্দম আকর্ষণ। কিন্তু এও মনে হয়েছিলো—সেটা নিতান্তই নারীর যৌবনের প্রতি পুরুষের যে চিরন্তন লিপ্সা, তারই তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। কামনা—বাসনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও আমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এতোটুকুও কমেনি। বরং লোলাকে ঘিরে সুখী সংসারের সুখস্বপ্ন দেখি। তাছাড়া ওকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আমার সন্দেহ সতর্ক ভাবটা অনিবার্যভাবে ক্রমশই ফিকে হয়ে এসেছে।

কখনো কখনো আচ্ছন্ন মনকে বিবেকের কষাঘাতে সচেতন করেছি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর যৌবনের সাজানো ডালিতে নিজের সত্তাকে সমর্পণ করেছি।

লোলা কিন্তু একবারের জন্যও টাকার কথা তোলেনি। সিন্দুকের কথা যেন ও একেবারে ভুলেই গেছে। ওর প্রতি আমার বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে লোলাও আমাকে সমানভাবে ভালোবাসে।

একদিন এক মিষ্টি সকালে আমরা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে পাহাড়ের সারি, ভোরের সিঁদুর রাঙা সূর্য---হঠাৎ লোলা প্রশ্ন করলো, আচ্ছা শেট, কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একজন লোক রাখলে কেমন হয়? আমরা বেশ মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে ওয়েস্টওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারি—

প্রস্তাবটা লোভনীয় হলেও বিপদজনক। আলস্যে আড়মোড়া ভেঙে ওর দিকে তাকালাম, তা হয় না লোলা। ওয়েন্টওয়ার্থে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেলে, লোকে নানা ধরনের কথা বলবে।---না, এখনও আমাদের মাস দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। জেনসন যে আর ফিরছে না, সে গল্পটা রটিয়ে দেওয়ার পর লোক রাখার কথা ভাবা যাবে।

লোলা আমার চোখে চোখ রেখে বললো, ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক ; আর কিছুদিন না হয় অপেক্ষাই করা যাবে। হঠাৎ কি মনে পড়ায় আবার বললো, শেট তুমি আজ ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে পারবে। অনেক জিনিসপত্র কেনার আছে।

আচমকা এক সন্দেহের ঝাপটায় সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। আমাকে সরানোর জন্য এটা কি লোলার কোনো নতুন মতলব? হয়তো আমাকে ওয়েন্টওয়ার্থে পাঠিয়ে ট্রপিকা স্প্রিংসে ফোন করে কোনো সিন্দুক সারানোর লোক ডেকে আনবে—তাকে দিয়ে সিন্দুক খোলাবে তারপর আমি ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরতে ফিরতে টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।

আমি লোলার দিকে ফিরে তাকালাম। ওর মুখে এক নির্বিকার ভাব। আমি ওকে বললাম বোধহয় ঠিক হবে না, লোলা। ওখানে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে---কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে।---তার চেয়ে বরং তুমি যাও, আমি এদিকটা দেখাশোনা করবো। সেটাই মনে হয় নিরাপদ হবে।

লোলার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। ও পায়ে পায়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো আমার দিকে তাকিয়ে বললো, শেট সত্যিই কি ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়া তোমার পক্ষে বিপজ্জনক হবে?

—তা জানিনা। তবে, আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না।

—তাহলে না যাওয়াই ভালো। তোমার ভালোমন্দ কিছু একটা হোক তা আমি চাইনা।

—শুনে সুখী হলাম।

—ঠাট্টা নয় শেট, সত্যি বলছি। তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

আমি আনন্দ আর ধরে রাখতে পারলাম না। বিছানা থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, সত্যি? এতোদিন তোমার মুখ থেকে শুধু এই কথাটাই শুনতে চেয়েছি লোলা।

ও আমার বুকে আঙুল দিয়ে দাগ কাটছিলো, হেসে বললো, হ্যাঁ, সত্যি। জীবনে কোনো পুরুষকে নিয়ে সুখী হবো তা ভাবিনি। কিন্তু তুমি সব কিছু পাল্টে দিয়েছো।— এ জায়গায় থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না, শেট—আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। সারাটা দিন শুধু কাজ আর কাজ। কোথাও যে একটু বেড়াতে যাবো তারও কোনো পথ নেই।

আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো লোলা,

এখানে থাকতে কি আমারও ভালো লাগছে? কিন্তু এখুনি এ জায়গাটা ছেড়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া জায়গাটা যে বিক্রী করে দেবো তারও তো উপায় নেই।

লোলা আমার বাহুর বাঁধন খুলে সরে দাঁড়ালো, তারপর বললো, অনেক কাজ পড়ে আছে। ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, লোলা আমাকে ভালোবাসে, ও নিজের মুখে বলেছে। আজ আমার আনন্দের দিন। আমি এই মুহূর্ত থেকে ওকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। আমি লোলাকে জানিয়ে দিলাম যে ঝামেলা মিটে গেলে আমি ওকে বিয়ে করবো। তখন আর না বললে শুনছি না।

লোলা হেসে বললো, না বলতে আমার বয়ে গেছে।—কিন্তু কার্ল যে মৃত সেটা তো প্রমাণ করতে হবে!

সেটা প্রমাণ করতে গেলে বিপদ-আছে। যে কোনো উপায়ে হোক আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কিভাবে, সেটা পরে ভাবা যাবেখন। যদি একবার এখান থেকে পালাতে পারি তবে আর চিন্তা নেই।

—আচ্ছা, ফ্লোরিডায় আমাদের একটা পেট্রলপাম্প খুললে কেমন হয়?

ভালোই হবে।—তার মানে সিন্দুকের টাকাগুলো কাজে লাগানো যাবে, কি বলো?

এতোদিন পরে এই প্রথম ও টাকার কথা উচ্চারণ করলো। খুব সহজভাবে কথাটা বললেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকলাম। কিন্তু কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। আমি ওর কথা সমর্থন করলাম।

আমরা দু'জনে আলোচনা করলাম যে, এই জায়গাটা আগে আমাদের বিক্রী করতে হবে, যেভাবেই হোক।

এমন সময় বাইরে ট্রাকের শব্দ পেলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর তারপরই কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে লোলার সঙ্গে কথা বলারই কোনো সুযোগ পেলাম না।

হঠাৎ দেখি অপরূপ সাজে সেজে লোলা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও আমাকে বলে গেলো যে, ও বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ; দুপুরের দিকে ফিরবে।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের কাজ সেরে রেস্তোরাঁয় গেলাম। লোলা টাকার উল্লেখ করায় বেশ খুশীই হয়েছি। ওর সম্বন্ধে যেটুকু অবিশ্বাস আমার মনের মধ্যে ছিলো, সেটা মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এর হাত থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেকথাই বারে বারে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ভাবতে ভাবতে দেখছি সমস্যাটা যেন একে একে জটিল হয়ে উঠছে। একসময় মনে হলো আর ভেবে কোনো লাভ নেই, কেননা এখন আমাদের অবস্থা মাকড়সার জালে আটকানো মাছির মতো। মুক্তির কোনো পথই আমাদের সামনে খোলা নেই।

নিরাপদে থাকতে হলে সারাটা জীবন আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।

হঠাৎ গাড়ির শব্দে তাকিয়ে দেখি রিক্স তার ঝরঝরে গাড়ি থেকে নেমে গুমটি ঘরের দিকে আসছে। পেছন পেছন এগিয়ে আসছে ওর কুকুরটা।

এতোদিন পরে রিক্সকে দেখে চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেলো গুমটি ঘরেই পোঁতা রয়েছে জেনসনের দেহ। একমুহূর্ত দেরী না করে ছুটলাম গুমটি ঘরের দিকে। বুকের ভেতর যেন দামামা বাজতে শুরু করেছে।

গিয়ে দেখি গুমটি ঘরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রিক্স। মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে। কুকুরটাও যেন ওর পায়ে পায়ে লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই কুকুরটা কুঁকড়ে গেলো।

রুক্ষস্বরে রিক্স-কে জিজ্ঞেস করলাম তার কি চাই। রিক্স থমকে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে এক লাথিতে সরিয়ে দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, কার্ল কোনো খবর-টবর দিয়েছে?

না।

লোলা কোথায় জানতে চাইলে তাকে বললাম যে তিনি ওয়েন্টওয়ার্থ গেছেন।

হঠাৎ দেখি রিক্সের কুকুরটা উৎসুক হয়ে কাজ করবার টেবিলটার দিকে তাকালো। তারপর ছোটো ছোটো পা ফেলে এগিয়ে চললো জেনসনের কবরের দিকে। সীমাহীন আগ্রহে ওখানকার মাটি শুঁকতে লাগলো। মাঝে মাঝে পা দিয়ে আঁচড়াতে চেষ্টা করলো।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। রিক্স কুকুরটাকে লক্ষ্য না করেই বললো, আমার কিছু টাকার দরকার। পেনসনের টাকা এখনও পাইনি।

আমার সমস্ত মন তখন পড়ে আছে কুকুরটার দিকে। কুকুরটা তখন মাটি আঁচড়াতে শুরু করেছে।

রিক্স হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কুকুরটাকে দেখলো। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কি এখানে কিছু পুঁতেছো?

কেমন যেন শীত শীত করতে লাগলো—সারা মুখে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম—কোনোরকমে মুখে হাত বোলালাম, কিচ্ছু পুঁতিনি!— যাও, যাও, এখন কেটে পড়ো!

আমার কথা কানে না তুলে রিক্স ধীরে ধীরে গর্তটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ওর শকুন চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গর্তটা পর্যবেক্ষণ করছে।

দেখে মনে হচ্ছে গর্তটা আগে কেউ খুঁড়েছে। অধৈর্য হাতের এক ধাক্কায় রিক্স কুকুরটাকে সরিয়ে দিলো, আপন মনেই বলে উঠলো কার্ল হয়তো ওর জমানো টাকা এখানেই লুকিয়ে রেখেছে।

আমার হাত-পা যেন ভয়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইলো। রিক্সের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলাম। আমার মুখের ভাবে রিক্স ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, বেরোও! আর কোনদিন এখানে আসার চেষ্টা করলে ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো! ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম, গাড়িতে উঠে সোজা কেটে পড়ো।

পেছোতে পেছোতে রিক্স ওর গাড়ির কাছে পৌঁছলো। গাড়ির দরজায় হাত রেখে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, আড়চোখে ঘৃণাভরা চাউনি নিয়ে তাকালো আমার দিকে, আচ্ছা, তুমি তাহলে সোজা কথার মানুষ নও! ওর গলায় যেন বিষ ঝরে পড়লো, শেষ পর্যন্ত পুলিশেই খবর দিতে হবে দেখছি। ওদের বলবো কার্লের খোঁজ করতে। নয়তো, তুমি আর ঐ বেশ্যাটা যেভাবে গা ঘষাঘষি শুরু করেছো—

অন্ধক্রোধে রিক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আমার ডান হাতের ঘুষি সপাটে গিয়ে আছড়ে পড়লো ওর চোয়ালে। রিক্স ছিটকে গিয়ে বালির ওপর পড়লো। রিক্স ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে বলে গেলো, ও পুলিশে যাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারলাম একটা ভীষণ ভুল করে ফেলেছি। রিক্সকে মারা আমার উচিত হয়নি। যাবার সময় রিক্স—এর আগুন ঝরা চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিল না।

রিক্স-আতঙ্ক মনের মধ্যে আরো চেপে বসলো। ধীরে ধীরে গুমটি ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। টেবিলটা সরিয়ে মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করে একগাদা পুরনো লোহালক্কড় এনে ওর ওপরে জমা করলাম। কারণ কুকুরটা আবার এসে জায়গাটা আঁচড়াক, তা আমি চাই না। আধঘণ্টা বাদে কাজ শেষে খাবার ঘরে গেলাম।

রিক্স যে এবার পুলিশে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি করবো ভেবে ভেবে কোনো পথ পেলাম না।

হঠাৎ জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি একটা জরাজীর্ণ লিংকন গাড়ি পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে থাকা লোকটিকে যেন চেনা চেনা ঠেকলো। সে গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সামনে আসতেই তাকে চিনতে পারলাম। মুহূর্তে স্তব্ধ হলো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন—কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে চললো পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম গতিতে—

আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমার বন্ধু—রয় ট্রেসি।

।। দশ ।।

আমি ও রয় উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলাম। এই হঠাৎ দেখার বিস্ময়কে ওর চোখ যেন মেনে নিতে পারছে না। ওর মুখ রক্তহীন বিবর্ণ।

কিছুক্ষণ পর ওর মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে গিয়ে ফুটে উঠলো এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য ; ঠোঁটের কোণায় ফিরে এলো সেই অতি পরিচিত হাসি। ও ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমাদের কারোর-ই তখন আর কথা বলার শক্তি নেই। এক প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাসের অনুভূতি যেন কণ্ঠরোধ করলো।

একসময় আমাকে ছেড়ে দিয়ে রয় সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শেট। তুই— তুই এখানে? আমি কি ভুল দেখছি?

ঠিক সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম রয়কে আমি কতটা ভালোবাসি। এতোদিনে ওর অনুপস্থিতিতে আমার বুকটা যেন খালি ছিলো। এখন বুঝতে পারছি রয় আমার জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। ওকে কাছে পেয়ে সাময়িকভাবে লোলার কথাও ভুলে গেলাম। ওর কাঁধে এক চাপড় মেরে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কপট তিরস্কারের সুরে বললাম, শালা, সিন্দুকের বাচ্চা! কোথায় ছিলি এতোদিন?

রয় অস্পষ্ট স্বরে বললো কিন্তু শেট তুই এখানে কি করছিস? আমি তো ভেবেছিলাম তুই কোনো শহরে কেটে পড়েছিস!

পুলিশও তাই ভাবছে। কথা বলতে বলতে আনন্দে আমার চোখ সজল হয়ে উঠলো। ওর হাত ধরে আমি ওকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চললাম। খাবার ঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে দুটো টুল নিয়ে আমরা বসলাম। রয় ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো। দুটো গেলাসে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে রয়ের দিকে একটা এগিয়ে দিলাম। অন্যটায় নিজে চুমুক দিয়ে ভাবলাম রয়কে এখনি সব বলাটা ঠিক হবে না। তাই ও যখন জানতে চাইলো আমি এখানে কি করছি। তখন সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে একটা জবাব দিলাম, আমি এখানে চাকরি করছি। তাছাড়া গা-ঢাকা দেবার পক্ষে জায়গাটা বেশ নিরাপদ।

রয় আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো, ফার্নওয়ার্থ থেকে তোর পালানোর কথা আমি কাগজে পড়েছি। তোর সাহসের প্রশংসা করি। এই ক'মাস শুধু তোর কথাই ভেবেছি। কোনোদিন ভাবতেই পারিনি, তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে।

ওর দিকে চেয়ে হাসলাম, সেটা আমিও ভাবিনি।

রয় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার হাত চেপে ধরলো, শেট, তোকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তুই আমার জন্যে যা করেছিস তার তুলনা হয় না। তোকে যখন ওরা ধরলো, আমি তো ভাবলাম তুই বোধহয় আমার কথা বলেই দিবি। কিন্তু —না শেট, তুই-ই আমার বন্ধুর মতো বন্ধু।

সে যাকগে—এখন কি করছিস বল্? আর এখানেই বা কেমন করে এলি?

এখন আমাকে সেলসম্যান হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, শেট। অর্থাৎ লরেন্স কোম্পানি এখন কোনোরকমে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ফ্রাঙ্কলিন থেকে আরম্ভ করে সব বড়কর্তারাই সন্দেহ করছে—কুপারের ব্যাপারটায় তোর সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম। আর তার ওপর কে আবার বলে বসেছে পাঁচশো ডলারের দেনায় আমি নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

একদিন ফ্রাঙ্কলিন আমায় ডেকে বললো, আমার আর সিন্দুক টিন্দুক সারানোর দরকার নেই। তার চেয়ে যে সব খদ্দেরের পুরানো লরেন্স সিন্দুক আছে, তাদের ধরে ধরে নতুন সিন্দুক গছানোর কাজটা আমি নাকি ভালোই পারবো। এবং তাতে নাকি আমার অভিজ্ঞতাও বাড়বে। তারপরেই আমার হাতে খদ্দেরদের নামের ইয়া বড় একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলো আর কিছু উপদেশও দিয়ে দিলো।

রয় পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজের টুকরো বের করলো—এই তো—'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'—মালিক ঃ কার্ল জেনসন।

এখন আমার কাজ হলো মিঃ জেনসনকে পটিয়ে একটা নতুন সিন্দুক গছানো—আচ্ছা, এই

জেনসন লোকটা কে, তোর বস?

বাইরে থেকে একটা ক্যাডিলাকের হর্ন কানে আসায় উঠে বাইরে এলাম।

রয়ের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য রেহাই পেয়ে মনে মনে খুশীই হলাম। ওকে কতোটা কি বলবো না বলবো, সেটা ভাববার কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। ক্যাডিলাক গাড়িটায় তেল ভরতে ভরতে চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম—

অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলাম রয়কে সব কিছু বলা ঠিক হবে না। বিশেষ করে জেনসনের খুনের কথা। লোলাই বুঝবে। তার চেয়ে বরং সবাইকে যে গল্পটা বলেছি ওকেও. সেটা বলবো। সেটাই নিরাপদ হবে বলে মনে হয়।

কাজ শেষ করে যখন রেস্তোরাঁয় ফিরে এলাম তখন রয় সিগারেট ধরিয়ে.পায়চারি করছিলো। আমি গিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম যে, মিঃ জেনসন এখানে নেই ঃ ব্যবসার কাজে অ্যারিজোনা গেছেন। কবে ফিরবেন কিছুই বলে যান নি।

রয় এ কথা শুনে হতাশায় ধপ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।—তাহলে এতোদূর এসে কোনো লাভ হলো না? তা তুই একবার মিসেস জেনসনকে বলে দেখ্ না, তিনি হয়তো নতুন সিন্দুক অর্ডার দিতে পারেন—

আমি ওকে বললাম যে এখানে কোনো আশাই নেই। কেননা মিঃ জেনসনের কথা ছাড়া এখানে কেউ এক পাও চলে না। তোর কপাল খারাপ কি আর করা যাবে।

রয় খুব হতাশ হয়ে পড়লো। রয় বললো যে, সিন্দুকের কাজ ছাড়া তো আর কোনো কাজই আমি জানি না। তাছাড়া বয়সও তো প্রায় পঁয়তিরিশ হলো, এই বয়সে নতুন চাকরি কেই বা দেবে? কথা বলতে বলতে ঘড়ি দেখলাম, একটা বাজে। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। আমি রয়কে জানালাম কি কি রান্না করেছি। এমন সময় দু'জন ট্রাক ড্রাইভার এসে খাবারের অর্ডার দিলো।

কাজ করতে করতে মাঝে মধ্যেই জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি, লোলা এলো কি না। এতোক্ষণে তো লোলা ফিরে আসার কথা। কেন এতো দেরী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ দেখলাম দূরের বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে লোলার মার্কারি।

খাবারের প্লেটটা এনে রয়ের সামনে রাখলাম, মিসেস জেনসন আসছেন। তারপর গলার স্বরকে অপেক্ষাকৃত নীচু করলাম। এখানে আমার নাম শেট কারসন নয়—জ্যাক প্যাটমোর। যেন ভুল না হয়।

রয় সেই ছেলেবেলা থেকে আমাকে শেট নামে ডেকে অভ্যস্ত। তাই জ্যাক প্যাটমোর বললেও, ও হয়তো ভুল করে শেট নামেই আমাকে ডেকে বসবে। আর তা শুনে লোলা যদি অবাক না হয়, তাহলে ও ভাববে লোলা আমার আসল পরিচয় জেনেও আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। এবং এতে রয় নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে। হয়তো বুঝতে পারবে যে জেনসনের উধাও হওয়ার পেছনে আমাদের হাত আছে।

এই সমস্ত ভেবেই ওকে ঐ নামটা বললাম।

রয় ঘাড় নেড়ে জানালো, নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ জ্যাক প্যাটমোর। আমার কোনো ভুল হবে না।

লোলা এসে জানালো যে, ওর ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেলো। সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা? রোদে একটানা গাড়ি চালানোর ফলে ওর মুখ হয়ে গেছে রক্তাভ।

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে ছোট্ট করে চুমু খেলাম। বললাম, সব কিছু ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি ওকে আরও জানালাম যে আমার এক ছেলেবেলাকার বন্ধু আজ হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছে। কার্লের সঙ্গে ওর কিছু ব্যবসার কথাবার্তা ছিলো। ওকে আমি বলেছি যে কার্ল অ্যারিজোনা থেকে মাস দুয়েকের আগে আর ফিরছে না।

লোলা যেন চমকে উঠলো, তোমার বন্ধু? কিন্তু ও যদি পুলিশে তোমার কথা—

আমি লোলাকে জানালাম যে, সে ধরনের ভয়ের কোনো কারণ নেই। ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

একসময় খাবার ঘর থেকে কাউন্টারের ওপর অধৈর্যভাবে টোকা মারার শব্দ কানে এলো।

খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক ঃ পরনে ফিকে বাদামী রঙের স্যুট। সারা মুখে একটা পরিশ্রান্ত ভাব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়লো পাম্পের কাছে দাঁড়ানো একটা যাত্রীবাহী বাস। মোটা লোকটির কথামতো যাত্রীরা একে একে বাস থেকে নেমে আসতে লাগলো।

কাউন্টারের কাছে ফিরে আসতে না আসতেই খাবার ঘর খদ্দেরে ভরে গেলো, আরম্ভ হয়ে গেলো কাজ আর কাজ। এর মধ্যেও আবার গোটা কয়েক ট্রাক তেল নেবার জন্য অনবরত হর্ন দিতে লাগলো।

রয়ের তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ। ও আমার অবস্থা দেখে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, আমি সাহায্য করলে তোর আপত্তি আছে? যদি বলিস তবে বাইরে গিয়ে ট্রাকগুলোতে পেট্রল দিই।

তাহলে তো আমার অনেক সুবিধা হয়। খুচরো পয়সা ভরা থলেটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, পাম্পের মিটারেই দাম লেখা আছে দেখতে পাবি ; কোনো অসুবিধা হবে না। থলেটা নিয়ে ও পাম্পের দিকে চললো।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে কাজের চাপ কিছুটা হাল্কা হয়ে এলো। এতোক্ষণ কাজের ভিড়ের মধ্যে রয়ের কথা মনেই ছিলো না। খেয়াল হতে জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম পাম্পের কাছে এখনও তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রয় একমনে তাদের উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করছে।

লোলা যে কখন রান্নাঘর ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই আমার ও রয়কে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো। একসময় আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, শেট, এ লোকটা কে? তোমার সেই বন্ধু নাকি?

হ্যাঁ, আমার বন্ধু রয় ট্রেসি। কাজের চাপ দেখে নিজে থেকেই আমাকে সাহায্য করতে চাইলো। বেশ ভালোই কাজ করছে কি বলো?

হুঁ—লোলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিলো, যা শুনে চোখ ফেরাতে গিয়েও থমকে গেলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোলাকে দেখতে লাগলাম। ও কিন্তু তখনও জানলা দিয়ে রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ ওর সবুজ চোখ কোনো এক কুটিল চিন্তায় কুঁচকে উঠলো।

তোমার বন্ধু কি এখানে কাজ করবে বলেছে শেট? তাহলে ওকে রাখলে কেমন হয়? তুমিই তো বলেছিলে আমাদের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রয়োজন—।

ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমিও তোমাকে ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম লোলা। রয় আমার ভাইয়ের মতো আর খুবই বিশ্বাসী।

—ওকে তো আগেই বলেছি যে, জেনসন এখানে নেই। এখন জানিয়ে দিলেই হবে, কার্ল অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়েছে। ও কোনো সন্দেহই করবে না—।

কিন্তু রয় কি এই নির্জন জায়গায় থাকতে চাইবে?

লোলার কাঁধে হাত রেখে হাসলাম, তবে একটা কথা বলতে পারি লোলা—তোমার দিকে রয় কখনই হাত বাড়াবে না। উনিশ বছর বয়সে ওর বউ পালানোর পর থেকে, ও কোনো মেয়েকেই সহ্য করতে পারে না।

ওই রয় আসছে। এলে ওকে জিজ্ঞেস করবে থাকবে কিনা। রয়কে আসতে দেখে চাপা স্বরে লোলা বললো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয় খাবার ঘরে এসে ঢুকলো। লোলাকে দেখেই ও থমকে দাঁড়ালো ; অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। অন্য কেউ লোলার দিকে এভাবে চেয়ে থাকলে হয়তো অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু রয়কে যেহেতু আমি চিনি তাই হাসতে হাসতে লোলার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। রয়, ইনিই মিসেস জেনসন—লোলা, এ আমার বন্ধু—রয় ট্রেসি।

লোলা রয়ের দিকে চেয়ে হাসলো, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

—ও কিছু নয়, রয় হেসে লোলার হাসি ফিরিয়ে দিলো, সত্যি মিসেস জেনসন, এই জায়গাটা ভারী চমৎকার!

আমি এই সুযোগে রয়কে বললাম, তাহলে এখানে থেকেই যা না। সুযোগ বুঝে রয়কে বললাম, রাস্তার ওপারে একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারিস। আর সপ্তাহে চল্লিশ ডলার করে মাইনে পাবি।—কি রে রাজি?

রয় আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে লোলার দিকে তাকালো ; মুখের ধূর্ত হাসিটাকে আরও ধূর্ত করলো, আপনি যদি রাজি থাকেন, তাহলে আর আপত্তি করার কি আছে মিসেস জেনসন?

আমি লোলাকে বললাম, ভালো করে ওর আদর যত্ন করো—সেই স্কুল থেকে ও আমার বন্ধু ; শুধু বন্ধু কেন, একেবারে ভাইয়ের মতো।

এমন সময় একটা ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন একরাশ ধুলো উড়িয়ে পাম্পের কাছে এসে থামলো আমরা সবাই মিলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

রাত দশটার সময় গাড়ি-ট্রাকের ভিড় কমলে আমরা খেতে বসলাম। ডিনার টেবিলের একদিকে আমি আর লোলা। আমাদের মুখোমুখি টেবিলের অপর দিকে রয় বসেছে। রয়ের উপস্থিতি আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তির কারণ হলেও লোলাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। নতুন চাকরিতে ঢুকে রয়-এর আনন্দ আর ধরে না। সমানে কথা বলে যাচ্ছে।

জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে শেট! কে ভেবেছিলো বল, এভাবে হুট করে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা লোভনীয় চাকরি পেয়ে যাবো। ঘুরে ঘুরে সিন্দুক বেচার চেয়ে এখানে চাকরি করা অনেক ভালো।

লোলা খেতে খেতে থমকে তাকালো রয়ের দিকে, তুমি বুঝি সিন্দুক কোম্পানিতে চাকরি করতে?

রয় বললো, আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই মিসেস জেনসন, এই সিন্দুকের লাইনে আমাদের চেয়ে অর্থাৎ আমার আর শেটের চেয়ে ভালো কারিগর আর নেই। আমি আর শেট একই দিনে, একই কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলাম। অবশ্য ও আমার চেয়ে অনেক ভালো কারিগর, তবে সিন্দুক খোলার ব্যাপারে ওর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। আর ওকে নিয়ে অসুবিধা হলো, ও একটু বেশী সাধুপুরুষ। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত ও শুধু আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেই গেছে। সব সময় আমি ওকে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি, আর শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাকে বাঁচিয়েছে।

রয় হঠাৎ গম্ভীর মুখে বললো, কিন্তু মিঃ জেনসন ফিরে এসে আমাকে দেখলে কি ভাববেন? ও লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, মিসেস জেনসন, চাকরীটা স্থায়ী হলে ভালো হয়।

কার্ল ফিরবে বলে আমার মনে হয় না। লোলার বিষণ্ণ স্বর শোনা গেলো। আর যদিও বা ফিরে আসে, তোমাকে দেখলে আনন্দ পাবে। আমি কাউকে এখনও বলিনি। চিঠিতে কার্ল পরিষ্কার করে না লিখলেও আমার মনে হয় ও আর ফিরবে না। অ্যারিজোনায় গিয়ে কার্ল আর একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, যাকে ওর আমার চেয়ে অনেক বেশী ভালো লেগেছে। কথা শেষ করে লোলা চুপ করে রইলো।

রয় সব শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলো, আমি দুঃখিত মিসেস জেনসন—

লোলা হেসে বললো, এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে—ও হাত রাখলো আমার হাতে, এখন আমি আর শেট— কার্ল যে শেটকে এখানে রেখে গেছে তাতেই আমি খুশী। আর আমি কিছু চাই না।

রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে মাথা নাড়লো, শেট, তোর ভাগ্য সত্যিই অসাধারণ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চল্ তোর ঘর দেখিয়ে দিই। রয়কে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। চাঁদের আলোয় ভেজা বালির রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার ওপারে পৌঁছে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম।

রয় ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলো। এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি! টেলিভিশন পর্যন্ত রয়েছে। তারপর ও ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা জেনসনের বাংলোর দিকে তাকালো, তুই কি ওখানে থাকিস?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কোথায় থাকবো?

রয় ওর মালপত্রের ব্যাগটা একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালো। রয়কে দেখে মনে হলো, ব্যাপার-স্যাপার দেখে ওর সন্দেহ হচ্ছে। যেভাবে হোক ওকে বিশ্বাস করাতেই হবে, না হলে আসল ব্যাপারটা ও ধরে ফেলবে।

ওর সন্দেহাতুর চোখ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর একসময় আমাকে বললো, তুই যে ঝামেলায় জড়িয়ে আছিস সেকথা লোলা জানে?

আমি উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত দেরী করলেও ঠিক করলাম, লোলা যে আমার সম্বন্ধে সবই জানে একথা রয়কে জানাতে কোনো বাধা নেই। হাজার হলেও ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তাই সম্মতি জানিয়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, বলেছি।

আমার উত্তরে রয় একটুও অবাক হলো না। হয়তো এই উত্তরই ও আশা করেছিলো।

রয় একমনে ওর ব্যাগ খালি করে জিনিসপত্রগুলো বিছানার ওপর ছড়িয়ে রাখতে লাগলো। —এ জায়গাটাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে তুই রাজা হয়ে যাবি।—সপ্তাহে কি রকম আমদানি হয় শেট?

জেনসন মারা যাবার পর থেকে সাপ্তাহিক আয় একেবারে কমে গেছে। কারণ ওর পুরনো লোহালক্কড়ের ব্যবসা থেকেই একটা মোটা টাকা আসতো আর এই লোহালক্কড়ের ব্যাপারে আমি আর লোলা সমান পণ্ডিত। তাই কার্ল মারা যাবার পরই লোহালক্কড়ের ব্যবসা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্তমানে আমাদের ভরসা রেস্তোরাঁ, পেট্রল এবং গাড়ি মেরামত। কিন্তু হলে কি হবে যা আশা করেছিলাম, আয়পত্তর তার চেয়ে অনেক কম, সপ্তাহে মাত্র শ'দুয়েক ডলার কোন প্রকারে লাভ হয়। সে টাকাটা আমি আর লোলা ভাগাভাগি করে নিই। জেনসন মারা যাবার পর, ওর সিন্দুকে আমার জমানো টাকা ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে ঃ ওতে আর হাত দিইনি। প্রতি সপ্তাহে আমার ভাগের একশো ডলার ঐ সিন্দুকেই জমিয়ে রাখি।

কিরে শেট, বললি না তো আমদানি কেমন হয়?

রয়ের কথায় আমার চমক ভাঙালো। ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, তুই যতো ভাবছিস ততো নয়। এই—শ দুয়েক ডলার আসে আর কি!

রয় জানালো যে ঠিকমতো কায়দা করতে পারলে, এই ধরনের একটা জায়গাকে কাজে লাগিয়ে মোটা টাকা আমদানি করা যায়।

তুই কি এই নির্জন জায়গায় চিরজীবন পড়ে থাকতে চাস, শেট? ছেলেবেলা থেকেই আমরা সবসময় ভেবেছি কি করে বড়লোক হবো, দুটো পয়সার মুখ দেখবো!—তাই তো বললাম, এ জায়গাটা কাজে লাগাতে পারলে তুই রাজা হয়ে যাবি। রয় এসে আমার মুখোমুখি বসলো।

আমি জানতে চাইলাম কাজটা কি ধরনের?

এই ধর,— মেক্সিকো ছেড়ে যারা পালাতে চায়, তাদের হেলিকপ্টারে করে এখানে নিয়ে আসা যায় ;—এ জায়গাটা তাদের ভালোই লাগবে। আর আমরাও মাথাপিছু দু'শো ডলার করে পাবো।

রয়, তুই যদি মাস দুয়েক ফার্নওয়ার্থে থাকতিস, তবে আর এ-ধরনের কথা বলতিস না। ওকে আমি শান্ত স্বরে বললাম।

রয় মাথার চুলে হাত চালিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসলো। কিছুটা অস্বস্তি ভরেই বললো, সে কথা ঠিক শেট। তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বড়লোক হওয়ার আশা আমি ছাড়তে পারবো না। আজ হোক কাল হোক বেশ কিছু টাকা আমার চাই-ই চাই।

আমিও ওকে জানিয়ে দিলাম, বেশ কিছু টাকা যে সে এখান থেকে পাবে না এটা নিশ্চিত।

রয় উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা ড্রয়ার খুলে কতকগুলো শার্ট প্যান্ট তাতে রাখলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে, শেট, সত্যিই কি তোর আর বড়লোক হওয়ার সাধ নেই?

না, রয়—ফার্নওয়ার্থের দাওয়াই খেয়ে সে ইচ্ছা আমার মিটে গেছে। তুই খেলে তোরও যেতো!

শুনেছি ওরা নাকি—কয়েদীদের প্রতি খুব নৃশংস ব্যবহার করে—গোটাকয়েক রুমাল বিছানা

থেকে তুলে ও দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুললো। কিন্তু সেগুলো রাখতে গিয়েই তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো রয়, আরে! এটা কি?

ওর কথার সুরে চমকে উঠলাম। অশান্ত হৃৎপিণ্ড যেন ধাক্কা খেলো এক অদৃশ্য কাচের দেওয়ালে, কিসের কথা বলছিস? দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করলাম। আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। রয় ৪৫ বোরের রিভলবারটা ততোক্ষণে ড্রয়ার থেকে বের করে ফেলেছে ; যে রিভলবারের গুলিতে জেনসন প্রাণ দিয়েছে।

আমার চোখের সামনে যেন গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠলো। মাথার প্রতিটি চিন্তার কোষ ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কি উত্তর দেবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

আমার মনেও নেই যে সেই ঘটনার পর রিভলবারটা লোলার কাছ থেকে নিয়ে, পরে কখন ঐ ড্রয়ারটায় রেখে দিয়েছিলাম। এতোদিন ধরে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন কি বলবো ওকে?

হঠাৎ ইচ্ছে হলো একলাফে রয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবারটা কেড়ে নিই, কিন্তু অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে কোনোরকমে জবাব দিলাম, ও, ওটা? ওটা জেনসনের রিভলবার। ও চলে যাবার পর একদিন ঐ রিভলবারটা পেয়ে এই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। যতোটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

রয় নিষ্পলক চোখে রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। গুলি ভরার সিলিন্ডারটা ও আঙুল দিয়ে ঘোরালো। রিভলবারের নলটা নাকের কাছে এনে শুঁকলো, খুব সম্প্রতি এটা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে দেখছি। আত্মগতভাবে শেষ কথাগুলো বলে রয় ওর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলো আমার চোখে, জানতে চাইলো এই গুলিতে কে মারা গেছে?

বহু কষ্টে ওর চোখে চোখ রাখলাম। অপরাধবোধের ছায়াকে মুখের আয়না থেকে সরিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কেউ মারা যায়নি, রয়। জেনসন এটা দিয়ে চিল শিকার করতো। হয়তো গুলি করার পর রিভলবারটা পরিষ্কার করতে ভুলে গেছে।

৪৫ রিভলবার দিয়ে কেউ যে পাখী স্বীকার করে, তা তো জানতাম না!

রয় রিভলবারটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো, তাহলে জেনসনের টিপ আছে বলতে হবে।

এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলাম, যাকগে অনেক দেরী হয়ে গেলো—আমি চলি।

রয় হঠাৎ প্রশ্ন করলো আজ রাতে কে জাগছে শেট?

আমি। কিন্তু কাল রাতে তোর ডিউটি।

দরজার দিকে পা বাড়ালাম, হঠাৎ রয় ডাকতে পিছন ফিরে তাকালাম।

কি বলছিস, বল!

৪৫ টা পরিষ্কার করে রাখিস। যে বন্দুকে বারুদের গন্ধ লেগে থাকে, সে বন্দুককে কখনো বিশ্বাস নেই!

ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, ঠিকই বলেছিস, আচ্ছা—গুড নাইট—!

ঘর ছেড়ে বাইরে আসতেই লক্ষ্য করলাম রেস্তোরাঁয় কোনো আলো নেই ; কিন্তু বাংলোয় লোলার ঘরে আলো জ্বলছে। সুতরাং বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

লোলা বিছানায় বসে মোজা খুলছিলো। পরনে সাদা অন্তর্বাস ও নাইলনের প্যান্টিস।

আমি ঘরে ঢুকতেই ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখলো।

লোলা আমাকে বললো, শেট তোমার বন্ধুকে আমার ভালো লেগেছে।

তা ভালো, কারণ, রয় আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলের একেবারে ওপরের ড্রয়ারটায় রাখলাম। লোলা আমার দিকে পিছন ফিরে থাকায় কিছু দেখতে পেলো না। ঠিক করলাম, কালই রিভলবারটা পরিষ্কার করে রাখবো।

ড্রয়ার বন্ধ করে লোলাকে বললাম, আমরা তিনজনে এক সঙ্গে থাকলে, দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে। তবে একটা কথা কি জানো, রয় মেয়েদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কৌতূহলী নয়। মাঝে মাঝে ভারী অবাক লাগে, সেই যে একবার উনিশ বছর বয়েসে ওর বউ পালালো—ব্যস, ঐ শেষ!

তারপর থেকে রয়কে কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে দেখিনি।

লোলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অবশিষ্ট জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিবাস পরতে লাগলো, শেট পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই, যে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না—সেটা শুধু নির্ভর করে কি রকম মেয়ে তার ওপর। লোলার কথায় যে একটা ঔদ্ধত্যের সুর লুকিয়ে আছে সেটা আমার কান এড়ালো না।

লোলা, রয়কে আমি তিরিশ বছর জানি। আজ পর্যন্ত মাত্র একটি মেয়ের প্রতিই ও আকৃষ্ট হয়েছিলো, সে ওর বউ। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই সে সব আকর্ষণ ধুয়ে-মুছে মিলিয়ে গেছে।

লোলা বিছানায় শুয়ে পড়লো, হাই তুলতে তুলতে বললো, তুমি একটা বাজলেই চলে এসো কেমন?

হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমু খেলাম। বললাম, চুপ করে ঘুমোও ফিরে এসে তোমাকে আর জাগাবো না।

সেই ভালো আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, সকালে তোমার কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

রিক্সের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। রয়কে নিয়ে আনন্দে এতো মেতেছিলাম যে ব্যাপারটা মনে ছিলো না।

লোলা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম, রিক্স আজ এসেছিলো। ওর গায়ে হাত তুলতে আমাকে বাধ্য করেছে। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

লোলা উত্তেজনায় আমার হাত চেপে ধরলো, আমাকে সব খুলে বলো। রিক্স কি করেছিলো?

ওকে সমস্ত কথা বললাম, লোলার সবুজ চোখজোড়া উত্তেজনায় বিস্ফরিত। সারা শরীর চাবুকের মতো টানটান।

লোলা বললো, শেট—রিক্স পুলিশে যাবে না। আর গেলেও পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা রিক্সকে ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু তুমি ওকে মারতে গেলে কেন? যাক্ ও নিয়ে আর চিন্তা করোনা। পুলিশের কাছে গেলে ওরা রিক্সকে সোজাসুজি তাড়িয়ে দেবে।

লোলার কপালে চুমু খেয়ে বললাম, শুয়ে পড়ো—কাজ সেরে আমি ফিরে আসছি।

আমি বাংলো ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

।। এগার ।।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ খাবার সময় রয়কে রিক্সের কথা জানালাম। ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকিস। যখন তখন হুটহাট্ করে এখানে ঢুকে পড়ে। এই তো কালই এসেছিলো—একেবারে অসহ্য ; কাল তো রাগের মাথায় ব্যাটাকে মারধোর দিয়েছি। তারপর ও বলেছে পুলিশে খবর দেবে—।

রয় চমকে মুখ তুলে তাকালো, পুলিশ! তার মানে?

রিক্স একদিন আমাকে আর লোলাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলে। জেনসন যে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে লটকে পড়েছে, সে খবর ও জানে না। তাই এখন ও কার্লকে খুঁজে বের করতে চায় ওর পেনসনের কাগজে কি সব সইয়ের ঝামেলা আছে। তাছাড়া রিক্স আমাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না—

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো রয়—তাহলে লোলা ওকে বলছে না কেন, জেনসন আর ফিরবে না?

হয়তো সেটা রিক্সকে বলার প্রয়োজন নেই আর বললেও রিক্স সে কথা বিশ্বাস করবে না।

রয় চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লো।

আমি রয়কে বললাম, যা বলছিলাম, আমরা যখন থাকবো না, তখন যদি রিক্স এখানে আসে সোজা তাড়িয়ে দিবি। এখান থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যেতে দিবি না—বুঝলি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, যাকগে—আয়, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। প্রত্যেকদিন সকালে লোলাই পরিষ্কার করে ; কিন্তু, এখন তুই এসেছিস—

রয়ের দিকে চেয়ে হাসলাম তাই লোলা এখনও ঘুমোচ্ছে—

খাবার ঘর পরিষ্কার করতে করতে রয়কে জানালাম ফার্নওয়ার্থ থেকে আমার পালানোর ইতিহাস। ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে রয় একমনে শুনতে লাগলো। ওর মুখ দেখে মনে হলো এই অবিশ্বাস্য গল্প ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমার কথা শেষ হতেই ও আমাকে জাপটে ধরে বললো, তোর সাহস আছে বলতে হবে। কি করে পালালি! একবার ভয়ও করলো না?

আমি বললাম, ফার্নওয়ার্থ থেকে পালানোর জন্যে কুকুর কেন, বাঘের মুখোমুখি হতেও কোনো কয়েদী পিছপা হবে না।

ফার্নওয়ার্থে ফেরার থেকে আমার মৃত্যুও অনেক ভালো বলে আমি মনে করি।

হঠাৎ জানলা দিয়ে বাংলোর দরজায় চোখ পড়তেই লোলাকে দেখলাম ও রেস্তোরাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে সেই চোলি আর একটা খাটো প্যান্ট। মাথায় একরাশ তাম্রাভ চুল একটা সবুজ ফিতে দিয়ে অগোছালো ভাবে বাঁধা।

ওকে দেখামাত্রই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম। কারণ সেদিন বারণ করার পর থেকে লোলা এই পোশাকে আর বাইরে বের হয় না। তাহলে আজ কেন? ও বুঝেছি 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ যেই একজন অপরিচিত পুরুষের আগমন ঘটেছে অমনি লোলা ওর ভরা যৌবনের পসরা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আড়চোখে রয়কে দেখলাম। ও কাজ করতে করতে থমকালো, চোখ তুলে তাকালো লোলার দিকে। ও তখন দরজার গায়ে হেলান দিয়ে স্থির চোখে রয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

লোলা আজ যেন আরও বেশী উচ্ছল হয়ে উঠেছে। রয়ের চোখের সামনে নিজেকে অনেক বেশী লোভনীয় করে তুলেছে।

কিন্তু রয়ের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হলো না। ও শূন্য দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কাজে মন দিলো।

লোলা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। দরজার কাছে পৌঁছে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রয়কে দেখলো। রয় তখনও সেই একইভাবে কাজ করে চলেছে আর আপন মনেই হালকা সুরে শিস্ দিচ্ছে। রয় লোলার দিকে পেছন ফিরে থাকায় ওর মুখের ভাব দেখতে পেলো না। কিন্তু লোলা রান্নাঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করতেই ও মুখ ফিরিয়ে একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো, শালা রমনীর মনঃ দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ! কোনদিন কোনো মেয়েকে সন্তুষ্ট হতে দেখলাম না।

আমারই দোষ। হেসে রয়কে বললাম, আমিই তোর কথা ওকে বলেছি। বলেছি যে মেয়েদের সম্বন্ধে তুই এতোটুকু কৌতূহলী নয়। একথা শুনে লোলা তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলে এ নাকি হতেই পারে না।

রয় হেসে জবাব দিলো এবার বোধহয় বিশ্বাস করবে।

এমন সময় বাইরে থেকে একটা ট্রাকের শব্দ পাওয়া গেলো। রয় বললো, তুই থাক, আমিই যাচ্ছি।

ও বেরিয়ে যেতেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

লোলা মুখ গোমড়া করে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এর মধ্যেই ও কাজ করার গাউনটা পরে ফেলেছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বললো, শেট আজ রাতে আমরা সিনেমায় যাবো। রয় এখানে দেখাশোনা করবে, কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমাদের দু'জনের একসঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? লোলা, আমার মনে হয় আরও কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করা ভালো।

লোলার মুখের ভাব কঠিন দেখালো চট করে ঘুরে আমার দিকে তাকালো।

না, বলছিলাম—জেনসন যে অ্যারিজোনায় গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেছে, সে গল্পটা

তো কেউ জানে না—তাই ভাবছিলাম, লোকে আগে গল্পটা শুনুক। তারপর আমরা একসঙ্গে যেখানে-সেখানে ঘুরবো, কারোর কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু তার আগে আমাদের দু'জনের—

আমার কথা শেষ হতে না হতেই লোলা রাগ করে বলে উঠলো, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আজ রাতে আমি সিনেমায় যাবো আর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

ঠিক আছে এত করে যখন বলছো, যাবো। বারোটার শো তো, কেউ যে আমাদের দেখে ফেলবে সে সম্ভাবনা কম।

দেখে ফেললেই বা—আমাদের তাতে বয়েই গেলো। লোলার কণ্ঠস্বর অধৈর্য।

কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছো। লোলা, কার্লকে আমরা এইখানেই কবর দিয়েছি। যদি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুলিস এখানে আসে তাহলে—

লোলা ব্যাঙ্গের সুরে বললো তার মানে বাকী জীবনটা আমাকে পুলিশের ভয়েই কাটাতে হবে; এই তুমি বলতে চাও?

এমন সময় রয় এসে রান্নাঘরে ঢুকলো।

রয়কে দেখেই লোলা বললো, রয় আমি আর শেট রাতে সিনেমায় যাচ্ছি। তুমি একা সব সামলাতে পারবে তো?

রয় একটু অবাক হলেও মুখে সে কথা প্রকাশ করলো না। বললো যে তার কোনো অসুবিধা হবে না।

লোলা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার তার কাজে মন দিলো।

রয় আমাকে লক্ষ্য করে বললো, শেট এক মিনিট একটু বাইরে আয়। গাড়িটার সবকটা প্লাগই খারাপ হয়ে গেছে। একটু দেখ, ঠিক করতে পারিস কিনা। আমি ওকে বললাম, এবারে গাড়ির কাজকর্ম একটু আধটু শেখ, না হলে অসুবিধায় পড়তে হবে।

রয় রান্নাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পেছন পেছন আমিও চললাম। কিন্তু রান্নাঘরের দরজা খুলেই ও দাঁড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা আচমকা ঘটে যাওয়ায় নিজেকে সামলাবার সময় পেলাম না। সোজা গিয়ে ওর গায়ে ধাক্কা খেলাম।

রয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম, আর জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে। গাড়ির আরোহী দু'জনের পরনেই কালো সুট আর স্টেটসন হ্যাট। দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা লোকটি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। তার কোটের ওপর বুকের কাছে লাগানো রয়েছে একটা রূপোর তারা। প্রখর সূর্যের আলো সেই তারার গায়ে ঠিকরে পড়ছে।

গাড়ি থেকে নামার সময় লোকটার কোটটা একটু ফাঁক হতেই চোখে পড়লো তার কোমরের বেল্টে আঁটা ·৪৫ রিভলবার।

রয় চাপাস্বরে ফিসফিস করে বললো, পুলিশ!

ততোক্ষণে আমিও বেশ বুঝতে পেরেছি। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বরফ শীতল স্রোত নেমে গেলো। পুলিশ কেন? তাহলে কি—

পাগলের মতো লোলার দিকে ফিরে তাকালাম। অদ্ভুত মনে হলেও এক আশ্চর্য ভয়ার্ত অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেললো। মনে হলো এই আসন্ন বিপদ থেকে একমাত্র লোলাই আমাকে রক্ষা করতে পারে।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি লোলার কাছে এগিয়ে গেলাম। লোলা, শেরিফ এখানে আসছে।

লোলা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললো, কোনো ভয় নেই শেট, শেরিফের সঙ্গে আমিই কথা বলছি। লোলার ব্যবহারে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ও এতো শান্ত, সহজ ও নির্বিকারভাবে কথাগুলো বললো যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

অবশ্য লোলার থেকে ভয়টা আমারই বেশী কারণ ফার্নওয়ার্থ থেকে আমিই পালিয়ে এসেছি।

আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। আমাকে এবং রয়কে পাশ কাটিয়ে লোলা ঘরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো লোলার অকম্পিত কণ্ঠস্বর, কি ব্যাপার, শেরিফ? হঠাৎ কি মনে করে?

আমি ও রয় দেওয়ালে কান পেতে শুনতে লাগলাম ওদের কণ্ঠস্বর, কথাবার্তা। কানে এলো শেরিফের সুস্পষ্ট ভরাট কণ্ঠস্বর, মিঃ জেনসনকে একটু ডেকে দিন—কয়েকটা কথা আছে।

কার্ল তো এখানে নেই, বাইরে গেছে, লোলার স্বর অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম শেরিফের মুখোমুখি লোলা দাঁড়িয়ে, ওর সবুজ চোখে শূন্য নিষ্পাপ দৃষ্টি। মনে হলো লোলাকে কায়দা করা এতো সহজ নয়। তবুও কেন জানিনা শেরিফকে দেখার পর থেকে কিছুতেই সহজ হতে পারছিনা।

মিঃ জেনসন এখানে নেই? লোলার কথায় শেরিফ যথেষ্ট অবাক হয়েছেন বলে মনে হলো, আশ্চর্য ব্যাপার মিঃ জেনসন কোনদিন এই জায়গা ছেড়ে গেছে বলে তো আমার মনে পড়ে না। আচ্ছা কোথায় গেছে বলতে পারেন?

লোলার কথায় ফুটে উঠলো অবহেলার সুর, কি জানি কোথায় গেছে! বলে তো গিয়েছিলো কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে। হয়তো অ্যারিজোনা কিংবা কোলোরাডো আছে—ঠিক বলতে পারবো না। ও তো গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও দেয়নি।

কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে? একটু পরেই শোনা গেলো।

লোলার স্পষ্ট শীতল উত্তর, আমার তো মনে হয় কার্ল আর ফিরবে না।

শেরিফ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফ একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলছেন, ও তাই নাকি?—কিন্তু মিসেস জেনসন, আপনি কি করে বুঝলেন, মিঃ জেনসন আপনাকে—

শেরিফকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে লোলা বলে উঠলো কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে, এ ঘটনা তো আজ নতুন নয়! লোলার কণ্ঠস্বর এবার ধারালো হয়ে উঠল কিন্তু এসবে আপনার কি প্রয়োজন বলুন তো, শেরিফ? কার্ল কি করলো না করলো, সে আমি বুঝবো ; আপনি এতে নাক গলাচ্ছেন কেন?

শেরিফের গলার স্বর শোনা গেলো। আমি দুঃখিত, মিসেস জেনসন। মিঃ জেনসন যে আপনার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারেন তা আমার মাথায়ও আসেনি।

না, এতে কার্লের খুব একটা দোষ নেই, দোষ আমার। কারণ ওর মতো বয়স্ক লোককে বিয়ে করে আমি খুব ভুল করেছি। বিয়ের পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার বনিবনা হতো না। এতদিন যে আমরা কি করে একসঙ্গে কাটালাম ভাবতেই অবাক লাগে—তবে কার্ল আমাকে এ জায়গাটা দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে না হলে, আমাকে হয়তো না খেয়েই মরতে হতো।— কিন্তু কার্লের সঙ্গে আপনার কি দরকার তা তো বললেন না, শেরিফ! অবশ্য আমাকে বলতে যদি আপনার অসুবিধা না থাকে।

শেরিফ বললেন, আপনার এখানে জ্যাক প্যাটমোর নামে একটা লোক কাজ করে শুনলাম— ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। চারিদিকে একটা হাতিয়ারের সন্ধানে চোখ বোলালাম, মাংস কাটার ছুরিটা টেবিলের ওপরই পড়ে ছিলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিলাম।

রয় আমাকে ছুরিটা তুলতে দেখেই ইশারায় বারণ করলো। দেখলাম, বিপদের আশঙ্কায় ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার মুখের ভাবে ও বোধ হয় বুঝতে পারলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কিছুতেই ধরা দেবো না। কিন্তু শেরিফের রিভলবারের কথা চিন্তা করেই ও আমাকে নিরস্ত করতে চাইলো, কিন্তু একবারও আমার কথা বুঝলো না। বুঝতে পারলো না, ফার্ণওয়ার্থের চেয়ে যে কোনো মৃত্যু আমার কাছে শ্রেয়।

এবার লোলার উত্তর শুনতে পেলাম, প্যাটমোর? হ্যাঁ, ও এখানে কাজ করে। কার্ল যাবার আগে ওকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে ছিলো।—আর আমার কাজের সাহায্যের জন্যে একজন লোক তো এমনিতেই দরকার, তাই ওকে আর ছাড়াইনি—।

ও—আচ্ছা, ওকে একবার ডাকুন তো, ওর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

তা বেশ তো—দেখুন, ও বোধ হয় গুমটিঘরে রয়েছে—,লোলার স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বাভাবিক, সম্ভবতঃ আমাদের শোনাবার জন্যই। রয় নিঃশব্দে আমার কাছে এগিয়ে এলো। ফিসফিস করে বললো, তুই এখানে থাক, আমি দেখছি। মনে রাখিস, জ্যাক প্যাটমোর—শেট নয়।

ও রান্নাঘরের খিড়কি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ লোলার স্বর শোনা গেলো, রিক্স কি প্যাটমোরের নামে আপনাকে কিছু বলেছে, শেরিফ?

হ্যাঁ—কেন বলুন তো?

কি বলেছে? প্যাটমোর ওকে মেরেছে? কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফের জবাব কানে এলো—হ্যাঁ, এই প্যাটমোর লোকটা নাকি অকারণেই ওকে মেরেছে। তাছাড়া প্যাটমোরের স্বভাব চরিত্রও খুব—

তাহলে আসল কারণটা রিক্স আপনাকে বলেনি দেখছি। প্যাটমোর কেন ওকে মেরেছে জানেন? রিক্স আমাকে বেশ্যা বলেছে বলে। লোলার কণ্ঠে অভিমানের সুর, প্যাটমোরের জায়গায় যদি আপনি হতেন তবে আপনিও রিক্সকে মারতেন, তাই না?

শেরিফ বললেন, আসল কথা কি জানেন, রিক্সের কথা আমি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি, তা নয়—এমন সময় খাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। পরক্ষণেই তোমার নামই জ্যাক প্যাটমোর?

হ্যাঁ—কি হয়েছে?

দরজার গায়ে কান পেতে একাগ্র চিত্তে শুনতে লাগলাম ওদের কথোপকথন, এরপর শেরিফ রয়কে কি প্রশ্ন করবেন কে জানে।

কিন্তু শেরিফের পক্ষে কেবলমাত্র রিক্সের বর্ণনা শুনে রয়কে চিনে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ বর্তমানে গোঁফ রাখার ফলে, আমার এবং রয়ের চেহারা প্রায় একই রকম দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রয়কে প্যাটমোর বলে ভুল করা শেরিফের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শেরিফ গম্ভীর স্বরে রয়কে প্রশ্ন করলেন, রিক্স বলছিলো, তুমি নাকি কাল ওকে মেরেছো—সত্যি নাকি?

লোলা অত্যন্ত চতুরভাবে রয়কে ঘটনার সূত্র ধরিয়ে দিলো। শেরিফের কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে উঠলো, এইমাত্র শেরিফকে বলছিলাম, রিক্স আমাকে বেশ্যা বলে গালাগাল দিয়েছে, বলেই তুমি ওকে মেরেছো!

হ্যাঁ, মেরেছি! রয় হালকা স্বরেই জবাব দিলো, এবং আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি শেরিফ—রিক্স যদি আবার এখানে কোনদিন আসে, তাহলে শুধু যে ওকে মারবো তা নয়, পা দুটো একেবারে ভেঙেই দেবো।

শেরিফ হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন, এখানে চাকরিতে ঢোকার আগে তুমি কোথায় থাকতে প্যাটমোর!

রয় বেশ ব্যঙ্গের সুরেই উত্তর দিলো, ওকভিল, ক্যালিফোর্নিয়া। শুনুন শেরিফ, আমাদের গ্রামে কোনো ভদ্রঘরের মেয়েকে রিক্সের মতো কোনো ছুঁচো যদি গালাগালি দেয় তবে আমরা তা সহ্য করি না। যদি মনে করেন, আপনি আমার হাতের ছাপ নিতে পারেন—

হয়েছে, তোমাকে আর বেশী চালাক সাজতে হবে না। বিরক্ত স্বরে শেরিফ রয়কে বাধা দিলেন, এ অঞ্চলে কোনো নতুন লোক এলে, তার সম্বন্ধে আমার খবর রাখা প্রয়োজন বলেই জিজ্ঞেস করছি।

লোলা হঠাৎ অযাচিতভাবে বলে উঠলো লোহালক্কড়ের ব্যবসার মাধ্যমে কার্লের সঙ্গে প্যাটমোরের পরিচয় হয়। তারপর কার্লই ওকে এখানে নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শেরিফ উত্তর দিলেন, সবই মানলাম, কিন্তু প্যাটমোর, তুমি একটু সাবধানে থেকো, একটা ঘুঁষি খরচা করার আগে দশবার ভেবে দেখবে, বুঝলে?

রয় একটু রুক্ষ স্বরে জবাব দিলো, আপনি তাহলে রিক্সকেও বলে দেবেন—কোন কথা বলার আগে যেন একশোবার ভাবে।

ঠিক আছে, রিক্সকে আমি সাবধান করে দেবো।

লোলা বিরক্ত স্বরে বললো, ওকে আরও বলবেন, এদিকে যেন আর না আসে। জর্জ সব সময়েই কেবল টাকার জন্য আমাকে জ্বালাতন করে।

হ্যাঁ, আমি জানি, মিঃ জেনসনও আমাকে অনেকবার এই কথা বলে ছিলেন। রিক্স নাকি টাকার জন্য দিনরাত তাকে জ্বালাতন করে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শেরিফের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এলো, মিঃ জেনসন

আপনাকে ছেড়ে চলে গেছেন শুনে আমি আন্তরিক দুঃখিত। একটু কাশলেন শেরিফ, আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই মিঃ জেনসন তার ভুল বুঝতে পারবেন—।

কিন্তু লোলার নিস্পৃহ স্বর শেরিফকে নিরাশ করলো, সে নিয়ে আপনি আর ভেবে কি করবেন। কার্ল যদি আমাকে ছেড়ে সুখে থাকতে পারে, আমিও পারবো।

সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু শেরিফের কথার সুরে তা মনে হলো না, তবে মিঃ জেনসন যে এ জায়াগা ছেড়ে চলে যাবেন ভাবতেই পারিনি—শুনেছি এখানেই নাকি তাঁর জন্ম হয়েছিলো।

এতোক্ষণ ধরে শেরিফের কথা শুনে লোলা বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠছিলো, তাই শেরিফের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বললো, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো, শেরিফ। সময় সুবিধা পেলেই এদিকে চলে আসবেন—

শেরিফও বললেন, আপনার কোনো প্রয়োজন পড়লেই আমাকে খবর দেবেন। মিসেস জেনসন—কোনো দ্বিধা করবেন না।

ধন্যবাদ।

শেরিফ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এতোক্ষণ পরে ভয় ও উত্তেজনা কেটে গিয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলাম। একটু পরেই লোলা আর রণ রান্নাঘরে এসে ঢুকলো।

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস। আনন্দে রয়ের হাত চেপে ধরলাম তুই না থাকলে আজ কি যে হোত—

তুমি মিছিমিছি ভয় করছিলে, লোলা অধৈর্যভাবে বলে উঠলো ; তোমাকে তো বলেছিলাম, শেরিফকে আমিই সামলাবো—

রয় আমার পক্ষ নিয়ে উত্তর দিলো, তা হোক, আমি যদি শেট হতাম, তবে আমিও ভয় পেতাম। তাছাড়া শেটের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিলো।

রয় দরজাব দিকে পা বাড়ালো।

আমি ওকে বললাম, সত্যি রয় তোর জন্যই আজ এই বিপদের হাত থেকে—

রয় থমকে ঘুরে তাকালো, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই আমার জন্য কোনোদিন কিছু করিসনি।—আরে শালা, কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও তো কিছু একটা আছে।

ও চলে যেতেই লোলার কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওকে লক্ষ্য করলাম, তারপর বললাম, আজ রাতে আমার আর সিনেমায় যাওয়া হবে না, লোলা।

লোলা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ফিরে তাকালো, তার মানে?

আমি আজ আর ওয়েন্টওয়ার্থে যাবো না।

কেন?

বুঝতেই তো পারছো। শেরিফ যদি হঠাৎ আমাদের দেখে ফেলেন, তবে? ওর নির্বুদ্ধিতায় আমার ভীষণ রাগ হলো, শেরিফ এখন জানেন রয়ই প্যাটমোর। তাহলে তার সঙ্গে দেখা হলে আমার পরিচয় কি দেবো?

লোলা বললো, ঐ পেটমোটা শেরিফটার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে তুমি ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে না? এর কোনো মানে হয়?

তুমি বুঝতে পারছো না—শেরিফের মাথায় যদি একবার ঢোকে, এখানে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, তাহলে বিপর্যয়ের আর কিছু বাকি থাকবে না।

গলার স্বর নীচু করে লোলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, মনে করো যদি ও জেনসনের দেহ খুঁজে পায়? তখন তুমি কি করবে? পারবে এমন নিশ্চিন্ত থাকতে? আমি জানি তুমি পারবে না। কারণ জেনসনকে তুমিই গুলি করেছো।

তাই বুঝি? তোমার ঐ শেরিফ সেটা প্রমাণ করতে পারবে?

অবাক চোখে লোলার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম। লোলা বলে কি!

যাক্ এসব কথা বাদ দাও। আমরা দু'জনেই যখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, তখন দু'জনকেই

সাবধানে থাকতে হবে। তুমি চাইলেও কোনো ঝুঁকি আর নিতে পারবো না।

লোলা নিস্পৃহ ভাবে বললো, আমি তাহলে একাই যাবো। ওর কথার মধ্যে একটা চাপা অভিমান লক্ষ্য করলাম। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর সবুজ চোখ দুটো যেন পাথরে খোদাই করা—বরফের মতো শীতল, নিষ্প্রাণ।

শেট আজ রাতে বাংলোয় আমি একা থাকতে চাই। তুমি রয়ের ঘরে থেকো।

শোনো লোলা—

আমি কি বলেছি, তা আশা করি বুঝতে পেরেছো? তুমি হয়তো ভুলে গেছো. আমিই এ জায়গাটার মালিক—তুমি নও। রয়ের সঙ্গে তোমার যখন এতোই বন্ধুত্ব তো যাও—ওর কাছে গিয়ে রাত কাটাও।

লোলার চোখের তারায় অতলান্ত ঘৃণার ছায়া। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বিশ্বাসই হতে চাইলো না, লোলা আমাকে এই কথাগুলো বলছে।

রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সশব্দে বন্ধ করে দিলাম ঘরের দরজা।

লোলার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার সেই দিনই শেষ হলো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, রয়ের সদা হাস্যময় উপস্থিতি, আমাকে ভুলিয়ে দিলো এই বিচ্ছেদের কথা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে যখনই বাংলোয় গেছি অনুভব করেছি জেনসনের অশরীরী উপস্থিতি। লোলার মোহময়ী সান্নিধ্য আর ততো ভালো লাগেনি। জেনসনের বিছানায় শোওয়ামাত্রই মনে হয়েছে, যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি। কিন্তু পরক্ষণেই লোলার উষ্ণ আলিঙ্গনে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী লুপ্ত হয়েছে মনের আকাশ থেকে।

তবু রোজ রাতে বাংলোয় ঢুকবার সময় কখনো কখনো মনে হয়েছে ফিরে যাই। সুতরাং লোলার সিদ্ধান্ত একরকম আমাকে খুশিই করলো। জিনিসপত্র সব বাংলো থেকে সরিয়ে রয়ের ঘরে নিয়ে তুললাম। রয় আমার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করতে ছাড়লো না।

সারাটা দিন লোলা মুখ গোমড়া করে থাকলো। আমার সঙ্গে একটা কথাও বললো না। বেলা দশটার সময় ও গাড়ি নিয়ে ওয়েস্টওয়ার্থে চলে গেলো। লোলা চলে যাওয়ার পর বাংলো থেকে আমার অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলাম। কাজ করতে করতে মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি। ভেবেছি, দু-এক দিনেই লোলা ওর ভুল বুঝতে পারবে—আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।

রয় বাইরে একটা গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাংলোয় আমি একাই ছিলাম। হঠাৎ ·৪৫ রিভলবারটার কথা মনে পড়ায় ড্রয়ারের কাছে গেলাম। একেবারে ওপরের ড্রয়ারটা খুলতেই চমকে উঠলাম। চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা নেমে এলো।

মনে মনে ভাবলাম একমাত্র লোলা ছাড়া ওটা কেই বা নেবে! সুতরাং সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। যেন রিভলবারটার ওপরেই নির্ভর করছে আমার জীবনমরণ!

সারা বাংলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওটার কোনো সন্ধান পেলাম না। রিভলবারটা যেন সম্পূর্ণ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রিভলবারটায় লোলার কি প্রয়োজন বুঝতে পারলাম না। নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ভাবেই কি ও ৪৫টা সরিয়েছে। বাকি দিনটুকু এই রিভলবারের চিন্তাতেই কেটে গেলো। কাজ করতে করতেও খালি ভেবেছি ৪৫ টার কথা। খুঁজেছি, ওটাকে সরানোর কোনো যুক্তিসঙ্গ ত কারণ—কিন্তু সবই বৃথা। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লোলার ঘৃণাভরা কুটিল চোখ। মনে হয়েছে, আমাদের অন্তরঙ্গতার দিনগুলো সব মিথ্যে স্বপ্ন। লোলা আমার সঙ্গে অভিনয় করে আমাকে বোকা বানিয়েছে।

রাত একটা পর্যন্ত রয়ের সঙ্গে বাইরেই কাটালাম। কিন্তু লোলার ফিরবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। অবশেষে কিছুটা হতাশ হয়েই রয়কে নিয়ে ঘরে ফিরে চললাম।

আমার বিছানা ঠিক জানলার পাশে। রাত প্রায় তিনটের সময় একটা গাড়ির শব্দ কানে আসায় জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, লোলার মার্কারি বাইরে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর লোলা বাংলোর দিকে চলেছে। ইচ্ছে হলো এক্ষুনি গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি, রিভলবারটার কথা কিন্তু রাতে আর না গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে লোলা যখন খাবার ঘরে এলো, তখন এগারোটা বাজে। লোলাকে একা পেয়েই জানতে চাইলাম রিভলবারটা কোথায়!

লোলা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, ওটা আমি লুকিয়ে ফেলেছি।

কোথায়?

ওয়েন্টওয়ার্থ যাবার পথে রাস্তায় পুঁতে ফেলেছি। কেন তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?

কেন? পুঁতে ফেলেছো কেন?

তোমার তো কারণটা বোঝা উচিত শেট, পুলিশ যদি রিভলবারটা খুঁজে পেতো, তাহলে কি আমাকে ছেড়ে দিতো মনে করেছো? ওরা সহজেই বুঝতে পারতো, ঐ রিভলবারের গুলিতেই কার্ল মারা গেছে তাই না?

লোলার কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত হলেও তবুও কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। বারে বারে মনে হচ্ছে ও যেন মিথ্যে বলছে। লোলা আমাকে আরো জানালো যে, ও এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চায়। এবং এখানকার দেখাশোনার ভার ও আমার ওপরে দিয়ে যেতে চায়।

আমি সব শুনে ওকে বললাম, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছো লোলা, এখানকার প্রতিটি পুলিশ ফাঁড়িতে আমার চেহারার বিবরণ—এমন কি ফটো পর্যন্ত রয়েছে। তুমি চলে গেলে আমার পক্ষে নিরাপদে থাকা অসম্ভব। সুতরাং এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া তোমার হবে না।

লোলার চোখ হায়নার মতো জ্বলজ্বল করে উঠলো, কার্লের সিন্দুক তোমাকে খুলতেই হবে শেট—কারণ আমার টাকা আমি চাই। টাকা পেলেই আমি এ সপ্তাহের শেষে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' ছেড়ে চলে যাবো। দেখা যাক কে আমাকে বাধা দেয়।

আমি ওকে বললাম, ওসবে কোনো লাভ হবে না। এ জায়গা তুমি তিনটে কারণে ত্যাগ করতে পারবে না।

প্রথমতঃ, এখানে সব সময় আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তুমি যদি চলে যাও তাহলে সবাই মনে করবে রয় একাই এ জায়গা দেখাশোনা করছে। আর তাতে শেরিফ যদি সন্দেহ করে বসে, তবে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তারপর শেরিফ এসে আমাকে দেখলেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়তঃ জেনসনের মৃতদেহ আশেপাশেই কবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যদি খোঁড়াখুঁড়ি করে মৃতদেহ খুঁজে পায় তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমাকে জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে। কারণ কার্লকে গুলি যখন তুমিই করেছো, তার ফলও তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আর তৃতীয়তঃ সিন্দুক আমি খুলছি না—এবং টাকাও তুমি পাবে না। কারণ, টাকা পেয়ে গেলেই তুমি আমার বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো পুলিশকে বলবে, জেনসনকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু এ কথাটা তুমি যাতে পুলিশকে না বলতে পারো সেদিকে আমি বিশেষ যত্ন নেবো, বুঝেছো?

আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার উত্তরের প্রতিটি শব্দ মিছরির ছুরির মতো লোলার গায়ে কেটে বসেছে। দেখলাম লোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে অন্ধকারের ছায়া, মুখে কষ্টকৃত প্রশান্তির ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। অধৈর্য হওয়ার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। এ জায়গা ছেড়ে আমি চলে যাবোই। আর যখন যাবো তখন তোমার হয়তো দুঃখ হবে তোমার পরিণতির কথা ভেবে। হয়তো মনে হবে, আমাকে এখন যেতে দিলেই তুমি ভালো করতে—

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো লোলা? তবে শোনো রয় যে কার্লের সিন্দুক খুলতে পারবে না, তা নয়। কিন্তু ভুলক্রমেও ওকে দিয়ে সিন্দুক খোলানোর কথা চিন্তা করো না। কারণ, রয় যদি সিন্দুক খুলে দেখে ওতে কি আছে, তবে সমস্ত টাকা ও-ই নিয়ে নেবে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। ভেবো না ও তোমার যৌবনের মায়াজালে ধরা দেবে। তা যদি হতো তবে আমি রয়কে এখানে চাকরি দিতাম না। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি। মেয়েদের উপস্থিতিই রয়ের কাছে অসহ্য এবং বিরক্তিকর। তুমিও তো কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছো, কোনো লাভ হয়েছে কি? রয়ের জীবনে সবচেয়ে প্রথমে যার স্থান, তা হলো টাকা। সিন্দুক খুলে টাকাগুলো দেখলেই তোমাকে খুন করবে। তারপর সমস্ত টাকা নিয়ে চলে যাবে। ও টাকা তুমি আর কোনোদিন পাবে

না। সুতরাং তোমার যদি এতোই টাকার প্রয়োজন থাকে, তবে যাও—রয়কে সিন্দুক খুলতে বলো।

কথা শেষ করে বাইরে পা বাড়ালাম। লোলা তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে এসেই রয়-এর সঙ্গে দেখা। মনে মনে ভাবলাম সত্যিই কি রয়কে বিশ্বাস করা চলে! ও যদি এতোদিনকার সং ভুলে লোলার যৌবনের ফাঁদে পা দেয়! কিন্তু ওর নির্বিকার, কঠোর ভাব আমাকে আশ্বস্ত করলো। মনে হলো রয়কে আমি বিশ্বাস করতে পারি।

আমি রয়কে বললাম, আমার কি মনে হয় জানিস, এবার লোলা হয়তো তোর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করবে। তোকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। দেখিস, সাবধানে থাকিস।

এবার মনে হলো, রয়কে সিন্দুকের কথা বলে দিই। কিন্তু মনে হলো রয় যদি একবার জানতে পারে সিন্দুকে কি আছে, তবে ওর পক্ষে স্থির থাকা মুস্কিল হবে। হয়তো সিন্দুক খোলার জন্য আমাকেই চাপ দেবে। আর যাই করি, সিন্দুক আমি খুলছি না।

রয় আপন মনেই মাথা নাড়লো, ওঃ, মেয়েদের পক্ষে সবই সম্ভব।

পর পর তিনটে দিন লোলা একাই কাটালো। আমার সঙ্গে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ করে দিলো। তাতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি, কারণ রয়ই হলো আমার সর্বক্ষণের সাথী।

রোজ রাতে বাইরের উঠোনে আমরা তাস খেলে সময় কাটাতাম। মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে খেলা ছেড়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে তেল মোবিল দিয়ে আসতাম।

খেলতে খেলতে ও প্রায় টাকা পয়সা নিয়ে আলোচনা করতো, বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো।

আমি ওকে অনেক বোঝাতাম বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন, টাকার লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করতে। কিন্তু ওর মাথায় সেই একই চিন্তা ঘুরে বেড়াতো।

সেদিন লক্ষ্য করলাম খেলার প্রতি ওর একেবারেই মন নেই। হঠাৎ ও টেবিলের ওপর তাস ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আজ আর খেলবো না খুব ক্লান্ত লাগছে। যাই শুয়ে পড়ি।

আজ রাতে কাজ করবার দায়িত্ব আমার। গাড়ির ভিড় কমলে আমরা এক সঙ্গেই শুতে যাই। কিন্তু আজ এই প্রথম রয় একা শুতে যাচ্ছে।

রয় বিদায় নিয়ে চলে গেলো। চুপচাপ বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম। একটু পরেই ওর ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে দেখি, বাংলোয় লোলার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দুটো আলোকিত জানলা আমার কাছে বয়ে নিয়ে এলো এক অনুচ্চারিত ইঙ্গিত। মনে হলো রয় হঠাৎ যেন আমার বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি এখানে বড় একা—।

।। বারো ।।

রয় সম্বন্ধে আমার গত রাতের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পরদিন সকালেই সেটা বুঝতে পারলাম। কারণ আমার চোখে পড়লো ওর ব্যবহার আগের মতোই হাসিখুশী ও উচ্ছল।

প্রতিদিনের মতো আজও সন্ধ্যেবেলা আমরা তাস নিয়ে বসলাম। নিজেদের মধ্যে হার জিত নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করলাম। নানা রকম ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও করলাম। রয় আবার ওর হাসিখুশী মেজাজ ফিরে পাওয়ায় অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম। এছাড়া নিশ্চিন্ত হওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল যেমন—আমার প্রতি লোলার ব্যবহার আবার ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠেছে। সারাদিনে লোলা আমার সঙ্গে বার দুয়েক কথা বলেছে, যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত। তবুও আমি খুব খুশী।

রাত প্রায় দশটার সময় লোলা বারান্দায় এসে আমাদের খেলা দেখতে লাগলো। আমরা ওকে দেখে ডাকলাম। কিন্তু ও এলো না, শুতে চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো যে ওয়েস্টওয়ার্থে গিয়ে আগামীকাল কিছু কেনাকাটা করার আছে। আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

আমি একটু অবাক হলাম। কারণ, এ পর্যন্ত কেনাকাটার ব্যাপারগুলো লোলা একাই সেরেছে। তাই আজ ওর এই অনুরোধে মনের মধ্যে সন্দেহের দোলা লাগলো। এর পেছনে কি লোলার কোন উদ্দেশ্য আছে?

রয় আমাকে জানালো যে আমার যদি কোনো অপত্তি না থাকে তাহলে ও লোলার সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে চায়। কারণ ওরও কিছু কেনাকাটা আছে।

আমি মনে মনে চমকে রয়-এর দিকে তাকালাম। মুখে বললাম, ঠিক আছে যাবি তো যা না। তবে দুপুরের আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করিস। নাহলে আমি একা সবকিছু সামলাতে পারবো না।

আমি কিন্তু সকাল আটটায় যাবো। বিদায় জানিয়ে লোলা বাংলোয় ফিরে গেলো—।

লোলার সঙ্গে রয়-এর যাওয়াটাকে আমি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছিনা। কারণ আমি নিশ্চিত, সুযোগ পেলেই লোলা ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করবে। তার ওপর এখান থেকে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবার কুড়ি মাইল রাস্তা লোলা চুপচাপ বসে কাটাবে বলে তো মনে হয় না!

রয় জানালো যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে কিছু কেনাকাটি করেই ফিরে আসবে।

পরদিন সকালে দেখলাম রয় আর লোলা মার্কারি নিয়ে রওনা হচ্ছে। ওরা চলে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গতাবোধ আমাকে আঁকড়ে ধরলো। মনের কোণায় ঘুরতে লাগলো একই সন্দেহ, একই আশংকা।

এসব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্টেশন ওয়াগনের ইঞ্জিন নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

এই সময় হঠাৎ দেখলাম, একটা বড় ট্রাক তেল নেবার পাম্পগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো। ট্রাকে সার বেঁধে সাজানো বড় বড় কাঠের প্যাকিং বাক্স। ট্রাকচালক একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক। মাথায় সোনালী চুলের কোথাও কোথাও শুভ্রতার আভাস। মাথায় একটা স্টেটসন হ্যাট।

ট্যাঙ্কে তেল দিচ্ছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ ট্রাক থেকে নেমে এলো। একটা ময়লা রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে লোকটা কৌতূহল ভরে আমার দিকে তাকালো। তুমি বোধহয় এখানে নতুন এসেছো, তাই না?—তা জেনসন গেলো কোথায়?

আমি লক্ষ্য করলাম, জেনসনের মতো এ লোকটাও সুইডেনের অধিবাসী। সুতরাং এ যদি জেনসনের বন্ধুও হয়, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। সেই কারণে খুব সাবধানে ওকে জেনসনের অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা শোনালাম।

আমার গল্পটা শুনে লোকটির মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠলো, চোখ দুটো হয়ে উঠলো সংকীর্ণ।

জেনসন কোনদিন এ জায়গা ছেড়ে গেছে বলে তো মনে পড়ে না। জানো গত বিশ বছর ধরে আমি এ রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করি। যতবারই গেছি কার্লের সঙ্গে প্রতিবারই আমার দেখা হয়েছে।—অ্যারিজোনায় নতুন পেট্রলপাম্প খুলে ওর যে কি সুবিধা হবে কে জানে!—তাহলে কি ও আর এখানে ফিরবে না।

হ্যাঁ, ফিরবেন। এখানকার সবকিছু গোছগাছ করার জন্য তাকে একবার আসতে হবে।

পেট্রল ট্যাঙ্কের ঢাকনা লাগাচ্ছি। লোকটা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলো, তুমি কি কার্লের বউ-এর পরিচিত কেউ?

না, আমি এখানে চাকরি করি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না—বলছিলাম—জেনসনের বউ-এর স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো নয়। যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখলাম যে জেনসনকে বিয়ে করে এখানে বসে আছে—তখন ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম।

মেয়েটাকে আমি আগে থেকেই চিনি। লোকটি একটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তখন মেয়েটা কারসন সিটিতে থাকতো। ফ্রাঙ্ক ফিনি নামে একটা লোককে ও বিয়ে করেছিলো। ফিনি একটা গাড়ির কারখানা দেখাশোনা করতো, আর সেই সঙ্গে একটা স্ন্যাক-বারের ম্যানেজারও ছিলো। জানো, শেষ পর্যন্ত কি হল?

—একদিন ফিনিকে স্ন্যাক বারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। ওর ডান হাতে ধরা ছিলো একটা রিভলবার। আর মাথাটা ফেটে চুরমার হয়ে সারা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। লোলার বক্তব্য

ও নাকি ওপরের ঘরে কাজেই ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় নীচের তলা থেকে রিভলবারের বিকট শব্দ ওর কানে আসে। তারপর ও নীচে এসে দেখে ফিনি মরে পড়ে আছে। কাউন্টারের ওপর যে ক্যাশবাক্স ছিলো তা থেকে প্রায় দু-হাজার ডলার অদৃশ্য হয়েছে। পুলিশের ধারণা সেই টাকাগুলো লোলাই নিয়েছে। অথচ তার বিপক্ষে কোনো প্রমাণ দাখিল করা গেলো না।

একজন অফিসার সন্দেহ করলো লোলাই হয়তো ফিনিকে গুলি করেছে। কারণ ওরা নাকি, প্রায়ই এটা-সেটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া করতো। কিন্তু সেটাও পুলিশ প্রমাণ করতে পারলো না।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে লোলা কারসন সিটি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলো। তাহলেই বুঝে দেখো, যখন দেখলাম ও এখানে এসে জেনসনের মতো একজন ভালো লোককে বিয়ে করে বসেছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভীষণ অবাক হলাম।

এতোক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে লোকটার কথা শুনছিলাম। কারণ লোলার অতীত ইতিহাস আমার কাছে অমূল্য। চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললাম, আশ্চর্য, আমি তো কিছুই জানতাম না। যাই হোক আমি লোকটাকে বললাম, আমি যতোদূর জানি, মিঃ জেনসন মিসেস জেনসনকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। আপনার এই কথাগুলো মিঃ জেনসনের কানে গেলে তিনি হয়তো খুব অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব এ নিয়ে আর বেশী আলোচনা না করাই ভালো।

জেনসন তাহলে ওর বউকে নিয়ে সুখে আছে বলছো?

লোকটা যেন আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

কথা শেষ করে লোকটা তেলের দাম বাবদ কয়েকটা নোট আমার দিকে এগিয়ে ধরলো, আর বললো, আমি যেন জেনসনের কাছে এই সমস্ত কথা না বলি।

লোকটি ট্রাকে উঠে পূর্ণ গতিতে ট্রাক ছুটিয়ে দিলো।

লোকটির কথাগুলো আমাকে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত করলো। ছুটন্ত ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে চললো। তাহলে লোলা আগেও একবার বিয়ে করেছে। ওর স্বামী মারা গেছে রিভলবারের গুলিতে। আর সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে দু হাজার ডলার। এ কথা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটা কে যেন খামচে ধরলো।

জেনসনও তো মারা গেছে রিভলবারের গুলিতে। আর আমি যদি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে না দিতাম তাহলে অদৃশ্য হতো ঐ একলাখ ডলার।

এই ঘটনা দুটোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে! সন্দেহ-আতঙ্কের সুতোয় মনটা দুলতে লাগলো পেন্ডুলামের মতো।

ঐ ট্রাক ড্রাইভারটার কথা যদি সত্যি হয়, তবে কারসন সিটির পুলিশ লোলাকে শুধু টাকা চুরির জন্যই সন্দেহ করেনি ফিনিকে খুন করার জন্যও সন্দেহ করেছে। তার মানে—লোলা কি জেনসনকে খুন করেছে?

মনকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম সেই ভয়াবহ রাতের দৃশ্যে। সবকিছু আবার যেন আমার চোখের সামনে নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, লোলা রিভলবার উঁচিয়ে বসবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তেজনায় ওর বুক উঠছে নামছে। তারপরই শুনতে পেলাম লোলার সেই অবিশ্বাস্য কর্কশ শাসানি। মনে পড়লো, জেনসনের উঠে দাঁড়ানোর কথা। রাগে চোখমুখ লাল করে ও লোলার দিকে এগোতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই আবার যেন শুনতে পেলাম সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ—লোলার সেই হিংস্র দৃষ্টি—বন্দুকের বিকট আওয়াজ!

এতোদিন ধরে ভেবে এসেছি সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে লোলা চমকে ওঠায়, ট্রিগারে আচমকা চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। আর তাতেই জেনসন মারা গেছে। এক আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এখন ঐ লোকটার কথা শোনার পর আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম।

প্রথম স্বামীকে খুনের ব্যাপারে পুলিশ লোলাকে সন্দেহ করেছিলো—তাহলে কি জেনসনকে লোলা নৃশংসভাবে খুন করেছে!

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ব্যাপারটা যদি সত্যিই খুন হয়, তাহলে ও তো অনায়াসেই খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারতো।

তারপর—হঠাৎ একটা বিচিত্র সম্ভাবনা আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি পরিবর্তন করে দিলো। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে এলো।

সেদিন লোলা যখন রিভলবার হাতে ঘরে এসে ঢোকে, তখন সিন্দুকের দরজা খোলাই ছিলো। তাহলে কি লোলার উদ্দেশ্য ছিলো জেনসনের পর আমাকে গুলি করে সিন্দুকের টাকা গুছিয়ে নেওয়া? হয়তো আগে থেকেই সবকিছু প্ল্যান করে রেখেছিলো। লোলার গুলিতে আমি আর জেনসন মারা গেলে পর, ও হয়তো টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলে পুলিশে খবর দিতো। তারপর পুলিশ এলে ফ্র্যাঙ্ক ফিনির সময় যে রকম গল্প শুনিয়েছিলো, এবারও সেরকম কিছু একটা শোনাতো।

লোলার এই নিখুঁত প্ল্যান বানচাল হয়ে যাওয়ার একটাই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তা হলো জেনসনকে গুলি করা মাত্রই আমি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তেই লোলা বুঝতে পেরেছিলো, ও যদি আমাকে তখন গুলি করে, তবে সিন্দুক চিরকাল বন্ধই থেকে যাবে। কারণ আমি ছাড়া সিন্দুক খোলার লোক এই জায়গায় আর নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ও এমন অভিনয় করেছে, যেন আচমকা গুলি বেরিয়ে জেনসন মারা গেছে। তারপরই লোলা যখন বুঝতে পারলো, ব্ল্যাকমেল করে আমাকে দিয়ে সিন্দুক খোলানো যাবে না, তখন ও অন্য রাস্তা ধরলো। এমন ভাব দেখালো যেন ও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু ওর ফাঁদে আমি পা দিইনি।

আর যখনই ও বুঝতে পেরেছে যে 'এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ সিন্দুক খোলার লোক আর আমি একা নই, তখনই আমার প্রতি ওর ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠেছে। যেহেতু রয়ও এখন সিন্দুক খুলতে জানে। তাই লোলা এখন রয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, জেনসনের ৪৫ বর্তমানে লোলার কাছে, একথা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে গেলো। অর্থাৎ আমার এবং রয়ের—দুজনেরই জীবন বিপন্ন। লোলা হয়তো রয়কে যাহোক করে রাজী করিয়ে সিন্দুক খোলাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে ওকে খুন করবে। হয়তো আমাকেও আর জীবিত রাখবে না। পুলিশকেও সেই একই গল্প শোনাবে।

নাঃ, এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। লোলার চোখের রক্তলোলুপ হিংস্র দৃষ্টি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

লোলাকে জব্দ করার একটা মাত্র উপায় আছে তা হলো সিন্দুক থেকে সমস্ত টাকা অন্য কোথাও সরিয়ে সিন্দুক খোলা রেখে দেওয়া। কিন্তু ঐ টাকাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য আমাকে প্রথমেই ভালো দেখে একটা জায়গা খুঁজতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করে ফেললাম যে টাকাগুলো সিন্দুক থেকে নিয়ে জেনসনের মৃত দেহের সঙ্গেই কবর দেবো।

বারান্দা ছেড়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়লো একটা ট্রাক ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পুরোনো প্যাকার্ড গাড়ি। প্যাকার্ডের ড্রাইভার অত্যন্ত খিটখিটে স্বরে জানালো, তার গাড়ি এখুনি ঠিক করে দিতে হবে না হলে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে তার দেরী হয়ে যাবে। ঐ ঝরঝরে প্যাকার্ডের পেছনে আমার সময় নষ্ট হতে লাগলো, দুপুরবেলা রয় আর লোলা যখন ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এলো, তখনও আমি ঐ হতচ্ছাড়া প্যাকার্ডের সঙ্গে রেঞ্চ নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছি।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত কেটে গেলো। কিন্তু এর মধ্যে একবারও সিন্দুকের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলাম না।

লোলা সবসময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। ও আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে ঠিকই, কিন্তু ওর নিস্পৃহ ব্যবহার সব সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অতীতের অন্তরঙ্গতার সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে আমাদের মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক সুদৃঢ় দ্বন্দ্বের পাঁচিল।

প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এই অস্বস্তিকর পরিবেশকে আমি মেনে নিলাম। এবং কিছু দিনের মধ্যে অনুভব করলাম লোলাকে স্পর্শ করতেও আমার প্রচণ্ড অনীহা। লোলার প্রতি একে একে আমার ঘৃণা জন্মাতে শুরু করলো।

সবসময় ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এক এক সময় মনে হয়েছে রয়কে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে আবার চুপ করে গেছি।

রয় যদি জানতে পারে যে সিন্দুকে এক লাখ ডলার আছে তবে ওর বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন

মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং ওকে ঠেকিয়ে রাখা খুব অসুবিধা হবে। সুতরাং মুখ বন্ধ করে দিন কাটাতে লাগলাম।

এই কঠিন সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো রয় ও লোলার অনুপস্থিতি। তাই বসে বসে দিন গুনতে লাগলাম কবে লোলা রয়-এর সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে—আমাকে এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ রেখে যাবে সম্পূর্ণ একা।

প্রায় সপ্তাহখানেক পরে এসে গেলো সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ। একদিন সন্ধ্যায় খাবার ঘরে আমি আর রয় কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় লোলা ঘরে এসে ঢুকলো, ওয়েন্টওয়ার্থে ব্রিজিত বার্দোর একটা ভালো ছবি এসেছে। আজ রাতে আমি দেখতে যাবো তোমরা কেউ যাবে?

রয় বললো যে সে মারপিটের ছবি ছাড়া দেখে না।

আমি ভেবে দেখলাম, এই সুযোগ। এখন যদি কোনরকমে রয়কে লোলার সঙ্গে যেতে রাজী করাতে পারি তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ, ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে ওদের রাত তিনটে হয়ে যাবে। আর ঐ সময়টাকেই আমি কাজে লাগাবো।

আর রয়কে বললাম ছবিতে মারপিট না হয় নাই থাকলো, ব্রিজিত বার্দোকে তো দেখতে পাবি।

রয় অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। ও হয়তো ভেবেছিলো, আমিই লোলার সঙ্গে যাবো।

রয় ইতস্ততঃ করে জবাব দিলো ভাবছিলাম আজ একটু তাস খেলবো।

কিন্তু এই কুড়ি মাইল গাড়ি চালিয়ে লোলা একেবারে একা ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে—তাই বলছিলাম—

লক্ষ্য করলাম লোলা একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। ও হঠাৎ বলে উঠলো, ঠিক আছে তোমাদের যখন যাবার ইচ্ছা নেই, তখন আমি একাই যাবো।

রয় লোলার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসলো, আচ্ছা—তোমার কথাই থাক। চলো কি ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে—

রয় আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে মাথা নোওয়ালো। লোলা প্রত্যুত্তরে হেসে বাংলোর দিকে পা বাড়ালো।

সাড়ে ন টা ব'জতে না বাজতেই লোলা সেজেগুজে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো। ওর পরনে একটা দুধ সাদা পোশাক। আগে কোনদিন ওকে এ পোশাকে দেখিনি।

লোলা যেন আজ প্রাণ ভরে সেজেছে। ওর রূপযৌবনের সমস্ত ছলাকলা প্রকট করে ও এগিয়ে চললো মার্কারির দিকে। ওর ভাব গতিক দেখে বুকের মধ্যে বেজে উঠলো বিপদের সংকেত।

লোলা ওর স্বভাবসিদ্ধ ছন্দে এগিয়ে গিয়ে রয়ের পাশে বসলো। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো।

শেট, আমি কিন্তু যেতে চাইনি। তুই বললি বলে তাই—

লোলাকে আড়াল করে চোখ টিপলো রয়।

রয়ের মন্তব্য আমার কানে বাজলো। কারণ ওর চরিত্রের সঙ্গে এ ধরনের কথা ঠিক খাপ খায় না—কিন্তু ওর কথা আমি গায়েই মাখলাম না। মিষ্টি করে জবাব দিলাম, আশাকরি সময়টা তোর ভালোই কাটবে।

আমি ভালোভাবেই জানি যদি একবার সিন্দুকের টাকাটা পরিকল্পনামতো লুকিয়ে ফেলতে পারি, তবে লোলা আর রয় দুজনেই থাকবে আমার বুড়ো আঙুলের তলায়—সম্পূর্ণ আমার আজ্ঞাধীন।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দেবার পর কয়েক মুহূর্ত আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বাংলোর দিকে চললাম।

বাংলোর কাছে পৌঁছেই লক্ষ্য করলাম সদর দরজা বন্ধ। বুঝলাম লোলা দরজায় তালা দিয়ে গেছে। সুতরাং গুমটিঘরের দিকে চললাম একটুকরো তারের সন্ধানে।

তারের মাথাটা সামান্য বেঁকিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। একটু চেষ্টাতেই খুলে গেলো বাংলোর দরজা। তারপর হাঁটু গেড়ে সিন্দুকের কাছে বসলাম, খুলে ফেললাম সিন্দুকের দরজা। সিন্দুকের দরজা খোলামাত্রই নির্মম রসভঙ্গের মতো কানে এলো কোনো গাড়ির হর্নের

শব্দ। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা হলদে ক্যাডিলাক।

অতএব কম্বিনেশন ডায়াল ঘুরিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে বাইরে এলাম। কিছুটা হতাশ হয়েই গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম—

সেই যে গাড়ি আসতে শুরু করলো ব্যস—সিন্দুক সিন্দুকের জায়গায় পড়ে রইলো, আর আমি অক্লান্ত ভাবে খেটে চললাম।

প্রায় বারোটা নাগাদ গাড়ি চলাচল একেবারে কমে এলো। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাংলোর দিকে এগিয়ে যাবো এমন সময় চোখে পড়লো দূরাগত কোনো গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। একটু বিরক্ত হয়ে পাম্পের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়িটা একটা পুরোনো মডেলের বুইক। গাড়ির আরোহী দু'জনের একজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

লোকটার বয়স প্রায় আমার মতো। মাথায় কালো টুপি, পরনে কালো জামা, আর একটা সাদা টাই। ক্ষুদে ক্ষুদে কালো চোখজোড়া যেন নিষ্প্রাণ দু' টুকরো কাঁচ।

তার স্থূলকায় সঙ্গীকে দেখে মেক্সিকোর অধিবাসী বলেই মনে হলো, তার গায়ের রঙ রোদে পোড়া—তামাটে। ঠোঁটের ওপর লম্বা টানা গোঁফ।

কেন জানিনা লোক দুটোকে দেখে মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'সাবধান—সাবধান'!

এতোদিন পরে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' সত্যিই বড় নির্জন এবং এখানে আমি সম্পূর্ণ একা!

মোটা লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো। হয়তো দেখলো আমি ছাড়া আর কেউ এখানে আছে কিনা। পাম্পের গা থেকে তেল দেবার পাইপটা নিলাম, ক লিটার দেবো?

মোটা লোকটা নির্বিকার সুরে জবাব দিলো—দশ লিটার।

ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে সাদা টাই পরা লোকটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। সে তখন গাড়ি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে এদিক—ওদিক চাইছে, যেন কার খোঁজ করছে।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো এই লোক দুটো হয়তো রেস্তোরাঁর ক্যাশ লুঠ করতে এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য একটা চিন্তা আমার মনে এলো। যদি ওরা বাংলোয় গিয়ে সিন্দুকটা খুঁজে পায়।

সাদা টাইপরা লোকটা কোট থেকে একটা পিন খুলে নিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলো। অনুভব করলাম ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখজোড়া আমার ওপরেই নিবদ্ধ। মনে মনে ভয় পেলাম।

কি হে, তুমি এখানকার মালিক নাকি? হালকা সুরে আচমকা প্রশ্ন করলো সাদা টাই পরা লোকটি, একা থাকো না বউ ছেলেমেয়ে আছে?

আমি এখানে চাকরি করি। পাম্পের মিটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জবাব দিলাম, মালিক এবং তাঁর একজন কর্মচারী একটু বাইরে গেছেন। এখনি এসে পড়বেন। ওঁদের আসার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

আমি তেল দেওয়া শেষ করে বালতি থেকে ভিজে স্পঞ্জটা তুলে নিলাম। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন মুছতে লাগলাম।

লোকটা চুপচাপ পিন দিয়ে মাড়ি খোঁচাতে লাগলো।

আমি কাজ করতে থাকলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু সবসময় লোক দুটোর গতিবিধির দিকে।

লোকদুটো আমার কাছে জানতে চাইলো যে খাওয়ার মতো কি কি আছে?

এতো রাতে তো স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছুই নেই। আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট অর্থাৎ লোলাদের ফিরতে এখনো ঘণ্টা আড়াই বাকি। সুতরাং এ লোকদুটোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। উপায়হীন হয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। খাবার ঘরে ঢুকে ওরা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

মোটা লোকটা আমাকে অতিক্রম করে কাউন্টার পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলো। রান্নাঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মারলো। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে সাদা-টাইকে উদ্দেশ্য

করে মাথা নেড়ে জানালো, রান্নাঘরে কেউ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমি বিপদে পড়েছি।

সাদা টাই পায়ে পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। টেলিফোন ডায়ালের ওপর আঙুলের টোকা মারলো।

লোকটা টেলিফোনের রিসিভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো। রিসিভারটা তার ছিঁড়ে দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে এলো। সাদা টাই সরীসৃপের মতো স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলো।—যাও ফ্রায়েড চিকেনের ব্যবস্থা করো গিয়ে। সল, তুমি ওর সঙ্গে যাও—ওর দিকে নজর রাখো।

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালাম। কানে এলো অনুসরণরত সলের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ফ্রাইং প্যানে মুরগী চাপিয়ে সলকে প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার—তোমরা এখানে কি চাও?

ভয় পেয়োনা, দোস্ত। সল এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বসলো। ওর পাঁচ আঙুল রিভলবারের বাঁটের গায়ে খেলে বেড়াতে লাগলো। চুপচাপ কাজ করে যাও।

আমার বুকের কাঁপুনি হঠাৎ বেড়ে গেলো ঠোঁট শুকিয়ে আসতে লাগলো।

এমন সময় সাদা টাই রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। ওর হাতে একপ্লেট স্যান্ডউইচ। সম্ভবতঃ খাবার ঘরের আলমারি থেকে তুলে নিয়েছে।

সাদা টাইয়ের মুখ স্যান্ডউইচে ঠাসা।—খোকার দিকে লক্ষ্য রেখো। দেখো যেন উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসে। আমি একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসি। কথা শেষ করে সাদা-টাই রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সল প্লেট থেকে একজোড়া স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো, এডি এমনিতে খুব ভালো লোক। তবে রিভলবারের ট্রিগার দেখলেই ওর ভীষণ টিপতে ইচ্ছা করে। সুতরাং ওর সঙ্গে বুঝেশুনে ব্যবহার করো—নয়তো—

মনে মনে ভাবলাম সলকে কায়দা করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। ওর ওই থলথলে চেহারা নিয়ে ও আমার সঙ্গে যুঝে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং একবার যদি ওকে কাবু করে ফেলতে পারি তবে এডির সঙ্গে আমার লড়াই হবে সমানে সমানে।

ভেবে দেখলাম, যদি সাহস করে সল আর এডির মোকাবিলা করতে পারি তবে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রয় ও লোলা ফিরে আসার আগেই সিন্দুকের টাকাটা সরিয়ে ফেলতে পারবো। সল হঠাৎ প্রশ্ন করলো, ক্যাশে টাকা-পয়সা কি রকম আছে?

—আজ বিকেলেই ব্যাঙ্কে সব টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে।

দুটো খালি প্লেট নিয়ে টেবিলে রাখলাম। উত্তেজনায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠলো। এই মোটাটাকে টিট করতে হলে এটাই উপযুক্ত সময়।

—শোনো ভায়া আমাদের মালের দরকার। চট্‌পট্ ছাড়ার ব্যবস্থা করো। এডির সঙ্গে প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না।

সল ধীরেসুস্থে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়ালো। শিকারীর চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। আমি আর দেরী না করে ফ্রাইং প্যানের গরম মুরগীগুলো সজোরে ছুঁড়ে দিলাম ওর মুখে। এক বিকট চীৎকার করে সল টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। গরম তেল ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। ভাজা মুরগীর কিছু অংশ ওর টুপির ওপর, আর বাকীটা ওর কোটের গায়ে লেগে মেঝেতে ছিটকে পড়লো।

সল একহাতে মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে কোমর থেকে রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। আর দেরী না করে ফ্রাইং প্যানটা ঘুরিয়ে সপাটে বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। সেই আঘাতে সল আবো কয়েক পা পিছিয়ে কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। ওর এক হাত তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে ৪৫ রিভলবারের বাঁট।

ফ্রাইং প্যানের আর এক আঘাতেই সল মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা চাপা গোঙানি।

সলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে বিনা দ্বিধায় ৪৫-এর বাঁট

দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করলাম।

এবার ও চোখ উল্টে, হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লো। ওর বন্দুকটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ খাবার ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দ হলো। আমি আর সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎবেগে ছুটলাম আলোর সুইচ লক্ষ্য করে। সুইচ অফ করতেই একরাশ অন্ধকারে ভরে গেলো ছোট্ট রান্নাঘরটা। বুঝলাম এডি যদিও পেশাদার খুনে তবুও আশার কথা আমি নিরস্ত্র নই।

সুতরাং রিভলবার বাগিয়ে ধরে অন্ধকার রান্নাঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম।

।। তের ।।

সল—- !

অন্ধকারে ভেসে এলো এডির সতর্ক ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, খুব সাবধানে হাল্কা পায়ে রান্নাঘরের খিড়কি দরজার কাছে গেলাম। আমার যেটুকু আশা ভরসা তা ঐ ৪৫ রিভলবারটার জন্য। যদিও জীবনে কোনদিন আমি পিস্তল ব্যবহার করিনি।

এমন সময় খাবার ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেলো। কানে এলো কাঠের পাটাতনে পা ফেলার খসখস শব্দ।

খিড়কির দরজায় হাত রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিলাম।

দরজা খুলতেই কানে এলো সলের চাপা গোঙানি, এবং সঙ্গে ওর নড়াচড়ার শব্দ। নাঃ সলের মাথাটা দেখছি লোহার তৈরী। ভেবেছিলাম, অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে; আর সেই সময়ে এডির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হবে। কিন্তু এখন দেখছি সমূহ বিপদ।

খিড়কি দরজা পুরোটা খুলতেই অনুভব করলাম মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটা। ভেবে দেখলাম বাইরে বের হতে পারলে এডির সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমার অনেক সুবিধা হবে। সেই কারণে ৪৫ টা রান্নাঘরের দরজাব দিকে কোনোরকমে তাক করে পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নীল আগুনের রেখা—-আর তার পরমুহূর্তেই রিভলবারের কান ফাটানো বীভৎস শব্দ। একটা গরম সীসের টুকরো আমার রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠলো।

এক লাফে তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বালির ওপর। মুহূর্তের মধ্যে আত্মগোপন করলাম অন্ধকারের মধ্যে

এডির লক্ষ্য যে এতোটা নির্ভুল তা আশা করিনি।

চারিদিকের বরফ শীতল নিস্তব্ধতা পরিবেশকে আরো ভয়াবহ করে তুললো। পরিস্থিতি যেন আমাকে বারবার জানিয়ে দিচ্ছে যে আমি একা। এই বিপদের মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসবে না আমাকে সাহায্য করতে। সম্পূর্ণ নিজের ওপরেই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

সামনের পাম্পগুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে ভাবে হোক আমাকে বাংলোয় পৌঁছতে হবে।

রেস্তোরাঁর দেওয়াল ঘেঁষে পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলাম। এমন সময় নরম স্বরে কেউ বলে উঠলো, ওহে খোকা, পিস্তল ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো। শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছো?

অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু এডির সাদা টাইয়ের ঝিলিক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়তেই গুলি করার একটা দুর্দম ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে নির্বুদ্ধিতার পরিণতির কথা চিন্তা করে নিরস্ত হলাম।

ভীষণ ভয় পেলেও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আমি তখনও হারাইনি। তাই যখন আরো একবার কানে এলো এডির নেশা ধরানো হাল্কা স্বর, আমি যেমন বসে ছিলাম, তেমনি রইলাম। কিন্তু আমার মনে হলো এডির কণ্ঠস্বর যেন আরো অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এডি যদি কোনো রকমে একবার বুঝতে পারে আমি কোথায় লুকিয়ে আছি, তাহলে

আমাকে খুন করতে ও এতোটুকু দ্বিধা করবে না।

খুব সাবধানে বালিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। বুকে হেঁটে এগোতে যেতেই পায়ে ঠেকলো একটা পাথরের টুকরো। অতি সাবধানে ওটা তুলে নিয়ে বিপরীত দিক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। পাথরটা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে গিয়ে সশব্দে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো নীল আলো, আর পিস্তলের বিকট গর্জন—

পিস্তলের আলোটা ঝলসে উঠছে ঠিক খিড়কি দরজার কাছ থেকে। কিন্তু আমি রিভলবার তুলতে গিয়েই থমকে গেলাম। কারণ এডি আমাকে গুলি করার পরমুহূর্তেই সিঁড়ির পেছনে বালির ওপর লাফ দিলো। বুঝতে পারলাম এডি সিঁড়ির ধাপের আড়ালে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎই এডিকে দেখতে পেলাম।

সন্তর্পণে একটু একটু করে রিভলবার শক্ত করে ধরে এডির ঝাপসা সাদা টাইয়ের ওপর তাক করলাম। অস্থির—ভয়ার্ত আঙুল ট্রিগারের ওপর ক্রমশঃ চেপে বসতে লাগলো—

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে রিভলবার নামিয়ে নিলাম। আর সেটাই হলো আমার চরম নির্বুদ্ধিতা। কারণ রিভলবার নামানোর এই সামান্য নড়াচড়া এডির শিকারী দৃষ্টিবে ফাঁকি দিতে পারলো না।

আগুনের ঝলক আর রিভলবারের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকে অনুভব করলাম এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সারা শরীর কেঁপে উঠলো। কিন্তু কোনো যন্ত্রণাই অনুভব করলাম না। শুধু মনে হলো, আমার মস্তিষ্কের ভেতর কেউ যেন একটা সুইচ অফ করে দিয়েছে, আর তারই ফলস্বরূপ নির্বাপিত হয়েছে আমার শক্তির উৎস, শরীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হয়েছে অকেজো।

বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়তেই অনুভব করলাম উষ্ণ উত্তাপ। রিভলবারটা হাত থেকে খসে বালির ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুঁচলো জুতোর অগ্রভাগ সপাটে এসে আছড়ে পড়লো আমার পাঁজরে।

মনে হলো একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার উত্তাপে আমার ভেতরটা পর্যন্ত পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। রক্ত সমুদ্রের বিশাল ঢেউ যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসতে লাগলো—

পরে রয়ের কাছে ঘটনা শুনেছিলাম ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এসে ওরা লক্ষ্য করে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। তাই দেখে রয়ের মনে কেমন যেন সন্দেহ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বালির ওপর আমাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। লোলা এবং রয় দু'জনে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসে তারপরই আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

জ্ঞান ফিরলে দেখি রয় আমার দেহের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর মুখ সাদা, হাত পা থর থর করে কাঁপছে। রয়ের ঠিক পেছনেই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোলা। উত্তেজনায় ওর মুখের রেখা কঠিন—চোখের তারায় কৌতূহল।

আমাকে চোখ মেলতে দেখেই লোলা রয়কে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর—কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলো কি হয়েছিলো, শেট? কে তোমার এ অবস্থা করেছে?

আমার কথা বলার কোনো শক্তি নেই। আমি ভেসে চললাম অন্ধকারের রাজ্যে। একরাশ কালো অন্ধকার যেন উন্মত্ত আক্রোশে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। মনে হলো, এই বোধহয় শেষ অন্ধকার—জীবনের ও পিঠ, মৃত্যু। কিন্তু আশ্চর্য, এই মৃত্যুভয় আমার মনে আশঙ্কার পরিবর্তে এনে দিলো এক বিচিত্র প্রশান্তি। চেতনার সীমারেখা পার হতেই যন্ত্রণার রেশ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেলো। জমাট অন্ধকারের বিশাল টুকরো এসে আশ্রয় নিলো দু' চোখের পাতায়—

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলেই দেখি রয় আমার পাশেই বসে আছে। চোখের চিন্তাকুল দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু লোলাকে কোথাও দেখলাম না। সম্ভবতঃ ও বাংলোয় ফিরে গেছে। রয় আমাকে প্রশ্ন করলো, এখন কেমন আছিস?

ভালোই।

মনে হলো, এই একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। শরীর দুর্বল হলেও আমার চিন্তাশক্তি কিন্তু আচ্ছন্ন হয়নি। এমন সময় জানলা দিয়ে ভেসে এলো হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দ। রয় উঠে দাঁড়ালো। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি

না। হঠাৎ এক মৃদুশব্দে চমকে চোখ মেললাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দেখি, লোলা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

শেট, কারা তোমাকে গুলি করেছে?

দুজন লোক ; ওদের কাছে রিভলবার ছিল, অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম। অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে লোলার দিকে তাকালাম। ওকে আর আগের লোলা বলে চেনা যায় না। চোখের কোণে কালি পড়েছে। এই ক দিনে লোলার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ওর মুখ যেন কাগজের মতো সাদা।

ওরা কি সিন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো?

বললাম—না।

লোলার ফ্যাকাশে মুখে লোভ উৎকণ্ঠার ছায়া। —কি করে সিন্দুক খুলতে হয় আমাকে বলে দাও শেট, চুপ করে থেকো না।

আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই অন্ধকার ; আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলো—সবকিছুর সামনে কে যেন হঠাৎ টেনে দিলো এক কালো পর্দা—

জীবন মৃত্যুর অনিশ্চয়তার দোলায় কেটে গেলো তিনটে দিন, সব কিছু ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

রয় যদি জীবনপণ করে এভাবে আমার সেবা না করতো , তাহলে হয়তো এই তিনটে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্যও আমার হতো না। এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের পাতা এক করেনি রয়।

রয়ের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে নাকি আমার অবস্থা চরমে উঠেছিল।

প্রায় সাতদিন পর ফিরে পেলাম কথা বলার শক্তি। তখন রয়ের সঙ্গে এডি এবং সলের ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। শুনলাম এডি নাকি ক্যাশবাক্স আর পেট্রল বিক্রির টাকা-সব কিছুই নিয়ে গেছে।

রয় আমাকে বললো তোর কোনো ভয় নেই শেট, তুই এবারে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠবি।

আটদিন আটরাত আমি অসহায়ভাবে বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু লোলা একবারের জন্যও আমার কাছে আসেনি। জানি না, এই কদিনে রয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

একদিন রয় আমার কাছে জানতে চাইলো, শেট, সত্যি করে বলতো জেনসনের আসলে কি হয়েছে?

আমিও মনে মনে ভাবছিলাম যে করেই হোক রয়কে সমস্ত ঘটনা জানানো ভীষণ প্রয়োজনীয়। তাই ওকে সত্যি কথাই বললাম, লোলা কার্লকে খুন করেছে—আর আমি বোকার মতো লোলার কথায় রাজী হয়ে সেই মৃতদেহটা কবর দিয়েছি।

ওকে আরও বললাম, লোলার প্রথম স্বামীর কথা এবং সেই স্বামীকেও লোলা নৃশংশভাবে খুন করেছে। তুই সাবধানে থাকিস, রয়, লোলার রক্তে মিশে আছে খুন করার নেশা। প্রয়োজন হলে তোকেও খুন করতে ওর একটুও হাত কাঁপবে না।

সব শুনে রয়ের চোখে ফিরে এলো নির্বিকার শূন্যদৃষ্টি। রয় কোনো কথা না বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো। মনে মনে ভাবলাম, যাক্ রয়কে যে আগে থাকতে সাবধান করে দিতে পেরেছি তাতেই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু তখনও বুঝিনি, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে ; সাবধান করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ পরদিন রাতেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

সেদিন রাত প্রায় এগারোটা বাজতেই দেখি, লোলা বাংলোয় ফিরে চলেছে। তার একটু পরেই নিভে গেলো বাংলোর আলো। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ রয় রেস্তোঁরার আলো নিভিয়ে ঘরে আমাকে উঁকি মেরে দেখলো। তারপর শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ করার মৃদু শব্দ। বুঝতে পারলাম, রয় ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

সব কিছু জেনেশুনেও মনে প্রাণে চাইলাম আমার অনুমান যেন মিথ্যে হয়। রয় সম্বন্ধে আমার ধারণা যেন এই অসুস্থ চিন্তায় কলঙ্কিত না হয়। কিন্তু আমি জানি এ মিথ্যা স্তোক দিয়ে লাভ নেই। কারণ, বাস্তবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার কেন এ পৃথিবীতে কারোর নেই। জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরেই রয় অন্ধকারে এগিয়ে চললো।

অন্ধকারে শুয়ে নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হতে লাগলো, ঈর্ষার বদলে অনুভব করলাম আতঙ্কের অস্তিত্ব। লোলা একবার যখন রয়কে কব্জা করেছে তখন ওকে দিয়ে সিন্দুক খোলাবেই। তারপর ও রয়কে খুন করবে।—না, এ বিষয়ে এতোটুকু সন্দেহ আমার নেই। রয়ের ঘরে আমাকেও লোলার শিকার হতে হবে। তারপর টাকাগুলো জায়গা মতো লুকিয়ে ফেলে খবর দেবে সেই শেরিফকে। লোলার স্বরূপ আমি জানি ; ওর আসাধ্য কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

রাত প্রায় দুটো নাগাদ রয় বাংলোর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। দরজা বন্ধ করে ঘরের দিকে আসতে লাগলো, নিঃশব্দে বসবার ঘরে এসে ঢুকলো রয়। একই সঙ্গে আমিও হাত বাড়ালাম আলোর সুইচের দিকে।

আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি রয়কে ডাকলাম, আয় এখানে এসে আমার পাশে বস, তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। রয় ধীরে ধীরে এসে আমার পাশে বসলো। লোলা তোকে শেষ পর্যন্ত তাহলে ফাঁদে ফেলেছে? হুঁ, রয় কোনো জবাব দিলো না। আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে, আমার কথায় যদি তুই সাবধান না হোস তবে তোর কবর তুই নিজেই খুঁড়বি মনে রাখিস। আমি ওকে জেনসনের সিন্দুকের কথা সব কিছুই বলে দিলাম। বললাম, জেনসনের সিন্দুকে এমন একটা জিনিস আছে যেটা না হলে লোলার চলবে না। আর সেটা পাওয়ার জন্য হেন কাজ নেই যে লোলা করতে রাজী নয়। এমন কি খুন করতেও ওর বিবেকে বাধবে না। এ জিনিসটার জন্যই ও জেনসনকে খুন করেছে। ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়েও সিন্দুক খোলাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। আর এখন যেই তোকে হাতের কাছে পেয়েছে, অমনি ওর কাজ শুরু হয়ে গেছে। লোলা জানে তুই সিন্দুক খুলতে জানিস ; তাই তোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে। তোকে দিয়ে যে করে হোক সিন্দুক খুলিয়ে ও তোকে খুন করবে।

কথা বলার পরিশ্রমে আমার সারা শরীর ঘেমে উঠলো। বুকের যন্ত্রণায় মনে হলো নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে। কিন্তু ওর অভিব্যক্তিহীন মুখে নিস্পৃহতার মুখোস। শুধু চোখের তারায় ঈষৎ কালো ছায়া। অধৈর্য হয়ে ও প্রশ্ন করলো তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সিন্দুকে কি এমন আছে যে লোলার সেটা না হলে চলবে না? সিন্দুকে যে এক লাখ ডলার আছে ; সে কথা বলার মতো বুদ্ধিভ্রংশ তখনও আমার হয়নি। তাই একটা বিশ্বাসযোগ্য কাল্পনিক গল্প ওকে শুনিয়ে দিলাম। রয় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো ; শেট, তুই, কি এগুলো সব বানিয়ে বলছিস, না সত্যি?

এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়, রয়। সেদিন জেনসনকে গুলি করার পর লোলা আমাকেও খুন করতো। কিন্তু ও দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই আমি সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিই। ও জানতো আমার সাহায্য ছাড়া ওর পক্ষে সিন্দুক খোলা অসম্ভব ; তাই এতোদিন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ও জানে, এখন আর আমার প্রয়োজন নেই, —সিন্দুকটা তুই কিছুতেই খুলিস না, রয়—আমার কথা শোন! জেনসন মারা যাবার পর পাঁচটা সপ্তাহ আমরা চুপচাপ, একা একা কাটিয়েছি, তারপর একদিন রাতে লোলা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলো— তারপর যা হবার তাই হলো ;ঠিক তোর বেলা যেমনটা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, তার আগে সেরকম কোনো চেষ্টাই আমি করিনি।

হাঁফাতে হাঁফাতে কোনো রকমে কথা শেষ করলাম। অনুভব করলাম মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গায়ের ঘামের শীতল স্রোত।

রয় আমার অবস্থা বুঝে আমার কাছে এগিয়ে এলো, কি হলো তোর?—নে, চুপচাপ শুয়ে পড়। একে তোর শরীর ভালো নয়, তার ওপর শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস।

আমি রয়ের হাত চেপে ধরলাম, যদি তুই সিন্দুকটা খুলিস, তাহলে আমরা কেউই লোলার হাত থেকে রেহাই পাবো না। আমি তোকে বারবার করে বলে রাখছি রয়—সিন্দুক খোলা মানে নিজেদেব মৃত্যুকে ডেকে আনা!

আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। কিন্তু তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস, শেট। লোলা সিন্দুক খোলার ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি।

আমি ক্লান্ত দেহে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অবসাদে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। রয়কে খোলাখুলি সব বলে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছি।

এখন বাকীটা ভাগ্যে যা আছে ঘটবে। তবে মনে হয় এবারের যুদ্ধে লোলা পরাজিত হবে। কিন্তু সে আশা কুহকিনী!

সে রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত রয় আমার পাশেই বসে রইলো। পরদিন সকাল দশটায় ঘুম ভাঙলো। নিজেকে বেশ সতেজ বলে মনে হলো। মাথাটা যেন আগের থেকে হালকা ঠেকলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা এখনো আমার হয়নি।

জানলার ধারে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বাইরের কর্মচাঞ্চল্য। লোলা আর রয় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছে। রেস্তোরাঁ খদ্দেরদের ভিড়ে জমজমাট।

প্রায় রাত দশটার সময় রয় এলো আমার ঘরে, হাতে স্যুপ এর বাটি।

হঠাৎ রয়ের চোখে কেমন অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। ও আমাকে বললো, একটু আগে খাবার সময় লোলা সিন্দুকের কথা বলেছে। জিজ্ঞেস করেছে, একটা লরেন্স সিন্দুক আমি খুলতে পারবো কি না!

আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠলাম। লোলা তাহলে তোকে সিন্দুকের কথা বলেছে?—

হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম যে সিন্দুকটা না দেখা পর্যন্ত আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আমার বুকের ভেতর তখন শুরু হয়ে গেছে তুমুল আলোড়ন।

তোকে আবার বলছি রয়, সিন্দুকটা যতোক্ষণ বন্ধ আছে, ততোক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিন্তু—

জানি তুই কি বলবি। আমাকে হাত তুলে বাধা দিয়ে রয় বললো, এতই যদি তোর ভয় তাহলে জেনসনের সেই রিভলবারটা আমাকে দে না কেন?

আমি বললাম যে রিভলবারটা আমার কাছে আর নেই। ওটা লোলা হাতিয়েছে।

রয় ভীষণভাবে চমকে উঠলো। কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো। লোলা আমাকে বলেছে রিভলবারটা ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তায় পুঁতে ফেলেছে ; কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম।

রয় চিন্তিত মুখে বসে রইলো। এরপর এ ব্যাপারে আমাদের আর কথা হলো না।

পরবর্তী চারটে দিন সাধারণ ভাবে কেটে গেলো। রয় আমাকে বলেছে, লোলা এখনও ওকে সিন্দুক খোলার কথা বলেনি। জানি না, সত্যি কি মিথ্যা।

আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেও বিছানা ছেড়ে নামার শক্তি এখনও আমার হয়নি। তবে সান্ত্বনার কথা, রয় আজকাল আর বাংলোতে শুতে যায় না। আমার মনে হয় রয়ের এই হঠাৎ উদাসীনতার কারণ সম্ভবতঃ লোলার প্রতি ওর প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। অর্থাৎ আমার কথা ওর মনে রেখাপাত করেছে। লোলা যে দু-দুটো খুন করেছে সে বিষয়ে রয়ের মনে আর কোনো সংশয় নেই।

বেশ কয়েকদিন পরে রাত তিনটের সময় আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, বাংলোয় বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। বার কয়েক ঢোক গিলে রয়ের নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। অর্থাৎ রয় এখন বাংলোর বসবার ঘরে; সেখানে ওর সঙ্গে রয়েছে লোলা, আর সেই অভিশপ্ত সিন্দুক।

মনে হলো এখনই বিছানা ছেড়ে ছুটে যাই বাংলোয় ; কিন্তু জানি, আমার এই অসুস্থ দেহ নিয়ে তা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং চুপচাপ বসবার ঘরের আলোকিত জানলার দিকে চেয়ে শুনতে লাগলাম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

রাত প্রায় চারটের সময় বাংলোর আলো নিভে গেলো। একটু পরেই রয় বাংলো থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে হেঁটে আসতে লাগলো।

একটু পরে আমার ঘরের দরজা খুলে গেলো। রয়ের গলা ভেসে এলো। —আলো জ্বালাস না। লোলা দেখতে পাবে।

এতোক্ষণ কি করছিলি বাংলোয়?

লোলা আমাকে সিন্দুকটা দেখিয়ে খুলতে বলেছিলো। আমি বললাম এটা খুব পুরোনো মডেলের, আমার পক্ষে খোলা সম্ভব নয়।

আমার বুক ভেদ করে বেরিয়ে এলো স্বস্তির নিঃশ্বাস।

সিন্দুকে কি আছে, কেন ও সিন্দুক খুলতে চায় সে বিষয়ে তোকে কিছু বলেছে? আমার উদগ্র কৌতূহল আর বাধ মানতে চাইছে না। অশান্ত তরঙ্গের মতোই মনের ভেতরে আছড়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রয় বললো, সিন্দুকে নাকি প্রচুর টাকা আছে। সিন্দুক খুললে লোলা আমাকেও সে টাকার ভাগ দেবে। রয় আমার কাছে জানতে চাইলো সিন্দুকে সত্যিই টাকা আছে কি না।

এক্ষেত্রে ওকে সত্যি কথা বলা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা। সুতরাং বাধ্য হয়েই বললাম, আছে তবে মাত্র তিনশো ডলার। জেনসন দুঃসময়ের সঞ্চয় হিসাবে ঐ টাকা সিন্দুকে জমিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু লোলার লোভ ঐ তিনশো ডলারের জন্য নয়, ও চায় সেই স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা।

কিন্তু ও যে বললো, সিন্দুকে প্রায় এক লাখ ডলার আছে?

রয়ের মুখে বিস্ময়ের ছায়া।

লোলা তোকে মিথ্যে কথা বলেছে, তোকে দিয়ে সিন্দুকটা খোলানোর জন্য ও এই টাকার টোপ ফেলেছে।

রয় চিন্তান্বিত ভাবে জবাব দিলো, তাই যদি হয় তাহলে লোলাকে হতাশ হতে হবে। শেষের দিকে ওর গলার স্বর কঠিন মনে হলো।

পরদিন সকালে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলাম। দেখছিলাম পাম্পের কাছে কর্মব্যস্ত রয়কে। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ পেয়ে চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোলা। লোলাকে দেখে যেন চেনাই যায়না। মুখের রেখা কঠিন। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় হয়ে উঠেছে প্রকট। চোখের কোলে কালি পড়েছে।

লোলা ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর সবকিছু অচেনা লাগলেও লোলার এই সাপিনী সবুজ চোখ আমার অনেকদিনের চেনা।

কর্কশ কাঁপা গলায় লোলা বলে উঠলো, কি করে, সিন্দুক খুলতে হয় আমাকে বলে দাও। যদি না বলো তবে এখনি আমি পুলিশে খবর দেবো। আর তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই ফার্নওয়ার্থে।

আমি ভয় না পেয়ে বললাম, তবে আর দেরী করছো কেন? যাও পুলিশে খবর দাও। কিন্তু ঐ একলাখ ডলার এর আশা আর করোনা। তাছাড়া পুলিশকে আমিও বলে দেবো, জেনসনের মৃতদেহ কোথায় লুকোনো আছে। ভেবো না, পুলিশ আমার কথা অবিশ্বাস করবে আর তোমার কথায় সায় দেবে। কারণ তুমিও তো আর ধোয়া তুলসী পাতাটি নও। ওদের যদি জানিয়ে দিই ফ্র্যাঙ্ক ফিনির কথা তাহলে তোমাকে আর রক্ষা পেতে হবে না।

আমার কথাগুলো শুনে লোলা ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ওর শরীরটা পলকে যেন পাথর হয়ে গেলো। অন্ধ আতঙ্কের নিবিড় ছায়া কেঁপে উঠলো ওর সবুজ চোখে।

ফ্র্যাঙ্ক সম্বন্ধে তুমি কি জানো? আগুনঝরা চোখে জানতে চাইলো লোলা।

আর কিছু না জানলেও তুমি যে ওকে খুন করেছো তা জানি। মিথ্যা রাগ দেখিয়ে লাভ হবে না লোলা। আমরা দুজনেই এমন ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাকী দিন কটা আমাদের এইভাবেই একসঙ্গে কাটাতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রেখো, জেনসনের সিন্দুকটা যেমন আছে তেমনিই থাকবে। রয়কে আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলেছি, সাবধান করে দিয়েছি। তাছাড়া সিন্দুক কি করে খুলতে হয়, তাও ও জানে না। সুতরাং শুধু শুধুই তুমি রয়ের পেছনে সময় আব বুদ্ধি খরচা করছো।

অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোলা। তারপর এক সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এই পরাজয়কে সাময়িক ভাবে মেনে নিলেও লোলা আমাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। আহত নাগিনীর মতোই ও হয়ে উঠেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ। সতর্ক না থাকলে যে কোনো মুহূর্তেই লোলা চরম আঘাত হানতে পারে।

মানসিক অস্বস্তি ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এর পরের দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন রয় হঠাৎ আমাকে এসে বললো, লোলা ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠলো বিপদের সঙ্কেত। আমি রয়ের দিকে সন্দেহভরা

চোখে তাকালাম। তার মানে ও তোকে এখানে একা রেখে যাচ্ছে?

রয় বললো, ও আমাকে সিনেমায় যাবার জন্য বলেছিলো কিন্তু আমি রাজী হইনি। কেননা তোকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে আমার মন চাইলো না।

নিজেকে ছলনা করার চেষ্টা করিস না, রয়। তুই ভালো ভাবেই জানিস, লোলা সিনেমায় যাচ্ছে না। তোর সামনে টোপ ফেলে তোকে সেটা গিলবার একটা সুযোগ দিচ্ছে। লোলা এতোদিনে বুঝে গেছে, এই দুনিয়াতে তোর কাছে টাকাই সব। সুতরাং তোর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও তোকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। লোলা জানে, ও সিনেমায় যাওয়া মাত্রই তুই সিন্দুক খুলতে চেষ্টা করবি। তাই ও সিনেমায় যাওয়ার ছল করে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে খোলা সিন্দুক সমেত তোকে হাতেনাতে ধরে ফেলবে।—বুঝতেই পারছিস, তোকে বোকা বানিয়ে কার্যোদ্ধার করার এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে।

তোকে তো বলেছি শেট, সিন্দুক আমি খুলছি না।

ভালো কথা, তবে লোলা সিনেমায় যাওয়ার পর যেন কথাটা তোর মনে থাকে।

রাত দশটার পরে লোলা মার্কারির দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আর রয় রেস্তোরাঁর কাছ থেকে ওকে লক্ষ্য করল। চাঁদের আলোয় দেখা গেলো উত্তেজনায় ওর মুখ কঠিন। স্থির দুই চোখে তাকিয়ে আছে মার্কারির মিলিয়ে যাওয়া লাল আলোর দিকে।

রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের আকাশের দিকে। আসন্ন কোনো দুর্ঘটনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে রইলাম। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম, জীবন পথের শেষ মাইলস্টোনের পাশে পরিশ্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ওপারের চির শান্তির জগৎ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সময় যেন আর কাটতেই চায় না। ঘড়ির কাঁটা শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পর লক্ষ্য করলাম, হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ট্রাক এদিকে এগিয়ে আসছে। ট্রাকটা ধীরে ধীরে পাম্পের কাছে এসে থামলো।

রয় গাড়ির শব্দ পেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো। ট্রাকের ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে ড্রাইভারের সঙ্গে দু-একটা কথা ও বললো। তারপর তেলের দাম মিটিয়ে লোকটা ট্রাক ছেড়ে দিলো।

বুঝতে পারলাম, এই সেই সংকটময় মুহূর্ত। রয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মন এই মুহূর্তেই চরম সিদ্ধান্ত নেবে। হঠাৎ গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো।

রয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললো।

ওর অসীম অর্থলিপ্সা লোলার প্রলোভনকে এড়াতে পারলো না। বুঝতে পারলাম যে রয় টোপ গিলেছে। ও এখন অভিশপ্ত সিন্দুক খুলতে যাচ্ছে।

বাংলোর দরজার কাছে পৌঁছে রয় একটু থামলো। তারপর পেছনে এক পলক নজর বুলিয়েই বাংলোয় ঢুকে পড়লো। একটু পরে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়েন্টওয়ার্থের আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বাংলোয় গিয়ে ঢুকলো। রয়ের এই অতিরিক্ত সাবধানতায় আমার হাসি পেলো। লোলাকে ও এখনও ঠিকমতো চিনতে পারেনি। রয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই লোলা ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

একটু পরেই বাংলোর বসবার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। সিন্দুক খুলতে রয়ের হয়তো মিনিট চারেক লাগবে। তারপরই বুঝতে পারবে যে লোলার কথাই সত্যি। দেখবে সিন্দুকে সাজানো রয়েছে একলাখ ডলার। না, এখন আর ওকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। কিন্তু এই তাসের জুয়ায় শেষ পর্যন্ত আমি লোলার কাছে হেরে গেছি।

আমার অনুমানই ঠিক। একটু পরেই দেখলাম যে চুপিচুপি লোলা বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে।

রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকবার পরই ও হয়তো গাড়ি থামিয়েছে পাহাড়ী রাস্তায়। তারপর হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে অতি সন্তর্পণে ফিরে এসেছে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'এ।

লোলার দক্ষতার প্রশংসা করতেই হবে। কারণ আমি সারাক্ষণই চেয়েছিলাম বাইরের রাস্তায়।

কিন্তু ওকে ফিরে আসতে বা গাড়ি থামাতে আমিও দেখিনি।

কিন্তু ঐ তো লোলা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে চলেছে বাংলোর দিকে।

চাঁদের আলোতে আলোকিত বালির উঠোনটুকু পার হওয়ার সময় দেখলাম ওর সবুজ পোশাক। জেনসনকে খুন করার সময় ওর পরনে এই একই পোশাক ছিলো। হয়তো এই সবুজের আড়ালেই লুকিয়ে আছে রয়ের মৃত্যুসংকেত।

শেষ পর্যন্ত তাহলে লোলার ফাঁদে ধরা পড়লো রয়। আমি যেন দেখতে পেলাম খোলা সিন্দুকটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে রয়। ও হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে থরে থরে সাজানো এক লাখ ডলারের দিকে। ঐ অবস্থায় বসবার ঘরে দরজা খোলার শব্দ ওর কানে ঢুকবে না। এবং লোলা ওকে খুন করবে। এ ব্যাপারে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

রয় এখনও জানে না মৃত্যু গুঁড়ি মেরে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আর সহ্য করতে না পেরে গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে, মাথাটা অসম্ভব ভারী ঠেকলো। দরজার হাতলে ভর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। মনের মধ্যে তখন একই চিন্তা, যে ভাবে হোক বাংলোয় গিয়ে রয়কে বাঁচাতে হবে।

কোনো রকমে দরজা খুলে বসবার ঘরে এলাম। বুকের কাছটা কেমন যেন উষ্ণ ভিজে ভিজে ঠেকলো। বুঝতে পারলাম পুরোনো ক্ষত থেকে আবার রক্তস্রাব শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করে অন্ধকারে পা বাড়ালাম। কিন্তু লোলাকে বাইরে কোথাও দেখলাম না। তাহলে কি ?—টলতে টলতে বাংলোর দিকে এগিয়ে চললাম। আমার বুক, পেট তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সর্পিল রেখায় তখন গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে রক্তের উষ্ণ ধারা। কিন্তু আমি না থেমে এগিয়ে চললাম।

বাংলোর কাছে পৌঁছতেই কানে এলো রিভলবারের চাপা গম্ভীর শব্দ। হৃৎপিণ্ড ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়লো বুকের ভেতর। থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। সেই সঙ্গে কানে এলো গুরুভার কিছু পতনের শব্দ। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম বাংলোর ভেজানো দরজা। টলতে টলতে বসার ঘরে ঢুকলাম—

দেখলাম রয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওর হাতের মুঠোয় জেনসনের ৪৫ রিভলবারটা। সিন্দুকের দরজা হাট করে খোলা। পরিষ্কার নজরে পড়ছে থরে থরে সাজানো নোটের বাণ্ডিলগুলো। রয়ের পায়ের কাছে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লোলা। ওর কপালে গভীর ক্ষত। লোলা যে বেঁচে নেই, এ কথাটা বুঝতে আমার দেরী হলো না।

আমি আর রয় পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। ওর মুখ রক্তহীন, পাণ্ডুর। নাকের ওপরে জমে ওঠা ঘামের ফোঁটা ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চক্‌চক্ করছে। আমি কোনোরকমে একটা চেয়ারে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। বুকের ব্যান্ডেজের কাছটায় কেমন যেন একটা কালচে ভাব।

রয় হতবাক্ হয়ে লোলার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল।

রয় আমাদের পালাতে হবে। বুকের রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ দু' হাতে চেপে ধরলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িটাকে বাংলোর কাছে নিয়ে আয়! পুলিশ এসে গেলে আমরা বিপদের মধ্যে পড়ে যাবো। নে টাকাগুলো চট্‌পট্ গুছিয়ে নে! এখনও পালাবার সময় আছে!

রয় আচ্ছন্ন স্বরে বললো, লোলা ঘরে ঢুকতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাছ থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ওকে খুন করতে চাইনি।

আর দেরী না করে রয় সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে টেবিলক্লথটা টেনে নিয়ে নোটের বাণ্ডিলগুলো তার ওপর রাখতে লাগলো।

রয় আমার ব্যান্ডেজটা একটু ঠিক করে দে ; আর কোটটা নিয়ে এসে আমার গায়ে জড়িয়ে দে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

রয় আমার মুখের দিকে ফিরে তাকালো। ওর মুখে এমন একটা অদ্ভুত ভাব, যা আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

টাকাগুলো টেবিলক্লথ-এ বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। কর্কশ লোভাতুর স্বরে বলে উঠলো, তুই আর

কতদিন বাঁচবি বলে তোর মনে হয় শেট? এখন আর তোর কোনো দাম নেই। তুই চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছিস!—আর আমি এই টাকা নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবো, নতুনভাবে বাঁচতে পারবো। গাড়িতে তোকে জায়গা দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত, শেট। তুই কি ভাবছিস তোর দাম এই একলাখ ডলারের চেয়েও বেশী?

রয় টাকার পুঁটলিটা আমার চোখের সামনে বারকয়েক ঝাঁকালো। তুই তো সেদিন বলেছিলি, তোকে আমি দু-দুবার বাঁচিয়ে তোর সব ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি, তাই তো? অতএব এবারে আমি চললাম। পরে আবার বলিস না যেন, রয় নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ!

হঠাৎ আমার উত্তেজিত মন ভীষণ শান্ত হয়ে পড়লো। রয়কে একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। জানলা দিয়ে দেখলাম, মার্কারির হেডলাইট জ্বলে উঠলো। তারপর গাড়িটা মোড় নিয়ে ছুটে চললো পাহাড়ে দিকে। যে পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে আমার কল্পনার আশ্রয়স্থল— ট্রপিকা স্প্রিংস।

চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিলাম, মাথাটা ভীষণ ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সামনে পড়ে রয়েছে লোলার মৃতদেহ।

শরীরের সব শক্তি মিলিয়ে গিয়ে চোখে নেমে আসছে নিঃসীম অন্ধকার। জানি, আজ নয় কাল, কেউ না কেউ আসবে এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'এ দেখতেই পাবে এই ঘরের আলো। ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, লোলাকে আমি খুন করিনি! জেনসনের মৃতদেহ খুঁজে পেলেও ওরা আমাকেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে। রয় বা লোলা কাউকেই ওরা সন্দেহ করবে না।

বুকভরা আশা নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলাম। আসুক সেই চির অন্ধকার, আমার কপালে এঁকে দিক মৃত্যুর স্নেহ চুম্বন। সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

হঠাৎ মনের মধ্যে এসে ভীড় করলো হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতি। জীবনে এই প্রথম মনে পড়লো মায়ের কথা, মনে পড়লো আমাদের ছোট্ট বাড়িটার কথা—

কিন্তু রয়ের কথা মনে পড়তেই চোখ বন্ধ হয়ে এলো। অতীতের স্মৃতির টুকরো ছবিগুলো হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো নিদারুণ বাস্তবের কঠিন আঘাতে। ছেলেবেলার রয় আর আজকের রয়, এই দুয়ের মাঝে বিশাল ব্যবধান—আমার চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিলো। বুকের যন্ত্রণাটা আরো বেড়ে গেলো—

—শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর হালকা পদধ্বনি—সে আসছে নিঃশব্দ চরণে—সে আসছে—।

ম্যালোরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সময় মধ্যরাত্রি। মেঘভরা কালো আকাশের বুক থেকে হিমেল বৃষ্টি পড়ছে গুড়িগুড়ি। করিডন ওল্ড কম্পটন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে। মাথার সোলার টুপি সামনের দিকে টানা, দুটি হাত বর্ষাতির পকেটে ভরা। সোহোর এই অঞ্চলে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেসকল মানুষ তারা সন্ধ্যা থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য বাইরে বের হতে পারেনি।

ওল্ড কম্পটন স্ট্রীট আর ক্রিম স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে এসে সে একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়াল। সিক্ত বায়ুর থেকে দেশলাই কাঠির আগুন আড়াল করবার সময় সে অনুসরণকারীর পদধ্বনি শুনবার চেষ্টায় উৎকর্ণ হল। কিন্তু শুনতে পেল না কিছুই। আড়চোখে পাশের দিকে দৃষ্টি দিতে শুধু চোখে পড়ল অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন সুবিন্যস্ত রাস্তা। লোকটা দেশলাই কাঠিটা রাস্তার পাশের নালীতে ফেলে দিয়ে ক্রিম স্ট্রীট দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সে উপলব্ধি করছে যেখানেই যাচ্ছে দুই বা তিনজন লোক কোন কারণ ছাড়াই তাকে অনুসরণ করছে।

এ ধরনের ঘটনা তার কাছে নতুন কিছু নয়। অতীতে পুলিসে তাকে অনেকবার অনুসরণ করেছে। যুদ্ধের সময় এখানে-ওখানে যখন ঘুরে বেড়াত গেস্টাপোরা তাকে নজরে নজরে রাখত। তারপর থেকেই তার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে কেউ তাকে অনুসরণ করলেই বুঝতে পারে। কোন কারণ ছাড়াই কেন তাকে মানুষগুলো অনুসরণ করছে সে এখনও বুঝতে পারছে না। তার কোন আপত্তি নেই স্বীকার করতে যে সে খুব সহজেই শত্রু সৃষ্টি করতে পটু। কিছু লোক আছে যারা তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু তারা তো তাকে অনুসরণ করবে না। কারণ তারা ভালভাবেই জানে কোথায় সে থাকে আর কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা তাকে বিভ্রান্ত আর উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

তবে এখন বুঝতে পারছে তার কল্পনা তাকে প্রতারিত করছে না। তাই এই বৃষ্টিঝরা রাতে সে বাইরে বেরিয়েছে অনুসরণকারীদের কোন একজনকে হাতেনাতে ধরে জিজ্ঞাসা করবে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কিন্তু এখন পর্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। এখন রাত প্রায় একটা বাজতে চলল, বারবার ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে, আড়ালে আত্মগোপন করে আর লুকিয়ে অপেক্ষা করেও তাদের হদিশ করতে পারেনি : তারা যেন প্রেতাত্মাদের মতই অদৃশ্য। তবে অসীম তার ধৈর্য। ধরবেই ঠিক সুযোগ মত।

এমিথিস্ট ক্লাবটা কাছেই ক্রিম স্ট্রীটের একটা গলিতে। সেখানে ঢুকে এই অনুসরণকারীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ক্লাবের উপর তলার জানালা থেকে একজনের চেহারা দেখে রাখবে। তবে এই বৃষ্টি তাদের উৎসাহ কিছুটা খর্ব করবে।

।। দুই ।।

একটা কানাগলির শেষ মাথায় এমিথিস্ট ক্লাবটা। যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে সোহোর এই অঞ্চলে এই রহস্যময় ক্লাবটির। এখানে দিনরাত মদ পাওয়া যায়, আর এই জেলার পুলিসের তৎপরতা বাড়লে এখানে নিরাপদ আশ্রয় মেলে। কোন এক সময় এই বাড়িটা পানীয় জমিয়ে কাজে ব্যবহার করা হতো, তবে বর্তমানে ঘরগুলো রং করে, চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজিয়ে আর দেওয়ালে ছবি টাঙ্গিয়ে বাড়িটা সাজান-গোছান হয়েছে। জনি বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গায়ের রং কালো আর তেল চকচকে বিশালাকৃতি দেহ।

এই জনি এমিথিস্ট ক্লাবের মালিক। এই সোহো অঞ্চলে যেসব ঝামেলা সৃষ্টি হয় আড়ালে তার হাত থাকে। লোকটার নিগ্রোর মত কালো চেহারা করিডনকে মনে করিয়ে দেয় কদোর বিভীষিকার কথা। তার পরনে সিভিল বো স্যুট আর পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা সার্ট। তাতে রং করা টাই আর বাঁ হাতের আঙ্গুলে বড় হীরে বসান আংটিতে তাকে খুব বেমানান দেখাচ্ছে।

ক্লাবে অনেক নরনারীর ভীড়। করিডন ভেতরে ঢুকতেই সকলে তীক্ষ্ণ নজরে তার দিকে তাকাল। আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। তার মিলিটারি ছাঁটের বর্ষাতি, চওড়া মাংসল কাঁধ আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি বুঝিয়ে দেয় সে তাদের দলের কেউ নয়, কিংবা পুলিশেরও লোক নয়। তারা বুঝতে চাইছে লোকটা কে।

ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে পাত্তা না দিয়ে করিডন বারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি শুনেছি তুমি ফিরেছ—হাত বাড়িয়ে দিয়ে জনি বলল, তবে বিশ্বাস করিনি। ফিরলে কেন? যদি এই নোংরা দেশ থেকে আমি একবার বের হতে পারি তাহলে আর ফিরব না।

তাতে কারো ক্ষতি হবে না—বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাকে পাত্তা না দিয়ে করিডন বলল, যদি শরীরের ক্ষতি না হয় তাহলে একটা স্কচ খাব ভাবছি।—একটা টুল টেনে নিয়ে সে বসল।

লাল আর সাদা চেকের শার্ট পরা একজন রোগা আর বেঁটে লোক নিপুণ হাতে পিয়ানো বাজাচ্ছে দূরে এক কোণে।

এখানকার যে পানীয়ই পান কর না কেন বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই—জনি আলতো হেসে বলল, ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। এইটা একটু চেখে দেখ। সে একটা বোতল আর একটা গ্লাস তার সামনে ঠেলে দিল।

যখন করিডন গ্লাসে মদ ঢালতে ব্যস্ত জনি বলল, শুনেছিলাম তুমি আমেরিকায় ছিলে?

—ঠিকই শুনেছ। কিন্তু ওখানে খাবারদাবারের দাম এমন প্রচণ্ড যে আমায় পালিয়ে আসতে হল।

জনি একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে ফেলল চোখ বুজে। আমি অন্যরকম শুনেছি। ওখানকার পুলিশি ব্যবস্থা নাকি খুব কড়া, সত্যি নাকি?

করিডন হুইস্কির দিকে তাকাল, তারপর মাথা তুলল। দৃষ্টিতে কাঠিন্য। সে বলল, আজকাল তোমার মত লোককে ভাঙ্গা বোতলের সাহায্যে শায়েস্তা করে। আমাকে হয়ত তাই করতে হবে।

হাসি উবে গেল জনির মুখ থেকে। সে বলল, আরে বাবা আমি ইয়ার্কি মারছি। বাইরে বেড়িয়েও তোমার মেজাজ ঠিক হলো না দেখছি।

আমার মেজাজ ঠিকই আছে। তোমার ইয়ার্কিগুলো মেয়েমানুষদের জন্যে জমা করে রেখ। ওরা পছন্দ করবে। আমার এসব ভালো লাগে না।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। জনি বলল, ওসব বাদ দাও। বল কেমন কাটছে। খুব ব্যস্ত নাকি?

না।—

তুমি অনেক দিন দেশ ছাড়া, তাই বোধহয় মানুষ তোমায় ভুলে গেছে। এখন তো ফিরেছ, কি করবে ভেবেছ কিছু?

এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার সম্বন্ধে যত কম জানবে পুলিশের কাছে তত কম বলতে পারবে। রলিন্স ভেতরে আছে নাকি? মনে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে ও কিছু জানতে চেয়েছে তোমার কাছে।

—ও সবসময় আশেপাশেই থাকে। তোমার ব্যাপারে ও আলোচনা করেনি। তুমি যখন বাইরে ছিলে ওর প্রমোশন হয়েছে। সে এখন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।

তাহলে পুলিস তাকে অনুসরণ করছে না। যদি তার চলাফেরার উপর তাদের কোন আগ্রহ থাকত তাহলে জনি জিজ্ঞাসাবাদ করত। জনি চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে বলে জেগে থাকতে। কিছু কিছু লোক জানে সে পুলিশকে খবর সরবরাহ করে। করিডনও তাই জানে। তার ব্যবসা এইভাবে খবর জোগাড় করা। এটাই সহজ পথ ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার।

আমার সম্বন্ধে কেউ আগ্রহী।—কথায় কথায় সে বলল, তারা আমায় সারাদিন চোখে চোখে

রাখছে।

তাতে তোমার চিন্তার কিছুই নেই। শুনেছ গেস্টাপোরা দু-বছর তোমায় খোঁজ করেছিল। কিন্তু তোমার হদিশ তারা পায়নি। নাকি পেয়েছিলো?

একবার পেয়েছিল।—করিডনের মুখ কঠিন হয়ে এল, তবে সে ব্যাপার তো আলাদা। এখন যা ঘটছে আমি তাই জানতে চাইছি। কোন ধারণা করতে পারছ?

আমি? আমি পারব কি করে? সম্প্রতি তো কিছু শুনিনি।

করিডন তার নিগ্রোসদৃশ মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে। এসব বাদ দাও, আমি খোঁজ খবর নেব। হুইস্কি শেষ করে দাম মিটিয়ে বারের কাছ থেকে সরে এসে কিছুক্ষণ বসল। বৃষ্টি এখনও ঝরেই চলেছে।

এখানে তোমার ভালই লাগবে। তুমি তো জানই যতক্ষণ খুশি বসতে পার। মেয়েটেয়ে লাগবে নাকি?

জীবন থেকে মেয়েছেলে বাদ দিয়েছি—করিডন বিরস বদনে হাসল, তাছাড়া তোমার মেয়েদের তো আমি দেখেছি—আমার উপযুক্ত নয়, ধন্যবাদ।

বারের কাছ থেকে সরে গিয়ে পিয়ানোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে প্রতিটি নরনারী তাকে প্রচণ্ড কৌতূহলজড়ানো চোখে দেখছে।

হ্যালো, ম্যাক্স!—পিয়ানোবাদকের উদ্দেশ্যে সে বলল।

বাজনা থামলো না পিয়ানোবাদক। ঠোঁট না নেড়ে সে বলল—হ্যালো।

ম্যাক্সের অস্থির আঙুলগুলোর দিকে তাকালো করিডন। সে বলল, তুমি কিছু জান নাকি, ম্যাক্স?

ম্যাক্স 'নাইট অ্যান্ড ডে'র সুর বাজাচ্ছে। সুরের মূর্চ্ছনার সঙ্গে তার মুখের ভাঁজ বদলাতে লাগল।

একটা মেয়ে তোমার খোঁজ করছিলো—ঠোঁট না নেড়েই সে বলল, ক্রিডের সঙ্গে দিন তিনেক আগে রাত্রে এসেছিল।

সিগারেটের ছাই ভাঙল করিডন। তারপর সে ম্যাক্সের অস্থির আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, মেয়েটা কে?

জানি না। এখানে আগে কখনো আসেনি। দেখে তো মনে হল বিদেশিনী, যুবতী, গায়ের রং ময়লা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা, পরনে ছিল সোয়েটার আর স্ল্যাকস, নাম জিনি।

কেন খোঁজ করছিল?

জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কোথায় থাক, জানি কিনা, আর সম্প্রতি তুমি এখানে এসেছিলে কিনা। উত্তরে বলেছি, আমার জানা নেই আর তোমাকে দেখিনি।

করিডন অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল। আর কিছু বলেনি?

বলছিল, তুমি এখানে এলে ক্রিডকে যদি জানাই পাঁচ ডলারের একটা নোট আমায় বকশিস দেবে।

পাঁচ ডলার!—ভ্রূ কুঁচকালো করিডন। তাহলে ক্রিডের সাথে দেখা করাই ঠিক হবে কি বল!

আমাকে এর মধ্যে জড়িও না।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ, ম্যাক্স। ক্ষতি হবে না তোমার কোন।

আমি ক্ষতির চিন্তা করছি না—ম্যাক্স কথাগুলো বলে চেয়ার এক পাশে সরিয়ে দিল, মনে কর না কেন তুমি ভালোর জন্যেই গিয়েছিলে।

এফি খুব খুশি হবে তোমাকে আবার দেখলে।

হাসল করিডন। ম্যাক্স, ও কেমন আছে?

ভালই আছে।—এখন দেখতে হয়েছে গ্র্যাবেলের মত।

একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট বের করে লুকিয়ে খোলা পিয়ানোর উপর রেখে কবিডন বলল, বাজাও ম্যাক্স। তারপর সে চলে গেল। ম্যাক্স 'নাইট অ্যান্ড ডে'র সুর থেকে 'দি ম্যান আই লাভ'-এর সুরে চলে এল।

।। তিন ।।

ক্রিড...করিডন ক্রিডকে ভুলে গিয়েছিলো। গত চারটে বছর তার সাথে দেখা হয়নি। মন অতীতে ফিরে গেল আর মানসপটে ভেসে উঠল দীর্ঘকায় মেয়েলি স্বভাবের ক্রিডের চেহারা—মাথায় নরম মসৃণ চুল। ত্রুটিহীন স্যুটের বোতাম ঘরে গোঁজা লাল ফুল। রহস্যময় মানুষটার চাল চলন। কেউ জানে না কোথা থেকে টাকা পায়। কেউ কেউ বলে সে নির্ভরশীল একজন মহিলার উপর। আবার কেউ বা বলে পুলিশের গুপ্ত সংবাদদাতা। অনেকে হৃদয়হীনের মত বলে, তার আয় আছে গোপনীয়। কোন চাকরি-বাকরি করে না আর তাকে সাধারণতঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন পিকাডিলি অঞ্চলে দেখা যায় অথবা দেখা যায় লিস্টার স্কোয়ারের কোন অভিজাত বারে। মোটেই জনপ্রিয় নয় মানুষটি। আর বিশ্বাসযোগ্যও নয়। যদিও ক্রিডকে শুধুমাত্র চেহারায় চিনলেও—সত্যি কথা বলতে কি তার সঙ্গে করিডনের মাত্র একবার দেখা হয়েছে। একবার এক তাসের আসরে করিডন জিতেছিল, ক্রিড সেই খেলায় যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর কি যে হল, তাস গেল ঘুরে। তৃতীয়বার খেলার সময় সে ধরে ফেলল যে ক্রিড—জোচ্চুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বীয়ারের বোতল তুলে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্চি চারেক কপাল ফেটে গেল। করিডন ভাবল, ক্রিড হয়তো এখনও তার উপর রাগ পুষে রেখেছে।

করিডন কখনও রাগ পুষে রাখে না। তাই তার ভাবতে খারাপ লাগলো যে চার বছর ধরে কেউ তার উপর রাগ পুষে রাখবে। যে সকল মেয়েদের সে চেনে তাদের কারো সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারার বর্ণনা মিলছে না। একটা সময় ছিল যখন মেয়েছেলে না হলে তার চলত না। তবে এখন সেই অভ্যাস চলে গেছে। যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতার পর তার জীবনে 'না হলে চলবে না' এমন কিছু নেই, আর তাকে আগ্রহী করে তোলে না।

করিডন ফিরে এল বারে।

উপর তলায় এমন কোন ঘর আছে, যেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়?—সামনে শরীর ঝুঁকিয়ে সে জানতে চাইল।

সন্দিগ্ধ মনে জনি জিজ্ঞাসা করল, যদি থাকেই তাতে কি হয়েছে?

উপর থেকে জানলা দিয়ে দেখতে চাই। বেশ তো দেখগে। একটা ঘর আছে এফির। এখনো শুতে যায়নি। ওকে বলে দিচ্ছি—

বারের পেছন দিকে একটা দরজা খুলে জনি বলল, এই যে এফি এখানে একটু এস। তারপর করিডনের কাছে এসে বলল, জানলা দিয়ে কি দেখতে চাও?

নিজের চরকায় তেল দাওগে।—করিডন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, আজকাল তুমি আমার ব্যাপারে খুব নাক গলাচ্ছ।

কেউ কি কোন প্রশ্ন করতে পারে না?

চুপ কর।—করিডন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমার কাছে তোমার কথাবার্তা অসহ্য মনে হয়।

বারের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এফি। করিডনের সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন তার বয়স পনের। তখন ও ছিল যথেষ্ট আনাড়ি, লাজুক আর শরীরেও ছিল না তেমন পরিপূর্ণতা।

ম্যাক্সের ধারণাই ঠিক। বিগত তিন বৎসরে মেয়েটার মধ্যে পরিপূর্ণতা এসেছে। করিডন বিস্মিত আর চমকৃৎ হল। যদির ও শরীরে কোন খুঁত না থাকত, যেমন উপরের কাটা ঠোঁট, তাহলে ওকে প্রকৃতই সুন্দরী বলা যেত। তাকে দেখামাত্র মেয়েটির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল আর চোখের দৃষ্টি হল উজ্জ্বল।

হ্যালো এফি, ভুলে গেছ নাকি আমায়?—করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল। সে জানে মেয়েটা তার পরম ভক্ত। বন্ধুত্ব দিয়ে তার মনটা জয় করেছে। কিন্তু এর জন্য তাকে কোন মূল্য দিতে হয়নি।

ছ'বছর আগে জনি মেয়েটাকে রাস্তায় পেয়েছিল। নিজের বাবা-মা, নিজের অতীত জীবন অথবা নিজের ঠিকানা জানাতে চায়নি বলে তার ধারণা হয়েছে বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। সেই সময় মেয়েটা দেখতে ছিল কুশ্রী নিতান্ত বালিকা, অর্ধভুক্ত আর সারা অঙ্গে নোংরা। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুটো দাঁত দেখা যেত। অকারণে কিছু করবার মানুষ জনি নয়। রান্নাঘরে ফাইফরমাস

খাটবার লোকের প্রয়োজন ছিল। আর কেউ তার খোঁজ করেনি বলে তাকে থাকতে দিয়ে, অন্যদের যেমন নির্দয়ভাবে খাটিয়ে নেয় তাকেও খাটিয়ে নিতে কসুর করেনি।

এফি বলল, হ্যালো মিঃ করিডন। এফির বিহ্বলভাব দেখে জনি মুখ বিকৃত করে হাসল। করিডনের প্রতি তার ভালবাসা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়।

—ওকে ওপরে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। বাইরেটা দেখতে চায় জানলা দিয়ে। ওকে সাহায্য কর।

এফিকে অনুসরণ করে বারের পিছনের দরজা দিয়ে স্বল্পালোকিত একটা প্যাসেজে এল করিডন। তারপর দরজা বন্ধ করতেই বাজনার সুর আর মানুষের চাপা কথাবার্তা কানে ভেসে এল। সে এফির হাত চেপে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

এফি আমাকে দেখে কি তুমি খুশী হওনি? হাসিমুখে করিডন জিজ্ঞাসা করল। যদিও তুমি ভাব দেখাচ্ছ আগের মতই আছ, তবু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার কথা তুমি ভুলে গেছ।

না, না, ভুলিনি আমি। এফি রুদ্ধশ্বাসে প্রতিবাদ করল, সত্যি বলছি আমি ভুলিনি, আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। তবে ভাবতে পারিনি তুমি আবার ফিরে আসবে।

ভুল ভেবেছিলে। আসলে তোমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারিনি এফি।—দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যেন রাতারাতি বড় হয়ে গেছ। দেখতেও সুন্দরী হয়েছ।

নিজের কাটা ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে এফি বলল, এমন করে তুমি বল না, কথাটা সত্যি নয়।

তোমার ঠোঁট ঠিক করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়—একটা ফন্দি তার মাথায় খেলে গেল, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সে বলল, কাজটা করতে পারে এমন চেনা লোক আমার জানা আছে। হাতে টাকা জমলে ঠিক করে নেওয়া যাবে। আর বেশিদিন লাগবে না। তবে মাস খানেক লাগতে পারে।

একমাস? এফির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

না একমাসে হবে না। তাহলে ছ'সপ্তাহ লাগতে পারে। সঠিক জানি না। তবে সব নির্ভর করছে টাকার উপর।

তোমার টাকা তো তোমার নিজের জন্যই লাগবে। কিছু করবার প্রয়োজন নেই। সত্যি বলছি, আমার খারাপ লাগছে না। আমার উপর তোমার দয়া যথেষ্ট আছে।

এখন চুপ কর, এফি—করিডন বলল, আমাকে ওপরে নিয়ে চল। অন্য কোন সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এফি করিডনের ঠোঁটে জড়ান চাপা হাসি থেকে রেহাই পেয়ে খুশী হল। সে ছুটে ওপরে উঠে গেল। করিডন তাকে ধীর পায়ে অনুসরণ করে ওপরে উঠে এল।

এই ঘর—এফি বলল তারপর দরজা খুলল। করিডন অন্ধকার ছোট ঘরটাতে ঢুকল। সে বিছানার উপর বসে বলল, আলো জেলো না, বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দেখতে চাই।

তারপর জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কে লোকটা?—জানলার কাছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এফি প্রশ্ন করল।

সেটাই তো জানতে চাই। তারপর দৃষ্টিগোচর হল কানাগলির মুখ আর ক্রিম স্টীটের সামান্য অংশ। দূর হয়ে গেছে রাস্তার আলো-আঁধারি। কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখা গেল না। করিডন আধো অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ল। চোখেমুখে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়তে লাগল।

এ আবার কি করছ?—এফি ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছি।

পড়ে যাবে। এরকম করো না।

আমার অভ্যেস আছে। পড়ব না। ব্যস্ত হয়ো না।—করিডন জানালা দিয়ে নীচে টালির উপর নামল।

এখান থেকে গলিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ির দরজার উপর চোখ বুলাল করিডন। দেখল একটা বাড়ির দরজায় নিজেকে আড়াল করে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সে বৃষ্টির মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা

ট্যাক্সি ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকে। তার আলোয় লোকটিকে এবার চোখে পড়ল। বেঁটে আর মোটা। তার গায়ে ময়লা তুঁতে রংয়ের ফ্রেঞ্চ কোট। মাথায় ব্যারেট ক্যাপ।

করিডন বুঝল, যারা তাকে অনুসবণ করছে এই লোকটা তাদের অন্যতম। আগে কখনো লোকটাকে দেখেনি। সে বর্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে তার বাইরে বের হওয়ার। আর সে নিশ্চিত যে লোকটার সঙ্গী সাথী ধারে কাছে কোথাও অপেক্ষা করছে। বিদেশীর মত দেখতে যে মেয়েটিকে ক্রিড সাথে করে এনেছিল সেও এই দলে।

করিডন এফির ঘরে ফিরে এসে ঠিক করল লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এসব ব্যাপারে জনি নিশ্চয়ই জানে, ক্রিড কোথায় থাকে সেই বলতে পারবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

পরের দিন সকাল দশটা বাজবার কয়েক মিনিট পরে করিডন ক্রিডের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল।

জনি তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও করিডন এমিথিস্ট ক্লাবের একটা চেয়ারে বসে আর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাত কাটিয়েছে। পরের দিন সকালে আবার ছাদে উঠে সেই লোকটার খোঁজ করেছে। কিন্তু সন্ধান পায়নি। শেষ পর্যন্ত ক্লাবের পিছন দিককার পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে ক্রিডের খোঁজে রওনা হয়েছে।

একটা তামাকের দোকান রয়েছে ড্রুরী লেনের নোংরা গলিতে, তার উপর তলায় চার কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটটা ক্রিড-এর। সদর দরজার সামনে থেকে কার্পেট ঢাকা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ল্যান্ডিং-এর পাশে ক্রিড-এর ফ্ল্যাটের দরজা।

ক্রিড অনেক বছর ধরে পকেট মারছে। গ্রেপ্তারের ভয়ে পুলিশ সম্বন্ধে তার আতঙ্ক আছে। যার পকেট মারলে লাভের আশা আছে শুধু তারই পকেট মারে সে। দু' আঙ্গুলের সাহায্যে কব্জি থেকে ঘড়ি খুলে নিতে ওভার কোটের পকেটে রাখা টাকার ব্যাগ আর শার্টের হাতা থেকে কাফলিং খুলে নিতে, তার জুড়ি নেই। গলা থেকে নেকলেস অথবা ব্রোচ খুলে নিতে, কিংবা মহিলাদের কাঁধে ঝোলান ব্যাগ খুলে টাকা তুলে নেওয়া তার কাছে ছেলেখেলা। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে না। পুলিশ জানে একজন চৌখস পকেটমার ওয়েস্ট এন্ডে পকেট মারছে। তাকে ধরবার জন্য কয়েক বছর হল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সফল হয়নি।

যখন করিডন ক্রিডের ফ্ল্যাটে পৌঁছল, বৃষ্টি থেকে গিয়ে সূর্যের আবছা আলো এসে পড়েছে রংচটা পুরনো বাড়িগুলোর ওপর। খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি অতিক্রম করে সে ক্রিডের দরজার সামনে এসে দরজার গায়ে টোকা মারল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া মিলল না, তারপর দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল ক্রিড।

চার বছর ক্রিডকে না দেখলেও করিডন সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল। মানুষটা সামান্য রোগা হয়ে গেছে।

করিডনকে দেখামাত্র পিছিয়ে গিয়ে ক্রিড দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হল, কিন্তু করিডনের পা ভেতরে থাকায় বন্ধ করতে পারল না।

হ্যালো ক্রিড!—মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে আশা করনি কেমন?

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল ক্রিডের চোখেমুখে, সে বলল এখন ভেতরে এস না, অসুবিধে আছে।

হাসি মুখে করিডন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে বলল, আমাকে চিনতে পারছো তো?

তুমি করিডন না?—ক্রিড সভয়ে বলল, ভেতরে যেও না। এখন বাইরে যাচ্ছি। কথা না শুনলে জোর করে বাইরে বের করে দেব। অন্য কোন সময়ে এস।

হলঘরটার চারিদিকে চোখ বুলাল করিডন। টেবিলে রাখা ফুলদানিতে কেটজার ক্রুন ট্যুলিপ ফুল শোভা পাচ্ছে, লাল আর হলুদ পাপড়িগুলো একটু বেশি ফুটেছে। সে বিস্মিত হল। ফুল আর ক্রিড পাশাপাশি বাস করছে একথা ভাবতেও পারছে না।

কপালের সেই কাটা দাগটা এখনও আছে দেখছি।—দাগটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে করিড

বলল, আরো একটা দাগ হওয়ার সম্ভবনা আছে কিন্তু।

তোমার প্রয়োজন কি জানতে পারি?

একা আছ?

হ্যাঁ। আমার গায়ে হাত তুললে ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

ভেতরে চল। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ক্রিড ঘরে ঢুকল। করিডন তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরটা সাজানো গোছানো আর একটা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সে বলল, কি করে ভালভাবে থাকতে হয় তুমি জান দেখছি।

ভয় পেয়ে ক্রিড আড়ষ্ট হয়ে সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এক্ষু জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

তোমার কি হয়েছে বলত? তীক্ষ্ণকণ্ঠে করিডন জিজ্ঞাসা করল, অতো ভয় পাচ্ছো কেন?

ক্রিড বিড়বিড় করে বলল, কিছু না—কিছুই হয়নি।

তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছ।—হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, জিনি কে? ক্রিড চুপ করে রইল। সারা ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

আমি জানতে চাইছি জিনি কে? তুমি যাকে এমিথিস্ট ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলে—তার কথা বলছি।

—চলে যাও তুমি। যদি না যাও আমি পুলিশ ডাকব।

—বোকার মত কথা বল না। মেয়েটা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ম্যাক্সকে। মেয়েটা কে?

মিথ্যে কথা।—ক্রিড বলল, মেয়েটা তোমায় চেনেই না, কখনও দেখেও নি। কেন জিজ্ঞাসা করতে যাবে বল, ম্যাক্স মিথ্যে কথা বলেছে।

বেশ মিথ্যেই না হয় হল। কিন্তু মেয়েটা কে?

ক্রিড ইতস্ততঃ করে বলল, তোমার পরিচিত কেউ নয়। মেয়েটা কে তা জেনে তোমার কি লাভ?

তুমি কি চাও, তোমার গায়ে হাত তুলি?—করিডন বলল, আমায় না বললে গায়ে হাত উঠবে বলে দিচ্ছি।

ক্রিড শঙ্কিত হল। সে মুখ বিকৃত করে বলল, গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না।

লোকটা কি বোঝাতে চাইছে এই ফ্ল্যাটে সে একা নয়, করিডন অবাক হল। ক্রিডের দিক থে চোখ সরিয়ে সে দরজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। এমনভাবে ক্রিড মাথা নাড়ে যেন অন্য ভাষার কোন মানুষটিকে আকার ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চাইছে। আঙ্গুল রাখল ঠোঁটে।

জিনির সম্বন্ধে আমায় বল।—উঠে দাঁড়াল করিডন।

বলবার মত কিছু নেই। একজন মেয়ে মাত্র।

ক্রিডের দিকে এক-পা এগিয়ে গেল করিডন, ভেতরে কে আছে? মেয়েটা কি করে? কোথা থেকে এসেছে?

তিনটে আঙ্গুল তুলে দরজার দিকে নির্দেশ করল ক্রিড। সে বলল, মেয়েটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। জোর করে এখানে এসে উঠেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? মেয়েটা সুন্দরী। ওকে আগে কখনো দেখিনি।

ওরা তিনজন?—করিডন জিজ্ঞাসা করল।

ক্রিড ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

কালো ব্যারেট ক্যাপ মাথায় কোন লোককে চেন? ক্রিড হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল এমনভাবে যেন করিডন তাকে ঘুঁষি মেরেছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। চলে যাও এখান থেকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোমার সুন্দরী বোধহয় তোমার জন্য এতক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

করিডন গলা চড়িয়ে বলল, তোমরা বাইরে বেরিয়ে এস হে। ক্রিড বলেছে তোমরা এখানেই আ।

ক্রিড মুখে অস্ফুট আওয়াজ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। প্রবেশ করল কালো ব্যারেট টুপি মাথায় সেই লোকটা। তার দস্তানা পরা হাতে একটা পিস্তল।

।। দুই ।।

জীবনে অনেকবার বন্দুকের মুখোমুখি হয়েছে করিডন। আগের অভিজ্ঞতা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল, কারণ একজন বোকা লোক কত অপ্রয়োজনে বন্দুক ব্যবহার করবে। সে বন্দুক তাক করা লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে কে গুলি ছুঁড়বে আর কে ছুঁড়বে না।

নড়াচড়া করো না, বন্ধু।—কালো ব্যারেট টুপি মাথায় লোকটা বলল, তার কথার টানে করিডন বুঝল লোকটা পোল্যান্ডের অধিবাসী, কোন রকম চালাকি করলে পস্তাতে হবে।—তার পিস্তলের লক্ষ্য করিডনের বক্ষের মধ্যস্থল।

দরজার দিকে তাকাল করিডন। মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করা। পরনে কালো সোয়েটার আর স্ল্যাকস কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেঁটে হলেও শরীরের গঠন সুন্দর। গায়েব চামড়া ফ্যাকাসে হলুদ আর কালো টানাটানা চোখ দুটি তার রাঙ্গানো ঠোঁট দুটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

ঘাড় পর্যন্ত নামা কালো চুল। কালো টুপী পরা লোকটির চেয়ে মাথায় সামান্য উঁচু। বুক উন্নত আব পাছা সরু। চেহাবায় পুরুষালী ছাপ বর্তমান। কাছে না গেলে বুঝতে পারার উপায় নেই যে সে নারী।

হ্যালো জিনি।—করিডন হাসল, এই বন্দুক তাকের মানে কি?

বসো। হাত দুটো এমনভাবে রাখ যাতে আমরা দেখতে পাই।—জিনি বলল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।

মুখে হাসি বজায় রেখে করিডন বলল, এই জন্যই কি এতদিন আমায় অনুসরণ করছিলে? তুমি কি কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলে, নাকি মনস্থির করতে পারছিলে না?

জিনি বলল—বস।

কালো টুপি পিস্তল নেড়ে জানালার পাশে রাখা একটা আবাম কেদারা নির্দেশ করে বলল, ওখানে বস।

করিডন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল। সে বলল, এই বন্দুকবাজির মানে কি?

দরজার সামনে আর একজন পুরুষকে দেখা গেল। লোকটা রোগা লম্বা আর মাথার চুল সোনালী। একটা হাত নেই আর মুখের পাশে চোখের উপর দিয়ে নেমে গেছে গভীর কাটা দাগ।

সব ঠিক আছে তো?—সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, যদি মনে কর তোমরা পারবে তাহলে আমি চলে যাই।

এই লোকটির সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ বিন্দুমাত্র নেই। সে ইংরেজ। সদবংশজাত, লেখাপড়া জানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে। পরনের স্যুটটা নোংরা হলেও সুন্দর। গায়ের রং ফর্সা, একজোড়া গোঁফ আছে নাকের নীচে।

সব ঠিক আছে।—ক্রিডকে দেখিয়ে মেয়েটা বলল, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। রাস্তায় আনা প্রযোজন।

ঠিক বলেছ।—এক হাতওয়ালা লোকটা কাছে এসে ক্রিডকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস। তারপর করিডনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, এর নাম জিনি পারসিগনী। বন্দুক হাতে জন। ওর ভাল নামটা জানি না। আমার নাম রনলি—নিগেল রনলি। আমার অন্য কাজ আছে, চললাম। তোমার সঙ্গে কথা জিনিই বলবে।

ক্রিডকে সাথে নিয়ে রনলি এঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গেল।

তোমার সম্পর্কে আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে উত্তর দেবে কি?—মেয়েটা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

কেন দেব?—করিডন বলল, তোমাদের মতলব কি বল তো? তোমরা কারা?

কঠিন আকার ধারণ করল মেয়েটার মুখ। সে বলল, আমরা একজনকে খুঁজছি। তোমাকে দিয়ে সেই কাজটা করাতে চাই। তবে তার আগে জানতে চাই তুমিই সেই লোক কিনা। আমরা...

পাহাড় তৈরী করতে রাজি নই।

আমি কাজ খুঁজছি না—করিডন বলল, তোমরা আমার সময় নষ্ট করছ।

তুমি টাকা কামাতে চাও না? আমরা ভাল অংকের টাকা দিয়ে থাকি।

কি রকম ভাল শুনি?

এই ধর এক হাজার পাউন্ড। এখন অর্ধেক পাবে, কাজ মিটে গেলে পাবে বাকি অর্ধেক।

এক হাজার পাউন্ড অনেক টাকা। টাকার অংক করিডনকে আগ্রহী করে তুলল, সে বলল, কাজটা কি?

তোমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে কি জবাব দেবে? মেয়েটা প্রশ্ন করল।

প্রশ্নগুলো কি?

তুমি মার্টিন করিডন, বয়স তেত্রিশ বছর, অবিবাহিত আর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। তাই তো?

হ্যাঁ, তাই।

কোনদিন কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে লেগে থাকনি, তাই না। তুমি সকল রকম কাজে পটু। নানা ধরনের কাজ করে অর্থ উপার্জন কর। তুমি জীবন শুরু করেছ বাড়ি বাড়ি গিয়ে অটোমেটিক মেশিন আর পিন-টেবিল বিক্রি করে। এ কাজ শুরু করেছিলে সতের বছর বয়সে। বছর যখন তেইশ থেকে পঁচিশ তুমি কুঁড়েমি করে সময় কাটিয়েছ, প্রচুর রোজগার করতে বিলিয়ার্ড খেলে। তারপর টুরিস্ট গাইড হয়ে আমেরিকার টুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখাতে প্যারিস আর বার্লিন। অনর্গল ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় কথা বলতে পার। এই কাজ ছেড়ে দিয়ে একজন ধনী ব্যক্তির দেহরক্ষীর কাজ করেছ, যে সকল সময় ভাবত কেউ তাকে খুন করবে। তবে এইসব করেছ যুদ্ধের আগে। ঠিক বলছি তো.

স্বীকার করতেই হবে দু-একটা পয়েন্ট বাদ গেলেও বাকি সব ঠিক বলেছ। সবিস্ময়ে করিডন বলল।

ওই পয়েন্টগুলোতে পরে আসছি।—মেয়েটা বলতে লাগল, উনিশশো আটত্রিশ সালে তোমাকে ব্রিটিশ বৈদেশিক অফিসের লোক ভাড়া করেছিল শত্রুপক্ষের রাষ্ট্রদূতের কিছু কাগজপত্র চুরি করার জন্য। কাগজপত্রগুলো তোমার সরকারের কাছে ছিল খুবই জরুরী। তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে ধরা পড়লে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তারা করতে পারবে না। তুমি সেই শর্তে রাজী হয়েছিলে। যখন সেফ খুলছিলে রাষ্ট্রদূতের সচিব তোমায় দেখে ফেলেছিল।—একটু থেমে মেয়েটি বলল, তুমি তাকে খুন করেছিলে।

চুপচাপ তাকিয়ে রইল করিডন পাশে হাত রেখে।—তোমাকে পালাতে দেখা গেলেও কোন রকমে বেঁচে ফিরে এসে কাগপত্রগুলো সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলে। পুলিশ জানত না যে ব্রিটিশের বৈদেশিক অফিস তোমায় নিয়োগ করেছে, তাই তারা প্রায় মাস দুয়েক তোমার উপর নজর রাখে। তাদের ধারণা হয়েছিল যে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অবশ্য তুমি সেরকম কিছু করনি। তোমার বিচারের জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে তা ছিল না।

—ঠিক বলেছ—করিডন বলল, আমার অত মনে নেই।

মেয়েটি বলে চলল, উনিশশো উনচল্লিশ সালে তুমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দিয়ে সারা ইউরোপ চষে বেড়াতে। তুমি খবরাখবর দিতে জার্মানীর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্বন্ধে। একমাস কাজ করেছিলে, তারপর জার্মান পুলিশ তোমায় সন্দেহ করতেই তুমি দেশে ফিরে আস। পরে কাজটা তোমা ভাল না লাগায় তুমি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলে। তারপর যুদ্ধ বেঁধে গেলে সৈন্যবিভাগে যোগ দিলে ডানফ্রিকে অবস্থানকালে আহত হলে আর পরে হলে একজন গেরিলা যোদ্ধা। ঠিক কিনা?

—তোমার ভাল লাগলে বলে যাও।—করিডন আরাম-কেদারায় নড়েচড়ে বসে বলল। দেখছি বলতে টলতে ভালই পার।

ফ্রান্সের কয়েকটা বর্ডার আক্রমণে তুমি ছিলে,—মেয়েটি বলতে লাগল। তারপর তোমাকে আরো বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হল, গুপ্তচরের কাজ।

'গুপ্তচর' কথাটা উচ্চারিত হতেই করিডনের চোখের দৃষ্টি কঠিন হল।

তোমাকে অনেকবার প্যারাসুটের সাহায্যে ফ্রান্সে নামানো হয়েছে। তুমি জার্মানীতেও নেমেছ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তো জোগাড় করেছিলে। কিন্তু তোমার আসল কাজ ছিল যারা খুব ঝামেলা

করছিল তাদের শেষ করা। তাদের মধ্যে কিছু ছিল আস্থাহীন আর কিছু জার্মান বিজ্ঞানী। যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দীদের কাছে যাতায়াত করে তাদের কাছ থেকে খবরাখবব আদায় করত, তোমার উপর ভার পড়েছিল তাদের খুঁজে বের করার। তোমাকে ফ্রান্সে নামানো হয়েছিল তাদের খুঁজে বার করে খতম করার জন্য। সে কাজ তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলে।

করিডনের অতীতের কথা মনে পড়ল। একটা মেয়ে ছিল ছিপছিপে চেহারার আর সুন্দরী। তাকে খতম করেছিল মুখের ভেতর গুলি করে। বুলেটের ধাক্কায় মাথার খুলির খানিকটা উড়ে গিয়েছিল। মুখ হয়ে গিয়েছিল বিকৃত। অতীতের কথা স্মরণ করে তার শরীর ঘেমে উঠল। আর হৃদপিণ্ড বুকের ভেতর লাফালাফি করতে লাগল।

একবার গেস্টাপোর হাতে তুমি ধরা পড়েছিলে, মেয়েটি বলতে লাগল, তোমায় কারা পাঠিয়েছে, আর তোমার উদ্দেশ্য জানবার জন্য তারা তোমার উপর নির্যাতন করেছিল। প্রচণ্ড অত্যাচারের পরেও তুমি মুখ খোলনি। পালাতে পেরেছিলে জার্মানীর বন্ধু দেশে ঢুকে পড়েছিলে বলে। তারপর তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তোমার উপর গেস্টাপোরা এমন অত্যাচার করেছিল যে তোমাকে চারমাস মিলিটারী হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

ইতিহাস বলা শেষ কর।—অভদ্রভাবে করিডন বলল, কি চাও তোমরা, আমার সম্বন্ধে তো অনেক কথা হলো। তোমাদের মতলব কি শুনি?

এতক্ষণ যা বললাম সব সত্যি তো?—মেয়েটি বলল, তা এসব তোমার জীবনে ঘটেছিল তো?

ঘটেছিল। তবে আমার কথা থাক, নাহলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আর একটা কথা। এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের পর তোমার কাউকে পছন্দ হয়নি। তুমি ঠিক করেছিলে আমেরিকায় চলে যাবে। কানাডাতে এক বছর ডলার চোরা-চালানের কারবার করেছ। তোমার কারবার পুলিশের কাছে গোপন থাকেনি। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে লন্ডনে ফিরে এসেছ। এখানে আছ এক সপ্তাহ হল আর বর্তমানে তোমার হাত একেবারে শূন্য। তুমি কি করবে এখনো মনস্থির করতে পারো নি। অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়কারী দলের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করতে তোমার ভালই লাগে, সেই দল যদি পুলিশের সাহায্যপুষ্ট হয় তবুও। তুমি এখনও মনস্থির করতে পারনি তাই না? একটা কাজ আছে তোমার জন্যে, কাজটা তোমার ভালই লাগবে। এক হাজার পাউন্ড এর বিনিময়ে পাবে।

॥ তিন ॥

ঘরে ঢুকল রনলি। ট্রাউজারের পকেটে হাত। এক ঝলক করিডনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিনির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

তোমরা দুজনে কতদূর এগোলে,—সে করিডনকে বলল। তোমার সম্বন্ধে অনেক খবর জোগাড় করেছি কি বল?

হাতে সময় থাকলে যে কোন লোকের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করা যায়।

—প্রত্যুত্তরে কথাগুলো বলে করিডন পকেটে হাত ঢোকাল।

হাত বাইরে রাখ—তীক্ষ্ণকণ্ঠে জন বলল।

না, না, ভয়ের কিছু নেই।·ও ঝামেলা করবে না।—রনলি বলল।

ঠিক বলেছ—পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে করিডন বলল, আমি কখনও ঝামেলা পাকাই না। হাসল সে।

বন্দুক সরাও—জিনি জনকে বলল।

বন্দুক সরাব না—জন বলল, ওকে বিশ্বাস নেই।

কাজের কথা বলবার আগে আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—জিনি কোনদিবে কর্ণপাত না করে বলল।

আমি যে ওকে বললাম বিশ্বাস করি না—জন বলল।

জিনি চীৎকার করে বলল, চুপ কর। আমি কথা বলছি তুমি চুপ করে থাক।...আর একটা ক"

কথাটা কি?—জানতে চাইল করিডন।

জিনি সামান্য ইতস্ততঃ করে রনলিকে বলল, ওকে জিজ্ঞাসা কর।

হ্যাঁ, করছি—রনলি বলল, দেখ, এখনো আমরা নিশ্চিত নই যে তুমিই করিডন, কারণ করিডনের কোন ফোটগ্রাফ হাতে পাইনি। তুমিই যদি করিডন হও তাহলে তোমার পিঠে আর বুকে কালচে জরুলের চিহ্ন আছে, আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই—

করিডন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বড় একঘেয়ে লাগছে। তার চোখে বরফ জমা দৃষ্টি ভাসছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে রাগে।

বসে থাক চুপচাপ।—জন বলল, নড়াচাড়া করলে গুলি ছুঁড়ব।

করিডন আবার গা এলিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। সে বলল, এভাবে সৎ হয়ে বসে থাকতে পারব না। তোমরা জাহান্নামে যাও।

নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। জন কয়েক পা এগিয়ে এল। রনলি তার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল।

থাম দেখি—সে চেঁচিয়ে উঠল, ভুল পথে এগোচ্ছি আমরা। তুমি ক্রিডের উপর নজর রাখো গে। যাও, দূর হও এখান থেকে।

জন ঘুরে দাঁড়াল।

আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি।—উত্তেজিত কণ্ঠে রনলি বলল, ওর ভার আমাকে দাও। লোকটা চুপচাপ বসে অবজ্ঞাভরে আমাদের দেখছে।

বোকা কোথাকার?—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জিনি রনলিকে বলল, ভাবছ ওর কাছ থেকে তুমি কথা আদায় করতে পারবে? গেস্টাপোব অত্যাচার যে সহ্য করেছে?

জন চিৎকার করে বলল, বড় বেশী কথা হচ্ছে—ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে করিডন তার হাতের কব্জি চেপে ধরে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জিনি আর রনলি বন্দুক হাতে করিডনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। তাদের দিকে বন্দুকের নল।

ও ঠিক কথাই বলেছে, আমাদের মধ্যে বড় বেশী কথা হচ্ছে। অনেক হয়েছে, এবার চললাম।—হাসল করিডন, নিজের পকেটে বন্দুকটা রেখে দিল। নীচু হয়ে টুপি তুলে নিয়ে বলল, আমি একাই যাব। আবার যদি পরে দেখা হয়, এরকম ভদ্র ব্যবহার করব না।

চমৎকার কাজ।—রনলির কণ্ঠ থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ল। সে জনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ভেতরে গিয়ে ক্রিডের দিকে নজর রাখো, আজকের দিনটা মাটি করলে।

কোন কথা না বলে জন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

করিডন চলে যেতে উদ্যত হতে রনলি বলল, আমরা তোমার সাহায্য চাই, এর জন্য টাকা দিতেও প্রস্তুত। আমাদের কথা শোন।

আগে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে ও করিডন কি না—জিনি বলল।

হ্যাঁ। রনলি বলল, শোন, যদি আমরা প্রকৃত সত্য না জেনে কথাবার্তা চালাই তাহলে আমাদের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজটা গোপনীয়। এর মধ্যে আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি। ক্রিড হচ্ছে পকেটমার। ও আমার পকেট থেকে ব্যাগ চুরি করে কাগজপত্র থেকে আমাদের উদ্দেশ্য জেনে নিয়েছে। অনেক সময় লেগেছে ওকে খুঁজে বার করতে। তারপর লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করতে লাগল। তাই আমরা এখানে এসে ওকে পাকড়াও করেছি। এখনো ঠিক করতে পারিনি ওকে নিয়ে কি করব। সুতরাং আমরা আর একটা ভুল করতে পারি না। গেস্টাপোরা যে চিহ্ন তোমার শরীরে এঁকে দিয়েছে তা আমাদের দেখাও। আমরা তোমায় সন্দেহ করছি না। তবে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

করিডন সিগারেটের ধোঁয়া ত্যাগ করল। তারপর একহাতের কোটের আর শার্টের হাতা গুটিয়ে ফেলল। সে বলল, ওরা প্রত্যেক রাতে আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখত। আমি যাতে ঠাণ্ডা বোধ না করি তাই হ্যান্ড কাফ গরম করে রাখতো। হাতে তারই দাগ, এবার সন্তুষ্ট হতে পেরেছ?

দু'জনে পৃথক পৃথক ভাবে হাতের দাগ দেখল। তাদের চোখে আতঙ্ক বা সহানুভূতির ছাপ

পড়ল না।

ওদের কাজের তুলনা হয় না। তাই না?—রনলি কথাগুলো বলে নিজের মুখের দাগে হাত বুলিয়ে বলল, ওরা গরম বেয়োনেট দিয়ে এই দাগ করে দিয়েছে।

করিডন বলল, অত্যাচার তোমার উপরেও হয়েছে?

হ্যাঁ। জিনির উপরেও হয়েছে।—কাছে এসে করিডনের হাতের দাগ পরীক্ষা করে জিনিকে বলল, ঠিক আছে, এ করিডনই। দাগ হ্যান্ড-কাফেরই।

হ্যাঁ, ঠিক আছে— জিনি বলল, তাহলে ওকে বল।

রনলি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বুঝলে কাজটা একটু বিচিত্র ধরনের। খুব বিপজ্জনকও বলতে পার। তুমি ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।

কাজটা কি?

একজনকে খুন করতে হবে।—রনলি বলল, আমরা চাই কাজটা তুমি কর।

মেয়েটা বলেছিল, আমরা একহাজার পাউন্ড দেব। অর্ধেক এখন আর কাজ শেষ হলে বাকী অর্ধেক।

কবিডনের মনের মধ্যে কথাগুলো আবর্তিত হতে লাগল।

ঘর থেকে জিনি চলে গেছে। রনলি তাকে বলছিল, মনে হচ্ছে আমি একাই কাজটা করতে পারব। তবে তুমি যদি থাকতে চাও—

তাবপরেই মেয়েটা ঘর থেকে চলে গেল। রনলি কাপবোর্ড থেকে এক বোতল মদ আর দুটো গ্লাস বের করে সামনের টেবিলে রাখল। তারপর সে বলল, জানি এখন পান করবাব সময় নয়, হলেও একটু পান কর—করবে না?

করিডন ঘাড় নাড়ল। এক ঢোক মদ পান করল।

যা বলব তা সাধারণতঃ নভেলেই পড়া যায় বাস্তব জীবনেব সঙ্গে কোন মিল নেই। মেয়েটাও ঠিক তাই। ওকে দেখলে অদ্ভুত মনে হয়, তাই না?

তোমরা সকলেই অদ্ভুত।—নীরসকণ্ঠে করিডন বলল, তোমাদের পরিচয় কি? তোমরা কি ...ন সমিতি বা ওই ধরনের কোন সংস্থার সভ্য?

রনলি হেসে বলল, তা বলতে পার। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। নিজের অজান্তে নিজেকে ...িয়ে ফেলছ সেই জন্যই তোমার সাহায্য আমরা নেব ঠিক করেছি। আমরা জানি, কাজটা না ক... ...ও তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না।

আমি ছেড়ে না যেতে পারি। না হয় নাই যাব—করিডন বলল, তবে তার মানে এই নয় যে কাজটা করব। তুমি কি এ ব্যাপারে সিরিয়াস...?

হ্যাঁ। তোমাকে তাহলে সব কিছু খুলেই বলি। 'ফ্রেঞ্চ রেজিমেন্ট মুভমেন্টের' নারী-পুরুষের মিলিত একটা ছোট গ্রুপেব আমবা মাত্র তিনজন বেঁচে আছি। শুরুতে আমবা ন জন ছিলাম—দুজন ফরাসী পিয়েরী গোর্ভিল আর জর্জ; দুজন ফরাসী নারী জিনি আব কার্লোট, দুজন পোলিশ, লুবিস আর জন; তিনজন ইংরেজ, হ্যারিস, ম্যালোরী আর আমি নিজে।

এই ধরনের নারী-পুরুষের সম্মিলিত গ্রুপের সাথে করিডন সুপরিচিত। এদের অনেকের সান্নিধ্যে সে এসেছিল গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করার পর। তারা প্রত্যেকেই ছিল চৌখস, দেশভক্ত, অত্যন্ত গোঁড়া আর তাদের যখন যা বলেছে কোন প্রশ্ন না করে তাই করেছে।

আমাদের কাজ ছিল ট্রেন লাইন চ্যুত করা।—রনলি বলল, সারা দেশে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতে হত। কাজ যা করবার করতাম রাত্রে। আমরা অনেক ভাল কাজও করেছি। আমাদের দলপতি ছিল পিয়েরী গোর্ভিল। মানুষটা ছিল আলাদা ধরনের এবং অ...মনীয়। ভাল ছিল লোক হিসাবে। ও আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠ করে তুলেছিল।

এক ঢোক মদ পান করল করিডন। তার মনে পড়ছে, এমন একজন লোকেব সাথে তার দেখা হয়েছিল। সে চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

জিনি আর গোর্ভিল পরস্পরকে ভালবাসত।—রনলি বলল, আমি চাই তুমি জিনিকে বুঝতে

চেষ্টা কর। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

ওরা মনে প্রাণে ছিল অভিন্ন। ওদের মত আর কাউকে আমি দেখিনি। হ্যাঁ ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। কিন্তু আমরা ভালোবাসা বলতে যা বুঝি ঠিক সে ধরনের ভালবাসা ওদের মধ্যে ছিল না। তার চেয়েও বেশী কিছু। যদি বলতে চাও বলতে পার মনের, দেহের আর আত্মার একীভূত হওয়া ; ওরা একজন আর একজনের জন্য মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল।

তোমাদের মধ্যে কেউ গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই না?

সত্যিই ওর জীবনে তাই ঘটেছে।

এসব তোমাদের ব্যাপার।—হুইস্কি শেষ করে করিডন বলল, আমাকে এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছ?

বলছি,—রনলি বলল, তবে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলব। জিনি, ম্যালোরী আর আমি শত্রুপক্ষের হাতে একবার ধরা পড়েছিলাম। আমাদের বন্দী করে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওরা জানত আমরা পিয়েরীর দলভুক্ত। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করল। পিয়েরীকে ওরা চায়। ওদের কথায় আমরা কান দিলাম না। ও আছে বলেই তো আমরা আছি। যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ট্রেন লাইনচ্যুত ঠিকই হবে। আমার কাছ থেকে যখন কথা আদায়ের চেষ্টা করছে তখন জিনি আর ম্যালোরী সেখানে উপস্থিত ছিল। ওদের কাছে সেই অত্যাচার নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কঠোর মনে হয়েছিল। আমি তেমন সাহসী ছিলাম না। ওদের অত্যাচারে বার দুয়েক আর্তনাদ করে উঠেছিলাম।

এসব ব্যাপারে ওরা একজনকেই বেছে নিত।—করিডন হেসে বলল।

হ্যাঁ। পিয়েরীর হদিস জানতে চাইল। মুখ খুললাম না। শেষ অবধি আমাকে নিয়ে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর জিনিকে বেছে নিল। আমরা জানতাম ওর কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারবে না এবং নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েও পারেনি। এমন কি ওর মুখ থেকে একবারের জন্যও যন্ত্রণা কাতর চিৎকার বের হল না। তারপর আমাকে নিয়ে পড়ল। একটা হাত ভেঙ্গে দিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। পরে জিনির মুখে সব শুনেছি।—সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল রনলি, গেস্টাপোরা ম্যালোরীকে চেপে ধরতেই ও বলল, তারা যা জানতে চায় সব জানাবে ও।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে সে বলল, ওরা আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিল আর নষ্ট করে দিল একটা হাত। আর জিনির কথা কল্পনা কর, জিনির কি অবস্থা ওরা করতে পারে। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এত দিন যা করেছি সব বৃথা।

রনলি জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, অত্যাচারের পর আমাদের তিনজনকেই একটা সেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তখন আমার অর্ধচেতন অবস্থা আর জিনির প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল ম্যালোরী। ওর গায়ে গেস্টাপোরা হাত তোলেনি। জিনির দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, বার কয়েক চেষ্টা করেছিল ম্যালোরীকে ধরতে। চিৎকার করে কাঁদছিল আর অনর্গল গালাগাল দিচ্ছিল ওকে, কিন্তু এতো দুর্বল হয়ে পড়ছিল যে ম্যালোরীর কাছে পৌঁছতে পারছিল না। আমার জীবনে যত রাত এসেছে সেই রাতটাই ছিল ভয়ঙ্কর। ম্যালোরী মাত্র একবার কথা বলেছিল, তোমরা বুঝতে পারছ না বোকার দল, ওরা দিনের পর দিন এভাবে অত্যাচার চালাত। আমাদের মধ্যে একজন ঠিকই বলে ফেলত। পিয়েরী ঠিক বুঝবে ; একেই বলে যুদ্ধের নিয়তি।

করিডনের কানে সব কথা পৌঁছল না। তার চিন্তা পাঁচশ পাউন্ড নিয়ে। যা দেবে বলেছে তারা, তার চেয়ে বেশী পাওয়া উচিৎ। দরদস্তুর সে ভালই করতে পারে। হ্যাঁ, দর একটু বেশীই হাঁকাতে হবে। যদিও শুধুমাত্র রনলিকে নিয়ে কাজ করতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

।। চার।।

তোমাকে ম্যালোরীর—ব্রায়ান ম্যালোরীর কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন।—রনলি গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, ও ফাইটার প্লেন চালাত। বন্দী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তার চরিত্রে কোনদিন দুর্বলতার ছাপ দেখা যায় নি। দেখতে শুনতেও চমৎকার।

বয়স হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, লেখাপড়া জানা আর প্রভূত অর্থের মালিক পিয়েরী একবার তাকে বলেছিল সে ভাল কর্মীদের মধ্যে একজন বলে মনে করে। বেছে বেছে কঠিন কাজগুলো করতে সে এগিয়ে যেত। তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে মানুষটা সাহসী, অদম্য আর অনমনীয়।

এই ধরনের লোকের দেখা আমি আগেও অনেক পেয়েছি।—করিডন বলল, বিপদ হবার আগে পর্যন্ত ওরা ঠিক থাকে, তারপরেই দেখা যায় ওরা একেবারে অপদার্থ।

ম্যালোরী সম্বন্ধে তেমন কথা খাটে না। অনেকবার ওর উপর চাপ এসেছে। কোন রকম ক্ষতির কারণ না হয়ে ফিরে এসেছে। ঈশ্বর জানেন সেই রাতে ওর কি হয়েছিল! সে গেস্টাপোদের কাছে বলে দিয়েছিল পিয়েরীকে কোথায় পাওয়া যাবে আর সঙ্গে কারা আছে; কার্লোট আর জর্জ ছিল ওর সঙ্গে। সৌভাগ্যবশতঃ লুবিস, জন আর হ্যারিস অন্য কাজে বাইরে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়েনি। তবে সে প্রত্যেকের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল।

এ ঘটনা কতদিন আগের?

প্রায় আঠার মাস আগের।

ধরা পড়েছিল গোর্ভিল?

হ্যাঁ। জর্জ আর কার্লোট খণ্ডযুদ্ধের সময় মারা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা পিয়েরীকে জীবন্ত ধরেছিল। বন্দী ছিল গেস্টাপোদের হাতে, দু সপ্তাহ আগে ওকে হত্যা করেছে।

তোমাদের জীবনে কি ঘটল?

আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। একদিন বিমান আক্রমণ হয়, বন্দীদের ক্যাম্পে বোমা পড়ে। আমাদের চিনতে পারেনি বলে পালাতে পারি।

আর ম্যালোরী?

সেও পালায়। আমাদের ফেলেই পালিয়েছে। হ্যাঁ। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ জিনি। ওর ব্রেন ফিভার হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছুই স্মরণ করতে পারে না। একটা বিশ্বাস ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একদিন না একদিন ম্যালোরীর দেখা সে পাবেই। আমাদের মিলিত সিদ্ধান্ত তাকে খুঁজে বের করতেই হবে আর এ ব্যাপারে অন্য কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টানছ কেন?

বলতে পার এটা আমার পরিকল্পনা। বাকি দুজনের এ পরিকল্পনা মনোমত নয়। কার্লোটের সঙ্গে জনের বিয়ে হয়েছিল। ম্যালোরীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কারণ আছে। জিনিরও তাই। আমার এ ধরনের কোন দাবী নেই, তবে আমি ওদের কথা দিয়েছি লোকটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করব।

বাকি দুজন? তারা কোথায় আছে?

ওরা মারা গেছে। গত সপ্তাহে ম্যালোরী ওদের খুন করেছে।

করিডনের দুচোখে সামান্য আগ্রহ ফুটে উঠল। সে বলল, গত সপ্তাহে? তুমি বলতে চাইছ—এখানে, এই লন্ডনে?

হ্যাঁ। ম্যালোরী যে এতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তা আমরা ভাবিনি। লুবিসকে পাওয়া গেছে রেললাইনের উপর। আর হ্যারিসকে মৃত অবস্থায় একটা পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। ম্যালোরী জানে আমরা ওকে খুঁজছি। আমাদের কাউকে ও রেহাই দেবে না। এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন অন্যের সাহায্য। তুমি ওকে শুধু খুঁজে বের করে দাও। বাকি কাজ আমরা করব। এই কাজের জন্য এক হাজার পাউন্ড দিতে চাইছি।

এটা খুন খারাপির ব্যাপারে দাঁড়াবে,—করিডন বলল, সে কথা ভেবে দেখছ?

হফম্যান বা আরো কয়েকজনকে যে তুমি হত্যা করেছিলে, ও গুলোকেও কি তুমি খুন বলবে?

না। ওই খুনগুলো করা হয়েছিলো আইন সঙ্গত ভাবে। এখন যদি আমি কাউকে খুন করি তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে, বিচার হবে এবং খুব সম্ভব ফাঁসি কাঠে ঝোলান হবে।

দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যার ঘটনা সাজান যেতে পারে,—রনলি বলল, ও আমাদের দলের দুজনকে ওই ভাবে খুন করেছে।

করিডন এক চুমুক হুইস্কি পান করে বলল, তবু ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় একজনকে

হত্যা করা এক জিনিস আর এখন ওকে খুন করলে অন্য জিনিস দাঁড়াবে।

সিগারেট নিবিয়ে রনলি বলল, এমন এলোপাথাড়ি আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। হয় তুমি কাজটা হাতে নাও, অথবা নিও না। কি করবে বল?

এক হাজারে এ কাজ করা যাবে না।

রনলির চোখ দুটি জ্বলে উঠল। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, তার মানে তুমি কি—?

ঠিক তাই। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এক হাজার যথেষ্ট নয়। নিজের জীবন বিপন্ন করতে হচ্ছে। এর মূল্য এক হাজার পাউন্ডের বেশী বলেই মনে করি।

বেশ— পনের শ' পাবে।

সামান্য ইতস্ততঃ করে করিডন বলল, ঠিক আছে ওই টাকাতেই কাজটা হাতে নিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আরো বেশী টাকা দেবে। রনলি হেসে বলল, জানতাম তুমি কাজটা হাতে নেবে। আমি বাজি ধরেছিলাম।

এখন অর্ধেক আর কাজ শেষ হলে বাকি অর্ধেক।

।। পাঁচ ।।

ক্রিড ঘরে এল। করিডনের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। জিনি আর জনের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য রনলি তাকে পাশের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাক—করিডন বলল, আমাকে বলা হয়েছে তোমার উপর নজর রাখতে।

ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায় বলত? তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, তুমি তো জান ওরা কি জন্য এসেছে, জান না? তুমিও কি ওদের মধ্যে আছ নাকি?

করিডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খুব সম্ভব জানি। ওরা তোমাকে নিয়ে ঠিক কি করবে বলতে পারছি না। তুমি একেবারে বোকা, তাই ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি বুঝব কি করে বল? মেয়েটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, ও যা ইচ্ছা করতে পারে। মনে হচ্ছে মাথায় গোলমাল আছে।

তুমি বিদেশীদের সঙ্গে তো কোনদিন মেলামেশা করনি তাই বুঝতে পারছ না, আসলে মেয়েটার মাথায় কোন গোলমাল নেই।

ওরা এখানে আছে চারদিন হল। আমাকে একেবারে একা ছাড়ে না। কোন গোপনতা রাখা যাচ্ছে না। এসব বরদাস্ত করতে পারছি না। এর যে শেষ কোথায়?

রনলির পকেট মারা তোমার উচিৎ হয়নি।

লোকটা বুঝি এইসব তোমায় বলেছে।

বলেছে তুমি একজন পকেটমার আর ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলে।

হাত টানাটানি চলছিল যে। ওদের এদেশে থাকা ঠিক নয়। কাগজপত্রে গোলমাল আছে। গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারে। আমি—আমি শুধু পঞ্চাশ পাউন্ড চেয়েছিলাম।

ঘাটিয়ে ঠিক করনি। আমার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কোন লাভ হবে না। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।

ক্রিড অস্থিরভাবে পায়চারী থামিয়ে বলল, জান ওরা আমায় বিশ্বাস করে না, এই হচ্ছে অসুবিধে। বাইবেল ছুঁয়েও প্রতিজ্ঞা করতে চেয়েছি যে ওদের কোন ক্ষতি করব না।

কাছে বাইবেল আছে?—মুচকি হেসে বলল করিডন।

না, নেই—তবে ওরা তো একটা কিনতেও পারে। আমি বলেছি দাম দেব।—ক্রিডকে অসহায় দেখাল, ওরা আমাকে একেবারে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তুমি বরং আমাকে হুইস্কি দাও।

ক্রিডের কানে গেল না করিডনের কথা। সে বলতে লাগল, ম্যালোরী নামে একজন লোককে ওরা খুন করতে চায়। যদি খুন করে তাহলে ব্যাপারটা খুনের পর্যায়ে পড়বে। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওদের মধ্যে মেয়েটা সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কি রকম যেন কঠিন হৃদয়া। ওরা যদি ম্যালোরীকে

মারতে পারে তাহলে আমাকেও পারবে। ভয়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারছি না।

একটু মদে চুমুক দাও।—করিডন বলল, তোমাকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে খুন করবে? পোলিশ লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, মনে মনে ও কোন মতলব ঠাওরাচ্ছে।

করিডন গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ক্রিডের হাতে দিল। তারপর সে বলল, বোকামী করো না। মন শক্ত কর, যা ভাবছ ওরকম কিছু ঘটবে না।

এই চিন্তা আমায় পাগল করে তুলেছে। আমার উপর কড়া নজর রেখেছে। মেয়েটা অমানুষ। ওর চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

জিনিকে সাথে নিয়ে রনলি ঘরে ঢুকল। ক্রিড সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তুমি কি ভেতরে জনের কাছে যাবে?—রনলি ক্রিডকে বলল, তোমাকে এঘর ওঘর করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। এর জন্য তুমিই দায়ী, কি বল?

আমি যাব না—ক্রিড চেঁচিয়ে উঠল ; যথেষ্ট হয়েছে। দয়া করে এবার বিদায় হও।—ঠিক এমন সময় জন ঘরে ঢুকল।

এস—জন কঠিন কণ্ঠে ক্রিডকে বলল। বাধ্য ছেলের মত পাশের ঘরে চলে গেল ক্রিড ' জন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

।। ছয় ।।

ওর ধারণা হয়েছে, তোমরা ওকে খুন করবে।—করিডন বলল।

আমবা ঠিক করেছি তুমি যে টাকা দাবী করেছ আমরা তাই দেব। মেয়েটি বলল।

বিস্ময় আব আনন্দে ক্রিডের কথা করিডনের মন থেকে মুছে গেল। সে কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, এখন অর্ধেক আর বাকি, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

করিডন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জিনির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, বেশ এখন তোমরা যা করতে বলবে আমি তাই করব। এখন আমার প্রয়োজন ম্যালোরীর একটা ফটো অথবা তাহার দৈহিক বর্ণনা। তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারবে নিশ্চয়ই?

আমাদের কাছে ওর কোন ফটো নেই, তবে চেহারার বর্ণনা এক টুকরো কাগজে লিখেছি। রনলি বলল, ওকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। আমাদের হাতে মাত্র দুটো সূত্র আছে, লুবিস আর হ্যারিস সেগুলো জানত বলে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে পেরেছিল। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে একা আর খুব সাবধানে।

হাসল করিডন। রনলি যখন কথা বলছিল জিনি তাকে নির্বিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিল। মেয়েটির এই খুঁটিয়ে দেখা তাকে বুঝিয়ে দিল যে, নিজেকে সাবধানে এগোতে হবে। সে বলল, বেশ তো সাবধানেই এগোব। সেই সূত্রগুলো কি?

ওর মাসীর একটা ঠিকানা। ম্যালোরী আমাকে দিয়েছিল এই ভেবে যে যদি কোনদিন ও মারা যায় তাহলে যাতে খবর পৌঁছে দিতে পারি। আর ওর প্রেমিকার নাম। ওর মাসী থাকে ওয়েন ডোভারের কাছে। তোমাকে দেব বলে ঠিকানা লিখে রেখেছি। লুবিস এই ঠিকানায় ওর মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। পরে তার দেহ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় রেললাইনের উপরে পাওয়া যায়। এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে লুবিস যখন ওর মাসীর কাছে যায় ম্যালোরী ওখানেই ছিল। রীটা অ্যালেন ম্যালোরীর প্রেমিকার নাম, রিজেন্ট স্ট্রীটে ম্যাস্টিস অ্যান্ড রবার্ট নামে একটা হরেক রকম জিনিসের দোকানে চাকরী করে। মোজার কাউন্টারে বসে। হ্যারিস তার কাছে গিয়েছিল। তার দেহ পরদিন পাওয়া গেছে উইম্বলডন কমনের কাছে একটা পুকুরে। সম্ভবতঃ রীটা অ্যালেন সেই অঞ্চলের বাসিন্দা। মাত্র এই দুটো সূত্রই আমাদের হাতে আছে। এরপর থেকে তোমাকে এগোতে হবে।

আশা করি এই দু'জনের একজনের কাছে ম্যালোরীর হদিশ পাবে।

করিডন বলল, ঠিক আছে দেখা যাক কি করতে পারি। সম্ভবতঃ তোমরা এইখানেই থাকবে।

তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব।

আমরা এখানে থাকব কিনা বলতে পারছি না। থাকতেও পারি, অন্য কোথাও যেতেও পারি।—রনলি বলল, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখ। যদিও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা খুব কঠিন।

হাসল করিডন, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি পালাব না। কাজ শুরু করব। মনে হচ্ছে কাজটা খুব আকর্ষণীয় হবে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে সে বলল, পিস্তলটা রেখে যাচ্ছি। জনের কাজে লাগতে পারে। আমার নিজের বন্দুক আছে। ম্যালোরীর চেহারার বর্ণনা তোমার কাছে আছে বললে না?

রনলি পকেট থেকে একটা খাম বের করে বলল, এর মধ্যে সব পাবে।

করিডন হাসল। খাম, টিপে দেখে সে বলল, সব? টাকাও? না, টাকা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল এখন অর্ধেক—বলনি?

জিনি কাপবোর্ডের কাছে গিয়ে ভেতর থেকে একটা চামড়ার ব্রীফকেস বের করে এনে বলল, তোমাকে চুক্তিপত্রে সই করতে হবে।

নিশ্চয়ই করব।

রনলি কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল।

ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, টেবিলের উপর টাকাটা রাখলে হয় না? তোমাদের অবিশ্বাস করছি ভেব না—ব্যাপারটা স্রেফ ব্যবসা। তাই না?

জিনি তিন বান্ডিল এক পাউন্ডের নোট টেবিলের উপর রাখল। আঙুলগুলো বন্দুকটার কাছে রাখল। করিডন চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবার ইচ্ছা থাকলে কি বন্দুকটা ফিরিয়ে দিতাম?—জিনিকে করিডন বলল।

টাকা গুনে নাও।—জিনি বলল।

তোমরা তো চাইছ কাজটা আমি করি তাই না,—করিডন বলল—আমাকে কাজটা দিতে তোমাদের একবারও বলিনি। তাই কাজটা যদি আমাকে দিয়ে করাতে চাও টাকা দিতেই হবে।

টাকা গুনে নাও।—মেয়েটার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

গুনছি।—টাকা গুনে কাগজে সই করে করিডন বলল, চললাম এখন। আমরা এমিথিস্ট ক্লাবে কাল দেখা করতে পারি কি বল?—উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল, আশা করি তোমাদের জানাতে পারব কতটা এগোতে পেরেছি, তাই না?

ঠিক আছে।—রনলি বলল, আমরা চটপট কাজ চাই। টাকাগুলোর মূল্য আমাদের কাছে অনেক।

আমার দায়িত্ববোধ আছে।

তোমার উপর নির্ভর করছি।

ঠিক আছে। আমার সই করা চুক্তিপত্র তোমার কাছে। জিনি কিছু বলল না, সে কঠিন দৃষ্টি মেলে করিডনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাহলে চলি। করিডন বলল, খুব শীঘ্র দেখা হবে। তারা কিছুই বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে করিডন লক্ষ্য করল, তামাকের দোকানের লোকটি সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে টাওয়ার তৈরী করতে ব্যস্ত—তার দিকে তাকালে করিডন চোখ টিপল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক।।

করিডন কখনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। লন্ডনে ফেরার পর সে সেন্ট জর্জ হাসপাতালের পেছনে গ্যারেজের উপরে তিন ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে বাস করছে। একজন মহিলা এসে প্রতিদিন ফ্ল্যাট পরিষ্কার করে দিয়ে যায়।। খাওয়া-দাওয়া বাইরে সেরে নেয়। বসবার ঘরটা কখনো ব্যবহার করে না। স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। দিনের বেলা সবসময় ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে।

বেডরুমটাও স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। একটা উঁচু প্রাচীর আলো আসার পথ আড়াল করে আছে।

অসুবিধে আর বাসস্থানের পরিবেশ নিয়ে কখনও করিডন মাথা ঘামায় না। তার কাছে একটা ফ্ল্যাটের অর্থ রাতে ঘুমানোর জায়গা ছাড়া আর কিছু নয়। জায়গাটা ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছি। অন্য গ্যারেজগুলোর উপরের ঘরগুলোতে আছে কয়েকটি ফার্মের অফিস। ছটা বাজলেই তারা বন্ধ করে চলে যায়। পরদিন সকালের আগে খোলা হয় না। তার উপর গুপ্তচরগিরি করবার মত কেউ নেই। রাতে ফ্ল্যাটটা একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

সাধারণতঃ অন্যদিন যে সময়ে ফেরে আজ তার আগেই ফিরল করিডন। শেফার্ড মার্কেটের কাছে একটা হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে পিকাডিলি থেকে হাইড পার্ক কর্ণারে হেঁটে এল। নটা বাজার কয়েক সেকেন্ড আগে করিডন ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছাল। ঘরে ঢুকেই শুনল বিগ বেন পিটিয়ে সময় নির্দেশ করছে।

শেষ ঘণ্টা পড়তেই দরজা বন্ধ করল করিডন। গা থেকে কোট খুলে ফেলার আগে পকেটে রাখা জিনিসগুলো একটা একটা করে বের করে রাখল। খামটা নজরে পড়ল, এটা রনলি দিয়েছে। আবার সেটা পকেটে রেখে দিল এবং পরে খামটার কথা একেবারে ভুলে গেল। বেডরুমে এসে বিছানার উপর বসল। যথেষ্ট ক্লান্ত লাগছে। গত রাতে খুব কম ঘুম হয়েছে। একটা সিগারেট ধরাল বিছানায় আধশোয়া হয়ে। প্রথমে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড। তারপর গেছে কেনসিংটনে একটা ছবির মত বাড়িতে, সেখানে এফির সম্পর্কে একজন প্লাস্টিক সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে। গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে অত্যাচারিত হওয়ার পর এই ডাক্তার হাসপাতালে তার জন্য যথেষ্ট করেছিলেন। এফিকে দেখাবার জন্য মোটামুটি একটা তারিখও ধার্য হয়েছে।

করিডনের খামটার কথা মনে পড়ে গেল। পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা কাগজপত্রর বিষয়বস্তু কৌতূহলশূন্য মনে পড়তে লাগল।

ব্রায়ান ম্যালোরী।

জন্ম ঃ চৌঠা ফেব্রুয়ারী, উনিশশ ষোল।

দৈহিক বর্ণনা ঃ—উচ্চতা ঃ ছয় ফুট এক ইঞ্চি, ওজন ঃ একশ বিরাশি পাউন্ড, চুল ঃ গভীর বাদামী, চোখ ঃ হালকা বাদামী বর্ণ। গায়ের রঙ ঃ ফর্সা, রোদে পোড়া। বিশেষত্ব ঃ বন্দী ক্যাম্প থেকে পালাবার সময় কণ্ঠনালীতে আঘাত লাগায় গলার স্বর কিছুটা নষ্ট হয়েছে। ফিসফিস করে কথা বলে, চেঁচাতে পারে না বা উচ্চস্বরে কথা বলতে পারে না। তবে অনুশীলনের ফলে কণ্ঠস্বরে স্পষ্টতা এসেছে।

অভ্যাস ঃ যখন রেগে যায় বাঁ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে। যখন খুশি হয় দুহাত সজোরে একত্র করে হাতে হাত ঘষে। সিগারেট ধরে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে। দেশলাই কাঠি জ্বালে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের চাপে।

করিডন মুখে অস্ফুট শব্দ করে, পাতা উল্টে পড়তে লাগল ঃ

আপনজন ঃ যতদূর জানা যায় মিস হিলডা ম্যালোরী ছাড়া আর কেউ নেই। ভদ্রমহিলা থাকেন ওয়েন ডোভারে 'দি ডেল' নামে একটা বাড়িতে।

তিনি সম্পর্কে ম্যালোরীর মাসীমা হন। এই ভদ্রমহিলা, ম্যালোরীর চার বছর বয়সে যখন মা মারা যান তখন থেকে মানুষ করেছেন। বাবার সাথে ঝগড়া হওয়ার পর তাদের মধ্যে খুব কমই দেখা সাক্ষাৎ হত। এসব সত্ত্বেও বাবা উইলে তার নামে বেশ কিছু অর্থ রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুখ বিকৃত করল করিডন। আর পড়তে ভাল লাগছে না। কয়েকপাতা এখনো বাকি আছে। কাগজগুলো দলা পাকিয়ে চুল্লিতে ছুঁড়ে দিল।

এখনি পোষাক পালটে বিছানায় আশ্রয় নেবে সে। করিডন চোখ বুজে শুয়ে রইল। অর্ধ ঘুমন্ত অর্ধ জাগরিত অবস্থায় তার মনটা ভেসে চলতে লাগল।

।। এক।।

সে স্বপ্ন দেখতে লাগল মারিয়া হফম্যান তার বিছানার পাশে বসে আছে। সাদা হাত দুটি কোলের উপর জড়ো করা। তার মুখ গুঁড়িয়ে গেছে আর রক্তপাত হচ্ছে। মেয়েটাকে গুলি করবার পর এই অবস্থায় সে তার পায়ের কাছে পড়েছিল। কি যেন বলতে চাইছে মেয়েটা কিন্তু মুখ নেই বলে বলতে

পারছে না। শুধু গভীর গর্তে বসা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই গর্তে চোখ নয় বেরিয়ে আছে কিছু দাঁত। করিডন বুঝতে পারছে কিছু বলতে চাইছে মারিয়া। এই প্রথম যে স্বপ্নটা দেখল তা নয়। প্রত্যেকবারই দেখেছে মেয়েটা তাকে কিছু বলতে চাইছে যা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বলতে পারছে না।

দরজায় নক হতেই করিডনের ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার নক হল। বিছানা থেকে নেমে বসবার ঘরে গিয়ে আলো না জ্বেলে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। জিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও তার পরনে কালো স্ল্যাকস আর কালো সোয়েটার। মাথায় এখন টুপী নেই। হাতদুটি ট্রাউজারের পকেটে ঢোকান। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট গোঁজা।

করিডন জিনিকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বেলে সিঁড়ি অতিক্রম করে দরজা খুলল।

ভেতরে এস।—করিডন বলল, একা এসেছ?

হ্যাঁ।—মেয়েটা ভেতরে ঢুকল।

সিধে ওপরে চলে যাও।

জিনি সিঁড়ি অতিক্রম করে বসবার ঘরে এল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডনের মুখোমুখি হল।

হঠাৎ এখানে আসার প্রয়োজন পড়ল কেন?—করিডন বলল, গতরাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি।

জিনি কিছু বলল না। সে মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারিদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

পান করবে নাকি?—আলমারী থেকে এক বোতল জিন বের করল, কোথায় যেন ভারমুথ রেখেছি।

চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। মেয়েটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

করিডন একগ্লাস মদ মেয়েটার কাছে টেবিলের উপর রাখল। সে বলল, নিজের ঘর মনে কর।

সহসা মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি শুধু প্রতিজ্ঞা কর, কিন্তু রাখ না।

ঠিকই বলেছ।—আমি কথা রাখি না সব সময়, অর্থ রোজগারের সুবিধাজনক পথ কি বল?

ঠিক বলেছ।

যারা টাকা দেয় তাদের করবার কিছু থাকে না।

না, থাকে না। যে কাজের ভার আমায় দেওয়া হয় তা তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন হয় না। তবে তোমার কাছে তো সইকরা চুক্তিপত্র আছে। কাজে লাগাতে পার।

মেয়েটি সিগারেট নিবিয়ে জিন আর ভারমুথ মেশানো মদের গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, আমার ধারণা ক্রিড তোমাকে বলেছে আমাদের কাগজপত্র আইনসম্মত নয়, তাই আমাদের এখানে থাকার অধিকার নেই।

হ্যাঁ বলেছে। তোমাকে খুব আশাবাদী বলে মনে হয়েছিল, তুমি আমার কাছে যখন চুক্তিপত্র চাইলে।

কি বল? ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার ইচ্ছা তোমার নেই?

অবশ্যই নেই। যদি কাউকে খুন করতে চাও, কাজটা তো নিজেকেই করতে হবে। যাকে কোনদিন চোখে দেখিনি তাকে খুন করব এ ধরনের আশা তুমি করতে পার না।

তবু তুমি টাকা নিয়েছ।

সব সময় টাকা নিয়ে থাকি। একটা সিগারেট খাবে নাকি?

দাও।—জিনি একটা সিগারেট নিল।

মানুষের উচিৎ নয় এইসব বাজে কাজ নিয়ে আমার কাছে আসা।—করিডন বলল, আমাকে না ঘাটানোই উচিৎ।

জিনি পায়ে পা তুলে বসল। তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। করিডন অবাক হল। সে বলল, ভাবলাম এতোগুলো টাকা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

আসার পর এই প্রথম জিনি মৃদু হাসল। সে বলল, তুমি কি আমায় বোকা ঠাওরেছ?

ঠিক বোকা নয়। একটু সাদাসিধে।

চুক্তিপত্র চেয়েছি বলে?

চুক্তিপত্রে সই নেওয়ার অধিকার কি তোমার আছে?

না, নেই। তোমাকে অন্য কারণে সই করতে বলেছি।

করিডন সজাগ হয়ে উঠল, কারণটা জানতে পারি? গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে মেয়েটি বলল, আরও একটু মদ পেলে ভাল হত।—শোন, ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার জন্য তোমায় প্ররোচিত করতে এসেছিলাম।

ভাবছি, তুমি ভাবলে কি করে আমায় প্ররোচিত করতে পারবে?

কাজটা তুমি করবে না? লোকটা বিশ্বাসঘাতক। ওর সরাই উচিৎ। দুবছর আগেও তুমি কোন বিশ্বাসঘাতককে বরদাস্ত করতে না।

তখন নির্দেশমত কাজ করেছি, আমার নিজের পছন্দ অপছন্দের কোন অবকাশ ছিল না।

পিয়েরীর চরিত্র জানলে তুমি ইতস্ততঃ করতে না।

সত্যিই জিনি পিয়েরীকে চিনি না। হাজার পিয়েরী দেশময় ছড়িয়ে আছে। তোমরা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলে বলেই—

জিনি চকিতে উঠে দাঁড়াল, চোখ দুটি জ্বলছে।সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, তুমি ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবে কি না বল?

নিশ্চয়ই না। নিজের চরকায় নিজেই তেল দাও।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

জিনি করিডনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সোফার উপর বসে পড়ল। তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, জানতাম তুমি এমনই কিছু করবে। কিন্তু রনলি বলেছিল সে তোমায় বিশ্বাস করে।

রনলির মত লোকেরা বিশ্বাসই করে থাকে।

কাজটা তুমি স্বেচ্ছায় করতে না চাইলে জোর করে করাতে হবে।

বাঃ, চমৎকার বলেছ কি বল?

আমরা তোমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না। তোমায় বলেছি ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে, জানি তুমি খুঁজে বের করবে।

এতখানি নিশ্চিন্ত হলে কি করে?

জিনি কিছুক্ষণ কিছু কথা বলল না। তারপর করিডনের চোখে চোখ রেখে বলল, ক্রিড মারা গেছে।

করিডনের মনে পড়ল ক্রিড বলেছিল, ওরা আমাকে খুন করবে—

তার মনে একটা চিন্তা খেলে গেল ঃ আমি কি এই তিনজনকে ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছি না, নাকি মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে?

তুমি মিথ্যে কথা বলছ—করিডন বলল, ক্রিডকে গুলি করে মারবার সাহস তোমাদের কারো নেই।

কোন কথা বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল জিনি। করিডন একটা সিগারেট ধরাল। সে বলল, আমার উপর দোষ দেওয়ার চেষ্টা করলে তোমাদের তিনজনকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলব।

সফল হবে বলে মনে হয় না।—জিনি বলল, কেউ জানে না যে আমরা ক্রিডের ফ্ল্যাটে ছিলাম। ক্রিডের ব্যাপারে আমাদের জড়াতে পারবে না।

ভেব না পুলিশ আমার বক্তব্য শোনবার পর তোমাকে এখান থেকে বের হতে দেবে, তারা আমার বক্তব্য আগে শুনবে তারপর তোমাকে তাদের লোকের হাতে তুলে দেব।

ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতেই হবে।—সে কথায় কান না দিয়ে জিনি বলল, তোমায় তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল।

তারপর?

যদি সঠিক সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করতে না পার তাহলে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব আমাদের ইওতা দিয়েছ কি না। আমরা সবরকম সাবধানতাই অবলম্বন করেছি। পিস্তল আর চুক্তিপত্র একটা জে·

ফার্মের সলিসিটারের কাছে দিয়ে বলা হয়েছে যে যদি আমাদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে ফোনে তার সাথে যোগাযোগ না করে তাহলে জিনিসগুলো তিনি যেন পুলিশের হাতে তুলে দেন অবিলম্বে।

জিনি উঠে দাঁড়াল।

।। তিন ।।

করিডন আধঘন্টার মধ্যে ক্রিডের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল। সে নিশ্চিত যে তাকে কেউ অনুসরণ করেনি। ভেতরে ঢুকে হলঘরে এসে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বসবার ঘরে ঢুকল। টর্চের আলোয় সারা ঘর খুঁটিয়ে দেখল। কাউকে দেখতে পেল না। দরজা আর জানালায় পর্দা ঝুলছে। জানলার সামনে মেঝের উপর পড়ে আছে ট্যুলিপ ফুলের পাপড়ি। দু-ঘরের মাঝের দরজার কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলল অন্ধকারাচ্ছন্ন পাশের ঘরে। সেই আলোয় একে একে দেখা গেল বিছানা পাতা একটা খাট, আরাম কেদারা, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়াড্রোব, ফুলদানী আর লাল রংয়ে মেলান একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলছে হুক থেকে। তারপর মেঝের উপর টর্চের আলো ফেলতেই তার নজরে পড়ল, খাটের পাশে ভেড়ার লোমের কম্বলের উপরে পড়ে আছে ক্রিড।

একটা অস্ফুট আর্তস্বর ছিটকে বেরিয়ে এল করিডনের গলা থেকে। সে ক্রিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। খুব কাছ থেকে ক্রিডের মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বুলেট তার কপালে একটা পরিষ্কার গর্ত সৃষ্টি করেছে। এ কাজ জন ছাড়া আর কারো নয়। হঠাৎ ক্রিডকে গুলি করে মারা হয়েছে, কারণ তার চোখেমুখে ভয়ের কোন ছাপ পড়েনি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে।

করিডন কয়েক পা পিছিয়ে এল। প্রয়োজনের বেশী সময় এ ফ্ল্যাটে থাকা ঠিক হবে না। ক্রিড যে মৃত এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। মেয়েটা যে মিথ্যে কথা বলবার মানুষ নয় তা ভাল করেই বুঝেছে। যদি তাকে কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে থাকে তো—

হঠাৎ আলো নিভিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল করিডন। উৎকর্ণ হল। কিছু যেন পড়ে গিয়ে ভাঙার শব্দ হল, নাকি যা শুনল তা স্রেফ কল্পনা। উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে রইল কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না। তবে কি পাশের ঘরে কেউ আছে? তার পায়ের ধাক্কায় কি কিছু ছিটকে পড়ল?

করিডন এগিয়ে গেল, হাতে ধরা টর্চ যে কোন মুহূর্তে জ্বালবার জন্য প্রস্তুত। তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল, সন্তর্পণে এগিয়ে এল।

গাঢ় অন্ধকার থেকে কেউ বলল, রনলি নাকি?

করিডন অনুমান করতে পারল না ঠিক কোনদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কে কথা বলছেন?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে, এক হাঁটু ভেঙ্গে সে বসে পড়ল। এক অবর্ণনীয় অনুভূতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

ক্ষণেকের জন্য এক ঝলক আগুন অন্ধকার দূর করে দিল। ঘর যেন কেঁপে উঠল। বুলেটটা তার মুখের পাশ দিয়ে তাপ ছড়িয়ে ছুটে গেল। সে দু পা পিছিয়ে গেল। কেউ বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েছে। দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়তেই সে মেঝের মধ্যে শুয়ে পড়ল। খোলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আলতো পদক্ষেপের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল।

করিডন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। গালে হাত বুলাল। আঙ্গুলে রক্ত জড়িয়ে গেল। চাপা কণ্ঠস্বর আর ফিস ফিস করে কথা বলা দেখে তার মনে হয়েছে, যে লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে সে ম্যালোরী ছাড়া আর কেউ নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছদ

।। ১ ।।

যদিও রীটা অ্যালেন কেমন দেখতে জানত না তবু তাকে দেখামাত্র করিডন ঠিক চিনতে পারল। ম্যাস্টিস অ্যান্ড রবার্টসের মোজা বিক্রির কাউন্টারে যে তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মা

নিশ্চয়ই একজন ম্যালোরীর বান্ধবী হবে। অন্য দুজন বয়স্কা মহিলা চেহারায় ক্লান্তির ছাপ আর পরনে সাধাসিধে পোশাক। রীটা অ্যালেনের চেহারা তরতাজা আর পোশাকে অভিনবত্ব আছে।

আপনাকে কি কিছু দেখাব?—রীটা হাসি মুখে করিডনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

রীটার বয়স হবে উনত্রিশের মত। কিংবা ত্রিশও হতে পারে। চেহারায় যৌনাবেদন আছে। সে এমন একজন নারী যার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। চেহারায় নেই তেমন প্রসাধন আর বেশ ভূষার আড়ম্বর।

বন্ধুত্বের হাসি হাসল করিডন। প্রত্যুত্তরে মেয়েটিও হাসল।

দেখুন কিছু উপহার এক নব দম্পতিকে দিতে হবে।

তাহলে একটা হাত-ব্যাগ বা ওই ধরনের কিছু দিন না কেন?

শেষ পর্যন্ত তাই দিতে হবে। যাহোক, এ দোকানে না এলে আপনার দেখা পেতাম না। যেখান থেকে আমি এসেছি ওখানে আমরা মেয়েদের রূপের প্রশংসা করি। অবশ্য যদি সে রূপবতী হয়। তাই আমি যদি আপনার রূপের প্রশংসা করি তাহলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন?

না হব না। তবে সাধারণতঃ এমন দেখা যায় না।

হয়ত তাই, যাকগে সে সব কথা। আজ রাতে কি আপনার সঙ্গ পাওয়া সম্ভব হবে? যদি আশা দেন তো দোকান বন্ধ হওয়ার পর পেছনের দরজায় অপেক্ষা করতে পারি।

মৃদু হেসে সুন্দর চোখ দুটি মেলে মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, আশা দেওয়া সম্ভব না। কারণ কোন অচেনা পুরুষের সাথে আমি বাইরে যাই না।

তা ঠিক। আমার মত একজন নিঃসঙ্গ আর ধনবান মানুষের জন্য কেন আপনি এত দিনের অভ্যাস ভাঙতে যাবেন।

না, সে রকম কিছু নয়। আসলে এমন কোন মানুষের সাথে আমি বাইরে যাই না, যাকে আগে কখনো দেখিনি।

এই সভ্যযুগে এরকম আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। আমার নাম স্টিভ হেনলে। আপনার?

রীটা অ্যালেন। আমি সত্যি বলছি—

বেশ তো সত্যিই যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমার সাথে মিশবেন না। বিশ্বাস করুন আমি খুবই নিঃসঙ্গ।

আপনার নিঃসঙ্গতার জন্য দুঃখিত। মনে হচ্ছে পুরোন অভ্যাস ত্যাগ করতে পারব। কারো সাথে বাইরে যাওয়ার সম্পর্কে আমার বাছবিচার আছে।

তুমি তাহলে আসছ? খুশি জড়ান কণ্ঠে করিডন বলল।

আসছি।—রীটা বলল, জান তুমিই প্রথম আমেরিকান নও যার সাথে আজ বাইরে যাব। তোমরা জান কি করে কাজ গুছিয়ে নিতে হয়।

ঠিক বলেছ। আচ্ছা যদি আমরা ম্যাডাম বারে রাত আটটার সময় দেখা করি? পারবে আসতে?

পারব।—মেয়েটি বলল, আর করিডনের মনে হল এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

।। দুই ।।

কথা হচ্ছিল রীটার ঘরে বসে। রীটা বলল, তাহলে তুমি তাদেরই একজন। আগেই আমার বোঝা উচিৎ ছিল। কি বোকা আমি। এখান থেকে তুমি চলে যাও। এর মধ্যে আমাকে জড়িও না।

আগে থেকেই তো তুমি জড়িয়ে আছো।—করিডন বলল, হ্যারিস খুন হয়েছে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে রীটা বলল, শুনতে চাই না। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমার কোন সম্পর্ক নেই ম্যালোরীর সাথে।

তুমি খুব সহজে নিষ্কৃতি পাবে না।—করিডন রীটার একটা হাত চেপে ধরল, খুন করা হয়েছে হ্যারিসকে।

যেতে দাও আমাকে।—হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল রীটা।

আমার কোন দোষ নেই।

ম্যালোরী ওকে খুন করেছে। ও এখানে হ্যারিসের প্রতীক্ষায় ছিল।

তুমি একটা আস্ত পাগল। এখানে ছিল না ম্যালোরী। লোকটা নিজেই মরেছে।

কিন্তু আমি জানি ম্যালোরী খুন করেছে। প্রমাণ আমার হাতে আছে। আমি ওকে খুঁজছি। কোথায় পাব বলতে পার?

জানলেও তোমায় বলতাম না। তাছাড়া সত্যিই আমি জানি না। এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না।—ঘরের চারিদিকে হিংস্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রীটা বলল, নিজেকে জড়াব না।

হয় আমাকে বল নাহলে পুলিশকে বল। পুলিশের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রীটার চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। করিডনের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে বলল, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম এমন ফ্যাসাদে পড়ব তাহলে ওর সাথে মেলামেশা করতাম না।

এসব শুনতে চাই না। অসহিষ্ণুর মত নড়েচড়ে করিডন বলল, কোথায় তাকে পাব তাই বল।

জানি না। ওর সম্বন্ধে খুব কমই জানি। শুধু মাঝে মাঝে ফোন করে। কোথায় তার বাসা তাও জানি না।

জানা না থাকলে জানিও না।—টাকা ব্যাগে ভরে করিডন রীটার দুচোখে মিনতি মাখা দৃষ্টি দেখে বলল, মনের পরিবর্তন হল নাকি?

টাকা প্রয়োজন নেই একথা বলতে পারব না। আছে, প্রয়োজন আছে। সপ্তাহ শেষ না হলে খাবার জোগাড় করতে পারব না।

টাকাটা তাহলে রাখ।—ম্যালোরী কখনো তোমায় লেখেনি?

সামান্য ইতস্ততঃ করে রীটা বলল, আমাদের ঠিক প্রথম সাক্ষাতের ঠিক পরেই লিখেছে।

কোন ঠিকানা নেই সেই চিঠিতে?

না।

খামের উপর পোস্ট অফিসের কোন ছাপ ছিল না?

মনে পড়ছে না।

মনে নিশ্চয়ই পড়ছে। এইটাই প্রথম জিনিস যা তুমি লক্ষ্য করেছ। কোন পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল?

দুনবার।

ওকি কখনো বলেছিল দুনবারে থাকে?

মনে হচ্ছে এর কাছাকাছি কোথাও থাকে। একবার বলেছিল একটা দ্বীপ কিনে বাড়ি তৈরী করবে।

জায়গাটা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

না।

এখানে কতদিন অন্তর আসে?

যখন ওর খুশি হয়। কখনো সপ্তাহে দুবার আসে, আবার মাস দুয়েক কোন পাত্তা পাওয়া যায় না।

তার মানে কয়েক সপ্তাহ আগে শেষবার তুমি ওকে দেখছ? কত সপ্তাহ আগে মনে আছে?

ছয়—সাতও হতে পারে, সঠিক মনে করতে পারছি না।

ওর কোন বন্ধুর নাম কখনো বলেছে?

না। নিজের কোন কথা বলত না।

বিশ্বাস হল না করিডনের। সে বলল, বলার মত আর কোন কথা আছে? ওর কোন আত্মীয়-স্বজন আছে নাকি?

এক বোন আছে।

খবরটা কাজের। দ্বীপে একটা বাড়ি। ওয়েন ডোভারে থাকে মাসীমা আর এখন জানা গেল একজন বোনও আছে।

তুমি জানলে কি করে? করিডন জানতে চাইল।

সামান্য ইতস্ততঃ করে রীটা বলল, একবার ফোন করে ওর খোঁজ করেছিল।

কবে ফোন করেছিল?

অনেকদিন আগে। আমাদের পরিচয়ের ঠিক পরেই।

কোন টেলিফোন নাম্বার মেয়েটা তোমায় দিয়েছিল?

দিয়েছিল। ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম।

নাম্বারটা কি?

রীটা বুঝতে পারল দরদস্তুর করবার এই হল সুযোগ।

সে বলল, পাঁচ পাউন্ডের বেশী কি পাব না? আমার অবস্থা কত যে খারাপ তুমি বুঝবে না।

টেলিফোন নম্বর কত?

ঠিক মনে পড়ছে না।—চোখমুখ কঠিন দেখাল।

বেশ তো। তুমি পাঁচ পাউন্ড পেয়েছ বাকি পাঁচ পাউন্ড আমার কাছেই থাক।—করিডন উঠে দাঁড়াল এবার ফিরব অনেক হয়েছে।

তোমার দলেব লোকদের মত তুমিও দেখছি কঠিন মানুষ।—রেগে গিয়ে রীটা বলল, আরো আট পাউন্ড দাও, আমি বলব।

পাঁচ, নিলে নাও, না হলে থাক।

বেশ। তুমি অপেক্ষা কর এখানে। নাম্বারটা নোট বুকে লেখা আছে। নিয়ে আসছি।

রীটা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সম্ভবতঃ সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠতেই একটা হিমেল আর্ত চীৎকার তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। করিডন দরজার সামনে ছুটে গেল। দেখল সিঁড়ির কাছে মেঝের উপর দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে বীটা। তার মাথা বেঁকে এসে পড়েছে ঘাড়ের উপর। একটা নগ্ন পা সিঁড়ির উপর রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

করিডন যখন নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার তালার গর্ত পাওয়ার জন্য হাতড়াচ্ছে, একটা লোক ঝমঝমে বৃষ্টি মাথায় করে অন্ধকারের মধ্য থেকে নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়াল। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে করিডন বন্দুকের অর্ধেকটা বের করতেই লোকটি বলল, ভয় নেই। আমি রনলি।

এমন চুপচাপ কি করছ এখানে?—রেগে গিয়ে করিডন প্রশ্ন করল।

তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে রনলি বলল, কথা বলতে চাই।

বেশ তো, ভেতরে এসো।—সদর দরজার তালা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসবার ঘরের সামনে এল। তারপর গা থেকে ট্রেঞ্চ কোট খুলে সে বলল, কি হয়েছে?

ক্রিডকে ওরা খুন করেছে।—চাপা কণ্ঠে রনলি বলল। ভাবলেশ শূন্য দৃষ্টিতে করিডন তার দিকে তাকাল। ক্রিডের মৃত্যুর পর থেকে যা যা ঘটেছে সে সব তার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

তাতে কি হয়েছে? খবরটা কি তুমি শুধু একাই জেনেছ?

তুমি তাহলে আগেই জেনেছ? মুখ মুছে রনলি বলল, খবরটা এখনো কাগজে বের হয়নি, তাই না?

না, কাগজে বের হয়নি। সেই কথা বলতে জিনি মেয়েটা গতরাতে আমার কাছে এসেছিল। পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই রকম, যদি আমি ম্যালোরীকে খুঁজে না পাই তাহলে সে বন্দুক আর চুক্তিপত্র পুলিশের হাতে তুলে দেবে। বন্দুকের গায়ে আমার আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাবে আর চুক্তিপত্র থেকে আমার মতলব প্রকাশ পেয়ে যাবে। ওদের আস্থা আছে নাকি তোমার উপর?

রনলিকে দেখে মনে হল হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। গা থেকে বর্ষাতি খুলে মেঝের উপব ছুঁড়ে ফেলল।

সে বলল, ওভাবে ওকে খুন করা হয়েছে কিনা তাই বিশ্বাস হচ্ছে না। মেয়েটা পাগল। পাগল

ওরা দুজনেই। আর আমি একটা বুদ্ধু। নাহলে ওদের সঙ্গে কাজে নামি।

হঠাৎ তোমার বিবেক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল নাকি হে? করিডন প্রশ্ন করল, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন তুমি ম্যালোরীকে খুন করতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলে।

ভাবিনি ওরা লোকটার দেখা পাবে।—ইতস্ততঃ করে মৃদুকণ্ঠে রনলি বলল, ওদের পরিকল্পনার উপর তেমন গুরুত্ব দিইনি। সত্যি বলছি। আমি পুলিশের কাছে যাবো। এই খুনের সঙ্গে আমি কোন ভাবেই জড়িত থাকতে রাজি নই।

একটু দেরী করে ফেলেছ হে।—করিডন বলল, এখন পুলিশের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। আমাদের যা করতে হবে তা হলো ম্যালোরীকে খুঁজে বের করা। আর কাজটা যত শীঘ্রই করা যাবে ততই ভাল।

তুমি কি বুঝতে পারছ না,—রনলি চেয়ারের হাতলে ঘুঁষি মেরে বলল, আমি যদি পুলিশের কাছে সব খুলে বলি কি ঘটেছে তাহলে তুমি জড়িয়ে পড়বে না। আমি ক্রিডের খুনের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাই না।

পুলিশ অনেকদিন থেকেই আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে।

করিডন ছোট ছোট পায়ে সারা ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, তোমার কথা ওরা কানেই নেবে না। তাছাড়া আগামীকাল ওরা আমাকে আর একটা খুনের অভিযোগে খোঁজাখুজি আরম্ভ করে দেবে।

রনলি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আর একটা খুন? তুমি কি বলতে চাইছ?

আমি রীটা অ্যালেনের সঙ্গে তার বাড়ি গিয়েছিলাম। সে সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে।

ওটা তো খুন নয়—

নয় বলছো?—করিডন বলল, ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয়েছে। আসল কথা হলো আমি উপস্থিত ছিলাম। তার বাড়ি আমরা যে ট্যাক্সি কবে গেছি তদন্তের সময় ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমার চেহারার বর্ণনা দেবে। আমি যখন ক্রিডের ফ্ল্যাট ছেড়ে আসছিলাম তখন নীচে তামাকের দোকানের লোকটা আমায় দেখেছে। আজ হোক আর কাল হোক, সেও আমার চেহারার বর্ণনা দেবে। যার একটু বুদ্ধি আছে সে দুয়ে দুয়ে যোগ করতে অসুবিধা বোধ করবে না। আর যোগফল নিশ্চয়ই পাঁচ হবে না।

কিন্তু কে ওকে ধাক্কা দিল?—রনলি সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, কি করে জানলে ওকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে?

অনুমান করতে পারছ না? আমার মনে হচ্ছে একাজ ম্যালোরীর।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

একথা বলছ কেন?—করিডন বলল, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় তোমার ধ্যানধারনা ছিল শুধুমাত্র ম্যালোরী। সে কেমন লোক আমরা জেনেছি। লোকটা একজন খুনী। হঠাৎ এমন কি ঘটল যে তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

বিমর্ষভাবে রনলি বলল, আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা। নিজেকে কখনই সাবালক ভাবতে পারলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমি অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের বই পড়তে ভালবাসতাম। সস্তা ধরনের উত্তেজনার আগুনে নিজেকে উত্তপ্ত করতে ভাল লাগত। আমাকে যখন জিনি ম্যালোরীর কথা বলল, ব্যাপারটা আমার মনকে নাড়া দিল।

হ্যারিসের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার কাছে জীবনটা মনে হচ্ছিল বইয়ে পড়া অ্যাডভেঞ্চারের মত। এই মৃত্যু আমার কাছে প্রথম আঘাত, যদিও আমি বিশ্বাস করিনি যে, এই খুনে ম্যালোরীর কোন হাত আছে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিল। জলকে খুব ভয় পেত। তার মৃতদেহ পাওয়া গেল একটা পুকুরে। সে যদি ঘটনাচক্রে পুকুরে পড়ে যেত তাহলে তার চোখমুখে ভয়ের ছাপ থাকত। সাঁতার জানত না। এখনও বিশ্বাস হয় না যে ওকে ম্যালোরী খুন করেছে।

তারপর মারা গেল লুবিস। তার মৃত্যু সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করব বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা হতে পারে। জিনি জোর দিয়ে বলল, কাজটা ম্যালোরীর, কিন্তু সে জানল

কি করে? লুবিস ট্রেন থেকে পড়ে যেতে পারে। আমি শপথ করে বলতে পারি যে সে গেস্টাপোর ভয়ে পিয়েরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। লোকটার মধ্যে বিন্দুমাত্র কাপুরুষতা ছিল না। এখন স্বীকার করছি আমি দুঃখিত। তোমাকে এরমধ্যে টেনে আনার জন্য সত্যিই দুঃখিত।

আমিও দুঃখিত।—করিডন কঠোর কণ্ঠে বলল।

সত্যি বলতে কি আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি যে সত্যিই সে তোমাকে দিয়ে ম্যালোরীকে খুন করাতে চায়। এখন বুঝতে পারছি তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। জিনি ঘর পেয়েছে চ্যানসারী লেনে একটা ছোট হোটেলে। ও সেখানে চলে গেছে। দিনের শেষে আমাকে জিনি জানাল যে ক্রিড মারা গেছে। তবে বিস্তারিতভাবে কিছু বলল না, তবে জনের চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম যে তাকে গুলি করে মেরেছে। তখনই ঠিক করে ফেললাম আমি কি করব। এদের সঙ্গে আমি আর থাকব না। মনে হল, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে দেখা করাই ঠিক হবে।

আমার সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হয়েছে, কি করতে চাও এখন?

জানি না। পুলিশের কাছে যাব ভাবছিলাম, তবে তুমি যদি বারণ কর তাহলে—কি করব বুঝতে পারছি না।

পুলিশের কাছে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না—অসহিষ্ণু কণ্ঠে করিডন বলল, এখন আমাদের কাজ হবে ম্যালোরীকে খুঁজে বার করা। তুমি কি জান ওর এক বোন আছে?

আছে নাকি?

আমাকে বলেছে রীটা অ্যালেন। ম্যালোরীর বোন তাকে কয়েক বছর আগে ফোন করে নিজের টেলিফোন নাম্বার জানিয়েছিল। মেয়েটার নাম অ্যান ম্যালোরী আর তার ঠিকানা হল, ২এ, দি স্টুডিওস, চেইনী ওয়াক। একটা ঘুম দেওয়ার পর তার সাথে দেখা করবার ইচ্ছা আছে—সে চিবুকে লাগান প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে বলল। আরেকটা ব্যাপার তোমাকে বলা হয়নি। আমি ম্যালোরীর খোঁজে নেমে পড়েছি—তারপর সে রনলিকে জানাল ক্রিড-এর ফ্ল্যাটে যাওয়া আর সেখানকার ঘটনা।

ও তোমাকে ভেবেছে বুঝি আমি?—বিস্ময়ে রনলি বলল, আমি কখনও ওর ক্ষতি করিনি।

যদি তার খুন করবার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে পালিয়ে না গিয়ে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়ত—করিডন বুঝিয়ে বলল।

রনলি একেবারে ঘাবড়ে গেছে। সে বলল, তুমি নিশ্চিত যে গুলি ম্যালোরীই ছুঁড়েছিল।

যেই ছুঁড়ে থাকুক না কেন, তার কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর। তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল। কে হতে পারে লোকটা?

হ্যাঁ,—রনলি বলল, লোকটা ম্যালোরী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

পরের দিন সকালে রনলি তখন কফি তৈরী করতে ব্যস্ত, কাল রাতে সে করিডনের ফ্ল্যাটেই ছিল। দশটার কিছু পরে করিডন রান্নাঘরে এল।

খবরটা কাগজে বেরিয়েছে—রনলির চোখমুখে চাপা উত্তেজনা, ক্রিডের খবর।

কি লিখেছে?

সাক্ষাৎকার নিতে চায় পুলিশ—তোমার নিজের পড়ে দেখা উচিৎ। কাগজ বসার ঘরে আছে।

রীটার সম্বন্ধে কিছু লিখেছে?

না। তামাকের দোকানের লোকটা তো নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে।

করিডন তিক্ত হাসি হেসে বলল, বলেছিলাম না—দেবে।

সে বসার ঘরে গেল। ক্রিডের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার বিবরণ প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। তামাকের দোকানের দরজার সামনে দাঁড়ান অবস্থায় তামাকওয়ালার একটা ছবি ছাপান হয়েছে। রিপোর্টারদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে সে বলেছে, একজন দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা আর তামাটে গায়ের রঙ, এমন একজন লোককে ক্রিডের মৃত্যুর পর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তার গায়ে ট্রেঞ্চ কোট আর মাথায় টুপী। পুলিশের ধারণা এই লোকটাকে জেরা করতে পারলে ঘটনার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে। ফ্ল্যাট থেকে কিছুই খোয়া যায়নি।

রনলি ট্রেতে করে টোস্ট আর কফি নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল।

রীটার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে প্রকৃত খেলা শুরু হবে।—কাপে কফি ঢালতে ঢালতে করিডন বলল, আমাকে একটা অ্যালিবাই ঠিক করতে হবে।

তোমাকে এই ট্রেঞ্চ কোট আর টুপী ত্যাগ করতে হবে।—রনলি উপদেশের সুরে বলল, যদি পুলিশ এগুলো এখানে পায়—

ঠিক বলেছ। তুমি এগুলো সরাবার ব্যবস্থা করতে পার না? ওগুলো আমি একটা সুটকেসে ভরে তোমাকে দেব তুমি এমিথিস্ট ক্লাবে নিয়ে গিয়ে এফি রজারকে দিতে পারবে না? ওকে বলবে আমি পাঠিয়েছি আর বলবে যতদিন না ফেরৎ চাইছি এগুলো ওর কাছে রেখে দিতে। পারবে?

অবশ্যই।—খুশি হয়ে রনলি বলল, কিন্তু অ্যালিবাই সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?

সে আমি ঠিক করব।—করিডন বলল, এখন শোন আমি ভাবছি তোমার সম্পর্কে। বলছিলে আমাকে এই ব্যাপারে জড়িত করেছ বলে তুমি দুঃখিত। এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তুমি আমায় কি সাহায্য করবে?

নিশ্চয়ই।

তাহলে ওই দুজনের কাছে ফিরে যাও।—রনলি কিছু বলতে উদ্যত হতেই করিডন বলল, এদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করবে। তাছাড়া সেই বন্দুক আর চুক্তিপত্র হাতাবারও সুযোগ পাবে।

রনলি সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিক আছে যথা সম্ভব আমি করবার চেষ্টা করব। তবে ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। যদি ওরা জানতে পারে?

কি আর করতে পারবে? কিছু বলবে না ওদের। ভাব দেখাবে, একটা স্লিপ আমি তোমাকে দিয়েছি, সেটা হারিয়ে ফেলে খুঁজছো। এখন ম্যালোরীর খোঁজে যাচ্ছি। আজ সকালেই ওর বোনের খোঁজে যাবো। এমনও হতে পারে আমাকে তোমার প্রয়োজন, তুমি মেয়েটার ফোন নাম্বার লিখে রাখ। দুপুর পর্যন্ত সেখানে থাকব। তোমাকে কোথায় পাব?

আমরা ব্রেয়ার স্ট্রীটের এনফিল্ড হোটেলে উঠেছি। চ্যানসারী লেনের কাছেই হোটেলটা। একটা খামের গায়ে ফোন নম্বরটা লিখতে লিখতে রনলি বলল।

রনলি সুটকেসটা নিয়ে চলে যাওয়ার পর করিডন বেডরুমের দিকে পা বাড়াতেই ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, কে কথা বলছেন?

আমি—এফি, আপনি মিঃ করিডন?—রুদ্ধশ্বাস একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কণ্ঠস্বর শুনেই সে বুঝতে পারল কোন অঘটন ঘটেছে। এফি তার সাথে আগে কখনো ফোনে কথা না বললেও তার কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারা গেল সে বিভ্রান্ত।

এফি? কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

তোমাকে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলাম। সে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, মিঃ করিডন এখানে পুলিশ এসেছে, জনির সাথে কথা বলতে শুনেছি। ও তোমার ঠিকানা পুলিশকে বলছিল।

কঠিন হল করিডনের চোখ মুখ। সে প্রশ্ন করল, কতক্ষণ আগের ব্যাপার?

মিনিট দশেকের বেশী হবে। ব্যক্তিটি সেই ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্স। কোন খুনের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল।

ঠিক আছে, এফি। চিন্তার কিছু নেই। ফোনের জন্য ধন্যবাদ। একটা সুটকেস তোমার কাছে পাঠাচ্ছি ওটা সাবধানে রাখবে, কারো হাতে ওটা ছেড়ে দেবে না। আচ্ছা ছাড়ছি এফি। আমার তাড়া আছে।

এফি কথা বলবার চেষ্টা করতেই করিডন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। বেডরুমের দিকে ঘুরতেই দরজার গায়ে জোরে টোকা পড়ল। মিসেস জেক্‌কন ঘর পরিষ্কার করতে আসেনি। সে তো রোজ কলিং বেল বাজায়। অনুমান করবার চেষ্টা করল কে হতে পারে। পা টিপে টিপে জানলার সামনে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। দেখল দুজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজন রলিন্স।

এই প্রথম নয়। এমন কোণঠাসা অবস্থায় করিডন আগেও অনেকবার পড়েছে। বেডরুমে ঢুকে আলমারী থেকে একটা হাল্কা রংয়ের ওভারকোট আর একটা টুপী পরে নিল।

খাবার রাখার আলমারীর নীচ থেকে একটা রুকস্যাক বের করল। এতে থাকে জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ভেতর থেকে এক গোছা পাউন্ড নোট বের করে ওভারকোটের পকেটে ভরে ফেলল। তারপর আবার ফিরে এল বসবার ঘরে। রুকস্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে যেতে উদ্যত হতেই দরজার গায়ে আবার টোকা পড়ল। প্যাসেজে এল দরজা খুলে। এখানে উপর দিকে একটা স্কাইলাইট আছে। সেটা খুলে ছাদে উঠে পড়ল। চিমনীগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকায় কারো চোখে পড়ল না।

শেষ গ্যারেজটা শূন্য পড়েছিল। সে স্কাইলাইটের সাহায্যে নীচে নেমে এল। তারপর পথে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হাইডপার্ক কর্নারের সামনে এসে পড়ল।

।। দুই।।

সবুজ রং করা উঁচু গেটের পাশে ছ ফুট উঁচু দেওয়ালের গায়ে ব্রাস প্লেটের উপর লেখা আছেঃ ২এ, দি স্টুডিওস, চেইনী ওয়াক।

করিডন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল। তারপর দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। রুকস্যাক কাঁধে ঝুলছে। সে ভেবে পেল না ম্যালোরীর বোনকে ঠিক কি বলবে। সে তপ্ত রোদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছায়া পড়ছে সারা দেওয়ালের উপর। উত্তেজনা বোধ করল।

দরজা খুলে একটা মেয়ে তার মুখোমুখি হল। করিডন হতাশ হল তাকে দেখে, কারণ অবচেতন মন ভাবছিল সে কোন সুন্দরী যুবতীর মুখোমুখি হবে। হয়তো আর একজন রীটা অ্যালেন, কিন্তু মেয়েটার চেহারা হতাশা ব্যাঞ্জক।

মেয়েটিকে স্পষ্ট আর নীচু কণ্ঠে বলল, সুপ্রভাত। আমি আপনার ভাইকে খুঁজছি—ব্রায়ান ম্যালোরী। ইতস্ততঃ করে করিডন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তার বোন, তাই না?

মেয়েটির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়ল। সে বলল, ব্রায়ানকে খুঁজছেন? আপনি জানেন না? ব্রায়ান তো মারা গেছে! প্রায় দুবছর হয়ে গেল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সুইংডোর ঠেলে এনফিল্ড হোটেলে প্রবেশ কবল জিনি। বগলে একখানা খবরের কাগজ। চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। সে লাউঞ্জে প্রবেশ করল।

পুলিশ ক্রিডের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে—অনুত্তেজিত কণ্ঠে জিনি ফরাসী ভাষায় বলল।

জন চমকে উঠে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সে বলল, বুঝতে পারিনি, তুমি ঘরে ঢুকেছো। কাগজে বেরিয়েছে খবরটা?

খবরের কাগজগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ধুলো জর্জর আর্ম চেয়ারে বসে পড়ে জিনি বলল, প্রথম পাতায় আছে।

জন সময় নিয়ে খবরের কাগজে প্রত্যেকটা খবর পড়ল। চোখে মুখে কোন রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না। সে বলল, করিডনের চেহারার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে। পুলিশ ধরে ফেলবে।

আমার তা মনে হয় না। যথেষ্ট সাবধানী লোকটা। ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার ব্যাপারে এ ঘটনা ওকে আরো বেশী আগ্রহী করে তুলবে।

খবরের কাগজ সামনে থেকে সরিয়ে জন বলল, পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করলে ও সব কথা ফাঁস করে দেবে। এই ধরনের লোকের সঙ্গে নিজেদের জড়ানো ঠিক হয়নি। উচিৎ ছিল ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

এই রকম বিড়বিড় করো না তো। বিরক্তি ভরা গলায় জিনি বলল, একমাত্র করিডনই পারে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে। ওর অতীতের কাজ বিচার কর। এই দেশটাকে ও আমাদের চেয়ে বেশী জানে, তাছাড়া ম্যালোরী ওকে চেনে না।

ভুল,—জন অবাধ্যের মত বলল, প্রথম থেকেই আমি এর বিপক্ষে ছিলাম। তোমার রনলির

কথা শোনা উচিৎ হয়নি।

অশিক্ষিত নির্বোধ তুমি।—জিনি গলা চড়িয়ে বলল, তুমি একা ম্যালোরীকে খুঁজতে চাও? কিন্তু তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান নও, আমি নই আর রনলিও নয়। কিন্তু করিডনের বুদ্ধি আছে। এই কথাগুলো কতবার তোমাকে বলতে হবে?

অনেকবার তুমি বলেছ।—জন চাপাকণ্ঠে বলল, তার চোখ দুটো জ্বলছে, আমি নিজে হাতে ম্যালোরীকে খুন করে সন্তোষ লাভ করতে চাই আর তা আমি করবই।

তাহলে তাই কর।—জিনি চেঁচিয়ে উঠল, তোমাকে আমি নিষেধ করব না। বেরিয়ে পড়, খুঁজে বের করে কাজ সমাধা করে ফেল—অবশ্য যদি পার।

সময় হলেই করব।—জন বলল, এই কাজের জন্য একবছরের উপর অপেক্ষা করে আছি। একজন মেয়েছেলের খামখেয়ালি পনায় নিজেকে বোকা প্রমাণ করতে চাই না। আমি কিছু টাকা চাই।

টাকা চাও করিডনের কাছে।—কথাটা বলে সে বিদ্রূপের হাসি হাসল, টাকা তার কাছে আছে আর তুমি যদি মনে কর—

জিনি চুপ করে গেল লাউঞ্জের দরজা খুলে রনলি ঘরে ঢুকল। তাদের দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দ্বিধাভরে ফায়ার-প্লেসের কাছে এসে দাঁড়াল।

ফিরে এলে কেন?—বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, করিডন কোথায়?

তা বলতে পারব না—জিনি। উচ্চস্বরে রনলি বলল, ও হাতের বাইরে চলে গেছে। আর তুমি কিনা আমায় বোকা বলছ।

চীৎকার করো না।—নিজেকে সংযত করে জিনি বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রনলির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কি করে ও হাতের মুঠো থেকে পালাল? আমি তোমায় বলেছিলাম তার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাবে না। কি ঘটেছিল?

রনলি কাঠখোট্টা রকম সংক্ষিপ্তভাবে বলল, ও নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছিল। যতক্ষণ আলো নেভাযনি আমি নজর রেখেছিলাম এবং ধারণা হয়েছিল শুয়ে পড়েছে। কাছে যাওয়ার কিছু ছিল না বলে আমি কাছেই একটা কফির দোকানে গিয়েছিলাম। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য গিয়েছিলাম। রাতের বাকী সময় দরজার বাইরে কাটিয়েছি। কিন্তু সকালে বাইরে বের হতে দেখিনি। দোকানে যখন গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই সেই সুযোগে কেটে পড়েছে।

বিশ্রীভাবে হাত নেড়ে জিনি বলল, তুমি টেলিফোন করলে না কেন? জন তোমাকে অব্যাহতি দিত। আমাকে কি সব কিছুই বলে দিতে হবে? একবারের জন্য কি নিজের মাথা খাটাতে পার না?

করিডন গত রাতে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে। রনলি বলল, সকালে তার জন্য যখন অপেক্ষা করছি, পুলিশ এসে হাজির। আমি চলে এসেছি।

জিনি আর জন দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল। জন উঠে দাঁড়াল।

পুলিশ!—জিনি বলল।

হ্যাঁ, পুলিশ।—রনলি বলল, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, আমি ওদের হাতে ধরা পড়িনি বলে। পুলিশের গাড়ি খোঁয়াড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

দেখ, আমি আগেই বলেছিলাম, লোকটাকে পুলিশ ঠিক বুঝতে পারবে।—জন বলল, এও বলেছিলাম ঠিক গ্রেপ্তার করবে।

এখনো ওকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি—জিনি বলল বটে। কিন্তু তাকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

এর থেকে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, রনলি বলল, সে তাদের কাছ থেকে ঘরে যেতে চাইল, আমি শুতে যাচ্ছি। সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। তোমরা দুজন বরং ঠিক কর আমাদের পরবর্তী কর্মধারা কি হবে।

আর আমাদের করিডনের সঙ্গে দেখা হবে না। জন তিক্ততার সাথে বলল, আমাদের টাকা-পয়সা নিয়ে ও ভেগে পড়েছে। এক সপ্তাহ আগে আমাদের যা করা উচিৎ ছিল, এখন আমরা তাই করব। ম্যালোরীকে আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করব। আজই আমি রীটা অ্যালানের সাথে

দেখা করব।

ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ হবে না। রনলি কোন কিছু না ভেবেচিন্তেই বলল, ও মারা গেছে—কথাটা বলে ফেলে বুঝতে পারল বলা ঠিক হয়নি।

মারা গেছে!—কথাটা পুনরাবৃত্তি করে জিনি তার দিকে তাকিয়ে রইল। কি করে জানলে ও মারা গেছে?

করিডন আমায় বলেছে।—মিথ্যে কথা বলা বিপদজনক হবে জেনেই রনলি বলল।

করিডন!—জিনি আর জন একসাথে বলে উঠল। ঐ কথা তোমায় কখন বলল?

রনলি একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করল। এই নীরবতা তাকে চিন্তা করার সুযোগ দিল। সে বলল, গতরাত্রে আমার সাথে কিছু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। ও আমায় বলল যে, মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

এক মিনিট কঠিন চোখে তাকিয়ে জন বলল, প্রথমেই একথা বলনি কেন?

রনলি ঘাবড়ান অবস্থায় একটা সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, সুযোগ দাও আমাকে বলবার। তোমাদের এক্ষুনি বলতাম।

বলতে নাকি, আমার তো সেরকম মনে হয়নি। তুমি বলছ মেয়েটা মারা গেছে, কিভাবে মারা গেল? কি ঘটেছিল?

করিডনের অনুমান ম্যালোরী তাকে খুন করেছে। অন্য ব্যক্তি দুটি এ কথা শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

ওর এরকম ধারণা হলো কেন?—জিনি জানতে চাইল।

রনলি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, ও রীটা অ্যালেনের বাড়ি গিয়েছিল। তার ধারণা ম্যালোরী ওখানে লুকিয়ে ছিল। করিডন ম্যালোরীর সংবাদ জানতে চেয়েছিল রীটার কাছে। তাদের কাথাবার্তা আড়াল থেকে ম্যালোরী শুনেছিল। তারপর রীটা যখন উপরে যায়, তখনই ম্যালোরী তাকে খুন করে।

ঠিক আছে, রনলি।—জিনি মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি ঘুমোতে যাও। আর কিছু বলতে হবে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ল সে।

রনলি?

জনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা রনলিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য করল। জনের হাতে ধরা পিস্তলের নল তার চোখে পড়ল।

যেখানে আছ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক।

পিস্তল সরিয়ে নাও, নির্বোধ—জিনি চেঁচিয়ে বলল, কেউ এদিকে আসছে—

হেনরী মেভোস দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। তার হাতে রয়েছে এক কপি 'দি টাইমস' খবরের কাগজ। লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোকের সামনে কাগজটা নেড়ে খুশিভরা কণ্ঠে শিশুর মত বলল, মিসেস কোডিস্টাল সব সময় কাগজ নিজের কাছে রেখে দেন—। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, কোন অঘটন ঘটেছে নাকি? কি হয়েছে?

জন ক্ষিপ্রহাতে পিস্তল লুকিয়ে ফেলল। সে বৃদ্ধের দিকে তেড়ে গেল।

জন—জিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল।

বৃদ্ধ কয়েক পা পিছিয়ে বলল, কি-কি-করবে—তারপর খবরের কাগজ ফেলে পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিনি বলল, তুমি সব নষ্ট করে দিচ্ছ। লোকটা চুপ করে থাকবে না। এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি কর।

জিনি দৌড়ে এল। জন তাকে অনুসরণ করল, বিড় বিড় করতে করতে।

তাড়াতাড়ি এস।—সিঁড়ির মাথায় গিয়ে জিনি বলল, বুড়োটা চলে গেছে। তাড়াতাড়ি এস।

তারা ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু তাদের একবারও নজর পড়ল না টেলিফোন বুথের দিকে। নজর পড়লে দেখতে পেত বুথের মধ্যে মেভোস জড়সড় হয়ে বসে আত্মগোপন করে আছে। উত্তেজনায় তার মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। পিস্তল। এনফিল্ড হোটেলের ভেতরে। যদি এইভাবে

পালিয়ে না আসত তাহলে বোধহয় খুন হয়ে যেত। সে রিসিভার হাতে তুলে নিল, একটা নাম্বার ডায়াল করল। চশমা পরে নেওয়ার মত সময় তার হাতে নেই। এক মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না। সরু সরু আঙুলের সাহায্যে ডায়াল করল ৯৯৯।

।। দুই।।

একে একে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে চামড়ার স্যুটকেস, ভেতরে ভরা আছে নিজস্ব জিনিসপত্র। সকলের পরণে ট্রেঞ্চ কোট আর টুপী, যা ফ্রান্সের লোকেরা পড়ে।

হোটেলের পরিবেশ চুপচাপ। সিঁড়ির নীচে শেষ মাথায় লাউঞ্জ জনশূন্য।

জিনি সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল মেভোস লাউঞ্জের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরিয়ে নীচে নামতেই সে সরে গেল।

গত দশটা মিনিট মেভোস খুব ব্যস্ত ছিল। টেলিফোনে পুলিশকে খবর দিয়েছে আর সাবধান করে দিয়েছে হোটেলের ম্যানেজারকে।

তারা তিনজন পাবলিক লাউঞ্জে এল।

জিনি বলল—চল। সে বুঝতে পেরেছে তাদের একমাত্র সম্বল এখন ভাগ্যই। বাইরে যাওয়ার সময় সদর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে। তারা জিনিকে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এক মিনিট মিস। তারপর তার দিকে ছুটে গেল।

জিনির মনে হল, গত চার বছর যাবৎ যে সকল পরিকল্পনা আর কাজ করেছে, সব কিছুই বৃথা হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীতি ঘিরে ধরল তাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে চাইল, পালাবার উপায় থাকলে ঠিক পালাত, কিন্তু উপায় নেই। একজন লম্বা সুদর্শন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক পুলিশ জিনির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছতেই জনের পিস্তল গর্জে উঠে ছেলেটাকে সচকিত করে তুলল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

।। এক।।

প্রায় দু-বছর হয়ে গেল ব্রায়ান মারা গেছে! করিডন তার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ লুকোবার চেষ্টা করল না।

খুব শান্তকণ্ঠে সে বলল, আমি জানতাম না, দুঃখিত। জানা থাকলে তোমাকে বিরক্ত করতাম না—

না, না, ঠিক আছে—মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, করিডন যাতে ব্রিবতবোধ না করে, দু বছর দীর্ঘ সময়। ওর মৃত্যু সংবাদে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু অতীত আঁকড়ে ধরে থেকে কি লাভ বলুন?

কোন লাভ নেই। ম্যালোরীর মত মানুষ মারা গেছে ভাবতেই পারি না।—চলে যেতে উদ্যত হয়ে করিডন বলল, যাক তোমার সময় নষ্ট করব না।

এভাবে আপনি চলে যেতে পারবেন না। ভেতরে আসুন। আপনি কি ওর এয়ারফোর্সের বন্ধু?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল। ওকে বেশ ভাল লাগত। আমার নাম করিডন—মার্টিন করিডন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না।

ভেতরে আসুন।

যে ঘরে করিডন প্রবেশ করল সেটা আলো-বাতাস মুক্ত একটা স্টুডিও। সামনে স্ট্যান্ডের উপর রয়েছে, অর্ধসমাপ্ত একটি নারীর পেন্টিং। সে আর্ট সম্পর্কে কিছু না বুঝলেও ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

বাঃ, চমৎকার। সে বলল, তুমি এঁকেছ?

হ্যাঁ,—মেয়েটি বলল, আচ্ছা ব্রায়ানের সাথে আপনার কবে শেষ দেখা হয়েছিল?

যুদ্ধের সময়। আমাকে দশ পাউন্ড ধার দিয়েছিল। ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

বসুন। ব্রায়ানের সঙ্গে পরিচিত এমন একজনের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। আমার উচিৎ

তার বন্ধুদের যত্ন করা। পানীয় চলবে?

সব সময়ে চলে, করিডন গা থেকে কোট খুলে বলল, যুদ্ধের পর অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। তারপর আমেরিকায় গিয়েছিলাম। মাত্র কয়েকদিন হল ফিরেছি। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল তোমার দাদাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারিনি। ভাবলাম, এই সুযোগে আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে খোঁজ করেছি। কিন্তু ওর নাম পাইনি, তবে পেয়েছি তোমার নাম। একবার বলেছিল, এক বোন আছে, নাম অ্যান। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তুমিই সেই বোন হবে, তাই চলে এলাম।

আমার সম্পর্কে ও কি বলেছে?—সে পানীয় এনে সামনে রাখা টুলের উপর রাখতে রাখতে বলল। করিডন নজর করল মেয়েটার হাত কাঁপছে।

আমার তেমন মনে নেই।—একটা আরাম কেদারায় বসতে বসতে সে বলল। ভাবল বেশী মিথ্যে বলা ঠিক হবে না। তাহলে বেশীক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব হবে না। কেন ম্যালোরীকে খুঁজছে তা বলতে চায় না আর বলতে চায় না জিনি এবং তার দলের সম্পর্কে।

করিডন তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল, ও কি করে মারা গেল, হয়ত তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাও না?

এ সম্বন্ধে কেন বলব না?—সে সামনে বসে পড়ে বলল, আমাকে সুযোগ দিলে সব খুলে বলব। ও চমৎকার মানুষ ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে তাকে গুলি করে জখম করে বন্দী করা হয়। জেল থেকে পালিয়ে একটা গুপ্ত ফরাসী গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়। আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। সেটাই ওর শেষ চিঠি। চিঠিটা একজন আমেরিকান পাইলট বন্ধুর হাতে পাঠিয়েছিল। এই গেরিলাদের সঙ্গে কাজ করতে তার ভালই লাগছিল। ওরা সংখ্যায় ছিল আটজন। তারা ট্রেন লাইনচ্যুত করত। দলপতি ছিল একজন ফরাসী, নাম পিয়েরী গোর্ভিল। ব্রায়ানের মতে লোকটি চমৎকার। তাঁর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড সাহস, বিশ্বাস আর দেশপ্রীতি। দলে ছিল দুজন ফরাসী পুরুষ, দুজন ফরাসী নারী, দুজন পোল্যান্ডের লোক, আর তিনজন ইংরেজ, সে নিজেও তাদের একজন। জিনি পারসিগনী নামে একটা মেয়ের কথা লিখেছিল, ফরাসী নারীদের মধ্যে সে একজন ছিল। এই মেয়েটির খুব প্রসংশা করেছিল। সকলেই ছিল চমৎকার মানুষ। আমার শুধু খারাপ লাগত বিপদজনক কাজ করছিল বলে। কিন্তু আমার তো কিছু করবার ছিল না। ওকে চিঠি লেখার সুযোগ ছিল না। পরে একদিন এয়ার মিনিস্ট্রির কাছ থেকে জানতে পারলাম গেস্টাপোদের হাতে সে ধরা পড়েছে। যখন পালাবার চেষ্টা করে তাকে গুলি করে জখম করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুদিন আগে তাকে গুলি করে মারা হয়।

আমি কি বিশ্বাস করতে পারি ওর মৃত্যু হয়েছে? করিডন বলল, জান অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে।

চকিতে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। তার চোখমুখে বিস্ময়। সে জিজ্ঞাসা করল, একথা বলছেন কেন?

আমি সম্প্রতি কয়েক জনের সাথে তোমার দাদার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তার এক বান্ধবী—রীটা অ্যালেন তাদের মধ্যে অন্যতমা। সে লক্ষ্য করল মেয়েটি চমকে উঠল, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হল, জানি না ওকে তুমি চেন কিনা। মেয়েটা বলেছে তোমার দাদা জীবিত আছে। মেয়েটা দাবী করেছে কয়েক সপ্তাহ আগে ওকে দেখেছে।

রীটা অ্যালেনের নাম উচ্চারণ করতেই মেয়েটা রেগে উঠেছিল, কিন্তু রাগ সহজেই প্রশমিত হয়ে গেল। সে বলল, এমন কথা ও কি করে বলল? আপনি ওখানে গেছিলেন কেন আমি বুঝতে পারছি না।

তোমার দাদা ওর কথা আমায় বলেছে। কয়েকদিন আগে ওর কাছে গিয়েছিলাম, হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওর নাম শুনেই মনে পড়ে গেল তোমার দাদা বলেছিল মেয়েটা তার বান্ধবী। স্বাভাবিকভাবেই আমি জানতে চাইলাম তোমার দাদা কোথায় আছে? ও জানে না, তবে বলল, কয়েক সপ্তাহ আগে নাকি তাদের দেখা হয়েছিল।

কি করে তার সাথে দেখা হবে?—অ্যান রেগে গিয়ে বলল, আপনি ভুল করছেন। মেয়েটা কোনদিন দাদার বান্ধবী ছিল না। ওর সম্বন্ধে ব্রায়ান বলেছিল, যখন মেয়েটা বিগিন হিলে ছিল তখন

দুজনের সাক্ষাৎ হয়। দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আপনি তো জানেন অল্প বয়সী অফিসাররা আজকাল কেমন হয়। তারা কিছু হারাতে রাজী নয়। মেয়েটা দাদার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ফলে পরে তার কাছে টাকা দাবী করতে থাকে। তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় বার তিনেকের বেশী নয়। এ ধরণের কথা ও বলল কি করে?

হতাশ হয়ে করিডন চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিল। সে বলল, তোমাকে তো সব কথা ম্যালোরী নাও বলতে পারে।—সাধারণতঃ ভায়েরা যা করে, বোনেদের কাছে অনেক কথা গোপন করে—

এটা কোন যুক্তি নয়।—অ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এ ব্যাপারে আর এসব খাটে না। ব্রায়ান বেঁচে আছে, মেয়েটা মিথ্যে কথা বলেছে।

কিন্তু কেন? করিডন জানতে চাইল, বলবার উদ্দেশ্য কি?

মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল অ্যানকে। তারপর সে বলল, এ খবরের জন্য ওকে কত টাকা দিয়েছেন?

করিডনকে এবার অপ্রতিভ দেখাল। সে বলল, কি করে জানলে ওকে টাকা দিয়েছি?

আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি, মেয়েটাকে আমি চিনি। অর্থের জন্য অনেক মিথ্যা কথা বলতে আর অনেক বাজে কাজ করতে পারে।

বেশ স্বীকার করছি টাকা ওকে দিয়েছি, কিন্তু মেয়েটা কেন বলতে গেল ব্রায়ান জীবিত?

আপনি কি তাই শুনতে চাইছিলেন না? যদি সে বলত ব্রায়ান মৃত, তাহলে কি ওর প্রতি আপনি কোন আগ্রহ দেখাতেন?

অ্যানের দিকে করিডন তাকিয়ে রইল। এ ধরনের সে কিছু আশা করেনি। চুপচাপ বসে থেকে সে চিন্তা করল রীটা অ্যালেন তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে কিনা। অ্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ওপাশে গিয়ে ইজেলের সামনে দাঁড়াল।

আপনি আমায় চিন্তায় ফেললেন।—দীর্ঘ নীরবতার পর অ্যান বলল, ব্রায়ানের মুখে কোনদিন আপনার নাম শুনিনি। কোন কোন ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে দাদাকে আপনি সঠিক জানেন না। আপনি কি সত্যিই ওর খোঁজে এসেছেন?

করিডন ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়াল। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। জানালা দিয়ে দেখল অলিভ-গ্রীন ট্রেঞ্চ কোট গায়ে আর কালো টুপী মাথায় একজন লোক এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসছে। লোকটি রনলি। খানিক পরেই রুদ্ধশ্বাস আর ঘর্মাক্ত রনলি হাঁপাতে হাঁপাতে এই স্টুডিওর দিকে ছুটে এসে দরজার গায়ে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিতে লাগল।

করিডন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে রনলিকে ধরে হলঘরে নিয়ে আসে। করিডনের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল।

কি হয়েছে?—করিডন প্রশ্ন করল, এখানে কি করছ?

রনলি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার বুক ওঠানামা করছে। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবে।

কি হয়েছে?—তাকে ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

ওরা আমাকে অনুসরণ করে এদিকে আসছে। রনলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখানে আসতে বাধ্য হলাম। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

চুপ কর। বলে করিডন আড়াচোখে পাশের দিকে তাকাল। অ্যান দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

।। দুই ।।

দেখা গেল সবুজ রং করা গেট খুলে দু'জন পুলিশ প্রবেশ করছে। দু'জনেরই হাতে একটা করে স্টেন গান। প্রত্যেকটা বাংলোর মাঝে বিশ ফুট ফাঁকা জায়গা। করিডন পর্দা ফেলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিজেকে আড়াল করে। কিছু কৌতূহলী নরনারী ভীড় করেছে গেটের বাইরে রাস্তার ওপাশে।

করিডনের পাশে দাঁড়িয়ে অ্যানও জানলা দিয়ে দেখছে।

পুলিশ দুজন ডানদিকের বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

ওরা তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে? জানলা থেকে চোখ না সরিয়ে রনলিকে করিডন জিজ্ঞাসা করল।

রনলি চেয়ারে বসে আছে শরীর এলিয়ে, সে বলল মনে হয়না দেখেছে। আমাদের মধ্যে পঞ্চাশ গজের ব্যবধান ছিল। বাঁক ঘুরে এখানে ঢুকেছি, তাই মনে হয়না দেখতে পেয়েছে। ওরা কি এখনো গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?

ওরা এখন বাড়ির উঠোনে তল্লাশি চালাচ্ছে।

রনলি কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। সে বলল, যদি পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে আমি কিছুই করতে পারব না। যদি আমি বলি জন গুলি চালাবে তা জানতাম না, তাহলে ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। অনেক সাক্ষীর সামনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকো।—করিডন বলল, তোমার এখানে থাকার কথা যদি পুলিশ না জেনে থাকে তাহলে মঙ্গল। তারপর সে অ্যানের কাছে গিয়ে বলল, এই পরিস্থিতির জন্য আমি দুঃখিত। বুঝিয়ে বলবার মত সময় হাতে নেই। কিন্তু বুঝিয়ে বলবার মত ঘটনা আছে, যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে তার থেকে দূরে রাখতে চাই। আমাদের হয়ে কথা বলতে বাধা কি বল?

অ্যান তার দিকে তাকাল। বিপদের আশঙ্কা করেছে, কিন্তু ভয় পায়নি। সে অবিচলিত কণ্ঠে বলল, তোমাদের কাউকে আগে আমি দেখিনি। যদি পুলিশ আমাকে প্রশ্ন করে উত্তরে আমি যেটুকু জানি তাই বলব।

করিডন হাসল। সে বলল, সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে, কিন্তু আমরা তোমায় পুলিশ দু'জনের সঙ্গে দেখা করতে দেব না। তারপর রনলির দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বেঁধে ফেলতে হবে। খানিকটা কর্ড বা ওই জাতীয় কিছু পাও কিনা খুঁজে দেখ। তাড়াতাড়ি কর।

অ্যান দুপা পিছিয়ে গেল। করিডন তার হাতের কব্জি চেপে ধরল।

বোঝবার চেষ্টা কর।—করিডন বলল, তোমার শরীরে কোন রকম আঘাত করব না। চেঁচিও না বা ছটফট করো না। পুলিশ চলে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার কোন রকম ক্ষতি আমরা করব না।

না, আমি ছটফট করব না। অ্যান বলল, ওর কথাবার্তা আমি শুনেছি, ও খুনী তাই না?

না, ও খুনী নয়। রনলি কখনও একটা মাছিকেও মারেনি। তোমার ভাইয়ের কজন সঙ্গী এদেশে আছে। জন এ কাজ করেছে। মনে পড়ছে জনকে? সেই পোল্যাণ্ডের লোকটা?

এ সবের অর্থ কি? ভয় পেয়ে অ্যান বলল, কি উদ্দেশ্যে এখানে তোমরা এসেছ?

দুঃখিত। সব শুনতে হলে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।—করিডন বলল। ইতিমধ্যে রনলি অ্যানের ঘরে পাওয়া বেল্ট আর স্কার্ফ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাকে সে বলল, পুলিশ দুটোর উপর লক্ষ্য রাখ। রনলির হাত থেকে বেল্ট আর স্কার্ফ নিয়ে অ্যানকে বলল, তুমি নিশ্চয় গোলমাল করবে না, কি বল?

না, আমাকে কি করতে হবে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত দুটো রাখ।

অ্যান তাই করল। হাত দুটো বেল্টের সাহায্যে শক্ত করে বেঁধে করিডন বলল, খুব বেশী চেপে বসে গেছে নাকি?

না, ঠিক আছে।

রনলির দেওয়া একটা রুমাল গোল করে পাকিয়ে করিডন বলল, হাঁ কর।

আমি চেঁচাব না।—ভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে অ্যান বলল।

শোন, যদি আমরা পালাতে পারি তাহলে পুলিশ তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, কেন চেঁচাওনি। তাই তোমার মুখ বন্ধ করে দেব। যা করছি সব তোমার ভালর জন্য।

ভয় পেলেও মুখে রুমাল ঢুকাতে অ্যান আপত্তি করল না।

বাঃ, চমৎকার। খুশী হয়ে করিডন বলল, এবার বেডরুমে চল। যতক্ষণ না মিটে যাচ্ছে তুমি বিছানায় শুয়ে থাকবে। পুলিশ চলে গেলেই তোমাকে মুক্ত করে দেব।

বেডরুমে গিয়ে খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে অ্যান বসল। তার চোখেমুখে ভীতি।

স্কার্ফের সাহায্যে পা দুটি বেঁধে ফেলে করিডন বলল, এবার শুয়ে পড়।

কথামত অ্যান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। করিডন স্টুডিওতে ফিরে এল। রনলিকে জিজ্ঞাসা করল, ওদের দেখা পেলে?

না।—রনলি বলল, মনে হচ্ছে ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে।

কলিংবেল বাজল। রনলি বেডরুমে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। করিডন দরজা খুলল।

কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?—সে জিজ্ঞাসা করল। একটা লোককে খুঁজছি—একজন পুলিশ বলল, মনে হল এদিকেই এসেছে।

কই আমার নজরে তো পড়েনি।

পুলিশের সঙ্গে আসা বিস্কুট রংয়ের সুট পরনে লোকটি এগিয়ে এসে অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে বলল, আপনি কে? আপনাকে তো আগে কখনো এখানে দেখিনি।

আপনি ব্যাপারটার সহজ সমাধান করতে চাইছেন?

আপনি কে?

নাম হেনলে। মিস্ ম্যালোরীর পুরোন বন্ধু। এ সব জেনে আপনার কি লাভ?

আমার নাম হোলরয়েড—ক্রিস্পিন হোলরয়েড। আমি মিস ম্যালোরীর প্রতিবেশী। উনি কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ও কেনাকাটা করতে গেছে।—পুলিশের দিকে তাকিয়ে করিডন বলল, অফিসার আপনারা কিছু জানতে চান?

না, আপনি যখন লোকটাকে দেখেননি, তখন থাক।

না, নজরে পড়েনি।

ওদের বিদায় করে করিডন দরজা বন্ধ করে বলল, বিপদ কেটে গেছে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল রনলি। তাকে উত্তেজিত আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করব?

কিছুক্ষণ ওই ভাবে পড়ে থাক। আসল ব্যাপার হল—আমরা তোমার ব্যাপারে কি করব?

স্টুডিওতে গিয়ে রনলি পায়চারি করতে লাগল। সে বলল, আমি কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। ধরা দেওয়াই ঠিক হবে। হয়ত পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করবে।

কেউ গুলি ছুঁড়তে দেখেছে?

জানি না। আমার মনে হয় না। পুলিশ তো আড়ালে ছিল। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করা হয়েছে। অবশ্য পুলিশ গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছে মাত্র, কে ছুঁড়েছে দেখেনি।

ইতিমধ্যে পুলিশ নিশ্চয়ই জেনে গেছে তোমরা সংখ্যায় একাধিক ছিলে। জনের চেহারার বর্ণনা পেয়ে যাবে। হয়ত তারা তাকেই আগে গ্রেপ্তার করবে। তার কাছেই পাবে পিস্তলটা।

এসব আমাকে রেহাই দেবে না।—রনলি নিরাশ কণ্ঠে বলল।

না। আমাদের কিছু করতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গুছিয়ে নেবে। পুলিশ খুনের প্রতিশোধ তারা চুপচাপ হজম করবে না।

তাহলে আমি এখন কি করব? ধরা দেব নাকি?

তোমার, আমার সাথে যাওয়াই ঠিক হবে। সামান্য সময় ভেবে করিডন বলল, রীটা অ্যালানের মৃতদেহ খুঁজে পেতে দেরী হবে না। তারপর পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে আমার পিছনে। আমি স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছি। তোমাকে বলিনি বোধহয় ম্যালোরী দুনবারের কাছে একটা দ্বীপ কিনেছিল। ওখানে একটা বাড়িও আছে। ভালভাবে লুকিয়ে থাকা যাবে ওখানে। ম্যালোরী সেখানে থাকতে পারে। তুমি আমার সাথে ওখানে যাবে।

আমরাও যাব।—দরজার সামনে থেকে জিনির নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জন তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা পিস্তল, সেটা করিডনের দিকে তাক করা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে তোমাদের কেমন লাগছে?—করিডন জনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

হাত নাড়বে না।—জনের চোখ দুটো চকচক করে উঠল আর রনলির কাছে গিয়ে বলল, তুমি বসে পড়।

রনলি বসে পড়ল। তাকে খুশি বলেই মনে হল। মনে হচ্ছে রনলিকে অনুসরণ করে তোমরা এখানে এসেছ?—করিডন বলল।

হ্যাঁ।—জিনি বলল, বেশী নড়াচড়া করো না। তোমার বন্দুকটা নিচ্ছি। বাধা দিলে জন গুলি ছুঁড়বে।

যেভাবে খুশী নিয়ে যাও। তোমাদের পরিণতি আমি দেখতে পাচ্ছি। করিডন বলল, তোমরা নিশ্চয়ই জানো পুলিশ এখনো আশেপাশেই আছে?

জিনি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে নিল। একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

পুলিশের কথা আমার জানা আছে। সে চটপট জবাব দিল, করিডন কোনরকম চালাকি করবার চেষ্টা করো না। রনলি তুমিও না।

করিডনের চারিদিকে জিনি ঘুরতে লাগল। অটোমেটিক পিস্তলটা নিজের ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে ভরে রাখল।

আমার পিস্তলের নিশানার বাইরে সরে দাঁড়াও। জন বিরক্তি জড়ান কণ্ঠে বলল, একপাশে সরে দাঁড়াও।

গুলি ছুঁড়ো না। এখন আনরা একই সমস্যায় পড়েছি। সকলের উচিৎ হবে মিলেমিশে কাজ করা।—জিনি বলল।

তোমাদের অসুবিধের ব্যাপারে আমি মোটেই নেই।—করিডন বলল, পুলিশকে গুলি করে মেরে সমস্যার সমাধান করা যায় বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এ কাজ করার অর্থ মাত্র একটাই, নিজের বিপদ ডেকে আনা। ক্রিডের মৃত্যুর সাথে তোমরা আর আমাকে জড়াতে পারছ না। কারণ পিস্তলে আমার আঙ্গুলের ছাপ আর নেই।

কিন্তু পুলিশ রীটা অ্যালেনের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। জিনি বলল, ওরা তোমায় খুঁজছে।

পুলিশ শুধু ওকে খুঁজছে না।—রনলি বলল, আমাদেরও খুঁজছে। এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া দরকার।

পুলিশ আমাদের সর্বত্র খুঁজছে।—জিনি বলল, আমরা দিনের আলোয় যেতে পারব না। যদি আমরা এক্ষুনি এখান থেকে সরে না পড়ি তাহলে ইঁদুরের মত ফাঁদে পড়তে হবে।

সেই ফাঁদ পাতুক।—হেসে বলল করিডন। ইঁদুর বলার জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

রনলি হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে। এখানে একমুহূর্ত থাকা ঠিক হবে না। পুলিশ দুটো আবার ফিরে আসবে।

উত্তেজিত হয়ো না। পুলিশ আর ওই হোলরয়েড আমাকে এখানে দেখেছে। এখন আমাদের উচিৎ হবে ওই হোলরয়েডের স্টুডিওতে ঢুকে রাত না নামা পর্যন্ত কাটান। পুলিশ যদি আবার এখানে আসে, দেখবে জায়গাটা শূন্য। ভাববে আমি তাদের চোখে ধুলো দিয়েছি। যদি এখানকার স্টুডিওগুলোয় তারা তল্লাশি চালায়, আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন হোলরয়েডকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করাতে পারবে।

হোলরয়েড কে?—জিনি জানতে চাইল।

এখানকার একজন প্রতিবেশী। রাস্তার ওপাশে থাকে।

ম্যালোরীর বোন কোথায়?

তার কথা জানলে কি করে?

সময় নষ্ট করো না। কোথায় সে?

হাত-পা বাধা অবস্থায় বেডরুমে পড়ে আছে। জিনি রনলিকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা তোমায় দেখেছে?

হ্যাঁ।

তাহলে ওকে তো এখানে রেখে দেওয়া যাবে না।

করিডন বুঝতে পারল, জিনি ঠিক কথাই বলেছে, তবু তার কথা সমর্থন করতে চাইল না। সে বলল, আমার মনে হয় ওকে হোলরয়েডের স্টুডিওতে নিয়ে যেতে হবে। সমস্যা বেড়ে যাবে—

ওই দেখ হোলরয়েড আসছে।—রনলি বলল, ওর নজর এদিকেই।

লোকটার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। জিনি বলল, ম্যালোরী মেয়েটাকে নিয়ে আমার পিছু পিছু এস। তোমার জিনিষপত্র সাথে আনবে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে সে হোলরয়েডের দিকে এগোতে থাকল।

কি ঘটে দেখবার জন্য করিডন অপেক্ষা করল না। সে অ্যানের বেডরুমে ঢুকল। মেয়েটা বিছানায় শুয়ে আছে। দেখে বুঝতে পারল নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অ্যান তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে—করিডন বলল, এখন তোমাকে মুক্ত করতে পারছি না। গোটা দলটাই এখানে এসে উপস্থিত। আমরা সবাই হোলরয়েডের বাংলোয় যাচ্ছি, কারণ যে কোন সময় পুলিশ আসতে পারে। কোন গোলমাল করো না। সে মেয়েটার পায়ের বাঁধন খুলে টেনে তুলে দাঁড় করাল।

রনলি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল—চলে এস, জিনি ওই বাংলোয় ঢুকে পড়েছে।

রনলি, টুপি আর কোট নিয়ে এস আমার। করিডন বলল, আমার রুকস্যাকটা আনতে ভুলো না। সে অ্যানের বাহু ধরল, ভয় পেও না তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

কিন্তু এবার করিডন অ্যানের মনে আশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হলো না। মেয়েটা ছিটকে দূরে সরে গেল। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, শোন, বুঝবার চেষ্টা করো—

জন রনলিকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, সময় নষ্ট করছ। তোমাকে আসতে বলা হয়েছে, তুমি আসবে। তাড়াতাড়ি কর,—মুখের সামনে জন পিস্তলটা নাচাতে লাগল। অ্যান ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

চলে এস।—করিডন বলল, গোলমাল না করলে ভালই থাকবে।

মুখ থেকে ওটা বার করে ফেল।—জন বলল, লোকের নজরে পড়বে। যদি চিৎকার করে আমি গুলি ছুঁড়ব। ওর কাঁধের উপর একটা কোট ঝুলিয়ে দাও। করিডন পোশাকের আলমারির কাছে গেল একটা কোট খুঁজতে।

রক্তাক্ত চোখ তুলে তাকিয়ে অ্যানকে উদ্দেশ্য করে জন বলল, যদি চালাকি করবার চেষ্টা কর, তোমায় খুন করব। একজন বিশ্বাসঘাতকের বোনকে খুন করলে আমাদের কিছু যাবে আসবে না।

করিডন তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে জনকে কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিল, অ্যানের মুখ থেকে পাকান রুমালটা বের করে নিল। একটা কোট তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিল যাতে তার বাধা হাত দেখা না যায়।

ওর কথায় কান দিও না।—অ্যানের বাহু ধরে সে বলল, চলে এস।

চল চল, এখান থেকে বের হও। জন রনলিকে বলল। রনলি প্রথমে গেল এবং করিডন আর অ্যান তাকে অনুসরণ করল।

।। দুই ।।

হোলরয়েডের স্টুডিও ঘর অগোছাল আর নোংরা বাজে অয়েল পেন্টিং-এ ভর্তি। একটা ধুলো জমা পুরানো আর্ম চেয়ারে বসে করিডন চিন্তা করতে লাগল।

করিডনের সামনাসামনি অপরিষ্কার আর একটা চেয়ারের হাতলের উপরে জিনি বসেছে। তার শক্তিধর বাদামী রংয়ের হাত চেপে ধরেছে নিজের হাঁটু। তার চোখেমুখে চাঞ্চল্য। সে অস্থিরভাবে একবার করিডনের দিকে আর একবার পর্দা ফেলা জানলার দিকে তাকাচ্ছে।

রান্নাঘরে রনলির হেঁটে-চলে বেড়াবার শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয় এমন ধরনের খাবার তৈরি করছে। বেকন ভাজার গন্ধ নাকে যেতেই করিডনের মনে পড়ল খিদে পেয়েছে।

স্টুডিও পেরিয়ে তারপর বেডরুম। বন্ধ ঘরে জন অনিচ্ছাকৃতভাবে অ্যান আর হোলরয়েডকে পাহারা দিচ্ছে।

তারা জিনির মুখোমুখি হয়েছিল অ্যানকে সাথে করে এই বাংলোয় ঢুকতে। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। জিনির চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠেছিল। করিডন অ্যানকে তাড়াতাড়ি বেডরুমে নিয়ে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে জিনির মনে হল করিডন অ্যানের কথা ভাবছে। তাই সে বলল, ওর সাথে তোমার কথাবার্তা বলা উচি .। দ্বীপটা খুঁজে বের কর। মেয়েটাকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাবো।

করিডন ভাবল, অ্যান যদি তাদের বলে দেয় দ্বীপটা, তাহলে পুলিশের কাছে মুখ খুলবার জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না জিনির দলবল।

আমিও তাই ভাবছি। করিডন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে নিল, হোলরয়েডের কি হল? ওকে নিয়ে আমরা কি করব?

এখানে রেখে যাবো, আমাদের সম্পর্কে লোকটা কিছুই জানে না। তাছাড়া কোন একজনের জানা প্রয়োজন যে, ম্যালোরী মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। সব শুনে ম্যালোরী আমাদের খোঁজে আসবে। আমি মেয়েটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চাই।

তুমি এত নিশ্চিন্ত হলে কি করে যে বোনের খোঁজে সে আসবে?

তাই আমার মনে হচ্ছে।

তার আগে আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। দ্বীপটা কোথায় জানতে হবে। অনেক পথ এগোতে হবে আর কাজটা নির্বিঘ্নে হবে না। এদেশের প্রত্যেকটা পুলিশ আমাদের খোঁজে অতন্দ্র থাকবে।

তুমি কি ভাবছ এই নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছি? আমরা গেস্টাপোর চোখে যখন ধুলো দিতে পেরেছি, ইংরেজ পুলিশের চোখেও ধুলো দিতে পারব।

মেয়েটার অনুমান ওর দাদা মারা গেছে। এয়ার মিনিস্ট্রি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, যখন গেস্টাপোর হাত থেকে পালাচ্ছিল তখন গুলি করে মারা হয়। তোমার স্থির বিশ্বাস যে ম্যালোরী বেঁচে আছে?

তবে কি ওর প্রেতাত্মা হ্যারিস আর লুবিসকে খুন করেছে আর রীটা অ্যালেনকে সিঁড়ির উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে? আমাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেকে মৃত বলে প্রচার করতেই হবে। তারপর একদিন যাদুমন্ত্রের বলে বেঁচে উঠবে।

করিডন কাঁধ ঝাকাল। তারপর জিনির যুক্তি স্বীকার করে বলল, ঠিক বলেছ। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের প্রথম কাজ হবে দ্বীপটা খুঁজে বের করা। প্রতিশোধ তুমি নিতে পারবে।

কিন্তু এখনো ওকে খুঁজে বের করতে পারিনি। শীতল নিঃশব্দ হাসি হাসল জিনি। হয়ত কোন দিনই ওকে ধরা যাবে না।

করিডন পাশের ঘরে এল, অ্যান আর হোলরয়েড বসে আছে চেয়ারে। আর জন বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছে, পাশে পড়ে আছে পিস্তলটা। সে তাকিয়ে আছে করিডনের দিকে।

হোলরয়েডকে নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও—করিডন বলল।

জন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার মতলবটা কি শুনি?

মেয়েটার সাথে কিছু কথা আছে।

তুমি আমার সাথে এস। জন পিস্তল তুলে হোলরয়েডকে বলল।

হোলরয়েডের চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে পড়ে যাচ্ছিল। করিডন তাকে ধরে ফেলল।

মনে জোর আন।—করিডন বলল, তোমার কোন ভয় নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা চলে যাবো। তারপর তো তুমি হবে এখানকার একচ্ছত্র নায়ক।

ভয়ে কম্পমান হোলরয়েডকে সে দরজার দিকে ঠেলে দিল।

ভাল বোধ করবে বাঁধন খুলে দিলে—করিডন অ্যানের হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, তোমার সঙ্গে কথার এটাই উপযুক্ত সময়, কি বল?

অ্যান হাতের সাহায্যে কব্জি ঘঁষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। করিডন বলল, পুরুষটা খুনে। ওকে সাবধান। মেয়েটা পাগল, রনলি লোকটা ক্ষতিকারক নয়। খুনের অপরাধে তিনজনকেই পুলিশ খুঁজছে। জন দুজন পুলিশ আর ক্রিড নামে একজনকে খুন করেছে।

যদি তোমার কথা সত্যি হয়, অ্যান বলল, তাহলে তুমি এদের দলে কেন?

ক্রিডের খুনের অপরাধ ওরা আমার মাথায় চাপাবার চেষ্টা করছে।

কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না। সবই উদ্ভট মনে হচ্ছে।

তুমি যা বলেছ কি করে বিশ্বাস করব বল?

পালাবার চেষ্টা কর না, আমি আসছি।—করিডন স্টুডিওতে এসে হোলরয়েডের জমিয়ে রাখা খবরের কাগজের স্তূপ থেকে ক্রিডের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে যে সংখ্যায় সেটা নিয়ে অ্যানের কাছে ফিরে এসে বলল, পড়ে দেখ। আমার চেহারার বর্ণনা এতে পাবে।

কাগজে ছাপা বিবরণ অ্যান পড়ল। তারপর সে বলল, কিন্তু কি করে বুঝব তুমি খুন করনি?

তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি না। আমাকে তুমি খুনী ভাবলেও আমার কিছু যাবে আসবে না। তবে এখন এসব ব্যাপারে পুলিশ আমায় দায়ী করতে পারবে না।

তা আমার ভাইকে এসব ব্যাপারে কি করতে হবে?

আমি তো বলিনি ওকে কিছু করতে হবে—বলেছি নাকি?

তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন? ওর সম্পর্কে এত জিজ্ঞাসাবাদই বা করছ কেন? একটুও বিশ্বাস হয় না যে ওর বন্ধু তুমি। ওই লোকটা দাদাকে বিশ্বাসঘাতকই বা বলল কেন? লোকটা কি বলতে চাইল?

তোমার দাদা তো মৃত, ওর কথা থাক।

ওদের ধারণাও কি তাই?

না।

ওরা কি দাদাকে খুঁজছে?—আমাকে দয়া করে বল, দাদা কি জীবিত?

ওরা তাই ভাবে।—করিডন বলল।

তাহলে ওরা দাদার বন্ধু নয়?

না।

কেন?

কারণ আছে। তুমি না জানলেই ভাল।

দাদা জীবিত আছে কিনা জানতে চাই, তুমি বল।

আমি যা জানি তুমিও তাই জান। এদের অনুমান তোমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তোমার ভাই সেখানে যাবে।

এইভাবে এরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চায়।

বাকিটুকুও বল।—অ্যান শান্ত কণ্ঠে বলল, বলবার মত আর বেশী কিছুই নেই কি বল?

তুমি অদূর ভবিষ্যৎ-এ সবই জানবে, তবু বলে রাখি ঘটনা খুব সুখকর নয়। ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা করিডন শোনাল।

গল্প বলা শেষ হলেই অ্যান সহসা বসে পড়ল, তার চোখ মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে অস্ফুটস্বরে বলল, না মিথ্যে কথা। দাদা কোনদিন কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

করিডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ওরা আমায় যা বলেছে, আমি তাই তোমাকে বলেছি। ওরা মিথ্যা কথা বলবে কেন? কেন ওরা এত কাণ্ড করেছে ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য?

এসব আমি বিশ্বাস করি না।

কেউ বলেনি তোমায় বিশ্বাস করতে। ওরা বিশ্বাস করে, এই যথেষ্ট।

ঠিক আছে, দাদা যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তাহলে তার ভালমন্দ নিয়ে আমি ভাববো না। তবে আমি জানি এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

অ্যান এসব কথা বলে আর কোন লাভ নেই।

অ্যান ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ব্রায়ান কি বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তাহলে ওর সামনে বিপদ?

সঠিক বলতে পারছি না। তবে যদি ওকে এরা কোণঠাসা করে হাতের মুঠোয় আনতে পারে তাহলে গুলি করে হত্যা করবে।

আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?

আচ্ছা, দুনবারে তোমার দাদার একটা দ্বীপ আছে না?

হ্যাঁ, আছে।—অ্যানের চোখে বিস্ময়, তুমি জানলে কি করে?

জায়গাটা ঠিক কোথায় জান?

নিশ্চয়ই জানি। ওই দ্বীপটা এখন আমার। তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ওখানে আমরা যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

ভাবছ, ব্রায়ান ওখানে আছে?

তা জানি না। তবে এদের ধারণা তোমার পিছু পিছু ম্যালোরীও ওখানে যাবে।

অ্যানের চোখ দুটো চক্‌চক্ করতে লাগল। সে বলল, যদি একবার জানতে পারে ওখানে আছি তাহলে ঠিক গিয়ে উপস্থিত হবে।

নাও যেতে পারে। ওকে গত চার বছর দেখনি।

ও আসবেই। অধিকার সম্পর্কে ও যথেষ্ট সজাগ। কিছু সময় চিন্তা করে অ্যান বলল, একটা প্রশ্ন করব তোমাকে? তুমি ওদের পক্ষে, না আমার দিকে?

তোমার কি মনে হচ্ছে?

তোমার উপর আস্থা রাখতে বলেছ। কিন্তু কেন বলছ?

তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়েছিল।—করিডন বলল, তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছি। মনে হয়েছিল আমার জন্য তুমি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ।

এখনো আমাকে সাহায্য করতে চাও?

অবশ্যই। তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখব।

তুমি বলেছ, ওদের সঙ্গে আছ খুনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়। এর একটাই মানে দাঁড়ায়, তুমি ওদের বিপক্ষে। আমিও তাই। তাহলে এদের দলে যোগ দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

হবে। তুমি তো আর বোকা নও, কি বল? আসলে তুমি দাদাকে যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করতে চাও। যদি সে বেঁচে থাকে আর বিপদে পড়ে তাহলে বলে রাখছি তাকে আমি সাহায্য করব।

আমিও চাই তুমি তাকে সাহায্য কর। তার বিরুদ্ধে তোমার তো কোন অভিযোগ নেই—নাকি আছে?

করিডন ইতস্তুতঃ করল। সে বলতে পারলো না যে ম্যালোরী একজন খুনী। সে বলল, তাকে যাতে গুলি না করা হয় তা আমি দেখব।

গোর্ভিলের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অ্যান ধীর কণ্ঠে বলল, যদি হার্মিট দ্বীপে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় তাহলে ঠিক জানতে পারবে।

ওটাই সেই দ্বীপের নাম?

হ্যাঁ। বাসরকের থেকে বারো মাইল দূরে। বাসরক আর দুনবারের মাঝে অবস্থিত।

ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?

অ্যান ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ পারব।

ঠিক নিয়ে যাবে তো?

অবশ্যই।

করিডন অ্যানের ফ্যাকাসে, স্থির প্রতিজ্ঞ আর বিস্মিত চোখমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল?

আমি চাই ব্রায়ানের সাথে এই তিনজনের ওখানে দেখা হোক। কল্পনাও করতে পারবে না ওই দ্বীপে প্রতিপদে কত বিপদ। ওখানে লুকিয়ে থাকার মত স্থান প্রচুর আছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কুয়াশা এসে দ্বীপটা ঢেকে দেয়। দ্বীপটার চরিত্র ব্রায়ান আর আমার নখদর্পণে।—অ্যানের চোখে বিদ্যুৎ, ওরা এসব জানে না। হ্যাঁ, হলফ করে বলছি। ওদের আমি ঠিক নিয়ে যাব, তবে গিয়ে ওরা অনুশোচনা করবে।

নবম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

নোংরা স্টুডিওতে তারা অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাতের অন্ধকার নামবে এই আশায়।

জন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে আর দু ঠোঁটের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট। তার কাছে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে আছে জিনি। মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভাঙ্গছে সে ধড়ফড় করে উঠে বসছে। রনলি তাদের সামনে মাথায় হাত রেখে বসে আছে। সে বিকেল পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। ঘরের এককোণে সোফায় পাশাপাশি বসে আছে করিডন আর অ্যান। ঘরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। করিডন সব সময় চেষ্টা করছে অ্যানকে জিনির দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে। তার ধারণা, যদি এই দু'জন কোনভাবে মুখোমুখি হয় তাহলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

অ্যানের কাছ থেকে দুনবারে যাওয়ার রুট করিডন জেনে নিয়েছে। অবশেষে ঠিক হয়েছে সকলে অ্যানের গাড়ি করে যাবে। অ্যান বলেছে, দুনবারে একটা মোটর-বোট আছে। মোটর-বোটটা এই দ্বীপে যাতায়াতের জন্যই রাখা আছে। এখন তাদের আর কোন কিছু করবার নেই, শুধু রাতের অন্ধকার নামবার অপেক্ষা করা ছাড়া। পুলিশ আর ফিরে আসেনি। করিডন মনে মনে ধন্যবাদ দিল এই ভেবে, যে পুলিশ দু'জন হোলরয়েডকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তারা খবরের কাগজের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে তাকে জড়ায়নি।

প্রতি আধঘণ্টা অন্তর জানলার সামনে থেকে সরে স্টুডিও পেরিয়ে বেডরুমে গিয়ে হোলরয়েডকে দেখে আসছে। এখানে হোলরয়েড হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে। করিডন আর অ্যান সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবার অ্যানের দিকে সে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তার দুচোখে ঘৃণা।

সাতটার কিছু পরে রাতের অন্ধকার নামতে শুরু করল। রনলি উঠে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে রান্না করবার কথা বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে করিডন জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। যখন সে যাচ্ছে, জিনি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

এখন কি সময় হয়েছে?—সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

এখনো হয়নি।—করিডন বলল, ঘণ্টাখানেক পরে অন্ধকার আরো ঘন হবে।

তিনজন একসাথে কালো আকাশের দিকে তাকাল। ঘন মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, বাতাসে শীতলতা।

বৃষ্টি নামবে—করিডন বলল, সৌভাগ্য বলতে হবে, বৃষ্টি নামলে পথ জনশূন্য থাকবে।

অন্য দুজন কিছু বলল না। সে তাদের বৈরাগ্য আঁচ করতে পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল। এখানে রনলি খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

সব ঠিক আছে তো? করিডন জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে সাহায্য করব নাকি?

ফিসফিস করে রনলি বলল, ওরা আমার সাথে কোন কথা বলছে না। ক্রিড কি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আমি বুঝতে পারছি।

তুমি একটু বেশী চিন্তা কর। করিডন বলল, আড়চোখে রান্না ঘরের দরজার দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল, জন জানলা দিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে—দুজনের বিরুদ্ধে এখন আমরা

তিনজন। অ্যান আমাদের পক্ষে।

এই দুজনের বিরুদ্ধে গিয়ে ও কি এখন সাহায্য করতে পারবে।—রনলি জিজ্ঞাসা করল।

দ্বীপটাতে পৌঁছনোর পর ওর প্রয়োজন হবে, যদি আমরা ওখানে পৌঁছই। তোমার চেয়ে ওদের আমি বেশী চিনি। ওরা জঘন্য প্রকৃতির। আমাকে মোটেই বিশ্বাস করে না—একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসতেই রনলি থেমে গেল। করিডন চমকে মুখ তুলে তাকাল।

করিডন স্টুডিওতে এসে দেখল, অ্যানের বাহু চেপে ধরে জিনি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার চোখমুখে হিংস্রতা। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। দুচোখে পাগলের দৃষ্টি।

জিনিকে টেনে সরিয়ে দিয়ে করিডন বলল, খুব হয়েছে। চুপচাপ বসগে, আমি নাটুকেপনা দেখতে চাই না।

কয়েক মুহূর্ত জিনি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেন চিনতে পারছে না। তারপর হাত তুলল তাকে মারবার জন্য। কিন্তু করিডন তার হাত ধরে ফেলে সজোরে ধাক্কা দিল। জিনি ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেল।

আগেই তোমাকে নিষেধ করেছিলাম।—করিডন বলল, এসব বন্ধ কর, কেমন?

জিনি দেওয়ালে পিঠ রেখে কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কথা বের হলো না। তারপর ঝুঁকে হাঁপাতে শুরু করল, চোখ মুখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মুখ থেকে হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

জিনি কয়েক মুহূর্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখ।—রনলি চিৎকার করে উঠল। ওর দিকে দেখ। এর আগেও ওর এমন অবস্থা হতে দেখিনি আমি।

করিডন এক পা পিছিয়ে এল। অ্যান ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। হাত তুলে আঙ্গুলগুলো কাঁপিয়ে জিনি তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জন চুপচাপ দেখছিল। সহসা সে জিনি আর করিডনের মাঝে এসে দাঁড়াল। কোনরকম দ্বিধা না করে জিনির গালে সজোরে একটা চড় মারল, মেয়েটা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই তাকে ধরে ফেলল। তারপর সন্তর্পণে তাকে মেঝের উপর শুইয়ে দিল। খুব সাবধানে আলতো করে মেয়েটার একটা চোখের পাতা তুলে দেখল আর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল।

ওর মাথায় একটা বালিশ দিয়ে দাও।—রনলিকে জন বলল। করিডন হাতের কাছে যে বালিশটা পেল সেটা রনলির হাতে তুলে দিল।

করিডন দেখল জন বালিশটা জিনির মাথার তলায় দিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে জিনির চোখমুখ মুছিয়ে দিল। সে এই প্রথম বুঝতে পারল মেয়েটা পাগল।

ওকে কি একটু পানীয় দেব?—করিডন জিজ্ঞাসা করল। অসুস্থ মানুষকে দেখলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এখনি ঠিক হয়ে যাবে।—জন বলল, কিছুক্ষণ ঘুমোবে। মাঝে মাঝেই এমন হয়। খুব কম মেয়েছেলেই এই কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর।—করিডন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল।

জিনিকে কিছু জানিও না। এসব ওর মনে থাকে না। ব্যাপারটা এমন কিছু মারাত্মক নয়—নার্ভের রোগ।

বোকার মত কথা বলো না। ওর কাণ্ডকারখানা বিপদজনক উন্মাদের মত। রীতিমত সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন।

তাই বুঝি?—জন হাসল—না, এত ভাবতে হবে না। ম্যালোরীকে খুঁজে পেলেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

জনের স্মিত আর ভয়ঙ্কর হাসি দেখে অ্যানের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা রক্তস্রোত প্রবাহিত হল।

।। দুই ।।

জিনি চোখ মেলল, দেখল জন তার পাশে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে তাকে মৃদু নাড়া দিচ্ছে। চোখ মেল।—জনকে বলতে শুনল, কেমন বোধ করছ?

জিনির মনে হলো জনের কথাগুলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। তার বেশ মনে আছে মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল, শরীরের অবসন্নতাভাব তাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল।

জনের গোল মুখ আর ধূসর চোখ তার কাছে খুব পরিচিত মনে হল। সে উঠে বসবার চেষ্টা করল। অনুভব করল জনের দুটি হাত তার পিঠে, তাকে উঠে বসতে সাহায্য করছে।

তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে।—জন মোলায়েম স্বরে বলল, ভাল না লাগলে শুয়ে থাক। কোন তাড়া নেই। করিডন গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেছে।

জ্ঞান হারিয়েছিলাম!—সে জীবনে কখনো জ্ঞান হারায়নি। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।—বাদামী হাত দুটো জনের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কি ঘটেছিল?

জন চুপ করে রইল।

অবস্থা কি খুব খারাপ হয়েছিল? জিনি জানতে চাইল, কতক্ষণ এ অবস্থা ছিল?

তেমন খারাপ কিছু না। প্রথমে মনে হয়েছিল তুমি জ্ঞান হারিয়েছ।—তার দু-চোখে ভয় জমতেই সে বলল, হয়ত আর কখনো এমন হবে না, ভয়ের কিছু নেই।

গালের যে জায়গায় জন চড় মেরেছিল সেই জায়গায় হাত বুলিয়ে ভয় পেয়ে বলল—এখানে ব্যথা লাগছে। আমাকে আঘাত করতে হয়েছিল?

না।—জন হাত নেড়ে বলল, তোমায় তো বললাম তেমন কিছু নয়।

আমাকে তোমায় আঘাত করতে হয়েছিল।—সে বিমর্ষ ভাবে বলল, জন, আমার কি হয়েছিল? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মাথাটা কেমন যেন ধরা। আমার ভয় করছে।

মনের উপর চাপ আর দুশ্চিন্তার ফল—ভেবে দেখ তুমি কিভাবে দিনগুলো কাটাচ্ছ—তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। বলছি তো চিন্তা করবার মত কিছু নয়।

আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে,—সে আবার বলল। ম্যালোরীকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের পরিণতি ভেবে কি হবে? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তোমার করে? হাতে মাথা রেখে কপাল টিপে ধরে জিনি বলল। কিন্তু ম্যালোরীকে কি আমরা খুঁজে পাব? ওর মৃত্যুর পর আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না। আমাদের বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

কার্লোটের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার জীবনও শেষ। জন মৃদুকণ্ঠে বলল, তবে এখন এসব কথা আলোচনা করবার সময় না। সামনে আমাদের অনেক কাজ।

আবার জিনি জনের হাত চেপে ধরল। সে বলল, জন তুমি না থাকলে আমি কি করব? আমরা ঝগড়া করি আমাদের মতান্তর হয়, কখনও বা পবস্পরকে ঘৃণা করি। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তোমাকে সবসময় কাছে পেয়েছি।

যে তোমার শত্রু সে আমারও শত্রু।—জন বলল, তাছাড়া প্রকৃত বন্ধুরা ঝগড়া করেই থাকে। বন্ধুদের পরীক্ষা এভাবেই হয়।

জিনি উঠে দাঁড়িয়ে জনের কাছ থেকে সরে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, বর্তমান অবস্থা কি বলত?

করিডন আর মেয়েটা গেছে গাড়িটা আনতে। জন বলল, রনলি খাবার গুছিয়ে নিচ্ছে।

জিনি বিরক্ত হয়ে বলল, ওদের একসাথে যেতে দিলে?

কি করব, আমাকে যে তোমার কাছে থাকতে হল।—জন বলল, একজনকে তো গাড়িটা আনতে যেতেই হত।

কিন্তু ওরা গাড়ি নিয়ে আমাদের ছেড়ে পালাতে পারে।—জিনি বলল, এদিকটা ভেবে দেখেছ?

যদি পালায় তাতে আমাদের কিছু যাবে আসবে না।—ওদের সাহায্য ছাড়াই কাজ হাসিল করতে পারব।

না, তুমি ভুল করছ। করিডনকে বাদ দিয়ে কোন কাজ করা যাবে না। ম্যালোরীর কাছে একমাত্র ও আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। ওকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না।

জন রেগে গিয়ে বলল, আগাগোড়া এই কথা বলে আসছ, আমার উপর আস্থা রেখে দেখ।

এই করিডনের উপরেই শুধু নির্ভর করছ কেন বলতে পার?

তা জানি না, বলতে পারব না। তবে আমার বিশ্বাস করিডনই পারবে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে।

ঠিক আছে। ফলেন পরিচয়তে। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লোকটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জানি—উপায়হীনের মত জিনি বলল, ওকে আমি ঘৃণা করি, ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারি। তবুও আমার স্থির বিশ্বাস এই লোকটা আমাদের ম্যালোরীর কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

রনলিকে দেখে আসি—প্রসঙ্গ পরিবর্তন না করলে ক্রোধ প্রশমিত হবে না বলে জন বলল, চুপচাপ অপেক্ষা কর। গাড়ি এসে যাবে। অত ভেব না।—সে রান্নাঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, রনলি তুমি প্রস্তুত?

রনলি চোরা আর অস্বস্তিকর চোখে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর সে বলল, যা পেয়েছি সব গুছিয়ে নিয়েছি। জিনি কেমন আছে?

ভাল আছে। গাড়িটা আসতে দেখেছ নাকি?

না, রনলি মাথা নাড়ল, আর হোলরয়েড কেমন আছে?

জানি না। ওর কাছে যেতে পারিনি। তোমাকে দিয়ে কোন ভাল কাজ হবে না নাকি? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিও পার হয়ে জন বেডরুমে ঢুকল।

জিনি শুনল জনের গলা থেকে অস্ফুট আর্তনাদ ছিটকে বেরিয়ে এল। সে জনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

লোকটা পালিয়েছে!—রনলিটা বোকা ওর ওপর নজর রাখতে পারেনি। দেখ লোকটা ঠিক পুলিশ ডেকে আনবে।

এদিকে করিডন অ্যানের বাংলোয় ঢুকে বলল, আলো জ্বেলো না মনে কর আমরা গ্যারেজেই আছি।দেখ তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই। ওই মেয়েটা সাংঘাতিক। একেবারে বদ্ধ পাগল। আমাদের সাথে তোমার আসা নিরাপদ হবে না।

অন্ধকারে অ্যান করিডনকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

প্রতিজ্ঞা কর কাউকে বলবে না, আমরা কোথায় যাচ্ছি।—করিডন বলল, এবার তুমি পালাও, আমি ওদের বলব তুমি পালিয়ে গেছ।

আমি তোমার সঙ্গে যাব—কোনরকম দ্বিধা না করে অ্যান বলল, যদি ব্রায়ান বেঁচে থাকে তাহলে ওকে সাহায্য করতে আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু ভাবনা এই পাগল মেয়েটাকে নিয়ে।—চিন্তিত কণ্ঠে করিডন বলল, সব সময় তোমার কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে না। একা পেয়ে তোমার ক্ষতি করতে পারে।

আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। জানি, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। তবু আমি তোমার সাথে যাবো। মন প্রস্তুত করে ফেলেছি।

বেশ, যা ভাল বোঝ কর। স্বীকার করছি তোমার উপস্থিতি আমাদের কাজে লাগবে। জায়গাটা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আমাদের রক্ষা করবে বার বার। তুমি স্থির নিশ্চিত তো?

নিশ্চয়ই।

তাহলে সাথে যা নিতে চাও চটপট গুছিয়ে নাও। ফোনটা কোথায়? একটা ফোন করতে চাই।

জানলার কাছে আছে।

করিডন ফোনে টেলিগ্রাম অফিসের সাথে যোগাযোগ করল। সে অপারেটারকে বলল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্সকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। টেলিগ্রামটা এইরকম হবে ঃ ক্রিডকে আর এনফিল্ড হোটেলে দুজন পুলিশকে যে বুলেটের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করুন। জন হল মসার পিস্তলের মালিক। এই লোকটা তার দুজন সাথীর সঙ্গে এনফিল্ড হোটেলে ছিল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, এই তিনটে মানুষ ক্রিডের সাথে তার ফ্ল্যাটে তিন দিনের মতো ছিল।—করিডন। ঠিক মত লিখেছেন?—হ্যাঁ, একবার পড়ে

শোনান—অপারেটর পড়ে শোনাতেই করিডন বলল, চমৎকার। তাহলে ছাড়লাম।

করিডন রিসিভার নামিয়ে রাখলো। সহসা বাইরে কারো চলাফেরার শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠল সে! জানলা দিয়ে দেখল চার পাঁচটা লোক খোলা জায়গা পেরিয়ে হোলরয়েডের বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অ্যান—করিডন চাপাগলায় ডাকল, কোথায় তুমি?

অ্যান কাছে এসে বলল কি হয়েছে? গোছানর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি—

বাইরে পুলিশ। সব ফেলে রাখ। খিড়কির দরজা আছে?

হ্যাঁ আছে। আমার সাথে এস।—অ্যান করিডনের হাত চেপে ধরে অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

একটু অপেক্ষা কর। কোথায় গিয়ে পড়ব বল তো?

গ্যারেজে। এখান থেকে রীলে স্ট্রীটে পড়ে কিংস স্ট্রীটে যাওয়া যাবে।

ঠিক আছে। আমার গা ঘেঁষে চল। যদি পুলিশ আমাদের দেখে ফেলে তাহলে মাটিতে সোজা শুয়ে পড়বে ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে। বুঝেছ?

হ্যাঁ।

সাবধানে খিড়কির দরজা খুলে অন্ধকারে করিডন উঁকি দিয়ে দেখল। ঠিক সেই সময়ে গুলি ছোঁড়ার শব্দ কানে এল। পর পর তিনটে গুলির শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

জনের কাজ—করিডন ফিসফিস করে বলল, আমার হাতটা ধর। তাড়াতাড়ি এস।

দুজন অন্ধকারে এগিয়ে চলল, আবার গুলি ছোঁড়ার শব্দ হল। মানুষের চিৎকার শোনা গেল। এস।—

অ্যানের হাত চেপে ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা রীলে স্ট্রীটে এসে পড়ল। করিডন বলল, ওরা এই রাস্তা ঘিরে ফেলতে পারে। যদি আমরা বাধা পাই তাহলে দায়দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে।

তারা দ্রুত পায়ে আলোকোজ্জ্বল কিংস স্ট্রীটের দিকে এগোতে লাগল। অন্ধকারে ঢাকা অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করার পর করিডন একজন পুলিশকে দেখতে পেল। সে দাঁড়াল না, অ্যানের হাত ধরে আগের মত হাঁটতে লাগল।

পুলিশ আমাদের পথ রোধ করতে পারে আবার নাও পারে—চাপা কণ্ঠে করিডন বলল, যদি পথ রোধ করে তাহলে দৌড়তে শুরু করবে। এছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না, তুমি দেখছ?

না,—চাপাকণ্ঠে অ্যান বলল।

পুলিশটা হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। একটু দাঁড়াও—হাত তুলে পুলিশটা বলল।

আমি বললেই দৌড়তে থাকবে।—করিডন ফিসফিসিয়ে বলল।

তারপর গলার স্বর চড়িয়ে পুলিশটার উদ্দেশ্যে বলল, আমায় বলছেন? পুলিশটা থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। করিডন তার গালে একটা ঘুঁষি মেরে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে—দৌড়ও। অ্যানকে একটা ধাক্কা মারল।

।। চার।।

জন চকিতে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারল হোলরয়েড পালিয়েছে। অগোছালো বিছানা, দুটো দড়ির টুকরো মাটিতে পড়ে আছে। খোলা জানালা পথে হাওযা ঢুকে পর্দা ওড়াচ্ছে। কতক্ষণ আগে হোলরয়েড পালিয়েছে, দশ, পনের না কুড়ি মিনিট আগে, পুলিশের গাড়ি এসে পড়ার আগে এই সময়টুকু যথেষ্ট।

জিনি আর রনলি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে ঠিক জনের পিছনে। তারা তাকিয়ে আছে শূন্য বিছানার দিকে। জিনির চোখে শূন্য দৃষ্টি। জনের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। আগে যতবার জরুরী অবস্থা উপস্থিত হয়েছে জিনি সামলেছে, কিন্তু এখন তাকে সেরকম মনে হলো না। এখনো তার মধ্যে আগের ভাব রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে জন ভাবল তাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। রনলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লক্ষ্য করল, সে নিজেও বিচলিত হলেও রনলির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া

নেই।

এতক্ষণে পুলিশের এসে পড়া উচিৎ।—রনলি বলল, হোলরয়েড যদি ফোন করে থাকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

হ্যাঁ। আর এবার আসবে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে, জন বলল, এনফিল্ড হোটেল থেকে যত সহজে পালিয়েছি তত সহজে এখান থেকে পালান যাবে না।

জানালা দিয়ে লক্ষ্য রাখ। রনলি বলল, দরজার দিকে আসতে পারে।

জন খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল। তারপর জিনিকে বলল, করিডনের পিস্তলটা রনলিকে দাও।

সহসা রনলি জিনির কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল। জন কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।—কপাল চেপে ধরে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে জিনি বলল।

পেছনের দিকটা দেখে আসি,—রনলি বলল, আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানে থাক।

রনলি চলে যেতেই জন স্টুডিওর জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বাইরে অন্ধকারে চোখ রাখল। কিছুই নজরে পড়ল না। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পেল, পুলিশ এসে গেছে, তারা সন্তর্পণে বাংলোর দিকেই এগিয়ে আসছে। রনলি ফিরে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, পুলিশ এসে গেছে। চারজন পিছন ি কটা পাহারা দিচ্ছে। সামনের দিকে আছে আটজন।—জন বলল, সংখ্যায় আরো বেশী হতে পারে।

আমরা তিনজন ওদের সাথে পেরে উঠবো না, জন—রনলি বলল, জিনিকে নিয়ে পিছনের দিকে পালাতে পার কিনা দেখ। পরে দেখা করব।

পরে দেখা করবে?—রনলির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে জন বলল, তার মানে?

দয়া করে যাও বলছি।—রনলি মিনতি করল। এটা একমাত্র সুযোগ। দুজনে যা পারব, তিনজন হলে সেটুকুও ভেস্তে যাবে। জিনিকে নিয়ে তুমি যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু রনলি, বাঁচার অধিকার আমার যেমন আছে, তোমার তেমনি আছে।

জনকে ধাক্কা দিয়ে রনলি বলল, আঃ, জিনিকে নিয়ে যাও বলছি। গুলির শব্দ শুনলেই বুঝতে পারবে।

তুমি আমার সুহৃদ।—জন বলল, তারপর সে রনলিকে একা রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ রনলি একা দাঁড়িয়ে রইল। নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছে সে। জন সম্পর্কে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই। আজ হোক আর দু-দিন পরেই হোক জন তাকে খুন করবে, হয়তো তার ছোঁড়া একটা গুলি মাথা ভেদ করে যাবে, কিম্বা পিছনে ছোরা বসিয়ে দেবে, তার চেয়ে এই ভাল হল। ওরা দু'জনে যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে মনে রাখবে। সহসা তার মনে হল জনকে সে হারিয়ে দিয়েছে।

বন্দুকের নল দিয়ে জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে দিল রনলি। এখন বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। জন আর জিনি কি চলে গেছে? ম্যালোরীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। এই মানুষটার কথা ভাবলে দুঃখে মনটা ভরে যায়।

রনলি শুনতে পেল জন পেছনের দরজা খুলে বন্ধ করল। হাতে ধরা বন্দুকটাকে প্রচণ্ড ভারী বলে মনে হল তার। প্রচণ্ড কষ্টে বন্দুক ধরে রাখল। জনকে ফিসফিস করে বলতে শুনল, আমরা প্রস্তুত।

রনলি একটানে পর্দা সরিয়ে ফেলে জানলার সামনে দাঁড়াল। অন্ধকারে একের পর এক গুলি চালাতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ

।। এক।।

এমিথিস্ট ক্লাবের দিকে যাওয়ার একমুখো রাস্তার মুখে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি ঝরে চলেছে। বেশ শীত পড়েছে, রাস্তার আলোগুলো যেন ধুলো পরানো। ক্রিম স্ট্রীট জনশূন্য। করিডন এমনই আশা করেছিল।

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিল করিডন। তারপর সে আর অ্যান গাড়ি থেকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

ক্লাবের পিছনে একটা দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। অ্যান আর করিডন ভেতরে ঢুকে একটা আবছা আলোকিত প্যাসেজে এল, এখানে আবর্জনার দুর্গন্ধ বাতাসে ভাসছে।

যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। এফির সাথে দেখা হলে বুঝবে কয়েক ঘণ্টার জন্য তারা নিশ্চিন্ত। কোট থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে করিডন বলল, মেয়েটাকে খুঁজতে যাচ্ছি, তুমি এখানে অপেক্ষা করবে?—খুব একটা সময় লাগবে না।

আচ্ছা—অ্যান বলল, কিন্তু যদি কেউ এসে পড়ে? বলবে তুমি এফির বান্ধবী। তবে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমাকে দেখে মনে হয়েছে প্রতিদিনই এ ধরণের কাজ করতে অভ্যস্ত।

যাও, এফিকে খোঁজোতো, প্রশংসা পরে করলেও চলবে।

করিডন রান্নাঘরের সামনে এল। দেখল এফি গুন গুন করে গান গাইছে আর আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

এফি!—দরজার সামনে থেকে করিডন ডাকল, আশে পাশে কেউ নেই। খোসা ছাড়ান ছুরিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল এফি। তার চোখমুখে বিস্ময়, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আরে মিঃ করিডন যে—

ঘরে ঢুকে করিডন বলল, এফি আমি বিপদে পড়েছি। তোমার সাহায্য প্রয়োজন। আমায় সাহায্য করবে?

নিশ্চয়ই। কি হয়েছে, মিঃ করিডন?

তোমার ঘরে যেতে পারি? একজন বন্ধু আছে সাথে। আমরা এখানে আছি জনি জানুক, সেটা চাই না। ও কোথায়?

ক্লাবে। এক্ষুনি আলুগুলো ছাড়াতে হবে, তাছাড়া রাতে ব্যস্ত থাকব। তুমি নিজে যেতে পারবে?

পারব। যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। একটা টাইম-টেবিল আনতে পারবে? আর কিছু খাবার অবশ্যই সঙ্গে করে আনবে। কিন্তু আমাদের কথা কাউকে জানাবে না।

না জানাব না। তুমি উপরে যাও মিঃ করিডন। দশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। করিডন এফিকে বুকে জড়িয়ে ধবে বলল, তুমি কি ভাল এফি। জানতাম তুমি আমায় সাহায্য করবে।

এর মধ্যে পুলিশ জড়িয়ে আছে নাকি, মিঃ করিডন?

হ্যাঁ আছে, তবে ভয় পেয়ো না। নিজেই সামলে নিতে পারব। তোমার আসতে দেরী হবে নাকি?

করিডন অ্যানের কাছে ফিরে এল। দেখল মেয়েটা ময়লা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, আমরা উপরে যাব। এফি ওর ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

এফির ঘরে যাওয়ার পথে কারো সঙ্গে তাদের দেখা হল না। আলো জ্বালাবার আগে জানালার খড়খড়ি টেনে দিল।

অ্যানকে কোট খুলতে সাহায্য করে নিজের কোটও গা থেকে খুলে ফেলল সে। তারপব কোট দুটো দরজার পেছনে হুকে ঝুলিয়ে রাখল। বলল, বিছানায় বস।

অ্যান বিছানায় বসে পড়ে বলল, ভাবছি ওই তিনজনের কথা, ওরা পালাতে পেরেছে বলে মনে হয়?

পালাবার সুযোগ আছে। আকস্মিক সংকট থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ওরা পটু। আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গ ত্যাগ করবে না বলে ঠিক করেছ? আমার সঙ্গে তুমি থাকলে ঝামেলায় পড়বে।

মনে হচ্ছে আমার সংস্পর্শ এড়াতে চাইছ তুমি। ঝামেলা আমি পছন্দ করি আর নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। ব্রায়ানের খোঁজে আমি যাবই।

কিন্তু নিজেকে পুলিশের সঙ্গে জড়িও না। যদি হার্মিট দ্বীপে যাবেই ঠিক করে থাক, তাহলে একা যাও।

ভেবেছিলাম আমরা দলবদ্ধভাবে যাব।

পুলিশ আসার আগে সেরকম ভেবেছিলাম, করিডন অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এখন থেকে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে পড়বে।

তোমাদের তিনজন চোখের আড়াল হয়েছে, কিন্তু তোমাকে চোখের আড়াল হতে দেব না। তাছাড়া আমি সঙ্গে না থাকলে তুমি দ্বীপটা খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি চাই ওই তিনজনের আগে দ্বীপে তুমি পৌঁছাও, অবশ্য ওরা যদি আসার সুযোগ পায়।

ঠিকমত তোমাকে বোঝাতে পারছি না। তোমার আচার-ব্যবহার অন্য মেয়েদের মত নয়। তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না। অথচ আমার সঙ্গে থাকতে চাও। ব্যাপারটা আমাকে ভাবায়। তোমাকে একেবারে বুঝতে পারছি না।

যুদ্ধের সময়কার কথা ভাব। তুমি ভাবছ তখন আমি নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসেছিলাম? যুদ্ধ আমাকে নতুন ভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে, অথবা বলা যেতে পারে কতকগুলো বাজে অভ্যাসের দাস করেছে আমায়। তারপর থেকে আমি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে তুমি যখন সহসা এসে পড়লে, থেমে গিয়ে অ্যান হাসল, আমি উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ হারাতে রাজি নই।

তুমি কি করেছ যুদ্ধের সময়?—করিডন জানতে চাইল।

তুমি যা করতে। তোমাকে প্রথমে পাত্তা দিইনি, তবে এখন চিনেছি। মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনতাম, তুমি তো রীবির কাছে ট্রেনিং নিয়েছ? আমি ট্রেনিং নিয়েছি ম্যাসিংহামের কাছে। ততদিনে তোমার ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে।

ম্যাসিংহাম? কি আশ্চর্য। ওর দুঃসাহসী কুমারী মেয়েদের মধ্যে তুমি ছিলে একজন?—করিডনের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হল।

হ্যাঁ। দশবার প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়েছিলাম। এর জন্য আমি গর্বিত।

আমি যখন শুনলাম প্যারাসুটে মেয়েদের নেবার জন্য একটা দল তৈরী করা হয়েছে, ভাবিনি ম্যাসিংহাম মহিলা সৈনিকের একটা দল তৈরী করেছেন। ভদ্রলোক প্রত্যেকটি মেয়েকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। তাই না? তাহলে ম্যাসিংহামের তৈরী দলের তুমি একজন?

অত অবাক হয়ো না।—অ্যান বলল, দয়া করে আমার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করো না। নিজের সম্পর্কে নিজেই ভাবব।

দরজায় টোকা মেরে এফি ঘরে ঢুকল, হাতের ট্রেতে খাবার। অ্যানকে দেখে কাছের একটা টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল। তীক্ষ্ণ হল চোখের দৃষ্টি। চোখ মুখ কুঁচকে যাওয়ায় তাকে কুশ্রী দেখাল।

এস এফি।—করিডন বলল, অ্যান ম্যালোরীর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দি, অ্যান এ হল এফি—আমার বন্ধু।

পরিবেশ স্বাভাবিক করে নিতে চাইলেও এফির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হলো না। এমনকি অ্যান যখন বলল, ঘর ছেড়ে দিয়ে তুমি যথেষ্ট দয়ার পরিচয় দিয়েছ, এফি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

অ্যানকে দেখামাত্র সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর আভাস পেয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

তুমি টাইম-টেবিল পেয়েছ?—করিডন প্রশ্ন করল। নিজের হাত ঘড়িতে সময় দেখল। দশটা বেজে কয়েক মিনিট।

এক্ষুনি নিয়ে আসছি, মিঃ করিডন। এফি বলল। খাবারের ট্রে বিছানার উপর রেখে বাইরে চলে গেল।

করিডন মৃদু হেসে বলল, খেতে শুরু কর। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব চলে যাব।

অ্যান একটা চিকেন স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে প্লেটটা করিডনকে দিল। তারপর সে বলল, মেয়েটা কি তোমায় ভালবাসে?

কে? এফি?—করিডন কাঁধ ঝাকাল, তাই মনে হয়। মেয়েটা খুব ভাল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমারই দোষ। ওকে অনেকদিন থেকে চিনি। বলেছি ওর কাটা ঠোঁট ঠিক করে দেব। আমার জীবনে অকৃত্রিম বান্ধবী। এর থেকে বেশী কিছু নয়।

অ্যান প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিৎ ওই তিনজনের ভাগ্যে কি ঘটল।

আমি খোঁজ নেব।

এফি টাইম টেবিল নিয়ে ফিরে এল।

এফি, শোন।—করিডন বলল, আমাকে লন্ডনে যেতে হবে। আমি বিস্তারিতভাবে তোমায় কিছু বলব না, কারণ যত কম জানবে ততই ভাল। আমরা আজ রাতে স্কটল্যান্ডে যাব। পথে খাদ্যের প্রয়োজন হবে আর আমি চাই তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে টিকিট কাটবে। পুলিশ আমাদের খোঁজে নজর রাখবে। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেনে উঠতে পারলে ভাল হবে। করবে তো?

করব মিঃ করিডন।—এফি গম্ভীর মুখে বলল। করিডনের স্কটল্যান্ডে চলে যাওয়ার অর্থ তার বুকে ছোরা বসিয়ে আত্মহত্যার সামিল।

করিডন টাইম-টেবিলের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলল, তুমি যাবার প্রস্তুতি কর আর ম্যাক্সকে কি একবার পাঠিয়ে দেবে? জনি যেন জানতে না পারে।

চেষ্টা করব।—এফি চলে গেল।

মেয়েটা ভাবছে আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। —অ্যান বলল, তুমি ওকে আশ্বস্ত করলে ভাল হয় না কি?

এ কাজ করা যাবে না।—টাইম-টেবিলের পাতায় চোখ রেখে করিডন বলল, আমি নিজেই নিশ্চিন্ত নই।

সামান্য সময় অ্যান সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

দরজা ঠেলে ম্যাক্স ঘরে প্রবেশ করল। অ্যানকে দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

ডেকেছ আমাকে?—সে প্রশ্ন করল।

করিডন বলল, শোন, চেইনী ওয়াকের গুলি ছোঁড়াছুড়ি সম্বন্ধে কিছু জান নাকি?

জানি বৈকি,—ম্যাক্স হেসে বলল, লোকে বলাবলি করছে। সেই তিনজনের কথা বলছ তো?

হ্যাঁ কি হয়েছে?

দু'জন পালিয়েছে আর হাত-কাটা লোকটা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। তবে পুলিশের বক্তব্য অন্যরকম লোকটা মরেনি—আহত হয়েছে আর সকলে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

করিডন আর অ্যান পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল।

।। দুই ।।

চার্চের ছাদের নীচে মাত্র একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। বেদীর দুপাশে জ্বলছে দুটো মোমবাতি। এই হলদে আলোর শিখায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চার্চের ভেতরে পিছন দিকে একজন বৃদ্ধা মহিলা দু' হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে। বাতাসের শব্দ চার্চের নিঃস্তব্ধ পরিবেশ নষ্ট করছে। দু'জন মানুষ এক পাশে পাতা বেঞ্চের উপর বসে আছে।

জন আর জিনি চঞ্চল মনে বৃদ্ধার চলে যাওয়ার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু মহিলাটির মধ্যে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। আহত জনের গা ঘেঁষে জিনি বসে আছে। তার দু চোখ চকচকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির দিকে নিবদ্ধ, জনের দিকে তাকাচ্ছে না। জিনির ব্যবহারের ব্যতিক্রম জনকে রাগিয়ে দিল, মন হতাশায় ভরিয়ে দিল।

তারা অলৌকিক উপায়ে পালাতে সমর্থ হয়েছে। জিনিকে দিয়ে কোন কাজ হয়নি। জন তাকে ঠেলে এনেছে একটা পুতুলের মত। জিনির হাত ধরে সাবধানে পালাবার সময়ে পুলিশের ছোঁড়া একটা গুলি জনের বাহুতে এসে লেগেছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে জিনির হাত চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে এই চার্চের সামনে এসে পড়েছে।

জিনির হাত ধরে রক্তাক্ত জন পবিত্র আর নিরাপদ চার্চে ঢুকে পড়ে উপাসকের বসবার আসনে বসে পড়ল। তাদের সামনে বসে আছে একজন বৃদ্ধা, উপাসনা করছে না—ঘুমচ্ছে।

জন বোতাম খুলে গা থেকে কোট খুলে ফেলল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

জিনি জনের রক্তাক্ত শার্টের হাতার দিকে তাকাল। ছুরিটা আমাকে দাও।—জিনি বলল, স্কার্ফটা খুলে ফেল।

জন ছুরিটা তার হাতে দিল, দেখল জিনি তার জামার হাতাটা কাটছে। দুজনেই দেখল কালচে আর ফুলে ওঠা ক্ষতস্থান।

একটা প্যাড চাপা দিয়ে শক্ত করে বাঁধ।—জন বলল, রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

একটা রুমাল ভাঁজ করে প্যাডের মত করে ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে স্কার্ফ দিয়ে শক্ত করে জিনি বেঁধে দিল।

চমৎকার হয়েছে—জন বলল, এবার কোটটা পরতে আমায় সাহায্য কর।

তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল, পিস্তলটা হাতের কাছে রাখল। পা দুটোতে যেন একেবারেই শক্তি নেই। এই মুহূর্তে পুলিশ যদি এখানে হানা দেয় তাহলে পালাতে পারবে না, তবে তাকে জীবিত ধরতে পারবে না।

জন হাতে-বাধা ঘড়িতে সময় দেখল। রাত পৌনে এগারটা। করিডন আর ম্যালোরী মেয়েটার কি হল তাই ভাবতে লাগল। করিডনের ধারণা মত ম্যালোরীকে সত্যই সেই দ্বীপে পাওয়া সম্ভব? তাকে যদি খুঁজে বার করতে হয় এখনি সেখানে গিয়ে খোঁজা শুরু করতে হবে। এখন একমাত্র ভরসা এই দ্বীপটা।

মধ্যরাতে ঠিক করল চার্চ ছেড়ে যাবে, বৃদ্ধাটি অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে, ঘুম-জড়ান চোখে তাদের সে লক্ষ্য করেনি।

নিঃশব্দ চার্চের পরিবেশ, আর এখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। জিনিকে আলতো ভাবে স্পর্শ করে জাগাল।

যাওয়ার সময় হয়েছে।—জন জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।—জিনি নিজের চুলে বিলি কেটে বলল, আর তুমি? তোমার হাতের অবস্থা কি?

ভাল। যাওয়ার সময় হয়েছে। দ্বীপে যেতে হবে। জন বলল, কি করে যাবে?

কিংক্রশ থেকে ট্রেনে স্কটল্যান্ডে যাওয়া যায়।

কিংক্রশ কোথায়?

গ্রেস ইন বার্ডের কাছে। হেঁটে পৌঁছতে হবে। জন আস্তে আস্তে অলস পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে বলল, তোমার মন বলছে আমরা দ্বীপে পৌঁছতে পারব?

পারব।—রূপোর যীশুমূর্তির দিকে তাকিয়ে জিনি বলল, জন, আমাকে একটু সময় দাও। হয়ত আর কখনো চার্চে ঢোকার সুযোগ জীবনে আসবে না।

তাড়াতাড়ি কর।—মুখের ঘাম মুছে জন বলল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল জিনি। ভাবল কি ভাবে প্রার্থনা করবে। কোন এক সময় সে ভগবানকে বিশ্বাস করত, কিন্তু এখন আর সেই বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর কি তার কোন প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না? তার একমাত্র কামনা যে কোন ভাবেই হোক না কেন, ম্যালোরীকে খুন করা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

উত্তরমুখী ধাবমান ট্রেন নির্দিষ্ট সময় সকাল সাড়ে আটটার কিছু পরে বারউইক স্টেশনে পৌঁছাল।

বারউইক হল দুনবারের আগের স্টেশন। করিডন তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে নিল কোন পুলিশ প্ল্যাটফর্মে আছে কিনা।

প্রত্যেক স্টেশনে করিডন লক্ষ্য রেখেছে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে করিডন প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা নিজের ছবি দেখে তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল রক্তস্রোত প্রবাহিত হল। ফটোর মাথায় ক্যাপসান লেখা আছে ঃ 'আপনি কি এই লোকটাকে চেনেন?'

এ ধরনের কিছু আশা করেনি করিডন। যে কোন সময় কেউ না কেউ তাকে চিনে ফেলতে

পারে।

দেখি কি লিখেছে।—করিডন কাগজ লুকিয়ে ফেলার আগে অ্যান কাছে এসে বলল।

ইতস্ততঃ করল করিডন। সে অ্যানকে জানতে দিতে চায় না যে রীটা অ্যালেন মৃত। তবে এটা ঠিক যে একদিন অ্যান ঠিক জানবে। অন্যের কাছ থেকে না জেনে তার কাছ থেকে জানাই ভাল হবে। তাই খবরের কাগজটা পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিল।

অ্যান ফটোটা দেখল খুঁটিয়ে। তারপর সে বলল, হ্যাঁ ফটোটা তোমারই। একেবারে হুবহু তোমার চেহারা। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে দুনবারে পৌঁছে যাব। কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

ঝুঁকি নেব।—করিডন বলল কঠিন কণ্ঠে, তবে আমার সম্পর্কে তোমার ভাল করে জানা প্রয়োজন। কোন মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা করবার প্রয়োজন নেই। পুলিশ আমাকে লক্ষ্য নাও করতে পারে।

কাগজে রীটার খবর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানের চোখমুখ কঠিন হয়ে এল, শক্ত হাতে কাগজ চেপে ধরল।

মেয়েটা তো মারা গেছে।—অ্যান বলল, অস্ফুট কণ্ঠে। লিখেছে ও খুন হয়েছে।

ঠিকই লিখেছে।—করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল, পুলিশের ধারণা এ কাজ আমার। তখন মেয়েটার ওখানেই ছিলাম কিনা। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল।

অ্যানের সারা মুখে ভীতি আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। করিডন একটা সিগারেট ধরাল—তুমি কি ভাবছ জানি। যদি তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কর তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তুমি ট্রেন ধরে লন্ডনে ফিরে যাও। তোমার দ্বীপে আমি একাই যাব। তুমি শুধু পুলিশকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু বল না।

এই ঘটনাগুলোর পিছনে অন্য ঘটনা আছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি কিছু লুকোচ্ছ। কি লুকোচ্ছ বল তো?

ঠিক বলেছ, এই ঘটনাগুলোর পেছনে অন্য ঘটনা আছে। তোমাকে বলতে চাইছিলাম না, তবে বলা প্রয়োজন। তোমার মনে আছে নিশ্চয় যে গোর্ভিলের দলে মোট ন'জন গুপ্তঘাতক ছিল?

গোর্ভিল, কার্লোট আর জর্জকে গেস্টাপোরা গুলি করে হত্যা করে। তোমার দাদার কোন হদিস পাওয়া যায় না। বাকী পাঁচজনের ধারণা, তোমার দাদা গোর্ভিলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা লন্ডনে আসে। তাদের মধ্যে দু'জন—হ্যারিস আর লুবিস কোন ক্রমে তোমার দাদার কাছে যায়। দু'জনই নশংসভাবে মারা যায়। একজন চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আর অপর জন পুকুরে ডুবে মরে। তোমার দাদার খবর জানতে রীটা অ্যালেনের কাছে গিয়েছিলাম। আমি ঘরে বসা অবস্থায় তাকে সিঁড়ি থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে ঘাড় ভেঙ্গে সে মারা যায়।

তোমার অনুমান ব্রায়ানই ওদের খুন করেছে?

হ্যাঁ।

ব্রায়ান সম্পর্কে তোমার অনেক অভিযোগ তাই না?

হ্যাঁ। তোমার দাদার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

এসব আগে বলনি কেন?

আমি চেয়েছিলাম তোমার সাহায্যে ওকে খুঁজে বের করতে।

তাহলে হঠাৎ তোমার মন পালটে গেল কেন? তোমাকে এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে।

তাই বুঝি।

এখন সবই জেনেছ। দুনবারে পৌঁছানোর পর বাড়ি ফিরে যাও। আমার কথা ভুলে যাও। তোমার দাদাব উপর সুবিচারই করব। তোমাকে কথা দিচ্ছি।

।। দুই।।

ট্রেনের করিডর দিয়ে করিডন যখন দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে, ঠিক তখনই প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একজন বিরাট চেহারার মানুষ তাব সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট

রলিন্স।

গোলমাল করো না বন্ধু। লোকটি হেসে বলল, হাডসন ঠিক তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। আড় চোখে দেখল করিডন। সত্যিই তার পিছনে ডিটেকটিভ কনস্টেবল হাডসন পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কোচের কোন দরজা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারত করিডন, কিন্তু ট্রেন এত দ্রুতগতিতে ছুটছে যে লাফ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারল না সে। এভাবে পালাবার চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল।

সে বলল, হ্যালো, রলিন্স। এখানে তোমাকে দেখব আশা করিনি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছ?

পেয়েছি।—কোন রকম ইতস্ততঃ না করে রলিন্স বলল ক্রিডের খুন নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার তার পাওয়ার আগেই সব জেনেছি। তোমার কাছে পিস্তল আছে তাই না?

হ্যাঁ, আছে। পকেট থেকে তুলে নাও হাডসন, ওটা আমার ডানদিকের পকেটে আছে।

হাডসন গম্ভীর মুখে পকেট থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা তুলে নিল।

এর পারমিট আছে? রলিন্স জানতে চাইল।

নিশ্চয়ই।—করিডন বলল, ওটা ব্যাগে আছে দেখবে নাকি?

এক্ষুনি দেখব না। তোমাকে লক-আপে পোরার মত সুযোগ নিশ্চয়ই দেবে না?

ভেব না এবারে আমায় লক-আপে রাখবার মত সুযোগ তুমি পাবে—কারডন হেসে বলল, কারণ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

সকলে তাই বলছে বটে।—রলিন্স বলল, তোমাকে দেখে অবাক হই করিডন। তোমার সুবিধার জন্য কিছু যাত্রীকে আমরা ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছি আর তোমাকে লন্ডনে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দুনবারে একটা গাড়ি ঠিক করে রেখেছি।

কিন্তু আমি তো লন্ডনে ফিরব না।

দুঃখিত বুড়ো শালিক, পুলিশ তোমার সাথে লন্ডনে কথা বলতে চায়।—পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রলিন্স বলল, এই ধরনের কোন ব্যাপার আব কি। মরতে চাও নাকি?

রলিন্সের দেওয়া সিগারেট ধরাল করিডন আর রলিন্সকেও ধরাতে সাহায্য করল।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছ নিশ্চয়ই?

যদি আমায় বাধ্য না কর। তবে তোমার কাছে আমি সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

কি অভিযোগ জানতে পারি?

ইচ্ছা করলে অনেক চার্জই তো গঠন করা যায়। তবে আমি চাই লোকটাকে ধরবার ব্যাপারে তুমি আমায় সাহায্য কব।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবাব মত কোন অভিযোগ তোমার নেই। আমি জোর দিযে বলতে পারি কোন চার্জ আমার বিরুদ্ধে গঠন কবতে পারবে না।

বেশ দেখা যাবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একদিন ফাঁদে তোমাকে ফেলবই। রীটা অ্যালেনের কথা ভুলে গেছ—সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ওর ঘাড় ভাঙ্গার ঘটনা?

ও নামে কাউকে চিনি না। কার কথা বলছ? এই সময়ে একটি মেয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। রলিন্স তার দিকে তাকাল। করিডনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল রক্তস্রোত বইল। মেয়েটা অ্যান।

অ্যান দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। করিডনের দিকে তাকাল না, বরং রলিন্সের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আপনার আপত্তি না থাকলে আমি ভেতরে আসতে পারি?

রলিন্স ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুঃখিত ম্যাডাম, এই কামরাটা সংরক্ষিত। একটু এগিয়ে গেলে জায়গা পাবেন। অসুবিধে কবলাম বলে দুঃখিত। আমরা পুলিশ অফিসাব।

আমি বুঝতে পারিনি। ভীষণ দুঃখিত। সত্যিই যদি আপনি পুলিশ অফিসার হন, —রলিন্সকে আড়াল কবে করিডনের দিকে তাকাল অ্যান, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

নিশ্চয়ই।—রলিন্স বলল, প্রশ্নটা কি?

আমার ভাই বলেছে, চেন টানলে পাঁচ পাউন্ড জরিমানা হয় না, কথাটা স্রেফ মিথ্যে। চেন টানলে ফাইন করে থাকে, কি বলেন?

হ্যাঁ, করে থাকে।—রলিন্স বলল, আর কিছু বলবেন?

না। আশা করি কিছু মনে করেন নি? করিডনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। মেয়েটা কি চেন টেনে ট্রেন থামাতে চাইছে? এখন নিজেকে ঠিক করতে হবে এ সুযোগ সে গ্রহণ করবে কিনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

মেয়েটাকে ধর।—একজন লোক উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে অ্যান কামরার দরজা খুলে ঘাসে ভরা জমির উপর লাফিয়ে পড়েছে। নীচে উপত্যকার অপ্রশস্ত নদীর পাড় ঘুরে সে রেল চলাচলের সেতুর দিকে দৌড়তে শুরু করল। সেতুর কাছাকাছি পৌঁছতেই করিডন লাফিয়ে পড়ল। গর্জে উঠল রলিন্সের রিভলভার ; কিন্তু নিশানা ঠিক হলো না।

অ্যান আরো দু'জন গোয়েন্দাকে দেখতে পেল। একজন রক্তে ভেজা রুমাল নিজের নাকে চেপে ধরে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে রলিন্সের কাছে দাঁড়াল।

তিনজন গোয়েন্দা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া করিডনের দিকে তাকিয়ে রইল। জলে ডুবতে কিছুক্ষণ সময় নিল সে। এভাবে জলে ঝাঁপ দিতে রলিন্সের সাহসে কুলোত না।

তিনটে লোক এমনভাবে করিডনকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল যে, তাদের কয়েক গজ দূরে সেতুর পাশের প্রাচীরের উপর অ্যান যে উঠে দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করেনি।

করিডন জল থেকে মাথা তুলে প্রাচীরের উপরে দাঁড়ানো অ্যানকে দেখতে পেল। তারপর লক্ষ্য করল জলের দিকে মেয়েটা বুলেটের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জলে পড়ে অ্যানকে ডুবে যেতে দেখল সে। অ্যান মাথা তুলতেই তার দিকে করিডন এগিয়ে গেল।

তুমি একটা বোকা। করিডন চেঁচিয়ে বলল, তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যেতে পারত।

তোমারও ভাঙ্গতে পারত।—অ্যান চোখ থেকে জল সরিয়ে বলল, কিন্তু আমাদের ঘাড় ভাঙেনি তো?

না, ঠিক আছে।

অবশ্যই।—অ্যান সাঁতার কাটতে কাটতে বলল, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে ঠিক সময়ে ট্রেন থামিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি। কিন্তু একাজ কেন করলে বলতো? তোমায় সাবধান করেছিলাম নিজেকে আমার সঙ্গে না জড়াতে। এখন তুমি নিজেকেও ঝামেলায় জড়িয়ে ফেললে।

হেসে অ্যান বলল, ওখানে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়াই ঠিক হয়েছে।

স্রোতে শরীর ভাসিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছে তারা পাড়ে উঠে পড়ল। ঘাসের উপর বসে পড়ে অ্যান হাঁপাতে লাগল।

আমরা কোথায় যাব বলতে পার?

করিডন দূরের পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, ওই দিকে আমাদের যেতে হবে। দুনবারে পৌঁছবার পথ নাতিদীর্ঘ। পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়িঘর আছে বলে মনে হয় না।

পাহাড়ের ওপাশে থাকতে পারে। অ্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভীষণ বিশ্রী লাগছে। এই ভিজে পোশাকেই কি দুনবারের দিকে হাঁটব?

করিডন হাসল। সে বলল, ইচ্ছে হলে খুলে ফেলতে পার, আমার আপত্তি নেই। লুকোনোর মত সময় আমাদের হাতে নেই।

।। দুই ।।

এক সময় তারা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল।

তোমার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।—করিডন হাঁটতে হাঁটতে বলল। চেয়েছিলাম তুমি যেন

নিজেকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে না ফেল।

হাসিও না। অ্যান হেসে বলল, নিজের ভালমন্দ নিজে দেখতে পারি।

এ তোমার কথা। করিডন বলল, তবে পুলিশ যদি রীটা অ্যালেনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে অপরাধী ভাবে তুমি ঝামেলায় পড়বে।

এ নিয়ে আমি ভাবছি না। তুমি ভাববে কেন? তুমি তো ভালভাবেই জান তোমাকে আমার ভাল লাগছে।

তাই নাকি?—চকিত কটাক্ষে তার দিকে তাকাল।

আমি তোমার মত নই। আমার সব চিন্তা জুড়ে তুমি আছ। আমার মত একজন সাধারণ মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছ তুমি, কি বল?

এক সময়ে মেয়েদের আমি খুব সস্তা ভাবতাম। প্রয়োজন মিটে গেলেই বাতিল করতাম। কিন্তু যুদ্ধের সময় এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। অনেক মাস আমি নারীর প্রতি আসক্ত হইনি। তুমি আমার মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করলে তাই ভাল বোধ হচ্ছে না।

অ্যান কি বলবে ঠিক করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর করিডন প্রশ্ন করল, তুমি কি কাউকে কথা দিয়েছ?

দিয়েছি। হাসল অ্যান, সে নেভিতে আছে। ছমাসে একবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তাহলে তো আর কথা বাড়ান ঠিক নয়।

তাই নাকি? আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি এই আর কি?

করে যাও পছন্দ। জীবনে এসব ব্যাপার বড় ঝামেলার সৃষ্টি করে।

কি ঝামেলা সৃষ্টি করে?

অ্যানের দিকে করিডন তাকাল। সে বলল, দেখ, তোমাকে আমার ভাল লাগে। যখন কাউকে ভাল লাগে, তাকে আঘাত দেওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে আমি অনুভূতিপ্রবণ। আমাকে উপর থেকে দেখে তোমার মনে হবে না বটে তবে আমি এই রকমই। এটা আমার চরিত্রদোষ বলতে পার।

আমাকে আঘাত দিতে চাও কেন?

তোমার দাদার পিছনে লেগে আছি বলে বলছি। ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছি। কিন্তু এখন ভাবছি কি করব।

ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তুমি পণ্ডশ্রম করছ।

কি বলতে চাইছ?

তোমাকে আগেই বলেছি ব্রায়ান রীটা অ্যালেনকে খুন করেনি বা গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ব্রায়ানকে আমি চিনি।

যদি তোমার ভাই না করে থাকে তাহলে কে করেছে?

আমি জানি এমন ভান করব না। তবে জানি ব্রায়ান এ কাজ করেনি। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না যে ও বেঁচে আছে, তবে বিশ্বাস করতে চাই। তুমি যখন প্রথম বললে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ব্রায়ান আমার কাছে কতখানি তুমি বুঝবে না। তবে জানি ও বেঁচে নেই। একরাতে স্বপ্ন দেখলাম ও মারা গেছে—ঘুম ভেঙে গেল। চার মাস পরে মিলিটারী থেকে ওর মৃত্যুর খবর এল। এত দেরীতে সেই মৃত্যু-খবর এসেছিল যে আমার মনে কোন আঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি।

করিডন তার কাঁধ চাপড়ে বলল, এসব ভুলে যাও। এস হাঁটি। আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি।

কিছুক্ষণ পরে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। অ্যান প্রথম ইঞ্জিনের শব্দ শুনে উপর দিকে তাকাল। দেখল একটা হেলিকপ্টার মাথার উপর উড়ছে, তাদের দিকেই আসছে।

শুয়ে পড়।—করিডন চিৎকার করে উঠল। অ্যান তার আগেই লম্বা ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়েছে। এখন সে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

আমাদের ঠিক দেখে ফেলেছে।—করিডন বলল, চল, আমরা কোন রকমে বনের দিকে যাই, ওটাই একমাত্র যাবার পথ।

তারা উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় আধমাইল তফাতে মাথা তুলে দাঁড়ানো বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল। হেলিকপ্টার তাদের মাথার উপর দিয়ে শকুনের মত উড়ে গেল।

তারা আধাআধি পথ গিয়ে পিছন থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল কতকগুলো লোক তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে।

এস দৌড়ই, আমরা এভাবে খোলা আকাশের নীচে ধরা পড়তে চাই না।

আমরা ধরা পড়বই।—অ্যান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

দুজনের মোকাবিলা আমি করছি। যত দ্রুত গতিতে পার দৌড়তে থাক।

অ্যান বনের মধ্যে ঢুকে গেল। করিডন পিছনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আড়চোখে তাকাল। দুটি সবল আর স্বাস্থ্যবান যুবক তাদের দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ করিডন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এখন ছুটে আসা লোকদুটি আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে।

এই দাঁড়াও বলছি।—একজন চিৎকার করে নিজের গতি বাড়াল।

বনভূমি সামনে। অ্যানকে আর দেখা যাচ্ছে না। করিডন সহসা উঠে দাঁড়াল। লোকদুটি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। করিডন চায় না লোকদুটি তার পিছন পিছন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ুক। পিছনের বাকী লোকগুলো এখনো প্রায় আধমাইল দূরে আছে।

করিডন সহসা উঠে দাঁড়াল। লোকদুটি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। সে একজনের কাঁধের পিছনে আঘাত করল। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে আর উঠল না।

দ্বিতীয়জন তার গলা টিপে রইল। সে লোকটার মুখে সজোরে এক ঘুঁষি মারল। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর সে বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল। অ্যান তার একখানা হাত ধরল। দুজনে বনভূমির আরো ভেতরে ঢুকে পড়ল। অনুসরণকারীদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না।

করিডন থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে জামার হাতায় মুখ মুছে বলল, ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম।

এখন কি করবে? অ্যান জানতে চাইল। এত অন্ধকারে আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। ওরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমাদের ভাগ্য ভাল ইতিমধ্যে আমরা কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে পারব।

এখন হাঁটব?

বেশী জোরে হাঁটার প্রয়োজন নেই। এই রাস্তাটা ধরেই হাঁটতে থাকব। কোথাও না কোথাও ঠিক পৌঁছব।

একাদিক্রমে আধঘণ্টা হাঁটার পর তারা বনপ্রান্তে এসে পৌঁছল। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দূরে একটা গ্রামের আলো দেখতে পেল।

ওই জায়গাটার নাম কি কে জানে।—করিডন হাত তুলে গ্রামটা দেখিয়ে বলল,

জানি না। এটা আমাদের রুটে পড়ছে না।

পড়া উচিৎ। কিন্তু আর এক পা এগোবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। খুব খিদে পেয়েছে।

তারা ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল। অ্যান খাবারের প্যাকেট খুলে সামনে রাখল। তারপর চুপচাপ খেতে লাগল। আপন আপন চিন্তায় দুজনে বিভোর হয়ে রইল। বিষণ্ণ দেখাচ্ছে করিডনকে।

অ্যান বলল, আবার চিন্তা করতে আরম্ভ করলে?

সব সময়েই চিন্তা করছি। করিডন হাসল, এই আলোচনা করতে আর ইচ্ছা করছে না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসময় অ্যান বলল, এদিকে একটা গাড়ি যাচ্ছে। নিশ্চয়ই রাস্তা আছে।

একটা গাড়ি গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছে। করিডন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অ্যান, এস আমরা নীচে নামি। একটা লিফট পেতে পারি।

পুলিশও তো হতে পারে। ঝুঁকি নেওয়া কি এতই জরুরী?

আমরা তড়িঘড়ি করব না। শুধু যাচাই করে দেখতে চাই। এস।

তারা নামতে লাগল খাড়াই পথে। একজায়গায় মোটর গাড়িটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে।—একসাথে নামতে নামতে করিডন বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি কথা বলে আসি। সজাগ থেক যাতে কোন ঝামেলা না হয়।

করিডন গাড়ির কাছে এল অ্যানকে ছেড়ে। ভাল করে দেখল ড্রাইভার একা। সাহায্য করতে পারি? করিডন উচ্চকণ্ঠে বলল, গাড়ির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে।

ড্রাইভার চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডনের উপর টর্চের আলো ফেলল।

সন্দেহ তুমি পারবে কিনা।—লোকটি বলল, তবে যদি তুমি আমার চেয়ে ভাল মেকানিক হও তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

এস দেখা যাক। গাড়ির ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে করিডন বলল, রোগটা কি?

বিশ্রী শব্দ করে থেমে যাচ্ছে।

পেট্রোল আছে তো?

ট্যাঙ্ক ভর্তি আছে।

সম্ভবতঃ কার্বোরেটর গোলমাল করছে। যন্ত্রপাতি কিছু আছে?

ঠিক করে দিলে খুব খুশী হব।—ড্রাইভার খুশী জড়ান গলায় বলল, তুমি কোথা থেকে এলে?

বউ আর আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—করিডন গম্ভীর মুখে বলে চেঁচিয়ে ডাকল, শুনছ ডার্লিং, এখানে এসে আমাদের সাহায্য কর।

অ্যান অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। এই হল আমার বউ। অ্যানের দিকে না তাকিয়ে করিডন বলল, বন্ধুর কার্বোরেটরে গোলমাল দেখা দিয়েছে, মনে হচ্ছে ঠিক করে দিতে পারব। শেষদিকের কথাগুলো অ্যানকে উদ্দেশ্য করে বলল।

আমার স্বামীর হাতের কাজ চমৎকার।—অ্যান বলল।

ব্রেয়ার আমার নাম। সেই উপকারী সামারিটনের গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। সে প্রশংসার দৃষ্টিতে অ্যানের দিকে তাকিয়েই সজাগ হয়ে উঠল, কারণ মেয়েটার পরনের ফ্রক অনেকখানি উপরে উঠে গেছে, তার পা দুটির অনেকটা দেখা যাচ্ছে।

করিডন কার্বোরেটর খুলতে ব্যস্ত আর এদিকে ব্রেয়ার ব্যস্ত অ্যানের সাথে ভাব জমানোর চেষ্টায়। করিডন কার্বোরেটর ফিট করে স্ক্রু লাগিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেখতে বলতেই ব্রেয়ারের মন খারাপ হয়ে গেল।

তুলনা হয় না তোমার।—ব্রেয়ার বলল, তোমরা কোথায় নামবে?

আমরা যাব দুনবারে,—অ্যান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ওখানে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন?

কেন পারব না? আমি তো এডিনবরা যাচ্ছি। খুশী হব তোমাদের পৌঁছে দিতে পারলে।

তারা গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করল করিডন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

মোটর-বোটটা আঠার ফুট লম্বা ক্রুকবান-বোট, দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন আর মোটর গাড়ির মত হ্যান্ডেল লাগান আছে। বোটটা ঝোলান ছিল কংক্রিট ছাউনির মধ্যে। একটা বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে কপিকলের সাহায্যে সেটা নীচে নামান হল।

অ্যান ব্যস্ত ইঞ্জিন পরীক্ষায়। করিডন চঞ্চল মনে দরজা দিয়ে বাইরে নজর রেখেছে। এই মুহূর্তে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করল তাদের যেন কেউ নজর করছে—এই ধরনের একটা অনুভূতি মনে জাগল। অন্ধকারে চোখ রাখল। সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে আসা শীতল বাতাস চোখে মুখে লাগল। কিন্তু তার সন্দেহ হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না।

সব ঠিক আছে।—অ্যান জানাল, ডাঙ্গার দিকে ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, আমরা কি যাব?

হ্যাঁ—দরজার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডন বলল, বাতসের বেগ বাড়ছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি ততই ভাল। পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

প্রায় একঘণ্টা। দ্বীপে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই। বাড়িতে টিনের খাবার অনেক আছে। চার সপ্তাহ চলে যাবে।

এক সপ্তাহ চললেই যথেষ্ট— অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে করিডন বলল, চল আমরা যাই। অ্যান বোটের ইঞ্জিন চালিয়ে দিল। বোট চলতে শুরু করতেই সে করিডনের কাছে এসে বলল, এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিৎ হবে। না গেলে হয়ত—অ্যান মাঝপথে থেমে গিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। করিডন ঘুরে দাঁড়াল। বোটের উপর মানুষের একটা ছায়া এসে পড়েছে।

কে ওখানে? করিডন কয়েক পা এগিয়ে প্রশ্ন করল।

জিনি আলোর সামনে এল। তার হাতের পিস্তল দু'জনের দিকে তুলে ধরা। চোখে মুখে নিষ্প্রাণ অভিব্যক্তি। চোখ দুটো চকচক করছে।

আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।—রুদ্ধশ্বাসে জিনি বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল করিডন। সে আশংকা করেছিল অন্ধকার থেকে রলিন্স বেরিয়ে আসবে বুঝি। সে বলল, এখানে এসে পৌঁছলে কি করে?

আমরা ঠিক করেছিলাম এখানে দেখা করব—জিনি নিষ্প্রাণকণ্ঠে বলল, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাওনি?

তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম—করিডন পিস্তলের দিকে লক্ষ্য রেখে বলল, জন কি অন্ধকারে ঘাঁপটি মেরে বসে আছে?

না।

তাহলে ও কোথায়?

জিনি হেসে উঠল। ভয়ার্ত সেই হাসি। করিডনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হল। অসুস্থ বলে মনে হল জিনিকে। ঠোঁট দুটি রক্ত শূন্য।

ও মারা গেছে—সে বলল।

মারা গেছে?—করিডন এধরনের কিছু আশা করেনি, কি হয়েছিল? পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল নাকি?

জিনি অ্যানের দিকে তাকাল। ঘৃণার ছাপ সারা মুখে। সে বলল, ওকে জিজ্ঞাসা কর। ও জানে। ম্যালোরী ওকে খুন করেছে।

অ্যান রুদ্ধশ্বাসে দুপা এগিয়ে যেতেই করিডন তার হাত ধরে থামাল। সে বলল, তুমি কি বলছ? এ ধারণা তোমার হল কি করে ম্যালোরী খুন করেছে?

দেখেছি খুন করতে।—জিনি কাঁপা আঙ্গুলে নিজের ঘন কালো চুলে বিলি কাটল, ম্যালোরী আমাদের অনুসরণ করছিল।

অনুসরণ করছিল—কোথায়?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিনি। সহসা সে বলতে লাগল, রনলি খুন হয়েছে। আমাদের জন্য সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। জন আহত হয়েছিল। পুলিশ আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছিল। আমরা একটা চার্চে লুকিয়েছিলাম—তারপর তার কোন কথা শোনা গেল না, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়তে লাগল।

থামলে কেন বল, বল কি হয়েছে?

একটা ট্রেনে চড়ে বসেছিলাম। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ট্রেনটা দুনবার পর্যন্ত এল। মনেব অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, তার প্রচণ্ড জল পিপাসা পেয়েছিল। বার বার জল খেতে চাইছিল। ওকে ছেড়ে আমি একটার পর একটা কামরায় চড়ে কিছু খাবার সন্ধান করছিলাম। হঠাৎ তার আর্তচিৎকারে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনের কামরা থেকে শরীরের অর্ধেকটা ঝুলে পড়েছে। ম্যালোরী ওর গলা টিপে ধরেছে। আমার কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না, আমি অনেক দূরে ছিলাম কিনা। জন রেল লাইনের উপর পড়ে গেল। লুবিসকে যেভাবে মারা হয়েছিল ওকেও সেইভাবে মারা হয়েছে। ম্যালোরীই ওকে খুন করেছে।

করিডনের শিরদাঁড়া শিহরিত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বলতে চাইছ ম্যালোরীকে দেখছ?

হ্যাঁ।

ও মিথ্যে কথা বলছে।—অস্ফুট গলায় অ্যান বলল।

চুপ কর। ওকে বলতে দাও।—জিনিকে করিডন প্রশ্ন করল, জনের মৃত্যুর পর কি হল?

ম্যালোরীকে এখান পর্যন্ত অনুসরণ করেছি। সে দ্বীপে চলে গেছে।

দ্বীপে কিভাবে গেল? এই বোটটা ওর। এটা নিয়ে যায়নি কেন?

জিনি কপাল চুলকোতে লাগল। তাকে মনে হল দ্বিধাগ্রস্ত। সে বলল, বন্দর থেকে একটা বোট নিয়ে গেছে।—হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে এসে কঠিন কণ্ঠে বলল, বোটে উঠে পড়, তাড়াতাড়ি কর। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ম্যালোরী দ্বীপে আছে, এবার রেহাই পাবে না।

।। দুই ।।

হার্মিট দ্বীপটা যত বড় হবে কল্পনা করেছিল করিডন, দ্বীপটা তার থেকেও বড়। ভেবেছিল জায়গাটা হবে পাহাড়ী আর আয়তনে বড় জোর দুশো স্কোয়ার ইয়ার্ড। এর মধ্যে একটা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যখন মোটর বোটটা একটা গুপ্ত বন্দরে ভিড়ল, দেখল সুউচ্চ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যানের কথাগুলো করিডনের মনে পড়ল, সে বলেছিল, দ্বীপটা সম্পর্কে যে না জানে তার পক্ষে খুব বিপজ্জনক।

কুয়াশা ঘিরে আছে দ্বীপটাকে। প্রচণ্ড বেগে হাওয়া ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। সমুদ্র-পাখী অন্ধকারে ইতস্ততঃ উড়ছে খাদ্যের অন্বেষণে।

পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। প্রায় দুশো ধাপ অতিক্রম করবার পর পাহাড়ের মাথায় খোলা আকাশের নীচে একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়াল। অ্যানকে অনুসরণ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু ঢালু রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। জিনি হাঁটছে আর বিড় বিড় করে কিছু বলছে।

তারা সহসা একটা বাড়ির সামনে এসে দাড়াল। বাড়িটা পাহাড় কেটে তৈরী করা, দুটো পাশ পাহাড়ের দেওয়ালে ঢাকা। মুখ সমুদ্রের দিকে। বাড়িটা দোতলা আর অপরিচ্ছন্ন। দেখতে কতকটা পুরোন দুর্গের মত। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়েছে পাহাড়ের বুক কেটে।

অন্ধকারে বাড়িটা ডুবে আছে। জানলাগুলো কালো আয়না যেন। অ্যান বাড়ির প্রবেশ পথের দিকে যেতে উদ্যত হতেই করিডন তার হাত ধরে থামাল।

এত ব্যস্ত হয়ো না,—বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে সাবধান করল তাকে, ব্যস্তভাবে ঢোকার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ ভেতরে থাকে—

ভেতরে কেউ নেই।—অ্যান মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি কি জিনির মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করেছ?

তবু কোন সুযোগের সৃষ্টি করা উচিৎ হবে না।

আমি অত ভয় পাই না।—নিজেকে ছাড়িয়ে সে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা বাইরে গেলে দরজা বন্ধ করে সীল করে যাই। যদি এসে দেখা যায় সীল ঠিক আছে তাহলে বুঝতে হবে ভেতরে কেউ নেই।

ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই?

না। এটাই একমাত্র দরজা।

অ্যান পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজার তালা খুলল।

এখানে দাঁড়িয়ে থাক। করিডন বলল, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

এখানে কারো দেখা পাবে না।—অ্যান বলল।

আমি সুযোগের সন্ধানে আছি। সে প্রতিটি ঘরে ঢুকে চোখ বুলিয়ে বুঝল কেউ বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে নেই। আর কারো পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। লাউঞ্জে ফিরে এসে দেখল, ইলেকট্রিক চুল্লির পাশে অ্যান দাড়িয়ে আছে আর অসুস্থ শরীরে জিনি ঘরের এপাশ-ওপাশ পায়চারি করছে।

এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। করিডন ঠিক করল। অন্ধকারের ভেতর দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল জিনি। বিরাট আয়তন দ্বীপের। পাহাড়ের কঠিন ঢাল আর বাতাসের গতি তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে আর পিস্তল হাতে নিয়ে অন্য দুজনের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে বসেছে।

অ্যান তাকে বেডরুমে ঘুমতে যেতে বলতেই সে জানাল, লাউঞ্জে চুল্লির পাশেই থাকবে।

ও একা থাক।—করিডন চাপা কণ্ঠে বলল, চল আমরা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে ওপরে যাই।

চারটে বেডরুম আছে লাউঞ্জের দিকে মুখ করে। অ্যানকে অনুসরণ করে করিডন একটা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ব্রায়ান এখানেই আছে। এ ধরনের বিশ্বাস তোমার নেই নিশ্চয়ই?—অ্যান আধশোয়া হয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, জিনির মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করে বসে নেই তো?

তার দিকে তাকাল করিডন। সে বলল, আমি নিশ্চিত ওর মাথার গোলমাল হয়েছে। ওর বলা জনের গল্প কেমন যেন খাপছাড়া।

স্মরণ করে দেখ জিনি বলেছে জন আর ম্যালোরী যখন হাতাহাতি করছে তখন তার পক্ষে করবার কিছু ছিল না কিন্তু তার হাতে তো পিস্তল ছিল। গুলি ছুঁড়ে ম্যালোরীকে খুন করতে পারত। না, গল্পটা ঠিক মিলছে না। আমরা জানি জন আহত ছিল। এই ক্ষতের কারণে তার মৃত্যু হয়ে থাকবে। কিন্তু জিনি ভেবেছে ম্যালোরী তাকে খুন করেছে কিম্বা ইচ্ছাকৃতভাবে সে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন বলছে? কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। আমাদের চোখে কিছু যেন এড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে চাই। এ সবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।—করিডন উঠে গিয়ে অ্যানের সামনে দাঁড়াল, যাও শুয়ে পড় গে, অ্যান। আমি আগাগোড়া ভেবে দেখতে চাই। কোন চিন্তা করো না।

এটাই আমার কাছে স্বস্তি।—অ্যান বলল, ব্রায়ান এসব ব্যাপারে জড়িয়ে নেই।

জিনি বলছে, ব্রায়ান এই দ্বীপেই আছে। যদি তাই থাকে তাহলে আমি ওকে খুঁজে বের করবই। মনে হচ্ছে কালই হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

ওর দেখা তুমি পাবে না।—অ্যান দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমি জানি পাবে না।

শুয়ে পড়গে।—করিডন নীরস কণ্ঠে বলল, ভেতরে লক করে শোবে। জিনিকে বিশ্বাস নেই। আশা করছি ওর হাত থেকে পিস্তলটা নিতে পারব। আজ রাতে আর কাজ নয়। দিনের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অ্যান বিদায় নিতেই করিডন ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল।

জানলার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছে করিডন। দ্বীপের কূলে কূলে ঢেউ ভেঙে পরবার শব্দ হচ্ছে। সকালের আগে কিছু করা যাবে না। কিন্তু পোষাক পালটে বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। অস্বস্তি বোধ করছে সে আর বিরামহীনভাবে পাড়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ তাকে চিন্তিত করে তুলল।

অস্থিরভাবে গায়ের কোট খুলে আর্ম-চেয়ারে বসল। শেষবার ঘুমের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ট্রেনে ঝিমুনি এসেছিল মাত্র, কিন্তু তাকে তো আর ঘুম বলে না। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসছে বটে, কিন্তু বিছানায় শুলে ঘুম আসবে না। সে চোখ বুঁজে শরীর এলিয়ে দিয়ে ম্যালোরীর কথা ভাবতে লাগল।

ম্যালোরী ঃ ভাবতে লাগল করিডন, জনের বর্ণনা মত তার একটা চেহারা তৈরী হয়েছে মাত্র। কারো মতে মানুষটা ভাল, আবার কারো মতে মন্দ। এই অবাস্তর চরিত্রের মানুষটা কয়েকজনকে খুন করেছে নির্দয়ভাবে। এই লোকটি সম্পর্কে রলিন্স প্রসংশা করছে। তাকেই আবার অ্যান ভালবেসেছে। জিনি আর জন তাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করে। লোকটা বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ত। হয়তো এই দ্বীপে আছে, কিংবা মারা গেছে। তাকে ফ্রান্সের কোন অজানা স্থানে কবর দেওয়া হয়েছে।

করিডন উত্তেজিতভাবে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল। ঠিক যেন এক রহস্য দানা বেঁধে আছে এর পেছনে যা সে ধরতে পারছে না।

ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই করিডন উঠে বসল। হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। নয়তো কেউ যেন সুইচ অফ করে দিয়েছে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে দৃষ্টি রাখল। বাড়ির সব আলোই নিভে গেছে, কূলে জলের ঢেউ ভেঙে পড়বার শব্দ শুধু কানে ভেসে আসছে। তারই মধ্যে কানে এল সেই অশরীরী কণ্ঠস্বর। করিডন

কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। নিচে অন্ধকার থেকে ভেসে আসা সেই কণ্ঠস্বর তার ঘাড়ের চুল খাড়া করে দিল। কোন অজানা দিক থেকে অশরীরী আর্তস্বর যেন ভেসে আসছে। ঠিক এই কণ্ঠস্বর সে ক্রিডের ফ্ল্যাটে শুনেছিল— ম্যালোরীর কণ্ঠস্বর।

করিডন নিজেকে আয়ত্বে আনার আগেই এক ঝলক আগুন ঝলকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ। মানুষের আর্তচিৎকার শোনা গেল। জিনির কণ্ঠস্বর। সামান্য সময় পরে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

অ্যান অন্ধকারের মধ্যে ছুটে করিডনের কাছে এল। কি হয়েছে? কি ঘটেছে এখানে? —ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল।

অ্যানকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে করিডন টর্চের আলো ফেলল নীচে লাউঞ্জের উপর। ওখানে কেউ নেই। লাউঞ্জের দরজা খোলা।

জিনি?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকল করিডন, জিনি, তুমি কোথায়?

কোন উত্তর ভেসে এল না।

মেন সুইচটা কোথায়?—অ্যানের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল।

রান্নাঘরে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাক। সে সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে নেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আলো জ্বলল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে লাউঞ্জের দিকে গেল।

জিনি নেই, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ান অ্যানকে উদ্দেশ্য করে সে বলল।

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? কি ঘটেছে বল তো? —কথাগুলো বলে অ্যান তার কাছে নেমে এল। আর দরজার সামনে গিয়ে বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারের দিকে তাকাল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

চারিদিকে ভালো করে খোঁজ তো? অ্যান, আমি বুলেটটা খুঁজে পেতে চাই।—সে নিজেই খুঁজতে শুরু করে দিল। তার সারা মুখে উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত বুলেটটা খুঁজে পেল অ্যান, একটা ওক কাঠের তৈরী দরজার পাল্লার গায়ে গেঁথে আছে। একটা ছুরির সাহায্যে বুলেটটা বের করল করিডন।

মসার পিস্তলের বুলেট।—অ্যানের দিকে তাকিয়ে সে বলল। তার মুখে জেগে উঠল সামান্য হাসি, তোমায় বলেছিলাম কি যেন আমি ধরতে পারছি না। ভেসে আসা কণ্ঠস্বর আমাকে বুদ্ধু বানিয়েছে। মনে হচ্ছে এখন ধরতে পেরেছি।

।। তিন ।।

বাড়ির বাইরে উঁচু সমতল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে করিডন সারা দ্বীপটা দেখতে পেল। দ্বীপটার যেন কিছু অংশ জলাভূমি, বাকী জায়গা পাহাড়। এই পাহাড় শেষ হয়েছে সমুদ্রের পাড়ে।

কিছুক্ষণ জমি পরীক্ষা করে করিডন ঠিক করল সুবিস্তৃত জলাভূমির দিকে যাবে না। কেউ যদি ওদিকে যায় তাহলে সাথে সাথে তার অস্তিত্ব নজরে পড়বে। পশ্চিম দিকটা ছোট বড় পাথরে ঢাকা, কারো পক্ষে সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এই দিকে গিয়ে খুঁজে দেখবে ঠিক করল। নদীযুক্ত সংকীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করে সে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

ইতিমধ্যে সে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেল। এখন প্রায় দুপুর। রোদ খাড়াভাবে গায়ে পড়ছে। তিনঘণ্টা ধরে সে হাঁটছে, সমুদ্র-পাখী ছাড়া আর কোন প্রাণী তার চোখে পড়েনি।

তাকে যাতে নীচে থেকে দেখা না যায় তাই করিডন পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তার ডান দিকে ছড়িয়ে আছে রৌদ্রতপ্ত বালুকাভূমি। আর বাকী জায়গা ছোট বড় পাথরে ঢাকা। আর একটু এগিয়ে সে দেখতে পেল বালুকাভূমির উপর এক ঝাঁক পায়ের ছাপ। কেউ বড় পদক্ষেপে হেঁটে গেছে, তাই একটা ছাপ থেকে আর একটা ছাপের দূরত্ব বেশী। পদচিহ্নগুলো উত্তর দিকে চলে গেছে, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

এই পদচিহ্নগুলো দেখে মনে মনে ভীত হয়ে পড়ল। এই চিহ্নগুলো সে দেখতে পাবে আশা করেনি। ম্যালোরী। তার মনে হল কেউ যেন দ্রুত পায়ে হেঁটে আড়ালে চলে গেল। সাথে সাথে

সে ঘুরে দ্রুত পায়ে সরু পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সে মনে মনে ভাবল যে চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা মানুষের ছায়াশরীর দেখল তা কি শুধুই তার কল্পনা? ছায়া শরীর যত তাড়াতাড়ি আবির্ভূত হয়েছিল ঠিক তত তাড়াতাড়িই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

করিডন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে সমতলভূমিতে নেমে এসে দৌড়তে শুরু করল।

করিডনের মনে হল, যে লোকটাকে সে চকিতে আড়ালে যেতে দেখেছে সে আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। খুব সাবধানে সে পা ফেলে এগোতে লাগল, অসাবধানে পা ফেললে পাছে কোন আলগা পাথর পায়ের আঘাতে নীচে পড়ে না যায়। এর ফলে লোকটি সজাগ হয়ে যাবে।

এইভাবে এগোতে এগোতে হার্মিটের কাছাকাছি উঁচু দুটি পাথরের মাঝখানে চলে এল। কুঁজো হয়ে পাথরের মাথায় উঠে এল সে। নীচের দিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এখানে তার চোখে যা পড়ল তা দেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখমুখে ফুটে ওঠা বিস্ময় আর সতর্কতা মুছে গিয়ে তার জায়গায় ফুটে উঠল হাসি।

গজ দশেক দূরে একজন বিশালাকৃতি মানুষ আছে। তার লক্ষ্য করিডনের দিকে। লোকটি পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাচ্ছে। তার রোদে পোড়া লাল মুখে বিষণ্ণ অভিব্যক্তি। লোকটি চকিতে মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে গেল, সাথে সাথে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এই যে বুড়ো শালিক।—সে খুশিভরা গলায় বলল, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, কি বল? অনেক আগেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম। এই পরিত্যক্ত দ্বীপটা একটু আগে ঘুরে দেখে এখন এখানে পৌঁছেছি।

লোকটা আর কেউ নয়, ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্স।

।। চার ।।

হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না। —করিডন উপর থেকে ধীর গতিতে নামতে নামতে বলল, কিন্তু তোমাকে দেখে খুব একটা অখুশী হইনি।

তা অবশ্য ঠিক।—সতর্ক হয়ে সে বলল, আমি একবারও ভাবিনি যে তুমি আমাকে দেখে খুশী হবে। জানতাম বিস্মিত হবে, তবে খুশী হবে না।

সত্যিই তাই। —করিডন বলল, আচ্ছা কয়েক মাইল দূরে সমুদ্র বেলাভূমিতে তুমিই তো একা হাঁটছিলে?

ঠিক ধরেছ।—রলিন্স বলল।

একবার ভেবেছিলাম মানুষটা অন্য কেউ,—করিডন বলল, যদিও জানি পুলিশের লোক ছাড়া অন্য কারও পদচিহ্ন অত বড় হতে পারে না। পথ চিনে এখানে কিভাবে এলে?

সেই লোকটা, জন না কি যেন নাম? আমাকে বাৎলে দিয়েছে। রলিন্স বলল, ফরাসী মেয়েটা তো এখানে, তাই না?

হ্যাঁ। তাহলে জনকে গ্রেপ্তার করেছ?

হ্যাঁ, করেছি, আমার লোকেরা ওকে রেল লাইনে পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছে। সে আমাদের একটা চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছে।

জন ভাল আছে?

না, ভাল আছে বলতে পারব না। ফিরে গিয়ে ওকে জীবিত দেখতে পাব কি না সন্দেহ আছে। গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল।

জন পড়ে গিয়েছিল। কেউ ওকে ফেলে দেয়নি তো?

জন বলেছে, এই ফরাসী মেয়েটা, তাকে মাথায় আঘাত করে নীচে ফেলে দিয়েছে।

করিডন মাথা নাড়ল। সে বলল, এই রকম কিছু আশা করেছিলাম।

এ ব্যাপারে তুমি কি জান? —রলিন্স প্রশ্ন করল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথরের টুকরো নীচে গড়িয়ে পড়ল। রলিন্স উপর দিকে

তাকালেও করিডন তাকাল না।

একটা দল ছিল।—সে বলল, দলের সকলে ম্যালোরী নামে একজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জন কি তার নাম উল্লেখ করেছে?

করেছে—রলিন্স বলল, কিছুটা বিরক্ত মনে হল, তুমি কি করে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য এদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছ তাও বলেছে।

সত্যিই কি ওরা তোমাকে সাড়ে সাতশো ডলার দিয়েছে?

হাসল করিডন। সে বলল, একটু বাড়িয়ে বলেছে। তবে টাকা দিয়েছে এ কথা ঠিক।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে রলিন্স তার দিকে তাকাল। জন বলেছে ম্যালোরী তার দুজন সঙ্গী লুবিস আর হ্যারিসকে খুন করেছে। আরো বলেছে, ম্যালোরী রীটা অ্যালেনকেও হত্যা করেছে। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি এই ম্যালোরী নামে লোকটি বছর খানেক আগে কর্মরত অবস্থায় মারা গেছে। কোন দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে।

ঠিক বলছ?—করিডন বলল, তুমি নিশ্চিত তো?

যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় আর কি? আমি রীটা অ্যালেনের মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী আর সেই ফরাসী মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চাই। —অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে করিডনের দিকে তাকিয়ে রইল। রীটার সম্বন্ধে কি জান বল তো? তার মৃত্যুর সময় তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?

করিডন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সে বলল, তবে আমি মেয়েটাকে স্পর্শ করিনি। তার চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে ওই অবস্থায় দেখি। সে নিজে পড়ে গেছিল, নাকি তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে ঘটনাটা আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। আমি দ্রুতবেগে পালিয়ে এসেছি।

ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয়েছিল আর এই জন্যই ব্যাপারটাকে খুন বলা হচ্ছে।—রলিন্স গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

প্রমাণ করা কঠিন হবে।—করিডন বলল, শোন রলিন্স, তড়বড় করবে না।—সেই ফরাসী মেয়েটার নিশানা অব্যর্থ আর তিন মিনিট হল সে একটা পিস্তল আমাদের দিকে নিশানা করে আছে। ওর অস্তিত্ব তুমি বুঝতে পারনি। আমি পেরেছি। সে আড়চোখে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আড়াল থেকে বেরিয়ে এস জিনি তোমার সঙ্গে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্সের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে জিনি বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে অবজ্ঞার হাসি।

তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছ।—সে রলিন্সের দিকে তাকিয়ে বলল, এরই নাম জিনি পারসিগনী। যেমন বসে আছ তেমনি চুপচাপ বসে থাক, আর সম্ভব হলে একটা কথাও বলবে না। জিনির সাথে আমার কিছু কথা আছে। তাই না জিনি?

আছে কি?—জিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল।

জানি না আমাদের আলোচনা তুমি আড়াল থেকে শুনেছ কি না।

করিডন জিনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, যদি না শুনে থাক তাহলে তোমাকে জানাচ্ছি যে আমার এই বন্ধু জনকে গ্রেপ্তার করেছেন আর জন জানিয়েছে কে তার মাথায় আঘাত করেছে। তার মানে ম্যালোরী নয়, তুমিই কাজটা করে ধাক্কা মেরে লাইনের উপর ফেলে দিয়েছ।

হ্যাঁ, ফেলেছি।—সে বলল, তাতে কি হয়েছে?

হয়েছে বৈকি।—করিডন বলল, অনেক কিছু হয়েছে।—একটু থেমে সে বলল, তুমি জান না যে বছরখানেক আগে ম্যালোরী মারা গেছে?

জিনি চমকে উঠল। কপালে হাত বুলিয়ে সে বলল, না, ও বেঁচে আছে।

না, বেঁচে নেই।—তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে করিডন বলল, যদি জানতে তাহলে এত ঘটনা কখনই ঘটত না, তুমিই বল, ঘটত কি? গত রাত পর্যন্ত তুমি আমায় বোকা বানিয়েছ। একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। ম্যালোরীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করবার চালাকি প্রথমবারে খুব কাজ দিয়েছিল। তবে পুনরাবৃত্তি করা ঠিক হয়নি। বাড়িটার সমস্ত দরজা জানলা পরীক্ষা করে দেখার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে কারও পক্ষে বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকা মোটেই সম্ভব নয়। তারপর

খুঁজে পেলাম বুলেটটা, বুঝতে অসুবিধা হল না তোমার পিস্তল থেকে সেটা ছোঁড়া হয়েছে।

মাত্র একজন মানুষ এই বাড়িতে ছিল যার পক্ষে গুলি ছোঁড়া আর তোমার নাম চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল ; সেই মানুষ তুমি। আমি দুই আর দুইয়ে যোগ করলাম আর গুণ করলাম, দেখলাম ফলাফল একই হল। যদি তুমি গতরাতে ম্যালোরীর কণ্ঠস্বরের নকল করে থাক, তাহলে ক্রিডের ফ্ল্যাটে যে কণ্ঠস্বর শুনেছি তা তোমার কণ্ঠের। এখন ভাবা প্রয়োজন কেন তুমি এই কাণ্ড করতে গেলে ? তুমি কি একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে, যাতে তোমার ইচ্ছামত ম্যালোরীর খোঁজ করতে পার?

জিনির মুখে মাংসপেশী কঠিন হল। সে কোন কথা বলল না।

আর একটা সমস্যা আমায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিল।—করিডন বলতে লাগল। কেন হ্যারিস, লুবিস আর রীটা অ্যালেন খুন হল। একটা ব্যাপার তাদের মধ্যে ছিল, সাধারণতঃ তারা তিনজনই ম্যালোরী সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানত এমন কিছু জানত যার সাহায্যে ম্যালোরীর কাছাকাছি পৌঁছন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। যদি ম্যালোরী মারা গিয়ে থাকে তাহলে কে তাদের খুন করল?

করিডনের স্থির দৃষ্টি জিনিকে শঙ্কিত করে তুলল। সে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল আর চোখ মুখের উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

গোর্ভিলের সঙ্গে ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা রনলির মুখে শুনে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছিল।—করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল, রনলি বিশ্বাস করত বটে, তবে ও শুনেছিল তোমার কাছে, তাই না? কিন্তু গোর্ভিল কোথায় আছে এ খবর ম্যালোরী জানায়নি গেস্টাপোদের, জানিয়েছিলে তুমি নিজে।

জিনির সারা শরীর কেঁপে উঠল. দু হাতে মুখ ঢাকল।

এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।—করিডন বলল, আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না। জানি গেস্টাপোরা কত জঘন্য শয়তান। তারা প্রথমে তোমার উপর অত্যাচার চালায়, কিন্তু কোন কথা আদায় করতে পারেনি। তারপর অত্যাচার চালায় রনলির উপর। সে জ্ঞান হারাবার পর আবার তোমাকে ধরে;. কি, সত্যি বলছি তো? এইবারে তোমার কাছ থেকে তারা কথা আদায় করে। ম্যালোরী নিজের কানে শুনেছিল গোর্ভিলের হদিশ তুমি তাদের বলে দিলে। তোমার জন্য তার কষ্টবোধ হয়েছিল, তাই নিজের কাঁধে দোষ নিল। দুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল তার স্বভাব। রনলি জ্ঞান ফিরে পেতেই তাকে সে জানাল সে গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রনলি তার কথা অবিশ্বাস করেনি। কি ঠিক বলছি তো?

কথা বলবার চেষ্টা করল জিনি, কিন্তু গলা দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে এল না। তার চোখ মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। দেখে মনে হল এখুনি পড়ে যাবে।

এই হল সমস্ত ঘটনার প্রকৃত ছবি। করিডন তার দিকে নজর রেখে বলতে লাগল, জন তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। তুমি ভয় পেয়েছিলে পাছে সে মুখ খুলবে। সুতরাং যতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় তা করেছ। তারপর ম্যালোরীর খোঁজে হ্যারিস আর লুবিসকে পাঠান হল, তাদের খুন করে তুমি শান্ত করলে। তুমি রীটার উপর লক্ষ্য রেখেছিলে আর তার বাড়িতে আমায় যেতে দেখেছিলে। যখন আড়াল থেকে ম্যালোরীর এই দ্বীপের কথা বলতে শুনলে, তাকেও খুন করলে।—করিডন জিনির দিকে আঙুল দেখাল, তুমিই ছিলে সবকিছুর মূলে, কি বল? ম্যালোরী নয়। যা করবার প্রথম থেকে তুমিই করেছ।

জিনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখের ভাবের পরিবর্তন ঘটতে লাগল, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল অপ্রকৃতিস্থ।

হ্যাঁ।—জিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, পিয়েরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করেছি। তুমি তো জান না গেস্টাপোরা আমার উপর কি ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল। আমি তো চাইনি ম্যালোরী আমার দোষ তার নিজের কাঁধে তুলে নিক। ও একটা বুদ্ধু, তাই আমাকে ভালবেসেছিল। যেন ওর মত একজন বুদ্ধুর ভালমন্দ আমি চিন্তা করতাম। হ্যাঁ, আমি ওদের খুন করেছি।—সে একপা একপা করে পিছু হটতে লাগল, পিস্তলের নল তাদের দিকে, যে যেখানে আছ সেখানে থাক।

রলিন্স উঠে দাঁড়াতেই সে চিৎকার করে বলল, আমি ধরা দেব না। যদি আমার দিকে এগোবার চেষ্টা কর খুন করে ফেলব।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের উপর দিকে ছুটতে লাগল।

রলিন্স চিৎকার করে তার দিকে ছুটতে লাগল। দুজন লোক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে জিনির পিছনে দৌড়তেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাডসন! ওকে ধর,—রলিন্স উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, পালাতে দিও না।

কিন্তু জিনির গতির সাথে ডিটেকটিভ দুজন পেরে উঠল না।

ও বেশী দূর যেতে পারবে না।—করিডন অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

ডিটেকটিভ দুজন পৌঁছবার আগেই জিনি পাহাড়ের মাথার উপর পৌঁছে গেল। পাহাড়ের ঢালে পৌঁছেও সে দৌড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে নীচে পড়ে যাওয়ার ভারী শব্দ তারা শুনতে পেল, যেন পাথরে পড়ে কিছু থেঁতলে গেল।

ডিটেকটিভ দুজন বর্ষাতিতে জড়ানো একটা ভারী বস্তু বালির উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুলিশ বোটে তুলল। রলিন্স দুহাত কোটের পকেটে ভরে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝেই সে একটা বড় পাথরের উপর বসা করিডনের দিকে তাকাচ্ছে। ধূমপান করতে করতে পিছন ফিরে দেখতে লাগল কর্মরত দুজন ডিটেকটিভ।

মনে হচ্ছে এবারেও তুমি জাল কাটলে। খুশি জড়ানো কণ্ঠে রলিন্স বলল, তোমার মত আর একটিও লোক দেখিনি।

আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল রলিন্স। ধীরস্থির কণ্ঠে করিডন বলল, তোমার কাজ হচ্ছে মানুষের পিছনে লেগে থাকা আর আমার কাজ হল মানুষকে সাহায্য করতে চাওয়া। এ কথা তোমার জেনে রাখা প্রয়োজন।

জানি হে জানি। রলিন্স অবজ্ঞা ভরে বলল, নইলে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

আমাকে পারিশ্রমিক হিসাবে যা দিয়েছে কাজের তুলনায় খুবই সস্তা। তিক্ত কণ্ঠে করিডন বলল, দেশের প্রতিটি খবরের কাগজে পড়তে হয়েছে, আমার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। পুলিশের তাড়া খেতে হয়েছে, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে আর ঈশ্বর জানেন আরো কত কি করতে হয়েছে। এবং এখন মনে হচ্ছে তোমার সাথে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে বিবৃতি প্রদান করতে হবে আর যে জট পাকিয়ে আছে তা ছাড়াতে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে যদি পরিণতি জানতে পারতাম তাহলে কখনও নিজেকে জড়াতাম না।

তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। রলিন্স বলল, হাডসন আর সন্ডার্স জিনির স্বীকারোক্তি আগাগোড়া শুনেছে বলেই আমার ধারণা। যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে নিতে হবে এমন কিছু আছে নাকি?

করিডন ইতস্ততঃ করে বলল, না। তুমি প্রস্তুত থাকলে আমিও প্রস্তুত, সে উঠে দাঁড়াল।

রলিন্স ধূর্তের হাসি হাসল। তোমার বোট কোথায়? নিশ্চয় তুমি এখানে সাঁতার কেটে আসনি। —সে হেসে বলল।

বোটের কথা থাক। করিডন চটপট বলল, সময় নষ্ট করবে না। বোটটা দ্বীপের অন্যদিকে আছে। কাউকে পাঠিয়ে দেব নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই যুবতীর কি হবে—যে ট্রেন থামিয়ে ছিল? রলিন্স জানতে চাইল, ও তো এখানেই আছে কি বল? তার বিরুদ্ধে পাঁচ পাউন্ড জরিমানা না দেওয়া এবং পুলিশকে বাধাদানের অভিযোগ আছে। ওকে তো এখানে ছেড়ে যেতে পারি না।

ওকে কেউ কি চেন টানতে দেখেছে?—করিডন বলল, ওকে কোর্টে দাঁড় করাবার মত প্রমাণ তোমার হাতে নেই। এই ঝামেলা থেকে ওকে বাদ দাও।

তা হয় না, রলিন্স বলল, দেখা করতেই হবে ওর সাথে।

দেখ, মেয়েটা চমৎকার। বোঝাবার চেষ্টা করল করিডন, এখানেই তার বাড়ি। বোটটা ওর নিজের। প্রয়োজন বোধ করলে ও ফিরতে পারবে। এবারের মত কর্তব্যচ্যুত না হয় হলেই রলিন্স। জান তো কাগজের লোকেরা তাকে নিয়ে কি কেচ্ছা শুরু করবে! তোমারও তো মেয়ে আছে।

রলিন্স হাসল। সে বলল, আচ্ছা, এই মেয়েটাই তো যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে নেমেছিল?

ঠিকই ধরেছ।

ঠিক আছে। চল আমরা যাই।

লোকে বলে পুলিশরা নাকি হৃদয়হীন। করিডন দাঁত বের করে হাসল, কিন্তু কথাটা ভুল দেখছি।

বোটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রলিন্স জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে চাও না? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমাদের জন্য চিন্তা করো না। মাঝে মধ্যে রলিন্স বেশ রসিকতা করে।

করিডন তার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল। ওকে কেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাব? সে জিজ্ঞাসা করল, ও আমার মত নয়। বোটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তাছাড়া নেভিতে কাজ করে এমন একজন ছেলে বন্ধু ওর আছে।

ভাগ্যবান লোক—নাবিক। হাসি চেপে রলিন্স বলল, একজন নাবিককে বিয়ে করে ভালই থাকবে। তোমার জন্য হতাশা বোধ করছি। ভেবেছিলাম মহিলাদের কাছে তোমার চাহিদা তুঙ্গে।

চুপ কর।—করিডন বোটে উঠল, পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি, যদি অ্যানকে শেষবারের মত দেখা যায় এই আশায়।

এম ফর মার্ডার

সোনালী রং-এর ঢেউগুলো সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়ছে। দূর পাহাড়ের গা বেয়ে যে সাদা সরু রাস্তাটা চলে গেছে, সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শেড্। সে সমুদ্রতীরের একটা কুঁড়ে ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভাবছিল ঐ পথ ধরেই আড়াই ঘণ্টা পরে ল্যারী আসবে। যদি এখনই সে টেপ করতে শুরু করে তাহলে তা শেষ হতে মাত্র দু ঘণ্টা সময় লাগবে। বাকী থাকবে আধঘণ্টা।

সে একটা চেয়ারে এসে বসল। ঘরটা বেশ গরম, যদিও পাখা চলছে। সামনে একটা টেবিলের উপর একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে, আর পাশেই রয়েছে এক বোতল মদ।

বোতল থেকে সে অনেকখানি মদ গলাধঃকরণ করে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ডান হাত দিয়ে মাথার মধ্যে সে বিলি কাটল।

শেড্ বেশ বলিষ্ঠ যুবক। ওর চোখ দুটো নীল—সমুদ্রের মত। গেঞ্জী পরে বসে আছে। তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। চেহারাতে বেশ সুপুরুষও বটে। অনিচ্ছাসহকারে সে ঘরের কোণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

ডিভানটার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। তার মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটার মুখ আর কাঁধের অংশ ডিভানের ও পাশে ঝুলে পড়েছিল। মুখখানার কথা ভাবতে গিয়ে শিহরণ জাগল—মুখখানা কালো হয়ে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখ থেকে জিভটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জোর করে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরালশেড্। গাড়ী থেকে নিয়ে আসা ভারী রেঞ্জটা টেবিলের উপর আওতার মধ্যে রাখল সে। একটা সিগারেট ধরাল। ভাবল, এবার তার স্বীকারোক্তি টেপ করা দরকার। ল্যারী আসার আধঘণ্টা আগেই তার রেকর্ড শেষ করা হয়ে যাবে।

কিন্তু সে যতবার রেকর্ড শুরু করতে যায়, ততবারই মেয়েটির বীভৎস মুখ তার সামনে ভেসে ওঠে। নিজেকে গালাগালি দেয়।

—তোমার সামনে বিপদ, সে বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে তা ভেবেই কাজ করো। যে মারা গেছে, তার চিন্তা করে বিপদ বাড়িয়ো না।

মনে সাহস এনে শেড্ টেপটা চালিয়ে দিল, ধীর শান্ত গলায় বলল—ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী মিঃ জন হ্যারিন্টনের অবগতির জন্য এই স্বীকারোক্তি টেপ করছি।

আমি শেড্ উইন্টার্স, ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লিক সাইডের বাসিন্দা, বেলা দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এই বয়ানটি টেপ করছি। আজ ত্রিশে সেপ্টেম্বর।

আমি একটা খুনের ঘটনার বয়ান দিতে যাচ্ছি। কিন্তু তাতে আপনি স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। তাই ঘটনাটি কিভাবে ঘটল, কেনই বা ঘটল, এটা কেনই বা খুনে পরিণত হল, আর কেনই বা লেফটেন্যান্ট লোগো সব জেনেও আমাকে গ্রেপ্তার করলেন না—সবই আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলছি। ধীরে সুস্থে মন দিয়ে আমার কথা শুনুন, তাহলে স্পষ্ট হয়ে সব কথা আপনার কাছে ধরা দেবে।

একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল

।। এক ।।

প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের স্টক ও সিকিউরিটি বিভাগের একজন ক্লার্ক আমি।

অফিসে বসে ব্যবসাপত্র সংক্রান্ত কতকগুলো কথা আমি চিন্তা করছি, সেই সময় ইন্টারকমে ডাক পড়ল।

সংযত স্বরে জবাব-দিলাম আমি উইন্টার্স বলছি।

ওপার থেকে জবাব এল——ওঃ মিঃ উইন্টার্স ! দয়া করে একবার মিঃ স্টার্নউডের ঘরে আসবেন ! বিশেষ দরকার।

আমি তখন সবেমাত্র লিনস্টেনের কাছ থেকে ধার নেব বলে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। সে একজন অর্থপিশাচ। চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। আসলে আমার এখন টাকার খুব দরকার।

আজ সকালবেলা পাঁচটা চিঠি পেয়েছি, চারটি ব্যবসাদারদের কাছ থেকে আর, একটা মেয়েটার কাছ থেকে।

মেয়েটা আমারই জন্য অন্তঃসত্ত্বা। আমি আমার দায় পালন করব কিনা তা জানতে চেয়ে সে চিঠি লিখেছে। মেয়েটির মুখ বুজিয়ে রাখাটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ঐ ব্যবসাদাররা আমাকে শাসিয়েছে যে, তাদের ঋণ শোধ করতে না পারলে আমাকে নাকি দেখে নেবে! আমার বস্‌কে জানাবে, এরকম আরো কত ধরনের কথা লিখে আমাকে শাসিয়েছে।

জানি, ওদের সময়মত টাকা দিতে না পারলে নেকড়ে বাঘের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। যেমন করেই হোক টাকার জোগাড় করতে হবে। আর ওদিকে মিঃ স্টার্নউডের তলব। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।

মিঃ স্টার্নউড খুব কঠিন লোক। অফিসের কাজ তো কিছুই করি না। বরং সুন্দরী টাইপিস্ট আর রিসেপশনিস্টদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। আমার কাজের ব্যাপারে কেউ তার কাছে রিপোর্ট দিল, না কি—কোন পাওনাদার তার কাছে অভিযোগ করেছে!

সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে আমি স্টার্নউডের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। সার বাঁধা টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কলিগদের চাপা হাসি শুনতে পেলাম। তারা আমাকে দেখে বেশ হিংসে করে তা আমি বুঝতে পারি।

আমি লোকগুলোকে অবশ্য করুণা করি। তাদের আমি জন্তু বলে মনে করি। তাদের কাজে যাওয়া, অফিসে কেরানীগিরি করা, আর বাড়ি ফিরে বউদের পেটিকোটের নীচে কুকুরের বাচ্চাদের মত কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকবার জন্য কেবল ছটফটানি। যাদের এখনো বউ হয়নি, তাদের কেবল দিনরাত বউয়ের খোঁজ।

যাক্ আমি স্টার্নউডের দরজা নক করে তার ঘরে ঢোকবার জন্য অনুমতি চাইলাম।

মিঃ স্টার্নউড আমাকে বসতে বললেন। হাতের কাগজপত্তরগুলো দেখতে দেখতে তিনি বলেন—আচ্ছা শেড্ তোমার বয়স কত হল?

—'আজ্ঞে বত্রিশ।'

—দ্যাখো, তুমি আর লিডবেটার একই সঙ্গে এই ব্যাঙ্কে এসেছ। সে আজ অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, আর তুমি? কোন উন্নতি হল না। কেন বলতে পার?

চটপট জবাব দিলাম—লিডবেটার আমার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

স্টার্নউড বলে চলেন—না, তোমার কথাটা ঠিক নয়, আসল কথা সে নিষ্ঠাভবে কাজ করে আর তুমি তা তো করই না, বরং তোমার নিজস্ব কাজের কোন খোঁজ রাখ না। তোমার করণীয় কাজটা তুমি কর না। এভাবে কোন্ ব্যাঙ্কের কাজ কতদিন চলতে পারে? তুমি জান তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে কবে তাকে বরখাস্ত করতাম। কিন্তু তুমি আমার বন্ধুর ছেলে বলে তোমার এই গাফিলতি এতদিন ধরে সহ্য করছি। মিঃ স্টার্নউড একটু থামলেন, একটা সিগারেট ধরালেন।

মিঃ স্টার্নউড আমার বাবার বন্ধু। তাঁর আগ্রহে এই চাকরীতে আমি যোগ দিই। এক যোগ্য ব্যাঙ্কার হয়ে ওঠার জন্য তিনি সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিতেন। এখন তিনি আমার উপর বেশ হতাশ হয়েছেন। এখানে কাজ করবার আগে আমি সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলাম।

আমার চাকরী চলে যাবার ভয়ে থেমে গেলাম।

তোমার মতলবটা কি বলতো শেড্? তুমি কি আমাদের ব্যাঙ্কে আর থাকতে চাইছ না? স্টার্নউড জিজ্ঞাসা করল।

তাঁর গলার স্বরে হতাশার ছাপ। মনে হল আমি যেন খুব অন্যায় করে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে বললাম—না স্যার। আমি ছাড়বার কথা ভাবি নি। আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি। এবার থেকে

আমি মন দিয়ে কাজ করব। আমাকে আর একবার সুযোগ দিন।

স্টার্নউড বললেন—'ঠিক আছে, আর এক্‌বার তোমাকে চান্স দিচ্ছি। তোমাকে এবার যে কাজটা দেব, তা অন্যরকম, তবে বেশ কঠিন। যদি ঠিকভাবে করতে না পারো, ব্যাঙ্কের ভীষণ ক্ষতি হবে। কাজটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, তুমিও ছাঁটাই হয়ে যাবে। এখন থেকে তুমি এই কাজের জন্য দেড়শ ডলার বেশী পাবে। লিডবেটার তোমাকে কাজটা বুঝিয়ে দেবে।

কাজটা যে কত শক্ত, তা যখন বুঝতে পারলাম ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। লিডবেটারেব মত দক্ষ কর্মীর মাথার চুল পেকে গেছে ছমাসের মধ্যে, আর সেই কাজের দায়িত্ব আমার উপর পড়ল!

মিঃ স্টার্নউড আমাকে জোশশেলী সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন। তিনি শহরের একজন বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তি।—একদিকে তার ট্রাকটরের ব্যবসা অপরদিকে ট্রাঙ্ক তৈরীর ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলার রোজগার করেন। উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে তিনি মারা যান। তার মেয়ের নামে নগদ সাত কোটি ডলার রেখে যান আর সম্পত্তি তো রয়েছেই।

উইলে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, জমিদারী এবং তার অগাধ বিষয় আশয় সবই প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন দেখাশোনা করবে।

অবশ্য তার মেয়ে যদি আমাদের কাজে অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য ব্যাঙ্কে তাদের অ্যাকাউন্ট স্থানান্তরিত করতে পারবে। এতবড় সম্পত্তির দেখাশোনা করতে অনেক ব্যাঙ্কই রাজি থাকবে কেননা শেলীর অ্যাকাউন্টের টাকা খাটিয়ে অনেক পরিমাণ ডলার সহজে লাভ করা যায়।

জোশ শেলীর কন্যা ভেস্তাল একেবারে গভীর জলের মাছ। এতদিন বাপের শাসনে সে ঘরের মধ্যে জন্তুর মতই আটকে ছিল, আর বাবা মারা যাবার পর বিশাল সম্পত্তি হাতে পেয়ে একটা বক্তলোভী বুনো দাঁতাল শুয়োর হয়ে উঠেছে।

নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও নীচু মনের মেয়ে এই ভেস্তালের মেজাজও বেশ সাংঘাতিক।

গত ছ বছর ধরে ব্যাঙ্কের পনের জন দক্ষ কর্মচারী শেলীর অ্যাকাউন্টের কাজ করে কেবল বদনামই কুড়িয়েছে। কাউকে শান্তিতে কাজ করতে দেয়নি ভেস্তাল।

শেলীর অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করা মানে স্বেচ্ছায় ফাঁসীর দড়ি গলায় পরা।

লিডবেটার তার কাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

শেলী অ্যাকাউন্টের ঘরে এসে আমাকে ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখাতে লাগল। আমি তার ব্যস্ততা দেখে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি এসব বন্ধ কর, এসব জটিল ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকবে না।

আমি যেন মাতৃহত্যা করে ফেলেছি এমনভাবে লিডবেটার আমার দিকে তাকাল। সে বলল—শেড়, তুমি জান না ভেস্তাল কেমন সাংঘাতিক মেয়ে। কেউ সুখে থাকুক, মেয়েটা তা চায় না। কাজে সামান্য খুঁত হলে কৈফিয়ৎ চাইবে। আর সে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

কর্মদক্ষতা না দেখাতে পারলে এই অ্যাকাউন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্যাঙ্ক তো তোমাকে খাবেই আর মিস শেলীও তোমাকে মরণ কামড় দেবে।

সে সাবধান করে বলল—শেড়, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। সাবধান। তোমার উপর ভীষণ দায়িত্ব, এই ফাইলগুলো ভাল করে বোঝবার চেষ্টা কর।

আমি হাসলাম। তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম—শোন, লিডবেটার মেয়েদের কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তা আমার জানা আছে। আর ঐ হিংস্র মেয়েটি এবার বুঝবে, কার সঙ্গে ছেঁচড়ামো করছে। তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

।। দুই ।।

পনেরই মে। আজ সকালবেলা মিস শেলীর সঙ্গে দেখা করবার অভিপ্রায়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

তার সম্পর্কে লিডবেটারের কাছ থেকে যা যা জেনেছিলাম, সেই তিনটি বিষয় দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে বলেই আমার মনে হল। ভেস্তালের এই তিনটি দাবী হল—

এক—পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে যে ফারের কোটটা তিনি সম্প্রতি কিনেছেন, সেটা ইনকামট্যাক্সের খাতায় গোপন করতে হবে, ন্যায্য খরচের হিসাব দেখাতে হবে।

লিডবেটার তা অবাস্তব বলে নাকচ করেছে। তা না হলে ব্যাঙ্কের বিপদ হবে।

দুই—লোয়ার ইস্ট সাইডে মাইল দুই জুড়ে শেলী ফাউন্ডেশানের যে বিশাল ভাড়া-বাড়ী আছে তাতে শতকরা পনের ভাগ ভাড়া বাড়াতে হবে।

তিন—উনিশশো চোদ্দ সালে তার বাবা তিনশ চৌত্রিশ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউ-এর বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িটা কিনেছিলেন তা ব্যাঙ্ককে বিক্রী করে দিতে হবে মিঃ বার্জেসের কাছে। তিনি সেখানে একটা পতিতালয় খুলতে চান।

এই তিনটি প্রস্তাব মানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় দাবীটির প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ঐ বাড়িটির ভাড়া কিছুদিন আগেই বাড়ান হয়েছে। আর তিন নম্বরের বাড়িটা বিক্রী করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ঐ বাড়িটাতে তার বাবার আমলের ভাড়াটেরা রয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ তিনটি বিষয়ে আমাকে তৈরী থাকতে হবে।

আমি দশটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে শেলী হাউসে হাজির হলাম। আমার পরনে তখন ছিল লিনেনের স্পোর্টস জ্যাকেট বড় বড় পকেটওয়ালা। ডীপ নীল রং এর ঢোলা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, সাদা শার্ট আর কাক লেদারের জুতো। রুমালটা বেশ জংলী টাইপের ছিল।

শেলী হাউসের প্রাইভেট রাস্তা, পাহাড় কেটে তৈরী। অনেকগুলো বাঁক ঘুরে তিন মাইল রাস্তা নশো ফুট ওপরে বিশাল গেটের সামনে পর্যন্ত চলে গেছে। এটা বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ বললে ভুল হয় না।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকি আমি, এমন সময় ধর্মযাজকের মত চেহারার একজন লোক দরজা খুলে উদয় হল।

বললাম—মিঃ উইন্টার্স! মিস শেলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পেনসিলভানিয়া সেন্ট্রাল স্টেশনের মতন একটা বিরাট হলঘরে এসে দাঁড়ালাম। বসতে বলে লোকটা চলে গেল। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলাম।

কত রকমের যুদ্ধাস্ত্র—বর্শা, তরোয়াল, বল্লম, কুঠার, অয়েল পেন্টিং ছবি ঘরে ভর্তি। ছুটন্ত ঘোড়ার ছবিই বেশী।

বাড়ির এমন গমগমে পরিবেশে লিডবেটারের গোবেচারা মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে চাকরটা এসে বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

চাকরটার সঙ্গে আমি বিশাল বারান্দা পেরিয়ে ওক কাঠের দরজার সামনে এলাম। চাকরটা ঐ দরজার এক পাল্লা খুলে ভিতরে কারোর উদ্দেশ্যে বলল—প্যাসিফিক ব্যাঙ্কের মিঃ উইন্টার্স।

বুকের ভিতরে কাঁপুনি নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। ঘরটা ছোট হলেও বেশ খোলামেলা। ও পাশের জানালা দিয়ে বাগান আর সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ফুলদানী ভর্তি। জানলার পাশে একটা ডেস্ক আর তাতে আসীন একটা মেয়ে। তার মাথা ভর্তি কালো চুল। রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে তার কৌতূহলী চোখদুটো আমাকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে।

কয়েকমাস পরে এই মেয়েটিই আমাকে নরকে নামিয়েছিল। তখনই আমার মেয়েটিকে ভাল করে দেখা উচিত ছিল।

আপনিই মিঃ উইন্টার্স? সে প্রশ্ন করল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—আমি মিস ডোলান, মিস শেলীর সেক্রেটারী।

আমাকে তার অনুরোধে বসতে হল। সে জানাল, মিস শেলীর কিছুক্ষণ দেরী হতে পারে। তখনই আমার মনে পড়ে গেল লিডবেটারকেও এরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত, ফিরেও আসতে হত।

আমি ডোলানের উদ্দেশ্যে বললাম—আমি বাগানে আছি। উনি যখন আসবেন, আমাকে দয়া

করে ডেকে নেবেন।

বাগানে এসে সিগারেট ধরালাম। পনের মিনিটে তিনখানা সিগারেট শেষ হল। তবুও ডাক পড়ল না।

মিস ডোলানের ঘরে এসে বললাম—উনি কি তৈরী হন নি?

—বোধ হয় আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।

মিস ডোলানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার কাছে একটা কাগজ আর খাম চাইলাম। সেটা দিতেই আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম—টাইপরাইটারটা একটু ব্যবহার করছি,বলেই বসে পড়ে একটা চিঠি টাইপ করলাম।

প্রিয় মিস শেলী,

পনের মিনিট ধরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। মিস ডোলানের কাছ থেকে জানতে পারলাম—আপনাব আরও দেরী হতে পারে। কিন্তু আমার তো একটা বিবেক আছে। এখানে বসে থাকলে আমার সময় নষ্ট হবে, আর তাতে আপনারই অর্থের ক্ষতি। জানেন তো বিনিয়োগকারী ঘুমিয়ে থাকলেও শেয়ার মার্কেট অপেক্ষা করে না। তাছাড়া ফার কোটের ব্যাপারটা আপনার স্বার্থেই আলোচনা করা দরকার।

নিজের নাম সই করে চিঠি খামে ভরে একটা চাকরের হাত দিয়ে মিস শেলীর কাছে পাঠালাম।

তারপর জানলার কাছে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। বেশ ভয় লাগছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাকরটি এসে জানাল—মিস শেলী এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। স্যার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মিস ডোলানের বিস্ময় ভরা মুখটা আমার চোখে পড়ল। তার চোখে বিস্ময়ের ছাপ কিছুটা প্রশংসারও বটে। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলাম।

চাকরটিকে অনুসরণ করে ভেস্তাল শেলীর ঘরে পৌঁছলাম। বিশাল বিছানার উপর আধশোয়া ভঙ্গিতে যাকে দেখলাম, তাকে বাড়ির চাকরের পর্যায়ে ফেললে বোধহয় ভালই হবে।

হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কপালের নীচে দুটো কালো গর্তের মধ্যে থেকে চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বার হয়ে আসতে চাইছে। একমাথা শুকনো হলুদ রং-এর চুল। বাজপাখীর ঠোঁটের মত খাঁড়া নাক। লাল লিপস্টিক সত্ত্বেও ঠোঁটটা যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

পরস্পরের চোখাচোখি হওয়াতে সে হেসে মৃদু সম্ভাষণ জানাল—আপনিই শেড্‌ উইন্টার্স? গলার স্বরটা মৃদু ও সুরেলা, যা চেহারার সঙ্গে বেমানান।

—হ্যাঁ, মিঃ স্টার্নউড আমাকে...।

আমার কথা শোনবার দিকে তার কান নেই, মাঝপথে আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল—এটা আপনি লিখেছেন? চিঠিটা দেখাল।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাতে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে, ঐরকম অবস্থায় মিস শেলী বলে—আপনি বেশ সুন্দর দেখতে, মিঃ উইন্টার্স। বোধহয় আমার জন্যই আপনি এই পোষাক পরেছেন?

হ্যাঁ, আমার মনে হল, অন্ততঃ পনেরজন কেরানীর সাদামাটা পোষাক দেখে একঘেয়েমি দূর করবার জন্য আমি অন্য ধরনের পোষাক পরলাম।

আমি আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে চাইছিলাম—তীব্র দৃষ্টি হেনে বলল—কিন্তু আপনার ধূর্তামির জন্য আপনি জিতে গেলেন।

আমিও বিজয়ীর হাসি হেসে বললাম—আমি সেটা অনুমান করেই আপনাকে চিঠি লিখেছি।

মিস শেলী ইঙ্গিতে বিছানার পায়ের দিকটা দেখিয়ে বলল—আপনি ইচ্ছা হলে এখানে বসতে পারেন।

আমি বসলে সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ফার কোট নিয়ে আপনি কি যেন বলছিলেন?

আমি চলনসই একটা জবাব ভেবেই রেখেছিলাম। বললাম—দেখুন! আমি কয়েকটা প্রস্তাব রাখব কিন্তু আপনার অপছন্দ হলে যদি দয়া করে ভুলে যান সেটাই ভাল হবে।

আগ্রহ সহকারে মিস শেলী প্রশ্ন করল—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

মিস শেলী, আমি বুঝতে পারছি আপনি ব্যাঙ্কের কাজে সন্তুষ্ট নন। নদীর এপার—ওপারের মতই ব্যবধান। আমি সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।

এরপর ভূমিকা সাঙ্গ করে বললাম—কোট কেনার খরচটা আপনি নিজের খরচের হিসাবের মধ্যে দেখাতে চাইছেন। কিন্তু সেটা ব্যাঙ্কের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক যে কাজ করে প্রত্যেকটার রসিদ থাকে। যদিও ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা রসিদ আদৌ দেখে না। তারা ব্যাঙ্কের কথাই মেনে নেয়।

মিস শেলী বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম—ব্যাপারটা জালিয়াতি করা। এক্ষেত্রে ছদ্মবেশ পরাতে হবে। এক অর্থে বলে—কর ফাঁকি দেওয়া। যার জন্য জেল বা জরিমানা দুটোই হতে পারে।

ফাঁকিটা কি ধরা পড়ে যেতে পারে?

তার কথা শুনে বুঝলাম জালিয়াতির নাম শুনে সে ভয় পেয়ে যায় নি। তার অর্থ এই ধরনের মেয়েকে সহজেই কায়দা করতে পারা যাবে। আমি নরম গলায় বললাম—আমি যেভাবে কাজটা করব, তাতে ধরা পড়বার আশঙ্কা নেই।

—কিভাবে করবেন? সেটা বুঝিয়ে বলুন!

উনিশ'শ ছত্রিশ সালে আপনার বাবা গোটা তিনেক কারখানায় মেরামতির কাজ করেছিলেন এবং সেইমত ইনকামট্যাক্স দপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তিরিশ হাজার ডলার নিজের খরচের মধ্যে দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ইনকামট্যাক্সের লোকেরা রসিদ না দেখেই ব্যাঙ্কের বয়ান জেনে নিয়েছিল। সেই রসিদগুলো আমি পাল্টে নতুন করে নিয়েছি। আমার স্থির বিশ্বাস ইনকাম ট্যাক্স সেগুলো দেখতে চাইবে না, ব্যাঙ্কের বয়ানও মেনে নেবে।

আমি রসিদগুলোর তারিখ পাল্টে দেব। কাজেই দেখুন, আপনার ফার কোটের চেয়ে বেশী টাকা, তিরিশ হাজার ডলার আপনার খরচের হিসাবে বেরিয়ে এল কি? এবার বলুন আপনি খুশী তো?

মিস শেলী বলল—মিঃ উইন্টার্স, আপনি বেশ বুদ্ধিমান। আমাদের দুজনের বোঝাপড়ায় ব্যবসাপত্তর এখন থেকে আমার মনের মতই চলবে।

তিনি মনের খুশীতে বেল বাজিয়ে চাকরকে দিয়ে একবোতল শ্যাম্পেন অর্ডার দিলেন।

আমি বিজয়ের উত্তেজনা মনের মধ্যে কোনরকমে চেপে রাখলাম। এখন কেবলমাত্র সাবধানে, ধীর, শান্ত মাথায় কাজ করতে হবে।

শ্যাম্পেন রুপোর পাত্রের মধ্যে বসিয়ে আনা হল। তার মধ্যে বরফের কুচি। বেশ কায়দা করে বোতলের ঢাকনাটা খুলল চাকরটা। তারপর সে দু গ্লাস মদ মিস শেলী আর আমার হাতে তুলে দিল।

একটু মুখে দিতেই মুখটা খারাপ হয়ে গেল। শ্যাম্পেনটা বাজে। বুঝলাম চাকরটা মজা করেছে।

যাকগে সে দিকে গুরুত্ব দিলাম না। মিস ভেস্তাল বাড়িভাড়ার ব্যাপারটা জানতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলাম—ওঃ বাড়িভাড়া! তাও হয়ে যাবে।

মিস শেলী জানতে চাইল উপায়টা।

বললাম—যে সংস্থা এখন ভাড়া আদায় করছে, তাদের পাল্টাতে হবে।

মিস শেলী অবাক হয়ে বলল—সেকি! ওরা তো গত চল্লিশ বছর ধরে কাজ করছে।

ভৃত্য যদি অকর্মণ্য হয়, বয়স্ক হয়, তাকে তো পাল্টাতেই হবে। পুরোনো বলে তো রেখে দেওয়া যায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম।

—দেখবেন, বাড়ির ব্যাপারে যেন এসব প্রশ্ন না ওঠে।

—না, না, এসব ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেকে আপনার চাকর বলে মনে করি না। আপনার চাকর অর্গিস নিজেকে চাকর বলে ভেবে খারাপ শ্যাম্পেন দিতে পারে, কিন্তু আমিও তাকে একদিন দেখে নেব।

না, না, অত চটে যাবেন না অর্গিসকে আমি বলব।

ঠিক আছে। আমি বললাম।

—তাহলে যাবার সময় হ্যারিসন কোর্টের চিঠিটা লিখে দেব। আপনি সই করে রাখবেন।

মিস শেলী উত্তর দিল না। চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানাতে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম—তার বুক বলতে কোন পদার্থ নেই। একেবারেই লেপাপোছা। একটা ছোট খাট পুতুলের মতই তাকে দেখাচ্ছে। সে উঠে বসে বলল—মিঃ উইন্টার্স আমাদের দুজনের সমঝোতা ভাল হবে বলেই মনে হচ্ছে। কি বলেন? তার খাড়া নাকটা কাঁপছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আপনি তিনশ চৌত্রিশ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউ-এর বাড়িটা মিঃ বার্জেসকে বিক্রী করে দিতে ইচ্ছুক?

মিস শেলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি কি একদিনেই সব কাজ সেরে নিতে চাইছেন? এটার কি বন্দোবস্ত করলেন?

আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম—আপনি যদি আপনার বাবার স্মৃতিটাকে একটা বেশ্যালয়ের রূপ দান করতে চান, তাই করবেন। কেবলমাত্র আপনার অনুমতির অপেক্ষায়।

আমার এই নগ্ন কথাগুলো মিস শেলীর মনে বেশ দাগ কাটল বলেই মনে হল। কিন্তু বুদ্ধির জোরে আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বলল—ভাড়াটাদের নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে যা মিঃ লিডবেটার সমাধান করতে পারছেন না।

ওসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে মিস শেলী বলল—ঠিক আছে, বাড়িটা বিক্রী করবার চেষ্টা করুন। আপনার বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখি।—কথাগুলো যেন সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

মিস শেলীর উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমি বার্জেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এবং সেটা আজই।

কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি যে একরকম আগুনে-বোমা।

তার প্রশংসা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত হলাম।

এমন সময় মিস শেলী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিল, এখনিই সে বেরোবে।

আমি বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গে করমর্দন করে মিস শেলী বলল—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভাল লাগল। আপনার কথা আমি মিঃ স্টার্নউডকে জানাব।

সুযোগ বুঝে আমি একটা দাঁও মারলাম।—আপনি যদি আমার জন্য একটা গাড়ি আর একটা নিরাপদ অফিস ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

মুখে বিরল ভাব এনে মিস শেলী বলল—আপনাকে গাড়ি তো ব্যাঙ্কই দেবে।

আমি তার কথা বুঝতে পেরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম—সব কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারব।

আর আপনার এসকল গোপনীয় কাজ করব, তা সকলে দেখে ফেললে তাতে আপনারই ক্ষতি। গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্য একটা নিরাপদ ঘরের দরকার। ব্যাপারটা আপনিই ভেবে দেখুন।

থেমে বললাম—এসব গূঢ় কথা আমি ব্যাঙ্ককে জানাতে চাইছি না।

সে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। মনে হল আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের রাগকে সামলে নিয়ে সে বলল—আপনার স্নায়ুগুলো বেশ সতেজ দেখছি। মিঃ উইন্টার্স, আমি বাজি রেখে বলতে পারি মিঃ স্টার্নউড বা অন্যান্য কলিগরা আপনাকে চিনতে পারে নি। তাই এতদিন ধরে অন্যান্য কর্মচারীরা আমার অ্যাকাউন্টের ভার নিয়েছিল। ঠিক আছে, মিঃ স্টার্নউডকে বলে আমি আপনার জন্য একটা আলাদা অফিস ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখব।

আর আমার ছ'টা গাড়ির মধ্যে একটা আপনি নিতে পারেন, অবশ্য সেটা দু-একদিনের জন্য।

আমি নিশ্চিত হলাম। যে দুনিয়া আমার কাছে স্বপ্ন মনে হয়েছিল, এখন তা আমার হতের মুঠোয়।

মিঃ অ্যাটর্নী দেখলেন কিভাবে তার গাড়ি, অফিসঘর সব আমার নিজের হয়ে গেল। এবার শুরু হল আমার আসল খেল।

মিঃ বার্জেসের কাছে গেলাম। বেঁটেখাটো মানুষ, রোগা চেহারা। মাথায় একটা টুপী। হুকের

মতই তার নাকটা বাঁকান। ব্যাঙের পেটের মত তার গায়ের রং ফ্যাকাশে।

একটা ঝরঝরে পুরোনো বড় টেবিলের এক পাশে বসে আছে একটা নেভা চুরুট ফোঁকলা দাঁতে চেপে।

তার টেবিলের মাঝখানে বসে আছে একটা মেয়ে। তার বুক দুটো কামানের মত উঁচু হয়ে রয়েছে। আর পাছা! যাকে বলে দেড়মণি নিতম্বা একটা আঙুলে টাইপ করে চলেছে।

কি চাই? যেন একটা খালি কৌটায় পয়সা পড়ল, এমন ঠংঠং আওয়াজ হল।

আমি আঙুল দিয়ে মিঃ বার্জেসকে দেখিয়ে বললাম—তোমার নিতম্বটা সামলে বসো খুকি। এটা তো সেই জায়গা নয়! বলে তার পাশ দিয়ে মিঃ বার্জেসের কাছে গেলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে দিলাম। তিনি আমার পোষাক দেখে বললেন—আপনি তো সাদামাটা কেরানী নন, বরং সিনেমা স্টার বলেই মনে হচ্ছে।

তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে আলোচনা সেরে ফেলতে চাইলাম।

তার সঙ্গে দরকারী সব কথা সারা হল। শর্ত থাকল এরকম, উনি বাড়িটা হাতে পেলেই বাড়ির ভাড়াটেগুলোকে উচ্ছেদ করে দেবেন।

কথা শেষ করে তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক চাইলাম।

সে বলে—আপনি তো বেশ চালু ছেলে!

আমি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললাম—আপনি আমার পাঁচশো ডলার মিটিয়ে দিলে বাড়িটা আপনার হয়ে যেতে পারে। না পোষালে বলে দিতে পারেন।

বার্জেস কিছুটা হতাশ হলেও পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগটা বার করে গুনে গুনে পাঁচশো ডলার আমার হাতে দিল।

আমি টাকাটা হাতে নিয়ে নিজেকেই গালাগালি দিলাম। ভাবলাম, আরও একটু বেশি চাইলেই বোধহয় ভাল হত। বুড়োটাকে শুষে নিতে পারলে ভালই হত।

বার্জেস এবার আমার চোখে চোখ রেখে বলল—বাড়িটা চালু হলে একবার দেখতে আসবেন-মেয়েগুলোকে চেখে দেখবেন। আশা করি আপনার এ বিষয়ে রস আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ঠিক আছে, কাল এক সময় এসে সই করাব আপনাকে দিয়ে। বাড়িটা আপনারই হয়ে গেল ভেবে নিন।

তাকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। দিনটা বেশ ভাল যাচ্ছে বলেই আমার মনে হল।

লিটল ইডেন এলাকায় পাঁচ ছটা সম্পত্তি তদারক সংস্থা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংস্থাটি হল স্টেইনবেক অ্যান্ড হোরে। ভাবলাম, এদেরকে ভার দিলে প্রাণপণ চেষ্টা করে এরা শেলীর ব্যবসা দেখাশোনা করবে।

বুলেভার্ড ফ্লোরাল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে বললাম—আমি প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন থেকে আসছি।

মেয়েটি আমাকে বের্নি হোরের কাছে নিয়ে গেল। লোকটা মাঝবয়সী। ফুটবলের মত নীরেট গোল তার চেহারা।

আমি ঢুকতেই এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল—আনন্দিত হলাম মিঃ উইন্টার্স বসুন।

আমি বসতে বসতে নিজের পরিচয় দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—শেলী ফাউন্ডেশনের ভাগ আদায়ের কাজটা কি আপনারা করতে রাজি আছেন?

বের্নি হোরের মুখভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। নাকটা চুলকে বলল—হ্যারিসন অ্যান্ড কোর্ট কি কাজটা ছেড়ে দিয়েছে?

উত্তরে বললাম—মিস শেলীই তাদেরকে ছাড়িয়ে দিতে চান। গত মাসের ভাড়ার রসিদের একটা বান্ডিল বার করে বের্নির হাতে দিয়ে বললাম—এর উপর বাড়তি পনের পার্সেন্ট ভাড়া আদায় করতে হবে।

অবশ্যই পারব, আপনি আমার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিন।

আমি বললাম—জানেন তো? দেশজুড়ে মিস শেলীর সম্পত্তি ছড়িয়ে রয়েছে। দায়িত্ব দিলে

সব চালাতে পারবেন তো?

কেন পারব না? এটাই তো আমার কাজ। কিন্তু কথায় তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

আমি লোভ বাড়িয়ে দেবার জন্য বললাম—অবশ্য তিনি যে রাজি হবেন, এমন কোনও কথা নেই, তবে কিনা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বের্নি ছুরির ফলার মত দৃষ্টি চালিয়ে একবার দেখে নিল, তারপর বলল—ভারটা আপনি একবার দিয়েই দেখুন না। সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন।

বুঝলাম সে আমার মনোভাবটা বুঝেও বুঝতে পারছে না। সোজা ভাবেই কথাটা বলা উচিত ভেবে আমি হাসতে হাসতে বললাম—মিঃ বের্নি আমার মনে হয় ঘোড়ার উপর বসে কথা বলার চেয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি কথা বলাটা বোধহয় ভালই হবে।

শহরে আপনাদের মত সংস্থা আছে এবং সকলেই এই বিশাল শেলী সম্পত্তি তদারকির ভার পেলে ধন্য হবে। তাই না? আর সেই কাজটা আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি, কোন স্বার্থে বলুন তো?

বের্নি হোরে এবার বুঝতে পারল, প্রশ্ন করল—আপনি কত চান। মিঃ উইন্টার্স?

মিঃ বের্নি আমাকে হাজার ডলার দিতেই হবে। আর পরিবর্তে মিস শেলীর সব সম্পত্তি দেখা শোনার ভার আপনি পাবেন।

ঠিক আছে, মিস শেলীর সই করা চিঠি আপনি আনলেই একেবারে নগদে হাজার ডলার পেয়ে যাবেন।

ঠিক আছে, বলে আমি তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জানিয়ে দিলাম আগামীকাল দুপুরবেলায় আসব।

।। তিন ।।

অফিসের টেবিলে আমার নামে একটি চিরকূট পড়ে রয়েছে। মিঃ স্টার্নউডের কোন পাওনাদার এল, নাকি স্বয়ং বের্নি বা বার্জেস মিঃ স্টার্নউডকে গোপন তথ্যগুলো ফাঁস করে দিতে এল। ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিঃ স্টার্নউডের দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলাম। তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে আমার ভুল ভাঙল।

তিনি সহাস্যে আমাকে বসতে বললেন—তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন—তুমি যাদু টাদু করলে নাকি? মিস শেলী তোমাকে পেয়ে দারুন খুশী। তিনি নিজেই আমাকে ফোন করে তোমার প্রশংসা করলেন। কি ব্যাপার বলতো? তোমার জন্য আলাদা অফিস ঘর করে দিতে বললেন।

তোমার অফিস ঘর এতক্ষণে বোধহয় তৈরী হয়ে গেছে। উপযুক্ত ভাবে সাজাতে বলেছি। আর মিস গুডচাইল্ড তোমার স্টেনো হয়ে কাজ করবে।

আমি মৃদু হেসে বললাম—স্যার, অত উল্লসিত হবেন না। বড় লোকের খেয়াল তো!

তা যাকগে, এখন তুমি কিভাবে তিনটে সমস্যার সমাধান করলে সেটাই বলতো?—প্রশ্ন করলেন মিঃ স্টার্নউড।

আমি জানতাম এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। উত্তরের একটা ছক আমি তৈরী করে নিয়েছিলাম। একটু চিন্তিত ভাব এনে বললাম—আমি মিস শেলীকে ফার কোটের ব্যাপারে বলেছি এটাতে কর ফাঁকি দিতে হবে, সেক্ষেত্রে ধরা পড়লে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।

বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ—স্টার্নউড বললেন—আমরা এরকম ভাবে কোনদিন বোঝাতে পারি নি।

বাকি দুটোর কি করলে তাই বল।

এবারেও প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম—মাপ করবেন স্যার। এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। তিনিই যে মালকিন, এটা প্রমাণ করবার জন্য বাড়িটা মিঃ বার্জেসকে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করেছি এবং শেলী ফাউন্ডেশানের হয়ে বাড়তি শতকরা পনের ভাগ আদায় করবার দায়িত্ব অর্পণ করলাম স্টেইনবেক অ্যান্ড হোরেকে।

মিঃ স্টার্নউডের চোখদুটো বিস্ফারিত হল। তিনি বললেন—বের্নি এক ধরনের অর্থ পিশাচ আর নির্দয়। জোচ্চোরও বটে।

আমিও তাকে এ ধরনের কথা বলেছি, কিন্তু তিনি আমাকে দাবড়ি দিয়ে উঠলেন—আপনারা আপনাদের চরকায় তেল দিন। বের্নি সব লুটেপুটে খাবে। স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার প্রভাবটুকু খাটিয়ে ওর রাশটুকু ধরে রাখতে পারি।

কিন্তু কিভাবে তুমি ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে? বের্নিকে সামলান সোজা কাজ নয়। আর মক্কেলের ক্ষতি হোক এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। আমি এখনি মিস শেলীকে ফোন করছি বলে তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মিস শেলী তো এইসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। এখনি আমার দফার শেষ হয়ে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললাম—উনি সাবধান করে দিয়েছেন, আমরা যদি ঐ ব্যাপারে কথা বলতে যাই তাহলে উনি আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত অ্যাকাউন্ট তুলে নেবেন। স্যার, আপনি খবরদার ফোন করবেন না। এতে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

মিঃ স্টার্নউড আঁতকে উঠে হাত সরালেন ফোনের উপর থেকে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম—কিছু ভাববেন না স্যার। ভাড়া সংক্রান্ত রসিদগুলো চেক করে আমি বের্নিকে সোজা করে রাখব।

মিঃ স্টার্নউডের গলায় আশঙ্কার সুর শুনে আমি তাকে আশ্বাস দিলাম।—নিশ্চয় আমি পারব স্যার।

তাকে প্রবোধ দিয়ে বললাম—একান্তই না পারলে তখন আপনি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলবেন।

এবারে আশ্বস্ত হলেন মিঃ স্টার্নউড ; বেশ, তুমি যা করবার কর। তারপর হেসে বললেন—অন্ততঃ ফারকোটের ব্যাপারটা ভালভাবেই মিটিয়েছ তুমি। এ দুটোও পারবে।

এরপর আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

।। চার ।।

পরদিন প্রাতে যথারীতি আমি অফিস ঘরে এসে পৌঁছলাম। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম মিস শেলীর নাম ভাঙ্গিয়ে, তার জমান টাকা ভাঙ্গিয়ে বেশ কিছু ডলার আয় করা যাবে।

মনে মনে ভাবলাম, বার্জেসের কাছে আমি ঠকে গেছি কিন্তু বের্নি হোরের কাছ থেকে হাজার তিনেক ডলার আদায় না করে আমি ছাড়ব না। পরিকল্পনা মত একটা চিঠি তৈরী করলাম। কেবলমাত্র নাম সই করবার অপেক্ষায়। শেলীর অ্যাকাউন্টের খাতা পত্র খুলে দেখতে লাগলাম। মিস শেলীর অ্যাকাউন্ট সবই সরকারী বন্ড আর স্টকে কেনা। একেবারেই পাকা কাজ।

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সোজা ওয়েস্ট সিটি স্ট্রীটের একটা বিশাল বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সোজা ছ তলায় উঠে গেলাম। এই বাড়ির খোপে অনেকগুলো অফিস। এখানে রায়ান ব্ল্যাকস্টেনের অফিস।

আমার পূর্ব পরিচিত সেই বন্ধুটির কাছে যেতেই সে আনন্দিত হল। বসতে বলল।

আমি বসতে বসতে বললাম—বিশাল শেলী অ্যাকাউন্ট থেকে কিছুটা খুঁটে তুলে নিলে হয় না?

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ওতে আমার কোন লাভ হবে না।

আমি রায়ানকে বললাম—ধরো না, যদি আড়াই লাখ ডলার শেয়ার বাজারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই জিনিসের দাম বাড়বে না?

ঠিকমত লাগাতে পারলে অবশ্যই বাড়বে। যেমন ধর, কোনওয়ে সিমেন্ট। গত কদিনে পাঁচ পয়েন্ট দাম বেড়েছে। তবে জানই তো, এসব ব্যাপারে ঝক্কি একটা থাকেই।

আমি তাকে হাজার ডলার শেয়ারে লাগিয়ে দিতে বললাম। লোকসান হলে বড়জোর হাজার খানেক হবে। তার বেশী তো নয়?

রায়ান সেকথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল—এভাবে টাকা খাটাবার অধিকার তুমি কিভাবে পেয়েছ?

নরম গলায় জবাব দিলাম—ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নয়, স্বয়ং মিস শেলীর কাছ থেকে। তিনি হাজার খানেক ডলার লোকসানটাও মেনে নেবেন।

রায়ান লিখিত অনুমতি চাইল, সে সোজাভাবে রাজি হবে না বুঝতে পেরে তাকে বললাম—দেখ রায়ান, শেলীর অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করার অর্থ সহজেই বাজারে চড়চড় করে দর বেড়ে যাওয়া। তোমারও এতে লাভ হবে—আমারও লাভ হবে।

রায়ান বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল—তার মানে? ব্যাঙ্কে কাজ করে এসব কথা তুমি বলতে পার নাকি?

—ঠিক আছে। তুমি যখন রাজি হবে না, তখন আমি লোরেন অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের কোম্পানীতে যাই। এরকম দাঁও ওরা হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না।

রায়ান তাড়াতাড়ি বলে উঠল—ঠিক আছে। আশা করি তুমি যা করছ, বুঝে শুনেই করছ। এখন তুমি কত চাও বল?

বেশী নয়! ফিফটি ব্র্যাণ্ডার।—জবাব দিলাম।

আঁতকে উঠল রায়ান—একেবারে ডাকাতি। যাক্ তাহলে কোনওয়ে সিমেন্টের উপর লাগাবো তো? চিঠিটা সই করে দাও।

আমি চিঠিটাতে সই করে বললাম—স্টক কেনো আড়াই লক্ষ ডলারের। দুই বা তিন পয়েন্ট বাড়লে ঝেড়ে দাও। আজই।

রায়ান বলল—দাম যদি বাড়তে থাকে তাহলে ধরে থাকবো তো?

না, আজই সম্ভব হলে ছেড়ে দেবে। মিস শেলী একজন অর্থ পিশাচ। চটপট কিছু লাভ দেখাতে পারলে আমার উপর খুব খুশী হবেন।

আরও কিছু বক্তব্য রায়ানের মাথায় ঢুকিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাঙ্কে। সেখানে বার্জেসের কাছ থেকে পাওয়া একশ ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললাম। তারপর লাঞ্চ সারবার জন্য ক্রোরিয়ান রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম ভাল খাবার জন্য।

ভাবছিলাম কদিন আগে পাওনাদারদের তাড়ায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আর আজ পনের শ ডলার হাতের মুঠোয়। আরও কত টাকা আসবে।

লাঞ্চ সেরে সোজা অফিসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম—হ্যালো—কে?

দূরভাষে ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল—আমি মিস ডোলান বলছি। আপনি কি মিঃ উইন্টার্স।

হ্যাঁ। আমি বলছি।

তার কাছ থেকে জানতে পারলাম—মিঃ হোরে এখনি এখানে এসেছিলেন। মিস শেলী আমার উপর রেগে রয়েছে।

আমি তাকে জানালাম এখনি যাচ্ছি। এদিকে ইভ ডোলানের কাছে সংবাদ পেয়ে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। এক সূত্রতেই আমার সব আশা, স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল বোধহয়। আমি ভাবতে পারিনি বজ্জাত হারামজাদা বের্নি খোদ মালিকের কাছে হাজির হবে।

অফিস, গাড়ি, সুন্দরী স্টেনো, বের্নির হাজার ডলার, রায়ানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ডলার, সবার উপর চাকরী। সব হাতছাড়া হয়ে যাবে আমার।

অফিস থেকে বেরিয়ে তিনটে ডবল পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করে মিস শেলীর দেওয়া ক্যাডিলাক গাড়িটা বাতাসের থেকে দ্রুতবেগে চালিয়ে সাত মিনিটের মধ্যে তার বাড়িতে চলে এলাম।

অর্গিস এগিয়ে এসে বলল—মিস শেলী অপেক্ষা করছেন ঐ লনে।

আমি তার সামনা সামনি পড়ে গেলাম। ব্যাঙ্গের স্বরে মিস শেলী আমার দিকে ছুঁড়ে দিল—এই যে, চতুর চূড়ামণি মিঃ উইন্টার্স!

কি বলুন—শান্ত স্বরেই তাকে শুধোলাম।

এবার কিভাবে নিজেকে বাঁচাবেন? এরই মধ্যে হাজার ডলার ঘুষ পকেটস্থ করলেন!

আমি বললাম—কি বলছেন আপনি? আমি তো—

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিস শেলী বিদ্রূপের স্বরে বলল—আপনি মিঃ হোরেকে চেনেন না?

হ্যাঁ, চিনি। অতবড় উকিল। আপনার ফাউন্ডেশনের ভাড়া আদায়ের এর চেয়ে যোগ্য লোক অন্য কেউ নেই।

কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া বের্নিকে ভাড়া আদায়ের জন্য কে অধিকার দিল, আর হাজার ডলার ঘুষ নিতে আপনার লজ্জা করে নি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে মেজাজের সঙ্গে উত্তর দিলাম—মিস শেলী, এটাকে ঘুষ বলবেন না। এটা কমিশন আদায় করছি ভাবুন।

মিস শেলি এবার ভীষণ রেগে গেলো—চোপরাও বদমাশ, জোচ্চোর কোথাকার। তুমি আমার নাম করে পকেট ভরাচ্ছ!

আমি বলে উঠলাম—বস্তীর কুৎসিত মেয়েগুলোর মত চেঁচাবেন না।

ইভ ডোলান আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, মিস শেলী রেগে গেলে তাকে ঠাণ্ডা করার একমাত্র উপায় হল কোন অজুহাত না দেখিয়ে, ক্ষমা না চেয়ে, উল্টে ধমক দেওয়া। তাকে আমি চিনি, তার ভেতরে যত রাগ, বাইরে ততই ভীতু।

ওষুধে কাজ হল। মিস শেলীর কুৎসিত মুখখানা বেলুনের মত চুপসে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল—দাঁড়াও হারামজাদা, তোমাকে ব্যাঙ্ক থেকে তো তাড়াব, এই শহরে যাতে থাকতে না পার সে ব্যবস্থা আমি করছি।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—ওরে ভয় দেখানোতে মিঃ উইন্টার্স ঘাবড়ায় না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমি তেড়ে গেলাম। কি ভেবেছেন আপনি নিজেকে!

শয়তান এখনি তুমি মজা টের পাবে।—বলেই ফোন করতে উদ্যত হল।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে সজোরে এক আঘাত করল। ভয়ে আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলাম, বুঝতে পারলাম—তার নখে আমার চামড়া চিরে গেছে। জ্বালা করছে।

মাথায় আগুন উঠে গেল, তার দু কাঁধে থাবা মেরে চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিলাম। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তা লক্ষ্য করলাম। দেহটা কাঁপছে। আমি কোন কিছু গ্রাহ্য না করে বললাম—শুনুন, আমার কথাগুলো। আপনার ফার কোটের ব্যাপারটা মীমাংসা করে আপনাকে ত্রিশ হাজার ডলার পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। বার্জেসকে বাড়িটা বিক্রি করবার ব্যবস্থা আমিই করেছি আর বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারটাও একদিনে সমাধান করে দিয়েছি। পাঁচঘর ভাড়াটের হাত থেকে আপনাকে রেহাই দিয়েছি, যা ঐ লিডবেটার মাসের পর মাস করে দিতে পারে নি। আপনার জন্য এতগুলো ডলার রোজগারের ব্যবস্থা করে দিলাম আর রক্তচোষা শয়তানদের কাছ থেকে নিজের জন্য নূন্যতম ছিটেফোঁটা কমিশন আদায় করেছি, তাতেই আপনার গায়ে জ্বালা ধরছে? আমি তো আপনার টাকা চুরি করিনি! আপনি আমার চাকরিটা খোয়াতে চান? ঠিক আছে। তবে আপনি মনে রাখবেন, আমার সাহায্য ছাড়া ঐ তিরিশ হাজার ডলার পাবার স্বপ্নও ঘুচে যাবে, উল্টে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে আশ্রয় পাবেন সোজা জেলখানায়। আপনার সুনামে সারা দেশ করতালি দেবে। এবার ফোন করুন। করুন ফোন—কথাগুলো এক ঝটকায় বলে বাইরের লনে চলে এলাম।

যেন একটা যুদ্ধ করে এলাম। সিগারেট টানছি। এমন সময় অনুভব করলাম মিস শেলী দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার পাশে। বেশ একটা আদুরে অভিযোগের সুরে বলে উঠল—আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, কাঁদালেন আমাকে!

আর আপনি আমার কি হাল করেছেন দেখুন। গালের ক্ষতটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। রুমালটা ক্ষতস্থানে চেপে ধরে বললাম—আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনার ঘাড় মটকাই নি।

সে ধপ করে আমার পাশে বসল, আপনি শুধু নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। আমার জন্য না হয় একটু করলেন। তার কদাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম মনে ব্যথা পেয়েছে।

মিস শেলী শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। অর্গিসকে ধমকের সুরে বলে দিলাম, সবচেয়ে ভাল

জাতের শ্যাম্পেনটা চাই, না হলে বোতলটা তোমার মাথায় ভাঙব।

সে যেন একেবারে আমাকে ভস্ম করে দেবে—এরকম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

যাক্, যুদ্ধে আমি জিতে গেছি। সাফল্য আমার হাতের মুঠোয়। আমি রিসিভারটা তুলে ব্ল্যাকস্টোনকে ফোন করলাম। সে জানাল—এইমাত্র সে শেয়ার বিক্রী করেছে। মোটামুটি পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার লাভ হয়েছে। আমার কমিশন হিসাবে পাব নশো ডলার।

সেখান থেকেই একবার মিস শেলীর দিকে তাকালাম। শুকনো ডিগডিগে চেহারা নিয়ে চেয়ারের ওপর বেঁকে বসে আছে। বুক বলতে কোন পদার্থ নেই। সৌন্দর্যের স্পর্শমাত্র নেই।

মিস শেলীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রায়ানকে বললাম—মিস শেলীর চেকটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

রায়ান ইতস্ততঃ করছে বুঝতে পেরে আমি বললাম—তুমি আমার হয়ে কাজ করছ, মিস শেলীর হয়ে নয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবতে ভাবতে এলাম—আমাকে চড় মারার খেসারৎ দিতে হবে তোমাকে পনের হাজার ডলার, আর তুমি পাবে কুড়ি হাজার ডলার। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।

আমাকে দেখে মিস শেলী জামার চেনটা টেনে দিয়ে মৃদু হেসে লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলল—আপনি বুঝি উঁকি মেরে দেখছিলেন! ছিঃ, কুমারী মেয়েদের খোলা বুক ঐরকম ভাবে দেখতে নেই। কথাটা বলে মাথা নীচু করল।

আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না। বলে কি? মিঃ শেড্ উইন্টার্স তাকাবে এই সুঁটকীর দিকে, যার একটা ডাক শুনে দশটা সুন্দরী এখানে হাজির হবে! যাক্ আমি ঠোঁটে লজ্জিত হাসি এনে বললাম—লজ্জা দেবেন না, এইমাত্র আপনার বিশ হাজার ডলার আয়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। সে জন্য অবশ্য আপনার আড়াই লক্ষ ডলার খাটাতে হয়েছে।

মিস শেলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল,—আমার অনুমতি না নিয়ে আমার টাকা ব্যবহার করেছেন?

জবাব দিলাম—টাকা নয়, আপনার সুনামের সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র।

মিস শেলীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—যে কোন জিনিসের উপর আড়াই লক্ষ ডলার দাম হলে স্টকের দাম বাড়তে বাধ্য। এক্ষেত্রে চার পয়েন্ট বেড়েছে।

আমার চোখে চোখ রেখে মিস শেলী বলল—মিঃ উইন্টার্স, আপনি কাজের লোক বটে তবে ভীষণ ধূর্ত ও চালাক।

আমি বললাম—ডাকাত, জোচ্চোর বলুন। মিস শেলী যেন লজ্জা পেয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে বলল—তখন আমি রেগে গিয়েছিলাম আর আপনারও ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেননা আপনি আমাকে আঘাত করেছেন।

ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাইছি কিন্তু আমি যে এত কাজ করলাম এবং সব কথা আপনাকে খোলাখুলি ভাবে বললাম, এতে কি আপনার খুশী হওয়া উচিত নয়?

এমন সময় অর্গিস বরফের উপর বসানো মদের বোতল ট্রেতে করে নিয়ে এল। এক গ্লাস ভর্তি করে আমার হাতে ও আরেকটা মিস শেলীর হাতে তুলে দিল। আমি এক চুমুক খেয়ে বললাম—অনেকটা ভাল। এবার আমি মিস শেলীর কাছে জানতে চাইলাম মিঃ হোরের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল।

—তখন আমার মেজাজটা ভাল ছিল না, পরে দেখা করতে বলেছি।

—ভালই করেছেন, আপনার ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়তি পনের পার্সেন্ট ভাড়া আদায় করবার ক্ষেত্রে সে একজন যোগ্য ব্যক্তি। আর তার রাশ টেনে রাখবার জন্য আমার প্রয়োজন।

মিস শেলী আমার কথা শুনে মুগ্ধ হল। বলল—আপনি যে আমার পাশে পাশে আছেন, এটা ভেবেই আমি আনন্দিত। এতক্ষণে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম—আমি যে আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী তার প্রমাণ কি আপনি পান নি?

মিস শেলী খুশির উচ্ছ্বাসে ঐ দিন রাত্রে তার সঙ্গে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানাল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম—আজ রাতে যে পার্কসাইড স্টেডিয়ামে লড়াই দেখতে যাব। আপনার কথা না রাখতে পারার জন্য দুঃখিত।

মিস শেলীর লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে জানিয়ে আমার সঙ্গে যাবার আবদার করল।

আমি এরকমই কিছু চাইছিলাম। মিস শেলীর পাশে পাশে হাঁটা, একসঙ্গে ডিনার খাওয়াতে সমাজে আমার দর হু হু করে বেড়ে যাবে। আমি ভেবে নিলাম—আজকে যে সুন্দরী মেয়েটিকে আসতে বলেছি তাকে ফুটিয়ে দেব।

মিস শেলীকে ঠিক সাতটার সময় নিতে আসব বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

।। পাঁচ ।।

স্টেডিয়ামের গেটে যুদ্ধ জাহাজের মতই রোলস রয়স গাড়ির ভিড়। গাড়ি থেকে নেমে মিস শেলীর সঙ্গে স্টেডিয়ামে পদার্পণ করতেই আমার মনে হল আজকেই সবচেয়ে আনন্দের দিন।

মিস শেলীর চেহারাটা কদাকার হলেও রুচিপূর্ণ সাদা পোষাক ও হীরার গহনাতে সর্বাঙ্গ মোড়া ছিল। আমরা যখন ডিনার খাচ্ছি, তখন সাংবাদিক কয়েকজন ঘন ঘন ছবি তুলছিল। নড়ে চড়ে বসলাম। মনটা খুশীতে মেতে উঠল।

এমন সময় বেশ কাঠখোট্টা গোছের একজন লোক মিস শেলীকে অভিবাদন জানাল। মিস শেলী তার পরিচয় দিলেন আর তাতে বুঝতে পারলাম—ইনি স্যাম লেগো, স্থানীয় পুলিশে রয়েছেন।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ওর সঙ্গে আমার পটবে না। মিঃ লেগো জানালেন তিনি প্যাসিফিক ব্যাঙ্কে পূর্বে আমাকে দেখেছেন।

আমি কেরানীর পরিচয়টা ভুলবার জন্য বললাম—কত লোকই তো ব্যাঙ্কে আসে, ঠিক মনে থাকে না।

এরপর মিস শেলীকে নিয়ে এসে রিং এর নির্দিষ্ট ধারে বসলাম।

মিস শেলীকে প্রতিযোগী দুই বক্সার সম্পর্কে পরিচয় দিলাম। মিডিলওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার জ্যাক স্লেড আর অখ্যাতনামা ডাকি জোন্স। মিস শেলী সেই অখ্যাতনামা জোন্সের উপর একশ ডলার বাজি ধরল। তাকে বারণ করা সত্ত্বেও সে শুনল না। শেষে জনসনের কাছে গিয়ে জোন্সের উপর মিস শেলীর একশ ডলার আর স্লেডের ওপর আমি পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরলাম।

লড়াই শুরু হবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জোন্স বিখ্যাত স্লেডকে ঘুঁষি মেরে চোয়াল ভেঙ্গে দিল। বোঝা গেল স্লেডের এই ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। মিস শেলী উত্তেজনায় যেন পাগল।

প্রচণ্ড ভিড়। মিঃ লেগো আমাদের ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে নিয়ে এলেন। সে কি দারুণ কষ্ট! একটা আধো অন্ধকার জায়গাতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্টেডিয়ামের গরম হাওয়ার স্পর্শ এখনও অনুভব করছি।

আমি মিস শেলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালই। গরম আর উত্তেজনায়—এরকম অনুভূতি আমার আর কখনও হয়নি।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে যে দৃষ্টি দেখলাম, তাতে আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার হাড়ের কাঠামোর উপর সরু চামড়ার শরীরে এমন উত্তেজনা থাকতে পারে যা চরম কামোত্তেজনার চেহারা। তার চোখে মুখে এমন দুর্জয় আসক্তি ফুটে উঠেছে, মনে হচ্ছে সে এখনি সর্বসমক্ষে পথের মাঝেই আমাকে আলিঙ্গন করবে। আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম, এক নিদারুণ অনিচ্ছায়।

আমার মনের ভাব মিস শেলী বুঝতে পারল। চট করে বলল—যান, বাজীর টাকাটা এখনি নিয়ে আসুন।

আমি ফিরে এসে দেখলাম—গাড়িটা নেই। মিঃ লেগোর কাছে জানতে পারলাম, মিস শেলী চলে গেছেন।

বোধহয় গরম আর লড়াইয়ের উত্তেজনা—আমার কথার মাঝে মিঃ লেগো বলল—এটা লড়াই না পতন?

আমার চাকুরী জীবনে এরকম অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আসলে মানুষ যখন চরম

আত্মতুষ্টিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তখন আচমকা ঘুঁষি খেয়ে তার চোয়াল ভেঙ্গে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আরও কত কী হয়!

আমি তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বললাম—ঠিক আছে আমি চলি। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সোজা ফ্ল্যাটে চলে এলাম। দেখলাম আমার পুরোনো প্রেমিকা গ্লোরী একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। তার বুকদুটো কালো ব্রা ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে আর এক চিলতে লাল রংএর জাঙ্গিয়া কোন রকমে লজ্জা স্থানটুকু ঢেকে রেখেছে। তার উরু অবধি নেটের মোজা আর ডান হাতে হুইস্কির গ্লাস।

গ্লোরি আমাকে দেখেই প্রশ্ন করল—এই যে খোকা! ভেস্তালের সঙ্গে খেলাটা কেমন জমল?

বলছি। অপেক্ষা কর—বলে রিসিভার তুলে নিয়ে মিস শেলীর উদ্দেশ্যে ফোন করলাম। মিস ডোলানের কণ্ঠস্বর—শেলী হাউস থেকে বলছি, কাকে চাই?

আমি বললাম—আমি মিঃ উইন্টার্স! আমি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, উনি তো আমাকে না জানিয়ে চলে এসেছেন।

ঠিক আছে, আপনি একটু ধরুন, বলল ইভ ডোলান—কিছুক্ষণ পরে তার কাছ থেকে জানলাম মিস শেলী শুয়ে পড়েছে। আজ আর কথা হবে না।

আমি বলতে চাইছিলাম কিছু—শুনুন মিস ডোলান—যাঃ লাইন কেটে গেল। মরুক গে, যাকগে!

তুমি দেখছি আজকাল বেশ ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় করছ। ব্যাপারটা কি বলতো? বোধহয় মিস শেলীকে রাগিয়ে দিয়েছ?—তার কথায় কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

আমি রেগে গিয়ে বললাম—গ্লোরি, তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না।

গ্লোরি বেশ বিরক্ত হয়েই বলল—ভেবেছিলাম, তোমার কিছু অন্ততঃ বুদ্ধি আছে কিন্তু তুমি—তুমি কিনা সাতকোটি ডলারের মালকিনকে চটিয়ে দিলে!

আমি বাথরুমে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালাম। বললাম—তবে না তো কি ঐ রকম একটা কুৎসিত বাঁদরের সঙ্গে প্রেম করব? বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করব? রাস্তার মাঝখানে!

গ্লোরি আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল,—বুঝছ না কেন, তুমি চুম্বন করবে সাত কোটি ডলারের মুখে, ঐ কুৎসিত বাঁদরটার মুখে নয়। সে আমাকে পরামর্শ দিল মিস শেলীকে বিয়ে করতে।

আমি বিস্মিত হলাম—কি বলছ? ঐ বাঁদরীর সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে?

গ্লোরি আমাকে বুঝিয়ে বলল—আগে তোমার কাজ সাত কোটি ডলার হাতান। আর তুমি বিয়ে করবে তার মানে তো এই নয় যে তুমি আর কোথাও মজা করতে পারবে না।

একটু থেমে বলল—তুমি আমাকে একটা ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট কিনে দেবে। সেখানে তো সবসময় তোমার জন্য আমি রেডি হয়ে থাকব। প্রিয় শেড্, তুমি এ সুযোগ হাতছাড়া করো না। মিস শেলী যদি তোমার কাছে প্রেম, ভালবাসা না পায়, তাহলে সে বিগড়ে যাবে। হতাশায় দূর করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। টাকা তো পাবেই না, বড় দুর্নাম হবে তোমার। শেড্ শোন, সিরিয়াসলি ভাবো।—বলতে বলতে গ্লোরি আমাকে পিছন থেকে নিবিড় আলিঙ্গন করল। তার দুই সুপুষ্ট স্তন আমার পিঠের সঙ্গে চেপে রইল।

গ্লোরি আমাকে পরামর্শ দিল আগামীকাল প্রাতে মিস শেলীর জন্য একগুচ্ছ সাদা ভায়লেট ফুল পাঠিয়ে দিতে।

আমি তার প্রশংসা না করে পারলাম না। অন্ধকারে সব মেয়েই সমান। কিন্তু সাত কোটি ডলার সবসময় সাত কোটি।

।। ছয় ।।

সাত কোটি ডলারের চিন্তা মাথায় রেখে গ্লোরির পরামর্শ মত এগিয়ে গেলাম আর এক মাসের মধ্যে ভেস্তাল শেলীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেললাম। অবশ্য পরিণয়ে আমার পরিচয়ের পরিণতি টেনে আনতে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। তবে একটা সুবিধা ছিল, আমিই একজন সুশ্রী যুবক

ওর জীবনে প্রথমে এলাম, তাছাড়া ও কারুর কাছ থেকে ভালবাসা পায় নি।

বিয়ের আগেই ভেস্তাল আমার নামে আড়াই লক্ষ ডলার দিল, যা বাজারে পুরোদমে খাটছে। যা লাভ হবে সবই আমার।

ওর প্রস্তাব—কয়েকটা অফিস খুলতে হবে। ওর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য বেশ কয়েকজন লোক নিয়োগ করতে হবে। আর বলাই বাহুল্য, এই কাজে আমার বেশ কিছু লাভ হয়েছে। সাত কোটি ডলারের উপর আমার পুরো অধিকার না থাকলেও ঐ একই অঙ্কের স্টক আর বন্ডের কাগজগুলোকে ধার পাবার জামিন হিসাবে সহজে আমি ব্যবহার করতে পারব। আর ব্ল্যাকস্টেনের সাহায্যে বেশ মোটা অঙ্কের ডলার আমি ঘরে তুলতে পারব। বেশ চমৎকার খেলা শুরু হল।

যাক্ আমাদের বিয়েতে ভেস্তাল জাঁকিয়ে অনুষ্ঠান করল। তার ইচ্ছা সারা পৃথিবীর লোককে ও দেখাবে, সে একজন সুপুরুষ, সুন্দর, সুশ্রী যুবককে স্বামী হিসাবে বরণ করছে। গণ্ডাখানেক ব্যান্ডপার্টি, ব্যালের অনুষ্ঠান, বেশ জমকালো পোষাক পরে বল নাচ আর দুমদাম আতসবাজী। হাজার খানেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছে বিবাহ সভাতে।

আমি অবশ্য চেয়েছিলাম চুপি চুপি বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু ভেস্তালের আবদারের কাছে আমার ইচ্ছা ধোপে টিকল না।

বিয়ের পর আমাদের হনিমুন হবে ভেনিসে। ভেস্তালের একটা সুসজ্জিত বিশাল মোটর বোট থাকবে ইতালিতে। বোটে করে আমরা যাব ভেনিসে আর প্রথমে আমরা বিমানে করে যাব ইতালীর নেপলসে। দেড় মাস ধরে হবে আমাদের হনিমুন।

এর মধ্যে ক্রাউন বুলেভার্ড এলাকায় কয়েকটা অফিস ঘর নিয়ে লিডবেটার আর মিস গুডচাইল্ডকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজের স্বার্থ গোছাতে তৎপর হলাম।

দেশের সবচেয়ে ধনী মহিলার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে আমার। কেরানী থেকে একেবারে টাকার গদীতে, যা স্বপ্নেও অকল্পনীয়। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি সুখের মুহূর্ত বেশিদিন থাকে না।

।। সাত ।।

বিয়ের রাতে সবাই বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে। ভাবছে, আমি বেশ পাকা খেলোয়াড়। স্বামী স্ত্রীর মিলন বাসর অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হতে। তখন মাঝরাত। সোজা বিমানবন্দরে এসে আমাদের বিশেষ সংরক্ষিত বিমানে উঠলাম। প্রথমে প্যারিসে এলাম, সেখানে রিৎজ হোটেল, দামী স্যুইট, রাতটা যেমন করেই হোক ওর সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সারাটা বিকাল পরিকল্পনা মাফিক ওকে নিয়ে ঘুরলাম। ভোর চারটের সময় হোটেলে পৌঁছোবার পর দেহের মধ্যে শ্রান্তভাব ফুটিয়ে তুলে আমি বিশ্রাম করবার অজুহাত দেখালাম।

ভেস্তাল অবাক হলেও মুখে কিছু বলল না। তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার পর প্যারী থেকে রোম। রোম থেকে মোটরে করে নেপলসে সেখানে তিনদিন থাকা হবে।

ভেস্তাল দর্শনীয় সব জিনিস দেখে চলেছে। পম্পেই, ক্যাপ্রি, ভিসুভিয়াস। সন্ধ্যাবেলা দুজনে সাঁতার কাটছি, এক সময় ও বলল—শেড্ ডার্লিং, আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরব। বিয়ে হয়েছে আজ তিনদিন হল—।

ও কথা সম্পূর্ণ না করলেও আমি বুঝতে পারলাম ওর ইঙ্গিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোনরকমে চেপে গিয়ে বললাম—হ্যাঁ ডার্লিং, আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।

মনে মনে ভাবলাম—যা কপালে আছে তা তো ঘটবেই। এই যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতেই হবে। সাত কোটি ডলারের কথা চিন্তা করে নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম।

অন্ধকারে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। যেন অচেনা পরস্পর। মনটাকে কোনমতে শক্ত করে নাক টিপে ভেস্তালকে দু-চারটে চুম্বন করলাম। পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল। বুঝলাম, ভেস্তাল তৃপ্ত হয়নি। না হবারই কথা কিন্তু আমার মন চাইছে না, সেখানে শরীর সাড়া দেবে কিভাবে?

তারপর থেকে দুজনেই চুপচাপ, বিষণ্ণ। আমাদের সঙ্গে ইভ ডোলানও এসেছিল।

ডোলানকে দেখে তার প্রতি দিনদিন আকর্ষণ আমার ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

আমরা ভেনিসের উদ্দেশ্যে জাহাজে চেপেছি। ডোলানকে কায়দা করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

রাতে ডিনার সেরে ডেকে এসে বসলাম—ভেস্তাল নাচের রেকর্ড চালিয়ে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল। আমি রাজি না হওয়াতে ও চুপসে গেল।

এদিকে উপসাগর ঘিরে আলোকমালা সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ তারার ঝিকিমিকি লালচে নীল আকাশের ক্যানভাসে। এত চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে ইভ ডোলানের কথা।

ব্র্যান্ডি খেতে খেতে আমি উঠে পড়লাম। একটু ঘুরে আসছি, তুমি যাও। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছ, শুয়ে পড়গে যাও।

ভেস্তাল প্রতিবাদ করে বলে উঠল—আমি মোটেও ক্লান্ত হইনি।

আমি শান্ত গলায় বললাম—একটু ঘুরে আসছি, এখুনিই ফিরব। কিন্তু তুমি যদি ঘুমিয়ে পড় তাই শুভরাত্রি আগেই জানিয়ে রাখলাম।

ওর কাঁধ চাপড়ে নীচের ডেকে নেমে এলাম। চাঁদের আবছা আলোয় ইভকে দেখতে পেলাম। সে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের রেলিং বরাবর হেঁটে যাচ্ছে। আমিও তাকে অনুসরণ করবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা আলোতে এসে দাঁড়াল। লোকটি জাহাজের সেকেন্ড অফিসার রোলিনসন। দুজনে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হল। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। আমার ভেতরটা হিংসায় জ্বলে গেল। ডোলানের একাকীত্ব ঘোচাতে এসে নিজেই একাকী হলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিজের কেবিনে ফিরে এলাম। ভেস্তাল আর আমার ঘরের মাঝে একটা দরজা ছিল, সেটা ভেজান। দরজায় অতি সাবধানে কান পেতে শুনতে পেলাম ভেস্তালের ফোঁপানি কান্নার শব্দ। তার ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালেও আমার মন রাজি হল না। অগত্যা নিজের বিছানায় একা শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল ছটায় জাগলাম। সূর্যের মৃদু মিষ্টি রোদ একটা সুন্দর আমেজ এনে দেয়। দাড়ি কামিয়ে সাঁতারের পোষাক পরে রেলিং-এর ধারে এলাম। মাত্র ত্রিশ গজ দূরে একটা মেয়ে সাঁতার কাটছে। ভাল করে লক্ষ্য করবার পর দেখলাম মেয়েটি ইভ ডোলান। নিজেকে সামলাতে না পেরে ওখান থেকে ঝাঁপ মারলাম নীল সমুদ্রের উচ্ছল জলরাশির মধ্যে।

তার কাছে পৌঁছে বললাম—সুপ্রভাত, মিস ডোলান।

ডোলানও তার প্রত্যুত্তর দিল।

আমি ডোলানের উদ্দেশ্যে বললাম—আসুন, একসঙ্গে দুজনে সাঁতার কাটি।

মিস ডোলান বলল—ক্ষমা করবেন, এক গাদা কাজ রয়েছে। ব্রেকফাস্ট করেই বসে পড়তে হবে। বলেই সে জাহাজের দিকে ফিরল।

তবে চলুন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করি। নাছোড়বান্দা ভাবে বললাম।

আমাকে মাপ করবেন, আমি মিসেস উইন্টার্স এর কর্মচারী মাত্র। উনি এসব পছন্দ করবেন না। কথা শেষ করেই সে তাড়াতাড়ি সাঁতরে গিয়ে জাহাজের ঝোলান সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

আমি চিৎ হয়ে ভেসে দেখতে লাগলাম। সাঁতারের পাতলা পোষাক ভেদ করে ইভের যৌবন স্পষ্ট ভাবে আমার চোখে ধরা দিল। আমার চোখের সামনে তার নগ্ন শরীর বারবার ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

তারপর তিনদিন কেটে গেছে। ভেস্তালকে নিয়ে দিনগুলো কাটাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে ভেস্তাল আঠার মত লেগে রয়েছে। আমাকে সুখে আর খুশীতে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেচারী! এদিকে আমি ডোলানকেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ডোলান আমার ইঙ্গিত বুঝেও কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছে।

কেবলমাত্র লিটল ইডেনে ফেরবার আশায় বুক বেঁধে রয়েছি। একমাত্র তখনি সব ম্যানেজ

করতে পারব।

শেড্! ভেস্তাল ডাকল, বাধ্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম—আমাকে বিয়ে করে তুমি বোধহয় সুখী হও নি, এখন অনুতাপ করছ, তাই না?

ভেস্তাল আমার এই মনোভাব ধরতে পেরে গেছে বুঝতে পেরে নিজের গালে নিজের চড় মারতে ইচ্ছা করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখে মৃদু হাসি এনে বললাম—তুমি এসব কথা ভাবছ কেন? আমি তো তোমাকে পেয়ে ভীষণ খুশী।

তোমার ব্যবহারই আমাকে ভাবাচ্ছে। ভেস্তাল বলল—তুমি আমাকে ঘৃণা কর, তাই না?

আমি নিজেকে অভিশাপ দিলাম। মুখে হাসি এনে ওর কাঁধে হাত রাখতে যেতে ও বলল—না, না, আমাকে ছুঁয়ো না, আমি তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করি নি। আমাদের হনিমুন নষ্ট করে দিয়েছ। এবার আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। অনেক হয়েছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলবে নাকি? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—ভেস্তাল! আমি হনিমুন নষ্ট করিনি, আসলে এই একঘেয়ে বেড়ানোতেই আমার বিরক্তি লাগে। আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি, তাই আমাদের একান্ত নিভৃতি প্রয়োজন।

ভেস্তাল সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল—তুমি আমাকে ভালবাস না বলেই আমার সঙ্গে শুতে পর্যন্ত চাও না।

আমি নির্দোষের সুরে বললাম—তুমি বরং চাও না আমার সঙ্গে শুতে। তুমি চাইলে আমি নিশ্চয়ই শোব।

এতেই কাজ হল। ভেস্তাল গলে গেল—নিশ্চয়ই চাই শেড্ আদুরে গলায় বলল—ওঃ শেড্, তুমি আমাকে ভালবাস। বল শেড্, তুমি একবার বল।

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম—কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটু কষ্ট স্বীকার করে বাঁদরীর কুৎসিত দেহটা কোলে তুলে নিলাম। কাঁধে খামচি দিয়ে ধরেছে সে। ধপাস্ করে তাকে বিছানায় ফেলতে গিয়ে আমিও তার শুকনো দেহটার উপর পড়ে গেলাম! তারপর আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

।। আট ।।

এরপর বেশ কিছুদিন চলল ভেস্তালের সঙ্গে আমার প্রেমের অভিনয় আর অপরদিকে ইভ ডোলানের সঙ্গে জাহাজের সেকেন্ড অফিসারের প্রেমের খেলা।

আমরা ভেনিসে পৌঁছলাম। ভেনিসে এসে একদিন লাউঞ্জ থেকে বেরোতেই ইভ ডোলানকে ধরলাম।

এই যে মিস ডোলান, কেমন আছেন?

চোখের কালো চশমার ফাঁক দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল —মিসেস উইন্টার্স মোরানোতে কাঁচের কারখানা দেখবেন। সেই কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

আপনিও যাবেন তো?—অনুরোধের সুরে শুধোলাম।

না আমি যাব না, অন্য কাজ আছে। বলেই ডোলান যাবার জন্য পা বাড়াতে আমি তার হাতখানা ধরে ফেললাম।

এক ঝটকায় সে আমার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। আমার দিকে একধরনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার এই ধরনের দৃষ্টির অর্থ আমি, বুঝি। এটা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। আমিও পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার বেশী কাছে আসবার চেষ্টা করবেন না, মিঃ উইন্টার্স। কথাগুলো বলে সে গটগট করে লাউঞ্জে ফিরে গেল।

আমি তখন হতাশ হলেও অবাক হলাম না, কেবল সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকলাম খেলিয়ে দেখবার জন্য। কিন্তু শরীরের কামনার আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

আমি কেবিনে ঢোকামাত্রই ভেস্তাল আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল—শেড্ ডার্লিং! বিকালে আমাদের সঙ্গে গন্ডোলায় ইভকে নিয়ে যাব? অবশ্য যদি তুমি বল।

ভেস্তালের কথা শুনে আনন্দ হলেও নিস্পৃহ গলায় বললাম—তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছা।

আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। বলে ওর হাত মৃদু চেপে ধরলাম। ভেস্তাল খুশী হল।

ডিনারের পর আমরা খেয়া ঘাটে চলে এলাম। সেখানে ইভ ডোলান অপেক্ষা করছিল। একটা কেবিনওলা গন্ডোলা নিয়ে আমরা লিডোর দিকে এগোলাম। ভেস্তাল এক একটা দৃশ্য দেখছে আর বকবক করে যাচ্ছে সমানে। আর আ ি সেদিনকার ইভের নগ্ন শরীরের উষ্ণ স্পর্শের স্মৃতিটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম।

যাক্ ভেপোরত্তি স্টেশনে গন্ডোলা ছেড়ে দিয়ে মোটর করে একটা হোটেলে চলে এলাম। ভেস্তালের আবদারে তার সঙ্গে নাচতে হল। ইভ একটা টেবিলে বসে আমাদেরকে দেখতে থাকে।

আধঘণ্টা পরে ভেস্তাল আর আমি টেবিলে এসে বসলাম। ভেস্তাল ইভকে আমার সঙ্গে নাচবার জন্য অনুরোধ করল অবশ্য অনেকটা দয়া করে।

ভেস্তালের অনুরোধে ইভ চমকে উঠে বলল—অনেক ধন্যবাদ, মিসেস উইন্টার্স। আমার নাচতে ভাল লাগছে না। বরং আপনাদের নাচ দেখতে ভাল লাগছে।

আমার কিন্তু এই সুরটা খুব ভাল লাগছে। এস ডার্লিং, আমরা তাহলে নাচি,—আবদারের সুরে বলল ভেস্তাল।

অগত্যা তার সঙ্গে ফ্লোরে গিয়ে নাচতে হল। মাঝরাত পর্যন্ত ভেস্তালের সঙ্গে নাচতে হল। আমরা ফিরে এলাম। ডোলানও নিজের ঘরে ফিরে এল।

ভেস্তাল আমার সামনে পোষাক ছাড়বার সময় ইভ সম্পর্কে নানান কথা বলতে লাগল। ভেস্তাল ইভের প্রশংসা করল। কথাপ্রসঙ্গে তার কাছ থেকে জানতে পারলাম ভেস্তাল ইভ বা অর্গিসকে আটকে রাখবার জন্য তাদের জন্য কিছু সম্পত্তি উইল করে রেখেছে। আমি তার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এরই মধ্যে উইল। সাত কোটি ডলার থেকে আবার চাকর চাকরানীদের ভাগ।

আমি ভেস্তালকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—কয়েকশো ডলার রয়েছে ওদের জন্য।

রাত্তিরে দুজনে আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমার মাথায় চিন্তা কি করে সাত কোটি ডলার পুরোপুরি হাতিয়ে নেওয়া যায়। আমার হঠাৎ খেয়াল হল—ভেস্তাল হঠাৎ যদি মারা যায়! আচ্ছা, ও যদি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে! এমনও তো হতে পারে ভেস্তাল পথে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে! তাহলে আমি সাত কোটি ডলার বিনা বাধায় পেয়ে যাব। কিন্তু মিঃ অ্যাটর্নী সাহেব, আপনি ভাববেন না যে আমি ওকে খুন করবার মতলব আঁটছি।

এরপর মোরানোতে কাঁচের কারখানা দেখতে গিয়ে প্রচণ্ড গরমে ভেস্তাল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমি স্নান সেরে ভেস্তালের কাছে গিয়ে একটু বাইরে গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসবার অনুমতি চাইলাম।

ভেস্তাল অনুমতি দিল, বলল তার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। কয়েকটা ভেজলিন খেয়েছে।

তাকে শুতে বলে আমি দরজা বন্ধ করে সোজা চলে এলাম ইভের ঘরে। তার দরজায় এসে নক করতে সে কটমট করে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে গালাগালি দিতে ইচ্ছা করছিল।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললাম—মিসেস উইন্টার্সের মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। দেখুন আপনি কি করতে পারেন।

ইভ বলল—আমি এখনই যাচ্ছি।

দেখুন। ও হয়ত একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। আপনি আজ ন'টা নাগাদ সানমার্কোর সামনে দেখা করবেন?

পারব বলে মনে হয় না—কথাটা বলে সে দ্রুতগতিতে ভেস্তালের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল পাছায় মারাত্মক একটা ঢেউ তুলে।

সানমার্কোর সামনে অপেক্ষা করছি ডোলানের জন্য। আমি জানতাম যে সে আসবেই কারণ দুজনের লক্ষ্য একই। এইসব কথা ভাবছি এমন সময় একটা মেয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পরনে সুন্দর সান্ধ্য পোষাক। পোষাকের সরু ফিতেটা যেন যৌবনকে ধরে রাখতে পারছে না। মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখলাম—কালো চশমা পরিহিত মেয়েটি ইভ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম—ওহ্ ইভ। তোমাকে একদম চিনতে পারিনি।

ইভ কথার উত্তর না দিয়ে বলল—এখানে নিরাপদ নয়, আমরা ঐ গন্ডোলাতে গিয়ে উঠব।

ইভ কথাগুলো বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল গন্ডোলার একটা কেবিনে। কেবিনের পাটাতনের উপর গদী মোড়া। ইভ তো সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি হাঁটু মুড়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। ওর পুরুষ্টু উরুর উপর হাত বোলাতে বোলাতে বললাম—তোমাকে যেদিন সাঁতারের পোষাকে দেখি সেদিন থেকেই—

আমার সব কথা শেষ করতে না দিয়ে ইভ আমাকে বুকের উপর টেনে নিল। মুহূর্তের মধ্যে শরীরের যত কামনা সব উজাড় করে ইভের তুলতুলে শরীরে ঢেলে দিলাম। তারপর দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরলাম।

কিছুক্ষণ ঐরকম ভাবে থাকবার পর ইভ বলল—সাড়ে নটা বেজে গেছে। এবার আমাকে যেতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম—এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কি দরকার আছে?

ইভ জবাব দিল—তোমার চেয়ে আমি ভেস্তালকে বেশী চিনি। একঘণ্টা পরে যখন ঘুম ভাঙবে, তখন আমাকে ডেকে পাঠাবে।

আমি অধৈর্য স্বরে বললাম—আমার অনেক দরকার আছে। কিছু কথা—

আমাকে থামিয়ে ইভ বলল—কথা বলার কিছু নেই, কেবলমাত্র চুরি করে একটু আধটু প্রেম বা দেহমিলন হতে পারে। তার বেশী নয়। নিশ্চয়ই ভেস্তালের কাছে ধরা পড়তে চাও না?—কথাগুলো বেশ খোঁচা মেরে বলল।

আর তখনি আমার মাথার মধ্যে সাত কোটি ডলারের চিন্তাটা পাক খেল। আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, না, মোটেই নয়।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে বলল—আমিও চাই না। তোমার হঠকারিতার জন্য আমার এই চাকরীটা খোয়াতে।

আমি ইভের চোখে চোখ রেখে বললাম—তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি। তোমাকে চাই আমার।

ইভ আমার দিকে একদৃষ্টে পলকখানেক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—আমিও তোমার জন্য পাগল হতে চলেছি। তবে আর একটা সুযোগ করে নেবার সময় দেবে তো? অযথা কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না।

আমিই তো তোমাকে সুযোগটা করে দিলাম।

মোটেও না। খোকনসোনা! বলে ইভ আলতো করে মুখ তুলে আমার ঠোঁটে চুম্বন করে মুচকি হেসে বলল—মাথা ধরাটা দিল কে? মাথা না ধরলে তুমি সুযোগ পেতে কি?

তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। প্রশ্ন করলাম—তোমার এ কথা বলার মানে?

ইভ মুচকি হেসে বলল— ভেস্তালকে যখন আমি একদম সহ্য করতে পারি না, তখনই একটা পিল্ খাইয়ে দিই খাবারের সঙ্গে।

আমি চমকে উঠে বলি—তার মানে?

ইভ বলল—এতে ভয় পাবার কিছু নেই। মারা যাবার ভয় নেই, আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে জেনেছি।

আমার ব্যাপারটা খুব ভাল লাগল না। বললাম—ওষুধপত্র নিয়ে এইভাবে খেলা করাটা বিপদজনক।

ইভের দিকে তাকিয়ে বললাম—তুমি ভেস্তালকে ঘৃণা কর! তাই না ইভ?

ইভ দৃঢ় গলায় জবাব দিল—তোমার চেয়েও বেশী।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্ন করি—তুমি তাহলে এখানে চাকরী করছ কেন?

ইভ পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়ে—তুমি ওকে বিয়ে করেছ কেন?

আমি বললাম—আমার ব্যাপারটা আলাদা।

মোটেই আলাদা নয়। তুমি টাকার জন্যে ওকে বিয়ে করেছ। আর আমি চাকরী করছি

বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারব বলে। তারপর ইভ আদুরে গলায় মিনতি জানিয়ে বসল—একটা চুমু দাও, আমাকে শেড্।

আমার মনে হল সত্যিই যেন আমি প্রথমবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। তার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটা লেপ্টে দিয়ে ওর মুখের উপর মুখ দিয়ে পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ এরকমভাবে থাকার পর ডোলান আমাকে ঠেলে উঠে বসল—শেড্, এবার আমি যাই। আমি ভেস্তালকে চিনি, সে যদি ঘুম ভেঙ্গে আমাকে না পায় তাহলে আমার চাকরীটা যাবে। ভেস্তাল খুবই সন্দেহ ও ঈর্ষা পরায়ণ। ঐ মহিলার কাছে কিছুই চাপা থাকে না।

ফ্লিকসাইডে ফিরে গেলে বোধহয় ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যাবে—বললাম আমি।

তা মোটেই হবে না। ইভ বলল—সেখানে দিনের বেলায় প্রতিটা দিন আমাকে তার কাছে থাকতে হবে এবং রাত হলে তোমাকে চাইবে। আমাদের গোপন যোগাযোগ কখনই সম্ভবপর হবে না।

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম—ওরই মধ্যে আমরা একটা সুযোগ করে নেব।

সেটা যেন পুরোপুরি নিরাপদ হয়, ঝুঁকি নিতে চাই না। কথা বলতে বলতে গন্ডোলাটা পাড়ে এসে ঠেকল।

ইভ আমার ঠোঁটে একটা চুম্বন দিয়ে বলল—আমি আগে যাচ্ছি, তুমি কয়েক মিনিট পরে এস।

তার কথা শুনে এক বুক আশায় রইলাম। ভেস্তাল নিশ্চয় খুব শিগগীর মারা যাবে। ইভই হয়তো ওকে ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলবে, আর তখনই আমি ইভকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পাব আর সাত কোটি ডলারের মালিক হয়ে যাব।

।। নয় ।।

কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেল কিন্তু ইভকে আর কাছে পাচ্ছি না। মধুর দিনটার কথা ভেবে আমি প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিলাম। শেষে একদিন থাকতে না পেরে স্নানের ঘর থেকেই ইভকে ফোন করলাম। জলের কলগুলো আগে ফুল ফোর্সে ছেড়ে দিয়ে অপারেটারের কাছে ইভের নম্বর চাইলাম। আমি তখন ভাবছি পাশের ঘরেই তো ভেস্তাল আছে, আর তার পাশেই ফোন আছে। সে যদি আমাদের কথা শুনতে পায়। যাক্ ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ডোলানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।—হ্যালো! কে বলছেন?

ইভ আজ রাতে তোমাকে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। আর পারা যাচ্ছে না—ক্লিক শব্দ করে ওপাশে ফোন রেখে দিল ইভ। আর ফোনে ভেস্তালের কণ্ঠস্বর শুনলাম—তুমিই ফোন করেছিলে শেড্।

আমার তখনি মনে হচ্ছিল ভেস্তালের গলাটা যেন চেপে ধরি। রাগ সামলে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ, আমি।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল—কেন?

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে স্নান সেরে ভেস্তালের ঘরে যেতে সেই এক প্রশ্ন, চোখে-মুখে সন্দেহের ছাপ সুস্পষ্ট।

আমি শুকনো হাসি হেসে বললাম—তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে, তাতেও ভেস্তাল ক্ষান্ত হয় না, প্রশ্ন করল—তাহলে ইভ রেখে দিল কেন?

ও রাখল কোথায়। তুমিই তো ফোনটা কেটে দিলে। একটু থেমে বললাম যে, লিডোতে সাঁতার কাটতে যাব বলে মিস ডোলানকে একটা মোটরের বন্দোবস্ত করবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

ভেস্তালের তাতেও অবিশ্বাস। সে বলল—মিস ডোলানকে যা বলার দরকার তা আমিই বলে দেব।

ঠিক আছে, বলে আমি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সে শুনেছে যখন কিছু একটা ব্যবস্থা করে থাকবে।

ঠিক তাই, ডিনার খাওয়ার পর ভেস্তাল অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানায় সে দুহাতে মাথা টিপে বসে রইল। আমাকে বাইরে ঘুরে আসতে বলল আর ইভকে এখনি পাঠিয়ে দেবার জন্য বলল।

আমি কিছুটা ভনিতা করে বললাম—সকালে রোদে বসতে বারণ করেছিলাম তো সে কথা তুমি শুনলে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম সোজা ইভের ঘরে। ইভের ঘরের দরজায় এসে টোকা মেরে ঢুকে পড়লাম, ইভ ঘরেতেই ছিল। ওর সুডৌল স্তন দুটো, নিটোল পাছা, আমার দুহাতে ছেনে, চটকে ওকে পাগল করে তুললাম। ইভ ওর ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরল—এভাবে সাক্ষাৎ হওয়া আমাদের পক্ষে—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম—ওর মাথা ধরেছে, তোমাকে এখনি ডাকছে।

ইভ মৃদু হেসে বলল—ও কিছু না, দুটো ভেজলিন বড়ি খাইয়ে দিলে ঘুমিয়ে পড়বে। আর তার পরেই আমি তোমার কাছে চলে যাব। সানমার্কোর সামনে অপেক্ষা করো, কেমন?

আমি বললাম—তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

আমিও, তবে সাবধানে সবকিছু—বলে ইভ দ্রুত পায়ে ভেস্তালের ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি দুটো ডবল হুইস্কি খেয়ে লাউঞ্জে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করবার পর সানমার্কোর খেয়াঘাটের সামনে এসে সেদিনকার সেই মাঝিটাকে গণ্ডোলা ঘাটে লাগাবার নির্দেশ দিলাম। সে আমাকে দেখেই স্যালুট করল। সেখানে অপেক্ষা করছি ইভের জন্য কিন্তু কোথায় ইভ! শেষে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। রাগে আমার সারা শরীর রি-রি করে কাঁপছিল।

ভেস্তালের ঘরে সোজা চলে এলাম। দেখলাম, ভেস্তাল শুয়ে আছে। ল্যাভেন্ডার জলে ভেজানো কাপড়ের টুকরো রয়েছে ওর কপালে। পাশে ইভ বসে আছে। ও কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। শেড্ লাইটে আমার ক্রুদ্ধ মেজাজটা, মুখ দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না।

ভেস্তাল আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। ইভও ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

শেড্ এলে বুঝি?—ভেস্তালের গলার সুর খুব নরম শোনাল।

হ্যাঁ, আমি। তুমি এখন কেমন বোধ করছ?

একটু ভাল। ওষুধে মাথার যন্ত্রণাটা একটু গেছে।

আমি ভেস্তালকে ঘুমোবার জন্য বললাম।

এবার মিউমিউ করে ভেস্তাল বলল—শেড্ ডার্লিং, আজ তুমি পাশের ঘরে শোবে? ইভ আজ আমার কাছে রাত্তিরটা থাকবে তাহলে। তুমি রাগ করবে না তো?

আমি আনন্দে উত্তেজনা বোধ করলাম। তাহলে ইভকে তো সারা রাত্তিরটা পাওয়া যাবে।

আমি বলে উঠলাম—না, না, রাগ করব কেন? তুমি বরং ঘুমোবার চেষ্টা কর। দশটা বেজে গেছে।

ভেস্তাল আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—জানতাম, তুমি অবুঝ নও।

এভাবে চারটে দিন কাটল ভেস্তালের সামনে নিজেকে সামলে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা। অসহ্য লাগছে যেন সবকিছু। সেদিন রাতে ডিনার খেতে যাব বলে স্নান সেরে পোষাক পরে তৈরী হয়ে নিলাম। ভেস্তাল এখনও তৈরী হয়নি। আমাকে দেখে বলল—ও বাবা, তোমার এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

আমি আদুরে গলায় বললাম তুমি তো একটা আলসে মেয়ে। তারপর তাড়াতাড়ি ভেস্তালকে নীচে আসতে বলে আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বারান্দা পেরিয়ে সোজা ইভের ঘরে ঢুকলাম। নীল রং-এর ছোট টাইট প্যান্ট দুই পুরুষ্টু উরুতে কামড়ে ধরেছে, বুক দুটো এক ফালি কাপড় দিয়ে বাঁধা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইভ মোজা পরছে।

আমাকে দেখে সে অবাক হল, ক্রুদ্ধও হল। গর্জন করে উঠল—শেড্, তুমি এখানে এসেছ কেন? ভেস্তাল জেনে যাবে।

কালকে ওকে ওষুধ খাওয়াবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। মিনতিব স্বরে বললাম।

কোন লাভ হবে না তাতে—ইভ বলল—অসুখ করলে আমাকে তার কাছে থাকতে হবে। কাজেই কি লাভ।

আমি ইভের তুলতুলে নরম শরীরটা জড়িয়ে ধরে ওর দেহের উত্তাপ আমার নিজের দেহের মধ্যে টেনে আনলাম।

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—ইভ উত্তেজিত গলায় দ্রুত বলে গেল। বলেছি না, তোমার জন্য আমি চাকরিটা খোয়াতে পারব না।

এমন সময় দরজায় কে নক্ করল।

দুজনের দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল। ইভ তড়িতে আমার হাত ধরেই একটানে আধখোলা জানলার ভারী পর্দার আড়ালে ঢুকিয়ে দিল আমাকে। তারপর দ্রুত স্বস্থানে ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভেস্তাল এসেছে। প্রশ্ন করল—কারোর সঙ্গে কথা বলছিলে মনে হল?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি গুণ গুণ করে গান গাইছিলাম।—ইভের গলার স্বর অতিশয় শান্ত।

ভেস্তাল তার কাছে সেন্ট চাইল, ছুতো দেখাল তার শিশিটা ভেঙ্গে গেছে!

ইভ জড়তাহীনভাবে বলল—নিশ্চয়ই! আপনি পুরোটাই নিয়ে যান।

ভেস্তাল চলে গেল। ওদিকে পর্দার আড়ালে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছি। শরীর গড়িয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চরম বোকামীর জন্য নিজেকে গালাগালি দিতে ইচ্ছে করছে। ব্রা আর প্যান্টি পরে রয়েছে ইভ। ভেস্তাল বোধহয় গন্ধ পায়। সন্দেহের কারণ হয়েছি আমি। ইভকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য একটা অজুহাত নিয়ে এসেছে।

দরজা বন্ধ করে ইভ এসে দ্রুত পর্দাটা এক টানে সরিয়ে দিয়ে গর্জন করে বলে উঠল—বেরোও। দূর হয়ে যাও আমার ঘর থেকে। আজই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ।

কিন্তু ততক্ষণে নড়বার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বুক ধড়ফড় করছে। তবুও বললাম—একটা রাস্তা খুঁজে আমি বার করব।

আর কোন রাস্তা নেই—ইভ চাপা স্বরে বলল। তারপর ইভ উঁকি মেরে একবার দেখে নিল বাইরে কেউ আছে কি না।

তারপর চোরের মত তার ঘর থেকে সন্ত্রস্তভাবে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে লাউঞ্জে ফিরে এলাম।

আজ নিজের বোকামীর জন্য সাত কোটি ডলার হাতছাড়া করতে বসেছিলাম। মাথায় চিন্তার জট পাকাতে থাকে। একদিকে টাকা অপরদিকে ডোলান।

অস্থিরতার মধ্যে দিনগুলো কাটছিল। শেষ পর্যন্ত ভেস্তালই বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ভেনিসে তিন সপ্তাহ কাটানো হল, তারপর বিমানে লসএঞ্জেলস্ আর সেখান থেকে মোটরে করে লিটল ইডেনে। এর মধ্যে মনে মনে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম ইভের সঙ্গে আমার দেখা কববার জন্য একটা আলাদা ঘর নিতে হবে। আমি নিজে সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব।

বাড়িতে ফিরে ভেস্তাল এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে বসল। আমি রায়ান ব্ল্যাকস্টোনকে ফোন করলাম। কাজকর্ম করবার সঙ্গে সঙ্গে লাভের অঙ্কটাও বেড়ে চলেছে।

কিন্তু ইভের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হয়ে উঠছে না।

ভেস্তাল আমার ঘরে এসে বলল—শেড্ ডার্লিং, আমাকে সানফ্রান্সিসকোতে যেতে হবে।

তাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম—পরশুদিন একটা পুরোনো স্কুলে একটা হলের উদ্বোধন করতে হবে। হলটির নাম 'শেলী লেকচার হল।' মিঃ শেলী এটা তৈরী করবার জন্য টাকা দিয়েছিল। প্লেনযোগে সেখানে যাবে, তিনদিন থাকতে হবে।

ভেস্তাল তার সঙ্গে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করল কিন্তু আমি কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলাম।

ভেস্তাল জানাল, তাহলে সে ইভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে একাকীত্ব ঘোচাবার জন্য।

তার কথা শুনে মনে হল একটা চড় মারি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইভের যাওয়া হল না। যাবার দিনে সে ভীষণ অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। আমি বেশ খুশী হলাম। ভেস্তালকে বললাম—তোমার খাস চাকরানীকেই নিয়ে যাও। কি করবে, বেচারী অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ভেস্তাল নিরুপায় হয়ে তার খাস চাকরানী মারিয়ানাকে নিয়ে সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্য রওনা হল।

আমি ভেস্তালকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলাম। ঠাট্টা করে বলল—দেখ আমার অনুপস্থিতির সুযোগে যেন কুকর্ম করে বসো না।

সরলভাবে বলে দিলাম—আজ ব্ল্যাকস্টেনের সঙ্গে ডিনার খাব, আগামীকাল স্টার্নউডের সঙ্গে। ব্যঙ্গের সুরে বললাম—এদের সঙ্গে কি কুকর্ম করব বল?

ভেস্তাল আমাকে চিমটি কেটে বলল—ইভ রয়েছে যে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করে বললাম—অতগুলো চাকর-বাকর বিশেষ করে অর্গিসের চোখ এড়িয়ে ইভের সঙ্গে কি করতে পারি?

ভেস্তাল আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। সারা শরীরের মধ্যে রি-রি করে উঠল। সব লোক ভাবছে টাকার লোভে এরকম একটা কুৎসিত বাঁদরকে আমার মত এক যুবক বিয়ে করেছে!

ভেস্তাল ন্যাকামির গলায় বলল—আমার যেতে ইচ্ছা করছে না শেড্ তোমাকে ফেলে।

আমি ভেস্তালকে একরকম জোর করেই প্লেনে উঠিয়ে দিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ হাত নাড়ল ভেস্তাল।

তারপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। অর্গিসের কাছ থেকে ইভের খবর নিয়ে জানতে পারলাম সে এখনও অসুস্থ। নিজের ঘরেই শুয়ে রয়েছে।

আমি পড়বার ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলে ইভের ফোন নম্বর ডায়াল করলাম। ফোনে ওর গলা শুনতে পেয়েই ওকে বারোটার সময় আমার ঘরে আসবার জন্যে বললাম।

বারোটার সময় ইভ আমার ঘরে এসে হাজির হল। দুঘণ্টা ধরে ইভের নরম তুলতুলে দেহটা উল্টে-পাল্টে ছেনেও তৃপ্তি পাচ্ছি না। তার দেহটা বুকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর ইভকে আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—আমরা কবে আবার মিলিত হতে পারব?

যতটুকু পাচ্ছ, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। ইভ বলল—জেনে রাখ, আমরা মোটেই নিরাপদ নয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে যে কোন মুহূর্তে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।

একটু থেমে সে আবার বলল—এই মুহূর্তে মিসেস উইন্টাস শেলী এসে দরজায় টোকা দিলেও আমি আশ্চর্য হব না। তিনি হয়তো আদৌ সানফ্রান্সিসকো যাননি।

আমি অনুরোধের সুরে বললাম—তাই বলে তোমার জন্য এখন ছ সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকব সুযোগের অপেক্ষায়!

আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম—সপ্তাহে যে দিন সে ছুটি পাবে, সেদিন আমাদের যাতে গোপন সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, তার জন্য একটা আলাদা ঘর নেব। কেউ জানতেও পারবে না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইভ সঙ্গে সঙ্গে বলল—না। ঐ ছুটির দিন আমি মায়ের কাছে যাই। ঐদিন না গেলে মিসেস উইন্টার্স মা ফোন করে জানতে চাইবে আমার কথা। শেষে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

তখন আমি তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিলাম। বললাম—আমার তিরিশ হাজার ডলার ব্যাঙ্কে রয়েছে তাই দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে নেব, আমাদের দুজনের চলে যাবে।

তাকে আরও বললাম—ভেস্তাল যাতে আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইভ দৃঢ়স্বরে জানাল—আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। তিরিশ হাজার ডলার নিয়ে আমাদের দুজনের সুখে আর কতদিন কাটবে? সে এই চাকরী ছাড়তে পারবে না।

আমি তাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এই চাকরীতে তুমি কি মজা পাও?

সে জানাল—এত বড় বাড়িতে সুখে থাকতে পাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে। নিজস্ব গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারছে। এটা তার কাছে অনেক আরামদায়ক।

আমি তাকে সাজগোজ ও পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বললে সে বলল—মেয়েদের মনস্তত্ব অনুযায়ী কোন মেয়ে তাদের থেকে সুন্দরীকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। সেজন্য মিসেস উইন্টার্স-এর কুৎসিত চেহারার সামনে নিজেকে সব সময় সজ্জিত করে থাকলে যে কোন মুহূর্তে চাকরী চলে যেতে পারে। তাকে অনেকে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিল, কিন্তু চাকরী চলে যাবার ভয়ে সে তাতে গুরুত্ব দেয় না। সে আরও জানায়—তার আগে কোন সেক্রেটারী এই কারণে টিকে থাকতে পারে নি। তার কারণই এই রূপ। তাই সে তার রূপ জাহির করে এই বিলাসিতাটুকু ছাড়তে পারবে না।

মিথ্যে কথা। আমি প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম—ভেস্তাল উইলে তোমার নামে টাকা রেখেছে তাই তুমি এই চাকরীটা ছাড়তে চাইছ না।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমি ঠাট্টার সঙ্গে জবাব দিলাম—কিন্তু ইভ, তুমি শেষে ঠকে যাবে। ভেস্তাল তোমার জন্য মাত্র কয়েক শো ডলার রেখেছে।

মোটেও না। ইভ প্রতিবাদ করে বলে উঠল—কদিন আগে ভেস্তাল নতুন উইল করেছে অ্যাটর্নী ডেকে। ইভ আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল—আমার নামে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলার। কাজেই বুঝতে পারছ, তোমাকে ছাড়ব তবু এই চাকরী আমি ছাড়ব না—।

আমি বোকার মত চুপসে গেলাম। ইভ বলতে থাকে—আর আমি এও জানি, তোমার নামে রয়েছে ছ কোটি ডলার আর সম্পত্তির সবটুকু। তারপরেই ব্যঙ্গের সুরে বলল—তুমি কি ভেস্তালকে এখনও ত্যাগ করতে চাইবে?

না, এখন অবশ্য অন্যরকম ভাবতে হবে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম,—কিন্তু টাকার আশায় থাকলে তো বুড়ো হয়ে যাবো। কতদিন এভাবে অপেক্ষা করতে হবে? আর টাকা পেয়ে ভোগই বা করব কবে? মরেও তো যেতে পারি!

অন্যমনস্কভাবে আমার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। ইভ বলল—সময়টা কমিয়ে আনবার আশায় থাকতে হবে।

আমি বললাম—কবে কোন্ দুর্ঘটনায় মারা যাবে বা কঠিন অসুখ হবে, এ রকম আশা করে বসে থাকা যায় নাকি?

আমাদের আর কোন্ উপায় নেই। আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনাকে স্তব্ধ করতে হল দেহের মধ্যে শীতল শিহরণ বয়ে নিয়ে যাওয়া টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে। মনে হল যেন আচমকা কোন লোক ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে দাঁত চেপে গর্জন করে বলে উঠলাম—রাত দুটোর সময় ফোন? ফাজলামো? ওদিকে ইভ জামাটা তুলে নিয়ে ওর নগ্ন শরীর দুহাতে চেপে ধরল। তারপর দরজার কাছে চলে গিয়ে দুটো পা দিয়ে প্যান্টিটা কোমরে টেনে তুলে নিল।

যাক্ রিসিভার তুলে ফোনে কান পাততেই শুনতে পেলাম ভেস্তালের গলা। পেত্নীটা তিনশ মাইল দূরে থেকেও আমার ও ইভের মাঝে একটা ব্যবধান গড়ে তুলতে চাইছে। ফোনে সে জানতে চাইল—আমি ঘুমোচ্ছিলাম কিনা?

ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর দিলাম—তুমিই তো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। আমি তাকে বললাম—তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। লক্ষ্মী মেয়ে—আদুরে সুরেতে বললাম।

ও আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলতে থাকে, ও একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে আর সেটা আমাকে বলবার জন্যই, আমি ভাল আছি কিনা তা জানবার জন্যই আমাকে ফোন করেছে। স্বপ্নটা এরকম—আমি ভেস্তালের থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। সে ধরতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ছুটে পালাচ্ছি। এক সময় আমি নাকি উধাও হয়ে গেছি। আমি যদি তাকে ছেড়ে দিই এই ভয়ে সে সর্বদা কুঁকড়ে রয়েছে। ফোনে আমাকে আদর করবার মতই বলতে থাকে—তোমাকে আমি ভীষণ

ভালবাসি। শেড্ তোমার গলা শুনে প্রাণ পেলাম।

এরকম আরও কত কথা। শুনতে শুনতে বিরক্তিতে আমার সারা শরীর রি-রি করতে থাকে। আমি ফোনের লাইন রেখে দেবার জন্য তাকে শুয়ে পড়বার কথা বললাম। কিন্তু সেখানে ও কি বক্তৃতা দিয়েছে, কি করেছে, না করেছে কত কথা একসঙ্গে বলে গেল। আমি তার সবটা শুনিই নি। একসময়ে প্রায় জোর করেই তাকে ফোন রাখবার নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ইভ ততক্ষণে পোষাক পরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। আমি তার কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম।

ইভ বলল—তার আজ আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে কোন লোক ঢুকে রয়েছে।

আমি তার কাছে কথা চেয়ে নিলাম—আগামীকাল তাকে আমি আবার পাব কিনা।

ইভ মৃদু হেসে জবাব দিল—কালকে আমাদের মিলন সম্ভব নয়। কেননা ভেস্তাল কালকেই চলে আসবে।

প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম—কখনই হতে পারে না। কাল ওকে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।

ইভ হেসে বলল—আমি তোমার থেকে মিসেস উইন্টার্সকে বেশী চিনি।

শেষ পর্যন্ত ইভের অনুমান ঠিক হল। অফিস থেকে পরের দিন বাড়ি ফিরে দেখলাম ভেস্তাল এসে গেছে। রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আবার সেই নরকযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন তিনেক কাটবার পর ঘটল একটা বিশ্রী ঘটনা।

সেদিন ভেস্তাল আমার কাছে এসে জানতে চাইল—আগামীকাল সে একটা পার্টি দেবে, আমি তাতে থাকতে পারব কিনা? আমি তখন শোবার ঘরে বসে শেয়ার বাজারের কিছু কাগজপত্র দেখছিলাম।

আমি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললাম—হ্যাঁ, থাকব। কিন্তু তুমি এখন এখান থেকে যাও তো সোনা।

ভেস্তাল চলে গেল। ভয় লাগে সে যদি আমার মনোভাব বুঝতে পারে। আমি দু পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করে সতর্কভাবে ইভের অফিস ঘরে চলে গেলাম।

আমি তাকে বললাম—আগামীকাল আমাদের দেখা হচ্ছে তো?

না, কাল মায়ের কাছে যেতে হবে—জবাব দিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে ফেললাম।

ও এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজার দিকে মুখ ঘোরাতেই দেখি দরজার সামনে অর্গিস দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি চাই?

অর্গিস একটুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিল—মিস ডোলান আমাকে আসতে বলেছিল।

আমি সাবধান হয়ে গেলাম। গুপ্তচরে সারা বাড়িটা ভর্তি। অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা। তারপর একটা বাঁক। সেদিকে রয়েছে গোটা তিরিশ ঘর। অতিথিরা এখানেই থাকে। সেদিক দিয়েই এগিয়ে গেলাম। একটা ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম ফোনের রিং এর শব্দ। দরজায় আড়ি পেতে শুনতে পেলাম ইভের গলা। ল্যারী নামক কোন এক ছোকরাকে সে ফোন করছে। সাতটার সময় আটলান্টিক হোটেলে দেখা করতে বলেছে।

আরও শুনতে পেলাম ইভ বলছে—ওদিকের সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে রেখ। হ্যাঁ, শুধু সময়ের অপেক্ষায়।

ইভের কথাবার্তা শুনে মন এক তিক্ত বিস্বাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মত ঘরে ফিরে এলাম। চুপচাপ অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কেউ নির্মমভাবে হাতুড়ি পেটা করছে আমায়। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

এদিকে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করতে করতে একটা ঘণ্টা কেটে গেল, ফিতে শেষ। নতুন ফিতে লাগিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙ্গে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। পড়ন্ত বিকালের রোদে এখনও তেজ আছে। কাঠের ঘরটা গরম

হয়ে গেছে, যেন একটা অগ্নিকুণ্ড ঘরেতে খাটের উপর শুয়ে থাকা প্রাণহীন নিথর শরীরটার দিকে তাকাল শেড্। একটা নীল রং-এর মাছি মেয়েটার মসৃণ উরু বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভোঁ করে উড়তে থাকে অনেকটা যেন ভয় পেয়ে। শেড্ মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। দেহটা এখনও শক্ত হতে শুরু করেনি, তবে খুব ঠাণ্ডা। ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল হাতটা।

ফিরে এসে হুইস্কির বোতলটা মুখে লাগিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা গিলে ফেলল। তারপর আবার টেপের বোতাম টিপে রেকর্ডার চালু করে দিল। রাস্তার দিকে নজর রেখে সে চেয়ারটায় বসল। কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ আবার বলতে শুরু করল।

আমি ভেবে বেশ মজা পাই। একদিকে ভেস্তাল আমাকে পাগলের মত ভালবাসে আর আমিও অন্ধ পাগল বনে গিয়েছি ইভের ভালবাসা পেতে। আমাকে হারাবার ভয়ে ভেস্তাল সবসময় ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকে। আর আমি ইভকে না পেলে পাগল হয়ে যাব—এই ভাবে যখন নিমজ্জিত, তখন একদিন আবিষ্কার করলাম ইভ আর একজনকে ভালবাসে। আমি কিছুতেই তা সহ্য করতে পারছি না। ইভকে ফিরিয়ে আনতে হবে যেমন করেই হোক।

বৃহস্পতিবার ভেস্তালের রোলস রয়েস গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় ভেস্তালকে ফোন করে বললাম—একটা পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে আমি তাকে এড়াতে পারছি না। ভেস্তাল বন্ধুকে পার্টিতে নিয়ে আসবার জন্য বললে—সে পার্টির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে কাটিয়ে দিলাম।

তারপর চলে এলাম আটলান্টিক হোটেলে। একসময় এই প্রেম-কুঞ্জে গ্লোরিকে নিয়ে আমি আসতাম। সবই আমার নিখুঁত ভাবে চেনা।

রোলস রয়েস গাড়িটা গাড়ির সারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। হোটেলের লন পেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে টেবিলটায় এসে বসলাম। এখান থেকেই চারিদিক লক্ষ্য করতে থাকলাম।

অদূরে ইভ ও ল্যারি বসে রয়েছে দেখলাম। ছেলেটি আমার বয়সী। ভাল স্বাস্থ্য, দেখতে আমার থেকেও বেশ সুন্দর। তবে তার পরনে রয়েছে একটা স্পোর্টস জ্যাকেট ও জিনের প্যান্ট, যাতে গরীবীর ছাপই স্পষ্ট। আর ইভ একটা সাদা শার্ট পরে রয়েছে। চোখে কালো চশমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ইভকে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা উঠে দাঁড়াল। ইভ একটা পাঁচ ডলারের নোট টেবিলে রাখল। আমি তাদেরকে অনুসরণ করলাম।

ওরা হোটেলের ভেতরের রেস্তোরাঁতে ঢুকল। আমি ঝুল বারান্দা থেকে ওদেরকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে মনটা আমার খুশীতে ভরে উঠল। দেখলাম—ভেস্তাল আমার জন্যে যে রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, আমার ইভের প্রতি যে রকম টান, ঐ ছেলেটার প্রতি ইভেরও সেরকম আগ্রহ। কিন্তু ল্যারীর ব্যবহারটা অনেকটা ভেস্তালের সঙ্গে আমার ব্যবহারের মতন।

ইভ সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা বিরক্তি প্রকাশ করছে, অস্থিরভাবে বারবার ঘড়ি দেখছে। এবারেও দেখলাম—খাওয়া শেষ করে টেবিল ছাড়বার আগে ইভই একটা কুড়ি ডলারের নোট টেবিলে রাখল। তার মানে ছেলেটা ইভের পয়সাতেই আছে। মনটা আমার খুশীতে ভরে গেল। যে পুরুষের টাকা থাকে না, কোন মেয়েই তাকে বেশীদিন পাত্তা দেয় না।

ওরা এগিয়ে যেতে থাকল। ইভ ল্যারীকে বলল—চল, আমরা সমুদ্রের পাড়ে যাই।

ছেলেটা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—মাপ কর। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি যেতে পারব না

ইভ কঠোরভাবে বলে উঠল—আমি তোমাকে আগেই বলেছি না, এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব না। চল, সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি।

ল্যারী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল—তোমাকে বলেছি তো, আমার একটা জরুরী কাজ আছে। সেটা ভীষণই জরুরী। আমাকে সেজন্য একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইভের উত্তরের অপেক্ষা না করে ছেলেটা চলে গেল আর ইভ আহত মন নিয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে ঘুরপাক খেয়ে আমি ইভের সামনে হাজির হলাম। চোখাচোখি হতেই আমি হেসে

ফেলে বললাম—আরে তুমি! এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছ? তোমার মায়ের কাছে গেলে না? *গল্পটা বেশ ভালই বানিয়েছ।*

ইভ কথাটা শুনেই ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল—পার্টি থেকে এখানে তুমি কি করতে এসেছ?

পার্টিতে যাওয়া আর হল কই? হেসে ফেলে বললাম—যখন কোন লোকের পাশে তার প্রেমিকাকে সহ্য করা সম্ভব হয় না, তখনই সে অন্য বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এটা তুমি তো জান ইভ? আমার সেই অবস্থা।

একটু থেমে বললাম—যাক্ আমার কথা ছাড়, লোকটা কে?

খানিকক্ষণ পরে উত্তর দিল ইভ—ও আমার স্বামী, বুঝেছ?

আমার এতক্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত মনটা দমে গেল—কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন?

স্থির দৃষ্টিতে ইভ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—সব কথা সবাইকে না বলাই আমার অভ্যাস।

নিজেকে সংযত করে বললাম—এজন্যই তুমি চাকরীটা ছাড়তে চাইছ না। আমি ইভকে সমুদ্রের ধারে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম।

ইভ যেতে না চাইলেও জোর করে ওর হাত ধরে এগিয়ে গেলাম।

ইডেন এন্ড থেকে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গেছে। ক্রমশঃ রাস্তটা উঁচুর দিকে উঠেছে আর বাঁ দিকে বালিয়াড়ি নীচে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সত্তর কিলোমিটার স্পীডে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। ঠিক যখন লিটল ইডেনের আলোটা চোখে পড়ল, তখনই কটাস করে একটা শব্দ। বাঁদিকের সামনের চাকার টায়ার ফেটে গেল। স্টীয়ারিং ধরে সামলাতে সামলাতেই ভীষণভাবে পাক খেয়ে গাড়িটা বালিয়াড়ির দিকে সাঁ সাঁ করে এগোতে থাকল। গায়ের রক্ত আমার হিম হয়ে গেল। নীচেই সমুদ্র। আমার জীবন বোধহয় আজ এখানেই শেষ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চাকাটা বালিতে গেঁথে গিয়ে ঝপ্ করে থেমে গেল গাড়িটা। একটুর জন্য আমি বেঁচে গেলাম। সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু আমার চিন্তাধারাটা পাল্টে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠা ইভকে পাবার কামনা, টাকা, আমার স্বাধীনতা জ্বলজ্বল করে উঠল।

বাড়িতে যখন ফিরলাম, তখন রাত সাড়ে বারোটা। আমাকে দেখেই ভেস্তাল প্রশ্ন করল—এত রাত করে ফিরলে?

—ফিরতে দেরী হয়ে গেল, চাকাটা মাঝরাস্তায় ফেটে গেল—কথাটা শেষ না করেই শিস্ দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু ভেস্তাল আমার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি কঠিন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? নিশ্চয়ই কোন মেয়ের সঙ্গে? বল কে কে?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠে বললাম—পুলিশের সার্জেন্ট জিম কেলার আমার সঙ্গে ছিল। তুমি এখন সরে যাও আমার সামনে থেকে।

মিথ্যে কথা বলছ।—বলেই ঠাস করে একটা চড় মারল আমার গালে।

আর দপ্ করে তখনি আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। রাগে অন্ধ হয়ে ভেস্তালের হাড্ডিসার দুটো কাঁধ খামচা মেরে ধরলাম। মনে হল যেন জীবনের মত শেষ করে দিই কুৎসিত ডাইনীটাকে।

কিন্তু ততক্ষণে দুটো লোহার মত শক্ত হাত বুলডোজারের মত আমার কব্জি দুটো মুচড়ে ধরেছে।

শান্ত গলায় লেফটেন্যান্ট লেগো বলল—অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ উইন্টার্স!

এই হতচ্ছাড়া পুলিশ অফিসার এখানে রয়েছে জানতে পারলে আমি ওর গায়ে কখনও হাত দিতাম না। রাগে আমার সারা শরীর কাঁপছে, একটা মেয়ে হয়ে ভেস্তাল কিনা আমাকে মারবে। নিজেকে সামলে নেবার জন্য একটা সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেশলাই-এর জন্য এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগলাম।

মিঃ লেগো ফস্ করে লাইটার জ্বেলে ধরল আমার মুখের সামনে, তারপর মুচকি হেসে বলল—মাঝে মাঝে নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে, তাই না? বোধহয়

সবারই? তার কথায় শ্লেষের সুর।

আমিও না ঘাবড়াবার মত করে বললাম—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বোধ হয়।

এরপর লেগো বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল। যাবার সময় লেগো আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে গেল—আপনার জামার কলারে যে লিপস্টিকের দাগ রয়েছে, সেটায় হয়তো আমার মত মিসেস উইন্টার্স-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে থাকবে।

আমি তার কথা শুনে নিজের বেখেয়ালের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। খানিকক্ষণ কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মেরে যাচ্ছে।

।। এগার ।।

সারারাত এপাশ-ওপাশ করলাম বিছানায়। ঘুম আসছে না কিছুতেই, শেষে সান্ত্বনা পাবার আশায় ইভের কাছে যাব বলে স্থির করলাম।

হল ঘরের ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে রাত তিনটে নির্দেশ করল। আমি দরজা খুলে মুখ বাড়ালাম। কেউ নেই দেখে বাইরে বেরিয়ে দরজায় নিঃশব্দে তালা লাগালাম। সোজা ইভের ঘরের সামনে। দরজার হাতলটা আস্তে করে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। দরজাটা বন্ধ করবার শব্দ হতেই ইভ জেগে গেল।

কে? ভয়ার্ত গলায় ইভ প্রশ্ন করে!—আমি। চুপ কথা বলো না।—আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ইভের বিছানার দিকে।

সে প্রথমে আমাকে দেখে ক্ষেপে গেল। চাপা গলায় বলল—সেদিন ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছ। আবার আজ! বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

আমি যথাসম্ভব কোমল গলায় ইভকে নানান কথা দিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করলাম। তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিলাম। সে বলল—তা কি করে সম্ভব? আমি তো একজনের বিবাহিত স্ত্রী।

আমি ব্যঙ্গের সঙ্গে বললাম—ছ কোটি ডলার আমার পকেটে ঝলমল করলে ঐ রকম স্বামীকে ফুটিয়ে দিতে কতক্ষণ? মাত্র বছরখানেক। সে সময়টা ইওরোপে ঘুরে বেড়াব তারপর বিচ্ছেদ পেয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করে ফেলব।

ইভ বলল—কিন্তু মিসেস ভেস্তাল! আমি ইভকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম—আমি আর কোন সম্ভাবনা নিয়ে বসে থাকতে পারব না। এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভেস্তাল মারা যায়। আর তখনি ছ কোটি ডলার আমার হাতের মুঠোয়।

অবিশ্বাসের গলায় ইভ বলল—তার মানে?

মৃদু হেসে বললাম—আমি ভেস্তালকে খুন করব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ইভ। তারপর চাপা গলায় বলল—খুন করবে? কি ভাবে?

বুঝতে পারলাম ইভকে বস মানানো গেছে। তবুও তাকে আমি সারাটা রাত ভাববার সময় দিলাম।

ইভ বলল—ভাববার কিছু নেই। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি তোমাকে চাই, কেবল কাজটা যেন নিরাপদে হয়।

আমি আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম, ওর শরীরের স্পর্শে আমি উষ্ণতা বোধ করলাম।

আমি গত রাত্রে ফেরবার পর যা ঘটনা ঘটেছে, ভেস্তালের কথা, লেগোর সাবধানবানী সবই একেএকে গুছিয়ে বললাম। আমি সেদিনই খুনের পরিকল্পনাটা ওকে জানিয়ে দিলাম। পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ ইভকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম।

ইভ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে খানিকটা গভীরভাবে চিন্তা করল। সে ভয় পেয়ে গেল।

আমি তাকে মনে সাহস দিয়ে বললাম—কোন চিন্তা নেই, মনে জোর আনো। তাহলে আমাদের মুক্তি।

তাকে গভীরভাবে চুম্বন দিয়ে বললাম—দুজনে একসঙ্গে এতবড় সম্পত্তির মালিক। ইভ

ভেস্তালের টাকার চেয়ে তোমাকে আমি বেশী করে পেতে চাই।

তুমি সবই পাবে, শেড্ ডার্লিং—ইভ দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। ওর নরম নরম উদ্ধত বুক দুটো আমার বুকের সঙ্গে লেপটে গেল—সাবধানে কাজ কর শেড্।

ঘড়িতে চারটে বাজে।—কিছু ভেবো না ইভ। সব ঠিক হয়ে যাবে। পরিকল্পনাটার মধ্যে কোন খুঁত থেকে গেল কিনা একবার ভেবে দেখ। —ওর গালে আদুরে টোকা মেরে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেদিন অনেক বেলা করে উঠলাম। স্নান করবার সময় আমার খেয়াল হল ভেস্তালের কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তা না হলে ভেস্তাল শান্ত হবে না, আর আমার পরিকল্পনাও সফল হবে না। ভাবামাত্রই ওর ঘরে ফোন করলাম।

কে? কর্কশ গলা ভেসে এল ভেস্তালের—কি চাই?

তোমার কাছে আমার দোষ স্বীকার করবার একটা সুযোগ দাও, ভেস্তাল। আমার কণ্ঠে ঝরে পড়ছে ক্ষমা চাওয়ার সুর।

ভেস্তাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল—বেশ, আধঘন্টা পরে এস।

মুখখানায় দুঃখের ভাব এনে কাঁচুমাচু করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা ছক আগে থেকেই কষে ফেলেছিলাম।

আমি খুবই দুঃখিত ভেস্তাল। জিম আর আমি অতিমাত্রায় পান করে ফেলেছিলাম। তারপর ওর পাল্লায় পড়ে বেশ্যাবাড়ি যেতে হল। ভেস্তাল আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনও এরকম হবে না—বলতে বলতে ওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরলাম।

এতেই কাজ হয়ে গেল। ভেস্তাল আমাকে জড়িয়ে ধরল, বলল—ওহ্ শেড্ ডার্লিং, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করব। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। পুরুষমানুষ এক-আধবার বেশ্যাবাড়ি গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আর কখনও যেও না।—গালে গাল ঘষতে লাগল।

ভেস্তাল ভেবেছিল ও আমাকে হারাতে বসেছে। ওর মধ্য থেকে রাগ বা হিংসে যেন দূর হয়ে গেছে। আমি হয়ত অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়েছি—এটা আন্দাজ করেছিল সে।

দেখুন মিঃ অ্যাটর্নী সাহেব কত সহজে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

।। বারো ।।

কয়েকদিন পরের কথা।

আমি অফিসে যাবার আগে কয়েকটা দরকারী চিঠিপত্র দেখছিলাম। ইভ আমার ঘরে ঢুকল একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে। একটা চিরকুট আলাদা বের করে আমার সামনে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

আমি চিঠিটা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল—এইমাত্র ভেস্তাল মিসেস এলিস-এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। আঠাশে সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত সাড়ে নটায়। বেহালাবাদক স্টোয়েনস্কির সঙ্গে ভেস্তাল দেখা করতে যাবেন।

আর হাতে তিনটে দিন সময় আছে। একদিকে মুক্তি পাবার আনন্দ অপরদিকে ভেস্তালকে খুন করবার এক অজানা অনুভূতিতে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কাগজটা পুড়িয়ে দিয়ে ভাবতে থাকলাম সামান্য ভুল হলেই সব শেষ। মিসেস এলিস ভেস্তালের নিকটতম বান্ধবী আর স্টোয়েনস্কি একটা ভণ্ড, তবে ধনী কুমারী মেয়েদের বা বউদের পটাতে ওস্তাদ।

একটা আশঙ্কা আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘোরা-ফেরা করছে। একবার যে ব্যাপারগুলো ইভের সঙ্গে আলোচনা করে নেব, তার কোন সুযোগ নেই।

এখন প্রতিদিন ভেস্তালের সঙ্গে শুতে হচ্ছে, নব বিবাহিত স্ত্রীর মতই সারাটা রাত ধরে ওকে খুশী করতে হচ্ছে। যাক্ আর তো কটা দিন!

অফিসে বেরোবার সময় দেখলাম ইভ পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ইঙ্গিতে ওকে বললাম—বৃহস্পতিবার বেলা দুটোর সময়। সমুদ্রপাড়ের কুঁড়ে ঘর।

ও মাথা নেড়ে জানাল যে ও বুঝেছে।

অফিসে গিয়ে পরিকল্পনামত কয়েকটা চিঠি বেছে নিয়ে টেপরেকর্ডারের নম্বর অনুযায়ী সময় দেখে ডিকটেশান দিলাম। মনে বেশ ভয় লাগল কিন্তু ফেরারও যে কোন উপায় নেই।

বৃহস্পতিবার অফিসে গিয়ে রায়ান ব্ল্যাকস্টেনকে ফোন করলাম।—ভেস্তালকে একটা সারপ্রাইজ দেব। তাছাড়া অনেক দরকার আছে। তুমি ঠিক নটা পনের মিনিটে আমার বাড়িতে আসবে।

তারপর মিস গুডচাইল্ডকে ফোন করলাম। তাকে জানিয়ে দিলাম—লাঞ্চের পর অফিসে ফিরব না। গলফ খেলতে যাব।

লিটল ইডেনে ছটা মাঠ রয়েছে। ভেস্তাল যদি ফোন করে আমার খোঁজ করে, সে কখনোই খুঁজে পাবে না আমাকে।

লাঞ্চ সেরে সোজা সমুদ্রের পাশের কুঁড়েঘরটাতে চলে এলাম।

এটা ভেস্তালের ঘর হলেও এই ঘরে সে আসে না। বাড়ির সুইমিং পুলেই সে সাঁতার কাটে। এক প্রান্তে নির্জন পরিবেশে এই কুঁড়ে ঘরটা আমার বেশ ভাল লাগে। এখানে অনেক আড়াল, গাড়ি লুকিয়ে রাখবার জায়গাও রয়েছে। আমি ঘরের দরজা, জানালা খুলে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইভ চলে এল।

ইভ ঘরে ঢুকতে দেখলাম ওর মুখটা বিবর্ণ। বুঝতে পারলাম আমার মত ইভের মনও সংকুচিত ও উত্তেজনাপূর্ণ।

ইভকে আমার একটা মূর্তি গড়ে ফেলবার কথা বলেছিলাম। দেখলাম ইভ তার দিয়ে তৈরী একটা লম্বা মত চোঙ্গা, টেবিলের একপাশে রাখল। বলল—এটা কাল রাতে তৈরী করেছি, দেখ এটাতে কাজ হবে কি না।

আমার সামনের টেবিলের উপর টেপরেকর্ডার ছিল। আমি ইভের উদ্দেশ্যে বললাম—প্রথমে আমরা মঞ্চটা একটু সাজিয়ে দেখি। ইভ সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল।

প্রথমে চোঙাটাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলাম। আমার কোটটা খুলে কায়দা করে চোঙাটাকে পরিয়ে দিলাম। একটা জ্বলন্ত সিগারেটও তার মধ্যে গুঁজে দিলাম। তারপর টেপরেকর্ডারটা চালু করে দিলাম।

আমি ও ইভ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম কোন খুঁত আছে কিনা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করলাম।

চেয়ারের উপর আমার হাতের অংশ দেখা যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী আকারে। টেপে আমার গলা নিখুঁতভাবে শোনা যাচ্ছে। টেপের মাঝামাঝি অংশে এসে ডিকটেশান বন্ধ হল। সামান্য জোরে আমার গলার স্বরে শোনা গেল—রায়ান, তোমাকে বসিয়ে রাখবার জন্য দুঃখিত। আর বিশেষ দেরী নেই।

পুরো ব্যাপারটা একেবারে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। নিখুঁত, একেবারে অচিন্তনীয়। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। দুজনের শরীর মৃদু কেঁপে চলেছে। টেপটা শুনলাম—শেষ পর্যন্ত।

টেপ বন্ধ করে দিলাম।—তুমি যদি ভয় পেয়ে গিয়ে কোন ভুল না করে বস, তাহলে আমরা সফল হব। যে চিঠিগুলো রেকর্ড করেছি সেগুলো ইভকে দিলাম। রায়ানের সঙ্গে কখন কথা বলব। টেপের নম্বরগুলো সময় অনুযায়ী মিলিয়ে মুখস্থ করে নিতে বললাম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে আমাদের নাটকের মহড়া শেষ হল। তারপর ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—জোর পাচ্ছ তো মনে ইভ? আমাদের দুজনেরই জীবন তোমার হাতে। এখনও যদি বল তাহলে ফেরবার সময় আছে।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে বলল—না, না, আমি ভয় পাচ্ছি না শেড্। কাজটা করতে পারব ঠিক করে।

বেশ্। তাহলে আসল নাটকের মহড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হও।

পরের দিন আঠাশে সেপ্টেম্বর। শুক্রবার। ভেস্তালের জীবনে অভিশপ্ত দিন, আমার জীবনেও বটে।

পাঁচটার আগেই অফিস থেকে ফিরে এলাম। বাড়িতে এসে দেখলাম ভেস্তাল নেই। অ্যাপ্রন আর দুটো হ্যান্ড গ্লাভস এনে আমার ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। চাকা পাল্টানোর সময় এগুলো আমাকে পরতে হবে, নইলে কালিঝুলি মেখে ব্ল্যাকস্টেনের সামনে আসা যাবে না।

ইভকে ফোন করে জানতে পারলাম—ভেস্তাল সিনেমায় গেছে। ছটার সময় ফিরবে। আমি তার ঘরে যাচ্ছি বলে দিলাম।

সে আপত্তি করেছিল, তবুও গেলাম। ইভকে কেমন ফ্যাকাশে লাগছে। তাকে পুনরায় মনে সাহস দিলাম।

সে জানাল—তার গাড়িটা সে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে এসেছে। 'আস্তে চালাও' সাইনবোর্ডটা যেখানে আছে, সেখানেই রাখা আছে। এটা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। সময়ের সামঞ্জস্য আনবার জন্য এটা খুবই জরুরী।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘ জমেছে, বোধহয় বৃষ্টি হবে। চাকা পাল্টাবার সময়ে বৃষ্টি হলে বেশ অসুবিধে হবে—আমি বললাম।

ইভ ভয় পেয়ে গেল। বৃষ্টি হলেও কাজটা করবে?

আমি জোর দিয়ে বললাম—বৃষ্টি কেন, ভূমিকম্প হলেও করব।

ড্রাইভার নিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—আমার নির্দেশ মত ইভ ওকে চায়ের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে।

ঘড়িতে তখন ছটা বাজে। ইভকে বললাম—টেপ রেকর্ডটা আমার ঘরে রেখে এস। আর সাড়ে তিনঘণ্টা পরে আমরা মুক্ত। ইভ! ভেবে দেখ, এখনও সময় আছে, পিছিয়ে আসার।

তুমি কি পিছিয়ে আসতে চাও?—ইভ বলল। আমি মন শক্ত করে বললাম—না। এরপর আমি বাগানে গিয়ে ভেস্তালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ছটার কিছু পরে ভেস্তাল রোলস রয়েস চালিয়ে এল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উঠছি। আমার সঙ্গ পেয়ে ভেস্তাল খুব খুশী। ভেস্তাল অনবরত বকবক করে চলেছে। ভালবাসার উজ্জ্বল জ্যোতি ওর চোখে মুখে সুস্পষ্ট।

আর মাত্র তিন ঘণ্টা পরে এই মেয়েটাকে আমি খুন করতে চলেছি। বিশ্বাস করতে পারছি না যেন নিজেকে।

ভেস্তাল বলল—শেড্‌ ডার্লিং। আমি পোষাক পাল্টাব। তুমি আমার পাশে বসে গল্প করবে।

আমি মিষ্টি করে ননী মাখানো আদুরে গলায় বললাম—আমার বিশেষ কটা কাজ রয়েছে। তুমি যাও। আমি একটু পরেই আসছি।

ভেস্তাল রাগ করবার ভান করে বলল—তুমি বেশী খাটাখাটুনী করছ। এত চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। বলেই একটা চুমু খেল। গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল, অতি কষ্টে মুখের ভাবটা ঠিক রাখলাম।

নিজের ঘরে এসে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলে দেখলাম জিনিসগুলো সব ঠিকঠিক আছে। দেখে চাবি দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলাম।

এক অজানা আশঙ্কা যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারছে।

শূন্য মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলার কাচে বৃষ্টির ঝাপটা আছড়ে পড়ছে। এমন সময় দরজা নক্‌ করে অর্গিস ভেতরে ঢুকল। মাপ করবেন, স্যার! জো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাতে মিসেস উইন্টার্সের গাড়িটা লাগবে।

কিছু খেয়েছে হয়তো। পেটে সয়নি।

আমি বললাম—আচ্ছা মিসেস উইন্টার্স নীচে এলে আমি বলে দেব।

অর্গিস দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

।। তের ।।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই একটা তাজা প্রাণ আমি নষ্ট করতে চলেছি। হাত-পা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ডিনার খেতে বসে ভেস্তাল অন্যান্য বারের মত এবারেও তার সঙ্গে যাবার জন্য আমাকে

অনুরোধ করল। কিন্তু আমি জানালাম, রায়ান আসবে, ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলতে হবে। কোন মেয়ের সঙ্গে কাটাব না জেনে ও আমাকে আর জোর করল না।

ডিনার পর্ব শেষ আর হতেই চাইছে না। মুখে জোর করে কিছু গুঁজে দিচ্ছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, যদি ভেস্তাল কিছু আন্দাজ করে ফেলে।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভেস্তাল ডিনার শেষ করে বলল—দেখ, এতদিন বৃষ্টি নেই, আর ঠিক আমার বেরোবার সময়েই বৃষ্টি।

সে উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দেখল।—এরকম বৃষ্টি হলে যেতে পারব বলে মনে হয় না।

আমি মনে মনে এই আশঙ্কা করছিলাম। তাকে একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য বললাম—বৃষ্টিতে ঘরে বসে থাকলে আরো মন খারাপ হয়ে যাবে। যাক্ আজ টিভির প্রোগ্রাম দেখেই সময় কাটাবে। মিসেস এলিসকে বলে দাও, তুমি যেতে পারবে না।

স্টোয়েনস্কির সঙ্গে দেখা করবার ভীষণ ইচ্ছা আমার, পরে ঠিক সময় নাও হতে পারে। অথচ বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে আমার ভয়ও লাগে।

অর্গিস কফি ঢালছিল। ভেস্তালের নির্দেশে সে দেখতে গেল ড্রাইভার জো সুস্থ হয়েছে কিনা।

ভেস্তাল বলল—দরকারের সময় না পেলে তবে ড্রাইভারের প্রয়োজন কিসের?

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ওর কি ইচ্ছে করে অসুখ হয়েছে, হঠাৎ করেই হয়েছে। আমি বলে ফেললাম, বৃষ্টির মধ্যে তোমার গাড়ি চালাতে যে কি অসুবিধা, আমি তাও বুঝি না।

ভেস্তাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, বলল—তুমি যেন আজ কেমন অদ্ভুত ধরনের আচরণ করছ সন্ধ্যাবেলা থেকে।

আবার সেই বোকামী। তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম,—দূর ছাই। তুমি কিযে বল? আমি ঠিক আছি। অদ্ভুত আচরণ তুমি আমার মধ্যে কি দেখলে?

এমন সময় অর্গিস এসে জানাল—সরি ম্যাডাম, জো খুবই অসুস্থ। আবারও বমি করেছে।

আমি একটা সুযোগ নিলাম—তবে বরং তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই। ওই বেহালাবাদক স্তাবকদের ভিড়ে তোমার খেয়াল অত রাখবে না।

আমার কথা শুনে ভেস্তালের জেদ আরো বেড়ে গেল। মেজাজের সঙ্গে বলে উঠল—আমার পথ চেয়েই সে বসে আছে, আমি নিশ্চিত জানি। আমার জন্যই এলিসের নিমন্ত্রণ নিয়েছে স্টোয়েনস্কি।

ঠিক আছে, তোমার যাবার ইচ্ছা হয় তো যাও। রেডী হয়ে নাও, নটা প্রায় বাজে।

হ্যাঁ, আমি এখনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি—ভেস্তাল আবার অনুরোধ করল তার সঙ্গে আমাকে যাবার জন্য।

—ডার্লিং, আমাকে মাপ করো আমি ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললাম—ব্ল্যাকস্টেন এসে ফিরে যাবে। সেটা কি ভাল হবে?

ভেস্তালকে সন্দেহ মুক্ত করবার জন্য আমি জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। আর তাতেই ভেস্তালের চোখে কামনার উত্তেজনা জেগে উঠল। বলল—আজ রাতে গিয়ে আর কাজ নেই। দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটাব। কেমন?

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—এখন রাত এগারোটা পর্যন্ত ব্ল্যাকস্টেন তো থাকবেই। তার আগে তো তুমি আমাকে পাবে না।

বেশ্, তাহলে, আজ রাতে—শেড্।—কথাটা সম্পূর্ণ না করেই ও বেরিয়ে গেল।

ভেস্তালের প্রশ্নের উত্তরে অর্গিস বলল—না, এখন সেরকম বৃষ্টি নেই। আপনি ঠিক মত যেতে পারবেন তো?

—হ্যাঁ পারব, ভেস্তাল বলল—তবে ফিরতে আমার দেরী হতে পারে। সাড়ে বারোটা হবে হয়তো।

ভেস্তাল চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ইভ আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। মুখটা ফ্যাকাশে লাগছিল।

সে আমার হাতে একটা টুপী দিয়ে বলল—মাথা ভেজা অবস্থায় মিঃ রায়ানের সামনে হাজির হলে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে।

আমি ইভকে পুনরায় মনে সাহস দিয়ে বললাম—এবার সব দায়িত্ব তোমার, ঠিক যেমনভাবে বলেছি।

আচ্ছা,—বলে ইভ ড্রয়ার টেনে অ্যাপ্রন, গ্লাভস দুটো বার করে দিল। বালি ভর্তি ব্যাগটা হঠাৎ যেন বাস্তব পরিস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলল।

আমি সেগুলো নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইভের দিকে ফিরে বললাম—গুড লাক, ইভ। মনে জোর এনে কাজ কর। আধঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আসব।

ইভ মাথা নাড়ল। জানালা গলে নীচে নেমে পড়লাম। ইভ জানালা বন্ধ করে দিল।

বৃষ্টি নেই বললেই চলে কিন্তু বাতাস বেশ জোরে বইছে। আমি গ্যারেজের দিকে বেশ দ্রুত এগিয়ে গেলাম। যাতে ভিজে না যায় সেজন্য ঘুরপথে আসতে ভেস্তালের একটু বেশী সময় লাগবে। আমাকে শুধুমাত্র লনটুকু পার হতে হবে।

কয়লার মত কালো অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে রয়েছে। থমকে লনটা ছুটে পার হয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গ্যারেজটা ভূতের অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটার কাছে গেলেই অটোমেটিক আলো জ্বলে উঠবে। অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভেস্তাল আসছে, অন্ধকারের মধ্যে তার সাদা বর্ষাতিটা চোখে পড়ল। বুকটা ধক্ ধক্ করতে লাগল। ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বালি ভর্তি ব্যাগটা শক্ত হাতে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভেস্তাল হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গান গাইছিল। ওর মুখটা যেন চিন্তান্বিত। ও গ্যারেজের কাছে আসতেই আলো জ্বলে উঠল, দরজাও খুলে গেল। ও ভেতরে ঢুকল।

ক্রেসপাতের জুতো পড়েছিলাম। নিঃশব্দে ভেস্তালের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভেস্তাল গাড়ির দরজা খুলছে। ও বোধহয় অমঙ্গল কিছু আশঙ্কা করেছিল। হয়তো ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সাবধান করে দিল আর তাই সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে দেখবার চেষ্টা করল। ওর মুখটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর আমার বুকের ভেতরটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

এই সুযোগে বালিভর্তি থলেটা দিয়ে ওর মাথার ঠিক মাঝখানে আঘাত করলাম। হাঁটু দুমড়ে গেল, গাড়ির দরজা থেকে হাতটা খসে পড়ল।

আমার চাপা ঠোঁট ভেদ করে নিঃশ্বাস হিস্‌হিস্ শব্দে ছিটকে বেরিয়ে এল।

আবার ব্যাগটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয় বার আঘাত করলাম সর্বশক্তি দিয়ে। ওর মাথাটা দুলে উঠে ঝাঁকুনি দিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। ও ঢলে পড়তে চাইল। আমি বালির ব্যাগটা ফেলে দিয়ে ওর শরীরটা ধরে ফেললাম।

আমার গায়ের সঙ্গে ওকে চেপে ধরে নিলাম ন্যাকড়ার পুতুলের মত। গাড়ির দরজা খুলে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে সামনের আসনে বসিয়ে দিলাম, ডানদিকের দরজায় হেলান দিয়ে রাখলাম।

বালি ভর্তি ব্যাগটা তুলে স্টীয়ারিং-এর নীচে রাখলাম। তখনই হঠাৎ মনে হল—গাড়ির চাবি কোথায়? ইঞ্জিন চালু করব কি করে? শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। হাত দুটো কাঁপছে, ওর ব্যাগটা ওলট-পালট করে ঘাটলাম কিন্তু কই চাবি কোথায়। আতঙ্কে কিছু মনে করতে পারছি না। সর্বনাশ! কি হবে? সময় যে বয়ে যাচ্ছে। ড্যাশ বোর্ডের ঘড়িটাতে সময় দেখলাম—নটা বেজে সাত।

নিজের বোকামীর জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম, গাড়ি থেকে নেমে গ্যারেজের মাঝে, চারপাশে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে গাড়ির নিচে চাবিটা পেলাম। কখন ভেস্তালের হাত থেকে ঠিক্‌রে গিয়ে নীচে পড়েছে।

চাবিটা নিয়ে ইঞ্জিন চালু করে ফিরে দেখলাম একবার। কাত হয়ে গাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে ও বসে আছে। মাথাটা পেছনের দিকে হেলান। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বোজা।

ধীরে ধীরে বুকটা ওঠা-নামা করছে, মাথা থেকে একটা সরু রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

প্রথমে খুব আস্তে, তারপর রাস্তায় পড়ে গাড়ি জোরে ছুটিয়ে দিলাম ক্লিক রোডের মাথায় আসতে তিন মিনিট সময় লাগল। বাতাসের জোর অনেক বেশী। গাড়ির কাচে বৃষ্টির পশলা আছড়ে পড়ছে। ওয়াইপার দুটো চালিয়ে দিলাম। গাড়ির আলো নিভিয়ে দিলাম। বাঁকের কাছে গিয়ে গাড়ি থামাতে দেখলাম সামনের বাঁকের মুখে—মাইলখানেক নীচে একটা গাড়ির আলো এগিয়ে আসছে। নিশ্চিত রায়ানের গাড়ি।

ভেস্তালকে পুরো আমার কোলে বসিয়ে নিলাম। মাথাটা টেনে সোজা করে রাখলাম। হাত দুটোকে স্টীয়ারিং হুইলের সঙ্গে আটকে রাখলাম।

ওর মাথাটা পিছন দিকে হেলে যাচ্ছে। আমার গালের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠেকিয়ে নিয়ে আমার নিজের শরীরটা দুমড়ে নিয়ে একেবারে সীটের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। গীয়ারটা চেঞ্জ করে ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। বাঁক ঘোরবার আগে সামনের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলাম।

ব্ল্যাকস্টেন খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল কিন্তু আমার গাড়ি দেখেই সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। আমি গাড়ির স্পীডটা বাড়াতে যাব, এমন সময় ভেস্তালের চাপা গোঙানির শব্দ শোনা গেল, এত ভয় আমি কোনদিনও পাইনি। গাড়িটা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। আমি আঁতকে উঠলাম।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর উঠে গেল গাড়ির চাকা। সামনেই সাদা বেড়া। ধাক্কা খেলেই একেবারে নশো ফুট নীচে পড়বে।

কোনরকমে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নিতে পারলাম। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ভেস্তালের ঘাড়টা ধরে ওর মুখখানা ড্যাশ বোর্ডের উপর ঠুকে দিলাম। আঘাতটা জোরে না হলেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভেস্তাল।

ব্ল্যাকস্টেন কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। সে হর্ন বাজাল কিন্তু আমি কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম না। বাঁকটার মুখে এসে আমি গাড়ির ব্রেক কষলাম। দৃষ্টির বাইরে এসে গাড়িটা থামালাম। ব্ল্যাকস্টেনের গাড়ির পেছনের লাল আলোটা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম।

তারপর গাড়ি থেকে নেমে এলাম। ভেস্তালকে গাড়ির মধ্যে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্ল্যাকস্টেন বাড়ি পৌঁছে যাবে। তাকে কিছুতেই কুড়ি মিনিটের বেশী বসিয়ে রাখা যাবে না। সুতরাং পঁচিশ মিনিটের মধ্যে চাকা বদল করে গাড়িটা খাদে ফেলতে হবে।

তাড়াতাড়ি সব কাজ করে ফেলতে হবে, নয়ত ইভ ভয় পেয়ে গেলে মন ভেঙ্গে যাবে আর সে সব গণ্ডগোল করে দেবে। ব্ল্যাকস্টেনেরও সন্দেহ বাড়বে। শরীর ঘামছে। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ির কাছে এসে পেছনের খোল থেকে চাকাটা বার করলাম। ভয় হচ্ছিল, জো ফাটা চাকাটা পাল্টে রাখেনি তো। ইস্ আর আমার ভেবে দেখার উপায় নেই।

টায়ারের বেড় ঘুরে হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা পেতে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। রেঞ্জ আর স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে আন্দাজে চাকা পাল্টাবার কাজ শুরু করলাম। অন্ধকার চতুর্দিকে কিন্তু আলো জ্বালাতে সাহস পাচ্ছি না। একে তো কাজটা দুঃসাধ্য, তার উপর বৃষ্টিতে বার বার নাটবল্টুগুলো পিছলে যাচ্ছে পরাতে গিয়ে। সাত মিনিটের প্রচেষ্টায় শেষে চাকা খুলল। তাড়াতাড়ি করতে পেরেছি।

এবার কাটা চাকাটা বসাতে হবে। খাপে খাপে বসানোর গর্তগুলো ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছি না। হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে ছটা নাটের মধ্যে পাঁচটা নাট লাগিয়ে চাকাটা পরিয়ে দিলাম। আর হাতে সময় রয়েছে মাত্র দশ মিনিট। এর মধ্যেই সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।

দৌড়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে স্টার্ট করার জন্য বোতাম টিপতে গিয়ে দেখলাম ভেস্তাল নেই। আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কাঠের মত শক্ত হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে বৃষ্টি আবার জোরে শুরু হল। নিশ্চয়ই ভেস্তাল পালিয়েছে। চাকা বদল করবার সময় ও জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিন্তু দমকা বাতাস বইছে, সে কি গর্জন। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে দিলাম। ঠিক তখনি অন্ধকার খাদের মধ্যে ওকে দেখতে পেলাম। যেন অন্ধকারে কাউকে অচেনা পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেস্তাল তেমন ভাবে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে খাদটার দিকে।

এরই মধ্যে সে গাড়ি থেকে একশ গজ দূরত্বে চলে গেছে। আমি ভেবে পেলাম না, এখন কি করব? গাড়ি থেকে নেমে আমি তার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। হেডলাইটের সামনে আমার দীর্ঘ ছায়া মূর্তি দেখে ভেস্তাল আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল,

—ওহ শেড্! তুমি এসেছ? বেঁচে গেছি। জান শেড্ আমার মাথায় খুব লেগেছে।

ও কথা বলতে বলতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গা এলিয়ে দিল। আমি জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে দিতে ও ভয় পেয়ে গেল—শেড্, কি হয়েছে? আমাকে ব্যথা দিচ্ছ কেন?

আমার মনে হল এখনি যেন ওর গলাটা টিপে মেরে ফেলে দি। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল তাহলে খুব ভুল করা হবে।

ভেস্তাল যেন আমার মতলবটা বুঝে ফেলেছে। সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল, গাড়িটা লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল। আমিও তার পেছন পেছন ছুটলাম। একটা বড় পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিলাম। ভেস্তাল ছুটবার সময় একবার সামনে, একবার পিছনে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল। হাত-পা দুমড়ে পড়ে গেল। রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে মুখে মৃত্যুর ভয়।

চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে ভেস্তাল আমাকে দেখছে। আমি তার কাছে যেতেই ও আর্তনাদ করে বলে উঠল—শেড্, দয়া করো, মেরো না। আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেব। আমাকে বাঁচতে দাও শেড্।

আমি ওর ডান হাতের কব্জিটা মুচড়ে ধরলাম। পাথরটার ভার যেন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

ভেস্তাল শেষবারের মত প্রাণফাটা ব্যাকুল আর্তনাদ করল ঃ—শেড্ তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না।

আমি ততক্ষণে পাথরটার ছুঁচাল দিকটা ওর মাথার উপর তুলে দিতেই ও ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলল। নিশ্চিত মৃত্যু যেন, সে আর পালাল না। মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

আর ইতিমধ্যে আমার হাতের পাথরটা ওর মাথার মাঝখানে আছড়ে পড়ল।

রাস্তার উপরই ও ছটফট করতে করতে দলে পড়ল। মরে যাচ্ছে ভেস্তাল! কিন্তু তখন আর কিছুই করবার নেই।

—জানেন অ্যাটর্নী সাহেব, ভেস্তালের সেই করুন আর্তনাদ আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি। এখনও আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে কি রকম নিষ্ঠুর ভাবে আমি সেদিন তাকে খুন করেছিলাম। তার করুণ মুখখানা—

এই সময় ছেলেবেলার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। আমাদের একটা পোষা কুকুর ছিল, সেটা পাগল হয়ে গিয়ে আমার হাতে কামড়াল। বাবা তাকে তিনটে গুলি করে মেরে ফেলল। কুকুরটা ছটফট করতে করতে মারা গেল। তার সেই ছটফটানির নির্মম দৃশ্যটা ঘুমের মাঝে স্বপ্নে আমি দেখেছি, কেঁদে উঠেছি।

আর ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ! আজ আমি আমার নিজের স্ত্রীকে কি নৃশংস ভাবে হত্যা করলাম। একজন নারীকে আর টাকা পাবার লোভে। যাক্ মৃত্যুপথযাত্রী ভেস্তাল তখন কাতরাচ্ছে। সেই অবস্থায় তার একটা হাত ধরে বস্তার মত রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে এনে গাড়িতে তুলে দিলাম।

একমুহূর্তে সব ব্যাপারটা ভেবে নিলাম। পাথরটার কথা মনে হতেই ছুটে গিয়ে নীচের উপত্যকায় ছুঁড়ে দিলাম।

সময় খুব কম। কাজও প্রায় সারা। ফিরে এসে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে ঠেলতে ঠেলতে ঢালু রাস্তায় নিয়ে এলাম।

হেডলাইটের আলোতে সাদা বেড়াটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভেস্তালের দেহটা তখনও থির থির করে কাঁপছে।

গাড়ির স্টিয়ারিং চালু করে ঘুরিয়ে দিলাম সাদা বেড়াটার দিকে। গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে উঠে গেল ঘাসে। তারপর দড়াম করে ধাক্কা মারল বেড়ার গায়ে, বেড়া ভেঙ্গে গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাছপালার ডাল ভাঙ্গার পট্ পট্ শব্দ।

তারপর ধাক্কা খেতে খেতে উল্টেপাল্টে আরও সব পাথরের টুকরো সঙ্গে নিয়ে প্রায় দুশো ফুট নীচে গিয়ে পাথরের গায়েই আটকে গেল গাড়িটা।

পরক্ষণেই গুড়ুম শব্দ। গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

জানলাতে পা রেখে শুনলাম আমার গলার স্বর এখনো চিঠির ডিকটেশান দিচ্ছে।

আহ্, প্রাণ ফিরে পেলাম। আমি প্রায় ঠিক সময়ে এসেছি। কিন্তু আমার অ্যাপ্রনটা ভেজা, জুতো কাদায় মাখামাখি আর হাতদুটো নোংরা।

ইভ আমাকে দেখতে পেয়ে একটা তোয়ালে আর স্পঞ্জ ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। চাপা গলায় বলল—মিঃ ব্ল্যাকস্টেন আধঘণ্টার উপর বসে আছে। আর টেপ চলবে মাত্র দুমিনিট, তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে নাও।

আমি চুলে চিরুণী বুলিয়ে নিলাম। কোট পরে নিলাম।

আধ গেলাস হুইস্কি খেয়ে নিলাম। বুকপেট জ্বালিয়ে দিল কিন্তু ভাল লাগল।

ভাল করে মুখ মুছে, ইভের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ইভ তোয়ালে, স্পঞ্জ, অ্যাপ্রন, টুপী ডেস্কের নীচের টানাতে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিল। টেপ বন্ধ হয়ে গেল।

দুঃখিত রায়ান। তোমাকে অনেকক্ষণ বসতে হল—সহাস্যে তার পাশে বসলাম,—আরেকটু হুইস্কি চলবে নাকি রায়ান?

দাও। রায়ান বলল, তুমি আজকাল বড্ড বেশী কাজ করছ। ও ভাল কথা, তোমার স্ত্রীকে দেখলাম।

আমি বললাম—ও তাই নাকি? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মিসেস উইন্টার্স ভীষণ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঝড় বৃষ্টিতে ঐ রকম গতিতে গাড়ি চালালে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—আরে না, না, ওর সব রাস্তা ঘাট জানা। ভয়ের কিছু নেই।

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বললাম—বাইল্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেসের খবর কিছু জান?

জানি বইকি, আমিও তো একজন ছোটখাট শেয়ার হোল্ডার। রায়ান উত্তর দিল।

আমার মনে হয় ওরা বাজার ধরে নেবে। তুমি আমি যদি—

আমার কথায় ছেদ পড়ল একটা টেলিফোন বেজে ওঠাতে। চমকে উঠলাম আমি। রায়ানকে বসতে বলে আমি ফোনের কাছে এগিয়ে এলাম। ইভ বলল—মিসেস এলিস ফোন করছেন।

হঠাৎ করে ভেস্তালের মুখটা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ফোনে মিসেস এলিসের গলা—মিঃ উইন্টার্স? মিস ডোলানের কাছ থেকে জানলাম ভেস্তাল আধঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, অথচ এখনও এখানে আসে নি।

দেখলাম ব্ল্যাকস্টেন এদিকে তাকিয়ে আছে, আমাদের কথা শুনছে।

আমি মিসেস এলিসকে বললাম—দেখুন, হয়ত আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে, এখনি হয়ত পৌঁছে যাবে। আমি এখন খুব ব্যস্ত। কিছু মনে করবেন না, পরে না হয় ফোন করব। ছাড়ছি।

রায়ানের উদ্দেশ্যে বললাম—যতসব ঝামেলা। মিসেস এলিসের ওখানে পৌঁছতে দেরী হচ্ছে দেখে ওরা আশঙ্কা করছে যদি ওর কোন বিপদ হয়ে থাকে।

আরে বাবা, ও মত পাল্টে সিনেমাতেও চলে যেতে পারে।

ব্ল্যাকস্টেন আমার কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল—শেড্ রাস্তাটা খুব খারাপ। তাছাড়া উনি যা জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

আরে বাবা ঝুঁকি নেবার মেয়ে ভেস্তাল নয়। বোধহয় ও সিনেমাতেই গেছে। বাদ দাও ওসব ফালতু কথা। কাজ শুরু করা যাক। হিসাবটা একেবারে করে দেখাও।

আমার কথা শুনে ব্ল্যাকস্টেন হতাশ হয়ে বলল—তোমার বউ, তুমিই বোঝ।

তারপর আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনাতে কাটালাম। কুড়ি মিনিট বাদে আবার ফোন এল।

ফোন ধরলাম, লেফটেন্যান্ট লেগোর কণ্ঠস্বর। আমার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

বুঝলাম, রায়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

লেগো মিসেস এলিসের বাড়ি থেকে বলছে। চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, ভেস্তাল এখনও পৌঁছায় নি। লেগো আমাদের বাড়িতে আসবে বলল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন? আমি বরং এখনি যাচ্ছি।

ব্ল্যাকস্টেনকে বললাম—এখনি আমাদের বাড়িতে পুলিশ আসবে।

রায়ান চমকে উঠে বলল—পুলিস কেন?

—আজকের পার্টিতে ভেস্তালের বন্ধু লেফটেন্যান্ট লেগো আছে। ভেস্তাল এখনও পৌঁছায় নি।

রায়ান আমি দুঃখিত। আজকের মত আলোচনা থাক আমাদের। গাড়ি নিয়ে বরং একবার বেরিয়ে দেখি কি হল?

রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে যখন লাউঞ্জ থেকে বেরোচ্ছি, তখনি ইভের সামনাসামনি হলাম।

ইভের উদ্দেশ্যে বললাম—দেখি কি হল? মিস ডোলান আপনি পড়ার ঘরটা গুছিয়ে রাখবেন। অনেক কাগজপত্র ফাইল করা দরকার।

ইভ বুঝে গেল ডেস্কের মধ্যে রাখা সব জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

আমি আস্তে করে বললাম—গাড়িটা ভিজে আছে, ব্যবস্থা করো।

।। চোদ্দ ।।

অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। জনা দশেক পুলিস অফিসার, জনা কুড়ি দমকল কর্মী, দুটো বড় সার্চ লাইট জ্বেলে ভেস্তালের প্রাণহীন দেহটা তুলে আনল।

ব্ল্যাকস্টেনের গাড়িতে আমি বসেছিলাম। আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। থর থর করে কাঁপছে। ভাবছি কোন ভুল করে ফেলেছি কিনা?

ইভও আমাদের পেছন পেছন এসেছিল। গাড়িটা যে কাদামাখা আর ভিজে গিয়েছিল, তা কেউ আর বুঝতে পারবে না। ইভ বেশ বুদ্ধিমতী বটে!

একসময় মিঃ লেগো গাড়ির সামনে এসে বলল—ভেস্তালের দেহ পাওয়া গেছে। আমাকে বাড়ি চলে যেতে বলল।

আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় ব্ল্যাকস্টেনের দিকে তার নজর পড়াতে জিজ্ঞাসা করল—ইনি কে?

ইনি রায়ান ব্ল্যাকস্টেন, আমার এজেন্ট। রাতে ইনিই আমার সঙ্গে ছিলেন।—কথাটা বলে নিজেকে ধিক্কার জানালাম। গাল বাড়িয়ে চড় খাবার কোন দরকার ছিল না। এতে তো সন্দেহ জন্মাতে পারে।

মিঃ লেগো আগামীকাল সকালবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করবে, জানাল। তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি ব্ল্যাকস্টেনের গাড়িতেই বাড়ি ফিরে এলাম। ব্ল্যাকস্টেন আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল।

পড়ার ঘরে ফিরে এসে খানিকটা হুইস্কি গলাধঃকরণ করলাম। সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

ইভ এল। দরজা বন্ধ করে দেবার পর—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, সব ঠিকমত হয়েছে তো?

হ্যাঁ, সব ঠিকমতই হয়েছে। চেয়ারের উপর চোঙাটা বসিয়ে তার উপর তোমার কোট চাপিয়ে দিয়ে নকল হাতটার মধ্যে একটা সিগারেট গুঁজে দিলাম। দশ মিনিট পরেই অর্গিসকে ডেকে পাঠালাম। পড়ার ঘর খুলে আমি বেরিয়ে গেলাম। টেপরেকর্ডারের চিঠির ডিকটেশান শুনে অর্গিস মনে করল তুমি ঘরেই আছ। সে কফি আনল, টেবিলে রাখল। হাতলে রাখা তোমার নকল হাতটা সে দেখতে পেল। তারপর ব্ল্যাকস্টেন এলে অর্গিসকে নির্দেশ দিলাম লাউঞ্জে বসাবার জন্য।

আমিও দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বললাম—আধঘণ্টা তুমি ভীষণ ব্যস্ত। অর্গিস

যখন ঘরে এসেছিল আমি তোমার চেয়ার আগলে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্ল্যাকস্টেনকে বসতে বলে তার কাছ থেকে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সব—ব্যাপারটা ঠিক আছে তো?

আমি ওকে অভিবাদন জানালাম, ইভ বলল—এত নিখুঁতভাবে সব কাজগুলো হয়েছে ঘটনাটা যে সাজান, তা মনেই হবে না।

আমি ইভকে বললাম, তুমি অর্গিসকে খবরটা দাও। কেমন? বলতে বলতে প্রায় টলতে টলতে এসে ইভকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা মুক্ত হয়ে গেছি ইভ, বুঝেছ। আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করব কি বল?

ইভ বেশ রুক্ষভাবে আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল—তুমি আমার কাছ থেকে এখন দূরে থাক। এখনও আমরা নিরাপদ নই। মিঃ লেগো ভীষণ চতুর। উনি বুঝে ফেলতে পারেন যে পুরোটাই আমাদের ষড়যন্ত্র। তুমি আমার কাছে এখন এস না। বিপদ আরো বাড়বে।

আমি সরলভাবে বললাম—তুমি কমাসের মধ্যে আমাকে বিয়ে করবে ইভ?

তার চোখ দুটো স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠল,—তুমি পাগল হয়েছ? এর পরও বলছ তোমাকে বিয়ে করতে? তুমি আমাকে মুক্তি দাও। পুলিস যদি আমাদের সম্পর্ক জানতে পারে, তাহলে আইনের কাছে আমরা ধরা পড়ব। আমি খুব তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

রাগে আমার হাত পা জ্বালা করছে। বললাম—এত সহজে তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। আমাকে যদি বিয়ে না কর তাহলে আমি তো পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করব আর তোমাকেও ফাঁসাব।

তোমার হিম্মত যদি থাকে, তাহলে পুলিসের কাছে স্বীকার করবে তুমি খুন করেছ। পরিকল্পনা তোমার, আমি কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে ছিলাম। আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না শেড়—তফাতে থাক।

কথা শেষ করে শরীরে একটা পাক খাইয়ে দর্পিত ভঙ্গীতে ইভ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুঝে উঠতে পারলাম না ইভের হঠাৎ কি হল! ল্যারীর পরামর্শেই কি ওর মনটা ঘুরে গেল? যাক্, ইভকে পরে ঠিক হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব। এই মুহূর্তেই নিজের জন্য বেশী চিন্তা হচ্ছে।

কি বীভৎসভাবে মরতে হল ভেস্তালকে। কোন ভুল করিনি, তাহলে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে আমাকে প্রাণ দিতে হবে! ভাবতে গা-টা শিউরে উঠল। সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। প্রাতঃরাশ দেবার সময় লক্ষ্য করলাম দাস-দাসীরা সবাই কাঁদছে। মিঃ লেগো বলেছিল, এগারোটার সময় আসবে। কিন্তু তার আগমনের কোন লক্ষ্মণ তো দেখতে পাচ্ছি না। অফিসে বেরোব বলে ভাবছি, এমন সময় ফোন এল—ব্ল্যাকস্টেনের ফোন।

মিঃ লেগো এতক্ষণ তার অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কেবল বার বার এক কথা। কাল ন'টা থেকে দশটার সময় আমি কোথায় ছিলাম!

মিঃ উইন্টার্স বা মিস ডোলান এসময় কি করছিল—এরকম নানান প্রশ্ন।

আমি তাকে বলেছি, এটা নিছকই দুর্ঘটনা মাত্র কারণ মিসেস উইন্টার্স খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার কথা মানতে চাইছেন না।

ব্ল্যাকস্টেনের কথা শুনে আমার হাত পা কাঁপছে।

ব্ল্যাকস্টেন আবার বলল—উইন্টার্স, তোমাকে একটা কথা বলি গোপনে। আমার মনে হয় মিঃ লেগো তোমাকে পছন্দ করেন না।

গলার স্বর সংযত রেখে বললাম—স্বাভাবিক। মিঃ লেগো ভেস্তালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তুমি আমার হয়ে যা বলেছ, তা তো আর ভুল বল নি।

তুমি নিজে জান যে, ভেস্তালের মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর মিঃ লেগোর ধারণা হয়ত পাল্টে যাবে। তুমি সব সত্যি কথা বলেছ, এজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্ল্যাকস্টোন বলল—না, না, এটা তো আমার চোখে দেখা। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আমি সর্বদা তোমার পাশে থাকব।

ফোন রেখে দিয়ে ভাবলাম এবার অফিসে যাই।

লেফটেন্যান্ট লেগো আমাকে সন্দেহ করছে। লোকটার অনুমান শক্তি যে প্রখর তা মানতেই হবে। আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাগানের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আর তার ভেতরে একজন পুলিস অফিসার বসে রয়েছে। তার মানে এখন লেগো আসবে।

আমি তাড়াতাড়ি টেবিলে গিয়ে বসলাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে বসলাম। এমন ভাব দেখালাম যেন আমি কত ব্যস্ত।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখলাম মিঃ লেগো। বললাম—গুড মর্নিং, লেফটেন্যান্ট! আসুন! হুইস্কি ঢালি? গলার স্বর পুরোপুরি স্বাভাবিক।

মিঃ লেগো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল না, ধন্যবাদ।—

আমি নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, আমি ছ কোটি ডলারের মালিক। আমি একে ভয় পেতে যাব কেন? আমি এবারেও স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন করলাম—কিছু কিনারা করতে পারলেন নাকি? কি করে দুর্ঘটনাটা ঘটল?

শান্তস্বরে মিঃ লেগো বললেন—গাড়ির সামনের চাকাটা ফেটে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, মিঃ উইন্টার্স?

রাত নটা থেকে দশটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? কি করছিলেন?

আমি চটপট তাকে জানালাম—আমি এই ঘরেই ছিলাম। কয়েকটা চিঠির ডিকটেশান দিচ্ছিলাম।

পাল্টা প্রশ্ন—ডিকটেশান কি রেকর্ডে টেপ করছিলেন?

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেই জিজ্ঞাসা করলাম—এর সঙ্গে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক আছে?

মিঃ লেগো কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—এটা মোটেও দুর্ঘটনা নয়।

আমার রক্ত যেন তীব্র বেগে শিরা উপশিরা দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। বুকের মধ্যে ধক ধক করতে শুরু করল

—আপনি কি বলছেন? এটা দুর্ঘটনা নয় তো কি?

খুন। পরিকল্পিত খুন।

।। পনের ।।

কথাটা আমার মাথার মধ্যে যেন দড়াম দড়াম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছেন? স্পষ্ট করে বলুন!

মানে এটাই, ভেস্তালকে খুন করা হয়েছে।—দৃঢ়স্বরে মিঃ লেগো জানাল।

—আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন? জানতে চাইলাম।

সে কথা পরে হবে, তার আগে আপনার ডিকটেশান টেপ করা ক্যাসেটটা দিন। ওটা সাক্ষী হিসাবে আমার একান্ত দরকার।

আমি মৃদু হেসে বললাম—সরি মিঃ লেগো, অনেক গুলো ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি এতে রেকর্ড করা আছে। সেগুলো এখনও টাইপ করা হয় নি। অবশ্য একান্ত দরকার পড়লে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ভেস্তালের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দায়ী করছেন না?

প্রথম সন্দেহ স্বামীর উপরই এসে পড়ে, মৃদু হেসে মিঃ লেগো টেপটা বার করে তার উপর সই করে দিতে বলল।

তারপর মিঃ লেগো আমাকে জানাল যে, সে জানে অর্গিস আমাকে রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে এই ঘরে দেখেছে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদিও ভাল নয়।

তবুও অর্গিস সত্যি কথা বলছে এটা ভেবেই তিনি সরাসরি আমাকে দায়ী করতে পারছেন না।

আমি এবার চালাকি করে জিজ্ঞাসা করলাম, তা আপনি কি বলেন?

লেগোর চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরে পড়তে থাকে। কঠোর দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি টাকার লোভে তোমার স্ত্রীকে খুন করেছ।

আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। মৃত্যু যেন আমার গলা টিপে ধরবে এখনি। ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, আমি ভেস্তালকে খুন করি নি।

হ্যাঁ তুমিই খুন করেছ। মিঃ লেগোর গলার স্বরে হুঙ্কার। রুক্ষ্ম স্বরে বলল—তোমাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। মেয়েদের পটাতে তুমি পটু। আমি জানতাম তোমার সঙ্গে যখন ভেস্তালের পরিচয় হয়েছে, তখনই ওর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তুমি শেলীকে বিয়ে করনি, করেছ ওর টাকাকে।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে তার কথা শুনছি। একটু থেমে সে বলল—তুমি খুন করেছ, এ আমি নিশ্চিত। কিন্তু কি করে করলে বলতো?

ওর শেষ কথাটাতেই আমি মনে জোর ফিরে পেলাম। ভাবলাম, ও আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে আসল সত্য জানতে চাইছে। আমিও সংযত থাকবার চেষ্টা করে বললাম—আমি যে খুন করেছি তা প্রমাণ করুন আগে।

লেগো বিদ্রূপের স্বরে বলল—মিঃ উইন্টার্স, তুমি খুব বুদ্ধিমান। ভেস্তালকে তুমি খুন করেছ। তোমাকে আমি বঁড়শি দিয়ে গেঁথে তুলব। ভেস্তালের খুনী কে আমি বার করবই।

তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ—আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলাম।

তোমার গায়ে এখনই হাত তুলতে পারছি না আমি। কিন্তু শয়তানরা ভুল একটু অন্ততঃ করে থাকবে। তুমিও ইতিমধ্যে একটা বড় ধরনের ভুল করেছ।—

মুহূর্তে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সে বলতে থাকে—গাড়িটার সামনের ফাটা চাকাতে বালি ছিল। কিন্তু গাড়িটা যে রাস্তা ধরে গেছে, সেখানে বিন্দুমাত্র বালি ছিল না। আর ক্লিক রোডেও বালি নেই।

আমি বাজি লড়ে বলতে পারি যে, কদিন আগে যে টায়ার ফেটেছিল, তুমি সেটাই লাগিয়েছ। তখন লক্ষ্য করে দেখোনি টিউবে বালি লেগেছিল। এভাবে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে চাকাটার একটা নাট নেই। ক্লিক রোডে সেই চাকাটার একটা নাট পড়েছিল। এবার কি মনে হচ্ছে?

লেগোর কাহিনী শুনতে শুনতে আমি ভিতর থেকে দুমড়ে যাচ্ছি। লোকটা এখনই বোধহয় সব প্রমাণ করে দিল। তবুও বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে দাপটের সঙ্গে বললাম—বেশ, লেফটেন্যান্ট তোমার কাল্পনিক গল্পটা প্রমাণ করে দেখাও।

লেগো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল—মিঃ উইন্টার্স, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। প্রমাণ আমি করব, তবে আমার ধারণা তোমাকে এ কাজে কেউ সাহায্য করেছিল, সে কে? তুমি একই সঙ্গে দু জায়গায় রইলে কি করে সেটাই গোলমেলে।

একটু থেমে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—তবে কি ইভ ডোলান তোমাকে এ কাজে সাহায্য করেছে?

আমার শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। আমি কায়দা করে বললাম—ও করতে যাবে কেন? আমরা কেউই এ কাজ করি নি। আসলে তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

আমার কথাগুলো একবার প্রতিধ্বনিত করল লেগো—ও কেন করতে যাবে? তারপর ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল—আচ্ছা মিঃ উইন্টার্স,তুমি কি তোমার স্ত্রীর উইলের সম্পর্কে কিছু জান?

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম—না।

আমি প্রশ্ন করলাম—উইলের সঙ্গে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

লেগো বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল—মিস ডোলান বেশ বড় রকমের দাঁও মেরেছে ভেস্তালের কাছ থেকে, আর তাই তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিল।

আমি বললাম—তার মানে?

মানেটা এইরকম। ভেস্তাল নতুন উইল করে মিস ডোলানকে তিন কোটি ডলার আর এই বাড়িটা দিয়ে গেছে। আর তোমাকে টাকা দিতে চাইলে নাকি তুমি নিতে চাইতে না! তাই তোমার

ভাগে পড়েছে —মাত্র তিরিশ হাজার ডলার।

তার কাছ থেকে এ কথা শোনার পর মনে হল যেন আমার পায়ের তলায়—মাটি নেই। আমার মুখের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে লেগো কথাটা আবার বলল, অনেকটা যেন চিবিয়ে চিবিয়ে —হ্যাঁ, মাত্র ত্রিশ হাজার ডলার পেয়েছ তুমি।

আমি জোর গলায় বললাম—তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না।

লেফটেন্যান্ট আমার মুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল,—আমি একটুও মিথ্যে বলছি না, তোমার স্ত্রীর উইল আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি মুখের ভাব নির্বিকার রেখে হেসে বললাম—মিস ডোলান যদি অতটাকা পেয়ে থাকেন, তা তার সৌভাগ্যের কথা। আমার পক্ষে ত্রিশ হাজারই যথেষ্ট। তোমার যেমন খুশী, তেমনই ব্যাখ্যা কর।

আমার মনের ভিতরটা জ্বলে যেতে থাকে। ইভের এইজন্যই এত দর্প। ল্যারীর সঙ্গে পরামর্শ করেই সে আমাকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে। আমার সঙ্গে ও এতবড় বেইমানী করল! ওকে এত সহজে আমি ছাড়ব না।

লেগো এবার দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করল—এবার বল, তোমার দলে মিস ডোলান ছিল কিনা? বল, দুজনে জুটি করে একাজটা করোনি? বল উইন্টার্স? সত্যি কথা বল!

আমিও হার মানবার পাত্র নই। মুখে হাসি এনে বললাম—তোমার স্বপ্ন, মিঃ লেগো তুমি নিজেই বারে বারে উপভোগ কর। বলছি তো আমি খুন করি নি। সারা সন্ধ্যা আমি এখানে কাটিয়েছি। অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টেন সাক্ষী আছে।

দেখ উইন্টার্স চালাকি করবার চেষ্টা করো না। তোমরা দুজনে মিলে অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টেনকে বোকা বানিয়েছ। মনে রেখ, ফাঁসির দড়ি তোমার গলাতেই নাচছে। তোমাকে এত সহজে আমি ছাড়ব না।—কথাটা শেষ করে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেগো।

আমি জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার হাত পা কাঁপছে। মুখে ঘাম ভর্তি হয়ে রয়েছে।

এক পেগ হুইস্কি খেয়ে ইডেন এন্ডে চলে এলাম। একটা নিরিবিলি টেবিলে বসে আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। না, কোন ভুল আমার হয় নি। অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টেন যখন বলবে আমি বাড়িতে ছিলাম, তখন লেগো বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। জজসাহেব কেস বাতিল করে দেবে।

এবার আমাকে দেখতে হবে ডোলান কি বলে। খুন করবার আগে বলেছে—আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করব। আর কাজ হয়ে যাবার পরে বলছে, তুমি আমার ধারে কাছে আসবে না। আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আমার মনে হল ইভ দু-একদিনের মধ্যে পালাবে। তার আগে ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে দিতে হবে। নজর রাখতে হবে ওর গতিবিধির উপর। কিন্তু কি করে পাব ওর খবর? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জোসুয়া মরগ্যানের কথা মনে হল।

সোজা রুজভেল্ট বুলেভার্ডে চলে এলাম জোসুয়ার অফিসে। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হবে, নজর দারিতে ওস্তাদ। এ কাজের জন্য ওর অনেক লোক আছে। এক হাজার ডলার দেব বললাম। সব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে প্রথমে অর্গিসের সঙ্গে দেখা হল। ভেস্তাল মারা যাবার পর থেকে সে যেন আমাকে এড়িয়ে চলছিল।

সে আমার কাছে মাইনে চাইল। বাড়ির সকল চাকর-বাকর—প্রত্যেকেই নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে।

আমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম।—ঠিক আছে, পনের মিনিট পরে আমার ঘরে সবাইকে আসতে বলবে।

সকলে চলে যাচ্ছে শুনে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ইভকে কিছুটা শিক্ষা দিতে পারব। একা এই বাড়িতে আমি আর ইভ। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম—মিস ডোলান বেরিয়েছে

ছটার পর ফিরবে।

চাকর-বাকরের সংখ্যা তিরিশ জনা মতন হবে। যে যার বেতন নিয়ে চলে গেল। আমি তাদের সবার ঠিকানা নিয়ে নিলাম, যদি লেগোর কোন দরকার হয়।

সবার শেষে অর্গিস এল, টাকাটা হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—ম্যাডামকে, আপনি যেভাবে মারলেন, তার দাম আপনাকে একদিন দিতে হবে স্যার।

আমি রেগে গিয়ে মেজাজের সুরে বললাম—এই বুড়ো উল্লুক, ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবার আগে, মুখ বুজিয়ে পালা। যা ভাগ্—

আমার ধমক খেয়ে অর্গিস মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে কেউ নেই। বিশাল বাড়িটা যেন মরে গেল। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, আর বুকের ধক-ধক শব্দ ছাড়া কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না এতবড় বাড়িটা থেকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

জানলার পাশে গিয়ে শূন্য মন নিয়ে বসে নীচের লম্বা তকতকে সিঁড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম।

ইভ এখনি আসবে। আর তার সঙ্গে হবে আমার শেষ বোঝাপড়া।

।। ষোল ।।

ছটার সময় নয়, কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় বাড়ি ঢুকল ইভ। এতক্ষণ আমি কেবলি ভেবে গেছি ইভের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। সে ভেস্তালকে সহ্য করতে পারত না বলেই ঔষধ খাইয়ে অসুস্থ করে দিত। আসলে আমি ভেস্তালকে বিয়ে করবার পর ভেবে নিয়েছিল আমাকে দিয়ে সে তার ইচ্ছাটা পূর্ণ করাবে। আর এতদিন তাই সে আমার সঙ্গে অভিনয় করে নিজের কাজটা হাসিল করে নিয়েছে। আর এখন বেঁকে বসেছে। দেখা যাক বুদ্ধির দৌড় কার কতটা?

ইভ গ্যারেজে গাড়ি রেখে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিঃশব্দে লাউঞ্জে চলে এসে একটা সীটের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম।

ইভ সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় চারিদিক তাকাল। ও ঘরে বাঁদিকে চলে যেতেই আমি হলের দরজায় চাবি দিলাম। কান খাড়া রাখলাম।

নিজের ঘরে ঢুকে ও ঘণ্টা বাজাল। বুঝতে পারলাম এখন ও এবাড়ির মালিক! তাই ঘণ্টা বাজিয়ে সে ঝি-চাকরদের ডাকল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা অব্যবহার্য ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করছি।

বার বার ঘণ্টা বাজানোর পরে সে ইন্টারন্যাল ফোন তুলে ডায়াল করল ও পাশে ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল।

এবার সে বিরক্তির সঙ্গে সিঁড়ির থামটার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে হলের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ডাক দিল—অর্গিস! কেউ সাড়া দিল না।

ওর মুখটা তখন বেশ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ও অস্থির হয়ে উঠছে। একটা ভয় ক্রমশঃ গ্রাস করছে ওকে। তার এরকম পরিণতি দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

ইভ হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল—এখানে কে আছ? অর্গিস তুমি—তোমরা কোথায় গেলে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

নিস্তব্ধ সব।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর নিজের মনে বলল—সকলেই তাহলে কি একসঙ্গে চলে গেল! না, তা তো হতে পারে না। ভয় পেয়ে গেল ইভ।

দৌড়ে গিয়ে হলের দরজাটা একটানে খোলবার চেষ্টা করল। একটুও নড়ল না দরজাটা।

ইতিমধ্যে আমি ইভের খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়িয়েছি। কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখলাম, তারপর হেসে বললাম—দরজাটা টানাটানি করে কোন লাভ নেই। ওটা চাবি দেওয়া।

আতঙ্কে সে প্রায় চীৎকার করে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, তারপর দু-হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। বলল—তুমি ওরকম ভাবে আমাকে দেখছ কেন?

তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে তবুও হাসবার চেষ্টা করলাম—এরকম প্রাসাদতুল্য একটা বাড়ি, সঙ্গে তিন কোটি ডলার! কি রকম লাগছে বলতো ইভ?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল—আমাকে যদি কেউ ভালবেসে দান করে যায়, সেটা কি আমার দোষ?

আমি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললাম—তুমি আর ল্যারী দুজনে মিলে তো পরিকল্পনাটা বেশ করেছ। মিষ্টি কথায় বেশ কাজ হাসিল করে এখন আমাকে কাঁচকলা দেখাচ্ছো। এটা কিন্তু খুব গুণের কথা? এখন তুমি খুব খুশী তো?

ইভ তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিল—পরিকল্পনাটা তোমারই ছিল আর যা করেছ তুমিই করেছ। —মিঃ উইন্টার্স! তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, আমি এখনি সব গোছগাছ করে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আমি তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম—লেফটেন্যান্ট লেগো জেনে গেছে যে, আমরা দুজনে মিলে এই কাজটা করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ইভের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে। চীৎকার করে উঠল—তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই হোক কিন্তু লেগো ভীষণ চতুর। ফেটে যাওয়া চাকার মধ্যে তিনি বালি আবিষ্কার করেছেন, একটা হারিয়ে যাওয়া নাটক্লিক রোডে পেয়েছেন। তিনি সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করেছেন—ভেস্তালকে খুন করবার আসল পরিকল্পনাটা তোমার কিনা? কারণ তাঁর ধারণা উইলের জন্যই তুমি খুন করেছ।

ইভ আঁতকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গেল।—তুমি, তুমি মিথ্যা বলছ।

আমি হেসে বললাম, বিশ্বাস করতে হবে না। কিন্তু মিঃ লেগো যখন প্রমাণসহ হাজির হবে, তখন সামাল দিও। তোমার ল্যারী তখন তোমার কাছে থাকবে তো? বলতে বলতে ধীর পায়ে আমি ইভের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ইভ দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সভয়ে বলে উঠল—খবরদার আমার দিকে এগোবে না।

আমি গর্জন করে বলে উঠলাম—দাঁড়াও, তোমার এই ব্যবহারের মাসুল দিতেই হবে। একটা কাজ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তোমার নরম সরু গলাটা আমার এই লৌহ কঠিন হাত দিয়ে শুধুমাত্র একটু চাপ দেব। তারপর তুমি কেবল একটা লাশে পরিণত হবে। তুমি যাতে আর অন্য কোন পুরুষকে ধোঁকা না দিতে পার, সেজন্য এটুকু তো আমায় করতেই হবে।

আচমকা ইভ একটা লাফ দিয়ে দু-হাতে আমার বুকে ধাক্কা মেরে দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর পিছনে ছুটলাম।

ভেস্তালের পড়ার ঘরে বড় ডেস্কটার একপাশে ইভ আর এক পাশে আমি।

ইভ গর্জন করে উঠল—আমার কাছে আসবার চেষ্টা করবে না।

আমি হেসে বললাম—তোমাকে একটু আদর করব। বলে ধীরে ধীরে তার দিকে এগোলাম।

চট করে ড্রয়ারের ভেতর থেকে ৩৮ বোরের একটা পিস্তল বার করে আমার বুক লক্ষ্য করে তাক করল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এসো। আদর করবে এস—বিদ্রূপের সুরে বলল ইভ।

—তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, ধাপ্পা দিয়েছি শেড্। আমি শুধুমাত্র তোমাকে দিয়ে ভেস্তালকে খুন করাবার মতলবে ছিলাম।

তোমার সঙ্গে যখন শুয়েছি, প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে ঘেন্না করেছি। সব মুখ বুজে সহ্য করে গেছি! দামও দিতে হয়েছে তার জন্য। এখন আমি সব পেয়ে গেছি। এবার তুমি এখনি এ বাড়ি থেকে বেরোও।

আমি অবস্থা ভাল নয় বুঝে, পিছু হটলাম। তাকে শাসালাম—তোমার সুখের জীবন আমি ভেঙ্গে তছনছ করে দেব।

ইভও ভয় না পেয়ে জবাব দিল—তুমি এখান থেকে না গেলে এখনি গুলি চালাব।

আমি মৃদু হেসে বললাম—শুভরাত্রি ইভ। সারারাত ধরে একা এই বাড়িতে ভেস্তালের প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপ কর।

জ্যাকের বারে চলে এলাম। রাত বেশ অনেক হয়েছে। তিন পেগ হুইস্কি শেষ করে চতুর্থটার জন্য কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল।

শেড্ ডার্লিং—! চমকে পিছন ফিরে তাকালাম পাশের দিকে। তার দিকে তাকাতে অনেক পুরান স্মৃতি মনে এল।

ছবির মত অনেকগুলো দৃশ্য, অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ভেস্তালের আগে সে ছিল আমার সাথী, ভেস্তালের সঙ্গে বিয়ের আগের রাতও যার সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলাম, সেই গ্লোরির দেখা পেলাম আজ কতদিন পরে।

প্রায় ষোল মাস আমি তার কোন খবর রাখি নি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—গ্লোরি, কি খবর তোমার, কেমন আছ?

সে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল—মনে হচ্ছে খুশী হও নি তুমি?

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আনন্দের সঙ্গে বললাম—আমি একশবার খুশী হয়েছি। তা তুমি এখানে কেন?

গ্লোরি মুচকি হেসে জানাল—আমি ভেবেছিলাম কোন রাজকুমার আমাকে ডেকে নিতে আসবে। কিন্তু কেউ এল না, বোধহয় আর আসবেও না—তার গলায় শ্লেষের সুর।

আমি ওর গালে টোকা মেরে আদুরে সুরে বললাম—কে বলল, আসবে না? এই তো আমি এসেছি। চল, আমরা কোন নিরাপদ আশ্রয়ে যাই।

গ্লোরি আমার কথা শুনে খুব খুশী হল। বলল—আমার ফ্ল্যাটে চল। তোমার তো গাড়ি আছে?

গাড়ি চালাতে চালাতে বললাম—তোমাকে খুব মিস করেছি। গ্লোরি—এখন কি করছ?

না, কিছু না। গ্লোরি হেসে বলল—তোমরা যখন ভেনিসে হনিমুন করছিলে, আমি তখন ফ্লোরিডাতে একজন সুন্দর বৃদ্ধের সঙ্গে দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম। বেশ ভালই কাটছিল, হঠাৎ কোথা থেকে বুড়োর স্ত্রী এসে তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একসময়ে সে আঙুল দিয়ে স্থান নির্দেশ করে বলল—বাঁ দিকে ঘোরাও। ব্যাস এখানেই গাড়ি থামাও। আমি এখানে নামছি। তুমি পিছন দিকে গাড়িটা পার্ক করো।

আমি লিফটে করে সোজা চলে গেলাম গ্লোরির ফ্ল্যাটে।

গ্লোরি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ঘরটা বেশ ছোট কিন্তু সাজানো গোছান। গ্লোরির ঠোঁটে মৃদু হাসি তাকে বেশ মোহময়ী করে তুলেছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে গ্লোরিকে। আমি আসবার আগেই ও নিজেকে অন্য পোষাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছিল। হলদে সিল্কের গাউনে বেশ ভালই লাগছে।

আমি তার কাছে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে গ্লোরির কোমরটা বেড় দিয়ে ধরে আমার শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমু দিলাম। বললাম—তুমি জান না আমার স্ত্রী মারা গেছে?

হ্যাঁ, খবরের কাগজ থেকে জেনেছি।—বলে গ্লোরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল—তাহলে তোমার স্ত্রীর টাকার মালিক তো এখন তুমি?

সবটা নয়, ডার্লিং। বেশীর ভাগটা গেছে অন্যের দখলে। যাক্ এখন বাদ দাও এসব কথা। তার চেয়ে বরং আমরা মহৎ কাজে লিপ্ত হই, এস।

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময় গ্লোরিকে বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছিল। ও যা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করছিল, তাতে অকালে বুড়ি হওয়া তো স্বাভাবিক।

গ্লোরি জিজ্ঞাসা করল—এতদিন কোন্ রূপসীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে? শেড্ ডার্লিং! আমি তো বাপু সতীপনা করি না, তা তো তুমি জান?

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ ভেস্তালের সেক্রেটারী। কটা মাস ওর সঙ্গ পেয়ে কামোত্তেজনা মেটাবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু এখন যদিও আর কোন সম্পর্ক নেই।

গ্লোরি বলল—একসময় তুমি মেয়েগুলোকে নাচাতে, আর এই প্রথম তুমি একটা মেয়ের কাছে হেরে গেলে তাই তো?—তার কথায় ব্যঙ্গের সুর।

আমার মুখে শুকনো হাসি—তুমি দেখছি জ্যোতিষি হয়ে উঠেছো!

শেড্, আমি নিজেও পুরুষদের কাছ থেকে তাক বুঝে পালাতে অভ্যস্ত ছিলাম, এখন তারা আগে পালিয়ে যায়।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—যৌবন তো যায়, সুন্দরীও নই আমি, তবুও তুমি আমার সঙ্গ পাবার জন্য উদগ্রীব।

জান শেড্, গতরাতে তুমি ভীষণ নিষ্ঠুরের মত আমাকে পীড়ন করেছ। তোমার চাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমার দেহের আর ক্ষমতা ছিল না। মনটা যদিও তৃপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু তুমি আমাকে কাল প্রায় মেরে ফেলছিলে।

আমি হাসলাম।

একটু থেমে সে আবার বলল—আচ্ছা, মেয়েটা কি খুব সুন্দরী, তবে ওর গলা শুনে মনে হল—কড়া ধাতের মেয়ে।

তার দ্বিতীয় কথাটায় আমি চমকে উঠলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে গ্লোরির দিকে তাকালাম। তুমি ওর কথা শুনলে কখন?

গ্লোরি সরলভাবে উত্তর দিল—টেলিফোনে শুনেছি। মিয়ামী থেকে ফিরে মনে হল তোমার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

আমার ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল।—ইভ তো আমাকে কিছু বলেনি। চীৎকার করে বললাম—তুমি কখন ফোন করেছিলে?

পরশু ফোন করেছিলাম। তখন রাত নটা কুড়ি হবে। মেয়েটি ফোন ধরেছিল। তুমি বাইরে গেছ জানিয়ে সে ফোনটা নামিয়ে রাখল। অথচ আমি তোমার গলা—

ওর কথা শেষ হতে না হতেই এক লাফে গিয়ে ওকে খামচে ধরলাম। আমার কোন কথা তখন তুমি শুনতে পেয়েছিলে?

দুঃখিত শেড্। কথাটা তোমাকে এতটা বিচলিত করবে তা ভাবিনি। সে ভয় পেয়ে বলল—শেড্ লাগছে আমায় ছাড়।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—চোপরাও। টেলিফোনে তুমি কি শুনেছিলে বল?

ও তোতলাতে তোতলাতে বলল—তুমি চিঠি ডিকটেট করছিলে। কোনওয়ে সিমেন্ট—এরকম জাতীয় ব্যবসার কোন বিষয়ে। আর উত্তর দেবার সময় ঐ মেয়েটির গলা বেশ দৃঢ় অথচ বিচলিত শোনাচ্ছিল।

ওকে আমি ছেড়ে দিলাম। হাত-পা ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে যাচ্ছে। কাঁপছিল আমার সারা শরীর। গ্লোরি আবার বলল—শেড় কি হল তোমার? আমি কোন অপরাধ করে ফেলেছি? রাগের চোটে আমার মুখের ভাষা নোংরা হয়ে গেল। কি করেছিস হারামজাদি? সেই সময় ভেস্তাল আমার হাতে খুন হচ্ছে। দাঁত কড়মড় করে গ্লোরির হতভম্ব মুখের মধ্যে এক ঘুঁষি লাগালাম। অতর্কিত আক্রমণে গ্লোরি মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে এলাম।

।। সতের ।।

রুজভেল্ট বুলেভার্ড জন সমাগমে মুখরিত। ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে আমি একটা বুথ থেকে জোসুয়া মরগ্যানকে ফোন করলাম। তখন সকাল সাড়ে নটা হবে।

জোসুয়া মরগ্যান জানাল—মিস ইভ এখন পামবীচ হোটেলের একশ উনষাট নম্বর ঘরে রয়েছে। আপনি চলে যাবার পরই ও এখানে চলে আসে সঙ্গে বেশ বড় একটা সুটকেসও রয়েছে।

আমি মরগ্যানকে বললাম—আরো খবর নিতে।

এবার আমি ফোন রেখে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম পামবীচ হোটেলে। দরজায় টোকা দিতেই বাঁজখাই গলায় প্রশ্ন এল—কে?

প্রত্যুত্তরে গম্ভীর গলায় বললাম— টেলিগ্রাম। মিস।

সে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আলতো ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমাকে দেখে ইভ সভয়ে পিছিয়ে গেল, ভয়ে মুখখানা শক্ত কাঠ।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তোমার বোকামীর জন্য আসতে হল।

অবাক হয়ে ইভ তাকিয়ে রইল।

তুমি আমাকে বলো নি কেন— যে আমার ফোন এসেছিল সেই রাতে?

তোতলাতে তোতলাতে ইভ বলল—আ-আ-আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

কি বোকামীর কাজ করেছিলে তুমি? ব্ল্যাকস্টেন আর অর্গিস দুজনে—নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল টেলিফোনের রিং আর তোমার উত্তর?

—তাতে কি হয়েছে? সকলেই জানে যে তুমি ব্যস্ত ছিলে আর তোমাকে বিরক্ত না করে কেউ, সেজন্যই বলেছি বাইরে গেছ।

তার কথা শুনে মনে হল যেন একটা ঘুঁষি মেরে মুখটা ফাটিয়ে দিই। নিজেকে সংযত করে নিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—সকলে জানে যে আমার চিঠির ডিকটেশান গুলো ঐ মুহূর্তে টেপ হচ্ছিল, সবাই টেলিফোনের কথা শুনেছে, তাহলে তোমার টেলিফোনের কথা বলাটা নিশ্চয়ই টেপ হয়ে থাকবে। কিন্তু মিঃ লেগো টেপ শুনে দেখবে তোমার গলাটা রেকর্ড হয়নি। তখন সবাই এটা বুঝতে পারবে, রেকর্ডটা পূর্বে করা হয়েছে ও খুনটাও পূর্ব পরিকল্পিত।

ব্যাপারটা বুঝে ইভ বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল—তাহলে এখন কি হবে?

সময় মতো যদি আমাকে বলতে, কিছু অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা করতাম—একটু থেমে থেমে আবার বললাম—আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়।? পুলিশ তো অপরাধীদের খুঁজে বার করে ঠিক।

আমি তোমাকে নিয়ে যেখানে যাব, সেখানে পুলিশ আমাদের হদিশ খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমি জানতে চাই—তুমি কি যাবে আমার—

হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ইভের চোখদুটো সাদা কাগজের মত লাগছিল।

আমি তাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে নিয়ে যাব বলে চলে গেলাম।

ফিরে এসে দেখলাম পাখী পালিয়েছে। যদিও আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, অবিশ্যি সামান্য। রাগে শরীরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফোনে জোসুয়া মরগ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম—আমার চলে যাবার পর ইভ ল্যারী গ্রাঞ্জারকে ফোন করেছিল আর আজ দুপুর আড়াইটার সময় সমুদ্রের বাইরের কুঁড়ে ঘরে দুজনে দেখা করবে।

আমি মরগ্যানকে ওর লোকজন তুলে নিতে বললাম। পারিশ্রমিকের জন্যে আমার সঙ্গে বাড়িতে যোগাযোগ করতে বললাম।

এখন বাজে সাড়ে বারোটা। আমার করণীয় কাজগুলো পর পর সাজিয়ে নিলাম।

প্রথমে আটলান্টিক হোটেলে কানেকশান চাইলাম।—হ্যালো, আটলান্টিক? শুনুন, মিঃ গ্রাঞ্জারকে একটা খবর দিতে হবে—

কি?

উনি এইমাত্র বেরিয়েছেন। ঠিক আছে, খবরটা লিখে নিন। উনি এলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

—হ্যাঁ।

লিখে নিন—ল্যারী গ্রাঞ্জার, দেরী হয়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটার আগে দেখা করতে যেও না।—ইভ।

আচ্ছা , ধন্যবাদ।

।। আঠারো ।।

মিঃ অ্যাটর্নী, এই পর্যন্ত শুনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কেন আমার স্ত্রীকে খুন করলাম। আসলে, কেবলমাত্র টাকার জন্যে নয়, ইভকে পাবার জন্য আমি একাজ করলাম। ইভের প্রেম এজন্য দায়ী। বেশ বুদ্ধি করে খুনের মতলবটা ইভ আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ইভ হল আসল খুনী।

ইভ ভীষণ চালাক আর নোংরা মেয়ে। আমি কুঁড়ে ঘরটাতে পৌঁছোলাম, দেখলাম—ইভ ল্যারীর অপেক্ষায় তৈরী হয়েই আছে।

ইভ আমাকে দেখতে পেয়েই নাগিনীর মত ফুঁসে উঠল তবুও হাসবার চেষ্টা করে বললাম—হ্যালো ইভ। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আমাদের পালাবার পথ বন্ধ।

ইভ ৩৮ বোরের রিভলভারটা আমার দিকে তাক করে বলল—তুমি পারবে না ঠিকই, কিন্তু আমি পালাতে পারব।

আমি তার দিকে এগোতেই সে বলল—এগিও না, তাহলে গুলি করব। আমি জানতাম যে, ল্যারীর দেখা পেলে সে আমাকে গুলি করে মারবে।

আমিও মনে মনে ফন্দি আঁটছিলাম। ইভ আমার কাছ থেকে ষোল সতের ফুট দূরে। এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে আঘাত করা যাবে না। ভেতরে ভেতরে ও অস্থির হয়ে উঠছিল ল্যারীর জন্য। সুযোগটা কাজে লাগালাম।

কই, করো গুলি—বলে ইভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। জানলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম—ওই যে, তোমার প্রেমিক মহাশয় এসে পড়েছে।

ইভ যেই ঘাড় ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়েছে আমি বাঘের মত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রিভলভারটা ঘরের কোণে ছিটকে গেল। ওর গায়ে অসম্ভব শক্তি। ওর সুন্দর গলাটা চেপে ধরতে চাইলাম।

দু হাঁটু দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে ওর বুকে বসে ওর গলাটা টিপে ধরলাম। কোটর থেকে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। ডান নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল একফোঁটা রক্ত। মুহূর্তের মধ্যে নিস্পন্দ, নিথর হয়ে দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সমাপ্তির আগে

শেড্‌ দেখল দূরে ফোর্ড গাড়িটা আসছে। একসময় ঘরের কাছাকাছি এসে গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ হল, এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ পাচ্ছে ও। শেড্‌ রেঞ্জটাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

ল্যারী দরজা খুলে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে শেড্‌ ভারী রেঞ্জটা দিয়ে আঘাত করল। মাথার ব্রহ্মতালুর উপর যেন আচমকা বজ্রপাত হল।

ল্যারী লুটিয়ে বসে পড়ল। কথা বলার শেষ চেষ্টাও তার হল না।

শেড্‌ তাকে পরীক্ষা করে বুঝল—একদম শেষ।

শেড়ের এদিককার কাজটা শেষ হল। ল্যারীর পকেট হাতড়ে গাড়ির লাইসেন্স, ন্যাতানো ব্যাগ, সিগারেট কেস, রুমাল, দেশলাই আর বিশ ডলারের একটা নোট পেল। সেগুলো টেবিলের উপর রেখে ল্যারীর পোষাকগুলো সে পরে নিল আর তার পোষাকগুলো ল্যারীকে পরিয়ে দিয়ে সে টেবিলের উপর থেকে জিনিসগুলো হস্তগত করল।

পালাবার শেষ চেষ্টায় সে ল্যারীর মৃতদেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে বুইক গাড়ির দরজা খুলে দেহটাকে শুইয়ে দিল পিছনের সীটে। কুঁড়েঘরে ফিরে গিয়ে টেপের চাকতি দুটো নিয়ে নিল। ইভের স্যুটকেসের দিকে তার নজর পড়ল। খুলে তার মধ্যে দেখতে পেল ভেস্তালের গহনার বাক্স। সব শুদ্ধ নিয়ে গাড়িতে তুলল।

শেড়ের মুখে এবার বিজয়ীর কঠিন হাসি। সে ল্যারীর বুইকটা নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হল। হেডলাইটের বদলে ছোট লাইট দিয়েই সে রাস্তার অন্ধকার দূর করেছে।

আবার সেই ক্রিকরোড, সেই বেড়া। শেড্ বেড়ার কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে নিজের স্যুটকেসটা, পার্সেল আর গয়নার বাক্সটা ঘাসের মধ্যে নামিয়ে আনল। এগুলো সবই জেলা অ্যাটর্নী জন হ্যারিন্টনের কাছে পাঠাতে হবে।

এবার সে বুইক গাড়িটাকে খাদের ধারে এনে ফাঁকের মুখে গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ির দরজা খুলে হাত দিয়ে ক্লাচ্ পেডাল চেপে ধরল। গিয়ার পাল্টে তিনের ঘরে তুলে দিল। ইঞ্জিন পুরো গতি না নেওয়া পর্যন্ত সে নাকটা পুরো টেনে রাখল। তারপর কটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ক্লাচ্ ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিল।

একটা ভীষণ ঝাঁকুনি, তারপর গাড়িটা সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির খোলা দরজাটা ঘুরে এসে শেড়ের কাঁধে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল।

ধাক্কাতে ছিটকে দুপাক গড়িয়ে গেল শেড্। আর গাড়িটা সাঁ-সাঁ করে তার পাশ দিয়ে যেন উড়তে উড়তে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। খাদের অতলে। আর তখনি হঠাৎ ভয়ঙ্কর আতঙ্কে তার শরীরটা হিম হয়ে গেল। সে যে নিজেই খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে সে ঘাস মাটিকেই মুঠো করে ধরল। মাটিতে আঙুল গুলো শক্ত করে গেঁথে দিল।

ওদিকে বুইকটা খাদের মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে আগুন ধরে গেল। তার ধাক্কায় পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা অন্ধ, দুর্দমনীয় আতঙ্কে মরিয়া হয়ে সে অন্য কিছু ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। হাতের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। দেহটা কতক্ষণ ধরে আর ঝুলে থাকবে! শেষ চেষ্টায় সে ঝাঁকুনি দিয়ে দেহটা ওপরে তোলবার চেষ্টা করল। ডান হাঁটুটাও তুলতে পারল। কিন্তু তার হাতের চাপে মাটির চাবড়া আলগা হতে হতে শেষ পর্যন্ত খসে গেল। শেড্ হাত বাড়িয়ে আরেক জায়গা ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। দেহটা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে পাড়ি দিল।

নক্! নক্! হু ইজ দেয়ার

।। এক ।।

তাড়াতাড়ি এদিকে এসে আমাদেরকে সাহায্য কর। দূরে মাঠের মধ্যে গাছপালা ভর্তি ঘন বন। তার মধ্যে একদল শূকর ঘোরাফেরা করছে। মিশচারের করুণ চীৎকারটা অ্যালেক্সি শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হওয়াতে অ্যালেক্সি হতভম্ব হয়ে গেছিল। পুলিশের লোকেরা, ভীষণই ভয়ঙ্কর তারা, কখন যে ঘাপটি মেরে সেখানে এসে গেয়েছিল কেউ বুঝতে পারেনি। এই চিৎকার চেঁচামেচিতে অ্যালেক্সির ঘোর কেটে গেল এবং সে সময় নষ্ট না করে উল্টো দিকে দৌড়তে লাগল।

ফিফ্‌থ এভিনিউ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সে সিক্‌সটি নাইনথ্ স্ট্রীটে গিয়ে পৌঁছালো। তারপর সে দুর্ভাবনা করতে লাগল ওলেগ সম্বন্ধে। ভাবল ওলেগ লোকটা কোথায় গেল? সে একটা ল্যাম্পপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ওলেগ ছাড়াও সে পুলিশকে ভয় পাচ্ছে। মিশচার অ্যালেক্সিকে যে উপদেশ দিয়েছিল তার মূল বিষয়টি ছিল পুলিশের খপ্পর থেকে যতটা পারা যায় নিজেকে দূরে রাখা।

সিক্‌সটি নাইনথ্ স্ট্রীটের পথ দিয়ে প্রচুর লোক চুপচাপ যাতায়াত করছে আর প্রচুর গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিউইয়র্কের রাস্তাগুলোর পথচারীরা তাদের গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করে চলতে থাকে তাদের আশেপাশে কি হল বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারা অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। অ্যালেক্সি যে একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখছে আর ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে সেদিকে কেউ লক্ষ্যই করছে না। এদিকে অ্যালেক্সির মাথায় অনেক চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। মিশচার আহত হয়ে পড়ে আছে সে পালাতে পারবে না আর নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, তাহলে কি হবে? এই সব চিন্তায় সে যখন ডুবে আছে ঠিক তখনই একটা প্লি-মাইথ গাড়ি অ্যালেক্সির সামনে দাঁড়ালো অ্যালেক্সির অজান্তে। সে কিছু না দেখেই দৌড়বার জন্য তৈরী হল। কিন্তু তার আগেই বিরাট দেহের মোষের ন্যায় দেখতে একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে তার পথ আটকালো। যদিও অ্যালেক্সির ভয় দূর হল না, তবে সে নিশ্চিত বুঝতে পারল এ ওলেগ ছাড়া আর কেউ হবে না। যদিও অ্যালেক্সি লোকটিকে অনেক দূর থেকে দেখল এবং এই প্রথম দেখল তবু মিশ্চারের বিবরণের সঙ্গে মেলালে লোকটির সঙ্গে ওলেগ-এর অনেক সাদৃশ্য ছিল।

অ্যালেক্সি নিশ্চিত হবার জন্য ভয়ে ভয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নিশ্চয়ই ওলেগ—লোকটা অ্যালেক্সির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথা সামান্য একটু নেড়ে বলল, দৌড়ে পালালে কেন? এর মানে কি?

অ্যালেক্সি তাড়াতাড়ি বলল মিশচারকে মাঠে ওরা ধরে ফেলেছে। একটু মারামারি হয়েছে তাতে মিশচার আহত হয়েছে কিন্তু কতটা হয়েছে তা বুঝতে পারিনি। মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে দেখেছি নিশ্চয়ই মাথা ফেটে গেছে। তারপর অ্যালেক্সি ওলেগের হাত ধরে অনুরোধ করে বলল, ওখানে সব সাদা পোশাক পরা পুলিশ এসেছে এবং আরো নিশ্চয়ই এসে গেছে, তারা মিশচারকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠাবে। কিন্তু মিশচারকে কোথায় কোন্ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে তা আমাদের জানতেই হবে। আপনি প্লিজ সেখানে চলে গিয়ে খোঁজ করুন। ওলেগ স্থির চোখে কিছুক্ষণ অ্যালেক্সিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, অ্যালেক্সি এই কাজটা করছে না কেন?

ওহ্! ছটফট করে উঠল অ্যালেক্সি। ওলেগ কি করে এমন বোকার মত কথা বলল তা সে ভাবতে পারছে না কারণ মিশচার যখন ওলেগকে নির্বাচন করেছে মিশচারের উপর অ্যালেক্সির ভীষণ বিশ্বাস কারণ মিশচার অ্যালেক্সির কর্মগুরু, শিক্ষক এমনকি অভিভাবকও বটে। কিন্তু এর মধ্যে যে কাউন্টার এসপিওনেজ থাকতে পারে ও তা ভাবেনি বোধহয়। মিশচারও এতটা ভাবেনি।

নইলে কোড ভাষায় ওরা যে সেন্ট্রাল পার্কে সন্ধে সাতটায় মিলিত হবে তা ওয়াশিংটনের গোয়েন্দা দপ্তর টের পাবে কি করে? মিশচারের মত সাবধানী মানুষও ধরা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অ্যালেক্সি ওলেগকে বলল, ওলেগ টেক্ কেয়ার অফ ইওর সেল্ফ্! তুমি চাওনা নিশ্চয়ই আমি ধরা পড়ে যাই। আই অ্যাম এজেন্ট ইন প্লেস। জাহাজের মত আমি ভেসে থাকতে পারি না আমাকে সাবমেরিনের মত ডুবে থাকতে হয়। আমার এখনও অনেক কাজ, আসল কাজই এখনও শেষ হয়নি। আমাকে ওরা মিশচারের সঙ্গে দেখেছে। ওরা আমাদের একদম বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। মেয়েদের পোশাক পরে পুলিশ যে হঠাৎ উদয় হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি কিন্তু তাই-ই ঘটেছে। আমাকে এখন নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এর পরে বাকী যা কাজ তুমি বোধ হয় জানো।

অ্যালেক্সি ঘোরের মধ্যে ছিল তাই সে ওলেগকে অনেকটা বসের মত নির্দেশ দিচ্ছিল। যদি সে ওলেগ-এর ওই ভীষণ মারকুটে মুখের দিকে তাকাত তাহলে ওর এই অনর্গল কথা বলা গ্রামফোন রেকর্ডের মতই ভেঙে খান খান হয়ে যেত।

ওলেগ শক্ত গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু—

ওলেগের কথা শেষ হবার আগেই চারদিক থেকে পুলিশের গাড়ির সাইরেন বেজে উঠল। ছোটাছুটি আর হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। রাস্তার লোকজন কিছু না বুঝেই বোকার মত ছুটতে শুরু করল।

অ্যালেক্সি এক ছুটে একটা বড় বাড়ির আড়ালে চলে গেল আর তার ছায়া দিয়ে এক পা দুপা করে এগোতে লাগলো। সে চিন্তা করল ওলেগকে নিয়ে ভাববার সময় নেই আর সময় নেই মিশচারকে নিয়েও। তার যা বলার ওলেগকে বলে দিয়েছে এবার দায়িত্ব ওলেগের। মিশচার থাকুক বা না থাকুক ওলেগ জাহান্নামে যাক্ ওর মিশন শেষ হয়নি। এখনও মাইক্রোফল্‌স্ নেওয়া হয়নি। ওটা ভীষণ জরুরী। ওর ভূত ভবিষ্যৎ বাঁচা না বাঁচা, উন্নতি—সব কিছু নির্ভর করছে ন্যাটোর সেই গোপন দলিলের উপর। চার্লস কেলসো কি পারবে? যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে কাজ হাসিল হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু তার আগেই যে কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল।

একটা ট্যাক্সি সামনে আসতেই সেটাকে থামিয়ে চটপট তাতে উঠে পড়ল অ্যালেক্সি। ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ি চালু করার আগে অ্যালেক্সির দিকে একপলক তাকালো। সে তখন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল তার মধ্যে এতটুকু উত্তেজনা নেই। অ্যালেক্সি ড্রাইভারকে ম্যাডিসন স্কোয়ার যেতে নির্দেশ দিল। সেই ফাঁকে অ্যালেক্সি ড্রাইভারের মুখটাও দেখে নিল। দেখল তাতে সন্দেহ করবার মত কিছু নেই।

মিশচার অ্যালেক্সিকে বলেছিল তোমাকে ঠিক আমেরিকানদের মত দেখতে। মিশচার ঠিকই বলেছিল কথায় বার্তায় হাবে ভাবে কেউ ধরতেই পারবেনা যে অ্যালেক্সি রাশিয়ান। কিন্তু মিশচার এও বলেছিল, বাট্ ইভ মাস্ট নট থিঙ্ক লাইক অ্যান আমেরিকান। ক্যাপিটালিস্টদের চিন্তা ভাবনা যেন তোমায় পেয়ে না বসে। এই আঠাশ বছরের জীবনে অ্যালেক্সি পুরোপুরি আমেরিকান হলেও সে তার জন্মভূমি রাশিয়ার কথা একটিবারের জন্যও ভোলেনি।

অ্যালেক্সির ঘোর কাটলো যখন ড্রাইভার বলল, ম্যাডিসন স্কোয়ার স্যার। হঠাৎ চমকে উঠে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে চটপট নেমে পড়ল। ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত পা চালিয়ে পার্ক এভিনিউয়ের দিকে এগোতে লাগল। সেখান থেকে আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিফ্‌টি থার্ড স্ট্রীট-এ পৌঁছে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটিও ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

অ্যালেক্সি এত জোরে পা চালাচ্ছিল যে আকাশ ছোঁয়া উঁচু উঁচু বাড়িগুলো ছায়াছবির মত তার পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছিল। শনিবার ছুটি তাই বিলাসী আমেরিকানরা জোড়ায় জোড়ায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। অ্যালেক্সি মাঝে মাঝে থেমে তার চারপাশ দেখে নিচ্ছিল। সে সন্দেহজনক কাউকে তখনও পর্যন্ত দেখতে পেল না। দুটো বড় বড় বাড়ি পেরিয়ে সে আবার একটা ট্যাক্সী নিল। সেকেন্ড এভিনিউ হয়ে সিক্সটি সিক্সথ্ স্ট্রীটে পৌঁছালো। যেখানে সোজাসুজি গেলে তার সময় লাগত মাত্র দশ মিনিট সেখানে সে সময় নিল এক ঘণ্টা। একজন সিক্রেট এজেন্ট হিসাবে ভালো ভাবে তার জানা আছে কিভাবে অদৃশ্য অনুসরণকারীকে ফাঁকি দিতে হয় তাই সে এমন চক্কর মেরে

গন্তব্যস্থলে পৌঁছালো।

আটটা কুড়ির সময় সে কেটির ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে জানে কেটি এই সময় ফ্ল্যাটে থাকে না। তারজন্য একটা ডুপ্লিকেট চাবি সে সব সময় সঙ্গে রাখে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে তক্ষুনি চাবি দিয়ে দরজা খুললো না। এলিভেটর নেমে গেলেও তা উঠে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যদি কোন অচেনা ব্যক্তি হঠাৎ এসে যায়।

এলিভেটর নেমে গেছে। সে চারিদিক তাকিয়ে দেখল, সেখানকার এপার্টমেন্টগুলো সত্যি সুন্দর। সে একটা সিগারেট ধরালো। তার হাতটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। তাহলে কী অ্যালেক্সি নার্ভাস ফীল করছে?

মিশচারও এই একই প্রশ্ন অ্যালেক্সিকে করেছিল সেন্ট্রাল পার্কে সেই ফ্ল্যাগপোলের নীচে দাঁড়িয়ে, তোমাকে যেন একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। কেন? তুমি ভয় পেও না, আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। তোমার ইন্‌ফরমেশন পেয়েই আমাকে আজই আসতে হল। তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ আমি কাছাকাছি থাকলে তুমি কিছুটা ভরসা পাবে। নর্থ অ্যাটলান্টিক অরগানাইজেশন-এর হেড কোয়ার্টার থেকে যে টপ সিকিউরিটি মেমোরেন্ডাম পেন্টাগনের কেন্দ্রীয় সংস্থায় পাঠিয়েছে সেই খবরটা তুমি চার্লস কেলসোর কাছ থেকে চেয়েছো—তাই তো?

অ্যালেক্সি সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়েছিল।

মিশচার বলেছিল, তুমি লিখেছো ওটা এখন শ্যানডন হাউসে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেলে ওটা শ্যানডন হাউসে আসে।

মিশচার জিজ্ঞাসা করেছিল, শ্যানডন হাউসের আসল কাজটা কি?

অ্যালেক্সি বলেছিল, শ্যানডন হাউসের আর এক নাম দ্য ব্রেইন। সুপার সুপার সিক্রেট ব্যাপার। সিকিউরিটি ব্যবস্থা ভীষণই সাংঘাতিক। মানুষ তো দূরের কথা একটা সূচও গলে বেরুতে পারবে না।

মিশচারকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বলল, তাহলে এত ভীষণ সিকিউরিটি ভেদ করে তুমি কী মেমোরেন্ডাম বের করতে পারবে? মিশচার বোধহয় অ্যালেক্সিকে পরীক্ষা করে দেখছিল।

অ্যালেক্সি জোর গলায় বলেছিল নিশ্চয়ই পারবো। চাক্‌ মানে চার্লস কেলসোর মগজ আমি বোধহয় ঠিক মতই ধোলাই করেছি। আমেরিকান বিগবসদের এই দাদাগিরি ও সহ্য করতে নারাজ। তারপর ন্যাটোর জন্য যে কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে সেটা অনেক আমেরিকানদের মত তারও অপছন্দ।

তাহলে তো খুবই ভালো—বলেছিল মিশচার।

হঠাৎ সিগারেটের ছ্যাঁকায় অ্যালেক্সির ঘোর কেটে গেল। সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেখল এলিভেটর পাঁচতলায় না থেমে সোজা উপরে উঠে গেছে।

অ্যালেক্সি একটু স্বস্তির শ্বাস ফেললো আর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কেটির দরজা চাবি ঘুরিয়ে খুললো। এখন তার নাম আর অ্যালেক্সি নয়। এখন ওর পরিচয় নীলে—হেনরিক নীলে। আর বন্ধুদের কাছে রিক্‌। এখন সে একজন প্রকৃত আমেরিকান। এই পরিচয় সমর্থনের জন্য সে যথেষ্ট কাগজপত্র তৈরী রেখেছে।

।। দুই ।।

নিউইয়র্ক শহর থেকে কিছুটা দূরে নিউ জারসীর শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ঠিক নীচে ছোট একটা হ্রদের পাশে অ্যাপলেটন গ্রাম। এই শ্যানডন হাউসটা হল শ্যানডন শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এই হাউসটি আয়তন এখন প্রায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থের দুই হাজার একরের মত। অবশ্য এটা ধীরে ধীরে হয়েছে একদিনে হয়নি। বৃদ্ধ সাইমন শ্যানডন ছিলেন একজন খামখেয়ালী মানুষ। এই বিশাল সম্পত্তির মোট মূল্য কম করে তিনশ কোটি ডলারের মত। তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি এই আশ্চর্য প্রতিষ্ঠানটির জন্য দান করে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম এখন ইনস্টিটিউট ফর অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ।

পাহাড় আর হ্রদ থাকার জন্য সাধারণ লোক এখানে এমনিতে আসতে পারত না। তার উপর

সাইমন সাহেব ছিলেন বড় বেশী সাবধানী মানুষ। তিনি মনে করতেন যেখানে যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি সংগৃহীত হয় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য পাহাড় আর হ্রদ বাদে সমস্ত এলাকা জুড়ে তিনি চীনের প্রাচীরের আড়ালে আরো একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আর সেই প্রাচীরের দেওয়ালের ভিতরেও ছিল রহস্যজনক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শ্যানডন হাউসটি শহর থেকে আসা রাস্তার সঙ্গে যেখানে যুক্ত হয়েছে সেখানে একটি মাত্র দরজা ছিল আর সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ ও প্রস্থান করা হয়। গাড়ি ভিতরে নিয়ে যাওয়া বারণ ছিল। গাড়ি গেটের বাইরে পার্ক করতে হয়। যারা এখানে কাজ করে তাদের দুর্গের মত একটা ছোট দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হয়। তার আগে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। দরজার বাইরে শান্ত্রীরা টমি গান হাতে সব সময় প্রহরারত। যাদের ভিতরে যাবার অনুমতিপত্র আছে তারা ভিতরে নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু তার আগে শান্ত্রীরা তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করবে। যদি তারা নিশ্চিত হয় তবে ভিতরে যেতে দেবে।

তবে যারা ভিতরে যায় তারা যে সবাই বাইরের লোক তা নয় কারণ এই শ্যানডন হাউস চত্বরে অসংখ্য আধুনিক ফ্ল্যাট গড়ে উঠেছে তারপর খেলাধুলোর জন্য বড় মাঠ আছে, সুইমিং পুল আছে, সিনেমা আছে।

তবে যে বাড়িটিতে যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্যরকম এবং ভীষণ কঠোর। সমস্ত বাড়িটাতে আধুনিক সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো আছে। কোন বিপদ হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা সাংকেতিক শব্দ সৃষ্টি করে নিরাপত্তা প্রহরীদের সতর্ক করে দেবে।

এই শ্যানডন হাউসে যারা কাজ করে তারাও রহস্যময়। বাইরে তাদের দেখা যায় না ও তাদের কেউ চেনেই না। তাদের পরিচয় দ্য ব্রেইন অর্থ মস্তিষ্ক নামে।

পেন্টাগন যখন এই সাইমন শ্যানডনের কথা জানল এবং তার মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হল তখন সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধান খুবই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল। দেশের সব বড় বড় বুদ্ধিজীবিদের থেকে সেরাদের বাছাই করে এখানে রাখা হয়েছে। তাদের মাইনের অঙ্কও বিশাল এবং সরকারী নিরাপত্তার মধ্যে তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাতে তারা সুখের জীবন ভোগ করে থাকে। এখন শ্যানডন হাউসের গুরুত্ব এত বেশী যে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে শ্যানডন হাউসের ছাড়পত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। বৃদ্ধ সাইমন শ্যানডন মারা গেছেন কিন্তু তাঁর স্বপ্নের তাজমহল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস শ্যানডনের বয়স নব্বই এর কোঠায় তিনি সরকারী মাসোহারায় সুখেই দিন কাটান।

এই শ্যানডন হাউসের সব থেকে ছোট বুদ্ধিজীবি হল এই চালর্স কেলসো। বিশেষ অনুমতি নিয়ে সে নিউইয়র্ক থেকে এখানে কাজ করতে আসে।

কিন্তু আজ শনিবার আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের মত ছিল না চার্লস কেলসোর কাছে। সে কিছুটা চিন্তিত ছিল। অফিসে ঠিক সময় মত এসেছে। যত সময় এগোচ্ছে তার চিন্তা আরো বাড়ছে। ভাবছে কাজটা সে করতে পারবে ত? ভাগ্য তাকে যদি আজকে একটু সাহায্য করে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। চার্লস কেলসো সবার সঙ্গে হল ঘরে হৈ চৈ করে নিল। সবাই আস্তে আস্তে বিদায় নিল। যখন ওর ধারে কাছে কেউ রইল না তখন খুব আস্তে আস্তে খাঁচার মত ঘরটার সামনে এল। ঘরটা দেখতে অনেকটা ব্যাঙ্কের সেফ্ এর মত এবং পুরো ঘরটা ইস্পাত দিয়ে তৈরী। দরজার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা 'কমপার্টমেন্ট ডি'; সমস্ত গোপনীয় তথ্যাদি এই ঘরটিতে মজুত রাখা হয়। এই ঘরে কোনো কাজ থাকলে এর চাবি সিকিউরিটি অফিসারের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়।

চালর্স কেলসো ঘরটির কাছে একটা ব্যাগ হাতে হাজির হতেই সেখানকার ডিউটি অফিসার ম্যাকলেহোস হাসি মুখে এগিয়ে আসে। লোকটি ভীষণই হাসিখুশী, কিন্তু আজ তাকে যেন একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

চালর্স কেলসোর একটু ভয় করছিল। তবু হাসি মুখে ম্যাকলেহোসকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

অনেক দিন ধরে এক সঙ্গে কাজ করায় নিরাপত্তার কঠিন নিয়মগুলো আলগা হয়ে এসেছে।

সবাই এখন চেনা হয়ে গেছে, এছাড়া চার্লসের সুন্দর ব্যবহার ম্যাকলেহোসকে মুগ্ধ করেছে তাই সে চার্লসকে একটু পছন্দ করে থাকে।

ম্যাকলেহোস চার্লসকে চাবিটি দিয়ে বলল, আজ আমার ছেলের জন্মদিন। বিকাল চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছানোর কথা ছিল।

চালর্স বলল, স্যরি, ভীষণই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি বোধহয় তোমার দেরী করে দিলাম, ঠিক আছে আমি বেশী সময় নেব না দুই মিনিটে কাজ শেষ করছি। ম্যাকলেহোস বলল, না না আপনি আপনার কাজ শেষ করুন আমার হাতে এখনও কিছু সময় আছে।

দরজায় চাবি ঢুকিয়ে চার্লস ইচ্ছে করেই খুলতে দেরী করছিল। ম্যাকলেহোসকে জিজ্ঞাসা করল তাহলে কালকে কে ডিউটিতে আসবে?

ম্যাকলেহোস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— সেটাই হয়েছে মুশকিল, কাল বার্নের ডিউটি আছে। কিন্তু সে একশো দুই টেম্পারেচারে আছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকেই আসতে হবে। সত্যি এক দিনের জন্যও যদি ছুটি পাওয়া যায়।

ম্যাকলেহোসের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে চার্লস বলল, আমার আরও কিছু কাজ বাকি রয়ে গেল। কাল আবার আমার আসতে হবে।

ম্যাকলেহোস বলল, কাল রবিবার আবার আসবেন। ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, যদি খুব জরুরী হয় তবে ওটা আমাকে দিন আমি খুবই সাবধানে রেখে দেব বরং সোমবার নিয়ে নেবেন। দরজা খুলতে পারছেন না, দিন আমাকে দিন।

চার্লস ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছিল, যাতে দু মিনিটের জন্যও যদি ম্যাকলেহোসকে সরানো যায় তবে তার কাজ হয়ে যায়।

চার্লস হেসে বলল, না আমিই পারব খুলতে। ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ম্যাকলেহোস ফোন ধরতে গেল। চার্লসকে বলল, আপনি দরজা খোলার চেষ্টা করুন।

চালর্স এই রকমেরই একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। ম্যাকলেহোস ফোন ধরতে গেলেই চার্লস এক মুহূর্ত দেরী করল না দরজা খুলতে। সে প্রতিটা ড্রয়ার লক্ষ্য করতে লাগল। পেন্ডিং শব্দটা লেখা ড্রয়ারটা চোখে পড়তেই সে দিকে ছুটে গেল এবং ড্রয়ারটা খুলে ঝটপট ফাইল বাঁধা মেমোর‍্যান্ডামটা নিজের ফোলিও ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। ড্রয়ারটা বন্ধ করে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে ম্যাকলেহোস এসে গেছে। চার্লসের হাত কাঁপছিল আর বুকটা এত টিপ টিপ করতে আগে আর দেখেনি। তার গলা শুকিয়ে আসছিল। চালর্স আড় চোখে ম্যাকলেহোসের মুখটা দেখে নিল। দেখল, না সেখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ম্যাকলেহোস সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে দরজাটা শেষ পর্যন্ত খুলতে পারলেন।

চার্লস যথাসম্ভব মুখে হাসি টেনে চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আর রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে লাগল।

ম্যাকলেহোস দরজা আটকাতে আটকাতে জিজ্ঞাসা করল তাহলে, কাল আপনি কি করবেন?

চার্লস বলল, কোন উপায় নেই কাল আমাকে আসতেই হবে। ভীষণ জরুরী কাজ।

ম্যাকলেহোস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, এই যা একটা কাজ ভুলেই যাচ্ছিলাম।

চার্লস ভয়ে কুঁকড়ে গেল, ভাবল আবার নিরাপত্তার কোন নতুন ব্যবস্থা নাকি? ফোলিও ব্যাগটা এখন তার কাছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত লাগছিল। যদি ম্যাকলেহোস ব্যাগটা দেখতে চায় তাহলে?

ম্যাকলেহোস পাশের ঘর থেকে একটা কাগজ পড়তে পড়তে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত মুখ হাসিমাখা। চার্লস বড় বড় চোখে তাকে দেখতে লাগল।

ম্যাকলেহোস বলল, আমার ভুলো মন বলে ছেলেটা আজ কাগজে লিখে দিয়েছে, আমি যেন তার জন্য ফোর কোয়ার্টার্স চকোলেট নিয়ে যাই।

চার্লসের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কৃত্রিম হাসি টেনে মুখে বিদায় জানিয়ে ও খুব তাড়াতাড়ি ওর লাল মাস্টাঙ কার এর দিকে রওনা দিল।

চার্লস কেলসো গাড়ি ছুটিয়ে অ্যাপলেটন গ্রাম পেরিয়ে শ্যানডনের এলাকা ছাড়িয়ে নিউইয়র্কের

দিকে চলল। গাছপালা বাড়ি ঘর মানুষজন সব কেমন উল্টোমুখে চলতে লাগল। ভাবতে লাগল যদি শ্যানডন হাউসের গেটের টমি গানওয়ালা প্রহরী আরও একটু সজাগ হত তাহলে চার্লস সহজে ধরা পড়ে যেত। কিন্তু সে চার্লসের অতি পরিচিত ফোলিও ব্যাগ দেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিল।

চার্লস কিন্তু বিজয়ীর আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে তাকে একটা অপরাধবোধ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কিন্তু ফেরার আর কোন রাস্তা নেই। এতবড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা সে অনায়াসে করতে পারলো? কিন্তু সে তো চিরকালই এই জিনিসটাকে ঘৃণা করে এসেছে। তারপর হঠাৎ ভাবলো একবার আবার ফিরে যায় শ্যানডন হাউসে। আর ম্যাকলেহোসকে গিয়ে বলবে যে, সে ভুল করে অন্য ফাইল নিয়ে চলে এসেছে।

ক্লাচ থেকে পা সরিয়ে ব্রেক কষে স্টিয়ারিং-এ হাতের বাঁধন শিথিল করে ফেলেছিল। কিন্তু তখনই ওর মনে হল, না, যা করেছি ঠিক করেছি। এই ন্যাটো যেভাবে আমেরিকানদের অর্থ নিয়ে ছেলেমানুষী করছে তা সমস্ত আমেরিকানদের জানা দরকার। কিন্তু ও ঠিক করেছে ফাইলের প্রথম খণ্ডটি শুধু প্রকাশ করবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কোনও মতে প্রকাশ করা যাবে না। কারণ ও জানে ওতে যা আছে তা প্রকাশ হলে ওয়াশিংটনের ভিত পর্যন্ত নড়ে যাবে। না অতটা বিশ্বাসঘাতকতা সে করবে না। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পেলেও যথেষ্ট। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পর দেশের বর্তমান শাসকদের জালজুয়াচুরীর গভীরতা কতটা তা নিয়ে বেশ কিছুটা হৈ চৈ হবে। চার্লস মনে করে এটা তার নৈতিক কর্তব্য। দেশের প্রতিটা লোকের সবকিছু জানার অধিকার আছে। তবে সে কোনও মতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হাতছাড়া করবে না। সে রাশিয়াকে এতটা সুযোগ কিছুতেই দেবে না। সে চায় না কম্যুনিস্টরা সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করুক।

ধীরে ধীরে চার্লসের অপরাধবোধ কেটে যেতে লাগল। হালকা বোধ করল এবং নিজের অজান্তে দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করল।

নিজের ঘরে এসে চার্লস ফোলিও ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর ভাবল যাক একটা দিন গেল বটে।

তারপর তার ম্যাগটির কথা মনে পড়লো ম্যাগটি কোন মেসেজ রেখে যায়নি ত! ড্রয়ার থেকে একটা মেসেজ পেল ম্যাগটি লিখেছে ডরোথিয়ার সম্বন্ধে, যে ডরোথিয়া তার দাদা টম কেলসোর স্ত্রী। ওর মেজাজ গেল বিগড়ে। টমের ত এখন নিউইয়র্কে থাকার কথা নয় তার ত এখন প্যারিস থাকার কথা। চার্লস ভেবেছিল টমের অনুপস্থিতিতে কাজটা সেরে ফেলবে। ডরোথিয়া চার্লসকে আজ ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। না আজ সে কিছুতেই সেখানে যাবে না। আজ রাতের মধ্যেই তাকে মেমোরেন্ডামের প্রথম খণ্ডটার ব্যবস্থা চটপট করে নিতে হবে।

এদিকে রিক এসে পড়বে। এসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য চাপ দেবে। না সে কিছুতেই এই কাজ করবে না। রিক ভালো ছেলে সে নিশ্চয়ই বুঝবে।

চার্লস জামা কাপড় তাড়াতাড়ি পাল্টে নিয়ে হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। রেকর্ড প্লেয়ারে একটা জাজ মিউজিক চালিয়ে ব্যাগ থেকে ফাইল বার করে টেবিলে রাখতেই দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

।। তিন ।।

ঘরে ঢুকে রিক হাসল। রিককে দেখতে খুবই হ্যান্ডসাম। দীর্ঘ পেশীবহুল শরীর, ধূসর চোখ, বাদামী চুল। হাসলে ওকে খুবই সুন্দর দেখায়।

উজ্জ্বল আলোয় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগছিল চার্লসের। রিকের বয়সী হলেও রিকের মত সুন্দর চেহারা নয়। এখন ওকে আরও বিশ্রী দেখাচ্ছিল। আসলে মন অশান্ত থাকার জন্যই এমন দেখাচ্ছে। তাছাড়া নিয়ম মত খাওয়া, স্নান হয়নি।

রিক জামা খুলতে খুলতে চার্লসকে জিজ্ঞাসা করল তোমাকে এমন ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে কেন? কোন খারাপ খবর আছে নাকি?

চার্লস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মনের উপর যা চাপ যাচ্ছে তা তো কম নয়।

রিক জিজ্ঞাসা করল, কেন?

চার্লস বলল, এমন দুষ্প্রাপ্য জিনিস হাতানো কি সহজ কাজ!

রিক বলল, যাক্ তাহলে ওগুলো পাওয়া গেছে? শুকনো গলায় চার্লস বলল, হ্যাঁ।

তিনটে খণ্ডই?

চার্লস বলল, হ্যাঁ একটা থেকে আরেকটা আলাদা করব কি করে?

চার্লসকে পরীক্ষা করার জন্য রিক বলল, তুমি নিশ্চয়ই পুরো মেমোরেন্ডামটা টাইপ করতে যাচ্ছো না?

চার্লস জোরের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই না, প্রয়োজনটাই বা কি? তুমি যে বলেছিলে খবরটা পেলে রিপোর্টাররা মৌমাছির মত ছুটে আসবে, তা তুমি কি কিছু খোঁজ করতে পেরেছো?

রিক একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, হ্যাঁ টাইমস্ পত্রিকার একজন রিপোর্টার ত হাত উঁচিয়ে আছে।

চার্লস চমকে উঠে বলল, তুমি ঐ রিপোর্টারকে কতটুকু বলেছ?

রিক বলল, আমি কি অতই বোকা যে সব বলে দেব? আমি শুধু তাকে আভাস দিয়েছি যে কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে এমন একটা খবর দিতে যাচ্ছি তাতে তামাম আমেরিকা কেঁপে উঠবে। বলা যায়না ওয়াটারগেটকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে হাঁ তাতে জাতীয় নিরাপত্তার কোনও ক্ষতি হবে না।

চার্লস উদ্বিগ্নের মত বলল, কিন্তু তুমি ওই কাগজটাকেই বাছলে কেন? ওখানে যে টম কাজ করে।

রিক বলল, তাতে কি আসে যায়। টম তো ওয়াশিংটনের রিপোর্টার। সবসময় সে এখানে সেখানে যায়। ওতো আর শ্যানডন হাউসের ধারে কাছে আসছে না। তাছাড়া তুমিতো আর তোমার নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছ না। তাইতো?

চার্লস বলল, তা বটে। আমি আমার নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নই।

রিক ঠাট্টা করে বলল, জানি জানি তুমি যোগী পুরুষ, নাম প্রচারে তোমার অনীহা।

চার্লস রেগে উঠল, নাম আমি চাই না, এসব কাজে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না।

রিক হাসতে হাসতে বলল, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। এ কাজে কত রিস্ক তা কী আমি জানিনা।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল তোমার সেই রিপোর্টারকে আমার নাম বলনি তো?

না, ক্ষেপেছ! তাকে শুধু শ্যানডন হাউসের নাম বলেছি। রিক বলল।

শ্যানডন হাউসের নামই বা বলতে গেলে কেন?

তুমি আমাকে এত বোকা ভেবেছ? রিক বলল, রিপোর্টার ভদ্রলোক জানে আমি একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। স্বভাবতই আমার শ্যানডন হাউসে যাতায়াত থাকতে পারে। এই কাজটা আমিও করতে পারি। তাছাড়া শ্যানডন হাউসে কত রহস্যময় লোকের যাতায়াত। এ কাজ কে করেছে খুঁজে বের করা কার সাধ্য? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মন দিয়ে রিকের কথাগুলো শুনে চার্লস জিজ্ঞাসা করল, সেই রিপোর্টারের নাম কী?

তার নাম মার্টিন হোলজাইমার, খুবই নাম ডাক তার, তুমি বোধহয় ওর কথা শুনে থাকবে। রিক বলল।

চার্লস বলল, তার বয়স কত?

এই আঠাশ, ঊনত্রিশ হবে। একটা সুবিধা আছে জানো, এই ভদ্রলোক এই ম্যানহাটানে থাকে তাই তাকে যখন তখন পাওয়া যাবে।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল, কখন?

রিক বলল, আজ রাত্রেই তাকে পাওয়া যাবে। তোমার টাইপ হয়ে গেলে সুবিধা হয়। তুমি যদি কেটি-বো ব্রাউনিং-এর পার্টিতে যাও তবে আমি কাগজপত্র নিয়ে হোলজাইমারের সঙ্গে দেখা করতে পারি। চার্লসকে বাজিয়ে দেখার জন্য রিক বলল, এসো সময় নষ্ট না করে আমরা ফাইলটা চটপট দেখে নিই। কত সময় লাগবে এটা জানা দরকার।

চার্লস বলল, জাস্ট্ এ মোমেন্ট। ফোলিও ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিল, টমকে একটা

খবর দেওয়া দরকার।

রিক চমকে উঠল। তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

চার্লস বলল, না ঠিক তা নয়, আসলে ডরোথিয়া আজ ডিনারে আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যেতে পারব না এই কথাটা জানাতে চাই।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রিক বলল তা বেশ, তুমি চাইলে ডিনার সেরে এসো। আমি ততক্ষণ টাইপ সেরে ফেলি।

চার্লস জোরের সঙ্গে বলল, না, তা হয় না।

রিক হেসে বলল, আচ্ছা অন্ততঃ এটা একবার আমাকে দেখতে দাও।

রিকের দিকে তাকিয়ে চার্লস বলল, আপত্তির কোন কারণ নেই। কারণটা হল রিস্ক। তুমি একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসার। তোমার একটা সুনাম আছে। ইতিমধ্যেই তুমি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছ। আমি চাই না তোমার সুনাম নষ্ট হোক। আর আমিও কোন নাম কেনার জন্য এই কাজ করছি না। আমার বিবেক বলছে এইসব কথা প্রতিটি আমেরিকানদের জানার অধিকার আছে তাই আমি এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে চলেছি।

রিক বলল, এটাই আসল বন্ধুত্ব, তুমি যেমন আমার কথা ভাবছ আমিও তেমন তোমার কথা ভাবছি। তোমাকে আমাকে সব কিছুর আড়ালে থাকতে হবে। তাই হোলজাইমারকে আমি সব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি আর আমি হলাম তার একমাত্র কনফিডেন্সিয়াল সোর্স। তাই কোন মতেই আমাদের নাম সে প্রকাশ করতে পারবে না।

চার্লস বলল, ঠিক আছে। আর এও বলে দেবে শ্যানডন হাউসের নামও যেন প্রকাশিত না হয়।

রিক হতাশ হয়ে বলল, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষী করছ।

চার্লস বলল, না আমি একদম চাইনা শ্যানডন হাউসের নামটা ছাপা হোক।

হোলজাইমার যদি রাজী না হয়।

তাহলে মেমোরেন্ডাম দিয়ে কাজ নেই।

অবুঝ হয়ো না চার্লস।

চার্লস চিন্তা করে বলল, আমি ছাপতে দিতে রাজী হতে পারি যদি সে লেখে যে সে ন্যাটোর কোনো গোপন সূত্র থেকে পেয়েছে।

রিক বলল, দেখো আমাদের হোলজাইমারের কথাটাও একটু ভেবে দেখতে হবে। ওকেও নিশ্চিত হতে হবে যে দলিলটা খাঁটি। ওই বা এত রিস্ক নিতে যাবে কেন?

চার্লস বলল, হোলজাইমারের মনে এও হতে পারে যে আমিই বা এই সব ফাঁস করছি কেন?

রিক বলল, আমি একেবারে সত্যি কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়েছি বলেছি তুমি যুদ্ধ পছন্দ করো না আর সরকারী অর্থের অপচয় হোক তাও চাও না। দুই দেশের মধ্যে যখন সন্ধির আলোচনা শুরু হয়েছে তখন ন্যাটোরা পিছন থেকে যুদ্ধের জন্য ওসকাবে এটা তুমি মানতে পারছ না, তাই আগে থেকেই জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে চাও।

চার্লস এবার একটু হালকা বোধ করল আর ফোলিও ব্যাগটা খুলে খুব আস্তে আস্তে প্রথম খণ্ডটা আলাদা করে নিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাশে সরিয়ে রাখল।

রিক না জানার ভান করে বলল, তুমি আমায় বলেছিলে প্রথম খণ্ডে রাশিয়া আর আমেরিকার বন্ধুত্ব সম্পর্ক সৃষ্টির পথে একটু সাবধানী মাত্র। আচ্ছা বাকী দুটোতে কি আছে?

চার্লস বলল দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ন্যাটোর যুদ্ধ সম্ভার আর তৃতীয় খণ্ডে আছে যুদ্ধাস্ত্র কি ভাবে সাজানো হয়েছে তার বিবরণ:

রিক আশ্চর্য হবার ভান করে বলল, সত্যি এত সব বিষয় ওরা জানায় কী করে?

চার্লস বলল, এসব সোজা কাজ নয়। বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে খবর আসে। এখন সবাই চালাক হয়ে গেছে কেউ কারো গোপন খবর জানায় না। অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা দেখে বার করতে হয়।

রিক এবার বুঝতে পারল, মিশচার এত আগ্রহী কেন। এর সব খণ্ডগুলো পেলে মিশচার

ডিপার্টমেন্ট বার্লিন দেওয়ালের এপাশে ন্যাটোর দেশগুলো কোথায় কি সমরসম্ভার সাজিয়েছে তা সহজে জানতে পারবে আর সেই মত রাশিয়া পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারবে।

চার্লস প্রথম খণ্ডটা সরিয়ে নিয়ে বাকী দুটো খণ্ড ড্রয়ারে রেখে তালা বন্ধ করে দিল। সে যে রিককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না সে কথা স্পষ্ট।

রিক প্রথম খণ্ডটা নিয়ে পড়তে শুরু করল। হঠাৎ সে চমকে উঠল, এরিয়ল ডিনামাইট। এতটা সে নিজেও আশা করেনি। ও ভেবেছিল এতে আমেরিকার রাশিয়ার প্রতি নরম মনোভাবের সমালোচনা থাকবে। তেমন কিছু থাকার সঙ্গে আছে আমেরিকার উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী যে তেমন কিছু করতে গেলে যদি ন্যাটোর দেশগুলো বিপদগ্রস্ত হয় তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবে আমেরিকা। এছাড়া এও স্পষ্ট করে বলা আছে যে এই বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর পেছনে রাশিয়ার অসৎ উদ্দেশ্য আছে এবং প্রমাণ স্বরূপ রাশিয়ার বর্ধিত সমর সম্ভার সম্বন্ধে জানানো আছে। বলা হয়েছে রাশিয়া মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও সে পশ্চিমী দুনিয়ার কম্যুনিস্টদের ঢালাও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন যুদ্ধ নয় ফিফ্‌থ্ কলাম-এর এক অশুভ শক্তি দেশের মধ্যেও সৃষ্টি করে সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বানচাল করে ছাড়বে আর সুযোগ বুঝে একে একে ন্যাটোর দেশগুলো নিজের কব্জার মধ্যে এনে ফেলবে।

পড়তে পড়তে রিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল, কেমন বুঝছ?

রিক বলল, একটা বোমার মত ফেটে পড়বে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী এখনই এটা প্রকাশ করতে চাও?

চার্লস রিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তো বলেইছিলাম এটা সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে ছাড়বে। তা তুমি হঠাৎ তোমার মত পালটালে কেন?

না, তা ঠিক নয়, আমিও চাই এটা প্রকাশ হোক। কিন্তু কিছুদিন পরে হলে ভালো হয় কারণ ফোর্ড এখন ভ্লাডিভোস্টকে রয়েছে—

ও এজন; বলছ—

বারই ডিসেম্বর ব্রাসেলস্-এ ন্যাটোর মিটিং হবে। সেই সময় কিসিংগার সেখানে থাকবে— হোলজাইমারের কথা ভাবা যাক, কদিন সময় পেলে তাকেও একটু বাজিয়ে নেওয়া যাবে, রিক বলল।

চার্লস বলল, সেইজন্যই আমি চাই তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে। যাতে ন্যাটোর মিটিং-এ এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে কেউই চালাকি করতে পারবে না।

রিক চার্লসের কথায় অভিভূত হবার ভান করে বলল, সত্যি আমি এতটা চিন্তা করিনি, তোমার কথায় সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝে গেলাম। যাক্ অনেক সময় নষ্ট হল, সত্যি আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।

চার্লস বলল বেশ তো তাহলে তুমি দুজনের মত স্যান্ডউইচ বানাও আমি ততক্ষণে টাইপ সেরে ফেলি।

রিক ফাইলটা পড়তে পড়তে বলল, দাঁড়াও এটা শেষ হয়ে এসেছে। তুমি বরং ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করো। ড্রাই মারটিনি হলে ভালোই হবে।

চার্লস ভালই বলে প্যানট্রিতে ঢুকে গেল।

রিক এই সুযোগ-এর জন্য অপেক্ষা করছিল সে চটপট উঠে টাইপ মেশিনটার ঢাকনা খুলে A আর S অক্ষর দুটো নষ্ট করে দিল এবং ঠিকভাবে ঢাকা দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল।

চার্লস মার্টিনি নিয়ে এসে বলল, এই নাও তোমার মার্টিনি, পেঁয়াজ দিতে পারলাম না। জলপাই-এর তেলও নেই, লেবু দেবো—

রিক বলল, না দরকার নেই।

চার্লস বলল, টমকে আমার একবার ডাকতেই হবে, মনে হচ্ছে রিবন কম পড়বে।

তুমি কিন্তু পাগলামো করছ চার্লস, এসব ব্যাপার বেশী জানাজানি না হওয়াই দরকার, চার্লসকে রিক যেন সাবধান করতে চাইল।

চার্লস টাইপ মেশিনটা নিয়ে কাজ করতে গেল। দেখল হঠাৎ যেন মেশিনটা কাজ করছে না। যা ব্বাবা এটা আবার কখন খারাপ হল?

রিক উঠে এসো বলল, কেন? কি হয়েছে?

চার্লস বলল, মনে হচ্ছে মেশিনের ঘাটগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা কেটির একটা মেশিন আছে না?

রিক চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ নীচের ফ্ল্যাট থেকে কেটির মেশিন আনতে বেশী সময় লাগবে না কিন্তু আমি জানি ওর মেশিনটা অনেক পুরোনো, তোমার বোধহয় কোনও কাজে লাগবে না।

চার্লস কী চিন্তা করল, তারপর ঝট করে উঠে গিয়ে টমকে ডায়াল করল। হ্যালো টম! ডরোথিয়ার মেসেজ পেয়েছি কিন্তু একটা কাজে আটকে পড়ায় যেতে পারছি না তবে একটা ভীষণ দরকারে তোমার টাইপ মেশিনটা আনতে আমায় যেতে হবে। না কাল সকালেই ওটা আমি তোমায় ফেরৎ দিয়ে দেব। আচ্ছা মিনিট কুড়ির মধ্যে আমি পৌঁছচ্ছি।

রিসিভার ছেড়েই ঝটপট জামা পাল্টে রওনা দিল। রিককে বলে গেল যে সে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছে। রিক ভাবল সুযোগ যখন এসেছে তাকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হাতে তার অফুরন্ত সময় কিন্তু ওর প্রয়োজন মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

রিক প্রথমে ডেস্কটা পরিষ্কার করে নিল। মেমোরেন্ডামের প্রথম খণ্ডটা সরিয়ে রাখল। পকেট থেকে এক গুচ্ছ চাবি বার করল। সরু একটা চাবি বেছে নিয়ে হাতের মোচড়ে ড্রয়ারের তালা খুলেফেলল। এবং খুব সহজে মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটি হাতে পেয়ে গেল। চটপট পাতাগুলো দেখে নিয়ে ডেস্ক-এ সাজিয়ে নিল। রিডিং ল্যাম্পটা ডেস্কের উপর রেখে জ্বালাবার ব্যবস্থা করল যাতে আলো জোরালো হয়। তারপর পকেট থেকে ম্যাচ বাক্সের সাইজের ছোট্ট দামী ক্যামেরা বার করে ফটো তুলতে শুরু করল।

মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে তার কাজ শেষ হয়ে গেল। ক্যামেরা অফ করে পকেটে লুকিয়ে রাখল। রিডিং ল্যাম্প জায়গামত রেখে দিল। মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাস্থানে রেখে তালা আটকে দিল। সব কিছু শেষ করে আর একবার দেখে নিল কোথাও কোনও ভুল হল কিনা।

তারপর নিশ্চিত হয়ে নিজের জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চার্লসের অপেক্ষা করতে লাগল।

।। চার ।।

ব্রাড জিলন তার হাত ঘড়িতে দেখল সাতটা পনেরো বেজেছে। সে অস্থির হয়ে পড়ল, এখনও টনি লটন এল না। তার প্রায় বাহান্ন বছরের মত বয়স হয়েছে। এই বয়সে এত উত্তেজিত হওয়া ভালো নয়। তবু সে তার সুসজ্জিত, আরামদায়ক ঘরে থেকেও যেন শান্তি পাচ্ছিল না। সে ফাইলটার কয়েকটি শব্দ দেখে এত অস্থিরতা অনুভব করছে যে সেটা টেবিলের উপর তার চোখের সামনে খোলা পড়ে আছে। এই কয়টা অক্ষর যেন তার মাথার সব কিছুকে ওলোট পালোট করে দিচ্ছে।

হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে টনি লটন ঢুকল, যেন একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো—হ্যালো ব্রাড, কী ব্যাপার এত জরুরী তলব! কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?

টনি লটনের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে ব্রাড ভীষণ ভালোবাসে। টনির বয়স পঁয়ত্রিশের মত, চেহারা তার সাধারণ, কোনও চটকদার আহামরি কিছু নেই। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি বাদামী চুল, ধূসর চোখ। চেহারার মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় হল তার এই চোখ। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও উজ্জ্বল। তার এই সহজ সাধারণ চেহারার জন্য সে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যে গুপ্ত কাজগুলো করতে হয় তা সে অনায়াসে করতে পারে।

ব্রাড জিলনের অস্থিরতা কিছুটা কমেছে। সে টনির দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি দ্যাখো, কিছু হয়তো বুঝতে পারবে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

টনি লটন ফাইলটা নিয়ে যে লাইনগুলোর নীচে দাগ দেওয়া সেইগুলো ভালো করে পড়ে

ফাইলটা সরিয়ে রাখলো। তারপর রীতিমত স্বাভাবিক ভাবে বলল, তাহলে এই জন্য আপনি এত অস্থিরতা অনুভব করছেন?

খুবই উত্তেজিত ভাবে ব্রাড বলল, কেন নয়? আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না কে এই কোনোভ? আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অথচ টপ প্রায়রিটি দিয়ে ফাইলটা ডীল করতে বলা হয়েছে।

একটু ভেবে টনি বলল, আপনি আপনার অতীত ঘটনাগুলোকে আরও একটু তলিয়ে দেখুন, হয়তো দেখবেন আপনি লোকটাকে কোনও না কোনও ভাবে চেনেন।

সেটা কী সম্ভব? ব্রাড বলল।

টনি বলল, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি শুধুমাত্র আপনার জার্মানীর দিনগুলো মনে করুন। যখন হিটলারের ধ্বংস স্তূপের উপর নিজের ইমারত গড়ে তুলতে সোভিয়েত ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন তখন সোভিয়েত দলে কোনোভ ছিল।

লাফিয়ে উঠল ব্রাড, তাহলে তুমি বলছ সেই লোকটির কথা যে হিটলারের গোপন কাগজপত্র জোগাড় করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে হিটলার আর চার্চিল মিলে ষড়যন্ত্র করে রাশিয়া আক্রমণ করতে চেয়েছিল।

টনি বলল, সবাই কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করে ফেলেছিল।

ব্রাড বলল, তাহলে এই সেই গোয়েন্দা যে একাই হিমালয়ের গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিল।

টনি বলল, যাক, এটা মনে করাতো তেমন শক্ত কাজ ছিল না। আপনার তো মনে থাকা উচিৎ কোনোভ সম্পর্কীয় অনেক ফাইল আপনার দপ্তর ঘুরে গেছে।

ব্রাড একটু চিন্তিত ভাবে বলল, সত্যি এটা মনে থাকা তো উচিত ছিল। এখন আমার সব ঘটনাই মনে পড়ছে। ইয়েস অটোয়ার ঘটনার কথা মনে আছে। খুব জোর সে পালিয়ে গিয়েছিল নাহলে ক্যানাডিয়ান পুলিশের হাতে সে নির্ঘাৎ ধরা পড়ত। একবার আমেরিকাতেও ও ঢুঁ মেরেছিল। ও একটা মিচকে শয়তান।

টনি জানালো, এখন তো ও উত্তর আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রাড বলল, আমি বুঝতে পারছি না যে ন্যাটো ওকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? কী এমন আহামরি যে তাকে আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর ট্যাক্‌ল করতে পারবে না। তোমার কী মনে হয়?

টনি বলল, আপনারা যেন সব কিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি করেন। সামান্য কাজের জন্য আপনারা কামান নিয়ে আসেন।

ব্রাড একটু গম্ভীর ভাবে বলল, দ্যাখো ডেকেছি ভ্লাডিমির কোনোভ সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কিছু সাহায্যের জন্য।

টনি বলল, কিভাবে?

ব্রাড এবার সোজাসুজি কাজের কথায় এল, আগামী মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে যে একদল কৃষি বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় আসছে গম কিনতে কোনোভ সেই দলের সঙ্গে আসছে।

টনি একেবারে চমকে উঠল, বলেন কী? এতো সব ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছে। ছিল কানাডায় সেখান থেকে একেবারে খোদ আমেরিকায়, সত্যিই চিন্তার বিষয়।

ব্রাড বলল, সেই জন্যই তো এত চিন্তিত হয়ে তোমাকে ডেকেছি। ন্যাটোর যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে তারা কোনোভের গতিবিধির উপর সব সময় নজর রাখছে। তারা যে খবর দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে ওসব কৃষিটিষি নিয়ে কোনোভের মাথাব্যথা নেই তবে সবথেকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে যে বিষয়টি সেটা রাশিয়ায় আমাদের যে এজেন্ট আছে সে সংবাদ পাঠিয়েছে। এটি একটু অন্য ধরনের। ন্যাটো একটা গোপন ও টপ সিক্রেট মেমোরেন্ডাম ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছে। সেই খবরটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। কোনোভ সেই গোপন দলিলের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে আসছে। কাজটা খুবই কঠিন তবুও আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

টনির মুখ কঠিন হয়ে গেল সে বলল, ভেরী ডেঞ্জারাস নো ডাউট। আমাদের সব এজেন্সীকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার নিজস্ব নিয়ম মত ওর পিছু ধাওয়া করছি। উই কান্ট অ্যালাউ দ্যাট্ বাস্টার্ড টু পোক হিজ নোজ ইনটু আওয়ার অ্যাফেয়ার্স।

ব্রাড স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে। সত্যি তোমার কাছ থেকে এমন একটা উত্তরের আশা করে বসেছিলাম। সি. আই. এ. এবং এফ বি আই এরই মধ্যে সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একটা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে আছি তাই বুঝতেই পারছ আমার দায়িত্বটা বেশী।

ব্রাডকে নিশ্চিন্ত করে টনি বলল, ঠিক আছে এই নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না। আমার সুবিধা আপনার থেকে অনেক বেশী। এ ওয়াইন মার্চেন্ট! তাই কারো সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তাহলে এবার উঠি। আমার এজেন্সীগুলোকে সতর্ক করতে হবে।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ আমাকেও এবার উঠতে হবে। টম কেলসোর ওখানে আমার আজ ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।

টনি একটু চিন্তা করে বলল, ও টাইমসের মুভিং অ্যামবাসাডার। খুবই ভালো ছেলে। দেখুন ওর কাছ থেকে কোনো খবর আদায় করতে পারেন কিনা। আজকাল সাংবাদিকরা গোয়েন্দাদের থেকে বেশী খবর রাখে। গুড্ নাইট।

।। পাঁচ ।।

খুব তাড়াতাড়ি চার্লস তার টাইপ শেষ করল। যখন টাইপ মেশিন থেকে সমস্ত কাগজ বের করে মেশিনে চাপা দিল তখন ঘড়িতে বাজে ঠিক দশটা।

রিক ভেবেছিল চার্লস আরও সময় নেবে। কম করে রাত এগারোটা হবে। কিন্তু তা হল না, রিকের অন্তরের সব সুপ্ত বাসনা যেন ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে।

রিক টাইপ করা পাতাগুলো নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল। বলল, চমৎকার হয়েছে। তবে এই মেশিনেও কিছু গণ্ডগোল আছে তা স্পষ্ট। 'এম্' আর 'এন' অক্ষর দুটো মোটা পড়ছে আর 'এস' টা একটু বাঁকা হয়ে পড়েছে তবে পড়তে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

রিকের কোনও কথাই চার্লসের কানে ঢুকছে না। সে মেমোরেন্ডামগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে ড্রয়ারে রাখতে ব্যস্ত।

রিক বলল, আচ্ছা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটা আমাকে একবার দেখতে দেবে না?

চার্লস ড্রয়ারে তালা দিতে দিতে বলল, এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভালো। এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটা দেখব। তার বেশী দেখার দরকার নেই।

রিক যেন নিশ্চিন্ত হলো, সে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল, যাক্ চার্লস তাহলে তাকে সন্দেহ করছে না। কিন্তু একটা কথা মনে হতেই সে ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেল। যদি তার অজান্তে ড্রয়ারে আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যায়!

চার্লস একটু গুছিয়ে নিয়ে রিককে বলল, হোলজাইমারকে ফোন করো।

রিকের মাথা সেই চিন্তায় যেন কিলবিল করছে। কিছুতেই সে আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারছে না। নিজেকে নিজে সে বোকা ভাবছে। ইস্ কী বোকার মত কাজ করলাম, কেটির ফ্ল্যাটে আমার গ্লাভ্‌স রয়েছে। চার্লস চলে গেলে সে অনায়াসে সেগুলো আনতে পারত। মিশচার যখন শুনবে তার এই বোকামিকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। সিক্রেট এজেন্টদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তা সে তিক্ততার সঙ্গে তাকে স্মরণ করাবে।

চার্লসের কথায় রিক একটু যেন চমকে উঠল। নাও নাও দেরী করো না হোলজাইমারকে ফোন করো। তুমি তো বলেছিলে সে আমাদের জন্য রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তা ঠিক সময়েই তো ফোন করা হচ্ছে।

রিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে চাইছিল না এক্ষুনি হৈ চৈ হোক। রিক চাইছে মাইক্রোফিল্মটা চুপিচুপি রাশিয়ায় বিনা ঝঞ্ঝাটে পৌঁছে যাক। তারপর প্রথম খণ্ডটা প্রকাশ করতে। কারণ প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেলেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডদুটো নিয়ে আলোচনা হতে থাকবে তখন মাইক্রোফিল্ম রাশিয়ায় পাঠানো মুশকিল হয়ে যাবে। তাই সে চার্লসকে একটু বোঝাতে চাইল।

রিক রিসিভার থেকে হাত নামিয়ে বলল, চার্লস বলছিলাম কী, আজ রাত হয়ে গেছে।

হোলজাইমারকে তার অফিসে নাও পাওয়া যেতে পারে। কাল বরং ফোন করলে হয় না?

চার্লস গোলাবারুদের মত ফেটে পড়ল, কখনো না। তোমার এই কুঁড়েমীপনা আমার একদম পছন্দ নয়। কাল রবিবার আমাকে যে ভাবেই হোক একবার শ্যানডন হাউসে গিয়ে ফাইলটা রেখে আসতে হবে। আমি এত ঝামলা সামলাতে পারবো না। নাও হোলজাইমারকে ফোন লাগাও। শেষের কথাগুলো চার্লস রিককে অনেকটা হুকুমের সুরে বলল।

রিক আর কিছু বাহানা দিতে পারল না। তাকে অগত্যা হোলজাইমারকে ডায়াল করতে হলো। রিক ভেবেছিল হোলজাইমারকে হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু না ও ব্যাটাও ঠিক বসে আছে। অবশেষে রিককে কথা বলতে হল।

রিক ফোনে হোলজাইমারের সঙ্গে কথা বলার আগে চার্লস তাকে কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে দিল। বলল, ওকে এখানে আসতে বলবে না, বলবে কেটির ফ্ল্যাটে আসতে।

রিক জিজ্ঞাসা করল—কেন?

চার্লস বলল, কোনো প্রশ্ন কোরো না। যা বলছি শুধু তাই কর।

রিক বলল, কিছু বুঝতে পারছি না, কেটির ফ্ল্যাটে কেন?

চার্লস বলল অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে, ওহো এই সাধারণ কারণটুকু বুঝতে তোমার এত দেরী হবে ভাবতে পারছি না। আমাদের ফ্ল্যাটে এলে সে আমাদের পরিচিতি জেনে যাবে না?

রিক একটু বোকার ভান করে বলল, এবার বুঝেছি। আচ্ছা চার্লস হোলজাইমারের সঙ্গে তোমার সরাসরি দেখা হওয়াটা কী ঠিক হবে?

চার্লস বলল, হবে হবে। সে ব্যবস্থা আমি ভেবে রেখেছি ঘরের আলো নিভিয়ে রাখবো। শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রাখবো। তাছাড়া আমাকে হোলজাইমারের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে হবে। তাকে বলতে হবে কোনও ভাবেই যেন শ্যানডন হাউসের নাম প্রকাশ না পায়।

রিক বলল—কিন্তু ও যদি তোমার নাম জানতে চায়?

চার্লস বলল, জানতে চাইলেও তুমি কোনও মতেই নাম জানাবে না। শুধু বলবে যে শ্যানডন হাউসে আমার যাতায়াত আছে, ব্যস্।

রিক বলল, বুঝেছি তুমি এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চাইছ। কেটির ফ্ল্যাটে হোলজাইমার এলে ও শুধু কেটির নাম জানবে আর সেই ফাঁকে তুমি ওকে দেখেও নিতে পারবে। তাই তো।

রিক চার্লসের নির্দেশমত হোলজাইমারকে সমস্ত কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল।

চার্লস তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরের চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিল কোথাও কিছু বেঠিক আছে কিনা, জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ করে দিল। যখন দেখল ঘরের নিরাপত্তা অটুট রয়েছে তখন রিককে বলল, বেড়িয়ে এসো। দরজায় নতুন তালা লাগিয়েছি কোন রকম স্কেলিটন চাবিতে কাজ হবে না। আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না।

চার্লসের কথাটা শুনে রিক চমকে উঠলো। তাহলে সে যদি কেটির ফ্ল্যাটে গ্লাভস আনতে যেত ফিরে এসে নতুন তালা খুলতে পারত না। তাহলে তার কাজ একেবারে ভেস্তে যেত। যাক্ ভাগ্যিস ওর কাজ হাসিল হয়ে গেছে। কোনও রকম অঘটন ঘটেনি।

কিন্তু প্রথম খণ্ডের প্রকাশ রিক তাহলে কিছুতেই আটকাতে পারল না। প্রথম খণ্ডটা বেরুলে একটা ঝড় হবে। কী আর করা যাবে। চার্লসকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। রিকের মত অবস্থায় পড়লে মিশচারকেও তাই করতে হত।

কেটির ফ্ল্যাটে আধো আলো আধো অন্ধকারে ওদের কথাবার্তা পনেরো মিনিটে শেষ হয়ে গেল। চার্লস হোলজাইমারের হাতে ফাইলের প্রথম খণ্ডটা তুলে দিল। হোলজাইমার কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আলো জ্বেলে দিলে হোত না।

চার্লস বলল, না কোনও প্রয়োজন নেই। এটা আপনি আপনার অফিসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন। আমি কোনোরকম রিস্ক নিতে চাই না। যতদিন না এটা ছাপা হচ্ছে ততদিন আমি আপনাকে একদিন বাদে বাদে ফোন করবো।

হোলজাইমার একটু বিমর্ষ হয়ে বলল, ঠিক আছে।

চার্লস ছটফট করছে। সে উঠে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিয়ে একরকম প্রায় জোর করেই

হোলজাইমারকে বিদায় জানালো—তাহলে আসুন, পরে আরো কথা হবে, গুড নাইট।

হোলজাইমার একটু অনিচ্ছার সঙ্গে চার্লস ও রিককে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল।

চার্লস এবার রিককে বিদায় জানালো, গুড নাইট রিক, পরে কথা হবে।

চার্লস মনে মনে ভাবছে তাহলে এখনকার মত কাজ শেষ। সারাদিন যা ধকল গেল এবার একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে। কাল সকালে অবশ্যই টমকে মেশিনটা ফেরৎ দিতে হবে আর শ্যানডন হাউসে প্রহরীর চোখ এড়িয়ে ফাইলটা ঠিকমত রেখে আসতে হবে। এত সব কথা ভাবতে ভাবতে সে তার গাড়ির দিকে ছুটছে।

রিকও নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। সে তার উত্তেজনা বশে আনতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। দু চোখের পাতা সে কিছুতেই এক করতে পারছে না। তার অনেক কাজ বাকী। যে ভাবেই হোক মাইক্রোফিল্মটা আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাশিয়ায় পৌঁছে দিতে হবে। হঠাৎই তার মিশচার-এর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু যথেষ্ট বাধা আছে। ওখানে নাক গলাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। ওলেগই বা কী করছে? সব ভারই তো ওর উপর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওলেগের কাছ থেকে তো কোনও খবর নেই। কিন্তু নিজের দায়িত্ব সেই বা এড়িয়ে যায় কি করে? ওয়াশিংটনে যে একটা লিঙ্ক আছে, সেখানে কী খবরটা জানিয়ে দেবে! এটা কী ওর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? বোধহয় পড়ে। যদিও মিশচার এখন ওর কম্যান্ডিং অফিসার ওর প্রকৃত আনুগত্য মস্কোর কাছে, তবুও মিশচার ডিসইনফরমেশন ব্যাঙ্কের অধিকর্তা। ওর কোনও বিপদ রাশিয়ার গোটা স্পাইং লিঙ্কের বিপদ ডেকে আনবে। আর ওলেগ যখন পুরো ব্যাপারটা জানে তখন রিক যদি চেপে যায় তাহলে সে মূর্খতার পরিচয় দেবে। সব থেকে ভালো বেশী গভীরে না গিয়ে সাধারণ একটা রিপোর্ট করে দেওয়া। মিশচার ওকে নিউইয়র্ক-এর সেন্ট্রাল পার্কে ডেকেছিল। সেখানে যা কথা হবার হয়েছে। সেখানে ওরা বোধহয় সি আই এ অথবা ন্যাটোর ইনটেলিজেন্সের বুদ্ধির কাছে প্রতারিত হয়েছে। মিশচার এখন আহত। তবে কাজ হয়ে গেছে।

রিকের মাইক্রোফিল্মটার কথা মনে পড়লো। মিশচার বলেছিল এটা উদ্ধার হলেই ওলেগকে দিয়ে দিতে। ওলেগ ওটা রাশিয়ায় পাচারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওলেগ সম্বন্ধে বা তার কাজকর্ম সম্বন্ধে রিক তেমন কিছু জানে না। মিশচার যখন বলেছে তখন হয়তো হতে পারে ওলেগের আরও গভীরে যাতায়াত। এই মাইক্রোফিল্মটা পেলে রাশিয়ার গোয়েন্দা দপ্তর কেজিবির হাতের মুঠোয় চাঁদ পাওয়ার মত অবস্থা হবে, তাকে ওর নিজের চ্যানেলে পাঠিয়ে দেওয়াই ঠিক। রিক ভাবল তার আগে মিশচার-এর একটা খবর নেওয়া দরকার।

রিক চাপা উত্তেজনায় একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল। তারপর নাইনটিনথ্ প্রিসিঙ্কট যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রথমে সেখানে ডায়াল করল তারা বলল—আপনি সেন্ট্রাল পার্ক প্রিসিঙ্কট-এ ফোন করুন। পার্কের ভিতরের ব্যাপার ওরা দেখে।

রিক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেন্ট্রাল পার্ক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তারা বলল, হ্যাঁ একজন ব্যক্তিকে লেনেক্সি হিল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। উনি কি আপনার পরিচিত? হ্যাঁ তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

রিক একটু থেমে গলার স্বর যথা সম্ভব ভারী করে বলল—না আমি যার খোঁজ করছি সে আমার মামাতো ভাই তার বয়স বাইশ।

আচ্ছা দুঃখিত, বলে ওপাশ থেকে ফোন রেখে দিল।

রিক যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। যাক্ মিশচারকে তাহলে হসপিটালে দেওয়া হয়েছে আর আরও স্বস্তি পেল যে কোন রকম পরিচয় সে দেয়নি।

এইবার রিক নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল। কাল তাহলে ওর ওয়াশিংটন যেতে কোনও বাধা নেই। এখানকার বাকী সব কাজ ওলেগ করবে।

।। ছয় ।।

ওলেগ লেনেক্সি হিল হসপিটালের সামনে এল। সে মনে মনে চিন্তা করে নিল যে সে এখানে কী কী করবে। ওলেগের মনে হল ঐ অ্যালেক্সি। হ্যাঁ ওই আহাম্মকের যদি একটু বুদ্ধি থাকত।

ওলেগের শরীর রাগে রি রি করে উঠল। ওর উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজে ঝাড়া হাত পা হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি ওলেগের পাশ দিয়ে গিয়ে হসপিটালের চত্বরে ঢুকে গেল। ওলেগ ভাবল না এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না, তাতে সন্দেহ হতে পারে।

মিশচার আর ওলেগের ডিপার্টমেন্ট এক হলেও তাদের কাজ আলাদা আলাদা। মিশচার-এর কাজ গোপন খবর ডি সাইফার করা অর্থাৎ মূল বক্তব্য বের করে পাচার করে দেওয়া আর ওলেগ হচ্ছে একজিকিউটিভ অ্যাকশন ব্রাঞ্চের লোক। অর্থাৎ হঠাৎ বিপদ এসে গেলে তার মোকাবিলা করা।

এখানেও তাকে সেই কাজই করতে হবে। মিশচার মুখ থেকে কোনও খবর বের করার আগেই তাকে লোপাট করতে হবে। কিন্তু এত নিরাপত্তার মধ্যে তার একার পক্ষে একাজ করা কি সম্ভব হবে?

ওলেগ আবার চলতে শুরু করল। মেইন গেট ছেড়ে সে হাসপাতালের চওড়া প্রাঙ্গনে এসে গেল। তার মনে হল না যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। ওলেগ দেখল এমারজেন্সীর গায়ে একটা গ্যারেজ আর তাতে একটা খালি এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। ওলেগের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। হ্যাঁ এই পথেই সে তার কাজ হাসিল করবে।

নভেম্বরের রাত পরিষ্কার আকাশ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য রাস্তায় বিশেষ লোক নেই। একবার বেরুতে পারলে ওকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। ওলেগ জীবনে এরকম কাজ অনেক করেছে তাই তার সন্ধানী চোখে কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

এমারজেন্সীর ভিতর চলে এল ওলেগ। সামনে ইনফরমেশন কাউন্টার। সেখানে একজন নিগ্রো মেয়ে হসপিটালের পোষাক পরে কি যেন লিখে চলেছে। পায়ের শব্দে সে ওলেগের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোনও সন্দিগ্ধতা নেই কেননা কত লোকই তো তার কাছে আসে আত্মীয়ের খোঁজে।

ওলেগ ঠিক করে নিয়েছিল মেয়েটি প্রশ্ন করলে সে কি উত্তর দেবে। বলবে যে ও আজই কানাডা থেকে নিউইয়র্ক এসেছে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে এখানে এসেছে খোঁজ করতে। মিশচার নামটা সে কিছুতেই বলবে না। ক্যানাডিয়ান বা আমেরিকান পাসপোর্টে মিশচার-এর যে নাম আছে তার একটা সে বলবে। কিন্তু যদি মিশচার-এর সঙ্গে দুটোর একটাও না থাকে তাহলে তো সে ভীষণ বিপদে পড়বে।

অনেকক্ষণ ধরে অন্যমনস্ক ভাবে ওলেগ এইসব কথাগুলো ভাবছিল। না, বেশীক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেহ হতে পারে। মেয়েটির সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে আর এমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ওলেগ একটু ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করল, না মানে মিস আমি আমার একজন বন্ধুর খোঁজ করছি। এইমাত্র পুলিশের কাছ থেকে খবর পেলাম একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সেন্ট্রাল পার্কে আঘাত পেয়ে এইখানে ভর্তি হয়েছে। হতে পারে এই আমার সেই বন্ধু।

মেয়েটি নিরাসক্ত চোখে জানিয়েছে লোকটিকে ছটা নাগাদ ভর্তি করা হয়েছে। আপনি কী একটু দয়া করে দেখবেন?

মেয়েটি পাশের টেবিল থেকে একটা খাতা নিয়ে দেখতে লাগল।

ওলেগ নিতান্ত নিরীহ লোকের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কিছুক্ষণ খাতা দেখে বলল, হ্যাঁ একজন লোককে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে এখানে পাঁচটা সাতান্ন মিনিটে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু তারসঙ্গে কোনও পরিচয় পত্র পাওয়া যায়নি।

ওলেগ মনে মনে খুশীই হলো, যাক্ বাঁচা গেছে।

মেয়েটি বলল, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি তার পরিচয় পেতে কিন্তু কোনও কাজই হয়নি।

ওলেগ হতাশার ভঙ্গী করে বলল, মুশকিল হলো, কোনও পরিচয় না পেলে আমিই বা বুঝব কী করে এই লোকই আমার বন্ধু। একঘণ্টা ধরে ওকে ফোন করছি। কোন সাড়া নেই দেখে খোঁজ করতে বেরিয়েছি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি ওর বাড়ির লোকজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?

ওলেগ দেখল যে মেয়েটি বেশ বুদ্ধিসম্পন্ন। বলল, ওতো এখানে একাই থাকে। আমি যতদূর জানি ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন। ওর স্ত্রী এখন লং-আইল্যান্ডে থাকে। ভাবছি ওখানেও একটা খোঁজ নেব। কিন্তু যদি একবার এই অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকটিকে দেখতে পেতাম।

ওলেগের অবস্থা দেখে মেয়েটির মনে একটু বুঝি দয়া জাগলো। বলল, দাঁড়ান দেখছি কিছু করা যায় কিনা।

মেয়েটি উঠে গিয়ে একটা নার্সের সঙ্গে কথা বলল, নার্সটি গিয়ে কোথায় যেন ফোন করল। এদিকে ওলেগ জানালা দিয়ে বাইরেটা ভালো করে দেখে নিল, কী ভাবে কি করা যাবে।

মেয়েটি ফিরে এসে ওলেগকে বলল, হ্যাঁ বসুন একটু অপেক্ষা করুন। ওরাও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ওলেগ ভয় পেয়ে গেল, বলল ওরা মানে আপনি কাদের কথা বলছেন? আমি কী লোকটিকে এখুনি দেখতে পাবো না?

মেয়েটি বলল, পুলিশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

পাশের ফোনটা বেজে উঠতে মেয়েটি হুঁ, হাঁ শব্দে কিছু উত্তর দিল। তারপর ওলেগকে বলল, আপনি এলিভেটর ধরে সোজা উঠে যান। ফার্স্ট ফ্লোরেই পেয়ে যাবেন। সামনে যে ঘর সেই ঘরে ঢুকে যাবেন। বলেই মেয়েটি তার কাজে মন দিল।

ওলেগ ভাবতে লাগল, আবার পুলিশ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। পুলিশের হাতে পড়া মানেই হাজার প্রশ্ন। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক হবে না। ওর ইতস্ততঃ ভাব দেখে মেয়েটির সন্দেহ হতে পারে।

মেয়েটির নির্দেশ মত ওলেগ এলিভেটর ধরে সোজা ফার্স্ট ফ্লোরে এলো। সামনেই ঘর। ওলেগ দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখল ঘরটিতে তিনজন আছে। একজন বয়স্কা নার্স টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে আছে। আর একজন অল্প বয়স্ক নার্স ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আর একজন অল্প বয়স্ক পুলিশ অফিসার নোট নিচ্ছিল। তারা তিনজনেই ওলেগের দিকে তাকালো।

ওলেগ ঘরে ঢুকে বয়স্কা নার্সটিকে খুবই করুণ সুরে বলল, আচ্ছা আমাকে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। এটাই কী সেই জায়গা?

নার্সটি বলল, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

ওলেগ বলল, আচ্ছা সেই লোকটি কোথায়?

নার্স জানালো, তাকে অ্যানাস্থেসিয়ায় রাখা হয়েছে। এখন আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসছে।

ওলেগ বলল, অনুগ্রহ করে যদি বলেন কী হয়েছিল?

নার্স জানালো ভয়ের কিছু নেই। সুস্থ হয়ে উঠছে। হাতে চোট খেয়েছিল।

ওলেগ দেখল আর একজন নার্স কিছু জামা কাপড় সরিয়ে রাখছে।

ওলেগ তৎক্ষণাৎ বয়স্কা নার্সকে বলল, আচ্ছা যদি ওই পোষাকগুলো আহত ব্যক্তির হয় তাহলে আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেই আমার বন্ধু। আমি আমার বন্ধুকে এখুনি বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

নার্সটি বলল, লোকটির কেটে যাওয়া জায়গাগুলোতে অনেক সেলাই দেওয়া হয়েছে। তাই একমাত্র ডাক্তার বলতে পারবে তাকে এখন ছাড়া যাবে কিনা।

ওলেগ বলল, আমি জানি আমার বন্ধু হসপিটালে থাকা একদম পছন্দ করে না। আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসার আরও ভালো ব্যবস্থা করব।

নার্স জানালো, অনেক রক্ত বেরিয়েছে। এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া রিস্ক। অন্য হসপিটালে ভর্তি করলে করতে পারেন।

এবার পুলিশ অফিসারটি কথা বলল। সে উঠে ওলেগের কাছে এসে বলল, আচ্ছা আপনি কী আপনার বন্ধুর কোন বিবরণ দিতে পারেন? এই যেমন উচ্চতা, ওজন, বয়স, গঠন ইত্যাদি।

ওলেগ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, পুলিশ জেরা করলেই সে কী বলবে।

ওলেগ বলল, আমার সঙ্গে আমার বন্ধুর দেখা প্রায় দু বছর হল হয়নি। শেষবার মন্ট্রিলে দেখা হয়েছিল। আমি আজই এখানে এসেছি। ওর কোনও খোঁজ না পেয়ে পুলিশের ইনফরমেশন মত এই হসপিটালে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

পুলিশ অফিসারটিও ছাড়বার পাত্র নন। বলল, আমি উচ্চতা, বয়স, ওজন ইত্যাদি জানতে চাইছি। যদি না মেলে তাহলে এখানে আপনার বৃথাই সময় নষ্ট করা হবে।

ওলেগ একটু চিন্তার ভান করে বলল, সঠিক হবে না জানি তবু যতদূর বলতে পারি উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির মত হবে। ওজন ধরুন একশ আশি পাউন্ডের মত।

পুলিশ অফিসার আবার প্রশ্ন করল, চুল? চোখ?

ওলেগ বলল, চুল এখন হয়তো একটু একটু পাকতে শুরু করেছে। চোখ ধূসর বর্ণের। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে।

পুলিশ অফিসার বলল, হুঁ, কিছু কিছু বিবরণ মিলছে। যাইহোক আপনার বন্ধু যে লেনেক্সি হসপিটালে আছে এই খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?

ওলেগ একটা সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানার অছিলায় একটু সময় নিল, তারপর বলল, আমার বন্ধু যেই হোটেলে থাকে সেই হোটেলে আমি ফোন করি। হোটেল ম্যানেজার আমায় জানায় সে সেন্ট্রাল পার্কে গেছে। যদি তাকে ফোন করে তবে যেন সে একঘণ্টা পরে ফোন করে। একঘণ্টা পরে আমি ওকে ফোন করি। জানতে পারি তখনও সে ফেরেনি। তখন আমি সেন্ট্রাল পার্কে আসি। তা প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ। এখানে একটু হৈ চৈ লক্ষ্য করে কর্তব্যরত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা জানতে পারি। আমি আমার বন্ধু সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তিত ছিলাম। যদি তারই আঘাত লেগে থাকে এই ভেবে, তার উপর যখন জানলাম ওই ব্যক্তিটি বয়স্ক তখন হসপিটালে খোঁজ নিতে এলাম।

ওলেগ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নড়েচড়ে বসল।

পুলিশ অফিসারটি বলল, তাহলে আপনাকে তো আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়।

ওলেগ একটু হকচকিয়ে গেল, আবার কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বলল, আপনার নাম কী? কোথায় উঠেছেন? আপনার বন্ধুর নাম কী?

ওলেগ বলল, আমার নাম জন ব্রাউনিং। আমি হোটেল টরেন্টোতে উঠেছি। আমার বন্ধুর নাম রবার্ট জনস্টোন।

আপনার বন্ধুর ঠিকানা? পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করল।

ওলেগ বলল, এখনকার ঠিকানা ঠিক বলতে পারব না। তবে তখন সেভেন্টি টু স্ট্রীটের কাছাকাছি থাকত।

আপনার বন্ধুর টেলিফোন নাম্বার আপনার কাছে আছে?

ওলেগ বলল, হ্যাঁ অবশ্যই। বলে নিজের পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল। তারপর বলল, সরি মনে হচ্ছে নোট বইটা হোটেল রুমে ফেলে এসেছি।

পুলিশ অফিসারটি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে ওটা পরে দেখা যাবে।

তারপর একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে ওলেগের দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে বলল, আপনার বন্ধুর যে নাম আপনি বললেন, সেটা সঠিক তো?

ওলেগ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোথাও কোনও ভুল হলো নাতো?

ওলেগ বলল, হ্যাঁ, সঠিক জানি ওর নাম রবার্ট জনষ্টোন।

পুলিশ অফিসারটি বলল, ঠিক করে ভেবে বলুন, জনসন না জনষ্টোন?

ওলেগ একটু কুঁকড়ে গেল। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। বলল, জনসন নয় জনস্টোন।

পুলিশ অফিসারটির ঠোঁটের কোণে তেরছা হাসি খেলে গেল।

ওলেগের সারা শরীর কেঁপে উঠল। তার ভয় আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল অল্প বয়সী নার্সটির মন্তব্যে।

নার্সটি তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, তখনই ধরেছি। এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি রাশিয়ান না হয়ে

যায়ই না। আমি রাশিয়ান ভাষা বেশ ভালো ভাবেই জানি।

ওলেগের চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসলো। এমন অবস্থায় যে সে কখনো পড়েনি তা নয়। একটু সামলে নিয়ে ওলেগ বলল—আমার বন্ধু রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে—ষ্টেকু! তবে তার ইংরাজী ছাড়াও ফরাসী ভাষায় ভালো দখল আছে। কিন্তু রাশিয়ান বলেই একটু রাগতঃ ভাব দেখালো।

নার্সটি চেঁচিয়ে উঠল, বিশ্বাস না হলে ডঃ ব্রোনস্কীকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ লোকটি অ্যানাস্থেসিয়া নেওয়ার সময় রাশিয়ান ভাষায় আর্তনাদ করছিল।

ওলেগ বলল, হতে পারে আমার বন্ধু কয়েকটি রাশিয়ান শব্দ শিখে থাকবে।

নার্সটি আরও চিৎকার চেঁচামেচি করে তার নিজের সপক্ষে সাক্ষী জোগাড় করতে চাইল।

বয়স্কা নার্সটি ভীষণ চটে গেল চেঁচামেচিতে। বলল তোমরা কী করছ, এটা কী চেঁচামেচি করার জায়গা! দরকার হলে তোমরা আস্তে আস্তে কথা বলো। তারপর পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনার কাজ কী এখনও শেষ হয়নি?

পুলিশ অফিসারটি বলল, এই আর কিছুক্ষণ সময় নেব, বলে ওলেগকে কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ ব্রাউনিং অ্যালেক্সি বলে কাউকে আপনি চেনেন?

ওলেগের মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। বলল, কই না তো।

পুলিশ অফিসারটি বলল, আহত লোকটি বার বার এই নামটা উচ্চারণ করছিল। অ্যালেক্সি ওনার স্ত্রী নন তো?

নার্সটি আবার চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কোন মেয়ের নাম নয়। তাছাড়া আহত লোকটি আর একজনের নাম উচ্চারণ করছিল, ওলেগ।

পুলিশ অফিসারটি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওলেগ। আচ্ছা ওলেগ ওনার স্ত্রীর নাম নয় তো?

ওলেগা জোর করে মুখে হাসি এনে বলল, না না ওনার স্ত্রীর নাম ওইলমা জন ষ্টোন।

ওনার স্ত্রীর ঠিকানা? পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করল।

প্যাটোগ—! লং আইল্যান্ড। ওলেগ বলল, হতে পারে তিনি তার কুমারী জীবনের নাম ব্যবহার করছেন। কোনিগ। উইলমা কোনিগ। আমি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

পুলিশ অফিসারটি উইলমার সঠিক ঠিকানা জানতে চাইল যোগাযোগ করার জন্য।

সেই মুহূর্তে ও ঘরের ভিতর থেকে দুই জন যুবক বেরিয়ে এল তাদের একজনের গলায় ক্যামেরা আর অন্যজনের গলায় স্টেথো। পুলিশ অফিসারটি তার জেরা থামিয়ে দিল।

ওদের একজন পুলিশ অফিসারটিকে বলল, লেফটেন্যান্টকে বলবেন যে আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। হাতের আঙুলের ছাপ ভালোমতই নেওয়া গেছে। কাল সব পাঠিয়ে দেব।

বয়স্কা নার্সটি জানতে চাইল, জ্ঞান ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ—ভালোমতই ফিরেছে, হাতের আঙুলের ছাপ দিতে চাইছিল না।

ওলেগ খুবই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে উঠল, উনি কী ওর নাম জনস্টোন বলেছেন?

ডাক্তারটি উত্তর দিল, না উনি কিছুই বলছেন না, কোন কিছুই মনে করতে পারছেন না।

অল্প বয়স্ক নার্সটি মিশচার-এর জামা কাপড় দেখিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কী করব?

ক্যামেরা কাঁধে যুবকটি একটা সিগারেটের আর জামার হাতায় আটকানোর মত একজোড়া বোতাম যা দেখতে অন্যসব কাফ-লিঙ্কের মত নয়, নার্সের টেবিলে রেখে বলল, এগুলো ওর কাছে পাওয়া গেছে। জামা প্যান্টের সাথে রেখে দিন। লেফটেন্যান্ট-এর নির্দেশ মত কাজ করবেন।

কাফ লিঙ্ক দুটোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ওলেগ। ও দুটো মোটেই কাফ-লিঙ্ক নয়। জামার হাতায় লাগানো হয় এমন মারণাস্ত্র। পরীক্ষা করলেই বুঝে যাবে। ওলেগ যে প্ল্যান করেছিল সবই ভেস্তে যাচ্ছে। মিশচারকে নিয়ে পালানো সম্ভব হবে না।

বয়স্কা নার্সটি মিশচার-এর ঘরে ঢুকে যেতে ওলেগও আস্তে আস্তে মিশচার-এর ঘরে ঢুকে পড়লো। ওলেগ পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা খুঁজছিল তা থাকাতে নিশ্চিত হল।

মিশচার নিঃসাড়ে পড়ে আছে। নার্স ওর শিরায় আটকানো নলটা পরীক্ষা করছিল। ঘরে একটা

জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। ওলেগ আস্তে আস্তে মিশচার-এর বিছানার গা ঘেষে দাঁড়ালো।

ওলেগ নার্সটিকে অনুরোধ করল, আলোটা জ্বেলে দিন। ভালো করে একটু মুখটা দেখি।

নার্সটি ওলেগের এই সকরুণ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। আলো জ্বালাবার জন্য সে সুইচবোর্ডের দিকে গেল।

ওলেগ এই মুহূর্তটুকুর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে পকেট থেকে হাত বার করে মিশচার-এর ডান হাতটা তুলে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে মনিবন্ধে মৃদু চাপ দিল। আলো জ্বলে উঠলে মিশচার তাকালো। ওলেগকে দেখে তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ওলেগ আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিল।

নার্স বলল, বোধহয় উনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন।

ওলেগ বলল না, ইনি আমার সেই বন্ধু নন। ভাঙা অ্যাম্পুলের কাচ ওর আঙুলে বিঁধছিল।

ওরা বেরিয়ে এল। পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন?

নার্স বলল, উনি ঘুমাচ্ছেন।

ওলেগ পুলিশ অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ইনি আমার বন্ধু নন। আচ্ছা চলি, দেখি অন্য হসপিটালে খোঁজ করতে হবে।

।। সাত ।।

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে টম যখন প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক ফিরছিল তখন ভাবলো একটু ঘুমিয়ে নেবে। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ও রোড়িং অ্যাম্বাসাডার। সমস্ত কঠিন কাজগুলো ওকেই করতে হয়। মাসের প্রায় অর্ধেকের বেশী দিন তাকে আজ ব্রাসেলস কাল লন্ডন পরশু প্যাবিস করতে হয়। এবার একদিনের জন্য প্যারিস গেছিল। এখন ফিরছে। নিউইয়র্ক পৌঁছাবে কাল।

হঠাৎ টমের ডরোথির কথা মনে পড়লো। ডরোথি এখন কী করছে? ডরোথির মত সুন্দর মেয়ে সে আর একটাও দেখেনি। সত্যি এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাত্র একটা রাত সে ডরোথিকে কাছে পায়নি মনে হচ্ছে কত যুগ কেটে গেছে।

টম বাড়ি ফিরতে ডরোথি দরজা খুলেই টমকে জড়িয়ে ধরল। টম আলতো চুমু খেল।

ডরোথি অভিমান করে বলল, আমায় ফেলে তুমি কি করে থাক বলত।

টম দেখলো ডরোথি ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও কিছু এলো মেলো নেই। গভীর আবেগে পুলকে ডরোথিকে টম আরও জোরে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ চুম্বনে ভরিয়ে দিল।

টম জামা কাপড় পাল্টে পরিষ্কার হয়ে নেয়। তারপর দুজনে বারান্দায় দু গ্লাস মার্টিনি নিয়ে বসে। দুজনে নানা রকম গল্প করে। তাতে ভবিষ্যতের স্বপ্নও মিশে থাকে।

ডরোথি বলতে থাকে যে সময়টুকু টম ছিল না সে কি কি করেছে।

টম মুচকি হাসে আর শোনে।

ডরোথি বলে, এবার তুমি নিশ্চয়ই ছুটি পাবে। আমরা কিন্তু এবারের ছুটিটা বাইরে কাটাবো।

টম জিজ্ঞাসা করে, তা কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?

এমন একটা জায়গায় যাবো যেখানে কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আমি তোমায় শুধু আমার একার করে পাবো। ওহ্ দিন রাত কাজ আর কাজ। অসহ্য। ডরোথি বলল।

কি আর করবো বলো, যার যেমন কাজ। হতাশার সুরে বলল টম।

তোমার কোন কথাই শুনছি না। ডরোথি বলল, এবার বাইরে যাবই যাবো।

হঠাৎ টম বলল, আচ্ছা ডরোথি দক্ষিণ ফ্রান্সে গেলে কেমন হয়?

ইয়ার্কি করো না, ডরোথি বলল, ওখানে যেতে কত খরচ জানো?

টম বলল, না না ইয়ার্কি করছি না, সিরিয়াসলি। তোমায় বলতে ভুলে গেছি, এবার প্যারিসে মরিস মিচেলের সঙ্গে ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। ওরা এবার ওয়াশিংটন বেড়াতে আসছে।

টম বলল, আচ্ছা এমন করলে হয় না ওরা তিনমাস আমাদের বাড়িতে থাকুক আর আমরা তিনমাস দক্ষিণ ফ্রান্সে ওদের বাড়ি থাকবো। এতে দুই তরফেরই বাড়ি ভাড়া বেঁচে যাবে।

ডরোথি বলল, তার মানে বদলা বদলি।

টম বলল, তাতে মন্দ কি?

ডরোথি একটু ভেবে বলল, না মন্দ নয়। তাহলে আজই ফোন করে ওদের প্রস্তাবটা জানিয়ে দাও।

ইতিমধ্যে ফোন বেজে উঠল। ডরোথি একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওহ্, ওরা জানতে পারে কী করে বলতো?

টম ফোন ধরার জন্য গেল। ওপাশ থেকে নিউইয়র্ক টাইমসের সহকর্মী জিম বলল হ্যালো কী খবর! আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?

টম বলল, না, তেমন কোনও খবর আছে নাকি?

ইয়ার্কি মেরো না টম তুমি একেবারে মার মার কাট কাট ব্যাপার করে দিয়েছ।

টম বলল অবাক হয়ে, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জিম বলল, বুঝতে পারছি না তুমি ওটা হোলজাইমারের নামে প্রকাশ করলে কেন? এমন একটা খবর তুমি ছাড়া আর কেউ জোগাড় করতে পারে না। নিজের নাম প্রকাশ করতে পারতে। একেবারে হট কেকের মত কাগজ কাটছে।

টমের মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

জিম তখনও বলছে তুমি যদি গোপন করতে চাও তাহলে কারো কিছু করার নেই।

টম বিনয়ের সঙ্গে বলল, জিম আমাকে একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবে প্লিজ।

জিম এবার মনে হয় সত্যিই একটু থম মেরে গেল। ন্যাটোর একটা সিক্রেট মেমোরেন্ডাম সম্বন্ধে তুমি জানো না?

টম বলল, কী উল্টোপাল্টা বক বক করছ?

জিম বলল, তোমার টাইপ মেশিনের সমস্ত অক্ষর আমাদের জানা। মেমোরেন্ডামের কপি তো ঐ মেশিনে করা।

টম বলল, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। তোমার ভুল হচ্ছে।

জিম কিন্তু টমের কথা তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, আচ্ছা এতে তো জাতীয় নিরাপত্তা নষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় এতে আমাদের উপকারই হবে।

টম রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, ইমপসিবল, আমি এখনও বলছি আমি ওটা পাঠাই নি।

জিম বলল, টম তোমার এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। এডিটোরিয়াল বোর্ডে এই নিয়ে কথা হয়েছে। তারা বলছে এটা ভালোই হয়েছে। তারা টাইপ করা কপি দেখে এটা ছাপতে রাজি হয়েছে কারণ তাদের তোমার উপর অগাধ বিশ্বাস। অন্য কারুর হলে ওরা এটা এত সহজে ছাপাতে দিত না। এখন তোমার নিরাপত্তার কথাই ভাবা হচ্ছে। তুমি ভয় পেও না, সমস্ত সম্পাদকমণ্ডলী তোমার সঙ্গে আছে। আমিও তোমার সঙ্গে আছি। আমার খুব ভালো লাগল তাই তোমাকে ফোন না করে পারলাম না।

টম ক্লান্ত হয়ে বলল, জিম আমি এখনও বলছি, আমি এটার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

জিম বলল, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাল দেখা হলে কথা হবে।

জিম ফোন ছেড়ে দিল। টম বুঝতে পারছে না কী বলবে। ডরোথি সবই শুনছে ওদের কথা। কেউ কোন কথা না বলে চুপ করে গেল।

।। আট ।।

নিউইয়র্ক টাইমসের সেই কয়েকটি অক্ষর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সমগ্র আমেরিকাকে ঝলসিয়ে দিল! পেন্টাগন, শ্যানডন হাউস, সি আই এ এমন কি ন্যাটোর ইনটেলিজেন্সের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিল।

এদিকে টনি লটন হোলজাইমারের লেখার পাশে একটা ছোট্ট লেখা দেখে লাফিয়ে উঠল আর জামা প্যান্ট পরে তখনই রওনা দিল।

ব্রাড জিলন শ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন আর যে ঘরে মেমোরেন্ডাম

ছিল সেই ঘরে গিয়ে দেখে এসে নিশ্চিন্ত হলেন।

ব্রাড জিলনের ফোন পেতেই তিনি জানালেন আমার এখান থেকে মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়নি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। এখানকার ফাইলপত্র যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আছে। কোনও ভাবে হাত বদল হয়নি।

ওদিকে সেক্রেটারী অফ ডিফেন্স ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক টাইমসকে চেপে ধরলেন হোলজাইমার সম্বন্ধে জানার জন্য। এবং সে কোথা থেকে মেমোরেন্ডাম পেল তা জানার জন্য।

টাইমস পত্রিকার সম্পাদক খুবই ভদ্রলোক। তিনি বললেন, দেখুন মার্টিন হোলজাইমার আমাদেরই পত্রিকার একজন রিপোর্টার। আর আজকের শাসনতন্ত্রে নিজের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। আর তাছাড়া কোন্ সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে তা জানাতে আমরা বাধ্য নই।

সেক্রেটারী অফ ডিফেন্স পেন্টাগনেও একটা কড়া নোট দিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত। হোলজাইমার যদি সেই দুটোও পেয়ে থাকে তাহলে সর্বনাশ হতে আর বাকী থাকলো না। ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশ এতে বিব্রত হবে আর আমেরিকার মানসম্মান সব ধুলোয় মিশবে।

ব্রাড জিলন অস্থির ভাবে তার ঘরে পায়চারি করছে। এই সময় টনি এল।

টনি জিজ্ঞাসা করল, সকালবেলা কোথায় চলে গেছিলে আমি ফোন করে করে হয়রান?

ব্রাড জিজ্ঞাসা করল, কোনও খবর জোগাড় করতে পেরেছো?

টনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আগে আপনি বলুন।

ব্রাড বলল, বলছি আর ভবিষ্যতে আমরা কি করব তাও ঠিক করে নেব। ডিফেন্স সেক্রেটারী তো আর ছাড়বে না। চাকরি যায় যায় অবস্থা।

টনি ব্রাডকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঘাবড়াবেন না। এই নিয়ে আলোচনা হবে।

ব্রাড খুশী হল। তারপর বলল, আমি শ্যানডন হাউসে ফোন করেছিলাম। সেখান থেকে মেমোরেন্ডাম চুরি যায়নি। যেমন ছিল তেমন আছে তিনটি খণ্ডই। প্রথমটি প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হল খুবই বিপদ জনক। ওতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ নীতি আর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশদ বিববণ আছে। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাসেলসে ন্যাটোর বৈঠক বসবে। সেইজন্য মেমোরেন্ডাম ওয়াশিংটনে আসে। তারপর এটা শ্যানডন হাউসে পাঠানো হয়। শুধু মাত্র টপ সিকিউরিটি অফিসাররা এর খবর জানে।

টনি বলল, হুঁ তাহলে শ্যানডন হাউসে পাঠানোর মানে মেমোরেন্ডামটি দ্বিতীয় বারের মত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

ঠিক এই রকম, ব্রাড বলল, এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী পলিসি কাজেই পেন্টাগন এতে খুঁত রাখতে রাজী নয়।

কিন্তু শ্যানডন হাউসে এত দেরী হবার কারণ কী, টনি জিজ্ঞাসা করল।

ব্রাড বলল, বুঝতেই পারছ খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে আগামীকালই ওটা ফেরৎ পাঠানোর দিন ঠিক করা হয়েছিল।

কিন্তু পেন্টাগন এত তাড়াহুড়ো করে মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউসে পাঠালো কেন বুঝতে পারছিনা, টনি বলল।

কারণ অতিরিক্ত সাবধানতা যাতে মেমোরেন্ডামের কোন অংশ কোন কারণে আমেরিকার কূটনীতিকে দুর্বল না করে দেয়। ব্রাড বলল।

ব্রাড আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা টনি তোমার কি মনে হয় মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে ফাঁস হয়েছে?

টনি বলল, আমার তো তাই মনে হয়। তবে তাদের কথা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন অংশে কম নয়। ডিনামাইট দিয়ে না উড়িয়ে প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে এটা চুরি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

মেমোরেন্ডাম তার জায়গাতেই আছে কেউ যে তাতে হাত দিয়েছে তার প্রমাণ এখনও নেই।

তবে যদি একটু ভাবা যায় যদিও প্রমাণিত নয় যে কারো হয়তো সুযোগ এসে গেছিল ওটা দেখার আর তুলে নেবার। সে সেই সুযোগে ওটা নিয়ে টাইপ করে নিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। এটা আবার ভাববার বিষয়, সে কি দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ড টাইপ করার সময় পেয়েছে?

ব্রাড বলল, হতে পারে সে হয়তো শুধুমাত্র প্রথম খণ্ডটাই টাইপ করেছে।

টনি বলল, হতে পারে সেখানের নিরাপত্তা কঠোর। কিন্তু সেখানে কারো যাতায়াত থাকবে না এটা ভাবা ভুল। আমি ধরে নিচ্ছি কেউ এর সুযোগ অবশ্যই নিয়েছে। আর সে সবগুলোই তুলে নিয়ে গেছিল কারণ প্রহরীর সামনে তা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

ব্রাড বলল, তাহলে তুমি বলছ সবগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে ফটো তুলে মস্কোয় পাঠিয়ে দিয়েছে।

কে জি বি-র নজর এর উপর পড়েছে, টনি বলল, আমরা এর খবর রাখি।

ভ্লাদিমির কোনোভ।

তুমি যেন এর কথাই বলছিলে। সে তো মঙ্গলবার আসছে, তাই না?

টনি বলল, আজ্ঞে না। তিনি আটদিন আগে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছে গেছেন।

ব্রাড বলল, বলো কী? তাহলে তো মেমোরেন্ডাম এতক্ষণে কোনোভ-এর হাতে চলে গেছে।

টনি বলল, না তা আর সম্ভব হয় নি, কারণ কোনোভ ইতিমধ্যে মৃত।

ব্রাড লাফিয়ে উঠল, মারা গেছে?

টনি মুচকি হেসে, হোলজাইমারের খবরের পাশের একটা ছোট্ট খবর ব্রাডকে দেখালো।

ব্রাড খুব তাড়াতাড়ি তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এ তো একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সেন্ট্রাল পার্কে আহত হয়ে লেনেক্সি হসপিটালে ভর্তি হয়। সেখানে হার্টফেল করে মারা যায়। তার সঙ্গে একটা বেতের লাঠি আর ফ্ল্যাশ লাইটার ছিল।

টনি, ব্রাডকে যেন একের পর এক অদ্ভুত ধাঁধায় ফেলতে লাগল। ব্রাডের প্রসারিত চোখের দিকে তাকিয়ে টনি বলতে লাগল—কোনোভ যে নিউইয়র্কে পৌঁছেছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর আমায় এই খবর জানায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে এফ বি আই-কে খবর পৌঁছে দিই। কোনোভ খুবই চতুর লোক। ওকে ধরা খুবই কঠিন কাজ। হঠাৎ একটা খবর পাওয়া যায় যে কোনোভ শনিবার রাতে সেন্ট্রাল পার্ক যাবে। ওকে ফলো করা হয়, আমি এই খবরটা জানতে পারি গতকাল। আজকের খবরের কাগজে সেন্ট্রাল পার্কের ঘটনাটা চোখে পড়তেই আমি লেনেক্সি হসপিটালে যাই তখন সে মৃত এবং মর্গে আইডেন্টিফাই এব জন্য রাখা হয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, কোনোভকে চিনতে আমার একটুও দেরী হয়নি।

ব্রাড যেন কোন অ্যাডভেনচারাস গল্প শুনছে। সে বলে উঠল তারপর—

টনি আরাম করে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল—আমার আবার কোন জিনিস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি না জানলে চলে না। কোনোভ এল আক্রান্ত হল এবং মারাও গেল। আঘাত তাহলে খুব বেশীই লেগেছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সেন্ট্রাল পার্কে তার সঙ্গে আরও একজন যুবক ছিল। কোনোভকে যখন ধরা হয় তখন সে পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশের দৃষ্টি ছিল কোনোভের ওপর তাই তারা অন্য ব্যক্তিটিকে গুরুত্ব দেয়নি। যাইহোক তারপর পুলিশ তাকে আহত অবস্থায় লেনেক্সি হসপিটালে ভর্তি করে।

রবিবার রাত্রে একজন তৃতীয় ব্যক্তি তার বন্ধুকে খোঁজার নাম করে হসপিটালে আসে। পুলিশ তাকে ঘেরাও করে। কিন্তু সে খুবই চতুর লোক ছিল। সুযোগ বুঝে কোনোভকে মেরে সে কেটে পড়ে। লোকটি চলে যাবার কিছু সময় পরে জানা যায় কোনোভ মারা গেছে।

ব্রাড সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

টনি তার সিগারেটে আবার একটা সুখটান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—এই গেল কোনোভের কথা। এবার আসছি তোমার বন্ধু টম কেলসোর কেচ্ছার কাহিনী নিয়ে।

ব্রাড হাঁ হয়ে গেল, টম কেলসো!

হ্যাঁ টম কেলসো। টনি বলে চলল টাইমসের পত্রিকা অফিসে আমি গিয়েছিলাম। আজ সেখান থেকে দুটো লেখা বেরিয়েছে, একটা টম কেলসোর ফ্রান্সের ঘটনার প্রতিবেদন, দ্বিতীয়টি হোলজাইমারের এই বিদ্যুৎবাহী খবর। আমি সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে দুটো লেখার টাইপ কপি

দেখেছি। দুটোই একই মেশিনে টাইপ করা। বুঝতে আমার দেরী হয়নি, কারণ দু-চারটে অক্ষর একই ভাবে বাঁকানো, টাইপও একই জায়গায় মোটা সরু।

বুঝলে ব্রাড এরজন্য কোনও পরীক্ষার দরকার হয়না দুটো চোখই যথেষ্ট, টনি বলল।

ব্রাড বলল, আমি টমকে বহুদিন থেকে চিনি। আমি বিশ্বাস করি না।

টনি বলল—কিন্তু এটাই সকলে বলাবলি করছে এমন কি টাইমসের সবার ধারণা টম নিজের নাম প্রকাশ করতে না চাওয়ায় হোলজাইমারের নামে প্রকাশ করেছে।

ব্রাড জোর গলায় বলল, হতেই পারে না। টম একাজ কখনোই করতে পারে না।

টনি বলল, তাহলে টাইপ মেশিন?

ব্রাড বলল, ওটা বানানো গল্প।

ব্রাডকে একটু খোঁচানোর জন্য টনি বলল, এমনও হতে পারে কেউ ওর টাইপ মেশিন ধার নিয়েছিল।

ব্রাড বলল, অবিশ্বাস্য, টম হল স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ছেলে, ওর হাতে যদি মেমোরেন্ডাম এসে থাকে তবে তা নিজের নামে ছাপানোর সৎসাহস আছে।

ব্রাড হল পেন্টাগনের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন হর্তাকর্তা। তার নিশ্চয়ই কিছু বুদ্ধি আছে। তাই ব্রাড যখন এত জোর দিয়ে বলছে তখন টনিকে একটু নরম হতে হল।

টনি চিন্তিত হয়ে বলল, তাহলে এটা নিশ্চয়ই কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ যে এই মেমোরেন্ডাম সংগ্রহ করে হোলজাইমারকে দিয়েছে। তাকে ধরতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান।

ব্রাড বলল, হোলজাইমারকেও জেরা করে কোনও লাভ হয়নি। কেননা সে তো বাধ্য নয়।

টনি বলল, এর একটা পথ মনে হয় আমি খুঁজে পাচ্ছি। এইসব কথাবার্তা তো আর রাস্তাঘাটে হয় না কোন হোটেল বা আস্তানায় নিশ্চয়ই হয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রাড বলে উঠল, হোলজাইমার বলেছে নিউইয়র্কের কোনও এক ফ্ল্যাটে। কিন্তু তার নাম ঠিকানা বলতে সে রাজী নয়।

ওটা আমরা ঠিক বের করে নেব, বরং একবার টম কেলসোকে বাজিয়ে দেখ।

ব্রাড বলল, আচ্ছা সেও না হয় একবার দেখা যাবে।

টনি চেয়ার থেকে উঠে মাথায় টুপিটা দিয়ে বলল, তাহলে গুড বাই।

।। নয় ।।

বিরাট বড় একটা হোটেল, ভেতরটা দেখলে মনে হবে শহরের মধ্যে একটা ছোট শহর। প্রশস্ত নাচঘর। আলো এত বাহারী মনে হচ্ছে যেন হীরে পান্না ঝরে পরছে। অসংখ্য ছেলে ও মেয়ে আনাগোনা করছে। ফ্যাশন শো হচ্ছে।

টনি লটন নাচঘরের এক কোণে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে আছে। তার সামনে টেবিলে একটা ভর্তি পানীয়ের গ্লাস তাতে বরফের টুকরো ভাসছে।

আজ হোটেলে একটা প্রোগ্রাম চলছে। কৃষি সংক্রান্ত যে ডেলিগেশন রাশিয়া থেকে এসেছে তাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

টনি বসে বসে নিজের মনে হাসছিল, ভাবছিল আজকের পৃথিবীতে মানুষ কত সহজে আলোর আড়ালে নিজের কালো মুখটা ঢেকে সকলকে ধাঁধিয়ে দিতে পারে।

এই মুহূর্তে যখন ওয়াশিংটনের বড় বড় কর্তাদের ঘুম ও মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে যে ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের কেলেঙ্কারী আবার সেই ওয়াশিংটন কত সহজে সেই রাশিয়ার ডেলিগেশনের বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে টনি লটন নিমন্ত্রিত হয়ে আসেনি। ন্যাটো মেমোরেন্ডামের ফাঁস হয়ে যাবার পেছনে কেজিবি-র যে হাত আছে এবং পেছনের মগজটি ভ্লাডিমির কোনোভ এবং তার সহকারী যে, টনির মতে বরিস গেরস্কি ছাড়া আর কেউ নয় এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

কোনোভ-এর মৃত্যু হয়ে গেছে, এখন দরকার গেরস্কিকে। আন্দাজে টনি আজ এখানে এসেছে। মনে হয় ওর আন্দাজ সফল, সেন্ট্রাল পার্কের সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি...

টনি হাততালির শব্দে স্টেজের দিকে তাকালো, দেখলো একজন দোভাষী ভীষণ ব্যস্ত। একবার আমেরিকান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছে আর পরক্ষণেই রাশিয়ান ডেলিগেশন এর নেতাদের সঙ্গে কথা বলছে। টনি যথেষ্টই আন্দাজ করতে পেরেছে, লোকটার মুখ যদিও টনি দেখতে পাচ্ছে না, পিছন দিকে টনি বসে আছে, তবুও তার বুঝতে দেরী হয়নি এই লোকটিই লেনেস্কি হসপিটালে বন্ধুর খোঁজে গেছিল কারণ পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ লোকটির চেহারার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে দোভাষী লোকটির চেহারার সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে।

চওড়া কাঁধ, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির মত লম্বা, চুল সাদা কালো মেশানো। ইস্ যদি একবার এদিকে ঘুরত তাহলে টনি তার মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পেত। তখন সে তার চোয়ালের খাঁজ আর নীল চোখটা মিলিয়ে নিত। না! কিছুতেই লোকটা এদিকে ফিরছে না।

হঠাৎ টনির চোখে পড়ল—আরে ঐ সুন্দরী যুবতীটি ডরোথি কেলসো না? তাহলে সেও কি এখানে নিমন্ত্রিত? টনি দেখলো, না! কোথাও টম কেলসোকে দেখা যাচ্ছে না।

ডরোথি ক্লোক-রুমের সামনেই দাঁড়িয়ে গেল...ওই যুবকটি কে? বেশ স্মার্ট চেহারা। ঝলমলে কালো চুল, চমৎকার মুখশ্রী। ধূসর রং-এর স্যুট-এ ভালো মানিয়েছে। যুবকটিকে যেন ডরোথির পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে কিন্তু ডরোথি ভীষণ ব্যগ্র ওর সঙ্গে কথা বলতে...ডরোথি ওকে ধরে ফেলল।

হ্যালো রিক, ডরোথি বলল।

রিক চমকে উঠে তাকালো, ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও মুখে হাসি টেনে বলল, সরি, আমি একটু ব্যস্ত আছি। ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কেমন আছে?

আমার সঙ্গে তার বহুদিন সাক্ষাৎ নেই, রিক জানালো।

ডরোথি হতাশ হল—বলল, ওকে আমাদের ভীষণ দরকার ছিল, ভেবেছিলাম নিউ ইয়র্কে আপনার সঙ্গে চার্লসের প্রায়ই দেখা হয়ে থাকবে।

না আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, রিক জানালো, আমিও বেশ অনেকদিন হল নিউ ইয়র্কে যাই নি।

রিক দু চারটে কথা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে সেরে ডরোথিকে বিদায় জানিয়ে চলে গিয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞদের দলে মিশে গেল।

টনি সজাগ হয়ে উঠল। ভীড় ঠেলে আস্তে আস্তে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। দোভাষী লোকটির মুখটি তার দেখা দরকার। টনি নিজেকে ভীড়ে আড়াল করে রাখলো।

টনি খুশিতে ছটফট করে উঠল। হ্যাঁ এই তো সেই বরিস গেরস্কি, তুমিও ওয়াশিংটনে!

টনি সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের বাইরে টেলিফোন বুথে ছুটে গেল। ব্রাডকে খবরটা জানানো দরকার। গেরস্কি খুবই মারাত্মক লোক, তাকে চোখের আড়াল করা চলবে না। যা করার ব্রাডকেই করতে হবে।

টনি কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। আর একটু হলে ডরোথির সঙ্গে ধাক্কা লাগত। ডরোথি চমকে উঠে বলল—আপনি এখানে?

টনি বলল সহাস্যে, তাহলে চিনতে পেরেছেন ম্যাডাম! আমি ব্রাড জিলনের বন্ধু টনি লটন। লন্ডনে থাকি। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি কী আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েক মিনিট ধার চাইতে পারি? আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলে নিতাম।

ডরোথি বলল, ও সরি, আমার জন্য টম বাড়িতে অপেক্ষা করছে—

আমি কিন্তু খুব বেশী সময় নেব না ম্যাডাম! তাছাড়া আমি হয়তো আপনাকে চার্লসের খবর জানাতে পারবো, টনি বলল।

ডরোথি বলল, চার্লস সম্বন্ধে আপনি বলবেন, তাহলে আসুন একটা টেবিলে বসা যাক। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক হবে না।

টেবিলে বসে টনি পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ডরোথির হাতে দিল।

ডরোথি কার্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল, বলল, তাহলে আপনি...

টনি ডরোথিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল...ব্যস আর কোনও কথা বলবেন না। জানেন

তো দেওয়ালেরও কান আছে।

টনি এবার বলতে শুরু করল—এবার আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন, ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে বেরিয়েছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। আর ওই মেমোরেন্ডাম টম কেলসোর টাইপ মেশিনে টাইপ করা হয়েছে।

ডরোথি ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

আমার মনে হচ্ছে আপনারাও বিবাদের বাইরে নন। সমস্ত কেজিবি এখন ওয়াশিংটন নিউইয়র্কে তৎপর। চার্লসের উচিৎ ছিল সব কিছু খুলে বলা। এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটু জানতে চাই। তাহলে আপনাদেরই সুবিধা হবে। আচ্ছা আপনি কী অস্বীকার করেন চার্লস কখনোই আপনাদের টাইপ মেশিনটা ধার করে নি?

ডরোথি ভয়ে কাঁপছে। বুঝতে পারছে না এই লোকটাকে কতটা বলা উচিৎ।

টনি বলল, দেখুন মিসেস কেলসো আমাকে আপনি শত্রু ভাববেন না। আমি ব্রাডের বন্ধু। ব্রাড আমাকে নিজের ভাই-এর মত ভালবাসে। চার্লসের জীবনে মস্ত বড় বিপদ আসছে তাই কেজিবির গতিবিধি ছাড়াও আমাদের নিজেদের লোকেদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে।

আমাদের এখন সবথেকে জরুরী কাজ হল ওদের লোকেদের খুঁজে বের করা। আপনি আশাকরি আমার সব কথা বুঝতে পারছেন, টনি বলল ডরোথিকে।

ডরোথি সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনাদের টাইপ মেশিনটা চার্লস কখনো ধার নিয়েছিল? এটা খুবই জরুরী, শুধু ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য নয়, জীবন বাঁচানোর জন্যও।

ডরোথি বলল, হ্যাঁ।

আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে ক্লোকরুমের সামনে আপনি একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ও মনে হয় ব্যাসিল মীডি—তাই না? টনি জিজ্ঞাসা করল।

ডরোথি চমকে উঠল। না তো! ও তো রিক নীলে, চার্লসের বন্ধু।

টনি বলল ও তাহলে ইনিও শ্যানডন হাউসেরই স্টাফ্।

ডরোথি বলল, না না, উনি হলেন কম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

না তাহলে মনে হয় আমার চিনতে ভুল হয়েছে। টনি বলল, ওর সঙ্গে চার্লসের দেখা সাক্ষাৎ হয়—

আগে দুজনের খুব ভাব ছিল। এখন শুনছি ওদের আর তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয় না, ডরোথি বলল, আমি ওর কাছে চার্লসের খবর জানতে চাওয়ায় ও বলল বোধহয় একযুগ ওদের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

নিউইয়র্কে থাকে?

একই বাড়িতে, নিজের ফ্ল্যাটে।

টনি বলল, তাহলে ওদের দুজনের সাক্ষাৎ নেই কেন?

ডরোথি বলল, মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়েছে।

খুবই দুঃখের, সহানুভূতি জানালো টনি।

।। দশ ।।

ওলেগ গাড়ির দরজা খুলে অ্যালেক্সিকে বলল, উঠে এসো চটপট।

অ্যালেক্সি গাড়িতে ওঠার আগে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল।

ওলেগকে দেখতে বিশ্রী, মুখটা একেবারে গোল। বৃষস্কন্ধ চেহারা, হাত দুটো মোটা মোটা আঙুলগুলো থ্যাবড়া।

কিছুক্ষণ বসে থেকে অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ওলেগ বলল, এই একটু বেরিয়ে নেব।

অ্যালেক্সি বলল, সকালে ওভাবে আমাকে ফোন করা উচিৎ হয় নি তোমার। কেউ আড়ি পাততে পারত।

ওলেগ চেঁচিয়ে উঠল, ওরা চারিদিকেই জাল বিস্তার করেছে।

ওলেগ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা টম কেলসো চার্লস কেলসোর ভাই, তাই না?

অ্যালেক্সি ওলেগের এই হঠাৎ প্রশ্নে থমকে গেল, বলল তা হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

ওলেগ বলল, যদি চার্লস কেলসো ওর ভাইকে বলে যে সেই রাতে হোলজাইমারের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমিও উপস্থিত ছিলে?

অ্যালেক্সির ভয় দ্বিগুণ হয়ে গেল। তবুও সে বলল, বলেই যদি থাকে তাতে কী আসে যায়?

ওলেগ বলল, অনেক কিছুই হতে পারে। টম কেলসোর এমন অনেক বন্ধু আছে যারা পেন্টাগন এমনকি ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত। তাহলে বুঝতেই পারছ বললে কিছু ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওরা কী গোয়েন্দা দপ্তরের লোক?

হতেই পারে, ওলেগ বলল, তখন ওরা চার্লস কেলসোকে ছেড়ে তোমার দিকে বেশী মনোযোগ দেবে।

অ্যালেক্সি বলল, চার্লস জানেই না, আমি কখনো ওই মেমোরেন্ডামে হাত দিয়েছি। ওর এ রকম কোনও সন্দেহ কখনো হবেও না।

অ্যালেক্সি কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। ও চার্লসের ভয় দেখানো চিঠিগুলোর কথাই ভাবছিল। এই কদিনে চার্লসের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন অ্যালেক্সি লক্ষ্য করেছে। তাহলে কী চার্লস টর্নিকে কিছু বলেছে? নাহলে ওদের বন্ধুত্ব এমন নষ্ট হয়ে যাবে কেন?

ওলেগ বুঝতেই পেরেছে যে অ্যালেক্সি কিছু একটা দুঃশ্চিন্তা করছে। বলল, মনে হচ্ছে তুমি একটু চিন্তার মধ্যে আছো। আচ্ছা মিশচার তোমায় বলেছিল মেমোরেন্ডামের মাইক্রোফিলমটা তৈরী হয়ে গেলে ওটা আমার হাতে দিতে। তা ওটা এনেছ তো?

অ্যালেক্সি জানত ওলেগ এই প্রশ্ন করবে। অ্যালেক্সি ওলেগকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি ওটা ইতিমধ্যে মস্কো পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওলেগ চেঁচিয়ে উঠল, মস্কো পাঠিয়ে দিয়েছ? কখন পাঠিয়েছ? কই এখনও তো মস্কো থেকে খবর পাই নি যে ওরা মাইক্রোফিলমটা পেয়েছে।

অ্যালেক্সি দেখলো আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। এখন মিশচার পরে ওলেগই হল আমেরিকায় কেজিবি-র প্রধান হর্তাকর্তা।

অ্যালেক্সি আস্তে আস্তে বলল, তিন চার দিন আগে আমার সঙ্গে চার্লসের দেখা হয়েছিল। ওর হাব ভাব খুব একটা সুবিধার ছিল না। ওর মনে হচ্ছে ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে নিয়ে আসা তার খুব ভুল হয়েছে, একটা অপরাধ বোধ তাকে ঘিরে রেখেছে।

ওলেগ চুপচাপ ওর কথা খুব মন দিয়ে শুনছে।

অ্যালেক্সি বলে চলেছে—চার্লস আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল বলল, হয় আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাই নয় তো ও শ্যানডন হাউসে জানিয়ে দেবে এই মেমোরেন্ডাম সরানোর পেছনে আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ও কী চিঠি লিখেছে?

অ্যালেক্সি বলল, হ্যাঁ একটা ড্রাফট্‌ আমায় দেখিয়েছে, ফাইনালটা আমায় দেখায় নি।

ওলেগ বলল, হতে পারে এতক্ষণে ও ফাইনাল করে ফেলেছে।

অ্যালেক্সির ভয় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ও চুপ মেরে গেল।

ওলেগ বলল, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।

অ্যালেক্সি চুপচাপ বসে আছে। একবার সে ওলেগের মুখটা চুরি করে দেখে নিল। ওলেগ কি বোঝাতে চায় তা বোঝার চেষ্টা করল।

মিনিট খানেক কেউ কোনও কথা বলল না। অ্যালেক্সির মনে হল ম্যাজেন্টা আলোয় রাস্তার দু-পাশের গাছপালা গুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আদ্যিকালের ভয়ঙ্কর জীবের মত।

ওলেগের মনের কথা অ্যালেক্সি কিছুতেই ধরতে পারছিল না। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ওলেগ হঠাৎ বলে উঠল, কেটির খবর কি? ওর কোনও খবর রাখো?

অ্যালেক্সি একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। কেটি? কেন কেটির কি হয়েছে?

ওলেগ ভীষণ তিক্ত ভাবে বলে উঠল, তোমার কী ধারণা ছিল মাইক্রোফিলম নিয়েই তোমার কাজ শেষ?

অ্যালেক্সি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। সত্যি কেটির একটা খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল। মাইক্রোফিল্মটা পেয়ে সে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল। ওলেগের পরের কথায় অ্যালেক্সি রীতিমত চমকে উঠল।

কেটি এখন জেলে।

কেটি জেলে কেন? অ্যালেক্সি বলল, ম্যারিজুয়ানার আড্ডায় ধরা পড়েছে বুঝি?

ওলেগ বলল, তুমি দেখছি কোন খবরই রাখো না। তোমার ছুটি নেওয়া উচিত। গ্রীনউইচ ভিলেজের গোপন বোমা তৈরীর কারখানায় হাতে নাতে ধরা পড়েছে। বুঝতেই পারছ ওর মুখ থেকে পুলিশ সব কিছু বের করেই ছাড়বে। তখন তোমার অবস্থাই বা কী হবে আর আমার অবস্থাই বা কী হবে আন্দাজ করতে পারো?

ওলেগ ভিতরে ভিতরে খুবই অশান্ত হয়ে উঠেছিল। অ্যালেক্সি সাহস করে উঠতে পারছিল না ওলেগের সঙ্গে কথা বলার। সে চুপ করে বসে রইল।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে কথা বলার সুযোগ করে দিল। ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, কেটি কেমন মেয়ে?

অ্যালেক্সি কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি বলল, ও খুবই শক্ত মেয়ে। ওর কাছ থেকে ওরা সহজে কথা বের করতে পারবে না।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে ধমক দিয়ে সাবধান করে দিল বলল, তুমি এই দু তিনদিন তোমার ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও নড়বে না। কারো সঙ্গে দেখাও করবে না। তোমার মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়। তারপর আমার নির্দেশ পাচ্ছো, অপেক্ষা করবে ফোন করবে না, বুঝেছ?

অ্যালেক্সি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কোথায় থাকে, তোমার ওখানেই তো?

অ্যালেক্সি বলল, না, আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হওয়াতে ও শ্যানডন হাউসে ফ্ল্যাট নিয়েছে।

ওলেগ নিজের মনেই বলতে লাগল শ্যানডন হাউস? ওখানকার নিরাপত্তা ভীষণ কঠোর। আমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে বলল, তুমি তাহলে এখানে নেমে যাও। গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ফ্ল্যাটে চলে যাও। আর মনে রেখো আমার ফোনের অপেক্ষা করবে।

দরজা খুলে ওলেগ অ্যালেক্সিকে মাইল কুড়ি দূরে শহরের শেষে নামিয়ে দিল। আর নিজে দ্রুত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল।

।। এগারো ।।

প্রিয় টম, আমি চার্লসের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। আমাকে একদম গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমি বোধহয় ওকে একটু বোঝাতে পেরেছি। ও এখন মনে করছে এমন একটা বোকামির কাজ তার করা ঠিক হয়নি।

যদি ন্যাটো মেমোরেন্ডাম প্রকাশের আগে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যেত তাহলে এমন একটা ঘটনা মনে হয় ঘটত না। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। এমন কিছু নতুন ঘটনা ঘটেছে তার জন্য চার্লস খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি হলো কেটি কোলিয়ার নামে একটি মেয়ে ধরা পড়েছিল এখন সে জামিনে মুক্তি পেয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছে এটা খুবই চিন্তার কারণ।

এদিকে হোলজাইমার পুলিশের জেরায় হাবুডুবু খাচ্ছে। উপযাচকের মত এই চিঠি লিখলাম বলে কিছু মনে করো না। তবে আমার উপর ভরসা রাখতে পারো। চার্লসের জন্য আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করবো। তবে বুঝতেই পারছ আমরা অন্য একটা ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত।—তোমার ব্রাড জিলন।

চিঠি খানা প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করল টম। ডরোথির দিকে তাকিয়ে দেখল সে দুহাতে মুখ ঢেকে বিবর্ণ হয়ে বসে আছে।

এই চিঠিটা পড়ার আগে ওরা ভাবতেও পারে নি আজকের দিনটা এমন খারাপ বার্তা বয়ে নিয়ে এসে অন্ধকার করে দেবে।

এমনিতেই টম ভীষণ ক্লান্ত ছিল। কিছুক্ষণ আগে সে টাইমসের পরবর্তী সংস্করণের জন্য প্রায় পঞ্চাশ পাতা টাইপ করেছে। তার ওপর কাল কি পরশু ব্রাসেল যেতে হবে। কিসিংগার যাচ্ছে ন্যাটোর গোপন বৈঠকে যোগ দিতে। তাকে টাইমসের হয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের এই দুরূহ এবং অতি প্রয়োজনীয় বৈঠকের মালমশলা জোগাড় করে পর্যায়ক্রমে পাঠাতে হবে। এর মধ্যে আবার এসে গেল চার্লসের ব্যাপার।

টম একটা চুরুট ধরিয়ে ডরোথির দিকে তাকালো। সে সেই একইভাবে নিথর পাথরের মত বসে আছে। ডরোথি এই আঘাত সহ্য করতে পারছে না।

টমও কিছু কম আঘাত পায় নি। সে জানে তার ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তাকে শক্ত হতেই হবে। সে নিজেকে যথা সম্ভব সংযত করে রাখলো।

টম ধীরে ধীরে ডরোথির দিকে এগিয়ে গেল। ডরোথি দুহাতে টমকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। টমও নিজেকে সামলাতে পারল না।

টমকে জড়িয়ে ধরে ডরোথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, টম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুমি যেভাবেই হোক চার্লসকে একবার এখানে নিয়ে এসো। আমি শান্ত হতে পারছি না।

টম ডরোথিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে, কপালে চুমু খেয়ে বলল, আমি জানি তুমি চার্লসকে কতখানি ভালোবাসো। আমার থেকেও বেশী। কিন্তু আমাদের তো এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমাদের অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। চার্লস তো আর ছেলেমানুষ নয় ওকে বকে বেঁধে এখানে নিয়ে আসবো। আর ব্রাড যে চিঠি লিখেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে চার্লসের ওখানে থাকাই নিরাপদ। কেননা ওটা একটা দুর্গের মত। ওর নিরাপত্তা ব্যবস্থা উইন্ডসর প্যালেসের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তাই লক্ষ্মীটি তুমি একটু শান্ত হবার চেষ্টা করো।

ডরোথি বলল, সরি টম, আমি সত্যি ভীষণ অবুঝ হয়ে পড়েছিলাম।

টম মুখে মিথ্যে হাসি এনে বলল, না না, তা নয়। আমি এখন ভাবছি কেটি কোলিয়ারের কথা।

টম ইচ্ছে করেই চার্লসের প্রসঙ্গ থেকে কেটির প্রসঙ্গে চলে এলো। কেননা চার্লসের কথা যত হবে ডরোথি তত কষ্ট পাবে!

ডরোথি চোখ তুলে বলল, আচ্ছা এটা সেই মেয়েটি না যে ডাউন-টাউনে বোমা তৈরীর কারখানার বিস্ফোরণে মরতে মরতে বেঁচে গেছে?

টম বলল, বুঝতে পারছি না, ওর সঙ্গে চার্লসের কী সম্পর্ক আছে!

ডরোথি বলল, আমিও তো ভাবছি ওর সঙ্গে চার্লসের কী সম্পর্ক? তাছাড়া চার্লস কেন একবারও আসছে না আর ফোনও করছে না বুঝতে পারছি না।

টম কফির কাপে চুমুক দিল। চুরুটে একটা টান দিয়ে বলল, তাহলে তোমার সেই হোলজাইমার। ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি।

কিন্তু ওই বা চুপ করে আছে কেন? পুলিশকে সব কিছু জানাচ্ছে না কেন?

হোলজাইমারের কথা শুনেই ডরোথি তিক্ততার সঙ্গে বলল, ওই বদমাশটার জন্যই আজ ওদের এতো বিপদ।

এমন সময় দরজায় বেল বেজে উঠলো। টম ও ডরোথি আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল। কেননা একটু আগেই ব্রাডের চিঠি যেভাবে অশুভ বার্তা নিয়ে এসেছিল। আবার কে কি খবর নিয়ে এলো কে জানে!

টম দরজা খুললো, ওদের ভূত দেখার মত অবস্থা হলো। একী টনি লটন! ও আবার এখন এখানে কেন?

টনি ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তাদের দেখে বলল, কী ব্যাপার? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে এখুনি তোমরা হিচককের কোনও ছবি দেখে উঠলে।

ডরোথিকে টনি বলল, ম্যাডাম এমন একটা সুন্দর সকালে এইরকম গোমড়া মুখে থাকবেন না। চীয়ার আপ! তারপর মিঃ কেলসো কবে ব্রাসেলস রওনা হচ্ছেন?

টনিকে বসতে বলে, জোর করে মুখে হাসি টেনে ডরোথি বলল, কী নেবেন স্কচ না মার্টিনি?

টনি খুবই রসিকতা প্রিয়, বলল, সুন্দরী কোন মহিলা আমায় বিষ দিলেও আমি তা খেতে রাজি।

ডরোথি একটু লজ্জিত হল, এবং পানীয়ের বন্দোবস্ত করতে উঠে গেল।

টনি এবার আসল কথায় এলো। টমকে জিজ্ঞাসা করলো, চার্লসের খবর কী?

না কোন খবর নেই, টম বলল, তবে ব্রাডের একটা চিঠি পেয়েছি।

টনি বলল, ওটা আমিই ওকে লিখতে বলেছি। তা আপনারা ভয় পেয়ে যান নি তো?

টম বলল, না! তবে চার্লসের জন্য ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।

টনি বলল, ওহ্ আপনিও দেখছি ব্রাডের মতই অস্থির। আচ্ছা মিঃ কেলসো আপনি ডব্লু-বি-ম্যারিয়েটের নাম শুনেছেন?

টম নিজের মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমেরিকান রাইটার। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ফ্রান্সের ওপর একটা বই লিখেছেন। মনে হচ্ছে ওটা সিনেমাও হয়েছে।

টম বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ওর সম্বন্ধে এই রকমই শুনেছি। আচ্ছা আপনি ওর আর কোন খবর জানেন?

টম বলল, দেখুন, আমি একজন রিপোর্টার, গোয়েন্দা নই।

টনি সহাস্যে বলল, তা আমি জানি বৈকি। আচ্ছা রিক নীলেকে নিশ্চয়ই চেনেন?

টম বলল, হ্যাঁ চিনি ও চার্লসের বন্ধু। খুবই ভালো ছেলে। তবে মনে হয় ওদের বন্ধুত্বে এখন একটু ভাঙন ধরেছে।

টনি বলল, আমার কাছে খবর আছে এই রিকের সঙ্গে ম্যারিয়েটের বেশ ভালো যোগাযোগ আছে। চার্লস কী আপনাকে কখনো বলেছিল?

টম বলল, কই না, তো।

টনি বলল, স্বাভাবিক, চার্লসেরও না জানারই কথা।

ইতিমধ্যে ডরোথি তিন গ্লাস মার্টিনি নিয়ে এলো। ডরোথিকে দেখে টনি বলল, ধন্যবাদ মিসেস কেলসো। সেদিন হোটেলে ওই সুন্দর যুবকটির পরিচয় দেবার জন্য। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এখানে এসেছি।

ডরোথি কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

টনি বলল, কেন চার্লসের সেই বন্ধু রিক নীলে—

ডরোথি বলল, ও তাই বলুন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম।

টনি বলল, না না মিসেস কেলসো এখুনি ভয় পাবেন না।

ডরোথি বলল, আরো কিছু আছে নাকি?

টম দেখলো ডরোথির মুখ আবার আতঙ্কে ভরে উঠছে। তাই টম টনিকে বলল—

আচ্ছা মিঃ লটন এসব কথা এখন বন্ধ করলে হয় না?

টনি বলল, না ওর সম্বন্ধে আপনাদের জেনে রাখা ভালো, কেননা কখন কি বিপদ এসে যায়।

ডরোথি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, বলুন, । চার্লসের ভালোর জন্য আমাদের সব কিছু জানা দরকার।

টনি বলল, দ্যাটস্ রাইট। অন্ধকারে থাকলে অনেক বিপদের আশঙ্কা।

ডরোথি বলল, তাহলে আপনি বলছেন, রিক নীলে একজন বিপদজনক ব্যক্তি।

টনি বলল, আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা ওর সম্বন্ধে আরো সঠিক করে বলতে পারবো। তবে এই পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে রীতিমত চমক আছে।

এই রিক নীলে ছিল প্রথমে একজন ডব্লু-সি পিকারিং এর সাহায্যকারী। তারপর হঠাৎ তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কোনও কিছুতে থাকে না তাই এফ বি আই এর ফাইলেও ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই। পূর্ব জার্মানীতে সিয়ার যে এজেন্ট আছে সেও রিক নামে কাউকে চেনে না। সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। উনিশ শ' তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টিতে ও সোজাসুজি এসে ভর্তি হয়ে গেল ইউ. এস সৈন্যদলে। সে সিভিলিয়ান দোভাষীর কাজ করত। এই ভাবে সে পূর্ব থেকে

পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে আসে। ওর জন্ম ব্রুকলীনে।

ফাইল ঘেঁটে জানা গেছে ব্ল্যাঙ্ক নীলে নামে যে ভদ্রলোকের কাছে এসে নিজেকে তার প্রপৌত্র রূপে পরিচয় দিয়েছে তাতে সাতাশ বছর পরে চুরাশি বছরের বৃদ্ধের পক্ষে তার প্রপৌত্রকে চেনা সম্ভব নয়। তবে ও এমন কিছু কাগজ পত্রের প্রমাণ এনেছিল তাতে বৃদ্ধ ওকে মেনে না নিয়ে পারেনি।

এখন যা জানা গেছে তাতে ওর মা জার্মান ও বাবা আমেরিকান হলেও ও আমাদের লোক নয়।

ডরোথি চেঁচিয়ে উঠল, তাহলে ও শত্রু পক্ষের এজেন্ট।

হ্যাঁ, টনি বলল, গত নয় বছর ধরে ও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছে।

ডরোথি বলল, বিশ্বাসঘাতক! ওকে আমাদের এক বারের জন্যও সন্দেহ হয়নি। আশ্চর্য!

টনি একটু হেসে কৌতুক করে বলল, তাহলে বলতে হয় যে রিক খুব কাজের ছেলে।

ডরোথি রাগে ফেটে পড়ল, কাজের ছেলে ? রাবিশ, একটা মস্তো বড় শয়তান চার্লসকে কিভাবে ফাঁদে ফেলেছে। ওহ্ আমি ভাবতে পারছি না।

টনি হেসে বলল, কিন্তু মিসেস কেলসো রিক আমাদের কাছে শয়তান হলেও ওদের কাছে ও কিন্তু একজন সফল হিরো। যে পক্ষের হয়ে ও কাজ করছে তারা তাকে সোনার চেয়েও দামী মনে করে।

ডরোথি বলল, কিন্তু আপনি কি ওকে সমর্থন করেন?

টনি বলল, ডেফিনেট্‌লি নট্, আমরা কেউই তাকে সমর্থন করতে পারি না।

ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী সেইদিন থেকে ওর সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন মিঃ লটন?

টনি বলল, হ্যাঁ তা বলতে পারেন। আপনার কাছ থেকে ওর পরিচয় পাবার পর বিশেষ করে যখন জানলাম ও চার্লসের বন্ধু তখনই আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিতে শুরু করি। তাছাড়াও আরও কিছু ব্যাপার আছে।

টম এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল, এবার সে টনিকে বলল, আচ্ছা মিঃ লটন আপনি কেন ওর সম্বন্ধে এফ বি আইকে জানাচ্ছেন না?

টনি বলল, দেখুন সব কিছুর জন্যই সাক্ষ্য প্রমাণ দরকার। আমার কথার সত্যতা বিচার না করেই তো আর তদন্ত কমিশন বসবে না। তাই আমিও পেছনে লেগে আছি। কিন্তু ব্যাটা এত চালাক কী বলব, সেই দিন থেকে আর পাত্তা নেই। ওর মুখই দেখা যাচ্ছে না, বার বা রেস্তোরাঁয় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এমন কি ফোনেও কারো সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। একেবারে ঘরে খিল এঁটে বসে আছে। কিন্তু আমি যখন ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি তখন আগুনের উৎস আমি বার করবই।

এমন সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। টম উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। তারপর টনির দিকে তাকিয়ে বলল ইটস্ ইওর কল মিঃ লটন। ব্রাড ফোন করেছে। আরজেন্ট।

টনি লাফিয়ে উঠল, ব্রাড আবার এখানে ফোন করল কেন? কোন জরুরীখবর...

টনি রিসিভার তুলে বলল হ্যালো টনি বলছি। কী ব্যাপার?

ওপাশ থেকে ব্রাড বলল শুনছো টনি, তোমার সেই ম্যারিয়ট কাল রাতে খুন হয়েছে। ব্রাডের গলায় রীতিমত উত্তেজনা।

টনি চমকে উঠল, বল কী? এটা কী করে সম্ভব? আমি দুজনকে পাহারায় রেখেছিলাম। ব্রিজিট আর বারনারড।

ব্রাড জানালো, গভীর রাতে ব্যাপারটা ঘটেছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি ম্যারিয়েটের ওখানে গিয়েছিলে।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ, আমি তো ওখান থেকেই আসছি।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তাকে কি গুলি করে মারা হয়েছে?

ব্রাড বলল, না, ডাক্তারের মতে হার্টফেল করে মারা গেছে।

টনি বলল, কী করে বলছে? পোস্টমর্টেম তো এখনও হয় নি।

প্রাথমিক পরীক্ষা করে ডাক্তার মন্তব্য করেছে, ব্রাড জানালো।

টনি আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তিনি কী বিছানাতেই ছিলেন?

ব্রাড বলল, না, আমরাও ডাক্তারের মন্তব্যকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ ওর ঘর একেবারে

লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

টনি উত্তেজিত হয়ে বলল, তাহলে বুঝতেই পারছে যে ম্যারিয়ট হার্টফেল করে মারা যায়নি। লেনেস্কি হসপিটালে কোনোভ যেভাবে মারা গেছে এটাও ঠিক সেই একই কেস। আমার সন্দেহ তাহলে মিলে যাচ্ছে। ম্যারিয়েট কেজিবি-র সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ব্রাড অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ম্যারিয়টকে খুন করা হল কেন?

টনি বলল, এমন সিক্রেট এজেন্টদের জীবনের কোনও ভরসা থাকে না, তাদের যে কোন মুহূর্তে মেরে ফেলা হতে পারে।

টনি বলল, আচ্ছা ম্যারিয়ট-এর ঘরে কোন সন্দেহজনক জিনিস কিছু কী পাওয়া গেছে?

ব্রাড জানালো, সামান্যতম সন্দেহ করার মতও কোন জিনিস এখানে পাওয়া যায় নি।

টনি গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি ম্যারিয়েটের খুন সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিন। আমি দুদিনের জন্য ডুব দেব। হ্যাঁ, গোপনীয়। গুড বাই—

টনি ফোন রেখে টমের দিকে ঘুরে বলল, এইমাত্র যার কথা বলছিলাম ম্যারিয়েট, তিনি খুন হয়েছেন।

টনি টুপিটা মাথায় দিয়ে বলল, তাহলে চলি, আপনারা সাবধানে থাকবেন, আর পারলে চার্লসকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। আমরাও ওর নিরাপত্তা আরও জোরদার করছি।

টম জিজ্ঞাসা করল, আমি ম্যারিয়েটের সঙ্গে চার্লসের সম্পর্কটা কি বুঝতে পারছি না।

ডরোথি ভয়ে টমের হাত চেপে ধরেছে।

টনি বলল, ওই সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মত। চার্লস—রিক—ম্যারিয়েট। আচ্ছা চলি গুড্ বাই—

।। বার ।।

পার্ক অ্যাভিন্যুর একটা অলিভ গাছের নীচে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছে যেন একটা দৈত্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু দূরে পায়ের হাল্কা শব্দে সে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। হাতে খোলা ছোরা। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। পরিচিতের মুখ দেখে শান্ত হলো।

অ্যালেক্সি বলল, ব্যাপার কী ওলেগ? এভাবে এখানে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ম্যারিয়টের কোনও খবর শুনেছো?

অ্যালেক্সি বলল, ম্যারিয়ট, মানে ওয়াশিংটনে আমাদের...

ওলেগ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, এখানে ওর পরিচয় আর উল্লেখ না করাই ভালো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তুমি কী ওর কোনও খবর পেয়েছ?

অ্যালেক্সির সঙ্গে কেটি আছে। সত্যি এই মেয়েটির যে কত ক্ষমতা তা ভাবা যায় না। পুলিশের জেরার সামনে ও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

অ্যালেক্সি রাগত স্বরেই ওলেগকে বলল, কি করে আর রাখব। তুমি তো আমায় ঘরে বন্দি করে রেখেছিলে। এখন কেটি গিয়ে ডাকলো বলে বেরুতে পারলাম।

ওলেগ খুব শান্ত গলায়, যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বলল, ম্যারিয়েট মারা গেছে।

অ্যালেক্সি চমকে উঠল, মারা গেছে! ম্যারিয়েট মারা গেছে? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কি করে? কবে?

ওলেগ অ্যালেক্সির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, খুশীতে বলে উঠল, তাহলে মাইক্রোফিলমটা এখন আমার হাতে।

অ্যালেক্সি চমকে উঠল, ওহ মাই গড, তাহলে মাইক্রোফিলমটা এখনও মস্কোয় পাঠানো হয় নি?

ওলেগ বলল, আমি আগেই জানতাম ও একজন বিশ্বাসঘাতক। হি ইজ এ ট্রেইটর। কিন্তু এখনও এমন কিছু দেরী হয় নি।

অ্যালেক্সি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি ওটা কালই মস্কোয় পাঠিয়ে দিচ্ছ তো?

ওলেগ জোরের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই ওটা আমায় কালই পাঠিয়ে দিতে হবে।

অ্যালেক্সি ওলেগকে বোঝার চেষ্টা করল। সে কোনও চালাকি করবে নাতো? কিন্তু ওলেগের

কথায় ও স্বস্তি পেল কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারল।

কেটি ছটফট করছিল। ওদের কথা থামতেই বলল, না এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

ওলেগ সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেল। কেটিকে বলল তুমি একটু চারিদিকে নজর রাখো। আমি ততক্ষণ চটপট অ্যালেক্সিকে কয়েকটা ফটো দেখিয়ে নি।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে নিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। মাথার টুপি দিয়ে তারা তাদের নিজেদের মুখ প্রায় ঢেকে ফেললো। কেটি একটা গাছের নীচের ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে চারিদিকে নজর রাখতে থাকল।

পকেট থেকে একটা খাম বের করতে করতে ওলেগ বলল, যদি সেদিন সেন্ট্রাল পার্কে তোমরা একটু সাবধান হতে তাহলে এত ঝামেলা হতো না।

সন্ধের সময় সেন্ট্রাল পার্কে যে লুটেরাদের উপদ্রব হয় তা মিশচার-এর জানা উচিত ছিল।

যাক্ গে, বাদ দাও বলে ওলেগ একটা খাম থেকে তিনটে ফটো বের করে অ্যালেক্সির হাতে দিল। ওলেগ ওই ফটো তিনটির মধ্যে একজন টুইড জ্যাকেট পরা লোককে দেখিয়ে অ্যালেক্সিকে বলল, দেখো তো এই লোকটিকে কখনো চার্লস কেলসোর সঙ্গে দেখেছ কিনা?

অ্যালেক্সি ফটোগুলো নিয়ে দেখলো জ্যাকেট পরা লোকটির মুখ কোনও ফটোতেই স্পষ্ট নয়। কোথাও লোকটা রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে আছে, কোথাও এমনভাবে হাত তুলে আছে যে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। আবার আরেকটাতে মুখ নিচু করে আছে।

অ্যালেক্সি অনেকক্ষণ দেখে বলল, না! বুঝতে পারছি না। কে এই ভদ্রলোক?

ওলেগ ছোট্ট করে বলল, অ্যান এক্সপার্ট।

অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, বাকি দুজন কে?

ওরা নিউইয়র্কের গোয়েন্দা বিভাগের লোক, ওলেগ জানালো।

আচ্ছা ওরা কি এই এক্সপার্ট লোকটাকে অ্যারেস্ট করেছে? অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল। আর তুমি এই ফটো কোথায় তুললে? তাহলে কিছু বলা যেতে পারে হয়ত।

ওলেগ খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আমি এই লোকটাকে চিনি। এ হলো টনি লটন। মিশচার-এর মৃতদেহ যে মর্গে পড়েছিল, সেখানে এই স্ন্যাপ শট্ নেওয়া হয়েছে।

অ্যালেক্সির বুকটা ধড়াস করে উঠল। মিশচার-এর ওখানে? মর্গে?

অ্যালেক্সি খুব ভয়ে ভয়ে বলল, আমি তো এর নাম কখনো শুনিনি। কে এই টনি লটন?

ওলেগ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, এখানে আছো অথচ কোন খবর রাখো না। এই টনি লটন একজন ন্যাটোর এজেন্ট।

অ্যালেক্সি ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সে আস্তে আস্তে ওলেগকে জিজ্ঞাসা করল, এই লোকটা মর্গে গিয়েছিল কেন?

ওলেগ ফটো তিনটে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, দেন্ ইউ সী হোয়্যার ইউ স্ট্যান্ড! যাক্ ওসব কথা রাখো। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। গাছের ছায়ায় এসো।

ওলেগ ও অ্যালেক্সি কেটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এলো।

ওলেগ ভালো করে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল. শ্যানডন হাউসের নিরাপত্তা কর্মী ম্যাকলেহোস-এর বাড়ি তুমি কি চেনো?

অ্যালেক্সি উত্তর দিল, হ্যাঁ চিনি।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ওর কি স্ত্রী পুত্র আছে?

আছে।

ওলেগ বলল, খুব ভালো। বলে হঠাৎ যেন খুশীতে চকচক করে উঠল। অ্যালেক্সি এই খুশীর কারণ বুঝতে পারল না।

ওলেগ বলল, আমাদের এবার ম্যাকলেহোসের বাড়ি যেতে হবে।

অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল কেন?

ওলেগ বলল, প্রশ্ন পরে করবে, এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন।

ওলেগ বলতে লাগল। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো, হ্যাঁ—কেটি তোমাকে ম্যাকলেহোস চেনে না তো?

কেটি বলল, না, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই।

ওলেগ খুশীতে ডগমগ করতে লাগল। অ্যালেক্সিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে নিশ্চয়ই ম্যাকলেহোস চেনে?

অ্যালেক্সি ঘাড় নাড়লো।

ওলেগ বলল, শোন কেটি ম্যাকলেহোসকে বলবে যে ও নতুন নিউইয়র্ক এসেছে। এবং চার্লসের পূর্ব পরিচিতা। একবার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অ্যালেক্সি বলল, এটা খুব ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে না? তাছাড়া কেটি জামিনে ছাড়া পেয়েছে। যদি জানাজানি হয়ে যায়?

ওলেগ বলল, না না এত সময় আমার প্রয়োজন হবে না। আই শ্যাল সী টু ইট। আমাদের ম্যাকলেহোসকে প্রয়োজন। আমার একটু সময় দরকার যাতে ম্যাকলেহোসের কোয়ার্টার থেকে শ্যানডন হাউসের নিরাপত্তার বহরটা দেখে নেব।

ওলেগ অ্যালেক্সির উদ্দেশ্যে বলল, বোকামি করো না। উই অল আর ইন ডেঞ্জার! সামনেই ভীষণ বিপদ। তাই আমি যা বলি তাই কর।

অ্যালেক্সি ওলেগের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ও ধরতে পারছে না। ওলেগ মনে মনে নতুন কী ফন্দি বানাচ্ছে। এদিকে টনি লটনের পরিচয় পেয়ে অ্যালেক্সি নিজে ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। তাই ভাবল এনিয়ে সে আর কিছু ভাববে না। ওলেগ যখন এখন হর্তাকর্তা তখন ও যা ভালো বোঝে করুক।

ওলেগ যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিয়ে অ্যালেক্সি ও কেটিকে তাড়া দিল। তারা তিনজনে ম্যাকলেহোস-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

।। তের ।।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা আকস্মিক অথচ বেশ দ্রুত গতি. .

টনি লটন ঠিক করল ব্রাড জিলনের সঙ্গে ম্যারিয়টের খুন হওয়ার ঘটনা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে শ্যানডন হাউসের চারদিকে যে জাল বিস্তার করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নেওয়া যাক। টনির ধারণা ভুল নয়। বরিস গেরস্কি যেভাবে এগুচ্ছে তাতে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়ে যাবার কোন প্রমাণই সে তার আয়ত্বের বাইরে যেতে দিতে রাজি নয়। ওর সামনে এখন দুটো সমস্যা। এক হচ্ছে চার্লস কেলসো। দুই হচ্ছে জিন প্যারাকিনির নিরাপত্তা বজায় রাখা। শ্যানডন হাউসে নজর রাখার জন্য ওকে সেই দ্য ব্রেইনের-ই একজন করে রেখেছে। এর জন্য ব্রাড জিলনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সে-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কিন্তু চার্লস কেলসো যে কেন এখনও শ্যানডন হাউসে রয়েছে তা টনি লটন বুঝতে পারছে না। ওতো এখন ওর দাদা টম কেলসোর ওখানে থাকতে পারে। চার্লসকে নিয়ে এখন ভীষণ চিন্তা।

টনির শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল। সে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সামান্য কিছু খেয়ে নিল। তারপর একটা টেলিফোন বুথে গেল।

টেলিফোন বুথে ঢুকে সে ভাবলো কাকে ফোন করা উচিত। নিকোলে-কে না বিল কে? দুজনের সঙ্গে কথা বলাই রিস্ক।

টনি ডায়াল করল। ওপাশ থেকে বিল ফোন তুললো। টনি বলল—হ্যালো বিল। আমি টনি বলছি জিনের উপর ঠিকমত নজর রাখবে।

বিল বলল, ভালই আছে। এখন লাঞ্চ সেরে নিচ্ছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

বিল জানাল, বারনার্ডের সঙ্গে যেমন রোজ কিচেনে খায় তেমন।

ফিরল কখন?

এই আট মিনিট আগে হবে। আমি এসেছি বারোটা পনেরোয়।

টনি বলল, খুব খারাপ।

কেন?

আমি ওকে বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে রিক নীলেকে অনুসরণ করতে দেখেছি, টনি বলল।

বিল বলল, হয়তো হতে পারে।

টনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, হয়তো হতে পারে মানে? রিক সম্বন্ধে আমি সঠিক খবর জানতে চাই। জিনের ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি। জিন তার নিজের কাজে অবহেলা করছে। যাক খেয়ে নিয়েই যেন জিন বেরিয়ে পড়ে। রিক নীলের প্রতিটা পদক্ষেপ আমার জানা প্রয়োজন।

এমন কী ও যখন নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে বিশ্রাম করবে তখনও ও কী করছে তা আমাকে জানাতে হবে, টনি বলল।

টনি বিলকে আরও বলল, শোন তুমি আর নিকোলে একটা কাল্পনিক গল্প ফেঁদে চার্লস কেলসোর সঙ্গে দেখা করো। তাকে জানাবে যে নিকোলে কোনও এক কাগজের রিপোর্টার। সে চার্লসের সঙ্গে রিক নীলের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে। রিকের একটা খোঁজ পেলে ওর সঙ্গী-সাথীদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।

টনি খুব আফসোস করে বলল, কাল রিক তার ফ্ল্যাট থেকে বেবিয়ে গেল আর জিন তার কোনও খোঁজ রাখতে পারলো না। হোপলেস্।

টনি আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ফোন ছেড়ে দিল। দিয়ে আবার ডায়াল করলো।

টনি জিজ্ঞাসা করল, হ্যালো জর্জেস? আমি টনি বলছি। শোন তোমাকে আর বিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে না, আর শ্যানডনে কী এখনও কাজ চলছে?

জর্জেস বলল, ইয়েস স্যার। শ্যানডনে কোথাও কেবল ফল্ট হয়েছে। তার কাজ চলছে।

আচ্ছা এমিল কাছে আছে তো? টনি জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ ও চারদিকে নজর রাখছে।

একটা ধন্যবাদ জানিয়ে টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কেলসো নিজের কোয়ার্টারে আছে তো? বুঝতেই পারছ কেন এত প্রশ্ন করছি। কারণ হি ইজ দ্য ভাইটাল উইটনেস্। হোলজাইমার না বললেও চার্লসের কাছ থেকেই আমাদের কথা বের করতে হবে।

জর্জেস বলল, স্যার, আমি নিজেও ওর উপর নজর রাখছি। আজ ও শ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে। এখন তারই সঙ্গে এই চত্বরের মধ্যে কোথাও আছে। কদিন পরে এখানে কনফারেন্স হবে তারই প্রস্তুতি চলছে। বহুলোক কাজ করছে।

হ্যাঁ আমি জানি। তাই বলছি তুমি কিন্তু খুব সতর্ক থাকবে। টনি বলল।

হ্যাঁ স্যাব।

বিকেলের দিকে আমি ব্রাড জিলনকে নিয়ে শ্যানডন হাউসে যেতে পারি। একথা কাউকে বলতে হবে না, সিক্রেট।

না, স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

টনি ফোন রেখে দিল।

টনি পেন্টাগনের সিক্রেট ব্রাঞ্চে ব্রাডের অফিস ঘরে ঢুকলো। ব্রাড তাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল, তা তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি? কোন এনগেজমেন্ট আছে?

টনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সময় আর পাচ্ছি কোথায় যে তদন্ত ফেলে ফুর্তি করব? তা ম্যারিয়েট-এর ঘটনার ব্যাপারে আর কোন খবর পাওয়া গেল?

ব্রাড বলল একটা সত্যি কথা তোমায় বলি, এখন আমার কাউকেই বিশ্বাস হয় না। এমন কী নিজেকেও মনে হয় মস্কোর লোক। কিছুই আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই ম্যারিয়েটের কথাই ভাবছি। এত সুন্দর নিরীহ চেহারা দেখলে ভক্তিশ্রদ্ধা হয়। সে কিনা বিশ্বাসঘাতকের কাজ করল! আমেরিকা তাকে কী না দেয়নি তবুও আরও অর্থের লোভে...

এখন যা লেটেস্ট খবর তা হলো এই ম্যারিয়েটের মাধ্যমেই কেজিবি-র এজেন্টরা গোপন খবর পাচার করত।

টনি বলল, ব্রাড আমি কিন্তু সে কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি এই যে এত ঘটনা ঘটছে নিশ্চয়ই দেয়ার ইজ সাম নিউক্রিয়াস মানে একটা মধ্যমণি নিশ্চয়ই আছে।

ব্রাড বলল হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর এই মধ্যমণি—কে—বার করতে না পারলে আমাদের কোন কাজই সফল হবে না। তা তুমি এর কোন হদিশ পেয়েছ নাকি?

টনি একটু চিন্তিত ভাবে বলল, না ওটা এখনও ঠিক ধরতে পারছি না। তবে আমি যে কোন কাজ শেষ থেকে শুরু করি। প্রথমে হচ্ছে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁস হলো। তার আগে ওটা টাইপ হলো। কোন মেসিনে টাইপ হয়েছে তার হদিস মিলল। মেশিনটা টমের কাছ থেকে চার্লস একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল।

সুতরাং চার্লসের হাত থেকে মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়েছে। তাহলে চার্লসই হলো ওদের এজেন্ট। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এই রিক নামের ছেলেটি কে? ও কম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টে ভালো মাইনের চাকরি করে অথচ আশ্চর্য ও নিউইয়র্কে চার্লসের সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। আবার কেটি কোলিয়ার নামের ওই রহস্যময় মেয়েটি সেও একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। গোপন বোমা তৈরীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী?

ব্রাড ওর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। টনি কী বলতে চাইছে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে।

টনি বলল, তাহলে বুঝতেই পারছ চার্লস, রিক ও কেটি তিনজনের পরিচয় আছে।

ব্রাড ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

টনি একটা চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এবার লেনেক্সি হসপিটালের ঘটনা ভাবো। একদল মাগারের হাতে কোনোভ আক্রান্ত হয়ে পুলিশের সাহায্যে হসপিটালে যায়। হাসপাতালে সে নিজের অজান্তে দুটো নাম উচ্চারণ করে এক ওলেগ দুই অ্যালেক্সি।

এখন কথা হল সেন্ট্রাল পার্কে এই দুজন ছিল কী? আমার মনে হচ্ছিল, পুলিশের কথা অনুযায়ী পার্কের বাইরে গাড়ি পার্ক করা ছিল। সেখানে তারা একজন মুস্কো জোয়ানের ছায়া দেখেছে। আর আরেক জন ইয়াংম্যান কোনোভের কাছাকাছি ছিল। পুলিশ তাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল কিন্তু সে পালিয়ে গেছিল।

বরিস গেরস্কিকে আমি চিনি। লেনেক্সি হসপিটালে যে লোকটা বন্ধুকে খোঁজার নাম.করে কোনোভের খোঁজে এসেছিল, পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী বরিস গেরস্কির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সেন্ট্রাল পার্কে কোনোভের সঙ্গে যে দুজন ছিল তাদের মধ্যে একজন ওলেগ, অন্যজন অ্যালেক্সি। এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

এবার আসছি রিক নীলে প্রসঙ্গে। ওর সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তা হল পূর্ব জার্মানীতে আমাদের একজন এজেন্ট সত্যিই ছিল যার নাম হাইনরিক নীলে। কিন্তু বর্তমানে এই রিক নীলের চেহারার সঙ্গে তার চেহারার কোন মিল নেই।

ব্রাড একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। হাতের মার্টিনিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলল, ওয়ান্ডার ফুল। ইউ আর জিনিয়াস—টনি তুমি আমাকে একেবারে অবাক করে দিচ্ছ।

টনি একটু থেমে বলল, চার্লসের এই বন্ধু রিক নীলেকে আমরা সন্দেহের ঊর্দ্ধে নিশ্চয়ই রাখতে পারি না।

ব্রাড বলল, অবশ্যই না।

তাহলে আমার মনে হয় সেন্ট্রাল পার্কে সেদিন যে দুজন ছিল তার একজন রিক নীলে হওয়া অসম্ভব নয়।

ব্রাড ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত বোধ করছিল। বলল, তুমি ওলেগকে তো আইডেন্টিফাই করেছ। কিন্তু আরেকজন ব্যক্তি যে এই রিক নীলে তা আইডেন্টিফাই হবে কী করে?

টনি বলল, জর্জেস। ও বেশ কিছুদিন ইস্ট জার্মানীতে ছিল। ওর ইনফরমেশন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে কেজিবি-র যে এজেন্ট কাজ করছে তার কোড নাম হল অ্যালেক্সি।

ব্রাড বলল, সত্যি আমার শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এ কোন মনের মত করে বানানো গল্প।

টনি বলল, আমি আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি এই দেখার জন্য যে অ্যালেক্সি আর রিক নীলে

একই লোক কিনা। এই একটা কাজ আমার বাকি।

ব্রাড বলল, টনি তোমার কর্ম-কুশলতা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমার গর্ব হয়। এবার মনে হয় আমরা এই ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁসের একটা কিনারা করতে পারব। এটাই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। তার আগে একবার চার্লসকে ভালো করে বাজিয়ে নিতে হবে।

টনি বলল, হ্যাঁ, সেইজন্য আমরা একবার শ্যানডন হাউসে যাবো। তা তোমার এখন কোন কাজ নেই তো?

ব্রাড বলল, না! তেমন কোন কাজ হাতে নেই। তোমার সঙ্গে যাওয়াটা যদি জরুরী মনে করো তো, আমার তোমার সঙ্গে যেতে এখন কোন অসুবিধা নেই।

টনি বলল, হ্যাঁ গেলে ভালো হয়।

ওকে—চলো।

শ্যানডন হাউসের লোহার দরজা যেন বর্ম পরা কোন সেপাই। দরজা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। দরজায় সঙ্গীনধারী সেপাই।

একটি শান্ত, নির্জন প্রকৃতির কোলে পাহাড় ঘেরা অ্যাপলেটন ভিলার পাশে শ্যানডন হাউসের এই শ্বেত শুভ্র দুর্গের মত বিশাল চেহারা দেখে ব্রাড জিলন বলে উঠল...টনি দেখো, ঠিক যেন স্বর্গোদ্যান! তাই না! টনির এখন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার মত অবস্থা ছিল না।

গাড়ি শ্যানডন হাউসের সামনে এসে দাঁড়াতেই পাহারারত সেপাই ছুটে এলো। ব্রাড নিজেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারূপে পরিচয় দিল এবং প্রমাণ স্বরূপ কার্ড দেখালো।

ব্রাড সেপাইকে জিজ্ঞাসা করল, এখন সিকিউরিটি অফিসার কে?

সেপাই বলল, ম্যাকলেহোস স্যার।

ব্রাড বলল, তাকে খুব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান।

এখুনি ডেকে আনছি স্যার, বলে সে ভেতরে চলে গেল।

এদিকে টনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। জিন প্যারাকিনি রিক নীলের উপর ঠিকমত নজর রাখতে পারছে তো? বিল আর নিকোলে চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় সফল হয়েছে তো? রিক নীলে গতরাতে বেড়িয়ে কোথায় গেছিল? কার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল? আর একদিন মাত্র সময় আছে ব্রাসেলসে বৈঠক বসতে। মেমোরেন্ডাম কী মস্কোর আয়রন সেফে নিরাপদে পৌঁছে গেছে? টনির মাথায় নানা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে।

ম্যাকলেহোস ছুটতে ছুটতে এসে বলল, আসুন স্যার আসুন। নিরাপত্তা কর্মীদের ইন-চার্জ হবার মত চেহারা ম্যাকলেহোসের নয়। একটু নাদুস নুদুস চেহারা।

ম্যাকলেহোস ভেবেছিল ব্রাড জিলন একাই এসেছে। তার পাশে টনিকে দেখে এক অজানা ভয়ে সে শিউরে উঠল। ব্রাড তা বুঝতে না পারলেও টনির চোখে সেটা ধরা পড়েছে। টনি নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না—তার এই ভয়ের কারণ! ম্যাকলেহোস যেদিন ডিউটিতে ছিল সেদিন ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম হাত বদল হয়েছে। তাহলে কী ম্যাকলেহোস এর সঙ্গে জড়িত! কিন্তু তাই বা কী করে হবে? পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যাকলেহোসকে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।

ম্যাকলেহোস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। টনিকেও বলল, আসুন স্যার আসুন। টনি ও ব্রাড গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

ম্যাকলেহোস প্রহরীকে দরজা খুলে দিতে বলল। দুপাশে পাম গাছ আর মাঝে বাঁধানো রাস্তা। আধুনিক হাল ফ্যাশনের বাড়িগুলো দেখলে প্রাচীন রোমের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।

ব্রাড চারিদিক দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে গেল। বলল, অপূর্ব!

কিছুদূর যাবার পর একটি প্রহরী ঘেরা বাড়ি দেখিয়ে ম্যাকলেহোস বলল, এখানেই সব কম্পিউটর মেশিন আছে। এখানে বিশেষজ্ঞরা কাজ করে থাকে। আপনারা ভিতরে যাবেন না কী?

টনি বলল, না না, আমরা সমস্তটা একটু ঘুরে দেখবো।

ম্যাকলেহোস বলল, তাহলে চলুন। কিছুদূর এগিয়ে একটা প্রাসাদের মত বাড়ি দেখিয়ে বলল এইখানে সাইমন শ্যানডন সাহেব থাকতেন। এখন এখানে বিশিষ্ট অতিথিদের থাকতে দেওয়া হয়।

তা কেমন লাগছে আপনাদের?

টনি বলল, অতুলনীয়। টনির দৃষ্টি তখন শান বাঁধানো বড় দীঘির চারিদিকে অনেক লোক কাজ করছে সেদিকে।

ম্যাকলেহোস বলল, এই বাড়িগুলোর পিছনে একটা বড় হ্রদ আছে। সেখান থেকে এই দীঘিতে জল আসে। পাম্প করে জল বের করে দেওয়া হয়েছে। ওই দীঘির নীচ দিয়ে সব বৈদ্যুতিক তার গেছে। সেখানে বোধহয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে তাই কনট্রাক্টররা কাজ করছে। আর ঐ যে বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে ওখানে কনফারেন্স হবে।

ব্রাড টনিকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোনদিকে যাবো?

টনি বলল, আমরা একটু চার্লস কেলসোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার কোয়ার্টার কোন্ দিকে?

ম্যাকলেহোস বলল, আমি আজ ওকে দেখিনি। শুনেছি ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে তার সঙ্গে বাইরে যাবে। ওই পাহাড়ের দিকে তার কোয়ার্টার।

হঠাৎ দীঘির দিক থেকে একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার ভেসে এলো। সবাইকে সেইদিকে ছুটে যেতে দেখা গেল।

ম্যাকলেহোস প্রায় লাফিয়ে উঠে, এক্সকিউজ মী বলে, সেইদিকে ছুটে গেল।

টনি ও ব্রাড কখন সেইদিকে হাঁটতে শুরু করেছে তা নিজেরাও টের পায়নি।

এদিকে টনি বিল ও নিকোলে কে দেখতে না পেয়ে অস্থির হচ্ছিল।

দীঘির কাছাকাছি যেতে তারা দেখলো সব লোক জলের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

তারা দেখলো দীঘিতে জল কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে বৈদ্যুতিক তারগুলো সাপের মত জড়িয়ে আছে। ওপাশে যেখানে জল খুব কম সেখানে একজন ভাসছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ মুখ জলের দিকে। টুইড জ্যাকেট পরা। দু-হাত দু-পাশে ছড়ানো।

ব্রাড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, এ কে?

ভয়ে ম্যাকলেহোসের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। বলল, আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কেউ যেন ওদিকে না যায়। মেন স্যুইচ অফ্ থাকলেও কনট্রাকটরদের মাঝে মধ্যেই বিদ্যুৎ চালিয়ে নিতে হচ্ছিল।

টনি কঠোর দৃষ্টিতে ম্যাকলেহোসকে দেখছিল। ম্যাকলেহোস থতমত খেয়ে থেমে গেল। টনির চোখ মুখ আরও কঠিন হয়ে গেল।

ব্রাড আবার জিজ্ঞাসা করল, ও কে?

ম্যাকলেহোস বলল, আমার মনে হচ্ছে মিঃ কেলসো।

ব্রাড চকিতে ম্যাকলেহোসের দিকে ফিরে বলল, মানে চার্লস কেলসো!

ম্যাকলেহোস মৃদু মাথা নাড়লো।

টনির মুখ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল। বলল, তাহলে আপনি এতক্ষণ আমাদের বোকা বানিয়েছিলেন। মিথ্যে বলেছিলেন, তাই না?

ম্যাকলেহোস রীতিমত ভয় পেয়ে বলল, কেন স্যার?

টনি বলল, আপনি বলেছিলেন চার্লস কেলসো বাইরে গেছে, তাহলে ও এখানে এলো কী করে? প্লীজ্ মিঃ ম্যাকলেহোস আপনি সোজা কথা বলুন। কোনরকম কিছু ঢাকার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনি ভীষণ বিপদে পড়বেন--

ম্যাকলেহোস ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, দেখুন স্যার, আমি সাধারণতঃ বাইরের নিরাপত্তা দেখি। ভিতরের নয়।

টনি বলল, তাহলে ভিতরের নিরাপত্তা কে দেখে?

ম্যাকলেহোস আমতা আমতা করে বলল, ভিতরে চারদিকেই তো প্রহরা। তাই...

টনি ও ব্রাড নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে নিল। তারপর ম্যাকলেহোসকে টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস দীঘিতে নামতে গেল কেন?

ম্যাকলেহোস বলল, হয়তো তিনি কাজের তদারকি করতে এসেছেন। কোন কারণে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে জড়িয়ে যান।

টনি বলল, আমরা একটু মেইন সুইচটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কোন্ দিকে সেইটা?
ম্যাকলেহোস বলল, মেইন বিল্ডিং-এ। আসুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।
টনি বলল, আমি একাই দেখে নিতে পারবো। পুলিশে ফোনও আমি করছি। আপনি মৃতদেহ তোলার ব্যবস্থা করুন।

।। চোদ্দ ।।

অ্যাপলেটন প্রিসিঙ্কট-এর ফার্স্ট অফিসার ব্রাড জিলনকে একটা স্যালুট করে বিদায় জানালো। বলল, আমাদের দিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আপনার কথামত ম্যাকলেহোসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ব্রাড সেডানে চেপে একেবারে ফেটে পড়ল, টনি আমরা এভাবে শয়তান গুলোকে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা এইভাবে একের পর এক মানুষ মারবে! আমি ভেবে পাচ্ছি না, টমকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব—

টনি বলল, ওরা একের পর এক সাক্ষীকে মেরে ফেলছে। চার্লস আমাদের শেষ ভরসা ছিল।
টনি ও ব্রাড দুজনেই চিন্তাক্লিস্ট। অ্যাপলেটন থেকে নিউইয়র্কের দিকে সেডান ছুটে চলেছে।
অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর টনি বলল, ব্রাড, আমি যে মেইন সুইচ দেখতে চেয়েছিলাম সেটা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না।
ব্রাড বলল, তাহলে?
আমি আসলে ম্যাকলেহোসের অফিস ঘরটা দেখতে গেছিলাম। ওই লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। পুলিশ জেরা করে হয়তো আরো অনেক কথা বার করতে পারবে। আমি যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে পরে পুলিশকে জানাবো। তার আগে আমার লোকজনকে খুঁজে বের করতে হবে। ওরা হয়তো রিক নীলের পিছনে ছায়ার মত ধাওয়া করছে।
ব্রাড বলল, কিন্তু টনি তুমি ম্যাকলেহোসের অফিস ঘরে কি এমন দেখলে যা সন্দেহজনক?
টনি বলল, একটা বিছানা। যা অফিস ঘরে কখনোই শোভা পায় না।
ব্রাড বলল, কী বল? অফিস ঘরে বিছানা!
টনি বলল, এটাই আশ্চর্য, মনে হয় এই ঘরেই কাজ হয়েছে।
ব্রাড বলল, তাহলে তুমি এখনি পুলিশকে সব জানিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করলে না কেন? ওকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করতে বললে, আর বেশী হৈ চৈ না হয় তা দেখতে বললে।
টনি বলল, আমি আসল শয়তানকে ধরতে চাইছি।
ম্যারিয়েটকে যারা খুন করেছে, তারাই চার্লসকে খুন করেছে। টনি বলল, ব্রাড তুমি লক্ষ্য করেছ চার্লসের দেহে আপাতদৃষ্টিতে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। ম্যারিয়েটের দেহেও ছিল না। সবই একই পদ্ধতিতে হয়েছে।
ব্রাড জানতে চাইল। পদ্ধতিটা কি?
টনি বলল, ইঞ্জেকশন। আর এই কাজটা হয়েছে ম্যাকলেহোসের ঘরে। এই কাজে এক্সপার্ট একজন, বরিস গেরস্কি।
ব্রাড উত্তেজিত হয়ে বলল, এখানেও সেই গেরস্কি! তাহলে সে ম্যাকলেহোসকে হাত করেছে।
টনি বলল, হ্যাঁ এটাই জানতে হবে ম্যাকলেহোস কিভাবে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।
ব্রাড বলল, তাহলে বলতে হবে এখন শ্যানডন হাউসে নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই।
টনি উত্তেজিত হয়ে পড়ল, যাই হোক আর এভাবে চলছে না, এভাবে তাদের আর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। দরকার হলে ওলেগ আর অ্যালেক্সি যেই হোক বিনা প্রমাণে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে। ব্রাড একটু চিন্তিত ভাবে বলল, কিন্তু টনি, তুমি ওদের পাচ্ছো কোথায়?
টনি বলল, না আমার লোকজন সর্বদা ওদের চোখে চোখে রাখছে। কেবলমাত্র হাতে প্রমাণ পাচ্ছি না বলে ওদের এখনও ছেড়ে রেখেছি।
পেন্টাগনের বাড়ির সামনে সেডান আসতেই একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে টনিকে বলল, একজন জর্জেস নামে লোক আপনাকে ফোনে চাইছিল। আমি তার ফোন নাম্বার চাইতে সে বলল

প্রয়োজন নেই আপনাকে বললেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

টনি প্রায় ছুটতে ছুটতে অফিস ঘরে চলে গেল। হাতের সামনে যে ফোন পেল সেটাই তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে জর্জেসের কণ্ঠস্বর আসতেই টনি রাগে ফেটে পড়ল। তোমরা সব মরে গেছিলে নাকি? জিন কী হাওয়া লাগাতে বেড়িয়েছে? নিকোলে কী করছিল? সব অপদার্থ, ননসেন্স।

ওপাশ থেকে জর্জেস চুপচাপ সব শুনে বলল, আমি আপনার রাগের কারণ বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু আমাদেরও কিছু বলার ছিল।

টনি সেই উত্তেজিত ভাবেই বলল, তা চুপ করে আছ কেন? বল কী বলার আছে?

জর্জেস বলল, বিল আর নিকোলে আপনার কথা মতই চার্লসের সঙ্গে দেখা করেছিল। চার্লসের ঘরে যখন তারা বসে কথা আরম্ভ করতে যাচ্ছে এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। ফোন তুলেই তারপর চার্লস ক্ষিপ্র বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিল তাকে অনুসরণ করে দেখে। চার্লস ম্যাকলেহোসের অফিস ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল। তারপর চার্লস বেপাত্তা হয়ে যায়। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসে।

আর জিন রিক নীলের পিছনে ফলো করে। রিক শ্যানডন হাউসের দিকেই আসছিল। তারপর হঠাৎ নিজের গাড়িতে উঠে টাউনের দিকে রওনা হয়। জিনও ওকে ফলো করতে থাকে।

টনি বলল, ম্যাকলেহোস, ওই শয়তানের পক্ষে। আর জিন এখন কোথায়?

জর্জেস ফিসফিস করে বলল, আমার মনে হয় স্যার ওদের আরো কিছু মতলব আছে।

টনি চেঁচিয়ে উঠল, সব ভণ্ডুল করতে হবে। এখন তুমি কোন্ মতলব এর কথা বলছ?

জর্জেস বলল, চার্লস কেলসোর খবর তো আপনি জানেন স্যার। পুলিশ টম কেলসোকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

টনি বলল, ওহ্ পুলিশ তাহলে টমকে খবরটা জানিয়েছে। যাক্ ভালোই হল, আমরা ভাবছিলাম কীভাবে টমকে এই খবরটা জানাবো! ভেরি স্যাড্।

জর্জেস জানালো, চার্লসের কোয়ার্টারে যে সব জিনিস পত্র ছিল তা টমের ওখানে পুলিস পাঠিয়ে দিয়েছে শুনলাম।

টনি বলল, জিন এখন কোথায়?

জর্জেস বলল, ওর খবর এখনো পাইনি। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবো। স্যার, একটু ধরুন ওঘরে ফোন বাজছে। আপনি লাইন ছাড়বেন না আমি দেখে আসছি।

ব্রাড টনির পাশেই ছিল, বলল এবার মনে হয় আমাদের হোলজাইমারের দিকে নজর দেওয়া দরকার। ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম সংক্রান্ত ব্যাপারের ওই এখন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

টনি বলল, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আজই এফ বি আই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো।

এদিকে ফোনে আবার জর্জেসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো স্যার, সেন্ট্রাল পার্কে যেখানে কোনোভের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে রিক এবং গেরস্কি নামের যে দু'জনের কথা বলেছিলেন, হতে পারে সেই লোকটি এবং সঙ্গে একটি মেয়ে।

টনি উত্তেজনায় কেঁপে উঠল, জর্জেস তুমি লোকজন নিয়ে তৈরী থাকো। আমার মনে হচ্ছে, যতদূর সম্ভব ঐ মেয়েটি কেটি কোলিয়ার। আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, জিনকে জানিয়ে দাও ও যেন ওখানেই থাকে, আমরা গিয়ে পৌঁছচ্ছি। এবার আমাদের সুযোগ এসেছে।

টনি নিজের হাত ঘড়িটা দেখে নিল, ব্রাডকে বলল, এখন সাড়ে আটটা বাজে আমি বেরিয়ে পড়ছি। তুমি এখানেই থাকো আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। হোলজাইমারের ব্যবস্থা করবে।

।। পনেরো ।।

ব্রাডের অফিস ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ব্রাড বলল, হ্যালো, ইয়েস, ব্রাড বলছি,—কে? ও টম?

টমের কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে আসছে, বলল, ব্রাড আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

ব্রাড বলল, বন্ধু নিজেকে সামলাও, তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। আমিও ভীষণ মর্মাহত। তোমাকে সমবেদনা জানাবার সাহসটুকুও আমি জোগাড় করতে পারছিলাম না।

টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লসের খবরটা তুমি কোথা থেকে পেলে?

ব্রাড বলল, আমি আর টনি এই কিছুক্ষণ আগে শ্যানডন হাউস থেকে ফিরলাম। গেছিলাম চার্লসের সঙ্গে কিছু কথা বলব বলে। কিন্তু গিয়ে এমন একটা ঘটনা দেখবো ভাবিনি।

আচ্ছা চার্লসের কীভাবে মৃত্যু হোল তোমরা কী দেখেছ? টম জানতে চাইল।

ব্রাড বলল, আমরা কেন, কেউই দেখেনি।

টম বলল, ব্রাড দয়া করে আমায় একটু খুলে বল, সত্যি কী ঘটেছে।

ব্রাড জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

টম বলল, পুলিশ হাউস থেকে। ওরা সঠিক করে কিছুই বলতে পারছে না। তোমরা শ্যানডন হাউসে গেছিলে শুনে তোমার কাছে জানতে চাইছি। বুঝতেই পারছ আমাদের অবস্থাটা। ডরোথি একদম ভেঙ্গে পড়েছে।

ব্রাড একটু চিন্তা করে নিল, তারপর সমস্ত ঘটনা, শ্যানডন হাউসের কথা, কেবল ফল্ট এর কথা, এবং দীঘিতে চার্লসের মৃতদেহের কথা একে একে সব বলল।

টম উত্তেজিত ভাবে বলল, ওই রিক নীলের হাত সর্বত্র, ওর কিছু করা দরকার। কে ওর ব্যবস্থা করবে?

ব্রাড বলল, আমরা ওর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

টম চাপা গর্জন করে উঠল, কবে? কী ভাবে? ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়ে আজ অনেকগুলো মাস কেটে গেল। কত জন মারা গেল। তোমরা তার কিছু করতে পারলে না।

ব্রাড বুঝতে পারল টমের অবস্থাটা। ও অবুঝ হয়ে উঠেছে। ব্রাড বলল, দেখো অফিসিয়াল অ্যাকশন নেবার মত যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ আমাদের হাতে ছিল না। এখন যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে আশা করছি রিক নীলের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হাতে পাবো।

ব্রাড বলল, যাই হোক ফোনে সব কথা বলা যাচ্ছে না। আর এই সম্পর্কে বেশী আলোচনা না করাই শ্রেয়।

টম বলল, আমি কালই শ্যানডন হাউসে একবার যাবো। দেখি একজন রিপোর্টারের চোখে আর কিছু ধরা পড়ে নাকি। আমি ওই স্কাউন্ড্রেলগুলোকে কিছুতেই ছাড়বো না, যারা আমার ভাইকে খুন করেছে।

ব্রাড বলল, না আমি তোমাকে বাধা দেব না। একজন সাংবাদিক হিসাবে তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবার অধিকার আছে। তবে তোমায় অনুরোধ করছি এমন কিছু করো না যাতে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।

টম বলল, জানো ব্রাড আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চার্লসের মৃত্যুতে আমারও হাত আছে। কেন আমি ওকে জোর করে আমার কাছে নিয়ে আসলাম না, কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে টম ভেঙ্গে পড়ল।

ব্রাড কোন কথা বলতে পারলো না। সে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

পুলিশ হাউস থেকে বেরিয়ে লন দিয়ে যেতে যেতে টম অনেক কথাই চিন্তা করছিল। পাশেই টমের ফিয়াটটা পার্ক করা আছে।

তখন রাত দশটা। টম ওভার কোটটা গায় টেনে নিল। টুপিটা আরও একটু নামিয়ে নিল।

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেলেও গাড়ি যাতায়াত কমেনি। অল্প অল্প কুয়াশা চারিদিকে, অন্ধকার পরিবেশ।

গাড়ির দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে ওপাশের দরজার পিছনে একটা কালো রঙের সাইট্রোন কার দেখতে পেল। আর ঐ গাড়ির পিছনে যে ছায়ামূর্তি নিশ্চল হয়ে ওর গাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছে তার চেহারার আকৃতি দেখে টমের বুঝতে বাকি রইল না ও রিক নীলে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু ও এখানে কী করছে? নিশ্চয়ই ওকে ফলো করছে।

চমক কাটতেই টম ঘৃণায়-ক্রোধে জ্বলতে লাগল। ওহ্ যদি হাতে একটা পিস্তল থাকত, তাহলে

ওই শয়তানটাকে এখনই শেষ করে দিতাম। চার্লসের কথা মনে পড়তেই টম চঞ্চল হয়ে উঠল। না! কিছু একটা করতেই হবে। পিস্তল না থাক। দুটো হাত তো আছে। তা দিয়ে যদি ওর কণ্ঠনালীটা চেপে ধরা যেত। টমের মনের মধ্যে জেগে ওঠে আত্মপ্রত্যয়। টম ছুটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু ওরা মনে হয় সব কিছু বুঝতে পারে। টম গাড়ি ছেড়ে নড়ার আগেই রিক সাইট্রোন-এর ভেতর ঢুকে গেল আর মুহূর্তে চোখের সামনে দিয়ে শহরের দিকে মিলিয়ে গেল।

অনেক রাত হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক এখন জনশূন্য। যে সব গাছের তলায় বিকেল বেলা প্রকৃতি বিলাসী মানুষেরা প্রকৃতিকে উপভোগ করতে আসে এখন সেখানে ছায়া কালো নিস্তব্ধ অন্ধকার। এখন সেখানে যত শয়তানদের আড্ডা যদিও প্রহরী আছে তা সত্ত্বেও।

দ্রুত গতিতে টনি গাড়ি চালিয়ে আসছিল। ওর চোখ মুখ, মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছিল। আজ ওর মুষ্টিযুদ্ধের শেষ লড়াই। ফ্রান্স, অটোয়া ও জেনেভাতেও এর থেকে অনেক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আজ কী ও হেরে যাবে? সমস্ত ব্রাসেলস ওর দিকে চেয়ে আছে। টনি মনে মনে ছক কষে নিচ্ছিল। টনি জানে ওদের কাছ থেকে এখনই কোন কথা বার করা যাবে না। ওরা ভেঙে যাবার পাত্র কিন্তু মচকাবার নয়। তবে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন কে দিয়ে কেটি কোলিয়ার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে। তা না করে আবার ব্রাডকে দিয়ে কেটির ফোন কলগুলোর সন্ধান নিলেও হয়। প্রতি সপ্তাহে সে কতবার কোথায় ফোন করেছে, ওর ঘর থেকে কে কোথায় ফোন করেছে, ওর কাছে কটা ফোন এসেছে, হ্যাঁ এইটাই সহজ হবে।

টনির মনে একটু সংশয় দেখা দিল। আচ্ছা আমি যাদের কাজে লাগিয়েছি তারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো? বিল, নিকোলে, জর্জেস, ব্রিজেট, বারনারড...

সবার কথা একে একে ভাবলো। টনি কাউকেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ এখন যা পরিস্থিতি চলছে তাতে সব কিছুই সম্ভব। তবে বিল নিকোলে এদের বিশ্বাস যোগ্যতা সন্দেহাতীত। জর্জেস মোস্ট ফেইথ্‌ফুল হ্যান্ড। আর জিন একটু কুঁড়ে হলেও রিককে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। আর জেরার্ড যেভাবে জেনেভা থেকে খবর পাঠাচ্ছে তাতে তাকে সন্দেহের বাইরে রাখতে হয়। গেরস্কির যে ফাইল ন্যাটোর ইনটেলিজেন্স দপ্তরে আছে তার হুবহু রিপোর্ট জেরার্ড যেভাবে পাঠিয়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় তার ভিতরে বিশ্বাস ভঙ্গের চিহ্নমাত্র নেই।

এই তো কদিন আগে জর্জেস বলল, স্যার আমরা জেনেভা থেকে জেরার্ডের রিপোর্ট পেয়ে গেছি।

টনি জিজ্ঞাসা করেছিল ব্রাসেলসে সব ঠিক আছে?

জর্জেস জানিয়ে ছিল, চিন্তা করবেন না স্যার আপনার চিঠি জেরার্ড ঠিকমত পৌঁছে দিয়েছে।

টনি জানতে চেয়েছিল, জেরার্ড কি বলছে?

স্যার গেরস্কি সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা ছিল ও তার থেকে আরো বেশি সাংঘাতিক। জেরার্ডের রিপোর্ট আমি আপনাকে না জানিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট 'ভি' একজিকিউটিভ অ্যাকশন ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না।

টনি হেসে বলেছিল, না না, আরো াকছু পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ, স্যার জেরার্ড বলেছিল, গেরস্কির ফাইল নাম্বার।

টনি জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা জেরার্ড কী তোমার মতই অত্যুৎসাহী?

জর্জেস বলেছিল, আরো বেশী।

কেন? কারণ কী?

জেরার্ড সোভিয়েতের ডিসইনফরমেশন ব্রাঞ্চ থেকে একজন লোককে এখানে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সোভিয়েত কোড ভাষাগুলো আয়ত্ত করার জন্য। কিন্তু গেরস্কি খুবই চালাক। সে বাবুর্চির সঙ্গে জেরার্ডের কিচেনে ঢুকে পড়ে তাকে তো মারলেই তার সঙ্গে আরও দুজনকে। ফুড পয়জনিং—

টনি ভাবল, না! সেন্ট্রাল পার্ক প্রায় কাছাকাছি এসে গেল। আর এসব আবোল তাবোল কথা চিন্তা করবে না।

টনি গাড়ির সামনে হঠাৎ একটা ছায়া দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল। জর্জেস! টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি অমন হাঁপাচ্ছ কেন? তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন?

জর্জেস বলল, স্যার, ভীষণ বিপদ হয়ে গেছে। আমরা বোকা বনে গেছি। আর প্যারাসিনি...

টনি ভাবল তাহলে তার অনুমান ভুল। প্যারাসিনি বিশ্বাসঘাতকতা করল... জর্জেস তুমি সব কিছু ভালো করে খুলে বল।

জর্জেস বলল, স্যার প্যারাসিনিকে খুন করা হয়েছে।

টনি রীতিমত শিউরে উঠল, বল কী?

টনি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, ঘটনাটা কী করে ঘটল?

জর্জেস বলল, কোন শব্দ নেই, হৈ-হুল্লোড় নেই। সব কিছুই ঠিকমত হচ্ছিল। আমি গেরস্কি আর রিককে সেন্ট্রাল পার্কের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনাকে ফোন করতে যাই। প্যারাসিনি পার্কের ভিতরে কোন এক জায়গায় লুকিয়ে ওদের ফলো করছিল।

আমি ফোন করে এসে দেখি গেরস্কি আর রিক সেখানে নেই। প্যারাসিনিকেও দেখতে পেলাম না, ভাবলাম প্যারাসিনি হয়তো ওদের পিছু নিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সেন্ট্রাল পার্কের ভিতর যাই, দেখি প্যারাসিনি পড়ে আছে, ওকে খুন করা হয়েছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, কোন আঘাতের চিহ্ন আছে?

না স্যার, কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে হার্টফেলিওর কেস।

টনি আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগল। গেরস্কির সেই একই কার্যপ্রণালী। গেরস্কি যেভাবে বুদ্ধির খেলায় টনিকে হারিয়ে দিচ্ছে তাতে এটা হজম করা ওর পক্ষে সহজ হবে না এটা জর্জেস ভালোই বুঝতে পেরেছিল।

টনি জিজ্ঞাসা করল, বিল আর নিকোলে কোথায়?

বলতে বলতে একটা ছোট স্পোর্টিং কার চালিয়ে বিল আর নিকোলে সেখানে পৌঁছালো। ওদের ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

টনি বলল, প্যারাসিনির খবর জানো?

বিল বলল, জানি, আমরা ওর অবস্থা দেখে গেছি। একটা সাইট্রোন কার এ চেপে রিক আর গেরস্কি ফিফটি ফোর্থ অ্যাভেন্যুর দিকে যাচ্ছিল। আমরা ওদের ফলো করছিলাম।

টনি চমকে উঠল, ফিফটি ফোর্থ অ্যাভেন্যু। ওখানে তো টমের অ্যাপার্টমেন্ট।

টনি চট করে নিজের গাড়ি থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল আর জর্জেসকে বলল, তুমি আর নিকোলে প্যারাসিনির ব্যবস্থা কর।

আর বিল তুমি আমার সঙ্গে চলো। জর্জেস, তোমাদের কাজ হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। আর আমার ফোনের অপেক্ষা করবে।

।। ষোল ।।

টম কেলসো গাড়িটা বাড়ির লনে দাঁড় করালো। ফিয়াটের দরজা খুলে নিজে নেমে এল। তারপর পিছনের সীট থেকে চার্লসের সুটকেসটা নিল। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল। সব ঠিক আছে। সে যেমনটি বলেছিল, সেইভাবেই ডরোথি কাজ করেছে।

ডরোথি শুধু দরজা ও জানালার পর্দা দেয়নি। কাঁচের শার্সি এমন কী কাঠের পাল্লা গুলোকেও বন্ধ করে দিয়েছে। বারান্দায় উঠে দরজা খুলতে গিয়ে বুঝতে পারল টম দরজা লক করে আবার ভিতর দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। যাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতর ঘরে ঢুকতে পারবে না।

টম দরজায় ঘা দিল, কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তবে কী ডরোথি দোতলায় ঘুমিয়ে পড়েছে? টম ভাবলো তাহলে বাড়ির পিছনে গিয়ে ছোট পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ডাকবে? এমন ছেলেমানুষী করার আগে টম আবার বেশ কয়েকবার জোরে জোরে দরজায় ঘা দিল। কিছু মুহূর্তের

জন্য টম অজানা ভয়ে শঙ্কিত হলো। তারপর ডরোথির গলার শব্দে নিশ্চিন্ত হল।

ডরোথি দরজা খুলতে, মোটামুটি হালকা মেজাজে দোরগোড়ায় ডরোথিকে পেতে টম জড়িয়ে ধরে ওর গালে আলতো চুম্বন করল। বলল, থিয়া তুমি আমার স্বর্গ, স্বপ্ন।

ডরোথির শরীরের ভেজা স্পর্শ পেয়ে টম জিজ্ঞাসা করল তুমি বুঝি বাথরুমে ছিলে?

ডরোথি বলল, হ্যাঁ একটু হট বাথ নিচ্ছিলাম...তোমার গাড়ীর শব্দ শুনেছি। বাথরুম থেকে বেরুতে একটু দেরী হল।

ডরোথি দরজা লক করে ছিটকিনি তুলে দিল।

টম বলল, এমন হাল্কা পোষাক পড়ে আছো কেন? গরম কিছু গায়ে দেওয়া দরকার ছিল।

ডরোথি বলল, অত সময় পাইনি স্যার, ডিনার তৈরী করলাম, তারপর তোমার যা হুকুম, জানালা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর, পর্দা দাও বাব্বা!

দোতলায় বেডরুমে গিয়ে টম আবার ডরোথিকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ডরোথির গলায়, গালে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, আমার এখন মোটেও খিদে নেই। আমায় এখন কিছু কাজ করতে হবে, বুঝলে।

টম বাথরুমের কাজ সেরে, শোবার ঘরে গিয়ে বসল। ডরোথি কিচেনে চলে গেল।

ডরোথি একটা প্লেটে করে ওমলেট নিয়ে এলো। টম ওমলেটের প্লেটটা হাতে নিয়ে বলল, আমরা আবার আগের পরিবেশে আসার চেষ্টা করছি। শুধু...

ডরোথি বুঝতে পারল টমের চার্লসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ডরোথি নিজেও কী কম কষ্ট পাচ্ছে, টম যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তাই সে নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে যাচ্ছে।

ডরোথি নিজের জন্যেও ওমলেট নিয়ে এলো। বলল, দরজা জানালা গুলো এভাবে বন্ধ রাখা কী খুবই জরুরী?

টম দরজা জানালা কেন বন্ধ রাখতে চায় সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা ওগুলো বন্ধই থাক।

ডরোথি ওমলেটের প্লেট নিয়ে টমের পাশে বসে বলল, ব্রাডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

টম বলল, ওসি একবার ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোক তোমায় খুব স্নেহ করেন। তিনি খুবই চিন্তিত।

ডরোথি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, পুলিশ হাউসে কী হল আমায় বল না? চার্লসের হঠাৎ এমন হল কেন?

বলতে গিয়ে টমের গলা ধরে এল, অল্প কথায় কি হয়েছিল বলে দিল, ব্রাডের কথা টনি লটন এর কথা সব একে একে ডরোথিকে বলল।

ডরোথি টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বলল, আজ রাতেই তুমি চার্লসের সুটকেসটা খুঁটিয়ে দেখো, তার পর সামান্য রাগের সঙ্গে বলল, ব্রাড, টনি এরা কোন কাজের নয়, হোপলেস! তুমি বললে, তোমায় রিক নীলে ফলো করেছিল! কেন?

টম বলল, মনে হয় চার্লসের এই সুটকেসটার জন্য। আমি নিজে আগে দেখতে চাই এই সুটকেসে চার্লসের কী এমন মূল্যবান জিনিস আছে।

ডরোথি বলল, চলো আমি তোমায় সাহায্য করি।

দুজনে শোবার ঘরে বিছানায় সুটকেসটা নিয়ে বসল, ডরোথি এমন ভাবে সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে আছে যেন প্যানডোরার বক্স খুলতে যাচ্ছে। তা থেকে এমন সব জিনিস বের হবে যে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

টম সুটকেসটা খুললো, তাতে থরে থরে সাজানো আছে চার্লসের জামা-প্যান্ট। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে টমের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। টম এমন আস্তে আস্তে জামা প্যান্টগুলোতে হাত বোলাতে লাগল যেন ও চার্লসকেই আদর করছে। ডরোথিরও কান্না পাচ্ছিল। তবু সে জোর করে নিজেকে সামলালো, পাছে টম ভেঙে পড়ে।

টম একে একে জামা-প্যান্টগুলো পাশে সরিয়ে রাখলো, জামা-প্যান্টের নীচ থেকে একটা ডায়েরী আর দুটো খাম পেল।

ডরোথি ধরা গলায় বলল, আমি জামা-প্যান্টগুলো দেখি, তুমি বরং ডায়েরীটা দেখো।

টম ছোট ডায়েরীটা তুলে দু-চারটে পাতা উল্টে দেখে বলল, এটাতে কিছু নেই শুধু কিছু ঠিকানা আর ফোন নম্বর আছে। টম শেষের দিকের একটা পাতায় গিয়ে থামলো, দেখলো তাতে কিছু হিসেব-নিকেশ। চার্লস খুব সংসারী ছিল। রেস্তোরাঁ, থিয়েটারে কত খরচ করেছে তাও পর্যন্ত লেখা আছে।

তারপর কি একটা দেখে টম থেমে গেল, বলল, থিয়া এগুলো পড়তে একটু সময় লাগবে, এর ভাষা একটু অদ্ভুত, সামথিং ইমপরট্যান্ট।

ডরোথি বলল, অদ্ভুত মানে কোড ভাষায়?

টম বলল, না, তুমি তো জানো একটা পোস্টকার্ডে আমরা যতটা লিখতে পারি চার্লস অদ্ভুতভাবে তাতে আরো অনেক কথা লিখতে পারত। অনেকটা সেই ধরনের।

টম বই-এর মধ্যে নিবিষ্ট হল।

ডরোথি চার্লসের জামা-প্যান্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এটা শুধু টমকে সাহায্য করাই নয়, নিজের আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে মুছে ফেলা।

ডরোথি একটা একটা করে দেখে পাশে সরিয়ে রাখছিল। একটা ব্লেজারের পকেটে একটা সিল্কের রুমাল পেল। সেই পকেটে আর কিছু না পেয়ে অন্য পকেটে হাত দিতেই একটা কাগজ হাতে ঠেকল। বার করে এনে দেখল একটা এয়ার-মেইল।

সব কিছুতেই এখন তাদের কৌতূহল। ডরোথি চটপট ভাঁজ খুলে ফেললো। এয়ার-মেইলের ভিতরে অর্ধেকটা টাইপ করা একটা চিঠি। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখ দেওয়া। প্রাপক, পল ক্রান্যজ। ঠিকানা, শ্যানডন হাউস, অ্যাপলেটন হাউস এন জে। চিঠির এক কোণে ছোট করে লেখা আছে কপি টু টম। আর চিঠির একেবারে নীচে সরু পেন্সিলে খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা, টম যেহেতু আজ সন্ধ্যায়ই আমি বেড়িয়ে যাচ্ছি এ চিঠিটা আমি তোমায় দিয়ে গেলাম। এ চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আগে থেকেই কোন কথা বলতে চাই না। তুমি একটু সময় করে এটা পড়ে নিও। আর এ নিয়ে ভাববার মত যেন যথেষ্ট সময় পাও সেজন্যই কোন আলোচনায় এখনই যেতে রাজী নই। এর ওরিজিন্যাল আমি সই করে খাম এঁটে ডাকে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। যদি নীলে আমার প্রথম প্রস্তাবে রাজী না হয়, তবে এটা ডাকে পাঠাতে আমি এক মুহূর্ত দেরী করব না। আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। প্রথমে ও অস্বীকার করছিল। শেষ পর্যন্ত ও বাধ্য হয় সব স্বীকার করতে। যাইহোক, ওকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছি শ্যানডন এলাকা থেকে ওর কার্যকলাপ সরিয়ে নিতে। যদি ও তা করে তাহলে ক্রানৎজ-এর কাছে চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন নেই। তখন তুমি এর কপিও নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু ও যদি তা না করে তবে গষ্ট্যাতে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো। এর মধ্যে যদি তুমি কিছু ভেবে থাকো তা জেনে নিতে পারব।—তোমার চার্লস। তারিখ আটাশে ফেব্রুয়ারী।

চিঠিটা কোন রকমে শেষ করে ডরোথি লাফিয়ে উঠল। চার্লসের ব্লেজারের পকেট থেকে একটা নতুন জিনিস পেলাম বোধ হয় ন্যাটো সংক্রান্ত কিছু খবর লেখা, শ্যানডন হাউসের উদ্দেশ্যে চিঠি।

চিঠির বাকী অংশটুকুতে রয়েছে চার্লসের স্বীকারোক্তি। সে কিভাবে শ্যানডন হাউস থেকে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম সরিয়েছিল। তারপর রিক নীলের সাহায্যে কিভাবে ওটা হোল্জাইমারের হাতে যায়। চিঠির পরিসমাপ্তি ঘটেছে চার্লসের শ্যানডন হাউসে ইস্তফার মধ্য দিয়ে।

চার্লস বলতে চেয়েছে প্রতিটি আমেরিকানের ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম-এর যথার্থতা বিচার করার অধিকার আছে। সেই জন্যই সে ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর জন্য যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তার দায় দায়িত্ব বহন করতে সে প্রস্তুত।

ডায়েরীর থেকে টম দুটো পেপার কাটিং পেল। বলল, জানো চার্লস নিশ্চয়ই জানত রিক ওর সঙ্গে নানা রকম চালাকি করে চলেছে। এই পেপার কাটিংগুলো ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের। এর একটা হচ্ছে, এইরকম ক্যাপসন দিয়ে শুরু, এখন এ প্রকাশ করা চলে। এটা মাত্র গত মঙ্গলবারের কাগজের সংবাদ। এর বিষয়বস্তু হলো খুব সাংঘাতিক। ওয়াশিংটন পোস্টের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছে। গত ডিসেম্বরের তিন তারিখে একটি বিখ্যাত দৈনিকে ন্যাটো মেমোরেন্ডামের যে কপি

ছাপা হয়েছিল তার সমস্তটাই এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে পাচার হয়ে গেছে। পেন্টাগনের একজন নির্ভরযোগ্য কর্তাব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে এর দ্বারা স্বদেশের কোন মঙ্গল সাধন তো হয়নি বরং আরো বিরাট ক্ষতি করা হয়েছে।

কাগজটা ঠিক করে রেখে টম বলল, থিয়া ভাবতে পারো এটা কত বড় অন্যায় হয়েছে। ব্রাড জিলন ওকে রিক নীলে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন ও তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। এখন কী হলো, ওয়াশিংটন পোস্টে সব বেড়িয়ে গেল। বুধবার দিনই ও বুঝতে পারল যে ও প্রতারিত হয়েছে। হ্যাঁ রীতিমত প্রতারিত। তখন ও পল ক্রানৎজকে চিঠি লিখতে বসল। আর নীলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসল। আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। ও যে এত বড় বোকা তা জানা ছিল না। চার্লস একবারও বুঝলো না যে সে কত বড় অন্যায় করতে চলেছে। এতে দেশের কত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে তো বাচ্চা নয়। রিক নীলেকে তার আগে চেনা উচিৎ ছিল। চিরকালই সে এরকম না ভেবে কোন কাজ হুট করে করবে আর পরে সেই নিয়ে পস্তাবে।

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর কাকে এসব বোঝাবো। সে তো সব কিছু বোঝার উর্দ্ধে চলে গেছে।

ডরোথি টমকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না। ও আস্তে আস্তে চার্লসের জামা-প্যান্টগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সে আস্তে আস্তে টমকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা টাইপ করা চিঠিতে একটা কথা আছে ফার্স্ট অলটারনেটিভ, ওটা বলতে চার্লস কী বোঝাতে চেয়েছে?

টম রাগে জ্বলে উঠল। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। যদি রিক ওর কথা না মেনে নেয়, রাবিশ। আর যদি মেনে নেয় তাহলে সে তো আর এই চিঠি পল ক্রানৎজকে পাঠাতো না। এমন কী আমায়ও দিত না। ব্লেজারের পকেট থেকে বার করে ছিঁড়ে ফেলে বন্ধু গর্বে গর্বিত হয়ে রিককে বুকে জড়িয়ে ধরত। সত্যি আমার ধারণা ছিল না এত বোকা কেউ হতে পারে।

তারপর টম আবার পড়ে শোনাতে লাগল ডরোথিকে—নীলে যদি আমার প্রথম বিকল্প মেনে না নেয় তাহলে—ঠিক তখনই পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল।

টম ডায়েরীর একটা পাতা দেখিয়ে বলল, তুমি পড়ো তাহলেই সব বুঝতে পারবে। আমি দেখি এখন আবার কে ফোন করল।

ডরোথি খুব তাড়াতাড়ি চোখ বোলাতে লাগল ঃ বিকল্প—হয় এখানকার সমস্ত রকম কর্মসংস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবে নতুবা—আমি পল ক্রানৎজকে সব কিছু জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডরোথি মনে মনে ভাবল, চার্লস নিশ্চয়ই ভেবেছিল নীলে বন্ধুর কথা শুনে চলে যাবে। সত্যতা স্বীকার করবে। ওকে আর বিব্রত করবে না। চার্লসকেও আর চাকরি থেকে পদত্যাগ করে অপমানিত হতে হবে না। ডরোথি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওহ্ চার্লস সেই যদি চলে গেলে, কেন আগে বুঝলে না? কেন আমাদের কাছে এলে না? টমের একটা পরামর্শ নিতে পারতে। তোমার জন্য আমরা কত রাত অপেক্ষা করে থেকেছি। তোমার চাকরি গেলে যেত কিন্তু আমরা তো আর তোমাকে চিরকালের জন্য হারাতাম না। ডরোথির চোখ জলে ভরে উঠল।

টমকে আসতে দেখে ডরোথি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল, মিথ্যে হাসির চেষ্টা করল।

টম বলল, ব্রাড ফোন করেছিল। ও জানাতে চাইছিল আমরা কোন রকম নার্ভাস ফিল করছি কিনা। আমি ওকে কিছু সংবাদ দিলাম। আর ওই কেটি বলে মেয়েটার খোঁজ নিতে বললাম। আর জানিয়ে দিলাম রিক যে কোন সময়ে পালিয়ে যেতে পারে। ও একটা বড় শয়তান।

টম ডায়েরীটা রেখে দিল। চিঠিটা ভাঁজ করে তার মধ্যে রাখল। তারপর সব একসঙ্গে বড় টেবিল ক্লক-এর পিছনে রাখল।

টম ডরোথিকে বলল, তুমি ভীষণ শীতে কাঁপছ। তুমি বরং শুয়ে পরো আমি দেখি টনিকে ফোনে ধরতে পারি কিনা।

ডরোথি বলল, না, আমার এখন শুতে ইচ্ছে করছে না।

টম বলল, তাহলে তুমি গরমের কোন পোষাক গায়ে দাও আমি ফায়ার প্লেসের আগুনটা জ্বেলে

দিচ্ছি।

ডরোথির বাইরের ঠাণ্ডায় যত না শীত করছিল তার থেকে বেশী চিন্তা ভাবনাগুলো ওকে শীতল করে তুলছিল।

টম ফায়ার প্লেসে আগুন ধরিয়ে দুটো গ্লাসে করে ব্রান্ডি নিয়ে এল। সোফার সামনে যে টেবিল তাতে রেখে ডরোথিকে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে বলল, চিন্তাগুলোকে সব ব্রাড আর টনির জন্য রেখে দাও, লেটস হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক। তোমার হাত পা দেখছি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এসো আমরা একটু উষ্ণ হয়েনি। বলে টম ডরোথিকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, থিয়া আমি আর ভাবতে পারছি না। তুমি আমায় মাদকতায় ডুবিয়ে দিয়ে সব ভুলিয়ে দাও। ডরোথির নরম গালে মুখ ঘষতে ঘষতে টম লাইট-টা অফ করে দিল।

তারা আস্তে আস্তে কামনার আগুনে বিলীন হতে শুরু করল। ডরোথি টমকে দু-হাত দিয়ে নিবিড় করে আকড়ে ধরে টমের লোমশ বুকে মুখ ঘষতে থাকলো। টমের হাত অস্থির হতে শুরু করল। তা ডরোথির সোয়েটারের ভিতর দিয়ে নীচে ক্রমশ নীচের দিকে এগোতে লাগল। টমের ঠোঁট ডরোথির নরম ঠোঁটকে টেনে নিল। ঠিক তখনই—

একটা ছোট্ট শব্দে দুজনের দেহ আড়ষ্ট হল। চোখ হল পলকহীন। শরীরে কাঁটা দিতে শুরু করল।

টম আস্তে আস্তে নিজের হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল, কীসের শব্দ হোল না? তুমি শুনতে পেয়েছো?

ডরোথি কাঁপতে কাঁপতে বলল, হ্যাঁ।

ডরোথি টমের বাঁধন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে। কিচেনে ওমলেট করে প্যানটা আমি মেঝেতে রেখেছিলাম, অন্ধকারে নিশ্চয়ই কারো পা পড়েছে ওতে।

টম বলল, তাহলে জানালা দিয়ে কেউ এল কী?

টম ডরোথির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, তুমি—অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাও। পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে নার্সারী স্কুলের দারোয়ানকে ডেকে বলবে এখুনি পুলিশে একটা ফোন করতে।

ডরোথি বলল, টনিকে নয়?

টনি এখন কোথায় কে বলতে পারে। তুমি আর দেরী করো না। তাড়াতাড়ি যাও।

ডরোথি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে ঠিক তখনই বসবার ঘর আর শোবার ঘরের মাঝের দরজায় দীর্ঘদেহী পুরুষের ছায়া।

ডরোথি একটা আর্তনাদ করে টমকে জড়িয়ে ধরল।

ছায়াটির গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চালাকীর চেষ্টা করো না। একটু এদিক ওদিক নড়লে আমার লোক তোমাদের গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে।

টম কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ফায়ার প্লেসের আগুন খোঁচানোর লোহার দণ্ডটির দিকে চোখ পড়ল। ওটার একদিক ভয়ঙ্কর সূঁচালো। সেটা টমের হাতের কাছেই ছিল।

ওই ছায়া মূর্তিটি পিছন ফিরে বাকী লোকেদের ইশারায় ডাকলো সেই সুযোগে টম লোহার দণ্ডটি হাতে নিয়ে জামার ভেতর লুকিয়ে ফেলল। অবশ্য বুঝতে পারল না এটা কোন কাজে আসবে কিনা।

আরও দুজন লোক এসে দাঁড়ালো, সবার পরনে স্কিকরার পোষাক, মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত সব ঢাকা। শুধু চোখ দুটো খোলা। সবার হাতে পিস্তল ওচানো।

টম বুঝতে পারল একটা আগুন খোঁচানোর দণ্ড নেহাৎ ছেলেমানুষ এদের কাছে। কিন্তু তাই নিয়েই কিছু করা যায় কিনা ভাবতে লাগল টম।

।। সতেরো ।।

টম আর ডরোথির কাছে এক এক মিনিট মনে হচ্ছে এক এক যুগ। একটা ভয়াল নির্জনতা বিরাজ করছে তাদের চারিদিকে। অন্ধকারের মধ্যে একদিকে দুটি নারী পুরুষ অন্য দিকে তিনটি

ভয়াল মূর্তি। টম ভাবছিল নিশ্চয়ই ডরোথি ডাইনিং-স্পেস এর জানালার শার্সিগুলো আটকাতে ভুলে গেছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তোলা এখন বৃথা।

যে দুটো ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা টম বা ডরোথিকে দেখছিল না। তারা তাদের অপর সঙ্গীটিকে দেখছিল। সে মনে হয় নিজেকে একটু আড়াল করে রাখতে চাইছিল। টমও ওকে একটু খুঁটিয়ে দেখছিল। লম্বায় ছয় ফুটের মত ; টমের মতই। বেশ মোটা সোটা চেহারা। ওজন অনেক বেশী হবে। মুখের ওপর কাপড় থাকায় কণ্ঠস্বর পালটে গেছিল, এ-ই যে ওদের নেতা তা বুঝতে টমের দেরী হল না কারণ বাকী দুজন তার আদেশের অপেক্ষা করছিল।

ওদের যে নেতা সে ফরাসী ভাষায় বাকী দুজনের মধ্যে যে লম্বা তাকে বলল, তুমি নিচের ঘরে গিয়ে কাজ শুরু করে দাও আর অপর জনকে বলল তুমি দোতলাটা দেখ। নিজে লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে টম আর ডরোথির দিকে তাক করে দাঁড়ালো।

ডরোথি টমের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, ওরা নিশ্চয়ই চার্লসের সুটকেসের জন্য এসেছে।

ওদের নেতা বলে উঠল, উঁহু। কোন কথা নয়। তোমার পেছনে ওটা কি লুকিয়ে রেখেছ বার করো শিগগির।

টমের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

লোকটা ফরাসী ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, কোন চালাকি করার চেষ্টা করো না। হাতে কি আছে ফেলে দাও নাহলে বোকামির বড় মাশুল দিতে হবে।

টম ডরোথির কানে কানে বলল, ওরা যত বুঝবে আমরা ফরাসী নই তত ওরা খোলা মনে আলোচনা করবে আর আমাদেরও ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হবে।

লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠলো। চোপ! আমাকে বাধ্য করো না আমার এই রিভলবার ব্যবহার করতে।

টম ডরোথিকে বলল, এরকম বোকার মত আচরণ করো যেন ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছ না। ডরোথি ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে উঠছিল।

এবার লোকটা ইংরাজীতে বলল, কোন কথা নয় ওটা ফেলে দাও।

টম যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল এমন ভাবে হাতের যন্ত্রটা ফেলে দিল। আর লোকটার দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য ডরোথিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আশা করি তুমি এতে বাধা দেবে না, আমার স্ত্রী মোটেই সুস্থবোধ করছে না।

লোকটা বলল, কথা বলো না, যেখানে যেমন ভাবে আছ থাকো।

যে লোকটা নীচে গেছিল সে ফিরে এসে বলল, নীচের ঘরে কিছুই নেই। এদের কোন চাকর বাকর ও নেই, এরা এই বাড়ীতে একাই থাকে।

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল, ওদের দলপতি বলল, না তার কাটার প্রয়োজন নেই। তাহলেই সন্দেহ বাড়বে। তখন আশ-পাশের বাড়ীতে ফোন করা শুরু হবে। লোকটা নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, বেশী দেরী নয়, চটপট সব কাজ করো।

পাশের ঘর থেকে অন্যজন এক গোছা কাগজ নিয়ে ঢুকলো।

ডরোথি চিৎকার করে উঠল টম তোমার পাণ্ডুলিপি। ওটা ওদের কী কাজে লাগবে?

টম ডরোথির গালে আলতো চুমু খাওয়ার অছিলায় বলল, শোন, এই সুযোগে তুমি ক্লোসেট থেকে চার্লসের সুটকেশটা বার করে নিয়েই বাথরুমে ঢুকে গিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেবে। টেলিফোনের শব্দে ওদের একান্ত কথাবার্তা ঢাকা পড়ে গেল।

ডরোথি টমের মনের কথা বুঝে আর সময় নষ্ট করল না। টেলিফোনের শব্দের থেকেও জোরে চেঁচিয়ে বলল, শোন, এই পাণ্ডুলিপি তোমাদের কোন কাজে আসবে না।...তোমরা কী খুঁজছ আমায় বল, আমি তোমাদের তা বের করে দিতে পারি। টমের কাছ থেকে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

টম ডরোথির সাহস দেখে বেশ আনন্দিত হচ্ছিল। টম চেঁচিয়ে বলতে পারছিল না, কিন্তু ও মনে মনে বলছিল, থিয়া, আরো একটু তাড়াতাড়ি কর। ওই নেতা গোছের লোকটা শোবার ঘর তল্লাশি করছে। ও যে টেবিল ক্লকের দিকেই এগোচ্ছে। সর্বনাশ যদি একবার ঘড়ির পেছনে হাত

দেয়। ওহ্।

টেলিফোনটা বাজতে বাজতে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল ডরোথি গুটিগুটি করে আরো কয়েক পা এগিয়েছে।

এই বার লোকটাও একটু ইতস্ততঃ করছিল। ভাবছিল বলবে না বলবে না? অবশেষে খুব সংক্ষেপে বলল, আমরা সেই সুটকেসটার খোঁজ করছি। যেটা তোমরা পুলিশ হাউস থেকে নিয়ে এসেছ।

ডরোথি অবাক হবার ভান করে বলল, সুটকেস!

টম মনে মনে বলল ও থিয়া মাই ডারলিং আর দেরী করো না, লোকটা যে ঘড়ির থেকে আর কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। টম ছটফট করছে।

ডরোথি যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল ওরা কী চাইছে। বলল, ও এই সুটকেসটার কথা বলছ তোমরা? বলতে বলতে ডরোথি বসবার ঘরে চলে এল।

মুখোশধারী লোকটা ডরোথিকে ধমকালো, স্টপ, তোমাকে যেতে হবে না। কোথায় আছে শুধু বলে দাও।

ডরোথি ওর ধমকানোর তোয়াক্কা করল না। বলল, তোমরা খুঁজে পাবে না। পুরোন দেওয়াল আলমারী হাজার চেষ্টা করেও তোমরা খুলতে পারবে না। আমাকেই খুলে দিতে হবে।

দুজন মুখোশধারী ছুটে এসে ডরোথির হাত ধরল, ডরোথি তাদের হাত ছাড়িয়ে রেগে গিয়ে বলল, এমন করলে তোমরা সারা রাত ধরে খুঁজেও বের করতে পারবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডরোথি বলল, এই তো এখানে, তোমরা এত বোকা! সত্যিই যে ডরোথি ওদের বোকা বানিয়ে ছাড়ছে এটা ওরা ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না।

সত্যি ওরাও অবাক হলো। এই পুরনো গোছের ক্লোসেট তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। ওরা তিনজনে একসঙ্গে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ডরোথি একটু পিছিয়ে এলো। বসবার ঘরের পরে ডাইনিং স্পেস, তারপর বাথরুম সেখানে দাঁড়িয়েই সে ওদের ক্লোসেট খোলার কায়দা দেখিয়ে দিল।

ওরা তিনজনে দুহাতে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত ঘটনা ঘটল। ধড়াস করে ভেতরের একটা লম্বা ড্রয়ার ছিটকে বেরিয়ে এল। ভেতরে সুটকেস। তখন ডরোথি—

পিছন ফিরেই ডরোথি দৌড় লাগালো। সব থেকে পেছনে যে লোকটা ছিল সে ডরোথির মতলবটা ধরে ফেলেই ড্রয়ার ছেড়ে ওর পিছনে ধাওয়া করল। লোকটা অন্ধকারে কিচেনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ল। কিন্তু সে তখন মরিয়া ডরোথিকে ধরবার জন্য। ডরোথির কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পিছন ফিরে দেখা দূরের কথা দম ফেলবার পর্যন্ত সময় নেই। কিচেন পেরিয়ে সে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল।

ভিতরে ঢুকে বাথরুমের কাঠের ভারী দরজাটা ভিতর থেকে লক করে ছিটকিনি তুলে দিল। লোকটার অন্ধকারে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে বাথরুমের দরজা খুঁজে পেতেই তাতে বেধড়ক কিল চড় ঘুষি, সপাটে লাথি মারতে থাকল।

ডরোথি ওর নিজের চলাফেরার শব্দ ঢাকবার জন্য বাথরুমের শাওয়ার খুলে দিল, আলো জ্বালল না পাছে ওরা ওর গতিবিধি টের পায়।

ডরোথি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাথরুমের পিছনের জানালা ধরল। শব্দ যাতে না হয় সেই ভাবে আস্তে আস্তে কাঁচের জানালার ছিটকিনি খুলে ফেলল, জানালা গরাদ হীন, গভীর রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ঢুকতে লাগল।

খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল একটু দূরে অ্যাকশিয়া গাছের মগডাল। ডরোথি ভাবলো, আমি কী পারব? যদি না পারি? ওর হাত কাঁপতে শুরু করেছে। না পারলে চলবে না ওকে পারতেই হবে। ডরোথি জানালায় উঠে বসে একটা পা ঝুলিয়ে দিল। পায়ের কাছে একটা ডাল পেয়ে গেল। ওই ডালটা ওর ভার সামলাতে পারবে তো? পারবে নাই বা কেন? ডরোথি ভাবল। এই গুলোই তো অনেক সময় ছাদ ফুটো করে ওঠে যায়। যাই হোক ওকে তো বাঁচতে হবে সেই সঙ্গে টমকেও—

ডরোথি কিছু না ভেবেই ডাল ধরে শূন্যে লাফ দিল। পরিণতি সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। উল্টে পড়ল গাছের ডাল পালার মধ্যে। চোখে মুখে খোঁচা খেল, হাত পা যেখানে সেখানে ছড়ে গেল।

ফুট তিনেক উপরে ডরোথি দোল খেল। ওই ডালটার জন্য ও সরাসরি পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচলো। আস্তে করে ও ঘাসের উপর লাফিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর জন্য ও পা সোজা করতে পারছিল না। তবু তাকে ছুটতে হবে। কোন রকমে দুলতে দুলতে নিজেকে সে টেনে নিয়ে চলল।

টমের ভীষণ দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল ডরোথি কী পারবে? মুখোশধারীগুলো সুটকেস নিয়ে কি করছে সেদিকে টমের কোন লক্ষ্য ছিল না। ও কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিল। দরজায় লাথির আওয়াজ সব শুনছিল টম। তার পর সব শব্দ থেমে গেল। টম কোন মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না বা ধস্তাধস্তির আওয়াজও পেল না। এদিকে অন্য দুজন যারা সুটকেশ নিয়ে ছিল তাদেরও অন্য সঙ্গীটির দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তারা সুটকেশ নিয়ে ব্যাস্ত।

যে লোকটা ডরোথির পিছনে ধাওয়া করেছিল, সে ফিরে এল। কোন উৎকণ্ঠা নেই। খুবই সহজ ভাবে বলল, মেয়েটা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। থাক, বাথরুমেই থাক।

ওরা চার্লসের সুটকেশটা পোকা বাছার মত খুঁটিয়ে দেখছে প্রতিটি জামা প্যান্ট, পাসপোর্ট বিমান যাত্রার টিকিট হোটেল রির্জাভেশন স্লিপ্। যে কোনও রকম হাতের লেখা। দুটো পেপার ব্যাক এমন কী ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতা কোন কিছুই বাদ গেল না।

হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে। তবু তাদের তল্লাশি শেষ হচ্ছে না। যদি নিশ্চিত হবার মত কোন আশ্বাস মেলে, কিন্তু সবই বৃথা।

ওদের নেতার হাবভাব দেখে টমের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। টমের দুর্ভাবনা ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। সুটকেসে কিছু না পেয়ে এবার ওরা নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে পড়বে। এখান থেকে পালানোর একটাই পথ বসবার ঘরের খোলা জানালা। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে গেলে টমকে দুজন মুখোশধারীকে আহত করে যেতে হবে। কিন্তু এটা চিন্তা করা একেবারে ছেলে মানুষী। দিস্ ইস্ ইমপসিবল।

ওদিকে ওদের খোঁজা শেষ হচ্ছে না, খনিতেও বুঝি এভাবে হীরে খোঁজা হয় না। সুটকেশের লাইনিং কিছুই বাদ দিচ্ছে না। দুজন সুটকেস নিয়ে ব্যস্ত। অন্যজন টমের কাছেই ঘুর ঘুর করছে কোন পথ নেই। হঠাৎ টমের সেই লোহার দণ্ডটার দিকে চোখ পড়ল—কিন্তু টম হতাশ হল—ওদের তিনজনের হাতে তিনটে রিভলবার। না! কিছুই বুঝি করার নেই!

হঠাৎ টমের একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মাঝখানে দরজা তার বাঁ-দিকে নীচে নামার সিঁড়ি। ডানদিকের ঘরে ওরা সুটকেস নিয়ে ব্যাস্ত। অন্যজন ওর কাছেই রয়েছে।

জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। টম হঠাৎ বলে উঠল, তোমরা যদি কোন বই বা ডায়েরী খুঁজে থাকো তাহলে তার সন্ধান আমি দিতে পারি। এই ঘরে যে টেবিল ক্লকটা আছে তার পিছনেই পাবে। সেখানে একটা চিঠিও আছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে লাফিয়ে উঠল। যে টমের কাছে ছিল সে দাঁড়িয়ে রইল বাকী দু'জন সুটকেস ফেলে ছুটে এল।

টম বলে চলল, এটা একটা চিঠির কপি মাত্র। এর আরো চারখানা কপি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় দেওয়া হয়ে গেছে। রিক নীলে যদি ভাবে এখানে একটা ডাকাতি করিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবে তা তার মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোমরাও ঠিক তেমনই মূর্খ। টম বলল, রিক নীলেকে এতক্ষণে পেন্টাগন ন্যাটোর গোয়েন্দা দপ্তর চিনে ফেলেছে। এখন শুধু বাকী তার ধরা পড়া।

টমের এই কথাগুলো কাজ করল। একজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। অন্য দু-জন কিন্তু থামল না। তাদের একজন ঘড়ির কাছে ছুটে গেল আর কাগজগুলো সব টেনে বের করল। বলল—এই তো সেই চিঠি আর বই।

যে মুখোশধারী লোকটা টমের পাশে ছিল সে স্বাভাবিক কারণেই ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিল। টম ভাবল এটাই মস্ত বড়ো সুযোগ, এই সুযোগ হারালে চলবে না। কেননা টম বুঝেছিল মুখোশধারীরা সব কিছু পেয়ে গেলে তাকে আর জ্যান্ত রেখে যাবে না। তাই তার আগে এই একটাই উপায়। সেটা তাকে যেভাবে হোক কাজে লাগাতে হবে।

টম চোখের পলকে মেঝেতে পড়ে থাকা লোহার দণ্ডটা উঠিয়ে নিল। আর পাশের লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগে মুহূর্তে সজোরে দণ্ডটির ছুঁচালো দিকটা বসিয়ে দিল তার উরুর, মধ্যে। লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল...

অন্য দু-জন মুখোশধারী লোক কিছু বোঝার আগেই টম দিগবিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে তীরের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

অন্ধকারে রিভলবার ঝলসে উঠল, একটা নয় পর পর এলোপাথারি গুলি চলতে লাগল। দেওয়ালের চুন বালি খসতে লাগল,—নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হতে লাগল। তবু গুলির বৃষ্টি থামল না।

এদিকে ব্রাডকে এর পরের কাজ সম্বন্ধে জানিয়ে ফিরতে টনি লটনের একটু দেরীই হয়েছিল। গুলির শব্দ শুনতে ওর একটুকুও ভুল হয়নি।

রাস্তার মোড়ে গাড়ী রেখে তার কোমর থেকে রিভলবারটা হাতে নিয়ে নিল। টমের বাড়ীতে একটা ছায়ামূর্তি দেখে টনি নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে আড়াল করে নিল।

ছায়া মূর্তিটা কাছে আসতেই টনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটা আচমকা আক্রমণে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভয়ে বলতে লাগল, আমি পাশের বাড়ীর দারোয়ান অগস্তে। গুলির আওয়াজ শুনে এদিকে দেখতে এসেছি ডাকাত পড়েছে কিনা। যদি কোন সাহায্য করতে পারি।

টনি বলল, আচ্ছা তুমি এখানেই থাকো।

টনির পোষাক আর পিস্তল দেখে অগস্তে বুঝতে পারল, যাই হোক এ ডাকাত দলের লোক নয়।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাউকে দেখতে পেয়েছ?

অগস্তে বলল, না, স্যার।

তারপর হঠাৎ অগস্তে টনির হাতটা চেপে ধরে বলল, মনে হচ্ছে ওই ঝোপের ভেতর দিয়ে কেউ যেন বেড়িয়ে আসছে।

টনি ভালো করে নিরীক্ষণ করে অগস্তের হাত ধরে টান দিল, বলল, মনে হচ্ছে আহত টলতে টলতে হাঁটছে।

মূর্তিটা ঝোপ থেকে বেড়িয়ে এগিয়ে এলে তাকে স্পষ্ট দেখা গেল।

টনি অগস্তের হাত ছেড়ে তার দিকে এগোতেই পায়ের শব্দ পেয়ে ডরোথি পিছন দিকে ছুটতে শুরু করল।

টনি চেঁচিয়ে উঠল, 'ভয় পাবেন না, আমি টনি, থামুন'।

ডরোথি টনির গলার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

টনি কাছে আসতেই ডরোথি আর কিছু বলতে পারল না, শুধু বলল, মিঃ লটন, টম—টম।

টম কোথায়? টনি জিজ্ঞাসা করল।

ডরোথি বলল, বাড়ীতে।

একা?

না ওর সঙ্গে আরো তিনজন মুখোশধারী ডাকাত রয়েছে। প্লিজ আপনি টমকে বাঁচান, তাড়াতাড়ি করুন, টম একা—

অগস্তে বলল, স্যার আমি কী গাছ বেয়ে ওপরে উঠে যাবো?

টনি বলল, উঠে কোন লাভ নেই। তুমি বরং মিসেস কেলসোকে দেখো আমি দেখছি কি করা যায়।

টম বাড়ী থেকে বেড়িয়ে ওই গাছটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

ওর কানে ওদের কথাবার্তা আসছিল। কিন্তু ঠিক হদিশ করতে পারছিল না ; মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনে ডরোথিকে চিনতে ভুল হল না। তাহলে ডরোথির কোন ক্ষতি হয় নি।

ডরোথিকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না টম, ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। অগস্তে পায়ের শব্দে আর টমের গলার ঘড়ঘড় শব্দে চেঁচিয়ে উঠল, কে ওখানে?

টনি বাড়ীতে ঢোকার জন্য এগিয়ে গেছিল, অগস্তের চিৎকার শুনে পিস্তল তাক করে দাঁড়ালো।

টম চেঁচিয়ে উঠল, এদিকে গুলি ছুঁড়বেন না, আমি টম—

টনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, টম!

টম ডরোথির দিকে তাকিয়ে বলল, থিয়া তুমি ঠিক আছো তো?

ডরোথি বলল, হ্যাঁ টম আমি খুব ভালো আছি। ডরোথি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

টম ডরোথিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভেঙে পড়ো না থিয়া সব ঠিক হয়ে যাবে।

টনিকে বলল টম, টনি, ওদের মধ্যে একজন যে রিক নীলে ছিল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

টনি জিজ্ঞাসা করল, গেরস্কি ছিল?

টম বলল, আমি তো গেরস্কিকে চিনি না। তাই ঠিক বলতে পারবো না, তবে তাদের মধ্যে মুস্কো চেহারার একজন ছিল।

টনি বলল, গেরস্কির চেহারাটাও তো অনেকটা ওই রকম। ওরা কী এখনও তোমার বাড়ীতে আছে?

টম বলল, না, আমি আড়াল থেকে দেখেছি একজনকে ওরা কাঁধে ঝুলিয়ে গিয়ে চলে গেল।

টনি বলল, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে?

টম বলল, হ্যাঁ আমি একজনকে লোহার দণ্ড দিয়ে আচমকা ঘায়েল করে পালাই।

টম টনিকে বলল, ওরা চার্লসের সুটকেশের খোঁজেই এসেছিল। ওরা কেটি কোলিয়ার-এর এপার্টমেন্টের কথা বলছিল।

টনি বলল, ওরা এখন নিশ্চয়ই কেটি কোলিয়ার-এর বাড়ীতে যাবে। চার্লসের সুটকেশে কী কিছু ছিল?

টম উত্তেজিতে হয়ে পড়ল, ছিল ছিল অনেক কিছুই ছিল শ্যানডন হাউসের কথা, ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের কথা, কীভাবে রিক নীলে ওকে বোকা বানিয়ে মেমোরেন্ডাম হাতিয়েছে ; চার্লসের নিজের ভুল বোঝার কথা। ওয়াশিংটন পোস্টে যখন খবরটা বেড়িয়ে পড়ে তখন চার্লস ওর ভুল বুঝতে পারে। আর তখনই ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। চার্লস রিককে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়, হয় সে এখানকার সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে নচেৎ চার্লস শ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরকে সব কিছু জানিয়ে চিঠি দেবে। সেই চিঠিটাও ছিল।

টনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর দেরী করা চলবে না, এখুনি কেটি কোলিয়ার-এর বাড়ী ঘেরাও করতে হবে।

টম বলল, আমিও যাবো।

টনি বলল, না তোমার যাবার দরকার নেই কেননা ডরোথিকে একা বাড়ীতে রাখা ঠিক হবে না। আমি ব্রাড জিলনকে নিয়ে এখুনি রওনা হচ্ছি।

টনির চোখ মুখ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। কোনোভ মৃত, এখন গেরস্কি আর রিক নীলে, তাহলে রিক নীলে নিশ্চয়ই অ্যালেক্সি।

টনি টমকে বলল, টম, তোমায় এত কষ্ট পেতে হল বলে দুঃখিত। গুড নাইট টম, গুড নাইট ডরোথি।

।। আঠারো ।।

কেটির ঘরে ওরা গিয়ে উঠেছিল। রিক নীলে অশান্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, আর অনেক কিছু ভাবছিল।

পাশের ঘরে গেরস্কি, পোষাক পাল্টে তৈরী হয়ে নিচ্ছিল। এখুনি ওদের বেড়িয়ে পড়তে হবে।

রিক এই গেরস্কি লোকটাকে ঠিক চিনতে পারছে না। লোকটা এখনো পর্যন্ত কোন কথা বলছে না।

রিক ভাবছে, মিশচার-এর এই আবিষ্কারের কথা। কি নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

রিক ভেবেছিল, ওয়াশিংটনে দেখা হবার পর আর হয়ত এই লোকটার সঙ্গে ওর দেখা হবে না। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস এই লোকটা, যে ওলেগ নামে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে তার হাতে ও আজ পুতুল হয়ে গেছে।

লোকটার এতটুকু সহানুভূতি নেই। কোন কাজেই সে সন্তুষ্ট হয় না। এই যে টম কেলসোর বাড়ী থেকে কত বুদ্ধি খাটিয়ে রিক ওদের এখানে নিরাপদ স্থান নিয়ে এলো এর জন্য ওর মনে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। অথচ এই রিক নীলে না থাকলে ওরা কিছুতেই পালিয়ে বাঁচত না। আর এই লোকটার কী নিষ্ঠুর আচরণ!

রিক বুঝতে পারছে গেরস্কি সব কিছুর জন্য তাকেই দোষারোপ করছে। টমের বাড়ীতে এই ডাকাতি করার পরিকল্পনা গেরস্কিরই অথচ এখন উল্টে ওকেই চেপে ধরবে।

গেরস্কি পাশের ঘর থেকে পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। সে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী।

গেরস্কির মুখ গম্ভীর, থমথমে চোখ। চোখ তুলে রিককে দেখল।

রিক নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠল।

গেরস্কি বলল, তুমি তৈরী? বলেই যাবার জন্য পা বাড়ালো।

রিকও পুতুলের মত ওকে অনুসরণ করল।

এদিকে টনি আর ব্রাড জিলন যখন কেটি কোলিয়ার-এর বাড়ী পৌঁছালো তখন কেটি কোলিয়ার-এর শূন্য ঘর, খোলা দরজা তাদের বিদ্রূপ করে উঠল। অন্ততঃ মিনিট খানেকের মত তারা দুজনে কথা বলতে পারল না।

অবশেষে ব্রাড জিলন কথা বলল। তাহলে নীচে যে ফিংগার প্রিন্ট এক্সপার্টদের দাঁড় করিয়ে রেখেছ তাদের তো আর প্রয়োজন নেই। আসল লোকই তো পালিয়েছে। বরং এখন আমাদের উচিৎ সমস্ত প্রিসিঙ্কট-এ খবর দেওয়া যে কোন সাইট্রোন কার দেখলেই আটক করা। আর সব রাস্তা যেন ব্লক করে দেয়।

টনি তার এই বার বার ব্যর্থতা সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু গেরস্কি যে এত তাড়াতাড়ি এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবে তা টনি চিন্তা করতে পারেনি।

ব্রাড টনিকে তাড়া দিল। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না।

টনি বলল, না ঠিক হবে না। ব্রাড, পরাজয় আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। ওহ্ যদি ওই শয়তান দুটোকে ধরতে পারতাম...

ব্রাড টনিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, টনি ভেঙ্গে পড়ো না। হয়ত এবার আমরা জিতবো। ওরা কতদূর আর যেতে পারবে? আমি এয়ারপোর্ট, স্টেশন সব জায়গায় সতর্ক করে দিচ্ছি। ওরা যেন কোন মতেই ওয়াশিংটন ছাড়তে না পারে। এখন ওরা আর আমাদের অপরিচিত নয়। ওদের পরিচয় আমরা পেয়ে গেছি।

টনি বলল, আমি ফিংগার প্রিন্ট এক্সপার্টদের এনেছিলাম এই জন্যই, ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে চার্লসের আঙ্গুলের ছাপ ছাড়াও আরো ছাপ পাওয়া গেছে। সেটা কার দেখার জন্য। বুঝতেই পারছি এ রিক নীলে ছাড়া আর কারোর নয়।

রিক গাড়ী চালাচ্ছিল, পাশে গেরস্কি বসেছিল। কেউ কোন কথা বলছে না।

নিউইয়র্ক ছাড়তেই গেরস্কি বলল, ওয়াশিংটনের পথ ধরো।

রিক চুপচাপ ওর হুকুম পালন করল। রিক ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। গাড়ীর কাঁচ তোলাই ছিল। হতে পারে তার ভিতরের অবসন্নতা—ওকে শীতল করে তুলছিল।

লোকালয় ছেড়ে নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটছিল। আবার দুজনের মাঝে নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ গেরস্কির অনুযোগে রিক চমকে উঠল।

গেরস্কি ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার জন্যই ফেলিক্সকে এমন আহত হতে হল।

রিক ওর কথায় আহত হল। আমার জন্য! আমার জন্য ফেলিক্স আহত হল! আমি এর জন্য দায়ী?

গেরস্কি বলল, আমি মনে করি। তুমি যদি চার্লস কেলসোকে আয়ত্তে রাখতে পারতে, তাকে আরো সু-পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগাতে পারতে তাহলে আজ এমন ঘটনা ঘটত না।

রিক বলল, এর থেকে আর বেশী কী করতে পারতাম! ও আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। আমি ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও ছিল একেবারে নাছোড়বান্দা। তখন আমি ওর কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নিই। তাতে তোমার সুবিধা হয়।

গেরস্কি বলল, সুবিধা! কি সুবিধা হয়েছে? চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কারের মধ্যে যে সময়টুকু আমি পেয়েছিলাম তাতে কী ওর সব কিছু তল্লাশি নিতে পারতাম। তোমাদের মধ্যে যে এরকম ব্যবধান তৈরী হচ্ছে তা তো আমার জানার কথা নয়। যখন আমরা চার্লসকে নিয়ে ব্যস্ত তখন তুমি ওর কোয়ার্টারে থাকতে পারতে তাহলে যা খুঁজতে আমাদের এত হয়রানি হতে হল তার কোন কিছুই হতো না। চুপচাপ সব কাজ সারা হয়ে যেত। কিন্তু তুমি কী করলে, না আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে গেলে! তুমি আরো কী করলে অজুহাত দেখিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে চলে গেলে। যাতে তুমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারো। যেন চার্লসের মৃত্যুতে তোমার কোন হাত নেই।

একটু থেমে গেরস্কি বলল, কাছে না এসে তুমি গোমেজের মত দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে পারতে। আর গোমেজ—হ্যাঁ, গোমেজ একটা মহামূর্খ। ও পুলিশের হেফাজতে চলে গেল। যদি এটা প্রমাণ হয় যে শ্যানডন হাউসে ইলেকট্রিসিয়ানদের মধ্যে সেও একজন, তাহলে—গেরস্কি রিকের দোষগুলোকে আবৃত্তির মত আওড়ে গেল। তুমি বলেছিলে চার্লস কেলসো তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তুমি যদি এখান থেকে চলে না যাও তাহলে ও চিঠি লিখতে বদ্ধপরিকর। সবই তো বুঝলাম কিন্তু তুমি তো একবারও বলনি যে, ওর চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

রিক মিনমিন করে উঠল। চিঠি তো লেখা হয়নি। চিঠির একটা খসড়া তৈরী করেছিল মাত্র।

গেরস্কি চড়া গলায় বলল, মোটেই না। আমার কাছে একটা কপি আছে। এর থেকে আরো চারটে কপি হয়েছে। ওরিজিন্যাল না থাকলে তার কপি হয় না। এটা একটা বাচ্চাও জানে। সিলমোহর দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য তৈরী। চিঠির কপিগুলো কাকে কাকে পাঠাতে যাচ্ছে তা কী তোমাকে বলেছে?

রিক একটু জোর গলায় বলল, ও শুধু আমায় ভয় দেখিয়েছিল, চিঠির খসড়া তৈরী করেছিল।

গেরস্কি বলল, আর তুমি আহাম্মকের মত তা বিশ্বাস করেছিলে।

ও হয়ত ওর ফ্ল্যাটে লুকিয়ে রেখেছিল। আমায় বলেনি, রিক বলল।

গেরস্কি এবার চেঁচিয়ে উঠল, তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করে যেভাবে তল্লাশি করেছি তাতে সাগর থেকে মুক্তো তোলার থেকেও বেশী।

কিন্তু নীলে, আমি বাধ্য হচ্ছি বলতে যে তোমার ভাগ্য তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

রিকের কণ্ঠ কেঁপে গেল, তাহলে হয়ত ও আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল আসলে কোন খসড়াই নয় ওটা।

আর ডাকে পাঠাবার মত কোন চিঠিই ছিল না? গেরস্কি রিককে বিদ্রূপ করল! চমৎকার! ইডিয়েট! টমের কাছে লেখা চিঠিটা ভালো করে পড়ে দেখেছ? ওতেই পরিষ্কার লেখা আছে।

একটা চিঠি নিশ্চয়ই আছে সেটা এমন লোকের কাছে আছে যাকে চার্লস বিশ্বস্ত বলে মনে করে। আর সে যখনই চার্লসের মৃত্যু সংবাদ শুনবে তখনই হয় সেটা ডাকে দিয়ে দেবে, না হয় খুলে পড়বে। দুটোই আমাদের ক্ষেত্রে বিপদজনক।

গেরস্কি খুব ধীরে ধীরে বলল, আর সেই কারণেই তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি পদত্যাগ কর। আর ওয়াশিংটন থেকে চলে যাও। আমার দুজন লোক তোমায় নিরাপদে মস্কো

রেখে আসবে।

রিক চমকে উঠল, মস্কো? রিক এতটা ভাবতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে রিক মনে মনে একটা চিন্তা করল, এ নিশ্চয়ই গেরস্কির চাল। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিজে জেঁকে বসতে চায়। কিন্তু এটা অসম্ভব। রিক আমেরিকার প্রাচুর্যের মধ্যে যেভাবে দিন কাটিয়ে এসেছে তাতে মস্কোর কঠোরতার মধ্যে ও কিছুতেই নিজেকে মানাতে পারবে না।

রিক ভাবল, না! সব চিন্তা দূর করে গেরস্কির সঙ্গে অন্য ভাবে মুখোমুখি হতে হবে। এই খুনীটার সঙ্গে খুনীর মতই ব্যবহার করতে হবে।

রিক ওর উত্তেজনা চেপে রইল, তাকে প্রকাশ হতে দিল না।

রিক শান্ত গলায় বলল, কিন্তু আমি পদত্যাগ করলে চলবে কী করে? আমি চলে গেলে সে সব কে দেখবে? নতুন কেউ কি পারবে?

গেরস্কি বলল, ফেলিক্স পারবে।

রিক বুঝতে পারল ও নাছোড়বান্দা। গেরস্কি তৈরী হয়েই এসেছে। ফেলিক্সের নাম মিছিমিছি বলছে। আসলে ওর মতলব অন্য। তবু শেষ চেষ্টা করার মত রিক বলল ঃ শ্যানডন হাউসে আমার মত কেউ নজর রাখতে পারবে না। ওর নাড়ী নক্ষত্র আমার মুখস্থ আর শ্যানডন যদি আমাদের হাতছাড়া হয় তাহলে ওয়াশিংটন থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে।

রিক তখন অন্য কথা ভাবছে। যদি গেরস্কি ওর কথায় একটুকুও না গলে তাহলে অন্য পথ দেখতে হবে। ও নিজেকে পালটে ফেলবে। ওর গায়ে কেজিবি-র পোশাক আর রাখবে না। রিক নিজে নতুন জীবন শুরু করবে।

টনি লটনের কথা রিকের মনে পড়েছে আগেই। রিক টনি লটনের কাছে নিজে হাজির হবে। তাকে সব কিছু বলে দেবে। বলবে ঃ আমি সত্যিকারের একজন আমেরিকান নই। হাইনরিক নীলে ও আমার নাম নয়। আমার জন্ম উনিশ শো একচল্লিশে ব্রুকলীনে আমি সাইমাস নোসকা।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক থেকে উনিশশো তেষট্টিতে আমি পালিয়ে আসি তখন কেজিবি-র একজন শিক্ষিত গোয়েন্দা হিসাবে আমার নতুন নামকরণ হয় হাইনরিক নীলে।

তারপর উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে ওয়াশিংটনে কেজিবি-র গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকি।

কিন্তু এখন আমি ওদের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিনা। হত্যা খুন এসব আমার ভালো লাগে না। চার্লস কেলসোর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তাই আমি এখন আপনার আশ্রয় চাইছি।

গেরস্কি চেঁচিয়ে উঠল, কী অত ভাবছ? তোমার ভীষণ পরিশ্রম গেছে। গেরস্কির কণ্ঠে মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তার ওপর তোমার বন্ধু চার্লসের মৃত্যু তোমাকে ভীষণ মর্মাহত করেছে। তাই তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দু-সপ্তাহের বিশ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন।

রিক বলল, দু-সপ্তাহ কেন, কোন বিশ্রামই আমার প্রয়োজন নেই। আমার শরীর ঠিক আছে।

গেরস্কি আদেশের সুরে বলল, তাই নেবে। এখানকার কাজ সারতে দু-সপ্তাহ সময় লাগবে যদি আরো বেশী লাগে তাহলে তোমায় ছুটি বাড়াতে হবে। কিন্তু ছুটি তোমায় নিতেই হবে।

রিক বলল, তাহলে দেখছি তুমি শ্যানডন হাউস হাতছাড়া করতে চাইছ।

গেরস্কি বলল, সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। কিছুদিন আমরা চুপচাপ থাকবো। তারপর আবার নতুন করে শুরু করব। শ্যানডন্ হাউসের ওপর এখন ন্যাটোর নজর পড়েছে। ওই স্থান এখন আমাদের পক্ষে বিপদজনক।

রিক বলল, আমার মাথায় ঢুকছে না ন্যাটো এখানে কি করে আসতে পারে?

গেরস্কি হেনস্থা করে বলল, তোমার মত মূর্খদের মাথায় কিছু আসে না। যদি তোমার ঘটে একটু বুদ্ধি থাকত তাহলে দেখতে পেতে ইতিমধ্যে ন্যাটোর তিনজন এজেন্ট ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে একজন এমিল বাহেরেন, একজন জর্জেস ডিসপিনার্ড এবং তৃতীয় জন টনি লটন।

টনি লটনের নামটা শুনে রিক চমকে গেলেও সহজ ভাবে বলল, টনি লটন যদি একজন ন্যাটো

এজেন্ট হয়ও—তাহলেও তার শ্যানডন হাউসের ব্যাপারে কী আগ্রহ থাকতে পারে? আমরা তো সব দিকেই নজর রেখেছি।

গেরস্কি গম্ভীর গলায় বলল, তোমার জন্যই ন্যাটো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। গত তিনমাস ধরে ওরা তোমাকে ফলো করছে। যদি টম কেলসোর কথা সত্যি হয়।

রিক বলল, টম কেলসো মিথ্যে কথা বলেছে, ও কতটুকু জানে? গেরস্কি বলল, টম কেলসো নয়, তার অনেক আগেই আমি খবর পেয়েছি, তাই টমের কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি।

রিক উত্তেজিত হল, না! আমাকে কেউ ফলো করছে না। তাহলে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম।

গেরস্কি বলল, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ?

রিক বলল, তর্ক নয়, আমি তোমাকে বলতে চাইছি যখন একজন লোকের ওপরে বিরুদ্ধ পক্ষের সন্দেহ হয় তখন তারা তাকে চটপট ধরে না। কোন বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই—

রিকের কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে গেরস্কি বলল, তোমার কোন কথা আমি শুনতে রাজী নই। তোমার ব্যাপারে আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে। কাজেই তোমাকে আর একটা দিনও থাকতে দেওয়া যাবে না। কারণ তাতে কেজিবি-র বিপদ হতে পারে।

গাড়ীটা একটা গাছের কাছে দাঁড় করিয়ে রিক ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা।

গেরস্কি একটা কাগজ বের করে গাড়ীর আলোটা মেলে দিল।

তারপর কাগজটা রিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও চটপট এতে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে ফেল।

রিক একটু ঘুরে বসল, গেরস্কির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল। আর পেন বার করার অছিলায় পিস্তলটা বার করতে গেল।

কিন্তু তার আগেই রিক তার ঘাড়ের কাছে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল বুঝতে অসুবিধা হল না ওটা গেরস্কির পিস্তলের নল। গেরস্কি যে কত বড় শয়তান তা রিক পদে পদে টের পাচ্ছে।

রিক একটু মুচকি হেসে বলল, না, অতটা প্রয়োজন হবে না। আমি পেনটা খুঁজছিলাম।

গেরস্কি পিস্তলের নলটা রিকের ঘাড়ের কাছে আটকে রেখে বলল, নিজেকে অত চালাক ভেবো না অ্যালেক্সি। তোমার থেকেও চালাক লোক এই দুনিয়াতে আছে জেনে রেখো। নাও চটপট করো, বেশী সময় নষ্ট করা যাবে না।

রিক চুপচাপ ছুটির দরখাস্ত লিখতে শুরু করল। কিন্তু মনে তার একটাই চিন্তা। এই দরখাস্ত হাতে পেলে গেরস্কি কী করবে? একটা বুলেট দিয়ে কাজ সারবে না তো? অসম্ভব তো কিছু নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত রিক ওর যা পরিচয় পেয়েছে তাতে ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। হয়ত রিককে খুন করে গাড়ীটা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে আর রিকের দেহটা গাড়ীর মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে থাকবে। কালকের কাগজে একটা খবর বেরুবে—হাইওয়েতে একটা সামান্য অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে চালক সমেত গাড়ীটা পুড়ে গেছে। ব্যাস এই পর্যন্ত। রিক কি করবে ভেবে পাচ্ছে না'

রিক হঠাৎ লেখা থামিয়ে বলল, গেরস্কি তোমার ব্যাপারে আমি নিজেকে খুব একটা নিরাপদ মনে করছি না। তুমি গাড়ী থেকে না নামলে আমি এই দরখাস্ত লিখবো না।

গেরস্কির মুখে বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠল। মুচকি হেসে গেরস্কি বলল, ঠিক আছে তাই হবে। তুমি যদি তাতেই নিরাপদ মনে কর। তোমার পিস্তলটা বের করে আমায় দিয়ে দাও।

রিক মনে মনে ভাবল, লোকটা কি ভীষণ চালাক। ওটাই রিকের শেষ সম্বল ছিল।

গেরস্কি বলল, তোমার যেমন নিরাপত্তাবোধ আছে, আমারও তেমন থাকতে পারে। নাও চটপট করো। আর একটা কথা মনে রেখো, চালাকি করে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমরা আমাদের প্রয়োজনে যেমন বাঁচিয়ে রাখি তেমনই প্রয়োজন ফুরোলে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করি না। না! তোমার প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। তুমি হচ্ছ আমাদের সেরা এজেন্ট। তাই তোমাকে এখুনি মেরে ফেলতে পারি না।

রিক ভাবলো পিস্তল না থাকলেও গাড়ীটা তো তার কাছে থাকছে। গেরস্কি নেমে গেলেই গাড়ী স্টার্ট করে পালাবে। রিক মনে মনে একটু আনন্দিত হল।

রিক অসহায় ভাবে নিজের পিস্তলটা বের করে গেরস্কির দিকে এগিয়ে দিল। রিক মনের চিন্তা ভাবনাগুলো মনেই চেপে রাখলো।

রিক বলল, নাও, তুমি এবার নেমে যাও।

গেরস্কি বলল, নামছি নামছি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি তোমার লেখা চালিয়ে যাও। রিক বাধ্য ছেলের মত আবার লিখতে শুরু করল। গেরস্কি যেই গাড়ী থেকে মাটিতে পা রেখেছে রিক সঙ্গে সঙ্গে পেনটা ছুঁড়ে ফেলে গাড়ী স্টার্ট করবে বলে হাত বাড়ালো।

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ, গুড়ুম! আর গাড়ীটা কেঁপে উঠল।

রিক ভেবেছিল, গেরস্কি বুঝি ওকেই গুলি করেছে। কিন্তু ওতো অক্ষত। সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু বুঝে ফেলল। গেরস্কি টায়ারে গুলি করে ফাটিয়ে দিয়েছে। গাড়ীটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। রিকের হাত পা অসাড় হয়ে গেল। রিক আর কিছু ভাবতে পারল না।

গেরস্কি যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে হাসতে হাসতে রিকের কাছে এগিয়ে এসে বলল, দাও চিঠিটা দাও।

।। উনিশ ।।

ওয়াশিংটন পোস্টে পরের দিন দুটো দুর্ঘটনার খবর বের হলো।

প্রথমটি খুবই সামান্য ধরনের। গত রাতে ট্রেন্টনের কাছে একটা গাড়ী জ্বলে যায়। গাড়ীটার নম্বর প্লেট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে মার্ক আছে, সাইট্রোন। কোন আরোহী ছিল না। গাড়ীতে আগুন লাগল কিভাবে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। তার নীচে বিশেষ সংবাদদাতার কিছু সংযোজন আছে।

প্রথম খবর ঃ সিক্সটি নাইনথ স্ট্রীটের একটি বাড়ীর চার তলায় একটি ঘরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এটি আত্মহত্যা। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

খবরের ঠিক নীচে বিশেষ সংবাদদাতার সংযোজন ঃ-

জানা গেছে হাইনরিক নীলে চার্লস কেলসোর ভীষণ বন্ধু। পেন্টাগনের গোপন সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে সিক্সটি নাইনথ স্ট্রীটের এই মৃত ব্যক্তির নাম হাইনরিক নীলে। আর ইনিই হচ্ছেন চার্লস কেলসোর বন্ধু। ইনি মাথায় গুলি বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছেন। তার হাতে একটা পিস্তল পাওয়া গেছে আর ওটা থেকে একটাই গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

আসল কথা হল এই হাইনরিক নীলেই যদি সেই হাইনরিক নীলে হন যিনি চার্লস কেলসোর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাহলে আমাদের রীতিমত ভাবনার কারণ আছে। কেননা কেজিবি-র হাত তাহলে আমেরিকার কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

পেন্টাগনের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোন পড়ে থাকা বাড়ী—যেখানে কোন লোকের আনা গোনা নেই। কোন কাজকর্ম হয় না। পেন্টাগনের সদর দপ্তরের চেহারাটাও অনেকটা একই রকম। ভিতরের অফিস ঘরগুলোতে কোন কাজকর্ম হয় কিনা বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল।

বিকেলের দিকে টম কেলসোকে এখানে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল। সংবাদিক হবার জন্য যত্রতত্র অবাধ বিচরণের অধিকার তার আছে। তাছাড়া ব্রাড জিলনের ঘনিষ্ট বন্ধু হওয়ায় এখানে তো কোন কথাই নেই।

ব্রাড গম্ভীর মুখে বসে আছে। টম ব্রাডের দিকে তাকিয়ে বলল, কী ব্যাপার বলত, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি তোমার কিছু কিছু কথা না শুনে আমরা ভুল করেছি।

ব্রাড চুপচাপ চুরুটে টান দিল।

টম বলল, কী ব্যাপার আবার সেই ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের মত কোন কিছু নাকি?

ব্রাড বলল, তা ঠিক নয়। টনিকে এইমাত্র মেনটনের পথে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম।

টম উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, টনি মানে টনি লটন? কিন্তু হঠাৎ কী হল?

ব্রাড বলল, আজকের ওয়াশিংটন পোস্টের খবরটা দেখেছ? হঠাৎই পরিস্থিতি পালটে গেল।

টম বলল, সত্যি রিকের মৃত্যুটা আমার কাছে রহস্যজনক। হঠাৎ ওই বা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?

ব্রাড বলল, ওইখানেই রহস্য লুকিয়ে আছে। আমার মনে হয় এটা আত্মহত্যা নয় এটা খুন। আর নির্ঘাত আর কী সু-কৌশলে একের পর এক খুন করে চলেছে এই গেরস্কি।

টনি তো একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে গেছে। গেরস্কিকে না ধরা পর্যন্ত ও স্বস্তি পাচ্ছে না।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ তোমাকে একটা সুখবর দিতে ভুলে যাচ্ছি, টনির প্রমোশন হয়েছে। নীলের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র ন্যাটো এই অর্ডার পাশ করেছে।

টম বলল, খুব আনন্দ পেলাম। যদিও রিকের মৃত্যুতে টনির কোন হাত নেই কিন্তু ও যেভাবে রিকের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছিল তাতে কেজিবি রিককে বাঁচিয়ে রাখার রিস্ক নিতে পারল না। এ রকম একটা কিছু হবে তা আমার মনেও উঁকি দিয়েছিল। তা টনি এখন মেনটনে কেন হঠাৎ?

ব্রাড বলল, ভূ-মধ্যসাগরের ওই জায়গাটা মস্কো তার সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে, এটা ব্রাসেলসের আগেই খবর ছিল।

অবশ্য এর কারণ তোমার জানা। ওই শ্যানডন ভিলা। ঠিক একই রকম ধাঁচে গড়া ওই দুর্ভেদ্য জায়গাটায় এখন যে কাজকর্ম হবে সে খবর ওরাও রেখেছে। শ্যানডন হাউসে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে টনির এখানকার গোয়েন্দা দপ্তর ওকে আজ সকালে এই খবরটা দেয়। গেরস্কি আজ সকালের প্লেনে মেনটনের দিকেই গেছে।

টম অবাক হয়ে গেল, পালিয়ে গেল গেরস্কি?

ব্রাড বলল, ও খুবই চালাক আর শয়তান।

টম বলল, আশ্চর্য! এটা কী করে সম্ভব হল, তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও পালিয়ে গেল?

টমের কথা শুনে ব্রাড একটু হাসল। বলল, দ্যাখো এর জন্য আমাদের এতটুকু আফসোস নেই কারণ বরিস গেরস্কি আমাদের কাছে শত্রু হলেও ওদের দেশের কাছে ও একজন সফল নায়ক। এটা তো মানো? এটা আদি অনন্ত কাল ধরে চলে এসেছে যে আমরা ওদের পেছনে ধাওয়া করবো ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে। কখনো আমরা জিতবো কখনো ওরা জিতবে।

যেমন আমাদের লোকেরা আড়ালে থেকে ওদের কাজকর্মের খবর রাখছে। তারা নিশ্চয়ই ওদের কাছে শত্রু কিন্তু আমাদের কাছে তারাই মহামূল্যবান হীরের থেকে কম দামী নয়।

তোমায় আমি আগেই বলেছি আমাদের কাজের সঙ্গে সিভিল পুলিশদের কাজের অনেক তফাৎ। আমরা কাউকে চিনলেও তাকে চট করে ধরি না। আরো কোন মূল্যবান দলিল বা সংবাদ বা গোপন তথ্য পাচার করার সময় হাতে নাতে ধরার জন্য অপেক্ষা করি।

রিক নীলের কথাই ধরো, চার্লস কেলসোর মত গভীর আর বিশ্বাসী ছেলেকে কি ভাবে ধীরে ধীরে কব্জা করে ওকে আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে দিয়েছিল। চার্লসের নিজস্ব মতবাদটাই পালটে যায়। নাহলে কোন অর্থের লোভে তো চার্লস এই কাজ করেনি। নিতান্ত একটা ঘোরের বশে চার্লস এই সাংঘাতিক কাজটা করে ফেলে।

কাজেই আমার মতে হাইনরিক নীলে ওদের দেশের কাছে এজেন্ট হিসাবে অতুলনীয়।

টম বলল, তবুও তো ওকে মরতে হল। যাক্ সে কথা। হ্যাঁ ভালো কথা, ম্যাকলেহোসের কোন খবর জানো? কেননা চার্লসের মৃত্যুটা আমার কাছে এখনও রহস্যজনক।

ব্রাড বলল, আমাদের কাছে নয়। ম্যাকলেহোস এখন জেলে আছে ও সব দোষ স্বীকার করেছে। অবশ্য এমন একটা নীচ কাজ না করে ওর উপায় ছিল না। আমি বা তুমি হলে আমরাও বাধ্য হতাম এই কাজ করতে। কারণ ওর ছেলেকে আর মেয়েকে আটকে রেখে ওকে ভয় দেখানো হচ্ছিল।

টম বলল, এ মৃত্যু নিয়ে খেলা। চার্লস যে কেন এমন একটা ভুল করল?

সাতদিন পরে টনির খবর এল, নিকোলে নামে একজন ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছে। খুব সুন্দর আর বড় করে লিখেছে—

প্রিয় মিঃ ব্রাড,

ওয়াশিংটন থেকে সমস্ত পথটা আমি ছায়ার মত টনিকে অনুসরণ করে এসেছি, ওর দুশ্চিন্তার কথা আপনি জানেন। ও বড় একগুঁয়ে। একবার কোন কাজে হাত দিলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত

নিশ্চিন্তি নেই।

টনি এখন মিলিটারী হাসপাতালে। খুব আহত হয়েছে। সেরে উঠতে একটু সময় লাগবে। ও এখন শান্তিতে আছে। এতেই আমি খুশী। একটা সু-খবর জানাচ্ছি আপনাকে। মোনিক নামে একটা লঞ্চে করে গেরস্কি পালাচ্ছিল। ও বোধহয় জানত না যে ওই লঞ্চে প্রচুর গোলা বারুদ মজুত ছিল। আমরা সী-ব্রিজে করে ওকে অনুসরণ করছিলাম। টনি তো গেরস্কিকে হাতছাড়া করতে চায় না। ও তো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আর এক মুহূর্ত দেরী হলে কি হতো ভগবান জানেন।

এরই মধ্যে অন্য আরেকটা লঞ্চের সঙ্গে মোনিকের ধাক্কা লাগে। মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

এই দুর্ঘটনায় আমরা সবাই একটু না একটু আহত হয়েছিলাম। টনির আঘাতটা ছিল গুরুতর।

যাইহোক মোনিকের একটা কেবিনে আমি গেরস্কিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি পরে বুঝলাম গেরস্কি অনেক আগেই মৃত। আজ এই পর্যন্তই—

ব্রাড অনেক দুঃখের মধ্যেও খুশী হল। টনি সুস্থ হয়ে উঠেছে জেনে।

ব্রাড তখনই একটা চিঠি লিখতে বসল। শুভেচ্ছা আর প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে।

উত্তরটা হল এই রকম—

টনি আমার ভালোবাসা, আর অন্তরের গভীর সমবেদনা গ্রহণ কর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো। আর নতুন দায়িত্বে আরো সফল ভাবে কাজ করো,

গেরস্কির মৃত্যু সত্যি আমার কাছে খুবই সুখের সংবাদ।

এই সঙ্গে আমার অভিমানটুকু জানিয়ে রাখি। তোমার সঙ্গী এই সুন্দরীটি কে? যে এত গুছিয়ে তোমার মনের কথা লেখার অধিকার রাখে! তার কথা তুমি কিন্তু আমাকে বলনি বা তাকে দেখাও নি!

নীচে নাম সই করে ডাকে পাঠাবার মত তৈরী করে ফেলল ব্রাড।

দি ওয়ার্ল্ড ইন মাই পকেট

।। এক ।।

ওরা চারজন—তাস খেলার গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে।

পোকারখেলার প্লাষ্টিকের চাকতি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। দুটো অ্যাসট্রে, পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা। এক বোতল হুইস্কি আর তার পাশে চারটে শূন্য কাচের গেলাস।

আধো-আধারিতে ঘরটা ঢাকা। শুধু মাথার ওপরে ঝোলানো একটা শেড দেওয়া আলো টেবিলের একটা বৃত্তাকার অংশকে সবুজ আলোয় আলোকিত করে তুলেছে। সিগারেটের সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী সেই সবুজাভ আলোর বৃত্ত ছাড়িয়ে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছে।

চারজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দশাসই চেহারার লোকটা তার হাতের চারটে তাস টেবিলে চিত করে নামিয়ে রাখলো। তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে ভাবলেশহীন মুখে অন্য তিনজনের দিকে তাকালো। তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা টেবিলের ওপর চঞ্চল হয়ে উঠলো। আঙুলের টোকায় এক বিচিত্র ছন্দময় শব্দের সৃষ্টি হলো।

কিছুক্ষণ অন্য তিনজন স্থিরভাবে বসে রইলো। তিন জোড়া চোখই টেবিলের উপর পড়ে থাকা চারটে সাহেবের দিকে নিবদ্ধ। অবশেষে বিরক্তিভরে তারা নিজেদের তাসগুলো ছুঁড়ে ফেললো।

ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যানের চঞ্চল, শীতল চোখের তারা আরো চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিজয়ীর হাসি পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠলো! সে হাসি বুঝি ধূর্ত নেকড়ের হাসির মতোই তুলনীয়।

জিপো, আরো একবার তাহলে আমার কাছে তোমাদের হারতে হলো?—তার বিপরীত দিকে বসে থাকা জিশেপ ম্যানডিনির দিকে তাকিয়ে মরগ্যান কৌতুকভরে প্রশ্ন করলো।

জিশেপ ম্যানডিনির কালো কোঁকড়ানো চুলে রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে। ছোট তীক্ষ্ণ নাক। গায়ের রঙ বাদামী। সে মরগ্যানের কথায় ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বের করে বিষণ্ণভাবে হাসলো। তারপর অস্বাভাবিক স্থূলকায় শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তার প্ল্যাষ্টিকের চাকতিগুলো ঠেলে দিলো মরগ্যানের দিকে, আমি আর নেই। ফ্র্যাঙ্ক! আমার ভাগ্য-টাগ্য সব খরচের খাতায় জমা পড়ে গেছে। শালা সন্ধ্যে থেকে একটা নওলার বেশী কোনো তাস পেলাম না।

এডওয়ার্ড ব্লেক মরগ্যানের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চাকতিগুলোর দিকে তাকালো। আলতো করে আঙুল চালালো সাজানো চাকতির ওপর। তারপর চারটে চাকতি টোকা মেরে এগিয়ে দিলো মরগ্যানের দিকে। তার মুখ নির্বিকার।

সুদর্শন এডওয়ার্ড ব্লেক লম্বা, সূর্যস্নাত দেহের রং ঈষৎ বাদামী। তার সৌন্দর্যের আতিশয্য মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও পুরুষের মনে জাগিয়ে তোলে সতর্কতার সংকেত। ব্লেকের পরনে ধূসর-রঙা স্যুট, গায়ে সবুজ টাইয়ের ওপর হলুদ রঙে আঁকা সোয়ালো পাখির ছবি।

চারজনের মধ্যে তার বেশবাসই একমাত্র চোখে পড়ার মতো।

আলেক্স কিটসন, চারজনের চতুর্থ জন। বয়েস তেইশ হবে। বলিষ্ঠ চেহারা, কঠিন চোয়াল, নাকটা মুষ্টিযোদ্ধাদের মতোই চ্যাপ্টা, কালো চোখে সতর্ক ভাব। তেইশ বছরের সরলতা তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে।

বুক-খোলা শার্ট কিটসনের গায়ে আর পরনে সস্তা মোটা সুতীর-প্যান্ট। সে তার চাকতিগুলো ঠেলে দিয়ে মুখভঙ্গী করলো, আমিও আর নেই। ভেবেছিলাম দানটা জিতে যাবো। শালা চারটে বিবি পড়েছিলো, কিন্তু...কথা শেষ না করেই থেমে গেলো কিটসন। তার নজরে পড়লো ব্লেক এবং জিপো তাকিয়ে মরগ্যানকে লক্ষ্য করছে। কিটসনের কথা ওদের কানেও ঢুকছে না।

জিপো, ব্লেক এবং কিটসনের এগিয়ে দেওয়া চাকতিগুলোকে মরগ্যান তিনটে ভাগে সাজিয়ে ফেলেছে। তার পাতলা ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

খুশিমতো চাকতিগুলোকে সাজানো হয়ে গেলে মরগ্যান তাকালো, শীতল চোখজোড়া তাদের মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সইতে পারলো না ব্লেক। অধৈর্যভাবে বলল— 'ফ্র্যাঙ্ক, তোমার মতলবটা কি, খুলে বলো তো? সেই থেকে দেখছি কিছু বলার জন্য চেষ্টা করছো!

তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করলো, দু-লাখ ডলার করে পেলে তোমরা নিতে রাজী আছো?

তিনজনেই চমকে উঠলো। কারণ মরগ্যানকে ওরা চেনে। ওরা জানে মরগ্যান ঠাট্টা করে না—করেওনি।

জিপো আগ্রহে ঝুঁকে এলো। প্রশ্ন করলো, কি বললে?

প্রত্যেকে দু'লাখ করে। মরগ্যান জোর দিলো, টাকাটা বলতে গেলে আমাদের নাকের ডগায়, কিন্তু কাজে ঝুঁকি আছে।

পকেট থেকে ব্লেক এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। একটা সিগারেট বের করে তাকালো মরগ্যানের দিকে। প্রশ্ন করলো, মোট টাকার পরিমাণ আট লক্ষ ডলার?

না, দশ লাখ, এবং টাকাটা ভাগ হবে পাঁচ ভাগে—অর্থাৎ তোমরা যদি আমার সঙ্গী হও।

পাঁচ-ভাগ! পঞ্চম ব্যক্তিটি কে? জানতে চাইলো ব্লেক।

পরে আসছি সে কথায়, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো মরগ্যান। তার ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল সুপ্ত উত্তেজনায় টলমল।

দশ লাখ ডলার! —জিপো তখনও অবাক বিস্ময়ে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে—

ক্ষুধার্ত হায়নার মতো মরগ্যান হাসলো।

ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কি রকেট রিসার্চ স্টেশনের সাপ্তাহিক মাইনের কথা বলছো?—ব্লেক আচমকা প্রশ্ন করলো।

মরগ্যান মুখে বিজ্ঞের হাসি হেসে ব্লেকের কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, তোমার বুদ্ধি আছে, এড।—হ্যাঁ আমি ঐ টাকার কথাই বলছি।

মরগ্যান কিটসনের দিকে তাকালো, কিটসনের দু-চোখের তারায় হতচকিত শূন্য দৃষ্টি।

কি হলো, আলেক্স, একেবারে বোবা হয়ে গেলে তো!

আলেক্স বললো, তুমি কি পাগল হয়েছো, ফ্র্যাঙ্ক!

মরগ্যান প্রশ্ন করলো ব্লেককেই, তুমি কি বল এড, কাজটা আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে?

ব্লেক সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকালো মরগ্যানের দিকে, টাকার ওজন যতোই হোক না কেন, এ ধরনের কাজে অন্ততঃ আমি হাত দিতাম না ফ্র্যাঙ্ক।

এই হচ্ছে এডওয়ার্ড ব্লেক, সমস্ত ঘটনা না জেনে কোনরকম মতামত প্রকাশে সে রাজী নয়।

জিপো তার স্থূলকায় শরীরটাকে টান টান করে সোজা হয়ে বসলো। কিটসনের থেকে চোখ সরিয়ে মরগ্যানের দিকে তাকালো। অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কাজটার গণ্ডগোলটা কোথায়?

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে হাত তুলে কিটসনের দিকে, তুমিই বলো, আলেক্স। তোমারই তো জানার কথা। তুমি কিছুদিন চাকরিও তো করেছিলে সেখানে।

কিটসন নিস্পৃহস্বরে বললো, হ্যাঁ করেছিলাম সুতরাং আমি জানি—এবং ভাল ভাবেই জানি। মাসের পর মাস প্রত্যেকেই এই রকেট রিসার্চ স্টেশনের টাকাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। কেন জানো? কারণ তারা সকলেই সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক। আমাদের মতো নির্বোধ এবং উন্মাদ নয়।

না, আমি ঠাট্টা করছি না। ফ্র্যাঙ্ক জানে। 'ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সী'র প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে বিপদের অশুভ সংকেত।

গালে হাত ঘষে জিপো ভুরু কুঁচকে বললো, তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবে ফ্র্যাঙ্ক?

মরগ্যান জিপোর কথা কানে তুললো না। কিটসনের দিকে তাকিয়ে, থামলে কেন, আলেক্স? বলে যাও—ওদের জানিয়ে দাও এ কাজে কতোটা ঝুঁকি!

আমি ঐ এজেন্সীর চাকরি যখন ছেড়ে দিই, সেই সময়ে ওরা একটা নতুন ধরনের ট্রাক আমদানি করে। হঠাৎ কিটসন মুখ খুললো। তার আগে ওরা যে ট্রাকটা ব্যবহার করতো, নতুন ট্রাকটার তুলনায়

সেটাকে একটা রদ্দি টিনের বাক্স বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং তাতে থাকতো সশস্ত্র চারজন রক্ষী। তারা তীক্ষ্ণ নজরে টাকার বাক্স পাহারা দিত। —কিন্তু, এই নতুন ট্রাকের মজাটা কি জানো? কিটসন মুচকি হাসলো। সে হাসিতে বুঝি সামান্য ইঙ্গিত যে, কোনো সশস্ত্র রক্ষীর প্রয়োজন এ ট্রাকে নেই। তার ওপর, কোম্পানী এই ট্রাকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে এতোই নিশ্চিন্ত যে ট্রাকে আগের মতো ইনসিওর করার কথাও ওরা আর ভাবে না!

মরগ্যান বললো, তাহলে ট্রাকটার কিছু বিশেষত্ব আছে, কি বলো?

কিটসন কিছুটা অস্বস্তি হলেও সে মরগ্যানের কাছে প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কাজটা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তবুও এ কাজে সে মন থেকে সাড়া দিতে পারছে না।

মরগ্যান, ব্লেক, জিপো, কিটসন—ওরা চারজন গত ছ—মাস আগে জোট বেঁধেছে; এবং এর মধ্যেই ছোটখাটো বেশ কয়েকটা কাজ নির্বিঘ্নে গুছিয়ে নিয়েছে।

কিটসন বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, দশ লাখ ডলার তো দূরের কথা, তুমি ঐ ট্রাকের, ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। ফ্র্যাঙ্ক, কিটসনের স্বরের দৃঢ়তায় কেঁপে উঠলো, একটা নতুন ধরনের সঙ্কর ধাতুর চাদর দিয়ে ঐ ট্রাকটা তৈরী। বাইরে থেকে সেই ধাতব দেওয়াল কেটে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করলে সে দেওয়ালকে গলানো যেতে পারে। কিন্তু তাতেও সময় লাগবে এক সপ্তাহ। দ্বিতীয়তঃ ট্রাকটার দরজায় লাগানো আছে একটা সময়-নির্ভর তালা। ট্রাকে টাকা বোঝাই করার পর ওরা দরজায় তালা দিয়ে দেয়। তুমি তো জানো, এজেন্সী থেকে রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। সুতরাং সেই সময় নির্ভর তালাকে এমন যান্ত্রিক উপায়ে বন্ধ করা হয়, যাতে চার ঘণ্টার জন্য সেই তালা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র চার ঘণ্টা পরেই সেই অদ্ভুত তালাকে খোলা যাবে। বুঝতেই পারছো, ড্রাইভারের সুবিধের জন্যই একঘণ্টা বেশী দেওয়া হয়।

তাছাড়া বোতাম টিপলে ঐ সময় নির্ভর তালা চিরতরে বন্ধ হয়েই থাকবে। চার ঘণ্টা কেন চার বছর অপেক্ষা করলেও সে তালা খুলবে না। হ্যাঁ, উপায় একটা আছে—তবে সে কাজ যে-সে লোকের নয়। একজন রীতিমতো দক্ষ কারিগরের পক্ষেই সে তালা খোলা সম্ভব। শুধু এই নয়, আরো আছে। এতোসব বন্দোবস্ত সত্ত্বেও সবসময় ওদের সঙ্গে থাকে একটা শর্টওয়েভ ট্রান্স. মিটার। এজেন্সী থেকে ট্রাক বেরোনো মাত্র ট্রাক ড্রাইভার ও এজেন্সীর সঙ্গে চলে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে কথোপকথন এবং সেই যোগাযোগ বন্ধ হয় একেবারে রিসার্চ ষ্টেশনে ট্রাক পৌঁছানোর পর।

আচ্ছা, ড্রাইভার আর রক্ষীটাকে কোনরকমে কায়দা করা যায় না? মরগ্যান কিটসনকে বললো।

কিটসন জোরালো ভাবে হাত নাড়লো, কায়দা? ওদের সঙ্গে? তুমি কি পাগল হয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক? কে তোমাকে বলেছে যে ওদের কায়দা করা এতোই সহজ?

কুৎসিত ক্রোধে মরগ্যানের চোখ ঝলসে উঠলো, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি। আলেক্স—জ্ঞান দিতে বলিনি। আমি পাগল হয়েছি কিনা সেটা আমি বুঝবো। বেশী মুখ না ছুটিয়ে কথার জবাব দাও!

ব্লেক মরগ্যানকে চটতে দেখে তড়িঘড়ি করে বলে উঠলো, রাগ করো না, ফ্র্যাঙ্ক। ছোকরার কোন দোষ নেই। ও যতটুকু জানে ততটুকু বলছে। তাই বলে ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের মিল থাকতে হবে, তার কি মানে আছে?

মাথা নেড়ে মরগ্যান বললো, ঠিক আছে এড, আগে আলেক্সের কথাই তাহলে শেষ হোক। বলো হে ছোকরা ঐ ড্রাইভার আর প্রহরীকে কাবু করতে অসুবিধেটা কোথায়?

ততক্ষণে আলেক্স কিটসন ঘামতে শুরু করেছে। মরগ্যানের দিকে কঠিন চোখে চেয়ে কিটসন বলতে লাগল, আমি একসময় ওদের সঙ্গে কাজ করেছি। ওদের আমি ভালমতোই চিনি। ড্রাইভারের নাম ডেভ টমাস, আর বন্দুকবাজ প্রহরীর নাম মাইক ডার্কসন। ওরা দুজনেই রিভলবার চালাতে ওস্তাদ, এবং বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ ওদের চোখের নজর। এ ছাড়া ঐ ট্রাক লুটের যে কোন পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারলেই ওরা প্রত্যেকে পাবে দু-হাজার ডলার করে, পুরস্কার। ওরা জানে,

কারো পক্ষেই ট্রাকের তালা ভেঙে ঐ দশ লাখ ডলার হাতানো সম্ভব নয়। সুতরাং ওরা যে টাকার লোভে আমাদের দলে যোগ দেবে সেরকম সম্ভাবনাও কম। অর্থাৎ ডেভ টমাস ও মাইক ডার্কসন আমাদের পথে এক শক্ত বাধা।

হঠাৎ কিটসনকে বাধা দিয়ে জিপো বলে উঠলো, ওরে বাবা! এতো ঝামেলা থাকলে ও টাকায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

মরগ্যান জিপোর কথায় হাসলো। তালা খোলার ব্যাপারে জিপো পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তার পেশাদার অভিজ্ঞ আঙুলের কাছে পরাজিত না হয়েছে এমন তালা পৃথিবীতে নেই। তবে এ পর্যন্ত যত তালা জিপো খুলেছে, সবই নিজের খুশিমতো, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায়। কখনো তাকে তাড়াতাড়ি খোলার জন্যে চাপ দেওয়া হয়নি। সে যেমন ভালো বুঝেছে সে ভাবেই খুলেছে। কিন্তু মরগ্যান জানে, এবারের কাজটায় জিপোকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাই মরগ্যান চিন্তিত। জিপো কি পারবে সফল হতে! অবশ্য ওকে বলে কয়ে রাজী করানো যাবে। কারণ জিপো কখনোই তার কথা ঠেলতে পারে না। কিন্তু তাতে লাভ হবে কতোটুকু? যখন সময় আসবে জিপোর আসল অগ্নি পরীক্ষার, তখন সমস্ত কিছুই নির্ভর করবে শুধুমাত্র জিপোর দক্ষতার ওপর। মরগ্যানের কথায় কিছুই যাবে আসবে না। তখন যদি জিপো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—মিলিয়ে যাবে করুণ হতাশায়।

মরগ্যান জিপোর কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিলো, চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই জিপো। যেদিন থেকে আমরা চারজন এক হয়েছি, তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি, তোমাদের যুৎসই কাজের সন্ধান দিয়েছি, তোমাদের পরিচালনা করেছি—তাই তো?

ঘাড় নেড়ে কিটসন সম্মতি জানালো। কিটসন ও ব্লেক অপলকে তাকিয়ে মরগ্যানের দিকে।

কাজগুলো খুব বড় ছিল না বটে, কিন্তু মোটামুটি তোমরা প্রত্যেকেই বেশ কিছু করে টাকা পেয়েছ। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, আমাদের ওপরে পুলিশের নজর পড়বেই। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা এইসব ছোটখাটো লুটপাট চালিয়ে যেতে পারি না। তাতে টাকাও আসবে কম, এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেশী। তাই বেশ কিছু আয় করতে হবে তাড়াতাড়ি।

যা বলছিলাম আলেক্স এ কথা একবারও বলেনি যে, ট্রাকটা গত পাঁচ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহেই টাকা আনা নেওয়া করছে। এবং প্রত্যেকেই ট্রাকটাকে দুর্ভেদ্য বলে মেনে নিয়েছে। যথা—আমাদেব আলেক্স কিটসন। ওর মতো আরো অনেকেরই ধারণা, ওই ট্রাকটাকে লুঠ করার চিন্তা পাগল হওয়ার পূর্বলক্ষণ। এ ধরনের কোনো বদ্ধমূল ধারণাকে নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে বসে থাকা মানেই প্রতিদ্বন্দীর কাছে নিজেকে অরক্ষিত করা। তারপর প্রয়োজন শুধু একটা ক্ষিপ্র রাইট হুক—ব্যস! চতুর সুযোগ সন্ধানী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধার শোচনীয় পরাজয়।

ইচ্ছে করেই মরগ্যান কিটসনকে ঠেস দিয়ে উদাহরণ দিল মুষ্টিযোদ্ধার, কারণ জিপোর মতো কিটসনকেও তার নিজের দলে টানা দরকার। এখন সে ভাবটা আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। করানোর এই সুবর্ণসুযোগ। সুতরাং সে বলে চললো, আলেক্স তোমাদের যা যা বলেছে সবই আমি খবরের কাগজে মাস কয়েক আগে পড়েছি। ওয়েলিং কোম্পানী এই বিশেষ ট্রাকটা নিয়ে প্রচারের লোভটুকু পর্যন্ত সামলাতে পারেনি। যাকগে, যা বলছিলাম—যেদিন থেকে ঐ ট্রাকটার কথা আমি কাগজে পড়েছি, সেদিন থেকেই ওটাকে লুঠ করার চিন্তা আমার মাথায় ঢুকেছে। আমাদের পক্ষে কাজটা মোটেও অসম্ভব নয়।

সিগারেটের টুকরোটাকে ব্লেক টেবিলে ঘষে নিভিয়ে ফেললো এবং পরক্ষণেই অভ্যস্ত হাতে ধরিয়ে ফেললো আর-একটা। তার চোখজোড়া মরগ্যানের মুখে স্থির।

অর্থাৎ এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তোমার কোনো জোরালো পরিকল্পনা আছে?

হ্যাঁ, আছে। মরগ্যান সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে ধোঁয়া ছাড়লো। আবছা সবুজাভ ধোঁয়া ভেসে চললো। বিপরীত দিকে বসে থাকা জিপোর দিকে।—মোটামুটি একটা পরিকল্পনা আমি ছকে রেখেছি। কিন্তু সেটাকে বার বার যাচাই করে নিঁখুত করতে হবে। তাছাড়া আমরা পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাববার সময়ও পাবো যথেষ্ট। কারণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে ট্রাকটা রকেট রিসার্চ স্টেশনের মাইনের টাকা নিয়ে যাবে। আর এইভাবে যতই দিন যাবে, ওরা ততই নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সম্পর্কে অসাবধানী হয়ে পড়বে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই কাজ হাসিল।

কিটসন আর সহ্য করতে পারলো না। সামনে ঝুঁকে কর্কশ স্বরে বললো, থামো, ফ্র্যাঙ্ক। গাঁজায় দম দিয়ে আর উল্টো-পাল্টা বকো না। একটা বোতাম টিপতে কত সময় লাগে জানো? কোনো লোক যদি ঘুমিয়েও থাকে, তাহলে জেগে উঠে বোতাম টিপতে তার দু সেকেন্ডের বেশী সময় লাগতে পারে না। অর্থাৎ তিনটে বোতাম টিপতে মাত্র ছ সেকেন্ড—ব্যস। তারপরই ট্রাকটা হয়ে দাঁড়াবে একটা ইস্পাতের চৌকো বাক্স আমাদের কফিনের শেষ পেরেক। তোমার কি ধারণা মাত্র ছ-সেকেন্ডের মধ্যেই ট্রাক থামিয়ে দরজা খুলে টমাস আর ডার্কসনকে তুমি কাবু করতে পারবে? হুঁঃ—উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া ও ধরণের দিবাস্বপ্ন দেখা অসম্ভব।

মরগ্যান ঠাট্টার সুরে বললো, তোমার তাই মনে হয় বুঝি?

মনে হয় না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি বলেই বলছি। ট্রাক থামিয়ে তার দিকে এক পা এগোনোর আগেই পুরো ট্রাকটা ঢাকা পড়ে যাবে ইস্পাতেব চাঁদরে, সময়-নির্ভর তালা হয়ে যাবে ওলট-পালট। ট্রান্সমিটারে শুরু হবে সাহায্য প্রার্থীর অবিরাম বিপদ-সংকেত।

মরগ্যান কপট বিস্ময়ে ভুরু উঁচিয়ে বললো, সত্যি বলছো, আলেক্স?

কিটসনের ইচ্ছে হলো সপাটে একখানা ঘুঁষি মরগ্যানের নাকে বসিয়ে দেয়।

হ্যাঁ—সত্যি। তুমি যতই বলো না কেন, এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমি কোনরকমেই বিশ্বাস করতে রাজী নই।

অনেক হয়েছে আলেক্স। জ্ঞানদানের কাজটা তুমি ভালই পারো দেখছি। তা, এখানে না এসে পাদ্রীগিরি করলেই পারতে।

কিটসনের মুখ লাল হয়ে উঠলো অপমানে। রাগতভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। গম্ভীরভাবে একবার ব্লেককে আর একবার মরগ্যানকে দেখতে লাগলো। অবশেষে সংক্ষিপ্তভাবে সে বললো, ঠিক আছে—। কিন্তু, আমি আবারও বলছি, কাজটা অসম্ভব।

ব্লেক সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেললো মরগ্যানের দিকে, এবারে ঝেড়ে কাশে, ফ্র্যাঙ্ক।

মরগ্যান বললো, গতকাল আমি এজেন্সী থেকে রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। গাড়ির মাইলমিটার অনুসারে দুটো জায়গার দূরত্ব ঠিক তিরানব্বই মাইল। তিরানব্বইয়ের মধ্যে সত্তর মাইল বড় রাস্তা, দশ মাইল সাধারণ রাস্তা, দশ মাইল একটা নির্জন কাঁচা সড়ক এবং শেষ তিন মাইল রিসার্চ ষ্টেশনের নিজস্ব রাস্তা যে রাস্তা ধরে সোজাসুজি রিসার্চ ষ্টেশনে পৌঁছানো যায়। আমি ট্রাকটাকে থামাবার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলাম। সুতরাং প্রথমেই বড় রাস্তা এবং দশ মাইল সাধারণ রাস্তাকে একেবারে বাদ দিতে হয়। কারণ ঐ দুটো রাস্তায় লোকজন এবং যানবাহনের ভিড় বড্ড বেশী। রকেট রিসার্চ স্টেশনের নিজস্ব রাস্তাটায় দিনরাত সশস্ত্র প্রহরা থাকে। সুতরাং হাতে রইলো দশ মাইল লম্বা কাঁচা সড়কটুকু।

মরগ্যান সিগারেটের ছাই ঝাড়লো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তিনজনকে দেখলো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, সাধারণ রাস্তা থেকে কাঁচা সড়ক ধরে চার মাইল গেলে দশ নম্বর জাতীয় সড়কে যাবার সর্টকাট রাস্তা। এই রাস্তাটাই রিসার্চ স্টেশন হয়ে দশ নম্বর রাস্তায় মিশেছে। এই কারণে অনেক গাড়িই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এই রাস্তাটা কাঁচা সড়কের মতো খারাপ নয়। কিন্তু রিসার্চ স্টেশনের মাইল দুয়েক আগে একটা বিপজ্জনক বাঁক আছে; দুটো বিশাল পাথর দু-পাশ থেকে এগিয়ে এসে রাস্তাটার প্রস্থকে প্রায় অর্ধেক করে দিয়েছে। পাথর ছাড়াও জায়গাটা ছোট-বড় ঝোপে ছেয়ে আছে। অর্থাৎ আত্মগোপন অথবা মোটর দুর্ঘটনার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

মরগ্যানের কথায় ব্লেক সমর্থন জানালো, ঠিক বলেছো, ফ্র্যাঙ্ক। একবার ঐ রাস্তায় আমিও শালা আরেকটু হলেই গিয়ে ছিলাম আর কি! একটু অসতর্ক হলেই খেল খতম!—এমনি অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এখন ওখানে পথ-নির্দেশ লাগানো হয়েছে।

হ্যাঁ, দেখেছি জানালো মরগ্যান, আচ্ছা, এবার ট্রাকে বসে থাকা টমাস, ডার্কসনের অবস্থাটা ভেবে দেখা যাক। এখানকার যা আবহাওয়া তাতে ঐ বদ্ধ ট্রাকে গরম হবে অসহ্য। তা ছাড়া যাতায়াত করার ফলে ওদের রাস্তার সমস্ত খুঁটিনাটি মুখস্থ হয়েছে। এককথায় বিরক্তি, ক্লান্তি এবং একঘেয়ামী ট্রাকভ্রমণের যন্ত্রণা হবে নিত্যসঙ্গী। মনে কর ওরা পৌঁছলো বিপজ্জনক বাঁকের মুখে।

মোড় ঘুরেই ওরা দেখতে পাবে অভাবনীয় দৃশ্য। একটি গাড়ি পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে আছে, গাড়ির অবস্থা শোচনীয়। আর রাস্তার ঠিক মাঝখানে ভেসে যাওয়া রক্তের সমুদ্রে পড়ে আছে সুন্দরী যুবতী। তার সর্বাঙ্গ রক্তে ভেজা। জামাকাপড়ের অবস্থাও তথৈবচ। আচমকা ব্লেকের মুখের সামনে ঝুঁকে এলো মরগ্যান। আস্তে হিসহিস করে উঠলো, এখন, একটা কথা আমি জানতে চাই এড, টমাস ও ডার্কসন এ অবস্থায় কি করবে? মেয়েটাকে চাপা দিয়ে যাবে, না নেমে দেখবে মেয়েটা বেঁচে আছে কিনা, না আহত হয়েছে?

দাঁত বের করে শয়তানের হাসি হাসলো ব্লেক। তাকালো কিটসনের দিকে, কি হে স্বামী জ্ঞানানন্দ, শুনছো তো? উর্বর-মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন কি বলো?

ওরা কি করবে? বলো, মরগ্যানের প্রশ্নে কিটসন নড়েচড়ে বসলো। তার মুখে পরাজয়ের ইঙ্গিত।

ব্লেকই উত্তর দিলো, ওরা থামতে বাধ্য। সম্ভবতঃ একজন নেমে মেয়েটাকে দেখতে যাবে, আর অন্যজন ট্রাকে বসেই ট্রান্সমিটারে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে—অর্থাৎ কিটসনের কথা অনুযায়ী সত্যিই যদি ওরা অতোটা সাবধানী চরিত্রের লোক হয়।

কিটসনের দিকে ফিরলো মরগ্যান, তোমার কি মনে হয়? কি করবে টমাস আর ডার্কসন?

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলো কিটসন। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকালো, এড ঠিকই বলেছে। টমাস বসে থাকবে, আর ডার্কসন দেখতে যাবে পড়ে-থাকা মেয়েটাকে। রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে ওরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাবে। তারপর ট্রাকে উঠে আবার চলতে শুরু করবে রিসার্চ স্টেশনের দিকে।

আমারও তাই ধারণা বললো মরগ্যান। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই, টমাস রইলো গাড়ির ভেতরে, ডার্কসন রইলো রাস্তায়। এবার আরেকটা উত্তর দাও, আলেক্স—। মরগ্যানের চোখ সরাসরি কিটসনের দিকে, টমাস এক্ষেত্রে ড্যাশবোর্ডের বোতাম টিপে তালাকে অকেজো করে দেবে? নাকি ইস্পাতের আড়ালে ট্রাকটাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবে?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো কিটসন।

সম্ভবতঃ নয়। ধীরস্বরে জবাব দিলো সে।

মরগ্যান তাকালো ব্লেকের দিকে, তোমার কি মনে হয়, এড?

টিপবে না কখনো! বলে উঠলো ব্লেক, কিটসনের কথা অনুযায়ী একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কারিগরের প্রয়োজন। সুতরাং যতোক্ষণ না টমাস বুঝতে পারছে, যে ওরা বিপদে পড়েছে, ততোক্ষণ সে কিছুই করবে না। বরং জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করবে ডার্কসন কি করছে, বা মেয়েটা বেঁচে আছে কি না।

সম্মতি জানালো মবগ্যান, যাক, সবশেষে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কারণ ট্রাকটাও থামানো গেছে এবং টমাস বোতামও টেপেনি। তাহলে দেখছি, আলেক্সের কথামতো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমরা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। কিটসনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরলো মরগ্যান, তুমি বলেছিলে, সবটাই উদ্ভট দিবাস্বপ্ন! এখন কি মনে হচ্ছে তোমার?

এতে হাসাহাসির কি আছে বুঝতে পারছি না! বলে উঠলো কিটসন, মানলাম তুমি জিতেছো ; কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

তার মানে আমার বক্তব্য তুমি মেনে নিচ্ছো? হাসলো মরগ্যান, যাক ট্রাকটাকেও থামিয়েছি, আর ডার্কসনকেও গাড়ির বাইরে বের করেছি। আচ্ছা, এবার ভাবো বাঁকটার কথা। ট্রাকটাকে ঠিক ঐ জায়গাতেই আমি থামাতে চাই। তার কারণ একটা আছে। তা হলো রাস্তার দু-পাশে অসংখ্য বুনো ঝোপ। তাতে দু-তিনজন লুকিয়ে থাকতে পারে। এবার ডার্কসন নেমে যাবে পড়ে-থাকা মেয়েটার দিকে। এখন কথা হচ্ছে, টমাস জানালা বন্ধ করে দেবে? তোমার কি মনে হয়?

কিটসনকে লক্ষ্য করেই বললো। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে কিটসন মাথা নাড়লো। এই গরমে জানলা বন্ধ করে তিরানব্বই মাইল ওরা পাড়ি দেবে মনে হয় না।

শুধু মনে হয় না নয়। ওরা জানলা খোলা রাখতে বাধ্য। কারণ বাইরের চেয়ে ইস্পাতের তৈরী ট্রাকের ভেতরে গরম আরও বেশী হবে। অতএব ট্রাকটা থামছে রাস্তার ধারের ঝোপগুলোর কাছে। যার আড়ালে দুজন লোক সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। ড্রাইভার উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তার

সঙ্গীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে এবং ডার্কসন এগিয়ে চলেছে। পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে ওরা দুজনের কেউই বিপদের আশঙ্কা করছে না। কারণ ওই বিপজ্জনক বাঁকের কথা ওরা ভালভাবেই জানে। জানে যে গত ছ মাসে এখানে পাঁচ পাঁচটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অতএব এই দুর্ঘটনাটাও ওদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রাক থেকে ফুট দশেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আমি লুকিয়ে থাকবো। ডার্কসন যেই পড়ে থাকা মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়বে। আমি ঝোপের আড়াল থেকে ট্রাকের জানলার কাছে গিয়ে ড্রাইভারের রগে একটা রিভলবার চেপে ধরবো। এবং ঠিক একই সময়ে পড়ে থাকা মেয়েটা লাফিয়ে উঠে, ডার্কসনের পেটে রিভলবার ঠেসে ধরবে। মরগ্যান অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছোট টুকরোটা খুঁজে দিয়ে, এবার বলো, ডার্কসন এবং টমাস কি করবে? আত্মসমর্পন করবে, না গুলিভরা রিভলবারের সামনে ওরা বীরত্ব দেখাবে?

কিটসন শান্তস্বরে বললো, দেখাতেও পারে। ওদের বিশ্বাস নেই। টমাস এবং ডার্কসন বড় সাংঘাতিক লোক।

হতে পারে সাংঘাতিক কিন্তু পাগল তো আর নয়। খোলা রিভলবারের সামনে অহেতুক বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এবং সেটা ওরা ভালভাবেই জানে।

নিস্তব্ধতায় কিছুক্ষণ কেটে গেলো। অবশেষে জিপো কাঁপাস্বরে বললো, কিন্তু ফ্রাঙ্ক। এতো সহজে কি ওরা হার মানবে?

মরগ্যানের চোখ শয়তানি জিঘাংসায় পলকের জন্য চকচক করে উঠলো, তাহলে ওদের দুঃখজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমবেদনা জানানো ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

যেখানে আমরা প্রত্যেকে দু-লক্ষ ডলার করে টোপে গাঁথছি। সেখানে সামান্য একটু—আধটু রক্তপাত কিছু নয়।

আরো কিছুক্ষণ নিশ্চল নিস্তব্ধতা। জিপোই আবার মুখ খুললো, ফ্রাঙ্ক, এসব আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত আমরা এ কাজটা পেরে উঠবো না।

অধৈর্যভাবে মরগ্যান বললো, ঘাবড়ে যেও না, জিপো, তোমাকে অকুস্থলে থাকতে হবে না। তোমার জন্য আমি একটা বিশেষ কাজ ঠিক করে রেখেছি। এবং তোমার সাহায্যের বাইরে নয়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

ব্লেকের দিকে ফিরে মরগ্যান বললো, তোমার বক্তব্য কি, এড? দু-দুজন বীরপুরুষের কথা তো শুনলাম। এবার তোমারটা শুনি।

ব্লেক সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটাকে নিভিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে বললো, দুধচোষা খোকাদের কথা ছেড়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক। তবে আমার মনে হচ্ছে টমাস আর ডার্কসন কোনো ঝামেলা করবে না। আর একান্তই যদি সাহস দেখাতে চায়। তাহলে একটা বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে ওদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মরগ্যান ব্লেকের কথায় খুশী হয়ে বললো, বাস্তবকে অস্বীকার করার মতো নির্বোধ আমি নই, এড। টমাস এবং ডার্কসনের নিয়তি স্বয়ং ভগবানের হাতে। আমরা নিমিত্ত মাত্র। তাহলে তুমি, আমি এবং মেয়েটি—এই তিনজনেই ট্রাক থামানোর ব্যাপারটা সামলাবো। জিপো আর কিটসনের জন্য কোনো হালকা কাজ ঠিক করা যাবে—তবে একটা কথা। সেই সঙ্গে ওদের পাওনা টাকার পরিমাণও কিন্তু কমে যাবে। কারণ আমরাই যখন সমস্ত ঝুঁকি নিচ্ছি। তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পাওনা বেশী হওয়া উচিত, তাই না?

সংশয়ে কিটসনের ভুরু কুঞ্চিত হলো। দু-লক্ষ ডলারের ভাবনা তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে লেগেছে।

তাহলে আমাদের ভাগে কত পড়ছে জানতে পারি কি?

সঙ্গে সঙ্গে মরগ্যান বললো, নিশ্চয়ই। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার তুমি পাবে। আর জিপোর কাজ যেহেতু কলকব্জা সংক্রান্ত—সেহেতু সে পাবে একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার। তোমাদের দুজনের থেকে যে এক লক্ষ ডলার বাঁচবে, সেটা আমার আর এডের মধ্যে ভাগ হবে।

কিটসন ও জিপোর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। সবাই নীরব। শেষে কিটসন উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, কিন্তু ওরা যদি কোনো ঝামেলা বাধায়। তাহলে আমাদের কেউ মারা যেতে পারে।

মারা যেতে পারে টমাস আর ডার্কসন। নাঃ, কাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এতদিন আমরা যে সব কাজ করেছি, সেগুলোতে কোনো ঝঞ্ঝাটের ভয় ছিলো না। ধরা পড়লে বড়জোর বছর দুয়েক জেল খাটতাম। কিন্তু এবারে ধরা পড়লে আমাদের আর নিস্তার নেই। সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার! না, এসব খুনোখুনির মধ্যে আমি নেই।

ভয়ার্তস্বরে জিপো বললো, আলেক্স ঠিকই বলেছে, ফ্র্যাঙ্ক। খুনের দায়, বড় দায়। আমি তাতে জড়াতে চাই না।

হিংস্রভাবে মরগ্যান হাসলো, ঠিক আছে, তাহলে ভোট হোক। কোনো কাজ নিয়ে দ্বিমত দেখা দিলে আমরা বরাবরই ভোটের মাধ্যমে তার মীমাংসা করেছি। এক্ষেত্রেও তাই হোক।

কিটসন তীক্ষ্ণস্বরে বললো, তার কোনো প্রয়োজন নেই। এড যদি তোমার পক্ষেও যায় তবুও তুমি জিততে পারবে না ফ্র্যাঙ্ক। কারণ তাহলে ভোটের ফলাফল দাঁড়াবে দুই—দুই। এবং তোমারই তৈরী নিয়ম অনুযায়ী কোনো কাজে ভোটের ফলাফল সমান-সমান হলে সে কাজটা আমরা করি না। আশা করি তুমি নিয়মটা ভুলে যাওনি?

মরগ্যান অর্ধস্ফুট স্বরে হেসে উঠলো, না, ভুলিনি। কিন্তু তাতে ভোটাভুটি করার বাধাটা কোথায়? নিয়ম মাফিক সব কাজ করাই আমি পছন্দ করি। তারপর, নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে, গৃহীত হবে আমাদের সিদ্ধান্ত, রাজী?

কিটসন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে বলেই বলছিলাম—

চেয়ার টেনে মরগ্যান উঠে দাঁড়ালো। তার সুগঠিত পেশীবহুল দেহের বিশাল ছায়া টেবিলে পড়লো।

ভোটের কাগজগুলো তৈরী করো জিপো।

জিপোর মুখে পরিষ্কার হতবুদ্ধি ভাব। একটা নোটবই বার করে একটা পাতা ছিঁড়লো। তারপর ছুরি দিয়ে সেটাকে সমান চার টুকরো করলো। টুকরো কাগজগুলো টেবিলের ওপর দিয়ে, এই নাও—

হালকাস্বরে মরগ্যান বললো, মাত্র চারটে কাগজ কেন, জিপো?

মরগ্যানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কেন, আমাদের তো বরাবর চারটেই কাগজ লাগে?

মরগ্যান নরম করে হেসে, দশ লক্ষ ডলার হবে পাঁচ ভাগ—মনে আছে? সুতরাং মেয়েটারও ভাগ আছে একটা।

মরগ্যান দরজার দিকে এগিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে উচ্চস্বরে কাউকে আহ্বান জানালো, ভেতরে এসো, জিনি। ওরা এই কাজটার ব্যাপারে ভোটাভুটি করতে চায়। সুতরাং বুঝতেই পারছো। তোমার ভোটটা আমার একান্ত প্রয়োজন।

অন্ধকারের ছায়া আবর্ত থেকে যেন হাওয়ায় ভর করে জিনি সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ ঝলসানো সবুজ আলোর বৃত্তে মরগ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে হতবাক জিনিকে দেখতে লাগলো। তারা অপলকে জিনির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাইশ, তেইশ বছরের মেয়ে জিনি। সাধারণের তুলনায় একটু বেশী লম্বা। মাথায় একরাশ তামাটে চুল যত্নসহকারে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওর আয়ত ধূসর সবুজ চোখ সমুদ্রের মতোই গভীর অথচ অভিব্যক্তিহীন, স্ফুরিত ওষ্ঠাধারে এক অদ্ভুত নেশা। উদ্ধত চিবুকে দৃঢ়তাব ভাষা সোচ্চার। সব মিলিয়ে এক জীবন্ত চাবুক।

একটা রক্তরঙা রেশমী শার্ট, আর কালো স্কার্ট জিনির পরণে। স্ফীত বক্ষসৌন্দর্যের তুলনায় কটি দেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। সুঠাম নিতম্বের ঢাল গিয়ে মিশেছে আকর্ষণীয় সুগঠিত দু-পায়ের প্রান্তে। রুই মাছের টোপ গেলার মতো বিস্ফারিত চোখে ব্লেক, জিপো এবং কিটসন তখনো জিনির দিকে তাকিয়ে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনো ইতালীয় অভিনেত্রীর দেহসৌন্দর্য দেখছে।

হতভম্ব তিনজনের মুখে মরগ্যানের শীতল কালো চোখজোড়া খেলে বেড়ালো। সে হেসে উঠলো, মরগ্যান জানতো জিনির আকস্মিক উপস্থিতি ওদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দেবে। সেই আকস্মিক মানসিক সংঘর্ষের পরিণতি দেখার জন্য মরগ্যান যথেষ্ট কৌতূহলী ছিল।

জিপোর ডান হাত যান্ত্রিক ভাবে তার লাল টাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। টাইয়ের নটটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করলো। আর একই সঙ্গে পুরু ঠোঁটের আবরণ সরিয়ে তার ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বার করলো। বাঁকা চোখে জিনির দিকে চেয়ে জিপো হেসে উঠলো।

এরকম অবস্থার জন্য ব্লেক মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে ভুরু উঁচিয়ে ঠোট কুঁচকে শিস দেবার ভঙ্গী করলো। তার বিবর্ণ চোখের তারায় শূন্য দৃষ্টি।

কিটসনের অবস্থা পুরোপুরি আচ্ছন্ন। যেন একটা বিশমণী হাতুড়ী কেউ সপাটে তার ব্রহ্মতালুতে বসিয়ে দিয়েছে। সে যেন নীরবে আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে।

ওদের চমক ভাঙলো মরগ্যানের স্বরে, এই হলো জিনি গর্ডন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। পরক্ষণেই চেয়ার ছেড়ে ব্লেক উঠে দাঁড়ালো, তার দেখাদেখি জিপোও। কিন্তু কিটসন বসেই রইলো। তার বলিষ্ঠ হাতের আঙুল উৎকণ্ঠায় মুষ্ঠিবদ্ধ। চোখের তারা স্বচ্ছ কাঁচের মতো। মুখের ভাব তখনো হতচকিত।

মরগ্যান বললো, ডানদিক থেকে শুরু করছি। এ হলো এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার অনুপস্থিতিতে দলের ভার থাকে এরই হাতে।—জিপো ম্যানডিনি, আমাদের কলকব্জা বিশারদ, প্রতিভাধর—মরগ্যান হাসলো, আর সবশেষে আলেক্স কিটসন—গাড়ি চালাতে ওর জুড়ি নেই।

কিটসন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হঠাৎই যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার ধাক্কায় আরেকটু হলেই টেবিলটা উল্টে পড়ছিলো। কিন্তু কিটসন সেদিকে না তাকিয়ে, সম্মোহিতের দৃষ্টি নিয়ে সে তখনও জিনির দিকে তাকিয়ে, হাতের তালু মুষ্ঠিবদ্ধ।

জিনির চঞ্চল চোখ পলকের জন্য তিনজনের চোখে থামলো। তারপর ও একটা চেয়ার টেনে মরগ্যানের পাশে বসলো।

জিনির পাশে দাঁড়িয়ে মরগ্যান বলতে লাগলো, ওদের দুজনের ধারণা কাজটা নাকি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের নিয়ম হলো কোনো কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হলে আমরা ভোটের সাহায্যে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করি। সুতরাং এক্ষেত্রেও ভোট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জিনি সংশয়ের সঙ্গে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল, তার মানে? তুমি বলতে চাও, দু-লাখ ডলার নিতে রাজী নয় এমন গর্দভও পৃথিবীতে আছে?

মরগ্যান হাসলো, না ঠিক তা নয়। ওদের ধারণা, এ কাজটায় রক্তপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তাই—

অবাক চোখে জিনি গর্ডন জিপোর দিকে তাকালো, তারপর ওর ধূসর সবুজ চোখের তারা ব্লেকের চোখে স্থির হলো, সবশেষে গিয়ে থামলো কিটসনের মুখমণ্ডলে। যেন প্রত্যেককে ও জরীপ করে দেখলো।—ও,তোমার দলের যে এই অবস্থা তা কে জানতো! মরগ্যানকে লক্ষ্য করেই বললো। কিন্তু খোঁচা লাগলো কিটসনের পৌরুষে। সে অস্বস্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। অপমানে তার কান দিয়ে আগুন ছুটলো।

মরগ্যানের হাসি আরো বিস্তৃত হলো, সেটা তো আমিও ভাবছি। আমাদের হাতে এই প্রথম এসেছে একটা বড় কাজের সুযোগ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে জিপো আর কিটসনের কাজটা মোটেই পছন্দ নয়।

জিনি এবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বললো, হ্যাঁ, শুধু সুযোগ না—সুবর্ণ সুযোগ। দশ লক্ষ ডলার ছেলেখেলার কথা নয়। তুমি বলেছিলে এ কাজে তোমার দল সবরকম সাহায্য আমায় করবে। এবং তাও বিনা স্বার্থে না। কিন্তু এখন দেখছি, আমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে। এখন তুমি আবার ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ। হুঃ, যত্তো সব ন্যাকামো।

ওরা চমকে উঠলো। মেয়েটার মুখে এমন রুক্ষ, অপমানজনক কথা শুনে মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

মেয়েদের পক্ষে পশুসুলভ আচরণের ব্যাপারে ব্লেকের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। সে আর থাকতে না পেরে বললো বক্তৃতার পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না সুন্দরী। এবার দয়া করে একটু চুপ করো দেখি!

জিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর সুন্দর মুখে বরফের কাঠিন্য।

মরগ্যানকে লক্ষ্য করে বললো, মনে হয় এখানে এসে আমি ভুল করেছি। আচ্ছা—তাহলে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক। এই পরিকল্পনা নিয়ে আমি সাহায্য চাইবো এমন লোকের কাছে, যাদের শরীরের প্রতি শিরায় রক্ত বইছে। তোমাদের মতো অপদার্থ কাপুরুষদের সঙ্গে কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট করতে চাই না।

জিনি বলেই দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোলো।

মরগ্যান হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরে ওকে থামালো। হেসে বললো, উত্তেজিত হয়ো না, জিনি। এতে ওদের কোনো দোষ নেই। এ ধরনের কাজ একদম প্রথম বলে একটু অস্বস্তিবোধ করছে। কিন্তু সময় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই জিপো ম্যানডিনি তালা খোলায় শহরের সবচেয়ে সেরা কারিগর। মরগ্যান জিপোর পিঠে হাত রাখলো।—এড বুদ্ধি বিবেচনায় আমার চেয়ে কিছু কম যায় না। আর আলেক্সের মতো গাড়ি চালাতে পৃথিবীতে কম লোকই জানে। তবে রক্তপাতের ব্যাপারটা ওরা ঠিক পছন্দ করছে না।

জিনি তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে, তাই নাকি? তাহলে দশ লাখ ডলারের বেলায় ওদের পছন্দ অপছন্দ যাচ্ছে কোথায়? বুক পকেটে?—হুঁঃ, এইসব হরিদাস পালের গোয়াল নিয়ে তুমি দল তৈরী করছো? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, ফ্র্যাঙ্ক! জিনির কর্কশ কণ্ঠস্বর প্রত্যেকের কানে ঢেলে দিলো গরম সীসে, এ দুশ ডলারের ব্যাপার নয়, পুরো দশ লাখ ডলার। সেক্ষেত্রে কার কি হলো না হলো, অতো দেখতে গেলে চলে না। সেটা ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

জিনি মরগ্যানের হাত ছাড়িয়ে সরাসরি চোখ রাখলো কিটসনের চোখে, দু-লক্ষ ডলারের চেয়ে আহত হবার ভয়টাই কি তোমার কাছে বেশী হলো? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

জিনির আগুনঝরা অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কিটসন কুঁকড়ে মৃদুস্বরে বললো, কাজটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ওয়েলিং কোম্পানীতে আমি কিছুদিন চাকরী করেছিলাম। সুতরাং টমাস এবং ডার্কসনকে আমি ভালভাবেই চিনি। এতো সহজে ওরা হার মানবে না। যেখানে খুনোখুনির সম্ভাবনা আছে সেখানে আমি নেই।

জিনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকেও আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তোমার এই হারকিউলিস মার্কা চেহারা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে কেটে পড়তে পারো। আমরা কেউ বাধা দেব না।

অপমানের কালো ছায়া নেমে এলো কিটসনের মুখে। সে উত্তেজিত ভাবে বললো, মুখ সামলে কথা বলো। আমি বলছি এ কাজটা অসম্ভব। তোমরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখছো!

হাওয়ায় তর্জনী নাচিয়ে দরজার দিকে ইশারা করলো জিনি, দেখছিই তো! নইলে তুমি এখনো বসে রয়েছ কেমন করে? যাও বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে "দুদু" খাও। তোমাকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

ধীরে ধীরে কিটসন উঠে দাঁড়ালো। তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে আস্তে আস্তে জিনির কাছে এগিয়ে গেলো। ও তখনও একইভাবে সোজা হয়ে দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। চোখের দৃষ্টি কিটসনের চোখে নিবদ্ধ।

অবশিষ্ট তিনজন রুদ্ধশ্বাসে ওদের দেখতে লাগলো। ব্লেকের চোখে চিন্তার ছায়া। কারণ সে জানে, উত্তেজিত হলে কিটসনের মাথার ঠিক থাকে না। জিপো ভুরু কুঁচকে অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু মরগ্যানের মুখের হাসি তখনও রয়েছে।

কোনো শালা আজ পর্যন্ত এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় নি! জিনির মুখোমুখি এসে কিটসন থামলো। দু হাতের আঙুল অস্থির উত্তেজনায় হাওয়া আঁকড়ে ধরছে।

জিনি যেন একটি ছোট্ট পুতুল কিটসনের বিশাল চেহারার কাছে। কিন্তু ওর দৃপ্ত চাবুকের মতো ভঙ্গী মনে করিয়ে দেয় কেউটের শীতল চাউনিকে। আর আলেক্স কিটসনের অপমানিত পৌরুষ বুঝি আহত বাঘের মতোই ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

জিনি ঘৃণাভরা চোখে কিটসনকে দেখলো। শান্তস্বরে বললো, তুমি যদি আমার কথা বুঝতে না পেরে থাকো, তাহলে আবার বলছি, যাও বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে 'দুদু' খাও। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই।

একটা চাপা গর্জনের সঙ্গে কিটসনের ডান হাত ক্ষিপ্রবেগে জিনির দিকে এগিয়ে এলো—কিন্তু মাঝপথেই সে নিজেকে সামলে নিলো, নামিয়ে নিলো তার উদ্যত হাত।

জিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, কি হলো, থামলে কেন, মারো! তোমার মতো অতো প্রাণের ভয় আমার নেই।

হো হো করে হেসে উঠলো মরগ্যান।

মাথা নীচু করে কিটসন আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করে দরজার দিকে শ্লথপায়ে এগিয়ে গেল।

মরগ্যানের কর্কশ স্বরে সকলে চমকে উঠলো, কিটসন, এখানে এসে বসো। ভোট তোমাকে দিতেই হবে। তুমি যদি দল ছেড়ে চলে যাও এই মুহূর্তে, তবে এর পরিণতির জন্য আমি কিন্তু দায়ী থাকবো না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তারপর ধীরে ধীরে কিটসন ফিরে এসে চেয়ারে বসলো। মুখভাব গম্ভীর দ্বিধাগ্রস্ত।

জিপোর দিকে মরগ্যান ঘুরে, আর একটা ভোটের কাগজ, জিপো।

জিপো নোটবইয়ের পাতা কেটে আর এক টুকরো কাগজ দিলো।

কিছুক্ষণ ধরে ব্লেক উসখুস করছিলো, এবারে বললো, ভোট দেবার কাজটা সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা আমি জানতে চাই, ফ্র্যাঙ্ক। এই মেয়েটা এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো কেমন করে? জিনির দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বললো ব্লেক!

মরগ্যান বললো, গত পাঁচ মাস ধরে আমি শুধু এই ট্রাকটাকে সাফ করার মতলব ভেজেছি। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো উপায় খুঁজে পাইনি। হঠাৎ মাস তিনেক আগে জিনি আমার কাছে ট্রাক লুঠের একটা সাজানো গুছানো পরিকল্পনা ফেলে দিলো। সত্যি বলতে কি এর পুরো কৃতিত্বই জিনির। যে কারণে দশ লাখ ডলারকে ভাগ করা হচ্ছে পাঁচ ভাগে। ও সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটাকে ভেবেছে এবং সেই অনুযায়ী তৈরী করেছে ওর নিখুঁত প্ল্যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্ল্যানে কোনো ফাঁক নেই।

জিনির দিকে তাকিয়ে ব্লেক বললো, তোমার বাড়ি কোথায়, খুকী?—আর এই ট্রাক লুঠের দুর্বুদ্ধিই বা তোমার মাথায় এলো কি করে?

মেয়েটি ওর সস্তা ভ্যানিটিব্যাগ খুলে সিগারেট বার করে, অভিব্যক্তিহীন শীতলদৃষ্টিতে ব্লেকের দিকে তাকিয়ে, সিগারেট ধরালো, আমার বাড়ির খবর জেনে তোমার কি লাভ? আর ট্রাক লুঠের পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করছো?... টাকার প্রয়োজনটা হঠাৎ খুব বেড়ে ওঠায় হঠাৎ প্ল্যানটা মাথায় গজিয়ে উঠেছে। এবং আমাদের যখন পরস্পরের নামটা অজানা নয়, তখন নাম ধরে ডাকাটাই উচিত। ঐ ন্যাকা-ন্যাকা স্বরে, খুকু বলাটা ছাড়ো দেখি!

দাঁত বের করে ব্লেক হাসলো। মেয়ে মানুষের তেজ বরাবরই তাকে আকর্ষণ করেছে।

নিশ্চয়ই, তুমি যখন পছন্দ করো না সেটা কি আমার করা সাজে? কিন্তু একটা কথা—আমাদের দলের খবর তোমাকে কে দিলো? আর আমরাই যে এই কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক, সেটাই বা জানলে কেমন করে?

জিপোর দিকে জিনি দেখালো, তার কারণ আমি খোঁজখবর করে জেনেছিলাম, তালা খোলার ব্যাপারে ওর চেয়ে ওস্তাদ কারিগর আর এ শহরে নেই। এবং এ কাজে আমাদের প্রধান প্রয়োজন সেইটাই। আরো শুনলাম তোমার কথা। তোমার মতো ঠাণ্ডা রক্তের দুঃসাহসী পুরুষ নাকি খুব কমই আছে। মরগ্যানের আছে বুদ্ধি। সেই সঙ্গে দল পরিচালনার অদ্ভুত ক্ষমতা। তাছাড়া গাড়ি চালানোতে কিটসনের নামটাই সর্বাগ্রে। সুতরাং তোমাদের এখানে না এসে পারি কি করে?

অস্বস্তি কেটে জিপোর মুখে ফুটলো হাসির রেখা। সে প্রশংসা শুনতে বরাবরই ভালবাসে। বিশেষতঃ, একজন সুন্দরী তরুণীর মুখে। না, জিনি মিথ্যে বলেনি—ভাবলো জিপো। তারসঙ্গে অন্য কারিগরের কোনো তুলনাই হয় না। কারণ জিপো ম্যানডিনি, তালার লাইনে একমেব দ্বিতীয়ম।

কিটসনের ক্রোধ মিলিয়ে গেল। অপ্রতিভভাবে সে টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। চেয়ে

রইলো—হুইস্কি গ্লাসের বৃত্তাকার ভিজে ছাপের দিকে।

ব্লেক সন্দেহাকুল কণ্ঠে বললো, ওরা, মানে কারা?

জিনি একটু বিরক্তভাবে বলল, বহু জায়গায় আমি উপযুক্ত লোকের খোঁজ করেছি। তারপর জেনেছি তোমাদের নাম। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারো নাম করা মুশকিল। আমরা শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছি। আমি ভেবেছিলাম ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার হয়তো ভুল হতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও দেখতে হবে।

ব্লেক সিগারেট ধরিয়ে জিনির দিকে তাকিয়ে, আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। ঐ ট্রাকটা থামাতে তোমাকেই যদি শুয়ে থাকতে হয় রাস্তায়, তাহলে মানতে দ্বিধা নেই, সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজটাই তুমি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছো। এটাও কি তোমারই পরিকল্পনা নাকি?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, এবার দেখা যাক তোমাকে কি কি করতে হবে।—তুমি রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে থাকবে। তোমার কাছে লুকানো থাকবে একটা রিভলবার। ডার্কসন যেই তোমার কাছে এগিয়ে যাবে ; অমনি তুমি রিভলবার চেপে ধরবে তার তলপেটে—তাই তো?

সম্মতি জানালো জিনি মাথা হেলিয়ে।

এতে কিন্তু যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে ; এবং ব্যাপারটা যতটা সহজ ভাবছো ততটা সহজ নাও হতে পারে। ব্লেক বললো, এক্ষেত্রে দুটো জিনিষ ঘটতে পারে। হয় ডার্কসন সরাসরি হাত তুলে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে নয়তো তোমাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে রিভলবারটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। ডার্কসন সম্বন্ধে আমি যতটুকু শুনেছি, অতো সহজে হাল ছাড়ার লোক সে নয়। ও হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার রিভলবারটা কেড়ে নিতে চাইবে। তখন?

জিনি শান্তভাবে ধোঁয়া ছাড়লো।

নেহাত অল্প নয় দশ লক্ষ ডলার। শীতল নির্বিকারস্বরে জবাব দিলো জিনি গর্ডন, অতএব ডার্কসন যদি ভালোয় ভালোয় পোষ না মানে, তবে ওকে গুলি করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে জিপো মুখ মুছলো। জিভটাকে একবার বুলিয়ে নিলো শুকনো ঠোঁটের ওপর ; অস্বস্তিভরে একবার দেখলো মরগ্যানের দিকে, তারপর তাকালো কিটসনের দিকে।

ঠিকই বলেছে জিনি। মরগ্যান ওদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো, দশ লক্ষ ডলারের জন্য ওসব সামান্য ব্যাপারে নজর দিলে চলে না। তাছাড়া বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

জিনিকে লক্ষ্য করছিলো ব্লেক গভীর দৃষ্টিতে।

না, মেয়েটা মিথ্যে বলছে না। বাপ রে! এ যে দেখছি কেউটের বাচ্চা।

না, তা নয়—আমি শুধু খোলাখুলি ব্যাপারটা জানতে চাইছি।—একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে বারকয়েক ঠুকলো ব্লেক, এবার তোমার মতলবের বাকীটা শোনা যাক, ফ্র্যাঙ্ক।

মাথা নাড়ালো মরগ্যান, উহুঁ ; ভোট দেবার আগে সে বিষয়ে আর একটা কথাও জানার উপায় নেই। জিনির সঙ্গে আমার সেইরকমই শর্ত হয়েছে। তবে ও বলছে, ট্রাক লুঠের প্লান নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। সবটাই ও দাবার ছকের মতো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রেখেছে। আমি যা বললাম সেটা মোটামুটি পরিকল্পনার মূল ব্যাপারটা। যদি আমরা জিনিকে সাহায্য করতে রাজী থাকি, তবেই ও বাকী অংশটা আমাদের শোনাবে। তার আগে নয়। আর রাজী না হলে তো মিটেই গেল। ও তখন অন্য কোনো দলের কাছে যাবে—এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু দেখছি না। তোমরা কি বলো?

কিন্তু সত্যিই কি ও প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? ব্লেক প্রশ্ন করলো, আমার তো মনে হয় সেটা সম্ভব না। এখন পর্যন্ত আমরা শুধু ট্রাকটা থামাতে পেরেছি, আর টমাস ও ডার্কসনকে কব্জা করেছি। তার বেশী কিছু নয়। অবশ্য খানিকক্ষণ আগে আমরা এটাকে অসম্ভব মনে করেছিলাম। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, তোমার কথা যদি সত্যি হয় মানে ট্রাকটা যদি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে তো ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে। যে মুহূর্তে

ট্রাকের সঙ্গে ট্রান্সমিটারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সীর লোকেরা পুলিশে খবর দেবে। আর ওরা তো জানেই ট্রাকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুধু পুলিশ নয়, সৈন্যবাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত আমাদের পেছনে লাগবে। অর্থাৎ শয়ে শয়ে লোক হেলিকপ্টার ও গাড়ি নিয়ে আমাদের খুঁজবে। আর এই সামান্য তিরানব্বই মাইল চক্কর দিয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে একটা হেলিকপ্টারের মিনিট কয়েকের বেশী লাগবে না। তুমি তো ভালোভাবেই জানো, ঐ রাস্তায় ট্রাক নিয়ে লুকোবার কোনো জায়গাই নেই। যাও আছে, তাও পঁচিশ মাইল দূরে। আমি তো বুঝতে পারছি না। কেমন করে আমরা ট্রাক লুট করে টাকা নিয়ে সরে পড়বো! নাঃ, ওদের চোখে ধুলো দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

মরগ্যান কাঁধ ঝাঁকিয়ে, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু জিনি বলছে, এ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত কিছু ও ছকে রেখেছে।

জিনির দিকে ব্লেক তাকিয়ে, তাই নাকি? এই জটিল সমস্যার উত্তরও তুমি জানো?

জিনি শীতলস্বরে বললো, হ্যাঁ, এইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছি। আমি জানি ট্রাকটাকে নিয়ে কিভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।

জিনির আশ্বাসভরা দৃঢ়স্বরে কিটসন পর্যন্ত বিচলিত হলো। এতক্ষণ সে নির্বিকার ভাবে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হলো, নাঃ, কাজটা জিনির পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকাল, ঠিক আছে। তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান কেমন করে করবে তাই ভাবছি।—অবশ্য এখনও দুটো জিনিস আমরা ভেবে দেখিনি। এক নম্বর হলো, আমরা যখন ট্রাক থামিয়ে টমাস আর ডার্কসনকে কায়দা করবো, তখন যদি অন্য কোনো গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পড়ে, তাহলে? মানছি, ঐ রাস্তা দিয়ে খুব একটা গাড়ি-টাড়ি যায় না। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়তে কতক্ষণ? ব্যস তাহলেই চিত্তির।

বিরক্তি নেমে এলো জিনির মুখে। ও ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। আঁটোসাঁটো লাল শার্টের নীচে ওর উদ্ধত বুক প্রকট হয়ে উঠলো।

সে নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তুমি তো জানো। দুটো রাস্তা পাশাপাশি গিয়ে দশ নম্বর সড়কে মিশেছে। এখন ট্রাকটা যেই ওর রোজকার রাস্তায় ঢুকবে, অমনি আমরা একটা পথনির্দেশ বসিয়ে দেবো জোড়া রাস্তার মুখে। তাতে তীরচিহ্ন দিয়ে অন্যান্য গাড়িদের নির্দেশ করা হবে পাশের রাস্তা ব্যবহার করার জন্য তাহলেই অন্য আর কোনো গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে আসবে না। অর্থাৎ ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়, তাই না?

ব্লেক একগাল হাসলো। খুশী যেন ওর চোখেমুখে উপচে পড়লো।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, একেবারে জলের মতো সহজ। কিন্তু মেহেবুবা, এই সমস্যাটার সমাধান করো দেখি। ধরে নিলাম ট্রাকটা দখল করে আমরা বেশ একটা জুতসই জায়গায় গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু তারপর ট্রাকের তালাটা খুলবো কি করে? ফুসমন্তরে? কিটসন বলছে, ওটার তালা খোলার চেয়ে যুদ্ধ করে জয় করা অনেক সহজ। তাছাড়া আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। উঁহু, ব্যাপারটা নেহাত সোজা নয়।

জিনি মাথা ঝাঁকালো। জিপোর দিকে ইশারা করে বললো, সেটা ওর মাথাব্যথা, ও বুঝবে। তালার ব্যাপারে ও একজন ওস্তাদ। সুতরাং সে দায়িত্বটা ওরই, আমাদের নয়। আমরা শুধু ট্রাকটা ওর কাছে এনে দেব, তারপর যতসময় লাগে লাগুক। ইচ্ছে হলে এক মাস, চাই কি দু-মাস সময়ও জিপোকে দেওয়া হবে। জিনির সাগর সবুজ চোখ জিপোর দিকে ঘুরলো, কি হে, পারবে না এক মাসে ঐ ট্রাকের তালাটা খুলতে?

জিপোর অবস্থা তখন দেখে কে? প্রশংসায়-প্রশংসায় সে যেন রঙীন শূন্যে ভাসছে। জিনির প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নাড়লো, পারবো না মানে? আমি এক মাস সময় পেলে নক্র দুর্গের সমস্ত দরজা খুলে ফেলতে পারবো।

জিনি বললো, তোমাকে একমাস সময়ই দেওয়া হবে। এবং তাতেও যদি না হয় তবে আরো এক মাস সময় আমাদের ভাবনার কারণ হবে না।

মরগ্যান বললো, ব্যস, ও নিয়ে আর কথা নয়, আগেই তো বলেছি। জিনি সব সমস্যারই সমাধান

করে রেখেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর পরিকল্পনা সফল হবে। এসো, এবার ভোট দেওয়া যাক। তবে আবার বলছি, কিঞ্চিৎ রক্তপাতের জন্য প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ দু-পক্ষেরই কেউ না কেউ আহত হতে পারে। এমনকি মারা-ও যেতে পারে। যদি টমাস বা ডার্কসনের কেউ মারা যায় তবে আমরা খুনের জালে জড়িয়ে পড়বো। অথবা যদি সামান্য কোনো ভুলের জন্য আমরা ধরা পড়ি, তবে নির্ঘাত দশ থেকে বিশ বছরের জেল—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর অন্যদিকে রয়েছে সোনালী দুনিয়ার হাতছানি ; নগদ দু-লাখ ডলার! আমাদের অবস্থাটা মোটামুটি এই।

—তোমাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে, তাহলে এবার ভোট নেবার কাজ শুরু করা যাক, মরগ্যান থামলো। তিনজনের দিকে একবার দেখলো, তবে একটা কথা মনে রেখো। ভোটের মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই কিন্তু হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমাদের দলের নিয়ম কানুন তো তোমরা ভালভাবেই জানো, ভোটে যে পরাজিত হবে তাকে হয় আমাদেরই সঙ্গে কাজ করতে হবে, নয়তো চিরদিনের জন্য দল ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। বেশ ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তেই তোমরা সিদ্ধান্ত নাও। মনে রেখো, জমার খাতায় দু-লাখ ডলার। আর খরচের খাতায় দশ বিশ বছরের জেল—হয়তো বা ইলেকট্রিক চেয়ার। অতএব ইচ্ছে করলে তোমরা আরো কিছু সময় নিতে পারো। পুরো ব্যাপারটা ভালো করে খতিয়ে দেখো।

এসো তাহলে ভোট দেওয়া যাক—ব্লেক আহ্বান জানালো এবং একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিলো।

তুলে নিলো জিনি এক টুকরো কাগজ। বাকী তিন টুকরো কাগজ তুলে নিলো মরগ্যান। একটা এগিয়ে দিলো কিটসনের দিকে, আর একটা জিপোর দিকে। তারপর পকেট থেকে কলম বের করে অবশিষ্ট কাগজে কি লিখতে লাগলো। লেখা হলে কাগজটা ভাঁজ করে রাখলো টেবিলের ঠিক মাঝখানে।

ফ্র্যাঙ্কের কলমটা চেয়ে নিলো জিনি। লেখা শেষ করে কাগজটা এগিয়ে দিলো মরগ্যানের রাখা কাগজের পাশে।

ব্লেক ইতিমধ্যে লেখার কাজ সেরে ফেলেছে। কাগজটা হাওয়ায় নাচিয়ে ভাঁজ করলো ব্লেক, রাখলো অন্য দুটো কাগজের পাশে।

জিপো কাগজটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। অবশেষে দ্রুতহাতে লিখে লেখা কাগজটাকে ভাঁজ করে টোকা মেরে এগিয়ে দিলো অন্য কাগজগুলোর কাছে।

বাকী রইলো শুধু কিটসন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে। জিনি এবং অন্য তিনজন তাকে লক্ষ্য করছে।

তার দিকে কিটসন চোখ তুলে তাকালো। তারপর জিনির মুখে। ওরা চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে, তারপর মরগ্যানের কলমটা তুলে নিলো কিটসন। হিজিবিজি কি সব লিখে ভাঁজ কবে, রাখলো অন্য কাগজের ওপর।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। একসময় মরগ্যানই হাত বাড়িয়ে দিলো কাগজগুলোর দিকে। খুলে দেখলো একটা, রাজী।

আরেকটা খুললো মরগ্যান।

রাজী, চমৎকার! এবার দেখা যাক অন্যগুলো কি বলে।

কাগজগুলো ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেললো মরগ্যান। দেখলো সবাই রাজী।

সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো মরগ্যান। ফুটে উঠলো নেকড়ের হিংস্র হাসি, তাহলে আপত্তি নেই এই কাজটার ব্যাপারে দেখছি। আমি সেই রকমই ভাবছিলাম। দু-লক্ষ ডলার পায়ে ঠেলার মতো লোক এই পৃথিবীতে নেই—নেহাত।

জিনির চোখে কিটসন চোখ রাখলো।

তার দিকে জিনিও তাকালো, কিটসনের দিকে চেয়ে হাসলো জিনি। নীরব অথচ কোমল হাসি।

।। দুই ।।

পরদিন সকাল। প্রায় আটটা বাজে। ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর প্রবেশ-পথের কাছে এসে থামলো একটা কালো ধূলিধূসর বুইক সেঞ্চুরী।

রাস্তার দু-পাশে অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে কালো গাড়িটার একটুও সময় লাগলো না।

গাড়ির চালক ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান। মাথার তেলচিটে ময়লা টুপিটা চোখের ওপর নামানো। পাতলা ঠোঁটে একটা সিগারেট। তার পাশে বসে এডব্লেক।

এজেন্সীর দরজার দিকে দেখলো তারা। দরজার ওপরে কাটা তারের বেড়া। ডানদিকের পাল্লায় ঘণ্টি বাজাবার বোতাম। এবং পাশেই সাদা ফলক আঁটা তাতে লাল রঙের বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে লেখা ;

—দি ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সী—

আপনার নিরাপত্তা আমাদের নিতে দিন। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা এবং নিরাপদ ট্রাক পরিবহন ব্যবস্থা।

নিজেদের সম্বন্ধে ওরা একটা বিরাট ধারণা করে বসে আছে দেখছি—ফলকের লেখা পড়ে বললো ব্লেক, ঠিক আছে, আর কটা দিন ; তারপরেই ওরা দেখবে ওস্তাদের কেরামতি।

বলা যায় না, এর উলটোটাও তো ঘটতে পারে—ব্যঙ্গের হাসি হাসলো মরগ্যান।

তা পারে, তবে আমার মনে হচ্ছে, এ কাজটায় আমরা সাফল্যলাভ করবোই। ব্লেক বললো, মেয়েটা এমন সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়, তাই না?

হ্যাঁ। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা তুলে নিলো মরগ্যান, ওর পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই, কিন্তু সেই অনুযায়ী সবকিছু করতে পারলে হয়। কারণ কতকগুলো জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে জিপোকে নিয়েই ভাবনা।

জিপোর যাতে সে অবস্থা না হয়, তার দায়িত্ব আমাদের। জবাব দিলো ব্লেক, জিপোর জন্য আমি বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নই।

কিন্তু জিনির তো সে ভয় নেই ব্লেকের ঠোঁটের কোণে হাসির ছোঁয়া।

তা ঠিক।

মেয়েটা কে, ফ্র্যাঙ্ক?

মরগ্যান ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকালো, কি করে বলবো? যদ্দুর জানি এ শহরে থাকে না। তবে একটা কথা বাজি রেখে বলতে পারি, ও এর আগেও অন্য কোনো দলের হয়ে কাজ করেছে।

আমারও তাই মনে হয়, ব্লেক চোখ নামিয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখলো, তবে একটা ব্যাপার কি জানো? এই ট্রাক লুটের পরিকল্পনাটা যে জিনির একার মাথা থেকে বেরিয়েছে, তা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। ওই কচি মেয়ের মাথায় এ মতলব আসতেই পারে না। আর যে ভাবে সমস্ত জটিল সমস্যাগুলো ও সমাধান করেছে তা অবিশ্বাস্য। যদি এই ট্রাকটার ব্যাপারে অন্য কোনো দলও মাথা ঘামায় তাহলে একটুও অবাক হবো না। কারণ আমার ধারণা, অন্য কোনো দলের কাছ থেকে জিনি এই ট্রাক লুঠের পরিকল্পনাটা চুরি করেছে। হয়তো বেশী বখরার লোভেই ও সেই দল ছেড়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। অতএব, জিনি সম্বন্ধে সতর্ক থেকো, ফ্র্যাঙ্ক। পরে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের মতো আরেকটা দলও একই দিনে একই সময়ে ট্রাকটাকে খালি করার মতলব ভাঁজছে—সেটা আমাদের পক্ষে খুব একটা উপাদেয় হবে না ; বিশেষ করে ওরা যদি সে ব্যাপারে আমাদের টেক্কা দেয়।

মরগ্যান অস্বস্তিভরে টুপিটাকে মাথার পেছনে ঠেলে ভুরু কুঁচকে ব্লেকের দিকে তাকালো, হুঁ! সবই আমি ভেবেছি। কিন্তু তবু আমাদের একটা সুযোগ নিতে হবে। আগামী শুক্রবারের আগে কিছুতেই এ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রচুর প্রস্তুতি দরকার এর পেছনে।—আচ্ছা, কটা বাজলো?

ঠিক সাড়ে-আটটা।

তাহলে তো বাস আসার সময় হয়ে গেল!

হ্যাঁ।

ওরা সামনের বাসস্টপে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকালো। ব্লেক সেদিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো। অস্ফুটস্বরে বললো, যাই বলো ফ্র্যাঙ্ক, জিনির চেহারায় চটক আছে।—উফ্, একখানা জিনিষ বটে। ব্লেক অন্যমনস্কভাবে ঠোঁট কামড়ালো।

বরফের কাঠিন্য নেমে এলো মরগ্যানের মুখে। তার কালো সাপের মতো চোখ জোড়া ব্লেকের চোখে স্থির হলো! সে কর্কশস্বরে বলে উঠলো প্রসঙ্গ যখন উঠলোই তখন একটা কথা ভাল করে জানিয়ে দিই এড, জিনির কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা তোমরা করো না। কারণ, ওকে নিয়ে কোনো বাঁদরামি আমি সহ্য করবো না। সপ্তা দুয়েক, কি তারও বেশী ও আমাদের সঙ্গে থাকবে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই হয়তো ওকে আমাদের পাশে বসে কাটাতে হবে—কিন্তু তাই বলে ওর সম্বন্ধে ভুল ধারণা গড়ে উঠুক, তা আমি চাই না। সুতরাং প্রথম থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। কোনোরকম লক্কাবাজি আমি সহ্য করবো না।

মুখমণ্ডল ঘৃণায় বিকৃত করে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে ব্লেক বললো, তাহলে কি ধরে নেবো, জিনিকে তুমি নিজের জন্যই রেখেছো?

মাথা নাড়লো মরগ্যান, না। আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এড—জিনির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু লেনদেনের ; তার বেশী কিছু নয়।

মরগ্যানের শীতল, নিষ্প্রাণ কালো চোখের তারা যেন ঝিলিক মেরে উঠলো। ব্লেক সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিভরে হাসতে চেষ্টা করলো—আমাকে এসব না বলে কিটসনকে গিয়ে বলো। যদি কিছু করার হয় ও-ই করবে, আমি নয়। কাল রাতে কিরকম করে জিনিকে দেখছিলো মনে আছে?

মরগ্যান বললো, তোমাদের তিনজনের ওপরেই নজর রাখা দরকার। তুমি কিংবা জিপো—কিটসনের চেয়ে এমন কিছু কম নও!

ব্লেকের চোখে ক্রোধের ঝিলিক ফুটে উঠলো, তোমার মাথা থেকে দেখছি যীশুখ্রীষ্টের মতো জ্যোতি বেরোচ্ছে।

ক্রুদ্ধভাবে মরগ্যান কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বাসটাকে আসতে দেখে বললো, ঐ যে বাস আসছে। চুপচাপ নজর রাখো।

উইন্ডস্ক্রিনের ওপর দুজনেই ঝুঁকে পড়লো। সামনের রাস্তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। বাসটা এজেন্সীর সামনে এসে থামলো। দুজন লোক নামলো। একজনের চেহারা খাটো, রোগা, কিন্তু অন্যজন প্রায় ছ ফুট লম্বা—বৃষস্কন্ধ, শক্তসমর্থ চেহারা। চলাফেরার ভঙ্গী সাপের মতো ক্ষিপ্র ও নিশ্চিত। তার পরনে ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর ইউনিফর্ম। মাথায় লম্বা টুপি—তাতে বসানো চকচকে ইস্পাতের ব্যাজ। কোমরে পিস্তল ঝোলানো। অভ্যাসবশতঃই বাঁ হাতটা পিস্তলের খাপের ওপর রাখা।

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটা চারপাশে দেখলো। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে এজেন্সীর দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ঘন্টির বোতামে আঙুল চেপে ধরলো।

ব্লেক প্রশ্ন করলো, এই নাকি?

মরগ্যান তখন লোকটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত, অস্বস্তিভার বললো, হ্যাঁ, এই মাইক ডার্কসন। টমাস হয়তো এর পরের বাসে আসবে।

শালাকে দেখে তো মনে হচ্ছে এক নম্বরের হারামজাদা—ব্লেক ঠিক খুশী হতে পারলো না ডার্কসনকে দেখে। এক অজানা আশঙ্কায় সে বললো নাঃ, ব্যাটা যে সাহসী, তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

ডার্কসন ঘুরে দাঁড়িয়ে কালো বুইকটাকে অন্যমনস্ক ভাবেই দেখছিলো। ওর বয়েস পঁচিশের বেশী হবে না। দেখতে সুশ্রী না হলেও ডার্কসনের মুখে সাহস ও দৃঢ়তার আভাস রয়েছে। এবং সেটা মরগ্যানের চোখ এড়ালো না।

ডার্কসনকে খুন করা ছাড়া জিনির আর কোনো উপায় নেই ব্লেক ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো সে হঠাৎই যেন ঘামাতে শুরু করেছে আচ্ছা, জিনি কি ডার্কসনকে একবারও দেখেছে?

হ্যাঁ গতকাল দেখেছে। কিন্তু একবারও মেয়েটা ভয় পায়নি। বারবারই বলেছে, ডার্কসনকে ও

ঠিক কজা করতে পারবে? তারপর জানি না, কি করবে।

এমন সময় এজেন্সীর দরজা খুলে গেলো, ডার্কসন ভেতরে ঢুকলে আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

কিটসন দেখছি ঠিকই বলেছে। এ-তো সহজে হার মানবার পাত্র নয়। ব্লেক শান্তস্বরে বললো, প্রথমেই একে শায়েস্তা করতে হবে, ফ্র্যাঙ্ক, তা নইলে পরে বিপদ হতে পারে।

মরগ্যান বললো, হ্যাঁ, এবং সেই শায়েস্তা করার দায়িত্বটা তোমার! জিনির ওপর এ দায়িত্ব দেওয়া চলবে না, কারণ ও হয়তো ডার্কসনের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিক পেরে উঠবে না। ড্রাইভারকে আমিই টিট করবো। তোমার কাজ হবে একটা রাইফেল নিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা। ডার্কসন যেই ট্রাক ছেড়ে বেরোবে তখনি তুমি তার দিকে রাইফেল তাক করবে। একমুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হবে না। জিনির রিভলবারের সামনে ওর চালচলনের এতোটুকু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি করবে। কোনোরকম ইতঃস্তত করবে না, বুঝেছো?

ব্লেকের গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ, একটা তিক্তস্বাদ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শুকনো জিভটাকে মুখের চারপাশে বুলিয়ে নিলো, ঘাড় নাড়লো, নিশ্চয়ই, সেজন্য তুমি ভেবো না। ডার্কসনকে আমি চোখে-চোখে রাখবো।

মরগ্যান দাঁতে দাঁত চেপে বললো, ঐ যে দ্বিতীয় বাসটা আসছে। সেই সঙ্গে আমার শিকার আসছে—ডেভ টমাস।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাক ড্রাইভার টমাস বেশ লম্বা-চওড়া লোক। চলাফেরায় ডার্কসনের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই একই রকম উদ্ধত চিবুক, শীতল অচঞ্চল চোখ, পাতলা টানা ঠোঁট। কিন্তু টমাসের বয়স কিছু বেশীই হবে—তিরিশ-বত্রিশের কাছাকাছি। বাস থেকে নেমে সেও এজেন্সীর দরজার দিকে এগিয়ে চললো।

একদৃষ্টে, সরীসৃপ শীতল চোখে মরগ্যান টমাসের দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখতে লাগলো। চিন্তার ভাঁজ পড়লো কপালে।

মরগ্যান বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো, এই হলো দু-নম্বর হারামজাদা। নাঃ; লোক বাছাই করার ব্যাপারে ওয়েলিং এজেন্সীর তুলনা নেই। কোত্থেকে যে এই লোক দুটোকে যোগাড় করলো কে জানে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ এড টমাসকে আমার খুনই করতে হবে। তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ব্লেক মাথা থেকে টুপি নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। হঠাৎ তার বুকের স্পন্দন যেন বেড়ে উঠলো। আমাদের এই পরিকল্পনার একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা কিন্তু জালে আটকা পড়বো ফ্র্যাঙ্ক। সুতরাং আমাদের ভীষণভাবে সাবধান হতে হবে।

মরগ্যান স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বললো, এ কাজে সাফল্যের পুরস্কার দশ লক্ষ ডলার। এবং সেই কারণে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদা। এড, আমার বয়স বর্তমানে বিয়াল্লিশ বছর—তার মধ্যে পনেরোটা বছরই জেলে কেটেছে। যে ক'বছর বাইরে ছিলাম, সে কটা বছরও পুলিসের নজর বাঁচিয়ে, লুকিয়ে চলতে হয়েছে। এই করে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে। এতদিনে জীবনের সার যা বুঝেছি, তা হলো টাকা। অতএব ঐ ট্রাকের টাকা হাতানোর ব্যাপারে কোন বাধাই আমাকে রুখতে পারবে না—টমাস, ডার্কসন তো দূরের কথা। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো এড, আমরা এখন ঠিক কি অবস্থায় আছি। আমরা মরলাম কি বাঁচলাম তাতে কার কি এসে যায়? সূর্য যেমন উঠছিলো তেমনি উঠবে। শহরের কর্মব্যস্ত জীবনে এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে না। আমরা একেবারে ফালতু।

ব্লেক শান্তস্বরে বললো, ভাবি না যে তা নয়। তবে আমি কি ভাবছি জানো? আমি ভাবছি কিটসন আর জিপোর কথা। জিনির সামনে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তো রাজী হলো—ভোটও দিলো আমাদের স্বপক্ষে। কিন্তু পরে কি হবে সেটা কি চিন্তা করে দেখেছো?

মরগ্যান দৃঢ়কণ্ঠে বললো, ও নিয়ে ভাববার কি আছে? ওরা যখন রাজী হয়েছে তখন কাজটা ওদের করতেই হবে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি ওদের মাথার ঠিক থাকে—

থাকতেই হবে। না হলে—

তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। তবে বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওরা—

অচঞ্চল চোখে মরগ্যান ব্লেকের দিকে তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ স্বরে বললো। একবার যদি টাকাটা আমরা দখল করতে পারি, তবে ওটা আমরা খুলবোই—ওদের দুজনের সাহায্য নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক! এতোটা পথ এসে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান, কোনো মতেই হাল ছাড়তে রাজী নয়।

মাথা নেড়ে ব্লেক সম্মতি জানালো, কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ফ্র্যাঙ্ক। এই কাজের প্রাথমিক খরচ হিসেবে অন্ততঃ দু হাজার ডলার আমাদের দরকার। কাল রাতে আলোচনার সময় আমরা কিন্তু এ কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি। টাকাটা যোগাড় হবে কোথেকে বলো দেখি?

আমাদের একটা ছোট কাজে হাত দিতে হবে—যে কাজে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে আসল কাজ—দশ লক্ষ ডলার, তার আগেই যদি পুলিশ আমাদের পিছু নেয় তবে এতো পরিশ্রম, এতো সাবধানতা সব পণ্ড হবে। সেই জন্যই আমরা যে ছোট কাজটায় হাত দেবো, সেটা সহজ, সরল, নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া দরকার। আমি কাল রাত থেকেই এ নিয়ে ভাবছি—

সিগারেটে এক জোরালো টান দিলো ব্লেক, দশ নম্বর সড়কের পেট্রল পাম্পটা লুঠ করলে কেমন হয়? ঐ যে, ডুকাস যাবার পথে—

হ্যাঁ, করা যায়। তবে আমি ভাবছিলাম আরও নির্জন কোনো জায়গার কথা—মানে ঠিক বড় রাস্তার ওপর কোনোরকম ঝামেলা করতে চাইছি না। আচ্ছা এড, ম্যাডক্স স্ট্রীটের ঐ কাফেটার কথা তোমার মনে পড়ছে। যেটা সারারাত খোলা থাকে—?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

আমি ওটার কথাই মনে মনে ভাবছি। রাত্রিবেলা থিয়েটার সিনেমার শেষে বেশীরভাগ লোকই ঐ কাফেটায় যায়। আর পকেট তাদের ভারীই থাকে। কাজটায় কোনো উটকো ঝামেলার ভয় নেই।

আমতা আমতা স্বরে ব্লেক বললো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, কাজটা কি সত্যিই খুব সহজ? আমার তো তা মনে হয় না? হঠাৎ যদি কোনো খদ্দের অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে ওঠে, তাহলে?

মরগ্যান ধূর্ত হাসি হাসলো, তাহলে তো খুব ভালো হয়, আমরা আসল কাজের মহড়া দিয়ে নিতে পারবো। কারণ তুমি ভালোভাবেই জানো, টমাস এবং ডার্কসন—ওরা দুজনেই খোলা রিভলবারের সামনে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে—। তাছাড়া জিনিকেও একটু পরীক্ষা করা যাবে।

তার মানে মেয়েটা এ কাজেও আমাদের সঙ্গে থাকবে?

হ্যাঁ। আর থাকবে কিটসন। ওর ওপরে থাকবে গাড়ির দায়িত্ব। রিভলবার নিয়ে তুমি ও আমি কাফের লোকগুলোকে সামলাবো। জিনির কাজ হবে প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকাগুলো আদায় করা—ব্যস!

ব্লেক ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করলো, ট্রাকের ব্যাপারটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু জিপো কি এই কাজেও কোনো গতর খাটাবে না, ফ্র্যাঙ্ক?

শোনো এড, জিপোকে নিয়ে তোমার এই চুকলিপনা বন্ধ করো। এ কাজে জিপোকে আমাদের প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র এজেন্সীর ট্রাকের তালা খুলতে আমরা ওর সাহায্য নেবো। কারণ জিপো ছাড়া আর কারো পক্ষে যে ওই তালা খোলা সম্ভব নয় সেটা তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো। তুমি কি বলো?

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকালো, নিশ্চয়ই। তবে ভাবছি, জিপোর মতো আমিও যদি তালা বিশারদ হতাম তাহলে বেশ পায়ের উপর পা তুলে আরামে দিন কাটাতে পারতাম। যাক গে এবার বলো, ক্যারাভানটা আমরা কোথেকে যোগাড় করছি?

শুনেছি মার্লোয় একটা দোকান আছে, যারা ক্যারাভান বিক্রি করে। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমি কিটসন আর জিনিকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো। ওরা গিয়ে স্বামী স্ত্রী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবে। বলবে, মধুচন্দ্রিমা কাটানোর জন্য একটা ক্যারাভান ওদের দরকার।

ব্লেক হাসলো, কিটসনের দিকে নজর রেখো ফ্র্যাঙ্ক। ও যেন এই মধুচন্দ্রিমার ব্যাপারটাকে আবার সত্যি বলে না ভাবে।

মরগ্যান খিঁচিয়ে উঠলো, এক কথা বার বার বলা আমি পছন্দ করি না এড। এমনিতেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই। তা সত্ত্বেও যদি কেউ জিনির ব্যাপারে কৌতূহল দেখাতে চায় তবে ভুল করবে। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি ; কোনোরকম লক্কাবাজি আমি বরদাস্ত করবো না। কিটসন আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট। সুতরাং সদ্য-বিবাহিত স্বামীর ভূমিকায় সে-ই অভিনয় করবে। তবে সেটা কেবলমাত্র অভিনয়, তার বেশী কিছু নয়। আর আলেক্সের মাথায় যদি এই ব্যাপারটা না ঢোকে তবে সবার আগে ওকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

ব্লেক বললো, কিন্তু জিনি? তুমি কি এ সম্বন্ধে ওকে সাবধান করে দিয়েছো? বলেছো, ওকে কিভাবে সংযত হয়ে চলতে হবে?

চাপা হিংস্রস্বরে মরগ্যান উত্তর দিলো, আমি জানতাম একসময় কথাটা উঠবে। আমি যখনই জিনিকে দেখেছি, তখনই জানি, তোমরা তিন ভেড়ুয়া ওর পেছনে লাগবে। সেইজন্য প্রথম দিনই ওকে আমি বলেছি, কোনোরকম ছেনালিপনা দেখলেই সোজা তাড়িয়ে দেবো। আমার কথা শুনে ও কি বলেছিলো জানো? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আমার শুধু টাকার দরকার। অতএব তোমার পেয়ারের কুত্তাদের তুমিই সামলাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, টাকা ছাড়া মেয়েটা কিছুই বোঝে না। কিটসন যদি মেয়েটাকে নিয়ে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে চায়। তবে ও নিজেই বিপদে পড়বে। তোমার আর জিপোর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবেনা। সুতরাং মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দাও।—এবারে আশা করি কথাগুলো তোমার মাথায় ঢুকেছে?

জোরালো গলায় ব্লেক হাসলো, নিশ্চয়ই। আমারও মনে হয় এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মরগ্যানের শীতল, সরু পাঁচটি আঙুল আঁকড়ে ধরলো ব্লেকের কব্জি। চমকে উঠে সে তাকালো মরগ্যানের কালো হায়না চোখে।

মরগ্যান নরমস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, আমি ঠাট্টা করছি না, মিস্টার এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার ছকে বাঁধা অন্ধকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এই একমাত্র সুযোগ। তুমি যদি ভেবে থাকো একটা বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে লেপটা-লেপটি করে আমার পরিকল্পনার ফাটল ধরাবে—তবে মনে রেখো, যদি আমি দেখি, তোমার রিপু সংক্রান্ত দুর্বলতার জন্য আমাদের এই সুবর্ণসুযোগ নষ্ট হতে যাচ্ছে, তখন তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো। মনে কোরো না, তোমার, জিপোর বা কিটসনের যৌন তাড়নার জন্য আমি আমার ভবিষ্যতের গোড়ায় কুড়ুল মারবো। আমার কথা বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হচ্ছে না?

ব্লেক শুকনোমুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, তোমার হলো কি, ফ্র্যাঙ্ক? আমি এমনি ইয়ার্কি করছিলাম।

ব্লেকের দিকে সামান্য ঝুঁকে মরগ্যান তামাকের গন্ধভরা নিশ্বাসের ঝাপটা মারলো, ইয়ার্কিই যেন হয়!

এক দীর্ঘ উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতা। দুজনের স্থির কঠিন দৃষ্টি—পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ। অবশেষে পরিস্থিতি হালকা করার উদ্দেশ্যে ব্লেক বলে উঠলো, তোমার কি মনে হয় এই গাড়িটা ক্যারাভানটাকে টানতে পারবে?

পারতেই হবে—অবশ্য ক্যারাভানটা যে ভারী হবে না তা আমি বলছি না। তবে রাস্তাও খুব একটা উঁচু নীচু নয় যে ক্যারাভানটাকে টেনে নিয়ে যেতে গাড়িটার অসুবিধে হবে। শুধু প্রথম তিরিশ-চল্লিশ মিনিট আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই অকুস্থল থেকে যতোটা দূরে যাওয়া যায় আমাদের সরে পড়তে হবে। তারপরে আর ভাবনার কিছু নেই।

আসল কাজের দিন দুয়েক আগে কোনো একটা পার্কিং করা গাড়ি লোপাট করলেই হবে। তুমি দুটো নকল নাম্বার-প্লেট আগে থাকতেই তৈরী করে রেখো, আর জিপোর কাজ হবে চোরাই গাড়িটার রঙ পাল্টে নতুন রঙ লাগানো। জিনি যখন গাড়িটা চালাবে, তখন যেন ওটা চোরাই গাড়ি বলে কোনো পুলিশের চোখে ধরা না পড়ে।

ব্লেক হঠাৎ কনুই দিয়ে মরগ্যানের পাঁজরে একটা খোঁচা মারলো। মরগ্যান চমকে তাকাতেই দেখে ট্রাকটা আসছে—

আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সীর চওড়া কাঠের দরজা হাট করে খুলে গেলো।

মরগ্যান আর ব্লেক আগে ট্রাকটাকে কখনও স্বচক্ষে দেখেনি। ওরা ট্রাকের প্রতিটি অংশের ছবি নিঁখুত করে মনে এঁকে নিলো।

ব্লেক ভেবেছিলো এই অদ্ভুত যুগান্তকারী জিনিসটা বেশ বড় সড়ই হবে। কিন্তু ওটার, ক্ষুদ্র আকৃতি ওকে অবাক করলো। চারটে চাকার ওপর বসানো একটা ছোট্ট, ইস্পাতের বাক্স—আব তার সামনে ড্রাইভারের কেবিন—ব্যস। টমাসের হাতজোড়া স্টিয়ারিংয়ের ওপর সহজ অথচ পেশাদারী ভঙ্গীতে আলতো করে রাখা, চোখের সতর্ক দৃষ্টি সামনের রাস্তার ওপর। টমাসের পাশেই টান টান হয়ে মাইক ডার্কসন বসে।

আস্তে আস্তে ট্রাকটা রাস্তার ওপবে নেমে এলো। মরগ্যানও তার গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করলো। এমনিতেই রাস্তাটায় হাজারো গাড়ির জটলা। অনেক চেষ্টায় মরগ্যান চলন্ত ট্রাকটার কাছাকাছি এগিয়ে গেলো—মাঝখানে শুধু দুটো গাড়ির ব্যবধান।

ভেবেছিলাম ট্রাকটা অনেক বড় হবে, কথা বলতে বলতে ব্লেক উঁচু হয়ে সামনের লিংকন গাড়িটার বাধা কাটিয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করলো—। দেখে তো জিনিষটাকে খুব একটা শক্ত পোক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

মরগ্যান হাসল, তাই নাকি? তোমার মতো অনেকেই ট্রাকটার এই ছোট আকার দেখে ভুল করে।

রাস্তা একটু ফাঁকা হতেই অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় মরগ্যান লিংকন গাড়িটার পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। এবারে ট্রাকের পেছনটা ওরা পরিষ্কার দেখতে পেলো, কারণ মরগ্যানের বুইক আর ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাকের মধ্যে এমন ব্যবধান শুধু একটা হুড খোলা স্পোর্টস কার।

ট্রাকের পেছনের দরজায় ছাপা হরফে লেখা ঃ

দি ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক সার্ভিস—

আবিষ্কারের জগতে এক নতুন আলোড়ন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে নিরাপদ ট্রাক আপনার সামনে উপস্থিত। মূল্যবান জিনিষপত্র পরিবহনের দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে এলো ব্লেকের।

মরগ্যান হঠাৎ বলে উঠলো, ডানদিকে দ্যাখো?

ব্লেকের বিবর্ণ চোখ ডানপাশে ফিরে তাকালো।

একজন দ্রুতগামী পুলিশ মোটর বাইক নিয়ে গাড়ির ভীড় কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে অপসৃয়মান ট্রাকের দিকে।

মরগ্যান বললো, এবার কেটে পড়াই ভালো। এই শালা এখন থেকে শহরের শেষ পর্যন্ত ট্রাকটার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকবে। আর আমরা যদি এখুনি ঐ ট্রাকের পিছু না ছাড়ি, তবে ঐ মোটর বাইকওলা সন্দেহ করবে।

মরগ্যান গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লো।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাকটা শেষবারের মতো ব্লেকের চোখে পড়লো—তার পাশাপাশি সেই দ্রুতগামী পুলিশ অফিসার এগিয়ে চলেছে।

মরগ্যান সামনে একটা গাড়ি রাখার জায়গা দেখে বুইকটা থামালো, যাক, ট্রাকটা তাহলে তোমার দেখা রইলো—

তা রইলো, কিন্তু তাতে সুবিধে হলো বলে তো মনে হয না। শুধু একটা ইস্পাতের বাক্স—ব্যস। ওহ্—হো, তুমি সময়টা লক্ষ্য করেছিলে তো। কখন ট্রাকটা এজেন্সী ছেড়ে বেরোলো?

মরগ্যান একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, হ্যাঁ। ঠিক আটটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে। এখন থেকে মোটামুটি তিনঘণ্টা পরে ট্রাকটা সেই বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, জিপো আর কিটসন এই গরমে ঝোপের পিছনে বসে গলদঘর্ম হয়ে ট্রাকটার অপেক্ষা করছে।

তুমি ঠিকই বলেছো, ফ্রাঙ্ক। কাজটা যে বড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তবে একেবারে সোজা নয়। এর জন্য আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

যদি ভাগ্য সহায় থাকে। তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভালো কথা—এখন একবার সেই কাফেটায় গিয়ে চোখ বুলিয়ে আসতে হবে। কারণ ওটা লুঠ করার পর আমরা কোন রাস্তা দিয়ে পালাবো সেটা আগে থাকতেই দেখে রাখা দরকার।—শোনো এড, এই ছোট কাজটায় আমাদের কোন রকম ভুল করলে চলবে না। এর ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

শুধু এটা কেন, আসল কাজেও আমাদের কোনো গলতি হবে না। এখন থেকে আর কোনো ভুল নয়।

মরগ্যান মাথা নাড়লো। তারপর গাড়ি সামনের রাস্তায় ছুটিয়ে দিলো—।

এদিকে কিটসন আর জিপো সাড়ে এগারোটার কিছু পরে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছলো। রিসার্চ স্টেশন থেকে বাঁকটার দূরত্ব মাইল দুয়েক হবে। কিটসন গাড়ি থামাতেই জিপো নেমে পড়লো। ঝরঝরে লিংকনটা চালিয়ে কিটসন আশ্রয়ের খোঁজে চললো। তারপর ধীরে ধীরে আবার পা বাড়ালো বাঁকের দিকে—যেখানে জিপো অপেক্ষা করছে।

কিটসনের কাছে সূর্যের প্রখর রোদের তাপ অসহ্য বলে মনে হলো। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘামতে শুরু করলো।

কিটসনের পরনে বুক খোলা গাঢ় নীল রঙের শার্ট আর আঁটোসাঁটো কালো প্যান্ট। এতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকার পর হাত পা ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে তার ভালোই লাগলো। সে ধুলো ভরা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো।

কিটসন বাঁকটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কৌতূহল ভরে জায়গাটা দেখতে লাগলো।

হঠাৎ রাস্তাটা সোজা এসে এই জায়গায় খানিকটা সরু হয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে পড়ে রয়েছে দুটো বিশাল পাথর, সম্ভবতঃ দুপাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তায় গড়িয়ে এসেছে। পাথরগুলো যেন ঝোপঝাড়ে ঢাকা—অর্থাৎ গা ঢাকা দেওয়ার পক্ষে চমৎকার জায়গা।

কিটসনের হঠাৎ খেয়াল হলো, জিপোর যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানে সে নেই। কিন্তু একটা হালকা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিলো, আশেপাশেই সে কোথাও লুকিয়ে আছে—কিটসনকে লক্ষ্য করছে।

কিটসন খুশীই হলো। জিপোর মতো কোনো স্থূলকায় লোকও যে এতো নিখুঁতভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এলো।

কিটসনের প্রথম থেকেই এই কাজে আপত্তি ছিলো। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক ওর সমস্ত সাহসকে শুষে নিচ্ছিলো। ওর বার বারই মনে হয়েছে, টমাস অথবা ডার্কসন কিছু একটা গণ্ডগোল না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

গত ছমাস ধরে বক্সিং ছাড়বার পর থেকে কিটসন মরগ্যানের কাছেই রয়েছে। কিটসনের শেষ লড়াই ছিলো একজন বেঁটে খাটো অনামি মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু এমনই অদ্ভুত ব্যাপার সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই ক্ষিপ্র, খর্বকায় ব্যক্তিটি কিটসনের মতো নওজোয়ানকে রিংয়ের ভেতর একেবারে তুলোধোনা করলো।

টমাস [illegible]সন যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হার স্বীকার করবে না তা কিটসন জানে ; বরং রিভলবার চালাবার চেষ্টা করবে—হয়তো কেউ মারাও পড়বে। আর তারপর যদি কিটসন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে বিশ বছর জেল নয়তো সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার।

আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে জিনির মতো করে কিটসনের সঙ্গে কথা বলেনি, এমন অদ্ভুতভাবে কোনদিন কেউ তাকায়নি। মেয়েটার এই বিশেষত্বই মুগ্ধ করেছে কিটসনকে। এমন কি প্রথম সাক্ষাতের নেশাটুকুও সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার চোখের সামনে ভাসছে জিনির একরাশ তামাটে চুলের জলছবি। ওর সাগর সবুজ চঞ্চল চোখ জোড়া—

অর্থাৎ জিনির জন্য কেবলমাত্র জিনির জন্যই সে এই কাজে মরগ্যানকে সমর্থন করেছে। কিটসন জানে, এই দুঃসাহসের পরিণতি তেমন মধুর হবে না ; হয়তো চরম পরিণতির মুখোমুখি

তাকে দাঁড়াতে হবে কিন্তু তবুও সে পিছিয়ে আসতে পারছে না। পারছে না জিনির উপহাসের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

কিটসন জিপোকে খুঁজলো চারদিকে চেয়ে আরো একবার, কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেলো না।

জিপো, ঠিক আছে—এবারে বেরিয়ে এস। কিটসন উঁচু গলায় ডেকে উঠলো।

জিপো একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। কিটসনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ালো, লুকিয়েছি কিরকম বলো? এক্কেবারে হাপিস! তুড়ি বাজিয়ে এক অদ্ভুত ইশারা করলো জিপো।

জিপোর কাছে কিটসন এগিয়ে গেলো।

একটা লুকোবার জায়গা বটে! উবু হয়ে জিপোর পাশে বসে জায়গাটা দেখতে লাগলো সে, তারপর একপলক হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা এসে পড়বে—যদি অবশ্য রাস্তায় কোথাও না থামে।

মাটির ওপর জিপো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ওপরের নীল আকাশের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলো।

আলেক্স, নীল আকাশের দিকে তাকালেই আমার দেশের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, সেখানকার আকাশ যেন এর চেয়েও সুন্দর, এর চেয়েও নীল।

জিপোর দিকে কিটসন তাকালো। জিপোকে তার ভালো লাগে!

জিপো, কোথায় দেশ তোমার?—কিটসন উপুড় হয়ে শুয়েছিলো। অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে সে সামনের রাস্তার দিকে দেখলো।

ফিসোলে, ইটালির ফ্লোরেন্সের কাছাকাছি। মুখে গভীর চিন্তার ভাব ফুটিয়ে জিপো বললো, তুমি কোনোদিন ইটালিতে গেছো, আলেক্স?

উঁ—হুঁ—

যাওনি? গেলে বুঝতে পারতে পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর দেশ আর নেই।

কিটসন ভাবলো—যদি না মারা যাও। যদি না জাহাজে ওঠার আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়ো।

কিটসনের দিকে জিপো খুশীভরা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, তোমার টাকা নিয়ে কি করবে ভাবছো? কিভাবে খরচ করবে ঠিক করেছো?

জিপোর কথা শুনে কিটসনের মনে হলো সে যেন কোনো অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে।

আমার মনে হয় টাকাটা হাতে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা ভালো। সাত তাড়াতাড়ি এতো সব পরিকল্পনা করার মানে হয় না। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরা হেরে গেলাম—তখন সমস্ত স্বপ্ন এক ঝাপটায় মিলিয়ে যাবে।

অস্বস্তিভরে জিপো বললো, একটা কথা কি জানো আলেক্স। জীবনে স্বপ্ন দেখাটাই সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। জানি, সে স্বপ্ন হয়তো কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না। কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখায় এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমি সব সময় আসন্ন ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ভাবতে ভালবাসি। এ আমার বহু বছরের স্বভাব। স্বীকার করছি, আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, কিন্তু এবারের কথা আলাদা। দু লক্ষ ডলার........এতো টাকা কিভাবে খরচ করবো ভেবেই পাচ্ছি না।

কাঁধ ঝাঁকালো কিটসন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আসল কথাটা কি জানো? টাকাটাই আমরা এখনও হাতে পাইনি, বলে হাসলো।

জিপো শুকনো মাটি মুঠো করে তুলে হাত মেলে ধরলো। তার মোটা সোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধুলো ঝরে পড়লো। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি প্রথমেই গাড়ি কিনবে। বলো আলেক্স ঠিক বলেছি কিনা? আমি জানি। তুমি গাড়ি চালাতে ভালোবাসো। তোমার মতো গাড়ি চালাতে আমি আর কাউকে দেখিনি। সুতরাং প্রথমেই তোমার একটা স্পোর্টসকার কেনা উচিত। তারপর খুঁজেপেতে নিজের জন্য একটা সুন্দরী বউ যোগাড় করো—বাকি জীবনটা সুখে কাটিয়ে দাও। আচ্ছা, জিনিকে তোমার কেমন লাগে বলো তো? দারুণ দেখতে, না? একটা কথা আলেক্স—

ইটালীর মতো জায়গাতেও জিনির মত সুন্দরী কমই আছে। তবে মেয়েটা আমার তুলনায় বড্ড বাচ্চা, না হলে ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতাম। তোমার সঙ্গে জিনিকে কিন্তু দারুণ মানাবে। আলেক্স, ওর রুক্ষ ব্যবহারকে তেমন আমল দিও না। ও সবই উপর উপর। তুমি যদি ওর হৃদয়ে পৌঁছতে পার, তবে দেখবে ওর ভেতরটা আর সব মেয়ের মতোই সুন্দর নরম। আমার তো মনে হয়, তোমাকে ও কিছুতেই ফেরাতে পারবে না!

চুপচাপ কিটসন শুনলো। উন্মুক্ত ঘাড়ে উত্তপ্ত সূর্যের পরোক্ষ স্পর্শ অনুভব করলো। জিপো ছাড়া অন্য কেউ যদি তাকে এ ধরণের কথা বলতো, তাহলে মোটেই আমল দিত না। কিন্তু জিপো একেবারেই তার মনের কথা বলেছে। কথাগুলো হয়তো ঠিক।

আলেক্স, আমার কাছে একটা কথার খোলাখুলি জবাব দাও তো? তুমি সত্যি সত্যি কি ভাবছো? জিনির কথা?—জানো, তোমার জন্যে মাঝে মাঝে আমার চিন্তা হয়। এই কথায় তোমার হয়তো হাসি পাবে। কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না, আলেক্স। কাল রাতে ফ্র্যাঙ্কের কথায় যখন মনে মনে রাজি হলাম, তখনও আমি তোমার কথা ভেবেছি। আমি জানতাম, আমার মতো তোমারও এ কাজে অন্তরের সায় নেই। তুমি এ কাজটা করতে চাওনি, তাই না? আমিও চাইনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই তুমি হঠাৎ মনস্থির করে ফেললে, তুমি রাজী! কেন? আমাকে সোজাসুজি জবাব দাও!

কিটসন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো, আগে বলো তোমার রাজী হওয়ার কারণ কি?

জিপো মৃদু স্বরে বললো, মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে! ও যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ওকে দেখে অবাক হলাম। ওর কথা বলার দৃপ্ত ভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস আমাকে অবাক করলো। আমি যেন নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলাম। ফ্র্যাঙ্কের কাছে যখন কাজটা সম্পর্কে শুনেছি, তখন একেবারে রাজী হইনি। সমস্ত পরিকল্পনাটাকে কেমন খেলো, অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু জিনি এসেই সব ওলট-পালট করে দিলো। মনে হল মেয়েটার পরিকল্পনা নেহাত পলকা নয়। তার ওপর দু লক্ষ ডলারের হাতছানি আমাকে পাগল করে তুললো।

কিটসনের স্বরে অস্বস্তির সুর, হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। মেয়েটার মধ্যে কি যেন একটা আছে। তাই তোমার মতো আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

সে যে জিনির ঘৃণার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে মরগ্যানের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছে, সে কথা কিটসন মরে গেলেও স্বীকার করতে পারবে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে কিনা আমাদের রাজী করিয়ে ছাড়লো। এখন মনে হচ্ছে—আচমকা জিপো নেমে গেলো। চকিতে দেখলো চারপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে।

কি ব্যাপার? কিটসন জানতে চাইলো।

জিপো কান খাড়া করে স্থিরভাবে বসে। কিসের যেন একটা শব্দ হলো না? যেন কিছু একটা চলে বেড়াচ্ছে? সাপ নয়তো, আলেক্স?

সাপ? তো কি হয়েছে? সাপ আমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। কিটসন চাইছিলো জিনি সম্পর্কিত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে। জিনিই এখন তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জিপোর জলহস্তী চেহারা ভয়ে কাঠ। শুকনো গলায় বললো, বলা যায় না; এসব জায়গায় সাপের উপদ্রব থাকতে পারে, আলেক্স। আর এমনিতেই সাপকে আমি খুব ভয় পাই। যেন মনে হলো পাশ দিয়ে কি একটা চলে গেল।

জিপোর নির্দেশিত জায়গায় কিটসন কিছুই দেখতে পেলো না।

আলেক্স, আমার ছোট ভাই সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলো। আমি এইমাত্র যেভাবে শুয়েছিলাম সেও এই ভাবেই শুয়েছিল। আর কোত্থেকে হঠাৎ একটা সাপ এসে ওর মুখে ছোবল মারলো। কোনো ভাবে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ও মারা গেলো।—ওর চোখে মুখে অমানুষিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিলো। এই সাপটা—

জিপো চুপ করে গেলো। কিটসনের রুক্ষ স্বরে ভগবানের দোহাই, জিপো, দয়া করে তোমার বকবকানি বন্ধ করো।

জিপো ঘৃণাভরে কিটসনের দিকে তাকালো।

তোমার ভাই যদি এইভাবে সাপের ছোবলে মারা যেতো, তাহলে তুমি আর এধরণের কথা বলতে না, আলেক্স। আমার ছোট ভাইয়ের সেই করুণ মৃত্যুর কথা কি আমি ভুলতে পারবো? কেন জানি না, তারপর থেকেই সাপ দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

কিটসন অধৈর্য সুরে বললো, কোথায় মেয়েটাকে নিয়ে দিব্যি কথা বলছিলাম, আর মাঝখান থেকে তুমি, এই সাপের ব্যাপারটা টেনে আনলে।

না, আমার মনে হলো যেন কিসের একটা শব্দ, তাই—

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে—মেনে নিচ্ছি তুমি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছো। কিন্তু তাই বলে ধরে নিলে ওটা সাপ। তোমার কল্পনার বলিহারি—হুঁ...।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো জিপো, কিন্তু বহুদূরে চলন্ত ধুলোর মেঘ চোখে পড়ায় চুপ করে গেলো। কিটসনের কাঁধে হাত রেখে আঙুল তুলে ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে দেখালো।

ওরাই আসছে বলে মনে হচ্ছে না?

সুদূরপ্রসারী আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে কিটসন চেয়ে রইলো। একটা জমাট আতঙ্কের পিণ্ড তাকে শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইলো।

সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে জিপোকে নীচু হতে বললো, জিপো তার চাপা উত্তেজিত ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লুকিয়ে পড়ো! ওরাই আসছে।

ওরা নিশ্চলভাবে পড়ে থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা ট্রাকটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

সামনের একটা বাঁকে ট্রাকটা মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওদের অপলক চোখের সামনে আবার হাজির হলো। ওরা লক্ষ্য করলো, এবারে ট্রাকটার গতি যেন বেশ কিছুটা কমে গেছে। সম্ভবত, বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছে ওরা কোনোরকম দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ট্রাকটা ওদের অতিক্রম করার সময় কিটসন হাতঘড়িতে সময় দেখলো।

হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ট্রাকটা বেরিয়ে যাবার সময় পলকের জন্য ওরা দেখতে পেলো টমাস এবং ডার্কসনকে।

জিপো চলন্ত ট্রাকের ছবিটা মনের পর্দায় খোদাই করে উঠে বসলো।

একটা বাঁকের আড়ালে ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ধুলোর মেঘ থেকে চোখ সরিয়ে অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে তাকালো।

জিপো গাল চুলকিয়ে বললো, একটা ট্রাক বটে। কিন্তু লোক দুটোকে দেখেছো? যেন শয়তানের চ্যালা!

চলন্ত ট্রাকে বসে থাকা টমাস ও ডার্কসনকে কিটসন বেশ ভালো ভাবেই দেখতে পেয়েছে। সে ওদের দুজনকেই চেনে। তাই মরগ্যানকে বার বার সে সাবধান করে দিয়েছে। এখন ওদের দেখার পর কিটসনের সেই পুরোনো ভয়টা আবার ফিরে এলো। উইন্ডস্ক্রিনের ও-পিঠে বেজির চোখ নিয়ে বসে থাকা টমাস ও ডার্কসনের ছবি তার মনে টেনে দিলো আতঙ্কের পর্দা। কিটসনের মনে পড়লো, আর কিছুদিনের মধ্যেই ওদের সামনে তাকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে দাঁড়াতে হবে: কেউ যেন একমুঠো বরফ-কুঁচি ছড়িয়ে দিলো তার মস্তিষ্কে।

কিটসন সহজ হবার চেষ্টা করলো, তুমি কি জন্য ভয় পাচ্ছো, জিপো? তোমাকে তো আর ওদের সামনে আসতে হচ্ছে না! আর তাছাড়া, আমরাই কি কম নাকি? ওরা যদি শয়তানের চ্যালা হয়, তবে আমরাও অমানুষের অনুচর!

অস্বস্তিভরে জিপো মাথা নাড়লো। ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না ভেবে আমি সত্যিই হালকা বোধ করছি।...ওরা নেহাত সহজ লোক নয়!

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কিটসন তাতে ট্রাকের বিপজ্জনক বাঁক অতিক্রম করার সময়টা টুকে নিলো।

কিটসন বিরক্তিভরে জবাব দিলো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। মরগ্যান আর ব্লেকই ওদের সামলাবে।

কিন্তু জিনি? ওর কথাটা ভেবে দেখেছো? ওইটুকু একটা মেয়ে সে বলে কিনা দরকার পড়লেই গুলি চালাবে। আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না। তোমার কি মনে হয় ও সত্যি সত্যিই তাই করবে?

এই কথাটাই কিটসনও ভাবছিলো। জিনি সত্যিই কি তা পারবে! সে যেন দেখতে পেলো জিনির অতলান্ত সবুজ চোখ। উৎকণ্ঠাময় অভিব্যক্তি।

কিটসন ঠোঁট উল্টে বললো, কি জানি? যাকগে, এবার চলো, সে উঠে বসে রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নিলো।—কিন্তু জিপো, ট্রাকটা তুমি খুলতে পারবে তো?

ফ্র্যাঙ্ক তো বলছে, ট্রাকটা খুলতে আমাকে তিন-চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে তো ভাবনার কোনো কারণই নেই। যন্ত্রপাতি আর সময় ঠিক মতো পেলে আমি খুলতে পারবো না এমন তালা তৈরী হয়নি।

ফ্রাঙ্ক সেই কথাই বলছিলো। কিন্তু মনে করো যদি কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়? যদি তোমাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে ট্রাকের তালা ভাঙতে বলা হয় তাহলে কি তুমি পারবে, জিপো?

অস্বস্তির ছায়া পড়লো জিপোর মুখে, এ কথা কেন বলছো, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্ক তো আমাকে কথাই দিয়েছে তিন চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে আর ভয় কি? এতদিন ধরে তো দেখছি আজ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কের কথার কোনো নড়চড় হয়নি! তোমার তালা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলেও বেশ বুঝতে পারছো এই ট্রাকটা খোলা ছেলেখেলার কথা নয়।

কিটসন এগিয়ে চললো গাড়ির সন্ধানে, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।

কিটসনের দিকে জিপো চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ভাবলো জিনির কথা, ওর প্রতিটি ভাবভঙ্গী। কিটসনের সঙ্গে ওর কথা বলার ধরন ; শেষ পর্যন্ত জিপো, নিশ্চিন্ত বোধ করলো।

এই কাজটা নিয়ে এতো আলোচনার কি আছে? —সে ভাবলো। সূর্যের অসহ্য উত্তাপ অনুভব করলো। ফ্র্যাঙ্ক যখন ওদের আশ্বাস দিয়েছে, তখন আর কোনো ভয় নেই। তার ওপর ঐ পুঁচকে মেয়েটা যেন ধরেই নিয়েছে, দু লক্ষ ডলার ওর হাতের মুঠোয়। তাছাড়া এ কাজে জিপোর ভূমিকা খুব একটা বিপজ্জনক নয়। তাকে শুধু ট্রাকের তালাটা খুলতে হবে। আর ফ্র্যাঙ্ক যখন বলেইছে, ওকে তিন-চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে তখন আর চিন্তার কি আছে? তালা এবং বিভিন্ন ধাতু সম্বন্ধে যাদের একটু অভিজ্ঞতা আছে, তারা ঐ সময়ে যে কোনো তালাই খুলে ফেলতে পারবে—তা সে যতো শক্তই হোক!

নিঃশব্দে ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এগিয়ে চলেছে রিসার্চ স্টেশনের দিকে। তার চালক অথবা রক্ষী, কেউই জানতে পারলো না চারজোড়া অনুসন্ধানী চোখ তাদের দৈনন্দিন কর্মপন্থাকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখছে। সাদা ধুলোর কুণ্ডলীকে পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চললো.....।

।। তিন ।।

মরগ্যান রাত আটটায় একটা আলোচনা সভা ডেকেছিলো লু স্ট্রাইগারের জুয়ার আড্ডায়। কিন্তু ব্লেক পৌঁছে গেলো নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই—সাতটা পঁয়তাল্লিশে। অবশ্য তেমন কিছু নয়। নেহাত তার ঘড়িটা বেয়াড়া সময় দিচ্ছিলো বলেই।

ব্লেক বার-এর লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো। ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। অনেক পরিশ্রমের পর সে স্ট্রাইগারকে দেখতে পেলো। লালমুখো, মোটা লোকটা জুয়ার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে।

ব্লেক প্রশ্ন করলো, কেউ ভেতরে গেছে নাকি, লু?

উহঁ। দরজা খোলাই আছে। স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।

আচ্ছা, আমাকে একটা স্কচ খাওয়াও দেখি।

ব্লেক স্ট্রাইগারের এগিয়ে দেওয়া গেলাসটাকে দু চুমুকে শেষ করে নামিয়ে রাখলো। কোণার একটা টেবিলের দিকে আনমনাভাবে এগিয়ে টুপিটাকে পেছন দিকে ঠেলে বসে পড়লো। টাইয়ের নটটাকে সামান্য আলগা করে গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে।

একমুহূর্তের জন্যও অস্বাচ্ছন্দ্য আর ভাবপ্রবণতা ব্লেকের মন থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্কের ঐ রেস্তোরাঁ লুঠের ব্যাপারটাই তাকে ভাবিয়ে তুলেছে—জিনির চিন্তা তো আছেই।

ব্লেকের জীবনটা অন্য তিনজনের মতো অতোটা জটিল ছিলো না, বরং প্রচুর সুখ-সুবিধে ছিলো। ব্লেকের বাবা ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। তার ইচ্ছে ছিলো একমাত্র ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করবেন। ডাক্তার করবেন। কিন্তু এতো সুখে থেকেও পড়াশোনার ব্যাপারটা ব্লেকের কাছে বড়

একঘেয়ে মনে হলো। তাই মেডিকেল কলেজে বছর দুয়েক কাটানোর পরই সে পড়াশোনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলো। অনেক কষ্টে ব্রেক একটা চাকরী জোগাড় করলো কমিশনে গাড়ি কেনা-বেচার কাজ, এবং একই সঙ্গে সে আবিষ্কার করলো নারী সঙ্গ তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই আয়ের চেয়ে বিভিন্ন পথে ব্যয়ের পরিমাণই বেশী হতে লাগলো। অবশেষে একদিন সে বুঝতে পারলো পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝায় তার শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে। তখনই কোম্পানির সিন্দুকে ব্রেক হাত লাগালো। সিন্দুক থেকে চার হাজার ডলার সরিয়ে সে চম্পট দিলো। সে ধরা পড়ল, তার জেল হল। ব্রেকের বয়স তখন মাত্র বাইশ। পরেও যে ব্রেক আর জেল খাটেনি, তা নয়। তাকে আরো দুবার যথাক্রমে তিন চার বছরের জন্যে জেলে যেতে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ব্রেকের মনে জেল সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ঘৃণা এবং আতঙ্ক গড়ে উঠেছে।

শেষ বার যখন সে চার বছরের শাস্তি ভোগ করছে, তার দেখা হয় মরগ্যানের সঙ্গে—ঐ জেলেই। তখন মরগ্যান তার পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শেষ বছরটি কোনরকমে কাটাচ্ছে। কিন্তু পনেরো বছর জেলের কথা শুনেই ব্রেক কেঁপে উঠেছে।

একই সঙ্গে ওরা জেল থেকে ছাড়া পেলো। ছাড়া পাওয়ার পর মিলে মিশে দল বাঁধার প্রস্তাবটা মরগ্যানই রাখলো ব্রেকের কাছে। ব্রেক রাজী হলো।

ব্রেকের রাজী হওয়ার অন্যতম কারণ গোলমেলে লাইনে মরগ্যানের খ্যাতি। জেলে থাকতে অনেকের মুখেই শুনেছে। আজ হোক কাল হোক মরগ্যান একটা মোটা দাঁও মারবেই। এবং তারপরই সে একজন কেউকেটা হয়ে বসবে। সুতরাং মরগ্যানের প্রস্তাবে রাজী হতে দ্বিধা কি?

পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনের দিকে পেছনে তাকিয়ে ব্রেকের সামনে ধরা পড়েছে শুধু হতাশা আর ব্যর্থতার ইতিহাস। ভবিষ্যতের বিবর্ণ রূপও তার অজানা ছিলো না। তাই জীবনের প্রথম এবং শেষ জুয়ায় সে বাজি ধরেছে। ভবিষ্যতের রং বদলের চরম চেষ্টা না করে সে হার মানতে রাজী নয়। তার মনে হয়েছিল মরগ্যানই তাকে নিয়ে যাবে ঐশ্বর্যের রাজপথে। যে পথে কানাগলির আকারহীন বীভৎস স্মৃতিদের প্রবেশের অধিকার নেই।

ব্রেক একা একা বসে স্বপ্নের জাল বুনে চললো। ভাবতে লাগলো দু-লক্ষ ডলারের কথা। অতো টাকা নিয়ে কি করবে সে? দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে? ব্রেকের মন স্বপ্নের পাখায় উড়ে চললো। ওর চোখের সামনে রঙীন পর্দায় ভেসে উঠলো দেশ-বিদেশের সুন্দরী তরুণীদের ছবি, যাদের সুখ সঙ্গের জন্য সে পাগল। বেশ কিছুদিন খোঁজ করার পর সে যাবে মন্টি কার্লোয়। সেখানে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে আরো কিছু টাকা হাতাতে হবে। তারপর.....

এমন সময় সমস্ত স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে জিনি গর্ডন উপস্থিত হলো তার সামনে। ও এগিয়ে গেলো। উদ্ধত চিবুক, চোখের ভাষায় তাচ্ছিল্য, বারের অন্যান্য মধু-পিয়াসীর দল জিনিকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, চোখ টেপাটেপি করতে লাগলো। লু-স্ট্রাইগার তার জুয়ার আড্ডায় নারী সংক্রান্ত কোনোরকম আঠালো ব্যাপার পছন্দ করে না। নইলে বার-এ ঢোকার পর জিনির কি অবস্থা হতো বলা মুশকিল।

ব্রেক ভাবলো একটা জিনিষ বটে। জিনির শরীরে তার চোখ জোড়া আটকানো। গোপন আলোচনার জন্য লু-স্ট্রাইগারের কয়েকটা বিশেষ ঘর আছে। সেগুলো সে মোটা টাকায় খদ্দেরদের ভাড়া দেয়। বার থেকে বেরিয়ে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি নামলেই ঘরগুলো পড়ে। ব্রেক লক্ষ্য করলো জিনি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

আঁটো সাঁটো কালো নাইলনের স্ল্যাক্স জিনির পরনে, আর শ্যাওলা সবুজ শার্ট—গলার কাছটা সামান্য খোলা।

কিন্তু মেয়েটাকে বশ করা বড় কঠিন। ব্রেক আপন মনেই বললো। কোথায় থাকে, কি করে, কে জানে। তবে ওর সঙ্গলাভের পুরো ইচ্ছে। এখন একটু আধটু মিষ্টি কথা বলে ওকে হাত করে রাখা দরকার। পরে এই ট্রাক ঝামেলা মিটে গেলে জিনিকে নিয়ে একটু ফুর্তি করা যাবে। মেয়েটার মধ্যে প্রাণ আছে। আনন্দ আছে—আর চেহারা তো আছেই।

ব্রেক চেয়ার ছেড়ে উঠলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির দিকে গিয়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে জিনিকে সে ধরে ফেললো।

এই যে জিনি—আমরা দুজনেই তাহলে প্রথমে পৌঁছলাম, কি বলো?—ব্লেকের চোখ খেলে বেড়ানো জিনির আঁটো সাঁটো স্ল্যাক্সের ওপর, ওফ্ ; এটা পরে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

ব্লেকের আপাদমস্তক নিস্পৃহ মনের সবুজ চোখ জিনি দেখে।—তাই নাকি? বলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো, আলোটা জ্বালিয়ে দিলো।

আলো জ্বেলে গোল টেবিলটার কাছে নিয়ে চেয়ারে বসে হাতব্যাগটা খুললো। চিরুনি আর আয়না বের করে অবাধ্য একমাথা তাম্রাভ চুলকে আয়ত্তে আনতে চাইলো।

ব্লেকও একটা চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসলো। প্রশংসাভরা চোখে সে জিনির তরঙ্গায়িত যৌবনের দিকে চেয়ে রইলো।

ব্লেক হেসে বলল ; শুনেছো তো, আজ রাতেই আমরা ছোট কাজটা সারছি। ভয় পেলে নাকি?

জিনি আয়না চিরুনি ব্যাগে ঢুকিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো।

ও নিস্পৃহ স্বরে বললো ভয়, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে?

ব্লেক বললো, তা অবশ্য ঠিক—অন্ততঃ তোমার বেলায়। তুমি ভয় পেয়েছো বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো না।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে ব্লেক লাইটার জ্বালিয়ে ধরলো জিনির ঠোঁটের সামনে।

নীরবতায় কয়েক মুহূর্ত কাটলো। জিনি তারপর মাথা নামিয়ে লাইটারের আগুনে সিগারেটের অগ্রভাগ স্পর্শ করে পলকের জন্য হাসলো।

ব্লেক তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, হঠাৎ হাসবার কি হলো?

জিনির চোখজোড়া জ্বলন্ত লাইটারের ওপর এসে থামলো। ব্লেকও তাকালো। এবং সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, তার হাত থরথর করে কাঁপছে। ব্লেক লাইটার নিভিয়ে কষ্টকৃত হাসি হেসে বলল ঠিকই ধরেছো, জিনি, আমি ভয় পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানো? আজ রাতের ছোট কাজটায় কোনো গোলমাল বাঁধিয়ে আসল কাজটাকে আমরা না কাঁচিয়ে ফেলি। তার ওপর এই রেস্তোরাঁটা লুঠের মতলব আমার ঠিক পছন্দসই নয়। ফ্র্যাঙ্ককে আমি বহুবার বারণ করেছি। বলেছি, এর চেয়ে ডুকাসের ঐ পেট্রল-পাম্পটা কায়দা করা আমাদের অনেক সহজ এবং নিরাপদ ছিলো—কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাছাড়া ভেবে দ্যাখো, এই রেস্তোরাঁর ব্যাপারটায় কোনো খদ্দের হঠাৎই হয়তো অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে উঠতে পারে—তখন? বুঝতেই পারছো, সে ক্ষেত্রে আমাদের গুলি চালানো ছাড়া উপায় থাকবে না। আর সেই গুলিতে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে আসল কাজে হাত দেবার আগেই পুলিশ আমাদের পেছনে লাগবে।

জিনি ব্লেকের চোখে চোখ রেখে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। তাহলে কেউ যাতে না সাহস দেখাতে যায়, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।

কাজ করার চেয়ে মুখে বলা অনেক সোজা।

জিনি ভুরু কুঁচকে বললো, তাই নাকি? ঠ্যাংগার বারিতে ক্ষ্যাপা কুকুরও পোষ মানে, তেমনি রিভলবারের সামনে বীরত্ব দেখালে তার ফল ভাল হয় না, সেটা বেশ ভালো করে প্রত্যেককে সমঝে দিতে হবে। তাহলে আর গোলমালের ভয় থাকবে না।

সংশয়ে ব্লেকের ভুরু কুঁচকে উঠলো, তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, জিনি।.....আচ্ছা, এর আগে কি তুমি কখনো কোনো দলের হয়ে কাজ করেছ?

জিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো, তাহলে আমাকে বোঝবার চেষ্টা কোরো না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লেক বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি নিজেকে পর্দার আড়ালেই রাখতে চাও, রাখো—আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল, আজ রাতের সবচেয়ে কঠিন কাজটা পড়েছে তোমার ওপরেই। অর্থাৎ রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের মানিব্যাগগুলো তোমাকেই যোগাড় করতে হবে। সেই সময়ে কেউ হয়তো বাঁধা দিতে পারে। সুতরাং সাবধানে থেকো।

মনে মনে ব্লেক জিনিকে তার অস্বস্তির অংশীদার করতে চাইলো। কিন্তু জিনির জবাব শুনে অবাক হলো।

জিনি নির্বিকার অভিব্যক্তিহীন মুখে বললো, 'আমার রিভলবারের সামনে সে চেষ্টা কেউ করবে বলে মনে হয় না'।

জিপো এবং কিটসন এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

কিটসন ভীষণ অবাক হলো জিনির সঙ্গে ব্লেককে দেখে, তার মনের চাপা ক্রোধ প্রতিফলিত হলো তার রক্তিম মুখমণ্ডলে।

ব্লেক ঠাট্টার সুরে বললো, এই যে, জামাইবাবু এসে গেছেন দেখছি। এ ব্যথা কিযে ব্যথা, বোঝে কি আন জনে....।

সশব্দে হেসে উঠলো জিপো। তার কালো চোখের তারা খুশিতে নেচে উঠলো। ব্লেকের রসালো টিপ্পনীতে সে দোষের কিছু দেখলো না। কিন্তু কিটসন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো, থামো তোমার ঐ ছাগল-মার্কা রসিকতা পকেটে পুরে রাখো।

চটছো কেন, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্কই তো বললো তুমি আর জিনি.....নব বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সাজতে যাচ্ছো। ক্যারাভানে চড়ে মধু চন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছো।

কিটসন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি তোমাকে থামতে বলছি, এড!

ব্লেক হালকাসুরে বললো, আরে, এতে আপত্তি কিসের? কেন. তুমি কি জিনির সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে রাজি নও? এমনিতে ট্রাক লুঠের ব্যাপারে তোমার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। তার ওপর জিনির মতো একটা চামর যন্তরকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানোর চেয়ে মজা আর কি হতে পারে? অবশ্য সে সময়টুকু তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। মানে....

কিটসন ব্লেকের মুখোমুখি এসে বিদ্যুৎ চমকের মতো তার ডান হাত ঝলসে উঠলো। আধমণ হাতুড়ীর মতো সপাটে ব্লেকের চোয়ালে এসে পড়লো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গোটা ঘরটা যেন কেঁপে উঠলো। ব্লেক চেয়ার সুদ্ধু মেঝেতে উলটে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকার পর সে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকালো।

কিটসনের বিশাল শরীর রাগে কাঁপছে।—ওঠ শালা ভেড়ুয়ার বাচ্চা! তোর সবকটা দাঁতই আজ উপড়ে নেবো।

জিপো ভয় পেয়ে বললো, এই আলেক্স—শোনো! কিন্তু কিটসনের এক ঝটকায় সে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে দেওয়ালে পড়লো। ঘৃণাভরে ব্লেক মাথা ঝাঁকাল বহুদিন ধরে শুধু এই রকম সুযোগের অপেক্ষাই করছিলাম। শালা, এবার তোর বক্সিং করার শখ চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেবো।

ব্লেক দাঁড়াতেই মরগ্যান ঘরে এসে ঢুকলো।

জিপো রুদ্ধশ্বাসে বললো, ওদের থামাও, ফ্র্যাঙ্ক, ওরা এক্ষুনি একটা মারপিট বাধাবে।

দ্রুতপায়ে মরগ্যান এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালো। ব্লেকের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

নম্রস্বরে তিরস্কার করলো মরগ্যান। তার সরীসৃপ কালো চোখ ধক ধক করে জ্বলছে।

ইতস্ততঃ করলো ব্লেক, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। কোটটাকে টেনেটুনে ঠিক করলো, তারপর একটা চেয়ার হ্যাঁচকা টেনে নিয়ে তাতে বসলো। মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চোখ রেখে গালে হাত বোলাতে লাগলো সে।

এবার ফিরলো মরগ্যান কিটসনের দিকে, দলের মধ্যে গোলমাল করাবার চেষ্টা কোরো না, আলেক্স; তাহলে নিজেই গোলমালে পড়বে। এই শেষ, আর দ্বিতীয় দিন তোমাকে আমি সাবধান করবো না। নাও—বোসো।

জিনি এবং ব্লেকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো কিটসন।

অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি জিপো। জিনির পাশে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করলো, তোমার পাশে বসলে কোনো আপত্তি আছে?

উঁহু, স্বচ্ছন্দে বসতে পারো—জিনি মাথা নাড়লো।

জিপো বিব্রত হয়ে হাসলো। বসলো জিনির পাশে।

মরগ্যান ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। ঠোঁটের কোণায় জ্বলন্ত সিগারেট, মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে নামানো।

তাহলে শোনো—মরগ্যান বলতে শুরু করলো, আজ রাত বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় আমরা সেই রেস্তোরাঁটা লুঠ করছি; অর্থাৎ যখন কাফে থাকবে ভিড়ে জমজমাট—এবং হঠাৎ

এসে পড়ে আমাদের কাজ পণ্ড করে দেবে সে সম্ভাবনাও কম। গাড়ির দায়িত্ব থাকবে কিটসনের ওপর। মরগ্যান থামলো, এক পলক দেখলো কিটসনকে, তুমি তো জানো রেস্তোরাঁটা কোথায়! সুতরাং পালাবার পথ খুঁজে নিতে তোমার কোনোরকম অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে আমাদের জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করবে। যদি শেষ পর্যন্ত কাজটা পণ্ড হয়ে যায় তাহলে তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি ছোটাতে হবে—আর কোনো গাড়ি যদি আমাদের অনুসরণ করে, তবে তাকে ঝেড়ে ফেলার ভার আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম, কি বলো?

কিটসন গুম হয়ে বসেছিল। মরগ্যানের কথায় শুধু মাথা হেলালো।

মরগ্যান পায়চারি করতে করতে বললো, জিনি—তুমি, এড এবং আমি—এই তিনজন রেস্তোরাঁয় ঢুকবো। লু আমাকে একটা মেশিনগান ধার দেবে বলেছে। তাছাড়াও তোমার এবং এডের হাতে রিভলবার থাকবে। তুমি আমার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকবে। আমরা ঢুকলেই এড দরজার পর্দা ফেলে দেবে—খোলা রিভলবার হাতে দরজাটা পাহারা দেবে। আমি সোজা গিয়ে দাঁড়াবো বার-এর ওপর—যাতে মেশিনগান দিয়ে গোটা ঘরটাকেই কজ্জা করতে পারি। আশা করি মেশিনগান দেখে কেউ আর চেচাঁমেচি করবে না। যাক, এইভাবে লোকগুলোকে চুপ করানোর পর শুরু হবে তোমার কাজ। অর্থাৎ, প্রত্যেকের মানিব্যাগগুলো তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে। ক্যাশ টাকা ছাড়া আর কিছু আমরা চাই না। কিন্তু এড, সেই সময় যদি কেউ কাফেতে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব তোমার। ঠিকমতো যদি আমরা সব কাজ করতে পারি তাহলে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। মরগ্যান জিনির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কাজটা করার সময় তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মানিব্যাগ তোলার সময় হয়তো কোনো মাতাল আচমকা তোমার রিভলবার কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। আর একান্ত প্রয়োজন না পড়লে আমরা বন্দুক ব্যবহার করবো না।

জিপো আশ্বস্ত বোধ করলো এ কাজে তার কোনো ভূমিকা নেই ভেবে।

কিটসন মনে মনে ধন্যবাদ দিলো তাকে গাড়ির দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। ওঃ, কাফেতে সটান ঢুকে চল্লিশ—পঞ্চাশজন লোককে সামাল দেওয়া নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়। তার নিজের অতোখানি সাহস আছে কিনা সে বিষয়ে কিটসনের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তখনো ব্লেক ভেতরে ভেতরে কিটসনের ওপর রাগে জ্বলেছে। কিন্তু মরগ্যানের কথায় তাঁর মন থেকে কিটসনের চিন্তা একেবারে উবে গেলো। একটা অদ্ভুত শীতল অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার পাকস্থলিটা যেন কুঁকড়ে যেতে চাইলো।

ব্লেক বললো, ঠিক আছে, তুমি যদি এ ভাবেই কাজটা করবে বলে ঠিক করে থাকো তবে আর আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, ওর চেয়ে একটা সহজ কাজ নিলেই ভালো করতাম—এ কাজটা আমার মোটেই পছন্দসই নয়।

পায়চারি থামিয়ে মরগ্যান দাঁড়িয়ে বলল, আমি তা জানি এড। কিন্তু এ কাজটা পছন্দ করার পেছনে আমার কতগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ বড় কাজের আগে এটা আমাদের পরীক্ষা। এই কাজ থেকেই বুঝতে পারবো, আসল কাজের সময় তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগোতে পারবে কিনা। সেই কারণেই এই কাফে লুঠের পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছে—এটা তোমারও পরীক্ষা, জিনি। প্রথম থেকেই তুমি বড় বেশী কথা বলছো। এখন আমি দেখতে চাই তোমার কথার মধ্যে সত্যের পরিমাণ কতটুকু। সেই জন্যেই এ কাজে সবচেয়ে কঠিন কাজটাই আমি তোমার জন্য রেখেছি।

জিনি স্থির চোখে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকো, ফ্র্যাঙ্ক। কাজটাকে তুমি যতটা কঠিন ভাবছো ততোটা কঠিন নয়। আমি ঠিক পারবো।

মরগ্যান হেসে বলল, সময় এলেই বোঝা যাবে। ঠিক আছে, এবার বাকিটা শুনে নাও। কিটসন, তুমি জিপোর গাড়িটা নিয়ে ঠিক বারোটা দশ মিনিটে কাফের সামনে হাজির থাকবে। তোমার ঘড়িটা ঠিক আছে তো? কটা বাজে দেখো তো?

কিটসন হাতঘড়ি দেখে, আটটা কুড়ি।

মরগ্যান নিজের ঘড়ি দেখে, আর আমার ঘড়িতে আটটা বেজে তেইশ মিনিট। লু-র কাছ থেকে

তুমি মেশিনগানটা নেবে। সেটা গাড়ির সীটে রাখবে। তারপর তুমি কাফেতে একাই যাবে। আমি আর এড হেঁটে যাবো। কাফেতে ঢোকার সময় আমি পেছনের সীট থেকে মেশিনগানটা তুলে নেবো। তারপর জিনির দিকে ফিরে, তুমি ম্যাডাম স্ট্রীট ধরে আসবে। কাফের কাছে ঠিক বারোটা দশেই পৌঁছবে—যেন দেরি না হয়। তোমার কাছে ঘড়ি আছে তো?

জিনি সম্মতি জানালো।

ঠিক আছে।...তাহলে আলেক্স, যাবার সময় লু-র কাছে থেকে তুমি মেশিনগানটা নিয়ে যাও। জিপো, তুমি ওর সঙ্গে যাও। দেখো তোমার সাধের পক্ষীরাজ আবার বিগড়ে না যায়। বারোটা বেজে দশ মিনিটে আবার আমাদের দেখা হবে কেমন!

কিটসন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিভরে মরগ্যানের দিকে তাকালো, তারপর জিনিকে দেখলো। হঠাৎ দরজার দিকে এগিয়ে চললো। জিপো তাকে অনুসরণ করলো।

ওরা চলে যেতেই মরগ্যান জিনিকে প্রশ্ন করলো। তুমি ঠিক আছ তো?

জিনি ভুরু উঁচিয়ে, কেন, ঠিক না থাকার কোনো কারণ ঘটেছে না-কি?

মরগ্যান তীক্ষ্ণস্বরে বললো, দেখো, আমার সামনে বেশী বড় বড় কথা বোলো না। এ ধরনের কাজ আমি বহু করেছি কিন্তু তবুও আমি যে একেবারে ভয় পাই না তা নয়। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করো না জিনি। আমি জানতে চেয়েছি—তুমি ঠিক আছো কিনা? এখনো ভেবে দেখো, কাজটা তুমি পারবে কি না?

মরগ্যানের দিকে জিনি হাত বাড়িয়ে ধরলো। ওর সরু আঙ্গুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। নিথর, নিষ্কম্প।

জিনি শান্তস্বরে বললো, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছি? বলেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে মরগ্যানের দিকে চোখ রেখে বললো, বারোটা দশে আমাদের দেখা হবে, তারপর দরজার দিকে চললো, বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে জিনি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো।

ব্লেক ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

মরগ্যান মৃদুস্বরে, কে জানে। অনেক সাহসী লোককেই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আসল কাজের সময়েই আমরা জিনির সত্যিকারের পরিচয় পাবো। আচ্ছা—তাহলে এবার ওঠা যাক।

মরগ্যান এবং ব্লেক রাত ঠিক বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ম্যাডাম স্ট্রীটের মোড়ে এসে উপস্থিত হলো! রাস্তা পার হয়ে একটা অন্ধকার দোকান ঘরের সামনে ওরা দাঁড়ালো। চোখের শ্বাপদ দৃষ্টি প্যালেস অফ নাইট কাফের দিকে।

জানলার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলোর রেখা ভেসে আসছে। কাঁচের দরজার ওপরে অবস্থিত বার-এর একাংশ ওদের নজরে পড়লো।

মরগ্যান সিগারেটের টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিলো, ঐ সেই কাফে!

ব্লেক সচেতন হয়ে বললো, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এ কাজের হাত থেকে রেহাই পেয়ে জিপো মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

মরগ্যান বললো, এবং জিপোকে এ কাজে বাদ দিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে, ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সে সহজ হতে চাইলো, কিটসন গাড়ি নিয়ে হাজির হওয়া মাত্রই আমরা রাস্তা পার হয়ে কাফেতে ঢুকছি।

হুঁ, বলতে বলতেই ব্লেক প্যান্টের পেছন পকেটে হাত দিয়ে ৩৮ রিভলবারের শীতল স্পর্শ অনুভব করলো। এমন সময় সে লক্ষ্য করলো, জিনি ধীরে ধীরে কাফের দিকে যাচ্ছে। ওর পরণে সেই কালো স্ল্যাক্স এবং শ্যাওলা সবুজ শার্ট। কিন্তু ওর তামাটে চুল একটা সবুজ স্কার্ফের আবরণে ঢাকা। রাস্তার স্বল্প আলোয় ওর সৌন্দর্যকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে ওই সবুজ স্কার্ফ, ব্লেক লক্ষ্য করলো।

ব্লেক বললো, ঐ যে জিনি এসে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিপোর ঝরঝরে লিংকনটা কাফের দরজার সামনে এসে থামলো।

চলো এবার যাওয়া যাক। মরগ্যান ব্লেকের আস্তিন ধরে টান মারলো। তারপর দ্রুত লম্বা পা

ফেলে রাস্তা পার হতে লাগলো।

একেবারে নির্জন কাফের সামনে রাস্তাটা। ওদের কানে এলো কাফের জ্যুক-বক্স থেকে ওয়াল্‌স্‌ সঙ্গীতের হালকা সুর।

লিংকনের পাশে গিয়ে থামলো মরগ্যান। চারপাশ দেখে হাত বাড়িয়ে পেছনের সীট থেকে তুলে নিলো মেশিনগানটা।

আলেক্স, প্রস্তুত থাকো উপযুক্ত সময়ের জন্যে, গাড়ির চালকের আসনে বসে-থাকা কিটসনের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো ছুঁড়ে মারলো মরগ্যান, পালাবার সময় এক সেকেণ্ড সময়ও আমি নষ্ট করতে চাই না।

সম্মতি জানালো কিটসন, ওর হাত আঁকড়ে রইলো স্টিয়ারিং হুইলটা।

ইতিমধ্যে ব্লেক রুমাল দিয়ে মুখের নিম্নাংশ ঢেকে ফেলেছে।

তখন জিনি মুখ ঢাকার পর্যায় সেরে কাফের দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

মুখোশ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন অনুভব করলো না মরগ্যান। এ লাইনে থেকে তার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, কাফের কোনো খদ্দেরই পুলিশের কাছে চেহারার সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে না। কারণ আতঙ্কে চিন্তাক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাবে।

এসো, ভেতরে ঢোকা যাক—মরগ্যান বললো। তারপর এগিয়ে জিনির কাছে, তুমি দরজাটা খুলেই পাশে সরে দাঁড়াবে।

নিষ্পলক চোখে মেয়েটা তারই চোখে তাকিয়ে।

মরগ্যান বললো, মেয়েটার নার্ভের প্রশংসা করতে হয়। একটা কচি মেয়ের ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা কখনই সম্ভব নয়! অথচ ;....

মরগ্যান মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

জিনি মরগ্যানকে অনুসরণ করতেই ব্লেক এগিয়ে গেলো দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো সে। পর্দা টেনে দিলো কাঁচের ওপর।

দুজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে ছিলো বার-কাউন্টারে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখলো। প্রথমে নজর পড়লো মরগ্যানের দিকে। তারপর মেশিনগানটার দিকে। এই দৃশ্যে তাদের চোখজোড়া বেরিয়ে আসতে চাইলো। মুখের রং ফ্যাকাশে ভাব। তখনই দেখতে পেলো মুখ ঢাকা জিনিকে।

চিৎকার করে উঠলো মরগ্যান, সাবধান ! পথ ছেড়ে দাঁড়ান আপনারা! তার হাতের মেশিনগান আদেশের ভঙ্গীতে আন্দোলিত হলো।

নিমেষে ঘরের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেলো। মরগ্যানের তীক্ষ্ণস্বর রেশমী কাপড়ে ছুরির ঝলকের মতো কেটে বসলো সেই জমাট নিস্তব্ধতার ওপর।

বুড়ো লোকদুটো পেছোতে গিয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়লো।

মরগ্যান বার কাউন্টারে এক হাতের ভর নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই তাকে দেখা গেলো পা ফাঁক করে, দু হাতে মেশিনগান আঁকড়ে কাউন্টারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে।

মরগ্যান এলোপাথাড়ি লাথি চালিয়ে কাউন্টারের ওপর সাজানো বোতলগুলো চারিদিকে ছিটকে ফেললো। কাঁচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে ভেসে এলো কোনো তরুণীর ভয়ার্ত চিৎকার। কাফের চেয়ারে বসে থাকা প্রতিটি লোক চমকে উঠে দাঁড়ালো। পরস্পরের চাপা গুঞ্জন শুরু হলো।

মরগ্যান গর্জে উঠল। —খবরদার ; সেই সঙ্গে নেচে উঠলো তার হাতের মেশিনগান, কেউ নড়বেন না। চুপচাপ বসে পড়ুন। আপনারা চুপ থাকলে আমার মেশিনগানও চুপ থাকবে। সাবধান, কারো একটু বেচাল দেখলেই একেবারে সীসের বস্তা করে ছাড়বো।

ব্লেকের বুকে হৃদপিণ্ডের আকুল দাপাদাপি যেন দামামা বাজাতে লাগলো। ঘামের বন্যায় তার দৃষ্টি হলো অবরুদ্ধ। ব্লেক নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় এক হ্যাঁচকায় রুমালটা খুলে ফেললো। বুক ভরে শ্বাস নিলো। চারদিকে তাকিয়ে রিভলবারটা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। ব্লেক মনে মনে প্রার্থনা করছে, যেন কোনো বিপদের মুখোমুখি ওদের পড়তে না হয়।

ভাঙা গলায় একটা বুড়ী চিৎকার করে উঠলো। দুজন লোক উঠবার চেষ্টা করতেই তাদের

সঙ্গীসাথীরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলো। ঘরের সকলে যেন নিথর পাথর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

মরগ্যান গলার স্বর উঁচু পর্দায় তুলে বললো, ভালো করে শুনুন, আমাদের ক্যাশ টাকা চাই। অতএব চটপট আপনাদের মানিব্যাগগুলো বের করে টেবিলে রাখুন। চটপট তাড়াতাড়ি করুন।

বেশীর ভাগ লোকই তাদের পেছন পকেট হাতড়াতে লাগলো। আর জিনিও প্রস্তুত হলো ওর দায়িত্ব পালনের জন্য। মরগ্যানের দেওয়া ক্যাম্বিসের থলেটা স্ল্যাক্সের পকেট থেকে বের করলো। তারপর বাঁ হাতে থলেটা ঝুলিয়ে ডান হাতে ৩৮ নাচিয়ে টেবিলের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো। প্রত্যেক টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকা মানিব্যাগগুলো তুলে নিতে থাকলো। এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলোকে বাঁ হাতের থলেতে ঢুকিয়ে রাখতে লাগলো।

নিশ্চলভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ব্লেক ওকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ধীরে অথচ অত্যন্ত সাবধানে জিনি এগিয়ে চললো। যেন ভঙ্গুর বরফের চাদরে পা রেখে ও হেঁটে চলেছে। কিন্তু ওর চলার মধ্যে দ্বিধার ছায়া নেই। জিনি যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চললো।

আবার হিংস্রভাবে মরগ্যান চিৎকার করলো, চটপট করুন। মানি ব্যাগ বের করতে ফালতু সময় নষ্ট করবেন না। বলা যায় না, আমার আঙুলের চাপে মেশিনগান থেকে হয়তো...কিন্তু তা আমি চাই না। সুতরাং মানিব্যাগগুলো চটপট মেয়েটার হাতে তুলে দিন।

ব্লেক এতক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেলো। সে ভাবলো—মরগ্যান আর জিনিই বলতে গেলে কাজটা হাসিল করলো। ওঃ, ওদের সাহস আছে বটে।

মরগ্যানের স্বরের কাঠিন্য ও মৃত্যু শীতলতা সারা ঘরে ছড়িয়ে দিলো হিমের আতঙ্ক। তার দাড়াবার দৃপ্তভঙ্গী, সেই সঙ্গে শক্ত মুঠোয় ধরা কালো চকচকে মেশিনগানটা যেন শিয়রে দাঁড়ানো মৃত্যুদূতের প্রতিমূর্তি।

হঠাৎই ওর যান্ত্রিক পরিক্রমার মধ্যে জিনি একটা টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়ালো। একজন সুন্দরী তরুণী টেবিলে বসেছিল। পরনে দামী লোমের কোট। তার পাশে বসে স্থূলকায় চেহারার একটি লোক। চোয়ালের রেখা কঠিন, চোখের দৃষ্টি ক্রূর। টেবিলের ওপর কোনো মানিব্যাগের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

লোকটার সঙ্গে জিনির চোখাচোখি হলো। লোকটার ধূসর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো।

নরম সুরে জিনি বললো, ব্যাগটা চটপট বের করে দিন, স্যার, শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না।

লোকটা নির্বিকারভাবে বললো, দুঃখিত। আমার কাছে কোনো ব্যাগ নেই। তাছাড়া তোমার মতো একটা বাজারে মাগীকে দেবার জন্যে আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরি না।

ঘামতে শুরু করলো ব্লেক। সে যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। মরগ্যান একইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে মেশিনগান। মরগ্যান তখন তীক্ষ্ণভাবে জিনিকে লক্ষ্য করছে। ঠোঁট সরে গিয়ে তার দাঁতের সারি আংশিক উম্মুক্ত—সারা মুখে নেকড়ের হিংস্রতার ছাপ।

জিনির স্বর উঁচু পর্দায়-ব্যাগটা বের করে দাও!

লোকটা জিনির দিকে চোখ রেখে বললো, শালা, কুত্তীর বাচ্চা! আমার কাছে কোনো ব্যাগ নেই।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলো লোকটার সঙ্গিনীর মুখ। আতঙ্কে তার চোখজোড়া বুজে এলো। সে মোটা লোকটার গায়ে ধীরে ধীরে ঢলে পড়লো। কিন্তু লোকটা অধৈর্যভাবে মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

জিনি এবার রিভলবার উঁচিয়ে ধরলো। চটপট ব্যাগটা বের করে ফ্যাল, মোটা, নইলে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবো।

লোকটা জিনির কর্কশ ধমকানিতে এতটুকুও চমকালো না। কঠিন মুখে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো। আমার—কাছে—কোনো—ব্যাগ—নেই! বেরো এখান থেকে।

মেশিনগানের নলটা মরগ্যান লোকটার দিকে ঘোরালো কিন্তু লোকটা এবং মরগ্যানের মাঝখানে জিনি দাঁড়িয়ে আছে। মরগ্যান যে এ অবস্থায় গুলি চালাতে পারবে না তা লোকটা বেশ বুঝতে পারলো।

সুতরাং এই অবস্থা সামলানোর দায়িত্ব জিনির পুরোপুরি তাই মরগ্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করলো। সে জানতো, এটাই চরম পরীক্ষা। এই স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে ও কি ভেঙ্গে পরবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনি লোকটার দিকে চেয়ে হাসলো ; সে হাসির ঝলকানি রুমালের আড়ালে পলকের জন্য আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে গেলো। তার ক্ষণস্থায়ী রেশ পরমুহূর্তেই সাপের ছোবলের মতো ওর পিস্তলসুদ্ধ হাত আছড়ে পড়লো লোকটার মুখে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো যে লোকটা বাধা দেবার সুযোগই পেলো না। ৩৮ এর নলটা আড়াআড়িভাবে আঘাত করলো তার নাকে এবং গালে। গাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে লোকটা মুখে দু হাত চাপা দিয়ে পেছন দিকে হেলে পড়লো।

জিনি টেবিলে ঝুঁকে রিভলবার ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত হানলো, এবার ৩৮ এর নলটা লোকটার ব্রহ্মতালুতে, লোকটা আচমকা হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়লো।

বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠলো পাশের মেয়েটি এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো।

সাবধান নিজের জায়গা থেকে কেউ নড়তে চেষ্টা করলে আমি কাউকেই রেহাই দেবো না। সকলে মরগ্যানের দিকে ফিরে তাকালো। সারা ঘরময় আতঙ্কের আবহাওয়া, এমন কি ব্লেক পর্যন্ত মরগ্যানের হাড় কাঁপানো চিৎকারে শিউরে উঠলো।

জিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা লোকটার কাছে গিয়ে কলার ধরে টেনে তুলে ভেতরের পকেট থেকে লোকটার মানিব্যাগটা বের করে আনলো। ব্যাগটা থলেতে ভরে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেললো।

ওতেই যথেষ্ট কাজ হলো কোন যাদুমন্ত্রবলে একের পর এক মানিব্যাগ টেবিলে এসে গেলো। জিনি চটপট সেগুলো থলেতে ভরতে লাগলো।

ব্লেক সাফল্যের উল্লাসে দরজার দিকে আর নজর রাখেনি। তাই দরজা খুলে একজন দোহারা চেহারার বলিষ্ঠ লোক হঠাৎই তার সামনে উপস্থিত হলো।

সে নির্বোধের মত শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশাল চেহারার আগন্তুকের নজরে পড়লো ব্লেকের হাতে আলগা মুঠোয় ধরা রিভলবারটার দিকে। বিদ্যুৎগতিতে আগন্তুকের বলিষ্ঠ হাত কাটারির মতো ব্লেকের কব্জির ওপর নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা মেঝেতে ছিটকে পড়লো, গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামলো বার কাউন্টারের সামনে। হতভম্ব ব্লেক তখন একইভাবে দাঁড়িয়ে।

লোকটা ঘুঁষি তুলতেই মরগ্যান তার দিকে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, নইলে.....

মরগ্যানের দিকে লোকটা তাকাতেই তার হাতে মেশিনগানটা দেখে সমস্ত সাহস কর্পূরের মতো উবে গেলো। সে মাথার ওপর হাত তুললো।

একজন বলিষ্ঠ বেঁটে-খাঁটো লোকের কাছ থেকে জিনি মানিব্যাগটা নিচ্ছিলো। লোকটা মরগ্যানকে মেশিনগানটা অন্য দিকে ফেরাতে দেখেই জিনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিনি ব্যাগটা থলেতে ভরতে যাচ্ছিলো, এমন সময় বেটে লোকটার দুটো হাত মরিয়া হয়ে রিভলবারটা কেড়ে নিতে চাইলো। ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

৩৮ এর বাঁট জিনি শক্ত হাতে ধরে, লোকটার ভয়ার্ত চোখের দিকে দেখলো। তারপর ধস্তা-ধস্তির মধ্যেই ট্রিগার টিপলো। বিকট শব্দে কাফের সমস্ত দরজা জানলা থর থর করে কেঁপে উঠলো। লোকটা তড়িৎগতিতে সরে গেলে গুলিটা তার জামার আস্তিন ছিঁড়ে, হাত ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। জিনি রিভলবার নাচিয়ে দু পা পিছিয়ে এলো। লোকটা তখন বাঁ হাতে তার আহত ডান হাতটা চেপে ধরেছে।

মরগ্যান কর্কশস্বরে , জলদি করো, জিনি, আমাদের আর সময় নেই।

জিনি শান্তভাবে নির্বিকার মুখে কাজ করে চললো। চলাফেরার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। কাফের প্রতিটি লোক ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে নিশ্চলভাবে যার যার জায়গায় বসে। নিঃশব্দে ওরা জিনির কার্যকলাপ দেখছে।

বাইরে অপেক্ষারত কিটসন গুলির আওয়াজে চমকে উঠলো। তবে কি...? অসাধারণ সংযম এবং প্রচেষ্টায় সে স্থির হয়ে বসে রইলো। দু হাতের থাবা আঁকড়ে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইলটাকে। ঘামে মুখ চকচক করছে। উৎকণ্ঠায় উত্তাল হৃদপিণ্ড ধক ধক....।

হঠাৎ কিটসনের কানে এলো দৌড়ে আসা ভারী পায়ের শব্দ। একটু পরেই লিংকনের পেছনের দরজা খুলে গেলো। দুদ্দাড় করে কারা যেন গাড়িতে ঢুকে পড়লো। একটা উত্তপ্ত ঘামে ভেজা দেহ কিটসনের শরীরে এসে আঘাত করতেই সে পাশ ফিরে দেখলো ব্লেক তার পাশে সামনের সীটে বসে। যান্ত্রিকভাবে কিটসনের হাত এগিয়ে গেলো গীয়ারের দিকে। গাড়িটা এক প্রচণ্ড ঝাকুঁনি দিয়ে সচল হলো।

পিছনের সীট থেকে মরগ্যান বললো, শীগগির আলেক্স! যতো জোরে পারো গাড়ি ছোটাও।

কিটসন দাঁতে দাঁত চেপে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো। কিটসন গাড়িটা বাঁ দিকে ঘোরালো। সরু একটা গলি পার হয়েই বড় রাস্তায় পড়লো।

সহজাত দক্ষতার সঙ্গে সে বড় রাস্তা নিমেষে পেরিয়ে আর একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলো। গাড়ির গতি এবার সামান্য কমিয়ে হেডলাইটের সংকেত দিয়ে সে একের পর এক চৌরাস্তা পার হয়ে চললো।

পেছনের জানলা দিয়ে মরগ্যান দেখতে লাগলো কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। এই ভাবে আধ মাইলটাক যাওয়ার পর সে বললো। যাক বাঁচা গেছে। কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না। চলো। জিপোর ওখানেই যাওয়া যাক।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে ব্লেক বললো। মেশিনগানটা না থাকলে আজ ভীষণ বিপদে পড়তে হতো। আর যখন ঐ হারামজাদাটা জিনির হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলো, তখন....।

কিটসন কাঁপা গলায় বললো, কি হয়েছিলো? গুলির শব্দ পেলাম, কেউ কি আহত হয়েছে?

উহুঁ। একটা লোক জিনির রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলো—এমন সময় ধস্তাধস্তিতে রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে আসে। অবশ্য তাতে তেমন একটা কেউ আহত হয়নি, তবে লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছিলো, আর একটা লোক আচমকা এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে ফেলে দিলো। তারপর তাকে সামলাতে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে।

মরগ্যানের ঠিক পাশেই জিনি বসেছিলো। মরগ্যান অনুভব করলো ওর শরীর কাঁপছে। মরগ্যান রাস্তার আলোয় দেখলো জিনির মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

মরগ্যান ওর হাঁটুর ওপর হাত রাখলো, তোমার কাজে আমি খুশী হয়েছি, জিনি। সত্যিই তোমার সাহস আছে। বিশেষ করে ঐ মোটা লোকটাকে যেভাবে শায়েস্তা করলে....ওঃ, আমি তো ভাবতেই পারিনি...

দয়া করে চুপ করো, ফ্র্যাঙ্ক! মরগ্যানকে অবাক কবে মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সামনের সীটে বসা ব্লেক বা কিটসন কিছুই টের পেলো না। মরগ্যান জিনিকে একা থাকতে দিয়ে সরে বসলো।

কিটসন জিপোর কারখানার কাছাকাছি এসে খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগলো। মুখ না ফিরিয়েই বললো, মোট কত টাকা হাতালে?

মন্দ নয়। কম করে গোটা পঞ্চাশেক মানিব্যাগ তো হবেই। তাছাড়া কাফের ক্যাশ বাক্সও প্রায় ঠাসা ছিলো। মরগ্যান একটা সিগারেট ধরালো।

তখনো মরগ্যান, ব্লেকের হাঁপানোর শব্দ বেশ শুনতে পাচ্ছে। তার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জন্মেছে যে ব্লেক সংশয়ের মুহূর্তে আচমকা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এতদিন ব্লেকের সাহস ও দৃঢ়তা সম্পর্কে গভীর আস্থা ছিলো। কিন্তু আজ যেভাবে নির্জীবের মতো সে ঐ লোকটার মোকাবিলা করলো তাতে ভরসা রাখা যায় না। এখন থেকে ব্লেকের ওপরেও তাকে কড়া নজর রাখতে হবে।

এমন কি কিটসনও আজ মুহূর্তের জন্য তার বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলো। কথা ছিলো গাড়িতে উঠলেই সে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। কানের কাছে

চিৎকার না করলে কিটসন অতো জোরে গাড়ি চালাতে পারতো না। অর্থাৎ কাফে থেকে কেউ বেরিয়ে গাড়িটা দেখলে পুলিশের কাছে গাড়িটার বর্ণনা দিতো।

না, বড় কাজের আগে প্রত্যেককে ঠিক মতো প্রস্তুত করতে হবে। তবে জিনির আজকের কার্যকলাপ মরগ্যানকে ভীষণ খুশী করেছে। জিনির মূল্যই এখন তার কাছে সবচেয়ে বেশী।

মরগ্যান দেখলো জিনি এখন কান্না থামিয়ে সোজা হয়ে বসেছে। কাঠ-খোদাই অভিব্যক্তিহীন মুখ। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে।

মরগ্যান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, ধরো।

নিঃশব্দে জিনি সিগারেটটা নিলো। মরগ্যান সিগারেট ধরাতেই গাড়িটা উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তায় পড়লো। আর বেশী দূরে নেই জিপোর কারখানা।

কারখানা বলতে একটা বড় টিনের একচালা। তার পাশে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী একটা ছোট্ট ঘর—জিপোর বাসস্থান।

লিংকনের হেডলাইটের আলো কারখানার দরজায় পড়তেই জিপো বেরিয়ে এলো। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলতে গিয়ে বার কয়েক হোঁচট খেলো জিপো। অবশেষে গাড়ি ঢোকাবার জন্য দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খুললো। তাকে দেখে মনে হলো যে সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

কারখানার ভেতরে কিটসন গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিলো, ওরা নেমে পড়লো। জিপো দরজা বন্ধ করে ওদের কাছে এসে বললো, কি ব্যাপার? সব ঠিক আছে তো?

মরগ্যান বললো, হ্যাঁ, কিছু ভেবো না। এখন বোতল আর গ্লাস বের করো দেখি। আলেক্স, তুমি চটপট এই নাম্বার প্লেট দুটো পালটে ফেলো। আর রেডিয়েটরের জলটা পালটে ঠাণ্ডা জল ভরে দাও। বলা যায় না কখন পুলিশ এসে হানা দেয়। কি হলো জিপো দাঁড়িয়ে কেন?

ঝটপট গ্লাস নিয়ে এসো। ব্লেক অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিলো, মরগ্যান ডাকলো, এড, তুমি কিটসনকে একটু সাহায্য করো।

জিনির কাছে গিয়ে মরগ্যান হেসে, কেমন আছ, এখন?

জিনির মুখভাব কঠিন, গায়ের চামরা ঈষৎ নীলাভ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, বিরক্তিভরে বললো, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

এ কাজটার মতো আসল কাজটায় যদি উতরাতে পারো তবেই বুঝবো!

ওঃ, তখন থেকে খালি একই কথা, আমি কি কচি খুকি নাকি! বলে টেবিলের কাছে গিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করে চললো।

জিপো এক বোতল হুইস্কি আর পাঁচটা গ্লাস নিয়ে হাজির হলো। মরগ্যান গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে জিনির কাছে বাড়িয়ে ধরলো। নাও, খেয়ে নাও। ধকল তো কিছু কম গেলো না।

গ্লাসে একটা চুমুক দিতেই জিনির মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে আগের সতেজ লাবণ্য ভাব ফিরে এলো।

কাজটা যতোটা সহজ ভেবেছিলাম, ততোটা নয়! আরেকটু হলেই আমার হয়েছিলো!

মরগ্যান বলে উঠলো, কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন আর ও নিয়ে ভাবছো কেন? তাছাড়া, সবার চেয়ে তোমার কাজই ভালো হয়েছে। যাক, এবার দেখা যাক, কি রকম আমদানি হলো।

থলেটা টেবিলের ওপর উপুড় করে দিলো মরগ্যান। জিনি তাকে সাহায্য করতে লাগলো। জিপো, কিটসন আর ব্লেক গাড়িটাকে নিয়ে পড়েছে।

জিনি একটা কালো রঙের ছক কাটা মানিব্যাগ নিয়ে বললো, এই ব্যাগটা সেই মোটা লোকটার যাকে রিভলবার দিয়ে মেরেছিলাম!

ব্যাগটা খুলে দেখো ব্যাটা কিসের মায়ায় অমন রুখে দাঁড়িয়েছিল। জিনি ব্যাগ থেকে দশ দশটা একশো ডলারের নোট বের করলো।

হুঁ—লোকটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হাজার ডলারের মায়ায় যে কোনো লোকই তোমাকে বাধা দিতো।

তিনজনে গাড়ির ব্যবস্থা করে এসে চুপচাপ মরগ্যান ও জিনির কার্যকলাপ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। সমস্ত টাকা স্তূপিকৃত হওয়ার পর মরগ্যান একটা বাক্সের ওপর আয়েস

করে বসে লুঠের টাকা গুনতে শুরু করলো।

গোনা শেষ হলে মরগ্যান বললো, দু হাজার ন-শো পঁচাত্তর ডলার। যাক্ তাহলে আমাদের মূলধন যোগাড় হয়ে গেলো। এবার আমরা স্বচ্ছন্দে এগোতে পারি।

জিপো গোল গোল চোখ করে, ফ্র্যাঙ্ক, সত্যিই কি জিনি একটা লোককে মেরেছে?

মরগ্যান নোটগুলো গুছাতে গুছাতে বললো, হ্যাঁ প্রয়োজন ছিলো তাই মেরেছে। লোকটাকে যেভাবে ও শায়েস্তা করেছে, দেখার মতো। তুমি আমিও বোধ হয় পারতাম না। গম্ভীর মুখে জিনি গাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ওরা চারজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

মরগ্যান শান্তস্বরে বললো ওকে দিয়ে কাজ হবে। আর তোমরাও যদি ওর মতো কাজ দেখাতে পারো, তাহলে আর চিন্তা নেই। ধরে নাও, দশ লাখ ডলার আমরা পেয়ে গেছি।

মরগ্যান কথা শেষ করে সরাসরি ব্লেকের দিকে তাকালো। কিন্তু ব্লেক সেই চাউনির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলো। তারপর সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের খোঁজে হাতাড়াতে লাগলো। মরগ্যানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে অনুভব করলো।

আমার কথা শুনতে পেয়েছো, এড? কোনরকমে আগুন ধরিয়ে ব্লেক বলল, নিশ্চয়ই।

জিপোর চোখ এড়ালো না পরিস্থিতির ইঙ্গিত। সে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার, ফ্র্যাঙ্ক? কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?

তেমন কিছু নয়।.....

একটা লোক হঠাৎই এডের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়েছিল। আমরা অল্পের জন্য সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছি। নইলে কি যে হতো বলা যায় না।

থমথমে মুখে ব্লেক, লোকটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে তারও একই অবস্থা হতো।

হুঁ—তবে লক্ষ্য রেখো, যেন ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে! মরগ্যান কিটসনের দিকে ফিরে, আর তুমি? তোমার গাড়ি চালানো আজ একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। আরো জোরে গাড়ি ছোটানো উচিত ছিলো।

কিটসন জানে, মরগ্যান খুব একটা মিথ্যে বলছে না। কাফের থেকে ভেসে আসা বন্দুকের শব্দটাই সবকিছু ওলট পালট করে দিয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, কাফের কোনো লোককে বুঝি ওরা খুন করেছে। আর এই খুনের দায়ে জড়াবার আশঙ্কাটাই তাকে স্থবির করে দিয়েছে।

জিনি...

আস্তে আস্তে জিনি মরগ্যানের ডাকে ওদের কাছে ফিরে এলো।

মরগ্যান বললো, শোনো, এইবার আমরা বড় কাজের প্রস্তুতি নেবো। তুমি আর কিটসন কাল মার্লোয় যাবে ক্যারাভানটা কিনে আনতে। কি মাপের কিনতে হবে সেটা জিপোই তোমাদের বলে দেবে। এবার টেবিলে কালো সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মরগ্যানের চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ক্যারাভানের দামটা যত কম হয় ততই ভালো। কারণ এই তিনহাজার ডলারের প্রতিটি সেন্ট আমাদের কাছে এক-এক ফোঁটা রক্তের চেয়েও দামী। মরগ্যান এবার কিটসনের দিকে ক্যারাভান কিনতে গিয়ে তোমাকে কি বলতে হবে মনে আছে তো? বলবে যে তুমি আর জিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছো ; মধুচন্দ্রিমা কাটানোর জন্যে একটা ক্যারাভান তোমাদের দরকার। এতে সন্দেহের কিছুই থাকবে না ; কারণ আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিয়ের পর ক্যারাভান কিনছে। তবে একটা বিষয়ে লক্ষ্য রেখো, যে লোকটা তোমাদের ক্যারাভান বেচবে, সে যেন তোমাদের সনাক্ত করতে না পারে।

সন্দেহের চোখে কিটসন তাকালো ব্লেকের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার মতো মেজাজ ব্লেকের ছিলো না। কারণ কাফে লুঠের ব্যাপারটায় সে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। তাই বিরক্তি নিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ওঃ—এই ভাবটা মুখ থেকে তাড়াও দেখি, কিটসনকে ধমকে উঠলো মরগ্যান, তোমাকে মনেই হচ্ছে না, জিনিকে নিয়ে তুমি মধুচন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছো। নাঃ, ক্যারাভান কিনতে গেলে

দোকানদার তোমাদের সন্দেহ করে বসবে।

হাসলো জিপো, বললো, এক কাজ করলে কেমন হয়, ফ্র্যাঙ্ক? ধর—আলেক্সের জায়গায় আমিই না হয় গেলাম ক্যারাভান কিনতে প্রথমতঃ আমার সহজাত প্রতিভা ; তাছাড়া জিনির সঙ্গে আমাকে মানাবে দারুন!

জিনি জিপোর কথায় হেসে ফেললো।

জিনির সঙ্গে তোমার বয়েসের পার্থক্যটা বড্ড বেশী, জিপো। হেসে জবাব দিলো মরগ্যান, সুতরাং কিটসন ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মরগ্যান টেবিলের ওপরের টাকা থেকে দু হাজার ডলার কিটসনকে গুনে দিলো।

দরাদরি করে দামটা একটু কম সম করার চেষ্টা করো। কাল সকাল এগোরোটায় আমি বুইক আর ক্যারাভ্যান টানার শেকল তোমার ওখানে পৌছে দেবো। জিপো, তুমি লিংকনটাকে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করবে। কারণ বুইকটা কিটসনের ওখানে ছেড়ে দিয়ে তোমার গাড়িতেই ফিরবো।

ঠিক আছে।

আচ্ছা এবার তাহলে ওঠা যাক। লু-কে ওর মেশিনগানটা এখনই ফেরত দিতে হবে। এড, তুমি আমার সঙ্গে চলো। জিনি ও কিটসন, তোমরা বাসে করেই রওনা দিও। কারণ আমাদের চারজনকে একসঙ্গে যতো কম দেখা যায় ততোই ভালো।

পেছনের পকেটে বাকি টাকাটা ঢুকিয়ে মরগ্যান জিনিকে বললো, তোমরা কোথায় দেখা করবে সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিও। তবে কাল বিকেলের মধ্যেই ক্যারাভান সমেত তোমাদের এখানে ফিরে আসতে হবে। চলে এসো, এড।

জিনি মাথা থেকে সবুজ স্কার্ফটা খুলে আড়ষ্ট চুলের গোছাকে আঙুলের আলতো আঁচড়ে ঠিক করলো।

কিটসন জিনির সৌন্দর্য সম্পর্কে আবার সচেতন হয়ে উঠলো। টেবিলে হেলান দিয়ে নখ খুঁটতে লাগলো।

জিপো বললো, আর এক গ্লাস হবে নাকি?

উহুঁ—ধন্যবাদ। জিনি ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে রেখে কিটসনের দিকে তাকালো।

দেশলাই বের করে কিটসন জ্বলন্ত কাঠিটা কাঁপা হাতে জিনির মুখের কাছে এগিয়ে ধরলো। আগুনের শিখাকে স্থির করতে জিনি দুহাতে আঁকড়ে ধরলো কিটসনের চঞ্চল হাত। মুখ নামিয়ে সিগারেটের অগ্রভাগ আগুনে ডুবিয়ে দিলো। কিটসনের শিরা উপশিরায় উষ্ণ রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়লো।

আচ্ছা তাহলে চলি—বলেই জিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

জিপো বললো, পরে আবার দেখা হবে ; কিটসন জিনিকে অনুসরণ করলো।

রাতের উত্তপ্ত হাওয়া এসে ওদের শরীরে লাগলো। ওরা পাশাপাশি পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ জিনি বাসস্টপে পৌছে বললো, তুমি কোথায় থাকো?

লেনক্র স্ট্রীট।

ঠিক আছে, তাহলে কাল এগারোটার সময় আমি লেনক্র স্ট্রীটের মোড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

যদি বলো, তাহলে গাড়ি নিয়ে আমিই যাবো তোমার ওখানে—

না তার প্রয়োজন নেই।

আড়চোখে পাশে দাঁড়ানো জিনিকে কিটসন দেখতে লাগলো। একসময় বললো, সেদিন রাতে—আমি কখনোই তোমার গায়ে হাত তুলতাম না। হঠাৎ কেন যে অমন রেগে উঠলাম কে জানে।....আমি দুঃখিত।

জিনি হেসে বললো, আমি তো ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে মেরেই বসলে, খুব ভয় করছিলো আমার।

কিটসন লজ্জা পেলো, না, না—শুধু শুধু তুমি ভয় পেয়েছিলে। এমনিতেই আমার চেয়ে ছোট কারোর গায়ে আমি হাত তুলি না....তার ওপর তুমি তো মেয়ে!

তা ঠিক, তবে পরে ভেবে দেখলাম, তোমার হাতের ঐ চড়টা খেলে আমার উপযুক্ত শিক্ষা হতো। বলতে গেলে আমিই তো সাধ করে গাল বাড়িয়েছিলাম—।

কিন্তু ব্লেকের গায়ে হাত তোলাটা কি তোমার উচিত হয়েছে?

ব্যাটা বড্ড বেশী বেড়ে উঠেছিলো, তাই একটু দাওয়াই দিলাম। তাছাড়া, ওই তো গায়ে পড়ে ঝগড়া, বাঁধালো। সেই প্রথম দিন থেকেই...

তা হোক, তবুও ওর গায়ে হাত তুলে তুমি ভালো করোনি। এখন থেকে ব্লেকের ওপর তোমাকে নজর রাখতে হবে। কারণ, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ও ভুলবে না।

ব্লেককে আমি ভয় করি না।

আমারও তাই ধারণা। বছর খানেক আগে তোমার একটা লড়াই আমি দেখেছিলাম। ঐ যে লড়াইয়ে জ্যাকি ল্যাজার্ডকে একেবারে ময়দার বস্তা করে ছাড়লে—মনে পড়েছে? ওঃ। দারুণ জমেছিলো লড়াইটা।

কিটসনের বলিষ্ঠ মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটলো—সত্যিই দারুণ জমেছিলো সেই লড়াইটা। জ্যাকি ল্যাজার্ডকে সে যে হারাতে পেরেছিলো, তা নেহাতই ভাগ্যের জোরে। নটা রক্তাক্ত, ক্লান্ত রাউণ্ডের পর দশম রাউন্ডে ল্যাজার্ডকে কিটসন কাত করেছিলো। ভাগ্য সহায় থাকলে সে লড়াইয়ে ল্যাজার্ডও জিততে পারতো।

জ্যাকি খুব ভালো লড়েছিল! তুমিও নেহাত খারাপ ছিলে না। তা হঠাৎ বক্সিংটক্সিং ছেড়ে দিলে যে?

কিটসন একটু বিব্রত হয়ে কোনরকমে বললো, সে লড়াইটার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার চোখের ক্ষমতা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে—কাছের জিনিষ ভালো দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাপার স্যাপার দেখে তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি বক্সিং ছেড়ে দিতে বললেন। আমার ইচ্ছে ছিলো চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আর সম্ভাবনাও ছিলো....কিন্তু ডাক্তারের মতামতকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা...

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিটসন জিনির দিকে তাকালো। বুঝতে চাইলো, বক্সিং ছাড়ার গল্পটা সন্দেহ জনক কিনা। কিন্তু জিনির ভাবলেশহীন মুখে কোন অভিব্যক্তিই নেই।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর কিটসন বললো, তুমি হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কের দলে ভিড়লে কেন?

তাছাড়া কার কাছেই বা যেতাম— জিনি রাস্তার দিকে তাকিয়েই বললো, ঐ যে—বাস আসছে।

বাস থামলে ওরা উঠে পড়লো। দুজনে পাশাপাশি বসলো, কিটসন দুটো টিকিট কাটলো। বাসের আর কোনো আসনই খালি নেই। কিছু কিছু কৌতূহলী লোক মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে জিনিকে দেখছে।—কিটসন কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলো।

শহরের দিকে বাস ছুটে চললো। রেল রোড স্টেশনের সামনে জিনি উঠে দাঁড়ালো। 'আমি এখানেই নামবো।

ওকে যাবার রাস্তা করে দিলো কিটসন। জিনির শরীরের আলতো স্পর্শে মুহূর্তের জন্য কিটসন চঞ্চল হয়ে উঠলো। জিনি নেমে পড়লো।

বাস আবার চলতে লাগলো। কিটসন জিনিকে এক পলক দেখার আশায় জানলার কাঁচে মুখ চেপে ধরলো—কিন্তু বৃথাই চেষ্টা।

।। চার ।।

মার্লো অভিমুখে পরদিন সকাল এগারোটায় কিটসনকে বুইক নিয়ে ছুটতে দেখা গেলো। দশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে টানা ষাট মাইলের রাস্তা মার্লো। কিটসনের হাতে বুইক যেন উড়ে চললো।

জিনি গর্ডন কিটসনের পাশেই ছিল। কিন্তু এ জিনির সঙ্গে বুঝি আগের জিনির কোনো মিলই নেই। রঙিন আঁটো-সাঁটো ফ্রকটা পরে জিনিকে মনে হচ্ছে কোনো উচ্ছলা কিশোরী। ওর সুন্দর সতেজ মুখে অবাধ খুশীর রাজত্ব, যেন নববিবাহিতা কোনো বধু মধুচন্দ্রিমার আসন্ন সুখস্বপ্নে

বিভোর। ওর চোখের ইশারায় উদ্দাম চঞ্চলতা, মুখের ভাব কোমল, আর সেই সঙ্গে তোতা পাখির মতো অনর্গল কথা বলছে।

কিটসন তো একবারে হতবাক ওর অভাবনীয় পরিবর্তনে। নিজেকে এক সদ্যবিবাহিত যুবকের ভূমিকায় খাপ খাওয়াতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তবে এখন কিটসনকে দেখলে মনে হবে, কোনো মধ্যবিত্ত, উচ্চাকাঙ্খী যুবক বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনে যাচ্ছে। এবং ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয়ে সে বেশ বিব্রত।

মরগ্যান সকালবেলাই তার বুইক এবং ক্যারাভান টানার শেকল কিটসনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এবং কথামতো জিপোও মরগ্যানকে অনুসরণ করে লিংকন নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়েছে। তারপরে, জিনি ও কিটসন যখন মরগ্যানের বুইকে চড়ে রওনা দিলো, তখন কোন অজ্ঞাত কারণে জিপো হঠাৎই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়লো।

দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া বুইকের দিকে তাকিয়ে সে মরগ্যানকে বললো, ওদের দুটিতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে, তাই না? আসলে জিনিকে আমরা যতোটা কঠিন ভাবি ততোটা ও নয়। ওর মতো চেহারার মেয়ে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না... ওদের ঠিক নতুন বিয়ে-করা বর-বউয়ের মতোই দেখাবে। তাই না ফ্র্যাঙ্ক!

তুমি যে দেখছি বুড়ী বিধবার মতো উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করেছো, অ্যাঁ? তোমার হলে কি জিপো? হঠাৎ কি মাথা খারাপ হলো না-কি?

ঠিক আছে, আমার না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, প্রলাপ বকছি— কিন্তু বলতে পারো ফ্র্যাঙ্ক, ভালোবাসা ছাড়া এই দুনিয়ায় সুখটা কোথায়?

মরগ্যান প্রায় ধমকালো, ওঃ-হো—ওসব রাখো এখন। আমাদের অনেক কাজ—সময় নষ্ট কোরো না। চলো, এডের ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে চলো।

মরগ্যান ভাবলো জিপোর এ ধরণের মেয়েলি ভাব ভালো কথা নয়। আমাদের সামনে দুরুহ, দুঃসাহসিক কাজ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ভাবাবেগে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

নদীর খুব কাছে পাথরের তৈরী বিশাল বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে এড ব্লেক থাকে।

মরগ্যান লিফটে করে পাঁচতলায় পৌঁছলো। নির্জন বারান্দায় জুতোর মস্‌ মস্‌ শব্দ তুলে মরগ্যান এগিয়ে চললো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতাম টিপলো।

এড ব্লেক দরজা খুললো। ব্লেকের পরনে কালো পাজামা, কালো শার্ট। তার বুকের কাছটায় সাদা সুতোয় লেখা ; এ বি—এড ব্লেক। এডের মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখের পাতা ভারী ও আচ্ছন্ন।

আরে, কি ব্যাপার? তোমরা এতো সকাল সকাল? কটা বাজে এখন?

মরগ্যান ব্লেককে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বসবার ঘরটা ছোট হলেও আধুনিকভাবে সাজানো-গোছানো। কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা জিন এবং হুইস্কির খালি বোতল ঘরের চেহারা পালটে দিয়েছে।

সিগারেটের ধোঁয়া ও সেন্টের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়েছে। সেটা টের পেতেই মরগ্যান নাক কোঁচকালো ওঃ, ঘর তো নয়, যেন বেশ্যাবাড়িতে ঢুকেছি। একটা জানলা খুলে রাখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

তা কেন? বলে ব্লেক একটা জানলা খুলে দিলো। দেয়াল ঘড়িতে দেখলো এগারোটা কুড়ি। তোমরা দেখছি অনেক আগেই এসেছ।......তা কিটসন কি রওনা হয়ে গেছে?

মরগ্যান শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে। শোবার ঘরে কে আছে?

ব্লেক চতুর হাসি হেসে, ওর জন্যে ভেবো না—মেয়েটা এখন ঘুমে অচেতন।

ব্লেকের জামা ধরে মরগ্যান এক হ্যাঁচকায় টেনে আনলো, শোনো এড, আমাদের সামনে এক বিরাট কাজের দায়িত্ব। তাছাড়া, কাল রাতে তুমি খুব একটা ভাল ফল দেখাতে পার নি। আসল কাজের জন্যে তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে, নইলে তোমার সাহায্য আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। যদ্দিন পর্যন্ত না আমরা এই ট্রাকের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি

করছি, তদ্দিন মদ খাওয়া আর মাগী চরানো ছাড়ো। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

ঝটকা মেরে ব্লেক নিজেকে ছাড়াল। ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।—মুখ সামলে কথা বলো, ফ্র্যাঙ্ক!

তাই নাকি? যদি মিষ্টি কথায় চিঁড়ে না ভেজে তবে অন্য রাস্তা নিতে হবে দেখছি,...মিঃ এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার বক্তব্য তোমার মগজে ঢুকলে ভালো, নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে দল থেকে মেরে তাড়াবো মনে রেখো। ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান কারো চোখ রাঙানিকে ভয় করে না।

মরগ্যানের স্থির, উজ্জ্বল কালো চোখ ব্লেকের সমস্ত সত্তাকে বরফ করে দিলো। সে তাড়াতাড়ি বললো, ঠিক আছে। ঠিক আছে,—তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

থাকলেই ভালো।

ব্লেক বললো, খবরের কাগজে গত রাতের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু লিখেছে নাকি?

সাধারণতঃ যা লেখে তাই। ক্লাবের প্রত্যেকে এতো ভয় পেয়েছিলো যে পুলিশের কাছে আমাদের চেহারার কোনো সঠিক বর্ণনাই দিতে পারে নি। মনে হয় পুলিশ আমাদের খোঁজ পাবে না। এবার কাজের কথায় আসা যাক। তুমি এখন সোজা জিপোর ওখানে চলে যাও। ওকে কাজে সাহায্য করো গিয়ে। আমাকে একটু ডুকাসে যেতে হবে।

ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে মুখভাবে বোঝা গেল তার আজ কাজ করার মেজাজ নেই।

মরগ্যান খেঁকিয়ে উঠলো, নাও। চটপট করো। ফালতু দেরী করো না। আমি চললাম আর্নির সঙ্গে দেখা করতে। ওর কাছে একটা অটোমেটিক রাইফেল আছে। ও সেটা বেচবে। দেখি যদি পোষায় কিনে নেবো।

আমি তৈরী হয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।

মরগ্যান চলে যেতেই ব্লেক একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার কাছে একটা জানলা খুলে দিতেই রোদের উষ্ণ ঝলক শুয়ে থাকা মেয়েটির মুখে পড়লো।

মেয়েটি বিরক্তিভরে বললো। ওঃ-হো...এড, জানালাটা বন্ধ করো। মেয়েটি বিছানায় বসে ব্লেকের দিকে তাকালো। মেয়েটির গায়ের রং বাদামী, মাথায় কালো চুলের গুচ্ছ। আয়ত চোখের তারা ঘন নীল। পরনে হলদে রাত্রিবাস। তবে ফিকে আচ্ছাদনের আড়ালে ওর সুঠাম তনুর ইঙ্গিত।

রাত্রিবাস ছেড়ে পোষাক পরতে পরতে ব্লেক বললো, চটপট লম্বা দাও, সোনা। এখুনি আমাকে কাজে বেরোতে হবে। নাও, পা দুটোকে একটু কাজে লাগাও।

কিন্তু এড, আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তোমার কাজ থাকলে তুমি যাও না। আমি একটু না হয় ঘুমিয়েই নিলাম। কি, আপত্তি আছে?

পুরোপুরি। তোমাকে এখানে একা থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। এসো, জলদি উঠে পড়ো।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে মেয়েটা টলতে টলতে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। হাত টান টান করে আড়মোড়া ভেঙ্গে বাথরুমের দিকে এগোলো।

কিন্তু হঠাৎ এতো তাড়াহুড়ো কেন, এড? তোমাকে কে ডাকতে এসেছিলো?

বৈদ্যুতিক ক্ষুর দিয়ে এখন ব্লেক দাড়ি কামাচ্ছিল, উষ্ণস্বরে বললো, যত তাড়াতাড়ি পারো জামাকাপড় পরে কেটে পড়ো, সোনা। কতবার বলবো। আমাকে এখুনি কাজে বেরোতে হবে।

মেয়েটি রাত্রিবাস ছেড়ে ঝাঁঝরির নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিলো।

মাঝে মাঝে ভাবি, সব জেনেশুনেও কেন যে বার বার তোমার কাছে আসি। সেই বহু প্রচলিত ছকে বাঁধা রাস্তায় তোমার নাটক শুরু। যন্ত্র সঙ্গীতের হালকা সুর, নরম আবছা আলো, কানের কাছে ফিসফিস করে কতো কথা...তারপর হঠাৎ জামাকাপড় পরে রাস্তা দেখো। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কি ছিরি। অথচ এড, তুমিই আবার আমার স্বপ্নের রাজপুত্র! হৃদয়ের নায়ক।

বিরক্তভরে ব্লেক বললো, ছেনালী রাখো গ্লোরি। যা করছো জলদি করো। ফালতু সময় নষ্ট করো না।

ব্লেক দাড়ি কামিয়ে কফি তৈরী করতে রান্নাঘরে গেলো। তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা মুখ শুকিয়ে কাঠ—যেন মুখে এক মুঠো তুলো গোঁজা। কাল রাতে অতো মদ না গিললেই পারতাম—কিন্তু

না গিলেও উপায় ছিলো না। কারণ গত রাতের ব্যর্থতা তার আত্মবিশ্বাসকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।...নাঃ গ্লোরিকে কাল রাতে না ডাকলেই ভালো হতো।

মরগ্যান এসব ব্যাপার স্যাপার দেখে খুব একটা খুশী হয় নি।

ব্লেক একটা কাপে কফি ঢাললো। অ্যাসপ্রোর শিশি বের করে তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে নিলো। সে অস্বস্তির সঙ্গে দেখলো, তার হাত কাঁপছে। ব্লেক কফির কাপে শেষ চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্লোরি এলো।

পোশাক থেকে সাজসজ্জা—সবই ওর সম্পূর্ণ।

গ্লোরি আবদারের সুরে বললো, উম-ম...কফি। আমার জন্য এক কাপ ঢালো, এড।

উহুঁ—এখন আর সময় নেই। যাবার পথে কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে নিও। চলো যাওয়া যাক।

এক মিনিট এড। গ্লোরির স্বরের তীক্ষ্ণতায় ব্লেক ফিরে তাকালো, একটু আগে মরগ্যান এসেছিলো, তাই না? কি যেন সে বলছিলো—কিসব বিরাট কাজের দায়িত্ব...ব্যাপার কি এড? খারাপ কিছু নয় তো?

ব্লেক দাঁত খিঁচিয়ে বললো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, গ্লোরি। নিজের চরকায় তেল দাও। এ সম্পর্কে দ্বিতীয়বার কৌতূহল দেখালে ফল ভালো হবে না।

ব্লেকের হাত গ্লোরি আঁকড়ে ধরলো—এড, লক্ষ্মীটি—আমার কথা শোনো। মরগ্যান অত্যন্ত সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। তার সম্বন্ধে নানা কথাই আমার কানে এসেছে। সারাটা জীবন সে পুলিশের ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছে। মানুষ খুন ছাড়া এমন কাজ নেই যা মরগ্যান করে নি। তবে সে যেভাবে এগোচ্ছে তাতে খুনও হবে। এড আমার একটা কথা রাখো। তুমি মরগ্যানের সঙ্গ ছেড়ে দাও। নইলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে—

গত তিনমাস ধরে এই গ্লোরি ডসন ব্লেকের একমাত্র নৈশসঙ্গিনী। ও যে ব্লেকের অপছন্দ তা নয়। তাছাড়া গ্লোরিই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ।—যে মানুষ ব্লেকের মঙ্গল কামনা করে, ওর ভালো মন্দের চিন্তা করে—নিছক ব্লেককে ভালোবাসে বলেই—অন্য কোনো কারণে নয়। কিন্তু তবুও এই গায়ে পড়া উপদেশ ব্লেকের একেবারেই অপছন্দ। সে খেঁকিয়ে উঠলো, যাক, আর লম্বা চওড়া উপদেশ দিতে হবে না। আমার ভালোমন্দ আমিই বুঝবো। নাও, চলো—।

ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। অনুরোধ করা ছাড়া আর কি-ই বা আমি করতে পারি? কিন্তু আবার বলছি এড, মরগ্যান মোটেই ভাল লোক নয়। ওর দলে যোগ দিলে তুমি নিজের বিপদই ডেকে আনবে।

অধৈর্যভরে ব্লেক বললো, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—এবার থামো দেখি। দোহাই তোমার, এবারে চলো। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আজ রাতে, কি তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

না। এই কটা দিন আমি ব্যস্ত থাকবো। কাজ মিটে গেলে তোমাকে ডাকবো। হয়তো সামনের সপ্তাহেই সব চুকে যাবে—তার আগে নয়।

সংশয়, ও সন্দেহ ভরা চোখে মেয়েটি তাকালো, তুমি আর মরগ্যান মিলে কোনো বদ মতলব আঁটছো না তো? ওঃ, এড, ভগবানের দোহাই...

ব্লেক গ্লোরির হাত চেপে ধরে টানতে টানতে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে গেলো। চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে পকেটে চাবি রেখে বললো, তুমি একটু থামবে? বার বার এক কথা আমি পছন্দ করি না। ভেবো না, তুমি না হলে আমার চলবে না। এই বাজারে ঘাস ছড়ালে গরুর অভাব হয় না। কথাটা মনে রেখো...

ঠিক আছে, এড। তোমার ভালোর জন্যেই আমি তোমাকে সাবধান করতে চাইছিলাম। কিন্তু তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহলে...

ব্লেক ভেংচে উঠলো—হ্যাঁ। আমি অসন্তুষ্টই হচ্ছি। এখন দয়া করে একটু থামবে?

গ্লোরি সদর দরজায় পৌঁছে বললো, তোমার জন্য আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকবো। বেশিদিন দেরী করো না—লক্ষ্মীটি।

আচ্ছা, আচ্ছা—বলে দ্রুতপায়ে বাসস্টপের দিকে গেলো।

ব্লেকের জিনির কথা মনে হলো বাসে বসে। জিনি ও গ্লোরির মধ্যে বিশাল পার্থক্য তার মনে হলো। জিনির চেহারা আর সাহসের কথা ভেবে সে আবার অবাক হলো। ওকে পাশে নিয়ে পথচলার স্বপ্ন দেখলো। এই মুহূর্তে গ্লোরিকে তার ঘৃণা হলো।

ব্লেক মনে মনে কিটসনের অবস্থাটা কল্পনা করলো। জিনির পাশে একা বসে নববিবাহিত স্বামীর ভূমিকায় সে কিরকম অভিনয় করছে—সেটা দেখতে তার ভীষণ ইচ্ছে হলো। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ঘুঁষি খাওয়া থ্যাবড়ামুখো ছোঁড়াটাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। নিছক কৌতূহল মাত্র।

ব্লেক আনমনা ভাবেই আহত চোয়ালে হাত বোলালো। অনুভূত যন্ত্রণা তাকে মনে করিয়ে দিলো গতরাতে কিটসনের সঙ্গে তার মারামারির কথা। ব্লেকের চোখজোড়া প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলে উঠলো। দৃষ্টি হলো ক্রূর। না, ঐ অপমানের কথা সে কোনদিনই ভুলবে না। এর শোধ সে নেবেই।

যখন জিপোর কারখানার কাছে বাস থামলো, তখনও ব্লেক জিনির ভাবনায় মগ্ন। কারখানায় যাবার উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবলো জিনির পাশে বসে কিটসন কি নিয়ে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে?

কিটসন জিনির সঙ্গে কথাবার্তা খুব কমই বলছিলো। ষাট মাইল রাস্তা এভাবে চুপচাপ পাড়ি দিতে হবে ভেবে সে হতাশ হলো। সাধারণতঃ মেয়েদের সামনে কিটসন একেবারেই চুপচাপ থাকে না। বরং প্রগলভতার চূড়ান্তই হয়ে যায়। কিন্তু জিনির পাশে বসে এই অভাবনীয় নিজের পরিবর্তনে নিজেই অবাক হলো। সম্ভবতঃ জিনির তেজস্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের কাছে সে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে।—তাই তার জিভ আড়ষ্ট। অথচ জিনির মতো করে আর কোনো মেয়ের সঙ্গ সে কোনদিন কামনা করেনি।

জিনি কিন্তু একনাগাড়ে বকবক করেই চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা প্রশ্ন করে কিটসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। বেশির ভাগ প্রশ্নই কিটসনের মুষ্টিযুদ্ধ অধ্যায় সংক্রান্ত। বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত এবং তাদের সম্ভাবনাময় জীবনে হঠাৎ ইতি পড়ার কারণ—এইসব জানতে চেয়ে ও কিটসনকে বিব্রত করে তুললো। কিটসন ইতস্ততঃ করে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার চোখজোড়া গভীর একাগ্রভাবে সামনের দিকে নিবদ্ধ।

একসময় জিনি আচমকা বলল, দু লাখ ডলার পেলে সেটা নিয়ে তুমি কি করবে ভাবছো?

কিটসনের মুখের দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে ও পায়ের ওপর পা তুলে বসলো। জিনির সুঠাম উরু মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো। ব্যাপারটা কিটসনের চোখ এড়ালো না। মন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দিগভ্রান্ত বুইককে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার আয়ত্তে আনলো।

এখনো তো টাকাটা পাই নি। সুতরাং এতো আগে স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই হয় না।

জিনি একটু অবাক হলো, তার মানে আমাদের এই প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে তোমার এখনও সন্দেহ আছে?

ইতস্ততঃ করে সে রাস্তার দিকে নজর রেখে ধীর স্বরে বললো, যদি সত্যিই আমরা টাকাটা পাই, তবে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবো। কারণ টমাস এবং ডার্কসনের সঙ্গে আমি কাজ করেছি—আমি ওদের ভালো করে চিনি। ওরা আমাদের সহজে রেহাই দেবে না।

সেটা পুরোপুরি আমাদের ওপর নির্ভর করছে, শান্ত স্বরে বললো জিনি। টমাস ও ডার্কসনকে যদি ঠিকমত সমঝে দেওয়া যায় যে আমরা নেহাত ছেলেখেলা করতে আসিনি, তবে ওরা আর বাধা দেবে বলে মনে হয় না।...তাছাড়া, ওদের জন্য এতোটুকু চিন্তিত নই। পরিকল্পনামাফিক কাজ হলে আর কোনো ভয় নেই। টাকা আমরা পাবোই—অন্ততঃ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

বললাম তো, সে ক্ষেত্রে ভাগ্য ছাড়া উপায় নেই—কিটসন একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, পরিকল্পনাটা যে খারাপ তা আমি বলছি না। বিশেষ করে একটা ট্রাককে ক্যারাভ্যানের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার বুদ্ধিটা তো অপূর্ব! কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে ট্রাকের তালাটা খুলে ফেলতে পারবো—! ধরে নেওয়া যাক, ট্রাকটা আমরা খুললাম এবং সব টাকা ভাগ করে নিলাম। তারপর? দু-লাখ ডলার নেহাত চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! অত টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যাবে না। কারণ পুলিশ সর্বক্ষণ তক্কে-তক্কে থাকবে। সুতরাং ঐ এক বস্তা টাকা নিয়ে আমরা করবোটা কি?

কেন? টাকাটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে রেখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! তাতে পুলিশের ভয় নেই!

নেই যে তা বলি কেমন করে? গত বছর ব্যাঙ্ক লুঠের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে? তারাও তোমার কথামতো লুঠের টাকাটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু পুলিশ তো আর ঘাস খায় না! ওরা শহরের ভল্ট একে-একে খুলতে লাগলো ; বরং পেয়েও গেল ব্যাঙ্ক লুঠের সমস্ত টাকা। কিটসনের আঙুল চেপে বসলো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর চোখের দৃষ্টি স্থির।

যদি তাই হয়, তবে টাকাটা নিয়ে চলে যাবো ন্যু ইয়র্ক অথবা স্যানফ্র্যানসিসকোয়-অথবা আরও দূরে ছোট্ট কোনো শহরে। তখন পুলিশ আর খুঁজে পাবে না। তাছাড়া পুলিশের অ্যামেরিকার প্রতিটি ভল্ট খুলে দেখা সম্ভব নয়।

পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করবে ঐ দশ লক্ষ ডলার উদ্ধার করতে। সুতরাং...

ওঃ, তুমি দেখছি ভীষণ ভীতু। জিনির কথায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে কিটসন অবাক হলো। অতোই যদি ভয় থাকে, তাহলে এ কাজের সমর্থনে ভোট দিলে কেন?

কিটসন এ আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানলো, যাকগে ওসব কথা বাদ দাও। ফ্র্যাঙ্ক আমার কথা শুনলে হয়তো বলে বসতো, প্রলাপ বকছি। তাছাড়া মনে হয় এ কাজে আমরা সফল হবো। এবার তুমি বলো, তোমার টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

জিনি সীটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে জিনির সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব কিটসনকে আরো মুগ্ধ করলো।

ও-সে সব আমার অনেক আগেই ঠিক করা আছে। টাকা থাকলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। গত বছর আমার বাবা মারা গেছেন। যদি বাবার কিছু টাকা থাকতো, তাহলে বোধহয় তিনি আজ বেঁচে থাকতেন। বাবা মারা যাবার সময় আমি একটা সিনেমা হলে কাজ করতাম—অতি সাধারণ চাকরি। সুতরাং দামী ওষুধপত্রের সংস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বাবা মারা যাওয়ার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, টাকার অভাবের জন্য এ পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে আমি রাজী নই। বাবার মতো শুয়ে থেকে, নির্জীবের মতো হার স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক মাথা খাটিয়ে এই ট্রাক লোপাটের পরিকল্পনাটা আবিষ্কার করলাম।

কিটসন বিচলিত হলো জিনির এই অপ্রত্যাশিত আত্ম উন্মোচনে। এবং ট্রাক লোপাটের ব্যাপারে জিনির মন যে স্থির প্রতিজ্ঞ, তা জেনে স্বস্তি হলো। কিটসন বুঝলো, জিনি ক্রমশঃই তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

কিন্তু এই ট্রাক ও তার দশ লক্ষ ডলারের খবর তুমি পেলে কেমন করে?

জিনি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলো। কিটসন দেখলো ওর মুখে আগের সেই বরফ কঠিন নির্বিকার অভিব্যক্তি ফিরে এসেছে। কিটসন বললো, ভেবো না আমি তোমার হাঁড়ির খবর জানতে চাইছি। এমনি কৌতূহল হলো তাই বললাম। যাকগে, কিছু মনে করো না—ভুল হলে মাপ চাইছি।

কিটসনের দিকে জিনি তাকালো। তারপর রেডিওর সুইচ অন করে নবগুলো নাড়াচাড়া করে আধুনিক যন্ত্র সঙ্গীতের সুর বাজালো। জিনি সীটে পা এলিয়ে বাজনার তালে তালে পা নাচাতে লাগলো।

ওর ইঙ্গিত বুঝে কিটসন নিজের ওপর বিরক্ত হলো। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

মিনিট কুড়ি পর ক্যারভান মর্ট-এর সামনে কিটসনের বুইক এসে থামলো। দোকানের নাম 'দি কোয়ালিটি কার অ্যান্ড ক্যারাভান সেন্টার'। মার্লো থেকে মাইলখানেক দূরে দোকানটা বড় রাস্তার ওপরেই।

একটা সবুজ সাদা রঙের কাঠের ঘর কিটসন দেখলো—সম্ভবতঃ অফিস ঘর। তার পাশেই গ্যারেজ—পুরনো গাড়ি, লরি, ক্যারাভান সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড় করানো। ওদের গাড়ি দোকানের কাছে থামামাত্রই অফিস ঘর থেকে পড়িমড়ি করে এক অল্পবয়েসী যুবক দৌড়ে এলো। তাকে দেখেই বিরক্তি বেড়ে গেলো কিটসনের। যে ধরনের ছেলেদের সে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে, লোকটা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দলের। তার মুখশ্রী সাধারণের তুলনায় সুন্দর, গায়ের রঙ তপ্ত

কাঞ্চনবর্ণ, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, গভীর নীল চোখের তারা সজীব, প্রাণবন্ত। লোকটার পরনে সাদা গরম স্যুট। একটা ঘিয়ে রঙের শার্ট আর একটা রক্ত লাল টাই। ডান হাতের শক্ত কব্জিতে একটা দামী ওমেগা ঘড়ি সোনার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।

উদগ্রীবভাবে লোকটা কিটসনের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। একটা মোটা দাঁও মারার প্রত্যাশায় তার চোখেমুখে আশার আলো জ্বলজ্বল করছে।

সে চট করে এসে গাড়ির ওপাশের দরজার কাছে—যেখানে জিনি বসেছিল থমকে দাঁড়ালো। লোকটা দরজা খুলে ধরতেই জিনি নামলো। তার একগাল হাসিভরা প্রিয়জন সুলভ অভ্যর্থনার বহর দেখে আক্রোশে কিটসনের মুষ্টিবদ্ধ হতে নিসপিস করলো।

লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, ক্যারাভান সেন্টারে এসেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ম্যাডম। এখানে এসে ভালোই করেছেন। আপনাদের একটা ক্যারাভ্যান চাই, এই তো? আমাদের চেয়ে ভালো ক্যারাভান এ চত্বরে কোথাও পাবেন না। আসুন—দেখবেন আসুন—

ইতিমধ্যে কিটসন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে লোকটার গায়ে-পড়া স্বভাব দেখে অস্বস্তি বোধ করলো।

আমার নাম হ্যারি কার্টার। বুইকের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে কিটসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা—হাত ঝাঁকালো।

আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ কার্টার, আমরা একটা জুতসই ক্যারাভানের খোঁজ করছি—তাই না, অ্যালেক্স, জিনির স্বর কিশোরীর মতো খুশী খুশী শোনালো।

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে হ্যারি কার্টার বললো, তাহলে বলতে হবে, আপনারা ঠিক উপযুক্ত জায়গাতেই এসেছেন। আপনাদের জীবনে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়—এর গুরুত্ব অনেক...কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন। ক্যারাভান নিয়ে আপনাদের এতোটুকু অসুবিধেয় পড়তে হবে না। যেটা পছন্দ হয় সেটাই বেছে নিন—সবরকম ক্যারাভানই আমাদের দোকানে আছে। আপনাদের কিরকম চাই সেটা শুধু বলুন।

কিটসন গম্ভীরভাবে বললো, একটু কমদামের মধ্যে চাই।

দাম নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাববেন না, কমদামের ক্যারাভানও এখানে অনেক আছে। আসুন না। ঘুরে ফিরে দেখবেন। যেটা পছন্দ হয় বলুন, দামের জন্য ভাববেন না।

ওরা ক্যারাভানগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

কিটসনের বেশ কিছু সময় লাগলো মনমতো ক্যারাভান পেতে। কারণ জিপোর নির্দেশমতো ক্যারাভানটা কম করে ষোলো ফুট লম্বা দরকার। তাতে অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম না থাকাই ভালো। বেশ কিছুটা ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভানটাকে দেখে ওটা পরীক্ষা করার জন্যে থমকে দাঁড়ালো।

ক্যারাভানটা সাদা রঙের কিন্তু ছাদের রঙ আকাশ নীল। দু পাশে এবং সামনে পেছনে দুটো করে জানলা।

কিটসন জিনিকে বললো, এটায় কাজ চলতে পারে। জিনি মাথা দুলিয়ে বলল, মিঃ কার্টার, এটার মাপ কতো?

কার্টার যেন অবাক হলো। কোনটা? এই সাদাটা? আমার মনে হয় এটা আপনাদের পক্ষে জুতসই হবে না...,কার্টার কিটসনকে বললো, আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানি না। মিঃ...

হ্যারিসন। মাপ কতো ক্যারাভানটার?

সাড়ে ষোলো বাই ন-ফুট। সত্যি বলতে কি মিঃ হ্যারিস এই ক্যারাভানটা আসলে লিকার-টিকার করার জন্য তৈরী—এবং সেই কারণেই বেশ শক্তপোক্ত। তাছাড়া ভেতরে সেরকম কোনো সুব্যবস্থাও নেই। বুঝতেই তো পারছেন—। আপনার স্ত্রী সম্ভবতঃ এটা একেবারেই পছন্দ করবেন না তাই না মিসেস হ্যারিসন?—কার্টারের চোখজোড়া আবার গিয়ে থামলো জিনির সুগঠিত পায়ের ওপর।—অবশ্য এটার মতো অন্য ক্যারাভানও আছে—তাতে সবরকমই বন্দোবস্ত রয়েছে—দেখবেন আসুন, একেবারে 'এ' ক্লাস জিনিস।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিটসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যারাভানের চাকা দেখতে লাগলো, স্বয়ংক্রিয় ব্রেক...বুঝলো ক্যারাভানটার বইবার ক্ষমতা। তাছাড়া, জিপো বারবার বলে দিয়েছে স্বয়ংক্রিয়

ব্রেকের কথা। নাঃ, এ জিনিসই তাদের চাই।

জিনি ঠাট্টার সুরে বললো, আমার স্বামীদেবতা হাতের কাজে ওস্তাদ। আমাদের আসল মতলবটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, মিঃ কার্টার। আমরা ঠিক করেছি, একটা ক্যারাভান কিনে সেটাকে নিজেদের মনমতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবো। একবার এর ভেতরটা দেখতে পারি?

ও—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে এটা দেখা হয়ে গেলে আরো একটা ক্যারাভান আপনাদের কষ্ট করে দেখতে হবে। তাহলেই বুঝবেন আমি 'এ' ক্লাস বলতে কি বোঝাতে চাইছি। এটা নিছকই একটা বাক্য নয় বুঝলেন?

কার্টার ক্যারাভানটার দরজা খুলতেই জিনি ও কিটসন ভেতরে উঁকি মারলো।

কিটসন তার ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো। ক্যারাভানের ভেতরটা দু একটা হালকা সেলফ্ র‍্যাক দিয়ে সাজানো। ওগুলোকে খুলে সাফ করে দেওয়া যায়। কিটসন এবার ক্যারাভানের ভেতরে ঢুকলো। নাঃ, মেঝেটা ভীষণ মজবুত, তাছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কিটসনের মাথার ওপরে প্রায় ইঞ্চি খানেক জায়গা রয়েছে।

হ্যারি কার্টারের অনুরোধে এরা দ্বিতীয় ক্যারাভানটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে জানাল প্রথমটাই ভালো।

কিটসন নীল সাদা ক্যারাভ্যানটির দিকে যেতে যেতে—মিঃ কার্টার, প্রথমটাই পছন্দ হয়েছে। কতো দাম পড়বে ওটার?

কার্টার ক্যারাভানটার পাশে দাঁড়িয়ে ওটার ওপর চোখ বোলাতে শুরু করলো—এই ক্যারাভানটা বেশ মজবুত—মানে টেঁকসই, বুঝলেন মিঃ হ্যারিসন। বহু বছর পর্যন্ত এটা আপনাদের কাজে আসবে। না, এটা নিয়ে আপনারা ঠকবেন না। এটার নতুন দাম হচ্ছে তিন হাজার আটশো ডলার। তবে এটা তো নতুন নয়। তাই দামটা না হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন এর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই। মানে, যারা নতুন কিনেছিল তারা পুরো ছমাসও ব্যবহার করে নি। আর আপনাদের মধুচন্দ্রিমার ব্যাপারে যখন পছন্দ হয়েছে—তখন আর বেশি বলি কি করে? নিন, মাত্র আড়াই হাজারেই ক্যারাভ্যানটা দিচ্ছি। একেবারে জলের দর মশাই।

জিনি বললো, উহুঁ, অতো দাম তো আমরা দিতে পারবো না। তাহলে এটা আর আমরা নিতে পারলাম না, মিঃ কার্টার। চলো আলেক্স, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

আমি এমন কিছু দাম বলিনি, মিসেস হ্যারিসন। তাহলে আসুন, একটু কম দামের মধ্যে অন্য ক্যারাভ্যান দেখাই। ঐ তো, ওটা দেখছেন—ওটার দাম মাত্র পনেরো'শো ডলার—অবশ্য এটার মতো তেমন মজবুত নয়। কিন্তু খুব সৌখীনভাবে সাজানো।

নির্বিকারভাবে কিটসন বললো, আঠারো শো পর্যন্ত উঠতে পারি। মিঃ কার্টার, তার বেশি দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই।

অনুকম্পার হাসি হেসে কার্টার বললো, আপনার শর্তে রাজি হতে পারলে খুশি হতাম, মিঃ হ্যারিসন। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিশ্বাস করুন। আঠারো শো ডলারে একদম পোষায় না। জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছে বলেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে খারাপ লাগছে—ঠিক আছে, নিন। পুরোপুরি তেইশ শো ডলারই দেবেন। আর কম বলবেন না।

ক্রমশঃ কিটসনের মেজাজ তিরিক্ষি হতে লাগলো। কার্টারের মোলায়েম ভদ্র কথাবার্তা, সুন্দর ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কিটসনকে ঈর্ষান্বিত করলো।

জিনি বললো, কিন্তু অতো টাকা দিয়ে ক্যারাভান কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই, মিঃ কার্টার। ওর সবুজ চোখ এক বিশেষ মাদকতা নিয়ে কার্টারের চোখে চাইলো। কিটসনের চোখে খেললো ক্রোধের বিদ্যুৎ। জিনির এই মোহিনী ভঙ্গিমায় যেন রয়েছে যৌন আবেদন, আর কার্টার সেটা ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো চোখ দিয়ে চাটছে। —ওটাকে দু হাজারই করুন না। বিশ্বাস করুন, ওর চেয়ে বেশি টাকা আমাদের সঙ্গেই নেই।

চিন্তিতভাবে কার্টার গোঁফে হাত বোলালো। অসীম কৌতূহলে জিনির দেহের প্রতিটি বাঁক জরীপ করলো। ইতস্ততঃ করে কাঁধ ঝাঁকালো। আপনার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই, মিসেস হ্যারিসন। অন্য কেউ হলে এ প্রস্তাবে কখনই রাজী হতাম না। সত্যি বলতে কি, দু হাজারে ক্যারাভ্যান বেচলে আমার অন্ততপক্ষে একশো ডলার লোকসান যাবে—কিন্তু টাকাই

তো বড় কথা নয়। ঠিক আছে। এটাকে আপনাদের বিয়ের উপহার হিসেবে ধরে নিন। আপনাদের জন্য ওটার দাম আমি দু হাজারেই নামিয়ে দিলাম—মিসেস হ্যারিসন। সম্পর্কটাই আসল। সেখানে, টাকা পয়সার কোনো দাম নেই।

রাগে কিটসনের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। উত্তেজনায় তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

জিনি কিটসনের উত্তেজিত স্বরকে বাধা দিয়ে—শুনুন মশায় ধন্যবাদ, আপনার সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দু-হাজারে আমরা রাজি। জিনির মন কেড়ে নেওয়া, ইঙ্গিতের হাসি ব্যর্থ হলো না।

কার্টারের দৃষ্টি জিনির দিকে, এতে আর ধন্যবাদের কি আছে মিসেস হ্যারিসন। নেহাত আপনি বললেন তাই খাতির করলাম। আমার লোকদের বলে দিচ্ছি ওরা আপনাদের গাড়ির সঙ্গে ক্যারাভ্যানটাকে জুড়ে দেবে। আসুন, অফিসে বসে লেনদেনটা সারা যাক। কিটসনের দিকে ফিরে, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মিঃ হ্যারিসন। দরাদরির ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর জুড়ি নেই। আমার মতো ব্যবসাদারকেও তিনি রাজি করিয়ে ফেললেন। সত্যি, এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

ওদের লেনদেন সম্পূর্ণ হলো। বিলটা দু-আঙুলে ধরে সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে জিনির দিকে তাকালো। মধুচন্দ্রিমা কাটাতে কোথায় যাচ্ছেন, মিসেস হ্যারিসন? প্যারিসে?

উঁহু, আমার স্বামী মাছ ধরতে খুব ভালবাসেন। তাই ভাবছি কোন পাহাড়ী এলাকাতেই যাবো। তারপর কি হয় পরে দেখা যাবে।

কার্টারের লোলুপ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে কিটসন হাত বাড়িয়ে বিলটা যেন ছিনিয়ে নিলো। অথচ জিনি যেন নির্বিকার।

কিটসন জিনিকে বললো, চলো, এবার ওঠা যাক। ওদিকে আবার একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে।

কৃপার হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালো কার্টার। আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি। পরে যদি কোনদিন এই ক্যারাভ্যানটা পালটে নতুন কিছু নিতে চান, লজ্জা করবেন না—সোজা আমার কাছে চলে আসবেন। বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে জিনির সঙ্গে হাত ঝাঁকালো কার্টার।

বিরক্ত হয়ে কিটসন পকেটে হাত ভরে রাখলো। কার্টারের সঙ্গে হাত মেলাতে তার গা রি রি করছিলো। দরজার দিকে সে এগোলো।

ততক্ষণে বুইকের সঙ্গে ক্যারাভ্যানটা লাগানো হয়ে গেছে। কার্টার জিনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে গাড়ির দিকে এগোলো—পেছনে কিটসন।

জিনিকে গাড়িতে তুলে দেবার ভঙ্গী দেখে কার্টারের ওপর কিটসনের রাগ যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। কার্টার তার পিঠে এক সশব্দ চাপড় মেরে আসন্ন মধুচন্দ্রিমার শুভেচ্ছা জানালো।

গাড়ি ছুটে চলতেই জিনি বললো, যাক। জিনিসটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে—মরগ্যান খুশী হবে।

চাপা স্বরে কিটসন বলল, ওই হতভাগাটাকে কষে ধোলাই দেওয়া উচিত ছিলো। ব্যাটা যেভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিলো...

জিনি সবুজ চোখে ঘৃণা ও বিরক্তি নিয়ে কিটসনের দিকে তাকালো।

তার মানে?

না, ঐ কার্টারের কথা বলছি। ব্যাটা যেরকম জুল-জুল করে তোমাকে দেখছিলো। ইচ্ছে করছিলো ওর নাকে একখানা বসিয়ে দিই।

জিনির স্বর বরফ শীতল—কে আমার দিকে কিভাবে তাকালো, তাতে তোমার কি? আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই, তবে মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছো কেন?

কেউ যেন কিটসনের মুখে সজোরে চড় মারলো। অপমানে তার মুখ রক্তিম। শক্ত মুঠোয় স্টিয়ারিং চেপে ধরে সে গাড়ি ছোটালো।

জিপোর কারখানায় পৌঁছনো পর্যন্ত একবারও মুখ খুললো না।

জিপো, ব্রেক ও কিটসন সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আসল কাজের জন্য ক্যারাভ্যানটাকে তৈরী করে ফেললো।

ব্রেক ঐ এগারো দিন ধরে জিপোর কাছ থেকে নড়েনি। এমন কি জিপোর ঐ নোংরা

আস্তানাতেই সে রাত কাটিয়েছে। ব্রেকের এতোটা কর্মাত্মা প্রাণ হওয়ার কারণ সে জানে। মরগ্যান তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রাণপণ পরিশ্রম করে সে মরগ্যানকে দেখাতে চাইছে। তার ঐ ব্যর্থতা আকস্মিক ও সাময়িক, সেটা মরগ্যানকে বুঝিয়ে দিতে সে বদ্ধ পরিকর।

জিপোর পাশে শুয়ে রাত কাটানো যে কি দুঃসহ ব্যাপার সেটা ব্রেক বুঝতে পেরেছে। আসলে জিপোর মতো নোংরা এবং কষ্টসহ্য করার ক্ষমতা তার একেবারেই নেই।

প্রতিদিন সকালে ঘড়ি ধরে আটটার সময় কিটসন কারখানায় আসে। আর রাত বারোটায় ফেরে। ওরা তিনজনে সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানটার পেছনে লেগে থাকে যাতে ওটা ট্রাকটাকে বইতে পারে।

এই ক্যারাভ্যান নিয়ে কাজ করার সময়েই ব্রেক ও কিটসন বুঝতে পারলো জিপোর কর্মদক্ষতা। ওর বুদ্ধি ও উদ্ভাবনা ক্ষমতার সাহায্য না পেলে ওরা এগোতে পারতো না।

জিপোকে ব্রেক বিশেষ পাত্তা দিতো না। কিন্তু এখন বুঝলো যন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে জিপোর কাছে তারা নিতান্তই এক-একটি গর্দভ। জিপোর সাহায্য ছাড়া এই ট্রাক লুঠের কথা ভাবাই যায় না। ব্রেকের সেই সঙ্গে ঈর্ষা এবং বিরক্তি হলো।

কিন্তু কিটসন ভীষণ খুশী এই সরল সাদাসিধে ইটালিয়ানের কাজে। সে মনে মনে জিপোকে শ্রদ্ধা করতে লাগলো। তার মনে হলো, জীবনে এই প্রথম একটা কাজের কাজ শিখছে। তাছাড়া জিপোর একাগ্রতা ও ধৈর্য তাকে মুগ্ধ করলো।

ক্যারাভ্যানের কাজ শেষ হলো মঙ্গলবার রাতে। এবং সেই রাতেই জিপোর কারখানায় মরগ্যান এক আলোচনা চক্রের আহ্বান জানালো।

জিনি গত এগারো দিন ধরে একেবারে বেপাত্তা। ও মরগ্যানের কাছে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলো, যদি পরিকল্পনা কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় তবে যেন ফোন করে জানায়। কিন্তু ও কোথায় থাকে, কি করে, সে সম্বন্ধে কারোর জানা নেই—এমন কি মরগ্যানেরও না।

কাজে ব্যস্ত থাকলেও কিটসন সর্বদাই জিনির কথা ভেবেছে। নিজের অজান্তেই সে যে জিনিকে ভালবেসেছে, সেটা কিটসন আর অস্বীকার করতে চাইলো না। অবশ্য এই ভালবাসা নিতান্তই হাস্যকর ও অর্থহীন। যেমন সে জানে, ওয়েলিং কোম্পানীর ট্রাক লুঠের পরিকল্পনা তাদের টেনে নিয়ে যাবে অসাফল্য ও একরাশ বিপর্যয়ের মুখে।

কিন্তু জিনির প্রতি তার আকর্ষণ এতই উদ্দাম যে তাকে রোধ করা কিটসনের অসাধ্য। অসংখ্য বীজাণুর তো সেই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিটি শিরা উপশিরায়। মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে।

মরগ্যান ক্যারাভ্যান নিয়ে এই ক'দিন মাথা ঘামায় নি।

কখনো মরগ্যানের চিন্তা ধারা খাপছাড়াভাবে এগোয় না। সে জানে, ট্রাকটাকে দখলে আনার পর পালাবার ব্যাপারটাই হবে প্রধান।

অর্থাৎ পুলিশ খবর পাওয়ার আগেই অকুস্থল থেকে ক্যারাভ্যানের দূরত্ব যতোই বাড়ানো যায় ততোই নিশ্চিন্ত। সুতরাং অনিবার্যভাবেই সারা শহরের ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে তাকে প্রাণপণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

মরগ্যান রাত প্রায় আটটার সময় জিপোর কারখানায় এলো। এ কাজের সফলতা সম্পর্কে সে বর্তমানে নিশ্চিত। শুধু দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে একটু চিন্তা। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায়। তবে তাকে রোধ করার ক্ষমতা মরগ্যান কেন পৃথিবীর কারোরই নেই।

এই প্রথম বর্ষার শুরু। বৃষ্টির একঘেয়েমি আর সেইসঙ্গে নাকে ভেসে আসছে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। বাঁধানো রাস্তা থেকে যেন অনুভূত হচ্ছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস—মরগ্যানের এই ভিজে আবহাওয়া ভালো লাগলো।

অদূরে জিপোর কারখানার সমস্ত জানলা দরজা সযত্নে বন্ধ। ভেতরের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে না। পুরো এলাকাটা যেন জনশূন্য এক পরিত্যক্ত স্থান।

মরগ্যান বুইকের দরজা খুলে বাইরে পা রাখলো। হেডলাইট নেভাতে যাবে, পায়ের শব্দ কানে এলো। কেউ যেন তার দিকে দৌড়ে আসছে। মরগ্যান ৩৮ এর বাঁট আঁকড়ে ধরে অনুসন্ধানী চোখে তাকালো।

মরগ্যান এবার জিনি গর্ডনকে দেখতে পেলো। ওর পরনে একটা নীল বর্ষাতি। মাথায় নীল টুপি।

মরগ্যান বললো, বহুদিন পর বৃষ্টি হলো। তোমার ঠিকানা জানা থাকলে আসার পথে তোমাকে তুলে নিতাম।

জিনি বললো, তাতে কি হয়েছে?

মরগ্যান কাছে গিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তুমি থাকো কোথায়, জিনি?

জিনি থমকে দাঁড়িয়ে মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে—সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে মরগ্যান সামনের দিকে ওকে টেনে—আমার সঙ্গে কথা বলতে সমঝে বলবে, খুকী! তোমার ব্যবহার চালচলন প্রথম থেকেই আমাদের একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে। আমি এখনও জানি না, তুমি কে, তোমার আসল পরিচয় কি? কোথায় থাকো, এই ট্রাক লুঠ করার দুর্বুদ্ধি কি করে তোমার মাথায় এলো—মানে তুমি এক রহস্যময়ী। তবে তোমার উদ্দেশ্য আমার অজানা নয়। তুমি ভাবছো, যদি এই ট্রাক লুঠের ব্যাপারটা আমরা কেঁচিয়ে ফেলি তাহলে তুমি ভোল-চাল পাল্টে, টুক করে হাপিশ হয়ে যাবে। জিনি গর্ডন নামে যে কেউ ছিলো, সেটা পুলিশ ধরতেই পারবে না, প্রমাণ তো দূরের কথা।

জিনি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো—সেটা করা কি খুব অন্যায় হবে? মরগ্যানের পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গেলো কারখানার দরজার দিকে। বারকয়েক টোকা মারলো।

মরগ্যান নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। তার অভিব্যক্তিহীন কালো চোখ সংশয়ে কুটিল। কিটসন কারখানার দরজা খুলতেই সে জিনির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরা একইসঙ্গে কারখানায় ঢুকলো।

মরগ্যান বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, এই যে আলেক্স, এদিকের খবর কি?

কিটসন বললো, এ দিকের কাজ সব শেষ। জিনি ওর ভিজে বর্ষাতি টেবিলের ওপর রাখলো। ওর পরনে একটা ধূসর কোট স্কার্ট—আর সবুজ ব্লাউজ। এই পোষাকে ওকে দেখে কিটসনের বুকে যেন ধাক্কা লাগলো। আশান্বিত উৎসুক চোখে সে জিনির দিকে চেয়ে রইলো।

জিনি একবার কিটসনকে দেখলো কিন্তু তেমন আমল দিলো না। বর্ষাতির পকেট থেকে ও একটা বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করলো। সেটা হাতে নিয়ে ক্যারাভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিপোর কাছে গিয়ে বললো, এই যে পর্দাগুলো নিয়ে এসেছি।

মরগ্যান বললো, কি খবর, জিপো? মরগ্যানের প্রত্যুত্তরে স্বভাবসিদ্ধ একগাল হেসে জিপো তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তার মুখমণ্ডলে আত্মপ্রসাদের ছাপ স্পষ্ট।

জিপো পর্দার প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বললো, কাজ সব শেষ এবং কাজ দেখলে তুমি খুশীই হবে, ফ্র্যাঙ্ক। দাঁড়াও, পর্দাগুলো আগে লাগিয়ে দিই। তারপর দেখো শালার ক্যারাভ্যানের চেহারা—একেবারে যন্তর।

ব্লেক একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে ছায়ার আওতা থেকে বেরিয়ে জিনিকে দেখেই তার দৃষ্টি ওর শরীরে বাঁধা পড়লো—কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ।

এগারো দিন বলতে গেলে ব্লেক কোনো মেয়ের মুখই দেখেনি। তাই আজ জিনিকে সামনে পেয়ে ওর মনের ইচ্ছেটা অদম্য হলো। কিটসনকে জিনির দিকে মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে ব্লেক ভীষণ মজা পেলো। থ্যাবড়া মুখো ছোঁড়াটা ভাবছে কি? ও কি সত্যি সত্যিই জিনিকে কব্জা করতে পারবে? হুঁঃ, বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ।

ব্লেক জিনির সামনে গিয়ে, কি ব্যাপার। কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? একেবারে এগোরো দিন বেপাত্তা। তা, এই লুকোচুরির কারণটা কি?

উত্তরে জিনির সহজ মিষ্টি হাসি ব্লেককে খুশী করলো।

হালকা স্বরে জিনি বললো, ছিলাম কাছাকাছিই, তবে মোটেই লুকোচুরি খেলছিলাম না।

ব্লেক সিগারেট কেস্ এগিয়ে দিয়ে বললো, তাহলে তো মাঝে মাঝে এলেই পারতে? আমরা কাজে নতুন করে উৎসাহ পেতাম।

ব্লেক লাইটার জ্বালিয়ে জিনির সিগারেট ধরিয়ে দিলো।

আসতে আমার আপত্তি ছিলো না, তবে ঐ যে উৎসাহ-টুৎসাহ কি সব বললে, ওতে আমার একটু অনিচ্ছা আছে।

কিটসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো আর অস্বস্তি অনুভব করছিলো, ওদের সহজ, ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তায় তার বিরক্তি লাগলো। আর ব্লেকের কথায় জিনিকে খুশী হতে দেখে সে আরও দুঃখ পেলো।

তাহলেও অন্ততঃ একবার এসে দেখা করতে পারতে। আমি এখানে একা একা চুপচাপ দিনের পর দিন কাজ করে চলেছি...ওঃ। ভেবে দেখো দশ দশটা রাত জিপোর মতো জলহস্তীর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে...বাপরে বাপ।

সশব্দে হেসে জিনি—ভালোই হয়েছে। অভিজ্ঞতার একটু আধটু পরিবর্তন দরকার। বলেই জিনি ক্যারাভ্যানের দিকে গেলো। মরগ্যান তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যারাভ্যানটাকে দেখছে।

জিপো পর্দাগুলো লাগিয়ে গলদঘর্ম অবস্থায় বেরিয়ে, এসো, ফ্র্যাঙ্ক—ভেতরটা দেখবে এসো।

মরগ্যান একইভাবে ক্যারাভ্যানের দিকে চেয়ে, দরজাটার কি করেছো জিপো?

জিপো হেসে কিটসনকে চেঁচিয়ে ডাকলো, আলেক্স, এদিকে এসো একবার—ফ্র্যাঙ্ককে কলকব্জা নেড়ে দরজার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও।

কিটসন ক্যারাভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মরগ্যান দরজাটা বার দুয়েক নেড়ে চেড়ে দেখলো তার কাছে ওটা বেশ মজবুত বলেই মনে হলো।

সাফল্যের উত্তেজনায় জিপোর স্বর আগ্রহে ফেটে পড়ছে—কি হে। কিরকম বুঝছো?

দেখে তো মন্দ লাগছে না।

আসল কাজটা এখুনি দেখতে পাবে। আলেক্স, যন্তর চালু করো।

কিটসন একটা হাতলে চাপ দিতেই ক্যারাভ্যানের পেছনটা একটা বাক্সের ঢাকনার মতো উঠে গেলো। একই সঙ্গে মেঝের কিছু অংশ পাটাতনের মতো বেরিয়ে এলো। সেটা মাটিতে ঠেকতেই, ক্যারাভ্যান থেকে কারখানার মেঝে পর্যন্ত তৈরী হলো একটা ঢালু মজবুত রাস্তা।

জিপো হাত ঘষতে ঘষতে বললো, দেখেছো এবার আসল কায়দাটা? তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি হয়েছে। পেছনের ঢাকনা আর ক্যারাভ্যানের মেঝে দুটোকে একসঙ্গে কাজ করাতে গিয়ে কি কম অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে?

মরগ্যান ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো। —নাঃ, তোমার সামর্থ্য আছে—সত্যিই একটা যন্তর তৈরী করেছো। তবে এই কলকব্জার ব্যাপারটা আরো কয়েকবার চালাও, দেখি?

কিটসনকে কম করেও বার দশেক হাতল টিপতে হলো। মরগ্যান অবশেষে ক্ষান্ত দিলো। —হুঁ, ভালোই হয়েছে কায়দাটা। সে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

জিপো চটপট মরগ্যানকে অনুসরণ করলো। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারাভ্যানের যে সব পরিবর্তন সে করেছে সেগুলো দেখালো, যেন পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকে এনে সে নিজের বাড়ি দেখাচ্ছে।

হাইড্রোজেন আর অ্যাসিটিলিনের সিলিন্ডারগুলো রাখবার জন্য ওপর দিকে এই কাঠের বাক্সগুলো লাগিয়েছি। যন্ত্রপাতির জন্য ঐ কাবার্ডটা। আর মালপত্র রাখবার জন্য দুধারে কাঠের টানা তাক রয়েছে। মেঝেটাকে যথাসম্ভব মজবুত করেছি। যাতে চট করে ভেঙে না যায়।

মরগ্যান বিশেষ করে নজর দিলো ক্যারাভ্যানের মেঝের দিকে। তারপর ক্যারাভ্যান থেকে নেমে, চিত হয়ে শুয়ে ওটার তলায় মরগ্যান ঢুকলো। টর্চলাইট জ্বেলে পরীক্ষা করতে লাগলো। ক্যারাভ্যানের মেঝের তলায় আড়াআড়িভাবে বল্টুদিয়ে আটকানো ইস্পাতের চওড়া পাতগুলো তার চোখ এড়ালো না।

একসময় মরগ্যান বেরিয়ে এলো ক্যারাভ্যানের নীচ থেকে। সে হাত দুটো ঝেড়ে জিপোর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট স্বরে বললো। সাবাস জিপো! আমার কথার এতটুকু নড়চড় হয়নি দেখছি। কিন্তু ট্রাকটা ক্যারাভ্যানে ঢোকাবার পর বুইকটা কি ঠিকমতো টানতে পারবে?

কেন পারবে না। আমি বলছি না যে ওজন খুব কম হবে। তবে, যদি আমাদের পাহাড়ী রাস্তায় না উঠতে হয়, তাহলে ঐ ট্রাকসমেত ক্যারাভ্যানটাকে তোমার বুইক অতি সহজেই টেনে নিয়ে

যাবে।

হুঁ—পাহাড়ের দিকে না এগোলে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে...সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে তোমার ওপর জিপো—কত তাড়াতাড়ি তুমি তালা খুলতে পারো তার ওপর। যদি তোমার সময় খুব বেশি লাগে তাহলে হয়তো বাধ্য হয়েই পাহাড়ী এলাকায় ছুটতে হবে—নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তা আমি চাই না। কারণ পাহাড়ী এলাকার রাস্তাগুলো একেই বিপজ্জনক,তার ওপর অসম্ভব খাড়া। আমার মনে হয়, বুইকটা অতো ওজন পেছনে নিয়ে ঐ খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় উঠতে পারবে না।

জিপো অস্বস্তিভরে বললো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে ট্রাকের তালা খোলার জন্য আমি অফুরন্ত সময় পাবো? না কি ট্রাকের তালা ফুসমন্তরে পাঁচ মিনিটে খুলে যাবে বলে মনে করছো?

মরগ্যান জিপোকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলো। জিনি, কিটসন, ব্লেক চমকে জিপোর দিকে ফিরে তাকালো। ঠিক আছে, ঠিক আছে—এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন? তোমাকে আমি বলছি না যে ট্রাকটা পাঁচ মিনিটে খুলতে হবে। হয়তো দু-তিন সপ্তাহ সময় পাবে—তবে তারপরে আমাদের পাহাড়ে গিয়ে হয়তো লুকোতে হতে পারে।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে আমাকে একমাস সময় দেওয়া হবে তালা খোলার জন্য, আর এখন তুমি দু'তিন হপ্তার কথা বলছো? ওয়েলিং কোম্পানির ট্রাকটা আমি দেখেছি। ওর তালা খোলা নেহাত ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। তাড়াহুড়ো করে ঐ তালা খোলা অসম্ভব।

মরগ্যান ভাবলো ট্রাক উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক-শো লোক যে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। তার ওপর রয়েছে মিলিটারী হেলিকপ্টার—প্রতিটি রাস্তা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে। দ্রুতগামী পুলিশের দল মোটর বাইকে চড়ে প্রত্যেকটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সত্যিই তাদের দু লক্ষ ডলার করে পেতে হয়, তবে জিপোকে একটু তাড়াহুড়ো করতেই হবে। মরগ্যান জানে, আগে থাকতে জিপোকে এসব কথা জানালে ও ভয় পেয়ে যাবে। হয়তো একেবারে বেঁকে বসবে। তার চেয়ে বরং ট্রাকটা আগে ক্যারাভ্যানে চড়ুক তখন জিপোকে তাড়াহুড়ো করার জন্যে চাপ দেওয়া যাবে। তখন আর রাজি না হয়ে পারবে না।

মরগ্যান জিপোকে সমর্থন জানিয়ে বলল, আমারও তাই মনে হয়—-তাড়াহুড়ো করে ঐ তালা খোলা যাবে না। দেখা যাক, যদি ভাগ্য সহায় থাকে, তবে হয়তো একমাস সময় পেলেও পেতে পার। কে বলতে পারে, হয়তো প্রথম চেষ্টাতেই তুমি ট্রাকের তালা খুলতে পারবে।

জিপো গম্ভীরভাবে বললো, ওদের ট্রাকটা খুব মজবুত। ওটা খুলতে গেলে কম সময়ে হবে না।

একটা সিগরেট ধরালো মরগ্যান, তাহলে আসল কাজের জন্য আমরা প্রস্তুত?

তার মুখোমুখি দাঁড়ানো তিনজনের চোয়াল কঠিন হলো—মুখে একটা বিচলিত ভাব।

জিনি ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। ও সতর্ক হয়ে বললো, আজ মঙ্গলবার। সুতরাং চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য আমরা তিনটে দিন হাতে পাচ্ছি.. মানে আসলে কাজটার জন্যে আমরা শুক্রবারটাই বেছে নিচ্ছি। কারো কোনো আপত্তি আছে?

কুঁকড়ে যেন কিটসনের দম বন্ধ হয়ে এলো। গত এগারোদিন ধরে এতো ব্যস্ত ছিল যে আসল কাজের কথা তার মনেই ছিলো না। দিব্যি মনের আনন্দে প্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করেছে—একমুহূর্তের জন্যেও তার মনে হয়নি, এ সবই আসল কাজের প্রস্তুতি।

কিটসন যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়লো পার্থিব জগতে। আতঙ্কে তার হাত পা পলকের জন্য স্থবির হয়ে পড়লো।

ব্লেক অনুভব করলো তার শিরদাঁড়ায় কোনো সরীসৃপের শীতল উপস্থিতি। কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র ছিলো না। কারণ সে জানে, কপালের জোর থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সে মস্ত বড়লোক হয়ে উঠবে। দু লক্ষ ডলার থাকবে তার হাতের মুঠোয়। ব্লেকের উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো।

জিপোর অস্বস্তি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ট্রাক খোলার সময় সম্পর্কিত ঐ ভাসা ভাসা ধারণাটাই তার মনের জোরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ট্রাক লুঠ করার ব্যাপারে সে জড়িত থাকছে না। অতএব সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্তি। কিন্তু মরগ্যান তার হাত যশ সম্পর্কে একটা বিরাট ভ্রান্ত ধারণা

করবে। তা সে চায় না। বলা যায় না, হয়তো ঐ ট্রাকের তালা জিপোর পক্ষে খোলাই সম্ভব হবে না। সুতরাং আগে থাকতে ভুল ধারণা করে ফ্র্যাঙ্ক তখন বিপদে পড়বে।

ব্লেক জোরালো স্বরে বললো, ঠিক আছে, শুক্রবারই ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।

জিনি বললো, আমি রাজি।

কিটসন আর জিপোর দিকে মরগ্যান তাকালো।

দুজনেই ইতস্ততঃ করছে। কিন্তু কিটসন যেই বুঝলো জিনি তাকে লক্ষ্য করছে, অমনি ভাঙা গলায় বললো, শুক্রবারই হোক, ক্ষতি কি?

তখন জিপোও বললো, আমার কোনো আপত্তি নেই।

।। পাঁচ ।।

যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলে মরগ্যান গিয়ে বসলো।

তাহলে এই যদি আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, তবে অসম্পূর্ণ কাজগুলো এবারে সেরে ফেলা যাক। মরগ্যান সবার মুখের ওপর একে একে চোখ বুলিয়ে নিলো।

কারখানার এখানে সেখানে পড়ে থাকা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ওরা চারজন একমনে মরগ্যানের কথা শুনতে লাগলো।

মরগ্যান বললো, জিনির ব্যবহারের জন্য আমাদের আরও একটা গাড়ি দরকার। খোলামেলা টু-সীটার স্পোর্টস কার হলেই ভাল হয়। গাড়িটা জোগাড় করার ভার আমি কিটসন ও ব্লেকের ওপরেই দিলাম। গাড়িটা তোমরা কায়দা করামাত্রই সোজা এই কারখানায় নিয়ে আসবে। জিপো গাড়িটার রঙ, নম্বর সব পাল্টে দেবে—কেউ ধরতেই পারবে না। এই গাড়িটাকে আমরা বিপজ্জনক বাঁকের মুখে উল্টে দেবো। ঐ বাঁকটার কাছাকাছি রাস্তার ধারে একটা বড়সড় গাড্ডা আছে। ফুট দশেক লম্বা দুটো শাবল দিয়ে আমরা গাড়িটাকে ওই গর্তে উল্টে দেবো। তোমার ওপরে শাবল দুটো জোগাড় করার ভার, জিপো।

ঠিক আছে।...আর ফ্র্যাঙ্ক, ঐ পথ নির্দেশ দুটো আমি তৈরি করে ফেলেছি।

দেখি, কোথায়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপো পথ নির্দেশ দুটো নিয়ে এলো। মরগ্যান দেখে খুশীই হলো—ভালোই হয়েছে। এবার তাহলে পুরো পরিকল্পনাটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তোমরা একজন কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করো। কারণ কাকে ঠিক কি কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে পরে যেন কোনরকম সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। জিনি তুমি লেখো। কেমন?

আমাকে একটা কাগজ আর পেনসিল দাও—আমি লিখে নিচ্ছি।

জিপো কাগজ পেনসিল আনতে গেলে ব্লেক বললো, জিপো মনে হয় ভয় পেয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক। আমার তো ওকে নিয়ে রীতিমতো চিন্তা হচ্ছে।

মরগ্যান কঠিন মুখে বললো, জিপোকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। ট্রাক দখলে আনা পর্যন্ত আমরা ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার করবো, কিন্তু তারপরও যদি দেখি ও বেগড়বাই করছে, তাহলে ওকে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে—তাছাড়া উপায় নেই। সুতরাং জিপোকে নিয়ে ভয় পাওয়া নিরর্থক।

তুমি ঠিকই বলেছো—ওইভাবেই ওকে দিয়ে কাজ করাতে হবে।

মরগ্যান এবার কিটসনের দিকে তাকিয়ে বললো এবারে বলো, আলেক্স—কিরকম লাগছে তোমার? কিভাবে টাকাটা খরচ করবে কিছু ভেবেছো?

কিটসন ধীরভাবে বললো, এখনও টাকাটা আমাদের হাতে আসেনি। ওটা হাতে আসার পর মতলব ভাঁজার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

মরগ্যান তারপর জিনির দিকে ফিরলো—কেমন লাগছে, জিনি?

ভাবলেশহীন ভাবে জিনি বললো—কেন খারাপ কি?

জিপো একটা প্যাড আর পেনসিল এনে জিনিকে দিলো।

মরগ্যান বললো, পরিকল্পনাটা আগাপাস্তালা আমি আবার বলছি। কেউ যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পারো, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবে, কারণ প্রত্যেকেরই নিখুঁতভাবে জানা দরকার—তাকে

কি করতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন করতে দ্বিধা করবে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে লাগলো, শুক্রবার সকাল ঠিক আটটায় আমরা এখানে জমায়েত হচ্ছি। কিটসন ও জিনির পরনে থাকবে নতুন বর-বউ যেন ছুটি কাটাতে যাচ্ছে এরকম পোশাক। কিটসন বুইকটা চালাবে, আর স্পোর্টস কারটা চালাবে জিনি। আমরা থাকবো বুইকের লাগোয়া এই ক্যারাভ্যানটার ভেতরে—সম্পূর্ণ অদৃশ্য। জিনি গাড়ি নিয়ে সোজা যাবে ওয়েলিং এজেন্সির কাছে। সেখানে ও ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করবে। এদিকে কিটসন বুইক এবং ক্যারাভ্যান নিয়ে সোজা সেই কাঁচা সড়কের মুখে পড়বে। সেইখানে একটা পথ নির্দেশ সমেত জিপোকে আমরা নামিয়ে দেবো। এই খানে লিখে রাখো। পথ নির্দেশ দুটো জায়গামতো লাগানোর জন্য আমাদের দুটো ভারী হাতুড়ি দরকার। শোনো জিপো, কাঁচা সড়কের মুখে তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি। সেখানে লুকোবার জন্যে অনেক ঝোপঝাড় আছে। তোমার কাজ হচ্ছে ট্রাকটার জন্য অপেক্ষা করা। যেই ওটা কাঁচা সড়কে ঢুকবে, অমনি তুমি পথনির্দেশটা রাস্তার মুখে লাগিয়ে দেবে—যাতে অন্যান্য গাড়ি আর সেই রাস্তায় না ঢোকে। বুঝতেই পারছো এইভাবে আমরা ট্রাকটা একলা পাচ্ছি।...আচ্ছা—এবার কাজ হয়ে গেলে তুমি কাঁচা সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করবে। যাতে আসল কাজের পর তোমাকে আমরা তুলে নিতে পারি—বুঝেছো?

জিপো উত্তেজিতভাবে মাথা ঝাঁকালে, হ্যাঁ—

এরপর কিটসন গাড়ি থামাচ্ছে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে। সেখানে এড এবং আমি ক্যারাভ্যান থেকে নেমে পড়বো—বলাবাহুল্য আশপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আমরা ট্রাকের আসার অপেক্ষায় থাকবো। কিটসন কিন্তু গাড়ি চালিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবে। কিটসন, তুমি ক্যারাভ্যানটা কোনো জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে শুধু বুইকটা নিয়ে কাঁচা সড়কের অন্য মুখটায় পৌঁছবে। সেখানে দ্বিতীয় পথনির্দেশটা লাগিয়ে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে। ক্যারাভ্যানটা আবার বুইকের পেছনে জুড়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে, যেদিক থেকে ট্রাকটা আসার কথা, অর্থাৎ আমাদের দিকে মুখ করে রাখবে। তারপর সংকেতের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করবে। রাস্তা বেশ চওড়া আছে। ক্যারাভ্যান শুদ্ধু গাড়ি ঘোরাতে তোমার কোনো অসুবিধেই হবে না। তারপর সংকেত পেলে তুমি গাড়ি ছুটিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। গাড়িটাকে আগের মতো ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের পেছনটা ট্রাকের সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। রাস্তার মাটি যথেষ্ট শক্ত। তবে একটা কথা—সংকেত শোনার পর তুমি একমুহূর্তও দেরী করবে না। বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি ছোটাবে। এ ব্যাপারে যেন কোনরকম ভুলচুক না হয়।

কিটসন বললো, কিন্তু সংকেতটা কি, সেটা তো বললে না। কি করে বুঝবো কখন গাড়ি ছোটাতে হবে?

চিন্তায় মরগ্যানের ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, হুঁ—আমার মনে হয় রাইফেল বা রিভলবারের শব্দ তুমি অতি সহজেই শুনতে পাবে। যদি সে ধরনের গুলি গোলার ব্যাপার না ঘটে। তবে আমি বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে সংকেত পাঠাবো। বাঁশীর একটানা সংকেত শোনামাত্রই তুমি তোমার কাজ শুরু করবে। কেমন?

গম্ভীরভাবে কিটসন বললো, তোমার কি ধারণা যে রিভলবার বা রাইফেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে?

মরগ্যান কাঁধ ঝাঁকালো। কি জানি! আগে থাকতে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে আমার ধারণা, সেরকম ঘটনা ঘটতেও পারে।

মরগ্যান ব্লেকের দিকে একঝলক দেখে আবার বললো, সে যাই হোক, মোট কথা বাঁশীর শব্দ শুনলেই তুমি চলে আসবে। জিপো, তোমার কাজটা খুবই সহজ মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার শেষের কাজটুকু হয়ে দাঁড়াবে সবচেয়ে কঠিন—কথাটা মনে রেখো।

অস্বস্তিভরে জিপো ঘাড় নাড়লো। তবে কোনোরকম মারপিটের ঝামেলায় জড়াতে হবে না দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আর তাছাড়া সে যখন মরগ্যানের প্রধান কারিগর, তখন যন্ত্রপাতির কাজ ছেড়ে সে কেন যাবে সাধারণ হাতাহাতির মধ্যে—তার কাজ হচ্ছে ট্রাকের তালা খোলা, ব্যস।

মরগ্যান কিটসনকে বললো, তোমাকে কি করতে হবে—এখন বুঝতে পেরেছো?

কিটসন নিজেকে খুনের দায়ে জড়ানোর ভয় থেকে বাঁচাতে পেরে আশ্বস্ত হলো।

এবার তাহলে জিনির কথায় আসা যাক। ট্রাকটা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি গাড়ি নিয়ে এজেন্সির দরজার কাছে অপেক্ষা করবে। ট্রাকটা রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেই তুমি ওটাকে সাবধানে অনুসরণ করবে। ড্রাইভার যেন তোমাকে দেখতে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ট্রাকটা যখন মাঝারি রাস্তায় পড়বে, তখন তুমি ওটার ঠিক পেছনে গিয়ে হাজির হবে। ঘন ঘন হর্ন বাজাতে থাকবে। তোমাকে যাবার রাস্তা দিতে ট্রাকটা একপাশে সরে যাবে। এরপর তোমাকে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে। অর্থাৎ ট্রাক ড্রাইভার যেন তোমাকে মনে রাখে। অতএব যখন ট্রাকের পাশ কাটাবে, তখন খুব জোরে হর্ণ বাজাবে। চাই কি ড্রাইভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু-চার বার হাতও নাড়বে। তারপর তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। আমি চাই, ঐ ড্রাইভার যেন মনে করে তোমার ভীষণ তাড়া আছে। তুমি যদি ঠিক সময়মতো ট্রাকের পাশ কাটাতে পারো, তবে সামনে তখনও মাইল খানেক রাস্তা পাবে। যে গাড়িটা তোমাকে এনে দেবো সেটা ঘণ্টায়, কম করে একশো মাইল দৌড়বে—সুতরাং তুমি যতো জোরে পারো গাড়ি ছুটিয়ে যাবে। যাতে টমাস আর ডার্কসন বলাবলি করে যে, মেয়েটা একটা দুর্ঘটনা না করে বসে। আশা করি তুমি আমার মতলব বুঝতে পেরেছো?

জিনি সম্মতি জানালো।

কাঁচা সড়কের বাঁক ঘুরতেই ওরা আর তোমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তাই বলে তুমি গাড়ির গতি কমাবে না। দুর্ঘটনার কোনো ভয় নেই। কারণ মুখোমুখি আসা কোনো গাড়ির তুমি দেখা পাবে না। অর্থাৎ কিটসন ততক্ষণে কাঁচা সড়কের অপর প্রান্তে "প্রবেশ নিষেধ" পথ নির্দেশ লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও তুমি সাবধানে থাকবে। যাতে কোনো বিপদ না হয়। আমরা শাবল নিয়ে তোমার জন্য বিপজ্জনক বাঁকের মুখেই অপেক্ষা করবো।

এড ও আমি গাড়িটাকে উলটে ফেলে দেবো রাস্তার ধারের গর্তে। ট্রাকটা এসে পৌঁছবার আগে দৃশ্যসজ্জার জন্য আমরা মোটামুটি পনেরো মিনিট সময় পাবো। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে, কতো জোরে তুমি গাড়ি চালাতে পার তার ওপর। দুর্ঘটনার দৃশ্যটাকে বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব করে তোলার জন্য তোমার গাড়িতে আমরা আগুন ধরিয়ে দেবো। পেট্রল-ট্যাঙ্কে ডোবানোর জন্য একটা লম্বা, ছেঁড়া কাপড় আমাদের দরকার পড়বে। কাগজে কাপড়ের টুকরোর কথা লিখে নাও। মরগ্যান কিটসনের দিকে ঘুরলো—তুমি যাবে ডুকাসের একটা মাংসের দোকানে। সেখান থেকে বোতল দুয়েক শুয়োরের রক্ত নিয়ে আসবে। রক্ত কেনার কারণ বলে দিও তোমার বাগানের কাজে লাগবে। জিনি, তুমি সঙ্গে করে আর এক প্রস্থ পোশাক নিও। কারণ তোমার পরনের পোশাক রক্তে একেবারে ভর্তি করে দেওয়া হবে। আমি চাই ট্রাক থামিয়ে টমাস ও ডার্কসন মনে করুক, তুমি অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছো। তোমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে ওরা ট্রাক ছেড়ে নামতে আর দেরী করবে না। একটু হেসে মরগ্যান প্রশ্ন করলো, কোনো প্রশ্ন আছে?

জিনি বললো, না। এখন পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।

আচ্ছা, তাহলে রক্ত সমুদ্রের মাঝে অচেতন হয়ে তুমি পড়ে রয়েছো। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এড ও আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে—এডের হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। ট্রাকটা এসে এই দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে থামলো। এইখানে কিছুটা আমাদের আন্দাজের ওপর চলতে হবে। এবং এর পরবর্তী কাজগুলো অবস্থা বুঝে করতে হবে। কারণ জিনিকে পড়ে থাকতে দেখে টমাস এবং ডার্কসন ঠিক কি করবে বলা মুশকিল। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে জিনির ওপর দিয়ে তারা ট্রাক চালিয়ে যাবে না। সুতরাং ওরা থামবে। হয়তো দুজনে নেমে অবস্থাটা ভালো করে বুঝতে চাইবে। আমার ধারণা প্রহরীটা এগিয়ে যাবে জিনির দিকে। আর ড্রাইভার ট্রাকেই বসে থাকবে। তাহলে ডার্কসন যেই জিনির ফুট খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে। অমনি ট্রাকের পেছন দিক থেকে আমি এগিয়ে আসবো। এড তখন তার লুকোবার জায়গা থেকে ডার্কসনকে লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করে রাখবে। ডার্কসন যেই জিনির ওপর ঝুঁকে পড়বে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হবো ট্রাকের জানলার কাছে—ড্রাইভারের মুখে রিভলবার ঠেসে ধরবো। এবং একই সঙ্গে জিনি

ডার্কসনের পেটে বন্দুক চেপে ধরবে।

মরগ্যানের দিকে ওরা চারজন একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

এরপর কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাও তোমাদেরই মতো। হয় টমাস ও ডার্কসন আত্মসমর্পণ করবে, নয় তো গোলমাল বাধাতে চাইবে। সুতরাং আমাদের সবরকম পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। ডার্কসনের কোনোরকম বেচাল দেখলেই এড ওকে গুলি করবে। টমাসের ক্ষেত্রে আমাকেও ঐ একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মানে, পুরো ব্যাপারটাই একটা সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করছে। তবে যাই ঘটুক না কেন, টমাসকে আমি বোতাম টিপবার সময় দিচ্ছি না। তোমরা প্রত্যেকে যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারো তবে বিপদের কোনো কারণ নেই। মরগ্যান ব্লেকের দিকে তাকালো।

যদি একান্তই তোমাকে রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ ডার্কসন খুব বেশি হলে তোমার থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে থাকবে, আর তোমার হাতে থাকবে, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল—তা দিয়ে একশো গজ দূরের একটা মানুষকেও মেরে ফেলা যায়। তবে মনে রাখবে রাইফেল যেন একবারের বেশি ব্যবহার করতে না হয়। স্থির এবং নিশ্চিত গুলি করবে।

সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হবে না।

আচ্ছা, তাহলে টমাস, ডার্কসনকে কুপোকাত করে আমি বাঁশীতে ফুঁ দেবো। তুমি আমাদের থেকে শ'পাঁচেক গজ দূরে থাকবে। কিটসন, বাঁশীর শব্দের জন্য একমনে কান পেতে অপেক্ষা করবে। সংকেত শোনামাত্রই ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবে।

কিটসন ঘাড় নাড়লো। এরপর আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কিটসন গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভানটাকে ট্রাকের সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। আমি ট্রাকটা চালিয়ে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভানে ঢুকিয়ে দেবো। জিনি, তুমি ঐ সময়ের মধ্যে তোমার পোষাক চটপট পাল্টে নেবে। এড শাবল দুটো এবং রাইফেলটা নিয়ে ক্যারাভানে ঢুকিয়ে রাখবে। তারপর ট্রাকে আমার পাশে এসে বসবে। আর জিনি ও কিটসন বসবে বুইকে—পাশাপাশি। কিটসন আবার ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ট্রাকটা এসেছে সেদিকে ছুটবে। ততক্ষণে জিপো রাস্তা ধরে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। অতএব অতি সহজেই আমরা ওকে ক্যারাভ্যান খুলে ট্রাকের ভেতর তুলে নেবো।

তাহলে কিটসন আর জিনি রইলো বুইকে। আর আমরা তিনজন রইলাম ক্যারাভ্যানের ভেতরে দাঁড়ানো ট্রাকের মধ্যে—সম্পূর্ণ অন্তরালে। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বড় রাস্তার দিকে ছুটবো। তা বলে কিটসনকে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হবে না। ভাগ্য সহায় থাকলে আমরা পনেরো মিনিটের মধ্যেই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বো। ঐ সময়ের মধ্যে এজেন্সি জানতে পারবে তাদের ট্রাক মাঝ রাস্তায় গায়েব হয়ে গেছে। প্রথমে হয়তো ওরা ভাববে ট্রাকের ট্রান্সমিটার কোনো অজ্ঞাত কারণে খারাপ হয়ে গেছে। তাই হয়তো রিসার্চ স্টেশনে খোঁজ করবে। আমার অনুমান, এই ট্রাক উধাও হওয়ার ব্যাপারে বিস্ফোরণ ঘটতে সময় লাগবে মোটামুটি আধঘণ্টা। বড় রাস্তায় পড়ে কিটসন তিরিশ মাইলের বেশি জোরে গাড়ি ছোটাবে না। আর ঐ সময়ে রাস্তায় গাড়ি-টাড়ির ভিড়ও থাকবে প্রচুর সুতরাং এই ক্যারাভ্যানটার কথা কারো মনেও আসবে না।—বিশেষ করে লোকে যখন দেখবে নববিবাহিতা স্বামী-স্ত্রী ছুটি কাটাতে চলেছে। এ পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

কিটসন হাতে হাত ঘষে বললো, কিন্তু ড্রাইভার এবং রক্ষীর কি হবে? ওদের কী আমরা ঐ বাঁকের কাছেই রেখে আসবো?

মরগ্যান বিব্রতভাবে বললো, ও নিয়ে শুধু শুধু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এড এবং আমি ওদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো।

কিটসন ঘামতে লাগলো। টমাস ও ডার্কসনকে যে নৃশংসভাবে খুন করা হবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ওরা তো ক্যারাভ্যানটা দেখবে। এমন কি আমাদের চেহারার বর্ণনাও পুলিশের কাছে দেবে—বলবে ট্রাকটা আমরা ক্যারাভ্যানে লুকিয়ে রেখেছি। কিটসন টমাস ও ডার্কসনের ব্যবস্থার ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবে মরগ্যানের মুখ থেকে শুনতে চায়।

মরগ্যান বিরক্ত হয়ে বললো, সেটা যাতে না হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে, তাই না? অতএব তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আর এড এদিকে খেয়াল রাখবো। ঠিক আছে?

কিটসন জিনির দিকে তাকিয়ে ওর নির্বিকার মুখভাব দেখে তার আতঙ্ককে আরো বাড়িয়ে তুললো। তার মনের ভেতরে চিৎকার করে কে যেন বললো, সাবধান আলেক্স, ভালো চাও তো এখনো এসব ছেড়ে সরে এসো। কিটসন বুঝলো, এই ট্রাক লুঠের চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। এর শেষ অধ্যায় রক্তিম অধ্যায়। একজন অন্ধও এটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। কারণ টমাস ও ডার্কসনকে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে আসার সাহস তাদের নেই।...হঠাৎ মরগ্যানের কণ্ঠস্বরে, কিটসনের সম্বিত এলো—

তোমাদের যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি আবার শুরু করছি।

কাঁপা স্বরে জিপো বললো, দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক। ব্যাপারটা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকছে। আমি তোমার কাছে সোজাসুজি জানতে চাই ঃ টমাস ও ডার্কসনের তোমরা কি ব্যবস্থা করবে? কি করে তোমরা নিশ্চিত হবে যে ওরা পুলিশের কাছে মুখ খুলবে না?

মরগ্যানের চোয়ালের রেখা কঠিন হলো দাঁত খিঁচিয়ে বললো, তোমাকে কি জিনিসটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে? কি করে লোকের মুখ বন্ধ করতে হয় তা তুমি জানো না, ন্যাকা? শোনো জিপো, তুমি আর আলেক্স সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছেয় আমার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছো। তবে আগে আমি তোমাদের বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। চাই কি গরম চেয়ার পর্যন্তও ব্যাপার গড়াতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তেই তোমরা এ কাজে সম্মত হয়ে আমার পক্ষে ভোট দিয়েছিলে। অতএব কি পন্থায় টমাস ও ডার্কসনের মুখ বন্ধ করবো সে নিয়ে এখন আর ন্যাকামী কোরো না। তুমিও যেমন জানো, তেমনি আমিও জানি কিভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করতে হয়। কিন্তু তোমাকে তো আমি সে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি না? আমি আর এড যেচে সে ঝুঁকি নিচ্ছি। সুতরাং তুমি যদি এখন দলছুট হবার মতলবে থাকো, তো ভীষণ ভুল করবে। আমরা সবাই একসঙ্গে জলে নেমেছি। ডুবলে সবাই একসঙ্গেই ডুববো। তোমার আর কিটসনের হঠাৎ ধর্মোভাব জেগেছে বলে কাজ ভেস্তে দেবো, অতো বোকা আমি নই। বুঝেছো?

কয়েকবার ঢোঁক গিললো জিপো। মরগ্যানের নৃশংসতার ভাব দেখে তার মনে হলো, দ্বিতীয়বার যদি প্রতিবাদ করা হয় মরগ্যান তাকে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে না।

জিপো মৃদুস্বরে বললো, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।

আলবাৎ তাই হবে। বলেই মরগ্যান এক ঝটকায় কিটসনের দিকে ঘুরে, তুমি কি বলো?

মরগ্যানের চেয়ে কিটসন জিনিকে বেশি ভয় করে। কারণ এই চরম মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করলে জিনির কাছে হবে উপহাস্যাস্পদ। তাছাড়া একটা মেয়ের কাছে সে হার স্বীকার করতে পারবে না।

কিটসন বললো, আমি এমনিই একটা প্রশ্নর করেছি। তার জন্যও কি আবার জবাবদিহি করতে হবে না কি?

আশা করি তোমার প্রশ্নে উত্তর তুমি পেয়ে গেছো? যদি আর সময় নষ্ট করতে না চাও, তাহলে আবার বলতে শুরু করি?

উত্তেজনায় কিটসনের মুখ লাল, বলো।

বড় রাস্তায় পড়ে আমরা সোজা ছুটবো ফন-হ্রদের দিকে। কারণ, সেখানে একটা ক্যারাভ্যানের ঘাঁটি আছে। আমরা সেখানেই আমাদের ক্যারাভ্যানটা রাখবো। দুশো ক্যারাভ্যানের মধ্যে ওটাকে খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়—সন্দেহ করা তো দূরের কথা দুপুরের মধ্যেই আমরা ফন হ্রদে পৌঁছে যাবো। সেখানে হ্রদের চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর রয়েছে—কিটসন সেরকম একটা ঘর ভাড়া করবে। ভাড়া নেওয়া ঘরটার কাছেই তুমি ক্যারাভ্যানটা রাখবে। এবং তুমি আর জিনি নতুন বিয়ে করা বর-বউয়ের অভিনয় করবে। সাঁতার কাটবে, মাছ ধরবে। ঘুরে বেড়াবে—অর্থাৎ চুটিয়ে আনন্দ করবে। অন্যান্য লোকেরা যেন বুঝতে পারে তুমি মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এখানে এসেছো। এবং তোমরা নিজেদের মধ্যেই সর্বক্ষণ থাকতে চাও। তুমি যখন এই ধরণের পরিবেশ তৈরী করেছো, তখন আমি, জিপো ও এড ট্রাকটা নিয়ে পড়বো—

ব্রেক উত্তেজিত স্বরে, চেঁচিয়ে উঠলো, আশ্চর্য ফ্র্যাঙ্ক! কিটসন শালা দেখছি দিব্যি আরামের কাজ নিয়েছে! খালি ফুর্তি আর ফুর্তি!

উত্তেজিত রক্তিম মুখে কিটসন হাত মুঠো করে এগিয়ে এলো—রাগে চোখ জোড়ায় যেন আগুন জ্বলছে।

মরগ্যান রুক্ষস্বরে, থামো! মরগ্যানের রুষ্ট আদেশে কিটসন থামলো। —শোনো এড, তোমাকে আবারও বলছি। আমরা এই কাজটা দলগতভাবে করছি। কিটসনের কাজ গাড়ি চালানো এবং যৎসামান্য অভিনয় করা—ও দুটো কাজ ও আমাদের চেয়ে ভালোই পারে। অতএব তুমি কথায় কথায় ওকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা করা ছাড়ো। নয়তো শেষে আমরাই বিপদে পড়বো। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এই খেয়োখেয়ি দেখতে দেখতে আমার ঘেন্না ধরে গেলো। এক জিনিই যা চুপচাপ থাকে। এ কাজটা যদি আমাদের সত্তিই মতলব মাফিক হাসিল করতে হয়, তাহলে এই ছেলে মানুষিগুলো পকেটে পুরে রাখো। এ কথা আমি আর বলবো না—সেটা বুঝে চুপচাপ থাকো।

ব্রেক কাঁধ ঝাঁকালো—আচ্ছা, আচ্ছা—ঠিক আছে। ওঃ, একটা সামান্য মন্তব্য করলেও দেখছি বিপদ।

মরগ্যান আবার বলতে শুরু করলো, ক্যারাভান ফন হ্রদে গিয়ে থামামাত্রই জিপো ওর কাজ শুরু করবে। অবশ্য ক্যারাভ্যানের ভেতর ঐ অল্প জায়গায় এবং ভ্যাপসা গরমে ট্রাকের তালা খোলা সহজ হবে না, কিন্তু আমরা নিরুপায় জিপো, ওটুকু কষ্ট তোমাকে করতেই হবে। আমি আর এড ট্রাকের ভেতরে থাকবো—তোমারই সুবিধের জন্য। আমাদের তিনজনকেই একটু বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে, কারণ অন্ধকার নেমে আসার আগে আমরা ক্যারাভ্যান থেকে বেরোতে পারছি না। রাত হলেই আমরা ক্যারাভ্যান ছেড়ে ঘরে ঢুকবো, কিন্তু সকাল হওয়া মাত্রই সকলের অলক্ষ্যে আবার ক্যারাভ্যানে ফিরে আসবো। কেউ যাতে আমাদের দেখতে না পায়। জিপো যদি মনে করে তালা খোলার কাজ অল্প সময়ে হবে না তাহলে হয়তো আমাদের ফন হ্রদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে—সম্ভবতঃ পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে। কিন্তু সেটা এড়াতে পারলেই খুশী হবো। কারণ পাহাড়ী রাস্তায় বুইকের পক্ষে বোধহয় ক্যারাভ্যানটিকে টেনে তোলা সম্ভব হবে না...তার ওপর গাড়ি যদি বিগড়ে যায় তাহলেই তো চিত্তির। জিপোর দিকে তাকিয়ে মরগ্যান, কোনো প্রশ্ন আছে?

জিপো বললো, তার মানে ট্রাকের ভেতরে বসেই আমাকে ক্যারাভ্যানের ওপর কাজ চালাতে হবে। তাহলে তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করা মুশকিল হবে। প্রথমতঃ ক্যারাভ্যানের পর্দার ভেতর দিয়ে সেই আগুন কেউ দেখে ফেলতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ, ক্যারাভ্যানে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

হয়তো তোমাকে ঐ অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে নাও হতে পারে। সময়-নির্ভর তালাটা যে ঐ সময়ের মধ্যে খুলে যাবে না তাই বা কে বলতে পারে? অথবা কম্বিনেশন নম্বরটাও হয়তো অতি সহজেই তুমি বের করে ফেললে, তখন?

মরগ্যানের কথার সমর্থনে জিপো ঘাড় নাড়লো।

মরগ্যান টেবিল থেকে নেমে হাত পা ছাড়িয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সজীব করতে চাইলো, তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি পরিকল্পনা। এতে কোনোরকম সম্ভাবনাকেই আমরা বাদ দিইনি, কিন্তু তবুও এটা নিখুঁত হয় নি। কোনদিন কোনো পরিকল্পনা নিখুঁত হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত—ট্রাকটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে আমরা অতি সহজেই দিনের পর দিন লুকিয়ে রাখতে পারবো। ক্যারাভ্যানের সমুদ্রে কোনো একটা বিশেষ ক্যারাভ্যানের ভেতর ট্রাকটার অবস্থিতির কথা কেউ ধারণাতেই আনতে পারবে না। আমাদের প্ল্যানের এটাই হলো সবচেয়ে মার কাটারি অংশ। জিনি, এর জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার এই মতলবটা এককথায় অপূর্ব।

যার যা কাজ সে তা ঠিকমতো করলেই আমাদের কাজ চোখ বুঝে হাসিল হবে—জিনির অকম্পিত কণ্ঠস্বরে নেই কোনো উচ্ছলতা।

মরগ্যান ঘড়ি দেখে বললো, আমার তাই মনে হয়। এড, তুমি আর কিটসন জিপোর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো—গাড়ি রাখবার জায়গাগুলো একবার চক্কর মেরে এসো। একটা স্পোর্টস কার

আমার আজ রাতেই চাই। গাড়িটা পেলেই জিপোর এখানে নিয়ে আসবে। জিপো ওটার রং পাল্টে নতুন রং করে দেবে। যাও, বেরিয়ে পড়ো।

কিটসন বিরক্তির সঙ্গেই রাজি হলো। বলাবাহুল্য ব্লেকের সঙ্গই তার যতো বিরক্তির কারণ। কিন্তু তবু সে রাজি হলো। মাথা নীচু করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

ব্লেক শিস দিতে দিতে ওকে অনুসরণ করলো। জিনিকে পাশ কাটাবার সময় অর্থবহ ভাবে সে চোখ টিপলো। জিনি শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

লিংকনে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ ওরা পেলো।

মরগ্যান জিনিকে বললো। জিনি, তোমাকে যা করতে হবে তা হলো খাবারের ব্যবস্থা। গোটা দুয়েক বাক্স কিনে তাতে টিনে ভরা খাবার কিনে নিও। কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে, যা যা দরকার মনে করো, বুঝে শুনে কিনে রেখো—আর হ্যাঁ, দু বোতল স্কচ কিনতে ভুলো না যেন। যাও, তোমার আর কোনো কাজ নেই। শুক্রবার সকাল আটটার সময় আবার দেখা হবে—কেমন?

ঠিক আটটার সময়। প্যাড থেকে লেখা দুটো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মরগ্যানকে দিলো। সে কাগজ দুটো এক পলক দেখে পকেটে রাখলো।

বাইরে তো এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। বলো তো তোমাকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিই? মরগ্যান বললো।

জিনি প্লাস্টিকের বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে—না তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বাসেই যেতে পারবো। হঠাৎই মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে—তোমার ধারণা এ কাজে আমরা জিতবোই, তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমারও তো ঐ একই বিশ্বাস?

ইতস্ততঃ করে জিনি মাথা নাড়লো, হুঁ—। আচ্ছা, তাহলে চলি—দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে জিপো। শুধু দু লক্ষ ডলারের লোভ এবং মরগ্যানের নীরব শাসানি তার মুখ বন্ধ করেছে। এখন তার ভয় হচ্ছে, যদি তাদের কোথাও ভুল হয়ে যায়? যদি সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে? ওঃ ভগবান! তার মা শুনলে কি ভাববে?

জিপোর কাঁধে মরগ্যান আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত রাখলো—ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জিপো। আর মাত্র এক সপ্তাহ—তারপরই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। দু লক্ষ ডলারের জন্য এর চেয়েও বিরাট ঝুঁকি নেওয়া যায়, তাই না? যাকগে, কাল সকালে আমি আবার আসবো। ক্যারাভ্যানের ওপর তোমার কাজ দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। যাও, একটু গলা ভিজিয়ে নাও—এতো মুষড়ে পড়ার কি আছে?...আচ্ছা, তাহলে চলি—জিপোর পিঠে বার দুয়েক মৃদু চাপড় মেরে মরগ্যান চলে গেলো।

গমন্ট সিনেমার কাছাকাছি বিশাল গাড়ি রাখার জায়গা লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মনের ভেতর একসুপ্ত দ্বন্দ্বের আভাস পেলো কিটসন। এই বিপজ্জনক কাজে সাফল্য লাভের আশা সে করছে না। বরং সে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। এ কাজ থেকে সে পেছিয়ে আসতো, যদি না মরগ্যান তার ভূমিকা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতো। জিনি ও সে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করবে। তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। ঘুরতে হবে...তারা সাঁতার কাটবে, মাছ ধরবে—কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে দেবে। আর জিনি অভিনয়ের ব্যাপারে যেমন বাস্তবঘেঁষা, তাতে ঐ কটা দিন ও এড়িয়ে চলবে না কিটসনকে। তাছাড়া জিনি নিখুঁত অভিনয় করতে ভালবাসে।

সুতরাং জিনির সঙ্গলাভ তার মনের আশঙ্কাকে একেবারে মুছে দিলো। নাঃ, জিনির সঙ্গলাভের সুযোগ সে ছাড়তে পারবে না।

ব্লেক লিংকনে কিটসনের পাশাপাশি বসেছিল। হঠাৎ বললো, শোনো আলেক্স, তোমাকে আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভাল—জিনিকে নিয়ে যেন বেশি স্বপ্ন দেখো না। ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এই কাজের ঝামেলা মিটে গেলে আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বো—ঘুরে আসবো প্যারিস, লন্ডন—নানান দেশ। তাই তোমাকে আগেই বলে রাখলাম।

কিটসন আরেকটু হলেই একটা ট্রাকের গায়ে ধাক্কা মারছিলো। চৌমাথায় লাল আলোর সংকেত

দেখে সে গাড়ি থামালো। সে আগুন ঝরা চোখে ব্রেকের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে গর্জে উঠলো—তুমি মিথ্যে কথা বলছো! তোমার মতো একটা গাড়োলের সঙ্গে জিনি কখনো কোথাও যাবে না। অতএব, ফালতু তাপ্পি দিয়ে লাভ নেই।

তার টোপ ফেলা সফল হয়েছে জেনে ব্রেক হেসে উঠলো—তাই নাকি? তাহলে ঐখানেই তুমি ভুলটা করেছো, জ্ঞানদা সুন্দরী। জ্ঞান দানের অভ্যেসটা তোমার সাধারণ বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে না যাওয়ার কোনো কারণ আছে কি? তবু আমি কিছু লেখাপড়া জানি, তোমার তো ক অক্ষর গো মাংস। আর...তাছাড়া ঐ পেটেন্ট নাক নিয়ে তুমি জিনির সঙ্গে প্যারিসে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখো—হুঁঃ!

ব্রেকের তাচ্ছিল্যের হাসিতে কিটসন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, নামো বলছি। নইলে এক—

ব্রেকের জিভে হঠাৎ জেগে উঠলো ক্ষুরের ধার তোমার জায়গায় আমি হলে মোটেও সে চেষ্টা করতাম না, সেদিন আচমকা ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আমি ঠিক প্রস্তুত হতে পারি নি। কিন্তু আলেক্স, সে চেষ্টা এখন কোরো না—একটি ঘুঁষিতে তোমার দাঁত কটা উপড়ে ফেলে দেবো।

বিদ্যুৎগতিতে কিটসন পাশ ফিরলো...কিন্তু সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে ভেসে এলো অধৈর্য হর্নের শব্দ। সামনে চেয়ে দেখে লাল আলো সবুজে পরিণত হয়েছে। কিটসন সম্বিত ফিরে পেলে লিংকন আবার চলতে লাগলো।

ব্রেক কিটসনকে রাগাতে পেরে খুশী হলো। হ্যাঁ-যা বলছিলাম...সেদিন জিনির সঙ্গে গল্প করছিলাম, তা কথায় কথায় প্যারিসের গল্প উঠলো। তুমি তো জানো আমি বছর দুয়েক আগে প্যারিসে গিয়েছিলাম। জিনি বললো, ওর প্যারিসে যাবার খুব শখ। তখন—

দয়া করে চুপ করো। নইলে গাড়ি থামিয়ে তোমাকে চুপ করাতে হবে দেখছি!

ঠিক আছে, ঠিক আছে—তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি, যে জিনির ওপর প্রথম দাবিটা আমার। তুমি তো আবার ওর স্বামীর অভিনয় করছো। সুতরাং তখন যদি এ কথাটা ভুলে যাও তাহলে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে।

একটা বিরাট গাড়ি রাখবার জায়গার কাছে এসে হঠাৎই যেন কিটসন মুষড়ে পড়লো। জিনির মতো মেয়ের পক্ষে ব্রেকের মতো বদমাইশ লোকের ফাঁদে পা দেওয়া সহজ। তার ওপর ব্রেক হয়তো প্যারিসের ব্যাপারটা বানিয়ে বলছে না। এই আকস্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে কিটসন যেন হোঁচট খেলো।

কিটসন ব্রেকের সঙ্গে মুখোমুখি দ্বৈরথে নিজের জয় সম্পর্কেও তেমন স্থির নিশ্চিত নয়। প্রথমতঃ ব্রেক তার চেয়ে ওজনে চোদ্দ পাউন্ড বেশি এবং তার স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। একবার এক ঘরোয়া মারপিটের সময় ব্রেকের লড়াই কিটসন দেখেছিলো। ওর লড়াইয়ের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী কিটসনকে অবাক করেছিলো। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর জন্য যে কোনো কুটিল উপায় অবলম্বন করতে সে দ্বিধা করে না। উপরন্তু তার নৃশংস, নিষ্ঠুর লড়াইয়ের পদ্ধতি তো আছেই।

গাড়ি রাখার জায়গায় কাছে ওরা থেমে দেখলো, গাড়ি পাহারা দেবার কোনো লোকই সেখানে নেই। লম্বা লম্বা দুটো সারিতে গাড়িগুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রেক গাড়ি থেকে নেমে তুমি ও পাশের সারিটা দেখতে থাকো, আমি এ পাশেরটা দেখছি। যদি পছন্দমত মালের সন্ধান পাও, শিস দিয়ে জানাবে।

গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে দুজনে আলাদাভাবে এগিয়ে চললো। কিটসনের চোখ গাড়ির ওপর নিবদ্ধ হলেও মনে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাট।

ব্রেকের কথা মিথ্যে ভাবলেও কিটসনের মনে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খোঁচাতে লাগলো। সত্যিই কি জিনি ব্রেকের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? তবু ভালো, সে যে অন্ততঃ দু তিনটে দিন ওর সঙ্গে একান্তে কাটাতে পারবে—এবং তখনই সে একবার শেষ চেষ্টা করবে। জিনি যদিও বড় কঠিন, তবুও হাল ছাড়তে সে রাজি নয়। মাঝে মাঝে জিনির নির্বিকার, অচঞ্চল অভিব্যক্তি তাকে সন্দেহ গ্রস্ত করে তুলেছে। জিনির মন জয় করা আদৌ কোনো পুরুষের পক্ষে কি সম্ভব?

কিটসন একটা এম. জি. স্পোর্টস কারের সামনে এসে থমকালো। একটা ক্যাডিলাক এবং

জাগুয়ারের ফাঁকে ছোট্ট গাড়িটা দাঁড় করানো।

এইরকম একটা গাড়িই তাদের প্রয়োজন। কিটসন আড়চোখে এপাশ ওপাশ দেখে সতর্কভাবে গাড়িটার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

একটা ছোট টর্চ ছিলো কিটসনের। সেটা জ্বালিয়ে সে গাড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করলো। একটু খুঁজতেই গাড়ির চাবিটা পেয়ে গেলো। সুতরাং শিস দিয়ে সে ইশারা করে ব্লেককে ডাকলো। কিটসনের ডাকে ব্লেক এলো।

কিটসন বললো, মনে হচ্ছে এই গাড়িটায় কাজ হবে। এই যে গাড়ির চাবি।

ব্লেক গাড়িটা দেখে ঘাড় নাড়লো, হুঁ, চলবে। তা তুমি দেখছি দিনকে দিন সেয়ানা হচ্ছো, ব্যাপারটা কি? যাও—তাহলে গাড়িটা জিপোর কারখানায় পৌঁছে দাও। কারণ প্রথমতঃ তুমি গাড়ি চালানোয় দিগ্‌গজ, তার ওপর খুব একটা ভারী কাজের দায়িত্ব তোমার ওপর পড়েনি। সুতরাং এই যৎকিঞ্চিৎ ঝুঁকির কাজটুকু তোমাকে করতেই হবে। তারপরে না হয় জিনির সঙ্গে ঢলাঢলি কোরো।

কিটসনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। কোনোরকম ভাল মন্দ না ভেবেই ব্লেকের মুখে এক ঘুঁষি চালালো।

ব্লেক আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলো। পলকের মধ্যে সে মাথা হেলালো বাঁ দিকে। কিটসনের ঘুঁষি লক্ষ্যহীন অবস্থায় তার কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। কিটসন ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেকের ডানহাতি জোরালো ঘুঁষি আলেক্সের তলপেটে আছড়ে পড়লো। ব্লেক ইচ্ছে করেই সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুঁষি মারলো—কিছুটা প্রতিহিংসাবশতঃ কিছুটা আত্মরক্ষার প্রয়োজন। সংঘর্ষের আকস্মিকতায় কিটসন মুহূর্ত্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়লো। সে প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

কিটসন বহুদিন যাবৎ মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কিছুটা ধীরগতি হয়ে পড়েছে। শরীরের পেশী শ্লথ হয়ে পড়েছে। তাই ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগলো।

নৃশংস হাসিতে ব্লেক—এক মাঘে শীত যায় না চাঁদু। তাই আজ সুদে আসলে তোমার সেদিনকার বেইজ্জতি ওয়াপস করলাম। এরপর আর বেশি পায়তারা করলে নিজেই বিপদে পড়বে। যাও, চটপট গাড়িটা নিয়ে কেটে পড়ো। জিপো হয়তো অপেক্ষা করছে।

কথাটা শেষ করেই ব্লেক লিংকন চালালো। কিটসন তখনও একইভাবে বসে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ফুসফুসে হাওয়া টানার চেষ্টা করছে।

অবশেষে সে কোনরকমে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। টলায়মান পদক্ষেপে সে এম. জি স্পোর্টস কারে গিয়ে উঠলো। পরাজয়ের গ্লানি তার সারা শরীরে একটা বিজাতীয় রাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। ইঞ্জিন চালু করে কিটসন বেরিয়ে পড়লো।

ব্লেকের চড় খেয়েছে বলতে গেলে গাল বাড়িয়ে—কিটসন নিজেকে ধিক্কার দিলো। তবে পরের বার আর সে সুযোগ দিচ্ছে না। লড়াই করার শখ চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেবে।

কিটসন জিপোর কারখানা অভিমুখে গাড়ি ছুটিয়ে চললো।

দিনের পর দিন ব্লেক তাকে উপহাস করে এসেছে—কিন্তু কিটসন জবাব দেয়নি।

কিটসন যখন এলোমেলোভাবে ভাবতে ভাবতে জিপোর কারখানার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন দলপতি ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান তার বুইক নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চলেছে।

আসল কাজের ভাবনায় মরগ্যান মগ্ন। এই কাজটাকে সে অন্য তিনজনের চেয়েও গভীরভাবে নিয়েছে—যেন এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন। অবশ্য কথাটা মিথ্যে নয়। তাই মরগ্যান তাদের পরিকল্পনাকে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখেছে। বড় রাস্তায় গাড়ির সমুদ্রে গা ভাসিয়ে সে ভাবলো—এই আমাদের জীবনের শেষ কাজ।

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তায় এখনো জলের আস্তরণ। বুইকের হেডলাইটের আলো ভিজে রাস্তাকে যেন আয়না করে তুলেছে। সতর্ক হাতে গাড়ি ছুটিয়ে চললো মরগ্যান।

ঐ দশ লাখ ডলার হাতে পাওয়ামাত্রই তারা পাঁচজন যার যার ভাগের টাকা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরবে। নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা মরগ্যান আগেই করে রেখেছে। এই মুহূর্তে তার পকেটে

মেক্সিকো যাওয়ার টিকিট রয়েছে। এই টিকিটের বিশেষত্ব হলো যে কোনোদিন, যে কোনো সময়ে, যে কোনো প্লেনে মরগ্যান মেক্সিকো যেতে পারবে। সেজন্য কিছু বেশি টাকা লেগেছে। মেক্সিকোর এক আধা গ্রাম, আধা শহরে সে একটা ভল্ট ভাড়া করে রেখেছে। তাতেই সে লুঠের টাকা রাখবে, তারপর শুরু হবে প্রতীক্ষা। যখন মরগ্যান বুঝবে ট্রাক লুঠের চাঞ্চল্য কমে এসেছে তখন দু লক্ষ ডলার দিয়ে ধীরে ধীরে বন্ড কিনবে। সমস্ত টাকা যখন তমসুকে পরিণত হবে, তখন তাকে আর দেখে কে? এই পৃথিবীটাকে সে শুধু যে হাতের মুঠোয় পাবে তা নয়, পৃথিবী তখন থাকবে তার পায়ের তলায়।

মরগ্যান ভালোভাবেই জানে, এ কাজে সাফল্য ও অসাফল্যের সম্ভাবনা সমান-সমান—অর্থাৎ পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

মরগ্যানের চিন্তাধারা জিনির দিকে বাঁক নিলো। মেয়েটা তার সঙ্গে এক হয়ে মাথা খাটাচ্ছে ঠিক। কিন্তু একই সঙ্গে ও মরগ্যানের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জিনি ট্রাকটাকে ফাঁদে ফেলা থেকে শুরু করে লুঠ করা পর্যন্ত যে পরিকল্পনা দাখিল করেছে তা অপূর্ব। কিন্তু জিনিরই যে সে মতলবটা, সেটা মরগ্যান কিছুতেই মানতে রাজি নয়। তাহলে জিনির পেছনে কেউ কি আছে? নাকি কাউকে বৈঠকী চাল দিচ্ছে মেয়েটা?

মরগ্যান অবান্তর ভাবনাকে সরিয়ে রাখলো। কারণ পরিপাটি করা মতলবটা জিনিই তার হাতে তুলে দিয়েছে। তাতে মরগ্যান যে লাভবান হয় নি তা নয়। তাছাড়া এই কাজের সবচেয়ে কঠিন অংশের দায়িত্ব জিনি নিজে নিয়েছে। সুতরাং ওকে সন্দেহ করে লাভ কি?

মরগ্যান জিনিকে মন থেকে সরিয়ে, চিন্তিত মুখে আরো একবার পরিকল্পনার ছকে মন দিলো...

।। ছয় ।।

জিপোর ঘুম ভাঙলো শুক্রবার ভোর ছটায়। গতরাতে সে ভালোভাবে ঘুমোতে পারে নি। সম্ভবতঃ অসহ্য মানসিক উৎকণ্ঠাই এই অনিদ্রার কারণ। সে বিছানা ছেড়ে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দূরে ধূসর পাহাড়ের অন্তরাল থেকে ক্রমশঃ ভোরের সূর্য আত্মপ্রকাশ করছে।

দু ঘণ্টার মধ্যেই সেই কাজ শুরু হবে—যা নিয়ে একদিন তারা সর্বক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, আলোচনা করেছে—আজ থেকেই শুরু হবে পৃথিবীর চতুরতম এবং কঠিনতম তালার সঙ্গে জিপোর বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জিপো কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলো। যদি সে পরাজিত হয়, তাহলে? মরগ্যানের ক্রোধোন্মত্ত রূপের কথা মনে পড়ায় সে শিউরে উঠলো।

উত্তেজিত স্নায়ুগুলীকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে একটা টিনের গামলার দিকে এগিয়ে গেলো। গামলা থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলো। তারপর দাড়ি কামাতে গিয়েই সে বুঝলো তার হাত বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। গালে দু—এক জায়গায় রক্তও বেরিয়ে পড়লো। ট্রাকের সময়-নির্ভর তালা খোলার সময় তাকে ভীষণ সতর্ক হতে হবে।

কম্বিনেশন চক্রটাকে ঘোরাতে হবে এক চুল, এক চুল করে। কারণ কখন যে নম্বর মিলবে কেউ বলতে পারে না। সেই সময় যদি এভাবে তার হাত কাঁপে, তাহলে তো বিপদের কথা।

জিপো গভীর শ্বাস নিলো। নাঃ, এই উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাকে যে করে হোক রুখতেই হবে। বরাবর সে তার অচঞ্চল, স্থির, দক্ষ হাতের জন্য গর্ব অনুভব করেছে। কিন্তু আজ তার শিল্পীসুলভ আঙুল, আস্থা এবং আশ্বাসময় হাত—সব কি ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছে? আসল কাজের আগে থেকেই সে যদি সাহস হারিয়ে ফেলে তবে তো পরাজয় সুনিশ্চিত।

জিপো দেয়ালে ঝোলানো কাঠের ক্রুশটার দিকে ফিরে তাকালো। এই সুন্দর কাজ করা জিনিসটা তাকে তার মা দেশ ছাড়ার সময়ে দিয়েছিলো। হঠাৎই তার মনে হলো, এই মুহূর্তে তার প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু হাঁটু গেড়ে ক্রুশের নীচে বসে, বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে যখন প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হলো তখন সবিস্ময়ে দেখলো তার প্রার্থনার একটি শব্দও মনে নেই। জিপো উপলব্ধি করলো, এ কাজে ঈশ্বরের সাহায্য চাইবার ক্ষমতা তার নেই। জিপো অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে একই কথা বলল, 'ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।'

কিটসন বিছানা ছেড়ে উঠে কফি গরম করছিলো। একটা শীতল আতঙ্কের নাগপাশ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

গতরাতে তার শুধু উসখুস করেই সময় কেটেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পিছিয়ে আসার আর সময় নেই। ঠিক আটটার সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী একের পর এক কাজ শুরু হবে। নিয়তির লিখন স্পষ্ট অক্ষরে তার ললাটে আঁকা হয়ে গেছে। শুধু যদি জিনি না থাকতো, তাহলে কিটসন কিছুতেই এ কাজে সায় দিতো না। এতক্ষণে সে দূরে বহুদূরে চলে যেতো—যেখানে মরগ্যান তার খোঁজ পাবে না। কিন্তু...

সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, এ কাজে তারা বিফল হবেই হবে। কিন্তু জিনির আকর্ষণ অপরিণত ভালোবাসার নেশা তাকে রাজি করতে বাধ্য করেছে।

কফি চুমুক দিতে গিয়েই তার গা গুলিয়ে উঠলো। কাপটা সে বেসিনের ওপর উপুড় করে দিলো।

অন্য এক রাস্তার অন্য এক ঘরে জানালার কাছে মরগ্যান। ঠোঁটে একটা সিগারেট, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রক্তিম আকাশে। গত রাতের চরম প্রস্তুতির কথাই তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান যেন কোনো যুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। তাই আক্রমণ পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ সে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করছে, কোথাও গলদ আছে কিনা। এখন নিয়তিকে মেনে নিতে মরগ্যান প্রস্তুত—তাতে যদি পরাজয় আসে তবুও তার দুঃখ নেই। কারণ সে জানে তার তরফ থেকে কোন ভুল নেই, এর চেয়ে নিখুঁত পরিকল্পনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এখন সাফল্য অসাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে নিজেদের দক্ষতার ওপর। জিনি যদি হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়, ব্লেক যদি ঠিকমতো গুলি চালাতে না পারে। কিটসন তার গাড়ি ও ক্যারাভ্যান নিয়ে যদি বিপদে পড়ে অথবা যদি জিপো তালা খুলতে সক্ষম না হয়...কিছুই করার নেই। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মরগ্যান স্থির নিশ্চিত। মাথা নীচু করে স্থির অনড় হাতের দিকে দেখলো। নিজের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় সে সন্তুষ্ট হলো। না, কোনরকম ভুলকে সে অন্ততঃ প্রশ্রয় দেবে না

ব্লেক শহরের অন্যপ্রান্তে নিজের ফ্ল্যাটে তখনও শুয়ে। চিত হয়ে শুয়ে সে দেওয়ালের একটুকরো রোদের দিকে তাকিয়ে। সে জানে, যখন ঐ আলোর টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করবে তখনই তার বিছানা ছাড়ার সময় হবে।

কাল রাতে গ্লোরিকে ডেকে পাঠাতে খুব ইচ্ছে করছিলো কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা জেনে সে ইচ্ছে ত্যাগ করেছে। তার দরকারী জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে।

ব্লেক ভাবলো, আচ্ছা ডার্কসনকে খুন করার পর তার কি রকম লাগবে? কারণ অপরাধ জীবনে সেটাই হবে তার চরম পদক্ষেপ। এর আগে কোনদিন সে খুন করে নি। বরাবরই লুঠপাটের মতলবগুলো এমন ভাবে হয়েছে যাতে হতাহত না হয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

না, ডার্কসনকে খুন করাটাকে ব্লেক তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণ যা বাস্তব, তা স্বীকার করতেই হবে। কাজেই সাফল্যের প্রয়োজনে ডার্কসনের মৃত্যুর প্রয়োজন আছে। তাকে না মারলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু তবুও ব্লেকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য—ডার্কসনের কপালের লাল ফুটোটার দিকে। সে জানে তার হাত কাঁপবে না খুন করতে, তবু শিউরে উঠলো। জেলে থাকতে অনেক খুনীর সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। তারা গর্বসহকারে নিজেদের পাপের কাহিনী বললেও একটা অস্বস্তি আতঙ্কের ছায়া ব্লেক দেখতে পেয়েছে। কোথায় যেন ওদের ঘিরে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য কাচের দেওয়াল। তাদের চোখের যে অভিব্যক্তি, তা একবারেই আলাদা। এই কি তাহলে খুনীর চোখ? ডার্কসনকে খুন করার পর তার চোখেও কি ফুটে উঠবে একই দৃষ্টি? আমৃত্যু তাকে আতঙ্কের শিকার হয়ে কাটাতে হবে?

না, এ ঘটনার পর ব্লেক আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। দরজায় কড়া নাড়ার আকস্মিক শব্দেও তাকে চমকে উঠতে হবে। কোনো পুলিশি পোষাক তার মনে তুলবে শঙ্কার আলোড়ন। রাতের ঘুম হবে দুঃস্বপ্ন কণ্টকিত।

রোদের টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করতেই গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ব্লেক উঠে পড়লো।

খাট থেকে নেমে একটা স্কচের বোতলের দিকে এগিয়ে গেলো—বোতলে তখনো কিছুটা তরল অবশিষ্ট। ব্লেক বোতলটা উপুড় করে গলায় ঢাললো।

তারপর সে কলঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ঝাঁঝরিটা খুলে ঝর্ণার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

শহরের অপর প্রান্তে, ওপর তলায় একটা অপরিষ্কার ছোট ঘরে জিনি গর্ডন কাজে ব্যস্ত। নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্যুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করতে করতে হাত ঘড়িতে দেখলো—সাতটা বাজতে কুড়ি।

জিনি ভাবলো জিপোর কারখানায় রওনা হতে এখনও তার আধঘণ্টার ওপর সময় আছে—জানালার কাছে গিয়ে বসলো। দেখতে লাগলো বাইরের নোংরা, অপরিসর রাস্তা—তার দুধারের জঞ্জাল। এ সবই তার বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক। সুতরাং নোংরা হলেও কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

ভাগ্য যদি সহায় থাকে তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই দুঃখকষ্টের জীবনের অবসান হবে। নতুন করে জীবনের পথে পা বাড়াতে পারবে। তখন ওর কাছে থাকবে অজস্র টাকা। ও যেতে পারবে ওর স্বপ্ন নগরী ন্যু-ইয়র্কে। দামী দামী সব পোষাক কিনবে। প্রকাণ্ড বাড়ি কিনে সে রানীর হালে থাকবে। এতদিনের স্বপ্ন তার বাস্তবে রূপ নেবে।

যদি ভাগ্য সহায় থাকে...

কিন্তু মরগ্যানের ওপর জিনির যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। মরগ্যানের ধারণা অনেকটা তারই মতো। মরগ্যানের একটা কথা ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। হাতের মুঠোয় পৃথিবী এই তিনটি শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জিনির স্বপ্নের আসল রূপ। ওর ইচ্ছেকে এর চেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা আর কেউ করতে পারতো কিনা কে জানে। আর সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই প্রচুর টাকা।

নাঃ। ট্রাক লুঠ করা যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে লোক মরগ্যান।

কিন্তু ঐ তিনজন...

সংশয়ের ছায়া নেমে এলো জিনির মুখে।

কাজের মূল চাবিকাঠিই জিপোর ওপর নির্ভর করছে। আর সে যেভাবে অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাতে জিনির ভয় হয়। জিপো পারবে তো ট্রাকের তালাটা খুলতে? কিন্তু এখন জিপোর জন্য মরগ্যানের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই।

জিনির ভাবনা কিটসনকে নিয়েও। তার চোখের দৃষ্টি মোটেই ভালো লাগে না। আর যেভাবে সর্বক্ষণ ছোঁক ছোঁক করে। নাঃ, ফন হ্রদে গিয়ে তাকে সতর্ক থাকতে হবে—কোনমতেই যেন ঐ লোকটার সঙ্গে তাকে একা থাকতে না হয়।

জিনির কপালে ভাঁজ পড়লো কিটসনের কথা মনে পড়তেই। ছেলেটা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনির যুক্তি নির্ভর, আঙ্কিক মনের শীতলতা বুঝি কিটসনের চিন্তার উষ্ণতায় কমে এলো। মার্লো যাওয়ার পথে তাকে খুশী করার জন্য ছেলেটার আপ্রাণ প্রয়াসের কথা মনে পড়ে মুখে ফুটলো মিষ্টি হাসি।

জিনির হাতে টাকা আসামাত্রই নেকড়ের দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইবে। তাই ও ভাবছে, কাজের শেষে কিটসনের সঙ্গে যোগ দিলে কেমন হয়? ওদের দুজনের মিলিয়ে মোট চার লাখ ডলার হবে। তাছাড়া কিটসনের স্বভাব ভালোই। অনায়াসে জিনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারে। সবদিক থেকেই ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে। নইলে লোকে সন্দেহ করবে। একটা বিশ বছরের ছুড়ি এতো টাকা পেলো কোত্থেকে।

নাঃ, এ ব্যাপারটা নিয়ে জিনিকে আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে।

সবার আগে মরগ্যানই এসে পৌঁছলো।

সে যখন জিপোর কারখানার সামনে বুইক থামালো তখন ড্যাশ বোর্ডের ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ মিনিট।

গতরাতে সে, ব্লেক ও জিপো—তিনজনে বুইক গাড়িটার ওপর প্রচুর খেটেছে। বার বার দেখেছে কতোটা ধকল গাড়িটা সইতে পারে। মরগ্যান গাড়িটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তার

ফ্ল্যাটে—চালিয়ে দেখেছে গাড়িটার অবস্থা।

মরগ্যান কারখানায় ঢুকতেই দেখলো, জিপো ক্যারাভ্যানের কাবার্ডে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। জিপোর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। শ্বাস-প্রশ্বাস হাঁপানী রুগীর মতো যন্ত্রণা ক্লিষ্ট। যন্ত্রপাতি ধরা হাতদুটো কাঁপছে।

মরগ্যান ভাবলো প্রথম প্রথম তো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা যদি না হয় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

জিপো তো জিপো, এই মুহূর্তে মরগ্যান নিজেও কি সুস্থির থাকতে পারছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বে পৌঁছে সে নিজেও হয়েছে উৎকণ্ঠা কবলিত—জিভ শুকনো, বিস্বাদ। সুতরাং জিপো যে একটু বিচলিত হবে, তাতে আশ্চর্যের আর কি আছে!

কিন্তু জিপোর এই অনিশ্চিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। নইলে এই সামান্য দুর্বলতা থেকে রূপ নেবে বিরাট ফাটল—সেটা মরগ্যান কিছুতেই হতে দেবে না।

মরগ্যান এগিয়ে বললো, এই যে, জিপো,—ঠিক আছো তো?

মরগ্যানের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে জিপো বললো। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, ঠিক আছি। মনে হচ্ছে আজ আর বৃষ্টি হবে না। হুঃ, প্যাচপেচে বর্ষার চেয়ে রোদ্দুর অনেক ভালো।

এমন সময় একটা স্যুটকেস ও একটা পিকনিক বাস্কেট নিয়ে জিনি এলো। ওকে দেখে মনে হলো, গত রাতে ওর ভালো ঘুম হয় নি। ওর চোখের কোনে কালি, মুখে বিবর্ণতা।

মরগ্যান হালকা সুরে বললো। কি খবর, জিনি? ভয় করছে না কি?

ও মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে, তোমার মতোই—তার বেশি নয়।

মরগ্যান হাসলো, তাহলে তো ভয় করছে বলতে হয়। কারণ আমিও যে একেবারে নিশ্চিন্ত তা নই।

এবার কিটসন কারখানায় উপস্থিত হলো—তার পেছনে ব্লেক।

মরগ্যান ব্লেককে দেখেই বুঝলো, ও নেশা করেছে। ব্লেকের মুখে লালচে আভা, চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন একটা আলস্য অবসাদ। মরগ্যানের মনে অস্বস্তি হলো।

কিটসনকে কিছুটা নার্ভাস মনে হলেও জিপো বা ব্লেকের তুলনায় আজ সে নিজের ওপর অনেক বেশি আস্থাশীল। মরগ্যানকে এই ব্যাপারটাই অবাক করলো।

আটটা বাজতে দু মিনিট বাকি। সুতরাং শুধু শুধু মরগ্যান আর সময় নষ্ট করতে চাইলো না। সে বললো, ঠিক আছে, তাহলে এবার বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমরা তিনজন ক্যারাভ্যানটাকে বাইরে বের করো। আর জিনি, তুমি এম. জি টা নিয়ে সোজা এজেন্সিতে চলে যাও।

মরগ্যান জিনিকে অনুসরণ করে ছোট এম. জি. গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো।

চালকের আসনে জিনি উঠে বসলো। মরগ্যান ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। তুমি তো জানোই কি করতে হবে। দেখো, যেন কোনো ভুল না হয়। গুড লাক।

জিনির কাছে কিটসন গিয়ে বললো, গাড়ি চালাবার সময় সাবধানে থেকো। এম. জি. টা দারুণ জোরে ছোটে। গুড লাক।

জিনি কিটসনের চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লো, ধন্যবাদ! তুমিও সাবধানে থেকো। ক্লাচ টিপে, গীয়ার দিয়ে এম. জি. টা ছুটলো।

মিনিট পাঁচেক পরে ক্যারাভ্যানটাকে সঙ্গী করে বুইকটা আস্তে আস্তে কারখানা ছেড়ে বেরোলো।

মরগ্যান ও ব্লেক ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে—আর গাড়ির চালক কিটসন।

জিপো বাইরে এসে কারখানার দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর তালার ওপরে ঝুলিয়ে দিলো একটা কাঠের ফলক। তাতে লেখা : গরমের ছুটিতে কারখানা বন্ধ থাকবে।

জিপোর কেন জানি না মনে হলো, তার এই সাধের জীর্ণ কারখানাকে সে কোনোদিনই দেখতে পাবে না। এই কারখানা থেকে তার খুব একটা লাভ হয় নি ঠিকই। কিন্তু পনেরো বছর এটাকে সুখদুঃখের সঙ্গী করার ফলে আজ কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। ক্যারাভ্যানে ওঠার সময়ে জিপোর দৃঢ়তার প্রতিরোধ ভেঙে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো। একজন ভাবপ্রবণ

ইটালিয়ানের মতোই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ন্যাকামো? আবার কি হলো? ব্রেক খেঁকিয়ে উঠলো।

কি হলো ছিচকাঁদুনির?

এড থামো।' দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো মরগ্যান। সরে জায়গা করে দিলো জিপো। তার বিপজ্জনক শীতল দৃষ্টি ব্রেকের মুখে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো—সে মুখ ফিরিয়ে নিলো। মরগ্যান জিপোর পাঁজরে খোঁচা মারলো, জিপো, কারখানার জন্য কাঁদছো? তোমার হাতে আসবে নিজের বাংলো জমিজমা গাড়ি—কতো কি? ভেবে দেখো তো, মেয়েরা তোমার চারিদিকে কেমন ভিড় করবে! তোমার পকেট দু লাখ ডলারে ঠাসা।

ঘাড় নাড়লো জিপো, বিষণ্ণমুখে হাসির রেখা।

তাই যেন হয়—। সত্যি সত্যিই পারবো তো, ফ্র্যাঙ্ক?

নিশ্চয়ই। সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। প্রত্যেক কাজে আমার নির্দেশে চলেছো—তাতে বিপদ হয়েছে কি?

কিটসন জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিলো, কিন্তু ক্যারাভ্যানের চাকায় স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় দোলানির পরিণাম হয়ে উঠলো সাংঘাতিক।

একটা পথ নির্দেশ ও একটা হাতুড়ি দিয়ে রাস্তার মুখেই জিপোকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্যারাভ্যানটাকে নিয়ে বুইকটা রাস্তায় ঢুকে পড়তেই চাপা স্বরে ব্রেক, শালা, একেবারে অপদার্থ। যদি ঐ ট্রাকের তালা হারামজাদাটা না ভাঙতে পারে, তবে আমিই ওকে ভেঙ্গে তক্তা বানিয়ে দেবো।

মরগ্যানের স্বর যেন বরফে ডোবানো। জিপোর চিন্তা ছেড়ে এবার এদিকে মন দাও। তোমার কাজটুকু ঠিকমতো করো তারপর বোতলের কথা ভাবা যাবে।

গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমে একসময়ে ক্যারাভ্যানটা থামলো। পেছনের দরজাটা কিটসন খুললো।

বিপজ্জনক বাঁকের কাছে ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্রেক ও মরগ্যান রাস্তায় নেমে পড়লো। ব্রেকের হাতে রাইফেল। মরগ্যানের হাতে ৪৫। ওরা কয়েক সেকেন্ড থমকে রইলো। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপ অনুভব করলো ওরা।

কিটসনকে বললো মরগ্যান, 'তোমার কাজ তুমি জানো। অতএব বাঁশীর সংকেতের জন্য প্রস্তুত থেকো। একমুহূর্তও যেন দেরী হয় না আসতে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কিটসন প্রথমে ব্রেকের দিকে তারপর মরগ্যানের দিকে, গুড লাক।

বিদ্রূপ মাখানো স্বরে ব্রেক বললো, শালা এমনভাবে বলছে যেন ভাগ্য টাগ্যর ব্যাপারটা ওর দরকারই নেই। তোমারও বেশ খানিকটা ভাগ্যের দরকার, আলেক্স! শুধু শুধু আমাদের জন্য তুমি দুঃখ করছো।

কিটসন কাঁধ ঝাঁকালো, গীয়ার দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললো। হঠাৎ মরগ্যানের মনে পড়লো ক্যারাভ্যান থেকে শাবল দুটো নামাতে ওরা ভুলে গেছে।

মরগ্যান হেঁড়ে গলায় চিৎকার করলো। এই! এই! আলেক্স—থামো।

গাড়ি থামিয়ে কিটসন জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো, কি ব্যাপার?

প্রত্যেকটা জিনিসই কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এড? ওঃ, গাধার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? যাও, শাবল দুটো গাড়ি থেকে নামাও।

গাড়ি থেকে নেমে কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজাটা খুললো। শাবল দুটো ব্রেকের হাতে তুলে দিলো। মরগ্যানের চোখ জোড়া রাগে জ্বলছে। সে কিটসনকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। বুইক ও ক্যারাভ্যানটা চলতে শুরু করলেই মরগ্যান রাস্তার ধার বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ব্রেক তাকে অনুসরণ করলো।

মরগ্যান এই জায়গাটা এতোবার ঘুরে দেখেছে যে এর প্রতিটি ঝোপঝাড় তার নখদর্পণে। ব্রেকের হাত থেকে একটা শাবল নিয়ে মরগ্যান ওকে লুকোবার জায়গায় দেখিয়ে দিলো; ব্রেকের থেকে গজ ছয়েক দূরে সে তার লুকোবার জায়গা বেছে নিলো।

ওরা দুজনেই রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রতীক্ষায় রইলো।

নাঃ, লুকোবার জায়গাটা ভালই হয়েছে—ভাবলো ব্লেক। রাইফেলটা রাস্তার দিকে তাক করলো সে। না, রাইফেলের নিশানার বাধাই পড়ছে না ; তাছাড়া কারো পক্ষে দেখে ফেলা সম্ভব নয়। ব্লেকের অস্বস্তি কমে এলো—কিন্তু এক চুমুক স্কচের অভাবে ফুসফুসটা আনচান করতে লাগলো। ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে স্কচ যেটুকু খেয়েছে তার আমেজটা এখন যাই-যাই করছে। বেলা বেশি না হলেও সূর্যের তাপ প্রচণ্ড।

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? মরগ্যান আড়াল থেকেই প্রশ্ন করলো।

নাঃ, দারুণ আছি! রাইফেল ঠিক করতে করতে বলে উঠলো ব্লেক।

মরগ্যান একবার তাকালো হাতঘড়ির দিকে। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। টমাস ঠিক ঠিক চালালে, তবে এগারোটা নাগাদ বাঁকের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত। তাহলে জিনি মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে মরগ্যান ভাবলো,

হাতে সময় আছে দেখে মরগ্যান একটা সিগারেট ধরালো।

এই সুযোগে ব্লেকও একটা সিগারেট ধরালো। রাইফেলের ওপর রাখা তার বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল—তার হাত কাঁপছে। শত চেষ্টাতেও ব্লেক হাতটাকে স্থির রাখতে পারছে না। নিজের ওপর বিরক্ত হলো। উত্তাল হৃদপিণ্ডের উন্মত্ততা তার বুকে। এই দুঃসহ প্রতীক্ষা ব্লেকের স্নায়ুর ওপর জেঁকে বসলো।

পাঁচ মিনিট পর মরগ্যান আচমকা মাথা তুললো। যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করছে।

মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আসছে।

ব্লেক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই মরগ্যান চাপা স্বরে, বসে পড়ো, বোকা কোথাকার! এটা, জিনির গাড়ি নয়—শীগগির লুকিয়ে পড়ো।

ব্লেক বসে পড়ে ঝোপের আড়াল থেকে দেখবার চেষ্টা করলো।

গাড়িটা কাছে আসতেই ওরা দেখলো গাড়িটা একটা সৈন্যবাহিনীর ট্রাক। ড্রাইভারের পাশে তিনজন সৈনিক বসে। ট্রাকটা ওদের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

মরগ্যান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ও—আজকের ডাক গেলো। আজ ওদের অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা দেরী হয়ে গেছে।

এগারোটা কুড়ির সময় মরগ্যান এই প্রথম দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাহলে কি জিনি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? না কি ভয় পেয়ে মেয়েটা তাদের দল ছেড়েই পালালো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্লেক বললো, ওফ্ আর পারছি না। মেয়েটা এতোক্ষণ ধরে করছে কি?

মরগ্যান চিন্তান্বিত মুখে, বোধহয় গাড়ি টাড়ির ভিড়ে রাস্তায় আটকা পড়েছে।

ব্লেক উৎকণ্ঠায় বললো, টমাস যদি জিনিকে আগে যেতে না দেয়, তাহলে? ঐ শালারা যদি ট্রাক নিয়ে মেয়েটার আগেই চলে আসে। তখন আমরা কি করবো?

কিছুই করবো না। আগামীকাল আবার নতুন করে চেষ্টা করবো।

কিন্তু জিনিকে যদি ওরা কাল একই সময়ে আবার দেখতে পায়। তাহলে নির্ঘাৎ সন্দেহ করে বসবে। তখন পুরো কল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।

মরগ্যান ধমকে উঠলো, থামো, যতো সব আজগুবি চিন্তা। সে সব ভাববার জন্য যথেষ্ট সময়...।

মরগ্যান গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে থেমে, এইবার ও আসছে।

বিদ্যুৎ গতিতে ধেয়ে আসা এম. জি. গাড়িটাকে দেখতে পেলো এরা। তখনও তার দূরত্ব বাঁকের কাছ থেকে প্রায় এক মাইল।

ব্লেক তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললো। ও দেখি পাগলের মতো ছুটে আসছে, দেখো, কি সাংঘাতিক জোরে ছুটছে।

মরগ্যানও ওঠে আগ্রহভরে। হয়তো ট্রাকটা ওর গাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নেই। শীগগির এসো, শাবল দুটো চটপট তুলে নাও।

পকেট থেকে এক ফালি বড় ন্যাকড়া বের করে রাস্তার ওপর মরগ্যান গিয়ে দাঁড়ালো। ন্যাকড়াটা পাকিয়ে দড়ির মতো করে, বাঁ পকেট থেকে একটা বেনজিনের শিশি বের করলো।

বিপজ্জনক বাঁকের কাছে এসে গাড়ির গতিবেগ কমে এলো।—গাড়িটা বাঁক ঘুরেই মরগ্যানের দৃষ্টির আওতায় হাজির হলো। হাত নেড়ে সে জিনিকে উপযুক্ত জায়গায় গাড়িটা থামাতে নির্দেশ দিলো।

জিনি গাড়ি থামিয়েই লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো। মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ ও উত্তেজনার ছোঁয়া।

ওঃ, ওরা কিছুতেই আমাকে আগে যেতে দিচ্ছিলো না। শেষে অতিকষ্টে পাশ কাটিয়ে এসেছি। আরেকটু হলেই রাস্তা থেকে ছিটকে নালার মধ্যে যাচ্ছিলাম আর কি। শীগগির করো ফ্র্যাঙ্ক। জিনির মুখ রক্তশূন্য, কাগজের মতো ফ্যাকাসে। স্বর উৎকণ্ঠায় অস্থির। ওরা ঠিক আমার পেছন পেছনেই আছে।

জিনি গাড়ির যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে একটা রিভলবার বের করে আনলো, তারপর গাড়ির মেঝে থেকে শুয়োরের রক্ত ভরা বোতলটা তুলে নিলো।

আমাকে কোন জায়গায় শুতে হবে?

মরগ্যান আঙুল উঁচিয়ে জায়গাটা দেখালো।

বোতলের ঢাকনা খুলে জিনি যখন রাস্তায় রক্ত ঢালছে, মরগ্যান ও ব্লেক তখন জিনির গাড়িটাকে শাবলের চাড় দিয়ে ওলটাতে ব্যস্ত।

ওদের দুজনের একত্রিত শক্তিতে গাড়িটা শূন্যে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ করে নালার মধ্যে আছড়ে পড়লো।

যাও,শাবল দুটো নিয়ে লুকিয়ে পড়ো। বলেই মরগ্যান পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ব্লেক শাবল দুটো নিয়ে নিজের জায়গায় লুকিয়ে পড়লো। ওদিকে জিনি রক্ত ঢেলে চলেছে। ওব হাতে, গায়ে, জামায়—ঘেন্নায় মুখ বিকৃত।

মরগ্যান ন্যাকড়ার দড়িটার ওপর বেনজিন ঢেলে শিশি ঝোপের আড়ালে ছুঁড়ে দিয়ে ভেজা দড়ির একমাথা ঢুকিয়ে দিলো পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভেতরে। অন্য মাথাটা পড়ে রইলো রাস্তার দিকে।

ব্লেক চেঁচিয়ে উঠলো। ঐ যে ওরা আসছে। ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। জলদি, ফ্র্যাঙ্ক!

মরগ্যান ফিরে জিনিকে দেখলো। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও মুখ তুলে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালো—বর্ণহীন মুখে উৎকণ্ঠায় ভরা বিস্ফারিত সবুজ চোখজোড়া কেমন বেমানান লাগছে।

মরগ্যান বললো। জিনি। রিভলবার নিয়েছো?

হ্যাঁ।

ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা তো আছি।

মরগ্যান দেশলাই জ্বালতেই আচমকা দ্বিধায় পড়লো। ওলটানো গাড়িটা জিনির বড়ো বেশি কাছে রয়েছে না? যদি সে এখুনি গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে জিনির গায়ে আঁচ লাগবে না তো। কিন্তু সে সব চিন্তা করার আর সময় নেই।

ব্লেক আতঙ্কিত স্বরে। 'জলদি করো ফ্র্যাঙ্ক!

জ্বলন্ত কাঠিটা ন্যাকড়ার একপ্রান্তে স্পর্শ করালো মরগ্যান। তারপরেই তীরবেগে জিনিকে অতিক্রম করে ঝোপের আড়ালে ছুটলো।

আগুনের শিখা বেনজিন ভেজা নেকড়া বেয়ে পলকের মধ্যে পেট্রোল ট্যাঙ্কে প্রবেশ করলো। এক কান ফাটানো বিস্ফোরণ। গরম হাওয়ার হলকা এসে ঝাপটা মারলো মরগ্যানের মুখে—যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে এলো।

ঘন কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করে তুললো। বাঁকের সামনের রাস্তাটা ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেলো।

ব্লেক মুখ আড়াল করে চেঁচিয়ে বললো, জিনি নির্ঘাত পুড়ে মরবে।

এখন আর কিছু করার নেই। জিনির কথা না ভেবে সামনে দেখলো, ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাক সামনের বাঁক মোড় নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ওরা এসে পড়েছে।

ব্রেক রাইফেল তুলে নিয়ে বাঁটটা কাঁধে চেপে ধরলো। নিশানা স্থির করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু সামনের পটভূমি ওর চোখের সামনে স্তরে স্তরে কাঁপতে লাগলো।

এখন আগুনের শিখা অনেকটা কমে এসেছে—ধোঁয়াও অনেকটা কেটে গেছে। তখনও গাড়িটা ভীষণভাবে জ্বলছে—আবহাওয়ার উত্তাপে যেন চামড়া ঝলসে যাচ্ছে।

জিনি রাস্তার মাঝখানে স্থির পাথরের মতো পড়ে রয়েছে।

ব্রেকের মনে হলো, এর চেয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্র কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

নিশ্চলভাবে পড়ে থাকা মেয়েটা, ওর জামা কাপড়ের রক্ত, জ্বলন্ত গাড়িটা—সব মিলিয়ে যেন চূড়ান্ত দুর্ঘটনার এক বিশ্বাসযোগ্য নিখুঁত ছবি রূপ নিয়েছে। জিনিকে দেখে বোঝা শক্ত, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

ইস, গাড়িটাকে আর একটু দূরে রাখলেই ভালো হতো। আফসোসের ধিক্কারে মরগ্যান মনে মনে ফেটে পড়লো।

সে যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানেই তাপের প্রচণ্ডতা অসহ্য। তার ওপর জিনি রয়েছে মরগ্যানের চেয়ে জ্বলন্ত গাড়িটার অন্ততঃ কুড়ি ফুট কাছে। ওর জীবন্ত দগ্ধ হবার সম্ভাবনাকে মরগ্যান হেসে উড়িয়ে দিতে পারলো না। সত্যিই যদি? কিন্তু জিনির নিথর হয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গী দেখে ওর যন্ত্রণার কোনোরকম আভাসই বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিপজ্জনক বাঁকের মুখে ট্রাকটা এসে ঢুকলো।

মরগ্যানের সর্পিল আঙুল চেপে বসলো ৪৫-এর বাঁটের ওপর। সে এখান থেকে ড্রাইভার এবং রক্ষীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা জ্বলন্ত গাড়িটা ও রক্তাক্ত জিনিকে দেখেই ওদের মুখে ভাবান্তর ঘটলো। ট্রাক ড্রাইভার টমাস গাড়ি থামালো। জিনির থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে ট্রাকটা থামলো।

মরগ্যানের মনে ঝড় বইলো। এরপর ওরা কি করবে? ওরা কি গাড়ি ছেড়ে নামবে? না কি...? মরগ্যানের মতলব, আশা ভরসা, সবকিছুই এখন তুলাদণ্ডে দুলছে।

সামনে ঝুঁকে ডার্কসন ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করছে। আর টমাস ট্রাকের গীয়ারকে ঠেলে দিলো নিরপেক্ষ অবস্থানে।

মরগ্যান দেখলো, ট্রাকের দুধারের জানালাই খোলা। যাক, এখনো সবকিছু তার মতলব মাফিকই ঘটছে।

ট্রাকের ড্রাইভার এবং রক্ষী উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝতে চাইলো। মরগ্যান যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে তখন ডার্কসন টমাসকে কি যেন বললো। জবাবে টমাস ঘাড় নাড়লো।

মরগ্যান ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো। সামনের এই নৃশংস দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখেও ওরা বরফের মতো ঠাণ্ডা মাথায় বসে ওদের কর্তব্য ভাবছে।

মরগ্যান দেখলো, টমাস হাত বাড়িয়ে একটা ছোট কথা বলার যন্ত্র তুলে নিলো।

মরগ্যান ভাবলো, সর্বনাশ। ও কি নির্দেশ চেয়ে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে?

মরগ্যানের ইচ্ছে হলো আড়াল ছেড়ে রিভলবার নিয়ে ওদের দিকে ছুটে যেতে। টমাসকে বাধা দিতে হলে এখুনি একটা কিছু করা দরকার। সে যদি আগে থেকে এটা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতো, তাহলে ব্রেককে সে কখনোই রাস্তার এ পাশে রাখতো না। কারণ ব্রেক আর সে রাস্তার দুপাশে থাকলে এই মুহূর্তেই টমাস ও ডার্কসনকে আক্রমণ করতে পারতো। কিন্তু ওদের দুজনের সামনে একা একা ঝুঁকি নেওয়া নেহাতই অপরিণামদর্শিতা।

মরগ্যান এবার জিনির কথা ভাবলো। মেয়েটা ধীরে ধীরে আগুনের আঁচে পুড়ছে। ও কি বুঝতে পারছে না, ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরেই ট্রাকটা দাঁড়িয়েছে। ও নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে ডার্কসনের আগমনের প্রতীক্ষা করছে।

এই সংকটময় মুহূর্তে জিনির সাহসের প্রশংসা না করে পারলো না। ঐ অবস্থায় একরাশ উৎকণ্ঠিত অনুভূতি নিয়ে অন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়।

মরগ্যান দেখলো, টমাসের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ডার্কসন তাতে কথা বলছে। তার বক্তব্য

অনুমান করা সম্ভব হলো না।

মরগ্যান ভাবলো তাহলে তাদের পালাবার সময় ধীরে ধীরে কমে আসছে। যেই ট্রাকটা রাস্তা থেকে হাপিস হবে, সঙ্গে সঙ্গেই এজেন্সি বেতার তরঙ্গে সতর্কবাণী ছড়িয়ে দেবে।

ডার্কসন কথা শেষ করে যন্ত্রটা নামিয়ে টমাসকে কি যেন বলে দরজা খুলে ট্রাকের বাইরে নামলো।

টমাস একইভাবে ট্রাকের ভেতর বসে উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলো।

মরগ্যান যেখানে লুকিয়ে সেখান থেকে এখন ব্লেককে দেখা যাচ্ছে না। ব্লেক কি করছে ভেবে সে অবাক হলো।

ব্লেক জিনির দিকে এগিয়ে যাওয়া ডার্কসনকে নিশানা করে রাইফেল তুলে ধরলো। কিন্তু তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চাপা স্বরে সে একটা খিস্তি দিয়ে হাত স্থির করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। আতঙ্কের হিমেল হাওয়া ব্লেকের ফুসফুসে ঝাপটা মারলো।

রক্ষীটি ততক্ষণে জিনির দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে। ব্লেক জানে, এবার যে কোনো মুহূর্তে মরগ্যান রিভলবার নিয়ে ঝোপ ছাড়বে।

অনিশ্চিতভাবে ব্লেকের রাইফেলের নিশানা কাঁপতে লাগলো। একবার ডার্কসনের ওপর, পরে আবার তার বাইরে।

ঝোপঝাড়ের খসখস শব্দে চোখ ফেরাতেই সে দেখলো মরগ্যান রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। এবং এইখানেই ব্লেক করলো চরম ভুল। ডার্কসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে তাকালো মরগ্যানের দিকে।

ওদিকে ডার্কসন জিনির শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কিন্তু স্পর্শ করেনি। হয়তো তার মনের কোণায় সামান্যতম ক্ষীণ সন্দেহ ছিলো, যে এই দুর্ঘটনায় কোথাও একটা গোঁজা মিল আছে। হয়তো তার সন্দেহ হলো যে কেউ তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। ডার্কসন হঠাৎই মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো।

ইতিমধ্যে মরগ্যান ট্রাকের জানলায় উঠে পড়েছে। ওর হাতের রিভলবার বিচলিত, হতবুদ্ধি টমাসের মাথা লক্ষ্য করে স্থির।

জিনি আচমকা উঠে বসলো।

বিদ্যুতের মতো ডার্কসন ঘুরে দাঁড়ালো। ওর ডান হাত কাটারির মতো আছড়ে পড়লো জিনির রিভলবারের হাতে, কিছু বোঝার আগেই জিনির হাত থেকে রিভলবার রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। প্রায় একই সঙ্গে ডার্কসনের বাঁ হাতের প্রচণ্ড আঘাতে ও মুখ থুবড়ে পড়লো। ডার্কসন কোমরের খাপ থেকে ডান হাতে রিভলবার বের করলো। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ব্লেক উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে রাইফেলের ট্রিগার টিপলো। ব্লেক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ট্রিগারে চাপ দেবার পরিবর্তে হ্যাঁচকা টান মারলো। ঝাঁকুনির ফলে রাইফেলের নল হয়ে পড়লো ঈষৎ উর্ধ্বমুখী—সুতরাং কোনো ক্ষতি না করেই ডার্কসনের মাথার ওপর দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেলো।

ব্লেকের গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা টমাস পাশে ঝাঁপ দিলো। ওর হাত ছোবল মারলো ড্যাশবোর্ডের বোতাম তিনটের দিকে।

সরাসরি মরগ্যান ওর মুখ টিপ করে গুলি করলো।

একই সঙ্গে ডার্কসন মরগ্যানের দিকে তাক করে গুলি চালালো। সেই মুহূর্তে জিনি আঘাত করলো ডার্কসনের রিভলবার ধরা হাতে। ডার্কসনের হাত সামান্য বিচলিত হলেও বিফল হলো না। কারণ তার আঘাতে আচ্ছন্ন জিনির শক্তি তখন প্রায় নিঃশেষিত।

মরগ্যান তার পাঁজরে এক বিরাট ধাক্কা অনুভব করলো। সঙ্গে এক বুক-খাক করে দেওয়া জ্বলন্ত যন্ত্রণা গুলির আচমকা সংঘর্ষে সে রাস্তায় পড়ে গেলো। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে ডার্কসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। জিনি তখন কোনোরকমে ডার্কসনের রিভলবার ধরা হাত আঁকড়ে ঝুলছে।

মরগ্যানের গুলি প্রহরীর কপালে গিয়ে আঘাত করলো। এবং মুহূর্তে মৃত ডার্কসনের নিষ্প্রাণ দেহটা জিনিকে নিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়লো।

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ট্রাকের গা ধরে আস্তে আস্তে মরগ্যান উঠে দাঁড়ালো। উঠে দেখলে । আহত, অবসন্ন টমাসের ডান হাত অতিকষ্টে এগিয়ে চলেছে একটা বোতামের দিকে। মরগ্যা । কিছু করার আগেই টমাসের আঙুল খুঁজে পেলো বোতামটা এবং বোতামে চাপ দিলো।

মুহূর্তে ইস্পাতের চাদরে গোটা ট্রাকটা ঢাকা পড়ে গেলো। কেউ কিছু বোঝার আগেই ট্রাকটা একটা নিশ্ছিদ্র ইস্পাতের বাক্সে পরিণত হলো।

মরগ্যান খিস্তি দিয়ে টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, আক্রোশ হতাশায় ·৪৫ এর বাট দিয়ে সজোরে ইস্পাতের পর্দায় আঘাত করলো। ধাতব শব্দ মরগ্যানকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠলো। এমন সময় ট্রাকের ভেতরে, শোনা গেলো গুরুভার কিছু পতনের শব্দ—সেই সঙ্গে একটা চাপা, অস্ফুট আর্তনাদ। সম্ভবতঃ নিজের আসন থেকে ট্রাকের মেঝেতে টমাস গড়িয়ে পড়েছে।

ব্লেক ঝোপের আড়াল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো। দু হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা ধরে আছে—মুখে একরাশ অন্ধকার।

পায়ের শব্দে মরগ্যান তার দিকে ঘুরে তাকালো। মরগ্যানের চোখে চোখ পড়তেই ব্লেক আতঙ্কে থমকে দাঁড়ালো।

মরগ্যান হিংস্রস্বরে খেঁকিয়ে উঠলো, শালা কুত্তীর বাচ্চা! তোকে আমি খুন করে ফেলবো।'

অনুনয়ের ভঙ্গীতে, প্রাণভয়ে ব্লেক চিৎকার করে উঠলো, ফ্র্যাঙ্ক বিশ্বাস করো। আমি ওকে মারতে চেয়েছি। কিন্তু মাছিটা গোলমাল করতে থাকায় ফস্কে গেছে। তারপর তো ট্রিগারটাই বিগড়ে গেলো।

মরগ্যান হঠাৎ অনুভব করলো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোটের বোতাম খুলতেই রক্তাক্ত জামাটা চোখে পড়লো।

জিনি বেতালা পা ফেলে দৌড়ে এলো। জ্বলন্ত গাড়ির আঁচে ওর মুখ টকটক করছে। বাদামী চুলের কয়েক গুচ্ছ পুড়ে জড়িয়ে গেছে।

জিনি চিন্তিতভাবে বললো। খুব বেশি লেগেছে?

ও কিছু নয়, তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর দিলেও মরগ্যানের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। একটা শীতার্ত অনুভূতি তাকে আঁকড়ে ধরলো। পকেট থেকে বাঁশীটা বের করে জিনির হাতে দিয়ে, শীগগির কিটসনকে ডাকো।

জিনি বাঁশীতে ফুঁ দিলো ঃ লম্বা, একটানা কর্কশ সুরে বাঁশীটা বাজালো।

মরগ্যান ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই, জিনি বললো, টমাস? টমাসের কি হলো?

টমাসকে আমি শেষ করে দিয়েছি। একটা বোতাম ও টিপেছে বটে, কিন্তু অন্য দুটোর নাগাল পায়নি—তার আগেই ওর গড়িয়ে পড়ার শব্দ আমার কানে এসেছে। ইতিমধ্যে ব্লেক মরগ্যানের কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎই যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো, ফ্র্যাঙ্ক। তোমার বুক থেকে যে রক্ত ঝরছে।

মরগ্যান দাঁত খিঁচিয়ে, 'সরে যা আমার সামনে থেকে—শালা ভেড়ুয়া কোথাকার। তোর জন্যেই আমাদের সমস্ত মতলব ফেঁসে গেলো। এখন আমরা ডুবতে বসেছি।

জিনি তীক্ষ্ণস্বরে বলল না! এখনও একটা উপায় আছে। এদিকে এসো ফ্র্যাঙ্ক। বোসো। আগে তোমার রক্তটা বন্ধ করি।

মরগ্যান বসতেই জিনি টান মেরে তার শার্ট, কোট খুলে ফেললো।

ব্লেক একইভাবে দাঁড়িয়ে যেন তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

প্রথমে জিনি ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখলো—প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চেরা দাগ। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। চটপট স্কার্ট তুলে পেটিকোটের সেলাই বরাবর লম্বা একফালি কাপড় ছিঁড়ে নিলো জিনি। তারপর মরগ্যানের শার্টটা নিয়ে রক্ত ভেজা অংশটা বাদ দিলো ছিঁড়ে, বাকি কাপড়টা নিয়ে ভাঁজ করে একটা নরম প্যাডের মতো করে মরগ্যানের ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে। কাপড়ের ফালিটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো।

যাক, এতেই এখন মোটামুটি কাজ হবে। তবে ফন হ্রদে পৌঁছানো মাত্রই উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে। কেমন লাগছে এখন?

আস্তে আস্তে মরগ্যান দাঁড়ালো। কোটটা গায়ে দিতে গিয়ে, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে, আমি ঠিক আছি। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করা বন্ধ কর। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো। এখন আর ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানে ঢোকানো সম্ভব নয়—এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে। চলো, পালাতে হলে আর দেরী নয়—শীগগির।

কিটসন ঠিক সেই সময়ে ক্যারাভ্যান ও বুইক নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির। বিবর্ণ, উৎকণ্ঠা ভরা মুখে সে বুইক থেকে নামলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার ট্রাকের দিকে তাকালো। তারপর মরগ্যানের দিকে।

ডার্কসনের মৃতদেহটা ব্লেক একটা ঝোপের পেছনে লুকিয়ে ফিরে এলো। কিটসন উত্তেজিত ভাবে, কি হয়েছে? যেন গুলির শব্দ শুনলাম।

মরগ্যান বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখুনি আমাদের পালাতে হবে।

জিনি ওদের বাধা দিয়ে বললো, দাঁড়াও। এখনও একটা উপায় আছে। বুইকটা চেষ্টা করলে ট্রাকটাকে ঠেলে ক্যারাভ্যানে তুলতে পারে। আমার মনে হয় তা অসম্ভব নয়। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। বিনা চেষ্টায় দশ লাখ ডলারের ট্রাকটাকে হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই।'

মরগ্যান জিনির দিকে তাঁকিয়ে, হুঁ, তাইতো?...শালা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই পারা যাবে। আলেক্স, চটপট ক্যারাভ্যানটাকে বুইকের ল্যাজ থেকে ছাড়িয়ে নাও।

মরগ্যানের স্বরের তীক্ষ্ণতা কিটসনের কান এড়ালো না। হতভম্ব হয়ে সে ক্যারাভ্যানের দিকে ছুটে গেলো। বুইক থেকে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

মরগ্যান ব্লেককে বললো যাও, ওকে সাহায্য করো। চটপট, চটপট! আগে ক্যারাভ্যানটাকে ঘুরিয়ে নাও। জিনি, তুমি বুইকটাকে নিয়ে এসো ট্রাকের পেছনে।

কিটসন ও ব্লেক ক্যারাভ্যানকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন জিনি বুইকটাকে চালিয়ে ট্রাক ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। তারপর পেছন গীয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িটাকে পিছিয়ে এনে ট্রাকের গায়ে স্পর্শ করলো। অর্থাৎ বুইকের পেছনের বাম্পার ও ট্রাকের পেছনের বাম্পার পরস্পরকে স্পর্শ করলো।

কিটসন ও ব্লেক ক্যারাভানটাকে টানতে টানতে ট্রাকের সামনের দিকে নিয়ে এলো।

'এক কাজ করো এড, ক্যারাভ্যানের চাকার সামনে কয়েকটা আধলা ইট বসিয়ে দাও, যাতে এটা নড়তে না পারে। আর শাবল দুটো বের করে আনো। ও দুটো দিয়ে ক্যারাভ্যানের সামনেটা ঠেকা দাও—যাতে ট্রাকটা ঠেলে তোলার সময় ওটা উলটে না যায়।

কিটসন ঝড়ের বেগে কাজ করে চললো। মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো বড় পাথরের টুকরো তুলে ক্যারাভ্যানের চাকা ও রাস্তার ফাঁকে গুঁজে দিলো। ওদিকে শাবল দুটো দিয়ে ব্লেক ক্যারাভ্যানের সামনেটায় জোরালো ঠেকা দিয়েছে—যাতে ওটা উলটে না যায়।

মরগ্যান, জিনিকে ইশারা করলো, ঠিক আছে।

কিটসন ট্রাকের সামনের দিকে এসে দাঁড়াতেই মরগ্যান ক্যারাভ্যানের পেছনের দরজা খুলে দিলো।

সাবধান! ধীরে ধীরে জোর বাড়াবে, জিনিকে বললো মরগ্যান। বুইকের ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে জিনি ঠেলতে শুরু করালো। ট্রাকের হাত-ব্রেক দেওয়া থাকলেও বুইকের ক্রমবর্ধমান চাপে ট্রাকটা নড়তে লাগলো।

কিটসন ও ব্লেক ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে তোলার জন্য ওটার সামনের চাকা জোড়ায় মুহুর্মুহু লাথি মেরে ট্রাকের গতিপথ ঠিক রাখলো। ধীরে ধীরে ট্রাকটা ক্যারাভ্যানে ঢুকে পড়লো।

মরগ্যান জিনিকে ডেকে বললো, থামো! কাজ হয়ে গেছে, এড, শীগগির শাবল দুটো আর রাইফেলটা গুছিয়ে নাও। কিটসন, চটপট বুইকের সঙ্গে ক্যারাভ্যানটাকে জুড়ে দাও। জলদি। আর সময় নেই।

জিনি বুইকটা চালিয়ে ক্যারাভ্যানের সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। তারপর গাড়িটা পিছিয়ে

ক্যারাভ্যানের কাছ ঘেঁষে থামতেই কিটসন দুটোকে আবার শেকল দিয়ে আগের মতো জুড়ে দিলো।

জিনি চালকের আসন থেকে সরে বসতেই কিটসন বুইকে উঠে বসলো। স্টিয়ারিং ধরলো। গাড়ি ও ক্যারাভ্যানকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে যেদিক থেকে জিপোর আসার কথা সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

মরগ্যান ও ব্লেক লাফিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু ট্রাকটা যে এতো জায়গা নেবে ওরা ভাবতেই পারে নি। কারণ ট্রাকও ক্যারাভ্যানের মাঝে দেড় ফুট এবং পেছনে ফুট দুয়েক জায়গা রয়েছে। এতে ওদের আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইলো।

ঠিক ছিলো আগে থেকেই মরগ্যানও ব্লেক ড্রাইভারের কেবিনে বসবে। সুতরাং ওদের যেতে হবে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এতে বিপদ আর প্রচণ্ড ঝুঁকি। কিন্তু নিরুপায়। কিটসন যদি কোনো বাঁক নেয় তাহলে ট্রাকটা ছিটকে আসতে পারে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালের দিকে, হয়তো থেঁতলে দেবে ওদের দেহকে।

কিটসন গাড়ি ছেড়ে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করতে গেল। ও মরগ্যানের কথায় ঘাড় নাড়লো, ঠিক আছে, লক্ষ্য রাখবো—

এক কাজ করলে কেমন হয়? ব্লেক বলল চাকাগুলোকে পাথরের টুকরো দিয়ে আটকে দিলে কেমন হয়?

না, না, ওসব শুনে খেঁকিয়ে উঠলো মরগ্যান,

কিটসন ছুটে গিয়ে বসলো বুইকের চালকের আসনে।

ততোক্ষণে জিনি রক্তমাখা স্কার্ট, ব্লাউজ খুলে ফেলে একটা ধূসর পোষাক পরে নিয়েছে।

ওকে দেখলো কিটসন, জিনির মুখমণ্ডলে মৃতের ছায়া। গীয়ার দিয়ে গাড়ি ছোটালো কিটসন। অনুভব করলো, বুইকের ক্ষমতা কমে আসতে চাইছে।

ব্লাউজ পরে স্কার্টের চেনটা টেনে বন্ধ করতেই জিনিকে শুধালো কিটসন, কি হয়েছিলো?

শঙ্কিতস্বরে ব্যাপারটা কিটসনকে জানালো ও।

কিটসন ভীষণ ভয় পেলো, তার মানে ট্রাকের ভেতরে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে?

যদি সে মরে না থাকে, তাহলে এতক্ষণে বেতারে সংকেত পাঠিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতো। মরগ্যান তো বলছে যে ও টমাসকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। কি জানি!

তাহলে একটা মড়াকে সঙ্গে বয়ে আমরা ঐ ক্যারাভ্যানের ঘাঁটিতে যাচ্ছি?

জিনি ভাঙা উত্তেজিত স্বরে ওকে বাধা দিলো, ও, তুমি থামবে? তারপর পাশ ফিরে দুহাতে মুখ ঢাকলো।

ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান ক্যারাভ্যানের ভেতরে শ্রান্তভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে নিরাপত্তার প্রয়োজনে পা দুটো ঠেসে ধরেছে ট্রাকের পেছনের চাকায়। তার মনের ভেতরে বয়ে চলেছে চিন্তার অশান্ত ঢেউ।...

শেষ পর্যন্ত তাহলে কাজটা হলো। এখন বাকীটা ঠিকমতো সারতে পারলেই হয়। এর জন্য দু দুজন লোককে আমি খুন করেছি। অবশ্য সেটা তাদের নিয়তি। নাঃ, টমাস ডার্কসনের সাহস আছে। বিশেষ করে ড্রাইভারটার। কারণ সে জানতো যে আমার রিভলবারের সামনে সামান্যতম বেচাল মানেই মৃত্যু। তবুও সে বোতাম টেপার চেষ্টা করেছে। নাঃ, আমি হলে অন্ততঃ সে চেষ্টা করতাম না। অথচ টমাস তাই করেছে এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। এই ইস্পাতের চাদর নিয়ে আমাদের এখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। তাছাড়া ট্রাকের ভেতরে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। বাইরের পাটাতন ভেঙ্গে ওর দেহটাকে উদ্ধার করতে হবে। মনে হয় টমাস মারাই গেছে! কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে? হয়তো জ্ঞান ফিরে এলে ও বেতারে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করবে এবং আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে!

মরগ্যান মজবুত ইস্পাতের ট্রাকটার দিকে চোখ রাখলো। ভাবলো, সামান্য ইস্পাত প্রাচীরের ও পিঠেই রয়েছে তার এতদিনকার স্বপ্ন দশ লক্ষ ডলার। তার হাতের এতো কাছে স্বর্ণমৃগের মাদকতাময় নেশা ধরানো উপস্থিতি মরগ্যানকে ভুলিয়ে দিলো তার বুকের ক্রম বর্ধমান অসহ্য যন্ত্রণার কথা।

ব্লেক মরগ্যানের চোখের আড়ালে, ট্রাকের অপর দিকে নীচু হয়ে বসে আছে। ওর চোখ রয়েছে ট্রাকের গায়ে। অধীর সংশয়ে তার চোখেমুখে দুঃস্বপ্নের ছায়া—এই বুঝি ট্রাকটা তার দিকে ছিটকে এলো।

ব্লেক এখন তার সাহস ফিরে পেয়েছে—কিন্তু দুবার ব্যর্থতার কথা কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না।

ট্রাকটা ওরা হাতিয়েছে অথচ পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লেককে কোনো খুন করতে হয়নি। ব্লেক স্বস্তির শ্বাস নিলো। ওঃ, একটুর জন্য সে চরম অপরাধ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন সে যে কোনো পরিস্থিতির জন্যই সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমনিতে সে ভীরু বা কাপুরুষ নয়। অথচ ব্লেক জানে এ ঘটনার পর মরগ্যান তাকে আর বিশ্বাস করবে না। সুতরাং ব্লেককে ফ্রাঙ্কের ওপর নজর রাখতে হবে। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত সে হয়তো তাকে আঁটি চোষাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্লেক অতো সস্তায় নিজের দু লাখ ছাড়তে রাজি নয়।

গাড়ি মাইল ছয়েক যাবার পর কিটসন দেখলো জিপো দ্রুতপায়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

গাড়ি থামাতেই সে বুইকের কাছে ছুটে এসে, কি হলো? সব ঠিক আছে তো? কোনো গোলমাল হয়নি তো?

কিটসন বললো, না, সব ঠিক আছে। যাও, ক্যারাভ্যানে ঢুকে পড়ো।

কিটসন বুইক থেকে নেমে ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। এসো জিপো, এদিকে এসো।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে উঁকি মারতেই জিপো মরগ্যানকে দেখে বললো, সব ঠিক আছে তো ফ্র্যাঙ্ক? মরগ্যান যন্ত্রণায় কাতর—মুখে ধূসর, মৃত্যুর প্রলেপ। কোনোমতে অস্ফুটস্বরে বললো, হ্যাঁ...এখন চলো। এসো, চটপট ভেতরে, ঢুকে পড়ো।

জিপো হঠাৎ থমকে স্থির অবাক চোখে মরগ্যানকে দেখে। 'তুমি এখানে কি করছো, ফ্র্যাঙ্ক? তোমার তো ট্রাকের ভেতরে বসার কথা।

মরগ্যান গর্জে উঠলো, ভেতরে এসো। নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই।

জিপো আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। কয়েক পা পিছিয়ে, না। ওভাবে আমি ক্যারাভ্যানে চড়তে পারবো না। ট্রাকটা যদি সামান্য নড়ে তাহলেই তোমরা মাছির মতো থেঁতলে মারা যাবে।

মরগ্যান তার কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে ৪৫টা বের করলো। রিভলবার বের করবার সময় তার কোট খানিকটা সরে যেতেই জিপো দেখলো মরগ্যানের বুকে বাঁধা রক্ত ভেজা পট্টিটা।

মরগ্যান রিভলবার উঁচিয়ে, এসো ভেতরে।

কিটসন জিপোকে ধরে এক ধাক্কা মারলো। ক্যারাভ্যানের ভেতর জিপো ছিটকে গিয়ে পড়লো। ক্যারাভ্যানের দরজা কিটসন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলো।

কিটসন চালকের আসনে বসে গাড়ি ও ক্যারাভ্যান হাওয়ার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল প্রধান সড়কের দিকে।

।। সাত ।।

জিপো যথাসম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত করে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যারাভ্যান দোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে উলঙ্গ আতঙ্কের ছায়া কেঁপে উঠছে। ওর শরীর থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে একই ছন্দে দুলছে ট্রাকের ইস্পাত আবরণ।

ব্লেক এখন ট্রাকের পাশ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে পেছনের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে ও মরগ্যান ও জিপোকে লক্ষ্য করছে।

বুইকের প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে ভারসাম্য বজায় রাখতে ওরা তিনজন কিছু একটা আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ক্রমাগত ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তিনটে শরীর দুলছে।

জিপো আশ্চর্য হয়ে বললো, তাহলে এখনও একটা লোক ট্রাকের ভেতরে রয়েছে!

হ্যাঁ, রয়েছে—কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। লোকটা মারা গেছে। যাকগে, শোনো জিপো,

তোমাকে এই ইস্পাতের চাদরটা যে করে হোক খুলতে হবে। কারণ টমাস যে বেতার সংকেত চালু করেনি সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

ব্লেক কাজের শুরু থেকে এই প্রথম একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব করলো, আচ্ছা, বেতার সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে। তা এক কাজ করলে হয় না? ট্রাকের তলায় ঢুকে ব্যাটারির তার দুটো কেটে দিলে হয় না?

মরগ্যান যেন হাতে চাঁদ পেলো, ঠিক বলেছো। জিপো. তুমি তাহলে চটপট ট্রাকের নীচে ঢুকে পড়ো, ব্যাটারির তার কেটে দাও, তাড়াতাড়ি করো।

গম্ভীর মুখে জিপো, ট্রাকের নীচে কাজ করা সম্ভব নয় ফ্র্যাঙ্ক। যে কোন মুহূর্তে ট্রাকটা দুলে উঠতে পারে—তাহলে আমাকে চাপা পড়তে হবে।

মরগ্যান হায়েনার স্বরে গর্জে উঠলো, আশা করি আমার কথা তোমার কানে গেছে। জলদি কাজ শুরু করো।

জিপো গজগজ করতে করতে যন্ত্রপাতির ঢাকনাটা খুললো। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এবং একটা তার কাঁটার কাঁচি বাক্স থেকে বের করলো।

মরগ্যান পাশের জানলার পর্দা সরিয়ে সতর্কভাবে বাইরে দেখলো।

ওরা এখন মাঝারি রাস্তায় এসে পড়েছে। কিটসন গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্যারাভ্যানটা বিপজ্জনকভাবে এপাশ ওপাশ দুলছে। রাস্তায় যদি কোনো দ্রুতগামী পুলিশ উপস্থিত থাকতো তাহলে সে নির্ঘাত তার মোটরবাইক নিয়ে ওদের তাড়া করতো। কিন্তু কিটসনকে আস্তে চালানোর জন্য অনুরোধ করার কোনো উপায় নেই। থাকলে মরগ্যান তাকে সাবধান করে দিতো। সুতরাং প্রধান সড়কে পৌঁছে বুইকের গতিবেগ যে কমাতে হবে, তাতেও কিটসনের বিচার বুদ্ধির ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হবে।

তখন জিপো মেঝেতে উপুড় হয়ে ট্রাকের নীচে ঢোকবার চেষ্টা করছে। প্রথমতঃ স্বল্প পরিসরের জন্য সে অসুবিধেয় পড়েছে।—তার ওপর মস্তিষ্কে চেপে বসা ভয়টা তো আছেই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সে ট্রাকের তলায় নিজের শরীরটাকে প্রবেশ করালো। তখন মরগ্যান একটা টর্চ এগিয়ে জিপোর হাতে দিলো।

জিপো চিত হয়ে ট্রাকের তলায় পৌঁছতেই পাটাতনের গায়ে একটা বিশ্রী লাল দাগ দেখতে পেলো। ওর মুখ থেকে ইঞ্চিকয়েক ওপরেই যে রক্তের দাগ সেটা ভালো করে বুঝবার আগেই কয়েকটা আঠালো, উত্তপ্ত রক্তের ফোঁটা জিপোর মুখের ওপর এসে পড়লো।

সে শিউরে উঠে মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ট্রাকের মেঝের ওপিঠেই পড়ে থাকা টমাসের রক্তাক্ত দেহের সান্নিধ্য তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললো।

জিপো কাঁপা হাতে অন্ধের মতো ব্যাটারির তার দুটো খুঁজতে লাগলো।

অবশেষে একটা তারের সন্ধান পেলো, কিন্তু সেটা আবার নাগালের বাইরে। তাই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। আমি হাত পাচ্ছি না, ফ্র্যাঙ্ক। আমাদের ওপর থেকে চেষ্টা করতে হবে।

ওপর থেকে দেখবে কোন দিক দিয়ে? সব বন্ধ। ঠিক আছে এক মিনিট অপেক্ষা করো। মরগ্যান যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে ধাতু কাটার একটা লম্বা হাতলওলা কাঁচি বের করলো। কাঁচিটা ট্রাকের তলায় ঠেলে দিয়ে। এই নাও, এটা দিয়ে কাটো।

হয়ে গেছে। এবার আমাকে বেরোতে দাও।

হামাগুড়ি দিয়ে জিপো বেরিয়ে আসছিলো, হঠাৎই একটা অস্ফুট শব্দে তার হাত-পা যেন বরফ হয়ে এলো, ঘাড়ের ওপর সজারুর কাঁটার মতো চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠলো।

ট্রাকের পাটাতনের ওপিঠ থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো সেই সঙ্গে এক অস্ফুট গোঙানি—তারপরই কিছু একটা নড়ার শব্দ। পার্থিব আতঙ্কে জিপো কুঁকড়ে গেলো—যেন কোনো অশরীরীর হাত তাকে স্পর্শ করতে আসছে।

উন্মাদের মতো জিপো চিৎকার করে উঠলো, 'সরে যাও—যেতে দাও আমাকে! সরে যাও! সে পায়ের এলোপাথাড়ি ধাক্কায় ব্লেককে সরাতে চাইলো। অন্ধ আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে।

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠে ওর পাঁজরে একটা ঘুঁষি মারলো থাম, শালা! আচমকা আঘাতে জিপোর দম বন্ধ হয়ে এলো। বুকে হেঁটে ব্লেক ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোট ঝাড়তে লাগলো।

মরগ্যান ব্লেকের ছাই রঙা মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো, কি হয়েছে?

এমন সময় জিপো হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েই ট্রাকের গায়ে লেগে জামাটা ফেঁসে গেলো। জিপোর মুখ ফ্যাকাসে, আঠালো রক্তের ফোঁটাগুলো হাতের ঘষায় ওর গালে গলায় বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ও-ও বেঁচে আছে। সে মৃদুস্বরে বললো, আমি স্পষ্ট শুনেছি। ও নড়ছে ট্রাকের ভেতরে।

মরগ্যানের মুখভাব কঠিন হলো।

তাহলে টমাস এখন আর ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে পারছে না। তালাও বিকল করতে পারছে না। মনে হয়, ঐ তালা বা ট্রান্সমিটার চালু করার বোতামগুলো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে। আপাততঃ ব্যাটারিই যখন অকেজো, তখন আর ভয় কি? যাকগে, এসো জিপো, এই ইস্পাতের চাদরটা এবার ভাঙা যাক। তা না হলে টমাসকে শেষ করা যাবে না।

জিপো শিউরে উঠলো না-না—আমি না। টমাসের কাছে রিভলবার আছে। আছে না? ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙলেই ও আমাকে গুলি করবে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো মরগ্যান। সে জানালা দিয়ে আবার বাইরে চোখ রাখলো। প্রধান সড়ক ও মাঝারি রাস্তার চৌমাথায় এসে ওদের গাড়ি পৌঁছেছে। ধীরে ধীরে কিটসন বুইকের গতি কমিয়ে আনলো...একসময় একেবারে থেমে গেলো। মরগ্যান দেখলো, তাদের সামনে প্রধান সড়কের ওপর গাড়ি, রাস্তা আর আগের মতো নির্জন নয়।

এখন যদি টমাস রিভলবার চালিয়ে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে, তাহলে রাস্তার লোকে নির্ঘাৎ সেই শব্দ শুনতে পাবে—এবং বিপদে পড়বে।

এ সমস্যার উত্তর মরগ্যানের জানা নেই। ব্লেক বললো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, ফ্র্যাঙ্ক। পুলিশ এই বড় রাস্তায় সবসময়েই টহল দেয়। যদি গুলির শব্দ হয়। তাহলে ওরা শুনতে পাবে...

হ্যাঁ—অপেক্ষাই করতে হবে।

জিপো স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের রক্ত মুছলো। ঘেন্নায় তার গা গুলিয়ে উঠছে।

মরগ্যান ট্রাকের সামনে গিয়ে ইস্পাত আবরণীর ওপর কান চেপে ধরে কোনো শব্দ শুনতে চাইলো।

উঁহু—কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না? তোমরা কি ঠিক শুনেছো?

হ্যাঁ—টমাসের নড়াচড়ার শব্দও পরিষ্কার শুনেছি।

মরগ্যান ঘুরে দাঁড়ালো। জিপো, শুধু শুধু বসে থেকো না। ট্রাকের তালাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখো। যতো তাড়াতাড়ি তুমি কাজ শুরু করবে, টাকাটা ততো তাড়াতাড়িই আমাদের হাতে আসবে।

জিপো উঠে ট্রাকের পেছনের দিকে গেলো।

বুইক আবার চলতে লাগলো। মরগ্যান পর্দা সরিয়ে দেখলো অন্যান্য দ্রুতগামী গাড়িগুলো একের পর এক তাদের বুইক ও ক্যারাভ্যানকে অতিক্রম করে চলেছে। কিটসন গাড়ির গতি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল রেখেছে দেখে মরগ্যান স্বস্তি পেলো।

জিপো ট্রাকের পেছনটা পরীক্ষা করেই হতাশ হয়ে পড়লো। ট্রাকের তালা খোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মরগ্যান ট্রাকের পিছন দিক থেকে এসে জিপোকে বললো। কি, দেখে কিরকম মনে হচ্ছে?

তালাটা যে মজবুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক ঠিক কম্বিনেশন বের করতে গেলে প্রচুর সময়ের দরকার।

দরজা ভাঙার কোনো পথ আছে?

উঁহু—তা সম্ভব নয়। দেখেছো, কি জিনিষ দিয়ে এটা তৈরী? অতো সহজে ভাঙা যাবে না।

হয়তো প্রচুর সময় পেলে দরজা কেটে সেটা খোলা সম্ভব হতে পারে।

তুমি বরং কম্বিনেশন নম্বরটাই চেষ্টা করে দেখো—যদি বের করতে পারো। ক্যারাভ্যানের ছাউনিতে পৌঁছতে এখনও চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। শুধু শুধু সময়টা বসে বসে নষ্ট করবে কেন? এখন থেকেই কাজ শুরু করে দাও।

মরগ্যানের দিকে জিপো এমনভাবে তাকালো—যেন তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সে সন্দিহান।

জিপোর স্বরে আকুতি, এখন? এখন কি করে হবে? এই গোলমাল, গাড়ির দোলানির মধ্যে কাজ করা সম্ভব নয়। তুমি বুঝতে পারছো না, ফ্র্যাঙ্ক, চাকতি ঘোরানোর সময় আমাকে একমনে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কিন্তু এই গাড়ি-ঘোড়ার গোলমালের মধ্যে, তা কি সম্ভব—তুমিই বলো?'

মরগ্যান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার বুকের যন্ত্রণা ক্রমশঃই বাড়ছে। সে জানে এখন জিপোকে চাপ দিলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। তাই আহত টমাসের কথা ভাবলো সত্যিই কি লোকটা বেঁচে আছে? নাঃ...একের পর এক দুর্ঘটনা পরিস্থিতিকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে। বলা যায় না, সে কাজটাকে প্রথমে যতোটা কঠিন মনে করেছিলো, হয়তো কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে কাজটা তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল।

মরগ্যান আচমকা উন্মাদের মতো ইস্পাতের প্রাচীরে ঘুঁষি মেরে অসহায়ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, এর মধ্যে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার। ভেবে দেখো একবার। ঠিক এই দেওয়ালের ও পিঠেই রয়েছে কুবেরের সম্পদ। দশ লাখ ডলার। যে করে হোক টাকাটা আমরা নেবোই। তার জন্যে জাহান্নামে যেতেও আমি প্রস্তুত।

ওদিকে কিটসন তখন অন্যান্য গাড়ির গতিপথ বাঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে সে গাড়ি চালাচ্ছে—জিনির দিকে নজর দেবার তার সময় ছিলো না। কিন্তু প্রধান সড়কে পৌঁছেই সে দেখলো, তার সামনে টানা নির্জন রাস্তা। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির গতি কমিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে—গতিপথ ঠিক করে নিয়ে তারপর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সীটের মধ্যে গা এলিয়ে জিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। মুখের বিবর্ণতা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। শরীরের কাঁপুনিকে গোপন করতে ও হাত দুটোকে হাঁটুর ফাঁকে আড়াল করেছে।

কিটসন ট্রাকের ভেতরে পড়ে থাকা লোকটার কথা ভাবলো, ঐ দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে বের করবার কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠলো। একটা মিশ্র অনুভূতির ঢেউ খেলে গেলো তার শরীরে। কিন্তু লোকটা কি বেতারে সাহায্য চেয়ে সংকেত পাঠিয়েছে?... হয়তো ওরা এখন সরাসরি এগিয়ে চলেছে পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা দিতে।

কিটসন বললো, টমাস যদি ইতিমধ্যে বেতারে খবর পাঠিয়ে থাকে, তাহলে—হয়তো আমরা পুলিশের জালে ধরা দিতেই এগিয়ে চলেছি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উলটে জিনি জবাব দিলো, 'কিন্তু আমাদের কি করবার আছে বলো?'

কিছুই নেই। যাকগে। ক্যারাভ্যানে চড়তে হয়নি দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। ওর ভেতরে ওদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

জিনি আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে, শুনতে পাচ্ছো?

কিটসনের হৃদপিণ্ডটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সত্যিই দ্রুতবেগে ধেয়ে আসা পুলিশ সাইরেনের কান ফাটানো আর্তনাদ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সমস্ত গাড়িই তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে ধীরগামী যান-বাহনের জন্য নির্দিষ্ট পথের দিকে এগিয়ে চললো। পলকের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এবার আরও জোরে শোনা গেল সাইরেনের আর্তনাদ। তারপরেই কিটসনের চোখে পড়লো দ্রুতবেগে এগিয়ে আসা পুলিশের গাড়িটার ওপর। তার পেছনে সার বেঁধে ছুটে আসছে চার চারটে মোটরবাইক চড়া দ্রুতগামী পুলিশ। তাদের পেছনে আরও দুটো পুলিশের গাড়ি। ঘণ্টায় আশী মাইলেরও বেশী বেগে গাড়িগুলো তাদের অতিক্রম করে ছুটে গেলো মাঝারি সড়কের দিকে।

কিটসন ও জিনি তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো।

কিটসন ভাঙা গলায় বললো, একটুর জন্য আমরা ঐ রাস্তাটা পার হয়ে এসেছি। আর সামান্য

দেরী হলেই পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হতো।

তার বক্তব্যকে ঘাড় নেড়ে জিনি সম্মতি জানালো।

ওরা আরও মাইলখানেক যাওয়ার পর হঠাৎই লক্ষ্য করলো, ওদের সামনের গাড়িগুলো ক্রমশঃ তাদের গতিবেগ কমিয়ে আনছে। আরো দূরে নজর চালাতেই ওরা দেখলো গাড়ির এক লম্বা সারি ধীরে ধীরে নিজেদের গতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে।

কিটসন অশান্ত ও উত্তেজিতভাবে বললো, সামনে রাস্তা বন্ধ। নিশ্চয়ই পুলিশ রাস্তা আটকেছে। তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই দেখছি।

জিনি ভরসা দিলো, চুপচাপ বোসো। এখন সাহস হারালে চলবে না।

বহু সময় অপেক্ষা করার পর গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলো। কিটসনও ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। দূরে রাস্তার অবরোধটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দু দুটো পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে গাড়ি শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়ি দুটোর কাছাকাছি ছজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি গাড়ি থামতেই ওদের মধ্যে একজন অফিসার গাড়ির ভেতর ঝুঁকে চালকের সঙ্গে দু একটা কথা বলেই তাকে এগোতে নির্দেশ করছে।

জিনি বললো, সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমিই ওর সঙ্গে কথা বলবো।

কিটসন জিনির সাহসে অবাক হলো। ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওরা তিনজন কি ভাবছে। সেটা সে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো। ওরা এই রাস্তা অবরোধটা দেখতেই পাবে না, তাই বুইকের এই শম্বুক গতিতে হয়ে পড়বে সংশয়াচ্ছন্ন। মনে মনে প্রার্থনা করলো, ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওরা যেন কোনরকম গোলমাল বাঁধিয়ে না বসে।

দশ মিনিট বাদে ওরা অবরোধের সামনে এসে পড়লো।

নির্বিকার মুখে, নিছক উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্কার্টটাকে জিনি হাঁটুর ওপরে তুলে ধরলো। পায়ের ওপর পা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারটি জিনির দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমে ওর মুখে... তারপর ওর নগ্ন হাঁটুর দিকে চোখ রাখলো। তার রোদে পোড়া তামাটে মুখে প্রশংসার হাসি ফুটলো। কিটসনের দিকে তাকাবার প্রয়োজনই মনে করলো না।

বুইকের গায়ে হেলান দিয়ে সে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে জিনিকে বললো, আপনারা কোত্থেকে আসছেন জানতে পারি কি?

জিনি বললো, ডুকাস থেকে। আমরা মধুচন্দ্রিমা কাটাতে বেরিয়েছি। তা ব্যাপার কি, অফিসার? এতো হৈ চৈ কিসের জন্য?

অফিসার প্রশ্ন করলো, আপনারা কি ওয়েলিং কোম্পানীর একটা ট্রাককে রাস্তায় দেখেছেন? ট্রাকটাকে দেখলে ভোলার কথা নয়। কারণ ওটার গায়ে বড় বড় হরফে ওয়েলিং কোম্পানির নাম লেখা আছে।'

কই, না তো। কোনো ট্রাকই আমাদের চোখে পড়েনি, তাই না আলেক্স?

কিটসন মাথা নাড়লো।

জিনি হাস্যতরল কণ্ঠে বললো, কেন, আপনারা ট্রাকটা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি? বিনা কারণেই খুশী খুশী স্বরে হেসে উঠলো।

জিনির হাঁটু থেকে চোখ না সরিয়েই অফিসারটি হাসলো।

যাকগে, ছেড়ে দিন ওসব কথা। এবার আপনারা যেতে পারেন। আশা করি আপনাদের মধুচন্দ্রিমা শুভ হোক। কিটসনের দিকে চেয়ে, শুভ হওয়া সম্পর্কে আমার অন্ততঃ কোনো সন্দেহই নেই, মশায়—জানি না আপনার আছে কিনা! আচ্ছা, এবার তাহলে এগোন।

কিটসন গাড়ি নিয়ে সামনে এগোলো। একটু পরেই ওরা পুলিশের অবরোধ পার হয়ে রাস্তায় এসে পড়লো।

কিটসন হাঁফ ছেড়ে শক্ত মুঠোয় বুইকের স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরলো, ওফ্ খুব জোর বেঁচে গেছি। লোকটাকে তুমি দারুণ ঘোল খাইয়েছ।

জিনি স্কার্ট ঠিক করে হাঁটু ঢাকলো, এসব লোককে বোকা বানানো খুব সহজ। দেখবার মতো কিছু একটা পেলেই হলো। কাজ টাজ ভুলে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকবে। হাতব্যাগ খুলে জিনি সিগারেট বের করে কিটসনকে বললো, চলবে নাকি?

দাও একটা।

জিনি সিগারেট ধরিয়ে কিটসনের ঠোঁটে দিলো। সিগারেটে জিনির নরম ঠোঁটের লিপস্টিকের ছোঁয়া আছে দেখে কিটসন আমেজ ভরে এক গভীর টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো।

জিনি এবার নিজের জন্যে আর একটা সিগারেট ধরালো।

পরবর্তী দশ মাইল নীরবতার পর জিনিই বললো, সামনের চৌমাথায় ডানদিকে ঘুরবে। সেই রাস্তাটাই ফন হ্রদের রাস্তা।

সামনের রাস্তায় নজর রাখতেই আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। কিটসন দেখলো, একটা হোডার প্লেন তাদের লক্ষ্য করে উড়ে আসছে। রাস্তা থেকে বড়জোর শ-তিনেক ফুট ওপর দিয়ে প্লেনটা উড়ে আসছে।

ঐ দেখো।

হাওয়ায় চড়া শিসের ঝাপটা তুলে হোডার প্লেনটা বুইক ও ক্যারাভ্যানের ঠিক ওপর দিয়েই বেরিয়ে গেলো।

জিনি বললো, হুঁ, তাহলে ওরা দেখছি কাজ শুরু করতে খুব একটা দেরী করেনি। জিনি হাতঘড়িতে দেখলো বারোটা দশ—মানে ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাক থামানোর পর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে। অথচ সেই সামান্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট জিনির কাছে মনে হলো পঁয়তাল্লিশ বছর।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে তিনজনেই হোডার প্লেনের শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত জিপো হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে উপুড় হলো, আতঙ্কে যেন কুঁকড়ে গেলো। শব্দ শোনামাত্রই সে বুঝেছে প্লেনটা তাদেরই খোঁজ করছে।

পুলিশী অবরোধের কাছে পৌঁছানো মাত্রই তিনজনেই মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। মরগ্যান দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় ওর ·৪৫ বের করেছে। বিনা যুদ্ধে ধরা দিতে সে রাজি নয়।

বুইক আবার যখন তার গতিতে ফিরে এলো তিনজনে তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মরগ্যান একবার কোট খুলে তার ক্ষতস্থানটা দেখলো। জিনির বেঁধে দেওয়া ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। ক্ষতস্থানে আবার রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

প্রথম থেকেই ব্লেক মরগ্যানের সুনজরে পড়ার চেষ্টায় ছিল। এখন সুযোগ পেয়েই সে উঠে দাঁড়ালো। জিপোকে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেলো ক্যারাভ্যানের তাকে রাখা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটার দিকে।

ব্লেক বাক্সটা খুলতে খুলতে ব্যস্তস্বরে বললো, দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক, আমি এখুনি ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করে দিচ্ছি।

মরগ্যানের মাথা তখন ঝিমঝিম করছে চারিদিক অন্ধকার লাগছে। রক্তপাতের পরিমাণ দেখে সে মনে মনে শঙ্কিত হলো। ব্লেকের কথায় মাথা হেলিয়ে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে চেষ্টা করলো।

অস্বস্তি ও আশঙ্কা ভরা চোখে জিপো মরগ্যানকে দেখে ভাবলো, ফ্র্যাঙ্ক যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আমরা কি করবো? যে কোন জটিল পরিস্থিতিতেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমাধান বের করার ব্যাপারে মরগ্যানের জুড়ি নেই। ফ্র্যাঙ্ক মারা গেলে আমরা গিয়ে পড়বো অথৈ জলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে ব্লেক নতুন একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হলো।

এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এক গ্লাস চলবে নাকি?

মরগ্যান তিক্তস্বরে বললো, চলুক, ক্ষতি কি? এখন তো মজা লুটবার সময়। অতএব খোলো বোতল...।

তিন গ্লাসে বেশ খানিকটা করে নির্জলা হুইস্কি ঢেলে জিপো ও মরগ্যানের দিকে দুটো গ্লাস এগিয়ে দিলো ব্লেক।

ওরা সবেমাত্র গ্লাসে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎই ওরা অনুভব করলো ওদের বুইক বড় রাস্তা ছেড়ে আচমকা বাঁক নিলো। পর মুহূর্তেই রাস্তার প্রতিক্রিয়াবশতঃ ক্যারাভ্যানটা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি তুলে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চললো।

তিনজনে চটপট নিজেদের গ্লাস শেষ করে ফেললো। মরগ্যান দাঁতে দাঁত চেপে ক্যারাভ্যানের দোলানি ও বুকের জমাট তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সহ্য করে চললো।

মিনিটখানেকের মধ্যে গাড়ির গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে গেলো। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে জিনি ও কিটসন।

মরগ্যানের বিবর্ণ পান্ডুর মুখ দেখে কিটসন দুশ্চিন্তায় প্রশ্ন করলো, কোনো রকম অসুবিধে হয় নি তো?

মরগ্যান বাইরে তাকালো। ওরা এখন রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছে এক ফার বনের শীতল ছায়া ঘেরা রাজত্বে। পাহাড়কে পাকে পাকে জড়িয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ফন হ্রদের দিকে। এখান থেকে ফন হ্রদের দূরত্ব, ছ মাইল।

মাথার ওপরে উড়োজাহাজের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

মরগ্যান ট্রাকের দিকে দেখিয়ে, টমাস এখনও বেঁচে আছে। ওকে যে করে হোক একেবারে শেষ করতে হবে।

ব্লেক নির্বিকার মুখে খাবারের বাক্সটা জিনির হাতে তুলে দিলো।

এতক্ষণে কিটসন প্রতিবাদ করলো। টমাসকে নিয়ে কি করবে তোমরা? খুন করবে ওকে?

নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি ফুটলো মরগ্যানের মুখে। 'নয়তো কি জামাই আদর করবো? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে যা বলছি তাই করো।

জিপো তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে, 'থামো। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টমাসকে খুন করার মধ্যে আমি নেই। আমার কাজ ট্রাকের তালা খোলা—তাই খুলবো, ব্যস্‌। অন্য কিছুর মধ্যে থাকতে আমি রাজী নই...।

মরগ্যান খিঁচিয়ে উঠলো চুপ করো। ·৪৫ পলকে তার হাতে উঠে এলো। ইস্পাতের চাদরটা তোমাকেই খুলতে হবে, জিপো ; ভালো চাও তো যা বলছি তাই করো! নইলে তোমার ঐ ভুঁড়িকে সীসে দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবো।

মরগ্যানের মুখের নৃশংস কুটিল অভিব্যক্তি জিপোকে ঠাণ্ডা করে দিলো, কঁকিয়ে উঠলো। আমাকে ছেড়ে দাও ফ্র্যাঙ্ক। আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও।

মরগ্যান কিটসনের দিকে ফিরে, আমার কথা তোমার কানে যায় নি? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে বুইকের চাকা খুলতে শুরু করো।

ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন ফিরে চললো। মানসিক উত্তেজনায় বুইকের পেছনের ঢাকনা তুলে ও একটা স্ক্রু-জ্যাক বের করে আনলো। আসন্ন নৃশংস অধ্যায়ের কথা ভেবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। কিটসন জ্যাক ঘুরিয়ে বুইকের সামনের চাকা মাটি থেকে তুলতে লাগলো...

তখন মরগ্যান জিপোকে সাবধান করে দিচ্ছে, শোনো জিপো। এখন থেকে তুমি তোমার টাকার অংশ উপার্জন করার চেষ্টা করো। এ পর্যন্ত তো শুধু হাওয়ায় গা লাগিয়ে ঘুরেছো। এবার কঠিন কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নাও। ইস্পাতের এই হতচ্ছাড়া ঢাকনাটা তোমার খুলতেই হবে।

জিপো ইস্পাত আবরণীর কাছে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। ব্লেক একবার জিপোর দিকে, আবার মরগ্যানের দিকে অস্বস্তিতে দেখতে লাগলো।

জিপো দেখলো ইস্পাতের চাদরটা তেমন মজবুত নয়। ট্রাকের দরজার মতো এটার পেছনে তেমন যত্ন নেয় নি ওয়েলিং এজেন্সী।

মরগ্যানও সেটা বুঝতে পারলো।

যাও, ছোট শাবল আর হাতুড়িটা নিয়ে এসো, এটাকে ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না।

ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙার পরের কথা মনে করে, জিপো কর্কশ স্বরে বললো, টমাস ভেতরে

বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাকে দেখামাত্রই ও সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

যা বলছি, চটপট করো।

জিপো যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে হাতুড়ি আর একটা ছোট শাবল নিয়ে এগিয়ে এলো। ওর হাত এত কাঁপছে যেন এখুনি শাবল আর হাতুড়িটা ওর হাত থেকে খসে পড়বে।

মরগ্যান অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, শীগগির করো! জলদি! এতো ভয় পাওয়ার কি আছে তা বুঝতে পারছি না।

টমাস যদি আমাকে গুলি করে তাহলে ট্রাকের তালা খুলবে কে? জিপো শেষ অস্ত্র হিসেবে মরগ্যানের নাকের ডগায় ওর তুরুপের তাস ছুঁড়ে মারলো। কাজ হলো।

মরগ্যান ক্রোধভরে, দাও, ও দুটো আমার হাতেই দাও!...শালা, ভীতুর ডিম। দাঁড়াও। তোমাকে আর তোমার ঐ নদের চাঁদ ইয়ারকে আমি শায়েস্তা করছি। তোমরা যদি ভাবো পায়ের ওপর পা তুলে দু লাখ ডলার পাবে, তবে ভীষণ ভুল করবে।

মরগ্যান হাতুড়ি আর শাবলটা জিপোর হাত থেকে হ্যাঁচকা মেরে কেড়ে নিলো। শাবলটাকে ইস্পাতের ঢাকনা ও জানলার জোড়ের মুখে ঠেকিয়ে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করলো। শাবলটা ইস্পাতের চাদরকে সামান্য ঠেলে ঢুকে গেলো ভেতরে।

ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা মেরে শাবলটা যখন ইঞ্চি ছয়েক ভেতরে ঢুকে গেলো মরগ্যান তখন থামলো। হাতুড়ি ফেলে ব্লেকের দিকে ঘুরে। জিপোর মতো তুমিও কি ভয়ে কেলিয়ে পড়লে?

কাঁধের খাপ থেকে ·৩৮ রিভলবারটা হাতে নিয়ে ব্লেক বললো, তুমি প্রস্তুত হলেই আমি প্রস্তুত।

মরগ্যান বাঁকাভাবে হাসলো। কি ব্যাপার? তুমি কি এখন নিজের দু লাখ ডলারকে বাঁচাতে চাইছো?

বাজে কথা ছাড়ো ফ্র্যাঙ্ক। কাজ শুরু করো। টমাসের মোকাবিলা করার জন্য আমি প্রস্তুত।'

মরগ্যান শাবলের প্রান্তে সবলে চাপ দিতে যাবে। ক্যারাভ্যানের গায়ে তিনবার টোকা দেবার শব্দ এলো। মরগ্যান চাপা স্বরে, সাবধান! কেউ আসছে।

ব্লেক জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলো।

জিনি রাস্তার ধারে গুছিয়েই বসেছিলো, ওর কাছ থেকে গজ কয়েক দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, তার পেছনে একটা ক্যারাভ্যান। সম্ভবতঃ, তাদের মতোই আরো কেউ ক্যারাভ্যান নিয়ে ফন হ্রদের দিকে চলেছে।

একটা রোদে পোড়া লালমুখো মধ্যবয়স্ক লোক খুশী খুশী মুখে গাড়ি থেকে নামলো। তার সঙ্গিনী একজন সুশ্রী মহিলা ও একটি দশ বারো বছরের ছেলে। ওরা গাড়িতে বসেই বুইক ও ক্যারাভ্যানটাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো।

মধ্যবয়স্ক লোকটার হেঁড়ে গলা কানে এলো, কি ব্যাপার? চাকা বিগড়েছে মনে হচ্ছে? জিনিকে লক্ষ্য করে বললো, বলেন তো সাহায্য করি—

জিনি মিষ্টি হেসে না, না—তার কোনো দরকার নেই। আমার স্বামী একাই পারবেন। ধন্যবাদ।

লোকটা বললো, আপনারা কি ফন হ্রদের দিকেই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমরাও সেখানেই যাচ্ছি। গত গ্রীষ্মের ছুটিতেও গিয়েছিলাম। আপনারা আগে কোনদিন ওখানে গেছেন নাকি?

উঁহু।

দেখবেন। জায়গাটা খুব ভালো লাগবে। এক কথায় চমৎকার। তার ওপর সুব্যবস্থা তো আছেই। ওহ,-হো, আমার নামটাই বলিনি—আমার নাম ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড। ঐ যে গাড়িতে আমার স্ত্রী-মিলি; আর ওর পাশেই আমার ছেলে। আপনাদের ছেলেমেয়েদের দেখছি না!

জিনি ওর কথায় খোলা হাসিতে ফেটে পড়লো। ওর হাসি ব্লেককে অবাক করলো। সত্যি মেয়েটা অভিনয় জানে বটে।

ব্র্যাডফোর্ড অপ্রস্তুতে পড়তেই জিনি তাড়াতাড়ি বললো, না, এখনও পর্যন্ত নেই। আমরা মধুচন্দ্রিমা কাটাতে ফন হ্রদে যাচ্ছি।

এবার ব্র্যাডফোর্ড হো হো করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো।

ওঃ—দারুণ দিয়েছেন। আরে শুনেছো, মিলি! ওরা কোথায় মধুচন্দ্রিমা কাটাতে যাচ্ছে, আর আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করছি ওদের ছেলেমেয়ে আছে কিনা! হোঃ—হোঃ—হোঃ...!

মহিলাটি গাড়ি থেকেই বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুঁচকে বললো, তোমার সব সময়েই ঐ রকম। চলে এসো। ফ্রেড—ওদের শুধু শুধু বিরক্ত করছো।

হ্যাঁ—ঠিক বলেছো। আমারও তাই মনে হয়...আচ্ছা তাহলে চলি মিসেস...এই দেখুন কাণ্ড, আপনার নামটাই জানা হয় নি।

হ্যারিসন। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

তাতে কি হয়েছে? হয়তো ফন হ্রদে গিয়ে আমাদের আবার দেখা হবে। তখনই বকেয়া আলাপের পালাটা সেরে নেওয়া যাবে। আর নিতান্তই যদি দেখা না হয়, তাহলে আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি।

ধন্যবাদ।

গাড়িতে উঠে ব্যাডফোর্ড হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো পাহাড়ী রাস্তা ধরে।

মরগ্যান ও ব্লেক অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে তাকালো।

ব্লেক চিন্তিতভাবে বললো, এখন যদি টমাস রিভলবার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা গুলির শব্দ শুনতে পাবে।

মরগ্যান মরিয়া হয়ে পেলে পাক। এই বনে কি কেউ শিকার করে না? ওরা ভাববে কোনো শিকারী শিকারের পেছনে ছুটছে। এসো, কাজ শুরু করা যাক।

কিটসন এমন সময় জানলা দিয়ে ডেকে বললো, কি ব্যাপার? ভেতরে কি হচ্ছে?

তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমাদের সাবধান করে দেবে। আমরা আর দেরী করতে পারছি না।

শিউরে উঠলো কিটসন, ওর সারা শরীর যেন গুলিয়ে উঠলো।

ক্যারাভ্যানের জানালা বন্ধ করে দিলো মরগ্যান, ব্লেকের দিকে ফিরে ঘাড় নাড়ালো, এসো, এড তাহলে শুরু করা যাক।

চলো।

মরগ্যান শাবলটা নীচের দিকে হ্যাঁচকা মারতেই জিপো ভয়ে মুখ ঢাকলো দু-হাতে।

ওয়েলিং এজেন্সীর ট্রাক-চালক ডেভ টমাস পড়ে ছিলো ট্রাকের মেঝেতে। চৌচির, রক্তাক্ত চোয়ালের যন্ত্রণায় সব অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। শুধু সাহসকে সম্বল করে সে কোনোরকমে বেঁচে আছে।

মরগ্যানের রিভলবারের গুলি তার মুখের নিম্নাংশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। যাবার পথে টমাসের চোয়ালের হাড় চুরমার করে জিভকে দু ফালি করে সরাসরি গুলিটা বেরিয়ে গেছে।

এই আকস্মিক আঘাত ও যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া টমাসের মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তার জ্ঞান ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই টমাস অনুভব করেছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

টমাস ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করলো। চালকহীন ট্রাকটা কি করে ছুটছে, ভেবে সে অবাক হলো!

এভাবে এক নাগাড়ে রক্তপাত হওয়ার পরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম তা টমাস জানে। তবে মরতে সে ভয় পায় না। এখন যদি কোনো এক বিচিত্র মন্ত্রবলে সে বেঁচেও ওঠে তবুও খুব একটা লাভবান হবে বলে মনে হয় না, কারণ একটা ফাটা চৌচির চোয়াল ও আধখানা জিভ নিয়ে সে কি করে লোকসমাজে থাকবে? তাছাড়া বোবা হয়ে বাকি জীবনটা কাটানোর যন্ত্রণা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

এবার ট্রাকের এপাশ ওপাশ টলমল দোলানির দিকে মন সংযোগ হলো। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে সিদ্ধান্ত নিলো, ট্রাকটাকে কোনো গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাঃ। মতলবটা মন্দ নয়।

কিন্তু এরা কি শেষ রক্ষা করতে পারবে? আপাততঃ তার কর্তব্য হলো এই মুহূর্তেই বেতার যন্ত্র চালু করে বিপদ সংকেত পাঠানো, পুলিশকে জানানো ট্রাকের অবস্থিতির কথা। যেখানেই ওটা লুকানো থাকুক না কেন, পুলিশ ঠিক খুঁজে বের করবেই।

এখুনি এই কাজটা করা তার উচিত। কিন্তু বেতার যন্ত্রটা ঠিক তার পেছনে—ওপর দিকে। তাকে একপাশে কাত হয়ে ওপরে হাত বাড়াতে হবে। পাশ ফেরামাত্রই অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হবে ভেবে টমাস চোখ বুজে একইভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো। নেকড়ের হিংস্রতায় ভরা মুখটার কথা, সাপ কালো শীতল চোখ জোড়ার কথা—যে লোকটা তাকে গুলি করেছিল তার কথা ভাবতে লাগলো। টমাস লোকটার পরিচয় পেয়ে অবাক হলো। আর ঐ মেয়েটা, যে স্পোর্টস কারটা চালাচ্ছিলো সেও নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে। ওদের পুরো মতলবটা প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে ঐ দুর্ঘটনার দৃশ্যটা। কিন্তু তবুও ডার্কসন সোজাসুজি বেতারে খবর দিয়েছিলো এজেন্সীকে। জানতে চেয়েছিলো তাদের কর্তব্য।

টমাস তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে ভাবলো, ঐ ফুলের মতো কচি মেয়েটা কি করে এই নৃশংস ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়লো।

মেয়েটার কথায় টমাসের মনে পড়লো ক্যারির কথা—তার তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটার কথা।

ক্যারীর মাথার চুল অনেকটা ঐ মেয়েটার মতোই, তামাটে। কিন্তু ওর মতো ক্যারী অতোটা সুন্দরী নয়। অবশ্য ক্যারির বয়স এখনো অনেক কম—বড় হলে হয়তো আরও সুন্দরী হবে।

ক্যারী তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, বলে, ওর বাবার মতো সাহসী লোক আর নেই। নইলে দশ লক্ষ ডলার ভর্তি একটা ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

টমাস ভাবলো, ক্যারি যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখতো, তাহলে ওর সমস্ত স্বপ্নই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। সামান্য একটু ব্যথার ভয়ে, যন্ত্রণার ভয়ে আমি পাশ ফিরে বেতারে খবর দিতে পারছি না দেখলে ও লজ্জা পেতো।

ট্রাকের টাকা রক্ষা করার জন্য টমাস যদি নিজের জীবনও দিয়ে দেয়, তবুও ক্যারী এতোটুকু দুঃখ পাবে না। বরং বন্ধুদের বলবে তার বাবা কিভাবে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে। না, টমাস ওর কাছে ছোট হতে পারবে না।

এখন তার করণীয় কাজ দুটি, প্রথমতঃ বেতারে বিপদ সংকেত ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ বোতাম টিপে সময় নির্ভর তালাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অকেজো করে দেওয়া।

তালাকে অকেজো করার বোতামটা স্টিয়ারিং হুইলের ঠিক পাশে রয়েছে। ওটাকে নাগালে পেতে টমাসকে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে। কিন্তু এই নড়াচড়ায় তার ভাঙা চোয়ালের হাল যে কি হবে ভেবে সে ঘামতে লাগলো।

ক্যারী ট্রাক রক্ষা করার ব্যাপারে টমাসকে সমর্থন করলেও, হ্যারিয়েট—তার স্ত্রী যে করবে না, সেটা টমাস ভালোই জানে। হ্যারিয়েট টমাসের অবস্থাটা বুঝবে, কিন্তু ক্যারী যে ছোট,অবুঝ।

মিনিট পাঁচেক লাগলো সাহস করে প্রস্তুত হতে তারপর সে যখন পাশ ফিরতে চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার তীব্র ছুরি কেটে বসলো তার হৃদপিণ্ডে। টমাস মুহূর্তে আবার জ্ঞান হারালো।

টমাসের ঘুম ভাঙলো হাতুড়ি পেটার অপ্রত্যাশিত বিকট শব্দে। চোখ মেলেই দেখলো জানলা ও ইস্পাতের পাতের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া এক চিলতে মধ্যাহ্নের আলো। দৃষ্টি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হতেই দেখলো,একটা শাবল আংশিক ঢুকে রয়েছে ইস্পাত আবরণী ও জানলার ফাঁকে।

টমাস ভাবলো, তাহলে ওরা আমাকে শেষ করতে আসছে। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

দুর্বল হাতে রিভলবার বের করার চেষ্টা করলো। মরগ্যান গুলি করার সময়, টমাস রিভলবার ছোঁড়ার সুযোগ পায়নি। তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে চায়।

টমাসের রিভলবার ·৪৫ স্বয়ংক্রিয় কোল্ট। তাই একটু ভারী। রিভলবারটা হাতে নিতেই মনে

হলো খুব ভারি, আরেকটু হলেই পড়েও যাচ্ছিলো বন্দুকটা। অতিকষ্টে নামিয়ে আনলো তার ডান পাশে। আর বন্দুকের নলটা তাক করে রাখলো ট্রাকের জানলার দিকে।

ঠিক আছে শালা, এসো এবার! ভাবলো টমাস—আমার একদিন কি তোমার একদিন! ক্রমশঃ চমক দেবো, জীবনভর ইয়াদ রাখবে! আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি করো। মরার আগে জীবনের শেষ যুদ্ধে জিততে চাই।

এমন সময় তার কানে এলো কারো চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, সাবধান। কেউ আসছে!

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। টমাস অনুভব করলো, অনুভূতিকে স্থাবর করে দিতে চাইছে। সে মনের জোরকে সম্বল করে লড়ে চললো, কোনোরকমে জাগিয়ে রাখলো তার মনের চেতনা।

নিজের মনেই উচ্চারণ করলো টমাস, তাড়াতাড়ি করো! এ অবস্থা আমি আর সইতে পারছি না!...

হঠাৎই শুনতে পেলো কাবো উত্তেজিত স্বর, এখন যদি টমাস রিভলভার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা শব্দ শুনতে পাবে।

টমাসের রিভলবার ক্রমশঃ ভারী ঠেকছে। সে বুঝলো, জানালা লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দরজা খুললেই টমাস গুলি চালাবে। তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

টমাস প্রতীক্ষায় রইলো। যন্ত্রণায় তার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবুও অপেক্ষা করে চললো।

জানলায় শাবলের চার দিতেই সড়াৎ করে ওপরে উঠে গেলো ইস্পাতের চাদর। টমাসের চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ হলো ট্রাকের খোলা জানলায়।

ব্রেক ও মরগ্যান সরে দাঁড়ালো জানালার কাছে থেকে। দরজার দু-পাশে ওরা কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কোনো শব্দই কানে এলো না। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

শালা, চালাকি করছে না তো? প্রশ্ন করলো ব্রেক।

হতে পারে।

জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দিলো মরগ্যান, আর খুঁজে চললো দরজা খোলার হাতলটা।

টমাস লক্ষ্য করতে লাগলো মরগ্যানের কার্যকলাপ। তার চোখ আধবোজা ; তর্জনী চেপে বসেছে রিভলবারের ট্রিগারে সাফল্যের অনিশ্চয়তায় তার মন সামান্য আশঙ্কিত।

অবশেষে দরজাটা খুলে ফেললো মরগ্যান। দরজার পাল্লাটা গিয়ে থামলো ব্রেকের সামনে। সুতরাং ব্রেকের পক্ষে ভেতরে নজর রাখা সম্ভব হলো না। একদিকে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল, অন্যদিকে ট্রাক, এবং সামনে ট্রাকের খোলা দরজার পাল্লা—একরকম বন্দীই হয়ে পড়লো ব্রেক।

মরগ্যান বিদ্যুৎগতিতে ট্রাকের ভেতরে উঁকি মেরেই বাইরে শরীরটাকে বের করলো।

সে সেই কয়েক মুহূর্তে দেখলো একটা লোক বিস্রস্তভাবে ট্রাকের মেঝেতে পড়ে রয়েছে তার চোখ বোজা, মুখের রঙ ফ্যাকাসে।

ব্রেকের দিকে ফিরে মরগ্যান চাপা স্বরে বললো, কোনো ভয় নেই। ও মারা গেছে।

মনে মনে টমাস ভাবলো। পুরোপুরি নয় বন্ধু, একটু পরেই সেটা জানতে পারবে।

টমাস প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে রিভলবার ধরা হাতটা ঈষৎ উঁচিয়ে ধরলো। আস্তে আস্তে মরগ্যান সতর্ক ভঙ্গীতে ট্রাকের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

টমাসের বন্দুক মরগ্যানের দিকে নিশানা করা অতিরিক্ত সাবধানতা বশে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস টমাস মৃত। ঐ রকম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মুখ। মৃতের মতো রক্তহীন, পাণ্ডুর শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

মরগ্যান ব্রেকের দিকে ফিরে, ওকে এখান থেকে বের করে বাইরে কবর দেওয়া যাক। কি বলো? ব্রেক তখন কৌতূহলভরে জানলা দিয়ে টমাসকে দেখছে।

টমাস এমন সময় চোখ খুললো।

সাবধান। প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দরজাটা তার শরীরে চেপে বসায় সে অসুবিধেয় পড়লো।

মরগ্যান ওকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই টমাস ট্রিগার টিপলো।

ঠিক একই মুহূর্তে দুটো বন্দুকের শব্দ বিস্ফোরিত হলো।

মরগ্যানের গুলিটা টমাসের গলায় বিঁধে গেল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো।

টমাসও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। মরগ্যানের পেটে তার গুলি লেগেছে। হাঁটু ভেঙে ট্রাকের ভেতর মরগ্যানের মুখটা টমাসের কোলে গিয়ে পড়লো।

জিপো ভাঙা কর্কশ গলায় এক তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো।

ব্লেক ট্রাকের দরজাটা ঠেসে ধরলো মরগ্যানের বেরিয়ে থাকা পায়ে। কোনরকমে একপাশ হয়ে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের দরজার ফাঁক দিয়ে সে এদিকে এসে দাঁড়ালো। ব্লেক মরগ্যানের দেহটাকে চিত করে দিলো।

মরগ্যান ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম, এড। তার স্বর এতই অস্পষ্ট ছিল যে ব্লেকের বুঝতে কষ্ট হলো। তবে টাকাটা তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদের প্রত্যেকেরই কাজে লাগবে। এই দশ লাখ ডলার...গুড লাক...

হঠাৎই ব্লেকের খেয়াল হলো। সে এক অদ্ভুত চিন্তা করে চলেছে। যদি শেষ পর্যন্ত ট্রাকের তালা তারা ভাঙতে পারে, তাহলে দুলাখ ডলারের জায়গায় তারা প্রত্যেকে আড়াই লাখ করে পাবে। কারণ তাদের অংশীদারের সংখ্যা এই মুহূর্ত থেকে চারজন।

।। আট ।।

একটা বসবার ঘর, একটা শোবার ঘর। একটা ছোট্ট রান্নাঘর এবং তার চেয়েও ছোট্ট একটা স্নানঘর—এই নিয়েই গোটা কেবিনটা।

আধুনিকভাবে সাজানো-গোছানো শোবার ঘরে দুটো বিছানা—তাছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তো আছেই। বসবার ঘরটাও চেয়ার, সোফা ইত্যাদিতে ছিমছামভাবে সাজানো। অর্থাৎ চারজন শোবার পক্ষে কোনরকম অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

এই কেবিনটা হ্রদের এক প্রান্তে। এবং অন্যান্য কেবিনগুলোর থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কেবিন ভাড়া দেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি বেশ সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে জিনিকে বলল, এই কেবিনটা বিশেষভাবে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যই তৈরী। এই কেবিনে আগে যারা ছিলো। তারা গতকাল রাতেই ছেড়ে চলে গেছে।

হ্যাডফিল্ড কর্মচারীটির নাম। জিনি আর কিটসন এখানে এসে পৌঁছলে সে তখন ওদের পাশে এসে রাস্তা দেখিয়ে ওদের ইঙ্গিত কেবিনের দিকে নিয়ে গেছে।

হ্যাডফিল্ড মাঝে মাঝে অবাক চোখে কিটসনের দিকে দেখছিলো। ভদ্রলোককে কেমন যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছে চুপচাপ বসে রয়েছেন—ব্যাপার কি? কে জানে, হয়তো আসন্ন ফুলশয্যার রাতের কথা ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু হ্যাডফিল্ড—এরকম সুন্দরী বউ পেয়ে ভদ্রলোক বিব্রত কেন—কারণ খুঁজে পেলো না।

মেয়েটাও কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেক সুন্দরী মেয়েই মধুচন্দ্রিমার নামে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। হ্যাডফিল্ড ওদের কথা আবেগভরে ভাবলো। কোথায় ক্যারাভ্যান রাখতে হবে, কোথায় হ্রদে বেড়ানোর জন্য নৌকো ভাড়া পাওয়া যাবে—সবই দেখিয়ে দিলো। আরো বললো, কেউ কখনো তাদের বিরক্ত করবে না। তারা নিজেদের খুশিমতো দিন কাটাতে পারে।

এখানকার লোকেরা বেশ মিশুকে, মিসেস হ্যারিসন। হ্যাডফিল্ড বলতে বলতে ওদের কেবিনটা দেখালো। জিনিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। তারা সবসময়েই আপনাদের সুখ সুবিধের দিকে নজর রাখবে, গল্প-সল্প করবে।...আমার মনে হয়, আপনারা বোধহয় নির্জনতাই বেশি পছন্দ করবেন।—অন্তত প্রথম কয়েকদিন, কি বলেন? যাক গে—ও নিয়ে ভাববেন না। মিসেস হ্যারিসন, আমি সবাইকে বলে দেবোখন। আপনারা গুছিয়ে না বসা পর্যন্ত কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না।

ওদের চারজনের একমাত্র অন্ধকারের প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিলো না। সারাদিনের ধকলে ওদের কাছে ঐ সময়টুকু অসহ্য ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। জিনি কেবিনে ঢুকেই শোবার ঘরে ঢুকে

সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমিয়ে পড়লো। কিটসন বাইরে পাহারায় থেকেছে। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করেছে আর ক্যারাভ্যানের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ব্লেক ও জিপোকে নিরুপায় হয়েই টমাস ও মরগ্যানের মৃতদেহের সঙ্গে ক্যারাভ্যানের ভেতরে থাকতে হয়েছে। না, ওদের সময়টা খুবই খারাপ কেটেছে।

জিপো আর ব্লেক অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনের ভেতরে চলে এসেছে।

পরিশ্রান্ত জিপোর অবস্থা ব্লেকের চেয়েও খারাপ। সে এসেই একটা চেয়ারে বসে দুহাতে তার মুখ ঢাকলো। তার চোয়ালের পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ। ব্লেকের আঘাতের ফলেই ঐ ক্ষত। ফন হ্রদে আসার পথে জিপো হঠাৎ ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সে ক্যারাভ্যানের ধাতব দেওয়ালে পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো একরোখাভাবে ব্লেকের সঙ্গে সমানে যুঝে গেছে।

অবশেষে ব্লেক তাকে চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে ঘুঁষি মেরেছে। এছাড়া জিপোকে সামলানোর আর কোনো উপায়ই ছিলো না। তারপরে যখন জ্ঞান ফিরেছে সে চুপচাপ ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে থেকেছে। অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তাদের আটটি ঘণ্টা ক্যারাভ্যানের ভেতরে কাটাতে হয়েছে। মাছির দৌরাত্ম্যের জন্য জানালাগুলো এটে বসে সময় গুনেছে—। এ অভিজ্ঞতার কথা ওরা সহজে ভুলবে না।

ব্লেক আর কিটসন গেছে অন্ধকার ঘন জঙ্গলের ভেতরে টমাস ও মরগ্যানের মৃতদেহ কবর দেবার জন্য। জিপোর নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা বেলচা ছিল। সেটা দিয়েই মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে।

ব্লেক আর কিটসন বিষণ্ণ চাঁদের মরা আলোয় নিঃশব্দে কাজ করে চললো অত্যন্ত সতর্কভাবে। কারণ অদূরেই খোলা নীল হ্রদের জলে নৈশবিহারে ব্যস্ত দম্পতিদের কথোপকথন নৌকো থেকেও স্পষ্ট কানে আসছে। তাছাড়া পাড়ে পায়চারিরত অতিথিদেরও তারা দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎই তারা মাথা নীচু করে লুকিয়ে পড়লো—বুকের ধুকপুক শব্দ আচমকা বেড়ে উঠলো। ব্লেক ও কিটসনের ঠিক পাশ ঘেষে একজোড়া তরুণ-তরুণী বেরিয়ে এলো। ওরা এই স্বপ্নিল আঁধারে জঙ্গলের নির্জনতাকেই বেছে নিয়েছে। ওরা চলে যেতেই কিটসন আবার কাজ শুরু করলো।

মাঝরাতে ওদের কাজ শেষ হলো। ওপরের মাটি সমান করে তার ওপর ভাঙা ডালপালা ও শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিলো ব্লেক। ওরা শ্রান্ত দেহে কেবিনের দিকে ফিরে চললো।

জিনি ৩৮ রিভলবারটা কোলের ওপর রেখে গা এলিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আর জিপোর দিকে লক্ষ্য রাখছিলো।

ব্লেক কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ব্লেক ও কিটসন চেয়ারে বসলো। কিটসনের মুখের রঙ ফ্যাকাশে—রক্তহীন। তার গালের একটা ছোট পেশী, থেকে থেকেই কেঁপে উঠছে। মুখে ঘামের ফোঁটা চকচক করছে।

ব্লেক জিনিকে বললো, কোনো গোলমাল করে নি তো?

জিনির মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। চোখের নীচে কালি। দেখে মনে হচ্ছে ওর বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেছে। শরীরের জৌলুষও অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু বরাবরের মতোই শীতল ও নির্বিকার ভাবে। না।...তবে বরাবরই বলছিলো। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাবো—।

ব্লেক কঠিন স্বরে বললো, ট্রাকের তালা খোলার পর বাড়ি কেন। ও নরকে গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

জিপো ওদের কথাবার্তায় পাশ ফিরে তাকালো। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে চারপাশে দেখলো। তারপর ওদের তিনজনকে দেখেই সোফার ওপর উঠে বসলো। উত্তেজনায় জিপোর হাত কাঁপতে লাগলো, মুখ সংকুচিত হলো।

এড, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও...। আমার ভাগের টাকার দরকার নেই। ওটা তোমরাই নিয়ে নিও। ঐ হতচ্ছাড়া ট্রাকের সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না; তাই বলছি, আমার প্রাপ্য দু লক্ষ ডলার নিয়ে তোমরা আমাকে রেহাই দাও। ফ্র্যাঙ্ক যদি অতো করে না বলতো, তাহলে আমি এ কাজে হাত দিতাম না। এখনও যদি তোমাদের রাজা হবার সাধ থাকে তো লেগে

থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সোজা আমার কারখানায় ফিরে যাচ্ছি।

ব্রেক কিছুক্ষণ ধরে জিপোর আপাদমস্তক জরীপ করলো, কিন্তু আমার তা মনে হয় না, জিপো।

শোনো—এড্ একটু ভালো করে ভেবে দেখো। আমার অংশের সমস্ত টাকাই আমি-তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। দু লাখ ডলার নেহাত কম নয়। কিন্তু তার বদলে আমি শুধু বাড়ি যেতে চাইছি।

ব্রেক নির্লিপ্তভাবে, উঁহু—আমার ধারণা, সেরকম ছেলেমানুষী তুমি করবে না।

এবার জিপো কিটসনের দিকে ফিরে করুণ সুরে, আলেক্স। তুমি তো জানো, এই কাজটা কি রকম বিপজ্জনক। আমরা প্রথমে কেউ রাজি হইনি, মনে আছে? কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক আমাদের এ কথা সেকথা বলে ঠিক রাজি করেছিলো। চলো, আমরা চলে যাই। এড আর জিনিই ট্রাকের সমস্ত টাকা ভাগ করে নিক। ও টাকায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি আর আমি একসঙ্গে কাজ করবো। আমাদের দিন স্বচ্ছলভাবেই কেটে যাবে...বিশ্বাস করো, আলেক্স, বাকি জীবনটা আমরা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবো।

ব্রেক নরমস্বরে বললো। ন্যাকামো ছাড়ো, জিপো। তুমি এখানেই থাকছো। এবং ট্রাকের তালা খুলছো—এই আমার শেষ কথা।

পাগলের মতো করে জিপো বললো, না, না—এড, আমাকে যেতেই হবে। এই কাজের শেষ দেখার মতো সাহস আমার নেই। তবে কি করে ট্রাকের তালা খুলতে হয় সেটা তোমাদের বলে দিয়ে যাবো। তখন তুমি আর জিনি সহজেই তালা খুলতে পারবে কিন্তু আমাকে আর থাকতে বোলো না। আমাদের ভাগের পাঁচ লাখ ডলার তোমরা এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছো। কারণ আমার টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আলেক্স ওর অংশটা জিনিকে দিয়ে যাবে...। আমাদের তুমি ছেড়ে দাও, এড। আমরা চলে যাচ্ছি...।

ব্রেক কিটসনকে বললো, তুমিও কি চলে যেতে চাও?

কিটসন মরগ্যানের আকস্মিক ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে সাময়িকভাবে স্থবির হলেও ধীরে ধীরে হারানো সাহস ফিরে পাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে দু-দুটো মৃতদেহকে কবর দেওয়ার দুঃস্বপ্নের প্রভাবকে সে ক্রমশঃ কাটিয়ে উঠেছে। সে বেশ বুঝতে পারছে, এখন তারা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একমুখী রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এখন কিটসনের নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছুই হারাবার ভয় নেই, কিন্তু লাভের দিকে রয়েছে আড়াই লাখ ডলার, সোনালী ভবিষ্যৎ আর জিনির সঙ্গ। না। সে এখন চাক বা না চাক, ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

কিটসন ব্রেকের চোখে চোখ রেখে নিষ্কম্প স্বরে বললো, না।

জিপো মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো। শোনো, আলেক্স—তুমি কি বলছো, তা তুমি নিজেই জানো না। তুমি এই বিপদের মধ্যে এদের সঙ্গে থেকে কি করবে? তার চেয়ে আমার কারখানায় চলো। মনে কোরো না এ কাজ করে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে! শেষ পর্যন্ত তোমরা বিপদে পড়বেই। তার চেয়ে এখনই এসবের সংস্রব ত্যাগ করা ভালো। আলেক্স, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—।

কিটসন জিনির দিকে আড়চোখে তাকালো, না জিপো, তা হয় না।

জিপো গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে, তাহলে আমি চললাম। কিন্তু মনে রেখো এখানে থেকে তোমার ভালো কোনদিনই হবে না। তিন তিনটে লোক এই ট্রাকের কারণেই মারা গেছে। তাদের রক্তের দাম কোনদিনই তোমরা দিতে পারবে না।—পারবে? ফ্র্যাঙ্ক বলেছিলো, পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় ধরবে। হুঁ...ওর অন্তিম পরিণতির কথা কি মনে করিয়ে দিতে হবে? একরাশ ভিজে মাটির নীচে স্যাঁতসেঁতে একটা গর্তে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওর রাজা হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না, আলেক্স? তোমরা কেউই কি বুঝতে পারছো না, যে এসবের শেষ কোনদিনই ভালো হয় না, হতে পারে না? ঠিক আছে, তাহলে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—আমি চললাম।

ব্রেক চট করে হাত বাড়িয়ে জিনির কোলে পড়ে থাকা ·৩৮ টা তুলে নিলো। জিপোর বুক লক্ষ্য করে নিষ্ঠুরভাবে উঁচিয়ে ধরলো।

ট্রাকটা তোমাকে খুলতেই হবে, জিপো। নইলে ফ্র্যাঙ্কের পাশে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

জিপো বুঝলো, ব্রেক ঠাট্টা করছেনা। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ৩৮-এর কালো নলটার দিকে তাকিয়ে রইলো। জিপোর মুখে অপ্রসন্নতার স্পষ্ট ছায়া। আচ্ছা তাহলে তাই হোক। তুমি আমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখতে চাইছো, কিন্তু এতে কিছু লাভ হবে না। কারণ—এ কাজের শেষ পরিণতি ভালো হবে না—হতে পারে না।

ব্রেক বন্দুকটা নামিয়ে রাখলো।

সে বিরক্ত হয়ে, তোমার বকবকানি শেষ হয়েছে?

জিপো মাথা ঝাঁকিয়ে, আমার আর কিছু বলাব নেই। কিন্তু তোমাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছি এড। সেটা মনে রেখো।

ব্রেক অন্য দুজনের দিকে। তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে জিপো যখন রাজি হয়েছে, এবারে আমরা আলোচনায় বসতে পারি। এখন আমরা চারজন। তার মানে আমরা প্রত্যেকে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার করে বেশি পাবো। আর পরিকল্পনা যা ছিলো সেই মতোই কাজ চলবে। কিটসন—তুমি আর জিনি নতুন বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রীর মতোই অভিনয় চালিয়ে যাও। আমি আর জিপো ক্যারাভ্যানের ভেতরে ট্রাক নিয়ে পড়ে থাকবো। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমরা চারজন চারদিকে কেটে পড়বো—রাজি?

ঘাড় নেড়ে সবাই সম্মতি জানালো। ঠিক আছে, তাহলে এই কথাই রইলো। ব্রেক দরজার দিকে এগিয়ে তালা থেকে চাবিটা বের করে পকেটে রাখলো। আচ্ছা আমি তাহলে শুতে চললাম, আজকে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। ব্রেক জিপোর পেটে একটা খোঁচা মেরে, ওঠো, মোটুরাম—চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমাকে সোফাটা ছেড়ে দাও। মনে হয় সোফাতে শোবার অধিকার বর্তমানে একমাত্র আমারই আছে।

জিপো উঠে চেয়ারের দিকে এগিয়ে চললো। ব্রেক সোফায় বসে জুতো খুলতে খুলতে কিটসনকে লক্ষ্য করে বললো, পাশের ঘরে তোমার জন্য আর একটা খাট পাতা আছে আলেক্স। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো—স্বামীর কর্তব্য পালনে মন দাও।

কিটসন পরিশ্রান্ত ভাবেই একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো—হাই তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

জিনি পাশের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল।

ব্রেক ব্যঙ্গের সুরে বললো, তোমার দুর্ভাগ্য আলেক্স। মনে হচ্ছে তোমার মতো স্বামীকে জিনির ঠিক পছন্দ হয় নি।

কিটসন বিরক্তিভরে বললো, ওঃ—তুমি থামবে!'

জিনির পবদিন সকাল সাতটার কিছু পরেই ঘুম ভাঙলো। বসবার ঘরে এসে ও জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলো। বাইরের আলো আসতেই তিনজনে জেগে উঠলো।

ব্রেক বিরক্তিসূচক শব্দ করে উঠে রিভলবারের খোঁজে পকেট হাতড়াতে লাগলো।

তখনো কিটসনের ঘুমের আমেজ কাটেনি। সে মাথা তুলে পিটপিট করে জিনির দিকে তাকালো। জিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

জিপো শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটা কাটিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। আহত চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো যন্ত্রণায়।

রান্নাঘর থেকে জিনি বললো, তোমরা তাড়াতাড়ি ক্যারাভ্যানে যাবার তোড়জোড় করো, এর মধ্যেই কিন্তু হ্রদের ধারে লোকজনের ভিড় শুরু হয়েছে।

ব্রেক কলঘরের দিকে গেলো। মিনিট দশেক পরেই সে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে বেরিয়ে এলো। জিপোকে বললো, যাও, চান-টান সেরে নাও। তোমার গা থেকে মোষের মত বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে।

স্নান সেরে জিপো ঘরে ঢুকতেই দেখলো, জিনি একটা ট্রেতে প্রাতঃরাশ সাজিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে এসেছে।

জিনি ট্রেটা ব্রেকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, এগুলো নিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরেই, তোমরা খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলো।

ট্রেতে রাখা কফি, ডিম সেদ্ধ, কমলালেবুর রস ও স্যান্ডউইচের দিকে তাকিয়ে ব্রেক ট্রে টা জিনির

হাত থেকে নিলো,'শোনো সুন্দরী, এখন থেকে তোমরা আমার কথামতো চলবে। কারণ এ দলের পরিচালনার ভার এখন আমার।

জিনি তাচ্ছিল্যভাবে, পরিচালনার ভার? তার মানে? এ দলের পরিচালনার দায়িত্ব কারোরই নেই—মরগ্যানেরও ছিলো না। আমরা শুধু পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে যাবো। প্রথম থেকেই ঠিক ছিলো তুমি আর জিপো কেবলমাত্র রাত্রিবেলাতেই কেবিনে আসবে। আর সারাটা দিন তোমাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। এখন যদি তুমি তোমার মত বদলে থাকো, তো সে কথা বলো!।

ব্লেক ব্যঙ্গভরে বললো, আচ্ছা—খুব কথা শিখেছো দেখছি। তার মানে, ক্যারাভ্যানে বসেই আমাদের খানাপিনা সারতে হচ্ছে? ব্যাপার কি। তোমাদের দাম্পত্য জীবনযাত্রায় অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলেই কি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছো?

কোনো জবাব না দিয়ে জিনি রান্নাঘরের দিকে ফিরে চললো।

কিটসন উঠে দাঁড়িয়ে, এড, সব সময়ে জিনির পেছনে লাগাটা আমি পছন্দ করি না।

ব্লেক খিঁচিয়ে উঠলো, থামো! আর সাফাই গাইতে হবে না। যাও, বাইরে গিয়ে দেখো, আশেপাশে লোকজন আছে কিনা। না থাকলে ক্যারাভ্যানের দরজাটা চটপট খুলে দেবে।

কিটসন বাইরে গিয়ে চারপাশে কাউকে দেখলো না। সে ব্লেককে ডেকেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যারাভ্যানের দরজাটা খুলে দিলো।

ক্ষিপ্রগতিতে ব্লেক আর জিপো ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকলো।

ব্লেকের চোখ চক্‌চক্‌ করলো, যাও, এবার মৌজ করো গিয়ে। তুমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

হাতলে চাপ দিয়ে কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলো। কিটসন কেবিনে ফিরে এলো।

তখন জিনি আরও কয়েকটা স্যান্ডউইচ তৈরী করছে।

কিটসন এসে কলঘরে ঢুকে, স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, নতুন পোষাক পরে বেরিয়ে এলো।

বসবার ঘরে এসে দেখলো, জিনি টেবিলের ওপর ডিম সেদ্ধ ও স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রেখেছে।

ওঃ—চমৎকার হয়েছে। কিন্তু কার জন্য তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার না আমার?

সকালে, আমার কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই। বলে একটা কাপ নিয়ে জিনি কিটসনের দিকে আংশিক পেছন ফিরে অদূরেই একটা আরাম কেদারায় বসলো।

কিটসন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। এমনিতেই সে ক্ষুধার্ত ছিলো, তার ওপর স্যান্ডউইচের সুবাস তাকে যেন পাগল করে তুললো, মনে মনে জিনির রান্নার প্রচুর তারিফও করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ভাবছি, একটু বেরোবো। কিটসন বললো, নৌকায় হ্রদটা চক্কর দেওয়া যাবে কি বলো?

হুঁ।

কিটসন জিনির সংক্ষিপ্ত উত্তরে হতাশ হলো।

ক্যারাভ্যানে ওদের খুব কষ্ট হবে। জিনির সঙ্গে কথা বলার প্রয়াস পেলো কিটসন, বাইরে তেমন ছায়াও নেই। দুপুরে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা গরম হয়ে পড়বে।

সে ওরা বুঝবে। নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিলো জিনি।

হ্যাঁ-তা ঠিক।...আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? জিপো ট্রাকের তালা খুলতে পারবে?

জিনি অধৈর্য ভঙ্গী করলো, আমি কি করে জানবো?

না-মানে, জিপো যদি না পারে তবে কি করবো?

সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? নিজে না পারো তবে ব্লেককে জিজ্ঞেস কর।

আচমকা উঠে পড়লো জিনি। কফির কাপ নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

কিটসন অনুভব করলো, তার চিন্তার ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎই খাওয়ার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেলো, কয়েক চুমুকে কফিটা শেষ করে সে কাপ-প্লেট নিয়ে এগোলো রান্নাঘরের দিকে।

কাপ-প্লেট রেখে কিটসন বলে জিনি, আমি বিরক্ত করতে চাইনি। তবে ভেবে দেখো, আমাদের

একটু ঘোরাফেরা করা দরকার। কারণ বোঝাতে হবে, আমরা হনিমুনে এসেছি। আমাদের সম্পর্কটাকে কয়েকদিনের জন্য ভুলে থাকা যায় না? বুঝতেই তো পারছো শুধু... আচমকা থেমে গেলো কিটসন।

জিনি কিটসনের দিকে পেছন ফিরে কেমন যেন কাঁপা গলায়, দোহাই তোমার। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। দয়া করে পাশের ঘরে যাও।

কিটসন জিনির কথায় দুঃখ পেয়ে ঘুরে এসে জিনির মুখোমুখি দাঁড়ালো। তখনই নজরে পড়লো জিনির পরিবর্তনটা। সজীবতার রেশটুকু মিলিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে গ্রীষ্মের আকাশের বিবর্ণতা। কিটসন ভাবলো—নাঃ। মেয়েটা নিজেকে যতোটা সমর্থ মনে করে ততোটা নয়। গতদিনের বীভৎস ঘটনাগুলো কিটসনকে যেমন করেছে ওর মনেও তেমনি বীভৎসভাবে আঘাত করেছে।

ঠিক আছে। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। বলে কিটসন বসবার ঘরে চলে গেলো।

কিটসন জিনির কান্না শুনতে পেলো। এ কাজের হতাশ পরিণতির ইঙ্গিতই যেন বয়ে নিয়ে এলো সেই হালকা, অস্ফুট কান্নার সুর। শেষ পর্যন্ত জিনিও তাহলে কাঁদছে? তাদের সাফল্যের আশা এখন সুদূর পরাহত।

নীরবে কিটসন ধূমপান করে চললো অস্বস্তিকর প্রতীক্ষায়। হঠাৎ একসময় জিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলো শোবার ঘরে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর জিনি এসে বললো, চলো, যাওয়া যাক।

কিটসন দেখলো জিনির সাজসজ্জায় কোথাও খুঁত নেই কিন্তু চোখের অস্বাভাবিকতা ওর অস্থির মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

কিটসন উঠে দাঁড়িয়ে, একটা খবরের কাগজ পেলে মন্দ হতো না।

হ্যাঁ, মনে হয় বাইরেই পাওয়া যাবে।

জিনি দরজায় দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পরনে একটা হাল্কা সোয়েটার এবং শ্যাওলা সবুজ স্ল্যাক্স। এই পোশাক ওর কমনীয় দেহ সৌন্দর্য যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছে। কিটসনের এই মুহূর্তে জিনিকে আরো বেশি ভালো লাগলো।

কেবিনের বাইরে আসতেই সূর্যের প্রখর তাপ ওদের শরীরে যেন আছড়ে পড়লো। ওরা ক্যারাভ্যানটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে অনুমান করার চেষ্টা করলো ক্যারাভ্যানের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

সামনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা সোজা হ্যাডফিল্ডের অফিসের দিকে চলে গেছে। তার অফিসের পাশেই আছে একটা মুদিখানার দোকান। জঙ্গলের ছায়াঘেরা অঞ্চল পার হয়ে ওরা যখন কাঠের অফিস বাড়িটার সামনে এলো, তখন জিনি কিটসনের হাত আঁকড়ে ধরলো। ওর ঠাণ্ডা স্পর্শে কিটসন চমকে জিনির দিকে তাকালো।

বিষণ্ণভাবে জিনি হাসতে চেষ্টা করলো, আমার ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করো না। মাঝে মাঝে আমার অমনি হয়। এখন বেশ আছি।

কিটসন জিনির নরম হাতে চাপ দিয়ে, না, না—ঠিক আছে। সত্যিই তো, কাল সারাটা দিন ধরে কম ধকল গেছে।

এমন সময় অফিস থেকে হ্যাডফিল্ড বেরিয়ে এলো। ওদের দেখেই আকর্ণ বিস্তৃত হেসে, এই যে মিঃ হ্যারিসন, কিটসনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলো হ্যাডফিল্ড, কেমন লাগছে জায়গাটা, বলুন...আমি বেশ বুঝতে পারছি মশায়, আপনি দারুণ সুখে আছেন। হুঁ—হুঁ—আপনি না বলতেই কি রকম ধরে ফেলেছি দেখলেন? আরে মশায়, আপনার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা আপনার খুব ভালো লেগেছে, আর তাছাড়া—মিসেস হ্যারিসনের মতো সুন্দরী স্ত্রী পেলে আপনি কেন, যে কোনো স্বামীই সারাটা জীবন সুখে কাটিয়ে দেবে—কি বলেন মিসেস হ্যারিসন?

প্রাণ খুলে হেসে উঠলো জিনি। কিটসন অস্বস্তিভরে হ্যাডফিল্ডের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রাখলো।

জিনি হাসতে হাসতেই বললো, আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ হ্যাডফিল্ড। এতো প্রশংসাও করতে পারেন আপনি... যাকগে, আমরা কিন্তু খবরের কাগজের খোঁজে এসেছিলাম। আছে নাকি?

ভুরুজোড়া ঊর্ধ্বমুখী হলো হ্যাডফিল্ডের, খবরের কাগজ? বলেন কি মিসেস? আজ পর্যন্ত কোনো

খদ্দেরকে আমি খবরের কাগজ খোঁজ করতে শুনিনি। কারণ মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসে কেউ বাইরের খবরে নজর দেয় না। তবে খবরের কাগজ আছে। আর আজকের সবচেয়ে জোর খবর ওই ট্রাক লুঠের ব্যাপারটা।

হ্যাডফিল্ড খবরের কাগজ আনতে গেলে জিনি ও কিটসন পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালো।

হ্যাডফিল্ড চারটে খবরের কাগজ নিয়ে এসে বললো, ভাবলাম, আপনারা হয়তো সবকটা কাগজই দেখতে চাইবেন—তাই নিয়ে এলাম। তবে হেরাল্ড-এ পাবেন সাচ্চা খবর।

রুদ্ধশ্বাসে কিটসন বললো। না, আমি সবকটা কাগজই নেবো। মানে—খবরগুলো। একটু যাচাই করে দেখবো আর কি।

সে হ্যাডফিল্ডকে কাগজের দাম মিটিয়ে দিলো।

জিনির শরীরের বিশেষ অংশের দিকে তাকিয়ে, আপনাদের কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো, মিসেস হ্যারিসন? কিছু করার থাকলে বলুন, আমি এখুনি—

না, তার কোনো প্রয়োজন নেই, মিঃ হ্যাডফিল্ড। আমাদের কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না।

কথা শেষ করে জিনি সামনের মুদী দোকানে গিয়ে ঢুকলো; আর কিটসন কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার জোরদার খবরগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলো।

বড় বড় হরফে প্রতিটি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ট্রাক লুঠের খবর ছাপানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ট্রাকটার ছবিও ছাপানো রয়েছে। এমন কি ডার্কসন ও টমাসের ছবিও। সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে ট্রাক উদ্ধার সম্পর্কিত খবরের জন্য এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিসের তরফ থেকে ট্রাকের ড্রাইভার টমাসকে লুঠেরাদের একজন বলে সন্দেহ করেছে। আর এই সন্দেহের কারণ টমাসের নিরুদ্দেশ হওয়া।

একমনে কিটসন কাগজ পড়ছিলো আর বুকের ভেতর দ্রিমি দ্রিমি শব্দ হচ্ছে—হঠাৎ ফ্রেড ব্র্যাড ফোর্ডের ডাকে তার চমক ভাঙলো। গতকাল এই ভদ্রলোকই তাকে চাকা পাল্টানোর কাজে সাহায্যে করতে চেয়েছিলো। সম্ভবতঃ সেও এ সময়ে খবরের কাগজের জন্যেই হ্যাডফিল্ডের অফিসে এসেছে।

এই যে—মিঃ হ্যারিসন। কেমন লাগছে এখানে? সুন্দর জায়গা। তাই না?... তা খবরের কাগজ এর মধ্যেও পেয়ে গেছেন দেখছি?

হ্যাঁ, এইমাত্র পেলাম।

আপনি নিশ্চয়ই ট্রাক লুঠের খবরটা পড়ছিলেন? আজ সকালেই আমি রেডিওতে পুরো ঘটনাটা শুনলাম। ওরা সন্দেহ করছে ট্রাকটাকে নিশ্চয়ই আশেপাশের কোনো জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই অনুসন্ধানী দল হেলিকপ্টারে করে সব রাস্তার ওপর নজর রাখছে—কিন্তু কোথায় কি? ট্রাকের কোন পাত্তাই নেই।

হুঁ, বলে কিটসন কাগজগুলো ভাঁজ করে ফেললো।

কিন্তু মিঃ হ্যারিসন। এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে ওরা ট্রাকটাকে লুকিয়ে রেখেছে? ড্রাইভার ব্যাটা নিশ্চয়ই ওদের লোক? আপনার কি মনে হয়?

হতে পারে।

কিন্তু রক্ষীটার কি দশা হলো দেখুন তো! কি নাম যেন লোকটার?...ওঃ, হ্যাঁ—ডার্কসন।...আমার মতে, ওয়েলিং কোম্পানীর তরফ থেকে ওর পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য করা উচিত।

হ্যাডফিল্ড মাথা নাড়লো। উঁহু—ট্রাকটা এখানকার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার মতো বোকামি ওরা করবে না। কারণ সময়ে অসময়ে, সব সময়েই ওই জঙ্গল দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে। হয়তো এখান থেকে আরো ওপরে ফক্স উডেই লুকিয়ে রেখেছে। ঐ রাস্তায় লোকজনের চলাচল অনেক কম, আর বড় রাস্তা থেকে অনেক দূরেও জায়গাটা।

কিন্তু খবরদার। ভুলেও আমার ছেলেকে এ সংবাদ দেবেন না, মশাই, শুনলেই সে হয়তো পাহাড় বেয়ে ফক্স উড পর্যন্তই ছুটবে, কি যে ভূত চেপেছে মাথায়...

জিনি জিনিসপত্র ভর্তি একটা প্যাকেট নিয়ে মুদী দোকান থেকে এলো।

ব্র্যাডফোর্ড টুপি খুলে জিনিকে অভিবাদন জানিয়ে, সুপ্রভাত, মিসেস হ্যারিসন। পথে আর কোনো

অসুবিধে হয় নি তো?

না। হাসলো জিনি। প্যাকেটটা কিটসনের হাতে দিয়ে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কিটসনের বাহু আঁকড়ে ধরলো। হ্রদে বেড়াবার জন্য নৌকো পাওয়া যাবে, মিঃ হ্যাডফিল্ড?

নিশ্চয়ই, কেন নয়। এই তো বেড়াবার সময়। একটু পরেই রোদের তাপ অসহ্য হয়ে উঠবে। আপনি তো জানেন কোথায় নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে চলে যান, জো আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।

আচ্ছা, তাহলে আমরা চলি।

ব্র্যাডফোর্ড বললো, দরকার মনে করলেই চলে আসবেন, মিসেস হ্যারিসন। কুড়ি নম্বর কেবিনে আমরা আছি। আপনাদের ঘর থেকে বড় জোর সিকি মাইল দূরে হবে। আপনাদের দেখলে মিলি খুব খুশী হবে।

হ্যাডফিল্ড ব্র্যাডফোর্ডকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে, আরে মশাই। আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? কোথায় ওনারা এসেছেন মধুচন্দ্রিমা কাটাতে, আর আপনি বলছেন কিনা আপনার ঘরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে?

জিনি হেসে কিটসনের হাত ধরে, কাঁধে মাথা রেখে এগিয়ে চললো।

ওদের দিকে একদৃষ্টে ব্র্যাডফোর্ড ও হ্যাডফিল্ড চেয়ে রইলো। না, জিনির মতো সুন্দরী স্ত্রী পেলে হ্যাডফিল্ড এই মুহূর্তেই কিটসনের সঙ্গে জায়গা বদল করতে রাজি।

জিনি ঘরে এসে রান্নাঘরে জিনিষপত্রের প্যাকেট নামিয়ে রাখলো। কিটসন অতি সন্তর্পণে বাইরে এসে ক্যারাভ্যানের পাশে দাঁড়ালো। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না দেখে জানলায় আস্তে আস্তে টোকা মারলো।

ব্লেক ঘর্মাক্ত মুখে জানলা খুলে, কি চাই? ওঃ, ভেতরে যা গরম, তার ওপর হতচ্ছাড়া মাছিগুলোর জ্বালায় একটু স্থির হয়ে কাজ করার জো নেই। তা—কি চাই তোমার?

কাগজগুলো জানলা দিয়ে ভেতরে গুঁজে কিটসন বললো, তোমাদের জন্য খবরের কাগজ এনেছি। আর কিছু দরকার থাকলে বলো।

না, কিছু দরকার নেই। যাও, কাটো। বলেই ব্লেক সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিলো।

সে দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালো—কেবিন থেকে নিয়ে আসা একটা টুলে বসে জিপো কাজ করছে। ট্রাকের দরজায় কান পেতে সে ইঙ্গিত শব্দের প্রতীক্ষা করছে।

অসহ্য গরম ক্যারাভ্যানের ভেতরে, ব্লেক বাধ্য হয়েই তার কোট, জামা সব খুলে ফেলেছে। তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে কাগজ পড়তে শুরু করলো।

প্রায় আধঘণ্টা পর কাগজ একপাশে ছুঁড়ে ফেলে উঠে ব্লেক জিপোর কাজ দেখতে লাগলো।

একাগ্র মনে চোখ বুঁজে জিপো পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে কান খাড়া করে শুনে চলেছে আর ঘুরিয়ে চলেছে কম্বিনেশন চাকতি।

বিরক্তিভরে ব্লেক বললো সেই তখন থেকে কি শুরু করেছো? তুমি কি মনে করেছো, টানা দশ ঘণ্টা ধরে শুধু এই করে যাবে?

জিপো চমকে রাগত কণ্ঠে, থামো। কানের কাছে এমনি বকবক করলে কি করে কাজ করবো বলতে পারো?

ব্লেক ঘাম মুছে, আমি আর এই বন্ধ ক্যারাভ্যানে থাকতে পারছি না। একটু হাওয়া না পেলে আমি মারা যাবো। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? জানলার পর্দাটাকে ক্যারাভ্যানের গায়ে সেঁটে যদি আমরা জানলাটাকে খুলে দিই? তাহলে হাওয়াও আসবে, আর মাছিও ঢুকতে পারবে না—।

যা করবার তুমিই কোরো। আমাকে দিয়ে যদি ট্রাকের তালা খোলাতে চাও, তাহলে আর বিরক্ত কোরো না।

আগুন ঝরা চোখে জিপোর দিকে তাকিয়ে ব্লেক যন্ত্রপাতি রাখার তাক থেকে একটা হাতুড়ি আর কিছু পেরেক বের করে পর্দাটাকে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে গেঁথে দিলো। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা খুললো।

অদূরে বিশাল হ্রদ, ব্লেক দেখলো জিনি ও কিটসন একটা নৌকোয় উঠছে। কিটসন বলিষ্ঠ হাতে

নৌকা চালিয়ে চললো। ঈর্ষায় ব্রেক চাপা আক্রোশে ফেটে পড়লো। শালা, খুব ফুর্তি লুটছে। ওর জায়গায় আজ আমারই থাকা উচিত ছিলো। ঐ যে, শালা জিনিকে নিয়ে মৌজ করছে।

জিপো কর্কশ স্বরে, তুমি কি দয়া করে একটু চুপ করবে। এভাবে বিরক্ত করলে কাজ করবো কিভাবে?

আচ্ছা, আচ্ছা বাবা—ঠিক আছে। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ো না।

স্থির চোখে কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে চেয়ে, জিপো ভাবলো এতক্ষণ ধরে পরিশ্রমই সার হয়েছে—কম্বিনেশনের একটা নম্বরও সে মেলাতে পারে নি। হয়তো এইভাবে দিনের পর দিন তাকে কম্বিনেশন চাকতি নিয়েই থাকতে হবে—হয়তো কোনদিনই এই ট্রাকের তালা সে খুলতে পারবে না।

নাঃ, এবারে একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। হাতের আঙুলগুলোয় যেন খিল ধরে গেছে।

জিপো জানালার সামনে এসে বাইরের বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বুকভরে শ্বাস নিলো। বায়ু চলাচলের ফলে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা স্বাভাবিক হয়েছে।

ব্রেক বললো, ঐ তালাটাকে অন্য কোনোভাবে খোলা যায় না?

ফ্র্যাঙ্ককে তো আমি আগেই বলেছিলাম। তালা খোলার কাজটা নেহাত সহজ হবে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি নাও খুলতে পারি।

ব্রেক জিপোর চোখে চোখ রাখলো। তাই নাকি? তবে আমার মনে হয় তালাটা খুললেই তুমি ভালো করবে। জিপো আমার কথা, তালা তোমাকে খুলতেই হবে।

জিপো যেন কুঁকড়ে গেলো, বিড়বিড় করে, আমি তো আর ম্যাজিক জানি না—! হয়তো এ তালা পৃথিবীর কারো পক্ষেই খোলা সম্ভব নয়।

ব্রেক হিংস্র স্বরে বললো, অন্ততঃ এই একটা ক্ষেত্রে তোমাকে ম্যাজিক দেখাতেই হবে। যাও, কাজ শুরু করো। যতো বেশি সময় কাজ করবে ততো তাড়াতাড়ি তালাটা খুলবে।

জিপো আবার গিয়ে ট্রাকের দরজার গায়ে কান চেপে ধরলো। তারপর সেই আগের মতো আবার কম্বিনেশন চাকতি ঘোরাতে লাগলো।

জিপো সন্ধ্যের আগেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। তালা খোলার আর কোনো চেষ্টাই করলো না।

জিপোর উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে ব্রেক চুপচাপ ভেতরে ভেতরে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

জিপো এই গরমে একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করেছে। মাঝখানে শুধু এক ঘণ্টা বিশ্রাম পেয়েছে। এখন পর্যন্ত সে কেবল একটিমাত্র নম্বর মেলাতে সক্ষম হয়েছে। তার অনুমান আরও পাঁচটা নম্বর তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তবু ভাল যে তার বারো ঘণ্টা পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায় নি। হয়তো আগামীকালই আরো দুটো নম্বর জিপো খুঁজে পাবে। হয়তো এ সপ্তাহেই ট্রাকের তালা খুলে যাবে।

একটু অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে দিলো। ওরা ক্ষিপ্রগতিতে কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ওদের খাবারের ব্যবস্থা জিনি করেই রেখেছিলো, ওরা খেতে শুরু করলো গোগ্রাসে। ব্রেক মাঝে মাঝে কিটসনের দিকে গম্ভীরভাবে দেখছিলো। সারাদিনের উত্তাপে কিটসনের মুখ তামাটে। তার মানে জিনিকে নিয়ে ও সারাটা দিন বাইরে কাটিয়েছে। ব্রেকের মনে ঈর্ষা ও ক্রোধে ভরে গেলো।

একমনে খেয়ে চললো জিপো। খাওয়ার শেষে ওর ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ মিলিয়ে আবার সুস্থ ও সতেজ হয়ে উঠলো।

ব্রেক খাওয়া শেষ করে একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো তিনজনকে, শোনো, আজ সামান্য কাজ এগোনো গেছে। জিপো একটা কম্বিনেশন নম্বর মেলাতে পেরেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন থেকে রাতেও ক্যারাভ্যানে পাহারায় থাকা দরকার। কেউ হয়তো অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে ক্যারাভ্যানের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দরজা খোলার চেষ্টা করতে পারে, সেটা আমি চাই না। কিটসন, এই রাতে পাহারা দেবার দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে। তোমার সারাদিনে কোনো কাজই থাকে না, সুতরাং রাতে এই সামান্য কষ্টটুকু তুমি সইতে পারবে।

কিটসন উপলব্ধি করলো, ব্রেকের কথায় যুক্তি আছে। রাতে কোনো চোর-ছ্যাচোড়ের মাথায় ক্যারাভ্যান লুঠ করার মতলব গজিয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক।

কিটসন উঠে দাঁড়ালো। ঠিক আছে। আমি তাহলে ক্যারাভ্যানেই যাচ্ছি।

ব্রেক ভীষণ অবাক হলো, প্রস্থানরত কিটসনের দিকে চেয়ে রইলো। কিটসন বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আজ সকালটা তার ভালোই কেটেছে। বাইরের লোকের সামনে অভিনয় হলেও সে জিনিকে অন্তরঙ্গভাবে কাছে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মনে ক্ষীণ আশাও জন্মেছে—জিনি কি তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে?

কিন্তু একেক সময় জিনির চোখে চেয়ে তার মনে হয়েছে এর সবটাই বুঝি অভিনয়—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু কিটসন তবু হাল ছাড়েনি। তার এখন একমাত্র নেশা জিনি গর্ডন।

জিনির দিকে তাকিয়ে ব্রেক বললো, আজ আমি আর জিপো বিছানায় শোবো, তুমি সোফায় শোবে। সারাদিন আমরা কম পরিশ্রম করি নি। সুতরাং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। তোমার তাতে আপত্তি না কি?

জিনি নির্লিপ্তভাবে, না—আপত্তি থাকবে কেন?

ব্রেক অচঞ্চল চোখে চেয়ে, অবশ্য জিপো যদি সোফায় শুতে চায়, তবে— .

ধন্যবাদ—তার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমি সোফাতেই শুতে পারবো। ব্রেকের ইঙ্গিত বুঝতে জিনির অসুবিধে হয় নি।

ব্রেক হেসে ঘরের তাকে রাখা এক প্যাকেট তাস নামিয়ে ভাঁজতে শুরু করলো। তোমার যা ইচ্ছে। কি, এক হাত তাস হবে নাকি?

না, আমি এখন একটু বাইরে হাঁটতে যাবো। কিন্তু ফিরে এসে যেন ঘরটা খালি পাই।

ব্রেক তখনও হাসছে। 'নিশ্চয়ই খালি পাবে। এই, জিপো, চলো আমরা শোবার ঘরে গিয়ে তাস খেলি। বিছানায় বসেই তাস পাতা যাবে—।

জিপো শোবার ঘরে চলে গেলো।

যাক, তোমার ঘর তাহলে খালি করে দিলাম, জিনি। কিন্তু আলেক্সের সঙ্গে দিন কিরকম কাটলো। শেষ পর্যন্ত কি ওর গলায় ঝুলেই পড়লে নাকি?

জিনি শান্তস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আমার সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কের কি সেই কথাই ছিলো?

না, তা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না। তোমার কোমল হৃদয়ের মধ্যে কখন কি ঘটে যায়। অবশ্য কিটসনকে পছন্দ করার মেয়ে আমেরিকায় খুব কমই আছে। তবে সে যে তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সদর দরজার দিকে জিনি এগোলো।

ব্রেক বললো, আমরা দুজনে জুটি বাঁধলে কেমন হয়। সুন্দরী? ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখলে হয় না?

তোমার মাথার ঠিক নেই। বলেই জিনি বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলো।

ব্রেকের মনে হলো এখুনি জিনির পেছনে ছুটে যায়। তার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলার পরিণতি যে ভালো নয়, সেটা ওকে সমঝে দেয়—কিন্তু তাহলে কিটসন ক্যারাভ্যান থেকে বেরিয়ে আসবে।

সুতরাং ব্রেক নিজেকে সংযত করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শোবার ঘরে এলো।

বিছানায় জিপো বসেছিলো। তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

ব্রেককে দেখেই সে বললো, এড, তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। একেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর মেয়ের ঝামেলা।

ওঃ, থামো দেখি, বলে বিছানায় বসে তাস বাঁটতে লাগলো।

জিনির ফিরে আসার শব্দ পেলো রাত এগারোটা নাগাদ। কলঘরে জল পড়ার শব্দ—সম্ভবতঃ জিনি স্নান করছে।

ব্রেক তাসগুলো প্যাকেটে ভরে ফেললো, এসো জিপো, এবার শোয়া যাক। কাল অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা ক্যারাভ্যানে ঢুকবো।

আলো নিভিয়ে দিতেই ক্লান্ত জিপো নাক ডাকতে শুরু করলো।

ব্রেক অন্ধকারে চোখ মেলে কান খাড়া করে জিনির নড়াচড়ার শব্দ শুনছে। মিনিট কয়েক পরেই বসবার ঘর থেকে আলো নেভানোর শব্দ পেলো।

নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি পদ্ধতিতেই ব্লেকের বিশ্বাস। তার মতে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা সময়ের অপব্যবহারের নামান্তর। সুতরাং—

সুতরাং গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে ব্লেক উঠে বসলো। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে গেলো। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বসবার ঘরে গিয়ে ব্লেক আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। জিনি সোফায় উঠে বসলো। ওর পরনের ফিকে নীল রাত্রিবাস ব্লেকের কামনাকে আরো দুর্দম করে তুললো। সে একগাল হেসে সোফার কাছে গিয়ে, ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে, আসি। দেখি—সরে বসো একটু।

জিনি স্থিরভাবে বসে চাপা স্বরে আদেশ করলো বেরিয়ে যাও।

ওহ্-হো—তুমি দেখছি এখনো আমার ওপর রেগে আছো? কিন্তু জানো তোমার জন্যে আমি কতো কি ভেবে রেখেছি? লক্ষ্মীটি জিনি, একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো—। নিজেদের ভাগের টাকা পেয়ে গেলে আমরা দেশ-বিদেশে ঘুরবো। তোমাকে প্যারিসে, লন্ডনে নিয়ে যাবো। তুমি কি আমার সঙ্গী হতে রাজি নও?

জিনি আবার বললো, 'আমি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।

না, তেমন করে না বললে তুমি শুনবে না দেখছি—ব্লেক জিনিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতেই অনুভব করলো, তার বুকে কোনো ধাতব বস্তুর কঠিন পরশ।

পলকের মধ্যেই জিনি তার বুকে একটা ৩৮ চেপে ধরেছে।

জিনি ইস্পাত শীতল স্বরে আদেশ করলো, আস্তে আস্তে তোমার হাত সরিয়ে নাও। খুব ধীরে ধীরে হাত সরাবে—নয়তো একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবো।

ব্লেক অতি ধীরে জিনির শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিলো। আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। কেন যেন তার মনে হলো জিনি সত্যি সত্যি তাকে নৃশংসভাবে খুন করতে পারে। ব্লেক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত তুললো। চোখের দৃষ্টি ৩৮-এর নলের ওপর।

এবার উঠে দাঁড়াও। আস্তে আস্তে—হাত দুটো মাথা থেকে নামাবে না।

ব্লেক পায়ে পায়ে পেছোতে লাগলো।

জিনি রিভলবারটা ব্লেকের বুক লক্ষ্য করে ধরে। বেরোও ঘর থেকে। যদি দ্বিতীয় দিন এরকম সুযোগ নেবার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো। এবার নিজের ঘরে কেটে পড়ো, দরজার বাইরে আর এসো না।

আচ্ছা, সুন্দরী। তোমাকে আমি দেখে নেবো। এখন থেকে সাবধানে থেকো। এডওয়ার্ড ব্লেক কখনো অপমানের বদলা নিতে ছাড়ে না।

জিনি ব্যঙ্গসুরে বললো, থাক, থাক—অনেক হয়েছে। এখন রাস্তা দেখুন, শ্রী যুক্ত বাবু। এরপর থেকে প্রস্তুত হয়ে অভিসারে আসবেন।

ব্লেক শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। রাগে অপমানে তার সর্বশরীর কাঁপছে।

জিনি যদি ভেবে থাকে যে ওর ভাগের দু-লাখ ডলার ওকে দেওয়া হবে, তাহলে ভীষণ ভুল করবে। জিনিকে সে উচিত শিক্ষা দেবে। তাকে বন্দুক দেখানোর যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম সেটা সে হাড়ে হাড়ে সমঝে দেবে।

ব্লেক কিটসনকেও ছাড়বে না। জিনি আর কিটসনকে সে এমন দাওয়াই দেবে যা ওরা জীবনে ভুলবে না।

দশ লাখ ডলার যখন হাতে আসবে, তখন সে কিটসনকে গুলি করে শেষ করবে। আর জিনি? জিনির জন্য তার অন্য মতলব আছে।

অন্ধকারের মধ্যে ব্লেক হিংস্রভাবে হেসে উঠলো।

আড়াই লাখ ডলারের চেয়ে সাড়ে সাত লাখ ডলারের আবেদন যে কোনো মানুষের কাছেই অনেক বেশি, ব্লেকের কাছে তো গোটা সাম্রাজ্য।

ব্লেক শুয়ে শুয়ে ভাবলো টাকাটা নিয়ে সে কিভাবে খরচ করবে।

একসময় আরো একটা অদ্ভুত চিন্তা ব্লেকের মাথায় এলো। জিপোকেও যদি সে সরিয়ে দেয়,

তাহলে কেমন হয়? তখন পুরো টাকাটাই সে একা ভোগ করবে।

দশ লাখ সাড়ে সাত লাখের চেয়েও অনেক বেশি। ফ্র্যাঙ্ক বলেছিলো, পৃথিবীকে সে হাতের মুঠোয় রাখবে।

হুঁ...দশ লাখ ডলার থাকলে এই পৃথিবীটাকে সে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচতে পারবে। সে সহজেই হতে পারে এই পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট।

।। নয় ।।

একইভাবে পরবর্তী দুটো দিন কেটে গেলো। প্রতিদিন খুব ভোরে ব্লেক আর জিপো ক্যারাভ্যানে চলে যায়। আর কিটসন কেবিনে ফিরে আসে। ঘণ্টাকয়েক বিশ্রামের পর সে আর জিনি কেবিনের বাইরে বেরিয়ে পড়ে—তাদের দৈনন্দিন অভিনয় পর্বকে বাস্তবানুগ করে তুলতে তারা হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়ায় হ্রদের ধারে। নৌকো করে ভেসে বেড়ায় হ্রদের নীল জলে। অথবা সাঁতারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

ট্রাকের দরজার পেছনে জিপো সারাটা দিন লেগে থাকে। আর সেই সময়টা ব্লেক খবরের কাগজ পড়েই কাটিয়ে দেয়।

ব্লেকের মনে দৈনন্দিন খবরগুলো রীতিমত আশার উদ্রেক করলো। কারণ পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা উধাও ট্রাকটাকে খুঁজতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অবশ্য তারা অনুসন্ধানে এখনও ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু কাগজওয়ালাদের কাছে পুলিসের বক্তব্যে হতাশার সুরটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ট্রাকটাকে অন্য কোনো গাড়িতে উঠিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

দুশো সৈনিক ও পুলিস মিলে ফক্স উডকে চিরুনির মত আঁচড়ে দেখছে ট্রাকের হদিস পাওয়ার আশায়। তাছাড়া রাস্তায় রাস্তায় শ্যেনচক্ষু মেলে উড়ন্ত হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে।

সৈন্যবাহিনীরা আজ হোক কাল হোক ট্রাকটা খুঁজে বের করবেই। কারণ ট্রাকটা যেভাবে অদৃশ্য হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত হয়ে আছে তা বস্তুগতভাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী যে হারে পরিশ্রম করে চলেছে, সেই একইভাবে ব্লেক ও জিপো পরিশ্রম করে চলেছে—ক্যারাভ্যানের ভেতর, লোকচক্ষুর আড়ালে।

জিপোর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে গত দুদিন ধরে।

সে সারাদিন ক্যারাভ্যানের বদ্ধ আবহাওয়ায়, অসহ্য গরমে ধৈর্য ধরে কাজ করেছে। মাঝে মাঝে জিপো বিরক্তিভরে ট্রাকের তালাকে অভিসম্পাত করেছে। কিন্তু কম্বিনেশনের দ্বিতীয় নম্বরটা তার অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

খবরের কাগজ পড়া আর জিপোর কার্যকলাপ লক্ষ্য করা ছাড়া ব্লেকের আর কোনো কাজই ছিলো না। ক্যারাভ্যানের প্রচণ্ড গরম, তালা খোলার সমস্যা—ইত্যাদি চিন্তায় ব্লেকের স্নায়ুমণ্ডলী একেবারেই ভারাক্রান্ত, তার ওপর জিনি আর কিটসনের কথা মনে হতেই সে ক্রোধে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এখানে তারা গলদঘর্ম হচ্ছে আর কিটসন জিনিকে নিয়ে মজা লুটছে।

এ কদিনে কিটসন জিনির মনের ওপর একটা ছাপ রাখতে পেরেছে বলেই ব্লেকের ধারণা কারণ তিন-তিনটে দিন পেয়ে কোনো মানুষই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। ব্লেক বারো ঘণ্টাও সময় যদি পেতো, তাহলে ঐ সময়ে জিনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতো। এর মধ্যে জিনি আর কিটসনের ভাবনা তার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুললো।

তৃতীয় দিন ছটা নাগাদ জিপো ভেঙে পড়লো। অপরাহ্নের সূর্য পর্বত শ্রেণীর আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে। সেই সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো জিপো।

তিনদিন এই পরিবেশে জিপো কাজ করে গেছে। এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করলো, সে পরাস্ত হয়েছে। অনেক কিছু করেও দ্বিতীয় নম্বরটা মেলে নি। কারণ জিপোর তীক্ষ্ণ কানে নম্বর মেলার ধাতব শব্দটা ধরা পড়ে নি। অর্থাৎ চাকতিটা সতর্ক হাতে ঘোরাতে পারেনি। অর্থাৎ দক্ষ হাতজোড়া গর্বের বস্তু ছিলো, কিন্তু চাকতিকে তেমন ঘোরাতে পারেনি।

না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়! হঠাৎই চিৎকার করে উঠেছে জিপো। ট্রাকের দরজার গায়ে অবসন্নভাবে গা এলিয়ে। এ তালা খোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এড! এভাবে বেগার খেটে কোন লাভ নেই। বিশ

বছর ধরে চেষ্টা করলেও আমি এ ট্রাকের দরজা খুলতে পারবো না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

অপ্রকৃতিস্থ কণ্ঠস্বরে জিপোর অবস্থা দেখে ব্লেক চঞ্চল হয়ে রিভলবার নিয়ে জিপোর দিকে এগিয়ে গেলো।

জিপোর পাঁজরে রিভলবারের নলটা চেপে ধরে ব্লেক, থামো। যদি এই ট্রাকের তালা তুমি না খোলো, তাহলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।

অসহায়ভাবে জিপো কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার স্থূল দেহ কান্নায় কেঁপে উঠতে লাগলো।

তাই করো। আমাকে খুন করো। তুমি কি ভেবেছো মরতে আমি ভয় পাই? কিন্তু এই শালার ট্রাকের তালা তুমি আমাকে খুলতে বোলো না। তার চেয়ে আমাকে মেরেই ফেলো, আমি আর পারছি না।

ব্লেক রিভলবারের নল দিয়ে নৃশংসভাবে জিপোকে আঘাত করলো—সরাসরি মুখের ওপর। জিপো মেঝেতে ছিটকে পড়লো। তার গাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। ট্রাকের পাশেই অবসন্নভাবে সে পড়ে রইলো—যন্ত্রণায় চোখ দুটো বোজা।

জিপো রক্তাক্ত বীভৎস মুখে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আতঙ্কে আর্তনাদ করলো, মেরে ফেলো, শেষ করে দাও আমাকে। আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না।

থাম বলছি, শালা কুত্তীর বাচ্চা। নয়তো গলা টিপে তোকে শেষ করে দেবো। ব্লেক মরিয়া হয়ে চিৎকার করলো। জিপোর অবস্থা দেখে সে চিন্তিত। সত্যিই যদি জিপো শাসনের বাইরে চলে যায়। তাহলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। তাছাড়া চেঁচামেচির শব্দ বাইরে লোকের কানেও যেতে পারে।

জিপো আবার কান্নাভেজা স্বরে আকুতি জানালো, আমি আবারও বলছি, এড, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। এ তালা আমি খুলতে পারবো না।

ঠিক তখুনি ক্যারাভ্যানের দরজায় কে যেন টোকা মারলো, একবার...দুবার। ব্লেকের হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠলো, কে এলো এই অসময়ে?

জিনি আর কিটসনকে সে বুইক নিয়ে শহরের দিকে যেতে দেখেছে—কিছু কেনাকাটা করতে। না, বর্তমান আগন্তুক যে ওদের দুজনের কেউ নয়, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাহলে...?

জিপো আবার তার গোঙানি শুরু করতেই ব্লেক হাত চেপে ধরে হিংস্র ফিসফিস স্বরে ধমকে উঠলো। চুপ করো! ক্যারাভ্যানের দরজায় কেউ এসেছে।

আতঙ্কে জিপো কুঁকড়ে চুপ হয়ে গেলো।

দুজন নিশ্চল, শুধু কান খাড়া করে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় রইলো।

টোকা মারার শব্দ আবার শোনা গেলো।

ব্লেক হাতের ইশারায় জিপোকে তার জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। তারপর রিভলবার চেপে ধরে পা টিপে টিপে পর্দা ঢাকা জানলায় গিয়ে অতি সন্তর্পণে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো।

ক্যারাভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে।

সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে ক্যারাভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই টোকা মেরে চলেছে সে। তার হাতে একটা খেলনা পিস্তল, দরজার দিকে তাক করা।

ক্রুরদৃষ্টিতে ব্লেক ছেলেটাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

ছেলেটার পরনে সূতীর প্যান্ট, আর সাদা লাল ডোরাকাটা একটা জামা। পায়ে কিছুই নেই। মাথায় একটা ভাঙাচোরা শোলার টুপি। কৌতূহলভরা স্থির চোখে ছেলেটা ক্যারাভ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তারপর ছেলেটা দরজার আরো কাছে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে জানলার চৌকাঠ চেপে ধরলো। সে শরীরটাকে জানলা পর্যন্ত তুলতে চেষ্টা করলো ক্যারাভ্যানের ভেতরটা দেখার আশায়।

ব্লেককে ভয়ার্ত ও হিংস্র দেখে, বিপদের আশংকায় জিপো এগিয়ে এলো। সে ছেলেটাকে দেখেই যেন আঁতকে উঠলো। তার হাত সজোরে আঁকড়ে ধরলো ব্লেকের রিভলবার ধরা হাতটা।

জিপো ফিসফিসিয়ে, না! একটা বাচ্চাকে তুমি গুলি করতে যাচ্ছো? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?

ব্লেক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো। ছেলেটাকে উঠতে না পেরে মাটিতে নেমে

পড়তে দেখে সে হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

ছেলেটা হঠাৎ ঘুরে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে হ্রদের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগলো।

ব্রেক উদগ্রীব স্বরে, তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে?

কি জানি।

ওঃ, আমি তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। জিপো তুমি এখানে এসে একটু বিশ্রাম নাও, আমি বরং তালাটা খোলার চেষ্টা করি।

অবিশ্বাস্য বিরক্তিতে জিপো মুখ বিকৃত করে, তুমি খুলবে তালা? খবরদার ঐ তালায় তুমি হাত দেবে না। কাজের কাজ তো কিছুই পারবে না। উল্টে যে নম্বরটা মিলিয়েছি সেটাকেও নষ্ট করে দেবে।

ব্রেক রাগে চেঁচিয়ে উঠলো, তুমিও খুলবে না। আমাকেও খুলতে দেবে না, তাহলে তালাটা খুলবে কে?

'তুমি কি এখনও বুঝতে পারছো না, এড? এ তালা আমরা কোনদিনই খুলতে পারবো না। গত তিন দিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছি। কিন্তু তাতে লাভ কি হলো? শুধু একটা নম্বর মিললো এখনও আমাকে পাঁচটা নম্বর খুঁজে বের করতে হবে। আমি ততদিনে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবো।

এই গরমে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়ই। অতএব আমাকে বিদায় দাও, এড। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এই অমানুষিক পরিশ্রমের মূল্য, টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।

আঃ, থামো। তুমি কি সব আবোল তাবোল বকছো!

কিন্তু ব্রেক বুঝলো যে জিপোর কথায় যুক্তি আছে। এই উত্তপ্ত পরিবেশে তিন-চার সপ্তাহ কাটানোর কথা চিন্তা করা যায় না।

হতাশ হয়ে জিপো যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে নিরাশ চোখে কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে চেয়ে রইলো।

ব্রেক বললো, দরজাটাকে কেটে ফেলা যায় না?

এই ক্যারাভ্যানে বসে? অসম্ভব। লোকেরা বাইরে থেকে অ্যাসিটিলিন টর্চের আলো দেখতে পাবে। তাছাড়া কি রকম গরম হবে একবার ভেবে দেখেছো? আর ক্যারাভ্যানে আগুন লাগবার ভয় তো আছেই।

আচ্ছা, ক্যারাভ্যানটাকে যদি পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাওয়া যায়? ফ্র্যাঙ্ক বলছিলো, প্রয়োজন হলে ক্যারাভ্যানটাকে আমরা পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাবো। মনে হচ্ছে এখন এ ছাড়া আর উপায় নেই। সেখানে তুমি ক্যারাভ্যানের দরজা খোলা রেখেই নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। কি বলো?

জিপো রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো, 'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। অর্থ নয়। এবার আমি বাড়ি ফিরতে চাই। এ হতচ্ছাড়া তালাকে কেউই শায়েস্তা করতে পারবে না।

ব্রেক শ্লেষের সুরে, ঠিক আছে। ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক। কিন্তু তোমার সাহস গেলো কোথায়? এই ট্রাকের ভেতরে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার। একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জিপো।

জিপোর গলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো, ঢের ভেবে দেখেছি। দশ লাখ কেন, দশ কোটি হলেও এর মধ্যে আমি আর নেই। বার বার তো বলছি, তুমি কি সহজ কথাও বোঝো না?

নামো, অনেক হয়েছে। আগে ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

ওদিকে জিনি আর কিটসন কেনাকাটা করে বুইক চালিয়ে ফিরছে। ওরা জানে না ক্যারাভ্যানের নাটকের কথা।

স্থানীয় দোকান থেকে খাবার জিনিসপত্র কেনায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জিনি বুঝতে পেরেছিলো কারণ দোকানদার খাবারের পরিমাণ দেখেই বুঝবে এ খাবার স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তখন হয়তো ব্রেক ও জিপোর উপস্থিতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাই ওরা ঠিক করেছিলো, রোজকার কেনাকাটা ওরা শহরে গিয়েই নিশ্চিন্তে সেরে আসবে।

কিটসন ও জিনি গত দুদিন ধরে পরস্পরকে সঙ্গদান করেছে এবং মনের কাছাকাছি এসেছে।

নিজের অংশের টাকা পাওয়ার পর ও কিটসনের সঙ্গিনী হবে কিনা, এ নিয়ে জিনি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে। ও জানে কিটসন ওকে ভালবাসে। ক্রমে জিনিও কিটসনকে ভালবাসতে লেগেছে। কারণ ব্রেকের মতো কিটসনের ব্যবহার রুক্ষ বা অভদ্র নয়। বরং কিটসনের সান্নিধ্য ওকে দেয় নিরাপত্তার

ইঙ্গিত।

ফন হ্রদ অভিমুখে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে। জিনি থেকে থেকেই আড়চোখে কিটসনকে দেখছে। ওর হঠাৎই ভীষণ ইচ্ছে হলো আলেক্সকে সব কথা খুলে বলে, যে কথা সে বারবারই জানতে চেয়েছে, কিন্তু জবাব পায় নি।

আলেক্স...

জিনির দিকে এক পলক তাকিয়ে কিটসন সামনের রাস্তায় চোখ রাখলো।

কি ব্যাপার? কিছু বলবে?

হ্যাঁ—একদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে কি করে এই ট্রাকের খবর আমি পেলাম, তাইতো?

হ্যাঁ।

তুমি কি এখনও তা জানতে চাও, আলেক্স?

আমতা আমতা করে কিটসন জবাব দিলো, না—মানে আমার এমনিই মনে হয়েছিলো। তাছাড়া তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত হয়নি।...কিন্তু এখন আবার তোমার একথা মনে হলো কেন?

তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছো আলেক্স। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে আমার কাছে অসহ্য বিরক্তিকর হয়ে উঠতো। কিন্তু তোমার মার্জিত ভদ্র ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আমার সব কথা আমি তোমাকে খুলে বলতে চাই।...আলেক্স, এর আগে আমি অন্য কোনো দলের হয়ে কখনো কাজ করিনি—

কিটসন মাথা নাড়লো, আমি তো কখনো তা ভাবিনি।

তুমি ভাবোনি। কিন্তু মরগ্যান ভাবতো। সে ভাবতো, আমি অন্য কোনো দলের কাছ থেকে ট্রাক লুঠের মতলবটা চুরি করে বেশি বখরার লোভে তোমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছি। সে মুখে কখনো কিছু প্রকাশ না করলেও আমি জানতাম মরগ্যান আমাকে কি ভাবছে।

কিটসন অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসলো। কারণ সে জানে জিনির ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্যি। সত্যিই মরগ্যান তাই ভাবতো।

কি জানি। হতে পারে। তবে আমি কখনো ভাবিনি। তুমি আগে অন্য দলের হয়ে কাজ করেছো?

আমি ঐ ট্রাক এবং দশ লক্ষ ডলারের কথা জানতে পারি আমার বাবার কাছে। আমার বাবা ছিলেন রিসার্চ স্টেশনের প্রহরী।

কিটসন জিনির দিকে ফিরে, তাই না কি? তবে তো সবই তোমার জানা থাকার কথা।

মনে কোরো না আমি নিজেকে সতী সাধ্বী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আমার মায়ের স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিলো না। তার কিছু কিছু দোষ আমিও যে পাইনি তা নয়। আমার বয়স দশ বছর যখন, মা তখন বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। মা সর্বদাই আমাকে বলতো, টাকা ছাড়া দুনিয়া ফাঁকা।

কিটসন গাড়ির গতি কমিয়ে একমনে জিনির কথা শুনছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় গোলাকার রক্তাক্ত সূর্য যেন শেষবারের মতো খুশীর আবীর ওদের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আগ্রহের সুরে কিটসন, শোনো, জিনি। তুমি আর আমি এ কাজ ছেড়ে দেবো। কি, রাজি? আমরা মেক্সিকোয় চলে যাবো। এখনো বাঁচার সময় আছে, জিনি। একবার ভেবে দেখো—

না। এখন আর তা হয় না। টমাস ও ডার্কসনকে খুন করার আগে এ কথা ভাবা উচিত ছিলো। ভাবা উচিত ছিলো মরগ্যান মারা যাবার আগে। এখন এর শেষ দেখা ছাড়া আমার উপায় নেই, আলেক্স। কিন্তু ইচ্ছে হলে তুমি ছেড়ে দিতে পারো। তুমি ছেড়ে দিলে আমি অন্তত খুশী হবো। আমার জন্য তুমি ভেবো না। আমার মনে হয় দশ লাখ ডলার পাওয়ার আশা এখনো নিঃশেষিত হয় নি। তাছাড়া, আমি এখন চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। এর চেয়ে বেশি ক্ষতি আমার আর কিই বা হবে? কিন্তু তুমি ছেড়ে দাও, আলেক্স। তুমি কেন এর মধ্যে এলে? তুমি তো মন থেকে এ কাজে সায় দাও নি। আমি জানি তুমি কেন আমাদের হয়ে ভোট দিলে, আলেক্স?

একমাত্র তোমার জন্য। যবে থেকে তোমাকে দেখেছি, আমি আমার মন-প্রাণ সব হারিয়ে বসে আছি।

আলেক্স। আমি দুঃখিত।...দুঃখিত।

আচ্ছা জিনি, টাকাটা পাওয়ার পর আমরা পরস্পরের সঙ্গী হলে কেমন হয়? একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো কিটসন, আমি তোমাকে—ভালোবাসি, জিনি। তোমার আগে কোনোদিন এমন করে ভালো লাগেনি।

কি জানি...হয়তো তাই। যে কোনো জটিলতাকে আমি ভয় করি। তুমি যদি আমাকে কয়েকদিন সময় দাও, তাহলে ভাল হয়। কিটসনের আনন্দ আর বাঁধ মানতে চাইছে না।

তার মানে—তার মানে, তুমি...

হ্যাঁ, আলেক্স— কিটসনের হাত হাতে বোলালো জিনি, আমাকে ভাববার সময় দাও।

খুশীতে তার মন ধরে না, জিনি যে তার প্রস্তাবে সম্মত হবে ভাবতে পারেনি।

একেবারে নির্জন হ্রদের কাছটা। সুতরাং ব্লেক ও জিপোর বাইরে আসার কোনো ভয় নেই।

ক্যারাভ্যান থেকে দুজন বেরোলো, কিটসন বুঝলো কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। দেখলো তার ডান গালে লম্বা ক্ষত ; এবং অল্প রক্ত বেরোচ্ছে।

কিটসন জানতে চাইলে, জিপো জবাব দিলো না। কেবিনে ঢুকে ধপ করে বসে পড়লো।

বিষণ্ণ মুখে ব্লেক সোফায় গিয়ে বসলো। চোখে কুৎসিত দ্যুতি। হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গেলাস তুলে নিলো সে। কিছুটা খাওয়ার পর গা এলিয়ে দিলো সোফায়।

ক্যারাভ্যানের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে ঘুরঘুর করছিলো, ব্লেক কিটসনকে বললো। কিটসন কেবিনের দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিচ্ছে, ছোঁড়াটা ভেতরটাও দেখবার চেষ্টা করছিলো।

প্রশ্ন করলো জিনি, কিন্তু ট্রাকের তালার কি হলো?

কিছু হয় নি। জিনির দিকে তাকিয়ে বলে চললো সে, দ্বিতীয় কম্বিনেশন নম্বরটা মেলার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জিপোও প্রকৃতিস্থ নেই।

প্রকৃতিস্থ? জিপো চিৎকার করে উঠলো। আমি এসব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাচ্ছি! এ তালা খোলা আমার কর্ম নয়! তোমার কানে ঢুকেছে? আমি এর মধ্যে নেই!

জবাব দিলো জিনি, এখন আর তা হয় না, জিপো।...কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো?'

এই প্রচণ্ড গরমে ক্যারাভ্যানের ভেতরে কাজ করা সাধ্য নয়। কি যে গরম তা তুমি বুঝতে পারবে না। তিনদিন ধরে ঐ তালার পেছনে লেগে আছি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। সুতরাং এর পিছনে আমি আর নেই।

ফ্রাঙ্ককে তুমি বলেছিলে তালাটা খুলতে মাসখানেক লাগবে। কিন্তু তিনদিনের চেষ্টায় তুমি হাল ছেড়ে দিতে চাও?

যাকগে, ওকে ঘাঁটিয়ো না। জিনিকে বললো ব্লেক, সকাল থেকে একই কথা নিয়ে বকর বকর করে আমি হন্যে হয়ে গেছি। তবে সত্যি ক্যারাভ্যানের ভেতর বীভৎস গরম—ঐ গরমে কাজ করা যায় না। মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়তো ফ্র্যাঙ্কের কথামতো আমাদের পাহাড়ের দিকে যেতে হবে। ঐ নির্জন জায়গায় ক্যারাভ্যানের পেছনটা খোলা রেখেই কাজ করতে পারবো। নইলে এভাবে কাজ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

চিন্তিতমনে জিনি বললো, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে ওঠাতে বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর। এখানে কয়েক শো ক্যারাভ্যানের মধ্যে অতি সহজেই আমরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ঐ নির্জন পাহাড়ী এলাকায় আমাদের সন্দেহ করতে বাধ্য।

অধৈর্যভাবে ব্লেক বললো, কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আমাদের আর তো উপায় নেই। জিপো যদি একান্তই ঐ তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে—এবং সেটা এই ফন হ্রদ এলাকায় বসে করা সম্ভব নয়।

কিটসন অস্বস্তিভরে বললো, পুলিশ এখনো প্রতিটি রাস্তায় টহল দিচ্ছে। রাস্তায় তারা আমাদের বাধা দিতে পারে এড। তাছাড়া আরো একটা অসুবিধে আছে। বুইকটা অতো ভারী ক্যারাভ্যানটাকে নিয়ে পাহাড়ী রাস্তায় উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। ঢালু তো আছেই তার ওপর এবড়ো থেবড়ো—কিছুদিন আগে রাস্তার কিছু অংশ ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে বলে শুনেছি।

আমাদের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, আলেক্স। এ ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আগামীকাল দুপুরে যদি আমরা রওনা হই তাহলে সন্ধ্যে নাগাদ আমরা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছে যাবো। কিন্তু আমাদের একটা

তাঁবু ও কিছু খাবারের প্রয়োজন। অর্থাৎ জিপো ট্রাকের তালা না খোলা পর্যন্ত আমাদের বেশ কষ্ট করেই দিন কাটাতে হবে।

জিপো ভয়ঙ্কর স্বরে, আমি থাকছি না, এড। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ব্রেক, এমন সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গেলো।

উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতার পর রিভলবার উঁচিয়ে ধরে ব্রেক আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

বিবর্ণমুখে জিপো সামনে ঝুঁকে কিছু দেখতে চেষ্টা করলো।

চাপা উত্তেজিত স্বরে ফিসফিসিয়ে জিনি, লুকিয়ে পড়ো। যাও, শীগগির তোমরা শোবার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো।

জিপোর হাত ধরে টেনে ব্রেক শোবার ঘরে নিয়ে গেল। কিটসন দুরুদুরু বুকে কেবিনের দরজা খুললো।

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

এই যে, মিঃ হ্যারিসন। অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে মাপ চাইছি। মিসেস হ্যারিসন কোথায়? রান্নাঘরে বুঝি?

কিটসন দরজাটা পুরোপুরি আগলে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

সামান্যই। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি। বেশিক্ষণ আপনাকে আটকাবো না।

জিনি কিটসনকে ইতস্ততঃ করতে দেখে এগিয়ে এসে, 'আরে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড যে! হঠাৎ কি মনে করে?...আসুন—ভেতরে আসুন। হেসে ব্র্যাডফোর্ডকে অভ্যর্থনা জানালো জিনি।

ঘরে এসে ঢুকলো ব্র্যাডফোর্ড। তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো।

কি খাবেন? হুইস্কি না জিন?

ধন্যবাদ। এখনই ঠিক ভালো লাগছে না। ব্রাডফোর্ড বসলো। শুধু-শুধু আপনাদের দেরি করাবো না, মিঃ হ্যারিসন। আমার ছেলে বিকেলে হ্রদের কাছে ঘোরাফেরা করছিলো। ও বলছে, আপনাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরে নাকি দুজন লোক ছিল। সে তাকালো জিনির দিকে। ব্র্যাডফোর্ডের কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না।

জিনি জবাব দিলো, হাসলো ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে, তারা পরিচিত লোক, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। আমরা বলেছিলাম ; ছুটি কাটানোর জন্য ক্যারাভ্যানটা তাদের ব্যবহার করতে দেবো। হয়তো আমরা যখন বাইরে ছিলাম, তখন হয়তো এসেছিলো ক্যারাভ্যানটা ঘুরেফিরে দেখতে।

সংশয়ের ছায়াটা মিলিয়ে গেলো ব্র্যাডফোর্ডের। আমি তাই বলছিলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছে, লোক দুটো চিৎকার করে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিলো। বাচ্চা তো, তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ও ভেবেছে কোনো ডাকাত-টাকাত হবে।

হাসলো জিনি, না, ডাকাত না হলেও ঐ দুজনের স্বভাব-চরিত্র তেমন ভালো নয়। আমি তো ওদের একটুও বিশ্বাস করি না। দিনরাতই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে!...কিন্তু বেড়াতে যাবার সময় দুজনেই হরিহর আত্মা!

কিন্তু আমার ছেলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাই ভাবলাম ব্যাপারটা জানিয়েই যাই। বলা যায় না কী হয়ে যায় ; জানেন, এই হ্রদে বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয়েছে! যখন পরিচিত লোক বলছেন, তখন আর...

চিন্তার কিছু নেই।

না, না, ব্যস্ত হবেন না। ভুরু কোঁচকালো ব্র্যাডফোর্ড, যাক, আপনাদের সময় নষ্ট করবো না, মিসেস হ্যারিসন, এখন চলি। বাচ্চা ছেলে তো, সব কিছুতেই রহস্যের গন্ধ পায়। এই যে কাগজে ট্রাক লোপাটের খবর দিয়েছে, সেটা পড়ে কি ভাবছে জানেন? বলছে, ট্রাকটা কোথায় লুকানো আছে তা ও ধরে ফেলেছে। ট্রাকটাকে নাকি লুঠেরা ক্যারাভ্যানে লুকিয়ে রেখেছে...বুঝুন কাণ্ড! হাঃ—হাঃ—হাঃ—।

এই কথা শুনে কিটসনের মাথায় যেন বাজ পড়লো। সে চটপট টান হয়ে দাঁড়ালো।

সে বলে উঠলো, এমন ধারণা তার কেমন করে হলো? তবে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড, আপনার ছেলের কল্পনা-শক্তির তুলনা নেই!

তা সত্যি বলেছেন। ও আমাকে বলছে, পুলিশের কাছে গিয়ে জানাতে। ও ভাবছে, যদি ট্রাকটাকে

কোনো ক্যারাভ্যানের ভেতরে লুকানো অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে পুরস্কারের টাকাটা সেই পাবে। কাগজে দেখেছেন, পুরস্কারের টাকাটা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হয়েছে! নাঃ, টাকার পরিমাণটা নেহাত কম নয়।

জিনি বললো, পুরস্কারের টাকাটা পুলিশ ওকে দেবে বলে তো মনে হয় না। আপনার কি মনে হয়?। শেষে বাচ্চা ছেলে বলে ঠকাবে না তো?

ব্র্যাডফোর্ড ইতস্ততঃ করে বললো, হ্যাঁ—তা বলতে পারেন। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশে খবর দেওয়া উচিত হবে কিনা। তবে ছোঁড়াটা কিছু না কিছুর সন্ধান পেয়েছেই। অবশ্য পুলিস এসব কথাকে বিশেষ পাত্তা দেবে না।

আপনারও তো একটা ক্যারাভ্যান আছে, মিঃ ব্রাডফোর্ড, তাই না? পুলিশ যদি ট্রাক লুটের ব্যাপারে আপনাকেই সন্দেহ করে বসে, তবে আমি কিন্তু অবাক হবো না। শেষে হয়তো আপনার ক্যারাভ্যান নিয়েই ওরা টানাটানি করবে।...জানেন, একবার আমার বাবারও অমনি হয়েছিলো। তিনি কতগুলো মুক্তো পেয়ে থানায় জমা দিতে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু পুলিশ উল্টে তাকেই গ্রেপ্তার করলো। তারপর মাস খানেক কোর্ট কাছারি করার পর তিনি ছাড়া পান। তারপর থেকে বাবা ভুলেও কোনদিন পুরস্কারের কথা উচ্চারণও করেন নি।

ব্র্যাডফোর্ড বিস্ফারিত চোখে, বলেন কি? আমি তো এদিকটা একেবারেই ভাবি নি। না ম্যাডাম, আমি আর ওর মধ্যে নেই। ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। শখ করে জেলে যাওয়ার সাধ আমার নেই।

উঠে দাঁড়ালো ব্র্যাডফোর্ড।

জিনি হেসে, এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। কারণ কালই আমরা চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি! কেন, ফন হ্রদ বুঝি আপনাদের ভালো লাগলো না। আমার কিন্তু জায়গাটা বেশ লাগে—খোলামেলা, সুন্দর—

না, আমাদেরও ভালোই লেগেছে, তবে আরো অনেক জায়গায় তো বেড়াবার কথা আছে, তাই। এবারে আমরা যাবো স্ট্যাগ হ্রদের দিকে। তারপর ডিয়ার হ্রদে বেড়াতে যাবো।

তাহলে তো আপনাদের বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে দেখছি। যাক্, আপনাদের দিনগুলি সুখে কাটুক কামনা করি। জিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দরজার কাছে গিয়েও কথা বলছে। তখন তো কিটসন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ব্র্যাডফোর্ড মিনিট দশেক পরে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো। জিনি দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিলো। তাহলে আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তার অবকাশ নেই। আমাদের চলে যেতেই হবে।

চিন্তিত মুখে কিটসন, হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তুমি যেভাবে ব্র্যাডফোর্ডকে বোকা বানালে, সত্যি তোমার তুলনা নেই।

ব্লেক শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। থাক, থাক—অনেক হয়েছে। অতো বেশি উচ্ছ্বাসের দরকার নেই, আলেক্স। ও বোধ হয় আমাদের গলা শুনতে পেয়েছিলো। তাহলে কালই আমরা রওনা দিচ্ছি। নইলে ওই ছোঁড়াটা আবার কোন গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসতে পারে। আলেক্স, তুমি বরং ক্যারাভ্যানে গিয়ে থাকো। বলা যায় না, ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা হয়তো রাতের অন্ধকারে এসে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

সম্মতি জানিয়ে কিটসন দরজা খুলে বাইরে চলে গেলো।

নির্লিপ্ত সুরে জিপো বললো, আগামীকাল আমি বাড়ি যাচ্ছি। বুঝেছো? অনেক সহ্য করেছি...আর নয়। আমি শুতে চললাম।

জিপো শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ব্লেক ক্রোধভরে, 'কালই শালাকে টিট করবো। তখন থেকে ওর বকবকানি শুনে আমি হদ্দ হয়ে গেছি।

রাতের খাবার তৈরী করতে জিনি রান্নাঘরে চলে গেল।

ব্লেক রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, ব্র্যাডফোর্ডকে তুমি বেশ কায়দা করে বোকা বানিয়েছো। জিনি—তোমার বুদ্ধি আছে।...কিন্তু আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবেছো? আপত্তির তো কিছু

নেই—তুমি রাজি তো?

জিনি ব্লেকের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো, তুমি যদি পৃথিবীর শেষ পুরুষও হও, তবুও তোমার সম্পর্কে আমি কৌতূহলী হবো না।

আচ্ছা—সময় এলেই দেখা যাবে, হাসতে হাসতে ব্লেক আরাম-কেদারায় গিয়ে বসলো।

কিটসন পরদিন খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে গেলো। জিনি ক্যারাভ্যানের পাহারায় রইলো। ব্লেক ও জিপো তখন কেবিনে।

জিপোর মানসিক অবস্থা এতোই চরমে পৌঁছেছে যে শেষ পর্যন্ত কিটসন ও ব্লেক তাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিতে বাধ্য হয়েছে।

জিপোকে বাঁধা হয়ে গেলে ব্লেক ইশারা করেছে কিটসনকে, তুমি যাও। ওকে আমি দেখছি। কি করে ওর মত বদলাতে হয় দেখছি। ফিরে এসেই হয়তো শুনবে জিপো রাজী।

জিপোকে ঐ ভাবে ছেড়ে যেতে কিটসনের কষ্ট হলেও জিপোর সাহায্য ছাড়া তো ট্রাকের তালা খোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর জিপো বেহেড হয়ে পড়ায়, ওকে সামলানোর দায়িত্ব ব্লেক নিয়েছে।

কিটসন শহরে গিয়ে একটা বড়সড় তাঁবু ও প্রচুর খাবার কিনলো। কারণ পাহাড়ী অঞ্চলে গেলে রোজকার কেনাকাটা করা যেমন অসম্ভব তেমনি বিপজ্জনক।

কিটসন ফিরে এলে জিনি তার কাছে এগিয়ে এলো।

কিটসন বললো, কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো?

না। কিন্তু তুমি ফিরে আসাতে আমি খুশী হয়েছি। তখন থেকে ঐ ছেলেটার কথাই ভাবছি। যতো তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারি ততোই ভালো।

দুজনে কেবিনে এসে ঢুকলো।

জিপো আরাম কেদারায় বসে, মুখ শুকনো। কোটরগত চোখে কালি। ব্লেক উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সব ঠিকমতো হয়েছে?

হ্যাঁ—জিনিষপত্র সবই ঠিকমত কিনেছি।

জিপোর মত বদলেছে?

গম্ভীর ভাবে কিটসনের প্রশ্নের জবাব দিলো ব্লেক, ওর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা হয়েছে, ও ট্রাকের তালা খুলতে রাজী হয়েছে।

জিপো প্রতিবাদ করলো, 'তোমরা আমাকে দিয়ে গায়ের জোরে কাজ করিয়ে নিতে চাইছো। এর ফল ভালো হবে না। একথা আগেও বলেছি—এখনও বলছি। আলেক্স, তুমি আমার বন্ধু ছিলে। হুঃ—বন্ধুই বটে। তুমি আমার কাছে আর এসো না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।

কিটসন ব্লেকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, কি হয়েছে? ব্যাপার কি, এড?

ওর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে। ও আমাদের ট্রাকের তালা খোলার ব্যবস্থা না করলে যে ভীষণ বিপদে পড়বে সেটা ওকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি।

জিপো চাপা স্বরে কিটসনকে বোঝাতে চাইলো, এড বলছে ট্রাকের তালা না খুললে ও আমার হাত ভেঙ্গে দেবে। হাত ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে?

কিটসন কিছু বলতে যাচ্ছিলো ব্লেক মাথা নেড়ে ইশারা করতেই চুপ হয়ে গেলো।

চলো, যাওয়া যাক। দেখো তো, বাইরে কেউ আছে কি না।

কিটসন ও জিনি বাইরে এসে দেখলো সামনা সামনি কেউ নেই তবে হ্রদে নৌকোর আনাগোনা।

কিটসন ক্যারাভ্যানটা বুইকের সঙ্গে জুড়িয়ে কেবিনের দরজার সামনে চালিয়ে নিয়ে এলো। গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের পেছনের দরজা কেবিনের মুখোমুখি রাখলো।

এড, তোমরা প্রস্তুত?

কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা খুলতেই ব্লেক আর জিপো চটপট ঢুকে পড়লো ভেতরে। কিটসন দরজা বন্ধ করে দিলো।

কিটসন জিনির হাতে মানিব্যাগটা দিয়ে, আমি এখানেই আছি। তুমি বরং হিসেব পত্তরটা চুকিয়ে এসো।

কিটসন ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে জিনির ফেরার অপেক্ষায় রইলো। কিটসন ভাবছে—এখন তারা যাবে সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়—যেখানে নেই অজস্র ক্যারাভ্যানের আড়াল। এ যেন বিপদকে ডেকে আনা। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই।

এই যে, শুনুন।

কিটসন চমকে দেখলো একটা বাচ্চা ছেলে তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। পরনে সুতীর প্যান্ট। সাদা ডোরাকাটা জামা। মাথায় একটা শোলার টুপি।

কি ব্যাপার—

আমার বাবা আপনাকে চেনে। আমি ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র।'

তাই নাকি?

ছেলেটা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে। তারপর ক্যারাভ্যানের দিকে।

এটা আপনার?

হ্যাঁ।

ছেলেটা গম্ভীরভাবে বললো, এটার চেয়ে আমাদেরটা অনেক ভালো।

কিটসন এই সময়ে মনেপ্রাণে জিনিকে চাইলো, কি করছে এতক্ষণ জিনি।

এবার ছেলেটা উবু হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়লো। ঘাড় কাত করে ক্যারাভ্যানের তলাটা দেখতে চেষ্টা করলো।

ওরে ব্বাপ! আপনাদের ক্যারাভ্যানের তলাটা দেখি লোহার চাদরে মোড়া। এতো লোহা দিয়েছেন কেন? শুধু শুধু এটার ওজন বাড়ছে, তাই না?

কি জানি, জানি না। যখন এটা কিনেছি, এরকমই ছিলো।

বাবা বলছিলো, গতকাল আপনাদের দুজন বন্ধু এর মধ্যে ছিলো, সত্যি?

হ্যাঁ।

কিন্তু ওদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে।

না তো—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছিলো, নয়তো ওরকমভাবে ঝগড়া করছিলো কেন?

ওরা সবসময়ই ওরকম ঝগড়া করে—ও কিছু নয়।

ছেলেটা কয়েক পা পিছিয়ে ক্যারাভ্যানকে ভালো করে দেখতে লাগলো।

এর ভেতরটা আমাকে একবার দেখতে দেবেন?

কিটসনের স্বর ঈষৎ উত্তপ্ত, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কারণ চাবিটা আমার স্ত্রীর কাছে।

আমার বাবা কিন্তু মাকে কখ্খনো চাবি রাখতে দেয় না। মা সবসময় চাবি হারিয়ে ফেলে।

আমার স্ত্রী চাবি-টাবি খুব সাবধানে রাখে। কখনো হারায় না।

ছেলেটা আবার মাটিতে উবু হয়ে বসে সবুজ ঘাসগুলো দুহাতে ছিঁড়তে লাগলো।

আপনার বন্ধুরা কি এখনো এর মধ্যেই আছে?

না।

তাহলে কোথায় আছে?

বাড়িতে।

বাড়ি কোথায়?

সেন্ট লরেন্স—

তারা তাহলে একসঙ্গেই থাকে?

হ্যাঁ।

কিন্তু ওরা যেরকম বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিলো, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

বললাম তো, ও কিছু নয়। ওরা সবসময়েই অমনি ঝগড়া করে।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে ছেলেটা হাতে নিলো। তারপর সেটাকে ঘাস দিয়ে ভর্তি করলো।

ওদের একজন আর একজনকে কিছু করতে না পারার জন্য গালাগাল দিচ্ছিলো। কি বলছিলো জানেন?

উঁহু—

ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিলো, এখুনি একটা মারপিট বাধিয়ে বসবে—

ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওদের বন্ধুত্ব অনেকদিনের—অতো সহজে ভাঙবার নয়।

টুপিটায় ঘাস ভর্তি হয়ে গেলে সেটা চেপে মাথায় বসিয়ে দিলো।

হুঁ, শোনো খোকা। তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমার বাবা হয়তো তোমাকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

না, আমি বাবাকে বলেই এসেছি। বলেছি, আমি চুরি যাওয়া ট্রাকটা খুঁজতে বেরোচ্ছি—ঐ যে, যেটা প্রচুর টাকাসুদ্ধ উধাও হয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাবা আমার খোঁজ করবে না। আপনি কাগজে ঐ ট্রাক লুঠের খবরটা পড়েছেন?

হ্যাঁ, পড়েছি।

জানেন, আমি কি ভাবছি?

হ্যাঁ—তোমার বাবা আমাকে বলেছে।

বাবার বলা উচিত হয়নি। এভাবে শহরসুদ্ধ লোককে বললে আমি পুরস্কারের টাকাটা পাবো কি করে?

সামনের রাস্তা ধরে জিনিকে আসতে দেখলো কিটসন।

ছোট ব্র্যাডফোর্ড বলে চললো, যে করেই হোক পুরস্কারের টাকাটা আমার চাই। পাঁচ হাজার ডলার। টাকাটা পেলে কি করবো জানেন?

কিটসন মাথা নাড়লো, না তো—

বাবাকে আমি ওর একটা পয়সাও দিচ্ছি না—আমি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।

জিনি এলে কিটসন বললো, এই হচ্ছে ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র।

হেসে জিনি. কেমন আছো?

ছেলেটা পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আপনার কাছে কি ক্যারাভ্যানের চাবিটা আছে? ইনি আমাকে বলেছেন, ভেতরটা আমাকে দেখতে দেবেন।

জিনি ও কিটসন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করলো।

আমি দুঃখিত। চাবিটা আমি স্যুটকেসে ভরে ফেলেছি। এখন বের করা খুব মুশকিল।

আপনি নিশ্চয়ই চাবিটা হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক আছে, আমি তাহলে চলি। বাবা বলেছিলো, আপনারা নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

এখুনি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বিদায়। বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ছেলেটা শিস দিতে দিতে এগিয়ে চললো।

তোমার কি মনে হয়? ঠিক আছে, চলো। আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক।'

ওরা বুইকে উঠে বসলো।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দিতেই ঝোপের আড়াল থেকে ছোট ব্র্যাডফোর্ড বেরিয়ে বুইক ও ক্যারাভ্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা নোটবই বের করে পেন্সিল দিয়ে বুইকের লাইসেন্স নম্বরটা নোটবইয়ের পাতায় লিখে নিলো।

।। দশ ।।

ছটি রাস্তায় ভাগ করা চওড়া বড় সড়কটা এমনিতেই গাড়ির ভিড়ে জমজমাট তার ওপর বেশ কয়েকটা গাড়ি তাদের পেছনে একটা করে ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে চলেছে।

উড়ন্ত হোডার প্লেন থেকে থেকেই মাথার ওপর নেমে আসছে—উড়ে চলেছে প্রধান সড়ক ধরে—যেন চলমান যন্ত্রযানদের প্রত্যেকটিকে সে পরখ করে দেখছে। এবং পরখ করার প্রতিটি মুহূর্তেই কিটসনের বুক দুরুদুরু করে উঠছে।

পুলিশের দল মাঝে মাঝে দু একটা বড়সড় ট্রাকের ঢাকনা খুলে অনুসন্ধান করছে। কিন্তু একটা

ক্যারাভ্যানকেও তারা সন্দেহবশে থামালো না। হয়তো তাদের ধারণা, অতো ভারী ট্রাকটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া ক্যারাভ্যানের মতো হালকা জিনিসের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু ঐ পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ঠিক তিরিশ মাইল বেগে গাড়ি চালানো কঠিন বই কি? কিটসন দুঃসাহসের সঙ্গে গাড়ি চালাতে লাগলো।

ওরা দীর্ঘ ছ ঘণ্টা গাডি ছুটিয়ে চললো।

রাস্তায় যখনই তাদের কোনো পুলিসের গাড়ি বা মোটর বাইক চোখে পড়েছে, তখনই ওরা আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওরা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছলো।

অন্ধকার নেমে এসেছে, ততক্ষণে কিটসন বিপরীতমুখী বাঁকের প্রথম সারি অনায়াসেই পার হয়ে গেছে।

পথ যতই যেতে লাগলো, গাড়ি চালানো ততই দুরূহ হতে লাগলো। কিটসন জানে, বাঁকের দূরত্ব অনুমানে সামান্যতম ভুলচুক হলেই ক্যারাভ্যান সমেত অতল খাদে গড়িয়ে পড়তে হবে।

কিটসন অনুভব করলো, ক্যারাভ্যান ও ট্রাকের পিছুটান বুইকের গতিকে ক্রমশঃ শ্লথ করে তুলছে। অ্যাকসিলারেটরের কাছে তেমন আশা পাচ্ছে না কিটসন, সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। কারণ কিটসন জানে আরো কুড়ি মাইল সেই রুক্ষ্ম ও খাড়াই রাস্তা আরো বিপজ্জনক।

তাপমাত্রা যন্ত্রের দিকে দেখলো কিটসন। চক্রের নির্দেশক ক্রমশঃ স্বাভাবিক থেকে উত্তপ্ত অংশের দিকে এগোচ্ছে।

কিটসন জিনিকে জানালো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা গরম হয়ে পড়বে। ট্রাক ও ক্যারাভ্যানের ওজনের জন্যেই এই অবস্থা হচ্ছে। আমাদের সামনের কুড়ি মাইল রাস্তা মোটামুটি এইরকম—তারপরেই শুরু হবে আসল বিপদ।

কেন, এব চেয়েও খারাপ রাস্তা?

খারাপ? সেই রাস্তার তুলনায় এ রাস্তা তো শ্বেতপাথরে বাঁধানো। গত সপ্তাহের এক প্রচণ্ড ঝড়ে সেই রাস্তা এক রকম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই রাস্তাটা কেউ কখনো ব্যবহার করে না। সকলেই ডুকার্সের সুড়ঙ্গ পথটা ধরে যাতায়াত করে।

আরো তিন চার মাইল যাবার পর তাপমাত্রা নির্দেশক স্ফুটনাঙ্কের ঘরে এসে থামলো। অগত্যা বাধ্য হয়েই কিটসন একসময় রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালো।

গাড়িটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হোক—তারপর আবার চালানো যাবে। কিটসন গাড়ি থেকে নেমে গোটা কয়েক বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাড়ির চাকা আটকে দিলো। জিনি হাতল ঘুরিয়ে ক্যাবাভ্যানের দরজা খুলে দিলো।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ব্লেক বললো, কি হলো। থামলে কেন?

ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা না হলে গাড়ি চালানো যাবে না।

ব্লেক ক্যারাভ্যান থেকে নেমে বুক ভরে শ্বাস নিলো, হুঁ, আমরা তাহলে অনেকটা পথই এসে পড়েছি। ওপরে পৌঁছতে আর কত বাকি?

প্রায় ষোলো মাইল। খারাপ রাস্তা এখনো সবটাই বাকি।

নির্বিঘ্নে শেষটুকু পার হওয়া যাবে তো?

কি জানি। এই ক্যারাভ্যান ও ট্রাকের ওজন নেহাত কম নয়। শুধু ক্যারাভ্যানটাকে টেনে তোলাই সমস্যা তারপর ট্রাক তো রয়েছেই।

জিনি বললো, এক কাজ করা যাক। ট্রাকটা বের করে চালিয়ে নিয়ে চলো। এখন যথেষ্ট রাত হয়েছে। সুতরাং বিপদের ভয় নেই।

কিটসন জিনির প্রস্তাবে সায় দিয়ে, 'ট্রাকটাকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ। এবং এ কাজটাও যে খুব একটা সহজ হবে তা নয়।

তাই করা যাক তাহলে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিপো এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলো। এবার বললো, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আর কত দূর?

পাহাড়ের একেবারে ওপরে একটা হ্রদ আছে—আর আছে ঘন জঙ্গল। আমরা যদি সেখানে পৌঁছতে পারি, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কিটসন বললো।

ব্রেক জিপোকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠলো, কিন্তু ট্রাকটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে গেলে প্রথমে ব্যাটারির তার দুটোকে আবার লাগিয়ে নাও, জিপো। ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে একটু কাজের কাজ করো। চটপট করে ব্যাটারির তার দুটোকে লাগাও।

একটা শাবলের সাহায্যে ট্রাকের বনেট ভেঙে যখন ওরা ব্যাটারীর তার লাগালো, ততক্ষণে বুইকের ইঞ্জিন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ব্রেক বললো, বুইকের সঙ্গে ট্রাকটাকে আরো কিছুক্ষণ টেনে নিলে কেমন হয়?

কিটসন বললো, সেটা না করলেই ভালো হয়। কারণ রাস্তার খাড়াই ক্রমশঃই বাড়ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর বুইকের ইঞ্জিন আবার গরম হয়ে উঠবে।

ব্রেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রাকের ভেতরে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে পেছিয়ে আনতে লাগলো ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে।

সে কিটসনকে বললো, তোমরা আগে আগে বুইক নিয়ে চলো। জিপো আর আমি ট্রাক নিয়ে তোমাদের অনুসরণ করছি। আমি ট্রাকের হেডলাইট জ্বালছি না। তোমাদের গাড়ির পেছনের লাল আলো দেখেই আমি পথ চিনতে পারবো।

কিটসন বুইকে গিয়ে জিনির পাশে বসে ইঞ্জিন চালু করতেই জিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করলো।

ট্রাকের ওজনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বুইকটা সহজ গতিতে চড়াই রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

কিটসন বললো, ওরা ঠিকমতো অনুসরণ করছে তো?

হ্যাঁ। কিন্তু একটু আস্তে চালাও, বাঁক নেওয়ার সময় ওরা বেশ পিছিয়ে পড়ছে।'

মিনিট কুড়ি পর ওরা সেই বিধ্বংস অংশের কাছে পৌঁছলো।

হেডলাইট জ্বালিয়ে কিটসন গাড়ি থামালো, তুমি গাড়িতেই থাকো। আমি সামনে গিয়ে রাস্তার অবস্থাটা দেখছি।

ট্রাকের কাছে গিয়ে কিটসন ব্রেককে জানালো সে সামনের রাস্তাটা পরীক্ষা করতে যাচ্ছে।

ওরা বুইকের হেডলাইটের আলোয় দেখলো রাস্তাটা সোজা হয়ে ওপরে উঠে গেছে—প্রায় লম্বভাবে। বড় বড় পাথর নুড়ি সব রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

অবিশ্বাসের সুরে ব্রেক বললো, আরে সর্বনাশ। আমাদের এই রাস্তা বেয়ে উঠতে হবে?

কিটসন মাথা নাড়লো। হ্যাঁ, কাজটা যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই—তবে অসম্ভব নয়। প্রথমে ঐ বড় বড় পাথরগুলো আমাদের সরাতে হবে।

সে গিয়ে ঐ পাথরগুলো ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিতে লাগলো রাস্তার ধারে। সব পাথরগুলো সরাতে ওদের তিনজনের প্রায় আধঘণ্টা লাগলো।

কিটসন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, যাক, মনে হয় এতেই কাজ হবে। এই পর্যন্ত আসতে পাবলেই বাকিটা আমরা সহজেই পার হতে পারবো।

ওরা তিনজনে ঢাল বেয়ে নেমে চললো দাঁড়িয়ে থাকা বুইকের কাছে।

খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে। কিটসন বললো ব্রেককে, আর গাড়িকে প্রথম গীয়ারে রাখবে। হেডলাইট জ্বালাতে ভুলো না যেন। আর একমুহূর্তের জন্যও থামাবে না। যদি থামো, তাহলে চাকায় জোর পাবে না।

ঠিক আছে—বিরক্ত হয়ে উঠলো ব্রেক, কি করে চালাতে হয় তোমায় শেখাতে হবে না, তুমি তোমার খেয়াল রেখো, আমি আমারটা দেখবো।

ঠিক আছে; এখন বকবক না করে কাজ শুরু করো। কিটসনকে চেঁচিয়ে উঠলো ব্রেক।

কিটসন এগিয়ে গেলো বুইকের দিকে। উঠে বসলো গাড়িতে।

প্রয়োজনের তুলনায় বুইকের শক্তির কমতি নেই। কিন্তু পেছনে বাধা ক্যারাভ্যানের খালি হলেও

সে শক্তি হ্রাসের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আর পেছনের চাকা দুটো বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে লাগলো। সেইসঙ্গে পাথরের টুকরো, শুকনো মাটি ছিটকে পড়তে লাগলো দু-পাশে।

জিনি ঝুঁকে বসেছিলো—দৃষ্টি রাস্তার দিকে। পথে বড় পাথর পড়লেই জিনি কিটসনকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে।

বুইকের গতি কমে গেছে। স্টিয়ারিং শক্ত হাতে চেপে অভিসম্পাত করছে কিটসন। আর অনুভব করছে গাড়ির প্রচণ্ড কাঁপুনি। এইভাবে সেই সরু রাস্তায় একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিক করে দক্ষতার সঙ্গে রাস্তার ধার বাঁচিয়ে বুইক নিয়ে এগিয়ে চললো।

রেডিয়েটরের জল কমায়, গাড়ির ভেতরটাও গরম হয়ে উঠেছে।

হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়লো স্বাভাবিক রাস্তা।

ওঃ, আর একটু! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো জিনি। 'আমরা প্রায় এসে গেছি!

গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করালো কিটসন।

যাক, আমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত পেরেছি। কিটসন সাফল্যের হাসি হাসলো, 'ওফ, আমি তো ভাবলাম বোধহয় হয়ে গেলো।

তোমার কৃতিত্ব আছে, আলেক্স। এমনভাবে গাড়ি চালানো সোজা ব্যাপার নয়!

এইভাবে আধ ঘণ্টা ধরে চললো ট্রাক চালানোর কাজ। কিটসন হ্যাঁচকা মেরে একটু একটু করে এগোয় আর ব্লেক ও জিপো এসে পাথরের সাহায্যে ট্রাকের পতন রোধ করে।

অবশেষে ওরা বুইকের পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেলো। কিন্তু সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই ব্লেক বিরতির প্রস্তাব করলো।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কিটসনের মনে হলো ট্রাকের ইঞ্জিন যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন ব্লেককে ডাকলো, উঠে বসলো ট্রাকে।

দশ মিনিট পরে ট্রাকটাকে দেখা গেলো বুইকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এখন এটাকে ক্যারাভ্যানে ভরে ফেলা যেতে পারে। কিটসন বললো, বুইকের যখন টানতে অসুবিধা হবে না তখন ট্রাকটাকে আড়ালে রাখাই ভালো।

সে ট্রাকটাকে চালিয়ে ঢুকিয়ে দিলো ক্যারাভ্যানের ভেতরে। ব্লেক আর জিপোও একই সঙ্গে ক্যারাভ্যানে আশ্রয় নিলো।

ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন বুইকের কাছে এগিয়ে গেলো। স্টিয়ারিং ধরে বসলো চালকের আসনে জিনির পাশে।

তোমার দক্ষতায় আমি অবাক আলেক্স। তুমি না থাকলে এ রাস্তা পার হতে পারতাম না।

জিনি ঝুঁকে এলো, ওর উষ্ণ ঠোঁট আলতোভাবে কিটসনের গাল স্পর্শ করলো।

ব্লেকের ঘুম ভাঙলো তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা সূর্যের আলোতে। চোখ খুলে ওপরের ঢালু ক্যাম্বিসের ছাদের দিকে তাকিয়েই কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল সে কোথায় আছে ভাবতে।

ব্লেক চোখ বন্ধ করে অনুভব করলো সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ। ভুরু কুঁচকে সে পরিস্থিতি অনুমান করার চেষ্টা করলো।

অন্ততঃ পক্ষে লুকোবার জন্য একটা ভালো জায়গা পেয়েছে ওরা। যদি কপাল ভালো থাকে জিপো ট্রাক না খোলা পর্যন্ত ওরা বেশ নিরাপদেই এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে।

একটা ঝরনা রয়েছে কাছাকাছি—জলের অভাব নেই। তাছাড়া ঘন জঙ্গলে তাদেব আড়াল করে রেখেছে। উড়ন্ত কোনো বায়ুযান যে তাদের দেখবে সে সম্ভাবনাও কম। আর প্রায় পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে বড় রাস্তা থেকে।

এই বিধ্বস্ত রাস্তা বেয়ে যে ট্রাকটাকে আনা সম্ভব এটা কেউ বিশ্বাসই করবে না। তাই ট্রাকের খোঁজে এখানে কেউ আসার সম্ভাবনা কম।

জিপো যদি এমনিতে তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই তাদের অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে।

ব্লেক চোখ খুলে দেখলো ঘড়িতে ছটা পাঁচ বাজে। এবার মাথা তুলে শুয়ে থাকা জিনির দিকে

দেখলো। একটা কোটকে ভাঁজ করে মাথায় দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ও।

জিনি ও ব্লেকের মাঝখানে কিটসন শুয়েছে—গভীর ঘুমে অসাড়।

তাঁবুর ভেতরে জায়গা কম হলেও ওরা কোনোরকমে শুয়েছে। কারণ বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা।

এবার সে জিপোর দিকে চোখ ফেরালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ব্লেক লাফ দিয়ে উঠে বসলো।

তাঁবুতে জিপো নেই।

ব্লেক ভাবলো হয়তো জিপো বাইরে প্রাতঃরাশ তৈরী করছে। কিন্তু তাকে নিশ্চিত হতে হবে। তাই কিটসনকে পা দিয়ে এক ধাক্কা দিলো। কিটসনের ঘুম ভাঙতেই, শীগগির ওঠো। জিপো এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের আজ প্রচুর কাজ।

কিটসন হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। তার অবস্থান তাঁবুর সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়ায় সেই প্রথম হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এলো।

কিটসনের পরেই ব্লেক বাইরে এলো। ইতিমধ্যে জিনির ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসলো।

কিটসন চারপাশে তাকিয়ে, বললো, জিপো কোথায়?

ব্লেক দুহাতে মুখ আড়াল করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলো, জিপো—ও—ও—

কিটসন ও ব্লেক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ব্লেক বললো, হতভাগাটা আমাদের ছেড়ে সরে পড়েছে। মনে হয় পালিয়েছে। ওর ওপর আমাদের নজর রাখা উচিত ছিলো।

তাঁবু থেকে জিনি বেরিয়ে, কি হয়েছে?

জিপো পালিয়েছে।

তাহলেও বেশী দূর যেতে পারেনি। কারণ মিনিট কুড়ি আগেও আমি ওকে ঘুমোতে দেখেছি।

ভয়ঙ্কর স্বরে ব্লেক বললো, যে করে হোক ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। জিপোকে ছাড়া আমরা অথৈ জলে পড়বো। ওর মাথার ঠিক নেই। নইলে কুড়ি মাইল পাহাড়ী রাস্তা পায়ে হেঁটে কেউ পালাবার চেষ্টা করে। বড় রাস্তায় পৌঁছতে ওর দশ ঘণ্টা লেগে যাবে।

কিটসন ও ব্লেক ছুটতে লাগলো।

ঘাসজমির শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা থামলো। নীচের দিকে তাকালো। পাহাড়ে গাঢ় রঙের পটভূমিকায় রাস্তাটাকে সাদা সুতোর মতো দেখাচ্ছে।

কিটসন ব্লেকের হাত ধরে আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে জিপো যাচ্ছে।

ব্লেক নীচের দিকে প্রায় দু মাইল নীচের রাস্তায় একটা ছোট্ট সচল বস্তু দেখলো—জিপো।

ওকে এখনো ধরা যাবে। একবার ধরতে পারলে ওকে পালানোর ঠেলাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবো। চলো, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিটসন বললো, না। রাস্তাটা অসম্ভব সরু। ওকে ধরতে পারলেও গাড়ি ঘুরিয়ে আনা অসম্ভব। তার চেয়ে চলো পাহাড়ের দিক দিয়ে নামতে থাকি। তাহলে দু মাইল রাস্তা আমরা একমাইল হেঁটেই পৌঁছে যাবো।

কিটসন নামতে শুরু করলো পাহাড়ের গা বেয়ে। কখনো লাফিয়ে, কখনো বুকে হেঁটে খাড়াই পাহাড় বেয়ে সে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো।

জিপোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ব্লেক কিটসনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

কিটসন আঙুল তুলে জিপোকে দেখালো, ঐ যে যাচ্ছে।

ব্লেক দাঁত খিঁচিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে ধরলো।

কিটসন ব্লেকের কব্জি চেপে ধরলো, কি, করছো কি? এখন জিপোই আমাদের ট্রাক খোলার একমাত্র ভরসা। আর ওকেই তুমি খুন করতে চাইছো?

ব্লেক হিংস্রভাবে এক ঝাঁকুনি দিয়ে রিভলবারটা খাপে গুঁজে আবার খাড়াই বেয়ে নামতে শুরু করলো।

হঠাৎ কিটসনের চোখ পড়লো জিপোর ওপর, ও থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকালো জিপো। একটু দাঁড়িয়ে তারপর সে ছুটতে লাগলো।

কিটসন ব্রেককে বললো, ও আমাদের দেখে ফেলেছে। তারপর গলা চড়িয়ে চিৎকার করলো, জিপো! থামো! ফিরে এসো।

জিপো কিন্তু মরিয়া হয়ে ছুটে চললো : ওর পা যেন সীসের মতো ভারী লাগছে। তার পালানোর এই প্রয়াস যে নির্বুদ্ধিতারই ফলশ্রুতি তা সে উপলব্ধি করলো এবার।

তাঁবুতে সকালে যখন জিপোর ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন ব্রেক, কিটসন, জিনি তিনজনেই গভীর ঘুমে মগ্ন। ওদের ঘুমোতে দেখে পালাবার চিন্তাটা হঠাৎই তার মাথায় চাড়া দিলো।

তিনজনকে না জাগিয়ে অতি সন্তর্পণে গায়ের চাদর সরিয়ে জিপো উঠে বসেছে। হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

কুড়ি মাইল পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। তখন ঘড়িতে পৌনে ছটা। সুতরাং জিপোর মনে হয়েছে, কম করে সাতটা আটটার আগে ওদের ঘুম ভাঙবে না। তার মানে সে পালাবার জন্য দেড় দুই ঘণ্টা সময় পাবে।

সুতরাং সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েই জিপো রওনা দিয়েছে। দ্রুতপায়ে ঢালু রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেছে।

আধ ঘণ্টায় সে প্রায় দু মাইল পথ এসেছে। হঠাৎ ওপর থেকে ভেসে এসেছে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

চমকে মুখ তুলে তাকাতেই কিটসন ও ব্রেককে দেখেছে।

ওদের দেখেই জিপোর হাত-পা সিঁটকে গেছে।

সে শুনতে পেলো কিটসনের চিৎকার, জিপো! থামো! ফিরে এসো!

কয়েক শো গজ অন্ধের মতো দৌড়নোর পর জিপো বুঝতে পেরেছে, এভাবে সে ওদের সঙ্গে পারবে না। তাই পেছন ফিরে দেখলো, ব্রেক তখনও পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে। কিটসন তার পেছনে গোড়ালিতে ভর দিয়ে সরসর করে নেমে আসছে।

ফাঁদে পড়া ভয়ার্ত শিকারের মতো রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে জিপো ছুটে চললো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জিপো মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লো। হাত দিয়ে পতনজনিত আঘাত রোধ করলো সে। কিন্তু ওর ভারী শরীরটা পাহাড়ের রুক্ষ্ম, অসমতল গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

জিপোর আহত দেহটা রাস্তায় এসে থামলো। কোনোরকমে সে উঠে দাঁড়ালো। ঘাড় ফিরিয়ে ওপর দিকে তাকালো।

না, এখান থেকে কিটসন বা ব্রেক কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় ঝুলন্ত পাথরগুলোই জিপো ও ওদের মাঝে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেখতে না পেলেও ওদের পায়ের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে।

উন্মত্তের মতো জিপো চারিদিকে তাকালো। একটা আশ্রয় তার দরকার, ওরা এসে পড়বে।

সামনেই ডান দিকে বিস্তৃত ঘন বুনো গাছের ঝোপ—ঠিক পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে। ঝোপ লক্ষ্য করে জিপো তীরবেগে দৌড়লো। ঝোপের উচ্চতা বেশী নয়—জিপোর উরু পর্যন্ত। তারই মধ্যে সে ছুটতে লাগলো। কাঁটা ঝোপে লেগে তার প্যান্ট ছিঁড়ে গেলো—পা কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। ঝোপের মাঝামাঝি গিয়ে জিপো উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝোপের ডালপালা আবার তাদের জায়গায়, ফিরে এলো। নিষ্পাপ জিপোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিরাপত্তার চাদরে ভয়ার্ত জিপোকে আগলে রাখতে চাইছে।

কিটসনই প্রথম রাস্তায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু সামনে পেছনে তাকিয়ে জিপোকে না দেখতে পেয়ে সে ভীষণ অবাক হলো।

একটা অশ্রাব্য কটূক্তি করে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রেক তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় গেলো ও?

মনে হয় কোথায় ও লুকিয়ে পড়েছে।

দুজনেই সামনের ঝোপের দিকে তাকালো, ঐ কাঁটাঝোপই একমাত্র লুকোবার জায়গা।

ব্রেক বললো, শালা ওখানেই লুকিয়েছে। চেঁচিয়ে বললো, জিপো, বাইরে বেরিয়ে এসো। আমরা জানি তুমি ওখানেই লুকিয়ে আছো।

জিপো আতঙ্কে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে অনড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ব্লেক বললো, চলো, ওকে ধরে বাইরে টেনে আনি। তুমি ওপাশ দিয়ে ভেতরে ঢোক, আমি সামনে দিয়ে ঢুকছি।

ব্লেক দুহাতে কাঁটাগাছ সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। এইভাবে গজ দশেক যাওয়ার পর ব্লেক বুঝলো পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করে তার পক্ষে জিপোকে বের করা অসম্ভব। কারণ গোটা এলাকাটাই ঘন ঝোপে ঠাসা। সুতরাং এর মধ্যে জিপোর অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব।

ওদিকে কিটসনও একই সময়ে অবস্থাটা উপলব্ধি করলো এবং একরাশ বুনো ঝোপের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো।

ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকালো। ব্লেক চিৎকার করলো জিপো, এই শেষবারের মতো তোমাকে বলছি। যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না আসো তাহলে তোমাকে এমন মার মারবো, কোনদিন ভুলবে না, বেরিয়ে এসো বলছি।

জিপো ব্লেকের স্বরে ক্রোধ ও হতাশার আভাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলে, সে বুঝলো যদি সে সাহস করে নিশ্চলভাবে পড়ে থাকতে পারে, তাহলে তার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট। শুধু একটু সাহস...আর কিছু নয়।

হতাশ হলেও সামনের দিকে আরো কয়েক পা ব্লেক এগিয়ে গেলো। জিপো শুনতে পেলো ঝোপঝাড় ঠেলে তার এগিয়ে আসার শব্দ—কিন্তু সে চলেছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দিকে। কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ—সেও ব্লেকের মতোই মূল নিশানা এড়িয়ে চলেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে জিপো অপেক্ষা করতে লাগলো।

বেশ কয়েক মিনিট পর কিটসন ও ব্লেকের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলো, তখন জিপো বেরোনো মনস্থ করলো।

কারণ ওরা যদি এইভাবে পুরো এলাকাটা তন্ন তন্ন করে, তাহলে লুকোনো জায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলাই তার পক্ষে নিরাপদ।

সুতরাং খুব সতর্কভাবে বেলে মাটির ওপর বুক ঘষটে, কাঁটাগাছগুলো না নড়িয়ে সে তার স্থূল দেহ নিয়ে এগিয়ে চললো। কারণ কাঁটা ঝোপের সামান্য আন্দোলনই কিটসন ও ব্লেককে তার অবস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে।

এইভাবে তিরিশ চল্লিশ গজ যাওয়ার পর জিপো নিশ্চিন্ত বোধ করলো। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আগেই সে সাপটাকে দেখতে পেলো।

নিজেকে সামনে এগোবার জন্যে সবে ডান হাতটা সামনে বাড়িয়েছে। এমন সময় দেখে সাপটা তার আঙুল থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরেই কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। চ্যাপ্টা বাঁকানো ফণাটা শূন্যে স্থির।

জিপোর সারা শরীর যেন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়লো, সমস্ত চেতনা হয়ে গেলো আচ্ছন্ন। পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে পড়ে রইলো সে। হৃদপিণ্ডের দুর্দম গতি বুঝি তার কণ্ঠনালী রোধ করছে।

সাপটাও নিশ্চলভাবে ফণা তুলে প্রতীক্ষায় রইলো।

কয়েকটা যন্ত্রণাময় মুহূর্তের পর জিপো দাঁতে দাঁত চেপে, মরিয়া হয়ে বিদ্যুৎগতিতে তার ডান হাতটা ফিরিয়ে আনলো।

এবং সেই মুহূর্তেই সাপটা তার হাতে ছোবল মারলো।

জিপো অমানুষিক যন্ত্রণায় উন্মাদের মতো সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব চিৎকার করে উঠে অন্ধের মতো ঝোপঝাড় ভেদ করে দৌড়তে লাগলো।

ব্লেক ও কিটসন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার অনুসন্ধান করতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেলো জিপোর আর্তনাদ।

ওরা দেখলো জিপো রক্ত ভমানে৷ আর্তনাদে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে।

শালা একেবারে পাগল হয়ে গেছে, বলেই ব্লেকও জিপোর পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলো। ঝোপঝাড় ঠেলে কিটসনও তাকে অনুসরণ করলো।

জিপো ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে পাহাড়ের খাড়াই ঢালের দিকে ছুটে চললো। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো মাত্রই জিপো ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে পড়লো। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে অসহায়ভাবে নীচের রাস্তার দিকে নেমে চললো।

ব্রেককে পেছনে ফেলে কিটসনই আগে পৌঁছলো জিপোর কাছে। নিচের রাস্তার কাছে একটা বড় পাথরের গায়ে পিঠ দিয়ে সে পড়েছিলো। কিটসন জিপোর ওপর ঝুঁকে, জিপো! কোনো ভয় নেই। ব্রেক তোমাকে কিছু করবে না। কিন্তু তোমার হয়েছে কি?

কিটসন জিপোর কালসিটে পড়া মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

জিপো কোনরকমে বললো, একটা সাপ...

ব্রেক পড়িমড়ি করে এসে পৌঁছলো। জিপোকে দেখেই সে রাগে ফেটে পড়লো, শালা ভীতু কোথাকার। তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

ব্রেক এক প্রচণ্ড লাথি চালাতে গেলো কিন্তু কিটসন বাঁ হাতে সে আঘাত রোধ করে, থাক, এসব পরে হবে। দেখতে পাচ্ছো না। জিপোর কি অবস্থা হয়েছে।

জিপো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতটা তুলে কিটসনকে দেখিয়ে, সাপ...একটা সাপ...

কিটসন দেখলো, জিপোর রক্তিম হাতটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে—সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে তার হাতে। সে জিপোর স্ফীত হাতের ওপর আঙুল ছোয়াতেই সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলো।

কিটসন জিপোর পাশে পা ছড়িয়ে বসে, কি হয়েছে, জিপো?

জিপো শ্বাসকষ্টে হাঁপিয়ে, সাপ...একটা সাপ...আমাকে ছোবল...মেরেছে...

কিটসন দেখতে পেলো জিপোর হাতের উপর পাশাপাশি দুটো তীক্ষ্ণ দাঁতের দাগ। সুতরাং ওকে আশ্বাস দিয়ে, 'ভয় নেই, জিপো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।'

আমাকে...আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। আমি আমার ভাইয়ের মতো...সাপের কামড়ে...মারা যেতে চাই না...আলেক্স...

কিটসন রুমাল বের করে সেটাকে দড়ির মতো পাকিয়ে শক্ত করে জিপোর কব্জিতে বেঁধে দিলো।

ব্রেক উত্তেজিত ভাবে, 'তার মানে ওকে সাপে কামড়েছে? তাহলে—তাহলে আমরা ট্রাকের তালা খুলবো কি করে?

পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে তার ফলা খুলে ধরলো।

জিপো, এতে তোমার একটু ব্যথা লাগবে কিন্তু কিছুটা আরাম পাবে। এ ছাড়া এখন আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

ছুরির ধারালো অগ্রভাগ জিপোর উত্তপ্ত, স্ফীত হাতে বসিয়ে দিলো সে। খানিকটা লম্বা করে চিরে দিলো।

জিপো চিৎকার করে বাঁ হাতে কিটসনকে আঘাত করলো।

ওর হাতের ক্ষত থেকে ধীরে ধীরে রক্ত বেরোতে লাগলো। একইভাবে শক্ত হাতে কিটসন জিপোর কব্জি ধরে রইলো। হাতে চাপ দিয়ে ক্ষত মুখ দিয়ে বিষটা বের করার চেষ্টা করলো। জিপোর বিবর্ণ মুখ দেখে মনে হলো জিপো যেন আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

আলেক্স—তুমি আমার...সত্যিকারের বন্ধু। তোমার সঙ্গে সেদিন যে দুর্ব্যবহার করেছি, সে সব ভুলে যেও। আমাকে—আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো...

ভয় পেয়ো না জিপো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। দাঁড়াও, আগে বুইকটা নিয়ে আসি।

ব্রেক খেঁকিয়ে উঠলো। কি—কি বললে?

গাড়িতে করে আমি জিপোকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। ওর অবস্থাটা একবার দেখো। বাঁচে কি না বাঁচে ঠিক নেই। বলেই কিটসন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

ব্রেক তীব্রভাবে, কিটসন!

আবার কি হলো?

ফিরে এসো এখানে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? দেখো উপরে। একটা উড়োজাহাজ ধীর বেগে, চক্রাকারে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি গাড়িটা আড়াল থেকে বাইরে আনলেই ওরা সেটা দেখতে পাবে। তারপর পুলিস এসে এ জায়গাটা গরুখোঁজা করে আমাদের

বের করবে।

তাতে কি হয়েছে? একটা মানুষকে তো আর বসে বসে মরতে দেওয়া যায় না। জিপোকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না গেলে ওর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেটা বুঝতে পারছো না?

গাড়িটা তুমি লুকোনো জায়গা থেকে বাইরে আনতে পারবে না, ব্যস।

হাসপাতাল এখান থেকে কম করে তিরিশ মাইল দূরে। এতোটা রাস্তা আমি জিপোকে কাঁধে করে নিতে পারবো কি?

ব্লেক খেঁকিয়ে উঠলো, তাতে আমার বয়েই গেলো। মোটমাট গাড়িটা তুমি দিনের আলোয় রাস্তায় বের করবে না। জিপোকে এখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। উপায় কি?

নিকুচি করেছে তোমার উপদেশের, বলেই কিটসন পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো।

কিটসন।

ব্লেকের শাসানির সুরে কিটসন ঘুরে দেখলো ব্লেকের হাতে তার দিকে লক্ষ্য করে রিভলবাব রয়েছে।

ব্লেক নিষ্প্রাণ স্বরে, এখানে ফিরে এসো।

দেরি হলে জিপো মারা পড়বে এড। তুমি সেটা দেখছো না?

ব্লেক ভয়ঙ্কর স্বরে শাসিয়ে বললো, তুমি আগে এখানে ফিরে এসো। গাড়ি বের করার কথা ভুলে যাও। জলদি এসো, আমি আর দ্বিতীয়বার বলবো না।

কিটসন ধীরে ধীরে নেমে এলো। সে ভাবলো এতোদিনে তাহলে সময় এসেছে। আজই একটা ফয়সালা হয়ে যাক। তবে ওর ডান হাতের দিকে নজর রাখতে হবে। এই আমাদেব চূড়ান্ত ফয়সালা। সে কিছুতেই জিপোকে অসহায় ভাবে মরতে দেবে না।

কিটসন সহজভাবে এগিয়ে এলো, কিন্তু আমাদের কিছু একটা করা উচিত। এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিপোকে আমরা মরতে দিতে পারি না। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখো, গর্দভ কোথাকার। যতক্ষণে তুমি গিয়ে গাড়ি এনে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, ততক্ষণে ও মারা যাবে।

কিন্তু তাই বলে, চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। সে আড়চোখে দেখলো, ব্লেক বিভলবারটা সামান্য নামিয়ে নিলো।

পলকের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ব্লেকের কব্জির ওপর কিটসনের হাত নেমে এলো।

ব্লেকের হাত থেকে রিভলবারটা ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়লো। এক লাফে পিছিয়ে কিটসনের মুখোমুখি সে দাঁড়ালো।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর দাঁত বের করে নিঃশব্দে ব্লেক হেসে উঠলো।

ব্লেক হালকা স্বরে, তাহলে তাই হোক। তুমিই যখন আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনলে তখন আমি আর কী করতে পারি। তোমাকে টিট করার ইচ্ছেটা আমার বরাবরের। সুতরাং সুযোগ যখন পেয়েছি আজ তোমাকে সমঝে দেবো লড়াই কাকে বলে। শালা—

কিটসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিটসন মুখ লক্ষ্য করে একটা ঘুষি চালালো। ব্লেক চকিতে মাথা সরিয়ে নিলো আর ঘুঁষিটা কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। সে চট করে বসে পড়লো। কিটসনের ডান হাতের আড়াল কাটিয়ে তার বজ্রমুষ্টি সশব্দে প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁজরে আছড়ে পড়লো। আকস্মিক আঘাতে কিটসনের দম যেন বন্ধ হয়ে এলো। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

ব্লেক এগিয়ে আসতেই কিটসনের বাঁ-হাতি ঘুঁষি তার মাথায় আঘাত করলো। ব্লেকের শরীর টলে পড়লো।

একই সঙ্গে দুজন এগিয়ে আসতেই ওরা অন্ধ লক্ষ্যে ঘুঁষি চালাতে লাগলো। কয়েকটা গায়ে মুখে আঘাতও করলো। এইভাবে সাবধানী ভঙ্গিমায় ওদের 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' চললো।

ব্লেক হিংস্রভাবে কিটসনের বুক লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষিটা মারলো।

কিটসন জোরালো ঘুঁষির নিরেট আঘাত সইতে পারলো না। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে

পড়লো।

ব্লেক হিংস্রভাবে এগিয়ে এসে আর একখানা ঘুঁষি কিটসনের ঘাড়ে বসিয়ে দিলো। কিটসন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লো।

ব্লেক পিছিয়ে দাঁড়ালো।

কিটসন হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসলো। দেখলো, ব্লেক তার দিকে আবার এগিয়ে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে সে ব্লেকের হাঁটু লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো। দু হাতে ব্লেকের পা দুটো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো সে।

ব্লেক কিটসনকে নিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত ওরা দুজনেই শিথিল ভঙ্গিতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে রইল। তারপর কিটসন আচ্ছন্নভাবে ব্লেকের গলা টিপতে গেলে ব্লেকের ঘুঁষিতে কিটসনের হাত আলগা হয়ে গেলো। ব্লেক গড়িয়ে তার আওতার বাইরে চলে এলো।

এক মুহূর্ত ধরে ওদের ধস্তাধস্তি চললো। ব্লেক প্রাণপণে কিটসনের বাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা করলো, কিটসনও মরিয়া হয়ে ব্লেকের হাত ধরলো।

ব্লেক নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাঁ-হাতে ক্ষিপ্র ঘুঁষি চালালো। কিটসন কোনোরকমে ঘুঁষিটাকে এড়িয়ে তার পাঁজরে ঘুঁষি বসিয়ে দিলো, ব্লেক যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলো।

কিটসন সাফল্যের আশায় এগিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালালো ব্লেকের মাথা লক্ষ্য করে।

ব্লেক অস্ফুট শব্দ করে পিছালো।

এবার কিটসনের বাঁ-হাতি ঘুঁষি তার মাথায় পড়তেই ব্লেক চোখে অন্ধকার দেখলো। দু হাত শূন্যে তুলে ব্লেক আরো কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

কিটসন তার চোয়ালে সংঘর্ষ অনুভব করলো। তারপরেই তার মস্তিষ্কে শ্বেত তপ্ত কিছুর বিস্ফোরণ ঘটলো। কিটসন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পাথরের টুকরোর আঘাতে তার মুখ কেটে গেলো, যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে চিত হয়ে গড়িয়ে পড়লো। তারপর আপ্রাণ চেষ্টার পর মাথা তুলে দেখলো।

ব্লেক জিপোর দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

কিটসন টলতে টলতে উঠে ব্লেকের কাছে এগিয়ে গেলো।

ব্লেকের শীতল নির্বিকার স্বর, ও মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত হতভাগাটা আমাদের এভাবে বোকা বানালো।

জিপোর পাশে কিটসন হাঁটু গেড়ে বসে ওর শীতল হাতটা তুলে নিলো নিজের হাতে।

প্রশান্তির ছাপ জিপোর মুখমণ্ডলে। ক্ষুদে ক্ষুদে কালো চোখ জোড়া পরম নিশ্চিন্ততায় নীলাকাশে নিবদ্ধ।

কিটসন শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে ভাবলো, জিপোর মৃত্যুর পর ট্রাকের তালা খোলার ক্ষীণতম আশাও নেই। দশ লক্ষ ডলার এখন মরীচিকা! হাতের মুঠোয় পৃথিবী। হুঁ, তাই-ই বটে। মরগ্যান প্রথমেই করেছে চরম গলদ, আজ যদি ফ্র্যাঙ্ক থাকতো, তবে সে তার ভুলের নিষ্ঠুর পরিণতি দেখতো।

ব্লেক কিটসনকে ডাকলো, চলে এসো, ও মারা গেছে। ওর জন্য আমাদের আর কিছুই করার নেই।

মৃত জিপোর মুখে তাকিয়ে চুপচাপ তার হাত ধরে কিটসন যেন শেষ সান্ত্বনা দিতে চাইলো।

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে দীর্ঘ পথ ধরে লুকানো ট্রাকের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলো।

।। এগারো ।।

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড হ্রদের কাছেই বসে ছিলো। একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলো। এমন সময় দুজন লোককে সামনের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো।

সবেমাত্র প্রাতঃরাশ সেরে ব্র্যাডফোর্ড একটু বিশ্রাম করছিলো। একটু আগেই তার স্ত্রী ও ছেলে হ্রদের দিকে বেড়াতে গেছে। সে একটু পরে যাবে। এমন সময় আগন্তুক দুজনকে দেখে ব্র্যাডফোর্ড অবাক হলো।

একজনের পরনে সৈন্যবাহিনীর মেজরের পোশাক, দ্বিতীয় জনের পরনে সস্তা ছাই রঙের স্যুট, মাথায় টুপি।

মেজরের চেহারা বেঁটেখাটো। তামাটে, লম্বা মুখ, ঠোঁটের ওপর টানা মিলিটারী মার্কা গোঁফ। নীল চোখে অন্তর্ভেদী কঠিন দৃষ্টি।

মেজরের সঙ্গী যথেষ্ট লম্বা, ভারী রক্তিম মুখমণ্ডল যেন পাথর খোদাই করে বসানো। চোখমুখে তীক্ষ্ণতা, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়তো কোনো সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার হবে।

সামনে এসে মেজর ব্র্যাডফোর্ড?

ব্র্যাডফোর্ড উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, কিন্তু...কি ব্যাপার বলুন তো?

ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র?

না, সে আমার ছেলে—কিন্তু ওর সঙ্গে আপনাদের কি দরকার?

আমি মেজর ডিলেনি, ফিল্ড সিকিউরিটি। আর ইনি হলেন লেফটেন্যান্ট কুপার, সিটি পুলিশ।

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। কিন্তু আপনারা কি আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চান?

হ্যাঁ, কোথায় সে?

ও তার মার সঙ্গে হ্রদের ধারে বেড়াতে গেছে। কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো?

ডিলেনি তাকে আশ্বাস দিলো, চিন্তা করার কিছুই নেই ; মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। আমরা শুধু ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

এমন সময় জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড শিস দিতে দিতে এসে হাজির। কিন্তু বাবার সামনে দুজনকে দেখে শিস দেওয়া বন্ধ করে সতর্ক হয়ে গেল।

ব্র্যাডফোর্ড বললো, ঐ যে, ও এসে গেছে। এই—জুনিয়র, এদিকে এস। তোমার মা কোথায়? তাকে যে দেখছি না!

মা হ্রদের ধারে বসে আড্ডা দিচ্ছে!

ডিলেনিই প্রথম প্রশ্ন করলো, তুমিই কি ফ্রেড ব্যাডফোর্ড, জুনিয়র?

ঠিকই ধরেছেন।

পকেট থেকে একটা খাম বের করে দেখিয়ে এটা কি তোমার লেখা? এই চিঠিটা? ছেলের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা ব্র্যাডফোর্ড চিনতে পারলো কিন্তু কি লিখেছে বুঝতে পারলো না।

হ্যাঁ—আমারই লেখা।

সে মাটিতে উবু হয়ে বসে শতছিন্ন শোলার টুপিতে ঘাস ভরলো।

অবাক হয়ে ব্র্যাডফোর্ড বললো, আমার ছেলে আপনাদের চিঠি দিয়েছে?

হ্যাঁ, সে পুলিশ সদরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, লুকোনো ট্রাকটার হদিশ সে জানে।

জুনিয়র। একি করেছো তুমি! তুমি ভালোভাবেই জানো, লুকোনো ট্রাকের হদিস তুমি জানো না। তবে কেন...

ছেলেটা বাবার দিকে একবার অবজ্ঞাভবে তাকিয়ে আবার টুপিতে ঘাস ভরার কাজে মন দিলো। এবার ঘাসভর্তি টুপিটা তার মাথায় ভালো করে চেপে বসালো। তারপর গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালো।

সে নিজের মনে বলে চললো, এভাবে টুপিটা পড়া ছাড়া উপায় নেই। নইলে সব ঘাস পড়ে যেতো। এতে আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের আবিষ্কার।

ডিলেনি ও কুপার পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর ডিলেনিই আদর মাখানো সুরে. ট্রাকটা কোথায় আছে, খোকা? ছেলেটা টুপিটা আরো টেনেটুনে শক্ত করে মাথায় বসিয়ে গম্ভীর সুরে বললো, ট্রাকটা কোথায় লুকোনো আছে, আমি জানি।

সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু কোথায় আছে ওটা?

জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড স্থির। অপ্রতিভ চোখে মেজরের দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু পুরস্কারের কি হবে?

ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরে, 'শোনো জুনিয়র, তুমি ট্রাকের কোনো খবরই জানো না। তাহলে এদের শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো কেন? এতে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে—

ছেলেটা শান্তস্বরে জবাব দিলো, ট্রাকটা কোথায় আছে সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু

পুরস্কারের টাকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত একটা কথাও আমি বলছি না।

ডিলেনির স্বর তীক্ষ্ণ হলো, শোনো খোকা, যদি সত্যি সত্যিই ট্রাকের খবর তোমার জানা থাকে তো চটপট বলে ফেলো। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন, আমাদের সময় নষ্ট করার মতলব থাকলে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।

সরাসরি ছেলেটা জবাব দিলো, ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানের ভেতরে লুকোনো আছে।

ব্র্যাডফোর্ড অধৈর্য হয়ে, ওঃ, আবার সেই একই কথা। ও ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে হাজারবার আলোচনা করেছি। যেমন আমিও জানি, তেমন তুমিও জানো যে....

ডিলোনি বাধা দিলো, একমিনিট মিঃ ব্র্যাডফোর্ড ; যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কথা বলার সুযোগটা আমাকেই দিন। খোকা, তুমি বুঝলে কি করে যে ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানের ভেতর লুকোনো আছে?

জুনিয়র বললো, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ক্যারাভ্যানটা যাতে ট্রাকের ওজন বইতে পারে, সে জন্যে ওরা ক্যারাভ্যানের তলায় দুটো চওড়া ইস্পাতের পাত লাগিয়েছে।

ওরা? তার মানে কারা?

যারা ট্রাকটা চুরি করেছে। আমি তাদের কথাই বলছি।

তার মানে তুমি ট্রাকটাকে নিজের চোখে দেখেছো?

ছেলেটা মাথা নাড়লো এবং চিন্তিত মুখে টুপিটা খুলে নিলো।

প্রথম প্রথম এটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘাস গুলো গরম হয়ে যায়। নাঃ, আবার নতুন করে ঘাস ভরতে হবে দেখছি—

সুতরাং আবার সে তার স্ব-আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মন দিলো।

ডিলেনির কণ্ঠস্বর উত্তেজিত, ট্রাকটাকে তুমি কোথায় দেখেছো?

মেজরের কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটা মুঠো মুঠো ঘাস ছিঁড়ে টুপিতে ভরতে লাগলো। আমার কথা তোমার কানে গেছে?

কি বললেন?

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ট্রাকটা কোথায় রয়েছে?

ঘাস ভরতে ভরতেই ছেলেটা বললো, আমার বাবা বলছিলো, পুলিশ না কি আমাকে পুরস্কারের টাকাটা দেবে না। নিজেরাই ওটা মেরে দেবে।

ব্র্যাডফোর্ডের দিকে কুপার কটমট করে তাকালো। ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরে ছেলেকে তিরস্কার করলো। 'আমি মোটেই ও-কথা তোমাকে বলিনি। এভাবে কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা শিস দেওয়ার মতো বিচিত্র শব্দ করলো। তারপর বললো, কি মিথ্যেবাদী। তুমিই তো বললে ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানে লুকোনো আছে একথা পুলিশকে জানালে ওরা ভাববে আমরাই সেটা চুরি করেছি। তারপর বললে না, সব পুলিশই এক-এক নম্বরের চোর—

ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে ডিলেনি একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো, হুম—

কুপার গর্জন করে উঠলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার বাবা কি বলেছে না বলেছে বাদ দাও। ট্রাকটা কোথায় দেখেছো সে কথাই আগে বলো।

অত্যন্ত সতর্কভাবে ছেলেটা টুপির ওপর ঝুঁকে মাথাটা ভেতরে গুঁজে দিয়ে শক্ত করে এঁটে দিলো।

ছেলেটা সরাসরি লেফটেন্যান্টের চোখে তাকিয়ে, পুরস্কারের টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর কিছুই বলবো না।

কুপারের মুখভাব কঠিন হলো। তাই নাকি, আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমরা দুজন আগে থানায় চলো। তারপর দেখবো। যদি দেখি যে এতোক্ষণ ধরে তুমি শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেছো, তাহলে...

কুপারকে হাত দিয়ে ডিলেনি সরিয়ে, দেখি সরো, আমাকে কথা বলতে দাও। শোনো খোকা,

ট্রাকটা খুঁজে বার করার ব্যাপারে যে পুলিশকে খবর দিতে সাহায্য করবে, সেই-ই পাবে পুরস্কারের টাকাটা। এর মধ্যে পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্নই নেই। তোমার দেওয়া খবর যদি আমাদের ট্রাকটা খুঁজতে সাহায্য করে তবেই তুমি পুরস্কারের টাকাটা পাবে। এতে অবিশ্বাসের কি আছে?

সত্যি বলছেন?

মেজর ঘাড় নাড়ালো, সত্যি বলছি।

পুরস্কারের টাকাটা আমার বাবাকে দেবেন না তো? আমার হাতেই দেবেন?

হ্যাঁ তোমাকেই দেবো।

পাঁচ হাজার ডলার?

হ্যাঁ—'ছেলেটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে।

ঠিক বলছেন তো? ট্রাকের খবর দিলে টাকাটা আপনি আমাকেই দেবেন?

মেজরের মুখে আকর্ণ বিস্তৃত আন্তরিক হাসি, আমি ঠাট্টা করছি না, খোকা। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা কখনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাদের কথার দাম আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর জুনিয়র ব্র্যাডফোর্ড মনস্থির করে বললো, 'আচ্ছা, তাহলে বলছি। ওরা মোট চারজন আছে তিনজন পুরুষ, একজন মেয়ে। তিনজনের মধ্যে দুজন সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানের ভেতরেই থাকতো। শুধু রাত্রি হলেই বাইরে বেরোতো। একদিন রাতে আমি ওদের দুজনকে ক্যারাভ্যান ছেড়ে বেরোতে দেখেছি। ওদের গাড়ির নম্বরও আমার কাছে রয়েছে। ওরা বলছিলো, এর পর স্ট্যাগ হ্রদের দিকে বেড়াতে যাবে কিন্তু সব মিথ্যে কথা। আমি দেখেছি ওরা স্টাগ হ্রদে যাবার রাস্তায় না গিয়ে বড় রাস্তার দিকে গেছে। ক্যারাভ্যানটার রঙ সাদা, কিন্তু ছাদটা নীল রঙের! ছেলেটা নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ডিলেনির দিকে এগিয়ে দিলে, ওদের গাড়ির নম্বরটা এই কাগজেই লেখা আছে।

ডিলেনি পাতাটা সযত্নে পকেটে রাখতে রাখতে, কিন্তু ট্রাকটা যে ক্যারাভ্যানে আছে, সেটা জানলে কি করে?

ওদের দুজন যখন ভোরবেলা ক্যারাভ্যানে ঢুকছিলো, তখনই আমি দেখেছি। ট্রাকটা দেখবার জন্যেই তো আমি অতো ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম—

কিন্তু ওটাই যে হারানো ট্রাক সেটা তুমি বুঝলে কি করে?

হারানো ট্রাকের বিবরণ আমি খবরের কাগজে পড়েছি। ওই ট্রাকটাই সেই হারানো ট্রাক, স্পষ্ট দেখেছি।

ওরা এ জায়গা ছেড়ে কখন রওনা হয়েছে?

কাল দুপুরে। ওরা যখন যায় তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। স্ট্যাগ হ্রদের রাস্তার দিকে ওরা যায় নি। গেছে পাহাড়ী এলাকার দিকে।

ডিলেনি কঠিন ভাবে, ওঃ, তাহলে তো অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। তুমি তোমার বাবাকে বলে আমাদের সদরে ফোন করতে পারতে—!

বলেছিলাম বাবাকে। কিন্তু বাবা নিজেও ফোন করবে না, আমাকেও করতে দেবে না। তাই শেষ পর্যন্ত চিঠিই দিতে হলো। বাবা খালি বলছিলো, সব পুলিশের লোকই এক নম্বরের চোর।

কুপার এবং ডিলেনি একই সঙ্গে ফিরে তাকালো ব্র্যাডফোর্ডের দিকে। কটমট করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো।

ব্র্যাডফোর্ড ঢোক গিললো। নীচু স্বরে জবাব দিলো, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। ওর ধারণাকে অপরিণত মস্তিষ্কের কল্পনা ভেবে.....

থাক, হয়েছে। রূঢ় স্বরে ব্র্যাডফোর্ডকে থামিয়ে দিলো ডিলেনি। ফিরলো জুনিয়রের দিকে, 'ওই লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা তুমি দিতে পারবে, খোকা?

নিশ্চয়ই—বললো সে, এবং কিটসন, জিনি, জিপো ও ব্লেকের নিখুঁত শারীরিক বর্ণনা গড়গড় করে বলে গেলো।

কুপার ওদের চেহারার বর্ণনা টুকে নিলো।

এই তো লক্ষ্মী ছেলে। ডিলেনি উৎসাহভরা সুরে বলে উঠলো, তুমি একটা কাজের মতো কাজ

করেছো। যদি ট্রাকটা আমরা খুঁজে পাই, তাহলে তুমি যাতে পুরস্কারের টাকাটা পাও সেজন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

নিশ্চিন্ত থাকুন ; ট্রাক আপনারা খুঁজে পাবেনই। মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঝেড়ে-ঝেড়ে ঘাসগুলো ফেলে দিলো ছেলেটা. উঁহু, এই কায়দাটা তেমন জুতসই নয়। বড্ড তাড়াতাড়ি এটা গরম হয়ে যাচ্ছে।

কুপার দাঁত বের করে হাসলো, এক কাজ করো, ঘাসের বদলে বরফ দিয়ে দেখো কাজ হবে। জুনিয়রের মুখে হতাশা নেমে এলো।

নিতান্তই অবাস্তব। গম্ভীর স্বরে বললো সে, বরফ গলে যাবে না?

ডিলেনি ওর কাঁধ চাপড়ে দিলো, আমি একটা পথ বাতলাতে পারি, তোমার টুপির ওপরটা কেটে ফেলো। তাহলে স্বাধীনভাবে হাওয়া চলাচল করতে পারবে, মাথাও ঠাণ্ডা থাকবে। তাছাড়া, কে বলতে পারে যে আগামী যুগে এটাই একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াবে না!

ছেলেটা কিছুক্ষণ প্রস্তাবটা ভেবে দেখলো, তারপর মাথা নাড়লো, এটার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে। দেখি, চেষ্টা করে দেখতে হবে। হয়তো এ থেকে বেশ কিছু টাকাও জমিয়ে ফেলতে পারি—

গাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে ডিলেনি বললো, পাহাড়ের ওপরে.... একমাত্র ঐ জায়গাটাই আমরা এখনো খুঁজতে বাকি রেখেছি। ওখানে ওরা থাকলেও থাকতে পারে।

অসম্ভব। কুপার দৃঢ় স্বরে বলে উঠলো, আমার যদি একবারও মনে হতো যে ওরা ওখানে লুকিয়েছে, তাহলে এতোদিনে ও জায়গাটাকে তুলোধোনো করে ছাড়তাম। কারণ ঐ রাস্তা বেয়ে কারো পক্ষেই ওপরে ওঠা সম্ভব নয়—ভারী ট্রাক নিয়ে তো দূরের কথা! কয়েক সপ্তাহ আগে এক প্রচণ্ড ঝড়ে এ রাস্তার কিছুটা অংশ একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে।

কিন্তু একমাত্র ঐ পাহাড়ী এলাকা ছাড়া আর কোনো জায়গাই তো আমরা খুঁজতে বাকি রাখিনি।.....হোক অসম্ভব, তবু আমি একবার খুঁজে দেখতে চাই। হয়তো ভাগ্যের জোরে ওরা ট্রাক নিয়েই ও রাস্তাটা উৎরে গেছে।

গাড়িতে উঠে কুপার ইঞ্জিন চালু করলো।

তুমি পুরস্কারের জন্য সত্যি-সত্যিই ঐ বাচ্চাটার নাম সুপারিশ করবে নাকি? সে প্রশ্ন করলো।

কুপারের পাশে ডিলেনি আয়েস করে বসলো। তার চোখে দূরাভিসারী শূন্যদৃষ্টি, একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে কি করবে বলতে পারো? মাঝখান থেকে ওর গেছো বাপটা ঐ টাকাগুলো পকেটস্থ করবে। কুপারের দিকে ফিরে তাকালো ডিলেনি, মুখে দুর্জ্ঞেয় হাসি, পুরস্কারের টাকাটা কে পাবে সেটা আমরা ভালোভাবেই জানি, তাই না? পুরস্কারের শর্তে স্পষ্টই লেখা আছে, যে বা যারা ট্রাকটা খুঁজে বার করবে টাকাটা তারাই পাবে। আমার ধারণা তুমি আর আমিই সেটা খুঁজে বের করতে চলেছি ; অতএব...

কুপার সশব্দে হাঁপ ছাড়লো, ওঃ, তুমি যেভাবে ঐ বাচ্চাটাকে বোঝাচ্ছিলে, আমি তো ভাবলাম বুঝি সত্যি-সত্যি...

ডিলেনি জানালো, বাচ্চাদের পেট থেকে কিভাবে কথা বার করতে হয় তা আমার জানা, ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় একাগ্র এবং আন্তরিক হতে হবে, নইলে ওরা তোমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না।...তাছাড়া, তুমি তো জানো, আমি বরাবরই একাগ্র এবং বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে ভালোবাসি। উঁচু গলায় হেসে উঠলো সে।

কিটসন যখন তাঁবুতে ফিরলো তখন নটা বেজে গেছে। জিপোর বেলচাটা কাঁধে ফেলে শ্লথ ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো। গায়ের জামা ঘামে ভেজা।

গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে ছিলো জিনি। মুখ ফ্যাকাশে, সবুজ চোখে জল চিকচিক করছে।

ব্লেক ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের বাইরে বের করেছে। ট্রাকের দরজার গায়ে কান পেতে সে ডান হাতে কম্বিনেশন চাকতিটা ঘুরিয়ে চলেছে। অত্যন্ত সর্তক ভঙ্গীতে, ধীরে ধীরে সে চাকতিটা ঘোরাচ্ছে—সম্ভবতঃ জিপোর পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাইছে।

কিটসন বেলচাটা লাগিয়ে জিনির দিকে এগিয়ে গেলো। ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসলো. কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালো।

জিনি হাত রাখলো কিটসনের কাঁধে।

ওঃ, কি ভাবেই না বেচারা মারা গেলো : জিনির হাতের ওপর হাত রাখলো কিটসন, কিন্তু ওর জন্য আমাদের কিছুই করার ছিলো না। জিপো যখন মারা যায়, আমি আর ঐ ছুঁচোটা মারামারিতে মত্ত। অবশ্য এমনিতেই ওকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না, তার আগেই ও মারা যেতো।

ওসব নিয়ে আর ভেবো না, আলেক্স।

তারপর ওর দেহটা কবর দেওয়া-জিপো বড় ভালো লোক ছিলো, জিনি। ওর কথা শোনা উচিত ছিলো। এ কাজে জিপো হাত দিতে চায়নি। আমাকেও নিরস্ত করার জন্য কম চেষ্টা ও করেনি। এখন ভাবছি ; ওর কথা শুনলেই ভালো হতো।

হ্যাঁ।

ও বলেছিলো, এ কাজের ফল কোনোদিনই ভালো হবে না ; সেটা যে কতো বড় সত্যি কথা, তা আজ আমি বুঝতে পারছি। চলো জিনি—আমরা এখান থেকে চলে যাই ; তুমি আর আমি। অন্ধকার হলেই আমরা রওনা হবো।

তাই চলো। এ সবই আমার দোষ, আলেক্স, এর জন্য নিজেকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবো না। এতো সবের মূলে একমাত্র আমি। তুমি যখন জিপোকে কবর দিতে গেলে, তখন থেকে খালি ভাবছি। এখন বুঝতে পারছি খুব ভুল করেছি আমি। কতো অন্যায়, এখন ট্রাক যদি খোলাও হয়, তবু একটাও টাকা ছোঁবো না।

তাহলে তুমি আসতে রাজী? জিনির দিকে না তাকিয়ে কিটসন বললো, আমরা নতুন করে জীবন শুরু করবো, জিনি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

তুমি চাইলে আমার আপত্তি নেই! ও জবাব দিলো, কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সত্যিই কি আমরা পালাতে পারবো? আজ না হয় কাল আমাদের ধরে ফেলবেই।

কিটসন সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো।

কে জানে, হয়তো পারতেও পারি। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? আমরা বুইকটা নিয়ে সোজা মেক্সিকো সীমান্তের দিকে রওনা দেবো। পুলিশ আমাদের চেহারার বিবরণ জানে না। যদি আমরা মেক্সিকোয় পৌঁছতে পারি....

এই কিটসন! এদিকে এসো! ব্লেক ডেকে উঠলো, কি হচ্ছে ওখানে বসে? এখানে এসে কাজে হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো।

কিটসন উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো ট্রাকের দিকে।

তুমি অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে জানো? ব্লেক প্রশ্ন করলো। তার মুখমণ্ডল কঠিন, যেন পাথরে খোদাই করা। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

না, জানি না।

তাহলে এখন থেকেই শিখতে শুরু করো, এই হতচ্ছাড়া বাক্সটা আমাদের তালা গলিয়ে খুলতে হবে। এসো, সিলিণ্ডারগুলো ঠিক করে ধরো।

ও আমার দ্বারা হবে না। কিটসন জবাব দিলো।

ব্লেক তার দিকে তাকালো, 'তার মানে? এই ট্রাকটা আমাদের যে খুলতেই হবে, তাই না?'

ওতে আমার উৎসাহ নেই। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। তোমার দরকার থাকে তুমি খোলো। যদি খুলতে পার, সমস্ত টাকাই তোমার। কেউই ভাগ বসাতে যাবে না। আমি এই ঝামেলায় আর থাকতে চাই না।

ব্লেক বললো, শালা ভীতুর ডিম। বুঝতে পারছো না, এটা আমার পক্ষে একা সামলানো সম্ভব নয়। ফালতু না বকে এসে আমাকে সাহায্য করো।

অন্ধকার হলেই এখান থেকে আমি ও জিনি চলে যাচ্ছি। তুমি তোমার খুশিমতো পথ বেছে নাও। কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি, নিশ্চিত জেনো।

ব্রেক খেঁকিয়ে উঠলো। ও-তাই বুঝি? তোমরা দুজন...ও শেষ পর্যন্ত জিনিকেও কব্জা করেছো? কিন্তু তাই বলে দশ লক্ষ ডলারকে পায়ে ঠেলে চলে যাবে এ কেমন কথা। তোমার নিশ্চয়ই মাথার কোনো ঠিক নেই। তাহলে তোমরা এক দীর্ঘ পদযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।

আমরা বুইকটা নিয়ে যাচ্ছি।

সে তো তুমি ভাবছো। কিন্তু বুইকটা আমার কাজে লাগবে। আর আমি যাবার জন্য প্রস্তুতও নই। আর কিছু করি না করি, এই ট্রাকের তালা আমি খুলবোই। ভেবো না, তোমার মতো কোনো ডরপোক ভেড়ুয়া বা তার পেয়ারের তওয়ায়েফ আমাকে রুখতে পারবে। সোজা কেটে পড়ো, আমি বাধা দেবো না। তবে বুইক নয়, শ্রীচরণ ভরসা করেই বিদেয় হও। গাড়ি আমি ছাড়ছি না।

ব্রেক আড়চোখে দেখলো জিনি উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ব্রেক একা—তার প্রতিদ্বন্দ্বী একাধিক। তাছাড়া, জিনির কাছে হয়তো রিভলবারও আছে।

শান্ত স্বরে কিটসন বললো, আজ রাতেই আমরা চলে যাচ্ছি। এবং গাড়ি নিয়েই যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে বড় রাস্তা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসতে পারো। কিন্তু তারপরে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

ইতস্ততঃ করে ব্রেক জিনির দিকে তাকালো। নিশ্চলভাবে ও দাঁড়িয়ে ডান হাত শরীরের আড়ালে নামালো।

ব্রেক ভাবলো—এখন সে যদি ঠিকমতো প্যাঁচ না কষতে পারে তাহলে ওরা দুজনে তাকে খুন করবে। সে কিটসনকে লক্ষ্য করে বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যা বলছো তাই হবে। তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা ট্রাকটা খোলার চেষ্টা করতে পারি হয়তো খুলে যেতেও পারে। এসো, সিলিণ্ডারগুলো ধরো—কাজের সাহায্য করো।

ঠিক আছে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

এক পলক জিনিকে দেখলো ব্রেক, 'দেখাই যাক না। তোমার বড় বেশী উপদেশ দেওয়ার স্বভাব, আলেক্স। এসো, কাজে হাত লাগাও।'

কিটসন ক্যারাভ্যানের দিকে পা বাড়াতেই ব্রেক কিটসনের পেটে রিভলবার চেপে ধরলো।

ব্রেক জিনিকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'রিভলবারটা ফেলে দাও নইলে তোমার হবু বরের পেট ফুটো করে ছাড়বো।

জিনির হাত থেকে রিভলবার খসে পড়লো, ব্রেক দুজনকে রিভলবারের আওতায় রেখে পিছিয়ে জিনিকে বললো, সরে যাও রিভলবারের কাছ থেকে।

জিনি কিটসনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ব্রেক জিনির রিভলবারটা তুলে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

এবারে শোনো। এই ট্রাকটা আমরা খুলবোই। ট্রাক না খোলা পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে আমরা নড়ছি না। তোমরা এ টাকা না চাইতে পারো। কিন্তু আমি চাই। আলেক্স যাও। ভেতরে গিয়ে সিলিণ্ডারগুলো বের করো।

কিটসন ক্যারাভ্যানের দিকে পা বাড়িয়ে বললো, এ কাজ আমার একার সম্ভব নয়। গাড়িতে এগুলো তোলার সময় জিপো আমাকে সাহায্য করেছিলো। তুমি অন্য দিকটা না ধরলে হবে না।

ব্রেক রিভলবার খাপে ঢুকিয়ে, কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করো না, আলেক্স, ফল খারাপই হবে।

কিটসন সিলিণ্ডারের এক প্রান্ত ধরে টানলো। ব্রেক অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের কাঁধ পাতলো। তারপর দুজনে অতি সাবধানে এক পা এক পা করে বাইরে এলো।

কিটসন বাইরে এসেই আচমকা সিলিন্ডারের এক প্রান্ত কাঁধ থেকে ফেলে দিলো। সিলিন্ডারের প্রান্তটা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়লো। এই অতর্কিত আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে ব্রেক ছিটকে পড়লো।

কিটসন ডান হাতি ঘুঁষিতে ব্রেকের ঘাড়ে সজোরে আঘাত করলো—সে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

ব্রেক রিভলবার বের করার চেষ্টা করলো কিন্তু কিটসনের শরীরের তেরো স্টোন ওজন তার

ওপর চেপে বসলো।

বন্যজন্তুর মতো ওরা যুঝে গেলো। একসময় ব্লেক হাঁটু ভাঁজ করে কিটসনের বুকে আঘাত করলো—ছিটকে ফেলে দিয়ে রিভলবার বের করতেই কিটসন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

ব্লেকের রিভলবার ধৃত হাত আঁকড়ে ধরে কিটসন সপাটে ব্লেকের মুখে আঘাত করলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা ব্লেকের হাত থেকে খসে পড়লো।

কিটসন রিভলবার কুঁড়িয়ে উঁচিয়ে ধরেছে ব্লেকের দিকে।

ব্লেক নৃশংস স্বরে, এর বদলা আমি নেবোই।

তোমার বদলা নেবার দিন চলে গেছে, এড।

সহসা সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটা ছোট বায়ুযান হাওয়ার ঝাপটায় ঘাসের শীষগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে উপত্যকা অভিমুখে উড়ে গেলো।

ব্লেক চাপা স্বরে বললো, ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। এখুনি ওরা উঠে আসবে এই পাহাড়ে, আমাদের পিছু নেবে।

ওরা তিনজন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে দেখলো বহুদূরে একটা ছোট বৃত্তাকার পথে বাঁক নিয়ে প্লেনটা আবার তাদের দিকে ফিরে আসছে।

চিৎকার করে বললো ব্লেক, শীগগির লুকিয়ে পড়ো। বলেই অন্ধের মতো সামনের জঙ্গলের দিকে দৌড়লো।

কিটসন ও জিনি জঙ্গলের অন্য দিকে ছুটলো। ইতিমধ্যেই প্লেনটা তাদের মাথার ওপর এসে গেছে। ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো, খোলা কক্‌পিট দিয়ে দুজন লোক ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

জিনি ও কিটসন পরস্পরের দিকে তাকালো।

ব্লেক চেঁচিয়ে, লুকিয়ে পড়ো, গর্দভ কোথাকার। বোকার মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

কিটসন বললো, জিনি, ওরা আমাদের দেখেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

হ্যাঁ। আমি তো আগেই বলেছিলাম। ওরা আমাদের ধরে ফেলবেই।

কিটসন শরীরকে যথাসম্ভব মাটিতে মিশিয়ে রাস্তা পার হলো। উপত্যকার কোল ঘেঁষে বেয়ে ওঠা রাস্তায় ক্ষীণ সাদা পটভূমিতে তার নজরে পড়লো বিপদের যান্ত্রিক রূপ।

প্রায় মাইল দশেক নীচে তিনটে গাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ছুটে আসছে। কিটসন জিনির কাছে ছুটে এলো, ওরা আসছে।

ব্লেক আড়াল থেকে বেরিয়ে, ওদের দেখা যাচ্ছে?

হ্যাঁ। যেভাবে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আসছে তাতে ওদের পৌঁছতে মিনিট দশেকের বেশী লাগবে না।

ব্লেক কাঁপা স্বরে, এখনো পালাবার সুযোগ আছে। শীগগির বুইকটা নিয়ে এসো। আমরা যদি একেবারে পাহাড়ের মাথায় চড়তে পারি। তাহলে এখনো বাঁচবার উপায় আছে।

কিটসন বললো, এখান থেকে মাইলখানেক ওপরে রাস্তা একেবারে ধসে গেছে। আমাদের হয়তো পাহাড় বেয়েই উঠতে হবে...

ব্লেক ক্যারাভ্যান থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা নিয়ে এলো, আমি প্রাণ থাকতে ওদের হাতে ধরা দিচ্ছি না। কারণ বিদ্যুৎ-চেয়ার আমার পছন্দ না।

কিটসন বুইকের দরজা খুলতেই জিনি তার পাশে উঠে বসলো। জিনির শরীর কাঁপছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

ব্লেক গাড়িতে উঠতেই কিটসন গাড়িটাকে চালিয়ে ঘাস জমি পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলো।

তিনজনে একবার দূরে দাঁড়ানো ট্রাকটাকে ফিরে দেখলো।

ব্লেক নৃশংস স্বরে বলল, ওই শালারা বলেছিল এটাই পৃথিবীর নিরাপদতম ট্রাক। এখন দেখছি কথাটা কেবল প্রচারের জন্য নয়।

কিটসন ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চললো। চোখের দৃষ্টি সামনেব রাস্তায় নিবদ্ধ। প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য রাস্তার বাঁকে গাড়ির চাকা পিছলে যেতে লাগলো।

কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় আবার উঠতে শুরু করা মাত্রই সামরিক বাহিনীর উড়োজাহাজটা চঞ্চল

হাউন্ডের মতো তাদের মাথার ওপরে ঘুরতে লাগলো।

ব্রেক খিঁচিয়ে উঠলো, ওই ব্যাটাকে যদি একবার নাগালের মধ্যে পাই। বলে ব্রেক শক্ত হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো।

দূর থেকে ভেসে আসা পুলিশ সাইরেনের একটানা কাতর আর্তনাদ ওরা শুনতে পেলো।

জিনি ভয়ে কেঁপে উঠলো।

গাড়ি সচল রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো কিটসনের। কারণ রাস্তাটা শত গর্ত এবং আলগা পাথরে কন্টকিত।

ওদের বাঁ দিকে খাড়া পাহাড়, যেন একটা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল। আর ডান পাশে অতল খাদ। নীচের উপত্যকা এখান থেকে একটা বোতামের মতো দেখাচ্ছে।

কিটসন গাড়ির গতিটা কমিয়ে আনলো, এভাবে আমরা আর বেশীদূর যেতে পারবো না। আর একটু পরেই আমরা সেই বিধ্বস্ত অংশের মুখোমুখি হবো।

কিটসন পরের বাঁকে মোড় নিতেই ব্রেক কষলো। বুইক থমকে দাঁড়ালো।

অসংখ্য পাথর, বুনো ঝোপ রাস্তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বুইককে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

ব্রেক স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটা নিয়ে অন্যদিকে না তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে, ছুটে গিয়ে পাথর ঝোপে-ঢাকা ঢিবিটা বেয়ে উঠতে লাগলো।

কিটসন তাকিয়ে দেখলো ওপরে অনেক ওপরে পাহাড়ের শুভ্র তুষারাবৃত চূড়া দেখা যাচ্ছে। জিনির হাত ধরে বললো, জিনি, আমরা ওই পথ বেয়ে ওপরে উঠবো। ওখানে হয়তো লুকোবার যথেষ্ট জায়গা থাকতে পারে। তাছাড়া ব্রেকের সঙ্গে গেলে আমাদের বাঁচবার আশাই থাকবে না।

জিনি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেলো, ও আমি পারবো না, আলেক্স। তুমি একাই যাও।

কিটসন জিনিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো।

গেলে আমরা দুজনে একসঙ্গেই যাবো। বলে সে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উঠতে লাগলো। প্রথম একশো গজ সহজেই উঠলো, জিনিরও তেমন অসুবিধে হলো না। থেকে থেকেই কিটসন থমকে পেছন ফিরে জিনিকে উঠতে সাহায্য করছে। হাত বাড়িয়ে ওপরে টেনে তুলছে।

ক্রমশঃ ওদের আরোহণের গতি কমে এলো এবং সাইরেনের শব্দও আগের চেয়ে অনেক তীব্র।

পাহাড়ের বন্ধুর তলের পটভূমিতে ওরা নিজেদের বড় অসহায় বোধ করলো। কিন্তু পঞ্চাশ গজ ওপরে গেলেই ওরা বিশাল পাথরের আড়ালে সহজেই আত্মগোপন করতে পারবে। কিটসন জিনিকে বারেবারেই তাড়া দিতে লাগলো।

জিনির ডান হাত একসময় আতঙ্কে পিছলে গেলো। কিন্তু কিটসন ওকে আঁকড়ে ধরে নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে তুললো।

অবশেষে ওরা পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে পৌঁছলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই এসে থামলো কতকগুলো গাড়ি ওদের ঠিক নীচেই।

ওরা নীচের রাস্তায় উঁকি মারলো কিন্তু রাস্তার একটা অংশ সামনের একটা ঝুলন্ত বিশাল পাথর আড়াল করে রেখেছে। কিটসন ডানদিকে দেখলো ব্রেক পাগলের মতো ছুটছে আর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। সামনের বাঁকে মোড় ঘুরতেই কিটসন তাকে আর দেখতে পেলো না।

কিটসন ওপরে তাকালো, সম্ভবতঃ বাঁচবার আশায়।

তাদের কাছ থেকে আরো অনেকটা ওপরে ছোট ঝোপঝাড়ের পর্দায় ঢাকা একটা চওড়া পাথরের আড়াল দেখে কিটসন ভাবলো, যদি ঐ পাথরের আড়ালে পৌঁছতে পারে তাহলে পুলিশের অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ও জিনি পরম নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে।

সে হাত বাড়িয়ে জিনির বাহু স্পর্শ করলো, এখন ওপরে উঠতে পারবে তো?

হ্যাঁ, চলো।

সামান্য কাছে সরে এলো জিনি। কিটসনের দেহে ওর উষ্ণ ঠোঁট জোড়ার মাধ্যমে অনুভূতি সঞ্চালিত হল।

আমি দুঃখিত, আলেক্স। এ সমস্তই আমার দোষে হয়েছে।

উহুঁ, আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই ফ্র্যাঙ্কের কথায় রাজী হয়েছিলাম। তবে দুঃখ এই, আমরা শেষ পর্যন্ত জিততে পারলাম না।

নীচে উত্তেজিত লোকজনের কথোপকথন ওদের কানে এলো।

কিটসন ফিসফিসিয়ে, ওরা নিশ্চয়ই বুইকটা খুঁজে পেয়েছে? চলো, এগোনো যাক।

আবার ওরা পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো।

জিনি ভাবলো, কিটসন যদি পদে পদে ওকে সাহায্য না করতো, তাহলে এই খাড়াই পাহাড় বেয়ে ওঠা কোনোমতেই সম্ভব হতো না।

জিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ওপরের একটা ছোট ছুঁচলো পাথরকে দুহাতে আঁকড়ে একটা গাছের শেকড়ে পা রেখে ও হাঁপাতে লাগলো, দু চোখ বোজা।

আমি আর পারছি না, আলেক্স। আর এক পাও ওঠার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি একাই ওপরে উঠে যাও। আমার জন্য সময় নষ্ট কোরো না।

আর মাত্র ফুট খানেক ওপরেই রয়েছে সেই পাথরের আড়ালটা।

তারপর জিনির দিকে চোখ নামাতেই সে দেখলো, দূরে বহুদূরে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অতল গভীরতার হাতছানি।

একটা ছোট্ট কাঁটাঝোপের শেকড়কে অবলম্বন করে কিটসন ঝুলতে লাগলো। ভয়ে সে চোখ বুজলো।

জিনি কিটসনের অবস্থা দেখে চমকে উঠলো।

আলেক্স!

কোনো ভয় নেই। হঠাৎ কিরকম মাথা ঘুরে গেলো। তুমি নীচের দিকে তাকিও না জিনি। এক মিনিট—আমাকে একটু সামলে নেবার সময় দাও।

মসৃণ দেওয়ালের গায়ে লেপটে থাকা দুটো নিঃসঙ্গ মাছির মতো ওরা স্থির হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরই আবার উঠতে শুরু করলো। পা রাখবার একটা জুতসই প্রশস্ত জায়গা খুঁজে পেতে তার দেরি হলো না।

দেখি, হাত ধরো।...এবার আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করো। ভয়ের কিছু নেই, আমি তো ধরে আছি।

না, আলেক্স। এতো করেও তুমি আমাকে টেনে তুলতে পারবে না, আমি তার আগেই হয়তো নীচে...

কিটসনের অধৈর্য সুর, যা বলছি করো। হাতটা বাড়িয়ে দাও।

ও আলেক্স। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি আর এভাবে ঝুলে থাকতে পারছি না। আমার হাতের বাঁধন হয়তো খুলে যাবে—

ওর হাতের বাঁধন আলগা হতেই কিটসন জিনির কব্জি চেপে ধরলো। জিনির আর্ত চিৎকার মিলিয়ে গেলো। ওর দু বাহুর শেষ প্রান্তে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগলো জিনি।

কিটসন জিনির শরীরের সমস্ত ওজন নিজের হাতে নিয়ে ঝুলে রইলো।

কিটসন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, জিনি! সাবধান! আমি পাহাড়ের গা ঘেঁষে তোমাকে ধরে থাকছি, তুমি পাথরের খাঁজে টাজে পা রাখবার চেষ্টা করো। তারপর তোমাকে সহজেই টেনে তুলতে পারবো। কোনো ভয় নেই। শুধু আমাকে একটু সাহায্য করো।

একটু পরেই কিটসন অনুভব করলো জিনির ওজন নেই—অর্থাৎ ও কোনো অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে।

কিটসন জিনির দিকে তাকিয়ে, ঠিক আছে—একটু অপেক্ষা করো।

দীর্ঘ এক মিনিট পর কিটসন বললো, আচ্ছা এবার এসো। বলে সে ওকে টেনে তুলতে শুরু করলো।

চওড়া পাথরটায় পৌঁছেই জিনি অবসন্নভাবে কিটসনের পাশে বসে পড়লো।

ওরা তখন গুলির শব্দ শুনতে পেলো। জিনি ভয়ে কুঁকড়ে গেলো।

গুলির শব্দটা এসেছে নীচের থেকে ওদের ডান পাশ থেকে।

কিটসন অতি সাবধানে ঝুঁকে দেখলো বুইকটা এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ি তিনটে নীচের রাস্তায় রয়েছে।

রাস্তার অবরোধের ঠিক পেছনেই অতি সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে দশজন সৈনিক ও তিনজন পুলিশ অফিসার।

সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বাঁকের আড়ালে রয়েছে ব্লেক। দুটো ছোট ছোট গোলাকার পাথরকে সে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে সামনে রেখেছে। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে ব্লেকের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নল।

ব্লেকের থেকে আরো পঞ্চাশ গজ দূরে একটা জীপ দাঁড়িয়ে পাশেই তিনজন সৈনিক—ব্লেকের আড়ালে।

জীপটা নিশ্চয়ই পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে উঠে এসেছে এবং ব্লেককে ফাঁদে ফেলেছে। ব্লেককে অনুসরণ না করে সে মনে স্বস্তি পেলো।

ব্লেকের সোজাসুজি একজন সৈনিক মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার মাথার একটা ক্ষত থেকে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে।

বাঁকটার কাছে এসে সৈনিকের দল থামলো—ব্লেকের দৃষ্টির আড়ালে। ব্লেকের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব মাত্র কুড়ি ফুট।

একজন বেঁটে খাটো মেজর তার সোনালী চুলে ঢাকা মাথাটা অতি সাবধানে সামনে উঁকি মারলো। কিন্তু মৃত সৈনিকটাকে দেখামাত্রই ব্যস্তসমস্তভাবে সে মাথাটা ভেতরে টেনে নিলো।

সে চিৎকার করে উঠলো, আমরা জানি, তুমি ওখানেই লুকিয়ে রয়েছো। অতএব মাথার ওপর হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে এসো। চুপচাপ বেরিয়ে এসে ধরা দাও।

জিনি আস্তে আস্তে কিটসনের পাশে এসে নীচে তাকালো।

মেজর চিৎকার করলো। তুমি নিজেই বেরিয়ে আসবে, না আমরা গিয়ে তোমাকে টেনে বার করবো?

ব্লেক নৃশংস, আতঙ্কিত স্বরে, আয় শালা, আমাকে ধরবি আয়। আয়—তারপর দেখ্, কেমন দাওয়াইটা তোদের দিই।

মেজর একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে কি যেন বলে আর একজন সৈনিকের কাছে এগিয়ে গেলো। তার সঙ্গে আলোচনার পর সৈনিকটি তার রাইফেল আর একজন সহকর্মীর হাতে তুলে দিলো। তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি কি একটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগলো।

কিটসন রুদ্ধশ্বাসে সব লক্ষ্য করে চললো।

রাস্তার বাঁকের কাছে পৌঁছেই সৈনিকটি থামলো।

মেজর আবার চিৎকার করলো, এই তোমার শেষ সুযোগ। এখনো বাইরে বেরিয়ে এসো।

ব্লেক একটা অশ্রাব্য খিস্তি করে উঠলো।

মেজর বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক।

সৈনিকটি সেই ছোট্ট জিনিসটাকে ছুঁড়ে দিলো। ওটা পাক খেতে খেতে নীচে পড়তে লাগলো।

জিনি কিটসনের কাঁধে মুখ ঢাকলো।

কিটসন চিৎকার করে ব্লেককে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো। তাহলে ওরা আমাদের উপস্থিতি জেনে যাবে।

ব্লেক যে পাথর দুটোর আড়ালে ছিলো, গ্রেনেডটা ঠিক তার সামনে গিয়ে পড়লো।

কিটসন দু হাতে মুখ ঢাকলো। গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দটা অস্বাভাবিক তীব্র শোনালো। ছোট ছোট আলগা পাথরগুলো গড়িয়ে পড়ার শব্দ কিটসনের কানে এলো।

এক হাতে জিনিকে আঁকড়ে ধরে সে আস্তে আস্তে ভেতরে সরে এলো।

কিটসনকে দু হাতে জাপটে ধরে জিনি থর থর করে কাঁপছে।

হঠাৎ একজন চিৎকার করলো, এখানে তো মাত্র একজন। আর দুজন তাহলে গেলো কোথায়? মেয়েটাও তো এখানে নেই!

কিটসনের চঞ্চল আঙুল তখন জিনির চুলে বিলি কেটে, ভয় পেয়ো না। ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না। এই পাথরের আড়ালে আমাদের খোঁজ করার কথা ওদের মাথায় আসবে না।

তখনই শুনতে পেলো কোনো বায়ুযান উড়ে আসার শব্দ।

কিটসন জানতো, ওপর থেকে নজর ফেললে তাদের খুঁজে পেতে সময় লাগবে না। কারণ মসৃণ পর্বতপৃষ্ঠে তাদের শরীর দুটো মিনারের মতোই প্রকট।

জিনি প্রাণপণে চেষ্টা করলো নিজের শরীরটা কিটসনের শরীরে মিশিয়ে ফেলতে। যেন কোনো আতঙ্কিত পশু দিশেহারা হয়ে তার গর্তে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

কিটসন আতঙ্কিত চোখে সম্মোহিতের মতো বায়ুযানটির দিকে চেয়ে রইলো।

প্লেনটা ওদের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে গেলো। ওপরে চোখ রাখতেই কিটসন দেখলো, প্লেন চালক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের দিকেই দেখছে।

কিটসন যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলো, প্লেনচালক তার বেতারযন্ত্রে খবর পাঠাচ্ছে। নীচের রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছে পলাতকদের সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

জিনির মুখটা আলতো করে তুলে ধরে কিটসন বললো, জিনি, আমার কথা শোন। ব্রেক ঠিকই বলেছিলো। কারণ এখন দেখছি মরণ কারাগারে যাবার ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু তোমার এখনো বাঁচবার সুযোগ আছে। তোমাকে ওরা দশ বছরের বেশী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে না। তোমার বয়েস অনেক কম। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে যাবে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। তুমি বরং এখানেই থাকো পুলিশের লোক এসে তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

আর তুমি?

আমি এখান থেকে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেবো। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ পৃথিবী ছেড়ে নিষ্ক্রমণের পথ। আমি কিছুতেই মরণ কামরায় পা রাখতে পারবো না।

আমরা একসঙ্গেই যাবো, আলেক্স। এতে আমি ভয় করি না। কিন্তু দশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনকে আমি ভয় পাই। আমরা একসঙ্গেই যাবো।

হঠাৎই কোনো স্বরবর্ধক যন্ত্রে একটা কর্কশ আদেশ ভেসে এলো। এই তোমাদের দুজনকে বলছি। নীচে নেমে এসো। আমরা জানি তোমরা পাথরের ওপরেই লুকিয়ে রয়েছো। আমরা রক্তপাত চাই না বলেই বলছি, চুপচাপ নেমে এসো।

তুমি থাকো, জিনি—

না। তা হয় না।

সামনে ঝুঁকে কিটসন জিনিকে সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরে আবেগ ভরে চুমু খেলো। জিনি, মনে আছে ফ্র্যাঙ্ক কি বলেছিলো? হাতের মুঠোয় পৃথিবী। কে জানে, আমাদের সেই ইচ্ছার বাস্তব রূপ বোধ হয় এই পরিণতি, হয়তো সে ইচ্ছাপূরণ এই পৃথিবীতে সম্ভব নয়। তার জন্য রয়েছে অন্য পৃথিবী যে পৃথিবীর সন্ধানে আমরা চলেছি।

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়ালো।

ওরা নীচের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো পুলিশ ও সৈনিকদের দিকে তাকালো। তাদের রাইফেলের নল উর্ধ্বমুখী।

কিটসন চিৎকার করে উঠলো, ঠিক আছে। আমরা আসছি।

সে জিনির দিকে তাকালো, তুমি কি প্রস্তুত?

জিনি আরো শক্ত করে কিটসনকে আঁকড়ে ধরলো, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, আলেক্স। আমি প্রস্তুত।

নীচের দাঁড়ানো লোকগুলো দেখলো, ওরা মসৃণ পাথরের আশ্রয় ছেড়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিলো। পাহাড়ের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে, এলোপাথাড়িভাবে সত্যি সত্যিই ওরা দুশো ফুট নীচের রাস্তায় নেমে আসতে লাগলো।

দি গিল্টি আর অ্যাফ্রেড

।। এক ।।

সেন্ট রাফাইল সিটি স্টেশনের বাইরে পা রাখতেই নজর কেড়ে নেয় সোনালী চুলের পুতুল পুতুল মেয়েটি। পরনে সাঁতারুর বিকিনি। চোখে মস্ত রোদ-চশমা। মাথা ঢেকেছে বিশাল খড়ের টুপি, আঁটো শরীরের ত্বক কোমল, মসৃণ শক্ত ছাদের ক্যাডিলাকে উঠতে কিছু সময় নেয় মেয়েটি।

ভঙ্গি যেন বলে—ওগো পুরুষ, মেটাও নয়ন তৃষ্ণা তোমার। আমারও দৃষ্টি আছড়ে পড়ে ওইখানে।

চালকের আসনে বসে রমনী। ভ্রূভঙ্গিতে অহঙ্কার। একবার চতুর্দিকে চেয়ে দ্যাখে তার কৃপাপ্রার্থী পুরুষ সাম্রাজ্য। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে গাড়ি। যেতে যেতে চোখের কোণায় আমায় দিযে যায় অভিসাবের নির্ভুল আমন্ত্রণ। আমার মালপত্রবাহক কুলি বলে—ভাড়া গাড়ি লাগবে বাবু?

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে বুলিয়ে নিয়ে বললাম—লাগবে।

সকাল সাড়ে দশটায় সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। ষ্টেশন থেকে স্রোতের মত ধেয়ে আসে অগণিত মানুষ। বাইরে অপেক্ষারত মোটর, ভাড়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি...। আশাকরি, জ্যাক নিশ্চয়ই হোটেলে আমার জন্য ঘর বুক করে রেখেছে।

একটা গাড়ি এসে থামতে কুলি আবার মালপত্র তুলে দিল। তাকে বকশিস দিয়ে গাড়িতে উঠে বললাম—হোটেল অ্যাদেল্ ফি চলুন।

গাড়ি ছুটছে যানজট ছাড়িয়ে, রাস্তাটি সমুদ্রাভিমুখী। দু-পাশে সুদৃশ্য দোকানপাট। পামগাছে‍র সারি। ইউনিফর্মধারী পুলিশ। হু হু করে ছুটে যাচ্ছে মস্ত ক্যাডিলাক। দুরন্ত মানুষ যান।

লাল আলোব সংকেতে গাড়ি থামে। জানলা দিয়ে দেখি, স্বাস্থ্যবতী রমনীবা চলেছে অধিকাংশের পরণে সাঁতারের পোশাক। কেউ কেউ পাজামা কিম্বা খাটো প্যান্ট পরেছে। আবার কারো পরণে ফ্রেঞ্চীয় সাঁতার বিকিনি, বেশীরভাগই স্থূলকায় মধ্যবয়স্কা রমনী। আঁটো পোশাকে স্পষ্ট তাদের স্তনবৃন্ত। জানলার বাইরে মুখ রেখে থুতু ফ্যালে ড্রাইভাব। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে—দেখেছেন, যেন শনিবারের হাট।

—জায়গাটা বেশ শহুর শহুর।

—তাই ভাবছেন? একবর্ণ মিথ্যে বলবো না। জানেন, পৃথিবীর যে কোনো শহবের চেয়ে ঢের বেশী ধনী লোক বাস করে এখানকার দু-মাইলের মধ্যে।

স্বীকার করলাম, কথাটা জানা ছিল না। ইশ্, যদি সঙ্গে আরো ডলার নিয়ে আসতাম। জ্যাকের কাছে ধার চাওয়া বৃথা।

সমুদ্রকে পিছনে রেখে খাড়াই পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি ছুটছে। দু-পাশে দ্রুত অপসৃয়মান কমলালেবুর গাছ আর রুক্ষ কঠিন পথ। আর কিছুক্ষণ পর গাড়ি থামলো কাঙিক্ষত হোটেলে।

বেজায় মোটা রিসেপশন ক্লার্ক দেঁতো হাসি হেসে খাতা কলম এগোলেন—রিজার্ভেশন আছে নাকি স্যার?

—আশা করি। আমার নাম লিউ ব্রান্ডন। মিস্টাব সিপ্পি কি আপনাকে বলেছেন আমি আসছি?

—অবশ্যই মিস্টার ব্রান্ডন, ওনার ঘরের পাশেই আপনার ঘর।

টেবিলে-ঘণ্টার বোতামে আঙুল রাখতেই ঘণ্টা বাজে। ছুটে আসে বয়। তিনি নির্দেশ দেন—মিস্টাব ব্রান্ডনকে দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।

ফের বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে বলেন, মিস্টার সিপ্পি আছেন দুশো সাতচল্লিশে। মিস্টার ব্র্যান্ডন এখানে খুব আরামে থাকবেন। আপনাদের সেবার জন্যই তো আমরা...

—ধন্যবাদ, মিস্টার সিপ্লি কি ঘরে আছেন?

—না ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছেন, সঙ্গে এক যুবতী।

এডউইন হাসে, সেই সঙ্গে চোখ মটকে আরো যুক্ত করেন—বোধহয় সমুদ্রতীরে গেছেন।

শুনে আশ্চর্য হলাম না, জানি মেয়েদের প্রতি তার অসীম দুর্বলতা। বললাম, ফিরে এলে বলবেন, আমি এসেছি ও ঘরে আছি।

—তাই বলবো মিস্টার ব্রান্ডন। এলিভেটারে দু-তলা টপকে উঠে এলাম। দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর, ইঁদুর কলের মত ঘুপচি ঘর। জ্বলন্ত চুল্লির উষ্ণতা ঘর জুড়ে। খাট এত ছোট শুলে পা বেরিয়ে থাকবে। জানলা দিয়ে কিছুই দেখা যায় না।

ভাড়া বেশ সস্তা। এই যা ভরসা।

হোটেল বয় আমার মালপত্র রেখে গেছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে অর্ডার দিলাম বরফ আর ডাবল্ সিক্সটি নাইন। তারপর পোষাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিলাম। ঝরণার নিচে যতক্ষণ স্নাত হচ্ছিলাম, ভালো লাগছিল। বেডরুমে এসে ঘামছি।

এক পেগ স্কচ পান করে ফের ঝরণার তলায় এসে দাঁড়াই। এমন সময় দরজায় ধাক্কার শব্দ। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে এসে দরজা খুললাম। দীর্ঘকায় লালমুখো এক ভদ্রলোক। নাকে পুরোনো ক্ষতের দাগ, চোখে জিজ্ঞাসা অথবা সন্দেহ। সর্বাঙ্গে পুলিশি ছাপ। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজালেন, —আপনার নাম ব্র্যান্ডন? স্বরে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব।

—হ্যাঁ, কি প্রয়োজন?

ওয়ালেট খুলে পরিচয়পত্র দেখলে—'সার্জেন্ট ক্যানডি হোমিসাইড।'

তারপর প্রশ্ন করেন—জ্যাক সিপ্লিকে চেনেন?

—চিনি। উনি কি কোন ঝামেলায় পড়েছেন?

—বলতে পারেন! দেখলে চিনতে পারবেন?

অজানা আশঙ্কা চারিয়ে যায় আমার মধ্যে। —কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

—হি ইজ ডেড। হ্যাঁ,উনি মারা গেছেন। নিন, চটপট তৈরী হয়ে নিন, বাইরে আমার গাড়ি আছে। লেফটেন্যান্ট আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ডেড? লালমুখো সার্জেন্টের দিকে তাকাই—কি হয়েছিল?

চওড়া দুটি কাঁধ ঝাঁকাল ক্যানডি—সেকথা লেফটেন্যান্টের মুখ থেকেই শুনবেন। চলুন যাওয়া যাক।

দ্রুত জামাকাপড় পরে, চুল আঁচড়ে মোজা জুতো পরে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার হাত দুটোর মৃদু কাঁপন টের পাচ্ছি। জ্যাক আর আমি বেশ ছিলাম। জীবনের উত্তেজনায় প্রাণের উচ্ছলতায় টগবগ করে ফুটতো সে, প্রতিটি মুহূর্তকে যেভাবে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতো আমি সেভাবে কখনো করিনি। জ্যাক মারা গেছে। না, এ অসম্ভব।

জুতোর ফিতে বেঁধে আরেক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে বললাম—খাবেন?

ইতস্ততঃ করে ক্যানডি, একজোড়া পুরু ঠোঁটের ফাঁকে উচ্চারিত হয়—বেশ, বাস্তবিক এখন আমি ডিউটিতে নেই। গ্লাসে বড় করে ঢেলে এগিয়ে দিলাম। তা জলের মত এক নিঃশ্বাসে পান করেন তিনি। তারপর বলেল—চলুন, লেফটেন্যান্ট দেরী মোটেই পছন্দ করেন না। এলিভেটরে নিচে নামলাম। রিসেপশনের হোঁৎকা ক্লার্ক বিস্ফারিত চোখে দেখছেন। সম্ভবতঃ ভাবছেন, আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেতের চেয়ারে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বৃদ্ধ বললেন—ঐ লম্বা চওড়া লোকটা পুলিশ ছাড়া আর কিছু নয়।

অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে চালকের আসনে বসলেন ক্যানডি, আমি পাশে বসলাম। হোটেল চত্বর ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—কোথায় তাকে পাওয়া গেছে?

—সমুদ্রতীরে। চিউয়িংগাম চিবুতে চিবুতে ক্যানডি জানালেন, ওখানে সারি সারি কেবিন ভাড়া পাওয়া যায়। তারই একটিতে দারোয়ান তাকে পেয়েছে।

—হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু না অন্য কিছু?

—তাকে খুন করা হয়েছে।

বিহ্বলতা—আঘাত—শোক সব মিশিয়ে আমার মধ্যে কেমন ভাঙচুর হতে থাকে। হাঁটুর নিচে দু-হাত চেপে উত্তেজনা প্রশমিত করতে চেষ্টা করি। আর আমার কিছু বলার নেই। বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ক্যানডি গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন। আধ ঘণ্টায় সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেলাম। সমুদ্রতীর বরাবর সমান্তরাল চওড়া রাস্তা ধরে পার্কিং জোনের ছোট্ট জায়গায় এসে থামলাম, এখান থেকে দেখা যায় পাম গাছের ছায়া ঘেরা নির্জন লাল সাদা সারিবদ্ধ কেবিন। ইতিউতি রঙীন ছাতা মেলা। পার্কিং লনে চার-চারটে পুলিশের গাড়ি ও জ্যাকের কনভার্টেবল ব্যুইক। আমি আর জ্যাক যেটা ক'দিন আগে কিনেছি। সেকেন্ডহ্যান্ড, এখনো এজন্য ডলার গুনতে হচ্ছে।

দূরের এক কেবিনে দুশো মানুষের ভিড়।

কৌতূহলী মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। কেবিনের কাছাকাছি যেতে ক্যানডি জানান—ঐ বেঁটে ভদ্রলোক হলেন লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিন।

আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন র‍্যানকিন। ক্যানডির চেয়ে অনেক খাটো। পরনে হালকা ধূসর স্যুট, মাথার টুপি ডান চোখে ঈষৎ নামানো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। শক্ত মুখে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা।

ক্যান্ডি বলেন, ইনিই লিউ ব্রান্ডন।

র‍্যানকিন আমার দিকে দেখেন। চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। পকেটে থেকে একটা কাগজ বের করে দেখেন—আপনি এটা পাঠিয়েছেন?

কাগজটার দিকে তাকাই। এটা সেই টেলিগ্রাম যাতে আমার আসার কথা জ্যাককে জানিয়েছিলাম।

বললাম—হ্যাঁ।

—উনি কি আপনার বন্ধু ছিলেন?

—আমরা দু'জনে মিলে ব্যবসা চালাই। উনি আমার পার্টনার ছিলেন।

বহুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত ঘষেন র‍্যানকিন—বন্ধুকে ভাল করে দেখে নিন। তারপর কথা হবে।

উষ্ণ বালিয়াড়ি মাড়িয়ে তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকলাম।

বিচ্ছিরি মুখের দু'জন লোক জানলার কোণে কোণে গুঁড়ো পাউডার ছড়াচ্ছে আততায়ীর হাতের ছাপ পাবার আশায়। রোগা বয়স্ক একজন ছোট টেবিলে বসে আছে। তার পায়ের কাছে কালো বাক্স।

ঢুকতেই সবকটি মুখ আমার দিকে ঘুরে গল। চোখ পড়ল ডিভানে শায়িত মৃত জ্যাকের দিকে। বিধ্বস্ত শরীর। বিছানার এত কাছে, যেন মৃত্যুর সময় সে পালাতে চেয়েছিল, একজোড়া সাঁতারের পোষাক ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। ঘাড়ে এবং পিঠের ডান দিকে কালচে লাল গর্ত। গর্তের চারদিকে মারাত্মক কালশিরা দাগ, তার সূর্যআতপ্ত মৃত মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

হিমশীতল ধূসর চোখ মেলে র‍্যানকিন প্রশ্ন করেন—

—ইনিই তো?

—হ্যাঁ।

রোগা বয়স্ক লোকটার দিকে তাকান র‍্যানকিন।

—কাজ শেষ ডাক্তার?

—শেষ, তবে, পেশাদারি খুনির ছোঁয়া আছে এতে।

—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দুর্দান্ত সাহস দুটোই কাজে লেগেছে। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, খুনী বরফ খোঁচা ছুরি ব্যবহার করেছে। খুব কাছ থেকে বা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আচম্‌কা ছুরি মারা হয়েছে। ফলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আমি বলতে পারি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ইনি খুন হয়েছেন।

র‍্যানকিন নির্দেশ দেন—জল্‌দি ডেডবডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।

আর, আমার দিকে ফিরে বলেন, চলুন, ফেরা যাক।

আমরা কেবিন ছেড়ে বালিয়াড়িতে পা রাখি। র‍্যানকিনের কাছে আসেন ক্যান্ডি। র‍্যানকিন জানান—আমি ব্রান্ডনের হোটেলে যাচ্ছি। দেখুন, এখানে কি পাওয়া যায়। ডাক্তার বলেছেন বরফ

খোঁচা ছুরি ব্যবহৃত হয়েছে। জাগসনকে আরো লোক দিন। ওরা ছুরি খুঁজে দেখুক। খুনী ওটা কাছাকাছি কোথাও ফেলে যেতেও পারে। যদিও তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।

অতঃপর তিনি সোনার স্ট্র্যাপ কামড়ানো শীর্ণ মনিবন্ধে ঘড়ি দেখে বলেন—আড়াইটে নাগাদ আমার অফিসে দেখা করবেন মিস্টার ব্রান্ডন।

তপ্ত বালিয়াড়ি ভেঙে তিনি হেঁটে যান। জনতা রাস্তা ছেড়ে দেয়। তাকে অনুসরণ করে পার্কিং জোনে এসে বলি—ঐ ব্যুইকটা সিপ্পির ও আমার। ওটা কি আপনাদের কোন কাজে লাগবে। র্যানকিন ফিরে এসে ব্যুইকের দিকে তাকান। এক অধঃস্তন কর্মচারীকে ডেকে বলেন—সার্জেন্ট ক্যান্ডিকে বলো যে ব্যুইকটা করে সিপ্পি এসেছিলেন। তার গায়ের হাতের ছাপ নেওয়া হলে যেন এটি ব্রান্ডনের হোটেলে রেখে আসা হয়।

—ঠিক আছে? র্যানকিন আমার দিকে তাকান।

—ধন্যবাদ। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আমরা পুলিসের গাড়িতে গিয়ে উঠি। গাড়ি ছোটে হোটেলের দিকে।

কোনের দিকে বসেছেন র্যানকিন। সিগার বের করে। ধাতব সিগার টিনে কয়েকবার ঠুকে ছোট ছোট দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেন। আগুন জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন।

—আসুন, সিগার নিন। এবার বলুন, আপনি কে? সিপ্পিই বা কে? কি করে এসব ঘটলো? আস্তে আস্তে বলুন। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবেন।

সিগার ধরিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর শুরু করলাম। বললাম, সিপ্পি ও আমি সফলতার সঙ্গে গোয়েন্দা তথা এনকোয়ারীর ব্যবসা চালাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে আমি তিন সপ্তাহ ছিলাম তখন জ্যাকই অফিস দেখতেন। নিউইয়র্কে থাকাকালীন সিপ্পি আমাকে জরুরী টেলিগ্রামে সেন্ট রাফাইল সিটিতে আসতে লেখেন। সেখানে একটা বড় অর্থাৎ প্রচুর টাকার কাজ হাতে এসেছে। সুতরাং কোন রকমে কাজ সেরে প্লেনে করে উড়ে আসি লস্ এ্যঞ্জেলসে, তারপর ওখান থেকে ট্রেনে এখানে সকাল সাড়ে এগারোটায় পৌঁছেছি। নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে দেখলাম, সিপ্পি যথারীতি আমার জন্য ঘর বুক করে রেখেছেন। শুনলাম তিনি বেরিয়ে গেছেন। শাওয়ার খুলে যখন স্নান করছিলাম। তখন সার্জেন্ট ক্যান্ডি দরজা আঘাত করেন। তারপর তার সঙ্গে এখানে ব্যস্, এটুকু আমি বলতে পারি।

—সিপ্পি বলেননি কাজটা কি? দু-দিকে মাথা নেড়ে বলি—জ্যাক চিঠি ফিটি খুব একটা লেখেন না। মনে হয় তিনি লেখার চেয়ে সব মুখে জানাবেন বলেই ঠিক করেছিলেন।

খানিক চুপ থেকে র্যানকিন প্রশ্ন করেন—সঙ্গে আপনার লাইসেন্স আছে?

পকেট বইটা বের করে দিলাম। অভিজ্ঞ চোখে খতিয়ে দেখে সেটা ফেরৎ দিতে দিতে বললেন—আচ্ছা আপনার কি কোন ধারণা আছে কে তাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বা কোন্ কেসের জন্য তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—আদৌ না।

কঠিন চোখে তাকান র্যানকিন—জানলে, আমায় বলতে পারেন।

—সে প্রশ্নই ওঠে না। জানলে বলতাম।

—আপনার কি মনে হয় এই কেসের জন্য উনি কি কোন নোট রেখে গেছেন? বা প্রগ্রেস রিপোর্ট?

—মনে হয় না। সাধারণতঃ উনি কাগজপত্রে কিছু লিখতেন না। ও কাজটা দু'জনে একসঙ্গে বসে করতাম। আর রিপোর্ট আমিই তৈরী করতাম।

—সানফ্রান্সিসকোয় অফিস থাকতে নিউ ইয়র্কে গেছিলেন কেন?

—ক্লায়েন্টের ডাকে। যার সঙ্গে এর আগে আমরা কারবার করিনি। আমাদের মক্কেল তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন আর তার কাজের ভার শুধু আমাকে দিতে চেয়েছিলেন।

—সিপ্পি তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন? পুরনো মক্কেলের কাজ তাকে করতে হচ্ছিল—সেজন্য কি?

—হতে পারে।

—সদ্য যে কাজ উনি হাতে নিয়েছিলেন, তাতে তেমন কোন আলোকপাত উনি করেছিলেন বলে কি আপনার মনে হয়, যার ফলে তাঁকে খুন হতে হয়?

একটু ইতস্ততঃ করি। মনে পড়ে রিসেপশন ক্লার্ক বলেছিলেন—এক যুবতীর সঙ্গে জ্যাক বেরিয়ে গেছেন।' বললাম জানি না। হোটেলের রিসেপশনে আমাকে বলেছিলেন যে এক রমণী এসে ওনাকে ডেকে নিয়ে যায়। মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করা ওঁর মস্ত দোষ। পছন্দ মতো এক বিবাহিত মহিলার পাল্লায় পড়ে কি দুর্ভোগ। মহিলার স্বামী এসে অভিযোগ করেন, প্রতিবাদ জানান। আমার মনে হয়, এ ধরনের নারী সংসর্গ তার অনেক ঘটেছে।

—উনি কি বিবাহিতা রমণীদের সঙ্গেও...

—ও নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, সুন্দরী হলেই হল। ভাববেন না ওনাকে নিয়ে কুৎসা গাইছি। উনি আমার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তবে কাজের ক্ষেত্রে ওঁর এই দুর্বলতা বড় ক্ষতি করতো। আমিও বিরক্ত হতাম।

—কিন্তু স্ত্রীর প্রেমিককে বরফ খোঁচা ছুরি দিয়ে খুন করে স্বামী অন্তর্হিত, বড় একটা ঘটে না। কাজটা পেশাদারী হাতের।

—হতে পারে সেই স্বামী পেশাদারী খুনীকে ঐ ছুরি ব্যবহার করেছিল তেমন কোন রিপোর্ট আছে আপনাদের রেকর্ডে? মাথা নাড়েন র‍্যানকিন।

—না, এ হল ধনীদের শহর। অজস্র ছেলে ছোকরা ঘুরে বেড়ায়—যাদের অনেকে ভয়ঙ্কর ছুরি নিয়ে কাউকে পালাতে দেখা যায়নি, এখন সিপ্পি কি কাজ নিয়ে এখানে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে যদি একটু আলোকপাত করেন। আমার ধারণা, ও-ই কাজের মধ্যেই রয়েছে হত্যারহস্য।

জ্যাকের মক্কেলের নাম যতক্ষণ না নিজে ভালোভাবে জানতে পারছি ততক্ষণ র‍্যানকিনকে কিছু না বলাই ভাল। তবে নামটা জানতে, ফিরতে হবে অতীতে। এলা বরং জানতে পারে। এলা হল আমাদের টাইপিস্ট। সানফ্রান্সিসকোর অফিসে বসে থাকলে ওর কাছেই পাওয়া যবে জ্যাকের মক্কেলের নাম ঠিকানা।

—থামো ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় র‍্যানকিন। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেছি হোটেল অ্যাদেলফি।

লবি পেরিয়ে রিসপশনে পৌঁছে দেখি, হোঁৎকা ক্লার্কটির চোখে চাপা উত্তেজনা। স্ত্রী পরিবৃত দুই প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন ভিক্টোরিয়ান উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র। অদ্ভুত প্রাচীন পোষাক। কান খাড়া। নট্ নড়ন চড়ন। শুধু চেয়ে আছেন ফ্যাল ফ্যাল করে। র‍্যানকিন টিপ্পনি কেটে বলেন—চলুন, অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি, যেখানে এই বুড়ো ভামগুলো শুনতে পাবে না। শেষ কথাগুলো বেশ জোরেই বলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই লেফটেন্যান্ট, বিগলিত ক্লার্কটি আমাদের নিয়ে গিয়ে তার ডেস্কের পিছনে ছোট্ট অফিসে বসায়। বলেন—ইয়ে, কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

—এখানে নয়। র‍্যানকিন শুধোন—আপনার নাম? মুখ শুকিয়ে যায় ক্লার্কটির। কোনরকম উত্তর দেন, এডউইন ব্রিওয়ার।

—সিপ্পি ঠিক কখন এখান থেকে গেছেন?

—সাড়ে দশটা হবে।

—সঙ্গে কোনো মহিলা ছিলেন?

—হ্যাঁ। এক মহিলা তার খোঁজ করেছিলেন? সেই মহিলা আমার সাথে কথা বলার সময় এলিভেটর থেকে সিপ্পি নামেন। তারপর দু'জনে চলে যান।

—মহিলা নাম বলেছিলেন?

অসহায় ভাবে ঠোঁট নাড়েন ব্রিওয়ার। বলেন—ও হ্যাঁ, নাম বলেননি তবে মহিলাকে সিপ্পির ঘনিষ্ঠ বা পূর্ব পরিচিত বলে মনে হয়েছিল।

—কোন দিক দিয়ে?

—মহিলাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সিপ্পি বললেন 'হ্যালো বেবি ডল' তারপর তার কোমরে হাত রেখে দু'জনে গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

—তখন মহিলার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

—হাসছিলেন, তবে বুঝতে পারছিলাম, পছন্দ করছেন না। মহিলা ঠিক ঐ টাইপের নয়।

—তাহলে কেমন?

—মহিলার বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। খেলো বা সস্তা ধরনের মনে হয়না।

মাঝখানে আমি বলি—জ্যাক কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারতেন না। সম্মানেরও না। মুড ভালো থাকলে তিনি বিশপের স্ত্রীকেও টিটকারী দিতে পারেন।

ভ্রূ কোঁচকান র্যানকিন। প্রশ্ন করেন—ব্রিওয়ার, আপনি ঐ মেয়ের বর্ণনা দিতে পারেন?

দু-হাত কচলান ব্রিওয়ার। কিরকম অসহায় দেখায় তাকে। ঢোঁক গিলে বলেন—ভারী আকর্ষণীয়া। কালো, চমৎকার চেহারা। পরনে ছিল নেভী স্ল্যাকস আর সাদা সার্ট। চোখে মস্ত রোদ চশমা। মাথায় বড় টুপি। মুখ অতটা দেখতে পাইনি।

—বয়স?

—কুড়ির মধ্যে পঁচিশও হতে পারে।

—আবার দেখলে চিনতে পারবেন?

—হ্যাঁ, অবশ্যই পারব। ব্রিওয়ারের ডেস্কের অ্যাসট্রেতে র্যানকিন নিঃশেষ সিগারেট গুঁজে দেন। বলেন—ধরুন, সেই মহিলা যদি মস্ত রোদ চশমা আর টুপি না পরে কেবলমাত্র সাদা পোষাক পরেন, তাহলেও কি তাকে চিনতে পারবেন? একমুহূর্ত ভেবে ব্রিওয়ার বলেন—সম্ভবতঃ না।

—তাহলে আপনি তার পোষাকগুলো চেনেন, তাকে নয়?

—হুঁ!

—সেটা যথেষ্ট সহায়ক নয়। আচ্ছা, 'সিপ্পি 'হ্যালো বলার পর কি হল?

—সিপ্পি বলেছিলেন, দু-ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন, তা এখনই বেরিয়ে পড়া ভালো। এরপর ওনারা। সিপ্পির গাড়ি করে চলে যান।

—তবে কি মহিলা তার গাড়ি এখানেই রেখে যান?

—কই, তেমন তো দেখিনি, মনে হয়, তিনি হেঁটে এসেছিলেন।

—সিপ্পির ঘরের চাবি দিন।

—গ্রীভ্সকে ডাকতে পারি কি? উনি আমাদের হাউজ ডিটেকটিভ?

দু-দিকে মাথা নাড়েন র্যানকিন—না। আমি চাই না, আপনাদের হাউজ ডিটেকটিভ খ্যাপার মত সব লণ্ডভণ্ড করে খুঁজতে গিয়ে কোন ক্লু নষ্ট করে দিক। অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রিওয়ার কী বোর্ড থেকে চাবি এনে দেন। আমরা তাকে অনুসরণ করি। চার বুড়ো আমাদের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। ব্রিওয়ার জানান সম্ভবতঃ সিপ্পির কাছেই তার ঘরের চাবি থেকে গেছে। আপনাদের ডুপ্লিকেট দিলাম, আচ্ছা মিস্টার সিপ্পির কি কিছু হয়েছে?

চার বৃদ্ধ খানিকটা এগিয়ে আসে, কি হয়েছে—জানাতে চায় তীব্র আগ্রহে।

র্যানকিন চেঁচিয়ে বলেন—ভদ্রলোকের পেটে বাচ্ছা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। অবশ্য আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই।

আমরা এলিভেটরের দিকে চললাম। বৃদ্ধাদের চোখে অপার বিস্ময়। তখনো চেয়ে আছে আমাদের গমন পথের দিকে।

তিনতলায় যাবো, এলিভেটরের বোতামে চাপ দিয়ে তিনি বলেন—হোটেলের এসব বুড়োদের আমি ঘেন্না করি। আমি বলি আপনিও একদিন বুড়ো হবেন। হোটেলে ওরা মজা মারতে আসেন না।

—সেন্টিমেন্টালে খোঁচা দিলেন তো?

মুখ নামান র্যানকিন মেঝের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলেন—আমি ভাবতাম সবকিছু আমার দেখা হয়ে গেছে।

এলিভেটরে দ্বিতীয় তলা পার হয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করি—কেবিনের দারোয়ানের কাছে মেয়েটার সম্পর্কে কিছু জেনেছেন?

—উঁহু সেই একই বিবরণ। কেবিনে দুটি ঘর ছিল। মাঝে দরজা, একটা ঘর মহিলা, অপরটি সিপ্পি ব্যবহার করেছিলেন। একটি ঘরে মহিলার স্ল্যাকস, সার্ট, টুপি, সানগ্লাস পাওয়া গেছে, অন্য

ঘরে সিপ্পির পোষাক পাওয়া গেছে।

—কেবিনে মহিলা তার পোষাক ফেলে গেছেন?

—তাই তো বলছি। এর দুটি অর্থ হয়। এক, মহিলা এ ঘটনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্য ঠিক করেছিলেন সাঁতারের পোষাক পরে পালাবেন, এ শহরে প্রত্যেকেই সাঁতার স্যুট পরে ঘুরে বেড়ান, যেন সাঁতার কাটতে যাচ্ছেন... আর দুই খুনী, সিপ্পিকে খুন করার পর মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে। আমার লোকেরা সমুদ্রতীর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই খুনের সঙ্গে মহিলার কোনো সম্পর্ক নেই বলেই আমার ধারণা।

তৃতীয় তলে থামে এলিভেটর। জিজ্ঞাসা করি ঐ কেবিন থেকে মহিলাকে কেউ বেরুতে দেখেছে? —না, তবে এখনো সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। করিডোর দিয়ে হেঁটে যাই দুশো সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের দিকে।

চাবি খুলতে খুলতে র‍্যানকিন বলেন—কি সুন্দর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন মহিলা। এ শহরে লোকে মুখ দেখে না, দেখে ফিগার।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকি। আমার চেয়েও বড় ঘর। বায়ুহীন, গুমোট গরম।

ঘরে যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে। আলমারির ড্রয়ার খোলা, আসবাবপত্র ছড়ানো। জ্যাকের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। বিছানা ওল্টানো। ছুরি দিয়ে ফালা করা তোষক, বালিশ ফাটা। মেঝেতে স্তূপীকৃত তুলো। ভাঙা ব্রিফকেসের কাগজপত্র ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে।

র‍্যানকিন বলেন, খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছে।

—যাওবা কিছু পেতাম তারও আশা নেই। লোক পাঠাচ্ছি, দেখি, যদি হাতের ছাপ মেলে। তবে বাজি রেখে বলছি। তাও পাওয়া যাবে না। তারপর দরজার তালা বন্ধ করে দেন।

।। দুই ।।

বিছানায় শুয়ে আছি। কানে আসে দুমদাম শব্দ। পাশের ঘরে পুলিশের লোক 'ক্লু' খুঁজছে। হতাশা আর একাকীত্বে ডুবে যাই।

জ্যাক নিজের ভুল বুঝতে পারেনি, যদিও কাজের ব্যাপারে সে নিখাদ ছিল।

পাঁচ বছর আগে আমাদের প্রথম দেখা। আমি তখন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর। জ্যাক ছিল সান্‌ফ্রান্সিসকো ট্রিবিউন পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার। ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। একরাতে স্কচের বোতল শেষ করতে করতে দুই বন্ধু ঠিক করলাম ওপরতলার খবরদারি আর সহ্য করব না। ফানুসের মতো আমাদের পিছনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বসে বসে ওরা মজা মারবে। আর আমরা? ছুটবো, শুধু ছুটে যাবো...। না। আজ থেকে আর অর্ডার নেবো না। অল্প নেশাগ্রস্ত হলেও চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি, মাস মাইনের অনিশ্চয়তা ও এই শহরে নতুন অফিস খুলে বসার ঝক্কি ঝামেলা নিয়ে বিব্রত ছিলাম। হাতে তেমন মূলধনও ছিল না। জ্যাকের চেয়ে আমি পাঁচশো বেশি দিলাম। বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। ভাবলাম, এই অভিজ্ঞতা পাথেয় করে শুরু করা যাক।

অজস্র অনুসন্ধানী এজেন্সি ছিল শহরে। আমরা তাদের অধিকাংশই জানতাম। তারা আমাদের ভয়ের কারণ নয়। কাজ আমরা ঠিকই পাবো।

আধবোতল স্কচ শেষ করে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম থেকেই আমরা ভাগ্যবান। একবছর পর আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আর পেছনে তাকাইনি।

জ্যাকের মৃত্যু আমায় ভাবাচ্ছে। যে কাজ হাতে নিয়েছিল তা থেকে ওকে সরানোর উদ্দেশ্যে খুন করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং খুব সম্ভব ও কোন কুচক্রী মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। এবং ঐ চক্রই ওকে নিকেশ করে দেয়। র‍্যানকিনের ভাষায় ইঁদুরের লেজের মতো এতটুকু একটা বরফ খোঁচা ছুরি পেশাদারী দক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাই। বারোটা পঁয়তাল্লিশ। ক্ষুধার্ত লাগছে। গতরাত থেকে পেটে শক্ত কিছু পড়েনি। পাশের ঘরে ওরা কাজে ব্যস্ত। এখন খেলে সময় বাঁচবে।

গলায় জামার বোতাম আঁটছি। এমন সময়ে দরজা খুলে র‍্যানকিন মুখ বাড়ান। দরজায় ঠেস

দিয়ে দাঁতের ফাঁকে সিগারেট নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

আমি জানাই—খেতে যাচ্ছি। আমাকে দরকার।

পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—ও ঘরে কিস্যু নেই। হাজারটা হাতের ছাপ। কাকে সনাক্ত করবে। তদন্তের কোন উন্নতি আশা করবেন না। কোন সূত্র থেকে বুঝতে পারলাম না সিপ্পি কার হয়ে কাজ করছিলেন।

—আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, যে ওঘর লণ্ডভণ্ড করেছে সেও কিছু পায়নি। জ্যাক তদন্তের রিপোর্ট রাখতেন না।

—আপনি এখনো জানেন না মক্কেল কে? র‍্যানকিনের চোখে অনুসন্ধিৎসা—মক্কেলের নাম গোপন করেছিলেন বলেই যে উনি খুন হন তার কোন মানে নেই ব্রান্ডন। ভালো চান তো তার নাম বলুন। না বললে বুঝবো আমাকে ভেড়ুয়া বানাচ্ছেন।

—ভেড়ুয়া বানাচ্ছি না আপনাকে লেফ্‌টেন্যান্ট।

—আচ্ছা, আপনার কোন সহকারী সেখানে আছেন?

—আমাদের একজন টাইপিস্ট আছে। সদ্য সতেরোয় পড়েছে। বোবার মত ঘাড় গুঁজে কাজ করে মাইনে নেয়। তাকে আমরা কিছু বলি না।

র‍্যানকিনের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।—বেশ মক্কেলকে খুঁজে পেলে আমার সাথে দেখা করবেন। আর, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে না পেলে আমি আবার আসবো। তখন দেখে নেবো আপনাকে। দরজা ভেজিয়ে চলে যান র‍্যানকিন।

চুলোয় যাক খাওয়া। র‍্যানকিন সানফ্রান্সিসকোর পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। তার আগে এলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আমার কথা বলা দরকার।

এলিভেটরে নিচে নাবি। হোটেলের অদূরে ওষুধের দোকান। সেখানকার ফোন বুথে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল রেখে অফিসে নম্বর ডায়াল করলাম।

র‍্যানকিনকে এলা সম্বন্ধে অর্ধসত্য বলেছি। সদ্য সতেরোয় পা দেওয়া মেয়েটা হাবাগোবা নয়। ক্ষুরধার বুদ্ধি। ভীষণ চালাক। স্বস্তি পেলাম তার গলা শুনে—গুড আফটার নুন, স্টার এজেন্সি থেকে বলছি।

—লিউ বলছি। আমি দ্রুত বলে যাই—সেন্ট রাফাইল সিটি থেকে বলছি। একটা কাজ নিয়ে জ্যাক এখানে আসে এবং টেলিগ্রাম করে আমায় ডাকে। খবর খারাপ এলা। ও মারা গেছে। কেউ ছুরি মেরেছে।

কানে আসে নারীকণ্ঠের স্পষ্ট ফোঁপানি। আহা, মেয়েটি জ্যাককে পছন্দ করতো। প্রায় প্রেমে পড়ে গেছিল।

—জ্যাক মারা গেছে। তার স্বরে কাঁপন।

—হ্যাঁ। এখন শোন এলা, এটা খুব জরুরী। পুলিশ জানতে চাইবে, কাজটা কি ছিল, আর মক্কেল কে। জ্যাক আমায় কিছু বলেনি। তোমায় কি বলেছে?

—না। উনি শুধু বলেছিলেন একটা কাজ এসেছে। তারপরই তো সেন্ট রাফাইল সিটিতে চলে যান। তবে, উনি আপনাকে টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে ডেকে নেবেন বলেছিলেন।

—জিজ্ঞাসা করো নি, কাজটা কি।

টের পাচ্ছি, মেয়েটা কাঁদছে। এলার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। প্রশ্ন করি, কি করে কাজটা পেল? কোনো চিঠি বা টেলিফোন?

—এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন।

—তিনি নাম বলেছিলেন?

—না। আমি জিজ্ঞাসা করলেও জানান নি। শুধু আপনাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

জ্যাক কিছুই জানায় নি। অর্থাৎ, এ কেস মীমাংসার আর কোন রাস্তা নেই।

হঠাৎ মাথায় এক ভাবনা ঝিলিক খেলে গেল। মনে পড়লো, টেলিফোনে কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাকের অভ্যাস ছিল সামনের কাগজে আঁক কষার। হাতে পেন্সিল আর কানে

রিসিভার থাকলে ওর কাজ হল সংলাপের সংক্ষিপ্তসার লিখে রাখা। কখনো আবার ছবিও আঁকতো। অফিসের ছবি।

—এলা, জ্যাকের টেবিলের ওপর যে ব্লটিং পেপার আছে দেখোতো, জ্যাক তার উপর কোন মক্কেলের নাম লিখে রেখে গেছেন কিনা। ওর হিজিবিজি কাটার অভ্যাস তো জানোই।

আমি অপেক্ষা করে থাকি। শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম গড়ায়। বুথের ভিতর অসম্ভব গরম। একটু দরজা খুলে হাওয়া আসতে দিলাম। তখনই চোখে পড়লো লোকটার পা। সোডা বার-এর পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে চেহারা বলে দিচ্ছে লোকটা পুলিস, চোখাচোখি হতে, এক কাপ কফি নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো। চোখ এদিকে।

নির্ঘাৎ র‍্যানকিনের চ্যালা। হয় তো ভাবছে আমি অফিসে ফোন করছি। ভাবুক গে। টেলিফোনের ও প্রান্তে এলার গলায় সম্বিত ফিরে পেলাম—

—ব্লটারে অনেক হিজিবিজি। তার মধ্যে একটা নামই পড়া যায়, বড় হরফে লেখা 'লী ক্রিডি'।

—ওকে এলা। এখুনি ব্লটারটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে টয়লেট ফেলে দাও। যে কোন মুহূর্তে পুলিস ফোন করবে তোমায়, ওরা যেন কাগজটা না পায়।

পাক্কা তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর ফোনে এলা জানালো কাগজটা নষ্ট করে দিয়েছে।

—লক্ষ্মী মেয়ে। এখন শোনো আমি পুলিশকে বলেছি। তুমি একটি নির্বোধ মেয়ে। হাবাগোবা। তোমাকে আমরা কিছুই জানাই না। সেভাবে অভিনয় কোরো। আর হ্যাঁ, ওদের বোলো, একটা ফোন পেয়ে জ্যাক তোমায় বলে গেছে, সে সেন্ট রাফাইল সিটিতে যাচ্ছে, তুমি যেন এসব কিছুই জানো না। ভয় পেয়ো না।

যা বললাম, মনে রেখো, আরেকটা কথা। আমি যেতে পারলে কাজটা তোমায় দিতাম না। যেতে যখন পারছি না তখন তুমিই জ্যাকের স্ত্রীকে জ্যাকের মৃত্যু সংবাদটি দিও, বোলো, আমি চিঠি দিচ্ছি।

আচমকা গলা নাবিয়ে এলা ফিসফিসিয়ে বলে, দু'জন লোক এই মাত্র ঢুকলো। মনে হচ্ছে গোয়েন্দা...বলেই লাইন কেটে দিল।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছি, বুথ ছেড়ে সামনের কাউন্টার পেরিয়ে ঐ র‍্যানকিনের চ্যালার কাছাকাছি এসে দাঁড়াই। লোকটা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চকিতে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। আমি স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলাম।

খাওয়া সেরে সিগারেট ধরলাম। দেখলাম, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ লোকটা ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে কালো গাড়িতে উঠে এক নিমেষে উধাও হল।

বেলা দেড়টা।

হোটেলে ফিরে সোজা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি. দেখি, জ্যাকের ঘরের দরজা খোলা, জানলার কাছে পালোয়ান গোছের একটা লোক ব্যাগি স্যুট পরে দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটো মস্ত পাছায়। চোখ দুটি ঘুরছে ঘরময়, লোকটা ঘুরেই দেখলো আমাকে। চোখে রাগ ও সন্দেহ দেখে মনে হয় প্রাক্তন পুলিস।

—কিছু চুরি গেছে?

—আপনার এখানে কি দরকার? গম্ভীর গলায় ঝাঁঝ।

—আমি ব্রান্ডন। পাশেই আমার ঘর। আপনি গ্রীভস? স্বস্তিতে ঘাড় হেলায় লোকটা।

ঘরটা দেখছি গোছানো। সাফ সুতরো করা হয়েছে।

ঘরের কোণে জ্যাকের বিবর্ণ স্যুটকেস। রেইন কোট, টুপি আর একটা টেনিস র‍্যাকেটের কাঠামো জড়ো করা, আবর্জনার মতো।

—এগুলি দুষ্কৃতীরা নষ্ট করে দিয়েছে? প্রশ্ন করি। ওপর নীচে মাথা নাড়ায় গ্রীভস।

—এগুলো আমি ওনার স্ত্রীর কাছে ফেরৎ দিতে চাই। আমার জন্য কি কেউ একাজটা করবে?

—জো করবে। ওকে দরকার পড়লে বেল বাজাবেন।

—যদি আপনার বেশি কাজ না থাকে তো আমার ঘরে আসতে পারেন। একটা ডাবল সিক্সটি নাইনের বোতল আছে। খেতে খেতে কাজের কথা হবে।

—হাতে কিন্তু সময় আছে। চলুন। তাকে নিয়ে ঘরে এলাম।

একটা উঁচু চেয়ারে গ্রীভস, আমি বিছানায় বসলাম। বরফ গলছে অনেকক্ষণ। তিন আঙুল হুইস্কি মিশিয়ে গ্রীভ্‌সকে দিলাম। তাকে কেন জানিনা সহ্য করতে পারছি।

পানীয়তে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলেন—কে খুন করেছে, ওরা জানে?

—ওরা জানলেও আমায় বলবে না। আমি বলি, জ্যাক যে মেয়েটার সাথে গেছিল। তাকে চেনেন?

মাথা নাড়ে গ্রীভস—মেয়েটাকে দেখেছি। র‍্যানকিন আমার সাথে কথা বললে জানতে পারতেন। কিন্তু উনি শুধু ব্রিওয়ারের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত।

জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু আপনি জানাননি কেন তাকে?

—উনি ব্রিওয়ারের কাছে মেয়েটার বর্ণনা চাইলেন। গ্রীভস বলে যান—তাহলেই বুঝুন। কি ধরনের পুলিশ উনি। ব্রিওয়ার কেবল পোষাক দেখেছে। আমি লক্ষ্য করেছি মেয়েটাকে। এমনভাবে আপাদমস্তক ঢেকেছিল যাতে পরে না চেনা যায়। সেদিন চুল ডাই করেছিল বা উইগ পরেছিল। যাই করুক, আমি জানি তার চুল সোনালী রঙের।

—কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন এত?

ভারিক্কি চালে হাসেন গ্রীভস—আমার চোখ বলছে। দেখেছি তার বাহুর ওপর চুলের প্রান্তভাগের রং। মেয়েটার গাত্রবর্ণ ফর্সা।

তথাপি তাকে নিরুৎসাহ না করে চুপ করে থাকি।

উঠে দাঁড়ান তিনি। লবিতে এসে থেমে বলেন—মেয়েটা ডান হাত, ডান হাতে নিজের উরুর ওপর পিয়ানোর রিড টেপার ভঙ্গিতে আঙুল চালান—সর্বদা এমন করতো। মানে, মেয়েটার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। হয়তো নিজেও সে জানে না এই অভ্যাসের কথা। সঠিক বলা শক্ত, তবু আমার মনে হয়েছে যে সে কোন 'শো' ব্যবসায়ে যুক্ত।

—র‍্যানকিনকে বলেছেন এসব?

সিগারেট নিভিয়ে দু-দিকে মাথা নাড়েন গ্রীভস।

—জ্যাকের ঘরে দুষ্কৃতি ঢুকলো কি করে?

—সিপ্পির চাবি নিয়ে। তিনি চাবি নিয়েই বেরিয়ে ছিলেন। তাকে খুন করার পর খুনী চাবি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এখানে এসে সন্তর্পণে ওপরে উঠে ঘরে ঢোকে। একাজে স্নায়ুর জোর থাকা চাই। আর খুনীর তা ছিল বলে অক্লেশে কাজ সেরে চলে গেছে নিরাপদে। ওই সকালে আমি বা কর্মচারীরা কেউ ওখানে ছিল না।

ঠিক এসময়ে আমার মনে হল গ্রীভসকে জানানো দবকার কমবেশী আমিও এ ব্যাপারে যুক্ত। আমার কার্ড এগিয়ে দিলাম, কার্ড পড়ে রীতিমত চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত। নাক ঘষে কার্ড ফেরৎ দিয়ে বললেন—উনি কি আপনার পার্টনার ছিলেন?

—হ্যাঁ।

সর্বদা আমি আপনাদের দলে ভিড়তে চেয়েছি। আপনাদের লাইনে আমাদের চেয়ে পয়সা বেশি। তো চলছে কেমন?

—এ দুর্ঘটনার আগে বেশ চলছিল। এখন কাজ বন্ধ রেখেছি যতক্ষণ না খুনীকে ধরতে পারছি।

একটু থেমে আবার বললেন—লস অ্যাঞ্জেল্‌স থেকে একবার এক গোয়েন্দা এলেন আত্মহত্যার একটা কেসের তদন্ত করতে। মৃতের বিধবার ধারণা ছিল ওটা আত্মহত্যা নয়, খুন। সেজন্য তিনি গোয়েন্দাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাচেন তাকে বারণ করেন। তবু গোয়েন্দা তদন্ত চালাতে থাকলেন। একদিন তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ এক মাতাল গাড়ি তাকে ধাক্কা দিল। গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গেল। কলার বোন ভেঙে গোয়েন্দা প্রবর পড়ে থাকলেন হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেলেন, ছ'মাসের জন্য তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হল মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য। অথচ হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে পুলিসগুলো আধ পাঁইট হুইস্কি তার গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এ কথা কেউ মানল না।

—বাঃ চমৎকার! খবরের জন্য ধন্যবাদ। ক্যাচেন সম্বন্ধে সজাগ থাকবো।

—মদের জন্য ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে ডাকবেন, সাধ্যমত সাহায্য করব।

পানীয় শেষ করে গ্লাস নামান গ্রীভস।

আমি বলি—মনে থাকবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করি—আচ্ছা, লী ক্রিডি নামে কাউকে চেনেন?

তাকিয়ে থাকলেন অপলক। তারপর দরজা ভেজিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন—এ শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

আমি উত্তেজনা চেপে বলি—কত বড় ধনী?

—প্রথমে একশো মিলিয়ন বাক্স ছিল তার সম্পত্তি। গ্রীন স্টার সিপিং লাইন কিনেছেন। সানফ্রানসিসকো থেকে পানামা যাতায়াত করে তার ট্যাঙ্কারগুলো।

কিনেছেন এয়ার লিফট্ করপোরেশন। এখান থেকে মিয়ামী উড়ে যায় তার বায়ুদূত। আরো দীর্ঘ তার সম্পত্তির তালিকা। তার মধ্যে তিনটে খবরের কাগজ, দশ হাজার কর্মী সম্মিলিত এক ফ্যাক্টরি। গাড়িতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ লাগাবার কাজে মহিলারা যুক্ত। তিনি ক্যাসিনো কিনেছেন। তার হাতে গড়ে উঠেছে লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন, রিৎজা প্লাজা হোটেল এক দুর্দান্ত বড়লোকদের মাসকেটিয়ার্স ক্লাব। পাঁচ হাজারের ওপর রোজকার চলে। রক্তপরীক্ষা করার পর হয়তো আপনি ঐ ক্লাবে ঢোকার অনুমতি পাবেন। বুঝতেই পারছেন উনি কত বড় ধনী।

—উনি কি বিবাহিত?

—ও সিওর। ফিল্ম স্টার ব্রিজিৎ বর্দকে মনে আছে? তিনি ওর স্ত্রী।

মনে পড়লো বছর চারেক আগে কোন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঝড় তুলেছিলেন ব্রিজিৎ। কয়েকটি ছবিতে তাকে দেখেছিলাম। বন্য আর কোমলের সংমিশ্রণের জন্য তার খ্যাতি।

—তা হঠাৎ ক্রিডির সঙ্গে কি ব্যাপার?

—কিছু না, নাম শুনেছি। একজন তার সম্বন্ধে বলছিল। তাই কৌতূহল। লোকটা কে?

—গ্রীভস চিন্তান্বিত হয়ে কয়েক পলক চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

সিগারেট ধরিয়ে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। জ্যাক বলেছিল একাজে প্রচুর পয়সা আছে। লী ক্রিডি যদি মক্কেল হন তাহলে পয়সার ব্যাপারটা ভুল নয়। তার চারদিকে স্তাবক, চ্যালা, জো-হুজুর লোক, সেক্রেটারীর অভাব নেই যারা আমাদের মত লোককে তার কাছেও ঘেষতে দেবে না। জ্যাককে কি ভাড়া করেছিলেন তিনি? কেন? তাকে প্রশ্ন করা সহজ হবে না।

মুড ফিরিয়ে আনতে এক চুমুক হুইস্কি পান করি। অতঃপর টেলিফোন। রিসিভার তুলে ধরি—গ্রীভসকে দেবেন, কথাটা স্যুইচ বোর্ডের মেয়েটিকে বলি।

অল্প বিরতির পর লাইনের ওপার থেকে আসে গ্রীভসের গলা। বলি একটা টেলিফোন করার ছিল। আপনার স্যুইচ বোর্ড ক্লিয়ার তো! ইচ্ছে করেই একটু রহস্য রাখি কথায়।

—ভয়ের কিছু নেই। একটা পুলিশ, লাইনে আড়ি পেতেছিল। এইমাত্র চলে গেল।

ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে আবার রিসিভার তুলে মেয়েটির কাছে লী ক্রিডির লাইন চাইলাম।

মেয়েটা একটু ধরতে বলে, অল্পক্ষণ বাদেই পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে—আমি লী ক্রিডির বাড়ি থেকে বলছি।

—মিস্টার ক্রিডিকে দেবেন? আমার কণ্ঠে ব্যস্ততা।

আপনার নামটা যদি বলেন স্যার, আমি মিস্টার ক্রিডির সহকারীকে দিতে পারি।

—লিউ ব্রান্ডন আমার নাম। মিস্টার ক্রিডির সহকারীকে চাই না, মিস্টার ক্রিডিকেই চাই।

—যদি একটু ধরেন, আমি ক্রিডির সহকারীকে লাইন দিতে পারি। ঠাস করে যেন চড় পড়লো গালে। কণ্ঠস্বরের একঘেয়েমি। আর একই কথার পুনরাবৃত্তি যেন অপমানিত করে। এরপর লাইনের মধ্যে ক্যাঁ-কোঁ কট্ শব্দ। ছেঁড়া ছেঁড়া কথার আভাস। শেষে স্পষ্ট শোনা গেল হ্যামারস্কাল্ট হিয়ার। কে বলছেন?

—লিউ ব্রান্ডন। আমি মিস্টার ক্রিডিকে চাই।

—মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার কি দরকার? গলায় রুক্ষতা স্পষ্ট।

—সেটা মিস্টার ক্রিডি বলবেন, যদি আপনাকে জানানো দরকার মনে করেন। আমার সময় নষ্ট না করে লাইনটা দিন।

—তার সাথে কথা বলা অসম্ভব। কি বলতে চান, যদি সামান্য আভাস দেন। আমি তাকে বলবো। তিনি পরে আপনাকে ফোন করতে পারেন।

বুঝলাম রাস্তা বন্ধ। আমি রূঢ় ব্যবহার করলে আমার চালাকি ধরে ফেলবে লোকটা। সুতরাং শেষ অস্ত্রটি ছুঁড়ি খুব মোলায়েম স্বরে—বলুন, সানফ্রান্সিসকোর স্টার এজেন্সির সিনিয়র পার্টনার বলছি। তিনি অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। তাকে দেবার জন্য একটা রিপোর্ট আছে।

—তাই নাকি? কণ্ঠে বিস্ময়। ঠিক আছে মিস্টার ব্রান্ডন বলবো তাকে। পরে আপনাকে ফোন করছি। আপনার ফোন নম্বর কত?

নাম্বার জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। সিগারেট নিভিয়ে হুইস্কি শেষ করে চোখ বুজলাম। ভীষণ টেনসনের পর কখন চোখ লেগে গেছে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। ক্ষিপ্র হাতে রিসিভার তুলে নিলাম। মনিবন্ধে তাকালাম। প্রায় পনেরো মিনিট ঘুমিয়েছি।

—মিস্টার ব্রান্ডন?

—হ্যাঁ। হ্যামাবস্কান্টের গলা চিনতে পারলাম।

—আজ দুপুর তিনটের সময় মি. ক্রিডি আপনাকে ডেকেছেন। হ্যাঁ দয়া করে সঠিক সময়ে আসবেন। আজ দুপুরে মিঃ ক্রিডির বহু অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তার থেকে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আপনাকে দিতে পারবেন।

—সেই যথেষ্ট। বলে ফোন ছেড়ে দিলাম। ক্রিডি হয়তো জ্যাকের মক্কেল। হয়তো সেজন্য ঐ স্তরের একজন লোক আমার মত লোককে সময় দিতে রাজি হয়েছেন।

* * *

বহুদূর থেকে চোখে পড়ে লী ক্রিডির সাম্রাজ্য। বাড়ি যেন রাজপ্রাসাদ তিনতলা উঁচু। বিশাল বিশাল জানালা। টেরেস। নীল টালির ছাদ। লতানো ফুল গাছ ঢেকে রেখেছে সাদা দেওয়াল।

হোটেলের বাইরে সিপ্পির ব্যুইক রেখে গেছিল পুলিস। সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যুইকটা। পুলিশ না সিপ্পি। কে ক্ষতি করেছে গাড়ির? সম্ভবতঃ সিপ্পিই, সেই ব্যুইকটাব সওয়ার হয়ে ক্রিডির সাথে দেখা করতে ছুটেছিল। ব্যুইক ব্যবহার করে ট্যাক্সি খরচ বাঁচানো গেল। পেনিনসুলা থেকে প্রাইভেট রোডে পড়লাম। সামনের সাইনবোর্ড বলছে—খর এস্টেটের সাক্ষাৎপ্রার্থীরাই শুধু এপথ ব্যবহার করতে পারে, অন্যরা নয়।

আরো কিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ল লাল—সাদা পোল। তারপর ছোটখাটো সাদা গার্ড অফিস। এখানে রাস্তা ব্লক, দু'জন সাদা পোষাকের গার্ড এগিয়ে এল। ওরা কাছে আসতে বলি— মিঃ ক্রিডির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।

ওদের একজন এগিয়ে আসে—নাম কি?

নাম জানাই। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ওরা ব্যারিকেড তুলে নেবাব নির্দেশ দেয়। বলে সোজা যান। বাঁদিকে ঘোরার মুখে ছ'নম্বব সারিতে গাড়ি রাখবেন। বাঁদিকের মোড়ে, ছ'নম্বর সারিতে গাড়ি রাখলাম। দেখি, ওক্ কাঠের বিভিন্ন ফলকে বাটি অক্ষর জ্বলজ্বল করছে।

সহসা আমার পিছনে কে যেন বললো—যত্ত সব পয়সার অপচয়। ঘুরে তাকাই। সাদা পোষাকেব থলথলে বেঁটে এক গার্ড। তার সন্দিগ্ধ চোখ দুটো আমার সর্বাঙ্গে ঘুরে যায়—কাকে খুঁজছেন?

—ক্রিডিকে। ঘড়ির দিকে তাকাই। তিনটে বাজতে আর মিনিট বাকি। অগত্যা বলি—তিনটের সময় তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তিনি অপেক্ষা করা পছন্দ কবেন না।

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান, লোকে তাঁর দেখা পাবার জন্য তিন চার ঘণ্টা বসে থাকে। চলেই যাচ্ছিলাম, চকিতে মাথায় মতলব খেলে যায়। ঘুরে দাঁড়াই—আজ সন্ধ্যা ছ'টায় সময় হবে আপনার?

—আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আমার অনেক কাজ, বিড়বিড় করে সে।

—এই পুরোনো মালিকের কাছে বারো মাস কাজ করেছি। আজ চাকরি ছেড়ে দিয়ে পেটপুরে

মদ খাবো। সেলিব্রেট করবো। ব্যথা ভুলে থাকবো কেন?

—আজ আমিও সেলিব্রেট করবো। যদি অন্য কারোর সঙ্গে আপনাকে বসতে না হয়, তাহলে আসুন না, আমরা একসঙ্গে এনজয় করবো।

—আমার মেয়ে আমার মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না, ভাবছিলাম আজ একা একা খাবো। ভালোই হল, একজন সঙ্গী জুটে গেল। ঠিক আছে, বলুন, কোথায় আর কখন?

—ধরুন ছ'টায়। ভাল জায়গা জানা আছে আপনার?

—সাম্‌স কেবিন। যে কেউ বলে দেবে কোথায় জায়গাটা। আমার নাম টিম। টিম ফাল্টন।

—আমি লিউ ব্রাভন। আবার দেখা হবে, চলি। তাকে ছেড়ে একসাথে তিন তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে উঠি। বাঁদিকে লম্বা টেরেস পেরিয়ে প্রবেশ পথ।

মাত্র এক মিনিট বাকি। ডোর বেল বাজাই। দরজা খোলে তৎক্ষণাৎ। ছ'ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ হলিউডের বাটলারের ধরনের পোষাক পরিহিত রোগা প্রৌঢ় অল্প মাথা নুইয়ে একধারে সরে দাঁড়ান। আমি ঢুকি। ওরে বাবা। কি মস্ত হল ঘর। ছ'ছটা ক্যাডিলাক একসাথে এখানে গ্যারাজ করা যায় অনায়াসে।

—আপনি মিস্টার ব্রাভন?

—ঠিক ধরেছেন।

—আমি তাকে অনুসরণ করি। হল পেরিয়ে খানিক খোলা জায়গা। এখানে রোদ বড় তীব্র। আবার দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ ঘর।

ছ'জন ব্যবসায়ী অপেক্ষারত। উদ্‌গ্রীব। তাদের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ।

আমি বসে টুপি খুলে হাঁটুতে রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনটে বেজে তিন। সশব্দে দরজা খোলে। এক যুবক, দীর্ঘকায়, শীর্ণ, চামড়ায় আভিজাত্যের জৌলুস। পরনে কালো কোট ট্রাউজার, কালো টাই, ব্যবসায়ী দু'জনই উঠে দাঁড়ায়। প্রত্যেকে ভাবছে, বুঝি তারই ডাক এল।

যুবকের নির্দয় শীতল চোখ সবাইকে ছুঁয়ে আমাকে বিদ্ধ করে—মিঃ ব্রাভন? মিঃ ক্রিডি আপনাকে ডাকছেন। উঠে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, ক্ষমা করবেন মিঃ হ্যামারস্কাল্ট, আমি কিন্তু বেলা বারোটা থেকে অপেক্ষা করছি।

হ্যামারস্কাল্টের দৃষ্টিতে ভৎর্সনা।—আমি কি করতে পারি? মিঃ ক্রিডি যা ভালো বুঝবেন। উনি চারটের আগে ফ্রি হবেন না।

ছোট্ট লবি ও দুটো দরজা পেরিয়ে আমরা এসে থামলাম মেহগনি কাঠের জেল্লাদার দরজায়।

সে ধাক্কা দিয়ে দরজার পাল্লা খুলে ভেতরে তাকায়। বলে—ব্রাভন এসেছেন, স্যার। পাশে সরে দাঁড়ায় সে আমি ভেতরে ঢুকি।

এই ঘর মনে পড়িয়ে দেয় ফিল্মে দেখা মুসোলিনির সেই প্রখ্যাত অফিস। প্রায় ষাট ফুট লম্বা। বহুদূরে দুটো প্রকাণ্ড জানালা। যেখান দিয়ে ভেসে ওঠে সমুদ্র আর 'থর বে'। অনায়াসে বিলিয়ার্ড খেলা যায় এমন একটা ডেস্ক মাঝখানে। ঘরের অন্য অংশে গুটি কয়েক চেয়ার। দেওয়ালের হ্যাঙারে ঝুলন্ত স্যুট দুটো। একটা অয়েল পেন্টিং, এত কালো—আসল না নকল, বোঝা দায়।

ডেস্কের অপর প্রান্তে ছোটোখাটো একটা মানুষ। ধূর্ত দৃষ্টি। চশমা কপালে তোলা। ধূসর চুল, খুব অল্প। হাড় সর্বস্ব শক্ত করোটি। দৃঢ় মুখ।

আমি ধীরে এগিয়ে যাই। প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ক্রিডি যেন আমার শিরদাঁড়ার হাড়গুলোও দেখতে পাচ্ছেন। ওনার ডেস্কে পৌঁছতে টের পাই, আমি ঘেমে উঠেছি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে উনি চেয়ে আছেন। দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—কি চান আপনি?

—আমার নাম ব্রাভন, সানফ্রান্সিসকোর স্টার এনকোয়ারি এজেন্সি থেকে আসছি। আমার পার্টনারকে আপনি চারদিন আগে ভাড়া করেছিলেন।

দপ্‌ করে নিভে গেল মুখের আলো। বললেন—আমি ভাড়া করেছি—কি করে এ ধারণা হ'ল?

কথাটা তার ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। তথাপি লড়ে যাই—আমাদের সব মক্কেলের রেকর্ড রাখি আমরা। অফিস ছাড়ার আগে সিপ্পি লিখে রেখে গেছে। আপনি তাকে ভাড়া করেছেন।

—সিপ্পি কে?

—আমার পার্টনার। যাকে আপনি ভাড়া করেছিলেন।

—আমার অনেক অদরকারি কাজে আমি প্রতি সপ্তাহে কুড়ি পঁচিশ জনকে বহাল করি। কই, সিপ্পি নামের কোন নামতো মনে পড়ছে না। আপনি কি জন্য এসেছেন? কি চাই আপনার?

—আজ সকালে সিপ্পি খুন হয়েছে। ক্রিডির অন্তর্ভেদী চোখে চোখ রেখে বলতে থাকি—ও যে কাজ করছিল, আমি ভাবছিলাম, আপনি সে কাজের দায়িত্ব আমাকে দিতে পারেন।

—কাজটা কি? গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। জানতাম, আগে হোক পরে হোক, প্রশ্ন উঠবেই। এবং এই সেই মোক্ষম ও শেষ সীমান্ত। উত্তর আমার জানা নেই, কৌশলে জেনে নিতে হবে। বললাম—আমার চেয়ে আপনিই তা ভালো জানেন।

মুখ থমথমে। অন্ধকার। চিন্তিত দেখাচ্ছে। চার সেকেন্ড চুপ থাকার পরে টেবিলে ঘণ্টার বোতামে হাত রাখেন তিনি।

মুহূর্তে দরজা খুলে উদয় হয় হ্যামারস্কাল্ট। তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে হাঁক পাড়েন—হার্জ, হার্জ।

—এক্ষুনি, স্যার। চলে যায় সে।

চোখ নিচে। টেবিলে আঙুল বাজান ক্রিডি। আরো পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেটে যায় শব্দহীন।

দরজা খোলার শব্দ হয়। এক বেঁটে মোটা লোক ঘরে ঢোকে। তার বাঁ কান বেঁকে মাথার সাথে মিশে গেছে। কোনো অপকর্মের সাক্ষী। মুখ জুড়ে হাড়বিহীন বিরাট নাক, বুনো আক্রোশ ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে, কাঁধের কাছে ছড়ানো কালো চুল। পরনে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার ও সাদা স্পোর্টস কোট। টাই-এ হাতে আঁকা হিজিবিজি ছবি।

অতিদ্রুত টেবিলে এসে দাঁড়ায় সে, তার শরীর বুঝি ব্যালে নাচিয়ের মতো ভারহীন। আমাকে দেখিয়ে বলেন ক্রিডি—একে দেখে চিনে রাখো হার্জ। একে চোখে চোখে রাখার দরকার হতে পারে। হার্জ তাকায় আমার দিকে। আমার সর্বাঙ্গ জরিপ করে তার হিংস্র দুটি চোখ। ভাবলেশহীন চোখ,—দেখলে চিনতে পারবো, বস্, হার্জের গলা নরম। বস্-এর ইঙ্গিতে চলে যায় সে।

ক্রিডি বলে—এনকোয়ারি এজেন্টদের আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয় ঐ নোংরা লোকগুলো ব্ল্যাকমেলিং-এর সুযোগ খোঁজে। মিঃ সিপ্পি বা ঐ ধরনের কাউকে আমি ভাড়া করিনি। করার কথা ভাবিনি। আপনাকে পরামর্শ দেবো ; যথা শীঘ্র এ শহর ছেড়ে চলে যান। আমি আপনার মিঃ সিপ্পিকে চিনি না। আপনার সঙ্গে কোন কাজ কারবার করতেও চাই না। আপনি বেরিয়ে যান এখনি। নতুবা যার মূল্য আছে-এমন কিছু বলুন।

আমি হাসি। ক্রিডির অন্তর্ভেদী চোখে চোখ রাখি। ঐ চোখে রাগের বহ্নি। রাগ আমারও কম হয়নি। বোধহয় জীবনে এরকম ক্ষিপ্ত কখনো হইনি। হাসতে হাসতে বলি—হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে। প্রথমতঃ মিঃ ক্রিডি, আমি সঠিক জানতাম না আপনি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন কিনা। এখন জানলাম। ঘটনাচক্রে সিপ্পি তার ব্লটিং পেপারে আপনার নাম লিখে রেখেছিল ; কাজে নেমে, সেটাই ছিল আমার একমাত্র সূত্র। কাগজে আঁকিবুকি কাটা তার স্বভাব। তাই ভেবেছিলাম, কেউ হয়তো আপনার নামটা উত্থাপন করায় সিপ্পি তা লিখেছিল খেয়ালবশে। এখন জানলাম তা নয়। আজ সকালে আমি যখন ফোন করি, তখন নিশ্চিৎ ছিলাম আপনি দেখা করবেন না। আপনার স্তরের কোনো মানুষ আমাদের মত তুচ্ছ এনকোয়ারি এজেন্টকে পাত্তা দেবেন না, যদি না, সত্যি প্রয়োজন থাকে বা কোন কিছু গোপন করার থাকে। তাছাড়া দু'জন ব্যবসায়ীকে, যার মধ্যে একজন তিনঘণ্টা অপেক্ষারত, বাদ দিয়ে আমাকে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আপনি তিন মিনিটের বেশি কারোর কথা শোনেন না, আমি জানি। আপনি যখন জানলেন কত ক্ষুদ্র আমি তখনই আপনি আপনার পোষা গরিলাকে ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। ভাবলেন, ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবো আমি হোটেলে। আর সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পিঠটান দেবো। সবাই অত সহজে ভয় পায়না মিঃ ক্রিডি, তার মধ্যে একজন আমি।

—বলা শেষ হয়েছে?

—সম্পূর্ণ নয়। এখন আমি নিশ্চিত হলাম, সিপ্পিকে আপনি ভাড়া করেছিলেন। এবং সে এমন কিছু উন্মোচন করেছিল যা কারোর কাছে ভাল লাগেনি, তাই সে খুন হয়। আমি জানি আপনার

কাছে সেই সূত্র আছে যা জানলে পুলিশ খুনীকে ধরতে পারে। এবং আপনি চাইবেন না নিজেকে এই মার্ডার কেসের সঙ্গে জড়াতে। কারণ তাহলে প্রকাশ হয়ে যাবে আপনি কেন সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে, কোন মিলিয়ার যখন আপন বাসভূমি থেকে তিনশো মাইল দূরের কোন এজেন্টকে ভার করার কষ্ট স্বীকার করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি স্থানীয় বড় এজেন্টকে কাজের ভাড় দিয়ে সবকিছু ফাঁস করতে চান না। আমার প্রিয় সিপ্পি মৃত। পুলিশও যদি তার খুনীকে ধরতে অপারগ হয়, আমি হয়তো পারবো। হার্জ বা মিঃ ক্রিডি যাই করুন, আমি আমার কাজ করে যাব।

ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াই—দ্যাট্স অল। থাক্, আপনার পোষা গুণ্ডা ডাকতে হবেনা। আমি চলে যেতে পারবো নিজেই।

দরজার দিকে হেঁটে যাই। শুনতে পাই ক্রিডি বলছেন—আমি কিন্তু আপনাকে শাসাইনি।

দরজা খুলে বেরোই। বাটলার এগিয়ে দিতে আসে। ক্রিডির শেষ কথাটা মাথার মধ্যে লাফাতে থাকে পিং পং বলের মত।

* * *

হোটেলের সামনে দেখি পুলিশের গাড়ি পার্ক করা। ব্যুইক থেকে নামতেই পুলিসের গাড়ি থেকে এগিয়ে আসেন ক্যান্ডি—আপনাকে ডেকেছেন ক্যাপটেন।

হেসে বলি—যদি না যাই।

—ভাল কথায় না এলে জোর খাটাবো। এখন মর্জি আপনার। পুলিশের গাড়ির পিছনের সিটে বসতে বসতে বললাম—কি জন্য ডাকলেন?

—জানি না। মনে হল তার মেজাজ ভাল নেই।

—খুনীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন?

—এখনো পারিনি। তবে চেষ্টা চলছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার ঘেঁষে গাড়ি থামে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ ফাঁড়ির পরিচিত ঘ্রাণ নিতে নিতে সিঁড়ি টপকে স্যুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকি।

ক্যান্ডি সতর্ক করে দেন—সাবধানে পা ফেলবেন। ক্যাপ্টেন ক্ষেপলে বিপদে পড়বেন। তিনি একটা বন্ধ দরজার ঘা দেন। নব্ ঘুরিয়ে দরজা একটু খুলেই আমাকে ঠেলে দেন ভেতরে।

ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘর। বিরাট টেবিলের ও প্রান্তে বসে আছেন পর্বতসম মানুষটি। বয়স হয়েছে। তথাপি শরীরের কাঠামো বেশ শক্ত। কপালে ঝাঁপিয়ে পড়া চুল। মস্ত মুখে কঠোর হিংস্রতা।

দরজা ভেজিয়ে চলে যান ক্যান্ডি।

ব্রান্ডন? সিগারেটে জোরে টান মেরে বলেন ক্যাপ্টেন—আপনি আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন। এই শহর ছেড়ে কখন চলে যাচ্ছেন?

—জানিনা। আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যে!

—কি বললেন! এক সপ্তাহ ধরে কি রাজকাজ করবেন এখানে?

—প্রকৃতি দেখবো। সাঁতার কাটবো। মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করবো।

—হ্যাঁ! আপনি আর এই মার্ডার কেসে মাথা গলাবেন না, তাই তো?

—আমি সাগ্রহে লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনের তদন্তের উন্নতির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার সাহায্য ছাড়াই কাজটা তিনি সমাধান করতে পারবেন, ভরসা আছে।

—সে আপনার সহজ-সরল স্বীকারোক্তি। তবে হত্যাকারীকে ধরতে পারলে পিষে মারবো।

—তা আন্দাজ করতে পারি ক্যাপ্টেন।

—বটে? ছেলেমানুষি করবেন না। এই ধরনের কেসে মাথা গলিয়ে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন না। বুঝেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঠাৎ মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন—আপনি শুধু জঘন্য বদমাইশই নন, ধোঁকাবাজ। এসব ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে থাকুন, তাহলে হয়তো বাঁচতে পারেন। এ অফিসে ফের যদি আসেন তাহলে এমন অভিজ্ঞতা হবে জীবনে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, ফের যদি বেচাল দেখি, একেবারে ফটকে পুরে দেবো। বদমাশদের পেঁদিয়ে ঠাণ্ডা করতে আমরা ভালই জানি। ক্যান্ডি...ক্যান্ডি—হঠাৎ

চিৎকার করে ওঠেন তিনি, —এই ধোঁকাবাজটাকে নিয়ে যাও, একে দেখলে আমার বমি আসে।

দরজা খুলে ক্যান্ডি ঢোকেন। ক্যান্ডির সাথে বেরিয়ে যেতে গিয়ে চকিতে থামি, ঘুরে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, লী ক্রিডি কি আপনাকে বলেছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে?

ক্যাপ্টেনের হাত নিসপিস করে—তার মানে?

মিঃ ক্রিডি তাঁর কাজের জন্য সিপ্পিকে ভাড়া করেন। কাজ করতে গিয়ে খুন হল সিপ্পি। ক্রিডি চান ব্যাপারটা চেপে যেতে। সম্ভবতঃ তিনি ভয় পাচ্ছেন। সাক্ষী হিসেবে কোর্টে তলব হতে পারেন। এবং প্রশ্ন উঠতে পারে কেন তিনি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন। এ নিয়ে তার সাথে কিছু কথাও হয় আমার। তিনি তার পোষা গুণ্ডা হার্জকে দিয়ে আমায় ভয় দেখান যাতে আমি আর জল না ঘোলা করি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি উনি সাবধান হয়েও হননি! আবার আমাকে শাসাচ্ছেন আপনাকে দিয়ে।

আঁৎকে ওঠেন ক্যান্ডি। ক্যাপ্টেনের চোখ মুখের রং বদলায়। চেয়ার ছেড়ে ধীরে দাঁড়ান—ও, এখনো বাকি আছে কিছু দেখছি—দাঁত কিড়মিড় করে কথাগুলো বলেই সজোরে কষালেন এক চড়।

মারটা বেশ যুৎসই। ভার না সামলাতে পেরে মাটিতে সটান পড়ে যাই। আমাকে তিনি ওঠার সময় দেন। তারপর তাঁর রক্তজমাট কালো মুখটা আমার মুখের কাছে এনে বলেন—বেরিয়ে যা ধোঁকাবাজ। পরক্ষণেই ফিসফিসিয়ে বলেন—মার আমাকে, মার।

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ঝেড়ে দিই এক ঘুঁষি। কিন্তু জানি, উনি চাইছেন আমি হাত ওঠাই। মারি। জানি ঘুঁষি নয়, আমি একটু শাসালেই মুহূর্তে আমায় ফটকে পোরা হবে। অগত্যা, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

ক্যান্ডি ও ক্যাপ্টেন পরস্পরের দিকে তাকান। তারপর পিছু হটতে হটতে ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বলেন—হতভাগাকে এখুনি দূর করে দাও। নইলে খুন করে ফেলবো।

ক্যান্ডি আমার কাঁধ খামচে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যান। দরজার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তার রক্তজমাট মুখ থেকে রাগ বিরক্তি মিশ্রিত ক'টা কথা কানে আসে—আগেই সাবধান করেছিলাম। তবু গন্ডগোল পাকালেন। এখন জাহান্নামে যান।

সিঁড়ি ভেঙে পথে নামি।

।। তিন ।।

সেন্ট রাফাইল সিটির শেষ প্রান্তে হতশ্রী সাম্‌স কেবিন। সমুদ্রের খাঁড়ি থেকে যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে স্টীলের স্তম্ভের ওপর কাঠের রেস্টুরেন্টটি।

ছ'টা বাজতে পাঁচ।

পার্কিং জোন-এ গোটা তিরিশেক গাড়ি। যার মধ্যে একটাও ক্যাডিলাক কিংবা ক্লিপার নেই। সরু জেটি পেরিয়ে বার। জানলার ধারে, কোনের দিকে একটা টেবিলে গিয়ে বসি। ওয়েটার টেবিল মুছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। অর্ডার দিই, এক বোতল ব্ল্যাক লেবেল, বরফ আর দুটো গ্লাস। ছ'টার কয়েক মিনিট পরে ঢোকে টিম ফাল্টন। পরনে সবুজ ব্যাগি ট্রাউজার ও বুকখোলা নীল জামা। জ্যাকেট ঝুলিয়েছে কাঁধে।

চারদিকে সে দৃষ্টি বোলায়। আমায় দেখে হাসে। এগিয়ে এসে বসে আমার টেবিলে—এই যে মশাই, শুরু করে দিয়েছেন। আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না?

—বোতল খুলিনি এখনো। সহাস্যে বলি—বসুন। তা, ছুটি পেয়ে কেমন লাগছে।

—লোকটার কাছে এতদিন যে কি করে কাজ করলাম, তাই ভাবছি।

নখ দিয়ে বোতলের ছিপি খোলে টিম। দু'গ্লাসে মদ ঢেলে আমি বরফ মেশাই। তারপর একগ্লাস এগিয়ে দিই।

আমরা গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই। চিয়ার্স। চুমুক দিই গ্লাসে। সিগারেট ধরাই। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখি।

—ভাল কথা, মানুষটাকে কেমন দেখলেন, চমৎকার, তাই না? টিম প্রচ্ছন্ন কৌতুকে প্রশ্ন তোলে।

—হ্যাঁ, প্রকাণ্ড ঘর আর ঐ অন্তর্ভেদী চোখ। ঘেন্না লাগে ওর সঙ্গে কাজ করতে।

—আপনি একথা বলছেন ভাই! আমি একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছি অন্যত্র। দেখাশোনা করি এক বৃদ্ধার। বড় ভালোমানুষ বৃদ্ধা।

—বৃদ্ধার কথা পরে হবে, আচ্ছা, ঐ হার্জ লোকটা কেমন? টিম ভ্রূকুটি করে,—একি করছেন! মাটি করবেন নাকি সন্ধ্যেটা। ওকে নিয়ে পড়েছেন দেখছি আপনি।

—না মানে, যখন যাই ক্রিডির সঙ্গে দেখেছি লোকটাকে। এমন ঝাপট মেরেছিল আমায় লোকটা! কে লোকটা? কি করে ঐ অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে ক্রিডি নিজেকে খাপ খাওয়ান?

—হার্জ আগে গুণ্ডা ছিল। এখন ক্রিডির দেহরক্ষী ও কর্মী। এই এক রোগ বড়লোকদের। সর্বদা ভাবেন লোকে এই বুঝি তাকে গুলি করতে বা ছুরি মারতে আসছে।

—যতটা দেখায়, ততটা কি নিষ্ঠুর হার্জ?

মাথা নাড়ে টিম।—হ্যাঁ ঠিক ততটাই। কোন ফাঁকি নেই ক্রিডির নির্বাচনে।

তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ক্যাপ্টেন ও হার্জের মধ্যে তো কোন ফারাক নেই। আমি প্রশ্ন করি—আজ সমুদ্রতীরে যে খুন হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছেন খবরের কাগজে?

—সেই রকমই যেন সান্ধ্য কাগজে দেখলাম। এ প্রশ্ন হঠাৎ?

—মৃত ব্যক্তি আমার পার্টনার। আমার মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগে ক্রিডি তাকে ডেকে পাঠান। আপনি তাকে দেখে থাকবেন হয়তো।

—ক্রিডি ডেকে পাঠিয়েছিলেন? উৎসাহিত হয়ে টিম বলে—তাহলে দেখেছি হয়তো। এ সপ্তাহের বেশির ভাগ আমি গেট-এ ডিউটি করেছি। তাকে কেমন দেখতে?

আমি নিখুঁত বর্ণনা দিই সিপ্পির! জানি যদি সিপ্পিকে টিম দেখে তাহলে ভুলবে না। আমার ধারণা মিলে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে সে ফেটে পড়ে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি তাকে। লম্বা চওড়া লাল চুল—লোগার পথ ছেড়ে দেয় তাকে, আমি ফটকের সামনে তখন—তার নাম জিজ্ঞেস করিনি।

—তাকে দেখেছেন, একথা স্বীকার করতে পারবেন? ধরুন, যদি আপনাকে সাক্ষী দিতে হয় কোর্টে?

শেষ মদটুকু গলাধঃকরণ করে বলল সে—আলবাৎ স্বীকার করবো। গত মঙ্গলবার এসেছিলেন।

এই-ই যথেষ্ট। গাড়ির কথায় চিত্রটা আরও স্পষ্ট হয়। তাহলে ঠিকই ধরেছি। ক্রিডির সাথে জ্যাক সিপ্পি দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন?

কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে টিম—আপনি বললেন, খুন হয়েছেন!

—হ্যাঁ, পুলিশ ভাবছে কোন ঠগবাজ মেয়ের পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল। হতে পারে। উনি বড্ড বেশী পছন্দ করতেন মেয়েদের।

—পুলিসের কাছে গেছিলেন?

—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন ক্যাচেন লোকটা যেন কেমন। তাই না?

—যা বলেছেন। ক্বচিৎ ক্রিডির সাথে দেখা করতে আসেন। বছরে অন্ততঃ করে চারেক। ক্রিডির ঝুট- ঝামেলা সামলান বোধহয়। শুনলে অবাক হবেন, রাতে যত নাইট ক্লাব ও বেশ্যালয়গুলো খোলা থাকে। ক্যাচেন পরোক্ষভাবে সেগুলোর দেখভাল করেন।

—এসবের কি সম্পর্ক ক্রিডির সাথে?

—আরে। এ শহরের অধিকাংশই তার কেনা। এসব যারা চালায় ক্রিডি তো তাদের কাছে সরাসরি টাকা নিতে পারেন না, তাই ভাড়া আদায় করেন পরোক্ষভাবে। ক্যাচেনকে তাঁর দরকার।

—তিনি বিবাহিত। না?

—কে? ক্রিডি? যদ্দুর জানি, বিয়ে করেছিলেন চারবার। তার বেশিও হতে পারে। ব্রিজিৎ বর্দ তাঁর বর্তমান স্ত্রী। তাঁকে কখনো দেখছেন? প্রাক্তন ফিল্মস্টার।

—একবার। সত্যি, দেখার মত।

—এখনো তাই। তবে তাঁব সতীনের মেয়েকে তিনি দু-চোখে দেখতে পারেন না। আমি দু-একবার দেখেছি মেয়েকে। ওহ্, চোখ জুড়িয়ে যায়।

—তিনি কি বাড়িতেই থাকেন?

—না। আগে ছিলেন। ঘরটা কেউই এখন ব্যবহার করেন না। যখনই বুড়ো ক্রিডি কোন পার্টি দেন, মেয়ে মর্গটই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সৎমা ব্রিজিৎ বাইরে থাকেন। অন্ধকারে, ঠাণ্ডায়, লোকচক্ষুর আড়ালে। ব্রিজিৎ মর্গটের বনিবনা নেই। প্রায়ই ঝগড়া হত বলে, জিনিসপত্র নিয়ে মর্গট চলে যান। ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডের এক ফ্ল্যাটে থাকেন। সেই থেকে মেয়েকে হারিয়েছে বাপ। আমিও দেখতে পাইনি তাকে আর। ক্রিডির মত ব্রিজিৎ শুধুই বেদনা দিয়েছে আমাদের। চির অসুখী, সর্বদা প্রলাপ বকছেন, সারাদিন ঘুমোচ্ছেন, সারারাত বিনিদ্র কাটাচ্ছেন।

টিম বলে যায়—মিঃ ক্রিডির সাথে থেকে কেউই সুখী নয়। সর্বক্ষণ টাকার জন্য স্বামীর ব্যস্ততা বরদাস্ত করবে কোন স্ত্রী?

—উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা?

—মিসেসের বর্তমান প্রেমিক ঝাঁকড়া চুলের নাদুস নুদুস যুবক জ্যাকুইস ফ্রিসবি। ফ্রেঞ্চ ও কানাডার মিশ্র রক্ত তার শরীরে।

সহসা খেয়াল করি আমাদের টেবিলের দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য ভাবি হয়তো ওয়েটার। খাবার আনছে। জানলার দিকে তাকাই আর তখনই ফাল্টনের শ্বাস টানার শব্দ। দেখি, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হার্জ। আমার দিকে দৃষ্টি। তার পেছনে অর্ধবৃত্তাকার করে দাঁড়িয়ে চারজন লম্বা চওড়া, ভয়ঙ্কর গুণ্ডা ধরনের লোক। বন্ধ আমার পালাবার পথ। হার্জের ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে হিংস্রতা। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নামলো হিমশীতল প্রবাহ।

হঠাৎ স্তব্ধ হল গুঞ্জন। সবকটা মাথা ঘুরে গেল। সবার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে নিবদ্ধ। সঙ্গীন অবস্থা। আমার আর হার্জের মাঝে টেবিল। আমার চেয়ারের পেছনে দেওয়াল। গোলমালের গন্ধ পেয়ে অনেকেই নিঃশব্দে রেস্টুরেন্ট ছেড়ে প্রস্থানের পথে। ছোট্ট টেবিল সামনে। হার্জের পেছনে কোন দেওয়াল নেই। চোখে পড়ে, ঘরের কোণে এক দীর্ঘকায় নিগ্রো। বার-এর পিছন দিক থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। জো লুইসের মত চেহারা। চওড়া ঠোঁটে ছদ্ম ক্ষমার হাসি। ক্ষিপ্র পায়ে সেই চার সাকরেদ দরজা পেরিয়ে হার্জের পাশে এসে দাঁড়ায়।

টেবিলের কোণা ধরে আমি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি। নরম স্বরে নিগ্রো বলে—বস্, এখানে গোলমাল করবেন না। যদি আপনাদের দু'জনের মধ্যে কোনো বোঝাপড়ার দরকার থাকে, বাইরে গিয়ে করুন।

মাথা ঘুরিয়ে হার্জ নিগ্রোর দিকে তাকায়। চোখে সামান্য বিদ্যুৎ। ছারপোকা মনে হয় নিগ্রোটিকে। তড়িৎ হার্জের ডান মুষ্টি ছুটে যেতে দেখালাম। নিগ্রোর মুখে আঘাত হানে। প্রথমে টলে পিছিয়ে যায় সে। তারপর হাত-পা মুড়ে লুটিয়ে পড়ে।

চোখের নিমেষে ঘটে যায় সব।

টেবিলের দুই কোণা ধরে ছুঁড়ে দিই আমি। দু'জন গুণ্ডা সমেত হার্জ পড়ে যায়। আমি লাফিয়ে উঠে চেয়ার তুলে নিই। চক্রাকারে ঘোরাই মাথার ওপর তুলে জায়গা ফাঁকা হয়। বেরিয়ে যাবার পথ পাই আমি। টিম একটা চেয়ার তুলেছে। কাছের একটা গুণ্ডার মাথায় সজোরে বসিয়ে দেয়। দড়াম করে পড়ে যায় গুণ্ডাটা। ওদিকে ষণ্ডা মার্কা লোক দরজা আটকে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একজন নিগ্রো। হার্জ ও তার তিন সাগরেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। হার্জের মাথায় মেরে চেয়ারটা ভেঙেছে। লাঠির মত চেয়ারের দুটো পায়া আমার হাতে। এগুলো পশুর মত অতিকায় হার্জের বিরুদ্ধে নেহাতই নগণ্য।

দাঁত কিড়মিড় করে হার্জ। তার উদ্যত ডান হাত আঘাত করার আগেই আমি লাফিয়ে কাছে চলে আসি। মুখের মাঝামাঝি ঘুঁষি চালাই। জব্বর হয়েছে ঘুঁষিটা। মাথা টাল খায় হার্জের। সে সুযোগে পালাবার জন্য পা বাড়াই। অকস্মাৎ প্রবল বাঁ হাতের ধাক্কায় ফিরে আসি ফের হার্জের কাছে। হার্জের এক সাগরেদের কাছ থেকে এল মারটা।

চকিতে হার্জের কোমর জড়িয়ে ধবি আমি। তার একটা হাত কাঁধে তুলে নিয়ে, অর্ধেক ঘুরে, শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিই। আমার মাথার ওপর দিযে তার শরীর রকেট গতিতে মাটিতে আছড়ে পড়ে। সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফাল্টনকে খুঁজি। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুমালে মুখ ঢাকা। কনুই থেকে হাতটা ঝুলছে। তার অপর বাহু আকর্ষণ করে বলি—বাইরে যাই, চলুন।

হার্জের এক চ্যালা পথ আটকে দাঁড়ায়। আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুটে আসে। তড়িৎগতিতে মাথা ঘুরিয়ে পাঁজরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুঁষি চালাই। সেইসঙ্গে লাথি কষাই পা লক্ষ্য করে। তারপর সেদিকে না তাকিয়ে টিমকে কোনরকমে টেনে নিয়ে দৌড়ই বেরুবার পথের দিকে।

বাইরে এসেও নিস্কৃতি নেই। সামনে সঙ্কীণ; দীর্ঘ জেটি। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। শেষ প্রান্তে আলোকিত পার্কিং জোন।

টিম ভীষণ জখম। জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হার্জ দলবল সহ হাজির হবে।

টিম গোঙাতে থাকে—ছেড়ে দিন, এক পাও আর যেতে পারছিনা। আপনি পালান ওরা ধরার আগে। ওর একটা হাত আমার মাথা ঘুরিয়ে কাঁধে রাখি। প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকি পার্কিং জোনের দিকে। হার্জ ছুটে আসছে জেটিতে। আমি টিমকে বলি দৌড়োন,ওদের আমি আটকাচ্ছি।

টিমকে ছাড়তে সে আপ্রাণ দৌড়ায়। ততক্ষণে হার্জ আমার মুখোমুখি। আমার পাশে ঘুরতে থাকে মুষ্ঠি যোদ্ধার ভঙ্গিতে। যেন শিকারের ওপর ঝাঁপানোর আগে বাঘের সতর্ক ভঙ্গি।

আমি স্থান বদলাই। এমনভাবে দাঁড়াই যাতে মাথায় ওপর দিয়ে আলো এসে লাগে হার্জের চোখে। ধক্-ধক্ করছে তার রাগী চোখদুটো। আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখি।

খ্যাপা বাইসনের মত ঘুঁষি বাগিয়ে তেড়ে আসে সে। আমি অল্প সরে দাঁড়িয়ে অব্যর্থ ঘুঁষি চালাই তার মুখে। হার্জের মাথাটা পেছন দিকে টাল খায়। সুযোগ বুঝে ডাইনে ঘুরে দ্বিতীয় আঘাত করি গায়।

আচমকা অনুভব করি আমার বাঁদিকে যেন হাতুড়ির ঘা পরে।

পিছু হটে যাই দু-পা। হার্জ এগিয়ে আসে। এবার এক লাথি, সে ছিটকে পড়ে। পিছু ফিরে দেখি টিমকে দেখা যাচ্ছে না আর। এই সুযোগ, এবার পালাই। এক দৌড়ে পার্কিং জোন-এ আসতে কানে আসে ভারী কণ্ঠের ডাক—এই ব্রান্ডন, এদিকে আসুন।

দেখি গাড়ির মধ্যে টিম বসে আছে। সামনের সিটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিই। পেছনে, মাত্র কুড়ি গজ দূরে রাগে ফুঁসছে হার্জ। পার্কিং অঞ্চল ছেড়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছোটাই। দু-পাশে সুদৃশ্য গাছপালা, নুড়ি বিছানো পথ গেছে বড় রাস্তায়। প্রধান সড়কে পড়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিই। পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রার্থিত হাসপাতালের দরজায় গাড়ি থামাই। গাড়ি থেকে নেমে টিম বলে—এবার যেতে পারবো নিজে। আমি বোকা, পেটে কথা থাকেনা। সব খুলে বলেছি আপনাকে।

—আমি দুঃখিত। আপনাকে এরকম পার্টি দেবার জন্য ডাকিনি। বিশ্বাস করুন। আমরা কেস করতে পারি হার্জের বিরুদ্ধে। সাক্ষী আছে অনেক।

—ঢের হয়েছে। আমি আর নেই এসবে। থাকলে বিপদে পড়ব। কালই মালপত্তর নিয়ে চলে যাবো এ শহর ছেড়ে। বহুৎ শিক্ষা হয়েছে। আর না।

অসহ্য যন্ত্রণায় ন্যুব্জ। টিম ফাল্টন এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে যায়। আমি গাড়িতে উঠে হোটেলে ফিরতে থাকি।

হোটেলে ফিরে স্নান শেষে বিছানায় শুলাম। মনে পড়ল, রাতের খাবার খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত লাগছে।

রুম সার্ভিসকে স্যান্ডউইচ, মাখন রুটি ও বরফ শীতল এক পাঁইট বিয়ারের অর্ডার দিলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি সারাদিনের কর্মকাণ্ডের কথা। জানি, বাঘের গুহায় পা দিয়েছি। জানি না কতক্ষণ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারব। তাছাড়া হার্জকে কায়দা করলেও ক্যাপ্টেনের সাথে কি এঁটে উঠবো? যে কোন মিথ্যা চার্জে লকআপে ভরে দেবে।

এভাবে চিন্তা করতে করতে উঠে, মর্গটের ফোন নম্বর খুঁজি টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুলে। জানি ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডে ফ্ল্যাট তার। এইতো পেয়েছি। বড় হরফে লেখা ফ্রাঙ্কেন আর্মস।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে দরজা খুলি। ওয়েটার উপস্থিত খাবার নিয়ে।

খাবার শেষ করে সিগারেট ধরাই। তারপর হোটেলের প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ে জ্যাকের স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসি। সাড়ে দশটায় চিঠি লেখা শেষ হয়। চিঠিতে আমি তাকে স্বামী হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণবাবদ এককালীন মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। জানি, এ নিয়ে দীর্ঘদিন তর্কাতর্কি করে বিশ্রীভাবে শেষে ভালরকম আদায় করবেন। আমাকে কখনোই পছন্দ করতেন না তিনি। যাই দিই, তিনি খুশী হবেন না।

কাগজটা খামে ভরে ঠিকানা লিখে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখি আগামীকালের ডাকে দেব বলে। জ্যাকের জিনিষপত্র আমার ঘরে কেউ ডাঁই করে রেখেছে। কৌতূহলবশতঃ জ্যাকের সুটকেসগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই যাতে আপত্তিকর কিছু না থাকে। যা পেয়ে জ্যাকের স্ত্রী হতাশ বা দুঃখিত হয়।

কয়েকটা ফটোগ্রাফ ও চিঠি পাই যা প্রমাণ করে গত কয়েক বছর ধরে জ্যাক স্ত্রীকে ঠকাচ্ছিল। সেই ছবি ও প্রেমপত্রগুলো নোংরা ফেলার বাক্সে ফেলে দিই।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কিছু পেলাম না। স্যুটকেসের গোপন খাপে হাত রাখতে উঠে এল একটি 'ম্যাচ-ফোল্ডার।' নাইটক্লাব ও রেস্টুরেন্টে এগুলো দেয় বলে কোথায় যেন বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। কালচে লাল সিল্কে মোড়া ম্যাচ-ফোল্ডারের ওপর সোনালি হরফে লেখা 'দ্য মাসকেটিয়ার ক্লাব' ও তার ফোন নম্বর।

দু'আঙুলের ফাঁকে দেশলাই বাক্সের মত ম্যাচ-ফোল্ডার নিয়ে ডিটেকটিভ গ্রীভসের কথা মনে পড়ে—'এই শহরের সবচেয়ে বিত্তশালীদের ক্লাব'। কি করে এই ফোল্ডার পেল জ্যাক? সেকি গেছিল ঐ ক্লাবে? তাকে যতটা জানি, ব্যবসায়িক কারণ ছাড়া বড়লোকদের ক্লাবে সে যাবে না।

ফোল্ডার পেয়ে যেন মাটি পেলাম পায়ের নিচে। একটু চিন্তা করে, ঘর ছেড়ে এলিভেটর ধরে নিচে লবিতে নাবি।

গ্রীভস কাছে পিঠে আছে কিনা খোঁজ নিই রিসেপশনে। ক্লার্ক জানায়—এইমাত্র তার অফিসে গেলেন। নিচের ঘরে, ডানদিকে চলে যান। আপনার কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

—ওহ্ এই চোখ, না। ওয়েটারকে স্যান্ডউইচ পাঠাতে বলতে, সে খাবার ছুঁড়ে মেরেছিল। তাই—না না, সেজন্য মনে কিছু করিনি। আমি এধরনের ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত।

ক্লার্ক তো কথা শুনে হাঁ। আর আমি সোজা অফিসে। খোলা দরজায় পা দিতেই নজর পড়ে নাতিদীর্ঘ ঘরে ছোট্ট টেবিলে গ্রীভস বসে আছে।

—আপনার মুখের চেহারা কেউ বদলে দিয়েছে দেখছি। উৎসুকভাবে বলে গ্রীভস।

—হ্যাঁ। ম্যাচ ফোল্ডারটা টেবিলে ছুঁড়ে দিই চমকে ওঠে গ্রীভস।—এটা এল কোত্থেকে?

—সিপ্পির স্যুটকেস থেকে।

—বাজি রেখে বলতে পারি। কখনই সেখানে যাননি উনি। উনি সেই শ্রেণীর লোক নন। তাঁর অত পয়সা বা খুঁটির জোর ছিল না যে সেখানে প্রবেশাধিকার পাবেন।

—কেউ নিয়ে গেছিল হয়তো, সেটা সম্ভব তো।

—হতে পারে। একজন সভ্য বা মেম্বার তার পছন্দের লোককে ক্লাবে আনতে পারেন। তবে অন্য মেম্বাররা তাকে কোন কারণে অপছন্দ বা আপত্তি করলে সে সভ্যের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

—জ্যাক হয়তো এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

—শুনুন যারা ঐ মাসকেটিয়ার ক্লাবে যান, তারা কখনোই নিজেদের চাঁপাকলির মত আঙুল ক্লেদাক্ত করবেন না এরকম ম্যাচ ফোল্ডার ছুঁয়ে। ভয় পাবেন ওঁরা। নির্ঘাৎ-এ জিনিস রাস্তায় পড়ে ছিল। বিস্তর জীবাণু লেগে আছে। তবে আমার যা মনে হচ্ছে কেউ ঐ ক্লাবে যেতেন তা প্রমাণ করতে জ্যাককে সাথে নিয়ে গেছিলেন, হয়তো ব্যাপারটা স্রেফ বাজি রাখার খেলা।

—মেম্বারদের লিষ্ট কোথায় গেলে পেতে পারি? গ্রীভসের মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি। কাপার্ডের আড়াল থেকে অবিকল এই রকম একটা ছোট বই বের করে বললেন—হোটেল রিজাৎ প্লাজার একটি হোটেল থেকে এটা পেয়েছি। রেখে দিয়েছি কোনদিন কাজে লাগবে ভেবে। যদিও দু'বছর আগের ডেট লেখা আছে।

বইটা অবিকল ম্যাচবক্সের মত। লাল-জল সিল্কের ওপর সোনালী হরফে লেখা ক্লাবের নাম, ফোন নম্বর।—এটা পরে ফেরৎ দেবো। ধন্যবাদ বলে, পকেট বই ও ম্যাচ ফোল্ডার পকেটে রাখি।

—কে এই পাপ আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছে?

—কারোর দরকার নেই জানার। বলে, বেরিয়ে আসি। লাউঞ্জে যেতে যেতে বই-এর পাতা ওল্টাই। পাঁচশ জন সভ্যের নামধাম লেখা। তার মধ্যে আমার কাছে চারশো সাতানব্বই জন অর্থহীন। বাকি তিনজন... মিসেস ব্রিজিৎ ক্রিডি, মিঃ জ্যাকুইস ফ্রিস্‌বি এবং মিস্ মর্গট ক্রিডি।

মাথার মধ্যে অসংখ্য ঝিঁঝির ডাক। তার মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে। মাল নিয়ে কুলি যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বলি—ও ভাই, ফ্রাঙ্কলিন অ্যাভিনিউ কোথায় বলতে পারেন?

—ডান দিকে গিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা ধরুন। তারপর বাঁদিকে প্রথম সিগন্যালের পাশের রাস্তা।

ধন্যবাদ জানিয়ে, নিজের গাড়ির দিকে এগোই।

।। চার ।।

যাদের মাসিক রোজগার চার অঙ্কের ওপর, কেবল তাদের জন্য ফ্রাঙ্কলিন অ্যাপার্টমেন্ট। সমাজের ওপর তলার ধনকুবেরদের ত্রিশটির বেশি ফ্ল্যাট আছে এই ব্লকে।

সিলভার রিথ ও রোলসরয়েসের মাঝ দিয়ে ছুটছে আমার গাড়ি।

পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে পা রাখি ভেতরে। রিভলভিং দরজা। ওক কাঠের লবি।

খানিক দূরে রিসেপশনের ডেস্কের পিছনে এক লম্বা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে বন্ধুত্বের হাসি ছড়িয়ে বলি—মিস্ ক্রিডি আছেন?

নেকটাই নাড়াচাড়া করতে করতে আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করে সে—আপনাকে কি ডেকেছেন মিস ক্রিডি?

—না। দয়া করে তাঁকে বলবেন, আমি তার বাবার সাথে এই মাত্র দেখা করে এসেছি। দু-একটা কথা তার সাথে বলতে চাই। আমার নাম লিউ ব্রান্ডন।

নিখাদ সোনার ও মেগা রিস্টওয়াচে চোখ রেখে সে বলে তাঁকে ডাকার সময় পেরিয়ে গেছে।

—শুনুন মশাই, মিস ক্রিডিকে খবর দিন, তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

লোকটার চোখে শঙ্কা। সে চেয়ে থাকে খানিক। তারপর কাউন্টারের পিছনের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

প্যাকেট খুলে ঠোঁটে সিগারেট রাখি। মিনিট দুই পরে, সে হাসি মুখে ফেরে। বলে তিনতলা, সাতনম্বর ফ্ল্যাট।

স্বয়ংক্রিয় এলিভেটর পৌঁছে দেয় আমাকে তিনতলায়। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেলে হাত রাখি। ভেতর থেকে ভেসে আসে মোৎসার্টের সিম্ফনি। সৌম্য চেহারার মধ্য বয়স্কা রমণী দরজা খোলে। পরণে সিল্কের পোষাক ও সাদা অ্যাপ্রন।

মহিলার প্রশ্ন—মিস্টার ব্রান্ডন?

—হ্যাঁ। ছোট্ট হল পেরিয়ে যেতে যেতে আমি টুপি দিই মহিলার হেপাজতে। চমৎকার সুদৃশ্য হল। ডিম্বাকৃতি টেবিলে রুপোর পাত্রে, অর্কিড ফুটছে। কর্মচারীনী মহিলা দরজা খুলে 'মিঃ ব্রান্ডন' বলে একধারে সরে দাঁড়ায়। আমি ঘরে ঢুকি।

মস্ত লাউঞ্জ। ঘর, আসবাব আর পর্দার রং সাদা। এমন কি, গদি আঁটা চেয়ারগুলোও সাদা চামড়ার। মেঝের কার্পেট ও মিস ক্রিডির পোষাক সাদা। বিরাট রেডিও গ্রামের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ আমার দিকে। স্লিম, বেশ লম্বা, ধূসর সোনালী চুল রেশম কোমল। চিরন্তনের বহতা ধারায় কি অপার্থিব সৌন্দর্য। ফুটন্ত ফুলের শোভা তার চোখে। উন্নত স্তন, দীঘল দুটি পা, নিতম্ব যেন তানপুরা। দুধেল শরীরটা ঢেকেছে সান্ধ্য গাউন। গলায় হীরে বসানো মালাটি বোধহয় নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কিছু খসিয়ে মিঃ ক্রিডি উপহার দিয়েছিলেন মেয়ের একুশতম জন্মদিনে।

কনুই ঢাকা গ্লাভস ঢেকেছে দুই হাত। মনিবন্ধে হীরক খচিত প্ল্যাটিনাম ঘড়ি। গ্লাভসের ওপর ছোট্ট অনামিকায় রক্ত রুবির সোনার আংটি। তাঁর শরীরের প্রতিটি ত্বক যেন ঘোষণা করে তিনি

কোটিপতি ঘরের মেয়ে। এবার বুঝলাম, মিসেস ও মিস ক্রিডির দ্বন্দ্ব কোথায়।

আমি কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বললাম—অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিস্ ক্রিডি। বিষয়টা খুব জরুরী বলেই কষ্ট দিলাম।

অস্ফুট হাসি তাঁর চোখে। সে হাসি না আন্তরিকতার না বন্ধুত্বের। শুধু সৌজন্যবোধ। তার বেশি নয়, কমও নয়।

—বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আপনার?

—না মানে, সত্যি বলতে কি, আপনার বাবার নাম না করলে আমার মনে হয়েছিল আপনি দেখা করবেন না। স্টার এনকোয়ারী এজেন্সির প্রধান আমি। আশা করি আমায় সাহায্য করতে আপনি রাজি হবেন।

—তার মানে-আ-আপনি প্রাইভেট গোয়েন্দা? তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত। চিন্তার রেখা কপালে। তবু দু-চোখে সৌন্দর্যের কালো মেঘের খেলা।

—ঠিক ধরেছেন। অপ্রস্তুত হেসে বলি—আমি লড়ছি একটা কেস নিয়ে। মিস ক্রিডি আমায় আপনি সাহায্য করতে পারেন।

—সাহায্য! আপনাকে? কি বলতে চাইছেন আপনি। কেন সাহায্য করব আমি।

—কোন কারণ নেই। তবু কিছু লোক কার্পণ্য করেন না অপরকে সাহায্য করতে।

বলি—ব্যাপারটা খুলে বললে আপনি উৎসাহিত হবেন। সামান্য ইতস্ততঃ করে একটা চেয়ারে বসেন তিনি—ঠিক আছে বলুন। ঐ চেয়ারে বসতে পারেন আপনি।

বিপরীত চেয়ারে বসে শুরু করি—আমাদের অফিস সানফ্রান্সিসকো থেকে আমার পার্টনার মিঃ সিপ্পি টেলিফোনে একটা কাজের নির্দেশ পেয়ে এখানে আসেন দিন পাঁচেক আগে। যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি নাম জানাননি আমাদের অপারেটরকে। সে সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম না। কে ডেকে পাঠিয়েছেন না জানিয়েই সিপ্পি অফিস ছেড়ে আসেন। কিন্তু তাঁর ব্লটিং পেপারে আপনার বাবার নাম লিখে রেখে এসেছেন। এরপর তিনি কেবল মারফত আমায় এখানে আসতে লেখেন। আমি এসে পৌঁছই সকালে। আগে থেকেই সিপ্পি হোটেলে অন্য রুম বুক করেছিলেন। এসে শুনি, তিনি বেরিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে তাকে সনাক্ত করার জন্য পুলিশ আমায় নিয়ে যায়। সমুদ্রতীরে এক স্নানের কেবিনে তিনি খুন হয়েছেন।

—কেন? মিস ক্রিডির চোখ বিস্ফারিত।—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সান্ধ্য কাগজে দেখেছি—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—তিনিই আপনার পার্টনার?

—হ্যাঁ।

—আপনি বলছেন, তাঁর ব্লটারে আমার বাবার নাম লিখে রেখেছেন। কেন লিখেছিলেন?

—জানি না, তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিনা আপনার বাবা।

রক্তরুবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মিস ক্রিডি বলেন—বাবা ডাকবেন না। যদি তেমন দরকার হত, তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে ব্যবস্থা করতে বলতেন।

—এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আর কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে একটু বেরোতে হবে।

—আজ দুপুরে আপনার বাবার সাথে দেখা করেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি ভাড়া করেছিলেন কিনা সিপ্পিকে। তিনি বলেছেন করেননি। এবং ক্ষেপে গিয়ে হার্জ নামক একজনকে ডেকে আমার ওপর নজর রাখতে বলেছেন।

—কি মুশকিল, আমার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না। ক্ষমা করুন, আমাকে এবার উঠতে হয়...

আমি উঠে দাঁড়াই...সিপ্পির গতিবিধি অনুমান করার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে, সিপ্পি মাসকেটিয়ার ক্লাবে গেছিলেন। কার সাথে গেছিলেন, সেটাই প্রশ্ন। আপনি কি মেম্বার ঐ ক্লাবের? আপনি যদি সেখানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি কিছু খোঁজখবর নিতে পারি। মানে তদন্তের জন্য...

মিস ক্রিডি এত অবাক যেন আমি চাঁদে পা দিতে চাইছি—অসম্ভব ব্যাপার। এধরনের ইচ্ছা

না থাকলেও, ধরুন যদি আপনাকে আমি ক্লাবে নিয়েও যাই, কোনো মেম্বারই আপনার জিজ্ঞাসাবাদ করাটা পছন্দ করবেন না।

—আমি আপনার সঙ্গে তো যাবো। শুনেছি সেখানে দারুণ বড়লোকের ভিড়। যদি আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন আমার হয়ে।

—আ'ম সরি মিস্টার ব্রান্ডন। তা একেবারেই অসম্ভব। এখন বলতে বাধা হচ্ছি আপনি চলে যান।

মিস ক্রিডি বেল বাজান। মধ্যবয়স্কা পরিচারিকা ঢুকতেই বলেন—অ্যাই টেসা, এখন মিস্টার ব্রান্ডন যাচ্ছেন।

পরিচারিকার হাত থেকে টুপি নিয়ে আমি ঘর ছেড়ে করিডোরে পা রাখি।

এলিভেটরে নামতে নামতে মনে হল, মর্গট জানে তাঁর বাবা সিপ্পিকে কেন ভাড়া করেছিলেন। অর্থাৎ এটা পারিবারিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে মিসেস ক্রিডির বয়ফ্রেন্ড জ্যাকুইস ফ্রিসবির সাথে কথা বলা দরকার।

এখন মাত্র এগারোটা দশ। হোটেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরবো? গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর সমুদ্রাভিমুখে গাড়ি ছোটালাম।

মিনিট দশেক লেগেছে সমুদ্রতীর পৌঁছতে। অগনিত নারী-পুরুষ নেমেছে সমুদ্রস্নানে। বালিয়াড়ি ভেঙে হাঁটছি তীরের দিকে। বিচ-এর গেট বন্ধ। তালা দেওয়া। যাক্ নিশ্চিন্ত। কেউ লক্ষ্য করবে না আমায়। দূরে দেখা যায় স্নানার্থিদের সারিবদ্ধ কেবিন। পাহারার জন্য র‍্যানকিন পুলিশ মোতয়েন করতে পারেন। সমুদ্রতীর ভারি নিঃসঙ্গ।

এই সেই অভিশপ্ত কেবিন, দরজা ঠেললাম, খুললো না, তালাবন্ধ সঙ্গে ফ্ল্যাসলাইট ছিল। জ্বাললাম। পকেট থেকে সরু একটা স্টীলের গজ বের করলাম। কড়া ও তালার মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

দরজার কাছে থামলাম। গনগনে আঁচ থেকে যেন তাপ ঝাপটা দিচ্ছে। ফ্ল্যাসলাইটের তীব্র গোল আলো, সারা ঘরে ধীরে ধীরে বোলালাম।

ঘরে দুটো আসবাব। একটি ডিভান, একটি টেবিল, যেখানে সিপ্পি মারা যায় সেই কোনে রক্তের কালো ছাপ মৃত্যুর আলপনা এঁকেছে। ভয় ভয় লাগে। হিম হয়ে আসে শরীর। আমার বিপরীতে দুটো দরজা। এঘর থেকে দুটো ঘরেই যাওয়া যায়। ওরই একটা ব্যবহার করেছিল সিপ্পি। এই মেয়েটার কথা ভাবতে অবাক লাগে। কোন বদ উদ্দেশ্যে কি সিপ্পিকে এখানে এনেছিল? মেয়েদের ফাঁদে পা দেবার ছেলে সিপ্পি নয়। সিপ্পির মৃত্যুতে ক্রিডির কি কোন হাত নেই?

হাত দিয়ে কপাল মুছি। ভাবতে থাকি মেয়েটাই খুনী নয়তো?

দরজা ভেজিয়ে ঢুকি। সামনের ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে উঁকি দিই ভেতরে। কিছু না পেয়ে অগত্যা বেরিয়ে এলাম। ভাবছি, সময় নষ্ট শুধু শুধু। এবার দেখা যাক পাশের ঘরটা। চকিতে অনুভব করি অন্ধকার কেবিনে একা নই আমি। স্নায়ুর মত দাঁড়িয়ে থাকি। কান পেতে রই। কেবল নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ। ফ্ল্যাসলাইটের বোতামে হাত লেগে নিভে যায়। আমাকে ঢেকে দেয় প্রগাঢ় অন্ধকার। কিছুক্ষণ কাটে। কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবি, আমায় বিভ্রান্ত করেছে আমার কল্পনা। তখনই ক্ষীণ শ্বাস ফেলার শব্দ কানে আসে। কে যেন খুব ধীরে ধীরে মুখ খুলে শ্বাস ফেলছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোন শব্দ হলে ঐ শব্দে পেতাম না। ভাগ্যিস বন্দুক এনেছি সঙ্গে। দু-পা পিছিয়ে ফ্ল্যাসলাইট জ্বালি। মেঝেতে আলো ছড়ায় বৃত্তাকারে। আলো ঘুরিয়ে দেখি। নজরে কিছুই পড়ে না। তবু ঐ ক্ষীণ শব্দ আমায় তাড়া করে ফেরে। দ্বিতীয় পোষাক ছাড়ার ঘরের দরজায় মৃদু চাপ দিতে খুলে যায়। তুলে ধরি ফ্ল্যাসলাইট।

মেয়েটি বসে আছে মেঝেতে। দৃষ্টি আমার দিকে। পরণে হালকা নীল সাঁতার পোষাক। উজ্জ্বল হরিদ্রাভ ত্বক। চোখদুটি খোলা শূন্য দৃষ্টি। বা-কাঁধ থেকে বয়ে গেছে রক্তের ধারা। চব্বিশ-পঁচিশ-এর যেন নিখুঁত মডেল, কালো সুন্দর মুখ।

আলোর বৃত্তে অন্তিম শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অপলক চেয়ে থাকল সে। আমি দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মত। সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

তারপর খুব ধীরে একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। নিস্পন্দ। স্থির।

আমি নড়তে পারছি না। ঠায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয়েছি। মেয়েটি ঢলে পড়ার মুহূর্তে ছুটে গেলাম। কিন্তু হায়! তখন দেরী হয়ে গেছে বড়।

মৃতার দিকে তাকাতে গিয়ে বরফ খোঁচানো ছুরিটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম। হাতল প্লাস্টিকের। অর্থাৎ যেভাবে সিপ্পি খুন হয়েছিল সেভাবেই যুবতী খুন হয়েছে।

উঠে দাঁড়াই। মুখের ঘাম রুমালে শুষে নিই। ঘরে অসহ্য গরম, বড় ঘরে পা বাড়াই। বেরিয়ে আসতে চোখে পড়ে একটা দরজা। পাশের কেবিনের সাথে যুক্ত। পিছনের দিকে খিল দেওয়া। এই খিড়কি দিয়ে খুনী ঢোকে, বেরিয়ে গেছিল কি? হয়ত এখনো সেই খুনী পাশের ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে আমার যাবার অপেক্ষায়। সঙ্গের বন্দুক সাহস জোগায়। দরজার হাতলে হাত রেখে টের পাই, দরজা বন্ধ, চাপ দিলেও খোলে না। খুনী চলে যাবার সময় কি দরজায় পিছন থেকে খিল দিয়ে গেছে কি? নাকি ঐ ঘরে খুনী আছে?

তখনই এক আওয়াজ। শিহরিত হই। সর্বনাশ! ওটা দূরাগত পুলিশের সাইরেন।

দ্রুত ফ্ল্যাসলাইট নেভাই। দরজার হাতলে নিজের হাতের ছাপ মুছে দিই রুমাল দিয়ে। দরজার বাইরে আসি একলাফে। ডান-বাঁমে তাকাই। চতুর্দিকে শূন্য তীরভূমি।

সাইরেনের শব্দ আরো তীব্র। কাছে আসছে ক্রমে। পাম ঝোপের দিকে যেতে গিয়েও ফিরে আসি। পুলিশের লোক আসছে কেবিনের দিকে। এখন ঐ ঝোপে লুকোতে গেলে ধরা পড়ে যাবো নির্ঘাৎ।

অগত্যা পিছনের বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার দিকে ছুটতে থাকি আপ্রাণ। সাইরেনের ধ্বনি কানে আসে। তীরে বোধহয় ওরা এসে পড়ল। পিছনে না তাকিয়ে কম করে ওদের থেকে হাজার গজ দূরে চলে যেতে হবে।

বহুদূরে কেবিনগুলো যেন খেলাঘর। আমার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক পেট্রলম্যান। চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট। ঐ মৃতার কেবিনে দুটো পুলিশ ঢুকলো।

অবশেষে রাস্তায় এসে পড়ি। নিজের গাড়িতে উঠে দ্রুত স্টার্ট দিই।

হোটেলের পার্কিং লটে গাড়ি থামাই। ডাস্টার দিয়ে পোষাক ও শরীরের বালি ঝেড়ে ফেলি। তারপর গাড়ি রেখে হোটেলে ঢুকি।

রাতের হোটেল ক্লার্কের কাছ থেকে ঘরের চাবি নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যাই। তখনই ফোন বাজে। ফোন ধরে রাতের ক্লার্ক। এলিভেটরের খাঁচায় সবে পা রেখেছি, সে জানায়—আপনার ফোন।

—কে আবার ফোন করলো এখন? অবাক লাগে।—হ্যালো, বুথে এসে ফোন ধরি।

—মিস্টার ব্রান্ডন?

—হ্যাঁ।

—মর্গটি ক্রিডি বলছি—মিষ্টি নারীকণ্ঠ রিন্‌রিন্‌ বাজে।

—ফোন করার জন্য ধন্যবাদ।

—মাসকেটিয়ার ক্লাব থেকে বলছি। ভিজিটর বই দেখলাম। মিস্টার সিপ্পির নাম নেই।

—হয়তো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

—আমিও তাই ভাবছি। দারোয়ান বললো, কয়েকমাস যাবৎ লালচুলের কোন লোককে সে দেখেনি। সব মনে রাখে লোকটা।

—তাহলে তিনি যাননি বোধহয়।

—তিনি গিয়েছিলেন ভাবছেন কেন?

—ওনার স্যুটকেসে একটা ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছি।

—কেউ ওনাকে হয়তো দিয়েছিল।

—দিয়েছিল নিশ্চয়ই কেউ।

—হ্যাঁ, সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ, মিস ক্রিডি, আমি খুব...ক্লিক শব্দটা লাইন কেটে যাবার জানান দেয়। বুথ থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের বোতাম টিপি।

ঘরে এসে বিছানায় টুপি খুলে ছুঁড়ে দিই। জ্যাকের স্যুটকেস খুলে বসি। ম্যাচ ফোল্ডারটা,দেখি পঁচিশ পাতা ছেঁড়া হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্টার পার্টে মাসকেটিয়ার ক্লাবের নাম খোদিত। ভেতরের প্রত্যেক পাতার পেছনে একটা পটারীর বিজ্ঞাপন ছাপা, বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে এই রকম—

"মারকুসই হ্যান স্কুল অফ্ সিরামিক্স। দ্য ট্রেজার হাউস অফ্ ওরিজিন্যাল ডিজাইন।

দ্য চ্যাটিউ

অ্যারো পয়েন্ট

সেন্ট র‍্যাফাইল সিটি।"

এরকম এক সামান্য পটারীর বিজ্ঞাপন কি করে স্থান পায় দারুণ রাশভারি ও প্রখ্যাত ধনী ক্লাবের ম্যাচ ফোল্ডারে? এদের পাত্তা দেয় কি করে এত বড় ক্লাব? নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে এর মধ্যে।

ম্যাচ ফোল্ডারের একটা পাতা ছিঁড়ে পরীক্ষা করি। পিছনের দিকে কটি সংখ্যা ছাপা আছে—C451136ঃ এবং ফোল্ডারের প্রত্যেক পাতার পেছনেই, সংখ্যাগুলো ক্রমানুসারে ছাপা আছে। যেমন শেষ পাতাটির পিছনে ছাপা C451160। ম্যাচ ফোল্ডারের ছেঁড়া প্রথম পাতাটি ফোল্ডারে ঢুকিয়ে আমার ম্যানিব্যাগে রেখে দিই। আপাততঃ ঘুমোনো যাক।

দরজায় হঠাৎ করাঘাত।

সমুদ্র কেবিনে কি হাতের ছাপ রেখে এসেছি? বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

—দরজা খুলুন, আমরা জানি আপনি ভেতরে আছেন, ভারী পুরুষকণ্ঠ।

দ্রুত মানিব্যাগ থেকে ম্যাচ ফোল্ডার বার করে ঘরের কোণে মেঝের কার্পেটের তলায় রেখে দিই। ব্যাগ রেখে দরজা খুলি।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যান্ডি। ভারি গলায় বলেন—ক্যাপ্টেন ক্যাচেন আপনাকে চান।

বিছানা থেকে টুপি তুলে নিয়ে বলি—আমি যাচ্ছি, চলুন।

।। পাঁচ ।।

ঘরে ছ'টা চেয়ার, ডেস্ক, ফাইলপত্তর রাখার ক্যাবিনেট। ক্যাপটেন ক্যাচেন, লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিন এবং একচল্লিশ বছরের শীর্ণ, লম্বা, রিমলেশ চশমা পরিহিত ভদ্রলোক। ক্যাপ্টেন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ থমথমে। সিগার ঠোঁটে, রক্ত জমাট।

র‍্যানকিন বসে আছেন উঁচু চেয়ারে। ভারিক্কি গলায় লম্বা ভদ্রলোক বলেন—এর হাতে হাতকড়া কেন ক্যাপ্টেন?

সহসা মনে হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাপ্টেনের। ক্যাপ্টেন বলেন—একে গ্রেফতার করায় আপনার যদি আপত্তি থাকে আপনি কমিশনারের সাথে কথা বলতে পারেন।

—এনাকে অ্যারেস্ট করা হল কেন?

ক্যান্ডির দিকে তাকান ক্যাচেন, বলেন—খুলে দিন হাতকড়া।

আমায় হাতকড়া খুলে দেন ক্যান্ডি।

—বসুন মিস্টার ব্রান্ডন। খড়ের মত চুলের দীর্ঘ শীর্ণ ভদ্রলোক বলে—আমি হোল্ডিং। আসছি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে। শুনলাম, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন ক্যাপ্টেন, তাই আমিও দেখতে এলাম আপনাকে। হোল্ডিং চোখ থেকে রিমলেশ চশমা সরিয়ে নেন। কাঁচ পরীক্ষা করে মুছে ফের পরেন, বলেন—কর্তব্যের বাইরে ক্যাপ্টেন ক্যাচেন কিছু করতে পারেন না।

জানলা থেকে ঘরে আমার দিকে তাকান ক্যাপ্টেন। চোখে বন্য গরিলার উগ্রতা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হোল্ডিং বলেন—ক্যাপ্টেন প্রশ্নগুলো আপনি করবেন না আমি করব?

ক্যাচেন চুপ। আমার থেকে হোল্ডিং-এর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন—আপনিই করুন। আমি কমিশনারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। ইদানিং বড্ড বেশি বাধা আসছে আপনাদের অফিস থেকে।

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। সার্জেন্ট ক্যান্ডি জিজ্ঞাসা করেন—আপনার আমাকে প্রয়োজন নেই তো মিঃ হোল্ডিং।

—না, ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন। চলে গেলেন ক্যান্ডি।

হোল্ডিং আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—ক্যাপ্টেন ক্যাচেন এমাসের শেষের দিকে

রিটায়ার করছেন। তাঁর জায়গায় আসছেন লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিন।

—কনগ্র্যাচুলেশন, আমি বলি।

প্রত্যুত্তরে র‍্যানকিন অধৈর্যভাবে নড়েচড়ে বসেন। টাই ঠিক করেন। কোন জবাব দেন না।

হোল্ডিং জানান—এই রহস্য উদ্ধারের পুরো দায়িত্ব লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনের ওপর। আমি সমুদ্রতীরের জোড়া খুনের কথা বলছি।

এখন জানলাম এ কেসটা র‍্যানকিনের হাতে। সম্ভবতঃ আমাকে ক্যাপ্টেন ফাঁসাতে পারবেন না। অতএব সানন্দে আমি একটা বিবৃতি দিতে রাজি আছি।

এবার সহজভাব হোল্ডিং বলেন—ঐ কেবিনে ঢুকতে দেখা গেছে আপনাকেই?

—তা বলতে পারবো না। তবে, ওখানে ঢুকে দেখেছি যুবতী মারা যাচ্ছেন।

—উনি কি বলেছিলেন কিছু?

—না, তাঁকে দেখার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উনি মারা যান।

—ওখানে কেন গিয়েছিলেন?

—কোন নির্দিষ্ট কারণে নয়। কোন কাজ ছিল না হাতে। ভাবলাম অকুঃস্থলটা ফের দেখে আসি। জানি বিশ্বাসযোগ্য হলো না কথাটা। কিন্তু আমার পার্টনার ওখানে খুন হয়েছেন। আজ সকালে যখন যাই তখন আপনাদের বহুলোক ছিল। আমি জায়গাটা শুধু আর একবার দেখতে গেছিলাম।

—কখন গেছিলেন?

সঠিক সময় এবং ওখানে যা যা দেখেছি সব বললাম। র‍্যানকিন তাকান হোল্ডিং-এর দিকে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হাসি ফুটলো তার কঠোর শক্ত মুখে—আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমিও আপনার জায়গায় হলে একই কাজ করতাম। তবে, আর ওরকম কাজ করবেন না। আপনি কত ভাগ্যবান ভেবে দেখুন। আপনাকে খুনের চার্জে ফেলা হয়নি। কারণ ডাক্তারের মতে মেয়েটিকে ছুরি মারা হয়েছে অন্ততঃ আপনি কেবিনে ঢোকার দু-ঘণ্টা আগে। কি করে জানলেন—ওখানে মহিলা আছেন?

—কেউ আপনাকে ঐ কেবিনে ঢুকিতে দেখে হেড কোয়ার্টারে খবর দেয়।

—নিশ্চয়ই ‘নীল পাত্তা পাওয়া যায় নি? মৃতা মহিলাটি কে? হোল্ডিং ও র‍্যানকিন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন। হোল্ডিং বলেন—সম্ভবতঃ সেই মহিলা যিনি সিপ্পিকে হোটেল থেকে ডেকে আনেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সকাল এগারোটা থেকে মহিলা কি করছিলেন—বুঝতে পারছি না।

—সনাক্ত করা গেছে মৃতাকে?

—থেলমা কাজন নামে এক মহিলা নিরুদিষ্ট হয়ে সকালে কাজে গিয়েছে, এই বলে তার বাড়িউলি রিপোর্ট করেছেন। আমরা দ্বিতীয়বার থেলমাকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। যার কাছে কাজ করতেন থেলমা, সেই ভদ্রলোকও উপস্থিত থাকবেন।

—তিনি কে?

—তার নাম মারকুইস হ্যান—জানান র‍্যানকিন।—মজার কথা তিনি অ্যারো পয়েন্টে ‘স্কুল অফ্ সিরামিক্স’ নামে পটারীর ব্যবসা চালান। তাঁর ঐ শোরুমে থেলমা কাজ করতেন।

র‍্যানকিন চলে যান।

অনেকক্ষণ বাদে হোল্ডিং বলেন—ক্যাপ্টেনের সাথে আজ সকালে আপনার কি কথা হয়েছে? আপনি কি ক্যাপ্টেনকে বলেছেন, সিপ্পিকে কাজের জন্য ক্রিডি ভাড়া করে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তার কোন প্রমাণ আছে?

আমি সব বললাম। ক্রিডির নাম ব্লটারে লিখে রেখেছিল সিপ্পি তাও জানালাম। শুনে হোল্ডিং বলেন—অন্য কোন লোকও তো ক্রিডি সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য সিপ্পিকে নিযুক্ত করতে পারে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে শুনে যান হোল্ডিং। পাইপ থেকে ধোঁয়া ওড়ে। বলেন—এখন মনে হচ্ছে আমার, সিপ্পিকে লী ক্রিডি ভাড়া করেছিলেন। সিপ্পি খুন হতে ক্রিডি চাইছেন, সিপ্পিকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করার কথাটা চেপে যেতে। আচ্ছা সিপ্পির হত্যা রহস্যভেদেই আপনার বেশি আগ্রহ তাই না?

—অবশ্যই।

—তা কিভাবে সিপ্পি হত্যারহস্য ভেদ করবেন ভাবছেন? নিরাপত্তা ছাড়া বেশীদূর যেতে পারবেন না।

—জানি। যে অবস্থায় আছি, নিরাপত্তা ছাড়া চলবে না।

—সে ব্যবস্থা করা যাবে। যদিও এখনি তা কার্যকর করা যাচ্ছে না।

—আমার গলা থেকে ক্যাচেনের ফাঁস সরে গেলে হার্জকে ঝেড়ে ফেলতে পারি।

—ক্যাচেনকে আটকানো যায়। কঠিন হার্জকে সামলানো। ওকে অত ফ্যালনা মনে করবেন না। ওঠা যাক তাহলে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার শোবার সময় এখন।

—কিন্তু আমি কি তদন্তের স্বাধীনতা পাব।

—সেটা প্রশ্ন নয়। সিপ্পির মৃত্যুর পর আপনি নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করবেন, ধর্তব্য সেটাই, যেহেতু দু'জনেই আপনারা গোয়েন্দা ট্রেডের লোক। ঠিক আছে, আমার কার্ড রইল টেবিলে। আপনি আমার সীমাবদ্ধতা বুঝবেন না। উনি বলে যান—আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা নতুন মোড় নেবে প্রশাসন। বিরোধীপক্ষরা সুযোগ খুঁজছে এ শহরে ক্রিডির আধিপত্য খর্ব করার। সিপ্পির মৃত্যুর সাথে কোনভাবে যদি ক্রিডি জড়িত থাকেন, বিরোধীরা মস্ত সুযোগ পেয়ে যাবে। বর্তমান প্রশাসন যথেষ্ট জনপ্রিয় না হলেও বিস্তর শক্তিশালী। এখন তারা তীক্ষ্ণ তরবারির ওপর দাঁড়িয়ে। যে কোন স্ক্যান্ডাল তাঁদের ফেলে দিতে পারে।

—ওকে। তদন্ত চালিয়ে যাব আমি। আপনাদের অসুবিধা দূর করার জন্য নয়। জাজ হ্যারিসনের ভোটের টিকিট পাবার জন্য নয়। আমার পার্টনার খুন হবার জন্য তদন্ত করবো। যা আমার ব্যবসার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি আমার অংশীদার ছিলেন বলেই এর পেছনে আমার সেন্টিমেন্ট কাজ করছে। নইলে বেঁচে থাকাই বৃথা আমার। যদি আপনাদের স্বার্থান্বেষী লোকেরা আমার রহস্যভেদের কাহিনী জানতে চান, তাহলে আমার খরচা দাবী করব আমি।

চমকে ওঠেন হোল্ডিং—তাও ব্যবস্থা হবে। তবে তার আগে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই, ক্রিডি এ কেসের সঙ্গে যুক্ত কিনা।

—বুঝতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে কারোর থেকে কি কোন সাহায্য পেতে পারি?

—আপনার জন্য কি ব্যবস্থা করেছি র‍্যানকিন জানেন। সময় সময় তার বাড়িতে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন, তিনি তদন্তের কাজে ক'দ্দুর এগিয়েছেন।

—ঐ সম্পাদকের কি নাম?

—রাল্ফ ট্রয়। আপনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁকে সত্য কাহিনী দিলে তিনি ছাপবেন।

—তার আগে রহস্য ভেদ করতে হবে। দেখা যাক, ক'দ্দুর যেতে পারি...তারপর দেখা যাবে।

হোল্ডিং হাত বাড়ান—গুডলাক্। সাবধানে থাকবেন।

জানি আমার দরকার ভাগ্যের, আমাকে সাবধান হতেই হবে।

হেড কোয়ার্টারের শেষপ্রান্তে লাশ কাটা ঘর। আমি ঐ ঘরে ঢুকতে র‍্যানকিন আমাকে দেখে রুক্ষস্বরে খিঁচিয়ে ওঠেন—কি চাই?

অদূরে উপবিষ্ট একজনকে দেখিয়ে বলি—ঐ লোকটা কি হ্যান?

—হ্যাঁ। ঝানু পটারী ব্যবসায়ী। ওনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উনি কি বলেছেন জানেন?

মৃতার বাহুতে র‍্যানকিন হাত রাখেন—কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না থেলমার। ধার্মিক টাইপের যুবতী। পটারীদের কাজ করে গরীবদের সেবা করতেন। থেলমা অক্ষত যোনি, ডাক্তার বলেছেন, কুমারী।

—সিপ্পিকে শেষ অব্দি বয়ফ্রেন্ড বলেই কি মনে হয় না?

মর্গের আলো নিভিয়ে দেন র‍্যানকিন।—আপনি হোল্ডিং-এর কথায় নাচছেন? আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলতে থাকেন—লক্ষ্য রাখুন ওনাকে। গত চারবছর ধরে যে পজিসনে উনি আছেন, তাতে কারো না কারোর প্রভূত সাহায্য নিয়েছেন। চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত লোকটি সর্বদা নিজের দরকারে কাউকে না কাউকে ব্যবহার করেছেন। উনিই একমাত্র লোক, যিনি প্রশাসনে থেকে বিরোধী পক্ষের সাথে আঁতাত রাখেন। সুতরাং ওনাকে নজরে রাখবেন। র‍্যানকিন বেরিয়ে আসে মর্গ থেকে।

মাথায় ঘোরে র‍্যানকিনের কথাগুলো। ভাগ্যিস জানলাম, নৈলে বিশ্বাস করে বসেছিলাম হোল্ডিং-কে। তারপর মর্গ ও কোয়ার্টার ছেড়ে গাড়িতে চেপে বসলাম, গন্তব্য হোটেল।

নিজের রুমে গিয়ে চমকে উঠি। দমবন্ধ হবার জোগাড়। সিপ্পির ঘরের মত অবস্থা। আলমারির ড্রয়ার খোলা, ঝুলছে।

বিছানার গদি, তোষক ওলটপালট। ঘরময় স্যুটকেসের কাগজপত্র ছড়ানো ছিটানো। এমনকি সিপ্পির কাগজপত্রও লণ্ডভণ্ড। দ্রুত ছুটে যাই ঘরের কোণে। হ্যাঁ, কার্পেটের তলায় ম্যাচ ফোল্ডার ঠিক আছে। ফোল্ডার উল্টেপাল্টে দেখি। বোধহয় দুষ্কৃতির চোখ এড়িয়ে গেছে এটা। ফোল্ডারের পেছনে ছাপা নম্বরের স্থানটা ফাঁকা কেন?

উঠে দাঁড়াই। বুঝতে বাকী থাকে না, সিপ্পির ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে কেউ সুনিপুণ ভাবে নকল একটি ম্যাচ ফোল্ডার রেখে গেছে। আমাকে ধোঁকা দেবার জন্য। না-আসল ম্যাচ ফোল্ডার নয়।

লণ্ডভণ্ড বিছানায় গা এলিয়ে দিই।

।। ছয় ।।

পরদিন বেলা সোয়া এগারোটা অবধি ঘুমোলাম। গত রাতে নাইট ক্লার্ককে যখন জানিয়েছি কেউ আমার অবর্তমানে আমার ঘর তছনছ করে গেছে, ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ফোন করে জানায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাতঃরাশ এসে যায়। কফির পেয়ালায় চুমুক রাখতে ঝনঝন করে ফোন বাজে। র‍্যানকিনের স্বর—শুনলাম, কেউ গতরাতে হানা দিয়েছিল আপনার ঘরে।

—হ্যাঁ।

—কি রকম বুঝছেন?

—কিস্যু মাথায় আসছে না। কিছু পেলে জানাবো আপনাকে।

একটু থেমে র‍্যানকিন বলেন—ধর্মযাজক ব'লেছেন, কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না মৃত থেলমার। ছেলেদের সঙ্গে মোটে মিশতেন না। থেলমা ছিলেন ধর্মপ্রাণ।

ফোন ছেড়ে দেন র‍্যানকিন।

কফি শেষ করে অফিসে ফোন করি এলাকে। কয়েক মিনিট ব্যবসায়িক কথাবার্তা হয়। দু'একদিন পর ফোন করব বলে লাইন কেটে দিই। অসহ্য গরম ঘরে। ইচ্ছে করছে সমুদ্রে বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে রৌদ্র মেখে আসি। কাল বিলম্ব না করে সাঁতারের পোষাক চাপিয়ে এলিভেটরে একতলায় নাবি।

ঘরের চাবি ডে-ক্লার্ক ব্রিওয়ারকে দিই।

ডে-ক্লার্ক বলে...আমি দুঃখিত মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার নামে এত অভিযোগ...আপনি আসার পর চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার পুলিশ এখানে হানা দিয়েছে।

—জানি, বুঝেছি কেমন লাগছে আপনার। আজ রাতেই আমি চলে যাচ্ছি।

গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসি সমুদ্রতীরে। এখন মধ্যাহ্ন। বারোটা বেজে গেছে। বিস্তর ভীড় সমুদ্রতীরে। গাড়ি রেখে এগিয়ে যাই স্নান-ঘাটের দিকে।

একদমে সমুদ্রতীর থেকে বহুদূরে চলে যাই। তারপর, ধীরে ধীরে সাঁতরে ফিরতে থাকি। তীরে উঠে চারদিকে চোখ বোলাই। নির্জনতা খুঁজি। যেখানে স্বচ্ছন্দে গা মুছতে পারি' তখনই চোখে পড়ে এক তরুণীকে। সাদা-নীল ছাতার নীচে...দৃষ্টি আমার দিকে। সাঁতারের শ্বেতশুভ্র বিকিনী পরা। চোখে বড় রোদ চশমা লাগানো। রেশম কোমল চুল। অঙ্গসৌষ্ঠব মনে করিয়ে দেয় যেন ঐ মুখ দেখেছি কোথাও। হাতছানি দেন মর্গটি ক্রিডি।

আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে বলেন—আপনি মিস্টার ব্রান্ডন তো?

—যদি না হই, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আমরা চামড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, ঐ বড় বড় রোদ-চশমার আড়ালে আপনি কি ঠিক মিস্ ক্রিডি?

খিল খিল করে হেসে উঠে সানগ্লাস খুলে তিনি বলেন—বসছেন না কেন? ক্লান্ত, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

ধপ্ করে তার পাশে বসে পড়ি। বলি—ক্লান্তি বা অন্য কিছু নয়। গতকাল সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, আশা করিনি।

—ঘটনাচক্রে আমি তখন ক্লাবে ছিলাম। তাছাড়া আমার কৌতূহল ছিল। এ খুনের ঘটনা শুধু আশ্চর্যজনক নয়, নৃশংসতম, তাই না? যখন আপনি প্রশ্ন করলেন, আপনার পার্টনার ক্লাবে এসেছিলেন কিনা, তখনই জানতাম আসেননি, তবু পরীক্ষা করে একবার দেখলাম। ক্লাবের মেম্বার ছাড়া এখন ক্লাবে ঢোকা খুব মুশকিল।

আমি জিজ্ঞাসা করি—কাগজ পড়েছেন, আজ সকালের?

—মানে দ্বিতীয় খুনের কথা বলতে চাইছেন? মেয়েটি কে জানেন? ঐ মেয়েটিই কি আপনার বন্ধুর সাথে দেখা করেছিল, একসাথে কেবিনে ছিল?

—হ্যাঁ, ঐ যুবতীই।

—ধরুন ঐ মেয়েটিই যদি সিপ্পিকে খুন করে থাকে। তারপর সে হয়তো কৃতকর্মের অনুতাপে আত্মহনন করে। মেয়েটি নাকি খুব ধর্মপ্রাণ ছিল, খবরের কাগজগুলো তাই বলছে।

—আপনার জায়গায় আমি থাকলে যুবতী কিভাবে মরেছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাতাম না। পুলিশের কাজ ওটা। অ্যারো পয়েন্টে, স্কুল অফ্ সিরামিক্সে কাজ করতো মেয়েটি। কখনো গেছেন সেখানে?

—অনেকবার গেছি, কেন? হ্যানের তৈরি বহু নক্‌সা আমার প্রিয়। দারুন কারুকাজ। এইতো, গত সপ্তাহে হ্যানের তৈরী এক বাচ্চা ছেলের স্ট্যাচু কিনে নিয়ে এলাম।

—এই যুবতীকে কখনো দেখেছেন?

—মনে নেই। অনেক মেয়েই তো ওখানে কাজ করে।

—আমার ধারণা দোকানটা ভ্রমণার্থীদের জন্য। নিঃসন্দেহে হ্যান একজন বড় শিল্পী। আমি একদিন দেখতে যাবো। সঙ্গে কি আপনি যেতে পারবেন?

একটু চিন্তা করে মর্গটি বলেন—আবার গেলে জানাবো আপনাকে। আপনি কি এখনো অ্যাদেলফি হোটেলে আছেন?

মনে করিয়ে দিলেন। ভাল কথা, গতরাতে আমি ঐ হোটেলে আছি কি করে জানলেন?

মর্গটি হাসে। সে হাসিতে নিটোল মসৃণ মুক্তোর মত ঝলমল করে দাঁত, যেন পাঁজরে ধাক্কা দেয়।

আমি বলি—পুলিশ একবার আমার ঘরে যাচ্ছে আসছে বলে ম্যানেজার ভীত হয়ে পড়েছে। আমায় আজ রাতের মধ্যে অন্যত্র জায়গা দেখতে হবে।

—সহজ কাজ নয়। এখনই তো সিজন।

—হ্যাঁ, খুঁজে দেখি। হোটেল সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্যাক অর্থাৎ সিপ্পি ছিল ওস্তাদ। কোন হোটেলের রুম কত সস্তা, খাবার দুর্দান্ত...এসব তার নখদর্পণে! এই হোটেলেও ওই ব্যবস্থা করে দেন।

—আর কতদিন এখানে থাকবেন?

—তদন্তের কিনারা যতদিন না হয়। সেটা এক সপ্তাহ বা একমাসও হতে পারে। কতদিন জানি না...

—অ্যারো বে'র সীমান্তে দু-স্তরের লীজে আমার একটা বাংলো আছে। আমি এখন সেখানে যাই না। এখনও একবছর বাকি লীজের মেয়াদ শেষ হতে। ইচ্ছে হলে, আপনি থাকতে পারেন। সেখানে আসবাবপত্রসহ সব সাজানো আছে। গত একমাস যাবৎ যাইনি। তার আগে দেখে এসেছি সব ঠিকঠাক আছে। লাইটের বিলটা শুধু আপনাকে মেটাতে হবে। বাকী সব ব্যবস্থা আছে। তেমন কাজ না থাকলে চলুন না আজ রাতে ডিনারের পর যাই। আমি রাত দশটা নাগাদ ফ্রি হব।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মিস ক্রিডি, অপরিচিত বিদেশীর জন্য এমন অযাচিত উপকার—দেখুন, আপনাকে কোন রকম কষ্ট দিতে চাই না।

—না না, কষ্ট কিসের। ঘড়ির দিকে তাকাল মর্গটি—এবার যেতে হবে, ড্যাডির সাথে লাঞ্চ আছে। তিনি দেরী পছন্দ করেন না। দশটায় মাসকেটিয়ার ক্লাবের বাইরে দেখা করবেন। তারপর একসাথে বাংলোয় চলে যাব।

—বেশ, ওখানে থাকবো আমি।

—তাহলে এখনকার মত বিদায়।

লাঞ্চ সেরে হোটেলে ফিরলাম। স্যুটকেস গুছিয়ে নিলাম। বেল বাজিয়ে জো'কে ডেকে সিপ্পির জিনিস তার স্ত্রীর কাছে পাঠাতে বললাম। তারপর সিপ্পির স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলাম, সেইসঙ্গে দু'হাজার বাক্-এর চেক লিখে দিলাম। যদিও জানি, চেক ফেরৎ আসবে এবং শেষে মোটা অঙ্কের চেক দিতে হবে।

গ্রীভসের অফিসে এলাম। ডাস্টারে জুতো ঝাড়ছেন—বললাম কোর্টে যাবেন নাকি?

—আমাকে যেতে বলা হয়েছে। ডাস্টার রেখে, টাই ঠিক করে টুপির জন্য হাত বাড়ালেন—আপনি লিফ্‌ট দেবেন না বাস ধরবো।

—নিশ্চয়ই দেবো। চলুন।

কোর্টে পৌঁছই আমরা। করোনারের বিচার ব্যবস্থা বড় একঘেয়ে। তিনি আমার কাছে সাক্ষীসাবুদ চাইলেন। ব্রিওয়ারের দাপুটে বিবৃতি শুনলেন বহুদূরে চোখ রেখে নির্লিপ্ততায়। গ্রীভসকে ডাকলেন না। স্নানের কেবিনের দারোয়ানকে বাদ দিলেন। এক সময় র‍্যানকিন উঠে বললেন—পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে এ ঘটনার। সেজন্য একসপ্তাহ সময় মঞ্জুর করা হোক। ভাল মানুষের মতো করোনার সময় মঞ্জুর করলেন। অতঃপর উঠে তার চেয়ারের পেছন দরজা দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হলেন।

সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করে এসে আমি বসেছিলাম গ্রীভসের পাশে। ঝকঝকে চেহারার দু'জনকে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কারা?

উত্তর এল—সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহের মধ্যে সবথেকে বড় ও তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন অ্যাটর্নি ওরা।

—ওরা কি ক্রিডির ব্যবসা দেখেন?

—ক্রিডি ছাড়া এমন কোন বিখ্যাত বড় ব্যবসায়ী নেই যাদের কাজ ওরা করেননি।

কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিই, পথে একস্থানে গাড়ি থামিয়ে পুলিশের কাছ থেকে জেনেনিই ক্যুরিয়ার অফিসের ঠিকানা। তারপর নবলব্ধ ঠিকানায় এসে গাড়ি থামাই।

মিস্টার ট্রয় বললেন—বসুন মিস্টার ব্রান্ডন। আপনার কথা শুনেছি। হোল্ডিং বলেছেন আপনি আসতে পারেন।

আমি বলি—এখন বেশী কিছু বলতে পারছি না। শুধু পরিচয় করতে এলাম। হয়তো অল্প ক'দিনের মধ্যে জানাতে পারবো কিছু আপনাকে। বুঝছি, সত্য কাহিনী দিলে আপনি ছাপবেন।

ট্রয় বলেন—এ শহর অন্যায় আর নীতিহীনতায় ডুবে গেছে। কোন রকমে নাম কা ওয়াস্তে একটা প্রশাসন আছে। কাজকর্মের বালাই নেই।

—আজ জাজ হ্যারিসন নয়া সমাজ চান।

ট্রয় কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলল—অঙ্গীকার করেছেন করবেন, যদি নির্বাচনে যেতেন। কিন্তু জিতবেন না। আমি বলছি না এ শহরকে পরিচ্ছন্ন বা উন্নত করা যাবে না। করা যেতে পারে। ক্রিডি বা হ্যারিসন, যেই আসুন, কাজ করে যাবে সেই পুরোনো চক্র। এই হল সিস্টেম। তাছাড়া একজন মানুষ কিছুদূর পর্যন্ত সৎ থাকতে পারেন। সব মানুষকেই হয়তো কেনা যায় না, তবে পয়সা থাকলে হ্যারিসনকে কেনা যায়।

—অনুমান করা যায় ঐ কুচক্রীদের নেতা ক্রিডি। ক্রিডি না হলে আর কে?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ট্রয় বলেন—ক্রিডির অর্থ নিয়ে যিনি ব্যবসা চালান এবং এ শহর যার অঙ্গুলি হেলনে চলে, তিনি মাসকেটিয়ার ক্লাবের মালিক কর্ডেজ। এখন ক্রিডি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জাজ হ্যারিসন ক্ষমতায় এলেও কর্ডেজ তার নিজস্ব স্থানেই থাকবেন। কেউ যদি তার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয়, তবেই শহর দুষ্টচক্র মুক্ত হবে। কিন্তু কেউ সে কাজে যোগ্য নয়,—

—মাসকেটিয়ার ক্লাব নিশ্চয় কর্ডেজের একমাত্র আপত্তি নয়।

—না। ক্রিডির পয়সা লগ্নী করে তিনি পয়সা কামান। ক্যাসিনো একটি উদাহরণ। ক্রিডির পয়সায় যাবতীয় ব্যবসা কর্ডেজ দেখাশোনা করেন, বিনিময়ে পঁচিশ শতাংশ নেন। আমি আপনাকে পরিষ্কাব ছবি তুলে ধরলাম। ট্রয় বলে যান—হোল্ডিং বিষধর সাপ। তার স্বার্থে যতক্ষণ চলবেন

ততক্ষণ বন্ধু। একপা এদিক-ওদিক হলেই ছোবল খাবেন। সুতরাং তাকে সাবধান।

মনিবন্ধে ঘড়ি দেখে ট্রয় বলেন—এবার যেতে হবে আমায়।

জিজ্ঞাসা করি—আগামীকাল হেপ্পলের সাথে দেখা করবেন। কি, এই নামই তো বললেন?

—হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক হেপ্পল্।

—মাসকেটিয়ার ক্লাবের কোন মেম্বারকে চেনেন?

—আমি? হেসে ফেলে ট্রয়—বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

—জায়গাটা দেখে আসতাম।

—সে আশা ছাড়ুন। বোকামী করবেন না। মেম্বার ছাড়া, মেম্বার যদি কাউকে সাথে নিয়ে না যায়, তবে ওখানে ঢোকা অসম্ভব।

—আচ্ছা ক্রিডির বিরুদ্ধে নিরেট সাক্ষ্য প্রমান ছাড়া কি কিছু করার নেই?

—তাঁর বিরুদ্ধে বেফাঁস কিছু করতে গেলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে।

—বেশ, এবার সাক্ষ্য প্রমাণ সহ আসবো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ট্রয়।

।। সাত ।।

মাসকেটিয়ার ক্লাবের অবস্থান হল, রিৎজা-প্লাজা হোটেলের শীর্ষতলায়। কিন্তু সেখানে ঢোকা যায় কি করে?

হঠাৎ মনে পড়ল গ্রীভস একবার বলেছিলেন, তিনি রিৎজা প্লাজায় গোয়েন্দাগিরি করেছিলেন কিছুদিন। ফোনে যোগাযোগ করতেই তিনি আমায় থার্ড স্ট্রীটের বার এল্‌স-এ আসতে বলেন।

এল্‌স বারের সব থেকে কোণার টেবিলে বসে বিয়ারের অর্ডার দিলাম। বেয়ারাকে দিয়ে সান্ধ্য খবরের কাগজ আনিয়ে পড়তে থাকি। প্রথম পাতায় বিরাট ছবিসহ খবর। ছবিতে র‍্যানকিনকে দেখা যাচ্ছে অকুস্থলে, শার্লক হোম্‌সের দৃষ্টিতে দেখছেন। শেষ পাতায় থেলমার ছবি।

এমন সময় গ্রীভস এলেন। এসে টেবিলের অপরপ্রান্তে বসলেন, গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন—রিৎজা প্লাজা সর্বোচ্চ তলা জুড়ে মাসকেটিয়ার ক্লাব। প্রথমে আপনাকে হোটেলে ঢুকতে হবে। তারপর লবি, শেষ প্রান্তে লিফট্। লিফট্ থেকে নেবে লবি ধরে খানিক গিয়ে খাঁচা। তারমধ্যে রিসেপশনিস্ট।

তিনি যদি আপনাকে চিনতে পারেন খাঁচা খুলে ভিজিটার্স বইতে সই করে ঢুকতে দেবেন। এবার ছাড়া পেলে আরেকটা লিফট্ আপনাকে পৌঁছে দেবে। লিফটে উঠে ওপরে কোথায় কি আছে জানি না। ওরা আপনাকে চিনবে না সুতরাং ঢুকতেও দেবে না। ওসব ভাবনা ছাড়ুন। মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন।

—ওপরে একটা রেষ্টুরেন্ট আছে না?

—এ শহরের শ্রেষ্ঠ রেষ্টুরেন্ট বোধহয়।

—রেষ্টুরেন্ট ওপরে থাকায় নিশ্চয়ই একতলা থেকে বাক্স বাক্স মাছ মাংস অব্দি ওপরে যায়?

—হ্যাঁ যারা নিয়ে যায়, তাদের দেখেছি, তারা ডেলিভারি ম্যান।

—ডেলিভারি ম্যানদের কাউকে চেনেন। আমায় ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্য তাকে চাপ দেওয়া যেতে পারে? আমি শুধু ভেতরটা একবার দেখবো।

বীয়ার শেষ করে গ্রীভস বলেন—হ্যারি বেন্নামকে চিনতাম। এখনো কাজ করছেন কিনা জানি না। দারুন উৎসাহি আর কর্মঠ ছেলে। তবে আপনাকে তিনি সাহায্য না করলে আশ্চর্য হবোনা। আসছি, এক মিনিট।

টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন গ্রীভস। টেলিফোন বুথ থেকে মিনিট পাঁচেক পরে এসে বললেন—এইমাত্র কথা বললাম। পঞ্চাশ বাক্‌সের জন্য হ্যারি তার বৌকে ছাড়তেও রাজী। ব্যবসায়িক চুক্তি পঞ্চাশ বাক্‌স। ভেবে দেখুন, হ্যারি কিন্তু পঞ্চাশ বাক্‌সের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাকে বেচে দিতেও পারে।

—তাই যদি করে, ওরা মেরে ফেলবেনা আমাকে। বড় জোর গলা ধাক্কা দেবে। আপনি ওনাকে

রাত সাতটায় সময় দিন।

গ্রীভস মাথা হেলান। হ্যারি এলিভেটরের কাছে খাকবেন।

—যদি ওখানে গিয়ে ঝামেলায় পড়ি কি করা উচিৎ একটু পরামর্শ দিন।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে হঠাৎ উঠে বললেন—ঘুরে আসছি। পালাবেন না। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলেন, হাতে একটা মোড়ক। সেটা সামনে রেখে বললেন—নিন আর কুড়ি বাক্স দিন। আমার পরিচিত এক মদ্য ব্যবসায়ী আছে। যে ওই ক্লাবে মদ সরবরাহ করতে চায়, কোন আশা যে নেই তা বোঝে না। এই বোতলে তার মদের নমুনা। আর এই যে, তার ব্যবসায়িক কার্ড।

—কি আশ্চর্য, এটাই তো চাইছিলাম ধন্যবাদ ; অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ! বেশ, এবার উঠি।

উঠতে উঠতে গ্রীভস মৃদুস্বরে বলেন—ইয়ে, আপনি জীবনবীমা করেছেন তো?

বললাম—এর চেয়ে কত সাংঘাতিক জায়গায় গুণ্ডাদের শায়েস্তা করেছি।

রিৎজা-প্লাজার নির্দিষ্ট এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াই। ওপর থেকে নেবে আসে লিফট্। কাঠের চৌখুপি থেকে ঠোটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে বেরিয়ে আসেন যিনি তিনিই গ্রীভস বর্ণিত হ্যারি বেন্নাম। সাদা কোট, কালো ট্রাউজার, ঢুলুঢুলু চোখ। মোটা নাক, মুখশ্রী চমৎকার।

আমি হাসলাম—প্রাপ্য নিয়ে আমায় নিয়ে চলুন। পঁচিশ বাক্স এগিয়ে দিলাম।

হ্যারির চোয়াল শক্ত হল—একি, গ্রীভস বলেছে পঞ্চাশে?

—গ্রীভস এও বলেছেন আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন অর্ধেক, জায়গা দেখে ফেরার সময় বাকী অর্ধেক।

পঁচিশ বাক্স হিপ পকেটে চালান করে দিয়ে হ্যারি বলেন—পিছনের দরজা দিয়ে যান। তবে বিপদে পড়বেন কিন্তু।

—পঁচিশ বাক্স কি এমনিই দিচ্ছি? ওখানে আর কে কে আছে এখন?

—এখন কেউ নেই, আর দশ মিনিটের মধ্যে সব এসে পড়বে। বস্ তাঁর অফিসে।

—কর্ডেজ?

—মাথা নাড়ে হ্যারি।

—আর ওয়াইন ওয়েটার?

—অফিসে।

—বেশ আপনি চলুন আগে, আমি আসছি পেছনে। কোন বিপদে পড়লে আমি ওয়াইন ওয়েটারের খোঁজ করবো। সঙ্গে স্যাম্পেল আর বিজনেস কার্ড আছে। হ্যারি এগিয়ে যান লবির দিকে। অল্প দূরত্ব রেখে আমি অনুসরণ করি। দরজা পেরিয়ে পা রাখি প্রকাণ্ড কক্‌টেল লাউঞ্জে। দেখার মত জায়গা। এমন মনোরম বিশাল 'বার' জীবনে প্রথম দেখলাম। দুই দরজার মাঝে ইংরেজি 'এস' আকারে বার। তিনশো জন লোক একত্রে বসতে পারে। কালো কাঁচের মেঝে। ঘরের অর্ধেক অংশ ছাদ বিহীন। যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গোনা যায় এখান থেকে দশমাইল পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। চোখে পড়ে সমুদ্র ও বালিয়াড়ি। পাম গাছের আড়ালে বেন্নামের সাথে মিলিত হই। তিনি জানান অফিসগুলো ঐ দিকে। বারের পেছনে দরজার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেন। রেষ্টুরেন্ট এদিকে। আপনি কি দেখতে চান?

—পুরো জায়গাটা। আচ্ছা, আপনি সবাইকে যে ম্যাচ ফোল্ডার দেন, সেরকম কিছু ম্যাচ-ফোল্ডার আমাকে দিন না?

আমি বেন্নামের কাছ থেকে একটা ম্যাচ ফোল্ডার নিই। খুলে উল্টে পিছন দিকে দেখি—না, কোন সংখ্যা ছাপা নেই।

—এরকম আরো আছে?

—এগুলো তো ম্যাচ-ফোল্ডার, না?

—জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

—আরেক রকম আছে, যেগুলো বস্ দেন! দেখুন মশাই, ওসব বাদ দিন। বেন্নামের মুখ ঘামে ভিজে ওঠে। আপনাকে এখানে কেউ দেখলে চাকরি যাবে আমার।

—অফিসগুলো দেখার সুযোগ হবে না?

—আসুন।

এমন সময় বারের পেছন দরজা দিয়ে ল্যাটিন চেহারার মোটা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাদা কোর্টের বুকে এমব্রয়ডারী করা আঙুরের ছবি চিনিয়ে দেয় ইনি ওয়াইন ওয়েটার। লোকটার দৃষ্টি বেন্নামকে ঘুরে আমার দিকে স্থির হয়।

মাথা ঠিক রেখে বেন্নাম বলেন—ইনি মিঃ গোমেজ। অ্যাপায়েন্টমেন্ট ছাড়া কোন কাজ হয় না এখানে। তারপর গোমেজের দিকে ফিরে বলেন—এই ভদ্রলোক আপনার সাথে কথা বলতে চান।

হাসি ছড়িয়ে বলি—আমাকে একটু সময় দিতে পারেন মিঃ গোমেজ, আমি হলাম ওক্লার। ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াইন কোম্পানি থেকে আসছি। আমি ট্রেড কার্ড বের করে দিই। ভাবলেশহীন মুখ গোমেজের। কার্ড ফেরৎ দিয়ে বলেন—আপনাদের সাথে কোন কারবার আমার নেই।

—আমরা কাজ করতে চাই মিস্টার গোমেজে। আমাদের বহুমুখী ব্যবসা আছে যাতে আপনারা উৎসাহিত হবেন।

—উনি ভেতরে কি করে এলেন? গোমেজ বেন্নামের দিকে তাকান।

—কি জানি, এখানেই ছিলাম আমি, দেখি, আপনাকে ভদ্রলোক এসে খুঁজছেন।

আমি বললাম, মালপত্রের লিফট্ ধরে এসেছি। ভুল করেছি?

গোমেজ বলেন, অ্যাপায়েন্টমেন্ট ছাড়া সেলসম্যানদের সাথে আমি দেখা করি না।

—দুঃখিত মিঃ গোমেজ। কাউন্টারের ওপর ব্রান্ডির মোড়ক রেখে বলি, আগামীকাল আমায় ডেট দিতে পারেন? এই বস্তুটা ইতিমধ্যে চোখে দেখতে পারেন। আমরা কাল ব্যবসার কথা বলবো।

—আমরা এখনই ব্যবসার কথা বলব। পেছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ঘুরে দেখি, কেতাদুরস্ত কালো মানুষটি কুড়ি ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের বোতামে সাদা ক্যামেলিয়া। ঈশ্বর দূতের মত মুখ, খাড়া নাক, ছোট চুল, চঞ্চল দৃষ্টি, রোগা, লম্বা, উনিই কি মিঃ কর্ডেজ?

—এটা? বার কাউন্টারের মোড়কের দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। দ্রুত মোড়ক খোলেন গোমেজ। টেবিলে ব্রান্ডির বোতল এমন ভাবে রাখেন যাতে কর্ডেজ লেবেলটা পড়তে পারেন। লেবেলে চোখ বুলিয়ে কর্ডেজ বলেন—একমাস আগেই 'না' বলেছি। আপনি 'না' মানে জানেন না।

—দুঃখিত। আমি নতুন কাজ করছি তাই জানি না, আমার আগে এটা কেউ আপনাকে দেখিয়েছে।

—বেশ! এবার তো জানলেন। ক্লাব থেকে বেরিয়ে যান। চলে যান।

ও হ্যাঁ। আ'ম সরি। ভাব দেখচ্ছি যেন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়—বোতলটা যদি রেখে যাই, খুব ভাল ব্রান্ডি, যেকোন শর্তে আমরা এ মাল সরবরাহ করতে পারি।

—বেরিয়ে যান বলছি।

বার থেকে চলে আসি। কাঁচের মেঝেতে সবে পাঁচ-ছ পা ফেলেছি কি ফেলিনি, চোখের নিমেষে তিনজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক যাবার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ওদের দু'জনকে কস্মিনকালেও দেখিনি। লাতিন আমেরিকান মুখ, শক্ত, ভাবলেশহীন। তৃতীয়জনের ভাঙা চোয়ালের দিকে তাকিয়ে ধক্‌ধক্ করে আমার হাঁটু কেঁপে ওঠে। এ আর কেউ নয়। সাক্ষাৎ যমদূত হার্জ।

সাপের হিস্‌হিস্ শব্দের মত হার্জের সরু ঠোঁট থেকে ছিটকে আসে—এই যে খোচ্চর, চিনতে পারছো?

আমি একপাশে সরে দাঁড়াই যাতে হার্জ ও কর্ডেজকে একসঙ্গে দেখা যায়। কর্ডেজ অবাক হয়ে বলে—কি ব্যাপার?

হার্জ বলে, ছুঁচোর নাম ব্রান্ডন। ব্যাটা টিকটিকি। সিপ্পির সহকারী।

আমার দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন কর্ডেজ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারের দিকে চলে যেতে যেতে ছুঁড়ে দিয়ে যান কথাটা।

—এখান থেকে বের করে দাও ওকে।

—আলবাৎ। হার্জ বললো—এই ছেলেরা সরো, জায়গা দাও, খোকাকে দেখি একটু।

ভয়ঙ্কর হাসি নিয়ে হার্জ বাকী দুই গুণ্ডাদের সরিয়ে কাচের মেঝেতে পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। চকিতে পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার বের করে চক্রাকারে ঘুরিয়ে হার্জের বুকে তাক করি—থামুন। আমাকে রাগালে ভাঙচুর হবে।

হার্জ এগিয়ে আসে কয়েক পা। দরজার হাতলে হাত রাখে। চোখ আমার দিকে।

দুই তাগরাই গুণ্ডা স্থির। ওরা পেশাদার গুণ্ডা। জানে, আমাকে ঘিরে ধরলে গুলি খাবার সম্ভাবনা আছে।

কর্ডেজ ফিরে আসেন। বলেন—আপনাকে চলে যেতে বলেছি। যান চলে যান।

আমি বলি—বাঁদরটাকে আমার পথ থেকে সরে যেতে বলুন, চলে যাচ্ছি।

—ঠিক তখনই ঝপ্ করে আলো নিভে যায়।

কাজটা বোধহয় হার্জের। দুমদাম ক'টা দ্রুত পদশব্দ। কমলা রঙের তীক্ষ্ণ আলো ছুটে গেল। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল আয়না। কয়েকটি শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। এলোমেলো অনেকগুলো হাত আমার গলা, হাত, কোমর জড়িয়ে ধরেছে। আমি বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিতেই মাথার কাছে ধাতব কিছু মেঝেয় পড়ার শব্দ। একটা বুট আমার পাশে সজোরে পড়লো। বুঝলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আন্দাজে মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি চালালাম কষে। কাঁচের মেঝেতে দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে আঁক করে ভয়ার্ত আর্তস্বর। এমন সময় কে যেন আমার চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি হানলো। বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তখনই আলো জ্বলে উঠল।

হার্জ ও দুই গুণ্ডার মধ্যে আমি পড়ে আছি। উফ্ চোয়ালটা বুঝি ভেঙেই গেছে। যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আমার বন্দুক কেড়ে নিল এক গুণ্ডা।

কর্ডেজের গম্ভীর গলা—ওকে নিয়ে গিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলো। যেন এমুখো আর না হয়।

কর্ডেজ চলে যাচ্ছেন, তার জুতোর শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। আমার বন্দুক হার্জের হাতে। মুখে শয়তানের উল্লাস, পাকা বন্দুকবাজের মত বন্দুক নাচাতে নাচাতে হঠাৎ বন্দুক স্থির হয়। আঙ্গুল ছুঁলো ট্রিগার। জানি পেশাদার বন্দুকবাজরা শত্রুর কটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছাড়া সর্বত্র গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়। এবার নাও, ক'মাস হাসপাতালের বিছানায় খাবি খাও। মরবে না, যন্ত্রণা পাবে।

নম্র কণ্ঠে বলি—আমায় যেতে দিন আর কোনো গণ্ডগোল করবো না, শুধু এখান থেকে চলে যেতে দিন।

—তুমি যাবে চাঁদু। হার্জের মুখে নৃশংসতম হাসি—আমার রাস্তায় যাবে।

উঠে দাঁড়াই। আচমকা আমার মাথায় বন্দুকের বাঁটের আঘাত করে হার্জ। সরে যাই তৎক্ষণাৎ। পাশ দিয়ে বাতাস কেটে আঘাতটা কাঁধে এসে পড়ে। ফলে কাছাকাছি চলে আসি আমরা। মুহূর্তে হার্জের কোর্টের দু'কোণা ধরে শূন্যে তুলে, মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিই। বারের কোণায় তার মাথা ঠুকে কাচের মেঝেতে আছড়ে পড়ে। উপুড় হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে হার্জ।

দ্বিতীয় গুণ্ডার দিকে ধেয়ে যেতে প্রথম গুণ্ডা সরে যায়। লোকটা প্রস্তুত ছিল না। তার চোয়ালে এসে পড়ে আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত দুর্দান্ত ঘুষি। ধুপ করে পড়ে, গড়িয়ে গেল সে। স্বচ্ছ কাচের মেঝেতে পিছলে দেওয়ালে গিয়ে দুম্ করে মাথা ঠুকে গেল। আওয়াজটা ভারী, বোধহয় ফাটলো মাথাটা।

অমনি তৃতীয় গুণ্ডাটা ছুটে এল মত্ত হাতির মত। কিন্তু তার চোখে ভয়। তার ডান হাতের নিচে মাথা নুইয়ে পাঁজরে মারলাম মোক্ষম ঘুষি। টাল খেয়ে সে পিছু হটলো। খপ্ করে তার দুই ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে শূন্যে এক পাক ঘুরিয়ে দিলাম আছাড়। মাথাটা মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়লো। মত্ত শরীরটা সামান্য কেঁপে ওঠে, অস্ফুট আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল।

হার্জের দিকে তাকালাম। বারের কোণে উপুঁড় হয়ে পড়ে আছে। মুখটা কাৎ হয়ে আছে। দৃষ্টি

শূন্য, স্থির।

এক্ষুনি পালাতে হবে নয় তো এখানে কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে সব দেখে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আর এখানে আসার সম্ভাবনা নেই। তার চেয়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখে নিই। কিন্তু লুকোনো যায় কোথায়? টেরেসের দিকে হেঁটে যাই। ডানদিকে সারিবদ্ধ আলোর বিন্দু জানালায়। অনুমান যদি ভুল না হয়, ঐগুলোই মাসকেটিয়ার ক্লাবের অফিসঘর। টেরেসের ছাদ টপকালে ঢালু কাঠের পাটাতন নেমে গেছে ঐ জানালাগুলির মাথায়। চেয়ে দেখি, গাঢ়তর অন্ধকারে পাটাতন দেখা যাচ্ছে না। ওখানে নামতে হলে আগে টালির ছাদে নামতে হবে। আমি লাফিয়ে টেরেসের ছাদে উঠে পড়ি। প্রথমে কিছুটা সমান্তরাল, তারপর গড়ানে ঢালু টালি নেমে গেছে সটান নিচে। আমি সন্তর্পণে নিচে নামতে থাকি।

ধীরে উঠে দাঁড়াই, আরো নিচে নামতে হবে। ওঠার চেয়ে নামা শক্ত। পা ফস্কালেই তিনশো ফুট নিচে পড়ে মৃত্যু অবধারিত। টালির মধ্যে গোড়ালি গেঁথে শব্দহীন ভাবে সতর্কে পা ফেলে নামতে থাকি। ঢালু টালির শেষ প্রান্তে দু-হাত ধরে শরীর ঝুলিয়ে দিই। তারপর পা তুলে শরীর তুলে দিই।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অফিস ঘরের টেবিল, দামী পোষাকের সুদৃশ্য রমনী। আমি মিশে আছি অন্ধকারে। টেরেসের শেষপ্রান্তে কেউ না এলে আমায় দেখতে পাবে না। এক চিলতে পরিত্যক্ত লবি। জানালার পেছনে অবিকল বেড়ালের মত লাফ দিই। অল্প হাত পিছলে যায়। শরীর টাল খেয়ে পা হড়কে যায়। কোনরকমে বাঁ হাতে টালির কোণা চেপে ধরি। কিসে যেন পা লেগে খুট করে শব্দ ওঠে। দু'পা বেঁকিয়ে দিই লাফ। অফিস জানলার পেছনে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এটাও গড়ানে টালি—আরো নিচে নেবে গেছে। তবু সুবিধা এই, এখান থেকে অফিসগুলো স্পষ্ট দেখতে পাব। প্রথম দুটো জানলার ভেতরে তাকাই। লোকজন নেই। টেবিল, টাইপ রাইটার ফাইলিং ক্যাবিনেট সব ঠিকঠাক সাজানো। প্রথম শ্রেণীর অফিসের মত। তৃতীয় ঘরটি বেশ লম্বা। ঘাড় উঁচু চেয়ারে মস্ত কাঁচ ঢাকা টেবিলের সামনে বসেছেন কর্ডেজ। ঠোঁটের দীর্ঘ পাইপে ব্রাউন রঙের সিগারেট। বড় একটা লেজারের সংখ্যাগুলোয় পেন্সিলে দাগ দিচ্ছেন। ঘরে নীল উজ্জ্বল আলো। জানলা থেকে যে আলোর রেখা এসে পড়েছে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে চুপিসাড়ে দেখতে থাকি।

দশ মিনিট কেটে গেল। ভাবছি মিছি মিছি সময় নষ্ট। তখনই টোকা পড়লো দরজায়।

মুখ তোলেন কর্ডেজ—ভেতরে আসুন। বলে ফের কাজে মন দিলেন।

দরজা খুললো, মোটা লোকটা ঢুকলো। ঝকঝকে পোষাক। বোতামে লাল কারনেশন। ঢুকে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল।

যোগ শেষ করে মুখ তোলেন কর্ডেজ। নির্লিপ্ত আন্তরিকতায় বলেন—দেখুন, আপনার কাছে পয়সা যদি না থাকে চলে যান। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা উশুল করে দিয়েছি।

—পয়সা এনেছি। লোকটা টাই ঠিক করে, পকেট থেকে একতাড়া ডলার টেবিলে রাখে—এই নিন, হাজার ডলার, এবার দুটো চাই। ভুল মাল দেবেন না।

কর্ডেজ ডলারগুলো ঢুকিয়ে রাখেন। উঠে আলমারি খুলে কি নিয়ে আসেন। টেবিলের ওপর ম্যাচ ফোল্ডার এগিয়ে দেন লোকটার দিকে।

লোকটা ফোল্ডারের পাতাগুলো পরীক্ষা করে পকেটে চালান করে দেয়। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করে। ফের লেজার খাতা খুলে বসেন কর্ডেজ।

দীর্ঘ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আরো দু'জনকে প্রবেশ, বিল প্রদান ও ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে প্রস্থান করতে দেখা যায়। তাদের একজন হোঁৎকা বয়স্ক এবং অন্যজন কলেজ পড়ুয়ার মত ছোকরা।

মনে পড়ে মর্গটের সাথে দেখা করার কথা। ঢালু চাতাল বেয়ে আরো নিচে নামতে থাকি। আরে কি এটা? মনে হচ্ছে হোটেলের বেডরুমের ব্যালকনি। জানালায় আলো নেই কোন। অর্থাৎ নিরাপদ। এ পথে বেডরুমে ঢুকে তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। এরপর লিফটে হোটেল ছেড়ে

বেরোতে দেরী হয় না।

।। আট ।।

হোটেলের রিভলভিং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন মর্গট। উজ্জ্বল আলোর নিচে যেন সবুজ রাতপরী।

—হ্যালো। দারুণ লাগছে আপনাকে।

গলাবন্ধ সবুজ পোষাক দ্বিতীয় চামড়ার মত তার শরীর ঢেকেছে। মর্গট হাসেন—আপনার জন্যেই পরেছি। ভাল লেগেছে? জেনে খুশী হলাম।

—সাথে গাড়ি আছে?

—না। আপনাকে বাংলো দেখাবো, আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন না?

—নিশ্চয়ই দেবো।

দরজা খুলে আমার গাড়িতে ওঠেন মর্গট। গাড়ি ছোটাই। মাঝে পথ নির্দেশ দেন তিনি, আমি চালাতে থাকি।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙি—দারুণ জায়গা মাসকেটিয়ার্স ক্লাব, আপনি যান কখনো-সখনো?

—ঐ একটা জায়গা ট্যুরিস্টরা দখল করতে পারেনি। হ্যাঁ আমি গেছি অনেকবার। ক্লাবের অর্ধাংশের মালিক আমার ড্যাডি বলে, আমায় কোন বিল মেটাতে হয়না।

ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছি।

মর্গট বলেন—বললে বিশ্বাস করবেন না টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি মাঝে মাঝে।

—আমিও। দেখুন, টাকার জন্য মরিয়া হওয়া আপনাকে মানায় না। মডেল হিসেবে নাচলে আপনার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেকথা কোনদিন ভেবেছেন?

—ড্যাড করতে দেবেন না তার মর্যাদাহানির ভয়ে। তিনি বলে দিলে কেউ কাজে নেবে না আমায়।

—পালাতে হবে আপনাকে। নিউইয়র্ক আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

—আপনি কি মনে করেন আমি পারবো? বাঁ-দিকের রাস্তা ধরুন। অন্ধকারভেদী গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হয় সমুদ্রাভিমুখী বালুকাময় এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। স্পীড কমিয়ে আনি।

—ও শুধু কথার কথা, বলা সহজ।

লেডিজ ব্যাগ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরান মর্গট। ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—আপনার একা থাকতে ভালো লাগে না?

মনে পড়ে হার্জও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা। মনের ভাব চেপে বলি—কারণ থাকলে।

আরো আধ মাইল গাড়ি ছুটলো। দু-পাশে অন্ধকার চিরে হেডলাইটের আলো। জ্যোৎস্নায় ছায়া ছায়া পামগাছ ও বালিয়াড়ি। বহুক্ষণ দুজনেই নীরব। হঠাৎ মর্গট বলেন—এসে গেছি।

গাড়ি থামে। মর্গট আমার কাছ থেকে ফ্লাস লাইট নিয়ে যান। যেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ হাতড়ে চাবি বের করেন।

মাইল ব্যাপী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালিয়াড়ি। পাইন গাছের শ্যামলিয়া আর অনন্ত সমুদ্র। দূরে খাড়াই পাহাড়ের ওপর বাড়ির মাথায় সমুদ্রমুখী তীব্র আলো দেখে বলি—ও আলো কিসের?

—ওটাই অ্যারো পয়েন্ট।

—ঐ আলো কি হ্যানসের প্লেস থেকে আসছে?

—হ্যাঁ।

তালা খুললো। আলো জ্বাললো, দেখা গেল দুর্দান্ত মহার্ঘ আসবাবে সাজানো ঘর। দূরে, এককোণে কক্‌টেল বার। একটা টিভি কাম রেডিওগ্রাম কম্বাইন্ড। অনেকগুলো আরামদায়ক দামী চেয়ার। নীল সাদা মোজাইক মেঝে। দেওয়ালে তিনফুট দীর্ঘ জানালার ধারের ডিভান।—বাঃ চমৎকার, সত্যি আমায় থাকতে দেবেন এখানে।

দরজা পথে মর্গট। চোখে লাস্যময় মদির হাসি ছড়িয়ে বলেন—পছন্দ।

ঐ হাসি রক্তে হিন্দোল তোলে।—অপূর্ব। বারের দিকে তাকাই। সব ধরনের মদ মজুদ।

—ঐ বোতলগুলো আপনার বাবার না আপনার?

—বাবার, বাড়ি থেকে কিছু কিছু করে এনেছি।

মর্গট বারের পেছনে ফ্রিজ খুলে এক বোতল হিমশীতল স্যাম্পেইন নিয়ে আসেন।—সেলিব্রেট করা যাক। এই যে, আপনি খুলুন, আমি গ্লাস আনছি। আমি বোতলের ছিপি খুলি। মর্গট লাউঞ্জ থেকে একটা ট্রেতে দুটো গ্লাস আনেন। গ্লাসে মদ ঢেলে দিই। গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই—চিয়ার্স। ঠোঁটে তুলি। জিজ্ঞাসা করি—আমরা, কি সেলিব্রেট করছি?

—আমাদের মিলন। তার খোলা চোখে খেলা করে কামনা।

—আপনিই আমার জীবনে প্রথম, যিনি পরোয়া করেন না আমি গরীব না বড়লোক।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, কি করে ভাবলেন একথা?

ঠোঁট থেকে নিঃশেষিত গ্লাস নামিয়ে বললেন—আমি বলছি। এবার উঠুন, বাড়িটা ঘুরে দেখুন, কেমন লাগে। আমি খালি গ্লাস নামাই—কোথা থেকে শুরু করবো?

—বাঁ-দিকে সোজা গেলে শোবার ঘর।

পরস্পরের দিকে অপলক তাকাই। বুকের মাঝে দমকা বতাস। দু'জনেরই ভাবনা বুঝি একই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিশেছে। চমৎকার বেডরুম। ডাবল বেড।

জানালার ধারে ডিভানে শুয়ে আছেন মর্গট। দুটো কুশনের ওপর মাথা। দৃষ্টি প্রসারিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রে। আমার দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করে, পছন্দ হয়েছে?

—খু-উ-ব। আমাকে এখানে রাখতে আপনি রাজী তো?

—হুম্। আমিতো এটা ব্যবহার করছি না।

—খুনের তদন্ত ক'দ্দূর এগোলো?

—বিশেষ কিছু না। তবে এ মুহূর্তে, যখন আমার মধ্যে কিসব ঘটছে তখন কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবো তা আশা করবেন না।

—কি হচ্ছে আপনার?

—এই-ই নির্জন বাংলো আর রাতপরীর মতো আপনি।

—তাহলে বলুন খুব বিরক্ত করছি আপনাকে!

—করতে পারেন। হ্যাঁ আপনিই পারেন।

আমার দিকে তাকান সুন্দরী—কি হবে করলে?

একটুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর তার দীঘল পা মেঝেতে রেখে বলেন—সাঁতার কাটতে যাবেন?

—চলুন।

আমি উঠে দাঁড়াই। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নিতে হবে। ব্যাগ নিয়ে ঘরে আসি। বেডরুমে ব্যাগ রাখতে গিয়ে দেখি, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দেওয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মর্গট। ধীরে ধীরে পোষাক খুলছেন। উন্মুক্ত হচ্ছে নগ্নদেহ। যেন নগ্না শ্বেতপরী। দু-হাত মাথায় তুলে কাঁধ থেকে চুল সরাচ্ছেন। দৃষ্টি দর্পনে।

ব্যাগ রেখে, ফিসফিস করে বলি—ওটা তোমায় করতে হবে না, আমি করে দিচ্ছি।

ঘুরে দাঁড়ান মর্গট। ধীরে। চোখে কামনার আমন্ত্রণ। ভ্রূ ভঙ্গিতে অহংকার তুলে বলেন—তোমার কি মনে হয়, আমি সুন্দর?

—তার চেয়েও বেশী।

ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে গেছি। যা ঘটতে চলেছে, মৃদু চেষ্টা করি তাকে থামাতে।

নিজের অপরাধবোধে বলে উঠি—আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত।

মাথা নাড়েন মর্গট—ও কথা বোলো না। আমি যা করি তার জন্য দুঃখিত হই না।

তখনও তার নরম দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। ধীরে পা ফেলে আমার দিকে এগোতে যাবেন।

আঁধারে মর্গটের কথা ভাসে—একটা সিগারেট দাও। পাশের টেবিল থেকে প্যাকেট খুলে সিগারেট দিই। লাইটার জ্বালি। সেই নরম আলোয় দেখি রাতপরীকে। বালিশে শায়িত সোনালী মাথা। আমার দিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়ে। হাসি ছড়ায়, লাইটার নেভাই। অন্ধকারে মর্গটের

সিগারের লাল আগুনের ছটা। অন্ধকারের নারী বলেন—কি ভাবছো আমার সম্পর্কে? ক্ষমা চাইছি না। আমি খুব স্বাধীন ও সহজলভ্যা নই। কিন্তু যখন এমনটি ঘটে, তখন সেটা অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে প্রথম যখন দেখি, কি রকম এক অদ্ভুত অনুভব পেয়ে বসে। যে রকম বহুকাল অনুভব করিনি। আর এ হল তার পরিণতি। তুমি বিশ্বাস না করলেও এ খুব সত্য। এই ইচ্ছে-সুখের পাগলামিতে আমি খু-উ-ব খুশি। নির্লজ্জ ভাবে খুশি। হাত বাড়িয়ে আমার হাত খুঁজে নেন মর্গট...তোমাকে যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়েও তুমি সুন্দর। আমার স্বপ্নের প্রেমিককেও হার মানিয়েছ তুমি।

ঘটনার আকস্মিকতায় তখন আমি বিহ্বল। বিমূঢ়। রমনীর প্রতিটি শব্দ রোমাঞ্চিত করে। তবু মনে হয় যেন বড় অক্লেশে পেয়ে গেলাম। যেখানে আমার পা ফেলার কথা নয়, সেই নিষিদ্ধ এলাকায়, না, আমার পা টলেনি। দু-হাতে ভর দিয়ে মর্গটের শরীরের ওপর শরীর তুলে ঠোঁটে দিই আশ্লেষী চুম্বন।

একসময় তিনি উঠে পড়েন। ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে আমি অনুসরণ করি। দেখি, খোলা দরজার সামনে রাত্রির সমুদ্রের বালিয়াড়ির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছেন। চাঁদের আলোয় যেন ছবি। প্রকৃতির হাতে গড়া মূর্তি।

আমরা বারান্দায় আসি। চাঁদের আলোয় ঘড়ি দেখি। দুটো বেজে গেছে।

মর্গট আগে, আমি পরে সমুদ্রে নামি। দুশো গজ সাঁতরে তীরে উঠি দু'জনে। জল উষ্ণ ছিল। নিস্তব্ধ চরাচর। যেন পৃথিবীতে পড়ে আছি আমরা দু'জন নরনারী। বালিয়াড়ি ভেঙে বাংলোয় পৌঁছই।

বাংলোয় পা দিয়ে হঠাৎ থেমে মর্গট ঘুরে মুখ তোলেন। আমার দুটো হাত তার দীঘল মসৃণ পশ্চাত ছুঁয়ে ক্রমে ওপরে, ঢেউ খেলানো নিতম্বে এসে থামে। নিবিড় করে কাছে টেনে নিই। কতক্ষণ কেটে যায় এভাবে। একসময় খেলা ভাঙে। মর্গট বলেন—ভারী সুন্দর কাটলো লিউ। আমি আবার আসবো। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

—কি যে বলো। ভাবলে কি করে কিছু মনে করবো?

—আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে?

—এখন? বাকী রাতটা থেকে যাও না।

—থাকতে চাইলেই কি থাকা যায়। ড্যাডির লোক আমায় পাহারা দেয়। সারারাত বাইরে থাকলে নির্ঘাৎ ড্যাডি জানতে পারবেন।

—বেশ, তবে চলো।

আমরা গাড়িতে উঠি। ফাঁকা পথ। মাথায় অজস্র চিন্তা। প্রশ্ন করার এই সুবর্ণ সুযোগ। অত্যন্ত সহজে জিজ্ঞাসা করি—তোমার বাবা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাড়া করেছিলেন কেন?

সীটে মাথা রেখে মর্গট উত্তর দেন—তাহলে নিজমূর্তি ধরেছ। তুমি কি ভাবো সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি। তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে, তা করেছেন নিজের স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে।

—স্ত্রীর ওপর নজরদারীর কোন কারণ ছিল কি?

—বহু কারণ থাকতে পারে। এতদিন কেন করেননি তাই ভেবে অবাক হচ্ছি। ঐ মহিলার চারপাশে সর্বদা কিছু ভ্রমর গুঞ্জন করতো। বর্তমানে থ্রিসবির সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা চলছে। লোকটা ভয়ানক। সম্ভবতঃ এ নিয়ে বাবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বাবার উচিত এখনি ডিভোর্স করা। তাহলে আমি বাড়িতে থাকতে পারি।

—তুমি কি তাই চাও।

—কেউই বাড়ি ছাড়া থাকতে চায় না। ব্রিজিত আর আমার একসাথে থাকা অসম্ভব।

—তোমার ওপর নজর রাখতে তোমার বাবা সিপ্লিকে নিযুক্ত করেন নি, মনে হয়।

—সেজন্য পয়সা খরচ করে গোয়েন্দা রাখার দরকার ছিল না বাপির। আমার পরিচারিকাই যথেষ্ট স্পাইগিরি করে তাঁকে। মাইলখানেক পথ গিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে মর্গট—ব্রিজিতের ওপর নজর রাখার কথা ভাবছো?

—না। সিপ্লির খুনেব সাথে ওনার যোগাসাজস আছে বলে মনে হয় না। ব্রিজিতের ওপর নজর রাখতে গিয়ে সিপ্লি এমন কিছু আবিস্কার করে ফেলেন, যার কাছে ব্রিজিতের ওপর নজরদারী

মূল্যহীন। সেজন্য খুন হতে হয় তাকে।
—ওহ্ তুমি সত্যি তাই ভাবছো?
—অনুমান করছি।
—আচ্ছা, সিপ্পির কাছে এমন প্রমাণ যদি থাকে যাতে ড্যাডি ব্রিজিতকে ডিভোর্স করতে পারেন। আর যদি তা ব্রিজিত জানতে পারে তবে সে মাথা ঠাণ্ডা করে বসে থাকবে না। যথেষ্ট অর্থ তার নেই। ড্যাডি তাকে ডিভোর্স করলে ব্রিজিত তা পছন্দ করবে না। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।
—তোমার কি মনে হয় তিনি সিপ্পিকে খুন করেছেন?
—না। তবে থ্রিসবি করতে পারে। তুমিতো দেখোনি সে কত ভয়ঙ্কর। সিপ্পি যদি তেমন প্রমাণ পান এবং তার ফলে ব্রিজিত যদি তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে থ্রিসবি সিপ্পিকে খুন করতে পারে।
—থ্রিসবিকে দেখা দরকার একবার। কোথায় পাবো তাকে?
—শহরের শেষপ্রান্তে ছোট্ট নোংরা একটা জায়গা আছে। 'হোয়াইট চ্যাটিউ।' দেখা যেতে পারে ওখানে। মর্গটের কণ্ঠের তিক্ততা আমায় আকর্ষণ করে—সে শুধু ব্রিজিতকেই আনন্দ দেয় না। টাকা থাকলে যে কোন মেয়েকেই সে আমন্ত্রণ জানায়। এরকম লোক আকছার দেখা যায়। ডানদিকে, সোজা ফ্রাঙ্কলিন আর্মস ধরো।
আমি তাঁর নির্দেশমতো গাড়ি চালাই। অবশেষে তার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে থামি।
আমার হাত স্পর্শ করে তিনি বলেন—শুভরাত্রি, আবার তোমায় ডাকবো। থ্রিসবি সম্বন্ধে সাবধান।
গাড়ির দরজা খুলে মর্গট নেমে যান। আমি গাড়ি স্টার্ট দিই। এবার ফেরার পালা।
ফেরার পথে ভাবনা আসে। মর্গট থেকে কর্ডেজ। সিপ্পির স্যুটকেসে যে ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছি তার প্রতিটি পাতার দাম পাঁচশো ডলার। কর্ডেজ ম্যাচ ফোল্ডারে তিনটে পাতা ছিঁড়ে তিনজনকে দিয়ে প্রত্যেকের থেকে পাঁচশো ডলার নিয়েছে। সিপ্পি যেভাবেই হোক একটি ম্যাচ ফোল্ডার পেয়েছিল। যার জন্য প্রথমে সিপ্পির ওপরে পরে আমার ঘরে দুষ্কৃতী তছনছ করে গেছে। সিপ্পির ঘরে কিছু না পেলেও আমার ঘরে পেয়েছে। আসল ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে তার স্থানে নকল ম্যাচ ফোল্ডার রেখে সে ভেবেছে, ফোল্ডারের পেছনে সাঁটা সংখ্যা ছাপা লেবেলটা আমার নজরে পড়েনি। অর্থাৎ ঐ সংখ্যাগুলোর একটা তাৎপর্য আছে। হয়তো ম্যাচ ফোল্ডারের জন্যই সিপ্পিকে প্রাণ দিতে হল। আসলে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগুলো ছাড়া এখন উপায় নেই। আরো তথ্য প্রমাণ চাই।
রাত সোয়া তিনটে।
বাংলোয় ফিরে সদ্য হুইস্কি সোডা গ্লাসে ঢেলে বার কাউন্টারে যাচ্ছি হঠাৎ নজরে আসে, লাউঞ্জের ধারের টেবিলে মর্গটের হাতব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগ খুলি। কি আশ্চর্য! ব্যাগের ভেতর থেকে হাতে উঠে আসে একটা ম্যাচ ফোল্ডার। পেছনে দেখি, হ্যাঁ সাঁটা লেবেলে স্পষ্ট ছাপ... **C451148** থেকে **C451160** পর্যন্ত।
এই সেই ম্যাচ ফোল্ডার যা সিপ্পির স্যুটকেস থেকে পেয়েছি। এটাই আমি কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। ফোল্ডার পকেটে রেখে রিসিভার তুলি।—হ্যালো?
—অ্যাই, তুমি...লিউ? উত্তেজনাপূর্ণ গলা মর্গটের।
—বলতে হবে না। জানি কি হারিয়েছ তুমি?
—হ্যাঁ, আমার ব্যাগ। তুমি পেয়েছো?
—ওটা টেবিলে পড়ে আছে এখনো।
—ওহ্ বাঁচলাম। বুঝতে পারছিলাম না ওটা ক্লাবে না বাংলোয় ফেলে এসেছি। আমি সবসময় জিনিস হারাই। কাল সকালে ব্যাগটা নিয়ে আসবো, না তুমি দিয়ে যাবে?
—ঠিক আছে। কাল সকালে যখন হোক পৌঁছে দেব।
—থ্যাঙ্ক য়ু ডার্লিং, একটু স্তব্ধতা। তারপর মর্গট বলো—লিউ এখনো তোমাব কাছে আছি...তোমার কথা ভাবছি।

পকেটে হাত দিয়ে ফোল্ডার ছুঁই। বলি—আমিও ভাবছি তোমার কথা।

...শুভরাত লিউ।

...শুভরাত, সুন্দর।

সকাল এগারোটা কুড়ি।

বাংলো থেকে গাড়ি ছুটিয়ে এসে গেছি অ্যারো পয়েন্ট। বিচ রোডে সাইনবোর্ড জানায় এই পথে স্কুল অব্ সিরামিক্স দ্য ট্রেঞ্জার আইল্যান্ড অফ্ ওরিজিন্যাল ডিজাইন।

ট্যুরিস্টদের সাথে ভেতরে ঢুকি। কুড়ি ফুট চওড়া, পঞ্চাশ ফুট লম্বা ঘর। দু-ধারে লম্বা টেবিল নানান আকারের, নানান রঙের বিচিত্র নক্সাদার চীনে মাটির মহার্ঘ সব জিনিসপত্র। প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনে একজন করে মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের পরনে সাদা কোট, বুক পকেটে মাছের ছুরি। এই ধরনের কোন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কি থেলমা ক'দিন আগে খদ্দের সামলাতো? ঘরের শেষ প্রান্তে রঙিন পর্দা। বোধহয় আর একটা ঘর আছে ওদিকে। আমি বিভিন্ন সরঞ্জাম দেখার ভান করে বারে বারে ঐ পর্দার দিকে দেখছি। সামনের কাউন্টারের সেল্‌স গার্ল আমার ভাবভঙ্গি দেখে বলে—কোন জিনিস পছন্দ হচ্ছে না? উত্তরে বলি—আপনিই বলুন, এখানকার কোন বস্তুই কি বিয়ের উপহারের যোগ্য?

—একটু দাঁড়ান। মেয়েটি কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে দরজার কাছের প্রৌঢ়াকে কি যেন বলে। প্রৌঢ়া অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। হাতে হীরের আংটি বা পরণে আমার দুর্লভ পোষাক নেই। মেয়েটি ফিরে এসে জানায়—মিস ম্যাডক্স আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি এগিয়ে যাই। প্রৌঢ়া সীট ছেড়ে উঠে আসেন। বলেন—আমাদের আরো অঢেল সামগ্রী আছে। দাম একটু বেশী।

—তা হোক, জীবনে বিয়েতো একবারই। চলুন, সেগুলো দেখা যাক। প্রৌঢ়া ঘরের শেষ প্রান্তের রঙিন পর্দা সরিয়ে আমাকে নিয়ে মাঝারি আকারের এক ঘরে ঢুকলেন।

এ ঘরে মাত্র ছ'টা একই মাপের মুর্তি-স্ট্যান্ডে রাখা।

—হয়তো এগুলোর মধ্যে পছন্দ হবে আপনার।

চারদিক তাকিয়ে বলি—আগের চেয়ে ভালো।

এমন সময় ঘরে ঢোকেন সাদা মুখের এক ভদ্রলোক। তখনি চিনতে পারি। এই ভদ্রলোকই দানাগুয়ে, যিনি কর্ডেজের কাছ থেকে এক হাজাব ডলার দিয়ে দুটো ম্যাচ ফোল্ডারের পাতা কিনেছিলেন।

।। নয়।।

দানাগুয়ে ঘরে ঢুকে দু-পা পিছিয়ে আসেন। দ্বিধান্বিত দেখায় তাকে। তারপর চলে যান আমার পাশ দিয়ে। প্রথম ঘরের মত এ ঘরের শেষপ্রান্তেও রঙিন পর্দা। সেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে যান। অর্থাৎ, ওটা তৃতীয় ঘর।

ঘুরে ঘুরে মূর্তি দেখতে থাকি। বুড়ি ঠিক নজর রাখে। মূর্তি দেখার অভিনয় করে পায়ে পায়ে ঘরের শেষপ্রান্তে এসে থামি। পর্দার ফাঁক দিয়ে এখান থেকে পাশের ঘর সহজেই দেখা যায়। পর্দা সরিয়ে দানাগুয়ে ঢোকেন। মুখে অপরাধী ভাব নিয়ে ত্রস্ত পায়ে প্রথম ঘরের দিকে চলে যান। মিস ম্যাডক্স তখনো তাকিয়ে আছেন। হাসি অন্তর্হিত। চোখে সন্দেহ।

আমি ম্যাচ ফোল্ডার দেখাই। দুরু দুরু করে বুক। ধরা পড়ে যাবো নাতো? মর্গটের জিনিস, সেটা একপলক দেখে অভিজ্ঞা ম্যাডক্স পর্দা সরিয়ে আমায় ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দেয়।

—ধন্যবাদ। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম যাতে আমায় কেউ লক্ষ্য না করে। তার শূন্য শীতল দৃষ্টি বলে দিল, ভীষণ বোকার মত কথা বলে ফেলেছি।

পর্দার পর দরজা। মধ্যে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে একরাশ ব্যবহৃত ম্যাচ ফোল্ডার। একটা তুলে দেখি, ভেতরের পাতা ছেঁড়া। প্রত্যেকটির পিছনের সাঁটা লেবেল ছেঁড়া, মাথাগুলো পোড়ানো। জানি আর নিস্তার নেই। সামনের ঘরে অবধারিত মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। কিংবা তুমুল গণ্ডগোল। এবার ধরা পড়ার সময়। হঠাৎ খেয়াল হয়, আরে, মাঝের ঘর থেকে তো ম্যাডক্স আমায় দেখতে পাচ্ছেন না।

অবিকল দানাগুয়ের মত মুখ করে বেরিয়ে এসে ত্রস্ত পায়ে স্কুল থেকে পথে নামি। পার্কিংলট

থেকে গাড়ি ছোটাই ফ্র্যাঙ্কলিন আর্মস অভিমুখে। পকেট থেকে ম্যাচ ফোল্ডার বের করে মর্গটের ব্যাগে রাখি। কিছুক্ষণের মধ্যে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাই। রিসেপশন ক্লার্ককে নাম বলতে সে বারে গিয়ে বসতে বলে। উনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছেন। বারে বসে থাকি।

দশ মিনিটও কাটে না, মর্গট আসে। পরনে সাঁতারের পোষাক ঢেকেছে বিচকোট, পায়ে স্যান্ডেল।

বসতে বসতে তিনি বলেন—বেশীক্ষণ বসবো না, লিউ। এক জায়গায় লাঞ্চের ডেট আছে। ব্যাগ এনেছো?

ব্যাগ টেবিলে রাখলাম।—এর জন্য পুরস্কার পাওনা রইল।

চোখে কামনার ছটা—খুশি মনে দেবো। ধন্যবাদ লিউ। আমি এত বেখেয়ালী...বলতে বলতে টেবিল থেকে ব্যাগটা বিচব্যাগে ভরে নেন।

—এক মিনিট দাঁড়াও। ব্যাগটা খুলে দেখলে না কিছু খোয়া গেছে কিনা?

—অবাক দৃষ্টিতে মর্গট বলেন—কি খোয়া যাবে?

—তোমার ব্যাগে একটা ম্যাচ ফোল্ডার আছে।

—তাই নাকি? ম্যাচ ফোল্ডার! এতে তোমার কৌতূহল কেন?

প্রায় বড় ব্যাগ, তার ভিতর ছোট ব্যাগ খুলে মর্গট ফোল্ডারটা তুলে বলেন—এটাই তো?

—হ্যাঁ, কোত্থেকে পেলে?

—জানি না। ওটা ব্যাগে আছে তাই জানি না। লিউ এত কৌতূহল কেন?

—কারণ আছে। এটা সিপ্পির ব্যাগ থেকে পেয়েছি এবং আমার হোটেল রুম থেকে চুরি গেছে। পরিবর্তে এক নকল ফোল্ডার রেখে যায় চোর। এখন দেখছি তোমার ব্যাগে এটা।

—এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

—বোধহয় গতরাতে ক্লাব থেকে এনেছি। কাল ডিনার খেয়েছি সেখানে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি লাইটার নিতে ভুলে গেছিলাম। লাইটার নিতে না ভুললে কখনই দেশলাই বা ম্যাচ ফোল্ডার ব্যবহার করি না। টুপি রাখার ট্রে থেকেই বোধহয় ওটা নিয়েছি।

—কাদের সাথে ডিনার সেরেছো?

—পার্টি ছিল। সাকুল্যে পাঁচজন ছিলাম। আমি, ব্রিজিৎ, থ্রিসবি, দানাগুয়ে নামের এক ভদ্রলোক, বন্ধু ডোরিস ও যার সঙ্গে প্রায় টেনিস খেলি সেই হ্যারি লুকাস।

—মর্গট, এই ম্যাচ ফোল্ডার আমি চাই। লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনকে দেখাবো।

—কিন্তু লিউ, আমি পুলিশের ব্যাপারে জড়াতে চাইনা। তাহলে ড্যাডির কানে উঠবে কথাটা।

—চিন্তার কারণ নেই। তোমাকে জড়াবার ক্ষমতা তোমার বাবাকে এড়িয়ে র‍্যানকিনের নেই।

মর্গট ফোল্ডার দেন। বলেন—প্লিজ, আমায় জড়িওনা। যদি খবরের কাগজে প্রকাশ পায়...। তার হাতে মৃদু চাপড় মেরে বলি—ভেবো না।

তুমি কি এখন থ্রিসবির কাছে যাচ্ছ? তাকে পাবে কোথায়? মাউন্টেন রোড ধরে পাঁচমাইল গিয়ে সাইন পোস্ট দেখবে 'দি ক্রিস্ট'। ঐখানে পাবে হোয়াইট চ্যাটিউ। আচ্ছা, শীঘ্রই দেখা হবে লিউ। ও কে।

হোয়াইট চ্যাটিউ? নীল টালির সারিবদ্ধ বাড়ি। কাঠের গেট। গায়ে বাড়ির নাম। গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে গেলাম, কলিংবেলে হাত রাখতে যাবো, ভেজানো দরজা থেকে ভেসে আসে সংলাপ—পুরুষ কণ্ঠ—বেশ, তুমি ড্রিঙ্ক না করলে আমিই করি। খানিক নীরবতা।

নারীকণ্ঠ—ঈশ্বরের দোহাই। এখনই শুরু করো না জ্যাকুইস। তোমার সাথে কথা আছে।

পুরুষকণ্ঠ—আরে সেজন্যই তো মদ খেতে হবে। না হলে তোমার প্রলাপ হজম করবো কি করে?

নারী—তুমি একটা শয়তান! কুৎসিত শোনায় নারীকণ্ঠ। আমি নিঃশব্দে দরজার আড়ালে দাঁড়াই। ভেজানো দরজার ফাঁকে দৃশ্যমান বেশ বড় ঘর। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের অপূর্ব এক রমনী লাউঞ্জিং চেয়ারে গা এলিয়ে বসে। হ্যাঁ চেনা যায়। ইনিই ব্রিজিৎ ক্রিডি। প্রাক্তন অভিনেত্রী, লী ক্রিডির স্ত্রী।

চোখে পড়ে থ্রিসবিকে। সুঠাম, রোদজ্বলা চামড়া, কালো ঝাঁকড়া চুল, নীল চোখ, গোঁফযুক্ত মুখটি চৌকস। পরনে লাল সর্টস্ ও স্যান্ডেল। ডানহাতে মদভর্তি গ্লাস। ঠোঁটে সিগারেট। প্রশ্ন করে ব্রিজিৎ—কোথায় ছিলে কাল রাতে?

—কতবার বলবো এখানে ছিলাম। টিভিতে মারপিট দেখছিলাম।

—না। তুমি তা করোনি। আমি ক্লাব থেকে ফোন করে কোন সাড়া পাইনি।

—আমি সব সময় ফোন ধরি না। ব্রিজিৎ ডার্লিং, আমি চাই না কেউ বিরক্ত করুক। তাই রিং শুনেও ধরিনি।

সহসা উঠে দাঁড়ান ব্রিজিৎ। চোখে আগুন—মিথ্যে কথা, তুমি ছিলে না এখানে। আমি এসে দেখেছি তুমি নেই। আলো নেভানো এমনকি গ্যারাজে গাড়ি নেই। তোমার এত সাহস, মিথ্যে বলো? কি করছিলে?

থ্রিসবির মুখ থেকে প্লে-বয়ের হাসি উধাও। কঠোর হিংস্রতা ফুটে ওঠে—সেজন্য ছুটে এসেছো? কত সস্তা করে ফেলেছো নিজেকে তুমি! প্রথমত একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালে আমার ওপর নজর রাখতে। সে মারা গেলে নিজেই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ? যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।

বীভৎস চিৎকার করে ওঠে ব্রিজিৎ—মেয়েটা কে?

সিগারেট নিভিয়ে থ্রিসবি বলেন—যথেষ্ট হয়েছে আজ। তুমি চাইলে আমি আর সম্পর্ক রাখব না। এখানেই শেষ হোক।

—সে কি মর্গট? তার সাথে শুরু করেছো?

—মর্গট তোমার থেকে দশ বছরের ছোট। যুবতী ও ঢের বেশী সুন্দরী। তবে দেখছি তোমরা দু'জনেই মাদকাসক্ত, অতিরিক্ত যৌন পিপাসু ও বিরক্তিকর। যাক্‌গে এবার তুমি আসবে, আমার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে।

—মেয়েট' মর্গটি, তাইনা? সে এখনো ভালোবাসে তোমায়? সে ঠিক করেছে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে? উত্তেজিত ও রাগমিশ্রিত গলা কাঁপে ব্রিজিতের।

—দ্যাখো সিন ক্রিয়েট করোনা। তুমি কি যাবে এখন?

—কাল কোন্ মাগীর সঙ্গে কাটিয়েছ না জেনো যাবো না।

—বেশ, শোন তবে। মেয়েটা একদম তাজা। সোনালী চুল, সদ্য যুবতী। রাস্তায় একা হাঁটছিল, আলাপ হয়ে গেল। তার সাথেই রাত কাটিয়েছি।

—লম্পট! কুত্তির বাচ্চা—ব্রিজিতের মুখে রক্ত ছল্‌কায়। রাগে কণ্ঠ কাঁপে—মিথ্যে কথা। মাগীটা মর্গট—

—তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি। পরে বোল না যে আমি প্রাক্তন প্রেমিকাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। থ্রিসবিকে দেখা যায় না। বোতলের ছিপি খোলার শব্দ। ব্রিজিৎ বলেন—একসাথে আমরা অনেক এনজয় করেছি। আজ যে যার পথ দেখার সময় এসেছে। ঠিক আছে, আলাদা হয়ে যাবো। তবে তুমি ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই আমার থেকে কিছু ডলার ধার নিয়েছিলে। মনে পড়ে? ঠিক তেরো হাজার ডলার।

—চাইতে পারো, আমাকে জবরদস্তি করতে চাইলে কোর্টে কেস করো। মনে হয় তোমার স্বামী এ বিষয়ে তোমায় যথেষ্ট সাহায্য করবেন। তিনি আমায় এত টাকা দিয়েছ শুনলে তোমায় নির্ঘাৎ ডিভোর্স করবেন।

ব্রিজিৎ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করেন—তোমার সাথে কোনদিন আমার কিছু হয়েছিল তা ভুলে যাবো। তোমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

চেয়ারে ঘুরে বসেন থ্রিসবি—উঁহু, অতটা কঠোর হোয়ো না। দেখো, তুমি যৌন অতৃপ্ত রমনী। আমি তোমার খিদে মিটিয়েছি। তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। ভেবে দেখো ব্রিজিৎ, বিচ্ছেদের সময় তিক্ততা রেখো না। আমার মত অনেক সুন্দর চেহারার যুবক পাবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অক্লেশে আমায় ভুলে যাবে। আর ক-খ-নো দেখা হবে না আমাদের?

চোখ জ্বলে ওঠে ব্রিজিতের। টেবিল থেকে তুলে নেন কিটব্যাগ।—বেশ তাই হোক।

ব্রিজিতের হাসিতে নির্মম কৌতুক ঝরে। শিরদাঁড়া কাঁপানো হিমবাহ—তোমায় খুন করছি জ্যাকুইস। আমি তোমায় না পেলে, আর কাউকে পেতে দেবো না। ব্যাগের ভেতর থেকে, ব্রিজিতের হাতে উঠে আসে পয়েন্ট আটত্রিশের স্বয়ংক্রিয় রিভলভার। থ্রিসবির দিকে নিশানা।

।। দশ ।।

ধীরে উঠে দাঁড়ান ব্রিজিৎ। বন্দুক হাতে যেন বিকিনী পরিহিতা বাঘিনী। পাথুরে মুখ। বন্দুকের রূপালী ট্রিগারে আঙুল। নিচুস্বরে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাকুইস, আমাকে ঢের জ্বালিয়েছো। এবার সেই যন্ত্রণার কিছু ভাগ নাও।

ঠোঁটে জিভ বোলান থ্রিসবি—ব্রিজিৎ বন্দুক নামাও। এসো আমরা আলোচনায় বসি।

বড় দেরী হয়ে গেছে জ্যাকুইস। ঢের ক্ষমা করেছি। আর না, লম্পট, ভীতুর ডিম।

ঠিক এসময়ে নিঃশব্দে ঘরে পা রাখি। থ্রিসবি আমাকে দেখতে পায়। ব্রিজিতের পেছনে এসে দাঁড়াই। বন্দুক তুলেছেন ব্রিজিৎ। লাফিয়ে পড়ি। তার হাত সজোরে নিচে নামিয়ে দিতে, লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট কার্পেট গর্ত করে জানলা দিয়ে ছুটে যায়। হাত মুচড়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিই। অবাক চোখে ব্রিজিৎ তাকান। তার ভয়ার্ত মুখে চামড়া ঝুলে পড়ে। কিছুক্ষণ ওই ভাবে চেয়ে থেকে, টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হন। বাইরে গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ।

বন্দুক টেবিলে রেখে হাত মুছি রুমালে। স্তব্ধতা যেন ভারী পাথব। থ্রিসবি দেখছেন আমাকে। নরম সুরে বলি, উনি খুন করতে গেলে বড়জোর আপনার পায়ে একটা গুলি লাগত।

সম্বিৎ ফিরে পান থ্রিসবি। তখনো ভয়ার্ত দু-চোখ, কোনরকমে উচ্চারণ করেন, নিউরোটিক মাগী! বন্দুক পেল কোথায়? তা আপনি উদয় হলেন কোত্থেকে?

ট্রেড কার্ড দিই। থ্রিসবি চোখ বুলিয়ে নেন, দ্য স্টার এজেন্সি, আরে। এই এজেন্সির একজন, আচমকা থেমে মুখ ঘোরান। চোখে ভয়, হতাশা, বিহ্বলতার সংমিশ্রণ।

—ঠিক, সিপ্পি আমার পার্টনার ছিলেন।

—আমার ওপর নজরদারীর জন্য নিযুক্ত হন?

—না। দুর্ঘটনার পর আমি এসেছি। আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

রুমালে মুখ মোছেন থ্রিসবি। শূন্য গ্লাস নিয়ে বার টেবিলে যান—মদ চলবে?

—চলতে পারে, ধন্যবাদ।

দু-গ্লাসে মদ ঢেলে, এক গ্লাস আমায় দেন। সিগারেট ধরিয়ে এক বুক ধোয়া টেনে বলেন—বলুন, কি জানতে চান?

—ব্রিজিৎ কি আপনার ওপর নজর রাখতে সিপ্পিকে নিয়োগ করেন?

থ্রিসবি দ্বিধান্বিত—পুলিশ কেসে জড়াবো নাতো?

—না।

—হ্যাঁ, সিপ্পিকে ও ভাড়া করেছিল।

—কেন?

—ওর ধারণা, আমি ওর সৎমেয়ে মর্গটের সাথে প্রেম চালাচ্ছি।

আমি গ্লাসে চুমুক দিই, সিগারেট ধরাই, তবে কার সাথে আপনার প্রেম চলছে?

—সেটা বলার মত নাকি? সাধরণ এক মেয়ে।

—সিপ্পি কি সে কথা ব্রিজিৎকে জানিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ জানিয়েছিলেন। তাই ব্রিজিৎ মেয়েটার কাছে গিয়ে তাকে ঈশ্বরের ভয় দেখায়। পাপের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে।

—ব্রিজিৎ কি সফল হয়েছিলেন?

—বোধ হয়। মেয়েটাকে আর দেখতে পাই না।

—তারপর কি হল?

—ব্রিজিৎ আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে, বচসা হয়। গত পরশু ঠিক করি, অনেক হয়েছে। এবার সম্পর্ক চুকিয়ে দেবো। বাকীটা তো দেখলেন।

আচ্ছা মিস্টার থ্রিসবি, সিপ্পি যাকে ফলো করছিলেন, আপনার সেই প্রেমিকার নাম কি থেলমা কাজিন?

মুহূর্তে মুখ-চোখের অদ্ভুত পরিবর্তন হল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন,—দেখুন, পুলিশী জেরা করবেন না, সে এক সাধারণ মেয়ে।

—অনেক কথাই বললেন, বলুন না, মেয়েটা থেলমা কাজিন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই, এবার খুশি তো?

—কি করে আলাপ হল?

—পটারী প্লেসে ব্রিজিৎ কেনাকাটা করতে নিয়ে গিয়েছিল। তখনই টের পাই মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

—কি করে বুঝলেন আপনাদের ওপর সিপ্পি নজর রাখছেন?

—থেলমা বলেছিল। সে তার কর্মস্থানে আমায় ডেকে জানিয়েছিল, আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে তাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছিলাম, থেলমা না ছাড়লে ব্রিজিৎ শায়েস্তা করবে আমায়।

—খুন করেছে?

—মনে হয় খুনী সিপ্পিকে নয়, থেলমাকে খুন করতে গেছিল। সম্ভবতঃ থেলমাকে বাঁচাতে গিয়ে সিপ্পি খুন হয়।

—তাহলে ব্রিজিৎ জোড়া খুনের আসামী?

—আমি তা বলিনি, ব্রিজিৎ আইসপিক দিয়ে সিপ্পিকে খুন করছে—তা আমি বা আপনি কেউই দেখিনি

—ব্রিজিৎ ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে খুন করাতে পারে। যেমন হার্জ?

থ্রিসবি চমকে ওঠেন। করতে পারে, আমার বোধহয় এ শহরে থাকা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে।

আমি ঠোটে দ্বিতীয় সিগারেট রেখে পকেট থেকে ম্যাচ ফোল্ডার নিয়ে এমনভাবে ধরাই যাতে ওটা থ্রিসবির চোখে পড়ে। বলি—হার্জ সম্বন্ধে কি জানেন? ওর প্রতিক্রিয়া দেখার মত। ফোল্ডার থেকে ওর দৃষ্টি সরে না। আমি নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরিয়ে ওর ইতস্ততঃ ভাব দেখে প্রশ্ন করি—কি ব্যাপার?

—না মানে, আপনি মাসকেটিয়ার্স ক্লাবের মেম্বার জানতাম না।

—মেম্বার নই। এটা একজনের কাছে থেকে নিয়েছি।

—ওঃ, একটু বেরুবো। লাঞ্চের ডেট আছে। উঠে দাঁড়ান তিনি।

—আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। হার্জ সম্বন্ধে কি জানেন?

—লী ক্রিডির ভাড়াটে গুণ্ডা, ওর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন কেন? যাক্ ঠিক সময়ে এসে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ।

—আচ্ছা পরে দেখা হবে।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ফিরলাম সেন্ট রাফাইল সিটিতে। এক ড্রাগ স্টোর্সের সামণে গাড়ি থামাই, সিধে বুথে গিয়ে ফোন করি ক্রিডির বাড়ি। কিছুক্ষণ বিচিত্র যন্ত্র শব্দ। সেক্রেটারীর গলা ভেসে আসে, বলি—মিসেস ক্রিডির সাথে দেখা করতে চাই। আজ সকালে ওনার সাথে দেখা হয়েছিল। ওনার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। জিজ্ঞাসা করুন, উনি কখন দেখা করতে পারবেন।

—আপনার নাম?

—নামটা জরুরী নয়, যা বললাম তাই বলুন।

—প্লিজ, ধরুন এক মিনিট।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সেক্রেটারির গলা—তিনটের সময় দেখা করতে পারেন।

—বেশ, যাবো আমি, বলে রিসিভার নাবাই। ঘড়িতে দেখি তিনটে বাজতে তিন মিনিট বাকী। পার্কিং লটে গাড়ি থামাতে কানে ধাক্কা দেয় পরিচিত কণ্ঠস্বর—মিস্টার ব্রান্ডন? এভাবে পুরোনো দোস্তকে এড়িয়ে যেতে হয় বুঝি?

—দেখি সেই বাটলার ফাল্টনের চেনা মুখ। সংক্ষেপে বলি মিসেস ক্রিডির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—মনে হয় তিনি এখনি এসে পড়বেন। আমি ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে আসছি।

এক মিনিটের মধ্যে ফেরেন তরুণী। ঘরে ঢুকে দেখি ছবির মত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ক্রিডি। পরনে হলুদ স্ল্যাক্স, সাদা সার্ট। দৃষ্টি গোলাপ বাগানে প্রসারিত।

হলিউডের ফিল্মের মত স্লো মোশানে ফেরেন সতর্ক চোখে। বুঝি সেলুলয়েডে ধরে রাখা ফ্রেম। সামনের চেয়ার টেনে বসে পড়ি।

—আপনাকে বসতে বলিনি, হলিউডীয় চিত্রার্পিতের ভঙ্গি ব্রিজিতের।

—বলেননি, কিন্তু আমি ক্লান্ত। সারাদিন ধকল গেছে বড্ড। নিন, আপনার বন্দুক ফেরৎ দিতে এসেছি।

পকেট থেকে পয়েন্ট আটত্রিশের পিস্তল বের করে, ম্যাগাজিন খুলে এগিয়ে দিই।

পিস্তল তুলে নিয়ে ব্রিজিৎ বলেন—কি ভেবেছেন। ব্ল্যাকমেল করবেন আমাকে?

—আলবাৎ ব্ল্যাক মেইল করেত পারি আপনাকে। উনিশশো আটচল্লিশ-এর অস্কার বিজয়িনীর অভিনয় ছেড়ে আমার কথা চুপচাপ শুনুন।

—ওহ্, ঠিক আছে। কত টাকা চাই আপনার?

—আমাকে আপনার বয়ফ্রেণ্ড ভাববেন না মিসেস ক্রিডি, যে টাকার ধান্দায় ঘোরে। আমি কিছু খবরাখবর চাই।

—কি খবর?

—অন্য কারোর ওপর নজর রাখার জন্য কি সিপ্পিকে ভাড়া করেছিলেন?

—না।

—আপনি কি জানেন সম্প্রতি থেলমা কাজিন নামে একটি মেয়ের সাথে থ্রিসবি প্রেম করছেন?

—না। ওরকম কোনো নাম শুনিনি, চিনিও না।

—থ্রিসবি আমায় যা বলেছেন তা লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনকে জানালে আপনার আপত্তি নেই বোধ হয়।

—আপনি যা খুশি করতে পারেন? তবে সাবধান, আমাকে বিপদে ফেলতে গেলে আপনাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। ভাববেন না। তা আমি পারিনা, আপনার বকবক আর শুনতে চাই না। এবার কেটে পড়ুন।

এবার শেষ অস্ত্র সামনে রাখি। ম্যাচ ফোল্ডার....এটা কি আপনার?

থ্রিসবির মত কোন প্রতিক্রিয়া ফোটে না ব্রিজিতের মুখে—বুঝতে পাচ্ছি না কি বলতে চান? এখন চলে যাওয়া উচিত আপনার। ব্রিজিত উঠে বেল টেপেন। দরজা খুলে ঢোকেন সেক্রেটারী। যেতে যেতে বলি—আবার দেখা হতে পারে।

বাইরের ঘরে পা দিতেই দেখতে পাই দুরের চেয়ারে হিল্টন বসে আছেন। বলেন—মিসেস ক্রিডির সাথে কথা বলা শেষ হলে মিস্টার ক্রিডি আপনাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন।

—বেশ, দেখা যাক, চলুন।

মিস্টার ক্রিডির ঘরে দরজা খুলে হিল্টন অনুচ্চ স্বরে বলেন—স্যার, মিস্টার ব্রান্ডন এসেছেন। আমি ঘরে ঢুকতে ক্রিডি বলেন—আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হল?

—এজন্য ডেকেছিলেন? তাহলে আমি যাই।

—কয়েক মুহূর্ত আমায় জরিপ করেন ক্রিডি। টেবিল থেকে কাগজকাটা ছুরি চোখের সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলেন—আপনাদের এজেন্সি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি, শুনেছি বিত্তবান আপনারা। লাভজনক ব্যবসা ভালই চলছে এবং মূলধন তিন হাজার ডলার। উঠতি ব্যবসা কিনতে আমি পছন্দ করি। আপনাদের ব্যবসা কিনতে আমি প্রস্তুত। দশ হাজার ডলার দিচ্ছি। সুনাম আর ওই, কি যেন বললেন, হ্যাঁ, ব্যক্তিত্বের জন্য।

মনে মনে ভাবি, বিক্রি করলে সিপ্পি হত্যারহস্যের তদন্ত ধামা চাপা পড়ে যাবে, আমি তদন্ত চালাবই। কেনা যাবে না আমায়।

—আর দ্বিধা করবেন না। আপনার পার্টনার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি। অত্যন্ত বাজে লোক। তার সাথে আর কিছুদিন কাজ করলে আপনার কারবার ডকে উঠতো। লোকটা মেয়েবাজ। আদৌ ভাল গোয়েন্দা ছিল না। ওর জন্য সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করবেন না, আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবো।

—আমি বিক্রি হব না।

—একলাখ ডলার?

—না?

—দেড় লাখ?

—বাদ দিন। নিজেকে বড় সস্তা করে ফেলছেন। আমাকে কেনার ধান্দা ছাড়ুন এবং আপনার ঐ ডলার সর্বস্ব মানসিকতা বাদ দিন। ফিরবো বলে দরজায় পা রাখতে বুঝি পিছনে ফেলে আসা নিস্তব্ধতা কি যন্ত্রণাদায়ক।

।। এগারো ।।

মাঝ দুপুরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

—হ্যালো?

—কে লিউ? মর্গটের গলা। জানো, ম্যাচ ফোল্ডারটা জ্যাকুইসের।

—কি করে বলছো?

—মনে পড়ল, ও আমার টেবিলের বিপরীতে বসেছিল। আমার লাইটার কাজ করছিল না। ও পকেট থেকে তার ম্যাচফোল্ডার বের করে। টেবিলে সিগারেট-এর প্যাকেট ও ম্যাচ ফোল্ডার ফেলে জেরিসের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। সিগারেট ধরাতে গিয়ে আমি সেই ম্যাচ ফোল্ডার নিই ও পরে অন্যমনস্ক হয়ে সেটা ব্যাগে ভরে নিই। হলফ করে বলতে পারি টেবিলের ওপর ওকে ম্যাচ ফোল্ডার রাখতে দেখেছি। লিউ, জ্যাকুইসের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?

—ব্রিজিৎ সেখানে ছিলেন। তিনি যখন থ্রিসবিকে গুলি করতে যান সেই নাটকীয় মুহূর্তে আমার প্রবেশ। আমার হস্তক্ষেপে থ্রিসবি বুলেট বিদ্ধ হননি।

—বোধহয় ব্রিজিৎ মেজাজ হারিয়েছিল। কি ভাবছো লিউ, পুলিশকে জানাবে নাতো?

—না। তুমি কি জান ওনার বন্দুক আছে?

—না।

—সিল্পির খুনের ব্যাপারে ব্রিজিতের হাত আছে বলে মনে হয়?

—এখন ভাবতে পারছি না কিছু।

—কি করবে?

—থ্রিসবিকে ফের ধরতে হবে। তুমি জানো ওর বাড়িতে চাকর আছে?

—হ্যাঁ, ফিলিপিনো নামে একজন আছে। সকালে আসে, রাত আটটায় কাজ সেরে চলে যায়।

—আবার কখন তোমার সাথে দেখা হবে মর্গট? রাত সাড়ে দশটায় চলে এসো। ইতিমধ্যে থ্রিসবির বাড়ি ঘুরে এসে তোমায় জানাবো নতুন কি খবর পেলাম।

—বেশ, যাবো। সাবধান লিউ। বাড়ির খুব কাছে গেলে জ্যাকুইস পালিয়ে যাবে। আমার কথা মনে রেখো, লোকটা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর।

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ তুলে দিই। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলি, কে ওখানে?

উত্তর নেই। বারন্দার কোণে হাঁটু গেড়ে বসা মানুষটির নাড়াচাড়ার কোন শব্দ নেই। পা কাঁপতে থাকে। অন্যমনস্ক হাত থেকে একটা বুলেট দরজা ফুঁড়ে ছুটে যায়। হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে। চীৎকার করে বলি—দাঁড়াও! নড়ো না! এক পা নড়লেই খতম করে দেব।

ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে, বাঁ হাতে লাইটার জ্বালাই। সেই স্বল্পালোক বলে দেয় কোণের লোকটা নড়ছে না। কালো-খাটো মানুষটার চোখ বোঁজা। হাঁ মুখের কটি দাঁত দৃশ্যমান। আমার অভিজ্ঞতায় বুঝি মানুষটি মৃত। নিষ্প্রভ হতে শুরু করেছে লাইটারের আলো। আমি নিচে সিঁড়ি থেকে ফ্লাসলাইট কুড়িয়ে আনি। এই মৃত লোকটিই বোধহয় থ্রিসবির চাকর। কেউ তার বুকে গুলি

করেছে। মৃতের মাথাটা ঘোরাই। ঠাণ্ডা চামড়া। চামড়ার নিচে শক্ত পেশী পরীক্ষা করে বুঝি এর মৃত্যু হয়েছে কয়েকঘন্টা আগে।

কালো বেড়ালটা আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ল্যাজ নেড়ে জুলজুল করে তাকায়। হাঁটতে থাকে অতি ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখে। আমি বেড়ালটাকে অনুসরণ করতে থাকি।

মৃত চাকর ফিলিপিনোকে পাশ কাটিয়ে একটা দরজার সামনে থামে বেড়ালটা। রুদ্ধ দরজায় পা দিয়ে আঁচড় কাটে।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় মৃদু চাপ দিই। খুলে যায় ভেজানো দরজা। অন্ধকার আর নিঝুম স্তব্ধতা। বেড়ালটা কান খাড়া, খাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার মুখ শুকিয়ে যায়, হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে, পা যেন গেঁথে যায় মাটিতে।

ঘরের মধ্যে ফ্ল্যাসলাইটের তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয় মেঝে, খাটের পায়া। লাফ দিয়ে কালো বেড়ালটা খাটের ওপর ওঠে।

থ্রিসবি পড়ে আছেন বিছানায়। পরনে লাল সর্টস সাদা জামা। পায়ে স্যান্ডাল। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে। পিছন থেকে থ্রিসবিকে ছুরি মেরেছে আততায়ী।

ফোন করি ক্রিডিব বাড়িতে, বেশ কিছুক্ষণ বাদে অপর প্রান্ত সরব হয়—দুঃখিত মিস্টার ব্রান্ডন। মিসেস ক্রিডি আপনার সাথে কথা বলতে রাজি নন।

—দেখুন, মিসেস ক্রিডিকে দিন। তাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলার কষ্ট করতে হবে না।

অনেক্ষণ পর মিসেস ক্রিডির গলা পাই—ফের যদি ঝামেলা করতে চান, আমি স্বামীকে গিয়ে বলবো।

—খুব ভালো। তিনিও পছন্দ করবেন। আপনি বরং এখনি তাকে বলুন। কেন না, আপনি এখনি যে ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছেন যাতে আমার হাত নেই। থ্রিসবি খুন হয়ে তার বিছানায় পড়ে আছে। আর আপনার পয়েন্ট থার্টি এইট পিস্তল মৃতদেহের কাছে পাওয়া গেছে।

—মিথ্যে কথা।

—বেশ তাই ভাবলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন যতক্ষণ না আইনের জালে জড়িয়ে পড়েন। আমি খবর দিচ্ছি পুলিশকে।

ভীত শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রিজিৎ বলেন—সত্যি মারা গেছে?

—পুরোপুরি। আজ পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

—এখানে নিজের ঘরে।

—কেউ দেখেছে আপনাকে?

—না, আমি একা ছিলাম।

—আপনার সেক্রেটারী?

—চলে গিয়েছিল।

—আপনাকে যে পিস্তলটা দিয়েছিলাম সেটা কোথায়?

—বেডরুমের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি।

—আপনার জন্য করছি কেন জানি না। তবে পিস্তলটা অকুস্থল থেকে সরিয়ে নিয়েছি। মনে হয়, কেউ আপনাকে থ্রিসবির খুনী সাজাতে চাইছে। পিস্তল সরালেও থ্রিসবির গায়ে বিদ্ধ বুলেট থেকে পিস্তলের হদিস করতে পারে পুলিশ। যদিও তা করবে না খুব সম্ভব। এখন বসে বসে ডাকুন ঠাকুরকে। ব্রিজিতের উত্তরের অপেক্ষা না করে রিসিভার নামিয়ে রাখি।

ঠিক সোয়া দশটায় বাংলোয় ফিরে আসি। পাম গাছের আড়ালে কনভার্টেবল ক্যাডিলাক, একপলক সেদিকে তাকিয়ে বাংলোর ফটকে তালা খুলি। অন্ধকারে সন্তর্পণে স্যুইচ টিপে আলো জ্বালি। কান সজাগ, হাতে উত্তোলিত বন্দুক, কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভেসে আসে মর্গটের কণ্ঠস্বর।

।। বারো ।।

গাড়ি থেকে নেমে লেফটেন্যান্ট চেঁচিয়ে ওঠেন—আপনার সঙ্গে কথা আছে ব্রান্ডন। ভেতরে

আসছি আমরা।

র‍্যানকিন ভেতরে ঢুকে বলেন—স্বেচ্ছায় আসবেন, না জোর করতে হবে? আপনি এইমাত্র গ্রিসবির বাড়ি থেকে এসেছেন, বলুন, যাননি?

আমি পুলিশের গাড়িতে পিছনের সীটে বসি।

—বন্দুক দিন...হঠাৎ র‍্যানকিন বলেন।

—আমার কাছে নেই। তৎক্ষণাৎ র‍্যানকিন গাড়ি থামাতে বলে প্রশ্ন করেন—কোথায়?

—বাংলোয়।

বাংলোর সামনে গাড়ি থামে। ক্যানডিকে যথাসম্ভব আড়াল করে ড্রয়ার খুলি। ক্যানডি ঝুঁকে আমার পয়েন্ট থার্টি এইট বন্দুক তুলে বলেন—এটা?

—হ্যাঁ।

ড্রয়ারে তাকিয়ে শিউরে উঠি। ব্রিজিতের বন্দুক উধাও।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই, ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে, আমার কাছে বন্দুক নেই। র‍্যানকিন আমারটা নিয়েছে আর ব্রিজিতেরটা দিয়েছে হেপ্পলকে। হেপ্পলের কথাগুলো কানে বাজে—যে কেউ যে কোনো জায়গায় আপনাকে খতম করে দিতে পারে। আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন, কেউ সেজন্য দায়ী হবে না।

কেউ বেডরুমে সন্তর্পণে হাঁটছে। মিহি কিন্তু স্পষ্টই পদশব্দ শোনা যায়। স্যুইচ টিপে আলো নেভাই। কে যেন এ ঘরের দরজায় চাপ দেয়...ক্যাঁ-চ শব্দ ওঠে। পাল্লা ফাঁক হয়। আর তখনই ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠি—ওখানে কে আছো দাঁড়াও, নইলে খুপড়ি উড়িয়ে দেবো।

বলেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি, যাতে আততায়ীর গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

—লিউ?...ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মর্গট।

উঠে আলো জ্বেলে দিই। দরজায় মর্গট। মুখে আতঙ্ক, পরণে কাচের মত স্বচ্ছ রাত পোশাক। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। যেন এই ধূলিমলিন পৃথিবীর কেউ নয়।

—ওহ্ লিউ। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছো। প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়।

—আর তুমি যা করেছো তাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত, এখানে কি করছিলে মর্গট?

—ফিরে এলাম। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ডার্লিং...কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশ এলো, চলে গেলো। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বলে ঘরে এসে তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।

তোমায় ফেলে যেতে হয়েছিল বলে দুঃখিত। ওঃ যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তাতে ভাবলাম অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।

—দুঃখিত, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে আলো নিভতে দেখলাম। ভাবলাম তুমি হতে পারো। কিন্তু যদি তুমি না হও? ভেবে, তোমায় ডাকতে ভয় পেলাম, তাই দরজার আড়াল থেকে শুনছিলাম। তারপর তুমি যেরকম চিৎকার করে উঠলে!

আস্তে বলি—বিছানায় যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

সর্বাঙ্গে গভীর আশ্লেষী আমন্ত্রণ জানিয়ে মর্গট বলেন—ঠাণ্ডা লাগবেনা। আমি বিছানায় তো যাবো, তুমি?

দাঁড়াও আগে স্নান সারি, তারপর আসছি তোমার কাছে।

জামা কাপড়মুক্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকি। দরজা ভেজিয়ে সাওয়ার খুলে দিই। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। দশ সেকেন্ড ঐভাবে থাকার পর খুব সন্তর্পণে এক ইঞ্চি দরজা ফাঁক করে বেডরুমের উদ্দেশ্যে চোখ রাখি।

আশ্চর্য। বিছানায় মর্গট নেই। যে চেয়ারে জামাকাপড় রেখেছি তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে ম্যাচ-ফোল্ডার বের করে নিলেন। মুখে ভীতি ও মুক্তির মিশ্রণ দেখে ভারী বিশ্রী লাগে।

সাওয়ার বন্ধ করে বেডরুমে ঢুকি। ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মর্গট। চোখ বিস্ফারিত। বুকে আটকে আছে দমকা বাতাস।

বিছানার কাছে গিয়ে মর্গটের মাথায় সুস্পষ্ট ছাপসহ বালিশ মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলি। বিছানার ওপর বালিশ চাপা হলুদ হাতলের (আইস পিক) বরফ খোঁচানো ছুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

মর্গটি পাথরের মত নিশ্চল, হাতে ফোল্ডার, চোখে শঙ্কা।

—এ দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে ভেবেছো মর্গটি? সত্যি কি ভেবেছো তুমি তৃতীয়বারও সফল হবে? আমার প্রশ্নাঘাতে থর্‌থর্ কাঁপে ঠোঁট। কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। ছুরিটা হাতে নিই। সূচের মত ভীষণ আর ব্লেডের মতো ধারালো। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমেল প্রবাহ বয়ে যায়। টের পাই মৃত্যুর কত কাছ থেকে বেঁচে ফিরলাম। চোখে চোখ রেখে বলি—অভিনেত্রী তুমি অদ্বিতীয়া হলেও একজন তৃতীয় শ্রেণীর মিথ্যুক তুমি।

মর্গটি মাথা নাড়েন। বলতে থাকেন—তুমি বুঝবে না। ও আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল। আমার কাছ থেকে ম্যাচ-ফোল্ডার চুরি করেছিল আর তার ফেরতের বিনিময়ে আমায় চেয়েছিল। দেহদানে জোর করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তাকে আমি খুন করি।

—মর্গটি এ গল্পটা আগের চেয়ে ভাল। সিপ্পি মোটেই ব্ল্যাক মেইল করেন নি। তার অনেক ত্রুটি হলেও তিনি নীচ নন এত। ব্যাপারটা আরো জটিল। অনুমান করতে পারি কি ঘটেছিল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা নাড়েন মর্গটি, চোখের জলে ভাসে...হ্যাঁ ড্যাড কোন উপায় ছিল না।

ক্রিডির চোয়াল শক্ত হয়—উপায় ছিল না মানে?

—কর্ডেজ সম্বন্ধে ও পুলিশকে সব বলতে যাচ্ছিল। তা আমি করতে দিইনি।

—কেন? তুমি কি বলতে চাও, তুমি মাদকাসক্ত—তাই কি?

—মনে হয়।

হঠাৎ সেখানে ক্রিডির আবির্ভাব হয়। কপাল থেকে চশমা খুলে তিনি মুছে দেখেন।

শোনো মর্গটি, ক্রিডি বলতে থাকেন—তোমায় এখনি সেন্ট রাফাইল ছাড়তে হবে। মানিব্যাগ খুলে পেটমোটা টাকার বান্ডিল মেয়ের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—রাখো, চলে যাও। ব্রান্ডনের গাড়ি নিয়ে যাও। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসির কাছে চলে যাও। বুঝলে?

দৌড়ে বাংলো বাইরে আসি। পামগাছের ছায়ায় রাখা ক্রিডির কালো ক্যাডিলাকে উঠে ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ঘুরিয়ে ধাওয়া করি আমার গাড়ির পেছনে।

বিপজ্জনক দ্রুততায় গাড়ি চালাচ্ছেন মর্গটি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক পুলিশ। অবিশ্বাস্য ঝড়ের গতিতে মর্গটের গাড়ি ছুটে যায়। পুলিশ তো থ। বাঁশি বাজাতেও ভুলে যায়।

মাউন্টেন রোডে পড়েছি আমরা। আচমকা বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা এক মাতাল গাড়ি মর্গটের গাড়িকে পাশ দিয়ে ধাক্কা মেরে আমার দিকে ছুটে আসে। ব্রেক না চেপে স্টিয়ারিং ঘোরাই। এক চুলের জন্য বেঁচে যাই।

গাড়িশুদ্ধ মর্গটি ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে থাকে। টায়ারে ঘষা লেগে বুইকের পেছনে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রাস্তার বাঁকে গাড়ি থামে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। পুলিশের যে খুনে গাড়ি আমাকে ধাক্কা দেবার জন্য পথে নেমেছিল এবং শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটলো, ঘটনাচক্রে সেই গাড়ির স্টিয়ারিং ছিল মর্গটের হাতে। গাঢ় অন্ধকারে গাড়ির চালককে ওদের পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব হয়নি। জানি এই স্বেচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার পেছনে মাপকাঠি নেড়েছেন ক্রিডি। তিনি জানতেন আমার গাড়ি দেখা মাত্র পুলিশের গাড়ি ধাক্কা দিয়ে তা পিষে ফেলবে। তাই মর্গটিকে সেই গাড়ি নিয়ে মাউন্টেন রোড ধরে যেতে নির্দেশ দেন। আর এভাবেই তিনি নিঃশব্দে, রাতের আঁধারে সাক্ষ্যহীন, প্রচারহীন পোষা পুলিশী গুণ্ডা দিয়ে নিজে নষ্ট, অপদার্থ-মাদকাসক্ত ও খুনী মেয়েকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন। ক্যাডিলাক থামিয়ে নামলাম। আর করার কিছু নেই। পুলিশের গাড়ির একটানা সাইরেন বাজছে কাছে। আমরা ফিরতে থাকি।

কেড

।। এক ।।

অ্যারোপ্লেনটা ইস্টনভিল পাক দিয়ে ঘুরতেই কেড দেখতে পেল শহরের উত্তর দিকটা যেন শ্মশানের ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। কেড জানত এখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, কিন্তু এতটা ভাবেনি। সারা প্লেনে একটা ভয় তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। এখন তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আর একটু মদ তাকে খেতেই হবে।

মাথার ওপর আলোর সঙ্কেত যাত্রীদের বলে দিচ্ছে সীটবেল্ট পরে নিতে। সিগারেট খাওয়া এখন চলবে না। নাঃ, এয়ারহোস্টেস ওকে এখন আর মদ দেবে না। ইতিমধ্যে কেড আটটা ডাবল হুইস্কি শেষ করেছে। এয়ারহোস্টেসটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল শেষের দিকে। হৃৎপিণ্ড যতই লাফাতে থাক কেড বুঝল প্লেন না থামা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

প্লেনে সে ছাড়া আর মোটে দুজন যাত্রী আছে। ইস্টনভিলের পরিস্থিতি এখন যেরকম, একান্ত বাধ্য না হলে কেউ এখানে আসে না।

কেডের সঙ্গে নিউইয়র্কে যে জনাবিশেক যাত্রী উঠেছিল তারা সব অ্যাটলান্টায় নেমে গেল। এরা দুজন উঠল। লম্বা, পেশীবহুল দেহ লোকদুটোর মুখ টকটকে লাল। মাথায় পানামা টুপি, ধুলিধূসরিত স্যুট। কেডের একসারি সীট পেছনে ওরা বসেছিল। কেড যখন একের পর এক মদের গ্লাস গিলছিল, ওরা নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরে কি যেন বলছিল। নামবার আগে প্লেনটা যখন পাক খাচ্ছে ওদের একজন বলে উঠল, দেখ জ্যাক, কি ধোঁয়া দেখেছ? মজা জমে উঠেছে।

বেজন্মা নিগারগুলো! অন্য লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল পুড়ে মরুক ব্যাটারা।

কেড শিউরে উঠল। পাশের সীটে রাখা পুরনো প্যানঅ্যাম ওভারনাইট ব্যাগটার দিকে ও চোরা চাহনিতে চাইল। ওতে ক্যামেরা আর আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম আছে। ক্যামেরা না আনাই ঠিক ছিল। ইস্টনভিল এখন আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে, বিস্ফোরণ ঘটবে যখন তখন। এরকম অবস্থায় কেউ ছবি তুলতে আসছে ব্যাপারটা জানাজানি হলে মারাত্মক হবে।

জ্যাক নামে লোকটা বলল, মিলিটারি এসেছে মনে হচ্ছে।

আর না না, এর সঙ্গী বলল!

ফ্রেডকে চিনি না আমি? নেহাত বাধ্য না হলে ও ওই স্কুলের ছোকরাগুলোকে আমাদের মজা নষ্ট করতে দেবে না।

হয়তো কোন নিগার ভয়ের চোটে খবর পাঠিয়েছে।

না না। ফ্রেড বলেছিল ও প্রতিটি টেলিফোনের কল চেক করবে। নিশ্চয় করছে। বুঝবে ব্রিক! আমরা নিগারগুলোকে উচিতমত শিক্ষা দেব। এবার কাউকে আর বাইরে থেকে এসে বাধা দিতে দিচ্ছি না।

কেড রুমাল বার করে মুখ মুছল। ম্যাথিসন যখন ওকে ডেকে পাঠাল, তখনি ও বুঝেছিল এবার ও ফাঁদে পড়েছে। ম্যাথিসনের ছোট অগোছালো অফিসে ঢুকতেই ও টের পেয়েছিল ম্যাথিসন ওকে এবার মরণ ছোবল দেবে। কেড দোষ দিচ্ছে না তাকে। হেনরি ম্যাথিসনের মত ভাল বার্তা সম্পাদক আর হয় না। দুঃস্বপ্নভরা তিন তিনটে সপ্তাহ সে কেডকে পরপর সুযোগ দিয়েছে।

এড বার্ডিক ম্যাথিসনকে বলেছে সুযোগ দিলে কেড প্রমাণ করে দেবে যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ফটোগ্রাফার। কেড সে সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু কি লাভ হল?

লজ্জায় ঘামতে ঘামতে কেড তার কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো দিয়ে তাব প্যানঅ্যাম ব্যাগটা আঁকড়ে ধরল।

ম্যাথিসন লোকটা কড়া। পাঁচমাস ধরে কেড প্রমাণ করছিল যে বার্ডিক ওর সম্বন্ধে ঠিকই

বলেছে। কেড যখন ডেস্কের ওপর ফটোগুলো নামিয়ে রাখত, ম্যাথিসনের চোখে সে খুশীর ছোঁয়া দেখেছে। পাঁচমাস ধরে সব ঠিকই চলছিল, কিন্তু কেড আবার মদ খাওয়া শুরু করল। কারণ ছিল, খুবই সংগত কারণ। কিন্তু ম্যাথিসনকে জুয়ানার কথা বলে কোন লাভ হত না। মেয়েরা তুচ্ছ ম্যাথিসনের কাছে।

তারপর তিন হপ্তায় চারটে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেড নষ্ট করে ফেলে। তাই ম্যাথিসন যখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কেড ভেবেছিল এবার ও ওকে সিধে দরজা দেখিয়ে দেবে। তখন কেডের খুবই দুরবস্থা। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না। রোজ এক পাঁইট হুইস্কি খেতে হয়। আরো খেতে পারে ও, তবে প্রাণে টিকতে হবে তো। হাতের টাকা ফুরিয়েছে। গাড়ির বাকি টাকা দেওয়ার জন্য চাপ আসছে সমানে। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। কেডের কাছে দামী জিনিষ বলতে তখন ওই ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতিগুলো। ওগুলো হাতছাড়া করলে কেড মরে যাবে।

বস, ভ্যাল। ম্যাথিসন বলল। লোকটা ছোটখাট, কেডের থেকে দশবছরের বড়, সাতচল্লিশ বছর ওর।

তেমন সুবিধে করতে পারছ না, তাই না?

কেডের হাত কাঁপছে। চেয়ারটায় ভর করে ও দাঁড়িয়েছে। নেশা কেটে গিয়েছে তখন। মুখ গরম হয়ে উঠেছে। মাথা দপদপ করছে, পেটে একটা ব্যথা অনুভব করছে সে।

লেকচার রাখ, কেড বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমি...

বাজে বোক না। চুপ করে থাক, ম্যাথিসন গলার স্বর নামিয়ে বলল। তারপর ডেস্কের দেরাজ থেকে একটা স্কচের বোতল আর দুটো গ্লাস বার করে কেডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঢাল।

কেড নিজের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করে সতৃষ্ণভাবে গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ে মদটা শেষ করল।

একটা কাজের কথা আছে, ভ্যাল। একমাত্র তুমিই পারবে। ম্যাথিসন সহানুভূতির দৃষ্টিতে কেডের দিকে তাকাল। তারপর বোতলটা ঠেলে দিয়ে বলল, নাও, চালাও। মনে হচ্ছে তোমার আরো দরকার।

কেড ভান করল মদটা তুচ্ছ। তারপর বলল, কি কাজ?

এস্ সিন্ডিকেট একটা দারুণ কাজের খবর এনেছে। ওরা চায় তুমিই ছবিগুলো তোল।

সিন্ডিকেটের কাজ মানেই মোটা টাকা। একাজে ফটোগ্রাফার ছবি তোলে, সিন্ডিকেট সারা বিশ্বে সে ছবি ছাপায়, আধাআধি বখরা হয়।

বিষয়টা কি? কেড ভাবছে যদি কিছুদিন মদ বন্ধ করে সে এ কাজটা শেষ করতে পারে, তাহলে তার অর্থকষ্ট খানিকটা কমবে। এদিকে ম্যাথিসনের দিকে না তাকিয়ে সে গ্লাস ভরে নিয়েছে। ম্যাথিসন সেদিকে লক্ষ্য না করে বলল, আজ রাতে ইস্টনভিলে একটা সিভিল রাইট অভিযান শুরু হচ্ছে। কাল দুপুরের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। সিন্ডিকেট চায় তুমি কাল সকাল নটার প্লেনে ওখানে যাও।

কেড আস্তে আস্তে বোতল বন্ধ করল। তার মেরুদণ্ড শিরশির করছে।

আজ রাত্রে গেলেও তো হয়, সে প্রায় হতাশ স্বরে বলল।

না অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার নেই। তুমি ঝট্ করে যাবে আর ঝটপট কাজটা শেষ করে চলে আসবে।

যদি বেরিয়ে না আসতে পারি? কম্পিত স্বরে কেড বলল।

ম্যাথিসন গ্লাসে চুমুক দিয়ে চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ দুজনে নীরব থাকল। কেড শেষে মরিয়া হয়ে বলল, সেবার নিউইয়র্কে ঠিক এইরকম ব্যাপারের ছবি তুলতে গিয়ে তিনজন ফটোগ্রাফারকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, পাঁচটা ক্যামেরা ভাঙ্গে। কেউ ছবি তুলতে পারেনি।

সেইজন্যেই এস্ এই ছবিগুলো চায়।

কেড ম্যাথিসনের দিকে তাকিয়ে বলল তুমিও তাই চাও?

হ্যাঁ, চাই। এস্-এর বক্তব্য হল ছবিগুলো ভাল হলে 'লাইফ'-এর সঙ্গে কথাবার্তায় আসা যাবে। একটু থেমে ম্যাথিসন বলল, জি. এমের এজেন্ট ফোন করেছিল। জানতে চাইছিল আমরা তোমার

গাড়ির টাকা মিটিয়ে দেব কিনা। আমার বলতে হল কনট্রাক্টে তোমার গাড়ির টাকা দেবার কোন কথা নেই। আবার একটু থেমে ম্যাথিসন বলল তুমি ভাবনা চিন্তা করে বল। অ্যালিস তোমার টিকিট জোগাড় করে দেবে। খরচ খরচার জন্য একশো ডলার তোমাকে দিচ্ছি। তুমি চাইলে আরো দেব। কি করবে এখন বল।

মানে কাজটা ঝামেলার, বলতে গিয়ে কেডের মনে হল ভয় যেন তাকে খামচে ধরেছে। আর কে যাচ্ছে?

কেউ না। আর কেউ জানেই না। যদি কাজটা হাসিল করতে পার, তোমার কপাল ফিরে যাবে।

রুমাল দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে কেড বলল, আর যদি না পারি? আমার কপালে কি থাকবে?

ম্যাথিসন ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর একটা নীল পেনসিল তুলে নিয়ে ডেস্কের উপর একটা বিজ্ঞাপনের কপি দাগ দিতে লাগল। এটা ম্যাথিসনের পরিচিত ইঙ্গিত যে কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত কেড চুপ করে রইল। একেই বলে মরণ ছোবল। কিন্তু তার আত্মসম্মান এখনো শেষ হয়ে যায়নি। হুইস্কির ঘোরে তা আবার জ্বলে উঠল।

ঠিক আছে। টিকিটের বন্দোবস্ত কর। আমি কাল তৈরী থাকব। পা টললেও অন্তত মাথা উঁচু করে ও অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

ইস্টনভিলের এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে যেতে যেতে কেড দেখল দূরে মেঘহীন আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এয়ারপোর্টের আলোটাও কেমন ভুতুড়ে, গা ছম ছম করা।

ওর সঙ্গে যে দুজন যাত্রী এসেছে, ওরা সামনে হাঁটছে। ওরা খুব দ্রুত হাঁটছে, ওদের উদ্দেশ্য ওদের জানা। চওড়া হাতগুলো দুলছে উত্তেজনায়।

কেড তাড়াহুড়ো করল না। ভ্যাপসা গরম, তার ওপর ব্যাগটাও ভারী। এয়ারপোর্টের বাইরে পা রাখতে তার ভয় হচ্ছিল। এখন ও হোটেলে যাবে, শহরের অবস্থাটা কি বুঝতে হবে। তাছাড়া ওর এখন একটু মদ চাই।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের নিস্তেজ লবিতে মিটমিটে আলো জ্বলছে। লবিটা জনশূন্য। শুধু লবির মুখে প্লেনের ওই যাত্রীদুজন কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। লোকটা লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ, পরনে খাটো হাতা গলা-খোলা স্পোর্টস শার্ট আর রং-জ্বলা খাকি প্যান্ট।

কেড বাঁদিকের বারের দিকে সরে গেল। বারও খালি। কেবল টেকো, মাঝবয়সী বারম্যান খবরের কাগজ পড়ছিল।

উত্তেজনা যথাসম্ভব চেপে কেড নির্জলা স্কচ চাইল। বারম্যান একবার ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে তারপর হোয়াইট হর্স লেবেল আটা বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা কেডের দিকে ঠেলে দিল।

কেড ওভারনাইট ব্যাগটা মেঝেতে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। ওর হাতটা কাঁপছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে মদটা তুলল না। এইটুকু আত্মসংযম দেখাতে গিয়ে ওর শরীরে খুব কষ্ট হতে লাগল। দরদর করে ঘামছিল ও। তবু জোর করে নিজেকে সংযত করে ধীরেসুস্থে সিগারেটে টান দিল কেড। তারপর যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে মদের গ্লাসে চুমুক দিল।

এই আসছেন? বারম্যান শুধোল।

কেড ভেতরে কুঁকড়ে গেল যেন। মদটা শেষ করে বলল, হ্যাঁ।

বারম্যান বলল, আপনাকে দেখে অবাক হয়েছি যাদের বুদ্ধি আছে তারা এই শহরে আসার আগে দুবার ভাববে। বাইরের লোক এই শহরে এখন আসুক কেউ চায় না।

কেডের আরেকটু মদ দরকার। কিন্তু বারম্যানটাকে সামলাতে হবে। অত্যন্ত অনিচ্ছায় ও বারের কাউন্টারে পয়সা রেখে ব্যাগটা তুলে বেরোবার জন্য দরজার দিকে হাঁটতে লাগল।

দরজায় সেই স্পোর্টস শার্ট পরা লোকটা যেন ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কেডের বুক ধড়ফড় করে উঠল।

লোকটা কেডের বয়সীই হবে। মুখটা কঠিন লাল মাংসল। শার্টের বুকপকেটে একটা পাঁচফলা রুপোর তারা।

কেড দরজার কাছে পৌঁছতে লোকটা একটুও পথ দিল না। কেডের মুখের ভেতর শুকিয়ে গেছে।

লোকটা এবার নীচু গলায়, বলল আমি ডেপুটি শেরিফ জো স্লাইডার। তোমার নাম কেড?'

হ্যাঁ। কেড সভয়ে বলে উঠল।

শোন তোমার শ্রেণীর লোকেরা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে ডেপুটি বলে। আমি তাই চাই।

কেড নিশ্চুপ থাকল। অথচ একবছর আগে হলে ও অনায়াসে এরকম একটা পরিস্থিতি সামলাতে পারত। কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে নিজে, কেড অনুভব করল। এত ভয় পেয়েছে যে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আত্মগ্লানিতে কেড জর্জরিত হতে লাগল।

ভ্যাল কেড। নিউইয়র্ক সানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফটোগ্রাফার ঠিক বলেছি? স্লাইডার ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের সাথে বলল।

ঠিকই আমারই নাম ভ্যাল কেড, ডেপুটি।

ইস্টনভিলে দরকারটা কি তোমার, কর্কশ স্বরে স্লাইডার বলল।

কেড নিজেকে গালাগালি দিল। কি করবে তোমার ও' কেড, নিজেই নিজেকে মনে মনে বলল। ও শুধু তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। বল বল...

কিন্তু আসলে যা বলল তাতে নিজেই ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আমায় আসতে বলা হয়েছে, তাই এখানে এসেছি, ডেপুটি। আপনি ভাববেন না। আমি কোন ঝামেলাতে যেতে চাই না...

স্লাইডার ঘাড়টা একদিকে ঝাঁকাল। বটে, আমি কিন্তু শুনেছি "দি সান" ঝামেলা পাকাতে চায়।

—হয়তো চায়। কিন্তু আমি ওসবের মধ্যে নেই।

স্লাইডার ওর দিকে চেয়ে রইল। একটা কথা কেড, ওরা তোমার মতন মেরুদণ্ডহীন একটা মাতালকে এখানে পাঠিয়েছে কেন, বলতে পার? বল তো, আমি জানতে চাই।

কেডের মনে হল ওর এখনি আরেকটা হুইস্কি দরকার। এখনই।

বল কেড... স্লাইডার একটু ঝুঁকে কেডের বুকে মৃদু ধাক্কা মারল। কেড ছিটকে দুপা পিছিয়ে গেল। তারপর শুকনো ঠোঁট দুটো একটু মুছে বলল, আমি কোন ছবি তুলব না, ডেপুটি। আপনি দেখবেন।

স্লাইডার ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি কি ভাবছি তা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি কোথায় উঠছ?

হোটেল সেনট্রাল মোটর।

যাচ্ছ কখন?

পরের প্লেনে...কাল সকাল এগারটায়।

স্লাইডার বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, তাহলে আমরা দেরী করছি কেন? চল কেড, তোমার থাকার বন্দোবস্ত দেখি।

লবিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ স্লাইডার জিজ্ঞেস করল ব্যাগে কি আছে কেড?

আমার জিনিষ।

ক্যামেরা আছে কি?

কেড থমকে দাঁড়াল। স্লাইডারের দিকে চাইল, ওর চোখের দৃষ্টি কেমন উন্মত্তর মতন। তা দেখে স্লাইডার এত চমকে গেল যে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

আমার ক্যামেরায় হাত দিয়ে দেখ। দেখ একবার? হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের মতন কেড বলে উঠল।

তোমার ক্যামেরায় কে হাত দিচ্ছে? স্লাইডারের হাতটা ততক্ষণ বন্দুকের বাঁটের উপর চলে গেছে। আমি বলিনি। চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

'ক্যামেরা ছুঁয়ো না...ব্যস্।' কেড এবার একটু সংযত স্বরে বলল।

—চল, দেরী করছি কেন আমরা।

কেড এলোমেলো পায়ে গেটের দিকে চলতে লাগল। বমি পাচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের মধ্যে ও দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। ভাবলেই ভয় করে।

বাইরেটা ভ্যাপসা গরম, বাতাসে ধোঁয়া। বাইরে ছায়ায় একটা ধুলোমাখা শেভ্রলে দাঁড়িয়ে ছিল। স্লাইডার ইশারা করে গাড়িতে উঠতে বলল। গাড়ির ড্রাইভার ঠিক স্লাইডারের মতন পোশাকপরা। শার্টের পকেটে স্লাইডারের মত রুপোর তারা লাগানো খুব ছটফটে আর সতর্ক। সরু মতন মুখটা রোদে পোড়া, ছোট ছোট চোখদুটো ভিজে পাথরের নুড়ির মত ভাবলেশহীন।

রন, এই হচ্ছে কেড। এক সময়কার নামকরা ফটোগ্রাফার, হয়তো তুমি ওর নাম শুনে থাকবে। ও কোন ঝামেলা চাইছে না। ওকে হোটেলে নিয়ে যাও। কাল সকাল এগারটার প্লেনে ও ফেরত যাবে। যতক্ষণ না রওনা হয়, ওর সাথে সাথে থেক।

কেডকে স্লাইডার বলল, এ হচ্ছে রন মিচেল। নিগ্রোপ্রেমিকদের ও ঘৃণা করে, ঝামেলাবাজদের ঘৃণা করে, আর সবচেয়ে ঘেন্না করে মাতালদের। স্লাইডার একটু হেসে বলল ওকে চটিও না। চটালে ও রেগে যায়।

মিচেল সামনে ঝুঁকে খোলা জানলা দিয়ে কেডকে একবার ভাবলেশহীন চোখে দেখল। তারপর স্লাইডারের দিকে চেয়ে চোখ গরম করে বলল, তুমি যদি ভেবে থাক আমি সকাল থেকে এই বদমাতালটাকে পাহারা দেব, তোমার মাথা পরীক্ষা করাও।

স্লাইডার হাত নেড়ে বলল আরে না, না, ওকে পাহারা দিতে হবে না। চাও তো ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখ। মোটামুটি আমি ঝামেলা চাই না।

গজর গজর করতে করতে মিচেল শেভ্রলের দরজাটা খুলে কেডকে বলল, উঠে পড়। আর ঝামেলা করলে দেখিয়ে দেব।

কেড গাড়িতে উঠে হাঁটুর ওপর ব্যাগটা রাখল। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাইওয়ের দিকে গাড়ি ছুটে চলল। হাইওয়েতে যখন পৌঁছল তখন গাড়ির স্পীড ঘণ্টায় সত্তর মাইল।

কেড জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিল। পথে কোন গাড়ি নেই। এ যাবৎ শুধু একটা পুলিশের গাড়ি চোখে পড়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে মিচেল নীচুস্বরে কেডকে গালি দিচ্ছিল।

শহরের বাইরে পৌঁছে মিচেল গাড়ির স্পিড কমাল। ওদের গাড়ি এখন মেন স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুধারে দোকান-পাট সব বন্ধ। ফুটপাত দিয়ে কেউ হাঁটছে না। একটা বড় মোড়ে পৌঁছতেই কেড দেখল পথের ধারে একদল জোয়ান ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা মুগুর দোলাচ্ছে আর ওদের কোমরে বন্দুক।

একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে মিচেল হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল।

সেন্ট্রাল মোটর হোটেল একটা আধুনিক ধরনের দশতলা বাড়ি। সামনে লন তাতে একটা ফোয়ারা। প্রতিটা ঘরের সামনে বারান্দা। একদম রাস্তার ওপরে।

ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের দরজার দিকে এগোল। দারোয়ান মিচেলকে দেখে ঘাড় নাড়াল। আর কেডের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। সুইংডোর ঠেলে ওরা হোটেলের রিসেপশনের দিকে এগোল।

রিসেপশনের কেরানীটি কেডের হাতে একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড আর কলম দিল। কেডের হাত এত কাঁপছে যে সে অতিকষ্টে প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখল।

কেরানীটি বলল, '৪৫৮ নম্বর ঘর' বলে চাবি দিল। কেরানীটিকে খুব বিব্রত দেখাল যেন কোন ভিখারীর সাথে তাকে কথা বলতে হচ্ছে।

মিচেলই চাবিটা নিল। তারপর হোটেলের ছোকরা বেয়ারাটাকে আসতে মানা করে স্বয়ংক্রিয় লিফ্টের দিকে এগোল।

চারতলার লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে ওরা দুজন ৪৫৮ নম্বর ঘরে এসে পৌঁছল। মিচেল দরজা খুলল। ঘরটা বেশ বড় আর সুসজ্জিত। দরজা খুলে মিচেল ঝুলবারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে দেখল। বুঝল ওদিক দিয়ে কেড পালাতে পারবে না। তারপর খুশী হয়ে ও ঘরে ফিরে

এল।

কেড ব্যাগটা বিছানার উপর রাখল। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ওর। পা-টাও ব্যথা করছে। কিন্তু মিচেল না যাওয়া পর্যন্ত ও বসতেও পারছে না।

'ওকে' মিচেল বলল। যাওয়ার সময় পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। আমি কাছাকাছিই থাকব। কিছু চাই তোমার?

কেড সামান্য ইতস্ততঃ করল। গত সন্ধ্যা থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু তার ক্ষিধেও তেমন পাচ্ছিল না। কেড খায় খুব কম। সে মিচেলের দিকে না চেয়ে বলল, 'এক বোতল স্কচ আর বরফ।

—দাম দিতে পারবে?

—হ্যাঁ।

দরজা টেনে দিয়ে মিচেল চলে গেল। কেড বুঝতে পারল দরজার চাবি ঘোরাচ্ছে মিচেল। জ্যাকেটটা খুলে ও বড় ইজিচেয়ারে বসল। ওর হাত দুটো এখনও কাঁপছে।

প্রায় দশ মিনিট বাদে একজন ওয়েটার একটা স্কচের বোতল একটা গ্লাস আর বরফ দিয়ে গেল। কেড ওয়েটারের দিকে চাইল না, টিপসও দিল না। মিচেল ওয়েটারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল এবার বেরিয়ে দরজায় ফের তালা লাগাল।

কেড কান পেতে শুনল ওরা চলে গেছে কিনা। তারপর গ্লাসে একটা বড় পেগ ঢালল। একটু চুমুক দিয়েই ও টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলল।

একটা মেয়ে উত্তর দিল। কেড নিউইয়র্ক সানের কানেকশানে চাইল। এক মিনিট মেয়েটি বলল।

কেড শুনতে লাগল। মেয়েটি কথা বলছে কিন্তু কি বলছে শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট বাদে মেয়েটি কাটাকাটা গলায় বলল, আজ নিউইয়র্কের কোন কল নেওয়া হচ্ছে না।

কেড রিসিভার নামিয়ে রাখল। কার্পেটের দিকে খানিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তারপর ওদিকে গিয়ে মদের গ্লাস তুলে নিল।

মিস্টার কেড। উঠুন। মিস্টার কেড!

কেডের মনে হল স্বপ্নের মধ্যে ওকে কে ডাকছে। সে প্রায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চোখ মেলল। বারান্দার দিকের খোলা জানালা দিয়ে কড়া রোদ আসছে, তার চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে।

মিস্টার কেড, প্লিজ...আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।

কেড কোনমতে বিছানা ছেড়ে মাটিতে নামল। ঘরটা এখনও আবছা ক্রমে স্পষ্ট হল। যেই বুঝল একটা লোক ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল।

মিস্টার কেড, প্লিজ।

কেড এবার চোখ খুলে দেখল একজন নিগ্রো ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর।

মিস্টার কেড। আধঘণ্টার মধ্যে মার্চ শুরু হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো? নিগ্রোটি জিজ্ঞেস করল। কেড ভালভাবে তাকাল। লম্বা, রোগা তরুণ এক যুবক। পরনে গলা খোলা সাদা শার্ট, ইস্ত্রি করা কালো প্যান্ট।

এখানে তুমি কি করছ। কেড চাপা কর্কশ স্বরে বলল, কেমন করে ভেতরে এলে?

সরি, মিঃ কেড। আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি। আমি সানি স্মল। আমি সিভিল রাইটস কমিটির সেক্রেটারী।

কেড ওর দিকে তাকিয়েই থাকল। তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

আমার গার্লফ্রেন্ড এই হোটেলে কাজ করে। ওই বলল আপনি আপনার কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা দেয়নি। আর আপনাকে বন্ধ করে রেখেছে। শোনামাত্রই আমি এখানে চলে এসেছি। ওই আমাকে চাবি দিল। আমরা চাকর সুইপার আসবার লিফটে যেতে পারি। ওদিকে কেউ নজর দেয় না।

সাংঘাতিক এক আশঙ্কায় কেডের মন অন্ধকার হয়ে গেল। তার মাথায় কিছুই খেলছিল না। সে একদৃষ্টিতে স্মলের দিকে চেয়ে রইল।

বেশী সময় নেই, মিঃ কেড। নিন আপনার ক্যামেরা আমি ঠিক করেই রেখেছি। ও ক্যামেরাটা কেডের হাতে দিল। কেডের হাত কাঁপতেই লাগল। কিন্তু ক্যামেরার ধাতব স্পর্শটা হাতে লাগতেই ওর স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। কেড কর্কশ গলায় বলল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওর চোখ জ্বলতে লাগল। আমাকে একা ছেড়ে দাও। বেরোও।

মিঃ কেড। আপনার কি শরীর ভাল নেই', স্মল হতচকিত ভাবে বলল।

বেরোও। কেডের গলা চড়তে লাগল।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি তো আমাদের সাহায্য করতেই এসেছেন। আসেননি? আজই আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি যে আপনি আসছেন। কি হয়েছে মিঃ কেড? আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি যে। মার্চ তিনটের সময় শুরু হবে।

বেরোও। কেড উঠে দাঁড়াল। ডানহাতে মিনোল্‌টাটা আঁকড়ে ধরে ও বাঁ হাত দিয়ে দরজা দেখাল।

বেরোও, কখন মার্চ শুরু হবে তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বেরোও।

স্মল যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এ নিশ্চয় আপনার মনের কথা নয় মিঃ কেড, আস্তে কোমল গলায় স্মল বলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেডের ভেতর অবধি শিউরে উঠল। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন মিঃ কেড। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফটোগ্রাফার। আমি, আমার বন্ধুরা অনেক বছর ধরে আপনার তোলা ছবি দেখে আসছি। আপনার ছবি আমরা জমাই, মিঃ কেড। সেই রাশিয়ানরা যখন যায় তখনকার হাঙ্গেরীর সেইসব অপূর্ব ছবি, ভারতে দুর্ভিক্ষের ছবি, হংকঙে দুর্ভিক্ষের ছবি, মানুষের দুঃখ কষ্টের অনবদ্য সেইসব দলিল। আপনার মতন অদ্ভুত প্রতিভা আর মানুষের প্রতি দরদী অনুভূতি আর কজনের আছে, মিঃ কেড।

আমরা তিনটের সময় মার্চ শুরু করছি। পাঁচশোর বেশি লোক মুগুর, বন্দুক আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পরার জন্য। তা সত্ত্বেও আমরা মার্চ করছি। আজ রাতের মধ্যে আমাদের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরবে, কতজন যে হাসপাতালে যাবে। তা সত্ত্বেও আমরা মার্চ করতে চাই কারণ এই শহরে আমরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই মার্চে যেতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু যেই শুনল আপনি আমাদের মার্চের ছবি তুলবেন, তাদের ভয় কমে গেল। অদ্ভুত এক উদ্দীপনা দেখা দিল। আমরা জেনে গেছি আজ আমাদের কপালে যাই ঘটুক সারা পৃথিবীতে তার প্রমাণ থেকে যাবে। সারা পৃথিবী বুঝবে আমরা কি চাই। আমাদের একমাত্র আশা পৃথিবীর মানুষকে বোঝানো আমরা কি চাই, আমাদের নৈতিক দাবি তাদের কাছে জানানো। আপনি আমাদের হয়ে এই বার্তা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

স্মল একটু থামল, আপনি ভয় পেয়েছেন নিশ্চয়? আমরা সবাই ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমি ভাবতেও পারছি না আপনার মতন সৎ, গুণী মানুষ আমাদের মিছিলে আজকে থাকবেন না।

কেড পা টেনে টেনে রাইটিং ডেস্কের দিকে গেল। ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে সে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

ভুল লোককে ওরা হিরো বানিয়েছিল এখন বেরোও নিগার বেরিয়ে যাও,' স্মলের দিকে পেছন ফিরে কেড বলল।

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। আবেগঘন, টানটান অনুভূতিতে মন্থর এক দীর্ঘ নীরবতা। তারপর স্মল বলল, আমার দুঃখ হচ্ছে মিঃ কেড আমাদের জন্য নয়, আপনার জন্য।

আস্তে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, চাবি বন্ধ হল। কেড কিছুক্ষণ হাতের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ঘৃণায় যেন শিউরে উঠল। সামনের দেয়ালে গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল। দেয়াল থেকে ছিটকে আসা হুইস্কিতে তার শার্ট ভিজে গেল। কিছুক্ষণ ও কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল, মন থেকে সমস্ত চিন্তা প্রাণপণে সরিয়ে দিতে চাইল। হঠাৎ বন্ধ জানালার ওপার থেকে এক তীব্র

বুক কাঁপানো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে ভেসে এল। কেড উঠে দাঁড়াল। তার বুক ধকধক করতে লাগল। আবার সেই আর্তনাদ ভেসে আসল।

কাঁপতে কাঁপতে কেড দরজা খুলে ঝুলবারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরে ছিল শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত শীতলতা। এখন রাস্তা থেকে ঝাপসা শ্বাসরোধকারী গরম উঠে এসে যেন তাকে ধাক্কা দিল। কেড বারান্দার রেলিং আঁকড়ে ধরে সামনে ঝুঁকে রাস্তার দিকে চাইল।

সানি স্মল ঠিক রাস্তার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটো উত্তেজনায় টানটান, মুঠো পাকানো। দুপুরের কড়া রোদে ওর আবলুশ কালো শরীরের ওপরে শার্টটা অসম্ভব সাদা দেখাচ্ছে। প্রথমে ডান দিকে চাইল ও, তারপর বাঁ দিকে। কার দিকে হাত নাড়িয়ে স্মল তীক্ষ্ণ, তীব্র গলায় বলল, এস না, টেসা। আমার কাছে এস না। ওর গলার স্বর কেডের কানে বাজল।

কেড রাস্তার ডানদিকে চাইল। তিনজন শ্বেতাঙ্গ উন্মত্তের মতন স্মলের দিকে ছুটে আসছে। বিশাল দেহ, বলিষ্ঠ তিন শ্বেতাঙ্গ ওদের হাতে মুগুর। বাঁ দিকে তাকাতেই কেড দেখল ওদিক দিয়ে দুজন শ্বেতাঙ্গ ধীরে ধীরে স্মলের দিকে এগোচ্ছে। ওদের হাতেও মুগুর। আক্রান্ত আর আক্রমণকারীদের এ ছবি চিরকালের, চিরপরিচিত। স্মলের পালানোর কোন উপায়ই নেই।

বোঁ করে ঘুরে কেড প্রায় হাতড়ে হাতড়ে ঘরে চলে এল। ক্যামেরাটা ঝটিতি তুলে নিল। ঝটপট ৫৮ সি. এম. লেন্সটা খুলে ফেলে, ওভারনাইট ব্যাগটা উপুড় করে বিছানায় ঢালল। তারপর ২০ সি. এম. টেলিফোটো লেন্স নিয়ে প্রায় টলতে টলতে ব্যালকনিতে চলে এল। বহু বছর ধরে ক্যামেরা ব্যবহার করছে কেড, ওর এখন প্রতিটি গতিবিধি এমন নিশ্চিত ও দ্রুত যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন। ক্যামেরার লেন্সমাউন্ট খট্ করে বসে গেল। ১/১২৫-য়ে সাটার আর এফ ১৬-য় অ্যাপারচার দিল কেড। ভিউফাইন্ডার দিয়ে দেখে নিল। নিঃসহায় নিরস্ত্র নিগ্রোটি আর তার চারিদিক থেকে ঘিরে আসা আততায়ীদের চেহারা, এক ভয়ংকর হিংস্রতার ছবি

যেন কোন অলৌকিক উপায়ে কেডের হাতের কাঁপুনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ও সাটার টিপতে থাকল।

নিচে, পথে একটা লোক ছুটতে ছুটতে বলল, এই কুত্তীর বাচ্চা নিগারটা সেই স্মল! মার ব্যাটাকে তার গলায় পৈশাচিক উল্লাস যেন।

লোকগুলো যখন স্মলকে ঘিরে ফেলল তখন স্মল কুঁকড়ে গিয়ে হাতদুটো আড়াআড়ি করে মাথা ঢাকল। ওর হাতের উপর একটা মুগুরের বাড়ি পড়ল। স্মল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রোদে আরেকটা মুগুর ঝলসে উঠল। ছবি তুলতে তুলতে কেড স্পষ্ট শুনতে পেল মুগুরের আঘাতে হাড় ফেটে যাওয়ার আওয়াজ।

নিগ্রোটি রাস্তায় পড়ে গেল। পাঁচটা লোক ওকে বিজয় উল্লাসে যেন ঘিরে ফেলল। দশটা ধুলোমাখা, ভারি বুটজুতোর ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল লাল রক্ত গড়িয়ে রাস্তায় যেন নক্সা কাটতে লাগল।

পাঁজরায় মুগুরের আঘাত পরতেই স্মলের শরীরটা ছটফট করে উঠল। একটা লোক আরেকটা লোককে ঠেলে সরিয়ে নিগ্রোটির কাছে গিয়ে ওর গালের হাড়ের ওপর ধাঁই করে বুট দিয়ে লাথি মারল। ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে লোকটার জুতো আর প্যাণ্ট ভিজিয়ে দিল।

চারতলা থেকে ক্যামেরার সাটার নির্ভুল ভাবে তার কাজ করে চলল।

এই সময় হোটেল থেকে একটা পাতলা, ছিপছিপে নিগ্রো মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি লম্বা, ওর কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো, গায়ে একটা সাদা পোষাক, খালি পা। সাংঘাতিক জোরে মেয়েটি ছুটছে।

কেডের ২০ সি. এম. লেন্সে স্পষ্টভাবে মেয়েটি ধরা পড়ল। ওর মুখের আতঙ্ক, বিস্ফোরিত চোখ সংকল্পে কঠিন ওষ্ঠাধর....সব।

মেয়েটি যখন স্মলের কাছে গিয়ে পৌঁছাল তখন একটা লোক স্মলকে আবার মুখে লাথি মারতে যাচ্ছে। মেয়েটি হিংস্র নখ দিয়ে লোকটার মুখ ছিঁড়ে দিল। তারপর ও স্মলকে আড়াল করে লোকগুলির মুখোমুখি দাঁড়াল।

লোকগুলি প্রথমে একটু পিছিয়ে গেল। উত্তেজনাভরা সন্ত্রস্ত এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই যে

লোকটার মুখ নখে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সে একটা পৈশাচিক চীৎকার করে মুগুর ওঠাল। মেয়েটা মাথা বাঁচাতে হাত তুলল। মুগুরটা হাতের ওপর গিয়ে পড়ল। হাতটা অচল হয়ে গিয়ে পাশে ঝুলে পড়ল। কালো মাংসের ভেতর দিয়ে সাদা দাঁতের মতন সাদা হাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এল।

মার মার কালা কুত্তীটাকে। লোকগুলি চেঁচাল। এরপর অনেকগুলি মুগুর উঠে মেয়েটির মাথার ওপর গিয়ে পড়ল। মেয়েটি স্মলের ওপর পড়ে গেল। ওর সাদা পোষাক কোমর অবধি গুটিয়ে গেল। লম্বা, কালো পাতলা পা দুটো ছড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার অন্যপ্রান্ত থেকে এবার পুলিশের গাড়ির তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল শোনা গেল।

পাঁচজন লোক ঝট করে ঘাড় তুলল। দুজন ডেপুটি ওদের দিকে দেখছে। রোদে ঝকঝক করছে বুকের ব্যাজ। মুখের এদিক থেকে ওদিক অবধি হাসি ছড়িয়ে আছে। খুব ধীরে ধীরে ওরা এগোল। যে লোকটার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, সে মুগুরটা ধরে বাটটা দিয়ে মেয়েটির ফাঁক করা দুপায়ের মাঝখানে চালিয়ে দিল। ওর একজন সঙ্গী ওকে ধরে টেনে নিয়ে গেল।

ওদিকে ডেপুটিরা ধীর পায়ে প্রায় থেমে থেমে এগোচ্ছিল। পাঁচজন লোক এবার পেছোতে লাগল। অচৈতন্য রক্তাক্ত নিগ্রো দুটির কাছে ডেপুটিরা যখন পৌঁছল, পাঁচজন লোক তখন হাওয়া।

কেড ব্যালকনি থেকে সরে এল, ক্যামেরা নামাল। ওর কাঁপনি আবার শুরু হয়েছে বটে তবে কেড বুঝল ফ্রিডম মার্চের চেয়ে এ ছবির বক্তব্যে অনেক জোর থাকবে।

এখন তার চাই একটা ড্রিংক।

টলতে টলতে ও ঘরের ভেতর এল, তারপরেই ওর পা দুটো মেঝেতে আটকে গেল। মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা তুষারশীতল স্রোত নামতে লাগল।

খোলা দরজায় মিচেল দাঁড়িয়ে, ওর চোখ দুটো পাথরের মতন। দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর মিচেল ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় চাবি দিল।

ক্যামেরাটা আমায় দে, কুত্তার বাচ্চা। হিংস্র স্বরে মিচেল বলল।

কেড মনে মনে বলল, এও কি সম্ভব? আমি এক বছরে নিজের শরীর মন এত নষ্ট করে ফেলেছি যে এই খেলো গুণ্ডাটাকে দেখে আজ আমি ভয় পাচ্ছি। লোকটার গায়ে খুব জোর। ও ঝট করে আক্রমণ করলে আমি কিছুই করতে পারব না। ও আমায় তুলোধোনা করে ছাড়বে। ক্যামেরাটাও নিয়ে নেবে।

ক্যামেরাটা দে, কি বলছি শুনছিস ?

কেড পিছোতে লাগল। ক্যামেরা থেকে কাঁপা হাত দিয়ে সে ২০ সি. এম. লেন্‌সটা খুলে ফেলল। তারপর বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লেন্‌সটা। তারপর পেছোতে পেছোতে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিচেল আস্তে আস্তে এগোল।

আমি ছবি তুলতে দেখেছি তোমাকে। তোমাকে আমি সাবধান করে দিইনি আগে? দাও, ক্যামেরা দাও।

ক্যামেরা নাও, কেড রুদ্ধশাসে বলল, শুধু আমার গায়ে হাত দিও না। ও গলা থেকে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ খুলল।

মিচেল একটু দাঁড়াল। মুখে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার হাসি।

কেডের ডান হাতে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। গলা দিয়ে ঘরঘর করে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে। ওর মুখে তীব্র আতঙ্ক। কেডকে এখন এমন একটা তুচ্ছ ঘৃণ্য পোকার মতন দেখাচ্ছে, যে মিচেল চালে ভুল করে বসল। সে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ল। আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে ভাবতে লাগল ওর আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ওপর ও কখন ঘুঁষিটা বসাবে।

দাও, ও হাত বাড়াল।

সেই মুহূর্তে কেডের মধ্যে কি যেন একটা ওলোটপালট হয়ে গেল। চিরকাল ও ওর ক্যামেরাটাকে সমস্ত দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে এসেছে। কেউ ওর ক্যামেরায় আঁচড় বসাতে পারেনি। ওর সমস্ত অনুভূতি এক মুহূর্তে প্রখর হয়ে উঠল। অজান্তেই ডানহাতটা শক্ত করে বাগিয়ে ও বিদ্যুৎবেগে হাতটা দোলাল। স্ট্র্যাপে বাঁধা ক্যামেরাটা গুলতির মতন ছুটে গিয়ে মিচেলের

তাচ্ছিল্যমাখা হাসি মুখটার উপর ঠাস করে লাগল। মিচেল মুখ সরাবার একটু সুযোগও পেল না। ভারি ধাতব ক্যামেরার কোনটা ওর কপালের রগে গিয়ে লাগল। চামড়া কেটে গেল। মিচেল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোখ ভাসিয়ে রক্ত পড়ছে। আধো অচৈতন্য হয়ে মিচেল কেডের সামনে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। চোখদুটো রক্তে প্রায় বুজে গেছে।

কেড স্তব্ধভাবে ভয়ার্ত অবিশ্বাস্য চোখে মিচেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ক্যামেরাটা মিচেলকে আঘাত করে ফিরে এসে কেডের হাঁটুতে সজোরে মারল, কেড টেরই পেল না। ওর অবশ আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে স্ট্র্যাপটা পিছলে গেল। ক্যামেরাটা পড়ে গেল মাটিতে।

মিচেল মাথাটা একটু ঝাঁকাল। ব্যথায় কাতরে উঠল। তারপর অতিকষ্টে বাঁ হাতের উপরে শরীরের ভর রাখল। ডানহাতটা কোমরের কাছে নিয়ে এল। ৪৫ রিভলবারের বাঁটটা খুঁজতে লাগল।

কেড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজান্তেই ২০ সি. এম. লেন্সটা তুলে নিল। মিচেল যেই পিস্তলটা টেনে বার করতে যাবে, অমনি কেড ওর কাছে গিয়ে লম্বা লেন্সটা দিয়ে প্রাণপণে ওর মাথার ওপর মারল। মিচেলের শরীরটা প্রথমে একটু দুলে উঠল তারপরেই অচল হয়ে কার্পেটের ওপর এলিয়ে পড়ে গেল।

ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে কেডের। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুনি। বুকের ভেতর যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দু হাতে মাথা টিপে কেড অনেকক্ষণ বিছানার উপব বসে থাকল, জোর করে শরীরের ঝিমঝিম ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল। তারপর প্রায় অমানুষিক শক্তিতে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল। ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ফিল্‌ম গোটাতে লাগল। এত হাত কাঁপছে যে বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল। শেষ পর্যন্ত ও ক্যামেরা থেকে ফিল্‌মের কাট্রিজটা বের করল।

মিচেল একটু নড়ে উঠল। কেড টলমল পায়ে জ্যাকেট গায়ে গলিয়ে নিল। ডান পকেটে কাট্রিজটা রাখল। ক্যামেরাটা সঙ্গে নেবে ভাবতে গিয়ে ইতস্ততও করল বটে, কিন্তু এও বুঝল যে ইর্স্টনভিলের রাস্তা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনা।

হোটেলের করিডরটা একদম নির্জন। কি করবে ভাবল কেড। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল স্মল বলেছিল চাকর ও সুইপারদের লিফ্‌টের ওপর কেউ নজর রাখেনা। দ্রুত হেঁটে ও "সার্ভিস" লেখা দরজাটা ঠেলে একটা লবিতে ঢুকল। ওঃ সে যদি আধখালি হুইস্কির বোতলটা এখন আনত। ফিরে যেতে লোভ হল ওর। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করল কেড।

লিফ্‌টের বোতাম টিপল কেড। ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। যদি এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে সব গুছিয়ে ভাবতে পারত। কেমন করে সে ইর্স্টনভিল থেকে পালাবে? কাল সকালের আগে প্লেন নেই। সবচেয়ে ভাল হোত যদি ও কোন মোটর ভাড়া করতে পারত। কিন্তু মিচেল পুলিশকে ঠিকই খবর দেবে আর ওরা ওর মোটর আটকাবেই। যদি কেড ট্রেনে করে পালাতে পারত।

লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাল কেড। তিনটে বেজে দশ। ফ্রীডম মার্চ শুরু হয়েছে। তাই এই সময়ে কেড একটা পালাবার সুযোগ পেলেও পেতে পারে। পুলিশ আর ডেপুটিরা মিছিল পণ্ড করতেই ভয়ানক ব্যস্ত থাকবে।

লিফ্‌ট থামল। সামনে একটা প্যাসেজ। তারপর একটা খোলা দরজা। কেড তাড়াতাড়ি প্যাসেজটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে একটা সরু গলিতে এসে পড়ল। গলিটা হোটেলের পেছন বরাবর চলে গেছে। একটা লোকও নেই গলিতে।

কেডের পা কাঁপছে। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে সে হাঁটতে লাগল। বড় রাস্তায় পড়বার আগেই ওবই একটা সমান্তরাল সরু গলিতে ঢুকে পড়ল কেড।

নিয়ন আলোতে লেখা "গ্যারাজ" লাইনটা চোখে পড়ল হঠাৎ। শ্বাস প্রায় বন্ধ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কেড গ্যারাজে এসে ঢুকল।

একটা মোটা লোক একটা পন্টিয়াক গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কেড এগিয়ে আসতেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কেড যথাসম্ভব শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমি একটা গাড়ি ভাড়া করতে চাই।

'বেনসন' মোটা লোকটা স্যাঁতসেঁতে হাতটা এগিয়ে দিল। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও কেড হাতটা ধরে ঝাঁকাল।

গাড়ি ভাড়া করতে চান। কোন ঝামেলা নেই। আমার অনেক গাড়ি আছে। কতক্ষণের জন্যে?

কেডের হঠাৎ মনে পড়ল ম্যাথিসন যে তাকে একশো ডলার দিয়েছে তার থেকে মোটে আশি ডলার আর কয়েকটা সেন্ট পড়ে আছে। এত মদ খেয়েছে বলে তার আফশোষ হল। অথচ ওর এখন মদ দরকার।

কেড গলাটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলল, দু ঘণ্টার জন্যে। এই কাছাকাছি ঘুরে আসব। যা গরম।

কুড়ি ডলার। বেনসন চটপট বলল, ডিপোজিট আর ইনসিওরেন্সের জন্য নব্বই ডলার দিতে হবে, তবে ওটা ফেরত পাওয়া যাবে।

এই সময় কেড মারাত্মক ভুল করে বসল। অতিরিক্ত মদ্যপানে তার চিন্তাশক্তি এতই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে যে সে বলে বসল, দেখুন, হার্টজ-য়ে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে। আমি বিশ ডলার এখনি দিচ্ছি। তবে ডিপোজিট দিতে পারব না। বলে কার্ডটা বেনসনের হাতে দিল।

যেই লোকটা কার্ডটা দেখতে লাগল, কেড নিজের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। লোকটা কুৎসিত থমথমে মুখে বলল নিগ্রোপ্রেমীদের আমরা গাড়ি ভাড়া দিই না। যাও, ভাগো।' বলে কার্ডটা ফিরিয়ে দিল।

কেড মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল। ওর ছুটতে ইচ্ছে করল। রাস্তাটার শেষপ্রান্তে এসে বাঁ দিকে ঘুরে ও একটা নোংরা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। গলিটার সামনেই বড় রাস্তা। গলির মাঝামাঝি 'জ্যাকস বার' লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। প্রথমে কেড জোর করে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক গজ এগিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। তার মদ এখন ভীষণ প্রয়োজন। কেড জানে এক মিনিট সময়ও তার নষ্ট করা উচিৎ নয়। কিন্তু তার মদ চাই-ই। নইলে ও আর হাঁটতে পারবে না। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে বারের সুইংডোরটা ঠেলে ও ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটা ঘিঞ্জী নোংরা বার।

একটা বুড়ো নিগ্রো বারম্যান ছাড়া বারটা একদম ফাঁকা। কেডকে দেখে বারম্যানটা ভয়ে যেন জমে গেল।

আমায় ভয় পাবার দরকার নেই। কেড বলল, হোয়াইট হর্স আর বরফ। এখনই চাই।

বুড়ো নিগ্রোটি একটা বোতল, একটা গ্লাস আর এক বাটি বরফ কেডের সামনে রেখে অপর প্রান্তে চলে গেল।

দ্বিতীয় পেগের পর কেড একটু সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারল। গলিটা কি চুপচাপ। ফ্রীডম মার্চের এখন কি হচ্ছে কে জানে।

বলতে পার কেমন করে আমি একটা গাড়ি পেতে পারি। কেড হঠাৎ বেপোরোয়া হয়ে বলল, 'আমাকে শহর থেকে পালাতে হবে।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি দু কাঁধ সঙ্কুচিত করল, যেন কেউ তাকে মারতে যাচ্ছে।

সে মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'আমি গাড়ি টাড়ির খবর রাখি না।

সেন্ট্রাল মোটর হোটেলের সামনে তোমাদের দুজন আজকে খুব মার খেয়েছে। সাংঘাতিক আহত। শুনেছ?

বৃদ্ধ নিগ্রোটি বলল এ শহরে কে কি বলে আমি জানি না।

তোমার স্বজাতি সম্পর্কে ওভাবে বোল না। আমি নিউইয়র্কের একজন সাংবাদিক। তোমার সাহায্য চাই।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি এবার ঘুরে কেডের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাল। তারপর সতর্ক গলায় বলল, আপনি বোধহয় মিথ্যে বলছেন।

কেড ওর মানিব্যাগ বার করে প্রেস কার্ডটা রাখল।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি এবার সামনে এগিয়ে এল। তারপর নিকেলের তোবড়ানো চশমা বার করে পরল। একবার কার্ডের দিকে তাকায়, আরেকবার কেডের দিকে চায়। হঠাৎ ও বলে, উঠল আমি

আপনার কথা শুনেছি। ওরা ভেবেছিল আপনি ওদের সঙ্গে মার্চ করবেন।

জানি, ওরা আমাকে হোটেলে বন্ধ করে রেখেছিল। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসেছি।

যে দুজনকে ওরা হোটেলের বাইরে মেরেছিল, ওরা মারা গেছে।

কেড নিঃশ্বাস টানল। ঠিক জান?

জানি। আপনার এখান থেকে এখনি চলে যাওয়া উচিৎ। ওরা যদি আপনাকে এখানে দেখে, আমাকেও মেরে ফেলবে।

আমি ছবি তুলেছি। যে পাঁচটা লোক ওদের মেরেছে, ওদের আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব। তুমি আমাকে একটা গাড়ি যোগাড় করে দিতে পার।

আমার গাড়ি নেই।

সহসা বাইরে পুলিশের গাড়ির তীক্ষ্ণ হুইস্‌লে বাতাস দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। দুজনেই চমকে গেল। কেড তাড়াতাড়ি আরেকটা ড্রিংক ঢেলে নিল। এখন তার মাথা খুব পরিষ্কার কাজ করছে। মদটা গলায় ঢেলে ও মানিব্যাগ থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট একটা নামলেখা কার্ড আর ফিল্‌মের কার্ট্রিজটা বার করে।

ওরা হয়তো আমাকে ধরবে, কেড বলে। কিন্তু এ ছবি ওদের হাতে কিছুতে দেওয়া চলবে না। তোমাকে এগুলো নিউইয়র্কে সানের অফিসে পাঠাতে হবে বুঝেছ? তুমি বুড়ো হয়েছ, তুমি গরীব, তুমি খুবই ভয় পেয়েছো আমি জানি। কিন্তু যে দুজনকে ওরা আজ মেরে ফেলল, তাদের দিকে তাকিয়ে তোমাকে এটুকু করতেই হবে। এই ফিল্‌ম আর আমার কার্ডটা নিউইয়র্ক সান-এ তোমায় পাঠাতেই হবে।

তাড়াতাড়ি কেড দরজার কাছে চলে যায়, সুইংডোরটা ঠেলে ও গলিতে পা দিল।

আবার পুলিশের হুইস্‌ল বেজে উঠল। গলিটা এখন জনমানব শূন্য। কেড মোড়ের দিকে হাঁটতে থাকল। বুকের হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে। তবু ওর একটা আশ্চর্য আনন্দ হচ্ছিল। ও বুঝেছে নিগ্রো বৃদ্ধ যেমন করেই হোক ম্যাথিসনকে ছবিগুলো পৌঁছে দেবে। কেডের এখন যাই হোকনা কেন, ওর এসে যায় না। তার সব গ্লানি ধুয়েমুছে গেছে। সে নিজেকে অনেক হাল্কা মনে করছে।

তিনটে লোক রাস্তার কোণ থেকে এসে মুগুর হাতে ওকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু কেড ওর চলার গতি থামাল না।

।। দুই ।।

ইস্টনভিলে আসার চোদ্দ মাস আগে কেড মেক্সিকোর সমুদ্রতটে শৌখিন রঙ্গভূমি অ্যাকাপুলকোতে 'স্যানডে টাইমসের' রঙিন ক্রোড়পত্রের জন্য ছবি তুলছিল।

তখন কেডের অসাধারণ ফটোগ্রাফার হিসেবে খুব নামডাক। সম্পূর্ণ ফ্রি-লান্স কাজ করে ও, ছবিগুলো এক কথায় অসাধারণ। নিউইয়র্কে ওর এজেন্ট স্যাম ওয়াল্ড সেগুলি নিমেষে বিক্রী করে দেয়। কেডের ব্যাঙ্কের একাউন্টে টাকা জমতেই থাকে।

কেডের জীবনে সে এক মহাসৌভাগ্যের সময়। সে বিখ্যাত, ধনী। সবাই তাকে এক ডাকে চেনে। তার স্বাস্থ্য ভাল। অথচ খ্যাতি ওর চরিত্র নষ্ট করেনি। সাফল্য ওর মাথা ঘোরায়নি। তবুও অনন্য প্রতিভাবানদের মতনই তার চরিত্রে কিছু পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য ছিল। সে ছিল বেহিসেবী, বড্ড বেশী মদ খেত, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গ কামনা করত। অপরদিকে সে ছিল দয়ালু কোমল প্রকৃতির। নিপীড়িত সর্বহারাদের একরকম সে যেন মুখপাত্র ছিল। স্ত্রী বা সংসার না থাকায় সে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করত। মানুষটা ছিল সাধাসিধে সাধারণ। ওর প্রতিভাই ছিল অসাধারণ। সারা পৃথিবীটা সে ঘুরে ঘুরে মানবদরদী ফটোগ্রাফার হিসেবে অসহায়দের ওপর অত্যাচার, তাদের দুঃখ দুর্দশার ছবি তুলত। তার সারা সময়টা কাটত ট্রেনে, প্লেনে নয়তো গাড়িতে।

রেডইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার কয়েকটি সূক্ষ্ম, খুবই অনুভূতি প্রবণ ছবি তুলে ও তখন সবে অ্যাটিটলান হ্রদের তীরে সান্টিয়াগো থেকে ফিরছে। ছবিগুলোতে রেডইন্ডিয়ানদের জীবনের

প্রতিটা মুহূর্ত, ধুলো ময়লার গন্ধও যেন পাওয়া যায়। বোঝা যায় শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রেডইন্ডিয়ানরা কি অমানুষিক সংগ্রাম করছে।

এই ছবিগুলোর বিপরীত জীবনের বিষয়বস্তু তখন খুঁজছিল কেড। তাতে রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর তোলা ছবিগুলি আরো মর্মস্পর্শী হবে। সাদায়-কালোয় মেশানো বিপরীত একটা এফেক্ট।

তাই ওর অ্যাকাপুলকোয় আসা। যেসব অলস, বিলাসী মোটা মাংসল উচ্ছৃংখল নরনারী শবদেহের মতো সী-বীচে পড়েছিল তাদের ছবি সে তার ২০ সি. এম. টেলিফোটো লেনসে তুলছিল।

কেড তখন হিলটন হোটেলে আছে। ওর তোলা ছবিগুলো স্যাম ওয়াল্ডের কাছে রওনা হয়ে গেছে। একটা শক্ত কাজ করবার পর ভেতরটা যেমন হালকা হয়ে যায়, সেরকমই হয়েছিল কেডের। সে সুইমিং পুলটার পাশে ক্যাম্বিসের আরামচেয়ারে এক গ্লাস টেকুইলা কলিন্‌স হাতে নিয়ে বসে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবছিল।

সামনে একেবারে অসভ্য প্রায় নগ্ন কতগুলো আমেরিকান টুরিস্ট বর্বরোচিত ভাবে হইচই করতে করতে জলে ঝাপাঝাপি করছিল। কেড ওদের বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখছিল। এই বুড়োদের হাতে এত টাকা? অথচ কত যোগ্য তরুণদের কোন টাকাই নেই, এইভেবে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

পানীয়টা শেষ করে ব্রীজ পার হয়ে ও সমুদ্রতটের দি.ক এগিয়ে গেল।

সেদিন নিয়তি ওর সঙ্গে এক ভয়ংকর খেলা খেলল। ওর জীবন, ওর মৃত্যু সব যেন নির্ধারিত করে দিল সেই সর্বনাশা নিয়তি। সেই রোদজ্বলা মধ্যাহ্নে ও দেখা পেল জুয়ানা রোকাকে। এই জুয়ানা রোকাই কেডকে ধ্বংস করতে করতে সর্বনাশের শেষ কিনারায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিল। তার ভেতরকার চমৎকার মানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল পুরোপুরি। শোচনীয় পরিণতির শেষ অবস্থায় পৌঁছে একদিন ইস্টনভিলে বর্ণবিদ্বেষী কিছু মানুষের হাতে ওর প্রাণটাই প্রায় চলে গিয়েছিল।

মেক্সিকোর মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, খুব অল্প সংখ্যক মেয়েরাই শরীরের যত্ন নেয়। যারা নেয় না তারা হয়ে পড়ে মোটা আর কুৎসিত। জুয়ানা রোকা মেক্সিকান, ওর বয়েস এখন সতেরো। গড়পড়তা আমেরিকান মেয়েদের ছাব্বিশ বছর বয়সে শরীরে যে পূর্ণতা আসে জুয়ানার এখনই তা এসে গেছে। রেশমের মতন চুলের ঢল কোমর অবধি নেমেছে। চোখদুটো গভীর কালো, নাকটা ছোট কিন্তু যেন পাথর থেকে কুঁদে তোলা। ঠোঁট দুটোতে যেন মধুর স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি। পুরুষকে পাগল করে দেওয়ার মতন তার শরীরে মদির যৌনাকর্ষণ রয়েছে।

বালির উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল জুয়ানা। ওর কোঁকড়া চুল ঘেরা মুখখানা যেন একটা ছবির মতন। চোখদুটো বোজা। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেড জুয়ানার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কেড জীবনে যত নারী দেখেছে জুয়ানা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সুন্দরতম। যেন রক্তমাংসের মানবী নয় জুয়ানা। যেন একটা শিল্প যা চোখ ভরে দেখা যায়। আর কেড অনুভব করল ওর শরীরের টানও দুর্বার।

কেডের নিস্পন্দ ছায়া জুয়ানার মুখের ওপর পড়েছিল। জুয়ানা চোখ খুলল। তারপর পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এবার হাসল জুয়ানা। তার মুক্তোর মতন দাঁতের সারি দেখে কেডের ভেতরটা কেমন শিরশির কবে উঠল।

একেবারে একা? কেড বলল।

কেন, তুমিই তো আছ, মোহিনীর ভঙ্গিতে জুয়ানা বলল।

আমি তোমাকে কাল রাতেই দেখেছি। তুমি হিলটন হোটেলে আছ না?

হ্যাঁ।

জুয়ানা উঠে বসল। তার চুলের কালো রাশ গলায় পেঁচিয়ে বলল, তুমি তো কেড। বিশ্ববিখ্যাত ফটোগ্রাফার।

—কেমন করে জানলে? কেড হেসে বলল।

—আমি অনেক কিছুই জানি। সে খুব আন্তরিক সুন্দর চাহনীতে কেডের দিকে তাকাল।

তোমার অনেক ছবি আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে তুমি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়, না?

কেড ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

এ কথা বলছ কেন?

বল, আমি সত্যি বলিনি?

কেডের অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল জুয়ানা যেন তার ভেতর অবধি দেখতে পাচ্ছে।

আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। তোমার নাম কি?

জুয়ানা রোকা।

তুমি কি ছুটি কাটাতে এসেছ?

সেরকমই।

কোথায় উঠেছ?

৫৭৭ নম্বর ঘর, হিলটন হোটেলে।

মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গেল কেড। আমি তো ৫৭৯ নম্বর ঘরে আছি।

—জানি, আজ সকালেই ঘর বদলেছি।

জুয়ানাকে শুধু সুন্দর লাগেনি সেই মুহূর্তে ওর শরীরের অমোঘ সর্বনাশা আকর্ষণের কথাই ভেবেছে কেড। বুঝতে পারল সে নিজের বশে আর নেই। রক্ত দ্রুততালে বইছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

জুয়ানা নীল প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল। কটা বাজে?

নির্বোধের মতন তাকিয়েছিল কেড। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, দুটো বেজে কুড়ি।

ইস্। তাড়াতাড়ি উঠে জুয়ানা ভিজে তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিল। আমাকে যেতেই হবে। দেরি করলে ও ভারি রেগে যাবে।

—কে? শোন, যেওনা।

জুয়ানা কিন্তু ততক্ষণে বালি দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। স্বচ্ছল গতিভঙ্গী ওর। মেক্সিকান মেয়েদের গড়ন এত সুন্দর। কেড বালির উপর বসেই রইল। অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, তাদের মোহিনীমায়ার জাল কেটে বেরিয়েও এসেছে। কিন্তু এ যেন অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। তার যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি যন্ত্রণাও হচ্ছে সমানে। ঘর বদলিয়েছে, জুয়ানা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিল নাকি।

ক্যামেরা তুলে নিয়ে ও হোটেলে ফিরে এল। ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খড়ের চালার নীচে ওপেনএয়ার রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে দেখল।

প্রায় প্রতিটা টেবিলই ভর্তি। স্থূলকায়া আমেরিকান মহিলারা কিম্ভুত বড় রকমের ফুলকাটা টুপি আর সুইমিং স্যুট পরে চেয়ার মুড়ে বসে আছে। রোমশ শরীর বুড়োরা সাঁতারের পোষাক পরে বসে আছে। ওদের ভুঁড়ি হাঁটুর ওপর থলথল করছে।

হঠাৎ ও জুয়ানাকে দেখতে পেল। একটা টেবিলে একজন দীর্ঘকায়, পাতলা চেহারার মেক্সিকানের সঙ্গে বসে আছে। বয়স পঁয়ষট্টি হবে। পাতলা মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন, সাদা চুল, নীল চোখের দৃষ্টি কঠোর। চমৎকার নিখুঁত ব্লেজার, সাদা ফ্লানেলের প্যান্ট, সাদা সিল্কের শার্ট আর টাই ওর পরনে। চারিদিকে কুৎসিত প্রায় নগ্ন চেহারার মাঝে লোকটি যেন একটা ব্যতিক্রম। তার দিকে তাকিয়ে কেডের সব উৎসাহ যেন নিভে গেল। টেবিলটার থেকে অনেক দূরত্ব রেখে অনেকটা ঘুরে ও চলে গেল নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে এই প্রথম খেয়াল করল ওর আর পাশের ঘরটার মধ্যে একটা দরজা আছে। ওর দরজাটা খিল দেওয়া। নিশ্চয় দরজাটা ওদিক থেকেও বন্ধ থাকবে।

জুয়ানা বলেছে ও ওই ঘরে এসেছে আজ। তাহলে আজ রাতে যে কোন সময়ে জুয়ানার ইচ্ছে থাকলে ওরা যোগাযোগ করতে পারে। বিছানায় শুয়ে পড়ে কেড। অস্থির এক উত্তেজনায় সে ছটফট করতে লাগল।

জুয়ানার সঙ্গী পুরুষটি কে? ওর বাবা? স্বামী? প্রণয়ী? হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

নিউইয়র্ক থেকে স্যাম ওয়াল্ড কথা বলতে চায়। জুয়ানার মুখ ভাসছিল কেডের চোখের সামনে। প্লিজ বলে দেবেন আমি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছি কোন ঠিকানা রেখে যাইনি। এইটুকু করবেন দয়া করে?

বিখ্যাত কেড অমন অনুনয় বিনয় করে কথা বলছে যে অপারেটর মেয়েটি গলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা ভাড়া করা জীপে করে কেড এল্‌মোরো উপকূলে লা গামা রেস্টুরেন্টে গেল। "অ্যাকাপুলকো নিউজ" কাগজের সাংবাদিক রিকার্ডো ওরোসিওর সঙ্গে ওর ডিনার খাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

রেস্টুরেন্টে ওবোসিও ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরোসিও মেক্সিকান, ছোটখাট চেহারা, দড়ি পাকানো শরীর। কালো মুখ থেকে ওর হাসি কখনও মেলায় না। পোষাকও খুব কায়দা করে পরে।

খেতে খেতে এটা সেটা বিষয়ে কথা বলতে লাগল ওরা দুজনে। হঠাৎ কেড মনে করল ওরোসিও ওকে সাহায্য করতে পারে।

চামচ দিয়ে কফি নাড়তে নাড়তে কেড বলল, হিলটনে একজন মেক্সিকান আছে। লম্বা, পাতলা চেহারা, বয়স বছর পয়ষট্টি। মাথায় ঘন সাদা চুল, চোখের রঙ নীল। আমি যখন দেখি, ওর পরনে...

আমি জানি উনি কে। ওরোসিওর মুখে কৌতুকের হাসি। ওর কথা জানতে চাও, অ্যামিগো। আরে বলনা ওর তরুণী সঙ্গিনীটিকে তোমাব মনে ধবেছে।

কেড হেসে ফেলল। 'ধরে ফেলেছ দেখছি...যাকগে ভদ্রলোকটি কে?

ওর নাম ম্যানুয়েল ব্যারেডা। ওর জাহাজের ব্যবসা আছে। বাবসা কেন্দ্র হচ্ছে ভেরাক্রুজ। ভদ্রলোক বিরাট ধনী; ওর স্ত্রী শয্যাশায়ী, অসুস্থ। তিনটি ছেলে ব্যবসা দেখে। একটি মেয়ে আছে, ব্যাঙ্ক অফ যুকাতানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

কেড বিস্মিত হল। এসব খবর ধীরে ধীরে হজম করতে লাগল।

ওর সঙ্গে.. ওর কি মেয়ে? শেষ অবধি প্রশ্নটা করেই ফেলল কেড।

ওর প্রশ্ন শুনে ওরোসিও নিঃশব্দে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ওর হাসি আর থামেনা। কেড ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল।

হাসি থামিয়ে ওরোসিও বলল, মাপ কর ভাই। ও ওর মেয়ে নয়। ওর মেয়ে এক বিশালাকার মহিলা। ওর...

ওর মেয়ের কথা থাক। সঙ্গের মেয়েটি কে?

ইস্ যতবার এ প্রশ্ন শুনেছি ততবার যদি কেউ দশটা করে ডলার আমাকে দিত, আমি সেই মার্সিডিজটা কিনে ফেলতাম। ও আসার পর থেকে প্রত্যেকদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে এ প্রশ্নটার জবাব দিতে হয়।

এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হল না।

মেয়েটির নাম জুয়ানা বোকা।

জানি, ও কে? কি করে?

ও বর্তমানে সিনর ব্যারেডার নর্মসহচরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু ও যে কে তা বলা কঠিন। শুনেছি ব্যারেডের সঙ্গে দেখা হবার আগে ও মেক্সিকোয় সান ডিয়েগো ক্লাবে নর্তকী ছিল। শোনা যায়, বুলফাইটারদের সঙ্গে ওর বেজায় দোস্তি। কিম্বা বলা যায় বুলফাইটাররাই ওর সঙ্গে দোস্তি করতে ব্যস্ত। তবে ওদের উদ্দেশ্য খুব একটা সফল হয়নি। ওরা ওকে কায়দা করতে পারেনি।

এখন বলতো একজন ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফার যে নাকি জুয়ানা রোকার সম্পর্কে আগ্রহী, তার মনের কথাটা কি?

আরেকটু কফি নেওয়া যাক। কেড বলল, মেক্সিকান কফি সত্যিই চমৎকার।

কিছুক্ষণ চুপ করার পর কেড বলল, সিনর ব্যারেডার মতন ব্যস্ত মানুষ অ্যাকাপুলকোয় কি করছেন?

শুনেছি সম্প্রতি ওর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এখানে এসেছেন রোদ পোহাতে ডাক্তারের

পরামর্শে।

হার্ট অ্যাটাক?

ওরোসিও কেডের মনের কথা আঁচ করে বলল, তুমি হয়তো ভাবছ হার্টের রুগী এক বৃদ্ধ হিলটন হোটেলে কেমন করে জুয়ানা রোকোর মত একটি প্রাণবন্ত মেয়ের সঙ্গে সহবাস করছেন, তাই না?

বলতে পার। কেড হেসে বলল।

মেয়েরা যখন এত সুন্দরী হয় তাদের সঙ্গে মিশলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে বই কি। সিনর ব্যারেডা অ্যাকাপুলকোতে প্রেম করলে কেউ অত মাথা ঘামাবে না। সেই জন্যেই ঝুঁকি নিয়ে উনি মাথা ঘামাচ্ছেন না।

হয়তো তাই। কেড নিস্তেজ গলায় বলল।

কেডের মনে হয়েছে জুয়ানা হয়তো স্বেচ্ছায় তার পাশের ঘরে এসেছে। কিন্তু সিনর ব্যারেডা যদি তার জীবন, স্বাস্থ্য জুয়ানার জন্য সবকিছুই পণ রাখতে পারেন, এ ব্যাপারে ওর মাথা গলানো ঠিক হবে না। সে সিনর ব্যারেডার প্রশংসা করছিল মনে মনে।

যাক গিয়ে, সিনর ব্যারেডা আর তার প্রণয়নীর কথা থাক। চল পাহাড়ের দিকে ঘুরে আসা যাক।

ওরোসিও বিল চাইল। বলল অসম্ভব, আমাকে অফিসে ফিরতেই হবে। মিঃ কেড একটা উপদেশ দিই যদিও উপদেশ দেওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার কথা হল মেক্সিকোতে তুমি মজা-টজা করার জন্য অনেক মেয়ে পাবে। মেক্সিকোতে একটা কথা প্রচলিত আছে জুয়ানা রোকা পুরুষদের কাছে মৃত্যু স্বরূপ। ও আমাদের আধুনিক কারমেন। ওর জন্য দুজন বুলফাইটার প্রাণ হারিয়েছে। এখন থেকেই সাবধান হও। আগামীকাল বা আগামী পরশু সাবধান হয়ে লাভ নেই। এই কথা কটি বলেই আমি যাব। মনে রেখ মেয়েদের সৌন্দর্য খুব লোভনীয়, কিন্তু সৌন্দর্যটার আড়ালে হয়তো ধারালো ছুরি ঢাকা থাকে। তোমার অসম্ভব ভক্ত আমি, জান তো? কেডের হাত ঝাঁকিয়ে ওরোসিও চলে গেল।

কেড রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। জীপের পাশে দাঁড়িয়ে ও তারাভরা আকাশটার দিকে তাকাল। নরম কালো ভেলভেটের ওপর তারাগুলো যেন হীরের দ্যুতির মতন জ্বলছে। বাতাস গরম। বালির ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে ফিরে যাচ্ছে আবার। সমুদ্রের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে আলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে একটা বৃহৎ সরীসৃপ যেন এলিয়ে শুয়ে আছে। ছুটন্ত গাড়ির আলোগুলো মনে হচ্ছে উড়ন্ত জোনাকির ঝাঁক।

হোটেলে ফিরে কেড ব্যারেডার কথাই ভাবতে লাগল। ঠিক করেছে স্যাম ফোন করলে ওর কি কাজের কথা জেনে নেবে। আর কাল সকালেই ও অ্যাকাপুলকো ছেড়ে চলে যাবে। কাজে জড়িয়ে পড়লে ও জুয়ানাকে নিশ্চয়ই ভুলতে পারবে। সিনর ব্যারেডার মধুচন্দ্রিমাকে নষ্ট করবার কোন অধিকার নেই তার। প্রাণান্ত ভাল না বাসলে ব্যারেডা এমন ভাবে জীবনের সঙ্গে জুয়ো খেলতো পারত না।

ওর ঘর থেকে ওয়াল্ডকে ফোন করল ও। তারপর বিছানায় বসে সমুদ্রের বুকে চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল। বিশ মিনিট পরে ও কানেকশান পেল। 'ওরা বলল যে তুমি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছ। ওয়াল্ড গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাচ্ছিল।

কানের পর্দা ফাটাবে নাকি? নাঃ শেষ অবধি মত বদলাল স্যাম। কি কাজের কথা বলছিলে বলতো?

কি ব্যাপার। মেয়েটি রাজী হচ্ছে না নাকি?

বাজে কথা ছাড়। ফোনের বিল চড়ছে। কি কাজ বল?

ষাঁড়ের লড়াই। আগামী মাসে আমাদের কাগজে একটা নতুন ন্যাকামি শুরু হচ্ছে। নাম হল নিজেই দেখুন। পরিকল্পনাটা নীতিবাগিশ, আদর্শবাদী। ওদের ধারণা তোমার ছাপানো ছবি দিয়ে শুরু করলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতন অনৈতিক ব্যাপার বন্ধ করা যায়। আমেরিকার বাইরে যদি ছবিগুলো তোলা যায়, তাহলে ওরা ক্যাশ তিন হাজার ডলার আর পঁচিশ পার্সেন্ট রয়্যালিটি দেবে।

বুঝতেই পারছ ওরা কি চায়। ক্লান্ত বিধ্বস্ত ঘোড়া, ক্ষতবিক্ষত ষাঁড়, কাপুরুষ ফাইটার, টুরিস্টদের পাশব উল্লাস। তোমাকে আর কি বোঝাব? এই রবিবারে একটা জবরদস্ত লড়াই হবে। আমি ক্রিলের সঙ্গে কথা বলেছি। ডিয়াজ লড়ছে। ডিয়াজ এখন দুর্দান্ত জনপ্রিয়। কি, করবে তো?

আজ শুক্রবার। কেডের মনে হল এ ভালোই হল।

বেশ স্যাম। ক্রিলকে বলবে আমার টিকিট করে রাখতে। একেবারে সামনের দু-সারি বাদ দিয়ে টিকিট করবে। আমার দু পাশের সীট দুটো যেন খালি থাকে। আমার জায়গা চাই।'

ঠিক আছে।

ক্রিলকে বোল, লড়াইয়ের আগে ও পরে আমি ডিয়াজের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

এতে একটু ঝামেলা হতে পারে। ডিয়াজের এখন খুব নাম। ও রাজী নাও হতে পারে।

সে ক্রিল বুঝবে। ওকে বল আমি এই ব্যবস্থাই চাই।

বেশ। আমি কি তোমার জন্য 'এল প্রেসিডেন্টে' একটা ঘর বুক করে রাখব।

কেড একটু ইতস্ততঃ করে মাঝের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল না, আমিই বন্দোবস্ত করব। শেষ যে ছবি পাঠিয়েছি, পেয়েছো?

হ্যাঁ। অপূর্ব, অসাধারণ। ভ্যাল তুমি হচ্ছ দুর্দান্ত একটা ট্যালেন্ট, আমি বলছি, জান...'

কেড ওকে থামিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জের হবে। খুব দ্রুত শার্টার টিপতে হবে। ভাল আলো পাবে না তাই বড় অ্যাপারচার ব্যবহার করতে হবে। খুব মাথা খাটাতে হবে তাকে। কিন্তু ফটোগ্রাফির এইসব সমস্যা তার ভালই লাগে।

টেলিফোনটা তুলে এবার কেড মেক্সিকোর কোন্ কোন্ শহরে প্লেন যাবে খোঁজ নিল। আগে থেকে বুক করার দরকার নেই। প্লেনের সীটগুলো কখনই ভর্তি থাকে না। তারপর বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতল। না, কোন সাড়া শব্দ নেই। বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে দেখেছে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে কিনা। দেখেছে জানলা বন্ধ, ঘরে আলো নেই। কেড ঘরে ফিরে এল।

তাহলে সবটাই পরিহাস। জুয়ানা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। অর্থহীন, নিষ্ঠুর, ঠাট্টা।

দেয়াল আলমারি থেকে প্যাকিং ব্যাগ নিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল কেড। জুয়ানার নির্মম পরিহাস ও হজম করতে পারছে না। কেনই বা রেগে যাচ্ছে কেড। ওতো স্থির করেছিল ওদের ব্যাপার থেকে দূরে থাকবে ও। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও ভাবল ও একটু মদ খেয়ে নেবে। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়াই ভাল।

জামাকাপড় ছেড়ে ফেলল ও। বাথরুমে যাবার আগে শেষবারের মতন বন্ধ দরজাটায় কান পাতল। নিস্তব্ধ, একদম নীরব।

চুলোয় যাক। নিজের মনেই চেঁচিয়ে উঠল ও। শাওয়ারটার নীচে মাথা রেখে ও অনেকক্ষণ স্নান করল। তারপর ঘরে ফিরে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। খুব আরাম লাগছে এখন। আর একটুও রাগ নেই।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। কেড ভাবল স্যাম হয়তো কিছু বলতে ভুলে গেছে। ও হালকা করে ফোনটা ধরল। হ্যালো!

দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে।

জুয়ানার গলা, এ নিশ্চয়ই জুয়ানার গলা। সঙ্গে সঙ্গে কেডের বুকের ওঠানামা দ্রুততর হল, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

—কোনরকমে ও বলল তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, বিরক্ত করলাম নাকি?

—না, না ..

—ভালো, আমি বলছিলাম আমার দিকের দরজা খোলাই আছে।

এই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তেও কেড ব্যারেডাকে ভোলেনি।

আমি শুতে যাচ্ছি। আবেগে কেডের গলা থর থর করে উঠল।

আমি শুয়েই আছি।

রিসিভার নামিয়ে কেড বন্ধ দরজাটার খিল খুলে পাশের ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু নীল

আলো জ্বলছিল, কেড দেখল কালো চুলের বন্যার মাঝে জুয়ানা শুয়ে আছে। ঠোঁটে সেই মাদকতাময় হাসি। কেড ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

সোয়া নটার প্লেন ধরবার জন্য ওদের অসম্ভব তাড়াহুড়ো শুরু হয়েছে। সহযাত্রী শুধু আটজন আমেরিকান টুরিস্ট। তাদের হাতে ক্যামেরা।

যথারীতি প্লেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে।

কেডের অভিজ্ঞতায় জুয়ানার সাথে প্রেম তার জীবনে এক অনন্য ঘটনা। এরকমটা আর কখনো হয় নি। কিন্তু ভেতরের একটা পাপবোধ সেই অভিজ্ঞতার আনন্দকে অনেক ম্লান করে দিয়েছে।

ভোরের দিকে ওরা যখন প্রেমের বন্যায় তখনো ভাসছিল, জুয়ানা হঠাৎ বলল সে কেডের সঙ্গে মেক্সিকোয় যাচ্ছে।

তোমায় কে বলল আমি মেক্সিকোয় যাচ্ছি? কেড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমি টেলিফোনে সব শুনেছি। তুমি তো বুলফাইটের ছবি তুলতে যাচ্ছ, তাই না?

কেড বলল, তুমি তা করতে পার না। তুমি ব্যারেডার কথা ভুলে যাচ্ছ।

জুয়ানা তখন তার একটা পা তুলে খুব মন দিয়ে দেখছে।

আমার পা সত্যিই সুন্দর, তাই না?

কেড উঠে বসল।

শোন, তোমার এরকম করা ঠিক হবে না। ব্যারেডা তোমাকে সত্যিই ভালবাসে...

জুয়ানা দুম্ করে পা নামিয়ে দিয়ে বলল, ব্যারেডা বুড়ো...ওকে আমার অসহ্য লাগে। আমার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। নিচের হলে রেখেছি। কাল আমি তোমার সঙ্গে মেক্সিকো যাচ্ছি।

না, আমি তোমায় একাজ করতে দিতে পারিনা। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তুমি ব্যারেডার সঙ্গেই তো ছিলে...

আমার ওকে ক্লান্তিকর লাগত। আমার ওর সঙ্গে আসা উচিৎ হয়নি। আমার ভুল হয়েছে। ওর মতন বুড়োর সঙ্গে থেকে কি করব? আমি মেক্সিকো ফিরে যাচ্ছি। তুমি যদি আমায় না নিয়ে যেতে চাও, সোজা বলে দাও। আমি একাই যাব।

ব্যারেডাকে কি বলবে? কেড উদ্বেগে বলে উঠল।

কিছুই বলব না। ও যতক্ষণে ঘুম থেকে উঠবে, আমি চলে যাব।

শোন এরকম হৃদয়হীন ব্যবহার করা উচিৎ নয়। অন্তত লিখে জানাও।

লিখে জানাবার দরকার নেই। হলে যে বেয়ারা থাকে ও বলে দেবে আমি চলে গেছি, ব্যস্।

এই বলে জুয়ানা কেডকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। যখন ঘুম ভাঙ্গল ওদের, আটটা বেজে গেছে। জামাকাপড় বদলালো, হোটেলের বিল মেটালো, গাড়িতে মালপত্র তোলার তাড়াহুড়োতে ব্যারেডার কথা ভুলেই গেল কেড।

মেক্সিকো শহরের অর্ধেকটা পাড়ি দেবার পর কেডের হঠাৎ মনে পড়ল ব্যারেডার কথা। সত্যি ভদ্রলোকের জন্য খারাপ লাগছে খুব। জুয়ানার খুশীতে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কেড ভাবল জুয়ানার ভেতরটা কি নির্মম। তার একটু ভয় করতে লাগল।

কেডকে চেয়ে থাকতে দেখে জুয়ানা বলল, আমি একটা চমৎকার বাড়ির খবর জানি। আমরা সেটা ভাড়া করতে পারি। হোটেলে থাকার থেকে অনেক ভালো। আমি খুব ভাল রাঁধতে পারি। আমি বাড়িটার দেখাশোনা করব, রান্না করব, তোমার ভাল লাগছে না ভাবতে।

জুয়ানার পরনে দামী হাতকাটা সাদা পোষাক। মাথার উপর চুল চুড়ো করে বাঁধা। কানে সোনার দুল, গলায় চওড়া সোনার কলার। এই রকম সুন্দরী, সৌখিন মেয়ে হাত পুড়িয়ে রান্না করছে ভাবতেই হাসি পেল কেডের।

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ভাবছ আমি রাঁধতে পারি না?

কেড বুঝল জুয়ানার আঘাত লেগেছে। তাড়াতাড়ি বলল, আমি জানি তুমি রাঁধতে পার। কিন্তু ক'জন পরিচারিকা লাগবে তোমার?

দুর, আমরা কোন পরিচারক রাখব না। শুধু তুমি আর আমি থাকব।

বাঃ বেশ হবে। চল বাড়িই ভাড়া করব আমরা।

জুয়ানা ওর হাতের উপর হাত রাখল। মিষ্টি হেসে বলল, 'আমি স-ব ব্যবস্থা করব। তোমার কাছে টাকা আছে তো? সব বন্দোবস্ত করতে কিছু টাকা লাগবে কিন্তু। আমার কাছে দুশো পেসো আছে। ম্যানুয়েল বেচারা ভারী কৃপণ।

দাঁড়াও ভাল মনে করেছ। তুমি ওকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।

জুয়ানা কেডের হাতটা টেনে বলল, তোমার কাছে টাকা আছে কিনা জানতে চাইলাম। তুমি খালি খালি ম্যানুয়েলের কথা বলছ, আমার ভালো লাগছে না।

কেড একটা নিঃশ্বাস ফেলে মানিব্যাগ থেকে ওকে পাঁচ হাজার পেসোর নোট দিল।

মেক্সিকোয় পৌঁছে আমি চেক ভাঙ্গাব। এখন এর চাইতে বেশী টাকা আমার কাছে নেই।

যথেষ্ট হবে। দেখবে আমি কিরকম গুছিয়ে চালাতে পারি। আমরা খুব সুখী হব দেখো। জুয়ানার উজ্জ্বল চোখদুটি খুশিতে উপচে পড়ছে যেন।

এগারটার পর ওরা মেক্সিকো পৌঁছল। মধ্য আমেরিকায় স্যাম ওয়ান্ডের প্রতিনিধি অ্যাডোলফো ক্রিল এয়ারপোর্টে ছিল। মোটামুটি মানুষটি, মাথায় টাক, জামাকাপড়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য নেই। কিন্তু ব্যবহারটি খুবই মধুর।

কেড যখন জুয়ানার সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দিল ক্রিল যেন ধন্য হয়ে গেল। ওর চোখে বিস্ময় আর প্রশংসা।

কেড জিজ্ঞেস করল, টিকিট পেয়েছিলে?

নিশ্চয়ই, আপনি যা যা বলেছিলেন সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

ডিয়াজের সঙ্গে কখন দেখা করছি?

ক্রিলের মুখ থেকে সৌজন্যমাখা হাসিটা হঠাৎ নিভে গেল। দুঃখিত, এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ডিয়াজ কারো সঙ্গে দেখাই করে না, এমনকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও নয়। ডিয়াজ খুব গোঁড়া ধার্মিক। লড়াইয়ের আগে সে শুধু প্রার্থনা করে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভবই নয়।

কেড বিরক্ত হয়ে বলল, 'লড়াইয়ের আগে ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। আমি ওয়ান্ডকে আগেই তো বলেছিলাম।

ক্রিল পায়ে পা ঘষল, টুপি দিয়ে পা চাপড়াল।

সিনর কেড। সত্যি বলছি আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

জুয়ানার চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল রাগে। ও বলে উঠল, ডিয়াজ একটা বোকা, পেট মোটা কোলা ব্যাঙ। তুমি যদি সত্যিই দেখা করতে চাও, আমি ব্যবস্থা করে দেব। মেক্সিকোয় আমি কত কি করতে পারি। এখন আমি যাচ্ছি। বাড়িটার বন্দোবস্ত করতে হবে আমায়। কাল আমরা নতুন বাড়িতে যাব। আজ রাতে হোটেল এল্ প্রেসিডেন্টে থাকব। আমার জন্য হোটেলে অপেক্ষা কর। বিকেলের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

এক মিনিট শোন জুয়ানা। সত্যি বলছ ডিয়াজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে?'

নিশ্চয়। জুয়ানা চলে গেল।

ক্রিলের মুখে একটা মেকি হাসি খেলা করছে। বলল সিনর আপনি ভাগ্যবান। আপনার বান্ধবী শুধু সুন্দরীই নন, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

হ্যাঁ। কেড ব্যাগ তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

যেহেতু কেড সরল এবং ভদ্র, জীবনের অভাবিত সাফল্যে সে বিস্মিতই হয় কেবল, ভাগ্যের কাছে সবসময় তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়। এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অ্যামেচার ফটোগ্রাফার হিসেবে সে এক হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছিল দশ বছর বয়সেই। সেই তার সৌভাগ্যের শুরু। এক মসৃণ সফলতার পথ দিয়ে তার বাধাহীন চলা। জীবনে কখনও কোন কঠিন অসুখ হয়নি তার। জীবনে এমন একটা সময়ও আসেনি যখন ওর কাছে গাড়ি ছিল না। অনাহারের কষ্ট কি কেড তা জানতেই পারেনি। তেমন কোন আঘাতও জীবনে পায়নি ও। প্রায় সবসময়ই কোন না কোন সুন্দরী মেয়ে ওর সঙ্গিনী হয়ে থেকেছে। তার জীবনে সে এত সফলতার মুখ দেখেছে যে তার জীবনে জুয়ানা রোকোর অকস্মাৎ আবির্ভাবে সে অবাক হয়নি। যদিও জুয়ানার

আবির্ভাবকে সে দেবতাদের এক প্রসন্ন বরদান বলেই মনে করেছে।

এল্ প্রেসিডেন্টে আলোকিত ফোয়ারা আর বিশাল সুইমিং পুলের মুখোমুখি বারে বসে জুয়ানার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ও গত বারো ঘণ্টার কথা ভেবেছে। সামনের টেবিলে গ্লাসে সিনজানো বীয়ার আর বরফ।

জুয়ানা রহস্যময়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ও নিজেই বলেছে কেডকে যখন ও হিলটন হোটেলে ঢুকতে দেখে তখনি ওর প্রেমে পড়ে যায়। নিজেই খোঁজ খবর নিয়ে জানে কেড কে, ওর ঘরের নম্বর কত, সব। জুয়ানা সঙ্গে সঙ্গেই কেডের পাশের ঘর বদল করে নিয়েছে। জুয়ানা জানত কেড ওকে চাইবেই। এই বারোঘণ্টার মধ্যে পরস্পরকে ভাল করে জানার সুযোগই পায়নি ওরা। কিন্তু জুয়ানার বিষয়ে কেড যত কমই জানুক জুয়ানা কেডের সব খবরই জানে। এতেও কেড আশ্চর্য হয়নি। কেড বিখ্যাত সর্বজনবিদিত একটি নাম।

জুয়ানার সঙ্গে ভালবাসার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে এরকমটি আগে কেডের হয়নি। এই অভিজ্ঞতার এমন এক উত্তেজনা ও তৃপ্তি আছে যা কেড কখনও আগে অনুভব করেনি। এক যথার্থ প্রণয়ণীকে কি করে ভালবাসতে হয়, জুয়ানা তা জানে।

জুয়ানার কথা ভাবতে ভাবতে কেড সভয়ে উপলব্ধি করল জুয়ানা ছাড়া সে তার জীবনের কথা ভাবতেই পারছে না। জুয়ানা ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। মেয়েদের ব্যাপারে কেড সবসময়ই সতর্ক ছিল। কাউকেই তার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি। কিন্তু জুয়ানার সঙ্গে সংসার পাতার স্বপ্ন তাকে এক আশ্চর্য আনন্দ আর উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিচ্ছে। আবার যখনই মনে হচ্ছে ম্যানুয়েল কে কি অনায়াসে ও ছেড়ে এল। এক অজানা আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। অবশ্য সে তার মনকে বোঝাল, ব্যারেডার বয়স পঁয়ষট্টি, অসুস্থ রুগ্ন এক বৃদ্ধের সাথে জুয়ানার মতন যৌবনোচ্ছল, প্রাণচঞ্চল এক মেয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে। কেডের মনে হল জুয়ানা তাকে সত্যিই ভালবাসে, সেও জুয়ানাকে ভালবাসে, এ ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

জুয়ানার জন্য তার মন খারাপ হতে লাগল। সে জোর করে তার মনকে বুলফাইটের প্রসঙ্গে নিয়ে গেল। ক্রিল বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে ফোন করে জানাবে কি ঠিক হল না হল। ক্রিল ওর গাড়িটা কেডকে দিয়েছে ব্যবহারের জন্য। বলেছে ও কেডের গাইড আর সোফারের কাজ করবে। কেড ক্রিলকে বলেছে ও তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করবে, ক্রিলকে ওর পাশে বসতে হবে, কেড যখন যে ক্যামেরাটা চায় কেডকে তা হাতে তুলে দিতে হবে যাতে কেড ইচ্ছে মতো লেন্স দিয়ে অনবরত ছবির পর ছবি তুলতে পারে। কেডের ক্রিলকে বেশ পছন্দ হয়েছে। ক্রিলই বলেছে জুয়ানার ঘরে রাখার জন্য কেডের একটা বড় কারনেশান ফুলের তোড়া কেনা উচিৎ। ক্রিলই সেই ফুলের তোড়া কেনা ও রাখার ব্যবস্থা করছে।

লাঞ্চের পর কেড খানিক ঘুমিয়ে নিল। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছিল কেডের। বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোতেই জুয়ানার টেলিফোন এল।

টেলিফোনে অনেক পুরুষ কণ্ঠের কথাবার্তা, গীটারের বাজনা, গানের আওয়াজ আসছিল। কেড সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?

একটা কাফে থেকে। এখানে যা হৈ-চৈ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শোন, ডিয়াজ আগামীকাল আড়াইটার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলবে। ও হোটেল ডি টোরায় থাকবে। ঠিক আছে?

—নিশ্চয়। বাঃ চমৎকার। কি করে করলে?

রেনাদো আমার খুব বন্ধু। ও বুলফাইটারের ম্যানেজার। প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার কেড ওর একজন ফাইটারের ছবি তুলবে শুনে গলে গেছে। এখন ডিয়াজও খুব খুশী দেখছি পেটমোটা কোলাব্যাঙ একটা।

কেড মনে মনে বলল খুব বন্ধু। একথার মানে কি?

এমনিতে বলল, বাঃ চমৎকার। কিন্তু তুমি কাফেতে কি করছ ডার্লিং? আমার কাছে চলে আসছ না কেন?

রেনাদো এখানে আছে যে। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি তবে রাত দশটার আগে আসছি না।

কেন?

এখনও কাজ বাকি আছে যে। বাড়িটা পেয়েছি কিন্তু দালালের সঙ্গে দেখা করতে হবে, ওকে টাকা দিতে হবে। লোকটা একটা ডাহা চোর, ওর সঙ্গে দামদস্তুর করতে হবে। আগামীকাল বুলফাইটের পর আমরা আমাদের নতুন বাড়িতে সোজা চলে যেতে পারব। আজ রাতে চল আমরা নেগ্রুই রেস্টুরেন্টে যাই। ওখানে চমৎকার খাবার পাওয়া যায়। তুমি জান রেস্টুরেন্টটার কথা?

কেড বলছে ও জানে না।

তাহলে তোমার একটা মনে রাখার মতন অভিজ্ঞতা হবে। একটা টেবিল বুক করে নাও না কেন? আমি যাচ্ছি, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তুমি আমাকে এখনও ভালবাস তো?

সেটা এখানে এলেই বুঝতে পারবে।

জুয়ানা হেসে উঠল, সে আমার খুব ভাল লাগত। চলি। ফোনটা নামিয়ে রাখল জুয়ানা।

কিছুক্ষণ পর ক্রিল টেলিফোন করল। কেড ওকে ডিয়াজের কথা বলল। শুনে ক্রিল আশ্চর্য হয়ে গেল।

আপনি জানেন না সিনর ডিয়াজের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেবার জন্য আমি কি পরিশ্রমটাই না করেছি। আপনার বান্ধবী যে রেনাদোর কথা ভেবেছে, তা খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছে। রেনাদো অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানকার, তবে খুব কড়া প্রকৃতির। আপনার বান্ধবী রেনাদোকে নিশ্চয়ই খুব ভাল চেনেন। তাই ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে।

একথা শুনে কেডের উদ্বেগ আর ঈর্ষা বেড়েই গেল। রাত দশটার একটু পরে জুয়ানা হুড়মুড় করে কেডের শোবার ঘরে ঢুকল। বলল, চল ডার্লিং আমার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি জুয়ানা স্নান করে পোষাক বদলে নিল।

নেগ্রুই রেস্টরেন্টের খাবার সত্যিই চমৎকার। খেতে খেতে জুয়ানা বকর বকর করেই চলল। সব ব্যবস্থা তৈরী। এখন এক সপ্তাহের ভাড়া দিয়েছি। তবে যতদিন ইচ্ছে ততদিন আমরা ওই বাড়িতে থাকতে পারি। ডিয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঠিক করে দিয়েছি, খুশী হয়েছ তো? লোকটা একটা নির্বোধ, মোটা। তবে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে ডিয়াজ খুব মজবুত। রেনাদো তো বেজায় খুশি। রেনাদো সহজে খুশী হয় না...'

কেড বলল, ক্রিল বলল রেনাদো খুব কঠোর প্রকৃতির, কি করে ওকে রাজী করালে?'

জুয়ানা ছুরি দিয়ে একটা ক্রীমভর্তি পেসট্রি কাটছিল। ও চোখ তুলে হাসল।

ভাল, তোমার হিংসে হচ্ছে তো। পুরুষ যখন হিংসে করতে শুরু করে বোঝা যায় সে মেয়েটিকে সত্যিই ভালবাসে।

ওসব কথার কায়দা ছাড়...দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

তুমি কি রেগে গেছ, জুয়ানার চোখে কৌতুকের হাসি।

এখনো রাগিনি, তোমার জবাবের অপেক্ষা করছি।

রাগি পুরুষ আমি খুব পছন্দ করি। রাগ না হলে আবার পুরুষ মানুষ নাকি?

কেড অসহিষ্ণু গলায় বলল, দয়া করে বলবে কি রেনাদো রাজী হল কেন?

নিশ্চয়। এতে গোপন করার কিছু নেই। জুয়ানা খুব আরাম করে হেলান দিয়ে বসল। আমার বাবা ছিলেন একজন নামকরা বুলফাইটার, টমাস রোকো। বাবা রেনাদোকে উঠতে অনেক সাহায্য করেছিলেন। রেনাদো আজকে যে এত ক্ষমতাবান আর ধনী তা বাবার জন্যই অনেকটা। তাই আমি কোন সাহায্য চাইলে, রেনাদো না করতে পারে না।

কেড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। খুশী মনে জুয়ানার হাত ধরল।

তোমার বাবার কি হল?

বাবা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই ট্যাক্সকোয় একটা রুপো বেচার দোকান করেছেন বাবা। বাবা ভারি কড়া আর খিটখিটে। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলের। কিন্তু তার জন্য বাবা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন তা আমি মানতে পারছি না। মাও ঘ্যানঘ্যানে খিটখিটে। পনের বছর বয়সেই আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

তোমার বয়স কত?

সতেরো।

দু বছর আগে তুমি নিজের পরিজনকে ছেড়ে চলে গেছ?

নিজের পায়েই দাঁড়ানো ভাল।

কিন্তু কেমন করে রোজগার করেছ?

জুয়ানার চোখে উদ্বেগ আর আশঙ্কা ফুটে উঠল, তোমার কৌতূহল বড় বেশী দেখছি। পুরুষরা এসব সত্যিকথা জানতে চায়না। তারা যা সত্যি তাই বিশ্বাস করে।

কেড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। জুয়ানা কেডের হাত ধরে বলল, চল আমরা হোটেলে ফিরে যাই। বিশ্বাস কর আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে পাওয়া আমার জীবনের একটা বড় লাভ।

আমারও।

জুয়ানার মুখ খুশীতে ঝলমল করে উঠল। হাতে হাত জড়িয়ে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

।। তিন ।।

পেড্রো ডিয়াজ ছোটখাট আঁটসাট চেহারা। চৌকো ঘাড়, শক্ত শরীরটা যেন ইস্পাত আর কংক্রিটে তৈরী। শরীর থেকে পাশব শক্তি এবং অমানুষিক ক্ষমতা যেন ঠিকরে পড়ছে। মেক্সিকান হিসেবে ওর গায়ের রং রীতিমতো কালো। মুখ চোখ যেন কাটা কাটা। ডিয়াজ রীতিমতো সুদর্শন আর অহংকারী পুরুষ।

কেড যখন ওর বিরাট সুসজ্জিত হোটেল রুমে ঢুকল ডিয়াজ ওর দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে পাঁচিলের দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় কেড আসবে বলে ও ইচ্ছে করেই এই পোজে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই দাঁড়িয়ে রেজিনো ক্ল্যানোকো। ডিয়াজের খাপ ঢাকা চারটে তরোয়াল আর যুদ্ধ করবার আকাঙ্খা নাড়াচাড়া করছে। ক্ল্যানোকো ডিয়াজের তরোয়াল দেখাশোনা করে।

রেজিনো ক্ল্যানোকো ছোটোখাটো, পাতলা সুদর্শন এক তরুণ কিন্তু ওর আপাত সুশ্রী মুখের আড়ালে একটা শয়তানী যেন খেলা করছে। ওর চোখগুলি চঞ্চল, সন্দেহে ভরা। ওর ভাবভঙ্গী ঠিক একজন খুঁতখুঁতে সন্দিগ্ধ স্ত্রীলোকের মতন। ক্রিল আগে থেকেই ওর সম্পর্কে কেডকে সাবধান করে দিয়েছে।

ও ডিয়াজকে খুশী রাখে। কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব বিপজ্জনক। ডিয়াজ ওর কাছে দেবতুল্য। তবে এ নিয়ে কোন কেচ্ছা হয়নি। সবাই জানে ডিয়াজ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে ওস্তাদ। ষাঁড়ের মতন শক্তি ডিয়াজের।

একজন বিশাল চেহারার বেশ হাসিখুশি মানুষ চেয়ারে বসে কড়া চুরোট খাচ্ছিল। ইয়া ভুঁড়ি আর ইয়া গোঁফ ওর। ও হচ্ছে রেনাদো, ষাঁড়ের লড়াইয়ের ম্যানেজার। বলল, কেডের মতন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোক চিত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে সে রীতিমতো গর্বিত ও আনন্দিত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশে কেড ওকে ধন্যবাদ দিল।

তার পর কেড ডিয়াজের কাছে গেল। ডিয়াজ এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন ও হচ্ছে সম্রাট দয়া করে দর্শন দিচ্ছে মাত্র। তবে কেডের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, ও খুব তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ জয় করতে পারে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিয়াজ বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, হাসিও ফুটল ওর মুখে। কেড বুঝল ডিয়াজ তোষামোদ প্রিয়। কেড নির্লজ্জ ভাবে ওকে চাটুকারী করতে লাগল।

ক্রিল এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, এখন ও কেডের ক্যামেরাপত্র বার করতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেড ছবি তুলতে শুরু করল। সর্বদাই ও কিছু ফিল্ম নষ্ট হবে ধরে নেয়। ও জানে ও যার ছবি তুলছে সে কোন না কোন সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়বেই আর তখনই ওর ক্যামেরায় তার স্বরূপটা ধরা পড়বে। প্রায় সত্তরটা ছবি তোলার পর যে ছবিটি সে আকাঙ্খা করছিল সেটি তুলতে পারল।

ততক্ষণে ডিয়াজ ছবি তোলার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েছে। ডিয়াজ যেমন ভাবে বলেছে কেড সম্মতি জানিয়েছে। শুধু অপেক্ষা করছে অসাধারণ সেই ছবিটার জন্য। তখন তীব্র বিদ্বেষে ক্ল্যানোকো কেডের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায় জীবনে ব্যর্থ, এবং অন্যের সাফল্য সে সহ্য করতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কভাবে ক্ল্যানোকো তরোয়ালগুলোর ওপর হাত রাখল, চেয়ারের গায়ে দাঁড় করানো ছিল তলোয়ারগুলো। হঠাৎ ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে ডিয়াজ ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল। তার চোখ ক্রোধে নিষ্ঠুরতায় জ্বলে উঠেছে।

আনাড়ি উজবুক। তুমি কি দু মিনিটও চুপ করে থাকতে পার না?

সঙ্গে সঙ্গে শার্টার টিপল কেড, ও জানে এইজন্য সে প্রতীক্ষা করে ছিল যদিও এর পরে আরও গোটা কুড়ি ছবি ও তুলল। ফোটো তোলা হয়ে গেলে ডিয়াজ কেমন দুঃখিত ভাবে বলল, আপনারা আমার লড়াই দেখতে আসছেন তো?

নিশ্চয়। কেড ক্রিলকে ইশারা করল ক্যামেরা গোটাতে।

আপনার জীবনে এ এক বিরাট অভিজ্ঞতা হবে। আপনি আপনার নাতিনাতনীদেরও এই গল্প বলতে পারবেন, যে বিখ্যাত ডিয়াজকে আপনি ষাঁড় মারতে দেখেছেন।

ভাবলেশহীন মুখে কেড বলল, সে খুবই সম্মানিত বোধ করছে নিজেকে। ডিয়াজকে কথা দিল ফটোর এক কপি ওর কাছে পাঠাবে। তারপর করমর্দন করে রেনাদোর সঙ্গে হাত ঝাঁকাল।

লড়াইয়ের গোল ময়দানের দিকে যেতে যেতে ক্রিল বলল ও নির্বোধ বটে কিন্তু ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে খুব মজবুত, অসম্ভব সাহসও আছে লোকটার। যার সাহস বলেই আছে তার অনেক দোষ ক্ষমা করা যায়। আজ বিকেলে আপনি ওর আসল চেহারা দেখবেন। বছর খানেকের মধ্যেই ও ভস্‌কা হয়ে যাবে। তবে মেয়েদের বড় উৎপাত ওর জীবনে। দুটো লড়াইয়ে মজবুতি দেখাতে গিয়ে মানুষ সাধারণতঃ হেরে যায়।

কেড ক্রিলের কথা মন দিয়ে শুনছিল না। সে শুধু জুয়ানার কথা ভাবছিল। জুয়ানা সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। ও বলেছে ষাঁড়ের লড়াই ওর কাছে ক্লান্তিকর একঘেয়ে লাগে। এছাড়া বাড়িটাকেও ঠিকঠাক করতে হবে। লড়াই শেষ হলে কেডকে সোজা নতুন বাড়িতে যেতে বলেছে, ওখানেই সে কেডের জন্য অপেক্ষা করবে।

ডিয়াজ এক বিশালাকার ষাঁড়ের সঙ্গে যুজছে। ষাঁড়টা অত্যন্ত শক্তিশালী, দ্রুতগতি আর সাহসী। ক্রিল বলছিল আজকাল ভালো ষাঁড় পাওয়াই যায় না। যারা ষাঁড় প্রজন্ম করায় ও পালে তারা তেমন ভাল ষাঁড় পাঠায় না আজকাল। এখন যে সব ষাঁড় আসে, তারা ছোট, ফুর্তিবাজ কিন্তু তেমন সাহসী নয়।

ষাঁড়ের লড়াইয়ের কলাকৌশল কেড কিছুই বোঝে না। তবে এটুকু বুঝেছে এক অনন্য অসাধারণ যোদ্ধা আর প্রতিপক্ষে এক বলবান চমৎকার একটা ষাঁড়ের এ লড়াই ক্রীড়া হিসেবে অনন্যসাধারণ। সে তার সমস্ত নৈপুণ্য প্রয়োগ করে তিনশো ছবি তুলেছে। ক্রিলও ঠিক দক্ষ বন্দুকবাজের মতন একটার পর একটা ক্যামেরা ওকে যুগিয়ে যাচ্ছিল।

ষাঁড়টিকে হত্যার দৃশ্য বহুদিন কেডের স্মৃতিতে আঁকা থাকবে। তখনি বোঝা গেছে কি পাশবিক শক্তি ধরে ওই ডিয়াজ। পেশীবহুল বাহুর সবটুকু শক্তি দিয়ে ও তরোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল ষাঁড়ের শরীরে। আমূল বিঁধে গেছে তরোয়ালটা। ষাঁড়ের শরীর বালিতে গড়িয়ে পড়বার আগেই মৃত্যু ঘটে গেছে ষাঁড়টার।

এরপর ডিয়াজ উদ্ধত ভঙ্গীতে রাজার মতন মাঠের চারিদিকে হাঁটল আর দর্শকদের উল্লাস ধ্বনি শুনে মাথা নাড়ল।

ক্রিল আগেই একটা ফটোগ্রাফির দোকানের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল। সোজা ওরা চলে গেল সেখানে।

দু ঘণ্টা বাদে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল কেড, হাতে এক গোছা ভিজে প্রিন্ট।

ক্রিল আর দোকানের মালিক বীয়ার খেতে খেতে কথা বলছিল। কেডকে দেখে ওরা উঠে

দাঁড়াল।

এগুলো চলবে, ঠিক আছে।' কেড কাউন্টারের উপর প্রিন্টগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

দোকানের টেকো মালিকটার ষাঁড়ের লড়াই বেজায় অপছন্দ। কিন্তু প্রিন্টগুলো দেখতে ও শিস দিয়ে নিশ্বাস টানল। হ্যাঁ, আমি ছবিতে স্পষ্ট দেখতে পারছি ষাঁড়ের লড়াইয়ের আসল চেহারা।

এবার উদ্বেগের সঙ্গে ক্রিল বলল, ডিয়াজ খুশী হবেনা সিনর!

ওর ভাবায় কি আসে যায়? কেড প্রিন্টগুলো তুলে একটা বড় খামে ভরল। চল, বাড়ি যাই।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ক্রিল বলল, ডিয়াজ লোকটা সাংঘাতিক। তার ওপর ধনী, জনপ্রিয়। ছবি দেখে ও মোটেই খুশী হবে না। আমার কেমন মনে হচ্ছে ছবিতে ওর ষাঁড় মারার ব্যাপারটা অসম্ভব অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে।

জিনিসটা অকিঞ্চিৎকরই, কেড খুশী হয়ে বলল।

কিন্তু ডিয়াজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।

কে আমাকে বিপদে ফেলবে এসব যদি ভাবতাম তাহলে আজ টিকে থাকতে পারতাম না।

জানি সিনর, জানি, তবুও আপনাকে সাবধান না করে পারছি না।

ধন্যবাদ। পরে দেখা যাবে কি হয়।

ক্রিল ওর ভারী কাঁধটা ঝাঁকাল। তার মুখে অস্বস্তি আর হতাশা।

বুঝেছি সিনর, ডিয়াজের মতনই আপনার সাহস।

বেশ, এবার চুপ কর আর তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও।

বাড়িটা দেখে খুবই অবাক আর খুশী হল কেড।

একটা বড় হল, দুটো শোবার ঘর, দুটো বাথরুম, একটা রান্নাঘর একটা এতবড় গ্যারাজ আছে যে তাতে দুটো গাড়ি রাখা যায়। বাগানে ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে, একটা ছোট ফোয়ারা আছে আর কয়েকটা সুন্দর গাছ। বাড়ির ফার্নিচারও আধুনিক সৌখিন। জুয়ানার প্রত্যাশাদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে কেড অভিভূত হয়ে বলল, তুমি জাননা ডার্লিং বাড়িটা আমার কি পছন্দ হয়েছে। তোমার জন্য আমি এই প্রথম নিজের বাড়ি বলতে যা বোঝায় তাই পেলাম।

জুয়ানা কেডকে জড়িয়ে ধরল। এটা আমার আর তোমার বাড়ি। আর কেউ আমাদের মধ্যে আসবে না।

সেই রাতে জুয়ানার অনেক পীড়াপিড়িতেও কেড ওকে রাঁধতে দিল না। দুজনে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এল। তারপর জুয়ানাকে ডিয়াজের ছবিগুলো দেখাল। জুয়ানা প্রথমে কিছুই বলেনি। ডিয়াজ ক্ল্যানোকোর ওপর চ্যাচাচ্ছে এই ছবিটা দেখে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বিস্ময়ে। অন্যসব ছবি সরিয়ে এই ছবিটার ডিয়াজের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি সে মন দিয়ে দেখতে লাগল।

ডিয়াজকে সত্যিই এরকম দেখতে?

মুখোশটা খসে না পড়া অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, এ হচ্ছে পেড্রো ডিয়াজ। নিষ্ঠুর, নির্বোধ এই হচ্ছে ওর আসল চেহারা।

জুয়ানার কালো চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল। তোমাকে দিয়ে বাবা আমার কোন ছবি তোলার না। তারপর হেসে বলল, না এমনি ঠাট্টা করছি। তবে ডিয়াজ এই ছবি দেখে খুশী হবে না। চল, আমরা শুতে যাই। নতুন বাড়িতে এই আমাদের প্রথম রাত।

তুমি লড়াইয়ের ছবি দেখলে না?

জানি তুমি যে ছবিই তোল, অসাধারণ হয়। চল শুতে যাই। নাকি যেতে চাও না? জুয়ানার হাসিতে আমন্ত্রণ ফুটে উঠল।

পরদিন সকালে কফি খেতে খেতে কেড জিজ্ঞেস করল জুয়ানা গাড়ি চালাতে পারে কিনা?

নিশ্চয়। কেন?

এখানে তোমার একটা গাড়ি দরকার হবে। আমি খোঁজ নিচ্ছি একটা ভাল সেকেন্ড হ্যান্ড

গাড়ির।

উল্লাসে আনন্দে জুয়ানা নেচে উঠল।

—বরাবর একটা গাড়ির সাধ ছিল আমার।

কিন্তু এত টাকা আছে কি আমাদের। এই বাড়ি...

—ও নিয়ে তুমি ভেব না। এখন আমি বেরোচ্ছি। চারটের মধ্যে ফিরে আসব। যদি দরকার হয় ওলসোদার ফটোর দোকানে খোঁজ কর, আমি সেখানেই থাকব। ছবিগুলো এনলার্জ করতে হবে। আজ রাতের প্লেনেই ওগুলো পাঠাতে হবে। আমি না আসা অব্দি...

নিশ্চয়। আমি বাড়ির কাজ করব। আজ রাতে এমন চমৎকার ডিনার রাঁধব যে তুমি আমাকে বাহবা দেবেই।

কেড মানিব্যাগ খুলে পাঁচশো পেসোর নোটের তাড়া টেবিলে রাখল।

আরো দরকার হলে বোল। এ তোমারই টাকা জুয়ানা, যা খুশী করো। একটা পোষাক কিনে নিও ইচ্ছে হলে। আমার যা আছে আমরা ভাগ করে নেব।

কেড ছুটে বেরিয়ে গেল। ক্রিল পন্টিয়াক নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। এত সুখ কেড জীবনে আর পায় নি। মনে হচ্ছে তার যা কিছু আছে সব বিলিয়ে দিলে তার প্রেম সার্থক হয়।

গাড়িতে কেড ক্রিলকে বলল, তোমার সাহায্য চাই ক্রিল।

প্রথমে চাই একটা গাড়ি। থান্ডারবার্ডের বাজার দর কি এখন?

ক্রিল সমীহ করার ভঙ্গীতে বলল, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে সিনর। আমার বন্ধুর গাড়ির ব্যবসা আছে।

বিকেল তিনটের মধ্যে চাই কিন্তু।

নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।

বেশ আরেকটা কথা শোন। আমি একটা হীরের ব্রেসলেট কিনতে চাই।

ক্রীলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। প্রায় একটা ট্যাক্সিকে মেরে বসল।

ক্রিল এবার ঢোক গিলে বলল হীরে? হীরে কিনতে যে অনেক টাকা লাগে সিনর

টাকার কথা রাখ। হীরের ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

এ শহরে টাকা ফেললে কীসের না ব্যবস্থা করা যায়। আমার একটি বন্ধু হীরের খোঁজখবর রাখে। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ফটোর দোকানের সামনে গাড়ি রাখল ক্রিল।

গাড়ি আর ব্রেসলেট নিয়ে তিনটের সময় এখানে চলে এস।

নিশ্চয় সিনর। ক্রিল টুপি তুলে সম্মান জানাল।

তুমি খুব ভালো অ্যাডোলফো।

ক্রিল বলল, মাদাম খুবই রূপসী। কিন্তু আমি হলাম সাধারণ সাদামাটা লোক। আপনার কাজে লাগতে পারছি বলে আমি খুবই খুশী। কিন্তু কি জানেন, সোনাও ব্যবহার করতে করতে ক্ষয়ে যায়।

কেড হেসে দোকানে ঢুকল। টমাস ওলমোদা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। আড়াইটের মধ্যে প্রিন্ট শেষ করে স্যাম ওয়ান্ডকে পাঠাবার জন্য ফোটোগুলো প্যাকেটে ভরে ফেলল কেড। পেড্রো ডিয়াজের জন্য যে ছবিগুলো ডিয়াজকে ভাল দেখিয়েছে সেইগুলো বেছে বেছে আলাদা একটা প্যাকেটে ভরল। ওলমোদা বলল ওর সহকারী একটা ছেলেকে দিয়ে হোটেল ডি টেরোতে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেবে।

ক্রীলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কেড সকালের কাগজটা তুলে নিল।

কাগজের প্রথম পাতায় একটা ছবি। তার নীচে লেখা, বিখ্যাত জাহাজ স্বত্বাধিকারী ম্যানুয়েল ব্যারেডা গতকাল সকালে মারা গিয়েছেন। সম্প্রতি হার্ট অ্যাটাকের পর অ্যাকাপুলকোয় একটি সম্ভ্রান্ত হোটেলে সিনর ব্যারেডা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছিলেন। তিনি...।

কেডের হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল মাটিতে। সমস্ত শরীরটা যেন ওর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদি কেড ব্যারেডার কাছ থেকে জুয়ানাকে না কেড়ে নিতে সিনর ব্যারেডা নিশ্চয়

বেঁচে থাকতেন। কেডই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। কেড তাড়াতাড়ি ফোন করল জুয়ানাকে।

কাগজ দেখেছ আজকের? কেড প্রশ্ন করল।

সোনা, কাগজ দেখার সময় কোথায় আমার। কেন?

কাল সকালে সিনর ব্যারেডা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গিয়েছেন।

একটু থেমে জুয়ানা বলল, মারা গেছে? দাঁড়াও উনোনে কি যেন পুড়ছে। তুমি...'

কেড চীৎকার করে বলল, শুনছ, উনি মারা গেছেন। আমরাই ওকে মেরেছি।'

কিন্তু ডার্লিং ওর বয়েস হয়েছিল, অসুখে ভুগছিল। আমরা কোথায় ওকে মারলাম। তুমি যেন বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছ?

তোমার কিছু হচ্ছে না, জুয়ানা?

আমার খারাপ লাগছে ঠিকই, কিন্তু...

ওর সঙ্গে আমাদের এরকম করা ঠিক হয় নি জুয়ানা।

জুয়ানা সংক্ষেপে বলল, একদিন না একদিন ওকে মরতেই হত। এই নিয়ে মন খারাপ কর না। আমি যাই নইলে এমন চমৎকার ডিনারটা নষ্ট হবে।

কেড বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ভাবছে আমারও তো ঠিক এরকমই মৃত্যু ঘটতে পারে। কাল, পরশু অথবা একবছর বাদে জুয়ানার জীবনে যদি অন্য কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে! জুয়ানা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে সেই পুরুষের জীবনে প্রবেশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্বাসরোধকারী ভয় কেডকে একদম অবশ করে দিল। না না সে জুয়ানাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। কেডের ভালবাসা যেমন উন্মত্ত জুয়ানারও তাই। তাহলে এখন তাদের বিয়ে করে ফেলতে বাধা কোথায়?

চারটের একটু পরে কেড একটা ঝকমকে লাল থান্ডারবার্ড চালিয়ে বাড়ি এল।

ছটার একটু পরে ওরা বাগানের দোলনায় পাশাপাশি বসেছিল। জুয়ানা যেরকম দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালিয়েছে তা দেখে কেড অবাক হয়ে গেছে। গাড়ি আর হীরের ব্রেসলেট দেখে জুয়ানা এত খুশী হয়েছে যে আনন্দে কেঁদে ফেলেছে। আর কেডকে পুরস্কার দিয়েছে অনেক।

দশটার সময় মোমের আলোয় ডিনার খেতে বসেছিল কেড আর জুয়ানা। জুয়ানা হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে মেক্সিকানদের উৎসবে যা যা রান্না হয় তা করে ফেলেছে।

খাওয়া শেষ হলে জুয়ানা উৎসুক চোখে কেডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন রেধেছি বল তো? তোমার ভাল লেগেছে। মোমের আলোয় ওর হীরের ব্রেসলেট ঝকমক করছিল।

কেড মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, জুয়ানা তুমি যা কর তা সুন্দর হতে বাধ্য। তুমি সৌন্দর্যের প্রতিমা।

জুয়ানা আনন্দে লাফিয়ে বলল, চল আমরা এখন পিরামিড অফ দি মুনে যাব। এমন চাঁদের আলোয় পিরামিড দেখাটা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ওরা আধঘণ্টার মধ্যে সান জুয়ান টিওটিহুয়াকানে চলে এল। সে এক মহান দৃশ্য। কুড়ি মাইল জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

মেক্সিকো উপত্যকার প্রাচীনতম কীর্তি পিরামিড অফ দি মুনের পায়ের কাছে একটি নতজানু স্ত্রীলোকের মূর্তি আছে। লোকে বলে ওটা জলদেবীর মূর্তি। তারই পাশে দাঁড়িয়ে কেড জুয়ানাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। এই কথা বলার জন্য এমন রোমান্টিক আর নাটকীয় পরিবেশ আর হয় না। কেড জানে এটা তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, তার সমস্ত ভবিষ্যতের সুখ নির্ভর করছে জুয়ানার একটা 'হ্যাঁ' বলার উপর। সে দুরুদুরু বক্ষে জুয়ানার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। জুয়ানা কেডের হাত ধরে বলল, তুমি তোমাব মন ভাল করে বুঝে একথা আমায় বলছো তো? আমাকে কেউ কোনদিন স্ত্রী হতে বলে নি। আমিও তো তাই চাই। তুমি কি সত্যিই তাই চাও? তুমি যদি আমাকে না বিয়ে কর আমি তবুও তোমাকে ভালবাসবই। তুমি তোমার মন ঠিক জান?

কেড বিয়ে করতেই চায়, সে শিশুর মতন বিয়ের পবিত্রতাতে বিশ্বাস করে। সে মনে করে একমাত্র বিয়ে হলেই জুয়ানার সাথে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক হওয়া সম্ভব। বিয়ে হলে জুয়ানা কিছুতেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে না।

ওই সপ্তাহের শেষেই ওরা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলল। কেড নিজেকে খুব নিশ্চিত হালকা অনুভব করল। ওরা কেউ আর ব্যারেডার কথা উল্লেখ করে নি। কিন্তু ব্যারেডার কথা মনে পড়তেই কেডের খুব অস্বস্তি হয়েছে। জুয়ানা বিয়েতে কোন আড়ম্বর চায় না। শুধু কোজুমিলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চায়। জুয়ানা বলল ওর দিকের সাক্ষী হবে একটি মেয়ে। কেড অ্যাডোলফো ক্রিলকে ওর সাক্ষী হতে অনুরোধ করল। মোটা মেক্সিকানটি তো এ সম্মানে অভিভূত হয়ে পড়ল। কেডের সুখশান্তি কামনা করতে কবতে ও কেঁদেই ফেলল।

কেডের সুখের যেন শেষ নেই। জুয়ানা শুধু ভাল রাঁধতেই জানে না সে অত্যন্ত নিপুণভাবে সংসার চালাতে পারে একদিনেই কেড তা বুঝে গেল।

পরদিন সকালেই বিয়ে। ওরা মধুচন্দ্রিমাতে যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছিল। এমন সময় নিউইয়র্ক থেকে ওয়াল্ডের টেলিফোন এল।

সবাই ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি দেখে একেবারে অভিভূত। বলতে দ্বিধা নেই ভ্যাল এ যাবৎ যত ছবি তুলেছ, এ একেবারে সবার সেরা। এখন কি করছ? ফিরে আসছ? তাহলে কাজের ব্যবস্থা করে রাখব।

কাল সকালে আমি বিয়ে করছি, কেড ভাবল স্যাম ওয়াল্ডের মুখটা যদি ও একবার দেখতে পারত।

আরে আরে, ওয়াল্ড চেঁচিয়ে উঠল। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। যাঃ তুমি ঠাট্টা করছ।

কেড ওকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলল সে সত্যিই বিয়ে করছে।

যাক শুনে আমাব একটু কষ্ট হচ্ছে। তবে তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। কি করছ তা জেনে বুঝে এগোচ্ছ তো?

ওদের মধুচন্দ্রিমা তেমন জমল না। আসলে আমেরিকান টুরিস্টরা জুয়ানার দিকে এতো মনযোগ দিচ্ছিল যে কেড রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। জুয়ানা খুব কৌতুক অনুভব করছিল কিন্তু কেডের বিরক্তি বাড়ছিল। নাচ-ঘরেও কেড জুয়ানাকে কাছে পাচ্ছিল না। সমানে কেউ না কেউ জুয়ানাকে নাচের সঙ্গী হতে অনুরোধ করছিল। শেষমেষ এমন অবস্থা হল যে কেড বলল দিনের বেশীর ভাগ সময়টা ওরা ব্যালকনিতে লাউঞ্জ চেয়ারে শুয়ে কাটাবে। তাতে আবার জুয়ানার আপত্তি। অবশেষে দশদিন না যেতেই ওরা মধুচন্দ্রিমা বাদ দিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে আসবে ঠিক করল।

কেড দেখল বিয়ে জিনিসটা যদিও খুব চমৎকার কিন্তু ও আর আগের মতন স্বাধীন নেই। আগে ও রাস্তায় রাস্তায় ওর ফটোগ্রাফির জন্য নতুন বিষয় খুঁজে বেড়াত। কোন চিত্তাকর্ষক মুখ, নতুন দৃষ্টিকোণ, কোন আলোর খেলা। কিন্তু জুয়ানা ওর সঙ্গে থাকে বলে ও কিছুতে মনযোগ দিতে পারে না। জুয়ানা হাঁটতে ভালবাসে না। ও ওব থান্ডারবার্ড ছাড়তেই চায় না। কেড ওকে যতই বোঝাক যে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে গাড়ি ছোটালে ওর ভবিষ্যতে নতুন নতুন ছবি তোলা খুবই কঠিন হবে, জুয়ানা তার কথায় কর্ণপাত করে না। তাই ফিরে আসবার পাঁচদিন বাদে কেড স্থির করল সে এবার নতুন কাজে হাত দেবে। স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল কেড।

ফোন ধরেই ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম, কি ভায়া! তোমার ফোনের জন্যই বসে আছি। কেমন কাটল হনিমুন।

কেড বলল, ভালই কেটেছে।

এখনও কি নেশার মধ্যেই আছে।

কেডের এসব তামাসা ভাল লাগল না। ও বলল, কোন কাজের কথা আছে? আমি তৈরী।

একটা কাজ আছে তুমি করতে পার। বিশেষ টাকাপয়সা দেবে না। তিনশো ডলার আর অন্যান্য খরচাপাতি, তবে তোমার টাকাপয়সার যা হাল, তিনশো ডলার তোমার কাজেই লাগবে।

এ কথার মানে কি?

তুমি আমায় ভাবনায় ফেলেছে ভ্যাল। তোমার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার কাছে এসেছিল। তোমার অ্যাকাউন্টে চার হাজার ডলার ঘাটতি পড়েছে। আমি বললাম কিছু বন্ড বিক্রী করতে, কিন্তু তোমার জন্য আর কিছু নেই।

কেড উদ্বিগ্ন হল। ও টাকাপয়সার ব্যাপারে বরাবরই অসাবধান। এনিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের

সঙ্গে ওর খিটিমিটি লেগেই থাকত। শেষে ওয়াল্ডই বলে কয়ে তার অ্যাকাউন্ট দেখাশোনার ভার নেয়।

ওয়াল্ড বলেছিল সবচেয়ে ভাল হয় যদি কেড কয়েকটা বন্ড কিনে রাখতে পারে আর অ্যাকাউন্টে খরচ খরচার জন্য এক হাজার ডলার রাখে। হাজার ডলার ফুরিয়ে গেলে ও একটা বন্ড বেচতে পারে। আবার ছবি বেচে আর একটা বন্ড কিনতে পারে। তাছাড়া টাকায় টাকা আসবে। কেড রাজী হয়েছিল!

ওয়াল্ড বলল, এক মাস আগেও তোমার চল্লিশ হাজার বন্ড ছিল। এরমধ্যেই সব বেচে খেয়েছো?

কেড ঘন ঘন মাথায় আঙুল চালাতে লাগল। অনেকদিন ধরে ওর একটা অভ্যাস চেকের পেছনে লিখে দেওয়া, অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকলে, বন্ড বিক্রী করুন। কেড জানে ওর অজস্র বন্ড আছে, তাই অত হিসেব রাখত না। একটু ভয়ে ভয়ে ইদানীং ও যা খরচা করেছে তার একটা মোটামুটি হিসেব করল। থান্ডারবার্ড গাড়িটা কিনেছে। হীরের ব্রেসলেট কিনেছে। বাড়ির একমাসের ভাড়া আগাম দিয়েছে। জুয়ানাকে সিল্কের স্টোল কিনে দিয়েছে। দশ দিন ধরে কোজুমেলের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছে। তবুও চল্লিশ হাজার ডলার খরচ হয়ে গেল?

ফোন ধরে আছ না ছেড়ে দিয়েছ? ওয়াল্ড অধীর ভাবে জিজ্ঞেস করল।

একমিনিট চুপ কর। আমি ভাবতে চেষ্টা করছি।

সত্যিই তো যা খরচ করেছে তাত চল্লিশ হাজার ডলার হয়ই। খুব ধাক্কা খেল কেড, সে ঘামতে শুরু করল।

স্যাম, ওরা কি ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলোর টাকা দিয়েছে? তিনহাজার ডলার দেবার কথা ছিল...

দিয়েছে এবং তুমি দশদিন আগেই তা খরচা করে ফেলেছ। কি হচ্ছে বল তো, ঈশ্বরের দোহাই কি হচ্ছে আমায় বলবে।

তুমি বললে না চার হাজার ঘাটতি পড়েছে?

হ্যাঁ। এখন শোন...।

এক মিনিট ধর...

কেড কাগজে হিসেব করতে শুরু করল। কোজুমেলে ও গাড়ি আর মোটরবোট ভাড়া করেছিল। জলের নীচে সাঁতার দেবার জন্য স্বচ্ছন্দে ডুবুরীর পোষাক ভাড়া করা চলত, কিন্তু কেড তা কিনেছে। তা ছাড়া জুয়ানা একটা রুপোর টি-সেট চেয়েছিল তাও কিনে দিয়েছে কেড। ইস্ জুয়ানাকে নিরস্ত করা উচিত ছিল কেডের। রুপোর টি-সেট ও কি ব্যবহার করবে?

কেড বলল, স্যাম, তুমি কিছু স্টক বিক্রী কর। ব্যাঙ্কের ওভার ড্রাফট মেটাতে, আমার খরচ চালাতে এখন হাজার দশেক ডলার ব্যাঙ্কে থাকা দরকার। করবে তো?

আরে বাজার খুব মন্দা যে। এখন বেচার সময় নয়, কেনার সময়।

যা হয় বেচ। আমার দশ হাজার ডলার চাই।

বেশ। তোমার কি স্টক আছে দেখব, যা পারি করব।

কেডের মনটা একটু হালকা হল।

এখন কাজের কথা শোন। বোস্টনের আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম মেক্সিকোর চিফেন-ইজো আর উক্সমলের ধ্বংসস্তূপের একসেট নতুন ফটো চায়। আমি আমার পুরনো ছবিগুলোর কপি আর প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়ে দেব। ওরা তোমার হাতে তোলা ছবি চায়। কি বল?

এই তো য়ুকাতান থেকে ফিরলাম।

সেটা কি আমার দোষ। তুমি তো আমায় জানাওনি তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তিনশো ডলার আর খরচখরচা দেবে?

হ্যাঁ। কিন্তু দুজনের যাওয়া আসার খরচা দিতে পারব না। যদি বউকে নিয়ে যেতে হয় ওর ভাড়া তোমাকে দিতে হবে। কাজটার এক সপ্তাহ মতো সময় লাগবে।

এক সপ্তাহের কাজ করে তিনশো ডলার। গোল্লায় যাক ওরা।

ভ্যাল, অপরিণতের মত কথা বোল না। এ টাকাটা তোমার দরকার।

ওয়ান্ড ওকে এভাবে কোনদিনও কথা বলেনি। একটু ইতস্ততঃ করে কেড বলল, ঠিক আছে। ছবি দিলেই টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাব তো?

নিশ্চয়। আচ্ছা, ফোন রাখছি এখন। কেড রান্নাঘরে গিয়ে দেখল জুয়ানা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। বলল, ওয়ান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। একটা কাজ ঠিক হয়েছে। মেরিডায় ফিরে যেতে হবে।

জুয়ানা ভ্রূ কোঁচকাল।

কাজটা কি করতেই হবে?

আরে কাজ তো, হাজার হলেও।

কখন?

এই সপ্তাহের শেষাশেষি।

ঠিক আছে। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না তো?

না মানে আমি একাই যাচ্ছি। কাজটা জটিল, ঝামেলার ব্যাপার। আমাকে মন দিতে হবে ভালো করে।

জুয়ানা অবাক হয়ে বলল, তার মানে তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাও না?।

না তা নয়। আমার কাজের ধরণটা এরকম। এক সপ্তাহ আমি থাকব না, তুমি কি করবে ডার্লিং?

আমি তোমার সঙ্গে গেলেই ভালো হত। দিনের বেলায় তুমি না হয় কাজ করতে রাতেব বেলা তো আমবা একসঙ্গে থাকতে পারতাম।

কেড একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ওরা আমার একার খরচ দিচ্ছে।

জুয়ানার কালো চোখ হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে আমাদের অনেক টাকা আছে।

আছে। তা বলেই কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খরচ করতে হবে নাকি। আমার এখন একটু টানাটানি যাচ্ছে, তবে দুমাসের মধ্যেই আমি রয়্যালটি পাব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি তোমার খুব খরচ করিয়ে দিচ্ছি না?

দেখ তুমি ঘর সামলাও, আমি টাকাপয়সার ব্যাপার দেখবো। দু মাস বাদে আমরা আবার বেড়াতে যাব।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কেড ছুটে গিয়ে ফোন ধরল, তোমার স্টকের হিসেব দেখলাম। এখন বেচলে তিরিশ পার্সেন্ট লস দিচ্ছ তুমি?

চুলোয় যাক। ব্যাঙ্ককে বলা যাক লোন দিতে।

আরে তুমি কি খবরের কাগজে পড় না। লোনের ব্যাপারে এখন দারুণ কড়াকড়ি চলছে। লোন পাবে না।

কেডের অসম্ভব বিরক্তি বোধ হল। এমনিতেই টাকার জন্য মাথা ঘামাতে ওর চিরকাল খারাপ লাগে।

বেশ। নিজেদের মধ্যে তিরিশ পার্সেন্ট লোকসানে কি এসে যায় বল? বিক্রী করে দাও তুমি। আমার টাকার দরকার।

অত টাকার কি দরকার তোমার। ওভারড্রাফটের টাকাটা মিটিয়ে দাও আব ব্যাঙ্কে দু হাজার ডলার রেখে চালাও না যতদিন না রয়্যালটি পাও?

দাও এ ছাই স্টক বিক্রী করে। আমি অত টেনেটুনে চালাতে পারছি না। কেড ফোন ছেড়ে দিল।

এখন টাকার টান পড়েছে বলে কেড খরচের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে হয়ে উঠল। থান্ডারবার্ডেব জন্য পেট্রোল, রেফ্রিজারেটর মেরামতি, এক ডজন হোয়াইট হর্স হুইস্কির বিল, সব জমা পড়ছে। বেপেরোয়া ভাবে এক শিশি 'জয়' এসেন্স কিনেছিল? এখন আফশোষ হচ্ছে। ওলমোদো বিল পাঠিয়েছে ওর ডার্করুম ভাড়া করার জন্য। জুয়ানার চার জোড়া জুতোর বিল। জীবনে এই প্রথম

হিসেব করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কেডের। টাকা এত দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ও রীতিমতো ভয় পেয়ে যাচ্ছিল।

জুয়ানা গাড়ি চালিয়ে কেডকে মেরিডা যাবার প্লেনে তুলে দিল। কেডের বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ তারও লেগেছে। প্রায় কথা না বলেই এরা সারা পথটা এসেছে। এয়ারপোর্টের কাছে আসতে কেড বলল, আমি না থাকলে তুমি কি করবে ডার্লিং।

যা হয় করে সময় কাটাব। তোমার সঙ্গে গেলেই ভাল করতাম। আমার খুব মন খারাপ লাগবে।

কেড বলল, রোজ সন্ধ্যায় তোমায় ফোন করব। আজ রাত আটটায় ফোন করব।'

য়ুক্সমালে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কেড ক্রিলের টেলিফোন পেল।

ওখানে পৌঁছে কেড ভাবল টাকাপয়সা নিয়ে এত উতলা না হলেই সে পারত। জুয়ানার জন্য ওর খুবই মন খারাপ করছে। সন্ধ্যার পর ধ্বংসস্তুপের ছবি তোলার মতন আলো থাকে না। তাই সন্ধ্যাবেলাগুলোতে ওর নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে। আগের সন্ধ্যায় ও জুয়ানার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে এক ঘণ্টা। আজও ফোন করতেই যাচ্ছিল, এমন সময় ক্রীলের ফোন এল।

আপনাকে জানানো দরকার সিনর, আজ সকালে আপনার ষাড়ের লড়াইয়ের ছবিশুদ্ধ ম্যাগাজিনগুলো পৌঁছেছে।

তাতে কি হল? কেড অধীর হয়ে ঘড়ি দেখল। জুয়ানা তার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে।

এখানে সবাই খুব চটে গেছে। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম ডিয়াজ এখানে খুবই জনপ্রিয়। সবাই খেপে আছে।

তা আমাকে কি করতে হবে? মাথা চাপড়ে কাঁদতে হবে?

আমার মনে হল আপনাকে আমার জানানো দরকার যে আজ বিকেলে কেউ আমার গাড়ির চারটে টায়ার কেটে দিয়েছে। এমন কেউ করেছে যে জানে আপনাকে আমি ছবিগুলো তুলতে সাহায্য করেছি?

কেড সচকিত হয়ে উঠল। আমি দুঃখিত অ্যাডাল্‌ফো? তুমি জান কে এ কাজ করেছে।

আমার মনে হয় ক্ল্যানোকো। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম ও ডিয়াজকে দেবতা মনে করে?

আমি খুবই দুঃখিত। তুমি নতুন টায়ার কিনে নাও। আমার নামে বিল করো।

না, না, তা বলছি না আমি। আমি শুধু আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি সিনর। আপনার ওরা ক্ষতি করবে আমার ধারণা। আপনি সাবধানে থাকবেন।

গোল্লায় যাক ওরা। আমায় কিছু করলে ওদের মাথা ভেঙ্গে দেব আমি। শোন তুমি টায়ার কেন, আমার নামে বিল পাঠাও।

অনেক ধন্যবাদ সিনর, তবে সাবধান সিনর। ভালই হয়েছে আপনি এখন এখানে নেই। আপনি ফিরে আসতে আসতে এদের রোষ অনেকটা কমে যাবে।

হঠাৎ জুয়ানার কথা মনে হল কেডের।

আমার স্ত্রীর কিছু হবে না তো অ্যাডোলফো? কেড সাংঘাতিক ঘাবড়ে ফোনের রিসিভারটা আঁকড়ে ধরল।

ক্রিল হাসল। না সিনর, সিনোরা কেড একদমই নিরাপদ, কেন না উনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন। তার ওপর উনি মেক্সিকান, তার উপর অপূর্ব সুন্দরী।

কেড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঠিক বলছো তো?

ঠিক না জানলে আমি আপনাকে এ কথা বলতামই না। কিন্তু আপনি সাবধানে থাকবেন, সিনর, আপনার জন্য আমার খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি সতর্ক থাকব, তোমায় কথা দিচ্ছি। ও ফোন ছেড়ে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে ও জুয়ানাকে ফোন করল। জুয়ানা ফোন ধরল একটু দেরী করে।

ক্রিলের কথাগুলো কেড জুয়ানাকে বলল। নিজের কথা ভাবছি না আমি, কিন্তু তুমি একলা আছ। বড় চিন্তা হচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা কর না। আমি রেনাদোর সঙ্গে কথা বলব। ও বদমাসটাকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। তোমার খবর কি বল? কেড হঠাৎ উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠল। ও যেন শুনল একজন পুরুষ কি বলে উঠল। ডার্লিং তুমি কথা বলছ না কেন? জুয়ানা বলল। কেড কান পেতে আবার শোনার চেষ্টা করল। না, এবার কোন আওয়াজ ভেসে এল না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানকার কাজ ঠিকই চলছে। তোমার ঘরে কি কেউ আছে জুয়ানা?

আমার এখানে না তো, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

মনে হল একটা লোক তোমার সঙ্গে কথা বলল।

জুয়ানা হেসে উঠল, ও তো রেডিও। একটা নাটক শুনছিলাম। এখনি রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম।

কেড জোরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তুমি কি করছ একা একা? জুয়ানা অনেকক্ষণ বকরবকর করল, তারপর বলল, না তোমার আর পয়সা নষ্ট করা উচিৎ হবে না। গুডনাইট ডার্লিং।

নীচে রেস্টুরেন্টে যেতে যেতে কেড উপলব্ধি করল জুয়ানা তার কতখানি জুড়ে আছে। কী নিঃসঙ্গ কী একাকী যে লাগছে নিজেকে। ওয়েটারকে বলতে ওয়েটার কেডকে একটা খবরের কাগজ এনে দিল। খেতে খেতে কেড কাগজ পড়তে লাগল। খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে ও রেডিও আর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে স্তব্ধ হয়ে গেল কেড, হাত থেমে গেল তার। আজ মেক্সিকো রেডিয়োতে কোন নাটকের প্রোগ্রামই নেই! কেডের মন ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। এখন ও নিশ্চিত যে পুরুষ কণ্ঠই সে শুনতে পেয়েছিল জুয়ানার ঘরে। এর মধ্যেই জুয়ানা ওর সাথে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করেছে? মনের অস্থির যন্ত্রণা থামাতে ও প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল সবটাই তার কল্পনা। কেউ ছিল না জুয়ানার ঘরে। কিন্তু জুয়ানা কেন প্রোগ্রাম নিয়ে মিছে কথা বলল! ঘরে ফিরে এসেই ও জুয়ানার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। তখন দশটা বাজে। অপারেটর মেয়েটি বলল, ওদিক থেকে কেউ ফোন ধরছে না। কেড ওকে আবার চেষ্টা করতে বলল। আর অসহ্য রাগে যন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওয়েটারকে বলল এক বোতল টেকুইলা, বরফ ও লেবু আনতে। কত কি তার মনে আসতে লাগল, এখন নিশ্চয়ই জুয়ানা তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে রয়েছে। যত ভাবছে তত মাথা পাগল পাগল লাগছে তার।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল। টেকুইলার বোতল অর্ধেক খালি কেড প্রায় পুরো মাতাল। অপারেটর মেয়েটিকে কিছুক্ষণ পরপরই বলছে কি হচ্ছে ওদিকে। বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ফোন বেজে উঠল। কেড টলতে টলতে রিসিভার ধরল, কোন চুলোয় গিয়েছিলে? তীব্র ক্রোধে কেড বলে উঠল। অপর প্রান্তে জুয়ানা 'হ্যালো' বলতেই।

তুমি কথা বলছ। কি মজা। এইমাত্র তোমার কথা ভাবছিলাম।

কোথায় গিয়েছিলে? কেড প্রায় চেঁচাতে লাগল।

খোঁজ করেছিলে নাকি। আনা এসেছিল, আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম। আনা সেই বিয়ের সাক্ষী মেয়েটা।

মিথ্যে কথা বল না। তুমি কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছিলে...কে?

জুয়ানা নিশ্বাস টানল জোরে। ভ্যাল তুমি কি মদ খাচ্ছ নাকি?

তাতে তোমার কি? বল ওই পুরুষটা কে।

কোন পুরুষই আসেনি। আমি আনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বিশ্বাস না হয় আনাকে ফোন কর। ওর ফোন নম্বর দিচ্ছি তোমাকে।

আমি আসছি। কাল একটা হেস্তনেস্ত করব। কেড দুম করে ফোন নামিয়ে রাখল। কম্পিত হাতে কেড গ্লাসে দু ইঞ্চি টেকুইলা ভরে খেয়ে নিল এক ঢোকে। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপরই হাতের গ্লাস হাত থেকে পিছলে গেল আর ও বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল কেডের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ও পরপর চারটে

অ্যাসপিরিনের বড়ি খেল। কিন্তু মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতেই লাগল। তারপরে ঠাণ্ডা জল খেয়ে পরপর তিন পেয়ালা কফি খেল। এবার একটু স্থির হয়ে চিন্তা করতে লাগল সে কি করবে। জুয়ানা মিথ্যে কথা বলেছে তার কোন সন্দেহই নেই। ওর মনে হল এক্ষুণি ও জুয়ানার কাছে ছুটে গিয়ে কৈফিয়ৎ চায় কেন জুয়ানা তাকে মিথ্যে বলল, মিউজিয়ামের কাজ চুলোয় যাক। মনের শান্তির কাছে তিনশো ডলার কি? কিছুই না। সে তাড়াতাড়ি হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল আর প্রায় ছুটে এয়ারপোর্টে চলে এল। মাঝপথে কাজটা ছেড়ে দিলে স্যাম ওয়াল্ড কি বলবে তাকে? ভেবে উদ্বিগ্ন হল কেড। হঠাৎ তার মনে হল কাজটা শেষ না করায় সে প্লেনের যাওয়া আসার ভাড়া আর হোটেল বিলের টাকাও পাবে না। ইস্ এই সময় এত বাজে খরচা হয়ে গেল। মনটা তেতো হয়ে গেল। জুয়ানা ওর জন্যেই বসে ছিল। মুখ সাদা, মনে হয় সারারাত ঘুমায় নি। কেড রুক্ষ গলায় বলল, একটা ফয়সালা হয়ে যাক। আমি তোমার ঘরে স্পষ্ট একটা পুরুষের গলা পেয়েছি। কাল রাতে রেডিয়োতে কোন নাটকের প্রোগ্রামও ছিল না। এতেই প্রমাণ হয় তুমি মিথ্যেবাদী।

জুয়ানা ওর দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বলল, জানই যদি আমি মিথ্যেবাদী তাহলে ফিরে এলে কেন?

কেডের মনে ভয় আঁকড়ে ধরল।

ফিরে এলাম কেন? কী বলছ তুমি। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই?

কোন কৈফিয়ৎ দেব না আমি। আমি নাটক শুনছিলাম, তার জন্য কৈফিয়ৎ দেব কেন?

মিথ্যে কথা। কোন নাটক শুনছিলে তুমি? নাটকের নাম কি?

জুয়ানা উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। ওর কালো চোখে আগুন ঝরতে লাগল।

নাটকটা ছিল 'য়ু কানট টেক ইট উইথ য়ু'। নিউ অরলিয়েনস থেকে শর্টওয়েভে শোনা যাচ্ছিল। ক্রিলকে বল, তোমাকে খবর দিয়ে দেবে। তুমি অসম্ভব নির্বোধ, সন্দিগ্ধচিত্ত আর নিষ্ঠুর। আমি তোমায় ভালবাসি না।

কেডের ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গেল। জুয়ানাকে সে যেতে দিতে পারে না। কেড উদ্ভ্রান্ত ভাবে 'জুয়ানা, জুয়ানা' ডাকতে ডাকতে ওর পেছন পেছন ছুটতে লাগল।

।। চার ।।

জুয়ানার মন ফেরাতে রাত হয়ে গেছে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ শোবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করেছে কেড। বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

আমি মিথ্যেবাদী। তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, আমায় ভালবাস না। জুয়ানা রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে।

অনেক অনুনয় বিনয় করে প্রায় নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার পর জুয়ানার মন একটু নরম হল।

জান আমি কাল সারারাত ঘুমাই নি। তুমি আমাকে ভীষণ আঘাত করেছ। তুমি খারাপ, খুব খারাপ।

বিশ্বাস কর আর কখনও এরকম হবে না। শেষমেষ জুয়ানা কেডের বাহুতে ধরা দিয়েছে। কেড হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার ওরা নেগ্রুই রেস্টুরেন্টে খেতে গেল। আবার কেড শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। খরচের কথা খেয়াল করলই না। তার তো ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড আছে। পরে দেখা যাবে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে কেড ঠিক করল জুয়ানার মন পেতে ও ওকে একটা উপহার দেবে। একটা ওমেগা স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি। এখনো কিছু স্টক বাকি আছে তার। তিন মাসের মধ্যে রয়্যালটির টাকাও পেয়ে যাবে।

পরদিন ক্রিলকে কেড ফোন করে বলল একটা ঘড়ি দেখতে। ক্রিল বলল বিকেলের মধ্যেই ও ঘড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর কেড ভয়ে ভয়ে স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল।

স্যাম আমি য়ুকাতানে যাচ্ছি না। তোমাকে ছবিগুলি ফেরত পাঠাচ্ছি। মানে যাওয়া আসার পরিশ্রম আর খরচা উঠবে না স্যাম। আর কোন কাজের কথা থাকলে বল।

ওয়াল্ড বিরক্ত হল, আমি ওদের বলেছিলাম তুমি রাজী আছ...।

অন্য কোন কাজের খবর স্যাম?

ঠিক এখনি কিছু হাতে নেই তবে হ্যারি জ্যাকসনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ও তোমার ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলো দেখে একদম পাগল হয়ে গেছে। ও 'লাইফ' ম্যাগাজিনের সঙ্গে কথা বলেছে। নিউ অরলিয়নসের ডিক্সি র‍্যান্ডের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখার কথা হয়েছে। যদি ডিলটা হয়, তোমাকে ছবি তুলতে হবে। কাজটায় ভাল টাকা থাকবে ভ্যাল, কাল তোমায় সঠিক জানাব।'

বেশ। আরেকটা কথা আরো কিছু স্টক বেচে দাও আমার। আমার পাঁচ হাজার ডলার দরকার।

দোহাই তোমার। তোমাকে তো বলেছি...

স্যাম মনে রেখ টাকাটা আমার।

জানি এটা তোমার টাকা কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে তোমার ভ্যাল? তোমার একুশ হাজার ডলারের স্টক আছে এখন বেচলে মোটে ১৫ হাজার ডলার পাবে।

রয়্যালটি তো পাব?

শোন ভ্যাল...

পাঁচ হাজার ডলার আমার চাই। বলে ফোন রেখে দিল কেড।

ঘড়িটি ঠিক সময়ে এল। অপূর্ব অপরূপ ঘড়িটি, আগাগোড়া হীরে বসানো। কেড জানে এটা পেলে জুয়ানা যেমন খুশী হবে আর কিছুতে নয়। তাই-ই হল। সেই রাতে কেডের ভাগ্য খুবই প্রসন্ন হল। দুজনের মধ্যে ভালবাসা যেন উপচে পড়ছিল।

স্যাম ওয়াল্ড তারপর দিন সকালে ফোন করে বলল, নিউ অরলিয়নসের কাজটা ঠিক হয়ে গেছে। আর সে কেডের স্টক চল্লিশ পার্সেন্ট লোকসান দিয়ে বেচে দিয়েছে। স্যাম আরও বলল, শুক্রবার জ্যাকসন নিউ অরলিয়নসের ফনটেন ব্লু মোটর হোটেলে থাকবে। এটা সিন্ডিকেটের কাজ। তুমি হয়তো নয় হাজার ডলার পর্যন্ত পেতে পারো! শুনে যারপরনাই আনন্দ হল কেডের। আমি ঠিক পৌঁছে সব—স্যাম, ধন্যবাদ।

ও জুয়ানাকে ছুটে গিয়ে বলল ওরা শুক্রবার নিউ অরলিয়নসে যাচ্ছে। জুয়ানাও খুব খুশী হল। তারপরেই কেড ক্রিলকে বলল ট্রেনে সীট রিজার্ভ করতে। আর হোটেলে একটা বড় ঘর বুক করতে। ডিনারের পর কেড বলল চল একটু গাড়িতে ঘুরে আসি। জুয়ানাতো থান্ডারবার্ড চালানোর একটা সুযোগ পেলেই হয়। ও লাফিয়ে উঠল।

একসঙ্গে বেরিয়ে ওরা গ্যারেজের কাছে এল। এবং অকস্মাৎ গ্যারেজের কাছে একটা গাছের ঝোপ থেকে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি এসে ঘিরে ধরল তাদের।

দেখো, সাবধান, জুয়ানা তার ভারী হাতব্যাগটা একটা লোকের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেড নিজেকে সামলাতে না সামলাতেই দুজন বেঁটে মেক্সিকান ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেড লাথি মারার চেষ্টা করল। সজোরে একটা ঘুঁষি পড়ল ওর মুখে। সমানে গালাগালি দিয়ে ওরা কেডকে চড় ঘুঁষি লাথি মারতে লাগল।

জুয়ানার আর্তনাদ ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। কেড বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে ওঠবার চেষ্টা করতেই আরেকটা ছায়ামূর্তি তেড়ে এল ওর দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ও আবার পড়ে গেল। আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ওঠার চেষ্টা করতেই ও সভয়ে দেখল একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ছে ওর মাথায়। কেড হাত তুলে নিজেকে বাঁচাতে গেল, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। কেড চারিদিকে আগুনের হল্কা দেখল তার পর চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। চেতনা হারাবার আগে কেড নিজের গলার গোঙানি শুনতে পেল মনে হল যেন তার মাথা দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে সে জুয়ানার খোঁজ করছিল।

জুয়ানা, ক্রিল আর স্যাম ওয়াল্ড হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছিল। জোসে পিন্টো নামে তরুণ মেক্সিকান ডাক্তারটি সেই সময়ে ঘরে এল। ওয়াল্ড নিউইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছে। ওয়াল্ড লম্বা, মোটা আর অসম্ভব উদ্যম আর প্রাণশক্তি ওর। বছর চল্লিশ বয়স। জুয়ানার সৌন্দর্য ওকে এতটুকু টলাতে পারেনি। জুয়ানা আক্রমণের ব্যাপারে তেমন কিছুই বলতে পারেনি। বলেছে ওরা পাঁচজন ছিল। জুয়ানার মাথায় ওরা কম্বল চেপে ধরেছিল তাই জুয়ানা কিছুই দেখতে পারেনি। জুয়ানার আর্তনাদ শুনেই প্রতিবেশীরা পুলিশকে ফোন করে। মেক্সিকানরা খুব উদাসীন

বিশেষ করে সংকটের সময়ে। যথারীতি যখন পুলিশ এল আততায়ীরা তখন পালিয়ে গেছে। ওরা এসে দেখল গ্যারাজে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, থান্ডারবার্ড ততক্ষণে পুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ, কেড জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। ওকে তখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন পর স্থির হয় অপারেশন হবে।

ওরা উদ্বিগ্ন চোখে পিন্টোর দিকে তাকাল। ডাক্তারটি বলল, খুব সামলে নিয়েছেন উনি। ওর মাথার খুলির হাড় ভেঙ্গেছে তবে আশা করি জোড়া লেগে যাবে। আমরা আশা করছি মাসখানেকের মধ্যেই উনি সুস্থ হয়ে যাবেন।

আমি দেখতে পারি ওকে? জুয়ানা জিজ্ঞেস করল। কালকের আগে নয়। পরে একটা কাফেতে ঢুকে জুয়ানা ওয়াল্ডের সাথে কথাবার্তা বলছিল। হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল ও, দৈনিক খরচা লাগবে। আরো অনেক রকম খরচা আছে। আমার একটা নতুন গাড়ির দরকার...

ওয়াল্ড শীতল চোখে জুয়ানার দিকে তাকাল। ওর এখন তেমন টাকা নেই। কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতালের মতন ইদানীং ও টাকা উড়িয়েছে। তারপর জুয়ানার হাতের হীরের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বলল, টাকার দরকার থাকলে এটা বিক্রী করুন। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী গাড়ির টাকা দেবে। যে কটা টাকা আছে কেড হাসপাতাল থেকে বেরোলে ওর কাজে লাগবে।

জুয়ানার চোখ কঠিন হল। রাগে দাঁড়িয়ে উঠে জুয়ানা বলল, কেড সব সময় বলেছে আপনি ওর বন্ধু। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। ও কখনোই চাইত না আমি ঘড়িটা বেচে দিই। কক্ষনো না।

ওয়াল্ড অবজ্ঞার দৃষ্টিতে জুয়ানার দিকে তাকাল। ওয়াল্ডের কাছে জুয়ানা একটা সুন্দরী বেশ্যা মাত্র।

আমি ওর প্রকৃত বন্ধু বলেই বলছি ওই ঘড়ি আর যা দামী দামী উপহার আছে সব বেচে দিতে। ওর যে কটা টাকা আছে আমি তা আগলে রাখছি মহোদয়া। আপনি তার কানাকড়িও পাবেন না।

সুগঠিত কাঁধ দুটি ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে রাগে গরগর করতে করতে জুয়ানা বেরিয়ে গেল।

পরদিন সর্বপ্রথম ওয়াল্ডই কেডকে দেখতে গেল।

ছোট সাদা ঘরটায় ঢুকেই কেডের মুখ দেখে ওয়াল্ড বুঝল কেড অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কেড বলল, এসেছ ভাল করেছ স্যাম। জুয়ানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

কাল হয়েছিল। উনি ভালই আছেন।

কেড আগ্রহভরা চোখ তুলে বলল, আমাকে কখন দেখতে আসবে বলল কিছু?

বলেন নি বটে, তবে মনে হয় আজ আসবেন। তোমার কেমন লাগছে এখন?

কেড মুখ বিকৃত করে বলল, ব্যাপারটা একটা অভিশাপের মতন হল স্যাম। তার মানে নিউ অরলিয়ান্সের কাজটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

জ্যাকসন অপেক্ষা করতে পারল না। ও লুকাসকে কাজটা দিয়ে দিল।

কেড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর একটু ভেবে ওয়াল্ডকে বলল, জানি না জুয়ানার হাতে কেমন টাকাপয়সা আছে। চাইলে কিছু দিও ওকে।

উনি চালিয়ে নেবেনখন। তোমার বাকি স্টক কটা রাখা দরকার। তুমি যখন হাসপাতাল থেকে বেরোবে, তোমার টাকা লাগবে।

তা হয়তো ঠিক...ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলব।

ঘটনাটা কি হয়েছিল বলত?

আমার তোলা ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলো ওরা পছন্দ করেনি। অ্যাডালফো সাবধান করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কান দিইনি। গাড়িটা গেছে, তাই না?

হ্যাঁ।

একটা নতুন গাড়ির দরকার হবে ওর।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানী সেটা দেখবে এখন। ওর জন্য ভেব না। উনি নিজেকে দেখতে জানেন। শোন ভ্যাল, আমাকে নিউইয়র্কে ফিরতে হবে। বলে যাচ্ছি, যখনই তুমি সুস্থ হবে তোমার জন্য

একগাদা কাজ ঠিক করে রাখব। তুমি ভালভাবে সেরে ওঠ, আমি এদিকটা দেখছি।

ওয়াল্ড চলে যাবার পর কেড চোখ বুজে থাকল। মাথায় খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে। ওয়াল্ডের আগে জুয়ানা কেন তাকে দেখতে এল না? জুয়ানা এল বিকেলের দিকে।

তোমাকে দেখে এত ভাল লাগছে। কেমন আছ? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? জুয়ানা জিজ্ঞেস করল।

আমি ঠিক আছি। তোমার খবর কি? আমার জন্য মন কেমন করছে কি?

নিশ্চয়ই। হাসল জুয়ানা, তারপর বলল, এত কিছু সামলাতে হচ্ছে আমাকে কি বলব। ইনস্যুরেন্সের লোকেরা গাড়ি নিয়ে ঝামেলা করছে। বলছে ইচ্ছে করে টাকা পাবার জন্য আমরা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি। একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলতে হল। তিনি মনে করেন না ওরা টাকা দেবে। বাড়িওয়ালা বাড়িটা ইনসিওর করে রাখে নি। ও টাকা চাইছে।

কেডের মাথা যন্ত্রণায় দপদপ করছে। ও জোর করে হাসি টেনে আনল।

ওসব নিয়ে ভেব না ডার্লিং। আমি সেরে উঠে সব ব্যবস্থা করব।

কিন্তু আমার যে গাড়ি নেই। ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না। আমরা একটা গাড়ি কিনতে পারি?

নিশ্চয় নিশ্চয়। ব্যাঙ্কে কত আছ জানিনা তবে কুলিয়ে যাবে। ওই ড্রয়ারে আমার চেকবুক আছে। আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করে দিচ্ছি। তবে সবটা যেন তুলে নিও না সোনা।

জুয়ানার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেকবুক আর কলম নিয়ে তক্ষুণি কেডের কাছে এল।

ক্রিলকে বোল, ও সস্তায় ব্যবস্থা করে দেবে। যতদিন না সেরে উঠি একটু হুঁশিয়ার হয়ে খরচ করতে হবে।

আমার এক বন্ধুর গাড়ির ব্যবসা আছে। ক্রিলকে আর বিরক্ত করব না। তারপর ঘড়ি দেখে জুয়ানা বলল ডাক্তার আমাকে কয়েকমিনিট থাকতে বলেছে। তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কাল যদি নাও আসি চিন্তা কর না কেমন। আমি যখনই পারব আসব।

কেডের মাথার যন্ত্রণা এত বেড়ে গেছে ওর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, ঘামছিল দরদর করে। বলল, একমিনিট জুয়ানা, তুমি রেনাদোর সঙ্গে কথা বলেছিলে, ক্ল্যানোকোই তো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে, তাই না?

জানি না। যে কেউ হতে পারে। ওই ফটোগুলো নিয়ে অনেকেই ক্ষেপে আছে।

কিন্তু রেনাদোর সঙ্গে কথা বলেছিলে?

জুয়ানা কেডের দিকে না তাকিয়ে বলল, এই...মানে ভুলে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কেউ হতে পারে। আচ্ছা এখন চলি ডার্লিং। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। বলে চলে গেল।

জুয়ানা চলে যাবার পর খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল কেড। ডাঃ পিন্টো ওকে দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন এ কদিন কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। না, শুনুন আপনার ভালর জন্য বলছি। আপনাকে এখন ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

কেড বলল, আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে বলবেন যদি আমাকে দেখতে না-ই পায়, এতটা পথ আসবার দরকার নেই।

ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করব।

ঘুমের ওষুধ খাওয়ার আগে জুয়ানা যে এককাড়ি সমস্যার কথা বলেছিল মনে পড়ল কেডের। সেরে উঠে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ও। মনে মনে প্রার্থনা করল, জুয়ানা যেন ব্যাঙ্কের সব টাকা না তুলে নেয়। তারপরেই মনে পড়ল জুয়ানার হাতঘড়ির দাম দেওয়া বাকি এখনও। গ্যারেজের ব্যাপারটা একটা ঝামেলা হয়ে রইল। বাড়িওয়ালাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেডের হঠাৎ মনে হল তার আগেকার নিশ্চিন্ত আরামের জীবন যেন চিরতরে শেষ হয়ে গেছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কেডকে বেশিরভাগ সময়েই ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ওর মাথার যন্ত্রণা এখন অনেক কম। বুঝতে পারছে ক্রমশঃ ও শক্তি ফিরে পাচ্ছে। সবচেয়ে শক্তি দিয়েছে ওকে জুয়ানার রোজ সকালে পাঠানো একতোড়া ফুল। ফুলের সঙ্গে সবসময়েই একটা কার্ড থাকে। তাতে লেখা থাকে, আমার ভালবাসা নাও, জুয়ানা। কেড আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আটদিনের দিন কেড ডাঃ পিন্টোকে জিগ্যেস করল সে জুয়ানাকে দেখতে

পারে কিনা। ডাক্তার মাথা নাড়ল, না, এখন আপনার কাছে কোন লোক না আসাই ভাল। আপনার স্ত্রী আপনাকে বিব্রত করবে বলছি না। কিন্তু তারও তো নিজের সমস্যা থাকতে পারে। এখানে শুয়ে আপনি কি বা করতে পারেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার হাড় জোড়া লেগে যাবে। দেখবেন তারপর আপনি কি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ওকে একটু জানিয়ে দেবেন দয়া করে।

ডাঃ পিন্টো মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। বলে দেব।

দ্বিতীয় সপ্তাহ যেদিন শেষ হল কেড জানলার ধারে ইজিচেয়ারে বসেছিল। বেশ ভাল লাগছিল শরীর। জুয়ানার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও অধীর হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ পিন্টো যখন ওকে দেখতে এলেন কেড সেই কথাই ওকে বলল। ডাঃ পিন্টো ভাবলেশহীন মুখে বললেন, ঠিক আছে, আমি ফোন করব? কাল বিকেলে আসতে বলব, কেমন?

আজ বিকেলে। কেড জোর দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারি না এই ঘরে টেলিফোন নেই কেন।

পিন্টো বললেন, এখানে আমরা মাথার আঘাতের চিকিৎসা করি সিনর। তাই রোগীদের ঘরে টেলিফোন থাকে না।

আর কতদিন এখানে থাকতে হবে আমাকে?

আর এক সপ্তাহ। তারপরও মাঝে মাঝে চেকআপের জন্য আপনাকে এখানে আসতে হবে।

এতে তো খরচ হচ্ছে প্রচুর। তাছাড়া ডক্টর আমাকে কাজও শুরু করতে হবে।

করবেন তবে এক সপ্তাহ বাদে।

কেড জুয়ানার কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখল। আজ সকালেও একজোড়া কারনেশন ফুল এসেছে কেডের কাছে।

কেড হঠাৎ শিশুর মতন হেসে বলল, আচ্ছা বলুনতো, আমার স্ত্রীর এত খরচা করার দরকারটা কি। এসব বন্ধ করতেই হবে ওকে।

ডঃ পিন্টো কেডের দিকে তাকালেন না। আমাকে যেতে হবে সিনর। বলে বেরিয়ে গেলেন।

কেড ডঃ পিন্টোর যাওয়ার দিকে অস্বস্তি ভরা চোখে তাকাল। লোকটা যেন কী রকম।

বেলা তিনটে থেকেই কেড অধীর আগ্রহে জানালার পাশে বসে রইল। কতদিন বাদে সে জুয়ানাকে দেখতে পাবে ভেবে তার বুকে আনন্দের শিহরণ হচ্ছিল। সে জুয়ানার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, পিরামিড অফ দি মুনের নীচে তার বিয়ের প্রস্তাব, তাদের হনিমুন সবকিছুর কথা ভাবছিল। বড় অভাব ছিল তার জীবনে স্নেহ ভালবাসার। জুয়ানা তাকে ভরিয়ে দিয়েছে। জুয়ানা সঙ্গে থাকলে সে ভবিষ্যতকে ভয় করে না। সে আবার ঠিক টাকা রোজগার করবে। তাদের জীবন আবার সুখে আনন্দে ভরে যাবে।

দরজায় টোকা পড়ল।

এসো ডার্লিং। উত্তেজনায় কেডের বুক ধকধক করতে লাগল। এক্ষুণি সে জুয়ানাকে দেখতে পাবে।

দরজা খুলে অ্যাডোলফো ক্রিল ঘরে ঢুকল। উসকো খুসকো চেহারা বরাবরকার মতন। ময়লা পোষাক। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে আর ইতস্ততঃ করছে।

হ্যালো অ্যাডোলফো, তুমি আসবে তা ভাবি নি। কি করছ এখানে? ক্রিল চোখ তুলে তাকাল। কেড দেখল ক্রীলের চোখ ছলছল করছে। কেড অধীরভাবে বলল, আমি জুয়ানার জন্য অপেক্ষা করছি, ক্রিল। তুমি বরঞ্চ কাল এসো।

উনি আসবেন না সিনর কেড।

কেড ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এই একটা কথায় ওর হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

মানে ওর কি অসুখ করেছে?

না না।

তবে কি হয়েছে? বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেক না। জুয়ানা আসবে না কেন?

উনি এখানে নেই, সিনর। ক্রিল.ঢোক গিলে বলল।

কি যা তা বলছ, আজ সকালেও আমি ওর পাঠানো ফুল পেয়েছি।

ক্রিল জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এখানে নেই তো কোথায় গেছে?

উনি স্পেনে, সিনর!

কেড চেঁচিয়ে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি? স্পেনে ও করছেটা কি?

ক্রিল ঠোঁট কামড়ে বলল, স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মরসুম শুরু হয়েছে।

কেড প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। ওর কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। একটা ভয়ের স্রোত পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল।

ষাঁড়ের লড়াইতে জুয়ানার কি? তুমি কি বলতে চাইছ জুয়ানা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে?

ক্রিল ইতস্ততঃ করে মাথা নাড়ল।

কেড পনেরটা কার্ড তুলে ক্রিলকে দেখিয়ে বলল, মিথ্যে বলছ তুমি। পাগল হয়ে গেছ তুমি। আজ সকালেও আমাকে ফুল পাঠিয়েছে।

আমি পাঠিয়েছি সিনর। ক্রীল মাথা নীচু করে বলল। আপনার সঙ্গে এরকম মিথ্যাচার করেছি বলে খুবই খারাপ লেগেছে আমার। কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন এসময় আপনাকে কোন খারাপ খবর দেওয়া চলবে না।

তুমি...তুমি পাঠিয়েছো?

হ্যাঁ সিনর। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ভাল করে তোলা। কার্ডগুলো আমার হাতে লেখা। আমি ভেবেছিলাম সিনরার হাতের লেখা হয়তো আপনি চেনেন না।

কেডের গলা কাঁপতে লাগল। সে হিসহিস স্বরে বলল, কিন্তু আমি তো পনেরটা কার্ড পেয়েছি। ও কবে গেল?

আপনি এখানে যেদিন আসেন তার পরের দিনই।

কেড চোখ বন্ধ করে ফেলল। শুধু টাকার জন্যই তাহলে জুয়ানা তার কাছে এসেছিল। তার সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল যেন।

বলো আরও বলো। কেড রাগে দুঃখে অভিমানে প্রায় বুঁজে যাওয়া গলায় বলল। আরো তো বলার আছে না? সহসা তার কাছে সব কিছু দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে গেল।

হ্যাঁ। পেড্রো ডিয়াজ। দুঃস্বপ্নের মতন এ ভয়ংকর সত্য কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না।

পেড্রো ডিয়াজ।

ধন্যবাদ অ্যাডোলফো। তুমি দয়া করে এখান থেকে চলে যাও। আমায় একা থাকতে দাও।

ক্রিল বলার চেষ্টা করল সে কতটা মর্মাহত। কিন্তু কেডের স্তম্ভিত যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল এসে গেল। মোটা মানুষটি তার ময়লা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ক্রিল আগে থেকেই ডাক্তারকে সাবধান করে দিয়েছিল। উনি রুগী দেখে তাড়াতাড়ি কেডের ঘরে এলেন।

এসে দেখেন কেড পোষাক পরে টরে জ্যাকেট গায়ে গলাচ্ছেন ওর মুখ সাদা চোখ টকটকে লাল। কেড পকেটে ওর জিনিসপত্র ভরতে লাগল।

কি করছেন টা কি? পিন্টো চেঁচিয়ে বলল, পোষাক পরে আপনার বেরনোর অবস্থা নয় এখন। যান শুয়ে পড়ুন।

চুপ করুন। আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে কি কাগজপত্রে সই করতে হবে বলুন।

সিনর কেড, আমি সবই শুনেছি। আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের মতন কাজ করাটা আপনাকে মানায় না। আপনি সেরে ওঠেননি এখনও।

আমার আপনার সহানুভূতি চাই না। আমার এজেন্টকে হাসপাতালের হিসেবটা পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে ছেড়ে দিন।

কেডের চোখ মুখের মরিয়া ভাব দেখে ডঃ পিন্টো বুঝলেন কেডের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

উনি শান্তভাবে বললেন, সিনর কেড আপনি খুবই ঝুঁকি নিচ্ছেন। তবে আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি না। দয়া করে দরকারী ফর্মগুলো না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

কেড বলল, আমি পনের মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। এরপর আমি বেরিয়ে যাব।

কেড হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। শারীরিক দুর্বলতা আর স্নায়ুর উত্তেজনায় তার পা কাঁপছিল।

ক্রিল বাইরে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। ডঃ পিন্টোর ফোন পাবার পরই সে উর্দ্ধশ্বাসে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে।

আমি হাজির সিনর। কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?

কেডের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা। চোখ কোটরাগত, তাতে আবার কেমন বন্য দৃষ্টি। মুখ খড়ির মতন সাদা। পথচারীরা সবাই ওর দিকে একবার করে তাকাচ্ছিল।

কেড হিংস্রভাবে বলল, আমায় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমার টাকা নেই আর। আমাকে নিংড়ালেও আর টাকা বেরোবে না।

ক্রিল নরম গলায় বলল, আমি শুধু জিগ্যেস করছি তোমায় কোথায় নিয়ে যাব বন্ধু।

কেড দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রীলের কাঁধে হাত রেখে বলল, আমি দুঃখিত। কিছু মনে কর না। আমায় বাড়ি নিয়ে চল।

বাড়ির কাছে গিয়ে কেড অনেকক্ষণ গাড়ির মধ্যে বসে রইল। তারপর পা টেনে টেনে বাড়িতে ঢুকল। ক্রিল আধঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

কেড আধ গ্লাস টেকুইলা হাতে লাউঞ্জ চেয়ারে বসেছিল।

এগুলো কী ক্রিল। টেবিলে সযত্নে সাজানো কার্ডগুলির দিকে দেখিয়ে কেড বলল।

ক্রিল ওদিকে তাকাতেই তার চোখ বিতৃষ্ণায় কুঁচকে গেল।

ওগুলো জিনিস বাঁধা দেবার দোকানের টিকিট।

কেড চেয়ারে হেলান দিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বলল, জুয়ানা দেখছি বাড়ি ঝেঁটিয়ে সব নিয়ে গেছে। আমার ক্যামেরাটা পর্যন্ত নেই। কেড গভীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ক্রিল ততক্ষণে একটা তোবড়ানো খাম বার করে হিসাব টুকতে বসেছে।

কত? কেড জিগ্যেস করল।

আট হাজার পেসো সিনর।

কেড কাঁধ ঝাঁকাল। কী আর এসে যায় এতে। তুমি এখন যাও, কেড উদাস গলায় বলল। কাল ইচ্ছে করলে এস।

ক্রিল উঠে দাঁড়াল। আমি সাহসে বিশ্বাস করি সিনর। আমার মনে হয় আপনার মতন সাহসী লোক আবার ইচ্ছে করলেই উঠে দাঁড়াতে পারে। আমি আপনাকে বলেছিলাম একজন সাহসী লোকের অনেক দোষই ক্ষমা করা যায়। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

ওর দিকে না তাকিয়েই কেড বলল, তুমি নির্বোধ। এখন আমার জন্য ভাবনা করার আর কোন অর্থই নেই।

আমরা কথা বলতে পারি সিনর। কথা বললে অনেক সময় মনের ভার লাঘব হয়।

বেরোও তুমি, বেরোও। তোমার মতন একটা চর্বির গোলা আমাকে নিয়ে বিলাপ কববে তাই চাই নাকি আমি? তুমি যাও এখন।

আমি বুঝতে পারছি সিনর, ক্রীলের মুখে কোন ভাবান্তর হল না।

কেড মুখ বিকৃত করে বলল, তুমি কিছুক্ষণ আগেই আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছিলে।

আমি যাকে বন্ধু বলে মনে করি, সেও আমায় বন্ধু ভাববে না আমি তো আশা করি না সিনর।

আঃ বেরোও এখন তুমি।

ক্রিল কেডের দিকে তাকিয়ে বলল দয়া করে টেকুইলা সাবধানে খাবেন। মারাত্মক নেশা হয় এটায়।

জ্ঞান দিওনা, যাও এখান থেকে।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ক্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে ক্রিল স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল। ওয়াল্ড বলল, দ্যাখ অ্যাডোলফো, তুমি কি করতে পার। একটা মেয়ে ল্যাং মেরেছে বলে কেউ যদি অধঃপাতে যেতে চায়, তবে ওর মবণই ঘনাবে। কেডের সমস্যা নিয়ে আমায় বিরক্ত কর না। আমার নিজের অনেক কাজ আছে। ও ঠিকই আবার উঠে দাঁড়াবে। একটা বেশ্যার জন্য আর কতদিন শোক করবে।

উনি একজন সত্যিকারের মানুষ সিনব? একজন সাহসী মানুষ। আপনি এখানে একবার আসতে পারেন?

আমাকে জ্বালিও না। বলে ওয়াল্ড ফোন ছেড়ে দিল।

ক্রিল নিজেব বাড়িতে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। সময় অপচয় নিয়ে মেক্সিকানরা ভাবে না। ক্রিল সমানে ভাবল কেড একজন অসাধারণ মানুষ। ওর জন্য তার কিছু করা দরকার।

সন্ধ্যাবেলায় ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে কেডের বাড়িতে আবাব এল। বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনের দরজা খোলাই ছেল। ক্রিল তাড়াতাড়ি ঢুকে আলো জ্বালল। দেখল কেড উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। আর মেঝেতে টেকুইলাব খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। অনেক কষ্টে ক্রিল কেডের অচৈতন্য দেহটাকে সোফায় তুলে শুইয়ে দিল। গলার টাই আলগা করে দিল। বন্ধকী জিনিসের টিকিটগুলো নিজের পকেটে পুরল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝল কেড এখন ঘুমোবে। তার এখানে থাকার দরকার নেই। খুব অনিচ্ছায় ক্রিল আবাব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার বুকটা ভারি হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে কেড কাতরাতে কাতরাতে জেগে উঠল। তার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। মুখ শুকনো। জোর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, তার হাত পা সব কাঁপছে। হঠাৎ চারিদিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। টেবিলের ওপর তার বহু ব্যবহৃত প্যান আম ব্যাগটা। কম্পিত হাতে ব্যাগটা খুলে ওর ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতি দেখতে পেল। মিনোলটা তুলে নিতেই দরজা ঠেলে ক্রিল কফি, পেয়ালা, প্লেট চিনির পট ট্রেতে করে নিয়ে ঢুকল।

গুড মর্নিং সিনর।

ক্যামেরার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কেড বলল, তুমিই এটা ছাডিয়ে আনলে?

হ্যাঁ, সিনর। ক্রিল কফি ঢালল। এখন কেমন বোধ কবছেন?

টাকা কোত্থেকে এল।

মনে করুন না এটা একটা সামান্য ধাব, শোধ দেবার দরকার নেই। আমার টায়ার নষ্ট হয়ে গেলে আপনিই তো আমাকে টায়াব কিনে দিযেছিলেন, আমিও আপনার ক্যামেরাটা ফিরিয়ে আনলাম। বাস শোধবোধ হযে গেল।

ধন্যবাদ, অ্যাডেলফো। কেড বলল।

ক্রিল কফির পেযালা কেডের দিকে ঠেলে বলল, আমার মনে হচ্ছে সিনর আপনার এ বাড়িতে থাকতে আব ভাল লাগবে না। আমার ফ্ল্যাটে একটা বাড়তি ঘর আছে। ঘবটা তেমন নয় তবে আপনি কিছুদিন ব্যবহাব করতে পাবেন।

কেড তাড়াতাড়ি বলল. আমাব মানুষজনের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না ক্রিল। ধন্যবাদ, আমি অন্য কোথায় একটা ঘর দেখে নেব।

ঘবটার ঢোকাব দরজা আলাদা। আপনাকে কেউ বিবক্ত কববে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।

কেড যন্ত্রণায ছটফট করছিল। হাল ছেড়ে দিযে বলল, ঠিক আছে ক্রিল। ধন্যবাদ। কিন্তু শুধু কয়েকদিনের জন্যে।

নিশ্চয। আপনি কফি খান, আমি আপনাব জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছি।

তিন ঘণ্টা বাদে ক্রিল স্যাম ওয়াল্ডকে টেলিফোন করল। সব বলে বলল, ওর এখনি কোন কাজ শুরু কবা দবকার সিনর। শুধু টাকার জন্য নয়, ওকে আবার কাজে ফিরে আসতে হবে।

বেশ অ্যাডোলফো। দেখি কি করতে পাবি। কাজ করার মত শরীবের অবস্থা আছে তো?

মনে তো হয়।

ক্রিল অশান্ত মনে কেডের খোঁজখবরে গেল। ওর পরিচারিকা মারিয়াকে ও কেডকে

দেখাশোনা করতে বলেছিল। মারিয়া খবর দিল কেড আসবার পরে একজন ছোকরা এসে তিন বোতল টেকুইলা দিয়ে গেছে। কেডের দরজার বাইরে ও খাবার রেখে এসেছিল। কেড তা ছোঁয়নি। পরদিন সকালে ক্রিল খবরের কাগজ দেবার ছুঁতো করে কেডের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল।

কী? কী? কেড তীক্ষ্ণ গলায় বলল।

খববের কাগজ নিয়ে এসেছি সিনর।

আমি কাগজ চাই না। আমাকে জ্বালিও না।

মানে আর কিছু চাই আপনার। সিগারেট?

দোহাই তোমার, আমাকে একলা থাকতে দাও।

ক্রিল হতাশ হয়ে নিজের ঘরে ফিবে এল। বিকেলে কেডের বাড়ি গিয়ে দেখল চিঠিপত্র এসেছে। সেগুলি নিয়ে ও কেডের দরজায় ধাক্কা দিল।

আপনার চিঠি সিনর।

দরজা খুলে গেল। কেড মাথার ব্যান্ডেজ খোলেনি। দাড়ি কামায় নি। ক্রিল বুঝল কেড প্রচুর মদ খেয়েছে। ক্রীলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বলল, আমাকে দাও। তারপর চিঠিপত্রগুলো একরকম ছিনিয়ে নিযে মরিয়া হয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ক্রিল বুঝল কেড নিশ্চয় জুয়ানার চিঠি আশা করছে।

আমায় একলা থাকতে দাও। কেড ক্রিলকে প্রায় ঠেলে দরজার বাইবে বার করে দিল। বেশির ভাগ চিঠিই বিল। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী একটা চিঠিতে জুয়ানাকে তিন হাজার ডলার দেবে বলেছে। ডাইনার্স ক্লাব ছশো ডলারের বিল পাঠিয়েছে।

কেড চিঠিগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর টেকুইলার বোতলটা নিয়ে গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। কেড বুঝল সে নিজেকে ধ্বংস করছে। কিন্তু তাব যন্ত্রণা কমাবার আর কোন উপায়ই নেই। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠে একটু ইতস্ততঃ কবে ও ফোনটা ধবল। ও প্রান্তে ওয়াল্ডের গলা।

কেমন আছ ভ্যাল? একদিনের একটা কাজ আছে। করতে পারবে?

কেড অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল, হ্যালো স্যাম। আমি খুব ভাল আছি। দেখ, এখনি একগাদা বিল এসেছে। এগুলো তোমাকে মেটাতে হবে।

ঠিক আছে। ওগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কী, কাজটা করতে পারবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কাজটা কী

কাল জেনারেল দি গ্যল মেক্সিকো পৌঁছেছেন। ফ্রান্সে শুধু তোমাব তোলা ছবিই ছাপা হবে। বিরাট ব্যাপার। 'প্যারিস ম্যাচ'...'জুর দ্য ফ্রান্স'...সমস্ত কাগজ। কাজগুলো কর তোমায় আর ধারের জন্য ভাবতে হবে না। অ্যাডেলফো সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি শুধু ছবি তুলবে।

নিশ্চয় তুলব...তুলতে পারব। তার মাথা সমানে কামড়াচ্ছে।

কেডের ফটোগ্রাফার জীবনে কলঙ্কময় অধ্যাযের শুরু এখানে থেকেই। ক্রিলই সব ঠিক করে দিল। পাশ জোগাড় করল। দ্য গ্যলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঠিক করল। কেডকে ওর প্রাসাদে নিয়ে গেল সময হাতে করে। কেড এত টেকুইলা গিলেছে যে ভালো ছবি তোলা সম্ভব নয় এ অবস্থায়।

নিজের ছবি প্রিন্ট করার ক্ষমতা নেই কেডের। ও টমাস ওলমোদাকে সে ভাব দিল। কেড আর ক্রিল দুজনেই ওলমোদার অফিসে গেল প্রিন্ট দেখতে। দুজনের মনেই আশঙ্কা খেলা করছে। ওলমোদার মুখ দেখে কেড বুঝল সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। একটা ভযেব শীতল প্রবাহ তার পিঠেব শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে লাগল।

ওলমোদা বিভ্রান্ত ভাবে বলল. এ ছবিগুলো তো কোন কাজেই আসবে না সিনর। সব আউট অফ ফোকাস।

স্যাম ওয়াল্ড খবরটা জানামাত্র ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। তুমি ক্যামেরার দোষ দিচ্ছ ভ্যাল। এটা তোমার পরীক্ষা করা উচিৎ ছিল না। প্যারিস ম্যাচকে এখন কি জবাবদিহি দেব।

আমি জীবনে এরকম অবস্থায় পড়িনি।

কেড আমতা আমতা করে সমানে মিথ্যে বলতে লাগল, জীবনে একবার তো এরকম হতেই পারে, স্যাম। ক্যামেরার প্রি-সেটটা কাজ করছিল না।...বিশ্বাস কর আমি একদম বোকা হয়ে গেছি।

শোন ভ্যাল, তুমি আমার নাম ডুবিয়েছ। তুমি এরকম বেইমানী করতে পারলে আমার সঙ্গে

আঃ চুপ কর। কেড চীৎকার করে উঠল, যা হবার হয়েছে, আমাকে অন্য কাজ দাও। আমার হাত খালি সম্পূর্ণ। একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

আরেকবার এরকম কর, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। তোমার আর কি, কৈফিয়ৎ তো আমাকেই দিতে হয়। তুমি আমার কত ক্ষতি করেছ জান না।

আঃ, খ্যাচখ্যাচ কর না। আমার অন্য কাজ চাই। কেড টেকুইলার গ্লাসে চুমুক দিল।

পরে খবর পাবে। বলে ওয়াল্ড দুম করে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

দুদিন পরে ওয়াল্ড লিখিত হিসেব পাঠাল। সমস্ত বিল মিটিয়ে দিয়েছে, ডাঃ পিন্টো আর হাসপাতালের সব প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে। আর কোন শেয়ার বা স্টক নেই, একদম পরিষ্কার। তার ওপরে ওর এক বছরের রয়্যালটির টাকার মধ্যে ছ মাসের টাকাই ধার শোধ করতে চলে গেছে। কেড বুঝল ওর মূল্য এখন এক কানাকড়িও নয়। তার উপর ক্রীলের থেকে ও এ পর্যন্ত ৭০০ ডলার ধার করেছে, ওয়াল্ড ওর কাছে পায় ছশো ডলার।

টেকুইলা খেলে মন একদম অসাড় হয়ে যায়। এই-ই ভালো। কেড প্রাণপণে টেকুইলা গিলতে থাকল। এই সময় ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন কাগজ 'লুকনাউ'-এর হয়ে ডিউক অব এডিনবরার মেক্সিকো আগমনের ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দিল ওয়াল্ড।

ওর থেকে ভালো কিছু বাগাতে পারলে না? এডিনবরা কি সোজা ব্যাপার নাকি? সিন্ডিকেট থেকে এ ছবি তুললে ঠিক হত।

সিন্ডিকেটও ছবি তুলছে। ওরা লুকাসকে নিয়েছে। তোমার বদনাম ছড়িয়ে গেছে ভ্যাল। তুমি নিজের সর্বনাশ করছ। হ্যাঁ তবে এবার আমার ঠিকঠাক ছবি চাই। মনে রেখো।

ছবিগুলো তুলতে কেডের যা শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম হল বলার নয়। প্রিন্টগুলো ওলমোদা নীরবে কেডের হাতে তুলে দিল।

কেড বুঝতে পারল ছবিগুলো অত্যন্ত সাধারণ মানের, এতে অনন্য সাধারণ কেডকে কেউ খুঁজে পাবে না।

পরদিন বিকেলে ওয়াল্ডের টেলিফোন এল। কেড তখন তার বিশ্বস্ত বন্ধু টেকুইলার গ্লাস হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল। ও বুঝেছে ওয়াল্ড গালাগালি করবে। কিন্তু ওয়াল্ড যা বলল তা তীরের মতন তার বুকে গিয়ে বিঁধল। ওয়াল্ড আস্তে আস্তে বলল, শোন ভ্যাল, আমার মনে হয় তুমি এখনও সুস্থ হও নি। তোমার ছবিগুলো একটা তৃতীয় শ্রেণীর ফটোগ্রাফারও তুলতে পারত।

মাত্র ছশো ডলারের বিনিময়ে ওরা কী আশা করে।

যাক গে ভ্যাল, পয়সা ওরা দিয়েছে কিন্তু প্রশংসা করেছে লুকাসের ছবিগুলির। আমি আমার বদনাম নিয়েও ভাবছি। আমি তোমাকে ছশো ডলার পাঠাচ্ছি। আমার কমিশন নিচ্ছি না। সাবধানে চললে এতে তোমার দুমাস চলে যাবে। পরিশ্রম কম কর, বিশ্রাম নাও। যখন তুমি সত্যিই সুস্থ হবে তোমার জন্য কাজকর্ম দেখবক্ষণ।

এত বছর বাদে কি অনায়াসে ওয়াল্ড ওকে ছেঁটে দিল—এ যে অবিশ্বাস্য। কেড টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ঠিক আছে। ওয়াল্ডই তো একমাত্র এজেন্ট নয়। সে দেখিয়ে দেবে ওকে।

জানলা দিয়ে আছড়ে পড়ছে গাড়ি চলাচলের আওয়াজ। কেডের মাথা দপদপ করছে একটা ঢেউ যেন তার মধ্যে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপতে কাঁপতে ও দু হাতে নিজের মুখ ঢাকল। চরম হতাশায় ওর শরীর বেঁকে বেঁকে গেল, ভেতর থেকে দমকের ওপর দমক কান্না বেরিয়ে এল।

।। পাঁচ ।।

'নিউইয়র্ক সান'-এর বিশেষ প্রতিনিধি বার্তা সম্পাদকের অফিসে ঢুকে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। হেনরি ম্যাথিসন হাতের নীল পেন্সিল নামিয়ে বার্ডিকের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। এখন বার্ডিকের মেক্সিকোয় থাকার কথা, কেননা ম্যাথিসনই ওকে পর্যটনের ব্যবসায়িক দিকটা বাড়াবার জন্য কয়েকটা রম্যরচনা লিখতে পাঠিয়েছিল। অবশ্য বার্ডিক এ ব্যাপারে খুবই নিরুৎসাহ ছিল।

তুমি ফিরে এলে যে বার্ডিক? আমি তো বলিনি। বার্ডিক হাসল। বার্ডিক লম্বা, রোগা, চুল ভুরু সব সাদা। বয়স তিরিশ হবে। 'সান'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বার্ডিক। বার্ডিক জানে সান-এর তাকে দরকার তাই খানিক সুবিধে নেয় তবে লেখাগুলো ঠিক সময় মতই দেয়।

সেই টুরিস্টদের ওপর গুলভরা কাহিনীর কথা যদি বল সব করে দিয়েছি আমি। চার্লি দেখছে লেখাগুলো। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হেনরি। সান-এর এতে ভালো হবে।

ম্যাথিসন একটা সিগারেট ধরাল আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার্ডিককে দেখতে লাগল।

বলতে পার দশ দিন আগে মেক্সিকো শহরে কার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে? বার্ডিক বিনা অনুমতিতেই ম্যাথিসনের সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাল।

বল, এটা তো ধাঁধা নয় যে উত্তর দেব।

ভ্যাল কেড, ফটোগ্রাফার। বার্ডিক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওর কথার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল।

ম্যাথিসন ভাবলেশহীন মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল।

কেডকে মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। কোন্ মেয়ের থেকে ঘা খেয়ে বোতল ধরে দ্য গ্যালের ছবি তোলার ব্যাপারে সব ভণ্ডুল করে। ওর এজেন্টের প্রচুর অর্থদণ্ড হয়। ওরকম একটা মাতালের সম্পর্কে আমার ভাবার কি দরকার।

কেন না সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার। বার্ডিক গম্ভীরভাবে বলল।

মেক্সিকো থেকে শুধু এই কথা বলার জন্য তুমি এসেছ এড? আশ্চর্য।

আমি কেডের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

ম্যাথিসন হাঁ করে বার্ডিকের দিকে চেয়ে রইল।

মানে, আবার বল তো কথাটা।

আমি আর কেড একসঙ্গে কাজ করলে সান-এর চেহারাটাই পালটে যাবে। আর আমি তুমি দুজনেই বুঝি সান-এর উন্নতি হওয়া এখন খুবই দরকার।

তুমিও কি কেডের সঙ্গে বোতল টোতল ধরেছ নাকি?

হেনরি, আমি সত্যি বলছি। তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজি না হও আমি 'টাইমসে'র সঙ্গে কথা বলব। নয়তো 'ট্রিবিউন'কে বলব। আমি নিশ্চিত কেড আর আমি একসঙ্গে কাজ করলে ফাটাফাটি ব্যাপার হবে।

লোকটা আস্ত মাতাল। ওর সব শেষ হয়ে গিয়েছে। কিসে তোমার কেডের ওপর এত বিশ্বাস জন্মাল?

কেন তোমার কি মনে হয় না কেড আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। ও একজন জাত ফটোগ্রাফার।

আরে আমি পাড় মাতালদের চিনি। নেশা ওদের কেড়ে নেয়।

আরে একটা ঝুঁকি নিতে কি? কেড তার আগের অবস্থায় যদি ফিরে যেতে পারে তাতে আমাদেরই লাভ হবে।

ম্যাথিসন সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, তুমি কি কেডের সঙ্গে কথা বলেছ?

নিশ্চয়ই।

শুনেছিলাম ও কোন্ একটা ইন্ডিয়ানের কুঁড়েয় পড়ে আছে। শুনেছিলাম এক পেসোয় দিন চালাত আর এক বোতল টেকুইলা খেত। ঠিক তো?

এটা পুরনো খবর। ইন্ডিয়ানদের কুঁড়ে থেকে ওয়াল্ডের এজেন্ট ক্রিল ওকে হাসপাতালে নিয়ে

যায়। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে ওকে একফোঁটা মদও খেতে দেওয়া হয় নি।

ক্রিল আমার কাছে এসে অনুরোধ করে কেডের ব্যাপারে কিছু করার জন্য। আমি কেডকে দেখতে চাই, আমার ওর সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগে। ওর তোলা ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি মনে আছে? অসাধারণ, অপূর্ব। কেড আবার উঠে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। তুমি তো জান একসময় সব খবরের কাগজ কেডকে নেবার চেষ্টা করেছে। আমার বিশ্বাস আমি আর ও যদি একসঙ্গে কাজ করি আর তুমি যদি ওর পেছনে থাক, ও আবার আগের মতন কাজ করবে। এবং তাতে 'সান' উৎকর্ষতার একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছতে পারবে।

আমার বিশ্বাস হয় না ও মদ পুরোপুরি ছাড়তে পারবে।

বার্ডিক অধীর হয়ে বলল, বিশ্বাস কর ম্যাথিসন এক সপ্তাহ হল ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কোকোকোলা ছাড়া আর কিছুই খায় নি। আর এখানেই আছে কেড।

ম্যাথিসন অবাক হয়ে বলল, এখানে?

বার্ডিক বলল, কী করব বল ম্যাথিসন। নইলে আমরা 'টাইমসে' যাব।

ম্যাথিসন ভাবতে লাগল। মনে হচ্ছে তুমি একেবারে পণ করে বসে আছ।

হ্যাঁ। কেডের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই। তাহলে একটা অসাধারণ কীর্তি গড়ব আমরা।

কী রকমভাবে কাজ করবে?

রবিবারের ছটা পাতাই আমার চাই। আমরাই লেখা ও ছবির বিষয় ঠিক করব, মানে আমরা তিনজন।

কেডের রঙিন ছবি ছাপাব আমরা। আমি এরকম ভেবেছি। দু-রকম একেবারে বিপরীত জিনিসকে তুলনায় ফেলে আলোচনা হবে। কেড বৈপরীত্য দারুণ ফোটাতে পারে। যেমন সবল আর দুর্বল মানুষ, যেমন বৃদ্ধ আর তরুণ যেমন অত্যাচারী আর অত্যাচারিত।

ম্যাথিসনের বার্ডিকের প্রস্তাব মনে মনে ভাল লেগেছে কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না।

খরচ কেমন হবে?

কেডের কথা ভাবছ। এখন কেডকে হপ্তায় তিনশো ডলার দিলেই চলবে! আগেকার কেডকে ভাবলে এটা আমাদের খুবই সস্তায় দাঁও মারা হবে।

হুঁ...তোমার কি মনে হয় আমরা ওকে ছ বছরের কনট্রাক্টে রাজী করাতে পারব?

মানে, অতদিনের কনট্রাক্ট কেন? ধর দু বছর। দ্বিতীয় বছরে হপ্তায় একে ৫০০ ডলার দিতে হবে।

ম্যাথিসন বিরক্ত হয়ে বলল, মনে হয় তুমি কেডের এজেন্ট হয়েছ।

বার্ডিক বিনীত ভাবে হেসে বলল, না আমি শুধু দেখছি কেড যাতে না ঠকে। ওর গুণের প্রতি শ্রদ্ধা আছে আমার।

ম্যাথিসন বলল, আমি কথা বলি আগে ওর সঙ্গে।

বার্ডিক খুবই উদ্বিগ্ন ভাবে বারে অপেক্ষা করছিল। একঘণ্টা বাদে কেড সেখানে ঢুকল।

এই চারমাসে কেড অনেক বদলে গিয়েছে। রোগা হয়ে গিয়েছে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে পাকা চুল দেখা দিচ্ছে। মেক্সিকোর রোদে পুড়ে পুড়ে ওর গায়ের রং ইন্ডিয়ানদের মতন বাদামি হয়ে গেছে। তবে ওকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। তবুও বার্ডিক যখন ওর দিকে তাকাল কেড খুশীর হাসি হাসল।

বার্ডিকের পাশের টুলটায় বসে বলল, ধন্যবাদ বার্ডিক। দু-বছরের কন্ট্রাক্ট সই করে এলাম।

বার্ডিক ওর কাঁধে হালকা ঘুঁষি মেরে বলল, এবার আমরা ওদের দেখিয়ে দেব ভ্যাল। আমরা একটা ফাটাফাটি কাণ্ড করব।

সত্যিই হল তাই। 'সান' পত্রিকার এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু হল। অন্যান্য পত্রিকার থেকে 'সান'এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদপত্রের কর্মজীবনে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর কাজের চাপ থাকে তাতে কেডের পক্ষে ভাল হয়েছে। মদের অভ্যাস প্রায় চলে গেছে কেডের। শুধু কাজ আর কাজ। বার্ডিকের মত সমব্যথী বন্ধু পাওয়াতে একাকীত্বও অনেক ঘুচেছে। 'সান'-এর অফিসের কাছেই বার্ডিকের ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটেরই একটা ঘরে কেড থাকে। দুজনে আপন মনে

কাজ করে, সময় কেটে যায়।

বহুসময় ঘুমের আগে একা ঘরে জুয়ানার কথা মনে পড়ে যায় কেডের। জুয়ানা এখন প্রায় স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে বেদনা অনেক কম। কিন্তু কেড জানে এই মুহূর্তে যদি জুয়ানা ঘরে ঢোকে আর কেডকে জড়িয়ে ধরে, কেড সব ভুলে যাবে। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ের সিজন শেষ। জুয়ানা নিশ্চয়ই মেক্সিকোয় ফিরে এসেছে। হয়তো ডিয়াজের সঙ্গেও সম্পর্ক শেষ করেছে জুয়ানা অন্য কারও সাথে রয়েছে। জুয়ানা এখনও তার স্ত্রী। কিন্তু ওকে ডিভোর্স করার কথা ভাবতেও পারে না কেড।

কয়েকমাস কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেডের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বার্ডিক বিরক্তস্বরে বলল, বাজতে দাও। কিন্তু সেই টেলিফোনটার মধ্যে যেন একটা অমোঘ নিয়তির ডাক ছিল। কেড ফোনটা তুলল। ম্যাথিসন কথা বলছে।

শোন ভ্যাল, একটা দারুণ ব্যাপার অথচ একটা ফটোগ্রাফারও হাতের কাছে নেই। দুটোই শহরের বাইরে। কেড বলল, কি হয়েছে হেনরি?

বুড়ো ফ্রিডল্যান্ডার গুলি খেয়েছে। আমরা সবার আগে ওখানে পৌঁছতে চাই। তুমি কি ওখানে যাবে ভ্যাল?

কেড প্রত্যাখ্যান করতে পারত। কিন্তু তার মনে পড়ল ম্যাথিসনই তাকে আবার উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে। তার ঋণ শোধ করার এটাই সুযোগ।

আমি যাচ্ছি হেনরি। আমার ওপর ছেড়ে দাও।

খুব ভাল। তুমি ঠিকানা জানোতো?

জানি।

কেড তাড়াতাড়ি টাই আর জ্যাকেট পরে ক্যামেরা নিয়ে ছুটল।

জোলাস ফ্রিডল্যান্ডার কবি, নাট্যকার, শিল্পী, সঙ্গীতকার। লোকটার শিল্পজগতে বিশাল নাম। লোকটার সমকামী বলে দুর্নাম আছে। ওর সঙ্গে সবসময় একটি পেলব, ক্ষীণতনু সুদর্শন একজন তরুণ থাকেই। সেই তরুণ আবার বদলে যায় আবার আরেকজন তার জায়গায় আসে।

কিন্তু ফ্রিডল্যান্ডার মানেই জবর খবর। ওর ব্যাপার স্যাপার সবসময়েই সংবাদপত্রের জোর খবর। ছাতের ওপর ফ্রিডল্যান্ডারের অপূর্ব ফ্ল্যাট। ওর বাড়ির দিকে পড়ি কি মরি করে গাড়ি চালাতে চালাতে কেড বুঝল হেনরির তার কাছে সাহায্য চাইবার অধিকার আছে। ফ্রিডল্যান্ডারের গুলিতে আহত হবার খবর আগে ছাপানো যে কোন বার্তা সম্পাদকের কাছে একটা স্বপ্ন।

গাড়িটা কোনরকমে পার্ক করে কেড ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি টপকে উঠতে লাগল। ফ্রিডল্যান্ডারের সদর দরজার সামনে একজন বিশালকায় লালমুখো পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কেডকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি কে? কোথায় গটগট করে চলে যাচ্ছ?

লেফটেন্যান্ট টাকার আছেন?

থাকলে তোমার কি?

তাকে গিয়ে বল 'নিউইয়র্ক সান'-এর কেড ভেতরে যেতে চায়। আর চোখ পাকিও না তোমাকে একটা ষাঁড়ের মতন দেখাচ্ছে। পুলিশটি একটু ইতস্ততঃ করে ভেতরে গেল। কেডও ওর পেছন পেছন ঢুকল। লেফটেন্যান্ট টাকার ছোটখাট মানুষ, মুখটা কঠিন। সুসজ্জিত লবিতে দাঁড়িয়ে তিনি একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কেড ও পুলিশটিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি বিরক্তিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কে?'

'নিউইয়র্ক সান'-এর কেড। ম্যাথিসন আমাকে পাঠিয়েছে। কি হয়েছে?

ম্যাথিসন টাকারের সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। টাকার কেডের হাত ঝাঁকিয়ে বলল, আলাপ করে খুশী হলাম।

কি ব্যাপার যদি বলেন?

টাকার বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, বুড়ো বদমাশটা এবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। নতুন সঙ্গী আনার আগে আগের সঙ্গীটিকে ছাঁটাই করতে ভুলে গেছে। ফলে ঝগড়াঝাটি, ছেলেটি গুলি করেছে ওকে।

মারা গেছে?

আরে না না, সেই সৌভাগ্য কি হবে। ও ভেতরেই হিরো হয়ে বসে আছে।

ছেলেটির নাম কি?

জেরি মার্শাল। ছেলেটা ভালই। বুড়ো শয়তানটাই ওকে নষ্ট করেছে।

ওর ছবি তুলতে চাই।

নিশ্চয়ই। আগে আমি সেরে আসি, তারপর তুমি যেও।

কেড ক্যামেরা বার করল। তারপর ফ্ল্যাশগান এঁটে নিয়ে দরজা ঠেলে একটা বিশাল লাউঞ্জে ঢুকল। সাদায় কালোয় সাজানো ঘরটা। দেয়ালে ফ্রিডল্যান্ডারের আঁকা প্রাচীর চিত্র।

একটা উঁচু বেদীর ওপর জেব্রার চামড়া ঢাকা আরাম কেদারায় জোলাস ফ্রিডল্যান্ডার শুয়ে ছিল। একজন বয়স্ক চাকর সামনে দাঁড়িয়ে। একজন ডাক্তার ফ্রিডল্যান্ডারের মাংসল হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল।

কেড বেদীতে উঠে জিগ্যেস করল, এখন কেমন বোধ করছেন?

স্থূলদেহ মানুষটি মুখ বিকৃত করে বলল চলে যাও। কোন্ সাহসে এখানে ঢুকেছ। আমি ছবি তুলতে দেব না। আমার শরীর খুব খারাপ।

আমি ভ্যাল কেড।

পরিচারকটি কেডকে বাধা দিতে আসছিল, ফ্রিডল্যান্ডার তাকে হাত নাড়িয়ে মানা করল।

তুমিই কেড? সত্যি? তোমায় চিনতে পারছি বটে। খুবই অবাক এবং খুশী হয়েছি। তুমি একজন মহৎ শিল্পী...অবশ্য তোমার ক্ষেত্রে। এখানে কেন?

কেড বলল, মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার এই গুলি চালানোর কথা চাপা থাকবে না। আপনি চান না পৃথিবীর সব কাগজে আপনার ফটো বেরোক। আপনি আমাকে চেনেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ছবিগুলো খুবই উঁচু দরের হবে।

ফ্রিডল্যান্ডার হাসার চেষ্টা করল। তার যন্ত্রণা করছিল কিন্তু ভয়ানক খুশী হয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই তুমি ছবি তোল। শোন আর কোন ফটোগ্রাফারকে এখানে ঢুকতে দেবে না।

তরুণ ডাক্তারটি বলার চেষ্টা করল, প্লিজ মিস্টার ফ্রিডল্যান্ডার আপনি এত উত্তেজিত হবেন না।

ফ্রিডল্যান্ডার বলল, যাওতো, আমি হাতুড়েদের কথা শুনি না।

ছবি তুলতে তুলতে কেড বলল, কি করে ব্যাপারটা ঘটল মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার?

বুড়োটার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। কেড ঠিক এই অভিব্যক্তিই চাইছিল। কেড ছবি তুলতেই লাগল ওদিকে ফ্রিডল্যান্ডার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ছোকরা বদ্ধ পাগল। কিছু না ব্যাপারটা, আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে হিংসা হিংসি আর কি। জেরি হিংসের চোটে আমাকে যা তা বলতে লাগল। কিন্তু আমি অন্যের ধমকিতে চলি না। শেষে জেরি এই বন্দুকটা দিয়ে আমাকে গুলি করে বসল। আমি এর জন্য প্রস্তুতই ছিলাম না।

ফ্রিডল্যান্ডার-এর মুখ বিবর্ণ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। কেড মোক্ষম ছবিটি তুলল। ডাক্তার কেডকে ইশারা করল শেষ করতে।

ধন্যবাদ মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার। কেড বেরিয়ে গেল। বুড়োকে দেখে মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে; কিন্তু পাকা অভিনেতা একেবারে। দুর্বলভাবে হাত নাড়ল কেডকে। সদর দরজার বাইরে অনেক গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কেড সাবধান হল। প্রেসের লোকেরা এসে গিয়েছে। কেড টাকারকে জেরি মার্শালের কথা বলল। যাও, দশ মিনিটের বেশি নয় কিন্তু। আমি ওই বাঁদরগুলোকে সামলে আসি।

কেড ঘরে ঢুকে দেখল দুজন ডিটেকটিভ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। জেরি মার্শালের বয়স তেইশ বছর। লম্বা, ফ্যাকাসে চুল ও ভুরু, মুখশ্রী ভাল। চোখ নীল। কেডের হাতে ক্যামেরা দেখেই জেরি আড়ষ্ট হয়ে গেলো। বিদ্বেষের দৃষ্টিতে কেডের দিকে তাকাল। কেড ক্যামেরাটা টেবিলে রেখে বলল, আমি ভ্যাল কেড। তুমি রাজী হলেই আমি তোমার ছবি তুলব জেরি। আজ পৃথিবীর সব সংবাদপত্রে তোমার খবর হেডলাইনে বেরোচ্ছে তুমি তা থামাতে

পারবে না। বাইরে প্রেসের লোকেরা গিজগিজ করছে। তুমি ওদের এড়াতে পারবে না। তবে তুমি যদি আমাকে তোমার ছবি তুলতে দাও আমি কথা দিচ্ছি আমার কাগজের অফিস থেকে আমি তোমার জন্য একজন ভাল অ্যাটর্নি নিয়োগ করিয়ে দেব। সেই তোমার কেস দেখবে। এ ছাড়া আরও যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি আমাকে বলতে পার।

জেরি এবার একটু সহজ হল, বলল, আমি আপনার নাম জানি, কে না জানে? ঠিক আছে আমি আপনার শর্তে রাজী।

জেরি তো আর ফ্রিডল্যান্ডারের মতন আত্মসচেতন নয়, তাই সহজেই ওর মুখের আসল অভিব্যক্তি তোলা যায়। ছবি তোলা হয়ে গেলে একজন ডিটেকটিভ বলল, একে এখনি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে মিস্টার কেড। আপনার হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, তারপর জেরিকে কেড বলল, আজ রাতেই একজন উকিল যাবে তোমার কাছে, সবচাইতে ভাল উকিল। আর কিছু করতে পারি?

মার্শাল একটু আমতা আমতা করে বলল, আমার বোনকে খবর দিতে পারেন দয়া করে।

কেড বলল, নিশ্চয়। আজ রাতেই দেখা করব আমি। ওর ঠিকানা? জেরি মার্শাল ওর নামের একটা কার্ড বাব করে তার পেছনে ওর বোনের ঠিকানা লিখে দিল।

তারপর আবেগ প্রাণপণে দমন কবার চেষ্টা করতে করতে বলল, একটু সইয়ে বলবেন মিঃ কেড। আমাদের মধ্যে খুব ভাব, ও খুবই দুঃখ পাবে।

কেড কার্ডটা নিয়ে বলল, আমার ওপর আস্থা রাখ। বিশেষ কিছু বলতে হবে?

বলবেন বুড়ো হতচ্ছাড়াটাকে আমি খুন করতে পারলে খুশী হতাম।

ঠিক আছে।

ফ্রিডল্যান্ডারের ঘরের বাইরে চেঁচামেচি চলছে। হঠাৎ পরিচারকটি বেরিয়ে আসতে ওর হাত চেপে কেড বলল, পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তা আছে?

লোকটা বলল, ওদিকে চাকর জমাদারদের লিফট আছে।

পাঁচমিনিটের মধ্যে বেরিয়ে কেড জোরে গাড়ি চালিয়েছে 'নিউইয়র্ক সান'-এর অফিসের দিকে।

অফিসে গিয়ে দেখল ম্যাথিসন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। কেড টেবিলে ফিলমের কার্টিজ নামিয়ে রাখল।

হেনরি শুধু আমরাই ছবি তুলেছি। ছবি ভাল হযেছে।

ফ্রিডল্যান্ডার আর যে ছেলেটি গুলি করেছে জেরি মার্শাল দুজনের ছবি তুলেছি।

ম্যাথিসন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে ফটো এডিটরকে ছুটে আসতে বলল।

ম্যাথিসন রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কেড বলল, ছেলেটির সঙ্গে আমি একটা শর্ত করেছি। তুমি ওর জন্য একজন ভালো অ্যাটর্নি ঠিক করবে। আমার ধারণা আমার ছবির জন্য ও খালাস পেয়ে যেতে পারে।

কি বলতে চাইছ?

আগে ছবিগুলো দেখই।

আমি বের্নস্টাইনকে বলছি। এ ধরনের কেসে ও খুবই সফল।

শোন বের্নস্টাইন যেন আজ রাতেই ছেলেটিব সঙ্গে দেখা করে। বলেই কেড সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল।

ছেলেটার বোন ভিকি মার্শাল ট্রিমন্ট অ্যাভেনিউতে একটা ফ্ল্যাটে থাকে।

কেড জানতো না নিয়তি তার সঙ্গে আবার এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। জানে না আজকের এই সাক্ষাৎকার ওকে একদিন ইস্টনভিল নামে একটা শহরে পৌঁছে দেবে।

ফ্রিডল্যান্ডারের আহত হবার খবর যতই চমকপ্রদ হোক বার্ডিক এ নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। ও শুয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখছিল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যাথিসনের ফোন।

এড, এখনি চলে এসো। এক্ষুনি তোমাকে আমার চাই।

আস্তে হেনরি। এখন আমি অফ ডিউটি। আর ফ্রিডল্যান্ডার, শোন...

থামাও তোমার বকুনি। ম্যাথিসন অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল, এড। আমরা একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছি যা আমার ডেস্কের ওপর পড়ে আছে। এটা পেলে তুমি ফোর্ট নক্সের সমস্ত সোনাও চাইবে না। ও বাব্বা! আমাদের কেড ফ্রিডল্যান্ডারের যা একখানা ছবি তুলেছে, দেখলে সারা দুনিয়াতে সাড়া পড়ে যাবে। এ ছবির মতন ছবি তুমি আর দেখ নি। কেড মনে করে এই ছবির জোরেই ছেলেটা খালাস পেয়ে যাবে। আমিও নিশ্চিত। বের্নস্টাইন এখানে আসছে। তুমি লেখার দিকটা দেখ...

বার্ডিক উত্তেজিত হয়ে বসে পড়ল। বল কি হেনরি, কেডের ছবির জোরে...

আরে তাহলে আর কি বলছি। ছবিটা একবার দেখ শুধু...

আমি তোমাকে কি বলেছিলাম হেনরি, তুমি কেডের সম্বন্ধে যা বলেছিলে...

ঠিক আছে বাবা, আমি প্রতিটা কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এবার দয়া করে এখানে এস।

শোন হেনরি, নিউজের ছবি তোলার কথা নয় কেডের। তুমি ওকে এজন্য আলাদা করে টাকা দেবে। এ ছবির কপিরাইট শুধু কেডের। সারা দুনিয়ায় নিশ্চয় এ ছবি ছাপা হবে...

আরে তুমি আমাকে কি মনে কর। আমি কি একটা চোর নাকি?

কোনরকমে জামা গলিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই দরজায় বেল বাজল। কেড আর একটা লম্বা মতন রুপোলী চুল আর ভুরুওয়ালা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

কেড ক্যামেরা নামিয়ে বলল, এড, ইনি ভিকি মার্শাল। এর ভাই ফ্রিডল্যান্ডারের হাতে গুলি করেছে। রিপোর্টারদের উৎপাত এড়াতে আজ রাতে ইনি এখানে থাকবেন।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেড বলল, এখানে আপনাকে কেউ খোঁজ করার কথা ভাববে না, মিস মার্শাল। আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার ধারণা আপনার ভাইকে আমরা খালাস করতে পারব। আমি এখন 'সান'-এর অফিসে যাচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরব।

মেয়েটি আকস্মিক বেদনার আঘাতে তখনও মুহ্যমান হয়ে আছে। তার নীল চোখ দুটো বিষণ্ন, ঠোঁট কাঁপছে।

কেড নরম গলায় বলল, আপনি বসুন। বৃথা দুশ্চিন্তা করবেন না। এড, তুমি কি আসছ?

নিশ্চয়। হেনরি হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে।

লিফটে নামতে নামতে কেড বলল, মেয়েটি অসম্ভব আঘাত পেয়েছে। ভাইকে খুবই ভালবাসে।

বার্ডিক বলল, কি মেয়ে! কি চেহারা! কি করে জান?

মনে হয় ফ্যাশন আর্টিস্ট। ভাইয়ের কাছে যেতে চাইছিল, আমিই সরিয়ে আনলাম।

দশ মিনিট বাদে ওরা ম্যাথিসনের অফিসে ঢুকল। জোয়েল বের্নস্টাইন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। বিখ্যাত ফৌজদারী আইনজীবী বের্নস্টাইন। বেঁটে, মোটা আর একরোখা। উনি কেডের তোলা ফ্রিডল্যান্ডের ছবিটা দেখছিলেন মন দিয়ে। বললেন, ফ্রিডল্যান্ড এই ছবিটা কি করে তুলতে দিল?

বার্ডিক ছবি দেখে শিস দিয়ে উঠল। তুমি বুড়োটার মুখোশ একদম টেনে ছিঁড়ে ফেলেছ ভ্যাল। ওর মুখটা দেখেই মনে হচ্ছে পাপ আর অনাচারের একটা মূর্তিমান ছবি। মুখের প্রতিটি বলিরেখা স্পষ্টভাবে প্রকট। কেমন আক্রোশে ঠোঁটটা কুঁচকে আছে। কি কুৎসিত!

কেড খুব আস্তে বলল, আমরা এ ছবিটা ছাপব না। ফ্রিডল্যান্ডারের সঙ্গে একটা বোঝাপোড়া করব এ ছবিটা নিয়ে।

ম্যাথিসন ফেটে পড়ল, না আমরা এ ছবি ছাপবই। কি বাজে বকছ তুমি?

কেড ম্যাথিসনের দিকে তাকাল। অন্য ছবিগুলি আমি বিনাপয়সায় দিয়ে দিচ্ছি হেনরি। কিন্তু এ ছবিটা আমি না বলা অবধি তুমি ব্যবহার করতে পারবে না।

টেবিলে একটা ঘুঁষি মেরে ম্যাথিসন বলল, আমি এ ছবি ছেপে দিলে তুমি কি করতে পার?

বার্ডিক বলল, নিশ্চয়ই পারে। কপিরাইটের কেসে ফেলে দিতে পারে 'সানকে'।

কেড বের্নস্টাইনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এ ছবিটা ফ্রিডল্যান্ডারকে দেখিয়ে ব্যাপারকে জলদি মিটমাট করতে পারি। ফ্রিডল্যান্ডার যদি বলে এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা তাহলে জেরি মার্শাল ছাড়া পেয়ে যায়।

বের্নস্টাইন একটু ভেবে বললেন, ভাল প্রস্তাব। বলে ছবিটা ব্রিফকেসে পুরলেন। আমি যাচ্ছি।

এক মিনিট...এই। ম্যাথিসন প্রায় পাগলের মতন টেবিল চাপড়াতে লাগল।

ততক্ষণে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছেন, ম্যাথিসনের দিকে তাকালেনও না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপরে ম্যাথিসন বলল, ভ্যাল তুমি জান যে দুনিয়ার সমস্ত কাগজে তুমি এ ছবি বিক্রী করতে পারতে। মোটা টাকাও পেতে। তুমি এরকম করলে কেন?

কিছু না। কোন কোন সময়ে টাকা তুচ্ছ হয়ে যায়। আমি চাই ছেলেটা খালাস পাক।

কেডের দিকে তাকিয়ে বার্ডিকের হঠাৎ মনে হল মার্শালের বোন খুব প্রভাবিত করেছে। কেডকে, তাই যেন মনে হয়।

একঘণ্টাবাদে বের্নস্টাইন ফোন করলেন। ম্যাথিসন ফোন ধরল। উনি বললেন কাজ হয়েছে। আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টারসে যাচ্ছি। ফ্রিডল্যান্ডার রাজী হয়েছে। বন্দুকটা ভাগ্যিস ফ্রিডল্যান্ডারের। এটাই বলা হবে যে মার্শাল বন্দুকটায় গুলি ভরা আছে জানত না। দেরাজ খুলে বন্দুকটা তুলতেই গুলি ছুটে যায়।

সবাই বুঝবে এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা।

কিন্তু প্রমাণ তো করতে পারবে না। বের্নস্টাইন বললেন। ম্যাথিসন ফ্রিডল্যান্ডার আর মার্শালের বাকি ছবিগুলো দেখছিল। যাক অন্তত এগুলি ও একাই ছাপাতে পারবে। তবে একটা সাংঘাতিক সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেল।

বের্নস্টাইন হেসে বললেন, কেড একটা লোক বটে। আমার তো ফ্রিডল্যান্ডারকে ব্ল্যাকমেল করার কথা মনেও আসেনি।

হুঁ। ম্যাথিসন মুখ বিকৃত করে বলল।

জেরি মার্শাল যখন ছাড়া পেল তখন কেড আর বার্ডিক পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের বাইরে অপেক্ষা করছে। জেরি বেবোবার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টাররা ওকে ঘিরে ধরল। সমানে ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাতি জ্বলছে। কোনরকমে একটা পুলিশ জেরিকে কেডের গাড়িতে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। কেড সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

মার্শাল অভিভূত ভাবে বলল, মিঃ কেড, আপনি আমার জন্য যা করেছেন, বের্নস্টাইন আমাকে সব বলেছেন। বিনিময়ে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন...

কেড বলল, তোমার বোনের কাছে তোমার ঋণ আরো অনেক বেশি জেরি। এ কথাটা মনে রেখ। তোমার বোন খুবই ভাল মেয়ে।

বার্ডিক মনে মনে হাসল। বার্ডিক জুয়ানার সব কথাই জানত। ওর মনে হল ভিকি মার্শালের সঙ্গে কেডের একটা সম্পর্ক হলে কেড জুয়ানাকে একেবারে ভুলে যেতে পারবে। আর পারবে নিজেকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে।

কেড ওদের বাড়ির বাইরে গাড়ি থামাল। তারপর মার্শালকে বলল, যাও, ওপরে যাও। আমরা একটু বেড়িয়ে আসছি। আর কোন ঝামেলায় জড়িও না যেন। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুমোতে চাই।

মার্শাল বলল, কিন্তু মিঃ কেড ভিকি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাইবে।

কেড মাথা নাড়াল, ধন্যবাদের দরকার নেই। বলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বার্ডিক সিগারেট ধরাল, ভাল মেয়ে।

কেড বলল, হ্যাঁ।

বার্ডিক আড়চোখে কেডকে দেখতে লাগল। অনেকদিন পরে কেডের মুখে ও বেদনার ছাপটা দেখতে পেল না। ওকে কেমন খুব স্বস্তি পেয়েছে মনে হল।

পরদিন সকালে ওরা হলিউড গেল। বিস্মৃত চিত্রতারকাদের নিয়ে একটা লেখা বেরোবে, সেজন্য যাওয়া। ম্যাথিসন জানত কেড অপূর্ব সব ছবি তুলবে।

ফিরে এসে কেড ওর চিঠিপত্রের মধ্যে ভিকি মার্শালের একটা চিঠি পেল।

প্রিয় মিঃ কেড,

জেরির জন্য আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনাকে সামনে থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

একটু কি দেখা হওয়া সম্ভব? প্রায় সন্ধ্যায় আমি বাড়িতেই থাকি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কেড ভিকি মার্শালের বাড়িতে গেল। ভিকি মেয়েটি নম্র সহানুভূতিশীল স্বভাবের। এবং অবশ্যই শিল্পী মন আছে ওর মধ্যে। ঠিক এরকম একজন সঙ্গীই কেড চেয়েছিল। কিন্তু আশা করে নি।

প্রায় রাত দুটো অবধি ওরা গল্প করল। ভিকি জানাল জেরি কানাডায় চলে গেছে। ভ্যাঙ্কুভারে জেরির বন্ধুর একটা খেলার ক্লাব আছে। ও জেরিকে ওর পার্টনার হওয়ার জন্য অনেকদিনই পীড়াপীড়ি করছিল। ওর নিজের ভাই সমকামী, ভিকির কাছে এ আঘাত সাংঘাতিক। ওরা যদিও দুজন দুজনকে খুব ভালবাসে, কিন্তু ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়াটাই ভাল।

ভিকি কেডকে বলল ও কেডের একজন মস্ত ফ্যান। কেডের ইদানীংকার কিছু ছবি নিয়েও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করল। কেড মুগ্ধই হল।

কেড উঠে পড়বার আগে বলল, কাল আমরা কোথাও যেতে পারি না, শহরের বাইরে? আপনার কি সময় হবে?

ভিকি জানাল তার অনেক কাজ বাকী রয়েছে। সে কেডকে আগামীকাল ডিনার খেতে আসতে বলল।

বেশ, আমরা না হয় বাইরেই খাব কোথায়।

কেন আমার রান্না খেতে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

কেডের হঠাৎ জুয়ানার কথা মনে পড়ল। ওর মুখে এমন একটা বেদনা ফুটে উঠল যে বুদ্ধিমতী ভিকি তাড়াতাড়ি বলল, বেশ আমরা বাইরেই খাব।

না, আমি এখানেই আসব।

তারপর দশদিন ধরে ও রোজই ভিকির ফ্ল্যাটে এল। এই দশ দিনেই ও বুঝল ভিকিকে ও ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেলেছে।

ও ভিকিকে সবই বলল। জুয়ানার কথা, দুঃস্বপ্নের মতন সেই দিনগুলি, ওর রেডইন্ডিয়ানদের কুঁড়েয় পড়ে থাকা...সব। ভালবাসার কথা ওরা উচ্চারণ করেনি কিন্তু কেডও বুঝেছে ভিকিও তাকে ভালবেসেছে। কিন্তু জুয়ানার অশুভ স্মৃতি তার কাছে এখনও মলিন হয়নি, বড় জীবন্ত তার প্রভাব। কেড ভাবছিল সে কি আর কোন নতুন সম্পর্ক শুরু করতে পারবে!

তারপর কেড আর বার্ডিক নতুন কাজ নিয়ে প্যারিসে চলে গেল। প্যারিসে আমেরিকান পর্যটকদের নিয়ে একটা বেশ লেখা হতে পারে।

কেডও একটু স্বস্তি পেল। কিছুদিন নিজের মনটাকে ভাল করে যাচাই করে নেওয়ার জন্য ভিকির থেকে একটু দূরে সরাই ভাল। আটদিন বাদে ফিরতে ফিরতে প্লেনে বসে ও মনস্থির করল সে ডিভোর্স নেবে। আর ভিকিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। বার্ডিককে না জানিয়ে ও একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলল।

শুনল ডিভোর্স পেতে ওর কোন অসুবিধেই হবে না। শুধু মেক্সিকো শহরে তাকে দুসপ্তাহ থাকতে হবে। মেক্সিকোর বিবাহবিচ্ছেদ খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে হয়। উকিলই কেডকে ওঁর মেক্সিকান প্রতিনিধির ঠিকানা দিলেন। কেড ম্যাথিসনকে বলল সে দুসপ্তাহ ছুটি চায়। ম্যাথিসন আপত্তি করল। বার্ডিককে ও বলল বিবাহ বিচ্ছেদ করতেই ও মেক্সিকো যাচ্ছে। বার্ডিক খুশী মনে ওকে শুভকামনা জানাল।

যাবার আগের দিন ও সন্ধ্যাবেলাটা ভিকির সঙ্গে কাটাল। কিন্তু কিছুই বলল না। যতক্ষণ না ও সত্যিই জেনেছে ও মুক্তি পেয়েছে ভিকিকে ও মনের কথা জানাবেই না। শুধু বলল একটা জরুরী কাজে ও দুসপ্তাহের জন্য মেক্সিকো যাচ্ছে।

।। ছয় ।।

এল প্রাভো হোটেলের লবির দেওয়ালে বিভেরার আঁকা পঞ্চাশ ফুট লম্বা প্রাচীর চিত্র। রবিবার বিকেলের একটি সময় আমেরিকান টুরিস্টরা হাঁ করে তাই দেখছিল। কেড লবিতে ঢুকল সে সময়। একা একা সে লাঞ্চ খেয়ে নিয়েছে। আজ রবিবার, কি করে যে সময় কাটাবে ভাবছিল

কেড। মেক্সিকান উকিলরা ওকে পরামর্শ দিয়েছে কেড যেন ওদের সাথে আরো আলোচনা করে। জুয়ানার ব্যাভিচারের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছে, সব প্রমাণ খুঁটিয়ে দেখেছে। এক কথা বলতে বলতে কেডের বিরক্তি ধরে গেছে।

একটা পেপারব্যাক বই কিনে বিকেল অবধি আলামেদা গার্ডেনে সময় কাটাবে ভেবে একটা বইয়ের দোকানে গেল কেড।

সিনর কেড।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কেড ক্রিল অ্যাডোলফোর আনন্দে ঝলমলে মুখটা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হল না কেডের। করমর্দন করতে করতে ক্রিলের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেনি বলে কেডের একটু খারাপ লাগল। কেড ইচ্ছে করেই ক্রিলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি। কেডের দুঃসহ অতীতের সঙ্গে ক্রিল খুবই জড়িত ছিল। কেড সব ভুলতে চাইছিল। তবে এখন ক্রিলকে দেখে তার মন খুশীতে ভরে গেল।

ক্রিল আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছে, এ একটা বিশেষ মুহূর্ত সিনর। আমি তো জানতামই না আপনি এখানে এসেছেন। কি চমৎকার চেহারা হয়েছে আপনার। আপনাকে দেখে এত ভাল লাগছে।

কেড বলল, আমরা দুজনেই খুশী হয়েছি। চল কিছু খাওয়া যাক। তোমার সময় আছে তো?

আপনার জন্য সময় নেই? ক্রিল বলল।

ক্রিল কেডের সঙ্গে একটা স্বল্পালোকিত বারে ঢুকল।

আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ভাল আছেন। নিউইয়র্ক সান-এ আপনার অসাধারণ ছবি দেখেছি। আমি খুবই সাধারণ এবং অশিক্ষিত। হয়তো আমার পক্ষে এটা ঔদ্ধত্য হবে বলা যে আপনার ছবি আমার মনকে ভীষণ নাড়া দেয়।

ক্রিলের স্থূল হাতটায় চাপ দিল কেড। তারপর নিজের জন্য কোকাকোলা আর ক্রীলের জন্য কফি অর্ডার দিল। তারপর আবেগ সামলে বলল, অ্যাডোলফো, প্লিজ আমাকে সিনর বল না। আমাকে ভ্যাল বলেই ডেক। আর তুমি অজ্ঞ, অশিক্ষিত এ সব বাজে কথা বোল্লো না।

আনন্দে উচ্ছাসে ক্রিল প্রায় নেচে ফেলে আর কি।

এবার বল, এখানে এসেছ কেন?

একটুও দ্বিধা না করে কেড ভিকির কথা খুলে বলল।

বলল, অ্যাডোলফো, ভিকির সঙ্গে তোমার আলাপ করতেই হবে। জুয়ানার মধ্যে যা নেই, ওর মধ্যে আছে। আমি জুয়ানার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এসেছি। জুয়ানার সঙ্গে আমার যা হয়েছিল তা নিছক পাগলামো বলতে পার। এখন আমি সবই বুঝতে পারছি।

জুয়ানা তোমার উপযুক্ত নয়, কেড। ও বোঝে শুধু টাকা। ও ব্যাধিগ্রস্ত।

কেড ইতস্ততঃ করে বলল, জুয়ানার কি হল শেষ পর্যন্ত?

জুয়ানা এখন এখানে।

গলার মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে তোলে কেডের। মাথা নীচু করে বলল, এখনো ডিয়াজের সঙ্গেই আছে?

না ও ডিয়াজকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। ওরা যখন স্পেন থেকে ফিরল তখনই ওদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। আজ বিকেলে আমি ডিয়াজের ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই দেখতে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে এটাই ওর শেষ লড়াই।

শেষ লড়াই মানে?

ডিয়াজকে আমি দেখেছি, কেড। ও এখন একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। জুয়ানা ওর সাহস নিঃশেষ করে দিয়েছে। ওকে দেখলে তোমার দুঃখ হবে। গত রবিবার দর্শকরা ওর দিকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছে। তুমি ভাবতে পার?

কিন্তু অ্যাডোলফো কেন? কেড বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করল।

ক্রিল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, একটা রেডইন্ডিয়ানের কুঁড়ে ঘরের কথা তোমার মনে পড়ে...তা-ও জানতে চাও কেন?

কেড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, সত্যি আমরা পুরুষরা সত্যিই নির্বোধ।

জুয়ানাকে ভালবাসা মানে মৃত্যুকে ভালবাসা।

দ্বিতীয়বার কেড এই তুলনাটা শুনল। বলল, জুয়ানা কী করছে এখন?

চ্যাপুলটেপেক পার্কে তুমি একসময়ে যে বাড়ি ভাড়া করেছিলে ওখানেই থাকে এখন। ওর সঙ্গে এখন কেউ নেই। ডিয়াজ জুয়ানাকে অনেক দামী দামী উপহার দিয়েছিলো তাতেই... তাছাড়া ও সানপাবলো নাইট ক্লাবে রোজ রাতেই যায়। ওখানে ধনী আমেরিকানদের আড্ডা। দিব্যি আরামেই আছে ও।

কেডের চোখের সামনে জুয়ানার প্রায় অলৌকিক চেহারাটা ভেসে উঠল। ওর দীর্ঘ এলায়িত কালো চুল একটা বর্মের মতন ওর শরীরকে ঢেকে রাখে। জুয়ানার মতন তাকে কেউ আর অত উন্মত্ত করতে পারবে না।

কেড জোর করে জুয়ানার ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলল।

অ্যাডোলফো আমি ডিয়াজের লড়াই দেখতে চাই।

বেশ। আজকাল ডিয়াজের লডাইয়ে আর ভীড় হয় না। শুধু ওর অনিবার্য পরিণতি দেখার আশায় অনেক শকুন ওখানে ভীড় করে।

তবে তুমি কেন যেতে চাও অ্যাডোলফো।

আমার জীবনের একটা অধ্যায় তোমার, জুয়ানার আর ডিয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কেড। ওর জন্য আমার টায়ার খোয়া যায। যে ঘটনা গোড়া থেকে দেখেছি তার শেষটাও আমি দেখতে চাই।

গোল ময়দানে বাসি ছড়ানো। মাঠটা লালরঙের তার দিয়ে ঘেরা। বেড়াতারের ঠিক পাশের সীটটায় ক্রিল আর কেড গিয়ে বসে পড়ল। সত্যিই অনেক সীট খালি আছে। তবে ভীড় হয়েছে।

কেড ক্ল্যানোকোকে দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে রেজিনো তরোয়াল অনুশীলন করছে।

কেডকে ওর দিকে তাকাতে দেখে ক্রিল বলল, হ্যাঁ, রেজিনো এখনও ডিয়াজের সঙ্গে আছে। ডিয়াজের সত্যিই বিশ্বস্ত অনুচর ও।

গত রবিবার দর্শকরা যখন ডিয়াজকে বোতল ছুঁড়ে মারছিল, রেজিনো কাঁদছিল।

চারদিকে রোদ ঝকমক করছে। পরনে রুপোলি কালো পোষাক, পেড্রোকে দেখেই চিনতে পারল কেড। দুপাশে দুজন মাতাদোর। ওদের পেছনে আরো লোক। সবচেয়ে পিছনে ঘোড়ার পিঠে সহযোদ্ধারা।

ডানহাত দুলিয়ে ওরা বালির ওপর দিয়ে সমান তালে হেঁটে এল। কেড ভেতরে ভেতরে একটা অসুস্থ উত্তেজনা বোধ করল। সে ডিয়াজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ক্রিল ঠিকই বলেছে। আজকের ডিয়াজ আগের ডিয়াজের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তার সেই বাজপাখির মতন ধারালো মুখ কেমন ঝুলে পড়েছে, আগের মতন নিষ্ঠুর লাগছে না ওকে। ওর চোখ অস্থিরভাবে ঘুরছে। ক্রিল বলল প্রথম ষাঁড়টাব সঙ্গে ও লড়বে।

ডিয়াজ এগিয়ে গিয়ে ক্ল্যানোকোকে ওর আংরাখা দিল।

ডিয়াজ হঠাৎ কেডকে দেখতে পেল। মুখ ফিরিয়ে ও ক্ল্যানোকোকে কী বলল। ক্ল্যানোকোও কেডের দিকে তাকাতে লাগল। দুজনে মিলে কেডের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে লাগল। এসময় ষাঁড়টা ঝড়ের বেগে মাঠটায় ঢুকে পড়ল। তারপর শিং বাগিয়ে চারিদিকে ছুটতে লাগল। ষাঁড়টা যখনই কোন আংরাখা দেখতে পেল তার দিকে তেড়ে গেল।

ওঃ কি প্রকাণ্ড ষাঁড়টা। ক্রিল বলে উঠল।

ডিয়াজ ষাঁড়টাকে দেখতে লাগল। ক্ল্যানোকো রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে রেগেমেগে ডিয়াজকে কি যেন বলল। ডিয়াজ বলল, চুপ কর। আমাকে বোতলটা দাও। ক্ল্যানোকো বিরক্তিভরা মুখে একটা চোঙ্গার মতন মুখওয়ালা সোরাই দিল। ডিয়াজ চকচকিয়ে তা খেয়ে খেয়ে সোরাইটা ফেরত দিল।

ক্রিল বলল, সবাই ভাবছে ওটা জল, আসলে ওটা টেকুইলা।

মাঠে তখন ভীষণ হইচই। ষাঁড়টা একটা ঘোড়াকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। ডিয়াজ

সরাসরি কেডের দিকে তাকাল, আবার দেখা হল তাহলে। তোমার জন্যই আমি এই ষাঁড়টাকে মারব। তবে আমি তোমাকে করুণা করি। ডিয়াজের কথাগুলো কেড ঠিকই শুনতে পেল।

গুডলাক, কেড আস্তে বলল। ডিয়াজকে দেখে কেডের করুণা হল। তারপর বেঁটে চৌকো মানুষটা ষাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। মাঠের বাকি সবাই চলে গেছে। এখন ডিয়াজ আর ষাঁড়টা মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য তৈরী।

ডিয়াজ হাঁটতে হাঁটতে দুবার হোঁচট খেল। জনতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে ডিয়াজকে দেখছে। কেড দেখল ক্ল্যানোকো অন্য দুজন মাতাদোরকে কি যেন বলল। তারপর আংরাখা হাতে ওরাও ডিয়াজের পেছন পেছন ছুটল। অর্ধচক্রাকারে ডিয়াজকে ঘিরে আগলাতে আগলাতে ওরা চলল।

ডিয়াজ ষাঁড়টার তিরিশগজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে আসা মাতাদোরদের স্প্যানিশ ভাষায় গালাগাল দিল। ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। কেড দেখল দর্শকদের সীট আর মাঠ ঘেরা রেলিঙের মাঝ দিয়ে ক্ল্যানোকো পাগলের মতন ষাঁড়টার দিকে ছুটছে।

ক্রিল বলল, আরে বোকাটা করছে কী, এতে ডিয়াজ আরও ঘাবড়ে যাবে।

এবার ডিয়াজ ষাঁড়টার পনের গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তারপর আংরাখাটা খুলে ষাঁড়ের দিকে দোলাতে লাগল। ততক্ষণে ক্ল্যানোকো ষাঁড়টার পেছনে রেলিং বেয়ে নামবার চেষ্টা করছে। লেজ সোজা করে ষাঁড়টা আক্রমণ করল। এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। একটা প্রায় পৃথিবী কাঁপানো শব্দ হল, কেড দেখল ডিয়াজ ছিটকে শূন্যে উঠে গেল আর তারপর চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল বালির ওপর। এবার ষাঁড়টা ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এগিয়ে এল। অন্যরা দৌড়ে আসছে। ডিয়াজ উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু ষাঁড়টার গতি এত ক্ষিপ্র যে ক্ল্যানোকো কিছুই করতে পারল না। বাঁ শিং দিয়ে ষাঁড়টা ডিয়াজের বুক চিড়ে ওকে রেলিঙের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। তারপর আবার শিং বেঁধাল।

ক্ল্যানোকো আর্তনাদ করতে করতে ষাঁডটার সিং ধরে ওর নাকে ঘুঁষি মারতে লাগল। দর্শকদের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে কেডও পাগলের মতন চেঁচাচ্ছিল। ক্ল্যানোকোকে এবার মাটিতে আছড়ে ফেলে ষাঁড়টা অন্য একজন পলায়মান মাতাদোরের পেছনে ছুটতে লাগল। যাবার সময় ক্ষুর দিয়ে ক্ল্যানোকোর মুখটা থেঁতলে দিয়ে গেল। তিনজন চাকর এসে ডিয়াজকে তুলে নিয়ে মাঠ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। একজন ক্ল্যানোকোকে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্ল্যানোকোর মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল।

কেডের বমি পাচ্ছিল, সে কোনরকমে বলল, চল যাওয়া যাক। গেটের বাইরে দিয়ে যেতে যেতে কেড উদ্‌ভ্রান্তের মতন বলল, ডিয়াজের আঘাত খুব গুরুতর মনে হয় তোমার?

ক্রিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ডিয়াজ নিশ্চয়ই এতক্ষণে মারা গিয়েছে। ওর পাঁজরার হাড় চুরচুর হয়ে গেছে ষাঁডটার শিঙের ঘায়ে।

কেড খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। বলল, আমাকে হোটেলে নিয়ে চল অ্যাডোলফো। আমি এ শহর থেকে চলে যেতে চাই। আমার ঘেন্না ধরে গেছে এখানে।

ক্রিল অগুনতি গাড়ির ভীড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ওর পন্টিয়াকের কাছে পৌঁছে বলল, ডিয়াজ নিজেই নিয়তি ডেকে এনেছে। ক্রিল হোটেলের বাইরে গাড়ি থামাতে কেড বলল, নিজে কদিনের মধ্যে আমি চলে যাব। তোমায় খবর দেব। হোটেলে ঢুকেই কেড ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসে গিয়ে তার পরদিনই নিউইয়র্ক যাবার প্লেনে টিকিট বুক করল। লিফ্‌ট ওপরে চলে এলে কেড চাবি দিয়ে নিজের ঘর খুলল। সন্ধ্যার দীর্ঘ প্রহরগুলো সে কি করে কাটাবে ভেবে তার মন ভারি হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল কেড, আর তারপরই পাথর হয়ে গেল। জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে জুয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাধাসিধে পোষাক পরে আছে। চারিদিক দিয়ে রোদের আভা ওকে ঘিরে ধরেছে।

তোমার মতন কেউ হয় না, হতে পারে না। আমি ফিরে এসেছি কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমায় কত ভালবাসি। বলেই জুয়ানা দুহাত কেডের দিকে বাড়িয়ে দিল। তুমি কি আমাকে চাও, তাহলে নাও আমাকে। পরদিন সকালে কেড নিউইয়র্কে যাবার সীট ক্যানসেল করল। জুয়ানা বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে আছে। সারারাত ওরা পাগলের মতন কথা বলেছে, হেসেছে,

ভালবেসেছে। জুয়ানা কেডকে বলল, তোমাকে হারিয়ে বুঝেছি তুমি আমার কতখানি জুড়ে আছ। আমি একা ছিলাম এই জন্যই কুবুদ্ধি আমায় পেয়ে বসেছিল। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে কক্ষনো এমন হত না।

জুয়ানা কেডকে কী ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে, সবই মনে পড়েছে কেডের। কিন্তু ও সে নিয়ে আর ভাবল না। ও বুঝেছে জুয়ানা যত নিষ্ঠুরতাই করুক না কেন, জুয়ানা তার সর্বস্ব। জুয়ানা তাকে ডাকলে সে তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। এ যেন ভয়ংকর এক নিয়তির নির্দেশ।

আমরা পুরনো কথা আর মনে করব না জুয়ানা। তুমি আমার স্ত্রী। আমরা নতুন করে আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু করব। আমরা নিউইয়র্কে ফিরে যাব। কোথাও একটা ছোট ফ্ল্যাট খুঁজে নেব। আমরা খুব সুখী হব।

জুয়ানা কেডের হাত বোলাতে বোলাতে বলল, নিউইয়র্ক? আমার মনে হয় না ডার্লিং নিউইয়র্কে আমার থাকতে ভাল লাগবে। আমরা তো সেই বাড়িটাতেই থাকতে পারি।

নিউইয়র্কে আমার সান-এর সঙ্গে কনট্রাক্ট আছে। আমাকে ওখানেই কাজ করতে হবে।

কনট্রাক্ট? তার মানে?

আমি একটা কাগজে কাজ করি।

ওরা ভাল টাকা দেয় তোমাকে?

না

তবে তুমি ওখানে কাজ কর কেন?

সে তুমি বুঝবে না। এখনও দেড়বছর ওদের সঙ্গে আমায় কাজ করতে হবে।

জুয়ানা বলল, ওরা কত দেয় তোমায়?

হপ্তায় তিনশো ডলার, হতাশায় ডুবে যেতে যেতে কেড ভাবল অ্যাডোলফো ঠিকই বলে, জুয়ানা বোঝে কেবল শরীর আর টাকা।

টাকা তোমার কাছে খুব দামী না?

জানিনা। টাকা থাকা ভাল, তবে সেটা এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। তারপর হেসে জুয়ানা বলল কেড আমি কত কম টাকায় তোমার সংসার চালিয়েছি বল? নিজের হাতে রান্না করেছি।

হ্যাঁ।

তোমার কি মনে হয় সপ্তাহে তিনশো ডলারে আমরা চালাতে পারব?

নিশ্চয়। হাজার হাজার লোক-এর চেয়ে অনেক কমে সংসার চালায়।

তবে চল আমরা নিউইয়র্কে যাই।

কেড উকীলদের জানাল সে বিবাহ বিচ্ছেদ চায় না। এ বিষয়েও জুয়ানার সঙ্গে ও কথা বলল। জুয়ানা বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে পার না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। তুমি আমার স্বামী, তাই জন্যেই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

জুয়ানার মুখ দু হাত দিয়ে তুলে ধরে কেড বলল, তুমি আমার স্ত্রী তাই তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারছি।

জুয়ানা বলল, চল আমরা বাড়ী যাই। এই মাসের শেষ অব্দি ভাড়া দেওয়া আছে।

ওর সেই ওদের আগেকার বাড়ীতে ফিরে গেল। গ্যারাজে নতুন লাল থান্ডারবার্ডটা চোখে পড়ল কেডের।

জুয়ানা যেন কিছুই নয় এভাবে বলল, তোমার আমার অনেক পছন্দ ছিল। এটা পেড্রো আমাকে দেয়। ওকে তো ক্ষতিপূরণ দিতেই হত।

কেড বুকের কষ্টটা জোর করে সরিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে জুয়ানা বলল, তোমায় একটু টেকুইলা এনে দি?

কেড বলল, না আমি আর মদ খাই না।

কেন?

কেড বলল, মদ খেলে আমার শরীরের ক্ষতি হবে।

জুয়ানা যেন একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর ভেতরে গিয়ে কেড স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনটা

বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে ওর। গাড়িটা দেখে ও বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওদের শোবার ঘরে জুয়ানা আর ডিয়াজ প্রেম করত, এই ভেবে ওর যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। অথচ ও এত অসহায় যে জুয়ানাকে অস্বীকার করার তার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্ক স্থায়ী হবে না, কেড মর্মে মর্মে বুঝছিল। জুয়ানা যেমন শরীর আর টাকা ছাড়তে পারে না সেও জুয়ানাকে না ভালবেসে থাকতে পারে না। তবুও তো ক্ষণিকের জন্যও জুয়ানাকে চোখ ভরে দেখতে পাবে। জুয়ানা যদি ওকে ছেড়ে দেয় ও নিজেকে আর ধ্বংস করবে না। বড় কষ্ট পেয়েছে সে, আর সে নিজের জীবন নষ্ট করবে না।

দশদিন স্বপ্নের মতন কেটে গেল। এই দশদিন সে নিমেষের জন্য চোখের আড়াল করেনি জুয়ানাকে। একদিন বাগানে বসে জুয়ানা বলল, সোনা তুমি সুখী হয়েছ তো?

কেড বলল, কেন একথা বলছো?

জুয়ানা বলল, কত বদলে গেছ তুমি। কত গম্ভীর। কেমন যেন উদাসীন লাগে তোমাকে। তুমি আবার কাজ শুরু করবে না?

হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি তোমাকে। আমি নিউইয়র্কে ফিরব তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

নিউইয়র্কে কোথায় থাকব আমরা? আমাদের বাড়ীতে বাগান থাকবে না?

না।

জুয়ানার পরনে বিকিনি। সে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। কেডের মনে হ্ল জুয়ানা যেন সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমা।

আমার মনে হয় তুমি আগে ফ্ল্যাটটা জোগাড় কর তারপর না হয় আমি যাব। দেখ আমি কেমন হিসেবী হয়ে গেছি।

না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে জুয়ানা।

বেশ তো, তুমি যা বলবে ডার্লিং। কবে রওনা হব?

আগামী বৃহস্পতিবার।

তাহলে বুধবার বিকেলেই আমরা গাড়ি চালিয়ে চলে যাব নিউইয়র্ক।

কেড জুয়ানাকে লক্ষ্য করছিল, বলল, নিউইয়র্কে তোমার গাড়ি লাগবে না জুয়ানা। ওখানে পার্ক করবার জায়গা নেই। গাড়িটা আমরা বেচে দিয়ে যাব।

জুয়ানার চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই বলল, ঠিক আছে।

রাতে কেড বার্ডিককে টেলিফোন করল।

বৃহস্পতিবার ফিরবো এড। গিয়েই কাজ ধরব।

বার্ডিক বলল, বেশ তাই হোক। একটা খবর দেবে তো। আমি চিন্তায় মরি। ভাল আছ তো?

খুব। দেখা হলে সব বলব।

ঠিক আছে, একটা কাজ তোমার জন্য ঠিক করেই রেখেছি।

কি কাজ?

হ্যারি ওয়েস্টনের ডিজাইন করা পোষাকে একটা নতুন গানের নাটক শুরু হচ্ছে। শুধু আমরাই এই খবরটা ছাপার ভার পেয়েছি। শুক্রবার বিকেলে শুরু হচ্ছে।

ঠিক আছে। আমি পৌঁছে যাব কেড টেলিফোন ছেড়ে দিল। তারপর ক্রিলের সঙ্গে কথা বলল কেড।

অ্যাডোলফো আমি আর জুয়ানা একসঙ্গে আবার থাকব, ঠিক করলাম। বৃহস্পতিবার আমরা নিউইয়র্ক যাচ্ছি। গ্যারেজে ওর গাড়িটা রেখে দিচ্ছি। বেচে দিতে পারবে?

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর ক্রিল বলল, কী বললে, আমি ঠিক শুনেছি? তুমি আর জুয়ানা। আবার বলতো?

ঠিক ঠিক আছে। অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি যা করেছি ভেবেচিন্তেই করেছি। গাড়িটার ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

ক্রিল তখনও স্তম্ভিত হয়ে আছে। কোন রকমে বলল, ঠিক আছে।

ধন্যবাদ, কেড তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখল।

বুধবার রাতে বাক্স গোছাতে গোছাতে হঠাৎ জুয়ানা দু হাতে মাথা টিপে বিছানার ওপর বসে পড়ে।

কেড দৌড়ে ওর কাছে গেল, কি হল সোনা?

জুয়ানা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখ ব্যথায় শক্ত হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে জুয়ানা বলল, এই সময় প্রতিমাসে আমার এই নরকযন্ত্রণা। যাও যাও আমাকে একা থাকতে দাও।

কেড বলল, আমি ডাক্তার ডাকছি।

বোকার মতন কথা বোল না। মেয়েদের এরকম হয়। তুমি খোকা নাকি? আমাকে একা থাকতে দাও, ব্যস্।

নিচে গিয়ে কেড অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। তারপর বাগানে গেল। শেষে থাকতে না পেরে আবার উপরে গেল। জুয়ানা তখনও শুয়ে আছে। মুখ একেবারে চকের মতন সাদা। কেডকে দেখে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে বলল, কি হল, বললাম না আমাকে একা থাকতে দাও। এরকম হয় আমার। দু একদিন যন্ত্রণা থাকে তারপরেই ঠিক হয়ে যাব আমি।

কেড তবু বলল, কাল যেতে পারবে তো?

যেতে বাধ্য হলে যাব। এখন তো যাও। জুয়ানা বলল।

কেড বলল, বাধ্য হলে যেতে হবে না। পরেও গেলে হবে। আমি কি কিছু করতে পারি তোমার জন্য?

না, কিছু না। কাল নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন স্বাভাবিকভাবেই জুয়ানা ঠিক হল না। এত সাদা রক্তশূন্য লাগছিল ওকে যে কেড জুয়ানাকে নিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিল। তবু কেন জানিনা মনে হল, ঠিক যাওয়ার সময়েই জুয়ানার অসুখটা হল যেন সাজানো ব্যাপার একটা।

কেড জানে জুয়ানাকে অবিশ্বাস করা উচিৎ। তবু যতদিন পারবে ও জুয়ানাকে নিজের দখলে রেখে দেবে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কেড জুয়ানাকে বলল, আমি যাচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা দেব। মনে হচ্ছে যেতে পারবেনা না?

তুমি জোর করলে আমি যাব। ব্যথা সহজ করব আমি।

না, না শুয়ে থাক তুমি।

নীচে গিয়ে ক্রিলকে ফোন করল কেড, অ্যাডোলফো খুব তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারবে? তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

যেমন কথা, দশ মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির ক্রিল। ওর সারা মুখে উদ্বেগ।

কেড ওকে নিয়ে বসবার ঘরে গেল, আমার একটা উপকার করবে ভাই আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।

বেশ তুমি যা বলবে, করব। কিন্তু জুয়ানার ব্যাপারটা কি? আমি তো তোমাকে সাবধান...

জানি। শোনো আগামী তিনদিন তোমার কোন জরুরি কাজ আছে।

না।

আমি চাই তুমি এ বাড়িতে থাক। তুমি জুয়ানার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। জুয়ানা ভাল হলে তুমি ওকে নিউইয়র্কের প্লেনে বসিয়ে দেবে।

আমি ভাল করে বুঝলাম না।

আমার আর জুয়ানার একসঙ্গে নিউইয়র্কে যাবার কথা ছিল আজ। জুয়ানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এটা ওর ধাপ্পাও হতে পারে। হয়তো আমার থেকে ও ভাগবার সুযোগ খুঁজছে।

ক্রিল একেবারে বিচলিত হয়ে পড়ল, আমি বুঝতে পারছিনা, ও যদি চলে যেতে চায় ওকে যেতে দিচ্ছ না কেন। ওরকম একটা মেয়েমানুষ দিয়ে তোমার কি হবে?

আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না অ্যাডোলফো। ও যে আমায় চায় আমি নিশ্চিত জানি।

হয়তো আমাকে ভালওবাসে। কিন্তু ওর কাছে টাকার আকর্ষণ সাংঘাতিক। ধরে নাও না একটা যুদ্ধে নেমেছি আমি। দেখি না জয়ী হতে পারি কি না।

তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

হ্যাঁ। তুমি আমার অতি বিশ্বাসী বন্ধু। তুমি আমার জন্য এটুকু করবে?

নিশ্চয়। ওকে আমি নিউইয়র্কের প্লেনে তুলে দেবই, কথা দিচ্ছি।

কেড ওপরে গিয়ে জুয়ানাকে বলল ক্রিল তোমার দেখাশোনা করবে। তুমি সুস্থ হলে ও তোমায় নিউইয়র্কের প্লেনে তুলে দিয়ে আসবে।

আমার ওপর তোমার একটুও বিশ্বাস নেই না?

না। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমাকে ঘরে রাখতে চাই।

হঠাৎ হাসল জুয়ানা, হাত দুটো বাড়িয়ে বলল, আমি যে তোমায় কী ভালবাসি। এরকম ভালবাসা পাওয়া যে কোন মেয়ের ভাগ্যি। আর কেউ আমার জন্য এত কষ্ট করেনি।

জুয়ানা আবেগে থরথর করে কাঁপছিল।

আমরা দুজনে মিলে একটা চমৎকার জীবন গড়ে তুলতে পারি জুয়ানা।

নিশ্চয়ই আমরা তা করব।

ব্যাগ হাতে কেড নীচে নেমে এল। ক্রিল নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে দুজনের হাত ঝাঁকাল।

তোমার জন্য আমি কি করতে পারি অ্যাডোলফো? কেড বলল।

ক্রিল মৃদু হেসে বলল, সময় নিশ্চয়ই আসবে। বন্ধুত্বের মানেই তো হল পরস্পরের কাজে লাগা।

বিদায় অ্যাডোলফো। প্রতিদিন সন্ধ্যা আটটায় আমি ফোন করব। ওর ওপর নজর রেখ।

নিশ্চয়ই কিন্তু এরকম করে তুমি কতদিন চলতে পারবে। তোমার তো সুখ আসবে না।

আমি সুখ কিনতে চাইছি অ্যাডোলফো। আচ্ছা চলি।

বার্ডিক এয়ারপোর্টে এসেছিল। রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক। তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বার্ডিককে জুয়ানার কথা বলার চেষ্টা করল কেড। বার্ডিক ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ভ্যাল। তবে আমি মনে করেছিলাম তুমি ভিকির ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস। ঠিক আছে তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে বার্ডিক বলল, ভগবান করুন তুমি যা করছ তা ভেবেচিন্তে যেন কর।

কেড ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলল, জুয়ানা আমার স্ত্রী এড। বিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চিরস্থায়ী ব্যাপার। বার্ডিক কাঁধ ঝাঁকাল।

আমার কাছে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আমি হচ্ছি সিনিক। শোন আমি ওয়েস্টনের ডিজাইন শো নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।

এরপর কাজের কথা বলতে বলতে ওরা নিউইয়র্ক সা-এর অফিসে পৌঁছে গেল। সেই থেকে এমন ভাবে কাজে জড়িয়ে পড়ল কেড যে জুয়ানার খবরই নিতে পারল না। শহরে একটা বারে ওয়েস্টন, বার্ডিক আর নাটকের দুই প্রধান অভিনেতার সঙ্গে মঞ্চসজ্জা নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল কেডের। সাতটা পঞ্চাশ বাজে। তখনি ও কাছের একটা টেলিফোন বুথ থেকে মেক্সিকোতে টেলিফোন করল।

ক্রিল বলল জুয়ানা এখনও সুস্থ হয়নি। গাড়ির খদ্দের পেয়েছে একটা। ভালই দাম দেবে।

জুয়ানার সঙ্গে কথা বলা যাবে?

ঘুমোচ্ছে। পাঁচ মিনিট আগেও দেখেছি।

তবে কি ওর সত্যিই অসুখ করেছে?

বলতে পারছি না। ও ওপরে শুয়ে আছে, আমি নীচে বাগানে আছি। চিন্তা কোর না। কাল আবার ফোন কোর।

ওকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে পাঠাও।

কথা দিয়েছি তো। আমার সাধ্যমতন করব।

ফোন ছেড়ে দিয়ে এই প্রথম নিজেকে খুব হাল্কা লাগল কেডের। পরের দিন সারাদিনটা কেটে

গেল ব্যস্ততায়। সন্ধ্যার শুরুটা ফিল্ম্‌ ডেভেলপ করেই কাটিয়ে দিল কেড। কখন ফোন করবে ভেতরে ভেতের ছটফট করছিল। আটটার সময়ে অন্যদের হাতে প্রিন্ট করবার ভার দিয়ে ও একটা ফাঁকা অফিস কামরায় গিয়ে মেক্সিকোয় ফোন লাগাল। টেলিফোনের কানেকশনের জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কেড। অপারেটর জানাল কেউ ধরছে না।

কেড আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু আমি জানি বাড়িতে লোক আছে। আরেকটু দেখুন না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে কেড টালমাটাল হতে লাগল। অপারেটর জানাল কোন জবাব নেই। হয়তো ক্রিল জুয়ানাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছে। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে ফোন করল কেড। এয়ারপোর্ট থেকে জানাল ঘণ্টা দুয়েক বাদে মেক্সিকোর একটা প্লেন আসছে। নিশ্চয়ই ওই প্লেনে আসছে জুয়ানা। কিন্তু অ্যাডোলফো খবর দেবে তো একটা।

একঘণ্টা বাদে ছবিগুলো ম্যাথিসনকে পাঠিয়ে আবার ক্রিলকে ফোন করল কেড। এবারও অপারেটর জানাল কোন উত্তর নেই। এয়ারপোর্টে ফোন করে জানল মেক্সিকো থেকে সবচেয়ে শেষে যে প্লেন এসেছে তাতে জুয়ানা নামের কেউ নেই।

এ সময় বার্ডিক ঘরে ঢুকল। কেডের মুখ দেখে চমকে বার্ডিক বলল, কি হয়েছে?

কেড বলল, জুয়ানার কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছি না। ওকে ছেড়ে আসা আমার উচিৎ হয়নি। চুলোয় যাক সব। চল বেরোই, একটু মদ খাই।

থাম, তুমি আবার এসব শুরু করতে পারবে না। চল বাড়ি চল।

কেড একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, চল বাড়িই চল।

পরদিন ভোর ছটায় কেড আবার ফোন করল। এবারও কোন জবাব নেই। এয়ারপোর্টে ফোন করল কেড। সকাল সাড়ে নটায় মেক্সিকো যাবার একটা প্লেন আছে। সামান্য জিনিস ব্যাগে পুরে কেড ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। তার মনের মধ্যে একটা ঝড় চলছে যেন। তবু নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল কেড। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে পার্কের সেই বাড়িটাতে পৌঁছল কেড। নেমেই দেখল গ্যারাজ খোলা থান্ডারবার্ড নেই। সদর দরজা হাঁ করে খোলা। কেড প্রায় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। দরজা জানলা সব হা হা করছে। একটা ভয়ংকর সর্বনাশের আঁচ পাচ্ছে কেড। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ও ওপরে শোবার ঘরে গেল। শোবার ঘরের দরজার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কেড। তার বুকের হৃৎপিণ্ডটা সমানে লাফাচ্ছে। শেষে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

ক্রিল বিছানায় পড়ে আছে। পরনে সাদা গোলাপী ডোরাকাটা পায়জামা। ডান হাতে একটা ২২ রিভলভার আঁকড়ে ধরে আছে ক্রিল। বিছানায় রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে ডেলা হয়ে আছে। কপালে রগের ওপর একটা ছোট কাল গর্ত। কেড বুঝল ক্রিল কিভাবে মরেছে। বাতাসে তখনো জুয়ানার সেই বিশেষ এসেন্স ভাসছে। সেদিনই অনেক রাতে নিউইয়র্কে ফিরে এল কেড। বার্ডিক খুবই দুশ্চিন্তা করছিল। কেডকে দেখেই বার্ডিক বুঝল কেড প্রচুর মদ খেয়েছে।

যাক। অদ্ভুত হেসে কেড বলল, সব চুকে গেল।

বার্ডিক কেডের মদ খাওয়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কিন্তু সে কথা না বলে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কেড আবার অদ্ভুতভাবে হাসল, জুয়ানা ভেগেছে এড। নিজের সব জিনিস গুছিয়ে নিয়ে, থান্ডারবার্ড নিয়ে কেটে পড়েছে। হয়তো আমারই দোষ। আমি বড্ড কড়াকড়ি করছিলাম। গাড়িটা নিয়ে ওকে জবরদস্তি না করলে ও নিউইয়র্কে নিশ্চয়ই আসত। কিন্তু ওর এক প্রেমিকের গাড়ি বলে আমি সহ্য করতে পারিনি। আর তাছাড়া আমি কম রোজগার করি বলে ও ভয়ও পেয়েছিলো।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে ক্রিল ওর দেখাশোনা করছে। ও কি বলল।

কেড প্রায় পাগলের মতন হাসল এবার। তাই দেখে বার্ডিক ভয় পেয়ে গেল।

অতি কর্কশ, বিতৃষ্ণায় ভরা কণ্ঠে কেড বলল, নিশ্চয়ই। দেখাশোনার কথাই তো ছিল। আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম আমি ক্রিলকে বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু আমি একটা গাধা। তুমি ভাবতে

পার ক্রিল জুয়ানার সঙ্গে শুয়েছে?

বার্ডিক জোরে নিশ্বাস টানল। কি বলছ ভ্যাল? ক্রিলকে আমি ভাল লোক বলে জানতাম।

ঠিকই বলছি। আমাদের বিছানায় শুয়েছিল ক্রিল। মূর্খ বেজন্মাটা গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

তারপর চোখ ঢেকে বলল, উঃ আমি ভাবতে পারছি না। জুয়ানার ওপর জবরদস্তি করে, তারপর আমার মুখোমুখি হবার সাহসে কুলোয়নি। হোঁৎকা, একটা নির্বোধ একটা বেশ্যার বাচ্চা...

হা ভগবান। অসম্ভব আঘাত পেল বার্ডিক। ও তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে আকাশ দেখতে লাগল।

কেডের গলা কাঁপছিল, ক্রিল কথা দিয়েছিল ও জুয়ানাকে প্লেনে তুলে দেবে। বলেছিল আমি যেন ওকে বিশ্বাস করি। আমি হলফ করে বলতে পারি আমি মেক্সিকো ছাড়ার আগেই ও আমাদের বিছানায় গিয়ে জুয়ানাকে পাকড়াও করে। পাজী, হতচ্ছাড়া নরকে যেন ও ঝলসে মরে।

চুপ কর। এবার রাগে ফেটে পড়ল বার্ডিক। তুমি মাতলামি করছ। যা ঘটেছে তোমারই দোষে। তুমিই ক্রিলকে মারলে। ক্রীলের মতন সরল লোককে ঐ রকম একটা মেয়েছেলের খপ্পরে কেউ ফেলে আসে? এই মেয়েছেলেটা তোমাকে কতবার বোকা বানিয়েছে? ওই অ্যাডোলফোকে ওর সাথে শুতে বাধ্য করেছে, লোভ দেখিয়েছে। কি করে তোমার মনে হল অ্যাডোলফোর মনের জোর তোমার থেকে বেশী? তুমি যদি পুরুষ হও অ্যাডোলফো পুরুষ নয়? ও কি মহাপুরুষ নাকি?

ও তুমি ক্রীলের পক্ষে বলছ। আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম। পাজী, হোৎকা, চর্বির গোলা একটা...

বার্ডিক রাগে চীৎকার করে উঠল, তোমার কথা শুনে আমার বমি পাচ্ছে। অ্যাডোলফোকে ওর সত্যিই ভাল লাগত। খুবই নিরীহ আবেগপ্রবণ ভদ্রলোক। অ্যাডোলফোর মৃত্যুর জন্য যে কেড পুরোপুরি দায়ী জানে বার্ডিক। ওই বদমাশ মেয়েছেলেটার জন্য তুমি সেবার নিজেকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলে...তাও শিক্ষা হয়নি তোমার। কি কুৎসিত অপদার্থ নোংরা বেশ্যা মেয়েমানুষ একটা। এখন আবার ঢং করে বোতল ধরেছ। তুমি একটা মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। একটা হ্যাংলা ব্যক্তিত্বহীন মেয়েছেলেবাজ। এ পর্যন্ত একথা তোমার মুখের ওপর কেউ বলেনি। কিন্তু আমি বলছি। অ্যাডোলফোকে তুমিই মেরেছ। তোমার গুণ আছে তো কি? অ্যাডোলফোর তবু অনেক এলেম ছিল। জুয়ানা ওই বেশ্যাটা ওকে ফাঁসিয়েছে। ও আমাকে অব্দি ফাঁসাত। অ্যাডোলফো বুঝেছিল। কিন্তু তোমার জন্য নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। তোমার দোষ ষোলআনা—বেচারা তোমাদের এই বেহায়াপনার জন্য নিজের জানটাও খোয়াল।

কেড উঠে দাঁড়াল। আমি ম্যাথিসনকে বলছি, আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব যখন এরকম, তোমার সঙ্গে আমি আর কাজ করব না...

মনোভাব? তোমার সম্পর্কে আবার কি মনোভাব থাকবে। তুমি একটা বেহায়া ফালতু লোক। তুমি একটা সত্যিকারের অপদার্থ, গলা কাঁপছিল বার্ডিকের। বলল, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি ফিরবার আগেই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আমি জানি তুমি এখন মদ খেতেই থাকবে। আমি এসব বরদাস্ত করব না। জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড় এখনই। মদ খাও, মাতলামি কর, আত্মহত্যা কর। আমার কিছু এসে যায় না। যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে তুমি। ভিকিকে বিয়ে করতে পারতে তুমি, তা না করে ওই নর্দমার বেশ্যাটার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলে। সেও জাহান্নামে যাক। তুমিও জাহান্নামে যাও।

বলে দরজা ধড়াস করে বন্ধ করে বার্ডিক বাইরে বেরিয়ে গেল।

এরপর পর পর তিন দিন কেডের আর কোন পাত্তাই নেই। বার্ডিক আগেই ম্যাথিসনকে সব জানিয়ে দিয়েছিল। তবুও ম্যাথিসন খুবই ধৈর্যসহকারে কেডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বার্ডিককে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দিল সাধারণ নির্বাচনের ওপর একটা লেখা লিখতে।

বার্ডিক গভীর ক্ষোভে ম্যাথিসনকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে। হয়তো সারাজীবনই ও মাতাল থেকে যাবে। আমি জানি না তুমি ওর সঙ্গে কী করবে তবে ওর সঙ্গে কাজ করে নিজের বদনাম করতে চাই না আমি। ম্যাথিসন শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

বার্ডিককে বলল, ঠিক আছে এড। আমি ওর সাথে কথা বলব এখন। ও ফটোগ্রাফার হিসেবে দারুণ। তুমি আর কেড মিলে কাগজের বিক্রি সাতাশ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছিলে। সেটা কম কথা নয়। তুমি লন্ডনে যাও।

চারদিনের দিন কেড ম্যাথিসনের সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রচুর মদ খেয়েছে, তবে বেসামাল হয়নি। বলল আবার কাজ করতে চায়। ম্যাথিসন বলল ও ওকে প্রস রিপোর্টিং-এর কাজ দিতে চায়। কেড তাতেই রাজী হল। এক সর্বনাশা বিভীষিকার মধ্যে তিন সপ্তাহ কাটল। কেডের দ্বিতীয় আত্মহনন। তারপরই ইস্টনভিলের খবর এল।

।। সাত ।।

ইস্টনভিলের সরকারী হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে আস্তে আস্তে নেমে এল কেড। সেই ধুলোমাখা শেভ্রলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রন মিচেল। কেডের বাঁ চোখের নীচটা ফুলে আছে, চোয়ালে প্লাস্টার লাগানো, মুখটা অসম্ভব বিবর্ণ—এছাড়া কেডকে দেখে কেউ বুঝবে না সেন্টার মোটর হোটেলের থেকে বেরিয়ে তিন ডেপুটি পুলিশের কাছে কি অমানুষিক মার খেয়েছে কেড।

সারা শরীরে যন্ত্রণা। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও মনে একটা গভীর তৃপ্তি নিয়ে কেড হাঁটতে লাগল। মিচেল বলল, মিঃ কেড, গাড়িতে উঠে পড়। প্লেনটা বেরিয়ে যাবে নইলে। এই ক্ষুধে শহরটা দেখার শখ মিটেছে তো তোমার?

হ্যাঁ, কিছুটা। কেড গাড়ীর পেছনের সীটে উঠে পড়ল। অনেক কষ্টে পা দুটো ছড়াতে ছড়াতে কেড ভাবল ফিল্মগুলো নিশ্চয়ই এখন ম্যাথিসনের কাছে যাচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যেই ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ছবিগুলো পেয়ে যাবে। তারপর এই জানোয়ারগুলো যারা স্মল ও তার বান্ধবীকে মেরে ফেলেছে, তারা উচিৎ সাজা পাবে। তোমার ক্যামেরা পেছনের সীটে আছে কেড। তারপর মুখের কাল দাগের ওপর হাত দিয়ে বলল, খুব বোকা বনেছিলাম। যাক গিয়ে তুমিও ধোলাই খেয়েছ। আমিও খেয়েছি, শোধবোধ। ভবিষ্যতে আর এই শহরে পা মারিও না।

তাই হবে কেড বলল।

ওর ধুলোমাখা প্যান-অ্যাম ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বুক ধড়াস করল একবার কেডের। এরা ক্যামেরাটা খুলে দেখেনি তো। একরোল ফিল্ম নেই ওতে। হয়তো এটা একটা ফাঁদ। কেড ঘামতে লাগল। হয়তো কোথাও নিয়ে গিয়ে ওরা ফিল্মটার কথা জিজ্ঞেস করবে।

কি ভাবছ এত? মিচেল জিগ্যেস করল।

ভাল লাগছে না। পেটে যা লাথি খেয়েছি।

মিচেল হাসল। কী ভাবতে পারে বলল না।

ওরা কিন্তু এয়ারপোর্টেই পৌঁছাল। মিচেল বলল, যে ফ্রিডম মার্চ নিয়ে তোমার এত উৎসাহ ছিল, তার কথা জানতে চাও না। আমরা পণ্ড করে দিয়েছি ওদের মার্চ। এখন নিগারগুলো আবার গর্তে ঢুকে গেছে।

দেখ তোমার জায়গায় গিয়ে আবার বেশী গল্প কোরনা। মুখ বন্ধ রেখ।

কেড কোন জবাব না দিয়ে ভারী ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে যন্ত্রণায় বেঁকতে বেঁকতে গাড়ি থেকে নামল। মিচেল বলল বিদায় কেড। এবার তোমার এখানে বেড়ানোটা জমল না, বড়ই আফশোষের কথা। কেড লবিতে ঢুকে টিকিট দেখাল। কেরাণীটিও প্রায় মুখ ভেঙ্গানোর ভঙ্গীতে হাসল, ভালয় ভালয় পৌঁছল। কেউ কোন কিছু বলল না, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ও পুলিশের আওতার বাইরে চলে যাবে।

হ্যালো, কেড, কেড দেখল ডেপুটি জো স্লাইডার ওর মাংসল নিষ্ঠুর মুখে আধখানা হাসি মেখে ওর দিকে মাস্তানের মতন এগিয়ে এসেছে। কেড ভয় পেল বটে তবে ভাবল আবার যদি শুরু করতে চাস, শুরু কর। কিন্তু তোদের জান আমার হাতের মুঠোয় এখন। তোদের মুখের হাসি ছুটিয়ে দেব আমি।

চললে? স্লাইডার বলল,

সেরকমই তো মনে হচ্ছে, ডেপুটি।

বেশ বেশ। আগে গেলেও তো পারতে। যাবার সময় আর রাগ পু েরেখ না। কেড চুপ করে রইল।

আরে তোমার রাগ যে পড়ছেই না! আমার ছেলেগুলো আবার ভীষণ উদাসী! কালো পীরিতবাজদের আমরা দেখতে পারি না।

কেড তবু চুপ করে রইল।

শোন তোমার জন্য একটা সামান্য উপহার এনেছি।

স্লাইডারের মুখে এবার হাসি ছড়িয়ে পড়ল। চলে যাবে অথচ কোন স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবেনা তাই হয় নাকি?

ও আবার মারবে তাহলে। কেডের যন্ত্রণাকাতর শরীর শক্ত হয়ে গেল। ঠিক আছে এখন আমি মরে যাব। তারপর জিতব আমিই শেষে। এই পচাগলা শহরটা লাটে তুলে দেব।

স্লাইডার কি যেন আলতো করে তুলে দেখাল। দেখে রক্ত হিম হয়ে গেল। ও দেখল ঐ কোডাক ফিল্‌মের রোলটা। তুমি তো এই শহরটার কিছুই জাননা। এখানে নিগাররাই নিগারদের মাংস খায়। ওই বুড়ো স্যাম নিজে আমায় এই ফিল্‌মটা এনে দেয়। তুমি নিউইয়র্ক সানে এই ছবিটা পাঠাতে চেয়েছিলে। কিন্তু স্যাম বুঝেছিল এই ফিল্‌মটার কদর আমি আরো বেশী বুঝব! তাই ও এটা আমায় এনে দেয়।

কেডের অদম্য ইচ্ছে হল ফিল্‌মটা কেড়ে নেবার। না, কোন আশা নেই।

স্লাইডার বলল, শোন একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক। আমরা ফিল্‌মটা রাখি আর তুমি কার্টিজটা রাখ। ফিল্‌মটা টেনে বের করে একরাশ তালগোল পাকানো নষ্ট ফিল্‌ম ও কেডের পায়ের কাছে ফেলে দিল : কেড ওর পায়ের কাছে তাকাল। জীবনে সবচাইতে পরাজয়ের মুহূর্ত এটা। আমি শেষ হয়ে গেলাম, ম্যাথিসনকে কিছুই দেখানো গেল না। প্রচণ্ড মার খেলাম, কি ফল হল? জুয়ানা... অ্যাডলফো.... এড... ভিকি তারপর এই। কি আর এসে যায়! স্লাইডার হাসতে লাগল, জাহান্নামে যাও। তোমরা নিপাত যাও। তোমাদের এই বেজন্মা শহর নিপাতে যাক। কেড মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে রেলিং পেরিয়ে প্লেনের দিকে এগোল। স্লাইডারের অট্টহাসি ওর ওপর আগুনের হল্কার মতন আছড়ে পড়তে লাগল।

তিনঘণ্টা বাদে প্লেনটা যখন কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছাল, কেড পুরোপুরি মাতাল। এয়ারহোস্টেস মেয়েটি কেডকে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। অন্য যাত্রীরা কেউ মজা পাচ্ছিল, কেই বা ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে কেডকে পথ ছেড়ে দিল। এয়ারহোস্টেস মেয়েটি অবশ্য খুব মিষ্টি, ভালো। রিসেপশনের কাছে কেডকে পৌঁছিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, স্যার আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?

দারুণ আছি। হাজার না লক্ষ ধন্যবাদ খুকি।

এই সময় সোফারের পোষাক পরা একটা লম্বা রোগা লোক কেডের দিকে এগিয়ে এল।

মিঃ কেড?

কেড প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনমতে লোকটার হাত ধরে নিজেকে সামলাল।

হ্যাঁ।

আমি গাড়ি এনেছি স্যার। আপনার ব্যাগটা আমায় দিন।

তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে, সর, কেড লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোতে থাকল হোঁচট খেতে খেতে।

লোকটি ওর পেছন পেছন গেল।

মাপ করবেন মিঃ কেড।

ব্যাপারটা কি? কেড জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্ন করল।

মিঃ ব্র্যাডফ আপনার সাথে দেখা করতে চান, স্যার। আপনার ব্যাগটা আমায় দয়া করে দিন।

এতে যদি তোমরা মজা পাও, তাহলে চল। কিন্তু মিঃ ব্র্যাডফ আবার কে?

এই যে গাড়ি স্যার। একটা হলুদ রঙের রোলস রয়েস দেখিয়ে সোফারটি বলল।

কেড অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, ভুল করলে না তো?

না স্যার। মিঃ ব্র্যাডফ আপনাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন।

কেড বুঝল সোফারটি ওকে প্রায় জোর করেই গাড়িতে তুলল। নরম গদির সীটে নিজেকে ডুবিয়ে দিল কেড। তার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে সীটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিল, আর তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেল।

নিউইয়র্ক শহরের বহুতল বিলডিংয়ের চব্বিশ তলায় মিঃ ব্র্যাডফের ফ্ল্যাট ছাদের ওপর, চারিদিকে বাগান। কেড একটা গাছের ছায়ায় বসেছিল।

লোকটা লম্বা, রোগা গায়ের রঙ তামাটে খুব স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলে। নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে আর সূর্যোপাসনা করে। পঁচাত্তর বছর বয়স আন্দাজ, খুবই শক্ত সমর্থ চেহারা। ছোট ছোট চোখদুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

আমেরিকান ধনীদের মধ্যে পঞ্চম, এই ওর পরিচয়।

'হুইসপার' নামে কুৎসা-প্রচারকারী সংবাদপত্রের মালিক ব্র্যাডফ। ব্র্যাডফের আরও ব্যবসাপাতি আছে, তবে এই সংবাদ পত্রটিতে এর বিশেষ আগ্রহ। নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার জীবন্ত প্রতীক এই ব্র্যাডফ। তার পত্রিকা যে কত বিখ্যাত লোককে বিপদে ফেলেছে, তার সংখ্যা নেই। কেডের মুখোমুখি ব্র্যাডফ বসেছিল। কেডের নেশার ঘোর ভাল করে কাটেনি। ব্র্যাডফ সম্বন্ধে কেড আগেই জানত। লোকটা বিপজ্জনক, প্রভাবশালী, অসম্ভব ধনী। ব্র্যাডফ নীচুস্বরে বলল, কেড মনে হচ্ছে তোমার খেলা এখন শেষ।

হ্যাঁ, কেড বুঝেছে সে খুবই বিপদে পড়েছে, ব্র্যাডফের গুহায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু ব্র্যাডফের মতন একটা জঘন্য লোক ওর পিঠ চাপড়িয়ে কথা বলবে কেডের সহ্য হল না। বলল, তাতে তোমার কি এসে যায়?

আমি তোমার সব গতিবিধি জানি কেড। তারপর নিজের হাতের সোনার ওমেগা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ব্যস্ত মানুষ। আমি একটা কাজের কথা তোমায় বলতে চাই।

কেড মদের গ্লাস নামিয়ে রাখল। তার কোন আগ্রহই নেই। আমি কয়েকটা বিশেষ ধরনের ছবি চাই। তুমি তার জন্য দশ হাজার ডলার পাবে।

তারপর কেডের দিকে তাকিয়ে ব্র্যাডফ বলল, অন্যান্য কাগজে সেইসব ছবি ছাপাবার অধিকার তোমার থাকবে। তা থেকেও তুমি পয়সা পেতে পার।

আমায় কেন? আরো তো অনেক ফটোগ্রাফার আছে? আমি একটা অপদার্থ মাতাল দেখতেই তো পাচ্ছ।

তুমি কে আমি ভালোভাবেই জানি এবং তোমাকেই আমার দরকার। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে ব্র্যাডফ বলল, মদ খেলে মানুষের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু আর থাকেনা। তার ওপরে তোমার খুব পয়সারও প্রয়োজন। আমার অনেক টাকা আছে। অতএব আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

জাপানী পরিচারকটি একটা ছায়ার মতন এসে কেডের গ্লাসে আরো হুইস্কি ঢেলে দিয়ে চলে গেল। কেড বলল, আমার এখনো নিউইয়র্ক সান-এর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট আছে।

ব্র্যাডফ ঘাড় নেড়ে বলল, না আমি তোমার কনট্র্যাক্ট কিনে নিয়েছি। ম্যাথিসন কনট্র্যাক্টটা ঝেড়ে ফেলে যেন বাঁচল।

কেড মদের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল। হেনরিকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি আর কত নীচে নামব? সে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করল। 'হুইসপারের' মতন একটা নোংরা কাগজে যদি আমি কাজ করি তাহলে সেটা হবে আমার অধঃপতনের শেষ ধাপ।

ব্র্যাডফ বলল, তুমি ম্যাথিসনের সঙ্গে তোমার কনট্র্যাক্টটা খুঁটিয়ে কখনো পড়নি। ওই কনট্র্যাক্টে ছিল তুমি যদি উল্টো পালটা কাজ কর তাহলে ম্যাথিসন তোমার নামে মামলা ঠুকতে পারে। ম্যাথিসনের দয়ামায়া আছে, আমার কিন্তু নেই। তুমি যদি আমার কাজ আমার নির্দেশ মাফিক না কর তাহলে তোমার নামে এমন মামলা ঠুকে দেব যে জীবনে আর এক ডলারও কামাতে পারবে না, সে যে জাতের ছবিই তোল না কেন।

কেড ব্র্যাডফের দিকে তাকাল। ওর চোখ ঝাপসা, যেন কিছুই ভাল করে দেখতে পারছে না। আমায় কি করতে হবে?

ব্র্যাডফ বলল, অ্যানিটা স্ট্রেলিকের সম্পূর্ণ জীবনীটা আমি সংগ্রহ করেছি। কয়েকটা ফোটো পেলেই জীবনীটা ছাপানো যায়। তোমার সেই ছবিগুলি তুলতে হবে। অ্যানিটা স্ট্রেলিক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাড়কা। ব্রিজিত বার্দো, জীন মোরো, জিনা লোলো ব্রিজিতার সঙ্গে ওর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। কেউ কেউ অ্যানিটাকে আধুনিক যুগের গার্বো বলে। অ্যানিটার জন্ম রাশিয়ায়। বয়স সাতাশ বছর, চোখ ও চুল পাংসুটে সাদা। ও ঠিক সুন্দরী নয় সুশ্রী। গত পাঁচবছর ধরে অ্যানিটার নাম সংবাদপত্রে প্রধান সংবাদ বলে পরিবেশিত হচ্ছে। সে এপাশ ওপাশ ফিরলেও সেটা খবর হয়ে যায়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র এই অ্যানিটা। কেড এ সবই জানে। মদটা শেষ করে ও কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল। অ্যানিটা তোমার কি ক্ষতি করল ব্র্যাডফ। আমি তো বুঝতে পারছি সেই জীবনী কীরকম হবে।

অ্যানিটা আমার কী করেছে সে তোমার জানার দরকার নেই। এটা কখনও ভেবেছো অ্যানিটা কখনও বিয়ে করল না কেন?

স্ট্রেলিক সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহই নেই। ও বিয়ে করল না কেন সে নিয়ে আমাব মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

ব্র্যাডফ অন্যদিকে পা মুড়ল। এবার থেকে তোমার মাথা ঘামাতে হবে। চিত্রতারকাদের মধ্যে অ্যানিটা একেবারেই অন্যধরনের। পাঁচ বছর হল ও খুবই নাম করেছে। ওর নামে কোন কেচ্ছা নেই, ওর জীবনে কোন পুরুষের নাম শোনা যায় না। ও সমকামীও নয়। আরে এতো রীতিমত সন্দেহজনক। ও রক্তমাংসের মানুষ তো! আমরা বিশ্বাস করি না অ্যানিটা সাতাশ বছর বয়সেও ভার্জিন রয়ে গেছে। ও যেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেল সেদিন থকে আমার লোকজন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে অথচ আশ্চর্য এখনো কোন গোপন প্রণয়ীর সন্ধান পাইনি আমরা।

কেড বলল, তোমার জন্য আমার আফশোষ হচ্ছে। তোমার নোংরা কাগজটার পক্ষে এটা একটা আশাভঙ্গ বুঝতে পারছি ব্র্যাডফ। এর জন্য ভবিষ্যতে আমি তোমাকে সহানুভূতি জানাব।

ব্র্যাডফ মড়ার খুলিব মতন ভাবলেশহীন মুখ করে বলল, অথচ আমার এই নোংরা পাকমাখা কাগজটায় তুমি এখন কাজ করছ।

তাতে কি এসে যায়?

শোন কাজের কথা শোন। মে মাসে স্ট্রেলিক সুইজারল্যান্ডে যায়। ওখানে আমার লোক ওকে অনুসরণ করে। লোজানে স্ট্রেলিক হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। লোকটি ওকে আর খুঁজে পায়নি। আবাব সেপ্টেম্বরে স্ট্রেলিক সুইজারল্যান্ডে যায়। আমার লোকটি খুবই চালাক চতুর কিন্তু মন্ত্রোক্স অব্দি গিয়ে ওর নজর থেকে স্ট্রেলিক হাওয়া হয়ে যায়। ও আমাদের লোকদের ধাপ্পা দিচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন এই সতর্কতা? আমার ধারণা সুইজারল্যান্ডে ওর কোন গোপন প্রণয়ী আছে। আমার জানা দরকার সে কে। আমি ওদের দুজনের একসঙ্গে ছবি চাই। এটাই তোমার কাজ কেড। তুমি আমাকে ছবি দাও, আমি তোমাকে দশ হাজার ডলার দেব। যদি ছবি তুলতে না পার তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। এমন প্যাঁচে তোমায় ফেলব যে একটি ডলার রোজগার করতে চাইলে আমাকেই সেটা দিতে হবে।

কেড সব শুনছিল। বলল, এখন স্ট্রেলিক কোথায়?

প্যারিসে। কাল সকালে তুমি প্যারিস যাবে। আমার লোক ওর্লি এয়ারপোর্টে থাকবে। সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আর একটু মদ চাই?

কেড হাসল, মন্দ কি! তুমি যেন কি বলছিলে, মদ খেলে মানুষের নীতিজ্ঞান চলে যায়। হ্যাঁ, আমি আরেকটু মদ খাব।

ওর্লি এয়ারপোর্টের রিসেপশনের বাইরে 'হুইসপারের' প্রতিনিধি বেন শেরম্যান অপেক্ষা করছিল। লোকটা চৌকো বেশ গাট্টাগোট্টা খুব ব্যস্তবাগীশ ধরণের। ওকে দেখে কোন মাঝারি জাতের সেলসম্যান মনে হয়। ওর শার্টটা নোংরা, জুতোটাও ধুলোমাখা। দুজনে চুপচাপ

শেরম্যানের সিমকা গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। যে চওড়া রাস্তাটা গিয়ে ওতোরুৎ ডু স্যুদে পড়েছে, সেটা দিয়ে প্যারিসের দিকে যেতে যেতে শেরম্যান বলল, যে কোনো মুহূর্তে স্ট্রেলিক রওনা হতে পারে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি। এবার আমাদের চোখে এখনও স্ট্রেলিক ফাঁকি দিতে পারে নি। ওর গ্যারাজের লোকটাকে আমি হাত করেছি। ওর বাড়ির দারোয়ানটাও আমাদের টাকা খাচ্ছে। ওর হেয়ারড্রেসার খবর দিয়েছে অ্যানিটা বাক্সপত্র গোছাচ্ছে। যেই না খবর পাব স্ট্রেলিক রওনা দিয়েছে তুমি এরোপ্লেনে জেনিভা চলে যাবে। সেখানে বোম্যান্ তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেবে। আমি মোটরে অ্যানিটার পিছু নেব। ওর গাড়ি হচ্ছে অ্যাস্টন মার্টিন। ও গাড়ি চালায় খ্যাপার মতন। তাই আমাকে আবার ভড়কি দিতে পারে। যাইহোক, তুমি আর বোম্যাণ ওর জন্য ভালোরবিতে অপেক্ষা করবে। সেখানে ওকে বর্ডার পেরোতে হবে। লোজান থেকে মরোক্ক যাবার পথে দু দুবার ও আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। লোজান আর ভেভের মাঝপথে দুটো চালাকচতুর ছোকরাকে দুটো তেজী গাড়ি দিয়ে মোতায়েন করে রেখেছি। এবারও যদি ও আমাদের এড়িয়ে যায় তাহলেই গেছি। এস. বি. কাজ পণ্ড হওয়া পছন্দ করেন না।

কেড মুখ খুলল না। একটা ডবল হুইস্কি, খানিকটা বরফ এই শুধু ভাবছিল ও। এখানকার কাজে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে ছবি তুলতে রাজী আছে কিন্তু এত কষ্টভোগ করতে সে রাজী নয়।

এরকম মড়ার মতন মুখ করে থেক না দোস্ত। আমি তোমার সব খবর রাখি। তুমি জব্বর ছবি তুলতে পার জানি। কিন্তু এখন আমার সঙ্গেই তোমাকে কাজ করতে হবে। ভেবনা সব সাজিয়েগুছিয়ে তোমার কাছে এনে দেব আর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে ছবি তুলবে।

কেড বলল, চুলোয় যাও। বলে চোখ বুজল।

শেরম্যান এবার চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। সে ইন নদীর বাঁ দিকে রু দ্য ভোজিরো ছাড়িয়ে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে এসে গাড়ি থামাল।

ব্যাগটা নামাও, কেড। নামটা লেখাও। আমি ততক্ষণ অ্যানিটার দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে আসি। তুমি আসবে?

কেড ব্যাগটা নামাল। তুমি যার সঙ্গে কথা বলতে চাও বল, আমার অন্য কাজ আছে।

কেড হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল। শেরম্যান হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যাটা কেড বিছানায় শুয়ে কাটাল। হাতের কাছে এক বোতল স্কচ হুইস্কি আর 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন' কাগজটা। রাত নটার কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে খেয়ে এল। আগে অনেকবার প্যারিসে এসেছে। কিন্তু আজ তার এ শহরটা ভাল লাগছে। সে একলা থাকতে চায় সঙ্গে শুধু মদ থাকলেই হয়।

রাত সোয়া এগারটা নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। শেরম্যান ফোন করছে। কাল অ্যানিটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার জন্য জেনিভার টিকিট কেটেছি। তুমি সকাল নটা চোদ্দ মিনিটের প্লেন ধরবে। আমি তোমাকে সকাল আটটায় হোটেল থেকে তুলে নেব। জেনিভায় বোম্যান্ তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

সে-ও 'হুঁ' বলে সম্মতি জানাল। ফোন নামিয়ে ও গভীর হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল তারপর ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে জুয়ানার ছবি তার কাছে ভেসে উঠল। বিছানায় শোওয়া কালো চুলের রাশি দিয়ে ঢাকা জুয়ানার সেই অপূর্ব ভঙ্গিমা। সে নিজেকে গাল দিতে দিতে বিছানায় উঠে বসল। এখন তার চাই নির্জলা অন্ততঃ তিন গ্লাস মদ। এই অভিশাপ থেকে তার মুক্তি নেই।

পরদিন সকালে শেরম্যান কেডকে ওর্লি এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। কেডের ওরকম উদাসীন ভাব দেখে শেরম্যান ক্ষেপেই গেল। এ কাজটা আমার কাছে জীবনমরণের মতন। সারাক্ষণ মদে ডুবে থাকলে তুমি এ কাজটা করতে পারবে কি করে?

যাও যাও, কেড বলল। তার মাথায় খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে।

এস বি'র নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে নইলে এরকম একটা পাঁড় মাতালকে এই কাজের ভার দেয়। এদিকে কাজটা ভণ্ডুল হলে আমারই সব দোষ হবে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে শেরম্যান কেডকে টিকিট দিল, বলল, ওহে বোম্যান্‌কে সামলে চলবে। ও আমার মতন এত নরম নয়।

আর শোন, অন্ত কপচিও না। বোম্যানের মাকে গিয়ে ওর সম্পর্কে গুনগান করো। বোম্যানকে কে পরোয়া করে আর ব্র্যাডফকেই বা কে পরোয়া করে। বলতে বলতে কেড এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল।

প্লেন যখন জেনিভায় পৌঁছল কেড বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। সুইস্ কাস্টম্‌সের কর্মচারীরা ওর সঙ্গে খুবই কঠিন ব্যবহার করল। হর্সটি বোম্যান্ কাস্টম্‌সের বেড়ার ওপারে অপেক্ষা করছিল। লোকটি সুইস। জুরিখে থাকে। বেঁটে আঁটসাঁট চেহারা। চোখদুটিতে ধূর্তামি ঠাসা। কেডের সম্বন্ধে ও আগেই জানত, তাই কেডকে মাতাল দেখে অবাক হল না। বোম্যানের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। সে মনে করে সে সবরকম অবস্থা সামাল দিতে পারে। পাঁচবছর হল ও 'হুইসপার' কাগজের সুইস প্রতিনিধি। সুইজারল্যান্ডে কোন ট্যাক্সের ঝামেলা নেই। তাই বহু বড়লোকের ভরসা সুইজারল্যান্ড। এবং এদের গোপন রহস্য টেনে বের করেই 'হুইসপারে'র এত নামডাক। এটা প্রমাণিত যে বোম্যান্ কেচ্ছাসন্ধানীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ধানী।

ভালোরবিতে পৌঁছতে অ্যানিটার তিন চার ঘণ্টা লাগবে। আশাকরি ততক্ষণে তোমার নেশা কেটে যাবে। এখন কেড তুমি মদ ছুঁতেও পারবে না। তোমার সামনে এখন কাজ, আর সেই কাজ না করলে আমি তোমাকে ভালরকম বেগ দেব।

কেড ওর পালোয়ান চেহারার দিকে একবার তাকাল।

তাই বুঝি? নাও, আমার ব্যাগ নাও। তোমার মনিব ভালভাবেই জানে কাজটা আমার দ্বারাই সম্ভব তারজন্যই ও কনট্রাক্ট কিনে নিয়েছে। যাও, বকবকানি থামাও।

বোম্যান্ ব্যাগটা নিল। বেশ ঠাণ্ডা, কনকনে আবহাওয়া। ওরা বোম্যানের জাগুয়ার গাড়ির দিকে এগোল।

ভালোরবির কাস্টমস্ ঘাঁটির কাছে গিয়ে বর্ডারের বিশমিটার দূরের ছোট একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল বোম্যান্। ততক্ষণে কেডের নেশা অনেকটা কেটে গেছে। বোম্যান্ একটা ঘর ঠিক করেই রেখেছিল। ওরা দুজনে সেই ঘরে গেল। বোম্যান্ ওদের ঘরে এক লিটার কালো কফি পাঠিয়ে দিতে বলল। ঘরের জানলা থেকে বর্ডার পোস্ট দেখা যায়। বিছানায় ধপ্ করে বসে কেড দুহাতে মাথা টিপে ধরল।

একটা ডবল স্কচ আর বরফ। তাড়াতাড়ি। আমার মদ চাই-ই চাই।

বোম্যান্ নিজের ভারী কোটটা খুলে ফেলল। জানালা খুলে দিল। চারিদিক ধোঁয়াশায় ভরতি বোঝাই যায় এখনি বরফ পড়বে। বাতাস এত ঠাণ্ডা যে হাড়ে কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে।

জানলা বন্ধ কর, কেড বলল।

বোম্যান্ কেডের সামনে এসে দাঁড়াল, আমার দিকে তাকাও।

কেড ভুরু কুঁচকে বোম্যানের দিকে তাকাল। জানলা বন্ধ কর শিগ্‌গির। কেড বলল।

হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বোম্যান্ কেডকে গালে চড় মারল। কেড বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেল। উঠবার চেষ্টা করতেই বোম্যান্ আবার চড় মারল। কেড নিশ্চুপ। ওর মুখ জ্বালা করছে। নেশার ঘোর পুরো কেটে গেছে। ইস্টনভিলে মিচেলের প্রতি যেমন ঘৃণা হয়েছিল সেরকম অসীম ঘৃণা নিয়ে বোম্যানের দিকেও তাকাল।

বোম্যান্ বলল ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি মার চালাতে পারি জান। আমি বলছি তুমি মদ ছোঁবে না, ব্যস। বুঝেছ?

কেড নিজেকে তৈরী করছিল। হঠাৎ ও বিছানা ছেড়ে নেমে বোম্যানের মুখে এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালাতে লাগল। অত্যন্ত পেশাদারী দক্ষতার সঙ্গে বোম্যান মাথা সরিয়ে কেডের ঘুঁষি এড়াল। তারপর সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে এক জব্বর ঘুঁষি মারল কেডের হৃৎপিণ্ডের ঠিক নীচে। কেড একটা কোঁৎ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। বোম্যান্ তারপর চুলে হ্যাচকা টান মেরে কেডকে উঠিয়ে মুখের ওপর এলোপাথাড়ি এমন চড় মারতে লাগল যে কেড সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। এ সময় ওয়েটার কফি নিয়ে এল। কেড ওর শেষ শক্তি শেষ আত্মসম্মান সংহত

করে টলতে টলতে বোম্যানের দিকে এগিয়ে এল। বোম্যান্ খুবই তাচ্ছিল্য সহকারে আবার এক পেল্লায় ঘুঁষি মারল কেডের মুখে। কেড ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। বোম্যান্ বসল, এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। একটা ধরাল। কেড কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, এবার কোনরকমে শরীরটা টেনে তুলে পরম ঘৃণা ভরে বোম্যানের দিকে চাইল।

মনে হচ্ছে তোমার জন্মের ঠিক নেই, কেড বলল।

বোম্যান্ হাসল। যা বলেছো। নাও এখন একটু কফি খাও। উঠে পেয়ালায় কফি ঢালল বোম্যান্।

চিনি?

না।

বোম্যান্ কেডকে কফির পেয়ালা দিয়ে আবার বিছানায় বসল। এত ঘুঁষি চড় থাপ্পড় খেয়ে কেডের সারা শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে। হঠাৎ কেডের মনে হল সে একটা পাঁড়মাতাল, সারা মুখে কালসিটে, জামাকাপড় কুঁচকানো এই তো বোম্যান্ দেখতে পাচ্ছে। ওর সবরকম হার হয়ে গেছে। ওর আত্মসম্মানের শেষ স্ফুলিঙ্গটা আবার জ্বলে উঠল। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে ও গরম কফি খেল, তারপর আরো কফি ঢালল পেয়ালায়।

সিগারেট? বোম্যান্ 'ম্যারোকেইন'-এর প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

ধন্যবাদ।

কেড সিগারেট ধরাল। আরো কফি খেল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ভালো করে মুখ ধুল। নিউইয়র্ক ছাড়ার পর এই প্রথম নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগল কেডের। ঘরে এসে ও খোলা জানলা দিয়ে বর্ডার-পোস্টের দিক থেকে বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টানতে লাগল।

বোম্যান্ বলল, এখনো তিনঘণ্টা আছে অ্যানিটার এখানে পৌঁছতে। খাবে কিছু?

না।

আমার ইচ্ছে করছে। যদি খেতে চাও, ঘণ্টা বাজিও। ওরা তোমাকে মদ দেবে না, তাই সে চেষ্টা কোর না। পরে দেখা হবে।

বোম্যান্ বেরিয়ে গেল। কেড আর এক কাপ কফি খেল, তারপর ইজি চেয়ারে বসে রইল। একা থাকলে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে ও উঠে পড়ল, ঘর থেকে বেরোল লবিতে। ওভারকোট গায়ে দিয়ে ও বুটিকে চলে গেল। বড় বড় স্কচের বোতল সাজানো দেখে কেডের চোখ আটকে গেল। কিন্তু মদ কেনবার ইচ্ছেটা সে জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলল। এক প্যাকেট মদ ভরা চুইংগাম কিনল কেড। বোম্যান্‌কে হোটেল থেকে বেরোতে দেখে ও এগিয়ে গেল। বোম্যান্ বলল, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে? বেশ স্টেক বানায় এখানে। তোমার কিছু খাওয়া দরকার।

খেলেই হয়।

কেডের পাজরগুলো এখনো টনটন করছে। কিন্তু ওর আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

লাঞ্চ খাওয়া হলে বোম্যান্ বিল মিটিয়ে দিল। দুজনে অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে জাগুয়ারে বসল। গাড়ির মুখ বর্ডার ঘাঁটির উল্টোদিকে। বর্ডার-ঘাঁটিতে অ্যানিটা স্ট্রেলিক পৌঁছল সন্ধ্যা পাঁচটা পঞ্চাশে। ততক্ষণে চারিদিকে ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে কিন্তু বর্ডারের উজ্জ্বল আলোয় সহজেই অ্যানিটাকে ওরা চিনতে পারল। বোম্যান্ বলল, এসে গেছে। কাস্টমস্ পেরোতে ওর পাঁচ মিনিট লাগবে না। চল আমরা রওনা দিই।'

লোজার রোডের দিকে বোম্যান্ গাড়ি চালাল। পেছনের জানলা দিয়ে কেড দেখল একটি লম্বা মেয়ে, স্কি করার প্যান্ট আর সাদা চামড়ার জ্যাকেট পরা সাদা হেলমেটে চুলগুলো ঢাকা, অ্যাস্টন মার্টিনের পাশে দাঁড়িয়ে একদল সীমান্ত রক্ষীর সঙ্গে কথা বলছে। একটুক্ষণ তারপরেই ওকে আর দেখা গেল না।

সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেল কেড। অনেক অনেক মাস পরে এমন উত্তেজনার অনুভূতি বোধ করল কেড। বোম্যান্ বলল, আমরা পথ ছেড়ে দেব।

কিছুক্ষণ বাদেই অধীর হর্নের আওয়াজে বোম্যান্ পাশ দিল। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটারেরও বেশি স্পীডে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল লাল অ্যাস্টন মার্টিন।

বোম্যান্ অ্যাকসিলেটারে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, এইসব সরু রাস্তায় এমন স্পীডে কেউ গাড়ি চালায়। ড্যাশবোর্ডের শর্টওয়েভ রিসিভিং সেটের সুইচ টিপে দিয়ে বোম্যান্ মাইক্রোফোনটা তুলে নিল।

হর্সট ওয়াই আরকে ডাকছে। কাম ইন ওয়াই আর।

লাউড স্পীকারে একটি পুরুষের গলা ভেসে এল, শুনছি হর্সট।

পার্টি লোজানে যাচ্ছে। তুমি কোথায়?

'গ্রঁপ-র পাশে।'

এখানে আসবে। তোমার গাড়ি সামনে রেখে নজর রাখবে, তবে সাবধান ভীষণ স্পীডে গাড়ি যাচ্ছে।

লোজানের শহরতলীতে পৌঁছবার আগে ওরা অ্যাস্টন মার্টিনটা দেখতে পেল না। এই সব রাস্তা বোম্যানের হাতের তালুর মতন চেনা। যখনই সিধে রাস্তা পেয়েছে ও ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি চালিয়েছে, বাঁকের মুখে সাবধান হয়ে স্পীড কমিয়েছে। লোজানে ঢোকবার মুখে গাড়ির জঙ্গলে অ্যানিটার লাল অ্যাস্টন মার্টিন আবার দেখা গেল। গাড়ির স্রোতের মধ্য দিয়ে ওরা গ্রঁপ পেরিয়ে চলল। অ্যাস্টন মার্টিন আবার চোখের আড়ালে। গাড়ির ভীড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে অ্যানিটা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

শর্টওয়েভ সেটে আবার কথা শোনা গেল।

'ওয়াই আর বলছি। অ্যানিটার গাড়ি ঠিক আমার গাড়ির পেছনে, পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে। আমরা এখন কেডের পথে অ্যাভন্যু ড্যু লির্মঁতে।

বোম্যান্ বলল ওকে আটকে রাখ। আমি ধরে ফেলছি।

আচ্ছা। তারপরে একটা গাল দিয়ে ওয়াই আর বলল বেরিয়ে গেল আমায় কেটে। এঁকে-বেঁকে আমার পাশ কাটিয়ে একটা ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগাতে লাগাতে চোঁ করে বেরিয়ে গেল। এদিকে আমি জ্যামে আটকে আছি।

বোম্যান্ মুখ খিঁচিয়ে বলল, তুমি নিজেকে ড্রাইভার বল? বলে গাড়ির স্পীড অসম্ভব বাড়িয়ে বিপজ্জনক ভাবে গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও একটা গাড়ির পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল ড্রাইভারকে হাত দেখিয়ে। ড্রাইভারও হাত নাড়ল।

উত্তেজনায় টানটান হয়ে সারাক্ষণ বসে কেড। বোম্যান্ যেরকম দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে দেখে প্রশংসা না করে ও পারল না। বোম্যান্ আপন মনে বলল ও যদি মনে করে আমাকে কাটাবে ও ভুল করেছে। মাইক্রোফোনটা তুলে নিল ও। গ্রাডকে ডাকছি। শিগগির গ্রাড। লাউডস্পীকারে আরেকটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বল হ্র্সট্।

আমাদের পার্টি তোমার দিকে এগোচ্ছে। তুমি এখন ঠিক কোন জায়গায় আছ?

ফ্লার আর মর‍্যোক্স-এর মাঝামাঝি লেক রোডে।

নজর রাখ। পার্টি ভীষণ স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে।

বেশ।

লোজান পেরিয়ে ওরা লেক রোড দিয়ে যেন উড়ে চলল। পথে গাড়ির মেলা। বোম্যান্ কোনটিকে পাশ কাটিয়ে কোনটা আশ্চর্য দক্ষতায় ওভারটেক করে বেরিয়ে যেতে লাগল। এদিকে লেক থেকে হালকা কুয়াশা উঠে আসছে। সামনের গাড়িগুলোর হেডলাইটে চোখ ধাঁধানো আলো। বোম্যান্ চিন্তায় পড়ল। এই আলোতে ও আমাদের কলা দেখাতে পারে। গ্রাড যদি ওকে ধরে রাখতে পারে।

ভেভে ছাড়িয়ে মর‍্যোক্সে যাবার সোজা পথে যখন গাড়ি ছুটছে, তখন কেড হঠাৎ বলল, আরে তুমি ওকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ। ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে একটা গালাগাল দিয়ে বোম্যান্ ব্রেক কষল। ফুটপাথের ধারে গাড়ি দাঁড় করাল।

তুমি ঠিক দেখেছ?

কেড মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারে দেখল।

হ্যাঁ, পুলিশের সাথে কথা বলছে। পুলিশ ওকে ফাঁসিয়েছে। মাইক্রোফোন তুলে নিল বোম্যান্, গ্র্যাড, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য পার্টির গাড়ি দাঁড় করিয়েছে পুলিশ। এখনি আসবে। আমার ধারণা এবার ও সমঝে চালাবে।

আচ্ছা।

আমাদের নজর রাখতে হবে। এই জায়গাতেই আমরা আগে ধোঁকা খেয়েছি। কি হচ্ছে বলতো এখানে?

কেড তখনো পেছনে চেয়ে আছে। যা হয়, পুলিশ টিকিট দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে কিন্তু ও বেরিয়ে যাবে।

বোম্যান্ ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আসছে, কেড বলল।

অ্যাস্টন মার্টিনটা ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ওই গাড়ির পেছনের আলো দুটো দেখে দেখে বোম্যান্ এখান থেকে মরোক্স ভিল্‌নোভ্ ও আজিল অবধি অনুসরণ করল।

বোম্যান্ বলল, ও কি ইটালীর সীমান্তের দিকে যাচ্ছে না কি পাহাড়ের পথে ছুটছে? এই বরফ পড়ল বলে। বোম্যান্ ওয়াইপারের সুইচ টিপল। বোম্যান্‌দের পেছন থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলল নিভল।

বোম্যান্ বলল গ্রাড। ও মাইক্রোফোন তুলে বলল পার্টি ঠিক আমার সামনে। গ্রাড, আমায় এবার টেককর, ওর সামনে যাও। খেয়াল রেখ, ইটালী যাবার দু মুখো রাস্তায় ও যেন তোমায় ধোঁকা না দেয়। ও ভিলারও যেতে পারে।

আচ্ছা।

বিশ মিনিট পরে। গ্রাড অ্যাস্টন মার্টিনটার ক মিটার আগে, বোম্যান্ ক মিটার পেছনে। এই সময়ে অ্যানিটার গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরল। বোম্যান্ সঙ্গে সঙ্গে স্পীড বাড়াল। ও ভিলারে যাচ্ছে। পথ এবার খুব খারাপ। বরফও পড়বে।

এক কিলোমিটার যেতে না যেতেই বরফ পড়তে লাগল। অ্যাস্টন মার্টিনের স্পীড বেড়ে গেল। খুবই বিপজ্জনক বাঁকগুলো খুব নিপুণ হাতে কাটিয়ে কাটিয়ে গাড়িটা জোরে চলতে লাগল। বোম্যান্ গাড়ির আলো নিভিয়ে অ্যাস্টন মার্টিনটার খুব কাছাকাছি চলে এল। ওর ভয় এই পথে ওকে ফাঁকি মেরে কোথায় না চলে যায় অ্যানিটা। গ্রাড ইটালিয়ান রোডে চলে গিয়েছিল। আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ওদের পিছু পিছু আসতে লাগল। একটা ছোট্ট মতন গ্রাম হুমোজের কাছাকাছি সরু রাস্তায় অ্যানিটার গাড়ি হঠাৎ স্পীড কম করল। বোম্যান্ ব্রেক কষল নইলে ধাক্কা খেত।

বলল আমাদের দেখেনি তো, ওই আবার যাচ্ছে। না গাড়ি চালাতে জানে বটে ও। ঝড়ের বেগে খাড়া চড়াই পথে ও সেজিয়ের গ্রামে উঠে এল। চারিদিকে কুয়াশা আর বরফ। নির্জন গ্রাম। অ্যাস্টন মার্টিনটা এখন একশো মিটার আগে। হঠাৎ জাগুয়ারটা পিছলে গেল। মনে হল জাগুয়ারটা ডানদিকে পাক নেবে। বোম্যান্ সামলে নিল। কেড নিরুৎসাহ গলায় বলল, চলে গেছে।

এতক্ষণ কেড সামনের দিকে ঝুঁকে বসছিল। অ্যানিটার গাড়ির লাল আলোর উপর চোখ বিঁধিয়ে রেখেছিল। আর আলো দেখা যাচ্ছে না। বোম্যান্ বলল, ভিলারে যাচ্ছে আর কোন যাবার জায়গা নেই এখানে। গাড়ির গতি কমিয়ে ও চড়াই পেরোতে লাগল। সামনে শহর।

কেড বলে উঠল, তোমার ডানদিকে। ওই তো, ভেতরে ঢুকে গেল। দুটো গেট। দুটো লোক এসে গেট বন্ধ করল।

বোম্যান্ কয়েক মিটার এগিয়ে গিয়ে গাড়ি থামাল। গ্রাডের ল্যানসিয়া গাড়িও এসে দাঁড়াল পাশে। গ্রাড গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। ওর সবুজ টুপি আর বর্ষাতি বরফ পড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছিল। গ্রাড বোম্যানেরই বয়সী। চওড়া কাঁধ, দেখেই বোঝা যায় সুইস।

বোম্যান্ বলল, মনে হয় কারো জমিদারীতে ঢুকল। চিনতে পেরেছিলে তো ওকে?

না, এই বরফে কাউকে চেনা যায় না।

বোম্যান্ গাড়ি থেকে নেমে বলল, এখানে অপেক্ষা কর। তারপর বরফের ঝাপটা থেকে

নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে ও পেছনদিকে হেঁটে গেল। গ্রাড সিগারেট ধরিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল।

তুমিই কেড? আমি তোমার কথা খুব শুনেছি।

কেড নিস্পৃহ গলায় বলল, আমিও শুনেছি। ও গ্রাড-এর কাছ থেকে সরে বসল। সিগারেট খুঁজতে লাগল।

গ্রাড বলল, সত্যিই ছবি তুলতে জান বটে তুমি। আমি তোমার সব ছবির সম্বন্ধে জানি।

আমিও, কেড বলল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর গ্রাড বুঝল কেড ওর সঙ্গে কথা বলতে একান্তই অনিচ্ছুক। তাই নিজের গাড়িতে ফিরে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে বোম্যান্ ফিরল।

বলল, ওখানেই গেছে। খুব উঁচু পাঁচিল। গাড়ি যাবার রাস্তাটা খুবই লম্বা। বাড়ির চিহ্নও দেখলাম না। গ্রাড তুমি এখানে থাক। গেটের ওপর নজর রেখ। আমরা ডিনারে যাচ্ছি। এ জায়গাটার খোঁজ খবর নিতে হবে।

বোম্যান্ জাগুয়ারে উঠে বসে ভিলারের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

।। আট ।।

এখন রাত আটটা। বেলভিস্তার হোটেলের লাউঞ্জ একদম জনশূন্য। যে কজন খেলার মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই চলে এসেছে তারা ডাইনিং রুমে। চুল্লীতে কাঠের আগুন গনগন করছে। নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে চকচকে পালিশে লালচে আভা বেরোচ্ছে। বেশ ঘরোয়া, সুন্দর পরিবেশ। ফায়ারপ্লেসের খানিকটা দূরে একটা আরাম কেদারায় চোখ বুজে কেড বসেছিল। খুবই মদ খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজেকে দমন করল ও। ব্র্যাডফের এ কাজটা ওকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইল যে ভাল ফটো তোলার ক্ষমতা এখনও ওর আছে।

দরজা ঠেলে বোম্যান্ ঢুকল, শেরম্যান ওর পেছনে পেছনে। কেড শেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কোত্থেকে?

আর বোল না। শেরম্যান শিউরে উঠে বলল, প্যারিস থেকে ওই মেয়েছেলেটার পেছন নিতে গিয়ে মরেছিলাম আর কি। এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে।

বোম্যান্ অধৈর্য হয়ে বলল, জান তো কার পাল্লায় পড়েছ।

তারপর কেডের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খবর নিলাম। অ্যানিটা জেনারেল ফ্রিৎস্ ফন লুডউইগের ফোর্টে গিয়ে লুকিয়েছে। জান তো এই জেনারেল কে? স্তালিনগ্রাদে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে রুশদের কাছে তিনি সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই বাড়িতে তিনি গত বিশ বছর ধরে বাস করছেন অবসরের পর। কি মনে হয় বল তো এর থেকে?

কেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কিছু না। তোমার কি মনে হচ্ছে?

শেরম্যান বলল, লোকটা হিটলার বিরোধী প্রচার চালাত। অ্যানিটা তো জন্মসূত্রে রাশিয়ান, তাই না?

বোম্যান্ বলল, তা বটে, তবে আমাদের ধারণা ছিল ও ওর গুপ্তপ্রণয়ীর সঙ্গে দেখা করতে সুইজারল্যান্ড আসে, এক আশি বছরের বুড়ো জার্মান জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে আসে শুনলে ব্র্যাডফ খুবই হতাশ হবে।

বোম্যান বলল, মনে হচ্ছে ভেতরে কোন ব্যাপার আছে। আজ রাতে আমরা বাড়িটা দেখতে যাব।

শেরম্যান বলল, কিন্তু বরফে পায়ের ছাপ পড়বে। তুমি কি অ্যানিটাকে জানাতে চাও আমরা ওকে অনুসরণ করছি?

বোম্যান বলল, এই রকম বরফ যদি পড়তে থাকে তাহলে কোন চিন্তা নেই। বরফে সব ঢেকে যাবে, দেখবে তুমি। গ্রাডকে গিয়ে বরং ছেড়ে দাও। ও দুঘণ্টারও বেশী আটকে আছে। শেরম্যান গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

বোম্যান্ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এস. বির একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। প্রেম-টেমের থেকে এটা আরো জমাটি ব্যাপার হতে পারে। বুড়ো জার্মান জেনারেল, রুশদের প্রতি যার সহানুভূতি আছে এবং তার সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করছে একজন বিখ্যাত চিত্রতারকা। আমি আর তুমি ঠিক সব বের করে ফেলব কেড।

কেড চুপ করেই রইল। বোম্যান্ বলল, চল কিছু খাওয়া যাক। সামনে কাজ, আবার বেজায় ঠাণ্ডা।

ডিনারের পর দুজনেই নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। কেডের জন্য ও একটা স্কি-পোষাক ঠিক করে রেখেছিল। স্কি-বুট আর দস্তানা পরে ওরা চাকরের বেরুবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে শেরম্যানের কাছে গেল। বেচারা শেরম্যান ওর সিমকা গাড়িতে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল। এ সময় কনকনে বাতাস বইতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় ওদের হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেল। বোম্যান্ বলল, চল একটু দেখেশুনে আসি।

শেরম্যান বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি যাও। আমার দরকার নেই।

কয়েক মিনিট অনেক কষ্টে হেঁটে কেড আর বোম্যান উঁচু লোহার গেটটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওপাশে একটা ছোট বাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বোম্যান্ বলল, চল আমরা ওদিক দিয়ে যাই। পাঁচিল ঘেঁষে ওরা পা টিপে টিপে চলতে লাগল।

চল আমরা পাঁচিল টপকাব।

খানায় নেমে গেল বোম্যান্। বরফে ওর জুতো ডুবে গেল।

পাঁচিলে হেলান দিয়ে ও দাঁড়াল।

দাঁড়াও, আগে তোমায় তুলে দিই।

বোম্যান্ দু হাত জোড়া করল। কেড ওর জোড়া হাতের চেটোয় পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বোম্যান্ ওকে ঠেলে ওপরে তুলে দিল। কেড পাঁচিলটা আঁকড়ে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ল। পাঁচিলের ওপর বসে ও বোম্যানের দিকে চাইল। বোম্যান্ এত বেঁটে যে কেডের বাড়ানো হাতই ধরতে পারল না। রেগে গিয়ে একটা গাল দিল।

যাকগে। আমি এখানেই থাকি। তুমি দেখতো বাড়িটা যদি দেখতে পাও।

কেড নরম গলায় বলল, কি করে ভাবছ তুমি, আমি নিজেই পাঁচিল টপকে যেতে পারব।

এত ভাল লাগছিল তার এই দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার যে বলবার নয়। সে খুবই উত্তেজিত বোধ করছে। কিন্তু বোম্যান্‌কে বুঝতে দিল না।

দাঁড়াও দড়ি আনছি। বেনের গাড়িতে দড়ি আছে। আমার খেয়াল করা উচিৎ ছিল। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি দেরী করব না। বোম্যান্ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পাঁচিলের ওপর গুটিসুটি মেরে কেড বসে রইল। গায়ে মাথায় সমানে বরফ পড়ছে। পাঁচিলেব ওপর থেকে খানিকটা বরফ ফেলে দিল ও। তারপর বরফের মধ্যে লাফিয়ে নামল। নরম তুষারে পড়ল বলে ব্যথা লাগল না কিন্তু আচমকা আঘাত লাগল একটা। পায়ের পাতা জ্বলে যাচ্ছে, হাঁটুটাও যেন মড়মড়িয়ে উঠছে। এই অবস্থাতেই কেড গাছের সারির ভেতর দিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। শেষে একটা বড় সমতল বরফে ঢাকা জায়গায় এল। এবার ও বাড়িটা স্পষ্ট দেখতে পেল। কেমন এলোমেলো ছড়ানো বাড়িটা, মাঝে মাঝে বুরুজ আছে। দেখেই বোঝা যায় সুইজারল্যান্ডের বিশেষ ধরনের দুর্গপ্রাসাদ এটা। তেতলা বাড়িটার গায়ে গায়ে ছোট জানলা। কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে। সহসা কেড থমকে গেল। ও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। একটু পিছিয়ে বরফঢাকা একটা দেবদারু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও বাড়িটাকে দেখতে লাগল। নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে ও বাড়িটা লক্ষ্য করতে লাগল। মাথার ওপর সমানে বরফ পড়ছে। খেয়ালই হল না কেডের। ওর মনে হল বাড়িটার খুব কাছে না গিয়ে ও বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। হঠাৎ ও দেখল বাড়িটার কাছে কি যেন নড়ছে-চড়ছে। বরফের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেড দেখল একটা লোক মাথা নিচু করে হেঁটে বেড়াচ্ছে বাইরে। তারপর আরেকজনকে দেখা গেল। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে গেল কেডের। দেখল দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একটু একটু ফাঁক রেখে সারি সারি সশস্ত্র সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মুখ কেডের দিকে। চেহারাগুলো এমন ভয়ংকর যে কেড

সভয়ে পিছিয়ে গেল। আরো বিশ মিনিটও প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাত পা এদিকে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। যথেষ্ট দেখেছে ও এই মনে করে পাঁচিলের যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলল। পাঁচিলের ওপর বরফ সরিয়ে একটা চিহ্ন রেখেছিল কেড। কিন্তু এখন বরফ পড়াতে সেটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল কেডের।

বোম্যান্। ও আস্তে ডাকল।

এই যে।

পাঁচিলের ওপার থেকে সাড়া এল আর সাপের মত পিছলে একটা দড়ি বেয়ে কেডের পায়ের কাছে পড়ল। দড়ি বেয়ে উঠতে কেডের খুবই কষ্ট হল। পাঁচিলের ওপর উঠে ও ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা যেন পাঁজরার গায়ে আছড়াতে লাগল। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে কেড বোম্যানের পাশে লাফিয়ে পড়ল। বোম্যান ক্ষেপে গেছে। আমার জন্য অপেক্ষা করনি কেন?

জানি। চল, যাওয়া যাক এখান থেকে।

গাড়ির মধ্যে বসে একটু আরাম পেল কেড। গাড়ির ভেতরটা দিব্যি গরম বাইরের তুলনায়। হোটেলের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বোম্যান্ বলল, ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার আছে একটা। হোটেলে গিয়ে বলছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা হোটেলে পৌঁছে গেল। হোটেলের লবিতে পৌঁছতেই মোটাসোটা হাসিখুশী ম্যানেজার বোম্যানের দিকে এগিয়ে এল।

হর্স্ট, তুমি তোমার বন্ধু আর মিঃ শেরম্যান পুলিশ কার্ড লেখাওনি।

ভুলে গিয়েছিলাম একদম। আমায় দাও আমি নিয়ে যাই ঘরে। তান্‌স ওকে কার্ডগুলো দিল। বসার ঘরে গিয়ে বোম্যান্ স্কি-র পোষাক খুলতে লাগল।

এবার বল। এত রহস্য করার দরকার নেই।

কেড জ্যাকেট খুলে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে হাত পা আগুনে সেঁকতে লাগল।

কেড বলল, প্রায় বারোজন সশস্ত্র লোক বাড়িটার চারিদিকে টহল দিচ্ছে। অন্তত দুজনের কাছে অটোমেটিক রিভলবার আছে।

বোম্যানের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ঠিক?

আমি বিশ মিনিট ধরে সব লক্ষ্য করেছি। একদম ঠিক বলছি।

কি ব্যাপার বলতো? কিন্তু পাহারা কেন?

কেড ঘাড় নাড়ল। ঠাণ্ডা কি রকম? ব্যারোমিটার কি বলছে?

বোম্যান্ উঠে টেলিফোনে আবহাওয়ার খবর নিল। তারপর বিরক্তিভরা স্বরে বলল, টেম্পারেচার উঠছে। কাল দিনটা ভাল হবে মনে হয়।

কেড বলল, বাড়িটাব মুখোমুখি জঙ্গলের কিনারে একটা বড় অরোলা পাইন গাছ আছে। একমাত্র ওখান থেকেই আমি ছবি তুলতে পারি। তেতলায় একটা ঝুলন্ত বারান্দা আছে। কাল দিন ভালো হলে অ্যানিটা বারান্দায় আসতে পাবে। এছাড়া তো ফটো তোলার আর কোন উপায় দেখি না। আমার একটা ছশো মিলিমিটার টেলিরোকোর লেন্‌স দরকার। কোথা থেকে পাব?

সশস্ত্র পাহারা আছে বললে যে?

থাকুক। লেন্‌সের কি করবে তাই ভাব।

একটু ভেবে নিয়ে বোম্যান্ ঘড়ি দেখল। রাত বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

কাল এনে দিতে পারি।

ভাল করে আলো ফোটার আগেই আমি ক্যামেরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে গাছে উঠে পড়তে চাই।

বোম্যান্ ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করল। একটু অপেক্ষা করে নিচু গলায় কাকে যেন কী বলল, কেড বারান্দার ছবি কী ভাবে তুলবে তার সুবিধে অসুবিধে ভাবতে লাগল। রোদ যদি চড়া হয় আর অ্যানিটা বারান্দায় বেরোয়, রোকোর লেন্‌স পেলে ও ভাল ক্লোজআপ নিতে পারবে। বোম্যান্ ফোন নামিয়ে বলল, আমি গ্রাডকে পাঠাচ্ছি। মরোয়োক্সে আমাব এক বন্ধুর ফটোর দোকান আছে। তার কাছে লেন্‌স আছে। গ্রাড তিন ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে।

গ্রাডের শোবার ঘরে গিয়ে ও গ্রাডকে টেনে ওঠাল। এখন মরোয়াঙ্গে যেতে হবে বলে প্রচণ্ড গাল দিল গ্রাড। তারপর জামাকাপড় পরে একটু বাদেই ও বেরিয়ে গেল। কেড শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে ক্যামেরার যন্ত্রপাতি এনে ওর মিনোল্টায় ফিল্‌ম ভরতে লাগল।

দেখ বারো ঘণ্টা চালাতে পারি এই পরিমাণ স্যান্ডউইচ আমার দরকার। তাছাড়া কফি, আধ বোতল ব্র্যান্ডি, খানিকটা সরু দড়ি, তিন মিটার গিট বাঁধা দড়ি, একটা ভালো শিকারের ছুরি আর চড়াইয়ে ওঠার লোহার নাল চাই। গাছে ওঠা অত সহজ হবে না। তবে একবার উঠে পড়তে পারলে আমায় আর কেউ দেখতে পাবে না।

বোম্যান্ মাথা নাড়ল। ওর মধ্যে প্রথম খুশির ভাব দেখল কেড।

আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আর কিছু চাই?

গাছে ওঠার পর আমার একা থাকাই ভাল। তবে নামবার সময় হুড়মুড় করে নামতে হবে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কি ভাবে?

আমার একটা রেডিও আছে। তাতে কথা বলা যায়, শোনাও যায়। এটাই যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায়।

চমৎকার। তুমি আমার সঙ্গে পাঁচিল অবধি আসবে। যদি বরফ পড়া থেমে যায় তোমাদের নিজেদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলতে হবে। তোমাকে আমার মালপত্র বইতেও সাহায্য করতে হবে। তারপর তুমি হোটেলে চলে আসতে পার।

পরদিন সকাল ছটার একটু বাদে কেড আর বোম্যান্ হোটেল থেকে বেরোল। গ্রাড ইতিমধ্যে রোকোর লেন্স নিয়ে এসেছে। মালপত্র সব একটা রুকস্যাকে ওরা ভরেছে। বরফ পরা এখন বন্ধ। চাঁদের রুপোলী আলোয় ভরে গেছে চারিদিকটা। তুষারকণা ঝরছে। তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নীচে। পথ খুবই পিছল। শেরম্যানের সিমকা তখনো পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে শেরম্যানকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের পাহারা দেবার কথা বলল। শেরম্যান চমকে গেল, খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে ব্যাপার।

তাই দেখতেই যাচ্ছি। বোম্যান্ বলল, তুমি পাঁচিলের এপারে থাক। আমি যখন ফিরতে চাইব, তুমি আমায় দড়ি ছুঁড়ে দেবে।

বোম্যান্ পাঁচিলের কাছে গিয়ে কেডকে ঠেলে তুলল। শেরম্যান এবার বোম্যান্‌কে ঠেলে তুলে দিল। দড়ির এক প্রান্তে রুকস্যাক, কেডের ক্যামেরার সরঞ্জাম আর শর্টওয়েভ রিসিভার সেটটা বেঁধে দিল শেরম্যান। বোম্যান্ সেগুলো টেনে তুলল। দুজনে পাঁচিল বেয়ে নেমে খুব সন্তর্পণে অন্ধকার জঙ্গল দিয়ে চলতে লাগল। কেড যেখানে পা ফেলল ওর পায়ের ছাপের ওপরই বোম্যান্ পা ফেলতে লাগল। শেষ অবধি কেড বলল, এখান থেকে দেখা যাবে।

গাছের ফাঁক দিয়ে বরফ ঢাকা লনটা দেখা গেল। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে লনটা। রাতে যে অরোলা পাইন গাছটা দেখেছিল সেটার কাছে খুব ধীর পায়ে কেড হাঁটতে লাগল। লনের দিকে ইঙ্গিত করে কেড বোম্যান্‌কে বলল, দেখতে পাচ্ছ ওদের? সান্ত্রীদের দেখে বোম্যান জোরে নিঃশ্বাস টানল। কালো কালো নিশ্চল সব মূর্তি, হাতে রাইফেল, চোখ জঙ্গলের দিকে. নজর রাখছে। কেড পিছিয়ে অন্ধকারে চলে এল। ও চড়াইয়ে ওঠার জন্য লোহার নাল জুতোয় আঁটতে লাগল। আঙুল একেবারে হিম হয়ে গেছে। বোম্যান্ জিজ্ঞেস করল, কি ছাই ওরা পাহারা দিচ্ছে?

কেড বলল, তুমি ভাব গিয়ে। কেড পিঠে বাঁধা দড়িটা খুলে একটা মুড়ো সবচেয়ে নিচু ডালটায় বেঁধে অন্যমুড়োর ফাঁসটা চেপে ধরে ও গাছের গুঁড়িতে জুতোর নীচে আঁটা লোহার নাল বিঁধিয়ে দিল। তারপর অনেক কষ্টে ও ওপরে উঠতে লাগল। তলার দিকে একটা ঘন ডালের ওপর উঠে ও মুখ বাড়িয়ে বোম্যান্‌কে বলল, ঠিক আছে। জিনিসপত্রগুলো আমায় দিয়ে তুমি সরে পড় এখন। আর পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেল।

বোম্যান্ অন্যান্য জিনিসপত্র দড়ির মাথায় বেঁধে দিল। কেড সেগুলো টেনে ওপরে না তোলা পর্যন্ত চেয়ে রইল বোম্যান্। তারপর চাপা গলায় 'গুডলাক' বলে অন্ধকারে মিশে গেল। একটা ফার গাছের ডাল ভেঙ্গে সযত্নে ওদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলেছিল ও। কেড খুব সন্তর্পণে ওপরে চড়তে লাগল। অবশেষে গাছের প্রায় মগডালে উঠে ও দেখল, এখন উচ্চতা বড় বারান্দার সমান

পৌঁছিয়েছে। এই বড় বারান্দার ঠিক নিচেই ঢোকবার বিশাল দরজা। হালকা তেপায়া টেবিলটার পায়াগুলোও গাছের ডালে বাঁধল। রুকস্যাকটা আরেকটা গাছে বাঁধল। এবার ও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। আধঘণ্টা চুপচাপ বসে ও শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইচ টিপে বোম্যান্‌কে ডাকল। বোম্যান্ সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল, শুনছি।

আমি অপেক্ষা করছি। আমি প্রস্তুত। লাইন কেটে দিল কেড। কেড গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। এখন চারঘণ্টা অন্ততপক্ষে কিছু করার নেই। বেলা এগারটা হতে না হতে রোদ এমন চড়ে গেল যে কেড ওর গায়ের ভারী জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। এরমধ্যে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর ব্র্যান্ডি মেশানো কফি খেয়ে নিয়েছে ও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সান্ত্রীদের বেশ পরিষ্কার দেখতে পেল কেড। নজন সান্ত্রী। বিশাল জোয়ান চেহারা লোকগুলোর। এদের গায়ে কালো বর্ষাতি পায়ে রবারের বুট, মুখে কালো প্লাস্টিকের মুখোশ।

কেড ওর ছশো মিলিমিটার লেন্স দিয়ে দেখতে দেখতে ভাবল এমন গুণ্ডা চেহারার লোকজন ও কখনো দেখেনি। রোদ বাড়তে ওদের ছজন প্রাসাদে ঢুকে গেল। আরো তিনজন টহল দিতেই লাগল। এরা খুবই হুঁশিয়ার আর সতর্ক।

সকাল দশটা নাগাদ বারান্দা ও বাড়ির মাঝের দরজাগুলো খুলে গেল। কানঢাকা উলের টুপি আর পুরোনো একটা ওভারকোট পরা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। ওর হাতে লম্বা হাতল দেওয়া ঝাড়ু বারান্দা থেকে বরফ ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল সে। তারপর বারান্দার ওপর চারটে আরাম কেদারা পেতে দিল আর সামনে একটা কাঠের টেবিল পাতল। এবার কেডের একটু ভরসা হল। একটা চেয়ারের ওপরে ও ওর ক্যামেরার মুখ ঘোরাল। খুবই স্পষ্ট ছবি উঠবে নিশ্চিত হয়ে কেড লেন্সে ঢাকনা পরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। দশটা থেকে এগারটার মধ্যে চারিদিক যখন নিশ্চুপ তখনই ওর গাছের নীচে দুজনকে জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুনল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে নীচে ওদের দেখা অসম্ভব। বেজায় ভয় পেল কেড, কিন্তু ওদের দেখতে পেল না বলে বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। সূর্য যখন মাঝখানে হঠাৎ বারান্দায় খানিকটা প্রাণচাঞ্চল্যও দেখা গেল। দরজা খুলে হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এল অ্যানিটা স্ট্রেলিক। টেলিস্কোপিক লেন্স দিয়ে ও অ্যানিটা স্ট্রেলিককে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। অ্যানিটার পরনে আঁটো টুকটুকে লাল প্যান্ট আর সাদা সোয়েটার। ওর ছোট ছোট কোঁকড়া চুলের রুপোলি গুচ্ছো রোদে ঝলমল করছে। একটু পিছু হেলে হাঁটুর ওপর হাত রেখে কেড অ্যানিটাকে দেখতে লাগল। অ্যানিটা একটা চেয়ারে বসে এক প্যাকেট সিগারেট আর লাইটার বের করল। যখন ও সিগারেট ধরাচ্ছে তখন একটি লোক বারান্দায় বেরিয়ে ওর কাছে এল। লোকটির পরনে কালো স্কি-প্যান্ট, কালো গোলগলা সোয়েটার। লোকটা মাঝারি রকম লম্বা, ধূসর চুল ছোট ছোট করে কাটা, চৌকো কাঁধ, হাঁটা চলা উদ্দীপ্ত সৈনিক সুলভ। লোকটার দিকে পলকহীন চোখে কেড তাকিয়ে রইল। লোকটা অ্যানিটার কাছে গেল, অ্যানিটা হাত তুলল, হাসল। লোকটা অ্যানিটার হাতের আঙুলে চুমো খেল। কেড নিজের অজান্তেই যেন অন্তর থেকে নির্দেশ পেয়ে শাটার টিপল। এক নম্বর ছবি তোলা হল। লোকটাকে কেড দেখতেই থাকল, দেখতেই থাকল। কোথায় যেন দেখেছে ওকে, অসম্ভব চেনা লাগছে। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি সন্দেহ নেই। এবার উত্তেজনায় কেড প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসল। কেড চিনতে পেরেছে এই বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে। কেড ওর রোদেপোড়া মুখ লেন্সে ফোকাস করল লেন্স জুড়ে। দু-বছর আগের কথা। কেড তখন পূর্ব বার্লিনে। ডেইলি টেলিগ্রাফের সাপ্তাহিকীর জন্য কতগুলো ছবি তুলছে। ওর মনে পড়ল কিভাবে পূর্বজার্মানীর সিক্রেট পুলিশের সর্বময় কর্তা জেনারেল এরিখ হার্ডেনবুর্গের আসবার আশায় ও তিনটি ক্লান্তিকর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। তারপর জেনারেল যখন এলেন জ্বলন্ত চোখে কেডের দিকে তাকালেন, কিছুতেই ছবি তোলার অনুমতি দিলেন না. ওর মনে আছে। সেই হার্ডেনবুর্গ এখানে! হিটলারের পরে সবচেয়ে বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর জার্মান। টেলিস্কোপিক লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে ভয়ের একটা তুষার শীতল স্রোত কেডের পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে লাগল। হার্ডেনবুর্গ! এখানে অ্যানিটা স্ট্রেলিকের সঙ্গে। এমন চমকপ্রদ খবর পৃথিবীতে আর বুঝি হয়নি। ব্র্যাডেফ সত্যিই অসাধারণ। ব্র্যাডেফ ঠিকই বুঝেছিল। সেইজন্যই প্রাসাদ ঘিরে এত সশস্ত্র সান্ত্রী। ওরা হার্ডেনবুর্গের

গুপ্ত পুলিশবাহিনীর লোক। সেই বিখ্যাত গুপ্তবাহিনী। কেড সভয়ে ওদের দেখল। কেড বুঝল সারা জীবনে সে এর থেকে বেশী বিপজ্জনক কাজ আর করেনি। ওই লোকগুলি যদি ওকে দেখে তাহলে কুকুরের মতন গুলি করবে। একটি প্রশ্ন করবে না। আবার ও বারান্দার দিকে তাকাল। সেই বৃদ্ধ লোকটি একটা খাবার বোঝাই ট্রে আর রুপোর কফি পট এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। অ্যানিটা আর হার্ডেনবুর্গ খুবই নিবিষ্ট মনে কথা বলছে। হার্ডেনবুর্গ উঠে কফি ঢালতে লাগল। কেড একটার পর একটা ছবি তুলতে লাগল। এই উজ্জ্বল রোদে ছবি যে খুব ভাল আসবে ও বুঝতে পারছিল।

হঠাৎ দরজাগুলো সপাটে খুলে গেল। দুটো লোক বেরিয়ে এল বারান্দায়। একটি লম্বা হাড় বের করা শক্ত কঠিন চেহারা। হার্ডেনবুর্গের মতন পরনে স্কি-পোষাক। সে একটি হুইলচেয়ার ঠেলছে তাতে একটি বুড়ো, মোটা লোক বসে আছে।

কেড দেখেই চিনল লম্বা লোকটা হচ্ছে হার্ডেনবুর্গের ডান হাত হার্ম্যান লিয়েভন। কিন্তু বৃদ্ধটির দিকে কেড চেয়েই রইল। লম্বা লেন্‌সটা দিয়ে দেখতে দেখতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় যেন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। কেড স্থির জানত বোরিস ডুসলওস্কির মত দেখতে আরেকটা লোক এই পৃথিবীতে নেই। সেই স্থূল, মাংসল্ মুখ, মুখে বর্বর নিষ্ঠুরতা। এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তবু মুখের সেই ঔদ্ধত্য ব্যঙ্গ ভাব যায়নি। একসময় ও স্তালিনের পুলিশের সর্বময় কর্তা ছিল। ইহুদীরা ওর ভয়ে কাঁপত। বেল্‌সেনের সেই জানোয়ারটার মতনই ওর নাম সারা পৃথিবীতে ঘৃণা ও আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল। কেড বুঝল ও একটা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখছে। এই নিষ্ঠুর, নির্মম লোকগুলোর সঙ্গে এক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রতাবকার যোগাযোগ। এ যে পৃথিবী কাঁপানো খবর। পূর্ব বার্লিনের হর্তাকর্তা, রুশ সরকারের তথাকথিত এক মিত্রের সঙ্গে বর্তমান রুশ সরকারের এক প্রধানতম শত্রুর গোপন আঁতাত!!! উত্তেজনা আর বিস্ময় যত চরমেই উঠুক কেড ঠিক একটার পর একটা ছবি তুলে যেতে লাগল।

হার্ডেনবুর্গ আর ডুসলওস্কি টেবিলে এসে বসেছে। লিয়েভন ভেতরে চলে গিয়েছিল। এখন ও একটা ব্যাগ বোঝাই কাগজ নিয়ে টেবিলে রাখল। অ্যানিটা উঠে হার্ডেনবুর্গের পেছনে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত সম্পর্কের স্বচ্ছন্দতায় ওর কাঁধে হাত রাখল। হার্ডেনবুর্গ ব্যাগ থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছিয়ে রাখল। কেডের লেন্‌সটা এত শক্তিশালী যে ও ম্যাপটার খুঁটিনাটি পর্যন্ত দেখতে পেল। ম্যাপটা পশ্চিম বার্লিনের। হঠাৎ কেড দেখল ও এক রোল ফিল্‌ম খরচ করে ফেলেছে। আবার ক্যামেরায় ফিল্‌ম ভরল ও।

দুজনে খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখছে আর কথা বলছে। কেড ক্যামেরার শাটার টিপতেই লাগল। ও বুঝেছিল এক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ও দাঁড়িয়ে আছে। যে ছবিগুলো কেড তুলছে পয়সা দিয়ে তার মূল্যায়ণ হয় না। এ ছবি 'হুইসপারের' থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ ছবি এখনি সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে পৌঁছান দরকার। তিনি দেখার আগে এ ছবি আর কারও দেখা উচিৎ নয়। এ ছবির জোরে আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে কিনা করতে পারে। এ বোঝার রাজনৈতিক জ্ঞান কেডের আছে। কেডের দ্বিতীয় বোলটাও ফুরিয়ে গেল। বাহাত্তরটা ছবি তুলেছে কেড, একেকটা বারুদের গোলা। এখন ওর একমাত্র চিন্তা কি করে এখান থেকে পালিয়ে হোটেলে পৌঁছান যায় আর জেনেভায় আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিনিধির হাতে ফটোগুলি তুলে দেওয়া যায়। এবার ও টের পেল ওর হাত কাঁপছে। তাড়াতাড়ি ব্রান্ডির বোতলটা নিয়ে চুমুক দিতেই বিপত্তি। বোতলটা কেডের আড়ষ্ট জমে যাওয়া আঙুল থেকে পিছলে গিয়ে গাছের তলায় বরফের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেল কেড। আতঙ্কে তার হৃদপিণ্ডটা লাফালাফি করতে শুরু করল। যদি কোন সান্ত্রী এখান দিয়ে যায়, সব শেষ তাহলে। তাড়াতাড়ি শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইশ টিপল ও। বোম্যান্? অস্থির ভাবে কেড বলল, না শেরম্যান বলছি, বল কি ব্যাপার। আমার প্রয়োজনীয় ছবি সব তুলে নিয়েছি। এখন দরকার এখান থেকে সরে পড়া।

অন্ধকার না হলে তুমি বেরোতে পারবে না। একঘণ্টা আগে আমি ওখান থেকে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছি। গেটে দাঁড়িয়ে দুটো লোক পাঁচিলের ওপর নজর রেখেছে। অন্ধকার না হওয়া অবধি তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার হাতে এখন ডিনামাইট।

কিছু করা যাবে না। তোমাকে সবুর করতেই হবে।

ঠিক আছে, হাল ছেড়ে দিল কেড। বারান্দার দিকে আবার তাকাল। মিটিং শেষ। হার্ডেনবুর্গ ডুসলওস্কির চেয়ার ঠেলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। পেছন পেছন অ্যানিটা যাচ্ছে। ওর হাতে কাগজভর্তি ব্যাগ। দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, এবার বারান্দা খালি। কেড ক্যামেরা খুলে সযত্নে ওর রুকস্যাকে ভরল। তেপায়া টেবিলটা তুলে ভাঁজ করে ব্যাগে রাখল। আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রতিনিধি এই ছবিগুলো নিয়ে কি করবেন কেড তা ভাবছে না। এই ছবিগুলো তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে ও নিশ্চিত, ওকে এটা করতেই হবে। গাছের ডালে হেলান দিয়ে ও অন্ধকার হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সোওয়া পাঁচটার একটু পরে বরফ পড়তে আরম্ভ করল, ঠাণ্ডা সাংঘাতিক বেড়ে গেল। অচিরেই গভীর অন্ধকার নেমে এল চারিদিকে। প্রাসাদটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল শুধু তিন চারটি আলোকিত জানলা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে রইল। কেড সান্ত্রীদের দেখতে পাচ্ছিল। ওরা সমানে টহল দিচ্ছে, এ ওর সাথে কথা বলছে। যখন অন্ধকার আরও ঘন হল কেড শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইচ টিপল।

বোম্যান?

আছি। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। যে জায়গাটা দিয়ে ঢুকেছিলাম খুঁজে পাবে?

চেষ্টা করব। খুবই শক্ত অবশ্য।

কিছু হল?

দুর্দান্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। পৃথিবীব মধ্যে বৃহত্তম সংবাদ। যখন এখানে পৌঁছবে হেডলাইট জ্বালিও। তা দেখে আমি পথ চিনে নেব।

বৃহত্তম-সংবাদ মানে?

সময় নষ্ট কবছ। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কেড সুইচ বন্ধ করল।

কেড সাবধানে নামতে লাগল। সারা শরীবে ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বহু কষ্টে শেষ অবধি ও বরফেব ওপর নামল। মালপত্র তুলে নিয়ে কান পাতল। বাতাসে কান্নার মতন আওয়াজ, গাছপালার মর্মর ধ্বনি এ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না ও। যে পাঁচিল দিয়ে ও নেমেছে সেটা কোথায় আবছা বুঝতে পারছে। সেদিকে সন্তর্পনে এগোতে লাগল ও।

মালের বোঝা দুঃসহ রকমের ভাবি লাগছে কেডের। হঠাৎ ওর পা কিসে যেন বাধল। হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল কেড। ববফে ওর নাক মুখ ডুবে গেল, প্রথমে খুবই ভয় পেয়েছিল। এবার হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে কেড উঠে পড়ল। চারিদিকে একটু নরম আলো। এবার পেছন দিকে চাইতেই চুল খাড়া হয়ে গেল কেডের। আতঙ্কে তার হৃদস্পন্দন প্রায় থেমেই গেল। সমস্ত প্রাসাদটায় ঝলমলে আলো জ্বলে উঠল। এক দীর্ঘ নিশ্বাস বন্ধ করা মুহূর্ত। তারপরই ঘোব অন্ধকারে কেডকে ডুবিয়ে দিয়ে সব আলো নিভে গেল। একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র ঘণ্টা বাজছে।

কেড বুঝছে ও তারে হোঁচট খেয়েছে এবং তাই অ্যালার্ম বাজছে। সর্বনাশ, এমন আতঙ্ক জীবনেও আর ওর হয়নি। ও যদি কোনরকমে সান্ত্রীরা এখানে আসার আগে পাঁচিলটার কাছে পৌঁছতে পারে। শর্টওয়ভ রিসিভারটা ও ফেলে দিল। তারপর রুকস্যাকটা আঁকড়ে ধরে অন্ধকারে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেতে খেতে ও অন্ধের মতন ছুটল। হঠাৎ কেড দেখল ওর ডানদিকে পনের মিটার দূরে টর্চ জ্বলল এবং নিভল।

কেড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে কান পাতল। ঝোপের মধ্যে খসখসে শব্দ। রুকস্যাকটা ওর হাত পিছলে হরকে গিয়ে পড়ল। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। হঠাৎ একটা টর্চের আলো ওর ওপর এসে পড়ল। একটা সান্ত্রী চমকিত বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করল। তারপরেই কেড ওর পা ধরবে বলে সান্ত্রীটার উরুতে গিয়ে ধাক্কা খেল। দুজনেই বরফে পডে গেল। ভয়ে দিশেহারার মতন কেড অদৃশ্য মুখটাকে এলোপাথারি ঘুঁসি ছুঁড়ে আঁচড়াতে লাগল। সান্ত্রীটা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে খানিক চমকে গিয়ে ওর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কেডেব আনাড়ি হাত সবেগে সরিয়ে কেডকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেড হাঁচড় পাঁচড় করে উঠবার চেষ্টা করতেই

ও কেডের ওপর আবার এসে পড়ল। কেডের শ্বাসনালীতে ওর ইস্পাতের মত আঙ্গুলগুলো চেপে বসেছে। কেড বুঝল ও এখনি মরবে। হঠাৎ ওর কোমরের বেল্টে শিকারীদের ছুরির কথা মনে পড়ল। ও কোনরকম হাতড়ে ছুরিটা বার করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটা গেঁথে দিল। সান্ত্রীটার জামাকাপড় ভেদ করে শরীরে ঢুকে গেল ছুরিটা, কেডের হাতে কাঁপুনি আর ধাক্কা উঠে এল। হাতটা যেন অসাড় হয়ে গেল। একটু নিশ্বাসের জন্য আকুল কেড গড়িয়ে সরে এল। তার পর উঠে দাঁড়াল। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে কাছেই। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওর থেকে দশ মিটার দূরে পাঁচিলটার গা দিয়ে আলো ঝলকে উঠল। ছুরিটা আঁকড়ে ধরে পাগলের মতন কেড সেদিকে ছুটল। ঘড়ঘড় করে নিশ্বাস পড়ছে। হৃদপিণ্ডটা ফেটে যায় আর কি।

কেড? বোম্যানের গলা।

কেডের গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোল। হঠাৎ ওর পিঠের ওপর সপাৎ করে কি পড়ল। দড়ির মুড়ো। ওদিকে জঙ্গল হুড়মুড় করে সব ছুটছে কেড টের পেল। এই ঠাণ্ডায় ও ভয়ে ঘামতে লাগল। পেছন ফিরে দেখল প্রায় বারোটা টর্চ জ্বলছে, চমকাচ্ছে। দড়িটা আঁকড়ে ও ছুরিটা ফেলে দিল তারপর দেয়ালে পা ঠেকিয়ে পাঁচিলের ওপরে উঠল। পাঁচিলের ওপর দিয়ে ক পা হেঁটে বোম্যান্ যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কাছাকাছি বরফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেড। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে ও বোম্যান্‌কে বলল, চল জলদি। ওরা আমাকে তাড়া করেছে। কেড যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তা বোঝার মতন বুদ্ধি ব্যেম্যানের আছে। ও কেডকে জাপটে ধরে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিল তারপর অর্ধেক ঠেলে, অর্ধেক টেনে কেডকে ওর জাগুয়ারে তুলল।

গাড়িটা যখন চলছে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত কেড ঘড় ঘড় করে নিশ্বাস টানতে লাগল। বোম্যান্ বলল, কি হয়েছে কি?

কেডের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। সান্ত্রীটার শরীরে ওর ছুরিটা গেঁথে যাচ্ছে এই দৃশ্যটাই চোখের উপর ভাসছিল কেডের। সান্ত্রীটা মরে যায় নি তো?

কেড?

কেড কোনমতে বলল, কথা বল না, চালাও।

মরিয়া হয়ে গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেল বোম্যান।

কেড হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সদর দরজা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেও না! আমার সারা শরীরে রক্ত। উজবুক কোথাকার।

বোম্যান্ গলা চড়িয়ে বলল, কি হয়েছেটা কি?

আমায় উপরে নিয়ে চল।

বোম্যান্ গাল পাড়ল। তারপব কেডকে শক্ত করে ধরে হোটেলের পেছন দিকে নিয়ে গেল। 'সার্ভিস' লেখা লিফ্‌ট দিয়ে ওরা তেতালায় উঠল। কেডকে আঁকড়ে ধরে বোম্যান্ বসার ঘরে নিয়ে এল। শেরম্যান অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। গ্রাড বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে চেয়ারে বসেছিল। কেডকে দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, কেডের গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। শেরম্যান হাঁ করে কেডকে দেখছিল। রক্তে মাখামাখি জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে ফেলল কেড। রেগে আগুন হয়ে ও বোম্যান্‌কে বলল, জাহান্নামে যাও তুমি। মদ দাও আমাকে। মদ দাও শিগগির।

বোম্যান্ ঘাবড়ে গিয়ে মদ ঢালল।

নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে কেড বলল, ধ্বস্তাধস্তির সময় একজন সান্ত্রীকে আমায় ছুরি মারতে হয়।

ওরা তিনজনে হাঁ করে কেডের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর বোম্যান্ চেঁচিয়ে বলল, হা ভগবান....তুমি ওকে খুন করেছ?

কেড রুমাল দিয়ে ওর রক্তমাখা আঙ্গুল পরিষ্কার করল। তারপর বলল, ওকে ছুরি না মারলে ও মেরে ফেলত আমায়। বোম্যান্ চল, দেরী কোর না। আমেরিকান কনসালের কাছে এ ছবি পৌঁছাতে হবে। এ একেবারে ডিনামাইট চল, আমাদের জেনেভা যেতে হবে এক্ষুনি।

বোম্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, আরে উজবুক কি ব্যাপার আমি কিছু এখনো জানিই না। বল আমাকে।

দুঃখিত' কেড বলল। ব্যাপার বিরাট। বিবাটতম। জেনারেল হার্ডেনবুর্গ আর বোরিস

ডুসলওস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হচ্ছিল। আমার কাছে ওদের ছবি আছে। বোম্যান্ অবিশ্বাসী চোখে কেডের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল কেড বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছে।

ডুসলওস্কি? কি বলছ তুমি যা-তা। দশবছর আগে ডুসলওস্কি আত্মহত্যা করেছে।

আমিও তাই জানতম। কিন্তু ও বেঁচে আছে। তাই জন্যই তো ওরা এত সান্ত্রী রেখেছে। ওরা সবাই হার্ডেনবুর্গের লোক।

আরে নেশা হয়ে গেছে নাকি তোমার? কি বলছ তুমি?

টেবিলে ঘুঁষি মেরে কেড বলল, ডুসলওস্কি বেঁচে আছে। আমার কাছে ওদের ছবি আছে।

বোম্যান্ কেডের সাদা রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ও কেডের চোখ দেখে বুঝল কেড সত্যি কথা বলছে।

তা যদি হয়, আমায় ফিল্‌মগুলো দাও। আমি এস বিকে পাঠিয়ে দিই।

কেড মাথা নাড়াল।

না এ ছবি এত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্র্যাডেফকে দেওয়া যাবে না, এগুলো এক্ষুনি আমেরিকান কনসালের হাতে দিতে হবে।

বোম্যানের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

তোমার কনট্র্যাক্ট এস. বির সঙ্গে। তুমি যে ছবিই তুলে থাক, তা এস. বির সম্পত্তি। আমাকে দাও ছবিগুলো।

কনসাল ছাড়া আর কেউ এ ছবি পাবেনা, বোম্যান্।

বোম্যানের মুখ রাগে অন্ধকার হয়ে গেল।

একটা মাতালের সঙ্গে কাজ করতে গেলে এই-ই হয়। ও এবার রাগে ফেটে পড়ল। শেরম্যানকে বলল, তুমি কি ওর সঙ্গে একমত নাকি?

মোটেই না। এস.বিকে ফোটো দিতে হবে। ও ফোটো নিয়ে যা করবে ওর ব্যাপার।

সেই কথা। ছবিগুলো আমায় দাও। আমরা তিনজন তুমি একলা। দবকার হলে আমরা জোর খাটাব।

কেড ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। সত্যি তার যদি আর একটু সাহস থাকত, মদ যদি ওকে এভাবে শেষ না করত। তবুও ভয় পেলেও কোথা থেকে একটা শক্তি পেল কেড। এই ফিল্‌মগুলো এই গুণ্ডাটার হাতে কিছুতেই দেওয়া চলবে না।

কেড কাঁচের ছাইদানীটা তুলে নিল।

যদি জোর কর জানলা দিয়ে এটা ছুঁড়ব।

বোম্যান্ অবজ্ঞার হাসি হাসল। দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে জানলা ভাঙ্গলে তাতে কি এসে যায়। দাও কেড, ফিল্‌মগুলো আমাকে দাও। তুমি নিশ্চয়ই অতটা মাতাল হওনি। দাও।

শেরম্যান আর গ্রাড কেডের দিকে এগোতে লাগল। হঠাৎ দরজায় জোরে ধাক্কা মারল। তিনজনেই থমকে আড়ষ্ট হযে দাঁড়িয়ে গেল।

বোম্যানের দুচোখে ভয়, কে?

পুলিশ। দরজা খুলুন। ধমকে কে বলল।

কেড পেছোতেই লাগল, পেছোতেই লাগল। ওর শোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল দুম করে। সুইস পুলিশের ছাইরঙা ইউনিফর্ম পরে একজন দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ লোক ঘরে ঢুকল।

যে যেখানে আছে তেমন দাঁড়িয়ে থাক। বন্দুকের বাঁটে হাত দিয়ে ও বলল।

পুলিশটার পেছনে কালো বর্ষাতি আর কালো টুপি পরে একটা বেঁটে জোয়ান লোক ঢুকেছিল। সে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল। আরো দুজন লোক ঘরে ঢুকল। কেড দেখেই চিনল, ওরা হার্ডেনবুর্গের লোক।

বোম্যান্ সুইস পুলিশটিকে তড়পে বলল, এ সবের মানে কী?

আপনাদের পাসপোর্ট? আপনারা এ হোটেলে নাম রেজিস্ট্রি করাননি। সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বোম্যান্।

ও, দুঃখিত। আমরা ব্যস্ত ছিলাম। এই যে আমার পাসপোর্ট। আমার সঙ্গীদের পাসপোর্ট ওদের

কাছে। কেড সবই লক্ষ্য করছিল। সে এই ভাওতায় ভুলল না। হার্ডেনবুর্গের লোক যখন এখানে আছে, তখন ওদের গ্রেপ্তার করে খানাতল্লাসী হবেই।

শেরম্যান আর গ্রাড দুজনেই পাসপোর্ট দেখাল। কেড গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, আমার শোবার ঘর থেকে পাসপোর্ট নিয়ে আসছি। শোবার ঘরের দিকে ও আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। শরীর ভয়ে আড়ষ্ট, বুক ধড়পড় করছে।

পুলিশটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এই দাঁড়াও। শরীর ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তবু কেড এগোতেই লাগলো। পেছনে পায়ের শব্দ, কোনমতে দরজাটার পাল্লা ধরে ও সান্ত্রী দুটোর মুখের ওপর আছড়ে বন্ধ করল। একজন কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়েছিল, কেড ঠেলে সরিয়ে দরজায় চাবি দিয়ে দিল। তারপর একলাফে ঘর টপকে ও ঢাকা বারান্দার দরজাটা খুলল। তারপর দরজার পাল্লা টেনে নিয়ে পেছনে লুকোল। দরজা আর দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ও দাঁড়িয়ে থাকল। বসার ঘরের দরজা ধড়াস করে খুলে গেল, লোকটা ভাগল। জলদি। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

দুটো লোক বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এসে লিফ্‌টের দিকে ছুটল। কেড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বাইরের ঘরে পুলিশটা বলছে, তোমাদের গ্রেপ্তার করা হল।

বোম্যান উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করল। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তারপর বোম্যান্ বলল, ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি।

তারপর পুলিশটা আর দুজন সান্ত্রী বোম্যান্, গ্রাড আর শেরম্যানের সঙ্গে খোলা দরজা পেরিয়ে ঢাকা বারান্দা দিয়ে চলে গেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কেড ওদের জুতোর মচমচ শব্দ শুনল। লিফ্‌ট নীচে নেমে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল কেড। তারপর একটা গরম কোট গায়ে গলিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলে ঝুল বারান্দায় এসে ও দরজাটা বন্ধ করল।

কম্পাউন্ডে তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দুজন সুইস পুলিশ। কেডের নীচেই আরেকটা ঝুলবারান্দা। কেড রেলিং টপ্‌কে নীচের বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল। ঝুলবারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার দরজার পেছনে অন্ধকার। দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে ও ঢুকে পড়ল। তারপর দরজার পর্দা টেনে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে বের করে টিপল ও। আলোতে দেখল সামনেই বিছানা। একটি মেয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। দেখেই রক্ত জমে গেল কে-ডর। কেড মেয়েটি চেঁচাবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ চাপা দিল। মেয়েটি ওকে সরাবার চেষ্টা করল। কেড মরিয়া হয়ে ফিসফিস করে বলল, ভয় পেওনা। চেঁচিও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

মেয়েটি কেডের অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে বুঝল কেড খুবই ভয় পেয়েছে। ও আস্তে করে কেডের হাতটা ওর মুখ থেকে সরাল।

কি হয়েছে বলুন তো?

মেয়েটির শান্ত কণ্ঠস্বর কেডকে খানিক আশ্বস্ত করল। মেয়েটি বলল, তুমি আমায় প্রায় পিষে ফেলেছ।

কেড তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল 'দুঃখিত'।

মেয়েটি বলল, ভয়ে আমার প্রাণ প্রায় উড়ে গিয়েছিল।

কেড বলল তোমার থেকে আমি অনেক বেশী ভয় পেয়েছিলাম। আচ্ছা তোমার কাছে একটু মদ আছে?

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়েই রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি ভ্যাল কেড, না? আমি নিশ্চিত তুমি কেড।

হ্যাঁ, আমি কেড। কি করে জানলে?

সম্ভবতঃ আমি তোমার সবচাইতে বড় ভক্ত।

কেড ধপ্ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। এত স্নায়ুর চাপ তার সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও নিজের হাতের দিকে তাকাল। যেন রক্ত লেগে আছে ওতে। কেড মুখ ঢাকল।

মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে ততক্ষণে। কেডের হাতে একটা গ্লাস গুঁজে দিয়ে বলল, খেয়ে নাও এটা।

কেড প্রায় অচৈতন্যের ঘোরের মধ্যে ছিল। হুইস্কির ঝাঁজে ওর চেতনা ফিরে এল। চোঁ চোঁ করে এক ঢোকে হুইস্কি শেষ করতেই গ্লাসটা ওর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, এবার বলবে ব্যাপারটা কী?

মেয়েটির স্থির শান্তভাব দেখে কেড অবাক হয়ে গেল।

তুমি কে?

মেয়েটি বলল, আমি? আমার নাম জিনেৎ দু প্রা। আমি ফরাসী। মর‍্যোক্সে একটা ট্রাভেল এজেন্সীতে কাজ করি। ছুটি কাটাতে এখানে এসেছি।

তোমার গাড়ি আছে?

হ্যাঁ, নীচের গ্যারেজে...ভক্সওয়াগন।

দেখ, আমাকে জেনিভায় যেতেই হবে, কেড মরিয়া হয়ে বলল।

এখনি যেতে হবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার তো গাড়ির দরকার হবে। চল আমি তোমায় জেনিভায় নিয়ে যাচ্ছি।

কেড বলল, দেখ তোমাকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না। আন্তর্জাতিক গুরুত্বের ব্যাপার এটা। তোমার প্রাণ সংশয় হতে পারে।

মেয়েটির চোখ জ্বলে উঠল। তুমি কোন ছবি তুলেছ? তাই এত গোলমাল।

কেড বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করবই। আমি এখনই রেডি হয়ে নিচ্ছি। মেয়েটি জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

কেড এখনও ঠিক ধাতস্থ হয়নি। সে গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢালল। তারপর এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে আলো নিভিয়ে দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওর ঠিক নীচেই একদল লোক। চারজনের পরনে সুইস পুলিশের পোষাক, বাকি দুজন হার্ডেনবুর্গের লোক। একটা পুলিশ মাইক্রোফোনে কথা বলছে। ও পালিয়ে যেতে পারে, আমরা সারা হোটেলে তল্লাসী চালাচ্ছি। শহরের ওপর নীচের সব রাস্তা বন্ধ কর। বেশী দূর পালাতে পারবে না, নজর রাখ, লোকটা বিপজ্জনক।

কেড তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। ওর আগেই বোঝা উচিৎ ছিল এত সহজ হবে না। কেড বিভ্রান্তের মতন দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করবে ও? জিনেৎ এই সময় প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল।

আমার হয়ে গেছে। শুধু পেছনের জীপটা...

কেড বলল, নীচে পুলিশ। ওরা সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

পুলিশ।

এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল।

।। নয় ।।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল। কেড আর মেয়েটি পরস্পরেব দিকে তাকাল। পাগলের মতন কেড একটা লুকোবার জায়গা খুঁজছিল। ফিলমের রোলদুটো ও প্যান্টের পকেটে আঁকড়ে ধরল।

বাথরুম। মেয়েটি ফিসফিস করে বাথরুমের দিকে আঙ্গুল দেখাল। তারপর গলা তুলে বলল, কে?

পুলিশ।

কেড বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাথরুম থেকে পালানোর কোন রাস্তাই নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ির আওয়াজ। ও রুদ্ধশ্বাসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ও শুনল জিনেৎ দরজা খুলে দিচ্ছে। একজন লোক বলছে, আমরা একটি লোককে খুঁজছি...লোকটি মারাত্মক...অপরাধী।

ওঃ, জিনেতের গলায় ভয়। এখানে আমি ছাড়া তো কেউ নেই। বেরোব বলে জামাকাপড়

পরছিলাম।

আপনার পাসপোর্ট?

লোকটি ভারী পায়ের আওয়াজ তুলে শোবার ঘরে গেল।

জিনেৎ বলল, এই যে আমার পাসপোর্ট। লোকটা কি করেছে?

খুন।

এবার লোকটি হাতল ঘুরিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে চাইল। ভয়ে কুঁকড়ে কেড দেয়ালের গায়ে লেপটে থাকল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কেড নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না।

খুন। তবে ও সান্ত্রীটাকে মেরে ফেলেছে। কেডের সারা ইন্দ্রিয় জুড়ে এখন ভয় আর ভয়। জিনেৎ বলল, ঠিক আছে চলে গিয়েছে ওরা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে কেড শোবার ঘরে এল। জিনেৎ কেডের দিকে তাকাল। ওর চোখে ভয় আর সংশয়।

কি হয়েছে আমাকে বল। ওরা বলছে তোমাকে ওরা খুনের ব্যাপারে খুঁজছে।

আর কোন উপায় নেই। কেড আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসল। তারপর ক্লান্ত ভাবে একটানা বলে গেল সব। ব্রাডেফ...অ্যানিটা স্ট্রেলিক, প্রাসাদের বারান্দায় ওকী দেখেছে...একে একে সব। জিনেৎ গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল।

সান্ত্রীটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি, ওর ছুরি মারার কথা বলে চলল। আমি ছুরি না মারলে ও আমাকে মেরে ফেলত। ওরা নিশ্চয় বুঝেছিল আমি ফটো তুলেছি। ওরা নিশ্চয় আমার ক্যামেরা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না। এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। আমাকে আমেরিকান কনসালের কাছে পৌঁছতেই হবে।

ছবিগুলো কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কেড বলল, আমার তো তাই মনে হয়। আজকাল গুপ্তচর চারিদিকে। এ খবর যদি এখনো কেউ না জানে তাহলে এটার গুরুত্ব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

আমি তো জেনেভায় যেতে পারি। আমার তো মোটরে যেতে কোন বাধা নেই। মেয়েটি বলল।

কেড মেয়েটির দিকে তাকাল। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা দারুণ সমাধান, কিন্তু ইস্টনভিলের বুড়ো স্যামের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ওর মনে পড়ল।

এই মেয়েটি কে? কোন্ বিশ্বাসে ওকে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবে কেড? তাছাড়া গাড়ি থামিয়ে ওকে যদি ওরা তল্লাসী করে? মেয়েটি তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বে। না কেডের কোন অধিকার নেই মেয়েটিকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দেবার।

কেড বলল, না, কাজটা আমাকে নিজেকেই করতে হবে। তুমি এ জায়গাটা চেন? অন্য কোন পথে জেনিভায় পৌঁছন যায়?

মরোক্স পর্যন্ত রেলরাস্তা আছে। জেনিভা যাবার ট্রেন পেতে পার তুমি। তবে আমার মনে হয় ওরা স্টেশনেও নজর রাখবে। একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তুমি স্কি করতে পার?

ভাল পারি না। তবে চালিয়ে নিতে পারি।

স্কি চড়ে আমরা তাহলে যেতে পারি। আমি রাস্তা চিনি। অনেকবার স্কি করে গেছি সাইলে। সেখান থেকে আমরা লেকে যেতে পারি তারপর স্টীমারে জেনেভা?

কেড ভেবে দেখল মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য ওর উদ্বেগ হচ্ছে।

আমি আশা করতে পারি না যে তুমি... বলে ও থেমে গেল। তারপর বলল, আমাদের কাছে স্কি নেইও।

আমি স্কি জোগাড় করতে পারি।

কেড বলল, কিন্তু এ কাজে বুঝতেই পারছ খুবই বিপদ আছে। আমি তোমাকে এর মধ্যে টেনে আনতে চাই না। আমাকে বল কোথায় স্কি জোগাড় করতে হবে...

মেয়েটি বলল, তুমি খুঁজে পাবে না। আমার এক বন্ধুর বাড়ি। চল আমরা নীচে গিয়ে দেখি পুলিশ কী করছে। পুলিশ যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আমরা বাগান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।

ওরা যদি হোটেলেই থাকে তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

জিনেৎ মনে হয় কোন বাধা শুনবে না। কেড হুইস্কির বোতল খুঁজছিল। খানিকটা নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

দশ মিনিটের মধ্যে জিনেৎ ফিরে এল। বলল, ওরা হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। হোটেলের বাইরে একটা পুলিশ মোতায়েন আছে বটে তবে আমরা পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। ওখানে কেউ নেই।

কেড বলল, আমার যে তিনজন বন্ধু গ্রেপ্তার হল তাদের কি হল?

হোটেলের মালিক মিঃ বান্‌স্‌ বললেন ওদের পুলিশের গাড়িতে নিয়ে গেছে।

কেড মুখ বিকৃত করল। জিনেৎ একটা খাটো উলের কোট গায়ে দিয়ে বলল, চল যাই।

কেড জিনেতের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল, কেন তুমি নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়াচ্ছ। একটা লোককে আমি খুন করেছি। ধরতে পারলে পুলিশ আমাকে খুন করবে। ভগবান জানে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে কি হবে।

জিনেতের নীল চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। ও বলল, কেননা আমি তোমার ভক্ত। আর এর চেয়ে উত্তেজক ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটেনি।

বেশ, কেড বলল, চল তাহলে যাওয়া যাক।

কেডের দিকে খানিকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিনেৎ বলল তোমার মধ্যে কোন রোমান্স নেই, না?

কেড হুইস্কির আধখালি বোতল পকেটে রাখল। জিনেতের পেছন পেছন ঢাকা বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি অবধি ওরা হেঁটে গেল। আধাআধি নেমে জিনেৎ হাত তুলল। ও এগিয়ে গিয়ে জনশূন্য বসার ঘরটা দেখে নিয়ে কেডকে ইশারা করতে কেড নেমে এল।

জনাকীর্ণ খাবার ঘর, একটা ঢাকা বারান্দা, একটা কাচের দরজা ঠেলে ওরা একটা বারান্দায় এল। বাইরে শক্ত বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। খুব জোর ঠাণ্ডা। বাতাস যেন ওদের চোখ মুখে কেটে বসতে লাগল। মেয়েটি ভালই রাস্তা চেনে। ওকে অনুসরণ করতে ল্যাগল কেড। দেবদারু গাছের সারি দিয়ে খানিক চলে একটা পাঁচিলের কাছে এল। জিনেৎ বলল, ওদিকে আরেকটা পথ আছে। বাড়িটা অবধি চলে গেছে। দস্তানা পরা হাতে কেড জিনেতের পা ধরে পাঁচিলে তুলে দিল। তারপর পাঁচিল টপকে জিনেত নামল। কেড তাড়াতাড়ি পাঁচিল পেরিয়ে ওর কাছে গেল। একটা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো। কিন্তু জঙ্গলের বাইরে বিরাট মাঠ চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কেড মুখ ফিরিয়ে দেখল। বরফের উপর ওদের পায়ের কালো ছাপ। কেডের দুশ্চিন্তা হল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে ওরা একটা বাড়ির খিড়কি দরজায় পৌঁছল। বাড়িটা কাঠের তৈরী, ছোট দোতলা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে জিনেতের পেছন পেছন উঠল কেড। সদর দরজার ওপরের ঢালু ছাদে হাতড়ে কি যেন খুঁজল জিনেত। তারপর বলল পেয়েছি, বলে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। একসঙ্গে পা ফেলে ওরা একটা ঠাণ্ডা, বড় হলঘরে এসে ঢুকল। কেড দরজা বন্ধ করল। জিনেত আলো জ্বালল।

জানলা বন্ধ। কেউ দেখতে পাবে না।

কেড উদ্বিগ্নভাবে বলল, আমাদের তাড়াতাড়ি করঁতে হবে। হার্ডেনবুর্গের লোকরা আমাদের পায়ের ছাপ দেখে এখানে চলে আসবে ঠিক।

আমি স্কি আনছি। তুমি এখানে দাঁড়াও।

কেড বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করি।

জিনেৎ বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমিই আনছি।

কেড অস্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কোটের পকেটে হাত ঢোকাতেই ওর রক্ত হিম হয়ে গেছে। এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগল। দুটো পকেটই খালি। ফিল্মের রোল নেই।

ভয়ে যন্ত্রণায় দীর্ণ হতে হতে কেড স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধড়াস ধড়াস বুকে

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে একটা ঢাকা বারান্দার দিকে চোখ রেখে জিনেৎকে খুঁজতে লাগল।

জিনেত, কেড আকুতিভরা গলায় ডাকল।

কোথেকে যেন জিনেৎ সাড়া দিল, এক মিনিটও লাগবে না। দাঁড়াও...

অন্ধের মতন কেড সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে একটা খালি গ্যারাজে গিয়ে পৌঁছল। একটা ব্র্যাকেটে সারি সারি স্কি ঝুলছে। জিনেৎ কেডকে দেখে চমকে উঠল।

কি হল?

ফিলমের রোল দুটো নেই। হোটেলেও ছিল।

জিনেৎ বলল, তা হতে পারে না। ভাল করে দেখেছ?

দস্তানা খুলে কেড আবার পাগলের মতন পকেট হাতড়াল। তারপর চরম হতাশায় শূন্যে ঘুঁষি ছুঁড়ল।

যাতে হাত দিই তাই পণ্ড হয়ে যায়, চরম হতাশায় খান খান হয়ে কেড বলল।

দেখ পাঁচিল টপকাতে গিয়ে হয়তো ফেলে দিয়েছ, আমি গিয়ে দেখছি।

কেড বলল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাই। কেড ছুটল।

ভ্যাল। অপেক্ষা কর।

জিনেৎ কেডের পেছনে ছুটে এল। দরজার হাতলে হাত রাখল কেড। কি হল? কেড অধীর হয়ে বলল।

তুমি ওখানে যাবে না, ভ্যাল। ওখানে তোমার বিপদ হতে পারে। ওরা যদি আমায় দেখে আমি বলতে পারি আমি খিড়কির দরজা দিয়ে হোটেলে ফিরছিলাম। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

না না, আমি তোমার সঙ্গে যাব। রোলদুটো খুবই দরকারী জিনিস। কেড দরজা খুলতে যেতেই জিনেত ওর পাশকাটিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল।

আমি ওগুলো ঠিক খুঁজে পাব। একটু বুদ্ধি খাটাও। কেন বেকার ঝুঁকি নেবে?

জিনেতের দিকে ফ্যাকাসে সাদা মুখে প্রেতের মতন হাসল কেড।

হয়তো আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি। হয়তো এখনও আমি অত মাতাল উজবুক নই। হোটেলে যখন তুমি আমার খুব ভক্ত বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলে তখনই পকেট থেকে রোল দুটো সরিয়েছ তুমি। আমি প্রায় মজে যাচ্ছিলাম আর কি।'

জিনেৎ আহত মুখ করে বলল, আমি! আমি তোমার ফিল্‌ম সরিয়েছি? আমি তোমায় এত সাহায্য করলাম আর তুমিই আমাকে দায়ী করছ। ঠিক আছে চল আমরা দুজনেই গিয়ে খুঁজি। জিনেৎ দরজা খুলে বেরোতে গেল। কেড বিদ্যুৎগতিতে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করল। আমায় ফিল্‌মগুলো দাও, কেডের গলার স্বর মরিয়া, ভয়ঙ্কর। রোলগুলো না দিলে দেখ না তোমার কি হাল করি।

কেডের উন্মত্ত ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি দেখে জিনেত শিউরে উঠল। জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলল, সত্যি, ভেবেছিলাম বেরিয়ে গেছি প্রায়। এই নাও রোলগুলি। বলে জিনেৎ কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়েন্ট থার্টি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন অটোমেটিক রিভলবার বের করে কেডের বুকের দিকে তাক করল।

নড় না, মিঃ কেড। জিনেতের চোখ ঠাণ্ডা, কঠিন।

কেড বলল তুমি কে? আমার বোঝা উচিৎ ছিল তুমি এত সময় মতো সুবিধেমত হাজির হলে কি করে?

পিছিয়ে যাও, ঘরে ঢোক। আরাম করে বসে থাক। আর বীরত্ব দেখাতে যেও না।

গভীর বিতৃষ্ণায় কেড মুখ কোঁচকাল। কোন উপায় নেই। বসবার ঘরে ঢুকে ও আলো জ্বালল। ঘরের একদিকে বিরাট ফায়ার প্লেস। তাতে বোঝাই করা কাঠ। কেড লাইটার জ্বালিয়ে কাঠ ঘেঁষে আগুন জ্বালল। কাঠের আগুন দপদপ করে জ্বলে উঠল। জিনেৎ সোফার উপর আধখালি হুইস্কির বোতল ছুঁড়ে মারল। বলল, ওটা নিয়ে মজে থাক। আমাকে টেলিফোন করতে হবে। বলে

পেছোতে পেছোতে সাইড বোর্ডের ওপর টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। কেড হুইস্কিতে একটা লম্বা চুমুক দিল। তার সারা শরীর হঠাৎ শিউরে উঠল।

জিনেত ফোনে বলল নিকি আছে? দশ মিনিট বাদে আসবে? আমাকে বলবেন ফোন করতে। আমি ওর বাড়িতে আছি। বলবেন খুবই জরুরি দরকার।

কেড গরম কোটটা খুলে রাখল। তারপর হুইস্কির বোতলটা নিয়ে সোফায় বসল।

জিনেতের দিকে তাকিয়ে কেড বলল, তুমি কি রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছ?

কেডকে দেখে জিনেৎ একটু হাসল।

হয়তো। আমি একটু পরেই চলে যাচ্ছি। জানি না তোমার কী হবে। হয়তো এখানে থাকাই তোমার পক্ষে নিরাপদ।

সত্যি। আমার জন্য তোমার উদ্বেগ দেখে আমি খুবই নাড়া খেয়েছি। একটা কথা ভাবছি আমি, আমার ফিল্ম যখন পেয়ে গেছ তখন এ ব্যাপারে কি করে ঢুকলে না বলার কোন কারণ নেই। আমার কৌতূহল হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিনেৎ ঘাড় নাড়ল।

না, খুলেই বলছি। অ্যানিটা স্ট্রেলিক আর আমি অনেকদিন ধরেই একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা হার্ডেনবুর্গের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ হাতাতে চেয়েছি। অ্যানিটা ওর প্রেমে পড়ার ভান করে ওকে মজিয়েছে। অ্যানিটা ওকে বুঝিয়েছে যে আমরা বর্তমান রুশ গভর্নমেন্টের বিরোধী। হার্ডেনবুর্গ অ্যানিটার প্রেমে এতই উন্মত্ত হয়েছে যে ও বিশ্বাস করল যে ও ডুসলওস্কিকে ক্ষমতায় ফেরানর চেষ্টা করছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আষাঢ়ে গল্পের মতো অবাস্তব মনে হল যে হার্ডেনবুর্গ যে বিশ্বাসঘাতক তা প্রমাণ করবার আমরা তথ্য হাতে চাইলাম। 'হুইসপার' কাগজের মিঃ ব্র্যাডেফকে টোপ ফেলতে কোন অসুবিধে হল না অ্যানিটার। মিঃ ব্রাডেফ কোন ব্যাপার আছে মনে করে তোমায় পাঠালেন ফটো তুলতে। আমরা নিজেরা ছবি কিছুতেই যোগাড় করতে পারতাম না। হোটেলে তোমার ঘরের ঠিক নীচে একটা ঘরভাড়া করে আমি আশায় আশায় বসে থাকলাম তুমি ছবি তুলেছ, এখন সেগুলি আমার হাতে। অঙ্কটা জলের মতন সহজ, তাই না?

যেভাবে আমি তোমার ঘাড়ের ওপর পড়েছিলাম তুমি কী জানতে?

না না ওটা আমার সৌভাগ্য বলে ঘটে যায়। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো আমার ভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

নিকি কে?

নিকি এই বাড়িটার মালিক। ও তোমার একটা রোল নিয়ে যাবে মোটরে। আমি আর একটা রোল নিয়ে যাব ট্রেনে।

আর আমি বসে বসে আগুনে হাত পা সেঁকব যতক্ষণ না হার্ডেনবুর্গের গুণ্ডারা এসে আমায় মেরে ফেলে, তাই না? কেড গলায় বিষ ঢেলে বলল।

জিনেৎ নিস্পৃহভাবে কাঁধদুটো ঝাঁকাল।

তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। একবছর আগে হলে আমি তোমাকে বিপদে ফেলতাম না। কিন্তু তুমি এখন বস্তা পচা মাল। তুমি নিজেকে ফালতু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার?

কেড কিছু বলল না।

জিনেৎ একটু ঝুঁকে বলল, আচ্ছা তুমি তো বিরাট একজন ফটোগ্রাফার। তোমার ছবি আমি দেখেছি। আচ্ছা একথা কি সত্যি যে মেক্সিকোর একটা বেশ্যার জন্য তুমি তোমার জীবন নষ্ট করেছ?

কেড বলল, গুপ্তচর হিসেবে তুমি বেশ মজার স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার ওই নোংরা নাক দিয়ে আমার অতীত জীবন শোঁকা বন্ধ কর দয়া করে।

জিনেৎ লাল হয়ে উঠল।

আমি দুঃখিত। আমি সত্যিই জানতে চাইছি।

বেশ। তোমার এটা বিকৃত কৌতূহল বুঝতে পারছি। আমি জানি আমার সম্বন্ধে লোকে কি ভাবে। আমি এখন জাদুঘরের একটা মরা জিনিস। কিন্তু বলতো আমার মতন মাতালের ওপর

তোমাদের এই বিশ্বাস কি করে হল যে আমি ছবিগুলো তুলতে ভণ্ডুল করিনি। তোমরা এত চালাক আর চৌকস হয়েও আমার ওপর বিশ্বাস রাখছ কি করে তাই আমি ভাবছি।

জিনেৎ হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

কি বলছ তুমি?

কেড বলল, খুকি তোমার জন্য আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। তোমার আশায় আমি জল ঢেলে দিলাম। জেনারেল দ্য গলের ছবি তুলতে আমি কেমন বেরিয়েছিলাম শোন নি?

তুমি কি ভাবছ আমি মদ না খেয়েই গাছে উঠেছিলাম।

যে ফিল্ম পেয়েছো সেগুলি প্রিন্ট করে তারপর বীরত্ব দেখাও।

ছবিগুলো আমার থেকেও বাজে হবে বাজী রেখে এ কথা আমি বলতে পারি।

জিনেতের মুখ মড়ার মতন সাদা দেখাল। তাড়াতাড়ি ও কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিল্মগুলো স্পর্শ করল।

কেড বলল, তোমার রাশিয়ান মনিবটিকে আমি জানি না। কিন্তু তিনি যখন জানবেন এরকম জরুরি কাজের জন্য আর সব ফটোগ্রাফার বাদ দিয়ে আমাকে বাছা হয়েছে তিনি মোটেই খুশী হবেন না।

জিনেৎ খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসেছিল। তারপর বলল, তুমি কথা বলায় খুব ওস্তাদ, তাই না? আমি বলতে পারি তোমার যতই নেশা হোক ফটো তুমি ঠিকই তুলেছ। তুমি হলে কেড, এরকম জরুরি ব্যাপার তুমি বুঝবে না এ হতে পারে না।

কেড জিনেতের দিকে তাকিয়ে হাসল, বেশ প্রিন্ট করেই দেখ। আমার নিজের ওপর তো এত বিশ্বাস নেই।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই দুজনে চমকে উঠল। জিনেৎ কেডের দিকে রিভলবার তাক করে রিসিভার তুলল, এখনি আসবে নিকি? অসম্ভব জরুরি দরকার। যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার এখানে এস।

কেড আবার বোতল খুলে লম্বা একটা চুমুক দিল। জিনেৎ খেঁকিয়ে বলল, তুমি মদ খাওয়া থামাতে পার না?

কেডের হাত থেকে বোতলটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ওর এখন খুব নেশা জমে গেছে।

নিজের কথা ভাব খুকুমণি। বন্ধুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলে দোস্তরা তখন এসে গেছে।

দোস্ত? কি বলছ তুমি!

বাইরে জুতোর মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন বারান্দায় হাঁটছে। কেড আর জিনেৎ দুজনেই কান পাতল। বাইরে বাতাস জোরে বইছে। ছাদ থেকে বারান্দায় বরফ খসে পড়ল। জিনেৎ চমকে উঠল।

কেড ইশারা করে জিনেতকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর কেড দরজাটা ফাঁক করে খুলে ধরল, জিনেৎ সামনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল। হঠাৎ কেড জিনেতের কবজিতে সজোরে মারল। জিনেতের হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। এত জোরে ধাক্কা মারল কেড ওকে যে ও চরকি খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে চলে গেল। বন্দুকটা তুলে কেড হাসল।

তুমি অ্যামেচার মনস্তাত্ত্বিক হওয়া ছাড়। ভেবেছিলে আমার খুব নেশা হয়েছে না? আমি ভান করেছিলাম। আমি ততটা উজবুক নই।

জিনেতের চোখ জ্বলতে লাগল।

নাও আবার গোড়ায় ফিরে যাওয়া যাক। ফিল্মগুলো আমায় দাও।

জিনেৎ পেছনে হটে গেল কিন্তু কেড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে ওর হাতের কব্জি মুচড়ে দিল। তারপর ওর দোমড়ানো হাত কাঁধের কাছে নিয়ে গিয়ে আরও মুচড়ে দিল। জিনেৎ যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

কেড হিংস্রভাবে বলল, 'দাও ফিল্মগুলো দাও।' কেড ওর দোমড়ানো হাত আবার মুচড়াতে গেল তখন জিনেৎ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফিল্মগুলো বের করে কেডের হাতে দিল। এবার জিনেতকে ধাক্কা দিয়ে সোফার উপর ফেলে দিল কেড। তারপর ফিল্মগুলো নিয়ে কেড ইজি-

চেয়ারে বসল। হাতের রোল দুটোর দিকে তাকিয়ে কেড বলল, একটা কথা জান। আমি অনেক ভেবেছি। হার্ডেনবুর্গ, ওর বাজে ষড়যন্ত্র এসব নিয়ে আমি কেন এত উত্তেজিত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছে আমার গভর্নমেন্ট-এ নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? চালাক না হার্ডেনবুর্গ, যত ইচ্ছে চালাক। আগে এরকম পরিস্থিতিতে আমি উত্তেজিত হতাম এখন হইনা।

ইস্টনভিল নামে একটা শহরে আমি দুজন অসহায় নিগ্রো তরুণ তরুণীকে খুন হতে দেখেছিলাম। তাই দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়েছিল মানব সভ্যতা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমি জানি তা ঠিক নয়। আজ আমি জানি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অন্য মানুষের মরা দরকার। নিগ্রো হত্যার ফটোগুলি আমার কাছে ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার ফটোর জোরে আমি পাঁচটা বেজন্মা বিবেকহীন পাষণ্ডকে শাস্তি দেব। কিন্তু আরেকটা পাষণ্ড আমার সেই ফিলমগুলো নষ্ট করে দেয়। ডেপুটি শ্লাইডারের তাচ্ছিল্য ভরা হাসি মনে পড়ল কেডের। মনের কোণায় জ্বালা করে উঠল। বলল,

তুমি মনে করছ হার্ডেনবুর্গ যে বেইমান এই কথা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করলে একটা বিরাট ব্যাপার হবে। তোমার বয়েস কম তাই বুঝছ না, পৃথিবী যেমন চলছে তেমনই চলবে। পৃথিবীতে বিশ্বাসঘাতকতাই হচ্ছে আমাদের জীবনে সবচেয়ে স্বাভাবিক একটা ঘটনা। তাই আমি তোমাদের ব্যাপারে থাকব না। ফিল্মগুলো আমার। আমি এ নিয়ে যা খুশী করব।

এবার স্থির অকম্পিত হাতে ডেপুটি শ্লাইডার যেমন করে কার্তিজ থেকে ফিল্মগুলো টেনে বার করছিল, কেড সেইভাবেই ফিল্ম টেনে টেনে বার করতে লাগল।

জিনেৎ আর্তনাদ করে বলল, না না এরকম কর না।

কেড পায়ের কাছে ফিল্মের ফিতের কুণ্ডলীটা দেখে বলল, এই নাও জিনেৎ কার্তিজটা তোমায় উপহার দিচ্ছি। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দাও এটা। অত দুঃখী দুঃখী মুখ কর না জিনেৎ। তুমি ভুল ঘোড়ার ওপর বাজী রেখেছিলে।

কেড এবার বোতল থেকে একটা লম্বা চুমুক দিল, এটা আমার খুব জরুরী ছিল। তুমি গুপ্তচর হিসেবে খুব চতুর নও জিনেৎ, তোমার দেখা উচিৎ ছিল আধবোতল মদ এখনও রয়েছে। জিনেৎ রাগে দুঃখে চীৎকার করে বলল, তোমার মতন মেরুদণ্ডহীন মাতালের থেকে আমার কিছু আশা করাই ভুল হয়েছিল। যাও, তোমার মেক্সিকোর সেই বেশ্যার কাছেই যাও, দেখ ও যদি তোমায় ঠাই দেয়।

কেড হাসল, বেশ, আমি মেরুদণ্ডহীন। বেশ, সে বেশ্যা। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও আমরা পরস্পর পরস্পরের থেকে এমন কিছু পেয়েছিলাম তুমি তা কখনো পাবে না। স্পষ্ট বুঝতে হবে তোমার মতন মেয়ের সেরকম একটা ভালবাসা দরকার যা কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত তোমায় দেয়নি। এই যে জীবন যাপন করছি আমরা এই জটিল জীবন বাঁচার কী কৌশল জান? ভাল মুহূর্তগুলো তারিফ করা আর বাজে মুহূর্তগুলোকে ছেটে ফেলা। আমার সমস্যা এখানেই। খারাপ মুহূর্তগুলো আমাকে হারিয়ে দিল। আমি হেরে গেলাম। শোন, এইসব গুপ্তচর, ষড়যন্ত্র এসব ভাওতা ভুলে যাও। একজন পুরুষকে খুঁজে নাও, তাকে ভালবাস, বিয়ে কর সন্তানের মা হও। মেয়েরা এই জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

জিনেৎ চেঁচিয়ে বলল, চুপ কর। তোমার মতন মাতালের থেকে আমি পরামর্শ চাই না।

কেড ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, ঠিকই বলেছ। যারা নিজেদের জীবনের হিসেবে ভুল করে ফেলে তাদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। আচ্ছা আমি চলি, তোমার বন্ধু না আসা অবধি বসে থাক আরাম করে। ও দরজার কাছে পৌঁছতে জিনেৎ বলল, বোকামি কর না। ওরা বাইরে সব ওৎ পেতে আছে তোমার জন্য।

আমার ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। এখন জীবিকা অর্জনের আর কোন পথই রইল না। যে জীবনে আমার কোন আগ্রহ নেই, তার দাঁড়ি টানার অধিকার আমার আছে। যত ইচ্ছে এবার নাটুকেপানা করব আমি, আর মনে মনে হাসব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গ্যারাজে গেল কেড। পায়ে স্কি বাঁধতে বাঁধতে জুয়ানার কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেডের। জুয়ানা এখন কী করছে? হয়তো এই মুহূর্তে কোন ধনকুবের স্থূলদেহ

আমেরিকানের পাশে শুয়ে আছে, জুয়ানার চারপাশে সূর্য তার জ্যোতি ছড়িয়ে রেখেছে। স্কি বাঁধা হল। হঠাৎ চলচ্চিত্রের সিনের মতন পরপর কয়েকটা মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্যাম ওয়াল্ড, এড বার্ডিক, ম্যাথিসন, ভিকি মার্শাল। গভীর দুঃখে আর বিস্ময়ে মাথা নাড়ল কেড। ওরা কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে গেছে ওর কাছে। যেন অলীক, অবাস্তব সিনেমার ছবির মতন। তারপর, গ্যারাজের দরজা খুলতে খুলতে অ্যাডোলফো ক্রিলের মুখ ভেসে উঠল কেডের সামনে। সেই মোটাসোটা মেক্সিকান, জামায় খাবারের দাগ। ওর কৃতার্থ হাসি, ওর বিনয়, ওর মমতা, ওর বিশ্বস্ততা, সব নিয়ে অসম্ভব বাস্তব হয়ে গেল ওর মুখ। মনে হল এই মুহূর্তে কেডের খুব কাছেই আছে ক্রিল।

জ্যোৎস্নায় মাখামাখি বরফের উপর কেড এসে দাঁড়াল। আইলে যাবার ঢালু পথে ও নামতে শুরু করল, স্কি-র গতি বেড়ে গেল ওর। আর ঠিক তখনই বাইরে চারিদিকে ওৎ পেতে থাকা হার্ডেনবুর্গের সান্ত্রীদের মধ্যে একজনের চোখে পড়ে গেল কেড। রাইফেল উঁচু হল, আঙুল ট্রিগারে উঠল, গুলি ছোঁড়ার শব্দ। গুলিটা ছুটে এল মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। কেডের স্কি বরফে পাক খেতে খেতে ঘুরে ঘুরে ছিটকে যেতে লাগল আর বরফের ওপর লিখে যেতে লাগল কেডের মৃত্যু সংবাদ।

ডেভিল

।। এক ।।

জুডাস মেয়েটির মৃদু আর্তনাদ শুনতে পেল, যেন একটা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তাতে সে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে বরং তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে সক্ষম হলো। সে হাসি ব্যঙ্গাত্মক। তার বাঁ হাতটা সে সিগারেটের প্যাকেটটা তোলার জন্য ব্যবহার করলো। চামড়ায় ঢাকা স্টীলের আঙ্গুলগুলো নিখুঁত এবং সুনিপুণ ভাবে কাজ করলো। ছোট পিস্তলটা তাকে আরও সাহসী করে দেয়। যান্ত্রিক হাত তার সবচেয়ে ভালো কাজ দেয়। কেন এমন হলো জুডাস? স্মৃতি মন্থন করে চললো, সেই ছেলেবেলার ঘটনা যার সূত্রপাত।

নিজের কুৎসিত চেহারার জন্য সবসময় সে ছোট হয়ে থাকতো। নিজের কাছে তার দেহের কোনো মূল্য ছিলো না। তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা তামাসা করতো। সেই অল্প বয়স থেকে তার মনের ক্ষোভ, সমস্ত অভিযোগ জমা হতে হতে একদিন তার মনে প্রতিরোধের স্পৃহা জন্মাল। সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

পরবর্তীকালে সে অনেক হত্যার নায়ক হয়ে উঠেছিলো। এই পৃথিবীর চোখে তার এই দেহটা যদিও কেবল অবজ্ঞা আর অবহেলার বোঝা স্বরূপ, তবু একদিন সে মনে করার চেষ্টা করে, তারা তার মনের প্রকৃত হিসেব একদিন না একদিন করবেই! করতে হবেই। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য বারে বারে তাকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এবারে সাফল্য তার হাতের রেখাতেই আছে। হ্যারল্ড তার মধ্যে সেই শক্তি এনে দিয়েছে। এখন কে কাকে আবিষ্কার করেছিলো তার জন্য কিছু এসে যায় না। রহস্যজনক পথে আসতে আসতে খুঁজে পেয়ে থাকে। আর এইভাবেই তারা একে অপরকে আবিষ্কার করে থাকে। এখন সে নিজেকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে এবং তা হবে চিরকালের জন্য।

মেয়েটি আবার আর্তনাদ করে উঠলো। আর একটা ক্ষণস্থায়ী চীৎকার। হ্যারল্ড তাকে তাতিয়ে দিচ্ছিল। অনেক কিছুতেই হ্যারল্ডের প্রতিভা আছে। এই অসাধারণ মেয়েটিকে সে পানামা শহর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলো। মেয়েটি কোনো তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলের অতিথিসেবিকা ছিলো। জুডাস তাকে এখানে আনার বিরুদ্ধে ছিল। এ ধরনের মেয়েদের নির্বাচনে তার যথেষ্ট সতর্কতা এবং খুঁত খুঁতে স্বভাব ছিল। তবু হ্যারল্ডের নজরে পড়লো সে, তাকে কামনা করল। তাই সে তাকে এখানে আসতে অনুমতি দিয়েছিল।

জুডাস যদিও জানে, হ্যারল্ড যা চায় অর্থাৎ অন্য মেয়েদের মতো দেহের লীলা খেলায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারবে না। অথচ হ্যারল্ড তার মধ্যে সেটাই দেখতে চায়।

আর একটা আর্তনাদ এবার দীর্ঘ হলো। হ্যারল্ডের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। এবার হ্যারল্ড নিশ্চয়ই তার ঘরে মেয়েটিকে নিয়ে যাবে। দরজা খুলে রাখবে। জুডাস উঠে দাঁড়িয়ে মোচড় দেওয়া দেহটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললো টেলিভিশনের সামনে। বোতাম টেপার পর সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় হ্যারল্ডের শোবার ঘরের ছবি ভেসে উঠলো।

মেয়েটির দেহ থেকে হ্যারল্ড তার পোষাকগুলো একে একে খুলে ফেলছিল। আর তখনই তার গলা ফেটে বেরিয়ে এসেছিল ভয়ঙ্কর সেই আর্তনাদ। তাতারের বিরাট দেহের আয়তন সারা টেলিভিশন জুড়ে ভেসে উঠেছিল। হ্যারল্ড মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। জুডাস লক্ষ্য করল, মেয়েটির শরীর খুব ছোট হলেও দেহের গড়ন ঠাসা। ভরাট বুক এবং ছোট পেটটা নিটোল গোল। তার পা দুটো কিন্তু যথেষ্ট যৌবনসুলভ এবং আকর্ষণীয়, রসাল।

মেয়েটির কাছে গিয়ে হ্যারল্ড স্পষ্ট করে বলল, তাতার তুমি এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। দৈত্যের মতো চেহারা নিয়ে তাতার ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটির নগ্ন দেহের দিকে তখনও তাকিয়েছিল। তার চেহারা মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, তার জন্মভূমি মঙ্গোলিয়ায়। ভয়ঙ্কর

প্রতিহিংসাপরায়ণ এই মঙ্গলীয় যাযাবর।

জুডাস তাকে মঙ্গোলিয়া থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল। হ্যারন্ডের কাছে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সময় জুডাস তাকে বলে দিয়েছিল হ্যারল্ড যা বলে সব শুনতে। সর্বময় কর্তৃত্ব হল একমাত্র জুডাসেরই। সেই শক্তিশালী মঙ্গোলিয়ানকে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে জুডাস মনে মনে খুশী হলো। অবশ্য জুডাস জানে, তাতার শিশুর থেকে বেশী কিছু, আবার মেয়েটির হাতে চাপ দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। সে এলো তবে তার চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। ভয়ঙ্কর!

হ্যারল্ড তাকে লম্বা কোচের উপর নিয়ে গিয়ে ফেললো। হ্যারন্ডের চেহারা দীর্ঘ বলিষ্ঠ। হ্যারল্ড তার পাশে গা ঘেঁষে বসল। সে তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলো। এই ভাবেই হ্যারল্ড এই সব মেয়েদের ভালোবাসতে চেষ্টা করে। সে মেয়েটির বুকে আদর করতে লাগল এবং ধীরে ধীরে তাকে তার সোহাগের কথা জানাতে থাকলো। হ্যারল্ড তার বুকের গভীরে চুমু খাচ্ছিল। এখন সে তার সারা দেহের উপর ঠোঁট বোলাতে থাকলো। মেয়েটি এর আগে বহু পুরুষদের যেমন ভালোবেসেছে তেমনি সমান ভাবে তাদের অবহেলা করেছে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে অতি আন্তরিকভাবে সে তার দু বাহু প্রসারিত করে তাকে আহ্বান করল এবং তাকে তার পথে চলতে দেওয়ার সুযোগ করে দিল।

টেলিভিশনের পর্দায় একমাত্র জুডাসই মেয়েটি কি করছিল তা দেখতে পাচ্ছিল। ওদিকে হ্যারল্ড তখন তার বুকের সুউচ্চ চূড়ার মাঝে মুখ গুঁজে দিয়েছিল পরম তৃপ্তিতে।

মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে চায় সে এবং তারা সাড়া দেয় প্রকৃত ভয় পেয়ে কিংবা আবেগে আগ্নেগিরির মত সবেগে বিদীর্ণ হয়ে। হ্যারল্ড যখন তাকে কম্বলের নীচে টেনে নিল এক মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবল সে। হ্যারল্ড তার দেহটা মেয়েটির নগ্ন দেহের সামনে গড়িয়ে দিতেই সে চোখ বুজে ফেললো। আসন্ন মিলনের প্রতিষেধক কোন উপায় অবলম্বন করল না মেয়েটি, কাবণ সে ভাবল, এই পুরুষত্বহীন মানুষটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

জুডাস মৃদু হাসলো। হ্যারল্ড তার কাল্পনিক মন নিয়ে কেমন জোর করে উপভোগ করার পরিবর্তে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে চাইছে। হ্যারন্ডের এই পুরুষত্বহীনতার কারণ খুঁজতে গিয়ে জুডাসের মনে হয়, তার আগের জীবনে কোনো দুর্ঘটনা এর জন্য দায়ী। হ্যারল্ড মনে করে কোনো নারী হয়তো তাকে জখম করে দিয়েছে এবং সে তার এই অক্ষমতার জন্য দায়ী। হ্যারন্ডের দৈহিক অক্ষমতা এবং মেয়েদের উপর দৈহিক নির্যাতন এ দুটির মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে জুডাস। হ্যারন্ডেব এই সব আচরণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল জুডাসের। হঠাৎ তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ জুডাসের মনটাকে ফিরিয়ে দিল টেলিভিশনের পর্দায়। তখন হ্যারল্ড মেয়েটির হাত পিছন দিক করে মোচড় দিচ্ছিল। হ্যারল্ড তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, আমার জন্য তুমি কিছুই করছ না।

আমি, আমি তো চেষ্টা করছি। মেয়েটি ছাড়া পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মরিয়া হয়ে সে নিজেকে চরম উত্তেজনায় তুলতে চাইলো। কিন্তু কোথায় সে উত্তেজনা? সে ক্ষমতা হ্যারন্ডের কোথায়! নারী-পুরুষের মিলনে সাফল্য আসে যৌথ প্রচেষ্টায়, একক ভাবে নয়। মেয়েটির হঠাৎ জ্ঞান হলো হ্যারন্ডের মত এক পুরুষত্বহীন মানুষের সঙ্গে এ ভাবে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হল নিজেকে কানাগলির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই। এরপর তার মধ্যে আর কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। হ্যারল্ড তাকে দূরে ঠেলে দিল। তারপর রাগে উত্তেজনায় দু'হাত দিয়ে হ্যারল্ড তার গলা টিপে ধরল। অভাবনীয় যন্ত্রণায় মেয়েটি কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

হ্যারল্ড রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করল—তুমি কোন চেষ্টাই করছ না। মেয়েটির হাত ধবে দ্রুত মোচড় দিল। যত জোরে সম্ভব তার মুখের ওপর চড় বসিয়ে দিল। আর্তনাদ করে মেয়েটি মাটির উপর পড়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে কাঁচের অ্যাস্ট্রেটা তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল হ্যারন্ডের দিকে। বলে উঠলো, শয়তান, তুমি আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছ। আমি তোমাকে খুন করবো।

জুডাস কঠিন হয়ে উঠলো, এই কারণেই এই মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। সে ভেবেছিল বিপদ সংকেত বোতামটা টিপে তাতারকে হ্যারল্ডের ঘরে ছুটে যেতে নির্দেশ দেবে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখলো টেবিলটাকে কেন্দ্র করে মেয়েটি সেই ভারী অ্যাস্ট্রেটা হ্যারল্ডের দিকে ছুঁড়তে উদ্যত। ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যারল্ডের হাতের চাবুকটা বাতাসে দুলে উঠে মেয়েটির পিঠের ওপর আছড়ে পড়লো। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটি তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। হ্যারল্ড তার পেটে সজোরে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে। মেয়েটি দু'হাত দিয়ে তার নগ্ন বুক এবং পেট ঢাকলো। হ্যারল্ড আবার চাবুক চালালো যতক্ষণ না মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

মেয়েটি তাকে কাতর অনুরোধ করল থামাবার জন্য। কি ভেবে হঠাৎ হ্যারল্ড থামলো, তারপর মেয়েটির যন্ত্রণা কাতর দেহটা দু' হাত দিয়ে তুলে ধরল। তার কান্না ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—এই কেবল মাত্র নমুনা। এরপর আরো অনেক, অনেক কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য—

তাতারকে সে ডেকে পাঠাল। তাতার ঘরে প্রবেশ করতেই হ্যারল্ড বলল, তাতার তুমি একে নীচের তলায় নিয়ে যেতে পার। কিন্তু তার আগে এখানে কিছুক্ষণ সময় তুমি ওর সঙ্গে খেলতে পার।

তাতার মেয়েটিকে দু' হাত দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে সামনে সেই বিরাট ডাইনিং টেবিলের ওপরে শুইয়ে দিল। তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটির নগ্ন দেহ জরীপ করতে লাগল। দৈত্য সমান মঙ্গোলিয়ান লোকটা মেয়েটির পা দু'টোর মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে ঝুলিয়ে দিল। টেবিলের ধার ঘেঁষেই সে দাঁড়িয়েছিল। তার দেহের নিম্নাঙ্গ আবরণহীন।

।। দুই ।।

ওয়াশিংটনের ডুপনট সার্কেলে অ্যামালগামাটেড প্রেস আন্ড ওয়েয়ার সার্ভিসেসের একটা বিরাট বিল্ডিং-এর একেবারে নীচের তলায় আন্ডার গ্রাউন্ড গ্যারেজে আমি এক দীর্ঘদেহী পুরুষ লিফটের ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলাম, তারপর সুইচটা টিপে দিলাম। একেবারে সর্বোচ্চ তলায় আমার গন্তব্যস্থল। হেডকোয়ার্টার্সে কদাচিৎ আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। অ্যামালগামাটেড প্রেস অ্যান্ড ওয়েয়ার সার্ভিসেসের নামের আড়ালে আসল সংস্থা হল এই টাইগার। সমস্ত কাজ এমন কি খুব বড় কাজ বাইরে বাইরেই হয়ে থাকে। এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নেওয়া কিংবা জরুরী মিটিং-এ যোগদান করা ছাড়া আমার এখানে আসার প্রয়োজন হয় না।

এক সময় লিফট থামল। আমি রিসেপশন রুমে প্রবেশ করে দেখলাম, একটি মেয়ে সেখানে বসে আছে। মেয়েটি নতুন। এর আগে মেয়েটিকে আমি দেখিনি।

আমি মৃদু হেসে আমার পরিচয় পত্রটি মেয়েটির সামনে পেশ করলাম। মেয়েটি আমার বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে মিষ্টি হেসে আমাকে সম্ভাষণ জানাল। মেয়েটির পাশে একটি মেসিন দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে ফিরে আমার পরিচয় পত্রটা মেসিনের ওপর রাখলো। মেসিনটার ওপর লাল আলো প্রতিফলিত হলো। আমি লক্ষ্য করলাম, মাস্টার ডকেটে লিপিবদ্ধ হওয়া আমার ছবি, আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখছিল মেয়েটি। তারপর মেয়েটি সামান্য হেসে বেশ আগ্রহ নিয়ে আমার কাগজগুলো ফিরিয়ে দিল।

আমি সামান্য হেসে তার পাশ দিয়ে আর একটা অফিসঘরের দরজার পথে গিয়ে ঢুকলাম। কেউ একটা কথাও বললাম না, কিন্তু অনেক খবরাখবর আদান-প্রদান হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে মাস্টার ডকেটের মাধ্যমে মেয়েটি জানতে পারলো এই দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষটি হলো এজেন্ট মিকি। নীল চোখ, ডকেটের বিবরণের চেয়েও সামনা সামনি আমাকে দেখতে আরো বেশী সুন্দর, আমার চোখ দুটো আরো বেশী ঘন নীল। ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। বাঁ দিকের হিপে চিরস্থায়ী গুলির দাগ। বুকের ডান দিকে কাটা দাগ। আমি—কিলমাস্টার। সব রকমের এয়ারক্রাফটের চালক হিসাবে আমার লাইসেন্স আছে। চারটে ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারি এবং অন্য আরো ছ'টি ভাষা আমার ভালোই জানা আছে। খুব ভালো গাড়ি চালাতে পারি আমি। আমি অবিবাহিত

এক সর্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ। ম্যাকের অফিসে ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভেতরে এসো, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ম্যাক। আমি দেখলাম চীফকে খুব ক্লান্ত দেখালেও তার গলার স্বর এখনও সতেজ, তার নীল চোখ এখনও উজ্জ্বল। আরো তিনজন লোক তখন ঘরের মধ্যে বসেছিল। তাদের পরনে অসামরিক পোষাক। ম্যাক এক এক করে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জ্যাকুইজ ডেবল, ফ্রেঞ্চ ইনটেলিজেন্স। রোগাটে চেহারা। ইনি হলেন অরন কুহল, ইজরাইলি সিকিউরিটি ফোর্সের কর্মকর্তা আর উনি হচ্ছেন ইউ, এস নেভির কমান্ডার হফকিনস্।

আমি সকলের সঙ্গে করমর্দন করে আমার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম।

এইসব ভদ্রলোকেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। আজ আমাদের দেশ বিপন্ন। এদের সবার জাহাজ চালনা সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, সমুদ্রের নীচে একটা বিরাট ট্র্যাজেডি অপেক্ষা করছে আমাদের প্রত্যেকের দেশের জন্য। ম্যাক বললেন, আমার ধারণা এন থ্রি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমি মাথা নাড়লাম এবং তিনটি দেশের মিলিত ঘটনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আকস্মিক একটা পরিবর্তন এনে দিল যেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসরায়েলি, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান সাবমেরিন তিনটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকস্মিক ভাবে, যার কোনো ব্যাখ্যা চলে না। এই দুর্ঘটনায় প্রেসের মাধ্যমে সারা পৃথিবী এখন মুখর, সোচ্চার।

তারপর তুমি নিশ্চয়ই জানো, ম্যাক বলতে থাকেন,—এই সব সাবমেরিনগুলোর মধ্যে কোনো একটিও তারপর থেকে রেডিও মেসেজ পাঠায়নি, এমনকি কোনো সমস্যার কথাও উল্লেখ করেনি শেষে পাওয়া রেডিও মেসেজে। তারা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর জবাব আমাদের দিতে হবে। ইউনাইটেড স্টেটস এর প্রেসিডেন্ট একটা নোট পেয়েছে মুক্তিপণের। তাতেই উত্তরটা লেখা আছে। একশো মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমাদের নবতম সাবমেরিন এক্স-৮৮, ফেরত দেওয়া হবে।

সেই এক্স-৮৮. আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তার মানে সেই পরীক্ষামূলক সাবমেরিন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর সেই নোটটা কার কাছ থেকে এসেছে জানো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, জুডাস। এটা তারই উপযুক্ত কাজ। হ্যাঁ। কেবল একটিমাত্র লোক আছে এই পৃথিবীতে যে এইসব জঘন্য কাজে সিদ্ধহস্ত, মানুষের মুখোসের আড়ালে লুকিয়ে আছে যার মধ্যে শয়তানের প্রতিভূ। ম্যাক আরো বললেন, জুডাস তার কুকীর্তির নমুনা স্বরূপ আরো দুটি সাবমেরিনের উল্লেখ করেছে। বাস্তবিক এই এক্স-৮৮ হলো আমাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের একটা ব্লুপ্রিন্ট। আমাদের সবচেয়ে আধুনিক রক্ষণাত্মক এবং আক্রমণাত্মক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ারপ্ল্যান্টের সবচেয়ে গোপনীয় কাঠামো। তাছাড়া এর সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের নাবিকদলের পুরো একটা দল, বেঁচে থাকার সমস্যা। আমরা যদি তার মুক্তিপণ না দিই, অন্য কোথাও সাবমেরিনগুলো বিক্রী করে দেবে সে। আমি তার বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে বললাম,—আর যদি দিই, তাতেও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে হয়তো আমাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু টাকা দাবী করতে পারে এবং সেই সঙ্গে অন্য কারোর কাছে বিক্রীর জন্য দর-দাম করতে পারে।

ম্যাক আমাকে সমর্থন করে বললেন, আর এই কারণেই এই সব ভদ্রলোকদের কাছে যে সব খবরাখবর আছে তা তারা আমাদের জানাতে এসেছেন।

ইজরায়েলি ভদ্রলোক আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন,—আপনাদের দেশ এখন চরম বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই বলতে হয় যদি তার এই পাগলামি সাফল্যলাভ করে তাহলে সে এই একই দাবী আমাদের দেশের কাছ থেকেও করবে। আমার মতে এখন থেকেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমাদের সাবমেরিন গুম হওয়ার খবর সব চীফের কাছে বলেছি। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন।

ম্যাক তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন, পাঁচ দিনের মধ্যে শর্তমত আমরা যদি তার দাবী মিটিয়ে

না দিই সে তাহলে আরো বেশী করে আমাদের সাবমেরিন আটক করবে। আরো বেশী নাবিকদের ধরে রাখবে, এবং আরো বেশী অর্থ দাবী করবে।

আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, কেন আমাদের সাবমেরিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা নিজেরা কি করতে পারি না? র‍্যাডার, বেতার মারফত বার্তা বিনিময় ব্যবস্থা, বিপদ সংকেত জানানোর আধুনিক সব যন্ত্রপাতিগুলোর কি হল?

ম্যাক বলতে থাকেন, আমার মনে হয় ঠিক সময়ে সেগুলো অকেজো করে দিয়েছিল আরো শক্তিশালী কোন যন্ত্রের সাহায্যে। আমরা নিশ্চিত জানি যে, সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সাবমেরিন আটক করার মত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং শক্তিশালী কিছু একটা নিশ্চয়ই সে ব্যবহার করছে একটা নির্দিষ্ট ঘাঁটি থেকে। এক্স-৮৮ এবং তার নাবিকদল সম্ভবতঃ সেই ঘাঁটিতে বন্দী হয়ে আছে। এই পাঁচদিনের মধ্যে তোমাকে সেই ঘাঁটিটা খুঁজে বার করতে হবে, অস্ত্র প্রয়োগ করে ধ্বংস করতে হবে। সে যাইহোক না কেন এবং নাবিক দল সমেত সাবমেরিনগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে।

আমি সরলভাবে উত্তর দিলাম, কাজটা না করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। কথাটা শেষ করে উপস্থিত তিনজনের দিকে আমি তাকালাম। তাদের চোখে আমার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল।

ফরাসী প্রতিনিধির কাছ থেকে খুব সামান্য খবর পাওয়া গেলেও সেগুলো খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। ম্যাক বলতে থাকেন, আমরা ধীরে ধীরে সবই বলবো। এন-থ্রি, প্রথমত আমরা জানতে পেরেছি এইসব সাবমেরিনগুলোর উপর জুডাসের কর্তৃত্ব থাকলেও, হাতের কাজ কিংবা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার নেই। মঁসিয়ে ডেবল, আপনি এবার কিছু বলুন।

খুব সামান্য খবরই আমি আপনাকে দিতে পারি। জ্যাকুইজ ডেবল বলল—সামুদ্রিক জীববিদ্যায় অভিজ্ঞ ফ্র্যাঙ্কয়েস সাংগুই-এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। প্রায় বছর খানেক আগে প্রফেসার সাংগুই-এর কাছে একটি লোক এসে বলে, সমুদ্রের নীচে এমন একটা কিছু সে তৈরী করতে পারে, যেটা সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সে ফরাসী ছিল না। তার নাম ছিল হ্যারল্ড ফ্রাটকে। সাংগুই তাকে চিনত। সামুদ্রিক জীববিদ্যায় হ্যারল্ডের অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। কিন্তু লোকটার একটা বদনামও ছিল সেই সঙ্গে, নারীসঙ্গ লোভী।

একবার সে এক যুবতী মেয়েকে চুরি করে এনে তার ঘরে আটক করে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার হয় এবং এই কারণে তাকে ভালো চাকরীটা খোয়াতে হয়। তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইজরায়েলি সিকিউরিটি অফিসার অরন কুহল আর এক কাহিনী শোনাল। প্রায় বছর খানেক আগে ইজরাইল-জর্ডান বর্ডার দিয়ে একটি লোক সুন্দরী যুবতী মেয়েদের পাচার করতো ধনী ক্রেতাদের কাছে মোটা টাকার বিনিময়ে। বেশীর ভাগ আরব এবং দূর প্রাচ্যে। যাইহোক কাগজপত্রে দেখা যায় সেই ক্রীতদাস লোকটির ক্রেতা ছিল হ্যারল্ড ফ্র্যাঙ্ক।

তাই বুঝি! আমি গভীর চিন্তা করে বললাম, হয়তো সে এখন তার নতুন ক্রেতা জুডাসকে আবিষ্কার করেছে। এসবই অনুমান। কিন্তু জুডাসকে ধরার পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়। এসব খবরগুলোর উপর নির্ভর করে বসে থাকলে আমাদের করার কিছু নেই। বর্তমানে জুডাসের সঠিক অবস্থানের জায়গাটা কোথায় সবার আগে সেটা আমাদের জানতে হবে।

ম্যাক আমার কথার মাঝে বলল, ঠিক আছে এন-থ্রি, আমাদের সংগৃহীত খবরগুলো মাস্টার কমপিউটারকে পরিবেশন করে জানতে চাইব জুডাসের বর্তমান ঠিকানাটা।

সব শুনে আমি বললাম, প্রেসিডেন্টকে দেওয়া জুডাসের নোটটা ক্যারেবিয়ান থেকে এসেছে। লেশার অ্যানটাইলেমোর কাছাকাছি সম্ভবতঃ ভেনেজুয়েলাও হতে পারে।

আমি বললাম, ভাগ্য সহায় বলে আমার অনুমানটা কাজে লেগে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আলোচনা বন্ধ রেখে আমার মনটা চলে গেল দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা ক্যারেবিয়ান সাগরে। ম্যাকের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

তোমার অনুসন্ধানের কাজ চালাতে গেলে কয়েকটি বিশেষ ধরণের সাহায্যের প্রয়োজন।

মহাসাগরীয় অভিযানের জন্যে ইতিমধ্যেই সেখানে একটি অভিযাত্রী দল গঠন করা হয়েছে। ডঃ ডি. ফ্রাশার সেই দলটির নেতা।

ডঃ ফ্রাশারের প্রয়োজন মত সেখানে আমাদের সব রকম ব্যবস্থা করা আছে। জাহাজের ছোট ঘাঁটি, ছোট প্লেন নামা-ওঠার রানওয়ে, জলের ওপর সেতু তৈরী করার উপযোগী চ্যাপ্টা ধরনের নৌকো ইত্যাদি। এক কথায় ডঃ ফ্রাশারের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট সেখানে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কাজের কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ডঃ ফ্রাশাবের সেই ইউনিটে আমাকে কি হিসেবে যোগ দিতে হবে তা তো বললেন না?

জলের নীচে জাহাজ সমূহের সমস্যার ব্যাপারে তুমি যেন বিশেষ গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছ, ম্যাক প্রত্যুত্তরে বললেন, তার ইউনিট থেকে তোমার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে পাঠান হচ্ছে। চুক্তিপত্রে এই শর্তটা যোগ দেওযা হয়েছে।

কিন্তু ডাক্তার জানতেও পারবে না, তাকে আমার আশ্রিত হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জুডাস এবং এক্স-৮৮ টা খুঁজে বার করতে গিয়ে এরই মধ্যে তুমি এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে ফেলেছ। বলে ম্যাক উঠে দাঁড়ালেন। এর অর্থ হল যে, তাদের আলোচনা শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাক বললেন, স্পেশাল এফেকটস্-এর সামনে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো। স্টুয়ার্ট তোমার জন্য একটা নতুন চামড়ার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসবে। সে তোমায় তার ব্যবহার ভালো করে বুঝিয়ে দেবে।

আমি সেই তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে করমর্দন করলাম। তারাও উঠে দাঁড়িয়েছিল আমাকে বিদায় দেবার জন্য। তাদেব মুখগুলো কেমন বিষণ্ণ, শোকাচ্ছন্ন! স্পেশাল, এফেকটসের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি তাদের মনেব অবস্থাটা বুঝলাম। এমন বিষণ্ণ হওয়া তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ফ্রেঞ্চ ইজরায়েলি এবং আমেরিকান, এই তিনটি সাবমেরিনের কম করেও তিনশ নাবিকদের হত্যা করেছে জুডাস। তাদের স্মৃতি এতো তাড়াতাড়ি মন থেকে কি মোছা যায়?

স্পেশাল এফেকটসের সামনে আমি দেখলাম স্টুয়ার্ট অপেক্ষা করছে। তার হাতে ম্যাকের বর্ণনা মতো চামড়ার সাজ সরঞ্জাম। স্টুয়ার্ট আমাকে আসন্ন অভিযানের ব্যাপারে নির্দেশ দিল এবং আমিও মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলাম।

আচ্ছা এন-থ্রি, লোকটি তার বক্তব্য শেষ কবল এই বলে, আপনি পুয়েরটোরিকোয় যাবেন নিয়মিত যাত্রীবাহী বড় বিমানে চড়ে। এযার কমাণ্ডার সামুদ্রিক ইউনিট থেকে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে সেখানে। আমাদের চীফ চান সবকিছু যেন খুব সতর্কতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করা হয়। আমাদের সেই ইউনিটের জ্ঞানের সীমা খুব সীমাবদ্ধ। সম্ভবতঃ সেখানকার লোকজন এ-এক্সাই-র নাম কখনও শোনেনি। আপনি হবেন কমান্ডার কার্টার, সামুদ্রিক গবেষক। আমার ধারণা এখন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কিছু পেয়ে গেছেন। আপনার যাত্রা শুভ হোক।

গুডলাক।

আমি মাথা নোয়ালাম, তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দিলাম।

যাত্রীবাহী বিমানে প্রচণ্ড ভীড়। দ্বীপপুঞ্জে ছুটি উপভোগ করতে চলেছে সবাই যে যার আত্মীয়-স্বজনের কাছে। আমি দেখলাম আমার আসনেব পাশে একটি মেয়ে আগে থেকেই বসে ছিল, তার কোমরে বেল্ট লাগানো, মাথাভর্তি বাদামী রঙের চুল, আপেলের মতো লাল টকটকে গাল। কমলালেবু রঙের জ্যাকেটের আড়ালে নিটোল গোল দুটি স্তন।

পরনে নীল স্কার্ট। সুডৌল পা, দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাকে সুন্দর ও সতেজ দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে তাকে যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ঘন ঘন যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল সে।

আমি মেয়েটিকে বললাম, ঘাবড়াবেন না, এখুনি রওনা হয়ে যাবে।

আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হেসে উঠলো। সে বলল, আমার জানা ছিল না, বিমানে এত ভীড় হয়।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমাদের যাত্রা দীর্ঘ হবে কিন্তু আমার মনের মতো

একটা মেয়ে পাশে থাকায় যাত্রা বেশ সুখকর হবে বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েটির নাম বেটিলাও রলিংস। নেব্রামাকায় তার জন্ম। বছর খানেক আগে সে এই বড় শহরে আসে।

এখানে তাকে কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়, প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়।

আমিও মেয়েটিকে আমার পরিচয় দিলাম, তবে আমার আসল নামে নয়, টেড ম্যালন নামে। কারণ এই যাত্রীবাহী বিমানে অনেক জোড়া কান খোলা আছে। বেটিলাও আমার কথায় প্রভাবিত হলো।

আমি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি পুয়েরটোরিকোতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছ?

'না, না, হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, 'আমি সেখানে একটা নতুন চাকরী নিয়ে যাচ্ছি। সত্যি আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। হয়তো আমার একটু ভয় ভয় লাগছে। যাইহোক সেখানে তারা আমার জন্য একটা বিশেষ বিমান পাঠাচ্ছে।

তা তোমার কাজ কি হবে সেখানে?

একজন ধনী ব্যক্তির সেক্রেটারী কাম সঙ্গিনী। নিঃসঙ্গ, নিজস্ব দ্বীপে থাকেন। আমি ছাড়া কয়েকজন লোক সেখানে থাকবে। আমি শুনেছি আমার কাজ খুব হাল্কা হবে।

এ কাজের খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

মেয়েটি বললো, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে। বিজ্ঞাপন দাতা হলেন—দি ওয়ালটন এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি। নামটা শুনে আমার মনে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দিল। আমার অবচেতন মন কেন যে আমাকে এভাবে ভাবিয়ে তুললো হয়তো যথাসময়ে জানা যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে বৈমানিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—

পুয়েবটোরিকোর চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহদয়গণ মিনিট কযেকের মধ্যেই আমরা মাটিতে অবতবণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, শেষ মুহূর্তে আমাদের বিমান নামতে পারবে কিনা। কয়েক ঘণ্টা আগে যাবতীয় ছোট বিমান এখান থেকে ফিরে গেছে। যাইহোক আপনারা যে যার কোমরে বেল্ট বেঁধে রাখুন।

বিমানবন্দরটা যেন পেঁজা তুলোর সাদা কুয়াশাব চাদরে ঢাকা ছিল। তারই মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে বৈমানিক তার বিমানখানি নামাল। আলোয় আলোকিত বিমানবন্দর। আমি অনুভব করলাম বিমানখানি মাটি স্পর্শ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান থেকে নেমে টার্মিনালের ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। পাশে বেটিলাও। আমাদের দুজনকে সেখানে পরীক্ষা করা হলো।

স্থানীয় একটি লোককে আবহাওয়ার খবর জানতে চাইলে সে বললো, এ রকম কুয়াশা সারা রাত ধরে থাকবে। অতএব রাতটা হোটেলেই কাটাতে হবে। আমি বেটিলাওয়ের দিকে তাকালাম। তার মুখে বিরক্তির ছাপ। আমি মুখে হাসি ফোটালেও ভেতরে বেশ ক্ষুব্ধ হলাম। বারোটা ঘণ্টা বেকার নষ্ট হতে যাচ্ছে। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, এভাবে ভেঙে পড়ার কি আছে, আজকের সারা সন্ধ্যেটা তোমাকে খুশি করার জন্য আমি খরচ করবো।

বেটিলাও হঠাৎ আমার একটা হাত গভীর অনুরাগে টেনে নিয়ে তার বুকের উপর রাখল। অসম্ভব নরম বুক। উত্তেজিত মুহূর্তে সে নিজেকে আরও বেশী উত্তেজিত করার জন্য আমার হাতটা তার পশম নরম স্তনের উপর চেপে ধরল। তারপর আমাকে বললো, তোমার প্রস্তাবে আমি এক্ষুনি রাজী। অপেক্ষা কবাটা আমি ভীষণ ঘৃণা করি।

বেশ, তাহলে আমার সঙ্গে এসো। আমি তার হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, এখন একটা ভালো হোটেল দেখে ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর সন্ধ্যেটা আমাদেব খুশি মতো ব্যবহার করা যাবে।

মেয়েটির মুখের হাবভাবে যেন খুশি উপচে পড়ছে। আমার সঙ্গে সেও সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চললো।

টার্মিনালের কাছাকাছি একটা ভালো হোটেল পেয়ে গেলাম আমরা। ককটেল, নাচ, ডিনার এবং ড্রিঙ্কস সেরে আমরা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মেয়েটি বললো, এত সুন্দর সন্ধ্যা আমার জীবনে এর আগে কখনও আসেনি বলে আমার মনে হয়।

কাল সকালেই এক নির্জন দ্বীপে নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধের কাছে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। সেখানে কতমাস যে থাকতে হবে জানি না। এখন হঠাৎ আমার মনে হল, আমার যাওয়ার ইচ্ছাটা নেই তোমাকে ছেড়ে। তোমাকে আবার আমি দেখতে চাই টেড। আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটির চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

আমিও তার নাকের ওপর আলতো ছোঁয়া রেখে বললাম, আমি নিজেও তোমার কথা চিন্তা করছিলাম। সেই নির্জন দ্বীপ, সেখানে তুমি আর সেই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ। অসহ্য কল্পনা করা যায় না। তোমাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমার মনে হয় না। তুমি যেন এক অনন্যা, তোমার আগে অন্য কোনো মেয়ে বোধহয় আমাকে এতোটা ভাবিয়ে তুলতে পারেনি।

হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, বেটি লাও দু' হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে। সে ফিস ফিস করে বললো, টেড আমাকে কিছু দাও। এমন একটা কিছু যা অনেকদিন ধরে রাখতে পারবো।

আস্তে আস্তে আমার মাথাটা নামিয়ে আনলাম, বেটিলাও ঠোঁটের ওপর আমার ঠোঁটটা চেপে ধরলাম। মেয়েটি তার ওষ্ঠদ্বয় মেলে ধরলো আগ্রহভরে। থরথর করে কেঁপে উঠলো সে। চুম্বন অতি দীর্ঘ হলো। যতক্ষণ না বিস্বাদ ঠেকল কেউ কাউকে ছাড়তে চাইলাম না। তারপর একটু সময়ের জন্যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে এলো। কিছুক্ষণ কি ভেবে গা থেকে কমলালেবু রঙের জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। এক মুহূর্তের মধ্যে ব্লাউজ এবং স্কার্টটাও খুলে সবশেষে ব্রা। এখন তার দেহে সামান্য সুতো বলতেও কিছু নেই।

আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। ঠিক এই রকমটিই আমি চাইছিলাম। আমার মুখের ওপর তার মুখ, আমার বুকে দু'টি স্তনের উষ্ণ নিপীড়ন। আমি মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম দুধ সাদা নরম দেহটা তার। আমি চুমু দিয়ে তার দেহ পরিক্রমা শুরু করলাম। সে একে একে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

এখানে তোমার সঙ্গে যে আমি রাত কাটাব আশা করিনি। আমি তার ঠোঁট থেকে মুখটা সামান্য একটু তুলে বললাম।

মেয়েটি বললো, জানো টেড আমিও ভাবিনি। ঠিক এই রকমটি আমি চেয়েছিলাম, আজ আমি খুব সুখী তোমাকে আমার মনের মত করে পেয়ে।

আমি মেয়েটিকে আরো কাছে টেনে নিলাম, ওর বুকের ওপর আঙুল ঘষতে থাকলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমার হাতের স্পর্শ পেয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তার সারা দেহে বসন্তের সমাগম, পশম নরম ভরাট বুক। স্পর্শে মাতাল হয়ে যেতে হয়। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কম। অক্ষত যৌবনা। ওর আলিঙ্গন আরো দৃঢ় হলো। তার দেহটি কেঁপে উঠছিলো।

আমি চরম সোহাগের পরশ রাখতে যখন তার দু' পায়ের মাঝখানে বসে পড়লাম তখন শুধু বেটিলাও কণ্ঠ দিয়ে হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এলো। তারপর সে তার দেহটাকে আমার কাছে এলিয়ে দিল চরম সুখপ্রাপ্তির আশায়।

আমি তখন তার কামনা জর্জরিত দেহটাকে নিয়ে সুখের সাগরে ডুবে গেলাম। শরীরে যেন শিহরণের প্লাবন বয়ে গেল। অনেক কাঁপুনির পর শরীর শান্ত হলো। মেয়েটি লতার মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো।

আমি মেয়েটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললাম, আশা করি আজকের এই আনন্দময় মুহূর্ত তোমার মধ্যে অনেকদিন প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, অনেকদিন থাকবে, বেটি নীচু গলায় বলল, চিরদিনের মত। আমার চোখে চোখ রেখে বলল, টেড আমি তোমাকে চিঠি লিখতে চাই। আমি তোমাকে আমার ঠিকানা দিতে পারছি না, কারণ এখনও পর্যন্ত আমি নিজেই সেটা জানি না। কিন্তু তুমি যদি তোমার ঠিকানাটা দাও তাহলে আমি লিখতে পারি।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আমার নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দিলাম। ও ঠিকানাটা ওর নোটবুকে লিখে নিল। তারপর বেটিলাও শিশুর মত শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লে পর

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলাম। আমি আমার জিনিসপত্র সব পরীক্ষা করে নিয়ে পরের দিন ভোরে রওনা দেবার জন্য তৈরী হলাম।

আমি জান্তি মেয়েটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের এই যে বিরতি, এরজন্য আমার কষ্ট হবে কিন্তু উপায় নেই। এবং একশো জন লোককে বন্দী অবস্থায় অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে দিতেও চাই না আমি।

।। তিন ।।

ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো এসে পড়ায় আমার ঘুমটা ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি ছুটলাম বেটি লাওয়ের ঘরে তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে, তার শুভ কামনা করতে। দরজার কাছে গিয়ে দেখি মেয়েটির বদলে ঘরের মধ্যে বসে আছে এক দৈত্যকার লোক। তার মাথাটা দেহের মতই বিরাট, ছোট ছোট দুটি চোখ। লোকটা যে মোঙ্গলিয় তাতে কোনো ভুল নেই। লোকটার হাতে একটা খাম দেখা যাচ্ছিল, তার উপর লেখা রয়েছে—টেড ম্যালন।

লোকটা নীচু গলায় বললো, মেয়েটিকে তুমি চেন নাকি?

গতকাল প্লেনে তার সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু তোমার জানার কি দরকার?

মঙ্গলিয় বলল, মেয়েটিকে তুমি ভুলে যাও। আদেশ তো নয় যেন সতর্ক করে দেওয়া।

আমি লোকটির কাছ থেকে নোটটি নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম।

'প্রিয় টেড,'

তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইলাম না। চলে যাচ্ছি। কালকের সুন্দর রাতের কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। তোমার দেওয়া ঠিকানায় আমি চিঠি লিখব। আমার কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য আশা কোর। ভালোবাসা নিও। সব কিছুর জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বেটিলাও।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে বেটির চিঠিটা পড়ছিলাম। হঠাৎ মুখের ওপর প্রচণ্ড ঘুঁষি এসে পড়লো। অসহ্য যন্ত্রণা। এ রকম আঘাত এর আগে আমি কখনও পাইনি। টাল সামলাতে না পেরে একটা ছোট টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। চোখ দুটি ফুলে উঠেছে। তার চারিদিকে জমাট কালো অন্ধকার। আমি দেখলাম ঘরের মধ্যে আমি একা। বুঝতে পারলাম ঐ দানবটাই আমার ওপর অমানুষিক আঘাত হেনেছিল। আমার ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। রুমাল দিয়ে মুছে কোনরকমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তার ওপর চোখ রাখতে গিয়ে আমার দৃষ্টি আটকে গেলো বেটিলাওয়ের কমলালেবু রঙের জ্যাকেটের ওপর। চামড়ার জ্যাকেট পরিহিত একটি লোকের সঙ্গে সে তখন ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল। দানব মঙ্গোলিয়ান বেটির সুটকেস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিলাম। এখন যেন একটু স্বস্তি বোধ করছি। সমস্ত ঘটনাটা অবিশ্বাস্য ভাবে ঘটে গেলো। বেটিলাওয়ের জন্য দুঃখ হলো। তার কি পরিণাম হতে যাচ্ছে কে জানে।

এখন আমার হাতে আর বেশী সময় নেই। প্রত্যেকটা ঘণ্টা হিসেব করে চলতে হবে। আর দেরী না করে আমার জিনিসপত্র নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম ট্যাক্সির জন্য। আমার গন্তব্যস্থল এখন ইশলা গ্রেন্ড বিমান বন্দর। দূরে উজ্জ্বল লাল হলুদ রঙে লেখা এয়ারো কমাণ্ডারের পরিচয় লিপি চোখে পড়লো আমার। আর তারই পাশে গোটা গোটা কালো অক্ষরে লেখা 'ও সিওনোগ্রাফিক এক্সপিডিসন ম্যাক'। টার্মিনাল পেরিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম, এক দীর্ঘদেহী যুবক ঠিক সেই মুহূর্তে প্লেন থেকে নেমে আসছিল। পরনে খাকি ট্রাউজার।

কমাণ্ডার? সে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, আমি বিল হেডউইন। সুস্বাগতম। যদিও জানি আপনি সাময়িক ভাবে আমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তবু আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

হ্যালো বিল। আমি প্রত্যুত্তর দিলাম। চমৎকার চেহারা যুবকটির। তার দেহের গঠন ঠিক সাঁতারুদের মতন। হাসিখুশিতে ভরা তার মুখ চোখে পড়ার মতন। অল্প সময়ের জন্যে থাকলেও

আমি বললাম, আমি তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করব।

কমান্ডার, এয়ারো কমান্ডারে উঠতে উঠতে বিল হেডউইন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকলো— আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা খুব খুশি। আপনার নাম আমরা অনেক শুনেছি। শুনেছি জলের নীচে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে অনেক। আর সেই জন্যই ডঃ ফ্রেশার আপনার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ম্যাক কার্যত বেশ ভালো ভাবেই তৈরী করেছেন। বিল খুব নীচু দিয়ে প্লেন চালাচ্ছিল ক্যারিবিয়ানের উপর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা তোমাদের দলে ক'জন আছেন?

যুবকটি বলল, 'আমার স্ত্রী সিনথিয়া এবং আমি। গত মাসে আমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ডঃ ফ্রেশারের সঙ্গে আমরা এক বছরেরও বেশী কাজ করছি। তারপর আছেন ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান রে অ্যানডার্স হাউই থমসন আমাদের মেকানিক, আমাদের রাঁধুনি কনসুয়েলা, আমার মনে হয় মেয়েটি বারবাডোজ দ্বীপপুঞ্জের মেয়ে। আর আছেন ডঃ ফ্রেশার।

আমাদের প্লেনটা খুব নীচ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নীলাভ সমুদ্রের জলের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালাম ভাসমান সেই জাহাজটা এখন অনেক বড় দেখাচ্ছে। জাহাজের নাম ট্রিটন। সাদা রঙের কাঠামো। আমাদের প্লেনটা সমুদ্রের জল স্পর্শ করার সময় আমি দেখলাম স্নানের পোশাক পরে জাহাজের পিছন দিকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মেয়েটি বেটিলাও রলিংসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিল প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল এবং ট্রিটনের পিছন দিকে প্লেনটা থামাল সে। ও হচ্ছে সিনথিয়া, বিল বলল।

আমি জাহাজের ভিতর প্রবেশ করে নাবিকদের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। কনসুয়েলা পূর্ণযুবতী। হাল্কা কফির রঙের দেহ। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান এবং মেকানিক এরা দুজনে সেই জাহাজের মধ্যে কনসুয়েলাকে পেয়ে অত্যন্ত সুখী। ডঃ ফ্রেশার এখন ব্যস্ত রয়েছেন। সিনথিয়া বললো—কমান্ডার এখন চলুন আপনার কোয়ার্টার দেখিয়ে নিয়ে আসি। বেশ সুন্দর ভাবে সাজগোজ করেছিল সিনথিয়া। আমি তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখলাম তার ঘরটা ছোট হলেও টিপটপ। ম্যাকের নির্দেশ মতো উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসান ছিল সেখানে। একটা খবর পাঠালে ভালো হতো, ম্যাক সেই খবরটার জন্য আশা করে আছেন। সিনথিয়া চলে যেতেই তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার ডেকের উপরে উঠে এলাম। মেকানিক হাউস তখন সবেমাত্র প্লেনের অয়েলট্রাঙ্কে জ্বালানি ঢোকানর কাজ শেষ করেছিল।

কনসুয়েলা তখন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির সরলতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমার প্লেনের ওপর ওঠার ইচ্ছা হলো। দরজার সামনে পা রাখতে গিয়ে দেখলাম মেয়েটি ট্রিটনের পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। দীর্ঘাঙ্গী মাথাভর্তি সোনালী চুল। পায়ের গড়ন চমৎকার। চলার গতি আরো বেশী সুন্দর। আমি খুব বিস্মিত হলাম বিল তাদের দলের এই সদস্যার কথা আমাকে না বলার জন্যে। কিন্তু কেন সে তার পরিচয় দিল না? এড়িয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে তো সে নয়। আমি এবারে তাকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। খাড়াই নাক। সুন্দর পাতলা দুটি ঠোঁট। তার চেয়েও সুন্দর তার নীল গভীর দুটি চোখ। সামনে নীল সমুদ্রের মতই গভীর। মেয়েটি তার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখে তার শান্ত হাসি। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ম্যাক তো একবারও বলেন নি, ডঃ ফ্রেশার একজন মহিলা। ভালোই হবে, অভিযানটা তাহলে বেশ রসালো হবে। ডঃ ফ্রেশার আবার নিজের থেকেই কথা বললো। তার কথা বলার ধরন শান্ত এবং মার্জিত। তার পরনের আলগা ব্লাউজ গোপনীয়তা আরো বেশী করে প্রকাশ করে দিচ্ছিল যেন। সেটা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললো। কমান্ডার, আমি আশা করি এখানে সবকিছু আপনার মনের মতো করে পেয়েছেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি খুব সন্তুষ্ট তবে আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো ডঃ ফ্রেশার এর আলগা ব্লাউজের নীচে দোলায়িত স্তনযুগলের উপর।

ডঃ ফ্রেশার আমাকে বললেন, আমার যা কিছু প্রয়োজন হবে আমি যেন তাকে জানাতে দ্বিধা না করি। আমি ডঃ ফ্রেশার-এর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম তার মনোভাব কঠোর হওয়া সত্ত্বেও সে বিচিত্র এবং বৈচিত্র্যময়। সত্যি কথা বলতে কি অল্প সময়ের আলাপ হলেও আমি বুঝে গিয়েছিলাম, সে যে ধরণের দৃঢ়চেতা মেয়ে, সে তার ঔদ্ধত্য, তার নিজের হাতে গড়া খ্যাতির শিখর থেকে এক চুলও নেমে আসবে না।

ডঃ ফ্রেশার তার বিদ্যুৎ নীল চোখ দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। তারপর বললো, আমি আমার কেবিনে থাকবো, আমাকে আপনার প্রয়োজন হলে আসতে পারেন। আমি এখন চললাম এই বলে সে ডেকের নীচে চলে গেল।

এরপর আমি এয়ারো কমান্ডারে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটা ট্রিটন জাহাজ ছেড়ে আকাশে পাড়ি দিল। অল্প কিছুক্ষণ পরে আবার জ্বালানি নিয়ে ফিরতে হলো ট্রিটনে।

কনসুয়েলা আমার জন্যে স্যান্ডউইচ নিয়ে এলো। পূর্ণ যুবতী, কামনার উদ্রেক করে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওকে পাত্তা দিতে চাইলাম না। খাওয়া শেষ করে আবার আকাশে উড়লাম। দ্বীপপুঞ্জের উপর চক্কর দিতে থাকলাম বৃত্তাকারে। দ্বীপগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে দেখলাম কোনটা একেবারে মনুষ্যবর্জিত, আর যে সব দ্বীপগুলোতে মানুষের চিহ্ন আছে বলে মনে হলো তা অতি নগণ্য। তাদের দিয়ে আমার ইপ্সিত অভিযান চালানোর পক্ষে সহায়ক নয় বলে আমার মনে হলো : তবু অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি পারলাম না। এরই মধ্যে আরো দুবার আমি অভিযান চালালাম। যখন আবার ট্রিটনে ফিরে এলাম তখন আকাশ ভর্তি তারা সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। তখন আমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, তেমন কিছুই চোখে পড়েনি, কিন্তু অন্তত একটা ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট। যে সব জায়গার ওপর দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই আমি দেখতে পাইনি তবু কেন জানিনা বারবার আমাকে আকর্ষণ করছে। একবার তো আমার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি আমার ছোট্ট প্লেনটাকে কোথাও অবতরণ করাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে ফিরে আসতে হলো ট্রিটনে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। দেহের ক্লান্তি কাটানোর জন্য ভীষণ ড্রিঙ্কস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

রাত্রির হাওয়াটা বেশ গরম। আমি তখন স্নানের পোশাক পরেছিলাম। সেই অবস্থাতেই ডঃ ফ্রেশারের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ডঃ ফ্রেশারের নেমপ্লেটটা আমার চোখে পড়ল। আমি রজায় নক করলাম।

ভেতরে আসুন। সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

কেবিনে ঢুকে দেখলাম, ডঃ ফ্রেশার তার পোশাক পরিবর্তন করেছে। গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট, সেই সঙ্গে হাল্কা নীল রঙের হাতকাটা ব্লাউজ। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার নরম, নিটোল স্তনযুগল। একটি টেবিলের সামনে মাইক্রোস্কোপের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল ডঃ ফ্রেশার। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বললো, হ্যাঁ বলুন।

আমি বললাম, কাল সকালের মধ্যে জাহাজটাকে পূর্বদিকের কাছাকাছি যতটা সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আরো মাইল পঞ্চাশ গেলেই আমার আশা প্লেনের রেঞ্জের মধ্যে এসে যাবে। বারবার জ্বালানির জন্যে ফিরে আসতে হলে কাল আমি খুব বেশী জায়গায় পাড়ি দিতে পারবো না।

কিন্তু এই মুহূর্তে নোঙর তুলে জাহাজ আমরা জলে ভাসাতে পারি না। ডঃ ফ্রেশার প্রতিবাদ করে উঠলো, আমরা এখানে আমাদের কাজের অপূর্ব সাড়া পেয়েছি, আমরা আমাদের পরীক্ষণ কাজের মাঝপথে এসে দাঁড়িয়েছি। এ অবস্থায় এখান থেকে যাওয়া আমাদের সম্ভবপর নয়।

দুঃখিত, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমি তার সঙ্গে শান্ত ব্যবহারই করতে চাইলাম।

মেয়েটির কঠোর দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করলো, আমাকে হাসাতে বাধ্য করলো, ওর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে ওর নাম ড্যানিয়েল। আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি আমার অশান্ত চোখ দুটিকে মেয়েটির থাইয়ের উপর লুকোচুরি খেলা খেলতে দিলাম। তারপর সেখান থেকে তার নাভিদেশে যেখানে

স্কার্টটা খুব শক্ত করে বাঁধা ছিল। সেখানে এসে আমার চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল।

কমান্ডার, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটি ডাকলো।

আমি তার চোখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি বলতে থাকে—আমি আবার আরম্ভ করবো। আমি তোমার দয়ার কথা বুঝতে পেরেছি। তুমি একজন সৎ স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ। তুমি চাও মেয়েরা তোমার পায়ের তলায় এসে পড়ুক। আবেগের তাড়নায় কোনো মেয়ের দিকে তুমি তাকাতে পার না। যতক্ষণ না তাকে তুমি তোমার বিছানার শয্যা-সঙ্গিনী হিসেবে দেখছো। কি বিচিত্র তোমাদের মনের ক্ষুধা, তোমাদের দেহের—আমি হেসে বললাম, থামলে কেন, বলে যাও! আমি বিমোহিত। তোমার কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে, আমাকে যাদু করে ফেলেছ, বলে যাও।

মেয়েটি বলতে থাকে—আমি নিশ্চিত জানি, তুমি ভাবছ তুমি আমার ওপর দয়া দেখাচ্ছ, আমিও বুঝি তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন, অনেক মেয়ে আছে যারা তোমার মতো স্বাভাবিক প্রকৃতির নয়, যারা তোমার পশুসুলভ ইচ্ছের সঙ্গিনী হতে সাড়া দেবে না। এখন আবার ভাবছি তাড়াতাড়ি সেটা তুমি উপলব্ধি করতে পারলেই আমাদের মিলন ত্বরান্বিত হবে। তোমার কাছে আমি নিজেকে পরিষ্কার করে দিলাম তাই না?

ড্যানিয়েল, তুমি কি জানো আমি কি ভাবি? আমি অলস ভাবে প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের থেকেই আবার বললাম, আমি মনে করি তুমি আমাদের বাইরেটাই শুধু দেখেছো, আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করোনি কখনো। তোমাকে বাস্তবের সংস্পর্শে আসতে হবে ড্যানিয়েল। আমার মতে তুমি হলে সেইসব মেয়েদের দলে ড্যানিয়েল, যাদেরকে আমি বলি দলে যাওয়া, এলোমেলো ভীতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের মেয়ে।

আমি ও সবের কোনটাই নয়। ড্যানিয়েল বললো, কেন জানো? কারণ তোমার ঐ নীল-ধূসর রঙের চোখদুটি অন্য কোনও সাধারণ মেয়েদের প্রলোভিত করলেও আমাদের পারবে না। তুমি ঠিক বুঝতে পারো না, বিজ্ঞান ভাবাপন্ন অভিজ্ঞ বৈমানিকদের একটা বাড়তি ক্ষমতা আছে যার বলে তারা অনায়াসে নিজেদের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

আমি জোরে হেসে উঠলাম। আর সেই বৈজ্ঞানিক হলে তুমি তাই না? আমি খুব সহজেই প্রমাণ করে দিতে পারি, তুমি ভুল করছ তোমার সবই ভুল।

তুমি কিছুই করতে পার না। ড্যানিয়েল হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। মানুষের শিক্ষা, সুনিয়ন্ত্রিত মনের দৃঢ়তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই সব কিছুর কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে থাকে, ভাবপ্রবণতাটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে থাকে।

আচ্ছা তুমি কি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছ?

তা দেখব না কেন? আমার নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

আমি বললাম, তোমার ওপরও আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু আমাদের কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কখনও কোনো জোর খাটাব না তোমার ওপর। এবং তোমাকেও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আমাকে ছেড়ে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না।

ড্যানিয়েল বললো, না, আমি পালাবো না; আমার পালিয়ে যাবার দরকার হবে না। বাস্তবিক আমি আগ্রহ নিয়েই তোমার ওপর লক্ষ্য রাখবো, তোমার অহমিকা কেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে তা দেখার জন্য।

এবার আমি উঠে দাঁড়িয়ে, তার পাশে গিয়ে ঘন হয়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকে ড্যানিয়েলের মুখ। যে কোন মুহূর্তে বুঝি বা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। ড্যানিয়েল আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো।

আমি মনে মনে ভাবলাম কি আশ্চর্য, দুটি মেয়ে যেন দুই ভিন্ন মরু প্রান্তের বাসিন্দা। একে অপরের সঙ্গে কোনো মিল নেই। আমি ভাবছিলাম বেটিলাওয়ের কথা। সে কেমন বিনা বাধায় তার ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে দিয়েছিল, অপর দিকে ড্যানিয়েল ফ্রেশার কি রকম অনিচ্ছুক। অবশ্য আমি বাজি ধরে বলতে পারি তাদের মধ্যে মূলত সত্যিকারের কোন পার্থক্য নেই। আসলে ফ্রেশার একটু উদ্ধত স্বভাবের। এই সুন্দরী বায়োলজিস্টকে একটু একটু করে বশে আনতে হবে

তাকে বুঝিয়ে, তাকে ভালোবেসে। এখন কেবল অনুসন্ধান—

।। চার ।।

আমি প্লেনটা খুব নিচু দিয়ে চালাচ্ছিলাম। ক্যারিবিয়ানের নীল জল। এটা আমার সকালের দ্বিতীয় দফার অভিযান। উড়ন্ত ছোট্ট প্লেনটা ছোট ছোট দ্বীপ ছুঁয়ে চলেছে। আর একটা দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই দ্রুত প্লেনটা আমি উপরে তুলে দিলাম। উদ্দেশ্য দূর থেকে সমস্ত দ্বীপটাকে তার দৃষ্টির নাগালের মধ্যে এনে ফেলা। আমার চোখের আয়নায় তখন প্রতিফলিত হলো নীচে কয়েকজন মাছ ধরা জেলের ব্যস্ততা, রৌদ্রে তাদের জল শুকনোর তাড়া। এসব দৃশ্য দেখে ম্যাককে আমি বার্তা পাঠিয়েছিলাম মাত্র একটি শব্দে 'না'।

বার্তাটা পাঠাতে এবং সেটা গ্রহণ করতে গিয়ে সমান ভাবে বিরক্ত হতে হলো। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল যুগপৎ দৃঢ়তার এবং ব্যর্থতার। এদিকে বিমানেব ইঞ্জিনে কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি ট্রিটনে ফিরে এলাম।

মেকানিক হাউই থমসন সব দেখে শুনে রিপোর্ট দিল। ইনসুলেশন কেবিল ছিঁড়ে গেছে। ভালো করে ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে গেলে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে, তারপর আরো এক ঘণ্টা লাগবে সারানোর কাজে। মেকানিকের হাতে আমি প্লেন ছেড়ে দিয়ে এলাম। পথে একটা জটলা দেখে থামলাম। তারা সবাই রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওদিকে বিল হেডউইন রেলিং-এর উপর বুক দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা টেপরেকর্ডার তুলে আনছিল জলের নীচ থেকে। ড্যানিয়েলকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল। তার পরনে ছিল দু' খণ্ড বেদিং সুট। আমি জিজ্ঞেস করলাম ওটা কোথা থেকে এলো?

বিল বললো, সমুদ্রের তলা থেকে, তিনদিন সেখানে ছিল শব্দ ধরার জন্য। ডঃ ফ্রেশার এখন জলের নীচে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। উদ্দেশ্য জলের নীচে পরীক্ষা কার্য চালান এবং কিছু নমুনা সংগ্রহ করা। আমাদের সী স্পাইডার আমরা নিজে চালালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারি।

তা তুমি জলের তলায় কতক্ষণ থাকবে? আমি ড্যানিয়েলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

এক ঘণ্টা আবার দু ঘণ্টার জন্যও থাকতে হতে পারে। কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিল তাকে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি তোমার সঙ্গী হতে চাই। জলের মানুষ, তাই স্বভাবতই আমি উৎসাহী তোমার সঙ্গে জলে ডুবতে। তার মধ্যে একটা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ হতে দেখলাম আমি। সী স্পাইডারের জায়গা মাত্র দুজনের জন্য। সেক্ষেত্রে সবার সামনে ড্যানিয়েল আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেটা আমার পক্ষে সুখকর হবে না। অথচ তার সঙ্গ চাইতে মন চাইছিল না। ড্যানিয়েলের উত্তরটা শোনার জন্য সাগ্রহে আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

ঠিক আছে প্রথমে আমি যাবো, ড্যানিয়েল গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি আমাকে অনুসরণ কর। সাবধানে এসো।

আমি খুশি মনে মাথা নাড়লাম। পাটাতনের দরজা-পথে যেতে গিয়ে তার সুন্দর দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধ হয়ে। সী স্পাইডারের বসার জায়গা মাত্র দুটিই, এবং স্বল্প পরিসর গায়ে গা ঠেকে যাবার মতন। ড্যানিয়েলের ইতস্ততঃ ভাবের কারণটা এবার আমি অনুমান করতে পারলাম। ড্যানিয়েল নিজেই সী স্পাইডারকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী হাতল দুটি শক্ত করে ধরা তার হাতে। প্রয়োজন মত সে দুটো এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছিল ড্যানিয়েল। স্পাইডার সমুদ্রের নীচে নেমে চলেছে। কাঁচের দেয়াল দিয়ে আমি দেখলাম আমাদের চারপাশে নীলাভ জলের মধ্যে অসংখ্য নাম না জানা সামুদ্রিক জীব ঘোরাফেরা করছে।

একটা হাল্কা ধরনের ঝাঁকুনি আমাদের মনে করিয়ে দিল যে, আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলাম। সেই সময় ড্যানিয়েল সুইচবোর্ডে একটা সুইচের উপর আঙুল টিপল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে স্পাইডারের যান্ত্রিক হাতগুলো চালু হয়ে গেল। আমাদের কাজ সামুদ্রিক সম্পদ প্রবাল, মণি, মুক্তা সংগ্রহ করে স্পাইডারের লাগোয়া কেনিস্তারায় গচ্ছিত রাখা। ডঃ ফ্রেশারের এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো তাই।

ড্যানিয়েল হঠাৎ চীৎকার করে উঠল। বারবার একটা অ্যালুমিনিয়াম রডের উপর ধাক্কা দিতে দিতে সে বলল—কি সর্বনাশ দেখ এটা নড়ছে না, কেমন আটকে গেছে।

আমি চকিতে সেদিকে দেখলাম যে অ্যালুমিনিয়ামের রড তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যতটা সম্ভব আমি আমার দেহটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললাম,—সম্ভবতঃ আমার হাত ওখানে পৌঁছতে পারে, দেখি আমি কি করতে পারি। ড্যানিয়েলের পা দুটোর উপর ভর করে ঝুঁকেছিলাম আমি। আমার মুখ চাপা পড়ছিল তার মাংসল থাই দুটোর ওপর। সেই ভাবেই হাত বাড়িয়ে রডটা স্পর্শ করলাম এবং রডটাকে তার নির্দিষ্ট পথে আনার চেষ্টা করলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ও ভাবে কাজ করতে। তবে ড্যানিয়েলের স্পর্শ আমাকে বাড়তি প্রেরণা দিচ্ছিল, কাজের উৎসাহ জোগাচ্ছিল, কাজ করতে গিয়ে আমার মাথাটা আরো শক্ত হয়ে বসে গেল ড্যানিয়েলের নগ্ন থাই দুটোর ওপর। শ্বাস প্রশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম নাভিদেশ অসম্ভব দ্রুতগতিতে ওঠানামা করছে যেন। মাথাটা একটু তুলে ড্যানিয়েলের দিকে তাকালাম। আমি এখন খুব কাছে থেকে ড্যানিয়েলের দেহখানি দেখতে পাচ্ছি।

আমি আবার ঝুঁকে পড়লাম। ড্যানিয়েল একটা কথাও বললো না। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, রডটা তার নিজের চলার পথে স্বাভাবিক ভাবে আবার নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। আমার কাজ শেষ। এবার আমি ড্যানিয়েলের শরীরের ওপর ভর করে উঠে বসলাম সোজা হয়ে। ড্যানিয়েল তখন কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন আমার বুকের কাছে ওর বুক, মুখের কাছে ওর মুখ। স্পর্শের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে সে।

ধন্যবাদ। ড্যানিয়েলের গলার স্বরটা এবার একটু নরম শোনাল। আমি এবার তার বুকের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলাম। ব্রা-বিহীন বেদিং সুট পরা ড্যানিয়েলের স্তন দুটো আমার বলিষ্ঠ বুকের চাপে পিষ্ট হতে থাকলো। এক উষ্ণ আলিঙ্গনের আসন্ন প্রস্তুতি। ড্যানিয়েল এবার আর আপত্তি করলো না। তবে তার নীল চোখের তারা দুটি তেমনি শান্ত, নিস্তেজ বলে মনে হলো। কিন্তু তার হাবভাবে মনে হচ্ছিল ভেতর ভেতর সে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তখন। সে যেন আমার কাছ থেকে গাঢ় চুম্বন আশা করছিল সেই মুহূর্তে। তবে প্রকাশ্যে তার কোন প্রকাশ নেই। তার শিক্ষা, অধ্যাবসায় বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাকে এমন সংযত হতে সাহায্য করেছিল। হঠাৎ আমি সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। ড্যানিয়েল তখন থরথর করে কাঁপছিল। তার নীল চোখে কামনার দ্যুতি ঝলমল করছিল। আমি তাকে দুহাত বাড়িয়ে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। আমার মুখ ঝুঁকে এলো ড্যানিয়েলের উষ্ণ কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ওপর।

ড্যানিয়েল তার ভিজে ঠোঁট মুছল না। আমার ঘ্রাণটুকু ঠোঁটে মেখে সে সুইচে হাত রাখলো, একটু চাপ দিল। আমি বুঝতে পারলাম সী স্পাইডার এবার উপরে উঠতে শুরু করল।

ট্রিটনে ফিরে এসে আমি ড্যানিয়েলের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালাম। আমরা সুন্দর একটা মুহূর্ত অতিক্রম করে এলাম। এর মধ্যে অনেক কিছু জানলাম। ডঃ ফ্রেশার ঘুরে দাঁড়াল। কোনো উত্তর দিল না। আমি বুঝতে পারলাম তার কঠিন হয়ে ওঠা মুখটা ঢাকার জন্য সে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি তাকে বললাম, তোমার ঐ বৈজ্ঞানিক মনোভাবটা আমার ভালো লাগে না ড্যানিয়েল। তুমি যখন আমার কাছে আসো তখন তোমার অন্য রূপ আমি দেখতে পাই, কি মিষ্টি যে লাগে তখন তোমাকে আমার। কিন্তু তুমি যখন নিজেকে সংযত করার চেষ্টা কর তখন তার সাড়া পাই না। তখন কেমন যেন তোমাকে নিঃস্ব বলে মনে হয়।

ইতিমধ্যে হাউই এসে খবর দিল, এক খণ্ড ইনসুলেশন আলগা হয়ে গিয়েছিল। মেকানিক বললো প্লেন এখন আকাশে ওড়ার জন্য প্রস্তুত।

আমি তখুনি প্লেনটা আকাশে মেলে দিলাম। এবারও আমি ব্যর্থ হলাম। দ্বীপে দ্বীপে ঘোরাই সার হলো। উল্লেখযোগ্য প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। যাইহোক একটা দ্বীপের সামনে আমি একটা পরিত্যক্ত জাহাজ দেখতে পেলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। এদিকে জ্বালানিও ফুরিয়ে আসছে। আগামীকাল আবার আমি এখানে আসবো। আমি ফিরে চললাম।

রাত্রির ঘন অন্ধকারে ট্রিটনে এসে আমি ম্যাককে সেই একটাই বার্তা পাঠালাম, না। এবারও ব্যর্থ হতে হল। সারাদিনের ক্লান্তিতে দু চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। ড্যানিয়েলের কেবিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে হলুদ আলো ছিটকে এসে পড়ছিল করিডোরে। আমি দরজায় নক করলাম, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

দরজা খুলে গেল কিন্তু কেবিন শূন্য। ড্যানিয়েল নেই। সেখান থেকে আমি চলে এলাম ডেকের উপর। মাথার উপর তারা ভর্তি নীল আকাশ। নীচে নীল সমুদ্র। নীচের ডেকের কেবিন থেকে হাউই, রে অ্যানডার্স এবং কনসুয়েলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

বিল ও সিনথিয়াদের কেবিন অন্ধকার। অন্ধকার থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র একমাস হলো। আমি মনে মনে হাসলাম। সী স্পাইডারটা ট্রিটনের পাশে থেকে ভাবছিলাম ক্যারিবিয়ানের নীল জল। কিন্তু ড্যানিয়েল কোথায়? আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে দশটা। এতো রাত্রে ক্যারিবিয়ানের মাঝখানে সে গেল কোথায়? আমার উদভ্রান্ত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল ক্যারিবিয়ানের নীল জলের গভীর থেকে গভীরে। হঠাৎ এক সময় আমি দেখতে পেলাম একটা রবারের ভেলা ভেসে আসছে ট্রিটনের দিকে। কাছে আসতে সিক্ত সোনালী চুলে ভর্তি ড্যানিয়েলের মুখখানি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। তার পরনে ছিল মাত্র দু'খণ্ড বেদিং সুট। তারপর ট্রিটনের দেওয়াল ঘেঁষে দড়িব মই বেয়ে উপরে উঠে এলো সে। তারপর কেবিনে গিয়ে ঢুকলো।

আমি গালে হাত দিয়ে নতুন সমস্যার কথা ভাবতে বসলাম। চিন্তা হলো যে ড্যানিয়েল এতো রাতে ভেলায় চড়ে কোথায় গিয়েছিল? তবে কি সে জুডাসের লোক? কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। পরের দিনের অভিযানও ব্যর্থ হলো। ট্রিটনে ফিরে এসে কেবিনে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলো না। রাত্রি আরো ঘন হওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। সমুদ্রের নীল জলে ঘন কালো ছায়া পড়লে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলাম ইঞ্জিন ঘরের সামনে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কেবিনের আলো না নিভিয়েই ড্যানিয়েল বেরিয়ে এলো। তার হাতে গতকালের সেই রবারের ভেলাটা। ডেকে ওঠার পথে পা বাড়াতেই আমি তাড়াতাড়ি দ্রুত পায়ে নিজের কেবিনে ছুটে এলাম। আবার দ্রুতগতিতেই ফিরে এলাম ডেকের ওপর। ভেলাটা তখন জলের ওপর ভাসছিল। তার সোনালি চুল হাওয়ায় ভাসছিল। পূর্ণিমার আলোয় ক্যারিবিয়ানের নীল জল ঝলমল করছিল। মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহর। কেবল সমুদ্রের অশান্ত গর্জন সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে রেণুর বেণু করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জলটাকে মনে হচ্ছিল যেন সীমাহীন রুপোর থালা।

ভেলায় ড্যানিয়েলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হাঙ্গর অধ্যুষিত জলে রাতে সাঁতার কাটাটা বিপজ্জনক। ডঃ ফ্রেশারের রাতের এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার। মিথ্যেই সে সন্দেহ করছিল। আমি দেখলাম, ড্যানিয়েল দু হাত দিয়ে বালি খুঁড়ছে। ভাবলাম ড্যানিয়েল হয়তো গোপনে লুকিয়ে রাখা কোনো ট্রান্সমিটার সেট খুঁজছে। কিন্তু না, দেখলাম—ড্যানিয়েল তার চুল থেকে ক্লিপ খুলে নিয়ে সামনে একটা ঝরনার জলে চুলগুলো ভাসিয়ে দিল। তার সোনালী চুলগুলো জলের তোড়ে পিঠের ওপর চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠলো। তারপর পিছন দিকে হাত দিয়ে ব্রার হুক খুললো এবং কোমর থেকে জাঙ্গিয়া খুলে ফেলে একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো ঝরণার নীচে। নিরাভরণ দেহ। আমি দেখলাম আমার সামনে রাত্রিদেবী দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঝরণার জলের কণাগুলো ফুল হয়ে ঝরে পড়ছিল। ড্যানিয়েলের পায়ের নীচে ক্যারিবিয়ানের সমুদ্র। কন্যা তখন জলের দিকে তাকিয়ে চাঁদের বন্দনা করছিল।

ড্যানিয়েল আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। চাঁদের আলোর নীচে ড্যানিয়েলের নগ্ন শরীরের শোভা দেখছিলাম আমি। নিটোল গোল স্তনযুগল, সুন্দর গড়ন। স্তনের বৃন্ত দুটি আঙুরের মত লোভনীয়। চওড়া ঠোঁট কামনা জাগায়। ড্যানিয়েলকে জলে নামতে দেখে আমি শরীরের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করলাম। স্বচ্ছ জলের নীচে ড্যানিয়েলের পুরুষ্টু স্তন দুটি জলে ভাসছিল, যেন দুটি শ্বেতপদ্ম পাপড়ি মেলার অপেক্ষায়। ড্যানিয়েল সাঁতারে নামলো।

হঠাৎ আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। ড্যানিয়েল কি জানে না চাঁদের আলোয় সাঁতার কাটাটা একেবারেই নিরাপদ নয়? একটু অসাবধান হলেই সামুদ্রিক জীব তার নগ্ন দেহের উপর তাদের হিংস্র দাঁত বসিয়ে দিতে পারে। প্রবালের আকর্ষণই তাকে বিপদে ফেলতে পারে। তার

মত প্রবালও সামুদ্রিক জীবগুলোর একান্ত কামনার ধন।

ড্যানিয়েল জলের তলায় ডুব সাঁতার দিল। সে যতক্ষণ জলের নীচে ডুব দিয়ে রইলো ততক্ষণ আমার চিন্তার অন্ত রইলো না। সে জলে ভেসে ওঠার পর আমি জলে সাঁতারে নামলাম।

জোরে জোরে পা চালিয়ে ড্যানিয়েলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ড্যানিয়েলের পায়ের সঙ্গে কি একটা জড়ানো। সমুদ্রের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জীব তার পায়ের ওপর ধারাল দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। আমি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। ড্যানিয়েল তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। আমি আমার স্যুটের পকেট থেকে ধারালো ছুরিটা বের করে দ্রুত পা চালিয়ে তার কাছে গেলাম। ড্যানিয়েলের অবস্থা তখন সঙ্গীন। তার দেহটা নিস্তেজ হয়ে আসছিল। তার বোকামির জন্য আমার ভীষণ রাগ হলো। কেন সে এ ভাবে একা একা চাঁদের আলোয় সাঁতার কাটতে নামল?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ড্যানিয়েলকে রাহুমুক্ত করলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে ডাঙ্গায় ওঠাতে হবে নাহলে নতুন করে আবার বিপদ আসতে পারে। ড্যানিয়েলের অবশ দেহের অর্ধেকটা জলের নীচে ছিল। পা চালাতে পারছিল না সে। আমি তাকে টেনে তুললাম বালুকাবেলায়। এবার আমার প্রথম কাজ হলো ড্যানিয়েলের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখা। সে তখন হাঁপাচ্ছিল। তখনও ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছিল।

আমি তার ব্রা-টা জল থেকে তুলে নিয়ে এসে তার সেই ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলাম শক্ত করে, রক্ত বন্ধ করার জন্যে।

ড্যানিয়েল আমার দিকে চোখ মেলে তাকালো। ড্যানিয়েল তার পরিষ্কার জাঙ্গিয়াটা খোঁজ করলো। কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম—এখন ওসব ভুলে যাও। এখন আমার কাছে তোমার কোন কিছুই অপ্রকাশিত নয়। লজ্জা ঢাকার ব্যাপারটা খুব দেরী হয়ে গেছে। তবে চিন্তার কিছু নেই। আমি ছাড়া তো এখানে আর কেউ নেই।

আমি তাকে বললাম—চাঁদের আলোয় একা সাঁতার কাটা যে বিপজ্জনক এটা জানা উচিৎ ছিল।

ধন্যবাদ, সে জবাব দিল, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যদিও তোমার এই গুপ্তচর বৃত্তি আমার পছন্দ নয়। তুমি নিশ্চয় আমাকে অনুসরণ করে এসেছ।

নিশ্চয়ই! এই বলে আমি তাকে জোর করে আবার বালির বিছানায় শুইয়ে দিলাম। চাঁদের আলো তার নগ্ন দেহটার ওপর পড়ে এক আলাদা স্বর্গীয় শোভা বর্ধন করছিল। আমি তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

কমান্ডার, আজ আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যি তুমি এক শক্তিমান পুরুষ, অদ্ভুত তোমার ব্যক্তিত্ব। তোমাকে আমি কোনদিন ভুলবো না।

ঘুরে ফিরে আমার চোখদুটো গিয়ে পড়ছিল তার নগ্ন দেহের ওপর। অভিব্যক্তি দিয়ে আমার ইচ্ছেটা ওর কাছে ব্যক্ত করতে চাইছিলাম। আমি দেখলাম তার শান্ত নীল চোখ দুটি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। সে চোখের তারায় এখন কালো ছায়া। আমার মাথাটা এবার ড্যানিয়েলের বুকের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিলাম। তার স্তনের বোঁটা এখন আমার মুখে স্থান করে নিয়েছে। প্রথমে আস্তে আস্তে পরে জোরে জোরে ঠোঁট ঘষতে থাকলাম। ড্যানিয়েল আর স্থির থাকতে পারলো না। ভেতরে ভেতরে সেও ভীষণ উত্তেজিত। তার নাভিদেশের দ্রুত ওঠানামা তার স্বাক্ষর বহন করছিল।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে আমি তার বুকের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

তোমার বৈজ্ঞানিক মনের সেই দৃঢ়তা এখন কোথায় গেল ডক্টর?

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, তোমার সান্নিধ্যে এসে আজ আমার সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আমি ওকে বললাম, তোমার মনের দৃঢ়তার আমি প্রশংসা করি। তোমার মনের এই অদ্ভুত দৃঢ়তাই আমাকে আরো বেশী উৎসাহ দিয়েছিল তোমাকে এমন করে কাছে পাওয়ার জন্যে।

ড্যানিয়েল আমার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না, চোখ নামিয়ে নিয়ে

বললো—এবারে আমাদের ফেরা উচিৎ।

ভেলায় উঠে বসে ড্যানিয়েল তার হাত দুটো আড়াআড়ি ভাবে রাখলো। শান্ত ট্রিটন। নির্জন ডেক। একটি লোককেও দেখা গেল না।

নিজের কেবিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ড্যানিয়েল। তা দু' চোখ দিয়ে মুঠো মুঠো কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছিল। আমি ওর একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম—তোমার সঙ্গে এ ক'দিন মিশতে গিয়ে আমি একটা সত্য উপলব্ধি করলাম, দৈহিক বলপ্রয়োগ একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র।

না—না, এটারও প্রয়োজন আছে কমান্ডার। ওটা একটা সুস্থ স্বাভাবিক মনের পরিচয়। মৃদু হেসে ড্যানিয়েল আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলো।

আমি আমার কেবিনে ফিরে গেলাম। এবার আমি খুশি। নিঃসঙ্কোচে এখন আমি আমার অভিযান চালাতে পারবো। মেয়েটি আমাকে ভাবনামুক্ত করেছে।

।। পাঁচ ।।

ক্যারিবিয়ানের নীল জলে সূর্যের আলো এসে ঝলমল করছিল। আমার ছোট প্লেনের কাঁচের ওপর মিঠে রোদের আলো এসে পড়েছিল। দুরন্ত বেগে আমার প্লেনটা আকাশে উড়ছিল। সেই পরিত্যক্ত জাহাজটা খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধে হলো না আমার। একটু দূরে নিকটবর্তী দ্বীপের ওপর প্লেনটা ধীরে ধীরে নামালাম। উদ্দেশ্য সেখান থেকে সাঁতরে সেই জাহাজে গিয়ে আমি উঠবো, আমার অনুসন্ধান কাজ চালাবো। মাথার ওপর ক্যারিবিয়ানের উত্তপ্ত সূর্য। নীচে শীতল জল। আমার ভালো লাগলো ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটতে। জাহাজের কাছে গিয়ে জাহাজের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠলাম। ডেকের মাঝপথে এসে হঠাৎ একটা অপরিচিত মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। গলার আওয়াজ ডেকের নীচ থেকে এলো বলে মনে হলো।

প্রথমে নজরে পড়লো পয়েন্ট আটত্রিশ পুলিশ মডেলের রিভলবার। তারপর মেয়েটি দৃষ্টিগোচর হলো। হলুদ বেদিংস্যুট তার গায়ে। আমার অনুমান তার বয়স আঠাশের কাছাকাছি হবে। দীর্ঘাঙ্গী। চুলের মতন তার চোখের বাদামী রঙ। সব মিলিয়ে তার চেহারাটা আকর্ষণীয়।

কি চাও তুমি সে জিজ্ঞেস করলো। কেউ সাহায্য চায় কিনা সেটা দেখতে এখানে আমার আসা। আমি মৃদু হেসে বললাম তোমার হাতের রিভলবারটা নামাও।

আমি আমার পরিচয় মেয়েটিকে দিলাম। আমি কমান্ডার কার্টার সমুদ্র বিষয়ে গবেষক। সামুদ্রিক অভিযানে আমি কাজ করছি। গবেষণা করার জন্য আমাদের একটা জাহাজ আছে। আমরা সেটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছি। মেয়েটি দ্বীপের ওপর অবস্থানরত আমার প্লেনটার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে রিভলবারটা নামিয়ে রাখলো।

মেয়েটিকে খুব বিষণ্ণ লাগলো। সে নিজের পরিচয় দিল।

আমার নাম জয়সি ট্যানার। মিয়ামি থেকে আসছি। এখানে আমি আমার ছোটবোনকে খুঁজতে এসেছি। জয়সি জোরে নিঃশ্বাস নিল। তার স্তনের বৃন্ত দুটি আবাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো ব্লাউজের তলা থেকে। ভেবেছিলাম তাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করবো কিন্তু এখন আমি জানিনা আমি কি করবো।

মিয়ামিতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আমি ম্যানেজার। আমাব বিয়ে হয়েছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে। মিয়ামিতে একটা ভালো অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। ছোট বোন জুনি মিচিগান থেকে আমার কাছে বেড়াতে আসে। তার বয়স এখন উনিশ। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। মিয়ামির কাগজে একদিন সে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলো। নির্জন দ্বীপে এক বৃদ্ধের সেক্রেটারী কাম সঙ্গিনী হয়ে থাকার চাকরী। অবিবাহিতা হতে হবে। শুধু তাই নয়, চাকরী প্রার্থীর কোন নিকট আত্মীয় বন্ধু থাকলে চলবে না। তাই জুনি আমাকে এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির কাছে তার ল্যান্ডলর্ড হিসাবে পরিচয় দেয়। এই ভাবেই সে ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপে চাকরি পেয়ে যায়। এজেন্সির নাম হল হ্যামার এজেন্সি।

আমার মনে পড়ল বেটিলাও ওয়াশিংটন এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির কথা বলেছিল। জয়সি আবো

বললো, জুনি তাকে চিঠি লিখবে বলেছিল। কিন্তু ছ'মাস হয়ে গেল, কোন খবর নেই। পুলিশের শরণাপন্ন হতে তারা বলে, লিখিত অভিযোগ না জানালে তারা তাকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

ক্যারিবিয়ানের কেউ বলতে পারলো না, এমন কোন ধনী ব্যক্তি নেই যে এখানে তার নিজস্ব দ্বীপ আছে। তবে বোনের খোঁজে এখানে এসে আমার মনে হয়েছে জায়গাটা বোধহয় আমি খুঁজে পাবো। কেন জানিনা বারবার মনে হয়েছে আমার বোন জুনি এখানে কোথাও আছে।

আমি মেয়েটির কথা শুনছিলাম, কিন্তু আমার ভাবনা ছিল অন্য পথে। জুনির ব্যাপারে একটা আসন্ন বিপদের কথা ভাবছিলাম। বেটিলাওয়ের কথা মনে হলো। দুজনের চাকরী দাতা একজন নিঃসঙ্গ ধনী বৃদ্ধ যে একটা অলৌকিক দ্বীপের মালিক। এবং দুটি মেয়েই নিখোঁজ। দুজনের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিই লালবাতি জ্বালিয়ে বেপাত্তা।

জয়সির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই! আমি জয়সির কাঁধে হাত রেখে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালাম। তুমি যে সব খবর আমাকে দিলে তা যদি সত্যি হয় তাহলে বহু লোক তোমাকে ধন্য ধন্য করবে। তবে আমি প্রথমে নিজে একবার যাচাই করে নিতে চাই।

আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলে জয়সি আমার হাত ধরে আকর্ষণ করলো। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকালো। ব্লাউজের নীচে জয়সির স্তন যুগল খাড়া হয়ে উঠেছিল তখন। স্তনের বৃন্ত দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। পলক পতনহীন চোখে আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

এবার জয়সি তার ব্রাহীন স্তন দুটো আমার বুকের ওপর চেপে ধরে বললো, তুমি কথা দাও যে, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।

আমিও ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, আমি কথা দিলাম আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো। বিদায় নিয়ে আমি দ্রুত সেখান থেকে চলে এলাম। একটু পরেই প্লেনটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলাম। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সত্যি কি বেটিলাও এবং জুনি কোনও নির্জন দ্বীপে এক নিঃসঙ্গ ধনী বৃদ্ধের সঙ্গিনী কাম সেক্রেটারীর চাকরী পেয়েছে? না কি তাদের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিগুলো সত্যি সত্যি ভুয়ো! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। আর সেই রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে পারলেই সন্ধান করার কাজটা সহজ হবে।

জয়সির বর্ণনা মত সেই দ্বীপের খুব নীচু দিয়ে প্লেনটা চালাতে থাকলাম আমি। ওর কথাই ঠিক। অলৌকিক দ্বীপই বটে। ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। আমি দূরবীণ দিয়ে দেখলাম—দ্বীপের মাঝ বরাবর বর্ণনা মত সাদা কংক্রীটের বাড়ি। কতকটা পিলবক্সের মতন। বাড়ির চারপাশে ঘন বন জঙ্গল। দেখা গেল সেখানে কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। খুব সাবধানে নামতে হবে এখানে। হাতে সময় বেশী নেই। খুব তাড়াতাড়ি চূড়ান্ত অভিযানের জন্য তাকে আবার এখানে অবতরণ করতে হবে। এবার সেই দ্বীপটাকে ফেলে প্লেনটাকে ছুটিয়ে দিলাম হাওয়ার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমার মনে হলো এ ব্যাপারে ম্যাকের কাছ থেকে অনেক বেশী খবর নেওয়া প্রয়োজন। এবং সেইসব খবরের ওপরেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই অলৌকিক দ্বীপ এবং ঐ রহস্যময় বাড়িটার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাটা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। সময় যেখানে মূল চাবিকাঠি এই অভিযানের, অতএব আমাকে খুব ভেবেচিন্তেই এগোতে হবে। জয়সির ছোট জাহাজে ফিরে এসে ভাবলাম ও বলেছিলো ওর জাহাজে রেডিও রুম আছে। সেটা যদি ভালো থাকে তবে সেখান থেকেই ম্যাককে বার্তা পাঠানো যাবে।

জয়সি ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, তুমি সেই বাড়িটার কথা ঠিকই বলেছিলে। যাইহোক এখন তুমি আমাকে তোমার সেই রেডিওরুমে নিয়ে চলো।

বেশ তো চলো আমার সঙ্গে।

আমি অবাক হলাম। অনেকগুলো ট্রান্‌সমিটারে ভর্তি রেডিওরুম। তার মধ্যে দুটো এতো শক্তিশালী যে ম্যাকের কাছে বার্তা পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তাড়াতাড়ি একটা ট্রান্‌সমিটার চালু করে দিলাম বোতাম টিপে। ম্যাককে বললাম—ওয়ালটন এবং হ্যামার এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সী

দুটোর খোঁজ নিয়ে এক্ষুনি জানাতে। ম্যাককে সিগন্যাল দিলাম। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। রিসিভার চালু করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

জয়সি ডেকের ওপর বসেছিল। তার পরনে খাটো সাইজের হাফ প্যান্টটা তার হাঁটুর ওপর আঁট হয়ে বসেছিলো। তার গায়ে এখন আগের সেই ব্লাউজ নেই। তার বদলে সেখানে বিকিনি শোভা পাচ্ছিল। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম।

আচ্ছা কমান্ডার, তুমি আমার জন্য এতো সব করছো কেন বলো তো?

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জয়সির দেহের সঙ্গে আমার দেহটাকে এক করে ফেলার। কিন্তু কি কারণে যেন সে ইচ্ছাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম।

আমি তাকে বললাম, তোমার বোনের মত আমার এক বান্ধবী একই অবস্থায় পড়েছে। আমি নিজে এ ব্যাপারে জানতে খুব আগ্রহী। মনে হয় এখানে কোনো অঘটন ঘটতে চলেছে। এখন আমাকে একটা বিশেষ খবরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

জয়সি বললো, তুমি যে কাজ করছো সত্যি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডেকের ওপর শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম জয়সি আমার বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। তার অশান্ত চোখ দুটি এখন আমার দেহ পরিক্রমায় ব্যস্ত। তার পরনের বিকিনি স্তন দুটোকে খুব অল্পই ঢাকতে পেরেছিল।

জয়সি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা কোনো মেয়েই বুঝতে ভুল করবে না। বড় বড় কথা বলে তুমি মন জয় করতে চাও না। তোমার স্বভাব হলো কথা কম, কাজ বেশী। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার খুব বেশী কৌতূহল নেই।

আমি গাঢ়স্বরে বললাম, কিন্তু তুমি যে আমাকে কৌতূহলী করে তুলছো জয়সি।

তা তুমি তোমার সেই কৌতূহলটা মেটালেই তো পারো। বলে জয়সি আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকলো। আমি অনুভব করলাম জয়সির হাতটা আমার বুকের ওপর বিলি কাটছে। আমি এবার চোখ মেললাম পুরোপুরি। জয়সি তখন আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে। তার স্তন দুটি প্রায় বিকিনি মুক্ত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবার অপেক্ষায় সময় গুনছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলেও এই মুহূর্তে ড্যানিয়েলের কথা মনে পড়ে গেল। জয়সি তার দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে তাকে উপহার দিতে চাইছে, সে নিতে পারছে না। অথচ ড্যানিয়েলকে সে পেতে চায় তার আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু ড্যানিয়েল সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এই মুহূর্তে আমি ভীষণ ভাবে দেহের ক্ষুধা অনুভব করছিলাম। তাই বাধ্য হয়ে জয়সির আহ্বানে সাড়া দিলাম। ওর পিঠে হাত রেখে ওকে আকর্ষণ করলাম। বিকিনি অপসারিত হলো জয়সির বুকের ওপর থেকে।

জয়সি তার স্তনযুগল আমার বুকের ওপর চেপে ধরলো, তাদের নরম স্পর্শ আমাকে অসম্ভব উত্তেজিত করে তুললো। আপনার থেকেই তার কোমর উত্তোলিত হলো। ডেকের ওপর জয়সিকে আস্তে আস্তে শুইয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জিভ দিয়ে আমি সেটাকে বৃত্তাকারে চুম্বন দিতে থাকলাম। অসম্ভব সুখ-তৃপ্তির কান্নার মতো করে কঁকিয়ে উঠলো সে। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। জয়সির শেষ বাধায় টান দিলাম। সে কোমরটা উঁচু করলো। শেষ বাধা নেমে গেলো পায়ের নীচে। সামান্যই পোষাক ছিল আমার পরনে, কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো পোষাক থেকে বেরিয়ে আসতে। ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। জয়সির ঠোঁটে আমার ঠোঁট। আমার তাড়া না থাকায় আমি ধীরে ধীরে তাকে চরম উত্তেজনার মুহূর্তে পৌঁছে দিতে তৎপর হলাম। কিন্তু হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে দ্রুত জয়সি তার দেহে ক্লাইমেক্স টেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেললো। কিন্তু আমি তখনো অপরাজিত। অবশ্য জয়সি আমাকে সাহায্য করে গেল এ ব্যাপারে। এক সময় দুজনেই এক চরম সুখকর অবস্থায় পৌঁছে গেলাম। দুজনেরই চোখ বুজে এলো এক সঙ্গে। আমি তার বুকের ওপর পড়ে রইলাম সেই অবস্থায়।

তারপর একসময় জয়সি শান্ত চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। এত সুখ আমি জীবনে এর আগে কখনও পাইনি।

আমি প্রত্যুত্তরে মিষ্টি হাসলাম ক্যারিবিয়ানের উষ্ণ চাদরের তলায় শুয়ে, সেই মুহূর্তে আমি রেডিও সিগন্যাল শুনতে পেলাম, তাড়াতাড়ি রেডিওরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। ম্যাক তখন আমাকে বার্তা পাঠাচ্ছিল সাংকেতিক ভাষায়। ওয়ালটন এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লাইসেন্স প্রাপ্ত, একমাস কাজ চালানোর পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মিয়ামির হ্যামরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। খুব বেশী মেয়ে এ দুটো এজেন্সির মারফৎ চাকরী পায় নি। ম্যাকের বার্তার শেষ অংশটুকু আমার চোয়াল শক্ত করে তুললো। দাবীপত্র পাওয়া গেছে। সময় ফুরিয়ে আসছে। তুমি যদি কোন সন্ধান করে থাক তাহলে এগিয়ে চল।

হ্যাঁ সন্ধান পেয়েছি বৈকি। সেই অলৌকিক দ্বীপের পাশে প্রবাল দ্বীপের সন্ধান এবং আরো অনেক কিছু। সেই ফরাসী ইন্টেলিজেন্স অফিসার বর্ণিত বৈজ্ঞানিক হ্যারল্ড ফ্রাটকের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তারপর মনে পড়লো সেই দাস ব্যবসায়ীর কথা, মেয়ে সংগ্রহই যার প্রধান ব্যবসা ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েদের চাকরী দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো, কারণ জয়সির অনুসন্ধান প্রমাণ করে দেয় যে, নিঃসঙ্গ ধনী বৃদ্ধ বলে এখানে কেউ থাকে না। ওরকম কারোর নিজস্ব কোন দ্বীপ এখানে নেই। আসলে এইসব এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি, কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেওয়া এসবই জুডাসের কুকীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

মনে মনে ভাবলাম অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও আর একবার ঐ দ্বীপে অনুসন্ধান কাজ আমি চালাব। জয়সিকে বললাম ও ঐ ছোট জাহাজটিতে অপেক্ষা করে থাকলেই অনেকখানি সাহায্য করা হবে।

আমি জয়সিকে কথা দিলাম কাল সকালের কোন এক সময় আমি তাকে রিপোর্ট করবো।

এরপর আমি জয়সির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জলে নেমে এলাম, জয়সি হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো, মনে মনে ভাবলাম আমার জন্য আরো অনেক মেয়ে অপেক্ষা করে আছে ঐ অলৌকিক দ্বীপটিতে। জুডাসের সামনাসামনি দাঁড়াতেই হবে। চিরদিনের মতো সেই শয়তানকে খতম করে দিতে হবে।

।। ছয় ।।

ট্রিটনে ফিরে এসে দ্রুত কেবিনে চলে এলাম। স্টুয়ার্টের তৈরী স্কুবা সুটগুলির মধ্য থেকে একটা বিশেষ ধরনের পোশাক টেনে নিয়ে চোরা পকেটগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। স্টুয়ার্ট আমাকে সেই পোশাকটা ব্যাখ্যা করছিল। কোন পকেটে কি আছে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ছোট সিরিশের ক্যাপসুলগুলো হচ্ছে বিস্ফোরক বস্তু। ছোট লাইটারটা সিগারেটের অর্ধেকের থেকেও বিস্ফোরক জিনিসে আগুন লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। ঢাকনা দেওয়া একটা পকেটের ভেতরে রয়েছে জলের নীচে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য রবারের মোড়া তার জাতীয় বস্তু। নাইট্রোলিসারিন মাখানো। স্টুয়ার্ট আমাকে সেটার ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সুটের অপর পকেটে একটা ছোট ট্রান্সমিটার রাখা আছে। মাত্র একটা বার্তা পাঠানোর উপযোগী করে তৈরী করা এই ট্রান্সমিটার। বার্তা পাঠানোর পরেই তার আয়ু শেষ। এসব ছাড়া আরো কতগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস সেই বিশেষ ধরণের সুটের বিভিন্ন পকেটে থাকতে দেখা গেল। বিপদের সময় এসবগুলো প্রয়োজন হতে পারে। আমি যখন আমার জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত তখন হঠাৎ বিল হেডউইন এসে খবর দিল, ড্যানিয়েল তার সী স্পাইডারের অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে। আমি ব্যস্ত হয়ে তক্ষুনি তার কেবিনে চলে এলাম এবং তখন আমার আর এক দফা অবাক হওয়ার পালা। ড্যানিয়েল আজ সুন্দর করে সেজেছে, তার রূপ যেন ফেটে পড়ছে। সে আজ উঁচু করে চুল বেঁধেছে। পরনে লাল বিকিনি।

তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ড্যানিয়েল, আমি তার উদ্ধত বুকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সম্ভাষণ করলাম, বিকিনির আড়ালে তার স্তন যুগল অসম্ভব ফোলা দেখাচ্ছিল। যেন লাল গোলাপ ফুটে রয়েছে বুকের মাঝে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হচ্ছে, আজ রাত্রে ফিরছি না।

ড্যানিয়েল ঘুরে দাঁড়াল। তা কখন ফিরে আসছো? কাল সকালে। আমার একবার ইচ্ছা হলো ড্যানিয়েলকে সব খুলে বলি, কিন্তু কি ভেবে চেপে গেলাম। আমি ড্যানিয়েলের কাছে গিয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। আমি বুঝতে পারলাম ড্যানিয়েল দু'হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, ড্যানিয়েল সবেমাত্র তার ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটের সঙ্গে মিশিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজের ওপর গোলা বর্ষণ হলো। ড্যানিয়েল লাফিয়ে উঠলো। ও দিকে আমি ছুটে গিয়ে চোখ রাখলাম কামানের গোলা ছোঁড়ার গর্তটার ওপর, উঁকি মেরে দেখার জন্য। এক ধরনের অনুসন্ধানকারী জাহাজ দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। গোলা বর্ষণের অর্থ হলো তারা আসছে, আমাদের জাহাজটাকে সতর্ক করে দিতে চাইছে।

অনুসন্ধানকারী জাহাজটা তখন ট্রিটনের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অফিসার সহ ছজন লোককে দেখতে পেলাম, বাকী পাঁচজন নাবিক। সেই দীর্ঘদেহী অফিসারের ইউনিফর্ম দেখে আমি চিনতে পারলাম, তারা কোথা থেকে আসছে, আর কেনই বা আসছে। তারা হলো ভেনেজুয়েলিয়ান, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পাহারা দেওয়া যাদের কাজ। কিন্তু ট্রিটনকে পরীক্ষা করার কোনো কারণ আমি দেখতে পেলাম না। তারা তাদের ছোট ডিঙ্গি ছেড়ে ট্রিটনে উঠে এলো।

লম্বা রোগাটে অফিসার ভদ্র লোকটিকে বেশ বিজ্ঞ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে মনে হয়। লোকটার উদ্দেশ্য যে কি, ঠিক তা বোঝা যাচ্ছে না। যাইহোক আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। মই বেয়ে নিঃশব্দে জাহাজ থেকে নেমে জলে ভাসতে থাকলাম, জাহাজের দেওয়াল ঘেঁযেই নিজের দেহটাকে জলে ভাসিয়ে রাখলাম। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম অফিসার ভদ্র লোকটির সঙ্গে ড্যানিয়েল এবং বিল হেডউইনের কথোপকথন।

নীচের ডেকগুলো আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অফিসারটির ইচ্ছের কথা শুনে চমকে উঠলাম আমি। তাহলে? বিড়াল কি ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে?

আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী মনে করলাম। তারা আমার আসল পরিচয় জানেন না: যে কোনো মুহূর্তে বিড়াল একবার যদি ইঁদুরের সন্ধান পেয়ে যায়—আমি পরের কথাগুলো আর ভাবতে পারলাম না। এরপর দড়ির মই বেয়ে আবার ফিরে এলাম ট্রিটনে। আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করে ট্রান্সমিটারের সামনে বসে ম্যাককে বার্তা পাঠানোর জন্যে তৎপর হলাম।

বার্তাটা হলো এই রকম—

মনে করুন আমি এখন কড়িকাঠের উপর ঝুলছি। চূড়ান্ত অভিযানে আমি এক্ষুনি নেমে পড়ছি। প্রতিটি মিনিট এখন আমার কাছে মূল্যবান সময়।

ট্রান্সমিটার অফ করে রিভলবিং চেয়ারটা ঘোরাতেই আমি দেখলাম, ড্যানিয়েল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

সত্যি করে বলতো কে তুমি? ড্যানিয়েল শান্তভাবে প্রশ্ন করল। এই রকম এ ঘরে তোমার প্রবেশ করা উচিৎ হয় নি। আমি বললাম, তোমার এ কাজের জন্য দেখবে একদিন তোমায় ব্যথা পেতে হবে।

ড্যানিয়েল বেশ জোরের সঙ্গেই চিন্তা করে বলল,—কিছুদিন থেকে আমি তোমাকে সন্দেহ করছিলাম। এখন আমি একেবারে নিশ্চিত। বল তুমি কে?

আমি ড্যানিয়েলের দিকে স্থির চোখে তাকালাম, আমি ঠিক করলাম এবার ড্যানিয়েলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

আমি প্রতারক নই! আমি আরো বললাম—আর জোর দিয়ে আমি এ কথাটা বলতে পারি, ভেনেজুয়েলিয়ানদের সঙ্গে ঐ জাহাজটার কোন সম্পর্ক আদৌ নেই। আমার কথা শুনে ড্যানিয়েল স্তব্ধ হতবাক।

আমি বললাম, আমার নাম টেড, কিন্তু কখনই কমান্ডার ছিলাম না। আমি সিক্রেট এজেন্ট। আমি তোমাকে যা বলবো সব সত্যি। রূপকথার গল্প মনে হলেও খাঁটি সত্য। এই মুহূর্তে তোমাকে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করলে কিছু এসে যাবে না বলে আমি মনে করি। আমি সংক্ষেপে অতি দ্রুত আমার কাহিনী বলে গেলাম।

আমি কথা শেষ করে ড্যানিয়েলের দিকে তাকালাম। তার নীল চোখ দুটি এখন অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সেই নীল চোখে এখন গভীর বিস্ময়, সমুদ্রের ঐ নীল অতল জলের মতই অবাক করা।

ড্যানিয়েল বললো, যা তুমি খুঁজতে যাচ্ছ সেটা তুমি নিজেই হয়তো জানো না। জুডাস হয়তো সেই দ্বীপে থাকতে পারে, কিন্তু তোমার মুখে শুনলাম লোকটা যে রকম ফন্দিবাজ তাতে তার অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

এখন কেবল একটাই চিন্তা আমাদের, সর্বাধুনিক সাবমেরিনগুলো অক্ষত অবস্থায় কি করে উদ্ধার করা যায়। আমি অনুভব করলাম ড্যানিয়েল আমার হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো দু'হাতের আঙুলগুলো দিয়ে, যেন সে আমাকে একা ছাড়তে চায়না। আমি আর দেরী না করে ড্যানিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেকের ধারে এগিয়ে গেলাম। আমার এক হাতে সাঁতারের জন্য ব্যবহৃত পাখীর ডানা।

বাতাসের তীব্রতা এড়ানোর জন্য আমি আমার ছোট প্লেনটা নীচু দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। জয়সির সেই ছোট জাহাজটির কাছে। সেখান থেকে আমি যাবো আমার অভিযানের মূল ভূ-খণ্ড কম্ব ও নোরেস্টা দ্বীপে রবারের ভেলায় চেপে। আপাততঃ এই আমার পরিকল্পনা।

অপরাহ্নবেলায় জাহাজের ওপর চারপাশে জল আছড়ে পড়ছিল। আমি জাহাজের ওপর প্লেনটা নামিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম ডেকের চারপাশে। আমি ভাবছিলাম জয়সি দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসবে। কিন্তু কোথায় জয়সি? কয়েকবার ওর নাম ধরে ডেকেও কোনো সাড়া পেলাম না। কেবল সমুদ্রের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

অনেক দূরে চোখে পড়লো একটা কাঠের ভেলা সামনে দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কি ঘটেছে এরপর আর বুঝতে বাকি রইল না। তাহলে? ট্রিটন থেকে ফেরার পথে ভেনেজুয়েলিয়ানরা কি জয়সির জাহাজটা দেখতে পেয়েছিল, এবং তারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে? মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার পরিকল্পনার কিছু অদল-বদল করলাম। রবারের ভেলার বদলে আমি জয়সির জাহাজটাকেই চালিয়ে নিয়ে যাবো ঠিক করলাম; হয়তো জয়সির জীবন রক্ষা হতে পারে।

দক্ষিণা বাতাস বইছিল। আমার হাতে জাহাজখানি পালতোলা হাল্কা নৌকার মত ছুটে যাচ্ছিল। তখনও বেশ আলো ছিল। প্রবাল বেষ্টিত সেই ছোট্ট দ্বীপটা আমার দৃষ্টিগোচরে এলো। আমি ইতিমধ্যে আমার পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ছোট বেঁটে খাটো লোকটি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। প্রথমে সে ভাবল গোধূলী আলোটা তার ওপর বুঝিবা মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। একটা ভৌতিক ধূসর আলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছিল।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে বুঝতে পারলো সেটা জয়সির ছোট্ট জাহাজখানা। তার বাকী সঙ্গীদের ওপর খুব রাগ হলো। সে প্রথমে সুইচ বোর্ডে হাত দিয়ে লাল বোতামের ওপর চাপ দিল। তার আওয়াজটা হ্যারল্ড, তাতার এবং আরো তিনজন সহচরদের তার চেম্বারে টেনে আনতে বাধ্য করবে। তাদের আসার অপেক্ষায় থাকার সময় সে নিজের ওপর ভীষণ রাগ করল। ট্রিটনে হ্যারল্ডকে পাঠানোই তার ভুল হয়েছে। কিন্তু হ্যারল্ড তাকে ধরে বসলো আর তার অনুরোধেই সে তাকে অনুমতি দিয়েছিল। ফেরার পথে জয়সির সেই ছোট্ট জাহাজটা দেখতে পেয়ে তারা ওখানে হানা দেয় এবং সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে আসে সেখান থেকে। জুডাস সেই মেয়েটিকে তাদের ধরে আনতে দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

দৈত্য সমান মঙ্গোলিয়ানকে অনুসরণ করে হ্যারল্ডই প্রথমে জুডাসের অফিস ঘরে প্রবেশ করল। অপর তিনজন প্রহরী সে সময় ঘরে ঢুকলো। তাদের সবার চোখে একটা অজানা ভয় থিরথির করে কাঁপতে থাকে।

আমি তোমাদের বলেছিলাম ট্রিটন জাহাজে অনুসন্ধান করে ফিরে আসতে, জুডাস চীৎকার করে বললো—অন্য কোথাও কেউ তোমাদের থামতে বলেনি, কিংবা ঐ মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসতে বলেনি।

জুডাস জানলা পথে আবার উঁকি মারল। জয়সির সেই ছোট্ট জাহাজটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে

আসছিল তখন। জুডাস তার হাতের রিভলবারটা শক্ত করে ধরলো। তারপর তাতারের দিকে ফিরে বলল—একজন নাবিকের সঙ্গে তুমি এক্ষুনি চলে যাও। জাহাজটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দাও। আমি ওটার কোনো চিহ্ন রাখতে চাই না। সে যেই হোক না কেন, তাকে হত্যা করে এসো।

তাতার ডিঙ্গি নিয়ে ছুটে চলেছে। উদ্দেশ্য জয়সির জাহাজটার ওপর তীব্র আঘাত হানা।

ওদিকে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলাম। আমি আমার পরিকল্পনা মতো জাহাজের একেবারে পিছন দিকে চলে এলাম। জাহাজের ইঞ্জিন চালু রইলো, সেটা তার গতি পথে এগিয়ে চললো। দড়ির মইটা জাহাজের পিছন দিকে আগে থেকেই ঝোলান ছিল। আমি সেই মই বেয়ে জলের ওপর নেমে এলাম।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় ঝুলে থেকে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম। জাহাজটা তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে থাকলো, জাহাজটার গায়ে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছিল। তার ঝাপটা এসে লাগছিল আমার গায়ে।

ওদিকে ডিঙ্গিটা এবার জাহাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আমি জলের নীচ থেকেই শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। সম্ভবতঃ ওরা মেসিনগানই ব্যবহার করে থাকবে। একবার জলের ওপর ভেসে উঠে দেখে নিলাম জাহাজটার পরিণতি।

খুব সতর্কতার সঙ্গে আমি সাঁতার কাটছিলাম, দেখলাম তাতার ফিরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতার তার ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে দ্বীপের প্রবেশ পথে ঢুকে পড়েছিল।

হঠাৎ আমার নজরে পড়লো বিরাট বিরাট ড্রেন পাইপ। ভাবলাম এগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হয় সে রহস্যটা আগে আমাকে জানতে হবে।

এক সময় আমি বুঝতে পারলাম যে প্রবাল দ্বীপ এবং উপহ্রদের মাঝপথে এসে আমি উপস্থিত হয়েছি। লম্বা করিডোরের মত চ্যানেল। আমি খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে থাকলাম। প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না। কিন্তু দ্বীপের গভীরে প্রবেশ করার পর দেখলাম দূরে দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা ডিম্বাকৃতি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবতঃ বাড়িটা দোতলার সমান উঁচু। ঠিক প্রবেশ পথে স্টীলের বিরাট দুটি আধার দেখতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম ও দুটো বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দেবো। বিশেষভাবে তৈরী প্যান্টের পকেটে রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক দ্রব্য। কিন্তু আপাততঃ সেটা পকেটের মধ্যেই রেখে দিলাম। কারণ, আমাদের সাবমেরিনগুলো এবং নাবিকরা সেখানে নিরাপদে আছে কিনা তা না জানা পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।

আমি এখানে এসেছি সাবমেরিনগুলো এবং নাবিকদের উদ্ধার করতে কিন্তু ধ্বংস করতে নয়। যেভাবে হোক সমুদ্রের তীরভূমি খুঁজে বার করতেই হবে। এবং সমুদ্রের ফাঁদ খোলার পথ আমাকে খুঁজে দেখতেই হবে।

হঠাৎ আমার চোখে পড়লো কতগুলো সুস্পষ্ট কালো ছায়ামূর্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ আমার কাঁধের পাশ দিয়ে কয়েকটা ধারালো অস্ত্র ছুটে বেরিয়ে গেলো।

মনে হয় জলের তলায় কোথাও টিভি ক্যামেরা বসানো আছে নিশ্চয়ই সমুদ্রের ফাঁদের প্রহরায়। এবং এখানে আসামাত্র সেটা আমার আসার খবর পাঠিয়ে থাকবে হয়তো।

এখন একমাত্র উপায় হলো নিজেকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করা। স্টুয়ার্টের কথা আমার মনে পড়ে গেলো। প্রকৃতির কাছে আমরাই ঋণী, যখন, যে কোনো প্রয়োজনে। স্টুয়ার্ট আমাকে একটা শিশি দিয়ে বলেছিলো, বিপদের সময় এটা কাজে লাগতে পারে। আমি সেই শিশিটা পকেট থেকে বার করে তার শেষ প্রান্তে চাপ দিলাম। হাতটা অসম্ভব কেঁপে উঠে সেটা ফেটে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশ ঘনকালো মেঘের মত ছেঁয়ে গেলো। শিশি থেকে সেই তরল জাতীয় পদার্থ জলের ওপর পড়ে একটা কালো পর্দা সৃষ্টি করলো। আমার দেহটা ঢাকা পড়ে গেলো সেই কালো পর্দার আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরেই বীচের উপর দাঁড়িয়ে স্কুবা স্যুটটা খুলে বালির ওপর ফেলে দিলাম। পকেটগুলোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলাম। হাতে উঠে এলো বিস্ফোরক তার, একটা ছোট ট্রান্সমিটার তার। এগুলো আমি অতি সাবধানে বালির নীচে চাপা দিয়ে রাখলাম। আমি আমার

সঙ্গে রাখলাম কেবল সিগারেট লাইটারের আকারের ছোট একটা রিভলবার এবং দুটি ছোট সিরিস ক্যাপসুল। তারপর নীচু হয়ে ছুটে চললাম দ্বীপের প্রবেশপথের দিকে।

ওদিকে তখন সেই রহস্যময় বাড়ির একটি ঘরে কুৎসিত দেখতে ছোটখাটো বেঁটে লোকটা রাগে উত্তেজনায় লাফাতে শুরু করে দিয়েছিল। সব দৃশ্য সে দেখে ফেলেছে। জলের নীচে রাখা টি. ভি. ক্যামেরা তাকে প্রতিটি দৃশ্যের ছবি পাঠিয়ে ছিল।

লোকটি চীৎকার করে উঠলো, বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাও।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা সংকেতধ্বনি শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার উধাও হয়ে গেল। সারা দ্বীপ নীলাভ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো।

আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। একদল সশস্ত্র প্রহরী আমার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করতে উদ্যত। আমি তাড়াতাড়ি দেহটাকে গাছের আড়ালে নিয়ে গেলাম। পরপর তিনটি গুলি এসে গাছটিতে বিদ্ধ হলো। আমি এবার পজিসন নিলাম। পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়লাম। অব্যর্থ লক্ষ্য। তিনজনই রক্তাক্ত কলেবরে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো।

আমি তখন দ্বীপের প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই পথ দিয়েই আমি ছুটে চললাম। আমার চোখে পড়লো সত্যিকারের একটা বিরাট জেটি। সেখানে একটা জাহাজের অস্তিত্ব দেখতে পেয়ে ছুটে গেলাম সেদিকে। তারপর একরকম লাফ দিয়ে উঠলাম গিয়ে সেই জাহাজটায়। এখানে আমি অস্ত্রের ভাণ্ডার আবিষ্কার করলাম। দুটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, একটি মেসিনগান। অস্ত্রগুলোর দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলাম—এরপর আমার হাত থেকে এই দ্বীপের আর কেউ রক্ষা পাবে না।

জেটির দিকে লোকগুলো তখন এগিয়ে আসছিল। আমি ডেকের উপর স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো। জলে ভারী জিনিস পতনের শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আর্তচীৎকাব। বাকীরা সবাই প্রাণ হাতে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলো। আমি উল্লাসে ফেটে পড়লাম। আমি আর দেরী না করে ডেকের ওপর থেকে ঝাঁপ দিলাম।

কিছুক্ষণ পর সেই রহস্যময় বাড়ির প্রবেশ পথে পৌঁছলাম। কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম আধডজন প্রহরী আমার দিকে ছুটে আসছে। আমার হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আবার গর্জে উঠলো। গুলির মুখে পড়ে তারা পিছু হটে গেল। এবার আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে থাকলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছবার আগেই দেখলাম একেবারে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল দেহী একটা লোক। আমি তাকে চিনতে পারলাম, মঙ্গোলিয়ান। আমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দানব মঙ্গোলিয়ান, নীচে তার সহচর। আমি তাদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। উপায় না দেখে আমার হাতের ছোরাটা তাতারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম। একটু পরেই আমার ঘাড়ের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলাম। আমার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকলো। চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

জ্ঞান ফিরে আসতেই আমার পিঠের ওপর অসম্ভব ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। উঠে বসতেই কানে কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম, অদ্ভুত হাস্যকর চেহারার এক ছোট খাটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট চেহারা সর্বস্ব মঙ্গল দাঁড়িয়ে ছিল জুডাসের পাশে। তার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমার মনে হলো এই লোকটাই সেই যুদ্ধ জাহাজের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সে অফিসার র‍্যাঙ্কের। সেখান থেকেই সে হুকুম দিচ্ছিল তাদের জাহাজটা মার্চ করার জন্য। রোগাটে লম্বা চেহারা, চোখে চশমা।

হ্যারল্ড, তোমার সঙ্গে আমাদের এক পুরোনো বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই। জুডাস তাকে উদ্দেশ্য করে বললো। আমি তখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তারা একটা বিরাট রেকট্যাঙ্গুলার জাহাজের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। তার ওপর সাজানো রয়েছে ট্রান্সমিটার, স্পীকার, ডায়াল, স্যুইচ, নব ইত্যাদি।

ইনি হলেন সেই বিখ্যাত টেড। জুডাস পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এলো সে। তার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

হয়তো আমি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছি, জুডাস আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, অবশ্য আমি এমন কিছু চাইনি যা আমাদের পরিকল্পনার বাইরে ভুল হতে পারে।

আমি বললাম, তাহলে কি আপনি সুখী নন? এই যে আপনি আমাকে আপনার বিরাট কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন, আমি আপনার উপকারে লাগার চেয়েও দ্বিগুণ বিপজ্জনক ।

মুহূর্তেব জন্যে জুডাসের চোখে একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখা গেলো। আমাকে বললো, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি আপনি আমার কাছে সত্যি বিপজ্জনক বটে! কিন্তু এখন নয়। হয়তো আপনি আপনার বুদ্ধিবলে আমার চোখকে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভেদ্য দ্বীপ ছেড়ে আপনি কিছুতেই পালাতে পারবেন না। হ্যাবন্ড এখানে আমার হাতে হাত মিলিয়ে এই দ্বীপটাকে নিশ্ছিদ্র করে রেখেছে, পালাবার কোন পথই খোলা নেই।

আমি মন্তব্য করলাম, আপনাদের ঐ লোহার বেষ্টনীর কথা বলছেন তো?

জুডাস মাথা নেড়ে বললো, দেখছি আপনি তাহলে ওটার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু সেটার সম্বন্ধে আমি আপনাকে আরো অনেক তথ্য জানাতে পারি। সেটা আরো ভয়ঙ্কর, আবো মর্মান্তিক শোনাবে আপনার কাছে। যাইহোক এখন আমার বা আপনার হাতে সময় বেশী নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি আমাব সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আবোহণ করতে চলেছি। অপব দিকে আপনার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে আর মাত্র কযেক ঘণ্টা বাকী রয়েছে হয়তো' এ সময় যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার আমি করবো, অবশ্য আপনার কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার পেলে। ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা তার দূত মাবফৎ আমাদের নির্দেশ মতো একশ মিলিয়ান ডলার দেবার ব্যবস্থা করেছেন শুনেছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও আপনি আমাদের সন্ধান করে পেয়ে গেছেন, কিন্তু সেটা বড়ো দেরী হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম সত্যি কি এক্স-৮৮ আপনাদের কাছে বন্দী হয়ে আছে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তাদের সেই লোহার বেষ্টনির ভিতর রাখা হয়েছে। আর তাদের সেই নাবিকগুলো সাবমেরিনের ভিতর দিব্যি বেঁচে আছে। তাদের জন্য আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। এখানে আপনি আপনার নিজের কথা চিন্তা করুন।

জুডাস একটা বিরাটকায় টেলিভিশন সেটের সামনে গিয়ে স্যুইচ অন করে দিল। টি. ভি.'র পর্দায় সেই লোহার বেষ্টনী দেওয়া অংশের ছবি ভেসে উঠতে দেখলাম আমি।

দেখলাম ধীরে ধীরে সমুদ্রের ফাঁদ খুলে যাচ্ছে। লোহার বেষ্টনীটা পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যেতে দেখা গেলো। তাদের সাবমেরিনটা অক্ষত অবস্থায় সেখানে বন্দী হয়ে রয়েছে। কি অদ্ভুত প্রযুক্তি বিদ্যার নিদর্শন। মনে মনে ভাবলাম প্রযুক্তিবিদ্যার সব কলকাঠি নস্যাৎ করে দিয়েছে হ্যারন্ডের এই অভিনব আবিষ্কার। আবার সুইচ টিপে যে কোনো মুহূর্তে ঐ লোহার বেষ্টনীটার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায়। তাতে বাঁচার চেয়ে মরণ ফাঁদে পা দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এর জন্য সব প্রশংসাই হ্যারন্ডের প্রাপ্য হওয়া উচিৎ।

হ্যারন্ডের দিকে ফিরতে দেখা গেল তার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। এটা আমাদের ঐ লোহার দুর্গের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যও বলতে পারেন। সবই দূর থেকে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। জলের নীচে টি. ভি. ক্যামেরা আছে। আর এখানে ঐ টি. ভি সেটটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কোনো বিপদের ছবি ঐ টি. ভি. সেটে ধরা পড়লেই আমরা সুইচ টিপে সেইসব বিপদগুলোর মোকাবিলা করে থাকি। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমাদের এখানকার প্রহরীবা সমুদ্রের ঐ ফাঁদের কথা আদৌ জানেই না। তারা শুধু জানে, এই দ্বীপটাকে পাহারা দেওয়াব জন্যেই তাদের এখানে চাকরী দেওয়া হয়েছে।

তাই বুঝি! আমি অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠে এবার জিজ্ঞেস কবলাম আগেব দুটো সাবমেরিনের খবর কি?

জুডাস উত্তরে বললো, তারা দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। যান্ত্রিক গোলোযোগেব দরুন সে দুটোর এই পরিণতি ঘটে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক।

আমি মন্তব্য করলাম, এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে আপনারা এখানে প্রযুক্তিবিদ্যায যথেষ্ট

উন্নতি করেছেন।

জুডাস বললো—আমাদের উদ্দেশ্য হল নিজেদের প্রয়োজনে আরো কিছু মূলধন হাতে পেলে আমরা হয়তো আরো উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারতাম। এখন কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে আরো গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে আমাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন। আর সেই জন্যই তো আপনাদের কাছে ঐ মুক্তিপণের দাবী করা হয়েছে। অতঃপর হ্যারল্ড তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে বসল।

এদিকে আমি সাবমেরিনের ভেতর অবস্থানরত মানুষগুলোর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবছিলাম। সাবমেরিনের সমস্ত যন্ত্রপাতি ওরা অচল করে দিয়েছে। তারা এখন অসহায় জীবন যাপন করছে। মনে মনে ভাবলাম যে ভাবেই হোক ওদের বন্দীদশা ঘোচাতেই হবে।

জুডাস এবার হ্যারল্ডের দিকে ফিরে বলল—আমার ঐ বন্ধুটির আর একটা ভালো গুণ আছে জানেন কার্টার? মেয়েদের যৌন সুখ দিতে ওর মতো বোধহয় কেউ নেই। কীলমাস্টার কার্টার, শুনেছি আপনি তো আপনাদের দেশের একজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট তা আপনাদের জন্যে এরকম আনন্দ উপভোগের কোন ব্যবস্থা নেই? যাইহোক এ ব্যাপারে হ্যারল্ডের জন্য আপনার কিছু ভাবা উচিৎ।

হ্যারল্ডের চোখে কামনার হাসি। জুডাস সংলগ্ন ঘরের দরজা খুলে দাঁড়াতেই তাতার আমাকে সজোরে সেই ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল। চারিদিকে সাদা টালিতে মোড়া। ঘরের দুদিকে সারিবদ্ধ ছোট্ট কক্ষ। সেই সব কক্ষের ভেতর থেকে বীভৎস কান্না এবং গোঙানির আওয়াজ আসছিল। আমি দেখলাম, প্রতিটি কক্ষে এক একটি নগ্ন নারী। নারী বলতে যা বোঝায় তাদের কারোর দেহেই নারী সুলভ বস্তুগুলো ছিল না বললেই চলে। অসংখ্য অত্যাচারের চিহ্ন তাদের দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, দেহ ক্ষত বিক্ষত। প্রায় প্রতিটি মেয়েরই স্তনযুগল কেটে নেওয়া হয়েছে। সত্যি কি নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্বাক্ষর বহন করছে তারা। একটি মেয়ের স্তন জোড়ার ওপর রক্তচোষা জোঁক বসান হয়েছে। দেখে মনে হয় ব্লটিং পেপার দিয়ে তার দেহের সব রক্ত চুষে নেওয়া হয়েছে। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। সে জয়সি। আমি সেইসব অসহায় মেয়েদের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, তাদের মুখে কি পরিমাণ ক্ষোভ, যন্ত্রণা থিকথিক করছিল। আমি তাদের সেই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না।

অবশেষে তারা শেষ কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। যেই কক্ষটা খালি ছিল সেই কক্ষের ভিতর আমাকে ঢোকানো হলো। আমি বদ্ধ কক্ষের মধ্যে পায়চারি করতে থাকলাম।

হ্যারল্ড সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার কক্ষের সামনে এসে অবজ্ঞা করার মতো করে বললো, এখানে তোমার বিশেষ ব্যবস্থা করার কথা আমি ভেবে দেখবো।

গুহার গরাদগুলো বেশ ফাঁক ফাঁক অবস্থায় বসানো ছিল। দুটো গরাদের মধ্যেকার ফাঁকটুকু দিয়ে আমি হাত গলিয়ে হ্যারল্ডকে কিছু বুঝতে দেওয়ার আগেই তার মুখের ওপর ঘুঁষি চালিয়ে দিলাম। দু হাতে মুখ ঢেকে মেঝের ওপর বসে পড়লো সে।

প্রহরীরা ছুটে এলো, জুডাস রক্তচক্ষু নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি দেখবো যাতে করে তোমাকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যদি হ্যারল্ডের চোখের কোনো ক্ষতি হয়—কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে চলে গেল।

আমি ঘরের একটা কোণায় গিয়ে বসলাম। আমার মাথায় এখন অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছে। এখানে এসে আমার কিছু বাড়তি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ভোর হয়ে এলো। আরো এক ঘণ্টা কিংবা দু ঘণ্টা পরে জুডাসকে মুক্তিপণ দিয়ে দেওয়া হবে। তার আগেই লোহার বেষ্টনীর সামনে গিয়ে হাজির হতে হবে এবং সাবমেরিনটাকে মুক্ত করে দিতে হবে। কিন্তু জুডাসের প্রহরীদের সঙ্গে সামনা সামনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মন চাইলো না আমার। তাই ভাবলাম যে করেই হোক প্রহরীদের অন্য কাজে নিয়োগ করে রাখতে হবে। আর সেই সুযোগেই অনায়াসে আমি সমুদ্রের ধারে চলে যেতে পারবো। বালির নীচে পুঁতে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো তুলে ফেলতে হবে। তারপর সাবমেরিন এক্স-৮৮ টাকে মুক্ত করে দিয়ে আবার ফিরে আসবো জুডাসের কাছে। তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে হবে, যে এতগুলো মানুষকে পরাধীন করে রেখে অমানুষিক অত্যাচার চালায়, তাকে স্বাধীন ভাবে বাইরে চলাফেরা করতে

দেওয়া উচিৎ নয় বলে আমার মনে হয়। তবে তার আগে এই বিকলাঙ্গ নারীগুলোকে মুক্ত করে দিতে হবে।

জুডাস এবং হ্যারল্ড তাদের যা ক্ষতি করেছে তা কখনো পূরণ হবে না। হ্যারল্ড এইসমস্ত নারীদের যৌন ক্ষমতার ওপরও ছুরি চালিয়েছে নির্দয়ভাবে। মনে হয় এখানে প্রায় পঞ্চাশটি মেয়ে বন্দী অবস্থায় আছে। তাছাড়া সাত আটজন প্রহরী, জুডাস হ্যারল্ড এবং মঙ্গল। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র না থাকলেও তারা বেশ শক্তিশালী। এখন কথা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এখান থেকে সে বের হতে পারবে কিনা, কারণ প্রহরীদের চোখে পড়লে আর রেহাই নেই। প্রথমে প্রহরীকে খতম করতে হবে। আমি পকেট থেকে একটা জিলেটিন ক্যাপসুল বার করে অপেক্ষা করে থাকলাম। আর এক হাতে মিনিলাইটার।

প্রহরী টহল দিচ্ছে। আমি আর দেরী না করে জিলেটিন ক্যাপসুলে আগুন ধরালাম। ক্যাপস্যুলের চারপাশ দিয়ে আগুনের রুপোলী শিখা ঝরে পড়ছে। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত ক্যাপসুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম প্রহরীর পা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার। তারপরই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

এবারে আমি দ্বিতীয় ক্যাপসুলটায় আগুন ধরালাম। জ্বলন্ত ক্যাপসুলটা এবার লোহার দরজা সংলগ্ন তালাটার ওপর স্থাপন করলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দরজা ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। এরপর একটা কক্ষ থেকে আর একটা কক্ষে ছুটে যেতে থাকলাম। প্রতিটি কক্ষের তালামুক্ত করে দিলাম কিন্তু দরজা খুললাম না। সে কাজটা তারা নিজেরাই করে নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত আমি সব কক্ষের দরজাগুলো খুলে দিলাম। তারপর কয়েকটি কক্ষের দরজা চকিতে খুলে দিয়েই ছুটে চলে এলাম বাইরে বের হবার দরজা পথে।

সেখান থেকে লক্ষ্য করলাম মেয়েরা একে একে যে যার কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। হৈ চৈ চীৎকার, সব মিলিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা।

যাইহোক আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে, এখন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বেরিয়ে আসার মুখে এক প্রহরীর সামনে পড়লেও তাকে কাবু করতে বেশী সময় লাগেনি। নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধানে এসে শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। সেই সঙ্গে অসহায় মেয়েগুলোর কান্নার শব্দ। প্রহরীরা এখন ভীষণ ব্যস্ত। ঠিক এইরকমটি আমি চাইলাম।

আমি হঠাৎ দেখলাম নগ্ন নারীরা ছুটে আসছে রোগাটে দীর্ঘদেহী সেই লোকটার পিছনে। লাউড স্পীকারে জুডাসের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। না, ও পথে নয় হ্যারল্ড বাড়ির অপর দিকে ঘুরে এসো। দুজন প্রহরী তোমাকে সাহায্য করবে। হ্যারল্ড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। এবার নগ্ন মেয়েগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এতদিন তারা অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর তারা। মেয়েগুলো যেন হ্যারল্ডকে জীবন্ত খেয়ে ফেলছে।

জুডাসের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল লাউডস্পীকারে। এবার সে প্রহরীদের উদ্দেশ্য করে বলছে, তোমরা ওখানে ছুটে যাও। ওকে রক্ষা কর, ওকে রক্ষা কর।

আমি এবার তাতারকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ওদিকে তাতারকে ছুটে আসতে দেখে নগ্ন মেয়েগুলো এবার উঠে দাঁড়ালো হ্যারল্ডকে ছেড়ে দিয়ে। তারা এখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। জ্বলন্ত চোখ নিয়ে তারা তাতার-এর দিকে এগিয়ে গেল। হ্যারল্ড-এর মতো তাতারকেও তারা জীবন্ত ছিঁড়ে খেতে চায়। কোনো সন্দেহ নেই জুডাস এ দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই কোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকবে।

আমি এবার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললাম। বিশেষ ধরনের ট্রান্সমিটার এবং বিস্ফোরক বস্তুগুলো একটা গাছের আড়ালে রেখে দিয়ে জলে ঝাঁপ দিলাম। ওদিকে সেই রহস্যময় বাড়ির ভিতর থেকে রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। ততক্ষণে আমি আমার উষ্ণ দেহটাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

॥ সাত ॥

সমুদ্রের ফাঁদটা বড় গভীর। আমি অনুভব করলাম, জলের চাপ এতো বেশী যে, হাত পা ছুঁড়তে গিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, ফলে আমাকে ঘন ঘন অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছিল।

অবশেষে আমি আমার অভিযানের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম। সামনেই সেই বিরাট আকারের লোহার পাতে মোড়া আঁধার। সমুদ্রের ফাঁদ। এটাকে এবার ধ্বংস করতে হবে। আমি এবার প্রস্তুত হলাম। আমার হাতে বিস্ফোরক তার, ডিসচার্যের অপেক্ষায়। কিন্তু ক্ল্যামসেলগুলো এমনি মসৃণ এবং শক্ত করে জোড়া লাগানো রয়েছে যে, কোন উপায়েই সেখানে এক্সপ্লোসিভ তার রাখার জায়গা করে নেওয়া যাচ্ছে না। আমি শেষ চেষ্টা করে দেখলাম জলের একেবারে নীচে যেখানে ক্ল্যামসেলের ভীত গাঁথা সেখানে ডুব সাঁতার দিয়ে। উদ্দেশ্য সেখানে থেকে যদি একবার বিস্ফোঁরণ ঘটানো যায়।

হঠাৎ আমার বুকের যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকলো। একবার মনে হলো আমার ইপ্সিত বস্তু আমি পেয়ে গেছি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেটা হারিয়ে ফেললাম।

এখনকার মতো অভিযানটা পরিত্যক্ত মনে করে ওপরে উঠে এলাম।

হঠাৎ সমুদ্রের নীচে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কাদা, বালি এবং পাথরের টুকরো উপরে উদঘাটিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্রেন আবার কার্যকরী হয়ে উঠলো। আমি দেখলাম সেই লোহার বন্ধনীটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো। মুখ খুলে গেলো, জয়ের চাবিকাঠি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু তখন আমার বমি পাচ্ছিল। বুকের যন্ত্রণাটা যেন চরমে পৌঁছে গেছে। এখন আমার করার কিছুই নেই। নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। শেষে একসময় দেখতে পেলাম আমার দেহটা এসে ঠেকেছে সেই মিনি উপহ্রদের সামনে। চারপাশ ঘিরে রয়েছে সেই অলৌকিক দ্বীপটা। তখনও রাইফেলের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে মানুষের আর্তচীৎকার। তার মানে জুডাস এখনও বেঁচে আছে। সম্ভবতঃ তার কিছু প্রহরী এবং দৈত্য সমান মঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে নিঃসন্দেহে সে তার বাড়ির কন্ট্রোলরুমে বসে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে এখনও। আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। সোনার থালার মতো মাথার ওপর সূর্যটা তখন জ্বলজ্বল করছিল।

আমার মাথায় তখন কেবল একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। লোহার বন্ধনীটা বিস্ফোরণের পর কি করে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল! মনে হয় কাজটা জুডাসের, পাছে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিবিদ্যার খুঁটিনাটি সব কিছু জেনে ফেলি সেই কারণে জুডাস হয়তো সেটা ধ্বংস করে ফেলতে চাইল নিজের থেকে। কথাটা ভাবা মাত্র আমার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। হয়তো এর পিছনে জুডাসের কোন উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে।

আমি আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। পাহাড় ঘেরা সমুদ্র। আমি পাহাড়ের গায়ে মৃদু আঘাত করে সাংকেতিক ভাষায় বলতে থাকি, এখন শোন, এখন শোন—স্বর্গ প্রবর্তিত সংকেত পদ্ধতি বিশেষ।

সাবমেরিন এক্স-৮৮'র ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পেল। আমার সংকেত ধ্বনি প্রথম শুনতে পেল জাহাজ ধ্বংসকারী লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে বার্তাপ্রেরক লোকটাকে খবর পাঠানো হলো। পরে লোকটা তাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

এটা স্বর্গ প্রবর্তিত সংকেত পদ্ধতি বিশেষ। বার্তাপ্রেরক ঘোষণা করল। আমি জলের ওপর ভেসে উঠে আবার সেই সাংকেতিক বার্তা পাঠালাম। এবার পর পর দুবার। এবার সাবমেরিনের প্রতিটি মানুষ অধীর আগ্রহে বার্তা শুনতে থাকলো। তারা সবাই জেগে উঠেছে।

আমি জানালাম, তোমরা নিজেরাই তোমাদের উদ্ধার করতে পারো। আধুনিক যন্ত্রগুলো সব ব্যবহার কর। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—

খানিক পরেই সাবমেরিনের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠলো, বিস্ফোরণের মতন। বোধহয় ইঞ্জিন চালু হল এবার। এরপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আমি দেখলাম লোহার প্রাচীর ঘেরা বন্ধনী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো এবার। সমুদ্রের ফাঁদ মুক্ত হয়ে এক্স-৮৮ নড়তে শুরু করল।

এক্স-৮৮ এবার সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। আমি এবার জল থেকে উঠে বীচের ওপর এলাম। সাবমেরিনের ট্রান্সমিটার চালু হয়ে গেছে। ম্যাক এক্ষুনি বার্তা পাবেন জানতে পারবেন এক্স-৮৮'র মুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এদিকে জুডাস এখনও বেঁচে আছে।

এখন আমার একমাত্র কাজ হলো জুডাসকে খতম করা। আমি সেই গাছটার সামনে ছুটে এসে লুকোনো সেই বিশেষ ধরনের মিনি ট্রান্সমিটার হাতে তুলে নিলাম।

আমি বার্তা পাঠালাম, দ্বীপটাকে ধ্বংস করে দিন। আপনারা আপনাদের সবরকম অস্ত্র ব্যবহার করুন। দ্বীপটাকে ধ্বংস করে দেওয়া চাই। ট্রান্সমিটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ হলো। এই একটি মাত্র বার্তায় ম্যাক বুঝে যাবেন, ধ্বংস করতে বলার অর্থটা কি। এরপর তিনি নিশ্চয়ই দেশ থেকে বড় বড় জেট বিমান পাঠাবেন, সঙ্গে মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভবতঃ। জেট বিমানের যা গতি তাতে মনে হয় মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে তারা এখানে পৌঁছে যাবে। আমি এবার বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। আমেরিকা থেকে উদ্ধারকারী দল এখানে এসে পড়ার আগেই আমি জুডাসের সঙ্গে মোকাবিলা করে নিতে চাই। এখন সারা দ্বীপে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে।

হঠাৎ লাউডস্পীকারে জুডাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কার্টার, আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চিন্তা কর না, আমি আমার এই ছোট্ট ঘর থেকে তোমাকে খতম করতে পারবো না। আর তুমিও আমাকে হত্যা করতে পারবে না। এই দ্বীপে কেবল তুমি আর আমি বেঁচে আছি।

আমি সামনের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা গাছের ডালে টেলিভিশন ক্যামেরা ঝুলছে। আমি সেটা লক্ষ্য করে পাথরের টুকরো ছুঁড়লাম। ক্যামেরার লেন্স ভাঙার শব্দ হলো।

এটা তোমার মূর্খতার পরিচয় কার্টার। আবার জুডাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চললাম। নগ্ন দেহের স্তূপ। বেশীর ভাগ মেয়েদের, তবে প্রহরীদেরও মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি এগিয়ে চললাম। ঘরটা খালি, পাশেই কন্ট্রোলরুম, তালা বন্ধ। সেখানে জুডাসকে দেখা গেল না। আমি ভাবতে লাগলাম কন্ট্রোলরুমে প্রবেশ করার পথ খুঁজে বার করতে হবে। জুডাসকে সামনা সামনি না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামবো না। আবার জুডাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, এসো আমরা দুজনে একটা চুক্তি করি। তুমি আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তোমাকে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, তোমার সঙ্গে আমি কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই না। এখনই আমি সমুদ্র পাড়ি দিতে যাচ্ছি। যদি তোমার সাহস থাকে তবে আমার সামনে এসে তুমি আমাকে বাধা দাও। জুডাস পুনরাবৃত্তি করল, জীবিত অবস্থায় এই দ্বীপ ছেড়ে তুমি চলে যেতে পার না কার্টার।

হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠলো। বিপদসংকেত। কাছেই কার যেন ভারী নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখি শিকারীদের বিরাট একটা ছুরি দেওয়ালে গিয়ে আঘাত করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে দস্যু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলাম তাতারের ওপর। তাতারও পিছিয়ে থাকলো না। পাল্টা আঘাত সেও হানলো। আমি ধীরে ধীরে তাতারের অগোচরে হিপ পকেট থেকে স্টিলেটোটা বার করলাম, তারপর অতর্কিতে সেটা আমূল বসিয়ে দিলাম তাতারের পেটের ভিতর। একটা আর্ত চীৎকার করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো সে।

আবার জুডাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, দাঁড়াও কার্টার। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না।

ঠিক আছে, তুমি যেখানেই থাক সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বাধা দাও। আমি দরজার বাইরে এসে তাকে আহ্বান করলাম। আমি এখন ভাবছি, সেই বিমানগুলো যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে। হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রায় জলের ধারে এসে পড়েছিলাম।

জুডাসের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। তুমি এখন ফাঁদে পড়ে গেছো বুঝলে? আমার সঙ্গে তোমাকে চুক্তিতে আসতেই হবে।

আমি বিদ্রূপের হাসি হেসে বললাম, একটু পরেই বুঝতে পারবে কে কাকে ফাঁদে ফেলেছে।

টেড, এবার তার কণ্ঠস্বর একটু নরম শোনালো। যাওয়ার আগে জলের দিকে তাকিয়ে দেখ।

চকিতে আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে দু' চোখ যায় শুধু

লাল, লাল হয়ে গেছে সমুদ্রের জল। তবে কি রক্ত—দ্বীপের চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জুডাস আমাকে সম্বোধন করে বললো, তুমি কি জানো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এগুলো কাদের ডেকে আনতে পারে।

আমি স্তব্ধ হতবাক, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রের লাল জলের দিকে। জলের নীচে সেই বিরাট বিরাট ড্রেনের পাইপগুলো দেখেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, কিসের প্রয়োজনে ওগুলো রাখা ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে হয় এখনও সময় আছে।

।। আট ।।

আমি জুডাস এবং হ্যারল্ডকে অভিশাপ দিলাম তাদের অমন অমানুষিক কাজের জন্য। সত্যি কি নির্মম নিষ্ঠুর তাদের পরিকল্পনা। সমুদ্রের জলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে জুডাস হাঙ্গর ডেকে আনছে। আমি জানি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা এসে পড়বে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই সব হিংস্র জলজীবগুলো এসে পৌঁছনোর আগেই আমি যদি রক্তাক্ত জলের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারতাম। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম একটা বিরাট আকৃতির হাঙর আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে আসতে বাধ্য হলাম।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো। শব্দটা যেন অতি পরিচিত। আকাশ ভরা জেট বিমানের ছায়া। প্রথম বোমা বর্ষণের আওয়াজ হলো। তারপর দ্বিতীয়বার আরো বেশী আওয়াজ তুলল। আবার সারা দ্বীপটা কেঁপে উঠলো।

আমি দেখলাম ম্যাক আমার নির্দেশ মতো নিউক্লিয়ার বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃতীয় বোমাটা বিস্ফোরিত হলো দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে। তারপর একের পর এক জেট বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হতে থাকলো দ্বীপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। আমার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার মিশন সফল হতে চলেছে এবার তাহলে।

লাউডস্পীকার আবার গর্জে উঠলো। শেষ পর্যন্ত জুডাস বুঝতে পারলো আমি কি ব্যবস্থা নিয়েছি।

আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম। তখনও ক্ষুধার্ত হাঙ্গরগুলো রক্তলাল জলের মধ্যে তাদের খাদ্য খুঁজে ফিরছিল। অসংখ্য হাঙরের দল গিজগিজ করছে।

জুডাসের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, তোমারি জয় কার্টার তোমারি জয়। ওদের ডেকে নাও। তুমি ওদের আমার ট্রান্সমিটারের সামনে নিয়ে আসতে পারো। ওরা তোমার কথা অবশ্যই শুনবে।

আমি বাড়ির দিকে ছুটে গেলাম। জুডাস ঘরের এক কোণায় কাঠের ডেস্কের পাশে পড়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল বোমার আঘাতে সে যেন আহত। বাড়িটা তখনও কাঁপছিল।

আমি ট্রান্সমিটারের সামনে এগিয়ে গিয়ে স্যুইচে হাত দিতে যাওয়া মাত্র থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে জুডাসের হাতের রিভলবার গর্জে উঠলো।

সামান্য ব্যবধানের জন্য এ যাত্রায় আমি বেঁচে গেলাম।

গুলি শেষ, বোধহয় জুডাস এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার হাতে অস্ত্র বলতে শুধু একটা ধারালো ছুরি। অতঃপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। আমার চোখে তখন প্রতিশোধ নেওয়ার আগুন জ্বলছিল।

জুডাস হঠাৎ আমার হাতের ওপর দাঁত বসিয়ে দিল। আমি আর দেরী না করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম দেওয়ালের দিকে। জুডাস টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল। সেই সঙ্গে আমার ভারী দেহটাও তার ওপর গিয়ে পড়লো। জুডাসের মাথাটা বোধহয় ফেটে গেল। রক্তের ধারা নামল তার ব্রহ্মতালু দিয়ে। সেই সঙ্গে তার হাতের ছুরিটাও অসাবধানবশতঃ নিজের বুকে আমূল বসে গেলো। চীৎকার করে উঠলো সে, তারপরই সব শেষ।

এবার আমি নিশ্চিত হয়ে ট্রান্সমিটারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই যন্ত্রটি তার প্রভুর মতই মৃত। আমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে তখন আকাশ পথে জেট বিমানের দাপাদাপি। তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বীপটা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তারা থামছে না।

আমি সমুদ্রের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো উজ্জ্বল হলুদ রঙের ডিম্বাকৃতি বস্তু ভেসে আসছে সমুদ্রতটের দিকে। প্রথমে ভাবলাম বুঝি আমার দেখার ভুল, মনের কল্পনা। না তা নয়। আমি ঠিকই দেখেছি। একটা রবারের ভেলা, ভেলাটা তখন সমুদ্রতট থেকে তিরিশ গজ দূরে। ভেলার আরোহীকেও চিনতে পারলাম। আসলে ওটা রবারের ভেলা নয়, ওটা সী স্পাইডার। তখন মাথার ওপর জেট বিমানগুলো শেষ বোমা বর্ষণ করতে ব্যস্ত। নীচে জলের মধ্যে হিংস্র হাঙরের দাপাদাপি। মৃত্যু মুঠোর মধ্যে অনিবার্য। আমি চমকে উঠলাম।

আমি ঠিক করে ফেললাম, যে ভাবে হোক তাকে বাঁচাতে হবে। ভাবলাম জলে ঝাঁপ দেবো। হিপ পকেট থেকে ধারালো ছুরিটা আমি বার করলাম। এখন এটাই আমার একমাত্র সম্বল, হিংস্র হাঙ্গরগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে। তবে সবই আমার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। আমি খুব সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সাঁতার কাটছিলাম। আমার প্রখর দৃষ্টি ছিল ভাসমান হাঙ্গরগুলোর দিকে।

এদিকে ড্যানিয়েল ততোক্ষণে আমাকে দেখে ফেলেছে। সে দ্রুত গতিতে তার সী স্পাইডারটাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে চাইল। অবশেষে সী স্পাইডারটা আমার দেহ ঘেঁষে দাঁড়ালো। স্পাইডারের দরজা খুলে ড্যানিয়েল আমাকে আহ্বান করলো। স্পাইডারে প্রবেশ করে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম অতঃপর। আকাশে বোমা বর্ষণের শব্দ। নীচে জলের ওপর হিংস্র হাঙ্গরের দাপাদাপি। ড্যানিয়েল এবার সী স্পাইডারটাকে জলের অনেক নীচে নামিয়ে নিয়ে এলো। এখন আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। আমি তার পাশে শান্ত হয়ে বসে ছিলাম। তখনও হাঁপাচ্ছিলাম, কথা বলতে পারছিলাম না। চোখ দুটো আমার ক্লান্তিতে বুজে এলো : দীর্ঘ বার ঘণ্টা আমার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। বহুবার আমি মারাত্মক বিপদে পড়েছি কিন্তু এবারের অভিযানের মত নয়। বার বার এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ আমাকে এর আগে সহ্য করতে হয়নি। তাই আমি আর কথা বলে ক্লান্তি বাড়াতে চাইলাম না।

তারপর একসময় জেট বিমানে যখন আমি উঠে এলাম তখন নিজেকে প্রায় সুস্থ মনে হচ্ছিল। চোখ মেলে তাকালাম। আমার পাশে উপবিষ্ট মেয়েটির দিকে তাকালাম। ড্যানিয়েল লাল বিকিনি পড়েছিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম আনন্দে, এই মুহূর্তটা আমার খুব ভালো লাগছিল। শান্ত পরিবেশ। ড্যানিয়েলের স্পর্শে শান্তির আমেজ পাওয়া গেল আমি চোখ বুজে সেই সুন্দর মুহূর্তটা উপভোগ করতে থাকলাম।

।। নয় ।।

আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেহে আমার শীতল পরশ লাগলো। ড্যানিয়েল আমার দেহের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আমার বুকের ওপর সে হাত দিয়ে বিলি কাটছিল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর ছোট করবো না। তোমাকে অসময়ে কাছে পেয়ে আমি যে কত খুশি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

ড্যানিয়েল আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি যখন সব কিছু বলে চলে এলে তখন আমি ভাবলাম আমাকে তোমার জন্য কিছু করতে হবে। ট্রিটনকে গতিময় করে তুলে সারা রাত আমি অপেক্ষা করে থাকলাম অধীর প্রতীক্ষায়। আমি যে এখন তোমার কাছে এসেছি সে কথা আমি কাউকেই বলে আসিনি। সবাই জানে আমি আমার রুটিন মাফিক কাজে বেরিয়েছি।

আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে ম্যাক জানতে পারবে না মুক্তির কথা। ড্যানিয়েল নেই, ট্রিটনও সঠিক উত্তর দিতে পারবে না রেডিও মারফত জানতে-চাইলে, এ একরকম ভালোই হলো।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ড্যানিয়েল আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে। আমি ধীরে ধীরে হাত রাখলাম তার বুকের ওপর। ড্যানিয়েল আমার দিকে কামার্ত চোখ নিয়ে তাকালো, তার ব্রা-হীন বুক যেন পাপড়ি মেলে দিল সেই মুহূর্তে, এরপর আমি তার ঠোঁটের সঙ্গে আমার ঠোঁট দুটি মিলিয়ে দিলাম। চুম্বন দীর্ঘায়িত হতে থাকলো।

এবারে আমি ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে দিলাম এবং নিজেকে তার দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম।

ড্যানিয়েল তার নগ্ন বুকের মাঝে আমার মাথাটা চেপে ধরলো। ড্যানিয়েলের নগ্ন দেহটা তখন থরথর করে কাঁপছিল।

এবার ড্যানিয়েল আমাকে তার বুকের ওপর থেকে নামিয়ে পাশে শুতে দিল এবং আমার বুকের ওপর সে উঠে এলো।

আমার দুহাতে তখন তার দুটি স্তন শোভা পাচ্ছিল। ড্যানিয়েলের ঠোঁটে অসমাপ্ত তৃপ্তির ছোঁয়া। আমাকে ছাড়তে তার মন চাইছিল না, তবুও ছাড়তে হলো, সে বলল, ট্রিটন আমার সময় হয়ে এলো বোধহয়।

আমাকে ছেড়ে ড্যানিয়েল এবার তার নগ্ন দেহটা আবার বিকিনির মধ্যে আবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলো। তার নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হলো, সেই সব সামান্য কয়েকজন মেয়েদের মধ্যে ড্যানিয়েল হচ্ছে একজন, যাকে সর্বক্ষণ নগ্ন অবস্থায় দেখতে ভালো লাগে।

আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কয়েকদিন পরেই আমাকে নিউইয়র্কে ফিরে যেতে হচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে ফিরে যাবে?

ড্যানিয়েল অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তার সুন্দর দুটি ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো। ড্যানিয়েল আমার মাথাটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললো, ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

আমি ড্যানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাকের অফিসে এলাম। টান টান পোশাক ড্যানিয়েলের দেহের প্রতিটি ভৌগোলিক রেখাকে ফুটিয়ে তুলেছিলো। ম্যাকের চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমি খুশি হলাম ড্যানিয়েল ম্যাককে খুশি করতে পেরেছে বলে, আমি ম্যাকের সঙ্গে ড্যানিয়েলের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমি ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি করে অনুমান করলেন?

কেন, তুমি রেডিও মেসেজে বললে ডঃ ফ্রেশারকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে আসছ, তখনি আমি ওর চেহারার একটা মোটামুটি ধারণা করে নিয়েছিলাম।

ম্যাক এবার হাসতে হাসতে বললো, শোন এবারে কাজের কথায় আসা যাক। তোমরা দুজনে এক সঙ্গে ফিরছো শুনে শেরী—নেদারল্যান্ডে আমার অতিথি হিসেবে তোমাদের দু'জনের ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। আর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, নিক, তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছো। তোমাকে আমাদের এখনও অনেক প্রয়োজন আছে বুঝলে।

ড্যানিয়েল আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সত্যি তোমার বস অপূর্ব লোক।

আমি মদের অর্ডার দিতে গিয়েও চিন্তা করলাম, ড্যানিয়েলের দিকে তাকালাম, তার নীল চোখে নীল বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তার মুখে শান্ত হাসি। সে বললো, আমি তোমাকে নিজের থেকেই জয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলাম।

আমিও তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, আমিও তোমাকে খুশি করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তুমি খুশি হতে পারনি। আমাদের যৌথ মিলনে তোমার যে কেবল পরিশ্রম হয়েছিল আমি জানি।

ড্যানিয়েল চমকে উঠলো। আমি তাকে বললাম, তুমি একজন ভালো জীববিদ্যাবিশারদ হতে পার, কিন্তু তুমি ভালো অভিনেত্রী নও।

তবু ড্যানিয়েলের ভাবতে ভালো লাগলো সেদিনের রাত্রিবাসের কথা। আমার স্পর্শে একটা আলাদা আমেজ, একটা আলাদা মাদকতা সে অনুভব করেছিল। আমাকেই সে সঠিক পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সে কখনই জয়ের জন্য চেষ্টা করেনি। তার চোখে ব্যর্থতার কোন গ্লানি কখনও প্রকাশ পায়নি।

শক্ ট্রিটমেন্ট

।। এক ।।

পেঁচার ছায়া ঃ—

ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীন ক্যাম্প রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো পড়ে আছে। গ্রীষ্মের অবকাশে অনেক লেখক বা শিল্পী বা পেনশন ভোগী এখানে বিশ্রামের জন্য আসতো। এই জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে খুব দূবে নয়।

আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তা বোধহয় গ্রীন ক্যাম্প ছাড়া অন্য কোনো শহরে ঘটতেই পারতো না। এখানে আমি একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করে ছিলাম, কেননা এখানেই আমি আমার রেডিও আর টেলিভিশন বিক্রির কারবার ফেঁদেছিলাম। গ্রীন ক্যাম্প থেকে আমার বাড়িটা মাইল চারেক দূরে—সপ্তাহে একবার আমি শহর থেকে মশলাপাতি কিনে আনতাম। এছাড়া যেতাম শেরিফ জেফারসনের অফিসে গল্প করতে।

এই জেফারসন সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া ভালো কেননা এই গল্পে তাঁর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। লোকে বলে তাঁর বয়স নাকি আশির ওপরে হবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বেশির ভাগ সময়ই তিনি গ্রীন ক্যাম্পের শেরিফ। স্ট্যাচু অব লিবার্টি ছাড়া যেমন নিউইয়র্কের কোনো অর্থ হয় না, তেমনি শেরিফ জেফারসন ছাড়া গ্রীন ক্যাম্পের কথা চিন্তাই করা যায় না।

ইনি ছাড়া আর যাঁর কথা বলা প্রয়োজন তিনি হলেন ডাঃ ম্যালার্ড।

যতদিন ধরে জেফারসন প্রশাসন চালাচ্ছেন ততদিন ধরেই ডাক্তার হলেন তিনিই। তাঁকে প্রায় কিছুই কবতে হতো না। কেউ যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়তো বা কারো হয়তো বাচ্চা হবে তাহলে তাকে আশি মাইল দূরে লস এঞ্জেলস্ স্টেট হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ডাঃ ম্যালার্ড জেফারসনের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন।

তখন গ্রীষ্মকাল, আমি একদিন শহরে একটা টি. ভি. সেট আনতে গিয়েছি। সেন্টাল গাড়িতে তুলে আমার অভ্যাস মতো জেফারসনের অফিসে গল্প করতে ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি বললাম, আমি ব্লু-জয় লেকের দিকে যাবো, আবার এদিকে এলে দেখা করবো।

জেফারসন বললেন, যদি ওদিকেই যাও তবে একজন নতুন খদ্দের পাওয়ার আশা আছে। মিঃ উইলিয়ামসের বাড়িতে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন—স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটি পঙ্গু, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকতে হয় তাঁকে। আমার মনে হয় উনি হয়তো টি. ভি. সেট নিতে চাইবেন।

আমি তাঁর কাছ থেকে নামটা জেনে নিলাম—"মিঃ ডেলানি", বাড়ি ফেরার পথে একবার ঘুরে যাবো ভাবলাম। আমার মনে হলো যাকে চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়াতে হয়, তিনি একটা টি. ভি. সেট নিতেই পারেন। আমার এক খদ্দেবের বাড়িতে রেডিওটা চালু করে দিয়ে আমি ব্লু-জয় কেবিনের দিকে গাড়ি চালালাম।

জায়গাটা ছোট্ট হলেও খুবই সুন্দর, বেশ আরামেব। বছর দুয়েক আগে আমি এখানে এসেছিলাম। এখান থেকে চারিদিকে মনোরম পাহাড় দেখা যায়, নীচে উপত্যকা আর সমুদ্র।

ওপরে একটা গেট। গাড়ি থেকে নেমে গেটটা খুললাম, সুন্দর একটা রাস্তা বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সিঁড়ির পাশে একটা বড়োসড়ো, ঝকমকে বুইক ওয়াগন, সেটার পিছনেই আমি গাড়ি দাঁড় করালাম।

বারান্দায় একজন ভদ্রলোক। চাকাওয়ালা একটা চেয়ারে বসে আছেন। মুখে সিগার, কোলের ওপবে একটা ম্যাগাজিন খোলা রয়েছে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, চোখের চাহনিটা বিতৃষ্ণায় ভরা।

গাড়ি থেকে নেমে আমি বারান্দায় উঠলাম।

মিঃ ডেলানি?

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি শুনলাম আপনি সবে এসেছেন। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, মনে হলো আপনার জন্য একটা রেডিও বা টি. ভি. সেট দিতে পারি আমি।

তিনি আমার কথা শুনে বললেন, এই সব পাহাড়ের মধ্যে কোনো ভালো রিসেপশন পাওয়া অসম্ভব।

আমি তাঁকে জানালাম যে ভালো এরিয়েল লাগালে সুন্দর রিসেপশনই পাওয়া যাবে। প্রমাণ দেবার জন্য আমি গাড়ি থেকে একটা ছোট টি. ভি. সেট নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রাখলাম। তারপর একটা বিশেষ ধরনের এরিয়েল খাটিয়ে দিলাম। মিনিট সাতেকের মধ্যেই পর্দায় একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠলো।

ম্যাগাজিনটা রেখে দিয়ে মিঃ ডেলানি ব্যাপারটা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, রিসেপশনটা কেমন?

ডেলানি বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দারুণ হয়েছে। কত দাম পড়বে?

আমি দামটা বললাম।

আপনার নামটা কি?

আমি বললাম, টেরি রেগান। এখানকার টি. ভি., রেডিও সমস্তই আমি দেখি। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি একটা বিশেষ ধরণের সেটই দিতে পারি। এতে একটা পঁচিশ ইঞ্চি পর্দা থাকবে, থাকবে একটা এফ. এম. রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার আর একটা টেপ রেকর্ডার।

এছাড়া একটা স্পীকার আমি আলাদা ভাবেই দেবো।

কি করে বুঝবো যে এটা কাজের হবে?

আমার কথায় বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি এরকম একটা মিঃ হ্যামিশকে করে দিয়েছি। উনি একজন লেখক, এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে থাকেন। তাঁকে টেলিফোন করলেই জানতে পারবেন সব কিছু।

ঠিক আছে আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। কত দাম পড়বে?

আপনি যে রকম ক্যাবিনেট চান, তার ওপর নির্ভর করবে। তবে পনেরোশো ডলারের একটা ভালো জিনিষ আমি বানিয়ে দিতে পারি।

কথাটা শেষ হতে না হতে পিছন দিকে একটা শব্দ হলো—কোনো কারণ ছিল না, তবু আমার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি চুলের গোড়া পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল।

গিল্ডা ডেলানিকে প্রথম দেখার কথাটা বোধ হয় আমি কখনও ভুলতে পারবো না।

মাঝামাঝি ধরনের লম্বা, সোনালী রঙ, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চকচকে চুলের রাশি। চোখ দুটো বড় বড়, গভীর নীল, যেন ফরগেট মি-নট ফুল। মেয়েটার পরনে একটা কাউবয় সার্ট আর নীলরঙের চাপা প্যান্ট। চেহারাটা তাকিয়ে দেখার মতোই।

ডেলানি ওর দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমার স্ত্রী।

এঁর নাম মিঃ রেগান। উনি এই অঞ্চলে রেডিও আর টি. ভি. সেটের কারবার করেন। আমাকে একটা টি. ভি. সেট বিক্রি করতে চাইছেন।

তুমি তো তাই চাইছিলে, আর টি. ভি. থাকলে তোমার ভালোই লাগবে। মেয়েটি বললো।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে চোখের বাইরে চলে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এর আগে আমি যতো মেয়ে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি করে ওকে কামনা করতে লাগলাম।

ডেলানি বললেন, ঠিক আছে আপনি সেটটা তৈরী করুন। পছন্দ হলে কিনবো।”

ঠিক আছে, আমি বললাম, আমি বানিয়ে দেবো। হপ্তা দুয়েক লাগবে। ইতিমধ্যে এই সেটটা

আপনি রেখে দিতে পারেন। আমি এটা এমনিই রেখে যাচ্ছি। আপনার একটা পাকাপাকি এরিয়েল লাগবে। কালকে এসে সেটা লাগিয়ে দেবো।

তাই আসুন। আমি তো সবসময়েই আছি।

আমি আর দেরী না করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলাম। সারাটি পথ মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে এলাম। রাত্রেও মেয়েটির চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারলাম না।

পরের দিন বিকেলের দিকে আমি ব্লু-জয় কেবিনে গেলাম। মিঃ ডেলানি বারান্দায় বসে একমনে টেলিভিশন দেখছিলেন। আমি গাড়ি থেকে নামার সময় উনি আমাকে ভালো করে লক্ষ্যই করলেন না।

এরিয়েলটা, খানিকটা তার আর যন্ত্রের বাক্সটা নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম।

ভেতরে যান, উনি হাত নেড়ে বোঝালেন, আমার স্ত্রীকে বা চাকরটাকে পেয়ে যাবেন।

ভেতরের ঘরটা খুবই সাজানো গোছানো, কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি দরজা ঠেলে বাইরে গেলাম। একটা খোলা জায়গায় ছোট একটা ফোয়ারা, জলের মধ্যে অনেকগুলি গোল্ডফিশ খেলে বেড়াচ্ছে।

জায়গাটা পেবিয়ে দরজা ঠেলে একটা বড়ো ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। এ ঘরটার অনেকগুলো দরজা, একটা দরজা খোলা আর সেখান থেকে গিল্ডা ডেলানির মৃদু গলার সুর ভাঁজা শোনা যাচ্ছিল।

আমাকে দেখে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখের চাহনির কোনো বর্ণনা হয় না, শরীরের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার তুলনা দেওয়া যায় না, আর যেমন করে তার চকচকে চুলের রাশ জানলা দিয়ে আসা রোদ্দুরে ঝক্‌মক্ ক'রে উঠছিলো, তারও কোনো সঠিক রূপ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। পরনে একটা ক্রীম রঙের সিল্কের শার্ট, একটা আকাশী নীল স্কার্ট। ওকে দেখে আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো।

মিঃ রেগান, কি খবর? মেয়েটি হেসে বললো।

আপনার স্বামী আমায় আসতে বলেছিলেন, এরিয়েলটা লাগাতে হবে। ছাদের ওপর যাওয়া যাবে কি?

ঐ ঘরে স্কাইলাইট আছে। আপনার সিঁড়ি লাগবে। স্টোর রুমে সিঁড়িটা আছে, ঐ যে দরজা, ও আঙুল তুলে দেখালো।

আমি মিসেস ডেলানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টোর রুম থেকে সিঁড়িটা নিয়ে ঘরে ঢুকে ছাদের দরজাটার নীচে রাখলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিলাম।

জিনিসপত্র নিয়ে আসবার জন্য নিচে নামলাম। জিনিস নিয়ে ফিরে আসছি এমন সময় মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। আমি ওর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

আপনার কোনো সাহায্যের দরকার? মেয়েটি বললো। দরকার হলে করতে পারি। আমি বললাম, 'তাহলে তো ভালোই হয়। যন্ত্রপাতিগুলো ছাদে নিয়ে যেতে চাই না। আপনি যদি ওগুলো হাতে হাতে এগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে উপকার হবে। আপনি ওপরে উঠতে পারবেন তো?

আপনি যদি এটাকে ঠিক করে ধরে রাখেন তাহলে পারবো। ও এগিয়ে এলো। আমি এরিয়েলটা নিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। ওর শরীর থেকে একটা সুগন্ধ আসছিল।

আমি সিঁড়িটার গায়ে হাত রেখে বললাম—এটা নিরাপদ।

এই সব কাজের জন্য চাপা প্যান্ট পরা উচিত ছিল আমার। ও হাসলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে আমি তাকাবো না।

ও হেসে উঠে হাত দিয়ে ধাপগুলি ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগলো।

স্কার্টটা একবার ফুলে উঠলো, যেটুকু দেখতে পেলাম, তাতে আমার রক্তের গতি দুরন্ত হয়ে গেল।

ওপরের দরজার ফাঁক দিয়ে ও তাকালো আমার দিকে। ওর সেই দৃষ্টিকোণ দেখে, ওকে বিশেষ কিছু মনে হচ্ছিল।

সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি থাকে এমন মেয়ের চোখে, যে পুরুষের সব কিছু খবর রাখে, আর এইমাত্র

আমি যা দেখেছি, তা দেখে পুরুষের অবস্থা কি হয়, এটাও জানে।

আপনি যদি এরিয়েলটা আমাকে দেন...ও বললো।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর হাতে এক এক করে এরিয়েল, তারের টুকরো আর যন্ত্রের বাক্সটা তুলে দিলাম।

ওপরে উঠে গেলাম, হঠাৎ মনে হলো যে পৃথিবীতে আমরা কেবল দুজনেই রয়ে গেছি। ওখান থেকে টেলিভিশনের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না।

আমি তারের টুকরোর পাক খুলতে লাগলাম। আমি কথায় কথায় জানতে চাইলাম ওর স্বামীর কথা, কোন দুর্ঘটনা হয়েছিল কিনা।

মেয়েটি তার কাঁধের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, ও তাই নিয়ে সাংঘাতিক ভাবে। ওর পক্ষে এটা খুব খারাপ হয়েছে। প্যাসিফিক ফিল্ম স্টুডিওগুলোতে ও টেনিস কোচ ছিল। সব নামকরা অভিনেতাদের ও শিখিয়েছে। কাজটা খুব রোজগেরে ছিল। পঞ্চাশের কাছে ওর বয়স। এই বয়সে ও খুব হৈ হৈ করতো, শেখাতে ভালবাসতো। এমন সময় দুর্ঘটনা ঘটলো। ও আর হাঁটতেও পারে না।

সব কথা শুনে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব করুণ মনে হলো।

আমি বললাম, খুব মুস্কিলের কথা, উনি ভালোবাসেন এমন কিছু নেই? চেয়ারে বসে কিছু না করে বাকি জীবনটা কাটাতে চাইছেন না নিশ্চয়?

হ্যাঁ তাই, ওর অনেক টাকা আছে। ওটার কোনো অভাব নেই আমাদের। মেয়েটির ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল এখানে ও চলে এসেছে ওর বন্ধুদের এড়াবার জন্য। কেউ করুণা করলে ওর ঘেন্না লাগে।

আমি তারটা এরিয়েলের সংগে লাগালাম। কথাবার্তা ভেঙে গেলো। এরিয়েলটা ও আমার হাতে তুলে দিল। এরিয়েল লাগাতে বেশি সময় লাগলো না। যতবার ওর হাত থেকে কোনো যন্ত্র নিচ্ছিলাম, ততোবারই কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বেড়ে উঠছিল।

ও আমার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল, আমার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছিল। আমি বুঝতে পারলাম ও একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চিবুকটা তোলা, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল। হঠাৎ ও আমার দিকে ঢলে পড়লো। আমি ওকে চেপে ধরলাম।

এর আগে আমি অনেক মেয়েকেই চুমু খেয়েছি কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ছিল। এই চুম্বনের জন্যই কি লোকে স্বপ্ন দেখে? বোধ হয় কুড়ি কি ত্রিশ সেকেন্ড আমরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তারপর ও সরে গিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলো। ওর দুটো চোখ,সেই ফরগেট-মি-নট, ভিজে উঠলো, বন্ধ হয়ে রইলো একটু, ও আমার মতই জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম। ওর চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ কানের কাছে জোরে বেজে উঠতে লাগলো।

রাত আটটার সময় আমি বাড়ি ফিরলাম। আমি কেবল গিল্ডার কথাই ভাবছিলাম। বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু ভাবতে চাইলাম আমি।

ও আমাকে চুমু খেলো কেন? ওর মতো সুন্দরী মেয়ে যে এতো ঐশ্বর্যের মধ্যে রয়েছে, সে আমাকে নিশ্চয় বিশেষ কিছু ভাবেনি। এটা একটা আবেগের বশেই হয়েছে। ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত। আমার জন্য ও স্বামীকে ছেড়ে আসবে এরকম ভাবা ছেলেমানুষি। তাকে দেবার মতো আমার কি আছে?

হঠাৎ আমার ভাবনাটা থামিয়ে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুললাম।

মিঃ রেগান, আপনাকে বিরক্ত করছি না তো! আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই ঠিক এগারোটা নাগাদ।'

ওর গলার স্বর শুনে আমার মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

এগারোটা বাজবার মিনিট খানেক পরে, আমি গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে উঠে

দাঁড়ালাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওর গাড়িটা এসে থামলো দেখে আমার বুকটা ধকধক করে উঠলো।

মিঃ রেগান, দেরী হলো বলে দুঃখিত, ও বললো, কিন্তু আমার স্বামী ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তার মানে একটা লুকোচুরি চলছে। আমার নিঃশ্বাস জোরে পড়তে লাগলো।

মিসেস ডেলানি, আপনি বারান্দায় উঠে আসুন।

ও বারান্দায় উঠে এলো। আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম, কেবল ভেতর থেকে একটা আলোর টুকরো এসে পড়ছিল।

ওর পরনে সেই কাউবয় শার্ট আর স্ল্যাকস। ও একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

খুব শান্ত গলায় ও বললো, আজ বিকেলে যা ঘটেছে, তার জন্য ক্ষমা চাইতে এলাম। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি সেই ধরনের মেয়ে যারা যে কোনো পুরুষের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি বললাম, মোটেই না, এটা হয়তো আমারই দোষ।

ও একটা চেয়ারে বসে পড়লো। একটা সিগারেট হবে?

আমি সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলাম। ও একটা সিগারেট নিল।

আমি দেশলাইটা জ্বালালাম। আমার হাতটা খুবই কাঁপছিল, সিগারেট ধরাবার জন্য ওকে আমার হাতটা চেপে ধরতে হলো। সেই ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় আমার বুকের শব্দটা বেড়ে গেলো।

ও বলে চললো, আমার লজ্জা করছে, আমার মতো অবস্থার মেয়েদের পক্ষে অনেক সময় খারাপ লাগে। তবু, রহস্য করে লাভ কি? আমার সংযমী হওয়া উচিত ছিল। আমি ভাবলাম আপনার কাছে এসে সবটা পরিষ্কার করে বলবো।

দরকার ছিল না...আমি কিছু মনে করিনি।

নিশ্চয়ই করেছেন। আমি জানি পুরুষের চোখে আমি আকর্ষণীয়া, এর জন্য আমার কিছু করার নেই। আর যখন কেউ দেখে যে আমার স্বামী পঙ্গু, তারা আমায় বিরক্ত করতে থাকে। আজ পর্যন্ত আমার চোখে তেমন কোনো পুরুষ পড়েনি, এজন্য ওদের ঠেকিয়ে রাখা সহজ ছিল। কিন্তু আপনার মধ্যে কি আছে...? যাই হোক আমি এই কথা বলতে এসেছি যে আর এরকম হবে না। মিঃ রেগান আমার যদি আর কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার দুর্ভাগ্য হয় তবুও আমি স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারবো না। উনি পঙ্গু। আমার ওপরেই নির্ভরশীল। আমার তো একটা বিবেক আছে।

আমি বললাম, যদি আপনি কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েন, স্বামীকে ত্যাগ করলে আপনাকে কেউ দোষ দেবে না। আপনার বয়স অল্প, বাকি জীবনটা ওঁর সঙ্গেই নিজেকে বেঁধে রাখবেন এতটা আশা করা ঠিক নয়। এতে আপনার জীবনটা নষ্ট করা হচ্ছে।

আপনি কি তাই মনে করেন? যখন আমি বিয়ে করেছিলাম, তখন প্রতিজ্ঞা করেছি যে ভালো হোক মন্দ হোক, ওর সঙ্গেই থাকবো। এখন চলে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া যে দুর্ঘটনায় ও পঙ্গু হয়ে গেছে তার জন্য আমিই দায়ী। সেই কারণেই, বিয়ের বাঁধন ছাড়াও ওর সম্বন্ধে আমার বিবেক রয়ে গেছে।

আপনি দায়ী?

হ্যাঁ, দুর্ঘটনার পর আপনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আমার সব বলতে ইচ্ছা করছে। আমরা চার বছর হলো বিয়ে করেছি। বিয়ের তিনমাস পর দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা একটা নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। জ্যাক খুব মদ খেয়েছিল। এ অবস্থায় ওকে আমি গাড়ি চালাতে দিই নি। আমি নিজেই চালালাম। আমবা একটা পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জ্যাক ঘুমিয়ে পড়লো। খানিকটা এসে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পথটা আটকে রেখেছে। ওটা আমাদেরই এক বন্ধুর, তার গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ে তার দিকে যেতে লাগলাম। পথটা ওখানে খুবই খাড়াই ছিল। গাড়িটা পেছন দিকে চলতে শুরু করলো। ব্রেক ঠিকমতো লাগাতে পারিনি। জ্যাক তখনও ঘুমোচ্ছে। আমি দৌড়ে গেলাম কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে।

গাড়িটা রাস্তা থেকে পড়ে গেলো, সে কী ভীষণ শব্দ, সেই মুহূর্তটা আমি ভুলতে পারবো না।

আমি বললাম, এটা একটা দুর্ঘটনা যে কোনো লোকেরই এরকম হতে পারতো।

জ্যাক তা মনে করে না। ওর ধারণা এটা আমারই দোষ। এরজন্য ভয়ঙ্কর দোষী মনে হয় আমাকে। আর সেই কারণেই আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারি না।

আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম, আপনি এখনও ওকে ভালোবাসেন?

ভালোবাসা? ও কথা আসে না। চার বছর ওর সঙ্গে আছি। ওর সঙ্গে থাকা খুব প্রীতিকর নয়। ও মাতাল, ও আমার থেকে তেইশ বছরের বড়ো। আমার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই। কিন্তু ওকে আমি বিয়ে করেছি। আমায় মেনে নিতেই হবে। আমার জন্যই ও পঙ্গু আর আমার জন্যই ওর জীবন নষ্ট হয়েছে।

আমি বললাম, যা হয়েছে তার জন্য আপনি নিজেকে দোষ দিতে পারেন না। যদি চান তাহলে ওকে ছেড়ে আসতে পারেন আপনি, আমার এই রকমই মনে হয়।

কিন্তু আপনার তো আমার বিবেকটা নেই, ও হাত বাড়িয়ে দিতে আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। দেশলাইয়ের আগুনে দুজনে দুজনকে দেখলাম।

আপনি পাগল করে দিতে পারেন...,খুব নীচু গলায় ও বললো।

আপনিও তাই।

আমি জানি, আমি কেবল পুরুষকে পাগল করে দিতে পারি তা নয়, আমি নিজেকেও উন্মাদ করে দিই। মিঃ রেগান, আমার জীবনটা দুঃসহ। আপনি হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছেন। আজ বিকেলে যা করেছি তার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।

আমার বিশ্বাস আপনি বুঝেছেন, যদি আমার তা মনে না হতো, তাহলে এই রাত্রে আমি একা এখানে আসতাম না। এবারে আমি ফিরে যাবো, ও উঠে দাঁড়ালো।

আমরা দুজন চন্দ্রালোকিত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও হঠাৎ বললো, আপনি কি একাই থাকবেন? আপনার বিয়ে করা উচিত।

আমি এখনো মনের মত মেয়ে পাই নি। ও আমার দিকে তাকালো। চাঁদের আলো সোজাসুজি পড়লো ওর মুখে, আমি একটা তিক্ত হাসি দেখতে পেলাম।

আপনাকে খুশি করা কি শক্ত?

সেইরকমই, বিয়ে একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার---অন্তত আমার কাছে।

প্রেম থাকা চাই। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসিনি, নিরাপত্তার জন্য বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার কিছু ছিল না। কিছুই না থেকে যদি কেবল স্বাধীনতা থাকতো তবে আর অনেক সুখী হতাম।

আপনি এখনও স্বাধীনতা পেতে পারেন।

এখন নয়। যদি ওকে ছেড়ে যাই, তবে আমার বিবেক আমাকে তাড়না করতে থাকবে। বারান্দার রেলিঙে অলসভাবে হাত রেখে ও বললো, একটা উত্তেজনায় এখানে এসেছিলাম। আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে...

আমি ওর হাতে হাত রাখলাম, গিল্ডা...

ও ঘুরে দাঁড়ালো—কাঁপছে।

গিল্ডা আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি...

আমিও, আমার লজ্জা করছে, কিন্তু যখনই তোমায় দেখলাম...আমি ওকে দুহাতে টেনে নিয়ে মুখের ওপরে আমার মুখ রাখলাম। আমাকে চেপে ধরার সময় ওর শরীরের আকুতি টের পেতে লাগলাম আমি।

ওকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। গ্যারেজের ছাদে যে প্যাঁচাটা বসে থাকে সে হঠাৎ উড়ে গেলো।

একটা ছোট্ট ছায়া মাটিতে পড়লো।

।। দুই ।।

খুনের চিন্তা—

গিল্ডা আমার ঘরে পর পর তিন রাত্রি এলো, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসলাম। উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর দেখলাম এটা আমার পক্ষে তৃপ্তিকর হচ্ছে না।

কেউ ওর আসা যাওয়া দেখে ফেলবে ভেবে গিল্ডা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। ওর স্বামী টের পেয়ে যাবে যে ও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, এই ভেবে ও আতঙ্কিত হতো।

আমাদের তাই লুকিয়েই প্রেম করতে হতো। কোন রকম একটু শব্দ হলেই ও ভয়ে আমার হাত চেপে ধরতো।

তিন রাত্রেই ও আমার সঙ্গে এক ঘণ্টারও কম সময় ছিল। ঐ অল্প সময়েই আমরা মরিয়া হয়ে প্রেম করে নিতাম। ও বাড়ি ফিরে যাবার আগে আমাদের কথা বলার সময়ই হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে আমি ভালোবাসতাম। আমার কাছে এই মিলন কেবল দৈহিক ছিল না। আমি মাঝে মাঝে বিচলিত হতাম ওর ওপরে ওর স্বামীর প্রভাব আছে জেনে।

আমি চাইতাম ও নিজের সম্বন্ধে বা আমার সম্বন্ধে কোনো কথা বলুককিন্তু ও যখনই কোনো কথা বলতো তা ওর স্বামীর সম্পর্কে।

ও প্রায় ওর স্বামীর কথা চিন্তা করতে করতে বলতো যে, ওর স্বামী যদি টের পেয়ে যায় তবে ও কখনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। তৃতীয় রাত্রে প্রেমক্রিয়ার পর জামা পরতে পরতে ও বলছিলো, আমার মনে হচ্ছে ও আমাকে চাইছে। আগে ওর কখনো রাত্তিরে ব্যথা হলে আমাকে জাগিয়ে কিছু চাইতো এখনোও আমাকে ডাকতে পারে।

দোহাই গিল্ডা, ওই চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমার স্বামীকে সত্যি কথা বলে দাওনা কেন? কেন বলোনা যে তুমি আমায় ভালোবাসো। তুমি মুক্তি চাও?

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, গিল্ডা, তুমি কি আমায় ভালোবাসো?

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, টেরি, তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো? আমি তোমায় ভালোবাসি। দিনের প্রতি মিনিটে আমি তোমার কথা ভাবি। তোমার কাছে আমি থাকতে চাই। কিন্তু ও যদি মারা যায় তবেই এটা সম্ভব। ও মারা না গেলে আমি মুক্তি পাবো না। ও আমাকে টেনে নিয়ে জানলার কাছে গেল। বাইরে চাঁদের আলো।

এখানে আসার আগে ডাক্তার দেখে বলেছে ওর স্বাস্থ্য খুব সুন্দর রয়েছে। ও স্বচ্ছন্দে আরো তিরিশ বছর বাঁচবে।

তাহলে ওঁর মারা যাবার কথা ভেবে সময় নষ্ট করছো কেন? আমরা তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে পারি না। তোমার ডিভোর্স নেওয়া উচিত। তোমার স্বামীর টাকা আছে। নিজেকে দেখার জন্য উনি একটা নার্স রাখতে পারেন। আর তুমিও মুক্তি পেতে পারো।

গিল্ডা সরে গেলো, তা আমি পারবো না। ও আস্তে আস্তে স্পষ্ট গলায় বললো, 'যদি ও মরে যায় টেরি, তাহলে এই টাকাটা আমার হবে। তুমি আর আমি এটা নেবো।

আমি হঠাৎ ভাবতে বসলাম, অতো টাকা পেলে আমি কি করবো, ভাবতে গিয়ে আমার মেরুদণ্ডে পিচ্ছিল স্রোত বয়ে গেল।

ঐ টাকা পেলে আমি একবছরে দ্বিগুণ করে ফেলতে পারি। লস এঞ্জেলসে একটা দোকান খুলবো। সারা জেলায় তিন চারটে সার্ভিস ভ্যান রাখবো, হাই-ফাই সেট বানাবো। প্রচুর টাকা কামিয়ে ফেলবো।

গিল্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলো। আমি ওর পেছনে গেলাম।

আমরা কি করবো টেরি? আমার দিকে না তাকিয়ে ও বললো আমরা আর দেখা করবো না। এ ছাড়া আর উপায় কি? প্রবঞ্চককে আমি ঘৃণা করি। যখন থেকে আমরা প্রেম করছি তখন থেকে আমার নিজের ওপর ঘেন্না করছে। এটা বন্ধ করতে হবে। এটাই হলো একমাত্র রাস্তা। আর কোনো উপায় নেই। আমাদের দেখা হওয়া বন্ধ করতে হবে।

আমি বললাম, শোনো...তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। কাল রাত্রে আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো।

কাল রাত্রি বলে কিছু নেই। কাল আমি আসবো না। এখনই এটা বন্ধ করতে হবে।

আমি ওকে ধরতে গেলাম, ও ছিটকে সরে গেল।

না, আমার পক্ষে ব্যাপারটা আরো শক্ত করে তুলো না, টেরি। তুমি জানো না, তোমার চেয়ে বেশি আমি এটা চাই, কিন্তু আমি জানি এটা বন্ধ করতেই হবে। আমি যাচ্ছি। আর আমাদের দেখা হবে না।

ওর কথা বলার স্বরে এমন একটা হতাশা আর দৃঢ়তা ছিল যে আমি সরে দাঁড়ালাম, বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা হলো আমার।

গিল্ডা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম ও গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার মনে হলো ও ঠিক বলছে না, এটা কেবল বিবেকের তাড়না, কাল রাত্রে ও নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু ও এলো না। শেষকালে যখন বারোটা বেজেছে আমাকে মেনে নিতে হলো যে গিল্ডা আসবে না।

পরদিন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে করতে শেরিফ জেফারসনের সঙ্গে দেখা হলো, ওঁর সঙ্গে একজন অচেনা যুবক।

নজর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, সুতরাং আমি জেফারসনকে হাত নেড়ে ডাকলাম। উনি বললেন, ম্যাট লাউসনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মিঃ লাউসন, ইনি টেরি রেগান, যার কথা বলছিলাম।

আমি লাউসন-এর সঙ্গে করমর্দন করলাম। লাউসন বললো, মিঃ রেগান, আমি সংক্ষেপে বলছি, আপনার তাড়া রয়েছে। আমি ন্যাশনাল ফাইডেলিটি থেকে আসছি। টি. ভি. ইনসিওরেন্স করিয়ে থাকি আমরা। আপনি তো এই অঞ্চলে টি. ভি সেটগুলো দেখেন। আপনি যদি আপনার খরিদ্দারের নামগুলো আমায় দেন, তাহলে আমার পরিশ্রম বেঁচে যায়। আমি অবশ্য এমনি এমনি চাইছি না, আমি একটা কমিশন দেবো আপনাকে।

এই ধরনের প্রস্তাবকে আমি দূরে ঠেলে দিতে পারলাম না। আমি জানতে চাইলাম কি ধরনের ইনসিওরেন্স করা হয়ে থাকে।

যেমন হয়ে থাকে, টিউবটার জন্য, মেরামতির জন্য আর পার্টস বদলের জন্য। এই অঞ্চলে যাদের টি. ভি. সেট আছে, কেবল তাদের নাম ঠিকানা কেবল আমি চাই।

'পাবেন। গাড়িতে আমার ঠিকানা লেখা বইটা আছে। আমি আপনাকে ওটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি লিখে নিয়ে শেরিফকে দিয়ে দেবেন। পরে যেদিন শহরে আসব, আমি ওটা নিয়ে নেব।

ঠিকানার বইটা বার করতে করতে আমি বললাম, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি টি. ভি. ইনসিওর করে জানতাম না। আমি জানতাম ওরা কেবল জীবন বীমাই করে।

আমরা সবরকম ইনসিওরই করাই, অবশ্য সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো জীবনবীমা।

ঠিকানা লেখা বইটা ওকে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। ডেলানির সুপার সেটটার জন্য অনেক জিনিস আমি জোগাড় করেছিলাম। বিকেলে কাজে লেগে গেলাম।

এই কাজটা আমি দুটো কারণে ধরেছি—এর আগে আমি কখনও কোনো সুপার সেট তৈরী করার সুযোগ পাইনি, এটা করতে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। কিন্তু আরো জরুরী কারণটা হচ্ছে যে, আমি বুঝে ছিলাম গিল্ডার কথাই ঠিক ও আর আসবে না। এই সুপার সেট নিয়েই আমি আবার ব্লু-জয় কেবিনে যেতে পারবো, কিছুটা সময় কাটাতে পারবো আর ওকে দেখতে পাবো।

আমি কাজ করে যেতে লাগলাম। টেলিফোনের আশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, টেলিফোন এলো না। গিল্ডার মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করলাম, যদিও জানি ওর মত বদলাবে না। আমি যতই কাজ করে চললাম ততই বুঝতে পাবছিলাম যে আমাব আর গিল্ডার মাঝখানে বাধা হয়ে বয়েছেন ঐ প্রৌঢ় লোকটি, যিনি দিনেব পব দিন একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন। যার কোনো প্রয়োজন নেই।

ডেলানিব সুপাব সেটেব ক্যাবিনেটের জন্য কাঠের ব্যবস্থা কবতে আমি পরের দিন লস এঞ্জেলসে গেলাম। কাঠ বেছে নিযে সেটাকে কেটেকুটে দিতে বললাম, ওরা বললো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এক ঘণ্টা কাটাতে হবে, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে দোকানগুলো দেখতে দেখতে ঘুরছিলাম। একটা জহুরীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম, হঠাৎ নজরে পড়ল একটা নীল রঙের পাউডার কেস, নীল রঙটা গিল্ডার চোখের রঙের সঙ্গে মিলবে ভালো।

আমি সেটা কিনে ফেললাম। দোকানে বললাম কেসটার ডালার ভেতরে গিল্ডার নাম লিখে দিতে। কাজটা করতে বেশি দেরী হলো না। বাড়ি ফিরে ব্লু-জয় কেবিনে, 'হ্যালো,' গিল্ডার গলা শুনতে পেয়ে আমার বুক ধকধক করে উঠলো। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে লস এঞ্জেলসে ডিনার খাবে। আমি তোমাদের বাড়ির বাইরে এগারোটার সময়ে থাকবো। স্পষ্ট করে বললাম আমি।

একটু চুপ করে থেকে ও বললো, আপনার রং নাম্বার হয়েছে বোধহয়, না, ঠিক আছে। অসুবিধার কিছু নেই। ও টেলিফোনটা ছেড়ে দিল।

বুঝতে পারলাম ডেলানি ঘরে আছেন। কাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

পৌনে এগারোটার সময় আমি ব্লু-জয় কেবিনের সামনে এলাম, এগারোটা বাজার দু মিনিট আগে গিল্ডা বাইরে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখেই আমার রক্ত দুর্বার হয়ে উঠলো।

কাছে এসে ও থামলো। আমি গেটটা খুলে দিলাম।

টেরি—

আমি কিছু না বলে ওকে কাছে টেনে নিতে চাইলাম। কিন্তু ও সরে গেলো।

না, টেরি না। আমি আগেই বলেছি, আমরা আর প্রেম করবো না। আমরা এখন থেকে শুধুই বন্ধু। বন্ধু না হতে পারলে আমাদের আর দেখা করা উচিত নয়।

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি।

টেরি, তোমার পক্ষে এটা কি খুব শক্ত?

ও নিয়ে ভেবো না। আমি তো মেনে নিয়েছি। চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। এঞ্জিন চালু করে বললাম, একটা রেস্তোরাঁ আছে। সেটা একটু দূরে, কেউ আমাদের চিনবে না।

সেই-ই ভালো।

লস এঞ্জেলস ওখান থেকে আশি মাইল। রাস্তাটা ভালো হলেও প্রায় দুঘণ্টা লেগে গেলো পৌঁছতে। পথে আমরা বিশেষ কিছু কথা বলিনি। গিল্ডা প্রথমে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে চাইলেও কোনো লাভ নেই জেনে বাকি রাস্তাটা আমরা চুপ করেই ছিলাম।

হার্মোসা বীচে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ, এখানকার খাবার ভালো। রেস্তোরাঁর টেবিলে ঢাকা দেওয়া আলো, খুব মৃদু বাজনা বাজছে। সাদা পোশাক পরা ওয়েটারগুলো ঠিক মেসিনের মতো ঘোরাফেরা করছে।

আমরা স্ক্যাম্পি, কেলোনীজ আর একশেতল মদ নিলাম। আমি ওর চোখের দিকে উৎসাহের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

গিল্ডা হঠাৎ বললো, চার বছর বাদে আমি এই প্রথম কারো সঙ্গে বের হলাম।

তোমার যদি ভালো লাগে, তবে আমরা আরো আসতে পারি। আমি বললাম।

আমার গলায় একটা তীক্ষ্ণতা ছিল, গিল্ডা সেটা ধরতে পারলো বোধহয়। চট করে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে।

টেরি ..তোমার নিজের কথা কিছু বলো, তোমার এই যে দোকানটা...তোমার কতটা আশা আছে এর ওপর?

আমার কথাগুলো ভালো না লাগলেও বললাম—যদি আমার পয়সা থাকতো, আমি নিজে একটা দোকান দিতাম। আমি জায়গা চিনি, আমি এমন একটা দোকানঘর চাই যেখানে ভালোভাবে আমার তৈরী হাই-ফাই সেটগুলো সাজিয়ে রাখতে পারবো, ডিমাক বাজিয়ে শোনবার জন্য একটা ভালো ঘর থাকবে। কিন্তু এটা পাওয়া সহজ নয়। এত টাকা আমার কখনই হবে না।

কত চাই তোমার?

পঁচিশ হাজারেই হতে পারে। ওর দ্বিগুণ পেলে বিরাট করে কিছু করা যায়।

টেরি, ও যদি মারা যায়, তাহলে তোমার যা দরকার তুমি পাবে।

একথা তুমি আগেও বলেছ। যদি মারা যায়...

দেখলাম ও ঘড়ি দেখছে।

আমি ওয়েটারকে বিল দিতে বললাম।

গাড়িতে উঠতে উঠতে গিল্ডা বলল, আজকের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার ভালো লেগেছে, টেরি। ধন্যবাদ।

আমি কিন্তু ওর মতো আমারও ভালো লেগেছে এই মিথ্যা কথাটা বলতে পারলাম না।

গাড়ি লস্ এঞ্জেলস ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে ঢুকলো।

আমরা চুপ করেই ছিলাম। ব্লু-জয় কেবিনের মাইল দুয়েক দূরে আমি গাড়িটা থামালাম।

গিল্ডা আমার দিকে তাকিয়ে বললো থামালে কেন?

আমি কিছু না বলে পাউডার কেসটা বার করে ওর কোলের ওপর ফেলে দিলাম। আমি ড্যাশবোর্ডের আলোটা জ্বেলে দিলাম। ও বাক্সটা নেড়ে চেড়ে দেখলো। দারুণ দেখাচ্ছিল। আমি টের পেলাম ও জোরে নিঃশ্বাস নিল।

এটা আমার জন্য?

হ্যাঁ, তোমার চোখের সঙ্গে এর রং মিলেছে।

টেরি আমি এটা নিতে পারি না। তোমার এরকম উপহার দেওয়া উচিৎ নয়।

আমি তোমাকে লোভ দেখাচ্ছি না, আমার এটা দেখে মনে হলো যেন এটা তোমার জন্যই তৈরী। আমি চাই শুধু তুমি এটা নাও।

আমি গাড়ি চালু করে দিলাম। গিল্ডা আমার পাশে চুপ করে বসে রইলো।

গেটের কাছে পৌঁছতে গাড়ি থামালাম, দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম।

টেরি তুমি জানো না আজকের দিনটা আমার কত ভালো লেগেছে। এই পাউডার কেসটার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা আমার প্রথম পাওয়া উপহার।

গিল্ডা আমার দিকে সরে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলো আমার ঠোঁট।

আমার কোন তৃপ্তি হচ্ছিল না। ওকে জড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি ভাবছিলাম সেই লোকটির কথা যিনি এখনও বিছানায় শুয়ে আছেন, হয়তো ঘুমোচ্ছেন, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে একশো গজ দূরে। উনি যতক্ষণ বেঁচে আছেন ততক্ষণ আমাদের লুকিয়ে চুরিয়ে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

গিল্ডা পরের দিন ভোরেই আমাকে ফোন করলো।

কাল আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ও জেগে ছিল। ওর ঘরে আলো জ্বলছিল।

উনি কি জেনেছেন যে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে?

জানি না। আজকে উনি একেবারেই চুপচাপ রয়েছেন। দু-একটা কথা ছাড়া কোন কথাই আমার সঙ্গে বলেন নি। টেরি, এভাবে আর সম্ভব নয়। তোমাকে দূরেই থাকতে হবে। আমি দুঃখিত। কিন্তু আর দেখা করবো না। আমাকে মাপ করো.. দোহাই আর টেলিফোন করো না।

লাইনটা কেটে গেল। কোন লোক যখন প্রেমে পড়ে, যেমন আমি গিল্ডার প্রেমে পড়েছিলাম, আমার মনে হয়, তার একটু মাথার গোলমাল হয়ে যায়। চারটে দিন আর চারটে বিশ্রী রাত কাটাবার পর আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিলাম না, কিছুই বিক্রী করতে পারলাম না। তিনবার ব্লু-জয় কেবিনে ফোন করেছিলাম কিন্তু বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাত্রে চোরের মত আমি ওদের বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। জানলার পর্দায় শুধু ওর ছায়া দেখতে আমার এতো কষ্ট হতো যে বলার নয়। আমি বিচলিত হয়ে পড়তাম।

পঞ্চম রাত্রে আমি হুইস্কি খেলাম। বুঝতে পারছিলাম যে গিল্ডার জন্য এই নিদারুণ যন্ত্রণা, একে কমাতেই হবে। সেই সমস্যার সমাধান করলো হুইস্কি। চারদিন বাদে আমি প্রথম ঘুমোলাম। কিন্তু স্বপ্নে ওকেই দেখলাম। আটদিন বাদে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে এই দুঃস্বপ্নের চরম হয়ে

এল।

তখন রাত নটা। আকাশে চাঁদ নেই, বৃষ্টি হতে পারে। আমি বারান্দায় বসে ছিলাম। টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

ঘরে ঢুকে আমি রিসিভার তুললাম। মিঃ রেগান নাকি? ডেলানির গলা চিনতে পারলাম, আমার বুকে ঘা পড়ছিল।

হ্যাঁ।

সেটটা চলছে না। টিউবটা বোধহয় গেছে। এই কদিনে আমি প্রথম একটা ভালো খবর শুনলাম। ওকে দেখতে যাওয়ার একটা কারণ পাওয়া গেল।

আমি এখনই আসছি।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি ব্লু-জয় কেবিনে পৌঁছে গেলাম।

আলো জ্বলছিল, যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি বারান্দায় উঠলাম। ভেবেছিলাম গিল্ডাকে দেখতে পাবো কিন্তু ভাবতে পারিনি ও ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাবে। তীব্র হতাশায় আমি ভেঙে পড়লাম।

ডেলানি টি. ভি. সেটটা দেখিয়ে বললেন, টিউবটা বোধহয় পুড়ে গেছে।

আমি ভালবগুলো দেখছি, ডেলানি হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। যদি আমার স্ত্রী কখনো আপনাকে গাড়িতে যাবার প্রস্তাব করে মোটেই রাজি হবেন না। ওর গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। আমি একবার ওকে চালাতে দিয়ে বোকামি করেছিলাম। তাই সারাজীবন এই চেয়ারে বসে কাটাতে হচ্ছে।

আমি কিছু না বলে গাড়ি থেকে একটা ভালব্ এনে লাগিয়ে টি. ভি. চালু করলাম। পর্দায় ছবি ফুটে উঠলো। আমি অ্যাডজাস্ট করে দিলাম।

ডেলানি জানতে চাইলো, কত লাগবে?

তিন ডলার।

গলা তুলে ডেলানি ডাকলেন, গিল্ডা এদিকে এসো।

দরজা খুলে গিল্ডা ভেতরে এলো। অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ও ভদ্রতাসূচক মাথা ঝাঁকালো।

ডেলানি বললেন, তিনটি ডলার দাও।

গিল্ডা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা আনতে গেল।

আমি টি. ভি. সেটটা জায়গায় বসিয়ে স্ক্রুটা আটকে দিচ্ছিলাম।

গিল্ডা ডেলানির কাছে গিয়ে ব্যাগটা খুললো, তিনটে এক ডলারের নোট বার করলো সে, আর তাই করতে গিয়ে ব্যাগটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। ব্যাগের জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

সেই পাউডার কেসটা চোখে পড়লো ডেলানির। একমুহূর্ত গিল্ডা দাঁড়িয়েছিল, তারপর এগিয়ে গিয়ে কেসটা দ্রুত তুলে নিলো। ডেলানি ওর কব্জিটা মুচড়ে কেসটা ছিনিয়ে নিলেন।

কয়েক মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। ডেলানির মুখটা বীভৎস হয়ে গেছে, বাঁ হাত দিয়ে উনি প্রচণ্ড জোরে গিল্ডার নাকে ঘুঁষি মারলেন। বেশ জোরে শব্দ হলো।

আমার ভীষণ ভাবে ইচ্ছে হচ্ছিল যে লোকটাকে গলা টিপে শেষ করে দিই, কিন্তু যেমন ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম।

গিল্ডা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। ডেলানি পাউডার কেসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গিল্ডা উঠে দাঁড়ালো নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। ডেলানি কেসটা খুলে ডালার ভেতরে গিল্ডার নামটা দেখতে পেলেন। তাঁর মুখটা রাগে থম্থম্ করছে।

তোমার তাহলে প্রেমিক জুটেছে, গলা শুনে আমার শরীরটা কেমন করে উঠলো।

গিল্ডা কথার কোনো উত্তর দিল না। দুহাতে বুক চেপে রেখেছে, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাকে জখম করেই তোমার আশ মেটেনি, এবারে বেশ্যা সাজতে ইচ্ছা হয়েছে। পাউডার কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উনি।

আয়নাটা চুরমার হয়ে গেল।

গিল্ডা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডেলানির হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি ঘরে আছি।

আপনি যান, উনি চীৎকার করে উঠলেন, একথা যদি শহরে ছড়ায় তবে আমি দেখে নেবো, বেরিয়ে যান।

আমি যন্ত্রের বাক্সটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গেট পর্যন্ত চালিয়ে গাড়ি থামালাম। তারপর গেটটা খুলতে যাবো এমন সময় অন্ধকারের মধ্য থেকে গিল্ডা ছুটে গাড়ির হেডলাইটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

গিল্ডার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, নাক ফেটে গেছে, চিবুকে শুকিয়ে আছে রক্ত, চোখদুটো জ্বলছে।

আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি ওকে বললাম, এর পরে তুমি আর ওর সঙ্গে থাকতে পারো না গিল্ডা, চলে এসো আমার সঙ্গে আমি তোমায় সুখী করবো। তোমাকে ডিভোর্স নিতেই হবে।

না, এখান থেকে তুমি যাও, তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ার মতো বোকামি করেছিলাম বলেই আজ আমার জীবন বিপন্ন।

ওভাবে কথা বলো না, ওর সঙ্গে আর তুমি থাকতে পারো না, আমার সঙ্গেই তোমায় থাকতে হবে।

আমি ওকে ধরে টেনে নিতে চাইলাম, কিন্তু ও ছিটকে বেরিয়ে গেল।

আমার কাছ থেকে সরে যাও। তুমি কি চাও আমি এর জন্য তোমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষে চাই? তুমি যদি আর না আসো, আমি জ্যাককে বোঝাতে পারবো যে, ওটা আমিই কিনেছিলাম। কতবার তোমাকে বলবো যে আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

যতক্ষণ না ও মরছে, আমি ধীর গলায় বললাম, তাই বলেছিলে না?

ও মরবে না। অনেকদিন বাঁচবে। আমার কাছ থেকে চলে যাও, নাহলে, এখন তোমায় যতটা ভালোবাসি, ততটাই ঘেন্না করতে হবে তোমাকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি ওর পেছনে যাবার চেষ্টা করলাম না।

সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করে ফেললাম যে আমি ডেলানিকে খুন করে ফেলবো। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

আমি খুব অবাক হলাম যে, এই সমাধানটা আমি আগে কেন ভাবিনি।

।। তিন ।।

হত্যার নিপুণ শিল্প—

বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ডেলানিকে খুন করতে আমার কোথাও বাধছে না। এই সিদ্ধান্তে এসে মনে হচ্ছে যে মনের ওপর থেকে একটা চাপ সরে গেল। নিজেকে যেন অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে।

শুয়ে শুয়ে মাথায় শুধু একই চিন্তা কি করে ডেলানিকে খুন করে সরে পড়া যায়।

ডেলানির মৃত্যুতে কি কি সুবিধা হতে পারে সেটা ভেবে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। গিল্ডা মুক্তি পাবে, ও আমার হবে। লোকটার অনেক টাকা পাবো আমরা দুজনে। নতুন জীবন শুরু হবে আমাদের। এই টাকায় আমি জীবনে বড়ো হয়ে উঠবো। আমার শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে, কিন্তু মূলধন ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না।

গোপনে খুন করার উপায়টা যদি বার করতে পারি, যাতে কেউ আমায় সন্দেহ করবে না, তাহলে একটা নতুন দারুণ জীবন পাবো আমি আর গিল্ডা।

কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। ডেলানি বাইরে বের হয় না, ওকে বাড়িতেই খুন করতে হবে। এমন সময় করতে হবে যখন গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে গিয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ গিল্ডা সপ্তাহের কেনাকাটা করতে যায়, ফেরে বারোটা নাগাদ। এর ভেতরেই কাজটা সারতে হবে। সবচেয়ে বিপদের ব্যাপার হলো খুনটা করতে হবে দিনের আলোয়। যদিও ব্লু-জয় কেবিনের সামনের রাস্তাটায় খুব একটা কেউ যাতায়াত করে না, তবু হয়তো কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তাছাড়া মেরিয়ার কথাও আমাকে ভাবতে হবে। যাতে ও সেই সময় বাড়িতে না থাকে তার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে।

আমাকে দেখতে হবে যাই করি না কেন গিল্ডা যেন জড়িয়ে না পড়ে। পুলিশ যদি জেনে ফেলে যে আমার আর গিল্ডার মধ্যে প্রেম চলছে তাহলে আর রেহাই নেই। খুন যদি করি তাহলে গিল্ডাকে আমার চাই আর ওঁর টাকাগুলো চাই।

চিন্তা করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হলো তবুও একটা নিরাপদ কিছু বার করতে পারলাম না।

ডেলানি নিজেই দেখিয়ে দিলেন যে কি করতে হবে।

পরের দিন সকালে টেলিফোন বেজে উঠলো।

ডেলানির গলা মিঃ রেগান নাকি?

ওঁর গলার স্বরে আমার শরীরে একটা অবর্ণনীয় উত্তেজনা বয়ে গেল।

হ্যাঁ, আমি বললাম।

আপনি একবার আসতে পারবেন? আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই, এলে খুশি হবো।

আমার মনে হলো আজ শুক্রবার। গিল্ডা থাকবে না। যাকে খুন করবো ঠিক করেছি তাকে একবার দেখার আমার ইচ্ছে হলো।

আচ্ছা, মিঃ ডেলানি আমি আসছি। ঠিক সাড়ে নটার সময় আমি ব্লু-জয় কেবিনে পৌঁছলাম। ডেলানি হাত দেখিয়ে আমাকে বসতে বললেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি একটা সিগারেট নিয়ে বসলাম। যাকে খুন করবো তার দিকে তাকাতে গিয়ে শরীর কেমন করে উঠলো। ডেলানি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

আমি কাল রাত্রের বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইছি। তখন আমি মাতাল ছিলাম। আমি দুঃখিত।

একটু হুইস্কিতে চুমুক দিলেন উনি, নিজের স্ত্রী বিশ্বাস ভঙ্গ করছে জানলে ভালো লাগে না, তাই বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

আপনার ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

ওই সেটটা কতদূর হলো? কবে পাবো?

সোমবার দিয়ে দেবো।

বাঃ, ভালো কথা ডেলানি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন,

মিঃ রেগান, আমার স্ত্রী সম্পর্কে কি মনে হয় আপনার?

আমি মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটতে না দিয়েই বললাম, আমি এ বিষয়ে কি বলতে পারি?

ডেলানি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলবো। শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আমি ওকে মেরেছিলাম।

মিঃ ডেলানি আমার কাজ আছে, আমি যাচ্ছি।

ডেলানি আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলেন, স্টুডিওর সুইমিং পুলে আমি ওকে প্রথম দেখি। যেসব মেয়ের ভালো শরীর আছে বুদ্ধি নেই, তারা যে কাজ করতে পারে তাই করতো ও। আমি অনেক তারকাদের দেখেছি কিন্তু ওকে দেখে আমি ভুলে গেলাম। আমি গিল্ডার প্রেমে পড়ে গেলাম। রাতদিন ওরই কথা ভাবতাম। আমি ওকে সে কথা জানালাম, কিন্তু ও খেলা করতে চাইলো না, হয় বিয়ে করতে হবে নয়তো কিছুই নয়। আমি ওর সঙ্গে ফেঁসে গেলাম। যখন ও সুইমিং পুল থেকে উঠে আসতো গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তো। সাঁতারের জামা ওর শরীরে লেগে থাকতো—এ সব দেখে আমি ওর প্রেমে না পড়ে থাকতে পারলাম না। আমার স্ত্রী কি চায় জানেন? ও টাকার জন্য পাগল, টাকা ছাড়া ও কিছুই জানে না। আমাকে বিয়ে করার পর প্রথম ও আমাকে বলেছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্স করতে। ইনসিওরেন্স কোম্পানী

থেকে একটা লোককেও ধরে এনেছিল আমার কাছে। যতক্ষণ না সই করা পলিসিটা ওকে দেখালাম, ততক্ষণ ও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ও জানে না যে ওকে দেখাবার পরেই আমি পলিসিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ডেলানি হাসলেন। তারপর কি হলো জানেন? আমরা একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। আমার একটু নেশা হয়েছিল। গিল্ডা বললো, ও গাড়ি চালাবে। আমি বোকার মতো চালাতে দিলাম। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের পথে ও কোথাও থামলো। গাড়ি থেকে নেমে ওর কোনো বন্ধু, সে সামনে গাড়ি থামিয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে গেল। যাবার আগে ও ব্রেক লাগিয়ে গিয়েছিল, অন্ততঃ সেই রকমই বলেছে। যাই হোক, গাড়িটা গড়িয়ে পড়লো। সেরে উঠতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। এখন কি মনে হয় জানেন? গিল্ডা আমার বদলে ঐ একশো হাজার ডলারটাই চেয়েছিল।

আমি বললাম, আমি এসব শুনতে চাই না, আপনার নেশা হয়েছে, আপনি জানেন না আপনি কি বলছেন।

হতে পারে, কিন্তু এই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়, এখন ওর প্রেমিক জুটেছে—যে লোকটা গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই হতে পারে। ওরা হয়তো দুর্ঘটনাটা মতলব করে করেছিল। পুলিশও একবার তাই ভেবেছিল কিন্তু আমি তখন ওকে ভীষণ ভালোবাসি, তাই বলেছিলাম যে ব্রেকটাতে আমি হাত দিয়েছিলাম। আমি তখন ওকে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এখন করি না।

ডেলানির একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু উনি এসব বলছেন বলে আমার আনন্দ হলো। এতে ওঁকে খুন করা আমার পক্ষে সহজ হবে।

আমি যাচ্ছি, মিঃ ডেলানি।

একটু দাঁড়ান, উনি বললেন, যে সেটটা বানাচ্ছেন, ওতে একটা রিমোট কনট্রোল সুইচ করে দিতে পারবেন? আমি প্রতিবার চেয়ার না চালিয়েই সেটটা চালাতে বন্ধ করতে চাই।

সেই মুহূর্তে আমার মাথায় খেলে গেলো ওকে কি করে খুন করবো।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচেই খুন করা যাবে। ঐ সুইচটা ডেলানির ধাতব চেয়ারে ঠেকে যাবে, টেলিভিশনের বিদ্যুৎপ্রবাহ এসে ইলেকট্রিক চেয়ারের মতই ওঁকে মেরে ফেলবে। এইটুকু ব্যবস্থাই করতে হবে আমাকে।

আমার মুখে যাতে কোন ছায়া না পড়ে সেই কারণে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, হ্যাঁ, তাই হবে, মিঃ ডেলানি।

বাড়ি ফিরে মতলবটা ভাবতে লাগলাম। কাল রাতে যা নিয়ে ভাবতে বসেছিলাম, এইটেই হলো তার সমাধান। ওঁর মৃত্যুটা যদি দুর্ঘটনা বলে দেখানো যায় তবেই সবচেয়ে নিরাপদ। শেরিফ জেফারসন তাহলে ব্যাপারটা খোঁজখবর নেবেন। যদি হত্যা বলে মনে হয়, তাহলে তিনি লস এঞ্জেলস পুলিশকে ডাকবেন। তাঁদের ধুরন্ধর লোকেরা এর তদন্ত করুক আমি চাই না। এল. এ হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেনান্ট জন বুজ্‌কে ঠকানো অতো সহজ হবে না। অনেক খুনীকে ও ধরেছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার নেই।

আগে মতলবটা ভালো করে ভেবে নিতে হবে যাতে কোনোরকম ফাঁক না থাকে। আগে সেটটা তৈরী করে ফেলতে হবে। আর দেরী না করে আমি কাজ শুরু করে দিলাম।

কাজ করতে করতে বারবার গিল্ডার কথাই আমার মনে পড়তে লাগলো।

প্রতিটা তার জুড়বার সময়, প্রতিটা ভালভ্ বসাতে বসাতে আমার মনে হচ্ছিল আমি এইভাবে গিল্ডাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছি, ওর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছি।

সোমবার সকালে আমি টেলিভিশন সেটটা গাড়িতে তুলে ব্লু-জয় কেবিনের দিকে রওনা হলাম।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে গিল্ডাকে আমি দেখিনি, ওকে দেখবার ইচ্ছেও হয়নি। আমার মতলব হাসিল না করে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম না। ও হয়তো শেষ মুহূর্তে এমন একটা কিছু বলবে, যাতে আমায় পিছিয়ে আসতে হবে, সেইজন্যেই কাজটা আগে সেরে ফেলতে চাইছিলাম।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পড়লাম। গাড়ির শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন ডেলানি। কাগজটা ফেলে দিয়ে চেয়ার চালিয়ে এগিয়ে এলেন।

মিঃ ডেলানি, যা কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছি।

বেশ সুন্দর, কি রকম হয়েছে?

আপনি নিজেই দেখুন। সেটের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ওপরে উঠে এলাম।

সেটটা বসাতে আমার আধঘন্টা লাগলো, ডেলানিকে বুঝিয়ে বললাম এটা কিভাবে চালাতে হবে।

একটা এল. পি. রেকর্ড লাগিয়ে ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিলাম, ডেলানির মুখ দেখে বুঝলাম যেমন মনে করেছি, সেই রকমই পছন্দ হয়েছে ওঁর।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা ওঁর চেয়ারের হাতলে আটকে দিলাম। এটা ওঁর খুব পছন্দ হলো। তিনটে নব আছে—একটা সেটটা চালাতে আর বন্ধ করতে, অন্য দুটো ভল্যুম আর টিউনিং।

নবগুলোয় রবার লাগানো, যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ এদের মধ্যে দিয়ে না যায়। ঐ রবারের আবরণটা খুলে ফেললেই এটার সঙ্গে চেয়ারের বৈদ্যুতিক যোগ ঘটে যাবে।

ডেলানি কন্ট্রোল সুইচ দিয়েই টি. ভি. দেখলেন, বন্ধ করলেন। ওঁর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দারুণ হয়েছে।

মিঃ ডেলানি, আপনার জন্য সবচেয়ে ভালোটাই তৈরী করেছি। নবটার ওপরে ওঁর আঙুলগুলো দেখতে কিরকম অদ্ভুত লাগছে। যদি বরাত ভাল থাকে তাহলে শুক্রবার এই করতে গিয়েই ওনার ভবলীলা শেষ হবে।

আমি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গিল্ডা বুইকটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি হাতটা একটু তুললেও গাড়ি থামালাম না।

বাড়ি ফিরে এলাম। চিন্তা করতে লাগলাম। এখন কেবল দেখতে হবে শুক্রবার গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে যাবে কিনা, তাহলেই ডেলানি একলা হয়ে যাবেন। ওদের বাড়ির মেয়েটি শুনলাম চলে গেছে। ভালোই হয়েছে। সামনে থেকে একটা বড় বাধা সরে গেছে।

কিন্তু সবথেকে বড় বাধাটা পেরোনো বাকি। বৃহস্পতিবার রাত্রে গিয়ে আমাকে রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা বিদ্যুৎপরিবাহী করে দিয়ে আসতে হবে। ডেলানি যখন মারা যাবেন তখন আমার ওখান থেকে অনেক দূরে থাকা দরকার। গিল্ডা বেরোবার আগেই ডেলানি যদি ওই সুইচটা ছুঁয়ে ফেলে তা হলে ডেলানির সঙ্গে গিল্ডাও মরবে। সেই কারণে যখন কেউ থাকবে না তখনই ব্যাপারটা ঘটাতে হবে।

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ দেখলাম একটা গাড়ি আসছে। দেখলাম সেই ইনসিওরেন্সের ম্যাট লাউসন।

গাড়ি থেকে নেমে ও আমার কাছে এগিয়ে এলো :

মিঃ রেগান, আমি কিছু টাকা এনেছি আপনার জন্য। খুব বেশি নয়, তবু খানিকটা তো বটে। এখানে কুড়িটা পলিসি করিয়েছি।

ভালোই তো, আমি চাইলাম ও তাড়াতাড়ি চলে যাক।

নতুন ট্রোজান রেডিও আর টি. ভি. সেট দেখেছেন? লস্‌ এঞ্জেলসে একমী স্টোরে রয়েছে। ওটার এজেন্সি নেবেন নাকি? আমি বললাম, আমি নিজেই সেট বানাই। তবে একবার দেখবো ওটা।

এর মধ্যে একটা টাইম ক্লক আছে। সেটাকে সেট করে দিলে ঠিক প্রোগ্রামের সময়ে নিজে থেকেই চালু হয়ে যাবে।

আমার পক্ষে উত্তেজনা চেপে রাখা কষ্টকর হলো। আমার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। টাইম ক্লক! এর সাহায্যেই আমি নির্দিষ্ট সময়ে সুইচটাকে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে তুলতে পারবো।

লাউসন চলে গেলে মতলবটা পুরোপুরি ভেবে নিলাম। বোকার মতো কিছু করে না ফেললে কেউ ধরতে পারবে না।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে ডাঃ ম্যালার্ড ডেলানির মৃতদেহ দেখতে আসবেন। ডাক্তার যদি বলে ডেলানির মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, স্কটল্যান্ড তাই বলবে।

ডাঃ ম্যালার্ড আর শেরিফ জেফারসন—এই দুই বৃদ্ধের অপটুতার ওপরে আমি নির্ভর করে আছি। কোনোরকম বিরাট ভুল না হলে আমি ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারবো। ভয়ের কোনো কারণই দেখি না। আমার হাতে আর তিনদিন সময় আছে। একটা টাইম সুইচ ক্লক চাই। ভাবলাম যেখানে আমাকে কেউ চেনে না সেইরকম জায়গা থেকেই আমাকে এটা কিনতে হবে। স্যানফ্রানসিসকো-র কথাই আমার মনে এলো।

পরেরদিন লস্ এঞ্জেলসে গেলাম। সেখান থেকে স্যানফ্রানসিসকোর ট্রেন ধরে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম। তাড়াতাড়ি করে ক্লকটা কিনে বাড়ি ফিরলাম অনেক রাত্রে।

পরের দিন সকালে এগারোটার সময়ে ডেলানিকে ফোন করলাম।

মিঃ ডেলানি, রেগান বলছি, টি.ভি. ঠিক চলছে?

খুব ভালো।

শুক্রবারের প্রোগ্রামটা দেখেছেন? আমি আসল কথাটায় এলাম।' ডেম্পসির মারপিটের ছবি দেখাচ্ছে।

তাই নাকি? কটার সময়ে?

শুক্রবার সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে।

ধন্যবাদ, ওটা দেখতেই হবে।

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে নটা চল্লিশ নাগাদ ডেলানি রিমোট কন্ট্রোলে অবশ্যই হাত দেবেনই, তখন ওটা মারাত্মক হয়ে থাকবে।

সব কিছুই এখন নির্ভর করছে গিল্ডার গ্রীন ক্যাম্পে যাওয়া না যাওয়ার ওপর। আমার পরিকল্পনার এই অংশটাই কেবল আমার হাতে নেই।

ব্লু-জয় কেবিন থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর একটা জায়গা আছে যেখান থেকে এই বাড়িটা আর গ্রীন ক্যাম্পে যাবার রাস্তাটা দেখতে পাওয়া যায়। আমি ঠিক করলাম এইখানে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করবো। ওখান থেকেই দেখা যাবে গিল্ডা বেরোলো কি না। যদি নটা কুড়ির মধ্যে ও না বের হয় তবে আমি তাড়াতাড়ি ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে ডেলানিকে আটকাবো যাতে তিনি রিমোট কন্ট্রোলে হাত না দেন। সেটটা দেখতে এসেছি এরকম একটা অজুহাত দিয়ে আমি ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবো। আমার এর পরের চালটা খুবই সহজ। আমার বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে আর ব্লু-জয় কেবিন থেকে মাইল দেড়েক দূরে থাকেন জেফ হামিশ, একজন লেখক, তাঁকে ফোন করলাম। আমি জানতাম হামিশের এল. পি. রেকর্ড যোগাড়ের একটা বাতিক আছে। ওঁকেই আমার অ্যালিবাই করবো। উনি নামকরা লোক, সাক্ষী হিসেবে ভালো হবেন।

টেলিফোনে ওঁকে বললাম, মিঃ হামিশ, একটু বিরক্ত করছি। আমি একটা গ্যাজেট পেয়েছি, আপনার কাজে লাগতে পারে। রেকর্ড চলতে চলতেই এটায় রেকর্ডটা পরিষ্কার করা যায়। ঠিক পিনটার সামনেই এটা ঝোলানো থাকে।

শুনে তো ভালোই লাগছে। একবার দেখলে হয়।

কাল সকালে ওদিকে যাবো। যদি সাড়ে নটা নাগাদ যাই অসুবিধে হবে না তো?'

কিছু না। আপনাকে ধন্যবাদ।

ভাবলাম ডেলানি মরবেন নটা পঁয়তাল্লিশে। সেই সময়ে আমি ওখান থেকে দেড় মাইল দূরে হামিশকে গ্যাজেটটা চালিয়ে দেখাচ্ছি। সাড়ে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত। একটা নিখুঁত অ্যালিবাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রে আমাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক আর সবচেয়ে শক্ত কাজ করতে হবে।

সাড়ে নটার একটু পরে আমি টাইম ক্লক আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ডেলানির বাড়ি রওনা হলাম।

দশটা বাজতে দশে আমি ডেলানির গেটে এসে পৌঁছলাম, ভেতরে আলো জ্বলছে, টি. ভি. সেটে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলাম। পেছনের দরজায় গিয়ে ঠেলা দিলাম। খুলে গেলো, রান্নাঘরে

ঢুকে পড়লাম। আমার পায়ের শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আমি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে গেলাম। আমার কাছে একটা টর্চ ছিল, সেটা জ্বেলে ভালো করে দেখে নিলাম। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। এখানে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সাড়ে দশটার সময় শুনতে পেলাম টি. ভি. বন্ধ হলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। বুকটা ধক ধক করছে। একটা দরজা বন্ধ হলো।

ডেলানির গলা শোনা গেল শুতে যাচ্ছো? তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম। তোমার প্রেমিকের কি হলো? আজকাল তো রাত্রে বের হচ্ছো না তুমি? সেকি এর মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে ভেগেছে?

আমি শুতে যাচ্ছি। শুভরাত্রি।

একটু ফুর্তি করতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার প্রেমিকের সঙ্গে তো ফুর্তি করো, স্বামীর সঙ্গে করবে না কেন?

তুমি মাতাল হয়ে গেছ, গিল্ডার গলায় ঘৃণা ফুটে উঠলো। তুমি জানো না তুমি কি বলছো।

একটা শব্দ হলো, শুনতে পেলাম গিল্ডা ফুঁপিয়ে উঠলো। স্টোরের দরজা খুলে আমি বাইরে বেবিয়ে এলাম। ওখান থেকে লাউঞ্জটা দেখা যাচ্ছে। ডেলানি গিল্ডার কব্জিটা ধরে চেয়ারের কাছে টেনে এনেছেন। চোখ দুটো বীভৎস দেখাচ্ছে। তুমি ভুলে যাচ্ছো আমি তোমার স্বামী। তোমার কিছু কর্তব্য আছে। তোমার প্রেমিকের সঙ্গে মজা করতে পারো, আমার সঙ্গে পারো না?

ছেড়ে দাও আমাকে, জানোয়ার কোথাকার।' ডেলানি আঙুল ঢুকিয়ে টেনে গিল্ডার ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেললেন। একটা আচমকা ধাক্কা মারলেন, গিল্ডা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

ডেলানি চেয়ারে বসে গালাগালি দিতে থাকলেন ওকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, উত্তেজনায় আমার মুখে ঘাম ফুটে উঠলো। বুকের মধ্যে খুনের নেশা টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

গিল্ডা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ ফ্যাকাসে, চোখ জ্বলছে। যথেষ্ট হয়েছে, গিল্ডা বললো, আমি তোমার কাছে আর থাকবো না।

ডেলানি হেসে উঠলেন, কোথায় যেতে চাও যাও, তবে আমি মরে গেলে একটি পয়সাও পাবে না।

গিল্ডা শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত দৃশ্যটা দেখে আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, ডেলানি লাউঞ্জের আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে চেয়াব চালিয়ে যাচ্ছেন। টের পেলাম যে দরজাটা সজোরে তিনি বন্ধ কবে দিলেন।

রাত দুটোর সময় টর্চ জ্বালিয়ে দবজাটা খুললাম। কান পেতে রইলাম খানিকটা। সব নিস্তব্ধ। পা টিপে টিপে আমি লাউঞ্জে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করে টি. ভি. সেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি করে আমি মেন সুইচের তারটা খুলে ফেললাম, সেটটার পেছনদিকের প্যানেলটা খুলে নিলাম। রিমোট কন্ট্রোলের তারটা এমনভাবে লাগালাম যাতে বর্ধিত কাবেন্টটা সরাসবি কন্ট্রোল নবে চলে যায়।

মেন লাইনে টাইমসুইচ ক্লকটা লাগিয়ে সেটটার পিছনে আড়াল করে রেখে দিলাম।

সমস্ত জিনিসটা একবার মিলিয়ে নিলাম: ব্যাপারটা খুবই সহজ। টাইম ক্লকে দশটা বাজতে কুড়ি না হওয়া পর্যন্ত রিমোট কন্ট্রোল মারাত্মক হয়ে উঠবে না। সেই সময়ে ডেলানি ওটাকে ছুঁলে বর্ধিত কারেন্টের পুবো ধাক্কাটাই লাগবে।

ঐ টাইম ক্লকটাই গিল্ডাকে আড়াল করবে। দশটা বাজতে কুড়ির আগে কিছুই হচ্ছে না। ততক্ষণে গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে চলে যাবে। যদি সে না যায়, আমি এসে কন্ট্রোল সুইচটা সামলে দিতে পাববো।

সব ঠিক আছে। এখন সমস্তটাই নির্ভর করছে গিল্ডার সকালবেলা গ্রীন ক্যাম্পে যাওয়াব ওপর।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে লাউঞ্জের জানলা খুলে বেরিয়ে এলাম। জানলাটা আবাব বন্ধ কবে দিয়ে বারান্দায নেমে পডলাম।

।। চার ।।

সামনে দীর্ঘ সময়—

পরের দিন সকালে সাড়ে আটটায় আমি আমার টেলিফোন অপারেটরকে ডাকলাম, 'ডোরিস আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে আমি মিঃ হামিশের বাড়িতে যাবো। সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছব সেখানে। এর মধ্যে কিছু দরকার হলে আমাকে ওখানে সোয়া দশটা পর্যন্ত পাবে।

ডোরিসকে জানিয়ে রাখা দরকার যে আমি সাড়ে নটায় হামিশের বাড়িতে থাকছি। এটা নিশ্চিত যে ডেম্পসি ফ্লিমটা শুরু হবার আগেই ডেলানি টি. ভি. চালাতে চেষ্টা করবেন। টাইম সুইচ ক্লকটা তখন সেটের মধ্যে কারেন্ট খেতে দেবে না, ফলে সেট চলবে না। উনি ভাববেন খারাপ হয়ে গেছে, আমাকে নিশ্চয় ডাকবেন। ডোরিস খবরটা পেয়ে হামিশের বাড়িতে আমাকে খবর দেবে। আমি হামিশকে বলবো যে ডেলানি আমাকে যেতে বলেছেন। এতে আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারবো যে কেন আমাকে ব্লু-জয় কেবিনে যেতে হয়েছিল। এবং সেইজন্য আমি-ই প্রথম ব্যক্তি যে ডেলানির মৃতদেহ দেখতে পাবো। ডাঃ ম্যালার্ড আর শেরিফকে ডাকার আগে আমাকেই প্রথম ঘটনাস্থলে হাজির হতে হবে।

পাহাড়ী পথটায় জোরে গাড়ি চালিয়ে আমি সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম, যেখান থেকে ডেলানির বাড়িটা দেখা যায়। ঘড়িতে তখন নটা বাজতে দশ। দূরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গিল্ডা কি গ্লীন ক্যাম্পে যাবে? না কি রিমোট কন্ট্রোল সুইচ সামলাবার জন্য আমাকে পাগলের মত দৌড়ে ঐ বাড়িতে যেতে হবে? মিনিট সাতেক লাগবে আমার ওখানে পৌঁছতে, নটা কুড়ি পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি তার বেশি নয়।

গাড়িতে বসে আছি হঠাৎ দেখলাম গিল্ডা গ্যারেজের দিকে চলেছে। কোন সন্দেহ রইলো না যে গিল্ডা গ্লীন ক্যাম্পে গেল, যেমন প্রতি শুক্রবার যায়, দুপুরের আগে ফিরবে না।

বাড়িটার দিকে তাকালাম। এখন সোয়া নটা, আধঘণ্টার মধ্যেই উনি মারা যাবেন। হামিশের বাড়ি যেতে যেতে আমি ডেলানির কথাই ভাবছিলাম। কি জানি এখন উনি কি করছেন।

সাড়ে নটা বাজতে মিনিট দুই বাকি আমি হামিশের বাড়ি গেলাম। হামিশ চেয়ারে বসে আছেন কানে রিসিভার। আমাকে দেখে মাথা নাড়লেন। এই যে উনি এসেছেন, আপনি ধরুন, তারপরে আমাকে বললেন, মিঃ রেগান, আপনার ফোন।

বুঝতে পারলাম ডোরিস ফোন করছে, আমি বললাম, ডোরিস বলছো? এক ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

টেরি, আমি কথা বলছি।

গিল্ডা? কোথা থেকে বলছো?

আমি তোমার বাড়ি থেকে বলছি, টেরি, আমি ওকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে এসেছি।'

আমার মনে হলো কেউ যেন আমার হৃদপিণ্ডে গুলি করেছে।

ছেড়ে এসেছো? কি বলছো তুমি? তুমি তো ছাড়তে পারবে না বলেছিলে।

কাল রাত্তিরে আমাদের মধ্যে দারুণ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেও হয়েছে একবার। টেরি, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একেবারে চলে এসেছি আমি, তোমার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো বলে এসেছি। আমি ডিভোর্স নেবো।'

আমি প্রায় কিছুই শুনছিলাম না। যখন ও চলেই এসেছে তখন আর ডেলানির মরবার কোনো কারণ নেই। ঘড়িটা দেখলাম। খুন করার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আর দু মিনিট আছে।

গিল্ডা, তুমি অপেক্ষা করো, এখন কথা বলতে পারছি না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি তোমার কাছে যাবো।

আমি লাইন কেটে দিলাম। তারপরে প্রাণপণে ডেলানির নম্বর ঘোরালাম। হাত দুটো ঘামে ভিজে গিয়েছে। কানে রিসিভার ধরে রইলাম আমি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। ওদিকে রিং বেজে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম—বুঝতে পারলাম খুব দেরী হয়ে গেছে।

ঘড়িতে পৌনে দশটা বাজা পর্যন্ত টেলিফোন ধরে রইলাম আমি। তারপরে খুব ধীরে ধীরে

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

এতক্ষণে ডেলানি মারা গিয়েছেন, আর আমিই ওঁকে মেরেছি। ওঁর মরবার কোনো দরকার ছিল না। গিল্ডা কেবল ওঁকে ত্যাগ করে এসেই মুক্তি পেয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, এখন নিজের কথা ভাবা প্রয়োজন। মন আমার আতঙ্কে ভরে গেলো।

হামিশকে আসতে দেখে আমি নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করলাম। রেডিওগ্রামটায় আমার আনা গ্যাজেটটা লাগিয়ে দিলাম।

উনি বললেন, আমি এই রকমই একটা চাইছিলাম।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে আমি ওঁকে গ্যাজেটটার সব কিছু বোঝালাম। নিজেই ঠিক করতে পারছিলাম না যে আমি কি বলছি। কিন্তু হামিশের জিনিসটা এতো ভালো লেগেছিল যে উনি কিছুই নজর করেন নি।

খুব ভালো, আমি এখুনি একটা চেক লিখে দিচ্ছি।

আমার হঠাৎ মনে পড়লো ডেলানি ডোরিসকে ফোন করেন নি। হামিশকে বলতে হবে যে আমি ডেলানির ওখানে যাবো, কোনো তদন্ত হলে আমি কেন প্রথমে ওর মৃতদেহ দেখতে পেলাম তার একটা কারণ দেখাতে হবে।

যদিও মনে হয় না, তবু ডোরিস হয়তো আমাকে ডাকতে ভুলে গিয়েছে।

আমি খুবই বিপদে পড়লাম। যদি ডেলানি মারা গিয়ে থাকেন, তবে ওঁর বাড়িতে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। আর যদি উনি বেঁচে থাকেন তাহলে ঐ রিমোট কন্ট্রোল যাতে না ছুঁয়ে ফেলেন তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। হামিশ চেক লিখে দিয়েছিলেন। আমি ডেলানিকে ফোন করলাম। কয়েক সেকেন্ড ধরে টেলিফোনটা বাজছে শুনে ছেড়ে দিলাম।

হামিশ চেকটা আমাকে দিলেন। সেটা পকেটে পুরে নিয়ে বললাম, আমাকে একবার ডেলানির বাড়িতে যেতে হবে। ওঁর জন্য একটা সেট বানিয়ে দিয়েছি। কেমন চলছে একটু দেখতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকালাম এগারোটা বাজতে কুড়ি।

বিদায় নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। গাড়িটা খুব জোরে চালাই নি। নার্ভের ওপরে চাপ পড়ছিল। স্টিয়ারিং চেপে ধরেছিলাম। ওখানে কি দেখবো জানি না। উনি কি বেঁচে আছেন?

যা কোনদিন করিনি তাই করলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমি। যেন বাড়িতে ঢুকে দেখতে পাই ডেলানি বেঁচে আছেন।

ব্লু-জয় কেবিনের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাচ্ছি যখন, মেল ভ্যান এসে পাশে দাঁড়ালো। হ্যাঙ্ক ফ্লেচার-গ্রীন ক্যাম্পের পিওন খুশি হয়ে হাসলো, জানলা দিয়ে দুটো চিঠি বাড়িয়ে ধরলো।

মিঃ ডেলানির কাছে যাচ্ছেন? এ দুটো নিয়ে যাবেন? আমাকে আর তাহলে ঢুকতে হয় না।

এটা একদিক থেকে ভালোই হলো। আমি ঠিক কটার সময় এখানে এসেছি, আর একজন সাক্ষী পাওয়া গেল।

দুটো চিঠিই ডেলানির, সে দুটো পকেটে রেখে গেটটা খুলে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠলো। ডেলানি কি মারা গিয়েছেন? আমি কি ওঁকে খুন করলাম? গাড়ি থেকে নেমে নিস্তব্ধ বারান্দার দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। লাউঞ্জের দরজাটা খোলা, একটু থামলাম। ভেতরে টেলিভিশন পর্দাটা একটা ধবধবে চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম, ডেলানি মাটিতে পড়ে আছেন, মুখটা দুহাতে ঢাকা, মারা না গেলে কেউ ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। শরীরে একটা বীভৎস কাঠিন্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি মারা গেছেন। মনে মনে ভাবলাম আমিই এর জন্য দায়ী। আমিই ওঁকে খুন করেছি।

ধীর পায়ে লাউঞ্জে ঢুকলাম। এখন আমার বিপদটা অনুভব করতে পারলাম। যদি একটা কিছু ভুল হয় তবে আমাকেও মরতে হবে। আমি জানি এখন প্ল্যান অনুযায়ী চলতে হবে। কেবল এক এক করে সব কিছু করে যেতে হবে। তাহলেই আমি নিরাপদ।

মেন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে প্লাগটা খুলে দিলাম। নীচু হয়ে ডেলানির ঘাড়ে আমি হাত রাখলাম।

আঙুলে ওঁর ঠাণ্ডা চামড়া ছুঁয়েই বুঝলাম যে উনি মারা গেছেন। বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। টি. ভি. সেটের পেছনের প্যানেলটা খুলে ফেললাম। টাইম সুইচ ক্লকটা বার করে দিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের তারটা খুলে ফেললাম। তারপর আবার ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দিলাম সব।

কাজটা পাঁচ মিনিটেই হয়ে গেল। ক্লকটা নিয়ে গাড়িতে সিটের তলায় রেখে এলাম। মেন্ লাইনের তারটা বদলে আগের রাত্রের মতো করে দিলাম।

একটা কোনো খুচরো যন্ত্রের বাক্স চাই, আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। পেয়ে গেলাম একটা, দুটো স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল তাতে, একটা পুরোপুরি ইস্পাতের। সেইটাই নিয়ে এসে ডেলানির হাতের কাছে ফেলে রাখলাম।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচের রবারের ঢাকনাগুলো পরিয়ে দিলাম আবার। টি. ভি. সেটটা ঘুরিয়ে বসালাম যাতে পেছনের খোলা দিকটা ডেলানির শরীরের দিকে থাকে।

দূরে সরে এসে সবটা দেখলাম। সব ঠিকই আছে কেবল একটা খালি গ্লাস ডেলানির পাশে কার্পেটের ওপর গড়াচ্ছে। মনে হলো এটা ঠিক মানাচ্ছে না। হয়তো মরবার আগে ডেলানি মদ খাচ্ছিলেন। গ্লাসটা তুলে নিলাম। তদন্তে কোনো ঝামেলা হয় এটা আমি চাই না। ব্যাপারটা যতটা পারা যায় স্বাভাবিক করে রাখাই ভালো। জো স্ট্রংগার যদি সন্দেহ করে যে ডেলানি মাতাল হয়েছিলেন তাহলে সে হয়তো অনেক বেশি করে খোঁজ খবর করবে। গ্লাসটা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখলাম। একটা কাপড় দিয়ে ধরে রেখেছিলাম পাছে আমার আঙুলের ছাপ না পড়ে যায়। কাবার্ডে গেলাসটা রেখে দিলাম।

লাউঞ্জে ফিরে এলাম। সমস্ত কিছু সাজাতে দশ মিনিট লেগেছে।

এখন শেরিফ জেফারসনকে খবর দেওয়া যেতে পারে।

টেলিফোন তোলার আগে আমি আর একবার চারিদিকে দেখে নিলাম। সবটা বিশ্বাসযোগ্য লাগছে কি না। ডেলানি টি. ভি.-র সামনে প'ড়ে আছেন, সেটটার পেছনটা খোলা ওঁর দিকেই ফেরানো। হাতের কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার, কেউ দেখলে এই কথাই ভাববে যে উনি সেটটার কোনো মেরামতি করতে গিয়েই শক্ খেয়েছেন।

এই ধরনের ব্যাপার আগেও অনেক ঘটেছে। মাঝে মাঝেই কাগজে বের হতো যে কেউ এরকম চালু অবস্থায় টি. ভি. সেট সারাতে গিয়ে মরেছে।

টেলিফোন তুলতে গিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো সেটটার তো কোন গোলমাল নেই। আমি প্রায় একটা ভুল করে ফেলছিলাম। কোঁনো দোষ না থাকলে ডেলানি একে সারাবার চেষ্টা করতে যাবেন কেন? কোনোরকম তদন্ত হলে সেটটা চালিয়ে যদি দেখা যায় যে এটা ঠিকমত কাজ করছে তাহলে পুলিশ তখনই সন্দেহ করবে।

আমার যন্ত্রের বাক্স থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার নিলাম, এটার গায়ে রবার জড়ানো। সেটটা খুলে টার্মিনালে স্ক্রু-ড্রাইভারের মুখটা ঠেকিয়ে দিলাম। একটা ঝলকানি দেখা গেল, কটা ভাল্‌ভ পুড়ে গেল, ধোঁয়া বের হলো একটু।

টেলিফোন তুলে শেরিফ জেফারসনকে ডাকলাম। 'শেরিফ?' কণ্ঠস্বরে জরুরী ভাব আনবার জন্য চেষ্টা করতে হলো না। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে, ভেতরে ভেতরে বেশ খারাপ লাগছে। টেরি রেগান বলছি। আপনি এখনই একবার ব্লু-জয় কেবিনে চলে আসুন। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ডেলানি মারা গেছেন।

তাই নাকি! ওঁর গলার স্বরটা শান্ত। আমি এখনই যাচ্ছি।

ডাক্তারকে নিয়ে আসবেন।

ও এখানেই আছে, দুজনেই যাচ্ছি। টেলিফোন ছেড়ে দিলেন, ওঁর এখানে আসতে আধঘণ্টা লাগবে।

আমি একটু সময় পেলাম। গিল্ডার কথাই মনে হলো।

আমার হঠাৎ মনে হলো যে, যদি কোনো গোলমাল হয় পুলিশ যদি জানতে চায় ডেলানির মৃত্যুর সময় থেকে গিল্ডা কোথায় ছিল। পুলিশ সন্দেহ করবে আমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপার আছে। ওরা তাহলে হত্যার মোটিভটা আন্দাজ করবে। গিল্ডা আমার ঘরে দেড় ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছে।

গিল্ডার জন্য একটা অ্যালিবাই বানাতে হবে আমায়। কিন্তু প্রথমে ওকে গ্রীন ক্যাম্পে পাঠানো দরকার। আমি বাড়িতে ফোন করলাম। গিল্ডা ধরলো।

আমি বললাম, যা যা বলছি কোনো প্রশ্ন না করে ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলো করে যাও। খুব জরুরী।

নিশ্চয় করবো টেরি। কোনোরকম গোলমাল হয়েছে নাকি?'

আমি চাই তুমি এখনই গ্রীন ক্যাম্পে চলে যাও। রাস্তা দিয়ে যাবে না লেকের পাশ দিয়ে যাবে। পথে জেফারসনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাক, এটা আমি চাই না। সেখানে গিয়ে যেমন হপ্তা শেষে কেনাকাটা করো, তাই করবে। সাড়ে বারোটার আগে আসার দরকার নেই। বুঝেছো?

কিন্তু টেরি, কেন? আমার কোনো কেনাকাটা করবার নেই। আজ বিকেলে আমি লস্ এঞ্জেলসে যাবো।

গিল্ডা! দোহাই! এটা খুব জরুরী! একটা বিপজ্জনক কিছু ঘটেছে। প্রশ্ন না করে যা বলছি তাই করো। তোমার ফেরার পথে মোড়ের মাথায় পৌনে একটার সময় আমি দেখা করবো, তখন তোমায় সব বলবো। সঙ্গে তোমার মালপত্র নিয়েছ নাকি?

হ্যাঁ।

ওগুলো যেন দেখা না যায়। গাড়ির পেছনে ঢুকিয়ে দাও। কেউ যেন জানতে না পারে যে তুমি ডেলানিকে ছেড়ে গেছ। যখন দেখা হবে সব বুঝিয়ে বলবো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। নার্ভগুলো যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। মিনিট কুড়ি ধরে সিগারেট খেতে খেতে মনটাকে হালকা করতে লাগলাম।

এমন সময় শেরিফের গাড়ির শব্দ পেলাম আমি।

জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ড সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন।

ডাক্তারকে খুব বৃদ্ধ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটা কালো ফ্রক কোট, কালো প্যান্ট পরনে, প্যান্টের নীচের দিকটা রাইডিং বুটের মধ্যে ঢোকানো।

জেফারসন জানতে চাইলেন, মিসেস ডেলানি বাড়ি আছেন কিনা।

না। উনি বোধহয় গ্রীন ক্যাম্পে কেনাকাটা করতে গেছেন।

আমি ওদের লাউঞ্জের দিকে নিয়ে গেলাম।

আমি যখন দেখি তখন ঠিক এইভাবেই উনি পড়েছিলেন। মনে হচ্ছে উনি সেটটার কিছু করতে গিয়েছিলেন, কোথাও ছুঁয়ে ফেলে শক্ খেয়েছেন। উনি নিশ্চয়ই খুব অসাবধান হয়ে কাজ করছিলেন। যে স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়েছিলেন সেটায় কোনো রবারের ঢাকনা ছিল না। ওটা ওঁর হাতের কাছেই পড়েছিল।

ডাক্তার ভালো ভাবে ডেলানির দেহটা দেখতে লাগলেন। প্রায় তিনঘণ্টা হলো শেস হয়েছেন। রাইগার মর্টিশ অনেকদূরে ছড়িয়েছে। দেহটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

ডেলানির মুখে নীল ছোপ ধরেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে, ঠোঁটে যন্ত্রণার চিহ্ন, বীভৎস দেখাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, শক খেয়ে মারা গেছেন। কোনো সন্দেহ নেই। নীল ছোপটা একটা নিশ্চিত চিহ্ন। চেয়ারটার পুরোটা ধাতব। সারা শরীরে শকটা সমানভাবে ছড়িয়ে গেছে।

জেফারসন টি. ভি. সেটটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগলেন। উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন কি করে ব্যাপারটা হলো? আমি বললাম, আপনি যদি ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে টি.ভিতে কাজ করতে যান, তাহলে বিপদ হবেই। কোথাও ছুঁয়ে ফেললেই সর্বনাশ।

সেটটায় কি কোনো গোলমাল ছিল?

এখানে একটা তার খোলা দেখছি। আমারই বানিয়ে রাখা ঢিলে করা তারটা দেখালাম।

জেফারসন আর ডাক্তার ভেতরটায় উঁকি দিলেন।

কি করে ঢিলে হলো এরকম, তুমি কিছু বুঝতে পারছ? জেফারসন জিজ্ঞেস করলেন।

জোড়টা খুলে গিয়েছিল। ডেলানি খুব তাড়া দিচ্ছিলেন, আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলাম। উনি ডেম্পসির মারপিটের ছবিটা দেখতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় সেটটা চলছে

না দেখে উনি আমায় না ডেকে নিজেই ঠিক করতে গিয়েছিলেন। তার ফলেই এরকম হয়েছে।

উনি যদি তোমায় না ডাকেন তবে তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

আমি বললাম, সেটটা ডেলিভারী দেওয়ার পর, এ পর্যন্ত আমি এটা দেখতে আসিনি, হামিশের বাড়িতে এসেছিলাম, ফিরে যাবার পথে ভাবলাম একবার দেখে যাই, উনি ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন কিনা। এসে ওঁকে এইভাবে দেখলাম।

জেফারসন দেহটার কাছে এগিয়ে গেলেন,'অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিতে হবে। মিসেস ডেলানি আসার আগেই একে সরিয়ে ফেলা দরকার।

শেরিফ আমাকে যদি দরকার না হয়, আমি গ্রীন ক্যাম্পে গিয়ে মিসেস ডেলানিকে খবরটা দিতে পারি। আমি বললাম।

তাই করো। উনি খুব আঘাত পাবেন। অ্যাম্বুলেন্স চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওঁকে আটকে রাখো। ওঁকে বোলো, আমি এখানেই কিছুক্ষণ থাকবো। ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলবো। একটা তদন্ত হবে, তবে ঝামেলার কিছু নেই।

আমি বেবিয়ে গেলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলাম যে যদি একটা বিরাট ভুল না কবে থাকি—তাহলে এই খুনের দায়ে আমাকে কেউ জড়াতে পারবে না।

গিল্ডা মোড়ের মাথায় আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল ওর মুখটা বিবর্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

কি ব্যাপার টেরি?

গিল্ডা একটা খারাপ খবর আছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ওর চোখ দুটো আতঙ্কে কালো হয়ে গেলো।

জ্যাকের কিছু হযেছে?

আমি ওর হাত দুটো ধরে বললাম, 'উনি মারা গেছেন।

গিল্ডা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো, সাদা হয়ে গেল মুখটা। একটু পরেই চোখ খুলে বললো, 'দুর্ঘটনা? তার মানে? কি হয়েছিল?'

উনি শক্ খেয়ে মারা গেছেন। শেরিফ জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ড ওখানেই আছেন।'

শক্ খেয়েছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দূর থেকে একটা সাইরেনের শব্দ কাছে আসছে শুনে দুজনেই শক্ত হয়ে গেলাম। গ্রীন ক্যাম্প অ্যাম্বুলেন্সটা আমাদের পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো চলে গেল। বুইকের দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকে গিল্ডার পাশে বসলাম।

টি ভি. সেটটার একটা তার খুলে গিয়েছিল, আমি বললাম।

ওঁর ডেম্পসির মারপিঠের ছবিটা দেখাব খুব আগ্রহ ছিল। যখন দেখেছেন যে টি. ভি. কাজ করছেনা, নিজেই নিশ্চয় কিছু ঠিক করতে গিয়েছিলেন। তাতেই প্রচণ্ড শক্ খেয়েছেন। চেয়ারটাও ধাতব ছিল, কোনো কিছু করার ছিল না।

গিল্ডা হঠাৎ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম:

একটু পরে ও সামলে নিয়ে বললো, 'তুমি এসব জানলে কি করে? তুমি তো তখন ওখানে ছিলে না।

নিশ্চয়ই ছিলাম না। আমি মিঃ হামিশের বাড়িতে ছিলাম, ফেরার পথে তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে আসতে হয়, সেট্টা কি রকম চলছে দেখার জন্য ঢুকেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম...।

গিল্ডা চোখ মুছতে মুছতে বললো, যখন তুমি জানতে যে আমি ওকে ত্যাগ করে এসেছি আর তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তারপরও তুমি ওখানে গিয়েছিলে?

সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। গিল্ডা আমি তাকে সেটটা বিক্রী করেছি কিন্তু এখনও দাম পাইনি। আমার এতে অনেক টাকা লেগেছিল।

তুমি ভেতরে গিয়ে ওকে দেখতে পেলে?

হ্যাঁ, এখন গিল্ডা, ওরা যেন জানতে না পারে যে. তুমি জ্যাককে ছেড়ে চলে আসছিলে। এই জন্যই আমি তোমাকে গ্রীন ক্যাম্পে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে কেনাকাটা করতে বলেছিলাম।

কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছিলাম এটা না জানাবার কারণ কি?

একটা তদন্ত হবে, করোনার নানা প্রশ্ন করবেন। যদি জানাজানি হয় তুমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছিলে, তাহলে নানারকম কথা উঠবে। এটা ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে গিল্ডা। তুমি জানো না, এ জায়গাটায় কি রকম কেচ্ছা রটে! এমন কি ওরা ভাবতে পারে যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যদি এটা জানাজানি হয় যে, আমার জন্য তুমি আমার বাড়িতে গিয়েছিলে, আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে, সবাই আমাদের জড়িয়ে গল্প ফাঁদবে, বুঝতে পারছ তো?

গিল্ডা বললো, আমার মনে হয় ও আত্মহত্যাই করেছে। কালরাত্রে আমাদের দারুণ ঝগড়া হয়েছিল, আবার আজ সকালেও আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়তো সেটাই আমার দোষ। আমার জন্যেই এরকম হলো। তুমি যদি তখন ওর মুখটা দেখতে...

ওসব ছাড়ো। এটা একটা দুর্ঘটনা। সেটটা চালু করতে গিয়েছিলেন, এমন কিছু ছুঁয়ে ফেলেছিলেন, যাতে শক্ খেয়েছেন। একটা ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়েছিলেন, চেয়ারটাও ইস্পাতের...।

এছাড়া পেছনের সেটটা তিনি খুলে ফেলেছিলেন, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তখন তার হাতে ছিল,

গিল্ডার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ও তো হাতের কাজ কিছু করতো না। কখনো ও এসব মেরামতের কাজে হাত দিত না। সেটটা মেরামত করার কথা ও চিন্তাও করতে পারে না।

একথাটা আমি ভেবে দেখিনি, তদন্তের সময়ে একথা বললে, করোনারের সন্দেহ হতে পারে। আমি বললাম, কদিন আগে একটা ছবি দেখার জন্য উনি পাগল হয়েছিলেন। আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন সেটটা কি করে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। তুমি তো জানই মারপিটের ব্যাপারে উনি কেমন আগ্রহী। ছবিটা হচ্ছে না দেখে, পেছনটা খুলে উনি তারটা লাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্ খেয়েছেন।

গিল্ডার চোখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'ওর পাশে স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল বললে না?

আমি ঘামতে শুরু করলাম। আমার মনে পড়লো যে যন্ত্রপাতির বাক্সটা স্টোরের ওপরের তাকে ছিল, তাকটা মাটি থেকে অন্ততঃ সাত ফিট উঁচুতে। ডেলানি চেয়ার থেকে নড়তেই পারেন না, তাঁর পক্ষে এটা পেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। একটা বিচ্ছিরি ভুল করে ফেলেছি।

একটু সামলে নিয়ে বললাম, গিল্ডা, এটাকে রহস্যময় করে তোলার চেষ্টা করো না। সেটটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। চারিদিকে খুঁজেছেন বাক্সটা, একটা লাঠি দিয়েও টেনে নামাতে পারেন। বাক্সটা মাটিতেই ছিল দেখেছি। তুমি ব্যাপারটা জটিল করে তুলছো। আমি বুঝতে পারলাম ও কিছুই শুনছে না। ও কি সন্দেহ করছে, যে আমিই তাঁকে খুন করেছি?

মনে মনে ভাবলাম, ব্যাপারটা একে একে জটিল হয়ে উঠছে। যদি আমি গিল্ডাকে বোঝাতে না পারি, আর ও যদি করোনারকে বলে যে ডেলানি আত্মহত্যা করেছে। এবং কাগজে বের হয়, তাহলে লস্ এঞ্জেলসের পুলিশ তদন্ত করতে আসবেই। উনি নেশা করেছিলেন। আমি দেখেছি ওঁর পাশে হুইস্কি আর গ্লাস ছিল। ঠিক আছে তোমার কথা অনুযায়ী উনি ভেঙে পড়েছিলেন, এবং বিচলিত হয়েছিলেন। টি. ভি. চালিয়ে তোমার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হতে চাইছিলেন। ওটা চলছে না দেখে রেগে গিয়েই হয়তো সারাতে গিয়েছিলেন। একজন অসুখী মাতালের পক্ষে যা করা সম্ভব তাই হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি না ও এরকম করতে পারে।

গিল্ডা এটা দুর্ঘটনা। তুমি যদি করোনারকে বলো উনি আত্মহত্যা করেছেন, খবরের কাগজে বেরোবে সেটা, তোমাকে আমাকে নিয়ে কেচ্ছা রটবে, আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে।

ঠিক আছে টেরি, ও যেন হঠাৎ ব্যাপারটা ছেড়ে দিল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তবু মনে হয় না কিছু যায় আসে, ও মারা গেছে, আমি স্বাধীন, এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

গিল্ডা আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই, সাবধান হতে হবে। এখন যা বলবো একটু পাগলামো মনে হলেও শোনো। তদন্ত হবে একটা, আমরা যে প্রেমিক প্রেমিকা এটা যেন কেউ না জানে। তাহলে আমরা মুস্কিলে পড়ে যাবো। পুলিশ হয়তো জানতে চাইবে, ওই সময়ে তুমি

কোথায় ছিলে, তুমি যে ওই সময় আমার বাড়িতে ছিলে এটা বলা খুব ভুল হবে। তুমি বলবে যে তুমি নটার সময় যেমন গ্রীন ক্যাম্পে যাও, তেমনি গিয়েছিলে, লেক রোড দিয়ে গিয়েছো। পথে টায়ার ফেটেছিল। টায়ার বদলাতে অনেক সময় লেগেছে সাড়ে এগারোটার আগে তুমি গ্রীন ক্যাম্পে পৌঁছতে পারোনি।

আমি লক্ষ্য করলাম সে শক্ত হয়ে গেল। আমার দিকে বিব্রত হয়ে তাকালো।

কিন্তু এ কথা কি করে বলবো এ তো সত্যি নয়।

আমি যতোটা সম্ভব গলার স্বর সংযত করে বললাম, ওরা যদি জানতে না চায় তবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যদি জানতে চায় তবে এই গল্পটাই তোমাকে বলতে হবে। না হলে আমাদের দুজনেরই বিপদ। আমি তোমার স্পেয়ার টায়ারটা ফাঁসিয়ে দিচ্ছি, যদি ওরা দেখতে চায়—'

টেরি গিল্ডা আমার হাত চেপে ধরলো, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? এমন করছো যেন আমি কোন অন্যায় করেছি।

শুধু তুমি একা নও, আমিও, আমরা দুজনেই ভুল করেছি। আমরা ভালোবেসেছি গিল্ডা। তুমি কি বুঝছো না যে, লোকের সহানুভূতি হবে একজন পঙ্গুর ওপরেই। উনি মারা যাবার আগে আমরা প্রেমে পড়েছি একথা যদি ছড়িয়ে যায়, কেউ কি আমাদের জন্য সহানুভূতি দেখাবে? সব কাগজের প্রথম পাতায় আমাদের কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই গিল্ডা তাই যা বলছি তাই তোমাকে করতে হবে।

ঠিক আছে, তাই হবে, আমি এখন ঠিকমতো ভাবতে পারছি না, কিন্তু তুমি যা বলছো তাই হবে।

বুইক থেকে বেরিয়ে পেছনে স্পেয়ার টায়ারটা পরীক্ষা করলাম তারপর সেটাকে অকেজো করলাম। আমি গিল্ডাকে জানিয়ে দিলাম যে, এখন থেকে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পরস্পরের দেখা না হওয়াই ভালো। তদন্তের পরে তুমি লস এঞ্জেলসে যাবে। সেখানে ঘর ভাড়া নেবে। আমি তোমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারবো। তারপরে কয়েকমাস বাদে বিয়ে করবো। এখান থেকে আমরা চলে যাবো। তোমার কাছে ওঁর টাকা থাকবে। আমরা দোকান করবো। তুমি এখন স্বাধীন, কিছুদিন বাদেই আমরা মিলিত হবো। ওর হাতে আমি হাত রাখলাম।

একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল, আমরা দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম। দুজনেরই খুব খারাপ লাগলো। আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাম্বুলেন্সে কি আছে।

ওখানে যাও গিল্ডা, আমি বললাম, জেফারসন অপেক্ষা করছেন। চিন্তা করো না। একবার তদন্ত শেষ হলে চিরদিন আমরা একসঙ্গে থাকবো।

মনে মনে বললাম চিরদিন মানে একটা সুদীর্ঘ সময়।

।। পাঁচ ।।

মৃত্যুটা ইনসিওর করা ছিল—

বিকেলে বাড়ি ফিরে বারান্দায় বসে ছিলাম হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে। মনে মনে ভাবছিলাম আমি একজনকে খুন করেছি। যদিও জানি যে প্ল্যানটার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না, তবু আমার মনে হচ্ছিল যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাবো।

একটা গাড়ি এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। শেরিফ জেফারসন গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এলেন। ওঁকে খুব ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন লাগছিল।

আমি দুটো হুইস্কি ঢেলে ওঁকে এক গ্লাস দিলাম।

তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। জো পরশু থেকে ছুটিতে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। কালকেই করবো। তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ঠিক আছে। আমি হাত দেখিয়ে চেয়ারে বসতে বললাম।

উনি বললেন, আমি প্রকৃত তথ্যগুলো সোজাসুজি জানতে চাই। ডাক্তার বলছে এটা দুর্ঘটনা, তোমার কি মনে হয়? আমার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল।

আর কিছু হতে পারে না, আমি বললাম, এটা নেহাৎই দুর্ঘটনা।

উনি বললেন, এটা দুর্ঘটনা বলেই আমার মনে হচ্ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত মিসেস ডেলানি ওঁকে ত্যাগ করে যাবার মতলব করেছিলেন। আমি একজন বাতিকগ্রস্ত পুরোনো পাপী। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি চারিদিকে ঘুরে দেখছিলাম। মিসেস ডেলানি সমস্ত কাপড় জামা নিয়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয় উনি যখন সকালের দিকে বেরিয়েছেন তখন আর ফিরবেন না বলেই বেবিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, দুর্ঘটনায় হোক বা আত্মহত্যা করেই হোক যেভাবেই উনি মারা গিয়ে থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না। জিনিসটা জটিল করে কোনো লাভ নেই। যদি উনি আত্মহত্যাই করে থাকেন তাহলে মিসেস ডেলানির পক্ষে তাতে অসুবিধা বাড়বে। আপনি বুঝতে পারছেন যে লোকে কত কি বলবে। কেন ওঁকে আরো কঠিন অবস্থায় ফেলবেন?

জেফারসন পাইপে ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমি সবই জানি কিন্তু আমার কর্তব্য, ব্যাপারটার রেকর্ড পরিষ্কার রাখা। মিসেস ডেলানির মুখে চোট লাগলো কেমন করে? আমার মনে হয় কেউ খুব জোবে ওকে মেরেছিল, এবং সে ওঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এতেই মনে হয় ওদেব বনিবনা ছিল না। এটা এমন ব্যাপার যে অনুসন্ধান করা উচিৎ। বুজ্ পারবে খুব তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান করতে।

আমি বললাম, আপনি এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্তা। আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। আপনি কি সত্যিই মনে করেন, কেউ টি. ভি. সেটে স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে মরতে যায়? ডাক্তারের মতো আমিও নিশ্চিত যে এটা একটা দুর্ঘটনা।

উনি একটু ভাবলেন তারপব বললেন, মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি। ওকে ঝামেলায় ফেলার মানে হয় না। যদি মিসেস ডেলানি স্বামীকে ছেড়ে গিয়েও থাকেন উনি পরে মত বদলে ছিলেন। এটা ওঁর স্বপক্ষে যাবে।

আমার সঙ্গে ওঁর মোড়ের মাথায় দেখা হয়েছিল। উনি ফিরেই আসছিলেন।

জেফারসন উঠে দাঁড়ালেন। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

আমি এবার যাই। তুমি তদন্তের সময় এসো বেলা এগারটায়।

'আমি যাবো।'

আমরা গোধূলির আলোয় বাইরে বেরিয়ে এলাম। উনি চলে যাবার পর আমি ঘরে ফিরে গেলাম।

গিল্ডাকে টেলিফোন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সেটা নিরাপদ হবে না। সামনে দীর্ঘ রাত। যেহেতু ডেলানির মৃত্যু আমার বিবেকে নাড়া দিচ্ছিল, সেজন্য আমার খুব ভয় করছিল।

গ্রীন ক্যাম্পে রিক্রিয়েশন হলে তদন্তটা হলো। জনা বারো লোক ভেতরে বসে ছিল। গ্রীন ক্যাম্পে ডেলানিকে বিশেষ কেউ চিনতো না। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কারুর আগ্রহও ছিল না।

এগারোটা বাজতে পাঁচে আমি হলে ঢুকলাম। গিল্ডা এলো মিনিট খানেক পরে। ওর সঙ্গে একজন সুবেশ যুবক, আমি আগে ওকে দেখিনি। গিল্ডা এগিয়ে এসে যুবকটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওর নাম জর্জ ম্যাকলিন, ডেলানির অ্যাটর্নী, লস এঞ্জেলস্ থেকে এসেছে। ম্যাকলিন আমার সঙ্গে করমর্দন করলো।

এগারোটায় জেফারসন আর ম্যালার্ড এলেন। ওঁরা গিল্ডার সঙ্গে করমর্দন করলেন। ম্যাকলিনকে আর আমাকে দেখে মাথা নাড়লেন, তারপর বসে পড়লেন।

করোনার জো স্ট্রিংগার এসে ঘরের মাঝখানে টেবিলের পেছনে বসলেন। ছোটখাটো মোটা মর্যাদাপূর্ণ চেহারা তেমন বুদ্ধিদীপ্ত নয়। স্ট্রিংগারের বয়স সত্তরের কাছে। উনি কাজ শুরু করলেন। জেফারসন সাক্ষী দিলেন, উনি ডেলানিকে টি. ভি-র সামনে কি ভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। উনি স্ট্রিংগারকে বললেন যে, এতে কোনো গোলমাল নেই, ডাক্তার এটা সমর্থন কববেন। স্ট্রিংগার ডাক্তারকে ডাকলেন।

ডাক্তার সাক্ষীর চেয়ারে বসলেন। উনি বললেন যে ডেলানি প্রচণ্ড শক খেয়ে মারা গেছেন।

নিঃসন্দেহ এটা একটা দুর্ঘটনা। উনি উল্লেখ করলেন যে ডেলানি একটা পুরো ইস্পাতের চেয়ারে বসে ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করেছিলেন। এই অবস্থায় স্ক্রু-ড্রাইভারটা কোনো খোলা তারের সংস্পর্শে এলে এত প্রচণ্ড শক্ লাগবে যে, খুব স্বাস্থ্যবান লোকও মারা যাবে।

জো কিছু নোট করলেন, ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আমাকে ডাকলেন।

প্রথমেই তিনি আমাকে যা বললেন, তাতে আমার তিনভাগ কাজ হয়ে গেল। মিঃ রেগান, আপনি কি বলতে পারেন কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো?

আমি স্ট্রিংগারের টেবিলে গিয়ে টি. ভি. সেটটা এঁকে বোঝালাম তারটা কিভাবে খুলে গিয়েছিল, স্ক্রু-ড্রাইভার ঠেকে গিয়ে কিভাবে শক্ লাগতে পারে। আমি এও বললাম ডেম্পসির ছবি দেখার জন্য ডেলানি কতটা উৎসুক ছিলেন। আসলে লোকে বুঝতেই পারে না, চালু টি. ভি. তে হাত দিলে কি বিপদ ঘটতে পারে। আসলে কথা হলো উনি লোহার চেয়ারে বসে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কাজ করতে গিয়েছিলেন, যার জন্য বাঁচবার কোনো সুযোগ-ই ছিল না।

স্ট্রিংগারকে দেখে মনে হলো উনি আমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করেছেন। আমি যখন সীটে গিয়ে বসলাম, উনি তখন ম্যাকলিনকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কিছু বলার আছে কিনা।

জর্জ বললো সে কিছু বলতে চায় না, ঠিক আছে।

স্ট্রিংগার বললেন যে, দেখা যাচ্ছে ডেলানি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে রায় দিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। শেরিফ জেফারসন, ডাঃ ম্যালার্ড, ম্যাকলিন ও আমি গিল্ডার পেছন পেছন সবাই বাইরে এলাম প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। স্ট্রিংগার গিল্ডাকে সমবেদনা জানালেন। জেফারসন বললেন, যদি আমি কিছু করতে পারি, মিসেস ডেলানি আমাকে বলবেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

গিল্ডা তাঁকে ধন্যবাদ দিল। বললো যে ম্যাকলিনই সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পারবে।

ওঁরা চলে যাবার পর শুধু গিল্ডা আর আমি একা রইলাম। এখন আমার মন থেকে সব ভয় চলে গিয়েছিল। যেমনটি হবে বলে আমার প্ল্যান ছিল, ঠিক তেমনি হয়েছে সব কিছু।

গিল্ডা আমাকে বললো, ঐ টি. ভি সেটটার তো দাম দেওয়া হয়নি, উনি দিয়েছিলেন কি? তুমি ওটা নিয়ে যেও।

ঠিক আছে পরশু এসে নিয়ে যাবো, আর কিছু?

সে মাথা নাড়লো, মিঃ ম্যাকলিন সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।

আমি গিল্ডাকে বললাম, একমাস এখন আমাদের দূরে থাকতে হবে। আমার মনে হয় তোমার লস এঞ্জেলসের কোনো হোটেলে চলে যাওয়াই ভাল। মাস খানেক পর আমার এখানকার ব্যবসা গুটিয়ে তোমার কাছে চলে যাব। কোথাও চলে যাব আমরা—নিউ-ইয়র্ক বা আর কোথাও, নতুন করে শুরু করবো। আমি দোকান খুলবো। লস্ এঞ্জেলস থেকে আমায় চিঠি লিখো। টেলিফোন করো না।

তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে। গিল্ডা রাস্তা পেরিয়ে বুইকটার কাছে গেল।

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে কটা কাগজ পকেটে ঠেকলো, দেখলাম দুটো চিঠি, যে দুটো পিওন আমায় ডেলানিকে দিতে বলেছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি ছুটে গিয়ে গিল্ডাকে চিঠি দুটো দিয়ে বললাম যে, কাল এসেছে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। গিল্ডা চলে গেল। একমাস অপেক্ষা করা কিছু বেশি নয়, তারপর আমাদের সামনে রয়েছে একটা নতুন উদ্দীপনাময় জীবন।

যেভাবে বলে রেখেছিলাম সেইভাবেই টি. ভি. সেটটা আনবার জন্য আমি ব্লু-জয় কেবিনে গেলাম। গাড়ি থেকে নামতে নামতে গিল্ডা বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওর পরনে কাউবয় শার্ট আর চাপা প্যান্ট।

ওকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, রাত্রে ঘুম হয়নি নিশ্চয়। আমি উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে সরিয়ে দিলো।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আমার হঠাৎ খুব ভয় করে উঠলো। টেরি...খারাপ খবর।

কি ব্যাপার?

আমাদের কোনো টাকা নেই।

চমকে তাকালাম। এ কথা শুনবো বলে আশা করিনি।

মিঃ ম্যাকলিন কাল এসেছিলেন। উনি ভেবেছিলেন আমি জানি। জ্যাক ভীষণ টাকা উড়িয়েছে। ম্যাকলিন সাবধান করতেন, ও শোনেনি। এখানকার ভাড়াটা অদ্ভুত বেশি। কোনোদিনই ওর বিশেষ কিছু ছিল না যদিও ও বলতো অনেক আছে। যে টাকাটা ও রেখে গেছে তাতে ওর দেনাই শোধ হবে না। টেরি, আমি খুবই দুঃখিত। এখনও বুঝে দেখো আমাকে বিয়ে করে তোমার কোনো লাভ নেই। তোমাকে আমার কিছুই দেবার নেই। ব্যবসা শুরু করতে না পারলে বৌ নিয়ে তুমি জড়াতে চাও না, আমি জানি। আমাকে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো হবে।

আমি বললাম, এটা খুবই দুঃসংবাদ বটে। ডেলানির টাকা নিয়েই নতুন করে শুরু করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু গিল্ডা আমি তোমায় ভালোবাসি। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমাকে একটা চাকরি নিতে হবে। প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি উঠে গিয়ে গিল্ডার পাশে বসলাম। গিল্ডা আমি তোমাকে চাই। হয়তো এটাই ভালো হলো। এই টাকাটা নিতে আমার দ্বিধা হচ্ছিল। আমাকে সুযোগ দাও আমি সব ঠিক করে দেব।

মুখটা অন্যদিকে করে গিল্ডা কাঁদতে লাগলো। কান্নার বেগ কমলে ও আমাকে বললো, আমি ভাবছিলাম এটা দুর্ঘটনা না, আত্মহত্যা। তোমার কি মনে হয় দেনাশোধ করার জন্য ও নিজেই এটা করেছে?

ও যা বলছিল আমি সবটা না শুনলেও ওর শেষ কথাটায় চমকে তাকালাম।

দেনা শোধ—তার মানে?

ও একটা ইনসিওরেন্স করেছিল, আমি নিজেই জানতাম না। মিঃ ম্যাকলিন কাল আমায় বলেছেন। ওর মধ্যে দুর্ঘটনার কথাও আছে। পাঁচ হাজার ডলার। উনি বলেছেন, টাকাটা পাওয়া যাবে। এতে জ্যাকের দেনা শোধ হয়েও কিছু থাকবে। আমি কোনো একটা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তাতে চলবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা যেন উল্টে গেছে, সেটটা ইনসিওর করা জানতাম না তো!

সেটটা তুমি দেবার পর, একজন এসেছিল। তার নাম বোধহয় লাউসন, ও-ই ইনসিওর করিয়েছে।

আমার মনে পড়লো ডেলানির নামটা লাউসন আমার কাছেই পেয়েছিল। কিন্তু ওটা তো সেটের জন্য। তোমার স্বামীর দুর্ঘটনার জন্য তো নয়?

হ্যাঁ, তাই। সেটের মালিক এতে দুর্ঘটনায় পড়লে তাও পলিসির মধ্যে আছে। মিঃ ম্যাকলিন তাই বলছেন।

হঠাৎ আমার বরফের মত ঠাণ্ডা লাগলো। আমার সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ছে মনে হলো। ভয়ে অসাড় হয়ে গেলাম আমি। এর মানে তদন্ত হবে। জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ডের মত সব কিছু সহজে ইনসিওরেন্স কোম্পানি মেনে নেবে না।

এই পলিসিটার জন্য আমার জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, গিল্ডা তদন্ত হতে পারে। এটার দাবী না করাই বোধহয় ভালো। এটা নিয়ে হৈ-চৈ করা ঠিক হবে না। ওরা তোমার আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলতে পারে।

গিল্ডা চমকে তাকালো, কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার! তিন হাজার তো দেনাই রয়েছে। আমাকে করতেই হবে।

আমি বললাম ওরা টাকা না দেবার যে কোনো ছুতো বার করতে চাইবে। ওরা প্রমাণ করতে চাইবে এটা আত্মহত্যা। তা হলে ওদের টাকা দিতে হবে না। আত্মহত্যা করার একটা ভালো কারণ ওরা বার করতে চাইবে। আমরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত এটা দেখাতে পারলে ওদের খুব সুবিধে হবে। ওদের যদি সন্দেহ হয় যে আমরা প্রেম করি তাহলে ওরা নেকড়ের মতো আমাদের ছিঁড়ে

খাবে। এতে কোনো ভুল নেই। ওরা জিতবে বলছি না কিন্তু তোমাকে মামলা লড়তে হবে। ওদের উকিল তোমার কাছ থেকে ঘটনাটা বার করে আমাকেও কোর্টে হাজির করাবে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমাদের নিয়ে রসের গল্প বের হবে।

গিল্ডা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল যেন আমি পাগল। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে দাবীটা না মেটা পর্যন্ত আমি দূরে দূরেই থাকবো।

লস্‌ এঞ্জেলসে আমাদের দেখা করা চলবে না। দাবী তোলার পরে ইনসিওরেন্সের লোক তোমার ওপর নজর রাখবে। আমাদের একসঙ্গে দেখলে ভালো হবে না। আমাদের প্রেমটা ওরা দাবীর বিরুদ্ধে লাগাতে পারে।

ও হতাশ ভাবে বললো, ঠিক আছে তুমি যা ভালো বোঝ কর। আমি উঠে পড়লাম, ও আমাকে জানালো যে ম্যাকলিন বলেছেন ইনসিওরেন্সের লোক না দেখা পর্যন্ত সেটটা রাখতে হবে। এটায় আমি আর একটা ধাক্কা খেলাম।

ঠিক আছে, তুমি তাহলে লস্‌ এঞ্জেলসের হোটেলে উঠে আমায় চিঠি লিখো। আমিও চিঠি লিখবো কিন্তু দেখা করবো না।

ঠিক আছে টেরি।

আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

।। ছয় ।।

অনুতাপ—

দেখতে দেখতে চারদিন কেটে গেলো। কিছুই ঘটলো না। দিনের বেলা ব্যস্ত থাকতাম, মোটের উপর খারাপ লাগতো না, কিন্তু রাতগুলো ছিল বিশ্রী।

পাঁচদিনের দিন আমি গিল্ডার একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, ও এখন লস্‌ এঞ্জেলসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। কাজ খুঁজছে একটা, যদিও এখনও কিছু পায়নি। ইনসিওরেন্স কোম্পানী ম্যাকলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ওরা টি. ভি. সেট্‌টা দেখবার জন্য লোক পাঠাচ্ছে। শনিবার সকালে সেই লোকটি আসবে—মানে কালকে—আমি কি সেদিন বেলা এগারোটায় ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে সেট্‌টা দেখিয়ে দিতে পারব! বাড়ির চাবি কোথায় পাওয়া যাবে তাও চিঠিতে বলা আছে।

পরের দিন ঠিক এগারোটায় আমি ওখানে হাজির হলাম। মিনিট দুয়েক পড়ে একটা প্যাকার্ড এসে দাঁড়ালো।

বছর বত্রিশ-তেত্রিশের একটা লোক নেমে এলো। চেহারাটা যদিও রোদেপোড়া কিন্তু হাসিখুশী মুখ।

আপনি মিঃ রেগান?

হ্যাঁ।

লোকটা হাত বাড়িয়ে দিলো।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো মিঃ রেগান, আমি স্টেভ্‌ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি থেকে আসছি। আপনি তো ব্যাপারটা জানেন। মিসেস ডেলানির অ্যাটর্নী বলেছেন, যে সেট্‌টায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেটা আপনি দেখিয়ে দেবেন।

আমি সেটটা দেখিয়ে দিতে ও আমাকে বসতে বললো তারপর বললো, এই দাবীটায় খুব হৈ-চৈ হয়েছে, কান পেতে থাকলে আপনিও শুনতে পেতেন।

আমি জানতে চাইলাম, হৈ-চৈ টা কিসের।

আমাদের ওখানে একজন আছে, তার নাম ম্যাডক্স। কোনো দাবী এলে ও এমনভাবে সেটা খুঁটিয়ে দেখে যেমন করে আপনি কোনো পুরোনো ডিম পরীক্ষা করে দেখেন।

এক বছরে আমাদের কাছে কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার দাবী এসেছিল। তার মধ্যে শতকরা দুটো গোলমেলে হয়। ম্যাডক্স প্রথমেই সেটা ধরতে পারে। প্রত্যেকবারই ও ঠিক বলেছে। আমাদের গোয়েন্দারা তদন্ত করার আগেই ও ঠিক ধরে ফেলে। আমি চুপ করে বসে শুনলাম।

আমি বললাম, এটায় কি কোনো গোলমাল আছে?

ম্যাডক্স বলেছে—টি. ভি. পলিসি আমরা কুড়ি হাজার করিয়েছি। একটাও আমাদের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার জন্য টাকা দিতে হয়নি। এটা আমরা লোভ দেখাবার জন্য করেছি। দিতে হবে বলে আমরা মনে করি না।

মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে দিতে হবে। আমি বললাম।

হতে পারে। যাই হোক, হঠাৎ কুড়ি হাজারের একটা দাবী এলো। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতো, কিন্তু তা নেই। পলিসিটা মাত্র পাঁচ দিনের, পলিসিটা ভালো করে দেওয়ার আগেই লোকটা কবরস্থ হয়ে গেছে। পোস্টমর্টেম ছাড়াই তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। এতে যে কোনো লোকই সন্দেহ করতে পারে। ইনসিওরেন্সের এজেন্ট তো কুত্তার মত ক্ষেপবে।

আমি বললাম, কিন্তু সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না।

হারমাস হাসলো, ম্যাডক্স বলছে এটাতে বিরাট ভুল রয়ে গেছে। ও উঠে গিয়ে ক্যাবিনেটটা খুলে দেখতে লাগলো।

ভালো সেট্।

আমি করোনারের রিপোর্টটা পড়েছি। সাউন্ড কন্ট্রোলের তারটা খুলে গিয়েছিল, ডেলানি সেটা ঠিক করতে গিয়ে শক্ খেয়েছেন। তাই না?

ঠিক তাই।

ওঁর কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল?

হ্যাঁ। ওঁর পাশেই পড়ে ছিল।

হারমাস সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ডেলানির কোমর থেকে নীচে পর্যন্ত পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে ছিল না?

হ্যাঁ।

আমি যতদূর জানি বউটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। ওঁরা মিলেমিশে ছিলেন না।

টি. ভি. সেট্টার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, সেট্টার পেছনটা লাগিয়ে দেবেন?

আমি সেট্টা লাগিয়ে দিলাম। এরপর আমাকে চেয়ারে বসে সেটের পেছনটা খুলতে বলা হলো।

আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওপরের স্ক্রু-দুটো খুললেও নীচের স্ক্রু-দুটো খোলা কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে, আমার নির্ভুল খুনের প্ল্যানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে নীচের স্ক্রু দুটোর দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। আমি বুঝতে পারছি হারমাস আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি নিজেকেই নিজে গালাগাল দিচ্ছিলাম। স্ক্রু দুটো এমন জায়গায় লাগিয়েছি যে ডেলানি ও দুটো ছুঁতেই পারেনি, ধরতেই পারে নি।

ও বললো, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। ডেলানির কোমর থেকে নীচের দিকটা অসাড়। ওর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতির বাক্সটা কোথায় থাকতো?

ঐ ওপরের তাকে। ডেলানি কোনো লাঠি দিয়ে পেড়েছিলেন। যন্ত্রপাতিগুলো আমি মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

লাঠিটা কোথায়?

আমি সেটা এনে দিলাম। হারমাস লাঠিটা লাগিয়ে বাক্সটায় টান লাগালো, সব কিছু ছড়িয়ে পড়লো। ঝুঁকে পড়ে স্ক্রু-ড্রাইভার তুলতে গেলো। ধরতেই পারলো না। চেয়ারের চাকা দুটো বেশ বড়, অনেক উঁচুতে ও বসে আছে। ওখানে বসে তোলা অসম্ভব। আমার দিকে তাকালো হারমাস। আমি কিছু না বলে ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য একটা সিগারেট ধরালাম।

হারমাস আমার কাছ থেকে জেনে নিল আমি প্রথমে ঘরে ঢুকে ডেলানিকে কি অবস্থায় দেখেছিলাম, কি কি দেখেছিলাম। তারপর আমি কি করেছিলাম, কাকে ফোন করেছিলাম, কেন আমার মনে হয়েছিল যে ডেলানি মারা গিয়েছেন ইত্যাদি।

হারমাস এবার উঠে দাঁড়ালো, এখানে আমি সব দেখে নিলাম। সেট্টা এইরকমই থাক। আমি

আরো একবার দেখবো। জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো, খুবই অদ্ভুত, কিন্তু ম্যাডক্সের কখনো ভুল হয় না দেখছি। ব্যাপারটায় একটা গোলমাল রয়েছে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আমি কিছু বললাম না। আমার হৃৎপিণ্ডটা বোধ হয় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। খুব ভয় করছিল।

আচ্ছা এবার আমায় যেতে হবে, ও হাত বাড়িয়ে দিল, আবার দেখা হবে। আপনার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করা যেতে পারে?

আমার টেলিফোন নম্বরটা দিলাম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করছেন এতে কোনো গোলমাল আছে?

ও হেসে বললো, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। লোকটির পক্ষাঘাত ছিল। উনি স্ক্রু-দুটো ধরতেই পারেন নি। স্ক্রু-ড্রাইভারটাও তুলে নিতে পারেন নি। আপনি যখন ওঁকে দেখেছেন তখন উনি একেবারে ঠাণ্ডা, যদিও মাত্র তিনঘণ্টা হলো মরেছেন, মরবার কদিন আগে উনি একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছেন। এই ভাবে মরে যাওয়ায় ওঁর স্ত্রী পাঁচ হাজার ডলার পাবে। হতে পারে সবই স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। তবুও ইনসিওরেন্সের লোকেদের সব কিছুতেই সন্দেহ হয়। আচ্ছা পরে দেখা হবে। ওকে চলে যেতে দেখে ফিরে এলাম ভেতরে। মনে মনে ভাবলাম শুরুটা খারাপই হয়েছে, অবশ্য তার মানে এ নয় যে ডেলানিকে খুন করা হয়েছে এটা প্রমাণ হলো। তার জন্য অনেক দূর যেতে হবে। আমাব প্ল্যানটা একেবারে নির্ভুল ছিল না। কিন্তু অন্ততঃ এটা একেবারে ভেস্তে যায় নি। আমি বুঝতে পারলাম যে, হারমাসের আমার আর গিল্ডার প্রেমটা ধরতে না পারার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। এটা জেনে ফেললে ও খুনের উদ্দেশ্যটা পেয়ে যাবে—স্ত্রী, পঙ্গুস্বামী, প্রেমিক আর পাঁচ হাজার ডলারের ইনসিওরেন্স পলিসি।

আমার মনে হলো গিল্ডাকে একবার সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ও আমার তৈরী ঘটনাই বলে যে সে গ্রীন ক্যাম্পে গিয়েছিল, যাবার পথে টায়ার ফেসেছিল, সেটা বদলাতে দেরী হয়েছিল অনেক।

মনে মনে ঠিক করলাম যে, লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে কোনো জায়গা থেকে ওকে টেলিফোন করব।

চারটের সময় আমি লস এঞ্জেলসে পৌঁছলাম। একটা জায়গা থেকে ওকে ফোন করলাম, সাড়া পেলাম না। বোধহয় কোনো কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। ঘুরে ফিরে আবার টেলিফোন করলাম। প্রায় সাতটার সময় ওকে পেলাম। গিল্ডা! আমার নাম ধরে ডেকে ফেলো না। শোনো আমি রাস্তার বুথ থেকে ফোন করছি। আমার নম্বর ৫৫৭৮১। তুমি বেরিয়ে কোন বুথ থেকে ফোন করো। আমি অপেক্ষা করছি। খুব জরুরী। তোমার লাইনে বলা যাবে না। তাড়াতাড়ি করো।

দশ মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুললাম আমি।

হ্যাঁ, কি ব্যাপার টেরি?

যা ভেবেছিলাম, ইনসিওরেন্সের লোকেরা সেই ভাবেই খোঁজ খবর করছে। মৃত্যুর কারণটায় ওরা সন্তুষ্ট হয় নি। আমাদের সাবধান হতে হবে। আমার মনে হয় ওরা তোমার ওপরে নজর রাখছে। শোনো...

টেরি! তুমি কি কিছু লুকোচ্ছ! প্রথম থেকে আমার এই রকমই মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলো তো?

ওরা তোমার ওপর নজর রাখতে পারে গিল্ডা। আমাদের দুজনকে যদি একসঙ্গে দেখে...

তুমি কোথায়?

ফিগোরো অ্যান্ড ফ্লোরেন্স ড্রাগস্টোরে।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো। আমার বুইক নিয়ে একঘণ্টার মধ্যে পৌঁচ্ছচি।

সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি ড্রাগস্টোরের ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে একটু অন্ধকার দেখে দাঁড়ালাম।

মিনিট দশেক পর বুইকটা এসে দাঁড়ালো। আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। গিল্ডা আবার রাস্তার ভীড়ে বুইকটা নিয়ে ঢুকে পড়লো।

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। আমি পেছন ফিরে দেখতে লাগলাম কেউ পিছু নিয়েছে

কি না। রাস্তার আলোয় গিল্ডাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল, ভীড় ঠেলে সামনের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা লস এঞ্জেলস থেকে বেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ী পথে উঠে পড়লাম। এখান থেকে লস্ এঞ্জেলসকে নীচে দেখতে পাওয়া যায়।

গাড়ি থামিয়ে গিল্ডা এবার আমার দিকে তাকালো। টেরি, তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?

ভয় পাইনি, আমি চিন্তিত হয়েছি। এই ইনসিওরেন্সের দাবীটা ঠিক হয়নি। কোম্পানীর লোক সেট্‌টা দেখেছে। তার সন্দেহ হয়েছে। তোমার স্বামীর পক্ষে বসে সেট্‌টার নীচের স্ক্রু-দুটো খুলে ফেলা সম্ভব মনে হচ্ছে না।

আমার মনে হয় ম্যাকলিনকে ব'লে ব্যাপারটা বাতিল ক'রে দিই। টাকাটা ছাড়াও আমি চালিয়ে নেব। বিক্রী ক'রে দেব সব। তাতে দেনা শোধ করার মত হয়ে যাবে।

আমি শক্ত হয়ে গেলাম, এখন আর বাতিল করা যায় না। এখন তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী জালিয়াতি সন্দেহ করবে। ওরা ভাববে তুমি ভয় পেয়ে গেছ। তাহলে ওরা এল-এ. পুলিশকে জানাবে।

তাহলে কি হবে?

একথা আগেই তোমাকে বারবার বলেছি গিল্ডা, আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

গিল্ডা আমার দিকে ঘুরে বসে বললো, তুমি সত্যি করে বলতো কি ব্যাপার? তুমি নিশ্চয়ই কিছু লুকোতে চাইছো।

আমি মনে মনে ভাবলাম, গিল্ডাকে যখন ভালোবাসি তখন ওকে মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। যদিও এটা মারাত্মক হতে পারে তবুও আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না। না গিল্ডা, এটা দুর্ঘটনা নয়, আমিই ওঁকে খুন করেছি।

গিল্ডা চমকে সরে গেল, তুমি খুন করেছো?

আমার মাথার ঠিক ছিল না, তুমি ওঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকবে এটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। উনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তুমি আমার হবে না এ চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠছিল তাই খুন করেছি।

গিল্ডা স্তব্ধ হয়ে রইল। ওর দ্রুত, অসম নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

তোমাকে ভালোবাসি বলেই...। ওরা বের করতে পারবে না। কয়েকমাস পরেই আমরা দূরে কোথাও নতুন জীবন শুরু করতে পারবো।

কি করে মারলে?

আমি বললাম সব। কিছু লুকোলাম না। পুরো ব্যাপারটাই বললাম।

গিল্ডা গাড়ির এককোণে চুপ করে বসে রইলো। কোলের ওপর হাত দুটো ফেলে বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে ; তার বড়ো বড়ো ফরগেট-মি-নট চোখ দুটোয় কোনো ভাষা নেই।

এই ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা যদি না হতো, আমি বললাম, আমার চিন্তা ছিল না। কিন্তু এখন... আমি জানি না কি হবে। হারমাস কিছু সন্দেহ করেছে। এই জন্যই ব্যাপারটা না মিটে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দেখা হওয়া ঠিক নয়।

গিল্ডা ভাবলেশহীন ভাবে বললো, আমাকে কি করতে বলো?

জেফারসনকে যা বলেছ, সেটাই বলবে। হারমাস প্রশ্ন করতে পারে। আমরা যে প্রেম করি, এটা যদি ওর ঘুণাক্ষরে সন্দেহ হয়, তাহলে আমাদের বিপদ হতে পারে। সেজন্য ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকা দরকার।

মানে তোমার বিপদ হতে পারে। আমি সত্যি বললে আমার কোনো বিপদ হবে না।

ও ঠিকই বলছে, আমি চুপ করে রইলাম।

ঠিক আছে। আমি তোমার জন্য মিথ্যে বলবো। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কি হেঁটে ফিরতে পারবে? আমি একাই যেতে চাই। বড়ো রাস্তায় তুমি লিফ্‌ট পেয়ে যেতে পারো।

আমার বুকে ধাক্কা লাগলো। গিল্ডা! এতে আমার প্রতি তোমার মন কি বদলে যাবে? আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি তোমাকে এখন আরো বেশি করে চাই।

আমার একটা ধাক্কা লেগেছে। এখন একটু একলা থাকতে চাই।

আমি ওর হাতটা ধরতে চাইলাম কিন্তু ও নাগালের বাইরে চলে গেল।

আমি ওকে কথাটা বলে ফেলেছি বলে আমার অনুতাপ হলো। ব্যাপারটা ওকে সামলাবার জন্য সময় দিতে হবে।

আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। গিল্ডা, তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি বলেই...না হলে এ কাজ আমি করতাম না।

আমার চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। গিল্ডা আমার দিকে তাকালো না। গাড়িটার পেছনের আলোটা পাহাড়ের পথে নীচে মিলিয়ে যেতে লাগলো ; আমার হঠাৎ মনে হলো গিল্ডা আমার জীবন থেকে চিরকালের মত সরে যাচ্ছে।

।। সাত ।।

সন্দেহ—

দুটো দিন খুব বিশ্রী ভাবে কাটলো। আমি গিল্ডার কথাই ভাবছিলাম। আমাকে না নিয়েই ও কিভাবে চলে গেল! আমার শুধু একটাই ভয় হচ্ছিল যে এই বোকামির জন্য আমার প্রতি ওর প্রেমটা না নষ্ট হয়ে যায়। আমি ওর স্বামীকে মেরেছি। এ ধাক্কাটা ওর পক্ষে মারাত্মক হবেই।

দ্বিতীয় রাত্রে আমি আর থাকতে না পেরে গাড়িতে লস্‌ এঞ্জেলস রওনা হলাম। একটা বুথ থেকে ওকে ফোন করলাম। পুরুষের গলা পেয়ে চমকে উঠলাম। মিসেস ডেলানি আছেন? প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম কি জানি লোকটা যদি পুলিশ অফিসার হয়।

মিসেস ডেলানি দুদিন হলো চলে গেছেন। কোনো ঠিকানা দিয়ে যান নি।

ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার নির্বোধের মত স্বীকারোক্তি ওর প্রেমকে নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি ভয় করেছিলাম।

সে রাত্রে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। এই প্রথম খুন করার জন্য আমার অনুতাপ হতে লাগলো। যা করেছি তার জন্য মনে হয় সারা জীবনটা আমাকে দাম দিতে হবে।

পরদিন সকালে হারমাস-এর ফোন পেলাম, এগারোটার সময়ে ব্লু-জয় কেবিনে একটা মিটিং আছে আমায় থাকতে হবে।

ঠিক সময়মতো আমি ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম হারমাসের প্যাকার্ডটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে দরজায় দেখতে পেয়ে ও চারিদিকে তাকালো।

ভেতরে আসুন। দেখুন আমরা কি করে রোজগার করি। ওর হাসিটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

আপনার সাহায্য চাই, আমার ওপরওয়ালা—ম্যাডক্স আসছেন—উনি এলে নিজের নাম শুদ্ধ ভুলে যাই।

ম্যাডক্স? আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম, উনি কেন আসছেন? সাইরেন লাগানো একটা পুলিসের গাড়ি দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম। গাড়ি থেকে নামলো এল. এ. স্কোয়াডের লেফ্‌টেনান্ট জন বুজ, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স, চোখ দুটো ধূসর রঙের। ওর পেছনে যে নামলো—একজন বেঁটেখাটো মোটাসোটা লোক—এ নিশ্চয় ম্যাডক্স। মুখটা গোল। চোখ দুটো সর্বদাই ঘুরছে। জামা-কাপড় এলোমেলো ভাবে পরা। হারমাস আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। ম্যাডক্স আমার সঙ্গে করমর্দন করলো।

আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, মিঃ রেগান।

আসুন, দেখা যাক, ম্যাডক্স ভেতরে গিয়ে টি. ভি. সেট্‌টার সামনে দাঁড়াল, এটাই তো?

হ্যাঁ, হারমাস বললো, এই স্ক্রু-গুলো দিয়ে পেছনের প্যানেলটা লাগানো ছিল।

আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়ছিলো।

ম্যাডক্স বলতে লাগলো, মিঃ রেগান! আপনাকে খানিকক্ষণ দরকার হবে না। লেফটেন্যান্ট ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হয়েছে, এই কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি।

আমাদের একজন সেল্‌সম্যান ডেলানির টি. ভি. সেট্‌টার ইনসিওরেন্স করিয়েছিল। একটা শর্ত ছিল যে সেটের গোলমালে যদি মৃত্যু হয় তবে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হবে। এটা কেবল লোভ

দেখাবার জন্য। সত্যি দিতে হবে আমরা ভাবিনি। পলিসি করিয়েছি আমরা তেইশ হাজার চারশো দশ, এই প্রথম একটা মৃত্যু জনিত দাবী এসেছে। সেই কারণেই সন্দেহ হচ্ছে। পলিসি সই হওয়ার পাঁচ দিন পরেই ব্যাপারটা ঘটেছে। এমনকি, পলিসি ওঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই ডেলানিকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে।

ম্যাডক্স বললো যে, এই কেসটা যে গোলমেলে তা প্রথম থেকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। অবশ্য আমার কথাকেই আমি মেনে নিতে বলছি না। আসুন, দেখা যাক। ডেলানি কোমর থেকে নীচে ঝুঁকতে পারতেন না। এটা অবশ্য ডাক্তারের মত। এখন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবো।

আমাকে বললো, মিঃ রেগান, চেয়ারটায় বসবেন?

আমি বুঝতে পারছি কি হবে। মুখটা ভাবলেশহীন করে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। হারমাস আমাকে একটা দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলেন যাতে নড়তে না পারি।

ম্যাডক্স বললো, ডেলানি এইভাবে থাকতেন, সোজা বসে ঝুঁকতে পারতেন না।

ম্যাডক্স আমাকে অনুরোধ জানালো, সেটের পেছনটা খোলার জন্য।

আমি চেয়ার চালিয়ে ওপরে স্ক্রু-দুটো খুলে ফেললাম, এটা তো খুবই সোজা কিন্তু নীচের দুটোর দু'ফুট কাছেও যেতে পারলাম না।

ম্যাডক্স বুজ্‌কে বললো, মিঃ রেগান যখন ডেলানির দেহ দেখতে পেয়েছেন সেট্‌টা খোলা ছিল। পাশে ছিল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। সেটা উনি হয়তো স্টোর থেকে কোনো লাঠি দিয়ে নামিয়েছিলেন। তাহলে তো সেটা মাটিতে এসে পড়বে। কি করে উনি তুললেন সেটাকে?

আমাকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলতে বলা হলো কিন্তু আমি পারলাম না।

বুজ্ হঠাৎ উঠে গিয়ে সেটের ভেতরটা দেখতে লাগলো। ম্যাডক্স বললো, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন? ডেলানি পেছনটা খুলে ফেলেছিলেন, যা তিনি করতে পারেন না। স্টোর থেকে উনি স্ক্রু-ড্রাইভার নামিয়েছিলেন, যা তিনি করতে পারেন না।

হারমাস আমার বাঁধন খুলে দিল।

বুজ, আমার দিকে ফিরলো, রেগান, তুমি এসেছিলে সেট্‌টা কেমন চলছে তাই দেখতে? ব্যাপারটা আর একবার শোনা যাক।

হ্যাঁ, ডেলানি মাটিতে পড়েছিলেন। পাশে ছিল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার সেটের পেছনটা খোলা। আমি প্লাগটা খুলে ওঁকে ছুঁয়েছিলাম, উনি তখন মারা গিয়েছিলেন।

ম্যাডক্স বলে উঠলো, কেউ যদি বিরাট বিদ্যুৎ প্রবাহে মারা যায় সে পুড়ে যাবে। অন্যান্য মৃত্যুর মতো তার শরীর সহজে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না। ইলেকট্রিক শকের ধাক্কায় তার রক্তের তাপ বেড়ে যাবে। ডেলানি সেইভাবে মারা গেলে তিন ঘণ্টাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন না।

তিনি আরো বলেন যে, আমি চাই ডেলানির দেহটা কবর থেকে তোলা হোক।

বুজ, বললো, এর জন্য আপনাকে শেরিফ জেফারসনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ডেলানিকে খুন করা হয়েছে। এ ইঙ্গিত নিশ্চয় আপনি করছেন না?

ম্যাডক্স-এর উত্তরের অপেক্ষায় আমি ছিলাম।

না, আমি ইঙ্গিত করছি না। আমি পরিষ্কার বলছি ওঁকে খুন করা হয়েছে। ঐ ইনসিওরেন্স করেছিলেন বলেই ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। খুনী ভেবেছিল যে দুজন বৃদ্ধকে সহজেই ঠকানো যাবে।

ওর মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠলো, এরকম একটা পরিষ্কার খুনের কেস্ আমি এর আগে পাই নি।

বুজ একটা পাইপ ধরিয়ে বললো, 'মিঃ ম্যাডক্স আমি জানি, আপনার এখনো পর্যন্ত কোনো দিন ভুল হয় নি। কিন্তু আমাকে আরো নিঃসন্দেহ হতে হবে।

এটা একটা খুনের কেস্। আমি খুনের গন্ধ পাই। যাই হোক, আপনাকে আমি আরো কিছু বলতে পারি। ডেলানির দেহ কবর থেকে তোলা হোক, এই নির্দেশ দেবার মত তথ্য আমি দিয়েছি। আমি এও বলতে পারি কে ওঁকে খুন করেছে।

আমার হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থেমে গেল। বুজের হাতেই কাঠিটা জ্বলতে লাগলো, বলতে

পারেন কে খুন করেছে?

ওঁর স্ত্রী, ম্যাডক্স বললো, আগেও সে একবার খুন করতে চেয়েছিল, সেবার ডেলানি পঙ্গু হয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বুঝতে পারলাম না, বুজ্ বললো।

ডেলানি বিয়ে করেছিলেন চার বছর আগে।

ম্যাডক্স বলতে লাগলো, বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই আমাদের এজেন্টের সঙ্গে ওর বৌয়ের আলাপ হয়। সেই এজেন্টকে দিয়ে ডেলানিকে একটা অ্যাকসিডেন্ট পলিসির কথা বলতে বলে। একশো হাজার ডলারের মতো পলিসি। ম্যাডক্স আঙুল তুলে বললো, কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর জন্য অ্যাকসিডেন্ট পলিসি নিতে বলে, তখনই সন্দেহ হয়। আমি এজেন্টকে কথা চালাতে বলে মিসেস ডেলানির ওপর নজর রাখলাম।

ডেলানি পলিসিতে সই করলেন, কিন্তু পরের দিন চিঠি লিখে সেটা বাতিল করে দিলেন। তিনদিন পর ডেলানি দুর্ঘটনায় পড়লেন। পলিসিটা করা থাকলে আমি মামলা লড়তাম, তা যখন নেই, তখন আর কিছু বলিনি। ডেলানি মদ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, গাড়ি চালাচ্ছিল বউটা, গাড়ি থামিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। বলেছিল যে ব্রেকটা ঠিকমতো লাগাতে পারে নি। খুব ভাগ্য ভালো যে ডেলানি সেবার বেঁচেছিলেন।

বুজ্ বললো—সাংঘাতিক!'

এবারো যেই ডেলানি টি. ভি. পলিসিটা নিয়েছেন, বউটা কাজে লেগে গেছে। এবারে মেরেও ফেলেছে, কিন্তু এবারে আমি এসে গেছি।

সেই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগলো, সত্যি কথা বলতে কি আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আরো বললেন যে, ডেলানি মরবার সময়ে ওর বউ কোথায় ছিল বার করতে হবে। নিশ্চয়ই একটা অ্যালিবাই আছে। সেটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে গ্রহণযোগ্য কিনা। ডেলানির দেহটা তুলিয়ে ফেলুন।

বুজ্ বললো, আমি জেফারসনের সঙ্গে কথা বলবো। দেহটা তুলিয়ে আনছি। মিসেস ডেলানি কোথায় জানেন কি?

হারমাস বললে, উনি এখন লস্ এঞ্জেলসে, ওঁর উকিল ম্যাকলিনের কাছে খবর পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, মিঃ ম্যাডক্স, কি হয় আমি আপনাকে জানাবো।

ম্যাডক্স বললো, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আমার চাই। আমাকে বললো, মিঃ রেগান আপনাকে সাক্ষী হিসেবে আমাদের দরকার হবে। যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

হারমাসের সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল।

কেবল বুজ্ আব আমি রইলাম। বুজ্ প্রশংসার সুরে বললো, লোকটা ভালো পুলিশ অফিসার হতে পারতো। কখনো ওর ভুল হয় না। ও বহুদূর থেকে খুনের গন্ধ পায়। ঘরটা সীল্ করে বুজ্ বিদায় নিল।

আচ্ছা মিঃ রেগান আবার দেখা হবে।

আমি বাড়ি ফিরে এসে দু গ্লাস স্কচ্ হুইস্কি খাবার পরে আমার সাহস ফিরে আসতে লাগলো।

গিল্ডার বিরুদ্ধে ওরা কিছু খাড়া করতে পারবে কি? আমি জানি ডেলানি ইলেকট্রিক শকে মারা গিয়েছেন। গিল্ডাকে ওরা কি ভাবে দায়ী করবে? অপেক্ষা করে দেখতে হবে। যদি গিল্ডার পক্ষে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে তবে বুজকে সত্যি ব্যাপারটা জানালেই ভালো।

পরের দিন গ্রীন ক্যাম্পে গেলাম। জেফারসন তাঁর অফিসে চুপ করে বসে আছেন।

এসো।

দু গ্লাস সরবৎ ঢাললেন।

যা চাইনি, সেরকম ঘটে যাচ্ছে, উনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল ডেলানির মৃত্যুটা সহজ নয়। যদি জানতাম যে সে ইনসিওরেন্স করিয়েছে, তাহলে ভালো করে তদন্ত করতাম।

তিনি আরও বললেন, ও মেয়েটা একটা মাছিকেও মারতে পারে না। আমার মনে হয় এটা খুন নয়। আত্মহত্যা। মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে ওঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল। এটা ডেলানির পক্ষে সহ্য

করা সম্ভব হয় নি। যে করে হোক, উনি টি. ভি. সেটের পেছনটা খুলে ফেলেছিলেন। কি করে বলতে পারি না। মরীয়া হয়ে লোকে অসম্ভব কাজও করে ফেলে।

ওরা কি মিসেস ডেলানির সঙ্গে কথা বলেছে?

তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলাম।

তার মানে? ম্যাকলিন জানে না?

না। ওকে একটা চিঠি লিখে গেছে যে সে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। পরে জানাবে। তিন দিন হয়ে গেল। বুজ্ বলছে ও ভয়ে পালিয়েছে।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে তাকালাম। বুজ্ এসে দাঁড়ালো। পা দিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিলো, জানেন উনি শক্ খেয়ে মারা যান নি।

আমি চমকে উঠলাম, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট।

জেফারসন ভাঙা গলায় বললেন, তাহলে কিসে মারা গেলেন?

বিষ। বুজ্ টেবিলে হাত রেখে জানালো, ওঁকে প্রচুর সায়ানাইড খাইয়েছিল।

আমার বাড়ির বাগানে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রাত দশটা আমি বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা। বুজের খবরে আমি এখনো স্তম্ভিত। ডেলানি বিষ খেয়ে মারা গেছেন। আমি তাহলে খুনী নই? নিয়তির চালে আমি খুনের দায় থেকে রেহাই পাওয়ায় স্বস্তি অনুভব করতে পারছিলাম। আমাকে আর কেউ গ্রেপ্তার করবে না। আদালতে ঝামেলা আর আমাকে পোহাতে হবে না। আমি যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি।

গিল্ডার কথা ভেবে নিজের খুব খারাপ লাগলো। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে ডেলানিকে বিষ খাইয়েছে। আমি নিশ্চিত যে জেফারসন ঠিকই বলেছেন। ডেলানি সহজ পথটাই বেছে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আমি যদি ওঁকে খুন করার মতলব না করতাম যদি ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটাকে না সাজাতাম, তাহলে গিল্ডা এতো বিপদের মধ্যে মনে হয় পড়তো না। খুন করার চেষ্টা করাও মারাত্মক। হয়তো কুড়ি বছরের জেল হতে পারে। ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

একটা গাড়ির আওয়াজ হলো। জেফারসনের পুরোনো ফোর্ডটা এসে দাঁড়ালো।

আসুন, বললাম আমি, উনি কি কারণে এসেছেন বুঝতে পারলাম না।

আমি নিজের কথা বলতে আসিনি। তুমি মিসেস ডেলানির খবর শুনেছ?

আমার শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। জেফারসন বললেন, ওকে আজ লস্ এঞ্জেলসে গ্রেপ্তার করা হয়েছ। প্রতারণা এবং স্বামীকে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ও বিপদের মধ্যে পড়েছে। উনি আরও বললেন যে, গিল্ডা নাকি স্বীকার করেছে, সে সায়ানাইড কিনেছিলো। ডেলানিকে নাকি জানিয়েছিলো সায়ানাইড কেনার কথা। সায়ানাইড্টা ও ড্রয়ারে রেখেছিল, কিন্তু পরেরদিন নানা ঝামেলায় ভুলে যায়। ও স্বীকার করেছে যে ডেলানির মৃত্যুর আগের রাত্রে ওদের ঝগড়া হয়, আর ডেলানি ওকে মেরেছিলেন। ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো আর সে কথা ডেলানিকে বলেও ছিলো। চলে যাবার সময়ে ডেলানি খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। গ্রীন ক্যাম্পে যাবার পথে ওর টায়ার ফেটে যায়। সেটা সারাতে কিছু সময় লাগে। সেই সময়েই ও মত পরিবর্তন করে যে বাড়ি ফিরে আসবে। একজন অসহায় মানুষকে ছেড়ে যাবে না। ফিরে আসার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয় তখনই খবরটা পায়। এই হলো ওর বিবৃতি।

এই খবরে আমি একেবারে চমকে উঠলাম। কি বলবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

বুজ্, এর মতে ডেলানির টাকাকড়ি নেই জেনে গিল্ডা ডেলানিকে খুন করে পাঁচ হাজার ডলার নেবে ঠিক করেছিল। ম্যাডক্সও তাই ভাবে। ডেলানির ইনসিওর ও নাকি জানতো না। ম্যাডক্সের মতে ও মিথ্যে বলেছে। সে বলছে ডেলানির সঙ্গে বিয়ের পরেও ও ইনসিওর করতে বলেছিল...

আমি বলে উঠলাম, কোন জুরীই এটা বিশ্বাস করবে না।

জেফারসন বললেন, জুরীই অবশ্য এর বিচার করবেন। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, ডেলানি যদি বিষই খেয়েছিলেন, তবে গ্লাসটা কোথায় গেল। ডেলানির আশেপাশে কোনো গ্লাস পাওয়া যায় নি। এতেই মনে হয় আত্মহত্যা নয়। সায়ানাইড এসেছিল বড়ো ট্যাবলেটের আকারে। ওকে হুইস্কি বা জলে মেশাতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। এতেই মনে হয় আত্মহত্যা নয়। মিসেস-ডেলানির পক্ষে তাই ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেছে।

আমি একেবারে শক্ত হয়ে গেলাম। আমার তখন মনে পড়লো ডেলানির পাশে একটা গ্লাস পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমি ব্যাপারটা জেফারসনকে বললাম। এবং গ্লাসটা যে ধুয়ে মুছে তুলে রেখেছি তাও বললাম, কেননা আমি জানাতে চাইনি যে ডেলানি মদ খেয়েছিলেন।

জেফারসন সোজা হয়ে বসলেন, সত্যি বলছো? জুরী বা বুজ্ কি এটা বিশ্বাস করবে? তবে আমি তো আইনের লোক নই। কিন্তু আমি তোমার আর মিসেস ডেলানির ব্যাপারে অবাক হচ্ছি।

কি বলছেন আপনি?

কিছু না। তুমি লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করো। সে তোমাকে বুদ্ধি দিতে পারবে।

তিনি উঠে পড়লেন, আমার মনে হয় না মেয়েটা খুন করেছে। ব্যাপারটায় গোলমাল আছে। ডেলানি যদি সেটের পিছনটা না খুলে থাকে তবে যে খুলেছে সে একজন পুরুষ। কোনো মেয়ের মাথায় এ জিনিস আসবে না। যাই হোক আমাকে যে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে হচ্ছে না সেজন্য আমি খুশি।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আর দেরী না করে ম্যাকলিনকে ব্যাপারটা বলো, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আমি অবশ্যই যাবো।

উনি মাথা নেড়ে ফোর্ডটায় গিয়ে উঠলেন।

।। আট ।।

বিচার শেষ—

পরের দিন সকালে আমি লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করলাম। ডেলানির পাশে গেলাসের ব্যাপারটা সবটাই তাকে বললাম, চুপ করে শুনলো সে। তারপর আমাকে বললো, এ কথাটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশকে জানিয়ে আসা ভালো।

এখনই যাচ্ছি, আমি উঠে পড়লাম।

এক মিনিট মিঃ রেগান, ধূর্ত চোখে সে তাকালো। একটা কথা বলে দিই, এ ধরনের সাক্ষ্য যিনি দেবেন তাঁর এ ব্যাপারটায় কোনো স্বার্থ না থাকলেই ভালো। আপনার কোনো স্বার্থ নেই তো? যদি বলেন আমি চাই মিসেস ডেলানি ছাড়া পান, তাহলে অবশ্যই স্বার্থ আছে।

আমি সে কথা বলছি না। ওর স্বরটা তীক্ষ্ণ হলো, বুজকে এ খবর দিলেই আপনার ওপর নজর এসে পড়বে। মিসেস ডেলানির বিরুদ্ধে ওরা যা খাড়া করেছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। বুজ্ ভাবতে পারে আপনি মিথ্যা বলছেন মিসেস ডেলানি ছাড়া পাওয়ার জন্য, ও এও ভাববে যে আপনার সঙ্গে মিসেস ডেলানির কোনো যোগাযোগ আছে। তাহলে ওর সুবিধা হবে।

আমি বললাম, মিসেস ডেলানির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, ওঁর স্বামী অবশ্য জানতেন। একদিন ওঁকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেছিলাম, ওই একদিনই।

ম্যাকলিন অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর বললো, ঝুঁকিটা আমাদের নিতে হবে। বুজ্ যদি জানতে চায় তাহলে বুজের কাছে ব্যাপারটা বলাই ভালো। আপনি না বলার পর ও যদি জেনে যায় তবে খুব খারাপ হবে। দেখুন, মিঃ রেগান, মিসেস ডেলানির অবস্থা খুবই অনিশ্চিত। ওঁর জীবনে কোনো কুৎসা নেই। আমি এইটাই ধরে নিচ্ছি। আদালতে আমি ওঁকে একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবে পেশ করতে চাই। যত দুর্ব্যবহারই ওঁর ওপরে করা হয়ে থাকুক তবু চার বছর ধরে উনি স্বামীর কাছেই ছিলেন। এমনকি ওঁকে মারধোর করার পরে যখন উনি বাড়ি ছেড়ে যাবেন ভাবলেন, তারপরও

উনি ফিরে আসছিলেন, ছেড়ে যেতে পারেন নি। এতে কাজ হবে জুরীদের ওপরে। ওদিকে যদি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী প্রমাণ করতে পারেন যে মিসেস ডেলানি স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁর বিশ্বাস ভাজন ছিলেন না তবে ওঁকে বাঁচানো যাবে বলে মনে হয় না। ওঁকে ছাড়িয়ে আনতে হলে কিছু টাকার প্রয়োজন। ওঁর যদি টাকা থাকতো, আমি লাউসন হান্টকে লাগাতাম। তাঁর মতো লোকেরই দরকার এই কেসে।

কত লাগবে তাঁর?

ম্যাকলিন বললো, পাঁচ হাজার ডলার-এর মতো।

আমি দ্বিধা করলাম না, ঠিক আছে, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

ম্যাকলিন আমার দিকে হাঁ করে চাইলো, কি বলছেন আপনি?

তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি টাকা দেবো। আমার টেলিফোন নম্বরটা আমি ওকে লিখে দিলাম।

বুঝতে পারছিলাম যে, ও আমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে, আমি পরোয়া না করে পুলিস হেডকোয়ারটার্সের দিকে গাড়ি চালালাম।

লেফটেনান্ট বুজের অফিসে ঢোকার সময়ে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল।

বুজ্ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে পাইপ টানছিল। আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, এসো রেগান। তোমার জন্য কি করতে পারি?

আমি বললাম, ডেলানির ব্যাপারে এসেছি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওঁকে যখন দেখতে পাই তখন একটা খালি গ্লাস পড়ে ছিল। আমি ওটাকে ধুয়ে রান্নাঘরে তুলে রেখেছিলাম।

বুজ্ কথাটা শুনে চমকে উঠলো। কি কারণে তুলেছিলে?

কি জানি কেন। আমার খুব ধাক্কা লেগেছিল। জেফারসনের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন গ্লাসটায় পা লেগে গিয়েছিল। ওটাকে দেখে কিছু করতে পেরে বেঁচে গেলাম। ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে মনে পড়লো।

তুমি কি ইয়ার্কি করছো? বুজের মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'না, এটা নিয়ে কি ইয়ার্কি করা যায়? সত্যি বলছি পাশে একটা খালি গ্লাস পড়েছিল। বুজ্ আমার দিকে তাকালো, তারপর বলল, যদি তুমি মিথ্যে বলে থাকো তাহলে খুনের সহকারী হিসাবে তোমাকে দেখা হবে। ঠিক আছে। চলো, ওই বাড়িটায় যাবো, সেখানে তুমি দেখাবে কোথায় গ্লাসটা পেয়েছিলে আর কোথায় রেখেছো?

সার্জেন্ট হপ্‌কিন্‌সকে ডাকলো ও, ভেতরে এলো হপকিন্‌স।

তাকে ব্যাপারটা বলা হলো। হপ্‌কিন্‌স আমার দিকে তাকালো।

ডেলানির বাড়ি পর্যন্ত আমরা চুপচাপ ছিলাম। ওরা দুজনে সামনে বসেছিল আমি পেছনে। খুব খারাপ লাগছিল আমার, ওদের বিরূপ মনোভাব আমি পরিষ্কার অনুভব করতে পারছিলাম।

বাড়িতে গিয়ে আমি সব দেখালাম। বুজ্ গ্লাসটাকে ছুঁতে দিলো না। রুমাল জড়িয়ে নিয়ে শুঁকলো একবার। তারপর সেটাকে নিয়ে ব্যাগে রেখে দিলো।

আচ্ছা রেগান, বুজের গলায় পুলিশী সুর লাগলো, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

এটাই আমি আশা করেছিলাম। তার জন্য আমি তৈরী ছিলাম। উনি আমার কেউ নন, ম্যাকলিনের সতর্কতার কথা মনে পড়লো আমার, কেবল আমার খরিদ্দারের স্ত্রী।

বুজের চোখ জ্বলে উঠলো, তুমি শপথ করে বলতে পারো যে তুমি ওকে কখনো বাইরে নিয়ে যাও নি একা একা?

ম্যাকলিনের কথা মনে পড়লো।

গিল্ডাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খাবার কথাটা যদি আমি চেপে যাই আর বুজ্ পরে জানতে পারে, তবে সেটা খুব খারাপ হবে। কিন্তু এখন আর বলা চলে না। এখন বললে, ও সত্যি কথাটা বার করে ফেলবে।

আমি একটা ঝুঁকি নিলাম।

আমি শপথ করছি, উনি আমার কেউ ছিলেন না।

আমার দিকে বুজ অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো, রেগান, ধরে নিচ্ছি—তুমি মিথ্যে বলছো

না। আমি খোঁজ নেব। যদি মিথ্যে বলে থাকো, পনেরো বছরের মত তোমায় জেলে যেতে হবে।

লেফটেনান্ট, তোমার যা খুশি তুমি করতে পারো।

বুজ হাসলো, ঠিক আছে, হয়তো মেয়েটা গ্লাসটা সরায় নি। আমি ভাবছিলাম গ্লাসটা না থাকার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা দেখা যাক, চলো তোমায় পৌঁছে দেব।

দুদিন পরে ম্যাকলিন আমাকে ফোন করলো।

হান্ট কেসটা নেবেন, সে বললো, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আজ এগারোটার সময় আসতে পারবেন?

আমি বললাম যাবো।

হান্টের খুব নাম, গত দশ বছরে খুনের কেসের খবর যারা কাগজে পড়েছে তারাই জানে ওঁর নাম। লস্ এঞ্জেলসের সৌখিন পাড়ায় ওঁর অফিস।

আমি কখনো ওঁকে দেখিনি। দেখে ভারী অবাক লাগলো। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

বসুন মিঃ রেগান। আমি কেস্‌টা দেখছি। শুনছি আপনি টাকা দিচ্ছেন?'

হ্যাঁ।

উনি এর কারণ জানতে চাইলেন।

আমি ব্যাপারটা সংক্ষেপ করতে চাইলাম। কত লাগবে?

কারণটা জানতে চাওয়া আমার ব্যাপার, যদি আপনি চান আমি মিসেস ডেলানিকে ছাড়িয়ে আনি। ম্যাডক্স যখন বলেছে ডেলানিকে খুন করা হয়েছে, তখন এতে কোনো ভুল নেই। আমার কাজ আমার মক্কেল কে ছাড়িয়ে আনা, দোষী হোক আর নির্দোষ হোক। যতক্ষণ বিচার শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ তার সব কিছুই আমি। যদি ম্যাডক্সকে হারাতে হয়, আমার সব কিছু জানা দরকার। আপনি যা বলবেন তা আর কেউ জানবে না। এখন যদি আপনি মিসেস ডেলানিকে বাঁচাতে চান তবে সমস্ত কিছুই খুলে বলা ভালো।

আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলাম তারপর সমস্তই তাঁকে খুলে বললাম। কিছুই লুকোইনি, বলতে পেরে আমার তৃপ্তি হচ্ছিল।

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। খুনের জন্যই সব কিছু করা হয়েছিল, ম্যাডক্স সেটা ধরতে পেরেছে। আপনি যা বললেন জানি না এতে সুবিধে হবে কি না। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী প্রমাণ করতে চাইবে যে ডেলানি মাতাল ছিলেন। যে মেয়েটা ওদের বাড়িতে কাজ করতো, তাকে দিয়ে ও বলাবে যে সকাল থেকেই ডেলানি বোতল নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। ও বলবে যে মিসেস ডেলানি হুইস্কিতে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। আপনি অন্যমনস্ক ভাবে ওটা সরিয়ে মতলবটা নষ্ট করে দিয়েছেন। যদি প্রেম ছিল তাহলে কিছুই করার নেই। জুরীকে আমার বিশ্বাস করাতে হবে গিল্ডা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, যেহেতু টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই উনি আত্মহত্যা করেছেন।

তাই তো হয়েছে। আমি বললাম, এটা ওদের বিশ্বাস করতেই হবে।

দেখা যাক্, আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনার প্রেমটা জানাজানি হওয়া না হওয়ার ওপরে।

স্বীকারোক্তি করার মত পাগলামো করে ফেলবেন না যেন, কারণ এতে সুবিধা হবে না। গিল্ডার শাস্তি একটু বেশি হতে পারে, কিন্তু আপনিও বিপদে পড়বেন। বিকেলে আমি গিল্ডার সঙ্গে কথা বলবো।

আমি চলে এলাম। বিচার শেষ হলেই আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে। হয়তো সমস্ত বিক্রি করতে হবে আমায়। একটা কাজের ব্যবস্থা করতে হবে আমায়। মিয়ামির অফিসে আমি চিঠি লিখলাম। যদি ওরা আমাকে কাজ দেয়।

এখন বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

গিল্ডাকে গ্রেপ্তারের পাঁচ সপ্তাহ পরে এই উত্তেজনাময় মামলা শুরু হলো। এই কটা দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে আমার কেটেছে।

ডাক্তারকে দেখে মনে হলো বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার ছিল যে আমাদের কথা বলতে দিচ্ছিল না। জেফারসন গম্ভীর মুখে ছিলেন।

প্রায় আড়াইটার সময়ে আমার ডাক পড়লো। এর আগে ডাঃ ম্যালার্ড, জেফারসন এদের সবাইয়ের শুনানী হয়ে গিয়েছে।

আমি সাহসে বুক বেঁধে উঠলাম। ছ সপ্তাহ আমি গিল্ডাকে দেখতে পাই নি। হান্টের সাবধানতার কথা আমার মনে ছিল।

শপথ নেবার পরে একবার গিল্ডাকে আড়চোখে দেখে নিলাম। অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে ও। গিল্ডা চুপ করে হান্টের পাশে বসেছিলো। জুরীদের দিকে তাকালাম।

তিনজন মহিলা, বাকিরা পুরুষ। ডি. এ. উঠে আমাকে টি. ভি. সেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। কিভাবে ডেলানিকে দেখতে পেয়েছিলাম, উনি যে ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মারা গেছেন বলে আমার মনে হয়, বললাম আমি।

ডি. এ গ্লাসটার কথাও আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন। জুরীদের চোখ থেকে একঘেয়ে ভাবটা সরে যাচ্ছে দেখতে পেলাম।

সমস্ত কথা শুনে ব্যাপারটা উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে জানতে চাইলেন। জুরীদের বোঝাতে চাইলেন যে ডেলানি সেট্টার পেছনটাও খুলতে পারেন নি বা স্ক্রু-ড্রাইভারটাও তুলতে পারেন নি।

শেষকালে উনি বললেন, ঠিক আছে মিঃ রেগান, এই বলে উনি হান্টের দিকে চাইলেন।

চেয়ার থেকে না উঠেই হান্ট বললেন আমাকে তার কিছু জিজ্ঞেস কবার নেই, পরে ডাকবেন আমায়। আমি আগের ঘরটায় ফিরে গেলাম।

বেলা চারটের সময় আমাকে আবার আদালতে আনা হলো। তখন সেখানে বেশ উত্তেজনা। কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন হেনরি স্টাভলী, শিরদাঁড়ার রোগের একজন বিশেষজ্ঞ, ডেলানিকে উনি চিকিৎসা করতেন।

উনি বললেন, ডেলানির অক্ষমতাটা স্বাভাবিক ছিল। তাঁর শিরদাঁড়া জখম হয়ে কোমর থেকে নীচে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

হান্ট বললেন, ডেলানির পক্ষে নীচের স্ক্রু দুটো খোলা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে অ্যাটর্নী সাহেব অনেক কিছু বলেছেন। এরই ওপর ভিত্তি করে আমার মক্কেলের বিচার হচ্ছে। জুরিদের দিকে ফিরে উনি বললেন, ডেলানি যে আত্মহত্যা করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। উনি যখন বুঝতে পারলেন ওঁর টাকাও নেই, স্ত্রীও ত্যাগ করে যাচ্ছে তখন উনি নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবেন বলে মনস্থির করলেন। উনি জানতেন যে ওঁর মৃত্যুটা যদি দুর্ঘটনা বলে মনে হয় তাহলে ওঁর স্ত্রী ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাবে, দেনাও শোধ হবে।

আমি বুঝতে পারলাম জুরীরা এটা বিশ্বাস করছে না।

শেষপর্যন্ত ঠিক হলো ডেলানির মতো অবিকল একজন রোগীকে আনা হবে। ডি. এ. তাঁর নিজস্ব ডাক্তার নিয়ে আসবেন। সবার সামনে ব্লু-জয় কেবিনে ব্যাপারটা দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

সেদিনের মতো শুনানী মুলতুবী হয়ে গেল।

পরের দিন ব্লু-জয় কেবিনে একটা ভীড় জমলো। বিচারক আর জুরীরা ছাড়া ছিলেন দুজন ডাক্তার, বুজ্, ম্যাডক্স, হান্ট, ডি. এ। এছাড়া আমি।

ডেলানির চেয়ারে একজন রোগাটে লোক বসেছিল, তার নাম হোলমান। হান্ট তাকে বললেন, স্টোররুমে গিয়ে যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিতে।

লোকটি চেয়ার চালিয়ে স্টোররুমে ঢুকে লাঠিটা দিয়ে বাক্সটাকে টান মারলো। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু স্ক্রু-ড্রাইভারটা কোলের ওপরেই পড়লো। ডি. এ. কে দেখে মনে হলো ওঁর অস্বস্তি হচ্ছে।

এবারে সেটটার পেছনটা খোলার ব্যাপার। হোলমান চেয়ার চালিয়ে টি. ভি. সেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু পারলো না, ব্যর্থ হলো। চেয়ারটা পেছনে সরে যেতেই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। তারপর একটু পাশ ফিরে জলের গ্লাসটা নিয়ে খানিকটা চুমুক দিলো, তারপর গ্লাসটা

ফেলে দিয়ে পড়ে গেল।

ঐ ভাবে থাকুন! হান্ট বললেন, তারপরে আমাকে ডাকলেন তিনি, দেখুন তো মিঃ রেগান, ডেলানিকে কি আপনি এই ভাবেই পড়ে থাকতে দেখেছিলেন? ভালো করে দেখুন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই ডেলানিকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

এই খানেই মামলাটা পুরোপুরি ঘুরে গেল।

বিকেলে ডি. এ. আদালতে লড়লেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি হারবেন। জুরীদের মনে হান্ট প্রচুর সন্দেহ দিয়ে দিয়েছেন। উনি বললেন কোনো দায়িত্বশীল লোক এই ভাবে গিল্ডাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। তাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হোক।

জুরীরা দুঘণ্টা ধরে আলোচনায় বসলো।

এই দুঘণ্টা আমার জীবনের দীর্ঘতম সময়। ওরা ফিরে এসে গিল্ডার দিকে তাকালো, বুঝলাম ও ছাড়া পাবে।

জুরীদের প্রধান বললেন, গিল্ডা নির্দোষ, কোর্টে প্রচুর আলোড়ন হলো।

গিল্ডা হান্টের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আদালত থেকে বেরোবার সময় আমার দিকে তাকালো না, দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু ও ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ম্যাডক্স বললো, 'আমার ভুল হতে পারে না। মেয়েটি কৌশল করে বেরিয়ে গেল। ও-ই খুনী!

গাড়িতে গিয়ে উঠলো ম্যাডক্স। পেছনে তাকিয়ে রইলেন হান্ট, তাঁর চোখমুখে বিজয়োল্লাস।

।। নয় ।।

তবুও সংশয়—

মিয়ামির অফিস থেকে চিঠি এলো। আমি ওখানে একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনেটা যদিও ভালো নয় তবুও ঠিক করলাম আমি চাকরিটা নেবো।

বাড়ি ফিরে আমি ম্যাকলিনকে ফোন করে বললাম, গিল্ডার ঠিকানাটা দিতে। ম্যাকলিনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে কয়েকঘণ্টা আগে ও নিউইয়র্ক চলে গেছে। কোনো ঠিকানা দিয়ে যায়নি তবে কোন চিঠি দিলে ম্যাকলিন পাঠিয়ে দেবে।

মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল, আমাকে কিছু না বলেই সে চলে গেল। বোধহয় খবরের কাগজের লোকেদের এড়াতে চায়, আমার খবর পেলে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে।

বাড়ি ফিরে আমি ওকে চিঠি লিখলাম। আমি লিখলাম যে আমি মিয়ামিতে যাচ্ছি। আমার ওখানকার ঠিকানা দিলাম। নতুন কাজটার কথাও লিখলাম। আমি চাই যে ও আমার কাছে আসুক, দুজনে নতুন জীবন শুরু করবো। আমি লিখলাম যে, আমার আশা আছে যখন আমি ডেলানির মৃত্যুর জন্য আর দায়ী নই এখন ও নিশ্চয় আমাকে আবার ভালোবাসতে পারবে। মিয়ামিতে উত্তর দিতে বলে চিঠি শেষ করলাম।

মিয়ামিতে চট্‌পট্ গুছিয়ে বসলাম আমি, দুঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি, পরিশ্রম হচ্ছে খুব কিন্তু জীবনে কোনো আনন্দ নেই কারণ গিল্ডার কোনো চিঠি পাইনি।

যতবার পিওন আসতো, ওর চিঠি আসছে মনে করে দৌড়ে যেতাম, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হতো।

তিনমাস পরে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি ওকে হারিয়েছি। সেই মুহূর্তে আমি যা করেছি তার জন্য আমার সত্যিকারের দুঃখ হলো। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম, যাকে ভালবাসি তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা বড় কষ্টদায়ক।

বছরখানেক পর ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণাটা কমে এলো। আমার অফিসে উন্নতি হয়েছে।

পনেরো মাস পরে আমার ওপরওয়ালা আমাকে ডেকে বললেন, নিউইয়র্কে একটা ব্রাঞ্চ খোলার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো কি না। আমি রাজী হয়ে গেলাম। এ সুযোগ আমি ছাড়লাম না। মাসের শেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিউইয়র্কের প্লেনে উঠলাম।

গিল্ডার কথা বারে বারে মনে হচ্ছে। এতোদিনে আমি গিল্ডার কাছাকাছি এসেছি। ওর সঙ্গে

যদি দেখা হয় তবে আমি ওকে আবার বিয়ে করার কথা বলে দেখবো।

এক খরিদ্দার আমার কাছ থেকে প্রায়ই এল. পি. রেকর্ড কিনতেন। একদিন একটা রেডিওগ্রাম তৈরী করাতে চাইলেন তিনি। লোকটির নাম হেনরি ফুলার। সত্তরের মতো বয়স হবে। খুব বড়লোক।

আমি বললাম, আমি সবচেয়ে ভালোটাই বানিয়ে দিতে পারি। তবে ঘরটা দেখলে আমার সুবিধা হবে, কি ধরনের অ্যাকাউন্টস দরকার তা বোঝা যাবে।

তাই আসুন, আজ বিকেলে আসতে পারেন, আমি থাকবো না, আমার স্ত্রীকে বলে রাখবো।

ব্যয়বহুল কিছু তৈরী করার আগে আমাদের নিয়ম, খরিদ্দার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, ফুলারের চল্লিশ লক্ষ ডলার আছে। বিরাট বাড়ি। তিনবার বিয়ে করেছেন। তৃতীয় বিয়েটা মাত্র ছ'মাস আগে। বাড়িটার ছাদের ওপর সুন্দর বাগান আছে, ওখান থেকে শহরটা খুব ভালোভাবে দেখা যায়।

ফুলারের বাড়িতে দেখলাম যে সর্বত্র অর্থের বিলাসিতা ছড়ানো।

গিল্ডা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আমাকে দেখেই সে চমকে উঠলো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, কব্জিতে মোটা সোনার চুড়ি তাতে দামী পাথর। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।

এখানে কি চাই তোমার?

গিল্ডা। আমি সর্বত্র তোমাকে খুঁজেছি। তুমি চিঠি দাওনি কেন? আমি অপেক্ষা করে ছিলাম...

ওর চোখে অবহেলা দেখে থেমে গেলাম।

কি চাই এখানে? গিল্ডা জানতে চাইলো।

আমি রেডিওগ্রামের ব্যাপারে এসেছি। কিন্তু তুমি এখানে? তুমি কি ওঁর সেক্রেটারি নাকি?'

না, আমি ওঁর স্ত্রী।

তুমি ফুলারের স্ত্রী? ওই বৃদ্ধকে বিয়ে করেছো তুমি। আমি বিশ্বাস করি না।

আমি এখন মিসেস হেনরি ফুলার, তুমি এখন আমার কাছে কেউ নও। দয়া করে কথাটা মনে রেখো। ও আরও বললো যে, যদি ভেবে থাকো যে আমায় ব্ল্যাকমেল করবে তবে ভুল করছো। সেরকম চেষ্টা করতে যেও না। তোমার জন্য আমাকে আসামী হতে হয়েছিল, এ জন্য কোনদিন তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। এখন বেরিয়ে যাও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হতে থাকলো। কিন্তু তোমার স্বামী আমায় ডেকেছিলেন রেডিওগ্রাম তৈরী করার জন্য। আমি বললাম।

সে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো। এখন বেরোও। কখও আসবে না এখানে।

'আচ্ছা, আমি আর আসবো না। তোমাকে সুখী দেখে আমি খুশী হয়েছি। আর দেরী না করে আমি লিফ্‌টে নেমে এলাম। কিছু ভাবতে পারছি না আর।

তিন সপ্তাহ বাদে আমি কাগজে ফুলারের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। ছাদের বাগান থেকে পড়ে ওঁর ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল।

আমার ভেতরে কি যেন মনে হতে লাগলো, তদন্তের সময় আমি গেলাম। আদালত লোকে ভর্তি। বসতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম ম্যাডক্স এসেছে।

একটু পরেই দেখা গেল গিল্ডা জর্জ ম্যাকলিনের সঙ্গে এসে ঢুকেছে। কালো পোষাকে ওকে ভালোই লাগছিল। একটু বিবর্ণ, হাতে একটা রুমাল।

সাক্ষ্য থেকে জানা গেল ফুলারের বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। অতিথিরা সকলেই বিরাট ধনী। ফুলার সারাক্ষণই হুইস্কি আর শ্যাম্পেন খেয়েছেন, পা টলছিল তাঁর। খুব গরম পড়েছিল, সবাই ডিনার সেরে ছাদের বাগানে গিয়েছিল।

ওখান থেকে গোটা ত্রিশেক ধাপ নেমেই একটা টেরেস। সবাই ওখানে গিয়ে শহরের আলো দেখছিলো। ফুলার আর গিল্ডা ওপরের ধাপেই দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ ফুলার পড়ে যান, গিল্ডা ধরার চেষ্টা করেছিল, পারে নি।

সবাই দৌড়ে এসে দেখতে পেয়েছিল ফুলার মারা গিয়েছেন।

ম্যাডক্স আমার পাশেই বসেছিলো, আমার কানে কানে বললো, ঐ ধাক্কাটার দাম চল্লিশ লক্ষ ডলার। ফুলারের মত বৃদ্ধ মাতাল ওর কাছে তো খেলনা একটা।

ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল হবার কিছু ছিল না। প্রত্যেকেই দুর্ঘটনাটা দেখেছে। ফুলার যে মাতাল ছিলেন এটার ওপর কোনো জোর দিলেন না করোনার। উনি বললেন, ফুলারের বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল। টাল সামলাতে পারেন নি। গিল্ডার জন্য উনি সমবেদনা জানালেন। প্রত্যেকে দুঃখ প্রকাশ করে বেরিয়ে গেল।

গিল্ডা প্রথমেই বের হলো, ওর চোখে রুমাল চাপা ছিল। আমাকে ও দেখতে পায়নি। ম্যাকলিন একটু ইতস্ততঃ করে ওর হাতটা ধরলো।

ম্যাডক্স বললো, খুন করে পালানো যায় কে বললো? যাই হোক, কোন টাকা বের করে নিতে পারেনি, অন্তত আমার কাছ থেকে। বুড়োটার অবশ্য ইনসিওর ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরলো ম্যাডক্স।

আমি রাস্তায় নেমে দেখতে পেলাম নীল ক্যাডিলাকটায় উঠে গিল্ডা আর ম্যাকলিন চলে যাচ্ছে। গিল্ডা ম্যাকলিনের দিকেই উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে।

দোকানে ফিরে যেতে যেতে আমার কেন জানিনা হঠাৎ ডেলানির কয়েকটা কথা মনে পড়লো, যে কথা উনি অনেকদিন আগেই আমায় বলেছিলেন ঃ আপনি জানেন আমার স্ত্রী কি চায়? সে টাকার জন্য পাগল, টাকা ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারে না।

আমি রাস্তার দিকে এক মনে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

ও-ই কি ডেলানিকে বিষ দিয়েছিল? ও-ই কি ফুলারকে সিঁড়ির নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

ম্যাডক্স কি ঠিক বলছে?

আমার মনে পড়ে গেলো ওর সুন্দর ফরগেট-মি-নট চোখ দুটো, মনে পড়ে গেল আমার হাতের মধ্যে ওর নরম শরীরটার কথা।

না, আর ভাবতে পারছি না আমি। ও এরকম করতে পারে না,—এ হতে পারে না।

আমি ওকে ভালোবাসি। যাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালোবাসবো জীবনে কোনদিন যাকে ভুলতে পারবো না, তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বিশ্বাস করা যায় না যা আমার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক হবে না।

প্যা ইন দ্য বটল

হ্যারি গ্লেব, নিউ বন্ড স্ট্রীটের স্টেশন থেকে এস্কালেটরে উঠে এল। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ করে। ফুটপাত জলে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল হুড়হুড়িয়ে নর্দমায় ঢুকছে। হতাশ হ্যারি গেটে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে রাতের আকাশের দিকে চাইল। আকাশের চেহারা অপ্রসন্ন, কালো মেঘে ঢাকা।

হ্যারি রেগে গিয়ে ভাবল, আমার পোড়া কপাল! ট্যাক্সি পাবার কোন আশাই নেই। জাহান্নামে যাক্ সব। আমাকে হেঁটেই যেতে হবে দেখছি। দেরী হলে বুড়ী মাগী রেগে লাল হয়ে যাবে। শার্টটা সরিয়ে কব্জিতে সোনার ঘড়ি দেখে ভাবল, ঘড়ি যদি ঠিক সময় দেয়, তবে আমার দেরী হয়ে গেছে।

একটু ইতস্ততঃ করে হ্যারি কোটের কলার তুলে ভিজে ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় খিস্তি করতে লাগল। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে মাথা বাঁচাতে মাথাটা নিচু করে চলতে লাগল।

টুপির কানা বেয়ে বৃষ্টি পড়ছে, পায়ে এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি বিড়বিড় করল, হতচ্ছাড়া দিনটার বজ্জাতি এবার কানায় কানায় পূর্ণ হলো। সিগারেটের ব্যাপারটা ঝুল খেল, হতভাগা কুকুরটা রেসে চারনম্বরে এল, চল্লিশ শিলিং একেবারে জলে গেল, আর তারপর এখন এই হাড় জ্বালানো বৃষ্টি!

বহুদিনের অভ্যাসমতো হ্যারি পথের আলো থেকে গা বাঁচিয়ে ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছিল। নিউ বন্ড স্ট্রীটের মাঝামাঝি এসেই ও সামনের লোকটার ইস্পাতের বোতাম দেখে বুঝল এ নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। তখনি ও রাস্তা পেরিয়ে গেল।

ঘাড়টাকে কুঁচকে ও এমনভাবে উঁচু করল যেন এখুনি একটা ভারী থাবা ওর ঘাড়ে এসে পড়বে। মনে মনে ভাবল, ওয়েস্ট এন্ড এখন ভীড়ে ঠাসা। ওঃ! লোকটা ষাঁড়ের মতো পেল্লায় জোয়ান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিস্যু করছে না, স্রেফ জাঁক দেখাচ্ছে। এটাকে কয়লাখনিতে নামিয়ে দিলে বরং কাজ দেবে ঢের বেশী।

পুলিশটার থেকে শতখানেক দূরে এসে ও আবার রাস্তা পেরিয়ে মে ফেয়ার স্ট্রীটে ঢুকল। কয়েক গজ হেঁটে ও পেছন ফিরে চাইল। যখন পুরোপুরি বুঝল কেউ ওকে লক্ষ্য করছেনা ও কোথায় যাচ্ছে, তখন একটা পুরোন বইয়ের দোকানের পাশের দরজা দিয়ে ও একটা ঢাকা বারান্দায় ঢুকল। জায়গাটা আলো-আঁধারি।

পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ছাতা বগলে একটা মেয়ে নামছিল। ভুরু আর চুল সাদা, পরনে চামড়ার জ্যাকেট, ফ্লানেলের প্যান্ট। হ্যারিকে দেখে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। চড়া রঙ মাখা মুখখানা ঝলমল করে উঠল!

—আমায় দেখতে আসছিলে সোনা?

—প্রাণ থাকতে নয়। আমার টাকা খরচের অনেক রাস্তা আছে। হ্যারি খ্যাঁক করে উঠল। তারপর মেয়েটির ঠোঁট কুঁচকে যেতে দেখে একটু নরম গলায় বলল, ফ্যান, আজ বাতি-টাতি সব নিভিয়ে দাও। আজ পথে কোন খদ্দের নেই। এই অসম্ভব বৃষ্টিতে পথে পুলিশ ছাড়া কেউ নেই।

—তুমি তো আছো! মেয়েটি টোপ ফেলে বলল।

হ্যারির খারাপ লাগল। ওয়েস্ট এন্ডের সব বেশ্যার সঙ্গে ওর চেনা-জানা আছে। হ্যারি জানে ফ্যান বুড়িয়ে যাচ্ছে, ওর সময়টা খারাপ যাচ্ছে, এখন ওর লাইনের অবস্থাটা এমন যে পারলে ওর গলা কাটে।

টুপি থেকে জল ঝেড়ে ফেলে হ্যারি বলল, দুঃখিত ফ্যান! এখন আমি ব্যস্ত আছি, কাজ আছে! কেউ ওপরে গেছে কি?

—বের্নস্টাইন, আর, আর সেই ছুঁচোটা, থিও। শুয়োরের বাচ্চা আমায় আধ ডলার দিতে চাচ্ছিল।

হ্যারি হাসি চাপল।

—থিওর কথা নিয়ে ভেব না। কেউ ভাবে না। চিরকাল ও বদ রসিকতা করে।

মেয়েটির চোখ রাগে জ্বলে উঠল।

—একদিন এমন টাইট দেব বুঝবে। অনেক পাঁকের পোকা দেখেছি আমি, কিন্তু ও ছুঁচোটা আমায় যে সব কথা বলে, গা গুলিয়ে ওঠে একেবারে।

হ্যারি আলগোছে বলল, আমার তো ওর মুখ দেখলেই গা গুলোয়। আচ্ছা ফ্যান, চলি।

—কাজ শেষ হলে এসো আমার কাছে। ভালো জমবে, সত্যি বলছি।

হ্যারি শিউরে উঠল।

—'যাব খ'ন একদিন, তবে আজ রাতে নয়। আমি ডানাদের বাড়ি পৌঁছব আজ। নাও, দেখি হাতের মুঠোটা?

ওর হাতে দু-পাউন্ডের নোট গুঁজে দিয়ে হ্যারি বলল, যা হয় একটা কিনে নিও।

মেয়েটি লোলুপ আগ্রহে নোট দুটো নিল।

—ধন্যবাদ হ্যারি। তুমি বড় ভালো ছেলে।

—জানি। হ্যারি হাসল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, বেচারা! রদ্দি হয়ে গেছে এক্কেবারে। মোটা বুড়ি! বলে কিনা জমবে ভালো, ছোঃ!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি দরজার সামনে দাঁড়াল হ্যারি। দরজায় লেখা ঃ

"মিসেস ফ্রেঞ্চ,
পরিচারক, পরিচারিকা সরবরাহ প্রতিষ্ঠান,
ভিতরে অনুসন্ধান করুন।"

ঠিক এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর রেলিং দিয়ে ঝুঁকে দেখল ফ্যান বৃষ্টির মধ্যে ছাতা খুলে পথে নেমে এগিয়ে গেল। মাথা নেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হ্যারি দরজায় টোকা মারল।

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। একটা মেয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

—এই যে! আমি যথারীতি দেরী করে এসেছি। হালকা মেজাজে হ্যারি বলল।

—এস হ্যারি। ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

—করতে দাও।

মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে চুমো খেল। মেয়েটির ঠোঁট দুটো নরম, ওর ঠোঁটের সঙ্গে গলে মিশে গেল।

—এত কড়া দেখাচ্ছে কেন তোমায়? অ্যাঁ? গত রাতের পরেও?

—রাতের কথা বোল না। মেয়েটি হেসে বলল, আজ সকালে যা মাথা ধরেছিল না—।

হ্যারি ভাবল, যেমন হীরের মতো কঠিন আর সুন্দর, তেমনি চড়া দামও বটে!

—চল হ্যারি, ওরা অপেক্ষা করছে। আর মাকে তো তুমি জানই।

সুন্দর আঙুলে ও হ্যারির মুখে আদরের ছোঁয়াচ বোলাল।

ওর কোমর জড়িয়ে ধরল হ্যারি।

—তোমার মা কি চায়? কয়েক হপ্তা দেখা না হওয়ার কারণে এখন আর আমার দেখা করতে কোন ইচ্ছে নেই। তোমার মার সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া।

—বোকামি কোর না হ্যারি। এস, আঃ আবার ও রকম করছ? সত্যি, তোমার হাত একটু সামলাও এবার।

হ্যারি মুচকি হেসে মেয়েটির পেছন পেছন অফিস কামরা পেরিয়ে ভেতরের ঘরে এলো। একটা বড় টেবিল, তার ওপর একটা টেবিলল্যাম্প। আর কোন আলো না জ্বলায় এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা আলো-আঁধারি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ টেবিলে বসে আছেন। সিডনি বের্নস্টাইন আর থিও ওঁর মুখোমুখি বসে। হ্যারি ঢুকতেই সবাই ওর দিকে তাকাল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ধারালো গলায় বললেন, তোমার দশমিনিট দেরি হয়েছে।

মহিলা মোটা থলথলে, গায়ের রং পাংশুটে হলদে। চোখ দুটো শানিত, চক্‌চকে। কানে দুটো দুল ঝুলছে। টেবিলল্যাম্পের আলোয় দুল দুটো ঝিক্‌মিক্ করছে।

হ্যারি দিব্যি বেপরোয়া চালে বলল, উপায় ছিল না। কান পেতে শোন বাইরে কেমন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ট্যাক্সি পেলাম না, হেঁটে আসতে হলো।

ও ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল চেয়ারে, এই যে সিড! কেমন চলছে বলো? ও কে? অন্ধকারে নখ কামড়াচ্ছে? আমাদের থিও না? কি হে থিও, ছুলি, ব্রণ সব কেমন আছে?

—জাহান্নামে যাও! থিও অন্ধকার থেকে খেঁকিয়ে উঠল।

হ্যারি খোলা গলায় হাসল। তারপর বলল, যাকে বলে গোপাল ছেলে। এবার টেবিলে হাত রেখে মিসেস ফেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে এবার তো আমি সশরীরে হাজির। না আসার চেয়ে দেরীতে আসাও ভালো। কি, ব্যাপার কি?

ডানা অধৈর্য হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বলে ফেল মা। আমি শুতে যেতে চাই।

—বস হ্যারি।

কাছের একটা চেয়ারে বসতে বললেন মিসেস ফ্রেঞ্চ, অনেকদিন হয়ে গেল। এখন একসঙ্গে একটা কারবার করতে হয়।

হ্যারি বসল।

—তাই না কি? জানি না।

এক প্যাকেট প্লেয়ার্স সিগারেট বের করে হ্যারি একটা ধরিয়ে বের্নস্টাইনকে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পুলিশ তো পিছু লেগেই আছে। দেখেছ কাল রাতে প্যারিকে কিভাবে ধরল? বেচারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি অমনি ধরে নিয়ে গেল। পুলিশ এখন দারুণ ক্ষেপে আছে। আরে বাবা পুলিশকে নিকেস করেছ কি মরেছ। জানি না কেস করতে যাওয়া ঠিক হবে কিনা।

মিসেস ফ্রেঞ্চ অধীর হয়ে উঠলেন।

—প্যারি একটা ন্যাকা। সব সময় তালে থাকে। কিন্তু এ কেসটা ভালো হ্যারি। আঁটঘাট বাঁধা, কোন ঝক্কি নেই।

সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে থিওর ময়লা হাতটা এগোতে দেখে হ্যারি ছোঁ মেরে প্যাকেটটা উঠিয়ে নিল।

খেঁকিয়ে বলল, না, তুমি ধান্দা কোর না। যাও কিনে খাও গে।

থিও চাপা গলায় ওকে একটা গালাগাল দিল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেঁকিয়ে উঠে বললেন, চুপ কর! কথা বলছি।

হ্যারি নরম হেসে বলল, বল! কি বলছো বল তো?

—ওয়েসলিদের ফার কোট চুরি করতে রাজী আছো?

হ্যারি কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠল। নাক দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

—আরে ব্বাপ। দাঁড়াও একমিনিট। তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছো? পাঁচ বছর হাজত ঘোরাতে চাও?

বের্নস্টাইন ক্রুদ্ধ গলায় ফুঁসে বলল, আমিও তাই বলছি।

লোকটা ছোটখাটো, সুঁটকো। মুখটা বাঁদরের মতো বাদামী কোঁচকানো। হাত আর কবজি গোছা গোছা কালো রুক্ষ লোমে ঢাকা। সার্টের কলারের ওপর দিয়ে ঘাড়ের লোম দেখা যাচ্ছে। ও বলল, একটু বুঝে শুনে বলবে তো? ইঁটের দেওয়ালে মাথা ঠুকে কোন লাভ আছে? ওয়েসলিদের পশমের পোষাক চুরি! মাথা খারাপ?

মিসেস ফ্রেঞ্চের চোখ কঠিন হয়ে উঠল।

—আমরা যদি চুরি করি, ভাগ নেবার বেলায় তখন তো নেবে?

বের্নস্টাইন মাথা হেলাল।

—হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো পাবার কোন চেষ্টাই নেই তোমাদের। মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভাবছ না কেন?

হ্যারি বলল, তুমি কি সত্যিই বলছো? আমাদের কিভাবে লড়তে হবে জানো?

—জানি। মিসেস ফ্রেঞ্চ সিগারেটের ছাই ফেললেন মেঝেতে। বললেন, কাজটা সহজ নয় তবে করা যেতে পারে।

বের্নস্টাইন ওর লোমশ হাতটা মুঠো করে টেবিলে ঝুঁকে বলল, আমি বলছি, না! চারটে পার্টি চেষ্টা করেছে। তাদের অবস্থাটা কি হয়েছে ভেবে দেখ। একাজে ভয়ানক বিপদের ঝক্কি আছে।

হ্যারি মুখ গোঁজ করে বলল, ঠিকই বলছে ও। কেসটা হাসিল করতে পারলে একখানা কেসের মতো কেস হবে। কিন্তু বুঝতে পারছিনা, আমরা পারব কিনা!

মিসেস ফ্রেঞ্চ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তুমি হাঁদার মতো কথা বোল না। তোমরা যা শুনেছ তার বাইরে কিছু জানই না। তোমরা এটা জানকি যে, চারটে হাবা ফার চুরি করতে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ খোঁজ নেয়নি আলমারীটা খোলার কায়দা কি? ওরা মাথা খাটায়নি কেন না ওদের মগজে ঘিলু বলে পদার্থই নেই।

বের্নস্টাইন সামনে ঝুঁকে বলল, ভুল করছ। ফ্রাঙ্ক খুব খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়েছিল। চারমাস ধরে খোঁজ-খবর নিয়েই গিয়েছিল। আলমারী খুলতে যাবার আগেই মামার হাতে ফেঁসে গেল। এবার কি বলবে বল?

—অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ওদের থেকে বোঝা যাচ্ছে আলমারীতে এমন একটা ঘণ্টা ফিট করা আছে যে আলমারীতে হাত পড়লেই ওটা বাজতে থাকবে। এই খোঁজটা নেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ হবে।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল, কাজটা করা হবে কিভাবে?

মিসেস ওয়েসলির একটি পরিচারিকা দরকার। অন্য সব এজেন্সিতে খবর নিয়ে-টিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমিও এই সুযোগটার জন্যেই বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছি।

এতক্ষণে হ্যারির গলায় আগ্রহ ফুটে উঠল, এই সুযোগে আমরা আমাদের চেনা লোক ফিট করব? মতলবটা ভালই, তাতে কাজ হলেও হতে পারে।

—কাজ হবে। ওখানে যদি একটা চালাক চতুর, চৌখস মেয়েকে ঢোকানো যায়, সে সমস্ত খবর, আলমারীর নকশা বের করে আনবে। যদি খবর আনে, তুমি কাজ করবে?

হ্যারি মাথা চুলকে বলল, করতে পারি।

হঠাৎ ওর প্যারির কথা মনে পড়ল। পরশু রাতে ওরা দুজনে বিলিয়ার্ড খেলছিল, প্যারি এখন জেলে। ওয়েসলিদের ফার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে পাঁচবছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে।

এ কথা মনে হতেই হ্যারি শিউরে উঠল আর বলল, কাজটা সোজা নয়, সময় থাকতে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, থিও কি সঙ্গে থাকছে?

নখ কামড়ানো থামিয়ে থিও বলল, নিশ্চয়, আমি তোমার মত ভীতু নই।

হ্যারি গলার স্বরটা যথাসম্ভব নরম রেখেই বলল, বাঁদরের বাচ্চা, একদিন আমি তোমার ঐ ব্রণগুলো থেঁতলে দেব। সেই সঙ্গে তোমার মুখটাও থেঁতো করব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওদের কথার মধ্যে বলে উঠলেন, আমরা একটা মেয়ে না পেলে কিছুই করতে পারব না, হ্যারি তোমার সন্ধানে কোন মেয়ের খোঁজ আছে নাকি?

হ্যারি চোখের কোণা দিয়ে তেরছা ভাবে ডানার দিকে তাকাল, আমি তো অনেক মেয়েকেই চিনি, কিন্তু ঠিক কি রকম মেয়ে চাও তার ওপর নির্ভর করছে সব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ তড়িঘড়ি বললেন, এই চালাক-চতুর, বয়স কম, দেখতে ভাল, চটপট টাকা পেলে খুশী হবে, এরকম একটা মেয়ে পেলে ভাল হয়। প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করে দেব।

হ্যারি চেয়ারটা পেছনে হেলিয়ে ওপর দিকে চেয়ে রইল। একটু ভেবে বলল, আছে একটা মেয়ে। বেশ চালাক-চতুর, নাম জুলি হল্যান্ড। ব্রিজ কাফেতে স্যাম হিউয়ার্টের কাছে কাজ করে। সিড তো ওকে দেখেছে। কি সিড, ওকে দিয়ে কাজ চলবে?

বের্নস্টাইন কাঁধ ঝাঁকাল। মুখে বিরক্তির ভাব।

—জানি না। চলতে পারে, তবে ঐ বদমেজাজী, খেঁকি কুত্তিটাকে মেজাজ সামলে চলতে

হবে।

হ্যারি হেসে উঠল।

—সিড রেগে আছে। সেদিনও মেয়েটার পেছনে একটা চিমটি কাটাতে ও অমনি সিডের বদনে একখানা থাপ্পড় কষিয়েছিল।

আরে বাপরে! হাসতে হাসতে আমার বেল্ট ছিঁড়ে যাচ্ছিল আর কি! সিডের কথায় কান দিও না। আমার মনে হয় ওকে দিয়েই চলবে। বেশ ভালই দেখতে, হাঁদা নয়। হিউয়ার্ট ওকে বেশ পছন্দ করে। তবে ওকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশের খাতায় নাম নেই তো?

—না না, ও হাঙ্গামা এড়িয়েই চলে, তবে ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ও বেশ বড় দাঁও মারার তালে আছে। প্রচুর উচ্চাশা আছে মেয়েটার। ঐ ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে হপ্তায় ক পাউন্ড কামাই করার চেয়ে মোটা টাকা কামানোর ধান্দায় বড় ঝুঁকি নিতেও রাজী হতে পারে।

—ওর কাছে আমরা কিছু ভাঙব না। তাতে খুব বিপদ। পুলিশ ঠিক আঁচ করবে কাজটা ভেতর থেকে হয়েছে। তাতে ওকে ধরবে। আমাদের এটা নিশ্চিত হতে হবে যে কাজ হাসিল হবার পর, কেস বিগড়ে গেলে ও যেন মুখ না খোলে।

থিও এগিয়ে বসল। ওর মুখে আলো পড়ল।

—ও মেয়ে খুঁজে বার করুক। মুখ যাতে না খোলে সে দায়িত্ব আমার।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেঁকিয়ে উঠলেন। মেয়েটাকে আমার চাই। মেয়েটা তোমায় পছন্দ করে হ্যারি?

হ্যারি হাসল।

—ঘেন্না করে বলতে পারব না। তবে একটা কথা কি, জানতে চেয়ো না, কেন মেয়েরা আমাকে দেখলেই গলে পড়ে।

ডানা ওর পায়ে লাথি মারল। হ্যারি তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে চোখ টিপে বলল, এখানে যারা আছে তাদের কথা আমি বলছি না। তবে এ মেয়েটা আমার দিকে কেমন ভিজে ভিজে চোখে তাকায়। যা বুঝতে হয় বুঝে নাও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, তাহলে তুমি ওকে ম্যানেজ করে এখন খেলাও। তারপর ওর মন যদি তোমার ওপর পড়ে থাকে তবে ও মুখ খুলবে না।

ডানা রেগে গিয়ে বলল, যেমন তুমি তেমনি তোমার ঐ হতভাগা মেয়েগুলো। সাবালক হও, বুঝলে?

হ্যারি ওর হাতে আদর করে বলল, দিব্যি চলে যাচ্ছে তো? তুমি তো জানো, ওদের কোন মূল্যই নেই আমার কাছে।

থিও বিশ্রীভাবে খেঁকিয়ে বলল, যাও না, দুজনে গিয়ে গলা ধরাধরি করে কাঁদো গে। তোমাদের দেখলে আমার বমি পায়।

হ্যারি রেগে বলল, এক ঘুঁষিতে এই হোঁদলটাকে আমি ছাতু বানাচ্ছি, দাঁড়াও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ রেগেমেগে থিওর দিকে তাকিয়ে হ্যারিকে বললেন, তুমি মেয়েটাকে এক হপ্তার মধ্যে আমার কাছে নিয়ে এসো হ্যারি। ওকে না পেলে আমাদের কিছুই হবে না। পারবে?

—দাঁড়াও ; এক মিনিট সবুর কর। আমি কাজটা করব বলে কোন কথা দিইনি। আগে শুনি আমার ভাগ্যে কি থাকছে? পড়তায় না পোষালে আমি নেই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ এ কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। পেনসিল আর কাগজের প্যাড টেনে নিলেন তিনি।

ফারগুলো তিরিশ হাজার পাউন্ড ইনসিওর করা। ধর আমরা সতের হাজারই পেলাম?

বের্নস্টাইনের দিকে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন।

আরও বললেন, তোমার ভাগে আট হাজারের কম পড়বে না হ্যারি, বেশীও পড়তে পারে।

—মার দিয়া! এই তো কথার মতো কথা বলেছো, আট হাজার পেলে—। হ্যারি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল।

—যতসব পাগলামী!

জানালার শার্সিতে বৃষ্টি ঝাপটাচ্ছে। বর্ষাতি মুড়ে আরামে যে পুলিশটি মে ফেয়ার স্ট্রীট ধরে হাঁটছে, সে জানলোই না যে কয়েক গজ দূরে ডাকাতির একটা পরিকল্পনা হচ্ছে। ডাকাতিতে ওর কোন আগ্রহই নেই। ও তখন ভাবছিল, সেদিন যে বাঁধাকপির চারাগুলো ও পুঁতেছে, সেগুলো বৃষ্টি পেলে বেশ বেড়ে উঠবে।

খোঁজ করলে দেখা যাবে কিংস স্ট্রীট, ফুলহ্যাম প্যালেস রোড আর হ্যামারস্মিথ ব্রিজ রোডের ইঁট, পাথর ও নোংরা জানলার জটিল অরণ্যের ভেতর নানা রকমের কাফে, রেস্টুরেন্ট আর ক্লাব দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে টিকে আছে।

ভাবতে অবাক লাগে এরকম হাড়-হাভাতে চেহারার কাফেগুলো চলে কি করে? হ্যামারস্মিথ ব্রডওয়ে থেকে দোকানদার আর লোকজনদের যে জনস্রোত বেরোয় তাদের কে, কে এ-সব রেস্টুরেন্টে খেতে আসে?

কিন্তু এই বিশেষ কাফে আর রেস্টুরেন্টগুলো জেগে ওঠে রাতে আর ভোরে। এগুলোতে রাত এগারটার পর ভীড় উপচে পড়ে। একদল ক্রূর ও ভীষণ চেহারার নরনারী চা বা কফি নিয়ে বসে নিচু গলায় কথা বলে। যতবার দরজা খোলে তারা সন্দিগ্ধ চোখে মুখ তোলে, চেনা লোক দেখলে নিশ্চিন্ত হয়।

সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যারা এখানে ইঁদুরের মতো গা ঢাকা দিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যায় তারা এসে ঝট্ করে এক পেয়ালা কফি খেয়ে চারদিকের হালচাল বুঝে নিয়ে আবার ওয়েস্ট এন্ড পালায়। ছোট-খাট গ্যাংগুলো নতুন চুরির খবরাখবর নিয়ে এখানে আলোচনা করে।

লন্ডনের অপরাধ জগতের সবচেয়ে নোংরা উচ্ছিষ্টরা, ফুলমার্কা সমকামীর দল মুখে রং মেখে, পায়ে চটি, গায়ে রঙিন সোয়েটার পরে এইসব জায়গায় ভিড় করে।

'ব্রিজ কাফে' এই অঞ্চলের রেস্টুরেন্ট রাজ্যের বাদশা। মালিকের নাম স্যাম হিউয়ার্ট। মোটা লোকটা, মুখের চেহারা চোয়াড়ে বয়স ধরা যায় না।

লন্ডনে বোমা পড়ার সময় হিউয়ার্ট আগ বাড়িয়ে জলের দরে কাফেটা কেনে। ও তখনি জানত ঐ অঞ্চলে মস্তানদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার একটা জায়গার দরকার একদিন পড়বেই। সেখানে ওরা কে শহরে আছে, কে নেই, কে দামী সিল্কের মোজা, ফারকোট সবচেয়ে চড়া দামে কিনতে রাজী আছে, সব খবর মস্তানদের জানতে হবে।

ছ-মাস আগে হিউয়ার্টের অফিসে জুলি হল্যান্ড নামে একটি মেয়ে আসে। কাছাকাছি একটা সস্তার লাইব্রেরীতে কাজ করতে করতে খবর পায় স্যামের ওখানে একটা কাজ খালি আছে।

মেয়েটি ওকে আস্তে বলল, হয়তো আমি কাজে লাগব। কি কাজ করছি তা নিয়ে ঝামেলা পাকাই না।

মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখে গাঢ় বাদামী চুল ঢেউ খেলে ছড়িয়ে পড়েছে, দেখে হিউয়ার্টের ভালো লেগেছিল। জুলির সতক দুটো চোখ ছাড়াও স্যামের ভাল লেগেছিল ওর শরীরটি। কামুকের মন দিয়ে ও কল্পনা করে দেখেছিল পোষাক ছাড়া জুলির শরীর একেবারে মনমাতানো হবে।

কেন যে মেয়েটিকে আগে ও দেখেনি! জুলি যদি লাইব্রেরীতেই কাজ করে তবে স্যামের আগেই দেখা উচিত ছিল।

নিজেকে নিজেই বলেছিল, পাঁচ বছর আগে হলে জুলি স্যামের চোখে পড়তই।

স্যাম যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ মেয়েদের কথাই ভাবে। ভীরু মানুষের মনের অবচেতন মনে যেমন মৃত্যু চিন্তা জেগে ওঠে স্যামের মনেও মেয়েদের কথা তেমনি অমোঘ ভাবেই জেগে ওঠে।

ইদানিং অত বেশী করে মেয়েদেব কথা ভাবে না, যখন খেয়াল হয় যে, মেয়েদের কথা তো ভাবছি না? তখন মেয়েদের মুখ মনে ভেসে ওঠে। ও নিজের মনে সক্ষোভে বলে ওঠে, এ আর কিছুই নয়, বয়সের লক্ষণ।

কামনার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল স্যাম। এ মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াতেই স্যামের মনে কামনা জাগিয়ে তুলল। জুলি একটা সোয়েটার পরেছে, তাতে বুক দুটো ঠেলে উঠেছে। আঁটো

স্কার্ট। স্যামের চোখে পড়ার মত জুলির প্রতিটা শরীরের রেখা। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক এমনভাবে লাগিয়েছে যে ঠোঁট দুটো চৌকো মনে হয়। নরম মোমের মতো ঠোঁট দুটো দেখেই স্যামের নিঃশ্বাস আঁটকে গেল।

জুলি স্যামের জরা কবলিত মনে কামনা জাগাবার জন্যেই যে ইচ্ছে করে এই ধরনের পোষাক পরেছে, তা জানলে স্যাম বিরক্ত হতো। এক খোশমেজাজী মস্তান ছোকরা জুলিকে এই কাজের খবরটা দেয়। স্যাম একটা চালাক-চতুর মেয়ে খুঁজছে, যে গাবিয়ে না বেড়িয়ে মুখ এঁটে থাকবে, তাতেই হবে। মস্তানটি বলেছিল মাঝে-সাজে চটকা চটকিতে জুলির আপত্তি না থাকলে স্যামকে ওর খারাপ লাগবে না।

মস্তানটি বলেছিল, ও বুড়ো হচ্ছে, বুড়োরা কি রকম হয় তা তো জানই। আলুভাতে মার্কা ব্যবহার করে। ও তুমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারবে।

জুলি কি জানত না ওই অঞ্চলের কাফেগুলো কি রকম? ব্রিজ কাফেও সেই জাতেরই, তবে হিউয়ার্ট রীতিমত ভাল পয়সা দেবে, সেটাই আসল কথা।

মস্তানটি বলেছিল, হপ্তায় ছ' পাউন্ড দেবে, তবে মাঝে মধ্যে যদি ওকে পায়ে চিমটি কাটতে দাও, তবে ওকে স্ক্রু মেরে সাত পাউন্ড পেতে পার হপ্তায়।

সা-ত-পা-উ-ন্ড! তখনি ও কাজটা বাগাবে বলে ঠিক করে। হিউয়ার্ট যদি ঘিনঘিনে লোক হয় তো কি আর করা যাবে? জুলিরও কিছু এসে যায় না তাতে, ওরকম খামচা খামচি ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। হপ্তায় সাত পাউন্ড! এ যে কুবেরের ধন!

জুলির বয়স বাইশ। ওর মা বাবা অসম্ভব গরীব। এর মধ্যে কুড়িটা বছর কেটেছে দুঃসহ দারিদ্র্যে। কখনো কুড়িয়ে, বাড়িয়ে, কখনও চুরি করে পেট চলত। জুলির মনে পড়ে ওর পেটের খিদে কখনো যেত না।

অতীতের কথা যত দূর জুলির মনে পড়ে ওর জীবনটা ছিল হতাশায় ভরা, অন্যদিকে ওর মনে হত ও যেন ফাঁদে পড়া জন্তু। মনে হত ওর অনেক টাকা থাকলে ভালো ভালো জিনিষ কিনতে পারত ও, সব কিছু থেকে ও বঞ্চিত হচ্ছে। জীবনের সুখ-আরামের উপকরণ পাবার জন্যে ও তখন মরিয়া হয়ে নিজেই সব যোগাড় করতে লাগল।

প্রথমে বন্ধুর কাছ থেকে চকোলেট, রুটিওয়ালার দোকান থেকে মিষ্টি রুটি, নিজের বোনের মাথাব রিবন, পাশের বাড়ির ছেলের কাঠের লাট্টু এইসব ছোট ছোট জিনিষ চুরি করত।

চুরি খুব হুঁশিয়ার হয়েই করত, কেউ ওকে সন্দেহ করত না। পরে লোভ বেড়ে যেতে বারো বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ও উলওয়ার্টের দোকানের জড়োয়া গয়নার বিভাগ থেকে চুরি করল এবং ধরা পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট খুবই দয়া দেখালেন। জুলির পারিবারিক রিপোর্ট পড়ে, ছোটদের মন বুঝে জুলিকে ডেকে পাঠালেন। বেদম ভয় পেয়ে যায় জুলি। ওঁর উপদেশের সারমর্ম বোঝাতে সেই যে বাঁদর আর বোতলের গল্প উনি বলেছিলেন, সেটা জুলির আজও মনে আছে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, জুলি, তুমি কি জান ব্রেজিলে কেমন করে বাঁদর ধরে?

জুলি বলল, জানে না।

উনি বললেন, আমি বলি তুমি শোন। ব্রেজিলের লোকেরা বোতলে বাদাম পুরে বোতলটা গাছের গায়ে বেঁধে রাখে। বাঁদর হাত ঢুকিয়ে বাদামটা ধরে, কিন্তু বোতলের সরু মুখ দিয়ে বাদামসুদ্ধ থাবাটা বের করতে পারেনা। তুমি হয়তো ভাবছো বাদামটা ছেড়ে দিলেই তো মুঠোটা খুলে হাতটা বের করে পালিয়ে যেতে পারে বাঁদরটা। কিন্তু লোভী বাঁদর তা করে না। এবং ধরা পড়ে। গল্পটা মনে রেখো জুলি। লোভ জিনিষটা সর্বনাশা। বেড়েই চলে এবং একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।

ম্যাজিস্ট্রেট ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

আর কোনদিন ও চুরি করেনি।

কিন্তু যতই বড় হতে থাকল ক্রমশঃ ওর টাকাপয়সার ওপর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। ইতিমধ্যে ওর বাবা-মা লন্ডনে বোমা পড়ার সময়ে মারা গেলে ও একখানা খুপরি ফ্ল্যাটে

স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করল। সহসা ও একদিন আবিষ্কার করল এখন ও যখন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে রাতের পর রাত বাইরে কাটাতে পারে। কেননা ওর মধ্যে এখন পুরুষকে আকর্ষণ করার মত কিছু সম্পদ লুকিয়ে আছে।

কিছুদিনের মধ্যেই ও নিজেব এই মোহিনী শক্তির কথা জেনে গিয়েছিল। সামান্য অছিলায় পুরুষেরা ওব শবীবে হাত রাখলে ও চটে যেত। বাস কন্ডাক্টর ওকে হাত ধবে নামাতে গেলে ও বিরক্ত হতো। বুড়োরা ওব হাত ধবে রাস্তা পার করে দিতে চাইলে ও খেপে উঠত। অন্ধকার সিনেমা হলে কোন পুরুষ ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পযসা খোঁজাব অছিলায় ওব পায়ে হাত বোলালে ও চটে উঠত।

কিছুদিনের মধ্যে ও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এখন স্বাধীনতা পাবার পর ও ভাবল এই আকর্ষণটুকুকে পুঁজি করে তুলতে পাবা যায় না?

যুদ্ধ আব আমেরিকান সৈন্যদলই ওকে এই সুযোগ এনে দিল। ইস্ট এন্ড থেকে যেসব ছুকরীরা এসে ইয়াঙ্কিদেব সঙ্গে ফুর্তি কবে, ও তাদের দলে ভিড়ল।

সৈন্যগুলো পিকাডিলিতে ঘোবাঘুবি করলে ঐ ছুকরিগুলো হিঃ হিঃ করে হাসে আর ওবা তা উপভোগ কবে। সতেবো বছরেব জুলি এমন একটা বড ঘরেব মেয়ের মতো আদব কায়দা রপ্ত করল যে ওকে দেখে মনে হত আলাদা জাতের মেয়ে।

অফিসাববাই ওকে পছন্দ কবল বেশী। এখন আর ওকে ছোট্ট খুপরি ঘবে দেখাই যায় না। এই ভাবে নিজের চারপাশে একটা কঠিন পাঁচিল গড়ে উঠল। কয়েকটা সম্পত্তি—একটা দৃঢকঠিন ব্যক্তিত্ব, এক আলমাবী ঝলমলে পোষাক, পুরুষদেব যৌন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করাব অভিজ্ঞতা আব পোস্টাফিসে পঞ্চাশ পাউন্ড জমে উঠল।

এইভাবে কিছুদিন ভালই কাটল। কিন্তু যুদ্ধ ফুবোতেই সৈন্যরা দেশে ফিবে গেল। ওর হাতে টান পড়তেই শুরু হল ছল-চাতুরীব খেলা। কাপডেব কুপন, খাবাব, টাকা সব কিছুর জন্যেই চাতুরীর আশ্রয় নিতে হলো অবিরাম। ভাগ্য জোরে লাইব্রেবীর কাজটা জুটল মাইনে হপ্তায় দশ শিলিং।

জীবনটা এখন শুধু ছলচাতুবি আব কৌশল হয়ে উঠল। জুলির মনে হল জীবনে বেপবোযা ঝুঁকি না নিলে দিন মন্দাই যাবে। ওব মনে হল, সৎপথে থেকে কষ্ট কব, নয় অসৎপথে গিয়ে মজা লোট—সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা। মাঝামাঝি সন্তোষজনক কোন পথই নেই।

ও জানত ব্রিজ কাফে জায়গাটা বদমাশদের আড্ডাখানা। কিন্তু ওখানে পয়সা মেলে, মোদ্দা কথা পযসা। দশ শিলিং-এ হপ্তা চালাতে চালাতে জীবনে ঘেন্না ধবে গেছে।

তরুণ মস্তানটি বলেছিল, হিউয়ার্টের ওখানে কাজ করলে তুমি শহবেব ভি আই পি-দের দেখতে পাবে, পাশাব দান ঠিক ঠিক ফেলতে পাবলে জন্মে অভাব হবে না। এত সুন্দর চেহারা তোমার, এটাকে কাজে লাগিয়ে মজা লোট। এই লাইব্রেবীতে কাজ করে নিশ্চয়ই মজা পাও না, তাই না?

হপ্তায় সাত পাউন্ড। ও তখনি মন ঠিক করে ফেলেছিল। কাফেটার প্রচুর বদনাম থাকা সত্ত্বেও ও দিব্যি সামলাতে পাববে। হিউযার্ট যদি রাজী থাকে ও এখনি ওব কাছে কাজ কববে।

জুলিকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে হিউযার্ট ওকে কাজে বহাল করবে বলে ঠিক করেছিল।

হিউয়ার্ট বলেছিল, দুটো কাজ খালি আছে। একটা দিনের বেলায, খানিকটা ঝাড়পোছ কবা, রাতেব জন্য স্যান্ডউইচ বানানো.. তেমন খাটাখাটনি নেই আর আহামরি তেমন কোন কাজও নয়। মাইনে হপ্তায় তিন পাউন্ড।

—আব অন্যটা?

জুলি প্রশ্নটা কবেছিল বটে, কিন্তু ও তখনই ঠিক করে ফেলেছিল যে দ্বিতীয় কাজটাই ও নেবে।

হিউয়ার্ট চোখ টিপে বলেছিল, অন্য কাজটা তোমাব পছন্দ হতে পারে। যে মেয়ের উচ্চাশা আছে যে মেয়ে মুখ বুজে থাকতে জানে তাব মনের মত কাজ।

—তাতে কি মিলবে?

- হপ্তায সাত পাউন্ড। টাকার হিসেব রাখবে, যে যা বলবে, মনে রাখবে। কাজটা রাতে—

সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত মুখবন্ধ রাখতে হবে মানে মুখে কুলুপ এঁটে রাখা, বুঝলে।

জুলি বলল, আমি কথা বলি না।

—বলে অবশ্য খুব একটা লাভ হবে না। অন্তত এ পাড়ায় তো নয়ই। আমার একটি মেয়ের কথা মনে আছে, তোমার থেকে বয়সে ছোট হবে, কি একটা কথা শুনে ফেলেছিল, কথাও বলেছিল তা নিয়ে। ওসবে মাথা না দিলেই পারত মেয়েটি। তারপর চোরাগলিতে ওর দেহটা পাওয়া গেল। চেহারা যা তা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং গাবিয়ে বেড়ানোর এই পুরস্কার। বুঝলে?

—আমাকে ভয় দেখিও না। আমি কালকের মেয়ে নই। জুলি ইস্পাতে শাণিত গলায় বলে উঠল।

হিউয়ার্ট ওর দিকে চেয়ে হাসল।

—যা বলেছো। যে মুহূর্তে তোমায় দেখেছি তখনই বুঝেছি তোমার মত ধারালো মেয়েই আমার দরকার। এখন শোন, খদ্দেরদের কাজটি করে দিও বুঝলে? খবর রাখা এবং সময় হলে ঝটপট সেটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই এ কাজের একটা দরকারী অঙ্গ। কোন খবরই লিখে রাখা চলবে না। মনে রাখতে হবে। এক রাতে কুড়িটা খবরও আসতে পারে।

হিউয়ার্ট আরো বলে যেতে লাগল, যেমন ধর, তুমি জ্যাক স্মিথের খোঁজে একটা ফোন পেলে। তোমায় জানতে হবে জ্যাক স্মিথ কে? সে এখানে আছে কি নেই? যদি না থাকে তবে তা জানিয়ে দেবে এবং খবরটা জেনে নেবে। স্মিথ আসার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যেন তার কাছে পৌঁছে দিতে পারো। আর ও ছাড়া আর কারো কানে না যায়, সে দায়িত্ব তোমার। আর সবসময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে বুঝলে? তবে তুমি পারবে।

জুলিকে ইতস্ততঃ করতে দেখে হিউয়ার্ট বলল, তুমি আগ বাড়িয়ে কোন কিছু জানতেই চাইবে না, যদি কিছুই না জান তো তোমার বিপদের ভয় থাকবে না। তাই না! মুফতে পয়সা কামাবার সহজ রাস্তা এটা। আমি দেখেছি খদ্দেরদের কেউ কেউ খবর পৌঁছে দিলে এক পাউন্ড, নয়তো দু-পাউন্ড দেবে তোমায়। আর শোন তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, আমি তোমায় আট পাউন্ড দেব। এর চেয়ে বেশী আর কি করতে পারি বল? ছেলেরা তোমার মত ফুটফুটে ; স্মার্ট, সরেস মাল দেখলে খেপে যাবে। ভেবে দেখ। প্রতি শুক্রবার করকরে নতুন আটটা এক পাউন্ডের নোট তুমি পাবে। ভেবে দেখ, কত জোড়া সিল্‌কের মোজা কিনতে পারবে তুমি?

—অ্যাঁ!

জুলি তাড়াহুড়ো করে কাজে লাগবার আগে কাজটার সম্বন্ধে আরো জানতে চেয়েছিল।

হিউয়ার্ট বলেছিল, তুমি ওখানেই ভুল করছ। কিছু জানতে চাইবে না তুমি, ঠিক আমার মত। এ শহরের অন্ধকার পাতালের পুরুষ ও মেয়েরা এখানে এসে কখনো খবর রেখে যায় কখনো বা দু-একটা প্যাকেট। আমি খেতে দিই। একটু-আধটু কাজ করে দিই। কিন্তু আমি কখনো প্রশ্ন করি না। অনেক সময় এখানে টিকটিকিরা আসে। ওরা এটা সেটা খবর জানতে চায় আমি কিছুই জানি না, তাই বলতেও পারিনা। তুমিও কিছু জানবে না, তোমাকেও ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তুমিও কিছু বলতে পারবে না। একেই বলে বুদ্ধির ধার।

জুলি চমকে উঠে বলেছিল, এখানে পুলিশ আসে? এটা আমার ভাল লাগছে না।

হিউয়ার্ট অধৈর্য হয়ে হাত নেড়েছিল এবং বলেছিল, —তুমিও জান, আমিও জানি। পুলিশ সর্বত্র নাক গলিয়ে বেড়ায়। ওদের চাকরীটাই এই। তুমি যেখানেই কাজ কর কিছুই এসে যাবে না, কেন না পুলিশ সেখানে যাবেই। আজ হোক, কাল হোক, যাবেই। তাতে কার কি এসে গেল? আমরা তো লোককে সার্ভিস দেওয়া ছাড়া কোন অন্যায় করছি না।

—আমাদের খদ্দেররা যদি ফন্দিবাজি করে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তাছাড়া তুমি ভাবছো কি? তোমায় আমি আট পাউন্ড দিচ্ছি। কাজটাতো পঞ্চাশ শিলিং-এর। পঞ্চাশ শিলিং ফেললে ডজন ডজন মেয়ে আমি পেতে পারি। কিন্তু আমি আট পাউন্ড দিচ্ছি, কেননা পুলিশ প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য করবেই যে তা বলছি না, তবে করতে পারে। আমি জানি কোন মেয়েই পুলিশের সংস্পর্শে যেতে চায় না। তাই আমি মাইনেটা একটু বেশীই দিচ্ছি।

এসব কথা জুলির বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। বিশেষ করে টাকার অঙ্কটা তো চমৎকার।

এ সুযোগ একবার হাতছাড়া করলে, জন্মেও জুলি হয়তো এমন সুযোগ আর পাবে না।

জুলি সবকিছু ভেবেচিন্তে বলেছিল, বেশ। আমি কাজটা নেব।

কাজটা যে কি সহজ, কিছুদিন কাজ করে ও অবাক হয়ে গেল। রাত এগারোটার আগে কাফেয় ভিড় জমে না। তারপর বাঁধা খদ্দেররা আসতে থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া আর কথাবার্তার গুঞ্জনে ঘরটা ভরে ওঠে।

ক্যাশ ডেস্কের সামনে কাঁচ দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় বসে জুলির মনে হয়েছে এ একেবারে প্রথম সিটে বসে থিয়েটার দেখার মতো ব্যাপার। জুলির মনে হয় না এই ঘরটার সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ আছে। ওর নিজেকে মনে হয় যেন অদৃশ্য, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। অদৃশ্য এক দর্শক গোপন জানলা খুলে একটা অদ্ভুত, উত্তেজক নাটক দেখছে।

দাঁতে চুরুট চেপে ধরে, কড়ে আঙুলে একটা মস্ত ঝলমলে হীরে বসানো আংটি পরে হিউয়ার্ট ওকে প্রথম রাতটা সব বলে কয়ে দিচ্ছিল। ঘরের লোকজনগুলোকে চিনিয়ে দিচ্ছিল। জুলির কানের কাছে মৃদু, একটানা স্বরে বলে যাচ্ছিল, বাদামী রঙের কোট পরে ঐ ব্যাটার নাম সিড বের্নস্টাইন। চিনে রাখ। গিডিয়ন রোডে ওর একটা ফারের দোকান আছে। সস্তায় ফার কিনতে গেলে সিডের কাছে গিয়ে আমার নাম বললে ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওর সঙ্গে যে কথা বলছে ওর ধরন-ধারণ আর ব্যবহার খুব মার্জিত। তাই সবাই ওকে ডিউক বলে ডাকে। কখনো দেখবে না ও প্লেটে চা ঢেলে খাচ্ছে। ও কি করে জানতে চেয়ো না।

হিউয়ার্ট বলেই চলল, ও হলো পাগসি। ওই যে ছাইরঙা স্যুটপরা লোকটা দেখছো ও রেসের বড়বাবু। কুকুরকে আফিম খাওয়াতে ওর মতো—হিউয়ার্ট তাড়াতাড়ি নিজের জিভকে সামলে নিল, যাক্‌গে, ও পাগসি, এইটুকু মনে রেখে বাকীটা ভুলে যেও। আর ওদিকে যে হতভাগা সিগারেট ধরাচ্ছে ও গোল্‌ডস্যাক। ও ব্যাটার মাথাটা বেজায় সাফ। দু বছর আগে যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, পকেটে তিরিশ শিলিংও ছিল না। আর এখন ও দশ হাজার পাউন্ডের চেক কেটে দিতে পারে, ভাতে হাত পড়ে না। ও হচ্ছে বাজী ধরতে ওস্তাদ।

জুলি—বের্নস্টাইন, পাগসি আর অন্যদের চিনে ফেলল। পাগসি আর ডিউক ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একবার, ও কয়েকটা কথা শুনতে পেল।

পাগসি বলছিল, আমি ভাগাভাগিতে নেই। হয় পঁচিশ হাজার নয়তো ফক্কা। তুমি ঠিক পারবে। ভাবছ্ কেন?

ডিউকের গলায় সংশয়, আমার পক্ষে গেলা কঠিন। কি বললে? সবগুলোই প্লেয়ার্স?

—হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময়ে পাগসি জুলিকে দেখে চোখ টিপেছিল।

জুলি মনে মনে ভেবেছিল, পঁচিশ হাজার প্লেয়ার্স সিগারেটে ওদের কি পড়তা থাকবে? পরদিন কাগজে দেখেছিল, হাউন্ডসভিচের একটা গুদাম থেকে পঁচিশ হাজার সিগারেট চুরি হয়ে গেছে। দুয়ে দুয়ে যোগ করতে ওর অসুবিধা হয়নি।

কাফের জীবনে বৈচিত্র্য যত, উত্তেজনাও তত। জুলি সবসময় টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকত। যে সব খবর আসত ও তার কোন মানে বুঝতো না।

—পাগসিকে বল গ্রে-হাউন্ডকে ভাল দেখাচ্ছে। বুঝেছ? গ্রে-হাউন্ডকে ভাল দেখাচ্ছে।

—মিঃ গোলড্‌স্মিথকে বল আমায় ফোন করতে। বারোটার সময় বয় ব্লু।

—মিঃ বের্নস্টাইনের জন্যে খবর আছে। বাঁধা সময়, বাঁধা জায়গা। সি. ও. ডি।

এই সাঙ্কেতিক খবরগুলো জুলির গোলমেলে লাগত, অসম্ভব আকর্ষণ বোধ করত ও। এইভাবে খবর পেয়ে পাগসি, বের্নস্টাইন, স্মিথরা পয়সা করছিল।

পুরুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওর। একা একা সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না। প্রয়োজন এমন একটি পুরুষের যে মিষ্টি কথা বলবে, উপহার কিনে দেবে। যাকে ইচ্ছে হলে জুলি দাক্ষিণ্য দেখাবে।

কাফেতে যে সব পুরুষরা আসে তারা জুলির দিকে মন দেবার ফুরসৎই পায় না, পয়সা কামাতে তারা এত ব্যস্ত। হিউয়ার্টকে সহজেই গাঁথা যায়, কিন্তু ও বেজায় বুড়ো। প্রথম প্রথম

ও জ্বালাত কিন্তু জুলি শিখে নিল ওকে বাগ মানাতে। সারা সন্ধ্যা জুলি ক্যাশ ডেস্কের খোপে বসে থাকে, হিউয়ার্ট ওকে চটকাচটকির সুযোগ পায় না। ঢোকবার বেরোবার সময়টাতেও ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে যায় আসে। হিউয়ার্টকে খুশী রাখার জন্যে জুলি ছিটেফোঁটা করুণা বিতরণ করে। আর মস্তানটির কথানুযায়ী হিউয়ার্ট সামান্যতেই খুশী হয়।

জুলি ওর সমবয়সী একটি সঙ্গী চাইছিল, যে শুধু ওর শরীরটাকেই চাইবে না, যার সঙ্গে ওর মনেরও মিল হবে।

ঠিক তিনমাস ঐ কাফেতে কাজ করার পরই একদিন সেখানে উদয় হল হ্যারি গ্লেব। হ্যারির ব্যক্তিত্ব দেখে জুলি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল। ওর হাসি মাখা প্রাণোচ্ছল চেহারা চোখে পড়ার মত, ওর আত্মবিশ্বাস অপরিসীম, ওর পোষাক চোখ ধাঁধানো। জুলি তো একেবারে মুগ্ধ।

হ্যারির একমাথা গাঢ় বাদামী ঢেউ খেলানো চুল, সরু গোঁফের রেখা, সবুজ গভীর চোখ দুর্দম কৌতুকে জ্বলজ্বল করছে। যদিও ও কড়া, নীতিজ্ঞানের বালাই নেই, ছেঁদো স্বভাবের। অহঙ্কারী আর স্বার্থপরও বটে, তবু ওকে পছন্দ না করে পারা যায় না।

হ্যারি সবসময়ে হাসিখুশি, ঠাট্টা ওর ঠোঁটের ডগায়। সবসময়ে ও এক পাউন্ড ধার দিতে রাজি, একটা মুদ্রায় টোকা মেরে দশ পাউন্ড বাজি ধরতে পারে। বাজি ফেলে মদ খেতে ও ওস্তাদ। ওয়েস্ট এন্ডের বেশ্যাদের, রংবাজ ছোকরাদের, ধাপ্পাবাজদের সবাইকে ও চেনে আর সবাই ওকে পছন্দ করে। ও লন্ডনের এক চালু মস্তান।

জুলির মনে হল ও যেন একেবারে সিনেমার পর্দা থেকে উঠে এসেছে। কাফেতে আর যাঁরা আসে তাদের সঙ্গে ওর তুলনা করতে গিয়ে মনে হল ট্রেনে ওর পাশে যে মোটা বুড়োটা বসে তার সঙ্গে ক্লার্কসেরলের তুলনা করছে।

তবে জুলি চালাক মেয়ে। ও হ্যারিকে বুঝতেই দিল না যে হ্যারিকে ওর মনে ধরেছে। নিজের আকর্ষণী শক্তির বিষয়ে ওর ভালই ধারণা আছে। ও জানত আজ না হয় কাল হ্যারিই প্রথম আসবে ওর সঙ্গে ভাব করতে।

সে সময়ে হ্যারি বের্নস্টাইনের সঙ্গে কি একটা কারবার করত যার জন্যে বাধ্য হয়ে ও ব্রিজ কাফেতে আসত। ব্রিজ কাফে ওর ভাল লাগত না, হিউয়ার্টকেও নয়।

একদিন ক্যাশ ডেস্কের সামনে জুলিকে ওর চট করে চোখে পড়ল। সন্ধ্যায় জুলি ওর কাঁচের খুপরি থেকে বেরিয়ে ডিউককে একটা খবর পৌঁছতে যাচ্ছে, হ্যারি ওর নিটোল চেহারা দেখেই উত্তাপ অনুভব করল। সে প্রথম ওকে সামনাসামনি দেখে একটা লম্বা শিস্ দিল।

জুলির দিকে বুড়ো আঙুলটা হেলিয়ে ও বের্নস্টাইনকে জিজ্ঞেস করল, বারুদ! স্যাম জোটাল কোথা থেকে?

বের্নস্টাইন বেরিয়ে যাবার পর হ্যারি ক্যাশডেস্কের কাছে গিয়ে জুলির সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করল।

এই সুযোগটার জন্যেই জুলি পরম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ও মনের আগ্রহ হ্যারিকে বুঝতে দিল না বরং হ্যারি ঘনিষ্ঠ হতে গেলে মৃদু ধমক দিল। হ্যারির মুখে ওর খোসামোদ শুনে খুব ঠাণ্ডা ও মোলায়েম ব্যবহার করল।

হ্যারির প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ, চুম্বকের প্রতি লোহার পেরেকের মতো। মেয়েরা ওকে এড়াতে পারে না। জুলির ব্যবহারে হ্যারি রীতিমত অবাক হল। হ্যারির মতে, মেয়েরা প্যানপ্যানে আর ঘ্যানঘ্যানে জীব। কিন্তু এ মেয়েটি যে একেবারে আলাদা প্রকৃতির হ্যারি তা বলে দিতে পারে।

জুলি মেয়েটি এমনিতে বেশ। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যঙ্গ— বিদ্রূপ দেখে হ্যারির ভেতর পর্যন্ত বিড়বিড় করে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে, ও হ্যারির মতলব ধরে ফেলেছে। হ্যারিকে বিশেষ আমল দিতে রাজী নয়, তা সে যতই তোষামোদ আর মিষ্টি ব্যবহার করুক না কেন।

হ্যারি একজোড়া সিল্কের মোজা, একবাক্স চকোলেট নিয়ে ঘুরে ঘুরেই আসছে জুলির কাছে কথা বলতে। হ্যারিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ দিয়ে জুলি যে দেওয়ালটা তৈরী করেছে, সেটা ভাঙবার জন্যে হ্যারি বহুবার জুলিকে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে অনুবোধ করেছে। জুলি রাজী হয়নি। আবার হ্যারি ওকে ছেড়ে চলে যাক সে ঝুঁকিও জুলি নিতে চায়নি।

পুরুষদের সম্বন্ধে ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ও জানে হ্যারিকে ও যত ঝুলিয়ে রাখবে তত ওর কামনা বেড়ে যাবে আর তারপর যখন জুলি ধরা দেবে তখনো ওর কামনার আগুন সহজে নিভবে না।

মিসেস ফ্রেঞ্চ যখন জিজ্ঞেস করল ওদের সাহায্য করবে এমন কোন মেয়ের খবর হ্যারি রাখে কিনা, তখন হ্যারির জুলির কথা মনে এসেছে। ওর মনে হয়েছে জুলি টাকা চায়, জুলির বুদ্ধি আছে। বেপরোয়া সুযোগ এলে ছিনিয়ে নেবার অপেক্ষায় আছে জুলি।

তবে জুলি হ্যারির সঙ্গে ওব বন্ধুত্বের প্রসঙ্গটা সমানে এড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যারি ঠিক করেছে জুলির প্রতিরোধ ভাঙতে হলে ওকে কাজের প্রস্তাবটা দিতে হবে। আর কাজের প্রস্তাবটা দেবার আগে ওর কাফের চাকরীটা চলে গেলে সবচেয়ে ভাল হবে। যতদিন চাকরী থাকবে, বাঁধা মাইনে পাবে ততদিন ও স্বাধীন। আর ওর যদি নীতিজ্ঞান প্রবল হয়, তবে হ্যারির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

হ্যারি স্বাধীনচেতা মেয়েদের ভয় পায়। জুলি স্বাধীন বলেই ওদের মধ্যে এই আড়াল, হ্যারি সেটা নিশ্চিত।

তাহলে হ্যারির প্রথম কাজই হবে ওর কাফেতে চাকরীটা খাওয়া। কিন্তু কিভাবে! হিউয়ার্টের কাছে তো জুলি ভালই কাজ করছে, ওকে চাকরী থেকে হটিয়ে দেবার মতো কোন কারণই ঘটেনি এ পর্যন্ত। তাহলে কি করা যায়! মাথা ঘামিয়েও ও কিছু বের করতে পারল না।

হ্যারি নিজেকে প্রবোধ দিল, যাক যা হয় একটা উপায় ঠিক হয়ে যাবে। হলও তাই। সবসময়ই হয় তাই-ই। তবে ও যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়।

মিসেস ফ্রেঞ্চের ওখানে মিটিং হয়ে যাবার দুদিন পরে জুলির টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় একটি মেয়ে বলল, ওখানে কি মিঃ হ্যারি গ্লেব আছেন?

জুলির মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। ও তিন দিন হ্যারিকে দেখেনি, তবে কি ওর সঙ্গে বড্ড রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলেছে বলে ও বাধ্য হয়ে অন্য কোন মেয়ের কাছে গেছে?

—না আমার মনে হয় উনি কাফেতে নেই, জুলি বলল। মনে মনে ভাবল কে এই মেয়েটি!

—আপনি ঠিক বলছেন? অসম্ভব জরুরী দরকার। আপনি প্লিজ একটু দেখবেন উনি আছেন কিনা। উনি বলেছিলেন ওখানে থাকবেন।

জুলি চমকিত হল। মেয়েটির গলায় হিস্টিরিয়া।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হিউয়ার্ট লক্ষ্য করল ঘন তামাকের ধোঁয়ার ভেতর চোখ বুলিয়ে জুলি চারিদিকে যেন কাকে খুঁজছে।

—কি হয়েছে? হিউয়ার্ট জুলিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—একটি মেয়ে মিঃ গ্লেবের খোঁজ করছেন। মনে হল মেয়েটি বেজায় উদ্বিগ্ন।

হিউয়ার্ট বাঁকা হাসি হেসে বলল, গ্লেবের বান্ধবীরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়েই থাকে। বোকাগুলোর ওটাই স্বাভাবিক মনের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। হ্যারি এখানে নেই।

জুলি ফোনে মুখ বেখে বলল, দুঃখিত, আমরা ওকে আজ রাতে দেখিনি।

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মেয়েটি বলল, উনি আসবেন, এলে আমাকে ফোন করতে বলবেন। নম্বরটা নিন দয়া করে।

জুলি নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। বলল, হ্যারি আসার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা ও দেবে। তারপর ফোন নামিয়ে রাখল।

হিউয়ার্ট মুখ বেঁকিয়ে গজগজ করতে করতে বলল, ও এখানে না আসুক, এটাই আমি চাই, ওর দ্বারা কারোর কোনদিন ভাল হয়নি।

কয়েক মিনিট পরে কাফেতে হ্যারিকে ঢুকতে দেখে জুলি ওকে হাত নেড়ে ডাকল।

হ্যারি এগিয়ে এসে বলল, হ্যালো! তুমি নিশ্চয় বলছ না, অন্ততঃ একবার তুমি আমায় দেখে খুশী হয়েছ?

—কয়েক মিনিট আগে ফোনে একটা খবর এসেছে। একটি মেয়ে জরুরী দরকার বলে ফোন করতে বলেছে। রিভার সাইড ৫৮৮৪৫ নম্বর।

হ্যারির মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

—ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?

হ্যারিকে ভালো লেগেছে জুলির। এখন ও আর ফাজলামো না করে গম্ভীর, কঠিন আর ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে উঠল। জুলি লক্ষ্য করল হ্যারির ডায়াল ঘোরাতে হাত কাঁপছে।

—ডানা?

জুলি ছাড়া হ্যারির কথা এঘরে কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

—হ্যারি কথা বলছি। কি হয়েছে?

হ্যারি উত্তরটা শুনল। জুলি দেখল হ্যারির হাতটা রিসিভারের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে।

—কতক্ষণ আগে? ঠিক আছে। চেপে বসে থাক। ঠিক আছে। চুপ কর, বোক না। সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা চলি।

ও টেলিফোন রেখে দিল।

জুলি ওকে চোখ দিয়ে বিঁধে বলল, কি কেউ ধরে ফেলেছে তোমায়?

—হ্যাঁ।

হ্যারি ওকে এক লহমা ভাল করে দেখল।

—আমায় একটু সাহায্য করতে পারো? ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যারি জুলির কোলের ওপর সাদা কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট ফেলে দিয়ে বলল, কাল অবধি এটাকে সামলে রেখ, কেমন? লুকিয়ে রেখ। যদি তোমার কাছে কেউ খোঁজ নিতে আসে আমি তোমায় কিছু দিয়েছি কিনা, তুমি একটা কথাও বলো না। কেমন?

জুলি হেসে বলল, আর কারোর জন্যে এ কাজ করতাম না। তোমার জন্যে করব।

—লক্ষ্মী মেয়ে। কাল আমার সঙ্গে একটু বেরোতে পারবে? আমি তোমায় লাঞ্চ খাওয়াবো।

—কাল নয়। কাল আমার সময় হবে না। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। তারপর একটু থেমে বলল, পরদিন হতে পারে। তুমি কাল রাতে আসবে?

—নিশ্চয়ই তুমি ওটা সামলে রেখো। চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি। দরজা খুলতেই আচমকা ও দাঁড়িয়ে পড়ল, এক পা পিছিয়ে এল।

বিশাল চেহারা, গায়ে বর্ষাতি, কপালে টুপি নামানো, দুটি লোক কাফেতে ঢুকল। পুলিশ! এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে জুলির হাত-পা অবশ হয়ে যেতে লাগল, ওর মনে হল ও তলিয়ে ডুবে যাচ্ছে। ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল, এই জন্যেই হ্যারি প্যাকেটটা হাত বদল করল।

হ্যারি পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে, হাসছে। কাফের অন্যান্য নারী-পুরুষরাও ওদের দেখছে, কেউ নড়ছে না, কথাও বলছে না। নিজেদের যেন রবার দিয়ে মুছে ফেলেছে সবকিছু থেকে, এমনই নৈর্ব্যক্তিক মুখভঙ্গি ওদের।

ডিটেকটিভ ডসনের মুখ চেনে জুলি। সে হিউয়ার্টের অফিসের দিকে ঘাড় হেলাতেই হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে এদিকে হেঁটে জুলির দিকে না তাকিয়েই চলে গেল।

পুলিশগুলো যেই চোখের আড়াল হল, অমনি যত মেয়ে পুরুষ সবাই হুড়োহুড়ি করে দরজার দিকে ছুটে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কাফেটা খালি হয়ে গেল।

জুলি ঘাবড়ে গিয়ে প্যাকেটটা ব্যাগে ভরতে যাচ্ছিল কিন্তু তা না করে জনশূন্য কাফের দিকে তাকিয়ে নিয়ে স্কার্টটা তুলে কোমরের বাঁধন ঠেলে প্যাকেটটা ঢুকিয়ে নিল। ব্যাগে রাখল না কারণ ওরা প্রথমেই ব্যাগটা খুঁজবে।

হিউয়ার্টের অফিসে বেশীক্ষণ থাকল না পুলিশ। ওরা হ্যারির সঙ্গে বেরিয়ে এল। পেছনে হিউয়ার্ট। ওর মুখে চাপা রাগ।

কমবয়সী অফিসারটি হ্যারিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে বেরিয়ে গেল ওরা।

হিউয়ার্ট আর ডসন কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ওরা জুলির কাছে এল। ডসন টুপিটা তুলে

ধরল। ওর বিশ্বাস ভদ্র ব্যবহার করলে প্রতিদান পাওয়া যায়।

—ইভিনিং মিস। আপনি কি ঐ গ্রেব ছোকরাকে চেনেন?

জুলি ওদের দিকে উদ্যত দৃষ্টিতে চাইল।

—না চিনি না। যদি চিনিও তাতে আপনার কি?

—ও এখনি আপনার সঙ্গে কথা বলছিল না?

—সিগারেট কিনছিল।

ডসন ওর দিকে সোজাসুজি চাইল। জুলি চোখ ফিরিয়ে নিল।

—কিনছিল বুঝি? কিন্তু আমি যখন ওকে সার্চ করলাম, প্যাকেট দেখলাম না তো? কি ব্যাপার বলুন তো?

জুলির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভুল হয়েছে, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। ও চুপ করে রইল।

—আপনাকে ও কিছু রাখতে দেয়নি? ডসন সোজাসুজি প্রশ্ন রাখল।

জুলি বুঝতে পারল ওর মেরুদণ্ড শিরশিরিয়ে একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ উঠে আসছে, কিন্তু ও জোর করে ডসনের চোখে চোখ রেখে বলল,—না দেয়নি।

—আপনার ব্যাগটা দেখতে দেবেন?

জুলি জ্বলে ওঠার ভান করে বলল, আমার ব্যাগ দেখার কোন অধিকার নেই আপনার। তবে দেখলে যদি খুশী হন তো দেখুন।

ব্যাগটা ডসনের দিকে ঠেলে দিল। ডসন ওটা ছুঁলো না পর্যন্ত। বলল—ঠিক আছে মিস। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

হিউয়ার্টের দিকে চেয়ে ডসন বলল, চললাম স্যাম। আবার দেখা হবে।

ফাঁকা কাফেটার দিকে চোখ বুলিয়ে ডসন মৃদু হেসে বলল, তোমার কারবারে বোধহয় লোকসান ঘটালাম। মনে হচ্ছে তোমার খদ্দেররা একটুতেই ঘাবড়ে যায়!

কঠিন চোখে হিউয়ার্ট বলল, আচ্ছা।

ডসন জুলির দিকে টুপিটা তুলে ধরে বলল,—গ্রেবের মতো মেয়েদের তাড়াতাড়ি ফাঁসাতে পারে, এমন কোন ছেলে আছে বলে আমার জানা নেই। হয়তো অন্য কেউও থাকতে পারে, তবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। গুডনাইট।

ও চলে যেতে হিউয়ার্ট জুলির দিকে বিশ্রী চোখে চাইল। কড়া গলায় বলল,—মতলব কি? কি শয়তানী করছ তুমি?

জুলি অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলছো?

—বন্ধ হলে পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। বলে হিউয়ার্ট ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে অফিসে গিয়ে ঢুকল।

গুদামঘরের ফাটা আয়নাটা দেখে জুলি মাথায় টুপি পরছিল, হিউয়ার্ট ঢুকল। কাফেতে এখন শুধু ওরা দুজন।

হিউয়ার্ট ওর স্বভাবসিদ্ধ ভোঁতামির সঙ্গে বলল, গ্রেব তোমায় কি রাখতে দিয়েছিল?

হিউয়ার্টের রুক্ষ গলা আর ঠাণ্ডা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেখে জুলি হুঁশিয়ার হল।

—খিঁচিয়ে বলল, ডসনকে কি বললাম, তা তো শুনেছো, শোননি? আমায় কিছুই দেয়নি ও।

—ডসনকে যা বলেছো তা শুনেছি ঠিকই।

আরো কাছে এসে হিউয়ার্ট বলল, মিথ্যে কথা যদি বলতে না পারো তো চুপ করে থেক। ডসন ঠিকই বুঝেছে তুমি একটা ধান্দা পাকাতে চাইছ। গ্রেব তোমাকে যে আংটিগুলো দিয়েছে, তা যদি ডসন বুঝতে নাও পারে, তবে তোমাদের মধ্যে যে একটা ব্যাপার চলছে তা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে।

আংটিগুলো? জুলি টের পেল ওর চামড়ার রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে বলল, আ-আমি জানি না তুমি কি বলছ।

ওর চোখে ভয় দেখে হিউয়ার্ট একটু নরম হলো। ও জুলিকে স্নেহ করে, ফালতু ঝুট ঝামেলা পাকাতে চায়না ওর সঙ্গে। বলল, দেখ বাছা, এতদিন নিজেকে তুমি দিব্যি চালাক চতুর বলেই

প্রতিপন্ন করে এসেছো। এখন বোকা হয়ে যাচ্ছো। আমাদের আওতার বাইরে গ্রেবের কারবার। আমরা ওর কারবার থেকে ফুটো পয়সাটিও পাই না। আমরা ওর জন্যে কিছু করিনা, ও-ও আমাদের জন্যে কিছু করে না, বুঝলে? ঠিক আছে তুমি জানতে না। আমার তোমাকে সমঝে দেওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ভেব না দোষ দিচ্ছি। গ্রেব বড় বেশী পাখোয়াজ।

—বলছি ও আমায় কিছু দেয়নি।

জুলির বুক ধড়াস ধড়াস করছে। ও যদি স্বীকার করে যে হ্যারির কাছ থেকে চোরাই আংটি নিয়েছে, তবে ও একেবারে হিউয়ার্টের হাতের মুঠোয় চলে যাবে। কি বোকামী আর কাঁচা কাজই না হয়ে গেছে প্যাকেটটা নিয়ে। ওর বোঝা উচিৎ ছিল ওতে চোরাই মাল আছে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল ওর।

হিউয়ার্ট ওকে নজর করল। আর ওর পাতলা ধারালো মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো।

—শোন, আজ সন্ধ্যেবেলা একজন ধনী মহিলা দু-সেকেন্ড, বেশী নয় ঠিক দু সেকেন্ড ওর ড্রেসিং টেবিলে হাজার পাউন্ড দামের তিনটে হীরের আংটি রেখে একটু আড়ালে গিয়েছিলেন। ব্যাস! আংটিগুলো বেমালুম হাওয়া। এই হচ্ছে গ্রেব। ঠিক দু-সেকেন্ডে কাম ফতে! অসম্ভব দ্রুত গতিতে কাজ সারে, আর সবার শোবার ঘর হচ্ছে ওর বিচরণক্ষেত্র। এই হলো ওর লাইন। ডসন আর আমি ওকে খুব ভালই চিনি।

চুরিটা করেই ও সরাসরি এখানে চলে এসেছিল। আমার ধারণা মেয়েটার ফোন এসেছিল ওকে সতর্ক করার জন্যে। আর ও তখনই মাল তোমার কাছে পাচার করে। নিজের নোংরা চামড়া বাঁচাতে ও যাকে তাকে ফাঁসাতে পারে। এখন শোন জুলি, গ্রেব একেবারে গোখরো সাপ। ওর জন্যে এখানে পুলিস ঢোকায় আমি ওকে পছন্দ করি না। ওর কথা ভাবতে আমি প্রস্তুত নই, এখন আমি আংটিগুলো চাই।

জুলি ওর টুপি আর কোট খুলে নিয়ে সাঁ করে দরজার দিকে এগোল কিন্তু হিউয়ার্ট ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ওর চোখে একটা কুৎসিত দৃষ্টি জ্বলে উঠল।

—এক মিনিট দাঁড়াও জুলি।

—আংটির কথা কিছু জানি না আমি। মিঃ হিউয়ার্ট দয়া করে আমাকে যেতে দিন। আমি বাড়ি যেতে চাই।

—এখনো নয়। জুলি, আমি খুব ধৈর্য দেখাচ্ছি, কেন না আমি তোমায় পছন্দ করি। কিন্তু ঐ লোকটার জন্যে তুমি গবেটের মত ব্যবহার করছ। এখানে কি চলে না চলে আমার সব নজরে আছে। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলেছ, নানারকম কায়দা করছ, আমি সব লক্ষ্য করেছি। ওকে গাঁথতে চেষ্টা করেছো, তাই না! খুব সাবধান। গ্রেব মেয়েদের সর্বনাশ ছাড়া কোনদিন ভাল করেনি। ওর মত নেংটি ইঁদুর কেন, তুমি অনেক ছোকরা পাবে। গ্রেব মেয়েমানুষের অভিসন্ধি জানে, আর তাতেই ও মাস্টার।

—ওঃ। কোন সাহসে তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো? সরে দাঁড়াও, পথ ছাড়ো বলছি। জুলি খেপে চেঁচিয়ে উঠল।

হিউয়ার্টের আর ধৈর্য থাকল না। ও বলে উঠল, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, আংটিগুলো আমাকে না দিয়ে তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমায় যদি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য কর, তবে আমি তোমায় ছাঁটাই করব।

—তুমি এগুলো পাচ্ছো না। আমি তোমার পচা কাজও চাই না। আমি এরকম কাজ অনেক অনেক পেতে পারি। তোমায় ভয় পাই না। বুড়ো শয়তান কোথাকার।

জুলির ছোট্ট সাদা মুখ কঠিন, ওর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবভঙ্গী, মুঠো পাকানো হাত দেখে হিউয়ার্টের মন প্রশংসায় ভরে উঠল। ও হাসিতে ফেটে পড়ল।

—চল জুলি। বোকামি কোর না। তোমার যথেষ্ট হিম্মত আছে। তুমি আর আমি দিব্যি চালিয়ে দিতে পারব। আংটিগুলো দিয়ে দাও, আমি এই ঝুটঝামেলা ভুলতে চাই।

—বলছি যে তুমি কি বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না। বারবার বলছি আমার কাছে আংটি নেই আর থাকলেও সেগুলো আমি তোমাকে দিচ্ছি না।

জুলি খেঁকিয়ে উঠে ছুট লাগাল। কিন্তু হিউয়ার্ট ওকে ধরে ফেলল। একহাতে ওর কব্জি ধরে, অন্য হাতে জুলির গায়ে হাত বুলিয়ে গেল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জুলি বলল, আমায় ছেড়ে দাও নইলে আমি পাড়া মাথায় করব বলে দিচ্ছি।

—চেঁচাও না, চেঁচাও। হিউয়ার্ট হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, যদি পুলিস আসে তো বলব গ্রেব তোমায় আংটিগুলো দিয়েছে। তখন তুমিই ফাঁসবে। বেশী কায়দা কোর না। চুপ করে দাঁড়াও। আমি জানি ওগুলো তোমার কাছেই আছে।

ও আঙুল বোলাতে বোলাতে প্যাকেটটা কোথায় আছে টের পেল।

—আহঃ! এই তো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। ও রকম করে কোন লাভ হবে না।

জুলি ধস্তাধস্তি করতে লাগল, লাথি ছুঁড়তে লাগল। হিউয়ার্টের গোদা গোদা পায়ে জুতোর ঠোক্কর মেরেও ওর দুটো হাত ছাড়াতে পারল না। এরপর হিউয়ার্ট যখন ওর স্কার্ট টেনে তুলতে শুরু করেছে, জুলি রেগে তীক্ষ্ণ কানফাটা চিৎকার করে উঠল।

দরজা খুলে হ্যারি ঢুকে বলল, আমি তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হচ্ছি স্যাম! যা করছ তা আধাআধি করলে তোমার দু-মাস জেল হতে পারে।

হিউয়ার্ট, হ্যারিকে দেখে ছিটকে জুলিকে ছেড়ে দিল। হ্যারি দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর টুপিটা কায়দা করে হেলিয়ে নামানো, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে, দু-চোখে উদ্ধত বিদ্রূপ।

—কেমন করে ঢুকলে? হিউয়ার্টের গলা রীতিমত ক্ষীণ।

হ্যারির চোখের চাউনি আর পকেটে ঢোকানো মুঠো পাকানো হাত দুটো দেখে ও কিসের ভয়ে যেন সিঁটকে গেল।

জুলি টলতে টলতে হোঁচট খেয়ে হিউয়ার্টের কাছ থেকে ছিটকে সরে এলো! ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলছে, মুখ সাদা।

—পচা শুয়োর কোথাকার! আমার গায়ে হাত দাও এতবড় আস্পর্ধা!

হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সব তোমার দোষ। এই বুড়োটাকে মেরে টের পাইয়ে দাও কত ধানে কত চাল।

হ্যারি দু-চোখে প্রশংসা নিয়ে জুলির দিকে তাকাল। মেয়েদের চটতে দেখতে, বিশেষ করে জুলিকে ধানীলঙ্কার মতো চিড়বিড় করতে দেখে ও খুব খুশী।

একটু মুচকি হেসে হ্যারি বলল, এই বুড়োটার জন্যে সব রাগ খরচ করে ফেলো না সোনা। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি একটা বুড়ো লোককে মেরে হাত নোংরা করি। চাও? চল আমার সঙ্গে বাড়ি। কেন, ও তো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

জুলি ঘর ফাটিয়ে চেঁচাল, ওর নোংরা থাবা দিয়ে আমায় চটকাবার উচিৎ শিক্ষা আমি দেবই।

চাব পাউন্ড ওজনের মধু ভর্তি একটা বোতল তুলে নিয়ে জুলি হিউয়ার্টের দিকে ছুঁড়ে মারল। ওর বুকের মধ্যিখানে বোতলটা লাগল, হিউয়ার্ট টলতে টলতে পিছু হটে গেল। ও আরেকটা কিছু ছোঁড়ার জন্যে খুঁজছিল কিন্তু হ্যারির হাসির চোটে দম আটকাবার জোগাড় হল। হ্যারি ওকে শক্ত করে ধরে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলো। চেঁচিয়ে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও স্যাম। ওকে আমি বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারব না। ও তোমায় নির্ঘাত খুন করবে।

ধড়াস করে দরজা বন্ধ হলো, চাবি ঘুরল।

জুলি রাগের চোটে হ্যারির হাত ছাড়িয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগল।

—আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও, নোংরা বুড়ো ছাগল কোথাকার। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার শেষ হয়নি। তোমায় আমি শেষ করব হতভাগা।

দরজার ফাঁক দিয়ে হিউয়ার্ট চেঁচিয়ে বলল, বেরিয়ে যাও তুমি। তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম. বুঝলে! তোমার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাই না। ভাগো নইলে, পুলিশ ডাকব।

জুলি পালটা চেঁচাল, আমি তোমাকে ধরাবো আমার গায়ে হাত দেবার জন্যে। ভেবনা, পার পাবে তুমি, ভেবো না মোটেই।

হ্যারি বলল, চল জুলি। যেতে দাও বুড়োটাকে। যথেষ্ট ভয় খাইয়েছো, ও আর কোন ঝামেলা করবে না।

জুলি হিউয়ার্টকে ছেড়ে হ্যারিকে নিয়ে পড়ল।

—আমার কাজটা খেলে তুমি। তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করাটা সোজা। কিন্তু আমি এখন করবটা কি?

হ্যারি ভাবল, আমি বলেছিলাম যা হয় কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু এতো দেখছি আরো ভাল হলো।

জুলি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলল, তুমি কি ব্যবস্থা করবে শুনি?

জুলি এখন উপলব্ধি করছে যে কাফেতে কাজ না করার মানেটা না খেয়ে মরা। হপ্তায় বারো পাউণ্ডের কাজ পাওয়া অসম্ভব। ও হ্যারির ওপর চেঁচিয়ে উঠল, জাহান্নামে যাও তুমি। তোমাকে জীবনে দেখতে না পেলেই ভাল হতো। যদি তোমায় সাহায্য করতে না যেতাম।

—মাথা গরম কোর না। চল কাথাবার্তা বলে দেখি। আমার গাড়ি বাইরে আছে। আমি তোমায় বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

কি যে করবে, কিছুই বুঝতে না পেরে হ্যারির সঙ্গেই চলল। ও একলা হলে হিউয়ার্টের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিত। কিন্তু হ্যারি ওকে কনুইয়ের ধাক্কায় হিউয়ার্টের কাছ থেকে ভাগিয়ে এনেছে। ওকে ফিরে যেতে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর।

পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্রাইসলার গাড়ি। জুলি দেখল নাম্বার প্লেটের জায়গায় ভাড়াটে গাড়ির নম্বর।

হ্যারি বলল, কোন ভাবনা-চিন্তা না করে সোজা গাড়িতে ওঠো, থাক কোথায়?

—এটা তোমার গাড়ি। জুলি একেবারে বিমূঢ়।

—নিশ্চয়ই। নম্বর প্লেটটার কোন মানে নেই। ওর একমাত্র মানে হল আমি গাড়িটা চালু রাখতে পারি, কোত্থেকে পেট্রল পেলে জিজ্ঞেস করে পুলিশ আমায় উত্যক্ত করে না।

গাড়িটা লম্বা, ঝকঝকে বনেট, হেডলাইট ভাল করে দেখল জুলি, মনে মনে ভাবল এমন একখানা গাড়ি রাখতে পারে, তাহলে হয়তো ওর বেশ টাকা-পয়সা আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আছে। দেখি ওর ঘাড় ভেঙে আমি কি আদায় করতে পারি।

—স্বপ্ন দেখ না রাজকুমারী! জাগো। কোথায় থাকো তুমি? বলে হ্যারি ওকে ঠেলে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

—ফুলহ্যাম প্যালেস রোড, বলল জুলি, চওড়া নরম গদিতে চেপে বসল আরাম করে। জুলির পাশে হ্যারি উঠে বসল, স্টার্টারে পা রাখল।

—ঘর নিয়ে থাকো? হ্যারির প্রশ্ন।

—ছোট ফ্ল্যাট।

—কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করে আছো?

—না, তুমি বড় বেশী জানতে চাও, তাই না?

—হ্যাঁ, পরের ব্যাপারে নাক গলানো আমার স্বভাব। একটু হাসল হ্যারি। জনশূন্য পথ দিয়ে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলল। যতক্ষণ না জুলির বাড়ির গেটে গিয়ে গাড়িটা থামল ওরা আর একটি কথাও বলল না।

তারপর হ্যারি জিজ্ঞেস করল, এই বাড়ি? চল ভেতরে যাই। এক কাপ চা পেলে ভাল হতো।

জুলি খ্যাঁক করে বলল, তুমি ভেতরে আসবে না, কোনো চা-টা পাবে না। যদি আংটিগুলো ফেরৎ চাও তোমাকে রীতিমত দাম দিতে হবে।

হ্যারি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে চাইল! ওর ঠোঁটের হাসি কিন্তু ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল।

—কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে পারবো না। লক্ষ্মী মেয়ে শোন, আমাকে ভেতরে যেতে বলো।

—এত রাতে পুরুষ মানুষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ঢোকানো আমার অভ্যেস নেই। আংটিগুলোর জন্যে আমার পঞ্চাশ পাউণ্ড চাই, নইলে ওগুলো তুমি পাচ্ছো না।

হ্যারি চাপা শিস দিল।

—অত নিষ্ঠুর হয়ো না সোনামনি। পঞ্চাশ পাউন্ড! ঐ নচ্ছার জিনিসগুলোর আসল দামই অতো নাকি?

—ওগুলোর দাম দশ হাজার পাউন্ড, তা তুমি ভাল করেই জানো। কাল সকালে টাকা নিয়ে আসলে ভাল। নইলে আমি আংটি বেচে দেব।

গাড়ির দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে নেমে জুলি প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে দরজা খুলল বাড়ির।

—জুলি!

—কাল সকাল পর্যন্ত দেখব। তার মধ্যে এলে ভাল। নইলে তারপর তুমি ওগুলোর দেখা পাচ্ছো না। সগর্বে ঘোষণা করে জুলি দুম করে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

হ্যারি কাছেই অপেক্ষা করছিল। একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ও একটু হেসে গাড়ি চালিয়ে কাছাকাছি গেল। এ পাড়ায় কাছেই একটা গ্যারেজ সারারাত খোলা থাকে। ও সেখানে গাড়িটা রেখে জুলির বাড়ি অবধি হেঁটে এলো। তখন রাত তিনটে বেজে গেছে। ও রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিল। একটা বেড়াল চোখে পড়ল শুধু। তারপর সহজ অভ্যস্থতায় লোহার রেলিং টপকে পাইপ বেয়ে জুলির জানলা ঠেলে ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দিল। অসম্ভব দ্রুত ওর চলাফেরা তেমনি নিঃশব্দে। সবশুদ্ধ কয়েক সেকেন্ডও লাগল না।

পর্দা সরিয়ে দেখল ঘরটা বড়, আসবাব মলিন, তেমন আরামদায়ক নয়। বিছানার পাশে টেবিলল্যাম্প। দেওয়াল ঢাকা কাগজ আর আসবাবের নিষ্প্রভ চেহারার ওপর বাড়িটার গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরটার ওপাশে আধখোলা দরজার ও প্রান্ত থেকে জল পড়ার শব্দ শুনে বুঝল ওটা স্নানের ঘর। জুলি শোবার জন্যে তৈরি হতে হতে গুণগুণ করে গান করছে। টুপি আর কোট খুলে একটা ইজিচেয়ারে বসে হ্যারি সিগারেট ধরাল।

কয়েক মিনিট বাদে সবুজ রাতের পোষাক পরে জুলি ঘরে ঢুকল। শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। হ্যারিকে বসে থাকতে দেখে ও প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর ওর মুখ সাদা থেকে লাল হয়ে গেল।

হ্যারি হালকাভাবে বলল, এই যে. আমায় মনে পড়ছে? বস, এই বিছানার ওপর। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বিপন্ন চোখে জুলি চার দিকে চাইতে চাইতে ড্রেসিং টেবিলে ওর চোখ আটকে গেল। ও ছুটে গেল সেদিকে, কিন্তু তার আগেই হ্যারি সেখানে গিয়ে ওর ব্যাগের নিচ থেকে দুটো হীরের আংটি তুলে নিল।

—রেখে দাও, জুলি ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বলল।

হ্যারি ওগুলো পকেটে পুরে নরম গলায় বলল, দুঃখিত সোনা। ওগুলো ছেলেখেলার জিনিষ নয়, ভয়ানক দরকারী জিনিষ। আমি কথা বলতে চাই জুলি। এসো, ভাব করি। আমায় এক কাপ চা খাওয়াও।

—শয়তান? জুলি রাগে ফেটে পড়ল। বলল, আমি তোমার জন্যে এত হ্যাপা পোয়ালাম আর আমাকেই এক পয়সা দিতে চাচ্ছ না? পচা বদমাশ!

—কে বলল আমি তোমায় কিছু দিচ্ছি না? তুমি কাজ চাও, তাই না? বেশ আমি তোমার জন্যে একখানা দারুণ কাজ দেখে রেখেছি। সত্যি বলছি। ধাপ্পা নয়।

—কি রকম কাজ?

—আগে আমায় একটু চা খাওয়াও। মুখ থেকে বিরক্তি মুছে ফেল। বিশ্বাস কর জুলি, আমি চা না খেয়ে কথা বলতে পারছি না।

জুলি নরম হলো ওর কথা শুনে। বলল, তোমায় নিয়ে পারা যায় না হ্যারি। চা করিয়েই তবে

ছাড়বে। দেরী হবে না বেশি।

জুলি চা করতে লাগল আর হ্যারি সিগারেটটা শেষ করে ভাবতে লাগল, আমি ওকে চমৎকার ম্যানেজ করেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি যা বলব ও তাই করবে।

জুলি ট্রে করে চা নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে রেখে চা ঢেলে হ্যারিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলল, কাজের কথা কি বলছিলে? তুমি আমায় পঞ্চাশ পাউন্ড দেবে, ওটা ভুলে যেও না।

—স্যাম তোমায় কি দিচ্ছিল?

—হপ্তায় বারো পাউন্ড।

—চট করে তুমি অত টাকার কাজ পাচ্ছো না যদি না—হ্যারি একটু ভেবে নিয়ে বলল, কি কাজ করছ তা নিয়ে বেশী খুঁতখুঁত কর আর...খানিকটা ঝুঁকি নিতে রাজী থাক।

—তোমার এ কথার মানে?

—যা বললাম! স্যামের কাছে কদ্দিন ছিলে?

—ছ-মাস।

—তার আগে?

—একটা সস্তার লাইব্রেরীতে।

—তার আগে?

—তার আগে আমি একটা কারখানায় কাজ করতাম। বলতে বলতে জুলির ভুরু কুঁচকে গেল।

—তাহলে পয়সার মুখ দেখেছো সবে এই ছ-মাস?

—হ্যাঁ। পয়সার মুখ, আমার যদি সাধ্যি থাকে, আমি দেখেই চলতে চাই। জুলি আরও কঠিন গলায় বলল, এর আগে আমি জীবনটা উপভোগ করতেই পারিনি। তোমার কী মনে হয় তুমি আমায় একটা ভালো কাজ দেখে দিতে পারবে?

—আমি জানি, পারব।

—কি কাজ?

হ্যারি চা খেতে খেতে জুলিকে ভাল করে দেখতে লাগল। আর ওকে নীরব থাকতে দেখে জুলি বলল, তুমি আমার জন্যে কাজ ঠিক করেছ বলে আমি বিশ্বাসই করি না। গুল দেবার আর জায়গা পাওনি। যদি দাও, পস্তাবে। আমি ডসনের সঙ্গে দেখা করে আংটিগুলোর কথা বলে দিতে পারি। কেউ আমার মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না।

হ্যারির হাত থেকে পেয়ালাটা পড়ে যাবার যোগাড় হল। জুলি কথাগুলো ঠাট্টা করে বললেও ঠিক ঠাট্টা হিসেবে নেওয়া যাচ্ছে না। জুলি হয়তো ওকে ভড়কে দিচ্ছে, কিন্তু হ্যারির মনে হল, না, জুলি ভেবেচিন্তেই বলেছে।

—এক মিনিট জুলি! কি বলছ ভেবে দেখ। সাবধান, পুলিশকে যে মেয়ে কথা লাগায় তাকে একটা বিচ্ছিরি, কুৎসিত নামে ডাকা হয়, বুঝলে?

—কথার ঘায়ে আমি মূর্ছা যাব না। জুলি পালটা জবাব দিল। মাথা ঝাঁকাল, কাজের কথা কি বলছো?

হ্যারি হুঁশিয়ার হয়ে, নিজেকে সামলে বলতে লাগল, এক মহিলার পরিচারিকার কাজ, মোটা টাকার কাজ। আমার এক বান্ধবী বাড়ির কাজের লোকজন দেবার এজেন্সী চালান একটা। তিনি তোমায় কাজটা পাইয়ে দিতে পারেন।

জুলি শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে গেল। হ্যারির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলতে চাও কি? আমি বাড়ির ঝিয়ের কাজ করব?

—না জুলি। শোন, রেগে যেও না। চাট ছোঁড়ার জন্যে মুখিয়েই আছ তুমি। টাকাটা যদি মোটা হয়, তাহলে কি কাজ না কাজ ও সব নিয়ে ভাবছ কেন? বাড়ির কাজে দোষ কি? হাজার হলেও তুমি তো কাফেতে কাজ করেছো। অত পিটপিটিনি তোমার নেই। আছে? কাজটা খুব ভাল। চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকবে, ভাল খাবে, ছুটি পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা মোটা টাকা পাবে।

—বাড়ির ঝি..., জুলি উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। হ্যারি ওর রাতের পোষাক পরা শরীরটা দেখতে দেখতে টের পেল ওর মন যেন ক্রমশই কাজের প্রসঙ্গ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

—না, আমি পারব না। হিউয়ার্ট আমাকে হপ্তায় বারো পাউন্ড দিত। তার কমে আমি চালাতে পারব না, চলবে না। বাড়ির ঝি-এর মাইনে তার ধারে কাছেও নয়, ওরা বেশী পায় না।

হ্যারি মুচকি হেসে বলল, এ বাড়ির কাজে পায়। এ কাজটা স্পেশাল কাজ। হপ্তায় পনেরো পাউন্ড মাইনে, কাজ ফুরোলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস। কি বল, ভালো নয়!

জুলি পায়চারি করতে করতে ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু কেউ তা দেবে না।

—ঠিক আছে শোন, খোঁচাখুঁচি করে এর বেশী কিছু জানতে চেওনা। হ্যারির গলা ধারালো হয়ে উঠল, আমি চাই ফোকটে কিছু পয়সা কর। কি করে তা জানতে চেও না। যা বললাম আশা করি বোঝার মত বুদ্ধি তোমার আছে।

—তাই বল। নিমেষে জুলির সন্দেহ হল, বলল কোনো জোচ্চুরি কারবার, তাই বলো।

—বলতে পারো...তবে তুমি যদি না জান ব্যাপারটা কি, তাহলে তোমার কোন বিপদ নেই। বুঝলে?

জুলি ভাবল, সেই পুরনো যুক্তি। হ্যারি অবশ্য ঠিকই বলছে। হিউয়ার্টও এই একই যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, কিছু দেখ না, কিছু শুনো না, তাহলে তোমার কোন বিপদের ভয় নেই, দিব্যি চালিয়ে নেবে। এই নিয়ম মেনে তা চালিয়ে নিয়েছিলও বটে।

হ্যারি বলল, তোমায় শুধু একটি বিশেষ বাড়িতে মাসখানেক কাজ করতে হবে। ওখানে হপ্তায় তিন পাউন্ড পাবে। আমি দেখব যাতে তুমি আরো বারো পাউন্ড পাও। কাজটা হয়ে গেলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস পাবে। কথা পাকা করবার জন্যে এখনি আমি তোমায় দশ পাউন্ড দিতে পারি।

—কিন্তু হ্যারি...আমি একটু ভেবে দেখতে চাই।

—ঠিক আছে কালই বোল। এখন চেপে যাও। হপ্তায় পনের পাউন্ড, কাজ ফুরোলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস, একেবারে ফুঃ করে উড়িয়ে দেবার মত নয় কথাটা।

জুলির মনে হঠাৎ একটা কেমন সন্দেহ জেগে উঠল, বলল, তুমি ঠাট্টা করছো না তো? তারপর দেখব তুমি এখান থেকে হাঁটা দিলে আর আমি গাড্ডায় পড়ে রইলাম। আমি কালকের মেয়ে নই। তোমার সঙ্গে আমার যদি আর দেখা না হয়, তাহলে আমার কি হবে?

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে বিছানায় ওর পাশে এসে বসল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, কানে কানে একটা কথা শোন। ও জুলির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আজ রাতে আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না, বুঝলে?

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—না, না, ওসবের মধ্যে আমি নেই। না বেরোও তুমি। বরঞ্চ পরে দেখা হবে সেই ভাল।

হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল।

—নিজের মন জান না, তাই না? প্রথমে আমায় থাকতে বলছ, তারপর তাড়িয়ে দিচ্ছো। আচ্ছা তোমার মন আমিই ঠিক করে দিচ্ছি।

জুলি তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনটা টানতে গেল, কিন্তু হ্যারি ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। জুলি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফিসফিসিয়ে বলল, না! থাম হ্যারি, না...।

হ্যারির ঠোঁট জুলির ঠোঁটের ওপর নেমে এল। এক মুহূর্ত ধস্তাধস্তি হল, তারপর দু-হাতে হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল।

—জাহান্নামে যাও! জুলি ওর কানে কানে বলল, আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধর আমাকে।

জীর্ণ পর্দার ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। পথে একজন গোয়ালা তার ঘোড়াকে কানফাটানো আওয়াজে বেজায় ধমকে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর দুধের বোতলের ঝন্‌ঝনানি আওয়াজ। আরেকটু দূরে ডাকপিওন কারো বাড়িতে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

জুলি একটু নড়চড়ে শরীর টানটান করে হাই তুলে খেয়াল করল বাথরুমের দিক থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। চাদরের তলায় পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে জুলি পরম তৃপ্তিতে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ঘুম ঘুম জড়ানো গলায় জুলি বলল, সব পেয়েছো তো হ্যারি?

—আমি এখনি চা চাই। বিছানা ছেড়ে ওঠনি এখনো?

—এই উঠছি। জুলি আবার পাশ ফিরে শুয়ে চিবুক অবধি চাদরটা টেনে নিল।

—বটে! হ্যারি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। জুলির মনে হল তোয়ালে জড়িয়ে ওকে মুষ্ঠিযোদ্ধার মত লাগছে। রোদেপোড়া পেশল, কঠিন শরীর ওর। হ্যারি বলল, ওঠো শিগগীর, নইলে বিছানা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জুলি বলল, এই উঠছি, উঠছি। এখনো নটা বাজেনি।

হ্যারি বাথরুমে ঢুকে গেল, বলল, সকালে আমার অনেক কাজ আছে।

রান্নাঘরে ঢুকে জুলি কেটলি বসাল। মনে মনে ভাবল, অবাক কাণ্ড বটে! মনে হচ্ছে ও যেন আমার সঙ্গে সারাজীবন রয়েছে। ও যেন আমার জীবনের একটা অংশ। দোষ শুধু নিজের কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। এমনটি না হলেই ভাল হত।

রাতে ও গল্প করতে করতে কতভাবে জানতে চেষ্টা করেছে হ্যারির দৈনন্দিন জীবনটা কেমন, ও কি করে, ও কি ভাবে, কিন্তু প্রতিবাবই ঠাট্টা তামাশার দেওয়ালে ঠোক্কর খেতে হয়েছে ওকে। প্রতিটা সিরিয়াস কথাকেই তামাশা করে কথার প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়েছে।

জুলির চা নিয়ে আসার আগেই হ্যারির পোষাক পরা হয়ে গেছে।

—হ্যারি...ঐ আংটিগুলো...আমার চিন্তা হচ্ছে। তুমি ওরকম একটা কাজ করে পার পাবে না বেশীদিন। জেনে রেখো।

ওর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হ্যারি শুধু হেসেছে।

—দোহাই তোমার, আমার জন্যে ভাবতে শুরু কর না। যদি চিন্তা করতেই হয়, নিজেকে নিয়ে চিন্তা কর।

—কিন্তু আমি তোমায় নিয়ে চিন্তা করি যে?

—দেখ, এ দুনিয়ায় আমার মেয়াদ অল্পদিনের, ভাগ্যে থাকলে বড়জোর চল্লিশ বছর। চল্লিশটা বছর আবার সময় নাকি? কিসসু না। তারপর কবরের অন্ধকার, ঠাণ্ডা পোকার খাবার হওয়া। তার চেয়ে যদ্দিন জীবন আছে স্ফূর্তি করে নিই।

—দশ বছর যদি জেলেই কাটাতে হয়, তবে পয়সা নিয়ে লাভটা কি? আসলে হ্যারি আর জুলি দুজনের জীবনদর্শনই এক রকম। তাই হ্যারির থেকে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাবার আশায় জুলি এই প্রশ্নটা করল।

—চালাক হতেও জানতে হয়। তিনবছর আমি জেল এড়িয়ে চলেছি, এখনও চলব।

জুলি আবার ওকে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিল, আমি না থাকলে তুমি ইতিমধ্যে জেলে ঢুকে যেতে।

—বিশ্বাস, ইচ্ছে হলে কোর। কেউ না কেউ আমার ঠিক জুটে যায়। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, তুমি আংটিগুলো না রাখলে আমি যেমন করে হোক ওগুলো পাচার করতামই। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে।

জুলি একটু বিরক্ত ও ক্ষুণ্ন হল। ও ভাবতে চাইছিল যে, নিজেকে ও রীতিমত বিপদগ্রস্ত করে হ্যারিকে জেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। খচ্ করে জিজ্ঞেস করল, যে মেয়ে তোমায় সাহায্য করে, তার সঙ্গে সবসময়েই প্রেম কর না কি তুমি? হয়ত তোমার ধারণায় এটাই পুরস্কার?

হ্যারি হেসে বলল, ভারি রগুড়ে মেয়ে তুমি। কার সঙ্গে প্রেম করছি, সে বিষয়ে আমার খুঁতখুঁতুনি আছে। টের পাবে একদিন।

জুলি এখন হ্যারিকে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে পেয়েছে, তেমনি করে অন্য কোন মেয়েও পেয়েছে, এই চিন্তাটা ওকে যন্ত্রণা দিতে থাকল।

জুলি এটা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলো না। বললো, হ্যারি...ডানা মেয়েটা কে? তোমায় ফোন করেছিল?

হ্যারির তড়িঘড়ি জবাব, আমার মা। ভারী ভাল, কি যেন কথাটা, মরা হাতি লাখ টাকা, না কি যেন? যা হোক, তোমার ওকে খুব ভাল লাগবে।

জুলি পা ঠুকে বলল, তোমার এসব ন্যাকা ঢং ছাড়ো। বলো, কে ডানা! আমি জানতে চাই।

হ্যারি জুলির মুখ লক্ষ্য করল, তারপর হাসল।

—খুঁচিও না জুলি। ডানা আমার পরিচিত একটা মেয়ে। মাথা খারাপ করার মতো কিছু নেই। তোমার অর্ধেক রূপও ওর নেই। আর আমার কাছে ওর কোন মূল্যও নেই।

—ও কেমন করে জানল, পুলিশ তোমায় খুঁজছে? জুলি প্রশ্ন করল।

—মন্ত্র জানে। নখদর্পণে ডসনকে দেখেছিল।

—ভাঁড়ামি থামাবে? আমাকে সত্যি কথা বলবে কিনা? জুলি রেগে গেল।

—দেখ, নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাও। হ্যারি হাসল, কিন্তু জুলি লক্ষ্য করল ওর চোখের দৃষ্টি অতর্কিতে কঠিন হয়ে উঠেছে।

দুজনে দুজনের চোখে চোখে চেয়ে রইল। জুলির চোখই আগে নেমে এলো। ও দেখল হ্যারিকে পীড়াপীড়ি করাই বৃথা। ও এবার চাল পালটালো।

জুলি হেসে বলল, বেশ, রহস্য করতে চাও তো কর। জুলির গলার সব কৌতূহল যেন এক মুহূর্তে নিভে গেছে। বল্লল, আরেকটু চা নেবে?

হ্যারি পেয়ালা এগিয়ে দিল। আর একটা সিগারেট ধরাল, ঘড়ি দেখে বলল, আর এক মুহূর্তে আমাকে বেরোতে হবে।

জুলি ভাবতে থাকল এই মুহূর্তে হ্যারি ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, আর হয়ত কোনদিনও দেখা হবে না।

চা ঢালতে ঢালতে জুলি জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাক তুমি হ্যারি?

—দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট। ওপরে একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে দিব্যি আরামে থাকি। একটাই বাটলার আমার আর প্রধানমন্ত্রীর কাজ করে।

উদ্বেগে, ক্রোধে জুলি অস্থির হয়ে উঠল। ও ভাবলো একে ঘাঁটিয়ে কোন লাভ নেই। হ্যারির এই ফাজলামি ফচকেমির আড়ালের ব্যক্তিত্বটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জুলিকে ওরকম নেই আঁকড়ে হলে চলবে না। যখন দুজনে দুজনকে ভালভাবে চিনবে তখন হয়ত হ্যারি ওকে বিশ্বাস করবে।

জুলি হালকা গলায় বলল, তুমি গম্ভীর হতে পারো না হ্যারি?

—গম্ভীর হতে যাবো কেন? খাও, পিও, মৌজ করো, প্রেম করো। আগামীকালই হয়ত কবরের পোকারা তোমায় কুরে কুরে খাবে। গম্ভীর হওয়ার সময় আমার নেই। স্ফূর্তি করতেই চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যায়।

—তবে আমি জানতেও পারবো না তুমি কোথায় থাকো? জুলি ভাবল মেয়েটা ওর সঙ্গে থাকে, তাই হ্যারি আমায় ঠিকানা বলছে না।

—একেক সময় তোমার বুদ্ধিতে ধার খোলে জুলি।

—বেশ, রহস্যই করো। জুলি রেগে মুখ ফেরালো।

উত্তরে হ্যারি বলল, আমার বিষয়ে যত কম জানবে ততই মঙ্গল।

কোটটা তুলে নিয়ে ও বলল, আচ্ছা, আমি চলি। কাজের কথা কি ভাবলে জুলি?

জুলি অনিচ্ছুক গলায় বলল, ঠিক আছে। ভাবলাম কাজটা করব। আমায় শুধু পরিচারিকার কাজ করতে হবে, আর কিছু নয়।

হ্যারি বলল, শুধু তাই। তবে চোখ, কান খোলা রাখতে হবে।

জুলি তখনি বুঝল একটা চুরি হবে। ওকে বাড়ির খবরাখবরের জন্যে রাখা হবে। ও এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। ওকে ইতস্ততঃ করতে দেখে হ্যারি পকেট থেকে পাঁচ পাউন্ডের নোট বার করল। বলল, আমি কথা দিয়েছিলাম আগাম কিছু দেব। নাও, পকেটে রাখো।

আর ইতস্ততঃ করল না জুলি। যে বিষয়ে ও জানে না কিছু, তা নিয়ে বিপদে পড়তে পারে না। আর নিজেকে যথেষ্ট সামলে চলতেও পারে ও। টাকা নিল ও।

—আমায় কি করতে হবে?

হ্যারি ওকে একটা কার্ড দিল। বলল, এই ঠিকানায় মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে আমার নাম করে বলবে আমি পাঠিয়েছি। তিনি সব জানেন। উনি সব তোমাকে বুঝিয়ে বলে দেবেন, কি করতে হবে। ও. কে?

—কোন ভয় নেই তো? আমার কোন বিপদ হবে না তো?

—কিসসু না। হ্যারি বলল, তোমায় শুধু পরিচারিকার কাজ করতে হবে। ব্যস। সোজা তাই না?

ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জুলি বলল, আর চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।

হ্যারি হাসল, যা বলেছো। আচ্ছা, জুলি, আবার দেখা হবে।

—আবার কবে দেখা হবে?

—শিগগীর। এখন আমার অনেক কাজ আছে। পরে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

—পুরুষ মানুষের মতোই কথা। যা চাইলে পেয়ে গেলে, ব্যস্, ঠাণ্ডা মেরে গেলে! জুলিকে কাছে টেনে নিয়ে হ্যারি চুমো খেল।

—যদি আমাকে খুব দরকার হয়, মিসেস ফ্রেঞ্চকে একটা খবর দিও। দু-একদিন বাইরে যেতে পারি, উনি জানেন কোথায় খোঁজ করলে আমায় পাবেন। ঠিক আছে?

ওর দিকে চেয়ে জুলি বলল, ঠিক তো থাকতেই হবে।

ওকে আবার জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে হ্যারি বাইরে বেরিয়ে গেল।

জানালায় দাঁড়িয়ে জুলি ভাবল, চুরির ছক কষা হচ্ছে। আমাকে ভেতরের খবর জোগাড় করে দিতে হবে। যাকগে, টাকাটা ভালো। আসল চুরির সঙ্গে তো আমার কোন যোগ নেই, তাহলে আমার বিপদ হতে পারে না।

হাতের নোট দুটোর দিকে চেয়ে ও হাসল, টাকাটা জব্বর।

মে ফেয়ার স্ট্রীটের একটা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দোকানের ওপরে জুলি মিসেস ফ্রেঞ্চের অফিস খুঁজে পেল। বইয়ের দোকানের ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে সিঁড়ি।

একটি মেয়ে পিকনিজ কুকুর কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। জুলির দিকে চাইল সে, কিন্তু কোন কৌতূহল ফুটে উঠল না তার চোখে। তারপর গাঢ় রঙ মাখা চোখ দুটো রাস্তার দিকে ফেরাল। একটি লোক প্রথমে মেয়েটিকে তারপর জুলির দিকে চেয়ে হেঁটে চলে গেল। মেয়েটি ভ্রূক্ষেপও করল না। এর মধ্যে লোকটি এখান দিয়ে দুবার হেঁটে গিয়েছে। যারা মনস্থির করতে সময় নেয়, এ হয়তো সেই ধরনের লোক। ও আবার ফিরে আসবে।

জুলি লবিতে ঢুকল। মেয়েটা নাক সিঁটকাল। আমি কোনদিন অত নিচে নামব না। জুলি স্বগতোক্তি করলো।

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দেখতে পেল বইয়ের দোকানের কাঁচের ওদিক থেকে একটা লম্বা, হাড়গিলে লোক ওকে দেখছে। মাথায় এক ঝুড়ি সাদাপাকা চুল। জুলি অস্বস্তি বোধ করল। ও বুঝল যতক্ষণ ওকে দেখা যাবে, বুড়োটা ওকে দেখে যাবে।

সিঁড়ির মাথায় একটা দরজায় লেখা,

মিসেস ফ্রেঞ্চ
ডোমেস্টিক এজেন্সি
ভেতরে অনুসন্ধান করুন।

দরজাটা ঠেলে জুলি একটা ছিমছাম, সাজানো ঘরে ঢুকল। ঘরে ফুল, ঝলমলে রোদ।

জানলার ধারে একটা চালাক-চতুর, মার্জিত মেয়ে বসে টাইপ করছে। মেয়েটির বাদাম-সোনা চুল ওপরে তুলে আঁচড়ানো। লাল বোতাম, সাদা পোষাকটি শরীরে এঁটে বসেছে। ঈর্ষায়, কৌতূহলী আগ্রহে জুলি ওকে দেখতে লাগল।

মেয়েটি ওকে দেখল। হাত তখনও টাইপ করে চলেছে। জুলিকে দেখে ও টাইপ করা থামাল, বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে চেয়ার ঠেলে কাউন্টারে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি পোষাকের দোকানের মডেলের মতো লম্বা। চলাফেরায় একটা সহজ লাবণ্য আছে। ওকে দেখে জুলির যেন নিজেকে খেলো রঙ-চটা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে জুলি মনে মনে তেরিয়া হয়ে উঠল।

—কিছু চাইছিলেন? মেয়েটি জুলিকে অতর্কিতে জিজ্ঞেস করল। ওর চাউনিতে তাচ্ছিল্য। গলাটা নিচু, কেমন যেন চেনা চেনা।

জুলি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, মিঃ হ্যারি আমাকে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

—ও আপনি বুঝি জুলি হল্যান্ড, বসুন। একটু অপেক্ষা করুন। মা এখন ব্যস্ত আছেন। বলে ও টাইপ করতে চলে গেল।

জুলি একটু আহত হলো মেয়েটির ব্যবহারে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হলো। শুধু টাইপের খুটখাট শব্দ আর লাইন শেষের টুং আওয়াজ। মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগল জুলি, আর ভাবতে লাগল, এরা নিশ্চয় ভাল পয়সা দেয়। ফ্রকটার কাটছাঁট সুন্দর, নাইলনের মোজাও পরেছে দেখছি। ওরকম একটা জামা আমার যদি থাকত। আমাকে ওর চেয়ে অনেক ভাল দেখতে।

হঠাৎ মেয়েটি এক তোড়া কাগজ নিয়ে অফিসে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এসে বলল, যান ভেতরে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ একটা বড় টেবিলে জানলার ধারে বসেছিলেন। পরনে মিশমিশে কালো পোষাক। দেখে জুলি মনে ধাক্কা খেল। কেন যেন ওর মনে হল কোন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধবাসরে এসেছে। মহিলার কানে ঝোলা জেট পাথরের দুল। মেয়ের রূপলাবণ্যের কিছুই নেই ওর মধ্যে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আঁটসাঁটো ঠোঁটে আর চিবুকে দুজনের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট।

মনে হল জুলির বিষয়ে ইনি সব কিছু জানেন, আচমকা কাজের কথা পেড়ে বসলেন।

—গ্লেব আমায় তোমার কথা বলেছে। যদি মাথা খাটিয়ে চল, দেখবে কাজটা সহজ। দেখে তো হাবা মনে হচ্ছে না।

জুলি এখনও দাঁড়িয়ে দেখে উনি অধৈর্য হয়ে বললেন, বস, বস। হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখালেন। গলাটা ভারি রুক্ষ।

—আজ বিকেলে তুমি ৯৭, পার্কওয়েতে যাবে। অ্যালবার্ট হল কোথায় জান? পার্কওয়ে তার পাশেই। ভুল তোমার হবে না। বাড়িটা যেমন কুচ্ছিত তেমনি বড়। মিসেস হাওয়ার্ড ওয়েসলি তোমার খাস মনিব। তুমি তাঁর চাকরানী হবে। তোমায় ওঁর জিনিষপত্র সামলাতে হবে, পোশাক পরা হয়ে গেলে গুছিয়ে রাখতে হবে, কেউ এলে দরজা খুলতে হবে, ককটেল দেবে, ফুল সাজাবে, টেলিফোন ধরবে। কাজের কথা ধরলে কাজটা সোজা। ও বাড়িতে আরো বাঁধা লোকজন অন্য সব কাজকর্ম করে। খাবার আসে রেস্টুরেন্ট থেকে। মিসেস ওয়েসলি তোমায় থাকা খাওয়ার পর হপ্তায় তিন পাউন্ড দেবেন। প্রতি শনিবার বিকেলে এখানে এসে তোমার বাড়তি টাকা নিয়ে যাবে। বুঝলে তো?

—হ্যাঁ।

মিসেস ফ্রেঞ্চের ভেতর যেন কি একটা আছে, ওর অস্বস্তি হতে লাগল। গাঢ় অন্ধকারে কোন অস্বাভাবিক শব্দ শুনলে যেমন মনে হয় এখনি ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, ঠিক তেমনি ভয়মেশানো অস্বস্তি।

—তোমার ইউনিফর্ম ওখানে ওই মোড়কে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কথা বলতে বলতে কানের চুলে হাত দিলেন। যেন কোন গোপন রহস্য টের পেলেন। মুখ হাসিতে ভরে গেল, যদি ফিট না করে, বদলে নিও। মনে হয় ঠিকই হবে। দোহাই ওখানে ময়লা জামা পরো না, মিসেস ওয়েসলি বেজায় রেগে যাবেন। এই যে তোমার প্রশংসাপত্র। দুটো খাম উনি দিলেন, পড়ে দেখ। মিসেস ওয়েসলি বিশেষ খুঁটিনাটি দেখবেন না, তবে বলা যায় না। একজন ডাক্তার, একজন ধর্মযাজকের প্রশংসাপত্র। এগুলো জোগাড় করতে আমাকে অনেক খরচও করতে হয়েছে। হারিও না যেন।

—ধন্যবাদ। জুলি ঘাবড়ে গিয়ে খামদুটো ব্যাগে ভরল। মিসেস ফ্রেঞ্চ বলে চললেন, এখন বুঝলে তোমায় কি করতে হবে? ওয়েসলিদের কথা তোমায় একটু বলে দিই। তুমি নিজেই টের পেয়ে যাবে, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। এরোপ্লেন ডিজাইনার ফার্ম ওয়েসলি বেনটনের সিনিয়ার পার্টনার হাওয়ার্ড ওয়েসলি। কারখানাটা নর্টহোল্ট বিমান ঘাঁটির কাছে। ওয়েসলি সেখানে রোজ যান। ওঁর কথা তুমি পড়ে থাকতে পার। উনি অন্ধ। জ্বলন্ত বয়ার প্লেন চালিয়ে ফেরত আনার

জন্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলেন। প্লেনের কর্মীদের বাঁচিয়েছিলেন নাকি যেন, সব আমার ঠিক মনে নেই। যাইহোক, উনি অগাধ ধনী, অন্ধও বটে।

একটা পেন্সিল নিয়ে মহিলা ব্লটিং-এ দাগ কাটলেন, বললেন, মিসেস ওয়েসলি বিয়ের আগে মিউজিক্যাল কমেডির অভিনেত্রী ব্লানশ ট্যারেল ছিলেন। তুমি হয়ত ওঁকে দেখে থাকবে। উটের মতো মদ গেলেন ঐ মহিলা। সেই কারণে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিলেন। ওয়েসলি চিরদিন ওঁকে নিয়ে পাগল। উনি নিজেকে ছাড়া কারো জন্যে ভাবেন না। শুনেছি ওয়েসলির টাকার জন্যে ওঁকে বিয়ে করেছেন, এরপর থেকে নরক যন্ত্রণা দেন। ভয়ঙ্কর মেজাজ ওঁর, বেজায় ছোট মন, আর চরিত্র, রাস্তার বেড়ালের মতো সচ্চরিত্র।

একটু ভেবে বললেন, পয়লা নম্বর কুত্তী একটা।

জুলি হতভম্ব হয়ে বলল, আচ্ছা!

মিসেস ফ্রেঞ্চ আবার বলতে লাগলেন, তোমার ওঁকে নিয়ে ঝামেলা হবে। তোমার কাজ বেশ সোজা হবে। মিসেস ওয়েসলিকে বাগানো সোজা হবে না। আর সেজন্য তোমায় এত টাকা দিচ্ছি। টাকাটা কষ্ট করে রোজগার করতে হবে, ভেবনা কাজটা খুব আরামের।

জুলির দিকে খুশি-খুশি চোখে চাইলেন, আমি যদ্দূর জানি উনি তিন হপ্তার বেশী একদিনও চাকরানী রাখতে পারেননি। কিন্তু তোমার কাজই হলো যতক্ষণ না আমি তোমায় ছাড়তে বলছি, ততক্ষণ টিকে থাকা। আমরা তৈরী হবার আগে ভাগে ছেড়ে দিলে সেই পঞ্চাশ পাউন্ড আর পাচ্ছো না। বুঝলে?

জুলি ধারালো গলায় বলল, কিসের জন্যে তৈরী হলে?

আমরা যখন জানাতে চাইব তখন তুমি জানবে। এখন তোমার কাজ হল পার্কওয়েতে গিয়ে ঢোকা আর গেড়ে বসা। আমরা যে টাকা দিচ্ছি, তাতে তুমি খুশী? খুশী না?

—হ্যাঁ। টাকা ঠিকই আছে।

—তবে খুশী থাক। প্রশ্ন কোরনা।

দেরাজ খুলে মহিলা বললেন, এখন এস। মুখ থেকে ওই রং মুছে ফেল। মনে রেখো, এখন তুমি চাকরাণী, সিনেমার অভিনেত্রী নও।

—হ্যাঁ। জুলির ঘেন্না হল মহিলার ওপর। টাকাগুলো ও ব্যাগে পুরল।

—মেজাজ সামলে চলো। মিসেস ওয়েসলি যখন কড়কাতে থাকবেন, তখন মেজাজ ঠিক রেখো। খুব হুঁশিয়ার হলেও সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে তখন।

—বুঝলাম।

—বেশ। তাহলে এখন কেটে পড়ো। বেরোবার সময় ডানাকে বোল, আমি ওকে ডাকছি।

জুলি ইউনিফরমটা নিচ্ছিল। মহিলার মুখে 'ডানা' নামটা শুনে হাত থেকে মোড়কটা পড়ে গেল প্রায়। তাহলে এই মেয়েটাই ডানা। হ্যারির কথা ওর মনে পড়ল, ও বলেছিল, ডানা তোমার মতো রূপসী নয়, ওর কথা ভাবার দরকার নেই। রূপসী নয়? কেমন করে হ্যারি ওকে মিথ্যেটা বলল? সবই তো আছে, ঠাঁট, রূপ, ভাল পোশাক। খুব রাগ হলো জুলির। মনটা ভেঙে গেল। হ্যারি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, মেয়েটির কোন মূল্য নেই ওর কাছে। ওরকম মেয়ে—

মিসেস ফ্রেঞ্চ হাঁক ছাড়লেন, দেরি করছ কেন? তুমি তো জান এখন কি করতে হবে, না কি জান না?

—হ্যাঁ। জুলি অফিসের বাইরে গেল।

জুলির দিকে পেছন ফিরে ডানা টেলিফোন করছিল, হ্যাঁ, এখন অফিসে আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জুলিকে দেখে কথা থামাল।

—মিসেস ফ্রেঞ্চ আপনাকে ডাকছেন। জুলি বুঝল ওর নিজের গলা কাঁপছে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ও কান পাতল।

কাঁচের শার্সির ওপাশ থেকে ডানার স্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে।

—এই মুহূর্তে বিদায় হলো। একটু বেশ্যা টাইপের, তবে যদি কাজ হাসিল করে...কি বললে? না তা আমি ঠিক জানি না। হ্যাঁ টাকা ওরা সবাই চায়। ওই কথাই তো ভাবে ওরা। ঠিক আছে

আজ রাতে কথা বলা যাবে।

কার সঙ্গে ডানা কথা বলছে, জুলি ভাবল। ওর মুখ গরম হয়ে উঠেছে। না হ্যারি নয়। ও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, ওকে বেশ্যা টাইপের মেয়ে বললে হ্যারি তা বরদাস্ত করবে। অফিসে ঢুকে ডানাকে একখানা চড় কষাতে ইচ্ছে হলো ওর। তারপর হঠাৎ যেন ওর মনে হলো ওর ওপর কেউ নজর রাখছে। ও পেছন ফিরল। ভেতরের অফিস থেকে বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ফ্রেঞ্চ। সিঁড়ির মুখের জানলার রোদ ওঁর কানের দুলে পড়ে ঝক্‌মক্ করছে। মিসেস ফ্রেঞ্চ নড়লেন না, কথাও বললেন না। ভয়ঙ্কর ভয় দেখানো হলো ওকে। 'চেম্বার অফ হররস'—এখানে যে সব মোমের মূর্তি থাকে, তাদের মতো পৈশাচিক। জুলি রাগটাগ ভুলে, থতমত খেয়ে সিঁড়ির দিকে পিছিয়ে গেল।

রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমি শুনছিলাম না কিছুই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ একদৃষ্টে পাথর-পাথর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জুলি ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল। সিঁড়ির মোড়ে গিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল, আরেকটু হলেই। যে লোকটাকে জুলি পথে দেখেছিল, সে মেয়েটির পেছনে উঠছে! লোকটা জুলির দিকে চাইল না। ওর চোখ সিঁড়ির ওপর দিকে। মুখটা টক্‌টকে লাল।

নিচে, বইয়ের দোকানের দরজার কাঁচের ওপর থেকে সেই রোগা, সুঁটকো লোকটা ওর দিকে চেয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে মে ফেয়ার স্ট্রীটের গরম, ব্যস্ততা, হুড়োহুড়িতে যতক্ষণ না জুলি পৌঁছল, ততক্ষণ লোকটা ওর দিকে চেয়েই রইল।

ঝিনুকের বুকের মতো গোলাপী রঙের রাতকামিজের ওপর সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে ৯৭ পার্কওয়ের সদর-দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে খেঁকিয়ে উঠল এক মহিলা, কি চাও? জ্বালাবার আর সময় পাওনি? কেউ বলে দেয়নি আমার চাকরানী নেই? মহিলার ভুরু চুল সব সোনালী সাদা। পুতুলের মতো মিষ্টি ফুটফুটে মুখটা ঘুমের আবেশে ফোলাফোলা। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন।

জুলি হতচকিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আপনাকে যদি বিরক্ত করে থাকি, আমি দুঃখিত।

মহিলা তার রাগ চাপবার কোন চেষ্টাই করল না। জুলি বলল, আমাকে মিসেস ফ্রেঞ্চ পাঠিয়েছেন, ভেবেছিলাম আমার আসার কথা আপনি জানেন।

ব্লানশ ওয়েসলি বলল, তবে ভেতরে এস না ছাই। বহুদিন কোন কাজের লোক নেই আমার। তাদের থেকে যা ব্যবহার পাই। সত্যিই!

হলের লাউঞ্জে ঢুকল মহিলা। জুলি সদর দরজা বন্ধ করে পেছন পেছন এলো।

ব্লানশ তার ধারালো আঙুলগুলো সোনালী, কোঁকড়া চুলের ভেতর চালাতে চালাতে বলল, একটু কফি না খেলে আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। এসে যখন পড়েছো খুঁজে বের করে কফি বানাও। এই যে রান্নাঘর। দয়া করে একগাদা প্রশ্ন কোর না। আমার মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আগে আমায় কফি দাও। এই প্যাসেজ পেরিয়ে শেষের ঘরটায় আমি আছি।

জুলির দিকে মহিলা এতক্ষণে ভালভাবে চেয়ে দেখল, বলল, আরে তুমি তো দেখছি বেশ ফুটফুটে। এতদিন কুচ্ছিত মুখগুলো দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেছে। এই কাজের লোকগুলো যে কেন এত বিতিকিচ্ছিরি হয় আমি ভেবে পাইনা। কিন্তু যাও। দাঁড়িয়ে আছো কেন? কফি বানাতে পারো, না কি তাও পারো না?

—হ্যাঁ। জুলি এক টুকরো হাসলো।

ব্লানশ চোখ কুঁচকে বন্ধ করলো।

—তা ভাল, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দয়া করে হেসো না। আমার নার্ভে সইবে না। পায়ের সাটিনের চটি জোড়ার দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি চাই আমার সঙ্গে যখন কথা বলবে ম্যাডাম বললে ভাল হয়। তাতে অসুবিধা হবে না আশা করি।

—না ম্যাডাম। জুলির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। মুখটা লাল হয়ে গেল।

—চটে গেলে? পেনসিলে আঁকা ভুরু জোড়া কপালে তুলে বলল, তোমাকে চটাবার মতো

কি বলেছি? লাল বিটের মতো লাল হয়ে গেলে। আমার মনে হয় ওতে ভারী বিশ্রী দেখায়।

—না ম্যাডাম। পেছনে হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে গেল জুলির।

ব্লানশ আত্মতৃপ্তভাবে বলল, হয়তো চটিয়ে দিতেই পারি, এখন অথবা পরে। মিঃ ওয়েসলি বলেন আমি চাকরদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানিনা। হয়ত তা সত্যি। কিন্তু আমার মনে হয় যদি কেউ ভালো মাইনে দিতে পারে, তবে তার যা খুশী বলার অধিকার আছে।

জুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনভোলানো ছোট্ট পুতুলের মতো মুখখানা, চুলের রাশি ঘিরে আছে মুখটার চারপাশে, সবশুদ্ধ ওকে বিমোহিত করে ফেলেছে।

ব্লানশ ভুরু কুঁচকে বলল, আমায় চোখ দিয়ে অমন করে গিলো না। আমায় দেখে লোক চেয়ে থাকে, তাতে অবশ্য আমি অভ্যস্ত। কিন্তু ওরকম বাড়াবাড়ি করলে আমার মেজাজ বেজায় খারাপ হয়ে যায়।

—দুঃখিত ম্যাডাম। জুলি বলল বটে। কিন্তু এই মহিলার এমনই একটা অমানুষী, বর্বর আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে বেশীক্ষণ চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় না।

ব্লানশ আঙুল দিয়ে রগ টিপে ধরল আর বলল, আজ সকাল থেকে আমার শরীরটা অসুস্থ লাগছে। আমি যদি মরেও যাই, তাতে কার কি এসে যায়। তারপরই হঠাৎ ভীষণ রাগে ব্লানশ চিৎকার করে উঠল, ঈশ্বরের দোহাই তুমি কি কফিটা আনবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে গিলবে? আমি কি একটা বেবুন আর আমার পাছা দুটো নীল, যে এমনভাবে দেখছো?

জুলি ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, দুঃখিত ম্যাডাম, আমি এখনি আনছি।

রান্নাঘরে গিয়ে ও তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। মনে মনে ভাবল, আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহিলা যে এমন আমি ধারণাও করতে পারিনি। বাব্বাঃ কাজটা টিকিয়ে রাখতে গেলে খুব সাবধানে, সামলে চলতে হবে।

জল ফোটার সময়ের মধ্যে জুলি তাড়াতাড়ি ফ্রক খুলে, মোড়ক থেকে ইউনিফর্ম বের করে পরল। ভাবল, ইউনিফর্ম পরা দেখলে মহিলা হয়তো খুশী হতে পারেন। আমি যে আমার অবস্থা জানি, তা অন্ততঃ বুঝবেন। জুলি হাসল।

জুলি ট্রে নিয়ে যখন ব্লানশের ঘরে ঢুকল, তখন ঘর চোখ ধাঁধানো আলোয় জ্বলছে। ঘরে বাসি এসেন্স আর ব্রান্ডির গন্ধ। ঘরের বাতাসটা বদ্ধ, ভারি। বিকেল তিনটে বেজে গেলেও একটি পর্দা বা জানলা খোলা হয়নি।

ঘরে অতুল বিলাসোপকরণ, অসম্ভব বিশৃঙ্খলা। তারই মধ্যে পায়চারি করছিল ব্লানশ। হালকা নীল লেপের সেলাই দেওয়া পুরু আস্তরণে দেওয়ালগুলো ঢাকা। নীল-সাদা চামড়ার গদী ঘরের সাদা পুরু কার্পেটের ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো। ইজি চেয়ার ও লেপমোড়া ডিভান। কারুকার্যকরা ড্রেসিংটেবিলের ওপর পাউডার, পেইন্টের টিউব থেকে পেইন্ট, অনেক শিশি উলটে পড়ে আছে। মেঝেতে, বিছানায়, চেয়ারে পোষাক ছড়ানো। ঘরের চেয়ারে জুতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা।

—কি সময়টাই না নিলে, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ব্লানশ। বলল, এখানে কাজ করতে চাও তো আরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। বুঝলে?

জুলির দিকে পিট্‌পিট্‌ করে চেয়ে দেখে বলল, একি পোষাক বদল করা হয়েছে দেখছি। বা তোমায় ভালই দেখাচ্ছে। কি সুন্দর ইউনিফর্ম। বিছানার পাশে একটা টেবিল দেখিয়ে বলল, ওখানে ট্রেটা রেখে চলে যাও। হয়তো বাথরুমটা পরিষ্কার করতে পারো। তারপর আমরা কথা বলব। ওই যে বাথরুম। কয়েক মিনিট বাদে কথা কইব।

বাথরুমটা দেখে জুলির হিংসে হল। আলাদা ঘরে শাওয়ার, মেঝেতে নিচু বাথটাব, ড্রেসিংটেবিল, মুখ ম্যাসাজের মেশিন, গিজার, চুল শুকোবার যন্ত্র। একটি অলস, আহ্লাদে মেয়ের সমস্ত চাহিদার সম্ভার সাজানো। শোবার ঘরের মত সবই আছে, কিন্তু এখানেও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। বাথটাব খালি করা হয়নি। দুধের মতো তোয়ালে জলে ভাসছে। মেঝেতে ছড়ানো ছিটোনো বাথসল্টগুলো জুলির জুতোর চাপে ভাঙতে লাগল। জুলি মুখ মোছবার টিস্যু কাগজ, ক্রীমমাখা হাত-তোয়ালে তুলতে লাগল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাথরুমটা পরিষ্কার করে ফেলল। টবটা খালি করল, তোয়ালেটা নিংড়ে

মেঝে মুছে ফেলল।

ও যখন শোবার ঘরে এলো, ব্লানশ তখনো পায়চারি করেই চলেছে। ড্রেসিং টেবিলের পেছন থেকে উঁকি মারছে অর্ধেক ব্র্যান্ডি বোঝাই পাত্র।

—এই তো তুমি এসে গেছো, ব্লানশ হাসল। এখন ওকে আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এবং আরো খুশী খুশী।

—তোমার নামটা কি জিজ্ঞেস করিনি, করেছি কি? করিনি বোধহয়।

—জুলি হল্যান্ড, ম্যাডাম।

ব্লানশ একটা ইজিচেয়ারে বসল, এক লহমা চোখ বুজল, তারপর মুখ তুলে জুলিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল।

—তুমি কি বললে মিসেস ফ্রেঞ্চ তোমায় পাঠিয়েছেন। আমার আজকাল কিছুই মনে থাকছে না।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

—ঠিক আছে। মনে হয় তোমায় দিয়ে কাজ চলবে। তোমার প্রশংসাপত্রটা আছে কি?

জুলি দুটো খাম বের করে ওনার হাতে দিল।

ব্লানশ খামগুলো খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়ে বলল, মেয়েছেলেটা এত পাকা কাজ করে। প্রশংসাপত্রগুলোয় চোখ বুলিয়ে ছুঁড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, তোমায় মাইনের কথা বলেছে বোধহয়?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

—ঠিক আছে। ধরে নাও আজ থেকে তুমি বহাল হলে। একটু ঝুঁকে আয়নায় মুখ দেখে বলল, দেখা যাক, কেমন মানিয়ে চলতে পার। কফিটা তো ভালই বানিয়েছো। তুমি বাড়িটা পরিষ্কার রাখবে আর আমি যখন বলব তখন কাজ করবে, এইটুকুই মাত্র চাই। এই প্যাসেজের ওদিকে তোমার ঘর। ঘরটা ভাল। লোকজনকে আরামে রাখায় বিশ্বাসী আমি। তুমি এখনি কাজ শুরু করতে পারো।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম.

ব্লানশ চিরুনী তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

—আজ রাতে আমি বাইরে থাকব। তুমি এখনি চলে এসো এখানে। ফ্ল্যাটটা খালি রাখতে চাই না আমি। তোমার কি মনে হয় এখনি আসতে পারবে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। এই ঝক্‌ঝকে পুতুলটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ক্লান্তি বোধ করছিল জুলি।

—রাতে একা থাকতে আপত্তি নেই?

জুলি অবাক হল, না ম্যাডাম, মোটেই না।

ব্লানশ অলস ভঙ্গীতে বলল, কি সাহস তোমার। আমার একা থাকতে বিরক্ত লাগে। মিঃ ওয়েসলি গত পনেরো দিন যাবৎ প্যারিসে, আমার ভয় করে। কে জানে কখন কে ঢুকে পড়বে। আজকাল রাতে এতসব অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর চুরিও বেড়ে গেছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এ বাড়িতে ভূত আছে। তোমার ভূতের ভয় নেই?

জুলি জোর দিয়ে বলল, না, ম্যাডাম।

—কল্পনাটল্পনা না থাকা নিশ্চয় ভাল। ব্লানশ ওর চুলের কোঁকড়াগুচ্ছে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমি এত অনুভূতি কাতর, এমন ভিতু! একেকবার আমার মনে হয়, সত্যি যেন কেউ প্যাসেজ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে। সে বোধহয় আমার নার্ভের জন্য।

কিংবা মদের ঝোঁকে বুঁদ হয়ে থাক বলে, জুলি মনে মনে ভাবল, হাসতে ইচ্ছে করল ওর। মুখে বলল, স্নানের জল ভরব ম্যাডাম?

—ভর। একটা ব্যাগ গোছাতে হবে। কাল সন্ধ্যের আগে আমি ফিরছি না। মিঃ ওয়েসলিও সেই সময় নাগাদ ফিরবেন। আমার অনেক কাজ থাকে। বহুদিন কোন লোক নেই। আমার সব অগোছালো হয়ে আছে। সব ঠিক করে গোছাতে হবে। লক্ষ্মীমেয়ে, ঐ কাবার্ডটা খোল। ওইটে। দেখ, আমার প্রতিটি পোশাকের আলাদা নম্বর আছে। ঐ যে হ্যাঙারে ঝুলছে।

ঘরে তিনটে বিশাল বিশাল কাবার্ড। তাতে ঠেলে বন্ধ করার দরজা। জুলি সেটা খুলে দেখল, সারি সারি পোষাক ঝুলছে, ফ্রক আর ইভনিং গাউন।

—প্রত্যেকটা পোষাকের সঙ্গে ম্যাচিং-করা টুপি, নিচের পোষাক, দস্তানা, ব্যাগ আর জুতো আছে। ব্লানশ ক্লান্ত, ক্ষীণ গলায় বলল, নিয়মটা আমিই বের করেছি। প্রত্যেকটা জিনিষের নম্বর আছে। নম্বরী জিনিষগুলো মিলিয়ে একসঙ্গে রাখাই তোমার কাজ। পারবে বলে মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—ওখানে একটা আলমারী আছে। দেওয়ালের ভেতর গাঁথা, দেখতে পাবে না। ওটা আমি নিজে দেখেশুনে রাখি। ওতে আমি ফারের জিনিষ আর গয়না রাখি। এখন তুমি তাড়াতাড়ি স্নানের জল দাও। আমাকে পাঁচটা কুড়ির ট্রেন ধরতে হবে। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ব্লানশ যখন স্নানের ঘরে গেল, জুলি তখন শোবার ঘরটা খুব ভাল করে পরিষ্কার করল। সন্ধ্যেবেলা এত তাড়াতাড়ি ছুটি পাবে ও ভাবেনি, তাই ভাবল সন্ধেবেলাটা কিভাবে কাটাবে। যদি ও হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, তাহলে দুজনে একটা সিনেমায় যেতে পারত। কিন্তু যোগাযোগের তো কোন উপায় নেই। তবে হ্যারি বলেছিল মিসেস ফ্রেঞ্চ ওর কাছে খবর পৌঁছে দেবেন। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

ব্লানশকে রওনা করা একটা প্রাণান্তকর অবস্থা। মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। দুবার সুটকেশ খুলতে হল, কেন না, ব্লানশ কি নিয়ে যাবে আর কি নিয়ে যাবে না, স্থির করতে পারছিল না।

তারপর যখন সব ঠিকঠাক গোছগাছ হল, জুলি ট্যাক্সির জন্যে ফোন করতে যাবে, তখন ব্লানশ খুঁতখুঁত করতে লাগল আর ঠিক করল যাবে না।

ইজিচেয়ারে ধপ্ করে এলিয়ে পড়ল ও। পোষাক পরে, মুখে রঙ মেখে ওকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। রংচঙে আকর্ষণীয় একটা পুতুল যেন। বসে পড়ে বলল, সত্যি মনে হচ্ছে আমি এত ঝামেলা করতে পারবো না। আমি যে ওদের তেমন পছন্দ করি তাও নয়। ওরা এত খারাপ যে বলার কথা নয়। তাছাড়া আমার শরীরও ভাল লাগছে না। আমি যাব না...ব্যস। সব ভাঁজ নষ্ট হবার আগেই সুটকেশ খুলে তুলে দাও আলমারীতে।

তারপর হঠাৎ যেন যন্ত্রণা হচ্ছে এমনি গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, বেচারা জুলি! আমাকে তো যেতেই হবে। আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম বাকী ওখানে থাকবে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমাকে। শিগগীর সব ভর, নাহলে আমি ট্রেন ধরতে পারবো না। তোমায় এত খাটাচ্ছি বলে আমি যে কি দুঃখিত তা কি বলব।

জুলির তখন চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়। সমস্ত জিনিষ দুমদাম সুটকেশে ভরতে লাগল। ও যেই ডালা বন্ধ করতে যাবে, অমনি ব্লানশ বলল, না জুলি এখনি বন্ধ কোর না। কি যেন...ঐ আমি ঐ গোলাপ-বেগুনী জামাটা নেব না। নিচের দিকে আছে, ওটা পড়লে আমাকে মড়ার মতো দেখায়।

জুলির তখন রাগে ব্লানশের গলা টিপে মারতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁচকা টানে জামাটা বের করতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ওকে রেগে যেতে দেখে ব্লানশ একটা পালটা চাল চাললো।

খুব আলতো করে বলল, তুমি কি গাউনটা নিতে চাও জুলি? আমার ওটা ভাল লাগে না। জিনিষটা অব্যবহারে নষ্ট হবে কেন?

জুলি মেঝেতে বসে পড়ল, ওর সব রাগ গলে জল হয়ে গেল।

—কি বললেন ম্যাডাম? গাউনটা ও আঙুল বুলিয়ে আদর করল।

—জামাটা সুন্দর, তাই না? হার্টনেলের তৈরী। রংটা আমার ভালো লাগে না। ভেবেই পাই না, কেন ওটা কিনেছিলাম। তুমি চাও ওটা?

—আমি? জুলির চোখে খুশীর ঝিলিক, হ্যাঁ, নিশ্চয়। ধন্যবাদ ম্যাডাম।

ব্লানশ তখন নিষ্ঠুর, একঝলক হাসি হাসল, যা দেখে জুলির আশা দপ্ করে নিভে গেল। আর তখনি ব্লানশ বলল, আমি ভেবে দেখবখ'ন। আমি এটা দিতে পারব না। ঐ দেড়শো গিনি না কত যেন দাম লেগেছিল ওটার। বিশ পাউন্ড দিলে আমি তোমায় ওটা দিয়ে দিতে পারি।

আশাভঙ্গে জুলি চেয়ারের পিঠে পোষাকটা রেখে নিচু হয়ে সুটকেস গোছাতে লাগল।

ব্লানশ কায়দা করে বলল, তোমার নিশ্চয়ই একটা পোষাকের পেছনে বিশ পাউন্ড খরচ করার ক্ষমতা নেই?

—না ম্যাডাম। জুলি মুখ ফিরিয়ে নিল।

—যাক্‌গে কিছু ভেবনা। দুঃখের কথা এই যে, তোমার অবস্থার একটি মেয়ে পোষাকটা পরলে নেহাত বেমানান হতো। সবাই তোমায় দেখে হাসত। তার চেয়ে আমি টাইম্স কাগজে বিজ্ঞাপন দেব, দিতে পারি না?

জুলি চট্ করে একবার ব্লানশের মুখের দিকে চেয়ে, ওর বিকৃত উল্লাস দেখে বুঝল যে, ব্লানশ ইচ্ছে করে ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে মজা পাচ্ছিল।

মনে মনে জুলি বলল, ঠিক আছে, নোংরা বিল্লী কোথাকার, তামাশা কর। তবে তোমার ফাঁদে আমি ধরা দিচ্ছি না।

ব্লানশ চলে যাবার পর জুলি ভাবল, ও যদি আমার মাথা খারাপ করে দেবার চেষ্টায় থাকে তবে সে গুড়ে বালি। সামনে চব্বিশ ঘণ্টা ও থাকছে না। হ্যারি ওর কি ক্ষতি করবে করুক, আমি তোয়াক্কাও করি না। হ্যারিকে সাহায্য করতে যদি ওর নাকটা খুবলে নিতে হয় নেব।

জুলির মনে হল, এখন দু-ঘণ্টা মতো ফ্ল্যাটটার পেছনে খাটলে তবে পরিষ্কার করে উঠতে পারবে। হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হলে সাতটায় ওরা দেখা করতে পারে।

জুলির মিসেস ফ্রেঞ্চের ওখানে ফোন করার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও নেই। তাই একটু ইতস্ততঃ করে ও ফোন করল।

ডানা ফোন ধরল।

ডানার গম্ভীর গলা শুনে জুলি আড়ষ্ট হয়ে বলল, জুলি হল্যান্ড কথা বলছি। আমি মিঃ গ্লেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাঁর নম্বরটা পেতে পারি কি?

—ধরুন। ডানা বলল।

খট্ করে টেবিলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ডানা। জুলি শুনতে পেল, সেই হল্যান্ড মেয়েটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হ্যারির কথা শুনে জুলি অবাক হয়ে গেল।

—কি হয়েছে? হ্যারির গলায় ধার।

—কিছু না, সব ঠিক আছে। সন্ধ্যেটা একদম ফাঁকা। মিসেস ওয়েসলি বাড়িতে নেই। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। সাতটা নাগাদ দেখা করতে পারি?

হ্যারি যেন বিরক্তস্বরে বলল, দুঃখিত, আমি এখন খুব ব্যস্ত।

—কিন্তু হ্যারি, তবুও আমরা দেখা করতে পারি নিশ্চয়। জানি না আবার কবে ছুটি মিলবে। এখন আমি একেবারে একা। কিছু করার নেই আমার।

—বিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ধরব। আমি দুঃখিত, আমার কিছু করার নেই। যখন ফিরব তখন পারলে দেখা করব। এক মিনিটও সময় নেই। চলি। হ্যারি ফোন রেখে দিল।

জুলির রাগ হয়ে গেল। ভাবল, গোল্লায় যাক্ সব! উচ্ছন্নে যাক! খুব বিপদে পড়া গেল। কারোর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, বেরোনো যাবে না। সন্ধ্যেটা ফাঁকা, কি দুর্ভাগ্য! এত সহজে হ্যারিকে পেলাম, আর ও আমার সঙ্গে আর একটু ভালভাবে কথাও বলল না। হাজার হলেও আমরা প্রেম করছি।

তারপর ও ভাবল, হয়তো ডানা শুনছিল বলে হ্যারির কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই ঐভাবে কথা বলেছে।

খানিকক্ষণ পর, নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে ও নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার দুঃখ ভুলে গেল। নিজের ঘর দেখে তো ও ভীষণ খুশী। এ ফ্ল্যাটের অন্যান্য ঘরের মত এ ঘরেও সুসজ্জিত আসবাব, টেলিফোন, বিছানার পাশে ট্রানজিস্টার আর সঙ্গে পরিচ্ছন্ন একটা বাথরুম রয়েছে।

এর মধ্যে জুলি ফুলহ্যাম প্যালেস রোডে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে বাক্স গুছিয়ে নিয়ে এসেছে নতুন আস্তানায়। এই নতুন জীবনে, বিশালবাহুল পরিবেশে ওর নিজেকে আর উপেক্ষিত মনে হল না।

এই সুন্দর ঘর, গরম জলে স্নান, রেডিও, ফোন, হ্যারিকে দেখতে না পাওয়ার, সঙ্গ না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিলো। আর এই আরামপ্রদ বিছানায় সব ক্লান্তির অবসান।

সাড়ে এগারোটায় রেডিও বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে যাবে, এমন সময় ও শুনতে পেল এই ফ্ল্যাটের কোথায় যেন একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। আওয়াজ শুনে ওর হাত থেমে গেল। অস্বস্তি নিয়ে, কানপেতে ও অপেক্ষা করতে লাগল। ছোট্ট নিস্তব্ধ ঘরটাতে অপেক্ষা করতে করতে ওর মনে পড়ল মিসেস ব্লানশের কথা, 'আমার একা থাকতে ভয় করে, আমি জানি এখানে ভূত আছে। রাতে এমন সব শব্দ হয়—'

জুলি ভাবল, ঐ কথাগুলো হয়ত ও আমায় ভয় দেখাতে বলেছিল। আবার আলো নেভাতে যাবে দেখল পর্দাগুলো ফুলে ফুলে উঠে থেমে গেল। নিজেকে ভরসা দিল, ও কিছু নয়, বোধহয় বাতাসে...। কিন্তু ও সতর্ক হয়ে শুনতেই লাগল।

ফ্ল্যাটটায় কোন আওয়াজ ঢোকে না এমনভাবেই তৈরী। এখন ঘড়ির আওয়াজ আর বুকের দ্রুততালে ধক্‌ধক্‌ ছাড়া আর কোন শব্দই নেই।

অধীর হয়ে ও আলো নেভাল। ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই ও ভাবতে লাগল, ফ্ল্যাটে কি কেউ ঢুকেছে? পর্দা সত্যিই কি বাতাস লেগেই ফুলে উঠছিল?

নাঃ...। এ একেবারেই যাচ্ছেতাই! আমি যদি ভয় না পাই, তবে এ ফ্ল্যাটে এমন কিছুই নেই আমায় ভয় দেখাতে পারে। জুলি ভাবল।

ঠিক তখন ও স্পষ্ট শুনতে পেল, একটা নরম, মৃদু মৃদু পা ফেলার আওয়াজ ওর ঘরের দিকে আসছে। ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ তো ভুল হবার কিছু নেই।

বিছানার পাশের বাতিটা জ্বালতে গিয়ে বাতিটা মেঝেয় উলটে পড়ে গেল। কার্পেটের ওপর আলোটা পড়ে যেতেই ও বিছানা থেকে ঝুলে, হন্তদন্ত হয়ে ওটা খুঁজতে লাগল। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা উঠছে আর নামছে। তারপর ও টের পেল অন্ধকারে দরজার হাতলটা ঘুরে যাচ্ছে, তখনি ওর খেয়াল পড়ল দরজায় তালা বন্ধ করা হয়নি।

দরজা খুলে যেতেই প্যাসেজের আলোর রেখা ঘরে এসে ঢুকল। জুলি বিছানার ওপর গুঁড়ি মেরে পিছিয়ে গিয়ে, ঘাড় গুঁজে ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে রইল। মেঝের ওপরে সরু আলোতে ভয় দেখানো ছায়া। দরজাটা খুলছে না আর। প্যাসেজে কার নিঃশ্বাসের নরম আওয়াজ।

এত ভয় পেয়ে গেল জুলি যে ওর মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরোল না। ভয়ে 'থ' মেরে গেল।

সাদা অস্পষ্ট কি যেন একটা দরজার ওপারে এগিয়ে এলো। জুলির ভেতরে একটা আর্তনাদ ফেটে পড়বে বলে ডেলা পাকিয়ে উঠল। গলা দিয়ে একটা ভাঙা, বিকৃত আওয়াজ বেরোল শুধু।

আলো জ্বলে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়েসলি। আলোছায়ায় ওকে একটা উল্লসিত প্রেতের মত দেখাচ্ছে।

জুলি আবার চেঁচাল।

ব্লানশ নিষ্পাপ গলায় বলল, আমি কি তোমায় বিরক্ত করলাম? ভেবেছিলাম চুপিচুপি এসে দেখে যাবো তুমি ঠিকমত শুয়েছো কিনা।

নীল ফুলের মত নীল চোখদুটো জুলির আতঙ্কিত মুখে স্থির হয়ে এঁটে রইল। ব্লানশ আবার বলে উঠল, শেষ অবধি মত পালটালাম। শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরলাম। তোমায় অজানতে ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত।

হঠাৎ ব্লানশের মুখে উল্লসিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল, তুমি বলেছিলে না তুমি ভিতু নও, বলেছিলে কিনা? না কি তুমি শুধুই বড়াই করেছিলে?

আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ব্লানশ বলল, গুড নাইট জুলি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অদ্ভুত, বিকৃত মানসিক অবস্থা ব্লানশের। ওর মাথায় হয়তো কোন গোলমাল আছে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো জুলি। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে জুলি বুঝল ও যতই হুঁশিয়ার হয়ে চলুক, ব্লানশের

সঙ্গে ও এঁটে উঠতে পারবে না। এবং তাই চট করে ও ফাঁদেও পড়ল।

প্রাতঃরাশ তৈরী করতে করতে জুলি ভাঁড়ার রাখার কাবার্ড থেকে চা নিয়ে আসছে, হঠাৎ দেখল আলো আঁধারে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ওর শরীর ছেড়ে যেন প্রাণটা বেরিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার শরীরে এসে ঢুকল। এই অতর্কিত আঘাতে রান্নাঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল, খানিক বাদে জুলির মাথা ঘুরতে লাগল, খানিক বাদে স্নায়ু বিপর্যয়ে জুলির পেশী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল, ও মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। বেশ কয়েক মিনিট কাটলে জুলি সাহস সঞ্চয় করে দেহটার দিকে তাকাতে বুঝল ওটা ভয় পাবার মত কিছু নয়, কয়েকটা জামাকাপড়ে কুশন ভরে ওটা বানানো হয়েছে। জুলি বুঝল ব্লানশ আবার টেক্কা দিয়েছে।

রান্নাঘরে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে ও এক কাপ চা তৈরী করে বসল। ভাবল, এরকম যদি চলতেই থাকে তবে ওকে কাজটা ছাড়তেই হবে। অতটা ভয় পাওয়া আমার বোকামি হয়েছে, কিন্তু কে বুঝবে অত মন দিয়ে মেয়েছেলেটা মরাটা বানাবে?

পরে ও দেরাজে পর্দাটর্দা তুলছে হঠাৎ গুটোনো চামড়ার কি যেন একটা হাতে ঠেকল। তাকিয়ে দেখল দেরাজের নিচে একটা কুণ্ডলী পাকানো ভয়ানক সাপ। দেখে ও পাথর হয়ে গেল। সাপে ওর ভীষণ ভয়, কান ফাটানো চীৎকার করে ও দরজার দিকে ছুটল।

ভয়ের চমকটা কাটতে ও এটাও ব্লানশের চমক ভেবে ফিরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দেরাজটা দেখল। কাঁচের চোখ, ভেতরে অন্য জিনিষ ঠাসা, তবু ওটা সাপই বটে। শিউরে উঠে ওটা কাপড় চোপড় চাপা দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করল। ভয়ে হাত-পা খুলে যাবার যোগাড়, ঠিক তখনই বেল বেজে উঠতে ও চমকিয়ে লাফিয়ে উঠল।

দরজা খোলার কথা খেয়ালই নেই ওর। সম্বিত ফিরে আসতে দেখল একটি লম্বা, সুসজ্জিত চেহারার লোক ওকে শীতল উৎসুক চোখে দেখছে।

—মিসেস ওয়েসলি ওঠেনি বোধহয়? লোকটা ওকে নালিশের ভঙ্গিমায় জিজ্ঞেস করল। তারপর সটান ভেতরে ঢুকে জুলির হাতে কোট আর টুপিটা দিল। জুলি টুপিটা নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা হাতের দস্তানা খুলে টুপিতে ফেলল।

জুলি বলল, না, মিসেস ওয়েসলি ওঠেননি। ভাবল, লোকটা কে? কি চায়?

—আমি মিঃ হিউ বেনটন, মিঃ ওয়েসলির পার্টনার, লোকটা বলল। ওর মুখটা পাতলা, নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, রং ফ্যাকাশে, চুল সাদাটে, ঠোঁট রক্তশূন্য, চোখ হলদেটে। গলার স্বর যেন, ও গির্জার ভেতর কথা বলছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও জুলিকে, যেন অশ্ববিক্রেতা সদ্য খরিদ করা ঘোড়া দেখছে। বলল, তুমি বোধহয় নতুন চাকরানী? মিসেস ওয়েসলিকে বলবে আমি এসেছি।

—এত তাড়াতাড়ি ডাকা উনি পছন্দ করেন না।

—বাঃ, বেশ! লোকটি হাসল। ছোট ছোট দাঁতগুলো এমন যান্ত্রিক ভাবে দেখাল যে ওটাকে হাসি বলা যায় না। বলল, তোমার চেয়ে আমি মিসেস ওয়েসলিকে অনেক বেশীদিন ধরে চিনি। ওঁর অভ্যেস আমার জানা আছে। বল, আমি এসেছি।

—কিন্তু আমার মনে হয়না...। জুলি বলতে গেল। ও তো জানে সকাল সাড়ে এগারোটায় ডাকলে ব্লানশ কি রকম খেপে যেতে পারে!

বেনটন মুখ বিকৃত করে বলল, তুমি কি মনে করবে সে জন্যে তোমায় মাইনে দেওয়া হয় না। যা বলা হবে তা মেনে চলার জন্যে মাইনে দেওয়া হয়।

জুলি পেছন ঘুরে ব্লানশের ঘরের দিকে গেল। ঐ লোকটাকে এত কথা বলতে সুযোগ দিয়েছে বলে ওর নিজের ওপরে রাগ হতে লাগল। দরজায় টোকা দিয়ে ও ঘরে ঢুকল।

ব্লানশ ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে শুয়ে আছে। হাতের কাছে টেবিলে ব্রান্ডির পাত্র।

মুখ তুলল ও। ফ্যাকাশে, ফোলা ছোট্ট মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

—আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সব সময় ঘরে ঢুকতে পার বলিনি, বলেছি কি? ওর চোখ রাগে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। বলল, দরকার হলে ঘণ্টা বাজিয়ে তোমাকে ডাকব। বেরিয়ে যাও।

জুলি আস্তে আস্তে বলল, আপনাকে বিরক্ত করায় দুঃখিত। কিন্তু মিঃ বেনটন এসেছেন, আপনাকে ডাকতে বলছেন বারবার। আমি বলেছি আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সমস্ত রাগ মিলিয়ে গিয়ে ব্লানশ ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—হিউ? এই অসময়ে? ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না। জুলি ঘরটা তাড়াতাড়ি সাফ কর। আমার মেকআপের বাক্সটা দাও। তাড়াতাড়ি। মরা মাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।

এ যে অন্য এক ব্লানশ। সেই নিষ্ঠুর, পিশাচী, অধীর, বিকারগ্রস্ত ব্লানশের চেয়ে এই ছটফটে, ছোট মেয়ের মত উত্তেজনায় অধীর ব্লানশ যেন আরো ঘৃণ্য।

ব্লানশ দ্রুততার সঙ্গে মুখে রং মাখতে লাগল। জুলি ছুটোছুটি করে ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে বাগে আনতে লাগল।

ফ্যাকাশে গালে রং লাগাতে লাগাতে ব্লানশ হুকুম দিল, চারিদিকে সুগন্ধী ছড়াও। ঘরে কি দুর্গন্ধ। রুজের তুলি রেখে এক চুমুকে ব্রান্ডি খেয়ে গ্লাসটা রেখে বলল, তাড়াতাড়ি একটা জানলা খোল। এমন টেনে টেনে ছুটছো যেন তোমার পিঠ ভেঙে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে জুলিকে যা যা ছড়ান, ছেটানো, গোছান করতে বলা হলো ও সব করল। নোংরা তোয়ালেগুলো বান্ডিল করে বাথরুমে রাখল।

যখন ও বাথরুম থেকে ঘরে এল, তখন দেখল ব্লানশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে, সুডৌল হাত দুটো মাথার ওপর ভাঁজ করা, দেখে মনে হয় এক মোহময় আকর্ষণের মূর্তি।

সেই ফ্যাকাশে, সাদাটে মেয়েছেলেটার এমন স্বপ্নের আশ্চর্য রূপান্তর দেখে জুলি ঈর্ষায় জ্বলে উঠল, ভাবল, ওঃ, খুকি পুতুলটি সাজগোজের জানেটা কি?

ব্লানশ খ্যাঁচ করে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় গিলছো কি? ওকে ডাক।

বেনটন লাউঞ্জে মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিরক্ত, বিরস মুখে পায়চারি করছিল। জুলি ঢুকতেই বলল, তৈরী হয়েছেন উনি? তুমি তো অনেকক্ষণ গেছো।

—দয়া করে এদিকটায় চলুন। ওর সামনে হাঁটতে হাঁটতে জুলির অস্বস্তি হচ্ছিল। ও যখন ব্লানশের দরজার কাছে পৌঁছল বেনটনের একটা হাত ওর উরু স্পর্শ করল। ঠিক যেন একটা মাকড়সা হেঁটে গেল, জুলি শিউরে উঠল।

ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে জুলির দিকে চেয়ে থেকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতটা সরিয়ে নিল। তারপর ব্লানশের ঘরে ঢুকে সরু গলায় বলল,

—ও ব্লানশ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, কি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছো। দরজাটা ঠেলে দিল। পুরো বন্ধ করল না। জুলির সারা শরীর জুড়ে তখন শিহরণ। ও শুনল বেনটন বলছে, খবর আছে, হাওয়ার্ড তার করেছে, সোমবারের আগে ফিরছে না।

—সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী কোথাকার! ব্লানশ হেসে বলল।

বেনটন ধীরে ধীরে বলল, নয়ই বা কেন? আজ বিকেলেই আমি আবার আসতে পারি। আমরা পুরো শনিবারটা একসঙ্গে কাটাতে পারবো।

ব্লানশ বলল, ডার্লিং দরজাটা বন্ধ করে দিলে হয়না? ফ্ল্যাটের চতুর্দিকে কুকীর্তির কথা রটিয়ে দিতে চাওনা নিশ্চয়ই।

জুলি তাড়াতাড়ি সরে এলো। ভাবল, ওঃ জুটি বটে একখানা। মরুকগে ওরা। তবে কি ব্লানশ সত্যিই পুরো শনিবারটা বাইরে থাকছে?

তখনি ওর হ্যারির কথা মনে পড়ল। কাল হ্যারি ম্যানচেস্টার থেকে ফিরছে। নানারকম প্ল্যান করে কাজ নেই। ওই ব্লানশ নাও যেতে পারে আর হ্যারিও নাও ফিরতে পারে। হয়তো জুলিকে এই লম্বা দুটো দিন একলা এই নির্জন ফ্ল্যাটে কাটাতে হবে।

অনেক পরে বেনটন ব্লানশের ঘর থেকে বেরোল। জুলি রান্নাঘর থেকে শুনল ও প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জুলি টেবিলে পিঠ রেখে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

—আপনি কি কিছু চান? জুলির ঠাণ্ডা গলা।

—চাই। হ্যাঁ...আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জুলি তখন মনে মনে রুখে উঠছে আর ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখতে দেখতে বেনটন ব্যাগ থেকে পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট বার করল।

—হ্যাঁ। নোটটা ছোট্ট, নিখুঁত ভাঁজ করল বেনটন, কি যেন বলছিলাম। ভাঁজকরা নোটটা আঙুলের গাঁটে ঠুকতে ঠুকতে বলল, তুমি মিসেস ওয়েসলির খাস চাকরানী। হয়তো অনেক কিছু দেখবে বা শুনবে, যা তোমার আওতার মধ্যে নয়। একজন খাস চাকরানী গাবিয়ে বেড়ায়না। বুঝলে?

জুলি রেগে লাল হয়ে বলল, সে কথা আপনাকে বলে দিতে হবে না।

বেনটনের ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল।

—দোহাই তোমার। রেগে যেওনা। মিসেস ওয়েসলি অসম্ভব ঝামেলা পাকাতে পারেন। বেশীর ভাগ সময়ই উনি চাকরানীদের এক সপ্তাহের বেশী রাখতে পারেন নি। আমার মনে হয় ওর চাকরানী অর্থাৎ তুমি, তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা আছে।

এক মুহূর্ত মাত্র জুলি ইতস্তঃ করল। সে তো এই কাজের ফাঁদে পা দিয়েছে লুটে নেবার জন্যে? তাহলে ঐ ফ্যাকাশে লোকটা ওকে ঘুষ দিলে নিতে বাধা কোথায়? পাঁচ পাউন্ড! পরে হয়তো আরো দেবে। বেনটনের চোখজোড়ায়, চোখ রেখে, 'হয়তো হয়েছে'—বলতে জুলির সাহস দরকার হল।

—আমি জানি আমি ভুল বুঝিনি তোমায়। দেখ আমি চাই না মিঃ ওয়েসলি কিছু কথা জানুন। বেনটন মুখে বিকৃতি নিয়ে বলল, উনি অন্ধ। আর জানবে অন্ধরা ভয়ানক খুঁতখুঁতে, সন্দেহবাতিক হয়। আমি ওকে আঘাত দিতে চাই না।

—বুঝেছি।

বেনটন বলে চলল, এ ফ্ল্যাটে কি হচ্ছে না হচ্ছে, যতক্ষণ তুমি দেখতে যাচ্ছো না, শুনতে যাচ্ছো না, ততক্ষণ তুমি আমি বেশ মানিয়ে চলতে পারব। এই ধর, আজ সকালে আমি এখানে আসিনি। বুঝলে?

জুলি মাথা নেড়ে বোঝাল সে সবকিছু বুঝেছে।

—এই বন্দোবস্তটা তোমার-আমার মধ্যেই থাকুক। মিসেস ওয়েসলি এটা পছন্দ নাও করতে পারেন।

আবারও জুলি মাথা নাড়াল।

—চমৎকার।

বেনটন সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা লোকটার গায়ে ল্যাভেন্ডার আর চুরুটের গন্ধ। নোটটা জুলির হাতে দিয়ে আদরের ভঙ্গিতে বাহুতে চাপড় মারল। ওর স্পর্শে শিউরে উঠে জুলি পিছু হাঁটল। কিন্তু পিছনে টেবিল। বেনটন ওকে টেবিলে ঠেসে ধরল। এই ভয়াবহ মুহূর্তে জুলি ভাবল ও বুঝি ওকে চুমো খাবে। কিন্তু বেনটন তা না করে সরে গেল। দরজা খুলতে খুলতে বলল, যেখান থেকে এটা এলো, সেখানে আরো নোট আছে জুলি। সুতরাং সহজ কথাটা বুঝেছো নিশ্চয়। কিচ্ছু দেখ না, কিচ্ছু শুনো না। বেনটন বেরিয়ে যেতেই ব্লানশ ঘণ্টা বাজাল।

ব্লানশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জুলি দেখল ওর দেওয়ালের আড়ালের আলমারিটা খোলা। ভেতরে ইস্পাতের খুপরিতে দুটো শক্তিশালী বাল্‌ব জ্বলছে। জুলি দেখল ভেতরে সারি সারি ফারকোট ঝুলছে। ও একটা ফার কতদিন মনে মনে চেয়েছে। কতদিন লোভার্ত চোখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়েস্ট এন্ডের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ও ফার দেখেছে। এখানে চিঞ্চিলা, সিল্ক, বীভার, সেবল, সাদা শেয়ালের চামড়ার জামা আর আর্মাইন ঝুলছে। আলমারীর অন্য দিকে ইস্পাতের দেওয়াল আলমারী দেখে জুলি বুঝল ওটা নিশ্চয় গয়নার আলমারী।

ব্লানশ ড্রেসিং টেবিলে বসে ফিনফিনে মোজা পরছিল। মুখ তুলে ও জুলির দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, লন্ডনের প্রত্যেকটা চোর আমাব ফার চুরি করা নিয়ে কথা বলে। কিন্তু ওরা তা পারবে না, কারণ যত আলমারী এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে ওটা সবচেয়ে নিখুঁত, ওটা খোলা সকলের অসাধ্য। আমার স্বামী ওটা তৈরী করেছেন। ঠিক মনে নেই এ পর্যন্ত ছ-

জন বা আটজন চোর ওটা ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ওরা আর চেষ্টা করবে না। যে ওই আলমারীতে হাত দেবে, তখনি কেনসিংটন পুলিশ স্টেশনে ঘণ্টা বেজে উঠবে, দু-মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়বে।

জুলি মনে মনে ভাবল, এটার জন্যই তাহলে হ্যারির আগ্রহ। ওই জন্তুটার কি শিক্ষাই না হবে, ফারগুলো চুরি করতে এলে।

ব্লানশ বলল, শুধু আমি আর মিঃ ওয়েসলি জানি কেমন করে ওটা খুলতে হয়, কোথায় ওর চাবি।

জুলি ইচ্ছে করে কথার প্রসঙ্গ পাল্টালো যেন আলমারীটার ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহই নেই। বলল, আমি কি কিছু করতে পারি ম্যাডাম?

—আমি এই সপ্তার শেষটা বাইরে থাকছি। মিঃ ওয়েসলি সোমবারের আগে ফিরছেন না। আমি জিনিষের ফর্দ করে লিখে রেখেছি। তুমি জিনিষগুলো গুছিয়ে দাও।

গতবার বাক্স গোছানোর কথা জুলির মনে আছে। হয়ত এবারও ঐরকম করবে। জুলি ফর্দ অনুযায়ী জিনিষপত্র গোছাল, কিন্তু ব্লানশ কিছু বলল না। তবু জুলি ওর অন্য বদমাইশির আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ ও বলে উঠল, জুলি এ ছুটিটা কি করবে?

জুলি হঠাৎ এই প্রশ্নে আমতা আমতা করে বলল, জানি না ম্যাডাম।

—কুঁড়েমি কোরনা। দেখবে অনেক সেলাই করার আছে, রুপোর জিনিষগুলো সাফ করবে। কাজ নিয়ে থেকো। আমায় যেন বলে দিতে হয়না, কি করবে। ফুল সাজিও, আমার জুতোগুলো পরিষ্কার কোর। চারদিকে তাকালেই দেখবে অনেক কাজ আছে।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

—রবিবার তুমি বেরোতে পার, কিন্তু বাড়িটা ফাঁকা থাক এটা আমার পছন্দ নয়। বুঝেছো? দোহাই তোমার কোন উটকো পুরুষ মানুষকে বাড়িতে ঢুকিও না। তোমাদের মত মেয়েদের আমি চিনি। বাড়ির দারোয়ান জানে তুমি একা থাকবে।

জুলির মুখ-চোখ গরম হয়ে গেল।

ব্লানশ ভুরু কুঁচকে বলল, মেজাজ খারাপ কোরনা। আমি বলছি না তুমি বাড়িতে পুরুষ ঢোকাবে, যদি ঢোকাও তো আমি সহ্য করব না। এদিকে এস।

জুলি এগিয়ে গেল। ওর মুখে ক্ষোভ, বিদ্রোহ।

ব্লানশ ওর শুকনো কাঠির মত আঙুলগুলো দিয়ে জুলির গাল ছুঁলো, জুলি শিউরে পিছিয়ে গেল। ব্লানশ বলল, কি ভালো ফিগার তোমার, কি সুন্দর চামড়া। আমায় ভয় পেও না। ব্লানশের চোখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো, ভয় পাও না তো আমাকে?

—না, ম্যাডাম। জুলির গলায় অস্বস্তি।

ব্লানশ হেসে বলল, ঠিক আছে। কেউ কেউ আমায় ভয় পায়, কিন্তু কোন মানে হয়? আমি প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে একটু তামাসা করি, সে শুধু মজা করে। তারপর জুলিকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে দেখে বলল, কাবার্ডের সামনের সেই মানুষটা দেখে ভয় পেয়েছিলে?

—বেশী না। জুলির গলায় আগ্রহ নেই।

—পাওনি? নীল ফুলের মতো চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল।

অন্য একটা চাকরানীর হিস্টিরিয়া হয়েছিল। সে যা মজা! আর সাপটা? দেখে চমকাওনি? হেসে উঠে বলল, সাপটা নিয়ে রগড় করতে আমি ভালবাসি। আমার স্বামী ওটাকে ঘেন্না করে। ওর বিছানায় মাঝে মাঝে ওটাকে ফেলে রাখি।

জুলি মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওর মুখের ঘৃণা ব্লানশকে দেখাতে চাইল না। ওর ইচ্ছে করল, ব্লানশকে ধরে ঝাঁকি মারতে।

—জুলি তুমি কি ফার ভালবাস? ব্লানশ মেকাপ শেষ করতে করতে অতর্কিতে জিজ্ঞেস করল।

জুলি মনে মনে ঠিক করল, তুমি আর আমায় ফাঁদে ফেলতে পারছনা। মুখে বলল, হ্যাঁ ম্যাডাম,

হয়ত ভালবাসি।

—আমার ফারগুলো দেখ। ছোঁও ওগুলো জুলি। আমি চাই তুমি ওগুলো ছুঁয়ে দেখ, ভালবাস।

জুলি নড়ল না।

—ধন্যবাদ ম্যাডাম। অন্যের ফারে আমার কোন আগ্রহ নেই।

ব্লানশ কৌতুকে হেসে উঠল, বাজে কথা। দেখ ওগুলো। একটি মেয়েও নেই যে ওগুলো পাবার জন্যে চোখ অবধি উপড়ে দিতে চাইবে না। এই সিল্কের কোটটার দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড, সাদা শেয়ালের গায়ের ফারটা...আমি দাম বলতে চাই না। যাও না ভেতরে। দেখ ওগুলো।

জুলি আলমারীর কাছে গেল। ফারগুলো খুব সুন্দর। কিন্তু ও কোন আগ্রহ দেখাল না।

ব্লানশ বলল, সিল্ক কোটটা হ্যাঙার থেকে নামাও। গায়ে দিয়ে দেখতে পারো ইচ্ছে হলে।

জুলি আলমারিতে ঢুকে সিল্ক কোটটার গায়ে হাত দিতে গেল। হঠাৎ 'সুইল' করে শব্দ করে, ইস্পাতের দেওয়ালগুলো বাতাসের ঝাপটা মেরে জুলিকে বন্ধ করে ফেলল।

এক মুহূর্ত জুলি এমনই হতভম্ব হয়ে গেল যে একটুও নড়তে বা কোন কিছু ভাবতে পারলো না। জুলি নিজেকে সামলালো।

ভাবল, এত সেধে ডেকে আনল। বোঝা উচিত ছিল ও কোন মতলব ভাঁজছে। ওকে ট্রেন ধরতে হবে, আমাকে বেশীক্ষণ পুরে রাখতে পারবেনা। কিন্তু আর একটু নড়াচড়ার জায়গা থাকলে ভাল হতো। এখানে বাতাসও বেশী নেই, আর এই জঘন্য ফারগুলোর গরমে কষ্ট হতে লাগল। ও যদি আমার প্রাণটাকে খাঁচা ছাড়া করতে চায় আমি তা হতে দেব না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করে বসে থাকবো যতক্ষণ না আমাকে বের করে দেয়।

ভয়টা শাসনে রেখে জুলি আলমারীটার মেঝেতে বসে পড়ল। ফার কোটগুলো ওর মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

তারপর ওর ভাবনা এলো, যদি ঐ মাথা খারাপ মহিলাটা আমাকে এখানে রেখে সত্যিই চলে যায়, আমি তো এই কম বাতাসে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবো না। এখনই নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ আলো দুটো নিভে গেল। তপ্ত, শ্বাসরোধকারী অন্ধকার ওকে ঘিরে ধরল।

জুলি উঠে দাঁড়াল। ও বুঝতে পারল ও কাঁপছে। বন্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হল এই শ্বাসরোধী ভয়ঙ্কর অন্ধকারে যেন ওকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে।

মাথা গোলমাল হয়ে গেল ওর। বন্য চীৎকারে ফেটে পড়ে ও ইস্পাতের দেওয়ালে ঘুঁষি, লাথি মারতে লাগল, আঁচড়াতে লাগলো। চারদিকের ফারগুলো যেন চেপে জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওকে। ঘুঁষি মারতে মারতে হাতগুলো যেন অকেজো রবারের হাতুড়ির মত হয়ে গেছে। ক্রমশঃ শ্বাসরোধী অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগল ও। আর্তনাদ করতে লাগল। ওর অস্থির ছট্‌ফটানিতে একটা ফারকোট হ্যাঙার থেকে খুলে পড়ে ওকে চাপা দিল।

গাঢ় অথচ অস্বস্তিভরা ঘুম থেকে ধীরে জেগে ওঠার মতো করে জুলির চেতনা ফিরে এল। ওপর দিকে চেয়ে ও অনেকক্ষণ কাঁদল। কেন যে কাঁদল ও নিজেও জানেনা। বোধহয় ভীষণ ভয় পেয়েছিল, এখনও ওর স্নায়ুগুলোকে শাসনে আনতে পারেনি বলে এই কান্না।

তারপর আর কাঁদতে পারল না। তখন ওর মনে হল কে ওকে বিছানায় নিয়ে এলো! হিউ বেনটনের স্পর্শের কথা মনে হতেই ওর গা শিউরে উঠল বিতৃষ্ণায়।

ও ভাবল, আর নয়, আমি আর থাকব না। ব্লানশ পাগল, বিপজ্জনকও বটে, আমি মরে যেতেও পারতাম।

বিছানা ছেড়ে উঠে ও ব্লানশের ঘরে গেল। মনে হল, ব্লানশ যেন ঘরেই আছে। কিন্তু না, ব্লানশ চলে গেছে। বিরাট, বিলাসবহুল কামরাটা অস্বাভাবিক ফাঁকা লাগছে ব্লানশ নেই বলে। বাতাসে ল্যাভেন্ডার আর চুরুটের ক্ষীণ গন্ধে জুলি শিউরে উঠে বুঝল তাহলে বেনটন এসেছিল।

বিছানার পাশের কাবার্ড থেকে এক বোতল ব্রান্ডি আর একটা গ্লাস বের করল। বিছানায় আরাম করে বসে খানিকটা ব্রান্ডি খেয়ে অচৈতন্য ভাবটা কেটে গেল।

জুলি ভাবল, আর থাকছি না। আজই জিনিষপত্র গোছগাছ করে রাতে চলে যাবো। আমি যতই সমঝে চলি না কেন ও আমায় ফাঁদে ফেলবেই। হ্যারি যাই বলুক, যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে।

জুলির চলে যাবার মুখ্য কারণ যতই ব্লানশ হোক, তবু ঐ দামী ফারকোটগুলোই ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। এখানে থাকা মানেই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। পুলিশ খোঁজ পাবে ও হিউয়ার্টের ওখানে কাজ করত, ওরা বুঝবে জুলি ছিল চোরদের সঙ্গী। সন্দেহ হবে চুরির সঙ্গে ওর যোগ আছে। না। ব্লানশ, ফারকোট কোন কিছুর সংস্পর্শেই ও থাকবে না।

হঠাৎ ফ্ল্যাটের কোথায় যেন একটা টেলিফোন বাজল। হাত বাড়িয়ে ও রিসিভার তুলল।

—জুলি?

—হ্যাঁ। তুমি কোথায় হ্যারি? আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। তুমি ফোন করেছ বলে আমি খুব খুশী। আশ্চর্য! ঠিক যখন তোমার কথা ভাবছিলাম!

—কি হয়েছে? হ্যারি তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল।

—তোমার সঙ্গে দেখা করব হ্যারি। জুলি একেবারে ভেঙে পড়ল, তুমি যতই ব্যস্ত থাক, আমার তোমার সঙ্গে দেখা করা ভীষণ জরুরী। আমি তোমায় দেখতে চাই হ্যারি।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, উত্তেজিত হয়ো না। একঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। তুমি বেরোতে পারবে?

—মেয়েছেলেটা দুদিনের জন্যে বাইরে গেছে। ওঃ হ্যারি! তোমার গলা শুনেও ভালো লাগছে। ওর একটা কথা মনে হলো, হ্যারি তুমি এখানে চলে এসো। এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই। বাড়িটাও দেখতে পারবে। তাও তো চাও তুমি, তাই না?

—টেলিফোনে এসব কথা থাক। কেউ আসবে না তো? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—না কেউ আসবে না। মিঃ ওয়েসলি সোমবার রাতের আগে আসবে না। বিছানার পাশের ঘড়িটা দেখে জুলি বলল, সাড়ে চারটে বাজে। তুমি কখন আসবে?

—ছটা। হয়তো সওয়া ছটা।

—হ্যারি, সাবধানে ঢুকো। দারোয়ান বাড়ির ওপর নজর রেখেছে।

লাইনের অপরপ্রান্তে খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হ্যারি বলল, হয়তো আমি না এলেই ভালো। এত ঝামেলা করার পর জিনিষটা কেঁচিয়ে দিতে চাই না।

—তোমায় আসতেই হবে। ওপর তলায় চলে যাবে লিফ্‌ট নিয়ে, হেঁটে নামবে। ওপর তলায় মিসেস গ্রেগরী থাকেন, তুমি ভান কর ওর কাছে যাচ্ছো।

—চালাক হয়ে গেছ তুমি। হ্যারি হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে যাবো।

—তোমায় আবার দেখব ভেবে ভাল লাগছে।

কিন্তু হ্যারি ফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, জুলি যে এখানে থাকবে না শুনে হ্যারি কি বলবে ভেবে জুলি চিন্তিত হলো। হঠাৎ ওর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ব্লানশের পোশাকের আলমারীর দিকে ছুটে গেল ও।

মনে মনে খুশী হয়ে ভাবল, আমি ওকে খুব চমকে দেব। আমাকে এত সুন্দর দেখাবে যে, ও আমার কথা ঠেলতে পারবে না।

ব্লানশের অজস্র পোষাক থেকে ইভনিং গাউনটা বেছে নিল। যে গাউনটা ও বাছল সেটা পপি ফুলের মতো রং, গলাটা নিচু কাটা, চওড়া ঘের দেওয়া স্কার্ট। জুলি ওর ঘন, গাঢ়, বাদামী চুল কাঁধ অব্দি আঁচড়ে ছটার মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল।

আয়নায় নিজেকে দেখে ভাবল, ওকে এত সুন্দরী দেখাচ্ছে যে ডানা ওর পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারবে না। জুলি বয়সে অনেক তরুণ, মুখে সারল্য, অনেক বেশী চিত্তহারিণী। আর পোষাকটা পরে ও এখন অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যা অন্য পোশাকে কখনও হয়নি। জুলির নিজেকে চিনতেও ভুল হচ্ছে।

ছটার একটু পরে দরজায় ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলে দেখল টুপিটা বাঁকা কায়দায় নামিয়ে ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হ্যারি দাঁড়িয়ে ওর সামনে। এক লহমায় ও জুলিকে চিনতেই

পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, বিহ্বল হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ।

—জুলি! এই ধার করা পোষাকে তোমায় দারুণ দেখাচ্ছে। আমি তো একেবারে ভিরমি খেয়ে গেছি। সে কথা সত্যি। হ্যারি জুলিকে চিনতে পারছিল না। হ্যারি ভাবল, ওঃ। অপূর্ব দেখতে ওকে! একেবারে কোহিনূর? আর আমি সে কথা জানতামই না।

জুলিকে জড়িয়ে ধরল ও, জুলি হাত ছাড়িয়ে বলল, আমাকে ছুঁয়োনা। আমার পোষাক লাট খেয়ে যাবে।

জুলির চোখের কঠিন দৃষ্টি দেখে হ্যারি চমকে গেল। থতমত খেয়ে গেল। জুলির দিকে হাঁ করে চেয়ে বলল, জুলি তুমি অসাধারণ! সিন্ডারেলা তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমায় দেখে তো আমার মাথা ঘুরছে। এটা সেই মেয়েছেলেটার পোষাক?

—নিশ্চয়ই। তুমি নিশ্চয় ভাবতে পারো না যে এ পোষাকটা আমি কিনতে পারি। নাকি তাই ভাবো? কিন্তু তুমি ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এসো।

হ্যারি ওর পেছনে লাউঞ্জে ঢুকল। জীবনে এই প্রথম ও একটা কেমন অসুবিধে বোধ করছে। জুলির সৌন্দর্য আর বাড়ির পরিবেশ ওর আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে। জুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হ্যারি বুঝল ও জুলির প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ও কিভাবে খাপ খাওয়াবে ভেবে পেল না।

জুলিও বুঝল ওর সৌন্দর্য হ্যারির মনে কি রকম প্রভাব ফেলেছে। ফায়ার-প্লেসের সামনে স্থির, অবিচল দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে চেয়ে থেকে ও হ্যারির এই অবস্থাটাকে নিজের কাজে লাগাতে চাইল।

—কি ব্যাপার জুলি! তুমি আমাকে একটা চুমোও দেবে না?

—না। জুলি কাটা কাটা গলায় বলল, আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দেব। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা।

—কেন, কি ব্যাপার জুলি? হয়েছেটা কি?

জুলি ব্লানশের ভয় দেখানোর সমস্ত ঘটনা বলল।

জুলির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখে হ্যারি হতাশ হলো। বলল, শোন জুলি, অত উত্তেজিত হয়ো না।

—ওকে ভয় করে আমার।

সোফায় গিয়ে বসল হ্যারি। হ্যারি ঠিক করলো জুলিকে একাজে বহাল রাখতে হলে ওকে কেন এখানে রাখা হয়েছে খুলে বলতে হবে।

অস্থিরভাবে সিগারেট ধরিয়ে বলল, জুলি আজ জানলেও জানবে, কাল জানলেও জানবে। আমি ঐ ফারগুলো চাই। তুমি তা বুঝেছ, বোঝনি?

—তুমি কি আমাকে হাঁদা ভেবেছো নাকি? নিশ্চয়ই বুঝেছি। আমার ভাল লাগছে না।

—তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি নিরাপদেই থাকবে। তোমার কাজ খালি আলমারীটা কি করে খোলে জেনে নাও। শহরে এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ঠিক করেছি আলমারিটা ভাঙব। তোমার সাহায্য চাই। তুমিই একমাত্র লোক যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

জুলি সংক্ষেপে বলল, ওটা তুমি ভাঙতে পারবেনা। ব্লানশেব থেকে জেনেছি আলমারীটার সঙ্গে কেনসিংটন পুলিস স্টেশনের যোগাযোগ আছে।

হ্যারি সামনে এগিয়ে বসল, এইতো। এ সব খবরের অপেক্ষাতেই তো ছিলাম। আমি জানতে চাই, ও আর কি বলেছে?

—বলেছে, আটজন চোর ওটা খুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কেমন ব্যাপারটা?

—চারজন, আটজন নয়। আমি ভেবেছিলাম ওই জন্যেই ধরা পড়েছে সবাই, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। দেখছ না সোনা? তুমি যদি লেগে থাকতে পার, তাহলে আমায় সব দরকারী খোঁজ খবর দিতে পার। ফারগুলোর কথা বল।

—একটা সিল্ক কোট আছে। ও বলল, সেটার দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড। জুলি চোখ কোঁচকাল।

ফারগুলোর কথা ভুলতে পারছেনা ও। ওগুলো দেখার পর থেকেই ওর পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলল, একটা সাদা মেরু শেয়ালের ফার, অপূর্ব দেখতে। ওই পিশাচীটার পক্ষে খুব বেশী ভাল। তাছাড়া বীভার, চিঞ্চিলা, আর্মাইন, সেবল।

—কোনও গয়নাগাটি দেখলে?

—না। তবে আমি জানি ওই আলমারীর ভেতর একটা ইস্পাতের সিন্দুকে গয়না আছে।

ওকে প্রশ্ন করতে করতে হ্যারি ভাবছিল কেমন করে জুলিকে এখানে থাকতে রাজি করানো যায়। জুলির কোন দুর্বলতার কথা জানতে হবে, যাতে ঘা মেরে ওকে যেমন করেই হোক রাজি করাতেই হবে।

—তুমি বললে তুমি ভেতরে ঢুকতেই আলমারীটা বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বন্ধ হলো না আস্তে?

জুলি শিউরে উঠে বলল, ইঁদুর ধরার কলের মত দুম্ করে। দরজা একবার বন্ধ হলে, ভেতরে কোন হাওয়া নেই তুমি দম বন্ধ হয়ে মরবে।

—বন্ধ যাতে না থাকতে হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে। ব্লানশ কি দরজা বন্ধ করে দেয় না ওটা আপনা থেকেই বন্ধ হলো?

—ব্লানশ তো ধারে কাছেই ছিল না। সত্যি বলছি আমি জানি না

—বেশ দেখা যাক, আমাকে ওর শোবার ঘরে নিয়ে চলো।

—বেশ। দেখতে চাও তো দেখ, ভাল করে দেখ, তবে আমার সাহায্যে দেখা-টেখা হবে না। আমি এ সবের মধ্যে আর থাকছিনা।

আরো হতাশ, অসহায় হ্যারি ওর পেছন পেছন ব্লানশের ঘরে গেল। জুলির এই কাজ ছেড়ে দেবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হ্যারিকে যেন হারিয়ে দিচ্ছে।

জুলি ওকে লেপ ঢাকা দেওয়াল দেখাল।

—ওর পেছনে। ওটা ছুঁয়োনা। আমরা চাই না এখুনি পুলিশ এসে পড়ুক।

—ঠিক বলেছ। আমরা চাই না। হ্যারি একটু অস্বস্তির সঙ্গে দেওয়ালটা খুঁটিয়ে দেখার পর বলল, কোথাও কোন চিহ্নই নেই। নিখুঁত কাজ। দরজার পাল্লা কি বাইরের দিকে খুলে যায়, না পাশে সরে যায়?

—পাশে সরে গিয়েছিল।

দেওয়ালের দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট চেয়ে মাথা নাড়ল হ্যারি, না, কোন লাভ নেই। আমি হাত দেবার আগে আমাদের ভাল করে জেনে নিতে হবে কি করে খোলে আলমারীটা। তোমাকেই জানতে হবে জুলি।

জুলি ওর অস্বস্তি টের পেয়ে বলল, আমি পারবো না, তোমাকে তো বলেইছি, আমি থাকতে পারবো না।

হ্যারি ওকে কাছে টেনে নিল।

—আরেকটু লেগে থাক জুলি। আমি তোমাকে পঞ্চাশের বদলে একশো পাউন্ড দেব। জুলি, প্লিজ, আরেকটু সাহস তোমাকে দেখাতেই হবে। তুমি তো এ পর্যন্ত চমৎকার চালালে।

জুলি মুখ তুলল। ওর পুরুষ্টু ঠোঁট হ্যারির ঠোঁটের নাগালে।

—না হ্যারি। যথেষ্ট হয়েছে আমার। দেখ আমি তোমার প্ল্যান সব শুনেছি। ফলে এ কাজে আমি তোমার বিপক্ষ হলাম। আমি পুলিশের ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া ঐ মেয়েছেলেটাকে আমি কত ভয় পাই তুমি জাননা। আমি ওকে সহ্য করতে পারছিনা।

হ্যারির মনে একটা কথা তড়িৎ গতিতে খেলে গেল। হ্যারি উপলব্ধি করল এ মেয়েটির মূল্য ওর জীবনে কতখানি। ও মনে মনে ভাবল, কথাটা খোলাখুলি বলে ফেলাই ভাল। ও আমায় কাত করে ফেলেছে, আমি ওকে হারাতে চাই না। ওর মতো আমার জীবনে কেউ আসেনি। ওকে যদি বিয়েও করতে হয় করব। চুলোয় যাক্ সব, আমি তাই চাই।

জুলির হাত ধরে হ্যারি বলল, তুমি কি একটু বেশী বেশী দেখাচ্ছো না জুলি? আর দু-তিন দিনের মধ্যেই তো কাজ ফতে হয়ে যাবে। তারপর আমরা বিয়ে করে ফেলব, কেমন লাগবে

তোমার?

জুলির দিকে সাগ্রহে চেয়ে ওর আরো কাছে গিয়ে বলল, বাকী জীবনটা আরামে থাকার মত প্রচুর পয়সা থাকবে আমার হাতে। আমরা আমেরিকায় চলে যেতে পারি। মনের সুখে থাকতে পারি।

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে চাইল। এ একেবারে আশাতীত। ওর শিরদাঁড়া দিয়ে উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল।

—বিয়ে করবে আমাকে? আমেরিকা নিয়ে যাবে?

—কেন করবনা? তুমি আনন্দ চাও, চাও না? হ্যারি উত্তেজিত হয়ে উঠল, আমি তোমাকে আনন্দ দেব। সমস্ত পৃথিবীটা থালায় সাজিয়ে তোমায় উপহার দেব। তুমি বুঝছ না সোনা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি।

—যদি মিথ্যেমিথ্যে বল..., জুলির চোখ চক্‌চক্ করে উঠল।

—নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছিনা। সত্যি বলছি জুলি। তুমি যদি এ কাজটা ছেড়ে দাও কি হবে তোমার? কোথায় যাবে তুমি? ধর আমাকে ছেড়ে গেলে, কোথায় যাবে তুমি? হিউয়ার্টের কাছে? সে তোমায় আর নেবে না। কারখানায় হপ্তায় চার পাউন্ডের চাকরি করতে তোমার আর ভাল লাগবে? আমি তো তোমায় যা যা চাও সব দিতে চাইছি—পোষাক, টাকা, মজা, যদি আমাকে চাও তো আমাকেও। জাহান্নামে যাক সব, এর চেয়ে বেশী কিছু তো আমার দেবার নেই। আমেরিকায় আমার কিছু বন্ধু আছে, আমরা মহাস্ফূর্তিতে কাটাবো বাকী দিনগুলো। কি বলো?

ওকে একটু চেয়ে দেখল জুলি। এইতো ওর জয়ের মুহূর্ত। হ্যারির মনের কথাটি মুখে এসেছে। হ্যারি ওকে ভালবাসে। এখন জুলিকে সতর্ক হয়ে চাল চালতে হবে, যাতে কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ও হ্যারির থেকে যা ইচ্ছে তাই আদায় করতে পারে।

হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল জুলি। বলল, আমিও তোমাকে ভালবাসি হ্যারি। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি চোর নই। স্বীকার করছি, যা আমার করা উচিত নয় তেমন কাজ আমি করেছি, তবে আইন বাঁচিয়ে। আমি কোনদিন এমন কাজ করিনি বা করবো না, যাতে আমাকে জেলে যেতে হয়। হ্যারি দোহাই, তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও। আমি জানি তুমি ধরা পড়বেই। ব্লানশ পিশাচের মতোই ধূর্ত। তুমি ধরা পড়লে আমার কি হবে?

হ্যারি জুলিকে কাছে টেনে নিল।

হ্যারি ভাবল, এখানেই খেলা ফুরিয়ে গেলে আমি কি করবো। যদি চোখ খোলা না রাখি তবে ওকে হারাবো। মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কোন উপায় ওকে বের করতেই হবে। তিনি এ কাজে অন্য মেয়ে খুঁজে বের করুন।

—বেশ জুলি, হ্যারি চুমো খেল, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তোমায় আমি জোর করে ধরে রাখতে তো পারবো না। তাতে আমাদের সম্পর্কের তফাৎ হবে না কিছু। আমি যে করে হোক ওই টিনের কৌটোটায় ঢোকার উপায় খুঁজে বের করবই। তবে তুমি চলে যাও। আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি সোনা। তোমায় ঠিকই দেখব।

—সত্যি হ্যারি। সত্যি বলছ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু কেন এ কাজ করছ হ্যারি? চল না আমেরিকায় চলে যাই দুজনে। এ ঝুঁকি নিও না হ্যারি।

হ্যারি একটু অধীর হয়ে বলল, আমাকে একাজ হাসিল করতেই হবে। তুমি ভাবছ কোথা থেকে টাকা আসবে? শোন জুলি, একাজটা করতে পারলে আমার ভাগে পাবো আট হাজার পাউন্ড। আমায় করতেই হবে।

আট হাজার পাউন্ড!

একটি মুহূর্ত ভাবল, ওর প্রলোভনে থেকে যায় এখানে, সাহায্য করে হ্যারিকে। তারপর হুঁশিয়ার হয়ে ভাবল, সে এ চিন্তাকে আমল দেবে না। হ্যারি নিশ্চয়ই একটা ফন্দী ঠাওরাবে ঠিকই। হ্যারি ঠিক চালিয়ে নেবে। তারপর সে টাকা জুলির জন্যেই খরচ করবে। বেকার ঝক্কি পোয়াতে

যাবে কেন?

—বেশ হ্যারি...জুলি বলতে শুরু করল।

—ওটা কি? হ্যারি শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিছু শুনতে পেলে?

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

—না? কি বলছো তুমি?

চট করে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলতেই, চট্‌পট্‌ করে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকেছে মনে হচ্ছে। হ্যারি ফিসফিসিয়ে বলল।

ব্লানশ!

জুলি অজ্ঞান হয়ে গেল প্রায়। ব্লানশের শোবার ঘরে, ওরই পোষাক পরা অবস্থায় ধরা পড়লে কি অবস্থাটাই হবে জুলির। ভয়ে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্যাসেজ দিয়ে একজোড়া পা হেঁটে আসছে।

—মিসেস ওয়েসলি? জুলির ভয়ে খাবি খাওয়ার অবস্থা। কি করব আমি। জানলার দিকে মিথ্যেই ছুটে গেল ও। আমাকে লুকোতেই হবে।

দরজা খুলে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদ চেপে নিয়ে হাত মুঠো পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জুলি। একটি লোক ঢুকল। কালো চশমা তার চোখে। দরজায় দাঁড়িয়ে কালো চশমা জোড়ার ভেতর দিয়ে সোজা জুলির মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—কেউ আছে এখানে? লোকটি আস্তে বলল, ব্লানশ, তুমি আছো?

এখন তীব্র উদ্বেগ থেকে সহসা মুক্তির স্বস্তিতে বিভ্রান্ত হতে হতে জুলি বুঝল এ হাওয়ার্ড ওয়েসলি। ওয়েসলি ওকে দেখতে পাচ্ছেন না।

হাওয়ার্ড ওয়েসলি খুব একটা লম্বা মানুষ না হলেও জুলির মনে হল লোকটা বিশালদেহ। শক্তসমর্থ শরীর, চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে হাঁটেন। কালো চশমার ভেতর দিয়ে জুলি লক্ষ্য করল ওর চোখ-মুখ অতি সুশ্রী, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, শক্ত চিবুক ওঁর শরীরের মধ্যে একটা কর্তৃত্বের আভিজাত্য এনে দিয়েছে। চওড়া কপালের ওপর অবাধ্য বাদামী চুলে সবে রগের কাছে পাক ধরেছে। পরে ও জেনে অবাক হয়েছিল যে, ওর বয়স মাত্র আটত্রিশ।

জুলি আর হ্যারি দুজনেই ওঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি ঘরে ঢুকতে ওরা সরে দাঁড়াল।

—ঘরে কেউ আছে কি? উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যারি জুলিকে হাত নেড়ে ইশারা করে এই পরিস্থিতিকে কি ভাবে সামলাতে হবে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে।

জুলি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ...আমি।

ওয়েসলি ওর দিকে মুখ তুলে এমনভাবে ভুরু কোঁচকালেন যেন আগাগোড়াই উনি জানতেন জুলি এখানে আছে।

—তুমি কে? প্যান্টের পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরালেন।

—আমি জুলি হল্যান্ড, নতুন চাকরানী। জুলি নিজের গলাকে সংযত শাসনে রাখার চেষ্টা করল।

—ওঃ। উনি পকেট হাতড়ালেন। কপালটা কুঁচকে গেল, বললেন, আমাকে একটু আগুন দিতে পারো। মনে হচ্ছে ওভারকোটের পকেটে আমি দেশলাই ফেলে এসেছি।

চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইল জুলি। হ্যারি পকেট থেকে লাইটারটা বের করে, টেবিলে রেখে, বুড়ো আঙুল দিয়ে ও ওয়েসলিকে দেখাল। হ্যারির না যাওয়া দেখে জুলি অবাক হল। ও স্থির, সতর্ক দৃষ্টিতে ওয়েসলিকে লক্ষ্য করছে।

হ্যারির এই ধীরভাব দেখে জুলি বিরক্ত হলো। জুলি কাঁপছে, থরথর করে, ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। লাইটারটা ছোঁ মেরে তুলে ও ওয়েসলির দিকে এগোল। ও আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল

ওয়েসলি সেদিক পানেই তাকিয়ে আছে দেখে প্রমাণ হয়ে গেল যে, উনি সত্যিই অন্ধ। ওদের দেখতে পাননি।

লাইটারটা জ্বালাতে চেষ্টা করল জুলি। ওর আঙুল এত কাঁপছে যে ওটা পড়ে যাবার যোগাড় হল প্রায়।

—আমাকে দাও। ওয়েসলি হাত বাড়ালেন।

জুলি লাইটারটা দিল।

মিসেস ওয়েসলি কোথায়?

—উনি এই শনিবার বাইরে গেছেন স্যার। জুলি হ্যারির দিকে তাকাতে হ্যারি ওর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে, চোখ টিপে দরজার দিকে সরে গেল।

—আচ্ছা। ওয়েসলি সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা জুলিকে দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

জুলি লাইটার নিয়ে টেবিল রাখলো, হ্যারি ওটা তুলে নিল।

ওয়েসলি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, কবে ফিরবেন বলেছেন?

সোমবারের আগে আপনি আসবেন বলে ভাবেন নি উনি। সোমবার নাগাদ ফিরবেন।

—তুমিও ভাবোনি আমি আসব? ওয়েসলি হাসলেন, তোমার সন্ধ্যেটা মাটি করে দিলাম না তো?

—না স্যার। জুলি সসব্যস্ত হয়ে বলল। মনে ভয় হল উনি আবার সন্দেহ করছেন না তো?
—আমার কিছু করার ছিল না। ম্যাডামের ঘর পরিষ্কার করছিলাম।

—করছিলে বুঝি? তোমার গায়ের সুবাসে আমার মনে হচ্ছে তুমি কোন পার্টিতে যাচ্ছ। একটু হেসে বললেন, আমি তোমাকে কোন কটু কথা বললাম না তো? তবে আজকাল আমায় নাক আর কানের ওপর নির্ভর করে চলতে হয় কিনা। ভারি সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তো!

জুলি লাল হয়ে গেল, পিছিয়ে এল দু-পা। সুন্দর সুগন্ধিই তো হবার কথা। ব্লানশের সুগন্ধি তো!

ও তোতলামি করে বলল, আ-আমি বেরোচ্ছিলাম না।

ওয়েসলি বললেন, মিঃ গেরিজ মালপত্র দেখছেন। উনি আমার সেক্রেটারী। এখনি ওপরে আসবেন। তুমি আমাদের কফি খাওয়াতে পারবে?

—হ্যাঁ স্যার। জুলি ভাবল এখনি এই পোষাক ছাড়তে হবে।

—তাড়াতাড়ি কফি দিও। আমার কাজ আছে। ওয়েসলি মাথা ঘোরাল, মনে হল উনি হ্যারির দিকে সটান চাইলেন। হ্যারি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল। ওয়েসলি বলল, আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এ-ঘরে আরো কেউ আছে। আছে কি? ওয়েসলি দরজার হাতলটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন।

হ্যারি ওয়েসলির হাতের কাছেই এসে গেল। জুলি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওকে সরে যেতে বলল ইশারা করে।

—না স্যার, কেউ নেই।

ওয়েসলি ভুরু কোঁচকালেন, আমার এমনি মনে হল। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পার কফি বানাও। উনি বেরিয়ে গেলেন।

উনি চলে যেতেই হ্যারি ফিসফিস করে বলল, ওফ্। খুব বাঁচান বেঁচেছি। পোশাকটা ছাড়। আরেকটা লোক তোমায় যেন এ পোশাকে না দেখে ফেলে।

—আমার দোষ নেই, আমি জানতাম না উনি আসবেন। জুলির কেঁদে ফেলার যোগাড়।

—সে থাকগে! তাড়াতাড়ি পোশাকটা ছেড়ে ফেল।

ব্লানশের আলমারী থেকে ইউনিফর্ম বের করে, ছুটে সেটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে পোশাক পাল্টে এলো।

ও যখন ফিরে এল, হ্যারি তখন কান পেতে কি যেন শুনছে। ও তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ওদের কফি দাও। আমি বেরিয়ে যেতে চাই।

জুলি রুদ্ধশ্বাসে বলল, আবার কবে আমাদের দেখা হবে? আমি আর এখানে থাকব না।

এরপরে তো নয়ই।

—কাল বিকেল অব্দি থাকো। আমি ঠিক তিনটের সময় উল্টো দিকের পার্কে থাকব। কেটে পড়ো। এখন যাও। কাল কথা হবে। আমি এখন যেতে চাই।

জুলি এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল।

—ঠিক আছে। তবে আমাকে জোরাজুরি করে লাভ হবে না। আমি এখানে থাকব না। জুলি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে গেল।

ও যখন কফি নিয়ে ফিরে এলো ওয়েসলি তখন ইজিচেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছেন। একটি যুবক টেবিলে বসে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। বয়সে জুলির চেয়ে সামান্য বড় হবে। ওর পাতলা, কুশ্রী মুখখানা জুলিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জুলি অনুমান করল ইনিই নিশ্চয়ই ওয়েসলির সেক্রেটারী, গেরিজ। ওয়েসলির কাছেই একটা টেবিল দেখিয়ে দিয়ে ও আবার কাজ করতে লাগল।

জুলি নীচু হয়ে ট্রে-টা রাখতে ওয়েসলি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিশ্চয়ই সদ্য এসেছ?

—কাল এসেছি স্যার।

সংশয়ভরা গলায় ওয়েসলি বললেন, আশা করি এখানে তোমার ভাল লাগবে। আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরব ঠিক ছিল না, তা তোমার যদি এই শনি-রবিবার কোথাও যাবার থাকে, আমাদের জন্যে নষ্ট কোর না। আমাদের কিছু লাগবে না। আমরা শনি-রবিবারটা কারখানায় থাকব। কালকে ব্রেকফার্স্ট দেবার জন্য বিরক্ত করব, শুধু। বুঝলে? রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিয়ে দিতে পার। সকাল নটার মধ্যে আমরা বেরোব, তুমি সাড়ে আটটার মধ্যে দিলেই হবে, কেমন?

—ঠিক আছে স্যার। জুলি জবাব দিল।

ব্লানশের শোবার ঘরে যেতে যেতে ভাবল, উনি খুব ভাল, দয়ালু মানুষ। অন্ধ হওয়া কি অভিশাপ? ব্লানশের মতো পিশাচী, জানোয়ারটাকে কি দেখে উনি বিয়ে করলেন?

ব্লানশের ঘর গোছানো হয়ে গেলে ও রান্নাঘরে গেল। কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না ও। এখনো হাতে অনেক সময় আছে। বেরোতে পারলে ভাল হতো কিন্তু একা একা ঘুরতে ভাল লাগে না। পায়চারি করতে করতে জুলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল।

হ্যারির কথা মনে এলো। ওয়েসলি আসার আগে হ্যারির সঙ্গে আমেরিকা যাবার কথা ভাবতে ওর রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল, কিন্তু এখন যেন তেমন লাগছে না। মনে মনে ওয়েসলির সঙ্গে হ্যারির তুলনা করতে লাগল। এ যেন নকল হীরের সঙ্গে আসল হীরের তুলনা। ওর হঠাৎ মনে হল হ্যারি চরিত্রহীন, হ্যারির পোশাক-আশাক রং-চঙে, কু-রুচি সম্পন্ন। ওয়েসলি ধনী, আভিজাত্য তাঁর চোখে মুখে। হ্যারি জীবনেও ওঁর মত ধনী হবে না। হ্যারি ফারগুলো চুরি করে আট হাজার পাউন্ডের মালিক হয়ে কতদিন থাকবে? আমেরিকা গিয়ে মনের সুখে টাকা ওড়ালে বেশীদিন থাকবে না টাকা। তখন কি হবে?

ও নিজের মনেই স্বীকার করল, হ্যারি একটি ভাল চোর। ডসন ওকে হ্যারির কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিল। হিউয়ার্ট ওকে ঘেন্না করে। ঐ জঘন্য মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হ্যারির কারবার চলে। তারপর ঐ ডানা মেয়েটা। হ্যারিকে বিয়ে করে আমি কটা ঝামেলা ডেকে আনব?

বিয়ে যদি করতে হয় তবে ওয়েসলির মত লোককেই বিয়ে করা উচিত। জুলি যা যা চায়, গাড়ি, বাড়ি, পোষাক, দাস-দাসী সব। তবে হ্যাঁ, ওয়েসলি ওকে চেয়েও দেখবে না। তাছাড়া ওঁর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

যদি জুলি ওঁকে চুরির কথা সব বলে দেয়? হয়ত জুলির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন উনি। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল জুলি। এসব কি ভাবছে ও। এরকম ভাবা ঠিক নয়। এতে বিপদ আছে। ওর মনে এল সেই মেয়েটির কথা যে সব কথা চাউর করে বেড়াত। তার কথা হিউয়ার্ট কি বলেছিল! এ-সব মনে আনা ঠিক নয়।

দরজায় আস্তে টোকা পড়তে ওর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। গেরিজ কফির ট্রে হাতে ঢুকল।

—হ্যালো, মনে হল ট্রে-টা নিয়ে আসি। চমৎকার কফি খেলাম। গেরিজের মুখে সহৃদয় হাসি।

জুলি খুশী হয়ে গেরিজের হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে বলল, তোমাদের দরকার ছিল কফিটা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রান্নাঘরে ঘুরতে ঘুরতে যুবকটি বলল, আমি টম গেরিজ। আমি মিঃ ওয়েসলির সব কাজকর্ম দেখি। আমাদের আলাপ হলে খুব খুশী হবো। তুমি আমাকে এখানে ঘনঘনই দেখবে।

—দেখব বুঝি?

—হ্যাঁ। মিঃ ওয়েসলিকে বললাম তুমি দেখতে চমৎকার।

জুলি মুখ ফিরিয়ে কফির বাসনগুলো ধোয়ার জায়গায় রাখতে লাগল।

—আশা করি তুমি কিছু মনে করলে না। সত্যি কথা বলবে।

জুলি হাসল। না আমি কিছুই মনে করিনি। তবে আমার মনে হয় ওয়েসলি আমার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন।

গেরিজ ভরসা দিল, দেখিয়েছেন বই কি। মুখে না বললেও কান খাড়া করে শুনছিলেন।

জুলি হাসতে হাসতে বাসন ধুতে লাগল।

গেরিজ বলল, মিঃ ওয়েসলি এখন ডিক্টাফোনে কথা বলছেন। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। কিছু মনে করনি তো?

—না।

—চমৎকার! এখানে থাকতে কেমন লাগছে?

—তেমন ভাল নয়, জুলি সত্যি কথা বলল।

—মিসেস ওয়েসলি নিশ্চয় তামাসাগুলো করেছেন?

—হ্যাঁ।

—সেই নকল সাপ, আলমারীতে পুরে বন্ধ করে দেওয়া।

জুলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন করে জানলে?

—সকলের সঙ্গেই করেন। আমার সঙ্গেও এই বদরসিকতা করেছিলেন। আমি ঐ হতভাগা আলমারীতে দশ মিনিট বন্দী ছিলাম। ভেবেছিলাম মরে যাব।

জুলি দৃঢ়গলায় বলল, এখানে ঐ বিপজ্জনক মহিলার সঙ্গে আমার বেশীদিন থাকার ইচ্ছে নেই।

—না না, থাক। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে দেখবে, মিসেস ওয়েসলি চমৎকার মহিলা। কিছুদিন বাদে উনি আর খোঁচাখুচি করবেন না। এই তো, এখন আমাকে আর বিরক্ত করেন না। তোমারও ওয়েসলিকে ভাল লাগবে।

জুলি হেলান দিয়ে দাঁড়াল। গেরিজের মুখ থেকে সমস্ত গল্প শোনার জন্যে ওর মন বেশ তৈরী।

—ভদ্রলোক টাকা দিয়ে মহিলাকে বিদায় করে দেননা কেন?

—ওঁর টাকা নেই বলে। এখন পাইলটদের বদলে যে যন্ত্র দিয়ে প্লেন চালানো হয়, অর্ধেক সময়ে, অর্ধেক খরচে, সেটি তৈরী করবার জন্যে ওয়েসলি একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টার রিসার্চের জন্যে উনি কানাকড়িটিও লাগিয়ে বসে আছেন। মিসেস ওয়েসলি একথা খুব ভালভাবেই জানেন যে উনি কিছুতেই টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় করে দিতে পারবেন না।

জুলি শুনে অবাক হয়ে বলল, কি ভয়ানক অবস্থা! তার ওপর আবার উনি অন্ধ।

—হ্যাঁ, গেরিজ মাথা নাড়ল, এ সপ্তাহে ওনার একটা বড় আশায় ঘা খেলেন উনি। একজন ফরাসী স্পেশালিস্ট ডাক্তার ওনাকে আশা দিয়েছিলেন, তিনি ওঁর চোখ অপারেশন করে ভাল করতে পারবেন। তাই আমরা প্যারিসে গিয়েছিলাম।

ঘড়ির দিকে চেয়ে শিস্ দিয়ে গেরিজ বলে উঠল, আমি যাই। বলেছিলাম শুধু পাঁচ মিনিট দেরি হবে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

পরে, জুলি যখন শুয়ে পড়েছে কানে এল গেরিজ হেঁকে বলছে, 'গুডনাইট!' চমকে উঠল ও. মনে ভাবল তাকেই ডেকে বলছে গেরিজ। গেরিজকে তার ভাল লেগেছে। তারপর বুঝল

ও ওয়েসলির সঙ্গে কথা বলে চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। জুলির হঠাৎ মনে হল এই ফ্ল্যাটে ও আর ওয়েসলি ছাড়া কেউ নেই।

ওয়েসলি লোকটা বেশ ভাল। জুলি ভাবল চিন্তার কিছু নেই। ওই জায়গায় যদি বেনটন থাকত আজ, তাহলে জুলি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত।

জুলির ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কাঁচ ভাঙার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যেতে ও লাফিয়ে ড্রেসিং গাউনটা চড়াল।

ওর ভয় হল ওয়েসলির হয়ত কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। প্যাসেজ দিয়ে ওয়েসলির ঘরে কান পাততে ঘরে মানুষের নড়াচড়ার আওয়াজ পেল। ও ধাক্কা দিল।

—কে ওখানে? ওঃ! ভেতরে এস জুলি, ওয়েসলি বলল।

জুলি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল পরনে ড্রেসিংগাউন ও পায়জামা পরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়েসলি। এখনো চোখে সেই ভারী, কালো চশমা। জুলির মনে হল ওটা তো খুলে ফেলতে পারেন। আর পায়ের কছে ভাঙাচোরা কাঁচের পাত্র ছড়ানো। কার্পেটটি ভিজে গেছে।

—হ্যালো জুলি! ওয়েসলির মুখে হাসি, আমাকে উদ্ধার করতে এসেছো?

—আমি শুনতে পেলাম...কথা বলতে গিয়ে ওয়েসলির হাত থেকে রক্ত পড়তে দেখে জুলি বলল, একি, আপনার হাত কেটে গেছে?

—হতভাগা পাত্রটা হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল। পরিষ্কার করতে গিয়ে আঙুলে কাঁচের টুকরো বিঁধে গেল।

—আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি। ওয়েসলিকে সাহায্য করতে পেরে জুলি মনে মনে খুশী হলো। তাড়াতাড়ি ব্লানশের বাথরুম থেকে ফার্স্ট এইডের বাক্স নিয়ে এসে বলল, বসুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ। চারদিক হাতড়িয়ে ওয়েসলি বিড়বিড় করে বললেন, আঃ, চেয়ারটা কোথায়? আমি সব কেমন গণ্ডগোল করে ফেলেছি।

জুলি ওর হাত ধরে ওকে চেয়ারের কাছে নিয়ে এল।

বসতে বসতে ওয়েসলি বললেন, এত অসহায় হওয়া বিশ্রী ব্যাপার। তুমি এসে না পড়লে কি যে করতাম, জানি না।

জুলি কি বলবে ভেবে পেল না। খানিকক্ষণ আড়ষ্টতার পর ওয়েসলির আঙুলের রক্তটা মুছিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। বলল, এর ওপর দিয়ে আঙুল ঢাকা পরিয়ে দিই, তাহলে আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।

—খুব ভাল কথা। অনেক উপকার করলে। তুমি ঘুমিয়েছিলে নাকি?

—না, একটা নরম চামড়ার আঙুল ঢাকা ব্যান্ডের ওপর দিয়ে পরাল জুলি, ওয়েসলির কব্জি ঘিরে টেপটা বাঁধল। জিজ্ঞেস করল, এতে একটু আরাম বোধ হচ্ছে কি?

—চমৎকার। ওয়েসলি আঙুলটা ভাঁজ করে মুড়ে দেখলেন। বললেন, জায়গাটা আমি কি ভয়ানক নোংরা করে ফেলেছি।

—না, না। ঠিক আছে, আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

জুলি ঝাড়ু আর ময়লা তোলার বাসন এনে কাঁচগুলো তুলে কার্পেটের ভিজে দাগ মুছে নিল।

—এখন সব পরিষ্কার করে দিয়েছি। আর কিছু করতে পাবি কি?

হঠাৎ ওয়েসলির একটা প্রশ্নে জুলি চমকে উঠল, জুলি তোমার বয়স কত?

—একুশ। একটু ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিল।

—দেখতে সুন্দর?

—আমি জানি না, জুলি একটু লজ্জা পেল।

—গেরিজ বলছিল তুমি নাকি দেখতে সুন্দর। গেরিজ এ সব ভাল বোঝে। আমার হঠাৎ মনে হল তোমার সঙ্গে একা থাকা ঠিক নয়। মিসেস ওয়েসলি এতে খুশী হবেন না।

ওয়েসলি ড্রেসিং-গাউনের কোমরের দড়িটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, এখন আবার ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার হয়তো তাই করা উচিত, কিন্তু আমি আর পারছি না। যাই

হোক, আমি যে রাতে এখানে ছিলাম একথা আমি ওকে বলব না। তুমিও না বললে খুশী হবো।

—না কিছু বলব না আমি। জুলি তখনই ভেবে নিল ব্লানশ একথা ঘুণাক্ষরে টের পেলে চরম নোংরামি করবে।

—ধন্যবাদ, এ একটা বাজে ব্যাপার বটে। কিন্তু কি আর করা যায়। যাও শুয়ে পড়। ওয়েসলি বলল।

—আর কিছু করবার নেই তো?

—জুলি যাবার আগে আমাকে একটা কথা বলবে? ওয়েসলি হেসে বললেন, আমি যখন ছিলাম না, এখানে মিঃ হিউ বেনটন এসেছিলেন কি? আমার পার্টনার?

জুলির মুখ দিয়ে 'হ্যাঁ' বেরিয়ে এসেছিল প্রায়। কিন্তু ওয়েসলির বসে থাকার ভঙ্গি, হাতের নড়াচড়া যেন ওকে সাবধান করে দিল। এখন গভীর লজ্জায় ওর মনে পড়ল মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ও বেনটনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

—না। এই মিথ্যেটা বলতে ওর নিজের ওপর ঘেন্না হল। বলল, কেউ আসেনি।

—আচ্ছা। ওয়েসলি ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন, ঠিক আছে, শুভরাত্রি জুলি। বাতিটা নিবিয়ে দিও। আমার আলোর দরকার নেই।

এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে উনি একা বসে আছেন, জুলি চলে যাচ্ছে, এ যেন কিরকম। ভাবলে মন বিষ হয়ে ওঠে।

হ্যারি গ্লেব সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা অস্বাভাবিক রকম জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ধারালো গলায় বলল, আমার ওপর চেঁচিয়ে লাভ নেই। জুলি থাকবে না বলেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কোন লাভ হয়নি। ও কাল কাজ ছেড়ে দেবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে শক্ত শীতল মুখে তাকিয়ে দেখলো।

—ওকে রাজী করাতেই হবে। ও বাড়িতে আর একটা মেয়ে ঢোকানোর সুযোগ আমরা পাবনা। জুলি যদি কাজ ছেড়ে দেয়, আমরা গেছি।

হ্যারি অসহায় ভাবে বলল, আমি তো যা করার করেছি। এখন ও যদি কাজ ছেড়ে দিতে চায়, তবে আমি ওকে থাকতে বাধ্য করতে পারি না। পারি কি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ রুক্ষ গলায় বললেন, তুমি বড় নরম মনের মানুষ। তোমার উচিত ছিল কুত্তীটার ঘাড় ধরে রামধোলাই দেওয়া। ও তাই চাইছে। ঠিক মত ম্যানেজ করতে পারলে তুমি যা বলতে ও তাই করত।

হ্যারির বিরক্তি ভরা মুখ।

—আমি মেয়েছেলেদের মেরে ও সব চাইছি না। আমাদের অন্য উপায় ভেবে বের করতে হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেঁকি কুকুরের মত ঘ্যাঁক করে বললেন, আমাদের আর কিছু করার নেই তা তোমার মাথায় ঢুকছে না? আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।

—না। তাতে লাভ হবে না। জ্বালিও না ওকে। হ্যারি খ্যাঁক করে উঠল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি ওকে দেখে গলে পড়ছ না তো হ্যারি?

হ্যারি চায় না মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে সন্দেহ করুক। ওর নিরাপত্তার দিক থেকে ভাবলে উনি ওর বিষয়ে বড় বেশী জেনে ফেলেছেন। তাই ওঁকে ভয় পায় হ্যারি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ আসা করছেন হ্যারি ওঁর মেয়ে ডানাকে বিয়ে করবে। উনি যদি এখন সন্দেহ করে বসেন যে হ্যারি জুলির প্রেমে পড়েছে তাহলে ঝামেলা পাকিয়ে ওকে পুলিসের হাতে তুলে দিতেও কসুর করবেন না।

—ছেঁড়া কথা বলো না, হ্যারি বলল, ও আমার কাছে কিছুই নয়, আমি শুধু কোনরকম মারধোর চাই না। তুমিও তা জান!

মিসেস ফ্রেঞ্চ বলল, মারধোরের দরকার পড়বে না। আমি শুধু ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে একটু ভয় দেখাতে চাই, বাস্, ওই পর্যন্তই। তাহলেই ও সমঝে যাবে।

প্রস্তাবটা হ্যারির মনোমত হল না, আবার প্রতিবাদও করতে পারল না।

—ঠিক আছে, তবে ওর গায়ে হাত দেবে না কিন্তু। সাবধান করে দিচ্ছি, আমি সহ্য করব না।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কাটছাঁট গলায় বললেন, বেশ! তুমি এখন কেটে পড় দেখি। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব। কাজটা হাসিল করতে আমাদের যেমন প্ল্যান ছিল তেমনি হবে, ওকে যা বলা হবে ও তাই করবে।

—ঠিক আছে। ওর অস্বস্তি হতে থাকল। ও দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, কিন্তু মনে থাকে যা বললাম, ওর গায়ে হাত দিও না।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কোন জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবতেই থাকলেন। তারপর টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

থিও টেলিফোন ধরল।

—কে? থিও নাকি? কাঁদুনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

—এখনি চলে এস। একটা কাজ করতে হবে। কড়া গলায় হুকুম দিলেন ফ্রেঞ্চ।

—হল কি? রাত হয়েছে। আমি ঘুমতে যাচ্ছিলাম।

—হ্যারি ওই হল্যান্ড মেয়েটার সঙ্গে বেড়িয়েছে। মেয়েটা বেগড়বাই করছে। আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

—ও এই কথা? থিও রীতিমত খুশী হল, এটা কাজ নয়, এ হল আরাম করা। আমি এখনি আসছি। ও রিসিভার রেখে দিল।

থিও পার্কওয়ের উল্টোদিকের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। মুখের স্যাঁতসেঁতে সিগারেটের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে বলে থিওর একটা চোখ কুঁচকে আছে।

নটা বাজতে ক-মিনিট বাকি। পথের এদিকটায় লোকজন বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে বাস যাচ্ছে। রোদে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছে থিওর। জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই পথের কোণে দাঁড়িয়ে শরীরকে আরামে রেখে, কোন কিছু না করে কাটিয়ে দিয়েছে। সে কোনরকম নড়াচড়াও অপছন্দ করে। গেরিজ পার্কওয়ে থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। ওয়েসলি কিছুক্ষণ বাদে দারোয়ানের সাহায্য নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। গাড়িটা চলে যেতে থিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন ওকে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।

সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে পার্কওয়ের বিশাল হলঘরে ও ঢুকতেই দারোয়ান আফিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওকে তাকিয়ে দেখল।

—কি চাই? দারোয়ানের গলায় সন্দেহ।

—আমার বোনকে দেখতে যাচ্ছি। ৯৭ নম্বর ফ্ল্যাটের চাকরাণী। কোন আপত্তি আছে?

দারোয়ানের সন্দেহ ভাঙাতে থিও আরও বলল,

—আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তো ফোন কর। বল ওর ভাই হ্যারি দেখা করতে এসেছে।

দারোয়ান খচ্‌খচ্ করে উঠল, আমায় কি করতে হবে বাতলাতে হবে না। মিসেস ওয়েসলি পছন্দ করবেন না।

—তাঁকেও বল। থিও হেসে বলল, সবাইকে বল। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দাও। গাবাতে থাকো দোস্ত, আমার তাড়া নেই, মনের সুখে যা করার কর।

দারোয়ান বুঝল ও বোকামি করছে। বলল, তাড়াতাড়ি যাও তবে। গিয়ে দেখা করে এসো। বেশিক্ষণ থেক না। তোমার মত মাল এখানে দেখতে চাই না আমি।

—ভাবিনি তুমি চাইবে। সেইজন্যই এলাম।

থিও অটোমেটিক লিফটের কাছে গেল, দরজা খুলে ঢুকল, দরজা বন্ধ করে চারতলার বোতাম টিপল।

লিফটের গায়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবল। ঝটপট কাজ সারতে হবে নইলে বুড়োটা দেখতে

আসবে কি হলো। সাতানব্বই নম্বর ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজিয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল।

জুলি দরজা খুলল।

—এই যে ময়না। থিও ওর হাতের চেটো দিয়ে চিবুকের নিচে একটা নিদারুণ ঠেলা মারল। জুলি ঘুরতে ঘুরতে ভেতরে গিয়ে পড়ল। থিও ঘরে ঢুকে ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, কেঁই কেঁই কোর না। মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আসছি।

জুলি পিছিয়ে গেল। দেখল সামনে একটা বেঁটে, চৌকো, এলোমেলো কালো চুল কোটের কলারে ঠেকেছে, গোল মুখটা ক্ষতবিক্ষত, চোখগুলো কাছাকাছি, ঘোঁটপাকানো, নিষ্ঠুর একটা পৈশাচিক চেহারা।

—উত্তেজিত হয়ো না ময়না। থিও হেসে বলল, ভেতরে চলো। আমি বসতে চাই না, ক্লান্ত।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জুলি থিওকে নিয়ে লাউঞ্জে গেল।

—দিব্যি খাসা, তাই না? এরকম জায়গা ছেড়ে যেতেও মন চায়, অ্যাঁ। জুলিকে দেখল ও, তারপর বলল, তুমি ছেড়ে দিতে চাইছ, তাই না?

জুলি ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি যাবই। কেউ আটকাতে পারবে না আমায়।

—আমি পারব। কাছে বস ময়না। আমরা কথা কইব। থিও ইজিচিয়ারে বসতে বসতে বলল।

জুলি টেলিফোনের দিকে ছুটে যেতে থিও ওকে পাকড়ে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। জুলি মুখ হাঁ করতে অমনি ওর মুখে চড় মারল। ভয়ে ও যন্ত্রণায় ওর গলা থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ বেরোল।

—এরপর আমার হাতের ঘুষি খাবে। ব্যাপার কি? ধোলাই খেতে চাও?

জুলি অসহায় ভাবে কাঁদতে লাগল। ও আর কোন ঝামেলা পাকাবে না নিশ্চিত জেনে থিও বসল। বলল, তোমাকে এ কাজের শেষ অব্দি দেখতে হবে, নইলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে জেনে রেখো। আমি তোমার কোন যুক্তি শুনতে চাই না।

—না! জুলি ফুঁপিয়ে উঠল, আমি পুলিশকে বলে দেব। আমি একাজ করতে চাই না।

থিও হাসল। বলল, তাই ভাবছ বুঝি! পকেট থেকে স্যাঁতসেঁতে ব্যাগ বের করে ও তিনটে ময়লা ফটো বের করল, দেখ এগুলো। পুলিশের ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ঝেড়েছি। সত্যি ছবি, দেখ না, ভাল লাগবে।

জুলি মুখ ফেরাল।

—আমি কিছু দেখব না। ও উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বলল, তুমি যদি না যাও...

থিও ঝুঁকে পড়ে বলল, আবার ধোলাই খেতে সাধ হয়েছে, হাবা ছুঁড়ি? ছবিগুলো দেখবি, নাকি ছাতু করবো তোকে?

থিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোল্ ওগুলো দেখ, আমি তোকে দুবার বলব না।

ধীরে ধীরে ছবিগুলো তুলে দেখে জুলির মুখ ভয়ে বেঁকে গেল।

থিও বলল, ভিট্রিঅলের খেলা। দেখে মনে হয় সত্যি দেখছি। এটার নাম এমি পারসন্স। মাগী বেশ্যা। একটা নিগ্রো ওর এই অবস্থা করে। অ্যাসিড খাবার আগে মাগী দেখতে মন্দ ছিল না। দেখ্, দেখতে থাক। ও মাগীটা এডিথ ল'সন। আরেকজনের খদ্দের ভাগাতে গিয়ে মুখে অ্যাসিড খায়। আর এই মাগীটা লেস্টার স্কোয়ারে একটা কাফেতে কাজ করত তবে গাবাত বড্ড বেশী। একদিন এক খদ্দের এসে কফি চাইল, যেমনি দিতে যাবে মুখে ঝাড় খেল অ্যাসিড। আর এইটে দেখছো ভিট্রিঅলে ওকে ডুবিয়ে ছেড়েছে? দেখতে খাশা ছিল মাগীটা। শোন ময়না, পুলিস জানেও না একাজ কে করেছে। তুমি যদি ঠিক দানের পিঠে ঠিক দান না খেল তবে তোমাকেও অ্যাসিড ঝাড়া হবে!

কাঁপতে কাঁপতে ছবিগুলো দেখে জুলির শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল।

থিও ওর ঘাড়ে টোকা দিল।

—দেখ, এই যে মাল। তর্জন আর বুড়ো আঙুলে একটা ছোট শিশি ধরে বলল, নিয়ে বেড়াই জানলে? ভেবনা পালিয়ে বাঁচবে, আমি মানুষকে খুঁজে বের করতে বেজায় ওস্তাদ। এখন থেকে তোমার একটা চালে ভুল দেখব, অ্যাসিড ঝাড়ব। মুখটি বুঁজে যা বলা হল কর, বেঁচে যাবে।

আমরা যা পছন্দ করি না তেমন একটা ঝামেলা পাকালে, ব্যস রূপের দশা খতম। বুঝেছো?

—হ্যাঁ।

আর কোন বেলেল্লাপনা না করে বুধবারের মধ্যে আমাদের জানাবে আলমারী কেমন করে খোলে। কোন ছুতো করলে আবার এসে ধোলাই দেব। বুধবার আটটায় মে ফেয়ার স্ট্রীটের অফিসে খবর পৌঁছানো চাই। না গেলে পস্তাবে। বুঝলে?

—হ্যাঁ।

—বেশ। বাথরুমটা কোথায়?

—ওইদিকে। জুলির মাথা কাজ করছে না ও কেন বাথরুমের খোঁজ করছে।

—চল সেখানে।

—না...

—ময়না, এই না বলার অভ্যেস তোমাকে ছাড়তে হবে। নইলে বিপদে পড়বে। চল।

জুলি বুঝতে পারছিল ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে এখন, কিন্তু ওর কিছু করার ছিল না। প্যাসেজ দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে ও বাথরুম দেখিয়ে দিল।

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে থিও বলল, খাসা! এমন বাথরুম সাফ রেখেও সুখ আছে। বেশ ময়না বাথটবের পাশে দাঁড়াও। জুলি কুঁকড়ে সরে গেল।

—আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও। যা বলবে তাই করব। শুধু আমাকে ছুঁয়ো না।

—বোকা ছুঁড়ির মতো কোর না। আমার টাইমের তিনঘণ্টা আগে তুমি আমায় বিছানা ছাড়িয়ে আমার সকালটা মাটি করেছ। কোন মাগী আমার সঙ্গে এরকম করে না।

—দয়া করে...

—আর তুমি—কথাটা এত অশ্লীল যে জুলি থমকে গেল।

—দেখ না কেমন লাগে। ওর মুখের দিকে ঘুষি ছুঁড়ল। জুলি দু-হাতে মুখ ঢাকতে থিও দারুণ জোরে ওর পেটে ঘুঁষি চালাল।

থিও হেসে বলল, সুন্দর কার্পেটটা নষ্ট করবে আশা করি নি।

জুলি মেঝেতে ভেঙে পড়ে বমি করতে লাগল, থিও বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বিকেল তিনটেয় হ্যারি সেই বেঞ্চটাতেই বসল যেটায় থিও সকালে বসেছিল। অধীর আগ্রহে ওয়েসলির বাড়ির জানলার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল, জুলি এলো না। পৌনে চারটেয় ও রেগে গেল। উদ্বেগও হল।

অস্বস্তিতে ভাবল, কি হলো ওর? ও নিশ্চয়ই অপেক্ষা না করেই চলে যায় নি?

আরো পাঁচমিনিট দেখে ও কাছের একটা বুথ থেকে ওয়েসলির ফ্ল্যাটে ফোন করে কোন জবাব পেল না।

এবার হ্যারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবল কোন্ চুলোয় গেল? বোবা জানলাগুলোর দিকে আবার তাকালো।

—ওখানে গিয়ে খোঁজ করার অনেক বিপদ। কিছুক্ষণ কিছু ভেবে না পেয়ে মনে আশঙ্কা হলো মিসেস ফ্রেঞ্চ জুলিকে কিছু করে বসেনি তো? এখানে দাঁড়িয়ে সাতকাহন ভেবে কি হবে। একটা ট্যাক্সি ধরল ও, চেলসীর ঠিকানা বলল। যদি ওরা জুলির কোন ক্ষতি করে হ্যারি ওদের টের পাওয়াবে মজা। জুলি এখন ওর।

ওঁদের ছিমছাম ফ্ল্যাটে মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ডানা যাচ্ছিলেন। হ্যারি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলো

—ডানা উঠে এলো।

—একি হ্যারি? আমি তো জানতাম না তুমি আসবে?

হ্যারি ওকে পেরিয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে রাগ ফেটে পড়ছে।

রুক্ষ গলায় হ্যারি বলল, জুলির আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এলো না। ফ্ল্যাটে ফোন করলাম, কেউ ধরল না। জুলির কি হয়েছে? তুমি কিছু বলতে পারো?

মিসেস ফ্রেঞ্চ পাথরের মতো স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

—হ্যারি তুমি যথারীতি গবেটের মতো করছো। ওর কি হলো না হলো তাতে তোমার কি এসে যায়?

অনেক চেষ্টায় হ্যারি নিজেকে সামলে রেখে ভাবল, কিছুতেই এদের জানতে দেওয়া চলবে না জুলিকে ও ভালবাসে। কাজটা হোক, তারপর টাকাটা হাতে পেয়ে এই দুজনকে বোঝাবে ওদের ধারণা সত্যি।

ও কাটাকাটা গলায় বলল, তুমি কি বলতে চাইছ আমি জানি না। সে আমাদের হয়ে কাজ করছে। আমি ওর ওপর চোখ রেখেছি। এখন ও উধাও হয়ে গেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, কাল রাতে তুমি বললে ও আমাদের হয়ে কাজ করছে না। আমার মনে হয় তুমি ওকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করছ হ্যারি। এটা ডানার ওপর সুবিচার হচ্ছে না।

হ্যারি ওঁর দিকে জলন্ত চোখে চাইল।

ডানা ওর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ও তোমার কাছে বিশেষ কিছু কি?

—না। কিন্তু আমি জানতে চাই ওর কি হয়েছে?

মিসেস ফ্রেঞ্চ হেসে বললেন, ঠিক আছে শোন। আজ সকালে আমি থিওকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ওদের কথাবার্তার পর জুলি এখন মত বদলেছে। তাই নিয়ে বোধহয় মুখগোমড়া করে বসে আছে এখন।

—থিও! তুমি ওই নরকের ইঁদুরটাকে পাঠিয়েছিলে?

—কেন পাঠাব না? তুমিই তো বললে ভয়ানক বেগড়বাই করছে।

—থিও! অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলে বলল, ও ওর গায়ে হাত দিয়েছিল?

—হঠাৎ এত কৌতূহল কেন? আমি তো শুনলাম তুমি বললে মেয়েটি তোমার কাছে তেমন কিছু নয়।

হ্যারি একবার মিসেস ফ্রেঞ্চের দিকে তারপর ডানার দিকে তাকিয়ে দরজাটা আছড়ে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

ডানা ওর পেছনে যাচ্ছিল। কিন্তু মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে আটকে বললেন, শীগগির ওর মেয়েটাতে মন ছুটে যাবে। যদি না ছোটে তবে কাজটা হাসিল হলেই আমি মেয়েটাকে নিকেশ করে দেব। বোকার মত করিস না। চিন্তা করিস না।

—চুপ কর, বলে ডানা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

* * *

সোমবার সন্ধ্যায় তিতিবিরক্ত মেজাজে ব্লানশ ওয়েসলি বাড়ি ফিরল। ছুটিটা মোটেই জমেনি। বেনটনের মেজাজ কেমন খিঁচড়ে ছিল। ওর কামনার দাবী যেন ফুরোচ্ছিল না, হোটেলটাও নরক। হিউ বেপরোয়া জুয়ো খেলে, আকণ্ঠ ধারে ডুবে আছে। ঐ কঞ্জুষটা যদি ভেবে থাকে সেরা সুখ-সুবিধা ছাড়া শনি-রবিবার ব্লানশের সঙ্গে কাটাবে, তবে সে ভাবনা বেশিদিন নেই।

পার্কওয়ের বিশাল হলঘরে ঢুকে ঠিক করল এখানে, ওর নিজের বাড়িতে কোনরকম বজ্জাতি বরদাস্ত করবে না ও। এখানে যদি ও আগুন চায়, জ্বেলে দিতে হবে। এখানে টোস্টের সঙ্গে ইচ্ছে হলে এক পাউন্ড মাখন চাইলে যোগাড় করে দিতে হবে। কোনরকম ক্রুটি দেখলেই তুলকালাম ঝগড়া বাঁধাবে ও।

কিন্তু যেই দারোয়ান ব্লানশকে দেখল অমনি ও ব্লানশকে দারুণ কায়দায় স্বাগত জানালো। ট্যাক্সিকে ভাড়া দেওয়া হল। চিঠিপত্র যত্ন করে বেঁধে দেওয়া হল। ম্যাজিকের মতো একটা জ্বলন্ত দেশলাই চলে এলো ব্লানশের মুখে ধরা সিগারেটের দিকে।

এই সশ্রদ্ধ, মন ভরানো ব্যবহার পেয়ে ব্লানশ গলে গেল।

হাতের দস্তানা খুলে ব্লানশ বলল, হ্যারিস, ফিরে এসে ভাল লাগছে। দুটো দিন জঘন্য কাটলো। এখানকার খবর কি? কেউ এসেছিল?

দারোয়ান জানে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেই হপ্তায় অন্ততঃ পাঁচ পাউন্ড বখশিস পাওয়া যাবে। ব্লানশ সম্পর্কে ওর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত পিলে চমকানো অশ্লীল। ও বলল শনিবার

রাতে মিঃ ওয়েসলি আর মিঃ গেরিজ ফিরে এসেছিল ম্যাডাম। রবিবার সকালে একটা লোক আপনার চাকরানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ব্লানশ মধুর হেসে, চোখের পাতা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ ওয়েসলি কি এ দুদিন এই ফ্ল্যাটেই ছিলেন?

—না ম্যাডাম, শুধু শনিবার রাতটা।

—মিঃ গেরিজ ওঁর সঙ্গে ছিলেন?

—না ম্যাডাম।

ব্লানশ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

—মিঃ ওয়েসলির কিছু দরকারে দেখার জন্যে আমার চাকরানী ছিল তো? সে ফ্ল্যাট ছেড়ে যায় নি?

—না ম্যাডাম। সে ছিল।

ব্লানশ মহোল্লাসে মাথা নাড়লো। একখানা জব্বর ঝগড়ার মশলা জুটেছে বটে। দারোয়ান ভাবল, গরুটা এ থেকে নিশ্চয় প্রলয় বাধাবে। বাধাক্ গে!

—কে আমার চাকরানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

দারোয়ান মুখটা কাল্‌চে, গোমড়া করে বলল, বলল তো চাকরানীর ভাই হয়, কিন্তু ওকে দেখেই টের পেলাম ছোকরা একদম বাজে টাইপের। ওর চেহারা আমার পছন্দ হয় নি মোটেই।

ব্লানশের হাসি মিলিয়ে গেল। ঝন্‌ঝনে্‌ গলায় বলল, তবে ওকে যেতে দিয়েছিলে কেন? তোমাকে পইপই করে বলে যাইনি ও যেন ফ্ল্যাটে কোন পুরুষ মানুষ না ঢোকায়? এতদিনে নিশ্চয় তুমি বুঝেছো ছুকড়িগুলো বেশ্যার চেয়ে ভাল নয়? তুমি কি চাও আমি যখন থাকব না, তখন আমার ফ্ল্যাট বেশ্যালয় হয়ে ওঠে?

দারোয়ান নিজে বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে ভেবে বলল, কাল সকাল নটায় ছোকরা এসেছিল ম্যাডাম। বেশিক্ষণ থাকে নি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে গেছে। বেশি থাকলে আমি নিশ্চয় ওকে নামিয়ে দিতাম। আমার বিশ্বাস কোনরকম বদমাইশি করার ফুরসতই পায় নি ওরা।

ব্লানশ সোজাসুজি চাইল ওর দিকে।

কাটাকাটা তেতো গলায় বলল, রবিবার সকাল নটায় শনিবার রাত নটার মতই বদমায়েশি করা যায়। আমি যা জেনেছি, এই পাঁকের পোকাগুলোর কয়েক মিনিটেই বজ্জাতি সারতে কিছু অসুবিধা হয় না। ওর ভাই থাকতে পারে আমার বিশ্বাসই হয় না। তুমি চিরকালের মূর্খ, গাধা। মনে হচ্ছে কোন গির্জার কবরখানায় না সেঁধোনো অবধি তুমি গাধাই থেকে যাবে।

—হ্যাঁ ম্যাডাম। দারোয়ান সবিনয়ে মাথা নোয়াল।

সহকারী দারোয়ান মালপত্র নিয়ে লিফটের দিকে গেল।

মূর্তিমতী ক্ষুদ্র একটা ঝড়ের মত ফ্ল্যাটে ঢুকে ব্লানশ প্রাণপণে বেল বাজাতে লাগল।

জুলি ছুটে আসতে ব্লানশ ওকে খুঁটিয়ে দেখল চোখের নীচে কালশিটের দাগ, মুখ ফ্যাকাশে। হবারই কথা, কালরাতে একপলকও ঘুম হয়নি।

জুলি কিছু বলল না।

ব্লানশ হুকুম দিল, ব্র্যান্ডি আন ঝটপট। তোমার চেহারা বিশ্রি হয়েছে।

জুলি এই মুহূর্তটায় ভয়ে কাঁপছে। ও ব্র্যান্ডির বোতল আর গ্লাস এনে দিল। সুটকেশটা তুলে নিল।

ব্লানশ শানিত গলায় বলল, যাবে না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। সামনে এসো, যাতে তোমাকে দেখতে পাই।

ব্র্যান্ডি ঢালল ব্লানশ, আধ বোতল ব্র্যান্ডি নির্জলা খেল, আবার ঢালল, সিগারেট ধরালো।

—এই ছুটিটা কিভাবে কাটালে?

জুলি চোখ নামিয়ে বলল, তেমন কিছু নয় ম্যাডাম, এই সব গোছগাছ করলাম। কিছু সেলাই ছিল।

ব্লানশ ধৈর্য হারিয়ে আঙুল নাচাল।

—সে ছেড়ে দাও। কেউ এসেছিল?

—না ম্যাডাম।

ব্লানশ কটমটিয়ে চাইল।

—বলতে চাও, তুমি ছাড়া এখানে এ-দুদিন আর কেউ আসেনি বা থাকেনি?

একটু ইতস্ততঃ করে বলল জুলি, তাই ঠিক ম্যাডাম।

—আশ্চর্য তো! দারোয়ান বলল, কাল তোমার ভাই এসেছিল?

জুলি তোতলাতে লাগল, আ ..আ .. আমার ভাই? পরে বুঝল থিও নিশ্চয় দারোয়ানকে ভাই পরিচয় দিয়েছিল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ...ম্যাডাম। আমি ভুলে গেছলাম। আমি ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিই নি। বেশিক্ষণ থাকে নি। আপনি নিশ্চয়ই দোষ নেবেন না।

ব্লানশ আয়েশ করে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল। ধারালো গলায় ব্লানশ বলল, আমি মনে করি তুমি মিথ্যে বলছ। আমি বিশ্বাস কবি না তোমাব কোন ভাই আছে বা তুমি তাকে বাডিতে ঢোকাও নি।

জুলি বলল, আমি সত্যি কথা বলছি ম্যাডাম ও বাড়িতে ঢোকে নি। ও জাহাজে কাজ পেয়েছে বিদায় জানাতে এসেছিল।

ব্লানশের চোখে ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে লাগল।

—আচ্ছা! তাই বুঝি।

মনে মনে ভাবল, এ বেশ্যা ছুঁড়িটা দেখছি মহা ঘাগী, তবে ওব সঙ্গে ফয়সালা শেষ কবিনি এখনো।

ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, তোমার ভাই ছাড়া তবে আব কেউ আসে নি?

জুলি ভাবতে লাগলো দারোযান ব্লানশকে কি বলেছে। জুলিকে ওয়েসলি কিছু বলতে বারণ কবেছেন। দাঁড়িযে আমতা আমতা কবতে লাগলো, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

—জবাব দাও।

জুলি ভাবল যা হবাব হবে।

—না, আব কেউ আসেনি ম্যাডাম।

ব্লানশ হাসল।

—মিঃ ওয়েসলি আসেন নি জুলি? ওর গলা রীতিমত মিষ্টি।

জুলি দেখল ও তো সব জেনে ফেলেছে। এখন আমি কি করি?

ব্লানশ ওকে কোন কিছু বলার সুযোগই দিল না। দুরন্ত বাগে জ্বলে উঠল। চেযাব ছেড়ে গজরাতে গজরাতে বলল, এই ব্যাপার অ্যাঁ? জানি অন্ধরা বাছাবাছি কবতে পাবে না। কথাই আছে অন্ধকারে সব বেড়ালই একরঙের কিন্তু ওয়েসলি একটা পথেব শুঁটকো বেড়ালকে পছন্দ করলো?

জুলির কথাগুলো প্রথমে গরম তাবপর ঠাণ্ডা লাগল। ওর তো কিছুই করার নেই। যতক্ষণ না মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে যেতে না বলছে ওকে এখানে থাকতেই হবে। জুলি মরিয়া হয়ে বলে উঠল, আপনি ভুল কবছেন ম্যাডাম।

—ভুল করছি? চেঁচিয়ে কান ফাটিয়ে দিল, কোন্ সাহসে তুমি মিথ্যে কথা বলো? ব্র্যান্ডির গ্লাসটা জুলির দিকে ছুঁড়ল। জুলিকে পেরিয়ে গ্লাসটা দেওয়ালে লেগে ভাঙল।

—বেবিয়ে যাও সামনে থেকে আধ পয়সার বেশ্যা!

জুলি দরজার দিকে ছুটল। আরো কিছু খুঁজতে লাগল ওকে ছুঁড়ে মারবার জন্যে। ওয়েসলি ঢুকছিলেন। ওঁব সঙ্গে জুলির আবেকটু হলে ধাক্কা লাগছিল।

—কি হচ্ছে এখানে? ব্লানশ? কি হচ্ছে?

ব্লানশ চেঁচাতে লাগল, কি হচ্ছে? তোমার আধপয়সার মেয়েমানুষকে বলছি ও কি জাতের মেয়ে।

ওয়েসলি সংযত গলায় বলল, তুমি নিজেকে শান্ত কর ব্লানশ। কি বলছ তা তুমি নিজেই জান না।

—তুমি অস্বীকার করতে পার ঐ ছুঁড়িটার সঙ্গে তুমি রাত কাটাও নি?

—আমি শুধু শনিবার রাতে এখানে ছিলাম। তাতেই তুমি চটেছো?

—তোমরা যদি বদমায়েশি না করে থাকো তো ও কেন বলল, তুমি মোটেই এখানে আসো নি?

—আমিই ওকে এইকথা বলতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার মত নোংরা, সংকীর্ণ মনের মানুষকে ও কথা বললে একটা বিশ্রী ঝামেলা এড়ানো যাবে। এখন দেখছি আমার ভুল হয়েছিল! খুশি হয়েছ?

ব্লানশ উন্মাদ হয়ে উঠল, সস্তার বদমাশ কোথাকার।

তারপর মারের শব্দ, আসবাব উলটে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

ভয় পেয়ে জুলি ঘরে উঁকি দিল।

ওয়েসলি মুখে হাত ঢাকা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর ব্লানশ ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জ্বলছে। চারদিকে টেবিল, ফুলদানি ভেঙে পড়ে আছে। ওয়েসলি শান্ত গলায় বলল, এবার নিশ্চয় তুমি খুশি হয়েছ?

—না হইনি! অপদার্থ কোথাকার! ব্লানশ ওঁর মুখে আবার চড় মারলো।

ওয়েসলি পিছিয়ে গেলেন।

—যথেষ্ট হয়েছে ব্লানশ। তুমি মাতাল হয়েছ। যাও শুয়ে নেশা কাটাও। তোমায় দেখে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

ব্লানশ চেঁচিয়ে উঠল, আমি তোমায় ঘেন্না করি। চারদিকে খ্যাপার মত চেয়ে ও ফায়ার প্লেসের আগুন খোঁচাবার শিকটা তুলে নিল। চোখে খুনীর মত ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। ব্লানশের এই রূপ দেখে জুলির রক্ত হিম হয়ে গেল। ব্লানশ শিকটা নিয়ে ওয়েসলির দিকে ছুটতেই জুলি চেঁচিয়ে উঠল, সাবধান! ওর হাতে শিক।

ওয়েসলি ব্লানশের পাশ কাটাবার কোন চেষ্টাই করলেন না। জুলি এসে ব্লানশের কবজি চেপে ধরল।

—ওঁর গায়ে হাত দিও না। উনি অন্ধ না? জুলি চেঁচিয়ে উঠলো।

ব্লানশ হাত ছাড়িয়ে জুলির দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন। ওর রাগ চলে গিয়ে পরম উল্লাসে হাসতে লাগলো।

—ওঃ হাওয়ার্ড। এ একেবারে বেজায় রগড়! হাসতে হাসতে ব্লানশ বলল, বোকাটা ভেবেছিল, আমি তোমায় সত্যি মারবো।

জুলি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ব্লানশের পৈশাচিক হাসি বিমূঢ় হয়ে শুনতে লাগল। ওর মুখ সাদা।

ব্লানশ হাসতে হাসতে বলল, পালাও জুলি। ওকে বাঁচাতে হবে না তোমায়। আমি ওকে কখনোই আঘাত করব না।

জুলি ঢোক গিলে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে এমন সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

হিউ বেনটন টুপি আর দস্তানা জুলির হাতে দিয়ে ওকে দেখলো গম্ভীর হয়ে। জিজ্ঞেস করল, মিঃ আর মিসেস ওয়েসলি বাড়িতে আছেন আশা করি? আমি নিজেই যেতে পারবো।

ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে শিকটা, ভাঙা ফুলদানি, কার্পেটে জলের দাগ দেখে ওর হলদে চোখ দুটো ব্লানশের ওপর গিয়ে স্থির হলো।

ব্লানশ হালকা গলায় বলল, এই যে হিউ। এসেছ, ভালই হল। আমি মেজাজ খারাপ করছিলাম।

বেনটন সাবধানে ঘরে ঢুকল, দুঃখের কথা। হ্যালো হাওয়ার্ড। তুমি ফিরেছ? অফিসে ছিলাম না তুমি আসার সময়ে, সেজন্যে দুঃখিত। আমি ব্রাইটনে শনি-রবিবারটা লম্বা ছুটি কাটাচ্ছিলাম।

ওয়েসলি বলল, অফিসে তাই বলল। আশা করি তুমি ভালই কাটিয়েছ?

—মন্দ নয়, ধন্যবাদ। আবহাওয়া সুবিধের ছিল না।

ব্লানশ মধুর গলায় বলল, হিউ, তুমি নিশ্চয় কোন ভাল হোটেলে ছিলে? সস্তার হোটেলগুলো এত বাজে, আগুন থাকে না। ব্র্যান্ডি থাকে না, মাখন দেয় না। জঘন্য।

বেনটন ঘরে পায়চারি করতে করতে বলল, জানি তুমি কি বলছ। তবে এখন সময়টা খুব

কঠিন, সময়টা ভাল নয়।

ব্লানশ হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলো, জুলি! জুলি কোথায় গেল। এগুলো সাফ করে ফেল এখনি।

জুলি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে লাগল, স্পষ্ট বুঝল বেনটন কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

ওয়েসলি হঠাৎ বললেন, একটু মদ খাও হিউ। আজ রাতে আমি বেরোচ্ছি না, বাড়িতেই কাজ করব।

বেনটন বলল, বেজায় আফশোষ! আমি ভাবছিলাম তোমরা দু-জন আমার ক্লাবে ডিনার খাবে কি না। আমি একটা হুইস্কি খেতে পারি। কি, মত বদলাবে না কি?

ওয়েসলি সাইডবোর্ডের দিকে যেতেই ব্লান্‌শ বলল, আমায় ব্র্যান্ডি দিও ডার্লিং। হিউ, তোমার ক্লাবে ডিনার খেতে আমার ভাল লাগবে। কি সুন্দর পুরনো ধাঁচের ক্লাবটা। চল না হাওয়ার্ড।

ওয়েসলি আস্তে বললেন, আমার কাজ আছে।

ব্লানশ বলল, তবে তোমাকে ছাড়াই যাব। আমি এখানে সারাদিন বন্ধ থাকবো না কি?

—যা ইচ্ছে। ওয়েসলি দুটো গ্লাস নিয়ে এলেন।

ব্লানশ গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বেনটনকে দিল।

বেনটন বলল, ঠিক আছে, পরে কখনো হবে'খন।

—কিন্তু আমি তোমার পুরোন ক্লাবে যেতে চাই বেনটন। হাওয়ার্ড কোথাও যেতে চায় না।

—বেশ হাওয়ার্ড যদি কিছু মনে না করে।

—কেন মনে করবো? ওয়েসলি হাতড়ে হাতড়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

জুলি কাঁচের টুকরোগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়লো দরজার বাইরে। ওর হৃদপিন্ডের স্পন্দন যেন থেমে গেল। শুনল বেনটন বলছে, ব্লানশ! তোমার ওই আশ্চর্য আলমারীর কথা আজ স্ট্যান্ডার্ড কাগজে পড়ছিলাম। লিখেছে ওটা নাকি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ঐ আলমারীটা আমি কখনো দেখিনি। তুমি কোনরকম রহস্য না করে ওটা আমাকে দেখাবে? আমি কথা দিচ্ছি আমি চোর নই।

দেওয়ালে লেপটে জুলি শুনতে লাগল।

ব্লানশ বলল, নিশ্চয় দেখাব। আমি ভাবিনি ওটা তুমি দেখতে চাইবে। বেশ মজার জিনিষ। জুলিকে সেদিন আটকে দিয়েছিলাম ওর ভেতরে। ব্লানশ হাসল।

—কেন ও কাজ করেছিলে? ওয়েসলির শানিত গলা।

—তামাশা করে। দেখছিলাম ও কি করে। নেকি মূর্ছা গেল।

ওয়েসলি বললেন, কাজটা কি ভাল হয়েছিল? বিপজ্জনকও বটে।

ব্লানশ অবহেলায় বলল, ও তো আর নালিশ করতে আসেনি। আমার ইচ্ছে হলে তামাশা করব। ওর ভাল না লাগলে কাজ ছেড়ে দিতে পারে।

বেনটন মিঠে গলায় বলল, আজকাল তো চাকরাণী মেলা কঠিন। ওকে তো বেশ কাজের বলেই মনে হয়।

—দেখতে ফুটফুটিটি আর সস্তার মেম আছে। সেইজন্যে দেখছি তুমি আর হাওয়ার্ড সর্বদা ওর হয়ে ওকালতি করছো। ব্লানশ ধারালো গলায় বলল, হাওয়ার্ড তো এমনই মজেছে কাল রাতে চোরের মত এসে ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

ঘরে সহসা নীরবতা নেমে এলো।

অস্বস্তি কাটাতে বেনটন বলল, না ব্লানশ!

তীক্ষ্ণ গলায় ব্লানশ বলল, আমি বলছি না কিছু হয়েছে। আর হাওয়ার্ডের সে বয়সও নেই। তবে জুলি ওর পেছু নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ওয়েসলি রেগে বলল, আমরা কি এ প্রসঙ্গ থামাব ব্লানশ? একদিনের পক্ষে যথেষ্ট আজেবাজে কথা হয়েছে। আমার মনে হয় না এটা তামাশা হিসেবেও উচ্চস্তরের।

বেনটন তাড়াতাড়ি বলল, চল না আলমারীটা দেখি। ঝগড়া বাঁধার আগেই ওর এই অছিলা, দেখতে দেবে আমায়? আমি কারুকে বলতে যাবো না ওটা কেমন করে খোলে।

ওয়েসলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, সে ব্লানশ জানে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে কম্বিনেশানটা আমরা দুজন ছাড়া কেউ জানবে না।

—ওঃ, তা যদি হয়...।

ব্লানশ বলে উঠলো, একবারেই নয়। ও নিশ্চয়ই দেখবে। হিউয়ের কাছে আমাদের গোপন কিছু নেই, আছে কি?

ওয়েসলি বলল, দেখাতে চাও, দেখাও।

বেনটনের গলায় একটা ব্যাঙ্গের সুর, আমি ধন্য হলাম। আগে ড্রিঙ্কটা শেষ করি, তারপর দেখাবে।

ব্লানশ খিলখিলিয়ে হেসে বলল, আমরা সবাই যাব। আলমারীটা আমার শোবার ঘরে। হাওয়ার্ডই বলতে পারবে ওটা কেমন করে খুলতে, বন্ধ করতে হয়।

জুলি এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি ব্লানশের ঘরে গেল। কোথায় লুকোবে? কাবার্ডে? না ওখানে লুকিয়ে লাভ নেই। বিছানার নিচে। না বিপদ আছে। তাহলে জানলার সামনে পর্দার আড়ালে। জুলি ছুটে গিয়ে পর্দার ফাঁকে ঢুকে পর্দা টেনে দম আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট বাদে আলো জ্বলল। জুলি পর্দার জোড়ের সরু ফাঁকে চোখ রেখে সব দেখতে পেল।

ব্লানশ আর বেনটন দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে। ওয়েসলি একটা ইজিচেয়ারে বসলেন।

ব্লানশ বলল, এই যে আলমারীটা এই দেওয়ালের পেছনে। আমি এই স্প্রিংটা ছুঁলে দেওয়ালটা সরে যাবে পাশের দিকে। এটা হাওয়ার্ডের বুদ্ধিতে তৈরী। সমস্ত জিনিষটা ও নিজে তৈরী করেছে। অন্ধ হবার আগে ও সব কিছু নিজের হাতে করতে পারতো। এমনই বুদ্ধি ছিল ওর।

ধাতব হাসি হাসল ব্লানশ। সে হাসি শুনে জুলি শিউরে উঠলো। ব্লানশ বেনটনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, একটা লুকোনো পয়েন্টার আছে। সেটা একটা বিশেষ নম্বরে ঢুকিয়ে দিলে তবে স্প্রিংটা কাজ করবে, নইলে নয়।

ওয়েসলি জিজ্ঞেস করল, অ্যালার্ম বন্ধ করেছো?

—না, ওটা ভুললে চলবে না। ব্লানশ বেনটনের দিকে চাইল, অ্যালার্ম বন্ধ না করে যদি পয়েন্টারটা ছোঁও, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ফ্ল্যাট পুলিশে ভরে যাবে।

বিছানার কাছে এসে মাথার দিকে হাতড়ে একটা ক্লিক শব্দ হলো। অ্যালার্মের গোপন সুইচটা বন্ধ হলো।

—এখন অ্যালার্ম বন্ধ হলো। ব্লানশ বলল।

—ও তাহলে এমনি করে তোমরা চোর ধর। বলে ব্লানশকে কাছে টেনে নিল। ব্লানশ প্রথমে একটু চমকে হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল ও নিশ্চুপভাবে বসে আছে। ও তখন বেনটনের চুমো নিতে মুখ তুলল।

ব্লানশ বেনটনকে ঠেলে দিয়ে আঙুল তুলে সাবধান করে দিল। জুলি ভাবল উনি ঘরে আছেন, কেমন করে ওরা এ কাজ করছে?

—এই যে পয়েন্টার। দেওয়াল থেকে লেপের খানিকটা আবরণ সরালো, জুলি দেখল ছোট নম্বরের একটা ডায়াল আছে দেওয়ালের গায়ে।

—আমি পয়েন্টারটা তিন নম্বর অব্দি ঘোরালাম, পা দিয়ে নয়টা টিপলাম, দরজা খুলল। দেওয়াল সরে, ইস্পাতের দরজা দেখা গেল।

—খাসা, নিখুঁত কাজ। ও ব্লানশকে ধরতে যেতে ব্লানশ ভুরু কুঁচকে ওকে ঠেলে দিল।

ব্লানশ বলল, এই ইস্পাতের দরজায় আরেকটা অ্যালার্ম আছে। ওটা বন্ধ করে দেবে হাওয়ার্ড। ওয়েসলি উঠে দাঁড়ালেন। ব্লানশ বেনটনকে বললো, সুইচটা বাথরুমে এমনি সুইচেরই মতো।

বেনটন শুনল না। ওয়েসলি হাতড়াতে হাতড়াতে বাথরুমের দিকে যেতেই বেনটন ব্লানশকে জড়িয়ে ধরলো। দুজনে দুজনকে পিষে ফেলতে লাগল। বেনটনের ঠোঁট নেমে এলো ব্লানশের ঠোঁটে। আবেগের উন্মত্ততায় ওরা টেরই পেল না ওয়েসলি ফিরে এসেছে।

ওয়েসলি দাঁড়িয়ে আছেন। জুলি দেখল ওর মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। জুলির মনে হল, উনি

যেন শুনতে পাচ্ছেন ওরা কি রকম জন্তুর মতো আচরণ করছে।

সহসা বেনটনের আলিঙ্গন থেকে ব্লানশ নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ওয়েসলিকে দেখে মুখ বেঁকিয়ে দাঁত বের করল ও।

ওয়েসলি নিরুত্তাপ গলায় বলল, অ্যালার্ম বন্ধ করে দিয়েছি।

ব্লানশ একমুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারলো না, তারপর বলল, হাওয়ার্ডই বলুক চোর ধররার ফাঁদটার কথা।

বেনটন তখন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

—চোর ধরার ফাঁদটা কি? ওর স্খলিত গলার স্বর।

জুলি তীক্ষ্ণ নজরে দেখল, ব্লানশ ইস্পাতের দরজাটার পাশের সুইচটা বন্ধ করলো। হঠাৎ বাতাস বেরিয়ে যাবার মত হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ হল। ঘরের আলো কেঁপে উঠল। দরজাটা খুলে গেল।

ওয়েসলি বললেন, যদি বা কোন চোর এত অব্দি পৌঁছতে পারে, এখনো অব্দি হয় নি, তবু আলমারীতে ঢুকলেই ও বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে দেওয়ালের একদিকে একটা লুকোনো আলো আছে। সেটা আলমারীটার উল্টো দিকের ভেতরে দেওয়ালের গায়ে একটা ফটোজেনিক ইলেকট্রিক সেলে পড়ছে।

বেনটন ঝুকে পড়ে ভেতরটা দেখল।

—তারপর? ব্লানশের দিকে চেয়ে ও ভুরু তুলল। ব্লানশ মাথা নাড়ল।

ওয়েসলি বলে চললেন, ভেতরে কোন লোক ঢুকলেই আলোটা বাধা পায়। ফলে সেলের ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা বইছে সেটা বাধা পায়, ফলে কমে যায়। ফলে ট্রায়োড ভাল্‌বের গ্রিড ভোলটেজ বেড়ে যায়। তার ফলে দরজা বন্ধ করবার জিনিষটায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ এসে ধাক্কা দেয়।

বেনটন বলল, আশ্চর্য বুদ্ধির খেলা। আমি যদি আলমারীতে ঢুকি, তাহলে বন্ধ হয়ে থাকবো?

ওয়েসলি বললেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ না কেউ খুলে দেয়, তুমি দমবন্ধ হয়ে মরবে।

বেনটন অসহায় হাসি হেসে বলল, আমার মনে হয় না আমি সে চেষ্টা করব। দরজাটাকে কন্ট্রোল করার কোন উপায় নিশ্চয় আছে!

—নিশ্চয়। সেলে যে আলোটা পড়ছে সেটা নিবিয়ে দাও। ব্যস, তুমি নিরাপদ!

—কিন্তু এত খুঁটিনাটি, এত বিরাট ব্যাপার করার দরকারটা কি ছিল? খরচও তো প্রচুর লেগেছে এটা বানাতে?

—এটা খেলনা নয়। ওয়েসলি বললেন, ইনস্যুরেন্স থেকে আমি এটা তৈরির খরচ তুলে নেব। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এটা দেখে মুগ্ধ হয়ে ওদের রেট কমিয়ে দেয়। ফারগুলোই তো তিরিশ হাজার পাউন্ডে ইনস্যুরেন্স করা। তাছাড়া ব্লানশের গয়নাগাটি তো আছেই।

বেনটন বলল, সাংঘাতিক জিনিষ! তবে ইনস্যুরেন্সের কথাটা আমি ভেবে দেখি নি। আমায় এটা দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ।

ব্লানশ বলল, এখন তোমার আদ্যিকালের ক্লাবে চল। চল না হাওয়ার্ড?

ওয়েসলি আচমকা বললেন, আমি দুঃখিত। আমার ডিকটেশান দেবার আছে, তুমি যাও।

বেনটন বলল, যদি তাই বল...। যেমন আছো তেমন চলো ব্লানশ, পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই।

ব্লানশ সিল্ক কোটটা হ্যাঙার থেকে টেনে নিয়ে গায়ে পরল।

—আলমারীটা বন্ধ করে দেবে হাওয়ার্ড?

—হ্যাঁ। ওয়েসলির কাটছাঁট গলা।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে ভাবল জুলি। অপেক্ষা করতে লাগল ব্লানশ যদি ওকে খোঁজে। কিন্তু ও তখন বেনটনকে নিয়ে বেজায় মত্ত।

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেয়ে জুলি ধড়ে প্রাণ পেল। এবপর পর্দার ফাঁক দিয়ে যা দেখল তাতে ও দাঁড়িয়ে জমে গেল একেবারে।

দেখল হাওয়ার্ড কালো চশমা খুলে ঘরের মধ্যে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। যেরকম চট্‌পট্‌

উনি আলমারীটা বন্ধ করলেন, জুলি বুঝল উনি অন্ধ নন। ও এত চমকে গেল গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরোল। ওয়েসলি শুনতে পেলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও যেখানটায় লুকিয়ে আছে পর্দার ঐ জায়গাটার দিকে তাকালেন।

এখন জুলি বুঝল চশমা জোড়া ওঁর মুখোশ। চশমা ছাড়া ঝকঝকে একজোড়া চোখ দেখতে পেয়ে ওর ভয় করল।

উনি নিচু গলায় বললেন, তুমি বাইরে আসতে পার জুলি।

ওর স্টাডির বড় ইঁট বাঁধানো ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন হাওয়ার্ড ওয়েসলি। বিভ্রান্ত, বিহ্বল জুলি সামনের একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল।

উনি যে দেখতে পান জুলি একথা জেনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ওনার কথানুযায়ী ওঁর পেছন পেছন স্টাডিতে এসেছে।

যদিও উনি বেশ স্বাভাবিক আছেন তবুও ওঁকে বেশ চিন্তিত, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কেউই কোন কথা বলল না।

হঠাৎ ওয়েসলি বললেন, ভেব না আমি তোমার ওপর রেগে আছি। ভয় পাবার কিচ্ছু নেই।

জুলি মুখ তুলল। ওঁর চোখ দুটো সাংঘাতিক যেন হীরক দীপ্ত চাউনি। যেন ওঁর সমস্ত সত্তা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ঐ চোখদুটোয়।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে ধীর গলায় বললেন, আমার চোখে দৃষ্টি থাকার কথা তুমি কাউকে বলবে না, এমন কি মিসেস ওয়েসলিকেও নয়। আমি কে তা বলতে পারব না। তবে তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি কাউকে কিচ্ছু বলবে না। আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

জুলি অবাক হল যে উনি ওর কাছ থেকে জানতে চাইলেন না পর্দার ওপাশে জুলি কি করছিল। আর তখনি ওর নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এল।

ও বলল, নিশ্চয়ই। আমি কিছু বলব না।

আমার দিকে চাও জুলি।

জুলি মুখ তুলে চাইতে উনি হাসলেন। বললেন, তুমি কি সত্যিই আমাকে কথা দিচ্ছো? এর ওপর আমার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করছে, এটুকুই খালি বলতে পারি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে।

জুলি ভাবল, তাই যদি হয়, তবে আমি কোন না কোন কাজে এটাকে কাজে লাগাতে পারি। হয়তো এজন্যই উনি আমার থেকে জানতে চান নি কেন আমি ওখানে লুকিয়েছিলাম।

—কথা দিচ্ছি। জুলি বলল।

কথা দেওয়ার কি কোন দাম আছে? জুলি দেখবে ঘটনা কোন দিকে যায়, সেইমত কাজ করবে।

—ধন্যবাদ। ওয়েসলি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, তুমি কোন বিপদের মধ্যে আছো, তাই না?

জুলি কিছু বলল না।

—দেখ জুলি, তুমি সব খুলে বল। তুমি যা মনে করছো আমি তার চেয়ে বেশীই জানি। এখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে ঢুকেছো তাই না?

জুলি ভাবল কেমন করে উনি টের পেলেন, আর ওর সম্বন্ধে কতটাই বা জানেন উনি?

—উদ্দেশ্য? কি বলছেন আপনি?

—এটা পড়ে দেখ। কাল এসেছে। ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে ওকে দিলেন।

লেখাটা দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল ও। হিউয়ার্ট ওয়েসলিকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখেছে। পড়ে ওর মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এল ঃ

প্রিয় মহাশয়,

সাবধান হোন। হ্যারি গ্রেব ফার চোর। জুলি হল্যান্ড আর গ্রেব পরস্পরের বন্ধু। চোখ না খোলা রাখলে আপনার ফারগুলো খোয়া যাবে।

[জনৈক বন্ধু]

বুড়ো জন্তুটা বলেছিল শোধ নেবে। ও নিশ্চয়ই জুলির ওপর নজর রেখেছিল।

ওয়েসলি খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, একথা কি সত্যি তুমি আর গ্লেব দুজনেই ফার চুরি করতে চাও?

জুলি এক মুহূর্ত ইতস্তত: করলো। তারপর ওঁকে সমস্ত কথা বলবে ঠিক করল। উনি তো চান জুলি ওঁর গোপন কথা চেপে রাখুক। উনি ওর কোন ক্ষতি করবেন না বলে ভরসা আছে। থিও, ওর সঙ্গে যা ব্যবহার করে গেছে, তার থেকে বাঁচতে ওদের কথা ফাঁস করে দিতে আপত্তি কোথায়? ওদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র সুযোগ!

—ওরা আমাকে বাধ্য করেছে। বলে রুমাল বার করে কান্নার ভান করতে করতে বলল, আপনি জানেন না ওরা কি রকম। আমাকে ভিট্রিয়ল দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছে, মেরে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। আমি একাজ করতে চাইনি।

ওয়েসলি বসলেন।

—এত ভেঙে পড়ো না। গোড়া থেকে শুরু কর। কে এই চিঠি লিখেছে।

রুমালে মুখ ঢেকে জুলি বলল,স্যাম হিউয়ার্ট। আমি ওর হ্যামারস্মিথের কাফেতে চাকরি করতাম। আমি জানতাম ওর কাফে গুণ্ডাদের দেখা করার জায়গা। তবু আমি ওদের হাত এড়িয়ে চলতে পারি নি।

আমি টাকাটা এত চাইছিলাম! আমি কোনদিন অর্থসুখ পাইনি। আপনি জানেন না গরীব হওয়ার কি দুঃখ।

একটা দীর্ঘ বিরতির পর ওয়েসলি বলল, তুমি এরকম কোর না বুঝলে? আমাকে যদি তোমাকে সাহায্য করতেই হয় করবো। তবে আমাকে সবকিছু খোলাখুলি বলতে হবে। এই গ্লেবের সঙ্গে তোমার কি ঐ কাফেতে আলাপ হয়?

—হ্যাঁ।

এবার জুলি ওর দুঃখের কথা বলে গেল। কেমন করে হ্যারি ওর সঙ্গে প্রেম করে, ও বিয়ে করবে বলেছে সে কথা, কেমন করে হ্যারি ওকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল, থিও এখানে এসেছে সে কথা, সব কিছু বলল।

শেষে বলল, আমি জানি আমার এখানে কাজ নেওয়া উচিত হয়নি। মুখটা এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখল যাতে ওয়েসলি ওর কান্নার ভানটা বুঝতে না পারে। বলল, আমি শপথ করে বলছি, আলমারীটা দেখার আগে আমি বুঝিনি, ওরা কি করতে চাইছে। যখন চলে যেতে চাইলাম,তখন ঐ থিও আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, একাজ না করলে মুখে ভিট্রিয়ল ছুঁড়ে মারবে। আমায় ভয় ধরিয়ে দিল।

ওয়েসলি সব কথা মন দিয়ে শুনলেন।

—চিন্তা করবার কিছু নেই। উনি হেসে বললেন। আমরা একটা উপায় বের করবো। দেখ দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা জানি না, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। তুমি রেস্টুরেন্টে বলে দেবে দুজনের খাবার পাঠাতে? এ-সব কথা ভাবতে আমি একটু সময় চাই। তুমি খাবারের ব্যবস্থা কর। আমরা খেতে খেতে কথা বলব।

মদের আলমারীটার দিকে হেঁটে গেলেন। বললেন, এখন তুমি একটু মদ নাও। অত চিন্তার কিছু নেই। তোমার সব কথা শুনে আমি মনে করি না তোমার কোন দোষ আছে।

দুজনের মদ ঢালতে ঢালতে উনি বললেন, যখন তোমায় প্রথম দেখি তখন সঙ্গে কে ছিল গ্লেব?

জুলি লজ্জায় মাথা নিচু করল।

—আমি তখন ভাবতেই পারিনি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমায়। ও রকম পোশাক পরেছিলাম বলে আমি লজ্জা পাচ্ছি।

উনি হাসলেন।

—তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, ওর দিকে মদ এগিয়ে ধরে বললেন, আর একদিন এবার

আমার জন্যে ওরকম সাজবে।

জুলি চমকিত চোখে চাইল। ওঁর মুখে একথা শুনবে বলে আশা করে নি।

—কে ছিল গ্লেব?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তোমার গ্লাসটা নিয়ে যাও। আমি ভেবে দেখতে চাই। খাবার দিতে যেন দেরী না হয়, কেমন?

জুলি রেস্টুরেন্টে দুজনের খাবারের জন্যে ফোন করল। তখন জুলির মনে একেবারে অন্য ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। খাবার আসতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যে ও কালো পোশাকের ওপর লাল বেল্ট পরে, মাথায় একটা লাল স্কার্ফ বাধল। আয়নায় নিজেকে মিষ্টি লাগলো দেখে ও খুশী হল। ভাবল যতদিন এই চেহারা আছে, ততদিন আশা আছে ওর।

রান্নাঘরে এসে ও মদ শেষ করে বেশ স্ফূর্তি অনুভব করলো। এত ভালভাবে সহজে ও সব বিপদ থেকে উৎরে যাবে তা ও ভাবেনি।

জুলি মনে মনে ভাবল, আমার ওপর মিঃ ওয়েসলির চোখ পড়েছে। যদি সাবধানে, চোখ কান খোলা রেখে ওঁকে খেলাতে পারি, তবে আমার জন্যে এমন কাজ নেই যা উনি করতে পারেন না। প্রচুর টাকা আছে ওনার। যা চাইব তাই পাবো। ওই মিসেস ফ্রেঞ্চ, থিও, আর হ্যারির হাত থেকে বাঁচতে পারব আর ওদের শায়েস্তা করতে পারব। এখন আমার ওয়েসলি আছে। ওদের আর দরকার হবে না।

খাবার ট্রে নিয়ে যখন ও গেল তখন উনি পায়চারি করছেন।

—সব তৈরী? একটা ট্রে নিতে নিতে বললেন, খাসা দেখাচ্ছে তোমায়। তুমি ওখানে বস, যাতে আমি তোমায় ভালভাবে দেখতে পাই।

টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। ওঁর দুটি সহৃদয় চোখ দেখে জুলির সব রকম ভয়, অস্বস্তি কেটে গেল।

ওয়েসলি বললেন, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাজের কথা বলব না। তুমি যতটা বিপদ বলে ভাবছ, অতটা কঠিন বিপদ নয়, কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন তুমি খুশী তো?

—না।

জুলির মনে কোন দুঃখ নেই, খারাপও ওর লাগছে না। তবু ওয়েসলির মন বোঝার জন্যে বলল, আমার এখানে বসা উচিত হচ্ছে না। মিসেস ওয়েসলি ভীষণ চটে যাবেন।

লক্ষ্য করল ওয়েসলির মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

শানিত গলায় বললেন, ওঁর নালিশ করবার কোন অধিকার নেই। নিজের ব্যবহারেই তিনি সে অধিকার খুইয়েছেন। তুমি দেখেছিলে কি করছিলেন ঘরে?

—হ্যাঁ জঘন্য কাণ্ড।

ওয়েসলি বললেন, তবে ওঁর প্রসঙ্গ থাকুক। আমি তোমায় আরেকটু মদ দিই।

উনি আরো মদ ঢালতে লাগলেন। ঘরে এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর উনি ফিরে এসে জুলির দিকে চেয়ে হাসলেন।

—এতে আমি খুব খুশী হয়েছি জুলি। ইদানিং বড় বেশি একাকিত্ব অনুভব করছিলাম। বহুবছর সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া হয়নি। আমার খুব ভাল লাগছে।

জুলি ওয়েসলির আগ বাড়িয়ে কথা বলা দেখে অবাক হলো।

ওয়েসলি ওর বিস্ময় লক্ষ্য না করেই বললেন, তুমি যা বলছিলে আমি তা ভেবে দেখছিলাম। সেই যে জীবনে আনন্দ না পাওয়ার কথা। জুলি, আনন্দ বলতে তুমি কি বোঝ?

জুলি ঝট্‌পট্‌ জবাব দিল, যা করতে চাই তাই করতে পারা।

—কি করতে চাও তুমি?

জুলি কোন ইতস্ততঃ না করেই বলল, টাকা চাই, ভাল পোশাক, নাচ গান করব। সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্টে খেতে যাব। গাড়ি থাকবে আমার, যা খুশী কিনবো। এইসব।

ওয়েসলি হাসলেন।

—জুলি সে সব দিয়ে হবেটা কি? তুমি দেখছি অতীতের মধ্যে ডুবে আছো। ওসব জিনিষে আর আজকাল মজা নেই। জীবনের সহজ জিনিষগুলো যেমন ধরো, ভাল বই পড়া, সুন্দর একটা বাগান, হেঁটে বেড়াতে যাওয়া, বাজনা শেখা, এইসব এখন আনন্দ দিতে পারে।

জুলি মনে মনে ভাবল সে আপনি ভুল ভেবেছেন। মুখে বলল, পয়সা থাকলে আমি যা চাই তা সহজে পেতে পারি, আর আমি আনন্দে সময় কাটাতে পারি।

—বেশ দেখা যাবে। তারপর ঐ কাফেতে জুলির অভিজ্ঞতা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। কাফেতে যারা যারা আসতো তাদের বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

খাওয়া যখন শেষ হল ততক্ষণে জুলি ওঁর সঙ্গে সহজ হয়ে উঠেছে।

—ঠিক আছে, এই ট্রে-গুলো আগে বিদায় করা যাক তারপর কাজের কথা হবে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, তবে বেশি সময় দিতে পারব না, কারণ শুতে যাবার আগে আমার অনেক কাজ আছে।

রান্নাঘরে ট্রে-গুলো রেখে জুলি ফিরে আসতে ওয়েসলি ওকে চেয়ারে বসতে বললেন আর নিজে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়ালেন।

নিচু গলায় বললেন, আমরা এখন একটা কাজই করতে পারি, পুলিশের কাছে যেতে হবে।

জুলি ভয় পেয়ে বলল, না, তা করতে পারবো না।

—তুমি ওদের দলকে ভয় পাচ্ছো, তাই তো? কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখছি না এছাড়া। পুলিশের সাহায্যে আমরা ওদের জন্যে ফাঁদ পাতবো, আর সকলকে ধরে ফেলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

জুলি শিউরে উঠে বলল, কিন্তু যদি ওরা জেনে যায়? যদি থিও পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালায়?

আমাদের এখন দেখতে হবে, যাতে ওরা না পালায়, ওরা যাতে জেনে না যায়। বুধবার ওদের সঙ্গে দেখা করে তুমি বল কেমন করে আলমারী খুলতে হয়। আমি তোমাকে সব খুঁটিয়ে লিখে দেব, তুমি ওটা নকল করে নেবে। গ্লেব যদি তোমার সাহায্য চায় তুমি সাহায্য করবে। আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে আমরা যে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছি এটা ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তারপর সব দায়িত্ব আমার।

ওঁর কথা শুনে জুলিও মনে জোর পেল।

জুলি অস্বস্তির সঙ্গে বলল, কিন্তু আমার যদি কিছু না হয়, তাহলে তো ওরা বুঝে যাবে আমিই ওদের ধরিয়ে দিয়েছি।

—তখন ওরা পাল্টা কিছু করার সময়ই পাবে না। দেখ জুলি তুমি কি বুঝছ না, এটাই তোমার বাঁচার একমাত্র রাস্তা?

—হ্যাঁ। জুলির গলায় অনিচ্ছা।

—ঠিক আছে। বুধবার তুমি গ্লেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে চেষ্টা কব ওরা কখন আলমারী ভাঙার কথা ভাবছে। এটা জানা খুবই জরুরী। আমরা তৈরী থাকব। তোমার কি মনে হয় তুমি শেষ অব্দি চালিয়ে নিতে পারবে?

হ্যাঁ। থিওর চিন্তায় জুলির গলা ক্ষীণ।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত ওয়েসলি জুলির দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে চিন্তা হচ্ছে এসব চুকে গেলে তোমার কি হবে?

—জানি না। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, জানি না কি করবো।

ওয়েসলি আস্তে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমায় একটা সুযোগ দিয়ে দেখতে চাই, তুমি যা বললে ঠিক সেইভাবে আনন্দ পেতে পার কিনা, সেইসব জিনিষ থেকে।

জুলির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওয়েসলি। বললেন, আমার ছ-বছরের বিবাহিত জীবনে আমি ভালবাসা বা মমতা কিছুই পাইনি। তিনবছর আগে অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার জীবন নিরানন্দ হয়ে ওঠে। এখন যখন চোখ ফিরে পেয়েছি, আমি এখন নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই। তোমারই মত একজনকে আমার দরকার। নারীবর্জিত জীবন কাটিয়ে আমি ক্লান্ত।

তুমি খুবই সুন্দর। আমি কি বলতে চাইছি আশা করি বুঝেছো?

জুলি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর মুখ রক্তের ঝলকে লাল হয়ে উঠল।

উনি বলে চললেন, আমি দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করতে চাই না তবে তোমাকে আমি নিরাপত্তা, একটা বাড়ি, বছরে হাজার পাউন্ড দিতে পারি। তোমাকে খুব একটা জ্বালাতন আমি করব না, তবে আমরা হয়ত সুখীই হবো।

এখন জুলি বুঝল উনি কি বোঝাতে চাইছেন। বছরে হাজার পাউন্ড আর বাড়ি দিয়ে উনি ওর মুখবন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন, আর তারই দাম দিয়ে উনি নিশ্চিত হতে চাইছেন যাতে জুলি কারুকে বলে না দেয় উনি দেখতে পান।

তা জুলি বুঝল। ওর মনে তো এই কামনাই ছিল, স্বপ্নেও ভাবে নি ওর প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। উত্তেজনার বহর চেপে রাখতে ওকে রীতিমত চেষ্টা করতে হল।

উনি বলে চললেন, ভেবে দেখ জুলি। আমি আমার মনোভাব তোমাকে জানালাম। সময় হাতে আছে প্রচুর। আমাদের অন্যান্য কাজ আগে করতে হবে। তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি এ কথাই ভাবছি।

জুলি ভাবল এ উনি মিথ্যে বলছেন। তাতে আমার কি? উনি চান তো আমি চুপ করে থাকবো। উনি দাম দেবেন তার।

—জানি না কি বলব...জুলি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওয়েসলি ওকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—তবে এখন বলতে হবে না। ভেবে দেখ। সব চুকেবুকে গেলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।

ঘর থেকে বেরোতে পেরে জুলি যেন বাঁচল।

ওয়েসলির প্রস্তাবের প্রথম চমক কেটে যাবার পর জুলির কাছে আর সবই গৌণ হয়ে গেল। অপ্রীতিকর দুঃস্বপ্নের থিওর প্রসঙ্গ ওর মনের তলায় চাপা পড়ে গেল।

ওয়েসলি চান ও তাঁর রক্ষিতা হয়ে থাকে। জুলি ওঁর শর্তে রাজী। নীরব থাকার পরিবর্তে ও পাবে নিরাপত্তা, নিজের ফ্ল্যাট, হাজার পাউন্ড, বছরে পোশাক। ওয়েসলি কি অগাধ ধনী নন? উনি তো বিশ্রি মোটা বুড়োগুলোর মত নন। উনি চমৎকার লোক। উনি প্রথম থেকে জুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সাত মাস আগে একটা সস্তার লাইব্রেরীতে জুলি কাজ করছিল, আর এখন নিজের বাড়ি, বছরে হাজার পাউন্ড পাবে।

হঠাৎ ব্লানশ ঘণ্টা বাজিয়ে ওর দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করল।

ব্লানশের ঘরে যেতে যেতে জুলি ভাবল, আর বেশিদিন নেই, তখন আমারই একটা চাকরানী থাকবে।

ব্লানশ বিষ মেজাজে, কাটাকাটা গলায় বলল, স্নানের জল ভর। হাতির মত দুদ্দাড় করে আওয়াজ কোর না। আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে।

জুলি কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে টবে জল ভরল না। শোবার ঘরে এসে দেখল ব্লানশ পায়চারি করছে।

ব্লানশ ঘ্যাঁচ করে উঠল, এই হপ্তা ফুরোলেই তুমি চলে যাবে। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

'জুলি ওর নতুন জীবন শুরুর আগে এখানেই থাকতে চায়'—এই ভেবে হেসে ফেলছিল।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম, ও এমন খুশী হয়ে কথাটা বলল যে ক্ষুব্ধ ব্লানশ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

—যদি কোন বজ্জাতি করার চেষ্টা কর তো পস্তাবে। এখন বেরোও আমার সামনে থেকে।

কিছুক্ষণ পর ব্লানশ বেরিয়ে যেতে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। লাউঞ্জে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়তে লাগল।

ও নিজেই নিজেকে শোনাল, কিছুদিন বাদে এটাই হবে তোমার স্বাভাবিক রুটিন। এখন থেকে অভ্যেস করা যাক্।

কিছুক্ষণের মধ্যে ও অস্থির হয়ে একখানা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করল, ভাল লাগল না, রেডিও খুলেও যুদ্ধের বাজনা শুনে বিরক্তিতে বন্ধ করে দিল।

ফাঁকা বাড়িটা যেন ওর বুকে চেপে বসতে লাগল।

নিজেকে ভরসা দিয়ে বোঝাল, যখন নিজের বাড়ি হবে, তখন অন্যরকম লাগবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি পোশাক পরব, ছাড়ব আর সাজব।

দুপুরের মধ্যে কিছু একটা করতে হবে বলে ও রুপোর জিনিষগুলো সাফ করতে বসল।

আশ্চর্য, কি তাড়াতাড়ি সময় কেটে গেল।

নিজেকে ধমক দিল, এরকম চাকরাণী সুলভ অভ্যাস আমায় ছাড়তে হবে। বিশ্রি!

পাঁচটার ক-মিনিট বাদে ব্লানশ ফিরে এলো। ওঁর অস্থির চলাফেরায় জুলি টের পেল ব্লানশের বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল।

জুলি ভাবল, আমার ভবিষ্যৎ নীতির বিরোধী এই অর্থহীন চাকরি আমি চাই না। টাকা থাকলে আমি রোজ সিনেমা দেখে, নাচের আসরে গিয়ে, গান শুনে সময় কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ব্লানশ এই টাকার পাঁজায় বসে কি করবে তা ভেবে পায় না, আমিও কি এই অবস্থায় পড়বো!

জুলি ভাবতে লাগলো, মিঃ ওয়েসলি ওঁর চোখের দৃষ্টি নিয়ে কেন ভান করে চলেছেন উনি অন্ধ? জুলির বিশ্বাস হয় না ওঁর কারখানার কাজের সঙ্গে কোন যোগ আছে।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল ব্লানশ টেলিফোনে বেনটনের সঙ্গে কথা বলছে। জুলি দরজায় কান পাতল।

পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ব্লানশের গলা, কাল রাতে পারছি না ডার্লিং। হাওয়ার্ডের সঙ্গে এভরিটে সেই জঘন্য ডিনারে যেতে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে চেঁচাতে। তুমি টাকা পয়সার ব্যাপারটা গুছিয়ে নিলেই আমি ডিভোর্স করবো। যাহোক কিছু কর।

—তুমি তো শুধু আমার টাকাতেই দিন কাটাতে চাও। তাই না? আমাকে দেখতে হবে না। তুমি নিজে চলবার মতো টাকা যোগাড় কর সোনা। যোগাড় করলেই আমি তোমায় বিয়ে করে ফেলব।

আবার কিছুটা থেমে ব্লানশ বলল, ভগবান, আমি দরজাটা খুলে রেখেছি। সেই ছুঁড়িটা বোধহয় সব শুনল।

জুলি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করলো।

পরে জুলি ওয়েসলির ঢোকার আওয়াজ পেল। জুলি ওঁর কাছে গেল।

ওয়েসলি ওর দিকে না তাকিয়ে এমন ভাব দেখালেন যেন উনি অন্ধ। ওয়েসলি বলল, জুলি ঠিক আছে সব। পুলিশ বলছে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে তুমি এগিয়ে যাও। কাল ওদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দাও আলমারী কিভাবে খোলে।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওকে দিয়ে বললেন, এটা নকল করে নাও। এতে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ওদের যাতে কোন সন্দেহ না হয় সেইভাবে তুমি ওদের থেকে জেনে নাও কখন ওরা ফার চুরি করতে আসবে। পুলিশ ওদের হাতেনাতে ধরবে আর তোমার কোন ভয় নেই।

—আচ্ছা!

জুলি ওদের দুজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার আশায় দাঁড়িয়ে রইল।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওয়েসলি বলল, কি ভয় করছে? পারবে তো?

—হ্যাঁ পারবো।

ওয়েসলি বলল, মিসেস ওয়েসলিকে চুরির কথা কিছু বোল না। উনি যেন কোনভাবে জানতে না পারেন।

জুলি মনে মনে খেপে গিয়ে ভাবল, চুলোয় যাক চুরি। মুখে বলল, বলবো না।

—ঠিক আছে। আমরা দুজনে কথা বলছি এটা প্রকাশ না হওয়াই ভালো। বেশিদিন এভাবে

সাবধানে চলতে হবে না আমাদের।

জুলি বলল, মিসেস ওয়েসলি আমাকে হপ্তা ফুরোলেই চলে যেতে বলেছেন। তার আগেই কি সব হয়ে যাবে?

—গ্লেবকে যদি শুক্রবার রাতের কথায় রাজী করাতে পার তবে হবে। আমরা সেদিন বাইরে থাকবো।

জুলি ভাবল, এই হতভাগা চুরি ছাড়া কি আমার কথা একটুও ভাববেন না?

—আমি তো ওদের রাজী করাব। কিন্তু আমার কি হবে? এখান থেকে গেলে তো আমার থাকার জায়গা চাই।

উনি অধীর হয়ে হাত নাড়লেন।

—সে ঠিক হয়ে যাবে জুলি। তুমি এখন পালাও কেমন। উনি হাসলেন।

জুলি বলল, কিন্তু আমাদের হাতে যে বেশি সময় নেই। আপনি আমাকে একটা ফ্ল্যাট দেবেন বলেছিলেন? জুলি ভাবল, উনি যদি এসব চিন্তা না করে থাকেন, তবে বাধ্য করব এই চিন্তা করতে।

—নিশ্চয়। তোমার ফ্ল্যাট হবে। আমাদের দেখতে হবে তাই না?

একটু ভাবলেন ওয়েসলি। বললেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? দেখব কি করা যায়। এখন পালাও জুলি। আবার বেরুবার আগে আমার কাজ আছে।

জুলি ওঁর অনিচ্ছা আঁচ করতে পেরেছে। কিন্তু করবারও তো কিছু নেই। তাও কিছুক্ষণের জন্যেও তো ওর কথা ভাবতে বাধ্য করেছে।

—ঠিক আছে হাওয়ার্ড...নিশ্বাস আটকে, লাল হয়ে ও বলল, আ...আমি তোমাকে হাওয়ার্ড বলতে পারি তো?

—ওয়েসলির মুখ আড়ষ্ট, কঠিন হয়ে গেল।

রুক্ষ গলায় বললেন, যা ইচ্ছে তাই ডেক আমায়। এখন যাও।

দরজার কাছে গিয়ে জুলি ঘুরে ওর দিকে তাকাল।

ওর নিশ্চল শরীরে একটা স্নায়ু ও শিরা ছেঁড়া টানটান উত্তেজনা। মনে হয় লোকটা কোন বোমা বিস্ফোরণের জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে।

বুধবার।

সকালটা যেন কাটতে চাইছিল না। ব্লানশ ওয়েসলির সঙ্গে রাতে ডিনারে যেতে চায় নি, মেজাজের ঝাল ঝেড়েছে জুলির ওপর।

ব্লানশের রাগের সঙ্গে জুলির মনে হয়েছে আজ মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে ওকে দাঁড়াতে হবে, মনে হতেই ওর পিলে চমকে গেছে। নিজেকে অসুস্থ মনে হয়েছে।

ব্লানশ লাঞ্চে বেরিয়ে যেতে টেলিফোন বাজলো।

হ্যারি ফোন করছে।

—জুলি। রবিবার থেকে তোমায় ধরার চেষ্টা করছি। যতবার ফোন করেছি ঐ ওয়েসলির বউটা ধরেছে। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হতে চলেছে। থিও তোমায় কি করেছিল?

জুলির সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠল।

—তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। ভীরু কোথাকার। তুমি ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে আমাকে মারতে পাঠিয়েছিলে? আমি তোমাকে ঘেন্না করি। মুখ দেখতে চাই না তোমার, বলে রিসিভারটা দুম করে রেখে দিল।

আবার ফোন বেজে উঠে, বেজে বেজে থেমে গেল।

প্রথম দেখা হবার পর জুলি হ্যারিকে একটু ভালবেসেছিল। এখন ওয়েসলিকে পেয়ে ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না জুলি।

সামনের দরজায় ঘণ্টা বাজতে ও গিয়ে খুলে দিল। ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার ডসন।

—আফটারনুন, ডসনের রুক্ষ গলা। ডসন টুপি ছুঁয়ে বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে

চাই।

জুলি ডসনকে দেখবে বলে আশা করেনি। ও সরে দাঁড়ালো, ডসন ঢুকল।

চারিদিকে তাকিয়ে ডসন বলল, ব্রিজ কাফের পর বেশ মুখবদল, কি বল? তুমি তো এখানে উঠেছো, তাই না?

—হ্যাঁ। জুলির গলা ক্ষীণ।

—দেখলাম মহারাণী বেরোলেন। এখন কিছুক্ষণ তো আসছেন না, তাই না?

—আসবেন না এখন।

—ঠিক আছে। চল কথা বলা যাক।

ওকে লাউঞ্জে নিয়ে এলো জুলি। চারিদিকে চেয়ে ডসন বলল, চমৎকার। একটি কাজের জিনিষও নেই। বেশ বেশ, সকলের ভাগ্যি সমান হয় না। বস তুমি।

জুলি বসল। ওর পা কাঁপছে।

—মিঃ ওয়েসলি চান না ওঁর স্ত্রী এ-সব কথা জানুক। মনে করেন মহিলা নার্ভাস হয়ে পড়বেন। দেখে তো মনে হয় না মহিলা নার্ভাস টাইপের। তাই কি?

—না।

ডসন মাথা নেড়ে বললেন, স্বামীরা হচ্ছে আজব লোক। নাকি উনি ভাবছেন মহিলা তোমায় ছেঁচবেন।

জুলি চমকে উঠে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন।

—যাকগে। এখন শোনা যাক সব। মিঃ ওয়েসলি তোমার কথা আমাদের সব বলেছেন। তবু ভাবলাম তোমার মুখ থেকে সরাসরি শোনা যাক। হ্যারি গ্লেবের সঙ্গে দোস্তিটা তাহলে হঠাৎ হল, তাই না? তখন যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি তো ওকে চিনতেই পারলে না।

জুলি আবার মুখের রা পালটাল।

—আপনার সঙ্গে...তারপরে...ওর সঙ্গে আমার...।

—তাই বুঝি? বেশ বেশ। আমি তোমায় ওর কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কি দিই নি? যাক ওয়েসলিকে সব কিছু বলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো। আগে বা পরে, ওদের আমরা ধরতামই, তোমাকেও ধরতাম।

জুলি চুপ করে সব শুনল। বুঝল কি বাঁচান টা না বেঁচেছে।

ডসন বলল, গ্লেবের সঙ্গে তোমার দোস্তি হবার পর থেকে সব কথা, কোন কিছু না লুকিয়ে বলে যাও।

জুলির ঘোর অনিচ্ছা থাকলেও, ও ওয়েসলিকে যা যা বলেছিল ডসনকে তার সবই বলল।

ডসন শুনতে শুনতে কোন বাধা দিল না, সমানে ওকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল।

থিওর কথা বলতে ডসন একটু নরম হল। ডসন হেসে বলল, থিও বড ভাল ছেলে। দু-বছর আগে একটা মেয়ের মাথা ফাটাবার জন্যে ওর ছ-মাস জেল হয়। আর একটা মেয়েকে ভিট্রিয়ল ছোঁড়ার মামলায় ওকে ধরেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা বোকা ওকে সনাক্ত করতে ভয় পেল। যাই হোক, তুমি সতর্ক থেকো, আমরা ওর ওপর নজর রাখবো।

জুলি ভয়ে কেঁপে উঠল।

ডসন বলল, মিসেস ফ্রেঞ্চের ওপরেও আমরা নজর রেখেছি। ডোমেস্টিক এজেন্সী চালাবার ফলে ও বড়লোকদের ভেতরের খবর জেনে যায়। তবে এই প্রথম দেখছি বুড়ি খোঁড়িয়াল ফিট করলো। খুব সতর্ক থেকো, একটি চালেও ভুল কোর না। ওদের সঙ্গে রাতে দেখা হবে

জুলি ঘাড় নাড়লো।

তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছি না, কিন্তু যদি ওরা আঁচ করতে পারে তুমি ওদের ধরিয়ে দিচ্ছো তবে ওরা বেজায় শয়তানী করবে।

—আমি জানি।

—চল দেখি, আলমারীটা তুমি খুলতে পার কিনা রিহার্সাল দিয়ে দেখাও। ওরা চাইবে আলমারী খোলার সময়, তুমি ওদের সঙ্গে থাকো।

জুলি ওকে ব্লানশের ঘরে নিয়ে গেল।
দেখেশুনে ডসন বলল, ওয়েসলির সঙ্গে ওর স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন?
জুলি সতর্ক হল, জুলি ভাবল, ওর কোন মতলব আছে নাকি?
বলল, বোধহয় ঠিকই আছে। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞেস করবেন।
ডসন নিজের নাকে টোকা মারল। শুকনো হেসে বলল, মনে হয় না আমায় বলবেন। আলমারীটা কোথায়?
জুলি দেখালো।
—দেখি, তুমি খোল ওটা। অ্যালার্ম বন্ধ করে দিতে ভুলো না। আমি মিছে লোকজন নিয়ে হুড়মুড়িয়ে উপস্থিত হতে চাই না।
জুলি অ্যালার্ম বন্ধ করল। বাথরুমে গিয়ে সেখানকার সুইচ বন্ধ করল। ডায়াল ও পয়েন্টার দেওয়ালের যেখানে আছে সে জায়গাটা খুঁজে পেতে ওর দেরী হল। পয়েন্টারের কাঁটা তিন নম্বরে ফিট করে চাবি টিপে ও প্রথমে দরজাটা খুলল।
—ভাল, তারপর?
জুলি সুইচ টিপে ইস্পাতের দরজা খুলল। ফটো ইলেকট্রিক সেলে যে আলো পড়ে সেটা নেভাল, সরে দাঁড়াল।
—এমনি করে খুলতে হয় জুলি বলল। ডসন ফারগুলো দেখে শিস্ দিল।
—ভাল! বোঝা গেল সব। এবার বন্ধ কর।
জুলি আলমারী বন্ধ করে সুইচ টিপে দিল। ডসন বলল, আমরা জানতে চাই কখন ওরা আসছে। যদি সাবধানে থাক, তাহলে কোন ভয় নেই। থিওর ওপর নজর রেখো। ওটা হচ্ছে মূর্তিমান বিপদ।
—জানি।
ডসন ওকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করল, এসবের পর কি করবে, আবার কোথাও ঝামেলা পাকাবে?
জুলি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, না।
—ভাল। ডসনের নীল চোখ দুটো কিসের সন্ধানে যেন ঘুরছে, ডসন জিজ্ঞেস করল, মিঃ ওয়েসলি কি তোমার কোন ব্যবস্থা করে দেবেন? ওঁর তোমার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ আছে দেখছি।
—জানি না। আমাকে ভাবতে হবে। আশা করি আবার চাকরী পাব।
—সে বরং ভাল। এ-পর্যন্ত তুমি বুদ্ধির পরিচয় দাওনি বরং শিক্ষা হয়েছে তোমার। পরের বার হয়ত কোন ধনী লোক এভাবে তোমায় সাহায্য করবেন না, তাই সামলে চলতে বলছি।
দরজা খুলে ডসন বেরিয়ে গেল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ অস্থিরভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, যে কোন মুহূর্তে ওই ছুঁড়ি এসে পড়বে। থিওর নজরে আছে, গণ্ডগোল কিছু হবে না মনে হয়।
হ্যারি গ্লেব উদ্বিগ্ন হলেও সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।
হ্যারি বলল, থিওকে দলে নেবার জন্যে একদিন তুমি পস্তাবে। ওকে আমি পছন্দ করি না।
—কেন? কি হয়েছে? তুমি সব সময় ওর কথা বল। তোমার গজগজানি শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।
হ্যারি বলল, ওকে বিশ্বাস করা চলে না। ও বিপজ্জনক। ইঁদুরের স্বভাব, কোণঠাসা করলেই কামড়াবে।
—কোণঠাসা করবে কে? ও বেজায় চালাক।
হ্যারি হেসে বলল, থিও চালাক? আমায় হাসিও না। ওর মাথায় পাথর পোরা আছে। শুধু মারজখমই জানে। একদিন ও ঠিক খুনের দায়ে ধরা পড়বে। আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই না।
—মিসেস ফ্রেঞ্চ রেগে বললেন, তুমি বুড়িদের মত কথা বলছো। থিও ঠিকই আছে।
হ্যারি বলল, ও একটা মেয়ের মাথা ফাটিয়ে জেল খেটেছে। পুলিসের কাছে ওর আঙুলের

ছাপ আছে। একটা ভুল করে পুলিসের প্যাঁদানি খেলে ও প্যাঁক প্যাঁক করবে। তুমি আমি তখন কি করব?

—আমি ওর কথা ভাবছি না। আমি ঐ হল্যান্ড মেয়েটার কথা ভাবছি। নজরে না রাখলে ও মুখ হাসাবে।

হ্যারি মুখ ঘষলো, এগিয়ে বসলো।

—এরপর আমি আমেরিকা কেটে পড়ছি। শহর খুব গরম হয়ে গেছে। এখানে সব ঠাণ্ডা হলে দেখা যাবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ধারালো গলায় বলল, ব্যাপারটা কি? ভয় পেয়ে গেলে না কি? না ভাল ছেলে হয়ে যাচ্ছ?

হ্যারি খোলাখুলিই বলল, অবাক হচ্ছো কেন? এতদিন যা জমিয়েছি ভালই চালিয়েছি। আর এ কাজেও ভালই পাবো। যদ্দিন পারি ফূর্তি করে মৌজ করে নেব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে মনে করিয়ে দিলেন, কাজ এখনো হাসিল হয়নি।

অফিসের দরজা খুলে গেল, ডানা ঢুকল।

ডানা ওর পাতলা আঙুল হ্যারির চুলে বুলিয়ে বলল, মেয়েটা এখনো তো এল না। কি হ্যারি আমায় মনে আছে তো?

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিয়ে বলল, ছাড় ও সব। পকেট থেকে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ে নিল ও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ডানার দিকে তাকিয়ে বলল, এই কাজটার পর হ্যারি এসব ছেড়ে দিচ্ছে, ও আমেরিকা যেতে চাইছে।

ডানা বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব হ্যারি। তাই না হ্যারি?

ডানার দিকে চেয়ে ধূর্তের হাসি হাসল হ্যারি।

তারপর হ্যারি বলল, হতে পারে, তবে আমি এখনো মনস্থির করি নি।

বাইরের দরজায় কে করাঘাত করল।

—এসেছে, ডানা বলল, আমি যাচ্ছি।

জুলি অন্ধকার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে।

—এস, ডানা বলল, দেরি করে ফেল নি?

—করেছি কি? জুলি কাটাকাটা গলায় বলল, আমি জানি না। জুলির গলা শুকিয়ে গেছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে, তবু নিজেকে শাসনে রেখেছে।

—এই যে ময়না! একটা বিদ্‌ঘুটে গলা শুনে জুলি পিছন ফিরে তাকাল।

অন্ধকার থেকে থিও বেরিয়ে এল।

—সারা পথ তোমার পেছনে ঘুরছি, পাছে মত বদলাও। থিওর মুখের দুর্গন্ধ জুলির মুখে ঝাপটা মারল।

ডানাও থিওকে অপছন্দ করে। ও জুলিকে বলল, ভেতরে এসো।

জুলি অফিসের ভেতরে এল। থিও জুলির পা মাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে দুঃস্বপ্নে দেখেছ, আমি হলফ করে বলতে পারি। ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছি তোমার।

হ্যারি ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—মুখ বন্ধ কর বাঁদর, তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে?

থিও হ্যারির দিকে বিষাক্ত চোখে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চকে বলল, এ মক্কেলটাকে আমাকে ঘাঁটাতে বারণ করে দাও। বিরক্তি ধরে যাচ্ছে আমার।

হ্যারি ভীরু হাসি হেসে বলল, এই যে জুলি। এস, আমার কাছে বস।

জুলি ঘৃণাভরে ওর দিকে চাইল।

থিও হাসলো।

—বেশ হয়েছে। এবারে ময়নার পেছনে লাথি মার।

মিসেস ফ্রেঞ্চ দুজনকেই চুপ থাকতে বললেন। জুলির দিকে চেয়ে বললেন, বস, আলমারীটা

কি করে খোলে তুমি জেনে নিয়েছ?

—হ্যাঁ। জুলি বলল।

থিও বলল, আমি ভাবছিলুম তোমায় সিধে করব ময়না।

হ্যারি উঠতে যাচ্ছিল, মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—বেশ বেশ। বস, আমাদের বল।

জুলি হ্যারির কাছ থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

—আমি লিখে এনেছি। পড়ে নিন। জুলি বলল।

থিও সামনে ঝুঁকে পড়লো।

—ঠিক হয় যেন। যদি কায়দা করার চেষ্টা কর, তবে পস্তাবে।

হ্যারি হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে থিওর মুখে মারল। থিও চেয়ার শুদ্ধ পড়ল। রাগে গালাগালি করতে করতে ও একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল বের করল। হ্যারি তৈরীই ছিল, লাথি মেরে থিওর হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে কুড়িয়ে টেবিলে রাখল।

থিওর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে হ্যারি বলল, তোমায় একবার সাবধান করে দিয়েছি। বলেছি যখন চুপ কর, জবান বন্ধ, তখন বন্ধ থাকবে। আমাকে বন্দুক দেখাবে না, তিন পয়সার বেঁটে মস্তান কোথাকার?

থিও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার নিচের সোফাটায় গিয়ে বসল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ পিস্তলটা তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরলেন।

—কতবার তোমায় বলেছি বন্দুক সঙ্গে রাখবে না? রাগে ঝকঝকে চোখে বললেন, হ্যারি কি বন্দুক রেখেছে?

হ্যারি জ্বলন্ত চোখে থিওর দিকে তাকিয়ে বলল। না, আমি ওই ডরপোকের বাচ্চা নই। আমি কোনদিন বন্দুক রাখি না, রাখবোও না। আমার মগজ আলুভাতে হয়ে যায় নি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ গর্জে উঠলেন থিওকে, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো।

থিও ছাতের দিকে চেয়ে ঠোঁট ওল্টালো। ওর চোখে ঘৃণা জ্বলছে।

জুলির ভয়ে, বিস্ময়ে, বন্দুক দেখে হাড় হিম হয়ে গেছে।

মিসেস ফেঞ্চ বলেন, ঠিক আছে, এবার কাজের কথা হোক, সে কাগজটা কোথায়?

পরিষ্কার অক্ষরে লেখা একটা কাগজ জুলি মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে রাখল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ এবং হ্যারি কাগজটা পড়ে দেখলেন।

—দুটো অ্যালার্ম! হ্যারি শিস্ দিয়ে উঠলো। ওরা দেখছি সবরকমে সাবধান হয়েছে। আমি আগেই ভেবেছি ওখানে ফোটো ইলেকট্রিক সেল আছে। ঠিক আছে, আমরা যা চাই, ঠিক তাই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জুলির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চাইলেন।

ঠিক বলছো ওটা খুলতে পারবে?

জুলি মাথা নাড়ল।

জুলি বলল, মিসেস ওয়েসলি ওঁর এক বন্ধুকে খুলে দেখাচ্ছিলেন, আমি ঘরে লুকিয়ে থেকে সব দেখেছি।

—ঠিক আছে, মিসেস ফ্রেঞ্চ কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। এবার আমরা কাজে হাত দিতে পারি। আজ বুধবার। এই হপ্তার শেষ নাগাদ আমি সবকিছু তোড়জোড় শেষ করতে পারবো। ওরা শনিবার কি করছে? কি জান?

জুলি বলল, আমি শনিবার কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। মিসেস ওয়েসলি আমায় নোটিশ দিয়েছেন।

সকলে এমনকি থিও-ও ওর মুখের দিকে তাকাল।

—কেন? মিসেস ফ্রেঞ্চ রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন।

—উনি আমায় পছন্দ করেন না। আমার কোন দোষ আছে বলে উনি আমায় ছাড়াচ্ছেন না।

—আমরা যখন কাজ হাসিল করবো ওখানে তোমাকে থাকতে হবে। এতে তুমিও জড়িয়ে পড়েছ এখন। তাহলে শুক্রবারেই ঠিক রইল। মিসেস ফ্রেঞ্চ বলল।

জুলির মনে হল একটু অনিচ্ছা দেখানো বুদ্ধির কাজই হবে। বলল, আমাকে আপনারা রেহাই

দিচ্ছেন না কেন? আমি তো আলমারী কেমন করে খোলে বলেছি, আর কিছু করতে পারবো না।

—এখন আমার কথানুযায়ী চলতে হবে তোমায়। এ জাল কেটে বেরোবার উপায় নেই তোমার। হ্যারি ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আগে তোমাকে বেঁধে রেখে আসবে। যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে চললে আমরা তোমায় দেখব, ওরা তোমায় কিচ্ছু করতে পারবে না। তোমার ভাগের আন্দাজ পাঁচশো পাউন্ড তুমি পাবে। পুলিশ জেরা করলে বলবে, তিনটে লোক সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে তোমায় বেঁধে রাখে, তুমি শুধু ওদের ওভারকোট আর মুখঢাকা টুপি ছাড়া আর কিছুই দেখার সুযোগ পাও নি। যা বলবে বানিয়ে টানিয়ে বোল, তবে শেষপর্যন্ত তাই বলে যেও। তুমি তো কচি খুকিটি নও! বুঝলে?

জুলি ক্ষুব্ধস্বরে বলল, হ্যাঁ।

—বেশ। এবার হ্যারির দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কাজ হচ্ছে জুলির সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ হাসিল করা। ফারগুলো নিয়ে চাকরদের লিফটে ওগুলো তুলে দেওয়া। থিও নিচ থেকে ওগুলো নামিয়ে নেবে। পেছনের গলিতে গাড়ি থাকবে।

একটু থেমে আবার বললেন, বাড়ির নিচতলা থেকে গলি মাত্র এক-পা রাস্তা। ফারগুলো লিফটে তুলে দিয়েই ফিরে গিয়ে গয়নাগুলো নেবে। জুলিকে বেঁধে ফেলে চাকরদের লিফটে নিচে চলে যাবে। সময়টা আমরা পরে ঠিক করে নেব। জুলির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, ওয়েসলিরা শুক্রবার বেরোবে বলে মনে হয়?

জুলি বলল, আমি শুনেছি ঐদিন ওঁরা রাতে বাইরে খাবেন, থিয়েটারে যাবেন।

—ঠিক আছে। হ্যারির দিকে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, শুক্রবার সন্ধ্যা আটটা।

হ্যারি মাথা নাড়ল। মুখে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু ওর চোখে একটা অস্বস্তি উঁকি দিতে লাগলো।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জিগ্যেস করলেন, কোন প্রশ্ন আছে?

হ্যারি বলল, জুলিকে ওখানে ফেলে আসাটা আমার ভাল লাগছে না। পুলিশ ঠিক বুঝতে পারবে ভেতর থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে এ-কাজ করা হয়েছে। ও যদি মাথা ঠিক রাখতে না পারে, যদি সাহস হারিয়ে ফেলে, আমরা ফেঁসে যাবো।

থিও হঠাৎ উঠে বসল।

বলল, সাহস হারাবে না। সাহস হচ্ছে শেষ জিনিষ যা খোয়া যাবে। থিও ওর তীক্ষ্ণ গলায় বেসুরো পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল।

হ্যারি ওর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বলল, এতে মজার কি আছে রে?

—চুপ কর! মিসেস ফ্রেঞ্চ হ্যারির দিকে চেয়ে বললেন, ও আজ ভয়ানক বাঁদরামি করছে। ওর কথায় কান দিও না। জুলি মাথা ঠিক রাখতে পারে কিনা সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আমরা ওকে সঙ্গে নিয়ে এলে, পুলিশ ওর খোঁজ করতে গিয়ে আমাদের ধরে ফেলবে।

হ্যারি অস্বস্তি নিয়ে বলল, ঠিক আছে। জুলির দিকে চেয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় জুলি? শেষ অবধি পারবে?

জুলি খেঁকিয়ে উঠল, পেছনে গুঁতো দিয়ে এর মধ্যে টেনে নামিয়ে, এখন ভালবাসা দেখানো হচ্ছে?

হ্যারি লাল হয়ে গেল। বলল, বেশ তাই যদি বল। মুখ ফিরিয়ে, আর কিছু আছে কি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, খুঁটিনাটি সব আজ আর শুক্রবারের মধ্যে বলে কয়ে নেব। তাহলে ঐ ঠিক রইল, শুক্রবার, সন্ধ্যা আটটা।

—আমি চলি তাহলে। হ্যারিকে যেতে দেখে ডানাও ওর সঙ্গে যেতে চাইল। হ্যারি ওকে বলল, খুবই দুঃখিত। একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আচ্ছা গুডনাইট। ও বেরিয়ে গেল।

ডানাকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে জুলি মনে মনে খুশী হল। ও অবশ্য এখন আর ঐ চিটিং বাজ, গুণ্ডা হ্যারিকে ভালবাসে না।

জুলি উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, আমি এবার যেতে পারি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নেড়ে বললেন, জুলি সাবধান! কোনরকম চালাকি করতে যেও না। থিও

নজর রেখেছে তোমার ওপর।

জুলি কারোর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ের সঙ্গে মনে একটা জয়ের উল্লাস। এখন শুধুই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। দায়িত্ব এখন ওর ঘাড় থেকে পুলিশের ঘাড়ে চলে গেছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুতপদে হেঁটে ও নিউ বন্ড স্ট্রীট পেরোল, বার্কলি স্কোয়ারের দিকে এগোল।

সহসা ছায়ার আড়াল থেকে হ্যারি বেরিয়ে এসে ওর কনুই ধরে পাশে পাশে চলতে লাগলো। জুলি হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো।

হ্যারি বলল, খেপে যেও না সোনা। আমি জানি ঐ থিওটা তোমার উপর হামলা করেছে, কিন্তু আমি জেনেছি অনেক পরে, আর তখন আমার কিছু করারও ছিল না। আমার কোন দোষ নেই।

জুলি হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, চলে যাও আমার কাছ থেকে! আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

হ্যারি বিব্রত হয়ে বলল, ওরকম কোর না জুলি। শোন, এ ব্যাপারটা চুকে গেলে আমরা বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাবো। এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। একটু হাসো। বল, আমার সঙ্গে যাবে।

জুলি বলল, চলে যাও! তোমায় আমি ঘেন্না করি। তুমি একটা চিটিংবাজ, আর কিচ্ছু নও। পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকলো।

হ্যারি ওকে জাপটে ঘুরিয়ে ধরে বলল, কি হয়েছে জুলি? আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি জানি আমিই তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়েছি কিন্তু সে ক্ষতি আমি পুষিয়ে দেবই।

—আমাকে ছাড়ো। তোমার মুখ দেখতে চাই না।

—তুমি আমেরিকা যেতে চাও না? আমি তোমায় দুনিয়ার সব মজা লুটে এনে দেব। এস সোনা, একটা চুমু দাও।

ও হাত বাড়ালো। হ্যারির এই অসীম আত্মবিশ্বাসে ঘা দেবার জন্যে জুলি ওর মুখে চড় মারলো। আমার পেছন ছাড়ো। বুঝলে? চেঁচিয়ে পেছন ফিরে জুলি অন্ধকারে দৌড়ে গেল।

হ্যারি স্তব্ধ হয়ে মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পিকাডিলি হোটেলের লবিতে ওয়েসলির সঙ্গে মিলিত হবার পর থেকেই জুলি খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। ওয়েসলির সঙ্গে দেখা হবার আগে অবধি বিকেলটা ওর ভালই কেটেছিল। ওর সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরেছিল। থিও ওর পিছু নিতে পারেনি, সেজন্যে মনে উত্তেজনা ছিল। বাস থেকে নেমে মুখ লুকিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার মধ্যেও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু ওয়েসলি অন্ধের ভান করছে জুলি তা জানত। আর যেভাবে মানুষ ওয়েসলির দিকে তাকাচ্ছিল, পথ ছেড়ে দিচ্ছিল সাহায্য করতে চাইছিল, তাতে জুলি বেজায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল।

ওর মনে হচ্ছিল ঈশ্বর সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে ওয়েসলিকে শিক্ষা দেবার জন্যে সত্যিই অন্ধ করে দেবেন। ওয়েসলির পক্ষে এরকম আচরণ অনুচিত।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করলে জুলির অস্বস্তিটা টের পেয়ে ওয়েসলি হেসে বলল, বেচারা জুলি! তুমি নিশ্চয় বিব্রত বোধ করছো। ভেব না অভ্যেস হয়ে যাবে।

জুলি রেগে গিয়ে বলল, কিন্তু এবকম আচরণ করাটা অন্যায় হচ্ছে।

ওয়েসলি সহসা শানিত গলায় বলল, অভিনয় যখন করতে হয়, তখন নিখুঁত হওয়া চাই। আমাদের যদি সম্পর্ক রাখতেই হয়, তবে আমি যেরকম, সেটাই তোমায় মেনে নিতে হবে।

ডিউক স্ট্রীটে এস্টেট এজেন্ট ফাউলার অ্যান্ড ফ্রিবডির অফিসের সামনে ট্যাক্সি থামলো।

ওয়েসলি তাঁর কি দরকার বলতে মিঃ ফাউলার চমকিত হয়ে জুলির দিকে তাকালেন। ওঁর চোখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হল ও রেগে গেল। উনি বার্কলে স্কোয়ার আর ভিগো স্ট্রীটে দুটো ফ্ল্যাটের বর্ণনা দিলেন।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা দুটো জায়গাই গেল। জুলির ভিগো স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটাই বেশি ভাল লাগল।

শোবার ঘরে গাঢ় নীল ছাতে রুপোলি তারা আঁকা। গোলাপী কাঁচের আয়না দিয়ে একদিকের দেওয়ালের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঢাকা।

জুলি উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করে শোবার ঘর, বাথরুমটা দেখে মহাখুশী। ওয়েসলি ওকে দেখছিলেন। ওঁর চাউনিতে বিদ্রূপ ফুটে উঠলো।

জুলি বলল, এটা চমৎকার। বার্কলে স্কোয়ারের ওই আদ্যিকালের ফ্ল্যাটের চেয়ে এটা অনেক ভাল।

ওয়েসলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি খুশী হলেই হলো, কিন্তু আমার মনে হয় এ জায়গাটা খেলো। খারাপ মেয়েমানুষদের জায়গা।

জুলি লাল হয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, সে আমি জানি না। এ জায়গাটা আমার চাই।

—বেশ, তোমার যখন ভাল লেগেছে তাহলে এটাই নাও।

—হ্যাঁ, আমি এটাই চাই। মনে মনে ভাবল, ওয়েসলির যদি জায়গাটা পছন্দ না হয়, তিনি না এলেই হলো।

ওরা যখন এজেন্টের অফিস থেকে বেরুল, ওয়েসলি ওর হাতে সামনের দরজার চাবি দিলেন।

চাবিটা নিয়ে ধন্যবাদও দিল না জুলি। ওর রাগ তখনো পড়েনি।

ওয়েসলি বললেন, এখন বোধহয় তোমায় কিছু পোশাক কিনে দিতে হবে। এখন আর তোমার জীবন সেই ব্রিজ কাফে, হ্যারি গ্রেব, ব্ল্যাক মার্কেটে জড়িয়ে নেই। বুঝেছ? না বোঝনি।

—তাই হবে। জুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল। সেই পুরোন দলের কারোর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না তার। জুলি যে পুলিশকে সব বলে দিয়েছে, আজ হোক কাল হোক সে কথা ছড়িয়ে পড়বেই। একবার জানাজানি হয়ে গেলে আর কেউ জুলিকে পাত্তা দেবে না।

ওয়েসলি ওর জন্যে জমকালো নয় তবে চমৎকার কাটছাঁটের সব পোশাক কিনলেন। সে পোশাক পড়ে দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জুলি দেখল তাকে বেশ অভিজাত আর স্মার্ট দেখাচ্ছে। দোকানের লোকটি বেরিয়ে যেতে ওয়েসলি ওর দিকে মুগ্ধ চোখে চাইতে জুলি খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল।

তবে যখন ওয়েসলি ওকে একটা মিঙ্ক কোট কিনে দিলেন, তখন ওর আনন্দ আর বাঁধ মানে না। তখনি জুলি ওয়েসলির সব রকম খুঁতখুঁতুনি ক্ষমা করে দিল।

ওয়েসলি বললেন, এখন আমি কারখানায় যাচ্ছি। আশা করি তোমার বিকেলটা ভালই কাটবে।

মিঙ্ক কোটটা পেয়ে জুলি বেজায় আনন্দিত। ও ওয়েসলিকে কিছু প্রতিদান দিতে চাইল।

ওয়েসলিকে চোখের ইশারায় আমন্ত্রণ জানিয়ে জুলি বলল, হাওয়ার্ড, তুমি কি আমার ফ্ল্যাটে ফিরতে চাও?

চমকে, অসহজ ও অস্বস্তির হাসি হেসে, ওর হাতে আদর করে ওয়েসলি বলল, এখন নয় জুলি, আমাকে কাজের জায়গায় ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি ওয়েসলি একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। জুলি সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রুদ্ধ জুলি ভাবল, নাকউঁচু, অহঙ্কারী লোক কোথাকার! ঠিক আছে আমাকে না চাইলে আমার বয়েই গেল। পরে যদি ওর ইচ্ছে হয়, আমার ইচ্ছে হবে না।

যে সাদা পোশাকের ডিকেটটিভটি পরম ধৈর্যে ওদের সারা বিকেল অনুসরণ করেছে ওয়েসলিকে চলে যেতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সারা বিকেলটা বেজায় হয়রানি গেছে। এখন হেড অফিসে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।

জুলির পেছন পেছন যেতে যেতে ওর মনে হল, এ আবার কি নতুন খেলা শুরু হল। মনে হচ্ছে, ওয়েসলি ওকে নতুন বাসায় তুলছেন? জুলি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। ওর সুডোল পা দুটো দেখতে দেখতে ও ভাবল ওয়েসলিকেও তো দোষ দেওয়া যায় না, অন্ধ হলে কি হবে মাল ভাল পেয়েছে।

জুলি বোঝেনি ওকে কেউ অনুসরণ করছে। ও পিকাডিলির দিকে যেতে লাগল। পুরো সন্ধ্যাটা

ওর সামনে। ওর এখন আনন্দ করতে ইচ্ছে হলো।

মিসেস ফ্রেঞ্চের অফিস থেকে বেরিয়ে হার্লেকুইন ক্লাবে এসেছে হ্যারি গ্রেব। এখন ওর একটু মদ দরকার। চুরির বিষয় সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা শেষ হল।

সিঁড়ি দিয়ে ক্লাবে উঠতে উঠতে হ্যারি ভাবল, শুধুই মনে হচ্ছে বিপদ হবে। যাক্ এটাই শেষ, আর একাজ অন্ততঃ কিছুকাল করবো না। যথেষ্ট হয়েছে।

লাউঞ্জে ঢুকে দারোয়ানের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সোজা বারে ঢুকে গেল। সাড়ে চারটে বেজে ক-মিনিট হয়েছে। দুজন বেশ্যা টুলে বসে হুইস্কি খাচ্ছে।

হ্যারিকে দেখে, বেশ্যা দুটোর সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত বারম্যান খুশিতে চিকমিকিয়ে উঠল। কিন্তু হ্যারির কথা বলার মেজাজ নেই। ও ডবল হুইস্কি নিয়ে জানলার ধারের একটা টেবিলে একা এসে বসল।

সারারাত ধরে হ্যারি জুলির কথা ভেবেছে। রাতে না ঘুমলে ওর শরীর খারাপ হয়।

আগামীকাল আমাদের কাজ হাসিল হবে। তারপর জুলির মন ফেরাবার চেষ্টা করব। ওকে যদি এই কাজে না জড়াতাম, তাহলে ওকে নিয়ে কোন ঝামেলাই হতো না।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে হ্যারি চিন্তা করতে লাগল, মিসেস ফ্রেঞ্চের পক্ষে জুলিকে ফ্ল্যাটে রেখে এস বলা খুব সোজা। সেটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে জুলিকে নিয়ে আমি যদি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকি কিংবা দেশ ছেড়ে পালাই দুজনে, সেটাই ঠিক কাজ হবে।

কিন্তু জুলি কি আমার সঙ্গে আসতে রাজী হবে?

হঠাৎ ওর মনে পড়ল আজ বিকেলটা জুলি যদি ছুটি পায়। কি করছে ও? ও নিশ্চয় ওয়েস্ট এন্ডে গোমড়া মুখে দোকান দেখে বেড়াচ্ছে।

দেখি, ওকে একটু খুঁজে দেখি। হয়তো বুঝিয়ে বললে বুঝবে।

বারম্যানের দিকে মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে ও ক্লাব থেকে বেরিয়ে পিকাডিলি পৌঁছে পার্ক লেনের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলো। হাইড পার্ক অব্দি গিয়ে ও বার্কলে হোটেলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ও হঠাৎ জুলিকে দেখল, জুলি চটপট হেঁটে পিকাডিলির দিকে যাচ্ছে।

একেই বলে ভাগ্যি। জুলিকে দেখতে পেয়ে হ্যারির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে।

ট্রাফিক আলোর সঙ্কেতে গাড়িগুলো গতি কমাতেই ও রাস্তা পেরিয়ে জুলির পেছনে ছুটল। সাদা পোষাকের ডিটেকটিভটা হ্যারিকে ওর পেছনে আসতে দেখে ভাবল এ আবার কোত্থেকে এল, কি চায়? একটু পিছিয়ে ও হ্যারিকে এগিয়ে যেতে দিল।

হ্যারি তখন এতই ব্যস্ত, যে ডিটেকটিভকে ও দেখতেই পেলনা। জুলি রাস্তা পেরোবে বলে দাঁড়িয়ে আছে, তখন হ্যারি এসে ওকে ধরে ফেলল।

টুপি তুলে বলল, হ্যালো আমি একটু কথা বলতে চাই। আমাদের প্ল্যান বদলে গেছে।

জুলি রেগে গিয়ে বলল, আমি কথা বলতে চাই না, চলে যাও।

হ্যারি ওর হাত ধরে বলল, কাজের কথা। গোঁয়ার্তুমি কোর না। কোণেই একটা ক্লাব আছে। ওখানে বসে কথা বললে কেউ দেখতে পাবে না।

জুলি ইতস্ততঃ করলো। ভাবলো, প্ল্যান যদি সত্যিই বদল হয়ে যায়, তবে ওয়েসলিকে তা জানাতে হবে।

—ঠিক আছে। রেগেই বলল। রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে ওরা এগোল।

জুলি ভাবল হ্যারির সঙ্গে দেখা হয়ে ওর সন্ধ্যেটা মাটি হল। ভেবেছিল একটা সিনেমা দেখে পার্কওয়েতে ফিরবে।

হার্লেকুইন ক্লাব এখন খালি। ওরা ঢুকল। হ্যারি জানতে চাইল জুলি কি খাবে।

—কিছু না। তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না আমি। জুলির সংক্ষিপ্ত জবাব।

হ্যারি ডবল হুইস্কির অর্ডার দিল।

জুলির মুখোমুখি বসে ও জিজ্ঞেস করল, জুলি তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর এখনো রেগে নেই?

এ ঝামেলার কাজটায় জড়িয়ে পড়ে, এখন তো আর পেছোতে পারব না?

জুলি অধৈর্য হলে উঠল।

—বলেছো কাজের কথা বলতে চাও, কি বলার আছে বল, আমাকে যেতে হবে।

হ্যারি এতক্ষণে জুলির শীতল চাহনি, অচেনা চাহনি ভাল করে দেখল। দেখে হ্যারি বুঝল জুলি আর ওকে ভালবাসে না। ও কেমন চুপসে গেল।

ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত গলায় বলল, কাজটা হলে তোমাকে ওখানে রেখে আসাটা আমার ভাল লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে ও ব্যবস্থাটা নিরাপদ নয়। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো চুরির পর। কোথাও গা ঢাকা দেব আমরা। তারপর জাহাজে চড়ে আমেরিকা পালাব।

জুলি এমনভাবে ওর দিকে তাকাল, যেন হ্যারি পাগল হয়ে গেছে।

ধারালো গলায় জুলি বলল, ওখানে যেতে আমি ভয় পাই না। তবে কাল রাতেই তো আমি তোমাকে বলে দিয়েছি যে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।

হ্যারি একটু সামনে ঝুঁকে বলল, দেখ জুলি, আমি স্বীকার করছি, আমিই এ ফাঁদে তোমায় ফেলেছি। আমি শুধু খানিকটা টাকা চাই। তারপরই আমি সোজা রাস্তায় চলব, ভাল হয়ে যাবো। সত্যি বলছি জুলি, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।

হ্যারির কথাগুলো নয়, যে ভঙ্গীতে ও কথাগুলো বলল, তাতে জুলির মনে গভীর ভাবে একটা ধাক্কা লাগলো।

—না। চেঁচিয়ে উঠল জুলি। তোমার সঙ্গে আমি জীবনেও যাব না। কিন্তু হ্যারি আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। সময় থাকতে সরে যাও। আমি জানি একাজ করে পার পাবে না তুমি। দোহাই তোমার এ-কাজ কোর না।

হ্যারি ওকে বাধা দেবার আগেই ও লাফিয়ে দরজার দিকে ছুটল।

হ্যারি একমিনিট মূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে, তারপর চেয়ারটাকে লাথি দিয়ে পেছনে ঠেলে জুলির পেছনে ছুটল। সিঁড়িতে জুলিকে ধরে ফেলল।

—জুলি? কি বলছ তুমি? কি জান?

ও হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলে হ্যারি ওকে আরো শক্ত করে ধরে ওর চোখে চোখ রাখল।

ওকে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি নিশ্চয় বলে দাওনি সব। বলে দিয়েছ? পুলিশকে বলে দিয়েছ?

না। আমি ভয় পাচ্ছি শুধু। এ কাজ বেজায় বিপদের। আমার শুধু মনে হচ্ছে এ-কাজ সফল হবে না। জুলি কথাগুলো বলে গেল।

হ্যারির সন্দিগ্ধ চোখ দুটো ওর মুখে কি যেন খুঁজেই চলেছে।

জুলি বলল, যেতে দাও আমায়। শুনছ? যেতে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও।

সিঁড়ির নিচ থেকে একটা কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি মিস্? লোকটা কি আপনাকে জ্বালাতন করছে?

ওরা নিচের দিকে চেয়ে দেখল বিশালাকার একটা লোক কপালঢাকা টুপি আর বর্ষাতি পরে ওদের দিকে চেয়ে আছে। হ্যারি দেখেই চিনতে পারলো ও সেভিল-রো পুলিশ ফাঁড়ির সাদা পোশাকি ডিটেকটিভ। ও তাড়াতাড়ি জুলিকে ছেড়ে দিল।

—ঠিক আছে। বলে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলো

ডিটেকটিভ হ্যারিকে বলল, একটু খেয়াল রেখো ভায়া। নইলে আমার সঙ্গে তোমাকে একটু বেড়াতে যেতে হবে।

হ্যারি বলল, খেয়াল থাকবে।

হ্যারি ক্লাবে ফিরে গেল।

হ্যারি যখন জুলিকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছিল যে ও তাকে ভালবাসে, মিসেস ফ্রেঞ্চ তখন থিওর সঙ্গে চুরির বিষয়ে শেষ খুঁটিনাটি আলোচনা করে নিচ্ছিলেন। জানলার পাশের চেয়ারে বসেছিলেন উনি।

ওঁর মুখোমুখি ইজিচেয়ারে গা ঢেলে পড়েছিল থিও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ব্যবস্থা করে ফেলেছেন চুরির জন্যে কোন্ গাড়ি ব্যবহার করা হবে। সহসা দুজনের মাঝে একটা নীরবতা। শীতল চাউনিতে বাইরের দিকে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চ যেন কি ভাবছেন।

হঠাৎ মুখ না ফিরিয়েই মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আর কিছু নেই তো?

থিও হাসলো।

—ঐ যে মেয়েটা জুলি—কি যেন পদবী ওর! বলে ধুলোমাখা জুতার দিকে চিন্তাকুল চোখে চেয়ে বলল, হ্যারি ওতে মজেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ স্বগতচিন্তা করছেন, কে জানে ও আবার সব ফাঁস করে দেবে না তো? মাথা পিছু আট হাজার টাকা করে পড়বে। ও যদি কথা বলে...।

থিও ধারালো গলায় বলল, আবার ঐ কথাগুলো বলবে না কি? বলেছি আমি ওকে ঠিক করে দেব। আমি...।

থিও কি যেন ভেবে আবার বলল, এখন হ্যারি ওর প্রেমে মজেছে, আমার অন্যের সাহায্য দরকার।

—কি ধরনের সাহায্য?

থিও ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলে হাত ঢুকিয়ে পাঁজরা চুলকোতে চুলকোতে বলল, আমার মনে হয়, হ্যারি কাজ হাসিল করে, লিফটে ফারগুলো আমাকে নামিয়ে দিয়ে তাবপর মেয়েটাকে বেঁধেছেঁদে, গয়নাগুলো নিয়ে ও সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামলো। আমি ফারগুলো গাড়িতে রাখলাম। গাড়ি কিন্তু চালাবে ডানা। মানে তিনজনের হাতে কাজটা হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে বললেন, এতে ডানাকে জড়াতে চাই না আমি। তুমি তো আগেও গাড়ি চালিয়েছো?

থিও ওঁর দিকে তাকিয়ে রেগে বলল, কি হয়েছে তোমার? ঐ মেয়েটাকে আমাকে দেখতে হবে না? বলে আবার পাঁজরা চুলকোতে লাগল।

—কেমন করে দেখবে?

—চাকরদের লিফটে আমি উঠে আসবো। হ্যারি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তারপর মেয়েটার বাঁধন খুলে আলমারীতে ঢুকিয়ে দেব। পুলিশ ভাববে ও চুরি করতে গিয়ে আটকা পড়ে মারা গেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

—সে তো খুন হবে থিও। কথাটা কেমন আনমনে বললেন মিসেস ফ্রেঞ্চ।

থিও নাক সিঁটকাল। নোংরা নখ দিয়ে নাক খুঁটল।

—দুর্ঘটনা। যাই হোক না কেন, দেখে দুর্ঘটনাই মনে হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আমি বলছি না আইডিয়াটা খারাপ। আর ও যে মুখ খুলবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমি খুনে মত দেব না থিও।

থিও কথাটাকে কোন আমলই দিল না। মোচড়ানো টুপিটার ভেতর থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সব থেকে কম নোংরা সিগারেটটা বেছে নিয়ে ধরালো।

নাক দিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে থিও বলল, পয়সার খানিকটা আমি খরচ করতে চাই। তুমি যা বলেছিলে—ও যদি মুখ খোলে, তবে খরচ করার সময়ই পাব না। তুমিও না, ডানাও না।

—হ্যারিও না।

—হ্যারির কি হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবো না। আমি ওকে দেখিয়ে দিতে—।

—আমি এসব কথা শুনতে চাই না। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

—আমি লজ্জিত। থিও আবার পাঁজরা চুলকোতে শুরু করলো।

দীর্ঘ বিরতির পর মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, ও অবশ্য আমেরিকা চলে যাবে।

থিও মুখ বাঁকালো।

—হ্যারির কথা ভুলতে পারছো না। হচ্ছে মেয়েটার কথা।

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নাড়ালেন।

—আমি ওর কথা শুনতে চাই না। খুনে আমার মত নেই।

থিও মিসেস ফ্রেঞ্চের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। তারপর অনায়াসে বলে উঠলো, বলছি না, জিনিষটা দুর্ঘটনা! আবার চুলকোতে লাগল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আমি আর ও নিয়ে কথা বলতে চাই না। তুমি হ্যারি আর ডানার চেয়ে বেশি পাবে। আরো পনেরোশো।

থিও-র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—দু-হাজারই করে দাও ওটা। পয়সা উঠে যাবে।

—পনেরো শো। হ্যারিকে তো আমাকেই বুঝিয়ে বলতে হবে।

—না। কাজ হাসিল হলে তবে টাকা ভাগ হবে। তখন ও আপত্তি করতে পারবে না। তখন তো সব খতম।

—বেশ দু-হাজার।

—ডানা গাড়ি চালাবে তো? থিও—জিজ্ঞেস করলো।

—জানি না কেন তুমি গাড়ি চালাতে চাইছো না। তবে তুমি যদি বল যে চালাতে পারবে না, তবে ডানা চালাবে।

—কেন কথা ঘোরাচ্ছো। আমরা তো সাক্ষী রেখে কাজ করছি না। তুমি কি চাও না আমি কাজটা করি?

—আমি তো বলেছি মেয়েটার মুখ বন্ধ রাখার এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু আমি এও বলেছি খুন আমি সমর্থন করি না। একথা যাক এখন।

—আমি দু-হাজার উপরি পাচ্ছি, ডানা গাড়ি চালাচ্ছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নাড়লেন।

—ঠিক আছে। ছেড়ে দাও। ও নিয়ে আমিই ভেবে দেখব।

থিও বেরিয়ে গেল। মিসেস ফ্রেঞ্চ অনেকক্ষণ জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। ডানা ঘরে এসে ঢুকল।

—থিও চলে গেছে? একা বসে আছো?

মিসেস ফ্রেঞ্চ 'হুঁ' বললেন।

—সব ঠিকঠাক হয়ে গেল? ডানা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

—সব।

ডানা মার টেবিলের কোণে বসে হাঁটুর ওপর যেখানে গার্টার চেপে বসেছে, সেখানকার লাল জায়গাটা ঘষতে ঘষতে বলল, ঐ হল্যান্ড মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ডানার দিকে না তাকিয়েই বলল, তোমাকে ওর কথা ভাবতে হবে না। তোমায় গাড়ি চালাতে হবে।

ডানার ভুরু কুঁচকে গেল।

—কেন? থিও চালাবে এরকমই কথা ছিল না?

মিসেস ফ্রেঞ্চ উঠে দাঁড়ালেন।

—থিও বলছে তার চেয়েও জরুরী কাজ ওর আছে। আমি জানি না ওকে কি করতে হবে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি, আমি চাই না যে তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর।

—ডানা একমুহূর্ত ফ্যাকাশে মুখে মার দিকে চেয়ে রইল।

—মা, তুমি নিশ্চয় বলছ না?

—চুপ কর। মিসেস ফ্রেঞ্চ আবার জানলার দিকে মুখ ফেরালেন।

পরদিন বিকেলে ওয়েসলির আসার কথা শুনে ডসন কনস্টেবলকে মাথা নেড়ে ওয়েসলিকে ভেতরে আনতে বলল।

ওয়েসলি ঘরে ঢুকতেই ডসন চেয়ার পিছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার ঠিক পাশেই

চেয়ার আছে মিঃ ওয়েসলি। তারপর কনস্টেবলকে ইশারা করতে চেয়ারটা ওয়েসলির হাঁটুর পেছনে ঠেকাল, ওয়েসলি বসল।

ওয়েসলি বললেন, তাহলে আজ সন্ধ্যায় ওদের ধরবার জন্যে আপনি প্রস্তুত থাকছেন। ভাবলাম শেষ অবধি যদি কিছু করার থাকে, জেনে যাই।

—সব ঠিক আছে, ডসন বলল, ওয়েসলি চিন্তাকুল মুখে চাইল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কোন চিন্তা নেই।

ডসন মনে মনে ভাবল, এই লোকটা হল্যান্ড মেয়েটার মধ্যে কি দেখেছে? মেয়েটা দেখতে ভাল, সে আমি বলবই, কিন্তু মেয়েটার মধ্যে আর কিছু তো নেই। কিন্তু এ লোকটার তো প্রচুর পয়সা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি আভিজাত্য আছে। ওদের দুজনের মধ্যে কোন মিলই নেই। তবে ব্যাপারটা কি?

সেই সাদা পোশাকী ডিটেকটিভটির কথা শুনেই ওর কৌতূহল হয়েছিল। ক্রেগ জুলির পিছু নিয়ে বুঝেছিল ওদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছে।

ওয়েসলি ইতস্ততঃ করে বললেন, তাহলে আপনারা সব হাতের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটারে যাচ্ছি। একমাত্র থিয়েটারে গেলেই আমি আমার স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। তবে আমি খুবই উদ্বিগ্ন আছি, দেখবেন আজ রাতে যা ঘটতে চলেছে তার বিন্দুমাত্রও যেন উনি টের না পান। তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। একটু থেমে অধীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন ওয়েসলি, আপনি মনে করেন জুলির কোন ক্ষতি হবে না, তাই তো?

—না। জুলি বলেছে ওদের প্ল্যান, চুরির পর ওকে বেঁধে রাখা। যাই হোক, আমরা কাছাকাছিই থাকবো। উনি যেন শুধু চেঁচান।

—আপনার পুলিশ ঠিক কোন্ জায়গায় থাকবে?

—হলে দুজন, পেছনের গলিতে দুজন, আর ফ্ল্যাটের ঠিক বাইরে সিঁড়ির মুখে দুজন, ছাতে দুজন। ওরা যেই বাড়িতে ঢুকবে আমরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িটা ঘিরে ফেলবো।

ওয়েসলি মাথা নাড়লেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে সব ঠিকই আছে। আমরা হিপোড্রোম থিয়েটারে যাচ্ছি, মনে হয় না আমাকে আপনাদের দরকার হবে। তবুও আটটা চল্লিশে ইনটারভ্যালের সময় আমি আপনাকে ফোন করব। তাতে হবে তো?

—হওয়া উচিত। তাহলে চিন্তার কিছু কারণ থাকবে না।

—ধন্যবাদ। আপনার নিশ্চয় অনেক কাজ, আর দেরী করাবো না আপনাকে। ওয়েসলি হাত বাড়ালেন।

ডসন হাত ঝাঁকিয়ে বলল, ব্যস্ত তো থাকতে হবেই স্যার। তবে এ কাজটা আমাদের পক্ষে বেশ ভাল। সব সময়ে আমরা ভেতর থেকে এমন খবর পাই না, বুঝলেন?

—দেখবেন, আপনাদের হাত ফসকে ওরা যেন না পালায়।

—সে ভয় নেই। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

—আপনারা বোধহয় মিস হল্যান্ডকে সাক্ষী দেওয়াতে চাইবেন। যদি তা পারেন সাক্ষী না দিতে হয় তবে খুশী হবো। ওর বিষয়ে যত কম প্রচার হয় ততই ভাল। সেটা কি খুব প্রয়োজন হবে?

ডসন ভাবল, এই কি ওঁর আসার উদ্দেশ্য? মুখে বলল, যদি ধরতে পারি তাহলে মনে হয় না ওকে দরকার হবে। অবশ্য আপনাকে দরকার হবে।

—তা ঠিক আছে। দেখুন আপনারা তো জানেনই মেয়েটা ভাল পরিবেশ থেকে আসেনি। আমি চাই ও যাতে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। দলটা ধরা পড়ায় ওর হাত আছে চাউর হয়ে গেলে ওর পুরনো পরিচিতরা ওকে বিপদে ফেলতে পারে।

—তা পারে। বাধ্য না হলে ওকে আমরা ডাকব না স্যার।

ওয়েসলি মাথা নাড়লেন।

উনি নড়বার কোন লক্ষণ দেখালেন না। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ভালো। ইন্সপেক্টর,

মিস হল্যান্ডের বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। আপনি নিশ্চয় আমার কথা বুঝতে পারছেন। এ সব চুকেবুকে গেলে আমি ওর দায়িত্ব নেব। তাই বলছিলাম, সামান্য জানাজানি হলেও লজ্জায় পড়তে হবে।

ডসন লজ্জিত হয়ে বললেন, এ বিষয়ে আমার কি বা বলার থাকতে পারে?

ওয়েসলি হেসে বললেন, তা আমি জানি। এ-সব মিটে গেলে আমি ওর দায়িত্ব নেব, আমি দেখব ও যেন আর কোন ঝামেলায় নিজেকে না জড়ায়।

ডসন নিরুত্তাপ গলায় বলল, ও ঝামেলায় না জড়ালে আমাদেরও খোঁজ নেওয়ার দরকার পড়বে না। এসব কথা আমাকে বলার দরকার ছিল না, স্যার।

—কিন্তু ইন্সপেক্টর, আমি চেয়েছিলাম আপনি প্রকৃত ঘটনাটা জানুন। আশা করি, ভবিষ্যতে আমায় কোন ডিটেকটিভ অনুসরণ করবে না। যদি করে আমি ব্যবস্থা নেব। ওয়েসলি কঠিন গলায় বললেন।

ডসন মুখ চমকে ভাবল, ধরে ফেলেছে। নিশ্চয়ই হতভাগা মেয়েটা ক্রেগকে দেখে ফেলেছে। আর সেজন্যই এত খুলে মেলে সব বলতে এসেছে।

ডসন ধীরে নিচু গলায় বলল, ওটা একটা দুর্ঘটনা মনে করে মাপ করে দিন। আমরা মিস হল্যান্ডকে পাহারা দিচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা অহেতুক ব্যাপার এসে গেল।

—তাই মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে যদি আপনার লোক আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে, তাকে চলে যেতে বলবেন।

—আজ সন্ধ্যার পর আশা করি মিস হল্যান্ডকে আর পাহারা দেবার দরকার পড়বে না। ডসন বলল।

—নিশ্চয়ই না। ওয়েসলি হাসলেন, আজ সন্ধ্যায় কোন্ সময়ে ফোন করবো আপনাকে? আপনার লোক কি আমায় ট্যাক্সি পর্যন্ত নিয়ে যাবে?

—ওয়সলি বেরিয়ে গেলেন।

ডসন ভাবতে লাগল, এ-সব লোককে আমি চট করে ঘাঁটাতে চাই না। ওঁর ডাক নরম, কামড় সাংঘাতিক। ওয়েসলির ট্যাক্সিটা চলে যেতে দেখে ভাবল, তবে লোকটা ভাল, হিম্মত আছে। ভি. সি পেয়েছে, এদিকে অন্ধ। যদি মেয়েটাকে নিয়ে মজা পায় তো পাক না।

ও আবার কাজ করতে টেবিলে ফিরে এলো।

জুলি ঘরে পায়চারি করছিল। দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে ও চমকে উঠলো। ওয়েসলি সান্ধ্য পোষাকে ঢুকল।

দরজা বন্ধ করে উনি হাসলেন।

—ভয় পেয়েছ জুলি? বুকে হাতুড়ি পিটছে?

জুলি কাতরভাবে মাথা নাড়াল।

উনি ভরসা দিলেন, এখনি সব চুকে যাবে। আমি সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এ কাজটা তোমার একাই করতে হবে।

জুলি বলে ফেলল, আমার...আমার শুধু হ্যারির কথা মনে হচ্ছে। কাল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও আমাকে ওর সঙ্গে আমেরিকা নিয়ে যেতে চাইল। বলছিল ও আমায় সত্যিই ভালবাসে। আমিও দেখলাম সে কথা সত্যি।

ওয়েসলির মুখে কোন কথা ফুটল না।

ধীরে ধীরে বললেন, তাই বুঝি? পুলিশ ওকে ধরবে তোমার খারাপ লাগছে? কিন্তু গ্লেবের মত লোক তোমাকে কোনদিন সুখী করতে পারবে না। আজ বা কাল ও নিজেকে ঝামেলায় জড়াবেই আর ওর সঙ্গে তুমিও ফাঁসবে। তোমার এখন নিজের কথা ভাবতেই হবে।

—জানি। কিন্তু যে আমাকে ভালবাসে তার সঙ্গে এরকম করাটা নীচতা। এখন মনে হচ্ছে যদি ওকে সাবধান করে দিতে পারতাম...যদি থিও না থাকত...।

ওয়েসলি কথা এড়িয়ে বললেন, এই নাও এটা। দেখ এতে মনটা একটু হালকা হয় কিনা।

মুখ ফিরিয়ে জুলি দেখল ওঁর প্রসারিত হাতে একটা চেকবই।

—এটা তোমার। আড়াইশো পাউন্ড জমা দিয়ে তোমার নামে ব্যাঙ্কে একটা খাতা খুলেছি। প্রতি তিনমাসে আড়াইশো পাউন্ড করে জমা দেব আমি। কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে সইটা করে আসবে। তারপর তুমি টাকা তুলতে পারবে।

জুলি চিরকালের আকাঙ্খিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের চেকবই পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলল, আমার জন্যে? আড়াইশো পাউন্ড?

—আমি তো তোমায় বলেছি বছরে হাজার পাউন্ড দেব। এই তার শুরু।

—ও। আসলে এটা তুমি দিচ্ছো যাতে আমি মুখ বন্ধ রাখি। তুমি আমায় পছন্দ করো না।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে বললেন, তোমার চুপ থাকার গুরুত্ব অনেকখানি। সেজন্য আমি তোমায় টাকা, পোষাক, বাড়ি, আনন্দ যা চাও দেব। কিছুতেই মুখ খুলো না।

—খুলব না। জুলি বলল, চেকবইটা হাতে চেপে ধরল।

—আর হ্যারির প্রতি যদি এখন দুর্বলতা দেখাও তো পরে অনুশোচনা করতে হবে। একটু থেমে উনি বললেন, জুলি, এখন আমায় যেতে হবে। ভয় পেও না। শেষ অবধি সামলে নিতে পারবে তো?

জুলি মনে জোর এনে ভাবল, আমাকে পারতেই হবে। হ্যারিই একদিন আমাকে বলেছিল, টাকা মানে ক্ষমতা। টাকা কোথা থেকে, কেমনভাবে পেলাম, ভাবতে চাই না। যে কদিন বাঁচব ফুর্তি করে নেব। তারপর তো কবরের পোকা...।

এ তো হ্যারিরই জীবনদর্শন। আজ যদি জুলির অবস্থায় হ্যারি পড়তো ও ইতস্ততঃ করতো না।

—হ্যাঁ আমি পারবো। জুলি বলল।

ওয়েসলি চলে যেতেই ওর হাত পা ভয়ে কাঁপতে লাগল। হাতের মুঠো শক্ত, ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে বসে আছে। আর চল্লিশ মিনিট বাকি হ্যারি আসতে। জুলির স্নায়ুগুলো পাকিয়ে ধরতে লাগল।

এই একই উত্তেজনা পার্কের গাছের ছায়ায় অন্ধকারে হ্যারি আর থিওর মধ্যেও। আলোকোজ্জ্বল ফটকটা ওরা লক্ষ্য রাখছিল।

হ্যারি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে একবার এ পায়ে, আর একবার ওপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

থিওর কিছুই হয়নি। ও একটা হাত পকেটে পুরে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে গাছে হেলান দিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

হ্যারি সহসা বলল, কটা বাজে?

—সাতটা বিশ। থিও ঘড়ির উজ্জ্বল কাঁটা দুটো দেখে, হ্যারির দিকে ঘেন্নার চোখে তাকাল।

—ওদের তো বেরিয়ে যাওয়া উচিত। ওরা কি চলে গেছে?

—না, হতে পারে না। তাড়াহুড়ো করছ কেন? আটটার আগে তো আমরা কিছু করতে পারছি না।

হ্যারি বিড়বিড় করে বলল, বুড়ি কেন ডানাকে এর মধ্যে টানল, জানি না। কাজটা তো আমাদের দুজনের দ্বারাই হয়ে যেত।

অন্ধকারে থিও প্রেতের মত হাসল।

বলল, ঠিকই করেছে। গলিতে অনেকক্ষণ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ দেখে ফেলতে পারতো। এই ভাল হয়েছে। আমায় কেউ দেখতে পাবে না। আমি পেছনে যাব, ফারগুলো নেব, ডানা গাড়ি নিয়ে আসবে, ফারগুলো ভেতরে রাখবো, ও চলে যাবে গাড়ি নিয়ে। এ তো ভাল বুদ্ধির কাজ।

হ্যারি আপত্তি জানাল। পরিকল্পনার পরিবর্তন ওর মনপুতঃ হয়নি।

—ঐ যে যাচ্ছে। থিও আঙুল তুলে দেখাল।

ওরা দেখল ব্লানশ আর ওয়েসলি ট্যাক্সিতে উঠল। গাড়ি চলে গেল।

হ্যারি সিগারেট ধরাল। বলল, খেল শুরু হল। আমি ওখানে যেতে চাই। অপেক্ষা করে করে শরীরে ব্যথা ধরে গেল।

থিও চেঁচিয়ে বলল, ভয় পেয়েছো?

—চুপ কর বাঁদর। হ্যারি গর্জাল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে থিও ঘড়ি দেখে বলল, আমার যাবার সময় হলো। পাঁচ মিনিট বাদে তুমি এসো। জেলে দেখা হবে। বলে, ঘষটে ঘষটে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হ্যারি আঙুল মটকে ভাবল, জেলে দেখা হবে। এ ধরনের বদরসিকতা?

হ্যারি এখন জুলির কথা ভাবছে। ও ঠিক করেছে কাজ হাসিল করার পর জুলির হাজার আপত্তি সত্ত্বেও ও জুলিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে।

থিও এতক্ষণে বাড়ির পেছনের গলিতে পৌঁছে গেছে ধরে নিয়ে হ্যারি কলার তুলে এগোল। ধীর পায়ে পার্কের ঘাসের সীমানা পেরিয়ে পার্কওয়ের দিকে এগোল। বুক ধড়াস ধড়াস করছে, গলা শুকিয়ে গেছে।

ডিটেকটিভ ডসন আর দুজন সাদা-পোশাকী ডিটেকটিভ ওকে নজরে রেখেছিল।

বিশাল লবিতে ঢুকে ও দারোয়ানের আফিসে গেল।

—মিসেস গ্রেগরির ফ্ল্যাট খুঁজছি। বলতে পারেন কোথায়?

জুলি ওকে বলেছিল ওপরতলার ফ্ল্যাটটা মিসেস গ্রেগরীর। হ্যারি খবরটা স্মৃতিপটে লিখে রেখেছিল।

—মিসেস গ্রেগরী?

—হ্যাঁ স্যার।

—ওপরে। ডানদিকের লিফটা নিন। জানি না উনি আছেন কিনা, দেখব ফোন করে?

—উনি জানেন আমি আসব। হ্যারি তাড়াতাড়ি লিফটের কাছে গিয়ে বোতাম টিপল।

অপেক্ষা করতে করতে ওর একটা আতঙ্কের অনুভূতি হলো, মনে হল ওর ওপর কেউ যেন নজর রেখেছে।

ওর ঘাম ঝড়তে লাগল। রুমাল দিয়ে মুছল।

ওপরতলায় পৌঁছে ঝট্ করে লবিটা দেখে নিল। জনশূন্য ভোঁ ভোঁ। দারোয়ান অফিসে ফিরে গেছে।

লিফট থেকে বেরিয়ে ও দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওয়েসলির ফ্ল্যাট যে তলায় সেখানে পৌঁছাল। নির্জন বারান্দাটা দেখে ও বেল টিপল।

চূড়ান্ত যন্ত্রণায় দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেরী হল জুলির দরজা খুলতে।

ওর দিকে চাইল জুলি, ভয়ে ওর মুখ সাদা, চোখ বিস্ফারিত।

—সব ঠিক আছে জুলি? হ্যারি তড়িঘড়ি ভাব দেখাল, চল যাই।

কিন্তু জুলি হাঁ করে চেয়ে রইল। হ্যারি ওভারকোট পরেছে, কালো সিলকের স্কার্ফে চিবুক জড়ানো।

—হ্যারি, একাজ কোর না। জুলি পিছিয়ে গেল।

হ্যারি ঠেলে ওকে জুলির শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

হ্যারি নিজে অস্থির হয়েও ওকে বলল, ঠাণ্ডা হও, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। ঢুকব আর বেরোব। বুঝলে, যত তাড়াতাড়ি পার, আলমারীটা খোল।

ভয়ে সিঁটিয়ে রইল জুলি। ওর মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়বে। ও নড়তেই পারল না, মরার মত চেয়ে রইল।

হ্যারি বলল, তাড়াতাড়ি কর। দোহাই তোমার। কথা বোল না। হতচ্ছাড়া আলমারীটা খোল। হ্যারি অস্থির হয়ে জুলিকে ঝাঁকাল।

—কিন্তু হ্যারি—জুলি ডুকরে উঠল।

হ্যারি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো, বেরোলে তবে কথা হবে। খোল এটা! লেপঢাকা দেওয়ালের দিকে ও ঠেলে জুলিকে নিয়ে গেল, অ্যালার্ম বন্ধ কর। বিছানার পাশে একটা ঘণ্টা

আছে, বন্ধ কর।

হঠাৎ জুলির মনে হল, হ্যারি যদি ফার না নেয়, তাহলে পুলিশ ওকে ধরতে পারবে না। ও দিব্যি বলতে পারবে, হ্যারি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

—হ্যারি শোন, তুমি কিছু নিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব, তুমি যদি এখন চলে যাও।

হ্যারি ঝট করে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। ওর শিরা, স্নায়ু, সব ছিঁড়ে যাচ্ছে।

হ্যারি চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ হাঙ্গামার অ্যালার্ম বন্ধ কর। কথা বোল না।

—কিন্তু হ্যারি তুমি বুঝছো না কেন?... জুলির কথার মাঝখানে চাপা গলায় হ্যারি দিব্যি গেলে জুলির হাত চেপে ধরে জুলির মুখে ঠাস করে একটা চড় মারলো।

রেগে গিয়ে হ্যারি বলল, আলমারী খোল। মাথা ঠাণ্ডা করো গাধা।

জুলি বুঝল যে ভয় পেয়েছে বলেই হ্যারি ওকে মেরেছে।

জুলিকে ভালবাসে বলেও যদি ও চড় মারতে পারে, তাহলে ওর ভালোবাসার মূল্যটা কি?

—ঠিক আছে। তারপর বোল না, আমি তোমায় সাবধান করি নি। রিক্ত গলায় জুলি বলল।

হ্যারি দেখল দশ মিনিট হলো ও ঢুকেছে। এখনো আলমারি খোলা হলো না।

—তাড়াতাড়ি কর। রুদ্ধশ্বাসে, আতঙ্কে হ্যারি বলল, বেরিয়ে পালাতে হবে।

জুলি যন্ত্রচালিতের মত বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে অ্যালার্ম বন্ধ করল। বাথরুমে গিয়ে দ্বিতীয় অ্যালার্মটাও বন্ধ করলো। হ্যারি ওকে তাড়া লাগাল।

কি করছে তা না বুঝেই জুলি আলমারীটা খুলল। ইস্পাতের দরজা খুলল, ফোটো ইলেকট্রিক সেলের আলোটা জুলি বন্ধ করতেই হ্যারি ঝাঁপিয়ে পড়ে ফারগুলো পাঁজা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জুলি শুনতে পেল ও রান্নাঘরের দেওয়াল সরাচ্ছে বোতাম টিপে, চাকরদের লিফটটা ওখানে। হঠাৎ জুলির মনে হল ও যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। চেয়ারটা ধরে নিজেকে সামলালো।

হ্যারি আবার এসে আরেক পাঁজা করে বেরিয়ে গেল। তড়িতের মত ছোটাছুটি করছে ও। জুলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। জুলিরও কিছু করার নেই। ও ভাবছে এক মুহূর্তেই পুলিশ আসবে আর হ্যারির খেলাও শেষ হবে।

তারপর হঠাৎই বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আর্তনাদে সারা ফ্ল্যাটটা হা হা করে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

জুলি দরজায় এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে উঁকি মারলো।

জুলি দেখল, দরজার গজখানেক ভেতরে হ্যারি দাঁড়িয়ে আর ওর পায়ের কাছে কি যেন একটা, হ্যারির চোখ সেদিকে। হ্যারির জন্যে জিনিষটা জুলি দেখতে পাচ্ছে না। কাছেই একটা অটোমেটিক পিস্তল পড়ে আছে, নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

—হ্যারি! জুলি আর্তনাদ করলো।

হ্যারি যেন আঁতকে উঠে সামনের দরজাটা বন্ধ করলো। ও নড়তেই জুলি দেখল, মেঝেতে পুতুলের মতো একটা শরীর পড়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে জুলি দেখল শরীরটা ব্লানশের।

ব্লানশের মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওর উজ্জ্বল চুল ঘিরে রক্তবলয় রচনা করেছে দেখে জুলি আর্তনাদ করলো।

সামনের দরজায় ভীষণ আঘাতের শব্দ। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো, খুলল না।

জুলি শিউরে পিছিয়ে এল।

দুহাতে হ্যারিকে ঠেকাতে চেষ্টা করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি ওকে গুলি করেছ, সরে যাও হ্যারি।

হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি বিশ্বাস কর, আমি গুলি করি নি। আমি রান্নাঘরে ছিলাম। জীবনে বন্দুক সঙ্গে রাখি না জুলি। তোমাকে পুলিশের কাছে বলতে হবে, আমি...আমি একাজ করিনি।

তারপর সামনের দরজা খুলে তিনজন পুলিশ অফিসার তেড়ে এল।

হ্যারি জুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক পা নড়ার আগেই ওরা হ্যারিকে ধরে ফেলল। অনেকগুলো হাত ওর ধস্তাধস্তির চেষ্টা ব্যর্থ করল।

তারপর সব অন্ধকার। জুলি যেন কোন খাদের গহন অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

থিও যখন চাকরদের লিফট চালিয়ে ওপরে উঠছিল তখন ও গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। তখনি ও পলকা ব্রেকটা কষে থামায়। লিফট তখনি থেমে যায়। হ্যারি লিফটে ঢোকার জায়গাটা খুলে রেখেছিল। সেই খোলা দরজার একটু নিচে থিওর লিফটা থামে। মুখটা বের করে রান্নাঘরের ছাদটা দেখতে পায়।

জুলির উন্মত্ত, ভীত আর্তনাদ, ফ্ল্যাটের সদর দরজা ভাঙার আওয়াজ পেল। ও বুঝল কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

লিফটের ভেতরে দড়ির যে অংশটা আছে, সেটা টেনে লিফটা নামানো যায় বহু কষ্টে। থিওর দড়ি টেনে টেনে লিফট ওপরে তুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তবু ঐভাবে উঠল, কেননা জুলির মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন।

এখন ওপরে পৌঁছবার একটু আগেই গোলমাল বাঁধল।

সহসা ও শুনতে পেল হ্যারির শঙ্কিত আওয়াজ। আমি একাজ করিনি, ওটা আমার বন্দুক নয়, আমি শপথ করে বলছি।

থিওর মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

ও ভাবল তবে কেউ গুলি খেয়েছে! কেউ দেখে ফেলার আগেই অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে দড়িটা টানার আগেই ব্রেক আলগা করলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল গতিতে লিফটা নামতে লাগলো। থিও ব্রেকটা প্রাণপণে আঁচড়ে ধরে বসে রইল। কিন্তু পেছনের গলির ডিটেকটিভ দুজন দেখল অন্ধকারের ভেতর থেকে লিফটা নীচে আছড়ে পড়লো আর থিও ভয়ে কঁকিয়ে উঠলো।

ছুটে গিয়ে থিওর পাণ্ডুর মুখে টর্চ ফেলল। যখন ওরা থিওকে ছুঁল থিও এমন আর্ত চীৎকার করে উঠল, যে দুজনে চমকে পিছিয়ে গেল।

লম্বা লোকটি বলল। ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা কর। আমরা অ্যাম্বুলেন্স আনছি।

অন্য লোকটিকে প্যাসেজ ধরে ছুটে যেতে দেখে থিও বলল, কোথায় যাচ্ছো?

—ডসনকে ডাকতে, অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিতে।

থিওর মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল, ডসন বুড়োটা আমাকে দেখতে পারে না, ও নিশ্চয় বেজায় খুশী হবে। ও হাঁপিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল। বলল, আমায় ছুঁয়ো না, পিঠটা ভেঙ্গে গেছে। না ছুঁলে তবু একরকম।

ডিটেকটিভটা ওর পাশে থেবড়ে বসে বলল, একটু শান্ত হও, আমরা তোমায় ঠিক টেনে তুলব।

থিও মুখ বেঁকাল।

বলল, শেষ অব্দি কাগজে নাম বেরুচ্ছে। আমার ব্যাগে একটা ফোটো আছে, প্রেসকে দিও, আমার বাবা কাগজে আমার ছবি দেখে চমকে যাবে। প্রথম পাতায় বেরুবে তো?

—হ্যাঁ। ডিটেকটিভটির মুখ কুঁচকে গেল।

—তাহলে তাড়াতাড়ি ওটা বের করে নাও। ওরা তোমায় পয়সা দেবে সেজন্যে। তুমি না নিলে ডসন নেবে। থিও জোর দিয়ে বলল।

—এইটে? ওর ব্যাগ থেকে ফোটোটা বের করে ডিটেকটিভটি ওকে দেখাল।

—হ্যাঁ। প্রেসকে দিও।

এক মিনিট চুপ করে শুয়ে রইল ও। তারপর বলল, গুলির কারবারটা কি হলো এক্ষুনি?

—জানি না। ব্লেবের কাছে তো বন্দুক ছিল না, ছিল?

থিও চুপ করে থাকল। ও ভাবল ও মরে গেলেও হ্যারির মারের দাম উসুল করে তবে মরবে। তবে গুলির ব্যাপারটা ভাল করে জেনে তবেই থিও মুখ খুলবে।

—ডসন আসার আগে আমি কিছু বলব না। ওকে তাড়াতাড়ি আনো। আমি পটল তুলবো।

—না না, তুমি বেঁচে দশ বছর জেল খাটবে। ডিটেকটিভ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। অন্ধকার থেকে ডসন বেরিয়ে এলো। থিওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

সাদা, যন্ত্রণা কাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে ডসন বলল, হ্যালো, এবার সত্যিই প্যাঁচে পড়েছ,

পড়েনি?

থিও চোখ খুলল।

বলল, আমাকে যতক্ষণ না ছুঁচ্ছো আমি ঠিক থাকবো। অ্যাম্বুলেন্স আসছে?

ডসন বলল, হ্যাঁ। থিও এই বন্দুকটা আগে দেখেছ? একটা অটোমেটিক পিস্তলের ওপর টর্চ ফেলে ওকে দেখাল।

থিও জিজ্ঞেস করল, হ্যারি গুলি ছুঁড়ছিল? কাউকে মেরেছে?

—জানি না। এটা ওর বন্দুক কিনা তার ওপর সব নির্ভর করছে।

থিও চোখ বুঁজল, খুলল।

—ওর বন্দুক। কাকে মেরেছে?

—ঠিক বলছো?

—নিশ্চয় ঠিক বলছি। আমি ওকে বন্দুক আনতে বারণ করেছিলাম, ও শুনল না। বলল যে কেউ কোনরকম বাধা দিলেই তাকে ও মারবে।

—জবানবন্দী সই করবে?

থিও ঘষা কাঁচের মত চোখদুটো চেয়ে মাথা নাড়ল।

—তাড়াতাড়ি কর, নইলে পটল তুলব। থিও যন্ত্রণাকাতর ভাবে বলল।

ডসন নোট বইয়ে সব লিখে নিচ্ছিল। অনেক কষ্টে থিওকে দিয়ে সই করালো।

অ্যাম্বুলেন্স যখন পৌঁছাল থিও মারা গেছে।

ডসন যখন পার্কওয়ের লবিতে আবার ঢুকল, তখন একজন বলিষ্ঠ চেহারার ডিটেকটিভের সঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে হ্যারিকে লিফটে করে নামানো হচ্ছে। আরেজন ডিটেকটিভ ওর পেছনে আসছে।

অটোমেটিক পিস্তল হাতে ডসনকে দেখেই মরিয়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, আমি এ-কাজ করিনি ডসন। ওটা আমার পিস্তল নয়। তুমি জান আমার কোনদিন বন্দুক কিংবা পিস্তল ছিল না। আমি এ-রকম কাজ করবই না। দোহাই তোমার ডসন, আমাকে খুনের দায়ে ধর না। আমি এ-কাজ করি নি।

ডসনের নীল চোখ হ্যারির আগাপাশতলা দেখে নিল।

ডসন প্রায় ধমক দিয়ে বলল, আমাকে ধাপ্পা দিও না গ্লেব। তোমার দোস্ত থিও সব ফাঁস করে দিয়েছে। আমার কাছে ওর সই করা জবানবন্দীতে লেখা আছে এ পিস্তল তোমার। তুমি বড্ড চালাক হয়েছো গ্লেব, এটাই তোমার শেষ খেলা।

হ্যারি চীৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা বলেছে ও, ওকে এখানে আন, ইঁদুরটাকে দিয়ে আমি সত্যি কথা বলাবো। নিয়ে এস ওকে।

ডসন রুক্ষ গলায় বলল, ও মারা গেছে। ডিটেকটিভকে নির্দেশ দিল, ওকে নিয়ে যাও।

হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল, মরে গেছে? তারপর ও ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। দুজন ডিটেকটিভের প্রবল চেষ্টায় ওকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল।

খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ধস্তাধস্তি করে হ্যারির ফোটো তুলতে লাগলো। অন্ধকার বিদীর্ণ করে গাড়িটা যখন জোরে চলে যাচ্ছে তখনও হ্যারির কাতর কণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা যেতে লাগলো।

ডসনের সহকারী গারসন এগিয়ে এল।

নীচু গলায় বলল, মিঃ ওয়েসলি এসেছেন। উনি ওপরে গেছেন।

ডসন মাথা নাড়ল।

ডসন বলল, আমি জানতে চাই, মহিলা পুলিশের কর্ডন ভেঙে কি করে ঢুকলো? কেন এভাবে ফিরে এল?

গারসন বলল, আমি মিঃ ওয়েসলিকে কোন প্রশ্ন করি নি। ওঁকে ধাতস্থ হতে একটু সময় দিলাম। আপনি ওঁকে প্রশ্ন করবেন না আমি?

ডসন বলল, আমি যাচ্ছি। আমরা বাড়িটা ঘিরে রেখেছিলাম, জানতাম গ্লেবের মতলব কি, তবু দিব্যি গ্লেব মহিলাকে খুন করলো। মহিলা সমাজে সুপরিচিত বটে। একবার কাগজগুলোকে খবরটা পেতে দাও। এখনি ওরা জানতে চাইছে, চুরিটা হবার আগেই পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হলো কেমন করে। হল্যান্ড মেয়েটার খবর কি?

ওপরে ডাক্তার ওকে দেখছে।

ডসন লিফটের দিকে এগোতে এগোতে বলল, থিওটা পিঠ ভেঙে মরেছে। জ্যাকসন মড়া আগলাচ্ছে।

ওরা লিফটে ওপরে উঠলো।

ডসন ফট্ করে জিজ্ঞেস করলো, ওয়েসলি কিভাবে নিলেন?

—একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। উনি যখন ঢোকেন তখন মৃতদেহ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মৃতদেহটা সরানো হয়নি, উনি তার ওপরেই পা তুলে দিয়েছিলেন বলতে গেলে। আমি ওঁর কাছে যেতে উনি মৃতদেহটা ছোঁয়ামাত্র ভয়ানক রকমের ধাক্কা খেলেন।

ডসন বলল, মনে হয় না দুজনের মধ্যে আর কোন ভালবাসা টিকে ছিল। ওয়েসলি হল্যান্ডকে রাখতে চাইছিলেন। যতদূর শুনেছি, ব্লানশ ওয়েসলিও বেশ দুশ্চরিত্রা ছিলেন। সে যাই হোক, বউয়ের মৃতেদেহের গায়ে হোঁচট খাওয়াতে নিশ্চয়ই মজা নেই। কি বল?

ডসন সদর দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল।

পুলিশ ফোটোগ্রাফাররা ছবি নিচ্ছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা হলে কাজ করছে।

ডসন সোজা ওয়েসলির কাছে গেল।

হাতদুটো কোলের ওপর ভাঁজ করে বসেছিলেন।

—ডসন, বড় দুঃখের ঘটনা। আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি। ওয়েসলি নিস্তেজ গলায় বললেন।

—হ্যাঁ। আমার লোকরা ওর আসা ঠেকাতে পারলো না। কাউকে ঢুকতে বারণ করবে, এ নির্দেশ ওদের দেওয়া হয়নি। কেউ বেরোতে গেলে বাধা দেবে এই কথা ছিল। আমার লোকেরা ওঁকে দেখেন নি আসতে। যদি ওঁর পরিচয় জানতো, তবে ওঁকে বাধা দিতো। কেন ফিরে এলেন উনি?

—ওয়েসলি হতাশার ভঙ্গিতে বললেন, আমরা ঝগড়া করেছিলাম। আমার অন্ধত্বের কারণে এবং নানা কারণে আমাদের তেমন বনিবনা ছিল না। উনি খুব মদ খেতেন। থিয়েটারে যাবার আগে উনি খানিকটা মদ খেয়েছিলেন। গাড়িতে আমাদের ভীষণ ঝগড়া শুরু হলো। আমি যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি, তখন উনি নেমে চলে গেলেন। থিয়েটারে ঢোকার আগে উনি চলে গেলেন আমি বুঝিনি।

আপনি নিশ্চয় বুঝবেন একটা ভীড়, ঠেলাঠেলির মধ্যে একটা অন্ধ লোককে একা ছেড়ে গেলে তার কি অবস্থা হয়। ভাবলাম হয়তো বাথরুমে, নয়তো বারে গেছেন। কিন্তু পর্দা উঠে যাওয়ার পরও উনি না আসাতে ভাবলাম উনি আর থিয়েটার দেখতে চান না, হয়তো ক্লাবে চলে গেছেন। সহসা মনে হল, উনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। তখন বেজায় উদ্বেগ হল। ট্যাক্সি করে এখানে পৌঁছে শুনলাম উনি...ওঃ...।

—কিন্তু কেমন করে ঢুকলেন উনি? কেউ ওঁকে ঢুকতে দেখেন নি। সেটা বলতে পারেন? ডসন জিজ্ঞেস করল।

—মনে হয়, গ্যারেজের দরজায় উনি ট্যাক্সি থামিয়েছিলেন। এ বাড়ির গ্যারেজ মাটির তলায়, দরজা আলাদা। উনি হয়তো গ্যারেজ থেকে সটান আমাদের ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলেন। উনি অনেক সময়ই তাই করতেন।

—কিন্তু গ্লেব ঢোকার পর কোন ট্যাক্সিকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

—হয়তো হেঁটে এসেছেন। আমি ঠিক বলতে পারছি না।

ডসন ওঁর দিকে তাকাল।

বললেন, তা হতে পারে। তবে খোঁজ নিতে হবে, গ্যারেজে ওকে কেউ দেখেছে কিনা। যাক্ যে একাজ করেছে, তাকে আমরা ধরেছি, সে পালাতে পারবে না।

ওয়েসলি আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন।

—যদি আমাকে আর দরকার না থাকে, তবে এই মর্মান্তিক আঘাতের কারণে আমি কি একটু একলা থাকতে পারি?

—নিশ্চয়ই। আমরা আপনাকে বিরক্ত না করারই চেষ্টা করব। আর কিছু করতে পারি কি?

—গেরিজকে...আমার সেক্রেটারীকে যদি দেখেন, আমার কাছে আসতে বলবেন।

—বলবো। ডসন দরজার দিকে এগোল।

—ওয়েসলি সতর্ক প্রশ্ন করলেন, মিস হল্যান্ড ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ...একটু ভেঙে পড়েছে, তবে ঠিক আছে। আমি ওর কাছেই যাচ্ছি।

—ও কি কিছু দেখেছে?

—তাই জানতে যাচ্ছি।

—তাই বলুন। ধন্যবাদ।

ডসন একটু দাঁড়িয়ে কি ভেবে বসার ঘরে গারসনের কাছে গেল। ওকে ডসন বলল, বাড়ির নিচে গ্যারেজে মিসেস ওয়েসলিকে কেউ আসতে দেখেছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখো। ওদিকে আমাদের কোন পাহারা ছিল না। ওয়েসলির সন্দেহ মহিলা ওখান দিয়ে ঢুকেছেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—হল্যান্ড মেয়েটা কোথায়?

—নিজের ঘরে। এই প্যাসেজের শেষ ঘর স্যার।

ডসন ভারি পা ফেলে হেঁটে গিয়ে দরজায় টোকা মারল।

জুলি বিছানায় শুয়েছিল। মুখখানা অশ্রুভেজা। ডসনকে দেখে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

সময় নষ্ট না করে ডসন জিজ্ঞেস করল, যখন গুলিটা চলে তুমি কোথায় ছিলে?

—মিসেস ওয়েসলির ঘরে।

—কি হল ব্যাপারটা?

—আ...আমি কিছু জানি না...আমি কিছু...দেখিনি।

ডসন ওর দিকে ভালভাবে চেয়ে বলল, দেখ বাছা, ফ্ল্যাটে তুমি আর গ্লেব ছিলে। তুমি সব খোলসা করে বলো। নইলে বিপদে পড়বে।

—কিন্তু আমি কিছু জানি না। জুলি উঠে বসল। আমি কিছু দেখি নি।

—শুনেছ তো কিছু? না শোন নি?

—মিসেস ওয়েসলিকে চেঁচাতে শুনেছি। তারপরই গুলির শব্দ শুনে ছুটে যেতে দেখলাম হ্যারি ঝুঁকে মিসেস ওয়েসলিকে দেখছে। ও তখনই রান্নাঘর থেকে এসেছে।

—শুধু এই দেখেছ। ওকে হ্যারি গুলি করেছে দেখনি?

—কিন্তু ও গুলি করেনি। ও রান্নাঘরে ছিল। ও একাজ করতে পারে না। ওর কাছে পিস্তল ছিল না। জুলি বলল।

ডসন রুক্ষ গলায় বলল, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা কোর না। তাতে কাজ হবে না। ও না করলে, তুমি করেছো। ফ্ল্যাটে তো শুধু তুমি আর গ্লেবই ছিলে।

ভয় পেয়ে জুলি বলল, না! আমি করিনি।

ডসন ভয়াল হাসি হাসল। বলল, আমি বলছি না তুমি করেছো, তবে তোমায় এটা বোঝাতে চাইছি, মিথ্যে বললে বিপদে পড়বে।

জুলি হাতের মুঠি শক্ত করে বলল, কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত যে হ্যারি একাজ করেনি, করতে পারে না। সদর খোলা ছিল। সেখান থেকে কেউ গুলি করতে পারে।

—অদৃশ্য মানুষ? সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে বা নামলে সিঁড়ির দুদিকে আমার লোক ছিল, ওরা দেখতে পেত। ওরা কাউকে দেখেনি।

জুলি ওর দিকে চেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ডসন জিজ্ঞেস করলো, পিস্তলটা কি গ্লেবের হাতে ছিল?

—না। মিসেস ওয়েসলির পাশে মেঝেতে, দরজার ঠিক পাশে পড়েছিল।

—ঠিক আছে। যাক, তুমি বেঁচে গেলে। থিও মরে গেছে। গ্লেব ধরা পড়েছে। ফ্রেঞ্চদের খুঁজছি। হুঁশিয়ার থেকো।

দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে এসে বলল, মনে রেখো তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। এখন থেকে মামলা ওঠা অবধি সাবধানে থেকো। বুঝলে?

জুলির ঘর থেকে বেরোবার সময় গারসনের সঙ্গে ডসনের দেখা হল।

গারসন বলল, গ্যারেজে কেউ ছিল না স্যার। কাজের লোকেরা সাতটায় চলে গেছে।

ডসন ভুরু কুঁচকে বলল, যে ট্যাক্সিটায় এসেছিল, সেটার খোঁজ কর। যেভাবে ফিরে এসেছিলেন, তারমধ্যে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হচ্ছে, এদিক থেকে তদন্ত করলে খানিকটা ফল পাওয়া যাবে।

গারসন চমকে তাকাল।

—কিন্তু, গ্লেবই ওকে খুন করেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। আছে কি?

ডসন তিক্ত গলায় বলল, মামলা শেষ না হওয়া অবধি সন্দেহ থেকে যায়। খানিকটা খাটুনির ভয়ে কেসটা হাত ফসকে যাবে, সেটা আমি চাই না। গ্লেবকে যখন এতদিন পর ধরেছি, তখন জাল ফসকে মাছ বেরোতে দিচ্ছি না। খোঁজ নাও, মিঃ ওয়েসলির কাছ থেকে যাবার পর মিসেস ওয়েসলি কি করেছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

কেউ লক্ষ্য করল না, ওয়েসলির স্টাডির দরজাটা ইঞ্চিখানেক খুলে গেল। গারসন চলে যেতে নীরবে বন্ধ হয়ে গেল।

পুলিশ চলে যেতে ফ্ল্যাটটিতে একটা অস্বাভাবিক নীরবতা ফিরে এল। জুলির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডসন গম্ভীর গলায় ওর লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে জুলি শুনতে পাচ্ছে। জুলি ভাবল, ডসন আবার ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ডসন শুধু ওয়েসলির সঙ্গে দেখা করে, ভারী পায়ের শব্দ করে চলে গেল।

তারপর গেরিজেরও চলে যাবার আওয়াজ পেল। জুলি আস্তে আস্তে উঠে কার্পেটে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে লাগল।

সারা ফ্ল্যাটে এখন শূন্য গীর্জার নীরবতা।

প্যাসেজে আসতে ও ভয় পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ব্লানশ যে কোন মুহূর্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াবেন।

এ ফ্ল্যাটে আর এক মিনিটও থাকার কথা ভাবতে পারছে না ও। ভিগো স্ট্রীটের চাবি আছে ওর কাছে। এই ভয়াবহ পরিবেশ ছেড়ে ওখানেই চলে যাবে ঠিক করলো জুলি। ব্যাগ গোছাতে শুরু করল।

ব্যাগ গোছানোর পর কিছু ভুলে গেল কিনা ও দেখছিল। হঠাৎ প্যাসেজে পায়ের শব্দ শুনে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল।

ব্লানশ?

অসম্ভব উনি মারা গেছেন।

অপেক্ষা করলো জুলি। আবার কান পাতল। ইঁদুর দেওয়ালের কাঠ আঁচড়ালে যতটুকু শব্দ হয়, তার চেয়ে জোর নয় আওয়াজটা। ও দরজাটা একচুল ফাঁক করে উঁকি মারলো।

দেখল, ফ্যাকাশে, অভিব্যক্তিহীন মুখে সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওয়েসলি কার্পেটের ভিজে দাগটা দেখছেন। তারপর ঐ জায়গাটায় পা বুলিয়ে স্বগত বললেন, ও বেঁচে থাকার যোগ্য ছিল না।

জুলির অসুস্থতা অনুভব হলো এখন। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে ও চোখ বুঁজল।

কখন ওয়েসলি ঘরে ঢুকেছেন ও শুনতে পায় নি। যখন উনি কথা বললেন ও চমকে, ছিটকে, লাফিয়ে উঠল।

ওয়েসলি মৃদু কণ্ঠে বললেন, ঘাবড়ে দিতে চাই নি। দরজায় টোকা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু

অতটা মাথায় আসেনি।

জুলি চুপ করে রইল।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। জুলির দিকে না তাকিয়েই বললেন, এখন সব কি নীরব, শান্ত না? পুলিশের মুখে শুনলাম, তুমি ঠিকই আছো। তুমি নিশ্চয় ভীষণ ঘা খেয়েছো তাই না?

জুলি কি বলবে ভেবে পেল না।

—ডসন কি রকম অদ্ভুত রকমের আচরণ করছিল। তাই না? এবার একটু দাঁড়িয়ে জুলির দিকে তাকালেন। আবার পায়চারি করতে করতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন। বললেন, ও যেন কি সন্দেহ করছিল। ব্লানশ কেমন করে ফ্ল্যাটে ঢুকলো, তাতে কি এসে যায়? ডসন কেন তাই নিয়ে রহস্য করছে?

—আমি জানি না।

—গ্লেব ওকে গুলি করেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। ডসনের মতলব কি আমি বুঝতে পারছি না।

জুলি বলে উঠল, হ্যারি গুলি করেনি। আমি জানি।

ওয়েসলি সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—কি বলতে চাইছ জুলি?

—হ্যারি ও কাজ করে নি। আমি জানি ও করেনি।

—তুমি কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছো?

—আমি জানি ও খারাপ। কিন্তু ও কোনদিন সঙ্গে বন্দুক রাখতো না। একবার আমার সামনে মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর কাছে বন্দুক আছে কি না। ও তখন বলেছিল, ও কখনো বন্দুক রাখেনি, রাখবেও না। তখন ও সত্যি কথা বলেছিল। আজ রাতে ও যখন বলল ও ব্লানশকে গুলি করে নি তখনো ও সত্যিই বলেছিল।

ওয়েসলি সামান্য কম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি পুলিশকে একথা বলেছো?

—ডসন আমার কথা বিশ্বাস করে নি। ও বলেছে, ফ্ল্যাটে শুধু আমি আর হ্যারি ছিলাম। হ্যারি না করলে আমি খুন করেছি।

—মূর্খ! ওয়েসলি রেগে গিয়ে বলল, ও নিশ্চয় একথা বিশ্বাস করে নি।

—না। ও আমায় ভয় দেখাতে চাইছিল। কিন্তু হ্যারি খুন করতে পারে না। আমি ডসনকে বললাম সদর খোলা ছিল—।

—কি বললে, কি বলতে চাইছ তুমি?

—সদর খোলা ছিল। ব্লানশ ঢোকার পর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ওয়েসলি জুলির কবজি ধরে টেনে এনে, ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, দরজা খোলার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক আছে? কি ইঙ্গিত করছো তুমি?

ওঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে জুলি স্থির, নির্বাক হয়ে গেল।

—জবাব দাও জুলি!

—আমি শুধু বললাম, প্যাসেজ থেকে কেউ ওঁকে গুলি করে থাকতে পারে।

জুলি বিরক্ত হয়ে কবজি ছাড়ানোর চেষ্টা করল। দোহাই তোমার ছেড়ে দাও। আমার ব্যথা লাগছে।

কিছুক্ষণ ওকে ধরে থেকে তারপর ওয়েসলি ওকে ছেড়ে দিয়ে মুখ ফেরালেন।

—দুঃখিত। ডসন এর জবাবে কি বলল?

জুলি বসে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, অদৃশ্য মানুষের কথা কি যেন বলল। বলল, কেউ উঠলে বা নামলে সেটা পুলিশের নজরে পড়তো।

—অদৃশ্য মানুষ? ডসন এই কথা বলল?

ওয়েসলির চাউনি জ্বরো রুগীর মত। কিন্তু সহসা উনি খুব স্বাভাবিক ভাবে হাসলেন, জুলি তুমি সাহায্য করতে চেয়েছিলে। কিন্তু ভেবে দেখ ওকে দরজা দিয়ে কেউ গুলি করতে পারে

না। পুলিশ যদি ওখানে পাহারায় থাকে তবে কারোর পক্ষে সম্ভব ওখান থেকে গুলি করা?

জুলি ওঁর ভাবভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে বলল, না, হয়ত না। কিন্তু আমি নিশ্চিত হ্যারি ও কাজ করে নি।

—গ্রেবের ওপর তোমার এ বিশ্বাস বড়ই দুঃখের। হাজার হলেও ও একটা চোর। তোমার ওপর ও কোন দয়া দেখায় নি। ব্লানশকে ও যে গুলি করেনি, তার কোন প্রামাণই নেই তোমার কাছে। তুমি কি ওকে ভালবাস?

—না, আমি ওকে ভালবাসি না। কিন্তু তবু বলব ও একাজ করেনি।

—এটা একটা যুক্তিগ্রাহ্য কথা হলো না। জুরি তোমার এ কথায় কান দেবে না। যাক, দেখা যাক কি হয়।

জুলি বিস্ফারিত চোখে বলল, ওকে কি ফাঁসি দেবে ওরা?

—জানি না। ও কথা এখন না ভাবাই ভালো। ওকে তো এখনো আদালতেই তোলা হয় নি। ওয়েসলি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এখানে আর একরাতও থাকতে পারবো বলে মনে হয় না। তুমি পারবে জুলি?

—না।

—তাহলে, চলো নতুন ফ্ল্যাটে যাই আমরা।

ওঁর সঙ্গে থাকার কথা ভেবে জুলি শিউরে উঠল, ভাবল, এখন থেকেই বোধহয় ওদের নতুন সম্পর্ক শুরু হবে।

—কিছুদিন আমি একলা থাকতে পারলে হোত। আমি কি ওখানে একা যেতে পারি না?

—সে অসম্ভব! ওঁর গলায় ধার। তুমি ভুলে যেতে পারো আমার সঙ্গে কোনদিন আলাপ হয়েছিল।

জুলি ওর দিকে কঠিন মুখে চাইল। ও ধারালো গলায় বলল, তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন আমি যাতে মুখ না খুলি. তার জন্যেই তুমি আমাকে এসব দিয়েছো? এখন আমার যা ইচ্ছে তাই করবো। আমি তোমার ঐ ফ্ল্যাট চাই না।

ওয়েসলি হাসলেন।

মৃদুস্বরে বললেন, একেবারে পাল্টে গেছ না জুলি? তুমি এখন যাকে ইচ্ছে বলতে পার আমি দেখতে পাই। আমার অন্ধত্বের ভান শুধু ব্লানশের জন্যে। এখন আর কিছু এসে যায় না। হয়তো ভবিষ্যতে তোমাকে বিশদ ভাবে সব বলব, এখন নয়। আর কয়েক সপ্তাহ আমি অন্ধের ভান করে যাবো। তারপর দৃষ্টি ফিরে পাবো। যদি তুমি বলে বেড়াতে চাও, বোলো। কিন্তু তুমি ফ্ল্যাট, টাকা কিছুই পাবে না। ঠিকভাবে চললে তোমার সবকিছুই থাকবে।

জুলি বুঝে উঠতে পারলো না উনি ধাপ্পা দিচ্ছেন, নাকি ধাপ্পা নয়। এই অনিশ্চয়তা ওকে খেপিয়ে তুলল। ও যে কোন শর্তে ফ্ল্যাট বা টাকা আঁকড়ে পড়ে থাকতে রাজি।

—বেশ, তাহলে তুমিও চলো। ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল।

ওয়েসলি নতুন সুরে, উদ্বেল হয়ে বললেন, ভাল। চল, তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করি দুজনে। আমি কথা দিচ্ছি ওখানে তোমায় আনন্দে ভরিয়ে রাখবো। আমি ব্যাগে কয়েকটা জিনিষ ভরে আসছি, তুমিও তৈরী হও। দেরী কোর না। কেমন?

জুলি গোছানো শেষ করল। ওয়েসলি এসে ব্যাগটা নিল।

—চলো। কাল গেরিজকে পাঠিয়ে দেব, ও গোছগাছ শেষ করে দেবে।

দুজনে প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে কার্পেটে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখে কুঁচকে গেল। ওয়েসলি এগিয়ে লিফটের বোতাম টিপলেন।

লিফটের দরজাটা খুলে গেল। ওয়েসলি বললেন, এখান থেকে চলে যেতে ভাল লাগছে। চিরটাকাল এ জায়গাটা আমার অপছন্দ ছিল।

লিফটটা যখন নামছে, লিফটের মেঝেতে কোণের দিকে একটা জিনিষ জুলির চোখে পড়ল। ওয়েসলিও সেটা সেই মুহূর্তেই দেখলেন। দেখেই চট করে ওটা তুলে পকেটে পুরলেন। জুলি সবই লক্ষ্য করল। ওদের প্রথম সাক্ষাতের দিনে, ওঁর হাতে পরিয়ে দেওয়া সেই লিউকোপ্লাস্টের টুপিটা।

উনি ওটা লুকিয়ে ফেললেন বলে জুলি একটু বিস্মিত হল। জুলি দেখল ওঁর মুখে কিছু একটা মনের ভাব চেপে রাখার অদ্ভুত উত্তেজনার চিহ্ন। ও নিশ্চিত জানলো কালো চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে ভয় জেগে উঠেছে।

তখন ও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা ওর মনে একটা দাগ কেটে রইল। পরে ওর এ ঘটনার কথা মনে হয়েছে।

হ্যারি গ্লেব যখন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল তখন ওয়েস্ট আদালতে লোক গিজগিজ করছে। হ্যারির দিকে অতগুলো তীক্ষ্ণ চোখের নির্মম কৌতূহলের দৃষ্টি হ্যারিকে স্তম্ভিত করলো ও ভীষণভাবে নাড়া দিল। ও সঙ্কুচিত চাহনিতে একবার তাকিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের মাথার ওপরের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

গ্রেপ্তার হবার পর হ্যারির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ওর ফাঁপা অহমিকার বদলে আজ ওর চোখে বন্য, ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। হাত কাঁপছে। এখন ও ফাঁদে পড়া ভিতু একটা জন্তু, ওর নাকে মৃত্যুর গন্ধ আসছে।

এক সপ্তাহের জেল হাজতের হুকুম হওয়ার আগে ও ডসনের সাক্ষাতে শুনেছে, যে মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ওঁর মেয়ে ডানা ওঁর হাত ফসকে সেই যে পালিয়ে গেছে, আর ধরা পড়ে নি। কোর্টের চারিদিকে তাকিয়ে ও বুঝলো ডসনের কথাটা কতখানি সত্যি কেননা ওর থেকে ক-গজ দূরেই ডানা বিপদ স্বীকার করেও হ্যারিকে দেখতে এসেছে। থিও মরে গেছে। হ্যারি ভাবল ও সবকিছু ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেছে। এখন ওর নিজেকে মনে হল অক্ষম, পরিত্যক্ত।

ডানা জানত ওর বিপদের সম্ভাবনা বেশি নয়। পুলিশের কাছে ওর তেমন বিশদ বিবরণ নেই। তবু সাবধানতাবশতঃ ও একটা চশমা পড়েছে, আঁটো টুপিতে ঢেকে নিয়েছে তামাটে চুল।

ডানার মনে হলো হ্যারিকে প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। সজোরে কাঠগড়ার রেলিং চেপে ধরে ও কম্পিত গলায় উকিলের সাহায্য চাইল। ডানার বুক ফেটে যেতে লাগল কেননা ও অনেকদিন ধরে হ্যারিকে ভালবেসে এসেছে।

ডসন যখন অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে বলল, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে সায় দিলেন। ডসন বলল হপ্তা ফুরোবার আগেই ও আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের আশা রাখে। হ্যারিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সময়, ডানাকে ও দেখতে পেল। ডানা ওর দিকে তাকিয়ে উৎসাহের হাসি হাসলো।

ভীড় ঠেলে বেরোবার সময় ডানা ভাবল, ওরা হ্যারিকে ফাঁসি দিতে পারে না। ও খুন করেনি। থিওর কাছে বন্দুক ছিল, থিওই খুন করেছে। যেমন করে হোক হ্যারিকে এই জাল কেটে বের করতেই হবে—কিন্তু কিভাবে?

চিন্তায় ডুবে ও রাস্তা চলছিল। মনের গভীরে ও বুঝতে পারছিল হ্যারির জন্যে ও কিছুই করতে পারবে না।

ডানা যখন নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে, ইন্সপেক্টর ডসন তখন আফিসে পৌঁছে দেখল গারসন বসে আছে।

গারসনের প্রশ্নের জবাবে ডসন বলল, এক হপ্তার হাজত হলো। তারমধ্যে ওদের ধরতে হবে। কোন খবর আছে?

—মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ডানার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। নিশ্চয় কোথাও ভালমতো গা ঢাকা দিয়েছে।

ডসন ঘোঁত করে শব্দ করলো।

—মিসেস ওয়েসলির সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোন খোঁজ পেলে, যে ট্যাক্সি ওকে থিয়েটার থেকে বাড়ি এনেছিল।

—মনে হচ্ছে উনি ট্যাক্সিতে যাননি। কোন ড্রাইভারই ওকে ওয়েসলির বাড়িতে এনেছে বলে খোঁজ দিতে পারছে না। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার স্যার, একজন ড্রাইভারের পক্ষে একজন অন্ধলোককে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

—যাক্, ও এখন ছেড়ে দাও, মিসেস ওয়েসলির গতিবিধির কোন খোঁজ পেলে?

—তেমন কিছু পাইনি স্যার। থিয়েটারের দারোয়ান দেখেছে উনি ট্যাক্সি থেকে নেমে থিয়েটারে ঢুকলেন, ওয়েসলি ভাড়া মেটাচ্ছেন। থিয়েটারে বহুবার অভিনয়ের সুবাদে দারোয়ান ওঁকে ভালই চিনত। উনি বারে চলে গেলেন। দারোয়ান ওয়েসলিকে ঢোকার দরজা দেখিয়ে বলে দেয় মিসেস ওয়েসলি বারে গেছেন। ওয়েসলি শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। উনি ঢুকে গেলেন।

—কেন শুনতে পেলেন না, আমি জানি না। উনি তো কালা নন?

—মিসেস ওয়েসলি বারে গেলেন। বারের মেয়েটার মনে হচ্ছিল ওঁর মেজাজ খারাপ আছে, বলতে গেলে কোন কথাই হয়নি ওঁর সঙ্গে। ওঁর এই আচরণে মেয়েটি খুশী হয় নি। তারপর উনি তিনটে ব্র্যান্ডি খান। প্রথম ঘণ্টা পড়ার মিনিটখানেক আগে বার থেকে বেরিয়ে যান। দারোয়ানটি অবাক হয়ে যায়। উনি পিকাডিলি সার্কাসের দিকে চলে যান। ফ্ল্যাটে গিয়ে না পৌঁছনো অবধি কেউ ওঁকে দেখেন নি।

—হয়ত আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে গেছেন উনি। ট্যাক্সি পাওয়া অত সোজা নয় আজকাল।

—তাই মনে হয় স্যার। উনি যদি বেরিয়েই ট্রেন পেয়ে থাকেন তবে অবশ্য যে সময়ে পৌঁছেছেন, তা সম্ভব।

—ওয়েসলির কথা বলো। তাঁর জবানবন্দীর সঙ্গে যা ঘটেছিল, তার মিল হচ্ছে কি রকম?

—ঠিকই মিলছে স্যার, তবে দুটো কথা। একটা হচ্ছে, দারোয়ানটি ওঁকে বলে মিসেস ওয়েসলি বারে কিন্তু উনি বলেছেন উনি জানতেন না মহিলা কোথায় গেছেন। অবশ্য এমন হতে পারে, উনি ওঁর কথা শোনেন নি। কিন্তু পর্দা উঠে যাবার পর উনি যখন থিয়েটার থেকে বেরোন, দারোয়ান একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে চায়। এখানে আমার একটু গোলমাল লাগছে। উনি জবানবন্দীতে বলেছেন, আমার মনে হল উনি এখানে ফিরে আসতে পারেন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি পেতে আমাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অবশেষে একজন দয়াপরবশ হয়ে আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দেয়।

—হ্যাঁ, বেশ ভালই গোলমেলে। দারোয়ান যদি ট্যাক্সি ডেকে দিতে চায়, উনি যদি ভয়ই পেয়ে গিয়ে থাকেন, তবে দারোয়ানকে ট্যাক্সি ডাকতে দিলেন না কেন? উনি তো জানতেন উনি নিজে নিজে ট্যাক্সি ধরতে পারবেন না। আমি আবার ওনার সঙ্গে কথা বলে দেখব। এখন উনি সেই হল্যান্ড মেয়েটির সঙ্গে ভিগো স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

গারসন হাসলো।

মেয়েটি তো দেখতে বেশ খাসা স্যার। একটি মেয়ের যদি সুন্দর মুখ আর ভালো শরীর থাকে, তবে ফুর্তিবাজরা তার মগজে কি আছে কি নেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না কেউ আজকাল।

—যে অন্ধ তার আবার সুন্দর মুখের মূল্য কি?

গারসন চোখ পিটপিট করলো।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই স্যার। আমি সে কথা ভেবে দেখি নি স্যার। না ঠিকই বলেছেন। তবে ব্যাপারটা কি?

—ওদের ওপর আমি নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি। ওয়েসলি ঐ মেয়েটার পেছনে টাকা ঢেলে যাচ্ছেন। নাইট ক্লাব, থিয়েটার, মদের পার্টি, রেস্টুরেন্ট, নাচের আসর, রেস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে ওরা একসঙ্গে যাচ্ছেন। উনি কারখানাতেও যাচ্ছেন না। আমি জানতে চাই আসল ব্যাপারটা কি?

—ব্লাকমেইল?

—মনে হয় না। ব্ল্যাকমেইল হলে মেয়েটা সবসময় ওর সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরবে কেন? ব্লাকমেইলারও নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইবে। জুলিকে ঠিক সে টাইপের মেয়ে বলে মনে হয় না।

—হয়তো ওরা প্রেমে পড়েছে স্যার।

—হয়তো। জানি না। যাই হোক গারসন, তুমি দেখ ফ্রেঞ্চরা কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওদের পেছনে লেগে থাকো। ট্যাক্সি ড্রাইভারের খোঁজ করে চলো। এখনও সময় আছে, হয়তো একজন কিংবা দুজন এগিয়ে এসে যোগাযোগ করবে। আমি এদিকে ওয়েসলির সঙ্গে কথা বলবো।

গারসন চলে গেলে ডসন ঘড়ি দেখলেন, তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। ভাবলেন পাঁচটার পর ওয়েসলির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। উনি বাড়িতে না থাকলে জুলির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে।

ওয়েস্ট এন্ডে বেনটন একা একটা ছোট অথচ আরামপ্রদ ফ্ল্যাটে দিব্যি থাকেন। পুরোনো ফ্যাশনের বাড়িটায় তিনটে ফ্ল্যাট, তিনটেই অবিবাহিত একলা মানুষের জন্যে।

রবিবারে সকাল নটায়, অন্যান্য দিন সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। বেনটন সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে সবকিছু সেরে সকাল নটায় কারখানায় চলে যায়।

ওর ব্রেকফাস্ট হলো জোলো দুধের সঙ্গে কর্নফ্লেক্স, মাখন, টোস্ট, কড়া কফি। কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না। খাওয়া হয়ে গেলে ট্রের-ওপরে পড়ে থাকা আঁটা মোড়কের খবরের কাগজ নিয়ে ইজিচেয়াবে বসে পড়তে শুরু করে।

ব্লানশের মৃত্যুর পরের দিন অভ্যাস মত স্নান করেছে, দাড়ি কামিয়েছে, প্রাতঃরাশ খেয়েছে। মনে তখন দুটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, ব্লানশ আর টাকা।

ব্লানশকে ও বহুবার স্টেজে দেখেছে দূর থেকে, মুগ্ধ হয়েছে। তবে প্রথম ভাল করে দেখে বেনটন, বিয়ের সময়ে। ওয়েসলি বিয়ের কথা ওকে আগে কিছুই বলেনি। অনেক বছর ওরা দুজনে ছিল কারখানার অংশীদার। একদিন ওয়েসলি-বেনটন এয়ারক্রাফট্ ফ্যাকটরি ছিল একটি ছোট, পরীক্ষামূলক, কল্পনামাত্র। দুজনের একত্র প্রচেষ্টায় আজ সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে চারশো একর জুড়ে মেশিনের দোকান, রানওয়ে আর হ্যাঙারের জঙ্গল। উদ্যোগটা ওয়েসলির তবে বেনটনের অবদানও কম নয়।

এই চুপচাপ, ফ্যাকাশে লোকটাব সংগঠন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রায় ছ-বছর আগে একদিন ওয়েসলি বেনটনের অফিসে ঢুকে ওঁর বিয়ের খবর জানালেন। বেনটন অভিনন্দন জানালো এবং মনে মনে কৌতূহল হল বউ দেখবে বলে। ভাবলো, দুনিয়ার কোন্ মেয়ে ঐ নাক উঁচু ওয়েসলিকে বিয়ে করছে! হয়তো কোন ঘোড়ামুখো মেয়ে। কিন্তু ওয়েসলি যখন ওকে ব্লানশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ও প্রবল ধাক্কা খেল মনে।

বেনটন ছিল দুশ্চরিত্র। স্কুলে পড়ার সময় বেনটন একটা অত্যন্ত নোংরা কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে। সর্বসমক্ষে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। নেশাখোরদের আফিমের মত, বেনটনের কাছে মেয়েরাও তেমনিই প্রয়োজনীয় ছিল।

ব্লানশকে কাছ থেকে দেখার পর ব্লানশ ওকে কাত করে ফেলল। ওর সঙ্গ কদিন পেতে না পেতেই ব্লানশের মদির, জান্তব আকর্ষণ বেনটনের ভেতরে থাবা বসালো। এ শুধু ক্ষণিকের মোহ নয়, সুন্দরী মেয়ের প্রতি সামান্য কামনা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি, গভীর প্রেমের অনুভূতি।

—ওয়েসলি যখন রয়্যাল এয়ারফোর্সে নাম লেখালেন, বেনটন তার অনুপস্থিতির সদ্ব্যহার করতে ইতস্ততঃ করলো না। ব্লানশের ততদিনে প্রচুর মদ খেয়ে শরীরে ও মনে পচন ধরে গেল। মদ বেনটনকে কাবু করতে পারলো না।

বেনটন অবাক হয়ে গেল যে ব্লানশের প্রতি ওর মোহ, ওর অনুভূতি এমনই প্রবল হয়েছে যে একবার ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সঙ্গ-তৃষ্ণায় টান ধরছে। টাকা থাকলে ও ব্লানশকে বিয়ে করত। ব্লানশ ওকে টাকাপয়সার সু-ব্যবস্থা করতে বললো।

এক বিকৃত যৌনকামনা ক্রমশঃ এক অদ্ভুত ধরনের গভীর প্রেমে দাঁড়াল। বেনটনের কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। ওর মধ্যে কি যেন ছিল, পুরুষরা ওকে অবিশ্বাস করতো। ব্লানশই ছিল ওর একমাত্র সঙ্গী।

কাগজ খুলে ব্লানশের ছবি আর খুনেব খবরটা পড়ে বেনটন মড়ার মতো স্থানু হয়ে বসে রইল।

কাগজটা আঁকড়ে, চোখ বুজে নিশ্চল বসে রইল বহুক্ষণ। ওর মন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। যখন একটু নড়তে পারলো সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে খেয়ে ফেলে আবার গ্লাস ভরে ফেলল। ও আবার খবরটা পড়লো আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পরে ও ওয়েসলির ফ্ল্যাটে ফোন করলো, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। কারখানায় ফোন করে

জানতে পারলো ওয়েসলি তখনো পৌঁছননি। কিছুই করার ছিল না ওর। ঠোঁট কামড়াতে লাগল আর উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইল।

একঘণ্টা বাদে ওয়েসলি ফোন করে কাঠ-কাঠ, ভাবলেশহীন গলায় বলল, আমি কিছুদিন কারখানায় আসব না, তুমি আশা করি চালিয়ে নিতে পারবে। জরুরী কাজ কিছু নেই, তোমার আমাকে দরকার পড়লে ক্লাবে খোঁজ কোর।

ওয়েসলি হঠাৎ সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন দেখে বেনটন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্লানশের মৃত্যুতে ও কি আঘাত পেয়েছে!

বেনটন ভেবেছিল কোন ছুতো দেখিয়ে ক-দিনের ছুটি নেবে। কিন্তু তা সম্ভব হল না।

হ্যারি গ্লেব যখন ওয়েস্ট লন্ডন আদালতে হাজিরা দিল, বেনটন সেদিন হাজির ছিল। হ্যারির মুখে যন্ত্রণা আর ভয় দেখে ও খানিকটা স্বস্তি পেল।

সেদিনই সন্ধ্যায় ও জারমিন স্ট্রীটে সেগেত্তির রেস্টুরেন্টে গেল।

সেগেত্তি ওর দিকে আসতে ও বলল, আমার বাঁধা টেবিল। ওর কটা চোখে বিষাক্ত চাহনি, বলল, আমি বেশিক্ষণ থাকব না।

সেগেত্তি বলল, অবশ্যই মিঃ বেনটন, ফাঁকা টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে নীচু গলায় বলল, বেচারি ম্যাডাম! ওঁর অভাব আমাদের বড্ড মনে হবে। কি ভয়ানক, পৈশাচিক ব্যাপার।

বেনটন বসলো।

ও সেঁকা সামন মাছের ফরমাশ দিয়েও খেল না। ব্লানশের প্রিয় ব্র্যান্ডি নিল এক বোতল। বোতলের ব্র্যান্ডি দ্রুত কমতে লাগল, আর ও চিন্তায় ডুবে গেল। খেয়ালও করল না যে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। টের পেল বেশ নেশা ধরেছে, পরোয়া করল না। ভেতরের তিক্ত, কঠিন প্রতিরোধটা ব্র্যান্ডির প্রভাবে আলগা হলো।

হঠাৎ ও ওয়েসলি আর জুলিকে ঢুকতে দেখল। জুলিকে চিনতে পারলো না। শুধু দেখলো একটা মেয়ে, পরনে আগুনরঙা সান্ধ্য পোষাক, উজ্জ্বল কাঁধ অবধি নামানো। গলায় ঝক্‌মকে হীরের হার। মেয়েটির দিকে কোন মনোযোগ না দিয়েই ও শুধু ওয়েসলিকে দেখতে লাগল। ও নিজেকেই প্রশ্ন করলো, ওয়েসলি কি করে এটা পারলেন? স্ত্রী নৃশংসভাবে খুন হবার পাঁচদিনের মাথায় উনি রেস্টুরেন্টে একটা মেয়েকে নিয়ে আসতে পারলেন কিভাবে? এইজন্যই কি উনি কারখানায় যাচ্ছেন না? এই মেয়েটির সঙ্গে বসবাস করছেন? মেয়েটি কে?

হঠাৎই ও রক্তরঙা চোখ দুটো জুলির দিকে ফেরালো। কোথায় দেখেছে ওকে? সহসা আড়ষ্ট হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লো ও। জুলি! ব্লানশের চাকরানী! চোখ মুছে আবার তাকালো। গাউনটা ওর চেনা। গাউনটা পরে জুলিকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ও যে জুলিই তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঐ গাউনটা ব্লানশ বিয়ের দিন পরেছিল। গাউনটা বেনটনের মনে ওদের প্রতিটি প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। ঐ হীরে, ঐ গাউন, এসব তো ব্লানশের! ওয়েসলি ওর চাকরানীকে ব্লানশের জিনিষ দিয়ে সাজিয়ে ওর প্রতি চরম অবমাননা করেছে। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালো ও। শ্বাসরোধকারী পৈশাচিক ক্রোধে জ্বলে উঠল।

বেনটন অস্পষ্ট ভাবে বুঝল, কেউ ওর একটা হাত ধরেছে, মোলায়েম গলায় ওর অসুস্থ লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করছে। নোংরা গালাগালি করে ও হাতটা ছুঁড়ে ফেলল। তারপর আড়ষ্ট পায়ে, জ্বলন্ত চোখে ওয়েসলির টেবিলের কাছে গেল।

চেয়ারে বসে রেস্টুরেন্টের সব লোক দেখতে লাগল, বেনটন ওয়েসলির টেবিলের সামনে থামলো। জুলির দিকে কম্পিত আঙুল তুললো।

ভাঙা, উন্মত্ত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ নোংরা কুত্তীটাকে তোমার স্ত্রীর পোষাক খুলে ফেলতে বলো। জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, কোন আস্পর্ধায় পরেছিস তুই? ঝি কোথাকার?

ওর হাতটা হীরের নেকলেশটা ছিনিয়ে নিতে গেল.কিন্তু জুলি ওর হাতটা মেরে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওয়েসলি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পাশের টেবিলে এক হোমরা-চোমড়া আর্মি

অফিসার বসেছিল। সে সামনে লাফিয়ে পড়ে বেনটনের মুখে উল্টো হাতের একটা চড় মেরে ওকে ছিটকে ফেলে দিলো।

অফিসারটি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মাতাল, শুয়োর কোথাকার!

দুজন ওয়েটার ছুটে এল। ওরা বেনটনের হাত ধরলো। মনে মনে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সেগেন্তি ওদের ইশারা করল, বেনটনকে নিয়ে যেতে।

বেনটন ক্ষ্যাপার মত ধস্তাধস্তি করতে করতে বলতে লাগল, আমায় ছেড়ে দাও। হাত সরাও! ওরা বেনটনকে দরজার দিকে টানতে লাগল। তারপর ওর গলা কান্নায় ভেঙে পড়লো, ও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সেই কান্নার দমকে সবাই হিম হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে, বকতে বকতে, দুজন ওয়েটারের সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল। কাঁচের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

শৈশব থেকে জুলি যা পায়নি, ব্লানশের মৃত্যুর পর অবশেষে ও হাতে যথেষ্ট টাকা, একটা মিঙ্ক কোট, ওয়েস্ট এন্ডে ফ্ল্যাট সব পেল। কিন্তু ওয়েসলি ওর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলেন।

জুলির ধারণা সব পুরুষই এক চরিত্রের। শুধু এগোবার কায়দাতেই যা পার্থক্য। ওয়েসলিকেও ও নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হলো। কিন্তু ওয়েসলি যখন ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার কোনও লক্ষণই দেখালেন না, তখন জুলির অহঙ্কারে ঘা লাগলো। জুলির সব আশাই বিফল হলো। জুলির সন্দেহ হল ওয়েসলি হয়তো ভুলতে পারছেন না যে ও ওঁর স্ত্রীর চাকরানী ছিল। সেকারণেই উনি ওর বিষয়ে উদাসীন।

ওঁকে পরীক্ষা অথবা শাস্তি দেবার জন্যে জুলি দামী দামী উপহার চাইতে লাগল। উনি তাতে বিরক্ত না হয়ে খুশীই হলেন। জুলি ওঁর কাছ থেকে মীনা করা টয়লেট সেট, সোনার সিগারেট কেস আর লাইটার চাইল। উনি হাসিমুখে দিলেন। স্যাভয়ে খাওয়ালেন, বার্কলেতে ডিনার, সিরোতে নাচের আসরে, সিনেমা, থিয়েটার সব জায়গাতে নিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সব সময় উদাসীনতার প্রাচীরটা ওদের মাঝে রয়ে গেল।

সেই খুনের রাত থেকে ওয়েসলি ওকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। ওর হ্যারির কথা মনেই এলো না। জুলির দিনরাত কাটতে লাগল নাইট ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা আর বে-হিসেবী খরচ করে। বাইরের জগতের কোন খবর যাতে জুলি না পায়, তার জন্যে ওয়েসলি একমুহূর্তও ওকে কাছ ছাড়া করেন না। ওদের ফ্ল্যাটে রেডিও নেই, খবরের কাগজ বন্ধ, টেলিফোন কেউ করে না, কেউ চিঠিও লেখে না। জুলি বুঝল ওয়েসলি ওকে সবকিছু দিতে তৈরী।

কদিনের মধ্যে ও ব্লানশের পোষাকগুলোর জন্যে আদেখলাপনা শুরু করলো।

একদিন জুলি, ওয়েসলি ওকে যে লাল সাদা ফুটফুট ড্রেসিং গাউন আর পাজামা দিয়েছিলেন, সেটা পরে ওয়েসলির কাছে এলো। কিন্তু ওঁর মধ্যে কোন বিকারই দেখা গেল না। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত চোখে জুলির দিকে তাকালো।

—কি শয়তানী মতলব মাথায় ঘুরছে?

একটু হেসে জুলি ওঁর কোলে বসতে গেলে উনি ওকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বললেন, আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে তোমায় দেখতে পাই।

জুলির তখন ওঁকে অসহ্য মনে হল।

ও রেগে বলতে শুরু করলো, আমার কয়েকটা পোষাক চাই। রঙীন ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে, পকেটে এমনভাবে হাত রেখেছে যাতে ওর নিটোল নিতম্বের ওপর পাতলা সিল্ক এঁটে বসেছে। জুলি তেরছা, সতর্ক চোখে ওয়েসলির দিকে চেয়ে রইল।

—কিন্তু এখনকার মত তোমার তো অনেক পোষাকই আছে। তোমাকে যেই একটা জিনিষ কিনে দি, অমনি আরেকটা চাও।

—তুমি যে পোষাকগুলো কিনে দিয়েছ, সেগুলো আমার পছন্দ নয়। আমি ভাবছিলাম, ও ফ্ল্যাটে কতকগুলো পোষাক শুধু শুধু পড়ে আছে। ওগুলো কেন আমি পরবো না?

ওয়েসলি ওকে বাধা দিয়ে বলল, ওগুলো ব্লানশের পোষাক।

—ওর তো আর দরকার হবে না। ওগুলো আমার হবে।

—ও ওগুলো পরেছে বলে আমি ভাবছিলাম একজন মৃত স্ত্রীলোকের পোষাক পরতে তোমার খারাপ লাগবে, তাই ও কথাটা বললাম।

জুলি সত্যিই অবাক হয়ে গেল।

—কিন্তু আমি তো ওর খুন হবার সময় পরে থাকা পোষাকটা চাইছি না, অন্য পোষাকগুলো নষ্ট হবে কেন?

—তোমার কি মনে হয়না আমি আমার স্ত্রীর পোষাকে তোমাকে দেখা পছন্দ নাও করতে পারি?

—তোমার কি সব কথার জবাব তৈরীই থাকে?

ওয়েসলি হঠাৎ হাসলেন। কি পাজি মেয়ে তুমি, ঠিক আছে জুলি ওগুলো তুমি নিও আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

জুল্‌ি এ সুযোগ ছাড়ল না।

—কেন?

—কেন চাইব না? বেশ, আমি কাউকে সুখী করতে চাইবনা কেন?

—তাতে তোমার সুখ কোথায়?

—আমি একটি সুন্দরী সঙ্গিনী পেয়েছি। তাছাড়া তুমি প্রজাপতির মত গুটি কেটে বেরুচ্ছো দেখতে আমার ভাল লাগে। এত সন্দেহ কিসের? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা স্বার্থে কারো উপকার করতে পারে?

—পুরুষরা আমাকে বিনা উদ্দেশ্যে সাহায্য করে না। তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে মেয়েমানুষ রাখতে চাও। মেয়েমানুষ রাখার বিষয়ে তোমার ধারণাটা খুব অদ্ভুত না?

—ওরকম কিছু বলেছি বলে মনে পড়ছে না। তুমি যে ভাষাটা ব্যবহার করলে, সেই মেয়েমানুষ হিসেবে তোমাকে রাখবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। আমি তোমায় দিতে চেয়েছিলাম বাড়ি, নিরাপত্তা, বছরে হাজার পাউন্ড। আমি কোন শর্ত করিনি। তুমি সুখী হও, তাছাড়া আর কিছু চাই না তোমার কাছে।

সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যাও পোষাক বদলে এসো। পোষাকগুলো তবে নিয়ে আসি চলো।

—তোমায় আসতে হবে না। তোমায় বিরক্ত না করেই আমি ওগুলো আনতে পারি।

—আমাকে তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত কোর না জুলি। তাছাড়া দারোয়ান ভাবতে পারে তুমি ওগুলো চুরি করছো।

জুলি লাল হয়ে গেল।

কথা ঘুরিয়ে বলল, তুমি কারখানায় যাবে না? আমার সঙ্গে এতখানি সময় কাটানো তোমার ঠিক হচ্ছে?

—ঘরে বসেই আমি কারখানার কাজকর্ম দেখতে পারি জুলি। তুমি কি ভয় পাচ্ছো আমার টাকাপয়সা ফুরিয়ে যাবে। আমার অনেক যোগ্য কর্মচারী আছে।

বেরোবার সময় জুলি দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

পার্কওয়ের ফ্ল্যাটে লিফটে ওঠার সময় ওয়েসলিকে কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল জুলি তা খেয়াল করল না। দামী দামী জিনিষ নিতে চলেছে বলে ও বেজায় উত্তেজিত।

ফ্ল্যাটে ঢুকতে কার্পেটের সেই বাদামী দাগ ওর মনে কোন দাগই কাটলো না। ওর মনে হল ব্লানশ যেন কোনদিনই ছিলনা। হ্যারি ওর মনের গভীরে একটা অস্বস্তি ভরা বিবেকের খোঁচা মাত্র।

জুলি একটা বিশেষ পোষাক বাছলো। ওয়েসলি বলল, না! ওটা না! ওটা রেখে দাও।

—কিন্তু এটা আমার ভাল লেগেছে। আমার গায়ের রঙের সঙ্গে এটা মানানসই হবে। কেন এটা নেব না?

—রেখে দাও।

ওঁর মুখের যন্ত্রণাব রেখা দেখে জুলি বুঝলো এ হচ্ছে বিপদ সঙ্কেত। ও ঐ পোষাকটা রেখে

দিল। আরো অনেক পোষাক ছিল।

ওয়েসলি অস্থির হয়ে বললেন, তোমার এখনও হয়নি? অত পোষাক তুমি পরে উঠতেই পারবে না।

—কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারবো। তুমি কি ভাবছো এমন সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো? সারা জীবন রাশি রাশি পোষাক চেয়েছি, এতদিনে তা পেলাম।

অবশেষে ও যাবার জন্যে তৈরী হলো। দুটো সুটকেশ বোঝাই পোষাক নিয়েও ওর আশ মিটল না। ও জানত ঘরে ফার আর গয়না আছে। ওসব কিছু না নিয়ে যেতে মন চাইল না।

মিষ্টি হেসে বলল, আমি কয়েকটা গয়না পেতে পারি? এ পোষাক পরলে গয়না ছাড়া বিশ্রি দেখাবে।

এক দীর্ঘ, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, উনি চেয়ে রইলেন।

—জুলি মনে হচ্ছে তুমি কিছুতেই খুশী হতে পারছো না। ঠিক আছে, আমি যা হয় বেছে দিচ্ছি।

অ্যালার্ম বন্ধ করে আলমারী খুলে দেরাজ হাতড়াতে লাগলেন। জুলি এগিয়ে গেল। উনি বাধা দিলেন।

—বলেছি আমিই বেছে যা হয় দেব? ওখানে গিয়ে বস দয়া করে। আমি দেখছি।

—আমি কেন দেখব না? আমার কি দরকার সেটা তো আমিই ভাল জানি।

—না, বললে, কিছু পাবে না।

জুলি রেগে গিয়ে জানলার কাছে চলে গেল। কিন্তু ওঁর শানিত চোখ দেখে ভয়ে গুটিয়ে গেল ও।

উনি বেছে যা গয়না দিলেন, তাতে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একটা হীরের নেকলেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টেবিলে ছুঁড়ে ফেললেন।

—কি সুন্দর। এগুলো সব আমার? আমায় দিয়ে দিচ্ছো?

—ধার দিচ্ছি তোমায়। যা কিছু পরছো, সবই ধার দিয়েছি।

অবাক হয়ে জুলি ওঁর দিকে তাকালো। কিন্তু ও এত উত্তেজিত ওসব শর্ত-টর্ত নিয়ে মাথাই ঘামাল না। গয়নাগুলো এখন তো পরতে পারবে, এটাই যথেষ্ট। পরে এগুলো রাখবে কি রাখবে না তা নিয়ে চিন্তা করবে। ও তখনি নেকলেশটা পরতে চাইছিল, উনি পরতে দিলেন না। যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দুটো সুটকেশ ভর্তি পোশাক গয়না নিয়েও ফারগুলো নেবার জন্যে জুলি ছোঁকছোঁক করতে লাগল।

ব্যাগে গয়নাগুলো ভরতে ভরতে বলল, আমি একটা ফারকোট পেতে পারিনা? আর্কটিক শেয়ালের ফারটা আমার খুব পছন্দ। ওটা নেব।

উনি অলামারী বন্ধ করে দিলেন।

—না। আমি যে মিঙ্ককোটটা কিনে দিয়েছি ওটা নিয়েই খুশী থাকো। এবার তোমার জিনিষ চাওয়া বন্ধ কর। তোমার কি কিছুতেই সুখ হচ্ছে না জুলি? দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, মুখ কালো করে লাভ নেই। চল। ছোটদের মত কোরনা।

জুলি ভেতরে ভেতরে জ্বলতে জ্বলতে লিফটের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু ওগুলোর জন্যে জোরাজুরি করাটা ঠিক হবেনা ভেবে তখনকার মত চুপ করে গেল জুলি। ওর মনে হলো, পবে ওটা যদি সমানে চাইতে থাকে তবে ওয়েসলি ওটা ওকে দেবেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সেগেত্তির রেস্টুরেন্টে, লন্ডনের সবচেয়ে ফ্যাশানী রেস্টুরেন্টে ওর হীরের নেকলেশ দেখাতে চেয়েছিল।

কিন্তু বেনটন ওদের সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি করে দিল।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ও রাগে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। ওর মনে হলো বেনটনের সঙ্গে পাল্টা রাগারাগি না করে উনি ওকে অপমান করেছেন। একথা ভেবে আর স্থির থাকতে না পেরে, ফেটে

পড়ে বলল, কোন্ আস্পর্ধায় ও আমায় গালাগালি দেয়? জানোয়ার। ও তোমার বউয়ের প্রণয়ী ছিল। তুমি নিশ্চয় ওকে দিয়ে আমাকেও অপমান করতে দেবে না?

ওর দিকে না তাকিয়ে ওয়েসলি হেসে বললেন, তোমার অসংযত মুখ বন্ধ কর।

জুলি এত ঘা খেল যে ফ্ল্যাটে না পৌঁছনো অবধি ওরা কেউ একটা কথাও বলল না। জুলি ট্যাক্সির নরম গদীতে নিথর হয়ে বসে রইল।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে জুলি ওকে আক্রমণ করলো। চোখ-মুখ লাল করে বলল, আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। আমি আর একমুহূর্তও তোমার সঙ্গে থাকব না। জানি না, কেন তোমার সঙ্গে এসেছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছ।

ওয়েসলি ইলেকট্রিক ফায়ার প্লেসের সুইচ টিপে জ্বালালেন। ওর চেহারায় ক্লান্তি, কিন্তু চোখে মুখে রাগের আগুন জ্বলছে।

—যদি যেতে চাও, তোমায় বাধা দেব না। কিন্তু সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। তোমার নিজের পোষাকে বেরিয়ে যাবে। বুঝলে? আমার ধার দেওয়া পোষাক একটাও পরে বেরুতে পারবেনা। যাও নিজের ঘরে। আজ রাতে তোমায় দেখে আমার বিরক্ত লাগছে।

রাগে সাদা হয়ে গেল জুলি। ও জানে উনি যত খারাপ কথাই বলুক না কেন, এই বিলাসবহুল সুখের জীবন ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

কিন্তু সে সম্পর্কেও উনি বললেন জুলি এখন সব ফাঁস করে দিলেও ওঁর কিছু এসে যায় না যদি নাই এসে যায়, তবে কেন এখনো অন্ধত্বের ভান করে চলেছেন? কেন? কার ভয়ে? কারখানার কেউ? বেনটন? পুলিশ?

পুলিশ! সহসা লাফিয়ে উঠলো জুলি। অতর্কিতে ওর মনে ঝলকে উঠল সত্য কথাটা। তাহলে ওয়েসলি ব্লানশকে খুন করেছেন। সেটা এতই স্পষ্ট আগে কেন বোঝেনি জুলি?

অভিনয়টা ওয়েসলির নিখুঁত ছিল। একজন অন্ধকে কেউ সন্দেহ করবেনা। ওয়েসলি ব্লানশকে ঘৃণা করতেন। গেরিজ বলেছিল ওঁদের ডিভোর্স হলে ব্লানশকে যে মোটা খেসারত দিতে হবে ওয়েসলির সে টাকা ছিল না।

ব্লানশ বেনটনের সঙ্গে প্রেম করছিল। খুনের কারণ ওটাই। চোখ অপারেশন সফল হলেও উনি ভান করে গেছেন, অপারেশনে ফল হয়নি।

যাইহোক, ব্লানশকে উনি ফিরে আসতে বাধ্য করেন। কিন্তু পুলিশের চোখ এড়ালেন কিভাবে? ওর মনে পড়ল লিফটে সেই ব্যান্ডেজটা কেন উনি লুকোনোর চেষ্টা করলেন। যখন মনে পড়ল ব্লানশকে কেউ বাইরে থেকেও গুলি করতে পারে তখন উনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে ওয়েসলি ব্লানশের সঙ্গেই উঠে এসেছিলেন। ব্লানশ যখন সদর দরজা খুলছিল, উনি কাছেই ছিলেন। ও হলঘরে ঢুকতেই উনি ওকে গুলি করে ওর গায়ের কাছে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। সব কিছু খুব সহজ হয়ে যায়। পুলিশ সেখানে ছিল না। উনি বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলেই লিফটের দরজা বন্ধ করে পুলিশ ফ্ল্যাটে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করেন। ওরা যতক্ষণে হ্যারিকে গ্রেপ্তার করে উনি ততক্ষণে মাটির তলায় চলে যান এবং সেখানে একটু সময় অপেক্ষা করে উনি সামনের গেট দিয়ে ঢোকেন। ওঁকে আর কে সন্দেহ করবে?

জুলি আতঙ্কে কাঁটা হয়ে গেল। ও জানত হ্যারি নির্দোষ ও খুন করতে পারেনা। কি করবে ভেবে না পেয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বাইরে একটা পায়ের শব্দ হতেই জুলি লাফিয়ে পিছু হটল। ওয়েসলি ঢুকলেন। জুলির চোখে ভয়।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, তুমি। তুমি ওকে খুন করেছো। সেইজন্যেই তোমার এই অন্ধত্বের ভান করে থাকা!

ওয়েসলি আস্তে দরজা বন্ধ করলেন।

শান্ত, অবিচল কণ্ঠে বললেন, জানতাম এক সময়ে তুমি সব বুঝতে পারবে। বেশ, এখন যখন সবই জেনেছো, এসো কথা বলা যাক। ভয় পেওনা। আমি তোমার গায়ে হাত দিতে চাইনা।

—আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। চলে যাও তুমি। আমি পুলিশকে সব বলতে যাচ্ছি।

উনি ইজিচেয়ারে বিছানার কাছে এসে বসলেন।

—উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই জুলি। শান্ত হয়ে আমার কথা শোন। সিগারেট খাবে?

জুলি ভয়ে শিউরে উঠে সরে গেল।

—জুলি, তুমি একটা বাজে নাটকের চাকরানীর মতো আচরণ করো না। ওঁর শানিত গলায় জুলি ক্ষেপে উঠল। আর উনি চাইছিলেনও তাই।

—কি আস্পর্ধা তোমার। বেরিয়ে যাও, নইলে আমি চেঁচাবো।

—সিগারেট খাও জুলি ; বোকামি কোরনা। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ওয়েসলি একটা সিগারেট ধরিয়ে কেস আর লাইটারটা বিছানার ওপর ফেললেন।

ওঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে জুলি বলল, যে কাজ তুমি করেছ তারপরে তুমি সুস্থির আছো কিভাবে? তোমার মন বলে কিছু নেই। তুমি সাপের মতই ঠাণ্ডা আর ভয়ানক।

—আমি কথা দিচ্ছি আমার মন আছে জুলি, কিন্তু সেকথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। তুমি ঠিকই বলেছ, আমিই ব্লানশকে খুন করেছি।

জুলি আড়ষ্ট হয়ে গেল।

—আর তুমি হ্যারিকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছিলে? কাপুরুষ কোথাকার! কি করে পারলে?

হ্যারির ব্যাপারে তোমার মত আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি নিজের দোষ স্বীকার করিনি বলে তুমি আমায় দোষ দিতে পারো না। পার কি? আমার অবস্থায় তুমি পড়লে তুমিও তাই করতে।

ওঁর ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত ভাব দেখে জুলি এমন ঘাবড়ে গেল, কি বলবে ওর মাথায় কিছু এলো না।

—হাজার হলেও জুলি, হ্যারি তোমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু সমাজের কাছে ও একটা ছিঁচকে চোর, তরুণী মেয়েদের কাছে ও একটা মূর্তিমান বিপদ। আমি তো দেখছি ওর স্বপক্ষে তোমার বলার মত কিছুই থাকতে পারে না। অপরপক্ষে, আমি এরোপ্লেন চালানোর ওপর গবেষণা করছি যা সফল হতে চলেছে এবং এ যুগে আর আগামী যুগেব মানুষের কাছে তার অশেষ মূল্য থাকবে। সুতরাং ওর চেয়ে আমার বাঁচবার দাবি বেশী জোরালো।

—কি করে এমন কথা বলছো? ও নির্দোষ। ওকে দোষী বানিয়ে, তোমার জায়গায় ওকে তুমি ফাঁসিতে ঝোলাতে পারো না।

ওয়েসলি হেসে বললেন, আমি তো বলিনি ও আমার বদলে ফাঁসি যাক। উত্তেজিত হবার আগে চুপ করে বসো, একটা সিগারেট খাও, ঠাণ্ডা মাথায় শোন, কি হয়েছিল, বুঝিয়ে বলি।

ওঁর ব্যবহারে সম্মোহিত হয়ে জুলি বসল। সিগারেট নিল।

—বেশ। তাহলে গোড়া থেকে শুরু করা যাক। আমার সঙ্গে ব্লানশের বিয়ে হয় ছ-বছর আগে। ওর সুখ্যাতি, সৌন্দর্যকে আমি অন্ধের মত, মূর্খের মতও বলা যায় ভালবাসতাম। আমাকে ও কি জাতের মেয়ে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে ও রূপকথার বই থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সে সময়ে আমার হাতে প্রচুর টাকা। ওর নামে মোটা টাকা লিখে দিলাম। তখন ও প্রস্তাব করলো আমার লিখে দেওয়া উচিত যে বিয়ে ভেঙ্গে গেলে ওকে দু-লক্ষ পাউন্ড দেব। যতক্ষণ না একটা পাকা দলিলে আমাকে সই করতে বলা হয় ততক্ষণ আমি ভেবেছিলাম ওটা ঠাট্টা। আমি সই করবো না বলায় ও আমাকে বিয়ে করবে না বলল। দুশো অতিথি আসার কথা। বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা। বুঝলাম সই আমাকে করতেই হবে নইলে ওকে পাবার আশা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যেরা আমায় বোকা বলবে।

এখন আমার মনে হচ্ছে আমার মূর্খতার জন্যে আজ আমি দাম দিচ্ছি। ওকে ভালবাসতাম। সঙ্ক্ষেপে কথায় বলি, ওর ব্ল্যাকমেলের প্রস্তাবে আমি সই করলাম।

বিয়ের প্রথম বছরটা সুখেই কাটলো। ব্লানশের ব্যবহার ছিল মিষ্টি। আমরা সবসময়ে একসঙ্গে ঘুরতাম, কিন্তু আমার যেন মনে হতো, ও শুধু আমার নয়। ও তখন অন্ততঃ বারোজন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছে। আমি তা জানতে পারি অনেক পরে।

কারখানা তখন বড় হচ্ছে। আমি জনসাধারণের টাকাকে মূলধন করতে চাইনি। আমি আমার কারখানাটা হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছিলাম কারণ আমার কতকগুলো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ছিল। তা সফল করতে আমি তখন কারখানা নিয়ে জুয়া খেলছি। জুয়াটা নিজের টাকাতেই খেলতে চাইলাম।

ব্লানশ চেয়েছিল আমার সঙ্গে যথেচ্ছাচার করতে। আমার হাতের মোটা রোজগার ও হারাতে চায়নি। ও মদ খেয়ে ফুর্তি করতো। আমি ওকে ঘাড় থেকে নামাতে বেজায় ব্যস্ত। ততদিনে আমি অন্ধও হয়ে যাই। ঐ ভাবেই দু-বছর কাটলো। তারপর বেনটন ওকে বিয়ে করবার জন্যে ব্লানশকে জোর করতে লাগল। ও আমাকে কারখানা বেচে দিতে চাপ দিতে লাগল, যাতে আমি ওর ঘাড় থেকে নেমে যেতে পারি। তাতে শর্তমত দুলক্ষ পাউন্ড পাবে। সে দলিল খুব পাকা। আদালত অবধি গড়ালে আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি জানতে পারলাম ও আমাকে চাপ দিয়ে বাধ্য করবে। আমি উদ্ধার পাবার পথ খুঁজতে লাগলাম।

কাজ আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর ছমাস গেলেই সম্পূর্ণ হবে। যদি সে ছমাস পর্যন্ত দেরী করে তাহলে আমি লাভ রেখে বেচতে পারি, কিন্তু ও দেরী করতে রাজি হলো না।

সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে উনি তখনি আরেকটা ধরালেন।

—তোমার কি ক্লান্ত লাগছে জুলি? কথাগুলো এজন্যই বলছি যে তোমার জানা দরকার, কি জন্যে আমি ব্লানশকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। ব্লানশ মাতাল, বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। যেসব অল্প বয়সী ছেলেদের ওর ভাল লাগত, তারই বিপদ ঘটাতো। এসব দেখে আমি তখন দিশেহারা। তারপর অপারেশনের সুযোগ এলো। অপারেশনের পরে ব্যান্ডেজ খোলার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে হলো যদি কখনো ব্লানশকে খুন করা যায়, তাহলে এই অন্ধত্বটা কি দারুণ অ্যালিবাই হয়ে সাহায্য করতে পারে। তখন সেটা একটা অলস চিন্তা হিসেবেই আমার মনে আসে। কিন্তু যত ভাবতে থাকি, ততই স্থির করি যে, কোনদিন চোখে দেখতে পেলে ওকে খুন করবো।

চোখের ডাক্তার সাবধান করে দেন, দৃষ্টি ফিরে পাবার সম্ভাবনা হাজারে এক। প্রথম যখন ব্যান্ডেজ খুলে দেই, কিছুই দেখতে পাইনি। সবাই অপারেশন বিফল হয়েছে বলেই ধরে নেয়। কিন্তু বেলার দিকে মনে হল ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যের মধ্যে আমি ভালই দেখতে পেলাম। কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না। আমি অন্ধের ভান করেই রইলাম।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে তোমাকে ব্লানশের পোষাকে আর গ্লেবকে দেখে আমি অবাক হই। আমি ধরে ফেলি তোমরা দুজন ফারগুলোর জন্যে এসেছো। তখন ভাবতে শুরু করি কি করে তোমাদের কাজে লাগিয়ে আমার অ্যালিবাই আরো জোরদার করতে পারি। ব্লানশকে মেরে ফেলবার প্রচুর কারণ আছে আমার। ওর প্রতি আমার কোন মমতাই ছিল না। সবরকমে ও আমার কাজের পথে বিশ্রি একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর কোন পথ আমার ছিল না। ওকে সরাতেই হবে।

বাকীটা তুমি সব জানো। আমি যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ভালভাবে হয়ে গেল সব। পুলিশ অবশ্য, ব্লানশ কেন ফিরে এল তা নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু মনে হয়না কিছু দাঁড়াবে তা থেকে। আমি খুব সাবধানতা গ্রহণ করেছিলাম। এখন জুলি, ব্লানশের মৃত্যু নিয়ে ভাববার আগে আমি তিন মাস সময় পাচ্ছি। এই তিন মাসে আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

তুমি—তুমি বলেছো পুলিশকে সব জানাবে? হ্যারিকে ফাঁসি যেতে দেবে না।

—কথা তো তাই না? কাজ শেষ হয়ে গেলে পুলিশের কাছে গিয়ে আমি আত্মসমর্পণ করবো। তিনমাসের আগে গ্লেব কোন বিপদে পড়বে না। কাজটা হয়ে গেলে আমার কি হবে, তা নিয়ে আমি ভাবি না। গ্লেবের মত একটা লোককে আমি আমার কৃতকার্যের জন্যে মরতে দেব না। এখন ওরকম করুণ মুখে আমার দিকে তাকাবার দরকার নেই জুলি। হয়তো গ্লেবের সময়টা খারাপ যাচ্ছে, কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ও নিরাপদেই আছে। তবে ওর ভাগ্য এর চেয়ে ভালো হবারও কথা নয়।

জুলি ওয়েসলিকে নিরীক্ষণ করে দেখল, ওর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে।

শেষ অবধি ও ওয়েসলিকে বলল, আমি বিশ্বাস করি না তুমি ধরা দেবে। আমি পুলিশকে

এখনি সব বলে দেব। তোমার দোষে হ্যারি কেন কষ্ট ভোগ করবে?

—তুমি এই কথা বলবে জেনেই আমি তোমায় সবকিছু খুলে বলার ঝুঁকি নিয়েছি। অতএব তোমার কথা একটু আলোচনা করা যাক। এটা তুমি বুঝতে পারছো, আমাকে ধরিয়ে দিলে তুমি কিছুই পাবে না। আর মনে হয় না, বেশী কামাতে পারবে বলে। যে বিলাসের স্বাদ তুমি পেয়েছো, যথেচ্ছ খরচ করার মজা তুমি পেয়েছো, বিশ্বাস হয়না এসব তুমি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারবে। আর যদি আমার ধারণা ভুল হয় তবে তুমি পুলিশের কাছে যাও। সে স্বাধীনতা তোমার আছে। তবে তুমি যা বলছো তা যদি আমি অস্বীকার করি, তবে ওদের পক্ষে গ্লেবকে ছেড়ে আমাকে ধরার মত প্রমাণ যোগাড় করা কষ্টকর হবে।

হয়ত ওরা তা পারবে কিন্তু তা জুয়া খেলার মতই অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে ঐ ফ্ল্যাটে তোমার আনন্দের, সুখের জিনিষ, পোষাক, গয়নাগাটি সব তুমি হারাবে। তবে তুমি যদি আমার ধরা না দেওয়া অবধি অপেক্ষা কর, তবে এ সব জিনিষ তো তুমি পাবেই, এছাড়া আমি তোমায় মোটা টাকা দিয়ে যাবো।

উঠে দাঁড়িয়ে উনি শরীর টানটান করে হাই তুলে বললেন, আজ আমি ক্লান্ত, এখন এসব কথা থাক। যদি তুমি আগের জীবনে ফিরে যেতে চাও, তবে আমি বাধা দেব না। আমি ভরসা দিচ্ছি হ্যারি নিরাপদেই আছে।

উনি হেসে দরজার দিকে এগোলেন। গুড নাইট জুলি।

ওয়েসলি চলে যাবার পর জুলি ওর বিবেকের সঙ্গে নিদারুণ যুদ্ধ করলো। ও ব্লানশকে ঘৃণা করতো। তারজন্যে ওর কোন মমতাই নেই।

জুলি ভাবলো ব্লানশ একটা ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ। ওর কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। ওয়েসলির হ্যারির ঘাড়ে দোষ চাপানো ক্ষমা করা যায় না।

হ্যারিও অতীতে জুলিকে থিওকে দিয়ে মার খাইয়ে কষ্ট দিয়েছে। জুলি যদি এখন স্বার্থপর না হয় তাহলে ওয়েসলি ওকে আর্কটিক ফারটা দিচ্ছে না কেন? যদি দেবার কথা মাথায় না আসে তবে ও ওটা সরাসরি চাইবে।

কিন্তু ওয়েসলি যদি ধরা না দেন? যদি এটা সময় পাবার ফন্দী হয় ওঁর? উনি গোলমাল শুরু করলে ও শুধু একবার পুলিশের কাছে যাবে। যাতে ওয়েসলি তাঁর কাজ শেষ করতে পারেন। জুলি জানতে পারবে যে হ্যারিকে জীবন দিয়ে দাম... জুলি ক্ষতবিক্ষত বিবেকের কাছে হার মেনে চুপ করলো।

পরদিন সকালে ওয়েসলি ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ও কি করতে চায়। ও ওঁকে সময় দিতে রাজী আছে বলার পর উনি এত শান্ত, অবিচল রইলেন দেখে জুলি ক্ষুব্ধ হলো।

ওয়েসলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, এখন তো ঠিকই হয়ে গেল কথা। আমাকে এখন কারখানায় যেতে হবে। ওখানে আমার অনেক কাজ আছে, সময় সংক্ষিপ্ত।

জুলি ভাবলো, আমায় তো সৌজন্যবশতঃ একটা ধন্যবাদ দিতে পারতো। হাজার হলেও আমি ওঁর জন্যে যা করেছি, খুব কম লোকই করতো।

ও আড়ষ্টভাবে বলল, একটা কথা, আমার মনে হয় আমি...কথা থামিয়ে ও আবার শুরু করল, ওই ফারগুলো, আমি আর্কটিক ফারটা চাই। বুঝতে পারছি না কেন ওটা পাবনা। আমি তো তোমার জন্যে যথেষ্ট করছি।

ওয়েসলি হেসে বললেন, আমি তোমার জন্যে এ পর্যন্ত কিছুই করিনি, তাই না?

যখন জেলে থাকবো তখন ওটা পরছো জানলে সুখীই হবো। কিন্তু ওটা এখন তোমায় দিচ্ছিনা। জুলি আমাদের খোলাখুলি হওয়া দরকার। আমার কাজ, আমার জীবন এখন তোমার হাতে। তুমি যে জিনিষটা মনেপ্রাণে চাও সেটা আমার হাতে রাখতে আমি নিরাপদ বোধ করবো। তবে আমি কথা দিচ্ছি আমার কাজটা হয়ে গেলে শুধু আর্কটিকটা নয়, সবগুলো ফারই তুমি পাবে। তোমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না, বড়জোর দু-মাস।

জুলিকে এই কথাতেই খুশী হতে হল।

জুলির মনোভাব বুঝে ওয়েসলির ব্যবহারটাই বদলে গেল। উনি স্বীকার করলেন, ওকে এই ফ্ল্যাটে এনে তোলার উদ্দেশ্য ওর মুখবন্ধ রাখা। ওর সঙ্গে যে ওঁকে এখনো থাকতে হচ্ছে এটা ওঁর দুর্ভাগ্য। উনি অন্য কোথাও চলে যেতে চান। কিন্তু হঠাৎ ওকে ফেলে চলে গেলে পুলিশের কাছে সেটা গোলমেলে মনে হতে পারে, এখন উনি এমন কিছু করতে চান না, যাতে পুলিশ ওঁকে সন্দেহ করে।

উনি বুঝিয়ে দিলেন জুলিকে, ও ইচ্ছে হলে যা খুশী তাই করতে পারে। এখানে ওর বন্ধুদেরও ইচ্ছে হলেই ডাকতে পারে। উনি তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না।

—এখন আমি তোমার সঙ্গে যখন ইচ্ছে বেরোতে পারবো না। যত খেটে কাজটা সারতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি তোমার বন্ধু গ্লেব ছাড়া পাবে। ওয়েসলি জুলিকে বললেন।

জুলি এরকমটা আশা করেনি। ওয়েসলি কারখানায় চলে গেলে ও নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল। ওর আগের জীবনের বন্ধুদের সঙ্গেও ওর কোন যোগাযোগ নেই। ওদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতেও ওর ভয় হলো। সকালটা একঘেয়ে কাটলো, দুপুরে একলা সিনেমা দেখেও বিরক্তি ধরে গেল। সন্ধ্যে ছটার পর ওয়েসলিকে দেখে ও খুশীতে ভরে উঠল।

—আশা করি দিনটা ভালই কেটেছে জুলি।

জুলি তিক্ত গলায় বললো, বিশ্রি কেটেছে। মনে হয়না তাতে তোমার কিছু এসে যাবে।

উনি বসার ঘরের দিকে এগোলে জুলিও ওঁর পেছন পেছন গেল।

ওয়েসলি বললেন, শুনে দুঃখিত হলাম। এখন আমার অনেক কাজ আছে, আমি ন'টার সময় খেতে চাই। তোমার যদি কিছু করার থাকে, আমি তাহলে একটা ট্রে আনিয়ে নেব।

—না আমি রাতে বাইরে যেতে চাই।

জুলি দেখলো উনি ডিকটাফোনের পাশে বসছেন। জুলি জিজ্ঞেস করলো, বেনটনের খবর কি?

ওয়েসলি ডিকটাফোনে নতুন সিলিন্ডার পরালেন।

এইকথায় ওয়েসলি পুরুষকাঠিন্য গলায় বললেন, ওর টাকা পয়সা আটকে ওকে বের করে দিয়েছি। ওর বাজারে প্রচুর দেনা ছিল। আমি শুধু যে গ্যারান্টি দিয়েছিলাম তা সরিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর টাকাকড়ির ব্যাপার সব অগাধ জলে তলিয়ে গেল। ও এখন আর আমাকে জ্বালাতে আসবে না।

মনে মনে জুলি খুশীই হলো, তুমি খুব কঠিন, তাই না?

—হয়তো। আজকাল মাঝেমধ্যে কঠিন হতেই হয়। তবে তুমি নিজেও ঠিক নরমসরম নও।

জুলি বুঝলো ও কথা বলে ওঁর কাজের ক্ষতি করছে হয়তো। তবুও ওর চলে যেতে খারাপ লাগলো। ও সঙ্গ চাইছিল।

জুলি বলল, তোমার কাজে আমি কোন সাহায্য করতে পারি না?

উনি মুখ ফেরালেন।

—আমায় সাহায্য করবে? জান জুলি, আমি তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। তোমার কি আমাকে ভয় করছে না? আমি কি করেছি জেনেও তোমার মনে কোন ভয় নেই?

জুলি কাঁধ ঝাঁকাল।

—তাতে আমার কি? ব্লানশের যা প্রাপ্য ছিল ও তা পেয়েছে, ও বাঁচার যোগ্য ছিল না। আমি কেন তোমায় ভয় পেতে যাবো?

—তোমার দৃষ্টিভঙ্গি দেখলে ঈর্ষা হয়। না জুলি এখন তোমার সময় অপচয় না করে আনন্দ করা উচিত। মনে হয় না তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সত্যি বলতে কি আমি আশাই করিনি তুমি এসময় বাড়িতে থাকবে। ভেবেছিলাম তুমি বাইরে গিয়ে আমোদ করছো।

—একা একা কি করে আমোদ করবো? সারাদিন বেজায় একঘেয়ে লেগেছে আমার।

—ব্লানশের মত তুমিও তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলে একঘেয়ে লাগে। তবে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করনা কেন?

—তুমি জানো তোমারই জন্যে এখন আমার কোন বন্ধুবান্ধব নেই। এখন তুমি আমায় ব্যঙ্গ

করছো?

—বাজে কথা। ওয়েসলি কাজের তাগিদে অস্থির হয়ে পড়লেন। বললেন, এখন আমাকে কাজ করতে হবে, তুমি যাও। খাবার খেতে খেতে তোমার সমস্যার কথা শোনা যাবে।

—আমার থাকা যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে আমি নিশ্চয় থাকতে চাইনা। জুলি রেগে উঠে দাঁড়াল, রাগের চোটে ওর চোখে জল এসে গেল। ধড়াস করে দরজা টেনে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল।

পরে সদর দরজায় ঘণ্টা বাজতে শোচনীয় অবসাদ কাটিয়ে ও সচকিত হলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডিটেকটিভ ডসন। জুলি ওকে দেখে চমকে উঠলো।

—মিঃ ওয়েসলি আছেন?

মুখের আতঙ্ক লুকোবার চেষ্টা করল। ও বুঝল ডসন ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু উনি কাজ করছেন।

—আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। বল বেশী সময় নেবনা। বলবে?

অনিচ্ছুক মুখে জুলি ওকে বসার ঘরে নিয়ে এলো।

চারিদিকে তাকিয়ে ডসন শিস্ দিল আস্তে।

—কেমন লাগছে এখানে?

—ভালই।

—সুন্দর পোষাক পরেছো। উনি তোমায় ভালই দেখাশোনা করছেন। তাই না? কেন বল তো?

জুলি রেগে তাকাল কিন্তু ভয়ও পেল। মনে হল, ডসন কি বোঝাতে চাইছে। যখন ও ওয়েসলির কাছে গেল, তখন ওকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ওর চোখে ভয় দেখেই ওয়েসলি বললেন, ডসন?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ওয়েসলি হাসলেন।

—ঠিক আছে। কিছু বলেছে কি?

—শুধু বলেছে, আমায় তুমি ভালই দেখাশোনা করছো, কিন্তু কেন সেটাই জানতে চাইলো।

ওয়েসলি হাসলেন।

—ডসন বোকা নয়, দেখেছো? ঠিক আছে জুলি। ওকে আসতে বল। ভয় পাবার কিছু নেই। ইচ্ছে হলে সত্যি কথাটা বলে দিতে পারো।

—বললে তুমি বোকা বনবে। জুলি বললো।

—অবশ্য, তুমি বলবে না কখনোই।

—অত নিশ্চিত হয়ো না।

—ওকে অপেক্ষা করিয়ে নাটক কোর না। তোমায় মানায় না।

জুলি ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোমায় আমি ঘেন্না করি। সব সময়ে তুমি আমায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর।

—ছেলেমানুষি কোর না।

ঘর থেকে জুলি বেরিয়ে গেল। ওর টকটকে লাল মুখ দেখেই ডসন বুঝলো জুলি কিরকম চটেছে।

ডসনের দিকে না তাকিয়েই বলল, উনি দেখা করবেন। ওই শেষের ঘরটায় আছেন।

ডসন খুব একটা ব্যস্ত হলো না।

—তোমার দোস্ত হ্যারি গ্লেবকে কাল দেখলাম। ও বেশ অসুস্থ। আমি ওকে বললাম তুমি ওয়েসলির সঙ্গে ভিড়েছো। হ্যারি খবরটা শুনে তেমন খুশী হলো না। দেখলাম ওর যেন ধারণা হয়েছে, সে তোমার দোষে...।

ডসন করুণ মুখে মাথা নাড়লো। বলল, হ্যারির কথা ভাব কখনো? মনে তো হয়না, পুরোনো

বন্ধুদের কথা ভাববার মতো সময় আছে তোমার? দিব্যি মজায় ফুর্তি করে বেড়াচ্ছো। ভাল। তবে হ্যারি তোমার কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন। তোমায় বলছি, ওর অবস্থায় পড়লে আমিও উদ্বিগ্ন হতাম। বেসরকারী ভাবে বলছি, ছোকরা ফাঁসিতে ঝুলবে।

জুলি নির্বাক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

—হয়তো তুমি তা ভাবছো না? হয়তো তোমার কাছে এমন খবর আছে, যার জোরে তুমি বেঁচে যাবে!

—নেই।

—ঠিক বলছো নেই? খুনের মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করলে অসম্ভব বিপদে পড়তে হবে, জেনে রেখো। তুমি এখনো মনে কর হ্যারি একাজ করেনি?

ওয়েসলি দরজা থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ইন্সপেক্টর?

ডসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঘোরাল।

কালো চশমায় চোখ ঢাকা ওয়েসলির নিথর, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই বোঝা যায়, ওঁর ভেতরে টানটান উত্তেজনা একেবারে।

—হ্যাঁ চাইছিলাম। আমি মিস হল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আপনি এসে পড়েছেন যখন...

—বসার ঘরে আসুন, ও ঘরটায় আরাম পাবেন। জুলি পোষাক বদল করে নাও, ইন্সপেক্টর চলে গেলে এক জায়গায় যেতে হবে, আশা করি মনে আছে।

ডসন আর ওয়েসলি চলে যেতেই জুলি ছুটে চলে গেল ওর শোবার ঘরে।

একা বসে বসে আশঙ্কায় অস্থির হতে লাগল ও। পুলিশকে যে ওয়েসলির কথা ও চেপে গেল, এতে ওর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই তো? ডসন ধাপ্পা দিচ্ছিল না তো? জুলি শুনেছে খুনে সহযোগিতা করলে শাস্তি হয়। কিন্তু তাতে কি জেলে যেতে হয়? ডসনকে যদি ও সত্যি কথাটা বলে দেয়, তাহলে ও হয়তো জুলিকে বিপদে ফেলবার সুযোগ পেয়ে খুশীই হবে।

হ্যারির কথা মনে পড়ল ওর। ও ওয়েসলির সঙ্গে বসবাস করছে একথা ডসনের বলা অন্যায়। কি আনন্দই না করত ওরা দু'জনে মিলে। ওকে পাবে না জেনেই ওকে মনে মনে চায় জুলি। জুলির মনে হল, ও বোধহয় আরেকবার হ্যারির প্রেমে পড়েছে। ও মনে মনে পরিকল্পনা করতে লাগল, ওয়েসলি যখন পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, তখন সমস্ত টাকা-পয়সা জুলির হবে, তখন তো ও আর হ্যারি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে।

ওয়েসলি ওর নামে যে টাকা দেবেন বলেছেন, তা নিয়ে ও আর হ্যারি আমেরিকা চলে যেতে পারে। জুলি ভাবল, ব্রানশের ফ্ল্যাটে চুরি করতে ঢোকার জন্যে ওর হয়তো, কিছুদিনের জন্যে কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু সে তো বেশীদিন নয়। জুলির সহসা পুরোনো ভালবাসা নতুনভাবে ফিরে এলো। ও বুঝলো মনে মনে হ্যারিকে ও চিরদিনই চেয়ে এসেছে। হ্যারি তো ওকে অনেক অনুনয় করেছিল ওর সঙ্গে চলে যাবার জন্যে। জুলি মূর্খ তাই ওয়েসলির জন্যে ও হ্যারিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বাইরে ডসনের ভারী গলার আওয়াজ পেয়ে ওর চিন্তার জাল কেটে গেল। শুনলো ডসন দরজা অবধি হেঁটে গেল। একটু বাদে ওয়েসলি ফ্যাকাশে, ক্লান্ত মুখে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন।

—ও চলে গেছে, কিন্তু খুব বাঁচান বেঁচেছি আমরা জুলি, খুব!

জুলি লাফিয়ে উঠল।

—কেন? ও কি চাইছিল?

—প্রশ্ন করছিল। আমি নিজেকে যতটা চালাক মনে করি ততটা নই। তবে ও এখন খুশী হয়েছে।

—কি প্রশ্ন করছিল?

—আমার জবানবন্দীটা মিলিয়ে দেখছিল। আমি ফাঁদে পা দিইনি বটে তবে আমি যে অন্ধ

এটা যদি ও নিশ্চিত না জানতো, তবে আমি অবশ্যই বিপদে পড়তাম।

চুলের ভেতর আঙুল চালালেন ওয়েসলি। খুবই উদ্বিগ্ন দেখালো ওকে। বললেন, আজ রাতে আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। একটু অস্থির অস্থির লাগছে। চলো কোথাও বেরিয়ে একটু আনন্দ করে আসি।

জুলি নিজের কথা ভাবছিল।

—ডসন বলেছে আমি কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ লুকিয়ে রাখলে বিপদে পড়তে পারি। আমি জানতে চাই এ কথার মানে কি? আমি অন্যের জন্যে বিপদে পড়তে চাই না।

—তুমি খালি নিজের কথাই ভাব না? যতক্ষণ না কথা বলছ, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নেই। তোমায় কেউ কিছু করতে পারবে না। ভয় পাবার কিছু নেই।

—তুমি তো বলেই খালাস, ওরা যদি ধরে ফেলে?

—কেমন করে ধরবে, তুমি যদি কিছু না বলো। দোহাই তোমার নিজেকে নিয়ে স্বার্থপরের মতো চিন্তা করা বন্ধ করো। তোমার এই ছোট-খাটো সমস্যা ছাড়াও আমার অন্য যথেষ্ট সমস্যা আছে। যাও জামা বদলে এসো, আমরা বেরুব।

জুলি জ্বলে উঠলো।

—তুমি আমার কথা এক মুহূর্তও ভাব না। সব সময় চাকরানীর মতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যবহার পেয়ে আমি ক্লান্ত।

ওয়েসলি বলল, এ শুধু তোমার দোষ জুলি। তোমার তো এখানে থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই?

—হ্যাঁ! আমি অত বোকা নই যে সব কিছু ছেড়ে দেবো এত সহজে।

—আমার মনে হয় তুমি লোভ দ্বারা পরিচালিত হও। লোভই তোমায় চালায়। যেই একটা জিনিষ পও, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চাও। কখনো কিছুতেই খুশী হওনা।

জুলি রেগে উঠে বললো, তুমি আমায় লোভী বলছ? আমি মোটেও কোনদিনই লোভী ছিলাম না।

ওয়েসলি হাসলেন।

—যাক রেগে যেও না। তোমায় নিয়ে আর পারবো না। তুমি একটা যা তা জুলি। যাও পোষাক বদলে এসো। চলো আমরা বেরোই।

—আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না। আমি তোমায় ঘেন্না করি। চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমায় একা থাকতে দাও। আমি তোমায় ঘেন্না করি। ঘেন্না করি।

বিছানায় আছড়ে পড়ে জুলি কাঁদতে লাগলো।

জুলির জীবনে আর কোন সুখই রইলো না।

জুলির একবার মনে হল, গয়নাগাটি সব বেচে দিয়ে স্বাধীন জীবন কাটায়। কিন্তু ও দেখল সে টাকায় ওর বেশীদিন চলবে না। টাকা ফুরোলে ওর আবার যে কে সেই অবস্থা হবে। উনি কথা দিয়েছেন ওর নামে মোটা টাকা লিখে দেবেন, ধনী হবার এ সুযোগ হারানো তো বোকামিরই সামিল।

বিচারাধীন সময়টা কাটলে পরে হ্যারিকে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলো, জুলিকে সরকার পক্ষের সাক্ষী হতে হলো। পুলিশকে ও যে খবর দিয়েছে, একথা সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে জুলি ভয়ানক বিপন্ন বোধ করল।

ওয়েসলির কাছে ও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পেল না।

—গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে, তা হয়না। ওয়েসলি বললেন, তবে কি বলবে সেটা তোমার খুশী। আমি এ কাজ করেছি সে কথা তোমার বলার ইচ্ছে হলে বলে দিতে পারো। আমি তোমায় কোন বাধা দেব না। বলে উনি জুলির মুখে ক্রুদ্ধ, নিরাশার ভাব দেখে হাসলেন।

জুলি ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। ওঁর কোন ভয়ই নেই ওঁকে ধরিয়ে দেবে বলে। বারবার ওঁর এই আত্মবিশ্বাস দেখে ক্ষেপে গিয়ে জুলি বারবার পুলিশকে ফোন করতে গিয়েও ফিরে এসেছে।

শত শত চোখের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ও লজ্জায় পুড়ে যেতে লাগল। হ্যারিকে দেখে ওর বুক ফেটে যেতে লাগল। ওকে চিনতে পারলো না জুলি। হ্যারির ওজন কমে গেছে, রোগা শীর্ণ মুখ-চোখে একটা ফাঁদে পড়া জন্তুর চাউনি। ওর দিকে কিছুতেই চোখ তুলল না হ্যারি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইল ও। ওর চকচকে স্যুট, এই নির্মম পরিবেশে বেমানান দেখালো। দুহাতে কাঠগড়ার রেলিং আঁকড়ে রইল ও। মাথাটা নিচু করেই রইল।

সরকার পক্ষের কৌসুলী বেশ সদয়ভাবেই ওর জীবনকাহিনী তুলে ধরলেন আদালতের সামনে। একটি সন্ত্রস্ত, অনভিজ্ঞ মেয়ে, যে অবস্থার ওপর ওর হাত নেই, তেমনি অবস্থায় পড়ে ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়েছে, এমনি একটা জুলির ছবি তুলে ধরলেন।

জুলির মনে হল উনি একটু বেশীই নির্দোষিতার ওপর জোর দিচ্ছেন। হ্যারি ওর সম্বন্ধে কি ভাবছে কে জানে। আদালতের ভিড়ের মধ্যে জুলি হ্যারির দিকে তাকাল, ও চোখ তুলল না।

কিন্তু আসামীপক্ষের কৌসুলী যখন জেরা শুরু করলেন, তখন মনে হলো আদালতের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বদলে গিয়ে, আদালতের ভালো ধারণাটা ভেঙে দিয়ে উনি ওকে যতটা সম্ভব অপদস্ত করার চেষ্টা করলেন।

উনি তাতে সফলও হলেন। মুখের ওপর প্রশ্ন করলেন জুলির সঙ্গে হ্যারির ঘনিষ্ঠতা সত্য কিনা?

জুলি উত্তরটা পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু যতক্ষণ না বিভ্রান্ত, আরক্ত মুখে সে কথা স্বীকার করলো, উনি জেরা করে যেতে লাগলেন। ওর নির্দোষিতা ভেসে গেল।

তারপর আদালতে উনি জানালেন, একটা চুরির পরিকল্পনা হচ্ছে জেনেও ও স্বেচ্ছায় ব্লানশের চাকরানীর কাজ নেয়, একথা সত্যি?

এ কথার প্রতিবাদ এত উত্তেজিতভাবে করলো জুলি, যে ও নিজেই বুঝলো কেউ বিশ্বাস করছে না।

কৌসুলী আরও জিজ্ঞেস করলেন, ও এখন কি করছে?

জুলি যখন বলল মিঃ ওয়েসলিকে দেখাশোনা করছে, তখন ওয়েসলি ভদ্রলোক ওঁর পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকা নাকের ডগা দেখতে ব্যস্ত রইলেন।

কৌসুলী জিজ্ঞেস করলেন, চাকরানী হিসেবে দেখাশোনা করছো?

জুলি দুম করে বলে বসলো, ও ওঁর হাউসকিপার।

কাঠগড়া থেকে নামতে নামতে জুলি উপলব্ধি করলো ও হ্যারি বা নিজেকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। আসামীপক্ষের কৌসুলী ওকে হেয় প্রতিপন্ন করে ছেড়েছেন। ওয়েসলি ওকে পরে জানালেন, হ্যারিকে ওল্ড বেইলিতে দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে।

কাগজে কেসের খবর বিশদ ভাবে বেরোল। বারবার কাগজ পড়ে জুলি, সাংবাদিকরা ওর এবং ওয়েসলির সম্পর্ক নিয়ে যে চোরা ইঙ্গিত করেছে, তা পড়ে লজ্জায় ওর মাথা কাটা গেল। ও এও বুঝলো হ্যারির বাঁচবার কোন ভরসাই নেই। যদিও হ্যারিকে কেউ গুলি করতে দেখেনি, তবু পুলিশ ঢুকেই দেখেছে যে ও পালাবার চেষ্টা করছে। ওর ব্লানশকে গুলি করে মারার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না, কিন্তু হ্যারির তা থাকতে পারে। মনে হলো কেসের ফলাফল কি হবে তা জানা যাচ্ছে।

জুলি এখন দুশ্চিন্তায় পড়ল। ও নিজেকে ভরসা দিতে লাগল হ্যারির কিছু হবে না, ওয়েসলি আত্মসর্ম্পণ করবেন। কিন্তু ওর যখন মাথায় এটা এল যে হ্যারি কি ভীষণভাবে ফাঁদে পড়েছে, এখন ওয়েসলির যদি কিছু বিপদ বা গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে, তবে তো হ্যারিকে বাঁচানোই যাবে না, তখন চিন্তায় দগ্ধ হয়ে ও ওয়েসলির কাছে গেল।

ওয়েসলি একতাড়া কাগজ দেখতে দেখতে নামিয়ে রেখে ওকে বললেন, তুমি কি ভাব আমার হৃদয় বলে কিছু নেই? ও কথা আমি কয়েক হপ্তা আগেই ভেবেছি। ব্যাঙ্কে আমি একটা সই করা

জবানবন্দী রেখেছি, আমার মৃত্যুর পর সেটা খুলে দেখা হবে। আমার যদি কিছু হয়, ও কষ্ট পাবেনা।

—কেমন করে বুঝবো তুমি সত্যি কথা বলছো?

—তোমার চরিত্রজ্ঞান আরেকটু বেশী থাকা দরকার, জুলি। তুমি ভাবো আমি গ্লেবকে বাঁচাবো না। তাই না?

—যখন বলছো বাঁচাবে, হয়তো বাঁচাবে। জুলি ক্ষুণ্ণ গলায় বলল।

তারপর দায়রার কেস ওঠার এক সপ্তাহ আগে ফ্ল্যাটে ঢুকেই ওয়েসলি জুলিকে ডাকলেন। জুলির সঙ্গে ওঁর দুদিন দেখা হয়নি। জুলি খুব সাবধানে ঘরে ঢুকল।

—কি হয়েছে? সন্দিগ্ধ চোখে জুলি জিজ্ঞেস করল।

ওয়েসলি প্যান্টের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে ভুরু কুঁচকে পায়চারি করছেন।

—ডসনের সঙ্গে দেখা করলাম। ও বলল, ডানা ফ্রেঞ্চ এসে আসামী পক্ষের সাক্ষী হয়েছে।

জুলির মুখের রং পাল্টে গেল। ও বলল, ও তো গ্রেপ্তার হবে?

—বোঝাই যাচ্ছে গ্লেবকে ও ভালবাসে।

—কি বলতে চাইছো? জুলি চেঁচিয়ে উঠল।

—ও নিজেকে বিপন্ন করে হ্যারিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

—কেমন করে?

ওয়েসলি কাঁধ ঝাঁকালেন।

—বন্দুকটা থিওর, থিও ব্লানশকে গুলি করেছে ও হলপ করে বলবে। ও এটা বুঝছে না যে এ সাক্ষীতে গ্লেব বাঁচবে না। তবে মনে হলো খবরটা তোমার ভাল লাগতে পারে। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে এখনও নিঃস্বার্থ মানুষ আছে।

জুলির হাত মুঠো হয়ে গেল। হিংসায়, রাগে ও জ্বলছে। সেই রং-মাখা মেয়েটা হ্যারির জন্যে এত করবে ভাবা গিয়েছিল কি?

—তুমি আমায় ঘেন্না কর, তাই না? জুলি ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো।

—না জুলি। তোমায় আমি ঘেন্না করি না। সত্যি বলতে কি তুমি আমার মনকে খুবই আকর্ষণ কর। তুমি পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলে দিলে আমার মত খুশী কেউ হতো না। তখন প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি তোমায় ভুল বুঝিয়েছিলাম।

—তুমি কি বলতে চাইছো, আমি বুঝলাম না।

—ঠিকই বুঝেছো। এখন এই মেয়েটা যা করলো সেটা দেখেও তুমি টাকা হারাবার ঝুঁকি নিলে না?

—তুমি জানোয়ারের মতো বিশ্রি ব্যবহার করছো আমার সঙ্গে। হ্যারির ফাঁসি হবে না, তুমি কথা দিয়েছো। কয়েক হপ্তার কষ্টের জন্যে আমি কেন সব হারাতে যাবো? তুমিই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর। তুমি ওকে ফাঁসি যেতে দেবে না তো?

—না। তবে তা বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, তাই না? আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যদি ওকে ফাঁসি যেতেও দিই, তুমি তাও কিছু ছাড়তে প্রস্তুত নও।

—নিশ্চয় পারবো। তুমি কোনরকম বদমায়েশি করবে না। আমি জানি আমি ওকে বাঁচাতে পারি, তাই আমি এরকম করছি। কেন আমি সুখ, বিলাস পাবো না। সারাজীবন আমি কিছুই পাইনি।

—সুখ? তুমি কি সুখী জুলি? আমার তো মনে হয়না। যখন তুমি স্বাধীন হবে, তোমার নিজের টাকা হবে, তখনো তুমি সুখী হবে না। তোমার মত মেয়ে কোনদিন সুখী হবে না। তুমি অবাস্তবের পেছনে ছুটছো।

—সে দেখা যাবে। আর কথাটা যখন উঠলোই, এখন বলো কত টাকা দিচ্ছো তুমি আমায়?

—আমিও এ কথাটাই ভাবছিলাম। কখন তুমি জিজ্ঞেস করবে? ভাবছিলাম বছরে দু-হাজার পাউন্ড যথেষ্ট হওয়া উচিত।

জুলি ভাবল এই সুযোগ!

—দু-হাজার? আমি তোমার জন্যে এত করলাম, তার জন্যে দু-হাজার? আমি আরো চাই। আরো চাই। অনেক টাকা চাই। কাকে দিয়ে যাবে তোমার টাকা? আমি সাহায্য না করলে তোমার মূল্যবান কাজটাই শেষ করতে পারতে না তুমি। তার দাম আরো বেশী হওয়া উচিত। জুলি চেঁচিয়ে বলল, আমার পাঁচ হাজার চাই।

—ছেলেমানুষি কোর না।

—আমি পেতে চাই। আমাকে পেতেই হবে।

ওর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চাইলেন উনি।

—তোমার একথা কখনো মনে হয়েছে জুলি আমি সহজেই তোমায় মেরে ফেলতে পারি?

দেশলাইয়ের নিভন্ত আগুনের মতো জুলির রাগ ফুস করে নিভে গেল।

—ভয় পেলে? একটা লোক যখন একটা খুন করে, দুটো খুন করলে তার শাস্তি বেড়ে যায় না। তোমার ঐ হতভাগা সরু গলা টিপে দেবার মতো সুবিধাজনক কাজ আর কি বা হতে পারে?

জুলি পিছিয়ে গেল।

—এক এক সময় জুলি, আমার মনে হয় তা করতে পারলে আমার বেজায় আনন্দ হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি স্বভাব খুনী নই। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, ব্লানশকে খুন করে আমি অনুতপ্ত। শেষের দিকে যখন বুঝলাম আমার কাছে ওর কোন মূল্যই নেই, তখন ওকে শেষ করে দেওয়াই ওর যোগ্য শাস্তি মনে হল। কিন্তু আমার হাতে মৃত্যু নয়। যতদিন বাঁচবো ওকে হত্যা করার জন্যে অনুশোচনা হবে আমার। জুলি জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ হলো মনের সুখ। সে আমার নেই। তোমারও নেই। ভয় পেও না। আমি তোমাকে মেরে আমার বিবেককে ব্যথা দিতে চাই না। তাছাড়া তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘেন্না লাগে। এখন যতই তোমায় দেখছি, ততই মনে হচ্ছে তুমি কি বিরক্তিকর মেয়েছেলে!

জুলি জ্বলতে জ্বলতে বলল, সে দেখা যাবে। এরজন্যে তোমায় অনুতাপ করতে হবেই। দেখো অনুতাপ করতে হয় কিনা।

ওয়েসলি হাসলেন।

চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের কাছে একটা মলিন শুঁড়িখানায় বসেছিল বেনটন। টেবিলের ওপর ছোট ছোট গোল গোল দাগের নকশার দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিল। রোগা শীর্ণ শরীরটা কাঁপছিল। চোখে একটা রিক্ত হতাশা।

ও নিজেকে বলল, আমি এখন শেষ হয়ে গেছি। গত দু-সপ্তাহ ধরে ও নিজেকে গুলি করে শেষ করে দেবার কথা ভাবছে। কিন্তু আত্মহত্যা করা আর পাওনাদারদের সামনে দাঁড়ানো, দুটোর একটা করারও সাহস ওর নেই। ওর অবস্থা এখন টানটান করে বাঁধা দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মত, বুঝতে পারছে এক পা নড়লেই মৃত্যু অনিবার্য।

বেনটন আগেই ঠিক করেছে এখন ও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। যতক্ষণ না ঘটনাচক্র কিছু করতে ওকে বাধ্য করে ততক্ষণ অবধি কোনরকম কাজ করবে না। ওয়েস্ট এন্ডের ফ্ল্যাট ও ছেড়ে দিয়েছে। গত চার-পাঁচ দিন ধরে পথে ঘুরে, বিভিন্ন হোটেলে রাত কাটিয়েছে। ওর পকেটে পঁয়ত্রিশ পাউন্ড আছে, শেষ হয়ে গেলে আর কিছু থাকবে না। সঠিক মনে নেই বাজারে ওর ধার কত? তবে অনুমান বিশ হাজার পাউন্ড, তার বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে।

ওরা যদি ধরে ফেলে তো ওকে দেউলিয়া করে ছেড়ে দেবে। ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে। যেদিন ওর বাবা ওকে প্রথম সম্ভ্রান্ত ক্লাবের সদস্য করে দেন, সেদিন সেই থাম বসানো বড় ফটকে ঢুকে বড় বড়, নিঃশব্দ ঘরগুলোতে প্রবেশের সময়ে ওর মনে যে গর্ব হয়েছিল, আজ তা শুধুই স্মৃতি।

ওর জীবনে গর্বের বিষয় চারটি—ওর স্কুল, ক্লাব, ফ্ল্যাট এবং ওর বাবা একজন জেনারেল ছিলেন, সেই কথাটা। এগুলোর সঙ্গে ওর জীবনে আর একজন মূল্যবান ছিল ব্লানশ। আজ ও সর্বহারা। আজ ওর রাগ ওয়েসলির ওপর।

বেনটন লোকটার মধ্যে কোন আদিমতার স্ফুলিঙ্গ নেই যা ওকে হত্যায় প্ররোচিত করতে পারে। ওর ঘৃণার মধ্যে ঈর্ষা আছে, প্রতিশোধ স্পৃহা আছে, কিন্তু হিংস্রতা নেই। কালো ওভারকোট

থেকে এক কণা ধুলো ঝেড়ে ফেলে ও অজান্তে হাতটা নাড়াল, তাতে বোঝা গেল অবশেষে মনস্থির করে ফেলেছে। হুইস্কিটা শেষ করে, স্খলিত পায়ে আরেকটা হুইস্কির ফরমাস দিতে গেল ও। চোখে পড়লো একটা লম্বা, শুষ্ক নিতম্বিনী, ভরা যৌবন শরীরের মেয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। একমুহূর্তের জন্যে বেনটনের শরীরে কামনার তরঙ্গ খেলে গেলেও ওর ময়লা চটচটে হাত, গলায় জমে থাকা ময়লা, চুলের মৃদু টক গন্ধ পেয়ে ওর শরীর শিউরে উঠলো। টেবিলে ফিরে এসে ও অর্ধেক হুইস্কি খেলো, গ্লাসটা সযত্নে রেখে ও সিগারেট বের করলো।

লাল টুপি পড়া মেয়েটা ওর কাছে এসে বলল, যদি বেশি থাকে আমি একটা পেতে পারি?

বেনটন উঠে দাঁড়ালো। ওর বাবা বলতেন জাত ভদ্রলোক বেশ্যাকে দেখলেও জাত ভদ্রলোকের মতই আচরণ করে।

বেনটন বলল, আপনি বোধহয় সময় নষ্ট করছেন। দয়া করে আমায় মাপ করবেন।

—আমার তাড়া নেই। আমি তোমায় বেজায় মজা দেব। চাইলে একঘণ্টা থাকতে দেব।

আবার তরঙ্গের মত কামনা ওর শরীরে খেলে ব্রানশের কথা মনে পড়িয়ে দিল। এখন ও একা। মেয়েটির দিকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে চেয়ে ও বাজিয়ে দেখলো। আবার মেয়েটির সঙ্গে যাবার কথা ভেবে ভয় পেল।

ভদ্রতায় অবিচল থেকে ও বলল, না, আমায় মাপ করতে হবে।

—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, খুবই বিরক্ত। আমি তোমায় সব ভুলিয়ে দেবো।

—না। হাসি ফুটিয়ে ভেংচির মত করে বলল বেনটন।

—একটু মদ তো কিনে দাও। তাতে আপত্তি আছে?

পকেটে হাত দিয়ে খুচরোগুলো দেখে ও ভাবল, এখন ওর প্রতি পয়সা দরকার। কিন্তু ও বুঝলো বারে দাঁড়িয়ে তিনটে লোক ওকে সব্যঙ্গ চোখে দেখছে। ভয় হলো মেয়েটা চেঁচামেচি না করে।

—আমার তাড়া আছে, যেতে হবে। এই যে এই নিয়ে কিনে নিন।

বেনটনের প্রসারিত হাতে আধ ক্রাউনটা দেখে মেয়েটার ঠোঁট ঘেন্না আর তাচ্ছিল্যে কুঁচকে গেল।

—যাও দেওয়ালে ওটা সেঁটে দাও গে। আমাকে যদি নাই চাও, তবে আমার দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করছিলে কেন? ভাগো কিপটে নেংটি ইঁদুর কোথাকার?

ও তাড়াতাড়ি বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো। পুরুষ কণ্ঠের সব্যঙ্গ হাসি শুনতে পাচ্ছে বেনটন। রাতের টাটকা বাতাসে বেরিয়ে ও বুঝলো নেশা হয়েছে ওর, সাবধানে হাঁটতে হবে ওকে। একজন অত্যন্ত বৃদ্ধা, জীর্ণ পোষাক পরা স্ত্রীলোক চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের দিকে হাঁটছিল। বেনটন টাল সামলাতে না পেরে তার ওপরে গিয়ে পড়ল। বেনটনের কাঁধের ধাক্কা খেয়ে বৃদ্ধাটি একটা দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে গেল।

আতঙ্কে পাথর হয়ে ও স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে মাথার টুপি খুলে ক্ষমা চাইল। জীবনে ও কোন মেয়েকে ধাক্কা মারেনি। জাত ভদ্রলোক যত মাতালই হোক না কেন, মেয়েদের গায়ে পড়ে যায় না। লজ্জায় লাল হয়ে গেল বেনটন।

বৃদ্ধাটি রেগে বলল, মাতাল হয়েছ! নেশা হয়েছে তোমার, তাই রাজার মত হাঁটছো?

বেনটন আধ ক্রাউনটা পকেট হাতড়িয়ে খুঁজতে লাগল। বৃদ্ধাটা পা ঘষটে ঘষটে চলে গেল। ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মাথা নিচু করে স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল।

ওয়েসলি! না আর দেরি করবে না বেনটন। আগে ও ওয়েসলিকে সিধে করবে। তারপর নিজের সমস্যা নিয়ে পড়বে।

ও জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। দূরে বিগবেনে নটা বাজলো। স্ট্যান্ডে তখনো ভিড়। টিভোলি থেকে জনস্রোতের পায়ের শব্দ, আনন্দের হাসি শুনতে পেল। ট্রাফালগার স্কোয়ার পেরিয়ে ও সহসা একটি ফোয়ারার সামনে থমকে দাঁড়ালো।

ও ভাবতে শুরু করল কারখানার তিনজন পাহারাদার রাত এগারোটায় মিলিত হয়ে একসঙ্গে খেতে বসে। বেনটন একবার ধরে ফেলেছিল, সতর্কও করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তবু ওরা এই সময়েই মিলিত হয়। আধঘণ্টা রিসার্চ ল্যাবরেটরি খালি পড়ে থাকে। ওর কাছে এখনো চাবি আছে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

ফোয়ারার কালো জলে ওর ছায়া দেখে ফিরে এল অতীতের ব্লানশের স্মৃতি। সেদিন ওর বড় বড় নীল চোখের দিকে তাকিয়ে যে অনুভূতি হয়েছিল, আজ তা আবার ফিরে এল। সে দুর্লভ মুহূর্তের আর পুনরাবৃত্তি হবে না। বেনটনের সামনে এখন শুধুই ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি। সামনে তাকাবার তো কিছুই নেই। স্মৃতি আর প্রতিশোধ স্পৃহা।

তাড়াতাড়ি পালমলের দিকে হেঁটে চলল ও। চমকিত চোখে ওর ক্লাবের আলোকিত জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে, ভেতরে ঢুকে ও একটু মদ খেয়ে নিল। শেষবারের মত চারিদিকে তাকিয়ে ওর ভালই লাগল। কিন্তু দারোয়ানটার দিকে চোখ পড়তেই ও মিইয়ে গেল। দারোয়ানটা জানে কার কত টাকা আছে। ধূমপানের ঘরটায় ও উঁকি মেরে দেখল বড় বড় ইজিচেয়ার জোড়ায় জোড়ায় পাতা, নরম আলো, দুটো ফায়ারপ্লেসে কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে, বৃদ্ধ ওয়েটারটি ট্রে বোঝাই মদ নিয়ে সংযত পায়ে গোল হয়ে বসে থাকা সভ্যাদের দিকে চলেছে। ওর এই প্রিয় ছবিটা ও বুকে এঁকে নিল। মনে বিষাক্ত তীর বিঁধে গেল।

সপ্তাহখানেক আগে ঐ ঘরটাই ওর জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ওয়েসলি ওর সুখের জীবন কেড়ে নিয়েছে। বেনটনের চোখ জ্বরো রুগীর মত অস্থির হয়ে উঠলো। একটা ট্যাক্সি সওয়ারি নামিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল, বেনটন ট্যাক্সিটাকে হাত দেখাতে দেখাতে ছুটলো। প্রথমে ড্রাইভারটি নর্টহোলটে যেতে চায়নি কিন্তু বেনটন ওর হাতে একটা এক পাউন্ডের নোট গুঁজে দিল, তখন ও গজগজ করতে করতে রাজী হলো।

বেজওয়াটার রোড ধরে ট্যাক্সিটা ছুটলো। জানলা দিয়ে হালকা বাতাস বইছে, মুখ শুকনো। আরো মদ দরকার ওর। ট্যাক্সিটা যখন শেফার্ড বুশ আন্ডারগ্রাউন্ড পেরোচ্ছে, তখন ও ড্রাইভারকে সামনের শুঁড়িখানায় থামতে বললো।

নিজে লোভীর মত ডবল হুইস্কি নিল ও ড্রাইভারটিকে এক পাঁইট বিয়ার কিনে দিল। বয়স্ক বলিষ্ঠ দেহের ড্রাইভারটি অসন্তুষ্ট হয়েই বিয়ারটা খেলো। কোন কথাই বলল না ওরা, শুধু প্রথমত 'সুস্বাস্থ্য' বলল।

এখন দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। প্রচুর সময় আছে হাতে। বেনটন মদের দাম মিটিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল।

উডগ্রীন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন পেরোবার সময়ে ওর হঠাৎ মনে পড়ল ব্লানশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই পথেই ও গ্রীন ক্রিমেটোরিয়ামে এসেছিল। ও ছোট উপাসনা মন্দিরে ঢোকেনি। ওয়েসলি একাই ছিলেন। ও কিছুতেই ওয়েসলির সঙ্গে শোক ভাগ করতে পারেনি। বেনটন পাশের উৎসুক কৌতূহলী জনতার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মর্মান্তিক শোক বুকে চেপে ও সবার অলক্ষে সমাধিতে গিয়ে একগুচ্ছ ভায়োলেট ফুল রেখেছিল। সেই ভেজামাটির স্তূপের ওপর ভায়োলেটই একমাত্র ফুল দেখে ও সামান্য সুখবোধ করেছিল।

কারখানার সিকি মাইল দূরে ট্যাক্সি থামালো ও। অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল। চওড়া রাস্তাটায় ঘরফিরতি গাড়ির ভিড়। গাড়িগুলোর জোরালো আলো থেকে মুখ বাঁচাতে ও মাথা গুঁজে চলতে লাগলো।

কারখানার গেটে তালা ঝুলছে। ও ওটাই আশা করেছিল। রাস্তা দিয়ে আরেকটু এগিয়ে বেড়ার গায়ে একটা তক্তা আলগা আছে। সেখান দিয়ে ঢুকল বেনটন।

কারখানাটা অন্ধকার। কন্ট্রোলরুম এমনকি হ্যাঙারগুলোও রাতে বন্ধ থাকে। বেনটনের বিবর্ণ চোখ এখন বেজায় সতর্ক, হাতগুলো ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

সদর ফটকের তিন চারশো গজ দূরে প্রধান অফিসবাড়ির পেছনে ইঁট ও টালির তৈরী একতলা রিসার্চ ল্যাবরেটরিটা লুকোনো। ওখানে পৌঁছে হঠাৎ একটা জানলায় আলো জ্বলছে দেখে বেনটন

চমকে উঠলো। বেনটনের মনে পড়ল কত সযত্নে ও এই বাড়িটাকে গড়ে তুলেছিল। কর্তৃপক্ষ বহুবার সকরুণ প্রতিবাদ জানিয়েছে ল্যাবরেটরিটা যাতে অন্যভাবে গড়া যায়। কিন্তু বেনটন জোর করেছে, তর্ক করেছে, খোসামোদ করেছে। শেষ অবধি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ওর কথা মেনে নিয়েছে। এই ল্যাবরেটরিটার জন্যে ওর অনেক গর্ব ছিল।

আর আজ, ও সেই জায়গাতেই আগুন জ্বালাতে চলেছে। ওয়েসলি ওকে শেষ করেছে, এখন ওর পালা ওয়েসলিকে খতম করা। এই বাড়ির যেসব জটিল যন্ত্রপাতি আছে তাতেই ওয়েসলির সব টাকা লগ্নী করা আছে। বাইরে ছাউনিতে একটা পেট্রোলের ড্রাম আছে, ওটা টেনে আনবে বেনটন। তারপর একটা কাঠি ঠুকবে দেশলাইয়ের। জ্বলবে নরকের আগুন।

আলোকিত জানালার দিকে চেয়ে বেনটন ভাবলো তবে কি ওয়েসলি ওখানে আছে?

ছায়ায় লুকিয়ে বেনটন অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিট বাদে একটা লোক বেরিয়ে আসতে ওর খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখেই বুঝলো ও হচ্ছে প্রধান পাহারাদার। রাতের খানা খেতে যাচ্ছে।

ঘরে কেউ উঁকি দিলে ভুল করবে যে এ ঘরে শান্তি বিরাজ করছে। ওয়েসলি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ বাদে বাদে পাশের টেবিল থেকে একটা একটা করে কাগজ নিচ্ছিলেন। দেখছিলেন, পাশে পরিষ্কার অক্ষরে নোট করছিলেন। ওঁর উল্টোদিকে নীল আর সাদা উল মিলিয়ে জুলি একটা গোলমেলে প্যাটার্ন বুনছিল। দু-রঙা উলের বল কোলের ওপর নিয়ে দক্ষ হাতে দ্রুতগতিতে প্যাটার্নটা বুনছিল।

কাঁটার শব্দ আর কাগজের খসখসানি ছাড়া এ ঘরে অন্য কোন আওয়াজ নেই। জুলি বেরোতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে একলা আর বেরোয় নি। তাই ওর বোনাটা এ ঘরে এনে আগুনের পাশে বসেছিল।

সারাদিন নিঃসঙ্গ ভাবে কেটেছে ওর। এখন সঙ্গ চাইছিল ও। এমনকি ওয়েসলির নীরব সঙ্গও যেন বহুদিন পরে এই প্রথম ওর মনে বিচ্ছিন্ন একটুকরো শান্তি এনে দিয়েছে।

সহসা ওর প্রশান্তি ছিন্নভিন্ন করে টেলিফোনটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে বেজে উঠল। সেই ঘণ্টার তীক্ষ্ণ আওয়াজ নিভৃত ঘরটিতে বিপদের সঙ্কেত বয়ে আনলো যেন।

এমনকি ওয়েসলিও চমকে উঠলেন।

কাগজে নামিয়ে রেখে ওয়েসলি বললেন, মাঝে মাঝে মনে হয় টেলিফোনটা আবিষ্কার না হলেই ভাল হতো। জুলি ফোনটা ধরবে? বলে দাও আমি ব্যস্ত আছি।

জুলি বোনা থামিয়ে অসন্তুষ্ট মনে টেলিফোন ধরল। একটি পুরুষ কণ্ঠ ওয়েসলিকে চাইছে। পুরুষটি বলল, খবরটা খুব জরুরী আমি কারখানা থেকে ফোন করছি। গলাটা উত্তেজিত, চেঁচিয়ে কথা বলছে।

—কারখানার ফোন। ফোনটা ওয়েসলিকে এগিয়ে দিল।

জুলি শুনতে পেল ফোনের ওপারের লোকটি চেঁচাচ্ছে। ওর অস্পষ্ট কথাগুলোর মধ্যে 'আগুন' কথা জুলি বুঝতে পেরে ওয়েসলির দিকে তাকালো। ওয়েসলির মুখ পাংশুটে সাদা হয়ে গেল দেখে জুলি বুঝলো একটা বিপদ হয়েছে।

ওয়েসলি আড়ষ্ট হয়ে বললেন, আমি আসছি।

লোকটি চেঁচাতেই থাকলো।

ওয়েসলি সংহত ধীর কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওকে রাখ, যতক্ষণ না আমি আসি। আমি এক্ষুনি আসছি। রিসিভার নামিয়ে এক মুহূর্ত জুলির দিকে চেয়ে রইলেন। জুলি ভয় পেল।

—কি হয়েছে?

—বেনটন ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

—বেনটন! কিন্তু কেন?

—তাতে আর কি এসে যায় বলো? হাতের চেটো দিয়ে মাথার রগের দুপাশ চেপে ধরলেন।

কিছু না ভেবেই জুলি বলল, তুমি কি চাও যে আমি আসি?

অনেক চেষ্টায় ওয়েসলি নিজেকে সামলালেন।

—হ্যাঁ। যতক্ষণ না ক্ষতির পরিমাণটা দেখি, ততক্ষণ এই ভান আমাকে করে যেতে হবে। আমাকে নিয়ে যাবার কেউ না থাকলে বেখাপ্পা দেখাবে। তাছাড়া আগুনটা দেখে তোমার বেজায় আনন্দ হবে। আগুনের দৃশ্যটা সাংঘাতিক হওয়া উচিত।

ওর ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ গলা শুনে জুলির শরীর কেঁপে উঠল।

—এমন হয়েছে না কি?

—মনে হচ্ছে। চল কপালে থাকলে ট্যাক্সি পাবো।

পিকাডিলিতে ওরা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

সন্ধ্যার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সি এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। জানলার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওয়েসলি বলল, দেখেছ জুলি, কি আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটনাগুলো ঘটে যায়? আমি ভেবেছিলাম পাকা কাজ করেছি, কিছুতেই ভেস্তে যেতে পারে না আমার পরিকল্পনা। অবশ্য ল্যাবরেটরিটাই ছিল আমার চাবিকাঠি অথচ ওটার কথাই ভাবিনি। এখন মনে হয়না তোমার বন্ধু গ্লেবের কেসটা হবে।

—জুলি ওর সাদা মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখল।

—আমি বুঝলাম না।

—ল্যাবরেটরি যদি পুড়ে যায় তাহলে আমার কোন কাজ হবে না। তাহলে সব কিছুই শেষ হয়ে গেল।

—তুমি বলতে চাও তুমি আর সময় পাবে না?

—অথবা টাকা।

জুলি কুঁচকে সরে গেল।

—এর সঙ্গে টাকার যোগাযোগ কোথায়?

ল্যাবরেটরির জিনিষপত্র যোগাবার জন্যে আমি টাকা ধার করি। টাকা ধার পাবার জন্যে আমি বন্ড দিই। যদি ল্যাবরেটরি গিয়ে থাকে তবে বণ্ডও গেছে।

জুলির অসুস্থতা বোধ হলো।

—তার মানে তোমার টাকা আর থাকবে না? তাহলে আমার কি হবে? তুমি তো আমাকে টাকা লিখে দেবে বলেছিলে?

—জানি। আমি অনুতপ্ত, আমি তো জানতাম না এরকম ঘটনা ঘটবে। টাকা আমার কিছুই থাকবে না। আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে ল্যবরেটরি গড়া হয়। কিন্তু ফার আর গহনা মিলিয়ে তুমি অনেক দাম পাবে। সাবধানে চললে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জুলি রাগে অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে বলল, তুমি আমাকে ঠকিয়েছো। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে। আমি এত সব সহ্য করার পর! জাহান্নামে যাও তুমি। আমার আগে বোঝা উচিত ছিল এরকম হতে পারে। ঠিক আছে, এখন আমি পুলিশের কাছে যাবো। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

—আমি দুঃখিত জুলি। কথা দিলেও কোন কিছু পাওয়ার যোগ্য তুমি নও। সুযোগ পেলে কথা রাখতাম। বিশ্বাস করো।

—তোমার শুধু কথা! তোমার খালি বাকপটুত্ব। তুমি কথা বলে আমাকে রাজি করিয়েছিলে। তুমি আর তোমার মত বাজে প্রতিশ্রুতি। রাগের চোটে ওর চোখ ফেটে জল এল। ট্যাক্সির একপাশে চুপ করে বসে রইল।

—তুমি ফারগুলো পাবে। ওগুলো থেকে তোমার সুখ পাবার কথা কিন্তু কেন জানিনা তা তুমি পাবে না। কি করবে জুলি? তুমি গ্লেবকে ভালবাস না? গ্লেব জেল থেকে বেরোন অবধি অপেক্ষা করবে?

—হ্যাঁ। ও তোমার মত অপদার্থ নয়। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করবো। তুমি যখন ফাঁসিতে ঝুলবে, তখন আমাদের কথা ভাববে।

ট্যাক্সিটা হোয়াইট সিটি পেরিয়ে গেল। রেসের জন্যে ঝুলন্ত আলোয় ট্যাক্সির ভেতরটা মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠলো। আলোয় দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

—এতটা তিক্ত হয়ে যেওনা জুলি। তোমার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয়েছে আমার। তবে আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, তাই আশাভঙ্গকে মেনে নিতে শিখেছি। আরো সময় পেলে গোড়া থেকে শুরু করতাম, কিন্তু এখন তা অসম্ভব। ব্লানশকে খুন করাই ভুল হয়েছিল। দেখলে তাতে আমার কিছু ভাল হলো না।

জুলি হতাশায়, ক্ষোভে চুপ করে রইল।

ওয়েসলির হাতে এত সইল জুলি, এখন কিনা টাকা নেই?

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না বেনটন এরকম কাণ্ড করতে পারে।

—শুনলাম ও ভীষণরকম পুড়ে গেছে। ওয়েসলি হতাশ হয়ে বলল।

—চুপ কর! আশা ভঙ্গে অস্থির হয়ে পড়েছে জুলি। বলল, ঐ তুমি পার কথা বলতে আর ধাপ্পা দিতে। ও ঘুরে তাকিয়ে বলল, কি করে জানবো এত কিছুর পরও তুমি আমাকে ফারগুলো দেবে? কেমন করে জানবো তুমি আমায় ঠকাবে না?

—সকালে আমার ব্যাঙ্কে গেলে ওরা তোমায় একটা চিঠি দেবে। পুলিশের জন্যে স্বীকারোক্তিও আছে। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি।

—তুমি যাও। আমি আর তোমার হুকুম, ফরমাস শুনছি না। এখন সব বদলে গেছে।

—বেচারি জুলি। তোমার জন্যে আমি ভয়ানক দুঃখিত।

ওরা দূরের আকাশে একটা বিশাল লাল আভা দেখতে পেল। ট্যাক্সির গতি মন্থর হলো।

ওয়েসলি বললেন, ঐ যে। বলেছিলাম না দৃশ্যটা দেখার মত হবে।

জুলি দেখল ওয়েসলির হাত কাঁপছে, তবুও ওর করুণা হলো না। ও ফার আর গয়নাগুলো বেচবে। যে টাকা পাবে, হ্যারির যে জমানো টাকা আছে সব মিলিয়ে ওদের চলে যাবে।

ট্যাক্সি কারখানার কাছে আসতে ওরা আকাশে লাল আর তৈলাক্ত কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে দেখলো। রাস্তার দুধারে সারবাঁধা গাড়ি। একটা বিশাল জনতা আগুন দেখতে চলেছে। চারিদিকে কোলাহলে পরিপূর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, হাসি, পায়ের শব্দ।

একটি পুলিশ ট্যাক্সি থামালো।

ধীর কণ্ঠে বলল, যেতে পারবেন না। রাস্তায় জলের হোসপাইপ আছে।

ওয়েসলি বললেন, আমরা হাঁটবো। ওরা গাড়ি থেকে নামলেন।

ওয়েসলি গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো, এই মহিলা ফিরবেন।

ঘাসের ওপর দিয়ে জুলি পেছন পেছন চলল। ওয়েসলি ওর বাহু ধরে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। একজনের ধাক্কায় ওঁর কালো চশমাটা পড়ে গেল। জুলি পেছনেই ছিল। ওর পায়ের চাপে চশমাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। ও যেন তৃপ্তি পেল। এবার ওয়েসলি শেষ। ওর মনে হল, এই কাচ ভেঙে যাওয়ার মতো ওদের পারস্পরিক সম্পর্কও শেষ হয়ে গেল।

জুলি বলল, চশমা ভেঙে গেছে।

—আর কি এসে যায়? তুমি দেখতে পাচ্ছো না জুলি আমার কিছুতেই আর কিছু এসে যায়না?

ওরা কারখানার গেটে পৌঁছল। জল ছাড়বার হিস হিস শব্দ পেল ওরা। আগুনের গর্জন এখন কাছে। গেটের পুলিশদের সঙ্গে ওয়েসলি কথা বলে একটা কার্ড দেখালেন, ওরা ওঁকে গেট ছেড়ে দিল।

ওঁকে দেখতে পেয়ে গেরিজ ছুটে এল। ওর চোখে তৈলাক্ত ঝুলের কালো ছোপ, চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি।

—খুব খারাপ অবস্থা। ওয়েসলি ওর হাত চেপে ধরলেন।

গেরিজ একমুহূর্ত কথা বলতে পারল না। ঢোঁক গিলল। ওয়েসলির হাত ধরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলো।

তারপর ফেটে পড়ল, কিছু নেই। সাংঘাতিক ব্যাপার। ল্যাবরেটরি একটা জ্বলন্ত চুল্লী। ওরা ওটা বাঁচাতে পারবে না।

—আর বেনটন? ওয়েসলির নিচু, শান্ত গলা।

—খুব পুড়ে গেছে, তবে বেঁচে আছে।

গেরিজ ওয়েসলির দিকে তাকাল, কিন্তু আপনার চোখ স্যার? চোখ ঠিক হয়ে গেছে? আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আমাকে বেনটনের কাছে নিয়ে চলো।

—খুব ভাল কথা স্যার। গেরিজ যেন বিভ্রান্ত বোধ করছে। বলল, কখন হলো স্যার, সেই অপারেশনের পর?

—আমাকে বেনটনের কাছে নিয়ে চলো। ওয়েসলির রুক্ষ গলা।

গেরিজ আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

—উনি ওখানে স্যার। প্রধান অফিসের পাশের ছোট বাড়ির দিকে আঙুল দেখালো। বলল, আমাকে ফিরে যেতে হবে স্যার। আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগে ফাইল-পত্র সরাচ্ছি।

—ঠিক আছে, তুমি যাও। জুলি তুমি আমার সঙ্গে এসো।

অনেক হোসপাইপের লাইন পেরিয়ে গেল ওরা। বেনটন মেঝেতে শুয়ে আছে। মাথাটা ওভারকোটের ওপর, গায়ে কম্বল।

কাছেই একটা চেয়ারে একটা পুলিশ বসে আছে। ওয়েসলিকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—আমি হাওয়ার্ড ওয়েসলি। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—হ্যাঁ স্যার। ওঁর খুব খারাপ অবস্থা। অ্যাম্বুলেন্স এলেই ওঁকে নিয়ে যাবে।

ওয়েসলি বেনটনের অনড় শরীরটার দিকে এগোল। জুলিও গেল।

—হ্যালো হিউ! ওয়েসলি হাঁটু গেড়ে বসলো।

বেনটন বিবর্ণ চোখ দুটো খুলল।

ক্ষীণকণ্ঠে বলল, কে ওয়েসলি?

—হ্যাঁ; খুব বেশী পুড়ে গেছো?

বেনটন ভুরু কুঁচকে, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে অতিকষ্টে বলল, শুধু মনে হচ্ছে যদি একাজ না করতাম! তোমাকে জব্দ করতে চাইলাম। কিন্তু যেই আগুন ধরল তখন ভীষণ ভুল করে ফেলেছি ভেবে আগুন নেভাতে গেলাম। এতদিনের পরিশ্রম পুড়ে শেষ হয়ে যাবে! কিন্তু আগুনের সঙ্গে পারলাম না। মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। মরে গেলেই ভাল হতো। ও চোখ বন্ধ করলো।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমাদের যা করা উচিত তাই করি। সবচেয়ে খারাপ হলো অনুতাপ করা। আমিও অনুশোচনা করছি। আমি জানি তোমার মনের অবস্থা। যখন অন্যায়টা করি তখন আমাদের আত্মবিশ্বাস কোথায় থাকে? পরে বুঝি কি মূর্খতা করেছি।

—হ্যাঁ ঠিক তাই। আমি অনুতপ্ত। আমি সত্যিই অনুতপ্ত ওয়েসলি।

—আমরা এ জায়গা গড়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম, না? এতে কৃতিত্ব আমার যত, তোমারও তত।

বেনটন ওঁর সাদা, ক্লান্ত মুখের দিকে তাকাল।

—কখনো ভাবিনি তোমার মুখে একথা শুনবো। এ...তোমার মহৎ মনেরই পরিচয়। ওর রোগা শরীরটা কেঁপে উঠল, হাত মুঠো হলো, মনে হচ্ছে আমার পায়ে এখনও আগুন জ্বলছে।

—এই অ্যাম্বুলেন্স এখুনি আসবে। ওরা তোমায় ঠিক করে দেবে।

—যদি ব্লানশ মাঝখানে না থাকতো, তাহলে এঘটনা ঘটতো না। আমরা একসঙ্গে কাজ করে যেতাম। বেনটনের মুখে ক্লান্তি।

—হ্যাঁ...ব্লানশ! ওয়েসলি উঠে দাঁড়ালেন। ল্যাবরেটরিটা শেষবারের মতো দেখে আসি। ভাবলাম তোমাকে আগে দেখে যাই।

বেনটন ক্ষীণকণ্ঠে বলল, কি যেন হয়েছে তোমার। বুঝতে পারছিনা তোমার কি হয়েছে।...তোমার চোখ?

—ভেবনা ওসব কথা। কিছু ভেবনা। আচ্ছা হিউ! ওয়েসলি সামনে ঝুঁকে হাত বাড়ালেন,

চলি, তুমি সেরে উঠবে।

বেনটন ওর হাত চেপে ধরল।

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আমি মূর্খ...অনুতপ্ত।

—আচ্ছা, বিদায়! হাত টেনে নিলেন। দরজা পর্যন্ত গেলেন উনি, জুলি...!

জুলি ওঁর কাছে গেল।

—এস জুলি।

ল্যাবরেটরির এদিকের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ার ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। সেই ধোঁয়ায় প্রচণ্ড উত্তাপে ওরা দুজন এক মুহূর্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এ ওর দিকে চাইলেন।

ওয়েসলি বললেন, ফ্ল্যাটে যাও। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। কাল ডসনের সঙ্গে দেখা করে স্বীকারোক্তিটা দিও। ওর জোরে গ্লেব বেঁচে যাবে। ফারগুলো সাবধানে বিক্রী কোর, তোমার ভাল থাকাই উচিত। আশা করি তুমি সুখী হবে জুলি।

জুলি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে চাইল। আগুনের হা-হা-হা গর্জনে ওঁর গলা শুনতে কষ্ট হচ্ছে।

—কি করবে তুমি? জুলি জিজ্ঞেস করল।

—আমার কথা ভেবোনা। এই যে গেরিজ, তুমি মিস্ হল্যান্ডকে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দাও।

বলেই ওয়েসলি দ্রুত পায়ে সামনে যেতে থাকলেন।

—কোথায় যাচ্ছে ও? হঠাৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জুলি। ওকে থামাও। ওকে যেতে দিও না।

ও ওয়েসলির পেছনে ছুটতে থাকলো। কিন্তু গেরিজ ওকে টেনে, হিচড়ে থামালো।

—নিরাপদ নয়, ওদিকে যাবেন না। গেরিজ উত্তেজিত ভাবে বলল।

—আমায় যেতে দাও! চেঁচিয়ে হাত ছাড়িয়ে জুলি ছুটতে লাগলো।

প্রধান অফিস বাড়িগুলোর কোণ দিয়ে পেছনে চলে গেলেন ওয়েসলি। জুলি যখন কোণে পৌঁছল প্রচণ্ড আগুনের হলকা ওকে যেন চড় মারলো। ধোঁয়া আর ফুলকির বন্যা বাতাসে ভেসে ওকে ধরতে এল, জুলি পিছিয়ে গেল।

কাছাকাছি একটা বাড়ির পেছনে দমকলকর্মীরা জল ছুঁড়ে চলেছে। তাদেরই একজন ওয়েসলিকে জ্বলন্ত ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল। দুজন দমকলকর্মী ওঁর পেছনে ছুটল। ওরা বেশী দূর এগোতে পারলোনা। আগুনের গনগনে আঁচের হলকা লেগে তারা পিছিয়ে এল।

ওয়েসলির যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে মাথা উঁচু করে, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে থাকলেন। দূর থেকে জুলি মুখে হাত ঢাকা দিয়ে দেখতে থাকল। ওঁর পোষাকে ধোঁয়া। হঠাৎ হাতের কবজি আর গোড়ালি জড়িয়ে পাক দিয়ে উঠতে লাগল আগুনের লেলিহান শিখা। জুলি মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো।

গেরিজ অগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে একবার মাত্র ওয়েসলিকে দেখতে পেল। একটা বিশাল, ভয়াল শব্দের বিস্ফোরণ। কাঠ আর ধাতুর জ্বলন্ত ধস ওয়েসলিকে অদৃশ্য করে ফেলল। উনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সে জায়গাটা লেহন করে একটা লম্বা লকলকে আগুনের জিভ আনন্দে আকাশপানে লাফিয়ে উঠলো।

ওয়েসলির চিঠি এখন জুলির হাতে। তাতে ফারগুলো নেবার নির্দেশ দেওয়া আছে। পুলিশের কাছে ওয়েসলির স্বীকারোক্তিও ওরই হাতে। এখন জুলি জানে ও কি করবে। পরদিন হ্যারির মামলা শুরু হবার কথা, অতএব একেবারে শেষমুহূর্তে উদ্ধার পাবে হ্যারি। ঠিক যেমনটি দেখা যায় সিনেমায়।

ওর মনে হল হ্যারি কোনদিন ভুলবে না যে আমিই ওকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু জুলি অত বোকা নয়। হ্যাবিকে উদ্ধারের আগে ও ফারগুলো চায়। তারপর ডসনের সঙ্গে দেখা করবে। প্রথম কাজ হল ফারগুলো হস্তগত করা। আর্কটিক ফারটা যদি পরে নিতে পারে, তাহলে ওর আত্মবিশ্বাস

বেড়ে যাবে। আর ডসনকেও চমকে দেওয়া যাবে।

একবার ওয়েসলির স্বীকারোক্তিটা পড়লে ডসন ওকে হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে দেবে। ও হ্যারির জন্যে অপেক্ষা করবে একথা ও হ্যারিকে জানাবে। একথা জানবে যে, মুক্তির দিন জুলি জেলগেটে অপেক্ষা করবে, তবে হ্যারি বুকে ভরসা নিয়ে হাজতবাসের দিনগুলো কাটাতে পারবে। ভাবতে গিয়ে জুলি একটু কেঁদেও ফেলল। ও যেন মানসচোখে দেখতে পেল হ্যারি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জেলের বিশাল ফটক থেকে বেরোচ্ছে, শীতে কাঁপছে, বরফ পড়ছে, হ্যাঁ...বরফ পড়তেই হবে। বরফ হ্যারির ওভারকোটে পড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। জুলিও সারা গায়ে ফার জড়িয়ে একটা বিশাল বড় গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। কোমল-মমতায় হ্যারিকে বুকে টেনে নেবে ও।

ওয়েসলির মৃত্যু জুলিকে নতুন জীবন দিয়ে গেল। ওঁকে আগুনে পুড়ে মরতে দেখে প্রথম ঘণ্টাখানেক ওর খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু এখন ওয়েসলি ওর মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। এখন ও মনকে বোঝাল, উনি তো ওকে পছন্দও করতেন না। শুধু নিজের স্বার্থে জুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কোন করুণাই পায়নি জুলি ওঁর কাছ থেকে।

অবশ্য ওর হাতে টাকা থাকবে। মিসেস ফ্রেঞ্চের কথা মনে আছে ওর। বলেছিলেন ফারগুলোর দাম ত্রিশহাজার পাউন্ড। এ তো আইরিশ ডার্বি জেতার মতো টাকা। ত্রিশ হাজার পাউন্ড পেলে দুনিয়া তোমার হাতের মুঠোয়। তারপর গয়না তো আছেই। হীরের দাম এখন খুবই চড়া। জুলি ঠিক করেছে, গয়নার কথা হ্যারিকে কিছু বলবে না। গয়না ও ব্যাঙ্কে রেখে দেবে, অসময়ের কথা ভেবে। আর হ্যারিও যে ওর জীবনের শেষদিন অবধি টিকে যাবে, সে ভরসাও জুলির নেই। মেয়েদের নিজের কথা ভাবা উচিত। জুলি নিজেকে বোঝাল।

ওয়েসলির স্বীকারোক্তিতে হ্যারির নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে গেছে। ওয়েসলি লিখেছেন কেমন করে উনি ব্লানশকে বাড়ি ফিরে আসতে প্ররোচিত করলেন। উনি ট্যাক্সিতে টোপ ফেললেন। ওয়েসলি ব্লানশকে এমন ইঙ্গিত করলেন যে ওরা থিয়েটারে বেরোলেই বেনটন জুলির সঙ্গে দেখা করে প্রেম করবে। টোপটা ব্লানশ গেলে। ও জানতো বেনটনের প্রতি ব্লানশ্‌-এর দুর্বলতা।

আর সেটাই ব্লানশকে খেপিয়ে তুলল। ও থিয়েটারে মদ গিলেই ওয়েসলির সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে ফিরে এসে গ্যারেজের গেট দিয়ে বাড়ি ঢোকে। ব্লানশ সদর খুলতেই ওয়েসলি ওকে লিফট থেকে গুলি করেন, পিস্তলটা হলঘরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। পিস্তলটা যোগাড় করেছিলেন একজন আমেরিকান সৈনিকের কাছ থেকে। লোকটির নাম এবং সার্ভিস নম্বর উনি লিখে দিয়ে গেছেন। দু বছর আগে ওটা উনি কেনেন। উনি জানেন ওটার খোঁজ করতে কোন অসুবিধা হবে না। পরিকল্পনার পিছনে বিপদ থাকলেও সফল হওয়া যায়।

পিকাডিলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে জুলি স্বীকারোক্তিটা বুকে জড়িয়ে ধরলো। এটা এখন হ্যারির জীয়নকাঠি। তার চেয়েও বড় কথা ওর ভবিষ্যত সুখের চাবিকাঠি। এটা খোয়া গেলে হ্যারিকে বাঁচানো যাবে না। ও স্বীকারোক্তিটা আঁকড়ে ধরে একবার ভাবল ট্যাক্সি নিয়ে কেনসিংটন পুলিশ স্টেশনে যাওয়াই বোধহয় ঠিক কাজ হবে। কিন্তু পার্কওয়ের আর্কটিক ফারটা তো ওকে পড়তেই হবে। ওটা পড়লে জুলিকে চিত্রতারকার মতো দেখাবে আর ডসনকেও খুব চমক দেওয়া যাবে। জুলি ট্যাক্সির জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

পার্কলেন দিয়ে লাইট্‌স্‌ ব্রিজে যেতে যেতে ও কল্পনার প্রাসাদ গড়তে লাগল। ফারগুলোর দাম ত্রিশহাজার হলেও বিশ হাজার পেলেও পেতে পারে। কিন্তু বিশ হাজারই বা কম কি? বিশ হাজার দিয়ে ও, হ্যারি যদি লন্ডনেই থাকতে রাজী হয় তবে ও জেল থেকে বেরোবার সময় একটা ফ্ল্যাট সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে বেশ ভাল হয়। ও ভাবতে লাগল শোবার ঘরের রঙ কি হবে? আসবাব কি কি থাকবে? ভাবতে ভাবতে ইতিমধ্যে পার্কওয়ে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি।

দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ওর একটু অস্বস্তি হলো। তবে তার দরকার হলো না। দারোয়ান দুপুরের খাবার খেতে গেছে, সহকারী তখনও আসেনি।

ওয়েসলির ফ্ল্যাটের সদর দরজা খুলে ও যখন ঢুকলো, তখন কেউ ওকে দেখতে পায়নি। এক মিনিট দাঁড়িয়ে ও কান পেতে রইল। এখানে একলা আসাতে ওর একটা অশরীরি অনুভূতি

হচ্ছে। কার্পেটে সেই হালকা বাদামি দাগ, বাতাসে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে ব্রানশের গায়ের সুগন্ধি।

ব্রানশের ঘরে ঢুকে জুলি দরজা বন্ধ করে অ্যালর্ম বন্ধ করল। তারপর আলমারী খুলল। ফটো ইলেকট্রিক সেলের বাতিগুলো নেভালো। একমিনিট মন ভরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ফারগুলো দেখলো। এখন ওগুলো ওর। ওর যা ইচ্ছে করতে পারে এগুলো নিয়ে। এটা জুলির চূড়ান্ত আনন্দের মুহূর্ত। কিন্তু ও গয়নার কথা ভোলেনি। এখন অবধি ও ব্রানশের সব গয়না দেখেনি। গয়না থেকে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। অনেক টাকা।

গয়নার কথা মনে পড়তেই ও ফারগুলো সরিয়ে আলমারীতে ঢুকলো। গয়নার আলমারীর ওপর ওর ব্যাগটা রাখলো। হঠাৎ খেয়াল হলো গয়নার আলমারী কি করে খোলে তা তো ওর জানা হয়নি। গয়নার আলমারী পালিশ করা দরজায় কোন চাবি ঢোকাবার ফুটো নেই কিন্তু দরজার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট কালো বোতাম ওর চোখে পড়ল। ও সেটা ছুঁলো, ভুরু কোঁচকালো, আঙুলে চেপে ধরল বোতামটা, টান দিলো।

হঠাৎ বাতাস বেরিয়ে যাবার শব্দ হলো। হু...ই...স। আলমারীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চারদিন বাদে ওর খোঁজ পেল পুলিশ। ডসনের হঠাৎ মনে হয়, হয়তো জিনিষের লোভে গিয়ে জুলি আলমারিতে আটকা পড়েছে। ওরা যখন দরজা খুলল, দেখলো যে আর্কটিক ফারের ওপর জুলির এত লোভ ছিল তারই নিচে, ওয়েসলির স্বীকারোক্তি হাতে চেপে ধরে পড়ে আছে জুলি।

ওর জন্যে কিছু করা গেল না বটে, কিন্তু হ্যারির কপাল জুলির চেয়ে ভালো ছিল। সেই কপালজোরেই ও মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে আঠারো মাসের কারাদণ্ড ভোগ করল। আশ্চর্য এই যে, ও যখন জেল থেকে বেরোল জুলির সেই কল্পনার ছবির মতো বরফ পড়ছে। কিন্তু কোন সু-সজ্জিতা তরুণী ওকে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।

শুধু স্যালভেশন আর্মির একটি কর্মী হ্যারির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর নাকের কাছে চাঁদার বাক্স তুলে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজিয়ে চাঁদা চাইল।

স্ট্রিক্টলি ফর ক্যাশ

তখন বাজে রাত সাড়ে নটা। ক্রমাগত চার ঘণ্টা দৌড়ে আমাদের গাড়িটা পেলোট্রাতে এসে থামল। জায়গাটা পরিষ্কার ছিমছাম আর পাঁচটা শহরের মতো। স্যাম উইলিয়াম পরিশ্রান্ত, ও দম নিচ্ছিল গাড়ি চালাতে চালাতে। স্যাম উইলিয়াম বললো, ওই যে ওসান হোটেল পেলোট্রাতে এসে থামল। কংক্রীট মোড়া, বৃত্তাকার হোটেল চোখে পড়ল গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে। থুথু ফেললো স্যাম, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। মুছে নিলো হাতের ও পিঠে লাল মাংসল মুখটা। পয়সার ব্যাপার অনেক। মুষ্টিযুদ্ধের ব্যাপারও আছে শনিবারের সন্ধ্যেগুলোতে। ওই পেটেন্সি তারও মুরুব্বি। স্যাম সদর রাস্তা থেকে গাড়িটা ঘোরালো ডাইনে। মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে চললো গাড়ি। এর দু-পাশে কাঠের বাড়ি। চোখে পড়ছে সামনে সমুদ্র।

চাঁদের আলোয় রূপোলী সাজে মোড়া। সমুদ্রের মুখোমুখি ডেরাটা ওই কোণে, টম্ রোশের। স্যাম গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। আমার দেরী হয়ে গেছে তাই নইলে নামা যেত তোমার সঙ্গে। আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি টমকে বলো। ও না করলে ওর গিন্নীকে বোলো। তোমার ব্যবস্থা করে দেবে ও-ই মিয়ামি যাবার। আলো-আঁধার জায়গাটা। গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের ধার দিয়ে।

ঘরগুলি সাজানো সারি সারি ভাবে। একদিকে সুদৃশ্য কাউন্টার। দুটো নোংরা চেহারার লোক বসে আছে টেবিলে। পরনে আধময়লা প্যান্ট ও ছেঁড়া গেঞ্জী। আরোও দুজন বসে আছে কাউন্টারের টেবিলে। প্রথমজন লম্বা চওড়া, গলায় লাল হলদে টাই ও ট্রপিক্যাল স্যুট পরে আছে। সামনের বেঁটে লোকটার পরনে তামাটে-রঙা স্যুট। শূন্যদৃষ্টি মেলে বসেছিলো বেঁটে লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো ট্রাক চালক বসে। কাউন্টারে আব একটি লোকও বসে। একটা ফ্যাকাশে রোগা চেহারার মেয়েকে চোখে পড়লো কাউন্টারের পেছনে।

বোধহয় অ্যালিশ রোশ। একটা ট্রেতে মেয়েটা সাজাচ্ছিল দুকাপ কফি। টম রোশকেও দেখলাম অন্যদিকে মাথাটা দুলিয়ে কি যেন সাফ করছে। ছোট্ট কালো মানুষ কালো চুল। আমাকে কেউ দেখেনি তখনও তাই দেখতে লাগলাম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত। লম্বা লোকটা যেখানে দোসর নিয়ে বসে, অ্যালিস কাউন্টার থেকে বেরিয়ে সেদিকে চলল ট্রে হাতে। লম্বা লোকটা মেয়েটার হাঁটুর নীচে তার হাতটা চালিয়ে দিলো। আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা।

লোকটার মুখে ফুটে উঠলো একটা কুৎসিত হাসি। মনে হলো এবার চেঁচাবে হয়তো মেয়েটা বা কষিয়ে দেবে ওর গালে একটি চড়। কিন্তু না, দাঁড়িয়ে রইলো সে তেমনি ভাবে। রোশের দিকে তাকালো একবার পিছন ফিরে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই তার, ভীষণ কাজে ব্যস্ত টম। মেয়েটার মুখ দেখে মনে হলো হৈ-হল্লা করার মতো যথেষ্ট শক্তিও নেই তার।

কারণ ব্যাপারটা সামাল দেওয়া টম রোশের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো আমার শরীরে। ঢুকে গিয়ে একটা ঝাড় দেওয়া যায় লোকটাকে। কিন্তু নিজেকে নিরস্ত করলাম টমের পৌরুষে আঘাত করা হবে ভেবে। কোন পরপুরুষ তার অর্ধাঙ্গিনীর কুল রক্ষে করুক তার উপস্থিতিতে তা কোন মানুষই চায় না আমি তা জানি।

একবার লোকটার হাতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো অ্যালিস নীচু হয়ে কিন্তু পারলো না। ফিসফিসিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে কি যেন বললো, গুরুর কাঁধে হাত দিয়ে তার বেঁটে দোসর। টম রোশের দিকে তার চোখ।

একটা বিরাশি সিক্কার গুঁতো দিলো খোলা লোকটা মুক্ত হাতের কনুই দিয়ে, বেঁটে লোকটা ককিয়ে উঠলো যন্ত্রণায়। লম্বা হাতটা এবার আস্তে আস্তে হাঁটুর ওপরে উঠলো এবার ওর নাকের ওপর একটা ঘুঁষি মারলো মেয়েটা সর্বশক্তি দিয়ে। টম ফিরলো এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে।

তার পায়ে অর্ডারি জুতো অল্প খোঁড়া হওয়ায়; অ্যালিসকে ঠেলে দিলো লম্বা লোকটা। সে

পড়লো গিয়ে ট্রাকচালকটার গায়ের ওপর, টেবিলে পৌঁছলো রোশ। চেয়ার ছেড়ে উঠলো না কিন্তু লোকটা, সেই ক্লেদাক্ত, হাসি তার মুখে, রোশ ঘুষি তুললো লোকটার মাথা লক্ষ্য করে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ঘুষি। রোশ সামলে নিলো নিজেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে। সেই ফাঁকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলো লোকটা তার পেটে। রোশ ছিটকে পড়লো ঘরের এক কোণে। তখন সে হাঁফাচ্ছে। এবার আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো লম্বা লোকটা, ফিরলো সে বেঁটে লোকটার দিকে, কেটে পড়া যাক চলো,—ঘেন্না ধরে গেছে, এ শালার জায়গায়। এক পা এগিয়ে করুণার দৃষ্টিতে রোশের দিকে তাকাল সে, 'শালা মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো, আবার যদি কোনোদিন হাত ওঠে তোমার।

একটা পা তুললো লোকটা রোশের মুখ লক্ষ্য করে। পারলাম না আর থাকতে, দ্রুতপায়ে ঢুকে রোশের কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম ওকে ঠেলে। ওর মুখে সর্বশক্তি দিয়ে একটা ঘুষি মারলাম, লোকটা আমার দিকে ফিরতেই। শব্দ হলো যেন গুলি ছিটকে বেরোনোর, বাইশ বোরের বন্দুক থকে।

লোকটা ক্ষেপে যাওয়ার ফলে তার সমস্ত শরীর দুলে উঠল ঘুষিটা চালানোর জন্য। মাঠে মারা গেল ঘুষিটা আনাড়ি ভাবে। বিপদ হতো আমার ঘুষিটা জমাতে পারলে। ছিটকে পড়লো মেঝেয় কাটা পাঁঠার মতো। দরদরিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো চোয়াল ফেটে। অপেক্ষা করলাম না ওর উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত, উঠতেও পারবে না আমি জানতাম। একবার পড়লে আর উঠতে পারে না এ ধরনের মানুষগুলি। এখান থেকে হঠাও, নইলে—ফিরে তাকালাম বেঁটে লোকটার দিকে। গুরুর ওপর নিবদ্ধ বেঁটের চোখ। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে।

আমি তাকে টেনে তুললাম রোশের দিকে এগিয়ে। মনে হোল রোশ লড়ে যেতে চায় দম না থাকলেও। সে লোকটার দিকে এগোতে লাগল এক পা দু-পা করে। টেনে ধরলাম তাকে, আর হাত লাগাতে হবে না-ও শালার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। টমের গা জড়িয়ে বললো অ্যালিস ছুটে এসে। লম্বার দিকে সরে এলাম, বেঁটে তখন ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে টেনে তোলার।

'বের করে নাও ওকে এখান থেকে, হাত লাগাও তোমরাও একটু —আমি বললাম গেঞ্জীধারী ও ট্রাকচালকদের উদ্দেশ্যে। চোখ তুলে তাকালো এবার বেঁটে লোকটা, তার চোখে জল। জখম করে দিলে তুমি-ওর মুখটা—লড়তে হবে ওকে শনিবার—, দুমড়ে দিতাম ওর গলাটা—নাও জলদি বের করো ওকে। এক পা এগোলাম, পালটে ফেলতে পারি আমার মত।

এবার ট্রাকচালকটা আমাকে মাপলো আপাদ মস্তক, তারপর বলে উঠলো বেশ উত্তেজিত গলায়, জানো? ঝাড় কাকে দিলে জো ম্যাকক্রেডী—ও এক নম্বর মুস্টিযোদ্ধা এখানকার। শনিবার ও লড়ছে মিয়ামির 'ছোকরা'র সঙ্গে, লড়াইতে বাজিও ধরা আছে অনেক টাকার। গলাটা নামিয়ে দিলো খাদে। শীগগির কেটে পড়ো। পেটেল্লির কানে গেলে কেচ্ছা হবে ম্যাকের এই অবস্থার কথা শুনলে। জোরালোই হলো সে রাতে খাওয়াটা। চেয়ারে গা এলিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম সিগারেটের প্যাকেটটা।

ভালো লাগছে অ্যালিস আর টমকে। মনে হচ্ছে ওদের, আমার মনের মতো মানুষ। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিয়েছি আমরা পরস্পরকে। ওদের কথা শুনেছি খেতে খেতে, মুখ খোলার পালা এবার আমার। তোমাদের জানার কৌতূহল হতে পারে, এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্য। আস্তানা ছিলো আমার পিটসবার্গেই, ধরালাম সিগারেটটা। বাবার একটা কাফে ছিলো ওখানকার কারনেলি ইস্পাত কারখানার উল্টো দিকে। মনে হওয়া উচিৎ, কি বলো, টাকা তো খোলামকুচি! লম্বা টান দিলাম সিগারেটে। কিন্তু জিজ্ঞেস করো না, তা হয়নি। নিজেই জানি না কারণটা আমি। বুড়ো তো টেঁসে গেলো দেনা রেখে, আর আমি ফকিরুদ্দিন আমেদ রাস্তায়। হেসে উঠলাম নিজের রসিকতায়। ভাবলাম একবার ঘুরে দেখা যাক ফ্লোরিডার বাজারটা। ঠকিনি মনে হচ্ছে। 'তা' আছেটা কি ফ্লোরিডার? চোয়াল বোলালো রোশ হাত দিয়ে। যাওনি তো কখনো পিটসবার্গে হাসলাম, ধোঁয়াশা আর আওয়াজ, ময়লা, ঝুল তাকাও যেদিকে। এখানেই তো কাটলো আমার জীবনটা। তোমার কথাই ঠিক হয়তো। বড় বিরক্তকর লাগে রোদ্দুরটা এক-একসময়।

গত তিন সপ্তাহ ধরে আমার জীবনের মধুরতম দিনগুলি কাটল ফ্লোরিডার রাস্তায় রাস্তায়।

জায়গাটা কিন্তু দারুণ, তাই একটু থামলাম। স্যামকে চেনো? ও-ই তো পাঠালো আমাকে তোমার কাছে। অন্য মনে জবাব দিলো রোশ—হ্যাঁ বহুদিন থেকেই! ও তো বলল, মিয়ামি পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে তুমি। 'করবো। মিয়ামি যাতায়াত করে জন বেটস্ তো। আমার কাছেই থাকে ওর চিঠিপত্র। ব্যবস্থা করে দেবো তোমার—বেট্‌স্ আসবে কাল সকালেই। তাহলে যাবে ঠিক করলে মিয়ামি? রোশ থামলো। হ্যাঁ।

বিয়ার ছাড়ো তো আর একটু। অ্যালিস, তেষ্টায় ছট্‌ফট্ করছে—দেখছো না দোস্ত। উঠে গেলো অ্যালিস। রোশ একটু উঠে বসল, ও রান্নাঘরে অদৃশ্য হতেই। কাউকে এমন 'হুক' মারতে দেখিনি ডেম্পসি ছাড়া। লাইন খুব সুবিধেব নয়।—আমার শরীরে ঘুরলো রোশের চোখ দুটো।

মনে হচ্ছে তুমি লড়াইয়ের লাইনে ছিলে? ছিলাম। কিন্তু বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি ওসব। কিন্তু কার সঙ্গে লড়েছো? চমক সৃষ্টি করতে পাবে তোমার চেহারা আর ওই হুক।

যুদ্ধের সময় জো-লুইয়ের সঙ্গে লড়েছি প্রদর্শনী লড়াইগুলোর কয়েকটাতে। আহা জো খুব বলেছিলো গোল হয়ে ভালো ছিল। বলেছিলো সুন্দর আমার ডান হাতের কাজ। 'হুঁ' আর এক লিনস্কির বদলি সেদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে ফেলে দিয়েছিলাম। রোশের চোখ দুটো জ্যাক ওয়াইনার এর দিকে। সেদিনটা এক পবমসুখের দিন আমার জীবনের। বিস্তৃত হলো রোশের মুখের ফাঁকটা, 'জ্যাক ওয়াইনার মানে ক্যালিফোর্নিযার এক নম্বর! হ্যাঁ, বলছি তো তার কথা—পিষে দিলাম পায়ে সিগারেট ফেলে। ভেঙ্গে দিয়েছিলাম জ্যাকের চোয়াল। হেসে উঠলাম। বড বেশি বিশ্বাস ছিলো ব্যাটার নিজের ওপর। 'যাব বাবা! তা কেন ভাই ছাড়লে? ব্যাপার তো বেড়ে। ঠিক রাখতে মুখেব ভূগোল, তাছাড়া বাধাও ছিলো অন্য ধরনেব। রোশ মাথা নাডলো, দোস্ত অপচয় করছো প্রতিভার। তুমি তাহলে বধ করে থাকো যদি ওয়াইনারকে। আর আমাকে কেটে পড়তে বলে গেল ওয়াইনার—ট্রাকচালকটা। বললো পেটেল্লির নাকি কিছু বলাব থাকতে পারে ম্যাকক্রেডীর ব্যাপারে। রোশকে থামিয়ে দিলাম। ভাববাব কিছু নেই, পেটেল্লির জন্য। হয়তো এতক্ষণে সাবডে দিয়েছে ওকে সলি ব্র্যান্টি। তাছাড়া পেটেল্লিতো মদত দিতেই ব্যস্ত তাব মিযামির বাচ্চাটাকে। অবশ্য তোমার বিপদ ছিলো ওই ছোঁডাটার গায়ে হাত তুললে। পেটেল্লির মাথা ব্যথা নেই ম্যাকক্রেডীর জন্য।

বেঁটে লোকটা কি সেই—সলি ব্র্যান্ট এই যে নাম বললে তুমি। যাকে দেখলাম ম্যাকক্রেডীর সঙ্গে। 'হ্যাঁ ও-ই বেচারা ম্যাকক্রেডীব 'মালিক', এখন মাথা চাপড়াচ্ছে। একটা ভাম ম্যাকটা। কিন্তু ব্রান্ট তো ভালো লোক। হাতে দুটো বিয়ারের পাঁইট নিয়ে অ্যালিস ফিরলো। রোশ দম্পতির অনুবোধে ঠিক করলাম রাতটা ওদেব কাফেতে কাটাবো। চোখে ঘুম নেই গত তিনটে সপ্তাহ।

অন্ততঃ ঘুমোতে পারবো ভালো কবে আজকেব রাতটা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম, আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তাব পর। অ্যালিস পৌঁছে দিলো আমাকে দোতলার একটা ছোট্ট ঘরে। ঘরটা থেকে সৈকত চোখে পড়ে পরিষ্কাব। আপনার কিছু দরকার হয় যদি—কিস্যু লাগবে না, থামিয়ে দিলাম অ্যালিসকে। খাসা দেখছি তো বিছানাটা। বাথরুম আছে ওইদিকে যদি স্নান করতে চান তো। মিষ্টি হেসে অ্যালিস বলল। ও দেখালো হাত বাড়িয়ে। করতে হবে হ্যাঁ। অনেক করেছেন—অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। তার জন্য আমরাও কৃতজ্ঞ, আপনি যা করেছেন। হয়তো মেরেই বসতো টমকে জংলীটা। উদ্বিগ্ন মুখে অ্যালিস বললো, আর দেখলেনই তো টমের স্বাস্থ্য।

তবু হিম্মত আছে টমের বলতে হবে, আপনার গর্ব বোধ করা উচিৎ ওর জন্য।

'করিই তো—', অ্যালিস, নরম হাতটা আস্তে রাখলো আমার কাঁধে। আনন্দের ঝিলিক ওর চোখ দুটোতে। জানেন খুব খারাপ গেছে ওর সময়টা। লড়াই করেছে বাঁচার। কিন্তু দুর্ব্যবহার কোনদিন করেনি আমার সঙ্গে। চরম দুঃসময়েও না। আপনি এসে না পড়তেন—যদি ; মিসেস রোশ—আরে ওসব ভুলে যান। শুধু বলে যাই একটা কথা ওই সময়। যাবার আগে, তুলনা নেই আপনার। ঠিক আছে তো সব? ঘরে উঁকি দিলো রোশ।

রোশ এক পা এগোল ঘরের মধ্যে। নিশ্চয়ই—টম পাল্টালো পায়ের ভর, নাকটা ঘষে নিলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। আমার দিকে তাকালো চোখে চিন্তার ছায়া নিয়ে।

টম কি ভাবছো? ওকে মুক্তি দিতে চাইলাম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে। তোমাকে একটা প্রস্তাব

দেবো ভাবছিলাম। অবশ্য এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে অ্যালিসের সঙ্গে। আচ্ছা, আপত্তি আছে কি কাজ করতে আমাদের সঙ্গে? মোটামুটি ভালোই আমাদের ব্যবসা। বাড়ানো যেতো আরও তুমি থাকলে। রোশ একটু থামলো—তাই বলে তুমি বড়লোক বনে যাবে রাতারাতি একথা বলছি না, আমি কিন্তু চাকরি নিতে বলছি না তোমাকে—তবে আগ্রহ থাকলে। একভাগ তোমাব লাভের তিন ভাগের মধ্যে, হাসলো রোশ। দোস্ত ভালোই হবে অ্যালিসও বলছিলো তাই।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে রইলাম। আরে পাগলা হয়ে গেছো তুমি, আমাকে জানো না চেনো না—অংশীদার বানিয়ে দিচ্ছো চোয়াল থেতলেছি বলে কোন শালার।

কেন—বলছি রোশ বিছানায় বসলো, 'এখানে আমদানী হয় অনেক আজে বাজে লোকের। তাদের মোকাবিলা করা আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সেজন্যই তোমাকে আসতে বলছি। অনেক অস্বস্তি থেকে তুমি আমাদের বাঁচাতে পারবে। তুমি নিজের হিম্মতেই নেবে তোমার বোজগারের প্রতিটি পয়সা, লজ্জা নেই এতে। না। নেই লজ্জা।

চাইলাম না আমি। বললাম, তাহলে দ্যাখো রোশ। প্রস্তাবেব জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ মনে কবছি নিজেকে। কিন্তু সম্ভব নয় এটা। ভুল বুঝো না আমাকে। শুধু অনেক টাকার স্বপ্ন দেখে এসেছি আমি সারাজীবন। কাজেই সন্তুষ্ট হতে পাববো না অল্প টাকায়। ওর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম প্যাকেট থেকে বেব করে। ধরালাম নিজেও। জানো কেন হয়েছে এটা? অভাবে রেখেছে বাবা আমাকে ছোটবেলা থেকে, শুধু খাবাব জুটেছে দু'বেলা দু-মুঠো। আমাকে বোজগার করতে হয়েছে। আর বাকি সবকিছুর জন্যই। মানুষের ফরমাস খেটেছি, দোকানে কাজ কবেছি খবরের কাগজ বেচেছি।

বুড়ো তো তারপব টেঁসে গেলো। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলাম একটা লম্বা টান দিয়ে, ভাবলাম কিছু পাব দোকানটা বেচে দিয়ে—কিন্তু সব চলে গেলো দেনা মেটাতে। চল্লিশটি ডলার আছে আমাব হাতে এই মুহূর্তে, বলে গেলাম একটু চুপ করে থেকে। পরে আছি যে জামা-প্যান্ট আব টাকা মিলিটারী পেনসনের। দেখিয়ে দিলাম নিজের শরীরটা, আমাকে যেতেই হবে মিয়ামি—আমার চাই যে অনেক টাকা।

রোশ টেনে চলেছে সিগারেট নির্বিকার মুখে বসে। সে নড়েচড়ে বসলো বেশ কিছু পরে, তা মিয়ামি কেন সেজন্য? অনেক টাকা অন্য কোন বড় শহরে বা নিউ-ইয়র্ক এও আছে।

—শুনেছি জায়গাটা নাকি ভূস্বর্গ, মিয়ামি দেখেছে এমন একজনের কাছে। সেখানে ঘরে ঘরে নাকি কোটিপতি, তারা ছুটি কাটাতে আসে. আর খোলামকুচির মতো—হাসলাম।

বোশ কিন্তু তেমনি গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সেই টাকার খোঁজে আমি চলেছি—শুনেছি সেখানে নাকি দারুণ লাভজনক, সমুদ্রেব ধারে মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজটা। আরও বলেছিলো ওই লোকটা, সে একজনের কথা জানে যে নাকি এক হাজার ডলার পেয়েছিলো একবার এক চিত্রাভিনেতার জান বাঁচিয়ে। উপরি একটা চাকরিও হলিউডে পেয়েছিলো। সে ব্যাটা গাড়ি চালাতো—আমি যার কথা বলছি তাকে পাঁচ হাজার দিয়ে গিয়েছিলো—তার কর্তা মরার আগে। পাঁচ হাজার মাত্র তিন বছরে।

বোঝো হাওয়ায় উড়ছে টাকা, রোশ চুলকে নিলা হাঁটুটা হাত নামিয়ে, ফিরলো আমার দিকে—চিন্তার আভাস তার চোখে, সবই তো বলেছে দেখছে আমার দোস্ত, কিন্তু আমার কাছে বলেনি এমন অনেক খবব। বাজে লোকেরও বাস অনেক মিয়ামিতে। পথে পথে ছিনতাইবাজ, পতিতা, জুয়াড়ী। হাওয়ায় ভর করে কোটিপতিদের টাকা ওদের পকেটেই সেঁদোবে তোমার পকেটে ঢোকবার আগে।

মুহূর্তের জন্যও আর নজরছাড়া করবে না, তোমার মতো এক কাপড়ের মানুষ দেখলে। রোশ বললো জানি, শোন, আমি গিয়েছি মিয়ামি। আমি ট্রাক চালাতাম, আমার পা জখম হবার আগে।

মাথা থেকে বের করে দাও মিয়ামির ব্যাপারটা, শোনো দোস্ত আমার কথা। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন, থাকবে মোটা ভাত-কাপড়ে। চলে যাও এখান থেকে। ভালোই লাগে চিন্তা করতে মোটা মালের কথা। কিন্তু সঙ্গে মনে রাখা দরকার বিপদের কথা। উঠে দাঁড়াল রোশ, ভাবো মাথা ঠাণ্ডা

করে,—টাকা পাবার রাস্তা, বক্সিং লড়ে নেওয়া। জানি না হিম্মত কেমন সেখানে তোমার, তবে, যদি নমুনা হয় আজকের ঘুষির ব্যাপারটা।

তাহলে—ওকে থামিয়ে দিলাম, বলেইছি তো, ছেড়ে দিয়েছি আমি লড়াই—কোনো মানে হয় না কানা হয়ে বেঁচে থাকার।

ইতি ঘটে গেছে ও অধ্যায়ের, জায়গা ভালো না মিয়ামি তুমি বলছো। একবার বুঝতে হয় ব্যাপারটা নিজে গিয়ে। গোলমাল থাকতে পারে আমার মাথায়। কিন্তু হবেই আমাকে যেতে—হাত রাখলাম রোশের কাঁধে, টম দুঃখিত আমি, স্থির করে ফেলেছি মন, অকৃতজ্ঞ ভেবো না আমাকে। ঠিক আছে। রোশ একটা ভঙ্গী করলো তার সরু কাঁধের। চলে যাও যদি তাই মনে করো, ঘুরে ফিরে দ্যাখো।

এখানে ফিরে এসো সুবিধে না হলে। আমার দরজা খোলা থাকবে তোমার জন্য। অন্য কাউকে কাজে নিচ্ছি না মাস তিনেকের মধ্যে। শুধু মালিক তোমার আমি আর অ্যালিস, লাভের এক তৃতীয়াংশ, দ্যাখো ভেবে—রোশ, ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করল। ভাবনা তো শেষ আমার। টম থেকো না আমার অপেক্ষায়, বললাম, নিয়ে নাও তুমি লোক, ফিরবো না আমি।

একটা সিগারেট ধরিয়েছি প্রাতরাশ শেষ করে। এমন সময় মুখ বাড়ালো রোশ দরজার ফাঁকে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সলি ব্র্যান্ট, কি বলবো? একটু ইতস্তত করলাম, তুমি বলো। দেখা করবো, নাকি করবো না? সরিয়ে দিলাম খাবারের প্লেট। দাও—ভিরিয়ে। ঢুকলো ব্র্যান্ট। পেছনে সরিয়ে দিলো টুপিটা চেয়ার টেনে বসে। লোকটা ঘুমায়নি যেন কতকাল। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললাম ও মুখ খোলার আগেই। কিন্তু লড়িয়ে নয় তো তোমার ছোকরাটি—পেয়েছে ওর পাওনা। লাভ নেই কাঁদুনি গেয়ে আমার কাছে।—দরকার কিছু নেই আমার। জানি যন্ত্রণা হয়েছে ও শালা ভামকে নিয়ে। ব্র্যান্ট চুলকালো মুখটা হাত দিয়ে। শালা রাতারাতি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার বয়সটা। আমার দিকে ব্র্যান্ট তার মোটা আঙুল বাড়িয়ে দিলো। তা, দাদা কোথায় পেয়েছো ঘুষির ট্রেনিংটা?

অন্য কোথাও হাতটা দাবাতাম এতো ঠুনকো জানলে ও শালার চোয়ালটা। শক্তই ওর চোয়াল—অনেক শালাই তো ওর চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে বছরের পর বছর ; করে আসছে তো হজমও। কিন্তু আমি জন্মে দেখিনি ওই মার।

যাক গে, ও শালাকে ফুটিয়ে দিতাম যদি অন্য কাউকে পেতাম মিয়ামির ছোকরাটার মোকাবিলা করার জন্য। ব্র্যান্ট থেমে গেলো বিমর্ষ মুখে। বাজি অনেক টাকার লাগিয়েছিলাম সাড়ে সাত—এবার ও আমার চোখে, আমি? না-না সোজা তাকালো, আচ্ছা তুমি বলেছিলে কার সঙ্গে লড়েছিলে? তাতে কিছু আসে যায় না, আমি কার সঙ্গে লড়েছি। লড়তে পারছি না তোমার জন্য জেনে রাখো এটুকু। অনেকদ্দিন হাতে দস্তানা গলাইনি, আমি বোধহয় রিংয়ে আর ফিরছি না।

আদেখলার মতো আমার শরীরে ঘুরলো, ব্র্যান্টের ক্ষুদে বাদামী চোখ দুটো, অরিজিনাল 'হুক' আর এই চেহারা—ছেড়েছো কদিন দাদা। 'বহুৎ দিন। ইচ্ছেও নেই আর হয়। ভাইটি এক মিনিট, সত্যি যাক, এই ব্যাপারেই যদি তোমার শুভাগমন ঘটে থাকে। তুমি নাকি ওয়াইনারকে দ্বিতীয় রাউন্ডে শুইয়ে দিয়েছিলে?

রোশের কাছে শুনলাম। কি উপকারটা হচ্ছে শুনি তাতে তোমার? তাহলে চলেছো মিয়ামি, ব্র্যান্ট প্রসঙ্গ পাল্টালো। শোনো দোস্ত বলে সে উঠে দাঁড়ালো। করবেটা কি মিয়ামি গিয়ে এই হেটো পোষাকে। ট্রপিক্যাল স্যুট চড়িয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়াই ভালো, তাই না?

যদি যেতেই হয়, দশ মিনিটে আউট হয়ে যাবে। উঠলাম আমি—মাথাব্যথা সেটা আমার। 'জানি'—ব্র্যান্ট ভেতরে উঁকি দিলো টুপিটা খুলে। ওর মধ্যে যেন কিছু হারিয়েছে।

'জানিনা, তোমার ঝুলিতে যদি অন্য কিছু থাকে। ওই ঘুষি ছাড়া। তোমার খারাপ দাঁড়াবে না ব্যাপারটা? আচ্ছা ঘটনাটা বোঝা যাক—একবার এসো না ব্যায়ামাগারে। পড়ে গেলাম চিন্তায়। রোশ, বেট্‌স্ মিয়ামি পাড়ি দেবে আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। হয় এখানে পড়ে থাকতে হবে আরও চারটে দিন, আর না হয় কেটে পড়তে হয় ওর সঙ্গে।

পকেটে রেস্ত নিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ে বেরোতে মন্দ লাগবে না। কিন্তু এক অচেনা অজানা হেভীওয়েট মুষ্টিকের সঙ্গে লড়তে হবে, ওই দুটো বস্তু পাবার আগে। কাজও ভালো ডানহাতের

ক্ষিপ্রতা আছে মোটামুটি। কিন্তু ভাবতে হবে না সেসব তোমাকে। তোমায় হারাতে হবে না ওকে, শুধু চালিয়ে যাওয়া কয়েক রাউন্ড। ওর ওপরেই লাগানো আছে বাজির সমস্ত টাকাটাই।

তবে সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে ব্র্যান্ট হাসলো, একটা সিগারেট ধরিয়ে। সে চোখের ভঙ্গী করলো একটা কথা অসমাপ্ত রেখে। না বললাম—কথা হওয়াই ভালো একরকম। আরে, বুঝলে না কথার কথা। বেরিয়ে পড়ি চল না, যেতে যেতে কথা হবে। ব্যায়ামাগার পৌঁছলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। লড়াইয়ের স্টেডিয়ামটা একটা ঘিঞ্জি জায়গায়, রাস্তার শেষে পেলোট্টার সদর। একটা ঘরও আছে সাজ বদলের—ছড়ানো নোংরা মাদুর, পাঞ্চিং ব্যাগ। দুটো রিং, বড় ঘর একটা। সাধারণই ব্যবস্থা। চোখে পড়লো না আশেপাশে কাউকে। এখুনি এসে পড়বে 'ম্যাকক্রেডীর অনুশীলন জুটি—ওয়ালার। লোকটার শরীর লোহার মতো।

দস্তানা আর লড়াইয়ের পোষাক বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ওয়ালার ঢুকলো সেগুলো পরতে পরতেই। নিগ্রো বিরাট চেহারার। আমাকে মাপলো ফোলা ফোলা রক্তাক্ত চোখে। ব্র্যান্টের উদ্দেশ্যে সাজ ঘরে ঢুকে পড়লে মাথাটা একটু হেলিয়ে। আরে শরীরে দেখছি একেবারে চর্বিটর্বি নেই একেবারে ভালো জমবে। জমবে, কথাটা ছুঁড়েদিলাম রিংয়ে ঢুকতে ঢুকতে। আবার সিগারেটটাও ছাড়তাম, এই কম্ম করতে হবে জানলে। লড়াই দেখব একটা শোনো হেনরি—যাচাই করা দরকার জনির এলেমটা। কিছু নেই মারামারি করার। হুঁশিয়ারী দিলো ব্র্যান্ট। একটা বিচিত্র শব্দ বের করলো ওয়ালার উত্তরে নাক দিয়ে। আমার দিকে ঘুরলো ব্র্যান্ট, এবার তুমিও শুনলে ফারার নাও ; শুরু করো—ব্র্যান্ট বেল বাজিয়ে দিলো। ওয়ালার এগিয়ে এলো নীচের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে। তাকে একটা অতিকায় কাঁকড়া মনে হচ্ছে। দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে রিংয়ে পাক খেতে শুরু করলাম। ওয়ালার দুটো ঘুষিও ছুঁড়লো। একটা হুকও ডান হাতের। সরে গেলাম বাঁ হাতের একটা মার দিয়ে। আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার ঘুষির ওজন নিয়ে। মাথা ঘামাচ্ছি সময়ের ব্যাপারটা নিয়েই।

কিন্তু পারছি না মারতে। ওয়ালার মোক্ষম মার দিলো একটা এক ফাঁকে মাথার এক পাশে। শরীর টলছে, কোনোরকমে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ওই অবস্থায় বাঁ হাত চালিয়ে দিলাম, •ওয়ালার আর এক পা এগোতে।

তুমি মনে হচ্ছে রিংয়ের মুখ দেখনি অনেকদিন, সময়মত পাঞ্চগুলো হচ্ছে না। দোস্ত আরো হুঁশিয়ার হতে হবে পরের রাউন্ডে। চেষ্টা করো একটু তফাতে থাকতে। দিলাম না জবাব। আমি জানি কি করবো, ধ্বসাতে হবে ওকে এই রাউন্ডে নইলে টিকতে পারবো না বোধহয় তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত। ওয়ালার কিন্তু বসলোও না বিরতির সময়টুকু। পাক খেয়ে চললো রিংয়ে। উঠে দাঁড়ালো ব্র্যান্ট, ঠিক আছে সব? চলো জনি,—এগোতে লাগলাম উঠে আসতে। আবার তেড়ে এলে ওয়ালার, সরে দাঁড়ালাম বাঁ-হাতের একটা জোরালো জমাবার মুহূর্তে। তারপর ওর পেটে ঘুঁষি জমালাম গোটা তিনেক।

ককিয়ে উঠলো কৃষাঙ্গ ওয়ালার—ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে তার সারা শরীরটা। সে আমার দেহের ওপর পড়ল অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে, দুজনে জড়িয়ে গেলাম। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম ওকে কিন্তু সুবিধা হলো না। সরে যেতে বলে আমাদের ব্র্যান্ট চেঁচিয়ে উঠলো। আর একটা আপারকাট বসালাম সেইমুহূর্তেই। গর্জন করে সরে গেলো ওয়ালার। কিছুক্ষণ ঘুষোঘুষি চললো দুজনের। অনেকটা ধাতস্থ আমি এখন।

এবার বাঁ হাতে হুক চালালাম সুযোগ বুঝে, ওয়ালারের বাঁ হাতটা নেমে গেলো, সেটা ওর মুখ আড়াল করে রেখেছিলো। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখন ওর মুখটা। আমার ডান হাত উঠলো। এবার দাঁতকপাটি লেগে গেলো ওয়ালারের। কিছুতেই আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়া থামছে না। ভারী হয়ে আসছে নিশ্বাসও, মুছলামও বার দুয়েক। তবে নিশ্চিন্ত বোধ করছি খানিকটা। উঠতে পারবে না চট করে নিগ্রোটা।

রিংয়ে ঢুকলো ব্র্যান্ট লাফিয়ে, আকণ্ঠ হাসি ঠোঁটে। দুজনে ধরাধরি করে ওয়ালারকে নিয়ে গেলাম রিংয়ের একটা কোণে। পরিচর্যা শুরু করতেই দরজার দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। মনে হচ্ছে ছোকরাটি বেশ চালু—কোত্থেকে জোটাল ব্র্যান্ট ওকে?

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ব্র্যান্ট, তার হাত চলছে না। তাকালাম ফিরে। তিনটে লোক দাঁড়িয়ে রিংয়ের বাইরে দরজার কাছে। কখন নিঃশব্দ পায়ে ঢুকেছে। চওড়া কাঁধের লোকটা কথা বললো, তাকে বেঁটেই বলা যায়। কোনদিন আপোষ করেনি এ লোক মুখ দেখে বোঝা যায়, আর কোনদিন করবে না। চকচক করছে তীক্ষ্ণ স্থির চোখ দুটো।

সবুজ লিনেনের পোষাক পরনে পেনসিলের মতো সরু গোঁফটা তার, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে জলপাই রঙ গায়ের চামড়ায়। মনে হলো ওর চামচে মস্তান মার্কা সঙ্গের দুজন।

আমার ভালো লাগলো না ওদের কাউকেই।

বললাম তো আপনাকে এর কথাই, চোয়াল ফাটিয়েছে ম্যাকক্রেডীর—ব্র্যান্ট কপালটা মুছলো রুমাল বের করে। 'তা শুনেছি তো, তা একেই কি লড়াবে ঠিক করেছো মিয়ামির ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে? মানে হ্যাঁ—আপনার কাছে যাচ্ছিলাম তো ওই ব্যাপারেই কথা বলতে মিঃ পেটেল্লি—একটু দেখে নিচ্ছিলাম ওর হাতটা।

'ভালোই তো মনে হোল তোমার কাজকম্ম—কাজ দেওয়া যাবে কিছু লড়াইয়ের—। পেটেল্লি থেমে একটু প্রশ্ন করলো, সই করেছো নাকি ব্র্যান্টের হয়ে? করিনি করবো না কারুর হয়ে। একদিনের জন্যেই লড়াইতো। চলে এসে ব্র্যান্টের সঙ্গে, বলা যাবে কথা।

রোশের কাফের সামনে পৌঁছতেই রাস্তার ধুলো উড়িয়ে মিয়ামির রাস্তায় উঠে যেতে দেখলাম বেটসের ট্রাকটাকে। দাঁড়িয়ে রইলাম মনে একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে—মিয়ামি পাড়ি দেবার কথা ছিল আমার ওই ট্রাকেই। ঢুকলাম কাফের ঝোলানো দরজা ঠেলে। কাজে ব্যস্ত রোশ। বলে উঠলো আমাকে দেখে, তাহলে পাল্টেছে তোমার মত? বেটস তো চলে গেলো এতক্ষণ অপেক্ষা করে। এতক্ষণ কি করছিলে? ফেঁসে গেছি টম আর বোলো না, ওকে বললাম ব্র্যান্টের কথা। একটা গাড়ি আর পাঁচশো নগদ, মোটামুটি চলে যাবে। কি বলো? তবে, থেকে যেতে হচ্ছে আরও চারটে দিন। মুক্তবিহঙ্গ তারপর—'হেসে উঠলাম। রোশকে পেটেল্লির কথাও বললাম।

'কিন্তু জনি উড়িয়ে দিও না ওর ব্যাপারটা। লোকটার কিঞ্চিৎ দুর্নাম আছে বাজারে।—' 'শুনেছি, ওর ছায়া মাড়াতে চাইছি না সেজন্যেই তো। তার সময়তো দিতে হচ্ছে রিংয়ে কিছুটা। লড়াইটা হয়ে গেলেই শনিবার পর্যন্ত।' 'জনি আমাদের সঙ্গে থেকে যাও—তোমার ভালোই লাগবে, আমাদেরও।'

বললাম না কিছু। খারাপ তো লাগছে না ওদের সঙ্গ। সলি ব্র্যান্ট ঢুকলো কিছু পরেই। সে বসে পড়লো একটা কোণের টেবিল বেছে। হাঁফাচ্ছে, কি করে এলাম সব। তুমি শুধু এই লড়াইটাতে নামছো বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো এটা পেটেল্লিকে বোঝাতে।

ব্র্যান্ট ঝাঁপী হাতে সিগারেট ধরালো। তবে ফারার তুমি ভুল করছো আমার মনে হয়। আখের গোছাতে পারতে পেটেল্লির মাথায় হাত বুলিয়ে। দরকার নেই—ওকে বুঝিয়েছি আমিও তাই, আর কিছু নেই যদি শেষ পর্যন্ত রাজিও করিয়েছি তবে, এখনো সময় আছে তোমার হাতে, যদি? টদির ব্যাপার। অস্বস্তি বোধ করছে ব্র্যান্ট। বসলো একটু নড়ে। 'একটু আছে—' 'কিরকম?' প্রশ্ন রাখলাম অধৈর্য গলায়। 'তাহলে দ্যাখো, যদি শেষ লড়াই হয়। এটা তোমার—পেটেল্লি উৎসাহিত হবে তোমার ব্যাপারে আশা কর না এটা নিশ্চয়?'

'বলছিও না হতে—যত কম মোলাকাত হয় ততই মঙ্গল ওর সঙ্গে আমার—' কিন্তু পেটেল্লি তো মেলা টাকা লাগিয়ে বসে আছে মিয়ামির ওই ছোকরার ওপরে। কাজেই জেতাতে হবে ওটাকে—' 'ঠিক আছে, যদি লড়ে জিততে পারে তো জিতবে—' ব্যাপার নয় যদির—' 'ও জিতবে ব্র্যান্ট ফিরিয়ে দিলো আমার কথা—। আর পেট্রিল্লির নির্দেশ এটাই, 'তাহলে ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছো আমাকে তাড়াবার—' 'তা একরকম তাই। পেটেল্লি বহৎ টাকা লাগিয়ে বসে আছে ছোঁড়াটার ওপর।

তোমাকে মাটি নিতে হবে তেসরা রাউন্ডেই—ব্র্যান্ট সাহেব দ্যাখো, ও বিদ্যেটা আমার জানা নেই তোমাকে তো বলেছি—আর, ওটা তো হবেই না এই লড়াইয়ে। ব্র্যান্ট মুখ মুছে ফেললো দ্রুতহাতে ময়লা রুমালটা বের করে 'দোস্ত শোনো—পেয়ে যাচ্ছো গাড়ি আর নগদ টাকা শনিবারের ব্যাপারটার পর। ঘোলা কোরো না জল।' ব্র্যান্ট শোনো, আমিও বলছি, যদি তোমাদের ওই ছোকরা

আমাকে ফেলতে না পারে কবজির জোরে, তাহলে মরতে হবে ওকে—কোনো গ্যাঁড়াকলে নেই আমি।'

করছি না মস্করা। দু'বছর আগে ফ্যাসাদে পড়েছিলো এক ছোঁড়া ওর কথা না শোনার জন্য—ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ওর হাত দুটো লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে। বুঝতেই পারছো তাহলে—'পেলে তো আমাকে—'পাবে। চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ব। আর এক ছোঁড়াও ভেবেছিলো পারেনি কিন্তু। ধরা পড়লো ছমাস পরে—ফাটলো মাথার খুলি, ছেলেটার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে—'

'ভয়টয় দেখিওনা আমাকে, আমি আছি যদি লড়াই লড়াইয়ের মতো হয়, কেটে পড়ছি নয়তো—' 'ফারার ভেবে দেখো, করো পেট্রেল্লি যা বলছে। এখানকার যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করো আমার কথা বিশ্বাস না হয়, মাজাকি চলবে না পেট্রিল্লির সঙ্গে রোশও জানে—ওর যে কথা সেই কাজ—'

'বোধ হয় তা চলবে না আমার সঙ্গে—' উঠে দাঁড়ালাম 'এটাই শেষ লড়াই আমার—আর শেষ হবে তা আমার ইচ্ছে মতোই, একথা তুমি জানিয়ে দিতে পারো পেটিল্লি সাহেবকে—'এখন ওটা তোমার ব্যাপার, তুমি বলো বলতে হয়—' ব্রান্ট কথা গুলি এক নিশ্বাসে ছেড়ে দিলো। 'না, দাদা—তুমি বলবে, তুমিই হোতা—এ ব্যাপারের। রিংয়ে যাচ্ছি আমি—'

ওরা ঢুকলো এ রকম একটা ভাব নিয়ে যেন জায়গাটা ওদের পৈত্রিক দখল। ওয়ালার ওদের দেখে কাঁধ মেরে গেলো। আমারও শরীর বেয়ে এক শীতল শিহরণ নামলো কেন জানি না ওদের দর্শনে।

চলো গলিয়ে নাও জামাটা ওস্তাদ—তোমার খবর গুরু নেবে—'পেপি মেলে দিলো বুড়ো আঙুল আমার দিকে। বললাম গলাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে 'ব্যস্ত আছি—, তাকে এখানেই আসতে হবে গুরুর দরকার থাকলে—' শুনলাম নিশ্বাস রুদ্ধ হতে ওয়ালারের—সন্দিহান হয়ে পড়েছে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে, মনে হোলো ওর দৃষ্টিতে।

ও—পেপি খেঁখিয়ে উঠলো, 'জলদি গলিয়ে নাও জামাটা—' পেপি কিছু খাটো আমার চেয়ে, আমার কোনো ইচ্ছে নেই ওর গায়ে হাত তোলার কিন্তু মনে হোলো হাত লাগাতে হবে না পাল্টালে ওর কথাবার্তার ধরনধারন, 'তোমরা দুজনেই, এখান থেকে বেরোও বলছি, না হলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

'তাহলে দ্যাখো সেই চেষ্টা করেই—অটোমেটিক বেরোলো বেনোর পকেট থেকে, 'শুনছো আমাদের কথা আমাদের সঙ্গে চলো জামা গলিয়ে', যদি খেতে না চাও গুলি' ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম, বেনোর চোখ দুটো অঙ্গার। ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না বুঝলাম। তুমি চেনো না ওদের—'ঠিক বলেছো ওয়ালার চাঁদ—মৃদু হাসি ফুটলো পেপির ঠোঁটে, তুমি তো চেনো আমাদের, বেনো তো ফেঁসে আছে গুলি মারার কেসে ও বছরেই তিনটে—না বাড়ালেই ভালো সংখ্যাটা—'প্রকাণ্ড ক্যাডিলাক গাড়িটা চোখে পড়লো জামা প্যান্ট পরে ওদের সঙ্গে রাস্তায় নামতেই। অটেমেটিক ধরা বেনোর হাতে। দাঁড়িয়ে ছিলো পুলিসের একটা সিপাই কিছু দূরে, সিপাইটা অদৃশ্য হয়ে গেলো দ্রুতপায়ে রাস্তার মোড়ে বেনোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই। হাড়ে হাড়ে এবার ব্যাপারটা বুঝলাম।

পরিষ্কার হলো তাও কার খপ্পরে পড়েছি। বসলাম পেপির পাশে দরজা খুলে। পেছনে উঠলো বেনো। মিনিট খানেকও লাগলো না ওসান হোটেলে পৌঁছতে। একটা লিফটের সামনে এলাম গাড়ি থেকে নেমে। তিনজনেই ওপরে উঠে গেলাম। কথা নেই কারো মুখে, শুধু তাক করা আমার দিকে বেনোর নলটা। আমরা হেঁটে চললাম একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে। আমিও এবং ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো একটা দরজার সামনে।

খোঁদাই করা 'প্রাইভেট' কথাটা দরজার ওপরে। দরজা ঠেলে দিলো পেপি টোকা দিয়ে। একটি মেয়ে অফিস ঘরে টাইপ করে চলেছে। চিবোচ্ছে চিউয়িং গাম। চকিতে উদাস চাহনিতে মেয়েটা তাকালো চোখ তুলে। যাও চলে, ইশারা করলো মাথা হেলিয়ে ভিতরের দিকে, অপেক্ষা করছেন উনি—' ও পেপির উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বললো।.পেপি ঘরে উঁকি দিলো ভেতরের দরজায় টোকা

দিয়ে। ঢুকে পড়ো—পরে আমাকে ইশারা করলো এক পাশে সরে গিয়ে। একটু সামলে কথাবার্তা!

ঢুকলাম। সিনেমার স্টুডিয়োর বাইরে আমি কখনও দেখিনি এরকম সাজানো। হালকা সবুজ রঙা কার্পেটে মোড়া সারা মেঝে। অগণিত হেলান দেওয়া চেয়ার সার সার। আয়না বসানো চারদিকের দেওয়ালে, চোখে পড়ে নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিপদক্ষেপেই। পেটেল্লি বসে কনুইয়ের ভর দিয়ে টেবিলের ওপর, আমার দিকে চোখ।

বললো হাত তুলে টেবিলের গজ খানেকের মধ্যে পৌঁছতে, 'শোনো খোকা একটু মন দিয়ে যা বলছি—'পেটেল্লির গলা ঠাণ্ডা কর্কশ, 'ভাল লড়িয়ে তুমি, পারতাম কাজ করাতে তোমাকে দিয়ে। কিন্তু তুমি চাইছো লড়াই ছেড়ে দিতে।

শুনলাম ব্র্যান্টের কাছে সত্যি কি কথাটা? 'হু'—। ভালই লড়ে মিয়ামির এই ছোঁড়াটা তবে ও শিশু তোমার ওই ঘুষির কাছে। যদি আমি না পাই তোমাকে, তাহলে আমাকে ওকেই ধরতে হবে।

ছোকরা এই প্রথম লড়ছে পেলোট্রাতে জেতাতে হবে ওকে—'পেটেল্লি ছাই ঝাড়লো সিগারের, 'লাগিয়েছি দশ হাজার—চলবে না গুবলেট হলে। সেইজন্যেই ব্র্যান্টকে বলেছি ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে তোমাকে, খেলা শেষ হবে তৃতীয় রাউন্ডে—বসে যেতে হবে তোমাকে, মানে হারতে হবে। শুনলাম তোমার নাকি মনঃপূত হয়নি ব্যবস্থাটা। যাক, তোমার মাথাব্যথা ওটা। কিছুই করার নেই আমার তোমার একটাই সুযোগ ছিলো আমার সঙ্গে হাত মেলাবার, কিন্তু তুমি হারিয়েছো সেটা—' পেটেল্লি একটু নড়ে বসলো,

'তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছো একথা যে এই এলাকা আমার। পেলোট্রার সব চলে আমার কথাতেই।

লোকের খবর নেওয়া যাদের কাজ, এমন কিছু লোকও আছে আমার।

তারা খবর নেবে তোমারও, এখন থেকে নজর রাখা হবে তোমার ওপর যদি ভুল রাস্তায় হাঁটো—। চেষ্টা কোরো না নড়বার শহর ছেড়ে আর লড়বে মিয়ামির ছোঁড়াটার সঙ্গে শনিবার।

তবে ওই দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্তই বেশ জমিয়ে। তারপর ওকে ছেড়ে দেবে আমার নির্দেশ এটা—'পেটেল্লি ভঙ্গি করল আড়মোড়া ভাঙ্গার, শেষ করে দেওয়া হবে তোমাকে, এদিক ওদিক হলে—

বুঝলেন তো কেন? বান্ধবহীন, বড় নিঃসঙ্গ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝেছি। পা বাড়ালাম লিফটের দিকে। বেনোকে দেখলাম রাস্তায় নামতেই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। এগোলাম ব্যায়ামাগারের দিকে, বেনো ছায়ার মতো পেছন পেছন চলেছে। সেদিনই না শুধু, পেপি বা বেনো আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চললো পরের চারটে দিনই, চোখের আড়াল করেনি মুহূর্তের জন্যেও। ভেবেছিলাম মিয়ামি চলে যাব চুপি চুপি শহর থেকে পালিয়ে। কিন্তু হোলো না তো আর—চামচে দুটো আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগেই রইলো।

রোশ একপলক তাকিয়ে বুঝলো আমার চোখে, বলতে গিয়েও বললো না কিছু একটা. রইলো চুপ করে। ব্র্যান্টকে বলি নি আমার সঙ্গে পেট্রেল্লির মোলাকাতের কথাটা, কিন্তু জেনেছে ও, কারণ সে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে আমাকে।

শুরু করে দিলো প্রহার।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত শনিবার দিনটি এলো।

আমার অন্তর ছুঁতে পারছে না রাস্তার জনতার উল্লাস। দেখলাম স্যাম উইলিয়ামস আর টম রোশকে। কোনোরকমে একটা দুর্বল হাসি ফোটাতে পারলাম আমার ঠোঁটে, ওদের উষ্ণ অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে। পেট্রেল্লি সিগার টেনে চলেছে নির্বিকার মুখে কাঁটা ঘরের একটা কোণে। পেছনে দাঁড়িয়ে পেপি।

কঠিন রেখার সাক্ষর মুখে। দেখলাম জনতার অভিবাদন নিচ্ছে দাঁত বার করে মোটা চেহারার একটা লোককে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরার ম্যানেজার লোকটা। ঢুকে পড়লাম সাজ ঘরে। জনতার আর এক দফা উল্লাস কানে এলো পোষাক পাল্টানোর ফাঁকে ফাঁকে। সম্ভবত ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা এবারে লক্ষ্য।

দেখলাম বস্তুটিকে উঁকি দিয়ে। তরুণটি বেশ বড় চেহারার। দৃষ্টি নামিয়ে আনলাম ওর হাতের ওপর—মনে হোলো কবজিতে হিস্মত আছে, সামান্য ভারী কোমরটা। আমি বেরোতে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো অবজ্ঞার একটা মৃদু হাসি দিয়ে।

পালা শেষ হলো ওজন নেওয়ার। আমার চার পাউন্ড ওজন বেশি ছেলেটার চেয়ে। আমার ইঞ্চি তিনেক বেশি ঘুষির নাগালও। 'কি আছে—ওইগুলো পড়েও তত তাড়াতাড়ি যত বেশি দামড়া হয়। ছোকরা তার ম্যানেজারকে শুনিয়ে দিলো কথাগুলো উঁচু গলায়। জনতার সকলে শুনলো।

ধুস। সে হেসে উঠলো হ্যা হ্যা করে। কথা বলো হাত ছেড়ে।। ওর দিকে তাকালাম কঠিন চোখে। হলো কাজ। ছোকরা নামিয়ে নিলো হাত। নেবে এলো নিস্তব্ধতা। আবার গুঞ্জন উঠলো আমি ফিরে চলতেই। আমার পিছনে দৌড়ে এলো ব্র্যান্ট।

'আরে জনি—কান দিওনা ওর কথায়, আলফাল বকে ও শালা—' 'তাই নাকি এর দাওয়াই জানি আমি। তা—বুঝলাম কি বলতে চাইছে ব্র্যান্ট। সে এই আশংকা করছিলো বাড়বে মারের পরিমাণটা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছোঁড়াটা।

মিথ্যে নয় কথাটা বাগে পেলে একবার—যাই হোক ব্র্যান্ট টাকার প্রথম কিস্তি নিয়ে এলো বিকেলেই। নিয়ে এলাম এ-গুলো, ব্র্যান্ট বলে গেলো অন্যদিকে তাকিয়ে।

খুলে দিলো বাক্সের ডালাটা ভেতরে আছে একটা সাদা সবুজ টাই, একটা তিনরঙা শার্ট রয়েছে রয়েছে সাদা লিনেনের স্যুট। এক কোণে এক জোড়া বাকস্কিনের জুতোও। ফারার তোমাকে এগুলো দারুণ মানাবে। ঠিক হয় কিনা পরে দেখো তো—

'ওগুলো থাক যেমন আছে, কেটে পড় তুমি—'

এগোলো এক পা ব্র্যান্ট। আরে, তোমার কি হোলো কি? তুমি তো চেয়েছিলে এই রকমই—' সে আমার নাকের সামনে স্যুটটা মেলে ধরলো।

'কেটে পড়, আমাকে উঠতে হবে আবার না হলে—'

চেষ্টা করলাম নিজেকে বোঝাবার—করার তো কিছু নেই আমার, আমি তো পান করেছি বিষ জেনে শুনেই—লড়াই ছেড়েছি নোংরামি এড়াতে, রিংয়ে ফিরে এলাম তবু আবার, সেই টাকার জন্যেই। ভালো ছিলো মিয়ামিতে ফুটানির স্বপ্ন না দেখলেই বাক্সভর্তি টাকা আর গাড়ি নিয়ে।

কেন ট্যাক্সি, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি আমার গাড়িতেই। পাঁচ মিনিট—' রোশ বেরিয়ে গেলো। মোটামুটি গায়ে লাগলো—তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলো মনটা।

নিজের গুলো পরা যেত সেগুলো ময়লা না হলে।

তবে মনেপ্রাণে কামনা করছি আপনার জয়—নিজেকে শুনিয়ে বললাম মৃদু করুণ কণ্ঠে 'আচ্ছা, তাহলে বেরোনো যাক।' অ্যালিস একপাশে সরে দাঁড়ালো দরজা ছেড়ে, 'আপনি নিশ্চয় ফিরে আসছেন?' উত্তর দিলাম অন্যমনস্ক হয়ে। 'আসছি কি? কে জানে—'আসবেন বইকি, 'ওমা, সে কি কথা। এর পয় আছে। ফেলুন তো পকেটে এটা—' অ্যালিস আমার হাতে দিলো রুপোর পদক জাতীয় একটা বস্তু। পদকটা ফেলে দিলাম পকেটে।

রাস্তায় পড়তেই দ্রুতপায়ে নেবে, আমার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো পেট্রেল্লির পেল্লায় ক্যাডিলাক গাড়িটা। ব্র্যান্ট পেছনে, বেনো বসে স্টিয়ারিংয়ে। ব্র্যান্ট মুখ বাড়ালো জানলার বাইরে। 'ভাবলাম তুলে নিই যাবার পথে তোমাকে। ভালো তো শরীর? 'ভালো। তুমি এগোও, আমি আসছি রোশের সঙ্গে।' 'তুমি যাচ্ছো এই গাড়িতে।' তাকালাম, পেছনে দাঁড়িয়ে পেপি, আগুনের টুকরো চোখ দুটো,—খোকা তোমাকে কাছছাড়া করছি না লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত—'

নইলে—' ধমকে থামিয়ে দিলাম, থাকো চুপচাপ কথাটা আমার অনেকবার শোনা হয়ে গেছে। গাড়ি আর গাড়ি চারিদিকে। এবার বেনোর চাপা গলা পেলাম, পেয়ে যাবো মাল খেলা শেষ হলেই, পেছন দিকে থাকবে গাড়িও, পেট্রোল ভর্তি, ঠিক আছে?

থেকে থেকে কানফাটানো উল্লাস উঠছে। 'শালা কিছু লোকও হয়েছে—তৈরী হয়ে নাও ফারার—' ব্র্যান্ট আমার কানে মৃদুস্বরে বললো। সাজ ঘরের বাইরে শুরু হয়ে গেছে জটলা—গুণমুগ্ধদের আর সংবাদ পত্রসেবীদের। ব্র্যান্ট ঢুকতে দিল না তাদের ভিতরে, বন্ধ করা গেলো দরজাটা অনেক কসরৎ করে। ওদের সামলাতে পেপি বাইরে রইলো। ওয়ালার অপেক্ষায় রয়েছে আমার।

ফিরলাম ব্র্যান্টের দিকে, 'তোমার দরকার নেই থাকার, দেখতে পারবে সব ওয়ালারই—

'কিন্তু জনি—' আমি তোমাকে এখানে চাই না, রিংয়েও না—'ব্র্যান্টকে থামিয়ে দিলাম।

কেন এত গরম হচ্ছো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, উপায় তো ছিলো না আমার—

আমার দরকার নেই ওসব জানার—তুমি আমাকে ভিড়িয়েছো এই ছেড়া ঝঞ্ঝাটে, সে জন্যেই তোমাকে বলছি দূরে থাকতে—ব্র্যান্ট ফিরলো দরজার কাছে গিয়ে, ফারার চেষ্টা কোরো না হিড়িক দেবার, নিষ্কৃতি নেই এ থেকে তোমার।

চেঁচিয়ে উঠলাম 'ফোটো।'

সে অনেক ক্ষতি করেছে সুস্থ বক্সিং পরিবেশের, করছেও। পূর্বনির্ধারিত লড়াই নয়তো এটাও আর একটা। 'সবতো জেনেইছো—আর কেন জানবে নাই বা, ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই শহরের কারোই। অত টাকা লাগিয়ে বসে আছে ওই ছোকরার ওপর পেট্রেল্লি, তখন আশা করা যায় কি আর? আমাকে লড়াই ছেড়ে দিতে বলেছে তৃতীয় রাউন্ডে। একটা সহানুভূতির শব্দ বেরলো ওয়ালার-এর ঠোঁট থেকে, কিন্তু দোষ নেই মিঃ ব্র্যান্টের ; খারাপ নয় লোকটা। নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তার পেট্রেল্লির সঙ্গে টেক্কা দিতে যাওয়াটা। লাশ পড়বে এদিক-ওদিক হলেই। ব্র্যান্টের ছেলে-বৌ আছে তো—ওসব যেতে দাও—আমি পারছি না ওকে সহ্য করতে।

আর আছো তো তুমি—'দরকার হবে না কারোরই থাকার যদি লড়াই তিন রাউন্ডেই শেষ হয়ে যায়—'ওয়ালারের কথাগুলি কেমন ম্লান শোনালো। 'আচ্ছা বসলাম উঠে, ধর যদি আমি না হারি ওই রাউন্ডে? যদি প্যাঁদাই ওই চ্যাংড়াটাকে? তাহলে তোমার জানা আছে কোনো রাস্তা এখান থেকে জীবন নিয়ে বেরোবার?' ওয়ালার তাকালো এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে, ভাবটা চুপ, কান আছে দেওয়ালেরও, জনি পাগলামি কোরো না, বের করে দাও ও চিন্তা মাথা থেকে—তার চোখদুটো বিস্ফারিত।

'আরে দোষ কি ভাবতে!' একটু পরে বললাম জানলার দিকে তাকিয়ে কোথায় নামা যায় ওই জানলাটা দিয়ে? জনি মাথা ঠিক রাখো, ওসব ভেবো না একদম—কাঁদো কাঁদো গলা ওয়ালার-এর। ওর কথার জবাব না দিয়ে বাইরে চোখ মেলে দিলাম জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে। জানলার নীচে গাড়ি রাখার জায়গাটা মাটি থেকে ফুট তিরিশেক দূরে।

আমার হয়তো খারাপ লাগতো না অন্য সময় এটা পরতে। কিন্তু আজ এটাকে দুর্বিসহ মনে হচ্ছে। আমি বেরিয়ে আসতেই প্রতিপক্ষরা মিয়ামির ছোকরাকে নিয়ে ঢুকলো বাদ্যভাণ্ডর সমারোহে। প্রবল হর্ষধ্বনি উঠলো ছোকরা রিংয়ে ঢুকতে।

এগিয়ে এলো ব্র্যান্ট, ফারার চলো, এগোনো যাক সামনে আমরা আছি পেছনে—' চিন্তিত দেখাচ্ছে ঘামে ভেজা ওর সারা মুখ। এগোলাম। বেনো, পেপি, ওয়ালার, ব্র্যান্ট আমার পেছনে। সারাটা পথ অভ্যর্থনার প্লাবনে মুখরিত হলো। উত্তেজনায় অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ফেরার সময় কল্পনা করলাম কেমন হবে সম্বর্ধনার ধারাটা। চলে গেলাম নিজের জায়গায় রিংয়ে ঢুকে। হলদে ড্রেসিং গাউন প্রতিদ্বন্দ্বি ছোকরার গায়ে—কেরামতি দেখাচ্ছে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে। টুলে বসলাম কানে নিয়ে দর্শকের উল্লাস।

ওয়ালার শুরু করলো দস্তানা পড়তে। আমাকে দেখছে আমার ঘাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে মিয়ামি-ছোকরার ম্যানেজার। নাকে আসছে সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে হুইস্কির গন্ধও। রিংয়ের বাইরে তাকালাম মাথাটা সরিয়ে নিয়ে। আর দেখলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই—বসে আছে দড়ির নীচেই।

মাইকে বকবক করে চলেছে টাকমাথার ঘোষক, কিন্তু কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। সে যখন আমার পরিচিতি দিচ্ছে শুনছি-না আমি তখনও—ওয়ালার দাঁড় করিয়ে দিলো আমাকে ঠেলে—কানে তালা লাগানো চিৎকার আরও একবার উঠলো। আমি চোখ সরিয়ে নিতে পারছি না ওই মহিলাটির ওপর থেকে। আঙুলে আঙুলে ঠেকে যাবে ও যে হাত বাড়ালে এতো কাছে বসে।

জীবনে দৃষ্টি দিয়েছি অনেক নারীর ওপর। বাইরে এবং চলচ্চিত্র জগতে। কিন্তু কখনও তো চোখে পড়েনি এমনটি। সিঁথি কাটা চকচকে কালো চুলের মাঝ বরাবর—প্রায় চোখেই পড়ে না এতো সূক্ষ্ম যে। চোখ দুটো ঝকঝকে। কেমন একটা জেল্লা মসৃণ গায়ের চামড়ায়। আমন্ত্রণের

আভাস পুরু ঠোঁটে।

নানা বয়সের আরও তো কত মহিলা বসে রিংয়ের বাইরে—নানা ভঙ্গিমায়—সকলের অঙ্গেই সান্ধ্য সাজ, কিন্তু যেন ওকে অনন্যা মনে হচ্ছে ওর আপেল রঙা ফিকে সবুজ লিনেনের স্কার্ট আর রেশমী ব্লাউজে। সাধারণের থেকে ওর উচ্চতা কিছু বেশিই হবে মালুম হয়।

ওর—চওড়া কাঁধ আর তন্বী পা দুটো থেকে আমার দৃষ্টি চলে গেলো ওর সজ্জার গভীরে। বেমালুম ভুলে মেরে দিলাম পেট্রেল্লির ব্যাপারটা। ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে উত্তেজনা থরথর দৃষ্টিতে। শুকিয়ে গেলো আমার ঠোঁট ওর চাহনিতে, দ্রুততর হলো হৃৎস্পন্দন। ওর চোখের ভাষা প্রাঞ্জল মঠের সন্ন্যাসীর কাছেও, আর মঠের লোক তো নই আমি। তোমার কি হলো কি?

মনে হচ্ছে দেখেশুনে ময়ূরের মতো নাচে হৃদয় আমার—ওয়ালার শেষ করলো দস্তানা পরানো।

'হয়তো তাই—' কথাগুলো বললাম মেয়েটির দিকে মৃদু হেসেই, ও ফিরিয়ে দিলো হাসি—ভরপুর হাসিতে অন্তরঙ্গতার আমেজ। সঙ্গে কেউ আছে কিনা পাশের লোকটার দিকে চোখ ফেরালাম যাচাইয়ের জন্য ঃ এক বিত্তবান সঙ্গী চোস্ত স্যুটে মোড়া—মোটামুটি বলা চলে সুপুরুষই।

আমার কৌতূহলী চাহনির প্রত্যুত্তরে ক্রোধের বিস্তার দেখলাম অপ্রশস্ত চিবুকে। 'আরে ওঠো, অপেক্ষা করছে তো রেফারী। ওয়ালার ঠেলা দিলো আমাকে আলতো হাতে। হ্যাঁ। মিয়ামির ছোকরাটাও অপেক্ষারত। দাঁড়ালাম রিংয়ের মাঝে গিয়ে।

'দোস্ত কুছ পরোয়া নেই, অতক্ষণ তোমাকে পড়ে থাকতে হবে না কোণা আগলে, এক্ষুনি তোমাকে ঝাড় দেবে না—' দাঁত বের করলো ছোকরা। রেফারী এবার তৎপর হলো, আচ্ছা ভাই শুনে নিন এবার কাজে নামা যাক মস্করা ছেড়ে...'তার প্রাক্ লড়াই ফিরিস্তি শুরু হলো। যা আগে অনেকবার শুনেছি।

ওয়ালার ছাড়িয়ে নিলো আমার গাউন। তাকালাম শেষবারের মতো রিংয়ের বাইরে, দেখার জন্যে ওকে। ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—ওর অনেক প্রত্যাশা জ্বলজ্বলে চোখে, 'মুছে দিতে হবে ওই নোংরা হাসি ওর মুখ থেকে—দিতে হবে শিক্ষা—'মানবী বললো ফিসফিসিয়ে।

সঙ্গের লোকটা শান্ত করলো ওর কাঁধে হাত রেখে। অধৈর্য হাতে মেয়েটা তার হাত ঝেড়ে ফেলে দিলো, 'আমার শুভেচ্ছা রইলো—' ওর গলা পেলাম নরম রিনরিনে। 'ধন্যবাদ—' বললাম ওর চোখে চোখ রেখে। দাঁড়িয়ে গেলো আমাদের মাঝখানে ওয়ালার মরীয়া হয়ে, 'আরে নজর দাও তো লড়াইয়ের ওপর—'

'বাজলো ঘণ্টা। মিয়ামির মস্তান তার কোণ থেকে বেরিয়ে এলো দ্রুতপায়ে। সেই চ্যাংড়া হাসির প্রলেপ মুখে তার। ওই-ই প্রথমে হাত চালালো—বাঁ হাত, মার ফসকালো অল্পের জন্য। ডান হাত বাড়ালো ছোকরা—এবার ফাঁকা গেলো এটাও। ওর একপাশে আস্তে আস্তে সরে গেলাম। খুঁজছি মওকা, ওর ছটফটানি কমাতে একটা মোটা মার দিতে হবে। আচমকা একটা মার পড়লো আমার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে কয়েকটা ঘুষি মারলাম ওর পেটে। আবার আমার মুখে একটা ঘুষি পড়লো ওর বাঁ হাতের। ছোঁড়াটা সঙ্গে তুলেছিলো ডান হাতটাও, কিন্তু সেটা কোনোরকমে এড়িয়ে গেলাম। ও এগিয়ে এলো আরো, ওর পায়ের কাজ অনেক দ্রুত আমার চেয়ে, মার পড়লো আরো কিছু আমার পাঁজরায়। ওকে এবার জড়িয়ে নিলাম। রেফারী এগিয়ে এসে আমাদের ছাড়িয়ে দিলো।

হাসলাম মনে মনে, ব্যাটার শিক্ষা হয়ে গেছে প্রথম দাওয়াইতেই। দুজনে আবার জড়িয়ে পড়লাম, ঘুষিও খেলাম পাঁজরায় একটা। ঘণ্টা পড়লো। নিজের কোণে সরে গেলাম। বাইরে তাকালাম। ওয়ালার পরিচর্যা শুরু করেছে। আর আমন্ত্রণের ইশারা নেই মেয়েটার চোখে, ক্রুদ্ধ তিরস্কার দুচোখে। চাপা অভিমান ঠোঁটে। ফাঁকি দিতে পারে নি আমার অভিনয় ওর চোখকে। বুঝলাম। ওয়ালার ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিলো আমার মুখেচোখে। আমার মন কোথায় হারিয়েছে ও বুঝেছে।

আড়াল করে দাঁড়ালো সে ; বললো ঘুরে এসে মেয়েটাকে, কি শুরু করেছো? ব্র্যান্টও এলো। ছোঁড়াটাকে ওভাবে মারলে কেন? 'মারবো না কেন? ও শালা লড়তে এসেছে নাকি? বলছে

পেটেল্লি—' 'পেটেল্লি চুলোয় যাক—'ওর কথা কেটে দিলাম। ঘণ্টা পড়লো শুরুর ঘোষণা দ্বিতীয় রাউন্ড। দাঁড়ালাম উঠে। উঠলো মিয়ামি খোকা,ও সতর্ক চোখে পায়ে পায়ে এগোলো আমাকে জরীপ করে। সে বাঁ হাত উঁচিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফারাকে রাখার। কিন্তু বেশি নাগাল, একটা ঘাড়ের পাশে আর একটা মুখে, দুটো, দিলাম কষিয়ে। ছোকরা গরম হয়ে গেলো, পাটা চালালো সেও... কয়েক সেকেন্ড দুজনে জড়িয়ে পড়লাম। রে—রে করে উঠলো দর্শকরা, মুক্ত করে নিলো খোকা নিজেকে ; একটা হুক চালালাম ও সরে যাবার আগে। সৃষ্টি হলো একটা ক্ষতের, রক্ত পড়ছে ডান চোখের নীচে। ও লাফিয়ে পিছিয়ে গেলো একটা খিস্তি দিয়ে। ওরই মধ্যে কাজ চালিয়ে গেলাম দুহাতে। ছোকরা ঠেকা দিয়ে চললো বাঁ হাতে চোখ সামলে।

এবার পেটে মারলাম আরো এক পা এগিয়ে। এবার বোধহয় ছোকরার জয়ের ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য মনে হোল না। তাই সে এবার দৌড়ে এলো মরীয়া হয়েই। একটা হুক জমালো সর্বশক্তি দিয়ে সপাটে আমার মুখে। আমার মাথা ঘুরে গেলো।

ছিটকে গেলাম পেছনে। বাঁ হাতে ঘুষি চালালাম পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে। কিন্তু ওতো বুঝে নিয়েছে আমার অবস্থা। ও এগিয়ে আসতে লাগলো...ওর হাতটা নেমে আসার সময় আমার মুখের ওপর, ঘুষি মারলাম ওর অরক্ষিত মুখ লক্ষ্য করে ; মারটা পড়লো চোয়ালে। হাঁটু ভেঙ্গে মস্তান মাটিতে পড়লো। আবার ঘণ্টা বেজে উঠলো রেফারী গুনতে শুরু করার মুহূর্তে। ছোকরার লোকেরা এসে ওকে ওর জায়গায় তুলে নিয়ে গেলো। টুলে বসতে যাবো নিজের জায়গায় ফিরে, গলা পেলাম পেপির। 'হ্যাকোড়বাবু কিন্তু পরের রাউন্ডেই। যেন মনে থাকে—"এখান থেকে সরে যাও। ওয়ালারও চমকে উঠলো আমার গলার আওয়াজে। ওয়ালার স্পঞ্জ করতে লাগলো আমার মুখ পেপিকে সরিয়ে দিয়ে। ভারী হয়ে এসেছে ওর নিশ্বাস উত্তেজনায়। হচ্ছে ভালোই।

নজর রাখো ওর ডান হাতটার ওপর—ব্যাটা মারতে পারে ওই হাতেই। তাকালাম রিংয়ের অন্য প্রান্তে, খাটছে পাগলের মতো ছোকরার লোকগুলো। স্মেলিং সল্ট একজন ধরেছে নাকের কাছে, কাঁধের পাশে আর একজন দলাইমলাই চালিয়েছে।

কি বলো তাহলে শেষ হয়ে এলো লড়াই? একটা রাউন্ড আর—। হুঁ যাক—সকলের কাছে মনে হয়েছে তো লড়াই বলেই, তুমি কাউকেই ঠকাওনি।

ওয়ালার বললো মৃদু গলায়। এবার চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম রিংয়ের বাইরে ও হাসছে। স্বাগত জানালো আমাকে হাত তুলে। বাজলো শেষ ঘণ্টা।

দাঁড়ালাম উঠে। মনে হচ্ছে পরিশ্রান্ত, অনভ্যাস অনেকদিনের। দুপা এগোতেই এবার ছোকরা রক্ষণাত্মক কায়দায় লড়ছে। লক্ষ্য করলাম ছড়ে গেছে নাকের পাশে, ক্ষত চোখের নীচে, অসংখ্য লালচে দাগ পাঁজরায়। কোণায় ঠেলে নিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলাম ওর রক্তঝরা নাকের ওপরই। আবার শুরু করলো রক্ত পড়তে ঝলকে ঝলকে। হয়তো ও পড়েই যেতো আমি না ধরলে। বলে দিলাম কানে কানে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে ঠিক আছে মারো কষে পেলুবাবু—। ছেড়ে দিয়ে সরে গেলাম।

ছোকরা হাওয়ায় বাঁ হাত ছুঁড়লো। মুখোমুখি হলাম এবার সুযোগ দিয়ে ওকে মারবার। একটা আপার কাট আমার চোয়ালে বসালো কোনো রকমে, বসে গেলাম হাঁটু ভেঙ্গে। আমার লাগেনি খুব বেশি—কিন্তু আমাকে তো 'হারতে, হবে এই রাউন্ডেই, কাজেই দরকার তার প্রস্তুতি। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সম্ভবত মিয়ামি থেকে এবারের গণউল্লাস। রেফারী গুনতে শুরু করলো আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে। আড়চোখে তাকালাম ছোকরার ওপর। ওর চোখেমুখে স্বস্তির ভাব। দাঁড়িয়ে আছে হেলান দিয়ে দড়ির ওপর। কাঁপছে হাঁটু, ঝাঁকিয়ে নিলাম মাথাটা। চোখে দেখছি সরষে ফুল ভাবটা যেন। খাড়া হয়ে গেলাম ছয় গোনার সঙ্গে সঙ্গে। চোখে চোখ পড়লো ছোকরার। 'পটে লিখা' ওর মুখটা যেন।

আমি আর উঠবো না ছেলেটা নিশ্চিন্ত ছিলো, তাই ও দুপা পিছিয়ে গেলো আমি উঠতেই। আরও একবার চিৎকার উঠলো দর্শকের। এবার সে উল্লাসে বিদ্রূপের ছোঁয়া। ওকে চেষ্টা করলো উত্তেজিত করার ছোকরার সমর্থকরা। ও এগিয়ে এলো ঘোর অনীহায়। পেছোলাম—শুরু হলো আমারও অভিনয়। আমি ফেরত দিলাম মার সঙ্গে সঙ্গে ও বাঁ হাত চালাতে। মিয়ামির ছেলেটা

ক্ষিপ্ত হলো যন্ত্রণায়। আগুনের টুকরো যেন চোখ দুটো। আবার পড়ে গেলাম মার খেয়ে। পেলাম তাই যা চেয়েছিলাম। বেহুঁশ ছিলাম প্রথম কয়েক মুহূর্ত—চোখ মেললাম আস্তে। পড়ে আছি মুখ থুবড়ে। পাশ ফিরে দৃষ্টি ফেরালাম। রিংয়ের বাইরে। উঠে দাঁড়িয়েছে আমার 'প্রেরণা', অজস্র ধিক্কার নিয়ে বিস্ফারিত চোখে।' ও চেঁচিয়ে উঠলো চোখে চোখ মেলতেই। ওঠো—লড়ে যাও উঠে,কেঁচো কোথাকার—।' এতো কাছে ও আমার, ছোঁয়া যায় হাত বাড়ালেই। উঠে পড়েছে আশে পাশের মানুষও—ধিক্কার তাদের কণ্ঠেও, কিন্তু আমি তো শুনছি শুধু ওর কথাই। 'জেনি ওঠ—রাস্তা নেই আর ফেরার—'

ও বিকৃত গলায় বলে উঠলো। ক্রোধে ওর চোখে, হতাশা আর ধিক্কারের ছায়া—একের পর এক। আমার সারা শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ—চেয়েছিলাম এই তো। আমার কথা তো ছিলো না পেট্রেল্লির কথায় চলার, প্রেরণার মুখ বিকৃতিই পথ বাতলে দিলো আমার। শুনতে পাচ্চি রেফারীর গলা, সংখ্যার অনুরণন ভেসে আসা যেন কত দূর থেকে সাত-আট...উঠে পড়লাম কোনোরকমে ছোঁড়াটার হাত বাঁচিয়ে ও এগোতেই আর এক পা, দস্তানার বাঁধনে জড়িয়ে ধরলাম ওকে—মৃত্যু আসে আসুক। ছেলেটা ব্যর্থ প্রয়াস চালালো অক্টোপাশের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার...আমার মন ফাঁকি দিতে চাইছে পেট্রেল্লিকে। হারছে ও—ওকে মরতে হবে আমাকে মারতে না পারলে। আমার আর দরকার কটা সেকেন্ড হালকা করার জন্য মাথাটাকে। সজোরে ঘুষি কষালাম বাঁ হাতে বাঁধনমুক্ত হবার আগে।

মিয়ামির সেরা লড়িয়ে তেড়ে এলো হিংস্র শ্বাপদের পায়ে...কিন্তু আর তো পাবে না আমার নাগাল, ব্যাটাকে খেলিয়ে চললাম...তিনবারের পর চতুর্থ বারে ডান হাতে সোজা হুক চালালাম আমার আওতায় পেয়ে—ছেলেটা ছিটকে পড়লো কাটা পাঁঠার মতো, রক্তে লাল সারা মুখ। না, সাড়া নেই কোনো—মিয়ামির ছেলে অনড় পড়ে আছে। অনেক আশার ধন পেট্রেল্লির।

ব্যাপারটা বুঝলো রেফারীও, তবু ত্রুটি নেই তার কর্তব্যে। শুরু হলো গোনার পালা...শেষও হলো...কিন্তু পড়ে রইলো মাটি আঁকড়েই প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার হাতটা তুলে নিয়ে রেফারী এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো ফ্যাকাশে মুখে, বিজয়ী—ফারার আজকের লড়াইয়ে। কাঁপছে ওর হাত।

আমার চোখ চলে গেলো রিংয়ের বাইরে—দাঁড়িয়ে পড়েছে মানবী, উত্তেজনায় উথাল-পাথাল তার ভরা বুক—চুম্বন ছুঁড়ে দিলো আমার দৃষ্টি মিলতেই।

তৎপর হলো কাগজ আর ক্যামেরার লোক আর দেখতে পেলাম না ওকে। এগিয়ে এলো ভিড় ঠেলে পেট্রেল্লি চাপা হাসি ঠোঁটে। তাকালাম চোখের দিকে—সেখানে দেখা দিয়েছে আগুনের হলকা, ফারার সাবাশ—কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবে তোমার প্রাপ্য—'ছোকরার ম্যানেজারের দিকে পেট্রেল্লি সরে গেলো। আমার কাঁধে ফেলে দিলো ড্রেসিং গাউনটা ওয়ালার নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে।

পেপিকে দেখতে পেলাম রিংয়ের বাইরে বেরোতে—দাঁড়িয়ে মুখে নরকের হাসি নিয়ে। লোকের ভিড় আমি নিশ্চিন্ত সাজঘরে যতক্ষণ থাকবো—কিন্তু সরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা—আর পারছি না ভাবতে...ওয়ালারও সঙ্গেই সাজঘরে ফিরছিলো, বারবার ভয়ার্ত চোখে তাকাতে লাগলো দরজার দিকে পরিচর্যা পর্ব শেষ হতেই। এসেছিলো টম রোশও, কিন্তু থাকতে দিলাম না ওকে বেশিক্ষণ—আমি চাই না আমার জন্য ও বিপদে পড়ুক। ঘরে জটলা চলছে কাগজওলা আর গুণমুগ্ধদের—ওরা আলোচনায় মুখর কে কবে জোরালো মার দিয়েছে হেভীওয়েট লড়াইয়ে, আর কারও দৃষ্টি নেই আমার ওপর। ওয়ালারের দিকে ফিরলাম টাইয়ের গিঁট দিতে দিতে, অনেক ধন্যবাদ ভাই ওয়ালার—তুমি এবার এসো—মুছে নিলো ঘাম-চপচপে মুখটা হাতের উল্টোপিঠে অতিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটা। জনি সব করতে পারি তোমার জন্য সে গলা নামিয়ে দিলো, জলদি সরে পড় এখান থেকে—ওরা একা পেলে তোমাকে...তোমার কিন্তু উচিত হয়নি ওটা করা।

কোনটা? কি হয়নি উচিৎ—। আমার হাত থমকে গেলো গিঁটে। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে সেই হীমশীতল অনুভূতি—তাকালাম ফিরে কালো হরিণ চোখ সেই বেশে দাঁড়িয়ে আছে চোখে চোখ রেখে আমার। জনি তোমার কি করা উচিৎ হয়নি। মেয়ে আবার প্রশ্ন রাখলো।

ওয়ালারকে যেতে দেখলাম লঘুপায়ে ঘর ছেড়ে। স্তব্ধ জটলার কাকলি—ক্ষুধার্ত চোখে মেয়েটাকে ওরা লেহন করছে। বলে উঠলো ওদের একজন, 'চলো হে, সরে পড়া যাক—মনে

হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন নেই থাকার সাহেবের কাছে।' ফোয়ারা ছুটলো হাসির মানুষগুলো যেন মজার কথা জেনেছে দুনিয়ার—ওরা একে একে বেরুলো। নৈঃশব্দ নামলো সারা ঘর জুড়ে। বললাম বেশ খানিক পরে কি খবর। টাকা পেলেন বাজির?

'তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে হয়েছে।

'তাহলে তাকেই তো আপনার জানিয়ে দেওয়া উচিৎ সেটা—জানেন তো মেয়েরা স্তুতি পছন্দ করে।' ঠোটে ওর দুষ্টু হাসি। বলছি তো তাকেই—' সত্যি! বিস্তৃত হলো হাসি। কিন্তু শান পড়লো চোখে তোষামোদের কথা ওটা, ওসব বিশ্বাস করি না আমি, আর—লড়াইয়ের ব্যাপারটাও আমার সাজানো মনে হোলো। 'আপনি কি বোঝেন লড়াইয়ের? চেষ্টা করলাম হাসবার 'বুঝি। প্রায়ই আমি দেখতে যাই এখানকার লড়াই—কাজেই, নতুন কিছু নয় এ ব্যাপার আমার কাছে—ঘটানো হয়ে থাকে ওগুলো, বললো একটু চুপ করে থেকে 'তা কেন মত পাল্টালেন?'

ওই মেয়েটার জন্য, তাদের কথা ভেবে—'আর বাজি ধরেছে কারা আমার ওপর। মেয়েটা তাহলে জায়গা জুড়ে রয়েছে দেখছি আপনাব বুকের অনেকখানি—'

পূর্ণদৃষ্টি মেলে দিলো আমার দিকে, 'ভালো লাগছে আপনাকে আমার, হঠাৎ আমার খেয়াল হলো—হাতে নেই তো সময়, আর কেটে পড়া দরকার ভীড় থাকতে থাকতে। বেরোতে গেলে ও-ভাবেই বেরোতে হবে পেট্রেল্লির চ্যালা দুটোর চোখে ধুলো দিয়ে—কিন্তু বেরোতেই মন চাইছে না এই মুহুর্তে ঘর ছেড়ে।

আচ্ছা কে আপনি? বলুন তো এখানে এসেছেনই বা কেন? ওর চোখে তাকালাম। ও ভাবছে কি যেন, 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই আমি কে তা নিয়ে—আমাকে ডাকবেন ডেলা বলে। এখানে এসেছি আমি জেনেই বিপদে পড়েছেন আপনি, এবং এর জন্যে দায়ী আমি। ঠিক বললাম তো? ঝিলিক উঠলো কালো হরিণ চোখে। 'হু', তা আর কি করবেন তার আর আপনি, 'না মানে—জানতে পারি বিপদটা কি ধরনের? আমার পিছু নিয়েছে দুটো মস্তান ধরতে পারলে—' 'বুঝেছি খপ্পরে পড়েছেন পেট্রেল্লির—'তাকে আপনি চেনেন? চমকে উঠলাম, 'কে না জানে ওর কথা? ওর নামটাই জানি আমি অবশ্য—প্রবৃত্তি বা ইচ্ছে নেই পরিচয় করার কিন্তু সময় নষ্ট করছি আমরা বোধ হয়, বের করে নেওয়া দরকার আপনাকে এখান থেকে—' ও বাইরে তাকালো জানলার দিকে এগিয়ে।

আপনি এই জানলা দিয়ে নেবে নিশ্চয়ই যেতে পারবেন ওই গাড়ি রাখার জায়গা পর্যন্ত? অনুসরণ করলাম ওর দৃষ্টি। সেখানে এখনো দাঁড়িয়ে দু-চার খানা গাড়ি। আমার প্রথম সারির গাড়িটা ডান দিকের দ্বিতীয়—' ডেলা দেখালো হাত বাড়িয়ে। আপনি ওখানে পৌঁছাতে পারলেই নিরাপদ সবার নজর এড়িয়ে—'।

দাঁড়ান' আপনাকে জড়াতে চাই না এর মধ্যে—বিপজ্জনক এই লোকগুলো—' 'করবেন না বোকামি জানতে পারবে না ওরা—' 'কিন্তু বাড়াবেন না কথা, আমি ফিরে যাচ্ছি গাড়িতে। এগোলো ডেলা, বন্ধ করে দিন দরজাটা নামতে শুরু করবেন আমি গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে। গাড়ি চালিয়ে আসবো আমি, উঠে পড়বেন আপনি। কিন্তু এতে বোধহয় খুশি হবেন না আপনার বন্ধু, আর আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন বোধহয় উনি ; আঙুল বাড়িয়ে লোকটার দিকে দেখালাম. গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো।

লোকটাকে মনে হলো অধৈর্য। ডেলা ঠোটে, নিরস হাসি ফোটালো ও আমার স্বামী, বন্ধু না—' ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে, 'আমার লাগবে না পাঁচ মিনিটও—কাউকে এখানে ঢুকতে দেবেন না—'ডেলা অদৃশ্য হয়ে গেলো আমি মুখ খোলার আগেই। দরজা বন্ধ করে দিলাম ও বেরোতেই।

আমি একা, এখন একা। ফিরে গেলাম জানলায়। পায়চারী করছে ডেলার স্বামী। ধরালো একটা সিগারেট চমকে উঠলাম পেছনে একটা শব্দ হতেই। চোখ পড়লো দরজার হাতলের ওপর—চেষ্টা করছে কেউ ঘোরাতে—ঘুরল না হাতল—ধাওয়া শুরু করেছে ওরা। আমার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে স্টেডিয়াম ফাঁকা হতে। বাইরে সপ্তমে উঠেছে নাচের বাজনা। যথেষ্ট সোচ্চার।

দরজার ছিটকিনিটা দেখলাম সন্তর্পণে এগিয়ে, মনে হলো না খুব পোক্ত, কানে এলো বাইরে ফিসফিস কথা ও দুর্বোধ্য ভাষা ; কিন্তু ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেলো তাতেই আমার। দরজার

দিকে গেলাম ম্যাসাজের টেবিলটা টেনে নিয়ে, মনে ভয় ঢুকেছে। ওরা অনেক ভালো জানে আমার চেয়ে স্টেডিয়ামের আনাচ-কানাচ। জানে আমার পক্ষে শক্ত হবে না জানলা দিয়ে নেবে পালানো। আমাকে নীচে খুঁজবে দরজা খোলার চেষ্টা ব্যর্থ হলে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেবে গাড়ি রাখার জায়গায় হাজির হবে তিন-চার মিনিটের মধ্যেই. নামতেও শুরু করেছে বোধহয়—কিছু করা দরকার এখুনি। দরজার ওপর শারীরিক প্রয়োগের শব্দ উঠলো জানলার ওপর পা চড়িয়ে দিতেই। কার্নিশে নেমে গেলাম, ফিরে তাকালাম না। পা পিছলে গেলো পাইপে পৌঁছবার আগেই শূন্যে উঠে গেলো শরীরের বেশ কিছুটা অংশ।

তারই মধ্যে নখ বসালাম অসমতল ক্রংক্রীটের দেওয়ালে কোনোরকমে। পা ফিরিয়ে আনলাম কার্নিশে কোনোরকমে। নামতে লাগলাম এগিয়ে পাইপ লক্ষ্য করে। লাফিয়ে পড়লাম মাটিতে, মাটি থেকে ফুট দশেক ওপর থেকে। শব্দ উঠলো গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবার দ্রুতগামী পায়ের আওয়াজও সেই সময়। থমকে গেলাম গাড়ির দিকে ছুটে যেতে গিয়ে—অনেক নিরাপদ এখানকার দেওয়ালের ছায়া, আলো ঝলমল গাড়ি রাখার জায়গাটা।

নেভানো হেডলাইট গাড়িটা এগোচ্ছে আমার দিকে। আমার ডান পাশটা স্বল্পালোকে নজর পড়লো—পেপি নিশ্চল দাঁড়িয়ে একশো গজ দূরে আমার থেকে—তার চোখ স্থির সাজঘরের জানলায়। আওয়াজ উঠলো একটা প্রচণ্ড। ভেঙ্গে গেলো সাজঘরের দরজা—কমে এলো গাড়ির গতি ডেলার গলা পেলাম আমার সামনে আসতেই, শীগগির উঠে পড়ুন।

উঠে বসতেই গাড়িটা বিদ্যুৎগতিতে এগোলো একটা ঝাঁকি দিয়ে। ডেলা হাত দিলো হেডলাইটের বোতামে, দেখতে পায় নি তো আপনাকে? বলতে পারছি না ঠিক—তাকালাম পেছনে। পেছনে বসে কালো চুলো লোকটা। ডেলা পরিচয় দিয়েছে যাকে ওর স্বামী বলে। অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছে না ওর মুখটা। চোখ মেলে দিলাম লোকটার মাথার পেছনে, না, চিহ্ন নেই কোনো অনুসরণ কারী গাড়ির। এখনো পিছু নেয়নি ওরা কেউ—এবার ফেটে পড়লো ডেলার স্বামী। মাথা খারাপ হয়ে গেছে ডেলা তোমার। দরকার নেই যাবার এই সব উটকো ঝামেলার মধ্যে, নামিয়ে দাও এ লোকটাকে। হেসে উঠলো ডেলা। পেলে তুমি বসো তো চুপচাপ, শেষ করে দিতে চাইছিলো ওকে ওরা। আর এটা হতে দেওয়া যায় না এক হাজার ডলার জেতার পর।

বোকা মেয়ে, সব সময়ই মাথা গলাবেই একটা না একটা ঝঞ্ঝাটে—লোকটা স্বগতোক্তি করলো। আবার ডেলা হেসে উঠলো, দারুণ রোমাঞ্চকর আমার কাছে এর প্রতিটি মুহূর্ত। ঠিক আছে আসনে গা এলিয়ে দিলো একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে লোকটা, তাহলে জলদি বেরোও এ নরক থেকে, পরে একে ছেড়ে দিও রাস্তায়—ডেলা আমাকে আড়চোখে দেখলো।

আমার গায়ে একটা ঠেলা দিলো ডেলা, ওকে সে কথা বলতেই হতে পারে, শুয়ে পড়ুন তো আপনি নীচে। আরও কয়েকখানা গাড়ি আমাদের আগে, লাইন ধরে এগোচ্ছে ধীরে—ডেলাকে চলতে হচ্ছে পেছন পেছন মৃদু গাড়ির গতি। দেখুন, উঁকি দিচ্ছে সব গাড়িতে ব্যাটারা। বেরোলে পরে অন্য গাড়িগুলো। শেষ হলো না ওর কথা, পল বলে উঠলো বিকৃতগলায়, গাড়ি আসছে পেছনে একটা দারুণ জোরে। নেমে যাই বরং আমি—'চুপ। ডেলা জোর করে নামিয়ে দিলো আমার মাথাটা কথা থামিয়ে দিয়ে, বলছি যা করুন—ডেলা তাকালো পেছনে।

আমি মুখ নামাতে চোখ আটকে গেলো ডেলার নিটোল পায়ের গোছে—জুতোয় মোড়া সাদা বাস্কিন চামড়ায়। পেছনের গাড়ি মারতে শুরু করেছে হেডলাইট। পেছন থেকে হর্ন বেজে উঠলো ডেলা গতি কমাতে।

'কেন থামাচ্ছো—চালিয়ে যাও মাঝরাস্তা দিয়ে পলের অধৈর্য গলা। গেট সামনে। মাথা তুলবার চেষ্টা করলাম গাড়ির গতি বাড়তেই, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো পাহারাদারদের একজনের সঙ্গে, 'অ্যাই এক মিনিট উত্তেজিত গলায় সে গাড়ির হাতল ধরে ফেললো কথাগুলো ছেড়ে দিয়েই। আমি হাতল ধরে রাখলাম প্রাণপণ শক্তিতে, খুললো না দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডেলা পায়ের চাপ বাড়ালো অ্যাকসিলারেটারে ; স্পিডোমিটারের কাঁটা নব্বুইয়ের ঘরে উঠলো কাঁপতে কাঁপতে, বিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বইতে করতে লাগলো লটপট। তীব্রতা কমছে পেছনে আলোর দূরত্ব বাড়ছে দুটো গাড়ির। 'আর পাচ্ছে না ওরা আমাদের।'

রাস্তায় জোয়ার এলো আলোর। আরে সামনে বাঁক আছে, দেখে চালাও। গতি একটু কমাও না, পল চেঁচিয়ে উঠলো, ক্ষিপ্ত গলায়। সে ঝুঁকে বসেছে।

আঃ, কোরো না তো, গলা চড়ালো ডেলাও। তাকালাম আবার ফিরে। খুব পেছনে পড়ে নেই পেছনের গাড়ি, মনে হোল দুশো গজের মধ্যেই। বাঁকের মাথায় ডেলাকে কমাতেই হোলো গাড়ির গতি, পেছন থেকে অনেক কাছে এসে গেলো বিশাল ক্যাডিলাকটাও।

ডেলা জুড়ে রেখেছে রাস্তার মাঝখানটা, কাঁটা ওঠা নামা করছে সত্তরের ঘরে ; গতি অনেক বেশিই বলা যায় এ রাস্তার তুলনায়। সামনে গাড়ি সাবধান। সামনে এগোতে দেখে ককিয়ে উঠলাম। বাঘের জলন্ত চোখের মতো দুটি হেডলাইড। ডেলা পা সরিয়ে নিলো আলো নিভিয়ে দিয়ে অ্যাকসিলারেটার থেকে। বাদুরের মতো গাড়িটা এগোচ্ছে পাখনা ঝাপটে। পেছনে আওয়াজ পেলাম ব্রেক কষার---তাকালাম, থেমে গেছে ক্যাডিলাক। আমাদের গাড়ি ডাইনে ঘুরলো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে।

চোখ ফেরালাম সামনে রাস্তার মাঝবরাবর গাড়ি একেবারে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় আমাদেরই ওপর চোখ ধাঁধানো আলোর সম্ভার নিয়ে আরো ডাইনে সরলো ডেলা---লাফিয়ে উঠলো পেছনের চাকা দুটো। ডেলা স্টিয়ারিং নিয়ে প্রচণ্ড কসরৎ চালালো। সোজা রাখার জন্য গাড়ি। কিন্তু আমাদের যেন দেখতেই পাচ্ছে না সামনের গাড়িটার চালক---চিৎকার করে উঠলো পল---গাড়িটা বেরিয়ে গেলো বেন্টলের গা ছুঁয়ে। কানে এলো ডেলার আর্তনাদ---সামনের ঝোপে গিয়ে পড়লো মড়মড়িয়ে অন্য গাড়িটা।

আমি আঁকড়ে ধরলাম ড্যাশ বোর্ড শূন্যে উঠতেই। আমাদের গাড়িটা মাকড়সার জাল হয়ে গেলো কাঁচ ভেঙ্গে। শব্দ উঠলো কাঠ ফাটার। প্রবল ঝাঁকুনি। একটা সাদা আলোর ঝলকানি। একটা তীব্র আর্তস্বর ভেসে আসছে ডেলার। এসবের মধ্যে মিলিয়ে গেলো আলো---আমার চোখে নেবে এলো আঁধার। আয়োডফর্ম আর ইথারের গন্ধে আমি হাসপাতালে মালুম হলো। পারলাম না চেষ্টা করেও চোখের পাতা খোলবার, পাতা ভারী হয়ে আছে।

ভালো কি একটু? আমার অনুভব নারকীয়, বলতে পারলাম না ওর প্রত্যাশা ভরা চোখে তাকিয়ে। চোখ বুজলাম ঠোঁটে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে। আর এক অনুভূতি চোখ বোজার পরেই---আলোর কাঁপুনি পাতার আড়ালে---যেন সাঁতরে চলেছি কুয়াশার সাগরে--কিসের ভাবনা? সে স্রোতে ছেড়ে দিলাম নিজেকে। একবারই তো মরে মানুষ।

যেন থমকে গেছে সময়। বাড়ছে আধার---চলে গেলাম নৈঃশব্দের আর কুয়াশার রাজ্যে রইলাম সেই অবস্থায় অনেক---অনেকক্ষণ। আলোর কাঁপুনি আবার শুরু---আমি শুয়ে বিছানায় আমার হাতটা ছুঁলো চাদরের প্রান্ত। আমার সামনে সরে আসতে বুঝলাম চোখে আলো, মনে পড়লো পাশে পর্দা, এই ব্যবস্থা তো থাকে মুমূর্ষুদের বিছানা ঘিরেই। তাকাতে---টুপিটা ঠেলে দেওয়া মাথার পেছনদিকে, মুখে আঁকিঝুঁকি কঠিন রেখার।

খড়কে চুষছে দাঁত খোঁচার। বিরক্তির স্বাক্ষর মাংসল মুখে 'পুলিস' চিহ্নিত সারা অঙ্গে। হাওয়া খেতে লাগলো টুপিটা হাতে নিয়ে আমাকে চোখ মেলতে দেখে, আমার কি ভাগ্যি লিখে দিয়েছিলাম খরচার খাতায় আমি তো তোমাকে। সেবিকা বেরলো পর্দার আড়াল থেকে না---এটি তন্বী নয় সেই মেদবহুল।

'বলুন তো কি ব্যাপার?' মনে হচ্ছে যেন ভেসে আসা অনেকদূর থেকে নিজের কানেই আমার কথা। 'বলবেন না কথা---শুয়ে থাকুন চুপচাপ---।' ধমকে উঠলো সেবিকা। 'ঘুমোবে। ধুর শুনতে হবে ওর কাছে সব---নার্স কেটে পড়ুনতো আপনি---' বিড়বিড় করে উঠলো আইনের খুঁটি, 'ভাইটি, তুমি বলতে চাও তো কথা, না?'

আবার আমার চোখ বুজে এলো 'সার্জেন্ট সাহেব---'। এবার সেই সাদা কুর্তাকে চোখ মেলতে দেখলাম, কেমন আছি আমি? 'ডাক্তার।' দেখালেন মশাই আপনি ভেলকি। ভালো করে তাকালাম, আমার ওকে ভালো লাগলো। কোথায় আমি?

চেষ্টা করলাম মাথা তুলতে, কিন্তু ভারী বড্ড---অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো আপনার একটা, তা,

সেরে উঠেছেন ও কিছু না—' ঢুকলো পুলিস সাহেব, এখন কথাবলা যাবে তো ওর সঙ্গে? প্রশ্ন দু-একটা। ঘটাবো না কোনো অস্বস্তি— ভালো নয় ওর আঘাতটা, তাড়াতাড়ি করুন—' সরে দাঁড়ালো ডাক্তার। পেনসিল হাতে, এগিয়ে বসলো সার্জেন্ট। মেলা নোটবইটা। কি ভাই তোমার নাম? বোলো না যেন উল্টোপাল্টা, আমার সব জানা দরকার—'

'জন ফারার—ঠিকানা? নেই কিছু—' বলছো শয়ন হট্টমন্দিরে? ও হাসলো দাঁতের ফাঁকে।

বলা যায় বাউণ্ডুলেও—'চেষ্টা করলাম আমিও হাসবার। লোকটা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কড়িকাঠের দিকে তাকালো একটা ফুঁ দিয়েও নিলো,—আচ্ছা বেশ। তা ঘরণী, বাপ-মা, বা অন্য কেউ তাদের পাত্তা? নেই কেউ। আমিও চোখ তুললাম কড়িকাঠে। পুলিস সাহেব এবার ফিরলো ডাক্তারের দিকে। আপনাকে বললাম তো—আমার নাড়ি ধরলো ডাক্তার, উনি এখনো আসেন নি কথা বলার অবস্থায়—'

'আরে দাঁড়ান—দাঁড়ান—' পুলিস বাবাজী বলে উঠলো পেনসিল চিবোতে চিবোতে, সবকিছু তো আমাকে জানতে হবে।

এবার সে ঘুরলো আমার দিকে, 'কেউ নেই তোমার ওয়ারিসন, এই তো? ঠিক আছে ভাই তা, কে ঐ মহিলটি—পাওয়া গেলো তোমাকে যার সঙ্গে?' এবার মনের চোখে ভেসে উঠলো একটা ছবি। কামার্ত একটা মুখচ্ছবি আর কালো কালো চুল একরাশ—

'ডেলা বলে ডাকবেন আমাকে ও বলেছিলো।' 'বলেনি পদবী কিছু?' 'জানি না—' একটা অদ্ভুত শব্দ করলো পুলিসসাহেব নাকে—বলা যায় আর্তনাদও। 'কেমন আছে ও? খুব বেশী কি আঘাত? প্রশ্ন করলাম।'

চিন্তা করবেন না ভালোই আছে—ও মুখ খোলার আগেই ডাক্তার বলে উঠলো। তিনি ওর স্বামী? 'কে আবার সেটি? পুলিস আমার দিকে তাকালো ছানাবড়া চোখে, যেন আমাকে ভূতে পেয়েছে। 'বসেছিলেন পেছনে, পল ওর নামও বলেছিলো তিনি কেমন আছেন?

'ওর জন্যেও আপনাকে চিন্তা করতে হবে না—' এবারও ডাক্তারই কথা বললো 'পুলিসসাহেব মাথা নাড়লো কপালে হাত রেখে। জানতে পারি কি করে ঘটলো ব্যাপারটা?' তার গলায় 'আশার সুর ধ্বনিত হলো না তেমন। এদের তো বলা যাবে না পেটেন্ট্রির খবর। আমি ভুলে যেতে চাইলাম গাড়ির ব্যাপারটা চোখ বুজে।

না, গেলো না তো ভোলা। বললাম, বেশ কিছুক্ষণ পরে, বেশ জোরেই একটা গাড়ি আসছিলো সামনের দিক থেকে। শালারা যেন দেখতেই পাচ্ছিলো না আমাদের—ও, মানে—ডেলা চেষ্টা করছিলো সরে যাবার, কিন্তু পারলো না—গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রায় আমাদের ওপর। কি হয়েছে ও শালাদের? লম্বা নিঃশ্বাস গলায় একটা, সার্জেন্ট আমাকে মাপলো আপাদমস্তক।

থাক চাঁদু ওসব কথা—আসা যাক কাজের কথায়। বাউণ্ডুলে তুমি তো—তা বাবাজী, ঘুরছিলে কেন বুইক চড়ে? ভূত দেখার পালা এবার আমার। বুইক নয় গাড়িটা বেন্টলে। মেয়েটাই চালাচ্ছিলো। ওর পাশে আমি বসেছিলাম—পেছনে স্বামী, উঠলাম হাঁফিয়ে। যাঃ এ যে শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের।

টুপি সরিয়ে চাঁদি ঘষে নিলো রুমাল দিয়ে। জোরে টেনে দিলো টুপিটা 'বাপু শোনো—তুমিই গাড়িটা চালাচ্ছিলে মেয়েটা বসে ছিলো পেছনে—কেউ ছিলো না ভাতার--মাতার—' সে আঙুলটা মেলে দিলো আমার দিকে ঝুঁকে। আর বুইক ছিলো গাড়িটা।

এবার আমি খেপে গেলাম, 'দূর মশাই আপনি ভুল করছেন—'মুঠোয় ধরলাম বিছানার চাদরটা, মেয়েটাই গাড়ি চালাচ্ছিলো বলছি তো—বেন্টলে গাড়ি কালো রঙের। অন্যদিক থেকে এসে ধাক্কা দেয় একটা গাড়ি—চেপে ধরুন ড্রাইভারটাকে, বলবে সেই শালাই—। মামা নোট বইটা নাচালো আমার নাকের ওপর, গাড়ি ছিলো না অন্য কোনো।

আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলতো? কি আছে লুকোবার, অ্যাঁ?

'থামুন তো এবার অনেক হয়েছে—'

রুক্ষ গলা পেলাম ডাক্তারের। চিৎকার করে দরকার নেই বের করার ওর কানের পোকা। ভালো না ওর অবস্থা—সার্জেন্ট, একলা ওকে থাকতে দিন, লুকোইনি আমি কিছুই—' চেষ্টা করলাম উঠে

বসতে। পারলাম না। আবার ঝলসে উঠলো মাথার আলো—ছিটকে পড়লাম আঁধারে। সারা ঘর ভরে গেছে দিনের আলোয় যখন জ্ঞান হলো। পর্দাটা সরে গেছে পায়ের দিকে, শুধু রয়েছে পাশের দুটো।

চোখে পড়ছে সামনের খাটটা—বেড়েছে কোলাহল। বুঝলাম আমাকে আনা হয়েছে ওয়ার্ডে। নজর করলাম ভালো করে—কেউ নেই। মনে হচ্ছে অনেক সুস্থ, যন্ত্রণাটাও গেছে মাথার—যদিও শুকোয়নি ঘাটা। তুললাম হাতদুটো, উঠলো অনায়াসে। ভাবতে শুরু করলাম সার্জেন্টের কথাগুলি—অস্বস্তি বাড়লো ভাবনায়।

গাড়ি ছিলো না অন্য কোনো। ও বলছে, স্বামীও না, বুইক গাড়ি। আর আমিই ছিলাম স্টিয়ারিঙে—লোকটা তাহলে কি বলতে চাইছিলো? নাকি আমি দর্শন করেছি স্বপ্নে হয়তো কুয়াশারই ফসল লোকটা হ্যাঁ—তাই—না, হয়তো আমাকে গুলিয়ে ফেলে! অন্য কারুর সঙ্গে। ডাক্তার বেরোল পর্দার আড়াল থেকে, মুখে একগাল হাসি।

'ভালোই তো আছেন দেখে মনে হচ্ছে—' 'তা আছি—' তাকিয়ে নিলাম একমুহূর্ত ডাক্তারের চোখে। 'আচ্ছা, বলুন তো এখানে কতদিন আছি?'

সে চোখ বুলিয়ে নিলো খাটের পায়ায় লটকানো কাগজটায়। এখানে ভর্তি করা হয়েছে আপনাকে ৬ই সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে এগারোটার সময়। বারো তারিখ আজ—ছ'দিন হলো—,

'সেপ্টেম্বর?'

'হ্যাঁ—তাই তো। কেন? বিস্ময় ডাক্তারের চোখে। 'কি করে হবে সেপ্টেম্বর, বলুন জুলাই।'

লড়াইয়ের দিনটা ছিলো ঊনত্রিশে—আর দুর্ঘটনাটা ঘটে সেই রাতেই—, 'জানি না তো তা—তবে ৬ই সেপ্টেম্বর আপনার ভর্তির তারিখটা আমি স্থির নিশ্চিন্ত এ সম্পর্কে—, 'উঁহু আমাকে খুঁজে পাবার আগে বলছেন আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম এক মাস ধরে?'

হাসি ফুটলো ডাক্তারের ঠোঁটে, 'না', তা নয়—আপনাকে তো পাওয়া যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেখানে আওয়াজ শুনে ছুটে যায় পুলিসের এক টহলদার কনস্টেবল—অবশ্য সে বলতে পারে না কি করে কি হলো তবে সে হাজির হয়েছিলো ঘটনার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই। ওরা এখানে আনে আপনাকে তার ঘণ্টা খানেক পরে।' চেটে নিলাম ঠোঁট জিভ দিয়ে 'ডাক্তার ঠাট্টা করছেন? ডাক্তার বসলো বিছানার এই কোণে, 'না, তবে মাথা খারাপ করার তো কিছু নেই এই নিয়ে আপনার। এ অবস্থা চলবে আপনার এখন বেশ কিছুদিন, মনে হবে সব এলোমেলো ঘটনা—দিনক্ষণ অতীত। তারপর, ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব। স্বাভাবিক হয়ে আসবে স্মৃতিশক্তি।' সে একটু থেমে বললো, 'একটা কথা আর, জ্বালাতে দেবেন না বেশী খোঁচড়গুলোকে। আমি বলেদিয়েছি ওদের। ওরা সাহায্য চায় আপনার—ওরা এটা উপলব্ধি করেছে যে স্বেচ্ছাকৃত নয় আপনার ভুলগুলো। আপনার শুধু বিশ্রাম চাই এখন পূর্ণ বিশ্রাম।

আর কি শুধু সময়ের ব্যাপার—' উদার ডাক্তার মানুষটা অনেক করেছে আমার জন্য, কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু এতে ছেদ পড়ছে না তো আমার ভাবনার। জানি আমি তো, আমার লড়াইয়ের দিনটা ছিলো ঊনত্রিশে জুলাই মিয়ামির ছোড়াটার সঙ্গে—আর সংঘর্ষটা ঘটেছিলো সেই রাতেই। ঘটনার হেরফের হবে না তাতে ও যাই বলুক। ডাক্তার আর তর্ক করে লাভ নেই এ ব্যাপারে। একটা উপকার করবেন আমার? নিশ্চয়, বলুন। ডেলা—মানে এখানে নিশ্চয় আছে সেই মেয়েটাও, ওকেই করুন না জিজ্ঞাসা—সে আপনাকে খুলে বলতে পারবে ঊনত্রিশে জুলাইয়ের ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করতে পারেন ওর স্বামীকেও, সেও বলবে একই কথা—।

মুখের হাসি তরুণ ডাক্তারের মিলিয়ে গেলো, 'আচ্ছা, ধরা যাক এ ব্যাপারটাই—স্বামীর ব্যাপারটা ওর ওই—এ রকম পাওয়াই যায়নি তো। গাড়িতে ছিলেন ওই মহিলাটি আর আপনি—, আওয়াজ উঠলো বুকে টিকটিক, 'বেশ তো বললাম খানিক পরে মানলাম—গাড়িতে ছিলো না আর কেউ। তাহলে জিজ্ঞাসা করুন ওই ডেলাকে আপনারা এটা তো মানছেন ও ছিলো জিজ্ঞাসা করুন ওকে যান—'

কষ্ট হচ্ছিলো বলতে একসঙ্গে অনেক কথা। ডাক্তার হাত চালিয়ে দিলো তার মসৃণ কালো চুলে। নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে ঠোঁটের হাসি, 'এটা আপনাকে জানাতাম না দুদিন আগে হলে—

কারণ অবস্থা ছিলো না আপনার শোনার মতো। এখন বলি—ঘাড় মটকে গিয়েছিলো মহিলাটির। পাওয়া যায় যখন আপনাকে, বেঁচে নেই উনি তখন—' পুলিস লেফটেনান্ট বিল রিস্কিন এলো বিকেলে। সন্দেহ থেকে যেতো ওর পদমর্যাদা সম্পর্কে নার্স পরিচয় করিয়ে না দিলে।

বিষাদের ছোঁয়া কেমন একটা উত্তর চল্লিশের ছোট খাটো মানুষটার মুখে, নিরীহ একজোড়া চোখ শুঁড়ওলা চশমার ফাঁকে। রিস্কিন নিঃশব্দ পায়ে ঢুকলো টুপি হাতে নিয়ে। লোকটা কথা বলে অত্যন্ত নরম গলায়।

আমার উদ্বেগ বাড়লো কারণ ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলো আমাকে মোটা সার্জেন্টটা হৈ-হুঙ্কার করে। কিন্তু এ তো—রিস্কিন বসলো আমার বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে। নজরে পড়লো ওর জুতো আর সাদা মোজা পায়ের ওপর পা-চাপিয়ে বসতে। সে নাচাতে লাগলো সরু পাটা।

'ভাই কেমন আছো?' রিস্কিন প্রশ্ন করলো মোলায়েম গলায়।

ভালোই আছি বললাম। সেই সঙ্গে আবার মুঠোয় নিলাম চাদরের কোণাটা। সন্দেহ করছি ওকে—ঘেমে গেছি, শুধু ওকে কেন সবাইকে।

আচ্ছা, বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবছে কি ওরা আমাকে? কে জানে। 'তুমি বিপর্যস্ত' ডাক্তার বলেছিলো—কিন্তু কেন তা হবে। তোমার আগে অনেকেই পেয়েছে তো মাথায় চোট, স্মৃতিভ্রংশও হয়েছে তাদের সাময়িক। এখন আমার ওপর ওসব ছেড়ে দিয়ে একটু হাল্কা হওতো চিন্তা ভাবনার ব্যাপারটায়। লেফটেনান্ট সাহেব পা নাচিয়ে চললো।

তাহলে এই রকম দাঁড়াচ্ছে ঘটনাটা—মারা গেছে মেয়েটা। তাহলে সে পালিয়েছে। তোমাকে যদি কেউ মেরেও থাকে। আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের শিক্ষা দেওয়া এই লোকটাকে এবং তার দলবলকে খুঁজে বের করার কাজটা সহজ হবে তোমার সাহায্য পেয়ে, আর তুমিও চাও তাই তো—তাই না? চাই, বললাম।

রিস্কিন চোখে চোখ রাখলো আমার। আচ্ছা তুমি ভবঘুরে কি সত্যি?

'হু' গাড়ি চালাতে দিয়েছিলো মেয়েটা তোমাকে?

দিলাম না জবাব। ওরা বুঝলাম না কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে আমার গাড়ি চালানোর ব্যাপারটায়। আমার ঘাড়ে কি চাপাতে চেষ্টা করছে ডেলার মৃত্যুর ব্যাপারটা? আবার বাড়লো অস্বস্তি। প্রশ্নটা পুনরুচ্চারণ করলো রিস্কিন তার স্বভাব-শান্ত গলায়, সে মুখে হাসিও ফোটালো আমাকে সাহস যোগাতে।

চালাচ্ছিলাম না আমি গাড়ি। বললাম গলা তুলে। মেয়েটাই চালাচ্ছিলো—পাশে ছিলাম আমি ওর স্বামী পেছনে ছিলো—আর একথা কতবার বলতে হবে আপনাদের? ভেবেছিলাম এবার খেপে যাবে রিস্কিন। কিন্তু...না সে শুধু একটু হেলালো মাথাটা—আরো স্পষ্ট হলো মুখে বিষাদের অভিব্যক্তিটুকু ভাই, আমি দুঃখিত—কোনো কারণ নেই তোমার উত্তেজিত হবার। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে আমার মনে হচ্ছে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে—। হয়েইছে তো! ঐ সার্জেন্ট ভদ্রলোকটা আপনাদের—। যেতে দাও—ভাই যেতে দাও ওর কথা। ওতো শুধু লোক খেপাতে শিখেছে গলা হাঁকড়ে—দোষ লাইনের।

কিন্তু ওসব কিছুই আমি—।

কথাটা রিস্কিন শেষ করলো হাসি দিয়ে। কিন্তু, থেকেই গেলো সন্দেহের রেশ—তবুও ভালো লাগছে ওকে। কোত্থেকে তুললো বল তো তোমাকে মেয়েটা? হেটে চলেছিলে তুমি—নাকি দিতে চাইলো লিফ্ট—ব্যাপারটা কি হলো?

না। অনুমান ভুল আপনাদের। আমাকে বলতে দেবেন দয়া করে সব গোড়া থেকে? হ্যাঁ, চাইছি তো ঠিক তাই-ই... রিস্কিন নোটবই বের করে ফেললো দ্রুতহাতে পকেট থেকে। 'ভাই কিছু কিছু নোট করবো আপত্তি না থাকলে মনে থাকে না সব কথা—বয়েস হচ্ছে তো—সে লেখার আসল ব্যাপারটাও বোঝালো চোখ মটকে। সব খুলে বললাম। বড়লোক হবার স্বপ্ন, পিটসবার্গের কৈশোর কাহিনী, কি করে এলাম পেলোট্রায়।

বললাম চোয়াল ভাঙার গল্প ম্যাক্‌ক্রেডীর—বললাম লুকোচুরির কথাটাও পেট্রেল্লির সঙ্গে। জানাতে ভুললাম না সে কথাও। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো ডেলা। সবিস্তারে বললাম

পেপি—বেনোর উপাখ্যানও। সবশেষে বললাম ব্র্যান্টের প্রস্তাবিত গাড়ি আর টাকার কথাটাও। অনেক সময় গেলো কাহিনী শোনাতে—শেষে ফিসফিসানিতে নেমে এলো গলা। তবু স্বস্তি পেলাম ভেবে সব বলতে পেরেছি। একটা কথাও বলেনি রিস্কিন সমস্ত সময়টা। কি সব লিখলো নোটবইতে সময় সময়। শেষে বললো কান চুলকে নিয়ে, 'যাক জানা গেলো তো সবই—তুমি ভাই একটা ঘুম দাও এবার শুয়ে, খুব পরিশ্রম গেছে।

পরিশ্রম যাচ্ছে আমারও, আর ঘুম কেড়েই নিয়েছে তো কর্তারা—চলি তাহলে রিস্কিন উঠে দাঁড়ালো, আবার দেখা হবে দু-একদিনের মধ্যে। শোনা যাবে কিছু মনে পড়ে যায় তো এর মধ্যে কিছু—আর আমার বলার কিছু নেই, গা এলিয়ে দিলাম নিশ্চিন্তে। আচ্ছা, চলি তাহলে শুয়ে পড়,—রিস্কিন ওয়ার্ড থেকে বেরোলো বেড়ালের পায়ে। কেটে গেলো দুটো দিন। বোধ করছি ভালো অনেকটা খুশী ডাক্তারও।

উঠতে পারবেন আপনি দিন দুয়েকের মধ্যেই—হাসলাম, অন্য কোনোখানে তো আমার ভাবনা। রিস্কিন তো এ কদিন ঘুম দিচ্ছে না নাকে তেল দিয়ে। কে জানে এবার সে উদয় হবে কি মূর্তিতে! ডাক্তার কেমন হয় একটু ঘুরে দেখলে শহরটা? এত কথা শুনেছি যে লিঙ্কন বীচ সম্পর্কে। এটা লিঙ্কন বীচ কে বললো আপনাকে? এতো মিয়ামি, বিস্ময় ডাক্তারের কথায়—'মিয়ামি। ওর দিকে তাকালাম অবিশ্বাসের চোখে। কিন্তু একটা হাসপাতাল আছে না লিঙ্কন বীচে? আছে হুইস্কি—প্রায় আমাদের এটার মতোই ভালো হাসপাতালই—তাহলে ওরা ভর্তি করালো না কেন আমাকে ওখানে? আসার দরকার ছিলো না কিছু দুশো মাইল দূরে মিয়ামিতে।

মাইল সত্তরেক হবে—দুশো নয়—শান্তস্বরে বললো ডাক্তার। এখানে আপনাকে আনা হয়েছে লিঙ্কন বীচ থেকে মিয়ামির কাছাকাছি ছিলেন বলেই—বাড়লো উত্তেজনা, কিন্তু পেলোট্রার শহরতলীতে লিঙ্কন বীচের রাস্তায় আমরা তো দুর্ঘটনার সময়—'

'বারণ করেছি না আপনাকে ভাবতে।'

ডাক্তার বললো কপট গাম্ভীর্যের গলায়। 'ঠিক হয়ে যাবে সব—বিশ্রাম নিনতো কটা দিন—।'

আবার দুর্ভাবনা শুরু হলো একা শুয়ে থাকতে থাকতে। গোলমাল হয়ে গেলো নাকি সবকিছু।

ঝাঁকিয়ে নিলাম মাথাটা—শক্ত রাখতে হবে নার্ভ। নইলে পাঠিয়ে দেবে হয়তো পাগলা গারদে। ওদের ব্যবস্থা মেনে নিলাম। ঘরটা সত্যিই সুন্দর বসে বসে দেখতে পাবো দিনভর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা। কিন্তু সায় দিলো না মন। মনে হলো আমাকে এখানে আনা হয়েছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই—জানা দরকার...কি সেটা? প্রায় ছটা বিকেল। জলের ঢেউ শুনছি বিছনায় বসে।

ঢুকলো রিস্কিন—ব্রাদার কি খবর? আছো কেমন? ভালো বলে ফেললাম কোনো ভূমিকা না করেই। আচ্ছা, ওরা কেন আমাকে ঢোকালো এ ঘরে?

রিস্কিন ধীর পায়ে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে, 'খরচ কত জানো এ ঘরে থাকার? 'জানি, আর জিজ্ঞেস করছি জানি বলেই তো—' রিস্কিন বসলো চেয়ার টেনে, বললো গলা নামিয়ে, 'আমি যে যাতায়াত করছি সেটা রুগীদের জানতে দিতে চান না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ভালো তো ডাক্তার লোকটা—তাই খারাপ লাগবে ভেবে তোমার কাছে ব্যাপারটা—'

রিস্কিন মুছে নিলো মুখটা রুমাল দিয়ে। ওর নিরীহ মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। নিঃশ্বাস নিলাম একটা লম্বা।

রিস্কিন সাহেব কি জানেন মনেই হয়নি ওটা আমার। আমার ধারণা সরানো হয়েছে আমাকে মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে ভেবেই—' রিস্কিন বের করলো সিগারেটের প্যাকেট পকেট থেকে। একটা খাবে নাকি? সিগারেটটা নিলাম হাত বাড়িয়ে। 'ভাই ওসব একদম ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে আজে বাজে চিন্তা—' হালকা গলায় রিস্কিন বললো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা, হাতকড়া আমার হাতেই পরাবে আবার এ ব্যাপারটা দেখলে নার্সটা।

তবে, এ জন্যেই তো আছে ওরা, কি বলো, রিস্কিন মুখে নির্মল হাসি ফোটালো। আমিও বের করলাম দাঁত, 'আজ মনে হচ্ছে অনেক ভালো। তবে বড় খারাপ মনটা—আমি ছিলাম আপনার অপেক্ষাতে—লম্বা টান দিলাম সিগারেটে। 'ব্যস্ত ছিলাম একটু।' রিস্কিন অনেকক্ষণ দেখলো সিগারেটের আগুনটা।

'তোমাকে চমকে দিবো একটা খবর দিয়ে—পারবে তো সহ্য করতে?'

'হয়তো পারবো, ব্যাপার কি?' গাড়িটা ছিলো না বেন্টলে, বুইক ছিলো। পাওয়া যায় তোমাকে চালকের আসনে। পেছনে ছিলো মহিলাটি, তাকে বের করতে হয় গাড়ির দরজা কেটে। গাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমি সেই জায়গায় নিজে ঘুরেছি, দেখেছি ছবিগুলো, দেখেছি বুইকটাও। প্রথম দেখতে পায় যে কনস্টেবলটা আমার কথা হয়েছে তার সঙ্গেও—আমি ওর কথা নিঃশব্দে শুনেছি। বলতে পারলাম না মুখের ওপর এটা যে ও মিথ্যা কথা বলছে।

নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে সমস্ত রক্ত আমার মুখের বুঝতে পারছি, মাটিতে পড়ে গেলো সিগারেটটা হাত থেকে।

রিস্কিন সেটা ঝুঁকে তুলেছিলো। আরে, হোলো কি? চমক আছে বললাম তো তোমাকে—হলো কি! তাকাচ্ছো যে অমন ভাবে? আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—আপনি!' বলে উঠলাম স্বাভাবিক গলায়। আহা—কেন চটছো? এসো, যদি আর কিছু বেরোয় একটু আলোচনা করা যাক ব্যাপারটা নিয়ে—' উন্মাদ হয়ে যাবো এবার সত্যিই মনে হলো আমার। ভাবলাম দৌড়ে পালাই খাট থেকে নেমে, দু চোখ যায় যেদিকে...সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে রিস্কিন মিথ্যে না বললেও। কানে এলো ওর শান্ত গলা, ব্যাপারটা ঘটেছিলো উনত্রিশে জুলাই তাই না? তুমি বলেছিলে। এদিকে দ্যাখো, যে তারিখে তোমাকে পাওয়া গেলো সে তারিখটা হলো ৬ই সেপ্টেম্বর দুর্ঘটনার পর। পরিষ্কার তার উল্লেখ আছে বলস্টে—। একই কথা লেখা হাসপাতালের খাতাতেও, তাহলে? কি বলবে এবার? কিছুই না, এখনও তাই বলছি আগেও যা বলেছি—সেটা হচ্ছে উনত্রিশে জুলাই লড়াইয়ের দিনটা ছিলো মিয়ামির ছোকরার সঙ্গে আমার লড়াইয়ের. আর অ্যাকসিডেন্টটা হয় লড়াইয়ের পর—যাক, কিন্তু খবর পেলাম আমি তো—একটু হদিস পেয়েছি আমি এ ব্যাপারে আমার মনে হয়।

কথাও হয়েছে এ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে, ঠিক পথেই আমি চলেছি—ওর মতে। অবশ্য শক্ত হতে পারে ব্যাপারটা গ্রহণ করা তোমার পক্ষে। শোন—আরো কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে তোমার, ডাক্তারের ধারণা। মানুষের মনে উদ্ভট চিন্তা ঢোকে মাথায় আঘাত পেলে। এখন মেনে নাও আমি যা বলছি দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। সহজ হয়ে আসবে ব্যাপারটা অনেক, দুজনের কাছেই—।

বুলিয়ে নিলাম জিভ শুকনো ঠোঁটে। বলুন—, একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো রাস্তায়—পেলোট্রার বাইরে—প্রচণ্ড গতিতে সংঘর্ষটা হয়েছিলো ধাবমান পরস্পরমুখী দুটো গাড়ির মধ্যে। উল্টে গিয়েছিলো দুটো গাড়িই। ওরই একটায় আগুন ধরে যায় বেন্টলে গাড়িটায়— রিস্কিন নতুন করে সিগারেট ধরালো, জনি ফারার বলে একজন মুষ্টিক গাড়িটা চালাচ্ছিলো—মারা গেছে সে—। চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে,-মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার—' বললাম হাত দিয়ে নিজের বুকে, জনি ফারার—আমিই ফারার—সস্নেহে রিস্কিন হাত রাখলো আমার পিঠে। 'জট ছাড়াবো দুজনে বসে বলেছি তো ভাই, সুযোগ দাও আমাকে একটু, শোনো শেষ পর্যন্ত কি বলতে চাইছি—এগিয়ে দিলাম মাথার বালিশ, আমার শরীর কাঁপছে আতঙ্কে।

কাগজে ছাপা হয়েছে দুর্ঘটনার পূর্ণ বিবরণ—ওরা লিখেছে সবই। দেখাবো, দেখতে চাও—? রিস্কিন তাকালো জানলার বাইরে লম্বা টান দিয়ে সিগারেটে, পরে ঘুরলো আমার দিকে। নিশ্চয় পড়ে থাকবে তোমার চোখে খবরটা, হয়ে থাকতে পারে মানসিক প্রতিক্রিয়াও। ভাবতে শুরু করে দিলে নিজেকে ফারার বলে, তুমিও অ্যাকসিডেন্টে পড়ে সপ্তাহ পাঁচেক পরে। নিশ্চিত হলে জ্ঞান হওয়ার পর—বুঝলে, তুমিই ফায়ার! এই বিভ্রান্তি থাকবে তোমার মনে আরও কিছুদিন, তাই মত ডাক্তারেরও—রিস্কিন সিগারেটটা পিষলো ভালো করে পায়ের তলায় ফেলে, শুধু বিশ্রাম এখন, আর ভুলে যেতে হবে এটা—যে তুমি ফারার—। ছিলে না তুমি গাড়ির গ্যাঁড়াকলে। উনত্রিশে জুলাইয়ের—মুষ্টিযোদ্ধা নও তুমি।

তুমি অংশ নাওনি কোনো লড়াইয়ে—ভ্রূ কুঁচকে তাকালাম রিস্কিনের দিকে। আমি বিশ্বাস করছি না আপনার এসব ভুতুড়ে গল্প। আপনার কি মনে হয়? মুহূর্তের জন্যেও নয়। ফারার আমি-লড়াই হয়েছিলো আমারই মিয়ামির ছোড়াটার সঙ্গে আর আমিই লাগিয়েছি ওর দাঁতকপাটি—এই হাতেই

আমার—' রিস্কিনের নাকের সামনে হাতটা মেলে ধরলাম। আর আমার হাতে লোকও আছে শুনুন। এ সব প্রমাণ করাব, তারা থাকে পেলোট্রাতেই। কাফে চালায় টম রোশ আর তার স্ত্রী অ্যালিস। তাদের নিয়ে আসুন—হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে রোশ নামটা। কথা হয়েছে তার সঙ্গেও। কথা হয়েছে ও ছাড়া ওর স্ত্রী অ্যালিস আর সলি ব্র্যান্ট বলে একজন লোকের সঙ্গেও। তারা সনাক্ত করেছে মৃতদেহ। কাগজে পড়েছো বলেই বোধহয় ওদের সম্পর্কে...

দাঁড়ান—খামচে ধরলাম ওর হাতটা।

বললেন সনাক্ত করেছে। কার মৃতদেহ?

কেন ফারারের—এই দ্যাখো রিস্কিন পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরলো ভাঁজ করা কাগজ, সব আছে এতেই—

হ্যাঁ। আছে সবই, সবই রিস্কিন যা বলছে। শুধু ব্যাপার একটা ছাড়া। বেন্টলে গাড়িটা আমি নাকি চুরি করেছিলাম কাগজে বলছে। আর দায়ী করেনি নাকি মালিক। ফেলে দিলাম ছুঁড়ে কাগজটা, রীতিমত এবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বলে চললো রিস্কিন।

চেষ্টা করেছি খুঁজে বের করতে বেন্টলে গাড়িটা, কিন্তু নম্বরটা জাল। পাওয়া গেছে বুইকটা—ওটা কার! পেয়েছেন? কথাগুলো ছাড়লাম একদমে। রিস্কিন হাসলো, তোমার— জনরিক্‌কা তোমার নাম। ঠিকানা—৩৯৪৫, ৪নং অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্র্যাঙ্ক বুলেভার্ড, লিঙ্কন বীচ—মিথ্যে—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা নয় করা হয়েছে সনাক্ত তোমাকে—কে? শুনি কে করেছে সনাক্ত? বলে উঠলাম অধৈর্য গলায়।

এক সম্পর্কের ভাই তোমার। আর এই কেবিনে তুমি তার দৌলতে। ও এই ব্যবস্থা করেছে তোমার খবর পাওয়া মাত্র—ভাই নেই কোনো আমার আর রিক্‌কা নামও আমার নয়—বসিয়ে দিলাম একটা ঘুষি। আপনি বকছেন আবোল-তাবোল—না। রিস্কিনের গলা তেমনি শান্ত, ও দেখে গেছে তোমাকে গতকাল রাতে, তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। সে সেই সময়ই দিয়ে গেছে তোমার পরিচয়ও। তাই বলছে গাড়ির রেজিস্ট্রি খাতাও। মাথায় শুরু হয়ে গেছে অসহ্য যন্ত্রণা, বললাম কোনো রকমে, বিশ্বাস করি না আমি এর এক বর্ণও—আমি ফারার—ছেড়ে দিলাম বালিশে মাথা। রিস্কিন একটু কান চুলকে নিলো আমার মুখে দিকে তাকিয়ে। এখন উত্তেজনার সুস্পষ্ট সাক্ষর তার চোখেমুখে। কিন্তু ঠোঁটে রেখেছে উদার হাসিটুকু—যে অভিব্যক্তি দেখা যায় কথা বলার সময় অপ্রকৃতিস্থ মানুষেব সঙ্গে। রিস্কিন মুখ খুললো বেশ কিছুক্ষণ পরে। এক কাজ করা যাক তাহলে—আমার মনে হয় হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে ওর সঙ্গে দেখা হলে।

জনি একটা ঝড় বয়ে গেলো তোমার ওপর দিয়ে—ডাক্তারের ধারণা তুমি—সান্ত্বনা দিতে পারবো আমি তোমার এই অবস্থায়। আমি এসেছি সেজন্যেই—আবার মনটা কেঁপে উঠলো অজানা আতঙ্কে। এমন কিছু ছিলো যা সাবধান করে দিলো আমার মনকে লোকটার হাসি মুখের আড়ালে।

কথা বলতে চাই না আমি আপনার সঙ্গে—রিক্‌কা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আমার নাকে পৌঁছলো সে নিঃশ্বাসের ঢেউ। ঝলসে উঠলো আংটি বাইরে থেকে আসা সূর্যের আলোয়, কিন্তু একবার ভাবো জিনির কথা—দেখতে চায় ও তোমাকে, জনি—আচ্ছা শেষ নেই কি এর! আমার হাত চলে গেলো চাদরের প্রান্তে। সেটা খামচে ধরলাম। বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন।

কোন দরকার নেই এখানে আপনার, আসুন আপনি—। ভুলে গেলে জিনিকে? ওকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে। রিক্‌কা ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর।

জানো কি বলে ডাকে ও লোকটাকে দপ্তরের সবাই—'শেয়ালে রিস্কিন!' রিক্‌কা হাসলো খ্যাঁক খ্যাঁক করে। 'করছে দেখছি খুব ভাই বেরাদার। ভাবছো ও সাহায্য করবে তোমাকে? 'না, লোকটা মাড়াবে না সে ধারই—খুনের গ্যাঁড়াকলে ফাঁসাবে কথা বের করে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে।' কিছুই বুঝছি না মাথামুণ্ড। একেবারে মেরি গেছি ঠাণ্ডা।

'কয়েদখানার বাইরে আছো এখনো তুমি আমার জন্যেই—রিস্কিন শুধু বের করার অপেক্ষায় রয়েছে খুনের মোটিভ। আমি বলে দিতে পারতাম ওকে সবই। শুধু একটা কারণে মুখ বন্ধ রেখেছি, একটা চুক্তি করবো বলে তোমাতে আমাতে—শুনতে চাই না আমি কিছু, বেরোও তুমি—মেয়েটা কে ওরা জানে না—লোকটা নির্বিকার বলে চললো, তুমি ডুববে ফাঁস করে দিলে। অবশ্য, আমি

এটা চাই না ওরা জানুক—কিন্তু হয়েই যায় যদি জানাজানি, আমি মোকাবিলা করি এসবের সেভাবেই।

যা খুশি করো আমার কেউ ভাই নেই, তাছাড়া কখনো এর আগে তোমায় দেখিনি, কেমন? রিক্কা পূরণ করে দিলো আমার পদ, কিন্তু ভালো হবে কি জানিয়ে দেওয়াটা রিস্কিনকে যে আমি তোমার ভাই নই—তোমার ঘাড়ে তিন-তিনটে খুনের ঝামেলা, যথেষ্ট নয় কি একটাই? সেই হাসির বিস্তার তার ঠোঁটে। দেখা দিলো সরষে ফুলের প্রাচুর্য আবার আমার চোখে—কি করবো যা অবস্থা মাথার গুলিয়ে ফেলছো অন্য কারোর সঙ্গে আমাকে বললাম কোনোরকমে। আমার নাম রিক্কা নয় জন ফারার। আমার কোনো সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে—

নিয়ে নিলাম একটা ঢোঁক, এখন বিদেয় হবে কি দয়া করে? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে একসঙ্গে কথা বলে। জানি। আমি জানি যে তুমি জন ফারার। বাইসনারকে আর পল ওয়ার্দমকে তুমি সাবাড় করেছো এও জানি, আর—ওর ঠোঁটে একফালি দুষ্টুমির হাসি খেললো, খতম করেছো তুমিই মেয়েটাকেও। অবশ্য ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো, বন্দুকটা না পাওয়া গেলে, কিন্তু বন্দুকে ছাপ পাওয়া গেছে ওর আঙুলের—ওর চোখে তাকিয়ে একটু ঝুঁকে, বললাম ফিসফিসিয়ে, এসব আসছে কোত্থেকে রিক্কা—ফিক্কার ব্যাপার? তুমিই রিক্কা রিস্কিনের ধারণা, কপালে বোলালো লোকটা মোটা আঙুল, আর সুযোগ নেবো আমরা যতক্ষণ পরিবর্তন না ঘটছে ওর ভাবনার—তুমিই ফারার ও জানবে যে মুহূর্তে—শুনতে পারছি না আর কিছু, চাইও না। ঢেকে ফেললাম মুখ হাত দিয়ে।

বিশ্বাস করতে পারছো না তাহলে আমাকে, এই তো? বেশ প্রশ্ন করো তুমি নিজেকেই—এই মাথা ব্যাথা কেন তোমার জন্য আমার—ভাবো সেটা। তুমি বেরিয়ে যেতে পারো যখন খুশি এখান থেকে, তাতে যায় আসে না আমার কিছু, আমি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি ওই মেয়েটার কথা, ও ভাবছে তোমার জন্য—ও বসে আছে তোমার পথ চেয়ে—সে আরো নামালো গলা।

আমাকে দিয়ে দাও টাকাটা। বলো, কোথায় রেখেছো টাকাটা?

'জানি না—আর, বলবো না জানলেও। বেরোও তুমি এখন—দিলাম গলা চড়িয়ে। ওর মুখটা হয়ে গেলো হিংস্রতার মুখোশ, প্রতিমূর্তি যেন দানবের।

বোকা কোথাকার! ওর গলা কাঁপছে। ভাবছো, আমি বিশ্বাস করি তোমার এই স্মৃতি বিলুপ্তির অভিনয়। তুমি এমন অবস্থায় পড়বে না বললে কোথায় রেখেছো, না জন্মালেই ভালো ছিলো তখন মনে হবে। কি, রেখেছো কোথায়? বলছি বেরোও—খামচে ধরলাম বিছানার চাদর। বন্ধ হলো হাঁটু বাজানো, রিক্কা উঠে দাঁড়ালো। মুখে বিস্তৃত হলো অর্থহীন নির্বোধ হাসিটুকু। 'চলি—তুমি তো খেলতে চাইছো এই ভাবেই? ঠিক আছে—তাহলে জানিয়ে দিই ব্যাপারটা রিস্কিনকে—ও চোখ রাখলো হাত ঘড়িতে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে কয়েদে পোরার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই; রেহাই থাকলেও একটা খুনের। জুটবে না তিনটের রেহাই, কি বলো? রিক্কা ফিরে দাঁড়ালো নিঃশব্দে দরজা পর্যন্ত গিয়ে। কি করবে? দরজা দেখিয়ে দিলাম বুড়ো আঙুলের ইশারায় শরীরী রিক্কা যেমন ঢুকেছিলো বেরিয়ে গেলো তেমনি। একজন সেবিকা ঢুকলো মন তৈরী করার আগেই এসবের বিশ্লেষণ করার।

সেবিকা আলমারির দিকে হাত বাড়ালো।

ডাক্তার বলছিলো ছেড়ে দেবে শীগগিরই তাই—আচ্ছা, ঘুমাবার চেষ্টা করি এবার একটু।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিলাম সুন্দর ফুলগুলো—বিছানাতে উঠে বসলাম ও বেরোতেই। পালাতে হবে এখান থেকে—দূরে কোথাও রিক্কা আর ওই রিস্কিনের কাছ থেকে। আমার মনে হচ্ছে দুটো জিনিষ এক, হয় ওরা আমাকে গুলিয়ে ফেলছে অন্য কারুর সঙ্গে না হয় আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছে ওদের একজন বা দুজন। দেখলাম ঘড়ি, ছটা বেজে কুড়ি।

বেরোতে হবে সিঁড়ি ধরেই। ফিরলাম। ঘরে ফিরে দাঁড়ালাম জানলার সামনে। ঘরটা সাত তলায়। তাকালাম নীচে, মানুষের ভীড় অসংখ্য সূর্যস্নানরত। না হবে না এখান দিয়েও। ফিরে এলাম গলার আওয়াজ পেয়ে দরজার বাইরে। সন্তর্পণে ডাক দিলাম, ফিরতে হতে পারে বিছানায় যে কোনো মুহূর্তে। একজন চালক আর সেবিকা এগিয়ে আসছে একটা ট্রলি ঠেলে। ফিরে তাকালাম

টেবিল ঘড়ির দিকে—দশ মিনিট বাকি সাতটা বাজতে। হাতে সময় বিশ মিনিট, কাজ সারতে হবে এর ভিতর। দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, চিন্তার জট মাথায়।

কানে এলো ট্রলি চালকের কথা। ওকে নামাবো কথা বলে ডাক্তারের সঙ্গে। ফেলে এসেছি মর্গের কাগজটা—। এটা না ভুলে বসে থাকো কোন্‌দিন—নিজের মাথা আছে—তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। বললো ঠোঁট উল্টে সেবিকাটা। দ্রুত সরে গেলো সেবিকা চালক তার দিকে হাত বাড়াতে। নীচে নামতে শুরু করলো সেবিকা।

পেছন পেছন চালক। বাইরে পা দিলাম এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে। ঝুঁকে রেলিং ধরে সিপাই দুটো, চোখ নীচের দিকে—সেবিকার বোধহয় অবয়ব। ওরা পেছন ফিরে রয়েছে আমার দিকে। পেয়ে গেছি আমার পথ। উল্টোদিকের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম বারান্দা দিয়ে হেঁটে। ঘরে ঢুকে পড়লাম দরজার হাতল ঠেলে। পাথর হয়ে গেলাম ট্রলির দিকে চোখ পড়তেই—মৃতদেহ স্ত্রীলোকের... আচ্ছাদিত সাদা চাদরে। বাড়ছে উত্তজনা...মুখের ওপর ভালো করে টেনে দিলাম চাদর।

এখন কি করা যায়। সরাতে হবে একে কিন্তু কোথায়? চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরের চারপাশে, না, চোখে পড়ছে না সেরকম কোনো জায়গা। তাহলে? নজরে পড়লো একটা দরজা কোণের দিকে, প্রায় সেদিকে দৌড়ে গেলাম—ঘরের হাতল ঘুরিয়ে দিলাম।

কলঘর। কলঘরের দিকে ট্রলি ঠেলে নিয়ে চললাম দ্রুতপায়ে ফিরে, নামিয়ে দিলাম স্নানের টবে ট্রলি থেকে তুলে মৃতার হিমশীতল দেহটা। শীতল অনুভূতি হলো একটা নিজের শরীরেও। ঘুরে উঠলো মাথাটা। দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত কলঘরের দরজা ধরে। আগের জায়গায় ফিরে এলাম ট্রলি চালিয়ে। চাদরটা আপাদমস্তক টেনে দিলাম নিজের শরীরটাকে তার ওপর ছেড়ে দিয়ে। শুরু হলো প্রতীক্ষা। কাঁপুনিও, মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে।

ধরা পড়ে যাবো না তো এখান থেকে বেরোবার আগেই। ফিরে যাবো নিজের ঘরে? সময় আছে এখনও...ঘরের দরজাটা খুলে গেলো দোদুল্যমান ভাবনার মধ্যেই...রুদ্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস...শুনছি নিজের হৃৎস্পন্দন...শুরু করলো ট্রলি চলতে...কান দিয়ে পড়ে রইলাম। চালকের মৃদুস্বর শিস...গাড়ি চললো বারান্দা দিয়ে যেন অনন্তকাল এক একটা মুহূর্ত। কথার টুকরো কানে এলো। ওতে কি আছে?

মড়া মেয়ে মানুষের গলা পেলাম চালকের। 'দুশ্‌শালা বোধহয় জ্যান্ত মানুষ বাড়ি ফেরে না হাসপাতাল থেকে—' উহুঁ—কবরওলাদের কাছ থেকে যে কমিশন খায় ডাক্তার সাহেবরা। 'হু'—হয়েছিলো কি?' রোগটার যেন কি নামটা বলেছিলো নাকি যে পেরিটোনাইটিস—' গাড়ি চড়লো লিফটে। নেমে চললাম নীচে। চালক হালকা মেজাজে শিস দিয়ে চলেছে।

আওয়াজ উঠলো দরজা খোলার, নড়ে উঠলো ট্রলি। 'আই জো—' ভেসে এলো বামাকণ্ঠ।

'কি গো সোনা—' থেমে গেলো ট্রলি।

'আবার মরলো কে?'

'মিসেস এনিসমোর ওই চুয়াল্লিশ নম্বরের—' চালক গলা নামিয়ে দিলো।

তোমাকে কিন্তু আজ দারুণ দেখাচ্ছে এক মিনিট ছেড়ে দিয়ে আসি এটাকে— চালক গাড়ি ঠেলে দিলো ঝোলানো দরজার ফাঁকে—গাড়িটা থমকে দাঁড়ালো দেওয়ালে একটা ধাক্কা খেয়ে। চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রায় যন্ত্রণায়। নৈঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত। উঠে বসলাম চাদর সরিয়ে লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেতেই। অন্ধকার বন্ধ একচিলতে আলো আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে—ট্রলির সারি সারা ঘর জুড়ে। বাতাসে শীতল ঘ্রাণ। নেমে পড়লাম, এবারও প্রায় ভুলেছিলাম টুপিটা। ওটাকে চাপিয়ে দিলাম মাথায়। মুখ বাড়ালাম দরজার বাইরে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই, ফুরিয়ে এসেছে দিনের আলো। দেখতে পাচ্ছি দূরে গেট, আশেপাশে কেউ নেই। নেবে গেলাম রাস্তায়—যাবো কোথায়, জানি না কি করবো। পয়সা নেই পকেটে, রুমাল পর্যন্ত না একটা—কিন্তু, আমার তো ভাবনা নয় তা নিয়ে...দূরে সরে যেতে তো পারছি রিস্কিনের কাছ থেকে রিক্‌কার সংস্পর্শ থেকে...হাসপাতাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের পীতাঙ্ক আলো মিয়ামির সৈকত জুড়ে।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে বালিয়াড়িতে নেভানো আলোগুলো। পাশে দুটো মানুষ বদলাচ্ছে পোষাক। একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ স্নানার্থী সম্ভবত। শুনতে পাচ্ছি ওদের কথা কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে কি বলছে। জনহীন সারা সৈকত।

লুকিয়ে বসে আছি আমি গড়ান গাছের আড়ালে ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা, ওরা এলো এমন সময়। গাড়ির কাছে চলে গেলাম আমি চু পায়ে, ওরা দৌড়ে জলে নামতেই। লোকটার কোটটা পড়ে চালকের আসনে—কোটটা তুলে নিলাম হাত বাড়িয়ে।

চামড়ার ব্যাগ টাকার ভারে স্ফীত কলেবর। টাকা অনেক! না, নিলাম না সব—মুড়ে ফেলে দিলাম পকেটে দেড়শো ডলার তুলে নিয়ে। ফিরে গেলাম গাছের আড়ালে আবার ব্যাগটা যথাস্থানে রেখে। মনটা থেমে থাকেনি তো, শরীর নিশ্চল থাকলেও তিনঘণ্টা। মিয়ামিতে বসে থাকবো না আমি নিশ্চয় ভাবছে রিস্কিন। হাঁটার অভ্যেস আছে আমার ও জানে। এতক্ষণে সাড়া উঠেছে কাছেই চেকপোষ্টগুলোতে। তাহলে—আপাতত থেকে যেতে হবে মিয়ামিতেই। গা ঢাকা দিতে হবে খুঁজে নিয়ে একটা শান্ত ছোট্ট হোটেল। একটা ঘর দখল নিতে হবে গল্প ফেঁদে। অপেক্ষায় রয়েছি বাক্স-প্যাটরার।

কিন্তু দৈহিক অবস্থা নেই আমার খোঁজাখুঁজি করার মতো। মানসিক তো নয়ই। বেড়ে চলেছে মাথার যন্ত্রণাও আর এতক্ষণে আমার চেহারার বর্ণনা চলে গেছে সব ফাঁড়িতে। শহর তোলপাড় করছে আমার খোঁজে, রিক্কাও। খুলে ফেলেছি ব্যান্ডেজ, এখন কিছু স্বস্তি পাচ্ছি টুপিটা পরে। একদিকে রেস্তোরাঁর ভীড় আর দোকান পসরা সারা তল্লাট জুড়ে আর একদিকে পোতাশ্রয়, সামনে সমুদ্র।

দেখেশুনে একটা হোটেলে ঢুকলাম আলো জ্বালিয়ে দিলো ঘরে ঢুকে বেয়ারা ছোকরাটা। বারান্দার ওই কোণে বাথরুমটা ও দেখালো আঙুল বাড়িয়ে, খুলবেন না ঝরনাটা। খারাপ হয়ে গেছে ওটা।

ছোট্ট ঘর। একপাশে খাট, একটি চেয়ার আর টেবিল। এক কোণে আয়নাও আছে। জীর্ণ কার্পেট মোড়া মেঝেয়। 'কি বলো বাকিংহাম প্রাসাদ?' ঠাট্টা করলাম।

স্যার তার চেয়ে বড়ই হবে একটু। ছোকরা জবাব দিলো অম্লান বদনে। বেয়ারাটা আমার দিকে তাকালো প্রত্যাশার চোখে টেবিলের ওপর চাবিটা রেখে। ওর হাতে গুঁজে দিলাম একটা ডলার, ছোকরা একটা ঢোক গিলে ফেললো বিস্ময়ে, স্যার আর কিছু চাই? রাত তো পড়ে আছে। মানে 'ওদের' ফোনের নম্বরগুলো আমার কাছে আছে। ছোঁড়াটা চোখের একটা ভঙ্গি করলো।

'এখন কেটে পড়ো তুমি' দিলাম নম্বরের চিরকুট পকেট থেকে বের করার আগেই। 'স্যার আমাকে ডাকবেন মন চাইলে—ম্যাডক্স আমার নাম।

আমাকে নীচেই পাবেন। শুধু উত্তরে তাকালাম মুখ তুলে দরজাটার দিকে। ম্যাডক্স বেরিয়ে গেলো ম্লানমুখে। একপাশে টুপিটা ছুঁড়ে দিলাম লোকটা বেরোনোমাত্র। কষ্ট হচ্ছে চোখ তুলে রাখতে এত শ্রান্ত হয়েছি যে।

মোলামেয় না বিছানাটা। কিন্তু তবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমার, এতে শরীর ছেড়ে দিতে। কিছুক্ষণ বসে রইলাম হাই তুলে শূন্য মনে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার চিরকালীন অভ্যেস টুপির মধ্যে একটা দশ ডলারের নোট রাখার, কাজে লাগতো দুর্দিনে। ভাবলাম সে অভ্যেস থাকা সম্ভব হয়তো এই টুপির মালিকেরও।

লাইনিংয়ের ফাঁকে ডলারটি রেখে দিলাম টুপিটা হাতে নিয়ে। পেনসিলে কটা কথা লেখা ঃ জন ফারার সি বোর্ড এয়ার লাইন রেলওয়ে, গ্রেটার মিয়ামি। বর্ণনা লেখা নীচের মালের ; স্যুটকেস একটা। ঘুম চলে গেছে চোখ থেকে—আমারই এই জামা-প্যান্ট-টুপি। খুঁজলাম রসিদের তারিখটা রয়েছে সেটাও ৬ই সেপ্টেম্বর। সময়ও দেওয়া ছটা বেজে পাঁচমিনিট। আমি যেন ভূতুড়ে পরিবেশে বসে নাস্তিকের চোখ নিয়ে—অনেকক্ষণ বসে রইলাম কার্পেটে চোখ রেখে। নেই কোনো সন্দেহ উধাও হয়ে গেছে আমার স্মৃতিপট থেকে পঁয়তাল্লিশটা দিন।

আর ঐ সময়টুকুর মধ্যে বিশ্বাস করলে, রিক্কার কথা বিশ্বাস করলে, তিন তিনটে খুন আমার হাতে হয়েছে। একটি নারী আর দুটো পুরুষ। হয়তো সত্যি নয় রিক্কার কথা—কিন্তু ওই দিন

গুলিতে কি ঘটেছে তা জানতে হলে ফিরে যেতে হবে প্রকৃতিস্থ অবস্থায়—একটা খতিয়ান মিলবে ভাগ্য প্রসন্ন হলে। মাথায় চোট পেয়ে ছিলাম বেল্টলে থেকে ছিটকে পড়ে। সেই মুহূর্ত থেকে আমার মন থেমে ছিলো হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত।

হাতে নাড়াচাড়া করছি কাগজটা, হয়তো রহস্য লুকিয়ে আছে আমার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো এই স্যুটকেসের মধ্যেই। আমার নাম লেখা রসিদে, সুতরাং স্যুটকেসও আমার। কিন্তু আমার তো জানা নেই কোথায় এয়ার লাইনের অফিস। অথচ আজ এখনই আমার চাই স্যুটকেসটা আমি স্থির হতে পারছি না ওটা না পাওয়া পর্যন্ত, আমার স্বস্তি নেই। হাত বাড়ালাম বেলটার দিকে। ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললাম ম্যাডক্সকে। সিগারেট চাই আমার, নির্দেশ দিলাম টাকমাথাকে। রিসিভার নামিয়ে দিলাম টেকো বিড়বিড় করে কথা শুরু করতেই। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো ম্যাডক্স মিনিট দুয়েকের মধ্যে। হাঁপাচ্ছে, 'স্যার মত পালটেছেন—' চকচক করছে তার চোখদুটো, 'স্যার আপনার কি পছন্দ। ওর নাকের সামনে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'সিগারেট?' উত্তরে বাড়িয়ে দিলো দ্রুতহাতে প্যাকেট বের করে। 'অল্পবয়সী মেয়ে—' 'হ্যাট খোকা ভুলে যাও এসব' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিলাম সিগারেটে আগুন দিয়ে। মেলে ধরলাম ওর চকচকে চোখের ওপর দুটো দশ ডলারের নোট।

'রোজগার করতে চাও এগুলো?' এবার ছেলেটার চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। কি করতে হবে বলুন। এগিয়ে দিলাম রসিদ, 'আনতে হবে এটা—' 'এই—স্যার এখন?' যদি চাও টাকাটা। ম্যাডক্স চোখ বুলিয়ে নিলো রসিদটায়। ক্রসবি তো আপনার নাম। ওর চোখে ছোঁয়া লাগলো সন্দেহের। ঢুকিয়ে দিলাম পকেটে নোট দুখানা মুড়ে। ম্যাডক্স জিভ কাটলো, না না স্যার, ও ব্যাপারটা ভুলে যান—' 'তাহলে ব্যবস্থা করো ওটা আনার—' ম্যাডক্স ছিটকে বেরিয়ে গেলো বন্দুকের গুলির মতো। স্মৃতিরোমাস্থনে মগ্ন হলাম অপেক্ষার মুহূর্তগুলোতে। একটা বুইক কনভার্টিবল আমি চালাচ্ছিলাম ৬ই সেপ্টেম্বরের রাতে। জন রিক্‌কা গাড়ির মালিক। মিয়ামি থেকে গাড়িটা চলছিলো পঁচাত্তর মাইল দূরত্বের রাস্তায়। একটা মেয়ে ছিলো আমার সঙ্গে—বলতে পারবো না সে ডেলা কিনা। ওই লোকটা ব্যাপারটা জানে—যে পরিচয় দিলো রিক্‌কা বলে।

কিন্তু সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে অজ্ঞ রিস্কিন। ঘটেছিলো একটা দুর্ঘটনা—আমি যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম গাড়ির ওপর আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ খবর নেই কোনো গাড়ির প্রতিপক্ষের। মারা যায় মেয়েটি, পুলিসের লোক আমাকে উদ্ধার করে অচৈতন্য অবস্থায়। ছিলো নাকি একটা বন্দুকের ব্যাপারও।

তাতে নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির আঙুলের ছাপও। রিস্কিনের বিশ্বাস দুর্ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত যে কোনো কারণেই হোক। মুখটা মুছে নিলাম হাতের চেটোয়। এটা বের করতে হবে যে মেয়েটা কে এবং বন্দুক কেন ছিল তার হাতে।

কেন গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম, সে ব্যাপারটাও বের করতে হবে। আমার নাকি লিঙ্কন বীচের 'ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে' ডেরা আছে রিস্কিন বলেছিলো। লিঙ্কন বীচে ডেলা আর তার স্বামী যাচ্ছিলো মনে পড়লো—সঙ্গী করতে চেয়েছিলো আমাকে—তাহলে লিঙ্কন বীচে হারানো দিনগুলো কেটেছে এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে। শুধু তাই নয়—ওই সময় টুকুর মধ্যে হয়ে গিয়েছিলো আমার একটা পাকা আস্তানাও। দামী স্যুট ছিলো আমার পরনে, মালিকও নাকি হয়েছিলাম দামী বুইক গাড়ির—কাজেই মালিকও হয়েছিলাম অনেক টাকার। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো ওই সময়ের মধ্যে মনে পড়লো রিক্‌কার কথা—লোকটা সরবরাহ করেছে অনেক অস্বচ্ছ তথ্য। আমার বাগদত্তা নাকি জিনি বলে একটা মেয়ে। আচ্ছা, তার দেখা পেয়েছিলাম কোথায়? সে এখনই বা কোথায়?

বলেছিলো লোকটা 'বাইসনার আর ওয়ার্দমকে তুমি মেরেছো—' কে ওরা?

'কোথায় লুকিয়েছো টাকাটা?' 'টাকা কিসের? তুমি যা খুশি করতে পারো এখান থেকে বেরিয়ে—ভাববে ওই! 'ও কে? আর কেন 'ও' ভাবতে যাবে আমার জন্যে? শূন্য মনে সিগারেট টেনে চললাম কড়িকাঠে চোখ রেখে। শেষ নেই যেন এ প্রশ্নের কিন্তু উত্তর?

উত্তর কে দেবে? বার বার মনে হচ্ছে একটা কথাই এ সমস্ত ছাপিয়ে—চলতে পারবো না

এক পাও টাকা ছাড়া। হাতে আছে শ' খানেক ডলার—বেশী সময় লাগবে না তা ফুরোতে। আর ফুরোলেই ত্যাগ করতে হবে আমাকে মিয়ামির মায়া—মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যেতে হবে। ছেদ পড়লো ভাবনায় পায়ের শব্দে।

উঠে বসলাম টুপিটা মাথায় চাপিয়ে। ম্যাডক্স সশব্দে মাটিতে নামালো একটা বড় চামড়ার স্যুটকেস। 'স্যার এই নিন, শালা ভারী প্রায় মনখানেক—' দেখেনিলাম ভালো করে স্যুটকেসটা—মনে হোল না এই স্যুটকেসটা কোনদিন দেখেছি। একটা লেবেল সাঁটা হাতলে—লেখা আমার নাম, হাতের লেখা আমারই! চেষ্টা করলাম তালাদুটো খোলার। নাড়ানো গেলো না। মজবুত তালা, ভারী, সময় লাগবে ভেঙে ফেলতে। স্যার শক্তই মনে হচ্ছে জিনিষটা, ম্যাডক্স আমাকে লক্ষ্য করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'হ্যাঁ, কিন্তু—হারিয়ে তো বসে আছি চাবিটা, তোমাদের আছে স্ক্রু-ড্রাইভার?' আবার সন্দেহের ছায়া নামলো ওর চোখে, অগ্রাহ্য করে আমি তা লক্ষ্য করলাম। 'ভাঙ্গবেন না তালা, একটা যন্ত্র আছে আমার কাছে।'

'সেটা আনো—' আবার ম্যাডক্স ছিটকে বেরোলো। বসে রইলাম একদৃষ্টে তাকিয়ে স্যুটকেসটার দিকে, মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ভয় আর উত্তেজনায়। এই স্যুটকেসের ডালা তুলে ধরার সঙ্গে কোনো হদিশ কি মিলবে হারানো দিনগুলোর?

আমি কি কিনেছিলাম এটা? চুরির মাল নাকি? ম্যাডক্স হুমড়ি খেয়ে পড়লো স্যুটকেসটার ওপর. তালা লাফিয়ে উঠলো একটা ধাতব বস্তু ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই।

'স্যার, সোজা কাজ—কিন্তু জানতে হয়—' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ম্যাডক্স হাত ঝেড়ে নিয়ে বললো। ওর হাতে তুলে দিলাম দুটো দশ ডলারের নোট। 'আচ্ছা, তাহলে কাল দেখা হবে—' আমি ব্যাকুল ওকে তাড়াবার জন্য। ম্যাডক্স স্যুটকেসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো প্রত্যাশার চোখে, তারপর দ্বিধাভরা গলায় বললে দরজার দিকে সরে গিয়ে, 'তাহলে দরকার নেই অপর কোনো—যেতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ ম্যাডক্স—' খিল তুলে দিলাম ও দরজা পেরোতেই। তালা খুলে দিলাম এক ঝটকায় বিছানায় ফিরে গিয়ে—ভাবিনি কি দেখব। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যা দেখলাম—প্রতি ইঞ্চি জুড়ে টাকা স্যুটকেসের—হা—হাজার হাজার ডলার—চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তাকিয়ে থাকতে থাকতে...বিছানায় সাজালাম একে একে বের করে আনকোরা নোটের বাণ্ডিলগুলো কাঁপা হাতে। সোয়া লাখ ডলার—কেন টাকার জন্য মাথা খুঁড়ছিলো রিক্‌কা সেদিন, এখন বুঝলাম।

ঘুরে উঠলো মাথাটা, ধরে ফেললাম খাটের রেল—আসছে হাঁটু ভেঙে—পড়ে গেলাম মাটিতে। কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না টাকার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও। খুনের মোটিভ। তাহলে কি আমি তিনটে খুন করেছি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই?

রিস্কিনের হাতে স্যুটকেস তুলে দিতাম কোন অভিযোগ না থাকলে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু, রিস্কিন তো সোজা হাতকড়া লাগিয়ে দেবে আমার হাতে আমার ঘাড়ে খুনের ব্যাপারটা চাপিয়ে দিয়ে। ওরা আমাকে তো খুঁজে বেড়াচ্ছে সেজন্যেই! জানা দরকার ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত, আর টাকা চাই সেজন্যেও। টাকা আছে আমার, খরচও করবো—যখন মনস্থির একবার করা গেল, জলবৎ হয়ে গেলো বাকি ব্যাপারটাও—হাত করলাম টাকা দিয়ে ম্যাডক্সকে, একশো দিতে হলো ম্যাডক্সকে টেকো সন্তুষ্ট হলো পঞ্চাশ নিয়েই। ওরা পেয়ে গিয়েছিলো আমার পরিচয়—আমার ছবি ছাপা হয়ে গিয়েছিলো খবরের কাগজে। খবরটা হচ্ছে এই লোকটাকে খোঁজা হচ্ছে একটি অজ্ঞাতনামা স্ত্রীলোককে খুনের অপরাধে। হোমিসাইড (নরহত্যা) বিভাগের লেফটেনান্ট বিল রিস্কিনকে জানান কোনো সূত্র দেবার থাকলে বা এর পরিচয় কারো জানা থাকলে।"

লিঙ্কন বীচের মাইল পঞ্চাশেক আগে কমিয়ে দিলাম গাড়ির গতি—কোথাও হবে জায়গাটা এখানেই। চোখে পড়লো সামনে একটা টিবি, ঝোপও ছায়া ছায়া, থামিয়ে দিলাম গাড়ি। পাঁচের ঘরে ঘড়ির কাঁটা—ফোটার দেরী নেই ভোরের আলো, দিনের আলোয় দিক-বিদিক ভরে যাবে মিনিট কয়েকের মধ্যেই। নিভিয়ে দিলাম হেডলাইট।

নেমে পড়লাম গাড়ি সরিয়ে দিয়ে রাস্তার এক পাশে। বসে রইলাম স্টিয়ারিংয়ে সিগারেট ধরিয়ে. বাড়ছে উত্তেজনা। করতে হবে অপেক্ষা, খুঁটিয়ে দেখতে হবে সবদিক দিনের আলোয়। ফুটলো

দিনের আলো, ছেড়ে দিলাম গাড়ি, থামালাম বেশ কিছু এগিয়ে। ওপড়ানো গাছ একপাশে চাকার স্পষ্ট দাগ ছেঁচড়ানো ঘাসে। তেমনি আছে সবই—মোছেনি ষাট দিনেও। এগিয়ে গেলাম আরো। গাড়ি থামালাম একটা ঝোপের আড়ালে, চলবে না কোনো ঝুঁকি নেওয়া। কোনো গাড়ি রাখা মানে বিপদ ডেকে আনা দুর্ঘটনার জায়গায়। ফিরলাম হেঁটে। হাত রেখে পকেটে বন্দুকের গায়। খাড়া রেখেছি চোখ কান। না, আশেপাশে কেউ নেই। জমি পরীক্ষা করলাম আধ ঘণ্টা ধরে, চোখে পড়লো না আর কিছুই। বোঝা গেল পুলিস এসেছে, জানতাম নিয়েও গেছে কিছু পেয়ে থাকলে, আমি কিছু পাবো না, কিন্তু মনে পড়ে যাবে এমন কোনো ব্যাপার, যা আমার অর্ধপ্রাপ্ত রহস্যের কিনারা করবে।

ঘেমে উঠলাম—বাড়ছে অস্বস্তি...স্বপ্ন দেখছি কি আমি? নাকি সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে কোনো ভূমিকা ছিলো ওই বিশালাকায়া আর সিংহের? পরে—চিত্র ফুটলো একটা পরিষ্কার অনেক পরে...একটা ছোট্ট বাড়ি সৈকতে, সাজানো আরাম কেদারা বারান্দায়...বসে আছি কান পেতে রেডিওর কাছে। শুনতে পাচ্ছি বাজনার রেশ-সমঝদার না হয়েও বলতে পারি রাগাশ্রয়ী বাজনার এটা বিঠোফেনের ঐক্যতান বাদন এক তন্বীকে দেখেছি পীতাস সাঁতার পোষাকে এগিয়ে আসছে ঘরের ভেতর থেকে—বন্ধ করতে বলছে রেডিও....সে বর্জন করতে রাজি সাঁতার পোষাক বাজনা থামালে...তার আকর্ষণ কি কম বাজনার চেয়ে? না...। সে একটা চড় কষালো আমার গালে আমার নেতিবাচক উত্তরে। একই ছবি বারবার কিন্তু অর্থহীন। একটা সেগারেট ধরালাম ছিন্নমূল গাছের ওপর বসে—মনে করবার চেষ্টা করছি সমস্ত ব্যাপারটা যদিও ঝোপের পরিবেশে চোখ নিবদ্ধ। একটা গাড়ি ছুটে এসেছিলো উল্টোদিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে কানে বাজছে মেয়েটার আর্তনাদ ও আমাদের গাড়ির ওপর ভেঙ্গে পড়ার শব্দের সঙ্গে...

মনে পড়ছে ড্যাশবোর্ডটা আঁকড়ে ধরেছিলাম বেন্টলে উল্টে যাবার মুহূর্তে। ফেলেছিলাম চোখ বুজে...আলোর ঝলকানি একটা চোখ ধাঁধানো...অন্ধকার তারপর...একটা ছবিও ভেসে উঠলো ছোট্ট কুটিরের...কুটিরটা সৈকতের মুখোমুখি। স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবার...ভাঙা শার্সি সামনে টিনের ছাদ। একটা ফাটল সদর দরজাতে—আগে ছিলো না তো এটা।

এটা তাহলে দুর্ঘটনার পর হয়েছে, তাই-ই। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে। দেখতে লাগলাম চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে। সৈকতমুখী পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে পামবনের ভিতর দিকে। সে পথে পা চালিয়ে দিলাম দ্রুতপায়ে—যেন চেনা পথ। আমি এ পথে হেঁটেছি এর আগে। সামনে সাগর বালিয়াড়ি ঝোপ থেকে। চোখ বোলালাম দু'পাশে, কোথাও নেই কুটিরের চিহ্ন। মন পাল্টালাম হাঁটতে শুরু করে ডানদিকের রাস্তা ধরে ঘুরলাম বাঁ দিকে। নিজের ঘরে অন্ধের মতো যেন আমার অবস্থা। হয়ে চলেছি স্বভাব-প্রবৃত্তিতাড়িত—সেখানে পৌঁছবোই জানি। কুটিরটা চোখে পড়লো বালিয়াড়ি ধরে মিনিট দশেক হাঁটতেই—যে ছবি এঁকেছি মনের মনিকোটরে সবই মিলছে—ফাটল ধরা শার্সি, টিনের ছাদ, ঠিক তেমনি। বর্ষীয়ান এক পুরুষ ধূমপানরত কুটিরের দরজায়।

বেশভূষা মলিন, তার দৃষ্টি আমার দিকেই। সে চমকিত হলো ভালো করে আমাকে নজর করে, সতর্কও একটু। 'সুপ্রভাত, জায়গা বড় নির্জন—আপনাদের এদিকটা, তাই না?' বলে বসলাম কাছাকাছি হতে। মানুষটা তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ রেখাবহুল মুখে। 'আসছেন কোথা থেকে?' গাড়ি চালিয়ে এলাম সারারাত—একটু বিশ্রাম নিতে চাই হাত পা ছড়িয়ে—পাওয়া যাবে কফি, মানে—পয়সা দিয়ে?

করেছি খানিক আগেই—পাবেন। আনছি—আপনি বসুন। বসে পড়লাম কাঠের প্যাকিং বাক্সে, দেখেছি একে আগে। খানিক পরে লোকটা বেরিয়ে এলো ধূমায়িত দু বাটি কফি নিয়ে। অনুভব করলাম কফির বাটিতে চুমুক দিতে দিতে। ও আমার দিকে তাকিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে। মজার ব্যাপার এর আগে দেখেছি আপনাকে? লোকটা বললো মৃদুস্বরে।

'দেখেছো আমার ভাইকে—' মিথ্যে কথা বললাম কথা বের করবার জন্যে। মনে পড়ছে, কাছেই একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছিলো ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে? ও চোখ সরিয়ে নিলো দ্রুত, 'না, না কিছুই জানি না ওসবের—' ও বলছে মিথ্যে কথা। 'আহত হয়েছিলো আমার ভাই—সে হারিয়ে

ফেলেছে স্মরণশক্তি। আসলে বুঝতে পারছি না কি ঘটেছিলো।

জানা যায় কিনা কিছু বললাম ওর চোখে চোখ রেখে। 'আমি জানি না কিছু বলছি তো ঐ ব্যাপারে, বললো কথাগুলো কেটে কেটে। শেষ হয়েছে আপনার খাওয়া?'

বেরোতে হবে আমাকে। কয়েকটা নোট বের করলাম পকেট হাতড়ে—ছড়িয়ে দিলাম হাঁটুর ওপর গুনে গুনে একশোটা ডলার—তাসের কায়দায়।

তাহলে নষ্ট করবো না তোমার সময়—তাই বলছিলাম তবে আমি খবর সংগ্রহ করবো না শুধু হাতে।

'আমাকে বারণ করেছিলো মুখ খুলতে ওই মেয়েটা—' লোকটার চোখদুটো জ্বলে উঠলো প্রাপ্তির আশায়। তবে আপনার ভাই বলছেন যখন আপনি—। টাকাটা বাড়িয়ে দিলাম হাতে।

আমার হাত কাঁপছে। বাড়ছে হৃৎস্পন্দন। ব্যাপারটা কি হয়েছিলো ভাই? 'এসেছিলো আপনার ভাই আর ওই মহিলা। ও বললো মাথায় নাকি চোট পেয়েছে আপনার ভাই, আর চুরি গেছে নাকি গাড়িটাও।

মিথ্যে কথা বলছে পরে বুঝলাম, কারণ জানলাম, হয়েছিলো একটা অ্যাকসিডেন্ট এবং ধরে যায় গাড়িতে আগুন। গাড়িতে পাওয়া যায় একটা লোকের মৃতদেহও। আচ্ছা আচ্ছা তা চেহারা কেমন ওই মেয়েটির? 'ময়লা রঙটা, তবে জেল্লা আছে চেহারায়, খাণ্ডারনি মেয়ে, দাদা—' লোকটা হেসে উঠলো, 'মনে হয় যাদের দেখে প্রথম দর্শনেই—আছে মালকড়ি—' ডেলা! 'ভাই বলে যাও। মনে হলো অবস্থা বেশ খারাপই আপনার ভাইটির—সে অভিনয় করছে পরে বুঝলাম। আর চেষ্টা করছে ধোঁকা দেবার আমাকে মেয়েটাও—' পরিষ্কার করে নিলো গলা একটু কেশে, 'মেয়েটা একজনকে ডাকতে বললো আমাকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে। প্রায় আধমাইল দূর হবে এখান থেকে ফোনের বুথটা। লোকটাকে ডাকলাম নম্বর ধরে, বললো সে আসছে।

কি মনে হলো ফিরে জানলায় উঁকি দিলাম দরজায় না গিয়ে—কথা বলছে মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাই। ঘরে ঢুকলাম ঘুরে গিয়ে—পড়ে আছে লোকটা চোখ বুজে—অজ্ঞান।

বললাম না কোনো কথা, কারণ আবার জট পাকিয়ে গেছে সবকিছুই। বেরিয়ে গেলো আচমকা মুখ দিয়ে, 'তোমার মনে আছে নম্বরটা?' 'হ্যাঁ আছে। নম্বরটা ভুলিনি মনে রাখা সহজ বলেই—লিঙ্কন বীচ ৪৪৪৪।' 'মনে পড়ে কাকে ডেকেছিলো?'

'হ্যাঁ, নিক রাইসনার। মনে হচ্ছে নামটা তাই বলেই—' যেন শিরদাঁড়া বেয়ে মাকড়সার পা উঠলো। 'আচ্ছা, কি বলেছিলো মহিলাটি? লোকটা চুলকে নিলো মাথাটা 'রিক্কা কে এক —অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নাকি তার—ওদের যেন নিয়ে যায় রাইসনার এসে।' তুমি দেখেছিলে রাইসনারকে? না, শুয়ে পড়েছিলাম আমি। প্রশ্ন করলাম আরো অনেক, কিন্তু জানা গেলো না আর এমন কিছু যা লাগবে আমার কাজে।

লিঙ্কন বীচের 'চৌরঙ্গী' স্যুটকেসটা ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ির পেছনে গাড়ি চালিয়ে দিলাম রুজভেল্ট বুলেভার্ডের দিকে। ভীড় শুরু হয়ে গেছে মানুষের, রাস্তার দু'পাশে—পরনে সাঁতারের পোষাক অধিকাংশরই। প্রায় বিবস্ত্রা মেয়েদের দু-একজন, কিন্তু উদাসীন।'

গাড়ি ভিড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম। একটা বড় প্যাকার্ড গাড়ির পেছনে। ৪৪৪৪ নম্বর চাইলাম টেলিফোন বুথে ঢুকে। একটা মেয়ের গলা পাওয়া গেল কিছুক্ষণ বেজে চলার পর। 'নমস্কার, বলছি লিঙ্কন বীচ ক্যাসিনো থেকে করতে পারি কি সাহায্য?'

'দিন নিক রাইসনারকে—' কথাগুলো ছেড়ে দিলাম, বিকৃত গলায়। 'কি বললেন নামটা?' 'নিক রাইসনার।' আবার গলা পেলাম সামান্য নিস্তব্ধতার পর। 'উনি তো এখন নেই আমাদের সঙ্গে, কে বলছেন আপনি?' শুকনো ঠোঁট বোলালাম শুকনো জিভ দিয়ে। 'বন্ধু বলছি আমি তার' এই শহরে সবে এসেছি। আচ্ছা, ওকে পেতে পারি কোথায়?' তাৎক্ষণিক উত্তর এলো বিব্রত গলায়, 'দুঃখিত। পাবেন না তো ওকে—মারা গেছেন উনি।' 'মারা গেছেন, বিস্ময় আনলাম গলায়। জানতাম নাতো—কবে?' 'তিরিশে জুলাই। সৈকত থেকে নিয়ে আসার পরের দিন। আমার হাড়ে কাঁপুনি লাগলো আবার। হয়েছিলো কি? প্রস্তুত ছিলাম না তারজন্য। এবার মেয়েটা যা বললো।

লাইনটা ধরুন তো একটু—।

ছাড়বেন না—আরে শুনুন। বসে গেছে আমার গলা। সাড়া নেই আর অনেকক্ষণ। শুরু করলাম ঘামতে। শব্দ হলো একটা খুট্ করে। 'কে বলছেন কথা?' গলা ভারী—রিক্কা! রইলাম চুপ করে, কানে নিয়ে রিসিভার। ওঠা-নামা করছে ওর ভারী নিঃশ্বাস।

আমার শীতল স্রোত নামানো মেরুদণ্ড বেয়ে। 'কে, জনি নাকি?' ওর গলা পেলাম আবার। নিরুত্তর আমি। নামাতে পারছি না রিসিভার। সম্মোহিত হয়ে পড়েছি ওর নিঃশ্বাস আর ভারী গলায়।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো একটা কর্কশ গলা পরমুহূর্তে। 'অপারেটর—শীগগির, আমাকে জানান কলটা কোথাকার।'

এগিয়ে এলো পাহারাদারদের একজন গাড়ি থেকে নামতেই, দাঁড়িয়ে পড়লো অন্যেরা, চোখ রেখে আমার দিকে।

ওখানে রাখতে চাই একটা স্যুটকেস। কি করতে হবে?

'স্যার, ওটা কি সঙ্গেই আছে?'

'হ্যাঁ, এই যে—' মাটিতে নামালাম স্যুটকেস বের করে। হাতের আন্দোলনে পাহারাদারকে থামিয়ে দিলাম ওটা নেবার জন্য হাত বাড়াতে। আমি ঠিক ততোটা দুর্বল নই আমাকে দেখে যতটা মনে হচ্ছে—বাতলাও কোথায় যেতে হবে।

আসুন আমার সঙ্গে। ওর পেছনে ভেতরে ঢুকলাম। চওড়া ইস্পাত মোড়া রেলিং চারদিকে। সশস্ত্র পাহারা চলেছে বাইরে লবিতেও। ঘাড়ে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল। আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলো একটা ফ্যাকাশে মুখোর সামনে পাহারার লোকটা। আভিজাত্য আছে লোকটার চেহারায়, চালিয়ে দেওয়া যায় কোন বিদেশী রাজদূত বলে। আমাকে অভিবাদন করলো উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে আমি সামনে আসতেই 'মিঃ ইভশ্যাম সব ব্যবস্থা করে দেবেন ইনি আপনার। নিজের জায়গায় ফিরে গেলো পাহারাদার একটা সেলাম ঠুকে। আঙুল দেখিয়ে দিলাম স্যুটকেসটার দিকে।

রাখতে চাই এটা। রাজপুত্র আর একবার ঝুঁকে জানালো সে কৃতজ্ঞবোধ করবে আমার সেবা করতে পারলে। নেবেন কি স্ট্রংরুম ভাড়া? দিলাম ঘাড় এলিয়ে। আমার সঙ্গে আসুন। লিফ্‌ট থামলো ছ' তলায়।

একটা ইস্পাত মোড়া দরজার সামনে দাঁড়ালাম বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে। পাহারা এখানেও। পাহারার লোক দরজা খুলে দিলো সেলাম করে।

চাবিটা দাও ছেচল্লিশ নম্বরের। ইভশ্যাম যুবরাজোচিত গলায় নির্দেশ জারি করলো। চাবি বাড়িয়ে দিলো পাহারাদার। খুলে গেলো দরজা ঢুকলাম একটা ছোট ঘরে। সর্বস্তরে ইস্পাত এখানেও। একটা টেবিল দুটো আরাম কেদারা। ধূসর কার্পেট মোড়া মেঝেতে। একটা দেয়াল সিন্দুক আমাদের মুখোমুখি। মশাই এখানে তো রাত্রিবাসও করা যায়, বললাম হালকা গলায়। কাগজ পত্র দেখেন এখানে বসেই আমাদের কিছু পৃষ্ঠপোষক। ব্যবসা করলে আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব সুযোগ সুবিধে দেবার—ইভশ্যাম ঘুরলো সিন্দুকের দিকে, মনে রাখতে পারবেন কি?

'কথাটা দাঁড়ায় সংযোগের অক্ষরগুলো মিলে মিতব্যয় পারবো বললাম। আপনাকে সিন্দুক খুলতে হলে। জানি, দু একবার করেছি আগেও এ ধরনের ব্যাপার। টিপলাম বোতাম। থেমে প্রতিটি শব্দের মাঝখানে।

ফাঁক হলো দরজাটা কথার বানান করা শেষ হতেই। চাবি পড়ে আপনা আপনি সংযোগের কাজ হয়ে যায় দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। মনে করিয়ে দিলো ইভশ্যাম। ব্যবস্থা ভালোই তো মনে হচ্ছে। পাহারাদারের কাছে থাকে ভল্টের চাবি।

আমরা কাউকে চাবি বাইরে নিতে দিই না। জানিয়ে দিতে পারেন কোনো বিশেষ নির্দেশ থাকলে। পরে আপনার হয়ে অন্য কেউ আসতে পারেন, নাকি নিজেই আপনি? সিন্দুক ছুঁতে দেবেন না কাউকে আমি সঙ্গে না থাকলে। বললাম একটু থেমে। আমাকে চিনবে তো আপনার পাহারাদার? হাসলো যুবরাজ। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আপনার ছবি উঠে গেছে সিন্দুক খোলার সঙ্গে সঙ্গে। ওটা রাখা হবে পাহারার ঘরে। মিলিয়ে চাবি দিয়ে দেবে আপনি এলে। হাসলো ইভশ্যাম, 'স্যার আসুন,

সইটই করার আছে নীচে আরো কিছু। ভাবলাম একমুহূর্ত আমি একটা তালিকা রাখতে চাই স্যুটকেসের জিনিসপত্রের। এগোন আপনি, আমি আসছি মিনিট কয়েকের মধ্যেই। নিশ্চয়ই, জানেন কোথায় আমি বসি—চলে আসুন।

লিফটে পৌঁছে দেবে আপনাকে পাহারার লোক। পকেটে ফেলে দিলাম একশো ডলারের দশখানা নোট বের করে আমি স্যুটকেস খুলে ইভশ্যাম বেরোতেই।

স্যুটকেসে রেখে দিলাম ২২ বোরের পিস্তলটা। দরকার হচ্ছে না দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের। লিফ্‌টের দিকে এগোলাম দরজায় চাবি দিয়ে। আমি গাড়ি চালিয়ে দিলাম ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে আমার ফ্ল্যাটের দিকে মিনিট বিশেক পরে।

অনেকদিন পর গুনগুনিয়ে গান ধরলাম। স্বস্তি পেলাম টাকাটা রইলো নিরাপদ জায়গায়। টাকায় হাত পড়বে না রিক্‌কার।

পেপি আর বেনোর নোংরা হাত। গাড়িটা চোখে পড়লো বুলেভার্ডের ভেতর মাইল খানেক চালাবার পর। একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে গাড়িটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে। এগোতেই বললাম পাম্পের ছেলেটাকে। গাড়িটা রাখতে চাই কিছুক্ষণের জন্যে।

স্যার আপনার যতক্ষণ খুশি।

ও জনি, ফিরে এসেছো তুমি। ঘটলো দ্রুত আকস্মিকতায় পরের ঘটনাগুলো ভয়ের চমক খেলে গেলো জিনির চোখে। খুলে গেলো মুখ...ওর গলা থেকে আর্তনাদ উঠলো।

পড়ে যাবার মুহূর্ত ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম মর্যাদা হয়ে...কিন্তু এখানে নেই তো জিনি...পড়ে, চললাম...নীচে...আরো নীচে...বর্তমান থেকে অতীতে...কানে বেজেছিলো আর্তনাদ একটি মেয়ের কিন্তু জিনির নয় তা। চেষ্টা করলাম হাত তুলতে, পারলাম না—ভারী ঠেকছে লোহার মতো। নেই কিছুই। চালালাম হাত শূন্যে। চেষ্টা করলাম উঠে বসলাম। যন্ত্রণা বড্ড...মিলিয়ে গেলো আর্তনাদ...কানে এবার শুধু নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ...মৃদু...গতি তার আর্ত মৃদু...এবারের স্পন্দনই বুঝি শেষ স্পন্দন প্রতিবারই মনে হচ্ছে।

'জনি' আমি চিনি এগুলো। ডেলার কণ্ঠ সমৃদ্ধ অতীতের স্মৃতিভারে। স্মৃতির রোমন্থনে ডুব দিলো মনটা আমার..ভেসে উঠলো তার দৃশ্য যে মারটা দিয়েছিলো আমাকে মিয়ামির ছোকরাটা—ডেলার তন্বী শরীরটা সেই সঙ্গে। 'ওঠো...লড়ে যাও উঠে।'

আস্তে আস্তে চোখ খুললাম কোনো রকমে...চারিদিক আঁধারে ছেয়ে রয়েছে...কিন্তু এত আলো স্টেডিয়ামের হাতুড়ি দিয়ে কি পেটালো ছোকরা তাহলে?

গেছি কি অন্ধ হয়ে? আবার চেষ্টা করলাম উঠে বসতে 'জনি, জনি কথা বলো, লেগেছে কি খুব? আমার মুখে ঝুঁকে পড়েছে ডেলার মুখটা। রাতের আকাশ দেখতে পাচ্ছি ওর কানের পাশ দিয়ে, গাছের সারি ছায়া ছায়া। উল্টো দিক থেকে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে গাড়ির আওয়াজ চাকার মাটি কামড়ানো—অনুভব শূন্যে বিচরণের।

'ঠিক আছি আমি, একা থাকতে চাই একটু হাত দিলাম মুখে। মুখ ভিজে চটচটে।

বলো তো কি হয়েছিলো? বললাম মৃদুস্বরে 'ওঠো, সাহায্য করতে হবে আমাকে।' ওর গলায় বিপদের সঙ্কেত। 'ও মারা গেছে মনে হচ্ছে?'

'পল। জনি উঠে পড়ো, চলবে না বসে থাকলে। সাহায্য করো আমাকে।' 'এক মিনিট ঠিক আছে।' উঠতে গেলাম হাতের চেটো ঠেকিয়ে মাটিতে, শুরু হলো বুকের যন্ত্রণা। উঠলাম তবু, দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত আমাকে ধরে ফেললো ডেলা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বার আগেই, 'তোমার কি হলো? দাঁড়াও ঠিক হয়ে।' চমকে উঠলাম ডেলার কর্কশ গলায়।

ও পড়ে আছে ওইখানে। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে না। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লাম বালির ওপর। ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায় বুকটা। পলের দেহটা পড়ে আছে কাত হয়ে, পাশেই দুমড়ে যাওয়া বেন্টলের মাথাটা হেলে পড়েছে হাতের ওপর। প্রায় থুতনিতে ঠেকেছে একটা পা। সেটা উপুড় হয়ে গেলো ওর দেহটা ধরে নাড়া দিতেই। থেকে গেলো সেখানেই মাথাটা যেখানে ছিলো।

মটকে গেছে ঘাড়টা। নাড়ি নেই, তুলে নিলাম হাতটা। আমার কাঁধে হাত রেখে ডেলা হাঁটু মুড়ে বসলো, কাঁপছে। বললাম, 'মারা গেছে।' কোনো জবাব দিলো না ডেলা, শুধু ওর হাতটা আরও

ডুবিয়ে দিলো আমার শরীরের গভীরে।

থাকো এখানে পাই কিনা দেখি কাউকে। দাঁড়ালাম উঠে। ও বেঁচে নেই তুমি ঠিক বলছো? আবার চমকালাম ডেলার হীম শীতল কণ্ঠস্বরে। 'হ্যাঁ।' কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়ালো একটা তালগাছে ডেলা আস্তে আস্তে উঠে। হাওয়ায় উড়ছে ওর এলোমেলো চুল। ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট। গোড়ালীতে নেমে গেছে এক পায়ের মোজা। ওর মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে—রক্ত শুকিয়ে গেছে নাকের পাশে।

মেলে দিয়েছে আমার দিকে উদাসীন কোটরগত চোখদুটো। অন্যখানে মন। অন্য গাড়িটা পড়ে আছে রাস্তার ওপারে একটু দেখবে ওটার ড্রাইভারের অবস্থাটা? গাড়িটা পেপির। পাত্তাই নেই ওটার কোনো। বেঁচে নেই আমরা হয়তো ভেবেছে।

কিন্তু অবস্থাটা দেখো ওই গাড়ির—পায়ে পায়ে রাস্তার দিকে এগোলাম যন্ত্রণা নিয়েই। চাঁদের আলোয় স্নান করেছে সারা রাস্তা, তবু—ওই জায়গায় পৌঁছতে আমার অনেক সময় লাগলো।

পড়ে আছে গাড়ি—থেঁতলানো কাত হয়ে ঝোপের মধ্যে। এখন ভগ্নস্তূপ প্রকাণ্ড ক্যাকার্ডটা। চোখ চালিয়ে দিলাম ভাঙ্গা জানলার ফাঁকে। স্টিয়ারিংয়ে বসে ড্রাইভার। আতঙ্ক সারা মুখে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে স্টিয়ারিং ওর শরীরটাকে। যেন বর্শার ফলক। তালগোলে পাকানো শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ।

ব্যাগ চেপ্টে রয়েছে ক্লাচ আর ব্রেকের মধ্যে। যাক, এবার তো পেয়েছো তোমার সাধের ব্যাগ। বিশ্রাম করো এবার একটু, আমি করে আসি ফোনটা। ডেলা ঘুরে দাঁড়ালো আমার পাশে এসে, 'না জনি আমরা যাবো না পুলিসের ব্যাপারেও, জানানোও চলবে না সেটা কাউকে, ওযে মারা গেছে।'

আরে পারবেই তো পরে জানতে সনাক্ত করবে গাড়িও। সোজাসুজি তাকালাম ডেলার চোখে। 'তবে আর উদ্দেশ্যটা কি চেপে যাওয়া এ ব্যাপারটা?'

'জানতে চেয়ো না এখন কিছু, পরে বলবো তোমাকে সব। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই তোমার এত, ঠিক আছে সব।' ডেলা কথাগুলো বললো স্বাভাবিক গলায়।

গোলমাল হয়েছে তোমার মাথার অ্যাকসিডেন্টে বস তো চুপ করে। আমি খবরটা দিয়ে আসি পুলিসে। ডেলা হাত ঢুকিয়ে দিলো ব্যাগের মধ্যে আমার দিকে তাক করলো একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করে, 'আছ যেখানে। থাকো সেখানে।'

আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো একটা গাড়ি ঝড়ের গতিতে পেলোট্রার দিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে। নিশ্চল বসে আমরা দুজন। চাঁদের আলো পড়ে ভীতিজনক করে তুলেছে ডেলার হাতের পিস্তলটায়। কিছু করে বসো না বোকামি করে। ডেলার গলা বরফ ঠাণ্ডা।

'নামিয়ে রাখো ওটা ডেলা—' কোনোরকমে বললাম কাঁপা গলায়। চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মতো মাথার যন্ত্রণা। ডেলা মৃদু হাসলো ঠোঁটের ফাঁকে। পরম মুহূর্ত এসেছে আমার জীবনে। আমরা দুজনেই শুধু জানি যে পল নেই। জনি তুমি বুঝতে পারছো না তুমি জানো না এই অবস্থায় যে কত জরুরী পলের মৃত্যু সংবাদ গোপন করাটা। শোনো, আমার সঙ্গে যদি হাত না মেলাও তুমি, তাহলে আমায় সরিয়ে দিতে হবে এ পৃথিবী থেকে তোমাকে। আর কোনো রাস্তা দেখছি না তোমার মুখ বন্ধ করার। মনে হলো লোপ পেয়েছে ডেলার শুভবুদ্ধি। কিন্তু কোনো কারণ দেখছি না ও যা বলছে তা অবিশ্বাস করার।

আর একবার শীতল স্রোত নামলো মেরুদণ্ড বেয়ে। 'এখন সময় নেই সব কিছু খুলে বলার তবে বলে রাখছি একটা কথা—অনেক টাকা পাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে।' ডেলা আমার দিকে মেলে দিলো তার মৃত্যুনীল চোখ। 'কি করার আছে?' 'আমাকে কি করতে হবে?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলাম ওর চকচকে চোখে চোখ রেখে।

দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো একটা বিদ্রূপের হাসি ডেলার নিষ্করুণ ঠোঁটে। তোমার গুলো ওর গায়ে চাপিয়ে দাও ওর জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে দরকার এটা রটে যাওয়া যে তুমি মরে গেছো—' 'আমি? আমাকে চেনে পেলোট্রার সকলে—' ডেলা আমাকে থামিয়ে দিল হাতের ইশারায়। 'গাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দাও। পলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে।' না-না আঁতকে উঠলাম, পারবো

না আমি তা করতে। দাঁড়াও...'

'তোমাকে পারতে হবে—মরতে হবে নইলে, কোনো রাস্তা নেই দ্বিতীয়। দূরত্ব কমে এলো ওর হাতের অটোমেটিকটার। স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি, মাথায় যে আঘাত পেয়েছি। কেড়ে নেওয়া যেতো ওটা ওর হাত থেকে মদের মাত্রাটা বেশী না হলে কিন্তু এখনও গুলি করে বসবে হাত বাড়ালেই। আমি খুন করেছি ওর চোখে। 'নাও শুরু করে দাও কাজ, নষ্ট হয়েছে অনেক সময়।' এবার ডেলার নরম গলা। 'কিন্তু আমার জানা দরকার ব্যাপারটা' 'জানবে পরে।' ডেলা নড়ে বসলো একটু 'কি, উঠবে? না?' ওর ঠোঁটে আবার খেললো সেই বীভৎস হাসি।

'উঠেছি—' হাত বোলালাম মুখে। ভিজে গেছে ঠাণ্ডা ঘামে। পল যেখানে পড়ে আছে সেদিকে আস্তে হেঁটে গেলাম। শুরু করলাম ছাড়াতে ওর জামা কাপড়। তেমন রক্তপাত হয় নি ঘাড় মটকে যাওয়ায়। পাল্টালাম আমার জামা কাপড়। ডেলা দাঁড়িয়ে পিস্তল উঁচিয়ে। ওকে জুতো পরাতে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাঁধলো।

'হবে না আমার দ্বারা।' ঘাসে বসে পড়লাম। 'হবে না পরাতে, ফেলে দাও গাড়ির মধ্যে। লোকে ভাববে খুলে পড়েছে পা থেকে। ওকে বসিয়ে দাও স্টিয়ারিংয়ে। চললাম পলের দেহ টেনে নিয়ে। মানুষটা ছিলো দশাসই চেহারার রীতিমত কসরৎ করতে হলো। একটুও কমল না কিন্তু আমার যন্ত্রণা। ওকে ঠেলে দিলাম গাড়ির দরজা খুলে, পল গড়িয়ে গেলো। খুলে আগুন লাগিয়ে দাও লিক-এ রুমাল বেঁধে।' জেল খাটানোর ব্যবস্থা করছো তুমি আমাকে। আমার ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। করো যা বলছি যন্ত্রপাতির বাক্সটা আছে হুডের ভেতর। জলদি বের করে নাও স্প্যানার। খুলে দিতেই কারবুরেটারের পাইপটা, হাতটা পুড়ে গেলো সিলিন্ডারের ঢাকনিতে। নেই বোধশক্তি, হয়ে গেছি আত্মস্থ।

বাড়ছে কমছে মাথার যন্ত্রণা। ভারী হয়ে গেছে রবারের মতো পা দুটো। রুমাল বেঁধে দিলাম লিক পাইপে। 'কাঠি জ্বেলে দাও।' ভাঙ্গা গলা এলো ডেলার। দিলাম। আগুনের হল্কা ছুটলো মুহূর্তে গাড়ির ইঞ্জিন থেকে।

সারা গাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন। কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে সরে এলাম। ডেলা ছুটে এলো আমার পাশে। চলে এসো এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে কেউ দেখে ফেলার আগে...। হাঁটতে শুরু করলাম আমি ওর সঙ্গে। দুজন দ্রুতপায়ে চলেছি। নিঃশব্দ প্রাণী দুটি। মিলিয়ে গেলো গাড়ির আগুন চোখ থেকে।

ডেলা দাঁড়িয়ে পড়লো সৈকতের শ্বেতশুভ্র বালিয়াড়িতে পৌঁছে, হাঁফাচ্ছে, ওঠানামা সুস্পষ্ট উন্নত বুক দুটোয়। 'জনি দাঁড়াও।' এবার ওর দিকে ভালো করে তাকালাম ঘুরে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে এখনো আছে পিস্তলটা। তবে আর আমি নই সেটার লক্ষ্য। 'বেশী সময় নেই হাতে, কথা বলে নিই তোমার সঙ্গে। অবশ্য দরকার ছিলো খোঁজখবর নেওয়ার তোমার সম্পর্কে। কিন্তু যাক গে। ভাবিনি দেখা হবে এরকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থায়।

ডেলা একটু থামলো, পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এখন থেকে। থাকতে হবে একসঙ্গে। কতকালের চেনা আমরা যেন, আচ্ছা কি রকম তোমার সাহস? মানে, কতটা ঝুঁকি নিতে পারো জীবনে বড় হবার জন্য? কিন্তু, একবারও ভেবেছো কি সেটা যে আমাদের এ কুকর্মের জন্য কয়েদ খাটতে হবে? 'তোমাকে ভাবতে হবে না সে জন্য শোনো টাকা চাও তুমি? অনেক টাকা? আমরা আধাআধি কয়েক লাখ ডলার রোজগার করতে পারি নার্ভের জোর থাকলে। গেলাম শক্ত হয়ে। লাখ ডলার! মনে গাঁথা হয়ে আছে এই টাকার স্বপ্নই তো...'ঠিক বলছো তো তুমি?' বললাম অবিশ্বাসের স্বরে। বলছি শোনোই আগে সবটা। বসলো ডেলা, আমাকে দেখিয়ে দিলো পাশের জায়গা। 'ওখানে বসো—' সামান্য দূরত্ব রেখে বসলাম, কোলে ফেলা ওর পিস্তলটা। আবার ওর মুখে চাঁদের আলো। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে এলোমেলো চুল আর রক্তরেখায়িত মুখ।

ডেলা তার কথা রুদ্ধশ্বাসে বলে চললো। পল ওয়ার্দামের কাহিনী। কুখ্যাত জুয়াড়ী, তিনতিনটে ক্যাসিনোর মালিক লোকটা, মালিক কোটিকোটি টাকার। তাই শকুনির দল ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ম্যানেজার আছে ক্যাসিনোগুলোর আলাদা আলাদা। তৎপরতা বেড়ে যাবে ওদের কানে খবরটা পৌঁছলে। আমাদের চুষতে হবে বুড়ো আঙুল। আমাদের

কাজ গুছোতে হবে পলকে বাঁচিয়ে রেখে, আমার পরিকল্পনা এটাই।

কাজটা সহজ হবে তুমি সঙ্গে থাকলে কয়েক লক্ষ ডলার মনে রেখো। নার্ভের দরকার শুধু একটু। তাই করবে আমি যা বলবো। আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবো। হওয়া উচিৎ আমার উত্তর ঃ না এবং উঠে শুরু করে দেওয়া চলতে কিন্তু একটা কাজই হবে তাতে। মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে বালিয়াড়িতে। পিঠে গুলি খেয়ে। আমার মনে পড়লো টম রোশের কথা। জনি, হঠাৎ বিপদ আছে অনেক টাকা হাতানোর। বলিনি আমি। 'না,' পারিনি বলতে—ডেলা এখনো খুনের মেজাজে আছে ও হাল্কা চালে কতাবার্তা বললেও, আমার মনে হলো। ভাবলাম টাকার কথা—কি করা যেতে পারে ও টাকায়? বললাম শেষে, কিন্তু কি করে চেপে রাখছো ওর মরার খবরটা? আর মনে করো কতদিনই বা চেপে রাখবো? ডেলা এলিয়ে দিলো শরীরটা মৃদু হেসে, স্পষ্ট হলো নিতম্বের রেখা হাঁটু মুড়তে।

'মুখ না খুললেই হলো তিন চারটে দিন। এসে যাচ্ছে টাকাটা আমাদের হাতে। 'সব শুনি বলে যাও—' সরানো আছে পর্যাপ্ত টাকা প্রতিটি ক্যাসিনোতে—যাতে কারবারের অসুবিধা না হয় ব্যাঙ্কের গোলমাল হলেও। জানো তো লিঙ্কন বীচের ক্যাসিনোটা বিশ্রামস্থল কোটিপতিদের। টাকাটা রাখা আছে ওইখানেই জ্যাক রিক্কা লস এঞ্জেলসের ক্যাসিনো চালায়। নিক রাইসনারের দখলে লিঙ্কন বীচের ক্যাসিনো, পিট্‌লেভিনস্কার হাতে প্যারিসেরটা। ডেলা আমার দিকে ঘুরলো বুক দুটো টান করে, রাইসনার জানতে পারলো পল ক্যাসিনোর উদ্বৃত্ত টাকা, জুয়োতে লাগাচ্ছে প্যারিস যাওয়ার মুখে।

সামনে একটা লোক এসে দাঁড়াল। লোকটাকে যথেষ্ট শক্তিমান মনে হলো বেঁটে হলেও। সে তুলে ফেললো আমাকে অবলীলায়। শরীরের সমস্ত ভার আমি ওর ওপর ছেড়ে দিলাম। 'ঠিক আছে, আমার ঘর এইতো কাছেই—স্যার ঘাবড়াবেন না আপনি।' মনে হলো ডেলাও হাত ধরেছে আমার একটা। টলতে টলতে এগোলাম আমি ধীর পায়ে ওদের দুজনের সাহায্যে। চোখ বুজে ফেললাম বিছানায় শুয়ে। শুনলাম লোকটার গলা। দিদি ভালো নয়তো ওঁর অবস্থা, ডাকি ডাক্তার? ডেলার গলা। কতদূরে টেলিফোনটা? 'হবে আধমাইলটাক?' লোকটা দূরে সরে গিয়েছে আমার কাছ থেকে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছি এখন ওর চেহারাটা শেষ সীমায় বয়স প্রৌঢ়ত্বের, অনেক জীবনযুদ্ধের স্বাক্ষর ঝাঁকড়া চুল আর রেখাঙ্কিত মুখে। চোখ ফেরালাম ডেলার দিকে, সে বসে আছে একটা চেয়ারে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় কঠিন মুখের রেখাগুলি। ও শোকার্ত হয় নি পলের মৃত্যুতে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়েছে ডেলার মানসিক স্থৈর্য এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। একটা হুইস্কির বোতল বের করে আনলো দৌড়ে ভেতর থেকে লোকটা ওর দিকে একবার তাকিয়ে। ডেলা একচুমুকে শেষ করে দিলো গ্লাস ভর্তি পানীয় বাড়িয়ে দিতেই।

লোপাট হয়ে গেছে আমাদের গাড়িটা ডেলা নামিয়ে রাখলো গ্লাস। 'শয়তানগুলো ডাণ্ডা বসিয়ে দিলো আমার বন্ধুর মাথায় আমাদের গাড়িটা আটকে। একটা খবর দেওয়া দরকার এখুনি লিঙ্কন বীচে—ভাইটি দেবে? ওরা এসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে আমাদের এখান থেকে। দেখাতে হবে তো ওকে হাসপাতালে। খবর দিয়ে দিচ্ছি এখুনি সব সময় হাজির আপনাদের সেবায় জুড হার্কনেস। হার্কনেস শোধ হবে না কখনও তোমাদের ঋণ। লীলাময়ী হাসি ফোটালো ডেলা তার ঠোঁটে 'আমরা যাচ্ছিলাম লিঙ্কন বীচে। দিদি নম্বরটা দিন খবর গিয়ে দি একটা পুলিসেও—' 'না, এখনও না।'

আগে দরকার ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, তারপর খবর দেওয়া যাবে পুলিসে। হ্যাঁ, নম্বরটা লিঙ্কন বীচ ৪৪৪৪, পারবে মনে রাখতে—না, লিখে দেবো? 'না, না, হবে না লিখতে—' 'চাইবে নিক রাইসনারকে—রিক্কার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলবে, তার আসা দরকার তাড়াতাড়ি হার্কনেস মাথা এলিয়ে বেরিয়ে গেলো কথাগুলো একবার আওড়ে। বিছানায় উঠে বসলাম লোকটা অদৃশ্য হতেই, কেন বলতে গেলে ওসব? এসে হাজির হবে পুলিসের খোচড়গুলো—' আমার দিকে তাকালো ডেলা, অনেক দূরে কোথাও তার চোখ দুটো—উধাও, সে ভাবছে অন্য কিছু, 'এই জন্যে বললাম, যে—ঠিকই গাড়িটা পলের, কিন্তু ভুয়ো নম্বরটা। ওটা চুরি গেছে খোঁজ পড়লে জানবে, বুঝলে। সেই হাসি ডেলার ঠোঁটে। ঠিকই বলছে ও হয়তো কিন্তু মনে ধরলো না আমার কথাগুলো

কারণ পেলোট্রাতে খবর চলে যাবে দু-এক দিনের মধ্যেই। আমি ড্রাইভারটিকে খতম করে গাড়ি নিয়ে ভেগেছি রোশ আর অ্যালিস জানবে। ছিনতাইবাজ ভাববে ওরা আমাকে, এটা পারছি না কিছুতেই মেনে নিতে। ডেলা আমার বিছানার পাশে বসলো লঘু পায়ে এগিয়ে।

এখুনি এসে পড়বে জনি, রাইসনার—দারুণ চালাক কিন্তু লোকটা খুব সাবধান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না ওকে। আমিই বলবো যা বলার। মাথায় চোট তোমার, কাজেই বলা বারণ কথা। সায় দিলাম মাথা হেলিয়ে। ও সন্দেহ করবে শুধু একটা ব্যাপারেই—কেন এসেছি আমি তোমার সঙ্গে। হয়তো ও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে পলের সঙ্গে ক্যাসিনোতে ফোন করে।

পল প্যারিসের পথে উত্তরে জানাবে, আর রিক্কা যাত্রা করেছে লিঙ্কন বীচের দিকে। শুধু ও এইটুকু জানুক, তবে বড় জোর কিলবিল করে উঠলে মাথার পোকা কথা বলার চেষ্টা করবে প্যারিসের লেভিনস্কীর সঙ্গে ; কিন্তু লেভিনস্কীও কিছু বলতে পারবে না স্টিমার প্যারিসের ডকে না ভেড়া পর্যন্ত।

আটকে গেলো ঠোঁটে সিগারেট, বুলিয়ে নিলাম জিভ শুকনো ঠোঁটে। এক পাশবিক ইচ্ছা হলো ডেলাকে কাছে টেনে নেবার। পড়তে পেরেছে আমার মনের কথা ও বোধ হয় সরে গেলো সামান্য।

চেষ্টা করলো চোখে কাঠিন্য আনার, তাই ভাবো যা বলছি বুঝলে? তোমার কিছু জেনে রাখা দরকার পলের সম্পর্কে সে থাকতো কিভাবে। পছন্দ করতো কি কি...হোঁচট খেতে হয় বেশী এসব ছোটো খাটো ব্যাপারেই—' বলে চললো ডেলা। কোথায় থাকত লস এঞ্জেলসের পল ওয়ার্দাম ; টেলিফোন নম্বর তার। তার সব পরে পাওয়া গেল।

ডেলা খেলালো ঠোঁটে সেই বিচিত্র হাসি। সত্যি নয় পুরোপুরি কথাটা কিন্তু বললাম না তা আর ওকে। শুধু এটুকুই মনে হয়েছে ওকে পেতে চাই, ভাবতে পারো যা খুশী, কিন্তু পরস্পরকে জানা দরকার আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হলে। ম্লান হাসলো ডেলা, বুঝলাম। শোন তবে—পলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বছর দুই আগে।

আমি তখন ঘোরঘুরি করছি ছবির রাজ্যে ঢোকার জন্য। আমার অবস্থা প্রায় কপর্দকহীন, আমার জীবনে দেখা দিলো পল এমন সময়। ওর কাছে আমার কোনো মূল্য ছিলো না মানুষ হিসাবে—নিষ্ঠুরতা পুরোদস্তুর স্বার্থপর আর লোকটা ঔদ্ধত্যের প্রতিমূর্তি।

কিন্তু ওর টাকা ছিলো, দরাজ হাতে খরচও করতো। তা, আমি পড়ে গেলাম পলের চোখে। আর যত রকম প্রক্রিয়া জানা আছে পয়সা হাতাবার, চললাম প্রয়োগ করে। টাকা খরচ করে চললো জলের মতো আমার জন্য। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই একসঙ্গে—কিন্তু, গাঁটছড়া বাধা তো আমার ধান্দা। বাক্সে ঠুকলো সিগারেট বের করে ডেলা তিক্ত হেসে। ঘৃণা ওর রক্তিম ঠোঁটে, 'পল তার শিকার ভেবে ছিলো আমাকে—তাই সেকি হলো বিয়ের অনুষ্ঠানটাও, কারণ জীবিতা পলের স্ত্রী। কিন্তু আমার দেড় বছর কেটে গেলো ব্যাপারটা জানতেই। পল বললো ওকে ডিভোর্স করবে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলোও।

ও পরিষ্কার করে নিলো গলাটা কেসে, 'সই হয়ে যাওয়ার কথা সামনের মাসেই ডিভোর্সের কাগজপত্র, কিন্তু দেরি হয়ে গেলো বড্ড। ওর স্ত্রী এখন টাকা পয়সা সবই পাবে, নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো আমি আবার। ডেলার কেমন বিষণ্ন গলা, 'বেশ কেটে গেলো দুটো বছর। আমি আর ফিরে যেতে চাই না আগের জীবনে, জনি এটা করছি এত ভেবেচিন্তে সেই জন্যেই, আর নিরস্ত করতে পারবে না তা থেকে কেউ আমাকে দরজার হাতল ঘোরার আওয়াজ উঠলো ডেলার কথা শেষ হবার মুহূর্তে। শুয়ে পড়লম বিছানায় সটান। চিতপাত হয়ে। ঢুকলো জুড হার্কনেস। ত্বরিতে ঘুরলো ডেলা। রাইসনারকে পেলে? হ্যাঁ আসছে। আমার কানে লাগলো ওর কথা বলার ভঙ্গি ওকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম চোখের কোণে। আমার দিকেই তাকিয়ে হার্কনেসও। জ্ঞান হয়নি? বোধ হয় ঘুমোচ্ছে নিঃশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক, জবাব দিলো ডেলা। সারা ঘর জুড়ে একটা দীর্ঘ অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ নামলো। হার্কনেস কথা বললো অনেকক্ষণ পরে, 'ফোন ধরেছিলেন যিনি, বললেন তার আসতে দেরী হবে ঘণ্টাখানেক।

এবার আমি শুতে যাবো আপনাদের অসুবিধা না হলে—অনেক রাত তো হলো 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। আর বিরক্ত করবো না ভাই, তোমাকে। ধন্যবাদ অনেক, তুমি যা করলে—' 'ঠিক আছে।'

লজ্জা দেবেন না একথা বলে বারবার। আচ্ছা, তাহলে, আর কিছু লাগছে আপনাদের? 'না-, রয়েছে তো সবই। তোমাকে আর উঠতে হবে না মিঃ রাইসনার এলে—'

থামলো ডেলা, হার্কনেসের দিকে বাড়িয়ে ধরলো ব্যাগটা খুলে কয়েকখানা নোট বের করে, 'মনে যদি কিছু না করো, তাহলে, এই সামান্য—' 'দরকার নেই।'

হার্কনেস ডেলাকে থামিয়ে দিলো। না, একশো আছে, তোমাকে নিতেই হবে এটা। একটা কথা আর—তোমাকে গোপন রাখতে হবে এ সবই।

বলবে জিজ্ঞাসা করলে কেউ কিছু—ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা কেমন? হার্কনেস টাকাটা নিলো সামান্য ইতস্তত করে, 'ধন্যবাদ।'

আমি মুখ খুলি না আমার মাথা গলাবার নেই এমন কিছু ব্যাপারে। সে দরজাটা টেনে দিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। ডেলা আঙুল তুললো পর্দাহীন জানলাটার দিকে, ওইখান দিয়ে দেখেছিলো ও আমাদের। ওর গলা প্রায় খাদে। মনে হলো আমারও তাই। ডেলার কাছ থেকে যেটকু জেনেছিলাম রাইসনার সম্পর্কে, তাতে আমার ধারনা হয়েছিলো ওকে হলি-উড মার্কা নৃশংস চরিত্রের একটা জীব বলে। কিন্তু ধারণা পাল্টাতে হলো ওকে দেখার পর। মনে হলো চল্লিশের নীচেই লম্বা ছিপছিপে চেহারার রাইসনারের বয়স। কিন্তু খড়ির মতো সাদা তার চুল, চোখে মুখে মাস্টার মশাই ছাপ। বাজ পাখীর মতো টিকালো নাক, সারা মুখে বিষণ্নতার ছোঁয়া। রাইসনার ডেলাকে দেখেছিলো দরজায় দাঁড়িয়ে।

ডেলা তাকে অভ্যর্থনা জানালো মৃদু হেসে চোখে চোখ মিলতেই, নিক এলে। পরে হবে কথাবার্তা আগে বেরোনো যাক এখান থেকে। রাইসনার বঙ্কিম হাসি ফোটালো ঠোঁটের কোণে। ডেলাকেই যেন উদ্দেশ্য করলো আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে।

মিঃ রিক্‌কা? রাইসনারের নরম মেয়েলি গলা আশা করি নি যা। চোখ বোলালাম ওর সারা শরীরে—ছিমছাম পোষাক কেতাদুরস্ত।

নষ্ট হতো বোধহয় প্যারিসের অভিজাতমহলে পলের ইজ্জত আমি সঙ্গে থাকলে— ডেলা বললো ঠোঁট উল্টিয়ে, তাছাড়া এটাও হয়তো ওর অভিপ্রায় আমি জনির সঙ্গে থাকি। জানি। রাইসনার উচ্চারণ করলো অস্ফুটে, গাড়ি তুলে দিয়ে বড় রাস্তায়।

চোখে পড়েনি অসাধারণ কিছু? তুলতেই বা গেলে কেন? লোকটা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো শহর ছেড়ে বেরোবার জন্য, যেতে চায় মিয়ামি না কোথায় বললো। খারাপ হয়ে গেছে তার গাড়িটা নাকি। অনুনয় করতে লাগলো পৌঁছে দেবার জন্য লিঙ্কন বীচ পর্যন্ত।

বললো কিছু শহরের নাম? হ্যাঁ, পেলোটা। ঠিক আছে কি করা যায় দেখি। মনে হয় না পল চট করে ভুলতে পারবে বেন্টলে গাড়ির শোক। যা বলেছো। ডেলা খুললো সিগারেটের প্যাকেট।

গাড়ি এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। কেউ কোনো কথা বললো না অনেকক্ষণ। প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলো রাইসনারই, কমই বলেন দেখছি আপনি তো কথা, রিক্‌কা সাহেব। নিরিবিলি পছন্দ বেশ, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু আপনিই যেন বক্সিং রিং থেকে নেমে এলেন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে। ডেলাই মুখ খুললো আমি কিছু বলার আগেই, একটা লোক মার খায় তুমি নিশ্চয় আশা করো না আর একজনকে ভাগতে হবে গাড়ি নিয়ে সুড়সুড়িয়ে। জনি যুঝেছে যতক্ষণ পেরেছে। তাহলে আর একটা বিশেষণ যুক্ত হলো শান্তর সঙ্গে বলবান। এবার বিদ্রূপের সুর সুস্পষ্ট রাইসনারের গলায়, তাহলে তোমার মতো নয়, মিসেস ওয়ার্দাম, হাততালি দেবে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। তখন কি করা উচিৎ ছিলো আমার চেল্লানো?

ডেলা বলে উঠলো গলার শির ফুলিয়ে। একটা বন্দুক থাকে সব সময় তোমার সঙ্গে আমি তো জানতাম, তাহলে ওটা রাখার কি দরকার যদি সময়ে ব্যবহার নাই করা গেলো। এবার শক্ত হয়ে মুঠো হতে দেখলাম ডেলার হাত দুটো। রাইসনার জিতলো প্রথম পর্যায়ে। ডেলা বলে দিলো নির্বিকার মুখে, বন্দুক ছিলো না আমার সঙ্গে।

ছিলো না? এই প্রথম, তাই নয় কি? রাইসনার ডেলার দিকে তাকালো গাড়ির আয়না দিয়ে। বৃষ্টি হয় ছাতা সঙ্গে না থাকলে, তাই না? বুঝলাম রাইসনার কথাগুলি বলছে না নিজের কানে মধুবর্ষণ করানোর জন্য। সন্দেহ করছে ও। যদিও সে বকেছিলো আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না

করে, কিছু বের করতে চাইছে তবু মনে হোল। টোকা দিলাম ডেলার হাঁটুতে। ইশারায় দেখিয়ে দিলাম হাত ব্যাগটা ও ফিরতেই। ও বুঝলো ইঙ্গিতটা, পিস্তলটা বের করে দিলো ব্যাগ থেকে আসনের নীচে নামিয়ে। সেটা ফেলে দিলাম পকেটে। আচ্ছা, কেন হঠাৎ থামতে গেলে পেলোট্রায় ? আচমকা রাইসনার প্রশ্ন করলো।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম আমরা। ধরিয়ে দিতে হোল না আমাকে আর খেই, ইতি ঘটানো দরকার ওর প্রশ্নোত্তরের আসরে, 'মশাই দেখুন বাদ দিন তো এইসব ছেঁদো কথাবার্তা—জাম খেয়ে আছে মাথাটা শালা—পৌঁছে দিন তাড়াতাড়ি একটু ঘুমোবো।' রাইসনার চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। 'নিশ্চয়— নিশ্চয়।' সে বাড়িয়ে দিলো গাড়ির গতি, মনে করবেন না কিছু, আমার বহুকালের বকুনির অভ্যেসটা।

উঠতে লাগলো গাড়ি চড়াই। তাকালাম জানলার বাইরে—। 'লিঙ্কন বীচ।' জানালো ডেলা। রইলাম তাকিয়ে সমুদ্রের মুখে, শহর অর্ধবৃত্তের আকারে। শহরের অল্পই দেখা গেলো গাড়ির প্রচণ্ড গতির জন্য—কিন্তু দেখলাম যেটুকু তাতে শহরটাকে আলাদাই মনে হলো আর পাঁচটা সৈকত শহরের থেকে। ঘড়িতে এখন রাত দুটো—স্ফটিকের সমাহার আর আলোর লাল-নীল ফোয়ারা শহরের সর্বত্র। চোখে পড়লো নিওনের প্রাচুর্যও। মনে হয় রূপকথার রাজত্ব।

বাহবা দিলাম। বাঃ জায়গাটা তো বেশ ; ক্যাসিনো ওইটে হোল—যেটা দেখছো উপসাগরের শেষে—' হাত বাড়ালো ডেলা, তারপর বললো রাইসনারের উদ্দেশ্যে, 'নিক দেখাচ্ছে কিন্তু ভালোই। যেন স্বগতোক্তি করলো রাইসনার। আমরা ক্যাসিনোতে পৌঁছে গেলাম অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। পাহারা রয়েছে গেটে ; কালো পোষাকের দুজন দুপাশে। হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর পোষাক। হাত তুললো ওরা, ভাবলেশহীন মুখে।

এগিয়ে চললো গাড়ি, দু'পাশে আলোর সারি। বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে আলোর কারসাজিতে, গাড়ি যেন চলেছে জলের তলা দিয়ে। এগুলো লাগিয়েছি মাস দুয়েক হলো, আলোর ব্যবস্থা করেছি সম্ভাব্য সব জায়গাতেই ; যেন দেওয়ালী পোকা পয়সাওলা মানুষগুলো, রাইসনার বললো, ছুটে আসে আলো দেখলেই। বেড়েছে ব্যবসাও।

নিজের মনের কথা যেন বলে চলেছে রাইসনার।

রাইসনার আবার শুরু করলো ডেলা কি একটা বলার জন্য মুখ খুলতেই ; আলো দিয়েছি প্রতিটি ফুলের বাগানেও। পল তো মাঝে মধ্যে গাই-গুঁই করতো টাকা খরচ হচ্ছে বলে—কিন্তু টাকায় টাকা পয়দা করে এখন বুঝেছে। দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষ ছুটে আসে শুধু ফুল দেখতে। বারে ঢোকে পরে খরচা করে মালের পেছনেও। ঘাসে ঢাকা এক ফালি জমিতে পড়লো রাস্তা এবার। ক্যাসিনো দাঁড়িয়ে আলোর সমারোহ নিয়ে আমাদের সামনে, স্বপ্রতিষ্ঠিত আপন মহিমায়। যেন একটা দৃশ্য আরব্যরজনীর ঃ কেল্লা মূরীয় ভাস্কর্যের অনুকরণে, আলোর ঝরনা মিনার থেকে বিচ্ছুরিত, উর্ধ্বমুখী রাতের আকাশ ভেদ করে। অদূরে চলেছে নানা রংয়ের আলো জ্বলা নেভা স্বয়ংক্রীয় প্রক্রিয়ায়। রিক্কা সাহেব, কিছু করতে পেরেছেন এরকম লস এঞ্জেলসে ? না বোধহয়। দশ হাজার খরচ করেছি এজন্য আমরা। রাইসনার গাড়ি চালিয়ে গেলো ক্যাসিনো পেরিয়ে। উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় সজ্জিত অঞ্চল পার হয়ে। সেখানে অনেক মানুষের কলতান এতরাতেও। সৈকত থেকে কিছুদূরে আর একটা গেট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো সারি সারি অনেকগুলি কুটিরের একটার সামনে। এসে গেছি। জানোই তো মিসেস ওয়ার্দাম সব ব্যবস্থা করা আছে তোমার জন্য, রাইসনার এই প্রথম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো ডেলার দিকে, 'কি ব্যবস্থা করবো রিক্কা সাহেবের ?'

ওকে দাও, পল ব্যবহার করে যেটা, ডেলা বললো অম্লানবদনে, গাড়ি থেকে নেমে। রাইসনার প্রশ্ন করলো একমুহূর্ত থেমে। পাঠিয়ে দেবো কি ডাক্তার ? দরকার নেই কোনো, ঠিক আছি আমি—ঠিক হয়ে যাবো ঠেসে ঘুম দিলেই। যেমন বোঝেন, উপেক্ষা ধ্বনিত হলো রাইসনারের গলায়।

নিক আর দরকার নেই অপেক্ষা করার। কাজের কথা হবে সকালেই। ধন্যবাদ সাহায্য করার জন্য আমাদের। ঠোটের ফাঁকে হেসে রাইসনার ডেলার মুখ থেকে আমার মুখে চোখ ঘোরালো, আবার তার চোখ ফিরে গেলো ডেলার দিকেই। তাহলে চলি, দেখা হবে কাল দুপুরে কাজে বসা

যাবে খাওয়া দাওয়ার পর। আস্তে চলতে আরম্ভ করলো বিরাট গাড়িটা চলতে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম গাড়ির পেছনের আলো দুটোর দিকে গাড়িটা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। লম্বা নিশ্বাস নিলো ডেলা। দেখলে তো রাইসনারকে কেমন মনে হলো?

চালাক লোক। হুঁ এসো ভেতরে। শুকিয়ে গেছে গলাটা, ভিজিয়ে নি একটু। ডেলা আলো জ্বালিয়ে দিলো কুটিরে ঢুকে। বেশ বড়ই ঘরটা ব্যবহার করা যায় দিনের বসার ঘর হিসাবে, আবার ব্যবস্থাও রয়েছে রাতে শোবার। একটা রান্নাঘরও আছে, লাগোয়া কলঘর। বিলাসিতার ছাপ সর্বত্র। বন্দোবস্ত সব কিছু বোতাম টিপে সবার। ডেলা ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে। কেমন, ভালো না ব্যবস্থা? পলের দারুণ শখ ছিলো এসব ব্যাপারে। এখানে এরকম কুটির আছে গোটা ত্রিশেক—তার নিজস্ব সজ্জা নিয়ে প্রত্যেকটিই—এটাই পছন্দ আমার কিন্তু।

ও দোলাতে লাগলো পা, একটু জলের ব্যবস্থা—হুম কি আছে ওই আলমারিতে? হুইস্কিতে সোডা ঢেলে ডেলার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিলাম। ডেলা এগিয়ে এল আমার দিকে।

যাবো না, বললাম মিসমিসিয়ে, আমার হাত কাঁপছে। ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। একদিন আমরা মিলবো একসঙ্গে কাজ করলে, জনি—কিন্তু আজ না। যাও শুতে।

প্লিজ এখন না। ওর কাঁধে নামিয়ে দিলাম আমার হাত দুটো। ডেলা শিউরে উঠলো। ওকে আমার মুখোমুখি টেনে ঘুরিয়ে দিলাম, 'শুধু তোমার কথাই শুনে আসছি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে, করছি যা বলছো। আমার কথায় চলতে হবে তোমাকে এখন থেকে। দুপাশ থেকে আমার গলায় নেমে এলো ডেলার হাত দুটো, ও কণ্ঠলগ্না হলো। আমার খুব ভালো লাগে যখন তুমি এভাবে কথা বলো জনি। ডেলা আমার ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে দিলো।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম রাজকীয় প্রাতঃরাশ চুকিয়ে। পাশের কুটিরে নজর গেলো সিগারেট ধরিয়ে পায়চারী করতে করতে। আমার দিকেই আসছে ডেলা বেরিয়ে। ডেলা আর একবার আমার হৃদয় দোলালো আকাশ-নীল হাতকাটা স্কার্ট, মাথায় নায়িকা টুপি আর রোদ্দুর চশমায়। অ্যাই জনি—ডেলা ছুঁড়ে দিলো তার মনোহর হাসি।

'দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে।' আমার মুগ্ধ দৃষ্টি। খারাপ দেখাচ্ছে না তোমাকেও কিছু। হাসিটুকু লেগে আছে ওর মুখে। ও চোখ বোলালো আমার কলারওলা গেঞ্জী আর ঢোলা প্যান্টে মাপসই হয়েছে বেশ—। হয়েছে তা তো, কিন্তু কোত্থেকে জোটালে এ গুলো?

জুটিয়েছি আমিই, জোটাচ্ছি তো সব কিছু সকাল থেকেই।

ডেলা হাসি থামালো, চলো যাওয়া যাক দর্জির কাছে, তোমার জন্য অর্ডার দেবো কিছু পোষাকের—বিশ্বাস হচ্ছে না আমার তো কিছুই, কোথায় মিয়ামি যাবার ধান্দা করছিলাম। ট্রাকে চড়ে, আর...।

ওর সাদা সাদা দাঁত মেলে দিলো ডেলা আবার, সব ঠিক আছে। আরে, এসো নিকের সঙ্গে বসতে হবে আবার এদিকটা সেরে। ওর সঙ্গে ঘুরলাম ঘণ্টা খানেক—ক্যাসিনোর চত্বর, দর্জির কাজ সেরে। হীরের নেকলেস থেকে অ্যাসপিরিনের বড়ি—দোকানপাট লিলিফুলে ভরা দীঘি, মৎস্যাধার বাগান, সবই করেছে ওয়ার্দাম—সবই। কৃত্রিম জলাশয় ওক গাছের ছায়ায়, জলে স্পেনীয় শেওলার বিস্তার। বিদ্যুৎ চালিত নৌকা ভাড়া করুন বান্ধবীকে নিয়ে যদি হারিয়ে যেতে চান। একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানাও আছে ক্যাসিনোর পেছনে। সেখানে সারাদিন কিচিরমিচির চলছে নানা দেশের পাখীর, দেখবে এসো সিংহের গুহাটা। পশুপ্রেমিক ছিল পল। তার পশুরাজদের প্রতি অসীম দুর্বলতা ছিলো। তাজ্জব বনে যাবে তুমি শুনলে, কত মানুষ শুধু এই লিঙ্কন বীচে পায়ের ধুলো দেয় ওই জানোয়ারগুলোকে দেখবার জন্যেই।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়ালাম গুহার ওপরে রেলিংয়ে, আমার কাঁধে ঠেকানো ডেলার কাঁধ। দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম নীচে গোটা দুয়েক পশুর বিচরণ চলেছে অলস পায়ে।

বললাম দেখার জিনিষই বটে। এদের নিজের হাতে খাওয়ায় রাইসনার। এদের জন্য সবটুকু ওর অবসর সময়ের। ফিরে দাঁড়ালো ডেলা। ফেরা যাক চলো, দেখার আছে আরো অনেক কিছু। পেরিয়ে চললাম মুক্ত অঙ্গন রেস্তোরাঁ। উঁকি দিলাম নীচের ঘরে, কাচ বসানো মেঝেতে। আমাদের দেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো মধ্য বয়স্ক এক মেদবহুল ইতালীয়।

লোকটার পরনে নিখুঁত প্রভাতিক পোষাক। 'জনি, লুই পরিচয় করিয়ে দি, তিনটে রেস্তোরাঁই এর এক্তিয়ারে আমাদের এখানকার। লুই ঝুঁকে অভিবাদন করলো ডেলা তার দিকে ফিরতে। লুই কেমন আছ? ডেলা ওর কুশল জানতে চাইলো মিষ্টি গলায়। ভালো ম্যাডাম।

জনি রিক্কা ইনি। সন্ধানী দৃষ্টি হানলো ইতালীয়টি আমার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলো ঝুঁকে, মিঃ রিক্কা আপনার কথা শুনেছি—সব খবর ভালো, আপনাদের লস এঞ্জেলসের? হ্যাঁ ভাই, কিন্তু কিছুই না এখানকার তুলনায়। হাসলাম। কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া নামলো লুইসের চোখে, আর ওয়ার্দাম সাহেব? ভালো আছেন তিনি? ডেলাকে এবারের প্রশ্ন। ভালোই প্যারিসের পথে তিনি তো এখন, ভাগাবান লোক তো।

'ও, তা আমার এখানেই খাচ্ছেন তো আপনারা? হ্যাঁ। সম্মতি দিলো ডেলা। একটা বিশেষ পদ রাঁধবো আজ আপনাদের জন্য। গলা মেলালাম। বেশ। আচ্ছা লুই দেখা হবে পরে। এগোলো ডেলা। আমাদের কি ওখানেই চার বেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত? বললাম, লুই বাইরে বেরোতেই। হ্যাঁ, ওইখানেই অন্য দুটোর একটাতে না হয়। অবশ্য পলের সবগুলোই। এরা না জানা পর্যন্ত ওর মৃত্যুসংবাদ আমারও। আমি অতটা ভাবিনি। ডেলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো আমার কথায়। আমরা হেঁটে চললাম নিঃশব্দে। মুখ তুলে তাকালাম একটা গাড়ির শব্দে। একটা কন্‌ভার্টিবল বুইক এসে দাঁড়ালো ক্যাসিনোর সদরে। একখানা গাড়ি বটে—সেদিকে তাকিয়ে রইলাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। গাড়ি মিশকালো রঙের। হতবাক হয়ে গেলাম গদি, চাকা আর গাড়ির আধুনিকতায়। গাড়ি কেমন? পলের ওটাও। ওটাই ব্যবহার করতো এইখানে থাকতে।

এখন ওটা জনি তোমার। আমি প্রশ্ন করলাম ভাঙা গলায়। তোমারই তো। ডেলার ঠোঁটে রহস্যের হাসি, পাথর চোখ দুটো, তোমারই, অন্ততঃ ছড়িয়ে না পড়ছে যতদিন পলের মৃত্যুর খবর। বাড়লো অস্বস্তি। উত্তেজনাও। একই কথা বলে চলেছে কেন মেয়েটা বারবার? একদম ভালো লাগছে না আমার ওই সব শুনতে, ডেলা বলতো কি ব্যাপার। কি বলতে চাইছো? কিছুই না, এসো। ডেলা এগিয়ে গেলো গাড়ির দিকে। বসে পড়লো দরজা খুলে। আমি দাঁড়ালাম, দরজায় হেলান দিয়ে, তুমি কিছু বলতে চাইছো, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে। নিরুত্তর ডেলা। শুধু বললো অনেকক্ষণ পরে, জনি উঠে পড়, তাকিয়ে আছে সবাই। চোখ তুললাম ওর কথায়। বিলাসিনীরা আমাদের গিলছে অত্যুৎসাহী চোখে।

বসে গেলাম স্টিয়ারিংয়ে। বেড়াতে যাবো শহরের দিকে। চলো গেটের দিকে। পথ বাতলে দেবো রাস্তায় পৌঁছে। হাত দিলাম স্টার্টারে। গেটের দিকে গাড়ি এগোলো, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি আমি কিন্তু এখনও। ডেলা আমার দিকে তাকালো ভাবলেশহীন মুখে, চোখ ঢাকা গো-গো র মুখোসে, বলতে চাইছি না আমি কিছুই। আপাততঃ আমাদেরই এসব, বলতে চাই শুধু এইটুকুই।

'না হয় হলো তা, কিন্তু আড়াই লাখের, করছো না তো কোনো সাড়া শব্দ সেটার সম্বন্ধে? কিছুই বলছো না টাকার অঙ্কটা? কেনা যায় বলছো ও টাকায় ক্যাসিনো আর এসব? ডেলা নকল করলো আমার গলা। তবে তা বলছি না, আর এই গাড়িটা—কেনা যায় অনেক কিছু?

একবারও ভেবেছো তোমার কতদিন চলবে আড়াই লাখের অর্ধেক টাকায়? খাটাবো টাকাটা। অন্ততঃ বাঁচা যাবে ভদ্রভাবে। কি মনে হয় তোমার? খাটাবার মত কিছু থাকবে তো গাড়ি, বাড়ি আর ওয়ার্ডরোব কেনার। পোকা আছে তোমার মাথায়, বুঝলাম কুবুদ্ধি খেলছে ডেলার মাথায়। তোমার ওই টাকাটা পেলেই চলে যাবে আমি তো ভেবেছিলাম। ডানদিকের রাস্তা ধরো গেট থেকে বেরিয়ে ডেলা সেলাম নিলো পাহারাদারদের। বলেছিলে কি? পোকা আছে আমার মাথায়?

ও হেসে উঠলো, তোমাকে শুধু একটা কথাই ভাবতে বলছি—কেমন লাগবে তোমার রাইসনার যখন এখানকার মালিক হয়ে বসবে কিছুদিনের জন্য? টাকাগুলো তো পেলাম আমরা, কিন্তু অনন্তকাল চলবে না তাতে তো, বাড়বেও না দাঁড়াও-দাঁড়াও আড়াই লক্ষ নিচ্ছি আমরা দুজনে মিলে তো—কিছুই না কি সেটাও? আর সিন্দুকেই পড়ে টাকা তো এখনও।...

এ-ই লিবার্টি ইন। জো এলসনার মালিক হচ্ছে। এক ডাকে চেনে সকলে মহিলাটিকে বে স্ট্রীটের। করিয়ে দিচ্ছি আলাপ। কিন্তু মনে রেখো জনি—তুমি একজন বিত্তশালীদের দলের।

এখানকার সকলে নামে চেনে রিক্‌কাকে। দেখলাম এলসনারকে মধ্যবয়সী বিশালকায়া মহিলা, দুশো পাউন্ডের কম নয় ওজনে। এগিয়ে এলো হাউ-হাউ করে ডেলাকে দেখে। লজ্জা পেলাম কথা বলতে লাগলো এমন ভাবে আমার সঙ্গেও। পীড়াপীড়ি চললো শ্যাম্পেনে গলা ভেজানোর জন্য। বিশেষ মেনু লিবার্টি ইনের। সঙ্গে নাচ, স্ট্রীপটিজ অবশ্যই। এলস্‌নার ন্যাকা হাসি দিলো, সংগ্রহ করা হয় ওদের হাতে হাতে। মুখবদলও হয় সীমান্তে। ওরা আসে দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে। আজ সন্ধ্যায় আসুন না, দেখার জিনিষ। আমরা জুয়ার আড্ডার দিকে এগোলাম ইন থেকে বেরিয়ে। এখানে জেরী ইট্টার সঙ্গে পরিচয় হলো।

পুরোদমে খেলা চলছে পোকার। ইট্টা জানালো দিন তিনেক আগে এ খেলা শুরু হয়েছে। ইট্টা বললো দাঁতের ফাঁকে সিগারেট নাচিয়ে, আমাদের টাকায় দশ পয়সা। কয়েক হাজার পেয়ে যেতে পারি এ ব্যাপারটায় মনে হচ্ছে। পরিষ্কার বুঝলাম একটা ব্যাপার, ডেলাকে ভয় পায় ইট্টা আর এলসনার দুজনেই।

একই চিত্র অন্যত্র। ডেলা বাইরের দিকে পা বাড়ালো ডজনখানেক লোকের সঙ্গে দেখাশুনার পর।

ফেরা যাক চলো, বসতে হবে নিকের সঙ্গে। উঠে বসলাম গাড়িতে, এ গলিতে মনে হচ্ছে টাকার ছিনিমিনি চলে। চোখ বুজে থাকে নাকি পুলিসের লোক? চোখ খোলে না ওদের সেবা করা হয় বলে ; আমার দিকে ডেলা হেসে ফিরলো। সাপ্তাহিক দক্ষিণা পাঁচশো। পুলিস সাহেব হেম। সে টাকাটা পায় রাইসনারের কাছ থেকে। তোমারও দেখা হবে ওর সঙ্গে। হেম ভালো মানুষের পো যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছে, দাঁড়াবে হাজতের দরজা খুলে।

নেই তো ওয়ার্দাম। চলবে কি করে এ গ্যাঁড়াকল। বুইক চালিয়ে দিলাম ভীড় কাটিয়ে। মনে হয় না নিকটা সামলাতে পারবে, তাকে খুঁজছে এলস্‌নার আর ইট্টা। বেঁকে বসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। তাই পরিচয়টা করিয়ে রাখলাম তোমার সঙ্গে ওদের। ডেলা ঠোঁট ঘষতে শুরু করলো অধররঞ্জনীর কৌটো খুলে।

'এর আবার কি সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে?' ডেলার ঠোঁটে খেলে গেলো বিচিত্র হাসি।

'জনি অনেক অনেক—'রাইসনার বসে একটা বড় টেবিলের পেছনে, সিগারেট পাতলা ঠোঁটে। ধূসর চুলের বেঁটে মানুষটাকেও দেখলাম ওর ডানদিকের একটা আরাম কেদারায়, হিংস্রতার প্রলেপ চওড়া মুখে। উঠে দাঁড়ালো ডেলাকে দেখামাত্র উদার হাসি মুখে 'আরে মিসেস ওয়ার্দাম যে—খুশি হয়েছি আপনার হঠাৎ আগমনে। অবাকও কম হয়নি। বিস্তৃত হলো হাসি, দেখা প্রায় বছর খানেক পরে, কি বলেন? তারপর আছেন কেমন?

আরো সুন্দর হয়েছে আপনার চেহারা। লোকটা বলে ফেললো অনেকগুলো কথা একসঙ্গে। ডেলা পেলব হাতটা বাড়িয়ে দিলো একটা চটুল হাসি হেনে। লোকটা হাতটা নিজের হাতে একটু বেশীক্ষণই রাখলো। 'আসুন' হাত টেনে নিলো ডেলা আস্তে, পরিচয় করিয়ে দি জনি রিক্‌কার সঙ্গে। মালিক লস এঞ্জেলস ক্যাসিনোর। ডেলা আবার আমার দিকে ফিরলো, জনি—আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী পুলিস ক্যাপ্টেন হেম—।

হেম হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, মিলিয়ে গেছে তার মুখের হাসি। সে আমার হাতটা শক্ত করেই ধরলো, মিঃ রিক্‌কা আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। পুলিস সাহেব ঠোঁট কাটার মতো বললো, অনেক শুনেছি আপনার কথা।

ওর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আমিও, জানালাম। রাইসনার ব্যস্ত হয়ে পড়লো এই ফাঁকে ককটেলের বন্দোবস্তে, জিম একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে তোমার জন্য, মিসেস ওয়ার্দাম। ডেলার হাতে মার্টিনির গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বললো সে। খবরটা বলে দাও জিম। হেম আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো রাইসনারের হাত থেকে হাইবলের গ্লাসটা নিয়ে। পাওয়া গেছে আপনার গাড়িটা। পেয়েছেন? প্রতিফলন হলো বিস্ময় আর প্রশংসার যুগপৎ ডেলার চোখে। কাজের লোক আপনি, ক্যাপটেন। তুলে ধরলো ডেলার দিকে হেম তার শান্ত নীল চোখ দুটো, খুব শক্ত ছিলো না কাজটা। রিপোর্ট এসেছিলো কাল রাতেই, তারপর সব পরিষ্কার হয়ে গেলো নিক আজ সকালে ফোন করতেই। কি জানলেন?

একটা সংঘর্ষ হয় পেলোট্রার বাইরে গত রাতে দুটো গাড়িতে। ড্রাইভার মরেছে দুটোরই। আপনার গাড়ি চালাচ্ছিলো তাদের একজন—গাড়িটা ছাই হয়ে গেছে একেবারে। অনন্য মুখভার ডেলার অ্যাঁ। ক্ষেপে যাবে তো পল শুনলে।

হুঁ। দারুণ ছিলো গাড়িটা! হেম হাত বোলালো তার ভারী চোয়ালে। আচ্ছা মিসেস ওয়ার্দাম লোকটাকে কেন বলুন তো গাড়িতে তুললেন? রাইসনার আমার দিকে এগিয়ে এলো ডেলা ওর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুরু করতেই, 'কি খাবেন আপনি—স্কচ?' বলে বসলাম বিনা দ্বিধায়, ওসব ছুঁই না আমি। শুধু খেতে পারি একটু বিয়ার। আমার চোখে আটকে গেলো রাইসনারের কালো চোখ দুটো, 'স্কচই আপনার প্রাণ আমি তো শুনেছি।'

যাঃ। রিক্কা তো স্কচে হাবুডুবো খায় ভুলে বসে আছি। থেমে গেলো বুঝি বা হৃৎস্পন্দন, আমি নজর দিচ্ছি কিছুদিন শরীরের ওপর, শুধু বিয়ার খাচ্ছি মাঝে মধ্যে। চোখ ফিরিয়ে বললাম রাইসনার পড়তে পারলো কিনা জানি না আমার চোখের ভাষা। আমার দিকে একটা বিয়ারের বোতল খুলে বাড়িয়ে দিলো ভাবলেশহীন মুখে। বলে চলেছে হেম তখন, 'মিসেস ওয়ার্দাম লিফট দেওয়া ঠিক হয়নি উটকো লোককে—কেন যে করলেন এটা।

না, মানে মনে হয়নি কিছু জনি তো সঙ্গে ছিলো তাই। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার আমার মনে হলো।

ধুর আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই লোকটা কে তা নিয়ে। গাড়িটার কথা আমি ভাবছি। ক্ষেপে উঠবে পলতো শুনলে, বিশেষ করে তৈরী যে গাড়ির অংশগুলো। আমি অবশ্য যোগাযোগ করেছি এ বিষয়ে বীমা কোম্পানির লোকদের সঙ্গে, ওরা রাজী হয়েছে টাকা দিতে। রাইসনার বললো মদের গ্লাসে লম্বা চুমুক মেরে।

ডেলা মিষ্টি করে বললো, ধন্যবাদ নিক। হেম ফিরলো আমার দিকে, ঠিক রাখতে হবে নথিপত্র, তা একটা বর্ণনা দিতে পারেন লোকটার চেহারার রিক্কা সাহেব? অবশ্য কিছু পেয়েছি ওদের কাছ থেকে পেলোট্রায়, দেখি মেলে কিনা আপনার সঙ্গে। এক বারও তো ভাবিনি এদিকটা —সর্বনাশ। এরা কি সন্দেহ করছে আমাকে ফারার বলে? হতবাক রইলাম মুহূর্তের জন্য। নিঃসঙ্কোচে বলে উঠলো ডেলা—মুখ খুলতে যাবো, 'জানেন মজার ব্যাপার আমাদের জনির মতো লোকটা অনেকটা দেখতে—স্বাস্থ্য ওর মতোই, লম্বা, চেহারা ফর্সা গোছের।'

টাই একটা সবুজ-তামাকে মিলিয়ে রং, সাদা লিনেনের স্যুট, আর একটা সাদা রেশমী জামা পরেছিলো যতদূর মনে পড়ছে। 'ওই ব্যাটাই হবে—হ্যাঁ হ্যাঁ, কি জানেন মিসেস, চক্কর খেয়ে পড়ে ছিলাম নিক আর আমি তো, এত মিল রিক্কার সঙ্গে ফারারের। গোলমেলে ঠেকছিলো ব্যাপারটা—শয়তানটাকে দেখতে অবিকল জনির মতো—' সাহস পেয়ে গেছে ডেলা।

কিন্তু তা মানছে না তো জনি, ও কর্ন্দপকান্তি ওর ধারণা—ডেলা খিলখিলিয়ে উঠলো। হেমও সঙ্গে। কিন্তু ভাঁজ থেকেই গেলো রাইসনারের কপালে। উঠে দাঁড়ালো হেম, 'তাহলে কাজ মিটলো আজকের মতো, চলি—হাজিরা দিতে হবে না আপনাদের আর কোর্টে—একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবো করোনার সাহেবের কাছে। ফারার গাড়িটা গেঁড়িয়েছিলো গাড়ি রাখার জায়গা থেকে, আর কি বলেন ধরতে পারেন নি আপনি তাকে?'

'যা ভালো বোঝেন।' ডেলা দেখালো ঝকঝকে দাঁতের বাহার। স্বস্তি পাচ্ছি ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পেরে আপনাকে, মিসেস ওয়ার্দাম। ডেলার নরম হাতটা চটকালো হেম আর একবার। যদি যান কখনও আমাদের ওদিকে, দেবেন পায়ের ধুলো। দপ্তরের জেল্লা বাড়ে সুন্দরীদের পদার্পণে। হেম মাথা নোয়ালো আমার দিকে ফিরে।

'রিক্কা সাহেব চলি—' বেরিয়ে গেলো হেম। অন্যদের জন্য তবু ভাবে পুলিসসাহেব, সিগারেট ধরালাম আমি। ওর পেছনেতো অনেক পয়সা যায়, ভাববেই তো—

পল একসঙ্গে খাতা দেখতে বলেছে ওকে আর আমাকে। থামিয়ে দিলাম রাইসনারকে। আমার জানার দরকার নেই পল আপনাকে কি বলেছে না বলেছে। ব্যস, কিছু জানায়নি আমাকে।

'মশাই দেখুন' হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলো ডেলা আমি উত্তেজিত ভাবে কিছু বলতে শুরু করতেই, জনি কথা বলো না তুমি, আমি জানি কি করে করতে হয় এসব ব্যাপারের সমাধান। ডেলা

উঠে দাঁড়ালো।

তুমি উদ্বৃত্ত টাকায় হাত দিয়েছো পলের ধারণা। দেখতে এসেছি আমরা সেটা তুমি পার পাবে না এসব বুকনি দিয়ে। ভালোয় ভালোয় চাবিগুলো দিয়ে দাও। রাইসনার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, যেন সে শুনছে খুব মজার কিছু। তা কে অন্ন মারছে, তুমি? মজার ব্যাপার সত্যি—হো-হো-শোনো।' রাইসনার বন্ধ করলো হাসি, 'এখান থেকে নড়ছি তবেই, পল যদি আমাকে তাড়ায়, তার আগে না। মস্ত ভুল করেছো যদি সেরকম কিছু ভেবে থাকো তুমি আর রিক্‌কা। এটা আমার এলাকা ভুলে যেয়োনা। অসুবিধেই হবে বাড়াবাড়ি করলে।' বদলে গেছে রাইসনারের গলার স্বর।

মনে হলো রাইসনারকে মেরেই বসবে ডেলা বুঝি এবার। কিন্তু না, ও সরে গেলো দুপা, মুঠোকরা হাত দুটো, আগুন ঝরছে চোখে, আচ্ছা দেখা যাবে। ডেলা ফিরলো আমার দিকে, খেতে যাই, এসো জনি। ও আর তাকালো না রাইসনারের দিকে। উঠে দাঁড়ালাম আস্তে আমিও। রাইসনার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলো কাগজ কাটা ছুরিটা রেখে, বলে উঠলো ডেলা বেরোতেই, 'আজব চীজ মেয়েমানুষগুলো।' সে আগুন দিলো সিগারেটে, তার ব্যতিক্রম নয় ম্যাডামটিও, যাক আপনি বলবেন খাতাপত্র কখন দেখতে চান, এখানেই পাবেন আমাকে সব সময়ে। রাইসনার আপনি ভুল করলেন। পল হিসেব দেখতে বলেছে ওকে। শুনেছি আমি নিজে।

শুনিনি আমি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসলো রাইসনার, একটা সিগারেট কেস বের করলো পকেটে হাত ঢুকিয়ে, 'হ্যাঁ রিক্‌কা সাহেব ভালো কথা, এটা পড়ে ছিলো আপনার ঘরে। রেখে গেছে যে লোকটা ঘর পরিষ্কার করে। রাইসনার আমার চোখে তার সন্ধানী চোখদুটো তুলে ধরলো টেবিলে কেসটা নামিয়ে দিয়ে। কেসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সম্পত্তি ওয়ার্দামের। ছিলো ওই প্যান্টের পকেটে। কেন গেলাম এটা পুযে রাখতে। গাফিলতি আমারই, ধন্যবাদ। রাইসনার সেটা হাত দিয়ে চাপা দিলো। কেসটার দিকে হাত বাড়াতে, 'আপনার কি কেসটা?' মানে? এটা পলের কাছে দেখেছি আমার তো মন হয়, এতে খোদাই করা আছে তার নামও। কি হলো তাতে?

সরে পড়াই ভালো সময় থাকতে ডেলা লাইটারটা সযত্নে নামিয়ে রাখলো একটা সিগারেট ধরিয়ে ও আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টেনে চললো জানলার পাশে একটা ডিভানে। টেনে দেওয়া জানলার পর্দা। নরম আলোর প্রলেপ ঘরে।

টুকরো কথা ভেসে আসছে সৈকতের দিক থেকে ভিড় উপছে পড়ছে বালিয়াড়িতে, কেউ জলে নেই আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি খাওয়ার পাট চুকিয়ে পোষাকের বাহুল্য নেই, ডেলার শরীরে রেশমী ওড়না জড়ানো। একটা চিন্তার ছাপ মুখে চোখে, কড়িকাঠের দিকে ধোয়ার বৃত্ত ছেড়ে ডেলা একমনে সিগারেট টেনে চললো।

আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে। নষ্ট হয়ে গেছে স্নায়বিক স্থৈর্য সম্পূর্ণ।

ডেলার দিকে চোখ। ডেলা চোখ নামিয়ে আনলো কড়িকাঠ থেকে ধীরে।

কি হলো, পাচ্ছো নাকি ভয়? প্রশ্ন করলো ভ্রূ তুলে। ব্যাপার ভয়ের নয়, এক ধরনের অস্বস্তি এটা। মানে, তোমাকে নিয়ে কেউ খেলছে তুমি বুঝতে পারছো অথচ। সৈকতে দৃষ্টি মেলে দিলাম জানলার দিকে এগিয়ে।

ডেলা দ্যাখো, আমাদের খেলা খেলেছি আমরা তো, কিন্তু রাইসনার তুরুপ মেরেছে। কাঁচকলা আমি তো কিছুই বুঝি না হিসেবপত্রের। পড়তে পারবো ব্যালান্স শীটটা বড় জোর। কিন্তু তাতে গ্যাঁড়াকল ধরতে পারবো না উদ্বৃত্ত টাকার। আচ্ছা, লোকটা সুবোধ বালকের মতো চাইবামাত্র চাবির গোছা এগিয়ে দেবে তুমি কি করে ভাবলে?

ডেলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার সিগারেটের দিকে, কিন্তু ছাই ঝেড়ে ফেললো পরে মেঝেয়, তাহলে? চাইছো পালিয়ে যেতে? পথ তো দেখছি না এছাড়া কোনো।

ও শালা একটা বর্ণনা চাইবে হোলেনহাইমারকে ট্রাঙ্কে ডেকে, তারপর চুপসে যাবে বেলুন। হুঁ ছিলোই তো ও ঝুঁকি। আমার মাথায় ওটা খেলেনি তুমি ভাবছো ন্যাকামি করলাম—'খেলেছে?' জানতাম ও শরণাপন্ন হবে হোলেনহাইমারের—লোকটা তো গাড়ল নয়। এগিয়ে এলাম ডেলার

সামনে কিংকর্তব্য তাহলে? আমাদের কি করার থাকছে জানাজানি হলে আমি রিক্কা নই? এতক্ষণে· হয়তো—জেনেছে। ডেলাই ধরিয়ে দিলো আমার কথার শেষাংশ। ভাবছিলো ও নিয়ে ভাবনার জরুরী ব্যাপার আছে অনেক বেশী। ভালো তোমার ভাবনা, কিছু নেই আমার ভাবনার। কয়েদখানায় ভাবতে বসতে হবে হেমকে খবর দিলেই। বেচারী! জনি আমার দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য। ডেলা উঠে সোজা হয়ে বসলো।

কেন বুঝতে পারছো না একটা কথা, আমরা চাপবার চেষ্টা করছি পল মারা গেছে। রাজ্য তছনছ হয় রাজ্যের রাজা মরলে। নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে না আদি ও অকৃত্রিম রিক্কা আর হেম, ইট্রা জো।

রাইসনার চুপচাপ থাকবে ক্যাসিনোর মালিকানা না পাওয়া পর্যন্ত। হেমকে ভাঙবে না কোনো কথাই। হেম কেন, কিছু বলবে না কাউকেই। বুঝতে পারছো এখন, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি আমি কেন?

বসলাম ডিভানের এক কোণে। কিন্তু সুবিধের নয় লোকটা। হয়তো ও মুখ খুলবে না, কিন্তু এখানে জামাই আদরে রাখবে না আমাদের নিশ্চয়ই? ডেলা নাচাতে লাগলো তার মাংসল পা।

'না, তার বদলে বুলেট নিতে হতে পারে হয়তো মাথায়। সংগত কিছু আশা করা যায় না রাইসনারের মতন লোকের কাছ থেকে এর চেয়ে। কিন্তু রাইসনার অদ্বিতীয় অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে। কি ভয় পাচ্ছো বুঝি? পাচ্ছি কি? পাচ্ছি হয়তো, কিন্তু করলাম না মুখে প্রকাশ। 'হচ্ছে না ভয়ের কথা।' জানো না তুমি হয়তো, কাজটা খুবই সহজ ওর কাছে। ও দেবে হেমকে কাজে লাগিয়ে। লোকটা সব কিছু করতে পারে টাকার জন্য। আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না এটা অন্ততঃ। খুনের ব্যাপার চেপে যাবে। বলছি না তা। আমি বলছি অ্যাকসিডেন্টের কথা। পায়চারি শুরু করে দিলাম উঠে ঘরময়। অশান্ত হয়ে উঠছে মনটা আমার। কি চাইছো তুমি বলত? ইঙ্গিত করে যাচ্ছো শুধু তখন থেকে। ব্যাপারটা খুলে বলো তো, কিছুর ইঙ্গিত করছি না। পরিষ্কার করে দিচ্ছি একটা রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করার পথ। এটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কি তোমার যে বে স্ট্রীটের আর ক্যাসিনোর পয়সা—তোমার আমারও। পারছি না, কি করে? ভয় হচ্ছে ওর চেহারায়। শোনো, তুমি এই ক্যাসিনো দিব্যি চালাতে পারবে আমি সঙ্গে থাকলে—আমাদের পয়সা রোজগার হবে দু হাতে।

রাইসনারের মন পড়তে পারবো না তোমার কি ধারণা। এতো মোটা আমার মাথা? আবার অশুভ ছায়া পড়লো মনে, 'ও ব্যাপারটা এই তাহলে? আর এতদূর টেনে এনেছো আমাকে এর জন্য?'

'বলছি তাইতো—' পা নামিয়ে ডেলা উঠে পড়লো কোমরের একটা ভঙ্গি করে, তোমাকে এখানে এনেছি দেখাবার জন্য পরিকল্পনা ব্যাপারটা। তুমি গিলেছো টোপ, চেয়েছিলে টাকা—তোমার চোখের সামনে টাকা।

কত নেবে নেওনা। একটু সাহস শুধু। ধরালাম সিগারেট, কাঁপছে আঙুল। জানি না উত্তেজনায় না ভয়ে, 'ওই সোয়া লক্ষের ব্যাপারটা তাহলে বলছো কিছুই না ওটা?'

ওমা, তা কে বললো—ঠিকই আছে সেটাতো। কিন্তু এখুনি তো বেরোনো যাচ্ছে না ওটা নিয়ে। দখল করো ক্যাসিনো, হাতে এসে যাবে উদ্বৃত্ত টাকাও।

হাসি পেল মানসিক অস্বস্তির মধ্যেও, আর রাইসার? শিস মারবে সে কি হাত গুটিয়ে—না এগিয়ে দেবে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে? মাথায় গুলি ঢুকবে একটু আগে তো বললে! আমি শুধু বলতে চাইছি একটা কথাই, তা হচ্ছে সাহস থাকলে তোমার।

'অ্যাকসিডেন্ট' হতে পারে রাইসনারের। এবার জানা গেলো সব। আমার আন্দাজ করা উচিৎ ছিলো আগেই এরকম কিছু একটা ঘটবে কারণ ডেলার সব কথার মর্ম তো একই সারা সকাল থেকেই।

পড়ে গেছে দাবার দান, যাবে না, ফেরানো আর। ঘষে দিলাম সিগারেটটা ছাইদানে। তাকাতে পারছি না ডেলার মুখের দিকে। সরিয়ে দিতে হবে রাইসনারকে। ডেলার আশ্চর্য শান্ত গলা। বে স্ট্রীট আর ক্যাসিনো আমাদের।

আর কিছুই করার থাকবে না যখন রিক্কা মঞ্চে উপস্থিত হবে। ওকে আমাদের সঙ্গে হাত

মেলাতেই হবে টাকাকড়ি আর খাতপত্রের দখল নিতে পারলে—আমাদেরই থাকবে লিঙ্কন বীচ। রিক্‌কা থাকতে পারে লস এঞ্জেলস নিয়ে। লেভিনস্কী তার জায়গায় থাকবে প্যারিসে।

'স্বার্থকতার প্রান্তরেখায় আমাদের জীবন—' আমার কাছে সরে এলা ডেলা আর একটু, নাকে আসছে চুলের সুবাস। কালো হরিণ চোখে তাকালো আমার কাঁধে হাত রেখে। জনি বলো কি করবে?

কি করবো আমি জানি। ডেলা একটা ভুল করেছে নিজের অগোচরে। বেরোনো অসম্ভব এখানে থেকে ওর ধারণা, কিন্তু নয় তা।

যাইহোক আপাতত থাকতেই তো হচ্ছে আমাদের। আমার এক উদগ্র ইচ্ছে এসব দখল নেবার—কিন্তু নিশ্চয় ওই মূল্যে নয়, তুমি বলে ছিলে না অ্যাকসিডেন্টের কথা? ওটা হবে না। অ্যাকসিডেন্টে হবে খুন। যেন অজন্তার ভাস্কর্য ডেলার মুখ।

হয় রাইসনার না হয় তুমি—তোমাদের মধ্যে সেই জিতবে যে অন্যকে বাগে পাবে।

রাইসনার তোমার কোমরে চেম্বার ঠেকাবে তুমি রিক্‌কা নও জানতে পারলে। খুন হবে না তখন আর সেটা আত্মরক্ষা হবে—কি বলো? ছেলে খেলার কিছুই নেই এনিয়ে, এটা খুনই হবে। ডেলা জানলার বাইরে চোখ মেলে দিলো আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে, বলা যাবে তাই হেমকে।

ডেলা বললো আমার দিকে পেছন ফিরেই। বলবো উদ্বৃত্ত টাকায় হাত দিয়েছে রাইসনার, আমরা দেখতে এসেছিলাম খাতাপত্র। রাইসনার ধরাও পড়লো কাজেই করে আর কি? সম্মান বাঁচিয়েছে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। বিশ্বাস করবে হেম কি সেকথা! স্যুইসাইড পার্টি নয় নিক শালা। করবে, চাঁদির জুতো মারলেই করবে।

দখল নাও তুমি ক্যাসিনোর জনি। শুধু একটা ধাক্কা রাইসনারের গলায়, ব্যাপারটি কি খুব বেশী মনে হচ্ছে? বুঝি না অতসব, বলেছি খুন করবো—করবো তাই। ভাবছি না সে জন্য বিনিময়ে কি পাচ্ছি। ডেলা আমার দিকে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ডিভানে বসে। জনি এসো, বোসো এখানে—আমার দিকে তাকিও না ওরকম চোখে। তুমি—ভালোবাসো তুমি আমাকে, তাই না? ডেলা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো শেষের কথাগুলো।

ভালবাসায় মারো গোলি—শোনো—আমাকে মনে করতে পারো তৃতীয় শ্রেণীর মুষ্টিক, কিন্তু গিলছি এই পরিকল্পনা দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ওয়ার্দামের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে। ডুববে রাইসনারকে না সরাতে পারলে এখন দেখছো আমাকে বেছে নিলে ওকে খতম করার জন্য। দেখিয়ে দিয়ে জায়গা—ভাবছো কাজ উদ্ধার করবে নাকের ডগায় একটা গাড়ি ভিড়িয়ে।

থামালাম, ভুল করছো ডেলা তুমি—তুমি তো জানো না খুনের মাশুল সারা জীবন তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে মৃতের অভিশাপ কুড়িয়ে। আমাদের বাকি জীবনটা এই লিঙ্কন বীচেই থাকতে হবে হেমের মুখ বন্ধ করতে পারলেও।

সুখ থাকবে না আমাদের মনে। নিয়ত মনে পড়বে শুধু একটা কথাই...হত্যাকারী আমরা রাইসনারের। আর, মুখ বুজে থাকবে না হেম চিরদিনের জন্য। সিগারেট বের করলাম পকেট হাতড়ে, সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইলাম না নেভা পর্যন্ত জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে, 'ও দিনের পর দিন টাকা চেয়েই চলবে, হয়তো একদিন চাইবে ক্যাসিনোর মালিক হতেও।'

তারপর একদিন তোমার মনের মানুষ হয়ে বসবে আমার ঘাড়ে, খুনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে...না...না আমি নেই ওসবে। এখনো খারাপ হয়নি আমার মাথা...আমি নেই খুনের ব্যাপারে। তোমার জন্যেও না, তাবৎ টাকার বিনিময়েও নয় ক্যাসিনো বা সারা লিঙ্কন বীচের। ভাবের কোনো প্রতিফলন নেই ডেলার চোখেমুখে। পা নাচাচ্ছে বসে। ও উঠে দাঁড়ালো কিছু পরে। এগিয়ে এলো এক পা আমার দিকে। বিশ্বাস করো না তুমি ওসব, সোনা। ও হাতে হাত জড়ালো আমার, 'সব দিয়েছি তো আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই। ফিরিয়ে দিতে পারিনি কালরাতে তো তোমাকে বিপদ আছে জেনেও।

ডেলা জড়িয়ে ধরলো আমার গলাটা—শোনো পাগল করেছো তুমি আমাকে। কখনো দেখা দেয় নি আমার জীবনে তোমার মতো মানুষ।

তোমায় বিশ্বাস রাখতে হবে আমার ওপর, তাই ঠিক তুমি যা বললে নিক সম্পর্কে, কিন্তু বলো

কি করবো। ওর ঠোঁট চেপে ধরলো আমার ঠোঁট, কথাগুলো মৃদুস্বরে বলে।

সরাতেই হবে ওকে। নইলে ওই সরিয়ে দেবে আমাদের। কিচ্ছু পাবো না আমরা, বোধ হয় বেরোতেও পারবো না প্রাণ নিয়ে। পারলাম না কথা বলতে। ভাসিয়ে দিলো আমার সব কথা ডেলার ঠোঁটের উষ্ণতা। ওই অবস্থায় রইলাম আমরা অনেকক্ষণ। উত্তাল আমার রক্ত। জনি—আমার বুকে আরো চেপে ধরলো ডেলা তার শরীরটা। চোখ বুজে আছি আমি... অকিঞ্চিতকর মনে হচ্ছে আমার কাছে দুনিয়ার আর সব কিছুই...শুধু আমি আর ডেলা...হাত ডুবিয়ে দিলাম ওর নিতম্বের শক্ত মাংসের গভীরে। আর্তনাদ করে উঠলো একটা অস্ফুট...খুলে গেলো ওর ঠোঁট। হয়েছে অনেক, শেষ হলে ভালো হয় এবার ব্যাপারটা। আমার কানে বিষ ঢেলে দিলো রাইসনারের নরম গলা। 'স্থান-কাল আছে সব কিছুরই। পাথর যেন ডেলা, তার রক্তশূন্য মড়ার মুখ। তাকালাম ঘুরে, দরজায় দাঁড়িয়ে রাইসনার। সেই হাসি ঠোঁটে, অনেক বড় দেখাচ্ছে হাতের ৪৫ অটোমেটিক পিস্তলটা।

নড়াচড়া চলবে না কোনোরকম। রাইসনারের সংযত গলা, পিস্তলটা বাড়িয়ে দিলো একটা আরাম কেদারার দিকে।

বসো ফারার, মিসেস ওয়ার্দাম তুমিও ওই ডিভানটায়। ডেলা হাত ছেড়ে দিলো। মেয়েটা হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ভয় হলো।

আসলাম আমি। কেমন একটা অস্বস্তি গলায়, বেশ কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। রাইসনার দরজাটা বন্ধ করে দিলো পা দিয়ে ঠেলে, এগিয়ে এলো কয়েক পা ঘরের মধ্যে। বেশ জমেছে দেখছি লীলা—তোমরা জানো বটে মজা করতে!

বুঝলাম খালি দেখে কেবিনটা। রাইসনার ঘুরলো আমার দিকে, আগুন ভয় হিংস্র চোখে, কি করেছো ওয়ার্দামকে? নিরুত্তর আমরা। রাইসনার একটা চেয়ার টেনে বসলো কনুই দিয়ে। মারা গেছে কি ও, না দিয়েছো শেষ করে? ডেলার অবস্থা হলো দাঁত কপাটি লাগার, মাথা খারাপ হয়েছে কি তোমার? এখন প্যারিসের পথে ও তো। বলো, নরকের।

এবার শব্দ হলো হাসির, কাঁচা কাজ করে ফেললে এরকম একটা। সন্দেহ হয়েছিলো মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনেই কারণ লস এঞ্জেলস থেকে লিস্কন বীচে এতটা রাস্তা আসতে দিতো না পল পেছনে লোক না লাগিয়ে—পল এটা আমার চেয়ে বেশী জানে তুমি যে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ পালটাও নাকি জানতো—কি বলবো?

ক্ষেপে উঠলো ডেলা, তুমি কোথেকে পেলে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা আমার সঙ্গে? সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো রাইসনার ওকে, তোমরা গাড়িতে তিন জন ছিলে, তোমাদের মধ্যে একজন মরেছে রাইসনার বসলো পা মুড়ে। রিক্কা নয় এ লোকটা, ফারার তাহলে! ওয়ার্দাম মরেছে। কি বলো, ভেস্তে গেলো সব তাহলে? মুঠো হয়ে গেলো হাঁটুর মধ্যে ডেলার হাত দুটো, নিক একটা বুদ্ধি করি এসো আমরা এই তিনজন। আমরা ছাড়া কেউ জানে না পল যে মরেছে। অর্ধেক ভাগ দাও আমাদের দুজনকে। আমরা লেগে যাচ্ছি কাজে। আমার নখদর্পণে পলের অনেক ব্যাপারই তো। আশাকরি আমরা সাহায্য করতে পারবো ক্যাসিনোর কাজে। রাইসনার এক বার দেখেনিলো আমার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে! আসছে কি করে এ লোকটা এর মধ্যে? ভাবতে যাবো কেন এরজন্য!

স্থির হাসি ঠোঁটে, 'পল ছিটকে বাইরে পড়ে যায় আমাদের গাড়িটা সংঘর্ষে পড়ার পর, ভেঙে যায় তার ঘাড়—' তোমাদের গল্প ওটা তো। হাসছে রাইসনারও। ধরো ওকে খুন করেছো তোমরা দুজনে আমি ভাবছি? যদি চালান দেবার ব্যবস্থা করি খুনের দায়ে দুজনকেই?

হেম শালা তো তোমাদের ঝুলিয়ে দেবে দুটো বড় পাত্তি পেলেই—ইদানীং টাকার দরকার হয়ে পড়েছে বেশী ওর আবার। বরফ মেরে গেলাম আমি। শুধু কানে এলো ডেলার কথা, কিন্তু তাতে তো চাপা থাকবে না ওর মরার খবরটা। তা বটে করা যাবে আর কি। আচ্ছা, শোনো আমি চিন্তা করছি কি ভাবে ব্যাপারটা। তোমাদের কথা শুনলাম আমি আড়ি পেতে। জানলাম মেরেছো পলকে তোমরা। ফারার বন্দুক তুললো আমি ঢুকতেই। আমি গুলি করে দিলাম তার আগেই। নিভে গেলো রাইসনারের হাসি, 'হেম জানে আমি কত দ্রুত সারতে পারি এসব ব্যাপার। বন্দুক তুললে তুমিও, আর পড়লে একই অবস্থায় প্রস্তাব দিলাম হেমকে একটা —মোটা ভাগ ক্যাসিনোর।

জো আর ইট্রাকে থানায় আটকে রাখবে একটা অজুহাতে সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক না হওয়া

পর্যন্ত। তার পর কাম ফতে মালের সাগর সাঁতরে উঠে আমার আগেই রিক্কা সাহেব। কি রকম?

'ঢোকাচ্ছো কেন হেমকে এর মধ্যে? হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকবে ওতো, সব সময়—' ঝুঁকে বসলো রাইসনার—চিন্তার ছায়া চোখে।

তাই হয়তো, কিন্তু বেরোবার একটাই রাস্তা এই ছেঁড়া ঝঞ্ঝাট থেকে। রাস্তা আছে আর একটা, ছন্দোবদ্ধ ডেলার গলা। কি? ডেলা ফিরলো আমার দিকে রাইসনারের দিকে তারপর—আদিম প্রবৃত্তি তার চোখে।

মেরে ফেললাম আমরা তোমাকে, নিরাপদ পন্থা সেটাই সবচেয়ে। আমাদের সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিলো তুমি ঢোকার আগেই। রাইসনারের ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটলো। অতলান্ত শীতল চোখ দুটো। হুঁ, শুনছিলাম, সেই জন্যেই তো ভালো মনে হচ্ছে আমার পরিকল্পনাটা। কিন্তু নিশ্চয়ই সেফটি ক্যাচ লাগানো অবস্থায় নয় বন্দুকে। কাজ হলো ওর কথায় এমন কি আমিও রাইসনারের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে আনলাম। ডেলা রাইসনারের মুখ লক্ষ্য করে নিপুণ হাতে দ্রুত ছুঁড়ে মারলো পাশ বালিশটা। আর নিজেই রাইসনারের বন্দুক শুদ্ধ হাত চেপে ধরলো লাফিয়ে উঠে। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল না বেরোয় গুলি। রাইসনারের হাতটা নেমে আসার আগেই আমি সপাটে ঘুঁষি চালালাম রাইসনারের চোয়ালে। নেমে গেলো ওর হাত। রাইসনার সরে গেলো দু পা ছিটকে। শক্ত করে ধরে আছে ডেলার হাত। আর একটা জমালাম দেওয়ালে মুখ থুবড়ে পড়ার মুহূর্তে। পড়ে গেলো রাইসনার।

জগ হয়ে গেলো চুরমার। গেলো টেবিলটাও। মেঝের কার্পেট ভরে গেলো ফুলে আর জলে। জলে ভরে গেলো ডেলার মুখ চোখ। ওর গলা থেকে উঠলো একটা মৃদু আর্তনাদ কিন্তু হাতছাড়া করেনি বন্দুক। থরথর করে কাঁপছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা, পড়ে আছে রাইসনার। কড়িকাঠের দিকে তার চোখদুটো—ওর ডান চোখটার ভিতর ঢুকে গেছে জগ থেকে কাচের একটা টুকরো।

ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো, খিঁচিয়ে আছে দাঁত। চোখেমুখে যুগপৎ স্বাক্ষর ভয় আর যন্ত্রণার। ঘুঁষির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ডান গালটা। রাইসনারের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা। ডেলা কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো আমার, কানে আওয়াজ পাচ্ছি ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের।

দুজনেই অনড় আমরা, দেখছি রাইসনারকে। প্রাণ নেই ওর দেহে। যেন চলচ্চিত্র-প্রক্ষেপক যন্ত্র চলছে মাথার ভেতর মনের পটে অতীতের প্রতিবিম্ব।

উঠে দাঁড়ালো ডেলা রক্তের ছোপ হাতে। আমি হতভম্ব সেদিকে তাকিয়ে। জনি, আমার চোখে ডেলা তাকালো ; আমি খুন করেছি ওকে।

থাকো ঠিক জনি। কানে এলো ডেলার তীক্ষ্ণকণ্ঠ, কেউ জানে না আমি আর তুমি ছাড়া এই ব্যাপারটা। চেয়েছিলাম এই তো। মনে পড়লো রাইসনারের কথা, সেও একই কথা বলছিলো পলের মৃত্যুতে। যা হোক ভালো জুটি। কি সব প্রার্থনা। কিন্তু পালাতে হবে তার আগে। ডেলা এক পা এগিয়ে এলো আমার দিকে, কথা বোলো না হাঁদার মতো। এই চেয়ে ছিলাম আমরা তো সার্থকতা ছুঁয়েছে আমার পরিকল্পনা। নেই রাইসনার, ক্যাসিনোর মালিক আমরাই। বাধা দেবার আর কেউ নেই। বিজয়ের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি ডেলার কালো চোখে। আহ্বান কামোন্নত ঠোঁটে। শুধুই জয়ের আনন্দ, চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। একটা চাপা উত্তেজনা প্রচণ্ড। ঝাঁকানি দিলাম ওর হাত ধরে, তুমি তো হাদা! মেরে ফেলেছি আমরা ওকে।

তাড়া করে ফিরবে ওরা তো আমাদের। আমাদের রেহাই নেই এর থেকে। ওরা লাশ পাবে রাইসনারের। ডেলা হাত চাপা দিলো আমার মুখে 'জনি প্লিজ—বসো চেঁচিয়ো না তো। ঠিক হয়ে যাবে সব—রাখো একটু সাহস। আমি সব সামলে নেবো...' রাইসনারের লাশটা পেছন করে বসে পড়লাম। মানলাম, ঠিক আছে—ঠিক হয়ে যাবে সব—কিন্তু মেরে ফেললাম লোকটাকে তো, কি করবে তার? তাকাও ওর মুখের দিকে, কি করতে হবে বুঝবে। আমি পারছি না তাকাতে, বললাম ডেলার দিকেই চোখ রেখে।

খুলে বলতো কি বলছো আর পারবো না তোমাকে নিয়ে। আচ্ছা, অনুভূতি নেই কি তোমার কোনোরকম, পারছো কি করে ওর দিকে তাকাতে? ডেলা আমার কাছে সরে এলো ডিভানের পাশ দিয়ে, 'হয়তো মনের জোর বেশী বলেই তোমার চেয়ে আমার।' কেন?

তোমার কাছে কাজটা কি অন্যায় মনে হচ্ছে? দ্যাখো ভেবে, মারতে যাচ্ছিলো ও তো আমাদের। তুমি শুধু ওকে মেরেছো নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তাও নিশ্চয় খুনের উদ্দেশ্যে নয়। থাকে কি সহানুভূতি ওর জন্য? নির্ভেজাল খুন এটা। অহর্নিশি তাড়িয়ে ফিরবে আমার মন, বিষময় করে তুলবে আমার হতভাগ্য জীবনটাকে। যেতে দাও সাতটা দিন ঠিক হয়ে যাবে সব। ভুলে যাবে সব। কিন্তু যদি সামলাতে না পারে নিজেকে, আর সাহায্য না করো যদি আমাকে। তাহলে ঝুলতে হবে ফাঁসিকাঠে দুজনকেই।

ভীতুর ডিম কোথাকার, ভাবছো না কেন একবারও এটা। ফিরে তাকালাম রাইসনারের মুখের দিকে। বীভৎস! ডেলা কাচের টুকরোটা বের করে নিলো রাইসনারের মুখের ওপর ঝুঁকে। হতবাক আমি আমার ঘটনাবহুল জীবনে দেখিনি এরকম ভয়ানক দৃশ্য। ঘাম ঝরলো আমার শরীর বেয়ে, বরফ যেন। ডেলা বসে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে—টুকরোটা হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে। ডেলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে।

তারপর রাইসনারের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে তাকালো। এরকম চেহারা হওয়া সম্ভব জন্তু জানোয়ারের টানা হেঁচড়ায়। আর সকলকে বোঝাতে হবে তাই। আমার দিকে তাকালো ডেলা চোখ তুলে। খুঁজছিলে না পালাবার রাস্তা? পেয়ে গেলে এই তো—ফেলে দিয়ে এসো এক সিংহের মুখে, হিসেব সোজা।

খাওয়ার তদ্বির করতে জানোয়ারগুলোর রাইসনার যেতো খাঁচার কাছে। হতেই পারে দুর্ঘটনা। সবাই জানে এটা। জানে হেমও। এটা ধোপে টিকে যাবে আমরা ভুলের বোঝা না বাড়ালে। থামলো ডেলা। আমি কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে ওর দিকে। পরে বললাম অনেক, 'তোমার মাথা থেকে বেরোলো এটাও কি এখন? হ্যাঁ, তাকাও ওর মুখের দিকে, মনে হবে তোমারও তাই। মাকড়সার পায়ের অনুভূতি হলো আমার শিরা বেয়ে আবার। সৃষ্টি করতে পারব ডেলা। ওর মাথা খোলে যে কোনো অবস্থায়। ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার আগেই ওয়ার্দামের শরীর, ওর মাথায় খেলেছে ক্যাসিনো দখলের ভাবনা, আর এখনো শুকোয়নি রাইসনারের মুখের রক্ত, বের করে ফেলেছে ও তার অপঘাত মৃত্যুর ব্যাখ্যা। নির্ভুল চালই হবে সবার অলক্ষ্যে গুহায় ফেলে আসতে পারলে ওর লাশটা। জনি আছে তো সব ঠিক? ও তুলে ধরলো কালোচোখ রক্তের দাগ ওর আঙুলে। ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দরী পিশাচিনি।

ঠিক আছে কেউ না দেখে ফেললে—এতক্ষণে নিতে পারছি স্বস্তির নিঃশ্বাস। থেমে গেছে বুকে হাতুড়ির ঘা। কিন্তু কিছুই করা যাবে না অন্ধকার না নামলে। 'না,' আচ্ছা, একবার দাঁড়াও তো উঠে। দাঁড়ালাম দেখি হাত দুটো—'খুঁটিয়ে দেখলো ডেলা। কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই আমার শরীরে।

'ঠিক আছে শোনো—বেরিয়ে পড় বাইরে ঘোরাফেরা করো সকলের সামনে। খেলে নিতে পারো একটু গলফ-ও, আরো ভালো হয় কাউকে খেলার সঙ্গী করতে পারলে। ফিরবে না মাঝরাতের আগে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে রাইসনারের কথা সে আছে আমার সঙ্গে তা বোলো। বসেছে কাজে চলবে না তাকে বিরক্ত করা, বেরিয়ে পড়। গলফ্ কেউ খেলতে পারে এরকম মনের অবস্থায়?

বলো তো তোমার কি হয়েছে? কিছুই ভাবতে পারছো না স্বাভাবিক ভাবে?

তোমারই হয়েছে কিছু, যদি হয়ে থাকে তো সাঁতার কাটো, গলফ্ যদি খেলতে না পারো তো, বেড়াও ঘুরেফিরে। যেতে পারো বারেও। করো যা খুশি। এখান থেকে বেরোও মোদ্দা কথা। দর্শন দাও ওদের। একটু ভাবলো ডেলা, ঘেঁষতে দেবে না এখানে কাউকে। জেনো এটা তোমারই কাজ। তো এতক্ষণ কি করবে তুমি? বললাম লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে। ডেলার ঠোঁটে সেই ভয়াবহ হাসি খেলে গেলো, কোথায় যাবো আমি আর—ওর কাছে এখানেই থাকবো। বসে পাহারা দেবো।

এই ন' ঘণ্টা ধরে! মরে যাবো না তাতে তো আর। আর ভাবতে হবে তো ভবিষ্যতের ভাবনা। আমার ভয় করবে না ওর সঙ্গে একা থাকতে, গেছে তো মরেই। আমি তো বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি এই ভুতুড়ে পরিবেশ থেকে, ডেলার কাছ থেকেও। আমি এই লাশ আগলাতে পারবো না পৃথিবীর সমস্ত টাকার বিনিময়েও। এগোলাম দরজার দিকে। 'জনি—' কি? ফিরলাম। রাইসনারের

জুতো মোজা দেখতে পাচ্ছি চোখের কোণ দিয়ে। চোখ ফিরিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি।

বিশ্বাস থাকা দরকার আমাদের পরস্পরের মধ্যে, জনি। মনে হচ্ছে ডেলাকে মর্মরমূর্তি। পালিয়ে যেয়ো না যেন ভয় পেয়ে। একা সামলাতে পারবো না আমি তুমি পালিয়ে গেলে। আমার দরকার তোমাকে। 'না, যাবো না।' কোনো রকমে বললাম বিকৃত গলায়। বিশ্বাস করতে পারলো না কথাটা ডেলা বোধহয়, অনেক সময় ন' ঘণ্টা, কাজেই সামলানো কঠিন পালানোর প্রলোভন। শোনো, সেক্ষেত্রে হেমকে খবর পাঠোবো সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু জানিয়ে দেবো রাইসনারকে তুমি খুন করেছো। হেম বিশ্বাস করবে আমার কথা। পালাবো না বললাম তো। ডেলা উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমাকে আদর করলো তার পুরনো কায়দায়। আজ আর আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে না ওর স্পর্শে। ভয় হচ্ছে কেমন।

আমাকে ভালোবাসতো তুমি এখনো—না, জনি? বাকি জীবনটা এই কাজটা মিটে গেলেই—আমাদের জীবন নিশ্চিন্ত নিরবচ্ছিন্ন। আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে সব কিছু ছাপিয়ে—আমার গলায় একটা রক্ত রাঙা হাতের স্পর্শ। পারলাম না, ওর হাতটা চাইলাম সরিয়ে দিতে। ডেলা বিপদজনক সাপের মতো। দিলাম ঠোঁটে ঠোঁট—আজ অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে ওর উষ্ণ ঠোঁটের আত্মসমর্পণ। অস্বস্তিটুকু বাড়ালো একটা মৃতদেহের উপস্থিতি। থাকবো তোমার অপেক্ষায় আমি, আমার ঠোঁটে চেপে আছে ডেলার ভারী ঠোঁট।

শিহরণ তুলেছে আমার গালে ওর তপ্ত নিঃশ্বাস। জনি সাহস রাখো মনে ঠিক হয়ে যাবে সব। বেরিয়ে এলাম বাইরে। ক্ষিপ্ত লিঙ্ক বীচ ; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—অপরাহ্নে। একক নরক যন্ত্রণা সামনে ঝাড়া ন'টি ঘণ্টা উন্মত্ত আগ্রহ মনে একটা—যতদূর দু চোখ যায় ছুটে চলে যাই...ছুটে চলবো শুধু। ডেলা যে কুটির আগলে বসে আছে রাইসনারের লাশ। অনেক সেখান থেকে—অনেক দূরে...দুস্তর ব্যবধান হোক কিন্তু জানি আমি...পারব না পালাতে পাতা আছে ফাঁদ...আমার মুক্তি নেই এ থেকে।

ঘরে ঢুকে গলা পেলাম বেয়ারার 'না, মিস বারে নেই উনি—ওকে দেখিনি লাঞ্চের পর। হ্যাঁ, একটার সময়, না, দেখিনি—তারপর...। সিগারেট পিষে দিলাম ছাইদানে। দপদপ করছে কানের পাশে শিরাগুলো।

হ্যাঁ, নিশ্চয়—বলবো দেখা হলে। বেয়ারা ছেড়ে দিলো টেলিফোন। শুরু হয়ে গেছে রাইসনারের খোঁজ। এখুনি করা দরকার একটা কিছু—ডেলার নির্দেশ লোকজন তফাতে রাখতে হবে কুটির থেকে। শুরু হলো খোঁজাখুজি...'অ্যাই শোনো—' হাঁক দিলাম বেয়ারাটাকে। স্যার, টেকো দাঁড়ালো পর্দা ঠেলে। ফোন করেছিলো কে?

রাইসনার সাহেবের সেক্রেটারি মিস ডোয়েরিং। ওকে ডাকছিলেন জরুরী ব্যাপারে। লোকটা হাত দিলো টাকে। স্যার, জানেন নাকি উনি কোথায়? জানি আমার মানসপটে ভাসছে একটা ছবিই। ওর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ চিৎ হয়ে পড়ে থাকা, মুখ ক্ষতবিক্ষত ঢুকে গেছে একটা কাচের টুকরো ডানচোখে। থেমে গেলাম গ্লাসে পানীয় ঢালতে গিয়ে। ঢালতে সাহস হচ্ছে না এ ব্যাটার সামনে। কেঁপে উঠতে পারে হাত। যান্ত্রিক গলায় বললাম ওর দিকে না তাকিয়ে, রাইসনার একটা কাজে বসেছে মিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে না করাই ভালো এখন বিরক্ত—। আমার কথা বলার ভঙ্গিতে লোকটা পাথর হয়ে গেলো। কথাটা ওঁকে ডেকে বলে দাও।

'মিসেস ডোয়েরিং না কে,' 'স্যার বলছি।' দাওয়াই বেশী পড়ে গেছে ওর গলার স্বরে বুঝলাম। সে অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহূর্তে। আবার বোতল ওল্টালো গ্লাস ভরতে গিয়ে মিঃ রিক্কা বারে আছেন ওর কথা কানে আসছে। বলছেন উনি—রাইসনার সাহেব নাকি কি একটা জরুরী ব্যাপারে কথা বলছেন মিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে। এখন চলবে না বিরক্ত করা। হ্যাঁ ম্যাডাম অ্যাঁ? বললেন কতটা জরুরী জানার দরকার নেই।

আজ্ঞে...ঘাম মুছলাম রুমাল বের করে—থাক হলো তো কিছু কাজ। বাড়াবাড়ি হলো একটু, তাহলেও এদিকে তো শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে স্কচের কাজ। পেকে এসেছে নেশাও। বোতলে ছিপি এঁটে দিলাম অনিচ্ছায়। ডেলার নির্দেশ দাঁড়াতে হবে জনতার মাঝে গিয়ে। বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম বাইরের খোলা জায়গায়। কমেছে রোদ। রয়েছে গাড়িটাও, গাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে

নিলাম শুধু দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসে।

নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে, অজানা গন্তব্য...কিন্তু চলবে না পালানো। থমকে দাঁড়ালাম একটা বিরাট আওয়াজে। মাটি কাঁপানো, গভীর কণ্ঠনিসৃত নিনাদ, গর্জন সিংহের—পাতলাম কান...চিড়িয়াখানার পথে পা বাড়িয়েছি কখন যে জানি না—আমাকে পেয়ে বসলো একটা বিদঘুটে ভাবনা ভেসে উঠলো একটা ছবি—বয়ে নিয়ে চলেছি সিংহের গুহায় রাইসনারের ক্ষতবিক্ষত দেহটা। শুরু হলো কাঁপুনি—তাকালাম পেছন ফিরে গাড়ির খোলতাই বেড়েছে সূর্যের আলোয়। তাহলে কেন আর দেরি, দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে...সাত ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট সময় এখনও আমার হাতে পাড়ি দিতে পারি চারশো মাইল পথ এই সময় আমি অনায়াসে...আমাকে ওরা খুঁজুক—আমার স্নায়ুগুলোকে নিস্পৃহ করে দিয়েছে সিংহের গর্জন...গভীর রাতে আঁতকে উঠলাম একটা ভয়াবহ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে।

ফিরে চললাম গাড়ির দিকে। স্টার্টারে হাত দিলাম দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসে। তাকালাম বাইরে না নেই কোনো প্রতিক্রিয়া। কেউ দাঁড়ালো না পথরোধ করে। বুইক এগিয়ে চললো মসৃণ গতিতে...বাড়ছে গতি—সদর রাস্তায় পৌঁছে যাবো মিনিটখানেকের মধ্যেই—মুক্তি তারপর...দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেলাম গেটটার দিকে। যথারীতি মোতায়েন কোমরে হাত রেখে পাহারাদার দুজন। হর্ন-এ হাত দিলাম গাড়ির গতি কমিয়ে। নির্বিকার পাহারাদার দুটো।

বন্ধই রইলো গেটের পাল্লা। থামিয়ে দিলাম গাড়ি, কি ব্যাপার? গাড়ি চালিয়ে বেরোতে হবে নাকি বন্ধ গেটের ভেতর দিয়ে? মনেই হলো না নিজের গলা বলে, কর্কশ, কটুকণ্ঠ আমার। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের একজন, চোখদুটো সামান্য কুঁচকে বললো, 'মিঃ রিক্কা দুঃখিত, একটা নির্দেশ আছে আপনার সম্পর্কে—'

'কি নির্দেশ?'

হাত ঘামছে স্টিয়ারিং ধরে থাকলেও শক্ত হাতে। আপনাকে ফিরে যেতে বলার নির্দেশ পাঠিয়েছেন 'মিসেস ওয়াম।' 'ওরা আপনার সঙ্গে কি কথা বলবেন মানে উনি আর মিঃ রাইসনার নাকি—' ওর গায়ে একটা ঘুঁষি জমালে কাজ হয় লোকটা যেভাবে মুখ বাড়িয়ে বুকনি দিচ্ছে...কিন্তু জুটিটা ওর...সে শালা তো হাত রেখে দাঁড়িয়ে কোমরের বস্তুটিতে...রেডি ফর অ্যাকসন! শ্‌ শালী। বাগে পেলে তোকে একবার ঠিক আছে, চেষ্টা করলাম ঠোঁটে হাসি ফোটাবার, 'আমাদের কথা হয়ে গেছে তাড়া আছে খুলে দাও গেটটা। তীক্ষ্ণ হলো সবুজ চোখদুটো লোকটার, বোধহয় আরো কথা আছে, কারণ ফোনটা এলো এইমাত্র।

'হুঁ, দেখছি—আচ্ছা—' গাড়ি ঘোড়ালাম পেছিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা গাল দিয়ে। লোকদুটো আমাকে দেখতে লাগলো পলকহীন চোখে গাড়ি ঘোরানো পর্যন্ত। বেরিয়ে এলাম গাড়ি লাগিয়ে গাড়ি বারান্দায়। চলছে কাঁপুনি। ডেলা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। পারছি না আর ভাবতে।

ঘুরতে হবে উদ্দেশ্যহীন—হাঁটতে শুরু করলাম সৈকতের দিকে। একটা গাড়ি এসে থামলো পাশে খানিকটা এগোতে। কে যেন বলে উঠলো বামাকণ্ঠে।

'উঠে—আসুন—' চলেছি আপনার রাস্তায়, তাকালাম ফিরে। মেয়েটা সোনালী চুলের, চোখে চটুল চাহনি। স্বল্পবাস অঙ্গে, শরীরের রেখাগুলি আরও তীক্ষ্ণ সাঁতার পোষাকে। বিরাটাকার টুপি মাথায়, গোলাপের পাপড়ি গোঁজা কানে। এ নারীর সঙ্গ অবশ্য বর্জনীয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায়—কিন্তু পাশে বসে পড়লাম এখন দরজা খুলে। গাড়ি এগিয়ে চললো সৈকতের কোণ ঘেঁষে। স্টিয়ারিংয়ে চলেছে তবলার বোল। গাড়ির রেডিওর সঙ্গে তাল রেখে। লাস্যময়ী তাকালো আড়চোখে। 'নিয়েছি তোমাকে দেখেই, জানো তোমাদের, মানে আমার খুব পছন্দ পয়সাওলা মানুষদের। আর দারুণ তুমি তো। অচেনা বান্ধবী খিলখিলিয়ে উঠলো।

হুঁ, দেখছি আমারই দলের লোক। যাচ্ছো কোথায়? সাঁতারে? টোল পড়লো ওর গালে। হ্যাঁ, আপনি—সাঁতার কাটো তুমি কি এই পোষাকেই? চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর নিম্নাঙ্গে। কেন পছন্দ নয় তোমার? মেয়েটা বুকে আঙুল ঘষে নিলো স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে।

'হলেই হলো তোমার—' পকেট থেকে সিগারেট বের করলাম। মোহিনী উঠলো হি-হি করে। এমন কোথাও যাই চলো না, দরকারই হবে না সেখানে এগুলো—যাবে?

তোমার গাড়ি তো, আর তুমিই চালাচ্ছো। বেড়ে গেলো গাড়ির গতি। একটা জায়গা জানি আমি, যাবে সেখানে—মেয়েটা বললো গলা নামিয়ে। দৃষ্টি মেলে দিলাম কাঁচের ভেতর দিয়ে।

চেয়ে ছিলাম কি আমি এই? কি জানি—বোধহয় না। কিন্তু গেলাম তো ফেঁসে। জনি রিক্কা তুমিই তো, তাই না? ও গাড়ি ঢোকালো একটা সরু রাস্তায়। তালগাছের সারি দুপাশে। চেনো তুমি আমাকে?

'হুম। তোমার কথা যে সবাই বলছে...তুমি নাকি লস এঞ্জেলসের জুয়োর রাজা। তুমি মস্‌তান কে যেন বললো—আমি, জানো পছন্দ করি খুব মস্তানদের। ও হেসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো স্টিয়ারিংয়ে। আচ্ছা, বলতে হয় তাহলে সুখবরই। তা, পেতে পারি কি তোমার পরিচয়টা?

জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন আমি। আমাকে জানে সবাই। চেনে সকলে আমার বাবাকেও—ইস্পাত সম্রাট গলওয়ে হ্যারিস ব্রাউন। মস্তানদের ভক্ত উনিও কি?

ওরদিকে তাকালাম আড়চোখে। আবার উঠলো হি হি করে। গাড়ি নেমে গেলো রাস্তা থেকে পাশের ঘাস জমিতে। পরিবেশ নির্জন ঝোপের, এ খানেও তালের সারি। বেশ সুন্দর, না? জর্জিয়া পেছনের আসনে ছুঁড়ে দিলো টুপিটা খুলে। পা বাড়ালো বালিয়াড়ির দিকে, যাবো সাঁতারে, সঙ্গে আসবে নাকি?

আমার খেয়াল হোল গাড়ি থেকে নেমে—গড়াতে দেওয়া যায় না এটা আর বেশিদূর। থাকার কথা নয় তো এখানে আমার। থাকার কথা আমার জনারণ্যে—।

এখানে মরতে এলাম কেন ওর সঙ্গে! না হয় পালাবার রাস্তা বন্ধ ক্যাসিনো থেকে। আবার শুরু করলাম গলা ছেড়ে দিয়ে, 'মনে হচ্ছে রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি, দরকার ছিলো ক্যাসিনোতে ফেরার।

রাস্তায় একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে।

'ও, সোজা রাস্তা ওটা তো। গরান ঝোপের মধ্যে দিয়ে এসেছেন আপনি। বোধহয়?'

'হ্যাঁ,' এগিয়ে গেলাম একটু। এবার চোখের ওপর স্পষ্ট ওর ছবির ফ্রেমটা—নির্মেঘ আকাশ ফুটে উঠেছে তুলির টানে...তালের সারি...বালুকা রাশি। 'বাঃ দারুন বাস্তব। ছবিটা বেশ হয়েছে তো—' সৈকত-সুন্দরীর কাছে কৌতুকের মনে হলো কেন আমার কথাগুলো। ও হাসলো মিষ্টি করে, 'হওয়ার কথা তাই তো—' হ্যাঁ, কিন্তু তা ফোটাতে পারে না তো সবাই। সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম পকেটে হাত দিয়ে। ওর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম। 'ধন্যবাদ, ধূমপান আমি করি না। জ্বালালাম আমারটা, বলতে পারেন আমি কতটা দূরে চলে এসেছি ক্যাসিনো থেকে?'

'মাইল তিনেক। আর আপনি তো চলে ছিলেন উল্টোদিকে—' মেয়েটা বুরুশটা ঘষে নিলো একটুকরো কাপড়ে। বলছেন ছেড়ে এসেছি ক্যাসিনোর সৈকত?

হ্যাঁ, এসে পড়েছেন আমার এলাকায়। ওর মিষ্টি হাসি মুখে নেই। ক্ষমা করবেন, ইচ্ছাকৃত নয় অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারটা। বলিনি আমি তা। মেয়েটা হাসলো আবার, আপনি আছেন বুঝি ক্যাসিনোতে? জোগালো না মুখে তাৎক্ষণিক উত্তর, ওকে জানাতে চাই না আমি জুয়াড়ী জনি রিক্কা। ক্ষতি নেই জর্জিয়া জেনেছে, কারণ এর তুলনা হয় না ওর সঙ্গে। আর কি দিন কয়েক আছি। বেশ জায়গাটা না? পাল্টালাম প্রসঙ্গ।

এদিকেই থাকেন আপনি কি?

'হ্যাঁ, আমার ডেরা কাছেই, মালমসলা জোগার করছি প্রদর্শনীর জন্য আর কি। কি সেটা? বসে পড়লাম বালির ওপর, দূরত্ব রেখে ওর থেকে। ওর দিকে তাকালাম—পছন্দ হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য আমার ব্যাপারটা। অপরিবর্তিত ওর মুখভাব। একটা কোম্পানী মিয়ামির—ফেসটান। বড় কোম্পানী। শুনেছেন হয়তো নাম। স্কেচ এঁকে দেওয়া হোল আমার কাজ, সাহায্য করাও কিছু রংয়ের পরিকল্পনায়—শোভা বর্ধনের জন্য শো-কেসের। বলছেন মনের মতো কাজটা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—মুখটা ওর উজ্জ্বল হলো। গত বছর গিয়েছিলাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ছবি আঁকার ব্যাপার ছিলো কয়েকটা। পশ্চিম ভারতীয় গ্রামে রূপান্তরিত করা হলো আমাদের দোকানের একটা বিভাগকেই—প্রদর্শনীটা দারুন হয়েছিলো। মনে হচ্ছে ভালোই তো কাজটা—আচ্ছা, আজ থাক—আপনাকে বিরক্ত করলাম।

না, না, মাথা নাড়লো ও। কাজ তো শেষ আমার। ও তুলে ফেলতে লাগলো বুরুশগুলো বসেছি সেই সকাল দশটায়, পেয়েছে খিদে।

বলুন দেরিই হলো একটু। সুন্দরী হাসলো। আবার সময় অসময় একা মানুষের। ও দেখতে লাগলো ছবিটা খুঁটিয়ে, ওকে দেখছি আমি কিন্তু। ওর বড় ভালো লাগছে। এই থাক আপাততঃ মেয়েটা আমার দিকে ফিরলো ছবি থেকে চোখ সরিয়ে, মিঃ রিক্কা সৈকত ধরে হাঁটা আপনার ফিরে যাবার সহজতম রাস্তা। উঠে দাঁড়ালাম জনি ফারার। পৌঁছে দিয়ে যাই না আপনার জিনিষগুলো।

জিনিষ তো অনেকগুলো। মনে হচ্ছে নিজে থেকেই নিচ্ছেন দ্বিপ্রাহরিক নিমন্ত্রণটা, আবার গালে টোল পড়লো 'ভার্জিনিয়া ল্যাভেরিক, আমার নাম, যদি কিছু কাজ না থাকে আপনার হাতে—' 'না, কাজ নেই আমার কোনো।' বোধ করছি বড় নিঃসঙ্গ, আর ভালও লাগছে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর—' হাতে তুলে নিলাম বুরুশের বাক্স হাঁটতে লাগলাম ভার্জিনিয়ার সঙ্গে।

ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো খানিক দূরে এগিয়ে, কিন্তু আপনাকে তো বসতে হবে কুটিরের বাইরে। আমি জানেন তো, একা। 'ও ঠিক আছে, এই আমার আনন্দ ওর পাশে হাঁটছি। নিষ্কলুষ নয় আমার চরিত্র, তবে আমি ভীতিজনক মানুষ নই—' হেসে হালকা করতে চাইলাম ব্যাপারটা। ভার্জিনিয়া হাসলো ঝকঝকে দাঁতে, 'বিত্তবানরা ও দোষে দুষ্ট প্রায় সবাই। দাঁড়ালাম বাংলোর সামনে। ফুলের সমারোহ চারপাশে, হালকা সবুজ রং করা ছাদটা কয়েকটা চেয়ার পাতা বাইরে ইতস্তত, বেতারযন্ত্রও রয়েছে এক কোণে। ছড়িয়ে বসুন হাত পা—ব্যবস্থা করি পানীয়ের, খাবেন কি—স্কচ? 'ফাইন।' আমার ইচ্ছে করলো হাতছানি দিতে।

'এক মিনিট'—ভার্জিনিয়া অদৃশ্য হয়ে গেলো পর্দার আড়ালে। অনেকক্ষণই নিলো সময় অবশ্য। আমি পায়চারি করে চললাম বারান্দায়, আবার শুরু হয়েছে কাঁপুনিটা। এলো ভার্জিনিয়া, দেরি হওয়ার কারণ বুঝলাম ওর দিকে তাকিয়ে বদল করেছে পোষাক। সাদা লিনেনের স্কার্ট এখন ওর গায়ে। টেবিলে নামিয়ে দিলো হাতের ট্রে।

স্যান্ডউইচের থালাও রয়েছে পানীয়ের সঙ্গে, নিন করে দিন শুরু—নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে আপনারও—' গ্লাসে ঢেলে দিলাম অনেকখানি স্কচ, ফেলে দিলাম কটা বরফের টুকরোও। ভার্জিনিয়া নরম আঙুলে একটা স্যান্টউইচ তুলে নিয়ে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলো। মারামারি করেছেন নাকি আপনি? চমকে উঠলাম। বললাম, সামলে নিয়ে, 'ইয়ে আর কি তর্কাতর্কি করার ফল একজনের সঙ্গে—' হাত বোলালাম নাকে।

ঠিক তত কিছু না যতটা খারাপ মনে হচ্ছে, না কি বলেন? ভার্জিনিয়া চুমুক দিলো লেবুর রসে, অস্বস্তিকর ছায়া ওর চোখে, বলে বসলাম কি বলবো ঠিক করতে না পেরে, 'কৃতজ্ঞ থেকে গেলাম আপনার সহানুভূতির জন্য। একা লাগছিলো বড়—'

'শুনেছি, অনেক আকর্ষণ ক্যাসিনোতে—'

'হয়তো, কিন্তু আমার পছন্দ নয় ওদের তেমন।'

টোল পড়লো গালে, 'শুনি পছন্দটা আপনার—' আমার কোনোকালেই নেই মজা করার অভ্যাস। আমি সোজা কথার মানুষ, এই কেউ আপনার মত। দেখবেন পাড়া মাৎ করবেন না যেন আবার চেঁচিয়ে। জানতে চাইলেন আপনি, দিলাম জানিয়ে। 'সেই' দলের নই আমি কিন্তু স্থির চোখে তাকালো ভার্জিনিয়া, 'আপনাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসতাম না এখানে 'সেই' দলের ভাবলে—' পরিবেশ মেঘমুক্ত হলো। ভার্জিনিয়া দিয়ে চললো তার কাজের ফিরিস্তি, কাজটাতে টাকা আছে ওর কথাতেও মনে হলো স্বাধীনতাও কিছু। ওর কাহিনী শুনতে ভালোই লাগছিলো। এখন স্বস্তি পাচ্ছি অনেকটা। কাজ হয়েছে স্কচে পানীয় পরিচর্যা করে চলেছে স্নায়ুর। ও বললো বেশ কিছু পরে, 'তখন থেকেই বলে চলেছিতো আমার কথাই। এবার শুনি আপনার কথা—আপনি কি করেন?

আশংকা করছিলাম এরকম কিছু একটার তাই মাথায় ছিলো উত্তরও। জীবন বীমা—আমি এক ক্ষুদে কর্মচারী পিটসবার্গ জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর। কাজটা ভালো লাগে?

মন্দ কি—এই আপনার মতোই কতকটা বেড়ানো যায়—'তা, নিশ্চয়ই ভালোই পান টাকা.

পয়সা—শুনেছি তো অনেক টাকার দরকার ক্যাসিনোতে থাকতে—' অচিরাৎ পরিষ্কার করা উচিৎ রহস্য, 'প্রতিজ্ঞা ছিল আমার একটা, দিনদুয়েকের জন্য হলেও অন্ততঃ—সাজবো কোটিপতি। এইজন্য টাকা জামিয়েছি বছরের পর বছর—যাক হলো তাও। পালাবো ভাবছি মঙ্গলবার নাগাদ। আপনার তাহলে ভালোই লাগে কোটিপতি হতে? ভার্জিনিয়া শুধোলো গালে হাত দিয়ে। হাসলাম, ভাবাই যায় না আর কিছু। হুঁ, তাই মনে হয় আমারও। কিন্তু স্বপ্ন থাকলে কি হবে কোটিপতি হবার, চোখেই দেখিনি কোনোদিন অতটাকা, দূরঅস্ত পাওয়া তো। আমার জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্য অনেক টাকা খরচ করতে পারবো। একটা পোষাক, মহড়া তারই, বলতে পারেন ক্যাসিনো বাস।

'অনেক টাকা? ও তাকালো আগ্রহের দৃষ্টি মেলে। অনেক টাকা হ্যাঁ, ম্যাডাম—'

কিন্তু কোথায় পাচ্ছেন? থেমে গেলাম। মনে হলো বলে ফেলেছি অনেক কথা।'

না-না। মাথায় নেই এখন কোনো পরিকল্পনাই, বলতে পারেন সবই দিবাস্বপ্ন।

বললাম হাল্কা গলায় একটু থেমে, হয়তো কেউ অনেক টাকা রেখে যাবে আমার জন্যে মরবার সময়।

ভার্জিনিয়ার কৌতূহল জমলো উজ্জ্বল চোখ দুটোয়। মওকা খুঁজছি প্রসঙ্গ পাল্টাবার ভার্জিনিয়ার মনে পড়লো এমন সময় বিঠোফেনের ফিফ্‌থ সিম্ফনির অনুষ্ঠান আছে রেডিওতে। ও চালিয়ে দিল রেডিওটা। শুনবেন পরিচালনা করছেন টসকানিনি, অনুষ্ঠান?

'চলুক—' কোনোদিন শুনিনি বিঠোফেনের সিম্ফনি, বিঠোফেন কেন, সিম্ফনি শুনিনি কারোর। বলতে গেলে এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে গেলো রৌদ্রস্নাত অপরাহ্নিক নিস্তব্ধতায় সঙ্গীতের মূর্ছনা। কাজ নয় শেষ হলো। ভার্জিনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ঝুঁকে। লাগলো কেমন? 'অপূর্ব! সব উন্নাসিকদের জন্যেই সৃষ্ট আমার ধারণা ছিল—' 'তার মানে ভালো লেগেছে বলুন আপনার?'

কি জানি, একথা বলতে পারি আমার অন্তরে একটা সাড়া উঠেছে—জাদু জানে লোকটা। শুনবেন আরো? আছে নাকি আরো? আছে, আরো ভালো নাইনথটা—আপনার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে।

শুনতেই হয় তাহলে তো। বসলাম জমিয়ে।

তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করুন। ভেতরে আসুন। ওর পেছনে ঢুকলাম একটা বড় লাউঞ্জে। ঠাসা ঘর বই আর জল-রং ছবিতে। রেডিওগ্রাম একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালের গায়ে, রেকর্ড পাশের তাকে। বললাম, চারপাশে তাকিয়ে, 'আচ্ছা, আপনারই তো এ বাড়িটা?'

হ্যাঁ। তবে এখানে থাকি না সব সময়। সেই সময়টা আমার এক লেখিকা বান্ধবী থাকে। সে নিউইয়র্কে এখন, এসে পড়বে কিছুদিনের মধ্যেই।

'কোথায় যাবেন আপনি তখন?'

কোথায় চীনে হয়তো। আমার অস্বস্তি হলো, কিন্তু আছেন তো এখন কিছুদিন?

হ্যাঁ, বড়জোর সপ্তাহ তিনেক। নিজেকে ছেড়ে দিলাম একটা আরাম কেদারায় সৈকতের দিকে মুখ করে। ভার্জিনিয়া দখল করলো একটা সেটি। মিললো ওর কথা। আমার চুলে শিহরণ উঠলো বাজনার আমেজে। ভার্জিনিয়া মেন্ডেলসন আর শুবার্ট শোনালো প্রয়োগ কৌশলের ফারাক বোঝাতে। চমকে উঠলাম দেয়াল ঘড়ির শব্দে। পড়লো সাতটা ঘণ্টা। পরে হিসেব করে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার পাঁচটা ঘণ্টা এখনো হাতে। ডিনারে কোথাও যাবেন নাকি?

দরকার নেই দামী কোথাও যাবার, আর ক্যাসিনোতে ফিরতে চাই না পোষাক পাল্টানোর জন্য। আবার বললাম, একটু ইতস্তত করে, নাকি দেওয়া আছে কাউকে তারিখ? তৈরী ছিলাম রূঢ় কিছু শোনার জন্য, কিন্তু হলো না সেরকম কিছু। জিজ্ঞেস করলো ভার্জিনিয়া, কখনো গেছেন রল-এ?

নাতো, সেটা কোথায়? আপনার অজানা থেকে গেছে অনেক কিছুই। রল-এ না গিয়ে থাকলে। হোটেলটা সৈকতেই, চলুন বেশ মজা হবে। রল-এ পৌঁছলাম ভার্জিনিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলে চড়ে। ছোট রেস্তোরাঁ গ্রীক পরিচালিত, মাছের আধার দেয়ালে। বাহুল্য চারিদিকে গদি আঁটা চেয়ার আর আয়নার। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে রল স্বয়ং উঠে এলো।

নিজেই আমাদের বানিয়ে দিলো মেনু—বিনের স্যুপ পয়লা এলো, ক্রমে কাছিমের স্টিক,

অ্যাসপ্যারাগাস সুপ, সবশেষে পেয়ারার মিষ্টান্ন। কথা বলে চলেছি খেতে খেতে।

ঘড়িতে সরব ঘোষণা হল আমার কথার মাঝেই, মনে মনে গুনে চললাম...যেন হাতুড়ি পিটিয়ে চললো বুকে একটা একটা ঘণ্টা...দশটা...এগারোটা...বারোটা।

জনি কি হলো? জিনি আমার দিকে তাকালো উৎকণ্ঠার চোখে। কিছু না। ফিরতে হবে আমাকে—মনে পড়ে গেলো একটা জরুরী কাজের কথা। বলতে পারলাম না এর বেশী কিছু। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন আটটা ঘণ্টা কেটে গেলো।

পৌঁছে দিই চলো তোমাকে লাগবে না দশ মিনিটও। গাড়িতে চড়ে বসলাম স্বপ্নোত্থিতের মত। শুকিয়ে গেছে গলা, বুকে ঘা চলছে হাতুড়ির...বুঝলো জিনি—একটা গোলমাল হয়েছে কোথাও কোনো, কিন্তু প্রশ্ন করলো না কোনো।

গাড়ি চালিয়ে গেল দ্রুত হাতে—ক্যাসিনোর গেটে পৌঁছে দিলো সাত মিনিটেই—হ্যাঁ, সাত মিনিট পাকা, কারণ আমার চোখ এঁটে বসেছিলো, ঘড়িতে। বেরোলাম গাড়ি থেকে—কাঁপছে হাঁটু। আবার বাস্তব রূপ নিলো রাইসনার ডেলা আর সিংহের গর্জন। রুমাল বোলালাম, ঘাম ভেজা মুখে।

'জিনি ধন্যবাদ, কথাগুলো বললাম ভাঙাগলায় কোনোরকমে। বলতে চেয়েছি আরো কিছু। ঠিক করতে চেয়েছি একটা তারিখও, জানাতে চেয়েছি ও কতো সুন্দর, কিন্তু আমার গলা দিয়ে বেরোলো না কোনো কথাই—'জনি কি হয়েছে? বিপদ কিছু নয়তো কোনো?' জিনি প্রশ্ন করল। উদ্বিগ্ন।

'না, ঠিক আছে—দেখা হবে আবার।' ফিরলাম, জিনি গাড়িতে বসে তেমনি ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে।

পাহারাদার কাচ বসানো চোখে গেট খুলে দিলো গাড়িটা আর তার আরোহিনীকে ঠাণ্ডা চোখে মেপে নিয়ে। ক্যাসিনোর দিকে হেঁটে চললাম আলো ঝলমল রাস্তায়। নিঃশব্দ পায়ে ঢুকলাম কুটিরের দরজা ঠেলে। রেডিও চলছে পুরোদমে আলো জ্বলছে ঘরের সব কটাই। ডেলা শুয়ে ডিভানে।

সিগারেট টেনে চলেছে মাথার পেছনে হাত রেখে। ঘোরালাম চোখ। আরে কোথায় সে? নেই রাইসনারের দেহটা—বুকে শুরু হলো হাতুড়ির পিটুনি। 'কোথায় ও?' 'ওইখানে—' ডেলা আঙুল বাড়ালো কলঘরের দিকে। তা এতক্ষণ ছিলে কোথায় তুমি? কাটাচ্ছিলাম সময়। এসেছিলো কেউ?

একটা কাজ দিয়েছিলাম তোমাকে তাই না? ডেলার চাপা রাগের গলা। করেছি তো চেষ্টা 'ফোন এসেছে তিনবার। দরজা ধাক্কাতেও শুরু করেছিলো লুই হতভাগা তো—বলা যায় কি এটাকে চেষ্টা? বারণ করেছিলাম তো ওদের বিরক্ত করতে।

রাস্তায় কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যদি—এখানেই থাকছি আমি, এখনো পর্যন্ত প্রমাণ দিতে পারোনি তুমি যে কাজের লোক। এগিয়ে পড় চাঁদবদন, ওকে খুন করেছো তুমিই তো? ঘরের সমস্ত আলোগুলো যেন নিভে গেলো চোখের ওপর থেকে।

'আরে শোনো—এই ব্যাপারে তুমিও তো আছো। হাতিয়েছো ওর বন্দুকটা। ওকে যদি খুঁজতে থাকে ওরা—' গেলাম থেমে। টোকা পড়লো দরজায়। বেশ জোরেই। মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম আমরা দুজনে। শব্দ হলো আবার, 'আছেন নাকি মিসেস ওয়ার্দাম।'

হেমের গলা অধৈর্য। আবার ভয় বাড়লো মনের গভীরে, গেছি পাথর হয়ে। ডিভান থেকে উঠে পড়লো ডেলা, বললো গলা তুলে, 'হেম সাহেব এক মিনিট কিন্তু ভয়ের ছায়া ওর চোখে, ফিসফিসিয়ে বললো কলঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে, 'ঢুকে পড়, যেন সাড়া না পায় কোনো!' অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম কলঘরের দরজা খুলে। হেমের গলা পেলাম কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর, মিসেস ওয়ার্দাম দুঃখিত বিরক্ত করার জন্য আপনাকে। বোধহয় শুনেছেন, পাওয়া যাচ্ছে না রাইসনারকে।

ফেরেনি নাকি এখনো? বসুন মিঃ হেম। না। ভারী বুটের আওয়াজ পেলাম কার্পেটে। খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মিস ডোয়েরিং, ফোন করে ছিলেন আমাকে—একবার ঘুরেই যাই তাই ভাবলাম—কিন্তু আপনি কি মনে করছেন কোনো কারণ আছে? মজা মারার আমেজ ডেলার গলায়। বসে আছে বে স্ট্রীটে গিয়ে দেখুন হয়তো। জানতে পারলাম বেরোয়নি ক্যাসিনোর এলাকা থেকে। মনে হলো না ডেলা কানে নিলো বলে ওর কথা। খাবেন একটু কিছু? বুকে ঝড় আমি দাঁড়িয়ে

আছি দরজায় কান লাগিয়ে।

'না, ধন্যবাদ—ডিউটিতে আছি এখন তো, কাজেই—' অফিসারোচিত হেমের গলা। ও খুব কৃতজ্ঞবোধ করবে আপনি সঙ্গদান করেছেন শুনলে রাইসনারের নিঃসঙ্গ সেক্রেটারীকে—' ডেলার গলা রিনরিনিয়ে উঠলো। 'কিন্তু মিসেস ওয়ার্দাম ব্যাপারটা গোলমেলে—শুনেছি রাইসনার সারা দুপুর ছিলো আপনার এখানে।' 'হ্যাঁ, ছিলোই তো। নিক বেরিয়েছে সন্ধ্যে নাগাদ, বললো যাচ্ছে সাঁতার কাটতে—' তাকে কেউ দেখেনি তো ওদিকেও। হেম বললো একটু থেমে।

আলোচনা করছিলেন কি ব্যবসার কথা আপনারা? ঘরে নীরবতা নামলো আবার। হেমের দিকে তাকিয়ে ডেলা, অনুমান করলাম, 'ক্যাপটেন বিশ্বাস করা যায় আপনাকে' আমার মনে হয়—কথা আছে, বসুন—' লড়াই শুরু দুজনের ইচ্ছাশক্তির, এবার বোধহয়, নীরব তাই দুজনেই। আওয়াজ হলো ক্যাঁচ করে কিছুক্ষণ পরে, জয় হলো ডেলার বুঝলাম, ক্যাপটেন একটু খান, আমার পছন্দ নয় একা খাওয়া। হেম চোখ ফেরালো স্কচের খালি গ্লাসটার দিকে।

শুরু করেছেন আমি আসার আগেই মনে হচ্ছে। আপনার যে সুনাম আছে বুদ্ধিমান পুলিস সাহেব বলে সেটা মিথ্যে নয়। ডেলা ফোয়ারা ছোটালো হাসির। হুঁ, এড়ায় না বড় কোনো কিছু আমার চোখে। শান্ত মনে হলো হেম কিঞ্চিৎ। উঠলো গ্লাসের আওয়াজ, ডেলা বোধহয় সোডা ঢাললো। মনে হচ্ছে এক নম্বরী জিনিষ আপনার বোতল দেখে।

যাক কি বলছিলেন যেন বিশ্বাসের ব্যাপারটা? আপনার জানার আগ্রহ হতে পারে এখানে হঠাৎ হাজির হয়েছি কেন আমি আর রিক্‌কা। শুনুন খাতাপত্র পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে পল আমাদের। পল রিক্‌কাকে পাঠিয়েছে ক্যাসিনোর উদ্বৃত্ত টাকা নিক জুয়োর পেছনে লাগাচ্ছে জেনেই, তাড়াবার জন্য ওকে। তা, মানে মানে সরে পড়েছে নিক তো দেখছি নিজেই। ডেলা সাবাস! অভিনয় করছো বেড়ে! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবলাম। কত টাকা গেছে? বলেন কি! বলা শক্ত সেটা এখুনি ; হতে পারে হাজার দশেক। দেখা শেষ হয়নি তো কাগজ পত্র, তবে—সব স্বীকার করেছে ও নিজে। চাবিগুলোও দিয়ে দিয়েছে ঝামেলা না বাড়িয়ে। আমি ওকে সরে যাবার বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছি। ভাবিনি এর মধ্যে আপনাকে টেনে আনবে ওই বোকা মেয়েটা—'

'হুঁ! এই তাহলে ব্যাপারটা? ধুত্তোর! হেম অনিচ্ছার গলায় প্রশ্ন করলো একটুক্ষণ পরে, 'তা, এখন কি করার আছে কিছু আমার?' 'বোধহয় না!'

'আপনার কি মনে হয় ও কোথায় গেছে?' পারছি না বলতে। গিয়ে থাকবে সমুদ্রের দিকেই। ওকে তো দেখেনি পাহারাদারগুলো, বলছেন—' 'হুঁ, ব্যাপার মজার। সঙ্গে নেয়নি দেখছি আর কিছুই তো—আমি দেখে এসেছি ওর ঘরটাও—' রইলাম রুদ্ধশ্বাস হয়ে—ডেলা কি করবে এবার?

'ওর কিছু জিনিষপত্র থাকে জোয়ের ওখানে। আর, একদিন এটা হবে নিক তো জানতোই—' 'কিন্তু চালু ছিলো লোকটা, অসুবিধা হতে পারে ব্যবসায় ও না থাকায়—' হেম বললো চিন্তাকুল গলায়। অসুবিধা হবে না কোনো আপনার—আছি তো আমি আর রিক্‌কা—'

'ওয়ার্দামের মতও কি তাই?' হ্যাঁ, ক্যাপটেন অনেক করেছেন, এখনো করছেন আপনি আমাদের জন্য, পলের ধারণা। কথাও হয়েছে এনিয়ে তার নিকের সঙ্গে—কিন্তু ঝগড়া বাধিয়েছে নিকই। ডেলা হেসে উঠলো আবার উচ্চকণ্ঠে। যাক, আপদ বিদায় হয়েছে। আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি সপ্তাহে আড়াই শো করে আপনার দক্ষিণা। ছ মাস আগে থেকে টাকার হিসেব হবে। আপনি টাকাটা পাবেন কালকেই।

হঠাৎ যেন হেম খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, 'হুঁ বেশ—বেশ। সকলেরই তো দরকার টাকার। মিসেস ওয়ার্দাম কি বলেন? মনে হচ্ছে ভালোই চালাতে পারবো আপনাদের সঙ্গে। তা, কোথায় রিক্‌কা সাহেব? আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হলো আবার।.

হাজির হয়েছে বে স্ট্রীটে গিয়ে সেই হয়তো। পারছি না বলতে ঠিক। কথা হবে, আসুন না কাল। 'আসবো—' আওয়াজ উঠলো ক্যাঁচ—হেম বোধহয় উঠে পড়লো, কথা বলতে হবে মিস ডোয়েরিংয়ের সঙ্গে। খুঁজে মরছে ওরা তো। বলতে পারেন, তবে না ভাঙাই ভালো আসলে কি হয়েছে।

ঠিক তা চাইছি না আমি এখুনি। বলবেন—গেছে যেন বাইরে কোথায়। আসছেন তো কাল?

চেয়ার ঠেলে ডেলা উঠলো। নিশ্চয়ই গুড নাইট। কালই আপনাদের সঙ্গে শুরু করা যাবে কাজ—কার্পেটে আওয়াজ পেলাম জুতোর, 'ব্যাঙ্কে খোঁজ করবো কাল তাহলে, কি বলেন? হ্যাঁ, আগেই চলে যাবো আমরা অবশ্য। কল্পনা করলাম ডেলার হাসিটা। ক্যাপটেন গুড নাইট। শব্দ পেলাম দরজা বন্ধ করার।

অপেক্ষা করছি আমরা দুজনে—দরজায় ডেলা, আর এই আঁধারে আমি রাইসনারের লাশ পড়ে আমার পেছনে কোথাও। আওয়াজ এলো গাড়ির স্টার্টারের, মিলিয়েও গেলো ক্রমে। ডেলা ঠেলে দিলো কলঘরের দরজাটা, 'সামলানো গেছে এখনকার মতো। বেরিয়ে এসো—' বেরিয়ে এলাম আস্তে। চোখ ঘোরালাম ডেলার দিকে, লক্ষ্য করলাম সেই বিজয়িনীর দৃষ্টি ওর চোখে আলোটা সরে আসতে।

দেখেছি যা আগেও 'রাস্তা পরিষ্কার—জনি বেরিয়ে পড়। রাইসনার শেষ বিদায় নিতে গিয়েছিলো তার প্রাণাধিক বন্ধুদের কাছে ওরা জানবে। কাছে গিয়েছিলো একটু বেশী। নাও চলো—চোখ ফেরালাম কলঘরের অন্ধকারে ঘাড়ের পাশ দিয়ে। কেমন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে রাতের এই প্রহরে বয়ে নিয়ে যাওয়া এই লোকটাকে কাঁধে করে। কিন্তু উপায় নেই।

বাইরেই আছে আমার গাড়িটা। ডেলা বলে উঠলো নরম গলায়, 'ওকে নিয়ে যাও গাড়িতে ফেলে। ক্যাসিনোর পেছনের রাস্তা দিয়ে। দেখে এসেছো তো গুহা। বেশী লাগবে না পাঁচ মিনিটের, নাও বেরোও। ভালো হতো গাড়িটা তুমি চালালে, চেষ্টা করলাম মৃদুস্বরে বলার। এক পাও নড়ছি না আমি এখান থেকে, তোমাকে কাজটা একাই সারতে হবে যদি টাকার ভাগ পেতে চাও। তোমারই সম্পূর্ণ দায়িত্ব যদি তুমি ভুল করো তো তার—ওকে মেরেছো তুমি, তোমার শেষ কাজও। কলঘরে ঢুকলাম ধীর পায়ে। ওকে দেখলাম আলোটা জ্বলতেই—রাইসনার সেই চিৎ হয়ে পড়ে তোয়ালে মাথার নীচে।

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম ওর শরীরে হাত দেবার আগে। লোকটা ভারী শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালাম লাশ কাঁধে ফেলে, মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে, কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। কলঘরের বাইরে পা দিতেই রাইসনারকে নিয়ে, ডেলা সদর দরজাটা খুলে দিলো ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে।

রাইসনার-এর দেহটা দিলাম সিংহদের।

চলছে গাড়ি—চাপা পড়ে রইলো সিংহগর্জনে ইঞ্জিনের শব্দ। বাড়িয়ে দিলাম গতি আস্তে...নজরে পড়লো ডেলার কুটির কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। আলো জ্বলছে। হেঁটে এগোলাম গাড়ি থামিয়ে। দাঁড়িয়ে কুটিরের দরজায় ডেলা। গর্জন শুনতে পাচ্ছি এখান থেকেও। হুইস্কির বোতল তুলে নিলাম ওর পাশ দিয়ে ঢুকে।

ডেলা ফিরে দাঁড়ালো দরজা বন্ধ করে। কোটরে ঢুকে গেছে ওর চোখদুটো। দেখতে পায়নি তো ওরা তোমাকে? নাড়লাম মাথা। 'হয়ে নাও চাঙ্গা, হেম হাজির হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে—' আরে ধুর, থামাও তো কপচানি।

খেঁকিয়ে উঠলাম, করতে তো হয়নি তোমাকে কাজটা। ন ঘণ্টা থাকতে হয়েছিলো আগলে বসে। ডেলা এগিয়ে এলো স্কচটা একচুমুকে নামিয়ে দিয়ে আবার ঢালতেই। জল দিয়ে এসো তো মুখে-চোখে কলঘরে গিয়ে। কেলেঙ্কারি হবে হেম দেখলে। কলঘরে ঢুকে গেলাম ওর দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে। সমস্ত পরিষ্কার করেছে ডেলা। দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। নিজেকে মনে হচ্ছে শ্মশান ফেরত মানুষ। ঘামে জব জব করছে সারা মুখ, চুল এসে পড়েছে চোখের ওপর, বীভৎস। বেসিনে মুখ নামিয়ে দিলাম ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিয়ে। চুলে চিরুনি চালিয়ে দিলাম তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে। এখনো কাঁপছে হাতটা। দেখি ডেলা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে ফিরতেই। প্রশ্ন করলো চোখে চোখ পড়তেই। ওকে জনি? বিশ্বাস করতে পারছি না নিজের কানকে।

কি বললে? কে ওই মেয়েটা? কাজ চলেছে চিরুনির কিন্তু জমে গেছে ভেতরটা। বলছো কার কথা? গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব। তোমাকে নাকি একটা মেয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলো পাহারার লোক বললো। কে মেয়েটা এবার সোজা তাকালাম ওর চোখে।

জানবো কি করে! হারিয়ে ফেলেছিলাম রাস্তা বলেইছিতো। যাচ্ছিলো দেরি হয়ে, তাড়া ছিলো ফেরার। লিফট নিলাম ওকে থামিয়ে। নেওয়া হয়নি ওর পরিচয়টাও, হয়েছেটা কি তাতে? না, ভাবছিলাম স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে ডেলা তাকিয়ে আছে,—লিফট নিতে ওস্তাদ তুমি তো আবার, তাই না? ও ফিরে চললো বসার ঘরে।

কলঘর থেকে আমিও বেরোলাম। 'একসঙ্গে গাঁথা হয়ে গেলো কিন্তু আমাদের জগৎ এখন থেকে—। ভালো নাও বাসি আমরা যদি পরস্পরকে, মুশকিল ছাড়াছাড়ি হওয়া। বুঝতে পারছো? ডেলা বলে চললো উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে। একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার আমাদের মধ্যে। অনুপ্রবেশ চলবে না কোনো নারীর আমাদের জীবনে। একই কথা বলেছিলাম পলকেও, পারবো না ঠকতে। এখান থেকে সরে যেতে হবে তোমার মাথায়ও যদি ওই ভূত চেপে থাকে তাহলে। খোলাই রাস্তা তো, তুলে দেওয়া হেমের হাতে—'ফোন বেজে উঠলো আমি কিছু বলার আগেই। ডেলা রিসিভার তুলে নিলো লীলায়িত ভঙ্গিতে এগিয়ে।

'হ্যালো?' দেখতে লাগলাম ওকে। অন্যদিক থেকে কানে এলো একটা উত্তেজিত গলার কচকচি অনেকক্ষণ ধরে। পরে বললো ডেলা, 'শুনতে পাচ্ছি আমি গর্জন! বলুন তো কি কেলেঙ্কারি! খাঁচার কাছে যেতো লোকটা সবসময় বারণ করেছে পল কতবার, অ্যাঁ? হ্যাঁ—আছে, ফিরলো এই তো না-না-এ ঝামেলায় যাচ্ছি না আমরা যা করার করুন আপনি । না, আর এদিকে আসতে দেবেন না কাগজের লোকগুলোকে—ঠিক আছে, দেখা হবে কালই ক্যাপটেন ধন্যবাদ। ডেলা হাসলো মোহিনী হাসি তাহলে ছাড়ছি গুড নাইট, ও নামিয়ে দিল রিসিভার। মুচকি হাসলো আমার দিকে ফিরে, 'ঠিক আছে সব, তাই হলো যা চেয়েছিলাম, হেম লোকটা কাজের।'

কি বলো এর মধ্যে নেই আমরা বাবা! ডেলা সরে এলো আমার দিকে, ঢালো না সখা আর একটু সেলিব্রেট করি। বাড়িয়ে ধরলাম হুইস্কি ঢেলে। ডেলা বললো গ্লাসটা নিতে নিতে, এইতো এখন নিশ্চিন্ত আমরা। হয়ে গেলাম বড়লোক শুরু সবে জীবনের। জনি, বুঝতে পারছো? বলতে পারলাম না, বললাম না কিছুই।

ডেলা চুমুক দিলো হুইস্কিতে ওর দৃষ্টি আমার দিকেই। খিল তুলে দিলো গ্লাস নামিয়ে হাসিমুখে দরজার দিকে এগিয়ে। আমাদের বিরক্ত করবে না আর কেউ আমি আর তুমি শুধু। ওদিকে ব্যস্ত ওরা সবাই এই আনন্দক্ষণটা ধরে রাখি এসো আমরা—দেখিয়ে দাও তুমি কত ভালবাসো আমাকে। ডেলা দাঁড়ালো আমার গা ঘেঁষে। আমার ঘৃণ্য মনে হলো ওকে। আমার জীবনে আর কখনো হয়নি এমন ঘৃণাবোধ। যেভাবে পেতে চেয়েছিলো পেয়েছে ও আমাকে। একটা কথাই যথেষ্ট ওর মুখ থেকে। আমি গাড্ডায়। আমাকে চলতে হবে ওর কথামতই, নইলে—থাকবে না কোনো নারী। মনে পড়লো জিনির কথা। 'টাকা আছে আমাদের, বলে চললো ডেলা, এটা পরম লগ্ন আমার জীবনের তোমারও নিশ্চয়—তাই না? কি, জনি বিশ্বাস হচ্ছে না? বললাম নির্লিপ্ত গলায়, হচ্ছে। ডেলা তার নরম হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর অতলান্ত কালো হরিণ চোখের দিকে। ও মৃদুস্বরে বললো, কেমন লাগছে লক্ষপতি হতে? ভালোই লাগছে বললাম। নামিয়ে দিলাম ওর ঠোঁটে ঠোঁট। জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ডিভানের দিকে চললাম আস্তে তুলে নিয়ে। আমার ওপর কর্তৃত্ব করেছে ও এতক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু চালু হতে হবে আমাকেও, অন্তত বাঁচাতে হবে পৈতৃকপ্রাণটা, ধরতে হবে ধৈর্য। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম, ওকে ডিভানে শুইয়ে দিয়ে।

এখুনি শেষ করে দেওয়া যায় ওর পাখীর মত নরম গলাটা টিপে—কিন্তু না, ওকে সরাতে হবে অন্য উপায়ে।

এ কথা বিশ্বাস করে নি ডেলা আমাকে গাড়িতে চাপিয়েছে অপরিচিত একটা মেয়ে। ফলে হতে পারলাম না ক্যাসিনোর সহ পরিচালক। আমাকে কাজ করে যেতে হলো ওর সহকারী হয়ে। আমি মেনে নিয়েছি এ অবস্থা, ভুলিনি এটা বুঝিয়ে দিতেও ওকে প্রকাশ্যে।

আমি বিশ্বাস করি নি ডেলাকেও। ও সিন্দুকের চাবিগুলো হাতিয়েছে রাইসনারের লাশ আগলাবার ছুতো করে। আমাকে বলেনি সংযোগের সংখ্যাগুলোও। অলিখিত চুক্তি আমাদের মধ্যে : আধা-আধি বখরা উদ্বৃত্ত টাকার। সোয়া লাখ করে।

এখনো পাইনি টাকাটা। টাকাটা চাইতে ডেলার কাছে ও বলেছিলো, জনি, ব্যবসায় নেমেছি আমরা এখন ও টাকায় চলবে না হাত দেওয়া।

গোটা ক্যাসিনোর মালিকানা অনেক বেশি লাভজনক, নয় কি? থোক টাকা পাওয়ার চেয়ে। অন্য খাতে বইছে কিন্তু আমার ভাবনা। এখান থেকে সরে যাবো জিনিকে নিয়ে ওই টাকাটা পেলে। আমার কোনো স্বপ্নই বাস্তাবে রূপ নেবে না ডেলার দেওয়া সপ্তাহান্তিক একশো ডলারে। এখন তো বেশি টাকার দরকার নেই তোমার। ডেলা হাই তুলছিলো ডিভানে প্রায় বিবস্ত্রাবস্থায় শুয়ে।

তুমি তোমার ভাগ পাবে, এখুনি নয় তবে। ব্যবসায় খাটছে ধরে নাও টাকাটা। অবস্থা বুঝি আমি বাজারের, অজানা সেটা তোমার। অপেক্ষা করো আর কটা দিন। আমি বিশ্বাস করি নি একথা অবশ্য, ডেলা নিজেও করেনি সম্ভবত। চাইলেই পাবে তোমার যখন যা দরকার। ঠোঁটে ডেলার কুহক হাসি। লক্ষ্মীটি তোমাকে দেখতে চাই আমি সুখী—সুখী তো না কি তুমি? হাসি ফোটালাম বহুকষ্টে মুখে। সুখী আমি বললাম।

ঘৃণা জমেছে মনে প্রচণ্ড। প্রবোধ দিলাম নিজেকে, একদিন সময় আসবে...শুধু অপেক্ষা সুযোগের। কিন্তু তা হলো না ডেলা যেমনটা চেয়েছিলো। কেউ মেনে নিতে পারলো না মেয়ে মানুষের খবরদারি। বেঁকে বসলো আবাসিকরাও, কর্মচারীরা তো নয়ই। ডেলা জাঁকিয়ে অফিসঘরে বসতে লাগলো রোজ সকালে। চালালো হাঁক-ডাকও—কিন্তু পেলো না তেমন পাত্তা। একদিন উপস্থিত হলো ধূমকেতুর মত ইস্পাত সম্রাট গলয়ে হ্যারিস ব্রাউন। তখন দপ্তরে ছিলাম আমিও। ডেলা স্বাগত জানালো মিষ্টি হেসে ব্রাউন ঢুকতেই, কিন্তু মনে হলো না ওর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। প্রশ্নবান ছুঁড়লেন সোজা তাকিয়ে আমার দিকে। অ্যাই রিক্কা তো আপনিই তাই না? হ্যাঁ, দাঁড়ালাম উঠে, গরম জল নেই আজ সকাল থেকেই আমার ওখানে, আপনারা কি শুরু করেছেন? আগুনের টুকরো ওর চোখ দুটো, ডেলা এগোলো হাসিমুখে। সাহায্য করতে পারি আমি হয়তো আপনাকে।

ওর দিকে ঘুরে তাকালেন ব্রাউন, নাকচ করে দিলেন ডেলার বক্তব্য হাতের আন্দোলনে, দেখুন আমি মেয়েদের কাজের ব্যাপারে কোনো কথা বলি না বিশেষ করে তরুণীদের সঙ্গে। রিক্কা তো ইনিই? সরে যান আপনি একেই বলছি যা বলার। ডেলার আর পথ রইলো না দুপা পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া। আমি করে দিলাম জলের ব্যবস্থা—আশ্বাস দিলাম উনি সপরিবারে আমার কুটির দখল করতে পারেন এ, ধরনের ঘটনা আর ঘটলে। ব্রাউন বেরোলেন দিকবিদিক কাঁপিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে। ছড়িয়ে পড়লো খবরটা অন্যেরাও তাদের অসুবিধার ফিরিস্তি নিয়ে আমার কাছেই আসতে লাগলো। বুদ্ধিমতী ডেলা। আমার ওপর ছেড়ে দিলো দপ্তরের কাজগুলো, জনি তুমিই চালাও—তুমিই এখন ক্যাসিনোর মালিক। অবশ্য আমার কাছেই রাখছি চাবিগুলো। জানিও টাকার দরকার হলে। ওর হাতেই রইলো বে স্ট্রীটের কর্তৃত্বও। ভয় করতে শুরু করলো ওরাও ডেলাকে। ডেলা হাজিরা দিতে লাগলো সেখানে সপ্তাহে তিনদিন করে সন্ধ্যেয়। সুবিধেই হলো আমার এতে। আমি জিনির মধুর সঙ্গ পেতে লাগলাম ওই দিন গুলোতে।

ভালো লেগেছে জিনিকে। হৃদয় দিয়ে ফেলেছি ওকে। যদিও জানি ওকে পাওয়ার ঝুঁকি অনেক। ওকে পেতে হবে তবু। মনে ছিলো ডেলার সাবধান বাণী—কিন্তু আমি বদ্ধপরিকর আমার প্রেমপর্ব চালিয়ে যেতে। জিনিকে একটা চিঠি দিয়ে ছিলাম ওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর, তাতে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম আচমকা বিদায় নেবার জন্য ওর কাছ থেকে ওই রকম ঃ সেদিন মনটা অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিলো বোধহয় অনেকটা সময় রোদে বসে থাকার দরুণই। পড়েছিলাম অসুস্থ হয়ে— সামলে উঠেছি এখন মোটামুটি। কবে আসবো, ক্ষমা চাইতে যাবো তোমার কাছে। ভাড়া করে ফেললাম একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডে চিঠি ছেড়ে দিয়েই। ঠিকানাটাও ওকে দিয়ে দিলাম। সপ্তাহে একশো ডলার আর খাওয়া-দাওয়া, আমার মন্দ চলবে না। অবশ্য থাকছেও না হাতে কিছু। মাঝে মধ্যে বসছি জুয়োর টেবিলেও—পাচ্ছিও কিছু কিছু। পিটসবার্গ অফিস থেকে লিঙ্কন বীচে বদলি হয়েছি আমি জিনি জানালো—দায়িত্ব নিয়ে এখানে নতুন অফিস খোলার। চালিয়ে গেলাম কাজের ভান, বিশ্বাস করলো জিনি সবই।

খারাপ লাগছিলো ওর কাছে মিথ্যের বেসাতি করতে—কিন্তু ছিলো না কোনো উপায়, কারণ

ভালবেসে ফেলেছি জিনিকে। জীবন-সঙ্গিনী করতে চাই আমার ওকে। কিন্তু টাকা চাই তার আগে, আর মুক্তি।

আরও ব্যাপারটা সহজ হতো যদি যেমন তেমন কিছু একটা হতো জিনির চাকরিটা। কিন্তু ওকে নিয়ে সরে যেতে পারছি না আমার হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকাতে। ফেলেছি ভুল করে—বোধহয় জিনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো এখন বুঝেছি আমি ফকির হলেও কিন্তু ধরা পড়ে এ সব তো দেরিতে। ডেলা বে স্ট্রীটে পাড়ি জমাতো যে সব দিনে, আমি বেরিয়ে পড়তাম বুইকে চেপে জিনির সঙ্গসুখের সন্ধানে। কথা হতো ফোনে—ফ্ল্যাটে সোজা চলে আসতো জিনি, কখনো ওকে তুলে নিতাম আমি। দুটিতে ডুবে যেতাম গানে বাজনায়।

দুজনে খেলতাম দাবা। খেলা শিখেছিলাম জিনির কাছেই। মাঝে মধ্যে চলে যেতাম রণের ওখানেও। ওখানে সময় কাটতো নিরাপদে, কারণ হাজির হবে না সেখানে ডেলা কখনোই। কেউ না ক্যাসিনোরও। ভালবাসে আমাকে জিনিও—কিন্তু এগিয়ে আসছে বেরিয়ে পড়ার সময় ওর তো—

দুশ্চিন্তা বাড়লো দুজনেরই 'জনি বলো তো কি করবো। জিনি বললো ফ্ল্যাটের এক নিভৃত সন্ধ্যায়। কবে হবে আমাদের বিয়েটা এই পর্যায়ে পৌঁছেছি আমরা এগারো দিনে। আমিও মাথা খুঁড়ে মরছি এই সমস্যা সমাধানের জন্য। আমাকে দুটো কাজ করতে হবে জিনিকে আমার জীবনে জড়াবার আগে। হাতে রাখা দরকার অনেক টাকা, প্রথম কাজ, থাকার জায়গা ঠিক করা দ্বিতীয় কাজ। আমাদের পাত্তা পাবে না যেখানে ডেলা এমন জায়গা এখানে যখন টেনে আনে ডেলা আমাকে—আশ্বাস দিলো সোয়া লাখের। পালন করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে আমার কাজ—কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখেনি ডেলা তার। আমার অর্জিত অর্থ ওই টাকাটা—আমার বিবেচনায় সুপ্রতিষ্ঠিত তাতে আমার অধিকার। পেতে হবে আমাকে টাকাটা। কিন্তু আমাকে জানতে হবে তার আগে সিন্দুকের সংযোগের সংখ্যাগুলো। রাস্তা নেই প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া। মোটামুটি ঠিক হয়েছে একটা জায়গা বিবাহোত্তর অজ্ঞাতবাসের। কিউবা। হ্যাঁ আমরা যাবো কিউবায়।

বিমানের টিকিট কাটবো টাকাটা হাতে আসা মাত্র। কখনো আসবে না ডেলার মাথায় কিউবার কথা। করার কিছু থাকবে না। আর এলেও। তাই, কবে বিয়েটা হতে পারে জিনি যখন প্রশ্ন রাখলো; আমার তৈরীই ছিলো আংশিক উত্তর।

জানালাম আমাদের মিলন সম্ভব হবে মাস দেড়েকের মধ্যেই। বললাম, আমাকে হাভানাতে ম্যানেজারের পদটি দেওয়া হবে যদি এখানকার কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক হয় তাহলে। অফিসের কর্তা জানিয়েছে আমাদের। জিনি বেশ হবে, পেয়ে যাবো আমাদের যা চাহিদা—কাজ করতে হবে না তোমাকেও আর। জিনি তোমার কেমন লাগবে কিউবায় থাকতে? জিনির উত্তর ঃ নীড় বাঁধতে পারে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে সে, আমি সঙ্গে থাকলে। দুশ্চিন্তাও বেড়েছিলো মিথ্যাভাষণে কোনোদিন যদি জানতে পারে জিনি প্রকৃত অর্থ...কিন্তু আমার টাকা নিয়ে বেশি মানসিক অস্থিরতা তার চেয়েও...কবে সরে যেতে পারবো আমার ভাগের টাকা বের করে সিন্দুক খুলে—প্রতিদিন বসতাম কর্মচারীদের সঙ্গে ক্যাসিনোর দপ্তরে, শোনা হোতো তাদের অভাব অভিযোগ, বিবেচনাও করা হতো প্রস্তাব থাকলে। এদের কখনো ডাকেনি পল বা রাইসনার এরা খুশী হতো তাই ডাকলে।

একটা ক্ষেত্রও হলো হেলিকপ্টার অবতরণের লিঙ্কন বীচে। উড়ো-ট্যাকসি চলাচল শুরু হলো মিয়ামি আর লিঙ্কন বীচের মধ্যে। মিয়ামি চলে যাচ্ছে একঘেয়েমি কাটাতে বীচের মানুষ, আবার বীচে আসছে মিয়ামির মানুষও—বেড়ে চললো ক্যাসিনোর আয় টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনও চালু হলো ক্যাসিনোর কার্যকলাপের। অনুষ্ঠানও শুরু হলো ক্যাবারে নৃত্য আর বাদ্যবৃন্দের। বুদ্ধির তারিফ করলো ডেলা আমার। জনি, দারুণ তোমার এই আইডিয়াটা, জবাব নেই—' 'হুঁ, করে ফ্যালো পুরস্কারের ব্যবস্থাটাও যখন স্বীকার করছো। হাসলাম, 'আচ্ছা দিয়ে দাও না ওই টাকাটা, বলেছো যেটা দেবে। কাজে লাগাবো ওটা—'মুক্তোঝরা হাসি ফোটালো ডেলা ঠোঁটে, জনি ধৈর্য ধরো একটু তুমি পাবে টাকা। বুঝলাম মাঠে মারা গেলো এবারের আবেদনও, 'কবে?' ডেলা একটা বেলেল্লা ভঙ্গি করলো, বলছি কাছে এসো, এই পর্যায় সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ওর অভিনয়ের... প্রেমের পালা শুরু করা অঙ্গুলি হেলনে...কিন্তু যেতে হবে কবে—দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এই মেয়ে মানুষটাকে

জিনির কাছ থেকে। ডেলা জানবে আমি ওর প্রেমে পাগল যতদিন আমি বাঁচবো ততোদিনই। শুয়ে শুয়ে ভেবেছি কুটিরের বিছানায় অন্ধকারে আমার মনের পটে বার বার ভেসে উঠেছে একটা মানুষের মুখ...রাইসনার।

লক্ষ্মীসোনা, দিচ্ছি বিবেকের তাড়নায়—ক্যাসিনোর জন্য তুমি অনেক করেছো। পাকা অভিনেত্রী মেয়ে-মানুষ। জিনি মিয়ামি যাবার জন্য প্রস্তুত হলো তার সৈকতবাস ছেড়ে দিন পনেরো পর। 'কি ওয়েস্ট চলে যাবে সেখানকার কাজে মিয়ামির কাজ সেরে। অবশ্য ঠিক হয়নি যাত্রার দিন। পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে রাইসনারের মৃত্যুর পর সব দিব্যি চলছে। রেহাই মিলেছে খুনের, লুকোচুরিও চলেছে ডেলার সঙ্গে। ভালবেসেছি জিনিকে—পাখানা মেলে দিয়েছে সেও তার হৃদয়ের।

লস এঞ্জেলস থেকে হাজির হলো এসে আসল রিক্কা এমনি এক দিনে।

জানতাম আমরা রিক্কা আসবে—তাই প্রস্তুতিও ছিলো মানসিক ভাবে। তারবার্তা এসেছে লেভিনস্কীর কাছ থেকে কিছুদিন আগে, সেখানে পল পৌঁছোয়নি। নিশ্চয় খবর গেছে রিক্কার কাছেও। ফেরত ডাকে পলের শরীর ভালো নয় লেভিনস্কীকে জানানো হলো, সে বিশ্রাম নিচ্ছে লন্ডনে। রাইসনারের নামেই তার গেলো। সময় নেবার জন্য এসবই। রিক্কার ট্রাঙ্ক আশা করছিলাম লস্ এঞ্জেলস থেকে, কিন্তু হয়তো উঁকি দিয়ে থাকবে কোনো সন্দেহ লোকটার মনে তাই, সে হাজির হলো সশরীরেই, বিনা নোটিসেই, একরকম।

আঁকি-বুঁকি কাটছিলাম সাঁতার দীঘির একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। ভাবছিলাম কেমন দাঁড়াবে আলোগুলোকে দীঘির চারপাশে মেঝেয় বসাবার ব্যবস্থা করলে ওপরের আলোগুলোকে তুলে দিয়ে। সময়টা বারোটার কিছু পরই হবে—ভিড় বাড়ছে লাঞ্চের —লোকও বাড়ছে বারের। টের পাইনি ওর ঢোকা। নিঃশব্দে চলাফেরাই নাকি তার বৈশিষ্ট্য পরে জেনেছি। লোকটাকে নজরে পড়লো চোখ তুলতেই দাঁড়িয়ে সামান্য দূরে।

চমকে উঠলাম। ওকে চিনলাম কোনো মিল না পেলেও আমার কল্পনার সঙ্গে ওর চেহারার। ওর চেহারাটা বেশ ভারীই হবে আমার ধারণায় ছিলো, কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি, বেঁটে, মোটা একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মাথায় টাক পড়ার পূর্বাবস্থা পাতলা চুল কয়েক গাছা ছড়িয়ে। এক মুহূর্তে বলে দেওয়া যায় লোকটা মদ্যপ মাংসল মুখটা দেখে।

একজোড়া প্রাণহীন চোখ সাপের মত, তৈরী যেন কাচের। অর্থহীন হাসি মুখে একটা, যে হাসি ঠোঁট থেকে কখনোই মিলোয় না।

বিস্তৃত হলো হাসিটা, জ্যাক রিক্কা আমি, কোথায় নিক? আমার পা চলে গেলো টেবিলের তলায় একটা বোতামে, সঙ্কেত বেজে উঠলো ডেলার ঘরে। শুধু এটা ব্যবহার করার কথা রিক্কার আগমনের সাবধানবানী হিসেবেই। ছেড়ে দিলাম চেয়ারে পিঠ, 'এক নিভৃত কোণে বসলাম অম্লান রইলো মুখের হাসি, অপরিবর্তিত মুখভাবেও—রিক্কা টেনে নিয়ে বসলো চেয়ারের পেছনে মোটা আঙুল ছুঁইয়ে। মানে, বলছেন মায়া কাটিয়েছে ইহলোকের? গন্ধ পাচ্ছি ওর নিশ্বাসের ওর অনুমান ঠিকই মাথা হেলিয়ে জানালাম। 'হুঁ, ব্যাপার গোলমেলে তা, জানতে পারি আপনি কে? সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম ড্রয়ার খুলে। ৪৫ কোলট অটোমেটিকটা রয়েছে আধখোলা ড্রয়ারের এক কোণে...শুধু ঘোড়া টিপে দেওয়া হাতের মুঠোয় নিয়ে বিপদ দেখা দিলে—পাকা করা আছে সব ব্যবস্থাই রিক্কার অভ্যর্থনার। 'আমি? কোম্পানী চালাচ্ছি আমি। 'হুঁ,—আচ্ছা।'

তো, কে দিলো এ গুরুভারের দায়িত্ব আপনাকে? ড্রয়ারে স্থির রিক্কার সর্পচক্ষু। কিন্তু সেখান থেকে অটোমেটিক চোখ চলে না সে যেখানে বসে আছে। তবে সে যে আন্দাজ করেনি কিছু তার মানে এই নয়। ফিরলাম ডেলার কণ্ঠস্বরে। আমি দিয়েছি, ও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। 'তাই বুঝি? রিক্কা বলল মাথা না ঘুরিয়েই—তার চোখ নিবদ্ধ আমার ওপরই, তা, কোথায় পল? ডেলা তার মুখোমুখি এগিয়ে এলো ধীর পায়ে 'জ্যাক কেমন আছো? দেখা নেই অনেকদিন, খবরাখবর কি লস এঞ্জেলসের? রিক্কা চাপিয়ে দিলো পায়ের ওপর পা, বুকে জড় করলো হাত দুটো। মনে হচ্ছে লোকটা বিপদজনক। তার জানার কথা নয় ডেলা এখানে রয়েছে, অজানা রাইসনারের মৃত্যুসংবাদও, কিন্তু বুঝলাম তার মুখোভাবের পরিবর্তন আসার পক্ষে যথেষ্ট নয় এ খবরগুলোর

কোনোটাই।

সে উত্তর দিয়ে গেলো নির্বিকার ডেলার প্রশ্নের, আছি ভালোই। হ্যাঁ, দেখা অনেকদিন পরে, খবর ভালোই লস এঞ্জেলসের। কিন্তু দেখছি না যে পলকে। মারা গেছে। ডেলাও কথাগুলো ছেড়ে দিলো নির্বিকার গলায়। সেই হাসি মুখে, ভাবান্তর নেই কোনো। স্বাস্থ্যের জায়গা তো লিঙ্কন বীচ তা এখানে—যাকগে একদিন তো মরতে হতোই। কি হয়েছিলো? ঠাণ্ডা লেগেছিলো—নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে? মারা গেছে গাড়ির দুর্ঘটনায়। আর তারপর ক্যাসিনোর মালকানী সেজে বসেছো একটা ছোকরা জোগাড় করে?

পা নাচাতে লাগলো রিক্‌কা। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই—ডেলার বরফঠাণ্ডা গলা, 'আর তাতে করার কিছুই নেই তোমার। রিক্‌কার হাসি সুস্পষ্ট হলো, ডেলা স্মার্ট মেয়ে তুমি বরাবরই। তা, ব্যাপারটা আর কেউ কি জানে তোমরা দুজন ছাড়া? 'না, জানবে জানার সময় হলে—' রিক্‌কা ফুটবল মাথা নাড়লো, ভালো। তা কে ইনি? সে মোটা আঙুল বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। 'ও জনি, ওকে এখানে জনি রিক্‌কা বলে জানে সকলে—' 'বেশ, বেশ—একেই আমি বলে ধরেই নিয়েছিলো নিক তাহলে—' কথা বললাম না আমরা কোনো। তা, ভায়া গেড়ে বসেছো ভালো জায়গাতেই। 'হ্যাঁ, আর সেদিকেও লক্ষ্য আছে আমার যাতে অন্য কেউ গিয়ে বসতে না পারে—' তাকালাম রিক্‌কার চোখে। তার ঠোঁট থেকে হাসি মেলালো না। ডেলা কোমর ঠেকিয়ে বসলো টেবিলে।

সিগারেট ধরাল। 'দ্যাখো জ্যাক কথা বলি খোলাখুলি—মারা গেছে পল। রাইসনারও। রইলাম জনি, লেভিনস্কী, তুমি আর আমি। লেভিনস্কী যেমন আছে থাক প্যারিসের ব্যাপারটা নিয়ে। লস এঞ্জেসল আছে তোমার। আমরা থাকবো লিঙ্কন বীচ নিয়ে—পা দেব না কেউ কারো ল্যাজে।

'হুঁ, ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে দেখছি বেশ নিখুঁত ভাবে। তা, মনে করছো কাজ করতে পারবে বলে এ ছোকরা, ঠিকমত? হাতটা এগিয়ে নিলাম একটু ড্রয়ারের দিকে, মনে হচ্ছে গোলমালের সূত্রপাতকারী সংলাপ। 'জ্যাক আমি নিশ্চিন্ত সে বিষয়, ওর এলেম আছে এ সব ব্যাপারে বলতে পারো পলের মতোই—'চমকে উঠলাম। মনে হলো সত্যি কথাই বলছে যেন ওর বলার ধরনে। রিক্‌কা মাথা নাড়লো আমার দিকে চেয়ে, ঠিক আছে। আমার পছন্দ চালু লোকই—আর ভালোই চালাচ্ছো তো তোমরা দুজনে—' ডেলা যেন অভয় পেলো একটু কিন্তু সতর্ক আমি। তোমার আপত্তি আছে এখানে যদি দিন দুয়েক থাকি? দেখতাম ঘুরে ফিরে একটু 'হ্যাঁ—হ্যাঁ থাকো না—আমাদের ভালোই লাগবে, ডেলা লুফে নিলো প্রস্তাবটা। খাওয়া যাক চলো একটু, শুকিয়ে গেছে গলাটা। ডেলা তাকালো আমার দিকে, আসছো নাকি জনি? ব্যস্ত আছি একটু, আসছি দেড়টা নাগাদ—

'ঠিক আছে। উঠে দাঁড়ালো রিক্‌কা। উঁকি দিলো ড্রয়ার বন্ধ করার মুহূর্তে, 'বাঃ, আমার তো পছন্দ এরকম লোকই—যে বাঁচাতে জানে নিজেকে। পরে মোলাকাত হবে, আচ্ছা দোস্ত। ডেলা বেরোলো রিক্‌কা দরজা খুলে ধরতে।

দেখে যাচ্ছি আমি। সশব্দে ড্রয়ার ঠেলে দিলাম আমি দরজা বন্ধ হতেই। চপ চপ করছে ঘামে মুখ, গতি বাড়ছে হৃৎস্পন্দনের বাঘের মুখে যাওয়া এ লোকটাকে বিশ্বাস করা মানেই। বলতে পারে বেশ গুছিয়েই কথাবার্তা—খালি হাতে ফেরার মানুষ না এ ধরনের চিজগুলো—মাথায় বসে রইলো চিন্তার কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরে উঠে দাঁড়ালাম জানলার কাছে—চোখে পড়ছে একটা অংশ বাইরে গাড়িবারান্দার। হেঁটে চলেছে ওরা পাশাপাশি। সেই হাসি রিক্‌কার ঠোঁটে। বলছে কথাও।

'ঠিক। রিক্‌কা ফিরলো ডেলার দিকে, কি কি হাত দিয়েছিলো সত্যিই উদ্বৃত্ত টাকায়—না কি শুধু সন্দেহ করেছিলো পল? দিয়েছিলো তবে, সরাতে পেরেছে খুব সামান্য—' জবাব দিলো ডেলা। অংশটা বিরাট। উদ্বৃত্ত টাকার ডবল টাকা আমার ওখানকার। রিক্‌কা বললো। ডেলা কঠিন গলায় বললো কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর, 'হ্যাঁ। তবে আমাদের দরকার এর প্রতি পাই পয়সাই। রিক্‌কা আমার দিকে ফিরলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় পাঠিয়ে দেওয়া যায় লস এঞ্জেলসে এই টাকার একটা অংশ মানে, আর কি কথার কথা। এটা করতো পল থাকলে—সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে জানতো এক জায়গার টাকা অন্যখানে খাটিয়ে। টেবিলে নামিয়ে দিলাম ছুরি-কাঁটা আমার চলে গেছে ক্ষিদে। কিন্তু কোনো বিকার নেই ডেলার সে খেয়ে চলেছে যেন কানে যায়নি কিছুই।

একমুহূর্তের জন্য থমকে গেলো রিক্কার হাসিটা রবারের মুখোশ যেন মুখটা! আমার আদৌ ভালো লাগলো না ওর ওই মুখভাব। তোমাদের ব্যাপার অবশ্য এটা—'রিক্কার ঠোঁটে ফিরে এলো হাসি। জ্যাক বললাম তো তোমাকে, এখানে লাগছে এর প্রতিটি পয়সা।

ডেলা কথাগুলো বলে গেলো মুখ না তুলেই। লাগছে হয়তো—'শেষ করলো রিক্কা খাওয়া। বেয়ারা সরিয়ে নিয়ে গেলো বাসন। রিক্কা বলে যেতে লাগলো লস এঞ্জেলসের ক্যাসিনো সম্বন্ধে। মনে হলো ফাঁড়া কাটলো এখনকার মত, কিন্তু তাহলে রিক্কা আবার এ প্রসঙ্গ তুলবে যদি আমি ভুল না করে থাকি, টাকা হাতাবার চেষ্টা চালাবে। জানি না কতদূর যেতে পারবে। কিন্তু শেষ না দেখে ছাড়বে না। সাঁতার দীঘির আলোক ব্যবস্থা সম্পর্কে রিক্কাকে বোঝাচ্ছি ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে। বারান্দায় বসে কফি শেষ করে আমার পেছনে কিছু দেখে চোখ তুললো রিক্কা আর ডেলা, ফিরলাম আমি। দাঁড়িয়েছে এসে একটা মেয়ে। ওকে চিনতে পারিনি প্রথমটায়, মনে পড়লো পরে—জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন মেয়েটা।

মাতাল, টলছে। আর আমাদের দেখা হয়নি সৈকতে সেই দিনটির পর। আমার অস্বস্তি হলো আজ ওকে দেখে। জর্জিয়া শুধোলো আমার কাঁধে একটা হাত রেখে, চিনতে পারো কিগো পিয়ারী? ও আমার দিকে তাকালো রক্তবর্ণ চোখে, পরনে স্ল্যাক্স। দাঁড়ালাম উঠে, রিক্কাও উঠলো। আমার দিকে ডেলার চোখ।

ইঁদুরের দিকে তাকায় বেড়াল যেমন করে। বিপদের সঙ্কেত, বললাম আড়ষ্ট গলায়—কিছু বলবে? 'হ্যাঁগো, এসেছি তো সেজন্যেই। জর্জিয়া পড়ে যেতে যেতে সামলালো আমার কোটের কোণ ধরে। তুমি চেনোই মিসেস ওয়ার্দামকে। জ্যাক রিক্কা ইনিই। পরিচয় করিয়ে দিই রিক্কা—মিস জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন। অভিবাদন করলো রিক্কা একটু ঝুঁকে। ওর দিকে তাকালো না ফিরেও জর্জিয়া। তুমিই রিক্কা, আমি তো জানতাম...। 'হ্যাঁ, ভাই হয় ও আমার সম্পর্কের বাবার দিকের। ভাবতে অবাক লাগে আবার বাপ আছে তোমার মত পোকা জাতীয় জীবের। কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভাসলো কথাগুলো—কেউই কিছু বললাম না আমি আর রিক্কা। সিগারেট ধরালো ডেলা একটা। কথা বলছো না যে, কিগো বেজন্মা! বুঝলাম, রিক্কা আমাকে দেখছে গভীর মনোযোগের দৃষ্টিতে। ফ্যাকাসে মেরে গেছে ডেলার মুখ। সে বসে আছে নিশ্চল। আমার দাস। আমাকেই সামলাতে হবে। তুমি কি চাও বললাম। এখন শুধু দর্শক নয় রিক্কা আর ডেলা, মজা দেখার জন্য অনেকেই জুটে গেছে।

আমার দিকে টান করে দাঁড়ালো জর্জিয়া তার ভরা বুকদুটো নিয়ে—লাম্পট্যের হাসি ফোটালো বগ্নী মাখা ঠোঁটে, ওর চোখে পাপের ছায়া, জানতে চাইছি সে কে, যে মাগীটাকে নিয়ে ঘুরছো। কে বল তো লালচুলো সুন্দরীটা? যাকে নিয়ে শোও ফ্র্যাঙ্কলিন বুলে ভার্ডের ডেরায়, কথা বলো যার কানে কানে রলের কামরায়, ও কে? দপদপ করে উঠলো মাথার শিরা। দমে গেলাম পরক্ষণেই—নামলো সেই শীতল অনুভব। আমার বেরোলো না কোন কথা মুখ দিয়ে। এবার কানে এলো রিক্কার রসিকতা, জনির ও, মায়ের দিকের ছুটকি কেটে পড় তো এখন—ভরে গেছে চোখ জলে। নাক লাল বিকট গন্ধ মুখে। পারছো না কিছুই। বুঝতে না? কাটো। কে হেসে উঠলো দর্শকদের মধ্যে। জর্জিয়া হঠাৎ চুপসে গেলো ফোটা বেলুনের মত, দৌড়ে চলে গেলো নিজের ঘরের দিকে এলোমেলো পায়ে। দরকার ছিলো ওকে তাড়ানোর, দুঃখিত জনি কথা বলার জন্য কথার মধ্যে—'রিক্কা বললো ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ধন্যবাদ। তাছাড়া ও ছিলো না প্রকৃতিস্থও। বললো চোখাচোখি হতেই ডেলার সঙ্গে, ব্যাপারটা কি রলের, জনি, নাকি ঠিক হবে না জিজ্ঞাসা করা ; হাসি ওর ঠোঁটে, বরফশীতল চোখ দুটো। 'কি বললাম শুনলেই তো, প্রকৃতিস্থ নয় মেয়েটা—' রিক্কা বলে উঠলো সান্ত্বনার গলায়, আরে আরে এরকম অনেক আছে। আমাদের লস এঞ্জেলসেও পাত্তাই দিতে নেই ওদের। মাথা পাগলের দল উঠে পড়লো ডেলা, 'বে স্ট্রীটে যাচ্ছি আমি আর জ্যাক—কথা হবে পরে—'ডেলা গাড়ির দিকে নেমে গেলো আমার দিকে না তাকিয়েই। রিক্কা হাত রাখলো আমার কাঁধে। সবই আজব চীজ মেয়েগুলো—ব্যতিক্রম নয় এও তার, চলি—'এ যেন কথা বলছে রাইসনার! নেমে গেলো রিককাও—তার ঠোঁটে আকণ্ঠ হাসি। বসে আছি টেবিলে ব্যস্ত মনে। হাতে জ্বলছে সিগারেট।

দেখতে পাচ্ছি দেওয়ালের লিখন। আর নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না ডেলাকে ফাঁকি দিতে পারবো বলে।

চালু মেয়েটা বড্ড—ও জিনির সমস্ত খবরই বের করে ফেলবে আজ রাতের মধ্যেই। আবিষ্কৃত হবে অভিসার কক্ষও ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডের। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠবে রলের নিভৃত কামরাও। তবে হেমের হাতে তুলে দেবে না ডেলা আমাকে বরং আমাকে টাইট দেবার চেষ্টা করবে রিক্‌কার সঙ্গে এক জোট হয়ে।

খেলা ফুরিয়েছে আমার এবার সরে পড়তে হবে মানে মানে সিন্দুকটার দিকে তাকালাম চেয়ার ঘুরিয়ে। তাড়া তাড়া নোট সাজানো আছে ওই ভারী ইস্পাত দরজার পেছনে, আমার প্রাপ্য যার একটা বড় অংশই। কিন্তু সম্ভব নয়। কোই পরোয়া নেই যদি টাকাটা পেয়ে যাই তো। কিন্তু সিন্দুকের দরজা তো চিচিং ফাঁক হচ্ছে না সংযোগের কায়দা ছাড়া। আশার স্বপ্ন বুনে চলেছি এতদিন ধরে শুধু। স্বপ্নে দেখা দেবে সংযোগের নম্বরগুলো। আর, মাত্র তিনটে ঘণ্টা সময় আজ আমার হাতে—চার ঘণ্টা হতে পারে হয়তো করতে হবে এর মধ্যেই। কার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে নম্বরগুলো ডেলার কাছ থেকে যখন পাচ্ছি না? লুই? জানে কি ও লোকটা? হয়তো—তুলে নিলাম ফোনের রিসিভার।

'লুই, বলছি রিক্‌কা, হয়েছে এক ফ্যাসাদ। অফিসে এসেছেন মিঃ ভ্যান এটিং—এখুনি ভাঙাতে চাইছেন একটা চেক; বেরিয়েছেন তো মিসেস ওয়ার্দাম—জানেন কি সিন্দুকের সংযোগ নম্বরগুলো? মনে হলো, ভালোই বললাম—ব্যবসায়িক সুর রয়েছে গলায়। গলায় রয়েছে ব্যস্ততার আভাস। জানি না তো মিঃ রিক্‌কা আমি দুঃখিত। লোকটা জানা থাকলে নিশ্চয় বলতো, গলার সুরে মনে হলো। ওফ্। এখন কি করি তাহলে? ক্ষেপে উঠেছেন তো ভদ্রলোক! যোগাযোগ করুন না মিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে, পেয়ে যাবেন বে স্ট্রীটে। করেছি চেষ্টা। ওখানে নেই উনি। আচ্ছা, হাজার তিনেক ডলার হবে না আপনার ওখানে, না? না, স্যার নেই অত টাকা। লুই, ঠিক আছে। দুঃখিত বিরক্ত করার জন্য—দেখি কিভাবে সাহায্য করা যায় মিঃ এটিংকে—'লুইয়ের গলা পেলাম রিসিভার নামিয়ে রাখার মুহূর্তে হয়তো বলতে পারতেন, মিস ডোয়েরিং থাকলে—' মিস ডোয়েরিং, আমার দৃষ্টি চলে গেলো সামনে দেওয়ালের দিকে।

ডোয়েরিং রাইসনারের সেক্রেটারী? চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ওকে ডেলা, হেমকে ডাকার জন্য। হাত টনটন করছে এখন রিসিভারটা এতো জোরে চেপে ধরেছি যে, জানেন কি সিন্দুকের ব্যাপারটা উনি?, 'শুনেছি তো জানেন বলেই উনিই তো টাকা বের করতেন রাইসনার সাহেব না থাকলে। কিন্তু এখন তো নেই তিনি, লুই, ও ঠিক আছে ছাড়ছি। লাইন ছেড়ে দিলাম প্রমাণ করার জন্য আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই এ ব্যাপারে। কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম লাইন ছেড়ে, তারপর সুপারভাইজারকে ডাকলাম ফোন তুলে, রিক্‌কা বলছি—ঠিকানা জানা আছে মিস ডোয়েরিংয়ের? মহিলাটি বললো লাইন ধরে রাখতে, অনন্ত সময় মনে হচ্ছে এক একটা মিনিট যেন। '২৪৭—সি কোরাল বুলেভার্ড—' গলা এলো সুপারভাইজারের। আছে ফোন? আছে স্যার। লিঙ্কন বীচ, ১৮৫৭৭। ধন্যবাদ, ছেড়ে দিলাম লাইন।

শুকোবার সময় নিলাম মুখের ঘাম। এবার নম্বর চাইলাম ডোয়েরিংয়ের, আমার পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি এই মহিলাটির সঙ্গে, শুধু দুএকবার চোখাচোখি হয়েছে। রিং হলো, লাইনে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ, হ্যালো? মিস ডোয়েরিং? হুঁ, কে বলছেন? রিক্‌কা, একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে। আসতে পারি মিনিট পনেরোর মধ্যে, আপত্তি আছে? ডোয়েরিং জিজ্ঞেস করলো একটু চুপ করে থেকে বলুন তো কি ব্যাপার? আপনাকে বিরক্ত করতে যাবো কেন আর ফোনে বলতে পারলে। আসবো? দরকার দেখা করা। মনে করেন যদি তাই। ছাড়ছি ধন্যবাদ। লিফটে হাজির হলাম দপ্তর থেকে বেরিয়ে।

লবি ছেড়ে গাড়ি বারান্দায় একতলায় নেমে। কথা বললো কে যেন—দেখালামই না লোকটাকে, সোজা চলেছি। বসলাম বুইকে চেপে সোজা গেটে। গেট খুলে গেলো আজ সঙ্গে সঙ্গেই। কাঁটা সত্তরের ঘরে তুলে দিলাম। সদর রাস্তায় পড়ে। নামলাম গাড়ি থামিয়ে ২৪৭-এর সামনে—বাড়িটা অনেকগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে। উঠে গেলাম সোজা পাঁচতলায় লিফটে করে। বারান্দা

দিয়ে হেঁটে বেল টিপে দিলাম নম্বর আঁটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। খুলে গেলো দরজা মুহূর্তে—দরজা খুললো ডোয়েরিং, আসুন মিঃ রিক্কা। আসুন ভিতরে। একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম ওর পেছন পেছন। একটা টেবিল আর রেডিও সেট দুটো আরাম কেদারা একটি সেটি। ওর পাশে সেটিতে বসলাম। দেখলাম দুজন দুজনকে, ভাবছি শুরু করবো কিভাবে। কথা বের করা শক্ত হবে না ওর কাছ থেকে। আমার মনে হলো, কিছু পেলেন কাজকর্ম? না, একটা দেবেন নাকি? ডোয়েরিং পা চাপালো পায়ের ওপর।

চোখে পড়লো হাঁটুর যে অনাবৃত অংশটুকু তাতে আকর্ষণের বস্তু হতে পারতো জিনির সঙ্গে পরিচয় না হলে।

কিন্তু তাকালাম না আজ। একটা সিন্দুক আছে রাইসনারের দপ্তরে, আমার দরকার সেটার সংযোগ নম্বরগুলো। আপনি নাকি জানেন লুই বলেছিলো—'কথাগুলো বলে দিলাম বিনা ভূমিকায় এক নিশ্বাসে। মিঃ রিক্কা সময় নষ্ট করতে আসেন নি আপনি নিশ্চয়? ভাবলেন কি করে সেটা বলে দেবো চাইবা মাত্র? আমি এসেছি আশা করে—আর জিজ্ঞেস করলেন না তো আপনি, কেন চাইছি—' ডোয়েরিং একটা খোঁচা দিলো আমার বুকে সরু আঙুলে, আপনি এতো দেরি করলেন কেন আমি তো ভাবছিলাম। কারণ জানতাম যে আপনি আসবেন। আপনি মাথা চাপড়াবার লোক নন সিন্দুক সামনে রেখে, আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম। তো, করতে চান কি—সিন্দুক ফাঁক করতে ডেলার মাথায় বাড়ি দিয়ে? তাহলে শুনুন ডেলা আমাকে কিছু টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো একটা কাজের বিনিময়ে, কিন্তু এখন শুরু করেছে অন্য কাহানী। ফুটে যাবো ভাবছি আমার প্রাপ্য টাকাগুলো নিয়ে। কিন্তু, ভাবলেন কি করে আমি আপনাকে সাহায্য করবো? ডোয়েরিং ভ্রূ নাচালো। বললামই তো ভেবে আসিনি করবেনই—আমার দিকে একটু সরে এলো ডোয়েরিং, আহা কেন গো বলছো এত গাছাড়া কথা? সব বলবো। আমি বলবো। আমার শক্ত সমর্থ মানুষই পছন্দ বুঝলে?

ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে দিলাম আমিও তাল বুঝে। ও সরিয়ে দিলো আমাকে আলতো হাতে ঠেলে খানিক পরে। উম—মনে হচ্ছে ভালোই খেলতে পারবে একটু ধৈর্য ধরলে—হাত চালিয়ে দিলাম চুলে। তাকালাম তাকের ঘড়িটার দিকে ঠোঁট থেকে রঞ্জনীর দাগ মুছে নিয়ে, পাঁচটা বেজে পাঁচ। কিছু নেই তাড়াহুড়োর, ওকে আশ্বাস দিলাম 'তবে পেতেই হবে টাকাটা আমাকে। ডোয়েরিং মুখে প্রলেপ দিলো পাউডারের, পালাতে পারবে টাকাটা নিয়ে? চেষ্টা করবো কি করে? হাঁটা দেবে বান্ডিলগুলো বগলের তলায় ফেলে। গাড়িতে করে বেরোবো স্যুটকেসে ফেলে। বাড়িয়ে দিলো বুড়ো আঙুল জানলার দিকে, তার চেয়ে অনেক নিরাপদ ওই পাঁচতলার জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়াও—'আঃ, ছাড়ো তো মজা, তুমি কত চাও? মনে হচ্ছে কি সেরকম ক্ষ্যাপা আমাকে? না। আমি ছোঁবো না ও টাকা—' ডোয়েরিং হাসলো শব্দ করে।

মোট পঁচিশ মিনিট সময় গেলো ক্যাসিনোয় ফিরতে। ডেলা ফিরেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম গেটের সবুজ চোখো পাহারাদারটাকে। বুঝলাম তাতে ফেরেনি লোকটা বিড়বিড়িয়ে যা বললো। ক্যাসিনোর পেছন দিকে চলে গেলাম দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে আমার দপ্তরটা। দেয়াল ঘেরা বাগান পেছনে শুধু। তাকালাম আশেপাশে নেই কেউ কোথাও। নীচে স্যুটকেসটা রাখলাম জানলা বরাবর। ক্যাসিনোর গাড়িবারান্দায় নিয়ে এলাম গাড়িতে ফিরে সেটা চালিয়ে। ওপরে উঠতে লাগলাম একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে। কথা বলার চেষ্টা করলো পথে পরিচিত অনেকে, সবাইকে এড়িয়ে গেলাম মুখে হাসির ভাব রেখে। ডেলা ক্রমে সবই জানবে স্যুটকেসের কথা ছাড়া। শুধু জানবে আমার সঙ্গে ছিলো একটা ব্রাউন পেপারের মোড়ক। খিল তুলে দিলাম ঘরে ঢুকে। আংটা নামিয়ে দিলাম জানলার কাছে গিয়ে বাঁধা শক্ত দড়িতে। আংটা গাঁথলো প্রথমবারেই স্যুটকেসে। সেটাকে টেনে তুললাম হড় হড় করে। নষ্ট করা চলবে না একটা মুহূর্তও। সিন্দুকের কাজ শুরু করে দিলাম সংযোগের সংখ্যাগুলো নিয়ে।

ঘড়িতে ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ঘোরানো হলো শেষ সংখ্যাটাও—অপেক্ষা করলাম নিশ্বাস বন্ধ করে। তারপর সিন্দুকের দরজা খুলে গেলো হাতল ধরে টানতেই। তাকালাম একটু পিছিয়ে গিয়ে। শুধু ব্যান্ডিলের সারি দুটো তাক ভরে...বাণ্ডিল! এক শো ডলারের বাণ্ডিলগুলো

ভরতে শুরু করে দিলাম স্যুটকেস খুলে সন্তর্পণে। স্যুটকেস ভরে গেলো আড়াইশো টা বান্ডিলে...সব আমারই। আরো অনেক টাকা সিন্দুকে...কিন্তু আমার তো না ও টাকা।

বন্ধ করে দিলাম সিন্দুক। তিনখানা নোট বের করে রাখলাম স্যুটকেসে তালা মারার আগে। জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম নোটগুলো ভাঁজ করে। সেটা পকেটে ফেলে দিলাম স্যুটকেসে চাবি মেরে। ভালো করে টেনে দিলাম সিন্দুকের দরজাটা, ঠিক আছে। একবার ঘষে দিলাম সিন্দুকের হাতলটা রুমাল দিয়ে। উঠে দাঁড়ালাম—ঘামে ভিজে গেছে, সারা পিঠ, ভিজে ন্যাকড়া শার্টের কলার। স্যুটকেসটা ফেলে দিলাম জানলার কাছে গিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে। নীচে দড়ি ধরে নেমে গেলাম জানলার খাঁজে কাঁটা আটকে দিয়ে। মাটিতে পা দিয়ে কাঁটা শুদ্ধ খুলে গেলো দড়িটা বার কয়েক ঝাঁকাতে। সেটা ফেলে দিলাম দড়ি পেঁচিয়ে ঝোপের মধ্যে। দ্রুতপায়ে মাঠ পেরিয়ে গেলাম স্যুটকেস হাতে নিয়ে। ট্রাক চালক তার হাত ঝেড়ে মাল তোলার কাজ শেষ করে যাত্রার প্রস্তুতি নেবার মুহূর্তে হাজির হলাম। ওর সামনে নামিয়ে দিলাম স্যুটকেস পৌঁছে গেলাম ঠিক সময়ই।

ভায়া! বললাম হাঁফাতে হাঁফাতে। আমাকে একবার মাপলো লোকটা আপাদমস্তক। সে উদাসীন হাসি ফোটালো মুখে একটা, পাঠাচ্ছেন কোথায়? বলছি ভাই দিতে পারো একটা লেবেল। লেবেল পেলাম। সব লিখে দিলাম পরিষ্কার করে ঃ জন ফারার মিবোর্ড এয়ার-লাইন রেলওয়ে। গ্রেটার মিয়ামি। চালক স্যুটকেসে সেঁটে দিলো চিরকুটে চোখ বুলিয়ে। চালকের আসনে উঠে গেলো আমাকে একটা রসিদ ধরিয়ে দিয়ে। এটা রাখো, দুঃখিত তোমাকে আটকাবার জন্য। ব্যাটা প্রায় ভিরমি খায় আর কি দশ ডলারের নোটখানা হাতে নিয়ে, 'স্যার আমি পৌঁছে দেবো ঠিকঠিক আপনার জন্য অপেক্ষা করবো—হেলিয়ে দিলাম মাথাটা মৃদু হেসে। দেখলাম দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান গাড়িটা। চলে গেলো এতগুলো টাকা, আমি নেই তার ধারে কাছেও। মাথা আছে ডোয়েরিং মেয়েটার। দেখবার লোভ সামলাতে পারতো না স্যুটকেসটা দেখা মাত্র তার ভিতর কি আছে পাহারাদার দুটো—ওই সবুজে চোখোটা বিশেষ করে। টুপির লাইনিংয়ে ঢুকিয়ে দিলাম রসিদটা একটা সরু ফিতেয় মুড়ে। আড়াই লক্ষ ডলার এই ছোট্ট কাগজটার দাম।

কাজ এগিয়ে চলেছে আশাতীত ভাবে বেরিয়ে গেলো টাকা। এবার বেরোতে হবে আমাকেও। ·৪৫ কোল্ট অটোমেটিকের কথা মনে পড়লো, টেবিলের ড্রয়ারে রাখা, নিতে হবে ওটা সঙ্গে। ক্যাসিনোর দপ্তরে পৌঁছলাম মিনিট দুয়েকের মধ্যে, ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম দরজা ঠেলে। আমার টেবিলের পাশে বসে ডেলা আর রিক্‌কা আমার বন্দুকটা রিক্‌কার হাতে তাক করা আমার দিকেই...জনি এসো কানে এলো ডেলার কিশোরী কণ্ঠস্বর। দামী কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। ফিরে আসার জন্য অভিশাপ দিলাম মনে মনে নিজেকে। ডেলা বলে উঠলো টেবিলের দিকে এগোতেই, তোমার আর বসা চলবে না ওখানে; পরিচয় করিয়ে দিই আমার নতুন অংশীদারের সঙ্গে। সে রিক্‌কাকে দেখিয়ে দিলো পেলব হাতবাড়িয়ে।

'হুঁ, জমেছে দেখছি নাটক বেশ—তা, এটা খেললো কার বুদ্ধিতে? তোমার না রিক্‌কা সাহেবের? আর আমার দিকেই বা উঁচিয়ে রেখেছো কেন বন্দুকের নলটা? কারুরই নয় বুদ্ধিটা আমাদের—বলতে পারো জর্জিয়ার! ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেই তোমার—ধীরে আস্তে সিগারেট ধরালাম প্যাকেট বের করে, উঠে এলো হাতে স্যুটকেসের চাবিটাও।

আমার হাঁড়ির খবর নিতে বেরিয়েছিলো ডেলা। তবু বললাম, এ সব মজা না মারলেই কি নয় রিক্‌কার সামনে? মনে হয় না এটা ভালো লাগছে ওর কাছে—' হাসির জোয়ার বইলো রিক্‌কার ভোঁতা মুখে 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ডেলা তো গুলি করতে বলেছিলো তোমাকে দেখামাত্র, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে আমি—'তাহলে দোস্ত এখানে তুমিই থাকো—'নির্বিকার ভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে। চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করলো ডেলা সামনে ঝুঁকে, তুমি একথা অস্বীকাব করতে পার ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে ফ্ল্যাট নিয়েছো? আর লদকালদকি করছো ওই মাগীটার সঙ্গে, সেটা? না। করি না। তো, এ ব্যাপারে কি করতে চাও? বললাম শান্তকণ্ঠে। ডেলা গুম হয়ে গেলো চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে। চুপচাপ আমরাও।

শেষে বলে উঠলো রিক্‌কা, তাহলে চলে যাওয়া যাক নাটকের শেষ দৃশ্যে—দরকার কি বৃথা

সময় নষ্ট করার একে নিয়ে—ফেটে পড়বে ডেলা এবার ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর আশ্চর্য নিয়ন্ত্রিত গলা পেলাম। 'হ্যাঁ, তাই যাবো। জনি সাবধান করেছি তো বারবার তোমাকে—চলবে না মে'বাজি। পরিষ্কার মনে আছে আমার কি বলেছিলে—' আশ্চর্য শান্ত আমার গলাও। তাহলে তোমা ভোগ করতে হবে তার ফলও—তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি এখান থেকে। তোমাকে ফিরে যে হবে নামহীন তৃতীয় শ্রেণীর মুস্টিকের জীবনে কেমন বুঝছো? বাঁচলাম। ভেবেছিলাম গালে স্পর্শ পড়বে ডেলার হাতের। তাকিয়ে নিলাম আড়চোখে সিন্দুকটার দিকে। এরা এখনো পায় নি মাল গাঁড়ানোর খবর। দাঁড়াও, সমাধান করে ফেললে তো হবে না এত সহজে ব্যাপারটার—কিছু টাকা পাবো আমি কথা ছিলো—সেটা চাই—' ডেলা আমার দিকে তাকালো চোখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে। একটা চুক্তি হয়েছিলো অলিখিত আমাদের মধ্যে মনে আছে, তোমার জীবনে অন্য কোনো নারী থাকবে না? বেইমানী করেছো তুমি—তোমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। দ্যাখো এখন ওই টাকার উপযুক্ত কি না তোমার প্রেয়সী।

উঠে দাঁড়ালাম সারামুখে ক্ষিপ্ততার মুখোশ নিয়ে। রিক্কা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'বোসো! বসলাম, দিতে চাও, দাও আমাকে তাড়িয়ে—কিন্তু আমার চাই টাকাটা! তোমাকে বেরোতে হবে এক কাপড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় বলা আছে গেটে ওদের—কেড়ে রাখবে সঙ্গে ঝুলি থাকলেও। হেঁটে যাবে। রাস্তা সোজা। তোমার তো আছেই হাঁটার অভ্যেস। পদযাত্রা শুরু করো—' তুমি পার পাবে না শেষ করলাম না কথা। আমার সর্বশরীর কাঁপছে রাগে। অভিনয় করছি মারাত্মক। রিক্কাও উঠে দাঁড়ালো আশঙ্কা করে ডেলার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—আরো কাছে সরে এলো বন্দুকের নলটা। সব টেবিলে রাখো পকেটে যা আছে!' ফতোয়া জারী করলো ডেলা। দ্যাখো চেষ্টা করেই—দেখি হিম্মত কেমন তোমাদের—' যেতে হবে না অতদূর—পায়ে গুলি করবো ও যা বলছে তাই কর নাহলে। শেষে বেরোতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে—' মনে পড়লো একশো ডলারের নোট তিনটের কথা জুতোর মধ্যে, পকেট দুটো উল্টে দিলাম মুখটা অবিকৃত রাখার চেষ্টা করে, দেখে নেবো তোমাকেও—' বললাম রিক্কার উদ্দেশ্যে। ঠোঁটের ফাঁকে রিক্কা হাসলো। শেষ হলো তল্লাশী। নিশ্চিন্ত হলাম চাবিগুলো চেয়ারে পড়ে থাকায় নইলে হারামজাদীটার ওগুলো দেখলেই মনে পড়ে যেতো সিন্দুকের কথা। অস্বস্তি বাড়াচ্ছে টুপির মধ্যে রসিদটাও। ঠিক আছে, এবার যেতে পারো তুমি। ডেলা কুৎসিত হাসি ফোটালো মুখে একটা। সরে পড় তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়েছি বেনো আর পেপিকে, এসে পড়লো বলে ওরা। গাড্ডায় পড়লে আবার, মুণ্ডু চিবোবে ওরা তোমার প্রিয়তম—

লুই দরজা ঠেলে ঢুকলো আমি কিছু বলার আগেই। রিক্কা ওকে দেখে পেছনে লুকিয়ে ফেললো বন্দুকটা। কি চাই? ঢোকা যায় না দরজায় সাড়া দিয়ে? কৈফিয়ৎ তলব করলো ডেলা। ভয় ফুটে উঠলো লুইয়ের চোখেমুখে মিঃ রিক্কা একা আছেন আমি ভেবেছিলাম—' উনি একা নেই দেখছোই তো, কি চাই কি? মেরে গেলাম ঠাণ্ডা। জানি কেন এসেছে লুই। জানতে এসেছে আমি খুলতে পেরেছি কিনা সিন্দুক। 'লুই কথা বলো তুমি—চলে যাচ্ছি আমি। তোমার নতুন মনিব ওই মোটা লোকটা—' ডেলা চেঁচিয়ে উঠলো দরজা খোলার মুহূর্তে ওর পাশ কাটিয়ে, দাঁড়াও। আর দাঁড়িয়েছে! এখুনি তো বেড়াল বেরিয়ে পড়বে ঝোলা থেকে। সরে যেতে হবে। নষ্ট করা যাবে না মুহূর্ত। বুইকে চড়ে বসলাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে। গাড়ি ছিটকে এগোলো। নামিয়ে দিলাম গাড়ির কাচ। যখন আমি গেটের কাছাকাছি—ষাটের ঘর ছুঁয়েছে কাঁটা। সেই পাহারাদার দুটোই গেটে, বন্দুক সবুজ চোখোর হাতে। ওরা নিশ্চয় নির্দেশ পেয়ে গেছে আমাকে থামাবার—কিন্তু থামা তো চলবে না আমার। মজবুদ, বড় গেট দুটো, আছে অসুবিধেও—সেটা একটা তালাতেই বন্ধ হয় আর বাইরের দিকে খোলে।

জানি ওরা আমাকে রুখবার চেষ্টা করবে না গাড়ির এই গতিতে, করলোও না। ক্ষিপ্র পায়ে সরে দাঁড়ালো ওদের ওপর পড়ার মুহূর্তে—নীচের দিকে মাথাটা নামিয়ে দিলাম শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে। গাড়ি সামনের লোহার পাত গেটে আছড়ে পড়লো। গাড়ি টলে উঠলো, গাড়ি সোজা করলাম অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়ে। আওয়াজ হলো বন্দুকের—কিন্তু বেপরোয়া আমি গাড়ি রাস্তায় পড়লো। আশীর ঘরে এক লাফে উঠলো স্পিডোমিটারের কাঁটা। এবার ওরা নড়াচড়া করুক।

মিয়ামি হাইওয়ের বাঁক পেলাম মাইল দুয়েক চালিয়ে। কমাতে হলো গতি, তা হোক। কমিনিট *সময় লাগবে ওদের বেরোতেও। আর, এ রাস্তায় ওরা জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না আমার চেয়ে। হারাতে পেরেছি ডেলাকে—গান গাইতে ইচ্ছে করছে আমার চেঁচিয়ে। বেরোতেও পেরেছি। টাকা পেয়েছি। ও চালু, আমি আরো চালু...আমি কিউবা পৌঁছে যাবো ও কাজ শুরু করার আগে।* আমার মনটা ঘুড়ির মতো উড়ছে। রাস্তা পাল্টালাম মাইল পঞ্চাশেক টেনে গাড়ি চালাবার পর। গাড়িটা বুইক কাজেই নজরে পড়বে দূর থেকে। সে ভয় কম এ রাস্তায়। ভরতে হবে গাড়িতে তেলও। মনে পড়লো জিনির কথা—সে রয়েছে মিয়ামিতে এক বান্ধবীর সঙ্গে। টেলিফোন নম্বরটাও আছে। ওকে ডাকবো পরের পাম্পে গাড়ি থামিয়ে।

নিয়ে নেবো তেলটা। করে ফেলতে হবে প্লেনের ব্যবস্থাটা আজ রাতেই। জিনিকে রাজি করাতে হবে আমার সঙ্গে কিউবা যেতে পেট্রোল পাম্পে হাজির হলাম আরও মাইল দুয়েক চালাবার পর। বেরিয়ে এলো এক ছাগল দাড়ি বৃদ্ধ গাড়ি থামাতে। ভরে দাও—আর, তোমাদের টেলিফোন আছে? আছে স্যার, ভেতরে। বৃদ্ধ বাড়িয়ে দিলো আঙুল। মনে পড়ে গেলো জুতোর মধ্যে লুকানো টাকাগুলোর কথা। সেগুলো বের করে নিলাম, আমার কাছে নোট নেই—ভাঙানো যাবে এটা? যাবে স্যার। ফোন করুন আপনি, ভাঙিয়ে দিচ্ছি আমি—'নিভে এসেছে দিনের আলো। ডায়াল করলাম জিনির নম্বর। প্রায় নটা ঘড়িতে। বাইরে তেল ভরছে ছাগল দাড়ি। টেবিলে পড়ে 'ক্যামেল' সিগারেটের প্যাকেট। ধরালাম একটা তুলে নিয়ে। 'হ্যালো?' ভেসে এলো চাপা কণ্ঠ। জিনির গলা নয়। আছে মিস ল্যাভেরিক 'না, বেরিয়েছে ফিরবে এখুনি—' মনে মনে খিস্তি দিলাম, ঠিক আছে, ফোন করছি আমি পরে।

ছেড়ে দিলাম। তাকালাম বাইরে—প্রায় শেষ বৃদ্ধের তেল ভরার কাজ। হাত তুলে জানালো চোখে চোখ পড়তেই, স্যার হয়ে গেছে। ফোন করতে হবে আবার চেঞ্জটা দেখি। ভাঙানো হলো নোট। সিগারেটও কিনলাম এক প্যাকেট। জিনিকে পেলাম মিনিট এগারো পরে, জনি? সোনা, কি খবর? 'জিনি শোনো, সুখবর আছে—আমি পেয়ে গেছি কাজটা হ্যাঁ—খবরটা এলো এইমাত্র...কাজ শুরু হবে কাল থেকে হাভানাতে। হাভানার প্লেন ভাড়া করে ফেলো এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করে—হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়তে হবে ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই...সঙ্গে তুমিও নিশ্চয়ই যাচ্ছো? ভাড়া করবো প্লেন? জিনি হাসলো, আরে, মেলা টাকা লাগে তাতে যে—লটারীর টিকিট ফিকিট কিছু...' আহা, ভাবতে হবে না টাকার কথা...এখন অনেক টাকা আমার কাছে...জিনি যাবে তো আমার সঙ্গে তুমি? আজ রাতেই? কিন্তু অনেক কিছু তো আছে গোছগাছ করার—' 'হ্যাঁ, করা শক্ত, কিন্তু আমাকে একাই যেতে হবে তোমাকে সঙ্গে না পেলে—' জনি বোলো না ওরকম করে,—গুছিয়ে নিচ্ছি আমি। লক্ষ্মীমেয়ে, আমরা বিয়ে করছি পৌঁছেই। কেমন, আমি আসছি?' নামিয়ে দিলাম রিসিভার।

সেখানে আর এক নাটক বাইরে বেরোতেই—বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে কাঁপছে মাথার ওপব হাত তুলে...আমার থেমে গেলো হৃৎস্পন্দন—আলো আঁধারিতে নজরে পড়লো ডেলার ছায়া শরীর,ওর হাতে বন্দুক—সেই বীভৎস হাসি ঠোঁটে, জনি কি খবর? বুঝলাম এক নজর তাকিয়েই ওর চোখের দিকে।

আমার লাশ পড়বে এক পা নড়লেই। 'ওঠো গাড়িতে, বেড়াতে বেরোবো দুজনে একটু। করলাম না দ্বিধা, করলে অবধারিত মৃত্যু। চড়ে বসলাম বুইকের স্টিয়ারিংয়ে পেছনে বসলো ডেলা, 'জলদি-মিয়ামি চলো! গাড়ি চালিয়ে দিলাম গিয়ার পাল্টে স্টার্টারে পা দিয়ে। গৌরাঙ্গ স্ট্যাচু বৃদ্ধ তখনো। ডেলা মুখ খুললো মাইল খানিক রাস্তা নীরবতায় কাটিয়ে। কোথায় টাকাটা? ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি গাড়ির আলোয় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চাঁদের আলোর মত। সেই দৃষ্টি চোখে—'জীবনে খুঁজে পাবে না তুমি সে জায়গা—'পাবো মিয়ামিতে অপেক্ষা করছে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পেপি আর বেনো। তোমাকে কথা বলাবে ওরাই—খুন করবে—তারপর। তোমার ভালোই লাগবে মরতে। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি নিঃশব্দে—কিছুই বলার নেই, ভাবনা আছে, শুধু ভাবনা। ভেবেছিলে বিয়ে করতে পারবে ওই মেয়েমানুষটাকে। তাই না? ডেলা বিষোদগার করলো, ওকেও তুলবো পেপি আর বেনোকে তোলার পর...তোমার মুখও খুলবে চ্যাঙড়া দুটো ওর ওপর কাজ শুরু

করলেই। মজা টের পাওয়াবো হাড়ে হাড়ে। সরল হয়ে গেলো ব্যাপারটা—তাহলে বিমান বন্দরের কথা শুনেছে ডেলা আমার শুরু হয়ে গেলো অন্য ভাবনা—গরান গাছের ঝোপ রাস্তার দুপাশে...জিনি বিদায়—'উচ্চারণ করলাম কথাগুলো মনে মনে।

*একমাত্র একটাই রাস্তা...কল্পনায় ভেসে উঠলো জিনির মুখটা, চোখ দুটো বড় টলটলে, ওর চুলের গোছা তামাটে... স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলাম প্রচণ্ড বেগে...*চাপ দিলাম অ্যাকসিলারেটারে সর্বশক্তি দিয়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠলো...জানি না কোনদিকে চলেছি আয়নায় চোখ...মুখ দেখছি ডেলার আবার আওড়ালাম মনে মনে, নাও, এবার গুলি করো—এইযদি শেষ পর্ব হয় আমার জীবনে। তাহলে আমার সঙ্গে তুমিও আছো। চলবে না তোমার নোংরা থাবার স্পর্শ জিনির শরীরে—মৃত্যু ভয়ের ছায়া ডেলার চোখে—আর্তনাদ উঠলো একটা বিলাপের তীক্ষ্ণগলায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো বন্দুকটা কোলে ফেলে দিয়ে। গাড়িটা ধাক্কা লাগলো একটা গাছে, আর একটা গাছে সেখান থেকে পিছলে। আঁকড়ে আছি আমি স্টিয়ারিং আর দেখতে পাচ্ছি না ডেলার মুখটা...উল্টে গেলো আস্তে গাড়িটা। হবার যা হলো...ভয় নেই আর—ভাবলাম শুধু ভাবছি জিনির কথা এমন সময় কি যেন পড়লো প্রচণ্ড শব্দে মাথার ওপর...শুধু কানে আসছে শব্দগুলো—কথা বল্—বল্ শালা টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো আমার কোটের কোণ ধরে একটা শক্ত হাত। চোখ খুলতে পারলাম কষ্ট করে সামনে ভেসে উঠলো বেনোর মাংসল মুখটা। ঘুষি মারতে গেলাম হাত উঠিয়ে। উঠলো না হাত। আমার মুখে মারলো হাতের উল্টো পিঠে বেনো একটা খিস্তি দিয়ে। পড়ে গেলাম বিছানার ওপর। হারিয়ে ফেলেছি চৈতন্য। একটা গভীর গলা পেলাম তার মধ্যেই। উল্লুক কোথাকার, মেরো না ওভাবে! কথা বের করতে হবে ওর কাছ থেকে—' কথা ঢুকলো কিনা কে জানে বেনোর কানে, আবার পেলাম ওর বিষঢালা গলা কথা বল অ্যাই শালা ছিঁড়ে ফেলবো কান নাহলে—' চারদিকে তাকালাম চোখ খুলে, পড়ে আছি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিজের ফ্ল্যাটে ফ্র্যাঙ্কনিল বুলেভার্ডে।

বিছানায় বসে বেনো। রিক্কা দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে। পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি...সব হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো ক্রমে মনে পড়ছে জিনির কথা—সে এই ফ্ল্যাটেই আছে কি? ওর চোখে ভয়ের প্রতিফলন দেখেছিলাম দরজা খোলার সময়।

'কোথায় ও?' প্রশ্ন করলাম ক্ষীণকণ্ঠে। দাঁত বের করে রিক্কা হাসলো, আছে, আছে পাশের ঘরেই। জনি খেলতে পারলে না খেলাটা জমিয়ে—আমার দরকার ছিলো মেয়েটাকেও। আর, আমাকে সোজা এনে ফেললে সেখানে! চেষ্টা করলাম হাত মুক্ত করতে, কিন্তু কবজিতে আরো এঁটে বসলো দড়িটা। বেনোর দিকে ফিরলো রিক্কা, নিয়ে এসো এখানে মেয়েটাকে। শুরু করতে হবে কাজ, বেরিয়ে গেলো বেনো। রিক্কা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো তার সাপের চোখে। জিনিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একটু পরেই বেনো ঢুকলো বাঁধা ওর মুখ। পেছনে বাঁধা হাত দুটো। বিস্ফারিত চোখে তাকালো জিনি আমার দিকে! আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম হাতের বাঁধন ছাড়াবার, কি করেছে ওরা তোমার? রিক্কার কাছ থেকে উত্তর এলো, এখনো করা হয়নি তেমন কিছু।

কিন্তু করতে হবে তুমি মুখ না খুললে—'চেঁচিয়ে উঠলাম ক্ষিপ্তের মত। ছেড়ে দাও ওকে বলছি সব। ছেড়ে দাও ওকে—এর মধ্যে ও নেই। আমাকে পাগল করেছে জিনির অবস্থা। মেদবহুল শরীরটা ছেড়ে দিলো রিক্কা একটা চেয়ারে। ব্যাপারটা সেই সময় আমার হাতে ছিলো, যখন প্রথম তোমাকে সুযোগ দিই আমি। এখন, সব চলে গেছে আমার হাতের বাইরে। দাবি করেছে পেটেল্লি তোমাকে।

টাকাটা চাই আমি শুধু তার হাতে তুলে দেবো তোমাকে মাল পেয়েই। রিক্কা তার মোটা ঠোঁটটা টানলো হাত দিয়ে, ভেবে দুঃখ পাচ্ছি ওর হাতে তুলে দিতে হবে। তোমার সঙ্গে ওই মহিলাটিকেও। সুবিধে হবে না তাতে বিশেষ। ছেড়ে দাও ওকে. নইলে সেখানেই থাকবে টাকাটা যেখানে আছে—তোমার বাপও খুঁজে পাবে না তা আর তা এমন জায়গায় আছে—' তোমাকে কথা বলাবার অস্ত্র আছে আমার হাতে। কি বললাম শুনলেই তো ছেড়ে দাও ওকে, নয়তো ছাড়তে হবে টাকার আশা—'রিক্কা একটা ভঙ্গি করলো তার থলথলে কাঁধের। উপায় নেই—সব কিছু চলে গেছে আমার আওতার বাইরে। জেনে ফেলেছে অনেক কিছু মেয়েটা। ব্যবস্থা করছে বেনো তোমার—বাদ যাবে না। মেয়েটা—'

বরফ মেরে গেলাম। ভয়াবহ ইঙ্গিত রিক্‌কার চোখে। শুধু বলতে পারলাম কোনো রকমে। কথা দিচ্ছি আমি খুলবে না ও মুখ।

ছেড়ে দাও ওকে। আড়মোড়া ভাঙলো রিক্‌কা। 'দাঁড়াও বলে নিই একটা কথা—তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যখন আমার দায়িত্বে রয়েছে এ ব্যাপারটার সবই ; হয় শারীরিক কার্যকলাপ চালাতে হবে ওর ওপর তোমাকে কথা বলাতে, নয়তো বুলেটের গুলি তোমার মাথায়, তোমার কোনটা পছন্দ? বলো, বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। অধৈর্য হয়ে পড়ছে বেনো। বেনো টান মারলো জিনির ছেঁড়া স্কার্ট ধরে...নেমে এলো জামাটা...বুঝলাম নিস্তার নেই আমার তবু, ওর মৃত্যু কামনাই শ্রেয় মনে হলো আমার বেনোর হাতে ওর শ্লীলতা হানির চেয়ে। আচ্ছা, সব বলছি আমি ওকে বারণ কর জিনির গায়ে হাত দিতে—'তাকাতে পারছি না জিনির চোখে। হাতে হাত ঘষলো রিক্‌কা আহ্লাদে। এইতো দেখছি পথে এসেছো—সোনার চাঁদ বলতো টাকাটা কোথায় রেখেছো?

মিয়ামি সেফ ডিপোজিট ভল্টে।

'হুঁ, করেছো দেখছি বিবেচনার কাজই, চলে গেলো মনটা ভল্টে। ২২ বোরের বন্দুকটা রয়েছে স্যুটকেসে। সারা শরীরে উত্তেজনার একটা তরঙ্গ বয়ে গেলো—রিক্‌কার ব্যবস্থা করতে হবে ওই বন্দুকটা দিয়ে।

লিখে দাও একটা চিঠি ওদের, যে—রিককা থেমে গেলো আমার নেতিবাচক ঘাড় হেলানোয়। অত বুদ্ধু ভাবলে কি করে আমাকে—টাকাটা বের করতে পারছো না আমি সঙ্গে না থাকলে। আমার নির্দেশ ঢুকতে পারবে না ভল্টে অন্য কেউ। কি ভাবলো রিক্‌কা মাথা নীচু করে, তারপর বেনোকে ইশারা করলো মাথা তুলে, আরে নিয়ে যাও মেয়েটাকে আসছে না কেন পেপিটা? সে জানে না আমরা এখানে—কতবার বলতে হবে একথাটা। তাকে বের করো খুঁজে। দরকার আছে। যেখানে আছে থাক না—নিজেই সারাবার চেষ্টা করো এ ব্যাপারটা—' তোমাকে যেতে বললাম ওকে নিয়ে। রিক্‌কা কানে নিলো না বেনোর কথা। বেনো প্রায় দরজার কাছে ঠেলে নিয়ে গেলো জিনিকে একটা প্রচণ্ড গুঁতো দিলো হাঁটু দিয়ে ওর নিতম্বে। জিনি বাইরে পড়লো মুখ থুবড়ে। যদি তোমাকে হাতে পাই আমি কখনো। আন্দোলিত করলাম দড়ি বাঁধা হাতটা বেনোর দিকে।

দেঁতো হাসি হাসলো রিক্‌কা, বেরাদার তোমারই তো দোষ, নারীর মর্যাদা আশা করা বৃথা বেনোর মত একটা জানোয়ারের কাছে ; তোমার উচিত ছিলো বোঝা, শয়তানটা তাকালো দরজার দিকে মুখটা বিকৃত করে। বেনোর ওপরই পড়বে তোমার দায়িত্ব টাকাটা বের করার পর। তাড়াতাড়িই সারতে পারে কাজগুলো ও শালা। তবে তোমার কাছে ঋণী থেকে গেলাম আমি একটা ব্যাপারে, আমি তোমার কাজে কৃতজ্ঞ, ডেলা মাগীটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। আমি এখন ক্যাসিনোর মালিক। রিক্‌কার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম বলে চললো রিক্‌কা, আর শোনো—পিঁয়াজী করার কোনো চেষ্টা করো না ভল্টে ঢুকে, বুঝলে? ক্যাসিনোর সম্পত্তি টাকাটা। আমার কাছে প্রমাণও আছে। আমার সঙ্গে হেমও আছে। চলে গেলো পাশের ঘরে গলাও পেলাম বেনোর সঙ্গে শলাপরামর্শের। চেষ্টা করতে লাগলাম হাত দুটো মুক্ত করার, কিন্তু রিক্‌কা ফিরে এলো তার মধ্যেই, বলে এলাম বেনোকে মেয়েটার ব্যবস্থা করবে আমি সময় মত না ফিরলে, কাজেই চলবে না ঝুটঝামেলা।

রিক্‌কা খুলে দিলো আমার পায়ের বাঁধন, নাও চলো—'বেনোকে দেখতে পেলাম দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই, ভোঁতা মুখো অটোমেটিক হাতে ধরে আছে আমার দিকেই। রিক্‌কা ক্রমে পকেট থেকে তার বন্দুক বের করলো আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে। আমি শুরু করলাম হাঁটতে।

আমার পেছনে রিক্‌কা। নীচে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে গাঢ় নীল প্যাকার্ডটা। চালাও তুমি, পেছনে বসছি আমি। দরকার কাজটা তাড়াতাড়ি। কে জানে কতক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বেনো শালা, খাসা মেয়েটা তো। রিক্‌কা দেঁতো হাসি হাসলো। গাড়ি চালিয়ে গেলাম সারাটা রাস্তা মুখ বুজে। বেশ কিছুটা সময় লেগে গেলো। পৌঁছতেই ছুটে এলো পাহারাদার। জমা দিয়ে গেছি একটা স্যুটকেস আজ সকালে...এসেছি সেটা নিতে...জানেনই তো সব আপনি গেলেই হবে মিঃ ইভশ্যামের কাছে। শুরু করলাম চলতে। পায়ে পায়ে রিক্‌কা। ইভশ্যাম বিস্মিত হলো আমাদের দেখে, কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন ঘটলো না মুখভাবের। অভিবাদন করলো সামান্য ঝুঁকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে এসে পড়েছেন আমার অংশীদার, দেখিয়ে দিলাম রিক্কাকে, দিন দুয়েকের জন্য দরকার স্যুটকেসটা। নিশ্চয় স্যার—তা, আপনাদের সঙ্গে ওপরে যাবো কি আমি? হবে না তার দরকার, চিনে গেছি আমি তো। রসিদ করে রাখছি আমি, এলেই পাবেন। ধন্যবাদ। আমরা এগিয়ে গেলাম লিফটের দিকে। পাঁচ তলায় উঠতে লাগলো লিফট।

ভালোই তো এখানকার ব্যবসাপত্তর। বলে উঠলো শূয়োরের বাচ্চাটা, চালু করলে মন্দ হয় না ক্যাসিনোতে এরকম একটা কিছু। নিরুত্তর আমি। বেরিয়ে এগোলাম লিফট থামলে, রিক্কা চলেছে গা সেঁটে। এগিয়ে এলো পাহারার লোক। চাবিটা দেখি ছেচল্লিশ নম্বরের। লোকটা একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, নিয়ে এলো পরে চাবিটা। আমরা দাঁড়ালাম ছেচল্লিশ নম্বরের সামনে। টাকাটা পাওয়া তো অসম্ভব হতো তোমার সাহায্য ছাড়া, জনি, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান লোক। ঘরে ঢুকলাম দরজা ঠেলে। বাঃ ঘরটা তো বড়ো। উঁকি দিলো ঘরে রিক্কা, অপেক্ষা করছি আমি বাইরে। বার করে আনো টাকাটা। কিন্তু ওকে তো বন্ধ ঘরে চাই আমি। সিন্দুক খুলবে না দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাইরেই থাকো তাহলে। রিক্কা সন্তর্পণে বন্দুকটা পকেট থেকে বের করলো বারান্দার দুপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে।

ভেতরে যেতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমারও চোখে চোখে রাখা দরকার তোমাকে। কিন্তু জনি সাবধান—চেষ্টা করলে কোনোরকম ফল্‌স দেবার। আমার হাত একটুও কাঁপবে না এই নোংরা লোকটাকে খুন করতে। এই কীটটার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান আমার আর জিনির জীবন। আর এই ইস্পাত মোড়া ঘরের বাইরে যাবে না ২২ বোরের গুলির শব্দ। বানান করে ঘোরাতে লাগলাম সংযোগের অক্ষরগুলো সিন্দুকের সামনে ঝুঁকে। সশব্দে দরজা খুলে গেলো শেষ অক্ষরটির সঙ্গে সঙ্গেই...শান্ত আমি...শুধু ভাবছি জিনি আর বেনোর কথা...চলবে না এতটুকু ভুল করা। দাঁড়াও সরে একটু ছবি তোলার একটা ব্যাপার আছে সিন্দুকের ভেতর স্বয়ংক্রিয়। দেখছি সব কিছুই ভেবে রেখেছে এ শালারা তো। সন্দেহের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই রিক্কার গলায়, এখানেই আছে কি টাকাটা? মনে হয় তাই তো। বললাম স্যুটকেসটা টেনে বের করে। জায়গা কম ঘরে, কাজেই বাক্সের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে না ও আমার পাশে এসে।

তুলে দিলাম স্যুটকেসের ঢাকনা। টেবিলে রাখতে লাগলাম একে একে বের করে নোটের বাণ্ডিলগুলো। আত্মপ্রসাদের হাসি রিক্কার ঠোঁটে। হাসিতে কেমন তেল তেলে ভাব। হাতে তুলে নিলাম ·২২ বোর বন্দুকটা তাক করলাম ওর পেট লক্ষ্য করে ডালার ভিতর দিয়েই। অস্ত্র ছোট্ট—অন্য ব্যবস্থা নিতে হয় এতে জীবনহানি না হলে। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিলাম হাতটা। চোখে চোখ ওর—টিপে দিলাম ঘোড়া... শব্দ হলো একটা খুট করে যেন শুক্‌না কাঠি ভাঙার শব্দ...হেলে পড়তে লাগলো রিক্কা পেছনে, অব্যক্ত যন্ত্রণার স্বাক্ষর মুখে...সে মাংসল হাতে পেট চেপে ধরে পড়তে লাগলো ...বন্দুক ছিটকে পড়লো রিক্কার হাত থেকে...ডালাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো। ওর মাথায় একটা বাড়ি দিলাম বন্দুকটা দিয়ে প্রচণ্ডশক্তিতে। ক্যাসিনোর মালিক, জ্যাক রিক্কা, লুটিয়ে পড়লো। ঘামে চপ চপ করছে আমার সারা শরীর, ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। পেট চেপে ধরে রিক্কা লুটোপুটি খাচ্ছে, অঝোরে রক্ত ঝরছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে—এবার তুলে নিলাম ওর বন্দুক ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম নলটা নাকের ওপর ধরে...পরস্পরের দিকে দুজনে তাকিয়ে আছি... রিক্কার দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসছে...সে উঠলো গর্জন করে, বুঝলাম এখনো জ্ঞান হারায়নি। সর্বশক্তি দিয়ে কপালের মাঝখানে বন্দুকের বাঁট বসিয়ে দিলাম। গর্ত হয়ে গেলো মুহূর্তে ফেটে গিয়ে—বন্ধ হয়ে গেলো রিক্কার হাত-পা ছোঁড়া শক্ত হয়ে একপাশে হেলে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম ওর মুখের সামনে। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তারপর ঘাম মুছে। বাণ্ডিলগুলো স্যুটকেসে ভরে নিলাম ·২২ বোর পকেটে ফেলে দিয়ে। পাহারাদারকে এগিয়ে আসতে দেখলাম বাইরে বেরিয়ে দরজায় চাবি এঁটে দিতেই। হেঁটে গেলাম দ্রুতপায়ে ওর দিকে। বাইরে যাচ্ছি আমি। উনি দেখছেন কাগজপত্র সময় লাগবে একটু। বিরক্ত কোরো না ওঁকে বুঝলে? স্যার ঠিক আছে। ওর কাছেই রইলো চাবি...তোমাকে দিয়ে যাবেন বেরোবার সময়। তোমাদের বন্ধ হয় ক'টায়? স্যার। দেখলাম ঘড়ি পৌনে বারটা এখন হাতে সময় আছে আড়াই ঘণ্টার ওপর, মনে হয় হয়ে যাবে ওর মধ্যেই। এগিয়ে গেলাম লিফ্‌টের দিকে। ইভশ্যাম অপেক্ষা করছিলো আমার জন্য। ওপরে

কাজ করছে আমার অংশীদার বন্ধুটি বলে এসেছি পাহারাদার লোকটাকে। স্যার ঠিক আছে। সঙ্গে নিচ্ছি স্যুটকেসটা, করতে হবে কিছু সইটই? ইভশ্যাম এগিয়ে দিলো দুটো কাগজ। করে দিলাম সই। ফিরছি দিন দুয়েকের মধ্যেই। স্যার আসবেন। সে ভুললো না ঝুঁকে অভিবাদন করতে রাজকীয় কায়দায়। রিক্‌কার গাড়ির দরজা খুলে দিলো পাহারার লোক। স্টিয়ারিংয়ে বসে গেলাম গাড়ির পেছনে স্যুটকেস রাখতে বলে। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছেড়ে দিলাম দরজা বন্ধ হতেই-—ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ড গন্তব্য। গাড়িটা থামালাম বুলেভার্ডের সমান্তরাল একটা রাস্তায় জায়গাটা আমার ফ্ল্যাটের পেছন দিকে। স্যুটকেসটা ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ির পেছনে মাল রাখার বুটে গাছে গাছে এগোতে লাগলাম ঝোপঝাড় ফুলের বাগান পেরিয়ে। একটা দড়ি টানা লিফট ফ্ল্যাটের পেছনে। ব্যবস্থা মুদি-মশলা তোলার জন্য। বেছে নিলাম এই রাস্তাই চমকে দিতে হবে বেনোকে।

'ও শালা নিশ্চয়ই আছে এখনো বাইরের ঘরে। ফ্ল্যাটে ঢুকতে হবে ওর অজান্তে। তারপর না, করবো না গুলি। অন্য উপায়ে বুদ্ধি ভাঁজছি ওপর দিকে মুখ করে বেরিয়ে এলো একটা সাদা বিড়াল ঝোপের ভিতর থেকে। মার্জার সুন্দরী মুখ ঘষতে লাগলো আমার পায়ে।

এটাকে আমি আগে দেখেছি, পোষ্য জীবটি দারওয়ানের। জিনির হাতে খাবারও খেয়েছে মাজে মধ্যে। এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে ফুরসত নেই ওটার দিকে নজর দেবার, একটা মৃদু ঠেলা দিলাম পা দিয়ে। বাঘের মাসী নড়লো না। পায়ে পায়ে চললো বেড়ালটাও ঝোঁপের ফাঁকে এগোতে এগোতে। চড়ে বসলাম লিফটে আমার কোলে উঠলো লাফিয়ে বেড়ালটাও। খেলে গেলো একটা বদবুদ্ধি মাথায়...একটা বিভ্রান্তির ঝড় তোলা যেতে পারে এটাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে...ওটাকে আঁকড়ে ধরলাম। শুরু করলাম উঠতে—লিফ্‌ট উর্ধ্বগামী হলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে। বেশ হাঁফিয়ে উঠলাম চতুর্থতলায় পৌঁছতে। থামতে হলো দম নেওয়ার জন্য। শুরু করলাম পূর্ণযাত্রা মিনিট খানেক বিশ্রামের পর। লিফট থামালাম আমার রান্না ঘর বরাবর। কিছুক্ষণ হাত মালিশ করলাম দড়ি ছেড়ে দিয়ে। লাফিয়ে পড়লাম রান্নাঘরের জানলার ভেতর একটু সুস্থ হতেই আমার দিকে তাকালো খাবার টেবিলের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে বেড়ালটাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে। এককোণে সরিয়ে দিলাম জুতো খুলে। সেটা একটু ফাঁক করলাম দরজার দিকে এগিয়ে...অপেক্ষা করলাম কয়েক সেকেন্ড...না আওয়াজ নেই কোনো...কাটলো কিছুক্ষণ।

ভেজিয়ে দিলাম দরজা। দুটো কাঁচের প্লেট বের করলাম অতি সন্তর্পণে কাবার্ড থেকে বেড়ালটাকে বগলদাবা করে। শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম প্লেট দুটো এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে। সেগুলো ভেঙ্গে খান খান হলো মরা জাগানো শব্দে। সরে গেলাম দরজার আড়ালে। চললো অপেক্ষা...শুধু কানে বেড়ালের ঘরঘরানি আর আমার নিশ্বাসের শব্দ। কাটলো বেশ কিছুক্ষণ। ভাবনা হলো, শব্দ কি শুনতে পায়নি বেনো...ফাঁক হয়ে গেলো দরজাটা সেই মুহূর্তেই...মাটিতে নামিয়ে দিলাম বেড়ালটাকে...প্রতিটি পেশী উত্তেজনা কঠিন আমার শরীরের...ফাঁক বাড়লো দরজার... স্থির দাঁড়িয়ে বেড়ালটাও দরজার দিকেই দৃষ্টি। বেড়াল ঢুকেছে দুঃশালা! বেনোর গলা।

বন্ধ করে দিলাম নিশ্বাস, বেজন্মাটা ঘরে ঢুকুক—কিন্তু না, ও দাঁড়িয়ে রইলো বাইরেই। দ্রুত ওঠানামা করছে বেনোর নিঃশ্বাস।

অ্যাই ঢুকেছিস কি করে এখানে? আয় এদিকে আয়। বাঘের মাসির কিন্তু পছন্দ হলো না লোকটাকে, সে ফুঁসে চলেছে বেনোর দিকে। এবার ঘরে ঢুকতে হলো বেনোকে। সে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলো ডানহাতে বন্দুক ধরে, আমার আর বেনোর মধ্যে ফুট তিনেক দূরত্ব...সাবধান করে দিলো ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়... বিপদ সামনে। বেনো ঘুরলো, ঘুষি চালালাম সঙ্গে সঙ্গে। মার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। দ্রুত চালনায় ঘুষিটা কাঁধের ওপর পড়লো, চোয়ালে না পড়ে। তবু, সেই ঘুষিটা ছিলো মোটামুটি ভারীওজনের। বেনো আছড়ে পড়লো দেয়ালে। সে চেষ্টা করলো উঠে দাঁড়াতে। রাগে অন্ধ আমার দিকে ঘোড়ালো বন্দুকের নলটাও...। ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এক রদ্দা মারলাম বন্দুকশুদ্ধ হাতে—ওকে ঠেলে দিলাম এক লাথিতে, বেনো আবার গিয়ে পড়লো দেয়ালে। এবার আরো কাছে ওর মাংসল মুখটা।

বেনো হাত বাড়ালো আমার টুঁটির দিকে, ঘুষি জমালাম ওর মাথার পাশে আমিও। একই সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে দিলাম হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে। হাতটা আস্তে ডুবিয়ে দিলাম ওর ঘাড়ের নরম

মাংসে ; ক্রমে চেপে বসতে লাগলো আঙুলগুলো ওর কণ্ঠনালীতে... ওর রক্ত জমে নীলাভ হতে লাগলো চাপ বাড়তে শুরু হতেই—নির্মমভাবে ঝাঁকাতে লাগলাম দেয়ালে চেপে ধরে...বেরিয়ে এলো বেনোর চোখ ঠেলে...বেনো নেতিয়ে পড়লো মাটিতে...অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের তারা। ওর কাছ থেকে সরে এলাম—যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে, বুকে ঘা পড়ছে হাতুড়ির—হাত রাখলাম ওর চোখের পাতায় ঝুঁকে পড়ে—না, স্থির কাঁপুনি নেই। সাড়া নেই ধমনীতেও—সিগারেট ধরালাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কেঁপে উঠলো হাতটা...বেড়েছে যন্ত্রণাও। একে একে সবাই চলে গেলো। বেনো, রিক্কা, ডেলা, আর এই রাইসনার, অথচ আমার মনের কোণে একবিন্দু করুণা নেই এদের কারোর জন্য। আমাকেই মরতে হতো এদের না মারলে বেনোর মুখে নাকটা ছোঁয়ালো বেড়ালটা লঘুপায়ে এগিয়ে একবার তার নাকটা ঘষলো থাবা বের করে। পায়ের তলায় পিষে দিলাম সিগারেটে গোটা দুই তিন দ্রুত টান দিয়ে—বাকি এখনো অনেক কিছু।

জুতো গলিয়ে দিলাম পায়ে, বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম বেনোর বন্দুকটা পকেটে ফেলে। জিনি পড়ে রয়েছে আরাম কেদারায়। পেছনে টেনে বাঁধা হাত দুটো। কাপড় গোঁজা মুখে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে চেতনা নেই। ওকে বাঁধনমুক্ত করলাম দ্রুতহাতে। মৃদুস্বরে ডাকলাম মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে, জিনি সোনা! আওয়াজ পেলাম একটা স্পষ্ট গোঙানির। আমি এসেছি জিনি।

ওঠো, আমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। আস্তে পেছনে হেলালো মাথাটা, চোখের পাতা খুললো সামান্য কাঁপুনির পর! জিনি চিনতে পারলো আমাকে—-জিনি আমার গাল ছুঁলো নরম হাতে, তুমি জনি, তুমি কোথায়—' ও বলে উঠলো ভাঙাগলায়, অপেক্ষা করেছি আমি, অনেক অনেকক্ষণ ধরে...ফিরবে বলে তুমি...দেরি হয়ে গেলো কত।

জিনি ভেঙে পড়লো কান্নায়! জিনি সব বলবো তোমাকে, এসো আগে বেরোনো যাক এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে এ শহর ছেড়ে। গাড়ি দাঁড়িয়ে বাইরে। আমরা কোথায় যাবো? উঠে বসলো জিনি, হাত দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করলো স্কার্টের ছেড়া অংশ। ঠিক করা যাবে সেটা যেতে যেতে, তাড়া আছে—চলো। কেঁপে উঠলো জিনি, কই সেই বিশ্রী লোকটা, সেই লোকটা বেঁটে ভয়ঙ্কর চেহারার? জনি ও লোকটা কে? ওকে টেনে তুললাম, চলেছে কাঁপুনি, পড়েই যেতো আমি না ধরলে।

জিনি ভয় নেই আর—চলো আমি ব্যবস্থা করেছি ওর—। 'না, জিনি সরিয়ে দিতে চাইলো আমাকে ঠেলে, মানে কি এসবের, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, না জানা পর্যন্ত আর যাবোই বা কেন—জনি পুলিস ডাকো তুমি। আসুক ওরা পালাবো কেন আমরা? জিনি বলে চললো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত গলায়। 'জিনি বুঝতে পারছো না তুমি চেষ্টা করলাম গলা স্বাভাবিক রাখার, আমাদের পথ আরো সমস্যাসঙ্কুল করে তোলা এক একটা মুহূর্ত চলে যাওয়া মানে—আমরা যেতে পারছি না পুলিসের কাছে। এর মধ্যে আছে ক্যাপটেন হেমও, পালাতে হবে আমাদের! ভয়ের ছায়া নামলো জিনির চোখে। জনি টাকার ব্যাপারটা কি—ওরা বলছিলো কোন টাকার কথা?

সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছানো টাকার কথাটা ওকে বলা মানেই, হয়তো বলতে পারবো পরে কোনদিন, তবে এখনি নয়। বললাম তাড়াতাড়ি, ওরা ভুল করেছে আমাকে অন্য কেউ বলে চলো তো এখন, সব বলবো গাড়িতে বসে—' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো জিনি, আমাকে খালি খালি জিজ্ঞেস করছিলো ওই লোকটা টাকার কথা, বলছিলো তুমি নাকি টাকা চুরি করেছো ক্যাসিনো থেকে। ওঠো তো এখন, মিথ্যা কথা বলেছে। তাহলে জনি সাহায্য করো আমাকে, হাঁটতে পারবো না বোধহয় আমি। ফেললাম স্বস্তির নিঃশ্বাস, হাঁটবে না তুমি মোটেই, আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি তোমাকে। জিনি আমার কণ্ঠলগ্না হলো, জনি ভয় হচ্ছিলো আমার বড়, কোথায় যে ছিলে তুমি এতদিন। লক্ষ্মীটি তুমি দেখো ঠিক হয়ে যাবে সব। সব ভুলে যাবে—একটা সপ্তাহ শুধু। এগিয়ে খুললাম সদর দরজাটা। বাইরে দাঁড়িয়ে হেম— ·৪৫ অটোমেটিক হাতে।

আমাকে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনলো বন্দুকের নল দিয়ে ঠেলে...যেন বরফের টুকরো ওর চোখদুটো। জিনিকে নামিয়ে দিলাম আরাম কেদারায়। হেম আমার মাথার বরাবর বন্দুক তুলে ধরলো পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করে। মাথার ওপর তুলে দিলাম হাত দুটো। ধরতে পেরেছি

তোমাকে শেষ পর্যন্ত ;বলে যেতে পেরেছে তোমার নামটা রিক্কা অবশ্য মরবার আগে। ফারার তুমি কাজকর্ম শুরু করেছো পাগলা কুকুরের মতো। অস্ফুট শব্দ বের করলো জিনি মুখ দিয়ে একটা, ও ভয় পেয়েছে। শোনো—। হেম থামিয়ে দিলো আমি মুখ খুলতে, তুমি খুন করেছো রাইসনারকে, আমার হাতে সে প্রমাণও আছে। তুমিই খতম করেছো ওয়ার্দামের মেয়েমানুষটাকে আর নিজের মুখেই বলে গেলো রিক্কা তা—খুন অনেকগুলো...হেমের গলা পাল্টে গেলো, এখন দাঁড়াও দেয়ালে পিঠ রেখে। আমি পড়তে পারছি ওর চোখের ভাষা—তাও জানি কি করবে। আমাকে ওর নিয়ে যাবার সাহস নেই কাঠগড়া পর্যন্ত। কারণ আমি জানি ওর কীর্তিকলাপের কাহিনী। গুলি করা ওর একমাত্র রাস্তা। প্রমাণ হবে সে গুলি করতে বাধ্য হয় আমি পালাবার চেষ্টা করলে। ফিরলাম জিনির দিকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে, এক বিন্দু রক্ত নেই সারা মুখে। হেম জিনির দিকে তাকালো আমার চোখ অনুসরণ করে, দাঁড়াও। তুমিও ওর পাশে উঠে দাঁড়াও, দলে তুমিও আছো! যেতে হবে জিনিকেও, হেম কোনো প্রত্যক্ষদর্শী রাখবে না আমার মৃত্যুর। হেম দাঁড়াও, আমরা একটা চুক্তি করি। আমি আর নেই ও লাইনে। কিন্তু তুমি রাজী হবে শুনলে। আমি বলে যেতে লাগলাম দ্রুত, ক্যাসিনোর উদ্বৃত্ত টাকাগুলি আমার কাছে আছে—আড়াই লাখ ডলার। থমকে গেলো হেম। ও থমকাবে জানতাম। পুলিস পুঙ্গবের জ্বলে উঠলো চোখ দুটো, চেষ্টা কোরো না আমাকে ধাপ্পা দেবার ফারার, তুমি পার পাবে না এ সব বলে। বুঝলাম হেম টোপ গিলেছে। কর্কশ গলায় কথাগুলো বললেও। ছেড়ে দাও আমাদের বখরা হবে আধাআধি সোয়া লাখ করে। কোথায় আছে টাকাটা কোনোদিনই পাত্তা পাবে না আমি না দেখিয়ে দিলে, এমন জায়গায় আছে। ভাগ নাও তোমার আর আমাদের পালাবার সময় দাও তিন ঘণ্টা। কি ভাবছো। ওকে বললাম নিরুত্তর দেখে। কোনো চুক্তি হচ্ছে না টাকাটা চোখে না দেখা পর্যন্ত। দেখবে দেখতে পাবে নিশ্চয়, কিন্তু সময় দিতে হবে ওই তিন ঘণ্টার। ওর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেলো গোঁফের ফাঁকে, ফারার আমি নেবো সমস্তটাই—শেষ হয়ে গেছে তোমার কথা। তবে, এক ঘণ্টা তোমাকে সুযোগ দেবো পালাবার। না! হেম শোনো, আমি তোমাকে দুলাখ দেবো, পেতেই হবে আমাকে কিছু আর ওই সময়টুকু পালাবার। তাহলে টাকাটা বের করার কষ্টটুকু স্বীকার করবো দুজনকেই গুলি করে হেম হাসলো। কি মহিমা টাকার! নাও কি করবে করে ফেলো এবার। শুরু করলাম সময় নিতে। আমি অর্ধেক টাকা ছাড়তে রাজি জিনি আর আমার মুক্তির বিনিময়ে, কিন্তু কোনো প্রশ্নই ওঠে না সবটা ছাড়বার। অনেক কেচ্ছা করতে হয়েছে আমাকে টাকাটা পেতে।

না, পারি না ছাড়তে। উপায়ই আছে এখন একটা, মেরে বেরোনো ওকে অন্যমনস্ক করে। আচ্ছা পাঁচ হাজার নিতে দাও আমাকে অন্ততঃ। বললাম মরিয়া হয়ে, চলতে হবে তো আমাকে। হুঁ, হেম বললো দাঁত মেলেই তা কোথায় টাকাটা?

নিয়ে এসো তো টাকাটা জিনি ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম গাড়ির চাবিটা। তাড়াতাড়ি করো—ফ্ল্যাটের পেছনেই আছে গাড়ি। জিনি কুঁকড়ে গেলো অসহায় পশুর মতো—আমার দিকে তাকালো... সে দৃষ্টিতে সেই অপার্থিব শিহরণ নামলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

ঘামে ভিজে গেছে আমার সারা শরীর। করলাম শেষ চেষ্টা, আসতেই হবে টাকাটা তোমাকে নিয়ে—দেখছো না এ লোকটা মেরে ফেলবে আমাদের দুজনকেই টাকা না পেলে, এখান থেকে বেরোও চাবিটা নিয়ে! না না. থাক, যেতে না চায় তো ও, যদি তাই করি, আমার যা করার কথা। হেম একটু তুললো বন্দুকটা। ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা বিড়ালটা বেরিয়ে এলো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। এবার কঠিন হলো আমার মুখের পেশীগুলো, তাহলে যেতে দাও আমাকেই...আমার সব জিনিই, ফিরে আসবো আমি, হেম, বিশ্বাস করো...আড়াই লাখ নয় কোনো মেয়েমানুষের মূল্যই, চলো, সবাই যাই আমরা—বেড়ালটা মুখ ঘষলো হেমের পায়ে। হেম ওটাকে ঢুকতে দেখেনি, ফলে সে চমকে উঠলো...মুখ নামালো একটা খিস্তি দিয়ে, পরম মুহূর্ত এই তো! ছিলাম তো এর অপেক্ষাতেই...হেমের বন্দুকশুদ্ধ হাতটা ধরে ফেললাম লাফিয়ে ডানহাতে, ওর গলায় বাঁ হাতটা, বেরিয়ে গেলো গুলি—কাঁপিয়ে জানলা দরজা।

হেম আমাকে জড়িয়ে ধরলো একটু পিছিয়ে, পড়ে গেলাম দুজনেই, আমি ওপরে। বন্দুক ছিনিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে ঘুষি মেরে, আবার আওয়াজ হলো গুলির। আমাদের লড়াই চললো

মিনিট খানিক, কি তারও বেশি, জানোয়ারের লড়াই, লড়িয়ে লোক হেম, তার আয়ত্তে লাইনের সব কায়দা কানুনই।

গড়াগড়ি খাচ্ছি আমরা, তছনছ করে আসবাবপত্র...ঘুষি চলছে, হাঁটুর কসরতও। মুশকিল হয়ে পড়েছে ওকে ধরে রাখা...আস্তে আস্তে নিঙড়োতে শুরু করলাম গলায় আঙুল বসিয়ে, আমার গলা ধরেছে হেমও আমার বন্ধ হয়ে আসছে দম...মুখে ঘুষি মারলাম প্রচণ্ড শক্তিতে ভেসে গেলো ওর নাক। হেম পড়ে গেলো চিৎ হয়ে। মেঝেয় ঠুকতে লাগলাম ওর মাথাটা। শিথিল হয়ে এলো ওর হাতের মুঠো দাঁড়িয়ে পড়লাম লাফিয়ে...চোখের পলকে হেমও উঠে পড়লো। মুখটা একটা রক্তাক্ত মুখোশ। রক্ত গড়াচ্ছে নাক বেয়ে...ওকে আর কাছে আসতে দিলে চলবে না, কাজ সারতে হবে দূর থেকেই, একজন মুষ্টিক আমি যে, একথা ভুলে গেছে হেম বোধহয়। হাত বাড়িয়ে সে ছুটে এলো আমার কোমর ধরার জন্য, আহ্বান মল্লযুদ্ধের।

কিন্তু শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, ওর রক্তাক্ত মুখে ডান হাতে মারলাম একপাশে সরে গিয়ে বেশ জোরেই। হেম বাঘের বাচ্চা, আবার তেড়ে এলো একমুহূর্ত থেমে এবার আমার ভুল হলো না আর, ওর হাত পড়তেই আমার কোটের কোণে, বাঁ হাতে হুক জমালাম হেমের রক্ত মাখা মুখের দিকে হেসে তাকিয়ে...যে মারে ফেটেছিলো ম্যাকক্রেডীর চোয়াল। এই একই মারে ওয়ালার মাটি নিয়েছিলো, এই মারেই শেষ করে ছিলাম মিয়ামির সেই ছোঁড়াটারও খেল...পুলিস ক্যাপটেন হেম এবারের শিকার। জিনির দিকে ফিরলাম দম নিয়ে, কিন্তু সে কোথায়? নেই! দৌড়ে গেলাম বারান্দায়। হাটখোলা সদর দরজা, ফিরে এলাম। ছুটে গেলাম জানলার দিকে বৈঠকখানায় ঢুকে দৌড়োচ্ছে জিনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলেছে গেটের দিকে।

টলছে, উঠে আবার ছুটছে পড়ে যেতে যেতে, হাত চাপা দিয়ে মুখে। শরীর বের করে ঝুঁকলাম জানলার বাইরে, জিনি শোনো আমি আসছি দাঁড়াও—অপেক্ষা করো। তাকালো না ঘুরেও...কে জানে কানে গেছে কিনা আমার কথা...জিনি চললো ছুটেই। আমার দৃষ্টি চলে গেলো ওর মাথার ওপর দিকে। গাড়ি এসে থামলো দুটো পুলিসের। গাড়ি থেকে নেমে এগোতে লাগলো ফ্ল্যাটের দিকে জনা দুয়েক সিপাই প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর পড়ছিলো জিনি দৌড়ে।

ওকে ধরে ফেললো সিপাইদের একজন। আরও কতজন সিপাই নামলো দ্বিতীয় গাড়ি থেকে...আমি সরে যাবার চেষ্টা করলাম পুলিসের লোকগুলো চোখ তুলতেই কিন্তু আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা তার মধ্যেই...একটা ঢোঁক আটকাল গলায়—একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জিনিকে দেখতে গিয়েই তো...শেষবারের মত দেখছি ওকে হয়তো...রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলাম চোখ ফিরিয়ে নিয়ে। পড়ে আছে বেনো—ভর্ৎসনার প্রলেপ নিয়ে তার হিমশীতল চোখে। জানলার বাইরে দড়ির লিফটে চড়ে বসলাম ওর নিশ্চল শরীরটা ডিঙিয়ে। আমি পেছনের গেটের দিকে ছুটে চললাম শেওলাধরা রাস্তা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পরে। না, আমাকে লক্ষ্য করেনি কেউ। অপেক্ষমান প্যাকার্ডে উঠে বসলাম একটানে গেট খুলে। বাঁশীর আওয়াজ কানে এলো গাড়ি চলতে শুরু করতেই—না।

আমার দ্রুতগামী গাড়ি আছে। কিন্তু আমি যাবো কোথায়? চারিদিকে এখুনি বেজে উঠবে বিপদের সঙ্কেত...আমাকে খুঁজে ফিরবে প্রতিটি পুলিসের গাড়ি তাহলে? কে আমাকে লুকোবে ওদের হাত থেকে? মনে পড়লো বে স্ট্রীটের লিবার্টি ইন-এর জো এলস্মোরের কথা; আশ্রয় মিলতে পারে টাকার বিনিময়ে ওর কাছে পৌঁছোতে পারলে। গাড়ি ঘোরালাম বে স্ট্রীটের দিকে। এক সিপাইয়ের সামনে পড়ে গেলাম লিঙ্কন বীচের প্রধান সড়কের সমান্তরাল লিঙ্কন অ্যাভিনিউয়ের। মাঝামাঝি পড়তেই। আমাকে থামতে বললো লোকটা হাতের ইশারায়, পায়ের চাপ বাড়ালাম আমি অ্যাকসিলারেটারে। গাড়ি এগোলো ঝোঁক নিয়ে। সাহস বলিহারি সিপাইজীর, এক হাতে লাঠি আর অন্যহাতে বন্দুক, নেমে পড়লো রাস্তায়! থমকে দাঁড়ালো রাস্তার দুপাশের মানুষ, কিন্তু পারলো —আমার মাথা লক্ষ্য করে লাঠিটা ছুঁড়ে দিলো আমাকে রুখতে না পেরে। নামিয়ে নিলাম মাথা লাঠিটা আবার বাইরেই পড়লো গাড়ির কাচে একটা গর্ত করে দিয়ে। আওয়াজও পেলাম পেছনে গুলির, ক্ষতবিক্ষত হলো গাড়ির বডি আর একটা রাস্তায় পড়লাম কিছুদূর এগিয়ে। বেশি দূর যাওয়া যাবে না গুলির দাগ আর ভাঙা কাচ নিয়ে আমাকে দেখতে শুরু করেছে রাস্তার মানুষ দাঁড়িয়ে

পড়ে, চোখে পড়লো গাড়ি রাখার জায়গা সামনে অল্প দূরে, গাড়ি দাঁড়িয়ে সারি সারি।

আস্তে আস্তে সবার পেছনে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম। সাদা পোষাকের একজন কর্মী এগিয়ে এলো নেমে গাড়ির পেছনে মাল রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢাকনিটা তুলে দিতেই। স্যার গাড়ির কি হয়েছে? তার চোখ গুলির দাগে। পাগলা এক ব্যাটার কীর্তি ওই আর কি! যাক একটু লক্ষ্য রেখো—আমি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি বিরাশি শিক্কার ঘুষি জমিয়ে দিলাম ওর মুখে লোকটা অবার মুখ খোলার আগেই। লোকটা পড়লো মুখ থুবড়ে, বেচারা! চারপাশে তাকালাম মাথা তুলে! না, দেখতে পায়নি কেউ। অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আরো জনা দু'তিন সাদা পোষাকের কর্মচারী, তারা মত্ত গল্পে। পাঁচিলের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলাম স্যুটকেস হাতে নিয়ে।

স্যুটকেসটা বড্ড ভারী লাগছে—বোধহয় এটা মনে হচ্ছে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলেই। আমার জীবনের মোড় ফেরাতে পারি এ টাকায় এখনো। কিন্তু টাকাটা ছাড়া একটা উঁচু ঢিবির ওপর উঠলাম দেয়ালের পাশ দিয়ে। নজরে পড়লো দুটো পুলিসের গাড়ি রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতে এদিকেই এগিয়ে আসছে বুলেভার্ডের ধার ঘেঁষে।

একটা কয়েক গজ তফাতে। আশ্রয় দরকার এখুনি একটা আর কোনো সম্ভবনাই নেই লিবার্টি ইন-এ পৌঁছোনোর। লিঙ্কন হোটেল রাস্তার উল্টোদিকে—সে দাঁড়িয়ে তার চল্লিশতলা আকাশ ভেদী উচ্চতা নিয়ে। এগোলাম রাস্তা পেরিয়ে, স্নানার্থীর ভিড়ে এক দল মেদের পাহাড় লোক। একটা একপাশে। স্নানের পোষাক পরনে যুবতী অন্যপাশে। স্নানার্থিনী আমাকে মাপলো কৌতূহলের চোখে। হোটেলের উদ্দেশ্যে জনতা চলেছে, জনস্রোতে আমিও মিশে গেলাম সেই সুযোগে...পেছনে ফিরে তাকালাম ঘূর্ণায়মান দরজার মধ্যে গলে গিয়ে এবং নিজেকে অভিশাপ দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই—আমাকে দেখে ফেলেছে সিপাইদের একজন।

লোকটা থমকে গেলো এক মুহূর্ত, তারপর পা বাড়িয়ে দিলো দ্রুতপায়ে হোটেলের দিকে। লিফটে উঠে পড়লাম দ্রুতপায়ে। লবি পেরিয়ে। আমি নির্বিকার গলায় বলে দিলাম এগারোতলা। লিফট চালক আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সিপাইটাকে দেখতে পেলাম লিফ্‌ট চলতে শুরু করতেই সে বেরিয়ে এলো ঘোরানো দরজা দিয়ে, জেট চালিত রকেটের মত ছিটকে।

সারা হোটেল ভরে যাবে পুলিসে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে। লিফট থামলো ষষ্ঠ তলায়। কেউ চড়লো না, দুজন বেরোলো। আমি মেয়েটা আর চালক তখন শুধু লিফটে। চালক আমার দিকে ফিরলো. মেয়েটাকে অপাঙ্গে লেহন করে একবার, স্যার, কোন ঘর আপনার? এসেছি একজনের কাছে। স্যার কাজ করে ফেলেছেন বেআইনী, নামটা লেখানো উচিৎ ছিলো নীচে অনুসন্ধানের দপ্তরে। একটু বোধহয় দেরি হয়ে গেলো, তাই না? চেষ্টা করলাম হাসবার। একদৃষ্টে তাকিয়ে যুবতী আমার দিকে। আমি তাকাতে, টেনে দিলো জামাটা একটু। মেয়েটাকে মনে হচ্ছে লাইনের...। স্যার নীচে নামতে হবে আপনাকে। মেয়েটার বুকে কিন্তু চালকের দৃষ্টি। নামবো ঠিক আছে। লিফ্‌ট থামলো তেইশ তলায়। মেয়েটা বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বারান্দা দিয়ে...অলস মন্থর পায়ে। ওর নিতম্বের আন্দোলন লক্ষ্য করছি বিমোহিত দৃষ্টিতে আমি আর চালক। চালক ছোকরার কাঁধে হাত ঠেকালাম মেয়েটা অদৃশ্য হতেই, চোয়ালে একটা ঘুষি মারলাম সর্বশক্তি দিয়ে ও মুখ ফেরাতেই—মাথাটা প্রায় নেমে যাবার উপক্রম হলো ওর কাঁধ থেকে মারটা এতটা জোড়ে পড়লো যে, ছেলেটা সশব্দে পড়ে গেলো টুল থেকে। মেয়েটার পেছনে ধাওয়া করলাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে। মেয়েটাকে ধরলাম তার ঘরের সামনে, দরজা খুলছে চাবি ঘুরিয়ে। সে ঢুকে পড়লো ঘরে আমার দিকে নজর পড়তেই। ৪৫ বোরের বন্দুকটা ওর কাঁধে ঠেকালাম দরজা বন্ধ করার মুহূর্তে, আলতো হাতে। কোনো শব্দ করবে না মুখ দিয়ে। ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম পা দিয়ে ঠেলে। আপনি কি চান? তন্বী বলে উঠলো প্রায় বিকৃত গলায়। কথা আছে বোসো। বের করে ধরালাম সিগারেট। ভয় নেই তোমার, পেছনে লেগেছে পুলিসের খোঁচড়গুলো। আমি এখানে থাকছি ওরা কেটে না পড়া পর্যন্ত। তাকে দেখাচ্ছে খুশী খুশী, নিতম্বিনী বসলো। বাইরে তাকালাম ডানদিকে স্যুটকেসটা নামিয়ে দিয়ে।

মনে হচ্ছে এখান থেকে সেটা অনেক দূর যে জায়গায় পৌঁছতে পারলে পালাতে পারি। ভিড়ও বাড়ছে হোটেলের বাইরে—সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে আসছে গোটা তিনেক পুলিসের গাড়িও...ওরা

তোমার ঘরে তল্লাসীতে আসবে আর মিনিট দশেকের মধ্যেই। আমার ঘাড়ে খুনের দায় চার চারটে, আমার হাত কাঁপবে না আর একটা বাড়াতে। কিন্তু তোমার কাছে ফেলনা নয় নিশ্চয়ই তোমার জীবনটা। তুমি আমাকে দেখনি, ওদের বলতে হবে ; গুলি ছুটবে কোনো গোলমাল হলেই বুঝলে? মেয়েটা কুঁকড়ে গেলো ভয়ে, আমার দিকে তাকালো বিস্ফারিত চোখে। আমার দুঃখ হচ্ছে ওর জন্য, কিন্তু কোনো পথ নেই আমার তো আর। পড়েছি যে গ্যাঁড়াকলে। ভিড় বাড়ছে বাইরেও, পুলিসের গাড়িও জমেছে মানুষও হাজার তিনেকের কম নয়... তাদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তেই পায়ের শব্দ উঠলো বারান্দায়...হাঁটতে পারে না নিঃশব্দ পায়ে ও শালারা তো...মনে হচ্ছে অনেক গুলোই হবে...একপাল মোষ! তল্লাসী চলেছে ঘরে ঘরে...। এখন বাকিটা নির্ভর করছে এ মেয়েটার ওপর। আমি গেছি ও ফাঁসিয়ে দিলে, শান দিলাম গলাটায়।

এসে পড়বে ওরা এখুনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কি করতে হবে। ওর মাথা লক্ষ্য করে তুললাম বন্দুকের নলটা। মেয়েটা বসে রইলো মোমের পুতুল হয়ে। মুছে গেছে মুখের সমস্ত রঙ...তাকিয়ে রইলো বোবা চোখে আমার দিকে। টোকা পড়লো দরজায়। নিঃশব্দে পার হয়ে গেলো একটা দীর্ঘ মুহূর্ত। জোরে আবার টোকা।

ফিসফিসিয়ে বললাম যাও, ও নড়বে না যদিও জানি। সত্যি হলো আমার আশঙ্কাই, মেয়েটা মাটিতে পড়লো একটা বিলম্বিত আর্তনাদ করে ; হারিয়েছে চেতনা। জলদি খোলো—

পেলাম একটা মোটা গলা। ভবিষ্যৎ নেই আমার আর কোনো। হেমের হাতেই যাওয়া ওদের হাতে পড়া মানেই আর তারপর, না, পথ নেই বাঁচার। কোনো কিছু ভাবছি না আমি।—ঘুরপাক খাচ্ছে টাকাগুলোকে কেন্দ্র করে আমার ভাবনা...ভোগ করতে না পারি আমি যদি এ টাকা, তাহলে করতে দেবো না কাউকেও...আবার কণ্ঠস্বর দরজার বাইরে। ফারার খোলো, আমরা জেনেছি তুমি ওখানে—। ফিরে গেলাম জানলায়। সারা বাড়ি জুড়ে জানলার নীচে কার্নিশ।

মুখ বাড়িয়ে দিলাম বাইরে। কার্নিশ একটা ফুলের বাগানে শেষ হয়েছে ডাইনে ফুট ত্রিশেক গিয়ে। গুলি খাবার ভয় থাকছে না ওখানে পৌঁছতে পারলে। চোখ ফেরালাম নীচের দিকে শুধু মাথা আর মাথা সৈকত জুড়ে—দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী সব মানুষের। নিবদ্ধ আমার জানলার দিকেই।

মাথাটা ঝিম করে উঠলো স্বল্পপরিসর কার্নিশটা আবার চোখে পড়তে, কিন্তু প্রাণে বাঁচবো না ওখানে না নামতে পারলে। চাপ বাড়ছে দরজায়—ভেঙে পড়বে যে কোনো মুহূর্তে। পা তুলে দিলাম জানলার ওপর। স্যুটকেসটা নিয়ে নিলাম কার্নিশে নেমে। গুঞ্জন উঠলো নীচে, কিন্তু আমি তাকাতে পারছি না আর নীচের দিকে। দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেন্ড হাতুড়ির আওয়াজ বুকে। কাঁপছে হাঁটু। ও জায়গায় হাঁটা যথেষ্ট বিপদজনক, স্যুটকেস ছাড়াই। আর হাতে করে ওটা...পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম দেয়ালে পিঠ রেখে। কায়দায় হাঁটছি সার্কাসে দড়ি হাঁটিয়েদের। আমাকে পৌঁছোতে হবে ওই ফুলের আস্তানায়। পার হয়ে চলেছি জানলার পরে জানলা, ইচ্ছা করছে কিন্তু পারছি না ভেতরে উঁকি দিতে একটা লোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো শেষ জানলার কাছাকাছি পৌঁছাতে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি দাঁতের ফাঁকে। থেমে গেলাম—লোকটা আমাকে দেখতে লাগলো হাঁ করে। সন্তর্পণে পকেট থেকে বের করে নিলাম বেনোর বন্দুকটা। ককিয়ে উঠলো লোকটা পড়ে; সারে যে আরে, উঠে এসো আমার এখানে।

সরে যাও জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে।

তুলে ধরলাম বন্দুকের নল। লোকটা সরে গেলো একটা অস্ফুট শব্দ করে...নীচের ভিড়ে গুঞ্জন উঠলো আবার—এগোতে লাগলাম, পৌঁছে যাবো আর ফুট বিশেক যেতে পারলেই। সুরু করলাম দ্রুত এগোতে, চেঁচিয়ে উঠলো পেছনে কে যেন...সাহস নেই ফিরে তাকাবার... চলতে থাকলাম...পিঠে গুলি খাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে প্রতি মুহূর্তেই...পৌঁছলাম অবশেষে। দম নিলাম একটা পাথর আঁকড়ে ধরে। এ ভাবেই কিছুক্ষণ কাটলো...চোখ তুললাম আস্তে, মুখের মিছিল রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িগুলোর জানলায়। কার্নিশে নামিয়ে দিলাম স্যুটকেস। পাথর ধরে আস্তে ওপর দিকে উঠতে চেষ্টা করছি সামনের কোন বাড়ি থেকে একটা হুঙ্কার ভেসে এলো, মাতাল কোথাকার, কি করছো কি? আর একবার সোচ্চার হলো জনতার গুঞ্জন। মোটামুটি তো পেলাম একটা পা রাখার জায়গা। এবার কোনোরকমে একদম দাঁড়াবার জায়গা পাবো ওই কংক্রীটের গাঁথুনি পার

হতে পারলে স্যুটকেসটা নিয়ে, গাঁথুনিতে চাপালাম ডান পা-টা। কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়লো ভারসাম্য রাখা। পিছিয়ে আসতে হলো। স্যুটকেসের ভারে ফুরিয়ে এসেছে দমও। হাতটা শূন্যে উঠে রইলো তিন-চার সেকেন্ড...বাড়তে শুরু করেছে আশ পাশের চীৎকার..শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে ঢুকতে পারলাম ফাঁকটার মধ্যে, নিজেও বুঝতে পারছি না কি করে তা হলো।

কিছুটা জায়গা বেড়েছে, বোধ করছি একটু নিশ্চিন্ত, ভেঙে পড়তে চাইছে সারা শরীর অবসাদে পারছি না দাঁড়াতে। বসে পড়লাম স্যুটকেস ধরে পিঠ ঢুকিয়ে সাঁকোর মধ্যে, সামনে পা দুটো শূন্যে এই প্রথম নীচের দিকে চোখ ছেড়ে দিলাম কার্ণিশে নামার পর, শুধু মাথা আর মাথা যতটুকু চোখে পড়ছে রুজভেল্ট বুলেভার্ডে আর ওসান বুলেভার্ডের এই উচ্চতা থেকে মনে হচ্ছে একটা চিকচিকে কার্পেট। চোখে পড়ছে পুলিসের লোকগুলোকেও—ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে ভিড় নিয়ন্ত্রণের। দাঁড়িয়ে গেছে গাড়ির সার...মাইল জুড়ে। মানুষ এগিয়ে আসছে হোটেলের দিকে গাড়ি ছেড়ে। আরো বাড়বে পুলিসের তৎপরতা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বাঁধা পড়বো অক্টোপাসের বাঁধনে, চলে যাচ্ছে সময়। আড়াই লক্ষ ডলার আমার পাশের স্যুটকেসে কড়কড়ে নোট আর নীচে মানুষ দু পাঁচ হাজার, আমার চিন্তায় শুধু। পরের কাজটুকু অনেক সহজ হয়ে গেলো এই মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গেই। তুলে নিলাম একটা একশো ডলারের বাণ্ডিল স্যুটকেস খুলে। বাণ্ডিলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম রবারের চাকতিটা টান মেরে খুলে—নোটগুলো নীচের দিকে নামতে লাগলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, নড়ে উঠলো জনতা, উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছেছে ওরা নিশ্চয়ই একজন লাফিয়ে উঠলো নোটগুলো ওদের কাছাকাছি নামতেই, ধরবার জন্য নোটটা। ওদের মাঝে কি জুড়ে দিয়েছি এবার মানুষগুলো জানলো...

গর্জন উঠলো একটা সে গর্জনে কেঁপে উঠলো সারা পরিবেশটা—প্রথম নোটটা ধরার জন্য কে একজন লাফিয়ে উঠলো রাস্তার উল্টোদিকের একটা জানলায়। কে একজন বলে উঠলো রাস্তার উল্টোদিকের একটা জানলায়, আরে লোকটা ফেলে দিচ্ছে টাকা! মুখগুলো একে একে মিলিয়ে গেলো সামনে চলতে লাগল ধাক্কাধাক্কি। এক অভিনব খেলায় আমিও মেতে উঠলাম। নীচের মানবসমুদ্রে বাণ্ডিল খুলছি আর ছড়িয়ে দিচ্ছি। রাখতে পেরেছি আমার প্রতিজ্ঞা ; একটা চমক সৃষ্টি করবো খরচের ব্যাপারে, অনেক টাকা হাতে পেলে...আমার বহুদিনের সাধ পালন করেছি, আজ। কি আনন্দ! রোমাঞ্চ অভূতপূর্ব! আমি দুনিয়ার সর্বশক্তিমান মানুষ এই মুহূর্তে। নীচের এই দৃশ্য ম্লান করে দিয়েছে আমার সমস্ত কল্পনাকে লড়াই করছে মানুষে মানুষে, মাড়িয়ে চলেছে একে অপরকে। এক অপূর্ব দৃশ্য চীৎকার আর আঁচড়া-আঁচড়ির। মেতে উঠেছে খেলায় পুলিসেরাও—

আন্দোলিত হচ্ছে লাঠি শুধু ছোঁবার জন্য টাকা বাতাসে দিকবিদিকে নোট ছড়িয়ে পড়ছে, লড়াই চলেছে সৈকতেও। কখানা নোট ধরতে ধরতে একটা মেয়ে তার স্কার্টে আঁজলা করে সেটাকে রাখল। ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিলো তার দিদিমার বয়সী এক বৃদ্ধা! আর এক দৃশ্য, একটা পুরুষকে ঠেঙিয়ে চলেছে চারজন মহিলা তাদের হাতব্যাগ দিয়ে...

কখানা নোট হাতের মুঠোয়। এক মহিলাকে এক সিপাই ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে—ওদের মধ্যে ছেড়ে দিলাম শেষ বাণ্ডিলটাও, দেখতে লাগলাম বসে ভারী হয়ে আসছে নিশ্বাস। ঘামে চপচপ করছে সারা শরীর। আবার আমার জীবনে ফিরে আসে যদি এই দশটা মিনিট সময়টুকু বরণ করবো সানন্দে। কিন্তু আমার কাছে আর টাকা নেই। ও টাকায় কিছু করা যাবে না, ডেলা ঠিকই বলেছিলো...টাকা নিঃশেষ হলো রোদে বরফ গলে যাওয়ার মত...যেন আমার কাছে ছিলো না এটাকা কোনদিনই। পরম মুহূর্ত অতিক্রান্ত আমার জীবনের। তার পুনরাবৃত্তি হবে না আর কোনদিনই। তাকালাম নীচে আমার দিকে আর কেউ তাকাচ্ছে না। ওরা আমাকে ভুলে গেছে টাকার উন্মাদনায়। সময় ফুরিয়ে এলো আমারও। এবার পৌঁছতে চেষ্টা করবে আমার কাছে পুলিসের লোকগুলো। দুটো রাস্তা এখন আমার সামনে ; শূন্যে লাফিয়ে ওদের ফাঁকি দেওয়া, না হয় আত্মসমর্পণ।

একই তো অবস্থা হবে দ্বিধা নেই আমার কোনো...এখুনি করে দিতে পারি জীবনের শেষ। আমাকে তা পীড়া দিচ্ছে জিনির চোখে যে অবিশ্বাস দেখেছি, আমার ভালোবাসা নিখাদ ওকে বিশ্বাস করাতে হবে। আমার এই একটা কর্তব্যই থেকে গেলো পৃথিবীতে ; সে কতখানি জুড়ে

ছিলো আমার জীবনের, ওকে জানানো। সে জানুক আমার কাহিনী...জানুক কেমন করে হারিয়ে যায় একজন নির্দোষ, সাঁতারু ঘূর্ণিজলে পড়ে, ওর হোক অনুশোচনা...অন্তত একবারের জন্যেও ভাবুক আমি গ্যাস চেম্বারে ঢোকার পর। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে খারাপ বলে হেম আমাকে যতটা, ততো খারাপ নই আমি মানুষটা। সত্য উদঘাটিত হওয়া দরকার জিনির কাছে। আত্মসমর্পণ করবো আমি। অন্তত আমি লিখে যেতে পারবো আমার কাহিনী বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার আগে। উঠে দাঁড়ালাম সন্তর্পণে...ফিরে তাকালাম কার্নিশের দিকে—একটা সিপাই জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমার থেকে কয়েক গজ দূরে—একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকে। সে জানলার বাইরে বেরিয়ে পড়তেই, এখন তার ওপরই তো ন্যস্ত আমাকে ধরবার পবিত্র দায়িত্ব—'দোস্ত ওখানেই থাকো—'বললাম নরম গলায়, হাতের ইশারা করে, তোমাদের কাছে আমিই আসছি, নীচের জনসমুদ্রের উত্তাল গর্জন কানে এলো, ওর দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য মিল আছে এ শব্দের সঙ্গে গুহার সিংহ গর্জনের। রাইসনারকে কাছে পাওয়ার মুহূর্তে তারাও হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলো। একটা জায়গায় শুধু তফাৎ। আমি জানি আমার ভাগ্যে কি ঘটবে—কিন্তু জানতো না রাইসনার!!

হানিমুন

।। এক ।।

আমার জীবনের ধ্রুবতারা মার্গারেট। একেবারে অসম্ভব আমার ওকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করা। আমি মরে যেতে পারি ওর জন্য অকাতরে। সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি একটু একটু করে। কারোরই অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে আমার কাছে মার্গারেট ছাড়া। নেই কোনো কিছুরই। আমি জানি না অন্যায় কাকে বলে। আমি আরো হাজারবার সেই অপরাধ করতে রাজি, মার্গারেটকে ভালবাসাটা যদি আমার অন্যায় কিংবা অপরাধ হয়। বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই আমার মধ্যে। পাগল হয়ে যাই আমি অষ্টাদশী মার্গারেট যখন তার ছিপছিপে যৌন আবেদনময়ী শরীর নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি রাজি আছি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যেতে যদি ওকে কাছে পাই। ওর সামান্য একটু স্পর্শ পাই, এমনকী নরকে যেতেও দ্বিধা নেই আমার। আমার মার্গারেট আমার একান্ত ভাবেই আমার। অন্য কোনো নারী যে আমার জীবনে আগে আসেনি সেটা কিন্তু ঠিক কথা নয়। আমার সমস্ত সত্ত্বা অধিকার করে নিয়েছে। মার্গারেট আমার জীবনের প্রথম মেয়ে। আমি এমন ভাবে নিজেকে কারো কাছে উৎসর্গ করিনি। ওরই মতো ও। ওর নিজের মত। আমি থামাতে পারি না আমার সংযম যখন ও ওর সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার ফরসা শরীরটা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন জোয়ার ওঠে আমার রক্তের মধ্যে। নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে যায় তখন আমার সমস্ত সংযমের বাঁধ। আদিমতম জীব হয়ে উঠি তখন আমি।

পিটার আমার নাম। বিখ্যাত এক বছর উনিশশো সতেরোয় আমি জন্মেছিলাম। বছরটা ছিল রুশ বিপ্লবের। বিট্রিশ নাগরিক ছিলেন আমার বাবা। মার্কিনী রক্ত ছিল তাঁর শরীরে। ভারতীয় ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন বোম্বাই-এর এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে। হোটেল ব্যবসা ছিল বাবার লন্ডন শহরে। পরে তিনি ভারতে যান এবং সেখানে বোম্বাইতে একটি হোটেল খোলেন। সোজাসুজি বলা চলে, ভাগ্য ফেরানোর জন্যই তিনি লন্ডন থেকে সুদূর বোম্বে যান। তিনি হোটেল খোলেন বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়া গেটের কাছে। সেখানে রাখেন একজন কর্মচারী। প্রায়ই তাকে করতে হত লন্ডন আর বোম্বাই। আমার মা আত্মহত্যা করেন যখন আমার ঠিক দশ বছর বয়স। আমি আজও জানতে পারিনি তিনি যে কেন আত্মহত্যা করেন। মামার বাড়ি বোম্বেতে আমি ছিলাম মা মারা যাবার সময়। মা ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছিল যখন আমি ট্রাঙ্ককলে খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছালাম। তার দেহে হঠাৎ আগুন লেগে গিয়েছিল এটা আমি বাবার কাছে শুনলাম। অন্যরকম বক্তব্য ছিল কিন্তু আমার ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি নিজেই গায়ে আগুন ধরান এটা আমি শুনেছিলাম আমার প্রতিবেশীদের কাছে। বাবা নিজেই মার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন এটা ছিল কারো কারো বক্তব্য। মায়ের আলমারী থেকে মায়ের লেখা একটা চিঠি আমি পেয়েছিলাম অবশ্য পরে। আমার কাছে তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় আত্মহত্যার ব্যাপারটা. তিনি অবশ্য লেখেননি যে কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার হৃদয়টা বেদনায় ভরে ওঠে মাকে মনে পড়লেই। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। মা মারা যাবার পর বাবা দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মহিলাকে এনে রেখেছিলেন নিজের কাছে। মহিলাটি যে বাবার প্রেমিকা তা আমি একদিন আবিষ্কার করেছিলাম। রীতিমতো যৌন সম্পর্ক ছিল ওর সঙ্গে বাবার। একদিন স্কুল থেক ফিরে এসে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তারপর দরজার একটি ছোটো ফুটো দিয়ে চোখ লাগালাম কৌতূহলবশতঃ। দেখলাম বাবা উন্মত্তের মতো চুম্বন করছেন সেই মহিলাকে। এক চিলতে পোশাক নেই দুজনের কারো শরীরেই। আমাকে খুবই ভালবাসতেন সেই মহিলা। ওকে ভাই লাগত আমার। এলিজাবেথ নাম ছিল ওঁর ; এলিজা বলে ওকে ডাকতেন বাবা। আমি ডাকতম ওকে মা বলেই। মোটামুটি শিক্ষিতা ছিলেন তিনি। মায়ের রূপের প্রশংসা করতেন তিনি মায়ের ছবি দেখে। যদিও তিনি ব্রিটিশ তবু তার একটা শ্রদ্ধা ছিল ভারত সম্বন্ধে। তিনি সুযোগ পেলে যেতে যাবেন

একথা তিনি প্রায়ই বলতেন। একজন কর্মচারী দেখতেন বোম্বেতে বাবার হোটেলটা। হোটেলটা সৎমা গিয়ে দেখাশুনা করবেন এটাই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু আর হয়ে ওঠেনি সেটা।

নিয়মিত স্কুলে যেতাম আমি। বলা যেতে পারে, যে আমি পড়াশুনাতেও ভালই ছিলাম। আমি স্কুলে পড়তে পড়তেই শেষ করে ফেলেছিলাম শেক্সপিয়ারের সব বই। আমি গোগ্রাসে গিলতাম কীটস, শেলী প্রভৃতির লেখাও। স্কুল থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না আমাদের ফ্ল্যাট। যাওয়া আসা করতাম নিজেই। চোদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গেল আমার ভোররাতে। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার পাজামা ভিজে গেছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, তবে কি প্রস্রাব করে ফেলেছি ঘুমের ঘোরে। কিন্তু দুধের মত সাদা আঠালো পদার্থ আমি হাত দিয়ে দেখলাম। এটা তো প্রস্রাব নয়। ঘটনাটা আমি সৎমাকে বলতে গেলাম, কারণ কিছুই লুকোতাম না আমি ওঁর কাছে। তিনি আমার সব কথা শুনলেন তার পর আমার গাল টিপে বললেন, "পিটার, বড়ো হয়ে গেছ এখন তুমি!"

পরে আমি এ ব্যাপারে আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। তোর কোন মেয়েকে ভাল লাগে?

কেন, কই না তো।

বছর তিনেকের বড় ছিল আমার চেয়ে বন্ধুটি। এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত সে। সে হেসে বলল, একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম কর, সবই বুঝতে পারবি।

করেছিস তুই।

হেসে বলল বন্ধুটি, বান্ধবী একটা আছে আমার। সেরকম কিন্তু কেউ নেই আমার। ভারতে এই সময় চলে গেলেন আমার বাবা। থেকে গেলাম আমি আমার সৎ মায়ের কাছে।

আমার আর কোনো কাজ ছিল না স্কুলে যাওয়া আসা ছাড়া। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে। ঘুরে বেড়াতাম একাই। একটাই শব্দ আমার কানে ভেসে উঠত বার বার তুই প্রেম কর কারোর সঙ্গে।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠত ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে। আমার বাবা চুমু খাচ্ছেন আমার সৎমাকে জড়িয়ে। এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিত আমার শরীরে। একদিন স্নান করতে বাথরুমে গিয়ে হস্তমৈথুন করলাম। বন্ধুদের কাছে এর আগে শুনেছিলাম আমি ব্যাপারটা। সেই প্রথম আমার জীবনে, এক ধরনের ঘন পদার্থ। এক আশ্চর্য সুখের অনুভূতি আমার সমস্ত শরীর জুড়েই। সৎমাকে বললাম না। তিন বছর এই একই ভাবে কাটল।

একটি মেয়ের সঙ্গ প্রয়োজন বলে আমার মনে হতে লাগল। সুপ্রসন্ন বলতে হবে আমার ভাগ্য। সৎমায়ের ভাই সঙ্গে একদিন একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। চল্লিশের কোঠায় সৎমায়ের এই ভাইয়ের বয়স। আমার সমবয়সী মেয়েটির বয়স পনেরো। ক্যাথরিন তার নাম। খুব কাছ থেকে এই প্রথম আমি একটা মেয়েকে দেখলাম। আমরা পরস্পরকে দেখলাম। বলা বাহুল্য ক্যাথরিনের প্রেমে পড়লাম আমি। আমার সারা হৃদয় আনন্দ এবং আবেগে ভরপুর হয়ে উঠল। আমি ছটফট করতে লাগলাম ভেতর ভেতর এক গোপন কামনায়। ভালই আলাপ হল আমার ক্যাথরিনের সঙ্গে। সৎমা চুপ করে রইলেন যদিও তার চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। তিনি আমাকে কিছু বললেন না। চেহারাটা একটু ভারী ক্যাথরিনের। ফরসা শরীরে দুটো নীলচে চোখ এবং বাদামী ছোট্ট চুলে ওকে অপূর্ব লাগল। তার কথাবার্তা খুবই মিষ্টি। আমরা সবসময়ই গল্প করতাম আমাদের আলাপের পর থেকে। দুজনে আমরা আমাদের ঘর ছাড়া পার্ক কিংবা সমুদ্রের উপকূলে চলে যেতাম। ওর সুডৌল স্তন যা ফ্রকের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে এবং ওর দুটি গভীর চোখ পাগল করে দিত আমাকে। ক্যাথরিন খুব ভালো গান জানত। একদিন আমাকে শোনালো। সে প্রশংসা করত ভারতবর্ষের। সে অবশ্য কিছুই জানতো না ভারত সম্পর্কে। একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা মহারাজা এবং যাদুকরেরা ওখানে থাকেন। রাজ পরিবারের কি মেয়ে ছিলেন তোমার মা?'

রাজ পরিবারের নয় কিন্তু অভিজাত পরিবারের।—একটু থামলাম এবং তারপর বললাম, 'ভারতে যাব আমি বড় হলে, ওখানে আমাদের হোটেল আছে। ওখানে যাওয়ার ইচ্ছা আমার

ডাক্তার হওয়ার পর, কি ভাল হবে তো?

হ্যাঁ ভালো হবে।

ক্যাথরিন ঘাড় নাড়লো। একটি বালির ঢিবির আড়ালে আমরা বসেছিলাম সমুদ্রের ধারে। ক্যাথরিনের দিকে একইভাবে তাকাতে আমার দু চোখের ভাষা বুঝতে পারল ক্যাথরিন। চোখ দুটো নামিয়ে নিল ও লজ্জায় লাল হয়ে। আমার কোলে সজোরে টেনে নিয়ে চুমু খেলাম আমি ওকে। পরপর পাঁচটা, ওর নরম আঙুরের মত ঠোঁট এমন কী গাল এবং কপাল সবেতেই। ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। বসা গেল না বেশীক্ষণ। দুজনে ফিরে এলাম আমরা। আমার দিকে আর তাকাতে পারছিল না ক্যাথরিন। তার দিন দুয়েক পরে আমার সৎমা এবং ভাই কিছু কেনাকাটা করতে গেছেন। বাড়িতে ক্যাথরিন এবং আমি একা।

দুজনে শোবার ঘরে গেলাম। বিছানায় বসেছিল ক্যাথরিন। একটা পাতলা ফ্রক পরেছে আজ সে। পোশাকটি ছিল সাদা রঙের। ওর দুটো নরম স্তন তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। রক্ত গরম হয়ে উঠলো আমার শরীরে। আমি পুড়ে যাচ্ছিলাম কামনার আগুনে। ক্যাথরিনের একটা হাত ধরলাম এবং তারপর বললাম, তুমি কি রাগ করেছো?

ক্যাথরিন 'নাতো' বলে মিষ্টি হাসল।

একটা চুমু খাব তোমাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠে সে আমার মাথাটাকে দুহাত দিয়ে নিজেই ওর মুখের কাছে নিয়ে এল। নিজেকে রাখতে না পেরে ওকে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম। তারপর ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফ্রকটা খুলে দিলাম এবং পরনের প্যান্টিটাও খুলে দিলাম। আমার সামনে শুয়ে আছে নগ্ন ক্যাথরিন। আমি সবে নিজেকে উন্মুক্ত করে ওর ওপর শুয়েছি, ঠিক সেই সময় দরজায় শব্দ পেলাম। দুজনেই ভয়ে সারা হয়ে পোশাক পরে নিলাম। বারান্দায় চলে গেল ক্যাথরিন পেছনের দরজা দিয়ে। দরজা খুললাম আমি দুরু দুরু বুকে। আমি দরজা খুলে আগত অতিথিকে দেখার পর আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল এবং তারপর ক্যাথরিনকে চীৎকার করে ডেকে বললাম, দেখে যাও কে এসেছে।

ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল ক্যাথরিন দৌড়ে। ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে আমাদের বকতে আরম্ভ করে দিয়েছে আমাদের অতিথি। সে আমাদের প্রিয় পোষা স্পানিয়েল কুকুর। থাপ্পড় মারলাম ওর গায়ে এবং বলে উঠলাম, 'তুই শেষপর্যন্ত বদমাইসি করলি টম, ল্যাজ নাড়তে লাগল টম আদর পেয়ে।

আমাদের সেই সুযোগ এসেছিল শেষ মিলনের। ক্যাথরিন চলে গেল এর ঠিক দুদিন পরেই। যাবার দিন যখন একান্তে একবার দেখা হয়েছিল তখন আমি রীতিমতো গম্ভীর হলেও ওর দুচোখে ছিল জল। কে জানে আমি আর আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাবো কিনা। 'আবার কবে আস‌ছ', ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম।

বলতে পারছি না, তবে আমাদের বাড়িতে তুমি যেও।

সারা মুখ ওর চুমুতে ভরিয়ে দিলাম আমি পরম আবেগে। আমার কাছে নিস্তব্ধ মনে হয়েছিল সেই রোদ ঝলমলে সকালটাও। থেমে গেছে তখন দূরে সমুদ্রের গর্জন। ওকে চেপে ধরেছিলাম আমি সজোরে। মুখটা ওর দুটো বুকের মাঝখানে রেখে বলেছিলাম, কিভাবে থাকবো আমি তোমাকে ছাড়া।

কেঁদে বলে উঠল ক্যাথরিন, 'আমিও তো পারব না পিটার', ওর দেহের সমস্ত সম্পদ যা কিছু লুকোনো আমি আলতো করে ছুঁয়ে দিলাম। আমাকে বারবার বলছিল ক্যাথরিন যে আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না।

ক্যাথরিন চলে গেল বেলা দুটো নাগাদ ওর বাবার সঙ্গে। ও আরেকজনকে বিয়ে করেছে পরে শুনলাম। ক্যাথরিনের সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়ার ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। নিজেকে পড়াশুনার মধ্যে ডুবোনো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তখন আমার।

।। দুই ।।

লেখাপড়া এরপর শেষ করলাম এবং তারপর যখন ভালভাবে আমি তাকালাম বাস্তব পৃথিবীর

দিকে তখন আমি পাশ করে গেছি ডাক্তারি। ক্যাথরিনের কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সেই মেয়ে অন্য একজনকে কি করে বিয়ে করতে পারে যে মেয়ে যাবার সময় আমায় কত কথা বলে যায়। সাময়িক উচ্ছ্বাস আর আবেগ কি সমস্ত ব্যাপারটাই তাহলে। তাহলে কি ব্যাখ্যা সত্যিকারের প্রেমের? ইতিমধ্যেই আমার বাবার হোটেলের পাশে আমি চেম্বার করেছি। রোগীও হচ্ছে এবং বেশ পশারও জমে গেছে। আমি হার্ট স্পেশালিস্ট, তাই বেশির ভাগ রোগীই হার্টের। এই মহিলাও সেই হার্টেরই রোগী। আপনার সমস্যা কি আমাকে বলুন, তাকে জিজ্ঞেস করলাম পরীক্ষা করবার সময়। সুন্দরী রোগিনী কটাক্ষ হেনে বললো, একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে উঠি এবং আমার বুক ধড়ফড় করে সবসময়। ওর বুক পিঠ স্টেথিসকোপ দিয়ে দেখে প্রেশার মাপলাম। সবই ঠিক। হেসে ওষুধের প্রেসক্রিপশান লিখে দিলাম এবং বললাম, আপনার কিছুই হয়নি, আপনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মহিলাটির নাম সোফিয়া এবং তিনি মাঝারী উচ্চতার। তার নীল চোখ দিয়ে উপচে পড়ছে কামনা। ভারী স্তন দুটি তার চেহারা চেয়ে। তার বাবা পেশায় অধ্যাপক। সোফিয়া চলে গেল সেদিন। আবার কিছুদিন পরে এল। পরীক্ষা করে বুঝলাম মনে হয় ওর সমস্যাটা বুকে। তার দুচোখে ইঙ্গিত বহন করছে যে সে আমার প্রেমে পড়েছে। তাকে বললাম, 'আপনার আর না এলেও চলবে সোফিয়া, কোনো অসুখ নেই আপনার।'

'আপনি ডাক্তার না ছাই, আপনার কোনো অসুখ ধরার ক্ষমতা নেই সোফিয়া কথাটা বলল কপট বিরক্তির সঙ্গে।'

'আমি তোমার বাড়ি একদিন যাব, কারণ আমি তোমার অসুখ ধরতে পেরেছি, আমি হেসে বলে উঠলাম।

সোফিয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠল, 'কবে যাবেন আমাদের বাড়ি।'

সোফিয়ার চমৎকার সাজানো গোছানো বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। ওর অধ্যাপক বাবা মিঃ জিওফ ডেক্সটার খুবই চমৎকার এবং ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি। ওঁর অসাধারণ দখল পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে। অধ্যাপককে বেশ ভালই লাগল। ওর স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন। সোফিয়াই এখন একমাত্র অবলম্বন। জমে গেল আমাদের আলাপ এবং আমি ওকে কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'ভারতীয় মহিলা ছিলেন আমার মা।'

তিনি শুনে অবাক হলেন এবং আনন্দিত দুটোই। তিনি বললেন, 'ভারতকে খুবই শ্রদ্ধা করি আমি। আমার একবার যাবারও ইচ্ছা আছে যদি পারি।'

সোফিয়ার সঙ্গে বেশি দিন প্রেম করলাম না আমি এটাই বলা বাহুল্য। ব্যর্থ প্রেমের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল। বিয়ে করে ফেললাম সোফিয়াকে মাস দুয়েক পরেই। একেবারে সংসার জীবন যাপন করব সেটাই মনে মনে ভাবলাম। আমার মনে অমন এক রঙিন স্বপ্ন যা আমি দুচোখে দেখছি। বেশ ভালভাবেই কাটল বিবাহিত জীবনের প্রথম মাস কটি। একটা সমস্যা দেখা দিল তারপর থেকেই। আর পাঁচটা স্থির মেয়ের মত নয় সোফিয়া। ওর ভেতরে সবসময় কিরকম যেন একটা অস্থিরতা। তৃপ্তি যেন নেই কোনো কিছুতেই। সোফিয়া একেবারে সেই রকম যা বোঝায় দেহ সর্বস্ব নারী বলতে। কোনো চেষ্টাই ওর মধ্যে নেই যা দিয়ে আমাকে ও বুঝতে পারবে। সবচেয়ে ব্যস্ততম পেশা ডাক্তারি পেশা হলেও আমি কিন্তু ওকে বেশ সময় দিতাম। রাতের বেলা একদিন সবে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি এবং তারপর বারান্দার চেয়ারে বসে আছি, ঠিক সেই সময় ও একটি নাইট গাউন পরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। দুটো পরিপূর্ণ নিটোল স্তন প্রকট হয়ে উঠেছে তার গাউনের ভিতর দিয়ে। তুমি আমাকে আর আগের মত ভালবাসো না, সে আমার একটা কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল।

আমি অবশ্য এর আগেও শুনেছি ওর এই ধরনের ছেলেমানুষি এবং অপরিণত কথাবার্তা। যখন তখন ওকে নিয়ে বিছানায় যাওয়াই হচ্ছে ওর ভালবাসার অর্থ। বাইরে স্বাভাবিক কিন্তু ভেতরে রেগে গিয়ে বললাম, 'আমাকে বলতো আমি শুনি, কিভাবে ভালবাসতে হবে।'

ও রেগে গেল কথাটা শুনে, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না ওর রাগের কারণ। আমার সামনে এসে দাঁড়াল নিজের নাইটিটা একটানে খুলে ফেলে দিয়ে। বাঘিনীর মতো চোখ দুটো জ্বলছিল এবং বলে উঠল, 'তোমার কি পছন্দ হচ্ছে না আমার শরীরটা।'

আমি বললাম, 'চল শোবে চল, সোফিয়া কি হচ্ছে'। বিছানায় নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলাম টানতে টানতে কিন্তু আমার সমস্ত পোশাক ও খুলে দিয়েছে ততক্ষণে। নগ্ন আমি একেবারে। বুঝলাম ওর চোখের ভাষাতেই যে ও কি চায়। মোটেই ইচ্ছা করছিল না, আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। ও নিজের বুকের উপর আমার একটা হাত রেখে উন্মাদের মত ক্রমাগত চুমু খেতে লাগল। ওর শরীরের দাবী কিন্তু আমি মেটাতে পারলাম না। এটাই ছিল সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। আমি অবসন্ন হয়ে পড়লাম ও তৃপ্তি পাবার আগেই। ও সহানুভূতি জানানো দূরে থাক, আমার অসহায় অবস্থাতে রেগে ফুঁসে উঠে বলল, 'আমার ভালো মন্দ বোঝার কোনো ক্ষমতা নেই তোমার। কারণ তুমি নিজে একটা জানোয়ার।'

আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম গম্ভীর হয়ে। আমার তখন কিছু বলার মত মনের অবস্থা নেই। ও দুহাতে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরল এবং তারপর বলল, 'নপুংশক, তুমি কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে।'

নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে ওর গালে একটা সজোরে চড় কষিয়ে বলে উঠলাম, 'বুঝিনি তোমাকে তখন এবং সেটাই আমার একটা মস্ত ভুল, আমি কথাটা বললাম দাঁত চেপে।

ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ হল তারপর থেকে। কথা বলতাম না প্রয়োজন ছাড়া এবং কেউ কাউকে ছুঁতাম না পাশাপাশি শুলেও। আমি ভেতর ভেতর অসহায় বোধ করতাম যদিও আমি একজন ডাক্তার। আমি ওকে কাছে ডাকলে যদি তৃপ্তি দিতে না পারি সেই ভয়ে এবং কিছুটা ঘৃণাতেও আমি ওকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। ক্রমশঃ সোফিয়াও অন্যরকম হতে লাগল। ওকে আমি একদিন বললাম, 'অনেকদিন কোথাও যাওনি, একদিন যাও, বাবার কাছে ঘুরে এস'।

সোফিয়া প্রতিবাদ না করে জিনিষপত্র গোছগাছ করে বাবার কাছে চলে গেল। ওর একটি চিঠি পেলাম মাসখানেক পরে। 'ও ডিভোর্স চায়' তাতে লেখা ছিল। 'ও ভালবাসে ওর চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোটো ওর বাবার এক ছাত্রকে। এবং তাকেই ও বিয়ে করবে।'

আমি স্থির হয়ে রইলাম চিঠিখানা পড়ার পরে। ভেবেছিলাম ও ফিরে আসার পরে ওর সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেব। এটা আমার একটা কর্তব্য স্বামী হিসাবে। আমার মন থেকে এক নিমেষেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল এই চিঠিটা পড়ার পরেই। ভাবতেই পারি নি সোফিয়া শেষ পর্যন্ত এতদূর এগিয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না তখন কারণ তার উগ্র যৌন ক্ষিদেই তাকে এ ধরনের স্বৈরিণী করে তুলেছে। চিঠি পাঠিয়ে দিলাম বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি জানিয়ে। সোফিয়ার মাও সোফিয়ার জন্মের পর অন্য এক পুরুষের সঙ্গে চলে গিয়েছিল এটা পরে অধ্যাপক বাবার কাছে শুনেছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই রক্তই সোফিয়া বহন করে চলেছে।

আবার নিঃসঙ্গ লাগল সোফিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর। আমাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল প্রচণ্ড একটা মানসিক অস্থিরতা। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছে সুখী হব এটা ভেবেছিলাম আমি যেহেতু যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু তাও হল না এবং আবার ব্যর্থ হলাম। আমার ওপর বুঝি ঈশ্বরের অভিশাপ আছে। লন্ডনে আর থাকবো না এটাই ঠিক করলাম। তখন বুঝি লজ্জার শেষ থাকবে না যদি কোনোদিন সোফিয়ার মুখোমুখি হয়ে যাই। ক্যাথরিনের কথা মনে এল এবং ভাবলাম কি বলবো ওকে যদি হঠাৎই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ও আমাকে চিনতে কি পারবে। আমি তীব্র একাকীত্বে ছটফট করতে লাগলাম। আমার জীবন চলল এইভাবেই, নিজের চেম্বারে যাওয়া সকালে, তারপর দুপুরে খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রাম করে, বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগী দেখা। এক মাঝবয়সী পরিচারিকা জোনসকে নিয়োগ করেছিলাম, সে ছিল খুবই সরল এবং খুবই ভাল ছিল তার রান্নার হাতটি। এক ধরনের মাতৃত্বের স্বাদ পেতাম ওর মধ্যে, এটা আমি বলতে পারি। আমি একজন পুরুষ মানুষ এটা যতই হোক। একটা শারীরিক চাহিদা আছে আমার। আমি প্রেম বা বিয়ে করব এ দুটোর কোনোটাই ভাবতে পারতাম না। প্রেম এবং বিবাহিত জীবন সবই ব্যর্থ। আমার মত দুঃখী পুরুষ খুব কমই আছে।

একটা পানশালায় মদ খেতে খেতে হঠাৎ একদিন আলাপ হল মেরিলিনের সঙ্গে। এই হোটেলেরই একজন বেশ্যা মেরিলিন। সে মোটেই নমনীয় নয় যদিও খুবই সুন্দরী। কেবল ছলাকলা দেখিয়ে পুরুষমানুষকে গ্রাস করে ফেলার মতলব সারাক্ষণই। একটি ছোট্ট ঘর যা ছিল হোটেলের

একপ্রান্তে সেখানে নিয়ে গেল সে আমাকে। তখন রীতিমতো উত্তেজিত আমি। ঘরে একটি দামী খাট এবং ড্রেসিং টেবিল। মেরিলিন আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি চুমু খেতে লাগলাম ওকে উন্মাদের মত। আমরা দুজনে পৌঁছে গেলাম উত্তেজনার চরমে। মেরিলিন ছটফট করছে এটা আমি বুঝতে পারলাম উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে। ওর এবং আমার দুজনেরই মুখে গোঙানি কারণ কেউই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি ওর প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিলাম মিলন শেষ হবার পরে। ও ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'পিটার আবার তুমি কবে আসবে?'

এই প্রথম আমি আনন্দ পেয়েছি এবং ওকেও আমি আনন্দ দিতে পেরেছি এবং আমি যে অক্ষম নই তাও বুঝতে পারছি। আমি শারীরিকভাবে রীতিমতো সুস্থ এবং যৌনগ্রন্থিগুলি এখনও তাহলে অকেজো হয় নি আমার। আমি দেহ মনে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও এক ধরনের মানসিক ভয় থেকেই আমি সুখী করতে পারিনি সোফিয়াকে।

বাড়িতে ফিরে এসে চেয়ারে বসা মাত্রই এক ধরনের অবসাদ নেমে এল আমার সারাটা শরীর ঘিরে। বোধ করলাম একটি বিষণ্ণতা। আমার শারীরিক আকাঙ্খা মেটাতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী নয়, প্রেমিকা নয় একটি বেশ্যার কাছে। দুনিয়াতে বুঝি বা খুব কমই আছে আমার মত হতভাগ্য পুরুষ। ভাল লাগছিল না লন্ডনে, তাই ভাবছিলাম কিছুদিনের জন্য কাটিয়ে আসি কোনো জায়গাতে। নিউইয়র্কে সোজা চলে এসে একটি হোটেলে এসে উঠলাম। নানা ধরনের চিন্তাভাবনা মাথায় জট পাকিয়ে আসে ছোট ছিমছাম ঘরটায় এসে শুলে। আমি মোটেই সুখী হতে পারলাম না সাংসারিক জীবনে। আমি ছুটে বেরিয়েছি চিরকালটাই ভালবাসার খোঁজে। আমি পাইনি ভালবাসা এবং একজন নারীকে আমি চিনতে পারি নি ডাক্তার এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করবার পরেও। একজন নির্বোধ মহিলাকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করেছি শিক্ষিত হয়েও। পারিনি তাকে যাচাই করতে। অক্ষমতা এটাই কারণ যদি নির্বাচনে ভুল করি তাহলে কিরকম বিপর্যয় নেমে আসে মানুষের জীবনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমিই।

এই সময়টা বেশ গরম নিউইয়র্কে। রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত কিছুটা কম ছিল তখন। আমার কাছে খুব একটা খারাপ লাগলো না প্রাকৃতিক পরিবেশ। এক ডাক্তার বন্ধু ছিল আমার। তার নাম ছিল মাইক। আমার অসহায় অবস্থার কথা আমি জানালাম মাইককে। মন দিয়ে সবকিছু শুনল মাইক এবং তারপর বলল, 'পিটার, তুমি এখানেই থাক এবং একটা চেম্বার খুলে বসে যাও এখানে। কথাটা আমার মনে ধরাতে ভাবলাম তাই করব, এখন কিছুদিন ভেবে বরং একটা সিদ্ধান্ত নেব।

আমি কিছুদিন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাস্তায়। রোগী দেখা শুরু করলাম শেষ পর্যন্ত ওখানেই চেম্বার করে। আমি একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম এবং তার মধ্যে কোনদিক দিয়ে যে দশ বছর কেটে গেল তা খেয়ালই করলাম না। সুন্দরী মহিলাদের মুখ দেখলেই আমার ক্যাথরিনের কথা কিংবা সোফিয়ার কথা মনে পড়ে যেত এবং এক ধরনের বিষাদ নেমে আসত তখন আমার সারা শরীর জুড়েই। একজন কর্মচারী রেখেছিলাম লন্ডনের হোটেলে। হোটেল ব্যবসা আমার দুটো জায়গা বোম্বে এবং লন্ডনে মোটামুটি ভালই চলছিল। বোম্বেতে গেলে কেমন হয়, হঠাৎ একবার আমার মনে হল। বোম্বেতে সেই ছেলেবেলার পর আর যাওয়া হয়নি। ওদিককার সঙ্গে সব সম্পর্ক অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছে মা মারা যাবার পর। কারণ মায়ের মা তার কয়েক বছরের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন এবং আরো আগে মায়ের বাবা। মা ছাড়া এক ভাইও তার ছিল। কলকাতায় চলে গিয়ে সেই ভদ্রলোক আইনের ব্যবসা করেন বোম্বের পাঠ চুকিয়ে। যদিও তার ঠিকানা জানি না। বোম্বেতে গেলে প্রথমেই একটা ফ্ল্যাটের দরকার হবে। কারণ আমার কর্মচারীরা হোটেলেই থাকে। আর দেরী করলাম না, সোজা ভারতে পৌঁছালাম প্যান আমেরিকান বিমানে। আমার কাছে স্বপ্নের দেশ ছিল ভারতবর্ষ। আমার কর্মচারী যেন কাছাকাছি ভাল একটি হোটেল ঘর বুক করে রেখে দেয়, তা আমি আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম। আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম কারণ সে আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ভারতীয় খ্রীস্টান ছিল কর্মচারীটা। ভদ্রলোককে বললাম আমি, 'একটা ফ্ল্যাট দরকার আমার এখানে, আপনি ব্যবস্থা করুন, কোনোক্রমে থাকতে পারলেই আমার চলবে, তার মধ্যে আমি বরং কিছুদিন দিল্লী ঘুরে আসি।

দিল্লীতে সোজা চলে এলাম ওকে সব দায়িত্ব দিয়েই। সেখান থেকে তাজমহল দেখতে আগ্রায়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের অমর স্মৃতি হিসাবে রয়েছে সেখানে এক বিশাল প্রাসাদ। পাশাপাশি রয়েছে স্বামী এবং স্ত্রীর কবর। সেই প্রাচীন আর মহান নিদর্শনের দিকে আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার মাথা নত হয়ে এল সম্রাটের প্রতি প্রেমে শ্রদ্ধায়। এরকম প্রেম এলো না কেন আমার জীবনে। ভালবাসা দিয়ে আমি কেন সুখী করতে পারলাম না স্ত্রীকে। এক ধরনের গভীর বিষাদ আমার সমস্ত শরীরে নেমে এল তাজমহল দেখতে দেখতে। বোম্বেতে আবার ফিরে এলাম। বোম্বের উপকণ্ঠ বান্দ্রায় আমার জন্য আমার এক কর্মচারী বাড়ি দেখে রেখেছে। এক বিধবা ভদ্রমহিলা তার ভাইঝিকে নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকে। তার আর কেউ নেই। মিসেস হ্যারিয়েট মুর ভদ্রমহিলার নাম। মার্গারেট ওর অষ্টাদশী ভাইঝির নাম।

।। তিন ।।

মিসেস হ্যারিয়েট মুরের বাড়িতে আমার কর্মচারীই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বান্দ্রার এদিককার বাড়িগুলো বেশ সাজানো গোছানো এবং সৌখিন। এদিকটায় বেশিরভাগ ধনী লোকেরা বাস করে কর্মচারীরা জানালো। ছোটখাট ছিমছাম বাড়ি দুধের মত সাদা রঙের। কুকুরের চিৎকার শোনা গেল ভেতরে বেল টিপতেই। একজোড়া চটির শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল। যিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা, চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। রুপোলী ঝিলিক তার চুলের এদিক ওদিক। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সেই চিহ্ন যৌবনে তিনি যে অত্যধিক সুন্দরী ছিলেন। তার স্তন দুটো বিশেষ করে কারণ, আমি খুব কমই দেখেছি এমন নিটোল স্তন। আমাকে একবার দেখলেন ভদ্রমহিলা, তারপর মৃদু হেসে আমার কর্মচারীকে বললেন, 'ডাঃ পিটার ব্রাউন তাহলে আপনিই।'

নমস্কার করলাম আমি মৃদু হেসে এবং তারপর বললাম, 'হ্যাঁ, তবে আমি ডাক্তার নই, আমি মিস্টার।'

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'আমি দুঃখিত,' তারপর বললেন, 'আসুন ওপরে, আমার নাম হ্যারিয়েট মুর'।

আমি কর্মচারীকে চলে যেতে বলার পর ভদ্রলোক চলে গেলেন। তিনি পরেছিলেন সাদার উপর গোলাপী নক্সাওয়ালা একটি স্কার্ট। দোতলায় ওর বসার ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে বসালেন। একটা চেয়ারে বসে ঘরের সর্বত্র একটি রুচির ছাপ দেখলাম। একটি সুদৃশ আলমারী রয়েছে বড় খাট ছাড়াও, প্রভু যীশুর ছবি দেয়ালে এবং তার সঙ্গে টাঙানো আরেকটি মিষ্টি মেয়ের ছবি। সোফায় বসলেন মিসেস মুর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'আপনাকে নিচের ঘরটা দেব, সেইটাই খালি আছে, আপনার পছন্দ হবে তো আমাদের বাড়িটা। ঘাড় নাড়লাম আমি এবং ঠিক করলাম আপাতত এখানেই থাকবো। কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। এটা বোম্বের অভিজাত এলাকা এবং এখানে সবরকমই সুবিধা হবে, বললেন মিসেস মুর।

হঠাৎ পুরনো কথা মনে পড়ল আমার। ডাক্তার হয়ে ভারতে যাব একথা আমি ক্যাথরিনকে বলেছিলাম। নিজেকে নিয়োগ করেছিলাম ওখানকার মানুষের সেবায়। মনে মনে ভাবলাম, লন্ডন এবং এখানকার ছোট্ট হোটেল বিক্রি করে দিয়ে একটা চেম্বার খুলবো। মিসেস মুরকে জানালাম এই পরিকল্পনার কথাটা। তিনি আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার পেছনে আমি আছি এবং এটা খুব ভাল কথা। তিনি এরপর দেখিয়ে দিলেন আমার ঘরটা।

নিজের অতীতের কথা মিসেস মুর শোনালেন রাতে খেতে বসে। তিনি বলে উঠলেন, আমার স্বামী প্রথম হেনরী মুর। তিনি আমাকে ছেড়ে চলে যান বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যে। কোনো সন্তান নেই তার। আমি জানি না ইংল্যান্ডে তিনি এখন কোথায় আছেন। ভারতে আমি ওর সঙ্গেই এসেছিলাম।

'আপনার ঘরের টাঙানো রয়েছে যে মেয়ের ছবিটি ওটি কার?'

মিসেস মুর হেসে জবাব দিলেন, 'ও আমার ভাইঝি, বলতে পারেন বড়ই দুর্ভাগা।'

জিজ্ঞেস করলাম 'কেন'?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মুর, 'এখানকার এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল আমার ভাই, ওঁদেরই মেয়ে মার্গারেট। ওর বাবা মা দুজনেই মারা যান ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে ওর যখন দুবছর বয়স ঠিক তখন। ও আমার কাছেই মানুষ সেই থেকে।

'এখন ও কোথায় আছে?'

মিসেস মুর বললেন, 'ও স্কুল থেকে গেছে এক্সকারসানে, পনের দিন পর ফিরবে এবং ও থাকে পাশের ঘরটায়।

মন আমার বারবার অতীতে ফিরে যাচ্ছিল এই ছবিটাকে দেখার পরই। আমার ক্যাথরিনের কথা মনে পড়ছিল। আমার প্রথম প্রেমিকাই নতুন করে আমার কাছে হাজির হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছিল। ছটফট করতে লাগল আমার ভেতরটা ওকে দেখার জন্য। এই প্রথম টের পেলাম আমার ভেতরকার অস্থিরতা। বাগানে গেলাম খাওয়া দাওয়ার পর। আমার চারদিকে গাছপালা এবং মাথার উপর ছাদ। আমার জীবনে এর আগে এমন রোমান্টিক পরিবেশ দেখিনি।

'মিঃ ব্রাউন কি ভাবছেন'—মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মুর।

'পরিবেশ খুব সুন্দর, খুব ভাল লাগছে, আর কিছু নয়'।

মিসেস মুর হাসলেন এবং আমি তাকিয়ে দেখলাম ওঁর দিকে। রহস্যের আভাস দুচোখে। মিসেস মুরের দুচোখে বয়স ভেদ করে আবার কি আসতে চাইছে রমণীর চিরন্তন পিপাসা!

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিসেস মুর'—ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'কি বলুন।'

'মিঃ মুরের পর আপনার কাছে আর কোন পুরুষ আসেনি—আমি বলে উঠলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বললেন, একটি প্রয়োজনের অছিলায় মিঃ মুর হঠাৎ ইংল্যান্ড চলে গিয়েছিলেন। ওর একটি চিঠি পাই তার কিছুদিন পরেই। এখানে আর ফিরবেন না, এই বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে করেছেন ওখানে তিনি একজনকে। বোঝাতে পারব না আমি কি আঘাত যে ওতে পেয়েছিলাম। তিনি একটু থেমে আবার বললেন, আমি সবাইকে বলেছি যে তিনি মারা গেছেন একটি কঠিন অসুখে। আমাকে সবাই বিধবা বলে জানে সেই থেকেই। ভারতের একটি সংস্কার হল, যে এখানে বিধবাদের আলাদাভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এই সংস্কার নেই আমাদের ওখানে। নিজেকে আমার বেশ নিঃসঙ্গ লাগতো। তখন এই বাচ্চা মেয়ে মার্গারেট ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। মিমি ছিল ওর ডাক নাম। ওকে ভরাট করার চেষ্টা করছি আমার জীবনের ফাঁকগুলি দিয়ে। ওকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই কারণ পড়াশুনোয় খুব ভাল মেয়ে মিমি।

সামান্য একটু থেমে মিসেস মুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি একভাবে তাকিয়ে ছিলাম বাগানের গাছপালাগুলোর দিকে। আমার কানে এল মিসেস মুরের কণ্ঠস্বর, বছর বাইশ-তেইশ বয়স তখন আমার। খুব ভেঙে পড়েছি তখন স্বামীকে হারিয়ে। একজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ঠিক সেই সময়েই। পঞ্চাশের কাছাকাছি তার বয়স। তিনি ওকালতি করেন বোম্বের হাইকোর্টে। মনে প্রাণে ভারতীয়। দীর্ঘদিন মেলামেশা করলেন তিনি আমার সঙ্গে। বলা যায় আমি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম যদিও ওর আমার মধ্যে বয়সের একটা পার্থক্য রয়েছে। ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলামও একসময়। বিধবা বিয়েতে রাজি নন এটা তিনি জানিয়েছিলেন চিঠিতে, কেন জানি না। কারণ আমি যে বিধবা তা আমি ওঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি কলকাতায় চলে গেছেন এটা আমি পরে শুনেছিলাম। আর খবর পাইনি কোনো, মিঃ ব্রাউন আমার ভাগ্য সত্যিই খারাপ।

মিসেস মুরের গলা ধরে এল এবং জল চিক্ চিক্ করতে লাগল তার দুচোখের কোণে। মিসেস মুর, এই বলে আমি তার পিঠে একটা হাত রাখলাম।

তিনি মৃদু হাসলেন এবং চোখের জল মুছে বলে উঠলেন, আপনাকে বিব্রত করে ফেলেছি ডাঃ ব্রাউন এবং এজন্য আমি খুবই দুঃখিত।'

'না না, সেরকম কিছু নয়। চলুন আপনার মেয়ের ঘরে যাই।'

তিনি মার্গারেটের ঘরের দিকে এগোলেন আমাকে নিয়ে। খুব ছিমছাম ধরনের ছোটো ঘর, সেখানে রয়েছে একটি ছোটো খাট। ওর বাবা এবং মার একটি ছবি রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো।

আর একটি ছবি পড়াশুনোর টেবিলে রাখা রয়েছে। মার্গারেটের এখনকার তোলা ছবি, তাকিয়ে রইলাম একভাবে মার্গারেটের ছবির দিকে। এই নারী যেন অনন্তকাল ধরে আমার পরিচিত একথা আমার মনে হল। বারবার এই ছবিটার মধ্য দিয়ে ক্যাথরিন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। রহস্যে ঘেরা সৌন্দর্যময় মিষ্টি মুখের সেই ছবিটি আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মিসেস মুর বললেন, 'ভারী দুরন্ত স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। আমি যখন যা বলব ঠিক উল্টো করবে।

কিছু না বলে আমি হাসলাম। আবার বললেন মিসেস মুর, পড়াশুনোয় খুব ভাল তবে মিমি। আপনি বুঝতে পারবেন ওর সঙ্গে আলাপ করে। জ্বালিয়ে মারবে আপনাকে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'তা জ্বালাক না।' তখন ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে আমার মনের গোপন ইচ্ছা। জ্বলতেই তো চাই আমি। আমার রক্তে আমি একটি তীব্র উন্মাদনা বোধ করলাম আবার যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে। আমি আবার মিসেস মুরের দিকে তাকালাম। কি ছিল কি জানে আমার দুচোখের মধ্যে। মিসেস মুর এবার মুখটা নামিয়ে নিলেন।

।। চার ।।

কেটে গেছে এর মধ্যে নটা দিন। এখানে ভালই কাটছে মোটামুটি। মিসেস মুরের কোনোরকম আপত্তি নেই ওর নীচের তলার বৈঠকখানায় আমি যদি আমার চেম্বার করি। মিসেস মুরকে নিয়ে দশদিনের মাথায় একটু ঘুরে এলাম। আমাকে বারবার উন্মনা করে দিচ্ছিল গাড়িতে মিসেস মুরের স্পর্শ। এখনও মিসেস মুরের সর্বাঙ্গে যথেষ্ট যৌবন। ওর দিকে তাকালাম আমি গাড়ির মধ্যে ওর একটা হাত আমার হাতের উপর নিয়ে। মৃদু মৃদু হাসলেন মিসেস মুর, কিন্তু তিনি হাত সরিয়ে নিলেন না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন যখন বাইরে কিছু কেনাকাটা করে ঘরে ফিরলাম। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আমি তখন আমার ঘরে বসে। আমার ঘরে মিসেস মুর এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। আমি শুয়েছিলাম, তাই তিনি আমার পাশে বসলেন বিছানার উপরে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মুর, 'ডাঃ ব্রাউন আপনি নিশ্চয় এখন খুব ক্লান্ত বোধ করছেন।'

'না না। আমার রীতিমতো অভ্যাস আছে ঘোরাফেরা করা, মিসেস আপনি চিন্তিত হবেন না অত।'

আমার একটা হাত ধরলেন মিসেস মুর। তারপর বললেন, 'আমি খুব খুশী হব আপনি আমাকে যদি হ্যারিয়েট বলে ডাকেন, 'আপনি আমার বন্ধু, এই কথা তিনি একটু থেমে আবার বললেন।

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে আমরা তাহলে পরস্পরের বন্ধু।'

এবার তুমিতে নামলাম আপনি থেকে। 'পিটার বলেই তুমি আমাকে ডেকো হ্যারিয়েট', আমি একথা বলে উঠলাম।

হাসল হ্যারিয়েট। বেশ সুন্দর লাগে ওকে হাসলে। সৌন্দর্যময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী হ্যারিয়েট। একটা হাত রাখলো আমার কপালে হ্যারিয়েট। নিজেকে আমি সংযত রাখলাম কোনোক্রমে। যদিও আমার রক্তে দোলা লাগল। হ্যারিয়েট নিজে থেকে আমাকে এরপর চুমু খেল ঘণ্টা দুয়েক পরে। তারপর বলে উঠল, 'এখন খেয়ে নেওয়া যাক চল।'

বারান্দায় গিয়ে আমরা দেখলাম যে সামান্য মেঘ জমেছে আকাশে এবং হাওয়ার বেগ কম। খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম দুজনে একসঙ্গেই। যে যার নিজস্ব ঘরে তারপর চলে গেলাম। মৃদু হাসলো হ্যারিয়েট এবং আমাকে একটা চুমু খেল যাবার সময়। কিন্তু আর না দাঁড়িয়ে ওপরে উঠে গেল সোজা সিঁড়ি বেয়ে। তাকিয়ে রইলাম ওর যাওয়ার দিকে এবং দেখলাম যে ওঁর হাঁটার ছন্দ বেশ সুন্দর। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না ও মিলিয়ে যায়। বারবার শিহরণ লাগছিল আমার রক্তে। নারী সঙ্গ আমি একেবারেই পাইনি গত কয়েক বছর। বেশ্যাদের সঙ্গে অবশ্য রাত কাটিয়েছি মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে, খুবই সাময়িক অবশ্য সেই ব্যাপারটা। একটি তীব্র অবসাদ নেমে আসত তারপরেই আমার সারাটা শরীর জুড়ে। প্রেমিকা ক্যাথরিন এবং স্ত্রী সোফিয়ার কথা মনে পড়ত। অসহায় তখন আমি। একটি ভীষণ অস্থিরতা বোধ করতাম তখন। একসময়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি দিনের পর দিন। অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছি আমি আমার বন্ধু এবং পরিচিত জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে। আমার মাথায় কোনোরকম গোলমাল হয়েছে একথাই তারা ভাবত। তারা আবার

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত রীতিমতো স্বাভাবিক ব্যবহার করাতে। বুঝতে পারতো না তারা আমাকে। একদিন আমার বন্ধু মাইক নিউইয়র্কে থাকার সময় বলল, তুমি একজন সাইক্রিয়াট্রিস্টকে দেখাও পিটার, তোমার মধ্যে একটা গোলমাল হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম মাইককে, আমার মধ্যে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এটা তোমার মনে হল কেন?

মাইক জবাব দিল, ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছো তুমি আজকাল প্রায়ই, আবার বললো একটু থেমে, অনেক কমে গেছে তোমার স্মরণ শক্তি আজকাল, ভালো কথা বলছি আমি তোমাকে। তোমাকে ভাল পরামর্শ দেওয়াটা আমার কর্তব্য তোমার বন্ধু হিসাবে, এটা আমি মনে করি।

দেখি, সবই বুঝলাম তোমার কথাটা।

এক মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম মাইকের কথামতো কিছুদিনের জন্য। আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক সারিয়ে দেন, এটা আমার খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে। আমার পেশার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হত ব্যাপারটা যদি বেড়ে যেত। নিজেকে পুরোদমে আমি এরপর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ডাক্তারীতে। ডাক্তারীতে এরপর ডুবে যাবার পর আমি নারীদের ভীষণভাবে এড়িয়ে চলতাম। একশো হাত দূরে রাখতাম আমি বেশ্যাদের। মিসেস হ্যারিয়েট মুর, সেই মহিলা যার সঙ্গে আমার দীর্ঘকাল পরে ঘনিষ্ঠতা হল। রমণী হ্যারিয়েট স্বামী পরিত্যক্তা প্রেমে রীতিমতো ব্যর্থ। আমার সঙ্গে হ্যারিয়েটের মিল এটা বলা বাহুল্য। আমিতো স্ত্রী পরিত্যক্ত এবং প্রেমে ব্যর্থ একটি হতভাগ্য পুরুষ। আমার বিছানায় ছটফট করে কাটলো সারা রাত, কারণ আমার ঘুম আসছিল না কিছুতেই। হ্যারিয়েট আমার কাছে আসবে এটা আমি আশা করছিলাম প্রতিমুহূর্তে এবং একটি উম্মাদনা যেন রয়েছে আমার রক্তে। আমার আশা পূর্ণ হল না কিন্তু এইভাবেই আমার সারাটা রাত কেটে গেল। কে জানে হ্যারিয়েট তবে কি দ্বিধাগ্রস্ত! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভোররাতে এবং ঘুম ভাঙল ঠিক বেলা নটায়। চারদিক ঝলমল করছে রোদে। আমি উঠে বসলাম হ্যারিয়েটের ডাকে। হ্যারিয়েট চায়ের প্লেট এবং সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। পিটার তুমি তো ঘুমোও না এত বেলা অবধি, তবে কি তোমার শরীর খারাপ হ্যারিয়েট হেসে বলল।

'শরীর ঠিক আছে, এই বলে হেসে বাথরুমে ঢুকলাম। টেবিলে মুখ টুখ ধুয়ে বসে চায়ে চুমুক দিলাম। আমার কপালে হাত রাখলো হ্যারিয়েট। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, আমি, আরে কোনো চিন্তার কারণ নেই, আমি ঠিক আছি।

চা শেষ করলাম, এই মুহূর্তে বেশ জোরে সাগরের হাওয়া বইছিল, আমার মনের ভেতর তীব্র ঝড় বয়ে দিচ্ছিল তীব্র বেগের সেই হাওয়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম হ্যারিয়েটকে, 'দিন তিনেক বাদেই ফিরছে মার্গারেট।

'হ্যাঁ', চায়ে চুমুক দিয়ে হ্যারিয়েট বলল, 'তবে তোমাকে ও শান্তিতে থাকতে দেবে না কারণ ও খুবই চঞ্চল।'

সজোরে হেসে উঠে আমি হ্যারিয়েটের দিকে তাকালাম ভালভাবে। ওর রঙীন গাউনের ভিতর দিয়ে আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল সাদা রঙের সেই মোহময়ী বুকজোড়া, বেশ আকর্ষণীয় বলা যায় হ্যারিয়েটের দেহের গঠন এবং সেই কারণেই ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছিল শরীরের রক্ত। রীতিমতো ঝাঁ ঝাঁ করছিল কান দুটো। আমি বুঝি একেবারে উন্মাদ হয়ে যাব একথা আমার খালি মনে হচ্ছিল। তবু সংযত রাখার চেষ্টা করলাম নিজেকে যথাযথ। হ্যারিয়েট নিজে থেকেই এগিয়ে আসুক এটাই আমি চাইছিলাম। এর জন্যে ক্ষতি নেই আমাকে অপেক্ষা করতে হলেও। কিন্তু ও যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে কি হবে! আমি তো শিউরে উঠলাম ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে। সত্যিই অসম্ভব আমার পক্ষে হ্যারিয়েটকে বিয়ে করা।

মার্গারেট আসার আগের দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা ঘরে শুয়ে আছি। বাইরে অন্ধকার কারণ রাত তখন এগারোটা। একটা নীলচে রঙের মৃদু আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। একটা সিগারেট খাচ্ছিলাম বিছানায় আধশোওয়া হয়ে। প্রচণ্ড অস্থিরতা মনের মধ্যে কারণ কাল মার্গারেট আসবে। আমাকে কিভাবে নেবে তা কে জানে। মিমি, মিমি, আমি উচ্চারণ করছিলাম এই নামটা খালি মনের মধ্যে। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। সেই স্বচ্ছ সাদা রঙের

গাউন পরনে। মুখের দিকে তাকালাম ওঁর। আমার পাশে এসে বসল হ্যারিয়েট। কি ভাবছো পিটার, সে বলে উঠল আমার একটা হাত ধরে।

তোমার কথাই ভাবছি হ্যারিয়েট। আমি বলে উঠলাম মৃদু হাসি দিয়ে।

হ্যারিয়েট সজোরে হেসে উঠে বলল, 'আমার সৌভাগ্য,' ওর স্তন দুটো দুলে উঠল ওর হাসির দোলায়। আমি সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিলাম না। ওকে নিজের কোলে টেনে নিলাম ওর একটা হাত ধরে। ওর ঠোঁটে, গালে, সর্বাঙ্গে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম। দোলা লেগেছে হ্যারিয়েটের রক্তে। ফিসফিস করে বলে উঠলো পিটার আমি আর পারছি না, আমাকে তুমি ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দাও।

আমার হাতের স্পর্শে সজাগ হয়ে উঠেছে ওর নরম বুক। আজ ফেটে পড়তে চাইছে বহুদিনের জমানো কামনা। ঘরের এক কোণে ওর গাউনটা খুলে ফেলে দিলাম। ঘরের মধ্যে জ্বলছে মৃদু নীলচে আলো এবং বিন্দুমাত্র পোশাক নেই তখন আমার শরীরেও। অন্ধকার বাইরেটা এবং তার মধ্যে জানলার পর্দাগুলো বাতাসে উড়ছিল, ক্রমশঃ বাড়ছিল যেন হাওয়ার বেগ। আমরা ডুবে যাচ্ছিলাম স্বর্গীয় সেই পরম সুখের গভীরে একটু একটু করে। জানি না কখন যে উন্মাদনা শেষ করে ক্লান্ত দেহে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে দেখি হ্যারিয়েট নেই। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা ছোট্ট কাগজ রয়েছে পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া। খুলে দেখি তাতে লেখা রয়েছে, 'তোমাকে আমি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে পেতে চাই পিটার, তুমি আমার সব কিছু, আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?

মাথাটা গরম হয়ে গেল চিঠিটা পড়েই। ওটাকে মুড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলাম আমি জানালা দিয়ে। 'অসম্ভব, একথা আমি নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললাম। মার্গারেটের মুখ তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

।। পাঁচ ।।

ঠিক দুপুর বারোটার সময় নিজেকে বাগানের একটি চেয়ারের মধ্যে বসে খবরের কাগজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাছে বেশ ভালই লেগে গেছে বোম্বে শহরটা। এখনকার স্বাধীন ভারতবর্ষ ঘুরে দেখার ইচ্ছা আছে। এ দেশের কাছে সারা পৃথিবীর অনেক প্রত্যাশা। আমাকে মুগ্ধ করেছে এর প্রাচীন দর্শন, ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি। এ দেশের কতো বিরাট এবং পুরনো সভ্যতা। এই ভারতবর্ষ মহান। আমি মোটেই ভারত বিদ্বেষী নই, বিশলিং কিংবা আর অন্য পাঁচটা ইংরেজের মত। ডাক্তারী করব আমি এখানেই। বাকী জীবনটা আমি কাটিয়ে দেবো এখানকার জনসাধারণের সেবাতেই। আমি হ্যারিয়েটের চিঠির উত্তর দিইনি। বারকয়েক দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। আমার চিঠি পড়েছো, একবার জিজ্ঞেস করেছিল।

'হুঁ', সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি ঘাড় নেড়ে।

মার্গারেটকে আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত, ও আসছে আজই একটা মেয়ে আঠারো বছরের। তবু বুক ধুকপুক করছিল আমার ওরই জন্য। আমি যেন অনন্তকাল ধরে চিনি মার্গারেটকে। আমার কাছে একটা পবিত্র সত্ত্বা যেন মিমি। আমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম, এটা আমি ওকে না দেখেই ভাবলাম। একবার চেষ্টা করলাম খবরের কাগজটা মন দিয়ে পড়বার। মন বসছিল না যেন কিছুতেই। বারবার ঝাপসা হয়ে আসছিল চোখের সামনের অক্ষরগুলো। একটা গাড়ীর শব্দে আমার চমক ভাঙলো হঠাৎ। ভেতর থেকে একটা মেয়ে নামল এটা দেখলাম। রঙ খুব ফর্সা নয় এবং ছিপছিপে মাঝারী উচ্চতার চেহারা। একটু বাদামী ভাব। আমার কাছে হ্যারিয়েট ওকে নিয়ে এলো। মার্গারেট আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাছে এখন রক্ত মাংসের নারী মার্গারেট, যে ছিল এতদিনের ছবি। ওর কাছে আমার পরিচয় দিল হ্যারিয়েট। হেসে উঠল মার্গারেট খিলখিল করে। তারপর নমস্কার করলো আমাকে। দুষ্টুমির ঝিলিক ওর চোখ দুটোয়। আমি ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে লাগলাম ওর সেই কালো আর টানা চোখের গভীরে। 'মিমি, তুই গল্প কর মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে, আমি খাবার নিয়ে আসি, হ্যারিয়েট বলে উঠল।

চলে গেল হ্যারিয়েট। 'পিটার তোমার রেহাই নেই', সে যাবার সময় বললো মৃদু হেসে।

আমি হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'কি ধরনের বই পড়তে ভাল লাগে তোমার?'

মার্গারেট প্রস্তুত ছিল না ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য। সে ঘাবড়ে গেল প্রথমটা এবং তারপর হেসে উঠল খিলখিল করে। সে বলে উঠল, 'আমি সবধরনের বই পড়ি। আমি প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে। সবকিছু পড়া ভালই তো, তাই না।'

হেসে উঠল তারপর খিল খিল করে এবং বলে উঠল, 'কি বলে ডাকবো আমি তোমাকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ওর রহস্যময় চোখে সমুদ্রের গভীরতা। ওর নিটোল বুক দুটো ওঠানামা করছিল হাসির চোটে। একে না হলে আমার চলবে না, এটাই আমি ভাবতে লাগলাম। আমি অপেক্ষা করছি যেন জন্মজন্মান্তর ধরে এই নারীর জন্যেই, নরকে যেতে কোনো ভয় নেই আমার এই জন্যে। বললাম, 'তোমার মায়ের বন্ধু আমি, পিটার বলে ডাকে তোমার মা আমায়, তোমারও বন্ধু হতে চাই আমি, তুমি কি বল।'

'তোমাকে তাহলে আমিও পিটার বলে ডাকব সে থামিয়ে দিয়ে বলল। হেসে উঠল আবার ও এই কথা বলে। আমার শরীরের ভেতর রক্তের দোলা বাড়ছিল। খাবার পরিবেশন করতে লাগল হ্যারিয়েট। মার্গারেটের দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি বার বার। আমার কৈশোর বয়সের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখামাত্রই। ক্যাথরিনের কথা মনে পড়ছিল এবং মোচড় দিয়ে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটা। আবার সেই যৌবনের প্রারম্ভে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে মার্গারেট বলল, 'তাজমহল দেখতে নিয়ে যাবে আমাকে?'

আমি বললাম, 'যাবো নিশ্চয়ই, বাইরে নিজেকে সংযত রাখলাম যদিও ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলাম। সেই যৌবনের প্রারম্ভে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল। হ্যারিয়েটকে মা বলে ডাকে মার্গারেট পিসীমার বদলে। বললো, 'সবাই তাজমহল দেখে আসি চলো মা।'

'মিমি এখন খেয়ে নাও ঠিক আছে যাওয়া যাবে।' ওর মাথায় হাত দিয়ে একথা বললো হ্যারিয়েট। খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলাম এবং মাঝে মাঝে আমি তাকাচ্ছিলাম মার্গারেটের দিকে। সামান্য মেঘ জমেছে আকাশে এবং কিছুটা রৌদ্র ম্লান হয়েছে। বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে গরমকালের এই সময়টা। এখন হ্যারিয়েট নেই, তাই পায়ের গোড়ালিতে হাত রেখে একটু ঝুঁকে বললো মার্গারেট। আবার কি কামড়ালো আমায়।

আমি চেয়ার থেকে উঠে গেলাম মার্গারেটের চীৎকারে এবং ওর গোড়ালিতে হাত দিয়ে দেখতে লাগলাম। চুপচাপ বসেছিল মার্গারেট কিন্তু আমার ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না ওর পাটা। হাত বুলোতে লাগলাম বেশ খানিকক্ষণ ধরে, বলে উঠলাম এখন কমেছে মার্গারেট।

খিলখিল করে হেসে বলল মার্গারেট, কিছুতো আমাকে কামড়ায়নি। দুষ্টুমীর ঝিলিক ওর দুচোখে। আমি এবার ওর একটা হাত ধরে বললাম, 'কি হচ্ছে, বদমাইসী।'

আমার পেটের কাছে টেনে আনলাম ওঁর মাথাটা এই কথা বলেই। এক হাতে ওর চিবুকটা তুলে নিয়ে মুখটাকে তুলে ধরলাম, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল ও। আমি এর আগে কোনো নারীর এমন মিষ্টি হাসি দেখিনি। ওর গালে টোল পড়ে হাসলে। আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারি এই জন্য এবং হাঁটতে পারি এর জন্য হাজার মাইল। আমি টিপে দিলাম ওর গালটা এবং ওর জিভের সঙ্গে ঠেকালাম নিজের জিভটা বের করে। নিজেকে তার আগেই ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে দৌড় লাগাল মার্গারেট। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হেসে বলে উঠল, 'পিটার ও তোমাকে খুব বিরক্ত করছে, না।'

—'না না, আমার খুব ভাল লাগছে ওর ছটফটে স্বভাবটা, কারণ আমি সহ্য করতে পারি না কোনো গোমড়া মুখো মেয়েকে।'

হ্যারিয়েট মৃদু হেসে বলল, ওর মন এখনও সেই বারো তেরো বছরে রয়েছে যদিও বয়স ওর আঠারো পেরিয়ে গেছে। ও কিন্তু এখনও এতটুকু গম্ভীর হতে শেখেনি।

ও গম্ভীর হলেই বরঞ্চ বুড়িয়ে যাবে। মৃদু হাসলো হ্যারিয়েট। বলে উঠল, তুমি বুড়োটে মেয়েদের একেবারেই পছন্দ কর না। কিন্তু ওদিকেই তো এগিয়ে চলছে তোমার বয়সটা।

হ্যারিয়েট, বয়স হলেও আমি এখনও রীতিমতো যুবক, আমি হ্যারিয়েটের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম।

হ্যারিয়েট রহস্য মাখানো হাসি হেসে বলল, 'আমি তো সেই পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন রাতেই। চোখের দিকে তাকালাম হ্যারিয়েটের এবং দেখলাম সেই চোখে ভাললাগার ইঙ্গিত। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি ভেতর ভেতর। আমি ভাবতেই পারছি না হ্যারিয়েটকে বিয়ে করার ব্যাপারটা। মার্গারেট, আমার মিমি, আমার ছোটো মিমি এখন রয়েছে আমার সমস্ত মন জুড়ে। ও অষ্টাদশী। আমি সারা জীবন থাকতে চাই ওর ওই নরম নিটোল বুকের মাঝখানে মাথা দিয়ে।

হঠাৎ আমার একটা হাতের উপর হাত রেখে হ্যারিয়েট বলে উঠল, পিটার কি ভাবলে তুমি আমাদের ব্যাপারটা।

শিউরে উঠলাম আমি এবং ভাবলাম ঠিক এই মুহূর্তে ওঁকে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এ বাড়ির পাট তাহলে চুকিয়ে ফেলতে হবে আমাকে। আমার পক্ষে সেটা একটা আত্মহত্যার সামিল হবে। আমার কাছ থেকে তাহলে সারা জীবনের মত হারিয়ে যাবে মার্গারেট। আমি সেটা কিছুতেই পারব না সহ্য করতে। তাই বললাম, আমি ভেবেছি তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারটা। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এই যা যে একটু দেরী হবে। ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। হ্যারিয়েটের দুচোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল এবং সে বলে উঠল, 'পিটার কিন্তু এর কারণ কি?'

এখানে আসলে আমি একটু গুছিয়ে বসতে চাই। চেম্বার খোলার ইচ্ছা আছে আমার। রোগী দেখব খুব কম পয়সায়। এমন কি বিনা পয়সাতেও, আমি শ্রদ্ধা করি ভারতকে। এখানকার মানুষ জনেদের কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আমি আমার ছোলেবেলায় মাকে কথাটা বলতে, শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন মা।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, ঠিক আছে, এই বলার পর একটি দীর্ঘশ্বাস বেরোলো তার বুক থেকে। অনেকক্ষণ চুপচাপ আমি এবং হ্যারিয়েট বসে থাকার পর এক সময় দেখলাম মার্গারেট গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

।। ছয় ।।

এরপর দিন দশেক কেটে গেছে। মার্গারেট একটু যেন আমাকে এড়িয়ে চলছিল। সেদিন রাত আটটার সময় নিজের ঘরেই বসেছিলাম আমি। বই পড়ছিলাম একটি চেয়ারে বসে। এটির বিষয় হচ্ছে নরনারীর যৌন জীবন। রাত দশটার আগে ডিনার হয় না তাই ডিনারে বসতে আজ এখনও অনেক দেরী। হ্যারিয়েট রান্নাঘরে রীতিমতো ব্যস্ত। এক কাপ চা দিয়ে গেছে হ্যারিয়েট ঘণ্টাখানেক আগে। আমি চাইনি কিন্তু ও নিজে থেকেই চুমু দিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি আপত্তি করি নি। কিন্তু ওকে পাল্টা টেনে ধরে চুমু আমি খাই নি। কি করছে নিজের ঘরে মার্গারেট কে জানে। ভেজানো ছিল আমার ঘরের দরজাটা। আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে রইল হঠাৎ সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ পেয়ে। দরজা খুলে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো মার্গারেট। আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল ওকে দেখা মাত্রই। খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পেছনে থেমে গেল ও। একটা রঙীন পাতলা ফ্রক ওর গায়ে। ওর কোমল স্তন দুটো ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে পাতলা ফ্রকের ভিতর দিয়ে। আমার চোখে পড়ল ওর সবুজ রঙের প্যান্টিটা। ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল আমার বুকের স্পন্দন। বই পড়তে লাগলাম তবু আমি নিজেকে যথাযথ সংযত রেখে। একটা অধ্যায় রয়েছে নরনারীর যৌনমিলনের উপর। আমার কাছে এগিয়ে এসে মার্গারেট একেবারে আমার কাঁধে হাত রাখলো। ওর কুণ্ঠা আমি বুঝতে পারলাম। আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে। কোমরটা জড়িয়ে ধরলাম ওর একটা হাত দিয়ে। বই পড়তে লাগলাম সেই অবস্থাতেই। ও সরে গেল না। কী বই পড়ছো, ও জিজ্ঞেস করলো।

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম,—'বিজ্ঞানের বই।' এবারে ও একটু ঝুঁকে পড়ল। আমার শরীরে ঠেকলো ওর স্তনটা একবার। ওর কোমর থেকে আমার হাতটা আর একটু নীচে নেমে গেছে। 'দেখি' বলে ও একটু ঝুঁকল।

কিছুক্ষণ দেখল এই বলে এবং তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বলে উঠল, 'কি অসভ্য বই। একটা ফোটো ওর চোখে পড়েছে যা ছিল নরনারীর মিলনের ওপর। চেপে ধরে আছি ওকে আমি। প্রচণ্ড উত্তেজনা তখন ভেতরে। আমি ওকে টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসালাম যখন ও

নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে, মৃদু হাসলাম, কেন, কোথায় দেখলে অসভ্য ব্যাপারটা?

মার্গারেট হেসে বলল, বইতেই তো রয়েছে, টেবিলের একধারে আমি রেখে দিলাম বইটাকে মুড়ে। একটি নরনারীর মিলনের ছবি রয়েছে মলাটে। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নেওয়া হয়েছে ছবিটি। গঠন শৈলী খুবই অপূর্ব এবং এমন শিল্পসম্মত কাজ সত্যিই খুব কম দেখা যায়। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মার্গারেট ছবিটার দিকে। হাত দিয়েই আছি আমি ওর কোমরে। ওর শরীর ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে এটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার কোলে বসালাম ওকে আমি আলতো করে টেনে নিয়ে। তুমি কি পড়বে বইটা, আমি বললাম এই কথাটা।

ছেলেমানুষী ভঙ্গী নিয়ে ও ঘাড়টা নেড়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে', আমি ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, যদি তুমি পড়াশুনা ভাল করে কর তাহলে আমি তোমাকে দেবো।

আমি কোনোরকমে সংযত রাখতে পারছিলাম না নিজেকে। চুমুতে অস্থির করে তুলব বলে ভাবছিলাম। হ্যারিয়েট যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে বলে সাহস হচ্ছিল না। আমার ঠোঁটের সামনে টেনে আনলাম ওর চোয়ালটা একহাতে ধরে, একটা চুমু খেলাম তারপর গভীর ভাবে। তখন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল আমার শরীরে। মার্গারেট আমার কোল থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো আমি আর একটা চুমু খাবার আগেই। বিষণ্ণ ওর চোখ দুটো। ঠোঁটটা একবার মুছলো হাতের পিছন দিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারপর একছুটে। আমি বসে রইলাম হতভম্ব হয়ে। কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না আমার ব্যাপারটা। আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি মার্গারেটের অদ্ভুত আচরণে। বলবে না তো ও হ্যারিয়েটকে। উল্টে রাখলাম বইটা এবং হ্যারিয়েট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তার মিনিট পাঁচেক বাদেই। সে এসে বসলো আমার সামনের চেয়ারটায়। তোমাকে একটু আগে মিমি বিরক্ত করছিল না, সে একথা বললো মৃদু হেসে।

একবার ঢোঁক গিললাম আমি। 'না তো', তারপর কোনোক্রমে বললাম।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, কিছুতেই ও আজকাল পড়াশুনা করতে চায় না। বড্ড বদমাশ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর বইটা হাতে নিয়ে ও দেখতে আরম্ভ করলো পাতা উল্টে। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে বলল, তোমাকে ও আর মানবে না, ওকে তুমি বেশি আদর দিও না।

আমি ঘামছিলাম এতক্ষণ। ঘামটা শুকোচ্ছে বলে এবার মনে হল। পাখাটা ঘুরছিল যে মাথার উপর তা আমি এতোক্ষণ টের পাইনি। এবার টের পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ওর মাকে তাহলে বলেনি ব্যাপারটা মার্গারেট। আমার সামনে এসে দাঁড়াল হ্যারিয়েট। কাঁধে রাখলো তার দুটি হাত। আমাকে উত্তেজিত করে গেছে মার্গারেট আগেই। এখনো কাটেনি তার রেশ। ঘরের দরজায় আমি উঠে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলাম। হ্যারিয়েটের গাউনটা খুলে চেয়ারের মাথায় রেখে দিলাম ওকে একটা চুমু খেয়ে। হ্যারিয়েটকে পাথরের মূর্তির মত লাগছিল সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে। বিছানাতে নিয়ে গেলাম আমি ওকে সোজা কোলে করে এবং তারপর নিভিয়ে দিলাম আলোটা।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর। সমুদ্র উপকূলে বেরিয়ে এলাম একদিন হ্যারিয়েট, আমি আর মার্গারেট। ভাল করে কথা বলছে না ইদানীং আমার সঙ্গে। বাগানে বসেছিলাম এবং তখন সবে বিকেল হয়েছে। একটি টেবিলে পত্রিকা পড়েছিল তখন আমার সামনে। পত্রিকাটা আমার নয়। ওটা একটি মেয়েদের পত্রিকা এবং হ্যারিয়েট ওটা নিয়মিত পড়ে। পত্রিকাটি উল্টে পাল্টে দেখে আমি রেখে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি পড়ে ফেলেছি একটি বিখ্যাত লেখিকার গল্প। প্রথমে অশ্লীল মনে হলেও পড়ে দেখলাম যে ভদ্রমহিলা ঠিকমতো লিখতে পারেন নি এবং কাহিনীটা অশ্লীল নয়। কাহিনীটা সংক্ষেপে বলা হল যে, বিপ্লবী দল যাতে রয়েছে তিনজন সশস্ত্র বিপ্লবী তারা লুকিয়ে আছে গোপন একটা ডেরায়। ওদের খোঁজে চারিদিকে তোলপাড় করছে পুলিশ। একজন নারী এবং দুজন পুরুষ রয়েছে ওদের মধ্যে। মেয়েটি ঐ দুজনের মধ্যে একজনকে ভালবাসলেও দেহ দিলো আরেকজনকে। এটাই ছিল কাহিনীর বিষয়বস্তু। পত্রিকার পাতাগুলি কিন্তু হাওয়ায় উড়ছিল। হ্যারিয়েট চা দিয়ে গেছে একটু আগে। চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম আস্তে আস্তে। হঠাৎ দেখলাম মার্গারেট একটা বই হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। চা খেয়ে

যাচ্ছিলাম আমি ওকে না দেখার ভান করে। আমাকে বললো মার্গারেট, 'ঐ রকম বই তুমি পড়ো কেন সবসময়?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম বই'।

কোনো জবাব দিল না মার্গারেট, সে শুধু একবার তাকালো টেবিলের পত্রিকার উপর। ও কি বলতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি তাই হেসে বললাম, 'ওটা আমার নয়, ওটা তোমার মায়ের।'

চেয়ারে বসে পড়লো মার্গারেট। 'তুমি মায়ের সঙ্গে মিশবে না', একথা হঠাৎ সে বলে উঠল অসন্তুটি ভঙ্গীতে।

মার্গারেট বলেটা কী? আমিতো শুনে রীতিমতো অবাক। বলে উঠলাম, ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই মায়ের সম্পর্কে।

এবার রেগে গিয়ে মার্গারেট আমার কোলে ছুঁড়ে মারল ওর বইটা। তারপর বলে উঠল ঝাঁঝিয়ে, তুমি তাই করবে যা আমি বলছি।

এই বলে ও আর না দাঁড়িয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল ছুটে। স্থির হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ও চলে যাবার পর আমি কোল থেকে বইটা নিলাম এবং ওপরটা দেখলাম। এটা একটি কমিক্‌সের বই। পোষা কুকুরটা ছাড়া পেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। হ্যারিয়েট আমার সামনে এসে বসল কিছুক্ষণ পরে। মুখটা ওর খুবই গম্ভীর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘের আনাগোনা। কি হলো হ্যারিয়েট, জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হ্যারিয়েট বলে উঠল বিরক্তি মাখা স্বরে, 'পিটার আর বলো না, কি বলবো তোমায়, মিমি যে কি কথার অবাধ্য, লন্ড্রীতে ওর স্কার্ট দুটো দিয়ে আসতে বললাম, এতই একগুঁয়ে যে কিছুতেই গেল না। বলে কি, তুমি গল্প করবে আর আমি যাবো, তাই আমি ভাবছি কি যে, আমি ওকে বোর্ডিং এ পাঠিয়ে দেবো।'

কেঁপে উঠলাম আমি, এ হতেই পারে না। আমার কাছে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে যদি মার্গারেট আমার চোখের সামনে না থাকে। কিছুতেই আমি বাঁচবো না।

।। সাত ।।

সকাল দশটা, সেদিন হ্যারিয়েট বাড়িতে ছিল না। কোনো দরকারে গেছে হয়তো। যাবার সময় বলে গেছে ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে। আমি বই পড়ছিলাম আমার ঘরে বসে। রেডিওতে খবর হচ্ছিল, কিন্তু আমি আসলে পড়ছিলামও না এবং শুনছিলামও না। আমি মার্গারেটের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম। ও কখন আসে তা প্রতি মুহূর্তেই আশা করে ছিলাম। দরজাটা ভেজানো রয়েছে। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমার কাছেই আসছে কি তবে আমার প্রেমিকা। বসে রইলাম আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে এবং দরজার সামনে এসে থেমে গেল পায়ের শব্দ। মিনিটখানেক কাটার পর আমার দরজাটা একটু একটু করে খুলে ঘরে ঢুকলো মার্গারেট। আবার ভেজিয়ে দিলো দরজাটা ঠিক তেমন ভাবেই। একেবারে আমার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো, হাসিমুখে। আমি ওর একটা হাত ধরাতে, খানিকটা এগিয়ে এলো ও। তোমার মা কোথায়, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ব্যাঙ্কে' ও জবাব দিল।

ব্যাঙ্কে গেছে, সেকি? তবে যে বললো আজ কার বাড়ি যাবে। মার্গারেট আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'হ্যাঁ ব্যাংকের পাশেই এরিনা আন্টির বাড়ি যাবে'।

বেশ দেরি হবে তো তাহলে।

মার্গারেট জবাব দিল, 'হ্যাঁ ব্যাংকে আজ তো একটু ভিড় হবে, তাই দেরী তো হবেই।

মার্গারেটকে কাছে টেনে নিয়েছি কথা বলতে বলতেই। ওর গায়ে একটা রঙীন পাতলা ফ্রক। ভেতরে কিছু নেই বলেই আমার চোখে পরিষ্কার ধরা দিচ্ছিল ওর দেহের অনুপম সৌন্দর্য। আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে ও আর বাধা দিল না। ওর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল এবং আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে গিয়ে আমি তখন আর আমাতে ছিলাম না। একটার পর একটা বিস্ফোরণ ঘটছে মাথার

উপর। মার্গারেট তুমি রাগ করেছো, আমি বলে উঠলাম অস্ফুটে।

বিড় বিড় করে ও বলে উঠল, কই নাতো। আমি চুমু খেতে লাগলাম ওর নরম আঙুরের মত ঠোঁটে, পাগলের মতো। আমার সোনামনি মিমি, একথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, আজ আর থাকবে না বুঝি কোনো বাধাই। ওর ফ্রকের উপর দিয়ে স্তনে আমার হাত চলে যাচ্ছে বারবার। বারবার ও সেই সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করছিল। ওর পুরো ফ্রকটাই খুলে দিয়ে একসময় আমি হাত দিলাম ওর উরু সন্ধিতে। আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলাম ওর লোমহীন উরুতে হাত বোলাতে বোলাতে। ওর পাখির মত নরম দেহটাকে তুলে নিয়ে বিছানায় গেলাম এবং আমার শরীর তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। দরজার বেলটা ঠিক তখনই বেজে উঠল যেই মাত্র আমি ওর পরম গোপন সম্পদের সঙ্গে আমার নিজের সংযোগ ঘটিয়েছি আমার সমস্ত উত্তেজনা শেষ ঠিক তখনই। ফ্রক পরে নিয়েছে মার্গারেট। আমি ওকে ওর নিজের ঘরে চলে যেতে বললাম এবং তারপর এগিয়ে গেলাম বাড়ির সদর দরজার দিকে। এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য, হ্যারিয়েট দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে। মুখ যন্ত্রণায় নীল এবং ব্যান্ডেজ রয়েছে পায়ে। আমার ঘরের বিছানাতেই শুইয়ে দিল ভদ্রলোক ওকে নিয়ে গিয়ে। 'কিভাবে ঘটলো', আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'রাস্তায় প্রচণ্ড জোরে একটা সাইকেল ওকে পিছন থেকে' ধাক্কা দেয়। জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

যন্ত্রণায় ছটফট করছিল হ্যারিয়েট এবং সামান্য লাল হয়ে গেছে ব্যান্ডেজটা। আমার ঘরে এসে হাজির মার্গারেট, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কাঁদতে আরম্ভ করে দিলো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'সে কোথায় গেল, যার সাইকেল?'

ম্লান হাসলেন ভদ্রলোক। 'আমি সেই লোক' ভদ্রলোক বললেন, 'দোষ ওনার ছিল না দোষ আমারই, রাস্তার একপাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি এবং পেছন থেকে আমি ওকে ধাক্কা মারি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কাছেই একটা ডাক্তারখানা ছিল এটাই আমার ভাগ্য ভাল।'

চুপচাপ রইলাম কারণ আমার আর কিছুই বলার ছিল না। নিজের ঠিকানা কিছুক্ষণ পর আমাকে দিলেন ভদ্রলোক এবং বললেন, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন প্রয়োজন হলে, অবশ্য আবার আমি আসবো'।

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং আমি হ্যারিয়েটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর কাছে বসে। মার্গারেট বসে রইলো পায়ের কাছে চুপচাপ। হ্যারিয়েট একসময় ঘুমিয়ে পড়লো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। আমাদের বাধ্য হয়ে সেদিন হোটেলেই খেতে হল।

হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরে এলাম আমি আর মার্গারেট। আমি হ্যারিয়েটের ঘরে থাকলাম সেদিন সারা বিকালটাই। বারবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি ওর। ঘুমিয়ে পড়ল ও একসময়। একটু স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করলাম আমার মধ্যে কারণ আমার তেমন একটা দুঃখ হচ্ছিল না। আমার মনে খুব একটা দাগ কাটেনি হ্যারিয়েটের দুর্ঘটনা এবং তার ফলে নিজেই আশ্চর্য হলাম। রাত দশটায় চুপিচুপি গিয়ে হাজির হলাম মার্গারেটের ঘরে। দরজা ভেজানো ছিল এবং বিষণ্ণ মুখে বিছানায় শুয়েছিল মার্গারেট। আমাকে দেখেও ওঠার কোনোরকম লক্ষণ দেখলাম না ওর। আমি হাত রাখলাম ওর মাথায়। বললাম, 'তোমার ভয়ের কিছু নেই, কারণ তোমার মা শিগ্‌গির সেরে যাবে।'

ওর মন খুব ভেঙে পড়েছে, ও যেমন ছিল তেমনই রইল। আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর মাথায়। আমার মধ্যে ভেতরে একটা চাপা ভাললাগা কাজ করে যাচ্ছে, যদিও বাইরে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমি আমার পরমপ্রিয়া মার্গারেটকে একবার কাছে পেতে চাই হ্যারিয়েটের অসুস্থতার সুযোগে। তোমার মায়ের পায়ে সামান্য লেগেছে, তো তার জন্য অত ভেঙে পড়ছো কেন মিমি, তেমন কিছু হয়নি, দেখবে উনি সেরে উঠবেন সপ্তাহখানেকের মধ্যেই।

মার্গারেট এতক্ষণ পাশ ফিরলেও এবার চিৎ হলো। আমি বসে আছি ওর পাশের বিছানায়। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে হ্যারিয়েটকে তাই ওর ঘুম ভাঙার কোনো সুযোগ নেই। ও আমার দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করলো এখনও কি ঘুমোচ্ছে মা।

ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওকে, তাই ওর ঘুম ভাঙবে না কাল সকালের আগে—আমি তাকালাম ওর দুচোখের দিকে। ওর অপূর্ব দেহটা দেখা যাচ্ছিল পাতলা ফ্রকের নীচে।

হাজার হাজার পোকা যেন নেচে বেড়াচ্ছে আমার মাথার মধ্যে। ওর গালে হাত বুলোতে লাগলাম আমি। ওকে পাগলের মত চুমু খেতে আরম্ভ করলাম ওর ওপর শুয়ে পড়ে। ছটফট করতে লাগল মার্গারেটের শরীরটা। আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে ও। ঘরের দরজাটা খিল দিয়ে এলাম আমি একবার উঠে গিয়ে। জ্বালিয়ে দিলাম নীল আলোটা। দুচোখে মার্গারেটের তখন ঘোর আসছে। আবার আমি এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ও আমার পিঠটা খামচে ধরছিল আমার অসহ্য চুমুতে অস্থির হয়ে গিয়ে। আমার কাছে এই মুহূর্তে ও একজন পরিপূর্ণ নারী। ও আমার স্বপ্নের নায়িকা। আমি হাজার হাজার মাইল হাঁটতে রাজি এই মার্গারেটের জন্যেই। খুলে দিয়েছি ওর ফ্রকটা। কোনো পোশাক ছিল না আমার শরীরেও। হাত রাখলাম আমি ওর উরুসন্ধিতে। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ছটফট করছিল একটা অসহ্য সুখের অনুভূতিতে। ওর মুখ থেকে বেরোচ্ছিল একটা অস্ফুট শব্দ। আমি মিলিত হলাম এই প্রথম মার্গারেটের সঙ্গে। আমরা ভেসে বেড়াতে লাগলাম একটি তীব্র স্বর্গীয় সুখে। আমাদের কাছে এখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমি আর আমার স্বপ্ন-নায়িকা মার্গারেট এখন একা এই পৃথিবীতে। পরস্পরকে আমরা নিঃশেষ করে দিলাম তীব্র আনন্দের শিখরে ওঠার চরম মুহূর্তে।

ওর পাশে ক্লান্ত শরীরে শুয়ে রইলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম ওর চুলে আমি। আমাদের বয়সের যে একটা বিরাট ফারাক আছে তা আমার মনে হচ্ছিল না। আমাকে বিয়ে করতে চায় ওর মা স্বয়ং হ্যারিয়েট। মার্গারেট এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ক্লান্ত শরীরে। ওকে একটা চুমু খেলাম আমি এবং তারপর ফ্রকটা ওর ওপর চাপা দিয়ে দিলাম। তারপর পোশাক পরে নিজের ঘরে চলে এলাম। রাত তখন বারোটা। হ্যারিয়েটের ঘরে উঁকি মারলাম আসবার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামতে। ও ঘুমোচ্ছে অকাতরে। আমার ঘরে চলে এলাম আমি পা টিপে টিপে। বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। আমি আজ নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছি মার্গারেটের দেহের প্রতিটি সম্পদ। একটা কুকুর যেন চীৎকার করে উঠলো কোথা থেকে। এ বাড়ির কুকুরটা ঘুমোচ্ছে। একটা বেড়ালের কান্না ভেসে এল দূর থেকে। আমার ভেতরে ন্যায় অন্যায় কোনো কিছুরই বোধ নেই এই মুহূর্তে। মার্গারেটকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আমি শুধু একথাই ভাবছিলাম। হ্যারিয়েট আমার সামনে একটি বাধা। হ্যারিয়েটের কাছে ধরা পড়ে যেতে হবে একদিন এরকম ভাবে চললে। কি হবে তখন। খেয়াল নেই একথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার পরের দিন সকালে নটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো।

।। আট ।।

মাসখানেক কেটে গেছে এরপর। সবটাই প্রায় সেরে গেছে হ্যারিয়েটের পা। এখন সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। ওটাও কমে যাবে কিছুদিনের মধ্যে বলে মনে হচ্ছে। একটা অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে ওর মধ্যে যে ও মাঝেমাঝেই ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভালভাবে কিছু গুছিয়ে বলতে পারে না তখন। ভীষণ অমনোযোগী হয়ে পড়ে এমনকি কথাবার্তা শোনার পরেও। দিন কয়েকের মধ্যে ব্যাপারটা সেরে ওঠে অবশ্য। এটা বেশি দিন থাকে না। হ্যারিয়েট স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং পড়াশুনায় মন দিয়েছে মার্গারেটও। পাশ করতেই হবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় এবং ও আরো সুন্দরী হয়েছে আমার চোখে।

আমার প্রিয়ার সঙ্গে আর একদিন মাত্র আমি চরমভাবে মিলিত হতে পেরেছিলাম। তেমন একটিও সুযোগ পাইনি অবশ্য হ্যারিয়েট সুস্থ হবার পর। হ্যারিয়েট একদিন দুপুরে আমাকে যৌন মিলনের প্রস্তাব দিল আহত অবস্থা থেকে সেরে ওঠার ঠিক কুড়িদিনের মাথায়। ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না আমি অবশ্য ব্যাপারটার জন্য। হ্যারিয়েটকে দুঃখ দিতে চাইনি তাই অগত্যাই আমি মিলিত হলাম ওর সঙ্গে। ব্যাপারটা যান্ত্রিকভাবেই শেষ হল এবং এর ফলে আমি কোনো সুখ পেলাম না। গম্ভীর হয়ে গেছে হ্যারিয়েট এবং ওর যৌন ক্ষিদে আরো যেন বেড়ে গেছে। আমার নিম্নাঙ্গে ও খেলা করে একটা যেন তীব্র সুখ পায়। তাই মাঝে মাঝে ওর হাত সেখানে চলে যায়।

আমি বেশ মানিয়ে নিয়েছি এই বোম্বের জীবনটা। বেশ সাজানো গোছানো এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই শহরটি। আমি ভারতবর্ষের লোকেদের অতিথিবৎসল গুণ দেখে খুবই খুশী। নিমন্ত্রণ রাখতে

গিয়েছিলাম হ্যারিয়েটের এক বান্ধবী মারাঠী পরিবারে। পরিবারে রয়েছে জনাতিনেক ছেলে মেয়ে এবং স্বামী স্ত্রী। আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি বিদেশী ওরা আমার সঙ্গে এতই প্রাণ খুলে গল্প করছিল। আমার খুব ভাল লেগেছিল ব্যাপারটা। আমি মাঝে মাঝেই দেখাশুনা করতে যাই আমার নিজের হোটেলটা। আমি চেম্বার করিনি এখানে। ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে আমার সম্ভব হচ্ছিল না। আমার কর্মচারী ভালই চালাচ্ছে আমার হোটেলটা। সে তার স্ত্রী এবং পুত্র নিয়ে হোটেলের একটি ঘরেই কাটায়। এছাড়া জনা তিনেক রাঁধুনি এবং চাকরও থাকে হোটেলের আরেকটা ঘরে। আমি ব্যাপারটা অপছন্দ করি াই আমার থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। হোটেলটা বড় করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই এই মুহূর্তে। আমি এই হোটেলের ঠিকানাতেই পাই লন্ডনের হোটেলের টাকা পয়সা। আমার নির্দেশ সেরকম ভাবেই ওদেরকে দেওয়া আছে। তখন সকাল নটা, একটা চেয়ারেই বসেছিলাম আমি আমার ঘরে এবং চারদিকে তখন রোদ ঝলমল করছে।

একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে এই বোম্বে শহরটার। হ্যারিয়েট এবং আমি চেয়ারে বসেছিলাম মুখোমুখি এবং একসঙ্গে চুমুক দিচ্ছিলাম কফিতে।

হ্যারিয়েট আমাকে হঠাৎ বলে উঠল। 'তুমি ঠিক করলে চেম্বারটা কবে করবে'?

'আমি এখনো এ বিষয়ে কিছু ভাবিনি।'আমি বললাম নিস্পৃহ ভাবেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো হ্যারিয়েট।

কেমন যেন হচ্ছে মিমি দিনকে দিন, ভালো করে কথা বলে না আমার সঙ্গে। আমি নাকি ওর ভাল চাইতে পারি না কারণ আমি ওর পিসি, মা নই, একদিন আমাকে বলেই বসল'।

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে মৃদু হাসলাম, বললাম, 'ও এমনিতেই একটু ছটফটে বাচ্চা মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

হ্যারিয়েট বললো, 'আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আমি ওকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি ওর পরীক্ষা হয়ে গেলেই, অন্তত মাস তিনেকের জন্য।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আত্মীয়া, কি সম্পর্কের?'

'আমার মায়ের খুড়তুতো বোন, আমার এক দূরসম্পর্কীয়া মাসি। সে এখন থাকে কলকাতায়। হ্যারিয়েটের এই কথা শুনে আমি মনে মনে উতলা হয়ে উঠলাম।

আমার পক্ষে অসম্ভব এতদিন আমার স্বপ্নের নায়িকাকে ছেড়ে কাটানো। আমি হাঁপিয়ে উঠি ওকে না দেখতে পেলেই। আমি বললাম, কি দরকার তার, আমি একটু বুঝিয়ে বললেই ও এমনিতেই জল হয়ে যাবে। আমি ওকে কোথাও নিয়ে যাব বরং তার চেয়ে। আমি কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে আসব কিন্তু তুমি যাবে কি করে?'

যাবার কোনো উপায় হ্যারিয়েটের নেই। সে বোম্বের শহরতলীতে চাকরী পেয়েছে সদ্য একটি স্কুল মাস্টারীর, চাকরীস্থল বোম্বের শহরতলীতে এবং সেটি ঘণ্টাখানেকের রাস্তা এখান থেকে। কাজে যোগ দেবে ও দিন সাতেক পর থেকেই। আমার যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে-না, হ্যারিয়েট বলে উঠল।

'আমাদের বিয়েটা এবার সেরে ফেলি এস, হঠাৎ ও একথা বলল সামান্য থেমে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম প্রথমে প্রশ্নটা আচমকা হওয়াতে। হ্যারিয়েট কি ধরতে পেরেছে আমার আর মার্গারেটের সম্পর্কটা, আমি একথা মনে মনে ভাবলাম তাই বলে উঠলাম, আমার চেম্বারটা খুলে আগে পশার না জমালে কি হবে।'

কিছু বললো না হ্যারিয়েট। ও শুধু গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম জানলা দিয়ে। একটা ফুলের গাছ ছিল সামনে। ফুল হয়নি এতে শুধু কুঁড়ি হয়েছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসা গাড়ির শব্দ। হ্যারিয়েট কখন যে আমার সামনে থেকে উঠে গেছে সেটা আমার খেয়ালই নেই।

একটা ঘটনা ঘটল ঠিক এক সপ্তাহ খানেক পরেই। হ্যারিয়েট নিজেই সেদিন আমার ঘরটা পরিষ্কার করেছে দুপুরের দিকে নিজে হাতে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সে মার্গারেট স্কুলে চলে যাবার খানিকক্ষণ পর। ওর হাতে একটি বই এবং তখন ওর চোখ জ্বলছে রাগে। ও সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ এত নীচ, তুমি, আমি তোমাকে অবশ্য অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা নজর দিয়ে বসলে ঐ বাচ্চা মেয়েটার উপর।

ওর একটা হাত আমি ধরতে গেলে ও আমাকে ছিটকে সরিয়ে দিল। 'আমাকে ছোঁয়ার অধিকার তুমি হারিয়েছ, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না', ও সামনে দাঁড়িয়েই বলল এ কথা।

অবাক আমি। হ্যারিয়েটের তো জানার কথা নয় আমাদের সম্পর্কের কথা। আমি তখন শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতো কি ব্যাপারটা?'

কিছু না বলে হ্যারিয়েট বইয়ের ভেতর থেকে একটি খাম আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দেখ, তোমার কীর্তির নমুনা দেখ।'

এবার আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। সমুদ্রের ধারে আমার ক্যামেরায় আমি মার্গারেটের বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম এবং ও সেগুলি পেয়েছে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে। বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছি আমি সমুদ্রে স্নান করা অবস্থায় এবং এর মধ্যে রয়েছে ব্রা এবং প্যান্টি পরা কিছু ছবি। হ্যারিয়েট ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে এই ছবিগুলি দেখে, সত্যি বিপদ আমার শিরে। একথা ভেবে আমি ঢোক গিললাম। ওর হাতে না পড়লেই ভাল হত ছবিগুলি, কিছু করার নেই তাতে। এতেই তুমি রেগে যাচ্ছ, এই সামান্য ব্যাপারে।

হ্যারিয়েট কঠিন স্বরে বলল, 'এতে আমার রেগে যাওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?'

আমি এরপর শান্ত স্বরে বললাম, 'তোমাকে বলতে আমি ভুলে গেছি যে, একজন মোটামুটি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শুটিং করতে আসছে এখানে। আমি ভাবছি তার কাছে এই ছবিগুলি পাঠাব কারণ আমার বন্ধু যদি একটা রোল দেয় মার্গারেটকে।

হ্যারিয়েট কিছুটা নরম হয়ে বলল, কিন্তু ও কথা তুমি তো আগে বলনি আমাকে।

আমি বললাম, 'ক্ষমা করো আমাকে, অন্য কিছু ভেব না তুমি প্লীজ, আসলে ব্যাপারটা তোমাকে বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। চল ঘরে চল।

ওর ঘরে নিয়ে গেলাম হ্যারিয়েটকে ওর কাঁধ ধরেই। ওকে এরপর বিছানায় শুইয়ে দিলাম এবং তারপর বললাম, 'হ্যারিয়েট আমি তোমাকেই ভালবাসি।'

চোখে জল এসে গেছে হ্যারিয়েটের। তাই ওকে একটা চুমু খেলাম আলতো করে এবং বলে উঠলাম, 'মিমি তোমার মত আমারও মেয়ে ; তোমারই মত আমি ভাল চাই ওর। আবার বললাম একটু থেমে, 'ও একজন নামী ফিল্ম স্টার হবে, ও আমাদের গর্ব, ওর নাম হবে, টাকা হবে, সেটা কি তুমি চাও না।

হ্যারিয়েট আমার মাথায়, গালে, ঠোঁটে এবং কপালে সব জায়গাতেই চুমু খেতে লাগল এবং আমি তখন বুঝলাম যে আমার অভিনয়কে আমি সার্থক করতে পেরেছি হ্যারিয়েটকে শান্ত করে। কতদিন চালিয়ে যেতে হবে এই মিথ্যা অভিনয় কারণ আমি হ্যারিয়েটকে একবিন্দু ভালবাসি না। মার্গারেটই আমার ধ্যানজ্ঞান। ও ছাড়া আমি কারো কথা চিন্তা করতে পারি না কারণ ও আমার জীবনের ধ্রুবতারা, ওকে ছাড়া আমি এক সেকেন্ডও থাকতে পারবো না। এই মুহূর্তে হ্যারিয়েটকে চটানো আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ মার্গারেটকে পাবার জন্যই আমাকে অভিনয় চালিয়ে যেতে হচ্ছে। হ্যারিয়েটকে চটালে মার্গারেটকে আমি চিরকালের মত হারাব এবং আমার চোখের সামনে থেকে বরাবরের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে আমার প্রেমিকা। আমি চিন্তাতেই আনতে পারছি না ব্যাপারটা। আমাকে জড়িয়ে ধরছিল হ্যারিয়েট। আমি ওর একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, আজ রাতে আমি তোমার ঘরে আসব পিটার?'

কেঁপে উঠলাম আমি, কারণ আমার চোখের সামনে তখন একমাত্র মার্গারেটের মুখটাই ভাসছে। আমার হ্যারিয়েটের সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও মনে হয় আমি মার্গারেটের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। মৃদু হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, এসো।'

'আমি যদি মিমিকে নিয়ে দিল্লী যাই, তোমার তাতে কি আপত্তি আছে হ্যারিয়েট। আবার একটু থেমে আমি বললাম।'

হ্যারিয়েট বলে উঠল, 'কেন?'

ওর প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, ও যে আমার বন্ধু যে ছবিটা কববে তা হবে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের পটভূমিকায়। প্রেমের ছবি তাই আগ্রার তাজমহলে শুটিং হবে। মার্গারেটকে নিয়ে একবার ওর কাছে যাব বলে ভাবছিলাম। মিমি তো রীতিমতো সুন্দরী তাই ওকে নিশ্চয় একটা

রোল দেবে।

হ্যারিয়েট কপট রাগে বলল, 'তুমি তো আমায় বলছো না, আমি বুঝি সুন্দরী নই।'

আমি বললাম, 'তুমিও সুন্দরী কিন্তু যেহেতু ওরা কমবয়েসী ভারতীয় মেয়ে চাইছে তাই মিমিই উপযুক্ত হবে কারণ মিমিকে ভারতীয়ই বলা যায়।

হ্যারিয়েট জবাব দিল, 'বুঝলাম'। বেশ কিছুক্ষণ কাটলো আমার একটা হাত ওর একটা হাতের উপর রেখে। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি মার্গারেট স্থির দৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, 'মিমি'।

ততক্ষণে হ্যারিয়েট দরজার দিকে তাকাতেই ওর মার্গারেটের সঙ্গে চোখাচোখি হল। হ্যারিয়েট ঠিক সেই মুহূর্তেই ওকে বিষণ্ন স্বরে বলল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন মিমি, ভেতরে আয়।'

ভেতরে ঢুকে মার্গারেট সোজা একভাবে দাঁড়িয়ে হ্যারিয়েটকে বলল, আমার খিদে পেয়েছে সেটা কি তুমি ভুলে গেছ, অথচ এখানে রয়েছ'।

আমার কিছুই বলার নেই বলে আমি নিষ্পলক দর্শক হয়ে রইলাম। মেয়েদের পারস্পরিক লড়াইয়ে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া প্রকাশ্যে যাবার কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে গেল ওরা দুজন এবং যাবার সময় এমনভাবে আমার দিকে মার্গারেট তাকালো যার অর্থ হতে পারে অনেক রকম।

।। নয় ।।

মার্গারেটের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাই সে এখন রয়েছে শুধুই ফলের অপেক্ষায়। যদিও এ ব্যাপারে তার খুব একটা চিন্তা নেই। মাঝখানে আরো একবার হ্যারিয়েট মানসিক রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মনমরা হয়ে থাকতো সবসময়। কান্নাকাটি করত এবং মার্গারেটকে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। স্থানীয় একজন বিখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসককে দেখালাম বেশ কিছুদিন ধরে। মোটামুটি ভাবে সেরে উঠে এখন রান্নাবান্না এবং কাজে যাওয়া ঠিকঠাকই করছে। পুরোপুরি কাটেনি ওর এই বিষাদ রোগটা। রোগটা অবশ্য খুব জটিল বলে ডাক্তার বলেছে। আবার দেখা দিতে পারে যে কোনো সময় এবং আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক নয় । ওর মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে বারবার। মনের মধ্যে এক বিচিত্র সন্দেহ এবং অবিরাম দ্বন্দ্বের ফলই এই রোগের মূল কারণ বলে ডাক্তারের কাছে জেনেছি। ওর মানসিক বিশ্বাসটা একান্ত জরুরী যদি ও সুস্থ হয়ে উঠতে চায়। আমি অবশ্য দৈহিক রোগের চিকিৎসক, আমার কারবার অবশ্য মন নিয়ে নয়। আমি এই সব বিষয়ে একরকম অসহায় এবং আমার অনেকটা সময় কেটে যায় হ্যারিয়েটের পেছনে। মাঝবয়সী মহিলা একজন রাঁধুনী রাখা হয়েছে। কারণ হ্যারিয়টের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিছুদিন বোম্বের নানা জায়গাতে বেড়িয়ে এলাম ওদের নিয়ে। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই না বুঝতে পারে হ্যারিয়েট, এটাই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য বিশেষ করে। মার্গারেটকে তাহলে আমি হারিয়ে ফেলব চিরকালের মত। এখন মাঝে মাঝেই হ্যারিয়েট জোর দিয়ে ওঠে দুটো কথার উপর। এক, যতদূর সম্ভব বিয়ে করতে হবে তাকে এবং দুই মার্গারেট ভালভাবে পড়াশুনা করবে ওকে একটা বোর্ডিং এ পাঠিয়ে দিলে। এবং সেখানেই ও থাকবে। হ্যারিয়েট এসব কথা কেন বলছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম পরিষ্কার। এ দুটো প্রচেষ্টাকেই বাধা দেওয়া এখন আমার একমাত্র কাজ।

মার্গারেটকে ওর কাছ থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে, এবার আমি সেই পরিকল্পনাটাই করলাম। কিছুটা পরিবর্তন অবশ্য লক্ষ্য করছি আমি মার্গারেটের ব্যবহারেও। একবারের জন্য এলেও সে বেশিক্ষণ আমার ঘরে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলায় মনের ভেতর রীতিমতো অস্থিরতা নিয়ে আমি ঘরে বসে আছি। এখানে এসেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু এখন চলেছি নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে। মানুষের ভাগ্য আর যোগাযোগ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে বাধা, তাই একটুও এদিক ওদিক হবার জো নেই। আমার নিজেকে এই মুহূর্তে ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক বলে মনে হচ্ছে। হ্যারিয়েটকে আপাতত শান্ত করার জন্য ওর দুটো প্রস্তাবই মেনে নিয়েছি। মাস তিনেক অপেক্ষা করতে বলেছি বিয়ের জন্য এবং আরো বলেছি তার মধ্যে মার্গারেটকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিয়ে তবে বিয়েটা করব। যদিও জানি এ দুটোই অবাস্তব। বোর্ডিং-এ যাবে না মার্গারেট এবং বিয়েও

করবো না হ্যারিয়েটকে। আমি এখান থেকে বরঞ্চ ওকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যাব। কাউকে টের পেতে দিইনি আমি এ সমস্ত ঘৃণাক্ষরেও। চেয়ারে বসেছিলাম চুপচাপ, চোখ দুটি বুজে। টের পাইনি, মার্গারেট কখন এসে দাঁড়িয়েছিল চুপিচুপি। মার্গারেট খিল খিল করে হাসছে, আমি আমার কপালে একটা চুমু পড়তে দেখেই বুঝলাম। আমি পাগল হয়ে যাই ও এরকম ভাবে হাসলে এবং তখন আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না নিজের ওপরে। আমি ওর হাত ধরতে যেতে ও খানিকটা দূরে সরে গেল। 'চোখ বুজে ভাবছিলে কি', ও তারপর ওখান থেকেই বলল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি এখন যার কথা ভাবছি সে হচ্ছে তুমি।

মার্গারেট রেগে উঠল কপট রাগে এবং বলল, 'কথাটা মোটেই ঠিক নয়, তুমি মিথ্যুক, তুমি নিশ্চয় ভাবছিলে অন্য কারোর কথা।'

ওর ইঙ্গিত বুঝতে আমার কিছুই অসুবিধে হল না যদিও পরিষ্কার করে কিছু বলল না।

'মার্গারেট বিশ্বাস কর, আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম,' আমি আবার বলে উঠলাম।

বিছানার উপর আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে মার্গারেট উঠে বসল। ঠিক দরজার সামনে বসল যাতে আমি ধরতে গেলে পালাতে পারে।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল, 'দিল্লী নিয়ে যাবে বলে যে তুমি আমায় বলেছিলে কি হল তার?

'একটু অপেক্ষা কর, আগে তোমার মায়ের অনুমতিটা নিই, তারপর নিশ্চয়ই যাব,' আমি বললাম।

দুচোখে রহস্যের ঝিলিক নিয়ে সে নিজের চুল টানতে থাকল এবং বলতে লাগল, কিন্তু মার কাছে যদি অনুমতি না পাই।'

'চিন্তা করো না, মা নিশ্চয় অনুমতি দেবে', খিলখিল করে হেসে উঠল ও, ওর হাসি আমাকে পাগল করে দেয় এবং আমি তা সহ্য করতে পারি না। স্কার্টের নিচের দিকটা কিছুটা উঠে গেছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ওর ফর্সা উরু দুটো এবং সেটিই আমার শরীর গরম করে দিচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে হ্যারিয়েট এসে পড়তে পারে, তাই কিছুই করার ছিল না। মার্গারেট হাসি থামিয়ে আবার বলল, 'আমাকে নিয়ে যাবে কোথায় দিল্লীতে'?

জবাব দিলাম, 'কনট প্লেস নামক একটি হোটেলে আমরা উঠব এবং সেখান থেকে যাব আগ্রা, আমাদের শুটিং হবে তাজমহলের সামনে'।

মার্গারেট জিজ্ঞেস করল, 'কোন ভূমিকায় আমি অভিনয় করব?'

'তুমি অভিনয় করবে একজন ভারতীয় কিশোরীর ভূমিকায়।'

আমি জানি এসব কথাই বানানো, যদিও বলেছিলাম এসব কিন্তু জানতাম যে বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওকে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি এটা। আবার বললাম, এটি দারুণ কাহিনী, একই মেয়ের প্রেমে পড়বে মাঝবয়সী ছেলে এবং তার বাবা। বাবা আত্মহত্যা করবে শেষ পর্যন্ত এবং পুলিশ সেই চিঠির সূত্র ধরে দুজনকেই গ্রেপ্তার করবে। পূর্বপুরুষের ব্যাভিচারের ফলে তখন কাল রোগে পেয়েছে মেয়েটাকে, মেয়েটা নিজেই সমুদ্রের কাছে সঁপে দেবে শেষ পর্যন্ত নিজেকে। কাহিনী এটাই।'

'ছেলেটার কি রোগ হয়েছিল', মার্গারেট শুনে তারপর জিজ্ঞাসা করল।

আমি বললাম 'সিফিলিস।'

'রোগটা কি খুব খারাপ রোগ?' মার্গারেট জিজ্ঞাসা করল আবার।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাভিচার কথাটার অর্থ কি?'

ও কি জানে না সত্যিই, না এর পেছনে কিছু উদ্দেশ্য আছে, এই কথার কি জবাব দেব তা আমি ভেবে পেলাম না।

'ব্যাভিচারী তাকেই বলে যে পুরুষ অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে, আমি কিছুক্ষণ ভেবে বললাম।

ও আবার হেসে বলল, 'তুমি যেমন।'

সামান্য বালিকার মত ওকে মনে না হয়ে এই মুহূর্তে ওকে আমার একজন পরিপূর্ণ নারী বলে

মনে হচ্ছিল। সব ছলাকলার বিদ্যেই জানা নারীদের। যে কোনো পুরুষের পক্ষেই নারী যে রহস্যময়ী তা জানা অসম্ভব। 'তোমার কেন আমাকে ব্যাভিচারী মনে হল'; জিজ্ঞেস করলাম।

খিল খিল করে নিষ্পাপের মত পবিত্র হাসি হেসে উঠল মার্গারেট। সে বললো, 'তোমার ডায়েরীটা পড়ে আমি দুজনের নাম প্রথমে দেখেছি এবং এখন আরো।'

মার্গারেট থেমে গিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। 'থেমে গেলে কেন, আমি বলে উঠলাম, কি ব্যাপার।'

চুপ করে গেল আবার মার্গারেট। আমি তখন আবার বলে উঠলাম, 'বলো।'

নিশ্চুপ হয়ে রইল সে। 'অন্যের ডায়েরী তোমার না বলে পড়া উচিত হয়নি মিমি', আমি ধমকের সুরে বললাম।

মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীতে কপট রাগে ঠোঁটটা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'তুমি সবসময় উচিত অনুচিত মেনে চল, আমি যা করেছি তা বেশ করেছি।' আমি ওকে এরপর মৃদু হেসে ধরতে গেলাম এবং সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে গেল সে এবং হরিণীর মত বিছানা থেকে নেমে একেবারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পালিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ঠিক দরজার সামনে। আমার চোখের সামনে থেকে ঠিক যে মুহূর্তে চলে গেল মার্গারেট, হ্যারিয়েট পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে বিরক্ত মুখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'খুব বিরক্ত করছিল বুঝি মিমি তোমাকে।'

আমি হেসে বললাম, 'না ওর ছটফট করাটা একটা অভ্যাস, কিন্তু ও আমাকে কোনোরকম বিরক্ত করেনি।

'আমি আর পারছি না ওকে নিয়ে, ও বড্ড অসহ্য করছে। ও আর একদম আমার কথা শুনছে না।'

হ্যারিয়েটকে বোঝালাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ওর মন খুব সাদাসিধে যদিও ও একটু ছটফটে এবং এর জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই।

হ্যারিয়েটকে ঘরে নিয়ে এসে মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম দুজনে। আমি আসল কথাটা পাড়লাম এটা ওটা খানিকক্ষণ বলার পরে। বললাম, আমার সেই বন্ধু এখন দিল্লীতে এসেছে এবং আমি ভাবছি ওর ওখানে নিয়ে যাব মিমিকে।'

হ্যারিয়েট জিজ্ঞেস করলো, সে দিল্লীতে কোথায় এসেছে।

জবাবে বললাম, কনট প্লেসের একটা বড় হোটেল।

একটু হাসলাম, তারপর বললাম, মিমিকে অবশ্য নিতে পারে এবং যেহেতু আমার চেনা শোনা আছে তাই আমি বলতে পারি কথাটা। এই বলে হ্যারিয়েটের চোখের দিকে তাকালাম এবং তারপর আবার বললাম, তুমিও যেতে পার, অবশ্য যদি তুমি যেতে চাও।

অনকেক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হ্যারিয়েট এরপর ওলটাতে লাগল একটি ম্যাগাজিনের পাতা। তারপর বলে উঠল, স্কুলের পরীক্ষা আছে তাই কামাই করা যাবে না বলে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরাই বরঞ্চ ঘুরে এস ওখানে। হ্যারিয়েট বলে উঠল সামান্য থেমে। মিমি তো দিল্লী দেখেনি তাই বেড়ানোও হবে এবং তার সঙ্গে কাজও হবে।

'তুমি কিছু মনে করো না', আমি ওর হাতে হাত রেখে বললাম।

'মনে আবার কি করবো।'

'অনুমতি দিচ্ছ তো তাহলে যেতে?'

হ্যারিয়েট মৃদু হেসে প্রশ্নের জবাবে বলল, 'বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে কিন্তু ফিরে এসেই, সুতরাং কথা দিয়ে যাও যেন দেরী না হয়।

গরম একটা রক্তের স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে চলেছি আমি। ঠিক কোন জায়গাতে পৌঁছাব আমি তা বলতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎই। আমি শুধু বললাম, 'আগে আমাকে ফিরে আসতে দাও।'

হ্যারিয়েট জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন লাগবে?'

হ্যারিয়েটের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে তাই আনন্দের আর সীমা রইলো না আমার। যাওয়ার অপেক্ষা শুধু এখন। ছটফট করতে করতে বলে উঠল হ্যারিয়েট, 'এখন যেও না, যত ইচ্ছে বিয়ের

পর যেও, তখন আর আমি কোনো বাধা দেব না।

'তুমি সত্যিই খুব ভাল হ্যারিয়েট,' আমি বলে উঠলাম।

আমার চোখে ভাসছে তখন দুটি মহল, এক দিল্লী এবং দুই হচ্ছে আগ্রার তাজমহল। শেষ গন্তব্যস্থল কলকাতা, যেখানে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এটি একটি তাজমহল, যা আমি ছবিতে দেখেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। আমার ঘরে এসেছিল কিন্তু হ্যারিয়েট সেই রাতে। ওর সব কিছু ভরিয়ে দিলাম আদরে আদরে। আগে কখনও এমন নিখুঁত অভিনয় করিনি এবং পরে কখনও করব বলেও জানি না।

।। দশ ।।

আজ সকালটা আমার কি যে ভাল লাগছিল বলার নয়। বারবারই অবশ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল মনের মধ্যে একটা গোপন ভয়। আমি বিনা দ্বিধায় এখন মার্গারেটকে নিয়ে যেতে পারি কারণ কোনো আপত্তি নেই হ্যারিয়েটের। চারদিক রোদ ঝলমল করছে এবং একটি বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে বোম্বের এই এলাকায়। মার্গারেটকে নিয়ে একটু বাইরে বেরোবার প্রয়োজন আছে। আমি সোজা হ্যারিয়েটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এবং তখন ও মৃদু হাসলো। ওর শরীর ঢাকা একটি সবুজ রঙ-এর গাউনে। 'কি ভাবছিলে', ও বলে উঠল।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো আমার ভেতরটা। আমি কোনো রকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করে ফেলছি না তো আমার ভেতরকার পরিকল্পনা গোপন রাখতে গিয়ে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যদি জানতে পারে। 'তোমার কথা ভাবছিলাম', আমি মৃদু হেসে বললাম।

'সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে', এই বলে ও চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে হেসে উঠলো। চুমুক দিলাম আমি চায়ের কাপে। সবুজের সমারোহ সারা বাগান জুড়ে এবং আমি তাকিয়ে ছিলাম সেইদিকে। মাঝে মাঝেই একটা মুখ দোতলার জানলার দিকে দেখা যাচ্ছিল এবং আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি মারছে মার্গারেট। ইদানিং আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না মার্গারেটের আচার আচরণ। কোনো কোনো সময় কথার খৈ ফোটে মুখে এবং ভীষণ ছটফটে, উজ্জ্বল এবং খোলামেলা হয়ে পড়ে, কোনো সময় আবার কথা বলতে চায় না একেবারেই। যদি কোনো কথা পাঁচবার বলি তারপর একবার উত্তর দেয়। আমি কোনো সময়েই আজকাল আর ওকে ঠিকমত বুঝতে পারিনা। তাই ও যেন ক্রমশঃ রহস্যময়ী হয়ে উঠছে আমার কাছে। আমার পক্ষে কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে এসব স্বত্ত্বেও ওর প্রতি আকর্ষণ আমার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উন্মাদ আমি মার্গারেটের জন্য। এক সুতোয় গাথা হয়ে গেছে আমার জীবনের সঙ্গে ওর জীবনটা। আমি মার্গারেটকে চাই তা যেকোনো মূল্য দিয়ে। পৃথিবীর অন্য কিছুতেই আমার কোনো উৎসাহ নেই বিন্দুমাত্র। তাই পৃথিবী প্রেমের জন্য—এটাই আমি বিশ্বাস করি। মার্গারেটের জন্য একান্তভাবেই প্রেম আমার কাম্য। আমি ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, জানলা দিয়ে মার্গারেট আমার দিকে যতবার তাকাচ্ছিল। এটা আমি একেবারেই চাই না ; হ্যারিয়েট এই মুহূর্তে আমার ঘনিষ্ঠ হোক কিংবা আমার একটা হাত ধরুক।

মুখোমুখি বসেছিল একবার হ্যারিয়েট। 'তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না দিল্লীতে হ্যারিয়েট, আমার বিন্দুমাত্র থাকতে ইচ্ছা করে না তোমাকে ছেড়ে।'

আমি রীতিমতো আতঙ্কিত যদিও একথা বলে ফেললাম। তাহলে তো আবার বিপদ. ও যদি যেতে চায়। হ্যারিয়েট বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর পিটার। কারণ আমার পক্ষে যাওয়া একেবারে সম্ভব নয়।'

এর মানে অনেক কিছু হতে পারে, আমি আমার মুখের অভিব্যক্তিকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেলাম। 'তুমি কি পিটার রাগ করলে,' হ্যারিয়েট বলে উঠল আমার একটা হাত ধরে। আমি দোতলার জানলার দিকে তাকালাম এবং সেখানে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কারণ সেখানে মার্গারেট নেই। আমি বললাম কোনোরকমে, 'কাজ ক্ষতি করে তোমার গিয়ে কাজ নেই, এতে হ্যারিয়েট আমি রাগ করব কেন। চিরকালের জন্য আমি তো আর চলে যাচ্ছি না হ্যারিয়েট।' কে জানে হ্যারিয়েট কি ভাবলো। তাই সে কোনো উত্তর দিল না! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো তার

বদলে। সামনের খবরের কাগজের দিকে হাত বাড়ালাম হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিছুটা পড়ে রেখে দিয়েছি অবশ্য আগে। অন্ততঃ আমাকে এখন খবরের কাগজটা পড়ে যেতে হবে। হ্যারিয়েট যতক্ষণ এখানে থাকবে। 'তোমার শরীরটা এখন ভালো তো,' আমি জিজ্ঞেস করলাম হ্যারিয়েটকে।

'আমার শরীর এখন দারুন ভালো' হেসে জবাব দিল হ্যারিয়েট।

'আমি খুশী তুমি ভাল থাকলেই।'

আবার বললাম একটু থেমে, 'আমার চিন্তা তোমার উপরেই থাকবে যদিও কোথাও না গিয়ে থাকি।

হ্যারিয়েট বলে উঠল, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না এই নিয়ে।' 'ঠিকঠাক হয়ে বেরোতে হবে কারণ আমার স্কুলে বেরোবার সময় হয়ে যাচ্ছে।'

'মার্গারেটকে নিয়ে আমি কিন্তু একটু বেরোব।' আমি তখন ওকে বলে উঠলাম।

ও জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কোথায় যাবে এখন তোমরা?'

'কিছু কেনাকাটার ব্যাপার আছে', আমি জবাব দিলাম।

'আচ্ছা', হ্যারিয়েট চলে গেল এই কথা বলে। মার্গারেট এদিকেই তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি দেখতে পেলাম।

মার্গারেটকে নিয়ে আমি মার্কেটে বেরোলাম ঠিক এগারোটা নাগাদ এবং তখন ওর পরনে ছিল গোলাপী স্কার্ট। ওর এই ফর্সা নিটোল গঠনে এই ধরনের পোষাক খুবই মানিয়েছিল। আর চোখ ঘোরাতে পারছিলাম না আমি ওর দিক থেকে। একটা ট্যাক্সি নিলাম যদিও আমাদের গন্তব্যস্থল সেখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। একটা রহস্য ওর চোখ দুটোয় রয়েছে। আমি একটা হাত রাখলাম ওর পিঠে, গাড়ির মধ্যেই। আমি রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলাম, যখন মার্গারেট আমার কাছে একটু এগিয়ে এল। তখন এতোখানি ঘনিষ্ঠতার কারণে তার খেয়াল ছিল না যে ট্যাক্সিতে একজন ড্রাইভার রয়েছে।

মার্গারেটের নরম আঙুরের মত ঠোঁটে একটা চুমু খেলাম আমি। আমার পাশে বসে আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের নায়িকা আর তার কোমল অঙ্গের উত্তাপ আমি নিচ্ছি প্রাণভরে। আমার উরুর উপর ওর হাতটা রাখলো মার্গারেট। বার বার কেঁপে উঠছিল আমার সারা শরীর। আমি একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিলাম কোনো এক অতল গহ্বরে। ভীষণভাবে টের পাচ্ছিলাম একটা নারীর স্পর্শ-সুখ কিভাবে পাগল করে দিতে পারে। তার কি একটা মনে হতে একটু সরে বসলো মার্গারেট হঠাৎ, একটু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। ও যদি রেগে যায় তাই বলতে পারছিলাম না কিছু মুখ ফুটে। আমি দুচোখে অন্ধকার দেখবো যদি ও অভিমান করে এবং বাঁচবো না যদি ও কোনো কারণে আমার ওপর রেগে যায়।

'মায়ের অসুখটা ঠিক কি রকম,' হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল মার্গারেট।

আমি বললাম, 'একেবারে মানসিক তোমার মায়ের অসুখটা।'

মার্গারেট জিজ্ঞেস করল, 'মন খারাপের রোগ কি?'

আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ও যেন একজন কৌতূহলী বালিকা। আর নেই সেই রহস্যময়ী নারী। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ,' আমি জবাব দিলাম।

'পাগল হয়ে যাবে কি মা?'

আমি এবার ওর দিকে তাকালাম ওর প্রশ্ন শুনে। বললাম, 'তোমার কেন মনে এল এরকম কথা হঠাৎ করে?'

'মায়ের মাঝে মাঝেই তো এইরকম হচ্ছে তাই ভাবলাম, যদি আবার হলে আর না সারে, সেই কারণেই আমি তোমাকে এ কথা বললাম।'

মার্গারেট ম্লান মুখে বলল, 'মায়ের কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব, মা নেই একথা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।'

আমি ওর কপালে হাত রেখে বললাম, 'না না এতে তোমার ভাবনার কিছু নেই।'

'আচ্ছা মা তোমাকে খুব ভালবাসে না!' মার্গারেট আবার স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠল।

আমি জবাব দিলাম, 'ভালবাসে তবে তোমার মত ভালবাসে না।'

এবার ও একটা কথা বলল যা খুবই অদ্ভুত শোনাল, 'তুমি তো বিয়ে করতে পারো মাকে।'

ও বলছে কি, তবে ও আমার এবং ওর মায়ের সম্পর্কটা জেনে গেছে, সেই কারণেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

আমি বললাম, 'এসব যা তা কথা বলো না, আমি তোমাকেই আসলে চাই।'

মার্গারেট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'আমি একটা ডায়েরী লিখছি।'

তাই নাকি 'খুব ভাল কথা, ডায়েরীটা আমাকে দেখাবে তো।'

ও ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, 'না আমি দেখাবো না তো। তোমাকে জানাবো না তো ডায়েরীতে আমার কত গোপন কথা লেখা আছে।'

'আমার কথা লিখেছো নাকি, ঠিক আছে দেখাতে হবে না।'

মার্গারেট হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব কিছুই লিখে রেখেছি আমি।'

আমি বললাম, 'আর রক্ষা থাকবে না। সর্বনাশ, এটা যদি তোমার মায়ের হাতে গিয়ে পড়ে।'

ও কিছু বলতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা থেমে গেল কারণ আমরা পৌঁছে গেছি।

আমাদের কেনাকাটা করতে সময় লাগলো প্রায় ঘণ্টা খানেক। আমরা বসলাম কাছাকাছি একটা পার্কে গিয়ে, কারণ আমাদের হাতে এখনও অনেক সময়। গাছপালা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। এক দম্পতি ঘনিষ্ঠভাবে বসেছিল দূরে। আমরা দুজনে বসে আছি পাশাপাশি এবং সেই সময় আমি মৃদু হাসলাম মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে। বললাম, এরপর আমরা অনেক দূর চলে যাব, আমাদের হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন আছে।

মার্গরেট হেসে আমার উরুতে ওর একটা হাত রাখল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলাম। একটু আগে আমরা খেয়ে এসেছি রেস্তোরাঁয় তাই মুখে সেই রেস্তোরাঁর গন্ধ পেলাম। তুমি অনেকক্ষণ পরে আমাকে চুমু খেলে—এই কথা বলে ও আমার দিকে একটু সরে এল।

সামনের গাছে একটি পাখি বসেছে, অনেক রকম রঙ ছিল পাখিটির গায়ে। আমি এরকম পাখি আগে কখনো দেখিনি। এ পাখির বাস সম্ভবত ভারতবর্ষেই। আমার দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকালো একবার এই অদ্ভুত পাখিটি। মার্গারেটকে ঐ পাখিটা দেখিয়ে বললাম, 'ঐ পাখিটার নাম কি মিমি?'

মার্গারেট পাখিটাকে দেখে বলল, 'আমি বলতে পারব না পাখিটার নাম, কারণ এই পাখিটাকে আমি আগে কখনো দেখিনি এবং চিনিওনা।'

আনন্দে হাত বাড়িয়ে দিল মার্গারেট। হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা উড়ে গেল। আমি তাই বললাম মনে মনে, 'একটা অচেনা পাখি তুমি মিমি, আমার কাছে, তুমি আমার কাছে এক রহস্যময়ী নারী, আমি তোমাকে চিনতেও পারি না এবং বুঝতেও পারি না। আমার তোমাকে খুব অদ্ভুত লাগে যখন তুমি পবিত্র সরল বালিকার মত হয়ে যাও। এটা মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে তোমার মধ্যে অদ্ভুত এক নারী লুকিয়ে আছে। যেমন, ঠিক এই সময়, আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবন তোমাকে ছাড়া অচল হয়ে যাবে। কোনোদিন ছাড়তে পারবো না আমি তোমাকে। আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলি তোমার দুচোখের দিকে তাকালে। আমাকে উন্মাদ করে দেয় তোমার উন্নত বক্ষ। দুরন্ত জোয়ার খেলা করে আমার রক্তে। তোমাকে নিয়ে নরকে যেতেও রাজী আমি। আরও একটি চুমু খেলাম আমি মার্গারেটকে। তারপর বললাম, 'আমার কাছে তুমি একটি দারুণ ছোট্ট সুন্দর পাখি।'

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, 'আমি তোমার নাগালের বাইরে তাহলে এমন ভাবে উড়ে পালাবো যে ধরতেই পারবে না।'

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে গালে আলতো করে একটা টোকা মারলাম, 'আমি তোমাকে কিছুতেই উড়ে যেতে দেব না, বুঝেছ, তোমায় আমি খাঁচায় রেখে দেব।'

বাগানে বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক এবং এরপর ওকে আমি একটা চুমু খেলাম উঠবার সময়। কমবয়সী এক যুবক বাগান থেকে বেরোবার সময় মার্গারেটের দিকে এমন লোভী চোখে

তাকিয়েছিল যেটা বলার কথা নয়। ওর গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় কসাই বলে মনে হল। তাকালাম একবার মার্গারেটের দিকে। যুবকটিকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মার্গারেট ওই যুবকটির দিকে তাকিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে ও এরকম ছলাকলা কোথায় শিখল। লাঞ্চের খাবার তৈরী হয়ে গেছে যখন বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করছিল পরিচারিকা মহিলাটি।

।। এগার ।।

ভারতের রাজধানী খোদ দিল্লী এসে এরপর আমরা পৌঁছলাম। এত সহজে যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে তা আমরা ভাবিইনি। দূরের কথা তো সন্দেহ্ করা। আমাদের তুলে দিতে স্টেশনে আমাদের সঙ্গে এসেছিল হ্যারিয়েট। ওর চোখ দুটো ছলছল করছিল আমাদের বিদায় দেবার সময়। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছিল না। ওর অভিভাবককে ফেলে মার্গারেট এই প্রথম দূরে চলে যাচ্ছে। হ্যারিয়েটকে জড়িয়ে ধরে মার্গারেট কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল , 'তুমিও চলো না মা আমাদের সঙ্গে।'

হ্যারিয়েট জবাব দিয়েছিল মাথায় হাত বুলিয়ে, 'আমার স্কুল আছে মিমি, কটা দিন তো মাত্র, তুমি ঘুরে এসো। কতো কি দেখবে ওখানে।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, ফিরে বলেছিল 'ফিরে এসো কিন্তু দশদিনের মাথায়।'

চুমু খেয়ে আমি ওকে বলেছিলাম, 'হ্যারিয়েট চিন্তা করো না, ঠিক সময় ফিরব আমি।'

আমি আর মার্গারেট উঠে বসেছিলাম ট্রেনের কামরায়। এক মারাঠি দম্পতি বসে ছিল সামনের সীটে এবং জানালার পাশে বসেছিল মার্গারেট। হ্যারিয়েটের হাত নাড়া এবং দুচোখে জল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যতক্ষণ না ট্রেনটা মিলিয়ে গেল। মার্গারেটও সমানে হাত নেড়ে যাচ্ছিল এবং অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক কথা বলেনি আমার সঙ্গে। চুপ করে বসে রইলাম অগত্যা আমি। একবার ওর পিঠে হাত দিতে গেছিলাম কিন্তু ও সরিয়ে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। আমার বিন্দুমাত্র বোধগম্য হচ্ছিল না, আমার সামনে সেই মারাঠী দম্পতি নিজের ভাষায় কি বলছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি মনোনিবেশ করলাম বোম্বের স্টল থেকে কেনা একটি ডিটেকটিভ বইয়ের দিকে। বাঁদিকে আমরা বসেছিলাম এবং বেশ কয়েকজন লোক ডানদিকে বসে তাস খেলছিল। তারা প্রত্যেকেই বয়স্ক এবং তারা প্রত্যেকেই চাকুরীজীবী বলে মনে হল। এরা নিজেদের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কথা বলছিল। তাই আমার খুব অবাক লাগছিল ভারতীয়রা কি করে বিদেশী ভাষায় কথা বলছে এই কথা ভেবে।

দিন দুয়েকের মত লেগে গেল পৌঁছতে আমাদের এবং এর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মার্গারেট। আমার সঙ্গে হেসে কথা বলছে এবং হাততালি দিয়ে উঠল ভাঙা মসজিদটা দেখে। তারপর আমার কাঁধটা ধরে নিয়ে গেল জানলার কাছে এবং বলল, 'কি সুন্দর দ্যাখো।' ট্রেন দ্রুত চলেছে বলে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল তাড়াতাড়ি, আমার চোখের সামনে থেকে। 'কোথায় তোমার সুন্দর জিনিস, আমি বলে উঠলাম তখন।

মার্গারেট আমার পিঠে একটা কিল বসালো এবং তারপর বললো, তাড়াতাড়ি আসতে হয়তো, ভীষণ কুঁড়ে তো তুমি।

আমি হেসে উঠে বললাম, 'তাড়াতাড়ি কতো আসব।' আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল সামনে বসা সেই মারাঠী দম্পতি। তাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর জানা গেল সে ভদ্রলোক অর্থমন্ত্রকের কেরানী এবং তিনি এসেছিলেন বোম্বেতে এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে। প্লাটফর্ম স্পর্শ করলো যখন ট্রেন তখন সন্ধ্যা ছটা বেজেছে। তখন কিন্তু রোদ ঝলমল করছে চারিদিক। লালচে আভা যমুনার জলে। লম্বা হয়ে এগিয়ে আছে লাল কেল্লার প্রাচীর। সম্রাটের বিশাল দরবার, দেওয়ান-ই-খাস, মুঘল সম্রাটের ঐতিহ্যময় নিদর্শন। তার দিকে তাকিয়েছিল মার্গারেট অবাক হয়ে। একটি মাঝারি ধরনের হোটেলে উঠলাম আমরা দিল্লীতে পৌঁছে। কাউন্টারে জমা দিলাম আমাদের জিনিষপত্র। বেশ বড়োসড়ো আমাদের কামরাটা। ভালই লাগলো মার্গারেটের হোটেলের

পরিবেশটা। আমাদের নাম লেখা হল হোটেলের রেজিস্টারে। বেশ সহৃদয় মনে হল কাউন্টারের ভদ্রলোককে। সে রোগা, তার চোখে চশমা এবং মুখে মৃদু হাসি। আমাদের ঘরটা চিনিয়ে দিল হোটেলের একজন বয়।

আমি বলে উঠলাম, 'বাঃ, ঘর তো বেশ চমৎকার।' খুব ভাল লেগেছে ঘরটা তার, আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বেশ বড়োসড়ো, ডবল বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল মাঝারী উচ্চতার এবং খানদুয়েক চেয়ার। একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিল মার্গারেট। আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়েছি বয়টা চলে যেতেই, এরপর জড়িয়ে ধরলাম মার্গারেটকে পেছন থেকে।

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে মার্গারেট বলে উঠল, 'তুমি খুব বাজে, এখন এসব একদম নয়, নইলে আমি পালিয়ে যাবো এখান থেকে।'

মেয়েটি কি বলে, আমি ওর অস্বাভাবিক ব্যবহারে শিউরে উঠলাম, আমি বুঝতে পারছিনা একেবারে কিছুই। রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল ওকে আমার সেই মুহূর্তে রীতিমতো। আমি সব কিছু ভুলে যাই, যখন ও মাঝে মাঝে আমার দিকে প্রেমের চোখে তাকায়। আমি আর আমার মধ্যে থাকি না ও যখন আমাকে আদর করে। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম আমি এখন ওর বিরক্তভাব দেখে। কিছুটা দুঃখ পেয়ে বললাম, মার্গারেট, ক্ষমা করো আমাকে, সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি।

খাটের উপর সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ল মার্গারেট। একটা হাসিখুশি ভাব ছিল যেন ওর চোখে মুখে। বলে উঠল একটা হাই তুলে, 'খুব সুন্দর হোটেলটা, এই বলে ও উঠে পড়ল এবং লাগোয়া বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ল ডানপাশের একটা দরজা খুলে। কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এসে বলল, 'সত্যি ভেতরটা খুবই সুন্দর।'

এরপর বাচ্চা মেয়ের মত আদুরে ভঙ্গিমায় সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল এবং জড়িয়ে ধরে বলল, 'রাগ করেছো কি তুমি?'

আমি ম্লান হাসি হেসে ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠলাম, 'তোমাকে আমি ভালবাসি মিমি, তোমার ওপর রাগ করবো কেন আমি ; আমি তোমায় ভালবাসি।'

সে হাত বুলোতে লাগল আমার পেটে এবং বলতে লাগল, 'তুমি কিছু মনে করো না, আসলে অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেই কারণেই আমি মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘটনাটা কি'।

বিছানায় বসল এরপর ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে এবং বলতে লাগল, 'তুমি আসোনি তখন, একটি বাড়িতে একটি ছেলে থাকত যা ছিল আমার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে, এখানকারই ছেলে, আমার ওর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কথা বলতে বলতে। হঠাৎ তারপর একদিন—

এই বলেই হঠাৎ মার্গারেট গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, একদিন দুপুরবেলা তার বাড়িতে সে আমাকে হঠাৎ করে ডেকে নিয়ে গেল, ওর মা, বোন কেউ ছিল না, এবং বাড়িতেও কেউ ছিলনা। আমার ভাব ছিল ওর বোনের সঙ্গেই বেশী। ওদের বাড়িতে একদিন গেলাম।

মার্গারেট সামান্য থেমে আবার বলল, দরজা বন্ধ করে দিল ও ঘরে ঢুকে এবং আমি ভয় পেয়ে গেলাম ওর দুচোখ দেখে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম ও আমাকে ধরবার আগেই এবং ও ওর প্রচণ্ড শক্তিতে আমাকে বিছানায় টেনে শুইয়ে দিয়ে তারপর চুমু খেতে লাগল আমাকে উন্মাদের মত। সজোরে একটি থাপ্পড় মারল আমাকে। যাতে আমি চুপ করে থাকি, কারণ আমি খুব ছটফট করছিলাম। ওর বাড়ি থেকে আমি যখন বেরিয়ে এলাম তখন ও আমাকে থামিয়ে বলল, আমি তোমায় শেষ করে ফেলব তুমি যদি কাউকে বল ব্যাপারটা। সেই থেকে আমি—এই বলে চুপ করে গেল মার্গারেট।

ওর দিকে আমি এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম হেসে। বললাম, মার্গারেট আমি ভালবাসি তোমায়, তোমার ভালোর জন্য সব কিছু আমি করতে পারি।

মা আমার জন্য খুব ভাবছে না।

এরপর অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেল মার্গারেট।

গম্ভীর হয়ে আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ'। মার কথা ওকে ভুলিয়ে দিতে হবে তা যে করেই

হোক। বললাম, চিরকাল তো আর তুমি থাকবে না মায়ের কাছে। আবার একটু থেমে হেসে বললাম, তোমার ভালমন্দের সবকিছু দায়িত্ব এখন আমার হাতে এবং আমিই এখন তোমার একমাত্র অভিভাবক।

খিলখিল করে মার্গারেট হেসে বলল, 'এখন থেকে তোমার উপর তো আমার শরীরেরও দায়িত্ব এবং আজ রাতে নিশ্চয় আমরা একসঙ্গে শোব।'

হোটেলের একজন বয় এসে বাক্সগুলো ইতিমধ্যে দিয়ে গেল এবং মার্গারেট বলে উঠল, 'আমার খুব খিদেও পেয়েছে, তার আগে অবশ্য স্নান করবো।'

বাক্স খুলে একটা হাল্কা নীল রঙের গাউন বের করে পরে নিল ও। আমি যে আছি সে ব্যাপারে কোনো খেয়াল না করেই ওর পরনের স্কার্টটা খুলে ফেলল ও। একটা ব্রা আর প্যান্টি শুধু পরনে, আমি ওর দিকে তাকাতে গাউনটা পরবার সময় ও আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে কেবল মৃদু হাসল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি পাগল হয়ে যাই ওর সৌন্দর্যে। এমন কী আমি হাজার হাজার মাইল হাঁটতেও পারি ওর সঙ্গে। আমার এই যে উন্মত্ততা ওকে পাবার জন্য এটা কি সত্যিই প্রেম, না কি এটা অন্য কিছু! সত্যিকারের ভালবাসা কাকে বলে, এটা যদি ভালবাসা না হয়!

মার্গারেট স্নানের ঘরে ঢুকে গেল তার কিছু জিনিষ পত্র নিয়ে। চুপচাপ শুয়ে পড়লাম আমি বিছানায় গিয়ে। বেশ ছিমছাম এবং বড়োসড়ো ঘরটা। এতে খুব ভালও লাগছে আমার। আমার আনন্দ রয়েছে সারা দেহটা জুড়ে এবং মার্গারেটকে নিয়ে আমি কাটিয়ে দিতে চাই আমার সারাটা জীবন। আমি এই প্রথম জানলাম যে এরকম একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল মার্গারেটের জীবনে। কোনদিন ও কাউকে বলেনি এর আগে। আমি বুজে ছিলাম চোখ দুটো এবং চোখ মেলে তাকালাম এরপর চটির শব্দে। সবে মাত্র স্নান সেরে মার্গারেট ঘরে ঢুকেছে এবং সেই মুহূর্তে খুবই অদ্ভুত লাগছে ওকে। একটা খারাপ খবর আছে, মার্গরেট ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি চমকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী? খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল মার্গারেট। তারপর জানাল, ঘরের বই-এর তাকের ভিতর রয়ে গেছে আমার ডায়েরীটা, মনে পড়ল ঠিক এই মাত্র আমার স্নান করবার সময়।

আমি চমকে বললাম, তাহলে এখন যদি ওটা তোমার মায়ের হাতে পড়ে, কি হবে তাহলে?

ভাবছিতো সেই কথাই।

মার্গারেট গম্ভীর এবং আমিও গম্ভীর হয়ে উঠে বসলাম। হ্যারিয়েট যে মানসিক বিকার গ্রস্তা ভেসে উঠল আমার মনের মধ্যে।

।। বারো ।।

হোটেলের সব লোকেরই খাওয়া দাওয়া শেষ হয় রাত তখন বারোটায়। সিগারেট টানছিলাম এতোক্ষণ বারান্দায় বসে। আমি সিগারেট খুব একটা বেশী খাই না, আমার নেশা বলতে যা বোঝায় নেই, এক প্যাকেট বড়ো জোর সারা দিনে রাতে। তীব্র অস্থিরতা ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের ভেতর। আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কথা মার্গারেটের কথা অনুযায়ী তার ডায়েরীতে লেখা আছে। সেই ডায়েরীতে লিখে রেখেছে আমাদের নিঁখুত যৌন মিলনের কথা।

আমি এখন থেকেই অনুমান করছি, এই ডায়েরী যদি হ্যারিয়েটের হাতে পড়ে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে। আমি আর কোনদিন ওখানে যাচ্ছি না, তেমন কিছু হবে না অবশ্য আমাদের এ নিয়ে। এখানে কিছু দিন কাটিয়ে কলকাতায় চলে যাব আমি মার্গারেটকে নিয়ে। ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত মহানগর কলকাতা। এই শহরটা খুব প্রাণোচ্ছল সারা ভারতের মধ্যেই। আমার প্রিয়তমা মার্গারেটকে নিয়ে অবশ্যই আমাকে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মহানগর দেখতে হবে।

ঘরের মধ্যে এলাম, আর বসে থাকতে না পেরে। মার্গারেট ঘুমোচ্ছে এবং ঘরে জ্বলছে একটি নীলচে আলো। আমি ওর মুখটা ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিনা যেহেতু ও ডানদিকে পাশ ফিরে আছে। এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছিল ঘরের ভেতরের জানলা দিয়ে। মনে হল সামান্য

মেঘলা। এক গ্লাস জল খেলাম আমি ঢক্ ঢক্ করে। আবার গ্লাস টেবিলের উপর রেখে দিলাম। একটা দিক দেখা যাচ্ছিল মার্গারেটের মুখের। আমি ওর পাশে বসলাম এবং ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে আলতো করে। চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ, লোভ সংযত করে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মার্গারেটকে। একটা হাত ওর গায়ে দিলেই কী চীৎকার করে রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি, বিশ্রী ব্যাপার হবে সেটা! আলোটা নিভিয়ে দেব একবার ভাবলাম। তারপর ভাবলাম, থাক জ্বলছে যখন জ্বলুক। একটা সিগারেট ধরালাম এবং ভেতরে তখন লক্ষ্য করলাম একটা ছটফটানি। মার্গারেট চিৎ হয়ে শুল এর খানিকক্ষণ পরে। মার্গারেট খানিকক্ষণ পরে পাশ ফিরে শুলো। তাকিয়ে বলল আলতো করে, আমার সহ্য হচ্ছে না একেবারেই সিগারেটের ধোঁয়া। এই কথা বলে সে আবার চোখ বুজে ফেলল, মার্গারেট তেমন একটা ঘুমোয়নি এতক্ষণে সেটাই বোঝা গেল।

ওর স্বচ্ছ গাউনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দেখতে পাচ্ছি ওর স্তন দুটো পরিষ্কার ভাবে। বাদামী আভা এবং স্তনবৃন্ত দেখা যাচ্ছিল ওর স্তনের চারপাশ দিয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর সুন্দর নাভি, যদিও অবশ্য পরা ছিল প্যান্টিটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর নিটোল উরু দুটো। দাপাদাপি আরম্ভ করে দিয়েছে আমার মাথার মধ্যে পোকা গুলো। সামান্য কাঁপছিল বুঝি আমার দেহটা। ওকে ছুঁতে পারছি না আমি যদিও ও আমার খুব কাছে রয়েছে। আমার মুখে বারবার আঘাত করছে ওর নিশ্বাসটা। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম আমি ক্রমশঃ। থাকতে পারলাম না আমি আর। ওর পাশে শুয়ে পড়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কয়েক মিনিট মাত্র। মৃদুভাবে ঠেলে সরিয়ে দিল ও আমাকে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে 'উঃ' বলে।

সরে গেলাম কিছুটা আমি। ও রেগে যায়নি, এই একটা ব্যাপারে আশা হল আমার। ও উচ্চারণ করেছে শব্দটা খুবই আদুরে এবং প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গীতে। ওর দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ কেটেছে মাত্র। আমাকে দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নিল ওর চোখ বোজা অবস্থাতেই। সত্যিই আমার পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ওকে বোঝা। আমার জীবনে আগে এরকম রহস্যময়ী নারী আসেনি। অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলেছে ঈশ্বর ওর মনটা। আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য ওর মনের সেই অতল গভীরের নাগাল পাওয়া।

একটি ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল ঠোঁটে। আমার দিকে একবার তাকালো পিট পিট করে। কাটলো এই ভাবে কিছুক্ষণ। হঠাৎ তারপর বলল, 'তোমার এই ব্যাপারে উৎসাহে কি ভাটা পড়ে গেল।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, 'না তো।'

বোকার মত কানে শোনালো কথাটা। বলে উঠল মার্গারেট, এসো, চুপচাপ বসে রয়েছ কেন তুমি?

ওর চুলে হাত বুলোতে লাগলাম আমি এবার। ও কপালে, গালে, চিবুকে সর্বত্রই আলতো আলতো করে একটা একটা করে চুমু খেতে লাগল। ওর নিঃশ্বাস ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। আমি উন্মাদের মত ওকে চেপে ধরে চুমু খাচ্ছিলাম। আমি আর না পেরে, নরম সাদা বুকের উপর একটা হাত রাখলাম। খুলে দিলাম ওর গাউনটা এবং প্যান্টিটাও। একটা অস্ফুট শব্দ বার বার বেরিয়ে আসছিল ওর মুখের ভিতর দিয়ে। একবারে কিনারায় পৌছে গেছি আমরা দুজনে তখন সেই চিরন্তন স্বর্গীয় আনন্দের। একভাবে হয়ে আসছিল মার্গরেটের কণ্ঠে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। আমরা দুজনে আদিম পুরুষ এবং নারী এই মুহূর্তে, আমাদের এই দুইয়ের দেওয়া নেওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই এবং কপটতা নেই। আমরা উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছি একে অপরকে। আমি ভালভাবে উপলব্ধি করলাম যৌন মিলনে মানুষ সবচেয়ে বেশী আন্তরিক এই মর্মান্তিক সত্যটা। একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল আমার সারা শরীর বেয়ে। আমরা দুজনেই ক্লান্ত শরীরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম চরম সুখের একেবারে শীর্ষে উঠে। কে জানে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি দুজনে।

একবারে পরের দিনে আমার ঘুম ভাঙলো বেলা নটা নাগাদ। তখনও ঘুমোচ্ছিল মার্গারেট। সত্যিই ক্লান্ত বেচারী, একটু ঘুমোক। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হোটেলের বয় বারদুয়েক

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরটাকে আমাদের দূর থেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। কতো ভালবাসা এবং ষড়যন্ত্র সেই প্রাচীন কাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই দিল্লীর আকাশে বাতাসে। একটি করে মোটা উপন্যাস লেখা যেতে পারে প্রতি মুঘল সম্রাটের ইতিহাস নিয়ে। চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম বারান্দায় বসে। দুটো ফোলাফোলা চোখ নিয়ে মার্গারেট হঠাৎ আমার পাশে এসে বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘুমিয়েছো তো ভালভাবে?'

আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার ও আমার প্রশ্নে। কিছু না বলে ও চায়ে চুমুক দিতে লাগলো নীরবে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, এবার জিজ্ঞেস করলো 'তুমি ঘুমিয়েছো তো?'

আমি বললাম, আমার ঘুম মোটামুটি ভালই হয়েছে, আজ কুতুব মিনার দেখে আসি মার্গারেট চল।

চলো।

এরপর চা খেলাম, তারপর আমরা দুজনে খাবার দাবার খেয়ে নিলাম এবং তারপর তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না ও গাড়ীতে। আমি একবার, জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে মার্গারেট, কি ব্যাপার এতো চুপচাপ কেন?

কিছু হয়নি তো।

ও চুপচাপ বসে রইল, যেমন চুপচাপ বসেছিল। আমার পক্ষে ওকে বোঝা একেবারে দুঃসাধ্য আগেই বলেছি। হয়ত আজে বাজে কিছু বলে বসবে, এক্ষুনি জোর করে কিছু বলতে গেলে। ঘণ্টাখানেকেরও কম সময় লাগলো কুতুব মিনারে পৌঁছাতে। ওপরে উঠতে লাগলাম আমি, ঘোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে। একটু নীচু নীচু ধরনের কংক্রীটের সিঁড়ি। একবারে উঁচুতে উঠতে দেওয়া হয় না। দুজনে আমরা এসে দাঁড়ালাম তার নীচের ধাপটায়। নারী পুরুষ ছিল ওখানে আরো জনাকয়েক। মার্গারেট নীচের দিকে তাকালো ওখান থেকে। হাতটা নাড়ল, তারপর একেবারে সরল বালিকার মত, ওরে বাবা, আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমি হেসে ওর হাতটা ধরতেই ও সরিয়ে নিল ওর হাতটা। ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি কিন্তু আমাকে ছুঁয়ো না।

কি হল আবার।

বলতে লজ্জা হচ্ছে না কি হল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না মার্গারেটের কথাবার্তার মাথামুণ্ড। কি হয় কে জানে ওর যে মাঝে মাঝে। মাথায় ওর সত্যি ছিট আছে কিনা, তাই মাঝে মাঝে ভাবি। হ্যারিয়েট তো প্রায়ই উন্মাদ হয়ে যায়, ওর মা অবশ্য হ্যারিয়েট নয়, পাগলামির লক্ষণ ছিল কি তার ওর বাবা মার মধ্যে। এই সমস্ত লক্ষণ হ্যারিয়েটের মধ্যে থাকার কারণ হল যে এসবের লক্ষণ ওদের বংশে আছে। আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে যাব মার্গারেটের মধ্যে যদি এই লক্ষণ দেখা যায়। কুতুবমিনারের সব কিছু দেখলো মার্গারেট ঘুরে ঘুরে।

ওকে একটি ছোট্ট বালিকার মত মনে হচ্ছিল যখন ও ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। কৌতূহল যেন ওর সব কিছুতেই। পাশাপাশি বিরাজ করছে যেন ওর দুটো সত্তাই। ওর একটা রহস্যময়ী রূপ নিষ্ঠুর কামপ্রবণ নারী। ওর মধ্যে রয়েছে একটি সরল সাধাসিধে পবিত্র বালিকা বা কিশোরীর রূপ যার তীব্র কৌতূহল সব কিছুতেই। 'কি হলো বলবে তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

মার্গারেট জবাব দিল, তুমি ভীষণ ব্যাথা করে দিয়েছ আমার দুটো বুকেই। এখন ভীষণ ব্যথা।

হাসতে হাসতে বলল খানিকক্ষণ পর, তোমাকে একটি উন্মাদ ষাঁড় বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়। আমার কথা তুমি চিন্তাও করো না যখন পাগল হয়ে যাও।

আমি কিছুটা আহত হয়ে বললাম, 'ষাঁড় বলছ আমাকে তুমি! ছোটো ছোটো পুতুলের মত সব কিছু দেখাচ্ছে কুতুব মিনারের উপর থেকে ভূমিতে। আমার দিকে মার্গারেট এবপর তাকাল, তার মনমরা হাসি নেই। সে বলে উঠল, 'আমার সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে যায় তোমার ষাঁড়ের মত ক্ষ্যাপামিতে।

আমি উত্তর না দিয়ে দেখলাম, মার্গারেটের ঠিক পাশেই এক দম্পতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছের পুরুষটি তার স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তাদের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে বলে আমার মনে হল। আমি মার্গারেটকে দেখালাম ইশারায় এবং মার্গারেট হেসে জড়িয়ে ধরল আমার কোমরটা। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর মার্গারেটের কাঁধে হাত রাখলাম। মার্গারেট এক সময় বলে উঠল, আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

বিয়ে!

আমি ঠিক তৈরী ছিলাম না এই কথাটার জন্য। আমার ধারণা ছিল আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ওর অনেক, মার্গারেট হয়ত নাকচ করে দেবে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিলে। কিন্তু এখন দেখছি মার্গারেট নিজেই কথটা তুলছে।

এটা ওর সাময়িক আবেগ বলে আমার মনে হল। মার্গারেট বলে উঠল, অবাক হয়ে উঠলে কেন বিয়ের কথা ওঠায়, তোমার কি এর মধ্যেই মিটে গেল আমার শরীরটার প্রয়োজন!

আমি তোমাকে ভালবাসি মার্গারেট, তুমি এসব কি কথা বলছ!

ও সজোরে হেসে উঠল আমার কথায়। এক কাজ কর, আমরা তাহলে দুজনে ঝাঁপ দিই বরঞ্চ এখান থেকে।

বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে মার্গারেট। আমি হতবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে ওর কথা শুনে। চুম্বকের মত মার্গারেট আমার কাছে। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ওকে কোনোদিন ছেড়ে থাকব! আমি পাগল হয়ে যাব সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে যদি ও কোনোদিন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এমন কী আমার মাথায় তখন খুনের নেশাও চেপে যেতে পারে।

চলো এখন নামি, তোমায় ঝাঁপ দিতে হবে না। কিছুক্ষণ থেমে বলল মার্গারেট।

আমরা দুজনে আবার নেমে এলাম দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে। আমি তাজমহল দেখতে যাব এবার মার্গারেট বলল মাটিতে পা রেখে। নিশ্চয় আমরা কালই যাব।

সামনের দিকে তাকালাম মার্গারেট এবং আমি। ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছিল, বিকেলে সূর্যের লালচে আভা দেখা যাচ্ছে সারা আকাশ জুড়ে। গাড়িতে উঠার পর মার্গারেটের মুখে লালচে আভা এবং খুশী খুশী দেখাচ্ছিল ওকে। অনেকক্ষণ ধরে আমার আঙুল নিয়ে করতে লাগল নাড়াচাড়া। হোটেলের ঘরে গিয়ে অবলীলায় খুলে ফেলল মার্গারেট সমস্ত পোশাক।

ওর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, দুটো হাত দিয়ে পরম আবেগে জড়িয়ে ধরলাম ওর পাছাটা। আমার দিকে ঠোটে রহস্যময় হাসি এবং দুচোখে ঝিলিক নিয়ে মার্গারেট তাকিয়েছিল। নগ্ন একটি স্বর্গের দেবীর মত বলে ওকে আমার মনে হচ্ছিল। আমার ভেনাসের উপমাটাই সেই মুহূর্তে মনে পড়ল। তুমি আমার ভেনাস, আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম। এই কথা বলার পর তখন ও আমার মাথায় হাত রাখলো।

।। তেরো ।।

চারদিক ভাসছিল রোদে। সূর্য ঠিক তাজমহলের মাথার ওপর। তাজমহলের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি এবং মার্গারেট। আমার মাথা শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে আসছিল, সাদা রঙের এই বিরাট মহলের দিকে তাকিয়ে। ভারতে না এলে আমার কোনোদিনই চোখে পড়তো না এতোবড়ো একটা বিস্ময়। মার্গারেট অবাক হয়ে তাজমহলের দিকে তাকিয়েছিল এবং সেই কারণে আমি সৌভাগ্যবান। আমরা দুজনে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। একটা হাত আমার ধরেছিল মার্গারেট, আমার ওকে একটা সরল বালিকার মত মনে হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে।

আচ্ছা মমতাজকে সম্রাট খুব ভালবাসতো তাই না? মার্গারেট আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ, আমি জবাব দিলাম।

মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল, অনেক বয়স ছিল না সম্রাটের?

আমি উত্তর দিলাম হেসে, তাতো বলতে পারবো না।

মমতাজ কি আমার বয়েসী ছিল? মার্গারেট আবার হেসে বললো।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ওর দিকে তাকালাম। নীরবে কাটলো বেশ খানিকক্ষণ। একে

বারে উপরে পৌঁছে গেছি আমরা। এক মহান প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে শ্বেত পাথরে এই অপূর্ব প্রাসাদ। মার্গারেটকে দেখালাম সম্রাট এবং তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধি। মার্গারেট সব কিছু দেখছিল অবাক হয়ে। কিছুক্ষণ পরে আমরা ওখান থেকে সরে এসে তাজমহলের বাইরের দিকে চাতালে বসলাম।

ছায়া আছে ওই জায়গাটায়। আমার কাছে ক্যামেরা ছিল, তাই বেশ কয়েকটি ভঙ্গীতে আমি মার্গারেটের ছবি তুললাম। ও পরেছিল একটি চকোলেট রঙের স্কার্ট। সব রঙের পোশাকই ওকে মানায়। ওর দেহের গঠন এতই সুন্দর সত্যিই অপূর্ব লাগছিল মার্গারেটকে। ওর দিকে রীতিমতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বেশ কিছু পুরুষ ওর পাশ দিয়ে যাবার সময়। কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলাম আমি। মার্গারেট কাত হয়ে শুয়ে পড়ল একটা হাতের উপর মাথাটা রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে। একভাবে আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম।

মৃদু হাসলো ও আমার দিকে তাকিয়ে এবং তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, তোমার পরিচালক বন্ধুর সঙ্গে কবে যোগাযোগ করবে?

ভাবছি আর কিছুদিন পরেই করবো।

বানিয়ে বললাম তারপরে, ও লন্ডনে ফিরে গেছে কি একটা দরকারে, কিছুদিন দেরী হবে ওর ফিরতে।

তুমি কি করে জানলে? মার্গারেট আবার জিজ্ঞেস করল।

আমাদের হোটেল থেকে আমি তো ফোন করেছিলাম।

মার্গারেট বলল, আচ্ছা, ওরা যদি আমাকে না নেয় তাহলে?'

আমি সামান্য থেমে জবাব দিলাম কি আর হবে তাহলে, তুমি অন্য কোনো জায়গায় কাজ করবে কিংবা তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব।

মার্গারেট বলে উঠল 'পড়াশোনা আমি আর করবো না। আচ্ছা, দিল্লীতে আর কতদিন থাকব আমরা?

ততদিনতো থাকতেই হবে যতদিন না তোমার ব্যাপারটা ফয়সলা হচ্ছে।

সে তো মাস দুয়েক বা তিনেক তো হতে পারে।' মার্গারেট বলে উঠল।

তাতে কি হয়েছে, আমরা তো নাও ফিরতে পারি যদি ইচ্ছা করি, আমি কথাটা বলে উঠলাম নিস্পৃহভাবে।

হেসে উঠলাম কথাটা বলেই। ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে তারপর মার্গারেট বলল, তুমি কি বলছো?

বললাম, ফিরতে নাও পারি আমরা, বিয়ে করব আমি তোমাকে। ঘর বেঁধে থেকে যাব তারপর যেখানে হোক, খুব ভাল হবে না।

কিছুই না বলে মার্গারেট গুম মেরে রইল। চুপচাপ রইলো বেশ খানিকক্ষণ, শুয়ে পড়লো তারপর তাজমহলের চাতালের উপরে। মুখটা ভালভাবে হাত দিয়ে ঢাকলো। ওর আচার আচরণ আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম চাতালে বসে।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা একমনে ভাবছিলাম। একেবারেই চলে এসেছি আমি ওকে নিয়ে বলতে গেলে। আমি হ্যারিয়েটকে চাইও না এবং ওর সঙ্গও আমার ভাল লাগে না। পুলিশের সাহায্য নিতে পারে অবশ্য হ্যারিয়েট বেশীদিন হয়ে গেলে। আমি কলকাতায় যাব এখান থেকে। আপাতত সেখানেই থেকে যাব একটা পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে। একবার তাকালাম আমি মার্গারেটের দিকে। ওর বোজা চোখ দুটি দেখে মনে হল বুঝিবা কোনো ইংরেজ দেবী শুয়ে আছে। তোমার সেই বন্ধু যিনি পরিচালক তাঁর নাম কি?

আমি ভেবে পেলাম না ঠিক কি বলবো। ডেভিড ম্যাকমিলান, এই নামটা হঠাৎ মনে পড়তেই আমি বলে ফেললাম।

মোট কটা ছবি করেছে সে?

আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ এবং সম্ভবতঃ গোটা তিনেক ছবি করেছে সে, এই কথা বলে আমি তাকালাম মার্গারেটের মুখের দিকে। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে আবার বলল মার্গারেট, শ্বেত

পাথরে তৈরী কি এই তাজমহল?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

মৃদু হেসে এরপর মার্গারেট বলল, তুমিতো আমাকে ভালবাস তাহলে তুমি কি করবে আমি মরে গেলে?'

আমি বলে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে, একটি প্রাসাদ তৈরী করে দেব তোমার নামে এবং সেই প্রাসাদের সামনে আমি সবসময় বসে থাকব।

মার্গারেট সজোরে হেসে উঠল এই কথাটা শোনা মাত্রই। আমার কোলের ওপর মাথা রাখলো তারপর একটুখানি সরে এসে।

তুমি মিথ্যা কথা খুব সুন্দর করে বলতে পারো, না, মার্গারেট শেষে বলে উঠল।

চমকে উঠলাম আমি। আমার কাছাকাছি থাকলেও মার্গারেট রীতিমতো রহস্যময়ী আমার কাছে। ও আমার হাঁটুর বয়সী এটা বলা যায়। আমি সবসময়ে ঠিক মতো ওকে বুঝতে পারি না তা সত্ত্বেও। ওর আকর্ষণ, আমার কাছে ক্রমশঃ বেড়ে গেছে ওর এই রহস্যময়তার জন্যই। মার্গারেট আমাকে কি সন্দেহ করছে, আমি মনে মনে একথাই ভাবলাম। আমি রীতিমতো অসুবিধায় পড়ে যাব ও যদি আমার মিথ্যা কথাগুলো ধরে ফেলে। ও কোনোদিন পালিয়েও যেতে পারে আমার কাছ থেকে। ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখা দরকার। আমার কোলে মার্গারেট শুয়েছিল চিৎ হয়ে। স্কার্টের খানিকটা উঠে গেছে এবং বোজা রয়েছে চোখ দুটো। সামান্য দেখা যাচ্ছে উরুগুলি। রঙ মাখনের মত। ওর দুটো স্তনের ছড়া দেখা যাচ্ছে স্কার্টের উপর দিয়ে। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম আমি। মার্গারেট হঠাৎ বলল, আমার মাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।

তোমার মাকে আমি ভালবাসি না এই কারণে।

আমার কথা শুনে মার্গারেট হেসে বলল, তোমার লোভটা আসলে আমার উপর ছিল তাই না।

আমি রীতিমতো আহত হলাম ওর কথা শুনে, যাকে আমি এত ভালবাসি, তার কাছ থেকে এই ধরণের কথা আমি আশা করি নি। তবুও মুখে হাসি বজায় রেখে বলে উঠলাম, তাই, কি মনে হয় তোমার?

মার্গারেট কোনো জবাব দিল না, খিল খিল করে হেসে উঠল তার বদলে। আমার বুকের বোতামটা এক হাতে খুলে দিয়ে হাত বোলাতে লাগল আমার বুকে। যতই আমি ওকে দেখছি এক অস্থির চরিত্রের নারী বলে আমার মার্গারেটকে মনে হচ্ছে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আমার, আমি ওকে বোঝার চেষ্টা করছি যতই। এক এক সময় আমার মনে হয় যে আমি ছাড়া ওব আর কোনো গত্যন্তর নেই। আমার ভুল কিন্তু ভেঙে যেতে দেরী হল না তার পরেই। এক দম্পতিকে আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরেই দেখলাম, ওরা কথা বলতে বলতে পাশাপাশি হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝেই হাসাহাসি করছিল। একবার সেদিকে তাকিয়ে মার্গারেট বলল দ্যাখো ওরা কি রকম ভাবে হাঁটছে। এই কথাটা ও আঙুল দেখিয়ে হেসে বলল আমাকে।

আমি হেসে উঠলাম মৃদু ভাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ উঠে বসে মার্গারেট বলল, কিছু কিনে দেবে আমাকে, চলো আমরা ওরকম জড়িয়ে ধরে হাঁটবো।

হো হো করে হেসে উঠলাম একথা শুনে আমি। এরপর ওর গালটা টিপে ধরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মার্গারেটও উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে চলতে থাকল। ওর কাঁধে হাত রেখে আমি আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম ওর সঙ্গে। একটি প্রচণ্ড রকমের সরল এবং উজ্জ্বল বালিকা বলে মনে হচ্ছিল ওকে তখন আমার। আমার খুব ভাল লাগে এই রূপটা ওর। এরপর একটা দোকানে এলাম আমরা তাজমহল থেকে বেরিয়ে এসে। দোকানে সবকিছুই আছে, কারণ এটি একটি স্টেশনারী দোকান। মার্গারেট একটি কাঁচের চারকোনা বাক্সের মধ্যে তাজমহল কিনলো। ঐ অপূর্ব প্রাসাদটা যেন ছোটো হয়ে গেছে, ওই বাক্সের মধ্যে। দারুণ সুন্দর। মার্গারেট উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, দারুন সুন্দর তো জিনিসটা।

এ ছাড়াও মার্গারেট কিনল একটা গাইড বুক। দুখানা স্কার্ট কিনে দিলাম ওকে আমি পোশাকের দোকান থেকে। ও খুব খুশী এসব পেয়ে। আমি একটা হার কিনবো, একটা গয়নার দোকান দেখতে পেয়ে বলে উঠলো হঠাৎ মার্গারেট।

ওর কথা রেখে দোকানে গিয়ে আমি ওকে ওর পছন্দ মত একটা হার কিনে দিলাম। খুবই আনন্দিত মার্গারেট হারটা পেয়ে। ওর অভিভাবক এখন আমিই। ওর সবকিছু প্রয়োজন এখন মেটাতে হবে আমাকেই। ওর সব এখন আমিই। এখন মার্গারেট আমার কাছে সব। প্রাণ ভোমরা আমার।

।। চৌদ্দ ।।

অনেক দিন থাকা হয়ে গেছে দিল্লীতে। আমি প্রায়ই মার্গারেটকে নিয়ে বেড়াতে গেছি। সমস্ত দিল্লী শহরই আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে গাইড বুক দেখে। এম, আন্নাদুরাই নামে এক তামিল ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল ওখানে। ওদের ঘর আমাদের পাশেই। ওর স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে রয়েছে। পঁয়ত্রিশের কোটায় বয়েস, খুব বেশী বয়স নয়। তিরিশের কোঠায় স্ত্রীর বয়স। একমাত্র ছেলে রয়েছে রাজেশ। খুব ছটফটে স্বভাবের এবং আমাদের ঘরে প্রায়ই চলে আসে। আমরা বুঝতে পারি না ওর আধো আধো কথাবার্তা। তবু ভালো লাগে আমাদের। ওর রীতিমতো ভাব হয়েছে মার্গারেটের সঙ্গে। আন্নাদুরাই দম্পতি এবং মার্গারেট উভয়েই ভাঙা ভাঙা হিন্দী জানে। তাই বেশী দেরী হলো না ওদের আলাপ জমাতে। খুবই পছন্দ ওকে মার্গারেটের। মার্গারেটকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয় বাচ্চাটা। আমি বাচ্চাটাকে নিজেও ভালবাসতাম কিন্তু পছন্দ করতাম না ওকে নিয়ে মার্গারেটের বেশী বাড়াবাড়িটা। একদিন নেমতন্ন করলো আমাদের আন্নাদুরাই দম্পতি। ভারতীয়রা যে খুবই অতিথিপরায়ণ হয় তা আমি লক্ষ্য করলাম সেদিনই। কয়েকবার হ্যারিয়টের সঙ্গে অন্য জায়গায় গিয়েও এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলাম এবং তাতে মনে হয়েছিল বেশীরভাগ ভারতীয়রাই অতিথি বৎসল। একদিন রাজেশকে কোলে নিয়ে মার্গারেট আমার কাছে আসতে আমি তাকে বললাম হেসে, ওকে পেলে কোথায়, কি ব্যাপার?

মার্গারেট হেসে উঠল এবং বলল, আমার চেয়ারে বারান্দায় বসেছিল রাজেশ, আমি তাই ওকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।

মার্গারেট রাজেশকে আমাকে দেখিয়ে বলল, কে হয় এ তোমার? রাজেশ কিছু না বলে চুপচাপ রইলো। মার্গারেট বলল আবার, রাজেশ, বলো, তোমাকে আমি সেই যে বললাম।

আধো স্বরে রাজেশ হেসে বলল ফাদার।

ইয়েস ফাদার—এই কথা শুনে মার্গারেট হাসতে শুরু করলো খিলখিল করে এবং তার দেখাদেখি হাততালি দিয়ে হাসতে আরম্ভ করল, রাজেশও। আর আমি কে, মার্গারেট জিজ্ঞেস করল আবার।

আধো আধো গলায় রাজেশ মাদার বলে নিজেই হাসতে শুরু করলো।

ভেরী গুড, এই বলে মাদার ওর কচি গালটা টিপে দিল।

মার্গারেট এরপর রাজেশকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সারা দেহে ওর চুমু খেতে লাগল পাগলের মত।

আমি বললাম, মিমি, তুমি ওকে এসমস্ত ব্যাপার শেখাচ্ছ কেন, ব্যাপার কি?

মার্গারেট বলে উঠলো কপট রাগে, বেশ করেছি, শিখিয়েছি।

মার্গারেট মাঝে মাঝে কিরকম অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে এটা আমি লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝেই। ও রেগে যায় কেউ ওকে কিছু বললেই আমি মার্গারেটকে বললাম, বেশী মেলামেশা ওঁদের সঙ্গে করো না, আমি তোমাকে বারবার বলছি মিমি।

কেন কি হয়েছে করলে?

স্থির চোখে তাকাল আমার দিকে একবার মার্গারেট। তখন রাগের চেয়ে বিরক্তি বেশী তার দুচোখে। আমি যে ব্যাপারটা ভালভাবেই জানি, তা হল, বেশ জেদী স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। আমি বললাম শান্তভাবে, তুমি সবসময় ছেলেটাকে নিয়ে ওরকম করছো এতে তো অসন্তুষ্ট হতে

পারে ওরা।

আমি রাজেশকে ভালবাসি এতে অসন্তুষ্ট হবার কি আছে!

ভীষণ ছেলেমানুষি মনে হল মার্গারেটের কথাটা আমার কাছে। কিছুই করার নেই আমার, কারণ আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি, যৌবনের শেষ প্রান্তে এই সরলমনা মেয়েটির সঙ্গে। যদিও আমার হাজার ইচ্ছে থাকুক না কেন। হাজার হলেও ওরা আমাদের অপরিচিত, এটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না ওকে। ভারতীয়রা খুব মিশুকে হয়, সাধারণভাবে যদিও দীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশে থাকার ফলে আমাদের মত সাহেবদের সংস্পর্শে এলে ওরা একটু হীনমন্যতায় ভোগে। সেটা সময় লাগবে কাটিয়ে উঠতে। আবার বললাম আমি শান্তভাবে মার্গারেটকে, 'বেশী আদর তুমি রাজেশকে করো না, এটা তোমাকে আমার অনুরোধ। ব্যাপারটা ভাল চোখে নেবে না হয়তো ওরা। ওদের ইচ্ছে থাকলেও ওরা কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারছে না মুখে।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও বলে উঠলো একসময়, রাজেশকে আমি বেশী সময় দিচ্ছি, এটা তোমার সহ্য হচ্ছে না, আসলে তোমার হিংসা হচ্ছে।

মার্গারেট এই কথাটা বলার পরেই হেসে উঠল। আমি উপরে শান্ত থাকলাম যদিও আমি ভেতরে রেগে গেছি। আমি বলে উঠলাম হেসে, মার্গারেট তুমি সত্যিই খুব ছেলে মানুষ।

তোমার লজ্জা করে না আমার সঙ্গে প্রেম করতে, বুড়ো কোথাকার।

আমি বললাম, চল মিমি, মিছিমিছি ঝগড়া না করে কোথাও আমরা ঘুরে আসি।

রাজেশকে নিয়ে মার্গারেট বাইরে বেরিয়ে গেল একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে। আমরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যদিও এর আগে একবার লালকেল্লায় গেছি, তথাপি যাত্রা শুরু করলাম লালকেল্লার উদ্দেশ্যে। মার্গারেট অবাক হল গোলাপী পোষাক পরা একটি লোককে দেখে, বলে উঠল ও, 'লোকটা জাদুকর।'

লোকটাকে দেখলাম আমি। গেরুয়া আলখাল্লা পরে, গলায় পুঁতির মালা এবং ওর হাতে রয়েছে একটি ঝাড়ন। একাকার হয়ে গেছে লোকটার ঝাড়নের সঙ্গে ওর দাড়ির ধূসর রঙ। আমি বললাম, তুমি এরকম সাধু আগে দেখনি বোম্বেতে?

মার্গারেট বলল, আমি সাধু দেখলেও এরকম ধরনের দেখিনি।

বললাম, এরা মুসলমান ফকির, তাই টুপি পরে মাথায় মুসলমানদের মতই।

একটি ছবি তুললে ওর কেমন হয়, বলে উঠল মার্গারেট।

খুব মুস্কিল হয়ে যাবে লোকটি যদি রেগে যায়, মার্গারেটকে আমি বললাম। তাই মার্গারেট আর কিছু বলল না। আমরা এগিয়ে চললাম। আমি দাঁড়ালাম লালকেল্লার ঠিক মুখের সামনে এবং বললাম, জানতো আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর বিচার হয়েছে এই লালকেল্লাতেই।

ওদের নাম সুভাষ বসু বলে আমি শুনেছিলাম, মার্গারেট বলল।

হিটলারের নাম তো তুমি শুনেছ?

বড় বড় হয়ে গেল মার্গারেটের চোখ দুটো এবং সে বলে উঠল, 'পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিল তো জার্মানীর এই লোকটাই এবং এর সঙ্গেই তো আলাপ ছিল সুভাষ বসুর।

আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছো, গান্ধীর নাম এখানকার সবাই জানে। তুমি কি শুনেছো তার নাম?

আমি শুনেছি, মার্গারেট বলে উঠল।

আমি জবাব দিলাম, সব থেকে জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি ভারতের এবং তার মৃত্যু খুব শোচনীয় ভাবে হয়েছিল এবং তাকে ভক্তি করে শহর গ্রাম সব স্থানের মানুষরা।

মা আমাকে একথা বলেছিলেন, আমি মায়ের কাছেই এটা শুনেছিলাম, এগোতে এগোতে বলে উঠল মার্গারেট।

আমরা এগোতে লাগলাম আবার কারণ ভেতরে ঢুকে অনেকখানি হেঁটে যেতে হয়। আমার পাশাপাশি হাঁটছিল মার্গারেট। আমার ফিল্মে নামার কি হলো, হঠাৎ ও বলে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে।

কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম আমি ওর প্রশ্ন শুনে। আমি একেবারেই ভাবতে পারিনি যে ও আমাকে

এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে লালকেল্লাতেই। বন্ধুতো এখনো আসেনি তাই, আমি বললাম, এখন তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। আবার বললাম, অন্য অনেক কাজ আছে, ফিল্মে যে নামতেই হবে তার কোনো অর্থ নেই। কাজ তো অনেক রকম আছে।

মার্গারেট নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, কাজ অনেক রকম আছে ঠিকই কিন্তু অনেক টাকা এবং নাম হবে ফিল্মে নামলে, তা অন্য কাজ কি আছে।'

নামে তোমার দরকার কি হবে।

কার না ভাল লাগে নাম। হেসে বলল মার্গারেট।

আমি বললাম, আমি তোমাকে নিয়ে সারা জীবন এভাবেই কাটাতে চাই। তাই আমার ওসব ভাল লাগে না।

বাজে কথা ছাড়ো, আমরা এগোই চলো, এবার খানিকটা রেগে মার্গারেট একথা বলে উঠল।

চুপচাপ এগোতে থাকলাম আমরা দুজনে। মার্গারেট দেওয়ান-ই-খাসের সামনে সম্রাটের সেই উঁচু সিংহাসনটার দিকে তাকিয়ে বলল, নিজের পায়ে দাঁড়াবো আমি।

মেয়েটি পাগল নির্ঘাত, আমি তাকালাম ওর দিকে। নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে এতো বড়ো একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বললাম না এই কথার উত্তরে। আমাদের সময় লাগল ঘণ্টা দুয়েকের মত লালকেল্লা দেখতে। উপভোগ করা গেল না তেমন। মার্গারেট গম্ভীর হয়ে রইল প্রায় সারাক্ষণই। টুকিটাকি কিছু জিজ্ঞেস করছে অবশ্য মাঝে মাঝে। জবাব দিচ্ছি আমিও। সোনার আংটি কিনে দিলাম রাস্তায় ওকে। ওর নামের আদ্যাক্ষর লেখা ছিল আংটির ওপরে। ওকে আকর্ষণ করছে এটাই। যখন হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম তখন রাত হয়ে গেছে। সেই তামিল দম্পতি যারা আমাদের পাশের ঘরে থাকে তাদের দরজা এখনও বন্ধ মানে তারা এখনও ঘরে ফিরে আসেনি।

আমরা ডিনার সেরে পোষাক পাল্টে নিলাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। আমার মুখের দিকে মার্গারেট তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে যখন আমরা খাচ্ছিলাম। বলছিলাম না তেমন কিছু। ও মাঝে মাঝে বলছিল অবশ্য কিছু মামুলি কথাবার্তা। সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছিলাম আমি। আমরা ঘরে ফিরলাম খাওয়া শেষ করে। মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম ওকে অপরূপ দেখাচ্ছিল সাদা রঙের স্বচ্ছ গাউনে। আমি পাগল হয়ে যাই মার্গারেটের ঐ অপরূপ রূপ দেখলে। তখন আর নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না আমার। ওর শরীরের ভিতরের প্রতিটি রেখা দেখা যাচ্ছে গাউনের ভিতর দিয়ে। মার্গারেট বিছানার উপর বসে হাই তুললো দুহাত উপরে তুলে দিয়ে। আমি একটা চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বার বার তাকাচ্ছিলাম ওর দিকে। আসলে আমি বোঝাতে চাইছিলাম মার্গারেটকে যে, আমি ওর উপর অসন্তুষ্ট ও সেটা বুঝুক। মার্গারেট মুড়ে বসলো পা দুটো। বেশ শব্দ করে দুহাত উপরে তুলে ও হাই তুললো, ওর দিকে তাকালাম আমি এবার। ওকে যা বলার তা আমি বলতে চেষ্টা করলাম আমার চোখ দুটো দিয়ে। মৃদু থেমে বলল মার্গারেট, কতদিন এখানে থাকব বলতো আমরা?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, বেশীদিন নয় আর।

যাবো কোথায় এবার আমরা?

জবাব দিলাম আমি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, কলকাতায় যাবার ইচ্ছা আছে একবার।

চিৎ হয়ে শুয়ে মার্গারেট বলল, বোম্বে তাহলে যাচ্ছি না আর আমরা।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না'। ও টান টান হয়ে আছে এবং ওর শরীরের চড়াই উৎরাই এক মোহময় জগতে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি ক্রমশ। ওকে বললাম, আমরা কলকাতাতে থাকবো এবং একটি চেম্বার করবো আমরা কলকাতাতে।

তোমার হোটেল দুটোর কি হবে, মার্গারেট জিজ্ঞেস করল।

বিক্রি করব ও দুটো।

আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিছুদিন আগে রোগাটে ছিল কিন্তু আগের চেয়ে ওর শরীরে এখন লাবণ্য এসেছে। আমার আগে ওর চেহারাটা ধারালো মনে হলেও ঠিক এই

মুহূর্তে সামান্য মেদ জমেছে ওর শরীরে। ক্রমশ শরীর আরো লোভনীয় হয়ে উঠছে। শরীর আর মনে বরং আমিই দিনের পর দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল কাত হয়ে, একটু টিপে দাও তো আমার কপালটা, বড্ড ব্যথা করছে।

আমি বিছানার উপর বসলাম এগিয়ে গিয়ে। ওর কপালে একটা হাত রাখলাম। এরপর ওকে একটা চুমু খেলাম আমি কিছুক্ষণ ওর কপালটা টিপে দেবার পর। আস্তে আস্তে ঘোর লাগছে মার্গারেটের দুচোখে। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলাম আমি ওর শরীরের আবরণ। হাত রাখলাম ওর বুকের ওপর। ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়ার পর ওর শরীরে আবরণ, আমাকে ওর শরীরের মোহময় আবরণ এবং সৌন্দর্য বাস্তব পৃথিবী থেকে এক অপূর্ব মায়াময় স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশঃ। কপালে লাগছিল আমার ওর নিঃশ্বাস। ঘরের আলোটা দিলাম নিভিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে।

।। পনের ।।

দিন দুয়েক আগে চলে গেছে সেই তামিল দম্পতি। আমি খুব কমই দেখেছি এইরকম ভদ্র পরিবার। এই সত্যটাই আবার তুলে ধরলো যে ভারতীয়রা অতিথিপরায়ণ। ওখানেই সরকারী চাকুরী করেন ভদ্রলোক। ভালই জানেন ইংরাজী, আমরা কথাবার্তা বলেছি নানা বিষয় নিয়ে। ভদ্রলোকের একটি বিষয় ভালরকম ভাবে জানাশুনো রয়েছে, তাছাড়া বেশ ভালরকম ওয়াকিবহাল ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কেও। ভদ্রমহিলাও শিক্ষিতা ছিলেন মোটামুটি।

ওরা চলে যেতে খুবই খারাপ লাগছিল আমার। অনেকটা ভেঙে পড়ল মার্গারেট বিশেষ করে। ও প্রায়ই রাজেশকে নিয়ে সব সময় থাকতো। অসম্ভব টান মার্গারেটের বাচ্চার ওপরে। বাচ্চাদের ওপর টান থাকে অবশ্য প্রায় সব ভারতীয় মহিলাদেরই। মার্গারেট ভারতীয় নয় যদিও তবু ভারতীয়দের এই গুণটা পেয়েছে খুব বেশী পরিমাণে। মার্গারেট কেঁদেই ফেলেছিল যেদিন রাজেশরা গেল সেদিন ওকে কোলে করে। গুম হয়ে কাটালো পরপর দুদিন। আদর করার চেষ্টা আমি মাঝে মাঝে করলেও ও নিস্পৃহ থাকার জন্য বেশীদূর এগোতে পারিনি। আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর ওর একরকম অবস্থাটা। ও আমাকে একেবারে আমলই দেয় না এই সময়টা। গ্রাহ্য করে না। উল্টে আমাকে কড়া কথা শোনায় আমি যদি এগিয়ে যাই। খুব একটা এগোতে পারি না কারণ আমি ওকে ভয় পাই। কিছু হলেই ও আমাকে পালিয়ে যাবার ভয় দেখায় ইদানীং। একাধিক বার আমার দেখা হয়ে গেছে দিল্লীর প্রায় সব জায়গাই। আমার কাছে এখন অনেক পরিচিত হয়ে গেছে দিল্লীর রাস্তাঘাটও। এখানেই থেকে যাব একবার মাঝে ভেবেছিলাম এবং চেম্বার করব এখানেই। এই ব্যাপারটা কিন্তু বাতিল করে দিলাম একটা কারণে। আমরা দিল্লীতে এসেছি হ্যারিয়েট সেটা জানে। ও আমাদের খোঁজে এখানে চলে আসতে পারে যে কোনো সময়। আমার সারা দেহে কাঁপন লাগে হ্যারিয়েটের মুখটা মনে পড়লেই। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছেও সারা শহর তোলপাড় করে দেবে আমাদের খোঁজে। খবরের কাগজ সামনে, চোখে পড়ল একটা আলোচনা। বিদেশে নাকি দারুণ সমালোচনা পেয়েছে এখানকার একটি বাংলা ফিল্ম। এত সম্মান পায়নি এর আগে ভারতের কোনো ছবি। 'পথের পাঁচালি' ছবিটার নাম। একজন অখ্যাত বাঙালী যুবক ছবিটির পরিচালক। কলকাতায় গিয়ে ছবিটা দেখব বলে ভাবলাম। হিন্দী এখানকার প্রধান ভাষা। যখন বোম্বেতে ছিলাম তখন দু একখানা হিন্দী ছবি দেখেছি। এখানকার ছবি সম্পর্কে আমার ধারণা তাতে খুব খারাপ হয়ে গেছিল। বলার নয়, সে এতো বাজে ছবি। যাকগে, নিশ্চয় দেখবো এই ফিল্মটা। ভারতের বেশীর ভাগ সংস্কৃতি কলকাতাই ধরে রাখে বলে শুনেছি। বুঝতে পারবো নিশ্চয় ওখানে গেলেই, একটা ছবি যেন ভাসছে আমার চোখের সামনে। রাস্তা দেখা যায় দূরে তাকালেই। ভিড় গাড়ি ঘোড়া এবং পথচারীর। এখনও ফাঁকাই লাগছে অবশ্য এই জায়গাটা।

এখনতো লন্ডন শহরে ক্রমশই ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। আমার মুখোমুখি এসে বসলো মার্গারেট স্নান সেরে একটা গাউন পরে। ওকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল সদ্য স্নান সারা অবস্থায়। পবিত্র ভাব

একটা ওর মুখের মধ্যে।

আমি মৃদু হাসলাম মার্গারেটের মুখের দিকে তাকিয়ে। মনটা ভাল এখন মার্গারেটের। হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঠিক ঘুমোতে পারিনি কাল রাতে।'

ওর কাঁধে হাত রেখে 'কেন' বলে আমি জিজ্ঞেস করে উঠলাম। শরীর কি খারাপ লাগছিল তোমার।

আমার জামার বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মার্গারেট মৃদু হেসে বলল, বুঝতে পারছি না আমি ঠিক। আমার শরীর তো ভালো আছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথায় যেন একটা বিষন্নতা লেগে আছে ওর মুখের মধ্যে। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার ভেতরটায়। কি অবিচার করেছি আমি মার্গারেটের ওপরে। আমি ভালবাসি তো ওকেই। আমি সবকিছু করতে রাজি আছি ওর জন্যে। আমি ভালবাসা পাইনি এর আগে কোনো নারীর কাছেই। আমাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা মার্গারেট সেটা অবশ্য আমি জানি না। কিছু দিন আগে আমাকে পাগল করে দিয়ে কিশোরী ক্যাথরিন আমার রক্তে হিল্লোল তুলেছিল। যথারীতি আবার ভুলেও গিয়েছিল তারপর। ওর এবং আমার ক্ষেত্রেও সাময়িক আবেগ ছিল ব্যাপারটা। উত্তেজনা ছিল কিশোর বয়সের, তাতে ছিল না কিন্তু কোনো প্রেম। আমাকে ভালবাসেনি কিন্তু ক্যাথরিন, এরপর আমার জীবনে এসেছিল সোফিয়া। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলাম আমি ওকে। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল কিন্তু সোফিয়ার রক্তে। আমার কাছে এসেছিল ও নিছক এক ধরনের মোহে। আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল ওর অস্থির স্বভাবই। আমরা বিয়ে করেছিলাম। বারবার মিলিত হয়েছিলাম দুজনে, আমাকে কিন্তু সোফিয়া ভালবাসেনি। অবশ্য ওর মতো বিকারগ্রস্ত একজন নারীর কাছে ভালবাসা আশা করাও ঠিক নয়। ভুল আমি করেছিলাম এবং ফলও পেয়েছি আমি তার হাতে হাতে। এরপর আমার জীবনে এল হ্যারিয়েট। আমাকে পেতে চেয়েছিল হ্যারিয়েট যৌবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে। আঘাত পেয়েছে হ্যারিয়েটও জীবনে। বর্তমানে অনিবার্য হয়ে উঠতো হয়তো হ্যারিয়েটের আসাটা। আমি সবকিছু ভুলে গেলাম কিন্তু মার্গারেটকে দেখার পর। আমার মত পুরুষ যার যৌবন শেষ হয়ে গেছে তাকে পাগল করে তুলল মার্গারেট। ওর জোয়ারের টানে ভেসে গিয়ে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। আমাকে ভালবাসেনি হ্যারিয়েট কিন্তু ও কেবলমাত্র আমাকে চেয়েছিল একটা অবলম্বন হিসাবে। আমাকে পেয়ে চরম বেড়ে গিয়েছিল ওর তীব্র যৌনক্ষুধা। সেটাই মেটাবার ছলাকলা ওর প্রেমের অভিব্যক্তি। ডাক্তার হলেও আমি মনের কারবারী নই।

আমাকে মৃদু ধাক্কা দিল মার্গারেট হাত দিয়ে, তারপর বলল, কি ভাবছো?

প্রথমে চমকে উঠলাম আমি এবং তারপর বললাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, কই কিছু ভাবি নিতো।

চেপে যেও না আমাকে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো মার্গারেট, সজোরে হেসে বলে উঠলাম আমি, 'আমাকে বিশ্বাস করছো না তুমি।

তোমাক বিশ্বাস করেছি বলেই আমি আজ এখানে। মার্গারেট গম্ভীর হয়ে বলে উঠল হঠাৎ।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, না, মিমি, না বলার কিছু নেই, আমাকে কিছু একটা কবতে হবে কলকাতা গিয়ে, ভাবনা এটাই যে আমার টাকা পয়সা ক্রমশঃ কমে আসছে।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রইল মার্গারেট একথা শুনে।

আমি চাকরী করব কলকাতায় গিয়ে, তারপর সে বলে উঠল কিছুটা নিস্পৃহ স্বরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। মাঝে মাঝে লোকজন যাওয়া আসা করছিল করিডোর দিয়ে। নেহাৎ কম ছিল না বিদেশী লোকজন। হঠাৎ বলে উঠল মার্গারেট, আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে।

চিন্তিত হয়ে ওর কথায় বলে উঠলাম আমি, জ্বরটর বোধ কর নাকি মাঝে মাঝে?

সেরকম কিছু বোধ করিনা, তবে মাঝে মাঝে খেতে পারি না।

ওর চোখে সামান্য কালি পড়লেও মাঝে মাঝে তা তেমন বোঝা যায় না। পেটটা যদিও সেরকম উঁচু বলে মনে হচ্ছিল না। ইদানীং অবশ্য লাবণ্য একটা এসেছে মার্গারেটের শরীরে।

এবার আরো একটা চিন্তা এসে হাজির হলো আমার মনের মধ্যে। তাহলে তো একটা সমস্যা বাড়বে ও যদি সন্তান ধারন করে। কে জানে এদেশে এসব ভাল ভাল ওষুধ আছে কিনা। সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেবোনা। তাই বলে উঠলাম।

মার্গারেট বলল, তুমি যখন বাইরে যাবে তখন আমার জন্য শেক্সপিয়ারের কিছু গল্পের বই এবং কিছু ম্যাগাজিন কিনে আনবে, যা লেখা আছে কমিক্‌সের উপর।

আমি বললাম, আনবো।

এরপর চুপচাপ চা খেলাম আমরা দুজনেই আমি ওকে হাসাবার জন্য হাসির কথা বলছিলাম মাঝে মাঝে এবং তাতে ও হাসছিল। ও যেন কোনো মতে দুঃখ না পায় সেটাই আমি তখন চাইছিলাম। ওর সবকিছু এখন আমিই। খেতে খেতে ওর দিকে তাকাতেই আমি নিজের ভেতর ভেতর একটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম। সংযত রাখতে পারছিলাম না আমি নিজেকে। প্রায়ই যখন এরকম হয় তখন মনকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না আমি ভীষণভাবে উত্তেজনা পেয়ে বসে আমাকে এবং অসহায় বোধ করি তখন আমি নিজেকে।

'মিমি ঘরে এসো' আমি বললাম মার্গারেটকে। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর কোনো কথা না বলে মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খাবার পর খেয়াল হল যে বন্ধ করা হয়নি দরজাটা। আমি এক ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জড়িয়ে ধরলাম মার্গারেটকে। একটু বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়ে মার্গারেট বলে উঠল, এই সাত সকালে কি হচ্ছে, সে এই কথাটা বলল গোল গোল চোখ করে।

প্লীজ মিমি আমি আর পারছি না।

মার্গারেট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বলে উঠল, আমার আর এখন ওসব ভাল লাগছে না। ওর এই রহস্যময় হাসির অর্থ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মার্গারেট বিছানায় বসেই আমাকে বললো, এগিয়ে এসো।

আমি ওর সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই আমার চরম উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমার কাছে এসে বসলো মার্গারেট মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পোষাকটা বদলে। দুজনে চুপচাপ রইলাম খানিকক্ষণ। সশব্দে উড়ে গেলো একটা এরোপ্লেন আমাদের মাথার খুব কাছ দিয়ে। এরকম হয়ে গেলে কেন তুমি, হঠাৎ মার্গারেট বলে উঠলো।

বললাম, আমার মাঝে মাঝে কেন জানিনা ওরকম হয় এবং তার ফলে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না।

আমাকে কবে বিয়ে করছো, হঠাৎ ও বলে উঠলো লাঞ্চের সময়। একটি মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছিলাম এবং ওর প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকালাম তখন অবাক হয়ে। আটকে রইলো ঠ্যাংটা মিনিট দুয়েকের জন্য। মৃদু হেসে তারপর ঠ্যাং একহাতে বের করে নিলাম এবং তারপরে বললাম সমস্ত ব্যবস্থা করবো আমি কলকাতায় গিয়ে।

মার্গারেট বলে উঠলো হেসে, বুড়ো হয়ে গেছ তুমি, কি হবে বিয়ে করে, তুমি আমার বাবা হয়ে যেতে যদি এতোদিনে মাকে বিয়ে করতে। আমার কপাল সত্যিই মন্দ কারণ যার বাবা হওয়ার কথা ছিল, এখন সে হতে চলেছে আমার স্বামী।

তোমার কপাল মিমি সত্যিই খারাপ, তুমি ভারতীয়, কিন্তু ভারতীয়রা চায় বুড়ো স্বামী। তারা কামনা করে শিবের মত বুড়ো স্বামী, বুড়ো দেবতা তো তিনি।

হেসে উঠলাম আমি সজোরে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মার্গারেট।

।। ষোল ।।

আমাদের থাকার মেয়াদ আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। প্রথম কারণটা হল, হঠাৎ মার্গারেটের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং এর দ্বিতীয় কারণটা হল, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। অনেকদিনের পুরনো বন্ধু আমার। স্কুলে পড়েছি ওর সঙ্গে ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়

ডাক্তারি পড়তে গিয়ে। অবশ্য বাইরে যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। ও পড়াশুনো করেছিল অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে। এখন অবশ্য ও যুক্ত আছে লেখালেখির সঙ্গে। কাগজের সাংবাদিক এখন ও ওখানকার। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানবার জন্য ও এসেছে এখানে। ওর একটা উপন্যাস লেখারও ইচ্ছা আছে এই পটভূমিতে। আমি সামনের চেয়ারে বসে আছি একদিন হোটেলের রিসেপশান কাউন্টারে। বিশেষ করে বেলার দিকে ওখানে গিয়ে আমি প্রায়ই বসি। মাথায় টুপি এবং পরনে নিখুঁত পোষাক নিয়ে এক যুবক ঢুকলো। ওর দিকে নিস্পৃহভাবে আমি তাকাতে ও আমার দিকে একবার টুপিটা খুলে চোখ কুঁচকে বলল, 'পিটার না।

এই বিদেশ বিভুয়ে কে আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারে সেটাই আমি অবাক হয়ে ভাবলাম। ওর দিকে আমি তাকাতে ও একেবারে আমার সামনের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে দেখে ভাবলাম একজন যুবক কিন্তু তারপরে দেখলাম এঁর যৌবন শেষ হবার মুখে কিন্তু বাঁধুনি খুব সুন্দর। যা বয়সকে একবার পেছনে ফেলে দিয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে আমি বলে উঠলাম, ফ্রেডি!

হ্যাঁ, আমি ফ্রেডি উইলসন, তোমার আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

তুমি তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছো, আমি বলে উঠলাম হেসে।

ওকে বসতে বললাম আমি। আমার কামরায় আমি ওকে নিতে যেতে চাই না এই মুহূর্তে কারণ আমি জানি না যে মার্গারেট এই মুহূর্তে কিভাবে রয়েছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেডি, পিটার তোমার কি ব্যাপার, তুমি কোথায় রয়েছ এখানে?

আমি ওকে বললাম আমার কামরার নম্বর। দোতলাতে আমি থাকি।

এই হোটেলেরই একেবারে শেষের কামরাতে ফ্রেডি থাকে একতলার ঘরে। আমি যদিও যেতে চাইছিলাম না কিন্তু জোর করে ও ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। ওর ঘরটা একেবারে শেষ প্রান্তে। যখন ঢুকলাম তখন দেখলাম এ ঘরটা বেশ ভালো একটা ফোয়ারা রয়েছে সামনেটায়। এখান থেকে ভাল দেখা যায় বাগানের বেশ খানিকটা। এ জায়গাটা ঠিক চোখে পড়েনা আমাদের বারান্দা থেকে। চেয়ারে বসলাম এবং ঠিক তখুনি ফ্রেডি গিয়ে দুটো চা বলে এসেছে। বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করলো ফ্রেডি, তুমি এখানে কবে এবং কি ব্যাপারে এসেছো?

আমি বললাম, কয়েকমাস হলো এখানে এসেছি।

এখানে চেম্বার টেম্বার করোনি। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না অবশ্য তোমার ডাক্তার হয়ে বেরোনোর পর। নিজেই আবার বললো একটু থেমে, আমাদের দুজনের পেশা আলাদা ছিল, একটা কারণ ছিল সেটাও, তোমাদের তো এখানে এবং বোম্বেতে একটি হোটেল ছিল।

সেগুলি কর্মচারীরাই চালায়, এখন বিক্রী করে দেবো ভাবছি।

কোথায় প্র্যাকটিশ করবে ঠিক করেছ?

কলকাতায়, আমি জবাব দিলাম।

ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বলল, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, কারণ জায়গাটা চমৎকার, তবে শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা আছে আমার, আমি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েছি। আমি যে উপন্যাস লিখবো ভাবছি ভারতকে নিয়ে, কলকাতা আর শান্তিনিকেতনের বেশীর ভাগ তথ্য থাকবে তাতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে, তোমার উপন্যাস কটা বেরিয়েছে এখনও পর্যন্ত?

দুখানা বেরিয়েছে। আমি কাগজের সাংবাদিক, সুতরাং রীতিমতো ব্যস্ত জীবনে আমাদের লিখতে হয় সেটা তো বুঝতেই পারছ। এখানে এসেছি আমি খবরের কাগজের কাজে। একটু থেমে বলল, বিয়ে করেছ, এবার খবর বলো তোমার।

কি বলবো তা আমি ভেবে পেলাম না। ভাবলাম কিছুক্ষণ, তার পরে বললাম, করেছিলাম বিয়ে, কিন্তু সেটা তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটু অস্বাভাবিক ধরনের ছিল আসলে ওর শারীরিক চাহিদা। ও একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের শরীর কামনা করত মানসিক দিক থেকে। ব্যাপারটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি কোনো মতেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফ্রেডি, পরিষ্কার ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল, আমার ক্ষেত্রেও একই কেস, তবে তোমার একটা হলেও আমার অবশ্য পর পর দুবার বিয়ে

হয়েছিল। একটু অপ্রকৃতিস্থা ছিল আমার প্রথমা স্ত্রী এবং এটা আমি টের পেয়েছিলাম কয়েক মাস পর। যৌন ব্যাপারে একেবারে ঠাণ্ডা ছিল অবশ্য আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী। এটা টেকেনি কারণ টের পেয়েছি বিয়ের পরেই। অবশ্য আমি চেষ্টা করেছিলাম নানাভাবে কিন্তু সেটা হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তাররা। মা ছিল মেয়েটির। ছেলেবেলায় ওর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা সেটা ওর মা কিন্তু কিছু বলেনি। পিটার বিয়ের আগে কিন্তু টের পাইনি একদম ব্যাপারটা। ফ্রেডি এই কথা বলে থামলো।

বিয়ে টিয়ে করার কথা ভাবছো নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি এখন এসব ভাবছি না ভাই, খুব বেঁচে গেছি একটা ব্যাপারে যে আমার বাচ্চাটাচ্চা কিছু হয়নি।

ঘাড় নাড়লাম আমি, আমারও তা হয়নি বটে, একটা প্রেম করছি বটে তা বলতে পারো।

ফ্রেডি চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলল, তাই নাকি, সে কোথায় এখন?

আমি বললাম ওর দিকে তাকিয়ে, সে এই হোটেলেই আছে, বাড়ি ওদের বোম্বেতে, খুব একটা বেশী নয় ওর বয়স। বলতে পারো সদ্য যুবতী একেবারে। এর সঙ্গেই কাটাবো ভাবছি আমার বাকি জীবনটা। যদি সব কিছু ঠিকটাক চলে।

উঠে দাঁড়াল ফ্রেডি, চলো আলাপ করে আসি তাহলে।

ওকে নিয়ে যাওয়াটা আমি মনে মনে অবশ্য চাইছিলাম না। রীতিমতো ভয় করি আমি মার্গারেটকে যদিও ওকে আমি মনে মনে ভালবাসি। ও যে কখন কি করে বসে কোনো ঠিক নেই। 'চলো' তবু আমি বলে উঠলাম।

ফ্রেডি এগোতে আরম্ভ করল এরপর আমার সঙ্গে। দোতলায় চলে এসে দেখলাম যে একটা চেয়ারে বারান্দায় বসেছিল মার্গারেট। সে ফিরে তাকাল আমাদের পায়ের শব্দ শুনে। পরিচয় করে দিলাম মার্গারেটকে এবং তারপর বললাম ফ্রেডি উইলসন আমার বন্ধু, এই হোটেলেই উঠেছে। আগে চোখে পড়েনি। এ একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং লেখক। ফ্রেডির দিকে তাকালাম এবং বললাম, এর নাম মার্গারেট, আমার সবকিছুই হল এ।

মার্গারেট উঠে দাঁড়াল এবং ওর সঙ্গে করমর্দন করল এবং তারপর বলল মৃদু হেসে, বসুন, খুব খুশী হলাম মিঃ উইলসন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

আমি এবং ফ্রেডি দুজনেই বসলাম। তাবপর ও বলল হেসে, আমাকে বেশী সমীহ করার দরকার নেই, আমি পিটারের যেমন বন্ধু তেমনি তোমারও।

ঠিক আছে।

মার্গারেট একটু থেমে আবার বলল, মিঃ উইলসন, আপনি চাকরী করেন কোন্ কাগজে?

হেসে ফ্রেডি বলল, আমি মিঃ উইলসন নই, আমি শুধুই ফ্রেডি, বললাম না।

মার্গারেট হেসে বলল, শুধু ফ্রেডি বলব ঠিক আছে, তুমি যে কাগজের সাংবাদিক তার নাম কি?

ফ্রেডি জবাব দিল, কাগজের নাম লন্ডন টাইমস।

মার্গারেট বলে উঠলো, ওটি বুঝি ওখানকার কোনো নামকরা কাগজ।

নামকরা কাগজ ওটি, তবে আমি এমন কিছু কেউকেটা নই, সামান্য সাংবাদিক আমি, আমার উপর ভার এখন পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার।

এবারে আমি বললাম, ফ্রেডি তাহলে তোমার এত দায়িত্বের মধ্যে লেখবার সময় কখন পাও?

ফ্রেডি বলল, ওর মধ্যে থেকেই সময় বার করে নিতে হয়।

মার্গারেট বলল, এখনও পর্যন্ত কটা বই বেরিয়েছে তোমার?

ফ্রেডি জবাব দিল, দুটো বেরিয়েছে, কিন্তু বিক্রী সেরকম একটা কিছু হয়নি, একটি নিটোল প্রেমের গল্প যাতে দুই প্রেমিক এবং এক প্রেমিকার মধ্যে টানাপোড়েন। এটি সে বিষয় নিয়েই লেখা যে আমাকে বেশ কিছু অদ্ভুত অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে। মোটামুটি দুটো বই খুবই প্রশংসিত হয়েছিল সমালোচকদের দ্বারা।

বই দুটোর কি নাম? মার্গারেট বলে উঠল হেসে।

'মিসেস হ্যারিসনের প্রেমকাহিনী' একটির নাম এবং 'আমার না বলা গল্প' আরেকটির নাম।

মার্গারেট বলল, দুটো নাম তো বেশ ভাল, আমাকে একবার প্রেমের উপন্যাসটি দিও, আমি পড়ব একবার।

খানিকটা থেমে কথাগুলি বলছিল মার্গারেট। ওকে খুব ক্লান্ত লাগছিল, ওর কপালে আমি ফ্রেডির সামনেই হাত রাখলাম এবং বললাম, তোমার জ্বরটর হয়েছে নাকি?

হেসে মার্গারেট বলল, অত উতলা হবার কোনো কারণ নেই। তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে যেতে পারব না।

ফ্রেডি এবং মার্গারেট দুজনে হেসে উঠলেও আমি কিন্তু চুপচাপ রইলাম।

।। সতের ।।

পনের দিন কেটে গেছে এর মধ্যে। আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে ফ্রেডি। ওর সঙ্গে এখন মার্গারেট আরো সময় কাটায়। ওকে পড়তে দিয়েছে ফ্রেডি ওর সেই প্রেমের উপন্যাসটা। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি যে, আমার ভেতরে একটি সূক্ষ্ম প্রেমের ঈর্ষা জন্ম নিচ্ছে। ফ্রেডি আমার এবং মার্গারেটের উভয়েরই বন্ধু। ফ্রেডির চৌখস চেহারা এবং ও জমিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু ওকে আমার সাহিত্যিক বলে মনে হয় না। ওকে খানিকটা তুলনা করা যেতে পারে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে। ফ্রেডির ঠিক বিপরীত আমি, কারণ আমি কথা কম বলি এবং আমার চোখে মুখে একটা আবরণ থাকে সবসময়। ফ্রেডি একটি সরল শিশুর মতো এবং ওর মধ্যে যে কোনো দাম্ভিকতা নেই সেটা মানতেই হবে।

মার্গারেটের মন জয় করতে চাইছে ফ্রেডি খুব সুকৌশলে এটাই আমার মনে হচ্ছিল। ফ্রেডি নিজেই প্রস্তাব দিল একদিন, পিটার চল তুমি, আমি এবং মার্গারেট একদিন কোথাও বেড়িয়ে আসি। এতে মার্গারেট রাজী আছে। দোনামনা আমিও খানিকটা করেছিলাম কিন্তু আমার কোন বাধা টিকলো না ফ্রেডি এবং মার্গারেটের যুগপৎ উৎসাহে। তিনজনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমার প্রায় সব জায়গাতেই যাওয়া হয়ে গেছে। দিল্লীর পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াবো আমি, শুধু সেটাই ঠিক করলাম মনে মনে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়ালাম সেইমতো প্রায় ঘণ্টা চারেক। ভারতীয়রা আমাদের ব্যাপারে কৌতূহলী খুবই। সেই কারণে আমাদের দেখছিল অনেকেই। একটি রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ খেলাম দিল্লীর চাঁদনি চক এলাকায়। আমাদের মত আরো অনেক বিদেশী দেখলাম সেখানে। মার্গারেটকে দেখলাম আমার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে ফ্রেডির সঙ্গেই বেশী মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে।

আমার দিকে তাকিয়ে খেতে খেতে হেসে বলল ফ্রেডি, তুমি খুবই ভাগ্যবান পিটার ভারতে যদি তুমি না আসতে তাহলে সত্যিই তুমি বঞ্চিত হতে কারণ এরকম একটি ম্যাডোনাকে কাছে পাওয়া সত্যিই খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি কিছু না বলে শুধু মৃদু হাসলাম। মার্গারেটও প্রশংসা শুনে হাসল। মুগ্ধতার আভাস তার চোখ দুটোয়। অনেকটা সেরে উঠেছে এখন ওর শরীর। কমনীয়তা ফিরে এসেছে আবার আগের মত চেহারায়। তার কথাবার্তায় রীতিমতো রসিকতা। ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটের দৃষ্টি বিনিময় মাঝে মাঝেই হচ্ছিল কথার ফাঁকে। ফ্রেডি মার্গারেটের প্রেমে পড়েছে এটা আমার মনে বেশ ভাল রকম ধারণা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য একটা ব্যাপার আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না যে মার্গারেটের আকর্ষণ ওর ওপরে আসে কিনা। বেশ ছটফটে স্বভাবের নারী মিমি। যেকোনো পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার ওর অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যেকোনো পুরুষকে এক নিমেষে উন্মাদ করে দিতে পারে ওর কমনীয় এবং যৌন আবেদনময় চেহারা এবং দুচোখের অসাধারণ অভিব্যক্তি।

ফ্রেডির বুকে এখন তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারছি বেশ ভালভাবেই। আমার কাছে মোটেই ভাল ঠেকছে না ব্যাপারটা। হঠাৎ আমাকে বললো ফ্রেডি, পিটার কলকাতায় একটা ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দাও মার্গারেটকে।

আমি হেসে বললাম, ইচ্ছা আছে কিন্তু দেখা যাক আমি কতদূর কি করতে পারি।

মার্গারেট বলে উঠল ফ্রেডি কিছু বলার আগেই, আমার খুব ভাল লাগে চাকরী করতে

হেসে বলল ফ্রেডি, ভাল লাগাই উচিত, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো তাহলে আমি একটা কথা বলব পিটার।

আমি জবাব দিলাম, বলো।

ফ্রেডি বলল, কলকাতায় এবার তো এখান থেকে যাবে তোমরা, সেখানে এক ভাল হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার চেনা আছে। সেখানে হয়ত হতে পারে রিসেপশনিস্টের কাজ।

হাততালি দিয়ে মার্গারেট উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠল, সত্যিই খুব মজা হবে তো তাহলে।

আমি সেই মুহূর্তে মার্গারেটের দিকে তাকালাম কারণ আমার খুব ভাল লাগে ওর এই বালিকাসুলভ চপলতা। আমার মনে হয় ও যেন প্রচণ্ড সরল এবং ওর এই সরলতাই আমাকে আকর্ষণ করে প্রচণ্ড। ওকে কিন্তু আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় ও যেন এক রহস্যময়ী নারী। তখন ঠিক বোঝা যায় না ওর ব্যবহারের সঠিক অর্থ কি? ভাল করে মনোবিজ্ঞানটা পড়লে ভাল হত বলে তখন আমার মনে হয়। বিশেষভাবে গবেষণা করা উচিত নারীদের এই মানসিকতার বিষয়টি নিয়ে এবং এটাই ছিল আমার অভিমত।

মার্গারেট ওর সেই স্বভাবজাত চপল কণ্ঠস্বর নিয়ে বলে উঠল, বলো না কবে আমাদের কলকাতায় যাওয়া হবে?

আমি বললাম, যাব এবারই।

ফ্রেডি বলল, ঠিক আছে, কলকাতাতে এখন তো আমি যেতে পারছি না, কারণ আমাকে দিল্লীতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে তাই আমি একটা চিঠি লিখে দেবো। একটা রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা হয়ে যাবে ওখানে তোমরা গেলেই।

রেস্তোরাঁ ছেড়ে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। মার্গারেট এবং ফ্রেডি গল্প করে কাটাল হোটেলে আসবার পথে বেশীরভাগ সময়টাই। ফ্রেডি একবার বলল এবং আমি শুনলাম, যে ও একটা কবিতা লিখবে মার্গারেটকে নিয়ে। মার্গারেট এই কথা শুনে হেসে আকুল হয়ে উঠল এবং তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, জানো তো ফ্রেডি যদি আমাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখে তা তুমি তাহলে আমাকে নিয়ে একটি গল্প লিখবে নিশ্চয়।

আমি বললাম হেসে, আমি নেহাৎই ডাক্তার, সাহিত্যিক নই, দেহের ডাক্তার না হয়ে মনের ডাক্তার হলে সবচেয়ে ভাল হত বলে আমার মনে হচ্ছে এখন।

মার্গারেট দুচোখে ঝিলিক দিয়ে বলে উঠল, কেন?

মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম এবং বললাম, খুব আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে মেয়েদের মন, জানো কি, ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়ে গেছিল এই হেলেনের জন্য। ফ্রেডি তুমি কি বল।

সজোরে হেসে উঠল ফ্রেডি। তারপর বলে উঠল সে, এটা কি সহজ ব্যাপার যে ইংল্যান্ডের অষ্টম এডওয়ার্ড এক সামান্য নারী—ওয়ালিস মিগসনের জন্য রাজ্যপাট ছেড়েছিল! গবেষণার বস্তু রীতিমতো রমনী। ওদের কাছে তো শিশু আমরা। একেবারেই দুগ্ধপোষ্য, মার্গারেট কি বল!

খিলখিল করে হাসল মার্গারেট, তারপর আচমকা বলে উঠল, তুমি যা বলেছ তা ঠিক, নজর সব পুরুষেরই এক থাকে।

কথাটা প্রথমে ধরতে পারেনি ফ্রেডি কিন্তু পরে যখন বুঝল তখন হেসে উঠল হো হো করে এবং রীতিমতো লাল হয়ে উঠল কান দুটো আমার। হাসছিল তখন মার্গারেট। সত্যিই তোমার কোনো তুলনা নেই মার্গারেট, আমি বলে উঠলাম।

ফ্রেডি চলে গেল আরও আধঘণ্টা সময় আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে। রাত্রে ডিনারের আগে যদি সম্ভব হয় আসবে একবার ও চলে গেল একথা বলেই। ঘাড় নাড়লাম আমি। মার্গারেট পোষাক ছেড়ে গাউন পরলো ফ্রেডি চলে যাবার পরই। গলার কাছে কারুকাজ করা খয়েরী রঙের একটা সাধারণ পোষাকে বারান্দায় এসে বসেছি আমি পোষাক ছেড়ে। আমার মুখোমুখি এসে বসলো মার্গারেট। গলায় সোনার নয় কিন্তু একটি সোনার মতই দেখতে দামী হার যা ওকে কিনে দিয়েছে ফ্রেডি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে। হারটা খুব অপূর্ব লাগছিল ওর সাদা দুধের মত শরীরে। আমি মার্গারেটের হারটা দেখে ওর বুকের দিকে তাকালাম এবং ঠিক তখনই ও আমাকে বলে উঠল,

দুগ্ধপোষ্য শিশু।

ঘাড় নাড়লাম আমি। একটা ক্ষীণ যন্ত্রণা হচ্ছিল আমার ভেতরে। ফ্রেডিকে কি ঈর্ষা করছি আমি তবে। কিরকম যেন রাগ হচ্ছিল আমার মার্গারেটের ওপরে। সমস্ত জায়গা জুড়ে ক্রমশঃ নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। আমি ভাল ভাবে নিতে পারছি না ফ্রেডির সঙ্গে মিমির এই ঘনিষ্ঠতা। আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, দুটো স্ত্রীই ফ্রেডিকে ছেড়ে চলে গেছে। হয়ত সুবিধার নয় ও স্বামী হিসাবে।

মার্গারেট বলল, তুমিই জানো যে তোমার বন্ধু কি রকম। আমি কি করে বলবো যে তোমার বন্ধু কেমন, তবে ওকে আমার ভাল লেগেছে বেশ।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, ওকে তুমি সেরকম বেশী আমল দিও না।

ঠোঁট টিপে হেসে মার্গারেট বলল, 'ঈর্ষা হচ্ছে না কি তোমার বন্ধুর ওপর?'

ঈর্ষা হবার কারণ কি, তবে অন্য পুরুষদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করো সেটা আমি চাইনা ঠিক। ফ্রেডি পুরুষতো বটেই। যদিও হোক না কেন আমার বন্ধু।

তারপর সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলল, যে চিঠিটা ও দেবে সেটা আমি নেব, কারণ ওটা আমার লাগবে যদি আমি কলকাতায় যাই।

আমি বললাম, 'তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছো যে চাকরী করবে?

তুমি তো ওখানে আর সবসময় থাকবে না আমার কাছে। কিছুতো একটা করতেই হবে।

আমি কোনোরকম জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। মার্গারেট আমার প্রিয়তমাকে আমি দেখতে লাগলাম একই ভাবে। আমার দিকে মার্গারেট তাকালো একবার। ওর ভেতরের অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ পাতলা গাউনের ভিতর দিয়ে। একবার আড়মোড়া ভাঙলো ও হাত দুটো উপর দিকে তুলে এবং তারপর হাই তুললো। খুব ক্লান্ত লাগছে, বলে উঠলো।

ওর একটা হাত ধরলাম আমি এবং তখন ও খানিকটা বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল, আজকে আমার আর ভাল লাগছে না।

মিমি বুঝতে পেরেছিল যে আমি তাকিয়ে আছি ওর বুকের দিকে, কিন্তু ক্রমশঃ কমে আসছিল আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। মিমি প্লীজ একবার, আমি বলে উঠলাম।

ও বলে উঠল, না। কিছুক্ষণ বাদে উঠে ও ঘরের ভিতর চলে যাবার পর আমি গিয়ে দেখি যে ও ফ্রেডির দেওয়া উপন্যাসটা পড়ছে। আমি গিয়ে ওর হাত থেকে বইটা নিলাম এবং তারপর টেবিলের পাশে রেখে দিয়ে বললাম, শরীর খারাপ বললে যে তুমি?

কঠিন মুখে মার্গারেট বলে উঠলো, কেন তুমি কেড়ে নিলে বইটা, আমি বিছানায় বসে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম, দু হাত ওর শরীরের দুদিকে রেখে। আমাকে সরিয়ে দিল ঠেলে ও, ওর দুটো হাত দিয়ে এবং ঝাঁঝিয়ে বলল, আমার তোমার সঙ্গে চলে আসাটাই ভুল হয়েছে কারণ সব সময় ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।

বেশ খানিকটা আহত হলাম আমি এবারে। কিন্তু ঠিক তখনই ওর সঙ্গে কিছু ঝগড়াঝাটি করতে আমার মন চাইছে না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আমার কিছুটা ফিরে এসেছে ওর সেই ধাক্কা খাবার পর। এটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে ও আমার কাছে আর থাকবে না। আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে ওকে দেখতে না পেলে।

জানোয়ার, এবার বলে উঠল মার্গারেট অস্ফুট কণ্ঠে।

বিছানায় গিয়ে আমি বসলাম কিন্তু বেরোচ্ছিল না কিছু মুখ দিয়ে। শুধু একটি কথাই বললাম, মিমি তুমি আমাকে অপমান করলে।

কোনো জবাব না দিয়ে টেবিল থেকে ফ্রেডির লেখা উপন্যাস নিয়ে মিমি পড়তে আরম্ভ করল।

মিসেস হ্যারিসনের প্রেমকাহিনী' বইয়ের মলাটের ওপরেই এই লেখাটা জ্বলজ্বল করছে আমার চোখে। একটা দেওয়াল তৈরী করছে ফ্রেডি আমার এবং মার্গারেটের মধ্যিখানে। এটা আমাকে ভাঙতেই হবে তা যে করেই হোক। ডিনার খাওয়া আর হলো না আমার সে রাতে। কেউই খেলাম না, ফ্রেডি আসেনি, সেই কারণে আমরা শুয়ে পড়লাম।

একেবারে সকাল হতে ঘুম ভাঙলো। উঠে বসে, পাশ ফিরে তাকিয়ে মার্গারেটকে দেখলাম।

ও ঘুমোচ্ছে অঘোরে এবং বইটা খোলা অবস্থায় উল্টে রেখেছে বুকে। নিষ্পাপ সরল বালিকার মত লাগছে ঘুমন্ত মার্গারেটকে। ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আমি বইটা ওর বুকের উপর থেকে তুলে নিয়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপর। একটুও ইচ্ছা করছিল না আমার ভেতরটা দেখতে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন হেরে গেছি ফ্রেডির কাছে এই জায়গাটায়। গভীর ঘুমে অচেতন মার্গারেট। কিছুটা উঠে গেছে তার গাউনের তলার দিকের অংশ এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে পা দুটোর ডিমের কাছের অংশ। মনে মনে বললাম, প্রিয়তমা মার্গারেট তুমি আমার। আমি ছাড়তে পারবো না তোমাকে কিছুতেই। আমার কাছে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে যদি তুমি চলে যাও। তুমি কারোর নয় মার্গারেট, আমার, একান্তভাবেই শুধু আমার।

একভাবেই তাকিয়েছিলাম আমি মার্গারেটের দিকে। একটি পাখি অনবরত ডাকছিল গাছের উপর বসে। হঠাৎ চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই পবিত্র হাসি দিয়ে ও আমাকে ভুলিয়ে দিল ওর গতরাতের অপমান। ওর জন্যে আমি এই মুহূর্তে করতে পারি সবকিছু।

।। আঠার ।।

বেলা নটা নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়লাম ব্রেকফাস্ট করে। বিশেষ দরকার আছে একটা। একটা ট্রাংকল করতে হবে লন্ডনে আমার হোটেলের কর্মচারীকে। বোম্বের হোটেলে নিশ্চয় আমার কর্মচারী ফোন করেছিল। ওখানে ফোন করা হয়নি অবশ্য এখনও আমার। আমার আসলে ভীষণ দ্বিধা হচ্ছিল বোম্বেতে ট্রাংকল করব না করব না। হ্যারিয়েট আমাদের সন্ধান জানুক এটা আমি কেনোমতেই চাইছিলাম না। একটা কাজ অবশ্য আমি ইতিমধ্যে করেছিলাম। হ্যারিয়েটের স্কুলে ট্রাংকল করেছিলাম বোম্বে থেকে চলে আসার ঠিক একমাস পরে। সেদিন স্কুলে আসেনি অবশ্য হ্যারিয়েট। এখানে ফিল্মের কাজে যে আমরা আটকে গেছি তা আমি ট্রাংকলে স্কুলের হেডমিসট্রেসকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আরো মাসখানেক দেরী হতে পারে, তিনি যেন ব্যাপারটা অবশ্যই জানিয়ে দেন মিসেস হ্যারিয়েট মুরকে। তিনি যেন চিন্তা না করেন অযথা।

অবশ্য জানিয়ে 'ছিলেন হেডমিসট্রেস যে, খুবই চিন্তিত উনি ওনার মেয়ের জন্য এবং সবসময়ই বলেন ওদের কাছে ওনার মেয়ের কথা।

আমি বলেছিলাম আশ্বাস দিয়ে, এটা ওকে জানিয়ে দেবেন যে চিন্তার কোনো কারণ নেই, ও ভালই আছে আমার কাছে। শেষ হতে একটু সময় লাগবে কারণ ফিল্মে নামার জন্য অনেক রকম ব্যাপার স্যাপার আছে।

আমার প্রথম এবং শেষ ট্রাংকল ছিল সেইটাই। তারপর দীর্ঘকাল আর আমি করিনি। একেবারেই ঝুঁকি নিতে চাই নি হোটেল থেকে ট্রাংকল করবার। হ্যারিয়েট জানুক যে আমরা ঠিক কোথায় আছি সেটা আমি চাই না একেবারেই। আমার হোটেলের ঐ কর্মচারীকে লন্ডনে ট্রাংকল করলাম এবং বললাম যে ও যেন আমার সমস্ত টাকা অবিলম্বে দিল্লীর এই হোটেলের নামেই পাঠিয়ে দেয়। ওকে ঠিকানাটাও দিলাম। অবশেষে ট্রাংকল করলাম বোম্বের হোটেলে। ভদ্রলোক একটু অবাক হল আমার ফোন পেয়ে। বলল, স্যার কেমন আছেন, চিন্তা করছিলাম আমি আপনার কথাই।

আমি ভাল আছি, মিসেস মুর আমাদের ওখানে কি এসেছিল?

কর্মচারী বলল, স্যার উনিতো ওনার মেয়ের জন্য খুবই চিন্তিত এবং সেই কারণে উনি বেশ কয়েকবার এসেছিলেন ওনার মেয়ের খোঁজে।

আমি জবাব দিলাম, আপনি কিছু ভাববেন না, আবার যদি উনি না আসেন, তাহলে আপনি ওনার বাড়ি গিয়ে বলে দেবেন যে, আমরা ভাল আছি, যেহেতু আমরা ফিল্মের কাজে ব্যস্ত, সেহেতু ফিরতে আমাদের একটু দেরী হবে।

কর্মচারী বললো, আমি বলে দেবো নিশ্চয় স্যার, আপনি এখন কোথায় আছেন বলবেন?'

আমার ঠিকানা ওকে বলা যাবে না কিছুতেই। বললাম নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় আমাদের থাকা হচ্ছে না ফিল্মের জন্য আমরা এখন রয়েছি ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে। শুনুন আমার টাকা আপনি পাঠিয়ে দেবেন লন্ডনের ঠিকানায়। তবে কেউ যদি চায় এখানকার ঠিকানা তাকে কিন্তু কোনো

মতে দেবেন না। মিসেস মুর চাইলে তাকেও দেবেন না বুঝেছেন।

এবার একটু ঘাবড়ে গেল কর্মচারীটি। বললো, স্যার ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

আমি এবার হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম সব কিছু সেরে। কে জানে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ঘণ্টা চারেক সময়। হোটেল দুটোকে বিক্রী করে দিতে হবে। মার্গারেটের কথাটা মনে পড়লো হোটেলের সামনাসামনি এসে। কি করছে এখন ও কে জানে। হোটেলে পা রাখতেই কাউন্টারের ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। আমি এগিয়ে যেতেই উনি আমার হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা রয়েছে খুলে দেখলাম, পিটার, আমি ফ্রেডির সঙ্গে একটু বেরোচ্ছি ওর অফিসটা দেখতে অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করার পর বেরোলাম। কিছু ভেবোনা, আমি ফিরে আসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ইতি—

তোমার প্রিয়তমা মিমি

আমার মাথা গরম হয়ে গেল চিঠিটা পড়ে। সোজা দোতলায় উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম এবং টুকরো টুকরো করে ফেলে চিঠিটাকে আমি উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। একটু দেরী হবে, যাবার সময় আমি বলে গেছি মার্গারেটকে। আমাকে না বলে তা সত্ত্বেও চলে গেছে মার্গারেট। আগুন জ্বলে উঠেছে রীতিমতো আমার মাথায়। ব্যাপারটাকে ফয়সালা করতে হবে তা যে করে হোকনা কেন।

আমি বিন্দুমাত্র আর আমল দিতে রাজী নই ফ্রেডিকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, যে ফ্রেডির উদ্দেশ্যটা কি। ফ্রেডি এবং মার্গারেট উভয়েই বন্ধু। ওর এটা বোঝা উচিত ছিল যে মার্গারেট আমার প্রেমিকা। ঘরে গিয়ে পোশাক বদল করে আমি এরপর বারান্দায় বসলাম। ক্রমশঃ বারান্দার বাইরে সন্ধ্যা নামছিল। আকাশে মেঘ জমেছে দেখলাম এবং এতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক একভাবে, কারণ আমার রীতিমতো অসহ্য লাগছিল ভেতরটা। আমি বিশ্বাস রাখতে পারছিলাম না আর কোনো নারীর উপরে। কম বয়েসী সুন্দরী এবং ছটফটে স্বভাবের মেয়ে মার্গারেট। এ থেকে পুরুষের কোনো রকম প্রলোভান আসাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার এখন সেক্ষেত্রে দায়িত্ব মার্গারেটকে পুরোপুরি আড়াল করে রাখা। ওর একমাত্র অভিভাবক এখন আমি। মার্গারেটের ফেরার কোনো নাম নেই যদিও দীর্ঘসময় কেটে গেল। আকাশে মেঘ জমছে ক্রমশঃ এবং বৃষ্টি আসতে পারে যেকোনো সময়। আমি রীতিমতো চিন্তায় অস্থির হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না কিছুই। আমি আমার দুচোখে অন্ধকার দেখি মার্গারেট যদি আমার সামনে না থাকে। ফ্রেডির ঘরটা একবার দেখে এলে হয়, হঠাৎ আমার মনে হল আমি দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে একেবারে শেষপ্রান্তে ফ্রেডির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে, কিন্তু বাইরে তালা। আমি কি-হোল দিয়ে ভেতরটায় উঁকি দিলাম এবং তাতে মনে হল যে ঘর ফাঁকা, তখন আমি ফিরে এলাম কাউন্টারের। আমাকে দেখে মৃদু হাসলো রিসেপশনিস্ট। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে পারেন মিঃ উইলসন কখন বেরিয়েছেন?'

মহিলাটি আবার মৃদু হাসলো। এবং বলল, মিঃ ব্রাউন, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কারণ আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম না তাই আমাকে ক্ষমা করবেন।

'আচ্ছা', এই কথা বলে আমি বাইরে গেলাম এবং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে ফিরে এলাম। আমি ঠিক ধূমপায়ী নই। তবে চার-পাঁচটার বেশী সিগারেট আমি খাই না দিনে। একটা সিগারেট ধরালাম বারান্দায় গিয়ে। ক্রমশঃ কমে আসছে রাস্তায় লোকজনের চলাচল। মেঘ ঘন হয়ে আসছে আকাশে এবং বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো সময়ই। একটি ভয় চেপে বসল, আবার মনের মধ্যে একটি সন্দেহ খেলে গেল হঠাৎ। ফ্রেডির সঙ্গে চলে গেছে কি মার্গারেট! কেমন যেন অসুস্থ লাগছে আমার নিজেকে। সিগারেট খাচ্ছিলাম চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে। পালিয়ে যেতে পারে না আমার কাছ থেকে মার্গারেট। একান্তভাবে নির্ভরশীল ও আমার উপর। আমার এবং মার্গারেটের পরস্পরের পরস্পরকে ছাড়া চলে না। ওকে আমি খুঁজে বেড়াবো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমার সারা দেহ জ্বলে উঠল ফ্রেডির

কথা মনে পড়া মাত্রই। এই সব লেখক ভীষণ বিপজ্জনক যদিও আমার বন্ধু। এরা রীতিমতো সিদ্ধহস্ত পরের প্রেমিকা কিংবা স্ত্রীকে বাগিয়ে নেবার ব্যাপারে। আমার একসময়ই ঠিক হয়নি ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ করিয়ে দেওয়াটা। ফ্রেডি সেই জাতেরই পুরুষ যাদের চোখ লক্‌লক্‌ করে ওঠে মেয়েমানুষ দেখলেই। কার স্ত্রীর কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে এ ইতিহাস লিখেছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

পরিবেশ ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে ঝির ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হবার পর। শুনতে পাচ্ছিলাম গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বৃষ্টির রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে আলোর ভিতর দিয়ে। সময় হয়ে গেল ডিনারের। এরপর হঠাৎ একটি গাড়ির শব্দে আমার চমক ভাঙল। বারান্দায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি সঙ্গে সঙ্গে। যা ভেবেছি তাই ঠিক। গাড়িটা এসে থেমেছে ঠিক হোটেলের গেটের সামনে। সেদিকে একভাবে তাকিয়ে থাকার পর, দরজা খোলার শব্দ হল হঠাৎ এবং এক যুবতী তার থেকে নেমে এল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি মিমি। আমার মার্গারেট। একটা ছোটো আকারের ছাতা হাতে। হোটেলের দরজার ভেতরে ঢুকলো মার্গারেট গাড়ি থেকে নেমে। ও তাহলে ফিরে এসেছে, কিন্তু আমি তো পাগল হয়ে গেছি নানারকম চিন্তায়। কিন্তু ফ্রেডিকে তো দেখতে পেলাম না, ও তাহলে কোথায় গেল। নানা প্রশ্ন ভিড় করলো মনের মধ্যে। মার্গারেটের পায়ের শব্দ পেলাম সিঁড়িতে, ও উপরে উঠে আসছে। একটি খুশীর ভাব উথলে উঠছে ওর চলার ছন্দে। মনের নিছকই কল্পনা এটি, তাই আমি টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে মার্গারেট দোতলায় উঠে আমার পিছনে হাত রেখে বলল, তুমি কি রাগ করেছো পিটার?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু কোনো কথা বললাম না এবং সেই সময় একটি একটি করে পাতা ঝরে পড়ছিল বাগানের।

মার্গারেট বলল, কি হলো, শোনো লক্ষ্মীটি।

চোখ দুটো জ্বলছিল আমার, আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এক ঝটকায়। মার্গারেট ভয় পেয়ে গেল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। আমি কিন্তু বলে...,এই কথা বলল সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে অস্ফুট স্বরে।

সজোরে এক থাপ্পড় কষালাম আমি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে। ও খানিকটা ঘাবড়ে গেল এই আকস্মিক আঘাতে, জলে ভরে গেল ওর চোখ দুটো, 'আমায় তুমি মারলে,' এই কথা বলল শুধু ও জড়ানো কণ্ঠস্বরে।

ও আর না দাঁড়িয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল ছাতাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। ঘরে ঢুকলাম আমি ওর পিছন পিছন, তুমি কি যা ইচ্ছা তাই করবে, কি ভেবেছো। কি, কথাটা বললাম কঠিন স্বরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

একই ভাবে কাঁদতে লাগল মার্গারেট কোনো কথার জবাব না দিয়ে। চীৎকার করে বললাম আমি আবার, জবাব দাও কি হলো?

আমি তো জানিয়ে গেছি তোমায়।

জবাব দিল মার্গারেট কাঁদতে কাঁদতে। ওর চুলের মুঠি ধরে আমি ওকে তুলে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম, কি হয়েছে তাতে, আমি তোমায় বারণ করেছি ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করতে।

এবার আরো জোরে কেঁদে উঠল মার্গারেট। ও রীতিমতো প্রতিবাদ করে অন্য সময়ে, কিন্তু এখন করল না বলে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না ওর এইরকম আচরণের অর্থ। ছেড়ে দিলাম ওর চুলের মুঠি এবং বললাম, যাও পোষাক ছেড়ে গা ধুয়ে এস এখনও ডিনার হয়নি।

কি হলো যাও'—মার্গারেট তখনও, কাঁদছিল তাই ধমকে বললাম। বিছানা ছেড়ে উঠে মার্গারেট গায়ের পোষাক খুলে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। বিছানায় শুয়ে রইলাম আমি চুপচাপ। টেবিলে পড়ে রয়েছে ফ্রেডির লেখা বইটা, আমি উল্টে রাখলাম বই-এর মলাটটা কারণ আমার দেখতে ইচ্ছা করছিল না ফ্রেডির নামটা। কেটে গেল প্রায় মিনিট

পাঁচিশেক। সেই তোয়ালে জড়িয়েই ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ওর দিকে তাকিয়েও আমি ইচ্ছে করে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে মার্গারেট তার প্রিয় পোশাক সেই সাদা রঙের গাউন পরে নিল। এটা চমৎকার মানায় আমার সুন্দরী প্রিয়তমা মার্গারেটের শরীরে। বাইরে আমি গম্ভীর থাকলাম যদিও ভেতর ভেতর উত্তেজিত বোধ করছি। আমার দিকে তাকালো মার্গারেট বার কয়েক। তারপর খুব আস্তে বলল, 'হয়ে গেছে আমার।'

ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম। মার্গারেটের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'চলো।'

বড়োজোর আধঘণ্টা লাগল আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করতে। আমি আর ও বারান্দার চেয়ারে বসলাম খাওয়া শেষ করে। চুপচাপ এবং বিষণ্ণ মার্গারেট। ফ্রেডি তোমার সঙ্গে আসেনি? আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

মার্গারেট কোনো জবাব দিলনা, সেই কারণেই আমি বললাম, কি হলো?

মার্গারেট যা বলার তা বললো এবং এরপর দুজনে আমরা চুপচাপ রইলাম।

ফ্রেডি কেমন লোক, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

জানি না, মার্গারেট বলে উঠল।

আমি বললাম, আমি তোমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম না ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে।

আর মিশবো না, ও জবাব দিল।

কি হয়েছে তোমার, তুমি এত চুপচাপ কেন? আমার কথার উত্তরে ও কিছু না বলাতে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো?

মার্গারেট চমকে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করলো আবার আমার বুকের ভেতর মুখটা গুঁজে। ও তো ওরকম ধরনের আচরণ করে না, তাই একটু অবাক হয়ে গেলাম আমি। ওকে যেন কিরকম অস্বাভাবিক লাগছে। ওর মাথায় হাত রেখে আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার মিমি?

মার্গারেট কাঁদছিল ফুঁপিয়ে। তোমার দুঃখ হয়েছে যেহেতু আমি তোমায় মেরেছি, আমি বললাম।

মার্গারেট ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কিছুই হয়নি আমার কিছুই হয়নি।'

ফ্রেডি কি কিছু বলেছে তোমায়? আমি এবার বললাম। ও জবাব দিল চমকে ওঠে, 'না।'

দুজনে বিশ্রাম নিলাম বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় তার কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে মার্গারেট সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ফ্রেডির বইটা যে ও ছুঁলোনা সেটাও আমি লক্ষ্য করলাম। ও শুয়ে রইল চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। ওর মাথার কাছে বসলাম আমি এসে। এবং ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম পরম আবেগে। চোখ বুজে ছিল মার্গারেট, আমি বললাম, তুমি কিছু মনে করো না মিমি কারণ তখন আমার মাথার কোনো ঠিক ছিল না।

এরপর আমি সরে এলাম ওর কোমরের কাছে এবং ওকে চুমু খেলাম দুহাত ওর দুপাশে রেখে উপুড় হয়ে। উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম ক্রমশঃ আমি এবং ততক্ষণে খুলে দিয়েছি ওর গাউনের উপরকার অংশটি। এবার বলে উঠলো মার্গারেট, না, প্লীজ আজ নয়... ক্রমশঃ আমার সংযম কেড়ে নিচ্ছে, আমি বললাম কেন?

শরীরটা আমার ভাল লাগছে না।

কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ধীরে ধীরে ও বলল, প্রথমে ফ্রেডির ওখানকার একটি অফিসে এবং তারপর একটি হোটেলে।

ওর বুকের উপর আমি মুখ রেখেছি এবং তার ফলে আমার চেতনা ক্রমশঃ হারাচ্ছে। আমি আরো নামিয়ে দিলাম ওর গাউনটা। কঁকিয়ে উঠল মার্গারেট, না প্লীজ আজ নয়।

আমি তোমাকে এক্ষুনি চাই, কেন নয় বলছ।

আমি মার্গারেটকে মুক্তি দিলাম এর প্রায় আধঘণ্টা পরে এবং ও পোষাক না পরে ফোঁপাতে লাগলো উপুড় হওয়া অবস্থাতেই, তখন শুনতে পেলাম দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ।

।। উনিশ ।।

আমরা কলকাতায় এসেছি তা মাস দুয়েক হয়ে গেল। এই এলাকাটা মোটামুটি ভাল, আমরা যে এলাকাটায় এসেছি। এখানে থাকে আমাদের স্বদেশীয় অনেক লোক, সাহেবপাড়া বলে জায়গাটাকে এখানকার লোকেরা। আমি একটি বেশ ছিমছাম এবং খোলামেলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। বাড়িটি দোতলা এবং এর একতলায় একখানা বড় ঘর, যা ড্রয়িং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং দোতলায় মোটামুটি বড় একটি বেডরুম, যার পাশে রয়েছে ছোটো রান্নাঘর। খানিকটা দূরে রয়েছে বাথরুম। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে মালিকের বাড়ি। আমাদেরই স্বজাতি ভদ্রলোক। এখানকারই এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোক খুব আমুদে স্বভাবের এবং দুখানা ছেলেমেয়ে ওনার। আমার পছন্দ হয়েছে মোটামুটি বাড়িটা এবং মার্গারেটেরও তাই। এবারে ঠিক করেছি এখানে চেম্বার করবো। যদিও হার্ট স্পেশালিস্ট আমি, তথাপি ঠিক করেছি যে সবরকম চিকিৎসাই করব। তবে বেশী বজায় রাখব আমার কাজের মধ্যে মানুষের সেবাটা।

আমার খুব ভাল লাগছে এই শহরটাকে যত দেখছি ততই। এটি দিল্লী কিংবা বোম্বের তুলনায় একেবারেই আলাদা। দেখা হয়ে গেছে অক্টারলোনি মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। দুটোই খুব ভাল লেগেছে। তাজমহলকে মনে রেখে তৈরী করা হয়েছে ভিক্টোরিয়াকে। কুতুবমিনারকে মনে রেখে মনুমেন্ট, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি আমি এবং মার্গারেট। হগ সাহেবের মার্কেট খুব একটা দূরে নয় আমাদের বাড়ি থেকে। সব কিছুই পাওয়া যায় ওখানে, একদিন চিড়িয়াখানা গেলাম ট্রামে করে। মার্গারেট রীতিমতো খুশী ট্রামে চড়ে এবং চিড়িয়াখানা দেখে। কত বড় জায়গা এবং ভাবাই যায় না ওখানে কত পশুপাখি রয়েছে। যা দেখে ও বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠেছিল। বাঘ দেখে এবং বাঘের আওয়াজ শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল ভয়ে। শহরটা যেন অতিমাত্রায় জীবন্ত বলে সব দিক থেকেই আমার মনে হয়েছিল। লোকজনের ভিড় সবসময় সবজায়গায়। তবে আমাদের দেখলে এখানকার বেশীরভাগ লোক তাকিয়ে থাকে ভয় আর কৌতূহল মাখানো দৃষ্টিতে। এখানকার লোকেরাই ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতিবান। রবীন্দ্রনাথ সেই বাঙালী কবি যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কলকাতারই মানুষ। একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলাম কবির বাড়ি দেখতে। যদিও জায়গাটা খুব ঘিঞ্জি তথাপি কবির বাড়িটা কিন্তু খুবই ভাল। খুবই শ্রদ্ধা হয় দেখলে। যদিও মার্গারেট এখানকার মেয়ে তথাপি সে জানে না রবীন্দ্রনাথকে।

একটু পাল্টে গেছে মার্গারেট এখানে এসে এবং সে একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। আমার ওকে খুব ভাল লাগে যখন মাঝে মাঝে খুশী থাকে ও। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই এবং আমার কোলে ও চুপচাপ শুয়ে থাকে। এখানে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব আর্ত মানুষের সেবায়, সেটাই ভাবছি। এই কলকাতা জব চার্নকের শহর। আমি বলা যায় ভালবেসে ফেলেছি এই অদ্ভুত শহরকে। একজন মহিলা ডরোথি টেলরকে রেখেছি এই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য। সবে তিরিশ পেরিয়েছে মহিলা, আমার চেয়ে ক বছরের ছোট। ওকে বেশ কম বয়েসী লাগে ওর ছোটো খাট এবং আঁটো সাঁটো চেহারার জন্য। মার্গারেটের তো খুবই ভাল লেগেছে এবং ও আন্টি বলতে অজ্ঞান। ডরোথির মুখ কিন্তু সুন্দর নয় যদিও চেহারাটা মোটামুটি ভালো। দাঁতগুলো উঁচু কিন্তু চোখদুটো আবার মোটামুটি ছোটো এবং ভেতরে ঢোকা। ওর ব্যবহারের দ্বারা ইতিমধ্যেই আমাদের মন জয় করতে পেরেছে। আমি নিশ্চিন্ত ওর হাতে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে বাড়ির সব কিছু দায় দায়িত্ব দিয়ে। ডরোথির স্বামী মারা গেছে এবং কেবল একটি মাত্র ছেলে আছে। শর্টহ্যান্ড শেখার জন্য মার্গারেটকে এখানে এক ভদ্রমহিলার কাছে ভর্তি করে দিয়েছি। উনি শেখান নিজের বাড়িতেই। এক বিদেশী ফার্মে উনি চাকরী করেন। উনি বাড়িতে ওনার অবসর সময়ে টাইপ এবং শর্টহ্যান্ড শেখান। গোটা তিনেক টাইপ রাইটার আছে বাড়িতে। আরো কয়েকজন শেখে ওখানে মার্গারেট ছাড়া। ওখানে যায় ও প্রতিদিন বিকালবেলা। নানা ধরনের বই আমি কিনে দিয়েছি মার্গারেটকে এবং আমি এটাই চাই যে ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করুক।

যখন প্রথম দেখেছিলাম মার্গারেটকে তখন একধরনের ছিল ও এবং ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে ও

এখন। যদিও ওর ছটফটে এবং জেদী স্বভাবটা এখনো যায়নি। ইদানীং কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায় ও মাঝে মাঝে। বিস্মিতমুখে অনেকক্ষণ ধরে ও মুখ বুজে শুয়ে থাকে। ঝাঁঝিয়ে উঠে ও ওর কাছে আমি গেলে। ওর কাছ থেকে তখন দূরে থাকি আমি খানিকটা ভয় পেয়ে। লক্ষ্য রাখতে ভুলিনা অবশ্য ওর উপর। ওর ওপর যেন ভালভাবে লক্ষ্য রাখে সেটা আমি ডরোথিকে বলেছি। আমার কাছে আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে আজকাল মার্গারেট। একদিন আমি বেরিয়ে গেছিলাম বাইরে একটা দরকারে। বেরিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট সেরেই। বেশ বেলা হয়ে গেল ফিরতে এবং বাড়ি ফিরে দেখি যে ড্রয়িংরুমের দরজাটা আলগা করে ভেজানো। এরপর আস্তে করে ঠেলে ঢুকে দেখলাম যে মার্গারেট বসে রয়েছে একটি চেয়ারে এবং ওর পা দুটো তুলে দিয়েছে সামনের টেবিলের ওপর। ওর শরীরে পোষাক নেই একচিলতে। মনোযোগ দিয়ে পড়ছে একটা বই। ও বইটা লুকোবার চেষ্টা করলো আমাকে দেখেই। কি ব্যাপার ও কি পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি, এই ভেবেই আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম।

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, বসে আছ কেন ওরকম হয়ে, কি ব্যাপার?

খিলখিল করে হেসে উঠল মার্গারেট, পোষাক পরে নাও, আমি বলে উঠলাম।

মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীতে 'উঃ' বলে দুটো হাত পেছনে নিয়ে বলে উঠল, এখন উপরে যাও তুমি।

কি বই দেখি ওটা। আমি বললাম এবার। ও লুকোবার চেষ্টা করলো প্রাণপনে। ওর কাছ থেকে আমি এবার বইটা কেড়ে নিলাম জোর করে। ছবির অ্যালবাম একটা, তাতে রয়েছে পুরুষ নারীর যৌনমিলনের কিছু ছবি বিভিন্ন ভঙ্গীতে। উল্টে পাল্টে আমি বইটা দেখে বললাম, পরে নাও পোষাক। গম্ভীর হয়ে মার্গারেট এরপর স্কার্টটা পরে নিল।

ও আমার সঙ্গে ওপরে এলে আমি বললাম, বসো ঐ চেয়ারটায়।

সামনের চেয়ারে বসে ও একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি, কোথায় পেলে তুমি এই বইটা? মার্গারেট চুপ করে থাকাতে আমি ধমকে বললাম, কোথায় পেলে তুমি এই বইটা আমায় বল?

রেগে গেল মার্গারেট এবার, যদিও সেটা আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ও বলে উঠল, সব কথা কি তোমাকে আমার বলতে হবে, স্বাধীনতা কি আমার একটুও থাকবে না তোমার জন্য?

কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম এবার আমি। এতো এক পরিণত নারীর কণ্ঠস্বর, এতো সেই সরল বালিকা মার্গারেট নয়। খানিকটা দমে গেলাম, মনে মনে বুঝলাম কোনো কিছু কাজ হবে না রেগে গেলেও। আমি তখন হেসে বললাম, ঠিক আছে, আমি স্বাধীনতা দিলাম তোমাকে, আমাকে বলা উচিত যদি তুমি মনে কর তবেই বলো। ওর দিকে তাকালাম আমি এই বলে।

মার্গারেট ঝাঁঝিয়ে বলল, এতোক্ষণ তো ধমকাচ্ছিলে, ন্যাকার মত এখন আবার কি হল যে তাকিয়ে আছ।

ওর মাথার চুলে আমি হাত রাখলাম ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে। তুমি অতো রেগে গেছ কেন?'

ও আমার মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে ছাড়ো, তুমি আমাকে ছোঁবে না।

বেশ খানিকটা আহত হলাম আমি। আমি হাসি ভাব তবু বজায় রাখলাম বাইরে। বললাম, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব আমি আজ বিকালে। কিছু কিছু মজার বই কিনে দেবো আমি তোমাকে।

মার্গারেট বললো গম্ভীর হয়ে, আমি এরকম ছবিওলা বই কিনবো।

আমি জানি না ও ধরনের বই কোথায় পাওয়া যায়।

মার্গারেট বলল, ঠিক আছে, আমি জেনে নেব।

ক্ষীণ আশা যেন এবার আমি দেখতে পেলাম, কার কাছ থেকে জানবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার এক বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ড দিয়েছে ওকে, আমি নিয়ে আসবো তার কাছ থেকে।

এবার বুঝতে পারলাম আমি মার্গারেট যেখানে শর্টহ্যান্ড শিখতে যায়, সেখানকারই কোনো

বান্ধবী হয়ত দিয়েছে ওকে বইটা, তুমি বইটা ওকে ফিরত দিয়ে দাও, আমি বললাম।

আমার সামনে বইটা এগিয়ে ধরে মার্গারেট আমাকে দেখালো যৌন মিলনের একটি বিশেষ অস্বাভাবিক ছবি এবং দেখানোর পরই ও হাসতে লাগল খিলখিল করে।

ওর দিকে গম্ভীর মুখে আমি আবার তাকালাম। আমি সজোরে হেসে উঠলাম যদিও তাতে ও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে আমি ওর দুচোখে, ঠোঁটে, গালে, উন্মত্তের মতো চুমু খেলাম। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠল মার্গারেট। ওর বুকে আমার একটা হাত রাখলাম। আমার বুকের উপরও মার্গারেটের একটা হাত। ওর খেলার বস্তু আমার বুকের চুলগুলো। আমার কিছু টাকার দরকার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

ও জবাব দিল, আমার খুব লজ্জা লাগে কারণ আমার বন্ধু বান্ধবীরা রোজ আমাকে খাওয়ায় অথচ আমি ওদের কিছু কোনোদিন খাওয়াতে পারিনা।

আদর করতে করতে আমি ওকে বললাম, ঠিক আছে, তুমি তোমার সব বন্ধুবান্ধবীদের একদিন আমার এখানে নিয়ে এস।

মার্গারেট বলল, আমি আনব ঠিক কথা কিন্তু আমাকে তুমি কিছু টাকা দাও।

আমি বললাম, তাহলে টাকার আবার কি দরকার?

মার্গারেট একটু অভিমান প্রকাশ করে বলল, কেন আমার বুঝি কোনো কারণে টাকার দরকার থাকতে পারে না।

ঠিক আছে দেওয়া যাবে।

আমি ওকে টাকা দিইনি যদিও বলেছিলাম দেব। আমার পকেট থেকে দিন সাতেক পর বেশ কিছু টাকা কমে গেল। আমি প্রচণ্ড বিশ্বাস করি ডরোথিকে। এটা অসম্ভব যে ও আমার টাকা নেবে। আমি ওকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। বিশ্বাস করা যায় ওকে পরিপূর্ণ ভাবেই। ডাকলাম আমি মার্গারেটকে। ও তখন গল্প করছিল ডরোথির সঙ্গে রান্নাঘরে। খবরের কাগজ পড়ছিলাম আমি চেয়ারে বসে। আমার সামনে মার্গারেট এসে দাঁড়ালো, আমি ওকে বসতে বললাম। চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। নিজেই অধৈর্য হয়ে একসময় বলল মার্গারেট, ডাকছো কেন, কি ব্যাপার?

শান্ত ভাবে আমি বললাম, কিছু টাকা আমার পকেটে কম হচ্ছে।

আমার দিকে তাকিয়ে তারপর মার্গারেট বললো, আমি নিয়েছি টাকা।

গম্ভীর হয়ে এবার আমি বললাম, টাকাটা তোমার নেওয়া উচিত হয়নি আমাকে না বলে।'

তুমি দাও নি তো আমাকে আমি যখন তোমার কাছে চেয়েছিলাম।

বললাম, হয়তো আমি ভুলে গেছিলাম, কিন্তু তুমি তো আবার চাইলে পারতে।

এবার ঝাঁঝিয়ে বলল মার্গারেট, তোমার কোনো কথা সত্যি নয়, তাছাড়া আমি কি ভিখারী নাকি যে তোমার কাছে বারবার দয়া ভিক্ষা করব।

আমি তোমার অভিভাবক, আমি দয়া ভিক্ষা করতে বলিনি তোমাকে কিন্তু তোমার উচিত হয়নি আমার অনুমতি না নিয়ে নেওয়া।

বেশ রুক্ষ ভাবে আমার দিকে তাকালো সে। তারপর বলল, তুমি আমার অভিভাবকও নও, কেউ নও, তুমি পালিয়ে এসেছ আমাকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে এবং তুমি বেইমানী করেছ আমার মায়ের সঙ্গে তুমি...

এই কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ও বইটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারতে মাথা নামিয়ে নিলাম আমি। একেবারে মেঝের কোণে পড়ল বইটা চেয়ার ছাড়িয়ে। ও হাঁপাচ্ছিল এবং চোখ দুটো জ্বলছিল ওর। ও খানিকক্ষণ থেকে চলে গেল রান্নাঘরে যেখানে রান্না করছে ডরোথি। ও কথা বললো না আমার সঙ্গে এবং চুপচাপ বসে রইলাম আমি। কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারছে না মার্গারেট ইদানীং। কিছুদিন ও ভাল থাকে, হাসিখুশি থাকে, আবার অগ্নিশর্মা হয়ে আজে-বাজে কথা বলে। ওর গায়ে হাত দিতে সাহস পাই না আমি। আমার মনে রীতিমতো উৎকণ্ঠা যদি কোনো বাজে কাণ্ড করে বসে। ক্রমশঃ দিন দিন মার্গারেট অবাধ্য হয়ে উঠছে আমার। চুপচাপ ঘরের

মধ্যে বসে ছিলাম হঠাৎ একসময় কানে এল হাসির শব্দ। প্রথমটা বুঝতে না পেরে কান খাড়া করতে পরে বুঝতে পারলাম ভালভাবে। খিলখিল হাসি শুনে এবার রীতিমতো অবাক হবার পালা। যে কিনা ওইরকম ব্যবহার করে গেল সে কি করে আবার হাসতে পারে সরল বালিকার মত। তা কি ভাবা যায়। আওয়াজ শুনলাম ডরোথির গলা, 'তোমার কথাই বলছিল ভিক্টর।'

ডরোথির একমাত্র ছেলে উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ভিক্টর। মুখ সুন্দর না হলেও ওর চেহারা বেশ ভাল। পড়াশুনা করে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বছরখানেক বাকি আর গ্র্যাজুয়েট হতে। খুব হাসিখুশী স্বভাবের। বুঝতে পারছি আলাপ হয়েছে মার্গারেটের সঙ্গে। তবে আমার ভয় এবং আশঙ্কা ভিক্টরকে নিয়ে নয় মার্গারেটকে নিয়ে এবং আমার বুক কেঁপে উঠল সেই আশঙ্কাতেই।

।। কুড়ি ।।

একদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখি মার্গারেট ড্রয়িংরুমে বসে ভিক্টরের সঙ্গে গল্প করছে। ওর পরনে খানিকটা নীলচে ধরনের রঙীন স্কার্ট, ওকে অনেক কমবয়েসী লাগে ও যখন এটা পরে। চেয়ারের উপর বসে যথারীতি মার্গারেট পা তুলে দিয়েছে টেবিলের উপর এবং তার ফলে ওর প্যান্টিটার খানিকটা দেখা যাচ্ছে স্কার্টের কিছুটা অংশ নেমে গিয়ে। যেকোনো পুরুষের কাছে পরম লোভনীয় ওর এই ফর্সা মাখনের মত নিটোল উরু দুটো। ভিক্টর পরেছে একটি সাদা শার্ট এবং প্যান্ট। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ছেলেটি স্মার্ট এবং সুন্দর। ভিক্টর কিছুটা কুণ্ঠিত ভাবে উঠে দাঁড়াল আমাকে দেখামাত্রই। অপরাধী ভাব নিয়ে হেসে কোনো রকমে বলল আমাকে, আপনি কেমন আছেন আংকল?

আমাকে আংকল বলতে ওকে শিখিয়ে দিয়েছে ডরোথি। 'এই চলছে মোটামুটি', আমি জবাব দিলাম।

এরপর চোখ দুটো বড়ো করে ঝাঁঝিয়ে আমি মার্গারেটকে বললাম, একি অসভ্যতা হচ্ছে মার্গারেট, একজন লোক বসে রয়েছে তোমার সামনে, ছিঃ আর তুমি কিনা পা তুলে দিয়েছ টেবিলের উপর, শিগ্‌গির নামাও।

তেমন আমল দিল না মার্গারেট আমার কথাটায়। খিল খিল করে হেসে উঠে পা নামালো অনেক অনিচ্ছা নিয়ে। কিন্তু ওকে আর বললাম না আমি। তাকালাম ভিক্টরের দিকে এবং ওকে বললাম, কেমন চলছে তোমার পড়াশুনা ভিক্টর?

ভিক্টর নীচু গলায় জবাব দিল, এই একরকম।

ড্রয়িং রুমে রাখা একটি ছোটো আকারের খাটের উপর গিয়ে আমি বসলাম।

মার্গারেট হঠাৎ আমাকে আংকল সম্বোধন করে বলে উঠল, ভিক্টরের কাছে বাংলা শিখব আমি।

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম মার্গারেট আমাকে আংকল বলে সম্বোধন করায়, তবে এটা বুঝতে পারলাম যে ও আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম। ওর রসিকতা আমার পছন্দ হচ্ছে না এটা আমি ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম আমার চোখের ভাষা দিয়ে।

'আমি বাংলা শিখবো', মার্গারেট আবার বলল। এবার আর ও আমাকে আংকল বললো না যে, সেটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আমি ভিক্টরকে বললাম ওর দিকে নিস্পৃহ ভাবে তাকিয়ে, তুমি বাংলা ভাল জানো বুঝি।

আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এমনকি আমার মোটামুটি অনেক বাঙালী বন্ধুবান্ধব আছে। সেই কারণেই আমি কিছু কিছু জানি।

আমি বললাম, মানুষ হিসাবে বাঙালীরা খুব অতিথিপরায়ন হয়।

ভিক্টর বলল, ওদের মধ্যে কিন্তু সংগ্রামী মনোভাবটা অনেক কম থাকে। ওদের মধ্যে পুরনো সংস্কার অনেক থাকে কিন্তু কোনোরকম উচ্চাশা থাকে না। একটু থেমে ও আবার বলল, তবে কি খুব বুদ্ধিমান হয় ওরা, বেশ কিছু পরিচিত বাঙালী আমার আছে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম বেশ খানিকটা সময় গল্প করে কাটিয়ে দিয়ে।

ভিক্টরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো মার্গারেট। ঠিক ভাবে নিতে পারলাম না আমি ব্যাপারটাকে। আমি মার্গারেটকে ভালবাসি এটা ঠিক কথা কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারি

না। ওর ঐ জেদী এবং ছটফটে স্বভাব নিয়ে ও কখন যে কি করে বসে তার কোনো ঠিক নেই। আমি এখনো ভুলিনি ফ্রেডির সঙ্গে ওর মাখামাখির ব্যাপারটা। সেই রাতে বিশেষ করে মার্গারেটের আচরণ আমি ভুলতে পারব না। কোনো রকম তেজ ওর ছিলনা, ও প্রতিবাদ করেনি কোনো উত্তেজিত আচরণের এবং ওর মধ্যে ছিল কিরকম একটা অপরাধী ভাব। স্বাভাবিক ব্যবহার ফ্রেডি ওর সঙ্গে করেনি এটাই আমার ধারণা ছিল। আমি ব্যাপারটা মার্গারেটের কাছে বারবার জানবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারছিনা। মার্গারেট যেন ওর প্রসঙ্গ ভুলতে পারলেই বাঁচে বলে বারবার মনে হয়েছে আমার। আমাকে বারবার এখন জ্বালাতন করে তোলে সেই ব্যাপারটা। ভিক্টরের সঙ্গে এখন ও আবার বেশী মেলামেশা করছে। ওদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক এখন রয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা যে চলে যাবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায় রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না মিমিকে। মিমির তুলনা হয় না পুরুষকে উত্তেজিত করার ব্যাপারে। ওকে কোনোদিনই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না ও যদি একবার অভ্যস্ত হয়ে যায় এই ধরনের জীবনে। ওকে হারিয়ে যেতে হবে চিরদিনের মত এখানকার এই কুৎসিত ভিড়ের মধ্যে। বেশ্যার জীবন বেছে নিতে হবে। যেখানে কিছু নেই নরক ছাড়া। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শোওয়া এবং আকণ্ঠ মদ। আমি দেখেছি এদের এখানকারই বিভিন্ন অলিগলিতে এবং শিউরে উঠেছি, ভয়ানক এদের জীবন দেখে। মৃত্যুর পর যে জায়গাকে ভারতীয়রা নরকের সঙ্গে তুলনা করে এটা ঠিক সেই ধরনের ভয়ানক। বেশ্যাদের জীবনকে এরকম নরক বলে আমার মনে হয় বলেই আমি ঠেলে দিতে পারি না এই জীবনে আমার প্রিয়তমাকে।

আমি ভালবেসেছি মার্গারেটকে। হয়তো অসমবয়সী আমরা কিন্তু এতে ফাঁক নেই। আমি ওকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসি। আমার ভালবাসায় কোনো প্রতারণা নেই। আমার কাছে সেটা প্রচণ্ড আঘাত হবে ও যদি আমার কাছ থেকে সরে যায়। আমি হয়তো সহ্য করতে পারবো না এই আঘাত। আমি জীবনে শান্তি পাইনি কোনদিন নারীর সান্নিধ্যে। আমার জীবনে এমনকি মার্গারেটকে নিয়েও কোনো শান্তি নেই।

মার্গারেট দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর। দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, আমি কিন্তু চলে গেলাম না। একটু শোনা দরকার কি ধরনের কথাবার্তা ওরা বলে। আমার কানে এল মার্গারেটের খিলখিল হাসির শব্দ। মার্গারেট বলছে শুনতে পেলাম, 'তুমি ভিক্টর আমার কান ধরবে না, খুব বেড়ে গেছে তোমার সাহস।'

ভিক্টর বললো, তোমার আংকল তোমাকে বারণ করে গেল টেবিলের ওপর পা তুলে বসতে, অথচ তুমি।

রাখোতো, বেশ করেছি, টেবিলের ওপর পা রেখেছি, যদি তুমি বেশী কর তো তাহলে আমি আমার পোষাকই খুলে ফেলব।

ভিক্টর বলল, তোমার লজ্জা করবে না, সেকি কথা।

পুরুষরা তোমরা সব কিছু পারো, আর আমরা করতে পারি না। মার্গারেট আবার বলল একটু থেমে, শেখাবে তো তুমি আমাকে?

ভিক্টর বললো, আমি তোমায় শেখাবো যদি তোমার আংকল অনুমতি দেয়।

আরে দুর, আমি থোড়াই কেয়ার করি ওসব আংকল টাংকলকে, অনুমতি কিসের। আমি কারো আপত্তি শুনবো না, আমি যখন শিখতে ইচ্ছা করেছি তখন আমি শিখবই।

আমি কথাবার্তাগুলো শুনছিলাম কান লাগিয়ে কপাটে। এসব কথা শুনে শিউরে উঠলাম মনে মনে, মার্গারেট এসব কথা কি বলছে। কান রাখলাম কপাটে খুব সাবধানে। কানে এলো ভিক্টরের কণ্ঠস্বর, খুব ভালবাসে তোমার আংকল, তোমাকে তাই না!

মার্গারেট বলল, আংকল আংকল করো নাতো বারবার। আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন মিঃ পিটার ব্রাউন এবং কোনো ফাঁক নেই সেই ভালবাসায়, তবে তিনি একটু ঈর্ষান্বিত যৌন ব্যাপারে। উনি রীতিমতো ক্ষেপে যান আমাকে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশতে দেখলে। আমি এই যে কথা বলছি তোমার সঙ্গে তো গিয়ে দেখবো যে উনি গম্ভীর মুখে শুয়ে রয়েছেন বা বসে রয়েছেন। তেমন ভাবেই কথা বলবেন না উনি আমার সঙ্গে।

ভিক্টর বললো, আমিতো ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, তুমি যে কি যৌন ব্যাপারের কথা বললে?

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, তুমি বুঝতে পারবে না ওসব ব্যাপার, আই লাভ ইউ, আচ্ছা ভিক্টর এর বাংলাটা কি হবে।

মোটামুটি থেমে থেমে যে বাংলা উচ্চারণ আমার ওর কানে এল তা হল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

মার্গারেট থেমে থেমে কোনোরকমে উচ্চারণ করল কথাটা এবং সেটাও আমার ঠিক বোধগম্য হল না, এবং তারপর হেসে উঠল সজোরে।

খানিকটা সময় কেটে যাবার পর আমি বুঝলাম যে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয় যখন তখনই ওরা বেরিয়ে পড়তে পারে, তাই শোবার ঘরে চলে এলাম আমি চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে। বিছানায় পোষাক ছেড়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ভাবলাম এবার চোখে চোখে রাখতে হবে মার্গারেটকে। অতো মেলামেশা বন্ধ করতে হবে ওর ভিক্টরের সঙ্গে। এটা মোটেই ভাল নয় যে ওরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আমাকে একদিন নিশ্চয় মাশুল গুনতে হবে এরকমভাবে চলতে থাকলে। তুলকালাম করে ছাড়বে যদি মার্গারেট এটা আঁচ করতে পারে। এবং তাতে হবে হিতে বিপরীত। এখন এখানে একটু আসা যাওয়া বাড়িয়েও দিয়েছে ভিক্টর। ওদের আলাপটা যে এর মধ্যেই বেশ পুরনো হয়ে গেছে তা মনে হল ওদের কথাবার্তা শুনেই। আমার আয়ত্তের বাইরে পুরো পরিস্থিতি চলে যাবে যদি এখন থেকে রশি টেনে না ধরা হয়। আর কোনো উপায় থাকবে না তখন।

আমার ঘরে এলো একবার ডরোথি। লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, খেয়ে নিন এবার সে বলল।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলেছো মিমিকে।

ডরোথি এগিয়ে গেল দরজার দিকে এবং বলল, না এখনো ওকে বলা হয়নি, আগে আপনাকে বলে তবে নীচে গিয়ে ওকে বলবো। আমি আবার ডাকতে ও ঘুরে দাঁড়ালো এবং বললো মৃদু হেসে, আমাকে কিছু বলবেন।

চুপ করে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, ঠিক আছে, আমি এখনি খেতে যাচ্ছি তুমি যাও।

প্রথমে ভেবেছিলাম ওকে কিছু বলব ভিক্টরের ব্যাপারে কিন্তু পরে ভাবলাম যে সেটা এখন না বলাই ভাল, মার্গারেটের কানে যদি ব্যাপারটা চলে যায় তাহলে সেটা খুবই খারাপ হবে। খুবই সুচতুর ভাবে বন্ধ করতে হবে ওদের এখনকার মেলামেশা। কোন উপায় নেই এছাড়া। এখন কোনো কাজে জোর করে লাভ নেই তার চেয়ে যদি বুদ্ধিবলে করা যায় তো তাহলে সেটাই খুব ভাল কাজ হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ডরোথি।

আমি বাইরে তাকালাম জানালা দিয়ে। গাড়ি চলছে দূরে। মোটামুটি রাস্তার ওপরে এই বাড়ি। কিছুক্ষণ কাটার পরে কানে এলো মার্গারেটের চীৎকার, 'লাঞ্চ রেডি।'

বারান্দায় গেলাম আমি। আমাদের খাবার জায়গা রান্নাঘরের ঠিক সামনের বারান্দাতে। জায়গাটা খুবই চওড়া এবং টেবিলটা ডিম্বাকৃতি। চেয়ার রয়েছে তার চারপাশে, ওর পাশে আমি বসলাম। ডরোথি খায় আমাদের খাবার পরেই। ভিক্টর নীচে ড্রয়িংরুমে বসে আছে, সেটা জানলাম আমি ওকে জিজ্ঞেস করে। ও খাবে ওর মায়ের সঙ্গে বসে। এরপর আরম্ভ করলাম আমরা খেতে এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডরোথি। কারণ ওই আমাদের খাবার পরিবেশন করে।

আমি আবার দোতলায় চলে এলাম নিজের ঘরে খাওয়া শেষ করে। ঘরে এসে ঢুকলো মার্গারেট মিনিট পাঁচেক পরে। আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম। জোর হাওয়া উঠেছে বৃটেনে, শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসছে নির্বাচনে রক্ষণশীলদের হারিয়ে দিয়ে। আমি যুক্ত নই ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতির সঙ্গে। তেমন একটা বুঝি না এসব ব্যাপারে। আমি রুশ বিপ্লবের বছর উনিশশো সতেরো সালে জন্মেছি। আমার মোটেই তেমন কোনো উৎসাহ নেই সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে। আমি কোনো তফাৎ খুঁজে পাই না হিটলার এবং স্তালিনের মধ্যে। আমি যে রাজনীতি বুঝি না সেটা

আমি অবশ্য আগেই বলেছি। মার্গারেট এগিয়ে এল আমার কাছে। ওর পরনে নীল রঙের গাউন স্বচ্ছ প্রকৃতির। যদিও ভেতরে অন্তর্বাস রয়েছে তথাপি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুকের উপরের অংশটা। আমি আধ শোওয়া হয়েছিলাম বিছানায় একটা বালিশে হেলান দিয়ে। ঠিক আমার কোলের কাছটায় এসে মার্গারেট বললো, আমার শরীরটা আজকাল ভাল যাচ্ছে না, কি ব্যাপার বলতো?

আমি বললাম, কি সমস্যা তোমার?

মার্গারেট জবাব দিল, একটুতেই হাঁফিয়ে যাচ্ছি আজকাল, একটুও রুচি নেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।

ওর দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম যে একটি মৃদু ক্লান্তির রেখা ওর মুখের মধ্যে। আমার চিন্তা হলো, আমি এখানে এসেছি মাস দুয়েক হলো। আমি এখানকার একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ওকে দেখাব বলে ঠিক করলাম যদিও আমি নিজে ডাক্তার।

কাছে টেনে নিয়ে মার্গারেটের ঠোঁটে চুমু খেলাম একটা, আলতো করে।

।। একুশ ।।

একটা চিন্তা আমার মাথায় সবসময় ঘুরছে যে এখানে একটা চেম্বার করব। যদিও ঠিক করেছি এখানেই প্র্যাকটিশ করবো তবে এখনো ঠিকমতো জায়গা পছন্দ হয়নি। দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এখানকার এবং তাদেরকেও বলেছি একটি ঘরের সন্ধান দিতে পছন্দমত। ভাবছি এখানে নিয়মিত প্র্যাকটিশ করবো। এখানে আসার পর মার্গারেট বেশ কিছুদিন মনমরা হয়েছিল। আগেকার মত ছটফটে উচ্ছল হয়েছে আবার ও এখন। আলাদা একটা জৌলুস এসেছে ওর চেহারায় এখন, যা দেখলে মাথা ঘুরে যাবে যেকোনো পুরুষের। ভিক্টরের সঙ্গে ও একটু বেশী মেলামেশা করছে বলে আমি ইদানীং লক্ষ্য করছি। অনেকবারই লক্ষ্য করেছি দুজনে বসে চুপচাপ গল্প করছে। হয়ত আমাকে দেখে হাসল কিন্তু আবার গল্পে মেতে গেল ভিক্টরের সঙ্গে। ওদের এই মেলামেশায় বাধা দেব না বলেই আপাতত আমি ঠিক করেছি। যদি আমি বাধা দিতে যাই তো মার্গারেট আবার যে স্বভাবের মেয়ে তাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশী। তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি তবে আমি ওদের ওপর। ওর সঙ্গে অবশ্য এখনও পর্যন্ত মার্গারেটকে আমি কোনো আপত্তিকর অবস্থায় দেখিনি। ভিক্টর খুবই নরম প্রকৃতির এবং ভীতু স্বভাবের যুবক। যেহেতু ওর মা এখানকার পরিচারিকা সেহেতু ও সাহস পাবে না বেশীদূর এগোতে। একটু সাবধানতা অবশ্য দরকার যেহেতু বিশ্বাস করা যায় না মানুষের মনকে। মার্গারেট যেখানে শর্টহ্যান্ড শিখছে সেখানে গেলে একবার কেমন হয় বলে আমার মনে হল। যেই মাত্র ভাবলাম, তৎক্ষণাৎ আর দেরী না করে সেখানে গেলাম। বেশ ছিমছাম বাড়ি, পলেস্তারা খসে পড়েছে এখানে ওখানে। চারদিক ভাল করে দেখলাম বাড়িতে ঢোকবার আগে। উল্লেখযোগ্য জিনিষ কিছুই চোখে পড়ল না। আমাদের ওখানকার বাড়িগুলোর সঙ্গে এই বাড়িগুলোর অনেক মিল রয়েছে। দরজায় শব্দ করতে একটি বছর বারো তেরো বয়সের মেয়ে মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে দিল। 'কাকে চাই?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল আমাকে দেখেই।

মিসেস উইলসন আছেন? বললাম আমি।

মেয়েটা বলল, ওনার আসার সময় হয়ে গেছে তবে উনি এখনও ফেরেননি।

পাঁচটা বেজেছে আমার রিষ্টওয়াচটায় দেখলাম। মেয়েটা বলল, এক্ষুনি ফিরবেন উনি, আসুন ভিতরে আসুন।

বেশ সাজানো গোছানো ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। যীশু খ্রীষ্টের ছবি রয়েছে দেওয়ালে। একটি পুরনো ক্যালেন্ডার টাঙানো চলতি বছরের। একটি মেয়েলী পত্রিকা টেবিলে রয়েছে। সাজানো রয়েছে কিছু বইও। মিসেস উইলসন এলেন প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর। উনি হাসলেন আমাকে দেখে। তারপর বললেন, আমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন আপনি নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ আগে এসেছি আমি।

ক্ষমা করবেন আমি আসছি এক মিনিট, এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং পোষাক পরিবর্তন করে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হাসি মুখে বললেন, কি খবর বলুন?

ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম শিখেছে মার্গারেট?'

ইতিমধ্যে চা দিয়ে গেছে মেয়েটি? মিসেস উইলসন চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে উঠলেন, খুব ভালই শিখেছে মার্গারেট, বেশ ভাল মাথাটা, তবে...। এই বলে সামান্য থামলেন তিনি এবং ওর কৌতূহলী চোখ নিয়ে আবার বললেন, আপনার ভাইঝিটি খুব চাপা প্রকৃতির।

মনে মনে অবাক হলাম কারণ এই ব্যাপারটা তার উল্টো, এবং খুব কমই আছে ওর মতো হৈ-চৈ এবং খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম কারোর সঙ্গে কথা বলে না ও কি এখানে।

হ্যাঁ কথা সবার সঙ্গেই বলে, তবে কেউ যদি ওর বাবার বা মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে তখন কিন্তু ও কিছু বলে না। শুধু বলে যে মারা গেছে এবং কেউ যদি আপনার প্রসঙ্গ তোলে তাহলে এড়িয়ে যায় ও একেবারে। আবার বললেন একটু থেমে, ওর কি কোনো পরিচিত ব্যক্তি আছে ফ্রেডি উইলসন বলে।

চমকে উঠলাম আমি। হেসে বললেন মিসেস উইলসন, মার্গারেট আমার পদবী শুনে বলল ওরও একজন এই পদবির ফ্রেডি নামে বন্ধু আছে। ভদ্রলোক নাকি খুব ভাল সাহিত্যিক এবং ভদ্রলোকের খুব প্রশংসাও করল ও।

টিনটিন করলো আমার ভেতরটা। এখনো তাহলে ফ্রেডিকে ভোলেনি মার্গারেট। আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, 'কিছু বলেছে নাকি সে আর ফ্রেডির ব্যাপারে।'

তেমন কিছু আর বলেনি, তবে একটা বই ও পড়তে দেবে বলেছে, একটা ফোটোও আমাকে দেখিয়েছে ফ্রেডির এবং এখানে আসারও নাকি কথা আছে ফ্রেডির।

আমি ঘাড় নাড়লাম এবং আমার বুকের ভেতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মিসেস উইলসন বললেন, ওর একটা বিয়ের প্রয়োজন এবং এমন একটা পুরুষের সঙ্গ দরকার যাকে ও ভালবাসে বলে এই মুহূর্তে আমার মনে হয়।

আমি ম্লান হেসে বললাম, আমি ওকে খুব ভালবাসি ছেলেবেলা থেকে এবং এই মুহূর্তে আমি ওর বিয়ের কথা ভাবছি না কারণ আমি ভাবতেই পারছি না যে ও আমার কাছে থাকবে না।

আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন মিসেস উইলসন। তারপর বললেন সহানুভূতির সুরে, আমি বুঝতে পারছি সেটা মিস্টার ব্রাউন, ছেলেবেলা থেকে আপনি মানুষ করেছেন বাপ-মা মরা মেয়েটাকে। ছাড়তে কষ্ট হলেও আপনাকে তো একদিন না একদিন ছাড়তেই হবে এবং চিরকাল তো আপনি আপনার কাছে ওকে ধরে রাখতে পারবেন না।

আমি জবাব দিলাম ম্লান কণ্ঠে, আমার কাছে ওকে রেখে দেবো বলেই তো শিখতে পাঠিয়েছি আপনার কাছে, একটু নজর দেবেন যাতে ও ভালভাবে শেখে। আমি আমার ডাক্তারখানাতেই ভাবছি যে ওকে চাকরীতে লাগিয়ে দেবো। ওকে দিয়েই করাবো আমি আমার সমস্ত কাজকর্ম।

সজোরে হেসে উঠলেন মিসেস উইলসন আমার কথা শুনে, বললেন, অবাক করলেন আপনি আমাকে, যতই আপনি ওকে আপনার নিজের কাছে রাখুন আপনি কি পারবেন ওর মনের ইচ্ছাকে দমন করতে, চাকরী করতেও কী রাজী আছে মার্গারেট?

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

আমি উঠলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলার পর। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মিসেস উইলসন। আমি নিজের মনেই বেশ ভারী মন নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। ব্যাপারটা এমনিতে স্বাভাবিক যে মার্গারেট ঐ ভদ্রমহিলার কাছে প্রশংসা করেছে ফ্রেডির। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এই ব্যাপারটা। কোথায় যেন খোঁচার মতো বিঁধছে একটা কাঁটা। আমাকে কি তাহলে একেবারেই ভালবাসে না মার্গারেট? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ও আমাকে ভালবাসে এবং এটা আমার মনে হয় ওর আচার আচরণ দেখে। কেন রয়েছে তাহলে ওর কাছে ফ্রেডির ফটো। আমি এটাকে সাজাতে পারছিলাম না কোনোরকম যুক্তি দিয়েই। একেবারেই বাড়ি যাবার ইচ্ছা আমার নেই বলে আমি খুব মনোরম জায়গা গার্ডেনে চলে গেলাম। যার চারদিকে শুধুই

সবুজের সমারোহ এবং মাঝখানে একটা ঝিল। দৃশ্যটা খুবই অপূর্ব একটি বেঞ্চিতে বসলাম গিয়ে, কিছু নারী পুরুষ রয়েছে আশেপাশের বেঞ্চিতে। হঠাৎ একটা গাছের তলাতে চোখ পড়তে আমার শরীর পাথর হয়ে গেল এবং আমি একটু আড়ালে বসলাম সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে যাতে ওরা দেখতে না পায়। ওরা গল্পে এতই মশগুল যে আমাকে একেবারে লক্ষ্যই করেনি। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম আড়াল থেকে। হাসির শব্দ শুনলাম।

কিছু কিছু শব্দ কানে এলেও আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না প্রায় ওদের কথাবার্তা। একটি হিমেল অনুভূতি যেন বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমার মনে হল যেন ঘামছি যখন আমি কপালে হাত রাখলাম। অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে একবার আমার মনে হল। আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না কি করব। কি করা উচিত এই মুহূর্তে আমার। ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত, কি হবে কান টেনে। তাহলে কি ও আরো জেদী এবং অবাধ্য হয়ে উঠবে। সেই মানুষ মরীয়া হয়ে উঠে যখন কারো কোনো গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন তাকে আর সামলানো যায় না, সে এমন কিছু ভয়ঙ্কর করে বসে। এতো সাহস আর স্পর্ধা ওর। আমি খুব সাবধানে দৃষ্টি রেখেছি ওদের দিকে। বিকেল চলে যাচ্ছে এবং বেশ খানিকটা সময় এইভাবে কেটে গেল। পুরো জায়গাটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। দু একজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে এ পাশে ও পাশে দেখলাম। ওরা ভেবেছে আমি পাগল বা বিকৃত মানসিকতা যুক্ত। আসলে ব্যাপারটা কী ওরাতো কেউ বুঝতে পারছে না। ওদের অবশ্য সেরকম কোনো অশালীন দৃশ্য দেখতে পেলাম না খানিকটা সময় কেটে যাবার পরও। ওরা পরস্পরের হাত ধরে রেখেছিল অবশ্য কিন্তু আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল সেটাও। সহ্য করতে পারছিলাম না আমি একেবারে এবং একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। নিজেকে সংযত করে বসে রইলাম আমি কোনোক্রমে। ওরা হাত ধরাধরি করে চলে গেল একসময়। আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম ওরা চলে যাবার পরও। বাইরে যদিও অন্ধকার অবশ্য বাগানের ভেতর আলো রয়েছে। একটি অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে আলো আঁধারি মিলে।

একটা গোপন রহস্য দানা পাকিয়ে উঠছে যেন কোথায়। এর আগেও আসা যাওয়া করেছে এরা, এটা নিশ্চয় প্রথম নয়। ও অনেক কিছুই তাহলে গোপনে করে। আমি যখন এর হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছি এখন এর একটা ব্যবস্থা করবো।

হাঁটতে লাগলাম বাগান পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তা ধরে। এক দম্পতি আমার পাশ দিয়ে দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে চলে গেল। মেয়েটি ভদ্র নয় সেটা ওর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে মনে হল। ওদের বাগানের ভেতর ঢুকতে দেখলাম আমি পিছন ফিরে।

আমি খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম লোকালয়ে পৌঁছে। নানা ধরনের মানুষ যাতায়াত করছে চৌরঙ্গীতে। একমনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িঘোড়ার শব্দ শুনছি। কিছু ভালো লাগছে না। একটি বারে বসে মদ খেলাম। বেশ রাত করে বাড়ি পৌঁছলাম। খাবার চাপা দিয়ে গেছে ডরোথি। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি ঘুমোচ্ছে মার্গারেট। মনে হল ওকে শেষ করে দিই। ওর ঘুমন্ত মুখ দেখে একটি সরল বালিকা মনে হল ওকে। ওর কাছে দাঁড়ালাম পোষাক ছেড়ে। গাউন উঠে গিয়ে পায়ের ডিম দেখা যাচ্ছে। মিমি ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। আমি হাত রাখলাম ওর মাথায় কিন্তু তাতেও ওর ঘুম ভাঙলো না। আমি ওর পাশে শুয়ে পড়াতে চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল আমার। আমার প্রতিশোধ নেওয়া হল না যদিও নেবো ভেবেছিলাম।

বেশ বেলা করে আমার ঘুম ভাঙলো। রিষ্টওয়াচে দেখলাম আটটা বেজেছে। মার্গারেট নেই পাশে ঘুরে দেখলাম, তাই উঠে বসলাম ধড়ফড় করে। মনে করার চেষ্টা করলাম গতরাতের কথা আমি। এখনো সামান্য ধরে আছে মাথাটা। বাথরুমে চলে গিয়ে স্নান সেরে নিলাম। চেহারায় যে বয়সের ছাপ পড়েছে তা বাথরুমে গিয়ে নগ্ন হয়ে দেখলাম। মাথার চুল পাকা। আমি রোজই দাড়ি গোঁফ কামাই এবং কামিয়েছিলাম গতকাল সকালেই। গতকাল বিকালবেলার কথা এখন কামাতে গিয়ে মনে পড়ল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল গার্ডেনের সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা। আবার রাগ জমতে আরম্ভ করলো শরীরে। আমি বারান্দায় গেলাম এরপর সমস্ত কিছু সেরে। একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পরছিল মার্গারেট বারান্দায়। একবার আমার

দিকে তাকিয়ে যথারীতি আবার মন দিলো খবরের কাগজে। ও আমাকে অবজ্ঞা করছে বলে যেন আমার মনে হল। ওকে সত্যিই অপূর্ব লাগছিল পাশ থেকে। সরল বালিকার মত এখন ওকে আর মনে হচ্ছে না। আমাকে নিয়ে খেলা করছে যেন এক রহস্যময়ী নারী। একটা চেয়ারে সামনাসামনি বসলাম আমি গম্ভীর মুখে। একমনে কাগজ পড়ছে মার্গারেট।

এর মধ্যে আমাদের চা দিয়ে গেল পরিচারিকা ডরোথি। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ ব্রাউন, আপনি কাল রাতে খাননি কেন?

আমি হেসে বললাম, একটু দেরী হয়ে গেছিল কাল আমার ফিরতে।

আমার সামনে থেকে চলে গেল ডরোথি 'আচ্ছা' বলে। চুমুক দিলাম আমি চায়ের কাপে। এক হাতে কাপ তুলে নিল মার্গারেট কাগজ পড়তে পড়তে।

।। বাইশ।।

ও আমার সঙ্গে আগে থেকে কিছু বলতে চাইছেনা এটা আমি বুঝতে পারছি। ওর ভেতর একটা যেন কোথায় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ওর মুখের মধ্যে কোমলতার বদলে কঠিনতা। শেষ করলাম দুজনে চুপচাপ চা খাওয়া। রাগে ফুলছিল আমার শরীরটা এবং আমি মার্গারেটকেবললাম, একটু ঘরে চলো।

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে ও এর কারণ জিজ্ঞেস করল।

আমি আবার বললাম, আমার দরকার আছে।

নিস্পৃহভাবে ও খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলে বলল, যা বলার তা এখানেই বলো।

আমি এবার বললাম একটু জোরে, ঘরে যেতে বলেছি না তোমাকে।

ভাল লাগছে না এখন ঘরে যেতে।

ওর ইচ্ছা নেই তা সত্ত্বেও ও হেসে উঠল এবং তখন আমি উঠে পড়লাম। আমাকে ভেতর ভেতর আরো জ্বালিয়ে দিল ওর সেই হাসির ন্যাকামি। আমি বললাম, যেতেই হবে তোমাকে।

মার্গারেট বলে উঠল, একটু পরে যাচ্ছি।

পরে নয় এক্ষুনি, এই বলে আমি ওর হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ঘরের ভেতর এবং ওকে ছুঁড়ে দিলাম বিছানার উপর। ও ছিটকে পড়লো বিছানার উপর। ও চোখদুটো বড়ো বড়ো করে ঢোক গিলে আবার বলল, হয়েছেটা কি?

আমি তাকালাম ওর দিকে স্থির চোখে এবং বললাম, কোথায় গিয়েছিলে কাল বিকালে তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিল, আমি যেখানেই যাই না কেন সেখানে নিজের ইচ্ছায় গেছিলাম।

ছুটে আমি আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। ডরোথি কিংবা অন্য কেউ এসে পড়ুক কথার মাঝখানে সেটা আমি চাইনা। এবার আমি দাঁড়ালাম গিয়ে মার্গারেটের সামনে। আমি বললাম, আমি এখন তোমার অভিভাবক, এটা তোমার ব্যাপার নয়, তুমি যখন যা করবে তা আমার অনুমতি নিয়ে করবে।

মার্গারেট ঝাঁঝিয়ে বলল, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে আমার নিজের ইচ্ছায়, তাই বলে তুমি আমার অভিভাবক হতে পারো না। আমাকে নিয়ে আসার এতটুকুও ক্ষমতা তোমার ছিল না যদি আমি না নিজে আসতে চাইতাম। আমার এই দেহের উপরেই যতো লোভ তোমার, কারণ তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।

আমি আবার বললাম, তোমার কাছে কেন রেখেছ ফ্রেডির ফটো?

ও আমার একমাত্র বন্ধু সেই কারণেই নিজের ইচ্ছায় রেখেছি আমি।

আমি ওর গালে একটা সজোরে থাপ্পড় মেরে বললাম, ও তোমার বন্ধু, বাঃ আর আমি তোমার কেউ নই?

মার্গারেটের দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল এবং ও গালে হাত দিল। জ্বলন্ত চোখে ও সেই অবস্থাতেই বলল, তোমার কাছে আমি থাকবো না।

ক্রমশঃ আমার এত রাগ বেড়ে যাচ্ছিল, যে ওকে আমি ভীষণ ভাবে মারলাম একটা বেল্ট দিয়ে। একবারের জন্যেও চীৎকার করে কাঁদলো না মার্গারেট, কি আশ্চর্য! আমি শান্ত হলাম বেশ

খানিকক্ষণ পরে। উপুড় হয়ে শুয়েছিল মার্গারেট, আমি চুপচাপ হাত দিয়ে বসে রইলাম মাথায়, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেল্টটাকে। আমার কিছুই ভাল লাগছে না এবং এইভাবে কাটলো ঘণ্টাখানেক। আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম এবং উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো মার্গারেট। ডরোথির কাছে আমি প্রথমেই গেলাম।

বেশ ঘাবড়ে গেল ডরোথি আমার উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা দেখে।

কি হয়েছে আপনার, সে জিজ্ঞেস করল। আমি একরকম জোর করেই মৃদু হাসলাম, বললাম, ভিক্টর কোথায়, আমার কিছু হয়নি।

ডরোথি জবাব দিল, বেরিয়ে গেছে তো ভিক্টর।

আমি বললাম, ও এলে বলবে, খুব জরুরী দরকার আমার, আমি বেরোচ্ছি, ও এলে নিশ্চয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

একটু অবাক হয়ে ডরোথি বলল, এলেই বলব, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি বললাম, বলো।

কোনো খারাপ খবর আছে কি—? ও জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম হেসে, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো যে, কোনো খারাপ খবর নেই। আমি সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এই কথা বলে। এলোমেলোভাবে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায়। আমার রীতিমতো অনুশোচনা হচ্ছে কারণ আমি এই প্রথম গায়ে হাত তুলেছি আমার প্রিয়তমার। মার্গারেটের একটা স্বাধীনতা নিশ্চয় আছে যদিও সে আমার প্রিয়তমা হোক না কেন। আবার এটাও ঠিক যে আমি ওকে ভালবাসি, তাই এটাই বা কেমন করে হয় যে ও আমাকে অবজ্ঞা করে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরবে এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবে। ওর কাছে থাকবেই বা কেন আমার বন্ধুর ছবি। ক্ষতিই বা কি, যদি আমার বন্ধুর ছবি ওর কাছে থেকেই থাকে। এটাই বা কেমন করে হয় যে আমি ছাড়া ওর আর অন্য কোনো পুরুষ বন্ধু থাকবে না। এই সব ব্যাপারটাই ওর নিজস্ব। আমার বোকামি। বাড়ি ফিরলাম, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ আর তুলো কিনে নিয়ে। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। দেখলাম ও এই ভাবে শুয়েই রয়েছে এবং ঘুমিয়েও পড়েছে। অসহায় লাগছে ওর মুখটা রীতিমতো। ও নিশ্চয়ই ভালবাসে আমাকে। আমার সঙ্গে নাহলে এখানে ও চলে আসতে পারে না। ওকে ডাকলাম আমি আলতো করে, ওর দেহে দু এক জায়গায় কালসিটে পড়েছে। বললাম, মিমি মিমি, আমি এসেছি উঠে পড়ো।

মার্গারেট ঘুমোচ্ছিল গভীর ভাবে এবং সেই কারণেই আমি ডাকতে ও উঠে বসলো ধড়ফড় করে। আমি বললাম, শুয়ে থাকো, একদম উঠবে না।

আমার নির্দেশ পালন করলো মার্গারেট একেবারে বাধ্য মেয়ের মত। ওর আঘাত লাগা জায়গাগুলোতে আমি ওষুধ লাগিয়ে দিলাম তুলো দিয়ে। পিঠে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমি বললাম, আমায় তুমি ক্ষমা কর মিমি, হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তখন আমার। লক্ষীটি কিছু মনে করো না, এরকম হবে না আর কোনো দিন।

মার্গারেট কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল। পরম আবেগে একটা চুমু খেয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম এবং ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওকে নিয়ে সেদিন খাওয়া দাওয়া শেষ করে কলকাতার বিভিন্ন দিকে বিশেষ করে উত্তরের দিকটায় ঘুরলাম। লোকজনের ভিড় বেশ এখানটায়। দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার সেদিনই সেই বিখ্যাত বাংলা ছবিটা। ছবিটা হচ্ছিল একটি মাঝারী ধরণের বাংলা সিনেমা হলে। তেমন একটা ভিড় নেই অবশ্য হলে ঢুকে দেখলাম। আমাদের দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের আশে পাশে যারা বসেছিল। আমরা যেহেতু বিদেশী সেহেতু অনেকেরই ধারণা হল যে আমরা ছবিটা বুঝবো তো! আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা ছবিটা দেখলাম তন্ময় হয়ে। আমি এর আগে এত গভীর এবং মানবিক ছবি দেখেছি বলে আমার মনে হল না। ছবিটি বিশ্ব জয় করার মত। ধন্যবাদ জানালাম হল থেকে বেরিয়ে ছবিটির যুবক পরিচালককে। যুবকটির বাবা নাকি সাহিত্যিক ছিলেন। এটাই নাকি তার প্রথম ছবি। একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানির কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট ছিল যুবকটি। তার আঁকা নাকি এখানকার অনেক বইয়ের কভারও। তার নিজের আঁকা যে কাহিনী নিয়ে তিনি ছবি করছেন তার কভার এবং

ভিতরের ছবিটিও। ক্যালিওয়ার্ক ভালই জানেন।

অনেকটা ছবি দেখার পর মার্গারেটের মন ভালো হল। ও হলের মধ্যে মাঝে মঝে আমার হাত চেপে ধরছিল। খুব ভাল লেগেছে ওর ছবিটা। একটা রেস্তোরাঁয় নানারকম খাবার খেলাম আমরা। ও উচ্ছল আবার আগের মতোই। হেসে কথা বলল ও আমার সঙ্গে। ছবিটা নিয়ে অনেক কথা বললাম। রাত আটটায় পোশাক পাল্টে চেয়ারে বসে আমি আমার একটা হাত মার্গারেটের কাঁধে রাখলাম।

ভিক্টরের সঙ্গে আমি গার্ডেনে গিয়েছিলাম কাল বিকালবেলা, তুমি ছিলে না। এই সময় ও বললো যে চলো একটু গার্ডেনে ঘুরে আসি, তাই গার্ডেনে পৌছলাম ঘুরতে ঘুরতে, তোমাকে বলা হয়নি, কারণ তুমি ছিলে না। ও একটু থেমে আবার বলল, ও আমার গুণমুগ্ধ শ্রোতা এবং বন্ধু।

আমি হেসে বললাম, ভিক্টর খুব ভালো ছেলে, তা তুমি নিশ্চয় ওর সঙ্গে যাবে।

আমি আর তুললাম না ফ্রেডি ছবিটার কথা।

আমরা ঘরে এলাম রাতের ডিনার শেষ করে। আমার প্রিয়তমা মিমি, আমার মার্গারেটকে গোলাপী রঙের গাউনে চমৎকার লাগছিল। মার্গারেট বিছানায় শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা অর্থেই হাসলো। আমার রক্ত গরম করে তুলেছে ওর কটাক্ষ। ঘরে তখন ম্লান আলো জ্বলছিল এবং ওর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম একটার পর একটা। মার্গারেট, আমি ক্লান্ত দেহে শুয়েছিলাম এবং নিজেরাই ভাল করে জানিনা কখন যে দুজনের চোখে ঘুম নেমে এসেছে। দীর্ঘকাল পরে আমি এতখানি আনন্দ পেলাম মার্গারেটের সঙ্গ পেয়ে।

।। তেইশ ।।

সকাল থেকে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ঘন হয়ে গেছে কালো মেঘে। কলকাতার বুকে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমাদের টেবিলে অনেকক্ষণ চা দিয়ে গেছে ডরোথি। নিজের মনে আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম এবং সামনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বৃষ্টি নামল কিছুক্ষণের মধ্যে। মার্গারেট তখনো ঘুমোচ্ছিল বলে ওকে আমার আর জাগাতে ইচ্ছা করল না। আমরা অনেক রাতে ঘুমিয়েছি গতকাল। অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে মার্গারেট বলে মন চাইছে না ওকে বিরক্ত করতে। আমার সঙ্গে ওর রোজই প্রায় ঝগড়াঝাটি হচ্ছে এবং বর্তমানে কাটিয়ে দেওয়া গেছে সেই অবস্থাটা। বৃষ্টি দেখছিলাম আমি চুপচাপ এবং সেই বৃষ্টির মধ্যে ঝড়ো কাকের মত হঠাৎ ছাতা নিয়ে হাজির হল ভিক্টর। ওর দেহের অনেকটাই ভিজে গেছে ছাতা থাকা সত্ত্বেও। আমার কাছে এসে ও হাজির হয়ে বোকার মত হাসলো ছাতাটা বাইরে রেখে। ওর হাসিটা খুবই সরল এবং ওর মধ্যে এখনও ছেলেমানুষি ভাব যায়নি তাই বেশ ভাল লাগছে ওকে দেখে। অবাক হয়ে বললাম, এতো ঝড় জল মাথায় করে, কি ব্যাপার ভিক্টর?

ভিক্টর হেসে বলল, মা বলল, খুব জরুরী প্রয়োজনে আপনি আমাকে ডেকেছেন আংকল, তাই আমি চলে এলাম।

ডরোথিকে বলেছিলাম একবার ভিক্টরকে পাঠিয়ে দেবার কথা এবং সেই কারণেই হয়তো ও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যাপারটা একেবারে ভুলেই গেছিলাম কিন্তু তা মনে পড়লো এবারে। ‘বোসো’, হেসে বললাম। চা দিয়ে গেছে ডরোথি ইতিমধ্যে। ভিক্টর অপেক্ষা করতে লাগল চায়ে চুমুক দিতে দিতে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভেবে পাচ্ছিলাম না কিভাবে কথাটা বলব, কারণ আমার মনে কোনো বল নেই এই মুহূর্তে। ভিক্টরই বলে ফেলল অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে, একটু গার্ডেনে গিয়েছিলাম আমি কালকে মার্গরেটকে নিয়ে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কারণ আমার ভালই লাগলো ওর কাছ থেকে কথাটা শুনে। তাই বললাম, আমি শুনেছি কারণ মিমি আমাকে বলেছে।

ভিক্টর আবার বলল, যেতে চাইছিল না মার্গারেট প্রথমে আমার সঙ্গে, আপনি এসে রাগ করবেন বারবার বলছিল, তাই ওকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে গেছি আমি।

সিগারেট ধরালাম আমি। আমি সাধারণত মনের ভেতর উত্তেজনা না হলে সিগারেট খাই

না। সিগারেটে টান মেরে বললাম, খুব ভাল করেছো, মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক যেও, আমার অনুমতির দরকার নেই সব সময়, তুমি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত, তুমি ইচ্ছা করলে ওর প্রিয় বন্ধু হতে পার।

ও কিছুটা অবাক হয়ে আমার কথায় বলল, ও খুব সরল মেয়ে, তবে ও বকে খুব বেশী।

ওর কথা শুনে আমি হেসে বললাম, তুমি ঠিকই বলেছো, বড় বেশী বকা ওর অভ্যাস, আবোল তাবোল কথা বলে, ওকে শর্টহ্যান্ড, টাইপ শিখতে দিয়েছি কিন্তু ও আজ অবধি তা ঠিকমতো শিখতে পারলো না। এতো বুদ্ধি কম হলে, ওর যে কি হবে!

ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে এবং শর্টহ্যান্ড টাইপেও যথেষ্ট স্পীড আছে।

আমি সজোরে হেসে উঠলাম, তুমি তো ওর এত বেশী গুণগ্রাহী হয়ে পড়ছ এর মধ্যে যে এতটা বেশী পরিমাণ ভক্ত হয়ে যাওয়া—এটা একদমই ভাল লক্ষণ নয়।

এই বলে আমি হেসে উঠলাম এবং লক্ষ্য করলাম ভিক্টর তাকিয়ে রয়েছে ফ্যালফ্যাল করে এবং ওর মধ্যে মার্গারেটের উপর প্রেমের চেয়ে বেশী একটা গুণমুগ্ধ ভাব গড়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে মার্গারেট যা ইচ্ছা করতে পারে এখন। আমি বললাম, মার্গারেটকে তুমি বাংলা শেখাবে বলেছিলে, তা শিখাবে কবে থেকে?

ভিক্টর চুপ করে রইল। কালো হয়ে আসছে আকাশ। বৃষ্টিও হচ্ছে প্রচণ্ড। সঙ্গে বইছে ঝড়ো হাওয়া! ভিক্টর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলল, আমি শেখাতে আরম্ভ করব সেদিন থেকেই যেদিন থেকে আপনি বলবেন।

তুমি আরম্ভ কর আগামী সপ্তাহ থেকে।

ভিক্টর আমার কথায় ঘাড় নাড়াতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। প্রচণ্ড দুর্যোগ চলছে বাইরে। আমার হাতের মুঠোর মধ্যে যেমন করে হোক রাখতে হবে এই সাদামাঠা ছেলেটিকে। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার কি কোনো অসুবিধা আছে আমার কাছে কাজ শিখতে ভিক্টর।

আমি থেমে যেতে ভিক্টর উৎফুল্ল হয়ে বলল, আমিতো কিছুই জানি না এবং এতে কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না আমার।

আমি তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে নেব এবং এতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি ঘড়িতে দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে এবং বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখছি না তাতে। তবে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি বললাম, আমি একটু আসছি, বসো ভিক্টর।

মার্গারেট ঘুমোচ্ছে এখনও পর্যন্ত, ওকে জাগাতে হবে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম ও বিছানায় নেই, বাথরুমে। দরজা বন্ধ, তাই মৃদুভাবে টোকা দিতে ও বলল মিষ্টি গলায়, 'চান করছি, জলের শব্দ আসছিল বাথরুম থেকে।

দরজায় আবার টোকা দিতে ভিতর দিকে সাড়া এল, 'খোলা আছে দরজা।'

আমি দরজাটা খুললাম মৃদু ভাবে টোকা দিয়ে। মার্গারেটের দেহ ভেজা কারণ ও স্নান করছিল। ওর ভিজে ঠোঁটে চুমু খেলাম এই অবস্থায় ওকে জড়িয়ে ধরে। আমার সারা দেহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটা আশ্চর্য সুখের অনুভূতি। আমাকে জড়িয়ে মার্গারেট আদুরে ভঙ্গীমায় বলল, এখনতো বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, কেমন হয় বৃষ্টিতে ভিজলে?

শরীর খারাপ হবে এতে, বললাম আমি কপট ধমক দিয়ে।

খিলখিল করে হেসে বলল মার্গারেট, হোক শরীর খারাপ, ভিজবো আমি তবু। আমি মুছিয়ে দিতে লাগলাম ওর দেহটা পরম মমতায় হ্যাঙার থেকে একটা তোয়ালে পেড়ে নিয়ে। ও খিলখিল করে হেসে উঠছিল এবং মাঝে মাঝে ছটফট করছিল। আমি পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিলাম ভাল করে মুছিয়ে দিয়ে। ও পা দুটো ছুঁড়ে বলে উঠল, তুমি আমাকে এই ভাবে নিয়ে চলো বৃষ্টিতে।

আমি চাই না এতে তোমার শরীর খারাপ হোক।

উঠে এলো মার্গারেট এবং হেসে বলল, তোমার শুধু শরীর খারাপের অজুহাত কারণ তুমি সেকেলে ভীষণ। আমার ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে যে আমাকে সারাজীবন কাটাতে হবে তোমার সঙ্গে।

আমি ঘরের মধ্যে এলাম কিন্তু কোনো জবাব দিলাম না এবং বললাম, আমি বাইরে বসে আছি, তুমি পোষাক পরে নাও তাড়াতাড়ি।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ভিক্টর বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ও মৃদু হাসলো। আমি ওর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বৃষ্টি কমে এসেছে, আমার টাকার দরকার, তাই একবার লন্ডনে খবর দিতে হবে। যদিও আমার টাকার দরকার কোনো অভাববোধে আমি ভুগছি। মার্গারেট এসে মুখোমুখি চেয়ারে বসল মিনিট পাঁচেক পরে এবং ভিক্টরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বলল, তুমি কখন এসেছো ভিক্টর?

মৃদু হেসে ভিক্টর জবাব দিল, অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি এই বৃষ্টিতে খুব ঘুমোচ্ছিলে, ও সামান্য বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল।

মার্গারেট হেসে বলল তবে বেলা তেমন একটা হয়নি। চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল ও এবং ঘাড় অবধি ওর চুল নেমে এসেছে। ওকে বেশ বেপরোয়া মনে হচ্ছে কারণ ওর পরনে একটি প্যান্ট এবং রঙীন শার্ট।

আমি তাকালাম মার্গারেটের দিকে, আগামী সপ্তাহ থেকে ভিক্টর তোমায় বাংলা শেখাবে মিমি।

মার্গারেট আমার এবং ভিক্টরের পরস্পরের দিকে তাকাল। কিছু না বলে খবরের কাগজটা টেনে নিল। কাগজ পড়তে লাগলো ও চিরুনীটা পাশে রেখে। আমি তাকালাম মার্গারেটের দিকে এবং দেখলাম যে ভিক্টরও মার্গারেটকে দেখছিল। ওর চাহনিতে কৃতজ্ঞতার ছাপ কিন্তু তাতে কোনো পাপবোধ নেই। আমরা যে ওকে আমল দিয়েছি এতেই ও খুশী। ভিক্টরের দিকে ছুঁড়ে দিল মার্গারেট খানিকটা কাগজ পড়ার পর। এরই মধ্যে কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেল তোমার, ভিক্টর হেসে বলল।

আমি শুধু সিনেমা আর খেলার পাতাটাই দেখি, আমার কাগজের অন্য কোনো খবর পড়তে ভাল লাগে না।

ভিক্টর সজোরে হেসে বলল, তোমার তো পৃথিবীর আর কোনো জিনিষ ভালো লাগে না ঐ দুটো ছাড়া। তাকিয়ে দেখলো মার্গারেট ভিক্টরের দিকে একবার। আমি ব্যস্ত ছিলাম তখন অন্য একটা কাগজ পড়ায়। আমি জরীপ করছিলাম ওদের দুজনকে তারই ফাঁকে ফাঁকে। এছাড়া আমার উপন্যাস, বিশেষ করে প্রেমের, পড়তে খুব ভালো লাগে।

হোঁচট খেলাম আমি কিন্তু তবু মার্গারেটের দিকে তাকালাম না এবং কাগজ পড়তে লাগলাম।

ভিক্টর হেসে বলল, তোমার তো উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে, আমারও লাগে, আমি প্রায় সব লেখাই পড়েছি শেক্সপিয়ারের, আমার খুব ভালো লাগে শেক্সপিয়ারকে।

মার্গারেট হেসে বলল, তোমাকে আমার একজন পরিচিত লোকের উপন্যাস পড়তে দেব, এই বলে মার্গারেট আমার দিকে তাকাতে আমি ভাবলাম সে হয়তো আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছে। তাই আমি কাগজ পড়তে লাগলাম নিস্পৃহ ভাবে। এবার জিজ্ঞেস করলো ভিক্টর, কি নাম ভদ্রলোকের?

লন্ডনের একটা কাগজের সাংবাদিক এবং লেখক ফ্রেডি উইলসন। থেমে থেমে বলতে লাগলো যে, ভদ্রলোক খুবই সুপুরুষ এবং ভালো লেখে, একটা ছবি ভদ্রলোকের আমার কাছে আছে, নাম আছে ভদ্রলোকের সাংবাদিক হিসাবেও।

মার্গারেট আমাকে পরখ করতে চাইছে নিশ্চয় আমার সামনে আমার বন্ধু ফ্রেডির প্রশংসা করে। এটা ঠিক নয় যে আমার ভেতরে একটা চিনচিনে যন্ত্রণা হচ্ছিল না কিন্তু নিস্পৃহ ভাবে তবু আমি কাগজ পড়তে লাগলাম। বাইরে রোদের আভাস তখন, কারণ বৃষ্টি থেমে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম ভিক্টরের দিকে যে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে।

মার্গারেটকে জিজ্ঞেস করলো, কি নাম উপন্যাসের?

নামটা বললো মার্গারেট উপন্যাসের। আমি তাকিয়ে বললাম ভিক্টরকে, আমাদের কফি দিয়ে যেতে বলতো একবার তোমার মাকে ভিক্টর।

ভিক্টর রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে আমি মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে হাসলাম এবং বললাম,

তুমি আজকাল নিজেকে খুব চালাক ভাবছো মার্গারেট।

তোমার এসব ভুল ধারণা, কে বলেছে এসব? ও হেসে উঠতে আমি বললাম, আমার কোনো ঈর্ষা নেই ফ্রেডির উপরে কারণ ফ্রেডি আমার বন্ধু।

আমি বলতে ও ওর সেই রহস্যমাখা হাসিটি মৃদু হাসলো। ভাবা যায় না ওর মাঝে মাঝে রহস্যময়ী হয়ে ওঠাটা। তখন আমার কাছে ও সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায় এবং ওকে তখন আর চিনতে পারিনা আমি। আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তখন ওর মনের তল পাওয়া। তোমার কি ফ্রেডিকে খুব ভালো লাগে, আমি জিজ্ঞেস করলাম মার্গারেটকে।

ভনিতা না করেই মার্গারেট বললো, আমি খুব কমই দেখেছি ফ্রেডির মত লোক।

আমি কি উত্তেজিত হচ্ছি ভেতর ভেতর, তাই আমি চুপ করে রইলাম। আমি ঠিক বলতে পারছি না যে আমি উত্তেজিত হচ্ছি কিনা। আমি তাই না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, ফ্রেডির কোন দিকটা তোমার বেশী ভালো লাগে মিমি?

ফ্রেডি খুবই সৎমানুষ, ওর সবকিছু, বিশেষ করে ওর আচরণ আমার খুবই ভালো লাগে।'

আমার আর জবাব দেওয়া হল না যেহেতু ভিক্টর এবং ডরোথি এসে পড়ল। ডরোথি ট্রে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হাসলো, কফি দিলো তারপর আমাদের। আমি আকাশের দিকে তাকালাম কফিতে চুমুক দিতে দিতে। রোদ অদৃশ্য হয়ে গেছে, আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে, সম্ভবতঃ ঝড় উঠবে বলে।

।। চব্বিশ ।।

মার্গারেটের গর্ভে সন্তান এসেছে তা ধরা পড়ল মাস তিনেকের মাথায়। মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল এবং একদিন খাবার পরে বমি করলো এবং কোনো রুচি ছিলনা ওর খাবারে। আমাকে কিছু জানায়নি ও, চেপে গিয়েছিল, ডরোথি একমাত্র জানতে পেরেছিল। বাড়ির পরিচারিকার থেকে মিমির সন্তান হবার লক্ষণ জেনে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে, 'আপনার আত্মীয়ার পেটে বাচ্চা আছে', ডাক্তার হাসি মুখে জানাল আমাকে।

সন্তান এসেছে মাস তিনেক হল, মাস তিনেক আগে আমরা দিল্লী থেকে এসেছি। আমি রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেলাম ডাক্তারের কথায়। রক্ত উঠে গেল আমার মাথায়। এ সন্তান আমার নয় এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। আমি খুবই সাবধানে প্রত্যেকবার মিলিত হয়েছি। মার্গারেটও ভোলে না প্রতিদিন সাবধান হতে। আমার সন্দেহ সেই কারণেই বাড়তে লাগলো ক্রমশঃ। মাস তিনেক আগের সেই রাতের কথা মনে পড়ল। দিল্লীতে তখন আমরা এবং অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। মার্গারেট ফিরছিল না কিছুতেই। তারপর আমি দেখলাম ও ফ্রেডির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি ওকে রীতিমতো মেরেছিলাম ফেরার পর। কোনো রকম প্রতিবাদ করেনি ওর মতো জেদী মেয়ে, আমার পরিষ্কার মনে আছে সেটা। মার খেয়েছিল চুপচাপ। কোথায় যেন একটা অপরাধে কষ্ট পাচ্ছিল ও এই বলে আমার মনে হচ্ছিল। ফ্রেডিই কি তবে সবকিছুর মূলে?

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি কিছুতেই, এবং ওর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম আমি সেই রাতেও। আমি সাবধান ছিলাম। আমি ভুলিনি সাবধান থাকতে হয় প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে। কিছুদিন নার্সিংহোমে রাখতে হবে এখন মার্গারেটকে। ওর শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে এবং ওকে রাখাটা ঠিক করলাম আমি ডাক্তারের পরামর্শেই।

কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি কি করব। অস্থির লাগছে নিজেকে ভীষণ এবং বারবার মাথাটা গরম হয়ে গেছে। মার্গারেটের গর্ভে আমার সন্তান যে আসেনি এটা আমার স্থির বিশ্বাস। এই সন্তানটি তাহলে কার?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে সকাল নটা বাজল। আমি তখন বসে আছি বারান্দায়। হাওয়ার বেগ আজ একটু বেশী। চা দিয়ে ডরোথি জিজ্ঞেস করল আমাকে, কেমন আছে আজ মিমি?

ও ওখানে কিছুদিন থাক, কারণ ওর শরীর খুব দুর্বল।

ডরোথি বলল আমার কথার জবাবে, মিঃ ব্রাউন, থাকাই ভাল ; কিন্তু আপনি কি একেবারেই

বুঝতে পারেননি যে ঐ ঘটনা কি ভাবে ঘটল?

বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলাম না তাই বললাম, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের তো একটা স্বাধীনতা থাকে, আমিতো ওকে সবসময় নজরে রাখতে পারি না।'

এ সমস্ত কথাবার্তা যে আমি পছন্দ করছিনা ডরোথি সেই কারণে 'সে তো ঠিক', এই কথা বলে চলে গেল। বসে রইলাম আমি নিঃসঙ্গ ভাবে কারণ এই মুহূর্তে নার্সিংহোমে শুয়ে আছে মার্গারেট ওর শরীর খুব দুর্বল এবং ওকে আমি নিয়ে আসব দিন কয়েক বাদেই। হঠাৎ চা খেতে খেতে বুকে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলাম, আমার মাথা ঘুরছে এবং আমার মনে হল যে আমার শরীরটা খারাপ। বেশ চনচনে রোদ বাইরে। পাখাটা ফুলস্পীডে চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম একটা ছেলে হয়েছে মার্গারেটের। মার্গারেটের এবং ছেলেটির উভয়েরই দুটো পাখা। মার্গারেট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দূরের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে একসময় দেখলাম। আমার কপালে ঘাম জমেছে এবং একসময় আমি চীৎকার করে উঠলাম। হাত উঠলো না যদিও হাত বাড়িয়ে চীৎকার করতে গেলাম এবং ঠিক উঠে বসতে যাব, ডরোথি ডাকল সেই সময়।

ওরকম চীৎকার করছেন কেন মিঃ ব্রাউন, উঠে পড়ুন বেলা হয়েছে।

আমি ধড়ফড় করে উঠে বসাতে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ডরোথি বলে উঠল, বেলা হয়েছে মিঃ ব্রাউন, উঠে পড়ুন, ওরকম চীৎকার করছেন কেন? কোন, অসুস্থবোধ করছেন কি আপনি?

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আমি বললাম, আসলে একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম, কিছু হয়নি কিন্তু আমার।

স্নান করে নিন, লাঞ্চ রেডি, ডরোথি বললো।

কোনোক্রমে উঠে বাথরুমে ঢুকে গিয়ে স্নান করাতে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগল। শেষ করে ফেললাম খাওয়া দাওয়া মিনিট পনেরোর মধ্যেই। সিগারেট ধরালাম বারান্দায় এসে। আমি যখন মানসিকভাবে অস্থির থাকি তখন আমার একটু সিগারেট খাওয়াটা বেড়ে যায়। ধোঁয়াটা ছাড়তে সেটি কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

গর্ভে সন্তান এসেছে মার্গারেটের। আমি যে মার্গারেটকে ভালবাসি, তার এখন অন্ধকার জঠরের ভিতর কার ভ্রূণ বড় হচ্ছে!

মার্গারেটের ওখানে বিকালবেলা গিয়ে আমি দেখলাম যে ওর গায়ের উত্তাপ দেখছিল নার্স। খানিকটা সরে দাঁড়ালো আমাকে দেখে মৃদু হেসে। এখন টেম্পারেচার কত, আমিও মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

নার্স জবাব দিল থার্মোমিটার দেখতে দেখতে, জ্বর এখন সামান্য আছে।

মার্গারেটের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগছে, আমি তাকালাম মার্গারেটের মুখের দিকে। আমাকে দেখে তবু ও মৃদু হাসলো। জিজ্ঞেস করলাম ওর কপালে হাত রেখে, কেমন আছো এখন?

ভালো বোধ করছি এখন একটু।

মার্গারেট বালিশ হেলান দিয়ে বসল। ওর পেটে যে বাচ্চা এসেছে, তা ওকে জানান হয়নি এখনো। বলতে নিষেধ করেছি ডাক্তার বা নার্স সবাইকেই। ওর পেটে যে ও কার ভালবাসার ফসলকে বয়ে নিয়ে চলেছে তা এখনও জানে না মার্গারেট। ওকে বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানাব বলে আমি ঠিক করেছি। ওকে জানানো হয়ত ঠিক হবে না কারণ এখন ও খুবই দুর্বল। ও সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি নষ্ট করে ফেলতে চাই ওর এই অবাঞ্ছিত বাচ্চাটি। পরম স্নেহে মার্গারেটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম আমি। ঘুণাক্ষরে যেন ডরোথি ওকে না জানায় যে ওর পেটে বাচ্চা আছে, সে কথা ডরোথিকে বলে দেওয়া হয়েছে। একবারে কিশোরী বালিকার মতো মার্গারেট, যদিও ওর বয়স হয়েছে। ও হয়তো ভাবেইনি যে ও গর্ভবতী হয়েছে; ওর মাথায় আমি হাত বুলাতে লাগলাম অনেকক্ষণ ধরে। ও কাঁধের উপর রেখেছে ওর একটা হাত। বেরিয়ে গেছে নার্স এবং একা রয়েছে মার্গারেট ঘরে। ছিমছাম ঘরটি যদিও খুব বড়ো নয়। একটা ফোটো

রয়েছে দেখলাম দেওয়ালে, তাতে বাচ্চা যীশু রয়েছে মাতা মেরীর কোলে। ফোটোটার দিকে তাকিয়ে দেখতে বেরিয়ে এল একটা কথা হঠাৎই 'কুমারী মাতা মেরী।'

মেরীর কি বিয়ে হয়নি—? সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো মার্গারেট।

আমি বললাম, 'না।'

ওর বাচ্চা হলো কি করে তাহলে?

আমি বললাম, মার্গারেটের প্রশ্নের জবাবে, যোশেফ ছিল তো মেরীর প্রেমিক হিসাবে।

মার্গারেটকে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি মিমি, তবু তোমার যদি এখন বাচ্চা হয় তবে তোমার কেমন লাগবে?

মার্গারেট খিল খিল করে হেসে বলল, আমার খুব ভালো লাগবে, আমি ওকে মানুষ করতাম, যদি আমার একটা বাচ্চা হত।

চমকে উঠলাম আমি। সরলভাবে ও কথাগুলি বলল নাকি ও মূর্তিমতী শয়তান। ও জানে কি যে ওর পেটে বাচ্ছা আছে। বুঝতে পারছি না আমি কিছুই। মার্গারেট যদি জেনে শুনে এই সমস্ত কথা বলে তো ওর মতো পাকা অভিনেত্রী তাহলে খুব কমই আছে এটা মনে করব। আমার হাতের উপর হাত রেখে মার্গারেট বললো, কবে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে এখান থেকে?

তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, দু এক দিন অপেক্ষা করো, ভালো হোক তোমার শরীরটা একটু, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।

আমার ভেতরটা রীতিমতো অস্থির তাই আমি বলে উঠলাম স্বাভাবিকভাবেই। নিজেকে সংযত রাখতে আমি চেষ্টা করছি তবুও প্রাণপনে। এটা মার্গারেটের অপরাধ না ভুল সেটাই আমি ভাবছিলাম। আমি কি ওকে ক্ষমা করতে পারব যদি এটা অন্য কারো সন্তান হয় কে জানে। এটা বলা একেবারেই সম্ভব নয় তবে আমার প্রেমিকা যেহেতু মিমি, তাই অনেকদূর এর জন্য এগোতে পারি আমি। আমি ক্ষমা করতে রাজী ওর হাজার অপরাধ হলেও। যদিও এটা সামান্য ভুল। নিশ্চয় পারবো আমি ওকে এর জন্য ক্ষমা করতে। চুমু খেলাম মার্গারেটকে আমি নীচু হয়ে। দু চোখ বুজে রইল ও। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম ওর চুলে মাথায়। চুপচাপ বেশ খানিকটা সময় কাটাবার পর মনে হল, কোনো এক অচেনা পরিবেশে ঢুকেছি আমি, যেহেতু একটা নিজস্ব গন্ধ আছে নার্সিংহোমের, তাই এটি একটি অদ্ভুত পরিবেশ। আমি কোনোক্রমেই যদিও এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া চাই না, তবু সহ্য করতে হয় আমাকে।

ভিক্টর আসবে না? মার্গারেট বলে উঠল। আমি বললাম, ডরোথি আসার সময় আমাকে বলল যে একটু পরেই ও আসবে। মার্গারেট হেসে বলল, বড় মজার ছেলে এই ভিক্টর, ওর সব কথাবার্তা শুনলে আমার ভীষণ হাসি পায়।

যেমন বলো ওর একটা কথা, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মার্গারেট জবাব দিল, ফ্রেডির বইটা পড়ে ওর খুব ভালো লেগেছে, তাই ও বলছে যে ও বড় হয়ে ফ্রেডির মত লেখক হবে। মার্গারেট একটু থেমে বলল, ওর সঙ্গে আলাপ হবে কি করে, আমি অবশ্য এ কথা বলেছি, যদি ও এখানে আসে তাহলে আলাপ হয়তো হতে পারে। মার্গারেট আমার চোখের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমাকে ও পরখ করতে চাইছে বলে মনে হলো। আমার কি রকম অবস্থা হয় ফ্রেডির কথা বললে সেটা জানাই যেন ওর উদ্দেশ্য। ফ্রেডির কথা একেবারেই আমি সহ্য করতে পারছি না। একাম্ম যেন আগুন জ্বলছে আমার মাথায়। আমার হাত আস্তে আস্তে উঠে এল মার্গারেটের মাথার উপর থেকে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না রাখতে। ভেতর থেকে উঠে আসছিল আমার এক ধরণের রফা।

মৃদু হেসে বললাম, 'তোমার খুব ভালো লাগে না ফ্রেডিকে?'

হেসে বলল মার্গারেট, আমার ভাললাগার কথা আমি বলি নি, ভিক্টরের ভালো লাগে ওকে এই কথাই আমি বলেছি।'

আমি চেষ্টা করলাম ওর কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে। যাকে আমি প্রাণপণে ভালবাসি, সে কিনা অন্য পুরুষের চিন্তায় বিভোর হয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে শুধু এক অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব গর্ভে নিয়ে। ওর প্রতিশোধ আমি নেবোই, ছেড়ে আমি দেবো না ওকে।

ও অসুস্থ তাই এই মুহূর্তে কিছু বলবনা, ওর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া আমি করব ও বাড়িতে ফিরে আসলে। ও বললো, আমি খেতে পারছিনা, কেন যে আমার শরীর বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এরপর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, আমি মাকে কাল স্বপ্ন দেখেছি জানো।

হ্যারিয়টকে দেখেছো!

মা, এখনতো উনিই আমার মা, মার্গারেট বললো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্বপ্নে কিরকম দেখলে ওকে?

মার্গারেট বলল, পাগলের মতো হয়ে গেছে মা, পাহাড়ের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল ধাক্কা মেরে। মা পাগলের মতো হাসছিল আমি পড়তে পড়তে যত চীৎকার করছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল তারপরই।

আমি বললাম, স্বপ্নটা খুব মজার না, তারপর কি হল?

মার্গারেট জবাব দিল, একটি চিল এসে আমাকে ছোঁ মেরে কোথা থেকে নিয়ে তারপর মিলিয়ে গেল, সেই চিলের মুখটা মানুষের। যখন আমি ওকে তুলে নিয়ে গেলাম তখনই বুঝতে পারলাম, সেই মানুষটা কে।

তখনই আমি বললাম, ফ্রেডি উইলসন কি?

মার্গারেট খিলখিল করে হেসে বললো, না, সেই মানুষটা তুমি।

ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই ভিক্টর তার মা ডরোথির সঙ্গে ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকল এবং আমার দিকে তাকিয়ে ডরোথি হেসে তারপর মার্গারেটকে জিজ্ঞেস করলো, মিমি, এখন কেমন লাগছে তোমার?

মার্গারেট মৃদু হেসে বলল, আমার খুব ভাল লাগছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলো ডরোথি, মিঃ ব্রাউন আপনি কখন এসেছেন?

আমি মৃদু হেসে বললাম, এই কিছুক্ষণ আগে।

মার্গারেটের কাছে এগিয়ে একটি চেয়ারে বসে ভিক্টর বলল; তোমাকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখব ভাবছি।

ভিক্টর আবার পাগলামি করছো, মার্গারেট একটা ধমক দিয়ে বলল।

ভিক্টর হাসতেই তার মনে পড়ল যে আমি আছি, তাই সে চুপ করে গেল।

আমি বললাম, তোমরা গল্প করো, মার্গারেট আমি যাচ্ছি, সময় হয়ে আসছে, ঘড়িতে দেখলাম। ভিক্টরকে বেরিয়ে আসার আগে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করো ভিক্টর।

ভিক্টর জবাব দিল, ঠিক আছে। বেরিয়ে এলাম আমি নার্সিংহোম ছেড়ে। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আমার মনের মধ্যে। বাড়িতে ফিরতে অনেক রাত হল কারণ একটা বারে আকণ্ঠ মদ গিলে ফিরলাম। ফ্রেডির মুখটা মনে পড়তে একটা অশ্রাব্য খিস্তি দিলাম। বিছানার উপর এলিয়ে দিলাম এরপর ক্লান্ত দেহটাকে।

।। পঁচিশ ।।

মার্গারেটের চলাফেরা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কারণ এখন ও মোটামুটি সুস্থ। দিন কয়েক বিছানায় শোয়ার পর এখন ও আবার চলাফেরা করছে। ওর পেটটা সামান্য স্ফীত হয়েছে। বারান্দায় বসেছিলাম এবং আমি ভাবলাম যে মার্গারেটকে এবার সবকিছু বলা দরকার। কিছুক্ষণ আগে চা দিয়ে গেছে ডরোথি এবং রীতিমতো আগুন জ্বলছে এখন আমার মাথার মধ্যে। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না যতক্ষণ না এর ফয়সলা হচ্ছে। আমার মুখোমুখি এসে মার্গারেট বসলো স্নান সেরে। বাদামী রঙের ড্রেসিং গাউন পরনে এবং দারুণ ফর্সা শরীরে সুন্দরী লাগছে ওকে। চোখদুটো ফোলাফোলা, ভালো ঘুমিয়েছে রাতে। আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে মুখটা ওর গম্ভীর। টেবিল থেকে টেনে নিয়ে কাগজ পড়তে লাগলাম আমি। আমি চুপচাপ চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কেটে গেল। সকালেই গরমের আভাস এবং রোদ ঝলমল করছে সারা জায়গায়। অনেক দূরে মেঘ জমেছে এবং অদ্ভুত পরিবেশ। শেষ বোঝাপড়া করা আমার দরকার

মিমির সঙ্গে। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে মিমি।

খবরের কাগজ থেকে ও চোখ দুটো তুলে তাকাল আমার দিকে। ভুরু দুটো কুঁচকে তাকাল, আমি ওর দিকে তাকাতে ও আমার গম্ভীর চোখ দেখে সম্ভবতঃ একটু ভয় পেয়ে গেলো। কি কথা, মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো ও।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর বললাম, তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে মার্গারেট।

মার্গারেট চমকে উঠল, কি বললে!

আমি আবার বললাম, এখন তুমি সন্তানসম্ভবা।

মার্গারেট বলল, আমার পেটে বাচ্চা, টেবিলের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ও। আমার ওর গায়ে হাত দিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছিল না। তাই আমি চুপ করে রইলাম, মার্গারেট বিশ্বাসঘাতিনী, আমার প্রেমের মর্যাদা ও রাখেনি। ও বিলিয়ে দিয়েছে ওর নিজের দেহটাকে অন্য এক পুরুষকে। ক্ষমা আমি কেমন করে করবো ওকে। ও মিশে আছে আমার দেহের প্রতিটি অনুপরমানুতে। আমি ওকে ছাড়তে পারব না। ওর সত্তা জড়িয়ে গেছে আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে। ও আমারই প্রেমিকা ও শত অপরাধ করুক না কেন। মার্গারেট মুখে একটা কাঠিন্য নিয়ে শান্ত হলো বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর।

তিনমাস আগে তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে, মার্গারেট এবং আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর, নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমি। এবার আমাকে বলো, এ বাচ্চা কার, আমি আরো গম্ভীর এবং কঠিন স্বরে বললাম।

কোনোরকম জবাব না দিয়ে চুপ করে মাথা নীচু করে রইল মার্গারেট। ভেসে আসছিল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর পাশের বাড়ি থেকে। মিমি এ বাচ্চা কার, বলো আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

মার্গারেট মুখটা কঠিন করে নীচু করে থাকাতে আমি আবার বললাম, এ বাচ্চা কার বলো?

মার্গারেট চমকে বলল, আমি জানি না।

তুমি একটা পাকা অভিনেত্রী, তুমি জানো নিশ্চয়, তুমি আঘাত করেছ আমার বিশ্বাসে, তুমি আমার ভালবাসার মর্যাদা দাওনি বিশ্বাসঘাতিনী, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম পাগলের মত এবাচ্চা কার বলো।

মার্গারেট জবাব দিল একই ভাবে, 'জানিনা বললাম তো।' একটা থাপ্পড় কষালাম সজোরে ওর গালে। ওর চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে জলে ভরে গেছে এবং ও সঙ্গে সঙ্গে একটা গালে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঘরের ভিতর ও দৌড়ে চলে যেতে ওর পেছন পেছন আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। ফুলে ফুলে কাঁদছে দেখলাম মার্গারেট, বিছানায় উপুড় হয়ে। আমার মাথা আরো গরম হয়ে উঠল ওর এই কান্নার আওয়াজ শুনে। আমি ওকে বসিয়ে দিলাম চুলের মুঠি ধরে। বললাম দাঁতে দাঁত চেপে, এ বাচ্চা কার তোমাকে বলতে হবে।

মার্গারেট একইভাবে কঠিন স্বরে বলল, আমি জানি না।

চীৎকার করে বললাম আমি চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরে, বাঃ চমৎকার। তুমি নিজে পেটে তিনমাসের বাচ্চা ধরে আছ আর তুমি জানো না। তোমাকে বলতেই হবে এ বাচ্চা কার। আমি তোমাকে শেষ করে দেব তা না হলে।

মার্গারেট এখন আর কাঁদছে না, এখন ওর জেদী ভাবটা ক্রমশঃ বাড়ছে। রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠছে এখন ওর চোখ মুখ। মার্গারেট জোর দিয়ে বলে উঠল, তুমি তো আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।

কার বাচ্চা, এই বলে আমি আবার ওর চুল ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

জানি না, মার্গারেট বলল।

মার্গারেট মুখ নীচু করে বসে রইল এবং ওর চুল ছেড়ে দিলাম আমি। আমি বললাম চেয়ারে বসে, আমি জানি, আমি যদি বলি।

আমার দিকে মার্গারেট তাকালো খানিকটা অবাক হয়ে। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল ও। মার্গারেটের দিকে আমি তাকালাম এবং আমি কেনো ব্যাপারটা ভাবতে পারছিনা ওকে শেষ করে

দিই বা আমি নিজে আত্মঘাতী হই এটাই আমার মনে হল কারণ আমার মাথায় এখন আগুন জ্বলছিল। আমি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম যতটা পারা যায়, চুপচাপ একই ভাবে বসে রইল মার্গারেট। তারপর বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবার পর আমি বললাম, আমি জানি এ বাচ্চা কার মার্গারেট, আমি বোঝাপড়া করব তার সঙ্গে পড়ে। আমি তোমাকে ভালবাসি মিমি। আমি ভাবিনি যে শেষপর্যন্ত তোমার কাছ থেকে আমি এতটা আঘাত পাব।

মার্গারেট চুপচাপ একইভাবে বসে রইলো এবং আমিও থেমে গেলাম। মার্গারেট আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল। ওর চোখে একটা প্রচণ্ড জেদী ভাব দেখলাম আমি। আমি এর আগে দেখিনি ওর মুখে এই ধরনের কাঠিন্য। আমার সেই ছোট্ট সরল প্রিয়তমা মিমি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। চুপচাপ মার্গারেট খানিকক্ষণ বসে রইল এবং তারপর আমি বললাম, শোনো মিমি, তুমি না বললেও আমি জানি এ বাচ্চা কার, পরে তার সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব। আমি তোমাকে ভালবাসি মিমি, তোমার কাছ থেকে যে এরকম আঘাত আসবে তা আমি ভাবিনি মিমি।

মার্গারেট চুপচাপ একইভাবে বসে রইলো এবং আমিও থেমে গেলাম। মার্গারেট আমার কাছ থেকে অনেকদূরে সবে যাচ্ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল। ওর চোখে একটা প্রচণ্ড জেদী ভাব দেখলাম আমি। আমি এর আগে ওর মুখে এই ধরনের কাঠিন্য দেখিনি। আমার সেই ছোট্ট সরল প্রিয়তমা মিমি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। একবারেই আমি জানিনা এই মার্গারেটকে। আমার নেই ওর সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয়। পোষাক এলোমেলো ভাবে মার্গারেট বসে আছে গম্ভীর হয়ে এবং দেখা যাচ্ছে ওর বুকের অনেকটাই। আমার চোখের সামনে সে বসে আছে নিরেট পাথরের মূর্তির মত। আমি বারান্দায় চলে এলাম ঘর থেকে বেরিয়ে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে যে আমার সেসব কোনোদিকেই নজর নেই। আমি আবার ঘরে ঢুকলাম কিছুক্ষণ বারান্দায় কাটিয়ে। এবং তখন ও একভাবে বসে আছে দেখলাম। আমি পড়তে পারলাম না ওর দুচোখের ভাষা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভেতর ভেতর ও তীব্রভাবে অনমনীয় হয়ে উঠেছে। আমার মনে হল যে এই মুহূর্তে আমার একটু বাইরে যাওয়া দরকার এবং সেই কারণেই আমি পোষাক পরলাম। আমার এখন মুক্তির দরকার, আমি বেরিয়ে এলাম দ্রুত পায়ে ঘর থেকে এবং হাঁটতে লাগলাম রাস্তার উপর দিয়ে। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আমার এই মুহূর্তে। ভেতর ভেতর একটি অস্থিরতা বোধ করছি বলে ভালো লাগছে না কিছুই। এমনকি নিজেকেও না।

এর আগে কখনো আসেনি আমার নিজের ওপর এত বিতৃষ্ণা। বারের একটি কোণের টেবিলে সোজা এসে বসলাম। এর আগেও আমি এখানে এসেছি বেয়ারা আমাকে চিনতে পেরেছে। বেয়ারা আমার কাছে মৃদু হেসে দাঁড়াতেই আমি হুইস্কির অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিলের ওপর এক গ্লাস হুইস্কি বেয়ারা রেখে গেল। এলোমেলো দেখাচ্ছিল বলে আমাকে বারের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলো আপনার শরীর কি খারাপ স্যার?

আমার কিছুই হয়নি, আমি ঠিক আছি। মৃদু হেসে জবাব দিলাম আমি হাত নেড়ে।

আমার সামনে থেকে কিছু না বলে চলে গেল ম্যানেজার ভদ্রলোক। আমি জানি না ঘণ্টা দুয়েক কোথা দিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার গাড়ি করলাম শেষ পর্যন্ত বার থেকে বেরিয়ে। এখন কোথায় যাওয়া যেতে পারে কারণ একেবারেই যেতে ইচ্ছা করছে না বাড়ি। হাল্কা লাগছে পা দুটো তাই জড়ানো গলায় কোচোয়ানকে বললাম, 'পার্কে যেতে চাই আমি।' সে, দু-একবার বোঝাতে শেষ পর্যন্ত বুঝল। পার্কে গিয়ে দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় সব নারী পুরুষ বসে আছে। একটি জলাশয়ের সামনে বসে আছি, যাতে ঢেউ উঠছে মৃদু। জলাশয়ের পাশের বেঞ্চিতে একভাবে খানিকক্ষণ বসার পর আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। ও কিরকম উচ্ছল স্বভাবের ছিল যখন আমার সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম দেখা হয়েছিল। এখন সে রুক্ষ এবং জেদী, ওর মধ্যে উচ্ছলতার কোনো অবশিষ্ট নেই তাই রীতিমতো কঠিন ওর মনের তল পাওয়া। একটু একটু করে মার্গারেট দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। আমি একভাবে বসে রইলাম সেই জলের মৃদু ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে। ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে দুপুর। এখানে প্রেম প্রত্যাশী নারী

পুরুষের ভিড় বেড়ে যাবে যতই রোদ কমে আসবে। একসময় ফাঁকা পরিবেশে এক মহিলা যার পরনে উগ্র ধরনের পোষাক সে এসে বসলো। ও বসলো দূরত্ব বজায় রেখেই। ওকে বোঝা যাচ্ছিল বেশ্যা হিসাবে ; কারণ আমার ভালো লাগছিল না ওর চাউনিটা। একটু গম্ভীর হয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি যাও, এখন কোনো আগ্রহ নেই আমার।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো বসে মহিলাটি। এই দুপুরে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছ, তোমার কি টাকার দরকার খুব? আমি বলে উঠলাম অসহিষ্ণুভাবে।

মহিলাটি রুক্ষ স্বরে বলল, আমি কি এমনি বেরোই টাকার দরকার না হলে। উগ্র পেন্ট করা মুখ, তাকিয়ে দেখলাম। তাতেও বয়সের ছাপ চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। একরাশ কালো অন্ধকার চোখের নীচে। বাদামী রঙের স্কার্ট পরনে এবং লালচে চুল। দুটি বুক বাঁধা আঁটোসাটো করে এবং ভীষণ উঁচু হয়ে আছে স্কার্টের উপর দিয়ে। রঙ বাদামী, ফর্সা বা কালো নয়।

তোমার কত টাকার দরকার, আমি বললাম জড়ানো কণ্ঠে।

মহিলাটি ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, এমনি কি দেবে নাকি তুমি।

পকেট থেকে পার্স নিয়ে আমি পঞ্চাশটা টাকা বের করলাম এবং এগিয়ে ধরে বললাম, তুমি এখান থেকে চলে যাও এটা নিয়ে।

তীব্রভাবে রেগে মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের সামনে খানিকটা এগিয়ে এসে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছ বদমাইশ, আমি ভিখারী আমার ফ্ল্যাটে ফাইফরমাশ খাটছে তোমার মতো লোক। দুহাতে স্কার্টটা উঁচু করে তুলে বলল, শুয়োর কোথাকার, আমি আমার দেহকে খাটিয়ে রোজগার করি।

মহিলাটি এই কথা বলে দ্রুত পায়ে গট গটিয়ে চলে গেল। আমার কানে ভেসে এল এরপর শিসের শব্দ এবং মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম হতভম্ব হয়ে।

বাড়িতে ফিরে এলাম সন্ধ্যে নামার আগে এবং উঁকি মারলাম এসেই ড্রয়িং রুমে। দেখলাম ড্রয়িংরুমের দরজা ভেজানো এবং সেখানে মার্গারেট এবং ভিক্টর অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলছে। দুজনেই সামান্য চমকে উঠল আমাকে দেখে এবং মার্গারেটকে গম্ভীর স্বরে আমি বললাম, এক্ষুনি আমার ঘরে এস।

আমি যে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ এবং এলোমেলো সেটা ভিক্টরের নজর এড়ায়নি এবং সেই কারণেই সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ভিক্টরের দিকে আমি তাকিয়ে বললাম, আমার এখন একটু দরকার আছে ভিক্টর, তুমি বাড়ি যাও।

ভিক্টর আগে এরকম অবস্থায় আমাকে দেখেনি কখনও তাই ওর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। দরজার দিকে ও উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো আমার কথা শোনামাত্রই। আমি ওকে বললাম দরজার সামনে আসতেই, আমার সঙ্গে কাল একবার তুমি দেখা করবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঘাড় নাড়িয়ে ভিক্টর এবং আমি ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ কিছুক্ষণ। আমি ওপরে আছি, এসো তাড়াতাড়ি, আমি মার্গারেটকে বললাম।

মার্গারেট মুখ নীচু অবস্থাতেই বলল, 'যাচ্ছি'।

আমার নেশা অনেকটা কেটে গেলেও একেবারে যায়নি, সেই কারণে আমার পা টলটল করছিল এবং তাই আমি ওপরে চলে এলাম। চোখ দুটো বুজে ঘরে গিয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিলাম বিছানার উপরে। চোখ খুলে হঠাৎ দেখলাম ডরোথি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আমি তাকে আসতে বললাম ভেতরে এবং ডরোথি ঢুকে একটা চেয়ারে বসলো। আপনার কি শরীর খারাপ, সে বলল।

আমি বললাম মৃদু হেসে, আমি লাঞ্চ খাইনি যদিও অবশ্য ডিনারও করবো না। কিন্তু আমার শরীর খারাপ নয়।

ডরোথি কি বলবে ভেবে না পেয়ে একটু অবাক হলো। আমি চোখ দুটো বুজে টান টান হয়ে শুয়ে রইলাম এবং ঘাড় নাড়িয়ে খানিকক্ষণ বসে বেরিয়ে গেল ও। পায়ের আওয়াজে চোখ খুলে দেখলাম যে মার্গারেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে, কোনোরকম উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট নেই এবং দু-চোখের কোণে কালি এবং পেটটা সামান্য উঁচু। চোখ দুটো রুক্ষ ;

'কি ব্যাপার', আমার সামনে চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে ও বলল।

ওর অনেক বয়েস হয়েছে বলে এই মুহূর্তে আমার মনে হল। ওর যেন কোনো প্রেম ভালবাসার অবশিষ্ট নেই আমার উপরে। ওকে পেয়ে বসেছে কাঠিন্য। তাই আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি খুবই দুঃখিত মিমি তোমার গায়ে হাত তোলার জন্য। একটু থামলাম কিন্তু কোনো জবাব দিল না মার্গারেট। তুমি ভিক্টরকে কি বলছিলে, আমি বললাম।

তোমার কোনো অধিকার নেই তা জানার, মার্গারেট চোখ দুটো কঠিন করে বলল।

আমি যদিও আহত হলাম কিন্তু বললাম স্বাভাবিক ভাবে, আমার কোনো অধিকার নেই তা জানার এই কথা বলছ কেন?

আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই এবং তুমি আমার মাকে মিথ্যা কথা বলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

আমি বললাম, তুমি প্রতিবাদ করোনি তো?

মার্গারেট বলল, আমি তোমাকে তখন বিশ্বাস করতাম তাই।

মার্গারেটকে আমি আর্তস্বরে বললাম, কেন ভালবাসতে না?

মার্গারেট আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নীচু করে বলল, আমি তা বলতে পারবো না তবে এখন আর বাসি না।

আমি ঢোক গিললাম এবং একটা গরম রক্তের স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমার মাথা গরম হয়ে গেলেও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি মার্গারেট, তাই আমি তোমাকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারবো না, আমি অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি তোমার জন্য। একটানা কথাগুলো বলে আমি থামলাম কিছুক্ষণের জন্য। তোমার বাচ্চাকে নষ্ট করতে হবে মার্গারেট।

মার্গারেট আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'না'।

আমি বললাম, কেন তুমি করবে না, কেন?

না, বাচ্চা আমি নষ্ট করবো না।

এই অবৈধ সন্তান তুমি পেটে ধরবে। আমি অবাক হয়ে বললাম।

সন্তান অবৈধ বলে আমি মনে করি না।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, এতোদূর এগিয়ে গেছ তুমি। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ওর মাথাটা তুলে ধরে বললাম, কি বলছো ভেবে দেখ তুমি মার্গারেট।

স্থির ভাবে বলল মার্গারেট, এ সন্তান আমার, আমি তো বারবার বলছি।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওকে ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় গেলাম ঘর ছেড়ে। আমার নিজেকে কোনোদিন এতোখানি নিঃস্ব মনে হয়নি। দেখলাম অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসছে বাইরে।

।। ছাব্বিশ ।।

সকাল থেকে মার্গারেটকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিছানায় ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলাম বাথরুমে। তাই সেখানে গেলাম কিন্তু সেখানেও না পেয়ে আমি তোলপাড় করে ফেললাম সারা জায়গা। ডরোথিকে জিজ্ঞেস করলেও ও কিছুই বলতে পারলো না। ডরোথিকে ভিক্টর-এর কথা জিজ্ঞেস করতে ও জানালো যে, ভিক্টরের ফিরতে দেরী হবে কারণ ও কলেজে গেছে। কোথায় যেতে পারে মার্গারেট। আমি ভাবতে পারিনি ঘুণাক্ষরেও যে শেষ পর্যন্ত ও পালিয়ে যাবে। আমার মাথায় কিছুই আসছিল না, তাই মার্গারেটকে কোথায় পাওয়া যাবে এই ভেবে বিভিন্ন পার্ক এবং রাস্তাঘাট এলোমেলোভাবে তল্লাশি করলাম। কিন্তু পেলাম না কোথাও। সব কিছু খুঁজলাম ঘরের মধ্যে তোলপাড় করে, যেমনকার পোষাক তেমনই আছে তার। মানে সেটা পরেই ও বেরিয়ে গেছে যেটা পরে ছিল। মেঝেতে হঠাৎ একটা ফোটো ছিটকে পড়তে দেখি ফ্রেডির ফোটো। ফ্রেডি হাসছে চশমার ভিতর দিয়ে এবং অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছে

ওকে। কুচি কুচি করে ছবিটা ছিঁড়ে আমি সেটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললাম, বিশ্বাসঘাতক, শুয়োরের বাচ্চা। রাস্তায় উড়ে পড়তে লাগলো টুকরো টুকরো কাগজগুলো। দুহাত দিয়ে নিজের চুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে অসহায় আক্রোশে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম। সজোরে একটা লাথি মারলাম মার্গারেটের বাক্সটা পায়ে লাগতে। শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বসে ক্লান্ত হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার প্রিয়তমা কোথায় গেল? আমার নিজেকে অস্থির লাগছে প্রচণ্ড কারণ প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মার্গারেট। ডরোথি আমাকে দেখে কিরকম যেন ভয় পেয়ে গেল আমার জন্য চা নিয়ে এসে। ও চলে যাচ্ছিল চায়ের কাপটা রেখে। আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, তোমরা নিশ্চয় জানো ডরোথি মিমি কোথায়, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো তোমরা।

ও কাতরকণ্ঠে বললো, আমি কিছুই জানি না মিঃ ব্রাউন, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

সব জানো আলবাৎ জানো বেইমান।

ডরোথিকে পাঁজাকোলা করে ঘরে নিয়ে এসে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ও ভয়ে আঁতকে বলল, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন।

আমি সজোরে থাপ্পড় মারলাম কারণ আমার মাথা দিয়ে তখন আগুন ছুটছিল, বলো মার্গারেট কোথায়, আমি বললাম।

আমি জানি না বিশ্বাস করুন।

ডরোথি কেঁদে উঠল এবং আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটানে ডরেথির স্কার্টটা খুলে দিলাম। তারপর একটু একটু করে নিংড়ে নিতে লাগলাম ওর অসুন্দর এবং শিথিল শরীরটাকে। ও মাঝে মাঝে আর্তনাদ করছিল, আমি ওকে বললাম, সব যখন শেষ হয়ে গেল, এখন যাও। তোমার পরিণাম খুব খারাপ হবে বাইরে যদি প্রকাশ কর। খুন করে ফেলব তোমাকে এবং ভিক্টরকে আমি ছাড়বো না।

আমি খিল দিয়ে দিলাম ও টলমল করতে করতে বাইরে চলে যেতেই।

একইভাবে কেটেছে আমার দিন সাতেক। ডরোথি এবং ভিক্টরকে সেই থেকে আর দেখিনি। খুঁজে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গা তোলপাড় করে ওকে পথে-ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, পার্কে খুঁজে বেরিয়েছি। মার্গারেট হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তাই ওকে কোথাও পাওয়া যায়নি।

একেবারেই চেনে না মার্গারেট কলকাতার রাস্তাঘাট। মায়ের কাছে ও বোম্বেতে ফিরে যায়নি তো, হঠাৎ একবার আমার মনে হল। ও অবশ্য টাকাপয়সা পাবে কোথায়, তাই আমার মাথায় কোনো ব্যাপারটাই ঢুকছে না ঠিক মতো।

ডরোথির ওখানে আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না বলে এখন আমাকে হোটেলে খেতে হচ্ছে কারণ খাওয়াটা আমার ঠিক হবে না।

আমার ক্ষমতা নেই মার্গারেটের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা থানায় জানানোর। অগত্যা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে চলে যেতে লাগলাম হালভাঙা নৌকার মতো। সারাদিন ঘুরি কেবলমাত্র রাতে ফিরি। সকালে সেই যে স্নান সেরে বেরোই, গভীর রাতে ঢুকি পা দুটো টলমল করে নেশায়। আমাকে তলার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যায় কোচোয়ান যার গাড়ি চড়ে আমি ফিরি। ভয়ে আঁতকে উঠি মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে। আমার নিষিদ্ধ পল্লীতে আসা যাওয়া বেড়ে গেছে। একদিন রাতে একটি বিশ্রী স্বপ্নে দেখলাম যে খাদের কিনারায় আমাকে চুলের মুঠি ধরে বসিয়েছে মিসেস হ্যারিয়েট মুর। আমার তলপেটে একটা ছুরি বসানো এবং পা দুটো ছটফট করছে। দুটো কিম্ভূত কিমাকার লোক হ্যারিয়েটের পাশে। প্রথমে দোলাতে আরম্ভ করল চুলের মুঠি ধরে হ্যারিয়েট এবং তারপরে অতল খাদের নীচে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কিম্ভূত কিমাকার লোকদুটো।

আমার সারা কপাল ঘামে ভিজে গেছে। আমি চীৎকার করে উঠেছি। পাখা ফুল স্পীডে বাড়ালাম এবং আলো জ্বাললাম। আমি ঘামছি। হাঁফাতে লাগলাম উঠে বসে খানিকক্ষণ। কয়েক গ্লাস জল খেলাম ঢক ঢক করে। দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেলেও আরেকটা খেলাম। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম আলো নিভিয়ে এবং তারপর জানিনা কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। একবার মনে হল যেন ভোর হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে। ঘুম ভেঙেছে দরজার ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে। দরজা খুলে যাকে দেখলাম আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম তাকে দেখে। হাতে ব্যাটন নিয়ে বিরাট চেহারার একজন পুলিশ অফিসার। আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটি ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল ওর গোঁফজোড়ার দিকে তাকিয়ে। দুজন ভয়ঙ্কর চেহারার কনস্টেবল পাশে। একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিঃ পিটার ব্রাউন আপনি না?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, মৃদু হেসে অফিসার বললেন, আমি খুবই দুঃখিত আপনাকে বিব্রত করার জন্য, একবার থানায় যেতে হবে আপনাকে আমার সঙ্গে।

গম্ভীর মুখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার অপরাধ কি? আমার কণ্ঠস্বরে কোনোরকম তীব্রতা ছিল না যেহেতু আমি জানি যে আমি কতবড়ো অপরাধী।

পুলিশ অফিসার বললেন, আমি কিছু জানি না, আপনি সেই সব জানবেন থানায় গেলেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি ধীরে ধীরে এখানকার রোদ গায়ে মেখে। বাড়ির দরজায় তালা দিলাম, দেখলাম এক প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন বাড়ির মালিককে চাবিটা দিয়ে দেয়, এই কথা তাকে বলে আমার মনে হল যেন এই যাওয়াই শেষ যাওয়া আমার। পুলিশ ভ্যানের ভিতর আমি ঢুকে বসতে থানার দিকে তা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে।

।। সাতাশ ।।

শেষ পর্যন্ত জেল হয়ে গেছে পিটার ব্রাউনের। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত ওকে দশ বছরের জন্য। পিটার হেরে গেল প্রতিবারই জীবনের বাস্তব খেলায় ভুল চাল দিয়ে। পিটারের ঘুমন্ত যৌবনকে জাগিয়ে দিয়েছিল জীবনের প্রারম্ভে যে কিশোরী এসেছিল। কিন্তু তার আশ মেটেনি এবং শেষ পর্যন্ত আশ মিটেছিল অনেকদিন পর স্ত্রীর সান্নিধ্যে। সে স্ত্রীকেও বেঁধে রাখতে পারেনি কারণ দেহ সর্বস্ব নারী পালিয়েছিল অন্য পুরুষের সঙ্গে। প্রেমের সন্ধানে তারপর দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছে পিটার। এমন কথা সত্যি নয় যে তার জীবনে বিভিন্ন নারীর সান্নিধ্য আসেনি। দেহের চাহিদা তার ক্রমশঃ বেড়েছে এবং কিছুতেই তার তৃপ্তি মেটেনি। অষ্টাদশী মানসপ্রিয়াকে সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। সেই কিশোরী প্রেমিকার কথা তাকে দেখামাত্রই মনে পড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত এক অনুভূতিমাখা স্বাদের সন্ধান দিয়েছিল সে তাকে প্রথম। প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ভুল চাল দিল হার্টস্পেশালিস্ট পিটার। মার্গারেটের দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেল তার আকণ্ঠ দেহ পিপাসা। মার্গারেট তন্বী যৌবনা এক্সটি স্বভাব চঞ্চল বালিকা। পবিত্রতা চোখের চাহনিতে এবং কুসুমের মত দেহ তার পাগল করে তুলেছিল পিটারকে। সে সবকিছু ভুলে মেতে উঠেছিল দৈহিক খেলায়। দৈহিক উন্মাদনার বীজ লুকিয়েছিল পিটারের পূর্বপুরুষের রক্তে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন পিটারের দাদু একের পর এক নারী সম্ভোগে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে। প্রচুর সম্পত্তি ছিল তার। সেই উন্মাদনা সংক্রামিত হয়েছিল পিটারের বাবার দেহেও। শুধু বোনকে পাবার আশাতেই ভদ্রলোক প্রথম স্ত্রীকে খুনই করেছিলেন একরকম। বোনকে পাননি তিনি। পিটার তো তারই সন্তান। ভারতীয় ছিলেন পিটারের মা। এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিলেন পিটারের বাবা। তার ছিল একটিমাত্র হোটেল লন্ডনে, সবকিছু খুইয়ে এইটিই ছিল তার সম্বল। ভারতে এসে বোম্বেতে একটি ছোটোখাটো হোটেল খুলেছিলেন ভাগ্য ফেরাবার আশায়।

ততদিনে পিটার শেষ করেছে ডাক্তারী পড়াশুনো। পিটার ভদ্রলোক হয়েছে ইতিমধ্যে রীতিমত। খুবই বিরল এমন অমায়িক স্বভাবের মানুষ। মারাত্মক খেলায় শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল পিটার। অস্বীকার করা যায় না রক্তের প্রভাব। ক্রমশঃ মারাত্মক ফাঁদের দিকে পিটারকে নিয়ে চলল পিটারের ভাগ্য। সুদূর বোম্বেতে এক কারাগারে পিটার তারই চরম পরিণতিতে জনৈক মিসেস হ্যারিয়েট মুরের হত্যার জন্য দায়ী সে—এটাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল মার্গারেটের একমাত্র অভিভাবক হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করার আগে। হ্যারিয়েট এবং মার্গারেট এই দুজনকে ও প্রতারণা করেছে একই সঙ্গে। ওদের বাড়িতে

ভাড়া থাকতো পিটার এবং মেলামেশার সূত্রে হ্যারিয়েটের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে পিটার ওর মৃতা বোনের মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ওর চোখে ধরা পড়েছিল অবশ্য মার্গারেটের পরিবর্তন।

ব্যাপারটাকে তা সত্ত্বেও ও গুরুত্ব দেয়নি। তার ফলে এই ব্যাপারটা ওর পক্ষে কাল হয়েছিল। ও মার্গারেটকে নিয়ে পালিয়েছিল এক পরিচালক বন্ধুর ফিল্মে নামিয়ে দেবার নাম করে। এই মিথ্যাচার মার্গারেটও বুঝতে পারেনি প্রথমটা। হ্যারিয়েটের সন্দেহ হয়েছিল যখন মাসখানেক পরেও ওরা ফিরলো না এবং ভীষণ আঘাত পেয়েছিল তখন ও। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজিও করলো। ওকে বেশ কয়েকমাস হাসপাতালে কাটাতে হলো তারপরই। নিজের মেয়ে যদিও নয় তবু মার্গারেটকে ও ভালবাসতো নিজের মেয়ের মত। হ্যারিয়েট সেরে ওঠার পর একদিন বাড়িতে ফিরে খুঁজে পেল হঠাৎই মার্গারেটের সেই ডায়েরী। হুবহু লেখা ছিল এতে মার্গারেটের প্রতিটি ঘটনা। সহবাসের কথাও বাদ যায়নি এতে পিটারের সঙ্গে। সেই সন্দেহ এবার সত্যি প্রমাণিত হল যা এতদিন নিছক সন্দেহ ছিল। এরপর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল হ্যারিয়েট। চরম পথ বেছে নিল শেষ পর্যন্ত। ঘুমের ট্যাবলেট একটার পর একটা খেয়েছিল রাতে চিঠি লেখার পর। ওর সেই ঘুম আর ভাঙেনি চিরদিনের মত।

প্রথমটা অস্বস্তি হত কয়েদির পোষাকে পিটারের। ব্যাপারটা অনেকটা সহ্য হয়েছে মাস তিনেক কাটার পর। পিটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে যে হ্যারিয়েট নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল ওকে ভালবেসে এবং ওকে অবলম্বন করে, ওর মন বেদনায় ভরে ওঠে এই কথা ভাবতে গিয়ে।

বোম্বে হাইকোর্টে বিচার হয়েছিল পিটারের। মন রীতিমতো বেদনায় ভরে উঠে যখন মনে পড়ে বিচারের দিনগুলোর কথা। ফ্রেডির সঙ্গে মার্গারেটকে কোর্টে দেখেছিল দীর্ঘকাল পরে। দারুণ সুন্দরী লাগছিল মার্গারেটকে। মার্গারেট পরেছিল নীল রঙের নক্সা করা সাদা গাউন, ওকে লাগছিল দারুণ সুন্দরী। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, কারণ এনগেজমেন্ট রিং ও দেখতে পেয়েছে মার্গারেটের হাতে। চেহারা আরো ভাল হয়েছে। পেট ফুলে উঠেছে কারণ আর বেশী দেরী নেই সন্তানের জন্মের। ফ্রেডিই এই সমস্ত ব্যাপারের মূলে দায়ী যে তা বুঝতে পেরেছিল পিটার। আসামীর কাঠগড়া থেকে দেখেছিল ফ্রেডিকে। চোখে চশমা পরা ছিল ওর। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য শান্ত ধীর স্থির চোখে। পিটারের কোনো ঈর্ষা হয়নি বরং দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ওর মন। পিটার ওর দিকে একবারই তাকিয়েছিল যখন কাঠগড়ায় ডাকা হয়েছিল মার্গারেটকে সাক্ষী হিসাবে। মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ভাব এবং লাবণ্য আরো বেড়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা। মার্গারেট চোখ নামিয়ে নিয়েছিল একবার পিটারের দিকে তাকিয়ে। পিটার এই প্রথম দেখলো মার্গারেটকে, ওর চলে যাবার পর। যে প্রিয়তমাকে ও একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছিল সেই আজ তার বন্ধু অন্য পুরুষের সঙ্গে। জেল থেকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে ও শেষ বোঝাপড়া করবে কারণ ফ্রেডি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

পিটারের এখন কিছুই করার নেই। অনন্ত সময় ওর জেলের ভিতর। নিয়মিত খবরের কাগজ এবং কিছু বই ও একটি বাইবেল পেয়েছে ও জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পিটার মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করে, বাইরের খোলা আকাশ যখন রোদে ঝলমল করে। কাশ্মীর থেকে লেখা একটি চিঠি পিটার পেলো কারাবাসের ঠিক মাসখানেকের মাথায় একদিন বিকালে। মার্গারেট লিখেছে জেলের ঠিকানাতেই। পিটার ভাবতেই পারেনি যে মার্গারেট ওকে চিঠি লিখতে পারে। পিটার পড়ল চিঠিখানা খুলে।

প্রিয় পিটার,

তুমি ভালো আছো আশা করি, তোমার মঙ্গল করবেন ঈশ্বর। ফ্রেডিকে আমি ভালবাসি তাই আমি ফ্রেডির সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। এই ভালবাসা সত্যিকারের ভালবাসা। আমি তোমার খারাপ ব্যবহারের পরও সহ্য করেছি সবকিছু কারণ আমার গর্ভের সন্তান ওর। সন্তান নষ্ট করিনি আমি কারণ ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল বরাবরই। চিঠি লিখতাম আমরা দুজনে দুজনকে, তাই কিছু গোপন করিনি ওর কাছে। ওর সামনেই তাই চিঠি লিখছি। ভিক্টরের ঠিকানায় চিঠি দিত ফ্রেডি। দুজনে দেখাও করেছি আমরা কলকাতায় মাঝে মাঝে। এসব তোমাকে লুকিয়ে

করতে হয়েছে কারণ তুমি এর কিছুই মেনে নিতে পারতে না। কোনোদিনই তুমি আমার মনকে বোঝনি, বরাবর দেহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছ। ফ্রেডি আমাকে বিয়ে করেছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে আমার সন্তানকে। ওরই সন্তান। ও প্রথমে চায়নি আমিই চেয়েছিলাম, ও ওর বিবেকের অনুশোচনার কথা জানিয়েছে এই ঘটনার পর যতবারই ও চিঠি লিখেছে।

ভারতে আমি জন্মেছি যেহেতু তাই তুমি আমায় অনায়াসে ভারতীয় বলতে পারো। আমি বিশ্বাসী এখানকার দর্শনে। এখানকার মেয়েরা সারাজীবন স্বামী আর ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে কাটিয়ে দিতে চায়। এদের একমাত্র কাম্য নয় বিভিন্ন পুরুষের কাছে দেহসুখ পাওয়া। আমি যেহেতু নিজেকে ভারতীয় নারী বলেই ভাবি তাই আমিও এর ব্যতিক্রম নই। ফ্রেডিকে আমি তা বলাতে ও মেনে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শনে ও ভীষণ অনুরাগী এবং অনেক কিছু শিখিয়েছে ও আমাকে। এখন আমি একেবারেই তা নই আগে যা ছিলাম। আমি ভাবিনি যে আমি এত ধীর স্থির হয়ে যাব, যে আগে এত চঞ্চল স্বভাবের ছিল।

কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি আমরা দুজন। এ জায়গাটাকে যে পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলা যায় তা যে কতটা সত্যি তা আমি বুঝতে পারছি। ভাবতে পারিনি যে আমাদের হানিমুন এত সুন্দর আর রমনীয় জায়গায় হবে। যত দেখছি নতুন করে বাঁচার সুখ খুঁজে পাচ্ছি। সন্তান হবে আমার আর কয়েক মাস পর, ও যেন ফ্রেডির মত হয় তুমি সেই আশীর্বাদ ওকে কর।

ফ্রেডির কোনো অভিযোগ নেই তোমার উপরে। ও পড়াশোনা করেছে মনোবিজ্ঞান নিয়ে। মানুষ যে রক্তের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না সেটাই ওর বিশ্বাস। ও ভাগ্যে বিশ্বাসী। বিজ্ঞান শেষ কথা নয় তার বাইরে আরো কিছু আছে। কে জানে আমরা সেখানে আদৌ পৌঁছব কি পৌঁছব না। বিজ্ঞানকে অবশ্য এ সব কথার জন্য অস্বীকার করা যায় না। আমি কিভাবে শিখলাম এসব জবর কথা সেটা হয়তো তুমি ভাবছো। আমি বলতে পারি এই সব শিখেছি ফ্রেডির উৎসাহে। আমি ধন্য যে ফ্রেডি আমাকে গ্রহণ করেছে। আমি এখন খুব সুখী, তোমার মঙ্গল কামনা করি ঈশ্বরের কাছে।

তোমার মিমি।

পিটারের দুচোখ ঝাপসা যখন চিঠি শেষ করল। ওর নিজেকে প্রচণ্ড মুক্ত মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে। কোনো বন্ধন নেই। কোনো দুঃখ নেই এই মুহূর্তে পিটারের। সে বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকাল গরাদের ফাঁক দিয়ে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, মিমি, আমার মার্গারেট, সুখে থাকো তুমি, সুখী হোক তোমাদের বিবাহিত জীবন।

পাখিদের ঘরে ফেরার পালা তখন বাইরের নীল দিগন্ত জুড়ে :

হ্যাভ দিস্ ওয়ান অন্ মি

প্যারিসের অরলি এয়ারপোর্টে প্রাগ থেকে এসে ক্যারাভেল প্লেনটি সময়মতো নামল। একটি বেঁটে এবং মোটাসোটা লোক নামল অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। একটি কালো রঙের জীর্ণ ব্রীফকেস তার হাতে।

মোনাথান কেইন লোকটির নাম। ওর একটি দুকামরার অফিস আছে প্যারিসের রু পল সেজা রাস্তায় এবং ওর পাসপোর্টটি আমেরিকান। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের গ্যালারী গুলোতে প্রাগ থেকে ভালো কাচের জিনিষ এনে রপ্তানি করা ওর কাজ। ও প্রাগে যায় এক সপ্তাহ বাদে বাদে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্তাদের বৈদেশিক মুদ্রা বেজায় দরকার তাই ওর ব্যবসায়ে কর্তারা খুবই খুশি।

কেইন একটি ট্যাক্সিতে উঠল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এবং রু রয়্যালে যেতে বলল ড্রাইভারকে। চারদিক দেখতে লাগল ট্যাক্সিতে বসে ও খুব সতর্কভাবে। অন্য কোনো গাড়ি বা ট্যাক্সি ওকে অনুসরণ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখল ও চলতে চলতে।

বিশেষ একটি কারণ ছিল কেইনের এই সতর্কতার। কাঁচ আমদানীই ওর একমাত্র কাজ নয়। ও একজন বিশ্বস্ত সংবাদবাহক প্যারিসের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির। লৌহ যবনিকার ওপারের গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ওর কাজ। গুপ্তচরদের ওপর নজর রাখা, তাদের খবর দেওয়া নেওয়া যাতে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ না পায় এবং তারা ঠিকমতো কাজ করে। ও এবার বিশেষ দুঃসংবাদ এনেছে প্রাগ থেকে। ও পারতপক্ষে দেখা করে না সি. এ. বির কর্তা যে প্যারিস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সেই জন ডোরীর সঙ্গে। ওর হয়তো জান চলে যাবে ওকে যদি কেউ ডোরীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখে। ডোরীর সঙ্গে দেখা না করে কোনো উপায় নেই ওর পরিস্থিতি এমন। ওর এত সাবধানতা তাই ট্যাক্সিতে উঠেও।

একটু আশ্বস্ত বোধ করল তাই কেইন। ওকে কেউ ধাওয়া করছে বলে মনে হয় না কারণ পেছনে গাড়ির ভিড়।

কেইন রু রয়্যালে পৌঁছাল আধঘণ্টা বাদে। একটি শৌখিন কাঁচের দোকানে ঢুকল ও ট্যাক্সি থেকে নেমে। ওকে দেখে একটু হাসল একজন কর্মচারী। দরজা বন্ধ করল কেইন একটি ছোট্ট অফিসঘরে ঢুকে। কথা বলছে টেলিফোনে জ্যাক ফয়। মেয়েলী চেহারার জ্যাক যেন তরুণ।

গায়ে নীল ব্লেজার এবং মাথায় রঙিন খড়ের টুপি পরল কেইন তাড়াতাড়ি নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলে। একটি গলিতে এসে পড়ল ও ব্রিফকেস হাতে নিয়ে অফিসের পেছনের দরজা খুলে। জোসেফের রেস্তোরাঁয় যেতে বলল ড্রাইভারকে। তারপর রু জাকো ধরে হেঁটে এসে একটি ট্যাক্সি ধরে।

রেস্তোরাঁর মালিক জোসেফ ক্রেভরে ওকে দেখে খুশি হয়ে হাত মেলাল ছোট বারটিতে ও যখন ঢুকল। তারপর ওকে নিয়ে গেল দোতলার একটি ছোটো প্রাইভেট ডাইনিং রুমে। জানলায় পর্দা রয়েছে ঘরটিতে। আর রয়েছে খাবারের টেবিল যাতে দুজনে খেতে পারে।

কেইন খাবারের অর্ডার দিল কুশল প্রশ্ন শেষ হতেই। ও যে খুবই শৌখিন তা বোঝা গেল ওর খাবার এবং মদ নির্বাচনে।

কেইন অধীর হয়ে ঘড়িতে দেখল পৌনে একটা। আমার বন্ধু এলে সোজা ওপরে নিয়ে এসো ও বলল। ক্রেভরে বেরিয়ে গেল সায় দিয়ে।

কেইন একটা সিগারেট ধরাল গম্ভীর হয়ে। ভদ্‌কা মার্টিনির বোতল রেখে গেল একজন ওয়েটার এসে। চুমুক দিল তাতে কেইন। এইসময় জন ডোরী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

উনচল্লিশ বছর কাজ করেছে ডোরী প্যারিস আমেরিকান এমবাসীতে। এখন ও বিভাগীয় পরিচালক সি. আই. এ-র। ছোটোখাটো দেখতে। চোখে চশমা, ছেষট্টি বছর বয়স। ব্যাংকারের মত দেখতে। যে সুদক্ষ কর্মী সংগঠন রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালাচ্ছে,

ডোরী যে তারই চতুর এবং নির্মম সর্বেসর্বা তা বোঝার কোনো উপায় নেই।
দরজা বন্ধ করতে করতে বলল ডোরী, হ্যালো জন ভালোই দেখাচ্ছে তোমাকে।
তোমার যদি তাই মনে হয় এবং সেটা যদি সত্যি হত তাহলে ভালই হত।
ডোরীর পছন্দসই পানীয় দিয়ে গেল ওয়েটার এসে। ডোরী চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ওয়েটার চলে যেতে। ও জিজ্ঞেস করল, কিছু ঘটনা ঘটেছে কি?
ঘটনা ঘটেছে, ফাঁস হয়ে গেছে ওয়ারদিংটনের পরিচয়।
ওয়ারদিংটন যে ছিল তোমার প্রাগের এজেন্ট।
ইংরেজ। অ্যালেক ওয়ারদিংটন, প্রাগে দশ বছর রয়েছে একটি চেক মেয়েকে বিয়ে করে। ইংরাজী শেখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের। আমরা ওকে খরিদ করি তিন বছর আগে। ওর বেজায় টাকার খাঁই। এটা অবশ্য সকলেরই আছে। কার যে নেই তা বলা যায় না। আমরা বেনে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিই ওর টাকা। ও জমিয়েছে প্রায় ষাট হাজার ডলার। ও কাজ করে টাকা জমিয়েছে কারণ ও এই পর্যন্ত যে টাকা জমিয়েছে তার সবটাই ওর দরকারী। যদিও কোনো সঠিক প্রমাণ নেই, এর কারণ ও চালে ভুল করেছে। ও বেজায় ঘাবড়ে গেছে, কারণ সন্দেহের চোখ পড়েছে ওর উপর নাহলে হয়তো ও ধাপ্পা দিয়েও চালাতে পারত। ও এখন পালিয়ে এসে টাকা খরচ করতে চায় কারণ জমানো টাকার কথা ভেবে ও এখন পাগল হয়ে গিয়েছে। ও মতলব আঁটছে এখন পালাবার। ভয়ের চোটে ও একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে আছে। আমাদের পাঠাতে হবে এখন ওর বদলী লোক।
খাবার চলে এল ইতিমধ্যে। কোনো কাজের কথা হল না খেতে খেতে। ডোরী তারপর বলল, আমার কোনোদিনই বিশেষ সুবিধের লোক বলে মনে হয়নি ওয়ারদিংটনকে ওর জায়গায় নিশ্চয় অন্য লোক পাওয়া যাবে।
আমি ঈর্ষা করতে পারছি না কে যাবে কারণ বেজায় কঠিন ওখানকার অবস্থা, ওখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে রাশিয়ান সিকিওরিটির একটি লোক, তার নাম মালিক।
মালিক এখন ওখানে, ও ওদের অন্যতম সেরা এবং দুর্দান্ত বিপজ্জনক লোক।
ওর জন্যেই তো পালাতে চায় ওয়ারদিংটন ঘাবড়ে ঘুবড়ে।
পারবে কি পালাতে ওয়ারদিংটন।
ও চেষ্টা করবে, তবে মনে হয় না যে ও পালাতে পাববে।
চেষ্টা করবে ও কবে নাগাদ ?
এখন তো সাহস সঞ্চয় করছে, তাই এটা বলা মুশকিল, তবে আমার ধারণা যে পুলিশ ওকে ধরবেই ও পালাবার চেষ্টা করলে।
আমাদের একটি মেয়ে এজেন্ট ওখানে আছে না ?
মেয়েটির নাম মালা রীড।
ও কাজের মেয়ে না।
মাঝেমধ্যে ও কাজে লেগেছে।
ওয়ারদিংটন সব বলে দেবে যদি ওকে চাপ দেওয়া হয়।
হ্যাঁ তা নিশ্চয়ই বলে দেবে।
মুশকিল হবে তা হলে বল তোমার আর মালার।
হ্যাঁ সেটা তো বেজায় মুশকিলের কথা।
প্রাগে তোমার যোগাযোগ নষ্ট হোক সেও চাই না এবং মালাকেও খোয়াতে চাই না। কিছু করতে হবে হয়তো ওয়ারদিংটনকেই।
ওকে মেরে ফেলাই আমাদের একমাত্র উপায়। আমার আর মালার মেয়াদও শেষ যদি মালিক ওকে একবার হাতে পায়।
এক সময় লোকটা কাজ দিয়েছে এবং আমরাও টাকা দিয়েছি তাই আমি তা হতে দেব না। তড়িঘড়ি করতে হবে যা করার তা তাড়াতাড়ি ।
তাতেও হয়তো দেরি হয়ে যাবে যদি আগামী রাতের মধ্যে করতে হয়।

আমার কাছে আছে বোধহয় ওর ঠিকানা। ও আছে তো বউকে নিয়ে। আমি দেখছি, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রাগের ধারে কাছে যেও না এখন তুমি। তোমার কি মনে করার কোনো কারণ আছে যে মালিক তোমায় সন্দেহ করে।

না না ওদের পেয়ারের লোক আমি, ডলার দিয়ে আমি বরং—

মালিক অতি সাংঘাতিক লোক তাই অত নিশ্চিন্ত থেকো না।

আমার কোনো বিপদ নেই যদি আমি ওয়ারদিংটনের মুখ বন্ধ করতে পারি।

বন্ধ ওর মুখ থাকবেই। কাকে এখন পাঠাই। ল্যাটিমার ভাষা জানে জ্যাক। সেই কারণে ওকে পাঠানো ভাল। গত দু, বছর ও ইন্টারন্যাশনাল ক্যালকুলেটর্সে চাকরী করছে। তাই ওকে সহজেই প্রাগে বদলী করতে পারি। বল তুমি কি বলবে।

হ্যাঁ বলতাম যদি এখানে মালিক না থাকত। ঠিক চিনে ফেলবে মালিক ওকে। জ্বলে গেছে যে লালবাতি। তোমরা নতুন কাউকে পাঠাবে ওয়ারদিংটনের জায়গায় ওরা তা জানে। সন্দেহ করবে ওরা নতুন লোক দেখলেই।

ভাবতে হবে না সে তোমায়। পারব তো ওর সঙ্গে কাজ করতে।

নিশ্চয় পারবে।

সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি ঠিক আছে। কিচ্ছুটি করো না আমি না বলা অবধি। দুহপ্তার মধ্যে ল্যাটিমারের সঙ্গে যোগাযোগ করব প্রাগে ফিরে, যদি সবকিছু ভালোয় ভালোয় উৎরোয়। আমাদের দুজনেরই ওকে দিয়ে বেশি কাজ হবে বলে মনে হয় ওয়ারদিংটনের চেয়ে।

নিশ্চিন্ত হল কেইন। ডোরী যখন বলেছে যা হয় কিছু একটা করবেই, করবেতো যখন ওকে আর ঘাঁটানো ঠিক নয়।

স্যুটকেস বন্ধ করল আলেক ওয়ারদিংটন। বাইরের দিকে চাইল জানলার পর্দা সরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে। উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চার ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েই আছে কালো বর্ষাতি হাতে লোকটি।

কপালের ঘাম মুছল ওয়ারদিংটন পিছিয়ে এসে। দশটা বাজতে পাঁচ তখন ঘড়িতে। সুক ইংরেজী শিখতে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। লোকটা চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। সুক দুনম্বর কর্তা চেক গুপ্ত পুলিশের। কেউ নজর রাখে না ও যতক্ষণ থাকে। লোকটি ফিরে আসে সুক চলে গেলে। এই রুটিন চলছে গত চারদিন ধরে। আজই পালাবে তাই ওয়ারদিংটন ঠিক করেছে। হয়তো দেরি হয়ে গেল সময় নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওকে ধরতে পারে ও স্পষ্ট টের পাচ্ছে।

প্রস্তুত হতে পারেনি ও এখনও। আগেকার মতলব মতো কাজ করা যেত যদি আরো সময় পাওয়া যেত। পালিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে কারণ সময় নেই। ও বাইরের ঘরে এল স্যুটকেশটা খাটের নীচে ঢুকিয়ে রেখে। বাজার করতে বেরিয়েছে ওর মেয়ে এমিলি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না ওকে ফেলে পালাতে। উবে গেছে পনেরো বছরের প্রেম ভালবাসা সবকিছু। অ্যালেক সি. আই. এ-র যে কাজ করে তা এমিলি জানে না। ও আরও জানে না যে ওর আরেকটি মেয়ে আছে জীবনে এবং সুইজারল্যান্ডে মোটা টাকা আছে।

একটি কল বের করল টেবিলের দেরাজ থেকে ওয়ারদিংটন। অতি সামান্য জিনিষ। বালি আর সীসের টুকরো ভরা একটি ছোট্ট ব্যাগ। যে কেউ সংজ্ঞা হারাবে এর আঘাতে। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্র হাতে এবং টিপটিপ করছে ওর বুক। লোকটি যদিও মারদাঙ্গায় পটু নয় কিন্তু যেহেতু আজ ওর জীবন বিপন্ন তাই ওকে মারদাঙ্গা করতে হবে।

ও টেবিলে বসল কলটি পকেটে পুরে। ও নিজেই অবাক হল নিজের স্থৈর্য দেখে। আজ সুককে গল্‌সওয়ার্দির ফরসাইটে সাগা পড়াতে হবে বলে মনে পড়ল। ও ভয় করে খুব সুককে। তবে সুক যে ইংরাজী শিক্ষায় বেশ এগিয়ে গেছে সেটা মানতেই হয়। এটা ভাবাই যায় না যে ইংরাজী সাহিত্য পড়ে এত আনন্দ পাবে ওর মতো পাষণ্ড।

বইয়ের পাতাটা খুলে টেবিলে রাখল ও যেখান থেকে আজকের পড়া শুরু হবে। সেই সময় ও শুনল সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। কে যেন চারতলার ঘরে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। পথের লোকটি উধাও সে গিয়ে দেখল জানলা দিয়ে।

ও দরজা খুলে দিল বেলের আওয়াজ শুনে। ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরে ঢুকল সুক। ভারিসারি চেহারা, ঠোঁটটি পাতলা, সদাই সন্দেহের দৃষ্টি ওর চোখে।

সুক চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করল ওর দিকে আরেকবার চেয়ে। ওর পড়া শুনতে ওয়ারদিংটন চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ও লক্ষ্য করে দেখল সুকের মাথার পিছনটা। ওকে গ্রেপ্তারের মতলব ঘুরছে লোকটার মাথায় বলে ওর মনে হল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল কলটা।

ওর মতলব আঁচ করেছিল বোধহয় সুক। ওয়ারদিংটন কল চালাল ও হঠাৎ পিছন ফিরতে না ফিরতেই। সুকের মাথার উপর গিয়ে পড়ল চোটটা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কলটা। সংজ্ঞাহীন নিশ্চল হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এলিয়ে পড়ল দেহ ওর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে। হাড়গোড় নেই যেন ওর শরীরে। মাটিতে পড়ল চেয়ার থেকে যেন কাপড়চোপড় এবং মাংসের একটি স্তূপ।

ওর স্যুটকেশ টেনে বের করল ওয়ারদিংটন ছুটে গিয়ে। একটি কালো বর্ষাতি পরে নিল। সুক অচৈতন্য ও ফিরে এসে দেখল। সুক হয়তো মরে গেছে ও ভাবল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল আর সময় নষ্ট না করে। ওর স্ত্রী এমিলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দোতলায়। এমিলির বয়স চুয়াল্লিশ বছর। বেজায় মোটা এবং বেঁটে। চাইল দুজনে দুজনের দিকে। স্যুটকেশ দেখে এমিলি বলল, নির্ভয়ে যেতে পারো, এসে যায় না আমার কিছু। চলে যাও।

আমি চললাম এমিলি, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি। কোথাও ঘুরে এস খানিক, এখন উপরে যেও না।

এমিলি ফুঁসে বলল, বাঁচা গেল, যাও তোমার মেয়ে মানুষের কাছে।

তোমার বাবা।

আমি কি করব তা বাতলাতে হবে না চুপচাপ চলে যাও।

ওয়ারদিংটন কর্কশ গলায় বলল, ওপরে যেও না এমিলি আমি বাধ্য হয়ে তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছি। উনি উপরে আছেন।

এমিলি তাচ্ছিল্য গলায় বলল, পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ আহাম্মক।

বিদায় এমিলি চললাম।

ওয়ারদিংটন বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্য রেখে চলল সরু পথের দুপাশে। ওকে যেতে দেখেনি কেউ। না কেউ যেতে দেখেনি ওকে। ও পালাবার চেষ্টা করবে না যতক্ষণ সুক সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ এবং সেটা ও ধরেই নিয়েছে।

ও ট্রামে উঠে ভাবল, তল্লাশী শুরু করবে সুকের জ্ঞান ফিরে এলে। সুকের মাথার খুলি কতটা মোটা এটা নির্ভর করবে তার উপর। ও ভাবতেই শিউরে উঠল, ওর কল মারার কথাটা।

দু একজন ঘুরে দেখল ওয়ারদিংটনের ইংরেজ মার্কা চেহারাটা। ওর অভ্যেস হয়ে গেছে এতে, সবাই একটু সন্দেহের চোখে দেখে প্রাগে বিদেশীদের।

ও একটি ছোট্ট পথে ঢুকল টাউনহল স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে। এই নির্জনপথে কেউ থাকে না, শুধু ও এবং আরেকটি বৃদ্ধা ছাড়া। ও প্রথমে পৌঁছল নির্দিষ্ট বাড়িতে তারপর অন্ধকার দরজা দিয়ে চট করে ঢুকে একটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠল এবং ঘা দিল একটি নোংরা দরজায়। পায়ের আওয়াজ দরজার পেছনে। একটি মেয়ে প্রথমে চাবি ঘোরাল এবং তারপর ফাঁক করে দাঁড়াল দরজা।

মেয়েটির নাম মালা রীড। ওয়ারদিংটন একই উত্তেজনা অনুভব করে যতবার ওকে দেখে। ও প্রেমে পড়ে যখন থেকে ও মালাকে প্রথম দেখে কিন্তু সে কথা ও জানায়নি মালাকে। মালা যে সংবাদবাহক ছাড়া ওকে আর কিছু মনে করে না সেটা ও ভালভাবেই জানে।

মালা বলল, তুমি এখানে, ব্যাপার কি। ওয়ারদিংটন মালাকে দেখতে লাগল, ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ নামিয়ে বর্ষাতি খুলতে খুলতে। বয়স আঠাশ মালার। চেক বিপ্লবে বাবা মৃত, মা মৃত ক্যানসার রোগে। আলহামব্রা নাইট ক্লাবে মনমাতানো ইংগিতে গলার খামতি গুটিয়ে গান গেয়ে টুরিস্টদের খুশি করে এখন মালা। ওকে উৎসাহই দেয় সরকার। দেশে ওর জন্য বেড়ে গেছে ডলার আমদানি। ও প্রতি রাতে ক্লাবে গাইছে গত দুবছর হল।

আমার কাছে আছে বোধহয় ওর ঠিকানা। ও আছে তো বউকে নিয়ে। আমি দেখছি, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রাগের ধারে কাছে যেও না এখন তুমি। তোমার কি মনে করার কোনো কারণ আছে যে মালিক তোমায় সন্দেহ করে।

না না ওদের পেয়ারের লোক আমি, ডলার দিয়ে আমি বরং—

মালিক অতি সাংঘাতিক লোক তাই অত নিশ্চিন্ত থেকো না।

আমার কোনো বিপদ নেই যদি আমি ওয়ারদিংটনের মুখ বন্ধ করতে পারি।

বন্ধ ওর মুখ থাকবেই। কাকে এখন পাঠাই। ল্যাটিমার ভাষা জানে জ্যাক। সেই কারণে ওকে পাঠানো ভাল। গত দু, বছর ও ইন্টারন্যাশনাল ক্যালকুলেটর্সে চাকরী করছে। তাই ওকে সহজেই প্রাগে বদলী করতে পারি। বল তুমি কি বলবে।

হ্যাঁ বলতাম যদি এখানে মালিক না থাকত। ঠিক চিনে ফেলবে মালিক ওকে। জ্বলে গেছে যে লালবাতি। তোমরা নতুন কাউকে পাঠাবে ওয়ারদিংটনের জায়গায় ওরা তা জানে। সন্দেহ করবে ওরা নতুন লোক দেখলেই।

ভাবতে হবে না সে তোমায়। পারব তো ওর সঙ্গে কাজ করতে।

নিশ্চয় পারবে।

সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি ঠিক আছে। কিচ্ছুটি করো না আমি না বলা অবধি। দুহপ্তার মধ্যে ল্যাটিমারের সঙ্গে যোগাযোগ করব প্রাগে ফিরে, যদি সবকিছু ভালোয় ভালোয় উৎরোয়। আমাদের দুজনেরই ওকে দিয়ে বেশি কাজ হবে বলে মনে হয় ওয়ারদিংটনের চেয়ে।

নিশ্চিন্ত হল কেইন। ডোরী যখন বলেছে যা হয় কিছু একটা করবেই, করবেতো যখন ওকে আর ঘাঁটানো ঠিক নয়।

স্যুটকেস বন্ধ করল আলেক ওয়ারদিংটন। বাইরের দিকে চাইল জানলার পর্দা সরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে। উল্টোদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চার ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েই আছে কালো বর্ষাতি হাতে লোকটি।

কপালের ঘাম মুছল ওয়ারদিংটন পিছিয়ে এসে। দশটা বাজতে পাঁচ তখন ঘড়িতে। সুক ইংরেজী শিখতে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। লোকটা চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। সুক দুনম্বর কর্তা চেক গুপ্ত পুলিশের। কেউ নজর রাখে না ও যতক্ষণ থাকে। লোকটি ফিরে আসে সুক চলে গেলে। এই রুটিন চলছে গত চারদিন ধরে। আজই পালাবে তাই ওয়ারদিংটন ঠিক করেছে। হয়তো দেরি হয়ে গেল সময় নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওকে ধরতে পারে ও স্পষ্ট টের পাচ্ছে।

প্রস্তুত হতে পারেনি ও এখনও। আগেকার মতলব মতো কাজ করা যেত যদি আরো সময় পাওয়া যেত। পালিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে কারণ সময় নেই। ও বাইরের ঘরে এল স্যুটকেশটা খাটের নীচে ঢুকিয়ে রেখে। বাজার করতে বেরিয়েছে ওর মেয়ে এমিলি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না ওকে ফেলে পালাতে। উবে গেছে পনেরো বছরের প্রেম ভালবাসা সবকিছু। অ্যালেক সি. আই. এ-র যে কাজ করে তা এমিলি জানে না। ও আরও জানে না যে ওর আরেকটি মেয়ে আছে জীবনে এবং সুইজারল্যান্ডে মোটা টাকা আছে।

একটি কল বের করল টেবিলের দেরাজ থেকে ওয়ারদিংটন। অতি সামান্য জিনিষ। বালি আর সীসের টুকরো ভরা একটি ছোট্ট ব্যাগ। যে কেউ সংজ্ঞা হারাবে এর আঘাতে। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্র হাতে এবং টিপটিপ করছে ওর বুক। লোকটি যদিও মারদাঙ্গায় পটু নয় কিন্তু যেহেতু আজ ওর জীবন বিপন্ন তাই ওকে মারদাঙ্গা করতে হবে।

ও টেবিলে বসল কলটি পকেটে পুরে। ও নিজেই অবাক হল নিজের স্থৈর্য দেখে। আজ সুককে গল্‌সওয়ার্দির ফরসাইটে সাগা পড়াতে হবে বলে মনে পড়ল। ও ভয় করে খুব সুককে। তবে সুক যে ইংরাজী শিক্ষায় বেশ এগিয়ে গেছে সেটা মানতেই হয়। এটা ভাবাই যায় না যে ইংরাজী সাহিত্য পড়ে এত আনন্দ পাবে ওর মতো পাষণ্ড।

বইয়ের পাতাটা খুলে টেবিলে রাখল ও যেখান থেকে আজকের পড়া শুরু হবে। সেই সময় ও শুনল সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। কে যেন চারতলার ঘরে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। পথের লোকটি উধাও সে গিয়ে দেখল জানলা দিয়ে।

ও দরজা খুলে দিল বেলের আওয়াজ শুনে। ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরে ঢুকল সুক। ভারিসারি চেহারা, ঠোঁটটি পাতলা, সদাই সন্দেহের দৃষ্টি ওর চোখে।

সুক চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করল ওর দিকে আরেকবার চেয়ে। ওর পড়া শুনতে ওয়ারদিংটন চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ও লক্ষ্য করে দেখল সুকের মাথার পিছনটা। ওকে গ্রেপ্তারের মতলব ঘুরছে লোকটার মাথায় বলে ওর মনে হল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল কলটা।

ওর মতলব আঁচ করেছিল বোধহয় সুক। ওয়ারদিংটন কল চালাল ও হঠাৎ পিছন ফিরতে না ফিরতেই। সুকের মাথার উপর গিয়ে পড়ল চোটটা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কলটা। সংজ্ঞাহীন নিশ্চল হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এলিয়ে পড়ল দেহ ওর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে। হাড়গোড় নেই যেন ওর শরীরে। মাটিতে পড়ল চেয়ার থেকে যেন কাপড়চোপড় এবং মাংসের একটি স্তূপ।

ওর স্যুটকেশ টেনে বের করল ওয়ারদিংটন ছুটে গিয়ে। একটি কালো বর্ষাতি পরে নিল। সুক অচৈতন্য ও ফিরে এসে দেখল। সুক হয়তো মরে গেছে ও ভাবল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল আর সময় নষ্ট না করে। ওর স্ত্রী এমিলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দোতলায়। এমিলির বয়স চুয়াল্লিশ বছর। বেজায় মোটা এবং বেঁটে। চাইল দুজনে দুজনের দিকে। স্যুটকেশ দেখে এমিলি বলল, নির্ভয়ে যেতে পারো, এসে যায় না আমার কিছু। চলে যাও।

আমি চললাম এমিলি, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি। কোথাও ঘুরে এস খানিক, এখন উপরে যেও না।

এমিলি ফুঁসে বলল, বাঁচা গেল, যাও তোমার মেয়ে মানুষের কাছে।

তোমার বাবা।

আমি কি করব তা বাতলাতে হবে না চুপচাপ চলে যাও।

ওয়ারদিংটন কর্কশ গলায় বলল, ওপরে যেও না এমিলি আমি বাধ্য হয়ে তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছি। উনি উপরে আছেন।

এমিলি তাচ্ছিল্য গলায় বলল, পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ আহাম্মক।

বিদায় এমিলি চললাম।

ওয়ারদিংটন বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্য রেখে চলল সরু পথের দুপাশে। ওকে যেতে দেখেনি কেউ। না কেউ যেতে দেখেনি ওকে। ও পালাবার চেষ্টা করবে না যতক্ষণ সুক সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ এবং সেটা ও ধরেই নিয়েছে।

ও ট্রামে উঠে ভাবল, তল্লাশী শুরু করবে সুকের জ্ঞান ফিরে এলে। সুকের মাথার খুলি কতটা মোটা এটা নির্ভর করবে তার উপর। ও ভাবতেই শিউরে উঠল, ওর কল মারার কথাটা।

দু একজন ঘুরে দেখল ওয়ারদিংটনের ইংরেজ মার্কা চেহারাটা। ওর অভ্যেস হয়ে গেছে এতে, সবাই একটু সন্দেহের চোখে দেখে প্রাগে বিদেশীদের।

ও একটি ছোট্ট পথে ঢুকল টাউনহল স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে। এই নির্জনপথে কেউ থাকে না, শুধু ও এবং আরেকটি বৃদ্ধা ছাড়া। ও প্রথমে পৌঁছল নির্দিষ্ট বাড়িতে তারপর অন্ধকার দরজা দিয়ে চট করে ঢুকে একটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠল এবং ঘা দিল একটি নোংরা দরজায়। পায়ের আওয়াজ দরজার পেছনে। একটি মেয়ে প্রথমে চাবি ঘোরাল এবং তারপর ফাঁক করে দাঁড়াল দরজা।

মেয়েটির নাম মালা রীড। ওয়ারদিংটন একই উত্তেজনা অনুভব করে যতবার ওকে দেখে। ও প্রেমে পড়ে যখন থেকে ও মালাকে প্রথম দেখে কিন্তু সে কথা ও জানায়নি মালাকে। মালা যে সংবাদবাহক ছাড়া ওকে আর কিছু মনে করে না সেটা ও ভালভাবেই জানে।

মালা বলল, তুমি এখানে, ব্যাপার কি। ওয়ারদিংটন মালাকে দেখতে লাগল, ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ নামিয়ে বর্ষাতি খুলতে খুলতে। বয়স আঠাশ মালার। চেক বিপ্লবে বাবা মৃত, মা মৃত ক্যানসার রোগে। আলহামব্রা নাইট ক্লাবে মনমাতানো ইংগিতে গলার খামতি গুটিয়ে গান গেয়ে টুরিস্টদের খুশি করে এখন মালা। ওকে উৎসাহই দেয় সরকার। দেশে ওর জন্য বেড়ে গেছে ডলার আমদানি। ও প্রতি রাতে ক্লাবে গাইছে গত দুবছর হল।

ও লম্বা সাধারণ মেয়ের চেয়ে। ও বিমোহিনী কিন্তু সুন্দরী নয়। ওর পুরন্ত ঠোঁট এবং বেগুনী চোখ। ওর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওর শরীর। উঁচু ও পুরন্ত বুক। লম্বাটে পা এবং সরু ধরনের কোমর। চোখ ফেরাতে পারে না পুরুষরা ওর শরীর থেকে।

ও সি. আই, এ তে কাজ করছে দুই বছর হল। ডোরীর এজেন্ট বলেছিল যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মালাকে কি বিপদে জড়ানো হচ্ছে তা মালার উপস্থিত বুদ্ধি থাকলেও মালা বোঝে না। কম্যুনিস্ট বিরোধী ও। বিশেষ কষ্ট হয়নি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজে লাগাতে। অন্য এজেন্টদের খবর পৌঁছে দিয়েছে মালা। ওয়ারদিংটনের সঙ্গে ও কাজ করছে, কি জালে ও জড়িয়ে গেছে বা কি বিপদে ও পড়েছে তা না জেনেই। সি আই কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়েছে তিন বার গত দু বছরে, খবরগুলোর গুরুত্ব না জেনেই। ওর সম্পর্কে ডোরীর ধারণা বাড়াবাড়ি রকমের উঁচু প্যারিসে। মালাই সবচেয়ে বেশি দমে যাবে যদি ওকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সবচেয়ে বড় মেয়ে এজেন্ট হিসাবে ধরা হয়।

ও প্রাগে কাটিয়েছে সারাজীবন ভালো রোজগার করে এবং পুলিশ ওকে সৎ নাগরিক বলে মনে করে যেহেতু ওর ব্যবহারের সন্দেহজনক কিছু নেই। ডোরীর হাতের নাচের পুতুল হিসাবে ও চমৎকার, যেহেতু কেউ ওকে সন্দেহ করে না।

ওকে ঘাবড়ে দিয়েছিল ওয়ারদিংটনের অতর্কিত আবির্ভাব। ও বলল স্যুটকেশটা দেখে, কোথাও কি যাচ্ছ তুমি

কোথাও যাচ্ছি, বোসো কথা আছে কয়েকটা।

হল না কি কোনো গণ্ডগোল।

ওর ঘরে পড়ে থাকা সুকের অজ্ঞান হওয়া শরীর-এর ছবি ওয়ারদিংটনের মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখল সামনে মালার মনভোলানো নারী দেহ। ব্যর্থতার অক্ষম ক্ষোভ, মনে বড় দুঃখ'। এ রকম একটি মেয়ে ওকে খুবই আনন্দ দিতে পারত যতই সাতচল্লিশ বছর বয়স হোক না কেন।

ওয়ারদিংটন বলল, আমি কিন্তু নিরুপায় এবং দুঃখিতও যে আমাকে কদিন কিন্তু এখানে থাকতে হবে।

মালা তাজ্জব, এখানে থাকবেন, না হতেই পারে না, কারণ এখানে জায়গা নেই। হতে পারে না এটা।

মাত্র কটা দিন থাকতে দিতে হবে। আমি তোমায় বিরক্ত করব না, কারণ আমি কথা দিচ্ছি যে আমি প্রাগ ছেড়ে চলে যাব, তবে আমি যেতে পারব না তোমার সাহায্য ছাড়া।

তুমি শোবে কোথায়, কারণ বিছানা একটা এক বিছানায় মালা যদি ওকে শুতে বলত। মালা কিন্তু সে কথা বলবেই বা কেন?

ওয়ারদিংটন বলল, বিশ্বাস কর, আমাকে থাকতেই হবে, দরকার হলে আমি মাটিতে শোব।

ওয়ারদিংটনের সাদা মুখ চোখে আতঙ্ক, মালা সেটা লক্ষ্য করল। তাই বলল, খুঁজছে কি ওরা তোমায়।

ওয়ারদিংটন মাথা নাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ ওরা খুঁজছে আমাকে।

চেয়ারে বসে ক্যাপ্টেন টিম ও হ্যালোরান। বিশাল চওড়া কাঁধ, লালচে মুখ, নীলচে চোখ এবং কঠিন মুখ। ও ইউরোপের সকল সি. আই. এ এজেন্টের ইনচার্জ। ডোরী ওকে কেইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলছে টেবিলের ওপাশে বসে। ও হ্যালোরান সব জেনে গেছে নির্বিকার মুখে। কোনো না কোনো একটি সমাধান ডোরী খুঁজে বের করবেই এটা ও জানে। ওর অগাধ বিশ্বাস ডোরীর উপরে।

ডোরী বলল, মালিক যদি ওয়ারদিংটনকে ধরে তাহলে কেইন এবং মালা ফেঁসে যাবে, শেষ পর্যন্ত এটাই দাঁড়াচ্ছে। খতম করতেই হবে ওয়ারদিংটনকে, যদিও সেটা অবশ্য কে করবে।

ও হ্যালোরান নির্দ্বিধায় বলল, মাইক ও ব্রায়েন। রাতের প্লেনেই যেতে পারে ও ডিপ্লোমাটিক পাসপোর্ট নিয়ে। ও কাজ হাসিল করে ফেলবে আজ, বেশি রাত বা কাল সকালের মধ্যেই। ওর কোনো অসুবিধে হবে না এতে।

তাই কর টিম তাহলে, ঠিক আছে। একটা ফাইল নিয়ে পড়তে লাগল ডোরী।

টিম ডোরীকে বলল টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলে, কাজ হয়ে গেছে ধরে নিন।

ফাইল সরিয়ে রেখে ডোরী বলল, বদলী পাঠাতে হবে এখন ওয়ারদিংটনকে, আমি ভাবছি জ্যাক ল্যাটিমারের কথা। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না কেইন। বদলীতে কে আসে তা দেখার জন্য ওরা ওৎ পেতে থাকে। ল্যাটিমার ফাঁস হয়ে যাবে কাজ শুরু করার আগেই এটা কেইন মনে করে থাকে।

আমি কথা বলব কেইনের সঙ্গে। উপযুক্ত লোক ল্যাটিমারই।

কথা বলেছি আমি, কখনো ভুল করে না কেইন, মালিককে মনে পড়ে তোমার। প্রাগে এসেছেন মালিক একথা কেইন বলেছে।

কে এসেছে, মালিক?

হ্যাঁ, মালিক, যে সোভিয়েতের সেরা এজেন্ট। ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকতে হবে ওর চোখে ধুলো দিয়ে, বলে চলল ডোরী, একটা ধোকাবাজি করতে হবে আমাদের। এমন একজনকে প্রাগে পাঠাতে হবে যাকে মনে হয় আমাদের এজেন্ট হিসাবে এবং তার ওপরই যাতে পড়ে মালিকের সন্দেহ। ল্যাটিমার প্রাগে ঢুকে পড়বে সেই ফাঁকে।

বেড়ে লাগছে শুনতে, তার অবস্থা কিন্তু শোচনীয় হবে যাকে আপনি প্রাগে পাঠাবেন।

শুকনো হাসি হেসে ডোরী বলল, সে তো বটেই, তবে তেমন লোকই যাবে যাকে খরচের খাতায় লিখে রাখা চলে। আজ সকালেই গ্যারলান্ড হংকং থেকে ফিরেছে সেটা কি তুমি জানো?

এখানে ফিরেছে গারল্যান্ড।

আমি ওর উপর নজর রাখি। অনেক দেনা আছে ওর আমার কাছে। সময় এসে গেছে এখন শোধ দেবার। আমি টোপ হিসাবে সামনে রাখব গারল্যান্ডকে। গারল্যান্ড প্রাগে এসেছে এটা মালিক যেই শুনবে, ও তখন ধরেই নেবে যে আমরা বদলীতে পাঠিয়েছি গারল্যান্ডকে। ল্যাটিমার চুপিসারে প্রাগে ঢুকে পড়বে। ও যখন গারল্যান্ডকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মনে হচ্ছে কি কেমন।

চুপ করে রইল ও হ্যালোরান। ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে গ্যারল্যান্ডের উপর। ডোরীর সেরা এজেন্ট ছিল একসময় গ্যারল্যান্ড। তারপর বলল, ধরে নিচ্ছেন কেন যে গারল্যান্ড প্রাগে যাবে? আমাদের হয়ে কাজ করে না এখন ও, বোকাও নয় লোকটা। আমি ভাবতেই পারছি না যে ও যাবে লৌহ যবনিকার ওপারে।

টাকা এবং মেয়ে মানুষ, এ দুটোই দুর্বলতা গারল্যান্ডের। ঘাবড়িও না। আমি সে বন্দোবস্ত করছি ও যাবেই।

আপনি কি এটাই চান যে যদিও ও যায় কিন্তু গেলেও পরে আর ফিরবে না।

শুধু নিজের কথা ভাবে গারল্যান্ড। ও কাজ করছে, আমাদের হয়ে কাজ করে মুনাফা লুটছে বলেই। বহু টাকা মেরেছে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে। আমরাও তাই করব ও যেভাবে আমাদের ব্যবহার করেছে। কোনো ক্ষতি নেই যদি ও খতম হয় তাহলে হবে। মাছ টোপ গিলবেই যদি সে টোপ জুৎসই হয়। আমি একটি খাসা এবং লোভনীয় টোপ তৈরী করেছি গারল্যান্ডের জন্য। ও যাবেই প্রাগে।

মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ওয়ারদিংটন। ও কামিয়ে ফেলেছে ওর বহুদিনের রাখা গোঁফ। অন্যরকম দেখাচ্ছে কেমন ওর মুখটা। ও দুর্বল এবং গো-বেচারা। ওকে কেউ চিনতে পারবেনা ওর গোঁফ ছাড়া এটাই ওর ধারণা। ও বলল, চুলের রং পালটাব ভাবছিলাম, তুমি যদি একটু সাহায্য কর। কি করে যে লাগাতে হয়, তবে এক বোতল পেরোসাইড সঙ্গে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মালা অসহায় চোখে। ওর ভেতরটা খুবই কাঁপছে। ওর মেয়াদ শেষ ওয়ার দিংটন গ্রেপ্তার হলে এটা ও জানে। সবই বলে দেবে, ওয়ারদিংটনকে যদি জেরা করা হয়। মালা ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। সিকিউরিটি পুলিশের হাতে পড়লে তার অবস্থা কি হবে তা ভেবে বলল, প্লীজ চলে যাও তুমি, দয়া করে চলে যাও।

নিশ্চয় তোমার মন মেজাজ ঠিক নেই, তুমি কি বলছ, তোমায় চা করে দিচ্ছি আমি, চা খেলেই তোমার ভালো লাগবে, কোথায় রেখেছ তুমি চায়ের সরঞ্জাম।

আমি তোমায় কোনো সাহায্য করব না, তোমাকে আমি এখানে রাখতে চাই না, তুমি চলে যাও প্লীজ।

রান্নাঘরে গেল ওয়ারদিংটন। অনেক দুশ্চিন্তা এখন মালার। সে নিজেই ভাবল একবার পালাবে। কিন্তু পালাবে কোথায়। এ কাজে কেন যে সে নামতে গেল ডোরীর এজেন্টের বড় বড় কথা শুনে। নিজেই পুলিশে খবর দেবে একবার ভাবল ও কিন্তু ওর জীবন শেষ হবে তাহলে, ওর রক্ত জল হয়ে গেল এই ভেবে যে ওর সুন্দর শরীরটা নিয়ে কি করবে পুলিশ। ওরা ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে পৈশাচিক উল্লাসে ওকে কথা বলাবার জন্য।

চা নিয়ে ঢুকল ওয়ারদিংটন। বলল, নতুন করে ছবি তুলব পাসপোর্টের, চুল রাঙিয়ে।

একটি লোকের কাছে নিয়ে যায় মালা। ছবিগুলো তুলে ও এটাই চায়। ওয়ারদিংটনের ব্রিটিশ পাসপোর্টে যে লোকটি নতুন ছবি লাগিয়ে দেবে। লোকটি নিশ্চয় ভয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করত।

রাত নটায় মাইক ও ব্রায়েন বার্নবের্গ অবধি প্লেনে এসে গাড়ি নিয়ে প্রাগে পৌঁছল।

ও আততায়ীর কাজ করছে ও হ্যালোরেনের হয়ে গত তিন বছর ধরে। দলত্যাগী গুপ্তচর খুন করেছে এর মধ্যে চারজনকে। ওর কোনো বিবেকদংশন নেই খুন বিষয়ে। যে কোনো পেশার মতই খুনও ওর কাছে একটি পেশা। সাইলেন্সার লাগানো ·৪৫ ক্যালিবার পিস্তল এই পেশার অন্যতম হাতিয়ার। সব চেয়ে নিরাপদ মাথায় গুলি করা। মগজ উড়ে যায় ·৪৫ গুলিতে।

ওয়ারদিংটনের বাড়ি কোথায় তা ম্যাপ দেখে ও আগেই জেনে গেছে। সে পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটা দেখে নিল গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে। আজ রাতেই ও ন্যুরেন্স বার্গ থেকে প্যারিসের প্লেন ধরবে ঠিক মতো কাজ হলে। রূপালী, সবুজ কঠোর দৃষ্টি যুক্ত চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন দৈত্যের মত চেহারার লোক।

শরীর দিয়ে কাঁপুনি বয়ে গেল মালিককে দেখে ও ব্রায়েনের। মালিকের ছবি ও সি. আই. এ-এর ফাইলে দেখেছে, যদিও চোখে দেখিনি। স্যুট পরা তিনজন লোক মালিকের পেছনে। স্টেনগান দুজনের হাতে। মালিক শান্ত গলায় বলল, কি চাই? অবস্থা বেগতিক ও ব্রায়েন সেটা বুঝল, ধরা পড়েছে কি ওয়ারদিংটন? ও বলল, আছেন কি মিঃ ওয়ারদিংটন। উনি ইংরাজী শেখান শুনলাম।

আসুন ভেতরে।

স্টেনগানধারীদের দিকে চেয়ে ঢুকল ও ব্রায়েন ইতস্ততঃ করে। মালিক দরজা বন্ধ করে বলল, আপনার পাসপোর্ট নেই? এখানে নেই মিঃ ওয়ারদিংটন।

পাসপোর্ট দিল ও ব্রায়েন। মালিক যার হাতে স্টেনগান নেই এটা দেখে তার হাতে সেটা দিল। দিয়ে বলল, কেমন আছেন মিঃ ডোরী।

বেঁচেই আছেন যদ্দুর জানি। কেমন আছেন মিঃ কোভস্কি? জিজ্ঞেস করলেন যে কোভস্কি সম্বন্ধে সেই কোভস্কি মালিকের ওপরওয়ালা।

আপনি একটু দেরী করে ফেলেছেন তবে যদ্দুর জানি তিনি বেঁচেই আছেন। আমি ব্যবস্থা করছি ওয়ারদিংটনের। সকাল দশটা নাগাদ ভেগেছে ওয়ারদিংটন।

পেছন পেছন চলল ও ব্রায়েন লোকটির। মালিক বলল, মিঃ ও ব্রায়েন এক মিনিট। চেষ্টা করবেন না ফেরার দয়া করে। বুঝলেন তাহলে ঘুরে যাবে ব্যাপার।

আচ্ছা চলি, নিশ্চয়।

ও ব্রায়েন বাড়ির ভিতর থেকে একটি মেয়ের চাপা কান্না শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে। এ নিশ্চয় ওয়ারদিংটনের বউয়ের কান্না।

।। দুই ।।

গারল্যান্ড বলল, পাঁচমিনিটের মধ্যে আমায় বেরোতে হবে দেখ খুকি, মদ শেষ করবে জলদি জলদি।

অসামান্য সৌন্দর্যে ভরা আঠারো বছরের একটি মেয়ে গ্যারলান্ডের সামনে বসে মদ্যপান করছিল। গারল্যান্ড এখনো কাবু হয়নি কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে মেয়েটি নানাভাবে প্রলোভন দেখাচ্ছে। বারবার মেয়েটি ওর দেহ সৌষ্ঠব মেলে ধরছে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে। গারল্যান্ডকে ছাড়তে রাজি নয় সে কিছুতেই। একেই বলে পুরুষ মানুষ গারল্যান্ডকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে ভাবছে।

বহু পুরনো পাপী গারল্যান্ড। ওর আর ভাল লাগে না কচি মেয়েদের এ ধরনের যৌন আবেদন।

ভেতরে সব ঠাণ্ডা মেরে আসে আধ বুড়ো মনে হয় নিজেকে। ভেতরে সব ঠাণ্ডা মেরে আসছে বলে মনে হয়। টেলিফোনের আওয়াজ হঠাৎ বাঁচিয়ে দিলে ওকে।

আমেরিকান গলা ভেসে এল ফোনের ওদিক থেকে, হ্যারি ময় বলছি গারল্যান্ড। আমাকে তুমি চেন না। আমাকে তোমার নম্বর দিয়েছিল ফ্রেড। একটা কাজ করে দিতে হবে আমার। আমি তোমায় টাকা দেব অবশ্য এজন্য।'

গারল্যান্ড মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, কত টাকা। পোশাক খুলছে ততক্ষণে মেয়েটি।

হ্যারি বলল, আমি লা ক্রোয়া দ্যের বারে থাকব দশটা পর্যন্ত। জায়গাটা চেন তুমি?

আমি যাব, কে চেনে না।

মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে, টেলিফোন নামিয়ে সে ঘুরে দেখল। বিশেষ কিছু নেই পরনে। লোভও হল একবার মনে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে। মেয়েটির অশ্রাব্য গালাগালি ভেসে এল দরজার পেছন থেকে।

ব্রেসেন বারে ফোন করল ও, ঘরে ফিরে এসে ফোন তুলে। ওই বারের বার ট্রেন্ডার ফ্রেডকে ও চেনে। ও হ্যারিকে ভালো চেনে না ফ্রেড তাই বলল। হ্যারি কোনো স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িত বলেই ওর মনে হয়। তোমায় নম্বর দিয়ে ভুল করিনি তো, ফ্রেড বলল।

বলা যায় না যে কি থেকে লাভের সুযোগ আসতে পারে তাই ওকে আশ্বস্ত করল গারল্যান্ড।

বুড়োটা সমকামী এবং তরুণদের ভিড়ই বেশী এই লা ক্রোয়া দ্যের নাইট ক্লাবে। নিগ্রো ট্রামপেটার খুব মৌজ করে ট্রামপেট বাজাচ্ছে যখন গারল্যান্ড ঢুকল। ক্লাবে হইচইতে ভর্তি এবং ঘাম ও সিগারেটের গন্ধে ভারী ক্লাবের বাতাস। মেয়েলী ভাব দেখাতে এগিয়ে এল মোটাসোটা বারমান। হ্যারি মস, এসেছে গারল্যান্ড বলল।

চার নম্বর কামরায় ও অপেক্ষা করছে ডিয়ার ।

একা অপেক্ষা করছে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

গারল্যান্ড উপরে চলে গেল, একটু হেসে। স্কচ হুইস্কির বোতল, বরফ ও গ্লাস নিয়ে বসে আছে চার নম্বর কামরায় একটি যুবক।

মস

বদমায়েসীর ছাপ আছে তরুণটির চেহারায়, চেয়ার ঠেলে দিল গ্যারল্যান্ডের দিকে এবং বলল, এসেছ দেখে আমি হ্যারি মস খুশী হলাম। সিগারেট ধরাতে ধরাতে গারল্যান্ড বলল, জলদি বল, যা বলবার।

আমি নিজে করতে পারছি না, একটা খারাপ কাজ আছে। ঝামেলা হবে না পাল্টা, ত্রিশ হাজার ডলার। আধাআধি বখরা আমার এবং তোমার মধ্যে। কথাটা কি মনে ধরেছে?

মনে এটা ধরতে পারে। সত্যি কোনো ঝামেলা হবে না এটা যদি বিশ্বাস করাতে পার।

সাহায্যের দরকার আমার। তুমি যে মুখ আলগা লোক নও একথা সকলে বলল। আমার কিছু করার নেই তুমি যদি এটা রটিয়ে বেড়াও।

সবাই!

কথাটা শোন, বললাম তো আমার বন্ধু ফার্ডি নিউম্যান এবং আমি আর্মিতে থাকার সময় পশ্চিম বার্লিনে একমাস আগে ট্রাক হাইজ্যাক করে আর্মির মাইনের টাকা চুরি করি। পালাই সেখান থেকে পূর্ব বার্লিনে। সেখান থেকে কায়রো ভাগা যাবে প্রাগে গিয়ে এই ধারণা ছিল ফার্ডির। খারাপ লাগছে শুনতে?

মিষ্টি লাগে খুব টাকার কথা শুনতে চালিয়ে যাও তুমি।

চেক সিকিউরিটি পুলিশের খপ্পরে পড়লাম যখন প্রাগে পৌঁছলাম। একটি লোকের ঠিকানা পশ্চিম বার্লিনে একটা মেয়ের কাছে নিয়েছিলাম। বিশ হাজার আগেই নিয়ে নিল সে হারামজাদা। আমাদের লুকিয়ে রাখবে, খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে দেবে, ঠাণ্ডা হলে পালাবার বন্দোবস্ত করে দেবে প্রাগ থেকে, এটাই বন্দোবস্ত করা ছিল। কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না কিন্তু ব্যাটার। দে চম্পট আমাদের ওর বাড়িতে তুলে। লুকিয়েছিলাম তিনদিন না খেয়ে। কে খাবার কিনতে যাবে

তা ঠিক করা হল চারদিনের দিন টস করে। ফার্ডি গেল। পুলিশের হুইসেল শোনা গেল ও চলে যাবার তিন মিনিট বাদেই। আমি ছাদে পালালাম টাকার থলে ভুলে। ফার্ডি ছুটছে এবং দেখি দুজন পুলিশ ফার্ডির পেছনে। একজন পিস্তল চালাল ধরতে না পেরে, ব্যাস খতম হয়ে গেল ফার্ডি। চম্পট দিলাম আমি। পালিয়ে এসেছি একটা মেয়ের সাহায্যে। ওখানেই রয়ে গেছে টাকা।

কি করে জানলে যে টাকা সেখানেই রয়ে গেছে।

সেখানে খোঁজার কথা কেউ ভাববে না যেখানে আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি। বেশি জায়গা নেইনি একশো ডলারের তিনশো নোট, সেটাই আমি বলছি।

আমি পারব বলেই বা ভাবছ কেন, তুমি যখন পারনি।

ওরা নজর রাখছে আমার উপর। ওরা চেনেও না তোমাকে। প্রাগ সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট লৌহ যবনিকার ওপারে যত জায়গা আছে তার মধ্যে। বেজায় মন্দা চেকদের আর্থিক অবস্থা। ওরা পাগল বিদেশী মুদ্রার জন্য, বেজায় খাতির করে তাই টুরিস্টদের। কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না যদি তুমি ট্যুরিস্ট হিসাবে যাও। ওরা খুলে দেখবে না টুরিস্টদের ব্যাগ অবধি। যাবে আর আসবে শুধু তুমি।

তুমি পাবে বলে জানছ কি করে যদিও বা টাকাটা পাই।

বাবা এতো জুয়ার বাজি ধরা, আজ না হোক আরেকদিন ঠিক ধরব। পড়বে তখন তুমি বিপদে।

আমি ঠিক অতটা আনাড়ী নই। তবে তুমিও তো পড়তে পার।

তুমি জবরদস্ত ঝানু বলে শুনেছি। চেষ্টা করে দেখব তবু। এখন বল কি ব্যাপার, সে কথা যাক।

কোথায় লুকনো আছে টাকা ভেবে দেখি।

তোমার হাতে যখন এয়ারপোর্টে প্লেনের টিকিট দেখব তখন বলব।

খরচ করার জন্য কমসে কম দু হাজার ফ্রাঁ লাগবে। অত টাকা কে দেবে।

ওটুকু কিভাবে যোগাড় করতে হয় তা আমি জানি।

সকল দশটায় ফোন করো তখন আমি ভেবে দেখব। আমার তেমন পছন্দসই নয় ও অঞ্চলটা। সেহেতু তাই খোঁজ নিয়ে দেখ এদিক ওদিক। ট্যুরিস্ট হিসাবে গেলে কোনো ঝামেলা নেই সবাই বলবে।

আচ্ছা চলি, তাই করব। বেরিয়ে গেল গারল্যান্ড এই কথা বলে। টেলিফোন বুথে ঢুকে মস ডায়াল করল ড্রিংক শেষ করে। রুক্ষ্ম কাটাকাটা গলায় জবাব এল অন্য দিক থেকে।

মস্‌ বলল, যাবে বলে মনে হয় পার্টি। কালকের মধ্যে জানাবে।

ডোরী বলল, আমিও ভেবেছিলাম তাই, এই কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল ডোরী।

তখনি ফোন করছিল গারল্যান্ডও। সে ফোন করছিল নিউ ইয়র্কে হেরাল্ড ট্রিবিউন কাগজের সাংবাদিক বিল্‌ ল্যামপসনবো। সা ক্রোয়া দ্যোরের উল্টোদিকের কাফে থেকে। বহু খবর রাখত গিল তার ফলে গারল্যান্ডের কাজে এসেছেও বহুবার।

ল্যামপসন বলল, গারল্যান্ড না কি।

তিন চার হপ্তা আগে ঘটে যাওয়া পশ্চিম বার্লিনের একটি ডাকাতির ব্যাপারে কিছু খবর দরকার।

জান না কী তুমি কিছু?

বিল এই ব্যাপারে আমিই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

ঠিকই বলেছ, পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে ভাগে দুজন নাম লেখানো সৈন্য। হ্যারি মস এবং ফার্ডি নিউম্যান তাদের নাম। এখনো তাদের খুঁজছে পুলিশ। ওরা নাকি লৌহ যবনিকার ওপরে পালিয়েছে বলে গুজব, তুমি শুনেছ নাকি এই সমস্ত খবর। জোরদার খবর এটি, বাজার গরম করতে পারে।

রিসিভার নামিয়ে রাখল গারল্যান্ড জবাব না দিয়ে। সত্যি কথা বলেছে তাহলে মস। ক্ষতি কি? ত্রিশ হাজার ডলার, মসেদের খরচে প্রাগে ঘুরে আসা যাবে টাকা যদি পাওয়া না যায়। এটা মন্দ নয়, যাবে বলে ও ঠিক করল। তিনচার দিনে সেরে নেবে ভিসার ব্যাপারটা।

সে বাড়ি ফিরে দেখে মেয়েটি তখনা যায়নি। ও বিরক্ত হল বেজায়।

মেয়েটি সম্বোধন করল বয় ফ্রেন্ডকে, হ্যালো, চোর ঢুকেছিল তোমার বাড়িতে।

ওকে চলে যেতে বলল গারল্যান্ড। ওর কথায় কানই দিল না মেয়েটি। বলল, চোর এসেছিল বলছি না। বিরাট চেহারা লোকটার মুখ লাল। লতি কাটা ডান কানের। আমি বসেছিলাম ওপরের সিঁড়িতে আমাকে দেখতে পায়নি ও। পেশাদার বলে মনে হল লোকটিকে। তালা খুলে ঢুকল যেভাবে।

সতর্ক হয়ে উঠল গারল্যান্ড। এ অস্কার ব্রুকম্যান না হয়ে যায় না, যা বোঝা যাচ্ছে লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে। ও হ্যালোরানের পোষা গুণ্ডা ব্রুকম্যান।

গারল্যান্ডকে প্রলুব্ধ করার আশা ছাড়েনি তখনও মেয়েটি। ওর নাম রিমা বলে জানা গেল। চোরটা ছিল কতক্ষণ গারল্যান্ড বলল।

ঘড়ি দেখেছি, বিশ মিনিট।

গারল্যান্ড বুঝল কিছুই চুরি যায়নি সব ভালো করে দেখে। আসল ব্যাপার ধাঁধাঁ লেগেছে ব্রুকম্যানের। ব্রুকম্যানকে পাঠিয়েছিল কি ডোরী? এত নির্বোধ তো হবে না ডোরী। তবে কেন এসেছিল ব্রুকম্যান!

ডোরীর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অস্কার ব্রুকম্যান। নিবানো চুরুটটি চিবোচ্ছে ও হ্যালোরান এবং চোখ তার জানালার বাইরে। একটা চাপা উত্তেজনা ঘরের হাওয়ায়।

ডোরী বলল, রিপোর্ট পেয়েছি ও ব্রায়েনের, এখনো বেঁচে আছে ওয়ারদিংটন।

ও হ্যালোরান বলল, আমরা দোষ দিতে পারি না ও ব্রায়েনকে। বড় দেরিতে এসেছিল কেইনের খবর।

মামুলী ওজর তো ওটা একটা। আমরা দোষ দিতে পারি না ও ব্রায়েনকে। ও আর ওখানে ফিরতে পারছে না, কারণ মালিক ওখানে এসে পড়েছে। ওয়ারদিংটনকে যদি মালিক ধরে ফেলে? ওয়ারদিংটনকে ধরবেই। ধরলে আমরা ভালো এজেন্ট হারাচ্ছি কিন্তু দুজনেই।

কিছুই বলল না ও হ্যালোরান ও ব্রুকম্যান। অন্ততঃ এটা মনে হচ্ছে যে গারল্যান্ড প্রাগে যাচ্ছে। রাগ ওর দুচোখে। জিজ্ঞেস করলো ব্রুকম্যানকে, রিপোর্ট কি তোমার?

বেশ খুশি ব্রুকম্যান, ভালোভাবে কাজ হাসিল করে। বলল, আমি খামটা ঢুকিয়ে রেখে এসেছি গ্যারল্যান্ডের সুটকেশে। ও খামটা খুঁজে পাবে না যদি টুকরো টুকরো করে না ছেঁড়ে।

কেউ দেখে ফেলেনি তো তোমাকে?

কেউ দেখেনি স্যার।

কিছুক্ষণ ভেবে ডোরী বলল, বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা, আমরা ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢোকাতে চাই গারল্যান্ডকে সামনে রেখে ভাঁওতা দিয়ে, এটা আগেই বলেছি। ওখানে মালিক আছে সে ভালোভাবেই জানে গারল্যান্ডকে। আমাদের বদলী এজেন্ট যে গারল্যান্ড এটা ও ভালোভাবেই ধরে নেবে। গারল্যান্ডকে প্রাগে পাঠানোই এখন আমাদের সমস্যা। সত্যিই ঘটে হ্যারি মস্ এবং ফার্ডি নিউম্যানের ডাকাতির ঘটনাটি, পুলিশের গুলিতে মরে নিউম্যান এবং প্রাগে জেল খাটছে আসল হ্যারি মস্। আমার এক ভাইপো আছে ড্রামাটিক স্কুলে। গারল্যান্ডের জালে তাকে জড়ানো হয়েছে হ্যারি মস সাজিয়ে। টোপ গিলেছে গারল্যান্ড। চোরাই টাকা উদ্ধার করতে ও যাচ্ছে প্রাগে। এই অপারেশনে দরকার প্রাগে পাওয়া টাকাটা।

দেরাজ খুলে একটা মোটা খাম বের করল ডোরী এবং ব্রুকম্যানকে বলল, ত্রিশ হাজার ডলার আছে এখানে, মালা আঁচ পাবে না, মালা রীডের বাড়িতে এমন জায়গায় এটা তুমি লুকিয়ে রাখবে। টাকাটা কোথায় লুকানো আছে এটা গারল্যান্ডকে বলা হবে। তুমি নাম ফাঁস করবে না যেইমাত্র গারল্যান্ড টাকা পাবে এবং পুলিশে খবর যাবে সেইমাত্রই ফোনে। ওর স্যুটকেশে খাম পাবে পুলিশ যখন গারল্যান্ডকে গ্রেপ্তার করবে। মালিকের মনে হবে যে ওয়ারদিংটনের জায়গায় গারল্যান্ড এসেছে সেই খামের কাগজপত্র দেখে। আমরা ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকিয়ে দেব এই গোলমালের মধ্যে।

ডোরী বলল ব্রুকম্যানের হাতে একটা কাগজ দিয়ে, তোমার নির্দেশ এটি, খুবই জরুরী সময়ের

ব্যাপারটা। প্রাগে রওনা হচ্ছে গারল্যান্ড এটা যখন জানব, তখন আমি সেটা তোমায় জানিয়ে দেব। কোনো ভুলচুক যেন এতে না হয়। তুমি কিচ্ছুটি করবে না আমি না বলা অবধি।

কাগজ আর টাকার খাম নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রুকম্যান কথায় সায় দিয়ে। ও হ্যালোরানকে বলল ডোরী, ভালো হত যদি ওয়ারদিংটনকে খতম করা যেত। আমাদের বিপদে ফেলতে পারে ও।

রূঢ় ভাবে বলল ও হ্যালোরান, পুরো অপারেশনটা গোলমেলে ব্যাপার এবং অনিশ্চিত বলে আমার মনে হয়। অযথা তুমি ভেবেছ গারল্যান্ডকে তুমি বরাবরই, ঝামেলা পাকতে পারে ওকে নিয়েই তোমার। আমরা সঠিক জানি না ও প্রাগে যাচ্ছে কিনা।

ও যাবে আমি জানি।

ও না হয় গেল, ও ভাগতেও পারে তোমার টাকা নিয়ে। বেজায় ধুরন্ধর ও।

একটা বেজায় ছিঁচকের সম্বন্ধে এই ধারণা হল কি করে তোমার ? ও মোটেও নয় তেমন ধুরন্ধর, গেলে যাবে টাকা, গারল্যান্ড পাচ্ছে না টাকা। চেকরা পেলেও ক্ষতি কি সরকারী টাকা গেলে। তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে গারল্যান্ডকে উঁচু নজরে দেখাটা। ও চালু নয় তত, এটা আমি বলতে পারি।

গারল্যান্ড ডোরীকে বোকা বানিয়ে কতবার যে মোটা টাকা মেরেছে সেটা মনে পড়ল ও হ্যালোরানের। তার মনে হল এখন বাঞ্ছনীয় নয় ডোরীকে ওসব কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

ফিল্মের কার্টিজ বেব করল ওয়ারদিংটন ক্যামেরাটা খুলে। পর পর কুড়িটা ছবি ওর তুলেছে মালা। লোকটাকে কিভাবে ভাগানো যায় সেটাই এখন মালার মনোভাব।

দিন দুয়েকে মধ্যে যে চলে যাবে, সেটাই ওয়ারদিংটন বলে দিয়েছে।

সে ফিল্মটা মালার হাতে দিয়ে বলল, এটা কারেল ভ্লাস্টের কাছে নিয়ে যাবে তুমি? সেলেট্‌না উলিসে ওর বাড়ি, নতুন ছবি লাগিয়ে দেবে ও পাসপোর্টে খুব কাজের আছে বুড়ো।

মালার কথামতো ও দরজা বন্ধ করল, বাথরুমে ঢুকে যাতে পোশাক পাল্টাতে পারে মালা। মালাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি ও যদিও প্রথম দর্শনেই ও মালার প্রেমে পড়েছিল। বেড়ে গেছে ভালবাসা দুবছরের পরিচয়ে। ওর মনে মালার প্রতি লিপ্সা আরো প্রবল হয়েছে যেহেতু মালার বাড়িতে ও কয়েকদিন রয়েছে। মালা ওকে প্রত্যাখ্যান করবে ও চিরদিন জানে। ও চুপ করে থাকে সব সময় এই কথা ভেবেই। নিজের মনকে অন্য দিকে ঘোরাল ও জোর করে। এক গোপন কম্যুনিস্ট বিরোধী সভায় ওর প্রথম দেখা ভ্লাস্টের সঙ্গে। ও এক দক্ষ এনগেজার সেটা ভ্লাস্ট বলেছিল। ও একটি অভিজাত হোটেলে লিফ্‌টম্যানের কাজকরে সেই পরিচয় গোপন রেখে। একদিন ওকে প্রাগ ছেড়ে পালাতে হতে পারে সেটা ওয়ারদিংটন জানে। দরকার হবেই হবে সেদিন জাল পাসপোর্টের। ভ্লাস্টের প্রয়োজন হতে পারে সেদিন। জীবনটা দিব্যি কাটছিল। সুই[illegible] ব্যাঙ্কে কতটা টাকা জমেছিল। এই মালিক হঠাৎ এসে উদয় হল ধূমকেতুর মত। ও ব্যবস্থা করছে পালাবার সেই থেকেই। ওর দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মালিকের হাতে পড়লে এটা ও জানে। বলে ফেলতে বাধ্য হবে তখন। অনেক মূল্যবান ডোরীর কাছে ওয়ারদিংটনের চেয়ে মালা এবং কেইন। ডোরী ওকে মারতে গুণ্ডা পাঠাবে ও সব বলবে জানে বলেই। ওর অবস্থাটা এখন কি? ওকে খুঁজছে যে মালিক শুধু তাই নয়, ওকে শিকার করতে ব্যস্ত ডোরীর ঘাতকও। ওয়ারদিংটন বেরিয়ে এল দরজায় টোকা পড়তেই।

মালাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নীল জামায় নতুন করে মুগ্ধ হল ওয়ারদিংটন। মালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল এবং তারপর মালার হাতে দিল পকেট থেকে একটা খাম এবং বলল, হারিও না, এতে টাকা আছে ভ্লাস্টের জন্য। সাবধানে যাও। সঙ্গে পাসপোর্ট এবং ফিল্ম নিয়ে যেও।

বেরিয়ে গেল মালা। ভ্লাস্টের বাড়ি পৌঁছল মিনিট কুড়ি বাদে। কেউ পিছু নিয়েছে কিনা সে দেখে নিল সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় উঠবার সময়। কেউ কোথাও নেই তাই দরজায় বেল টিপল মালা আশ্বস্ত হয়ে। এক বেজায় মোটা বুড়ো দরজা খুলে দিল। ওর হাতে টাকা, ফিল্ম পাসপোর্ট দিল মালা ঘরে ঢুকে। লোকটার ডানহাতে যে ব্যান্ডেজ বাঁধা সেটা দেবার সময় হঠাৎ খেয়াল হল।

মালা বলল, চোট পেয়েছেন কি আপনি কোনো।

বেশী কাটেনি, তবে কেটে গেছে। কাটাছেঁড়া সারতে বড় সময় নেয় আমার এই বয়সে।

আপনি তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দেবেন, মিঃ ওয়ারদিংটন বললেন।

বড় বদ সময় হল এই জখমটা। কিছু তো করতে পারব না হাত না সারলে। ও টাকা গুনতে লাগল এই বলে খাম খুলে। মালাকে বলল তারপর সন্তুষ্ট হয়ে, এই সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় করে দেব।

পুলিশ এর তল্লাশীতে বেরিয়ে পড়েছে কারণ এটা খুব জরুরী।

আমি কি করব বলুন, আমি সত্যিই দুঃখিত। ওয়ারদিংটন ওর ঘরে থাকবে এখন দুসপ্তাহ। মালা এখন কি করবে, তাই মালা বলল, আগে হয় না আরো।

নিঁখুত কাজের জন্য কিছু করা সম্ভব নয় হাত ঠিক না হলে, আমি খুবই দুঃখিত এই কথা ওকে বলে দেবেন।

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মালা। ভীষণ আলোড়ন হচ্ছে মনের মধ্যে, কি করবে ও এখন।

ওয়ারদিংটন বসে মালার ঘরে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেল হঠাৎ এবং পেয়ে কান পাতল খাপ থেকে ·৩২ ক্যালিবার পিস্তল বের করে। ও আশ্বস্ত হল দরজা খুলে মালাকে ঘরে ঢুকতে দেখে।

কি হল, ও জিগ্যেস করল।

হাত কেটে গেছে ভ্লাস্টের, ও কিছু করতে পারবে না দুসপ্তাহের আগে। এখানে রাখতে পারব না আমি তোমাকে দুসপ্তাহ।

ওরা আমাকেধরবেই আমি গেলে। তুমি কতদিন বাঁচবে আমি ধরা পড়লে। ওরা কথা বলাবেই বলাবে আমাকে দিয়ে। আমায় এখানে থাকতে হবে আমার তোমার দুজনের জন্যই।

আমি কি বলব কোনো বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে তোমাকে থাকতে দিতে। এখান থেকে চলে যাব আমি।

তার সন্দেহ হবে তাতে, কোনো জ্বালাতন করব না আমি তো বলছি। তুমি কেন বুঝছো না ওরা আমাদের দুজনকেই খুন করবে যদি আমায় ধরতে পারে।

হাত মুঠো করে চেপে ধরল মালা। ঠোঁট কাঁপছে, সাদা হয়ে গেছে মুখ। ও বলল, তুমি এই বিপদে আমাকে ফেলবে কেন, কাপুরুষ! স্বার্থপর এখানে এলে কেন তুমি?

তুমি শুধু তোমার কথা ভেবে বোকার মতো কথা বলছ। দুজনেরই কথা ভাবছি আমি, আমাদের। বাজে কথা। থাক ভাবা যাক লাঞ্চের কথা ।

।। তিন ।।

বসে আছে অস্কার ব্রুকম্যান গত দুদিন প্রাগে এসে। মালা রীডকে দেখে এসেছে এর মধ্যে ও আল্‌হামব্রা নাইট ক্লাবে ঘুরে। ও মালার দেহ দেখে অন্য পুরুষ-এর মতই মুগ্ধ হয়েছে যদিও একেবারেই সুর কানা। ও দেখে এসেছে মালার বাড়িও।

গারল্যান্ড পরদিন সকালে প্রাগ যাচ্ছে এই সাংকেতিক টেলিগ্রাম ও দ্বিতীয় দিনে ডোরীর কাছ থেকে পেল। ত্রিশ হাজার ডলার খামে পুরে খামটি ব্রিফকেসে ভরে মালার ফ্ল্যাটের দিকে হেঁটে চলল মালা যখন আলহামব্রা নাইট ক্লাবে। সিঁড়ি ধরে ও স্বাভাবিকভাবে অথচ সন্তর্পণে সেখানে পৌঁছে উঠে গেল। কোনো সন্দেহই হয় না ওর চলাফেরা দেখে। ওর এখানে আসার কথা ছিল যেন। ওয়ারদিংটনের কানে পৌঁছল ওর পায়ের শব্দ।

বুক ধড়াস ধড়াস করছে ওয়ারদিংটনের। বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ·৩২ ক্যালিবারের কোল্টটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

যেন এক প্রত্যাশিত আগন্তুক এই ভেবে ব্রুকম্যান প্রথমে দরজায় বেল দিল। আবার বেল দিল একটু পরে। বাড়ির মধ্যে কেউ নেই। দরজার তালা খুলল একটা ইস্পাতের ছোটো টুকরো দিয়ে এবং আলো জ্বালিয়ে দিল দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে, ওয়ারদিংটন উঁকি মারল এবং চিনতে পারল ব্রুকম্যানকে দেখে। পোষা গুণ্ডা ও হ্যালোরানের। ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল অজানা ভয়ে। কেন

এসেছে ব্রুকম্যানের মত খুনী গুণ্ডা, তাকে খবর দিল কে। ওকে আক্রমণ করে যদি ব্রুকম্যান। পিস্তল দিয়ে, তাহলে ও কি করে আত্মরক্ষা করবে।

ঠিকই জানত মনে মনে ওয়ারদিংটন, আরেকজনকে মারতে পারবে না ও কোনো দিনই পিস্তল চালিয়ে। ওর মন বড় দুর্বল এবং বড় মমতা মনে। ও বারান্দায় বসে রইল নিশ্চল হয়ে। সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে কয়েক মিনিট বসে রইল। ও উঁকি মারল তারপর সাহস সঞ্চয় করে, ব্রুকম্যান কি যেন ভাবছে একটি মানুষ প্রমাণ দেবদূতের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে। জামা আলগা, ফাঁপা মূর্তিটি কাঠের তৈরী।

ব্রুকম্যান দেবদূতের মাথা তুলে নিয়ে মাটিতে রাখল হঠাৎ কি ভেবে। মাথাটি আবার বসিয়ে দিল। ব্রিফকেশ খুলে একটি ছোটো প্যাকেট নিয়ে মূর্তির মধ্যে রেখে। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল তারপর ব্রিফকেস তুলে নিয়ে। কেবলমাত্র দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল এবং তারপরই সবকিছু চুপচাপ।

ওয়ারদিংটন নিজেই অবাক হল নিজের সৌভাগ্যে। ওয়ারদিংটন আলো জ্বালল ঘরে ঢুকে এবং একটি ইজিচেয়ারে এলিয়ে গেল মূর্তির দিকে চেয়ে। ভয়ে অসহায় স্তম্ভিত। যেহেতু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। অবসাদ নেমে এল শরীরে। কোনো অঘটন যে ঘটেছে এটা মালা বুঝল ওয়ারদিংটনের ঘামে ভেজা মুখ দেখে।

কি হয়েছে মালা বলে উঠল।

আমি লুকিয়েছিলাম কারণ ব্রুকম্যান এসেছিল।

কি বলছ তুমি, কে ব্রুকম্যান?

ডোরীর লোক ও, আমাকে খুন করতে এসেছে এটা ওকে দেখেই ভেবেছিলাম।

মালা শিউরে বলল, তোমায় খুন করবার কারণ কি?

আমি ধরা পড়লে তোমার আর কেইনের কথা ফাঁস করে দেব এটা ডোরী জানে, ও আমাকে যে মারতে আসেনি এটা আমি পরে বুঝলাম। একটা প্যাকেট রেখে চলে গেল ও দেবদূতের মূর্তির মধ্যে। তোমাকে দিয়ে যায় নাকি ওখানে ওরা চালাচালি করবার খবরাখবর।

কি রেখে গেছে ও ওখানে, বকছ কি তুমি?

জিনিষটা কি দেখাই যাক না।

ছেড়ে দাও আমাকে আমি জানতে চাই না।

সত্যি কথা বলছো তো আমাকে, ও ব্যবহার করে না এই জায়গাটি জিনিষ লুকোবার জন্য।

আমি কিছু জানতে চাই না, এটা কখনোই নয়।

তুমি খুকীপনা করছ। আমি জানি তুমি সি. আই. এ এজেন্ট, তুমি সি. আই এ-তে খবরাখবর দিয়েছ কেইন এবং আমার হাত দিয়ে। এবং সেজন্য টাকাও তুমি পেয়েছ। ওদের কাজ করতেই হবে তোমাকে, এমনকি, তার সঙ্গেও কাজ করতে হবে যে আসবে আমার জায়গায়।

মালা চেঁচিয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে এবার যাও তুমি, কেউ আমার উপর জোর খাটাতে পারবে না, কাজ করব না আমি আর ওদের হয়ে।

ওর দিকে চাইল ওয়ারদিংটন চোখে অনুকম্পা নিয়ে। মালার মনের ভয়ের পরিমাপ ও করতে চাইছে। কোমল গলায় বলল ও, তুমি উতলা হয়ো না, টাকা খেয়েছ ওদের তুমি, ওরা তোমায় ছেড়ে দেবে যদি ওদের তোমায় ছেড়ে দেবে যদি ওদের তোমায় দরকার না হয় কিন্তু তুমি ওদের ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না স্বেচ্ছায়। একমাত্র উপায় ওদের হাত ছাড়ানোর আমার মতে পালানো। ওরা তোমায় খুন করে ফেলবে নইলে।

বিশ্বাস করি না আমি।

আমি কেন পালাচ্ছি বলে তোমার মনে হয়, আমি তৈরি ছিলাম, এরকমটা ঘটবে বলে। মালা আমি তোমায় ভালবাসি, যদি এখন সে কথা বলার সময় নয়, তবু বলছি। সেই প্রথম দিন থেকেই। ও থেমে গেল মালার মুখ দেখে।

ও কুঁকড়ে গেল মালার মুখের ভয় এবং তাচ্ছিল্য দেখে।

আমাকে ভালবাস তুমি, মালা বলল।

তাহলে কি আমায় তুমি এই বিপদে ফেলতে পারতে, নিজেকে ভালবাস শুধু তুমি।

ভেবেছিলাম তোমার কাছে অন্তত একটু সহানুভূতি কারণ আমার আর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই।

তোমাকে কতবার বলতে হবে, তুমি আমার কেউ নও, চাই না, চাই না আমি তোমাকে এখানে।

একসঙ্গে সুইজারল্যান্ডে যাই আমরা চল, তোমাকে জাল পাসপোর্টও করে দেবে ভ্রাস্ট। আমার সঙ্গে তুমি থাকবে কিনা ঠিক করো জেনিভা পৌঁছে। আমার অনেক টাকা আছে জেনিভার ব্যাঙ্কে।

তুমি চলে গেলে আমার কোনো বিপদ থাকবে না। এখানেই থাকব আমি।

একথা বলতে পারে না কোনো এজেন্ট।

চলে যাও, তুমি যাও না।

ব্রুকম্যান কি রেখে গেল সেটা আগে দেখি।

ছেড়ে দাও, না।

হ্যারি মস সেখানে অপেক্ষা করছে যখন গারল্যান্ড ওরলি এয়ারপোর্টে পৌঁছল, ওকে টিকিট দিল মস্। গারল্যান্ড ও মস একটি বেঞ্চে বসল সুটকেসটা জমা রেখে। গারল্যান্ডকে এক টুকরো কাগজ মস পকেট থেকে দিয়ে বলল, ঠিকানা হচ্ছে এটি, টাকাগুলো আছে কাঠের তৈরী একটি দেবদূতের মূর্তির মধ্যে। আলগা বসানো মূর্তিটির মাথা। তিনদিনের টিকিট তোমার, শনিবারের রিটার্ন টিকিট। এখানেই অপেক্ষা করব আমি।

গারল্যান্ড বলল নীরস গলায়, কাঠের দেবদূত মূর্তি। আমি জানি সেটি।

চোখে না পড়ে পারবে না তোমার। এটি আছে ঘরের বাঁদিকের কোণে।

কেউ থাকে না কি ফ্ল্যাটে।

প্রাগে মুশকিলে বাড়ি পাওয়া যায়, তাই ঠিক বলতে পারি না।

আরেকটু বলতে পার কি, জায়গাটা কেমন?

চারতলার ফ্ল্যাট এবং তাতে কোনো কেয়ারটেকার থাকে না। অতি মামুলী ব্যাপার। ঢোকার সময় যে কেউ দেখে না ফেলে সেটা শুধু তুমি খেয়াল রেখো।

রাহাখরচের টাকা? ঠিকানাটা পেলাম।

বাজে খরচ করো না, এক হাজার ফ্রাঁ নাও, ফতুর হয়ে গেলাম আমি।

চললাম, আমায় না দেখলে মূর্ছা যেও না শনিবার, ব্যাপারটা অনেক ঝামেলার তুমি যা ভাবছ তার থেকেও।

আমি শনিবার এখানেই থাকব, কিছু হবে না।

গারল্যান্ড প্লেনে উঠল মিনিট পনেরো বাদে। মিষ্টি হাসল এয়ার হোস্টেস। পাল্টা হাসল গারল্যান্ড। ওকে বেজায় পছন্দ করে এয়ার হোস্টেসরা চিরকালই। প্রথম শ্রেণীর সিটে ও আরাম করে বসল এয়ার হোস্টেসটির সহায়তায় নিজের সীট ছেড়ে। খুব একটা ভালো চোখে অবশ্য ব্যাপারটা দেখল না অন্য লোকরা। গারল্যান্ড বসল ডবল স্কচ হাতে নিয়ে।

মাথায় নানান চিন্তা গ্যারল্যান্ডের। ওর ঘরে কেন এসেছিল ব্রুকম্যান। গারল্যান্ড তল্লাস করছে ঘর তন্ন-তন্ন করে, কোনো গুপ্ত মাইক্রোফোন বসায়নি তো ডোরী ওর ঘরে। কোন ভাবে ওকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছে কি ডোরী। খুব সুবিধার লাগেনি ওর হ্যারি মসকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র যেন হলিউডের। ওকে মনে হয় না আসল মস। প্রাগে আগে যাওয়া যাক, তারপর কি হয় সেটা দেখা যাবে, এটাই ভাবল ও:

হ্যারী মস ডোরীকে ফোন করল প্লেন আকাশে উঠার সঙ্গে সঙ্গে। রওনা হয়ে গিয়েছে। টোপ গিলেছে। কিছু করার আছে কি আর।

ধন্যবাদ অ্যালান। কিন্তু টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বাবা টাকাটা যেন কম না হয়। ব্রুকম্যানকে একটি তার পাঠাল ডোরী ফোন নামিয়ে রেখে— তোমাকে চেনে গারল্যান্ড। পড়ে যেও না ওর সামনাসামনি, বোকা ঠাওরিও না ওকে, চাই-চাই

এ অপারেশন উৎরোনো।

চেয়ারে বসল ডোরী হেলান দিয়ে তার পাঠিয়ে। বেজায় খুশি আজ ও।

একটি বদ্ধ ঘর। মিনিস্ট্রি অফ ইনটিরিয়ারের অফিসটি বিরাট ঘর। প্রাগ গুপ্ত পুলিশের প্রধান ঘাঁটি এই বিশাল দুর্গের মত বাড়িটি। তিনটি লোক বসে ঘরে একটি টেবিল ঘিরে।

শহরের রাস্তার একটি ম্যাপ দেখছিল গুপ্ত পুলিশের দুনম্বর লোক সুক। ওর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ঢেকে রেখেছে এক টুকরো প্লাস্টার। মালিক হল দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে ম্যাপ দেখছে এবং সবুজ সর্পিল চোখে সুককে দেখছে। বোরিস স্মেরনফ্ তিন নম্বর। নিষ্ঠুর মুখ এবং বলিষ্ঠ ভারী চেহারা। পিস্তল চালাতে ওস্তাদ। ও মালিকের ডান হাত। ওর মতো দুর্দম, নাছোড়বান্দা মানুষ শিকারী দুটি নেই সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বাহিনীতে।

ওর পালাবার কোনো পথ নেই। সুক বলল, টোকা মারল ম্যাপটায় আঙুল দিয়ে, সময় মতো ঠিক ধরা দেবে, ও লুকিয়ে আছে এখানে কোথাও।

ইংরাজীতে কাটা কাটা বলল মালিক, সময়টা কোনো জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় তোমার মতে। এই ব্যাপারটা ঘটল কমরেড তোমার গাফিলতির জন্য। আমি আগেই সাবধান করেছিলাম কমরেড তোমাকে ঐ লোকটির বিষয়ে। ও নিখোঁজ এখনও। সময়মতো ও ঠিক ধরা পড়বে একথা তুমি বলছ। তোমার কথাই ঠিক, বেশ ধরে নিলাম। বল কি ব্যবস্থা নিয়েছ।

কপালের ঘাম মুছল সুক। মালিকের দিকে চাইল না কিন্তু বলল, যে ব্যবস্থা করেছি যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে। খোঁজখবর নিচ্ছি এখন, লুকিয়ে রেখেছে কেউ ওকে। তল্লাশী করা হয়েছে প্রতিটি হোটেলে। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে এয়ারপোর্ট আর ফ্রন্টিয়ার পোস্টগুলিকে।

ওকে থামিয়ে দিল মালিক হাত নেড়ে। বলল, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই ও ধরা পড়লে।

হ্যাঁ মালিক কমরেড।

এটা খুবই জরুরী যে কে আসছে ওর বদলীতে। পাঠাবেই ওরা বদলী। প্রত্যেকের বিষয়ে বিশদ জানতে চাই যারা প্লেনে, ট্রেনে বা গাড়িতে প্রাগে আসছে। কাউকে ডোরী পাঠাতেও পারে। তবে এখনি পাঠাবে বলে মনে হয় না। বুঝলে তাকে বেশি করে নজরে রাখবে যদি কোনো লোককে সন্দেহ কর।

হ্যাঁ, কমরেড মালিক।

যাও এবার খুঁজে বার কর ওয়ারদিংটনকে। সুক উঠে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

স্মেরনফের দিকে তাকিয়ে মালিক বলল, কি রকম বুঝছ।

ইন্টারেস্টিং। জোনাথন কেইন নামক লোকটা কেনে কাঁচের জিনিস। দুবার প্রাগে আসে মাসে। ডোরীর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে চারদিন আগে। রুটিন মাফিক খবর পাঠিয়েছে প্যারিসের এক অভিজাত রেস্তোরাঁ শেজ জোসেফের এক ওয়েটার। বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি মালিকনভ ওর খবরটার রিপোর্টে। ডোরী প্রায়ই এর তার সঙ্গে লাঞ্চ খায় সে বলেছে।

কি জান কেইনের বিষয়ে, উজবুক মালিকনভ।

কিছুই বিশেষ জানি না। একজন পুরোপুরি আমেরিকান ব্যবসায়ী, অ্যালহামব্রা নাইট ক্লাবে যায় যখন প্রাগে আসে। আমি গিয়েছি অ্যালহামব্রা নাইট ক্লাবে। ভালোই খাওয়া দাওয়া। গান গায় একজন মেয়ে। মেয়েটির মা মার্কিন, বাবা চেক। বাবার মৃত্যুদণ্ড হয় কারণ সে সরকার বিরোধী ছিল। মালা রীড মেয়েটির নাম।

কোনো যোগাযোগ আছে কেইনের সঙ্গে মেয়েটার।

কেইন, ওর ফ্ল্যাটে যায়নি কিন্তু বহুবার ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে ওকে।

মেয়েটির উপর নজর রাখ বোরিস। সময় হয়তো খানিকটা নষ্ট হবে কিন্তু বুঝলে আমি সব খবর চাই মেয়েটির।

স্মেরনফ বেরিয়ে গেল, আমিও চাই, এই কথা বলে।

কেইন, ওয়ারদিংটন এবং সম্ভাব্য এজেন্টের কথা মালিক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কথাটা ঠিক হয়তো সুকের। সব শিকারই জালে পড়ে এদেশে সময় এবং ধৈর্য থাকলে।

ওয়ারদিংটন কাঠের দেবদূতের মূর্তির ভেতর থেকে বের করা প্যাকেটটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ও বলল, এটা নিশ্চয় তোমায় ফাঁসাবার জন্য। দেখেছ, বললাম না ডোরীকে আমরা কোনো বিশ্বাস নেই, আমি এটা বুঝেছি।

কোনো ভয় লুকোবার চেষ্টা না করেই মালা বলল, আমি কি করেছি, কেন?

খুলেই দেখা যাক দাঁড়াও? কি জানি।

মালার বাধা উপেক্ষা করেই ওয়ারদিংটন প্যাকেট খুলে ফেলল ছুরি দিয়ে প্যাকেটের উপরকার সেলোটেপ খুলে। খুলে দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে নোটের তাড়া দেখছে। কম্পিত আঙুলে নোটের তাড়া গুনতে শুরু করল ওয়ারদিংটন। ত্রিশ হাজার ডলার, ও বলল গোনা হয়ে গেলে।

ওর পাশে বসে পড়ল মালা ধপ করে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে। বলল, মানে কি এর।

আমার বদলে যে আসছে তার খরচার টাকা এটি, এটিই এর একমাত্র মানে, ওরা কোনোদিন দেয়নি আমাকে এত টাকা, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই বদলী লোকটা। এখানে টাকা রেখে গেছে তাই ব্রুকম্যান। খবরাখবর কেনার টাকা এটি। আমাকে যে খরচার খাতায় লিখেই ফেলেছে ওরা, এটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে এসে টাকাটা নেবে আমার বদলী এই নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না ওরা যে তোমার কি বিপদ হতে পারে।

কেঁপে উঠল মালা।

ওয়ারদিংটন বলল, কোনো অধিকার নেই ওদের এরকম করার, মালা তোমার কোনো ঝামেলাই হবে না, এ টাকা থাকলে প্রাণ ছেড়ে পালাতে। স্বাধীন হয়ে যেতে পার তুমি। আমার সঙ্গে জেনিভা যেতে পার তুমি পাসপোর্ট খরিদ করে। তুমি কেন ওদের কথা ভাববে, ওরা তো তোমার কথা ভাবেনি।

আমি ও টাকা ছোঁব না। আমার নয় ও টাকা।

বড় বোকা তুমি।

আমি চোর নই, যদিও বোকা।

চোর হওয়া বোকা হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল, যেখানে প্রাণ বাঁচাবার প্রশ্ন।

ঘুমোতে চলে গেল মালা। ঠিক করল ওয়ারদিংটন, ওই নিয়ে নেবে টাকাটা। মালা উঠে এসে দেখে কিছুক্ষণ বাদে যে, ওয়ারদিংটন মূর্তির ভেতর খবরের কাগজ দিয়ে প্যাকেট বেঁধে ঢুকিয়ে রাখল।

মালা বলে উঠল, তুমি কি করছ।

আমি বোকা নই, তুমি বোকা হলেও। আমি বুঝি টাকার দাম। তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি আমি। কি জালে জড়িয়েছ সেটা তুমি বুঝছ না। তোমার স্বার্থ আমি দেখব, তুমি সৎই থাক।

উদ্বেগ এবং আন্তরিকতা ওয়ারদিংটনের চোখে দেখে মালা বলল, একটু ইতস্ততঃ করে, টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে?

কেউ জানবে না মূর্তির নীচে লুকিয়ে রাখব।

আমি দুঃখিত অ্যালেক তুমি আমায় কি চোখে দেখ সেটা আমি জানি। আমি তোমার সঙ্গে সুইজারল্যান্ড যাব, তোমার যদি মনে হয় যে আমি পারব।

ওয়ারদিংটন বুঝল, ওর মত যদিও ও নয় বদলে গেছে টাকা দেখে, তাই ও বলল, তোমার জন্য বিট্রিশ পাসপোর্ট জোগাড় করে দেব কালই ড্রাস্টের সঙ্গে দেখা করে।

অ্যালেক তোমাকে ধন্যবাদ, কি করব বল, তোমাকে আমি ভালবাসি না, বড্ড ভয় করছে আমার কিন্তু।

আমারও ভয় করছে, তুমি দেখো আমরা ঠিক পালাব কিন্তু। আমাকে তোমার ভালোও লাগতে পারে হয়তো জেনিভায় পালালে।

ওরা যখন কথা বলছে, তখন মালার ফ্ল্যাটের উপর নজর রাখছিল, মালার ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের বাসিন্দাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে দুজন বলিষ্ঠ লোক।

মালা এখন বেড়াজালে গুপ্তচরদের বন্দী স্মেরনফের হুকুম অনুযায়ী।

ডোরীর আপিসে ঢুকল ও হ্যালোরান। ও প্যারিসে ছিল না গত তিনদিন। ওকে দেখে হেসে বসতে বলল ডোরী।

ডোরী বলল, কাজ ভালই এগোচ্ছে এদিকে। গারল্যান্ড প্রাগে যে পৌঁছেছে এটা ব্রুকম্যান খবর পাঠিয়েছে। ল্যাটিমারকে পাঠাব গারল্যান্ড ধরা পড়লেই। সেটা দুদিনের মধ্যেই হবে। তড়িঘড়ি কাজ সারে তো গারল্যান্ড। ওর ওপর নজর রাখছে ব্রুকম্যান।

আর কেউ আছে ওখানে? একা সামলাতে পারবে তো ব্রুকম্যান?

আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে ওর ওপর, ও পারবে।

ভাবতাম আমি হলেও। কেউ থাকলে হত ব্রুকম্যানের সঙ্গে। গারল্যান্ড বড় ধড়িবাজ। ব্রুকম্যান গেল, যদি একবার ও আঁচ করতে পারে যে ব্রুকম্যান ওর উপর নজর রাখছে।

টিম তুমি বড় মন্দ দিকটা দেখ। সামলে চলবে ব্রুকম্যান।

আমি আরো নিশ্চিন্ত হতাম যদি ওর সঙ্গে কেউ থাকত।

আমার ওপরেই ছেড়ে দাও এটা তুমি। আসা যাক আসল কথায়। একটা জরুরী নির্দেশ এসেছে গত হপ্তায় জয়েন্ট চিফ্‌স অফ স্টাফের কাছ থেকে। আমার নিজের হাতেই রেখেছি এটি কারণ এটি একটি টপ সিক্রেট। এটা আমাদের ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, এইসব নিয়েই চিঠিটা লেখা যদি রাশিয়া বাধাদান করে তো তাহলে আমরা কি করব। ডাইনামাইট একেবারে। প্রেসিডেন্ট জনসন যখন নিজে সই করেছে তখন মনে হয় যে এটি যা করেছে জেনে করেছে। একটি পাতা আছে ভিয়েতনামে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে। দেখা উচিত পড়ে আমাদের।

ও হ্যালোরানকে সেফ খুলে ডোরী একটি লম্বা সাদা খাম খুলে বের করে দিল। ও হ্যালোরান দুটি কাগজ বের করল খাম থেকে এবং তারপর সেটি পড়ে বলল, ভুল খাম দিয়েছ তুমি আমায়।

কি বললে?

সে চিঠি তো নয় এটি, এটা কোডের ফর্মুলা যা গত মাসে বাতিল করা হয়েছে।

কি বললে?

ডোরী ছিনিয়ে নিল কাগজ দুটো। ওর মুখ সাদা হয়ে গেল কাগজটা দেখে। পাঁশুটে হয়ে গেল এবং রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। ডোরীর যে হার্ট অ্যাটাক হবে। ও হ্যালোরানের সেই ভয়টাই হল।

কাউকে ডাকব। কি হল।

আমাকে ভাবতে দাও, তুমি চুপ কর।

সব কাগজপত্র ডোরী দেখল সেফ খুলে।

ওর ঠোঁট চাপা কঠিন, সাদা মুখ বুড়িয়ে গেছে। চোখগুলো যেন জ্বলছে।

ও বলল, আমি অমার্জনীয় ভুল করেছি টিম, ব্রুকম্যানকে সেদিন যে কাগজগুলো দিলাম গারল্যান্ডের সুটকেশে রাখবার জন্য, সেগুলো একটা টপ সিক্রেট লেখা খামে পুরেছিলাম চেকদের ধাঁধা লাগাবার জন্য। ব্রুকম্যান যখন ঢুকল তখন চিফ্‌স অফ স্টাফের চিঠিটা আমার টেবিলের উপর রাখা ছিল। ভুল খাম দিয়েছি আমি ব্রুকম্যানকে। আমার মনে হয় এই টপ সিক্রেট চিঠি নিয়ে গারল্যান্ড অন্য কোথাও নয় প্রাগে নিয়ে চলে গেছে। আমি খতম হয়ে যাব প্রলয় ঘটে যাবে যদি এই চিঠি রাশিয়ানদের হাতে পড়ে।

হতবাক এবং হতভম্ব কিছুক্ষণের জন্য হয়ে রইল ও হ্যালোরান। গুপ্তচর বিভাগের কর্তা হল সে, তার মাথা বিদ্যুৎগতিতে কাজ করতে শুরু করল একটু পরেই।

ও বলল, আমি তার পাঠাচ্ছি এখন ব্রুকম্যানকে। খামটা উদ্ধার ও করবে। গারল্যান্ড তো আসছে না দুতিনদিনের আগে। আমরা বাতিল করে দিচ্ছি এ অপারেশান। চেক পুলিশ গারল্যান্ডকে আটকাবে না, গারল্যান্ডের কাছে টাকা আছে এ কথা যদি ব্রুকম্যান চেক পুলিশকে বাৎলে না দেয়। দুদিকেই সুবিধা আমাদের। খামটা উদ্ধার যদি ব্রুকম্যান নাও করতে পারে। তবু চেক পুলিশ গারল্যান্ডকে আটকাচ্ছে না টাকার কথা না জানলে। কথাটা ঠিক বলিনি।

ডোরী আস্তে বলল, গারল্যান্ডকে মালিক আটকাতে পারে কারণ মালিক এখন ওখানে আছে।

তা হলেও উদ্ধার করতেই হবে ব্রুকম্যানকে খামটা।

তুমি কি বলেছিলে টিম, ও কি পারবে, আর কাউকে দিলে হত ব্রুকম্যানের সঙ্গে। এটা অসাধ্য কাজ ওর একার পক্ষে।

আর কাউকে পাঠাবার সময় নেই, তাই ওকে পারতেই হবে।

ডোরী তার লিখতে লাগল ব্রুকম্যানকে পাঠাবার জন্য। ডোরীর তারিফ করল ও হ্যালোরান মনে মনে। সর্বনাশের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াই আরেক বিশ্বযুদ্ধে দাঁড়াতে পারে ওর এই ভুলের জন্য। তবু ওর মাথা ঠাণ্ডা। লোকটা তৈরী লড়বার জন্য সর্বনাশ বাঁচাতে।

ডোরী ও হ্যালোরানকে তারটা দিয়ে বলল, চলবে?

গুপ্ত সংকেতিক কোডে লিখে দিল, এটা চলবে।

হ্যাঁ, এ খবর আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ যেন না জানে, যতক্ষণ পারা যায় চেপে রাখতে হবে। ওয়াদিংটনকে জানাতেই হবে যদি ব্রুকম্যান ব্যর্থ হয়। নিজের গলায় ছুরি বসানো এটা করার মানে। ও হ্যালোরান তারটা হাতে নিয়ে বোর্ড এবং সাইফার ডিভিশনের দিকে দৌড়ে গেল কাউকে কিচ্ছু না বলে।

।। চার ।।

গারল্যান্ডকে কোনোদিনই তেমন গুরুত্ব দেয়নি ব্রুকম্যান। লোকটা তেমন কিছু নয় ও ভাবত, কেবল বরাত জোরে উৎরে গেছে, সি. আই. এর জন্য যখন কাজ করছে। গারল্যান্ড লম্পট, যদিও ভালো পিস্তল চালায় এবং দক্ষ ক্যারাটে যোদ্ধা। ও ক্ষমা করতে পারত না ওই একটি দোষ। ও সব সাবধানতা অবলম্বন করত যদি ও গারল্যান্ডকে সাচ্চা পেশাদারী মনে করত। কিন্তু ব্রুকম্যান তা করেনি যেহেতু ও গারল্যান্ডকে তাচ্ছিল্য করত। এক সাংঘাতিক ভুল ও করে বসল তার ফলেই ব্রুকম্যান।

ব্রুকম্যানকে দেখে ফেলল গারল্যান্ড অ্যালক্রম হোটেলের খাতায় নাম লেখার সময়। ও সজাগ হয়ে উঠল ওকে দেখা মাত্রই। এখানে ব্রুকম্যান কেন? ও ভাবতে লাগল নিজের ঘরে বসে হোটেলে, ব্রুকম্যানের প্যারিসের ফ্ল্যাটে যাবার সঙ্গে কি ওর এই প্রাগে আসার কোনো সম্পর্ক আছে?

ওর মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল হঠাৎ। সম্পর্ক আছে নিশ্চয়। ওঃ আমি কি বোকা। ওর নিজের উপর ধিক্কার এল। ওর সুটকেশে কিছু গছিয়ে দিয়েছে নিশ্চয় ব্রুকম্যান। লৌহ যবনিকার ওপারে সেটি নিয়েই ও প্রাগে এসেছে।

ভালো করে দেখতে লাগল গারল্যান্ড নিজের সুটকেশ বের কবে। কিছুই বোঝা যায় না বাইরে থেকে। ও সুটকেশের লাইনিং এ ছোট একটু জায়গা কাটল ছুরি দিয়ে। তারপর ছিঁড়ে ফেলল পড়পড় করে লাইনিংটা। একটি সেলোটেপে আঁটা সাদা খাম রয়েছে। সুটকেসের তলায়। একটা লাল ছাপ তার উপর।

এইটি যে একটি টপসিক্রেট ডকুমেন্ট তা বুঝল গারল্যান্ড ছাপ দেখেই। দুটি পাতলা কাগজ ও বের করল খাম ছিঁড়ে ভিতর থেকে। পড়ল বার তিনেক। কাগজগুলোতে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সই রয়েছে বলে ও লক্ষ্য করল। ওর খুবই চেনা এই সই। টাইপ করে লেখা কাগজগুলির উপর।

ফ্রম দি জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ্, টপস ওনলি। তার নিচে লেখা :

ফর সেক্স্টেট

ফর অল্ অ্যামবাসাডারস

ফর সি. আই, এ ডিভিশনাল হেড ওনলি (কপি ২২)

সাংঘাতিক ঘটনা, এটা রাশিয়ানদের হাতে পড়ুক সেটাই কি উদ্দেশ্য? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো লাগতে পারে এর থেকে। সুতরাং অর্থ কি এটার!

গারল্যান্ড কর্মরত এজেন্ট নয় এখন! ও ভোলেনি তবু ওর প্রশিক্ষণ। রীতিমতো ওয়াকিবহাল ও রাজনীতির বিষয়ে। গারল্যান্ড সে বিষয়ে নিশ্চিত সে লৌহ যবনিকার ওপারে এই সর্বনাশা ডকুমেন্ট চলে আসবে তা জয়েন্ট চিফ্স অফ স্টাফ কখনো চাইবে না। ডোরীই হয়তো তবে ভুল

করেছে। ডোরী কি তার মানে ডবল এজেন্ট হয়ে গেছে? প্যারিসের বাইরে ওকে দিয়ে কাগজটা পাঠাতে চেয়েছে ও কি গ্যারল্যান্ডের অজান্তে?

গারল্যান্ড ভেবে বলল, হতে পারে না তা ; ডবল এজেন্ট তবে হয়তো ব্রুকম্যান, তাও হতে পারে না। ব্রুকম্যানের যে সন্দেহ হবে তা এতো ফটো কপি নয়। আসল জিনিষ এটি। খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে সেটি খোয়া গেছে। কোথাও চালে ভুল করেছে হয়তো ডোরী। পরোয়া করবো কেন আমি। নিজেকেই জিগ্যেস করল গারল্যান্ড। ল্যাজে খেলানো হয়েছে আমাকে শুধু বোকা বানিয়ে। সবই ভুয়ো ঐ কাঠের দেবদূত মূর্তি এবং ত্রিশ হাজার ডলার। বিগড়ে গেল ডোরীর কোনো পরিকল্পনা। ব্যাপারটা কি তাহলে।

কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলে একবার ভাবল, আরো ভালে হয় এটি, সে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল, যদি ডোরীকে জব্দ করা যায় এই কাগজগুলির সহায়তায়। এবার ডোরীর পালা, অনেক জ্বালিয়েছে ডোরী।

ও ড্রেসিংটেবিলের মাঝের দেরাজটা নামাল কাগজগুলো খামে পুরে, সেঁটে রাখল খামটা, দেরাজের ফোকরের ওপরের দিকে। ঢোকাল আবার দেরাজটা। এতেই কাজ চলবে এখনকার মতো। তারপর নীচে নেমে ভাল করে লাঞ্চ খেল। তারপর হ্যারি মসের দেওয়া ঠিকানা খুঁজে বার করল প্রাগের রাস্তার একটি ম্যাপ কিনে। মালা রীডের ঠিকানা আসলে এটি। পথটা দেখে আসা যাক, এটাই সে ভাবল, ব্রুকম্যান ওর পিছু নিয়েছে কিনা তা চলবার সময়ে ও দেখে নিল। না, কেউ পিছু নেয়নি।

দুশ্চিন্তার দরকার ছিল না ব্রুকম্যানের। ডোরীর সাংকেতিক তারটি পেল ও নিজের হোটেলে ফিরে গিয়ে। ওর মাথায় বাজ পড়ল, তারটি পড়ে ও যা বুঝল। ও পড়ল সংকেত উদ্ধার করে, ভীষণ জরুরী এখনি ফেরত চাই গারল্যান্ডের সুটকেসের কাগজ। টপসিক্রেট ওগুলো। যে কোনো রফা কর ওর সঙ্গে। ওকে খতম কর দরকার হলে। কাগজ ফেরত চাই, তা যেভাবেই পার, ডোরী।

ব্যাপার ব্রুকম্যান কিছুই বুঝল না। ও নিজেও অস্থির হয়ে উঠল কিন্তু তাগাদা পেয়ে। কাগজ ফিরে পেতে থাকগে কোনো অসুবিধা হবে না। ওর স্যুটকেশে যে কাগজগুলো লুকানো আছে তা গারল্যান্ড জানেই না। ও পুড়িয়ে ফেলল ডোরীর তারটা। ও গারল্যান্ডের হোটেলের দিকে রওনা হল একটি ৩২ ক্যালিবার অটোমেটিক এবং একটি তিন ইঞ্চি সাইলেনসার নিয়ে। গারল্যান্ডকে খতম করতেই হবে, কোনো রফার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা ওর নেই। যা ধড়িবাজ লোক।

মিঃ গারল্যান্ড এখানে, উঠেছেন কি? ও গারল্যান্ডের হোটেলে পৌঁছে হেড পোর্টারকে জিজ্ঞেস করল। খাতা দেখে হেড পোর্টার বলল, ৩৪৭ নম্বর ঘরে স্যার, কিন্তু মিঃ গারল্যান্ড বেরিয়ে গেছেন এখন। কোনো খবর রেখে যেতে চান আপনি?

ব্রুকম্যান বলল, আমি পরে ফোন করব, ঠিক আছে। লবিতে ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। তারপর লিফ্‌টে উঠে তিনতলায় পৌঁছল হেড পোর্টারের নজর এড়িয়ে।

ও গারল্যান্ডের দরজার তালা খুলল ইস্পাতের পাতলা রড দিয়ে। চমৎকার ঘরটি সাজানো। ও অসন্তুষ্ট হল। ওর মনে পড়ল নিজের হোটেলের ছোট, নোংরা ঘরটির কথা ভেবে। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল স্যুটকেশ খুলে। ও ঘরে কোনো তল্লাশি করল না। ওকে ঘর লন্ডভন্ড করতে হবে, কারণ হয় গারল্যান্ড খামটা সঙ্গে নিয়ে গেছে নয়তো বা কোথাও লুকিয়েছে। তাহলে রিপোর্ট গেলে সিকিউরিটি পুলিশের হাজির হওয়াটা ব্রুকম্যান চায় না।

গারল্যান্ডের সঙ্গে রফাই করতে হবে তাহলে। গারল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ব্রুকম্যান পিস্তলে সাইলেনসার লাগিয়ে। কাগজগুলো নিশ্চয় পড়েছে গারল্যান্ড। ও ডোরীকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, যদিও টাকার জন্য কাগজগুলো হাত ছাড়া করে। তাতেই রাজি হতে হবে এবার ব্যাটা যা চায়। ও গারল্যান্ডকে খুন করবে ব্রুকম্যান খামটা হাতে এসে গেলে। ব্রুকম্যান প্রাগ ছেড়ে উধাও হবে একটি নিঃশব্দ গুলির পরে।

মালা রীডের বাড়িতে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে গারল্যান্ড। ও মালার দরজায় বেল টিপল ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলল একটু বাদেই। গারল্যান্ড বেজায় খুশি হল মালাকে দেখে। কারণ

খাসা মেয়ে মালা। মালার পরনে আঁটো হয়ে বসে থাকা একটি নীল পোশাক, সে এটি দেখল চোখ বুলিয়ে।

গারল্যান্ড বলল, আপনি কি ইংরেজী বলতে পারবেন, মাপ করবেন।

ভ্রাস্ট এসেছে মালা ভেবেছিল। ও বুক ধড়াস করে উঠল লম্বা চওড়া চেহারার আমেরিকানটিকে দেখে। ও বলল, কি চাই, হ্যাঁ।

কাঠের দেবদূতের মূর্তিটি গারল্যান্ড ঘরের কোণে দেখতে পেল। এটুকু অন্তত সত্যি হ্যারি মসের কথাটা। ও বলল, এখানে কেউ থাকে হ্যারি মস বলে।

সে বলল বটে কিন্তু ভেবে পেল না যে মেয়েটি এত ভয় পেয়েছে কেন।

না।

মুশকিলে পড়ল, ও আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল এটারই। ওর সঙ্গে দেখা করতে আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছিলাম। ও বলতে পারেন কোথায় গেছে, আমি পুরনো বন্ধু ওর।

মালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, না আমি জানি না কিছু।

কিছু না বলে নেমে এল গারল্যান্ড। যাক্ আছে তো কাঠের মূর্তিটা। পথে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। খাসা মেয়ে এই মালা রীড। কিন্তু কেন পেয়েছে এত ভয়! মূর্তির মধ্যে আছে তো টাকাটা। জানে কি তা মেয়েটি। খুঁজে দেখতে হবে ও যখন থাকে না। আর কেউ থাকে কিনা ওর ফ্ল্যাটে দেখতে হবে। গারল্যান্ড জানে যে এই ত্রিশ হাজার ডলার পেতে হলে বেশ কিছু ধকল পেতে হবে।

যখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গারল্যান্ড তখন সে জানতেও পারল না যে, উল্টোদিকের বাড়ি থেকে স্মেরনফের সাকরেদ ঝেরোভ ওর ছবি তুলে ফেলল। সবারই ছবি তোলা হচ্ছে এ বাড়িতে, যে ঢুকবে বেরোবে। ঝেরোভের সহকর্মী নিকলিক চলে গেল ল্যাবরেটরিতে ছবিসুদ্ধ ফিল্ম রোলটি নিয়ে।

গারল্যান্ডের চোখে পড়ল হোটেলের দিকে ফেরার সময় পথ চলতে চলতে মালা রীডের ছবি শুদ্ধু পোস্টার অ্যালহামব্রা ক্লাবের দেওয়ালে সাঁটা। কোথায় কাজ করে মালা রীড, যাক সেটা জানা গেল। ওই ক্লাবে রাতে একবার ঢুঁ মারবে বলে ও ঠিক করল। ও হোটেলে ফিরে এল এইসব কথা ভাবতে ভাবতে। ঘরের চাবি দিতে দিতে হোটেলের হল পোর্টার ওকে বলল, আপনার খোঁজ করছিলেন এক ভদ্রলোক।

তাই নাকি কেমন দেখতে মনে আছে? কে হতে পারে।

চেহারা খুব লম্বা এবং ভারিসারি, কোনো দুর্ঘটনা হয়েছিল বোধহয় ডান কানে।

গারল্যান্ড হাসল, ব্রুকম্যান! আবার ব্রুকম্যান, খেলা শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই তৈরী থাকতে হবে।

ব্রুকম্যান বসে আছে সে দেখল ঘরে ঢুকে। বলল গারল্যান্ড, কি খবর, ভালো তো সব বউ বাচ্চা।

কথা আছে, নচ্ছার চুপ করে বসো গারল্যান্ড হাসল, সেইমত কথাবার্তা বল অস্কার। তুমি বড় হয়েছ। তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এই ধুমসো শরীর নিয়ে অত মেজাজে কথা বলা। তোমাকে দেখলে যেন মনে হয় পোয়াতী গাই। যা ওজন বেড়েছে তোমার। হবেই তো অতো মদ গিললে। ও ব্রায়েন তোমার বন্ধু কোথায় সে। মনে আছে তো সেবার তুমি যখন মস্তানি করেছিলে তার আমি কি হাল করেছিলাম।

ব্রুকম্যান বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বার করল, বোসো হতভাগা।

গারল্যান্ড হাসল, ফিল্মে নেমে পড় অস্কার। আমায় গুলি কর এস ও প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল ব্রুকম্যানের পিস্তলের নলে। বলল, গুলি কর ব্রুকম্যানের কব্জিতে প্রচণ্ড ঘা মারল হাতের তালুর পাশ দিয়ে। সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল ব্রুকম্যানের ডান হাত এবং পিস্তল ছিটকে দূরে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে গেল ব্রুকম্যান গাল দিয়ে! কিন্তু ওকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে গারল্যান্ড বলল, অস্কার আস্তে আস্তে, তুমি আমাকে এখনি খুন করতে পার না। মনে নেই আমাদের কথা আছে।

চোখ দুটি রাগে জ্বলছে ব্রুকম্যানের। ডান হাত দলতে লাগল অন্য হাত দিয়ে। খাটে টান টান

হয়ে শুয়ে পড়ে জিগ্যেস করল গারল্যান্ড কি ব্যাপার অস্কার বল।

টেবিলের উপর রাখল ব্রুকম্যান পিস্তলটি কুড়িয়ে এনে। তারপর বলল, আমি চাই তোমার টপসিক্রেটের চিঠিটা।

গারল্যান্ড হেসে বলল, সেটা কি তুমি একলাই চাও, মিঃ জনসন মিঃ কোসিগিন, প্রিয় বন্ধু ডোরী সকলেই চান চিঠিটা।

কাগজগুলো দিয়ে দাও গারল্যান্ড, বাজে কথা রেখে দিয়ে।

কথা বাজে, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক ব্যাপারটা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে প্যারিসে তুমিই প্রথম খামটা ঢোকালে। ডোরীর হুকুমে করেছ নিশ্চয়। তোমার অত বুদ্ধি নেই। যদিও আমি একবার ভেবেছিলাম যে তুমি ডবল এজেন্ট হয়ে গেছ।

আমি ডবল এজেন্ট, কি বলছ তুমি?

ফেটে যাবে তুমি যদি অত খেপে যাও। তুমি ডবল এজেন্ট নও, বুঝলাম সেটা। এ কাগজগুলো কিন্তু মারাত্মক। তোমায় খামটা দিয়ে তাহলে ডোরী ভুল করেছে। ঠিক বলছি।

ওগুলো দিয়ে দাও, আমি বলতে চাইনা কোনো কথা, গারল্যান্ড, জোচ্চোর তুমি একটা। তুমি এত নীচ নিশ্চয় নও যে এই কাগজের জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে সেটা তুমি চাইবে।

অস্কার আমায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখিও না। এ খেলা শুরু করেছে ডোরী। ও ভাবেনি আমার বিপদের কথা। ও গুলি ছুঁড়তে চেয়েছিল আমার কাঁধে বন্দুক রেখে। আমি থোড়াই কেয়ার করি ওর কি হয় তাতে। অস্কার কি মতলব ছিল ওর। পার পাবে না তুমি মিছে কথা বললে। ঘাস খাই কি আমি। আমি জানি মালা রীডের কথা। সব খুলে বল তুমি যদি কাগজ ফেরত চাও।

পিস্তলের দিকে চাইল ব্রুকম্যান। ওকে বুঝিয়েছে গারল্যান্ড যে যদি কেউ ওকে খুন করে তাহলে ডোরী পাবে না কিন্তু কোসিগিন কাগজটা পাবে। টপসিক্রেট এই কাগজটি। যে কোনো রফা করে কাগজটি ফেরত নিয়ে যেতে হবে একথা ডোরী বলেছে ব্রুকম্যানকে। ও নিরুপায় হয়ে বলল, কি ভাবে ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢোকাবার ব্যবস্থা করা হয় গারল্যান্ডকে সামনে রেখে ধোঁকা দিয়ে।

গারল্যান্ড সব শুনে চোখ খুলে হেসে বলল, ওই মূর্তির ভেতর টাকাটা আছে তবে তুমি টাকাটা আনবে আজ মালা রীডের বাড়ি থেকে। আমাদের দেখা হবে এয়ারপোর্টে আমি নজর রাখব। তুমি কাগজ পাবে, আমি টাকা নেব। আমার ভালবাসা দিও ডোরীকে। এ খবর পুলিশকে দিতে যেও না যে আমার কাছে ত্রিশ হাজার ডলার থাকছে। সব ফাঁস করে দেব তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, কাগজে কি লেখা থাকছে।

আমি ভাবতে পারি না যে কোনো ভদ্র আমেরিকান এরকম হতে পারে। তুমি ভাবতে পার না টাকা ছাড়া কিছু।

আহা, এমন মন্দ কি টাকা, আমি নজর রাখব, আজ রাত সাড়ে দশটায়।

স্মেরনফ দিল মালিকের হাতে একটি ছবি এবং দিয়ে বলল এই ফোটো তোমার ভালো লাগবে। কারণ খেলা জমেছে।

মালিকের মুখ বদলাল না এই ছবি দেখে কিন্তু রাগে কালো হয়ে গেল সবুজ চোখ। ও আস্তে বলল গারল্যান্ড।

এটাই বরাত জোর যে কেরনভকে বলেছিলাম ও বাড়ি থেকে যেই বেরোক তারই ছবি তুলবে। জালে পড়ে গেল মাছ।

ওই ওয়ারদিংটনের বদলী এজেন্ট হতে পারে গারল্যান্ড। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এ গারল্যান্ড, কারণ আমি জানতাম যে ওদের কুনজরে পড়েছে গারল্যান্ড। তুমি ভাবতে পার যে বদলী এজেন্টর কাজ করছে গারল্যান্ড। আছে নিশ্চয় এতে কোনো গড়বড়। কোনো কারণই নেই গারল্যান্ডের এই প্রাগে পড়ে থাকার। কাজ করতে হবে, চাকরী করতে হবে এখানে একটা বদলী এজেন্টের। কখনো কাজ করে না গারল্যান্ড।

ডোরী ধোঁকা দিচ্ছে তো গারল্যান্ডকে দেখিয়ে। ডোরী এটাই চায় যাতে আমরা বুঝি, বদলী

এজেন্ট হচ্ছে গারল্যান্ড। কোনো খবর আছে আর?

কারেল ভ্লাস্টের বাড়ি যায় আজ সকালে রীড মেয়েটি। বাড়ি ছিল না ভ্লাস্ট। ভ্লাস্ট পাসপোর্ট জাল করে এবং এটাই ছিল সুকের সন্দেহ, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ওর কাছেই গিয়েছিল মেয়েটা। চেষ্টা করছে হয়তো ভাগবার। গ্রেপ্তার করেনি কেন সুক ভ্লাস্টকে। কি প্রমাণ আবার এর। জেরা কর, গ্রেপ্তার কর লাকটাকে, তল্লাশি কর বাড়ি। প্রমাণ পাবেই পাসপোর্ট জাল করলে।

গারল্যান্ড।

গারল্যান্ড আলকর্নে থাকবে আমি যা জানি গারল্যান্ড সম্বন্ধে। অসম্ভব বিলাসী ও। আর কিছু কর না এখন ওকে আপাতত নজরে রাখলেও হবে। হদিশ মিলতে পারে ওকে দিয়ে ওয়ারদিংটনের। ও যেন টের না পায় যে তুমি নজর রাখছ সুতরাং এই বিষয়ে সাবধান থেকো। শুধু নজরেই রাখ মেয়েটাকেও। হদিশ দিতে পারে ও ওয়ারদিংটনের। মাইক্রোফোন লাগাও ওর ঘরে। কেরনভ যেন কাজ সারে আজ রাতেই। ওখানে আবার যাবে গারল্যান্ড। আমার চাই ওদের কথাবার্তার টেপ।

সময় নিয়ে বেরিয়ে গেল স্মেরনফ। আবার দেখল ফোটোটা মালিক। ও গারল্যান্ডকে হুঁশিয়ার করেছিল শেষ সংঘর্ষের সময়। সেইটাই হবে শেষ সাক্ষাৎ যদি আবার দেখা হয়। ও ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল হিংস্র বর্বরতায়।

গারল্যান্ডকে নিয়ে গত একঘণ্টা ধরে কথা বলছে মালা আর ওয়ারদিংটন। —কে লোকটি, কে হ্যারি মস্। ডোরীর এজেন্ট কি লোকটি? ও কি খুঁজছে ওয়ারদিংটনকে?

বেজায় ঘাবড়ে গেছে ওয়ারদিংটন। ও বলল, বোঝা যাচ্ছে না কিছুই চলা সম্ভব নয় আর এভাবে। ভ্লাস্টের কাছে যাবে না একবার তুমি।

যাচ্ছি ঠিক আছে।

কারেল ভ্লাস্ট ঘরে বসে নিজের জখমেব কথা ভাবছিল, মালা যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। হাত সারতে যে এখন ঢের দেরী এটাও বুঝেছে ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে। ও জানলা দিয়ে দেখল হঠাৎ, ওর বাড়ির সামনে দাঁড়াল একটি কালো ট্রাক গাড়ি। ওর ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল গাড়ি থেকে নেমে চারটি লোক। বুক ধড়াস করে উঠল ভ্লাস্টের। এরা যে সিকিউরিটি পুলিশের লোক তা ওদের দেখেই বুঝল। তা ও জানতও যে একদিন ওরা আসবে। ও তৈরী হয়ে আছে দুবছর ধরে। ও দরজার হাতলের নীচে পেরেক মেরে সেটে দিল খাবারের টেবিলের উপরের তক্তাটি। কিছুটা দেরী হবে হয়তো ওদের দরজা ভাঙতে। পনেরো মিনিট লাগবে হয়তো। প্রমাণপত্রগুলি নষ্ট করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে যাতে না ফাঁসে ওর বন্ধুরা। ফায়ার প্লেসে ফেলল ন্যাকড়ায় পেট্রল ঢেলে।

এরপর ফায়ার প্লেসে অন্যদের ছবি, পাসপোর্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সব কিছু ফেলে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল ফায়ার প্লেসের পেট্রোল ভেজা ন্যাকড়ায়। দরজা ভাঙছে ওরা কারণ ঘা পড়ছে দরজায়। ধীরস্থির রয়েছে ভ্লাস্ট। ও চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল পকেট থেকে ছোট ক্যাপসুল বের করে। ওর দিকে ভয়াল ভীষণ মুখে স্মেরনফ দরজা ভেঙে তেড়ে এল। ভ্লাস্ট বিষের ক্যাপসুলে কামড় বসাল মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে।

ওয়ারদিংটন শুনতে পেল সিঁড়িতে মালার পায়ের আওয়াজ। ওয়ারদিংটন ভয় পেয়ে গেল মালা ঘরে ঢুকতেই, মালার ফ্যাকাশে মুখ দেখে। ঠাণ্ডা বরফ জল যেন বইতে লাগল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

কি হয়েছে।

দাঁড়াতে পারছে না আর মালা। ও অবসন্ন শরীরে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল মারা গেছে ভ্লাস্ট, ওরা ওর মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিল আমি যখন গেলাম।

ভুল দেখেছ নিশ্চয়।

ওখানে হাজির হয়েছিল সিকিউরিটি পুলিশ, ওর মুখ স্পষ্ট দেখেছি অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময়।

নিজের মুখ দুহাতে ঢেকে বসে পড়ল ওয়ারদিংটন। সমস্ত পরিকল্পনা প্রাগ ছেড়ে পালাবার ভেস্তে গেল ভ্রাস্টের মৃত্যুর ফলে। মালার মনে জোর ফিরে এল ওর অবস্থার জন্য।

ও বলল, আমরা এখনো পালাতে পারি কারণ টাকাগুলো তো আছে।

এসব কথা যে নিরর্থক সেটা জানে ওয়ারদিংটন। পালাবার কোনো পথ নেই জাল পাসপোর্ট, ছাড়া। মালাকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ওর, মালার নিরাপত্তার জন্যই। ওর নিজের কোনো উপায় নেই, এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া। কিন্তু সাহস কি আছে ওর আত্মহত্যা করার।

ঘরে পায়চারি করতে লাগল মালা উত্তেজিত হয়ে। হঠাৎ থেমে বলল তারপর, আমাকে একজন সাহায্য করতে পারে, আমার মনে পড়েছে তার নাম ইয়ান ব্রন। আমার বাবার বন্ধু ওর বাবা। দুজনের একই সঙ্গে প্রাণদণ্ড হয়। ওর খামার বাড়ি প্রাগ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের পাসপোর্ট যে জোগাড় করে দেবে ইয়ান তাকে জানতেও পারা যায়।

তুমি নিশ্চিত জান যে তাকে বিশ্বাস করতে পার।

ওর বাবা আমার বাবার সঙ্গেই মরেছে বললাম না? বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়। ও সবজী বেচতে প্রাগে আসে ফি হপ্তায়। কাল হাটবারে ও আসবে। কাল আমি গিয়ে দেখা করব।

মালা না, বরং আমি ছেড়ে যাই তোমায়। জড়িয়ে পড়বে তুমি।

চুপ কর, সাহায্য করতে চেয়েছিলে আমায় তুমি না। পালা আমার এখন, খাবার ব্যবস্থা করি গে আমি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মালা যে আর ভয় পাচ্ছে না সেটা দেখল ওয়ারদিংটন। এই অবস্থার রাশ হাতে তুলে নিয়েছে কেমন করে যেন। নতুন আশার সঞ্চার হল ওর মনে।

ব্রুকম্যান ডোরীকে টেলিফোনে জানাল গারলান্ডের কথাবার্তার কথা। সাংকেতিক ভাষায় হল কথাবার্তা। ব্যবসার কথা হচ্ছে ভাববে অন্য লোক শুনলে। ডোরী বলল, তোমাকে তো দেওয়া হয়েছে যা ভালো বলে মনে হয় সেটা করবার। বলেছি তো তোমাকে সেই কথাই।

মালা রীডের ফ্ল্যাটে পৌঁছল ব্রুকম্যান রাত সাড়ে দশটার একটু আগে। কাউকে দেখতে পেল না বাড়ির চারপাশে। কাছাকাছি অন্ধকারে গারল্যান্ড কোথাও যে লুকিয়ে আছে এটা ও নিশ্চিত জানে। ও সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগল চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে।

কেরনভ ও সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে সেই মুহূর্তেই। মালা রীডের ফ্ল্যাটে মাইক্রোফোন বসাতে এসেছে ও স্মেরনফের হুকুমমতো। ও রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ব্রুকম্যানের পায়ের আওয়াজ শুনে এবং দেখল, উপরে উঠছে একটি বলিষ্ঠ লোকের আবছা চেহারা, কেরনভ নিঃশব্দে দৌড়ে উপরে উঠে গেল পায়ের জুতো খুলে ফেলে দিয়ে। ওয়ারদিংটন ঘরের আলো নিভিয়ে বারান্দায় গিয়ে লুকোল ব্রুকম্যানের পায়ের আওয়াজ শুনে। বেল টিপল মালার দরজায় ব্রুকম্যান। ওকে দেখছে কেরনভ তার উপরতলার সিঁড়ির রেলিং এর ফাঁক দিয়ে।

ইস্পাতের রড দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে ব্রুকম্যান আলো জ্বালল। প্যাকেটটি বার করল ও তাড়াতাড়ি কাঠের দেবদূত মূর্তির মাথাটি তুলে নিয়ে। সবই দেখতে পাচ্ছে ওয়ারদিংটন। ব্রুকম্যান দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল। সব দেখতে পাচ্ছে বলে ওয়ারদিংটন এটাও দেখতে পেল যে ছোটো টর্চের আলোয় ও নামতে লাগল সিঁড়ি দেখতে দেখতে।

কেরনভ পিস্তল হাতে নেমে এল দ্রুত গতিতে ওকে প্যাকেট হাতে নামতে দেখে। কি আছে প্যাকেটে? কেরনভ টাইম সুইচ টিপে দিল যখন প্রায় নিচতলায় পৌঁচেছে ব্রুকম্যান। সমস্ত সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ব্রুকম্যান ঘুরে দাঁড়াল বিদ্যুৎ গতিতে। কেরনভের দিকে তাকিয়ে গুলি করল ও টর্চ ফেলে দিয়ে। গুলি লেগেছে কেরনভের হাতে, জামার হাতা ছিঁড়ে গিয়ে। ব্রুকম্যানকে ও করল কিন্তু পরপর তিনটি গুলি। আরো সঠিক ওর লক্ষ্য।

ব্রুকম্যান সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে গেল। সিঁড়ির আলো নিভে গেল হঠাৎ। তাড়া করে নেমে এল কেরনভ। উপর পানে লক্ষ্য করল ব্রুকম্যান আবার। বসে পড়েছিল কেরনভ। গুলি বেরিয়ে গেল ওর মুখের পাশ দিয়ে। ওর ফুসফুস যে ফুটো হয়ে গেছে সেটা ব্রুকম্যান বুঝল। ও খতম এবার। ও সিঁড়ির পরে হোটেলের লবি পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছল প্যাকেটটা চেপে ধরে রক্ত থু থু করে

ফেলতে ফেলতে। ব্রুকম্যানের পিঠে গুলি করল অন্ধকারে নিশানা করে ঝেরনভ। আর পারল না ব্রুকম্যান। মাটিতে পড়ে গেল ও ছিটকে। রাস্তার নর্দমায় পড়ল প্যাকেটটা। উল্টোদিকের বাড়ি থেকে ছুটে এল নিকালক গুলির আওয়াজে। গারল্যান্ড সবই দেখল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। নর্দমায় প্যাকেট পড়ল, ব্রুকম্যান পড়ল সবকিছুই। পুলিশ ভ্যানের সাইরেন শোনা গেল দূরে। সর্বনাশ। এখন প্যাকেটটা তুলতে গেলেই। হোটেলে ফিরে গেল ও ছায়ায় ছায়ায় দৌড়ে।

টাকা তো চুলোয় গেল ও ভাবল হোটেলে পৌঁছে। এখন শ্রেয় প্রাগ ছেড়ে পালানোই। কিন্তু কি হবে সেই গোপন দলিলের। ডোরীকে তো আর কোনোদিন এগুলো পৌঁছতে পারবে না ব্রুকম্যান। ডোরী চুলোয় যাক ও একবার ভাবল। এ দলিল রাশিয়ানদের হাতে ও প্রাণ থাকতে যে পড়তে দিতে পারবে না ও সেটাও বুঝল। মালিক আছে যেহেতু সেহেতু পালাবার সময় নিশ্চয় তল্লাশী করবে ওরা। ডোরীর এক এজেন্ট তো এই মালা রীড। মালার কাজ এখন এটা ডোরীকে পৌঁছে দেওয়া।

ও অ্যালহামব্রা ক্লাবে চলে গেল ট্যাক্সি নিয়ে। সেখানে জায়গা নেই তিলধারণের। টেবিলে জায়গা পেল ও এক ওয়েটারকে ঘুষ দিয়ে। বুথে অবস্থিত রয়েছে টেবিলটি। ও মালা রীডকে লিখে পাঠাল ওয়েটারের হাত দিয়ে, আপনার দেবদূত মূর্তিটা আমি কিনতে চাই, এখানে আসবেন একবার।

মালা রীড বুথে ঢুকল দশ মিনিট বাদে। ও পালাতে যাচ্ছিল গারল্যান্ডকে দেখে। গারল্যান্ড ওকে আশ্বস্ত করল বহু কষ্টে। ও শরীরে আঙুল বুলিয়ে গেল, টাই ছুঁইয়ে। ও যে ডোরীর এজেন্ট সেটা মালা বুঝল। ডোরীর এজেন্টরা সাংকেতিক অঙ্গভঙ্গি করে যদিও ওরা কেউ পরস্পরকে চেনে না। ও সব কথাই বলল মালাকে। বলল, মালাকেই পাচার করতে হবে এই টপ সিক্রেট কাগজগুলি। কেননা ও হচ্ছে ডোরীর অন্যতম এজেন্ট প্রাগে। একেবারে নারাজ এতে মালা।

গারল্যান্ড বলল, তোমায় করতেই হবে এ কাজ। কোনো পথ নেই তোমার ফিরবার। ডোরীর এজেন্ট তুমি। জলে গেছে টাকা। বাঁচাতেই হবে ডকুমেন্ট। ডোরীর হাতে এটা তোমাকে পৌঁছতেই হবে। পারব না আমি। ভালোমতো চেনে আমাকে মালিক। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।

না না, ও লোকটা পায়নি টাকা। আমাদের কাছে আছে টাকা।

তুমি আর কে। আমাদের মানে কি বলতে চাইছ তুমি।

এতো লোকটা অন্যরকম ওয়ারদিংটনের চেয়ে। মালার কেমন যেন বিশ্বাস এসে গেল ওর উপর। এই পারবে ওকে সাহায্য করতে, যদি কেউ পারে, এই বলে ওর মনে হল। ও বলল ওয়ারদিংটনের কথা।

গারল্যান্ড এই কথা শুনে অদ্ভুত বনে গেল।

টোকা পড়ল বুথের দরজায়। কাঠ হয়ে গেল ভয়ে দুজনেই। ওয়ারদিংটন হাতে ব্রিফকেশ এবং চোখে চশমা নিয়ে ঢুকল।

।। পাঁচ ।।

মালিক দেখল শুধুই বাজে খবরের কাগজ ব্রুকম্যানের দেওয়া প্যাকেটটা খুলে। ও জ্বলন্ত চোখে কেরনভের দিকে তাকাল এই প্যাকেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। হাতে ব্যান্ডেজ কেরনভের।

তীক্ষ্ণ গলায় বলল মালিক, একটা লোকেকে মারলে তুমি এইগুলোর জন্য। মালিক যে কী প্রচণ্ড রেগেছে তা বুঝল একটি মাত্র লোক, স্মেরনফ। কিছু না বলে হঠাৎ সুক বলে উঠল, ও করেছে যা ভালো বুঝেছে।

অগ্নিদৃষ্টি হানল মালিক ওর দিকে।

কথা বলছি না আমি তোমার সঙ্গে। ও কেরনভকে আবার বলল, একটা লোককে খুন করলে এইগুলোর জন্য।

কেরনভ বলল আমার অন্য উপায় ছিল না, কারণ ও আমায় গুলি করে।

মালিক বলল, একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা এই ব্যাপারটা। ডোরীর এক এজেন্ট এই লোকটা। এর তদন্ত করবে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। বড় বড় হেডলাইন এ নিয়ে লিখবে ক্যাপিটালিস্ট প্রেস।

এই সবই হবে তোমার জন্য। সিঁড়ির আলো জ্বালতে গেলে কেন গাধার মত। নষ্ট হয়ে গেল গোটা অপারেশনটা। ঘর থেকে বের করে দিল কেরনভকে মালিক।

মালিক সুককে বলল, কোনো কাজের নয় লোকটি। বুঝেছ শাস্তি হওয়া চাই ওর। কোথায় গারল্যান্ড।

বলল পারি না গারল্যান্ড কোথায়। ওকে রাখা হয়েছে নজরে, কি সম্পর্ক ওর এর সঙ্গে কে জানে।

ও কোথায় খুঁজে বের কর। জানতে চাই আমি সুক তাড়াতাড়ি, বেরিয়ে গেল এই কথা বলেই। চুপচাপ স্মেরনফ। মালিক বলল, কারবারটা কি! ব্লাস্ট আত্মহত্যা করল তোমার জন্য। ডোরীর এক সেরা এজেন্টকে খুন করল ওই গাধাটা। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে তো রীড মেয়েটি। গারল্যান্ড তারপর।

কি করণীয় এখন আমাদের।

ধরতেই হবে গারল্যান্ডকে আর মেয়েটিকে। কোনো গোপন মেসেজ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে খবরের কাগজগুলোতে।

আবার ফিরে এল সুক। ফ্যাকাশে মুখে বলল, উধাও গারল্যান্ড, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে ও। যদিও তিনটে লোক আমি লাগিয়েছিলাম ওর পেছনে।

মালিক বলল, কমরেড সুক। এটা রিপোর্ট করা হবে। এ তোমার দায়িত্ব যেন গারল্যান্ড দেশ ছেড়ে না পালায়। স্মেরনফকে বলল, গ্রেপ্তার কর মেয়েটাকে, ওয়ারদিংটন যে কোথায় আছে সেটা বলতে পারবে ওই, ফ্ল্যাটে তল্লাশ কর মেয়েটার।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মালিক ও স্মেরনফ। সুক কপাল মুছল এবং এরপর ফ্রন্টিয়ার পোস্ট, এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশনের গার্ডদের নির্দেশ দিতে লাগল টেলিফোনে, আটকাতেই হবে লোকটাকে, যেন ভুল কোনো না হয়।

গারল্যান্ডকে সব কথাই বলেছিল ওয়ারদিংটন। এবার পুলিশ আসবে, ও বোঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনেই। ওর আর এখানে থাকা চলবে না। কিছু জামাকাপড় নিয়ে চলে এসেছে তাই ওর নিজের এবং মালার। ও একটু ইতস্ততঃ করছিল গারল্যান্ড টাকার কথা জিগ্যেস করাতে। মালা বলল, গারল্যান্ড জানে টাকার কথা। তখন ও বলল, ওর ব্যাগে আছে টাকাটা। গারল্যান্ড বলল, পালাতে হবে এখন। কিন্তু যাব কোথায় এখন?

মালা বলল, ইয়ান ব্রনের কাছে যাওয়া যায় একটা গাড়ি পেলেই।

যোগাড় করব, গাড়ীর জন্য কোনো ভাবনা করো না, সেখানেই যাওয়া যাক, চল। পথ আছে একটি বেরোবার পিছন দিয়ে, গারল্যান্ড বলল।

মালা—আছে, এই বলে ইতস্ততঃ করল।

গারল্যান্ড বলল, সময় নেই শীগগির চল।

ওয়ারদিংটন বুঝল ঠিকই বলেছে গারল্যান্ড। ওদের দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে এল গারল্যান্ড। গাড়িতেই লাগানো আছে ইগনিশান চাবি, ও একটা মার্সিডিস গাড়ি পেয়ে গেল এমন একটা গাড়ি খুঁজতে খুঁজতে। গাড়িতে উঠল ওরা গাড়ির দরজা খুলে। ওয়ারদিংটন পেছনে এবং মালা সামনে বসল। দুটি পুলিশের গাড়ি ক্লাবে এসে ঢুকল, ওদের গাড়ি যখন বড় রাস্তায় পড়েছে।

গারল্যান্ড বলল বেরিয়ে পড়া গেছে খুব সময় মতো। একই গতিবেগে মালার নির্দেশ মতো গাড়ি চলতে লাগল। মালাকে আশ্চর্য রূপে আশ্বাস দিল ওর মুখের প্রশান্তি, চোখের বিদ্রূপ আর আলগা হাসি। ওয়ারদিংটন হঠাৎ বলল হিয়াভকুভ ব্রিজ পেরোবার সময়, ওরা তো গাড়ির খোঁজ করবেই, কি করে পালাব।

গারল্যান্ড বলল, সুস্থির হও, এখনো আশি মিনিট বাকি ক্লাবের শো শেষ হতে। পুলিশকে খবর দিচ্ছে না সে শো ভাঙা না অবধি যে টুরিস্টের গাড়ি এটা। ভেবে দেখ ওর ভাষা পুলিশকে বোঝালে কি বিপদে পড়বে। দুঘণ্টার মতো হাতে পাচ্ছি অন্তত আমরা। আবার জিগ্যেস করল মালাকে ও ইয়ান ব্রনের কথা। ওর ক্রমেই পছন্দ হচ্ছে মালাকে। খাসা মেয়ে। কথা শুনে মনে হল মালার,

ওদের সাহায্যে এলেও আসতে পারে ইয়ান ব্রন নামে লোকটি।

ও ওয়ারদিংটনকে বলল তারপর, বিরক্তি ধরে গিয়েছিল তো ওর ডোরীর কাজ করে করে। আমিই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, তোমার কি দোষ দেব। গারল্যান্ডের কথায় যেন একটু সহানুভূতির আঁচ পেল ওয়ারদিংটন। ও বলল, তখন ভয় পেয়ে গেলাম যখন শুনলাম মালিক প্রাগে এসেছে।

তুমি ঠিক জান যে মালিক প্রাগে এসেছে?

হন্যে হয়ে ফিরছে হয়তো আমার জন্য।

বহুদিনের বন্ধু আমি এবং মালিক। আমাদের দোস্তি তেমনি সাপে নেউলে যেমন দোস্তি হয়।

গাড়ির গতি বাড়াল গারল্যান্ড। মরনান্তিক বিপদে পড়েছে ওরা তিনজন। স্মেরনফ সেখানে মালিক যেখানে। সোভিয়েতের অন্যতম সেরা মানুষ শিকারী হচ্ছে এই স্মেরনফ। ওয়ারদিংটন এবং মালা আরো ঘাবড়ে গেল।

গারল্যান্ড বলল, ব্রনের কথা বল। আমি জানি মালিককে। ও খোঁজ নেবে তোমাদের প্রত্যেকের চেনাজানার।

এক বছর দেখা হয়নি ইয়ানের সঙ্গে। ওর নাম কোনোদিন করিনি আমার কোনো বন্ধুর কাছে; ও আমায় সাহায্য করবে এটা আমি জানি। ওর বাবাকে সাহায্য করেছিল আমার বাবা। অনেক দূরে খুব নির্জন জায়গায় ওর বাড়ি। বিশ্বাস করা চলে ওর বউ ব্লাঙ্কাকেও। মেয়েটি চমৎকার। দুটো বড় গোলাবাড়ি আছে বাড়িতে।

আমাদের নিতেই হবে এ ঝক্কি। দেখি না এর জন্য আর কোনো উপায়। গাড়িটা দরকার হবেই তাড়াতাড়ি ভাগবার জন্য। লুকিয়ে রাখব না হয় একটি গোলাবাড়িতে গাড়িটা।

যত শুনছিল তত ভয় পাচ্ছিল ওয়ারদিংটন এবং গারল্যান্ডের উপর ততই বিদ্বেষ হচ্ছিল। ঝামেলা বাধাতে পারে ওয়ারদিংটন সেটা গারল্যান্ড বুঝেছিল। পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হতে পারে কারণ লোকটা মালাকে ভালবাসে। ও গোটা পরিকল্পনার কথাই বলল ওয়ারদিংটনকে হ্যারি মস থেকে শুরু করে ডোরী পর্যন্ত।

ডোরী বড্ড বেশী চালাকী করে ফেলেছে শেষে বলল ও। আমার ঘাড়ে ভুল কর এই টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট চাপিয়ে দিয়ে ভুলের মাশুল দিচ্ছে নিজেই এই জালে জড়িয়ে পড়ে। আমাকে বাঁচাতেই হবে ঐ বুড়োটাকে যা করে হোক। যদিও বুড়োটা আমাকে কম ভোগায়নি তবুও আমার কেমন যে মায়া পড়ে গেছে ঐ বুড়ো ছাগলটার উপর। দেওয়া যাবে না এখানকার রাষ্ট্রদূতকে কাগজগুলো। ওগুলো নির্ঘাত ও পড়ে ফেলবে। ওগুলো ডোরীর নিজস্ব কপি বলে জেনে যাবে। এল কি করে ওগুলো প্রাগে সেটা জানতে হবে। আমাকে ওগুলো ওর হাতে পৌঁছতে হবে যদি আমি ডোরীর প্রাণ বাঁচাতে চাই।

ওয়ারদিংটন বলল, তোমার কাছেই কি আছে এই কাগজগুলো?

হ্যাঁ। আমার ওগুলো ব্রুকম্যানকে দেবার কথা ছিল টাকার বদলে। এখন এগুলো আমারই হেফাজতে যেহেতু ব্রুকম্যান খতম।

আগে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাক একটা কথা যে আমার এবং মালার ওই টাকাটি। তুমি পাচ্ছ না ওই টাকা কারণ আমাদের পালাতে কাজে লাগবে ওই টাকা।

শুনি, তোমরা পালাবে কেমন করে?

আমি বুঝব যে কি করে পালাতে হয়।

ওয়ারদিংটনের হাতে পিস্তল, গারল্যান্ড গাড়ির গতি কমিয়ে পিছন ফিরে দেখল। ওর চোখ দুটি বন্য পশুর মত জ্বলছে এবং মুখটি ফ্যাকাশে ওর। ওয়ারদিংটন বলল, আমরা তোমাকে চাই না, আমাকে দাও কাগজটা। গাড়ির গতিবেগ হঠাৎ বাড়িয়ে দিল গারল্যান্ড কোন কথা না বলে।

মালা বলে উঠল ধমক দিয়ে, কি পাগলামি করছ অ্যালেক। চুপ কর।

মালা ওকে কি অপদার্থই না ভাবে তা ও ওয়ারদিংটনের গলার স্বর শুনেই বুঝল। চুপ করে গেল ও। সংকীর্ণ নির্জন পথ ধরে গাড়ি ছুটে চলল। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল দূরের পাহাড় এবং পথের দু পাশের বন। ওরা থামল একটু পরে ব্রনের খামারবাড়ির কাছে এসে।

মালাকে বলল গারল্যান্ড, ওরা তোমার বন্ধু, ওরা আমাদের থাকতে দেবে কিনা আগে গিয়ে দেখে এস। অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে নইলে।

ওয়ারদিংটন বলল, কেন ওকে হুকুম করছ, কি ভেবেছ তুমি নিজেকে।

এবার চটে গেল গারল্যান্ড। পিস্তল দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে ওর হাতে। গারল্যান্ড ওর পিস্তল ছিনিয়ে নিল ওয়ারদিংটন কিছু বোঝবার আগেই। ও পিস্তলটি ওয়ারদিংটনের হাতে ফিরিয়ে দিল পিস্তল থেকে বুলেটগুলি বের করে নিয়ে এবং বলল, এ অপারেশান এখন আমার হাতে, তোমরা চুপচাপ থাক, বুঝলে তুমি কেবলমাত্র সঙ্গে আছ। চুপ করে গেল ওয়ারদিংটন কি বিড় বিড় করে বলে।

মালার অপেক্ষায় দুজনেই নীরবে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সুক বেজায় খুশি মালা রীড মালিকের মত দায়িত্বশীল লোকের জাল থেকে পালানোতে। মালিককে দেখছিল ও চুপচাপ। মেলার ম্যাপ দেখছিল মালিক ভুরু কুঁচকে। এটা অসম্ভব যে মালা রীড পালাবে এবং একথা সে নিজেকেই বলছিল। স্মেরনফ ঢুকল দরজায় টোকা মেরে। বলল গারল্যান্ড আছে মালার সঙ্গে এবং এছাড়া সঙ্গে আছে আরো একটি লোক। চেহারার বর্ণনায় মনে হয় যে লোকটি ওয়ারদিংটন।

ঠিক জান, লোকটি ওয়ারদিংটন?

ওর বর্ণনা পেয়েছি ক্লাবের এক ওয়েটারের কাছ থেকে। কোনো সন্দেহ নেই যে ও ওয়ারদিংটন। গারল্যান্ড খবর দেয় রীডকে। কিছুক্ষণ বাদে এসে জোটে ওয়ারদিংটন। ওয়েটার ওদের যেতে দেখে কার পার্কের দিকে পেছনের দরজা দিয়ে। চুরি হয়েছে একটি মার্সিডিস গাড়িও।

ও টেবিলে রাখল গাড়ির নম্বর লেখা একটি কাগজ। মালিক কাগজটা দিল সুকের হাতে এবং দিয়ে বলল, খুঁজে বের কর গাড়িটা দৌড়ে প্রায় বেরিয়ে গেল সুক।

স্মেরনফ বলল, মালা রীডের ফ্ল্যাটেই তো এতদিন লুকিয়েছিল ওয়ারদিংটন। পাওয়া গেছে সেখানেই ওর জামাকাপড়। আঙুলের ছাপ প্রভৃতি।

অত্যন্ত জোরদার যে গাড়ি ওদের কাছে আছে। ওরা এতক্ষণে হয়তো ফ্রন্টিয়ার দিকে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। জার্মান সীমান্ত সবচেয়ে কাছে তবে ওরা যেতে পারে অস্ট্রিয়ান সীমান্তের দিকেও। ওখানে অনেক সোজা এখন সীমান্ত পেরোনো।

স্মেরনফ বলল, আমি জাসিয়ের দেখছি মালা রীডের। সীমান্ত পেরোবে না এখনি ওরা হয়তো। আমার মনে হয় যে খোঁজাখুঁজি একটু না কমলে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। বের করতে হবে ওদের আস্তানাটা যেখানে ওরা লুকিয়ে থাকে। দেখি কিছু হদিশ মেলে কিনা মালা জাসিয়েরে।

বের করতেই হবে খুঁজে ওদের। আশা করি অবস্থা কি হবে ওরা পালাতে পারলে তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বেরিয়ে গেল স্মেরনফ। সুক এসে ঢুকল দশ মিনিট বাদে। গাড়িটা বেরিয়ে গেছে হিয়াভকুভ ব্রিজ পেরিয়ে। দুজন পুরুষমানুষ এবং একটি মেয়ে ছিল গাড়িতে। গাড়িটার আর কোনো খোঁজ পায়নি তারপর।

তোমার দায়িত্ব হল কমরেড, সীমান্ত পেরিয়ে ওরা যাতে বেরিয়ে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখা। পরোয়া নেই কোনো, যত লোক লাগে লাগুক।

ওরা পারবে না পালাতে, বন্দোবস্ত আমি করছি।

মালিক চিন্তায় ডুব দিল সুক চলে যাবার পর। দারুণ রাগ হচ্ছে ওর নিজের ওপরই। মালার বিষয়ে আগ্রহী কেইন একথা যখন বলল স্মেরনফ তখনই ও গ্রেপ্তার করল না কেন মালা রীডকে। ভীষণ গাল দিল ও মনে মনে মালা রীডকে। ওকে বিপদে ফেলতে পারে মালিকের ওপরওয়ালা কোভস্কি এই বিপদের জন্যই। ভালো নয় তো ওদের সম্পর্ক।

স্মেরনফ ফিরে এল একঘণ্টা বাদে। একটি ফোটো হাতে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে একটা হদিশ পেয়েছি, এই ছবিটা ছিল রীড মেয়েটার ফ্ল্যাটে। একটি বলিষ্ঠ যুবক এবং মালা ছবিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো বড় বড় খামার বাড়ির গোলা রয়েছে ওদের পেছনে। মালিক বলল, তা হলে।

আদর্শ জায়গা এরকম একটি নির্জন খামার বাড়ি লুকোবার পক্ষে। একসঙ্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় দেশদ্রোহিতার জন্য এই ছেলেটা ইয়ান ব্রন-এর বাবা এবং এই মালা রীডের বাবা।

কোথায় জান এই খামার বাড়িটা।

ত্রিশ কিলোমিটার দূর এখান থেকে।

জোগাড় কর তাহলে লোক।

অপেক্ষা করছে তিনটি পুলিশ ভ্যান। বারো জন লোকও হাজির হবে অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

এর তিনগুণ লোক লাগবে যদি সঙ্গে থাকে গারল্যান্ড।

স্মেরনফ্ ফোন তুলল, যা বল।

বিপদে এদের ওপর নির্ভর করা চলে এ কথা মনে হয় ইয়ান ব্রন এবং তার স্ত্রীকে দেখে। ধীরস্থির, শান্ত এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে চেহারায়। গারল্যান্ড বলল, তুমি যত কম জানো এই অপারেশান বিষয়ে, ততই ভালো। সীমান্ত আমাদের পেরোতেই হবে। আন্তর্জাতিক গণ্ডগোল প্রচণ্ড রকমের যদি পেরোতে না পারি। আমাদের পিছনে লেগে আছে প্রুর সেরা এজেন্ট। সীমান্ত পেরোতে হবে দরকার হলে খরচ করে।

মাথা নাড়ল ইয়ান, সীমান্ত পেরোনো যাবে না কেবল টাকার জোরে। বরাত জোর চাই। স্বপ্নেও ভেব না পুলিশ পাহারা পেরোতে পারবে জাল পাসপোর্ট নিয়ে। ইদানীং যদিও অষ্ট্রিয়া সীমান্তের কড়াকড়ি কমেছে তবে তোমরা দামী মাল বলে প্রুর এজেন্ট যদি মনে করে তবে পুরো বর্ডার বন্ধ করে দেবে মিলিটারী দিয়ে। তবে এখান থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা আছে বটে। বেজায় কষ্টসাধ্য পথ, সেখানে হেঁটে যেতে হবে। লাগবে দিন চারেক। নজর পড়বে ওদের, তাই গাড়িতে যাওয়া চলবে না।

ইয়ান সঙ্গে থাকলে যে সুবিধা হবে সেটা বুঝল গারল্যান্ড। ও বলল, চল না কেন তোমরা দুজন। টাকা দেব আমরা।

ইয়ান ইতস্তত গলায় বলল, যাই কি করে আমরা সব ছেড়ে।

এখানে কি জন্য পড়ে থাকবে? এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

ত্রিশ হাজার ডলার আছে আমাদের। সমান ভাগে ভাগ করলে পাঁচজন ছয় হাজার ডলার করে পাবে। নতুন করে জীবন শুরু করবে তোমরা জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স যেখানে খুশি গিয়ে।

ওর ব্রিফকেস চেপে ধরল ওয়ারদিংটন। বলল, কোনো অধিকার নেই তোমার ওই টাকা বিলি করবার। আমার এবং মালার টাকা এগুলো।

ওর দিকে চাইল বাকী চারজন। মালা বলল, এমনিতো আমাদের নয় অ্যালেক, বোকামী করো না দয়া করে। ও এগিয়ে এল 'ব্রিফকেস দাও' বলে উঠল ওয়ারদিংটনকে। প্রতিবাদ, আপত্তি কিছুই খাটল না ওয়ারদিংটনের। গারল্যান্ডের হাতে তুলে দিল মালা ব্রিফকেসটি। তুলে দিয়ে বলল, আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করতেই হবে এই টাকা দিয়ে। গারল্যান্ডকে বলল এরপর, যা করবার কর এই টাকা নিয়ে।

গারল্যান্ড ইয়ানকে বলল, বারো হাজার ডলার তোমরা পাচ্ছ যদি আমাদের সীমান্ত পার করিয়ে দাও। তারপর তোমাদের ইচ্ছা ফিরে আসবে কি আসবে না।

ইয়ান বলল, একটু কথা বলে নিই আমরা। এই বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্ত্রীকে নিয়ে। মালাকে গারল্যান্ড বলল, এখানকার ভাষা জানে ওরা। কিভাবে আমরা যে পালাতে পারি ওরা সেটাও জানে। টাকা দিতে চেয়েছি কারণ ওদের ছাড়লে আমার চলবে না।

মালা ঠিকই বুঝেছে, তাই ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

গজগজ করতে করতে ওয়ারদিংটন বলল, কেন দেবে না টাকা? তোমার কি? তিন গুণ টাকা বের করে নেবে তো তুমি ডোরীকে ব্ল্যাকমেল করে।

গারল্যান্ড বলল, এই তোমার ভাগের ছ হাজার ডলার রইল যদি পছন্দ না হয় তো ফিরে যাও এটা নিয়ে প্রাগে। বাজে ন্যাকামি রেখে কাজের কাজ করতে হবে আমাদের সঙ্গে প্রাগে

থাকতে গেলে।

মালাকে বলতে গেল ওয়ারদিংটন, গারল্যান্ড টাকা মেরে দিচ্ছে। জোচ্চোর ও একটা। ও থেমে যেতে বাধ্য হল মালার ধমক খেয়ে। গারল্যান্ডের সহ্য হচ্ছিল না ওয়ারদিংটনের ঘ্যান ঘ্যানানি। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘরে পায়চারি করতে করতে দেওয়ালে একটা ছবি দেখে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইয়ান ব্রন এবং মালা। দুটি গোলা এবং খামারবাড়ি ছবির পেছনে। জিজ্ঞেস করল মালাকে, তোমার কাছে আছে এ ছবির কপি?

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মালা। কি অনুমান করছে গারল্যান্ড তা বুঝল। বলল, আমার ফ্ল্যাটে অ্যালবামে আছে।

ও ইয়ান ও ব্লাঙ্কাকে ডাকল, হয়েই গেছে তবে তো, ওদের বলল, এখন অন্য উপায় নেই তোমাদের পালানো ছাড়া।

ছবিটি দেখিয়ে বলল এ ছবির কপি আছে মালার ফ্ল্যাটে। খুঁজে পাবে ওরা এটি। কিছু দেরি হবে না খামারবাড়ির হদিশ করতে। ওরা চলে আসতে পারে দু ঘণ্টার মধ্যে। তোমাদের ভাগের টাকাটা নাও। আমাদের রওনা হতে হবে এখনি।

ইয়ান ব্লাঙ্কাকে বলল, এটা পথ চলার মতো নয়, মালা যেটা পরে আছে।

মালাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্লাঙ্কা অন্য পোষাক দেবে বলে। ইয়ানও বেরিয়ে গেল জিনিষপত্র গোছাবে বলে।

ওয়ারদিংটনকে বলল গারল্যান্ড, তোমার ভাগের টাকা নাও। খতম করে দেব যদি আর ঝামেলা কর। বহু ঝামেলা পোহাতে হবে এমনিতে আমাদের। মুষড়ে পড় না অত। একজোটে লড়তে হবে জান বাঁচাতে হলে। ভাগের টাকা পকেটে রেখে দিল ওয়ারদিংটন কোনো কথা না বলে। ইয়ান দুটি রুকস্যাকে খাবার, টিনের খাবার, মোমবাতি, সাবান, মাথা পিছু একটি করে কম্বল নিয়ে দশমিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে বলল, পাড়ি দিতে হবে লম্বা রাস্তা। গারল্যান্ড জিজ্ঞেস করল মালাকে ভাগের টাকা দিতে দিতে কোথায় যাচ্ছি প্রথমে।

আমার একটা কুঁড়ে ঘর আছে দশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ে, প্ল্যান করা যাবে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ম্যাপ নিয়ে বসে। দুটো বড় বড় কাগজের প্যাকেট গারল্যান্ডের হাতে দিয়ে বলল, আমরা সার বেঁধে যাব, এতে মরিচের গুঁড়ো আছে। তুমি শেষে, আমি প্রথমে। আসবে এই মরিচ ছড়াতে ছড়াতে। শিকারী কুকুর থাকবেই ওদের সঙ্গে। আমাদের গন্ধ পাবে না কুকুর এই মরিচের গন্ধে, আমাদের গুঁড়ো আছে দু কিলোমিটার অব্দি ছড়ানোর। কাজ হবে তাতেই।

ওরা উঠতে লাগল বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে। দিব্যি চলছে ইয়ান ও ব্লাঙ্কা। মালা বসে পড়ল কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে, একটু দম নিয়ে নিই, আর পারছি না আমি।

থেমে গেল সবাই, বেজায় বিরক্ত ইয়ান।

গারল্যান্ড হঠাৎ বলল, চেয়ে দেখ নিচে।

দশটি গাড়ি জোরে আসছে দূর থেকে ইয়ানের খামার বাড়ির দিকে, মালাকে তুলল হ্যাঁচকা টানে গারল্যান্ড। চড়াই পথে কোনোমতে দৌড়ে হোঁচট খেয়ে ওরা উঠতে লাগল। ওরা একটি মালভূমিতে পৌঁছল তারপর। চেয়ে দেখল নীচে, প্রত্যেকটি আলো জ্বলছে ইয়ানের খামার বাড়ির। দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে পিঁপড়ের মত। ঘুরে ঘুরে দেখছে ওরা চারদিক।

গারল্যান্ড বলল, খতম মরিচের গুঁড়ো;

ইয়ান বলল, আর লাগবে না, ঠিক আছে।

ওরা ইয়ানের কেবিনে পৌঁছল অবশেষে আধঘণ্টা দুরন্ত বেগে চড়াই ভেঙে। একটু আশ্বস্ত বোধ করল এখন সকলে। সবাই একটু সুস্থ বোধ করল দশ মিনিট বাদে এবং সিগারেট খেয়ে। আগুন জ্বালা হল ফায়ারপ্লেসে। টেবিলে বিছিয়ে ধরল একটি ম্যাপ বের করে ইয়ান।

ইয়ান বলল, যেতে হবে এই পথে। তোমাদের জানা দরকার ফ্রন্টিয়ার ব্যাপারটা কি, অনেক ওয়াচ টাওয়ার, সেনা, মেশিনগান, সিগন্যাল রকেট, সার্চ লাইট এবং রেডিও টেলিফোন সবই আছে। যাতে পরিষ্কার নজর চলে সেই কারণে সত্তর মিটার অব্দি গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। মিহি করে রোজ সাফ করে মাটি। যাতে দেখা যায় পায়ের ছাপ পড়লেই। অ্যালার্ম

সিগন্যাল লাগানো কাঁটা তারের বেড়া আছে। অ্যান্টি পারসোনেল মাইন বসানো বেড়ার বাইরের মাটির নীচে, মানুষ উড়ে যাবে এতে পা পড়লেই। পেরনো অসম্ভব সব শুনলে মনে হয়। একটি পথ আছে। তামার খনি যা বরবাদ এবং বাতিল হয়ে গেছে—তার বাতাস চলাচলের সুড়ঙ্গ দিয়ে। অস্ট্রিয়া পার করে দিই ওই পথে কিছুদিন আগে আমি একজনকে। তবে ওর বেলা তত সমস্যা ছিল না আমাদের বেলা যত শোরগোল হচ্ছিল। তবে ভয় পদে পদে বিপদ অনেক।

ও আবার বলল, অন্তত দিন চারেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে এখন আমাদের এখানেই। হইচই পড়ে গেছে এতক্ষণ ফ্রন্টিয়ারে। চেক সেনাদের আমি জানি। বাচ্চা ছেলে বেশীর ভাগই। উৎসাহে ভাটা পড়বে দিন চারেক খুব সজাগ থেকে। আমরা যেতে পারব তখন।

গারল্যান্ড বলল, বিপদ হবে না তো চারদিন এখানে থাকলে।

হবে না মনে হয়। এখানে এমন কেবিন আছে যে তা আমাদের প্রতিবেশীরাও জানে না। চুপি চুপি বানিয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে। একদিন কাজে লাগবে জানতাম কারণ পালাতে হবেই।

আমাদের জাগতে হবে পাহারায়। পাহারায় থাকবে পুরুষরা পরপর তিনজন। ডিউটি দেবে একেকজন চারঘণ্টা করে। আমি জাগব প্রথম খেপটা। বেরিয়ে গেল ও অন্ধকারে।

মালিককে বলল স্মেরনফ, কুকুরগুলো ওদের গন্ধ পাচ্ছে না কারণ ওরা মাটিতে মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়েছে।

মালিকের চোখ জ্বলে উঠল, অজুহাত শুনব না কোনো। তোমার কাজ হল দেখা ওরা যাতে ফ্রন্টিয়ার না পেরোয়। কাজে লাগাও যত লোক দরকার। তুমিও জান. ওরা হাঁটবে, বাঁধা পথে যাবে না। আমি ফিরে যাচ্ছি মিনিস্ট্রিতে। ও প্রাগে চলে গেল একটি পুলিশ ভ্যানে উঠে।

সহজে বিচলিত হয় না স্মেরনফের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গুণ। কোভ্স্কি ওকে ঘেন্না করে বলে মালিক বিচলিত হয়। মালিককে ফাঁসাবে ও একদিন। বিচলিত হয় না স্মেরনফ। মানুষ শিকার করা ওর কাজ। ওর চাকরি চলে যাওয়াই ঠিক যদি ও তাতে ব্যর্থ হয়। ওর বুক সোজা।

ও বলল সুককে, ভোরে 'তন্ন তন্ন করে যেন তিনটি হেলি কপ্টার খোঁজে পাহাড়গুলো। এবার ডেকে দাও ক্যাপ্টেন কুহ্লানকে। উৎসাহী এবং নবীন প্রকৃতির কম্যুনিস্ট কুহ্লানও তৎক্ষণাৎ হাজির হল দৌড়ে এসে।

জেলার ম্যাপ খুলে বসল ওকে নিয়ে স্মেরনফ্।

এখন হয় ওরা ফ্রন্টিয়ারের দিকে যাবে, নয়তো কোথাও লুকিয়ে থাকবে হইচই না কমা অব্দি। কোথাও এই অঞ্চলেই ওরা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে বলে আমার ধারণা। শুরু হচ্ছে কাল সকালে হেলিকপ্টারে তল্লাশি। এ অঞ্চলটা ঘিরে ফেল তুমি যত পার লোক জড়ো করে। একটিও যেন পথ না থাকে পালাবার। বুঝলে?

হ্যাঁ কমরেড স্মেরনফ্। আমার খুব চেনা এই তল্লাট। কতজন লোক লাগবে ঠিক জানি। লোক মোতায়েন থাকবে সকাল আটটার মধ্যে।

স্মেরনফ্ ক্রূর হাসল, ভোর ছটার মধ্যে, সকাল আটটা নয়।

কমরেড স্মেরনফ্, তাই হবে।

।। ছয় ।।

ভোর সাড়ে ছটা, ধীরে ধীরে আলো ফুটছে আকাশে। কুয়াশা চারদিকে। ওয়ারদিংটন বসে আছে একটি চ্যাটালো পাথরের উপর। ওর সমস্ত শরীর জমে গেছে ঠাণ্ডায়। গারল্যান্ডকে ও. এখনো মনে মনে গালি দিয়ে চলেছে। ওর রাগ আরো বাড়ছে গারল্যান্ডের প্রতি মালার আকর্ষণ দেখে। গারল্যান্ড যেন এক দেবতা মালার কাছে।

সবাই ঘুমোচ্ছে তাই কেবিনে কোনো সাড়া শব্দ নেই। আবার ভয় ঘনিয়ে এল ওয়ারদিংটনের মনে। সৈন্যরা আসবে একটু পরে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে তারা পাহাড়গুলি। ও যেন অভিভূত হয়ে পড়ল একথা মনে পড়তেই। সে পথ বন্ধ, ও যে আত্মহত্যা করবে। এখন গারল্যান্ডের কাছে ওর পিস্তলের গুলি।

গাছের মাথার ওপর দিয়ে আসছে একটি হেলিকপ্টার আকাশ ফাটানো শব্দ করে। লাফিয়ে

উঠল ওয়ারদিংটন। অন্যদিক থেকে আরেকটি হেলিকপ্টার আসছে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ও দৌড়তে লাগল কেবিনের দিকে। গারল্যান্ড ও ইয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবিনের দরজায়। গারল্যান্ড চেঁচাচ্ছে, জলদি লুকোও, ভেতরে এস। কেবিনের ভেতর দৌড়ে ঢুকল ওয়ারদিংটন। কেবিনের কাছে একটি গাছের নীচে দাঁড়াল গারল্যান্ড এবং ইয়ান। ওদের দিকেই আসছে সোজা একটি হেলিকপ্টার।

গারল্যান্ড বলল, ওরা কাজে নেমেছে পুরোপুরি তৈরী হয়ে।

কেবিনটা গাছের আড়ালে আমাদের দেখতে পাবে না ওরা। তবে ধরে ফেলবে একটু নড়াচড়া করলেই।

হেলিকপ্টার চলে গেল ওদের গাছের ঠিক ওপর দিয়ে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওরা। দূরে মিলিয়ে গেল একটু বাদে হেলিকপ্টারের শব্দ। কেবিনে ফিরে এল ওরা। প্রাতরাশ করছে মালা ও ব্লাঙ্কা। ব্লাঙ্কা শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন সন্ত্রস্ত। গারল্যান্ডের কাছে এসে মালা বলল, আমরা পালাতে পারব বলে মনে হয়।

খুব কঠিন হলেও, নিশ্চয়ই পারব। দিনে গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমরা এবং রাতেই এখন থেকে শুধু চলাফেরা করব। তোমার কোনো ভয় নেই আমি থাকতে।

গারল্যান্ড চোখ মটকে হেসে ইয়ানের কাছে গেল ওয়ারদিংটনের অগ্নিদৃষ্টি দেখে। দরজায় দাঁড়িয়ে ইয়ান। বলল, তিনটে হেলিকপ্টার এবার।

গারল্যান্ড বলল, নিবিয়ে ফেলাই ভালো আগুনটা। ধোঁয়া তেমন উঠছে না বটে, যা নিচ দিয়ে যাচ্ছে ওরা, তাতে মনে হয় ধরে ফেলতে পারে।

প্রাতরাশ তৈরী বলে প্লেট এবং কফির পেয়ালা নিয়ে বসে গেল। হেলিকপ্টার গর্জন করে উড়ে চলে গেল হঠাৎ প্রায় কেবিনের ছাদ ছুঁয়ে। চেঁচিয়ে উঠতে গেল মালা। হাতের খাবার প্লেট নামিয়ে রাখল ওয়ারদিংটন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে।

ধীর গলায় বলল ইয়ান, ওরা নিয়মমতো ফ্লাই করছে ভয় নেই। ঘুরে আসবেই না হয়তো আর এ পথে।

ওয়ারদিংটনের গলা ভেঙে গেল ভয়ে, জানলে কি করে। পড়ে গেছি তো আমরা ফাঁদে, পালানো দরকার এখনি।

শান্ত মৃদু গলায় বলল গারল্যান্ড, ওরা হয়তো ভয় দেখাতে চাইছে হেলিকপ্টার দিয়ে, সৃষ্টি করছে মানসিক চাপ। কোনো পথ খোলা নেই আমাদের পালাবার। ঘাবড়িও না। আমি দেখে আসি বাইরে একটা টহল মেরে কি হচ্ছে, তুমিও চল না। থাকুক না ওরা এখানে।

ওয়ারদিংটনের কাপুরুষতা দেখে সবাই বিরক্ত হয়েছে এটা যেমন ওয়ারদিংটন বুঝল তেমনি মালাও। নিজেকে বশে আনল জোর করে এবং তারপর বেরোল গারল্যান্ডের সঙ্গে। একটি মালভূমি থেকে উৎরাই নেমে ওরা পৌঁছল আরেকটি মালভূমিতে। হেলিকপ্টারগুলি ঘুরছে আর ঘুরছে গাছের আড়াল দিয়ে। গারল্যান্ড সচকিত হল ইয়ানের খামার বাড়ি দেখে। লরি আর সশস্ত্র সৈন্য সেখানে গিজ গিজ করছে। গারল্যান্ডের একটু মমতা হল ওয়ারদিংটনের ভয় দেখে। নিজে সিগারেট ধরাল ওকে দিয়ে। হাত কাঁপছে ওয়ারদিংটনের।

হেলিকপ্টার আবার। গাছের নিচে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে দুজনে। তুমি যে কি ভাবছ আমি তা জানি। ওয়ারদিংটন বলল, আমি ভীতু কাপুরুষ, আমি জানি। আমি কোনোদিন গুপ্তচর হতাম না যদি আমার টাকার দরকার না থাকত। এ অতি সহজ কাজ বলে আমার মনে হয়েছিল প্রথমে। নানা রকম কথা বলতো আমাদের ছাত্ররা। আমি ডোরীকে জানাতাম দরকারী খবরগুলো। বহুৎ টাকাও জমিয়েছিলাম। আমার ভাগ্যে নেই বোধহয় টাকা খরচ করা।

সেটা ভাবছ কেন, খুব সাবধানে যদিও কাজ সারতে হবে, তবে আমরা পালাবই।

আমি বাঁচব না, পালাতে পারব না বলে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। একটা উপকার আমার কর শোনো, আমার ষাট হাজার ডলার আছে জেনিভার ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্কে। মালার নামে রেখেছি আমি ওটা। ওই মালা বলে ও গিয়ে শুধু প্রমাণ দেবে। খবরটা দিও ওকে।

নিজেই বল তুমি।

হয়তো রাজী হবে না ও কারণ আমায় ও তেমন ভালবাসে না। ওর জগতে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। ও লজ্জা পেতে পারে বেঁচে থাকতে টাকাটা নিতে। কোনো প্রশ্ন থাকবে না মরে গেলে তখন ধন্যবাদ দেবার। ও খুশিই হবে তখন টাকাটা পেলে। উত্তর দিকে যাচ্ছে সৈন্যবোঝাই ট্রাক, তা দেখে ও বলল, ওরা আমাদের ঘেরাও করছে, জায়গাটা আমি চিনি।

গারল্যান্ড দেখল, একটি হেলিকপ্টার নামছে ওদের থেকে বিশ কিলোমিটার খানেক দূরে। ও বলল, হেলিকপ্টার নামল কোথায়, চেনতো তুমি ঐ অঞ্চলটা।

একটা বড় মাঠে যা রয়েছে গাছগুলোর পিছনে।

ফেরা যাক চল।

বেজায় খুশি স্মেরনফ্। এখন সাতটা বাজতে সাত। ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যদিও রাতে ঘুম হয়নি। ওর ঘুমের দরকার হয় না শিকারের সময়। কাজ হয়েছে ওর প্ল্যান অনুযায়ী। সৈন্য দিয়ে এলাকাটি ঘেরাও ভোর ছটা থেকেই। আশ্চর্য তৎপরতায় সম্পন্ন করেছে কুহ্‌লান ওর দায়িত্ব। তিরিশ কিলোমিটার এলাকা ঘেরাও খামারবাড়ি ঘিরে। ধরা পড়বে ওরা ঠিক সময়েই। স্মেরনফ্ নিজে হেলিকপ্টারে বসে এলাকাটা দেখবে সেটাই ভাবল একবার।

একটি হেলিকপ্টারে পেট্রল ভরা হচ্ছে কারণ সেটি নেমেছে। পাশে দাঁড়িয়ে পাইলট লেফ্‌টেনান্ট বুডোভেক। বুডোভেক স্যালুট করল স্মেরনফকে দেখে।

স্মেরনফ বলল, আছে কোনো খবর?

কোনো খবর নেই কমরেড। তবে দেখা হয়ে গেছে এদিকটা, তাই এবার যাব ওদিকে।

দেখনি কিছু। ভেবেছিলাম ওরা পাহাড়ে পালাবে।

চোখ চলে না এত গাছপালার জন্য।

কিছুই দেখনি সন্দেহ জনক।

পাহাড়ে একটু ধোঁয়া দেখলাম বলে একবার মনে হল। চক্করও মারলাম দুবার। দেখিনি হয়তো একথা মনে হল পরে।

আবার দেখে আসি চল। একটি শক্তিশালী বাইনোকুলার পরে নিল স্মেরনফ্ হেলিকপ্টারে উঠে বসে। 'জায়গাটা তোমার ঠিক মনে আছে তো। কোথায় ধোঁয়া দেখেছ।

হ্যাঁ কমরেড।

উড়ে চলল হেলিকপ্টার।

গারল্যান্ড উল্টোদিকে একা এবং আরেকদিকে বসে রয়েছে চারজন। ও বলল, কাজ হতে পারে, মাথায় একটা ফন্দি এসেছে, হেলিকপ্টারগুলো নামছে এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। আমরা কব্জা করতে পারি ওখানে পৌঁছতে পারলে। চালাতে জানি আমি। সীমান্তের কাছাকাছি এর ফলে আমরা পৌঁছে যেতে পারি, যদি সীমান্ত পেরোতে না পারি। কী বল তোমরা।

ইয়ান বলল উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হয়ে, নিশ্চয়, দুঘন্টার পথতো বিশ কিলোমিটার। উৎরাইয়ের পথ, চল যাই।

ওয়ারদিংটন বলল, আমি দেখেছি, সৈন্য গিজ্‌গিজ্ করছে জঙ্গলে।

ছটি বুলেট দিল ওয়ারদিংটনকে গারল্যান্ড ওর পকেট থেকে বের করে। বলল, দরকারে লড়তে যেতে হবে আমি জানি। বুলেট ভরে নিল পিস্তলে ওয়ারদিংটন এই কথা বলে।

ব্লাঙ্কা বলল, পাহারা থাকবে কিন্তু চারদিক হেলিকপ্টারে।

গারল্যান্ড বলল, চেষ্টা করে দেখতে হবে, পিস্তল আছে তো দুজনের কাছে।

মালা বলল, শোনো।

কাছে আসছে একটি হেলিকপ্টার। কেবিনের ওপরে থেমে গেল কাছে এসে। সবাই ঘরে সন্ত্রস্ত। পাথর পাথর মুখ গারল্যান্ড ইয়ান এবং ব্লাঙ্কার। স্মেরনফ্ কেবিনটি দেখল হেলিকপ্টার থেকে ঝুঁকে পড়ে। বুডোভেককে আরো নীচে নামাতে বলল ও হেলিকপ্টারটিকে। হিংস্র হেসে বলল, ধরেছি বোধহয় ওদের। খামার বাড়িতে অপেক্ষা করছিল সুক। স্মেরনফ্ সুককে খবরটা

দিল রেডিও টেলিফোনে। তারপর হেলিকপ্টার বুডোভেককে চালাতে বলে বলল, ওখানেই গা ঢাকা দিয়েছে ওরা। লেফটেনান্ট আছে বটে তোমার চোখ, বাহাদুর সাবাস।

গারল্যান্ড হেলিকপ্টার সরে যেতেই বলল, আমাদের এখনি পালাতে হবে কারণ ওরা হদিশ পেয়ে গেছে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে ওয়ারদিংটন বলল, আমরা ফাঁদে পড়েছি তোমায় বললাম না।

গারল্যান্ড হেসে বলল, এখনোতো গলায় ফাঁস চেপে বসেনি, সবে তো ফাঁদে পড়েছি, যাওয়া যাক চল। সেখানে চলে যাব, পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে সোজা হেলিকপ্টার যেখানে নামছে। দুঘণ্টা এখনো ওদের এখানে এসে পৌঁছতে। ইয়ান আমার কাছে কাছে থেকো, আমি থাকব আগে। তারপর থাকবে মেয়েরা এবং শেষে থাকবে ওয়ারদিংটন।

ওরা নামছে গাছের নীচে নীচে গা ঢাকা দিয়ে। উড়ছে তো উড়ছেই মাথার উপর হেলিকপ্টার ঘুরে ঘুরে। ওরা নীচের মালভূমিতে নামল। গারল্যান্ড এগিয়ে দেখল সন্তর্পনে। খামারবাড়ি থেকে সারে সারে ট্রাক আসতে আসতে থেমে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল অটোমেটিক অস্ত্রে যারা সুসজ্জিত থাকে সেইসমস্ত সৈন্যরা অফিসারদের সঙ্গে। ইশারায় ডেকে বলল ও ইয়ানকে, এসে পড়েছে ওরা। পথ করে নিতে হবে চলতে চলতে, লড়তে লড়তে। নিঃশব্দে করতে হবে। করতে পারবেতো? গারল্যান্ড বলল পিছন ফিরে, এগোলাম আমি এবং ইয়ান। তোমরা আসবে তিন মিনিট সবুর করে। অপেক্ষা করবে গোল বাধলে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ওয়ারদিংটনকে বলল, আমাদের হদিশ ওরা পেয়ে যাবে গুলির শব্দে তাই একদম গুলি ছুঁড়বে না।

যখন নামছে গারল্যান্ড ইয়ানের হাত ধরে, তখন ওদের দেখতে পেল স্মেরনফ্‌। ও হুকুম দিল বুডোভেককে এবং তারপর ওরা যে নামছে সেটা জানাল সুককে মাইক্রোফোনে। পলাতকদের মাথার উপর নেমে এল হেলিকপ্টারটা বাজপাখির মত। গারল্যান্ড হাত তুলল বিদ্যুৎ গতিতে এবং চারবার গর্জে উঠল ওর ৪৫ ক্যালিবার পিস্তল। টলে সরে গেল হেলিকপ্টারটা। দাঁতে দাঁত চিপে বুডোভেক ঘোরাল হেলিকপ্টারটা নামাবার জায়গার দিকে। রক্ত ঝরছে ওর হাত দিয়ে।

বেশী চোট লেগেছে, স্মেরনফ্‌ বলল গাল পেড়ে।

মাথা ঝিমঝিম করছে বুডোভেকের। ও বলল, লেগেছে হাতে তবে নামাতে পারব।

তবে তাই কর।

গারল্যান্ড বলল, আমরা যে এখানে আছি ওরা জানে। চুলোয় যাক। আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না ওরা গুলি না চালালে। আমরা এ পথেই নামছি ওরা ভাববে। এখন আবার আমাদের উপরে উঠে অন্য উৎরাই ধরে নামতে হবে। আরেকটি হেলিকপ্টার তখনই ছুটে এসে শিকারী পাখিব মতো ওদের মাথার ওপর নেমে পড়ল। অটোমেটিক রাইফেল চালাতে শুরু করল পাইলটের কেবিন থেকে একটি সৈন্য। মাটিতে শুয়ে পড়ল যে যার মতো। পাইলটের মাথা লক্ষ্য করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে গারল্যান্ড ধীরে এবং একটুও বিচলিত না হয়ে, ট্রিগার টিপল আস্তে করে। সামনে ঝুঁকে গড়িয়ে পড়ল নিহত পাইলট কন্ট্রোল ছেড়ে। আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে হেলিকপ্টারটি। গড়িয়ে পড়তে লাগল পাহাড় বেয়ে সেটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের মত জ্বলতে জ্বলতে।

চড়াই পথে সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল গারল্যান্ড। ধোঁয়া শুধু চারদিকে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে এবং শুকনো গাছের ডালপালায় আগুন লেগেছে। গাবল্যান্ড ওয়ারদিংটনকে বলল, ইয়ানকে দাও তোমার পিস্তলটা। ইয়ানকে বলল, চল, আগে যাব আমি আর তুমি।

পাহাড় বেয়ে নামছে ওরা। ধোঁয়ার মেঘ মাথার উপর। ওদের দেখতে পাবে না হেলিকপ্টার এই মেঘ যদি থাকে। ভীষণ গর্জন করতে করতে গাছ থেকে গাছে আগুন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে। সব যেন ঝলসে দিচ্ছে আগুনের আঁচ। শিকারী কুকুরের ডাক শোনা গেল হঠাৎ সব আগুন ছাপিয়ে।

গারল্যান্ড ইয়ানকে বলল, তিন মিনিট বাদে তুমি এস, আগে আমি যাচ্ছি। তিন মিনিট বাদে অন্যরা আসবে। গারল্যান্ড পিস্তল হাতে ক্ষিপ্র পায়ে অসম্ভব হুঁশিয়ার হয়ে নামতে লাগল। এগিয়ে আসছে কুকুরের ডাক। অবশেষে একটি পথ দেখল ঘন ঝোপের আড়ালে ও, বন রয়েছে পথের ওপাশে। গাছের পেছনে লুকলো হঠাৎ আওয়াজ শুনে পথে নামতে যাবে সেই সময়। ওর প্রায়

গা ঘেঁষে চলে গেল একটি সাঁজোয়া ট্রাক। চারজন সশস্ত্র সৈন্য অটোমেটিক অস্ত্র এবং হেলমেট নিয়ে তাতে বসে রয়েছে। গারল্যান্ড ওপাশের জঙ্গলে লুকোল পিছনে নেমে পথ পেরিয়ে যখন গাড়িটা পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে গেল।

ইয়ান লুকিয়ে আছে দেখল পথের ওপাশে। আরেকটা সাঁজোয়া ট্রাক যেতে দেখল দুজনেই। গারল্যান্ড ইয়ানকে, ট্রাকটা চলে যেতে বলল, অপেক্ষা কর ওদের জন্য। আমি এগোলাম ওদের নিয়ে এসো। এগোতে লাগল ও। ডাক বেড়েই চলল কুকুরের।

হেলিকপ্টারটা মাটিতে নামিয়ে এদিকে জ্ঞান হারাল বুডোভেক্। তিনটি সৈন্যকে বেরিয়ে এসে স্মেরনফ্ বলল, বের কর ওকে, চোট লেগেছে ওর। নিজের জিপের দিকে ছুটে গেল এরপর স্মেরনফ্। মালিক সেখানে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা থেকে সৈন্যরা গুলি ছুঁড়ছে দুজনে দেখল ওপরপানে চেয়ে। জঙ্গলে আগুন লেগে গেল, একটা গুলিতে হেলিকপ্টারটা আছড়ে পড়াতে।

নিজের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে গাল দিয়ে মালিক বলল, আরে এ হল গারল্যান্ড, যত গাধা, বলিনি, কাজ হাসিল সিধে নয় গারল্যান্ড যদি থাকে। বনে আগুন লাগল ওদিকে। কেন ওদের ধরলে না আগে। দেখছ কি প্রচণ্ড আগুন? ওখানে নিয়ে যাবে কি করে এখন সৈন্যদের?

নামতে পারবে নাতো গারল্যান্ডরা, পাহাড়ের ওপাশ বেয়ে এখন ওদের নামতে হবে। সেখানে মোতায়েন করে রেখেছি তিনশো সৈন্য এবং শিকারী কুকুর।

কেউ যেন মারা না পড়ে সবাইকে ধরা চাই জ্যান্ত।

অসম্ভব, গারল্যান্ডের মত লোককে জ্যান্ত ধরা।

তুমি দায়ী হবে যদি কারোর গায়ে আঁচড়টি লাগে। জ্যান্ত ধরতেই হবে ওদের। নইলে উদ্ধার করা যাবে না দরকারী খবর।

বলনি কেন আগে? স্মেরনফ্ ঊর্ধ্বশ্বাসে রেডিও ট্র্যাকের দিকে ছুটল সৈন্যদের এই নতুন নির্দেশ দেবার জন্য।

ইয়ান ও গারল্যান্ড এখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখছে জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে এসে। একটি মিলিটারী ট্রাক দাঁড়িয়ে পথের পাশে ঘাসের উপর। বন্দুক হাতে তিনটি সৈন্য নামছে। ওদের নির্দেশ দিচ্ছে অফিসার। গারল্যান্ড বলল, একটি ট্রাক নিয়ে আসছে চারটি সৈন্য। ওদের ইউনিফর্ম পরে আমরা সীমান্তে পৌঁছতে পারি ট্রাকটা কব্জা করে। তুমি ওদের ভাষায় কথা বলতে পার তুমি এগোও। ভয় দেখাও দারুণ। ভয় খাবে কারণ ছোকরাতো ছেলেগুলো, পেছনে আছি আমি।

এগিয়ে গেল ইয়ান, ওর পেছনে রয়েছে গারল্যান্ড। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল ইয়ান, একদম নড়বে না, ঘুরে দাঁড়াও অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে।

অস্ত্র ফেলে দিয়ে চারজন বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। এসে দাঁড়াল, মালা, ব্লাঙ্কা এবং ওয়ারদিংটন। ট্রাকে তুলল গারল্যান্ড সৈন্যদের রাইফেলগুলো। ইয়ান হুকুম দিল ওর কথা মতো। ইউনিফর্ম ছেড়ে পালাল সৈন্যরা। ট্রাকের ফ্লোরবোর্ডে তুলল সৈন্যদের দড়ি দিয়ে গারল্যান্ড ও ইয়ান। গারল্যান্ড বলল, বলে দাও যদি ওরা টু শব্দটি করে তবে ওরা গুলি খাবে। মালা, ব্লাঙ্কা এবং ওয়ারদিংটন বসল ট্রাকের ফ্লোরবোর্ডে। রাইফেল ওদের শেষ দুজনের হাতে। গারল্যান্ড ট্রাক চালাতে লাগল চেক ইউনিফর্ম পরে। পাশে ইয়ান, যার কোলে রয়েছে অটোমেটিক রাইফেল।

এগিয়ে চলল ট্রাক ইয়ানের নির্দেশানুসারে। হেলিকপ্টারের গর্জন মাথার উপর। একটি জীপ এগিয়ে এল হঠাৎ উল্টো দিক থেকে। নিজেদের এবং বন্দী সৈন্যদের ইয়ানের নির্দেশে মালারা একটি তেরপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে নীচে শুয়ে পড়ল। দুজন সৈন্য এবং একজনমাত্র অফিসার ছিল জীপটিতে। হাত তুলল অফিসারটি। থেমে গেল ওদের ট্রাক এবং জিপ। পিস্তলের সেফ্‌টিক্যাচ অফ্ করে তৈরী হল সন্তর্পণে গারল্যান্ড। চেয়ে বলল কটমট করে অফিসারটি, শুনি কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

স্যালুট করে বলল ইয়ান, কমরেড লেফ্‌টেনান্ট হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি ডিভিশনাল কম্যান্ডের হুকুমে।

ডিভিশনাল কম্যান্ডার কে তোমাদের?

কর্ণেল স্মেরনফ্।

অফিসারটি বেজায় ঘাবড়ে গেল। বলল, যাও তাড়াতাড়ি যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন তাহলে।

চলে গেল জীপ। কি বললে? ইয়ানকে বলল গ্যারল্যান্ড।

ইয়ান বলল, হোমরা চোমরা লোক এই স্মেরনফ্। কাগজে বহুবার দেখেছি ওর ছবি। ঢিল ছুঁড়লাম একটা তাই আঁধারে।

হল বটে কাজ।

একশো কিলোমিটারেরও কম রাস্তা বাকি সীমান্তে পৌঁছতে। তেরপলের পিছনে লুকিয়ে রইল ট্রাকের পিছনের সবাই। বড় রাস্তায় এসে পড়ল ওদের ট্রাক। সারে সারে আর্মি ট্রাক যাচ্ছে ওদের উল্টো মুখে জ্বলন্ত জঙ্গলের দিকে। ওদের পিছু ধরল একটা জীপ। একটি হেলিকপ্টার মাথার উপর নেমে এল। মাথা বের করে হাত নাড়ল ইয়ান। হেলিকপ্টার উপরে উঠে ওর হেলমেট দেখে অন্যদিকে চলে গেল।

বিপদ ঘটল কিছুদূর এসে। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে পথ আটকে। পিস্তল নিয়ে তৈরী হল গারল্যান্ড এবং ইয়ান। সার্জেন্ট এগিয়ে এল বলিষ্ঠ চেহারার একজন। চেক ভাষায় তাকে কি যেন বলল ইয়ান। তাতে কাজ হল এবার। ওদের পথ ছেড়ে দিল সার্জেন্টটি। আবার ট্রাক চালিয়ে দিল গারল্যান্ড। ইয়ান বলল, বেশ কাজ হচ্ছে কর্নেলের নামে। এ পথে যত গাড়ি যাতায়াত করছে ও জানত না যে এর প্রতিটির খবর রেডিওতে স্মেরনফ্ পাচ্ছে ঐ সার্জেন্টের মাধ্যমে।

রেডিওতে খবর পাচ্ছে স্মেরনফ্ ইয়ানের বাগানবাড়িতে বসে। ঘরে পায়চারি করছিল মালিক। স্মেরনফের তখনি সন্দেহ হল যখন ও শুনল হেডকোয়ার্টারে দুজন সৈন্য ট্রাক নিয়ে ফিরছে কর্নেল স্মেরনফের হুকুমে। ও একই উত্তর পেল আবার জিজ্ঞেস করে। এ অপারেশান তো চালাচ্ছেন না কর্নেল স্মেরনফ্। একই খবর দিল টহলদার হেলিকপ্টারের পাইলটও। উত্তেজিত ভাবে বলল স্মেরনফ্ হেলিকপ্টারকে, ধাওয়া কর ট্রাকটিকে, কোন্‌দিকে যায় আমাকে জানতে হবে। ট্রাকের আওতায় যেও না কোনো কারণেই।

পাখি পালাচ্ছে মালিক বুঝল। ও বলল ওরা ভেগেছে তো বোরিস তোমার এত কষ্টের আয়োজন ভেস্তে দিয়ে। তোমার হাল যা হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে ওরা যদি সীমান্ত পেরোয়।

রাগে জ্বলে উঠল স্মেরনফ্,বল, নিজের জন্য কষ্ট হচ্ছে। বোল না বাজে কথা। মালিক তোমার কষ্ট হয় নি জীবনে অন্যের জন্য।

।। সাত ।।

ঘন জঙ্গল দুপাশে, গারল্যান্ড ট্রাক চালাচ্ছে সরু পথ দিয়ে। ওদেরই অনুসরণ করে চলেছে মাথার উপর হেলিকপ্টারটা, এটা বুঝেছে ও। ইয়ান বলল, আমরা এসে গেছি বর্ডারের কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে। হাতে নঘণ্টা সময় আছে পেরোবার চেষ্টা করার আগে। জঙ্গলে ঢুকলে এবার ভালো হয় ট্রাক রেখে।

মাথা নেড়ে সায় দিল গারল্যান্ড। রেডিওতে খবর পাঠিয়ে চলবে হেলিকপ্টারটা ততক্ষণই যতক্ষণ ট্রাকে আছে। ঘন হয়ে ফিরে আসছে জাল। নিস্তার নেই এখন জঙ্গলে না ঢুকলে। ইয়ান বলল, আরো ৫ কিমি বাদে। ট্রাক থামাও ব্যস। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথ।

আকাশ দেখা যায় না দুপাশের গাছপালার জন্য। ওদের ট্রাকটা আর দেখতে পাচ্ছে না হেলিকপ্টারের পাইলট। নেমে পড়ল ওরা। ইয়ান বলল, পথ খুব খারাপ আমাদের যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে ওরা নিশ্চয়। পিছু পিছু এসো আমার।

কাঁধে রুকস্যাক এবং অটোমেটিক রাইফেল পুরুষদের হাতে। গারল্যান্ডের পিস্তল ব্লাস্কার হাতে এবং খাবারের টিনের ঝোলা পিঠে। শুধু কম্বল কয়টি মালার কাছে। ট্রাকে পড়ে রইল শুধু ওয়ারদিংটনের সুটকেস। মালাকে সাহায্য করতে লাগল গারল্যান্ড। এখন ওদের দিশারী ইয়ান। ওরা দেখল একটি ছোটো এবং খরস্রোতা নদী মিনিট পনেরো বাদে। নদীতে নামল ওদের নিয়ে ইয়ান। ওদের গন্ধ আর পাবে না কুকুরগুলো যদি জলে নামে। সর্বদা সজাগ ছিল ওদের মনে শিকারী কুকুরের ভয়।

ওরা নদী দিয়ে চলল অমানুষিক পরিশ্রমে দশ মিনিট ধরে। পাড়ে উঠল তারপর আবার।

কুকুরের ডাক এবং হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল দূরে।

ইয়ান বলল, সুড়ঙ্গ কাছাকাছি আছে খনির বাতাস ঢোকবার জন্য। তোমরা অপেক্ষা কর আমি খোঁজ নিয়ে আসি। ও ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেল এই কথা বলে। মাটিতে বসে পড়ল মালা। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত শরীরে দাঁড়াল ওয়ারদিংটন। ইয়ান পাঁচমিনিট বাদে ফিরে এসে বলল, চল, উঠে পড় তাড়াতাড়ি, খুঁজে পেয়েছি।

একটি বিশাল গর্ত মাটিতে ঘনজঙ্গল এবং ঝোপের মধ্যে। ইয়ান বলল, খুব গভীর নয় এটি, খনি পর্যন্ত চলে গেছে সিধে। আগে আমি নামছি এবং তারপর একে একে নাম তোমরা, আমি ধরব তোমাদের নিচ থেকে। ওরা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নামল কয়েক মিনিট বাদে এবং দাঁড়াল তারপর। চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে জল দেওয়ালের গা দিয়ে। গারল্যান্ড এবং ইয়ান একটি করে মোমবাতি জ্বালাল। নিচু সুড়ঙ্গ দিয়ে চলল ওরা ইয়ানের পিছুন পিছুন। নুইয়ে চলতে লাগল সবাই পিঠ। ওরা যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছে হাঁটছেই একথা মালার মনে হল এবং হঠাৎ ওরা পৌঁছল বিশাল একটি গুহায়।

ইয়ান রাইফেল নামিয়ে বলল, আমরা পৌঁছে গেছি। আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি এখানে দুদিন। বেজায় বিপদ ঘটবে যদি আজ রাতে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করা হয়। রাজী তো তোমরা? সীমান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে বেরুবার রাস্তাটা। নিবিয়ে দিলে একটা মোমবাতি, কাজ চলবে অপরটি দিয়ে। খাওয়া যাক এবার কিছু?

ওদিকে হেলিকপ্টারটা স্মেরনফকে খবর দিল যে খাবারের ব্যবস্থা করছে ওরা। রেডিওতে লাগানো ছিল লাউডস্পিকার। সব কথা শুনতে পেল তার ফলে মালিক। ট্রাকটি যে দাঁড়িয়ে আছে ১৫ নম্বর ম্যাপের একটি জঙ্গলে সেই খবরটি এল।

ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমোয়নি স্মেরনফ্। বইছে না আর ওর শরীর। ম্যাপ দেখে মালিক বলল, দশ কিলোমিটার বর্ডারের মধ্যে তার মানে ওরা রয়েছে।

হ্যাঁ, ওখানে আরো সৈন্য সুক পাঠিয়েছে। জ্যান্ত ধরতে চাও ওদের তুমি। সুযোগ পাবে এর ফলে ওরা পেরিয়ে যাবার। ওদের যে জ্যান্ত ধরবার হুকুম তুমিই বন্ধু দিয়েছ। এটা মনে রেখ সবসময়। ওদেরই সুবিধে এতে। ভয়ে ওদের গুলি করবে না শান্ত্রীরা দেখলেও। অটোমেটিক অস্ত্রও তাছাড়া এখন ওদের কাছে আছে। বর্ডার পার হয়ে যাবে ওরা সহজেই।

মূল্যবান খবর আছে ওদের কাছে। জ্যান্ত ধরা অসম্ভব গারল্যান্ডকে একথা তো আমি বলেইছি।

কোভ্স্কি যে ওকে চূড়ান্ত অসম্মানে ফেলবে একথা ভাবল মালিক। সীমান্ত পেরোয় যদি ওরা। কোভ্স্কি আবার এটাও জানতে চাইবে যে মালা ও ওয়ারদিংটনের কাছে কি খবর আছে। ও বলল, ঠিক আছে।

ওদের আটকানো যাবে না আর তাহলে। সেরা রাইফেলম্যান পঞ্চাশজন আছে সুকের কাছে। রাইফেল টেলিস্কোপিক সাইট। সেখানেই ওরা মোতায়েন আছে যেখান দিয়ে পেরোবে। মাইক্রোফোন তুলে বলল স্মেরনফ্, হুকুম বাতিল করে দিচ্ছি সব আগেকার, ধরা চাই ওদের মরা বা জ্যান্ত অবস্থায়।

সুক উজবুক একটা, আমি রেডিও ট্রাক নিয়ে যাচ্ছি ওখানে।

যা খুশি কর।

একটি রেডিও ট্রাকে বসল মালিক। বলল সার্জেন্টকে, যত তাড়াতাড়ি হয় নিয়ে চল আমাকে ম্যাপের ১৫ নম্বর সেকশানে।

লাগবে দুঘণ্টা।

অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা।

কথা বলছিল সুক এবং সুকের সহকারী লেফটেন্যান্ট স্টুর্সা। তরুণ কম্যুনিষ্ট যেহেতু স্টুর্সা তাই ও অত্যন্ত নির্দয় এবং নির্মম হতে পারে কাজের বেলায়। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সুক। বহুক্ষণ ধরে সার্চ শুরু হয়েছে। মালিক ওর চাকরি খতম করে দেবে যদি ও পলাতকদের ধরতে না পারে। ওকে ভরসা দিল স্টুর্সা। বলল, ওরা লুকিয়ে আছে জঙ্গলেই। জঙ্গলে ঘিরে আছে সৈন্যবাহিনী এবং শিকারী কুকুর। নদীর ওপারেও সৈন্য মোতায়েন আছে যদিও নদীতে পৌঁছে শিকারী কুকুর

ওদের গন্ধ অনুসরণ করতে পারেনি। ঘেরাও বাহিনী আরো এগিয়ে এল সুকের কড়া হুকুমে। পালাতে যেন ওরা না পারে। মালিক যে রওনা হয়েছে সেকথা স্মেরনফ্ ওকে জানাল রেডিও মারফৎ। ঘাবড়ে গেল এই কথা শুনে সুক। স্মেরনফ্ বলল, মালিক পৌঁছবার আগে ওদের ধরতে পারলে মঙ্গল তোমারই হবে, কমরেড সুক।

সুকের বাহিনী কি করছে তা দেখার জন্য ও রেডিও ট্রাক ছেড়ে সাজিয়েছিল নিচু টিলার ওপর। স্টুর্সা বুঝল, এটা একেবারে অসম্ভব কারণ সৈন্য এগোতে পারছে না তাড়াতাড়ি। তার কারণ দুর্ভেদ্য ঝাড়, কাঁটা বন এবং ঘন বন। কেটে গেল সত্তর মিনিট। নদীর দুপাশে চলে গেল জঙ্গল বেড়ে ঘেরাওকারী সৈন্যরা। কোনো দেখা নেই গারল্যান্ডের।

সুকের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ও গালাগালি দিল স্টুর্সাকে। বলে উঠল, যা করবার সবই তো করলে কিন্তু কি হল। এই তো হাজির এখানে সৈন্যরা জঙ্গল ঘিরে এগিয়ে। যাদের ধরবে তারা কোথায়? অপদার্থ মূর্খ। তোমাকে দাঁড় করাব আমি ট্রাইবুনালের সামনে।

হিম শীতল গলায় এই সময় একজন পিছন থেকে বলল, কমরেড সুক বড় উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তোমাকে। পিছন ফিরল কমরেড সুক ভয়ে সাদা হয়ে। দাঁড়িয়ে আছে সবুজ চোখে বরফের মত ঠাণ্ডা চাহনি এবং কাঁচের মত চকচকে চোখ নিয়ে মালিক।

সুক বলল, ওরা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে স্টুর্সা বলছিল। ওরা নেই দেখেছি কারণ আমরা তল্লাশি করেছি প্রায় পাঁচশো সৈন্য নিয়ে।

ও সুকের চেয়ে কাজের বিশ্বাসযোগ্য লোক তা মালিক বুঝল স্টুর্সাকে দেখেই।

বলল, লেফ্‌টেনান্ট কেন ভাবলে যে এরা জঙ্গলে আছে?

কুকুরগুলো আর গন্ধ পায়নি ট্রাক থেকে এখানে ওদের গন্ধ শুঁকে পৌঁছে। এই কথাটির অর্থ হল, এরা কুকুরদের ধোকা দেওয়ার জন্য জলে নামে এবং জঙ্গলে লুকোয়। কোনো হদিশই অথচ মিলল না ওদের জঙ্গলে। দুটো মুখই বন্ধ করেছি নদীর। পালাতে পারবে না ওরা নৌকার মাধ্যমেও।

বাতাসে যে মিলিয়ে যাবে ওরা ভূত নয় তো। ওরা তার মানে মাটির নীচে সেধিয়েছে যেহেতু গাছের ওপরে জঙ্গলে বা নদীতে নেই।

সার্জেন্ট এগিয়ে এসে বলল, আমি জানি যে কাছেই একটি বাতিল তামার খনিতে বাতাস ঢোকার সুড়ঙ্গ আছে।

সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

পারব।

মালিক বলল সুককে, খবর দাও স্মেরনফকে। আসতে হবে না তোমাকে। ও গেল এগিয়ে স্টুর্সা এবং সার্জেন্টের সঙ্গে। ওর ক্ষমতার ক্ষণিক মেয়াদ যে এবার শেষ হল তা বুঝল সুক।

ম্যাপ এঁকে বোঝাচ্ছিল ইয়ান গারল্যান্ডকে গুহার মধ্যে বসে। দুটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে গুহা থেকে। খনির ভেতর পর্যন্ত গেছে ডানদিকেরটি। জাল বোঝাই সেইটা। মাইনর ফিল্ডে, সীমান্তের মুখে পৌঁছেছে বাঁ দিকেরটি। বুকে হেঁটে যেতে হয় সে পথে। মাইন ফাটবে মাটিতে কাঁপুনি হলেই। মাইন মাটির নীচে। এতটুকু কম্পন না সৃষ্টি করে মাটির উপর দিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় দিন মালা ও গারল্যান্ড এবং তৃতীয় দিন যদি ওয়ারদিংটন যায় তা হলেই ভালো হয়।

সবই বুঝল গারল্যান্ড। ডবল ইলেকট্রিকের বেড়া যে তার পরে আছে তা বোঝা গেল ইয়ানের কথায়। জল বইছে বেড়ার নীচে মাটির তলে। মাটি নরম তার ফলে। শরীরের চাপে মাটি বসে যাবে তারের নিচ দিয়ে বুকে হেঁটে পেরুলে, এবং এর ফলে পেরনো যেতে পারে। মৃত্যু হবে তার ছুঁলেই। দুটি ওয়াচ টাওয়ার ডান পাশে একশো মিটার দূরে এবং বাঁ পাশে তিনশো মিটার দূরে। সর্বদা ঘুরছে তার সার্চলাইট। পেরতে হবে দুটি সার্চলাইটের সংকীর্ণ অন্ধকার জায়গা দিয়ে। যতক্ষণ ওরা বন্দুকের পাল্লায় থাকবে সীমান্ত পেরিয়ে ততক্ষণ গুলি ছুঁড়বে টাওয়ারের শান্ত্রীরা। মৃত্যু ডেকে আনার সামিল কারণ অসম্ভব দাঁড়িয়ে উঠে দৌড়নো। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়নো চলবে দুশো মিটার বুকে হেঁটে গিয়ে। তার আগে নয়। গারল্যান্ড বলল, কাজটি দুঃসাধ্য।

আমি সচক্ষে দেখেছি যে এটি দুঃসাধ্য হলেও করা যায়।

আমাকেই আগে যেতে হবে ইয়ান। প্যারিসে পৌঁছনোর দরকার আমার কাছের অত্যন্ত গোপনীয় দলিলটির। অন্যদের পালাবার পথ বন্ধ হবে, তোমাদের এতটুকু ভুলের জন্য মাইন ফাটলে।

কঠিন মুখে বলল ইয়ান, আমার স্ত্রীর জীবনের দাম অনেক বেশী তোমার দলিলের চেয়েও। তোমাদের এ পর্যন্ত এনেছি আমরাই। যতক্ষণ না আমরা আগে যাই ততক্ষণ কেউ যেন না যায়। কাল রাতে যাব আমরা। তুমি এবং মালা পরশু যাচ্ছ। ওয়ারদিংটন তরশু।

ইয়ানের সঙ্গে যে তর্ক করা বৃথা তা বুঝল গারল্যান্ড। ও রাজী হল অগত্যা। শুরু করে দিল এদিকে আবার গণ্ডগোল ওয়ারদিংটন। সবার শেষে সে একা যাবে না কিছুতেই। গলার আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ ওদের কানে। কথাবার্তা ও পায়ের শব্দ শোনা গেল সুড়ঙ্গের মুখ থেকে। চুপ করতে বলল সকলকে গারল্যান্ড। ও চলে গেল অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে দ্রুত বাতাস বেরোবার গর্তের মুখের কাছে। স্পষ্ট শুনতে পেল এখন সব কথা।

গর্তটির মুখে দাঁড়িয়ে মালিক সার্জেন্ট ও স্টুর্সা। সার্জেন্টটি বলল, 'একটা লম্বা সুড়ঙ্গ এবং তারপর একটি গুহা। দুটো সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে গুহা থেকে তার জানা নেই যে সেগুলি গেছে কোন্‌দিকে। তখনি সুড়ঙ্গে নামতে চাইল স্টুর্সা। মালিক বলল, ঢোকা উচিত আগে কাঁদানে বোমা মেরে তারপর। অতি সাংঘাতিক লোক এই গারল্যান্ড। তিনটি হাতবোমা ছিল স্টুর্সার কাছে। ও বলল, সঙ্গে কাঁদানে বোমা নেই। কমরেড মালিক আমি কন্ট্রোল করছি এ অপারেশান। আমি যাবই যাব ভেতরে।

সবই শুনল গারল্যান্ড। ও সকলকে সীমান্ত মুখে এগতে বলল, তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে। সময় নেই, তাই আর সময় মিলবে না। মেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলল ইয়ান রুকস্যাক দুটি তুলে নিয়ে। গারল্যান্ডের পেছন পেছন চলল ওয়ারদিংটন নাছোড়বান্দার মত। কিছুই অবশিষ্ট নেই যে ওর ভবিষ্যৎ বলে সেটা ও জানে। ও কাপুরুষ বা দুর্বল নয় এটা একবার অন্তত ও সর্বসমক্ষে প্রমাণ করতে চায়। ও গারল্যান্ডের মতই মরদ কা বাচ্চা এটা ওকে প্রমাণ করতেই হবে। মালা ওকে জীবনেও পাত্তা দেবে না, না হলে। মালার জন্যেই যে ওর শুধু বেঁচে থাকার ইচ্ছা এই কথাটা সত্যি। ও এগিয়ে চলল বন্দুক তুলে নিয়ে।

সুড়ঙ্গের ভেতর লাফিয়ে নামল স্টুর্সা। ওয়ারদিংটন ফিরে যায়নি যদিও গারল্যান্ড ওকে ফিরে যেতে বলেছিল। গারল্যান্ডকে না দেখলেও স্টুর্সা ওয়ারদিংটনকে ঠিকই দেখল। ওয়ারদিংটনের পিস্তল গর্জাল।

স্টুর্সা হাতের গ্রেনেড ছুঁড়ল আঘাতে ছিটকে পড়তে পড়তে। বুকে লাগল গ্রেনেডটা ওয়ারদিংটনের। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে দলা পাকিয়ে গেল ওয়ারদিংটন।

আকাশ ফাটানো শব্দ। স্তম্ভিত হয়ে রইল মুহূর্তের জন্য গারল্যান্ড। হাতড়ে এগিয়ে গেল তারপরে। স্টুর্সা সংজ্ঞাহীন, রক্তার্ত। ওর গ্রেনেড দুটি হাত করল গারল্যান্ড। যদিও ও লাইটার সিগারেটে জ্বাললো কিন্তু তারপরই লাইটার নেবালো ওয়ারদিংটনকে দেখে। সুড়ঙ্গ বেয়ে ফিরে এল তারপর। ইয়ান ফিরে এসেছিল বন্দুক এবং গ্রেনেডের শব্দে। পালাও পালাও গারল্যান্ড বলল। পালাও তোমরা, ওয়ারদিংটন মারা গেছে।

সুড়ঙ্গে যে পথ দিয়ে বাতাস ঢোকে সেই পথের ঢোকার মুখে পরপর ও ছুঁড়ে মারল দুটি গ্রেনেড। সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ ভেঙে ধ্বস নেমে। গুহাটা ধ্বসে পড়ল বিস্ফোরণে। ইয়ানের কাছে চলে এল গারল্যান্ড। বলল, আমরা যে চাপা পড়ে মারা গেছি, এটা ভাবতে পারে ওরা!

মালিক ক্ষেপে গেল পরপর বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শুনে। কি বোকা স্টুর্সা। হয়তো বন্ধই হয়ে গেল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। জীবন্ত সমাধি হল কি পলাতকদের। অন্য কোনো পথ নেই কি বেরুবার। আরো লোক জোগাড় করতে বলল ও সার্জেন্টকে। রেডিও ট্রাকের দিকে ছুটল ও নিজে। স্মেরনফকে বলল ও রেডিওতে, এমন লোককে খুঁজে বের কর যে জানে খনির এলাকাটা খুব তাড়াতাড়ি। কোনো ম্যাপ পাও কিনা দেখ এই অঞ্চলের। গ্যাস মুখোশ থাকে যেন তাদের সঙ্গে যাদের পাঠাবে। নীচে নামতে হবে ওদের। চাই অ্যাম্বুলেন্সও।

বুঝলাম কিন্তু সময় তো লাগবে।

জলদি কর এই কথা বলে কেটে দিল কানেকশন্‌ মালিক।

হাঁটছে পলাতকরা। হাঁটছে তো হাঁটছেই যে শত শত কিলোমিটার পথ বলে মনে হল মালার। হাতে মোমবাতি নিয়ে প্রথমে ইয়ান এবং পরে ব্লাঙ্কা। শেষে মালা এবং গারল্যান্ড। ওয়ারদিংটন যে মৃত একথা মালা বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওর হাত ধরে আছে গারল্যান্ড। কাঁদত নইলে ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এবার থামল ইয়ান। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দুজন মেয়ে। ওদের ইচ্ছে না আর এত ধকল।

ইয়ান বলল, ৪ কিমি আর বাকি। সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছব আর দুঘণ্টা বাদে। ঘন হবে ততক্ষণে অন্ধকার। আগে যাব আমি এবং ব্লাঙ্কা। আমরা আর সবুর করতে পারব না যদিও সজাগ থাকবে সীমান্তে শাস্ত্রীরা। বেরুবার পথ একমাত্র এটিই। জলে বোঝাই ডানদিকের সুড়ঙ্গটি সেটি সীমান্তের নীচ দিয়ে মাটির তলা দিয়ে ওপরে চলে গেছে। তেলতেলে গন্ধ জল। অসম্ভব সাঁতরে ৪ কিমি যাওয়া। জলে ইঁদুর, গ্যাস সবই আছে। লাশ ভেসে উঠেছিল যখন আমার এক বন্ধু গিয়েছিল গত বছর। লাশটি তেলে চোবানো, জলে চোপসা অর্ধেক খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে।

আবার চলতে শুরু করল ওরা। মালা পড়ে যেত তাই গারল্যান্ড চলল মালাকে জড়িয়ে ধরে।

ফিরে এসেছে মালিক ততক্ষণে বাতাস ঢোকার গর্তের মুখে। স্টুর্সা যে মারা গেছে তাও জেনে নিল আগে একজন সার্জেন্টকে নামিয়ে। মৃতদেহ পড়ে আছে আরেকটি লোকেরও। ধস নেমে বন্ধ সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে। নিচে নামল মালিক। ওয়াদিংটনের মৃতদেহ দেখল টর্চ জ্বেলে। পথ বন্ধ এগোবার। চাপা পড়ে মরল না কি বাকি পলাতকরা। দেখতে হবে খনি থেকে বেরুবার অন্য পথ আছে কি নেই। অসম্ভব এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা।

বরবাদ খনির ম্যাপের জন্য খনি মন্ত্রী বিভাগের এক কর্মচারীকে স্মেরনফ্‌ ধাতাচ্ছিল। কর্মচারীটি বলল, কোনো খোঁজ করা সম্ভব নয় পরদিন সকালের আগে। কোনো কথাই শুনল না কিন্তু স্মেরনফ্‌। সে জানাল, আসছি আমি প্রাগে। তোমায় ভুগিয়ে ছাড়ব যদি আমি ম্যাপ না পাই। বুঝেছ এটা একটা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার।

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে তখন পলাতকরা। মুখটি বন্ধ গাছ ও ঝোপে। ওদের মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে রাতের শীতল বাতাস।

ইয়ান বলল, অন্ধকার বেশ ঘন কারণ নটা বেজে গেছে। চললাম আমি আর ব্লাঙ্কা। চার ঘণ্টা লাগবে কম করে এই মাইন ফিল্‌ড পেরোতে। সেইমতো পার হয়ো আমি বলছি যেইভাবে। এক মিটার যাবে পাঁচ মিনিটে। বুঝলে খুব আস্তে। কি ভাবে আমরা পার হই সেটা দেখ। নরম মাটি পাচ্ছ তারপরে ইলেক্‌ট্রিক তারের বেড়ার তলায়। তার ছুঁলেই মারা যাবে সেই কারণেই খুব সাবধান।

বুঝেছি বলল গারল্যান্ড।

দুজন দুজনকে 'গুড লাক্‌' বলল। পরস্পরের কাছে বিদায় নিল মালা এবং ব্লাঙ্কা। মালা কাঁপছে। ভয় পেও না, ব্লাঙ্কা বলল। তোমায় দেখবে গারল্যান্ড। ও একেবারে ইয়ানের মতই। এই কথা বলে ওরা চলে গেল।

গারল্যান্ডকে ধরল মালা কেঁপে উঠে। জড়িয়ে ধরে বলল ওকে গারল্যান্ড। ভয় কি, আমি তো আছি নাতি নাতনীদের কি একখানা গল্প শোনাতে পারবে ভাবতো।

ওরাও এগুল ইয়ান এবং ব্লাঙ্কার পিছন পিছন। উঁচু ঘাস সামনে। ইলেক্‌ট্রিক তারের বেড়া রয়েছে একটু দূরে। পরস্পরকে চুমু খেল, ইয়ান ও ব্লাঙ্কা। গারল্যান্ডকে বলল ইয়ান দেখা আবার হবে অস্ট্রিয়ায়।

অসহনীয় এই উত্তেজনা। মালার শরীর কাঁপছে এবং ঘাম ঝরছে গারল্যান্ডের শরীর বেয়ে।

সার্চ লাইটের অনুসন্ধানী চোখ সীমান্তের অন্ধকার চিরে ফেলেছে। অন্ধকার চিরছে আলো ঘুরে ঘুরে।

ইয়ান আর ব্লাঙ্কা খুব আস্তে এগোচ্ছে। ভাঙন ধরেছে যেন গারল্যান্ডের অদম্য সাহসে। দেখতে পারছে না আর মালা। ও মুখ লুকিয়ে রয়েছে গারল্যান্ডের বুকে। সন্তর্পণে এগোচ্ছে ইয়ান আর ব্লাঙ্কা।

কি যেন ঘটে গেল হঠাৎ যা ঠিক বুঝল না গারল্যান্ড। সরাসরি ঠেকেছিল হয়তো ইয়ানের

শরীরে কোনো মাইন। ইয়ানের শরীর হাওয়ায় ছিটকে দুম্ করে পড়ে গেল আকাশ ধাঁধানো আওয়াজ আর ধোঁয়ার বিস্ফোরণের মধ্যে। ফাটল আরেকটি মাইন। চেঁচিয়ে উঠল মালা, ছুটছে ব্লাঙ্কা উঠে ইয়ানের দিকে। মেশিনগান গর্জে উঠল দুটি ওয়াচ টাওয়ারের। ব্লাঙ্কা ঝাঁঝরা হয়ে গেল গুলিতে।

মেশিন গানের গুলি ছিন্নভিন্ন করে দিল সমস্ত সীমান্তের মাটি। আকাশ দীর্ণ করল সাইরেনের কান্না। অন্ধকার রাত ভয়াল হয়ে উঠল বর্বর হিংস্রতায়।

।। আট ।।

ক্ষ্যাপা রাগে টগবগ করছে মালিক রেডিও ট্র্যাকে বসে। খবর শুনছে এক সার্জেন্ট রেডিও ইঞ্জিনিয়ার কানে হেডফোন লাগিয়ে। প্রাগে গেছে স্মেরনফ্ ম্যাপ আনতে। মাইন ফাটার আওয়াজ এবং মেসিনগানের গর্জন শোনা গেল দূর থেকে। মালিককে বলল সার্জেনটি হেডফোনে খবর শুনে। কমরেড মালিক বর্ডার পেরোতে গিয়ে একটি পুরুষ এবং একজন মেয়ে মারা পড়েছে।

গারল্যান্ড? মালিক বলল জেনে নাও, ওদের চেহারার বর্ণনা। নিস্তব্ধ রেডিও। হঠাৎ গলা ভেসে এল স্মেরনফের, দুটি পথ আছে বেরুবার জন্য, ম্যাপ পেয়েছি। এর মধ্যে জলে ভর্তি এবং বন্ধ রয়েছে একটি এবং অপরটি গেছে সীমান্তের মাইন-ফিল্ডে।

দুজন মারা পড়েছে পেরোতে গিয়ে, ঠিক বলছ একটা পথ জলে ভর্তি?

হ্যাঁ।

সার্জেন্টকে বলল মালিক, চলে এস ম্যাপটা নিয়ে, কারা মারা পড়ল খোঁজ নাও।

মাইন ফিল্ডের ঠিক মাঝখানে রয়েছে লাশদুটো তাই আনতে সময় লাগবে। মেয়েটির চুল সোনালি এবং পুরুষটির চেহারা ভারি সারি।

এই জল বোঝাই পথ দিয়ে বেরুত গারল্যান্ড যদি বেঁচে থাকত? আটকে পড়েছে কি তবে গারল্যান্ড খনিতে! মালিক বলল, কি রকম সময় লাগবে মাইন ফিল্ড পরিষ্কার করতে?

ওখানে কোনো মাইন ডিটেকটর নেই তাই লাগবে ঘণ্টা পাঁচেক। পাঠানো হয়েছে আনতে।

পাঁচ ঘণ্টা ওই সময়ের মধ্যে কতকি করতে পারে গারল্যান্ড। যদি ও বেঁচে থাকে, এমনকি ইচ্ছা করলে পালাতেও পারে।

দু ঘণ্টার মধ্যে স্মেরনফ এসে পড়ল পাগলের মতো ঝড়ো বেগে গাড়ি চালিয়ে। স্মেরনফ্ গাড়ির হুডে ম্যাপ বিছিয়ে দিল এবং তারপর টর্চের আলো ম্যাপের উপর ফেলে বলল ম্যাপ দেখিয়ে, দুটো বেরুবার পথ আছে। তিনশো মিটার ভেতরে চলে গেছে দ্বিতীয় পথটা অস্ট্রিয়ান সীমান্ত পেরিয়ে। অব্যবহার্য এই পথটি। জলে ভর্তি ৪ কিমির এই সুড়ঙ্গটি।

ছেলেখেলা ৪ কিমি সাঁতরানো গারল্যান্ডের কাছে।

ইঁদুর কিলবিলে, বন্ধ পচা এবং তেল বোঝাই জলটা। খেয়ে ফেলবে ওকে জ্যান্ত। গ্যাস বোঝাই সুড়ঙ্গ। গ্যাসটা মারাত্মক পরীক্ষা করে বলেছে বিশেষজ্ঞরা।

উবে যেতে পারে এতদিনে।

ও পথে যাওয়া অসম্ভব বিশেষজ্ঞরা বলেছে। তোমার হাতে এই বিশ্বাস করা বা না করা।

গারল্যান্ড, এ অন্য কেউ নয়, যদি এতটুকু ফাঁক পায় তো তবে পালাবে।

ম্যাপ দেখিয়ে একটু ভেবে মালিক বলল, আমি গারল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করব এই জলপথে বেরুবার মুখে।

অস্ট্রিয়া ওর টিকি ছোঁবে কি করে, পাগল হয়েছ কি তুমি?

মাত্র তিনশো মিটার তো বর্ডার থেকে, ওকে খতম করব গারল্যান্ড বেরুলেই। ফিরে আসব অস্ট্রিয়ান গার্ডরা আসবার আগেই।

বদ্ধ পাগলামি একেবারে এটি।

যেতে দেব না গারল্যান্ডকে পালিয়ে।

আমিও সঙ্গে যাব বেশ।

না আমার ফেরার বন্দোবস্ত তুমি নিজে করবে এদিক থেকে। ইলেকট্রিক সুইচ বন্ধ করবে

যখনই গুলির আওয়াজ পাবে। আমার ফেরার পথ করে রাখবে মাইন ফিলডের ভিতর দিয়ে।

অযথা ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি, ওপথেই যাবে কি গারল্যান্ড?

ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। খনির ভেতর সৈন্য নামাতে হবে ও পথে যদি না বেরোয়। চল সময় নষ্ট করো না। দেখতে হবে লাশগুলো।

ধুলোর ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ওদের গাড়ি।

হার মানতে জানে না গারল্যান্ড। ও ঠিক পথ করে নিয়ে পালাত যদি ও একা হত। মালা কাঁদছে কারণ ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে। যত বিপদ ওকে নিয়ে মালা ভয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদছে, মেশিন গানের আওয়াজ শুনে এবং দুটি লাশের দিকে চেয়ে।

ও পর পর দুটো চড় মারল মালাকে। জোর করে টেনে তুলে দিয়ে। মালা পড়ে গেলে ও আবার মালাকে টেনে তুলল। কি ধাতস্থ তো এখন ও বলল হেসে।

মালাও জোরে মারল ওকে চড়। তারপর ওর সম্বিৎ ফিরতে ও গারল্যান্ডের কাছে ক্ষমা চাইল। হেসে বলল, ক্ষমা করলাম তোমায় কিন্তু পালাতেই হবে আমাদের এখন, জলভর্তি সুড়ঙ্গ দিয়েই যাব। আমরা সবচেয়ে দামী ডিনার খাব আজ থেকে তিনদিনের মাথায় প্যারিসের রেস্তোরাঁয় দেখ না।

ওরা এগোচ্ছে সুড়ঙ্গ ধরে। রাইফেল এবং থলি হাতে গারল্যান্ড। জ্বলন্ত মোমবাতি মালার হাতে। বদ্ধ দুষিত হাওয়া। হালকা হল দুজনে কিছু কিছু পোষাক খুলে। প্যান্ট শুধু গারল্যান্ডের পরনে। জীন্‌স এবং অন্তর্বাস শুধু মালার পরনে।

সপ্রশংস চোখে গারল্যান্ড বললে, তুমি সত্যিই সুন্দরী। আমরা হয়তো ভালবাসাবাসিও করব তিনদিনের মাথায়।

একটু বসি। আর পারছি না আমি।

পথটা এগিয়ে দেখে আসি আমি।

দুজনের মনে কি যেন ঘটে গেল সহসা। মোমবাতি নিভে গেল। গারল্যান্ডকে টেনে জড়িয়ে ধরল মালা। এক হয়ে গেল যেন দুটো শরীর। সীমান্ত পেরুবার ভয় এবং দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ সুড়ঙ্গের ভয়। সবকিছুরই সময় যেন থেমে গেল। দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল আশ্চর্য এক সুখ স্রোত।

দুজনে ফিরে এল বাস্তবে একসময় এবং এরপর নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল গারল্যান্ড। এবং মালাকে ধীরে বলল, রাইফেল তুলে নিয়ে। আমি দেখে আসি কেমন, একটু। শুয়ে থাক তুমি চুপটি করে।

গারল্যান্ডের নাকে হঠাৎ তীব্র গন্ধ আসতে ও চোখ চেয়ে দেখল পাঁচ ছয়টি তেলের পিপে ঠেস দিয়ে রাখা দেওয়ালে। খালি অবশ্য পিপেগুলি এবং সেইমাত্রই ওর মনে হল যে পিপেগুলি যেহেতু খালি সুতরাং জলে ভাসবে সেগুলি। ওর পাশে সেই সময় এসে দাঁড়াল মালা।

গারল্যান্ড আর দেরি না করে কালো এবং পচা জলের কিনারায় পিপে এনে একটি একটি করে গড়িয়ে রাখল। একটি মোটা দড়ি পেয়ে গেল ওরা। তিনটি পিপে একত্র করার জন্য। ভেলা তৈরী হল তিনটে পিপে দড়ি বেঁধে।

দূরবীন নামিয়ে মালিক বলল, গারল্যান্ড ও নয়, খনির মধ্যেই আছে তার মানে এখনও গারল্যান্ড। সময় আর নেই তাই আর দেরী করব না। অত সবুর করা সম্ভব নয় ওরা ডিটেকটর এনে মাইন তোলা অব্দি। পেতে দাও টেবিল মাইনের ওপর, চলে যাব হেঁটে তার উপর দিয়ে।

কাজটা যে বিপজ্জনক তা ওকে বোঝাল পুলিশ কন্ট্রোলের মেজর। মাইন ফাটবে টেবিলের পায়া লাগালেও। মাইন ফিল্ড পেরুনো বরঞ্চ সম্ভব মোটা হুক লাগানো দড়িতে ঝুলে দোল খেয়ে। তাতেই সায় দিল মালিক। স্মেরনফ্‌ বলল, যদি গারল্যান্ড ও পথে না বেরোয়? দড়ি ছিঁড়ে যায় যদি, তুমি নেহাৎই গোয়ার্তুমি করছ।

মালিক বলল, তুমি দয়া করে চুপ কর কারণ আমি যাবই। যেতে হবে তিন কিলোমিটার পথ। মাইন ফিল্ড পেরুচ্ছি আমি দড়িতে ঝুলে। বন্ধ কর ইলেকট্রিক। হেঁটে চলে যাব তারের বেড়া

ধরে। ফিরব ওই পথেই। সব মাইন যেন তখন তুলে ফেলা হয়ে যায় ফিল্ডের।

বন্দোবস্ত হয়ে গেল দড়ির। মালিক হাত মেলাল মেজরের সঙ্গে। স্মেরনফ্ বলল, মেয়াদ শেষ এবার গারল্যান্ডের। এরপর ওকে দেখা হলে আমি খতম করব কারণ প্রথমেই ও‍ আমি হুঁশিয়ার করেছিলাম।

এত উচ্চাকাঙক্ষা কেন তোমার। আমিও যাই, কারণ গারল্যান্ডকে মারা আমার কাজ।

এটা বোঝাপড়ার পালা আমার এবং ওর।

ওয়াচ টাওয়ারে উঠে গেল মালিক মই বেয়ে। তারের বেড়ার ওপারে অস্ট্রিয়ার মাটিতে নামল এই দড়িতে ঝুল খেয়ে।

হুগো ভন রাইটেনা যিনি অস্ট্রিয়ান ফ্রন্টিয়ার এবং ক্যাপটেন, তিনি ভিয়েনার আমেরিকান দূতাবাসকে চাইলেন টেলিফোন তুলে। ও ভীষণ রকমের উঁচু ঘরানার, অভিজাত এবং কম্যুনিস্ট বিরোধি এবং ওর বয়স আটত্রিশ। ও মুগ্ধ আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রণালীতে। যেই পালিয়ে আসে কম্যুনিস্টদের থাবা এড়িয়ে ও প্রাণ দিতে পারে তাকে বাঁচাতে। ওকে জানিয়েছে গতকাল ভিয়েনার সি. আই. এ এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক হাওয়ার্ড যে সীমান্ত পেরুতে পারে এমন একজন আমেরিকান এজেন্ট। ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা হাওয়ার্ড কিছু বলেনি কিন্তু রাইটেনা আঁচে বুঝেছে।

ফোন ধরল হাওয়ার্ড। রাইটেনাও বলল, প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সীমান্ত পেরুবার। খবর এসেছে মাইন ফাটার মেশিনগান চলার। আমি যাচ্ছি সীমান্তে। জানাব যদি আর কোনো খবর পাই।

ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, তাই ধন্যবাদ। জান জায়গাটা কোথায়?

লেবানন পনেরো স্কোয়ার দুই।

ঠিক আছে।

দারুণ ব্যস্ততা চলছে গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে প্যারিসের আমেরিকান দূতাবাসে। ডোরী পায় ব্রুকম্যানের মৃত্যুর খবর। সংকেতে সংবাদ এসেছে প্রাগের আমেরিকান দূতাবাস থেকে যে মনে হয় গারল্যান্ড, মালা রীড এবং ওয়ারদিংটন অস্ট্রিয়ার সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। ওদের ধাওয়া করেছে মালিক ও স্মেরনফ্।

কালো ছায়া ডোরীর চোখের চারপাশে। ও হ্যালোরানকে দিল ও টেলিগ্রামটি। ও হ্যালোরান বলল, গারল্যান্ডের কাছে এখনো আছে কিনা জানি না টপ সিক্রেট ডকুমেন্টগুলি। ভাবি না ওর জন্যে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি যে মালিক আর স্মেরনফকে ও সামলাতে পারবে।

হয়ে গেল তিন দিন। এবার জানি যে কাগজ খোয়া গেছে।

আগে কিছু কর না দাঁড়াও গারল্যান্ড ফিরুক।

ল্যাটিমারকে প্রাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি কারণ ব্যস্ত ছিল মালিক গারল্যান্ডকে নিয়ে। ভণ্ডুল করিনি একেবারে সব। আমাকে ফাঁসাতে পারে তবে গারল্যান্ড। ও কাগজগুলো দিয়ে নিজের জান বাঁচাবে যদি মালিক ওকে ধরে।

বাঁচবে না কেন ও? কোনো কাজ কোনো দিন করেছি আমরা ওর বিশ্বস্ততা অর্জনের মত। আমি চললাম ভিয়েনা। খবর দিয়েছি হাওয়ার্ডকে। একটি ভালো লোক আছে ও বলেছে সীমান্তে। সহায়তা করবে সবরকম আমাদের।

টিম তুমি যা পার কর তবে পেতেই হবে দলিল।

তা হলে পাবে যদি দলিলটা বার করে আনা হয়ে থাকে প্রাগ থেকে। বেরিয়ে গেল ও হ্যালোরান। ভিয়েনা রওনা হয়ে গেল সে তারপরই একটি দ্রুতগামী মিলিটারী জেট প্লেনে।

গারল্যান্ড পচা দড়ি দিয়ে বাঁধল তিনটে তেলের পিপে। সব জিনিষ বার করল তারপর রুকসাক খুলে। একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে ছিল এক টুকরো চীজ্। একটি বাসি পাউরুটি, একটি সসেজ। টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের খাম সে তাতে ভরল। তাতেই সে ভরল নিজের, ইয়ান, ব্রাঙ্কা এবং মালার ভাগের টাকা। রুকস্যাকে ভরল ব্যাগটি আঁট করে বেঁধে। তেলের পিপের দড়ির সঙ্গে রুকস্যাকের স্ট্র্যাপ বাঁধল। গারল্যান্ড মালাকে চুমু খেল ভেলাটি জলে ভাসিয়ে বলল, যে বিপদই আসুক, আমি সামলে নেব তা ভয় পেও না। আমি প্যারিসের সেরা দামী ডিনার খাওয়াব

তিন দিন বাদে মনে রেখো।

ওরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ভেলায় উঠে। দুটি সামনের পিপের ওপর বসানো জ্বলন্ত মোমবাতি। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দাঁড় টানছে গারল্যান্ড। ওর হাত ভারি হয়ে গেল কিন্তু। ওরা হাত দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে চলতে থাকল হাতে রাইফেলটি তুলে নিয়ে।

বিষাক্ত, দূষিত অন্ধকার, কালো পিচ্ছিল এবং দুর্গন্ধ জল। যেতে হবে চার কিলোমিটার। নিচে নেমে এল ক্রমে সুড়ঙ্গের হাত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কারণ বাতাস ভারি। দুটি চোখ জ্বলে উঠল হঠাৎ মালার কাছে। ও হাত তুলে দিল ভয়ে চেঁচিয়ে। জলের ইঁদুর, তাই গারল্যান্ডও হাত উঠিয়ে নিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুরটা, ধাক্কা লেগে পড়ে গেল পিপের গায়ে।

ভেলা থেমে গেল কারণ অসংখ্য ইঁদুর রয়েছে চারদিকের জলে। ভেলা ঠেলে নিয়ে চলল গারল্যান্ড রাইফেলের কুঁদো দিয়ে। রাইফেলের নলের উপর লাফিয়ে উঠল একটি বিশাল ইঁদুর জ্বলন্ত চোখে। গারল্যান্ড বাঁ হাতে ইঁদুরটাকে ফেলে দিল। রাইফেল গর্জে উঠল। বজ্রপাতের মতো ভীষণ শোনাল বন্ধ পরিবেশে গুলির শব্দ, ইঁদুরের দল মিলিয়ে গেল নিমেষে।

নতুন চেহারায় এবার বিপদ এল। এত জল বেশি এবং এত নিচে নেমে এসেছে সুড়ঙ্গের ছাদ! সেই ছাদে শরীর ঘষে যেতে লাগল। গারল্যান্ড ভেলা ঠেলে দিয়ে চলল হাতে হাত ঠেলা দিয়ে দিয়ে। ভেঙে পড়ছিল মালা একেবারে। হাতে হাত রেখে ও ঠেলতে থাকল। ভেসে চলল ভেলা জোরে। দূষিত বাতাস, ভেলাকে বুঝি ডুবিয়ে দেয় ছাদ থেকে খোঁচা খোঁচা পাথরের টুকরো। যেন কাটছে না সময়। মালা চেতনা হারাল বিবশ ভয়ার্ত হয়ে।

ভেলা টেনে চলেছে গারল্যান্ড একাই ছাতে ছাতে ঠেলা মেরে। জল কি এখানে তবে কমে এল। কি হল? হাতে হাত ঠেকাতে হচ্ছে এবার হাত সম্পূর্ণ উঁচু করে গারল্যান্ডকে। ফাঁকায় বেরিয়ে এল হঠাৎ ভেলাটা সুড়ঙ্গ ছেড়ে। ওর শরীর জুড়িয়ে দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক নির্মল হাওয়া। সে বাতাসের স্পর্শ পেল।

গারল্যান্ড চেঁচিয়ে বলল, ওঠ, ওঠ, আমরা পৌঁছে গেছি মালা।

ও হ্যালোরেন সি. আই. এ. এজেন্ট ফ্রাঙ্ক হাওয়ার্ডকে দেখতে পেল মিলিটারী জেট থেকে নেমেই। মিলিটারি হেলিকপ্টারে দুজনে উঠে বসল। ওদের জন্য ডন রাইটেনা অপেক্ষা করছে অস্ট্রিয়া সীমান্তে। সব ঘটনার বিবরণ হাওয়ার্ড ও' হ্যালোরানকে দিয়ে বলল গারল্যান্ড দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে জলপথে আসবে বলে ওর ধারণা। সুড়ঙ্গের জল যে মানুষখেকো ইঁদুরে বোঝাই ও সেকথাও বলল। তদারকী করছে এদিকে মালিক স্মেরনফ। অনেক বিপদ।

অবিচলিত এবং নিরুদ্বিগ্ন ভাবে ও' হ্যালোরান বলল, আমি গারল্যান্ডকে জানি। ও বেরিয়ে আসবেই একশো ডলার বাজি রেখে বলছি।

গারল্যাণ্ডের কথা আমি অনেক শুনেছি, তাই বাবা আমি বাজি রাখছি না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল মালিক, ঘন্টারও বেশী সময় লেগেছে ওর এখানে আসতে। তৎপরতা বেড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে অস্ট্রিয়ান সীমান্তে চলাফেরার। ও নিশ্চুপে এপারে আসছে অসামান্য সাহসে, সন্তর্পণে, ঝোপ জঙ্গলে অস্ট্রিয়ান শান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে শিকারী বাঘের মত সাবধানে। আকাশ ফরসা হচ্ছে কারণ ভোর চারটে বেজে গেছে।

জঙ্গল এখন নিস্তব্ধ। খনিব সুড়ঙ্গের মুখ দেখা যাচ্ছে। এই মুখ দিয়ে বেরুবে গারলাণ্ড। পিস্তলের পাল্লার বাইরে এই জায়গাটা মালিকের। তার মানে আরো কাছে এগুতে হবে মালিককে। ঝোপে ঢাকা রয়েছে বাঁ দিকের সুড়ঙ্গের মুখের একটি টিলা। পিস্তল ছোঁড়া চলবে ওখান থেকে। ঝোপের পিছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মালিক ছুটে গিয়ে টিলায় উঠে।

গলার আওয়াজ পাওয়া গেল সৈন্যদের আবার জঙ্গলে। অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা গুলির শব্দে ছুটে আসবে ও যদি গারলাণ্ডকে গুলি করে সেটাই মালিকের হঠাৎ খেয়াল হল। আর ফেরা হবে না মালিকের। তার মানে খালি হাতে মারতে হবে গারল্যাণ্ডকে। ও ধরে সেই শক্তি। দাঁড়ানো যাক তবে সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মালিক যেই গারল্যাণ্ড বেরোবে। নেমে এগিয়ে চলল ও টিলা থেকে।

তীরে ঠেকল এসে ভেলা। শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে ভোরের বাতাস, দেখা যাচ্ছে দিনের আলো।

গারল্যাণ্ড টেনে তুলল মালাকে। পাড়ে টেনে তুলল ভেলাটিকে। গারল্যাণ্ড উঠল কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে দম নিয়ে, খুলে নিল মেলার সঙ্গে বাঁধা রুকস্যাক। বিপদ কাটেনি এখনো। সশস্ত্র শান্ত্রী আছে কিনা এ সীমান্তে, তাই বা কে জানে যে কোনো গ্রাম বা শহর আছে কি না।

গারল্যান্ড দাঁড় করাল টেনে মালাকে। খানিকটা আছে এখনো সুড়ঙ্গ। জলশূন্য তবে তা নীল আকাশের আভাস সুড়ঙ্গের মুখে। গারল্যান্ড বলল রুকস্যাক ও রাইফেল নামিয়ে রেখে, এখানে থাক তুমি, বেরুনো নিরাপদ হবে কিনা তা আমি একটু দেখে আসি।

ও দাঁড়াল সুড়ঙ্গের মুখে। চারপাশ বড় শান্ত নিস্তব্ধ। দীর্ঘ ঘাসের ছায়া কাঁপছে। সাদা মেঘ অলস মন্থরতায় ভেসে চলেছে নীল আকাশে। গারল্যাণ্ড থমকে গেল আশ্বস্ত হয়ে মালাকে ডাকতে গিয়ে। একটি পায়ের ছাপ বালির ওপর সামনে, আর কোনো ছাপ যে নেই সেটা ভাল করে দেখল। তবে কেউ এখান দিয়ে গেছে। ছাপটি ডেবে বসেছে বালিতে। যার পায়ের ছাপ এটি সে নিশ্চয় খুব বিরাটকায়, বলিষ্ঠ এবং তার দেহের ওজন খুব ভারি।

নিশ্চয় মালিকের পায়ের ছাপ এটি। এমন সর্বনেশে ঝুঁকি কেউ নেবে না মালিক ছাড়া।

ও ফিরে এল মালার কাছে। বলল, ঝামেলা বাধবে বোধহয়। আমাদের জন্য মনে হচ্ছে ওঁত পেতে বাইরে রয়েছে মালিক।

আতঙ্কে ওর হাত চেপে ধরল মালা। গারল্যাণ্ড বলল, আমরা জিতবই, তুমি ঘাবড়িও না। রাইফেল চালিয়েছ কখনো, নিশ্চয় চালাওনি। চালানো খুবই সোজা, তুমি এটা রাখো। ট্রিগার টিপবে এই ভাবে ধরে। পর পর চলবে কুড়ি রাউণ্ড গুলি, বাইরে যাচ্ছি আমি। তুমি আকাশের দিকে রাইফেলের নল উঁচিয়ে ট্রিগার টিপবে যেইমাত্র আমি বেরোব। মালিকের সময় লাগবে কোত্থেকে গুলি আসছে সেটা বুঝতে। আমি হদিশ পেয়ে যাব মালিকের। সতর্ক হতে পারবে সীমান্তের সৈন্যরাও।

তখনো ওর কথা শেষ হয় নি, সেই সময় পিস্তল হাতে মালিক সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে বলল, গারল্যান্ড নড়ো না।

রাইফেল ফেলে দিল মালা ভয়ে আর্তনাদ করে। মুখে হাসি নিয়ে গারল্যাণ্ড বলল, মালিক আঁচ করেছিলাম আমি যে ধারে কাছেই তুমি আছ। ঝুঁকি তুমি বেশী নিচ্ছ না কি যে বর্ডার টপকে এসে।

মেয়েটা এখানেই থাকুক বেরিয়ে এস।

মগজ ছুটে চলল গারল্যাণ্ডের। করছে না কেন মালিক ওদের গুলি, স্বচ্ছন্দে তো করতে পারত। সিধে জবাব, বর্ডারের এপারে এসে গুলি করলে ও নিজে ফাঁদে পড়বে। ওর সাহস হবে না গুলি করার। ও বলল, মালিক, চলে যাও, বরাতজোর থাকলে পালাতে পারবে! জলদি!

বেরিয়ে এস, বলেছিলাম না আবার দেখা হলেই সেটা শেষ মোলাকাৎ হবে।

মালিক ঝাঁপিয়ে পড়ল চলমান দানবের মত। গারল্যাণ্ড ধারণাও করেনি যে অত দ্রুত ছুটে আসবে ও। ও গারল্যান্ডকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিল, উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে। মালাকে ফেলে দিল তারপর লাথি মেরে।

মালিকের থাবা দুটো চেপে বসছে গারল্যান্ডের কণ্ঠনালীতে। গারল্যান্ডের চেয়ে দশ কিলোগ্রাম বেশী লোকটার ওজন। দম চলে যাচ্ছে এবং পিষে যাচ্ছে গারল্যান্ড। ওর শেষ শক্তি দিয়ে সাংঘাতিকের সাংঘাতিক 'ক্যারাটে' ঘা হানল ও মালিকের ঘাড়ে। হাত শিথিল হয়ে খসে পড়ল মালিকের। গারল্যান্ডের মুখ লক্ষ্য করে ও একটু পিছিয়ে ঘুষি চালাল। মাথা সরাল গারল্যান্ড ঠিক সময়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ল মালিকের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। মালিক যন্ত্রণায় শ্বাস টানল। চুরমার হয়ে গেল হাতের হাড় ভেঙে।

গড়িয়ে সরে গেল গারল্যান্ড। পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল দুজনে শুয়ে। উঠে দাঁড়াল মালিক, ওর হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। সর্বশক্তি নিঃশেষ গারল্যান্ডের। মালিক গারল্যান্ডের মুখের উপর বুটসুদ্ধ পা তুলল। একটা পাথর নিতে গেল তারপর জুতো নষ্ট করেছে ভেবে। ভেঙে দেবে গারল্যান্ডের মাথার খুলি। পরক্ষণেই থেমে গেল।

অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মালা। মালিক লক্ষ্য।

গারল্যান্ড চেঁচাল, মালা ওকে মেরো না।

মারবই।

থামো।

উঠে দাঁড়িয়ে গারল্যান্ড, মালার হাত থেকে রাইফেল নিল। তাকিয়ে আছে মালিক, এবারে ওকে মারবে গারল্যান্ড। ফুলে উঠছে বাঁ হাত। কিন্তু নির্বিকার শীতল মালিকের পাথর পাথর মুখ।

গারল্যান্ড মাথা নেড়ে বলল, কমরেড, ঠাণ্ডা হও। তোমার আমার একই অবস্থা তাই আমি গুলি করব না। আমরা গাধার মতো ফাঁদে পড়ি পরের হুকুমে। চলে যাও এই ভেলা করে। অবশ্য ইঁদুর থাকলেও আমি যখন পেরেছি তুমিও পারবে।

মালিকের সবুজ চোখে বিস্ময়, তোমায় আমি মারতে এসেছিলাম তবুও।

বড় বেশী গুরুত্ব দাও তুমি কাজকে। আমায় মারতে চেয়েছিলে তুমি। আমাকেও তার মানে তোমায় মারতে হবে এটা নিশ্চয় নয়। পালাও।

চেয়ে রইল মালিক। বলল, আমাদের আবার দেখা হলে একসঙ্গে বোতল খুলব।

মালিকের এটা ধন্যবাদ জানানোর ভাষা বলেই বুঝল গারল্যান্ড। ও হেসে মালিকের পিস্তল ফিরিয়ে দিল এবং বলল, যেতে পারবে না পিস্তল না থাকলে, কারণ এর আওয়াজে ইঁদুররা ঘাবড়ায়।

তুমি পাগল বলেই জেনে এসেছিলাম, যদিও এখন সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম।

পাগল আমরা দুজনেই কারণ পাগল না হলে এরকম কাণ্ড কারখানা কেউ করতাম না।

গুলি আছে পিস্তলে?

পিস্তল রেখে লাভ হত কিছু যদি গুলি থাকত।

আমায় তুমি পিস্তল দিচ্ছ গুলি সুদ্ধু।

বাপু পালাও, যেতেই পারবে না পিস্তল না থাকলে। একই পেশার লোক আমরা দুজনেই। নোংরা একইরকম পাপচক্রে কাজ করি দুজনেই। নাও, পারব না কি দুজনেই ভুলে থাকতে বদমাশ ওপরওয়ালাদের।

পিস্তল নিতে মালিক, চেঁচিয়ে উঠল মালা। গারল্যান্ড বললে, আমরা দুজনেই যবনিকার ওপারে দাঁড়িয়ে আছি, তাই ভয় পেও না। গুড লাক মালিক। সেটা একটা ভুল বলে ধরতে হবে।

রাইফেল রেখে চলে গেল ওরা রুকস্যাক নিয়ে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মালিক।

গারল্যান্ড ঢুকল ডোরীর প্যারিসের অফিসে। বলল, অ্যালসার কেমন জ্বালাচ্ছে?

অস্ট্রিয়ার জেলে পচতে তুমি যদি তোমায় আমি ধরিয়ে দিতাম গারল্যান্ড।

হাসিতে ফেটে পড়ল গারল্যান্ড। বলল, এই ধাপ্পায় ডোরী পাঁচ বছরের খোকাও ভুলবে না। সাহস করবে না তুমি আমায় ধরতে, এটা তুমি জান। আমি সব ফাঁস করে দিতাম ধরালেই। চাকরিটি যেত তোমার। আমি ফাঁদে পড়েছিলাম কারণ তুমি আমায় ফাঁদে ফেলেছিলে। তুমি একবারও ভাবনি আমার কি হবে। এবার তুমি শোধ নিতে গিয়েছিলে গতবার তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছিলাম। আমি ভেবে দেখলাম তখনই যখন তুমি আমার হাতে একটি টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট গছিয়েছ উজবুকের মত। শেষে ঠিক করলাম যে তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। তুমি একটা বিবেকবান উজবুক। তুমি কাজ ভালোই কর। পরের লোকটা হয়তো আরো বেশী উজবুক হবে যদি তুমি কাজ খোয়াও। তোমার ডকুমেন্টটা নাও, এটা আমি নিয়ে বেরিয়ে এসেছি প্রাগ থেকে। যদিও ভীষণ দুঃসাধ্য কাজ তবুও ভেবেছিলাম তোমাকে দেব তাই দিলাম।

ডোরী নিশ্চিন্ত হল ডকুমেন্ট খুলে দেখে। বলল, বল কি চাও?

হাবড়া হয়ে গেলে না কি বুড়িয়ে? ও কাগজ তোমার হাতে এনে দিতাম আমি দাঁত কষাকষির মন থাকলে?

তোমার বেজায় টাকার লোভ গারল্যান্ড আমি জানি, কিন্তু আমি তো ধনী নই, রফা করবে বিশ হাজার ডলারে।

এখনো ভয় আমি সব ফাঁস করে দেব বলে? তুমি হচ্ছ আমার তরকারীতে নুন, বুঝলে বুড়ো ছাগল। আমি আছি প্যারিসে, এ আমি ভাবতেই পারি না যে তুমি আমার কাছে ছুটে আসছ বোকামি

করে। প্যারিসে থাকবেটা কে, তুমি না থাকলে? এটা কি হয় যে আইফেল টাওয়ার নেই অথচ প্যারিস আছে। মনে রেখো তখন খেলা খতম করে দেব পরের বার যদি আমায় ফাঁদে ফেলতে চাও।

ধন্যবাদ আর হবে না মনে রাখব।

পেয়েছিলে এই ত্রিশ হাজার ডলার। তার কি হল?

হাসিতে ফেটে পড়ে গারল্যান্ড বলল, ডোরী সেই আদি ও অকৃত্রিম। তোমারও কোনো পরিবর্তন নেই আইফেল টাওয়ারের মত।

বেরিয়ে এল ও।

মালা ও গারল্যান্ডের দামী ডিনার খাওয়া হল প্যারিসের সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয়। মালাকে নরমান্ডি হোটেলে ঘর ঠিক করে দিয়ে সেই ঘর ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে ও। এমন সুন্দর সুখের জীবন পাবে বলে মালা ভাবেনি। ও অশেষ ঋণী গারল্যান্ডের কাছে। গারল্যান্ড মালাকে ওয়ারদিংটনের টাকার কথা বলল ডিনার শেষ করে। বলল, টাকা পাবে জেনিভার ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্কে প্রমাণপত্র দাখিল করলেই। ষাট হাজার ডলার, কম নয়।

দিয়ে গেছে আমাকে। সত্যিই ভালোবেসেছিল ও আমাকে। আমি কিন্তু পারলাম না। আমি কি করব এত টাকা নিয়ে?

একাই বা থাকবে কেন বেশী দিন, টাকাটা ব্যাঙ্কে খাটাবে।

আমরা একসঙ্গে এত সুখে, তুমি এসো না জেনিভায়।

আমি একা থাকতে ভালবাসি সোনা তাই একাই থাকব।

চোখে জল ভরে উঠল মালার, তাই দুঃখ হল গারল্যান্ডের। তা ওর বোঝা উচিত ছিল যে মালা ওকে ভালবাসবে। জেনিভায় মালা নতুন জীবন শুরু করতে পারে কারণ ওর টাকা আছে, বয়স আছে।

বেরিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে ওরা ট্যাক্সিতে উঠল। এক নিরানন্দ বিষণ্ণতা সন্ধ্যার আনন্দে, ব্যথায় ভারি আসন্ন বিদায়ের।

মালা হোটেলে পৌঁছে বলল, আসবে না ওপরে?

কাল তুমি জেনিভা যাচ্ছ। আমি আর যাব না, তোমার প্লেনের টিকিট নাও, বেছে নিও নিজের মনোমত জীবন। তোমাকে একা থাকতে হবে কেন? তোমার রূপ আছে, টাকা আছে। ভুলে যাও আমার কথা। আমি সুখী করতে পারিনা কোনো মেয়েকে।

মালা নেমে গিয়ে ধন্যবাদ জানাল। হোটেলে পেছন ফিরে ধীরে ঢুকল ও। ওর যৌবন উচ্ছল শরীরে ঢেউয়ের পর ঢেউ দেখল মালা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব এখন?

তখনো মালাকে দেখছে গারল্যান্ড। ওর হঠাৎ মনে পড়ল গুহার সেই রোমাঞ্চকর সহসা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

মালার সেই অস্ফুট আর্তনাদ নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে দিতে। প্রবল উত্তেজনার তরঙ্গ তুলল ওর শরীর ভাসিয়ে। আবার চাই মালাকে।

কোথায় যাব, কোথাও না। ও নেমে পড়ল ড্রাইভারের হাতে দশ ফ্রাঁর নোট গুঁজে দিয়ে তারপর হোটেলে ঢুকল।

গারল্যান্ড গিয়ে পাশে দাঁড়াল, মালা নিচ্ছে ওর ঘরের চাবি।

মালা মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। ওর হাত তারপর হেসে জড়িয়ে ধরল। লিফ্‌টের দিকে দুজনে এগিয়ে গেল।

হিট অ্যান্ড রান

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সেই ধরনের বড়সাহেব ছিলেন রোজার আইকেন যিনি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনকে মিশিয়ে ফেলতেন না। প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার আগে পর্যন্ত আমি তাঁর বাড়ি যাইনি বা তাঁর স্ত্রীকে দেখিনি।

তাঁর বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ তিনিও আমাকে কখনও জানাননি। অবশ্য এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। যদি অফিসের বড়কর্তারা কর্মচারীদের পরিবারের অংশ হিসেবে মনে করেন, তার চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। অনেকে কর্মচারীদের মাসে একবার বাড়িতে রাজকীয় নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। সেখানে কর্মচারীদের কেউ পান করতে বা কথা বলতে সাহস পায় না। আমি এই ধরনের বড়বাবুদের প্লেগ রুগীর মত দূরে রাখার চেষ্টা করি।

কিন্তু রোজার ছিলেন কড়া জমিদারী মেজাজের বড় সাহেব। যে সব মেয়ে পুরুষেরা তাঁর কাছে কাজ করত, তিনি তাদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। অন্য বিজ্ঞাপন এজেন্সির চেয়ে সিকি ভাগ মাইনে বেশী দিতেন। কিন্তু প্রথম সপ্তাহে কেউ ভাল কাজ দেখাতে না পারলে তিনি তাদের চেপে ধরতেন। ফলে তাঁদের চাকরী ছেড়ে দিতে হত। আইকেনের কাছে দ্বিতীয় কোন সুযোগ মিলত না। সোজা ভাষায় হয় কাজ কর, নয় বিদায় নাও।

উপকূল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও ভাল এজেন্সি ছিল আইকেনের পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড প্যাসিফিক এজেন্সি। আমি আগে এক ক্ষুদ্র সংস্থায় কাজ করতাম। যার আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং এক পা ছিল দেনার কবরে পোঁতা। অফিসের বড় কর্তাকে অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্যে ধরে নিয়ে ছিল প্রায় দু বছর আগে। বেশ মনে আছে আমি একদিন যখন নতুন ধরনের ডিশ ওয়াশার তৈরির পরিকল্পনা করছিলাম তখন রোজার আইকেনের সেক্রেটারির ফোন এল। তিনি জানালেন রোজার আইকেন ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান আর আমি কি সেদিন ছটার সময় যেতে পারব?

আমি অবশ্য আইকেনের খ্যাতি জানতাম আর একদল ধনী ব্যবসায়ীর হয়ে তিনি এজেন্সী চালাতেন এবং আশ্চর্য রকমের কাজ দেখিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই আমি একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম। উপকূল অঞ্চলের যে কোন বিজ্ঞাপন কর্মীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই ছিল ইন্টারন্যাশনালে একটি চাকরী পাওয়া।

ছটা বেজে পাঁচ মিনিটে তাঁর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইস্পাত রং-এর একজোড়া নীল চোখ আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। মাখনেব ভিতর দিয়ে গরম ছুরি যাওয়ার মত তার চোখের দৃষ্টি আমার মাথা ভেদ করে চলে গেল।

ছ'ফুট দু ইঞ্চির কিছু দীর্ঘ আইকেন, সুন্দর স্বাস্থ্য। হুইস্কির মত গায়ের রং, পানাশক্ত মুখ এবং চোয়াল দুটো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত। সাতান্ন বছর বয়স হবে, শরীরের মাঝখানটা বেশ মোটা। বেশ স্বচ্ছল অবস্থা দেখে মনে হয়।

প্রায় দশ সেকেন্ড আমাকে দেখে পরে উঠে তার গিঁটে ভর্তি হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বেশ জোরেই তিনি বললেন, আপনিই মিঃ স্কট?

বুঝতে পারছিলাম না কাউকে কি তিনি স্কট ভেবেছিলেন। কারণ তার ঘরে আসার আগে অন্ততঃ পাঁচজন ক্ষুদে অফিসারের কাছে আমার নাম ধাম জানাতে হয়েছিল।

হ্যাঁ, আমিই চেসটার স্কট।

ডেস্কের ওপর একটা ফাইল খুলে তিনি তাঁর মোটা আঙুল বুলিয়ে বললেন, এসব আপনার কাজ?

গত চার পাঁচ মাসে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় আমি যে সব কাজ করেছিলাম তাদের ডজন দুয়েক কাটা টুকরো ফোল্ডারে ছিল।

এসব আমারই কাজ জানালাম।

তিনি ফোল্ডার বন্ধ করে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

বললেন, মন্দ নয়। আপনার মত লোককে কাজে লাগাতে পারি। ওরা আপনাকে কত দিচ্ছে?

জানালাম।

কিছুক্ষণ এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে যেন আমার কথা ঠিকমত শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

আপনি কি জানেন আপনার দাম আরও বেশি?

আমি জানি।

তাহলে কিছু করার চেষ্টা করেন নি কেন?

জানালাম ইদানীং বেশ ব্যস্ত ছিলাম এবং এ ধরনের কিছু করার সময় পাইনি।

আপনার কাছে টাকার চেয়ে কাজের দাম বেশী, অ্যাঁ?

ঠিক তা বলছি না। আসলে আমি ব্যস্ত ছিলাম।

আপনি এখন যা পাচ্ছেন আমি তার চেয়ে প্রতি সপ্তাহে একশো করে বেশি দেব। সোমবার থেকে কাজ শুরু করতে পারেন।

ইন্টারন্যাশনালে এই ভাবেই কাজ করতে আসি।

এখন দু বছর পরে আমি অফিসের দ্বিতীয় কর্তা এবং যে কোন কাজের জবাবদিহি কেবল আইকেনকেই দিতে হয়। এখনকার বেতন দু বছর আগে স্বপ্ন মনে হত। আর আছে ক্যাডিলাক কনভারটিবল, সমুদ্রের উপর একটি তিন ঘরের বাংলো, কাজ করার জন্য ফিলিপিনো ছেলে এবং ব্যাঙ্কে বেশ মোটা অঙ্ক।

ভাববেন না আমি কেবল চেয়ারে বসে ও সিগারেট টেনে এই অবস্থায় উঠেছিলাম। আইকেনের কাছে কাজ করতে এলে সত্যিকারের কাজ করতে হয়। শনিবার সমেত প্রতিদিন সকাল নটায় ডেস্কে এসে বসতাম এবং এমন দিনও গেছে যখন মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করতাম। ইন্টারন্যাশানালে কাউকে ভাল মাইনে দিলে যাতে শরীরের মাংসের প্রতি পাউন্ড পাওয়া যায় আইকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এত পরিশ্রমেও ভাল লাগত এবং কাজ করার বেশ ভাল কয়েকজন সঙ্গীও পেয়েছিলাম। আর সকলের উপরে ছিলাম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ঘটল না।

জুলাই মাসের এক গরম সন্ধ্যায় অফিসে বেশ দেরি পর্যন্ত কাজ করছিলাম। তখন প্রায় নটা হবে। আমার সেক্রেটারী প্যাট হেনেসি ও শিল্পী জো ফেলোস কেবল সেখানে ছিল। একটা নতুন গায়ে মাখা সাবানের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কাজটা খুব বড়, সারা দেশ জুড়ে টেলিভিশনের কর্মসূচী এবং প্রায় বিশ লাখ টাকা খরচ হবে।

কয়েকটা বিজ্ঞাপনের আর্ট পুল ফেলোস আমাকে দেখাচ্ছিল, ছবিগুলো বেশ সুন্দর। প্যাট ও আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখন প্যাটের ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলল সে।

দেখতে খুব সুন্দর প্যাট। লম্বা, গায়ের রঙ সুন্দর, বড় নীল চোখ, বয়স প্রায় ছাব্বিশ এবং ক্ষুরের মত ধারালো। সে ও আমি যেন একটা দল গড়ে তুলেছিলাম। মাঝে মাঝে সে আমার স্মৃতিশক্তিকে তাজা করে তুলত। তবে আইকেনের দেওয়া কাজের স্তূপের সঙ্গে আমার তাল মিলাতে সহজ হতো।

টেলিফোনে প্যাট কি বলছিল সেদিকে আমি মন দিই নি। জো ও আমি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া পাল্টাচ্ছিলাম। মডেলের মেয়েটির ছবি দেখে আমি খুশি হতে পারিনি।

দেখ জো, বাস্তবে যদি কোনো মেয়ের এত বড় স্তন থাকে, তবে প্রথমে সে রিভলভিং দরজা দিয়ে যেতেই আটকে যাবে।

জো সহজভাবে বলল, ব্যাপারটা ঠিক তাই। আমি ঠিক এটাই বোঝাতে চাইছি লোকেরা এই

বিজ্ঞাপন দেখামাত্র নিজেকে প্রশ্ন করবে এই সুন্দরী যখন রিভলভিং দরজার ভিতর যাবে তখন কি করবে। ড্রয়িংটা মনোবিজ্ঞানের।

আমি খসড়াটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম আর হাসি সামলাতে পারলাম না। প্যাট এসে শান্ত গলায় বলল, মিঃ আইকেন তাঁর পা ভেঙেছেন।

যদি বলতে তিনি তাঁর গলা....ঠাট্টা করছ?

প্যাট আমার দিকে দেখল।

মিঃ আইকেনের হাউস কিপার কথা বলছিলেন। আইকেন প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছে।

জো কিছু না বুঝেই বলল, ব্যাপারটা ঠিক তারই উপযুক্ত। নিশ্চয়ই দিলদরিয়া মেজাজে কোথাও পা ভেঙ্গেছে। সে কি বলল কোন্ পা?

জো, তুমি কি চুপ করবে? বলে প্যাটকে বললাম, 'তিনি কোথায়? হাসপাতালে?

সকলে ধরে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। একবার আপনাকে দেখতে চান, হাউসকিপার আপনাকে এখুনি যেতে বললেন।

তখনই খেয়াল হল যে আইকেন কোথায় বাস করেন সেটাও আমি জানি না।

কোথায় পাব তাকে।

জো একটু বাঁকা হাসি হেসে, পাম বুলেভার্দে তার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। প্রায় চব্বিশটা ঘর, লাউঞ্জটা একটা বাস গ্যারেজেব পক্ষে যথেষ্ট। অল্প দূরে, সপ্তাহের শেষটা কাটাবার জন্য।

প্যাটের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি বলল, দি গেবলস পাম বুলেভার্দ। ডান দিকের তৃতীয় বাড়িটা।

সে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার ও ফাইল খুলে কাগজপত্র নিয়ে একটা হোল্ডারে জমা করতে লাগল।

কি খুঁজছ? বললাম।

তোমার দরকাবে লাগতে পারে। মনে হয় না বড়কর্তা কেবল দেখতে চেয়েছেন। কাল একটা বোর্ড মিটিং আছে। তোমাকেই সেটা সামলাতে হবে। তিনি সব কাগজপত্র দেখতে চাইতে পারেন। এর ভেতরে সব আছে। বলে ফোল্ডারটা আমাকে দিল।

কিন্তু তাঁর পা নিয়ে তিনি ব্যবসার ব্যাপারে মনে হয় কিছু কথা বলবেন না। তাঁর নিশ্চয়ই খুব ব্যথা হচ্ছে।

প্যাট গম্ভীরভাবে বললো, আমি নিয়ে যাব, চেস। এসব দরকারে লাগতে পারে।

পরে সত্যিই সেগুলো আমার প্রয়োজনে এসেছিল।

সমুদ্র ও দূর পাহাড়ের পরিবেশের মাঝে দু একর বাগানের উপর 'দি গেবলস' একটি বিরাট বাড়ি। চব্বিশটা না হলেও অন্ততঃ দশটা ঘর আছে। বেশ সুন্দর বাড়ি, এ ধরনের বাড়ির একটা আমার শখ আছে। কোন বন্ধুকে মনে মনে ঘৃণা করলেও এ ধরনের একটা বাড়ি দেখে তাকে প্রশংসা করতেই হবে।

বাড়ির বাঁ দিকে আছে বেশ বড় আকারের একটা সুইমিং পুল ও চারটে গাড়ি রাখার মত একটা গ্যারেজ। সেখানে রোজার আইকেনের একটা বেন্টলি, একটা ক্যাডিলাক, একটা বুইক ওয়াগন ও একটা টি আর টু গাড়ি আছে।

বেগোনিয়া, গোলাপ, পিটুনিয়া ও অন্যান্য গাছে বোঝাই বাগানটা আলোয় ভর্তি ছিল। আমি যখন বালির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পুলটা নির্জন লাগছিল। পুলটা এমন সুন্দর যে এর পাড়ে বিকিনি পোশাকে সুন্দর মেয়েরা থাকলে মানায়।

আইকেন বিরাট লোক জানতাম, কিন্তু এত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে থাকার মত রোজগার করেন এ ধারণা আমার ছিল না।

গাড়ি ছেড়ে সদর দরজার সামনে প্রায় বিশটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে ঘণ্টা বাজালাম।

ইংরেজ বাবুর্চির পোশাকে একটা লম্বা মোটা লোক দরজা খুলে ভুরু কোঁচকাল। পরে জেনেছিলাম তার নাম ওয়াটকিনস এবং ইংল্যান্ড থেকে বেশ পয়সা খরচ করে তাকে আনতে হয়েছিল।

আমি বললাম, স্কট। মিঃ আইকেন আমাকে ডেকেছেন।

হ্যাঁ স্যার। এই পথে আসুন।

একটা বড় হল ঘরের ভিতর দিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে একটা ঘরে এলাম। এই ঘরটা রোজার আইকেন কাজ করার জন্য ব্যবহার করেন। ঘরে একটা ডেস্ক, একটা ডিক্টোফোন, চারটে সোফা ও দেয়ালে সারি দিয়ে প্রায় হাজার দুয়েক বই ছিল।

ওয়াটকিনস আলো জ্বেলে বিছানা পাট করে যখন বাড়ির ভেতর যাচ্ছিল তখন বললাম।

কেমন আছেন?

যতটা ভাল আশা করা যায় তেমনি আছেন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি বলে আসছি। আপনি এসেছেন।

আমি ঘরটার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে বইগুলোর নাম পড়তে লাগলাম।

ওয়াটকিনস ফিরে এসে, মিঃ আইকেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মোটা ফোল্ডারটা নিয়ে একটা ছোট পথ ধরে তাকে অনুসরণ করে চললাম। পরে একটা এলিভেটরে এলাম যেটা আমাদের দুজনকে উপর তলায় নিয়ে এল। বড় প্যাসেজ পার হয়ে একটা দরজার সামনে এসে দরজায় টোকা মেরে ওয়াটকিনস হাতল ঘুরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

আইকেন একটা ছোট পালঙ্কে শুয়েছিলেন। ঘরটা বড় এবং সর্বত্র পুরুষালী স্পর্শের ছাপ। বড় জানালাগুলো থেকে পর্দা টানা ছিল চাঁদের আলোয় ভরা সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল।

আইকেন শুধু শুয়েছিলেন তাছাড়া আগের মতই সব দেখাচ্ছিল। দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট এবং বিছানায় অনেক কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিল। বিছানার পাশে একটা বাতি জ্বলছিল, আর ঘরের বাকিটা ছায়ায় ঢাকা।

তার গলার স্বরেই বোঝা গেল তিনি ভাল আছেন। ভিতরে এস স্কট। নতুন সমস্যা, তাই না? চেয়ারটা টেনে নাও। এর জন্য আমাকে কিছু খেসারতি দিতে হবে। সিঁড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমার অ্যাটর্নিকে পাঠিয়েছি, সাংঘাতিক মৃত্যুফাঁদ। মামলা করে তাদের কান টেনে আনার ব্যবস্থা করছি। তাতে অবশ্য আমার পা ভাল হবে না।

একটা চেয়ার টেনে বসে তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, বাদ দাও। এসব বলে তো আর কিছু শোধরান যাবে না। ঐ বোকা ডাক্তারটার কথামত আমাকে প্রায় হপ্তা চারেক অকেজো হয়ে থাকতে হবে। যদি লক্ষ্য না রাখি তবে খোঁড়া হয়ে পড়ব। আর যাই হোক, খোঁড়া হতে চাই না। সুতরাং আমাকে বাড়িতে থাকতেই হবে। আগামীকাল বোর্ডের মিটিং আছে। তোমাকেই ঝক্কি সামলাতে হবে। কি পারবে তো?

কেমন করে মিটিং পরিচালনা করতে চান বলুন। ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবো।

কাগজপত্র সঙ্গে এনেছ?

আমার তখন প্যাটকে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছা করছিল। ফোল্ডার থেকে কাগজগুলো বের করে দিলাম।

তিনি দশ সেকেন্ড আমার দিকে চেয়ে থেকে কাগজগুলো নিতে নিতে বললেন, জান স্কট। তুমি বেশ চালাক চতুর ছোকরা। এগুলো কেন নিয়ে এলে? কি করে ভাবলে যে, আমি বিছানায় শুয়ে কাজে অসমর্থ হব?

আপনি শয্যাশায়ী থাকবেন এটা আমি ভাবতে পারি না, মিঃ আইকেন। আপনি সেই ধরনের মানুষ যারা সহজে শয্যা নেয় না।

সত্যি কথা।

মনে হল আসল জায়গায় ঘা দিয়েছি।

বল স্কট, কিছু টাকাকড়ি জমিয়েছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে তাকালাম। আমার প্রায় হাজার বিশেক ডলার আছে।

বিশ হাজার, অ্যাঁ? এত বেশী? মনের আনন্দে হেসে উঠলেন। এই প্রথম তাকে এত হাসিখুশি দেখলাম। মনে হয় টাকা কড়ি খরচ করার জন্যে আমি তোমাকে যথেষ্ট সময় দিইনি। তাই না?

না, ঠিক তা নয়। বেশির ভাগটাই আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

কেন জিজ্ঞাসা করলাম বলছি। এই সব মাথা মোটা লোকগুলোর জন্য খেটে খেটে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। নিউইয়র্কে নিজে একটা ব্যবসা খুলবো ভাবছি। পরের হপ্তা চারেক ইন্টারন্যাশানাল তুমিই চালাবে। আমি সবকিছু বলে দেব সেইভাবে কাজ করবে। এমনও সময় আসবে যখন তোমার নিজেকেই বুদ্ধি খাটিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই কাজ করতে হবে। আমি তোমাকে মোটামুটি আমাদের পলিসি জানিয়ে দেব। তা তোমাকে কাজে পরিণত করতে হবে। যদি সফল হতে পার তবে ফিরে এসে তোমাকে এমন সুযোগ দেব যা এখানকার সকলেই পেতে চায়। যদি তুমি চাও, তবে আমার নিউইয়র্কের ব্যবসায় তোমাকে অংশীদার করে নেব। আমি যখন আবার ইন্টারন্যাশানাল চালাব, তুমি তখন ওখানে গিয়ে দেখাশোনা করতে পাববে। এইভাবে দুজনে অনেক টাকা করতে পারব। স্কট কি বল?

নিশ্চয়ই। আমার ওপর আশা রাখতে পারেন মিঃ আইকেন।

ঠিক আছে, দেখা যাক। ভুল না করে ইন্টারন্যাশনাল চালাও। ভুল করেছ কি চাকরি খতম, বুঝেছ?

এতে হয়ত আইকেনের পর্যায়ে ওঠার একটা সুযোগ মিলতে পারে। আবার শীঘ্র বা দেরিতেই হোক না কেন নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারব। বিশ হাজার ডলার, কোন বিজ্ঞাপন কর্মীকে নিউইয়র্কে যা সুযোগ দিতে পারে তা এবং আইকেনের পৃষ্ঠপোষকতা সব মিলিয়ে তাঁর কথামত সত্যিই আমার একটা সুযোগ এসেছে যা এই ব্যবসায়ের যে কোন লোকই পেতে চাইবে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বোর্ড মিটিং এর ব্যাপারে আলোচনা হল। প্যাট আমাকে প্রত্যেকটি কাগজ দিয়েছিল। একটিও ভুল হয়নি। প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় কালো সিল্কের পোশাক পরে এক ভদ্রমহিলা এলেন। নাম হাউসকিপার মিসেস হেপল ভিতরে এসে জানালেন।

ঘুমোবার সময় হয়েছে মিঃ রোজার। ডঃ স্কালবার্জ আপনাকে এগারোটায় ঘুমোতে বলেছেন। প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

আইকেন কাগজপত্র সরিয়ে দিতে দিতে, সেই হাতুড়েটা। ঠিক আছে, এগুলো নেবে স্কট?

কাগজগুলো ফোল্ডারে রাখছিলাম তখন তিনি বললেন, পরের চার সপ্তাহে আমাকে এই সব কাজ করতে হবে। বোর্ড মিটিং শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ফোন করবে। টেম্পলম্যানের উপর নজর রাখবে। সেই নষ্টের গোঁড়া। কাল রাতে একবার দেখা করতে এস। ওয়াসারম্যানের হিসাবপত্র কি ভাবে সামলালে জানতে চাই। ওটা এবং বিউটি সাবানের উপর নজর রাখবে। নইলে আমরা ও দুটো হারাব।

সবকিছুর উপরই লক্ষ্য রাখব। আশাকরি তিনি যেন ভালভাবে ঘুমোতে পারেন। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এলিভেটরের কাছে এসে বোতামটা টিপলাম কিন্তু কিছু হল না। আগে যে লোকটি এলিভেটর ব্যবহার করেছিল সে নিশ্চয়ই গ্রিন দরজা খুলে রেখেছিল, ঠিক করলাম সিঁড়ি দিয়ে নামব এবং সেদিকে গেলাম।

নেমেছি প্রায় অর্ধেক, চাতালের সামনে দেখা গেল গোটা চারেক দরজা। একটা দরজা ছিল খোলা, আলো বাইরে পড়েছিল এবং বাইরেন সবুজ ও সাদা রং-এর কার্পেটের ওপর একটা আয়তাকার ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

সিঁড়ির কার্পেট ছিল মোটা, ফলে আমার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

একটা পুরো আকারের আয়নার সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। দুই হাত দিয়ে কাঁধের উপর লম্বা বাদামী রং এর চুলগুলো তুলে ধরছিল। মাথাটা ছিল এক পাশে নোয়ান। পরনে শৌখিন ছোট প্যান্ট, কোমর থেকে হাঁটুর ওপর চার ইঞ্চি পর্যন্ত ঢাকা। পা ও পায়ের তলা ছিল নগ্ন।

এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখিনি। বয়স কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

তাকে দেখা মাত্র একটা বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বয়ে গেল শরীরে। কখনো কোন নারী আমার শরীরে এ রকম কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

আধো অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটাকে পাবার জন্য খুব

ইচ্ছা হচ্ছিল।

হয়তো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ পিছন হটে আমার আড়ালে চলে গেল ও দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

প্রায় দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে হলঘরে এলাম।

লাউঞ্জ থেকে ওয়াটকিনস বেরিয়ে এল।

কুটিল চোখে তাকিয়ে বলল সঙ্গে টুপি নেই?

না।

আপনার গাড়ি আছে স্যার?

হ্যাঁ।

সামনে দরজার দিকে এগোতেই সে দরজা খুলে দিল।

শুভরাত্রি, স্যার।

আমি শুভরাত্রি জানিয়ে উষ্ণ নিস্তব্ধ অন্ধকারে হেঁটে গাড়িতে ঢুকে গিয়ে ড্রাইভিং হুইলের পিছনে বসলাম।

যদিও আইকেনের চেয়ে মেয়েটি বছর পঁয়ত্রিশের ছোট, নিশ্চিত ছিলাম সে তার মেয়ে বা মিসট্রেস নয়। দৃঢ় বিশ্বাস হল সে তার স্ত্রী ভেবে কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লাম।

।। দুই ।।

ভাল ঘুমোতে পারিনি সে রাতে। মনে অনেক কিছু আনাগোনা করছিল। একদিকে নিউইয়র্কের পার্টনারশিপের ব্যবসার বিরাট সুযোগ, অন্যদিকে আগামীকাল বোর্ড মিটিং যা বেশ গোলমেলে হতে পারে।

ইন্টারন্যাশানাল ও প্যাসিফিক এজেন্সির ডিরেক্টর পাঁচজন। তাদের চারজন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও আইকেনের গুণমুগ্ধ। পঞ্চমজন অ্যাটর্নি শেলউইন টেম্পলম্যান। সবজান্তা ও বিরক্তিকর লোক এবং তাকে সামলাতে হবে ভাবতে খারাপ লাগছিল।

তার ওপর ছিল ওয়াসারম্যানের হিসেবপত্র। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে টেলিভিসন সেট তৈরির সবচেয়ে বড় প্রস্তুতকারক জো ওয়াসারম্যান। তিনি বড় মক্কেলদের একজন। তিনিও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। প্রায়ই তিনি ভয় দেখাতেন যে হিসেব-নিকেশ সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন এজেন্সিকে দেবেন। আমরা তাঁকে কোনরকমে এতদিন আটকে রেখেছিলাম। আইকেন চিরদিন নিজেই এটা দেখাশুনা করতেন। আইকেন খুব কম অ্যাকাউন্ট নিজে দেখতেন। এখন আমাকে দেখতে হয় ফলে ঝামেলা অনেক।

আরেক চিন্তা হচ্ছে, কাল থেকে সম্ভবতঃ চার সপ্তাহের জন্য আমি হচ্ছি ইন্টারন্যাশনালের সর্বেসর্বা, প্রায় দেড়শো স্ত্রী পুরুষ আমার অধীনে কাজ করবে আর প্রায় দুশো তিনজন মক্কেল সপ্তাহের কাজের দিনগুলির যে কোন সময়ে তাদের সমস্যা নিয়ে চিঠি লিখবে বা ফোন করবে। তাদের আশা উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই চাই। এতদিন এ নিয়ে আমার উদ্বেগ ছিল না, কারণ কঠিন প্রশ্ন হলেই এর ওর ঘাড়েই সমস্যাটা চাপিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন তা করলে আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা ভাল হবে না। এ ছাড়া পা ভাঙ্গা মানুষকে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বিরক্ত করা ঠিক নয়।

শুয়ে শুয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে সমস্যাগুলো বেশ জটিল মনে হচ্ছিল। পরে বুঝতে পারলাম আধো অন্ধকারে আমার ঘেমে নেয়ে যাবার আসল কারণ হচ্ছে অন্য। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আইকেনের স্ত্রীর ছবিটা বার বার মনে পড়ছিল।

সাদা কাঁধে বাদামী চুল তুলে ধরার ছবি, ছোট জামাটার নীচে তার সুগঠিত স্তন দুটোর ছবি। তার তাজা তারুণ্য, সে যে আইকেনের স্ত্রী এই চিন্তা ও তাকে কাছে পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা—এই সব চিন্তাই তাহলে সারারাত আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

আইকেন তাকে কেন বিয়ে করেছিলেন? সে কি তার মেয়ের বয়সেরও ছোট? তার চেয়েও

বড় প্রশ্ন মেয়েটাই বা কেন তাকে বিয়ে করল?

এই চিন্তাগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি। বার বার নিজেকে বলেছি, সে আইকেনের স্ত্রী। সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী। কিন্তু যেভাবে তার চিন্তা করছিলাম তাতে মনে হচ্ছিল যেন আমি একেবারে অসহায়। সে রাতে কিছুতেই তাকে মন থেকে সরাতে পারিনি।

সকাল নটায় অফিসে গেলাম। ঠিক প্যাট যখন এলিভেটরে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আমি তার সঙ্গ নিলাম। সেখানে আরও অনেক কর্মচারী ছিল, দুজনে আমরা হাসি বিনিময় করলাম। কোন কথা বললাম না।

নিজের অফিসে ঢোকার পর আমি তাকে নিউইয়র্ক পরিকল্পনার কথা বললাম।

ওহ, চেস কি সুন্দর? আমার সব সময়েই মনে হয়েছে তিনি কেন নিজের ব্যবসা নিউইয়র্কে ফাঁদেন না। তুমি দায়িত্বে থাকবে ভাবতে সুন্দর লাগছে।

এখনও ঠিক হয়নি। হয়ত এখানে একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসব আর তখুনি চাকরী খতম।

একবারও ভাববে না যে তুমি গণ্ডগোল বাধাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ঠিকই পারবে।

আমি তোমাকে নিউইয়র্কে চাই, প্যাট। তোমাকে ছাড়া আমি কোন কাজ করতে পারব না।

নিউইয়র্ক থেকে আমাকে সরাতে পারবে না। আমি বরাবর সেখানে কাজ করতে চেয়েছি।

সেদিনের ডাক দেখছিলাম, এমন সময় জো ফেলোস ভিতরে এল।

দাঁত বার করে জো বলল, এই যে বস্, বুড়োটা কেমন আছে?

একমাত্র পার্থক্য উনি ওঠানামা করছেন না বিছানায় শুয়ে আছেন। দেখ জো আমি খুব ব্যস্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোর্ডের মিটিং আছে। কি বলতে চাও বল।

জো বসে বলল, বিশ্রাম নাও, বাবা। বোর্ড মিটিং এমন কিছু নয়। শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়োটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাজী রেখে বলতে পারি সে চেঁচিয়ে ছাদ ফাটাচ্ছে।

না, তা নয়। তিনি আঘাতের কষ্ট আমলই দিচ্ছেন না। আমি দুঃখিত। আমি একটু ডাকটা দেখতে চাই।

তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তোমার কি হয়েছে?

বছর দুই তার সঙ্গে কাজ করে তাকে আমার ভালই লেগেছে। শিল্পী হিসেবে সেই সবচেয়ে ভাল। সে প্রায়ই বলত মনিব হিসেবে আইকেনের চেয়ে আমাকেই তার ভাল লাগে। যদি কোনদিন নতুন ব্যবসা ফাঁদি সে আমার ব্যবসায় যোগ দেবে।

আমি তাকে নিউইয়র্ক পরিকল্পনার কথা বললাম।

কি সুন্দর। তুমি, আমি আর প্যাট এই নিয়ে বিশ্বজয়ী দল গড়ে তুলতে পারব। যদি ব্যবসায় না নাম চেস আমি তোমায় মেরে ফেলব।

যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বাড়িতে আর, ও-র বৌকে দেখেছ?

তার স্ত্রী? স্বাভাবিক ভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম, না আমি তাকে দেখিনি।

তাহলে, কি জিনিস হারিয়েছ। ফুঃ! কি একটা জিনিস। আমি কেবল একবার তাকে দেখেছি। সেই থেকে রোজ তাকে স্বপ্নে দেখি।

তার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে?

যতদিন না দেখেছ ততদিন চুপ করে থাক। দেখলে বুঝবে কি বোকার মত প্রশ্ন করেছ। তার বৈশিষ্ট্য কি? একটা জিনিস, তার কড়ে আঙুলেও যতটা যৌন আবেদন আছে, অন্য কোন মেয়ের মধ্যে আমি তা দেখিনি। কুড়ির বেশী নয় কিন্তু কি সুন্দরী। ভাবতেও ঘেন্না করে যে, ঐ হুইস্কিখেকো পাষাণ হৃদয় খিটখিটে বুড়োটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে।

কি করে বুঝলে সে জীবনে খুশি নয়?

এটা তো চিরন্তন ব্যাপার। বুড়োটাকে বিয়ে করার একমাত্র কারণ হতে পারে মেয়েটার তার চেক বই-এর দিকে নজর। এখন মেয়েটা বারটা বেডরুমের বাড়িতে বাস করে। সুন্দর গলায় হীরের নেকলেশ পরে। কিন্তু বাজী রেখে বলতে পারি সে জীবনেও সুখী নয়।

তুমি জানতে এটা, আশ্চর্যের। আর. এ-র যে স্ত্রী আছে আমি জানতাম না। মেয়েটার বাড়ি

কোথায় ছিল?

জানি না, সৌন্দর্যে মেয়েটা প্রথম সারির মেয়ে। তোমার আসার বছর খানেক আগে সে বিয়ে করে। বুড়োটা সতের বছর বয়সে তাকে বঁড়শীতে গাঁথে। প্রায় দোলনা থেকে নিয়ে পালানো আর কি। যাইহোক, তাকে দেখার চেষ্টা করবে সত্যিই দেখার মত।

গল্প থামিয়ে এবার যাবে? বোর্ড মিটিং-এর মাত্র দশ মিনিট বাকী।

পরে এ নিয়ে ভাবতে খারাপ লাগছিল যে কেবল রোজার আইকেনের টাকার জন্য সে নিজেকে বলি দিয়েছে।

প্রায় তিনটের সময় আইকেনকে ফোন করলাম। যতটা ভেবেছিলাম বোর্ডমিটিং তার চেয়েও কঠিন পর্যায়ে এসেছিল। আইকেন মিটিং-এ না থাকায় টেম্পলম্যান তার দশ ইঞ্চি বন্দুক যেন উঁচিয়ে এসেছিল। আমি তাকে সামলেছিলাম। শেষে আর. এ-র ইচ্ছামত বিষয়গুলিতে তাদের রাজী করাতে পেরেছিলাম।

আর. এ-র বাড়িতে ফোন করতেই একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—হ্যালো, কে?

গলার স্বর শুনেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। স্থির হয়ে রিসিভারটা কানে চেপে তার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনতে লাগলাম।

সে আবার বললো, হ্যালো? কে?

স্কট বলছি। মিঃ আইকেনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মিঃ স্কট? হ্যাঁ নিশ্চয়। একটু দয়া করে ধরবেন? তিনিও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কেমন আছেন?

তিনি বেশ ভাল আছেন। ডাক্তার ভালই বলেছেন। প্ল্যানটা খোলার শব্দ পেলাম। কিছু পরে আইকেন লাইনে এলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

গেবলসে এসে পৌঁছলাম আটটার কিছু পরে। গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম আর একবার দেখা পাব কিনা। মেয়েটির চিন্তায় আমাকে দুর্বল করে তুলল, বুকের ভেতর নেচে উঠল।

বাগান ও সুইমিং পুলের ফ্লাডলাইট নেভানো থাকলেও চাঁদের আলোয় পরিবেশটা বেশ সুন্দর লাগছিল।

উপরে উঠে বেল বাজালাম। ওয়াটকিনস কিছু পরে দরজা খুলে বলল, শুভসন্ধ্যা স্যার।

আমি তার পাশ দিয়ে হলঘরে এসে বললাম, মিঃ আইকেন কেমন আছেন?

বেশ ভালই বলব। সম্ভবতঃ আজ রাতে তিনি একটু নার্ভাস ছিলেন। মনে হয় আজ বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল।

যত শীঘ্র পারি চলে যাব।

তাহলে ভাল হয়, স্যার।

আমরা এলিভেটরে চাপলাম। বুড়ো মানুষটা জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

আইকেন বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন, দাঁতের ফাঁকে সিগার। তাঁর দুই হাঁটুর ফাঁকে হিসাব নিকাশের কয়েকটা কাগজ, পাশে একটা প্যাড ও পেন্সিল পড়েছিল। তাঁর ঠোঁট দুটো ছিল একটু বাঁকা ও চোখের পাতা দুটো ভারী, আগের রাতের মত অত ভালো আজ দেখাচ্ছিল না।

বিরক্তস্বরে তিনি বললেন, ভিতরে এস, স্কট।

ইজিচেয়ারে বসে বললাম, পা কেমন আছে?

ভালই আছি। হ্যামিলটন ফোন করেছিল। সে বলল তুমি মিটিং-এ ভাল কাজ দেখিয়েছ।

তিনি ভেবে থাকলে আমি খুব আনন্দিত। টেম্পলম্যানকে খুব ভালভাবে সামলাতে পারিনি। আমাকে বেশ ভুগিয়েছেন।

মিনিট পেয়েছ? হেসে আইকেন বললেন।

তাঁর হাতে সেগুলো তুলে দিলাম।

ততক্ষণ আমি পড়ি তুমি কিছু পান কর, আমাকেও একটু দেবে। দেয়ালের পাশে একট টেবিলের উপর বোতল ও গ্লাস রাখা সেদিকে হাত দেখালেন। আমাকে হুইস্কি দাও। হ্যাঁ, য বলছি, গ্লাসে কিছু হুইস্কি ঢাল।

তার গলার স্বর আমাকে সতর্ক করে দিল যে কোন তর্ক করা ঠিক হবে না। আমি দুটো গ্লাসে পানীয় ঢাললাম। তাকে একটা গ্লাস দিলাম। তিনি সেদিকে চাইলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁকে বেশ বদমেজাজী অনিষ্টকর ব্যক্তির মত দেখাচ্ছিল।

আমি যে বললাম কিছু হুইস্কি ঢাল! শুনতে পাও নি?

টেবিলে গিয়ে গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢাললাম এবং তার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি গ্লাসটা নিয়ে পুরোটা গিলে নিলেন গ্লাসটা আমার হাতে দিয়ে, আর একবার তৈরি করে নিয়ে এসে পাশে বস

আর এক গ্লাস তৈরি করে এনে পাশে বসলাম।

দুজনে পরস্পরের দিকে চাইলাম। হঠাৎ তিনি দাঁত চেপে বললেন, কিছু মনে কর না। স্কট যদি পা ভাঙো কিছুটা অসহায় হয়ে পড়বে। আমাকে অসুস্থ মানুষ হিসেবে দেখানোর জন্য বাড়িতে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। সারাদিন অপেক্ষা করছিলাম, তুমি এসে আমাকে পানীয় দেবে।

আমারও ভাবা উচিত ছিলো যে আপনি যা পেতে চাইছেন তা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস

তুমি ও তাই ভাব? বিচারের ভার আমাকে দাও। মিনিটটা হাতে তুলে নিল। ইচ্ছে করলে ধূমপান করতে পার।

একটা সিগারেট ধরালাম, কিছু স্কচ পান করলাম। মিনিটটা পড়তে তার প্রায় দশ মিনিট লাগল পরে কাগজগুলো হাঁটুর উপর ছুঁড়ে ফেলে আর একবার তিনি পান করলেন।

আরম্ভটা বেশ ভাল। বরং তার চেয়েও বেশী। আমি নিজে এর চেয়ে ভাল কাজ দেখাতে পারতাম না। এইভাবেই কাজ করে যাও। নিউইয়র্কের চাকরী তোমারই হবে।

সত্যিই প্রশংসা।

এখন দেখা যাক ওরা আমাদের যে সব সুযোগ দিয়েছে সে সবের কিভাবে সদ্ব্যবহার কর যায়। তোমার কি ধারণা বল?

আগেই ভেবেছিলাম তিনি এ প্রশ্ন করতে পারেন সেইজন্য অফিস থেকে আসার আগে বিভিন্ন বিভাগের প্রধানের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তাই তৈরিই ছিলাম।

আধঘণ্টা ধরে বলে চললাম, তিনি শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলেন যখন বলা হয়ে গেল, তিনি বললেন মন্দ নয়। আমি তোমাকে আরও ভালভাবে কাজ করতে শেখাব।

এবার আমার শোনার পালা এবং আমাকে কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা। তিনি আমার ধারণাগুলিকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আমার ভুল বুঝলাম। আমার যুক্তিগুলো ছিল আরও ব্যয়সাপেক্ষ। তাঁর যুক্তিতে খরচের প্রায় দশ শতাংশ সাশ্রয় হবে। বুঝতে পারলাম তিনি আমার চেয়ে অনেক বড় ব্যবসায়ী।

নটা বেজে গেছে দেখে মনে পড়ল ওয়াটকিনস আগেই আমাকে জানিয়েছিল। আলাপ আলোচনা অল্পক্ষণ করার জন্য।

কাগজগুলো ব্রিফকেসে গুছোতে গুছোতে বললাম, ঠিক আছে স্যার। সব দেখে রাখব। এবার আমি বিদায় নেব। দশটায় আমার কাজ আছে।

তুমি মিথ্যেবাদী স্কট। ঐ বোকা বুড়ো ওয়াটকিনসের কথা শুনে তুমি যেতে চাইছ। ঠিক আছে তুমি বিদায় হও। কাল আটটায় একবার দেখা করবে। কোন মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা আছে স্কট?

চমকে কিছু কাগজ মেঝেয় পড়ে গেল। সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে বললাম, যদি সেই অর্থে বলেন তবে বিশেষ ভাবে কারো সঙ্গে নেই।

আমি ঠিক তা বলছি না। পুরুষের প্রতি মুহূর্তে নারীর প্রয়োজন হয়। কখনও তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে না তবে তাদের ব্যবহার করবে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা অফিসে আছে। আমি চাই

না তুমি সবসময় কাজ কর। মাঝে মাঝে আমোদ ফূর্তি করো। মেয়েরা যে আমোদ ফূর্তির একটা উপকরণ এটা বুঝতে তোমার বেশী সময় লেগেছে। তবে তোমাকে যাতে তারা গাঁথতে না পারে সেদিকে দেখবে। যদি তাকে গাঁথতে দাও তবে তুমি খতম।

হ্যাঁ, স্যার। আগামী কাল আটটায় আসব।

এই সপ্তাহের শেষটা তুমি ছুটি নাও। আগামী শুক্রবার রাতে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। সোমবার সকালে একটা ফোন করবে। আজ মঙ্গলবার, সপ্তাহের শেষটার জন্যে একটা প্ল্যান করে ফেল, স্কট। আমি চাই তুমি কিছু বিশ্রাম নাও। গলফ্ খেলতে পার?

হ্যাঁ, পারি।

যদি খুব সিরিয়াসলি না নাও তবে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল খেলা। গলফ্ অনেকটা একটা মেয়ের মত। যদি কোনটাকে সিরিয়াসলি নাও ও তাকে সুযোগ দাও তোমাকে গেঁথে ফেলবে। ব্যস, তুমি খতম। কি রকম খেলতে পার?

বললাম, সবচেয়ে ভাল দিনগুলোতে বাহাত্তর বার মেরেছি।

তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমাকে প্রথমবার দেখলেন, বাঃ তুমি তো ভাল খেলো।

তা হওয়া উচিত। পাঁচ বছর বয়স থেকে খেলছি। আমার বাবা গলফ্ পাগল ছিলেন। এমন কি মাকেও খেলাতেন।

আগামীকাল রাত আটটায় আসব বলে দরজার দিকে চাইলাম।

তাই করবে, স্কট। সপ্তাহের শেষটা গলফ্ খেলার ব্যবস্থা করবে। রাতের জন্য একটা সুন্দরী মেয়ে খোঁজ করে নেবে। জীবনে আমোদ-প্রমোদের সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে গলফ্ ও মেয়ে।

বাইরে আসার পর বেশ আনন্দ হচ্ছিল। তাঁর পাগলামির জন্য কেমন যেন বিস্বাদ লাগছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটা মনে দুলে উঠলো, এলিভেটর ছেড়ে সিঁড়ির মুখটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিচের চাতালটায় তাকিয়ে দেখলাম জায়গাটা বেশ অন্ধকার, মনে হল তখন নটা বেজে দশ, এই সময়ে সে তার শোবার ঘরে থাকবে এটা আশা করা যায় না।

এলিভেটর চেপে নিচে হলঘরে এসে দেখলাম ওয়াটকিনস আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, মনে হয় না মিঃ আইকেন আজ ভাল আছেন।

তাঁর অল্প জ্বর হয়েছে স্যার। ভেবেছিলাম এটা হবে।

হ্যাঁ। আমি আবার কাল রাতে আসব।

আমার বিশ্বাস, মিঃ আইকেন আপনার আশায় পথ চেয়ে থাকেন।

শুভরাত্রি জানিয়ে গ্রীষ্মের চাঁদের আলোয় ভরা রাতে বেরিয়ে এলাম।

ক্যাডিলাক গাড়িটার দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে বাড়িটার উপর দিকে চাইলাম। শুধুমাত্র মিঃ আইকেনের ঘরে আলো জ্বলছে আর সব অন্ধকার। আশ্চর্য, মেয়েটা কি বাইরে গেছে, নাকি বাড়ির পেছন দিকে কোথাও আছে?

সারাদিন ধরে তাকে আর একবার দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু মনে হল, মিসেস হেপল অথবা ওয়াটকিনস কোন এক অন্ধকার জানলা থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। এভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এটা নয়। গাড়িটার দরজা খুলে পেছনের সীটে ব্রিফকেসটা রেখে ড্রাইভিং হুইলের নীচে গিয়ে বসলাম।

মেয়েটা সেখানে বসেছিল, হাতদুটো মুঠো করে কোলের উপর রাখা। অন্ধকার হলেও আমি তার মাথার আকারটা বুঝতে পারছিলাম। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে সে আমার দিকে চেয়েছিল। সে ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। অন্য কেউ হলে আমার হৃদপিণ্ডটা হয়ত এভাবে নেচে উঠত না।

প্রায় পাঁচ সেকেন্ড আমি তার দিকে তার মৃদু গন্ধ ও নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই পাঁচ সেকেন্ডে যেন আমার সবকিছু আবছা হয়ে এল।

জীবনের এই মুহূর্তকে আর কোনদিনই ভুলব না।

।। দুই ।।

সে বলল, হ্যালো আপনাকে অবাক করে দিয়েছি। ভাবতে পারিনি এত শীঘ্র বেরিয়ে আসবেন।

হ্যাঁ, তা কিছুটা, আশা করিনি...।

সে হেসে, এটা আপনার গাড়ি?

হ্যাঁ।

খুব সুন্দর গাড়ি। গাড়ির ব্যাপারে আমি পাগল। যখন এটা দেখলাম ঠিক তখনই ভেতরে আসি। রোজারের বেন্টলির চেয়ে এটা আমার বেশী পছন্দ। আর এটাই বেশী জোরে চলে, তাই না?

হ্যাঁ, বেশ জোরে চলে।

সীটের গদিতে হেলান দিয়ে মেয়েটা বসা, চাঁদের আলোয় তার মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছিল, অপরূপ সুন্দরী দেখতে।

রোজার আপনার কথা আমাকে বলেছে। সে বলে আপনি তার নতুন পার্টনার হবেন।

এখনও ঠিক হয়নি।

আমার অবাক হবার ভাবটা তখনো যাচ্ছিল না। সে কথা বলে যাচ্ছিল যেন সারা জীবন ধরে আমার চেনা।

সে বলল, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনার কি নিউইয়র্কে থাকতে ভাল লাগবে?

খুব বেশি।

আমার ইচ্ছা এখানে থাকার। আপনার কি মনে হয় না, পাম শহর দারুণ বিশ্রী?

মনে হয়, আপনার বয়সে এরকম লাগতে পারে।

সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, মনে হচ্ছে আপনি যেন বুড়িয়ে গেছেন, তা কিন্তু নয়। এখনও বোধ হয় ত্রিশ হয়নি, তাই না?

একত্রিশ।

আপনি ভীষণ চালাক।

রোজার বলল আপনি ব্যবসায়ে বিশ হাজার ডলার খাটাবেন। আপনার বয়স মাত্র একত্রিশ হলে আপনি এত টাকা পেলেন কোথা থেকে?

আমার বাবা বেশি অংশটা রেখে গেছেন, বাকীটা আমার জমানো। আপনি কি সমস্ত টাকাই রোজারের ব্যবসায়ে খাটাতে চান?

আপনার খুব আগ্রহ দেখছি।

হ্যাঁ কিছুটা, মানুষ যে ভাবে টাকা রোজগার করে তাতে আমার চিরদিনই আগ্রহ আছে। একটা মেয়ের ধনী হওয়ার একমাত্র পথ বিয়ে করা। পুরুষেরা বাইরে গিয়ে টাকা রোজগার করতে পারে। অবশ্য আপনি ভাগ্যবান যে আপনার বাবা আপনার জন্য অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তাই না?

আমারও অনুমান ঠিক তাই। সে উঠে বসল ও এগিয়ে গিয়ে ড্যাস বোর্ডে হাত রাখল।

গাড়িটা আমার খুব পছন্দ। আমাকে চালাতে শেখাবেন?

শেখাবার কিছুই নেই। এটার ড্রাইভ আটোমেটিক, স্টার্টারে পায়ের চাপ দিলেই আপনা থেকেই চলবে।

বিশ্বাস হবে কিনা জানি না। আমি কখনও গাড়ি চালাই নি। রোজারের চারটে গাড়ি আছে কিন্তু একটাও আমাকে ছুঁতে দেবে না।

কেন?

সে অদ্ভুত ধরনের। কোথাও যেতে হলে আমাকে সাইকেলে যেতে হয়। সাংঘাতিক তাই না? তার ওজর হচ্ছে আমি চালাতে পারি না। যদি শিখি, তবে চারটের একটা গাড়ি তাকে দিতেই হবে। আপনি আমাকে শেখাবেন?

হ্যাঁ, যদি আপনি চান তবে তাই হবে।

যে কোন জিনিসের চেয়ে পৃথিবীতে এইটাই আমি সবচেয়ে বেশি করে চাই। আপনি কি

এখনই আমাকে শেখাবেন, না আপনার কিছু করার আছে?

আপনি বলতে চান এখনই?

হ্যাঁ, যদি আপনি সময় দিতে পারেন।

ঠিক আছে, আমরা তাহলে স্থান পরিবর্তন করব। আমি গাড়ি থেকে বেরোতে যেতেই সে আমার কোটের হাতা ধরে থামাল। তাঁর আঙ্গুলের ছোয়ায় রক্তের উষ্ণ স্রোত আমার মেরুদণ্ডের ভেতরে বয়ে গেল।

এখানে নয়। ওরা আমাদের দেখে রোজারকে বলে দেবে। এমন কোথাও যাওয়া যাক যেখানে কেউ দেখতে পাবে না।

ওরা? আপনি কাদের বোঝাতে চাইছেন?

মিসেস হেপল ও ওয়াটকিনস। মিসেস হেপলকে আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ।

আমার ভাল লাগে না। সে নীচ স্বভাবের মেয়ে। আপনার কি মনে হয়?

ঠিক জানি না। কেবল কাল রাতে দেখেছি। তার সঙ্গে কথা বলিনি।

সে আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমাকে বিপদে ফেলতে চায়। রোজার তার কথা শুনে চলে।

বিপদের সংকেত দেখতে পেলাম। আপনি গাড়ি চালাতে শিখুন মিঃ আইকেন যদি সেটা পছন্দ না করেন......?

সে তার হাত আমার বাহুতে রাখাতে থামতে হল।

আপনি যে ওদের মত তাকে ভয় করেন একথা বলবেন না। তাহলে ড্রাইভিং শেখার জন্য আমাকে অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে।

আমি তাকে ঠিক ভয় করি তা নয়, তবে এমন কিছু করতে চাই না যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

সে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, আমার ইচ্ছার কি তবে কোন অর্থ, নেই?

আমি আপনাকে গাড়ি চালাতে শেখাব। বলে গিয়ার লিভারকে পজিশনে রাখলাম ও গ্যাস পেডালে পা দিয়ে চাপ দিলাম। বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের মত গাড়িটা ছুটল।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে জোরে গাড়ি চালালাম, স্পীড মিটারের কাঁটা প্রায় নব্বই-এর ঘরে। পরে একটা ছোট রাস্তার দিকে ঘুরলাম ও গাড়ি থামালাম।

বাবা! সে চিৎকার করে উঠল। আপনি সত্যিই জোরে গাড়ি চালাতে পারেন। আমি এত জোরে কখনই চালাই নি।

বাইরে বেরিয়ে এসে বললাম, ঐ দিকে সরে যান। যেখানে বসে আছেন ওখান থেকে কোনদিনই গাড়ি চালাতে পারবেন না।

সে ওপাশে সরে গেলে আমি ভিতরে ঢুকে তার জায়গায় বসলাম।

দেখুন খুব সোজা, এটা হচ্ছে গীয়ার লিভার। এটাকে একটা নটের নিচে আনতে হবে। পরে ডান পা দিয়ে অ্যাকসিলেটরে চাপ দিন। যখন গাড়ি থামাতে চান তখন অ্যাকসিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিন ও বাঁ দিকের বড় পেডালটায় চাপ দিন। ওটা হচ্ছে ব্রেক। পেয়েছেন?

বাঃ, বেশ সোজা। সে বলল এবং একবারের চেষ্টাতেই গিয়ার লিভারটা নামিয়ে অ্যাকসিলেটরটা পা দিয়ে চেপে ধরল।

পাগলের মত গাড়িটা ছুটে চলল। কি ভাবে গাড়ি নিয়ে যেতে হয় তার কোন ধারণাই নেই। কোথায় ছুটে চলেছে সে একবারও লক্ষ্য করল না।

আমি এতই বিহুল হয়েছিলাম যে কিছুই করতে পারলাম না।

সে সময় খুব ছুটে ঘাসের ধারে এসে পড়লাম ও দূরের চাকাগুলো মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছিল। পরে রাস্তায় এসে উঠলাম।

গাড়িটা বাগানের বেড়ার দিকে ছুটছিল ; আমি স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে গাড়িটা সোজা চলালাম।

পা সরিয়ে নিন অ্যাকসিলেটর থেকে! চীৎকার করে পা সরিয়ে দিলাম, তার পর ব্রেকে চাপ দিতেই গাড়িটা থেমে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড ছিল ভয়ংকর। একটুর জন্য শেষ হয়ে যেতাম।

তার দিকে চাইলাম ইঞ্জিন বন্ধ করে।

গাড়িতে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল তাই তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। চঞ্চল হয় নি বরং হাসছিল। তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল।

এখন একটু বিশ্রাম নিন, আমি বললাম। আত্মহত্যার এ এক পথ। জোরে চাপ দেবেন না...।

জানি অধৈর্য্য হয়ে সে বলল, আমাকে বলতে হবে না, খুব জোরে চাপ দিয়েছিলাম। আর একবার চেষ্টা করা যাক।

লক্ষ্য রাখবেন যখন গাড়ি ছুটবে রাস্তার দিকে।

সে হেসে উঠল ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি, সে বলল। ভাবতেই পারিনি যে এটার এত ক্ষমতা আছে।

খুব আস্তে চালান। অ্যাকসিলেটরে আস্তে চাপ দিন, বলে ইঞ্জিন চালু করলাম।

হ্যাঁ, জানি।

গিয়ার ঠিক রেখে আমরা ঘণ্টায় কুড়ি কিঃ মিঃ বেগে চললাম। এবারও বোঝা গেল কোন অভিজ্ঞতা নেই।

আপনি যদি সবই করেন তবে কি করে শিখব বুঝতে পারছি না, বলে হাতটা সরিয়ে দিল।

বললাম মিঃ আইকেন কি কখনও আপনাকে গাড়ি চালানো শেখান নি?

রোজার? সে হেসে উঠল, না, না, তার কোন ধৈর্য্যই নেই।

বেশ জোরে চালাচ্ছেন অথচ রাস্তার দিকে নজর দিচ্ছেন না। আর একবার চালান যাক।

এবার ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, ঠিক এই ভাবে চলুন তাহলে বেশ ভাল লাগবে।

সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ির হেডলাইটকে খুব জোরে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

ডান দিকে এগিয়ে যান। আস্তে চালান, রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখুন।

খুব তাড়াতাড়ি বাঁক নিতে গাড়িটা অনেক দূর এগিয়ে গেল এবং দুরের চাকাগুলো রাস্তার পাশের ঘাসের উপর এসে পড়ল। স্থির জানতাম যে এবার সে ঘাসের উপর থেকে গাড়িটাকে রাস্তায় আনার চেষ্টা করবে। ফলে হয়তো উল্টো দিকের গাড়িটা পথের উপর এসে পড়বে। আমি ব্রেক কষতেই গাড়িটা থেমে গেল। অন্য গাড়িটা জোর শব্দ তুলে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

অধৈর্য হয়ে সে বলল, আমার ইচ্ছা যা কিছু করার আমাকেই করতে দিন। আমি নিজেই সামলাতাম।

তা বটে, এটাই কিন্তু আমার একমাত্র গাড়ি।

সে হেসে বলল, বেশ মজা। ভালই লাগছে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি গাড়ি চালান শিখে যাব। রোজার যদি তার একটা গাড়িও আমাকে ব্যবহার করতে না দেয় তবে আপনারটা আমাকে দেবেন কি?

একা চালাবার আগে আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

যখন পারব তখন গাড়িটা দেবেন তো?

ঠিক আছে, তবে সময় নিয়ে অসুবিধা হবে। প্রতিদিনই কাজের সময় এটা লাগে।

যখন আমার দরকার হবে তখন আপনি বাসেও যেতে পারেন।

ভাববার কথা। আমি বাস পাগল নই। তাছাড়া কাজের সময় প্রায়ই আমার গাড়িটার দরকার হয়।

মাঝে মাঝে খুব প্রয়োজনে ট্যাক্সি নিতে পারেন। পারেন না?

মনে হয় তা পারি।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি গাড়িটা আমাকে দিতে চান না। এটাই আসল কথা। তাই না?

না, তা নয়। আমার ভয় আপনি কোন কিছুতে ধাক্কা মারবেন বা কেউ আপনাকে ধাক্কা মারবে। একা চালাবার আগে আপনার অনেক প্র্যাকটিসের দরকার। আপনি একা কোথায় যেতে চান?

বিশেষ কোন জায়গায় নয়, আমি শুধু চালাতে চাই। সব সময়ই আমার জোরে চালাতে ইচ্ছা করে।

ঠিক আছে। যখন একা গাড়ি চালাতে পারবেন তখন ধার নিতে পারেন।

আপনি কি সত্যিই বলছেন?

হ্যাঁ, তাই বোঝাতে চাইছি।

যখন ইচ্ছা তখনই পেতে পারি? আমার কাজ হচ্ছে টেলিফোনে আপনাকে বলে দেওয়া কখন আমার চাই। তাহলেই আপনি পাঠিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ, এইটুকুই আপনাকে করতে হবে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

সে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে আমার হাতের ওপর ওর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, যত মানুষ দেখেছি আপনিই সবচেয়ে ভাল।

আমি অবশ্য তা বলব না। যদি গাড়ি চান পেতে পারেন। এখন আর একবার দেখা যাক আগের চেয়ে ভাল ভাবে এটাকে কায়দায় আনতে পারেন কি না?

হ্যাঁ। বলে সে ইঞ্জিন চালু করল।

এবারে সে সত্যিই ভাল চালাচ্ছিল, দুটো গাড়ি গাঁ গাঁ করতে করতে উল্টো দিকে ছুটে গেল, তখনও সে গাড়িটা ঠিকমত সোজাভাবেই চালিয়ে নিল।

এবার শিখে ফেলেছি। এখন অনেক কিছু বুঝতে পারছি।

প্রয়োজন হলে যাতে হুইলটা ধরতে পারি তাই তার দিকে একটু সরে বসলাম। পা ব্রেকের কাছে এগিয়ে আনলাম। সে সোজা পথেই গাড়িটা চালাল এবং গাড়ির গতিও বাড়িয়ে দিল। স্পীডোমিটারের কাঁটা আশির ঘরে গেল।

আস্তে আস্তে চালান। খুব জোরে যাচ্ছেন কিন্তু।

কি চমৎকার। আমি এই ভাবেই চালাতে চেয়েছি। কি গাড়ি! কি সুন্দর!

এবারে আস্তে চালান।

চোখ ঝলসানো আলো জ্বালিয়ে একটা আলো অন্ধকার থেকে আমাদের দিকে এল। আমরা তখন রাস্তার ঠিক মাঝখানে। আমি ব্রেকে পায়ের চাপ দিলাম।

ডান দিকে যান। সে খুব তাড়াতাড়ি ডানদিকে চালিয়ে নিল। যদি ব্রেকে চাপ না দিতাম আমরা তবে ঘাসের উপর এসে পরতাম ও গাড়িটা উল্টে যেত। অন্য গাড়িটা জোরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্যাডিলাকটা থামালাম।

এটা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি বেশ যাচ্ছিলাম।

তা যাচ্ছিলেন, এক রাতে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনার এখন প্রয়োজন প্র্যাকটিস। সেটাও আজ রাতে করবেন? এবার আমি চালাব।

ঠিক আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে—সর্বনাশ! এবার ফেরা দরকার। রোজার ভাববে আমি কোথায়?

আমার মনে একটু তিক্ত ও কটু অনুভূতি জাগল।

আপনি কি জোরে গাড়ি চালাবেন? বেশ জোরে?

অ্যাকসিলেটরে জোরে চাপ দিলাম। ক্যাডিলাকটা ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে ছুটল।

এগারটা বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় আমরা গেবলসে পৌছলাম।

গাড়ি থামতে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আপনি বেশ জোরে গাড়ি চালাতে পারেন। সত্যিই ভাল পারেন। আমার বেশ লাগছিল, কখন আমি দ্বিতীয়বার শিখব?

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম। দেখুন আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না। আপনার স্বামী সত্যিই চান না যে আপনি গাড়ি চালান....।

সে তার ঠাণ্ডা আঙ্গুলগুলো আমার মনিবন্ধে রাখল।

রোজার কখনও জানবে না। কি করে জানবে?

তার স্পর্শ পেয়ে সব যেন গুলিয়ে ফেললাম ও অসংযমী হয়ে উঠলাম।

আগামী কাল রাত আটটায় আমি এখানে থাকব। নটার পরেই শুরু করা যাবে।

আমি গাড়িতে অপেক্ষা করব। বুঝতে পারবেন না কত আনন্দ আমার হয়েছে। প্রায়ই এত বিরক্ত লাগে কিন্তু আজকের সন্ধ্যা যে এত সুন্দরভাবে ও উত্তেজনার সঙ্গে কাটিয়েছি, কোনদিনও কাটাইনি। সত্যিই ভাল লাগছিল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছিল যে সে লেবু রং-এর স্ন্যাক ও নীল রংএর সোয়েটার পরেছিল। সোয়েটারের নীচের গড়ন আমার দম বন্ধ করে আনল।

আমার নাম লুসিলি। মনে থাকবে তো?

বললাম যে মনে থাকবে।

সে হেসে বলল, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে। শুভ রাত্রি।

হাত নাড়িয়ে বাড়ি যাবার রাস্তায় এগিয়ে গেল। যতক্ষণ না অদৃশ্য হল ততক্ষণ চেয়েছিলাম।

সে যেন এখন আমার রক্তে ভাইরাসের মতই ভয়ংকর ও বিপদজনক।

সে রাতে তো বলাবাহুল্য ঘুম হয়নি। মনটা যখন আগুনে তখন ঘুম আসবে কি করে? মনে হল, পরের সাক্ষাতের সময়টা বুঝি একশো বছরের দুরত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

একই ভাবে পরের তিনদিন কাটল। প্রতিদিন সকালে নটায় অফিসে আসতাম, ফিরতাম রাত সাতটায়। গেবলসের সামনের বড় রাস্তার মোড়ে একটা ইতালিয়ান রেস্তোরায় খেয়ে নিতাম ও বড় বাড়িটায় আটটায় এসে পৌঁছতাম। ঘণ্টা দেড়েক ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচানা এবং দরকারী ফোন ও চিঠিপত্রের আলোচনায় আইকেনের সঙ্গে কাটাতাম। পরে নীচে ক্যাডিলাকে আসতাম যেখানে লুসিলি অপেক্ষা করছে।

দৈনন্দিন জীবনের বাকী সময়টা কোনরকমে এই মুহূর্তটা এলে যেন বেঁচে যেতাম। ওয়াট কিনসকে শুভরাত্রি বলায় সে যখন দরজাটা বন্ধ করে দিত তখন যেন সত্যিকারের জীবন ফিরে পেতাম!

আমি ও লুসিলি রাত সাড়ে নটা থেকে এগারটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম। বেশি কথা হত না। সে গাড়ি চালাতে বেশি মনোযোগ দিত। তার সঙ্গে কথা বললেই দেখতাম গাড়িটা রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরত। ক্যাডিলাকটা চালাতে সে এত আনন্দ পেত যে তার আনন্দের সময় কোনরকম বাধাকে সে আমল দিত না। গেবলসের ফটকের সামনে এসে যখন আমরা দাঁড়াতাম তখনই কেবল মিনিট পাঁচেক কথা বলে কাটাতাম।

তার সঙ্গে তিনটি সন্ধ্যা কাটাবার পর তার প্রতি আমার অনুরাগ এত বেড়ে গেল যে আবেগ সংযত করা আমার পক্ষে কষ্টকর হল।

আমার সঙ্গ পছন্দ করে এমন এক বন্ধুর মত ব্যবহার সে করত। আমিও জানতাম সে আমাকে পছন্দ করে।

নিজের ব্যবহার নিয়েই আমার ভয় ছিল। জানতাম যদি সে সামান্য উৎসাহ দেখাত তবে তার সঙ্গে প্রেম করতে দ্বিধা করতাম না।

জানতাম আগুন নিয়ে খেলা করছি। আইকেন যদি কখনও জানতে পারেন আমার চাকরী যাবে। সে বলেছিল তিনি ভোগী মানুষ কিন্তু তার স্ত্রীকে নিয়ে তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করলে তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

যতক্ষণ না লুসিলি আমার প্রেমে পড়ছে ততক্ষণ গাড়ি চালানো শেখানোতে কোন ক্ষতি নেই

কিন্তু নাগালের বাইরে যাবার আগে এসব থামিয়ে দেওয়াই ভাল।

তৃতীয় দিন শুভরাত্রি জানিয়ে বললাম, পরদিন রাতে আমি বাড়ি থাকব না। সপ্তাহের শেষের দিকটা মিঃ আইকেন আমাকে ছুটি দিয়েছেন তাই আমি থাকব না।

এতে কি বোঝায় যে আমি কাল কিছু শিখতে পারব না?

সোমবার রাত পর্যন্ত শেখা হবে না।

আপনি কি কোথায়ও যাচ্ছেন?

না, যাচ্ছি না।

তাহলে যথারীতি আসুন না কেন? এখানেই আমার দেখা পাবেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না। আপনি আসতে চান না। তাই না?

চাই না, ঠিক তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ভয় হয়। আমার বিশ্বাস, আপনার স্বামী জানতে পারলে রেগে আগুন হয়ে যাবেন।

সে হেসে দুই হাত আমার বাহুতে রেখে অল্প নাড়া দিয়ে বলল, সে সত্যিই রেগে যাবে, কিন্তু মনে করার কিছু নেই আমাদের। তাছাড়া সে কখনই দেখতে পাবে না।

ওয়াটকিনস বা মিসেস হেপল দেখে ফেলতে পারে....

তারা কোনদিনই রাতে বার হয় না। আমি আপনার বাড়িতে বাইসাইকেলে চেপে যাব। আপনার বাংলোটা দেখা হয়ে যাবে।

আপনি ওখানে যাবেন না। না, আপনার ওখানে যাওয়া উচিত হবে না। যদি সত্যিই আসতে চান তবে এখানে আসুন, আমি ঠিক নটায় এসে যাব।

সে গাড়ির দরজা খুলে বেরোতে বেরোতে বলল, আমি এখানেই আসব। চেস, তোমার মত সুন্দর লোক দেখিনি। অনেকটা শিখে ফেলেছি তাই না? আশা করি, দু-এক দিনের মধ্যেই পারমিটের জন্য দরখাস্ত দিতে পারব।

সুন্দর শিখেছ। ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।

বাড়ি ফিরে ডবল হুইস্কি ও সোডা নিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে নিজের অবস্থাটা ভাবছিলাম।

গত পাঁচ রাত ধরে তাকে জানার পর এটুকু বুঝেছি যে তাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়তে পারি না। কিন্তু সে কি ভাবছে, ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

বাংলোতে আসার প্রস্তাবটা আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাকে বলেছিলাম চাকরটা সন্ধ্যে সাতটার সময় চলে যায় এবং আমি একাই থাকি।

সে কখনও উৎসাহ দেখায়নি এবং বোঝাতে চায়নি যে আমি একজন সাহায্যকারী বন্ধুর চেয়ে বেশী কিছু নয়। প্রতিদানে কিছু আশা না রেখেই কি গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে বা তাকে প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে।

দেখতে হবে আমি যে ঝুঁকি নিয়েছি সে তা বোঝে কিনা। সমস্ত ভবিষ্যৎটা ভরাডুবি দিতে চলেছে। আইকেন জানতে পারলে নিউইয়র্কের চাকরীটা ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে।

সারারাত ছটফট করে কাটালাম। পরদিন অফিসে মেজাজ বেশ গরম ছিল। যখন সব কাজ শেষ করে সপ্তাহের শেষে দেখার জন্যে কাগজপত্র চেয়ে নিলাম তখন স্বস্তি পেলাম।

বিনা প্রতিবাদে আমার মেজাজ সহ্য করার পর প্যাট সই করার জন্য কয়েকটা কাগজ নিয়ে এল।

হায় ভগবান! ভেবেছিলাম সব কিছু সই করে দিয়েছি।

মাত্র ছটা।

দ্রুতগতিতে কাগজের উপর সই করে বললাম, প্রথমতঃ সোমবার ফিরব। এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। ছটা বেজে গেছে, তাই না?

প্রায় সাড়ে ছটা, এখনই বেরিয়ে যাচ্ছো?

ভুরু কুঁচকে বললাম, জানি না। যেতে পারি। সম্ভবত গলফ্ খেলব।

আশা করি ভালভাবে বিশ্রাম নেবে। কিছু ভাবতে হবে না চেস, তোমার সব কাজ সুন্দর

ভাবেই হচ্ছে।

রাগের সঙ্গে বললাম, সোমবার দেখা হবে। মাথা নেড়ে তার কাছে বিদায় নিলাম।

জো তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, স্টেশন পর্যন্ত লিফ্‌ট দেবে, চেস?

হ্যাঁ।

তাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাড়ি যাবার পথে স্টেশন পড়ে।

যখন নিচে নামছিলাম জো জিজ্ঞাসা করল, আজ আর. এ.-কে দেখতে যাচ্ছ?

না, তিনি আমাকে সপ্তাহের শেষটা ছুটি নিতে বলেছেন। ওয়াসারম্যানের টি ভি স্ক্রিপটা সঙ্গে নিয়েছি দেখার জন্য।.মনে হয় খুব খারাপ নয়।

কাজকর্ম ফেলে তুমি ছুটি নাও না কেন? তোমাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। উদ্বেগের কারণ কি?

কিছুই নয়, আমার ক্যাডিলাকটার দিকে যাবার সময় বললাম।

জো আমার সঙ্গে এল।

হ্যাঁ, গত দুদিন ধরে তুমি পাউলাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছ।

পাউলা ভীষণ ভীতু। ওয়াসারম্যানের সঙ্গে ফোনের লাইন দিতে, কিন্তু একবারও পারে নি।

হয়তো খারাপ ছিল।

ইঞ্জিন চালু করলাম।

এসব কি জো?

এস যাই সীটে বসতে বসতে জো বলল। —এবার আমার পালা। ঠিক আছে, তবে একটু বিশ্রাম কর। কাজে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি।

সে ঠিক বলছে আমি জানতাম, সেজন্য লজ্জা বোধ হল।

দুঃখিত, জো। সপ্তাহের শেষে ঠিক হয়ে উঠব।

আমিও সেই ভাবে চলব, জো বলল। এখন তোমার অনেক কাজ। আলোচনার বিষয় পালটে সে বলে চলল, জান এই গাড়িটার জন্যে তোমাকে হিংসে করি।

আমার ক্যাডিলাক কেনার শখ ছিল। দাম প্রচুর কিন্তু পয়সা উঠে এসেছে। যদিও আঠার মাস, এখনও বেচলে প্রচুর দাম পাব।

যদি নিউইয়র্কের পরিকল্পনা দানা বাঁধে আর আমার মাইনে বাড়িয়ে দেয় তবে যে কোন ভাবে আমিও একটা গাড়ি কিনব।

প্ল্যানটা যদি ঠিক হয়, জো, তবে চেষ্টা করব যাতে তোমার মাইনে বাড়ে।

ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোন কথা বলেছে?

গত রাতে একবার বলেছিলেন কত তাড়াতাড়ি আমি টাকাটা তুলতে পারব।

তুমি কি মনে কর, চেস তার ব্যবসায়ে টাকা খাটান ঠিক হবে?

নিউইয়র্কের ব্যবসা কখনও খারাপ হতে পারে না। যদি ব্যবসার ঝুঁকি নিই তবে মাইনে ছাড়াও লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ পাব। এই সুযোগ ছাড়া পাগলামি। ব্যবসা মোটামুটি আমিই দেখব। ফলে আমার স্বার্থ আমিই রক্ষা করতে পারব।

জো বলল, আমারও এমন সুযোগ পেতে ইচ্ছে করছে। মোট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ। বড়লোক হতে চলেছ, চেস।

দেখ জো, ভাগ্য নির্ভর করবে ব্যবসা কেমন চলবে তার ওপর।

কত শীঘ্র ব্যবসা খাড়া করতে পারবে, চেস?

দালালদের বলেছি কাজ চালাতে, কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারব। বাজার এখন বেশ চড়া। ভাগ্যের ব্যাপার ডুবেও যেতে পারি।

স্টেশনের কাছে আসতেই গাড়ি থামালাম। জো গাড়ি থেকে বেরিয়ে বলল, ধন্যবাদ চেস। এমন দিনও আসতে পারে যেদিন আমি এই গাড়িটাই হয়ত কিনে নেব। যখন নিউইয়র্ক যাবে তখন একটা এলডোরাডো নিতে পারবে। তুমি কি আমার কাছে বিক্রী করার কথা ভাবতে পার?

দাঁত চেপে তার দিকে চেয়ে বললাম, টাকা জোগাড় না করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তবে আমি

কিনতে পারব। সপ্তাহের শেষটা ভালভাবে কাটাবে আশা করি।

তাড়াতাড়ি বাংলোর দিকে ছুটলাম।

।। দুই ।।

আমি গেবলসের প্রবেশ পথের ফটকটার সামনে নটা বাজতে এক মিনিট আগে এসে পৌঁছলাম।

লুসিলি ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়।

তাকে এগোতে দেখেই আমি গাড়ির দরজা খুললাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম সে একটা হালকা নীল পোশাক ও জ্বলজ্বলে রং-এর স্কার্ট পরে। সরু ফিতে দিয়ে চুলটা বাঁধা। সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সে ড্রাইভিং হুইলের নিচে বসতেই আমি সরে যাচ্ছিলাম।

সে হেসে বলল, হ্যালো। তোমার সময়জ্ঞান দারুণ। আমার পোশাক পছন্দ হয়েছে? কেবল তোমার জন্যেই এটা পরেছি।

দারুণ।

তোমাকেও দারুণ দেখাচ্ছে।

তুমি কি সত্যিই তাই ভাবছ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমরা আজ কোথায় যাব? চল, আজ সমুদ্রের দিকে যাই।

ঠিক আছে।

সে রাতে সে জোরে গাড়ি না চালিয়ে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে সুন্দরভাবে গাড়ি চালাল।

সে গাড়ি চালানোর সঙ্গে গুনগুন করে গান করছিল। বুকের ভিতরটা মোচড় দিল যখন বুঝলাম সে শীঘ্র পারমিট করবে আর গাড়ি চালানোও শেষ হয়ে যাবে।

একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। একটা খাড়া বাঁক নিতেই দেখলাম সামনে বালির স্তর, পামগাছের সারি ও সমুদ্রের জল চকচক করছিল।

গাড়ি চালানোর পর এই প্রথম কথা বলল, কি সুন্দর তাই না? বুঝতে পারবে না এই গাড়িটা চালিয়ে আমি কত আনন্দই না পাচ্ছি। চেস্‌, এর মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই। আমি এখন সত্যিই ভাল চালাচ্ছি, তাই না?

খারাপ নয়। তবে পারমিটের দরখাস্ত দেবার আগে আরও প্র্যাকটিস দরকার। তুমি এখনও পিছনে চালাতে পার না। পিছনে চালাবে এখন?

এখন নয়।

গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় মাইলের পর মাইল সমুদ্রতট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেখানে কোন জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছিল সমগ্র পৃথিবীতে কেবল আমরা দুজন।

গাড়ির আলো নিভিয়ে সে বলল, সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। তুমি কি আসবে?

চমকে বললাম, তোমার গাড়ি চালানো শেখার কথা। সময় বেশি নেই। এখন দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট।

রোজারকে বলে এসেছি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। মাঝরাতের আগে আশা করবে না। গাড়ি খুলে সে বাইরে এল। এখানে কেউ নেই সমুদ্রতট এখন আমাদের। যদি সাঁতার কাটতে না চাও গাড়িতে বস আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বালির উপর দিয়ে ছুটে গেল পাম গাছের দিকে।

গাড়িতে বসে লক্ষ্য করছিলাম। যে প্রশ্ন রাতের পর রাত আমাকে উতলা করে তুলেছিল, তারই উত্তর। যদি এর অর্থ আমার প্রতি প্রেম করার সুযোগ না হয় তাহলে সে এই নির্জন জায়গায় আসত না।

মনে মনে বললাম, আইকেনের স্ত্রীকে বোকা বানাতে চাইছ। এখন যদি এ পথে এগিয়ে যাও

তবে সারা জীবন তার জন্য অনুতাপ করতে হবে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সে তখন পাম সারির কাছে। সে জুতো দুটো ছুঁড়ে দিল, পরে উপরের জামাটা নিচের দিকে টেনে খুললো নীচে সাঁতারের পোশাক ছিল।

গাড়ির পেছনে গিয়ে জুতো খুলে তোয়ালে ও সাঁতারের পোশাক নিলাম। আমি সবসময়ই এই পোশাকটা গাড়িতে রাখি। তোয়ালে পরে এগিয়ে গেলাম।

সে আমার দিকে ফিরে হাসল, জানতাম তুমি আসবে। চিরদিন চাঁদের আলোয় সাঁতার কাটতে ভালবাসি কিন্তু রোজার কিছুতেই দেবে না। তার ধারণা এ কাজ বিপজ্জনক।

মনে হচ্ছে যে কাজগুলো তোমার করা উচিত নয় সেগুলোই আমার সঙ্গে করছ।

সে জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

তারপর সে ছুটে ছপাৎ করে জলে এসে পড়ল।

সে কিন্তু সত্যিই সাঁতার কাটতে খুব ভাল পারে। সে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে যত বেগে গিয়েছিল সেই বেগেই ফিরে এল।

সে আমার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল।

এখানে আসার জন্যে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

হচ্ছে।

আমি চিত হয়ে চাঁদের দিকে ভাসতে লাগলাম। সাঁতার কাটা শেষ করে ফিরে যাবার জন্য আমি তখন অধীর। সে ফিরে এসে আমার পাশে ভাসতে লাগল।

আর বিলম্ব সহ্য করতে পারলাম না।

এবার ফিরে যাওয়া যাক।

আমরা সাঁতার কেটে তীরে উঠে এলাম। সে তার পোশাকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, চেস, কাল কি করবে?

জানি না...বিশেষ কিছু নয়। গলফ্ খেলতে পারি।

কাল দেখা হবে কিনা জানি না। আমার এক মেয়ে বন্ধু কাল নিমন্ত্রণ করেছে। তাকে এড়িয়ে কাল অনেক দূরের গ্রামে যাওয়া যায়।

একটা তোয়ালে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অন্যটা দিয়ে আমার মাথা মুছে বালির উপর বসে বললাম, দেখা যাক কি করা যায়।

একটু সাবধান হওয়া দরকার। সাইকেলে আমি তোমার বাড়ি আসতে পারি। বড় রাস্তা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

আমার মনে হয় লুসিলি, দিনের বেলায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

আমার পাশে বসে বলল, চুপচাপ বসে থাকা ভয়ানক বিরক্তিকর। তাই না?

নিশ্চয়ই।

সমস্ত দিন গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ান বেশ মজার। তাই না? আমরা কাল পিকনিক করতে পারি। তুমি কি মনে কর, এটুকু ঝুঁকি নেওয়া যায় না?

তুমি এরকম ঝুঁকি নিতে চাও?

বুঝতে পারছি না কে আমাদের দেখবে। আমি বেশ বড় কালোটুপি ও সানগ্লাস পরতে পারি। চুলটা উপর দিকে তুলে নিতে পারি। বাজী রেখে বলছি কেউ চিনতে পারবে না।

যদি তোমার স্বামী জানতে পারেন, লুসিলি, তুমি ভয় করবে কি?

সে চিবুকটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বলল, হ্যাঁ করব।

তিনি কি করবেন তোমার মনে হয়?

নিশ্চয়ই ভীষণ রেগে যাবেন। তোমার বাড়িতেও সারাটা দিন একসঙ্গে কাটাতে পারি। বেশ নির্জন, তাই না? আমরা সাঁতার কাটতে পারি, পিকনিক করতে পারি। কেউ দেখতে পাবে না।

তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও, তাই না?

না, মনে হয় সিরিয়াস নই। বেশ শীত করছে, পোশাক পরতে যাচ্ছি।

সে লাফ দিয়ে উঠে তার পোশাক ও জুতো নিয়ে গাড়িটার দিকে ছুটল।

প্রায় দশ মিনিট আমি সেইভাবে পাথরের মত বসেছিলাম। সে আমাকে ডাকছে।

চেস...।

আমি নড়লাম না, ফিরে চাইলামও না।

আসবে না, চেস?

তবুও ফিরে চাইলাম না।

সে ছুটে এসে আমার পাশে এসে, তোমাকে ডাকছি, শুনতে পাও নি?

সে এখন পোশাক পরে নিয়েছে কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে জামার নীচে কিছুই পরেনি।

বসবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বালির উপর কয়েক ফুট দূরে সে পা মুড়ে বসে, বল, চেস।

তুমি কি সত্যিই চাও কাল গাড়ি নিয়ে পিকনিক করতে যাব—কেবল আমরা দুজনে?

সে অবাক হয়ে, মনে হয় তুমিই বলেছিলে...।

তুমি কি পিকনিক করতে চাও?

কেন, না? নিশ্চয়ই চাই।

ঠিক আছে। তোমার স্বামীকে গিয়ে বল যে আগামীকাল সারাটা দিন তুমি আমার সঙ্গে কাটাবে। যদি তিনি রাজী থাকেন তবে আমরা যাব।

আমি তা করতে পারব না। সে—সে জানে না যে আমি তোমাকে চিনি।

তাহলে বল যে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি রাগ করেছ মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার চেস?

গিয়ে বল যে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

আমি তা পারব না। সে কিছুতেই পছন্দ করবে না।

কেন না?

চেস, আমার মনে হয় এসব বন্ধ করে দাও। সে আমার ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর এবং বোকার মত ব্যবহার করে। সে কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

কি বুঝতে চাইবেন না?

চেস, তোমাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার?

আমাকে বল, তিনি কি বুঝতে চাইবেন না।

সে চায় না আমি অন্য মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই।

কেন? তিনি কি তোমাকে বিশ্বাস করেন না?

চেস? কি হয়েছে? এত রাগ করছ কেন? কেন তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ?

তিনি কি মনে করেন যে আমার সঙ্গে বাইরে গেলে বিশ্বাস হারাবে?

আমি জানি না চেস। যদি এইভাবে বকে চল, আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব।

ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে বললাম, কেন পছন্দ করছ না? সত্য ঘটনার মুখোমুখি হতে ভয় কোথায়? তুমি বিবাহিত, তাই না? তুমি কুমারী নও। তুমি নিশ্চয়ই জান যখন তোমার মত সুন্দরী মেয়ে কোন মানুষকে রাতের বেলায় নির্জন স্থানে নিয়ে আসে, তখন তার মনের অবস্থা কেমন হয়। তুমি কি এতই বোকা যে এসব বোঝ না?

সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, লুসিলি, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

সে শক্ত হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে প্রেম? না, না, এসব কি বলছ?

আমার গলা সপ্তমে উঠে গেল, তবে কেন এখানে এসেছ? কেন নিজেকে আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছ? তুমি কি মনে কর আমি পাথর দিয়ে তৈরী?

আমি যাচ্ছি...।

আমি ছুটে গিয়ে তার মনিবন্ধ চেপে ধরলাম ও নিজের দিকে টান দিলাম। তার মুখটা তখন আমার মুখের কাছে।

চেস আমাকে যেতে দাও।

আমি পাথর দিয়ে তৈরী নই, বলেই তার মুখের ওপর মুখ রাখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আশ্চর্য তার গায়ে ভয়ানক জোর। সে একটা হাত মুক্ত করে ভয়ানক জোরে আমার মুখে মারল।

ঘা খেয়ে আমার জ্ঞান ফিরল।

আমি তাকে যেতে দিলাম। সে জোরে গাড়ির দিকে ছুটল।

সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ক্যাডিলাকটা চলতে লাগল।

লুসিলি! যেও না...লুসিলি!

গাড়িটা জোরে বৃত্তাকারে ঘুরে সমুদ্রতটের রাস্তার উপর দিয়ে ছুটল।

লুসিলি।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিনের একটানা শব্দে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল বাংলোতে ফিরতে।

হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিলাম যা করেছি তা করার জন্য আমার পাগল হওয়া উচিত ছিল। সে আইকেনের কাছে সব বললেই আমার উপযুক্ত সাজা হবে। তার কথাগুলো যেন আমার মনে হাতুড়ির মত আঘাত করছিল।

সমুদ্র থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ছোট্ট বাগানের মধ্যে আমার বাংলো। সবচেয়ে কাছের বাড়িটার বড় রাস্তার সিকি মাইল দূরের বাড়িটা জ্যাক সিবোর্ন নামে এক ধনী দালালের বাড়ি। সে মাসখানেক আগে গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাতে এসেছিল।

আমার সদর দরজার সামনে একটা গাড়ি দেখলাম। আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বুঝলাম সেটা আমারই ক্যাডিলাক।

লুসিলি সামনে এসে, চেস....তোমার গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।

কয়েক গজ ব্যবধানে আমরা দাঁড়িয়ে, লুসিলি আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল....।

এসব কথা আর বোলো না। আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে আসব।

তার আগে কি ভিতরে যেতে পারি? তোমাকে কিছু বলা দরকার।

না। তোমাকে আমি বাড়িতেই রেখে আসব। আমাকে তুমি গাড়িতেই বলবে।

একবার কি ভিতরে যেতে পারি না?

গাড়ি চালাতে চালাতে আমরা কথা বলব। তোমাকে রেখে আসতে হবে...তাকে কাঁপতে দেখে আমি থেমে গেলাম। পড়ে যেতে দেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে দু হাত দিয়ে তাকে ধরে নিলাম।

লুসিলি ভগবানের দিব্যি। কি হয়েছে?

সে আমার উপর ভর দিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তাকে শুইয়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে মাথাটা বুকের উপর তুলে নিলাম ও চেপে ধরলাম। তার মাথাটা নীচের দিকে হেলে পড়ল। তাকে এত সাদা দেখাচ্ছিল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ বাদে তার চোখের পাতা নড়ে উঠল। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, সহজ ভাবে নাও। নড়বে না.....।

তার মাথাটা আমার কাঁধের উপর রাখল। তাকে তুলে নিয়ে সদর দরজার দিকে যেতে আমার কোন কষ্টই হচ্ছিল না।

এবার ঠিক হয়ে উঠব। আমাকে নামিয়ে দাও। অত্যন্ত দুঃখিত। আগে কখনই এরকম হয়নি।

আমি তাকে নামিয়ে চাবি দিয়ে দরজাটা খুললাম। আবার তাকে তুলে ধরে লাউঞ্জে নিয়ে এলাম। তাকে শুইয়ে দিয়ে বললাম. চপ করে শুয়ে থাক।

সে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়েছিল, তার চোখ দুটো মনে হচ্ছিল যেন কাগজে কাটা দুটো গর্ত।

তোমার জন্য কিছু পানীয় নিয়ে আসছি। আমার ব্যবহারের জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

কিছু চাই না, বলে সে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

আমি লিকার ক্যাবিনেটে গিয়ে গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে নিয়ে এলাম।

খেয়ে নাও, সুস্থ হয়ে উঠবে।

সে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে, না, চেস, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমার গাড়িটা ভেঙ্গে গিয়েছে।

এ নিয়ে কাঁদাকাটার কোন দরকার নেই। গাড়ি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে তোমাকে কাঁদতে হবে না।

তার মুখটা এত জীর্ণ দেখাচ্ছিল। সে বলল, আমি ভাঙ্গতে চাইনি। গাড়িটা আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না। বিরাট জোরে শব্দ হল। দরজায় একটা বিরাট দাগ পড়েছে ও সামনের লোহার গার্ডটায় টল খেয়েছে।

কি বলতে চাইছ? তুমি কি কোন মানুষকে ধাক্কা দিয়েছ?

দিব্যি খেয়ে বলছি দোষ আমার নয়, সে পিছন থেকে এসে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে সে ওখানে ছিল।

কে? কে চিৎকার করেছিল?

পুলিশের সেই লোকটা। একটা মোটর সাইকেলে চেপে ছিল। সে ঠিক গাড়িটার পাশে এসে চিৎকার করে উঠেছিল....।

ভয় পেও না। শুধু বল কি ঘটেছিল।

সে চিৎকার করতেই গাড়িটা কেঁপে ওঠে এবং তাকে গিয়ে আঘাত করে....। সে কাঁদতে শুরু করল।

তার হাত দুটো নিজের হাঁটুর উপর রেখে টিপতে লাগলাম।

কাঁদলে কোন ফল হবে। তাকে ধাক্কা দেওয়ার পর কি হল?

জানি না। সোজা বেরিয়ে আসি। পিছন ফিরে চাইনি।

তুমি দাঁড়াও নি বলছ?

না, দারুণ ভয় পেয়েছিলাম।

গাড়ি চালিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।

সে কি আঘাত পেয়েছিল?

জানি না।

কোথায় এটা ঘটে?

সমুদ্র তট থেকে উপরে আসার পথের উপর।

তাকে আর চীৎকার করতে শুনেছিলে?

না। গাড়ির পাশে ভয়ানক জোরে শব্দ হয়েছিল। আধঘণ্টার বেশী তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

খুব জোরে চালাচ্ছিলে?

হ্যাঁ।

আমি একবার গাড়িটা দেখে আসি, বলে উঠে ড্রয়ার থেকে একটা ফ্ল্যাশ লাইট নিলাম। সোজা গাড়ির কাছে এসে বুঝলাম যে গাড়ির সামনের ফেণ্ডারের ধারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সামনে আলোটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। ফেণ্ডার বেঁকে গিয়েছে। দরজায় একটা গভীর খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে এবং লম্বা হয়ে একটা আঁকাবাঁকা দাগ পড়েছে।

গাড়ীর পিছনের ফেণ্ডারের ধারটায় রক্তের দাগ ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল। দুরের চাকার সাদা বৃত্তটাতে থকথকে রক্ত লেগে ছিল। সেদিকে চেয়ে ভয়ে আমার রক্ত হিম হল।

মনে হল সে মোটর সাইকেলটাকে পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে চালককে ফেলে দিয়ে পিছনের চাকা দিয়ে তাকে মাড়িয়ে দিয়েছে। এসবের পরেও থামে নি।

ফ্লাশলাইটটা নিভিয়ে আমি পিছন দিকে এলাম। সম্ভবতঃ আরোহী লোকটা এই মুহূর্তে রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তায় মরে পড়ে আছে।

লাউঞ্জে ফিরে দেখি তখনও লুসিলি চিৎ হয়ে শুয়েছিল। নিঃশ্বাস এলোমেলো ভাবে পড়ছিল। তাকে ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছিল।

ব্রাণ্ডির গ্লাসটা নিয়ে এসে বললাম, এই যে, একটু খেয়ে নাও। দেখ, কেঁদে কোন লাভ নেই।

তার মাথাটা তুলে একটু খাওয়ালাম। কি ঘটেছে আমি দেখতে যাচ্ছি। এখানেই অপেক্ষা কর। যত শীঘ্র পারি দেখেই ফিরে আসছি।

তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজতে কুড়ি। সে মাথা নাড়ল।

তাকে সেখানে রেখে ক্যাডিলাকটার কাছে গিয়ে বুঝলাম এই অবস্থায় গাড়ীটাকে রাস্তায় নেওয়া যাবে না। যদি কেউ দেখতে পায় তবে সকালের কাগজে খবর পড়ার পর দুটোর মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে। আমার ধারণা ঘটনাটা কাগজে বার হবে।

এখন আমার একটা গাড়ির প্রয়োজন। মনে পড়ল রাস্তার আরও নীচের দিকে সিবোর্নের বাড়ী। সে ছুটি কাটাতে সেখানে আসে তার একটা গাড়ীও আছে। প্রায়ই তার বাড়ীতে গিয়েছি। জানতাম যে গ্যারেজের দরজার ওপরে একটা পেরেকে সে চাবিটা ঝুলিয়ে রাখত। ঠিক করলাম তার গাড়িটা নেব।

সিবোর্নের গাড়িটা হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ সালের পন্টিয়াক। গাড়িটা এত বড় যে এখানে আসার সময় তার ছ টা ছেলেকে নিয়ে আসত। পন্টিয়াকটা রাস্তায় নামিয়ে ক্যাডিলাকটা গ্যারেজে রেখে দরজা লাগিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রাখলাম।

পন্টিয়াকটা জোরে চালিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আসতে মাত্র দশ মিনিট লাগল।

খুব সাবধানে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি ঘাসের ধারে প্রায় ছ টা গাড়ি দাঁড়িয়ে। একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমুদ্রের দিকে যাওয়ার রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার প্রবেশপথ আটকে পুলিশের দুজন লোক তাদের দাঁড় করানো মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

শেষ গাড়িটার পাশে নিজের গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একজন মোটা মানুষ মাথার পিছন দিকে একটা পানামা টুপি লাগিয়ে তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে পুলিশ দুজনের দিকে চেয়েছিল।

. তার কাছে এসে স্বাভাবিক স্বরে বললাম, কি হয়েছে? গণ্ডগোল কিসের?

সে আমার দিকে ফিরে চাইল। তখন বেশ অন্ধকার। গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলো নিচের দিকে প্রতিফলিত হচ্ছিল। সে আমার পায়ের দিকটা দেখতে পাচ্ছিল।

একটা অ্যাক্সিডেন্ট। পুলিশের একজন লোক মারা গিয়েছে। আমি চিরদিনই বলে এসেছি পুলিসের এই লোকগুলো যেভাবে গাড়ির সামনে এসে পড়ে তাতে তারা নিজেদেরই বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে। এই লোকটাও সেই কাণ্ড করেছে।

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, ধাক্কা মেরে পালানো আর কি। কে করেছে বলতে পারছি না। আমি যদি সেই হতভাগার মত পুলিশটাকে মেরে কোন সাক্ষী থাকত না তবে চারপাশে ঘুরতাম আর মনে মনে দুঃখ পেতাম।

কিন্তু তাকে পুলিশরা ধরতে পারলে তাকে একেবারে ক্রুশে বিঁধে মারবে। আমার ধারণা এই শহরের পুলিশেরা নাৎসিদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আত্মহত্যা করেছে, বললেন না? নিজের গলার স্বর যেন চিনতে পারছিলাম না।

ঠিক তাই। মাথার উপর দিয়ে গাড়ি চলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই গাড়ির পাশটায় ধাক্কা মেরেছিল ফলে হতভাগাটা পিছনের চাকার ঠিক নিচে গিয়ে পড়েছিল। একজন লম্বা ছিপছিপে চেহারার লোকের দিকে দেখাল, লোকটা জনতার দিকে চেয়ে কি যেন বলছিল। এই লোকটা তাকে দেখেছে, তার পরনে ধূসর রং এর পোশাক ছিল। ও আমাকে বলল যে বেচারার মুখটা রক্তের মত দেখাচ্ছিল।

পুলিশদের একজন রাস্তায় এসে গর্জন করে উঠল, এই শকুনির দল, অনেক সহ্য করেছি। এখান থেকে সরে যাও। তোমাদের মতই এক বদমাস ধাক্কা মেরে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছে। এখান

থেকে ভাগো সব।

মোটা লোকটা মুখ বেঁকিয়ে গাড়ির দিকে চলে গেল।

আমি পন্টিয়াকটা চালিয়ে সোজা বাংলোর দিকে এলাম।

লাউঞ্জের দিকে যখন হাঁটছিলাম, দেখলাম লুসিলি এক বড় ইজিচেয়ারে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। মুখটা ভীত, পুরোন পার্চমেন্ট কাগজের রং এর মত দেখাচ্ছিল।

লাউঞ্জে পৌছলে সে বলল, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, চেস?

গ্লাসে ডবল হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে খেয়ে ফেললাম।

না, সব ঠিক, এ কথা বলব না, বলে চেয়ারে বসলাম।

উঃ।

কিছুক্ষণ বাদে লুসিলি বলল, কিছু দেখতে পেয়েছিলে?

পুলিশ এসে গেছে? আমি তাকে দেখতে পাইনি।

আমাদের এখন কি করা উচিত তোমার মনে হয়, চেস?

ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। মনে হয় না আমরা কিছু করতে পারব।

তুমি বলতে চাও আমাদের কিছুই করার নেই?

আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু চেস, আমরা নিশ্চয়ই কিছু একটা করব। আমার থেমে যাওয়া উচিত ছিল যদিও অ্যাক্সিডেন্ট। আর একবার দেখলে হয়ত সে আমাকে চিনতে পারবে। হয়ত সে গাড়ির নম্বরটা নিয়ে রেখেছে। আমাদের কিছু করা উচিত।

এস, তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি।

লুসিলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু একটা আমার কাছে চেপে যাচ্ছ, তাই না? ব্যাপারটা কি?

খুবই খারাপ খবর লুসিলি। যতটা খারাপ হতে পারে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই।

কি বলতে চাইছ?

তাকে তুমি চাপা দিয়েছ।

হ্যাঁ।

আমাকে বাড়ি নিয়ে চল, চেস। রোজারকে অবশ্যই বলতে হবে।

তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

না, সে পারবে। সে পুলিশের এক ক্যাপ্টেনের বন্ধু। সে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

কি বুঝিয়ে বলবে?

আমি সবে মাত্র গাড়ি চালাতে শিখেছি। এটা কেবল একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

মনে হয় না তাতে কোন ফল হবে।

তার কি খুব জোর আঘাত লেগেছে? তুমি কি বলতে চাও—সে মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, সে মারা গেছে।

উঃ, চেস...।

ভয় পেও না। আমাদের আর কিছু করার নেই। বেশ গোলমেলে ব্যাপার। মাথা খারাপ করা ঠিক হবে না.....

তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। তুমি তো গাড়িতে ছিলে না। তোমাকে নিয়ে তাদের কিছু করার নেই, সব দোষ আমার।

এই ব্যাপারে আমরা দুজনেই ছিলাম, লুসিলি। তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার না করলে হয়ত তুমি জোরে গাড়ি চালাতে না, তোমারা ও আমার ততটা দোষ।

উঃ চেস...। মুখটা নামিয়ে কেঁদে উঠল।

এক মুহূর্ত চেয়ে তাকে দুই হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলাম।

এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, বললাম। কাগজে কি বেরিয়েছে না দেখার আগে আমাদের করার কিছু নেই। পরে যা হয় ঠিক করা যাবে।

ধর কেউ যদি আমাকে ধাক্কা দিতে দেখে থাকে?

কেউ দেখে নি। সমুদ্রের ধারে কেউ ছিল না, আমি দু হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলাম। আঘাত করার পর কোনও গাড়ি যেতে দেখেছ?

মনে হয় না। অবশ্য মনে করতে পারছি না।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ, লুসিলি। মনে করার চেষ্টা কর।

ফিরে এসে সে বসল।

ঠিক আছে। এখন শোন, কাল কাগজ দেখার পর আমরা আলোচনা করব। তুমি কাল আসবে? সকাল দশটায় ; পারবে?

সে আমার দিকে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি শূন্য মনে হল।

ওরা কি জেলে পাঠাবে? সে প্রশ্ন করল।

আমি চমকে উঠলাম। যদি ধরতে পারে তবে জেলে পাঠাবে। পুলিশদের মেরে নিস্তার নেই।

ওভাবে বোলো না।

এতে ফল হবে না, কাল কখন আসতে পারবে? দশটায় আসবে?

তুমি নিশ্চিত যে, আমরা কিছু করতে পারব না?

কাগজে কি বলে! কাল সকালেই জানতে পারব। সকালে দেখা করে ঠিক করে নেব কি করতে হবে।

তুমি কি মনে কর, রোজারকে বলতে হবে? সে কিছু করতে পারবে।

তাঁকে তুমি বলতে পার না, লুসিলি। যদি বল, তাহলে আমার গাড়িতে কি করছিলে বলবে? সমুদ্রের ধারে কি করছিলে বলবে? সমুদ্রের ধারে তুমি ও আমি ছিলাম এবং পোশাক খুলে সাঁতার কাটছিলাম কি করে বুঝিয়ে বলবে? আমার মনে হত যে তোমার স্বামী কিছু পারবে তবে তোমার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলতাম, কিন্তু তিনি কিছুই পারবেন না। যদি কিছু বল তবে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং আমিও চাকরী হারাব।

এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে রইল ; পরে জোর গলায় বলল, জেলে যাওয়ার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ভাল। রোজার আমাকে জেলে যেতে দেবে না। আমার প্রভাব দারুণ। আমার বিশ্বাস সে আমাকে জেলে যেতে দেবে না।

তার দেহে আস্তে নাড়া দিলাম।

লুসিলি, তুমি বাচ্চার মত কথা বলছ।

সে কিছুতেই লোকমুখে বলাবলি করতে দেবে না যে তার স্ত্রী জেলে গিয়েছে।

তুমি বুঝতে পারছ না ঘটনাটা কি ভয়ানক, শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম, তুমি পুলিশের লোককে মেরেছ, এটা অ্যাকসিডেন্ট, তোমার লাইসেন্স নেই। পুলিশ না হয়ে অন্য কাউকে মারতে, তোমার স্বামী সেটা চাপা দিতে পারতেন। কিন্তু আইসেনহাওয়ারের চেয়ে তাঁর যদি বেশি প্রভাব থাকে এবং নিশ্চয়ই তাঁর নেই, সেই অবস্থায় তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

তুমি বলতে চাও জেলে যেতে হবে? ভয়ে তার তাজা তরুণ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল।

আমার দিকে চেয়ে সে তার ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। লুসিলি মাথা নাড়ল।

ঠিক আছে, এবার এস। তোমাকে বাড়ি রেখে আসি।

সে উঠে দাঁড়িয়ে সদর দরজার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

আমরা কি গাড়িতে যাচ্ছি না, চেস? মনে হয় না যেতে পারব গাড়িটায়।

আমার আর একটা গাড়ি আছে। হাতটা বাহুতে রেখে বারান্দার দিকে আসতে সাহায্য করলাম।

হলঘরের আলোটা নিভিয়ে সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম ; সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তখন শুনতে পেলাম, এই যে, এটা আপনার গাড়ি?

আমি বেশ চমকে উঠেছিলাম। লুসিলি জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে শুনতে পেলাম ; উপস্থিত বুদ্ধি তখনও কাজ করছিল—সে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল অন্ধকার বারান্দায়, যাতে দেখা না যায়।

নিচে গেটের কাছে একজন লোক দেখতে পেলাম। অন্ধকারে শুধু বোঝা যাচ্ছিল যে সে

দীর্ঘকায় ও মোটা। সিবোর্নের পন্টিয়াকটার পিছনে একটা বুইক কনভারটিবল দাঁড়িয়েছিল। পন্টিয়াকটার পিছনের আলো এটার বনেটে পড়েছিল।

লুসিলিকে চাপা গলায় বললাম, যেখানে আছ সেখানেই থাক। বলে নিচে নেমে মানুষটার সামনে এলাম।

সে বলল, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, বিরাট গোঁফ এবং বেশ হাসিখুশি মুখ হুইস্কির মত লাল। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে দেখেছেন। এটা কি জ্যাক সিবোর্নের গাড়ি নয়?

হ্যাঁ, আমি এটা ধার নিয়েছি, আমারটা ভাল করতে পাঠিয়েছি।

আপনি স্কট?

হ্যাঁ।

হাতটা বাড়িয়ে দিল। পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত, আমি টম হ্যাকেট। জ্যাক কখনও আমার নাম উল্লেখ করেছে কিনা জানি না। আপনার নাম অবশ্য অনেকবার আমার কাছে বলেছে। এই পথে যাচ্ছিলাম, দেখতে এলাম বুড়োটা এসেছে কিনা।

তার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ভাবছিলাম লুসিলিকে দেখেছে কিনা। হলঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন সেখানে আলো জ্বলছিল।

না, জ্যাক আগস্টের আগে এখানে আসবে না, কখনই আগে আসে না।

একটা চান্স নিলাম। আমি পাম-বে-র পথে যাচ্ছিলাম। পারাডাইশো হোটেলে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। আমার স্ত্রী ট্রেনে কাল সকালে আসবে। সে গাড়িতে বেশিদূর যেতে পারে না তার অসুখ করে। আমার অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না। ভেবেছিলাম জ্যাক এখানে আছে, বেশ গল্পগুজব ও ড্রিংক করা যাবে।

আগস্টের আগে সে তো এখান আসবে না।

হ্যাঁ, আপনি তো তাই বললেন। যদি আপনার কাজ না থাকে তবে চলুন না কোথাও গিয়ে ড্রিংক করা যাক। রাতটা বেশ সুন্দর।

পারলে খুব খুশী হতাম, কিন্তু আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

আচ্ছা, আমার মনে হয়েছিল দুজনে একটা ছোটখাট পার্টি করতে পারি, তাই না? পন্টিয়াকটার দিকে চেয়ে বলল, পুরোন বাস, ভাল চলে?

খুব ভাল।

আপনার যখন কিছুই করার নেই চলুন না আমাদের ওখানে। প্যারাডাইশো, সুন্দর জায়গা, বেশ স্ফূর্তি করা যাবে। গার্ল ফ্রেন্ডকেও নিয়ে আসতে পারেন। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত।

সে হাত নেড়ে গাড়িতে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। গেটের লোহার বড় রডটা আঁকড়ে ধরেছিলাম। হৃৎপিণ্ডটা কাঁপছিল।

কাঁপা গলায় লুসিলি বলল, ও আমাকে দেখেছে?

আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে এটা সে দেখেছে। কিন্তু তোমাকে সে চিনতে পারেনি, ভয় পাবার কিছু নেই।

তার হাত ধরে পন্টিয়াকের ভিতরে এসে ঢুকলাম।

সে মৃদু গলায় বলল, তুমি ঠিক বলছ যে রোজারকে কিছু বলব না?

তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে একটা নাড়া দিয়ে, কখনই বলবে না। তিনি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারবেন না। যদি তাঁকে বল তাঁকেও একই পথে ঠেলে দেবে। এটা কি বুঝতে পারছ না? পুলিশের হাতে তোমাকে তুলে না দিলেও একটা শাস্তি অন্ততঃ দেবেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। কি করতে হবে সব কাল তোমাকে বলব।

সে কাঁদতে শুরু করল। জোরে পাম বুলেভার্দের দিকে গাড়ি চালালাম।

।। দুই ।।

আমি বড় রাস্তায় সারি সারি গাড়ির পিছনে এসে পড়লাম। যেগুলো একটু একটু করে শহরের দিকে যাচ্ছিল। এত ভয়ানক ট্রাফিক জাম আগে কখনও দেখিনি। পুলিশের লোকটা মারা যাওয়ার জন্যেই এরকমটা হয়েছে।

সামনে কি হচ্ছে দেখতে পেয়ে লুসিলি কান্না থামাল।

ব্যাপারটা কি?

জানি না? চিন্তা করার কিছু নেই।

একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। ঘড়িতে দেখলাম বারটা বেজে দশ তার বাড়ি পৌঁছতে এখনও প্রায় দু মাইল বাকী।

হঠাৎ সামনের গাড়িগুলো একেবারে থেমে গেল। পুলিশের একজন লোক হাতে জোরালো ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে গাড়ির সারি ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং যাবার সময় প্রত্যেকটি গাড়ির উপর আলো ফেলছিল।

আমার গা ঘামে ঠাণ্ডা।

লুসিলি ভয়ে ভয়ে, এরা আমার খোঁজ করছে, বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল।

তার হাত চেপে বললাম, চুপ করে বস। ওরা তোমার খোঁজ করছে না। ওরা গাড়িটা খুঁজছে। চুপ করে বসে থাক।

পুলিশের একজন কাছে এগিয়ে আসতে সে একটুও না নড়ে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিল।

আমাদের ঠিক সামনের গাড়ি থেকে একজন দীর্ঘকায় চওড়া কাঁধের মানুষ বেরিয়ে পুলিশকে বলল, এসব কি ব্যাপার? আমি পাম বে-তে যেতে চাই। আপনারা এই রাস্তা পরিষ্কার রাখতে পারেন না?

পুলিশের লোকেরা তার উপর আলোটা ফেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন, যদি তাই মনে হয় থানায় গিয়ে অভিযোগ করুন। যখন সব ঠিক হবে, আমরা আপনাদের যেতে দেব, তার আগে নয়।

তখন বিরাট চেহারার লোকটি নরম গলায় বলল, যাই হোক ব্যাপারটা কি স্যার? খুব বেশি দেরি হবে কি?

গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি গাড়ি আমরা লক্ষ্য করছি। খুব বেশি দেরি হবে না।

আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে সে ফ্ল্যাশলাইটের আলো গাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে বাম্পারের কাছে নিয়ে এল তখন এত জোরে হুইলটা চেপে ধরলাম যে আঙুলগুলো ব্যথা করল।

পুলিশের লোকটা হাতের আলোটা আমার মুখ থেকে লুসিলির মুখে ফেলল। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

তার বাহুতে চাপ দিয়ে বললাম, সহজভাবে নাও।

লুসিলি কিছুই বলল না।

আমার সামনের গাড়িটা চলতে শুরু করল, আমিও পিছন পিছন চলতে লাগলাম। পরে ধীরে ধীরে গাড়ির গতি বাড়ল।

ওরা আমার খোঁজ করছে, তাই না চেস?

ওটা কোথায়? যে গাড়িটা ওরা খুঁজছে।

এমন এক জায়গায় যেখানে ওরা খোঁজ পাবে না। দেখ, তুমি কি ভয় পাওয়া কমাবে?

পাম বুলেভার্দের মোড়টা পেরিয়ে এবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। গেবলসের ফটকে বারোটা বেজে দশ মিনিটে এসে পৌঁছলাম।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললাম, আগামীকাল সকাল দশটায় তোমার দেখা পাচ্ছি।

লুসিলি খুব আস্তে গাড়ি থেকে বেরিয়ে, চেস! ভয় করছে, ওরা আমারই খোঁজ করছে।

ওরা গাড়িটার খোঁজ করছে। এখন মন থেকে সবকিছু মুছে ফেলো। কাল সকালের আগে আমাদের কিছু করার নেই।

কিন্তু ওরা সব গাড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। ব্যাপারটা গুরুতর। রোজারকে কি জানাব? এসব ব্যাপারে সে খুব ভাল।

না, উনি কিছু করতে পারবেন না। আমিই একা সামলে নিতে পারি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।

জেলে যাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারছি না।

তোমাকে জেলে যেতে হবে না। কাল আবার আলোচনা করা যাবে।

বেশ, তবে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিন্তু চেস যদি মনে কর সামলাতে পারবে না, তবে রোজারকে বলব।

আমি সবটা সামলাব। সবটা আমার উপর ছেড়ে তুমি ঘুমোতে যাও।

লুসিলি স্খলিত পায়ে বাড়ির রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

সে অদৃশ্য হওয়ার পর পন্টিয়াকে ফিরে বাংলোর দিকে ছুটলাম।

যখন ফিরছিলাম ভয়ের একটা জগদ্দল পাথর আমার কাঁধে নিঃশব্দে এসে বসল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সকাল দশটা বাজতে দশ মিনিট আগে নার্ভাস হয়ে এমন এক কাণ্ড করে বসলাম যা জীবনে কোনদিন করিনি। সারারাত জাগা এবং ভয়ে আমার নিস্তেজ স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে সতেজ করতে একের পর এক, দু বোতল হুইস্কি গিলে ফেললাম।

সকালে বাংলোর চারপাশে পায়চারি করতে করতে খবরের কাগজের হকারের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেদিন আটটায় কাগজ দিয়ে গেল। বারান্দায় ছুঁড়ে দেওয়া কাগজটা কুড়িয়ে নিতে যেই এগিয়েছি এমন সময় আমার ফিলিপিন দেশীয় চাকর টটি এসে হাজির।

খবরের কাগজটা তার সামনে পড়তে দ্বিধা লাগছিল।

আজ অফিস যাচ্ছি না, টটি।

অসুখ করেছে, মিঃ স্কট?

না, সপ্তাহের শেষদিনটা ছুটি নিচ্ছি।

আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।

কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ব্রেকফাস্টের জিনিসগুলো নিয়ে এখান থেকে যাও। টটি বেশ চটপটে ছোকরা। চাইছিলাম না যে সে কিছু সন্দেহ করুক।

আজ সকালে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করব ভেবেছিলাম, মিঃ স্কট। আর বিরক্ত করব না।

গলার স্বর নামিয়ে বললাম, সোমবার পর্যন্ত এসব কাজ বন্ধ রাখ। যখন তখন ছুটি পাওয়া যায় না। আমি ইচ্ছামত দিনগুলি কাটাতে চাই।

ঠিক আছে, মিঃ স্কট। আর কিছু বলবেন?

আমি বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতেই, ও বলল, মিঃ স্কট...

আবার? কি বল?

আমি কি গ্যারেজের চাবিটা নিতে পারি?

কেঁপে উঠল বুকটা। সে জানতে চাইবে ওখানে পন্টিয়াকটা কেন, ক্যাডিলাকটা বা কোথায়? সে ক্যাডিলাকটাকে এত সুন্দর পরিষ্কার রাখত যে যথেচ্ছভাবে সবসময় ব্যবহার করা গাড়িটা একেবারে নতুনের মত দেখাত।

চাবিটা কেন চাইছ?

ভিতরে একটা ধোয়ামোছার ন্যাকড়া আছে, সেটা বাড়িতে নিয়ে গেলে আমার বোন সেটা পরিষ্কার করে দেবে।

ভগবানের দোহাই, ওটার জন্য আর বিরক্ত করো না। ওসব ভুলে যাও। আমি এখন কাগজটা পড়তে চাই।

বারান্দায় গিয়ে কাগজটা কাঁপা হাতে খুলে বসলাম।

খবরের কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় করে খবরটা দেওয়া হয়েছে। তারা লিখেছে, এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে নির্মমভাবে চাপা দেওয়ার ঘটনা।

পাম সিটি ইনক্যোয়ারারে'র মতে, মৃত ব্যক্তি পেট্রল অফিসার হ্যারি ওব্রায়ান শহরের পুলিশ বাহিনীর জনপ্রিয় অফিসার। তিনটি কাগজেই মৃত ব্যক্তির ছবি দেওয়া হয়েছে, তাঁকে কঠিন ও নির্মম পুলিশ মনে হচ্ছিল। বয়স ত্রিশের কাছে, চোখ দুটো ছোট যেন গ্রানাইট পাথরে তৈরি, ঠোঁট নেই বললেই চলে এবং শরীরটা বেশ ভারি ধরনের।

পাম সিটি ইনক্যোয়ারা'র লিখেছে, মৃত ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক, বাপ-মায়ের প্রিয় পুত্র এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পুলিশ অফিসার।

বিবরণীতে লেখা ছিল, মাত্র দুদিন আগে এমন জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল, ও'ব্রায়ান তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন যে, তিনি বিয়ের দিন পরের মাসের শেষ দিকে লিটল টাভার্ন নাইট ক্লাবের জনপ্রিয় বিনোদিনী মিস ডলোরেস লেন।

তিনটি পত্রিকারই সম্পাদকীয়তে দাবী জানানো হয়েছে যে শহরের শাসন কর্তৃপক্ষের উচিত দোষী ড্রাইভারকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

পত্রিকাগুলোর বিবরণীতে আমি ভয় পাইনি, ভয় পেয়েছিলাম পুলিশের কার্যকলাপে।

পুলিসের ক্যাপ্টেন, জন সুলিভাঁ গতকাল রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে ওব্রায়ানের হত্যাকারী ড্রাইভারকে খুঁজে বার করার আগে পর্যন্ত একজন লোকও বিশ্রাম নেবে না।

সুলিভাঁ তাঁর দশ মিনিট বক্তৃতার শেষে বললেন, এ ব্যাপারে একটুও ভুল বুঝবেন না। আমরা দোষীকে খুঁজে বার করবই। এটা একটা সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট নয়। অতীতে অনেক পুলিশ অফিসারই দুর্ভাগ্যবশতঃ মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন কিন্তু সেইসব ড্রাইভারদের সকলকেই কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কিন্তু এই লোকটা পালিয়ে গিয়ে নিজেকে আসামী সাব্যস্ত করেছে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আর তাঁর গাড়ি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই শহরের প্রতিটি গাড়িকেই পরীক্ষা করে দেখা হবে। গাড়ির প্রতিটি মালিককে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই ঘটনার পরে যদি কোন গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ড্রাইভার যেন তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেয়, নইলে ঝামেলায় পড়বে। রাস্তায় অবরোধ রাখা হয়েছে। কোন গাড়িই পরীক্ষা না করে ছাড়া হবে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে, আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

এটা খুঁজে পেলে মালিককে উপযুক্ত ওষুধ দিতে পারব।

ইতিমধ্যে দশটা বাজতে দশ মিনিট হয়ে এল, টটির কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যা পড়লাম সে সব ভাবছিলাম। এর মধ্যে প্রায় দু বোতল ডবল হুইস্কি খেয়ে ফেললাম।

শহরের প্রতিটি গাড়ি পুলিশ পরীক্ষা করে দেখবে এটা হেঁয়ালি ঠেকলেও মনে পড়ে গেল, একটা মারাত্মক অস্ত্রের সন্ধানে এই শহরের পুলিশেরা একবার শহরের সমস্ত ডাস্টবিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল এবং প্রায় চারদিনের পরিশ্রমের পর সেটা উদ্ধার হয়েছিল। ভাবলাম সুলিভাঁকে তাচ্ছিল্য করা ঠিক হবে না।

লুসিলির আশায় দশটায় গেটে এসে দাঁড়ালাম।

আমি দুটো সিদ্ধান্তে এলাম। পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত সত্যি কথা বলা, নইলে ক্যাডিলাকটা যদি ধরা পড়ে তবে সমস্ত দোষটা নিজের কাঁধে তুলে নেব।

এই সিদ্ধান্ত শুধু লুসিলির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য নয়, এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। দুজনে বিপদে জড়িয়ে পড়ায় লাভ নেই। তাছাড়া দোষটা তো আমারই। আমি যদি সেদিন ওরকম ব্যবহার না করতাম তাহলে হয়তো সে অত জোরে গাড়ি চালাত না।

লুসিলিকে দোষী ধরলে আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাতে যে শুধু চাকরী হারাব তা নয়, সাহায্য করার অভিযোগে জেলেও যেতে হবে। তাকে ঝামেলার বাইরে রাখলে আর আমি সাজা পেয়ে বাইরে বেরোলে, মিঃ আইকেন হয়ত আমার চাকরী ফিরিয়ে দেবেন।

তখন লুসিলি এল, তার সাইকেল গ্যারেজে রেখে তাকে লাউঞ্জে নিয়ে এলাম।

কাগজ দেখেছ?

হ্যাঁ, আজ সকালে রেডিওতে ঘোষণা করেছে। কি বলেছে তুমি শুনেছ?

রেডিও? না, এদিকটা আমি একেবারেই ভাবিনি। কি বলেছে?

তারা খবর জানতে চেয়েছে। যে কেউ গতরাতে ভাঙ্গা, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটা দেখেছে সে যেন থানায় জানিয়ে আসে। সব গ্যারেজকে জানানো হয়েছে যদি কেউ ভাঙ্গা গাড়ি মেরামত করতে আসে তবে যেন থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ তার ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আমার বাহুবন্ধনে এসে আমার কাঁধে মাথা রাখল। ভীষণ ভয় করছে। উঃ, চেস... আমার বিশ্বাস ওরা আমায় খুঁজে বার করবে। আমি কি করব?

তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। চল আলোচনা করা যাক।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লুসিলি ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

সে একটা গলা-খোলা শার্ট একটা হালকা নীল স্ন্যাক পরেছিল। এই চরম মুহূর্তেও ভাবছিলাম কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বস। ইজিচেয়ারটার কাছে তাকে নিয়ে এলাম।

আমিও বসে বললাম, দুজনের একসঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোন যুক্তি নেই। যদি গাড়িটা ধরা পড়ে সমস্ত দোষটা আমিই নেব।

সে শক্ত হয়ে বলল, না, তুমি তা করতে পার না। দোষটা আমারই...

এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট যদি তুমি থামতে এবং সাহায্য করতে, লুসিলি তাহলে রেহাই পেত। কিন্তু তোমাকে জানাতে হত কেন অত জোরে গাড়ি চালিয়েছিল। এতে হয়ত জেলখানা এড়িয়ে যেতে কিন্তু একটা স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়তে। বুঝতেই পারছ কাগজের লোকেরা কিভাবে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ফেলবে। তোমার স্বামী তোমাকে ডিভোর্স করবে আমি চাকরী হারাব। সুতরাং এখন পুলিশকে সব বললে আমরা দুজনেই একটা বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পরব।

লুসিলি মাথা নেড়ে চলল।

আমি পুলিশকে সবকিছু বলতে চাইছি না। একটা সুবিধে আছে যে ওরা হয়ত ক্যাডিলাকটা খুঁজে পাবে না। যদি খুঁজে পায় তবে বলব যে আমিই পুলিশের লোকটাকে ধাক্কা মেরেছি। তুমি ঝামেলার বাইরে থাকলে আমাদের দুজনের পক্ষেই মঙ্গলকর। ভাগ্য ভাল হলে আমি হয়ত অল্প শাস্তি পেয়েই বেরিয়ে আবার চাকরীটাও ফিরে পাবো। কিন্তু তুমি জড়িয়ে পড়লে আমি আর কোনদিনই বিজ্ঞাপন এজেন্সীতে চাকরী পাব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, তুমি কি সত্যি বলছ চেস? সত্যিই তাদের বলবে যে তুমি এটা করেছ?

হ্যাঁ, আমি তাই চাইছি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুসিলি বলল, বেশ, তুমি যদি ঠিকই করে থাক...

হ্যাঁ, আমি ঠিক করেছি।

সে কাঁধ থেকে চুলগুলো সরিয়ে ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু উদ্বেগ কিছু কমল না।

তোমার কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে না, লুসিলি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। একটা জিনিস চেস, আমি সাঁতারের স্যুটটা তোমার গাড়িতে ফেলে এসেছি।

বেশ ঠিক আছে। তুমি চলে যাওয়ার পর আমি গাড়িটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে যাব। আমি তখন সাঁতারের পোশাকটা নিয়ে আসব।

আমরা কি এখনই গিয়ে নিয়ে আসব?

যখন গাড়িটা দেখতে যাব তখন নিয়ে আসব।

আমি এখনই যেতে চাইছি।

বুঝলাম তার জেদের কারণ। পুলিশের লোক যদি গাড়িটা দেখতে পায় তবে সাঁতারের পোশাকটা পেয়ে ঠিক জেনে নেবে ওটা কার।

ঠিক আছে তুমি অপেক্ষা কর। আমি এখনই নিয়ে আসছি।

আমি তোমার সঙ্গে যাব...

তোমার না যাওয়াই ভাল। আমাদের এক সঙ্গে থাকা ঠিক হবে না।

বরং আমি যাই।

কি ব্যাপার লুসিলি? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

আমার কাছে এটা খুব দরকারী।

নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের দুজনকে একসঙ্গে যাতে না দেখে সেটাও দরকার। আমি নিয়ে আসছি।

লুসিলি উঠে আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই, চেস।

বেশ কষ্ট করেই রাগ চেপে হলঘরের দিকে চললাম। সেও আমাকে অনুসরণ করল।

এখানে অপেক্ষা কর। আমি গাড়িটা নিয়ে আসি।

গ্যারাজে গিয়ে পন্টিয়াকটা বার করে রাস্তায় এনে চারপাশে তাকালাম কাউকে দেখতে পেলাম না।

হাত নেড়ে বললাম, এস।

সে ছুটে গাড়িতে এসে বসতেই আমি এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ পথ জোরে চালিয়ে সিবোর্নের বাড়ি এলাম।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। গ্যারেজের দরজাটা ভেজান।

ক্যাডিলাকটা রেখে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছিলাম আবার টেনে দেখেছিলাম ভালভাবে লাগানো হয়েছে, কিনা।

কি ব্যাপার, চেস?

এখানে অপেক্ষা কর বলে ছুটে গ্যারেজে ঢুকে দেখলাম তখনও ক্যাডিলাকটা সেখানেই ছিল কিন্তু আগের রাতে ফ্ল্যাশের আলোয় যেমনটি দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বিশ্রী দেখাচ্ছিল।

তালাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওটা ভাঙা এবং মোচড়ান। দরজার কাঠেও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম।

লুসিলি পাশে এসে কি ব্যাপার?

কেউ এখানে এসেছিল।

কে?

কি করে জানব?

তুমি কি মনে কর পুলিশ...

না। পুলিশ হলে নিশ্চয়ই আমার কাছে যেত। লাইসেন্স ট্যানে আমার নাম লেখা আছে।

চেস সুইম স্যুট?

কোথায় রেখেছিলে?

পিছনের সীটে পায়ের কাছে।

গাড়ির পিছন দরজাটা খুললাম। সত্যিই যদি সাঁতারের পোশাকটা ফেলে থাকে। এখন কিন্তু সেটা সেখানে নেই।

।। দুই ।।

একটা উড়োজাহাজ উপরে গর্জন করে উড়ে যাচ্ছিল। আর কোন শব্দ ছিল না। পিছনের খালি সীট ও সামনের খালি মেঝেয় তাকিয়ে বুকটা দুর দুর করে কাঁপছে।

লুসিলি ধীর গলায়, ব্যাপার কি?

সেটা ওখানে নেই।

নিশ্চয়ই আছে, আমাকে দেখতে দাও।

একপাশে সরে দাঁড়ালাম। লুসিলি নিশ্চয়ই এখানে আছে বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে নিচের দিকে হাত বাড়াল।

তোমার কি ঠিক মনে আছে সমুদ্রের ধারে ফেলে আসনি?

নিশ্চয়ই না, আমি নিশ্চিত মেঝের ওপর রেখেছিলাম।

লুসিলির চোখ দুটো ভয়ে গোল হয়ে উঠেছে।

গাড়ির পেছনটা একবার দেখি, বলে পিছনের পেটির ঢাকনাটা খুললাম। খুলে দেখলাম না, নেই।

ওটা নিয়ে কি করেছ?

তার দিকে চাইলাম, কি বলতে চাও? আমি জানতাম না যে তুমি ওটা গাড়িতে রেখেছ।

মিথ্যা বলছ! তুমি নিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।

এ কথা তুমি কি করে বলতে পারলে?

লুসিলির মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে ক্ষেপে বলল, মিথ্যা বলবে না, তুমি নিশ্চয়ই নিয়েছ। সেটা কোথায়?

তুমি কি পাগল হয়েছ? নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ। দরজার দিকে দেখ, কেউ নিশ্চয়ই এসেছিল এবং সুইম-স্যুটটা দেখে নিয়ে গেছে।

না, না, কেউ আসেনি। তুমিই দরজা ভেঙেছ। সেইজন্যেই দোষটা ঘাড়ে তুলে নিতে তোমার এত আগ্রহ। তুমি ভেবেছিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তোমার পায়ের নিচে পড়ে পা দুটোয় চুমু খাব, তাই না? ভেবেছিলে আমার সঙ্গে প্রেম করবে, তাই না? তোমায় যা ইচ্ছে তাই করতে দেব, তাই তোমার ধারণা ছিল, তাই না? তুমি সবসময়ই আমাকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলে। তুমি ঠিক করেছিলে যে সুইম-স্যুটটা আবার পরে গাড়িতে রেখে যাবে যাতে পুলিশ জানতে পারে যে আমি তোমার সঙ্গে গাড়িতে ছিলাম।

সজোরে চড় বসাতে যাচ্ছিলাম, অতি কষ্টে সামলে নিলাম।

ঠিক আছে। আমি তোমার সুইম-স্যুট নিইনি। বোকাদের এভাবে ভয় দেখাতে পার। কেউ এসে নিয়ে গিয়েছে, তবে আমি নিইনি।

সে চাপাস্বরে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি প্রশ্ন করলাম, এর অর্থ কী?

সে তার কপালটা আঙুলের ডগা দিয়ে চেপে ধরে হঠাৎ হেসে উঠল।

অত্যন্ত দুঃখিত, চেস, সত্যিই আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আমি চাইনি। কাল রাতে ঘুম হয়নি, নার্ভগুলোর অবস্থা ভয়ানক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

হ্যাঁ, সব ভুলে যাও।

কে নিয়ে যেতে পারে চেস? পুলিশও হতে পারে, পারে না?

না, পুলিশ নয়।

অন্যদিকে চাইল লুসিলি। মনে হল, যেন তার ভাবনা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

এখানে তোমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই, লুসিলি, তোমার থাকা বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, আমাকে একটা সিগারেট দেবে?

অবাক হয়ে আমার ক্যাসেল মার্কা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা বার করে তাকে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান দিয়ে গোছা গোছা ধোঁয়া মুখ থেকে বার করতে লাগল। সে সবসময় গ্যারেজের সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের দিকে তাকিয়েছিল।

সে মুখ তুলে চাইতে দেখতে পেল আমি তাকে লক্ষ্য করছি। সে হেসে বলল, সুতরাং আমরা দুজনেই এই ঝামেলায় পড়লাম, তাই না, চেস?

ঠিক তা নয়। ছিঁচকে চোরও হতে পারে।

তোমার তাই মনে হচ্ছে? ব্ল্যাকমেলারও হতে পারে।

কেন, এঁকথা বলছ কেন?

আমার এরকম মনে হচ্ছে। ব্ল্যাকমেলিং-এর পক্ষে আমরা বেশ খারাপ অবস্থায় আছি, তাই না? আমি পুলিশের লোকটাকে চাপা দেওয়ার জন্য, আর তুমি আমাকে প্রলোভন দেখানোর জন্য।

এ দিকটা অবশ্য আমার খেয়াল হয়নি, কিন্তু এখন লুসিলি বলাতে মনে হল ঠিকই বলেছে।

অবশ্য নাও হতে পারে...

না। আমাদের বরং অপেক্ষা করে দেখা উচিত কি ঘটে। সে আমার পাশ কাটিয়ে গ্যারেজের দরজার দিকে গেল। মনে হয় আমার ফিরে যাওয়াই ভাল।

হ্যাঁ।

আমি যখন গ্যারেজের দরজা লাগাচ্ছিলাম সে অপেক্ষা করছিল।

আমাকে আবার ফিরে এসে তালা দিতে হবে।

হ্যাঁ।

লুসিলি এবার পন্টিয়াকের ভিতর এসে সোজা হয়ে হাত দুটো হাঁটুর উপর রেখে বসল।

আমিও বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে একেবারে উল্টোদিকে ঘুরে সোজা বাংলোর দিকে চালালাম।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

তোমার সাইকেল নিয়ে আসছি।

আমি ভিতরে যাব চেস। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

বেশ, ঠিক আছে।

দুজনে এসে বাংলোতে ঢুকলাম। আমি একটু দাঁড়িয়ে লাউঞ্জের সদর দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

লাউঞ্জে ঢুকে দেখি লুসিলি একটা ইজিচেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট। অন্য একটা চেয়ারে বসে তার দিকে তাকালাম। সেই সৌন্দর্য যেন তার হারিয়ে গেছে। একটা কাঠিন্য এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। এখনও সে দেখতে সুন্দর। লোভনীয় কিন্তু তার সেই সরলতা ও যৌবন যেন উধাও হয়ে গেছে।

লুসিলি আস্তে আস্তে মাথাটা ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, মনে হচ্ছে আমি একটা বিরাট ঝামেলার সৃষ্টি করেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি হয়ত মুক্তি পেতাম, কিন্তু সেখানে সুইম-স্যুটটা ছেড়ে রাখার জন্য আবার হয়ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব, তাই না?

আমি অবশ্য তা বলব না। এটা নির্ভর করে কে নিয়েছে তার উপর। দামী কিছু পাবার লোভে একটা ছিঁচকে চোর ভিতরে ঢুকতে পারে। গাড়ির মধ্যে সুইম-স্যুটটা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। সে এর থেকে কিছু পাবে এই আশায় সেটা নিয়ে গেছে।

লুসিলি মাথা নেড়ে, আমি তা মনে করি না। স্যুটটায় আমার নাম লেখা আছে। এই শহরের প্রায় সকলেই জানে রোজার কি রকম ধনী।

আমার হৃৎপিণ্ডটা কাঁপতে লাগল, হাত দুটো ভিজে উঠল। এইসব কথাবার্তা আমার মনে বিপদের লাল সংকেত জ্বালাল।

সে শান্ত গলায় বলে চলল, আর যাই হোক, একটা ছিঁচকে চোর কেন সুইম-স্যুট নিতে যাবে? এটা কার দরকার হবে? মনে হয় আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তুমি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে চাচ্ছো...

সে অধৈর্য ভঙ্গিতে, দেখা যাক কি হয়। তুমি কি ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে চাও, চেস?

এতে কোনও লাভ হবে না। একবার ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে শুরু করলে আর রেহাই নেই, মনে হবে একটা ভূত যেন ঘাড়ে চেপে বসে আছে।

আমার মনে হয়, রোজারের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

আমি তাকে যতটা জানি তুমি ততটা জান না। সে নিজের পদমর্যাদা এবং লোকে তার সম্বন্ধে কি ভাববে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। আমি যদি তাকে সব খুলে বলি আর তুমি যদি সমস্ত দোষটা নিজে নিতে চাও তবে আমার মনে হয় সে ব্ল্যাকমেলের টাকাটা দিয়ে দেবে।

ভয়ে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লুসিলি বলে চলল, তার টাকা অনেক। সে দর কষাকষিও করতে পারে। মনে হয় না তার পক্ষে এটা বেশি কিছু হবে।

কিন্তু তিনি তোমাকে ডিভোর্স করবেন।

জেলে যাওয়ার চেয়ে ডিভোর্স ভাল।

কিন্তু এখনও আমরা জানি না যে আমাদের ব্ল্যাকমেল করা হবে।

তুমি কি মনে কর এই লোকটা আমার সুইম-স্যুটটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিয়েছে?
এ নিয়ে তোমার বিদ্রূপ করা ঠিক না। আমি সাহায্য করার চেষ্টা করছি।
অন্ততঃ তোমার বাস্তববাদী হওয়া দরকার।
অস্বাভাবিক জোরে বলে ফেললাম, এই মুহূর্তে ব্ল্যাকমেলের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি বলেছি যে তোমাকে ঝামেলার বাইরে রাখব ভেবেই বলেছি।
অর্থাৎ এই লোকটার মুখ বন্ধ করতে টাকা খরচ করবে?
কোন লোকটা?
যে লোকটা আমার সুইম-স্যুট নিয়েছে।
এ তোমার কল্পনামাত্র। আমরা এখনও লোকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানি না।
তুমি কি মনে কর সেটা আপনাআপনি উধাও হয়ে গেল?
আমি মনে করি, তুমি সেটা সমুদ্রের ধারেই ফেলে এসেছ।
লুসিলি চিৎকার করে বলল, না ফেলে আসিনি। আমি গাড়িতেই রেখেছিলাম, কেউ নিয়ে গেছে।
ঠিক আছে, এ নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নেই।
চেস, তুমি কি দিব্যি করে বলবে তুমি নাও নি?
নিশ্চয়ই, আমি নিই নি। উঃ, ভগবানের দিব্যি।
আমি ভেবেছিলাম আজ সকালে তুমিই আমাকে ফোনে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলে। মনে হচ্ছিল তোমারই গলা।
আমি শক্ত হয়ে উঠলাম। কি বলতে চাইছ? কে তোমাকে ফোন করেছিল?
আজ সকালে প্রায় নটা নাগাদ টেলিফোনে ঠিক তোমার গলার মত করে বলল, মিসেস লুসিলি, আশা করি কাল রাতে সাঁতার বেশ আনন্দের হয়েছে। তারপরেই চুপ হয়ে গেল।
শরীরটা হিম হয়ে এল।
আগে কেন একথা বলনি?
ভেবেছিলাম তুমিই ফোন করেছ আর সেইজন্যেই সুইম-স্যুটটা ফিরিয়ে আনতে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।
না, আমি নই।
সেইজন্যই বলছি আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে।
কিন্তু সমুদ্রের ধারে কেউই ছিল না।
যেই হোক না কেন, সে জানত যে আমি গাড়ি চড়েছিলাম সাঁতার কাটার জন্য।
তাহলে কি এই লোকটাই তোমার সুইম-স্যুট নিয়ে গিয়েছে?
হ্যাঁ।
মদের ক্যাবিনেটের দিকে যেতে যেতে, তুমি ড্রিংক করবে?
হ্যাঁ, দাও।
হুইস্কি, না জিন?
হুইস্কি।
দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে বরফের টুকরো দিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে যেই যাচ্ছি টেলিফোনটা বেজে উঠল।
মনে হল মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। লুসিলি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে। লুসিলি চাপা গলায়, তুমি কি ধরবে না?
রিসিভারটা তুলে ধরলাম, হ্যালো?
মিঃ, চেস্টার স্কট বলছেন?
হ্যাঁ, কে বলছেন?
ওর সঙ্গে তোমার প্রেম করা উচিত ছিল, মিঃ স্কট। ওভাবে ওকে পালিয়ে যেতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। আর যাই হোক, এই উদ্দেশ্যেই তো মেয়েদের আমাদের হাতে ছেড়ে

দেওয়া হয়।

কি বলতে চাইছেন? কে বলছেন? কপালে তখন ঠাণ্ডা ঘাম জমা হয়েছে।

একটানা কড় কড় শব্দে বুঝলাম, আমার কথাগুলো যখন বলছিলাম তখন লাইনের ওপাশে কেউ নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

ধীরে ধীরে টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে পিছন ফিরে লুসিলির দিকে চাইলাম।

সে হাত দুটো দিয়ে হাঁটুটাকে চেপে ধরে ভয়ে ভয়ে বসেছিল।

কে? জিজ্ঞাসা করল, সে।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'জানি না, তবে মনে হয় যে লোকটা আজ সকালে তোমাকে ফোন করেছিল সে।

লোকটার কথাগুলো শুনে সে দু হাতে মুখ ঢাকল।

উঃ, চেস। আমরা কি করব?

জানি না। বেশ জটিল ব্যাপার।

দেখ, আমি ঠিকই বলেছি। লোকটা ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।

সে তো ব্ল্যাকমেলের কথা কিছুই বলেনি।

নিশ্চয়ই সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। তার কাছে সুইম-স্যুটটা আছে। সে তোমাকে চেনে, আমরা সমুদ্রের ধারে ছিলাম সে জানে এবং পুলিশটা মারার জন্যে আমি দায়ী সেটাও জানে। সে নিশ্চয়ই আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। আমরা জানি না তার কাছে সুইম-স্যুট আছে কিনা বা ও' ব্রায়ানকে তুমি চাপা দিয়েছ সেটা সে জানে কিনা। এটা অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সে আমাদের সমুদ্রের ধারে দেখেছে।

নিশ্চয়ই তার কাছে সুইম-স্যুট আছে এবং সে তোবড়ানো গাড়িটা দেখেছে।

কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি না লুসিলি। এই দুটো টেলিফোন কল যদি ব্ল্যাকমেলের প্রথম সূচনা হয়, তবে মনে হয় সে তোমার স্বামীকে বলে দেবার ভয় দেখাবে যে, সে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে দেখেছিল। অ্যাকসিডেন্টের কথা সে হয়তো কিছুই জানে না।

তাতে কি আসে যায়? অ্যাকসিডেন্টের কথা যদি সে নাও জানে তবুও আমাদের তাকে টাকা দিতে হবে যদি অবশ্য তুমি চাকরী হারাতে আর আমি রোজারকে হারাতে না চাই।

আমরা পুলিশের কাছে যেতে পারি। ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করা উচিত তারা তা জানে এবং আমাদের এড়িয়ে চলবে।

কি করে একথা বলছ? ঐ গাড়িটা নিশ্চয়ই দেখেছ।

আমরা এটাও সঠিক জানি না। অন্ধকারে সে নাও দেখতে পারে।

তুমি যেন কথার পিঠে কথা বলছ! আমার নিশ্চিত ধারণা অ্যাকসিডেন্টের বিষয় জানে।

তাহলে সে কেন একথা বলল না? ব্ল্যাকমেলের পক্ষে সেটা অনেক ধারালো অস্ত্র।

আমি জানি তোমার ধারণা ভুল, তবু যেমন খুশি ভাবতে পার। কি করবে ভাবছ?

এই মুহূর্তে কিছুই করতে যাচ্ছি না। লোকটা সত্যিই জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তবে সে বিপদের প্রধান কারণ নয়। আসল বিপদ আসতে পারে পুলিশের কাছ থেকে। এই লোকটা যদি অ্যাকসিডেন্টের খবর জানে তাকে পয়সা দিয়ে থামান যাবে কিন্তু পুলিশকে টাকা দিয়ে কিছু করা যাবে না। তারাই হচ্ছে বিপদ।

বিষণ্ণ মুখে সে বলল, তুমি বলেছিলে দোষটা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে। আমার পক্ষে অবশ্য বিপদের কারণ এই লোকটা পুলিশ নয়।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে বিপদের বাইরে রাখব কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারি না। তুমি এতই অসাবধানী যে গাড়িতে সাঁতারের পোশাকটা ফেলে এলে? যদি কেউ সেটা পুলিশের কাছে

নিয়ে যায় তবে আমি বিপদ থেকে তোমাকে রেহাই দিতে পারবো না। আমি দিব্যি করে বলছি, তাঁদের বলব যে আমিই গাড়িটা চালাচ্ছিলাম। কিন্তু তাতেও নরহত্যায় সাহায্য করার অপরাধে তুমি অপরাধী।

সে রেগে বলল, আমার স্থির বিশ্বাস যে সে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। আমি জানতে চাইছি যে তুমি কি ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দেবে, না আমি রোজারের কাছে যাব?

শান্ত ভাবে বললাম, তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ, লুসিলি? এটাও কিন্তু আমার কাছে ব্ল্যাকমেলের মত শোনাচ্ছে।

কি রকম শোনাচ্ছে আমি জানতে চাই না। আমি জানতে চাই, লোকটা টাকার দাবী করলে তুমি কি করবে?

দাবী না জানান পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাই।

তার চোখদুটো জ্বলছিল। আমার বিশ্বাস, তুমি কাঁধে দোষ তুলে নেওয়াটা এড়িয়ে যেতে চাইছ। তুমি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যে মনে হয় দুঃখ করতে শুরু করেছ। ঠিক আছে, তুমি কিছুতেই ছাড়া পাবে না।

তুমি কি নিজের চিন্তা ছাড়া কোনদিন অন্যেরটা ভেবেছ? তুমি বরাবর শুধু ভাবছ কেমন করে ঝামেলা থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে।

তুমি না থাকলে আমি এই ঝামেলায় পড়তাম না। কেন আমি তোমার কথা ভাবব? দোষ পুরোটা তোমারই।

রাগ সামলে বললাম, তুমি ঠিক বলছ, লুসিলি? তুমি কি এতই নির্দোষ? তুমি গাড়ি চালানো শেখবার জন্য বারবার আমাকে প্ররোচিত করে অন্যায় করেছ। তুমিই আমাকে নিয়ে গিয়েছ এই নির্জন সমুদ্রতটে। তুমি যেভাবে আচরণ করছিলে যে কোন মানুষ ভাবতে পারত যে তুমি সহজলভ্যা।

সে ক্ষেপে গিয়ে বলল, এইসব বলার সাহস কে তোমাকে দিল?

উঃ, ঝগড়া করে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাকে ঝামেলার বাইরে রাখব এবং সম্ভব হলে আমি তা করব।

তুমি আমাকে ঝামেলার বাইরে রাখ। আমি রোজারকে হারাতে চাই না, জেনেও যেতে চাই না, তুমি একটা জন্তুর মত ব্যবহার করছ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলল, এ নিয়ে আমি আর ভাবতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটা তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে।

তুমি বরং এ আশা ছেড়ে দাও। তোমার কাছে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছি। তুমি একটা স্বার্থপর কূপমণ্ডুক ভ্রষ্টা ছাড়া কিছুই নও। যে মুহূর্তে তুমি নিষ্কৃতি পাবে সেই মুহূর্তে চোখের পাতা ওলটাতে ছাড়বে না।

গত রাতে রোজারকে বললেই ভাল হত। এখনই আমি গিয়ে সব বলব।

তাতে কি এসে যাবে? আমি কি তাতে হাঁটু গেড়ে তোমার সামনে বসব? ঠিক আছে তুমি যদি তোমার ধনী, প্রভাবশালী রোজারকে এই ঝামেলায় আনতে চাও, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে সব বলব। আমি বলব, তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসে গাড়ি চালাতে শেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিলে। তুমি মাঝরাতে সাঁতার কাটার প্রস্তাব করেছিলে। তুমিই ছায়া রং-এর টুপি ও সানগ্লাস পরে আমার বাংলোয় ছদ্মবেশে এসেছিলে এবং আমার সঙ্গে যে ঘুরতে সেটা তোমার স্বামীর কাছে চেপে গিয়েছিলে। যখন তোমাকে তাঁর অনুমতি নিতে বলি, তুমি বলেছিলে তিনি মুর্খ, ঈর্ষাকাতর, তাই না? চল তাঁকে সব খুলে বলা যাক। দেখা যাক তিনি এসব পছন্দ করেন কিনা?

যদি সঙ্গে আসতে না চাও, এখানে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না। যদি ধাপ্পা দাও তবে আমি তোমার ধাপ্পা ধরে ফেলব।

হলঘর দিয়ে গিয়ে সদরের দরজা খুলে ফেললাম। লুসিলি আমার দিকে চেয়ে বলল, চেস...শোন...

সে ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল, না...শোন...

রাগের সুরে বললাম, আমি যে বোকা, তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। যদি কঠিন পথ বেছে নাও, তবে সেই ভাবেই আমার কাছে ব্যবহার পাবে।

অশ্রুসজল কণ্ঠে সে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত চেস! তুমি জান না কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমি রোজারকে কিছু বলব না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমি নিজেই জানি না তোমাকে কি বলেছি।

জান না? কেবল ব্যবহার পালটাচ্ছ। প্রথমে আমাকে বিশ্বাস করেছিলে, পরে ভয় দেখাতে শুরু করলে, তারপর স্বামীর কাছে যেতে চাইলে। এখন আবার বিশ্বাস করতে শুরু করেছ। সোজাসুজি মিটিয়ে নাও, তুমি তোমার স্বামীকে জানাতে চাও, না চাও না?

না, চেস।

ঠিক? আর মত পালটাতে পারবে না।

না, চেস।

তুমি, কি চাও যে ব্যাপারটার মোকাবিলা আমিই করি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ঠিক? খুব সহজেই কিন্তু তুমি মত পালটাও, তাই না?

চেস, প্লীজ আমার উপর রাগ করো না। দিব্যি করে বলছি, কি করেছিলাম বা বলেছিলাম কিছুই জানি না। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

তুমি কথা বলছ বেশি কিন্তু কিছুই করছ না। লাউঞ্জে চল। এতক্ষণ ধরে আমরা বাইরে কথা বলছি।

সে লাউঞ্জে গিয়ে এক নাটকীয় ভঙ্গিতে বসেছিল, কিন্তু তার কোন নাটকীয় ভঙ্গিই আর আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম।

লুসিলি, এ দিকটা ভেবে দেখেছ? হঠাৎ আমি বললাম, তোমার কি খেয়াল হয়েছে যে এর ভিতর বিশ্রী ব্যাপার থাকতে পারে?

কি বলতে চাইছ?

জানি না?

কোন কারণে সে নিশ্চয় সেখানে গিয়েছিল। কোন গাড়ির বেপরোয়া চালককে ধরার জন্য গিয়েছিল মনে হয় না। কেন সে সেখানে গিয়েছিল, তোমার কি কিছু মনে হয় না?

মনে হয় না? আমার মনে হয়, বেশ ঠিক আছে। এখন ও আলোচনা বাদ দেওয়া যাক। আমি ভেবে দেখব। গোটা ঘটনাটা দুজনে আলোচনা করা যাক। সাঁতারের পর তুমি গাড়িতে ফিরে এসেছিলে, পোশাক পালটে সুইম-স্যুটটা গাড়ির মেঝেয় রেখে এসেছিলে, ঠিক তো?

হ্যাঁ।

কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?

না, নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কেউ ছিল! যে লোকটা ফোন করেছিল সে আমাদের দুজনকে দেখেছে! কি করে সে জানবে যে আমরা দুজন একসঙ্গে সাঁতার কেটেছিলাম? আমার মনে আছে কোন আড়াল ছিল না। সে নিশ্চয়ই ওখানেই ছিল।

আমি ভাবছি, দিনের আলোয় চারপাশ দেখব। সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছে না সে থাকতে পারে। যতদূর মনে আছে আড়াল ছিল না। কিছুক্ষণ থেমে বলে ঃ তোমার কি মনে হচ্ছে যে তুমি যখন গাড়ির ভিতর সাঁতারের পোশাকটা রেখে এসেছিলে, সেই লোকটা গাড়ির কাছে গিয়ে সেটা তুলে নিয়েছিল?

আমার দিকে চাইল সে।

না, তা মনে হয় না।

আমরা যখন ঝগড়া করছিলাম তখন যদি সে নিয়ে থাকে তাহলে এটাই বোঝায় যে সে তোবড়ানো গাড়িটা দেখেনি।

কিন্তু গ্যারেজের দরজা ভাঙা ছিল—তখনই সে নিয়েছিল।

ঠিক আছে, আবার আলোচনা করা যাক ঃ যখন তুমি গাড়িতে ফিরে চালাতে শুরু করলে তখন কি হয়েছিল?

নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম একেবারে। গাড়িটা চড়াই পথে চালাচ্ছিলাম। প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর একজন লোকের চীৎকার শুনতে পেলাম...

লুসিলি এই জায়গাটা এড়িয়ে যেও না। কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে?

কত জোরে ঠিক জানি না।

মনে হয় সত্তর। ঠিক জানি না।

ও'ব্রায়ানকে তুমি দেখনি? তুমি যে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছ জানতে পারনি?

হ্যাঁ।

তাহলে নিশ্চয়ই তার পাশ দিয়ে গিয়েছে! সে নিশ্চয় হেডলাইট নিভিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করছিল এবং যখন তুমি তার পাশ দিয়ে যেতে চাইছিলে সেই সময় সে তোমার সামনে এসে পড়ে।

আমার তাই মনে হয়।

পরে কি ঘটল?

বলেছি তো। তার চীৎকার শুনতে পাই ও পাশ কাটিয়ে চলে আসি। গাড়ির পাশে ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পাই।

তুমি মোটর সাইকেলটার শব্দ পাওনি?

মনে হয় পেয়েছিলাম।

তখন গাড়ির স্পীড কমিয়েছিলে? তখন সে তোমার কাছে এসে পড়েছিল। সে কি সামনে এসে পড়েছিল, না পাশে?

লুসিলি বলল, মনে পড়ছে না।

এবারে মনে করে বল আলোটা কি ডান দিকে ছিল?

পরে সে বলল ঃ হ্যাঁ, সে পাশে এসে পড়ে এবং গাড়ির জানালার কাছে চীৎকার করে ওঠে। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।

সামনে ঝুঁকে অন্যদিকে চেয়ে বসে ছিল দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটো।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

কিন্তু, একটু আগেই অন্যরকম বলছিলে।

এখন ঠিক বলছি।

তুমি ঠিক বলছ না, লুসিলি। সামনের দিকের হেডল্যাম্পটা গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই তোমার সামনে ছিল। সে হঠাৎ পিছন দিক থেকে তোমার ডানদিকে আসেনি। তাহলে সে ইচ্ছে করেই অ্যাকসিডেন্ট করতে চেয়েছিল।

তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে শক্ত হয়ে গেল, তুমি যদি সব জান তবে জিজ্ঞাসা করছ কেন? সে কোন্ পাশে ছিল আমার মনে নেই।

যেভাবেই হোক তুমি তাকে আঘাত করেছিলে। শব্দ শোনার পর কি হয়েছিল?

আমি গাড়ি চালাতে লাগলাম।

খুব জোরে ধাক্কা লেগেছিল?

হ্যাঁ।

তাকে ধাক্কা দিয়েছিলে তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছিল তুমি দাঁড়িয়ে তাকে না দেখে আরও জোরে গাড়ি চালিয়েছিলে?

তুমি কি প্রশ্ন করেই চলবে? কি ঘটেছিল আমি তো তোমাকে বলেছি।

আমার পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার। তুমি বড় রাস্তায় এসে কি করলে?

বুঝতে পারলাম না লোকটার মোটর সাইকেলটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে তোমার গাড়িটাও, ভীষণ ভয় পেলাম। ভাবলাম তোমাকে সব বলব। পুলিশ দেখলে অবশ্য ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় থাকি কি করে জানলে?

সে টেনে টেনে যেন ভাববার সময় নিচ্ছে, 'আমি—আমি টেলিফোন গাইড থেকে জেনেছি। আমি—আমি একবার সাইকেলে যাবার সময় তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম। তাই জানতাম তুমি কোথায় থাক।

সে সত্যি বলছে না দেখে অস্বস্তি বোধ করলাম।

এখানে আসতে তোমাকে দেড় মাইল পথ পার হতে হয়েছে। আসার সময় তুমি রাস্তায় আর কোন গাড়ি দেখেছ?

মনে হচ্ছে না।

তোমার মনে পড়া উচিত। যতই হোক এটা একটা বড় রাস্তা। তখন সাড়ে দশটা, নিশ্চয়ই অনেক গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল?

আমার চোখে পড়েনি।

আমার মনে হয় অন্ততঃ একটা গাড়ির পাশ দিয়ে এসেছিলে, লুসিলি।

গলা সপ্তমে সে বলল, যদি তাই হয় তাতে কি এসে যায়?

তুমি গাড়ির একটা আলো নিয়েই চালাচ্ছিলে যে কোন গাড়ির চালক তোমাকে দেখে ভেবে থাকবে যে তুমি মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলে, কাছে এসে দেখে যে মোটর গাড়ি চালাচ্ছ। সে. সেটা মনে রাখবে, তবে সে পুলিশকে জানাতে পারবে তুমি কোনদিকে গাড়ি চালাচ্ছিলে। তুমি শহর থেকে যাচ্ছিলে না। তোমাকে যদি দেখে থাকে তবে পুলিশ বুঝতে পারবে গাড়িটা কোথায় খুঁজতে হবে। তারা বুঝতে পারবে সারা শহর খোঁজার বদলে প্রথমে খোঁজ দরকার সমুদ্রের আশেপাশে মানে এখানে।

আমি এসব ভেবে দেখিনি।

এই জন্যেই আমি এসব জানতে চাইছি। ভয়ানক জরুরী, তুমি কি একটু মন দিয়ে শুনবে? তুমি একটু মনে করার চেষ্টা কর ফিরে আসার সময় কোন গাড়ি দেখেছিলে।

সে অসহায় ভাবে, মনে করতে পারছি না। তখন শুধু ভাবছিলাম কি করে তোমার বাড়ি পৌঁছাব।

ভাবলাম অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে। বড় রাস্তায় অনেক গাড়িই সে দেখেছে। সে যে একটা হেডল্যাম্প নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল তা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে। লোকটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে আর পুলিশ এই অঞ্চলে গাড়ির খোঁজ করবে।

ঠিক আছে, অনেক হয়েছে, তুমি বরং বাড়ি যাও। এ ব্যাপারে তোমার আর কিছুই করার নেই। বরং ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

কিন্তু তুমি কি করতে চাও, চেস?

এখনই ঠিক বলতে পারছি না। যদি ঘটনাটা খারাপের দিকে যায় তোমাকে জানাব। আপাততঃ এইটুকুই বলতে পারি।

তার মুখ গম্ভীর, তোমার গাড়িটা নিয়ে কি করবে?

এ সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

আর যে লোকটা ফোন করেছিল?

আবার সে ফোনের অপেক্ষা করতে হবে। যদি তোমাকে ফোন করে তবে আমাকে জানাবে।

কিন্তু ধর, যদি টাকা চায়?

যদি সে টাকা চায় বলে দিও, আমার সঙ্গে তোমার আগে কথা বলতে হবে।

আমি কি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেব?

না। টাকা চাইলে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আমিই তার সঙ্গে মোকাবিলা করব। মনে

হচ্ছে তুমি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।

না, মোটেই নয়। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম। আমি জানি সে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। আমার কোন টাকা নেই। তুমিই বা কেমন করে জানবে যে কোন্ লোকটা তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায় এবং তুমিও টাকা দিতে পারছ না। ফলে সমস্ত ঘটনাটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটাই বা তোমার কেমন লাগবে?

ভগবানের দোহাই। সে এখনও তোমার কাছে কিছু চায়নি, চাইলে আমাকে জানাবে আমিই ব্যবস্থা করে নেব। এখন বাড়ি যাও। আমাকে ভাবতে দাও।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে এখন আমাকে শুধুই অপেক্ষা করতে হবে?

আজ রাত দশটায় আমাকে ফোন করবে। হয়ত কিছু বলতে পারব।

হঠাৎ লুসিলি দুহাতে আমাকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিল, সে ফিসফিসিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলল, চেস...আমি ভয় পেয়েছি। তুমি আমাকে সামলাবে। সব কিছু কি ঠিক করে দেবে?

তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে যেন ধাতস্থ হলাম। তার ঠোঁটের স্পর্শ আমাকে উত্তেজিত করে তুলল।

তোমার উপর নির্ভর করে রইলাম, চেস। আজ রাতে ফোন করব।

তাই করো।

তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। নিজেকে সংযত করে জানালার বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

।। দুই ।।

এগারোটা বাজতে কুড়ি, একটা ইজিচেয়ারে বসে ভাবছিলাম...

সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে। কোন সন্দেহ নেই যে লুসিলি একজন পুলিশের লোককে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছে। কিন্তু যেভাবে সে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী যা ঘটা সম্ভব মনে হচ্ছে, পারস্পরিক মিল নেই। যে কারণেই হোক লুসিলি আমাকে মিথ্যা বলেছে। কেন সে বারবার বলছে যে ও'ব্রায়ান তাকে উল্টো দিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। সে এতই ভয় পেয়েছে যে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে এবং ফাঁদে পড়া জন্তুর মত রেহাই পাবার চেষ্টা করছে।

বড় রাস্তায় নিশ্চয়ই তাকে কেউ দেখেছে এবং আমার ধারণা পুলিশ এখন গাড়িটার অনুসন্ধানে এই অঞ্চলেই মনোযোগ দিয়েছে।

ক্যাডিলাকের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে মনে পড়তেই আমার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। যদি পুলিশ রক্তের দাগ দেখে তাহলে সত্যিই আমি ফেঁসে যাব।

বাংলোতে তালা লাগিয়ে গ্যারেজে গেলাম এবং একটা বালতি ও কিছু স্পঞ্জ জোগাড় করলাম। টুকিটাকি যন্ত্রপাতি রাখার জায়গায় একটা শক্ত তালা আর কড়া দেখতে পেলাম। তারপর পন্টিয়াকটা নিয়ে সিবোর্নের বাড়ির দিকে ছুটলাম।

দিনের আলোয় দেখলাম ক্যাডিলাকটার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। হেডল্যাম্পটা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে গেছে এবং তার চারপাশের ধাতব অংশটা এমন ভাবে বেঁকেছে যে মিস্ত্রী ছাড়া তাকে মেরামত করা সম্ভব নয়।

গাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখে চমকে উঠলাম রক্তের কোন দাগ নেই। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দু পাশের চাকাই খুঁটিয়ে দেখলাম। ডান পাশের পিছনের চাকাটায় একটু রক্তের দাগ দেখলাম।

পুরো দশ সেকেন্ড সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে চাকার সাদা বেড়টায় রক্তের থকথকে দাগটা দেখতে দেখতে অনেক সন্দেহ এল মনে।

উঠে সামনের হেডল্যাম্পের দিকে এসে বুঝলাম ব্যাপারটা অন্যরকম। লোকটা হঠাৎ লুসিলির পিছনে আসে এবং সে চমকে উঠে ও গাড়ির পিছনে তাকে ধাক্কা লাগে—লুসিলির এই কাহিনী সম্ভবতঃ সত্যি নয়। এটা আগে কেন বুঝিনি যে হেডল্যাম্পটা সে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে

হলে ধাক্কাটা সামনের দিকে লাগাই স্বাভাবিক এবং এর অর্থ হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট যখন ঘটে তখন পুলিশের লোকটি তাকে ওভারটেক করছিল না। সে নিশ্চয়ই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছিল। এর মানে আমি তার আরও একটি মিথ্যা ধরে ফেললাম এবং এটা অনেক গুরুতর মিথ্যা। সে বলেছিল যে সে পুলিশের লোক দেখেনি, তাকে চীৎকার করতে শুনেছিল এবং সে চমকে গাড়ি বেকায়দায় চালিয়ে দেয় তাতেই অ্যাকসিডেন্ট ঘটে। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট সে ভাবে ঘটেনি। গাড়িটা যখন নিচের দিকে নেমে আসছিল তখন লুসিলি নিশ্চয়ই লোকটার গাড়ির আলো দেখতে পেয়েছিল। লুসিলি স্বীকার করেছিল যে সে জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তা ছিল সংকীর্ণ। লুসিলি গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং লোকটা রাস্তা পেরিয়ে যাবার আগেই লুসিলি তাকে সোজাসুজি ধাক্কা দেয়। লোকটা তার পাশে এসে পড়ে এবং লুসিলিকে চমকে দেয়—এই কথাগুলো লুসিলির তৈরী করা। আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে, তার দোষ নয়।

গাড়িটা পরীক্ষা করার পর কোন জুরি তার কথা বিশ্বাস করবে না। মনে পড়ল, তার দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার প্রতিশ্রুতির কথা। যদি স্বীকার করতাম যে অ্যাকসিডেন্টের সময় আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তাহলে যে কোন জুরিই বলত যে আমি মাতাল অবস্থায় এরকম অ্যাকসিডেন্ট করেছি। রাস্তাটা একদম সোজা চলে গেছে। এগিয়ে আসা আলোটা না দেখার কথা নয়। আমার গলাটা শুকিয়ে এল যখন বুঝলাম এরকম একটা ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। তারপর, গাড়ির ডান দিকের পিছনের চাকায় রক্তের দাগ। কিন্তু কি করে এ দাগ সেখানে হতে পারে? লুসিলি মোটর সাইকেলটাকে সামনের দিকে আঘাত করেছিল। পিছনের চাকাসুদ্ধ গাড়িটা পুলিশের লোকটার উপর দিয়ে সম্পূর্ণ চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

টায়ারের গায়ে বিশ্রী চটচটে লাল দাগটা আবার পরীক্ষা করে দেখলাম সত্যিই রক্ত।

ঠিক করলাম রক্তের দাগটা রেখে দেব। কেসটা যদি কোন চতুর আইনজ্ঞের হাতে পড়ে তাহলে দাগ কেন নষ্ট করা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে। প্রমাণটা নষ্ট করলে নিজের বিপদ ডেকে আনব।

গ্যারেজের দরজাটা লক্ষ্য করলাম। যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম তা দিয়ে তালাটা সোজা করলাম।

দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করলাম। তারপর আলতারাপটা স্ক্রু দিয়ে আটকে তালাটা লাগালাম। এবার নিশ্চিত হলাম পুলিশ তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে না। তারা প্রথমে সিবোর্নের খোঁজ করবে, চাবিটা চাইবে। তাতে আমি কিছুটা সময় পাব।

সমুদ্রের ধারে যেখানে আমি ও লুসিলি সাঁতার কেটেছিলাম দিনের আলোয় ভালভাবে পরীক্ষার জন্য সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। পন্টিয়াকটার কাছে এলাম।

তখন বারটার কিছু বেশি। রাস্তায় সপ্তাহের শেষের ভ্রমণকারীদের মোটর গাড়ির ভিড়। সমুদ্রের ধারে যাবার নোংরা রাস্তাটায় আসতেই কুড়ি মিনিট সময় লাগলো।

দুই পাশের বালির গাদার সংকীর্ণ ঢালু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সতর্কভাবে দেখছিলাম।

তখন, আবার মনে হল, অদ্ভুত কাণ্ড, ও'ব্রায়ান কেমন করে এই রাস্তায় আসতে পারে। রাস্তার দুপাশে কোথাও কোন বড় গাছ কিংবা ঝোপ নেই, যার পিছনে সে লুকিয়ে থাকতে পারে।

ডানদিকে একটা বালির ঢিবি দেখতে পেলাম। মাটির বেশ খানিকটা অংশ থেঁতলিয়ে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। এটাই কি তবে দুর্ঘটনার স্থান। গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে প্রায় দু মাইল পর্যন্ত সমুদ্র ও সমুদ্রতট দেখা যায়। ছোটখাট কয়েকটা বালির ঢিবি ছাড়া সব সমতল। দূরে পামগাছের যে সারি যার নীচে আমি ও লুসিলি বসেছিলাম। এ ছাড়া কোথায়ও কোন আড়াল ছিল না।

চারপাশের পরিবেশে আর কোন কিছুই দেখতে পেলাম না, পন্টিয়াকে ফিরে এলাম। সমুদ্রতটের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেখানে গতকাল গাড়ি থমিয়েছিলাম তার কুড়ি গজের মধ্যে এসে থামালাম।

প্রথমে দেখলাম বালির উপর ক্যাডিলাকের টায়ারের ছাপ, ভয় পেলাম। আরও দেখলাম পামগাছগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া আমার ও লুসিলির পায়ের ছাপ। এই জিনিসটা আগে আমার

মাথায় আসেনি। যদি পুলিশ এখানে এসে থাকে, অথবা যদি আমাদের পায়ের ছাপ দেখে ফেলে।

যে লোকটা আমাদের ফোন করেছিল এবং সমুদ্রের ধারে আমাদের লক্ষ্য করেছিল তার পায়ের ছাপও নিশ্চয়ই থাকবে।

প্রায় তিনশ গজ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম না।

এ থেকে দুটো জিনিস পরিস্কার হল ঃ পুলিশ এখানে আসেনি সুতরাং ক্যাডিলাকের টায়ারের ছাপ তারা দেখেনি। আর যে লোকটা ফোন করেছিল সেও ঘটনাস্থলে ছিল না। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও ধোঁয়াটে মনে হল। যদি লোকটা সেখানে এসে থাকে। তবে আমাকে ও লুসিলিকে একসঙ্গে সাঁতার কাটতে ও তারপরে ঝগড়া করতে কি করে দেখল? সে নিশ্চয়ই কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী বাইনাকুলারের সাহায্যে দেখেছিল। সেই জন্যেই লুসিলি তাকে দেখতে পায়নি।

বালির ওপরের টায়ারের দাগ মুছতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তারপর পামগাছগুলোর কাছে এসে সাবধানে গতরাতের পায়ের ছাপগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে আবার রাস্তা ধরে ফিরে গেলাম যাতে আমার ও লুসিলির পায়ের ছাপগুলো মুছে যায়। এইভাবে আরও একবার রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম।

কাজ শেষ করে মনে একটা নিরাপত্তার ভাব এল যে পুলিশ যদি সমুদ্রের ধার পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে আসে তাহলে আর পায়ের ছাপগুলো দেখতে পাবে না।

অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে পন্টিয়াকে ফিরে এলাম। গাড়ির দরজা খুলছিলাম তখন একটা গাড়ির এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম এবং চারপাশে তাকিয়ে, একটা লাল হলুদ রং এর গাড়িকে রাস্তার মোড় ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

ধক্ করে উঠল হৃদপিণ্ডটা ভাবলাম যে গাড়িটা যদি আর তিন মিনিট আগে আসত তবে আমাকে ছাপগুলো মুছতে দেখতে পেত।

শ'খানেক গজ দূর থেকে দেখলাম গাড়িটার চালক একজন মহিলা। দশ গজ মত দূরে গাড়িটা থামল। আমার দিকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এল।

তার পরনে লাল পোশাক, মাথায় ছোট সাদা টুপি এবং হাতে সাদা নেটের দস্তানা। বেশ দোহারা চেহারা, গায়ের রং কালো ঃ মুখটা ফ্লোরিডায় সমুদ্রের ধারে সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েদের মত, যারা দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের প্রয়োজন মত নিজেদের ভোগ্যপণ্যের মত দেখিয়ে বেড়ায়।

সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তার নাইলন ঢাকা সুন্দর পা দুটো দেখা গেল, ভারী নিতম্বের উপরের পোশাকটায় হাত বুলিয়ে সে তার কালো কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চাইল।

এই জায়গাতেই কি পুলিশের লোকটি মারা পড়েছিল?

আশ্চর্য হচ্ছিলাম মেয়েটি কে। আর এখানে কি করতে এসেছে। বললাম। মনে হয় আরও উপরের দিকের রাস্তায় ঘটেছিল। বরং বলব আপনি আসল জায়গাটা ফেলে এসেছেন।

ও কাছে এসে বলল। আপনার মনে হয়। আরও পিছনে ওপর দিকের রাস্তায়?

কাগজে বলেছে, সে রাস্তার উপরে মারা গিয়েছিল।

সে একটা সিগারেট বার করে তার লাল ঠোঁটে চেপে আমার দিকে তাকাল।

আমার লাইটারটা বার করে ধরালাম সে যখন সিগারেটের প্রান্তটা ধরাতে এগিয়ে এল তখন তার চুলের গন্ধ পেলাম।

ধন্যবাদ।

সে আমার দিকে সোজা তাকাতে আমি তার কড়া মেকআপ করা মুখ আর মুখের উপর সরু গোঁফের রেখা দেখতে পেলাম যা ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েদের বৈশিষ্ট্য।

আপনি কি সংবাদপত্রের লোক? সে বলল।

সংবাদপত্রের লোক? না তো। আমি এখানে এমনি এসেছিলাম। সাঁতার কাটতে।

সে মাথা ঘুরিয়ে বালির জায়গাটার দিকে চাইল। লুসিলি ও আমার পায়ের ছাপ মুছে ফেলার সময় গর্তের মত যে ছাপ পড়েছিল সেদিকে চাইল।

আপনি কি এই ছাপগুলো করেছেন?

বালির উপরের ছাপগুলোর কথা বলছেন? যখন এখানে আসি তখনও দাগগুলো ওখানে ছিল।

দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন পায়ের ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে।

আপনার তাই মনে হচ্ছে? বাতাসেও হতে পারে। বাতাসেও বালির উপর অদ্ভুত দাগ হয়।

হয় নাকি? উপরের রাস্তায় এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা জায়গায় দেখলাম, মাটিটা যেন থেঁতলিয়ে গেছে। ওখানেই কি লোকটা মারা গিয়েছিল?

হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তা নয়। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত।

মনে পড়ল কোন একটা কাগজে দেখেছিলাম যে ও'ব্রায়ান একজন নাইট ক্লাবের গায়িকাকে বিয়ে করছে।

হ্যাঁ। আজ সকালেই কাগজে দেখলাম যে আপনি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন।

সে হাসল। হাসিটা ঠাণ্ডা, তিক্ত হাসি। পড়েছেন? মনে হয় না কাগজে পড়ার আগে আপনি কোনদিন আমার নাম শুনেছিলেন। দশ বছর ধরে আমি এই কাজ করছি। এটা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয় যে, প্রথম নাম প্রচারের সুযোগ পেলাম তখনই, যখন যে লোক আমাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল। সে নিজেকে মেরে ফেলল, কারণ সে এতই বোকা ছিল যে এর চেয়ে ভাল কিছু করতে সে জানত না।

সে হঠাৎ পিছন ফিরে ওল্ডস মোবাইল গাড়ির দিকে ফিরে গেল। আমি সেখানেই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে গাড়িতে বসে উল্টো দিকে গাড়ি চালাল। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে বালি ও ধুলোর ঝড়ের মধ্যে জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

দুপুরের খাবারটা স্যান্ডউইচ দিয়ে সেরে বাংলোর দিকে ছুটলাম। লাঞ্চের সময় অনেক কিছুই ভাবছিলাম। দুর্ঘটনাটা যে একটা গোলমেলে ব্যাপার এই বিশ্বাস মনে ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল। আমি নিশ্চিত যে লুসিলি দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটিয়েছিল সেটা আমাকে মিথ্যা বলেছে। ঘটনাস্থল দেখার পর ব্যাপারটা আরও জটিল মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, লুসিলি ও'ব্রায়ানকে তার দিকে আসতে দেখে গাড়ির গতি কমাতে না পেরে সে সোজা তার দিকে গাড়ি চালিয়েছিল। এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে কোন জুরির কাছেই কোন রকম করুণা পাবার আশা করতে পারে না। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে কেন তার এত আগ্রহ অবাক লাগছিল আমার।

বর্তমান সমস্যা হচ্ছে। ক্যাডিলাকটা নিয়ে আমি কি করব। পুলিশ যদি সেরকম খুঁটিয়ে সার্চ করতে থাকে, তবে সিবোর্নের গ্যারেজে তারা গাড়িটাকে দেখতে পাবে।

পুলিশের বড়কর্তা ঘোষণা করেছেন যে, দুর্ঘটনার পর যদি কারও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে থানায় রিপোর্ট করতে হবে এবং কিভাবে গাড়ির ক্ষতি হয়েছে তা জানাতে হবে।

ভাবছিলাম। এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে আসা যায় কিনা। গ্যারেজের দরজায় যদি গাড়িটাকে চালিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা দিই এবং তারপর পুলিশকে ফোন করে জানাই যে, গাড়িটা এরকম ভাবে ড্যামেজ হয়েছে। তবে তারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? কিন্তু গাড়ির পাশে গভীর ক্ষতের দাগদুটোর সঙ্গে তো এর কোন সঙ্গতি নেই। এবং এই দাগ দুটো পুলিশের মনে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে।

যাই হোক মোটামুটি আমি এই নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। সদর দরজার তালা খুলতে খুলতে তখন এটা নিয়ে ভাবছিলাম, সেই সময় টেলিফোন বাজতে শুনে লাউঞ্জে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

মিঃ স্কট?

ওয়াটকিনসের গলার স্বর চিনতে পারলাম। আশ্চর্য, কি কারণে সে ফোন করতে পারে।

হ্যাঁ কথা বলছি।

মিঃ আইকেন আপনাকে ফোন করতে বলেছেন, স্যার। তিনি বললেন যে সম্ভবতঃ এখনও আপনি বাড়িতেই আছেন। যদি আপনি সময় করতে পারেন, তবে একবার এখানে এলে মিঃ আইকেন খুব খুশি হবেন।

কিন্তু এখন আমার গলফ ক্লাবে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। আমাকে ফোনে পাওনি একথা কি তাকে বলতে পার না?

বলতে পারি স্যার। কিন্তু মিঃ আইকেনের কথার ধরনে মনে হল, ব্যাপারটা খুব জরুরী। যাই হোক, যদি মনে করেন...

না, ঠিক আছে। আমি আসছি। তিনি এখনই দেখা করতে চান?

তিনি আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন স্যার।

ঠিক আছে। এখনই বেরিয়ে পড়ছি, বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

আয়নায় তাকিয়ে দেখলাম আমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, দু চোখে সন্ত্রস্ত ভাব।

লুসিলি কি নার্ভাস হয়ে তাঁকে সব বলে দিয়েছে? সে কি নিজের কথা আগে বলেছে? কোন গণ্ডগোল না হলে এমন হঠাৎ জরুরী তলব করবেন কেন?

গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল, কোন বৃদ্ধ মহিলা বিছানার নিচে শব্দ শুনলে যে রকম আতঙ্কগ্রস্ত হন, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম।

আইকেনের বাড়ির সামনের অলিন্দে দাঁড় করানো ধূসর রঙের বুইক কনভারটিবল গাড়িটার পাশে আমার গাড়িটা রেখে উপরে উঠতে লাগলাম।

উপরের ধাপটায় উঠেই সামনে চাইতে আইকেনকে পাজামা ও ড্রেসিংগাউন পরে একটা লাউঞ্জের চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখলাম, একটা কম্বলে পা দুটো ঢাকা। তার পাশে চওড়া কাঁধের একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন আমার দিকে পিছন ফিরে।

আমার বুকটা কাঁপছিল এবং স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে আসছিল। তাঁর মুখে কোমল স্মিত হাসি দেখা দিল আমাকে স্বাগত জানাতে। আমি একটু নিশ্চিত হলাম। আমার ওপর চটে থাকলে, তার এমন হাসিমুখ থাকত না।

এই যে স্কট, তুমি কি গলফ খেলতে গিয়েছিলে?

অন্য লোকটি ফিরে চাইল তখনই চিনলাম, টম হ্যাকেট সেই লোকটা, যে দুর্ঘটনার রাতে লুসিলি ও আমাকে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল, সিবোর্নের অনুরাগী টম হ্যাকেট।

সে দরাজ হাসিতে হাতটা বাড়িয়ে দিল, হ্যালো আবার তবে দেখা হল। আর. এ. বলছিলেন, আপনি নাকি নিউইয়র্ক অফিসের হেড হয়ে যাচ্ছেন?

আইকেন বিরক্ত হয়ে বললেন। বস, বস, তুমি কি গলফ খেলতে যাচ্ছিলে?

ওয়াটকিনস যখন ডাকল তখন প্রায় যাবার মুখে, বলতে বলতে হ্যাকেটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

অত্যন্ত দুঃখিত খেলতে যেতে বলেছিলাম, সত্যিই তাই চেয়েছিলাম কিন্তু হ্যাকেট এসে পড়ায় মনে হল তার সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া উচিত।

হ্যাকেটের দিকে চাইলাম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না তবে মনে হয় গোলমেলে কিছু নয়।

হ্যাকেটের দিকে চেয়ে আইকেন হেসে বললেন। এই ছোকরা খুব পরিশ্রম করে। আমি সপ্তাহের শেষে ওকে ছুটি নিতে বলেছিলাম। গলফ খেলতে ও সুন্দরী মেয়ে খুঁজে নিতে বলেছিলাম। তুমি এভাবে হাজির হয়ে সব পণ্ড করে দিলে।

হ্যাকেট হেসে, তা মনে করবেন না। সে হয়ত গলফ খেলার সুযোগ পায়নি কিন্তু অন্য জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হয় নি। কি, তাই না?

আমি কোনরকমে হাসি বজায় রাখলাম।

আইকেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। আচ্ছা? ওর সম্বন্ধে তুমি কি করে জানলে?

ঠিক আছে। ছোকরার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, তাই না? ব্যাপারটা হচ্ছে স্কট, আমি নিউইয়র্কের ব্যবসায় কিছু টাকা খাটাতে চাই। যখন আর. এ. বললেন যে, ওখানকার অফিস তুমিই চালাবে। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছা হল। এই জন্যেই আর কি, তাই না আর. এ.?

আইকেনের মুখটা ভার হয়ে উঠলে তিনি যথেষ্ট নরম সুরে বললেন। হ্যাঁ তাই। যাই হোক ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। হ্যাকেট প্রায় হাজার দশেক ডলার ব্যবসায় খাটাতে চায়। সে চাইছে যে, তুমি তার টাকা পয়সার ব্যাপারে দেখাশুনা করবে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

হ্যাকেট আমাকে বললেন, তুমিই উপযুক্ত লোক। কিন্তু দু একটা ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই মনে কিছু করবে না?

না, না। আনন্দের সঙ্গেই বলব।

এগুলো তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রশ্ন নয়। অফিসের বাইরে কে কি করে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। যতক্ষণ না সে কোন গণ্ডগোল বা কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়ছে।

একটা সিগারেট বার করে তা ধরাবার সময়ে নিজেকে আড়াল করলাম।

আশা করি, তুমি কোন কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত নও।

আইকেন অধৈর্য হয়ে বলল, স্কটের এ ধরনের কোন ব্যাপার নেই। তুমি নিশ্চয় মনে কর না যে, স্ক্যান্ডালের সঙ্গে জড়িত কোন লোককে আমি চাকরি দিই, নয় কি?

আমি নিশ্চিত যে তুমি তা কর না—হ্যাকেট সামনে ঝুঁকে আমার হাঁটুতে একটা টোকা মারল। আমি ছেলেমানুষি করতে ভালবাসি। তুমি এর কোন গুরুত্ব দিও না। এখন, আমাকে তোমার পড়াশুনার বিষয়ে কিছু বলবে কি?

আমি নিশ্চিত জানি যে সে কোন কিছু জানে বা সন্দেহ করে। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিল। সে যে লুসিলি, তা কি সে আন্দাজ করতে পেরেছিল?

শিক্ষাগত যোগ্যতা বললাম। পরে আমার কর্মজীবন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। নিউইয়র্কের অফিস কিভাবে চালাব ভেবেছি, কতজন কর্মচারীর প্রয়োজন হবে, অফিস কোথায় হবে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করল। সব শুনে তাকে সন্তুষ্ট মনে হল।

তুমি পারবে। তুমি ঠিক রোজারের ধাঁচের লোক এবং আমার পক্ষে আশাতীত। তাছাড়া বিশ হাজার ডলার ব্যবসায়ে লাগাবে।

আইকেন মাথা নাড়লেন।

মাইনে ছাড়া মোট আয়ের শতকরা পাঁচভাগ পাবে?

হ্যাঁ।

হ্যাকেট কিছুক্ষণ ভেবে, ঠিক আছে। শর্ত খুবই ভাল, স্কট আশা করি তুমি ভাল মুনাফা করবে। কখন টাকাটা দিচ্ছ?

পরের বৃহস্পতিবার।

ঠিক আছে, রোজার। আমার চেকও ঐ সময়ে পাবে। ঠিক আছে?

আমার পক্ষেও ভাল হয়। আমি ও ওয়েস্টারকে দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখব। তুমি ওকে চেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, ভাল লোক। হ্যাকেট উঠে দাঁড়াল। ঠিক আছে, আমরাও স্কটকে গলফের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। আমার স্থির বিশ্বাস তুমি চাকরিতে উন্নতি করবে। তোমার উন্নতি কামনা করি। হাত বাড়িয়ে দিল।

ধন্যবাদ। তার সঙ্গে করমর্দন করে আইকেনের দিকে চাইলাম, যদি তাই হয়...

আইকেনকে নিচে রাস্তার দিকে চাইতে দেখে চুপ করে গেলাম।

আইকেন বললেন, এ আবার কি ঝামেলা?

আমিও সে দিকে চাইলাম।

একটা নীল রঙের গাড়ি, মাথায় যার লাল সংকেত আলো এবং সাইরেন বসানো দ্রুত বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি শক্ত হলাম।

গাড়িতে চারজন পুলিশের লোক বসেছিল।

।। দুই ।।

ধূসর রঙের দোমড়ান মোচড়ান পোশাক এবং হাল্কা টুপি পরা এক দীর্ঘকায় লোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার মাংসল মুখ কঠিন এবং রোদে পোড়া। তার চ্যাপ্টা নাকের দুপাশে জড়ুলের চিহ্ন। দেখেই মনে হচ্ছে এ ভীষণ কড়া মেজাজের সন্দিগ্ধ প্রকৃতির পুলিশের লোক।

আমি ও হ্যাকেট যখন রেলিং-এ ঝুঁকে দেখছিলাম সে উপরে চেয়ে আমাদের দেখল। এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল।

উর্দি পরা দুজন পুলিশ গাড়িটার দু-পাশে এসে দাঁড়াল এবং ড্রাইভার গাড়ীর ভেতরেই রইল।

সাদা পোশাকের লোকটিকে আমাদের কাছে আসতে দেখে ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। সব দাগী আসামীই যে ভাবে পুলিশের দিকে চায়। আমিও ভাবছিলাম সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।

আইকেনের সামনে এসে বলল, শহরের পুলিশ বাহিনীর ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট বলছি। ক্যাপ্টেনের অভিবাদন নেবেন। আপনার সহযোগিতা কামনা করি।

কি ব্যাপার? ক্যাপ্টেন কি চান?—একেবারে হতভম্ব হয়ে বললেন।

ঐ যে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা সম্ভবত আপনি সকালের কাগজে পড়েছেন। ক্যাপ্টেন শহরের প্রতিটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে চান সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা। মিঃ আমরা শুধু একবার দেখে নিতে চাই।

আইকেনের মুখ গম্ভীর। গাড়ি দেখতে চান? এটা কি ভাবতে পারছেন না যে আমার সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই?

হ্যাকেট রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখে কৌতূহল প্রকাশ পাচ্ছিল।

ওয়েস্ট মাথার পিছনদিকে টুপিটা আরও ঠেলে দিল। তার কপালটা ঘামে চকচক করছিল।

না, স্যার আমরা সে সব ভাবিনি। তবে আমরা শহরের প্রতিটি গাড়িই, চেক করে দেখছি। আপনার ড্রাইভার আছে। এমনও হতে পারে যে সে গতরাত্রে আপনার কোন গাড়ি ব্যবহার করেছিল। নিশ্চিত বলছি না, তবে একবার দেখে নিলেই হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন অবশ্য বলেছেন যে আপনি আপত্তি করলে যেন আপনাকে বিরক্ত না করা হয়।

আইকেন রেগে বললেন, আমার ড্রাইভার গতরাত্রে কোন গাড়ি ব্যবহার করেনি।

ঠিক আছে স্যার, ক্যাপ্টেন জোর করতে বারণ করেছেন। তবে ড্রাইভার না করলে অন্য কেউ ব্যবহার করে থাকতে পারে।

আমার পা ভাঙ্গার পর আমার একটা গাড়িও বাইরে যায় নি। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন।

আমার এই কাজ। যদি আপনার গাড়ি দেখাতে আপত্তি করেন, ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি এবং ক্যাপ্টেনকে একথাই বলব।

আইকেন যেন ফেটে পড়লেন এবং হ্যাকেটের দিকে চেয়ে, কথা শোন আমাদের টাকার যে কিভাবে অপব্যবহার হয় এটি তারই উদাহরণ। চারটে গাড়ি পরীক্ষা করতে চারজন লোক। আমি সুলিভানকে লিখে সব জানাব। একটা বোকা লোক গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে, তার জন্য এত হট্টগোল।

হ্যাকেট বিনীতভাবে বলল, ড্রাইভার থামেনি। এই অফিসারকে তুমি দোষ দিতে পার না। রোজার উনি ওর ডিউটি করছেন।

ঠিক আছে, যান, আমার গাড়ি পরীক্ষা করুন। আমি মিথ্যা বলি না। আমাদের কর বাবদ দেওয়া টাকার এইভাবে অপব্যবহার করুন। যান! এখুনি এখান থেকে চলে যান।

ওয়েস্ট বলল, ধন্যবাদ। আপনার গ্যারেজ কোথায় দয়া করে বলবেন?

আইকেন আমার দিকে চেয়ে, গ্যারেজটা কোথায় জান?

জানি।

তাহলে এই ভদ্রলোককে নিয়েগিয়ে দেখিয়ে আনতে পারবে? ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। দেখবে

ওর লোকেদের অন্য কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে। কেবল লক্ষ্য রাখবে যে আমার ড্রাইভারকে বিপদে ফেলার মত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ সেখানে নেই।

আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে এলাম যেখানে উর্দিপরা লোকগুলো ছিল। ওয়েস্ট তাদের দিকে মাথা নাড়ল। যখন তাদের চোখের আড়ালে এলাম ওয়েস্ট শান্ত গলায় বলল, আপনি কি এই লোকটার কাছে কাজ করেন?

হ্যাঁ।

আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা। আমার ধারণা ছিল আমাদের ক্যাপ্টেন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লোক। এখন দেখছি এই আইকেনের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না।

আমরা পন্টিয়াক ও বুইকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওয়েস্ট থেমে গাড়ি দুটোর দিকে চাইল।

এ দুটো কার জানতে পারি?

সিবোর্নের গাড়ি লাইসেন্সের টিকিটটা সরিয়ে সেখানে আমার টিকিটটা আগেই আটকে রেখেছিলাম কিন্তু জানতাম ইচ্ছে করলে সে লাইসেন্সের টিকিটের সঙ্গে গাড়ির নাম্বার মিলিয়ে দেখতে পারে তাহলেই সর্বনাশ। গাড়িটা ধার করা তাও বলতে ইতস্ততঃ করলাম।

পন্টিয়াকটা আমার। বুইকটা মিঃ হ্যাকেটের যাকে উপরে দেখলেন।

ওয়েস্ট গাড়ি দুটোর চারপাশে পাক দিয়ে আচ্ছা গাড়ি দুটোর নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল নেই তাই না? আপনি বললেন না যে পন্টিয়াকটা আপনার?

হ্যাঁ।

আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে পারি। আমাদের লোকেরা তাহলে আপনার কাছে যাবে না। আপনার নাম কি?

বললাম।

ছাপা ফর্মের একটা প্যাড সে হাতের উপর তুলে নিল এবং লিখতে শুরু করল।

ঠিকানা?

বললাম।

সে গাড়িটার দিকে চেয়ে আরও কিছু লিখল। পরে কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ল।

ক্যাপ্টেন এইভাবে সার্টিফিকেট দিতে চান। মনে হতে পারে যেন উকুন বাছা হচ্ছে। এই সার্টিফিকেটের বলে আপনার গাড়ি আজ থেকে বিপদমুক্ত। যদি ফেণ্ডার বেঁকে যায় বা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের কাছে আর রিপোর্ট করার দরকার হবে না। কেউ কিছু বললে সার্টিফিকেটটা দেখাবেন। ঝামেলা কিছু নেই, এই ভাবে আমরা শহরের সব গাড়িই পরীক্ষা করে দেখছি। সার্টিফিকেটটা নিয়ে নিলাম।

হারাবেন না। অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন।

না হারাব না। সার্টিফিকেটটা যত্ন করে পকেটে রাখলাম যেন দশলক্ষ ডলারের বিল রাখছি।

ওয়েস্ট বলল, ক্যাপ্টেনের আইডিয়া খুব সুন্দর। এই জন্যেই তিনি ক্যাপ্টেন। অবশ্য কোন কাজ করেন না। আমি বলতে চাইছি যে আমি ক্যাপ্টেন হলে এরকমটা করতাম না। এখন পুলিশের সবলোকই সেই হত্যাকারীর খোঁজে ঘুরছে। প্রত্যেকটি পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্যারেজ দেখছে। রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করছে। আমাদের ক্যাপ্টেন কেমন জানেন? পত্রিকায় যে সব পুলিশের খবর বার হয় তিনি তাদেরই মত একজন। তিনি আত্মপ্রচার চান। প্রেসের কাছে যে টুকরো খবরটা আজ সকালে তিনি দিয়েছিলেন, পড়েছেন? ও'ব্রায়ানের ব্যাপারে। আপনার কাছেই বলছি, ও'ব্রায়ান ছিল পুলিশ বাহিনীর সবচেয়ে খারাপ লোক, ভীষণ কুঁড়ে সবসময় এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে ঘুষ নিত এবং একটু আধটু ব্ল্যাকমেলও করত। পুরোপুরি বদমাশ ছিল, ক্যাপটেন তা জানত। গত সপ্তাহে ও'ব্রায়ান বলল এইবার সে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে নিস্তার পাবে। উল্টে লোকটা নিজেই গাড়ি চাপা পড়ল। জানেন, এ কয়দিনে কতটুকু ঘুমিয়েছি? এক ঘণ্টা দশ মিনিট, তাও আবার গাড়িতে বসে বসে। আজ একটু ঘুমোবার সময় পেলে ভাগ্যবান মনে করব।

শুনতে শুনতে ভাবছিলাম কোন পুলিশ অফিসারকে এভাবে কথা বলতে শুনিনি। কিছুটা হতভম্ব হয়েছিলাম।

ওয়েস্ট তার সাদা দাঁত বার করে ঠোট চেপে ধরল।

খুব সিরিয়াসলি কথাগুলো ধরবেন না মিঃ স্কট। মাঝে মাঝে আমি এভাবে কথা বলি। এতে বেশ ভালোই লাগে। যদিও জানি ও'ব্রায়ান ভাল লোক ছিল না তবুও যে লোকটা হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার করা আমার খুব ইচ্ছা। হয়ত কিছুটা সময় নেবে তবে আমরা তাকে খুঁজে বার করবই-সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে জুতোসুদ্ধু পা দিয়ে চাপা দিয়ে বলল। এবার চলুন, আপনার বসের গাড়ি দেখা যাক। এই নয় যে গাড়িগুলো নিয়ে কিছু করার আছে। তবে আমাকে একটা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হবে। কোথায় গাড়িগুলো আছে?

সুইমিং পুলের ধারে, কাছেই।

সুইমিং পুল, অ্যাঁ? দারুণ বড়লোক। আপনি বড়লোকের কাজ করতে ভালবাসেন, মিঃ স্কট?

চাকরি যেমন নিতেও পারি তেমনি আবার ছাড়তেও পারি।

হ্যাঁ, সেইটাই একমাত্র উত্তর। লোকটা নরাধমও হতে পারে। কমিশনারেরও চোখে একই রকম দৃষ্টি দেখেছি। টাকার জন্য লোকে নিজেকে ক্ষমতাশালী মনে করে। আমি এধরনের ক্ষমতাশালী লোকেদের পছন্দ করি না। টাকা পয়সাওয়ালা মানুষেরা যে পথে চলে, যখন চলে সবসময়ই নিজেদের ভার, অন্যদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে।

মোড়টার বাঁক নিতেই চার গাড়ির গ্যারেজ ও সুইমিং পুলটার কাছে এসে পড়লাম।

লুসিলি সুইমিং পুলের ড্রাইভ বোর্ডে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দিকে পাশ ফিরে থাকতে আমাদের দেখতে পায়নি। একটা সাদা বিকিনি পরেছিল যেটা লোককে দেখান যায় না এমন দেহের অংশকে কোনরকমে আড়াল করে রেখেছিল। শরীরের অন্যান্য অংশগুলো সোনালী দেখাচ্ছিল, তার ঘন বাদামী চুল কাঁধে ছড়িয়ে ছিল। এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করেছিল যে আমি ও ওয়েস্ট থমকে দাঁড়ালাম যেন হঠাৎ একটা শক্ত দেয়ালের সামনে এসেছি।

সে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে হাত দুটো উপর দিকে তুলে বোর্ড থেকে লাফ দিল।

মনোরম ভঙ্গীতে ডিগবাজী খেয়ে সে জলে এসে পড়ল। চুলগুলো দুপাশে ভাসিয়ে চিৎ সাঁতার কেটে বাঁধানো সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আচ্ছা ওয়েস্ট বলল।

সে টুপি সরিয়ে রুমালটা নিয়ে কপালের ঘাম মুছল লুসিলিকে উঠে আসতে দেখে। তার সোনালী চুল থেকে জল পড়ছিল এবং সাদা বিকিনিটা গায়ের উপর এমনভাবে চেপে বসে ছিল মনে হচ্ছিল যেন দ্বিতীয় কোন চামড়া।

সে কেবিনে ঢোকা পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম।

ওয়েস্টের শক্ত মুখটা দুর্বোধ্য হাসিতে ভরে উঠল। ওর মেয়ে?

মিসেস আইকেন।

মিসেস আইকেন?

হ্যাঁ।

আপনি বলতে চান ঐ পাকা বুড়োটার বৌ?

হ্যাঁ, মিসেস আইকেন।

সে শিস দিতে দিতে বলল, বয়স কুড়ি বছরের বেশি বলে মনে হয় না।

এটা অবশ্য আমার দোষ নয়।

ঠিক, ঠিক। আপনার দোষ নয়। আচ্ছা লোকটা নিশ্চয়ই টাকার জোরে বিয়ে করেছে, তাই না?

বলতে বলতে সে আমাকে ছেড়ে গ্যারেজের ভিতরে ঢুকল।

রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম।

লুসিলি কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। তার কোমরে লাল রঙের বেল্ট পরনে প্যান্ট ও পায়ে চটি। হাতে ছিল কম্বলে তৈরি বিকিনির অংশ দুটো এবং সে আমাদের দিকেই আসছিল।

সাবধান করে না দিলে ওয়েস্টের সামনে কিছু বেফাঁস বলে ফেললে ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে বুঝতে পেরে তার দিকে ছুটলাম।

চেয়ে দেখলাম ওয়েস্ট গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসছে। ওয়েস্ট গ্যারেজের দরজা বন্ধ করছিল, আমি পা ফেলে তার কাছে এলাম।

এই লোকটা পুলিশ অফিসার, তাড়াতাড়ি বললাম। সে তোমার খোঁজে আসেনি। গাড়ি পরীক্ষা করতে এসেছে। ভয় পাবার কিছু নেই। এভাবে আসা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু সময় ছিল না। যাই হোক এখন হয়তো মূর্চ্ছা যাবে।

চোখ মুখ দেখে, তার বয়স অনেক বেশি দেখাচ্ছিল।

ওয়েস্টের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, আমাদের দিকে আসছে এবং উপস্থিত হল।

সে দাঁড়াল আমার পাশে এসে, এবং লুসিলির দিকে চেয়ে ছিল।

লুসিলিও তার দিকে চাইল যেন একটা খরগোস একটা সাপের দিকে চেয়ে আছে।

ওয়েস্ট বলল, শুভ সন্ধ্যা, মাদাম। আমি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আশা করি পড়েছেন...আর বেশি কথা সে বলতে পারল না।

হঠাৎ লুসিলি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। তবে জোরে জোরে হাঁটছিল।

ফিরে দেখছিল ওয়েস্ট, ছুটে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা দুজনে কথা বলতে পারলাম না।

বেশ মেজাজি, অ্যাঁ, সে বলল, বদ-খেয়ালি, তাই না?

পুলিশ অফিসার ওর কাছে আর এমন কি? স্বাভাবিক ভাবে বললাম, বড়লোকের বৌ তো।

ঠিক রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে সে বলল, এটা ওর অভ্যাস। বুঝতে পারছি না কি হয়েছিল। মুখের রং পালটাতে চলেছেন?

তাই বুঝি?

ওয়েস্ট আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

হ্যাঁ, রং পালটেছিল। যেন পুতুল। এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ঐ বুড়ো আইকেনকে বিয়ে করা মানে জীবনটা নষ্ট করাই মনে হয়।

কর্কশ স্বরে বললাম, তোমার যদি এতই কষ্ট হয় তবে মেয়েটাকে গিয়ে বল না।

আমার চাকরিটাকে পছন্দ করি না বটে তবে হাবাতেও চাই না। ওর কি কোন প্রণয় আছে, আপনি কি মনে করেন?

ওকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

ইচ্ছা হয় তবে মনে হয় না আমাকে বলবে। সে কি কোনদিন আইকেনের গাড়ি ব্যবহার করেছে? কোনটাকে কি কোনদিন ভাঙ্গা চোরা অবস্থায় দেখেছেন?

না, ড্রাইভার ভালভাবেই রাখে। দেখলে সম্ভবতঃ সেই দেখবে।

ও ব্যবহার করে কিনা এটা দেখা অবশ্য আপনার কাজ নয়। কিন্তু তার যদি ড্রাইভার পারমিট না থাকে তবে উত্তর হবে সে নিশ্চয়ই গাড়ি ব্যবহার করে না।

ওয়েস্ট আড়চোখে আমাকে দেখে, ওর কোন ড্রাইভিং পারমিট নেই। এর অর্থ এই নয় যে ও গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে বার হয় না। অনেকেই এ রকমটি করে। কি করে জানলেন যে ও গাড়ি চালাতে জানে না?

মনে হয় ওকেই জিজ্ঞেস করা ভাল। এতে আপনার কিসের দরকার?

দেখুন ভাই, মনে কিছু করবেন না। আমার কাজই হচ্ছে প্রশ্ন করা। আমি পুলিশের লোক। যখন অস্বাভাবিক কিছু ঘটে আমরা ভাবি কেন এমনটি হল। ভাবছি আমাকে দেখে কেন সে বিবর্ণ হল। সুন্দর চেহারার মেয়েকে বাগে আনতে পুলিশের চেয়ে হোমরা চোমরা লোকের দরকার কিন্তু সে সত্যিই কেমন হয়ে গেল। কেন? কি এমন ঘটল? বিবেক যদি দংশন না করে তবে পুলিশের লোক দেখলে মুখ ফ্যাকাশে হতে পারে না।

আমি কি করে জানব?

ঠিক। আপনি কি করে জানবেন?

ওয়েস্ট আইকেন যেখানে ছিলেন সে দিকে চলল। কিছুটা দুরত্ব রেখে আমিও পিছন পিছন চললাম।

চারটি গাড়ির জন্য আইকেনের নামে সে চারটি সার্টিফিকেট দিল।

আইকেন সেগুলো নিয়ে টেবিলে ছুঁড়ে দিল। ওয়েস্ট হ্যাকেটকেও তার গাড়ির জন্য একটা সার্টিফিকেট দিল।

মনে হয় সব ঠিক আছে। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, স্যার। নিস্তব্ধ পদক্ষেপে সে নিচে নামল।

আমার মনে হয় এসব হচ্ছে কর-দাতাদের টাকার যথেচ্ছ অপব্যবহার। যতসব ঝামেলা...আইকেন গর্জন করলেন।

হ্যাকেট ভুরু কুঁচকে বলল।

তুমি কি তাই বল? যে লোকটা পুলিশটাকে মেরেছে ওরা তাকেই খুঁজছে। ওদের কাছে এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তারা জানে হত্যাকারীর গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটা খোঁজার ব্যাপার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটাকে তারা খুঁজে বার করবেই যেটার কোন সার্টিফিকেট নেই। তখন তারা হত্যাকারীকেও বার করতে পারবে। আচ্ছা, আমরা তোমার গলফ খেলায় বাধা দিচ্ছি। আমাকেও যেতে হবে। আইকেনের দিকে চেয়ে। বৌটা ভেবে খুন হবে আমি আবার কোথায় গেলাম। তাহলে আর. এ. আমাদের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট আনন্দের হবে, কি বল? বলেই সে আইকেনের সঙ্গে করমর্দন করল।

আইকেন বললেন, সব কিছুই স্কটের উপর নির্ভর করে।

হ্যাকেট আমার কাঁধ চাপড়ে, ও ঠিকই বলেছে। বেশ। আমি এবার যাই। পায়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে আর. এ.। যত শীঘ্র ভাল হবে ততই মঙ্গল।

হ্যাকেট ও আমি আমাদের গাড়ির দিকে যেতে যেতে হ্যাকেট বলল, আমার হোটেলে আসতে ভুলবে না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাব।

বাঃ খুব সুন্দর। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আর. এ. চান প্রতিরাতেই আমি তার কাছে আসি ফলে সময় পাই না।

হ্যাঁ, আমি তার ব্যবস্থা করব। তবু সময় করার চেষ্টা করবে। পন্টিয়াকের দিকে চেয়ে, দেখছি এখনও তুমি জ্যাকের গাড়িটা ব্যবহার করছ।

হ্যাঁ, তবে বেশিদিন করতে হবে না। শীঘ্রই আমার গাড়ি ফিরে পাব।

গাড়িটার কি হয়েছে বললে?

তেল পড়ে যাচ্ছে।

সে মাথা নেড়ে, গাড়িগুলো বড্ড বিপদে ফেলে। এখানে আসার আগে আমার গাড়ির গ্যাসকেট ভেঙ্গে যায়। প্রত্যেক গাড়িই কিছুদিন পরে পরে গণ্ডগোল করবে।

আমি নিশ্চিত যে একটা অপ্রীতিকর মুহূর্তের সামনে পড়তে হবে।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বলল, আর. এ.-র স্ত্রীকে দেখেছ?

আমি, আমি দেখেছি।

আমিও দেখেছি। প্রায়ই ভাবি আর. এ. কেন তাকে বিয়ে করল। সে আসলে একজন যুবকের উপযুক্ত। আর. এ. তার পক্ষে যথেষ্ট বয়স্ক। যখন এই বয়সের মেয়ে তার চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছরের বড় বুড়োকে বিয়ে করে তার আশেপাশের সমস্ত যুবককে সে বিপথগামী করে। কেন যে তোমাকে কথাগুলো বলছি বুঝতে পারছি না। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে অবশ্য নষ্ট হবে না।

আমার হাত চাপড়াতে চাপড়াতে—সময় পেলেই আমাদের ওখানে যেতে ভুলবে না। আজ এই পর্যন্ত। আশাকরি আবার শীঘ্র দেখা হবে। গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে চলে গেল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম।

বুঝতে পারলাম গতকাল রাতে আমার বাংলোয় লুসিলিকে দেখে সে চিনতে পেরেছিল। তাই উপদেশের ভঙ্গিতে আমার মুখে যেন বিপদের লাল আলো ফেলছিল।

জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে পন্টিয়াকের ভিতরে বসলাম। সামনে ঝুঁকে উইন্ড-স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে সামনে চেয়ে স্টার্টারের বোতাম টিপে জোরে গাড়ি চালিয়ে বাংলোর দিকে ছুটলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

অনেক কিছু চিন্তা করছিলাম বিকেলবেলায়। হ্যাকেটের ইঙ্গিত উদ্বেগের কারণ হলেও বিপদের কারণও হবে। আসল সমস্যা ক্যাডিলাকটার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়াই ভাল। যদি কোনমতে একবার মেরামত করে নিতে পারতাম তাহলে অন্য সমস্যাগুলো সহজ হত।

সন্ধ্যের পরেই মনে হল কাজটা আমি খুব সহজেই করতে পারি। ওয়ালেট থেকে লেফটেন্যান্ট ওয়েস্টের দেওয়া সার্টিফিকেটটা বার করে পরীক্ষা করে দেখলাম। সমস্যার সমাধান সে নিজেই আমাকে করে দিয়েছে।

ফর্মটা পূরণ করতে গিয়ে সে কেবল লাইসেন্স নম্বরটাই লিখেছে। কিন্তু কোন কোম্পানির গাড়ি তা লেখেনি। পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা যদি ক্যাডিলাকে লাগিয়ে মেরামতের জন্য স্থানীয় গ্যারেজে নিয়ে যাবার পথে যদি কেউ বাধা দেয় তবে সার্টিফিকেটটা আমার সমস্যার সমাধান করবে।

সার্টিফিকেটটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না সমাধান এত সহজে হবে। একমাত্র বিপদ ছিল যদি কোন পুলিশের লোক গাড়ি থামিয়ে লাইসেন্স ট্যাগের সঙ্গে নম্বর প্লেটটা মিলিয়ে দেখে। সে ক্ষেত্রে ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ঝুঁকি একটা নিতেই হবে।

নম্বর প্লেটটা সন্ধ্যের আগে পালটাতে যাওয়া বিপজ্জনক। সন্ধ্যে হতে তখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সেই সময়ে ব্যাপারটা লুসিলিকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া ভাল। সে ওয়েস্টের আকস্মিক আবির্ভাবে ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। একটা উপায় যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন তাকে সম্পূর্ণ নার্ভ হারাতে দেওয়া ঠিক নয়।

আইকেনের বাড়িতে ফোন করতেই লুসিলি ধরল।

চেস বলছি। শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

তোমাকে বলতে চাই যে আমি একটা উপায় পেয়েছি। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরবতার মধ্যে তার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ, তুমি কি তাই মনে করেছ?

হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। দুজনেই ঝামেলা থেকে রেহাই পাব।

কেমন করে?

ফোনে বলা ঠিক হবে না। তোমার আর চিন্তার কোন কারণ নেই। সেটাই জানাতে চাইছি।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

তুমি এখন বিশ্রাম নিতে পার। ব্যাপারটা সহজভাবে নেবার চেষ্টা কর।

ঠিক আছে বলে লাইন রেখে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে তার ব্যবহারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। আশা করেছিলাম, সে খুশি হবে এবং দুশ্চিন্তা ছাড়বে। কিন্তু মনে হল সে কিছুটা হতাশ হয়েছে।

বারান্দায় বসে এইসব চিন্তা করছিলাম আর সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে আটটার আগে আশানুরূপ অন্ধকার হল না।

সোজা সিবোর্নের বাড়ি এলাম পন্টিয়াকটা নিয়ে।

পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা খুলতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। টর্চের আলোয় কাজ করতে হচ্ছিল। স্ক্রুগুলোতেও মরচে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত প্লেটটা খুলে পন্টিয়াকের সামনের দিকে এসে দেখলাম। সামনের প্লেটটার স্ক্রুগুলোতে বিশ্রীভাবে মরচে পড়েছে। সেগুলো খুলতে প্রায় লড়াই করতে হল।

গাড়ির নিচে প্রায় অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে যখন মরচে-পড়া স্ক্রুগুলো খুলতে ব্যস্ত ছিলাম তখন বাইরে মৃদু পায়ের শব্দ পেলাম।

স্প্যানারটা তখনও হাতে, ভয়ে হিম হয়ে গেলাম। অন্ধকারে ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের দিকে চাইলাম। কান দুটো খাড়া করে চুপ করে শুয়েছিলাম। বুকটা কাঁপছিল মনে হচ্ছিল তবে কি মনের ভুল।

আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে ভাবলাম বাইরের কোন গোলমালের শব্দ কানে এসেছিল।

আবার স্ক্রুগুলো খুলতে লাগলাম।

শেষ স্ক্রুটা প্রায় খুলে এনেছি তখন গ্যারেজের দরজায় খট্ করে শব্দ হল।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। যেখানে শুয়েছিলাম সেখান থেকে একটা কপাটের নিচের অংশ দেখা যায়। সেটা ক্রমশঃ খুলে আসছে।

শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। সামনের বাম্পারের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আলোটা নিভে গেল। তারপরেই গ্যারেজ ঘরের দরজা হাট করে খুলতে শুনলাম। এত ভয় পেলাম যে তাড়াতাড়ি গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম।

পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা হাতে নিয়ে যেই দাঁড়াবার চেষ্টা করছি অমনি একটা চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো আমার উপর এসে পড়েই আবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

হতবুদ্ধি হয়ে প্রস্তর মূর্তির মত গুটিসুটি হয়ে বসে রইলাম। কারও ছুটে পালাবার শব্দ পেয়েই আমার বুদ্ধি কাজ করল। ব্যাপারটা কি হতে পারে বুঝতে পারলাম।

ফ্ল্যাশলাইট ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে কেউ আমাকে অনুসরণ করেছিল এবং পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা হাতে নিয়ে ভাঙ্গা চোরা ক্যাডিলাকটার পাশে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিলাম সেই অবস্থায় আমার ছবি তুলে নিয়েছে।

রাগে ও ভয়ে নম্বর প্লেটটা ফেলে দিয়ে গ্যারেজের বাইরে ছুটে এলাম।

ফটোগ্রাফ নেওয়া লোকটা রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তার পায়ের শব্দে মনে হল পলাতক একজন পুরুষ। কোন মহিলার পক্ষে এত জোরে ছোটা সম্ভব নয়।

তার পিছনে ছুটলাম কিন্তু চাঁদের আলো না থাকায় ছোটার অসুবিধা হচ্ছিল।

রাস্তাটা আমি চিনতাম। জানতাম কয়েক শ গজ দূরে আমার বাংলোর ওপারে ফুলের চারাগাছ ও পামগাছের একটা বাগান আছে। বাগানটার ওপারে খোলা রাস্তা বড় রাস্তা পর্যন্ত। রাস্তার দুপাশে ছিল বালির ছোট ছোট স্তূপ। ফলে কোন আড়ালের সৃষ্টি হয়নি।

এত জোরে আগে কখনও ছুটিনি। ফুলের চারাগাছ ও পামগাছের সারির কাছে এসে কোন শব্দ পেলাম না। বুঝতে পারলাম লোকটা রাস্তা থেকে পালিয়ে কোন চারাগাছের পেছনে লুকিয়েছে।

নিঃসন্দেহ যে, এই লোকটাই আজ সকালে আমাকে ও লুসিলিকে ফোন করেছিল। এই লোকটাই ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। সে আমার একটা ছবি নিয়েছে যার জন্য দশ বছরের শাস্তি হতে পারে। কিছুতেই তাকে পালিয়ে যেতে দেব না। যদি তাকে শেষ করে দিতে হয় তাও করব।

ফ্ল্যাশলাইটটা কেন যে সঙ্গে আনলাম না। চারিদিক এত অন্ধকার। লোকটা আমার সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে। কোন রকম শব্দ না করে এগিয়ে চারাগাছের বাগানটায় এলাম। নিশ্চিত ছিলাম লোকটা এখানেই আছে। কিন্তু আলো ছাড়া তাকে বার করা বেশ কঠিন।

কিছুটা পথ হেঁটে শব্দ শোনার জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তু না, কোন শব্দ নেই। হামাগুড়ি দিয়ে আমার মতই ভয় পেয়ে হয়তো কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে।

অন্ধকারে আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ পায়ে কিছু একটা ঠেকতেই চমকে দ্রুত নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। অন্ধকারে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম এবং একটা মুখের উপর আমার হাত পড়ল। চারাগাছ থেকে মানুষের একটা অস্পষ্ট চেহারা উঠে আসতে দেখলাম। পিছু হটে ঘুঁষি পাকালাম কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

একটা কিছু খুব জোরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত দুটো তুলে মাথা বাঁচাবার ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। কঠিন কিছু একটা ঘাড়ের উপর এসে পড়তে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথার উপর ভয়ানক আঘাত পেলাম।

নির্জন শূন্য অন্ধকারে লুটিয়ে পড়লাম।

।। দুই ।।

অনেক দূরে ঘড়িতে নটা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘণ্টা বাজার মিষ্টি মৃদু শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে এল। শব্দটা খুব পরিচিত। বুঝলাম লাউঞ্জে বারান্দায় ঝোলান আমার নিজের ঘড়িটার শব্দ শুনছি।

চোখ খুললাম। হাতুড়ি পেটানোর একটা জোর শব্দ তখনও মাথার মধ্যে পাচ্ছিলাম।

নিজের সোফায় শুয়েছিলাম। মাথার পেছনদিকে হাত রাখতেই ফোলা জায়গাটা ও রক্তের শুকনো দলাটার উপর হাত পড়ল। কয়েক মিনিট পরে উঠে বসে চারিদিকে চাইলাম।

সমস্ত আলোগুলো জ্বালান ছিল। পাশে ছোট একটা টেবিলে আমার সবচেয়ে ভাল হুইস্কির একটা বোতল ও একটা পাত্রে কিছু বরফ ছিল। এই হুইস্কি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এনে রেখেছিলাম। প্রায় সিকি ভাগ ফাঁকা।

আস্তে বাঁ দিকে চাইলাম। কিছু দূরে একটা চেয়ারে একজন লোককে বসে থাকতে দেখে, তার অস্পষ্ট চেহারা দেখেই বুঝলাম এই লোকটাই আমাকে ও লুসিলিকে ফোন করেছিল। পন্টিয়াকটার নম্বর প্লেটটা পালটাবার সময় আমার ছবি তুলেছিল এবং আমার মাথায় আঘাত করেছিল।

আবার চোখ বন্ধ করে কয়েক মিনিট চুপ করে রইলাম। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উল্টো দিকে বসে থাকা লোকটার দিকে চাইলাম।

ধীরে ধীরে তার মুখটা স্পষ্ট হল। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স প্রায় তেইশ চব্বিশ, ফরসা গায়ের রং, গায়ের চামড়া তামাটে। গ্রীসিয়ান নাক, নীল চোখ এবং সরু গোঁফ? সুন্দর মাথার উপর চুলগুলো গুছিয়ে সাজানো। অবশ্য মেয়েদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

পরনে ছিল নীল স্পোর্টিং স্যুট এবং পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো, হাতে সোনার ভারী ব্রেসলেট তাতে ঘড়ি লাগানো ছিল। ডানহাতে ছিল হুইস্কির গ্লাস। আমার দিকে চেয়ে হাসতে মনে হল ছুটে গিয়ে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিই।

এই যে, শয়তান, বেশ উৎফুল্লভাবে সে বলল। আমি কি জোরে আঘাত করেছি?

মারটা বেশ জোরে হয়েছে।

সে বললো, মদ খাবে?

তুমি কে? এখানে কি করছ? গর্জন করে উঠলাম।

সামনের দিকে পা বাড়িয়ে সে বলল, একটু আলাপ হওয়া দরকার। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে চলেছে। আমার নাম রস, বন্ধুরা অসকার বলে। আলাপ করার ইচ্ছে আছে নাকি?

ইচ্ছে হচ্ছে তোমার দাঁতগুলো ঘুঁষি মেরে মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিই, উঠে বললাম।

তোমাই দোষ দিতে চাই না, তবে তোমার অবস্থায় পড়লে আমি এসব চেষ্টা করতাম না। তোমার চেয়ে বড় মাতব্বররা ভেবেছিল আমাকে জব্দ করতে পারবে। কিন্তু হাল ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্ট না হয় যেন। সোজাসুজি লেনদেনের ব্যাপার। আমি কোন জিনিস বিক্রি করতে চাই, আর তুমি সেটা কিনতে চাও। একেবারে সোজা ব্যাপার।

লুসিলি তবে ঠিকই বলেছিল যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে। রস-এর দিকে সোজাসুজি চাইলাম। লোকটা কি ভয়ংকর হতে পারে ভাবছিলাম। প্রথমেই জানা দরকার সে ঘটনার কতটুকু জানে। তারপর ঠিক করব কি করতে হবে।

কি বিক্রি করবে ভাবছ?

এখান থেকে কাছেই সুন্দর সমুদ্রতীর আছে সেখানে ছেলেমেয়েরা একটু আমোদ করতে যায়। সেখানে লুকিয়ে থাকার মত একটু জায়গা আছে। টাকার দরকার হলে, সেখানে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকি, গতরাতে অবশ্য ভাগ্য ভালই ছিল। এক বড় বিজ্ঞাপন কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর সঙ্গে সেই অফিসেরই এক কর্মচারী বালির উপর কিছু একটা করছিল, মনে হল, সে হয়ত চাইবে না যে সেখানে কি হচ্ছিল, বলে দিই তার মনিবকে বরং কিছু টাকা খরচ করতে রাজি হবে। এই ভাবেই বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক রসিক লোককে পাকড়াও করি। এতে আমার দু পয়সা হয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, এটা ব্যবসা নয়। আসলে কথা দিয়ে কথা রাখা।

সে মাথা নাড়ল।

ঠিক সমস্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা দিতে সকলেই গোটা পঞ্চাশেক করে দেয়। আমি তোমার কাছে বেশি চাই না কিন্তু সেই সঙ্গে গাড়ি দুর্ঘটনাও আছে। বিজ্ঞাপন মালিকের স্ত্রীর দিকে তুমি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলে তাতে সে ভয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে পালায়। পুলিশের একটা লোককে চাপা দেয়। নিশ্চয়ই সব কাগজে পড়েছ। ওর চাপা দেওয়ার দু মিনিট পরেই আমি সেখানে হাজির

হই। সে থামেনি, তোমার গাড়িটা ভেঙেচুরে দুমড়ে গেছে। নম্বর প্লেট পালটানোর আইডিয়াটা চমৎকার। কিন্তু আমিও ফ্ল্যাশলাইট ও ক্যামেরা নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা তোমার বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার ক্যামেরায় এখন একটা ছবি আছে যা তোমাকে আর মেয়েটাকে দশবছর শ্রীঘরে রাখবে। তুমি যদি তা না যেতে চাও এবং মেয়েটাকে পাঠাতে না চাও তবে আমিও তোমার কাছে বেশ মোটা টাকা পাবার আশা করতে পারি।

বুঝতে পারলাম বেশ বড় রকমের ঝামেলায় পড়েছি।

এই শয়তান, এতটা মুষড়ে পড়লে কেন? আর যাই হোক টাকা কেবলই টাকা। টাকার চেয়ে জীবনে বড় জিনিস আর কি আছে। আর লাখ টাকা নিয়ে জেলে থাকলে জীবনে ফূর্তি করবে কখন? আমারও টাকার বেশ দরকার। আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। এক দফায় টাকা মিটিয়ে দাও। নগদ মিটিয়ে দাও, আমিও কোনদিন আর তোমার মনিবকে বলতে যাব না যে তার বৌ-এর সঙ্গে ফূর্তি করে তুমি তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিলে। ছবিটাও আর পুলিশের লোকের কাছে পাঠাবার দরকার হবে না। কি বল?

তাহলে আরও পাবার জন্যে তুমি ফিরে আসবে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সে দাঁত বার করে হাসল। তা নিশ্চয় তোমাকে অবশ্যই একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু বেশ মোটা কিছু যদি ছাড় তবে তোমাকে একদম ভুলে যেতে পারি।

কত টাকা?

তিরিশ হাজার মত তোমাদের দেওয়া উচিত। লুসিলির কিছু হীরার গহনা আছে। আমার ধারণা সেগুলোর কিছু কিছু তুমিও হাতিয়ে নিয়েছ। ঠিক আছে। তিরিশ হাজারই কথা রইল। তোমারও সস্তাতেই সব মিটে গেল।

পাগল! আমার এত টাকাই নেই। ছবিটা পাঁচ হাজার দিয়ে কিনতে রাজি আছি—আর এক পয়সাও বেশি নয়।

সে হুইস্কি শেষ করে। বাঃ, সুন্দর স্কচ। টাকা জোগাড় করতে তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। আমি তোমাকে ফোন করে বলে দেব কোথায় টাকাটা জমা দিতে হবে। নগদ তিরিশ হাজার কিন্তু।

বলছি তো আমার অত টাকা নেই। পাঁচ হাজার অবধি দিতে পারি।

ছেলেমানুষী কোরো না। ভেবে দেখ। এই বাংলোটা বিক্রি করলে পনের হাজার মিলবে। লুসিলিও কিছু দিতে পারবে। দুজনে মিলেমিশে একটা ব্যবস্থা কর। টাকাটা কিন্তু এক দফায় দিতে হবে। বার বার আসতে পারব না। আমি আর ফিরে আসছি না শোন। আমি যখন গভীর জলে ছিপ ফেলি তখন নিশ্চিত জানি যে বঁড়শিতে মাছ গাঁথবেই। হয় মেয়েটাকে নিয়ে জেল খাটো নয়তো তিরিশ হাজার টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা কর। বৃহস্পতিবার ফোন করে জানব কতদূর কি করলে। আমার কি করা উচিত আমি জানি। তবে তুমি যা ভাবছ আমার চিন্তাধারা সেরকম নাও হতে পারে। তবে তোমার মধুর স্বপ্ন নষ্ট হতে দিও না। টাকাতে কি আসে যায়? তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে দুঃখিত তবে এটার জন্যে তুমিই দায়ী। আবার আমাদের দেখা হবে। আজ চলি, পানীয়ের জন্য ধন্যবাদ।

আমি তার দিকে চাইলাম সে দরজার দিকে গেল। মাথার যন্ত্রণায় বেশ অসুস্থ বোধ করছিলাম।

সে বলল, ব্যাপারটা হালকা ভাবে নিও না। কিছু সময় নিতে পার। এটা অবশ্য স্বাভাবিক একটা কিছু উপায় বেছে নেবে কারণ তুমি এখন বঁড়শিতে গাঁথা, পরে আরও ভালভাবে বুঝবে যে বঁড়শিটা ভিতরে গিয়ে শক্তভাবে আটকে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই সে চলে গেল। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনলাম।

টলতে টলতে গিয়ে ক্যাবিনেট থেকে একটা গ্লাস বার করে কড়া হুইস্কি ঢাললাম। সেটা খেয়ে বাথরুমে এসে ঠাণ্ডা জলের কলটা খুললাম। মাথাটা তার নীচে রাখলাম। বেশ আরাম হচ্ছিল। আর এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

ভাবছিলাম তাহলে ব্ল্যাকেমেলের চেহারাটা এই রকম। রস বলছিল বঁড়শিটা বেশ ভালভাবেই গেঁথেছে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই। দেখাই যাক তার কথামত বঁড়শিটা কতদূর গিয়েছে।

অনেক চিন্তার পরে মনে হল বঁড়শিটা সত্যিই বেশ গভীরে ঢুকেছে। যে দিকেই যাই না কেন

ধরা পড়ব। যদি আইকেনের কাছে গিয়ে সত্যি কথা বলি, তিনি আমাকে বার করে দেবেন। পুলিশকে সত্যি কথা বললে, তারা লুসিলিকে চেপে ধরবে। যদি কোন রকমে তিরিশ হাজার ডলার জোগাড় না করতে পারি, তবে আমার ভরাডুবি নিশ্চিত, বিশেষ করে নিউইয়র্কের চাকরীটা যাবে।

তাহলে এখন আমার কি করা কর্তব্য?

একটি মাত্র পথ আছে তাতে শুধু যে মুক্তি পেতে পারি তাই নয়, রসকেও ধরিয়ে দিতে পারি। তাহলে সে আমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হয় তাকে পাকড়াও করতে হয় নতুবা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে হয়।

এখন আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ক্যাডিলাকটাকে নিরাপদে সরিয়ে রাখা।

সাড়ে নটা বাজে, সাম লোথারকে ফোন করলাম। সে একটা গ্যারেজের মালিক। আমার গাড়ির মেরামতির কাজ সে-ই করে।

সাম, এত রাতে ফোন করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু ক্যাডিলাকটা নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি। একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। তোমার কাজের চাপ কেমন? তাড়াতাড়ি মেরামত করে দিতে হবে।

মিঃ স্কট, আপনার যদি খুব তাড়া থাকে তবে কাজটা এখনই হাতে নিতে পারি। আমার এখানে কয়েকজন লোক আছে গাড়িটা এলেই ওরা সেটা মেরামতের কাজে লেগে যাবে। বুধবারেই হয়তো গাড়িটা পাবেন কিন্তু কথা দেওয়ার আগে গাড়ির ক্ষতির পরিমাণটা একবার দেখতে চাই।

অনেক ধন্যবাদ সাম। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা নিয়ে আসছি।

ঠিক আছে কিন্তু একটা কথা মিঃ স্কট। গাড়ির ধাক্কা খাওয়ার খবরটা পুলিশের কাছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। আমার উপর পুলিশের কড়া হুকুম আছে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ছাড়া কোন গাড়ির কাজ যেন হাতে না নিই। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই একথা পড়েছেন। আপনি কি একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারেন?

ইতিমধ্যেই সার্টিফিকেট জোগাড় করেছি। ঘটনাটা ঘটা মাত্রই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করি। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সার্টিফিকেট দেয়।

বাঃ, চমৎকার। তাহলে গাড়িটা নিয়ে আসুন। আমি লোকগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেব।

নম্বর প্লেটটা পালটানো হয়েছে। তা হয়ত সে ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি তো একটা নিতেই হবে। একটা অজানা গ্যারেজে যাওয়ার চেয়ে তার ওখানে অনেক অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

বাংলোতে তালা লাগিয়ে প্রায় পৌনে এক মাইল পায়ে হেঁটে সিবোর্নের বাড়ি এলাম পন্টিয়াকটা যে ভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেভাবেই রয়েছে।

মাথাটা দপদপ করছিল তবুও ভিতরে ঢুকে সামনের নম্বর প্লেট লাগানোর কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম। শুকনো রক্তের দাগগুলো তুলতে হবে। যদি সত্যিই কোনদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তবে আমার অনুকূলে যে সব সাক্ষ্য আছে সেগুলি আমি মুছে ফেলতে চাই। এক বালতি জল এনে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেললাম। তারপরে ক্যাডিলাকটা রাস্তায় এনে পন্টিয়াকটা গ্যারেজে ঢোকালাম। গ্যারেজে তালা লাগিয়ে গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তায় এলাম।

রাস্তা জনহীন ছিল বলা চলে। একটা হেডলাইটেই গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। যে কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তাদের একটা আলোর দিকে নজর পড়েছে বলে মনে হল না। সামের গ্যারেজে সোজা চলে এলাম।

স্বল্প আলোকিত টিনের বড় ছাউনির নিচে গাড়ি নিয়ে এসে দেখলাম, সাম দুজন মেকানিকের সঙ্গে কথা বলছে।

দীর্ঘ, সুগঠিত সাম বেরিয়ে এসে করমর্দন করে বলল। গুড ইভনিং, মিঃ স্কট। নিশ্চয়ই আপনি গাড়িটা জোরে ধাক্কা মেরেছেন।

হ্যাঁ। মেয়েদের গলা জড়িয়ে জোরে গাড়ি চালালে এ রকমটা হয়।

সে দাঁত বার করে হেসে বলে জানি। বলে দিতে হবে না। নিজেরও অনেকবার হয়েছে। মেয়েরা অনেক সময় সর্বনাশ ডেকে আনে। আমার মনে হয় এক সপ্তাহের আগে সারানো সম্ভব হবে না।

মেকানিকরা গম্ভীর মুখে গাড়িটা দেখছিল। গাড়ির প্যানেলটা পরীক্ষা করে সাম বলল। এই

দাগ দুটো গর্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা কাজে লেগে যাও। দরজাটা খুলে গর্তটা মেরে দিয়ে আবার লাগাবে। মিঃ স্কট, পুলিশের সার্টিফিকেটটা এনেছেন?

ওয়ালেটটা বার করার জন্য যখন পকেটে হাত দিলাম দূরে একটা মোটর সাইকেল এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। পুলিশের একজন লোক গ্যারেজের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সাম, এক সেকেন্ড বলেই পুলিশের লোকটির কাছে গিয়ে এই যে টিম কি ব্যাপার?

একটা ভাঙাচোরা গাড়ি দেখছি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিঃ স্কট ওঁর ক্যাডিলাকটা নিয়ে এসেছেন। একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলেন।

পুলিশের লোকটি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাডিলাকটার দিকে এগিয়ে ভাঙ্গা হেডল্যাম্পটা দেখছিল।

ইতিমধ্যে আমিও খানিকটা ধাতস্থ হয়ে, ওয়ালেট থেকে সার্টিফিকেটটা বার করে তার দিকে এগিয়ে বললাম।

গাড়িটার ক্ষতি হওয়ায় আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে, লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট আমাকে দিয়েছেন।

সে ঘুরে হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলাতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। কিন্তু আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম।

সে সার্টিফিকেটটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে নম্বর প্লেটটা দেখে আমার সার্টিফিকেটটা দেখল। টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মুখে বাতাস টেনে গাল দুটো ফুলাল।

লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছিল?

তিনি মিঃ আইকেনের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি মিঃ আইকেনের কাছে চাকরি করি। লেফটেন্যান্ট আমার ও মিঃ আইকেনের গাড়ি দেখে সার্টিফিকেট দেন। সাম আমাকে চেনে। সে আমার গাড়ি প্রায়ই মেরামত করে। আমার গলার স্বর কাঁপছিল।

গাড়িটার এমন দশা কেমন করে হল?

গাছে ধাক্কা মারি।

সাম হেসে বলল, মিঃ স্কট একটি মেয়ের সঙ্গে ফূর্তি করছিলেন। ওঁর বয়সে আমি নিজেও আমোদ স্ফূর্তি করেছি। অবশ্য গাড়ির ক্ষতি হলে সোজা কোন গ্যারেজে গিয়ে মেরামত করে নিতাম।

সার্টিফিকেটটা আমাকে দিতে দিতে পুলিশের কর্মচারীটি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে। আপনিও কাউকে চাপা দিতে পারতেন।

হ্যাঁ জানি। লেফটেন্যান্টও একই কথা বলেছিলেন। তাঁকে বলেছি আর কোনও দিন এ রকম হবে না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

বুঝতে পারলাম সে এই নিয়ে কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু ওয়েস্টের নাম বলাতে আর কিছু করতে সাহস পাবে না।

ভবিষ্যতে আর কখনও করবেন না, বলে সামের কাছে গিয়ে বলল, ভেবেছিলাম ও'ব্রায়ানকে হত্যা করেছে যে লোকটা তাকে ধরে ফেলব। গাড়িটা দেখেছে এমন একজন ড্রাইভারের কাছে খবর পেলাম। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল।

সাম চোখ টিপে বলল। ভাগ্যে তাড়াতাড়ি লেফটেন্যান্টের কথা বলেছিলেন নইলে মাথামোটা লোকটা হয়ত ঝামেলায় ফেলত।

আমি তাকে সার্টিফিকেটটা দিলাম।

তোমার কি এটা দরকার হবে?

হ্যাঁ হবে। বলে সাম সার্টিফিকেটটা পকেটে পুরল। আপনাকে কি একটা গাড়ি ব্যবহার করতে দেব, মিঃ স্কট?

পেলে খুব ভাল হয়।

বুইকটা নিন। শুক্রবারের মধ্যেই ক্যাডিলাকটা মেরামত হয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার পথে বুইকটা এখানে নিয়ে আসবেন, ক্যাডিলাক তৈরী থাকবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বুইকে চড়ে বড় রাস্তার দিকে ছুটলাম।

তখন এগারটা বাজতে বিশ মিনিট। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ঝামেলার জন্য তখনও বুকটা কাঁপছিল তাই নির্জন বাংলোয় যেতে ইচ্ছে হল না। শহরের দিকে গাড়ি চালালাম।

একটা বারে এসে ঢুকলাম। নতুন আইডিয়া মাথায় আনার জন্য আমি এবং জো অনেক সময় এখানে এসে মদ খেতাম।

বারের মালিক—বয়স্ক, মোটা, হাসিখুশি। সে আমাকে দেখে হাত তুলে অভিবাদন জানাল। আমরা তাকে 'স্লিম' বলতাম।

টুলে বসতে বসতে বললাম ডবল স্কচ।

তখন বারে মাত্র চারজন লোক ছিল দূরে এক প্রান্তে।

স্লিম বলল, এখনই আনছি মিঃ স্কট। আজ আপনার দেরী হয়েছে।

হ্যাঁ। তা হোক, কাল তো রবিবার।

তা অবশ্য সত্যি, রবিবার আমার প্রিয় দিন। চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটার শেষ খবর শুনেছেন?

না, নতুন কিছু?

রেডিওতে বলল, মাত্র মিনিট দশেক আগে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে বড় রাস্তা ধরে সমুদ্রের তটের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে সেই দিকেই তারা যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের থানায় আসতে বলেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে ও'ব্রায়ানকে যে গাড়িটা চাপা দিয়েছিল তারা সেটা দেখেছে অথবা নিজেরাই চাপা দিয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে হুইস্কিতে চুমুক দিলাম।

তাই বুঝি?

বাজি রেখে বলতে পারি তারা থানায় আসবে না। একজন মহিলা নিশ্চয়ই সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যায় নি। তারা নিশ্চয়ই চাইবে না যে তাদের নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হোক।

সত্যি কথা। যে লোকটা চাপা দিয়েছে তাকে ধরার জন্য পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন প্রহসন মনে হচ্ছে। দিনের প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একজন লোক মারা যায়। কিন্তু পুলিশের লোক বলে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে।

হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অসকার রস নামে কোন লোককে তুমি চেন?

হ্যাঁ, চিনি। মাউন্ট ক্রেস্তায় লিটন ট্যাভার্ন নাইট ক্লাবের বারম্যান। আপনি তাকে চেনেন, মিঃ স্কট?

না, কে একজন বলছিল শহরের সবচেয়ে ভাল বারম্যান। আমি ভাবছিলাম তার এমন কি বিশেষত্ব আছে।

নিশ্চয়ই কোন মহিলা আপনাকে বলেছে। শহরের সবচেয়ে ভাল বারম্যান! খুব বড় বড় কথা। তাছাড়া এ কাজ সে শখে করে। মার্তিনি যা তৈরি করে একটা বেড়ালেও বমি করে উগরে দেবে। তার কি আছে জানেন, আসলে তার আছে রূপ। মেয়েরা দলে দলে তার পাশে আনাগোনা করে। তাছাড়া বিশেষ কোন গুণ নেই। আমি হলে এই বারে তাকে নিতাম না। বিনা পয়সায় কাজ করলেও না।

লিটল ট্যাভার্ন? আচ্ছা। ওখানে ডলোরেস লেন গান করে না?

ঠিক বলেছেন। সেখানে না গিয়ে আপনার অবশ্য ক্ষতি হয়নি। কারণ চোখের ঘুম হারাবার মত মেয়েটার কিছু নেই।

সে কি পুলিশের যে লোকটা মারা গিয়েছে, তার বাগদত্তা ছিল না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এমনও হতে পারে যে এটা সংবাদপত্রের বানানো গল্প। নাইট ক্লাবের গায়িকা। কেন একজন পুলিশকে বিয়ে করবে?

হুইস্কি শেষ করে। ঠিকই বলেছেন। অবশ্য খবরের কাগজে যা পড়ি তার অর্ধেকটা আমি বিশ্বাস করি। ঠিক আছে। আমাকে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। যাচ্ছি স্লিম।

মাঝে মাঝে আপনার দেখা পেলে খুশি হব, মিঃ স্কট। সপ্তাহের শেষটা আনন্দে কাটাবেন

নিশ্চয়ই।

একটা সিগারেট ধরালাম বুইকে বসে। ভাবলাম তাহলে রস ও ডলোরেস একই নাইট ক্লাবে চাকরি করে। সত্যিই তো স্লিমের কথাই ঠিক, নাইট ক্লাবের গায়িকা কেন পুলিশের লোককে বিয়ে করতে যাবে? ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখা দরকার।

ঠিক করলাম লিটল ট্যাভার্ন নাইট ক্লাবটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

স্টার্টারে চাপ দিয়ে রাতের রাস্তায় মাউন্ট ক্রেস্তারের দিকে গাড়ি ছুটালাম।

নবম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

লিটন ট্যাভার্ন নাইট ক্লাব রাস্তার ঠিক মোড়ে, ভিতরে ঢোকার পথটা ঘোরানো নানা রঙের নিয়ন আলোয় সাজানো। জমকালো সাজে এক দারোয়ান বসে আছে। গাড়ি দাঁড় করানো জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে দিলাম।

নাইট ক্লাবের দরজায় আসতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে তার টুপিতে হাত ঠেকাল।

একটা সাজানো ঘরে এসে ঢুকলাম। টুপি ও কোঁচান পোশাক পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার অনাবৃত হাঁটু দেখা যাচ্ছিল। নিতম্ব দুলিয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে সাদা দাঁতগুলো বার করে হাসল। আমার মাথায় টুপি নেই দেখে তার হাসির বহর কমে গেল। বুঝলো যে আমার কাছে ডলার বকশিশ পাবার আশা নেই। শরীরের গঠনের সঙ্গে তার ও মেরিলিন মনরোর অনেক সাদৃশ্য আছে।

ছাদের ঝোলান আলোর লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হাল্কা নীল আলোয় ভরা জায়গায় এলাম। সেটা একটা বার।

ঘরটা বেশ বড়, শেষের দিকে ঘোড়ার খুরের মত দেখতে একটা বার আছে। অসংখ্য টেবিল চেয়ারে শ'খানেক মানুষ মদ খাচ্ছিল।

তাদের একজনও রাতের পোশাকে ছিল না। মেয়েরাও ছিল বিভিন্ন ধরনের, কেউ হয়তো ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী। অতীত উপকারের বিনিময়ে রাতে বেরিয়েছে। পেছনের সারিতে নোংরা পোশাকে কিছু যুবতী মেয়ে ছিল যাদের অনেকে পেশাদার। কিছু বয়স্ক মেয়েও ছিল যারা তাদের নাচের সঙ্গীর আশায় ছিল। পামসিটির যে কোন নিকৃষ্ট নাইট ক্লাবের লোকেরা এদের চেয়ে মার্জিত।

দুজন বারম্যান ভীড় সামলাচ্ছিল। তাদের একজনও রস নয়। লোক দুজনকে মেক্সিকো দেশীয় মনে হল।

বারের পিছনে রসকে মদ পরিবেশন করতে দেখলাম। চারপাশে জন দশেক মেয়ে ইচ্ছে করেই আমার দিকে চেয়েছিল। তাদের আহ্বানের দৃষ্টি গ্রাহ্য করলাম না।

বারের চারিদিকে ঘুরে দেখে ট্রপিক্যাল স্যুট পরা এক মোটা লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লোকটি রাম খাচ্ছিল বলে মনে হল। তিনভাগই ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

স্কচের অর্ডার দিলাম। বারম্যান যখন মদ ঢালছিল তখন বললাম ক্যাবারে কখন শুরু হবে।

সাড়ে এগারোটায় স্যার, সে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল।

রেস্তোরাঁয় যাবার রাস্তার বাঁ দিকে।

আকাশী সবুজ রঙের পোশাক পরা এক লম্বা রোগা মেয়ে মদ নিয়ে চলে গেল। শ্যাম্পেন খাওয়ার জন্য নাকিসুরে জেদ ধরায় তার বয়স্ক সঙ্গী অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল। তখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি।

অত্যাধিক মদ খেয়ে মোটা লোকটা বোকার মত হেসে বলল, আপনার রোজগারের পয়সা ক্যাবারে দেখে নষ্ট করবেন না। শহরের সবচেয়ে নোংরা জোচ্চোরির জায়গা—অনেকেই একথা বলে।

মেয়ে নেই?

হ্যাঁ, মেয়ে আছে। যদি অবশ্য তাদের মেয়ে বলা যায়।

শুনেছি সেই লেন মেয়েটা নাকি দারুণ জিনিস।

সে খানিকটা রাম এবং লাইম জুস চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, যদি মেয়েটা বাগাতে পারেন তাহলে অবশ্য খুশিই হবে। তবে তাকে বাগানো খুবই কষ্টকর। অবশ্য দুদিন সন্ধ্যায় আমি তার গান শুনেছি অতি জঘন্য গান।

তাহলে এখানকার বিশেষত্ব কি?

সে চারপাশ দেখে নিয়ে খুব কাছে এসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, বন্ধু ভেবেই বলছি। উপর তলায় ওদের জুয়াখেলার আড্ডা আছে। জুয়ার বাজি মারাত্মক—প্রায় আকাশছোঁয়া। এসব ঠাট হচ্ছে লোক দেখানো। কথাটা খুব গোপনে রাখবেন ভাই।

আমিও তাহলে উপরটা দেখে আসতে পারি।

উপরে লোক যেতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। কারণ এ সব কিছুই তো বেআইনী। ক্লডের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন, আড্ডাটা সেই দেখাশোনা করে। ইচ্ছে করলে আমার নাম বলতে পারেন। আমার নাম ফিল ওয়েলিভার।

ধন্যবাদ। কোথায় তার দেখা পাব?

ভেতরে, বেরিয়ে যেতে যেতে বলল।—আমাকে এখন যেতে হবে। বৌ-কে বলে এসেছি আজ রাতে বেড়াতে নিয়ে যাব। পাঁচ মিনিট আগেও কথাটা মনে হয়নি। আর দেরী করা ঠিক হবে না।

আমিও ঐ পথে এগিয়ে বাঁ দিকে রেস্তোরাঁটা দেখতে পেলাম। ডিম্বাকৃতি একটা ঘর, লাল ও গোলাপী আয়না এবং নীল সাজে ঘরটা মৃদু আলোয় আলোকিত। জন ষাটেক লোক সেখানে ডিনার খাচ্ছিল। তাদের মৃদু গুঞ্জন ও সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গিয়েছিল।

হেড ওয়েটার একজন খিটখিটে রোগা লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল লালচে সোনালি, ব্যবসায়ী সুলভ হাসি হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমি ক্যাবারে দেখতে চাই। তবে ডিনার চাই না।

আচ্ছা স্যার। ড্রিঙ্ক ও স্যান্ডউইচ লাগবে...?

নিশ্চয়ই। টক হুইস্কি এবং সরষে মাখান মুরগি আর রুটি নিয়ে এস।

পিছনের সারিতে ব্যান্ডের কাছে আমাকে একটা ছোট টেবিলের সামনে সে নিয়ে এল। আমি বসলাম।

ব্যান্ডের চার রকমের বাজনা ছিল ঃ চারজন বিশালকায় নিগ্রো, একটা ট্রাম্পেট, ড্রাম, ডবল বাস এবং স্যাক্সোফোন।

একটু পরেই ওয়েটার আমার জন্যে মুরগির স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। সরষে মাখানো রুটি শুকনো আর মুরগিটা দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তার জন্ডিস হয়েছিল। স্যান্ডউইচটা ফেলে দিলাম। খারাপ টক হুইস্কি অনেকবার খেয়েছি কিন্তু এত খারাপ কখনও খাইনি।

প্রায় পৌনে বারোটায় চারজন মেয়ে নাচতে নাচতে ভিতরে এসে ঢুকল। মাতালদের জন্যেই তারা এসেছিল এবং নিয়মিত লোকদের ইশারা করে তারা যত হৈ হৈ করে ঢুকেছিল তার চেয়েও বেশি জোরে নাচতে নাচতে চলে গেল। সেই ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিল, ক্যাবারে হিসাবে এটা জঘন্য।

মাঝ রাতের একটু পরেই ডলোরেস এল। হাতে মাইক্রোফোন। পরনে সোনালী রঙের পোশাক এত জোরে গায়ের উপর চেপে বসেছিল মনে হচ্ছিল যেন চামড়া। আলোর নিচে সে দাঁড়িয়েছিল, দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। দুটো ল্যাটিন আমেরিকান গান গাইল। মাইক্রোফোন ছাড়া কারও পক্ষে তার গান শোনা সম্ভব নয়। সে উদাসীনভাবে গাইছিল যেন বিরক্ত হয়ে। গানের শেষে অতি নগণ্য পরিমাণ করতালি তাঁর ভাগ্যে জুটল।

সে চলে গেল। তার চোখ চকচক করছিল। তারপর সমস্ত জনতা আবার নাচতে শুরু করল।

ওয়ালেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে লিখলাম। আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবেন? আশা করি আজ সকালে পায়ে বালি লাগেনি।

একটা ওয়েটারকে পাকড়াও করলাম এবং তার হাতে কাগজের টুকরো ও পাঁচ ডলারের নোট দিয়ে ব্যবস্থা করতে বললাম।

যখন দ্বিতীয়বার টক হুইস্কি খাচ্ছিলাম ওয়েটার ফিরে এল।

সে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার সঙ্গে ড্রেসিং রুমে দেখা করবে। ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে যাবেন সামনেই তারকা চিহ্নিত একটা দরজা দেখতে পাবেন।

তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

গ্লাস শেষ করে ওয়েটারের নির্দেশমত এক অদ্ভুত ধরনের গুপ্ত রাস্তা দিয়ে গেলাম।

তারকা চিহ্ন দরজায় টোকা মারতেই মহিলা কণ্ঠে শুনতে পেলাম, ভেতরে আসুন।

দরজার হাতল ঘুরাতেই একটা ছোট ঘরে এসে পৌঁছালাম। ঘরে একটা আলো দেওয়া আয়না, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা কাবার্ড, মেঝেয় শতছিন্ন একটা কার্পেট।

ডলোরেস আয়নার সামনে বসে প্রসাধন করছিল। একটা লাল সিল্কের ওড়না তার শরীরের উপর দিয়ে উরু পর্যন্ত এসেছে। নাইলন মোজায় ঢাকা তার সুন্দর পা দুটো দেখা যাচ্ছিল।

ড্রেসিং টেবিলের উপর অর্ধেক খালি একটা জিনের বোতল। জিন ভর্তি একটা গেলাস পাশে।

সে আয়না দিয়ে চাইল। ভেবেছিলাম, আপনিই হবেন। জিন খাবেন?

না। ধন্যবাদ। এতক্ষণ হুইস্কি খাচ্ছিলাম। আপনার জন্য মদ কিনব এটাই ধারণা ছিল।

আয়নায় ঝুঁকে একটা ব্রাশ দিয়ে কালো ভুরুর উপর থেকে পাউডারের গুড়ো ঝাড়ল। কেন?

আপনার গান খুব ভাল লেগেছে। এক বোতল শ্যাম্পেনের সঙ্গে আরও জমত। তাছাড়া আপনার সঙ্গে একটু কথাও বলতে চেয়েছিলাম।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে, জানতে চাই আপনি কে?

সে এখন তিনভাগ মাতাল, তবে ঠিক কাজ না করা বা কথা না বলার মত মাতাল হয়নি।

নাম চেসটার স্কট। বাসস্থান ও কর্মস্থান শহরে।

চেসটার স্কট? কোথায় যেন নামটা শুনেছি?

তাই বুঝি?

কোথায়...আমার গান তাহলে ভাল লেগেছে? তাহলে একটা সিগারেট দিন।

তাকে দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে নিলাম—গান সুন্দর হয়েছিল তবে ব্যাকগ্রাউন্ড ভাল ছিল না।

জানি। কিভাবে হাততালি দিচ্ছিল লক্ষ্য করেছেন? মনে হয় তাদের হাতে ফোস্কা পড়েছে।

শ্রোতারা আপনার উপযুক্ত নয়। বাজে আর্টিস্টকে অবশ্য জনতার যে কোনো ঝামেলা পোয়াতে পারে। সমুদ্রের ধারে সকালবেলা কেন গিয়েছিলেন? ঐ সাঁতারের ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই নয়।

জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম।

একজন পুলিশের লোককে বিয়ে করতে আপনি কেন রাজি হয়েছিলেন?

সে ধীরে ধীরে ভাসা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, আমি কাকে বিয়ে করি তাতে আপনার কি?

কিছুই না। তবে আপনার মত মেয়ে পুলিশকে বিয়ে করা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

সে হেসে বলল, পুলিশের লোক হলেও সে অন্য ধরনের ছিল।

তাই বুঝি? তা বিশেষত্ব কি ছিল?

ওর টাকা ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পর্দার পিছনে গেল। আপনার টাকাকড়ি আছে, মিঃ স্কট?

তার মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। সে তখন পরনের পোশাকটা খুলে পর্দার বাইরে ফেলে দিল।

বেশি নয়। তবে কিছু টাকাকড়ি আছে।

এই পৃথিবীতে কোন অর্থ আছে : কোন গুরুত্ব আছে। এমন জিনিস হচ্ছে টাকা। তা নইলে কাউকে আমল দিতে নেই। অনেকেই বলে, স্বাস্থ্য আর ধর্মই হচ্ছে জীবনের পরম কাম্য, কিন্তু আমি কেবল টাকাই বুঝি। যদি টাকা না থাকে তবে কোন রকমে একটা ক্ষুর কিনে গলায় বসিয়ে দিন। একটা ভাল চাকরি পাবেন না। বেড়াবার মত জায়গায় যেতে পারবেন না। উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন না। টাকা না থাকলে আপনি রাস্তার মানুষ, যেখানে কদর্য জীবন যাপন করতে হয়।

পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে লাল রঙের পোশাক যাতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ

প্রকট হয়ে উঠেছিল। সে টলতে টলতে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এল।

সে মাথায় চিরুণি চালাতে চালাতে বলল, গত দশ বছর ধরে এই কাজ করছি। আমার প্রতিভা ছিল সামান্য। আমার মাতাল দালালটা এরকমভাবে আমার কাছে আসে যে অন্যের কাছে পাত্তা পাওয়া যায় না। ফলে আমার জীবনটা যে রকম বললাম অনেকটা সেই ধরনের। সুতরাং ঐ লালমুখো পুলিশটা যখন আমার কাছে আনাগোনা শুরু করল তখন তাকে সুযোগ দিলাম কারণ তার টাকাকড়ি ছিল। গত দশবছর ধরে অনেক নাইট ক্লাবে কাজ করেছি কিন্তু কখনও বিয়ের প্রস্তাব আসেনি। শেষে এই পুলিশটাই দিল। যদিও সে রুক্ষ নির্দয় ও ভয়ংকর প্রকৃতির, তবুও সে অন্তত বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিছুক্ষণ থেমে আবার জিন খেল। ওর টাকা ছিল, আমাকে অনেক উপহার দিয়েছে। সে ড্রয়ার থেকে একটা অত্যন্ত দামী সুন্দর অলংকার বের করে দেখাল। সে আমাকে এটা দেয় এই উদ্দেশ্যে নয় যে আমি পাওয়া মাত্র জামা-কাপড় খুলতে থাকব। সে আমাকে নরম চামড়ার কোর্ট দিয়েছিল এবং বলেছিল বিয়ের উপহার হিসেবে একটা দামী কোর্ট দেবে। পাম উপসাগরের তীরে তার একটা ভারী সুন্দর বাংলো আছে। বারান্দার সামনে বিস্তৃত সমুদ্র, ঘরগুলোও বিচিত্র ঃ একটা ঘরের মেঝে কাঁচের এবং নিচে আলোর ব্যবস্থা আছে। সে বেঁচে থাকলে আমি তাকেই বিয়ে করতাম যদিও লোকটা স্থূল রুচির সে মাথার টুপি পরেই এখানে এসে ড্রেসিং টেবিলের উপর পা তুলে দিত, এবং আমাকে 'বেবি ডল' বলে ডাকত। সে জিনের শেষটুকু খেয়ে, চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল যখন সে এবং আর্ট গ্যালগানো...সে কাঁদতে শুরু করল, তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছে আমি এখন মাতাল। আপনার কাছে কেন এসব কথা বলছি?

জানি না। লোকে অনেক সময় মনের কথা বলে হালকা হতে চায় তাই হবে। মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন গতি ছিল না। তার জন্য আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত।

তাই বুঝি? আমি নিজের জন্যেই দুঃখিত হচ্ছি? আপনার কি বৌ দরকার মিঃ স্কট?

বলতে পারছি না।

আপনার কি দরকার?

আমি জানতে চাই, ও'ব্রায়ান কিভাবে চাপা পড়েছিল?

সে জিনের গ্লাসটা তুলে শুকতে লাগল, ভীষণ বাজে জিনিস। যখন গান করি আর আজ রাতের মত হাততালি পাই, তখন এই মদ খাই। ও'ব্রায়ানের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

কিছু নয়। আমি জানতে চাইছি, কেমন করে সে চাপা পড়েছিল?

কোন কারণ নেই। অকারণ কৌতূহল?

কেবল কৌতূহল।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আপনার নাম কি বললেন যেন?

স্কট।

আপনি জানতে চান হ্যারি কেমন করে চাপা পড়েছিল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন?

পারি বলতে। জিন চুমুক দিল, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিনটা ঢেলে দিল। বলতে পারি। কিন্তু মিঃ স্কট, আপনার কাছে এর মূল্য কত?

সিগারেটটা ফেলে দিলাম।

টাকায় এর মূল্য কত জানতে চান।

টয়লেটের সামনে গিয়ে সে হাসল। কিন্তু সুন্দর নয়। তাকে কঠিন দেখাচ্ছিল, যেন তার শরীরটা পাথরে খোদাই করা।

হ্যাঁ, বলতে চাই এর আর্থিক মূল্য কত?

চেস্টার স্কট—এখন বুঝেছি আপনি কে! অসকার রস আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে।

একথা ভাবলেন কেন? ভাবলেশহীন মুখে জিজ্ঞাসা করলাম।

শুনতে পাই অনেক জিনিস সে বলল। ব্ল্যাকমেল করা আমি পছন্দ করি না। আমার টাকা দরকার,

মিঃ স্কট। আমি চেষ্টা করবো অসকার রসের হাত থেকে মুক্তি পান। কিন্তু মূল্য দিতে হবে, জোর করে নয়। মাত্র পাঁচশো, সে তুলনায় কিছুই নয়।

কি তথ্য?

আপনার কাছে পাঁচশো ডলার আছে মিঃ স্কট?

না কাছে নেই।

আজ রাতে আনতে পারেন?

তা পারি। মনে পড়ল অফিসে আটশো ডলার রেখে এসেছি। আমি ধার নিতে পারি, সোমবার ব্যাংক খুললে জমা দিয়ে দেব। কি করে বুঝলেন যে আপনার তথ্য আমার প্রয়োজনে আসবে?

একটা সিগারেট দিন।

সে সিগারেট ধরাচ্ছিল, তখন তার হাতটা আমার হাতের উপর রাখল।

তার কাছ থেকে সরে গেলাম।

অসকারের হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি, সে বলল।

কি করে আমাকে মুক্তি দেবেন? জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হল আমার মাথায় পা দিয়ে সে নিজেই মুক্তি পেতে চায়।

আমি বলে দেব কখন টাকা দিতে হবে, তার আগে নয়। যখন সাপে কামড়ায় তখন তার প্রতিষেধক দরকার। অসকারের কামড় থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি আপনাকে প্রতিষেধক দেব। যদি পাঁচশো ডলারের বিনিময়ে তিরিশ হাজার বাঁচাতে না চান তবে আপনি বোকা। আজ রাতেই কি টাকাটা দিতে পারবেন?

হ্যাঁ, দিতে পারব।

সে বলল, দুটোর পর আমি বাড়িতে থাকব। ম্যাডক্স আর্মসের দশ নম্বর ঘরে আমাকে পাবেন। কোথায় আপনি জানেন?

বললাম, জানি।

টাকাটা তাহলে নিয়ে আসুন, মিঃ স্কট। আমি আপনাকে প্রতিষেধক দেব। ঠিক দুটোয় আসবেন। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। ঐ মাতালদের কাছে আবার আমাকে গান করতে হবে। পরে তাহলে দেখা হবে।

তার পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে এলাম। ফিরে তাকালাম তাকে দেখে মনে হল, সে ভয় পেয়েছে।

সেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে আমার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

।। দুই ।।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম একটা কালো রঙের গাড়ি দ্বিতীয় সারি থেকে বেরিয়ে আমার পিছু নিল।

কালো গাড়িটা আমার পিছনে পিছনে এসে অফিসের সামনে আমার গাড়িটা দাঁড় করাতে ঐ গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে গেল তখন ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ঠেকল।

পৌনে একটা বাজে। সদর দরজার একটা চাবি আমার কাছে ছিল কিন্তু ভাবলাম সদর দরজাটা খুললে অ্যালার্মটা আর বাজবে না। তাই কলিং বেলটা টিপলাম।

সে উঠে এসে শার্সির ভেতর থেকে দেখে খুলে দিল।

আশা করি তোমাকে বিছানা থেকে তুলিনি। রবিবারে কাজ করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি।

ঠিক আছে মিঃ স্কট। আপনি কি অনেকক্ষণ থাকবেন?

পাঁচ মিনিট।

তাহলে আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব, আপনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করবো। আপনি কি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন?

কিছু না বলে এলিভেটরের দিকে গিয়ে অফিসের দরজা খুলে আলমারী খুলে ক্যাশ বাক্স থেকে পাঁচশো ডলার নেওয়ার জন্য সেখানে একটা স্লিপ রেখে দিলাম।

পথে অনেক কিছু ভাবছিলাম। ডলোরেস বলছিল, রসের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে আমাকে প্রতিষেধক দেবে। এর অর্থ হচ্ছে। সে আমাকে এমন কতগুলো তথ্য দেবে যা দিয়ে আমি রসকে ভয় দেখাতে পারি।

পাঁচশো ডলারের নোটগুলো পকেটে রাখতে গিয়ে ভাবছিলাম যে তথ্যটা কি হতে পারে। ডলোরেসকে কতদূর বিশ্বাস করা যায়। রসও বলেছিল তাকে শহর ছেড়ে যেতে হবে। ডলোরেসও বলেছে শহর ছেড়ে যাওয়ার জন্য তার টাকার দরকার। ও'ব্রায়ানের মৃত্যুতে তাদের কোন পরিকল্পনা কি নষ্ট হতে চলেছে?

একজন সাধারণ পুলিশের কর্মচারীর পক্ষে চামড়ার কোট উপহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া কাঁচের মেঝেওয়ালা বাংলোর মালিক হওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোন গোপন আয়ের পথ আছে। তাহলে সে পুলিশের কাজ করে কেন?

দারোয়ানকে গুডনাইট জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বুইকটা যেখানে ছিল সেদিকে যাবার সময় দেখলাম রাস্তার উল্টোদিকের দোকানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমি কিছু বোঝার আগেই সে ছায়ার আড়ালে চলে গেল।

বুইকে ফিরে এসে পাম সিটির কোয়ার্টারগুলোর দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে তাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কালো গাড়িটার মত তাকে দেখে আবার মনে করতে হয়েছিল।

ম্যাডাম আর্মস হচ্ছে ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ের অল্প শৌখিন পাড়াগুলোর আবাসিক অঞ্চল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাথরের ইঁট দিয়ে কোন বাড়ি তৈরি করার পর তাতে আর হাত না দিলে যেমন দেখায় সেরকম দেখাচ্ছিল।

একটা অল্প আলোকিত দেউড়িতে এসে দাঁড়ালাম। ডান দিকে সারি সারি চিঠির বাক্স, সামনে পুরনো ধরনের একটা এলিভেটর এবং ডানদিকে একটা ঘরের বাইরে লেখা দারোয়ান।

প্রাচীর পত্র থেকে বুঝলাম দশ নম্বর ঘর হচ্ছে চারতলায়। এলিভেটার চেপে ঘড়ি দেখলাম দুটো বাজতে তিন মিনিট বাকী।

একটি ছোট প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। যার দুদিকে দরজা। বাঁদিকেই দশ নম্বর ঘর।

দরজায় গায়ে লেখা ছিল, মিস ডলোরেস লেন।

কলিং বেলটা টিপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজার পেছনে চলাফেরার শব্দ পেলাম। দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে তলার শিকলে এসে আটকে গেল।

কে? ডলোরেস বলল।

স্কট। অন্য কে ভেবেছিলেন?

শিকলটা ভিতরে টেনে দেওয়ার জন্য দরজাটা একবার বন্ধ হয়ে তারপরে খুলে গেল।

একটা ধূসর রঙের পোশাকের উপর সে হালকা ট্রাভেলিং কোট পরেছিল। তার মুখ গম্ভীর।

ভিতরে আসুন। এরকম একটা নোংরা জায়গায় বাস করলে রাত দুটোয় কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার আগে সাবধান হওয়া দরকার।

ঘরটা বেশ বড়, ফার্নিশড্ অ্যাপার্টমেন্টে যে ধরনের আসবাবপত্র থাকা উচিত সে তুলনায় নগণ্য আসবাবপত্র। সম্ভবতঃ সে বেশ আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

আমাকে চারপাশে চাইতে দেখে বলল, এসব দিকে তাকাবেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজ এসব ছেড়ে যাচ্ছি। একমাত্র সুবিধা যে ঘরটা খুব সস্তা।

একটা অর্ধেক ভেজান দরজার দিকে চেয়ে মনে হল ঘরটা শোবার ঘর। বিছানার নিচে বড় বড় স্যুটকেশ রয়েছে। সে যাবার জন্য প্রস্তুত।

সে উদ্বেগের সঙ্গে বলল। টাকা এনেছেন?

এনেছি। কিন্তু টাকা দিচ্ছিনা যতক্ষণ না জানতে পারছি আপনি যে খবর দেবেন তার জন্য টাকা দেওয়া যাবে কিনা।

দেওয়া যায়। টাকাটা একবার দেখান।

টাকাটা বার করে তাকে দেখাতেই, সে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, পাঁচশো ডলার?

হ্যাঁ।

এবার আপনাকে দেখাব আমার কাছে কি আছে। বলে সে টেবিলের একটা ড্রয়ার টেনে খুলল।

আমি এতই মূর্খ যে সব সময় ভেবেছিলাম সে একজন স্ত্রীলোক এবং তাকে যে কোন সময় বাগে আনতে পারব।

তার হাত উঠে এল ·৩৮ ইঞ্চি অটোমেটিক রিভলবারে, তার মুখে ভয়ংকর ভাব, নলটার মুখ আমার দিকে তাক করা।

একটুও নড়বেন না। টেবিলের উপর টাকাটা রাখুন।

আমার জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা কেউ বন্দুক উঁচিয়ে আমার দিকে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা বিশ্রী। বন্দুকটা বিপজ্জনক ও মারাত্মক।

এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছি। মুখটা শুকিয়ে আসছে এবং শরীরটা ঠাণ্ডা ও হালকা মনে হচ্ছে।

ওটা বরং নামিয়ে রাখুন। গুলি বেরিয়ে আসবে।

টেবিলে টাকা না রাখলে এখনই গুলি বেরিয়ে আসবে।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে সে বাঁ দিকে কিছুটা সরে হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালাল।

গুলির শব্দ শোনার মত এই তলায় কেউ নেই। নিচের তলার লোকটা কানে শুনতে পায় না সে ভাববে এটা গাড়ির ব্ল্যাংক ফায়ারিং অথবা কিছুই শুনতে পাবে না।

ভয়ানক জোর বাজনার সুরে ঘরটা ভরে উঠল, কোনো স্টেশনের গান লাউড স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল।

টেবিলে টাকা রাখুন নইলে গুলি করে মারব।

বোঝা গেল সে মিথ্যা বলছে না। বুকটা কেঁপে উঠল। ট্রিগারে তার আঙ্গুল, যে কোন সময় গুলি বেরিয়ে আসবে।

প্রসাধন সত্ত্বেও সে ঘামছে।

দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম। ডলারের নোটগুলো নিয়ে সে তার ওভারকোটের পকেটে রাখল।

স্বাভাবিক গলায় বললাম। বেশি দূর যেতে হবে না। পুলিশ ধরে ফেলবে।

চালাকি করবেন না। আপনি যদি পুলিশকে আমার সম্বন্ধে বলেন। আমিও তাদের আপনার সম্বন্ধে বলব। আপনার সম্বন্ধে শুধু অসকার রসই জানে না, আমিও সব জানি। আমি চোর নই। ব্ল্যাকমেলার নই। কিন্তু শহরে থেকে যেভাবেই হোক আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। হঠাৎ সাহসী হবার চেষ্টা করে আমাকে বাইরে যেতে বাধা দেবেন না, তাহলেই গুলি করব। এবার ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। নড়বার চেষ্টা করবেন না।

তার চোখে একটা নিষ্ঠুর ভয়ার্ত ভাব। তার কথামত কাজ না করলেই সে গুলি করবে। পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম।

শোবার ঘরে গিয়ে তার স্যুটকেসটা নিয়ে যাচ্ছে।

চলি মিঃ স্কট, আপনি অনেক উপকার করেছেন। ধাপ্পা দেওয়ার জন্য দুঃখিত,কিন্তু আপনি যদি বোকার মত ফাঁদে পা দেন তাহলে আমার দোষ কি?

দরজা বন্ধ হওয়ার ও চাবি লাগানোর শব্দ পেলাম।

দেয়াল থেকে সরে রেডিওটা বন্ধ করে দরজার দিকে যেতে গিয়ে বাইরে প্যাসেজে ডলোরেসকে ভয়ে চীৎকার করে উঠতে শুনলাম, না। আমার কাছ থেকে সরে যাও। না...খবরদার না...

বুকটা দুরদুর করে কাঁপছিল। তার গলার স্বর আতঙ্কে পূর্ণ।

চীৎকারের পরেই একটা ধস্তাধস্তির শব্দ, তারপরেই একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল।

সে আবার আর্ত চীৎকার করে উঠল তারপরেই নিস্তব্ধ।

আমি কান পেতে শুনছিলাম এলিভেটারের গ্রিল বন্ধ হওয়ার ও নিচের দিকে নামার শব্দ।

রাস্তা থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট করে একটা গাড়ি দ্রুত চলে গেল।

একটা নিস্তব্ধতা চারিদিকে আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। এরপর খুব আস্তে একটা ভয়ংকর ধরনের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ দরজার ওপাশ থেকে এল। সে শব্দে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলাম। টেলিফোন বাজতে থাকল, দরজার হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

ভয়ানক মজবুত দরজা ভেঙ্গে ফেলার আশা নেই তাছাড়া জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পর্দা সরিয়ে নিচের দিকে চাইলাম। না, সেদিক দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, এখানেও কোন পথ নেই।

বসবার ঘরে ফিরলাম। টেলিফোনের আওয়াজ আমার নার্ভে আঘাত করছিল।

ঘরের ওপাশে আর একটা দরজা রান্নাঘরের ও বাথরুমের। উপরের জানলা খুব ছোট্ট।

রিসিভারটা তুলে টেবিলে রাখলাম, রিসিভার থেকে একজন পুরুষের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো।

ডলি? ডলি বলছ? আমি এড। আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে...।

রান্নাঘরে গিয়ে খুঁজলাম যদি শক্ত কিছু পাওয়া যায়। যা দিয়ে দরজা ভাঙ্গা যেতে পারে কিন্তু কিছুই পেলাম না।

দরজার কাছে ফিরে এলাম। চাবির গর্তে চোখ রেখে দেখলাম তখনও তালায় চাবি ঢোকানো।

ভুতুড়ে শব্দের মত তখনও রিসিভার থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। চেয়ারের উপর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলাম।

আবার রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে ক্যাবিনেটের ড্রয়ার হাতড়ে একটা সরু প্লায়ার্স পেলাম। সেটা দিয়ে একটু চেষ্টা করতেই চাবিটা দরজার তালা থেকে বেরিয়ে খবরের কাগজের উপর পড়ল।

খুব আস্তে খবরের কাগজের পাতাটা টেনে চাবিটা তুলে নিলাম।

টেলিফোনের কাছে এসে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দরজার কাছে ফিরে তালায় চাবিটা পরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম।

স্বল্প আলোকিত প্যাসেজে এসে দেখলাম এলিভেটরের পাশে মুখ নিচু করে ডলোরেস পড়ে। তার কোটটা জড়ো হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। মারা না গেলে কেউ এভাবে পড়ে থাকে না। আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল।

বসার ঘরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ধীরে ধীরে প্যাসেজে এসে ঝুঁকে ওকে দেখলাম তার মুখ অন্যদিকে ঘোরান। তবু তার চুলে রক্ত দেখলাম।

কাঁধটা ধরে তাকে চিৎ করে দিলাম।

ডানদিকের কপালে কেউ মারাত্মকভাবে আঘাত করে খুলির হাড় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

তার কোটের পকেটে হাত দিলাম পাঁচশো ডলার আর তার স্যুটকেশ অদৃশ্য হয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে সরে এলাম। কারণ কেউ দেখলে ভাববে আমিই তাকে হত্যা করেছি।

একথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

প্রায় অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছি। এমন সময় একজন মহিলাকে উঠে আসতে দেখলাম।

প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে স্বাভাবিক ভাবে নামতে লাগলাম।

সিঁড়িতে স্বল্প আলোতে ভালভাবেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম এবং মেয়েটিও আমাকে দেখল।

সে যুবতী ও সুন্দরী। মলিন ফ্যাকাশে ও একটা মিষ্টি ভাব তার মুখে ছিল, চোখের নিচে কালি। তার কালো কোটের নিচে ফুলকাটা সান্ধ্য পোশাক দেখা যাচ্ছিল। মাথায় একটা লাল রিবন বাঁধা।

সে সোজা উপরে উঠে গেল।

যদি সে চারতলায় যায় তবে ডলোরেসের মৃতদেহে হোঁচট খাবে। তার চীৎকারে পুলিশ এসে পড়ার আগেই পালাতে হবে।

হল ঘরে এসে উপরতলার কোথাও দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম তার ঘর নিশ্চয়ই তিনতলায়। সাবধানে দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম। রাস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে যেখানে বুইকটা রেখেছিলাম সেখানে এলাম।

ভিতরে এসে ভীষণ খারাপ লাগছিল। ডলোরেসকে মৃত দেখে মনে দুঃখ হচ্ছিল। চোখ বন্ধ করে মনের দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম।

একটা গাড়ির শব্দে ধাতস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি চাবিটা স্টিয়ারিং-এর তালার গর্তে বসালাম।

স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি আমার পাশ কাটিয়ে ম্যাডক্স আর্মসের সামনে এসে দাঁড়াল। স্যুটকেশ হাতে একজন এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে সে ছুটে দেউড়ির দিকে চলে গেল।

ট্যাক্সিটাকে চলে যেতে দেখে ইতস্তত করছিলাম, এই লোকটাই কি এড, যে টেলিফোনে কথা বলছিল?

রাস্তায় এসে প্রথম বাঁক নিয়েই ব্রেক কষে পাশের রাস্তায় যেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে সেখানে গাড়িটা দাঁড় করালাম। ভাবলাম লোকটা যদি এড হয় তবে তাকে ভালভাবে না দেখলে সত্যিই বোকামি হবে।

বুইকটা দাঁড় করিয়ে আস্তে আস্তে ম্যাডক্স অ্যাভিনিউর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

ম্যাডক্স আর্মসের প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে একটা ছায়া ছায়া জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্যুটকেশ হাতে লোকটা পাঁচ-ছয় মিনিট পরে বেরিয়ে এল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে তার দিকে এমন ভাবে এগোতে লাগলাম যেন পার্টি থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার।

আমাকে দেখে স্যুটকেশ হাতে লোকটা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগল।

আমি পিছু নিলাম কিন্তু সে যাতে বুঝতে না পারে যে আমি তাকে অনুসরণ করছি সেদিকে খেয়াল রাখলাম।

সে চৌমাথায় এসে আমার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল।

আমি ছুটতে শুরু করলাম সে চোখের আড়াল হওয়ামাত্র। সে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। সেখানে তিনটে ট্যাক্সি ছিল। প্রথমটায় ঢুকে ড্রাইভারকে বললাম, ঐ ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন। যদি ওটাকে চোখের আড়ালে যেতে না দেন তাহলে পাঁচ ডলার বেশি পাবেন। খুব কাছে যাবেন না।

ট্যাক্সির দরজা লাগাবার আগেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

আমাদের দেখে ফেলার বিশেষ কোন ভয় নেই। ওদের লুকিয়ে পড়ার মত গাড়িও রাস্তায় নেই। আমার বন্ধুকে বলতে শুনলাম ওয়াশিংটন হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য।

মত পালটাতেও পারে। কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাই না।

ড্রাইভার বলল কোথায় গিয়েছে আলফ্রেড আমাকে বলে দেবে, সবচেয়ে ভাল হয় যদি সোজা ওয়াশিংটন হোটেলে যাই। নইলে লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে।

ঠিক আছে। প্রথমে তবে ওয়াশিংটন হোটেলেই চলুন।

ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দিল। আপনি বুঝি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!

হ্যাঁ, বললাম কারণ না বললে অনেক কথা বলতে হয়। এই লোকটাকে হাতছাড়া করলে আমার চাকরি চলে যাবে।

ঐ লোকটা হাতছাড়া হবে না। আমি আপনাকে ঠিক নিয়ে যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময় সে হোটেলের পঞ্চাশ গজের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে দাঁত বার করে

বলল, দেখুন, সে এখনও এসে পৌঁছায়নি। নিশ্চয়ই এখানে আসবে। আমি কি অপেক্ষা করব?

হ্যাঁ।

সিগারেট বার করে তাকে দিলাম। দুজনেই ধরালাম।

ট্যাক্সির ভিতরেই বসে উইন্ড স্ক্রীনের ভিতর দিয়ে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

ওয়াশিংটন একটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল। পাম সিটিতে যে সব ট্রাভেলিং সেলসম্যান আসে তারাই এটা ব্যবহার করে। এর একমাত্র সুবিধা রেল স্টেশনের খুব কাছে।

চুপচাপ বসে পাঁচ মিনিট ধরে ভাবছিলাম তখন ট্যাক্সিটা এসে হোটেলের সামনে দাঁড়াল।

ড্রাইভারকে পয়সা মিটিয়ে স্যুটকেশ হাতে লোকটা হোটেলে ঢুকে গেল।

আমার ড্রাইভার বলল ঐ দেখুন। আপনাকে আর কি বলব?

তাকে পাঁচ ডলার দিয়ে ধন্যবাদ বললাম। ভিতরে গিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বলব।

কোন সাহায্য দরকার?

ঠিক আছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে কাঁচের দরজার বাইরে দাঁড়ালাম। স্যুটকেস হাতে লোকটা রাতের কেরানীটার সঙ্গে কথা বলছিল। ছাদ থেকে ঝোলানো আলোর ছটায় তাকে বেশ ভালভাবে দেখলাম।

সে যে শ্রেণীর মানুষ তাতে তার সঙ্গে ডলোরেস বাইরে যাবে আশা করা যায় না। বেঁটে, মোটা বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে। কাপড় চোপড় ভয়ংকর ময়লা, নীল স্যুটের কনুইগুলো ময়লা লেগে চকচক করছিল। মাথার টুপি ময়লা তেলচিটে। শুধু টাইটা নতুন আনকোরা নীল রঙের চকচকে মাঝখানে হলুদ সুতোয় একটা ঘোড়ার মুখ আঁকা।

সে কেরানীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা ময়লা রুমাল দিয়ে বারবার মুখ মুছছিল। তাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল।

শেষে কেরানীকে কিছু পয়সা দিতে সে রেজিস্টারটা তার দিকে এগিয়ে দিল। খাতায় সই করে কাউন্টারের উপর থেকে চাবি, স্যুটকেশ তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তারপরে কাঁচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

।। দুই ।।

ভাবলেশহীন বুড়ো খিটখিটে কেরানীটি আমাকে আসতে দেখল।

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তাকে ভালভাবে দেখার পর মনে হল, এসব লোককে বাগে আনার একমাত্র পথ ঐ। তার পোশাক দেখে মনে হল সে অত্যন্ত দরিদ্র।

গম্ভীর ভাবে বললাম। যে লোকটা এইমাত্র উপরে গেল আমি তার সম্বন্ধে জানতে চাই।

ওয়ালেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বার করে আঙ্গুলের ফাঁকে নোটটাকে অনেকটা পতাকার মত করে ধরে তার কাছ থেকে ফুট তিনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের উপর হাত রাখলাম।

কেরানীর চোখ আমার হাতের দিকে সরে গেল, মুখে অল্প হিংস্রভাব ফুটে উঠল।

আমাদের খদ্দেরদের ব্যাপারে কোন খবর দিই না। আপনি কে মহাশয়?

আমি একজন মানুষ যে দশ ডলার দিয়ে খবর কেনে।

মনে হলসে আমাকে বিচিত্র ধরনের শাঁসালো মানুষ ভেবেছে।

আপনি নিশ্চয়ই পুলিশের লোক নন বা প্রাইভেট ডিটেকটিভও নন।

আমি কে জানার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটার নাম কি?

তার হাত দুটো এগিয়ে এল। তার হাত আসা মাত্র আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

লোকটার নাম কি?

জানি না। তবে নিশ্চয় বলতে পারি খাতায় যা লিখেছে তা নয়।

খাতাটা এগিয়ে দিতেই পড়লাম ঃ জন টার্নার সানফ্রান্সিস্কো। খুব ছোট্ট করে বিশ্রীভাবে লেখা।

সে বলল, এ রকম টার্নারের জন্য যদি দশ ডলার করে পাই তবে বেশ বড়লোক হয়ে উঠতে

পারি। এ চাকরিটা ছেড়েও দিতে পারি।

সে কি বলেছে যে এত রাতে কেন এসেছে। কিংবা কদিন এখানে থাকবে?

কেরানীটি কাঁধ নাচাল।

যদি টাকা পাই মশায় তবে স্মৃতি শক্তিও জেগে উঠবে।

কাউন্টারে নোটটা রাখলাম

এখানেই থাকতে দিন। এর উপর নজর রাখুন।

সে নোটটার উপর ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি জানতে চান মশায়?

আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

সে বলল যে শেষ ট্রেন ফেল করেছে, কাল ভোরে ট্রেন ধরবে। তাকে সকাল সাতটায় ডেকে দিতে হবে।

ট্রেনে কোথায় যাবে?

কিছুই বলেনি। তবে সানফ্রান্সিস্কো নয়। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সানফ্রান্সিস্কো যাবার কোন ট্রেন নেই। সান ডিয়েগো হতে পারে। সান ডিয়েগো যাবার ট্রেন সকাল সাড়ে সাতটায় ছাড়বে।

ওর রুম নাম্বার কত?

কেরানী নোটটা খুব আস্তে আস্তে তার দিকে টানতে লাগল।

আঠাশ নম্বর ঘর। তবে হঠাৎ কিছু একটা করে বসবেন না। ঘর ভাড়া না নিলে কাউকে উপরে যেতে দেওয়া হয় না।

সাতাশ বা উনত্রিশ নম্বর ঘর খালি আছে!

কী বোর্ড থেকে ঝুলে থাকা চাবির সারির দিকে দেখল। নোটের উপর থেকে আঙ্গুল না সরিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে উনত্রিশ নম্বর ঘরের চাবিটা হুক থেকে বার করে আনল।

চাবিটা আমার সামনে রেখে মাছি ধরবার আগে টিকটিকিরা যেমন জোরে ছোটে সেইভাবে দ্রুতগতিতে দশ ডলারের নোটটাকে অদৃশ্য করে দিল।

রাতের জন্য দু ডলার। খারাপ ঘর নয়। অন্তত তার চেয়ে ভাল।

দু ডলার রেখে চাবিটা নিলাম।

যদি কোন কারণে ঘুমিয়ে পড়ি। তবে সকাল সাড়ে ছটায় আমাকে ডেকে দেবেন।

ঠিক আছে। উপর তলায়, দোতলায়। সিঁড়ির মুখে বাঁ দিকে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে দোতলায় এলাম।

প্যাসেজের আলো অত্যন্ত কম। কার্পেটটা অত্যন্ত নোংরা ও রং ওঠা। বাঁধাকপি ধোয়া জলের গন্ধ ফুটো পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা জল এবং আধোয়া জিনিসপত্র প্যাসেজে পড়েছিল। ওয়াশিংটন অবশ্য পাম সিটির প্রথম শ্রেণীর হোটেল নয়।

আঠাশ নম্বর ঘরের সামনে এসে কান পেতে রইলাম। কোন শব্দ না পেয়ে উনত্রিশ নম্বর ঘরের দিকে গেলাম। তালা খুলে সুইচ হাতড়ে আলোটা জ্বালালাম।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চারদিকে চাইলাম। একটা খরগোসের বাসস্থান বলা চলে।

একটা বিছানা একটা টয়লেট বেসিন এবং দুটো চেয়ার। বিছানার উপর দিকে দেয়ালে একটা মেয়ের ছবি টাঙ্গানে' রয়েছে মেয়েটার দুটো পাখা. পিছনে রেশমের জাল ছড়ানো আছে। সে দু হাতের মুঠো দিয়ে একটা লোহার দরজায় জোরে ঘা মারছে। সম্ভবতঃ মেয়েটি প্রণয়ের প্রতীক। যাকে দরজার ভিতর বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঘরে এসে বিছানায় শুলাম।

তখন আমার হাতঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ। হঠাৎ মনে হল যেন জঙ্গলে এসে পড়েছি। আজকের শনিবারটা আমার জীবনের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল ও দুর্যোগপূর্ণ দিন। ভাবছিলাম এর পরে কোথায় যাব।

ঘুমোবার লোভ সামলাতে পারছিলাম না এমন সময় টেলিফোনের শব্দ। রিসিভার তুললে যে শব্দটা হয় পাশের ঘর থেকে এল।

শোনার চেষ্টা করলাম।

যে লোকটা হোটেলের রেজিস্টারে টার্নার নাম লিখেছে সে বলল, আমাকে এক বোতল স্কচ ও বরফ পাঠান।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর কড়াগলায় সে বলল, আজে বাজে কথা শুনতে চাই না। কোন তর্কাতর্কি না করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বেশ কষ্ট করেই বিছানা ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে আলো নিভিয়ে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরে সিঁড়ির উপর পা টেনে টেনে হাঁটার শব্দ পেলাম। একটা পাঁচ ডলারের নোট বার করলাম।

রাতের সেই কেরানীটা করিডর দিয়ে আসছিল হাতে একটা ট্রে, ট্রের উপর এক বোতল হুইস্কি ও এক পাত্র বরফ।

যখন সে পঁচিশ নম্বর ঘরের সামনে এল অমনি আমি তার সামনে এসে পাঁচ ডলারের নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে ট্রে টা তার হাত থেকে নিলাম।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেভাবে মাংসের টুকরো ছোঁ মেরে নেয়, সেইভাবে সে পাঁচ ডলারের নোটটা নিল। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আঠাশ নম্বর ঘরের দিকে চেয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আঠাশ নম্বর ঘরে টোকা মারলাম।

কে?

রুম সার্ভিস।

দরজায় চাবি ঘোরাতে শুনলাম, কপাটে খুব জোরে চাপ দিলাম সশব্দে দরজা খুলে গেল। টার্নার বা এড যেই হোক টাল খেয়ে ভিতরে সরে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম।

ষাট বছরেও তার ক্ষমতা অসাধারণ। সঙ্গে সঙ্গে সে পাক খেয়ে বিছানার উপর রাখা কোল্ট ৪৫ পিস্তলটা নিতে ছুটল।

আমি ছুটে গিয়ে বিছানায় তাকে চেপে ধরলাম। তার হাত পিস্তলের ওপর। আমার হাত তার ওপর, কিছুক্ষণ দুজনে বল প্রয়োগ করলাম।

তার মুঠো থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলাম। সে যখন উঠে বসল একেবারে পিস্তলের মুখে। তার অভিজ্ঞতা যেন আরও বেশি।

বললাম, বিশ্রাম নাও। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সে গম্ভীর ও কাঁপা গলায় বলল, তুমি কে?

আমি কে জানার কোন প্রয়োজন নেই। দরজার বাইরে মদ আছে। যদি নিয়ে আস দুজনে খেয়ে গল্প করা যাবে।

তার প্রয়োজনের তাগিদে সে বিছানা থেকে একরকম ছুটে গিয়ে ট্রেটা এমনভাবে নিয়ে এল যেন তার জীবন এর উপর নির্ভর করছে।

সে যখন গ্লাসে স্কচ ঢালছিল আমি দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলাম।

সে এক চুমুকে স্কচটা শেষ করে আবার পানীয় তৈরি করতে লাগল।

আস্তে বললাম, আমার কিন্তু বরফ দরকার।

সে গর্জন করে উঠল, তুমি কে? কি চাও?

গলার স্বর দৃঢ় করে বললাম, আমি প্রশ্ন করব এবং তুমি উত্তর দেবে। যখন ডলোরেসকে ঐ অবস্থায় দেখলে তখন কেন পুলিশকে খবর দিলে না।

রক্তশূন্য মুখে সে বলল, ওর কি হয়েছিল তুমি জান?

জানি। তোমাকে ভিতরে ঢুকতে ও বেরিয়ে আসতে দেখেছি। পুলিশকে কেন খবর দাও নি?

তাতে কি লাভ হত?

তোমার নাম কি?

টার্নার। জন টার্নার।

ঠিক আছে তুমি যদি এরকমই চাও বলে ভারী পিস্তলটা তুলে নিলাম। ডিটেকটিভ গল্পে ৪৫

বোরের পিস্তলের কথা শুনেছি কিন্তু এই প্রথম ব্যবহার করছি।

উঠে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। আমি পুলিশ ডাকছি।

সে কর্কশ স্বরে বলল, এক মিনিট। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি তাকে ঐ অবস্থায় দেখি। কেউ যেন তার মাথায় জোরে আঘাত করেছিল।

তোমার নাম কি?

এড নাটলে। আমি তার এজেন্ট ছিলাম।

মনে পড়ল ডলোরেস কোন এক এজেন্টের কথা উল্লেখ করেছিল।

পুলিশকে কেন খবর দাওনি?

মদের প্রভাবে তার নার্ভ শক্ত হয়ে উঠল, তাতে তোমার কি? সোজাসুজি বল তুমি কে? তুমি পুলিশের লোক নও। খবরের কাগজের লোক নও, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হলে অবাক হব না, ঠিক করে বল তুমি কে?

দেখ, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে পুলিশ ডাকব।

সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বলল, আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম।

ঠিক আছে, এখন তবে ডাক। ভাবলাম সে হয়তো টেলিফোনের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো সিগারেটের বাক্স এনে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল।

আমি তোমাকে চিনি। ধস্তাধস্তিতে হেরে যাবার আগেই তোমাকে চেনা উচিত ছিল। তুমিই তার রেলের ভাড়ার টাকা জুগিয়েছিলে না?

৪৫ পিস্তলটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে তার কাছে এসে একটা গ্লাস তুলে এক ঢোঁক খেলাম। মদটা হাতে করেই চেয়ারে বসলাম।

যদি সেই লোকই হই তাতে কি হয়েছে?

আচ্ছা তাহলে তুমি তাকে টাকা দিয়েছিলে?

তুমি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি জানতে চাই, যখন তুমি দেখলে যে তাকে খুন করা হয়েছে। তখন পুলিশ ডাকলে না কেন? তুমি আমাকে সব কিছু খুলে বল, নইলে আমি থানায় গিয়ে সব বলে দেব।

সে ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তারা হয়তো ভাববে আমিই ওকে খুন করেছি। এই নয় যে আমি তাকে আগে সাবধান করে দিইনি...। সে থেমে মুখ বাঁকাল, আমি কোন কিছুতেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাই না।

কিসের জন্যে তাকে সাবধান করেছিলে?

গ্লাসের সবটুকু এক চুমুকে খেয়ে আরও হুইস্কি ঢেলে বলল, জানি না কেন তোমার সঙ্গে কথা বলছি। হয়ত আমি মাতাল তবুও তুমি যদি জানতে চাও তবে বলছি। ঐ পুলিশের লোকটাকে বিয়ে করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছিল।

কেন তাকে এই জন্যে সাবধান করেছিলে?

হুইস্কি গিলে নিয়ে আমার দিকে ঘোলাটে চোখে চেয়ে বলল, কারণ লোকটা ভাল ছিল না। ডোলোরেস সে কথা মানতে চায় না। তার নোংরা হাতে গ্লাসটা ঘোরাতে সে গর্জন করে উঠল, আমি যাই বলি সে শুনতে চায় না। আমি যখন বলতাম সে নোংরা ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। ও'ব্রায়ান যে বিলাসে দিন কাটাত সে ভাবে পুলিশের পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, যদি না সে দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ডলোরেস কথা শুনতো না। ভাবতো বিয়ে করলে বিনোদিনীর জীবন যাপনের আর দরকার হবে না। আর একটু খেয়ে নিল। তারপর বলল, এর পরিণতি হল মাথা ভেঙ্গে মৃত্যু।

ও'ব্রায়ানের দুর্নীতি? চেয়ারের ধারে এসে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে ধূর্তের মত চাইল।

জানি না।

ডলোরেস চলে যেতে চাইছিল?

কারণ কোন আকর্ষণ ছিল না। তার শখ ছিল মেক্সিকো দেখার।

সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কারণটা কি?

একটু হুইস্কি খেল।

তুমি কি টাকা দিয়েছিলে?

টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু যে তাকে হত্যা করেছে সে টাকা নিয়ে পালিয়েছে, বললাম।

মনে হচ্ছে মাতাল হয়ে পড়েছি। আমাকে ভাবতে দাও। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, এর অর্থ হচ্ছে সে মৃত, তুমি আগেই জানতে। পাঁচশো ডলারের জন্য সে তোমাকে গেঁথেছিল, এই মাত্র বললে যে তুমি টাকা দিয়েছিলে। আমি এখন আধ-মাতাল, তাহলেও আমি বোকা নই। এমনও হতে পারে যে তুমি তাকে হত্যা করেছিলে। হ্যাঁ...হতে পারে। মনে হয় পুলিশের কাছে খবরটা দেওয়া বৃথা হবে না। আমার চেয়ে তোমার ব্যাপারেই কৌতূহল বেশি হবে। তাকে হত্যা করার আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তোমার ছিল।

আমি তাকে হত্যা করিনি, বললাম চোখের দিকে চেয়ে, এবং আমার ধারণা তুমি তাকে হত্যা কর নি। যদি তুমি মনস্থির করে থাক তবে দুজনেই থানায় যাওয়া যাক, পুলিশই ঠিক করবে কে দোষী।

ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস করি, সে বলল। মেয়েটা মারা গিয়েছে। কোনমতেই তার জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যেই মরুক না কেন আমার কিছু এসে যায় না। অতীতে বহুবার পুলিশের ঝামেলায় পড়েছি। তবে এসব ঝামেলা থেকে সরে দাঁড়ানই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি তুমি আমাকে একটু ঘুমোতে দাও ভাল হয়। সকালের ট্রেন ধরতে হবে, শরীরটা খারাপ লাগছে।

একটু পরেই ঘুমাও তুমি কি রসকে চেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি কাউকে চিনি না, আমার কথা শোন, যদি বাঁচতে চাও তবে এই শহরের কাউকে চিনতে চাইবে না। এবার কি ঘুমাতে দেবে?

তুমি কি মনে কর রস তাকে হত্যা করেছে?

রস? রসিকতা করছ? একটা মাছি মারার মত সাহস তার নেই।

তাহলে কি আর্ট গ্যালগানো তাকে হত্যা করেছে?

মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। একটু চুপ করে ফিস ফিস করে বলল, আমি জানি না কে হত্যা করেছে। এখন বিদায় হও!

মনে হলো বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না। মনে মনে ভাবলাম সকালে একবার চেষ্টা করা যাবে।

যাওয়ার আগে দেখা করব, যেতে যেতে বললাম। সব কিছু জানা হল না, কি বল?

আরে ভুলে যাও, এই নোংরা শহর সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার বেরোতে পারলেই বাঁচি।

তাকে দেখছিলাম, মোটেই সুন্দর দেখাচ্ছিল না।

স্বল্প আলোকিত প্যাসেজে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। নোংরা দুর্গন্ধে ভরা হোটেলে বাকী রাতটুকু কাটাবার ইচ্ছা ছিল না, এখান থেকে বাংলো এই দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে যাবার মত অবস্থা আমার ছিল না।

উনত্রিশ নম্বর ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাবলাম শরীরের বিশ্রাম দরকার।

সারাদিনের ঘটনাগুলো চিন্তা করছিলাম. নাটলের কাছে যেটুকু জানা গেল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এতই ক্লান্ত যে দু-এক মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে জেগে উঠলাম। সোজা হয়ে বসলাম, হৃৎপিণ্ডটা জোরে কাঁপছিল। অন্ধকারে চেয়ে রইলাম। একটু বাদেই প্যাসেজে মৃদু কিন্তু দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে আলো না জ্বেলেই দরজা খুলে প্যাসেজে উঁকি দিলাম।

নাটলের ঘর থেকে পোড়া বারুদের গন্ধ ভেসে আসছিল। তার ঘরের দরজা আধ ভেজানো। আলো জ্বলছে।

দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে দেখলাম।

ঘরের এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। তার পরনে নোংরা পাজামা। পা দুটো খালি। জামার বুক পকেটের নিচে দলা দলা রক্ত।

এখন আর তার জন্য কেউ কিছুই করতে পারবে না।

সে এখন অন্য জগতে।

নিচে কোন মহিলার আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

আমার নিজেরও তখন ভয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

আমি যেন দুঃস্বপ্নের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মৃত মানুষদের মধ্যে সময় কাটাচ্ছি।

নাটলের দিকে চেয়ে বুঝলাম এই হোটেলে কেউ আমাকে দেখতে পেলে চলবে না এবং পুলিশ আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে।

মহিলাটি প্যাসেজের কোথাও দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছিলেন এবং উপর তলার আর একজন মেয়ে চীৎকারে যোগ দিল।

চীৎকার করতে থাকা মেয়েটা এবার জানালা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, পুলিশ! খুন! পুলিশ! ভয়ে এবার ছুটতে লাগলাম। ভয়ঙ্কর জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আর একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রাতের কেরানীটি ডেস্কের উপর মুখ নিচু করে শুয়ে ছিল, তার মাথার চারপাশে রক্ত। তার ডানদিকের কপালে কেউ ভীষণ জোরে আঘাত করছে, একই ভাবে ডলোরেস লেনকে হত্যা করা হয়েছিল।

মৃতদেহটা দেখবার জন্য দাঁড়ালাম কিন্তু দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনে ভয়ে আমার শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল।

কাঁচের দরজা দিয়ে যাবার পথটা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে, কম্পিত বুক নিয়ে সেদিকে ছুটলাম। খেয়াল হল যদি এই পথে যাই পুলিশের গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ব।

রিসেপশান ডেস্কের ঠিক পেছনে একটা দরজায় লেখা 'সার্ভিস'।

কাউন্টারের পাশ দিয়ে ছুটে প্যাসেজে এলাম। অল্প আলোতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে আর একটা প্যাসেজ পেলাম যেটা রান্নাঘরে পৌঁছেছে। একটা দরজার সামনে লেখা 'ফায়ার এক্সিট'।

শক্ত করে আটকানো ছিটকিনি খুলে একটা অন্ধকার গলি পেলাম।

দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়েই গলি দিয়ে সদর রাস্তায় এলাম। গলির শেষে এসে রাস্তার দুপাশে চেয়ে দেখলাম।

হোটেলের প্রবেশ পথে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোন পুলিশের লোক নেই।

অন্ধকারে ক্লান্ত পা দুটো টেনে রাস্তার উল্টো দিকে ছুটলাম।

দুটো রাস্তা পেরিয়ে যখন হাঁটছি তখন একটা ট্যাক্সি উল্টোদিক থেকে আমার দিকে আসছে। ট্যাক্সিটা দাঁড় করালে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তখন এত ক্লান্ত যে এসব বিবেচনা করার মত অবস্থা ছিল না।

হাত নাড়তেই ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। ড্রাইভারকে বললাম, ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ে নিয়ে যেতে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ে এসে পৌঁছলাম। ম্যাডক্স আর্মস পেরিয়ে যাবার সময় জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

পুলিশের তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির পাশে পাঁচজন উর্দিপরা এবং একজন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। ঠিক পরের মোড়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিলাম। ট্যাক্সিটা চলে যেতে যেখানে বুইকটা রেখেছিলাম সেখানে এলাম।

সেখান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম সাড়ে তিনটে বাজে। বাংলোয় যাবার পথে ভাবছিলাম, আজকের রাতটা কী ভয়ঙ্কর।

শুধু একটি পুলিশের মৃত্যুর সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়েছি তা নয়। এখন আমি তিনটে হত্যা কাণ্ডের

সঙ্গে জড়িত। এর অবশ্যম্ভাবী ফল যাচিয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

বাংলোতে চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এসে পৌঁছলাম।

সদর দরজার তালা খুলে অন্ধকার হলঘরে এসে পড়লাম। আলো জ্বালার প্রয়োজন হল না। হলঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে শোবার ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে ভিতরে ঢুকলাম।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম, একটা মিষ্টি মৃদু গন্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাসকে ভরিয়ে তুলেছে, এ ধরনের গন্ধ জীবনে কোনদিন শোবার ঘরে পাইনি।

আলোটা জ্বালতেই দেখলাম আমার বিছানায় বাদামি রঙের চুলে মুখটা অর্ধেক ঢেকে নগ্ন হাত দুটো বিছানার চাদরে এলিয়ে দিয়ে লুসিলি শুয়ে আছে। মরে গেছে না ঘুমিয়ে আছে বুঝলাম না।

নড়াচড়ার বা নিঃশ্বাস ফেলার কোন লক্ষণ দেখলাম না। আমার বিছানায় তাকে দেখতে পাওয়া এক চরম বিস্ময়। সে হয়তো মৃত।

আজ রাতে তিনজন লোক মারা গেছে, এ হয়ত চতুর্থ। তিনজন মারা যাওয়ার পরে পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু লুসিলি মারা গেলে পালিয়ে যেতে পারব না। তাকে কোনদিনও ভুলতে পারব না, কারণ সে আমার বাংলোয়, আমার বিছানায় মরে পড়ে আছে।

বিছানার কাছে এসে কাঁপা হাতে আস্তে তার বাহুতে হাত দিলাম।

লুসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। যেন আলোটা এড়াতে চাইছে।

স্বস্তি পেয়ে সরে এলাম। তার পোশাক মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, এক জোড়া বাসন্তী রঙের স্ল্যাক্‌স। একটা সাদা জামা, এক জোড়া প্যান্টি এবং চেয়ারে একটি ব্রা।

ভাবতে পারছিলাম না। সে কেন আমার বিছানায় শুয়ে আছে, এবং তার ফল কি হতে পারে।

এখন আমার ঘুমের দরকার।

পাশের অব্যবহৃত শোবার ঘরটার গিয়ে জামা কাপড় খুলে বিছানার চাদরটা টেনে শুয়ে পড়লাম।

বালিশে যখন মাথা রাখলাম। মনে হল যেন অতলে ভেসে যাচ্ছি। আমার বিছানায় লুসিলি। ভাঙ্গা ক্যাডিলাক, পুলিশের ভয় এবং অসকার রসের ভয়াবহতা—সব গুলিয়ে যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমার সমস্যা ও ভয় আড়ালে বসে অপেক্ষা করছিল, কখন আমার ঘুম ভাঙে।

।। দুই ।।

চোখ খুলে দেখি বিছানার পাশে ঘড়িতে এগারটা বেজে পাঁচ। কাঠের খড়খড়ির ভিতর দিয়ে সূর্যের প্রখর কিরণ এসে পড়েছে।

চুপ করে শুয়ে কিছুক্ষণ ভাবছিলাম গত রাতের ঘটনাগুলো কি সত্যিই ঘটেছে না আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুম একেবারে ছুটে যেতে যখন বুঝতে পারলাম এসব কল্পনা নয়, গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে স্নানের পোশাক নিয়ে বাথরুমে গেলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে চলাফেরার শব্দ পেলাম। একটু পরেই দরজা খুলে দোরগোড়ায় লুসিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

বললাম, এই যে, অতিরিক্ত বিছানাটা ব্যবহার করনি কেন? নাকি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল?

লজ্জিত ভাবে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তোমার জন্য। এত ক্লান্ত ছিলাম যে কখন তোমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আর ঘুমের মধ্যেই বুঝি জামাকাপড় খুলে ঘরময় ছড়িয়ে বিছানার চাদরের মধ্যে ঢুকেছিলে? আশা করি তুমি আমার মতই ঘুমিয়েছিলে। আমি একটু বেড়িয়ে ফিরেছিলাম, ভাবলাম তোমাকে জাগানো ঠিক হবে না। তা এখানে আসার কি কারণ ছিল, না ভেবেছিলে যে বিছানার পরিবর্তন হলে গেবলসে রাত কাটানোর একঘেয়েমি কাটবে।

তুমি বলেছিলে সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছ। কিন্তু সেটা কি বলনি, সেটা জানতেই এখানে এসেছিলাম।

আচ্ছা, ভিতরে ঢুকলে কি করে?

আমি—আমি একটা জানলা খোলা দেখতে পাই।

সেটা আমার গাফিলতির জন্য হয়েছে। দেখ, শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ের মত সাইকেলে চেপে এখন চলে যাবে? আজ সকালে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম চাই।

চেস, একটু শোন। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। যে লোকটা ফোন করেছিল...সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চায়।

হ্যাঁ, আমি ব্যাপারটা জানি। ঠিক আছে, এ নিয়ে কথা বলব। কিন্তু এখন একটু কফি চাই। তুমি বাথরুমে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নাও। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি নর্দমায় ঘুমিয়েছিলে। কফি নিয়ে আসি, পরে কথা হবে।

কফি তৈরি করতে রান্নাঘরে গেলাম, লুসিলি বাথরুমে গেল।

সে বাথরুম থেকে সবে বেরিয়েছে, আমি টেবিলের উপর কফি, কমলালেবুর রস ও টোস্ট রাখলাম। অনেক মেয়েরই যেমন পুরুষের ড্রেসিং গাউন পরার আগ্রহ থাকে তেমনি সেও আমার গাউনের হাতা দুটো গুটিয়ে পরেছে, তাকে সুন্দর ও লোভনীয় দেখাচ্ছিল।

বসে কফি খাও, কোন আলোচনা এখন নয়, কথা বলার অনেক সময় পাবে।

কিন্তু চেস....

বললাম তো কফি খাওয়ার সময় একটু চুপচাপ থাকতে চাই।

সে বিষণ্ণভাবে কাপে কফি ঢালল।

পরিবেশটা ভারী সুন্দর। যদি আমার কোন সমস্যা না থাকত, যদি আইকেন মারা যেতেন ও লুসিলি আমাকে বিয়ে করত, তবে আগামী কুড়ি বছরের এমনিভাবে দুজনে কফি খাওয়ার সুন্দর ছবি কল্পনা করতে ভাল লাগল।

দুজনে নিঃশব্দে কফি খাচ্ছিলাম। কফি খাওয়া শেষ হলে সিগারেটের বাক্সটা তার দিকে ঠেলে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। কিছুটা সুস্থ বোধ হল। এবার শোনা যাক।

ঠিক আছে, বল কি বলতে চাও। তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় এসেছিল। আমি তখন সাঁতার কাটছিলাম। জল থেকে উঠে আসার সময় হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমাকে বিকিনি পরে যে অবস্থায় একদিন দেখেছিলাম। আমার সন্দেহ, সেই অবস্থায় কেউ তোমাকে দেখলে যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবে। লোকটাকে তোমার পছন্দ হয়েছে? মেয়ে দেখলে অনেকে যেমন পাগলের মত ভুল বকে আমার মনে হচ্ছে লোকটা সেই ধরনের।

সত্যি? জঘন্য, বোধহয় লোকটা টাকা চেয়েছিল সেইজন্য। সে যদি তোমাকে জল থেকে বেরিয়ে এসে ডিনারে যেতে বলত তবে তোমার তাকে পছন্দ হত।

চেস! তুমি কি পাগলের মত বকা বন্ধ করবে? লোকটা তিরিশ হাজার ডলার দাবী করেছে। তার মতে, তুমি ও আমি ঐ টাকাটা দিতে পারি।

জানি। আমার কাছেও সে একই প্রস্তাব করেছিল। আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। তোমার কি মনে হয় তিরিশ হাজার ডলার জোগাড় করতে পারবে?

কোনমতেই সম্ভব নয়।

তুমি কি পরিমাণ জোগাড় করতে পারবে?

জানি না। আমার একটা হীরার আংটি আছে। এইটিই আমার সম্বল। আমাদের বিয়ের আগে রোজার আমাকে দিয়েছিল, জানি না এর দাম কত হবে। ইচ্ছা করলে তুমি এটা বিক্রি করতে পার।

একবার দেখতে দাও।

সে আমার দিকে চেয়ে থেকে পরে আঙুল থেকে আংটি খুলে আমার হাতে তুলে দিল। ইজিচেয়ারের পাশটা দেখিয়ে বললাম, এখানে এসে বস।

সে হাতদুটো কোলের উপর রেখে বসল।

হীরার টুকরোটা মন্দ নয়। তবে এমন কিছু লোভনীয় নয় যে ব্যবসায়ীরা কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

আমার ধারণা পাঁচশো ডলার পেতে পার। অবশ্য তুমি যদি তাকে বল যে তোমার মা অনাহারে আছে এবং তুমি খাদ্যের অভাবে মরতে বসেছ, এবং যদি সে বিশ্বাস করে। ঠিক আছে, আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের এখন উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ডলার দরকার।

চেস, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন? আমি কি করেছি? আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাই তোমাকে সাবধান করতে চাইছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, বরং আমার উপর চটে যাচ্ছ। এটা আমার দোষ নয়।

গত রাত আমার ভয়ানক ভাবে কেটেছে। তোমার সমস্যার ব্যাপারে আমার এখনই কোন আগ্রহ নেই, লুসিলি। বর্তমানে মাথা ঘামাবার মত অন্য অনেক কিছু আছে।

কিন্তু এসব তোমার নিজেরও সমস্যা। কেমন করে টাকা জোগাড় করবে?

হ্যামলেটও একদিন একই প্রশ্ন করেছিল। তোমার নিজের এ ব্যাপারে কোন মতামত আছে?

হ্যাঁ, এর বেশির ভাগটা তুমি নিজেই দিতে পার, পার না?

তুমি বলেছিলে না তোমার বিশ হাজার ডলার আছে?

লুসিলি সামনে ঝুঁকে বসেছিল, তার চোখে ভয় ও উদ্বেগ।

তোমার স্বামীকে ব্যবসায়ে এই টাকাটা দিতে হবে। তার বদলে অসকারকে এই অর্থ দিলে তিনি রাগ করবেন।

চেস! ব্যাপারটা তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না! কি হয়েছে বলত? এই লোকটা বলল যে সে রোজারকে গিয়ে বলবে। আমরা সমুদ্রের তীরে প্রেম করছিলাম এবং পুলিশকে গিয়ে বলবে যে পুলিশের লোকটাকে আমি চাপা দিয়েছি। তুমি যখন গাড়ির নম্বর প্লেটটা পাল্টাচ্ছিলে তখন সে একটা ছবি তুলে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমি যতটা জড়িত, তুমিও ততটা। এখন বল আমরা কি করব?

আমরা চাই না যে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসুক। এইটিই হচ্ছে প্রথম কথা। দু নম্বর, অসকারকে এক পয়সাও দেব না, আর তিন নম্বর হচ্ছে কেউ আমাদের দেখে ফেলার আগে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

সে শক্ত হয়ে উঠল।

তুমি টাকা দেবে না? তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে। সে পুলিশের কাছে যাবে। সে রোজারকে গিয়ে বলবে...তোমাকে দিতেই হবে।

এ ব্যাপারে কোন 'অবশ্য' চলে না। সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত আমাদের সময় আছে, তার মানে ছ-দিন। রস যাতে জোর করে টাকা আদায় করতে না পারে সেজন্য তাকে নিরস্ত করার উপায় যদি এ কদিনে না পাই। তবে খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। এ ধরনের লোকের একটা অতীত থাকে। শহর থেকে চলে যাওয়ার তার যথেষ্ট আগ্রহ। তার অতীত ও কেন শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে জানার চেষ্টা করছি। যতক্ষণ না বুঝতে পারছি যে তাকে টাকা দেওয়া উচিত তার আগে তাকে এক পয়সাও দিচ্ছি না।

যদি সে জানতে পারে যে তুমি তার অতীত জানার চেষ্টা করছ, সে সেটা বরদাস্ত নাও করতে পারে। সে তখন পুলিশের কাছে যেতে পারে...

সে যাবে না। তুমি কি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত জামাকাপড় পরে বাড়ি যাবে? আমার অনেক কাজ, তুমি থাকায় বাধা পড়ছে।

সত্যিই কি তুমি সিরিয়াস নও? অযথা তাকে চটাতে যাচ্ছ। সে টাকা তুলে নেবে।

সে পারবে না। সে বোকা নয়। সে নিজেও জানে যে তিরিশ হাজার ডলার তার পক্ষে আশাতীত। এখন তুমি কি বাড়ি যাবে?

সে অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে দাঁড়াল।

চেস, তোমার কি মনে হয় না যে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। চালাক হবার চেষ্টা করতে গেলে দুজনকেই জেল খাটতে হবে।

হেসে বললাম, এসব চিন্তা আমার হাতে ছেড়ে তুমি বিশ্রাম নাও। যথেষ্ট সময় আছে, এমন কি ভাগ্য ভালর দিকেও মোড় নিতে পারে।

আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না, তার পাওনা মিটিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ভাল।

তোমার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক কারণ টাকাটা তোমার নয়। লোকটাকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ থাকলে তোমার স্বামীর কাছে তিরিশ হাজার ডলার ধার চাও না কেন? অবশ্য তিনি দেবেন এই আশা খুবই কম।

সে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোন গাইডের পাতা উল্টে 'আর' পৃষ্ঠায় এলাম। বিচ বুলেভার্দে বেলে-ভিউতে একজন অসকার রসের নাম পেলাম। পাড়াটা শহরের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল না হলেও অনেকটা আমার পাড়ার মত।

কৌতূহল বশত আর্ট গ্যালগানোর নাম আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেলাম না।

বইটা নামিয়ে আর এক কাপ কফি ঢাললাম। মাথাটা আবার ব্যথা করছিল তিনটে অ্যাসপিরিন অল্প গরম কফির সঙ্গে খেয়ে নিলাম।

ঘটনাগুলো ভাবছিলাম, মিনিট দশেক পরে লুসিলি আমার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হলদে লেবু রঙের স্ল্যাক্স ও সাদা জামায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার ডান হাতে সাদা কাগজে মোড়া একটা হ্যান্ডব্যাগ।

সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, চেস, এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব দৃষ্টি নেওয়া উচিত। আমি ভাবছিলাম...

আর বলতে হবে না, তুমি ঠিক করেছ। আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য। আমার প্রতিটি পয়সা লোকটার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি জান না, ব্ল্যাকমেলারকে একবার পয়সা দিলে সে বার বার আসে। রস আনন্দের সঙ্গে সমস্ত টাকা নেবে, সম্ভবত বছর খানেক চুপচাপ থাকবে। আমরা যখন ভাবব সব ঠিক হয়ে গেছে তখন হঠাৎ সে এসে হাজির হবে এবং কামড় বসাবে। এটা আমার টাকা, লুসিলি। আমার সমস্ত টাকা তখনই খোয়াবো, যখন বুঝব এছাড়া কোন গতি নেই।

সে পায়চারি করতে করতে বলল, তাহলে আমার মনে হয় রোজারকে সব ঘটনা বলাই ভাল। সে ক্ষেত্রে আমার জেলে যাওয়ার বদলে সে টাকাটা দিতে হয়তো রাজি হবে।

এ ধরনের কথা তো আগেও অনেকবার হয়েছে। মনে হয় আমার রেগে যাওয়ার আগেই তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।

সে চোখ লাল করে বলল, এই টাকা আমাদের দিতেই হবে। যদি তুমি না দাও তবে রোজারকে বলতেই হবে।

আগের বারও এই অভিনয় করেছিলে, শেষে বলেছিলে যে তাকে কোনদিন বলবে না এবং আমার সামনে তার নাম উচ্চারণও করবে না। ঠিক আছে, যদি বলার আগ্রহ এত বেশি থাকে, তবে চল দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাক। অন্তত জানতে পারব যে প্রকৃত ঘটনা তাকে বলা হয়েছে।

তোমাকে ঘেন্না হচ্ছে, তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে উঠে হ্যান্ডব্যাগ দিয়ে জোরে আমার মুখে আঘাত করল।

সময় মত হাত তুলে আড়াল করতে আঘাতটা আমার হাতের কব্জিতে এসে পড়ল। তার হাত থেকে হ্যান্ডব্যাগটা ছিটকে দেয়ালে লেগে ফেটে গেল, ভিতরের সমস্ত জিনিস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

একটা জিনিসে চোখ পড়তেই, বিস্ময়ে চিৎকার করে বললাম, আচ্ছা এটা কি?

সে ছোঁ মেরে জিনিসটা নিয়ে শার্টের নিচে লুকিয়ে রাখল। ভীত ও বিস্মিত চোখ দুটো বড় বড় করে পিছন দিকে সরে গেল।

সে দরজার ছিটকিনি খোলার জন্য ছুটল, আমিও তার দিকে ছুটে গেলাম।

হলঘরের ভিতরে তাকে ধরে ফেললাম। সে নিজেকে মুক্ত করে সদর দরজা খোলার চেষ্টা করল। তাকে চেপে ধরে পাঁজাকোলা করলাম। সে হাত পা ছুঁড়ে আমাকে কিল লাথি মেরে

কামড়াবার চেষ্টা করল। গায়ের জোর অদ্ভুত, হাত দুটো চেপে ধরার আগেই কয়েকটা ঘুঁষি মুখে পড়তে পাগলের মত হয়ে উঠলাম।

তাকে পিছন থেকে চেপে ধরে বল প্রয়োগ করলাম। সে চিৎকার করল। তাকে জোর করে হাঁটুর উপর বসাতে বাধ্য করলাম।

সে পাক খেয়ে নিজেকে মুক্ত করে আবার সদর দরজার দিকে ছুটল। আবার তাকে ধরে ফেললাম। সে মোঁচড় খেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল। আমি প্রস্তুত ছিলাম, লাথিটা এড়িয়ে গেলাম।

তার মাথা দিয়ে আমার নাকে আঘাত করার চেষ্টা করল, একটা হাত মুক্ত করে আমার ঘাড়ে নখ বসিয়ে দিল।

নখগুলো কেটে বসে যেতেই আমার রাগ বেড়ে গেল। অনেকটা যেন এক বন বিড়ালকে ধরার চেষ্টা করলাম। সে হাঁটু দুটো উপরে তুলে আমার বুকে জোরে আঘাত করল এবং নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালাতে গিয়ে জিনিসটা মাটিতে পড়ে গেল।

জিনিসটা তুলে দেখলাম গাড়ি চালানোর পারমিট।

ভাল ভাবে দেখলাম লুসিলির নামে পারমিট, দু বছর আগে দেওয়া হয়েছিল।

তার দিকে দেখলাম।

সে নড়ল না। এক কোনে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

পারমিটটা পকেটে পুরে ক্রন্দনরত লুসিলির দিকে পিছন ফিরে বাথরুমে গেলাম। টয়লেট বেসিনের জলে ঘাড়ের কাটা জায়গাটা ধুতে থাকলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হলে আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ নিশ্চয়ই কোথাও মারামারি করছিলাম।

শোবার ঘরে এসে পায়জামা পালটে একটা গলাখোলা শার্ট ও স্ল্যাক্‌স পরে লাউঞ্জে এসে সমুদ্রের বালি ও পাম গাছগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম।

এমন সময় একটা শব্দ হতেই পিছনে ফিরে দেখলাম লুসিলি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। শান্ত কাঁপা গলায়...চেস...আমি সব বুঝিয়ে বলছি...সত্যি...আমি...।

ঠিক আছে, ভিতরে এসে সব বুঝিয়ে বল। শুনতে মন্দ লাগবে না, যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে তুমি প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী। এখন সত্যিই যদি তোমার কার্যকলাপ বুঝিয়ে বল, তাহলে তোমাকে অস্কার পুরস্কার দেওয়া উচিত।

সে একটা চেয়ার নিয়ে বসতে বসতে বলল, দয়া করে শোন, চেস...আমি জানি তোমার কি পরিমাণ রাগ করা উচিত, কিন্তু আমি কখনও তোমার কাছে মিথ্যা বলিনি। তার মুখে একটা নিরীহ নিরপরাধ ভাব। কোনদিন যদি পারমিট চাইতে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতাম। এ রকম ব্যবহার করা তোমার উচিত হয়নি।

দেখ, আমাকে তুমি রাগিয়ে দিও না।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত, চেস। তোমাকে রাগাতে আমি চাই নি। কোনদিনই তোমার কাছে মিথ্যা বলিনি, যদি, তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর...।

উঃ, এসব কথা ছাড়। তোমার কথাগুলো শোনা যাক। গাড়ি চালানো শিখতে চাওয়া আসলে কি একটা ধাপ্পা?

দেখ চেস, তোমাকে যে মুহূর্তে প্রথম দেখি সেদিনই তোমার প্রেমে পড়ি।

সেই মুহূর্তটা কখন?

যেদিন রাতে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে—আমাকে দেখেছিলে।

মনে হল অনেক অনেক দিন আগের কথা।

যখন নিজের দেহটাকে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলে? সেই সময়?

হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত একা, চেস। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কষ্ট তুমি বুঝবে না। রোজার

অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম তোমার কাছে আনন্দ পাব। সেইজন্যেই আমি গাড়ি চালাতে শিখতে চাওয়ার ভান করি।

প্রশংসার ভঙ্গিতে বললাম, বাঃ, সত্যিই দারুণ ব্যাপার। কেবলমাত্র আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একটা ওজর খুঁজছিলে?

সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, হয়ত কোনদিনও তোমাকে একথা বলতাম না চেস, কারণ প্রেম এমনই জিনিস মেয়েরা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

আমার কিন্তু মনে পড়ছে যখন আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা? তুমি কিন্তু অবাক হয়ে আমার উপর রেগেও গিয়েছিলে।

সে অস্বস্তিভরে বলল, আমি—আমি ভেবেছিলাম ভালবাসি এটা স্বীকার করে নেওয়া বিপজ্জনক। আমি—আমি সেটা চাইনি...

লুসিলি, আমি তোমাকে কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে চাই না। তুমি গাড়ি চালাতে না জানার ভান করেছিলে কেবলমাত্র মজা মারার জন্য? আমি সোজাসুজি উত্তর চাই।

না, ঠিক তা নয়। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। জানলে তুমি খুশি হবে ভেবেছিলাম।

আচ্ছা, এখন তো আমাকে চিনেছ। এখন কি আমাকে তোমার ভাল লাগছে?

নিশ্চয়ই। যার প্রেমে পড়েছি তাকে জানা ভাল। যে কোন মেয়ের জীবনে প্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। রোজার আমাকে ভালবাসে না।

এটা কখন আবিষ্কার করেছ, বিয়ের পরে না আগে?

সে যে আগে অভিনয় করেছিল সেটা মনে পড়তেই বলল, বিয়ের পরে এটা জানতে পারি। আমার উপর তার আর কোন আগ্রহ নেই।

কেন নেই? আশ্চর্য কথা।

সে বৃদ্ধ। তাছাড়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন।

বুঝতে পারছি। তোমার প্রতি অনুরক্ত এমন কোন মানুষকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলে এবং সেইজন্যেই আমার উপর তোমার দৃষ্টি পড়ে।

তোমার রাগ করার কারণ বুঝতে পারি, চেস। তোমার জায়গায় আমি হলে এইরকমই মনে করতাম। তোমার রাগ করার জন্য একটুও দোষ দিচ্ছি না। এর অনেকটা দোষ আমার। আমি অত্যন্ত একা বোধ করি। তুমি আমার জীবন আবার সজীব করে তুলেছিলে।

হ্যাঁ, আমার জীবনেও তুমি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলে। তুমি সব কিছুই বলেছ। এখন সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা যাক। তুমি নিশ্চয়ই বছর দুয়েক গাড়ি চালান শিখেছ, তাই না?

না, না, বছর দুই গাড়ি চালাচ্ছি না। আমার একটা পারমিট ছিল বটে। কিন্তু খুব বেশি চালাইনি। রোজার তার গাড়ি ব্যবহার করতে দিত না। হপ্তা দুয়েক চালিয়েছি, সে বলত আমি নাকি খুব জোরে গাড়ি চালাই সে জন্য আমাকে গাড়ি চালাতে দিত না।

যখন তুমি আমাকে শেখাতে বল তখন বুঝি আবার নতুন করে শিখতে চেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

পারমিটটা তার কোলের উপর ছুঁড়ে দিলাম।

আশা করি তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবে। তোমার স্বামীর ড্রাইভারকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কখনও তুমি গাড়ি ব্যবহার করতে কিনা। তোমাকে আমি সন্দেহ করি, লুসিলি। একজন শিক্ষানবীসের পক্ষে পুলিশের লোককে চাপা দেওয়া এবং একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভারের চাপা দেওয়া এক নয়। আদালতে বিচারক যখন তোমার পারমিট দেখবেন, তখন অন্যরকম হবে।

এভাবে কথা বলবে না। তুমি কেবল আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ।

সত্যিই তোমাকে ভয় দেখানোর ইচ্ছা আমার আছে, লুসিলি। তোমার বিশ্বাস তুমি এভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে, তাই না?

এই প্রথম বোঝা গেল সে ক্রমশ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তাকে অত্যন্ত বিরক্ত

হতে হল।

তুমি কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল।

বুঝতে পারছ না? আমাকে একটু অনুগ্রহ করবে? তোমার হতাশা, তোমার স্বার্থ এবং তোমার সমস্যা নিয়ে আমার এখান থেকে চলে যাবে? তোমার যৌন-আবেদন, তোমার ছেলে-মানুষি ভাব এবং তোমার লোভনীয় দেহ আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে নেবে? তোমার বাতের পোশাকে যখন তুমি তোমার দেহটাকে তুলে ধরেছিলে, তখন সত্যিই আমি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যখন তোমাকে গাড়ির ভিতর দেখি তখন আবার আমার অনুরাগ জেগে ওঠে। আবার সমুদ্রের ধারে যখন তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যেন যে-কোন মুহূর্তে আমাকে দেহদান করবে, কোন স্বার্থে বা মূল্যে নয়, তখনও অনুরাগ কম জেগে ওঠেনি। কিন্তু সেই সব ঘটনার পর আমার চোখ খুলে গিয়েছে। তোমার প্রতি কোন আগ্রহই বর্তমানে আমার নেই। আমার ধারণা তুমি প্রতারক। আমি জানি তুমি একজন মিথ্যাবাদী। এটাও জানি, যে কোন কারণেই হোক তোমার টাকার প্রয়োজন। কোনমতেই এ টাকা আমার কাছ থেকে পাবে না। অন্য কোন লোককে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কর। আমার মত তোমার ফাঁদে পা দেবার হাজার হাজার লোক আছে। আবার চেষ্টা কর। তবে এমন লোক বেছে নেবে যার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। আমার উপদেশ নাও, তবে আমার আশা ছেড়ে দাও। যদি তাড়াতাড়ি চেষ্টা কর আর একজনকে নিশ্চয়ই বাগাতে পারবে। তোমার শুভ কামনা করি, এখন তোমার সুললিত দেহটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

আমার দিকে চেয়ে সে চুপ করে বসে রইল। তার মুখটা ফ্যাকাসে এবং চোখদুটো কঠিন ও চকচকে দেখাচ্ছিল।

তুমি কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না, সে শেষ পর্যন্ত বলল। তার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল। আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারলে কি করে? আমাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে! এ ব্যাপারে আমি যতটা জড়িত তুমিও ততটা! আগেই বলেছি কেন আমার একটা ড্রাইভিং পারমিট আছে। কিন্তু তাতে সমস্ত ঘটনাটার পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। এই লোকটা তিরিশ হাজার ডলার চায়, নাহলে রোজারকে আমাদের কথা বলবে। এই অবস্থায় আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারলে কি করে?

উঠে দাঁড়ালাম।

বল, লুসিলি, কতদিন তুমি ও অসকার একসঙ্গে কাজ করেছ? কতদিন লোকের এভাবে রক্ত চোষার চেষ্টা করছ? তোমার ঘাড় ধরে বার করে দেবার আগে এই কথাটা বলে যাও।

সে ভয়ঙ্কর রেগে তার হাত দুটো নিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। আমি তৈরিই ছিলাম। তার মনিবন্ধ চেপে ধরে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিলাম ও হাতটা বাঁকিয়ে পিছন দিকে চেপে ধরলাম।

সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। তাকে এক পাক ঘুরিয়ে মনিবন্ধটা ছেড়ে দিয়ে তার বাহু চেপে ধরলাম ও তার হিংস্র, জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে রইলাম।

বল, এবার উত্তর দাও। কতদিন ধরে তোমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করছ?

তুমি ভুল করছ, ঐ লোকটার সঙ্গে আমি কোনদিনই কাজ করিনি। কি করে এ ধারণা হল?

ফাজলামি করবে না। আমাকে সেই নির্জন সমুদ্রের তটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি ফাঁদ পেতেছিলে। সেখানে অন্য কেউ ছিল না। গতকাল আমি জায়গাটা দেখে এসেছি। সেখানে তোমার ও আমার ছাড়া আর কারও পায়ের চিহ্ন ছিল না। রস সেখানে যায় নি। কি ঘটেছিল সে জানত, তুমিই তাকে সব বলেছিলে। তোমার স্বামীর ব্যবসায়ে যে বিশ হাজার ডলার খাটাব ঠিক করেছিলাম, তোমরা দুজনে সেটা বাগাবার তালে ছিলে। তোমার স্বামী তোমাকে এসব বলেছিলেন, তাই না? সেই জন্যেই তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিন একথা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলে। তুমি রসকে সব বলেছিলে এবং দুজনে ব্ল্যাকমেল করে আমার কাছ থেকে টাকাটা বাগাবার চেষ্টা করেছ। যেদিন তোমাকে টেলিফোনে বলি যে সমস্যার একটা সমাধান হয়েছে, তুমি সেদিন খুশি হওনি। আমি রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্র তুমি ফোন করে রসকে সব জানিয়ে দাও। সে প্রথমে এসে দেখল আমি কি করছি এবং আসার সময় একটা ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছিল।

এখন পারলে তোমার বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা মিথ্যা করে বলতে পার।

সে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল।

বাইরে এসে কিছু পানীয় ঢেলে বরফ মিশিয়ে গ্লাসটা নিয়ে ফিরে এলাম, তখন সে কান্না থামিয়ে চোখ মুছছিল।

চেস.....।

আবার শুরু করা যাক। ইতিমধ্যে আর কি কি গল্প বানালে?

চেস, আমাকে এত কষ্ট দিও না, এবারের ভঙ্গি একটু নতুন। আমি কিছুই জানি না, সে—সে বেশ কয়েকমাস ধরে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে।

অল্প স্কচ পান করলাম।

তুমি বলতে চাও অসকার তোমাকে কয়েকমাস ধরে ব্ল্যাকমেল করছে?

হ্যাঁ।

সুতরাং তুমি ভাবলে যে অসকার যদি একই সঙ্গে আমাকেও ব্ল্যাকমেল করে তবে ভাল হয়?

আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি। সে কোন রকমে জেনেছিল যে তোমার অনেক টাকা আছে...।

নিশ্চয়ই তুমি বলেছিলে?

না দিব্যি করে বলতে পারি আমি বলিনি, সে নিজেই জেনেছিল।

রেগে বললাম, দেখ বাজে কথা বল না। ভগবানের দোহাই, এমন গল্প বানাবে যেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কেবল আইকেন ও তুমি জানতে যে আমি কি পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে খাটাব। আইকেন কিছুতেই বলবেন না। সুতরাং তুমিই বলেছ।

আমি—আমি তাকে বলতে চাইনি চেস। তুমি এটুকু বিশ্বাস রেখ। আমরা দুজনে কথা বলছিলাম এবং বলেছিলাম, এমন একজনকে চিনি যার অনেক টাকা আছে। আমিও যদি এত টাকার মালিক হতে পারতাম। এমনি কথাচ্ছলে...মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ইচ্ছা করে তাকে বলিনি।

তাহলে তুমিই বলেছিলে?

সে আবার হাঁটুর ভিতর হাত দুটো ঘষার কৌশল রপ্ত করতে লাগল।

হ্যাঁ, তবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি।

সে কেন মাসের পর মাস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল?

সে ইতস্ততঃ করছিল এবং অস্বস্তি ভরে বলল, আমি সে কথা বলতে পারব না চেস। এটা—এটা অত্যন্ত গোপনীয়। এমন কিছু আমি করেছিলাম...।

কোন আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা?

না, সেরকম নয়। আমি আগে কখনই এরকম করিনি।

বেশ ঠিক আছে, বলে ফেল। সে তাহলে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল এবং তা সত্ত্বেও তুমি বেশ খোশ মেজাজেই তার সঙ্গে গল্প করছিলে, যেমন ধর তোমার স্বামীর কর্মচারীদের নিয়ে এবং তাদের কার কত টাকা আছে সে সব নিয়ে।

না, এসব নিয়ে নয়...

বাজী রেখে বলতে পারি এসব নিয়ে। যাই হোক, আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া, তোমাকে গাড়ি চালান শেখাতে বলা তারই আইডিয়া, কি বল?

হ্যাঁ।

তুমি আমাকে কেন সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিলে তা জানতে না। কি বল?

না—না, সে বলেনি।

যেহেতু সে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করে সেজন্য তার কথামত তুমি ওঠা বসা কর। কি বল?

তার মুখে রক্ত জমা হল।

সে যা বলে তাই আমাকে করতে হয়।

তুমি কি তাকে টাকা দাও?

সংকুচিত মুখে সে বলল, না, কোন টাকা দিইনি।

সে তাহলে ব্ল্যাকমেল করে কেবল তার ইচ্ছেমত তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে।

হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে সেদিনের ছোট্ট অভিনয়ের পর তুমি গাড়ি চালিয়ে যেভাবেই হোক একজন পুলিশকে চাপা দাও। তাড়াতাড়ি কাছের কোন জায়গা থেকে তাকে ফোন করে বল যে তুমি একজন পুলিশকে চাপা দিয়েছ। সে দেখল আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত এটা মারাত্মক অস্ত্র এবং তোমাকে উপদেশ দিল আমার বাংলোতে গিয়ে আর এক দফা অভিনয় করতে। তার কথামত তুমি বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলে দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্যে। সে তোমাকে আশ্বাস দিল টাকাটা আমার কাছ থেকে সে নেবে। যেহেতু তুমি তার কথায় ওঠ-বস, সেহেতু তার উপদেশ মত কাজ করলে।

সমস্ত ঘটনাটা এভাবে ঘটে নি, চেস। আমি ফোন করিনি। আমি এখানে এসেছিলাম।

তোমাকে বিশ্বাস করি না, লুসিলি। আমি বিশ্বাস করি না রস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করেছে। আমি বিশ্বাস করি তুমি এবং রস একই সঙ্গে এই ব্যবসা চালাচ্ছ।

ভুল করছ, চেস! দিব্যি করে বলছি আমরা ব্ল্যাকমেল করি না, সে বলল, আমি যা বলেছি তাই সত্যি।

তাকে চেয়ে দেখছিলাম, সে মিথ্যা বলছে।

ঠিক আছে, দুজনে এক সঙ্গে গিয়ে রসের সঙ্গে কথা বলব। তার কি বলার আছে শুনতে চাই। তুমি অপেক্ষা কর, পোশাক পালটে এখনই আসছি। তুমি আর আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

তার প্রতিবাদ করার আগেই লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। শোবার ঘরটায় এলাম। সে-ঘরের দরজাটা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

লাউঞ্জের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। লুসিলিকে হলঘরে ঢুকতে এবং সেখান থেকেই আমার শোবার ঘরের দিকে চাইতে দেখলাম, সে লাউঞ্জে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটু পরে টেলিফোন করার শব্দ পেলাম।

তার জন্য যে ফাঁদ পেতে রেখে এলাম সে তাতে পা দিল।

পা টিপে টিপে দরজার কপাটে কান পেতে শুনতে লাগলাম।

তাকে বলতে শুনলাম ঃ আমি এখন কি করব? মনে হয় না সে টাকা দেবে। না...আর সামলাতে পারছি না, তোমার কিছু করা দরকার...।

হাতলটা ঘুরিয়ে ঢুকলাম।

লুসিলি টেলিফোনের কাছ থেকে সরে এল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, বললাম। অপরাধীর মত চেয়ে থেকো না, তোমার কথা শুনেছি। এবার স্বীকার করবে তুমি তাদের দলে।

সে আমার দিকে চেয়ে রইল। তাকে আর সুন্দর বা তাজা যুবতী দেখাচ্ছিল না। তাকে বয়স্কা, পরাজিত এবং ফাঁদে ধরা-পড়া জীবের মত দেখাচ্ছিল।

নিজেকে খুব চালাক ভেবেছ, তাই না?

ঠিক আছে, আমি দোষ স্বীকার করছি। কিন্তু টাকা তোমাকে দিতে হবে। তুমি প্রমাণ করতে পারবে না আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তোমার একটা ছবি আমার হাতে আছে। যদি টাকা না দাও তোমার ছবি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি অন্য জায়গায় ছিলাম প্রমাণ করতে পারব। আমার লোক আছে, যারা সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, দুর্ঘটনার সময় আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। টাকা দেওয়া ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই।

গাড়ির পিছনের চাকার রক্তের দাগগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম দাগগুলো কি করে হয়েছিল। ডলোরেস এবং নাটলের মত ও' ব্রায়ানকেও হত্যা করা হয়েছিল।

তুমি ও রস তাকে হত্যা করেছিলে, তাই না? ধাক্কা দেওয়াটা মিথ্যে ঘটনা। তুমি তার মাথায় আঘাত করেছিলে, পরে ক্যাডিলাকটার পিছনের চাকা দিয়ে তাকে চাপা দিয়েছিলে। না ভেবে

কাজ করায় তোমরা বিরাট ভুল করেছিলে। ভুল করে পিছনের চাকা দিয়ে তাকে চাপা দিয়েছিলে। এটা এত বড় ভুল, লুসিলি যে হত্যাকারীর তার জন্য ফাঁসি হতে পারে।

সে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমি তাকে হত্যা করিনি।

তুমি ও'রস তাকে হত্যা করেছিলে। এক ঢিলে তোমরা দুটো পাখি মারতে চেয়েছিলে, চাও নি? তোমরা ও'ব্রায়ানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলে এবং আমার কাছ থেকে বিশ হাজার ডলার বার করতে চেয়েছিলে।

কর্কশ স্বরে সে বলল, কথাটা ঠিক নয়। তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। আমি তাকে হত্যা করিনি। যদি তুমি আমাদের টাকা না দাও...

কোন মতেই টাকা পাচ্ছ না। সামনের বিকেলটা খুব ব্যস্ততায় কাটাব। আমি জানতে চাই কেন তোমরা ও'ব্রায়ানকে হত্যা করেছিলে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। তোমার হাত-পা বেঁধে এখানে রেখে যাব। আমি যা জানতে চাই যতক্ষণ না তা জানতে পারি।

সে ভয়ে পেছন দিকে হটতে শুরু করল, আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করো না। আমাকে এখানে রেখে যেতে পারবে না।

তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, যদি শান্তভাবে আত্মসমর্পণ না কর তবে বল প্রয়োগ করতে হবে। গলার কাছটা যেমন আঁচড়ে দিয়েছিলে যদি সেরকম খারাপ ব্যবহার কর তবে বাধ্য হয়ে আমাকেও খারাপ ব্যবহার করতে হবে।

সে পাক খেয়ে জানালার দিকে ছুটল কিন্তু তার আগেই ছুটে গিয়ে তার বাহু চেপে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলাম। সে আমার মুখ আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করছিল, তার হাতে দুটো ধাক্কা মেরে সরিয়ে জোরে মুখের চোয়ালে আঘাত করলাম। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সে জড়বস্তুর মত আমার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

তাড়াতাড়ি তার হাত দুটো পিছনে টেনে তার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তাকে চ্যাংদোলা করে শোবার ঘরে নিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে জামা ও টাই পরে জুতো পালটে নিলাম। দেখলাম সে নড়তে শুরু করেছে।

রান্নাঘর থেকে একটা দড়ি এনে বিছানার সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম।

সে চোখ খুলে আমার দিকে চাইল, ভয়ে পূর্ণ চোখ।

অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমার এটা প্রয়োজন ছিল। তোমাকে এভাবে ফেলে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। যত শীঘ্র পারি ফিরব। চুপ করে শুয়ে থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

সে হিংস্রভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, এর শোধ নেব।

সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমাকে ছেড়ে যেও না। ফিরে এস।

ঘাবড়িও না। বেশি দেরি করব না

বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

প্যাসেজ দিয়ে যখন যাচ্ছি তাকে প্রাণভয়ে চীৎকার করতে শুনলাম। চেস আমাকে ছেড়ে যেও না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে যেও না।

আমি ভ্রূক্ষেপ না করে বাংলোর সদর দরজায় তালা দিয়ে বুইক গাড়িটার দিকে ছুটে গেলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

বেশ কয়েকটা খবরের কাগজ কিনলাম শহরে এসে এবং বুইকে ফিরে যাবার সময় খবরের শিরোনামাগুলো দেখলাম। ডলোরেস ও নাটলের হত্যাকাণ্ড প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তাতে কিছুই নেই।

এমন জায়গায় গাড়িটা ছিল যেখানে গাড়ি রাখা নিষেধ, সেজন্য গাড়িতে এসে তাড়াতাড়ি

প্লিমস্ বারের দিকে ছুটলাম, যেখানে পরবর্তী কার্যকলাপ ঠিক করার আগে স্যান্ডউইচ ও বীয়ারের সঙ্গে খবরের কাগজগুলো পড়তে পারব।

বার প্রায় খালি, এক কোণে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে জো ফেলোস বসেছিল। দুজনেই বিফ প্যাটিসের সঙ্গে বীয়ার খাচ্ছিল। দৃষ্টির আড়ালে যাবার আগেই জো ফেলোস আমাকে দেখে, এই যে চেস, এদিকে এস।

একটা স্যান্ডউইচ ও বীয়ার আনতে বলে জোর বুথে এসে ঢুকলাম।

জো বলল, ভেবেছিলাম গলফ্ খেলতে গিয়েছ, বস, বস। জিম বাকলের সঙ্গে পরিচয় করে নাও। ইনি হচ্ছে 'ইনক্যোয়ারার' পত্রিকার প্রধান ব্যক্তি।

কেবলমাত্র ইনক্যোয়ারার পত্রিকাই সে কথা জানে না, বাকলে বলল। বেঁটে, মোটা, মাঝবয়সী ভদ্রলোক, চোখের দৃষ্টি অনুসন্ধানী।

আমার ঘাড়ের কাটা দাগগুলোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, দেখ ভাই, মেয়েটা নিশ্চয়ই বেশ চড়া দামে তার আত্মসম্মান বিক্রি করেছে।

জো অবাক হয়ে চাইল।

আমি বললাম, কিছু ভাববেন না, ব্যাপারটা অনেকটা এই ধরনের—একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রায় বিরক্ত করে। বোকার মত আমি তাতে বাধার সৃষ্টি করেছিলাম। দেখা গেল মেয়েটা আমার বাধা দেওয়া পছন্দ করল না। আমি যে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলাম এটাই আশ্চর্য।

দুজনেই হেসে উঠল। কিন্তু জো আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আলোচনার বিষয় পালটাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, রবিবারের দিনে তুমি এখানে কি করছ?

এর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে সারাটা দিন কাটাব বলে ঠিক করেছিলাম, জো বাকলের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, এখন বলছে কাজ আছে। সুতরাং এখন একাই যেতে হবে। অবশ্য তুমি যদি রাজী হও।

ইচ্ছে ছিল জো, কিন্তু নানা কাজে বাঁধা।

যতক্ষণ মেয়েটা বাঁধা আছে ততক্ষণ আপনারা দুজনে মানিকজোড় হতে পারেন, বলে বাকলে হো হো করে হেসে উঠল।

মনে পড়ল লুসিলি আমার বিছানায় বাঁধা অবস্থায় আছে। অবচেতন মনে সে সত্যি ঘটনার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এই ইনক্যোয়ারারটা কি আপনি এখানে কিনেছেন? আমাকে সীটের উপর কাগজটা রাখতে দেখে বলল।

হ্যাঁ, আপনার দরকার?

গত রাতে আমি যে খবরটা পাঠিয়েছিলাম সেটার কি হল এখনও দেখার সুযোগ হয় নি। সে কাগজটা খুলে সামনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বোলাতে লাগল। কাগজের পাতা উল্টিয়ে দেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল। তিন হাজার শব্দ প্রায় রক্ত ও স্কচ দিয়ে লেখা বলা চলে। আর নিষ্ঠুর বদমাশ তাকে দুশো শব্দে কমিয়ে এনেছে। এদের জন্য কাজ করি ভাবতেও ঘেন্না হয়।

জো বলল, জিম সেই গাড়ি চাপা দেওয়ার খবরটা পাঠাচ্ছে এবং সেটার তত্ত্বাবধানে আছে।

স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে চিবোতে লাগলাম আর বললাম, সত্যি? আজ সকালে খবরটা পড়ার সময় পাইনি। কোন নতুন খবর আছে?

বাকলে গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

নতুন? দেখুন, এই খবরটা এখন সাংঘাতিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এমন কি, এর উপর বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনও আসতে পারে।

জো বলল, বাজে কথা ছেড়ে আমাদের আসল কথায় আসা যাক। খবরটা যদি এতই আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তবে প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে দেওয়া হল না কেন?

কারণ এখনও আমরা সব কিছু তথ্য জানতে পারিনি। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

জো অধীর হয়ে বলল, কি ব্যাপারে? কোন্ ঘটনার কথা বলছ?

বাকলে বলল, বলছি। ও'ব্রায়ান মারা না গেলে তার সম্বন্ধে লোকে কিছুই জানতে পারত

না। ও'ব্রায়ান দারুণ ভাল লোক ছিল বলে সুলিভা যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সেটা শুনতে ততদিনই ভাল লাগছিল যতদিন না আমরা ও'ব্রায়ানের ব্যাপারে তদন্ত করি। প্রকৃত ঘটনা জানতে পারা গেছে। ব্যাঙ্কে তার প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার এবং পাম ক্রেসেন্টে তার সুন্দর একটা বাংলো আছে। যা একমাত্র সিনেমা তারকাদেরই থাকা সম্ভব। পুলিশের কোন লোক এভাবে থাকা মানে ঘুষ। তার এই সব ব্যাপার জানতে মাত্র দুজন। যে যে মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, একজন নাইট ক্লাবের গায়িকা এবং তার এজেন্ট নাটলে। তাদের ভাগ্যে গত রাতে কি ঘটেছে জানেন?

জো গোল গোল চোখে তার দিকে চেয়েছিল।

তাদের দুজনকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওয়াশিংটন হোটেলে নাটলের বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। হোটেলের রাতের কেরানীকে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছে। হত্যাকারী ভিতরে এসে কোন্ ঘরে নাটলে আছে জানতে চেয়েছিল তারপরেই তাকে হত্যা করে। শেষে উপরে গিয়ে নাটলেকে হত্যা করে। মেয়েটা যখন তার ম্যাডক্স আর্মসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তাকে হত্যা করা হয়।

জো বলল, এত বড় ঘটনা কাগজে নেই।

হ্যাঁ, আছে মাত্র দশ লাইন। কিন্তু আগামীকাল কাগজের প্রথম পাতায় সবচেয়ে বড় খবর হবে। আমরা এর উপর তদন্ত করছি। ও'ব্রায়ানের জোচ্চুরি জানার চেষ্টা করছি। পুলিশ কমিশনার মনে করেন ও'ব্রায়ান কয়েকটি প্রতারক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুলিভা কিন্তু মনে করেন লোকটা ব্ল্যাকমেলার ছিল।

যে মেয়েটা গতকাল খুন হয়েছে সে কি লিটল ট্যাভার্ন নাইট ক্লাবে গান করত? স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ। সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু টাকার জন্য গান করতে হত।

লিটন ট্যাভার্নের প্রকৃত মালিক কে?

বাকলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সত্যিই রহস্যময়। আমি জানার চেষ্টা করেছি। রেজিস্ট্রি করা আছে আর্ট গ্যালগানো নামে জনৈক ব্যক্তির নাম। কিন্তু কেউ জানে না লোকটি কে। আমার ধারণা শহরে ঐ নামে কোন লোক বাস করে না। ক্লাবটা চালায় জ্যাক ক্লড নামে একজন। কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

শুনেছি গতকাল রাতে ক্লাবের উপরতলায় এক জুয়ার আড্ডা বসেছিল এবং বাজীর হার ছিল খুব চড়া।

বাকলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এটা কথার কথা। এই শহরে জুয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন মাতব্বর লোক আড্ডা খোলার তালে ছিল, কিন্তু পুলিশ কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্যম নষ্ট করে দেন। লিটল ট্যাভার্ন তিন বছর হল চালু হয়েছে। জুয়ার আড্ডা থাকলে নিশ্চয়ই শুনতাম।

আপনি কি সঠিক জানেন? গত রাতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। একজন আমাকে বলল যে উপরে জুয়ার আড্ডা আছে।

বাকলে আমার উপর দৃষ্টি রেখে বলল, এক মিনিট, এই অঞ্চলটা ও'ব্রায়ান তদারকি করত। সে নিশ্চয়ই ক্লাবের এই সব আড্ডা গোপন রেখে থানায় কোন রিপোর্ট পাঠাত না। এটা দারুণ খবর। তাহলে এখানেই সে ঘুষের টাকা পেত। আপনি কি প্রায়ই সেখানে যান?

প্রায়ই যাই না তবে মাঝে মাঝে যাই।

আপনি কি সেখানে গিয়ে দেখবেন জুয়ার টেবিল আছে কি নেই?

মাঝখানে জো বলল, এই! তোমারও কিছু সাহস থাকা উচিত। তাহলে চেস কেন তোমার নাংরা কাজগুলো করতে যাবে?

বাকলে বলল, উপরে জুয়ার আড্ডা আছে কিনা দেখার সুযোগ একজন পুলিশের পক্ষে যতটা কষ্টকর আমার পক্ষেও একই রকম। কিন্তু ইনি সেখানে যান। যদি ইচ্ছা করেন তবে আমাদের কেন সাহায্য করবেন না?

যদি সম্ভব হয় তবে আমি আপনার রহস্য জানার চেষ্টা করব। আজ বিকেলে সেখানে যাব এবং যদি সুযোগ পাই আপনাকে ফোনে জানাব।

জো অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল আর বাকলে এগিয়ে এসে আমার গায়ে হাত বোলাতে লাগল।

আপনিই হচ্ছেন মানুষের মত মানুষ। ইনক্যোয়ারার কোনদিনই আপনার অবদান ভুলবে না। পরের বার আপনার সেলসম্যান যখন বিজ্ঞাপনের জন্য আসবে তখন সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করব।

ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বার করে আমার হাতে দিয়ে যদি আমি ধারে কাছে না থাকি তবে জ্যাক হেমিংসের সঙ্গে যেন দেখা করি। যে কোন প্রয়োজনে সে সাহায্য করবে। সত্যিই যদি উপরে জুয়ার আড্ডা থাকে তবে বেশ ঝামেলার ব্যাপার। শুনুন, আপনি যদি আমার অফিসে আসতে পারেন তাহলে আপনাকে একটা ক্যামেরা দেব। তাদের আড্ডার ছবি যদি একটা তুলে আনতে পারেন তাহলে আমরা ওদের বেকায়দায় ফেলতে পারি।

মনে হয় না তারা সেটা বরদাস্ত করবে।

ক্যামেরাটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এর লেন্সটা আপনার বোতামের গর্তে ফিট করা থাকবে। আপনার করণীয় হচ্ছে পকেটের ভিতর লুকিয়ে রাখা শার্টার টিপে ধরতে হবে। বাকী কাজটুকু লেন্স এবং ফিল্মে হয়ে যাবে। জুয়ার আড্ডার একটি ছবি এনে দিন মিঃ স্কট। কাগজের কর্তৃপক্ষ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

আশা করি পারব।

সে আমার হাতে আনন্দে চাপড় মারল।

চলুন এখান থেকে ওঠা যাক। আমার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন চলুন।

জো হঠাৎ হাতের উপর দিকটা চেপে ধরল, এক মিনিট চেস তুমি অযথা ঝামেলা ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ। ধর, তুমি আর আমি যদি যাই তাহলে কেমন হয়?

না, জো, দুজনে গেলে অযথা ভিড় হবে। আমি কোন ঝামেলায় গিয়ে পড়ছি না। ঝামেলার মোকাবিলা করতে চলেছি।

বাকলে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। এতে ঝামেলার কিছু নেই। সত্যিই যদি আড্ডা থাকে তবে পুলিশ কমিশনারের গদি কাঁপিয়ে দিতে পারব।

একই ব্যাপার। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। দুজনে ভিড় হবে ঠিক কিন্তু বিপদের সময় রক্ষা পাওয়া যাবে।

না, জো। আমি নিজেই হয়ত উপরে যেতে পারবো না। দুজনের পক্ষে তো অসম্ভব। আর বিকেলে হয়ত আড্ডা নাও বসতে পারে।

জো জেদ করে বেরিয়ে, আমি তোমায় সঙ্গে আসছি, চেস। যদি প্রয়োজন হয় বাইরে অপেক্ষা করব।

আমি জানি, কোন কাজে একা করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি।

তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না, জো। আমি নিজের শখের সঙ্গে ব্যবসাকে জড়িয়ে ফেলেছি কিন্তু তুমি অযথা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

বাকলে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিচে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুব দাও গে, জো। আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার অন্য দরকার আছে। তুমি সাঁতার দাও গে। বলে আমায় হাত ধরে টানতে টানতে বুইকের কাছে নিয়ে এল।

পথে জিজ্ঞাসা করলাম, লেন মেয়েটাকে কে মেরেছে এ সম্বন্ধে পুলিশের কি কোন ধারণা আছে?

নাম না জানলেও তাকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের কাছে তার আঙুলের ছাপ আছে এবং লোকটার চেহারার বিবরণও তারা জানতে পেরেছে। আমার ধারণা লোকটা হয় পাগল। নয়ত একেবারে শিক্ষানবীস। সমস্ত জায়গা জুড়ে সে আঙুলের ছাপ রেখে গেছে। মেয়েটার ঘর থেকে এবং ওয়াশিংটন হোটেল থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল।

ডলোরেস লেনের ঘরে এবং নাটলের ঘরে লোকটার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তারা বলে। লোকটা দীর্ঘকায়, গায়ের রং কালো এবং বয়স আপনারই মত। লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট মনে করেন খুব শীগগিরই তাকে ধরা সম্ভব হবে।

বাইরে চেয়ে কাঁপা বুকে বললাম, সত্যিই?

হ্যাঁ, তারা শহরে সেই মেয়েটার খোঁজ করছে যে তাকে দেখেছিল। মনে হয় সে চিনতে পারবে। তাহলে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে এবং দুটো মিলিয়ে দেখা হবে।

।। দুই ।।

দু' এক মিনিট পরেই লিটল ট্যার্ভান নাইট ক্লাবে এসে উপস্থিত হলাম। গাড়ি রাখার জায়গা ছিল না, কিন্তু জায়গা করে নিতে বেশ বেগ পেতে হল।

সে দিন প্রচণ্ড গরম এবং বাতাস বলতে ছিল না। পাম সিটিতে এমন হয়, কিন্তু বাতাসের জন্য প্রাণটা হা-হুতাশ করে, বাতাসের বদলে ধুলো এসে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। মেজাজটা খাপ্পা হয়ে ওঠে, যে-কোন মুহূর্তে ফেটে পড়ার পর্যায়ে আসে।

বারান্দার সামনে টেবিলগুলোতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দল খাবারের বিরাট তালিকায় চোখ বুলোচ্ছিল।

ওপরে উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। দারোয়ান ছাড়া কেউ আমার দিকে চেয়ে দেখল না; দারোয়ান খিটখিটে মেজাজের। সে সেলাম জানাল এবং সহজ ভাবে রিভলভিং দরজাটাকে সরিয়ে পথ করে দিল যেন সে ডিমের খোলায় ঠেলা দিচ্ছে।

হ্যাট-পরা মেয়েটা আমাকে চিনতে পারল। জায়গা থেকে সরে দাঁড়াল না। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অন্য দিকে চাইল।

বারের দিকে গেলেও ভিতরে ঢুকলাম না। বারটা লোকে ভর্তি। পিপে পিপে মদ খেয়ে চীৎকার করে কথা বলছে। সঙ্গে আসা সুন্দরী ও সোনালি চুলের মেয়েদের মনে দাগ কাটার চেষ্টা করে সারা সপ্তাহের কষ্টে রোজগার করা টাকার শ্রাদ্ধ করছে।

বারের পিছনে অসকার রস ছিল। সেখানে দুজন মেক্সিকান লোকও ছিল। তারা খুব ব্যস্ত। মেয়েদের মহলে রস ব্যস্ত ছিল। দেখতে পেলাম তিনজন মহিলাকে শ্যাম্পেন ককটেল পরিবেশন করছে।

সরে এলাম সেখান থেকে। রস আমাকে দেখে, সেটা চাইছিলাম না। আমার রাম খাওয়া বন্ধুর সন্ধানে চারপাশ চেয়ে দেখলাম।

এবং খুঁজে বার করলাম। বারের এক কোণে থেকে উঠে আসছিল।

কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিনতে পারেন?

তখন সে মাতাল। চোখ খুলে আমাকে চেনার চেষ্টা করল, চিনতে পেরে হেসে উঠল।

হ্যাল্লো, সে বলল, দুঃখ কষ্ট ভুলতে এসেছেন?

দেখতে এসেছি বাজী ধরে কিছু টাকা রোজগার করা যায় কি না, বলে লবির দিকে গেলাম। ওপরে গিয়ে সুযোগ পাব? আপনি কি বলেন?

কেন নয়? আমি ওপরে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন।

ভেবেছিলাম ওপরে গেলে ঝামেলায় পড়ব।

তা বটে। আমাকে এখানে সকলেই চেনে। আপনার নাম যেন কি বল্লেন?

স্কট।

বেশ, বেশ। তাহলে চলুন ভাই, স্কট। দেখা যাক আপনি কিরকম জুয়ায় হেরে যান।

হলঘরের ভিতর দিয়ে সে আমাকে নিয়ে একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করে চললাম। এলিভেটরে করে দুটো তলা ওপরে নিয়ে এল।

গির্জায় বিশপ যেমন তাঁর ভক্তদের ফুঁ দিয়ে আশীর্বাদ করেন, আমাদের ওপরে ওঠার সময় ওয়েলিভার সেই ভাবে আমার মুখের উপর ঢেকুঁর তুলে রামের বাষ্পকণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।

বাকলের দেওয়া ছোট্ট ক্যামেরাটা আমার কোটের ভাঁজে পিন দিয়ে আটকানো ছিল। জামার পকেটের মধ্যে রাখা শাটার আঙুল দিয়ে টিপে ধরলাম। বাকলে একটা ছবি নিতে বলেছিল। ক্যামেরায় ছোট্ট ফিল্ম। পাল্টাবার কোন সুযোগ ছিল না। সে বলেছিল, জীবনে হয়ত এই একবারই সুযোগ মিলবে। যদি আমরা জুয়ার আড্ডার একটা ছবি আনতে পারি—অবশ্য কোন আড্ডা যদি থেকে থাকে—তাহলে এই শহরের অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে।

যদি ছবিটা নিতে গিয়ে আমি ধরা পড়ি তবে শহরের বদলে যে আমিই মোক্ষম ভাবে ফেঁসে যাব, এ তথ্যটা সে মনে হয় খেয়াল করেনি।

এলিভেটর দাঁড়াল, অল্প শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল।

একটা হলঘরে ওয়েলিভার ঢুকল যেখানে দুজন লোক। মল্লবীর বললেই চলে। সারা জায়গাটা জুড়ে বসে বসে শরীরের পেশীর কসরৎ করছিল। যেন জো লুই বা রকি মার্সিয়ানোর সঙ্গে তারা অনায়াসে এক হাত লড়তে পারে।

ওয়েলিভারের দিকে তারা কঠিন দৃষ্টিতে চাইল। তারপর আমার উপর।

হলঘরের দুই পাল্লার দরজার দিকে ওয়েলিভার শান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল পেছনে আমিও যাচ্ছিলাম। রবিবারের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছি এই রকম ভাব দেখিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

যখন আমরা দরজার বেশ কাছে তখন তাদের একজন কসরৎ থামিয়ে আমাদের দিকে অবাক হয়ে চাইল।

একটা উড়োজাহাজের মরচে-পড়া স্ক্রু খুলে গেলে প্রপেলারে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম গলায় একজন চিৎকার করল, এই যে, তুমি কোথায় যাবে ভাবছ?

ওয়েলিভার চোখ রাঙিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বাজখাঁই গলায় সেও কেঁপে উঠেছিল। হাজার হোক সে ক্লাবের মেম্বার, এ ধরনের ব্যবহার আশা করেনি।

আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?

ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি আমার দিকে এগিয়ে, না—ওকে। কোথায় যাবে?

সে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলার চেষ্টা করল, আমার বন্ধু, আমি ওকে, ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি। কোন আপত্তি আছে?

মিঃ ক্লড কি যেতে বলেছেন?

নিশ্চয়ই, মিঃ ক্লড অনুমতি দিয়েছেন। বলে আমার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সন্দেহের চোখে তারা আমার দিকে চেয়ে রইল।

একটা বড় ঘর, পুরুষ ও মহিলায় ঘরটা ঠাসা ভর্তি। মৃদু আলো, সিগারেটের ধোঁয়া ও উত্তেজিত কথাবার্তায় ঘর ভরে ছিল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে জুয়ার টেবিল। টেবিলের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পাম সিটির অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা। ওয়েলিভার বলেছিল বাজীর হার বেশ চড়া। টেবিলের ওপর রাখা টাকা পয়সার স্তূপ। একবারের বাজীর জন্য টেবিলের ওপর প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার রাখা ছিল।

ওয়েলিভার টাকার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, এটা একবারের বাজী, পাগল লোকেদের সঙ্গে আমরা কোন ঝামেলায় আসতে চাই না।

প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল একজন মোটা বয়স্ক লোকের উপর, যে এক গাদা খুচরো টাকা পয়সা সামনে রেখে বসেছিল। তার কাছে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ নম্বর কালো ঘরে অনেকগুলো খুচরো পয়সা তাকে রাখতে দেখলাম।

বেশ কয়েকজন লোক মোটা লোকটাকে অনুসরণ করে কম বাজী ধরল। একটি চাকা ঘোরার পর একটা বল ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ নম্বর কালো ঘরে এসে থামল।

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল চারিদিকে। জুয়ার পরিচালক ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একজন মেক্সিকান, সে যারা হেরে গেল তাদের খুচরো পয়সাগুলো একত্রে জড় করে মোটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিল।

একজন সুন্দরী মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখ থেকে মদের উগ্র গন্ধ বেরিয়ে আসছিল।

ঠেলা দিয়ে পথ করে সামনে এগিয়ে মেয়েটির পেছনে এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে টেবিলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তীব্র আলোয় জুয়াড়ীদের সামনে টাকা পয়সা সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। ছবি নেওয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থা।

বাকলে বলেছিল আমাকে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে রাখা শাটার টিপতে হবে। লেন্স এত দ্রুত ছবি নিতে পারে এবং ফিল্ম আলোর স্বল্পতাকে এত সুন্দর ভাবে পরিপূরণ করতে পারে যে ছবি কোনমতেই খারাপ হবে না।

একটা বসার জায়গার খোঁজে ওয়েলিভার সরে গেল। সবচেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পেরে শাটারের বোতামের আঙ্গুল এনে দম বন্ধ করে বাকলের উপদেশ মত আস্তে আস্তে বোতমটা টিপে দিলাম। একটা অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম শাটার কাজ করেছে।

ঠিক তারপরেই ঘটনাটা ঘটল।

জানতাম না যে লোকগুলো যখন জুয়াড়ীদের খেলা দেখছিল আর বাজীর হিসেব রাখছিল, তখন আমার ওপরও নজর রাখছিল। আমার মুখের অভিব্যক্তির জন্য অথবা আমার কোটের ভাঁজে লেন্সটা জুয়ার পরিচালক দেখেছিল কিনা জানি না। তারা ধরে ফেলেছিল। দুটো শক্ত শরীর আমার শরীরে চাপ দিল। লোহার সাঁড়াশীর মত দুটো হাত চেপে ধরল। দুজন লোক আমার দুপাশে।

এই দুজন কিন্তু আগের দুই মল্লবীর নয়, এরা দুজন পেশাদারী জুয়াড়ী। রোগা চেহারার লোক দুজনকে যমজ দেখাচ্ছিল। একজন ফর্সা, অন্যজন কালো। দুজনেরই মুখ কুড়ালের মত। চোখ মলিন, চ্যাপ্টা এবং ভাবলেশহীন।

দুজনেই ভয়ংকর প্রকৃতির, কঠিন রুক্ষ ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল।

ফর্সা লোকটি বলল, এই শয়তান, কোন রকম ঝামেলা করবি না। আমাদের মালিক তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বিশেষ পদ্ধতিতে জনতার ভিড় থেকে আমাকে সরিয়ে নিল। তাদের মুঠোর চাপে আমার হাত দুটো যেন পঙ্গু হয়ে গেল।

সবেমাত্র টেবিলের পাশে ওয়েলিভার একটা বসার জায়গা পেয়েছে আমার এই অবস্থা দেখে অবাক হল কিন্তু বসার জায়গার লোভে আমার দিকে চেয়ে হাসল।

ফর্সা লোকটা বলল, এই শয়তান, ভয় পাবিনে। ভালভাবে হেঁটে চল। যদি বাঁদড়ামি করিস তাহলে আমার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

আমার মনিবন্ধ ছেড়ে লোক দুটো কাঁধে ধাক্কা মেরে মেরে আমাকে সামনের দিকে হাঁটাতে লাগল।

কেউ আমার দিকে নজরও দিল না। আমি হয়ত তাদের ঘুঁষি মেরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারতাম কিন্তু তাতে বিপদ বেড়ে যেত।

সুতরাং তাদের সঙ্গে হেঁটে দরজার সামনে এলাম। ফর্সা লোকটা দরজায় টোকা মারল।

ভিতরে এস, ফর্সা লোকটা হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

কালো লোকটা কনুইয়ের ধাক্কা মেরে ঘরে নিয়ে এল। ঘরটা অফিস না বসবার ঘর বোঝা গেল না। লাল টকটকে পর্দায় ঢাকা জানালার পাশে একটা ডেস্ক। ডেস্কের পিছনে একটা চেয়ার এবং ডানদিকে একটা লোহার ক্যাবিনেট। ঘরে বাকি চেয়ার ও রেডিও সেট। এবং স্প্যানিশ শালে মোড়া একটা ইজিচেয়ারে ভর্তি। ঘরে একটা ছোট বার ছিল।

ডেস্কের পিছনে এক্সিকিউটিভ চেয়ারের উপর কালো জামা পরে একজন মোটা, দীর্ঘকায় লোক বসেছিল। তার মাথা লাল ও পাকা চুলে ভর্তি, তার মাংসল মুখে একটা গভীর চিন্তার ভাব তার ছোট্ট কটা চোখ দুটো স্থির ও দৃষ্টি যেন ভাসা ভাসা।

কালো লোকটা ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল এবং অন্যজন দরজা ভেজিয়ে দিল। মনে হল দরজায় চাবি লাগানো হল।

এবারে অস্বস্তি লাগছিল যদি তারা ক্যামেরাটা দেখতে পায়, তবে বিপদ।

ডেস্কে বসে থাকা লোকটা আমার দিকে চেয়ে পরে কালো লোকটার দিকে চেয়ে ভুরু দুটো কোঁচকাল।

কালো লোকটা বলল, সদস্য নয়। প্রতারকের মত বিনয়ের সুরে মোটা লোকটা যাকে জ্যাক ক্লড ভেবেছিলাম বলল, অত্যন্ত দুঃখিত বন্ধু। আমরা কিন্তু রবাহুত লোককে স্বাগত জানাই না। আপনার নাম জানতে পারি।

আমি চেসটার স্কট। এখানে এত উত্তেজনা কেন? ফিল ওয়েলিভার আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে হল আমার বন্ধু।

কোথায় থাকেন মিঃ স্কট?

বললাম।

সে টেলিফোন বইটা নিয়ে আমার ঠিকানা যাচাই করে দেখল।

মিঃ ওয়েলিভারের জানা উচিত আমার অনুমতি ছাড়া কোন বন্ধুকে তিনি ওপরে আনতে পারেন না, যতক্ষণ না তার বন্ধুরা আমাদের বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে দেয়।

আমি সেকথা জানতাম না। ফি-এর কথা ওয়েলিভার কোনদিন বলেনি। আমি ফি দিতে রাজী আছি। কত?

ক্লড বলল, পঁচিশ ডলার।

কালো লোকটার দিকে চেয়ে। বলল, মিঃ স্কটের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান?

গত রাতে একে মিস লেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল।

ক্লডের দৃষ্টি যেন অনেক দুরে সরে গেল। চেয়ারে, একটু নড়ে বসে বিনয়ের সঙ্গে বলল, মিঃ স্কট, মিস লেনকে আপনি চেনেন?

না, তার গান শুনেছি। আমার ধারণা সে বেশ সুন্দরী। আমার সঙ্গে মদ খাবার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলাম।

সে খেয়েছিল?

না।

কিন্তু আপনি কি তার ড্রেসিং-রুমে কথা

হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?

কি নিয়ে কথা বলছিলেন?

এমনি এটা সেটা নিয়ে। আপনাদের কি দরকার?

ক্লড কালো লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আর কোন প্রশ্ন আছে?

আর কিছু নেই।

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। মিঃ স্কট। পঁচিশ ডলার দিন।

ওয়ালেট থেকে পঁচিশ ডলার বার করে টেবিলের উপর রাখলাম।

একটা রসিদ লিখে আমার হাতে দিয়ে, একটু সাবধানে চলবেন, মিঃ স্কট। কারণটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে না। আশাকরি প্রায়ই আপনার দেখা পাব।

আশা করি পাবেন।

কালো ও ফর্সা লোকটা বিরক্তি নিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

রসিদটা ওয়ালেটে রেখে। আচ্ছা ধন্যবাদ বলে পিছন দিকে গেলাম।

ঠিক সেই সময় অসকার রস ভিতরে এসে ঢুকল।

তার পরনে বারম্যানের পোশাক এবং হাতের ট্রেতে এক বোতল স্কচ, একটা গ্লাস এবং বরফের পাত্র।

ক্লডের টেবিলে ট্রে রাখার আগে পর্যন্ত সে আমাকে চিনতে পারেনি। পরে সে আমার দিকে এমন ভাবে চাইল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বেরিয়ে যাবার পথের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

রস আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দরজার হাতল ঘুরালাম কিন্তু দরজায় তালা লাগান ছিল।

ফর্সা লোকটা তালা খুলতে এগোলে রস হুংকার দিল, এই, ওকে এখান থেকে যেতে দিও না।

চাবি তালায় লাগানো ছিল। চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতে যাব লোকটা ছুটে দরজার কাছে

এসে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরল।

রস বলল, ও এখানে কি করছিল?

ফর্সা লোকটা হতবুদ্ধি হয়ে ক্রুডের দিকে চাইল।

আমি তার চোয়ালে সজোরে এক ঘুঁষি মারলাম সে পিছন দিকে সরে যেতেই তার মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল।

চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুললাম।

ধর ধর।

কালো লোকটা চিৎকার করে উঠল।

তার দিকে চাইলাম হাতে একটা ৩৮ স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। নলটা আমার দিকে।

তার হুমকি উপেক্ষা করেই দরজা খুলে ফেললাম।

রস হিংস্র ও ভয়াবহ ভাবে আমার দিকে ছুটে এল।

সে আসার আগেই আমি প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম।

আমার মুখে ঘুঁষি মারলো। কিন্তু আমি এক পাক ঘুরে তার হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম। তার মুখে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম। সে ছিটকে পড়ে গেল। আমি ছুটে দরজা পেরিয়ে জুয়ার ঘরে এলাম।

বেশ ভারী একটা কিছু আমার হাঁটুর পেছনে লাগতেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠতে যাব এমন সময় কালো লোকটা আমার চোয়ালে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিল। মাথাটা তুলতে যাব একটার পর একটা ঘুঁষি পড়ল।

এক লাথি মেরে কালো লোকটাকে দুরে ছিটকে ফেলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। রস বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এল।

সে একটা ঘুঁষি ছুঁড়তেই আমি ছুটে এসে সজোরে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম।

কিন্তু ওকে বেশি আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

কালো লোকটা উঠে এত দ্রুতগতিতে আমার দিকে ছুটে এল যে আমার আর কিছুই করার ছিল না।

ভারী রডের মত একটা কিছু নেমে আসার শব্দ পেলাম। মাথাটা বাঁচাবার জন্য অল্প পাশে সরিয়ে নিলাম।

আমার চোখ অন্ধকার হয়ে উঠল। বুঝলাম। দ্বিতীয়বারে আমার দেরী হয়ে গেছে।

যাই হোক সে একজন পেশাদার লোক। যখন সে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে তখন ফাঁদে পড়তেই হবে।

চতুদর্শ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই মুখে গরম রোদ এসে পড়ল এবং তীব্র আলো চোখের বন্ধ পাতায় পড়তে চোখ ধাঁধিয়ে উঠল।

একটা চলার অনুভুতি পেলাম। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে বুঝতে পারলাম আমি একটা গাড়িতে শুয়ে আছি এবং কেউ একজন খুব জোরে গাড়িটা চালাচ্ছে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কারণ একটা যন্ত্রণা ঘাড় বেয়ে মাথার পিছন দিকে ও চোখে ঠেলে উঠতে চাইছে।

চুপ করে নিস্পন্দ হয়ে রইলাম এবং গাড়ীর দোলায় উঠানামা করতে লাগলাম। একটু আরাম বোধ করতেই চোখ খুলে চারপাশে চাইলাম।

আমার সেই ভাড়া করা বুইক গাড়ির পিছনের সীটে আমি শুয়ে আছি। একজন লোক আমার পাশে বসে, তার ইস্পাত রঙের ধূসর প্যান্টের পায়ের দিকটা যে আমাকে জোরে আঘাত করেছিল।

ফর্সা লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল। তার মাথায় হালকা রঙের জোকারের মত একটা টুপি যেটা নামিয়ে প্রায় নাকের উপর নিয়ে এসেছে।

চোখ দুটো অর্ধেক বন্ধ করে জানালার বাইরে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম গাড়িটা কোন্ দিকে চলেছে।

আমরা পামসিটির এক প্রান্তের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। রবিবারের বিকেলে রাস্তা জনহীন।

মিনিট পাঁচেক পরে দেখতে পেলাম, পাম সিটি পেছনে ফেলে সমুদ্রতীরে যাওয়ার বড় রাস্তায় এলাম। আমি যে দিকটায় থাকতাম, ভাবলাম তারা হয়ত আমাকে আমার বাংলোতে রাখতে যাচ্ছে।

আমার হাত ও মনিবন্ধ ঢেকে রাখার জন্য একটা ছোট কম্বল হাঁটু পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। আমার মনিবন্ধ দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে আঠা লাগানো ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একটু আলগা করার জন্য চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলাম এত জোরে লাগান আছে যে মনে হচ্ছে স্ক্রু দিয়ে আটকান।

কালো লোকটা বলল, মোড়ে ডান দিকে বাঁক নেবে লিউ। ওর বাড়ি হচ্ছে এখান থেকে ডানদিকে প্রায় তিনশো গজ দূরে, যে কোন লোকের বাস করার পক্ষে চমৎকার। এখানে থাকবার সুযোগ পেলে মন্দ হত না।

লিউ অর্থাৎ ফর্সা লোকটা বলল, ওকে বল না কেন উইলে তোমার নামে বাড়িটা লিখে যাবে। ওর তো বাড়িটার আর কোন প্রয়োজন হবে না।

আঃ, গুলি মার। আমার অতটা প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ মনে হল তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছে বুঝতে পারলাম না, কারণ গাড়িটা হঠাৎ গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালো লোকটা বলল, এখানে।

লিউ বলল, ঠিক আছে ওকে নামিয়ে ফেলা যাক।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় জোরে ঘা দিতে লাগল।

কালো লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের দরজা খুলে আমাকে চেপে ধরে বার করে নিল।

মাটিতে নামিয়ে রাখা হলে লিউ বলল, তুমি কি খুব জোরে আঘাত করেছিলে নিক? এর এখন মাটির উপর হাঁটা উচিত।

ঠিক ভাবেই মেরেছি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়বে।

দুজনে মিলে কখনও ঘাড়ে তুলে, কখনও বা পথ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে সিঁড়ির উপর ধাপে এনে ফেলল।

নিক বলল, ওর চাবি পেয়েছে?

হ্যাঁ, এই যে।

সদর দরজার তালা খুলে হলঘরের ভিতর দিয়ে আমাকে টানতে টাতে এনে আমারই ইজিচেয়ারে দুম্ করে ফেলল।

লিউ বলল, ওকি বেঁচে আছে তোমার ধারণা?

অভিজ্ঞ হাত আমার নাড়ি টিপে, বেশ ভালই আছে, মিনিট পাঁচেকের ভিতর জ্ঞান ফিরে আসবে, উঠে বসবে।

ওর ভাল হওয়া দরকার। গ্যালগানোর সঙ্গে কথা বলার আগে যদি লোকটা ফেঁসে যায় তবে গ্যালগানো ক্ষেপে যাবে।

শান্ত হও ভাই, ভালই আছে। কাউকে যখন ফাঁদে ফেলি, ঠিকভাবেই ফেলি। দেখ না, একটু পরেই কেমন নাচ নাচবে।

মৃদু কাঁতরিয়ে পাশ ফিরলাম।

দেখছ? ঘোর ভাবটা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে, দড়ি দাও।

লিউ যখন ইজিচেয়ারের পায়ার সঙ্গে দড়িটা বাঁধছিল তখন চোখ খুলে তাকালাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে পিছনে সরে গেল।

চোখ চাইছে, আমার দিকে ঝুঁকে মুখের উপর হাত বুলাতে লাগল। বিশ্রাম নে স্যাঙাৎ। বড়কর্তা তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে।

নিক অধীরভাবে বলল, চলে এস। এখান থেকে যাওয়া যাক। ভুলে যাচ্ছ আমাদের হেঁটে

ফিরতে হবে?

লিউ গর্জন করে উঠল।

ক্লড বদমাশটা একটা গাড়ি পাঠাল না কেন?

তাকেই প্রশ্ন করো।

বুকের উপর বাঁধা দড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে পিছনে ফেরে নিষ্ঠুর হাসি হেসে।

'বিদায় স্যাঙাৎ' বলে তারা হলঘরে ঢুকল এবং লাউঞ্জের দরজাটা অর্ধেক খুলে রাখল। সদর দরজা খুলে আবার বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

বাংলোয় আবার নীরবতা। এমনকি দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দ ও অস্বাভাবিক লাগছিল।

কয়েক মিনিট ধরে হাতের মনিবন্ধে লাগান আঠামাখা ফিতেটা খোলার বৃথা চেষ্টা করলাম কিন্তু খোলা সম্ভব নয় দেখে চুপ করে শুয়ে রইলাম।

সেই সময় মনে পড়ল লুসিলিকে আমার বিছানায় বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। হয়ত সে বাঁধন খুলতে পেরেছে। এমনও হতে পারে সে হয়ত আমার বাঁধনও খুলে দিতে পারে।

জোরে ডাকলাম, লুসিলি! লুসিলি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

কিন্তু ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ও জানালার পর্দার পত পত শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পেলাম না।

গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে, লুসিলি তুমি কেমন আছ?

আবার চারিদিক নিস্তব্ধ।

লুসিলি!

দরজা খোলার মৃদু শব্দ পেলাম প্যাসেজের কোথাও, হয়ত আমার শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ।

মাথাটা একটু তুলে দেখলাম আমার শোবার ঘরের দরজা।

তীক্ষ্ণস্বরে বললাম, কে ওখানে? লুসিলি তুমি?

ধীর কিন্তু ভারী পায়ের শব্দ প্যাসেজে এগিয়ে আসছে শুনলাম। ভয়ানক ভয় পেলাম, এত ভয় জীবনে পাইনি।

লুসিলি না। এত ভারী পায়ের শব্দ মেয়েদের হতে পারে না। একজন পুরুষ আমাদের শোবার ঘর থেকে এগিয়ে আসছে।

কে ওখানে? বুকটা ধড়ফড় করে ভয়ে।

ভারী পায়ের শব্দ ধীর গতিতে এগিয়ে লাউঞ্জের দরজার সামনে এসে থামল। দরজার ওপাশে দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, ভিতরে এস, যেই হও না কেন। ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসে চেহারা দেখাও।

দরজাটা আস্তে খুলতে লাগল। সম্পূর্ণ খুলে গেলে দেখলাম দরজায় দাঁড়ান লোকটি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। পরনে ঘন নীল রঙের কোট, ধূসর ফ্ল্যানেলের প্যান্ট ও বাদামী রঙের জুতো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন রোজার আইকেন।

।। দুই ।।

আইকেন ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁর ধীর কিন্তু সংযত মুখের ভঙ্গি দেখে একটু স্বস্তি পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না, স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করছেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন।

সব যেন স্বপ্ন মনে হল। ইনিই আইকেন, তবুও মনে হল ইনি যেন আইকেন নন। উজ্জ্বল চোখ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বে ভরা মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এ অন্য আইকেন যাকে আমি চিনি না এবং যে কেবল আমাকে ভয় দেখায়। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

তোমাকে মনে হচ্ছে ভীষণ ভয় দেখিয়েছি, স্কট।

আর কোন সন্দেহ রইল না ইনিই আইকেন।

কর্কশ কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ। বেশ ভালভাবেই ভয় দেখিয়েছেন। আপনার পা দেখছি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গিয়েছে।

তিনি জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ ধরনের কোন কিছুই ঘটেনি। আমার স্ত্রীর সাথে তুমি যাতে পরিচিত হও তার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলাম।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে শুয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি এগিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন।

ভারী সুন্দর তোমার বাংলো, স্কট। একটু নির্জন কিন্তু সুবিধা অনেক। অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে তুমিই কি তাদের স্বামীদের বোকা বানাবার চেষ্টা কর?

কোন দিনই একত্রে বেশিক্ষণ থাকিনি বা কোনদিনই তার শরীর স্পর্শ করিনি। অত্যন্ত দুঃখিত, হাত পা খুলে দিলে বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বলতে পারব, অনেক কথাই বলার আছে।

লুসিনির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, সে কি পালাতে পেরেছে, নাকি এখনও বাংলোতে আছে? বিছানায় যদি বাঁধা থাকে তবে আইকেন নিশ্চয়ই জানেন, তিনি তো শোবার ঘর থেকেই বেরিয়ে এলেন।

আইকেন সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন।

ভাবছি যেমন আছ সেই ভাবেই তোমাকে রেখে যাব। যাইহোক ইতিমধ্যে কথা বলা যাক।

আমার মাথায় তখন এক অদ্ভুত চিন্তা, আমার শরীরটা ভাবতেই শক্ত হয়ে উঠল তার দিকে চাইলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে লোকটি আসবে লিউ জানিয়েছিল তিনি এবং ইনিই কি একই ব্যক্তি। যাকে আমি রোজার আইকেন নামে জানতাম, লিউ এবং তার সাকরেদরা তাঁকেই আর্ট গ্যালগানো নামে চেনে। চিন্তাটা অদ্ভুত হলেও যুক্তিপূর্ণ।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ভেবেছ, আমি গ্যালগানো।

আড়াআড়ি ভাবে পায়ের উপর পা চাপিয়ে বসলেন।

ইনটারন্যাশানাল থেকে আমি যা পাই তা দিয়ে আমি যেভাবে আড়ম্বরের সঙ্গে জীবন যাপন করি তা কি সম্ভব, স্কট? তিন বছর আগে লিটল ট্যাভার্ন ক্লাব কিনে নেওয়ার একটা সুযোগ আসে এবং আমি সেটা কিনে নিই। এই শহরে বড়লোকের বাস। সমাজের অপাঙক্তেয় ধনী লোকে গোটা শহর ভর্তি, তাদের করার মত কোন কাজ নেই। একজন আর একজনের বৌ নিয়ে পালিয়ে মদ খেয়ে বেড়ায়। আমি জানতাম এদের সুযোগ দিলে জুয়া খেলতে দ্বিধা করবে না। তাদের জন্য সে সুযোগ করে দিলাম।

গত তিন বছর ধরে লিটন ট্যাভার্নে জোর জুয়ার আড্ডা চলছে এবং আমার ভাগ্যও ফিরে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। লিটল ট্যাভার্ন যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল ও' ব্রায়ান। কোন জুয়ার আড্ডা সন্দেহ হলে রিপোর্ট করার কাজ ছিল তার। সে আবার পুলিশ কমিশনারের মাথার মনি, প্রথম দিকে একটা বোঝাপড়া থাকলেও পরে তার লোভ ক্রমশঃ বেড়ে চলল। আড্ডা থেকে পাওয়া লাভের টাকা আমার কাছে আসার বদলে তার কাছে যেতে লাগল। দাবীর চোটে সে আমাকে উত্যক্ত করে তুলল। ব্ল্যাকমেলার হিসেবে সে ছিল প্রথম শ্রেণীর। পাঁচ ছয় মাস পরে দেখা গেল লিটল ট্যাভার্ন কেনার আগে আমার যা আয় ছিল বর্তমান আয় তার চেয়েও কম। তার লোভ এতই বেড়ে চলল যে অনেক সময় ইনটারন্যাশানালের মুনাফার টাকা থেকে তার দাবী মেটাতে হত। এ ব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না।

চারটে বাজল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানলার খড়খড়িতে এসে পড়ল।

চুপ করে শুয়ে এমন একজন লোকের কথা শুনছিলাম যিনি আমার বড়সাহেব এবং দেশের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁর বিরাট আকৃতি। বলিষ্ঠ চেহারা এবং সুন্দর পোশাকে এখনও তাঁকে সুন্দর ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমার কাছে কিন্তু তার মূল্য এখন অনেক কম।

তিনি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। ও' ব্রায়ানের মত একজন ব্ল্যাকমেলারের মুখ বন্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে তাকে হত্যা করা। পুলিশের একজন লোককে হত্যা করা বেশ বিপদের স্কট। সমস্ত পুলিশ বাহিনীর কাছে যেন একটা চ্যালেঞ্জ এবং তারা হত্যাকারীকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমি মোটামুটি একটা প্ল্যান করেছিলাম, সমস্ত ঘটনাকে

আমি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম যে যদি একটা মানুষকে হত্যা করতেই হয় তবে তা থেকে রেহাই পাবার মত সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখতে হবে।

ভয়ানক আর্থিক অসুবিধায় পড়েছিলাম। ইনটারন্যাশানাল থেকে ইতিমধ্যেই পনের হাজার ডলার সরিয়েছিলাম এবং সেটা খুব বেশিদিন চেপে রাখা সম্ভব হত না। এছাড়া সর্বত্র দেনা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ও' ব্রায়ানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে জুয়ার আড্ডার আয় থেকে এই দেনা শোধ করতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না। ও' ব্রায়ানের পরে সেই পদে যে আসবে তার পক্ষে নাইট ক্লাবের রহস্য জানার আগেই আমি আড্ডা তুলে দিতে পারব। সুতরাং আমাকে তাড়াতাড়ি টাকা তুলতে হবে। ঠিক সেই সময় তোমার কথা মনে পড়ে। আগেই শুনেছিলাম তোমার কিছু টাকা জমা আছে। তোমার কাছে টাকাটা ঠকিয়ে নেওয়ার একটা প্ল্যান করে নিয়েছিলাম, স্কট। সেই জন্যই নিউইয়র্ক অফিসের অবতারণা এবং তুমিও ফাঁদে ধরা দিয়েছিলে।

লুসিলির কথা মনে পড়ল তাঁর শান্ত কিন্তু ভয়ংকর কথাবার্তা শুনতে শুনতে। আইকেনের আসার আগে লুসিলি কি বাঁধন খুলে চলে গিয়েছে অথবা সে এখনও আমার শোবার ঘরে আছে—একথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। ওর মুক্তি পাওয়ার সুযোগ কম।

তিনি বলে চললেন, যদি সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বাঁচার একটা পথ করে রেখেছিলাম। কেবল মিসেস হেপল ও লুসিলি জানত। মিসেস হেপল অনেকদিন আমার সঙ্গে আছেন এবং তাকে বিশ্বাস করা যায়। লুসিলি...সম্পর্কে কিছু বলে নিই। সে ছিল লিটল ট্যাভার্নের একজন নর্তকী। যখন ক্লাবটা কিনে নিই তখন সতর্ক ছিলাম যাতে ক্লড ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে আইকেন কে। সেখানে খদ্দের হিসেবে আমি যেতাম। মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। জীবনে এটা এক বিরাট ভুল। সে সুন্দরী, যুবতী ও আমুদে। কিন্তু কোন মেয়ের যদি রূপ থাকে এবং মাথামোটা হয় তবে যে কেউ তাকে নিয়ে কিছুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

যাই হোক তার একটা গুণ ছিল তাকে যা করতে বলি সে তাই করত। তার মূর্খ ভাই রস একই ভাবে আমার কথায় ওঠাবসা করত। যখন লিটল ট্যাভার্ন কিনে নিই তখন সে সেখানে কাজ করত। এদের দুজনকে কি করতে হবে বুঝিয়ে বললাম, ও' ব্রায়ান যদি এভাবে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে তবে লিটল ট্যাভার্ন উঠে যাবে। রসের চাকরি চলে যাবে এবং লুসিলি দেখবে এক গরীব লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। আমারই উপদেশমত লুসিলি তোমাকে গাড়ি চালাতে শেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিল—ভাল উপদেশ আশা করি। কঠিন হাসিতে বলল, যখন প্রস্তুত হলাম তখন লুসিলিকে বললাম তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যেতে। ও' ব্রায়ানকে বললাম সেখানে তার সঙ্গে দেখা করব। তার মাসিক প্রাপ্য পাওনা হয়েছিল। দুজনের সেখানে সাক্ষাৎ হল। আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলাম রস পিছন থেকে এসে মাথায় আঘাত করে তাকে অচৈতন্য করে ফেলে। ইতিমধ্যে লুসলি ও তুমি সেখানে এক নাটক করছিলে। কি ভাবে আচরণ করতে হবে লুসিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি তার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠবে এটার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে তোমার মনে একটা অপরাধবোধ জাগবে। লুসিলি তোমার গাড়ি নিয়ে পালাবে সেটারও প্রয়োজন ছিল। পুরুষের মনস্তত্ব আমার ভালভাবেই জানা ছিল এবং জানতাম যে আমি যেভাবে চেয়েছিলাম তুমি সেভাবেই কাজ করে যাবে। লুসিলি গাড়িটা নিয়ে আমার কাছে আসে। দুর্ঘটনার পরিস্থিতি সাজান খুব কঠিন নয়। ও' ব্রায়ান রাস্তায় শুয়েছিল। তার উপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিলাম। রাস্তার মাঝখানে তার মোটর সাইকেলটা রেখে খুব জোরে চালিয়ে সেটার উপর এসে পড়লাম। ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। গাড়িটা লুসিলি ও রসের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, তোমার বাংলোয় নিয়ে যেতে।

আপনি একটা ভুল করেছিলেন, সব হত্যাকারীই এ ধরনের ভুল করে। ও' ব্রায়ানকে পিছনের চাকায় চাপা দেন। আর তার মোটর সাইকেলটা গুঁড়িয়ে দেন সামনের চাকা দিয়ে। এ থেকেই আমি বুঝতে পারি ব্যাপারটা গোলমেলে। যে ভাবে আপনি ঘটনাটা সাজিয়েছিলেন তাতে অ্যাকসিডেন্টে ও' ব্রায়ানকে চাপা দেওয়া দেখান যেত না।

তিনি ভুঁরু কুঁচকিয়ে বললেন, তাতে কিছু এসে যায় না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার

জন্য তুমি গাড়িটা মেরামত করে নিয়েছিলে। বুদ্ধিমানের মত তুমি গাড়ির নম্বরটা পালটিয়ে নিয়েছিলে। কিন্তু তোমাকে নম্বর প্লেট হাতে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রস একটা ছবি তোলে। ছবিটা দেখে আমি বুঝতে পারি তোমাকে আমি যেভাবে ফাঁসাতে চেয়েছিলাম তুমি সেভাবেই ফেঁসেছ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে তুমি চালাক হতে চেয়েছিলে। তার চেয়েও দুঃখের যে তুমি লেন মেয়েটার ঘরে গিয়েছিলে। এতে আমার পক্ষে জটিলতার সৃষ্টি হয়। জানতাম যে এই মেয়েটার হাত থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। কারণ ও' ব্রায়ান ইতিমধ্যেই তাকে বলেছিল যে, সে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। ফলে তার পক্ষে ধারণা করে নেওয়া স্বাভাবিক যে ও' ব্রায়ানের মৃত্যু অ্যাকসিডেন্টে ঘটেনি।

আমার লোকেরা সবসময় তার ওপর নজর রাখত এবং সেটাও সে জানত। সে এবং নাটলে ভয় পেয়েছিল। তারা শহর থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল যেখানে আমার নাগাল যাবে না। কিন্তু তাদের পালিয়ে যাবার মত অর্থ ছিল না। সুতরাং তুমি যখন তাদের সামনে হাজির হলে, সে দেখল অর্থ সংগ্রহ করার এই সুযোগ। আমার লোকেরা বলল তুমি তার ঘরে ঢুকেছ। সেখানে যেতে একটু দেরি হয়েছিল, অবশ্য সে যে তোমাকে উল্টোপাল্টা কথা বলেছিল সেটা শুনতে পেয়েছিলাম। আমি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, বেরিয়ে আসতেই তাকে হত্যা করি। নাটলের হদিশ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার একজন লোক এসে বলল যে তোমাকে এবং নাটলেকে ওয়াশিংটন হোটেলের একটা ঘরে সে দেখেছে। সোজা সেখানে গিয়ে তাকে গুলি মেরে হত্যা করি। রাতের কেরানীটারও দিন ঘনিয়ে এসেছিল। নাটলের ঘরে যাবার জন্য সে আমার কাছে একশ ডলার নেয়। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সেইজন্য তাকে হত্যা করি। তা নইলে পরে সে আমাকে চিনে ফেলত। তাঁর লাল মাংসল মুখে হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

একবার হত্যা করলে তখন সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সহজেই আবার হত্যা করার প্রয়োজন হয়, স্কট। কিন্তু সমস্ত ঘটনা তাতে জটিল হয়ে পড়ে। একবার একজনকে হত্যা কর, পরে প্রথম হত্যার কারণ চাপা দেওয়ার জন্য আবার হত্যা করতে হবে। আবার দ্বিতীয় হত্যাকে চাপা দেওয়ার জন্য হত্যা করতে হবে।

কর্কশ কণ্ঠে বললাম, আমার ধারণা আপনি মানসিক দিক থেকে সুস্থ নন। ও থেকে মুক্তি পাবার আশা করবেন না।

নিশ্চয়ই পাব। এই সময় আমি পা-ভাঙ্গা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকা ছিল বাঁচবার সহজ উপায়। কারও মনে সন্দেহই হবে না যে এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি জড়িত। তাছাড়া অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। তোমার এখানে একটা টাইপরাইটার আছে। এতে আমি একটা অর্ধ সমাপ্ত ভাবে টাইপ করে রাখব যাতে তোমার অপরাধ স্বীকারের প্রথম দিকটা টাইপ করা থাকবে। এ থেকে পুলিশ বুঝতে পারবে যে, তুমি ও' ব্রায়ানকে অ্যাকসিডেন্টে চাপা দিয়ে মেরেছিলে এবং লুসিলি ও রস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যখন আমার লোকেরা তোমাকে এখানে নিয়ে আসছিল তখন আমি কাকে তার বাংলোয় নিয়ে গিয়ে নাটলেকে যে বন্দুক দিয়ে হত্যা করেছিলাম সেই বন্দুক দিয়ে তার মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করেছি। প্রতিবন্ধক যারা, তাদের আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই, স্কট।

রসের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তার চেয়ে বেশি লুসিলিকে নিয়ে। তোমার সেই অপরাধ স্বীকার করা চিঠিটায় আবার ফিরে আসা যাক, স্কট। পুলিশের লোক চিঠি থেকে জানবে [illegible] ও তার এজেন্ট নাটলে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল আর সেজন্য তুমি তাদের [illegible] করেছিলে। তুমি যে তাদের হত্যা করেছিলে পুলিশ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাবে। আর তারা এও পড়বে যে তুমি রসের বাংলোয় গিয়ে তাকে হত্যা করে নিজের বাংলোয় ফিরে এসেছিলে। আসার সময় লুসিলিকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এনে তোমার নেকটাই তার গলায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা কর।

অস্বস্তি ভরে বললাম, আপনি কি লুসিলিকে হত্যা করেছেন বলতে চান?

আইকেন বললেন, অবশ্যই। এ ধরনের সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। যখন লুসিলিকে

বিছানার সঙ্গে অসহায় অবস্থায় বাঁধা দেখতে পেলাম তখন মনে হল তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে তোমার একটা রঙীন নেকটাই তার নরম নির্বোধ গলায় জড়িয়ে টান দেওয়া। খুব সহজ ব্যবস্থা, স্কট। রস ও লুসিলি দুজনের হাত থেকেই মুক্তি পেলাম। একজন ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে মুক্তি পেলাম যে আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ভগবানের আশীর্বাদের মত হ্যাকেট একলক্ষ ডলার নিয়ে উপস্থিত হল, এখন তোমার টাকা প্রয়োজন নেই। আমি আবার ব্যবসা শুরু করতে পারব। এমন কি জুয়ার আড্ডা যদি চালু না রাখতে পারি তাহলে একলক্ষ ডলারও আমার প্রতিভা নিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করবো।

রেহাই পাচ্ছেন না আপনি, তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, অনেকেই জানে। ক্লড জানে তার সাকরেদ দুজনে জানে...

সেই কঠিন হাসি তাঁর মুখে দেখা গেল।

আমার ভরাডুবি হলে তাদেরও হবে, এটা তারা জানে। এখন বাকী বিবেকের তাড়নায় তোমার নিজেই নিজের শিকার হওয়া স্কট। এখন আত্মহত্যা করা। এত খুন করার পর জীবন তোমার কাছে দুর্বিসহ হয়ে নিজের জীবনের ইতি টেনেছ, পুলিশের লোক শেষ পর্যন্ত জানবে।

পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বার করে আইকেন ডান হাত প্যান্টের পিছন পকেট থেকে ৪৫ পিস্তল বার করলেন।

এটা নাটলের পিস্তল তিনি বলে চললেন। এই পিস্তলে নাটল ও রসকে মারা হয়েছিল। এখন তোমাকে মারা হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্কট। চিরদিনের মত তোমাকে হারাব, তুমি অভিজ্ঞ ও দক্ষ, কিন্তু এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আর কোন পথ নেই। আশ্বাস দিচ্ছি কষ্ট পাবে না। কানে গুলি করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে।

আমি আঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে আমার দিকে আসতে দেখলাম, পিস্তলটা কাঁধে ঝোলান। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

জীবনের এক চরম মুহূর্ত, যা ভুলতে পারব না।

আইকেন দরজার দিকে চাইলেন, তাঁকে বুড়ো আঙুলে দিয়ে পিস্তলের সেফটি টেনে ধরতে দেখলাম।

আইকেন সেখানে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

ওরা জানতে পারবে আমি ভিতরে আছি, কর্কশ গলায় বললাম, গাড়িটাও বাইরে আছে।

আমার দিকে চাইলেন, তাঁর মুখ থেকে গর্জনের মত শব্দ বেরিয়ে এল।

একটা শব্দ করলে শেষ করে দেব, তিনি বললেন।

সদরে ঘণ্টা বেজে গেল।

আইকেন নিঃশব্দে হলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তাঁর পিঠ এখন আমার দিকে এবং ঘরের দরজার দিকে ফেরানো। ছোট দরজায় ছায়া দেখা গেল। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ চেহারার লেফ্‌টেন্যান্ট ওয়েস্ট ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে .৩৮ পিস্তল।

আমার দিকে না, আইকেনের দিকে তিনি চেয়ে ছিলেন।

পিস্তল উঁচু করে গর্জে উঠলেন, হাত তোল, আইকেন। পিস্তল ফেলে দাও।

আইকেনের দেহ কেঁপে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি পিস্তল তুলে ধরলেন, ভয় ও রাগে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

ওয়েস্ট তাঁকে গুলি করলেন।

আইকেনের পিস্তলও গর্জন করে উঠল কিন্তু তিনি মাটিতে ঢলে পড়ছেন, বুলেটটা কাঠের মেঝেয় গর্ত করে বেরিয়ে গেল। আইকেনের চোখে রক্তের চিহ্ন দেখা দিল। সশব্দে পড়লেন মেঝের ওপর। শেষবারের মত নড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর আঙুল থেকে পিস্তলটা ছিটকে গেল, ওয়েস্ট গম্ভীর ভাবে পিস্তলটা তুলে নিলেন।

বাইরে শব্দ শোনা গেল। পুলিশের লোক বন্দুক হাতে ভিতরে এসে ঢুকল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওয়েস্ট বললেন। শেষ করে দিয়েছি।

পিছনের পকেটে পিস্তলটা রেখে, আমার দিকে এসে হেসে বললেন, ভীষণ ভয় পেয়েছেন

নিশ্চয়?

তার দিকে চাইলাম, এত ভয় পেয়েছিলাম যে কথা বলার শক্তি ছিল না।

ওয়েস্ট যখন হাতের ফিতে খুলছিলেন, জো ফোলাস ছুটে ঘরে এসে ঢুকল। তার চোখ ও মুখ চকচক করছে।

এই যে, চেস! আমি উঠে বসে মনিবন্ধে হাত ঘঁষছিলাম, সেখানে সাড় ফিরিয়ে আনতে। এখন ঠিক আছ তো?

হ্যাঁ, বললাম। তুমি কি করছ?

আমিই পুলিশ ডাকি, সে বলল। আইকেনের মৃতদেহ দেখতে পেল। পিছন দিকে সরে এল। হায় ভগবান! মরে গিয়েছে?

দেখুন আপনারা দুজনে, ওয়েস্ট বললেন, বাইরে বেরিয়ে আসুন। টলতে টলতে যখন দাঁড়ালাম, ওয়েস্ট আমার কাঁধে টোকা মেরে বললেন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার আগে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, চিন্তা করবেন না। আইকেনের কথা শুনেছি, আপনার বিপদের কোন কারণ নেই? বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

আইকেন কি লুসিলিকে মেরে ফেলেছেন?

হ্যাঁ, ওয়েস্ট বললেন। লোকটা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি লিটল ট্যাভার্নে তার জুয়ার আড্ডা ছিল?

কোটের ভাঁজে হাত রাখলাম। ক্যামেরাটা তখনও সেখানে ছিল। সেটা বার করে ওয়েস্টের হাতে দিলাম, এতে জুয়ার আড্ডার ছবি আছে। ইনক্যোয়ারার আমাকে ক্যামেরাটা দিয়েছিল।

মনে হচ্ছে বিকেলটা ব্যস্তভাবে কাটবে। বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করুন, টেলিফোনের দিকে গেল।

একজন পুলিশ জো এবং আমাকে ঠেলতে ঠেলতে বারান্দায় নিয়ে এল। আমরা বসসে বসতে, পুলিশ দুজন বিরক্ত হয়ে আমাদের দিকে চাইল।

ক্লাবের পিছন দরজা দিয়ে লোক দুজনকে বার করে আনতে দেখলাম, জো বলল। আমি তাদের অনুসরণ করি, ভাবলাম তুমি বিপদে পড়েছ। বাংলো পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করি, কিন্তু একা তাদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। তখন পুলিশ ডাকতে যাই।

ধন্যবাদ জো, বলে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। ভীষণ খারাপ লাগছিল।

কয়েক মিনিট যেতে জো বলল, মনে হচ্ছে আমরা দুজনে চাকরি হারাব।

না, হারাব না। কোন একজনকে ইনটারন্যাশানাল চালাতে হবে, আমাদের এটা বিরাট সুযোগ জো।

তা বটে। আমি ভেবে দেখিনি, আইকেন নিশ্চয়ই উন্মাদ ছিল। আমার কিন্তু মনে হত ওর কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে।

আইকেনের মুখের কথা তুমি শুনেছ?

সমস্তক্ষণ আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। সব সময় ভয় হচ্ছিল আমাকে দেখে ফেলবে। ঐ দৈত্যের মত লোকটা না থাকলে জানি না কি করতাম।

আমি নিজেও ঠিক একই কথা ভাবছিলাম, আমি বললাম।

তারপর আমরা কোন কথা বলিনি, আমরা বলেছিলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট বারন্দায় এলেন।

ক্লড এবং সঙ্গী দুজন ধরা পড়েছে, তিনি বললেন। তাঁর মুখ খুশিতে ভরে উঠল। দুই ওয়াগন ভর্তি শহরের গন্যমান্য লোককে ধরা হয়েছে, তাদের জেলে পাঠান হবে। আগামী কাল খবরের কাগজে ছাপা হবে। সেখানে ওয়েস্ট আমার দিকে চাইলেন। ঠিক আছে, সবকিছু আমাদের আবার খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আমি এখনও সঠিক তথ্য জানি না। আপনাকে একবার থানায় আসতে হবে এবং আমরা সব কিছু লিখে নেব। যান, এখন কথা বলুন গে।

আবার কথা শুরু করলাম আমরা.....,

হীট দেম হোয়ার ইট হার্টস

।। এক ।।

ডার্ক ওয়ালেস আমার নাম। চল্লিশের কোঠায় বয়স, অবিবাহিত। আমায় দেখতে সুন্দর না কুৎসিত তা বলব না। শুধু এটুকুই বলব যে আমায় দেখে বাচ্চারা মোটেই ভয় পায় না। ফ্লোরিডার প্যারাডাইস সিটির প্যারাডাইস অ্যাভিনিউতে আস্ত একটি বহুতল বাড়ি। নাম তার ট্রুম্যান বিল্ডিং। এই বাড়িটির শেষ তলায় অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী নামে এক বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে। মোট কুড়িজন বেসরকারী গোয়েন্দা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আমি সেই কুড়িজনের একজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে আমাদের এই বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানটি ব্যয়বহুল হলেও কাজকর্মের দিক থেকে তা সেরা বললে খুব ভুল বলা হবে না। মাত্র দুবছর আগে কর্নেল ভিক্টর পার্নেল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পার্নেল বুঝতে পেরেছিলেন যে আজই হোক বা কালই হোক প্যারাডাইস সিটির কোটিপতি বাসিন্দাদের অনেকেরই একটি ভাল বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। যেসব কাজে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে তার মধ্যে আছে বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকদের সমস্যা, ব্ল্যাকমেল, জুলুম করে টাকা আদায়, হোটেল প্রতারণা, স্বামী বা স্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং খুন খারাপি বাদ দিয়ে তার কাছাকাছি কোন ধরণের অপরাধের বেসরকারী তদন্ত।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের কুড়িজন গোয়েন্দা কর্মীর প্রায় সবাই আগে পুলিশ বা মিলিটারী পুলিশ বিভাগে কাজ করত। প্রত্যেকটি কেস তদন্তের ভার থাকে দুজন গোয়েন্দার ওপর। প্রতি দুজন গোয়েন্দার একটি অফিস আছে এবং খুব জরুরী বিষয় না হলে অন্যান্য সহযোগীরা কি করছে তা কোনও গোয়েন্দা বা তার সহকর্মী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। আমাদের কাজকর্ম খবরের কাগজের লোকেরা যাতে জানতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এত সতর্কতার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত দুবছরে মাত্র একবার গোয়েন্দা তদন্তের বিবরণ জানাজানি হয় এবং সে কেস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করছিল সেই গোয়েন্দাদের ছাঁটাই করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে গত আঠারো মাস যাবৎ চাকরী করার পর আমার পদোন্নতি হয়েছে। আমার একটি অফিসঘর আর একজন সহকর্মীও আছে। তার নাম বিল অ্যান্ডারসন। দেখতে বেঁটেখাটো হলেও তার গায়ে মোষের মত জোর আছে। বিল আগে ছিল সার্লেতে পুলিশের ডেপুটি শেরিফ। ঘটনাচক্রে নিরুদ্দিষ্ট বাচ্চা ছেলেকে খুঁজে বের করতে আমায় সার্লেতে যেতে হয়েছিল। আর সেখানেই বিলের সঙ্গে আলাপ হয়। সত্যি বলতে কি, সেবার বিলের সাহায্যেই কেসটার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। কথায় কথায় বিল আমাকে বলে ফেলেছিল যে সে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চায়। কেসটা মিটে যাবার পর আমিও প্রতিদান হিসেবে কর্নেল পার্নেলকে বলে তাকে পুলিশের চাকরি ছাড়িয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এলাম।

এক কথায় বিলকে কাজের লোক বলা চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও একনাগাড়ে কাজ করে যেতে পারে, আমাদের লাইনে ওটাই দরকার। এখানে ওখানে গিয়ে পুরোনো কাগজ ঘেঁটে খবর যোগাড় করতে তার জুড়ি নেই। হাতে কাজ না থাকলে ও শহরের বিভিন্ন এলাকায়, রেস্তোরাঁয় নাইট ক্লাবে, নয়ত বন্দরের আশে পাশে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় বস্তীগুলোয় ঘুরে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে ভাব জমায়। বিলের চেহারা দেখে সে সব এলাকার গুণ্ডা বদমায়েশরা ভয়ে ভয়ে ওকে এড়িয়ে যায় কারণ তারা জানে বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা এই লোকটার এক ঘুঁষিতে একটা হাতী পর্যন্ত কাৎ হয়ে পড়বে।

আমরা দুজনে জুলাই মাসের এক সকালে অফিসে কাজের আশায় বসে আছি। জানি যে কোন

মুহূর্তে আমাদের ডাক পড়তে পারে। বাইরে বৃষ্টি, আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে। বিল তার বাড়ির জন্য একমনে চিঠি লিখছে আর আমি সুজির কথা ভাবছি।

সুজি লং পুরো নাম, ও বেলভিউ হোটেলে রিসেপশনিস্টের চাকরী করে। এক হতচ্ছাড়া বদমাশ ঐ হোটেলের কামরা ভাড়া নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করত। তার ওপর নজর রাখতে গিয়ে সুজির সঙ্গে আমার আলাপ। সুজি আমায় লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে কিছু খবর দিয়েছিল, সেই খবরের ভিত্তিতে তদন্ত করে আমি লোকটাকে হাতে নাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তারপর সে ব্যাটার পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

সুজির চুলের রং বাদামী। আর জায়গায় জায়গায় লালের ছোপ, সেই চুলের ঢাল দু কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের অনেকটা ঢেকে যায়। তার চোখের মণি ধূসর আর অদ্ভুত জীবন্ত। ঠোঁটে সবসময় দুষ্টু হাসির ছোঁয়া লেগে আছে। সুজির বুক যেমন চওড়া কোমর তেমন সরু, উরুদুটি খুব বড় আর পা দুটি বেশ লম্বা। এক কথায় ও হল তেমনই একটি মেয়ে যাদের আমি স্বপ্নে দেখি। ও আমার মনের মত মেয়ে। প্রত্যেক বুধবার রাতে ওর ছুটি থাকে। সেদিন আমরা একসঙ্গে ঘুরতে বেরোই। একটা সস্তা অথচ ভাল রেস্তোরাঁয় সমুদ্রের মাছের নানারকম রান্না খাই। তারপর তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে তার ছোট্ট খাটে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে রাত কাটাই। মাস তিনেক এভাবে কাটাবার পর আমরা টের পেলাম যে দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি। আমি কয়েকবার ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু প্রত্যেকবারই ও মাথা ঝাঁকিয়ে সেই একরকম দুষ্টু হাসি হেসে জবাব দিয়েছে, না ডার্ক এখনও আমাদের বিয়ে করার সময় আসেনি।

আমি অবাক হয়ে বলেছি, কেন? ও একই রকম ভাবে উত্তর দিয়েছে, বিয়ে করতে আমিও চাই। কিন্তু আমি যে চাকরীটা করছি তার মাইনে পত্র খুব ভাল। এক্ষুনি তোমায় বিয়ে করলে আমার চাকরীটা ছেড়ে দিতে হবে। তোমার আর আমার কাজের সময় এক নয়। এখনও সময় আসেনি সোনা। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো।

ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত খুশির স্বাদ পাচ্ছি এই ভেবে, যে আজ বুধবার রাতে সুজির সঙ্গে বেড়াতে যাবো, এমন সময় আমার টেবিলের পাশে ইন্টারকমটা বেজে উঠল।

সুইচটা নামিয়ে বললাম, ওয়ালেস বলছি।

উল্টো দিক থেকে কর্নেল পার্নেলের সেক্রেটারী গ্লেন্ডা কেরীর কর্কশ স্বর ভেসে এল, একবার আমার অফিসে আসুন, দরকার আছে।

কর্নেল বিশেষ জরুরী কাজের দায়িত্ব নিয়ে ওয়াশিংটনে দুদিন হল গেছেন। যাবার আগে গ্লেন্ডাকে অফিসের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন গ্লেন্ডার নির্দেশমত আমাদের চলতে হচ্ছে।

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গ্লেন্ডা বলল, বসুন, আপনার জন্য একটা কাজ এসেছে। গ্লেন্ডা দেখতে বেশ লম্বা চওড়া পরনে সাদা ব্লাউজ কালো স্কার্ট। আমি চেয়ার টেনে বসতেই সে বলল, মিসেস হেনরী থরসেন টেলিফোন করেছিলেন। আজ দুপুর বারোটা নাগাদ ওঁর সঙ্গে দেখা করুন, উনি একটা পারিবারিক রহস্য সমাধানের জন্য একজন স্মার্ট বেসরকারী গোয়েন্দা চাইছেন। আপনি ওর স্বামী হেনরী থরসেনেন নাম এর আগে শোনেন নি?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

হেনরী থরসেন ছিলেন এক ধনী ব্যবসায়ী, মাত্র বছর খানেক আগে তিনি মারা গেছেন। এই নিন ওঁর ঠিকানা।

আমি গ্লেন্ডার কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকলাম। বিলের চিঠি লেখা এতক্ষণে শেষ হয়েছে। তাকে বললাম, বিল, হাতে কাজ এসেছে। আমায় দুপুর বারোটায় মিসেস হেনরী থরসেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি এই ফাঁকে হেরাল্ড পত্রিকার অফিসে চলে যাও। ওদের মর্গ থেকে একবছর আগের পুরনো কাগজ ঘেঁটে হেনরী থরসেন আর তাঁর পরিবার সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করো। বিকেল চারটে নাগাদ আমি অফিসে ফিরব। তখন দেখা হবে। খালি হাতে ফিরে এসো না যেন।

বিল তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খুশি খুশি মুখ করে বেরিয়ে গেল। আমি জানি

এ ধরনের কাজ ওর খুব পছন্দ। আর খালি হাতে ফিরে আসবে না।

শহরের বাইরে প্রচুর গাছ গাছালির মধ্যে দুএকর জমি নিয়ে মৃত হেনরী থরসেনের প্রাসাদোপম দোতলা বাড়িটি। বিশাল লন আর গাছপালার মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাতায়াতের রাস্তাটা গিয়ে বাড়ির বারান্দার সামনে শেষ হয়েছে। চারপাশে কোথাও টুঁ শব্দটিও নেই। বারোটা বাজতে তখনো তিন মিনিট বাকি। কলিংবেল বাজাতেই ভেতরে মিষ্টি সুরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

সদর দরজা মিনিট পাঁচেক বাদে খুলল, ভেতর থেকে এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ এসে দাঁড়াল। তার পরনে সাদা কোট কালো ট্রাউজার্স, গলায় কালো রংয়ের বো টাই। লোকটি বেশ বুড়ো, তার মাথায় সাদা চুল বেশীর ভাগ ঝরে গিয়ে জায়গায় জায়গায় টাক গজিয়েছে, বয়স সত্তরের নীচে নয়। তার রক্তাভ চোখ দেখে বুঝতে পারলাম যে সে একটু বেশীরকম মদ খায়।

অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী থেকে আসছি। আমার নাম ডার্ক ওয়ালেস। মিসেস থরসেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ওকে খবর দাও আমি এসেছি।

আমার সঙ্গে আসুন, বলে সে আমায় পথ দেখিয়ে একতলায় বিশাল ড্রইংরুমে নিয়ে এল। একটা বড় কৌচ দেখিয়ে বলল, আপনি বসুন, ম্যাডাম এক্ষুনি আসছেন। বলে ঘাড় হেলিয়ে ছোট্ট অভিবাদন জানিয়ে সে চলে গেল।

ড্রইংরুমের দেয়ালে অসংখ্য প্রাচীন তৈলচিত্র আর পুরনো আমলের সৌখিন আসবাব বাড়ির মালিকের অতুল বৈভব আর শিল্পরুচির পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে। সেইসব দেখতে দেখতে একসময় বিরক্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু গৃহকর্ত্রী মিসেস থরসেনের দেখা নেই।

পুরো পঁচিশ মিনিট বাদে তিনি এলেন। চটির হালকা শব্দে মুখ তুলে দেখি লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারার এক মাঝবয়সী মহিলা পায়ে পায়ে ঘরের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ালেন। যৌবন চলে গেলেও নানারকম প্রসাধন ও সাজগোজের ভিতর দিয়ে তিনি তা ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন। মহিলার মুখখানা বেশ সুশ্রী, চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি গায়ের চামড়া ফুঁড়ে ভেতরের সবকিছু পলকের মধ্যে দেখে নিতে পারে। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

তাঁকে দেখে কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো সত্ত্বেও তাঁর মুখে ভদ্রতা বা সৌজন্যের সামান্য হাসির রেশটুকুও ফুটল না। কঠোর চোখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একনজরে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—

আপনিই মিঃ ওয়ালেস?

বিনয়ের সুরে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বসুন। আমি অল্প দু-এক কথায় কাজ সেরে নেব।

বেশ কিছুটা দূরে বসলেন মিসেস থরসেন। তারপর বললেন, শুনেছি আপনারা ব্ল্যাকমেলিংয়ের কেস খুব ভাল করেন। কথাটা কি ঠিক?

একশোবার ঠিক মিসেস থরসেন। আপনি ঠিকই শুনেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের জুড়ি নেই।

আমার মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে মিঃ ওয়ালেস, সে লোকটিকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।

আপনি যদি আমাদের ঠিক ঠিকমত সাহায্য করেন তাহলে এটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু তার আগে জানতে চাই ব্ল্যাকমেলিংয়ের সন্দেহটা আপনার মনে দানা বাঁধল কেন?

আমার মেয়ে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যেক মাসে দশহাজার ডলার তুলছে, গত দশমাস ধরে এটা চলছে। মিঃ অকল্যান্ড ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত। তিনিই কয়েকদিন আগে খবরটা আমায় দিলেন। বললেন মেয়ের ওপর যেন নজর রাখি।

মিঃ অকল্যান্ড কে?

আমাদের পরিবারের টাকাকড়ি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। মিঃ অকল্যান্ড সেই ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল, এখন উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধুদের একজন। প্রয়োজনে নানারকম উপদেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন।

তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আপনার মেয়ের নিজস্ব আয়ের পথ আছে, আর তার নামে

ঐ ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্টও আছে?

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাই। আমার স্বামী আমাদের একমাত্র মেয়ে ঐ অ্যাঞ্জেলাকে খুব ভালবাসতেন। তাকে একদিনের জন্য চোখের আড়াল করে তিনি থাকতে পারতেন না। মারা যাবার আগে তিনি ওর নামে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সেই টাকার মাসিক সুদ পনেরো হাজার ডলার। ওর মত অল্প বয়সী একটি মেয়ের কাছে এটা কিন্তু প্রচুর টাকা।

ওর বয়স কত?

চব্বিশ।

আমার মতে একটি চব্বিশ বছরের মেয়ের প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলা নিজে স্বাভাবিক মেয়ে নয়, ও হল মিসল বেবী। তার অর্থ কি তা জানেন?

নিশ্চয়ই। গর্ভবতী মায়েদের কখনও কখনও হাম হয় এবং গর্ভের সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়ে। সেসব সন্তান ভবিষ্যতে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়।

ঠিক তাই। অ্যাঞ্জেলার বেলাতে ঠিক তাই ঘটেছে। ফলে ও মানসিক দিক থেকে অস্বাভাবিক হয়েছে। ছোটবেলা থেকে দিনরাত অসুখে ভোগায় লেখাপড়াও সেরকম কিছুই হয়নি। তারই ভেতর বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে সামান্য কিছু পড়েছে। কুড়ি বছরের পর থেকে ওর মানসিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়। আমার স্বামী ইতিমধ্যে মারা যান, আর তার আগে তিনি ওর জন্য ব্যাঙ্কে এক মোটা অঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলেন। প্রথম দুমাস এমনভাবে ছিল যেন মাসিক সুদের টাকার ওপর ওর কোন মোহ নেই। তারপরেই তৃতীয় মাস থেকে ও প্রত্যেক মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে সুদের দশ হাজার ডলার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে শুরু করে। মিঃ অকল্যান্ড আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, উনিই খবরটা আমায় জানান এবং নিজেও খুব উৎকণ্ঠার ভেতরে থাকেন। উনিই আমায় বললেন যে তাঁর ধারণা অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে। মিঃ অকল্যান্ড খুব খাঁটি লোক, আমি ওকে খুব শ্রদ্ধা করি।

আপনার স্বামী একবছর আগে মারা গিয়েছেন তাই না মিসেস থরসেন?

হ্যাঁ।

তারপর থেকেই আপনার মেয়ে প্রত্যেক মাসে দশহাজার ডলার করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলছে, তাই না? গত দশমাস যাবৎ এটা ঘটছে, কেমন?

ঠিক তাই।

কিন্তু প্রথম দুমাস সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেনি, তাই না?

তুলেছিল তবে তার পরিমাণ খুবই কম। মিঃ অকল্যান্ডের মতে ও সে সময় মাত্র দু হাজার ডলার করে তুলেছিল নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে। ঐ টাকায় সে নিজের থাকা খাওয়া চালিয়ে আর যে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটি ওর দেখাশুনা করে তার বেতন দিয়েছে।

আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে থাকে?

গম্ভীর গলায় মিসেস থরসেন বললেন, না, আমার স্বামী ওর জন্যে একটা ছোট্ট বাড়ি বাংলো ধাঁচের বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই এস্টেটের শেষ ভাগে গেলে সেই বাড়িটা চোখে পড়বে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটিকে নিয়ে সে ঐ বাড়িতেই থাকে। অ্যাঞ্জেলার ঘরসংসার দেখাশোনা থেকে শুরু করে রান্নাবান্না ঘর সাফ করা সব ঐ মেয়েটিই করে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয়নি। ও কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে যায় না। আমি যে সমাজে মেলামেশা করি সে ওই সমাজকে এড়িয়ে চলে। তাছাড়া ওর চেহারায় চটক বা আকর্ষণ কিছুই নেই।

ওর কি একটিও বান্ধবী নেই?

আমি জানি না। ও ওর নিজের মত জীবন কাটায় আমি আমার নিজের মত জীবন কাটাই।

কিন্তু ছেলে বন্ধু? ওর কি কোন ছেলে বন্ধুও নেই?

বিরক্তির সুরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তাই। কোন সুন্দর স্মার্ট ছেলে অ্যাঞ্জেলার প্রতি আকৃষ্ট হবে এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি আগেই বললাম, ওর চেহারায় কোন আকর্ষণ নেই।

কিন্তু ও ধনী মিসেস থরসেন। প্রচুর টাকা আছে এমন বহু লোক দেখতে আকর্ষণীয় নয় এমন

অনেক মেয়ে নিয়ে দিন কাটায়।

একথাটা আমি ও মিঃ অকল্যান্ডও ভেবেছি। তেমন কেউ যদি সত্যিই অ্যাঞ্জেলার জীবনে এসে থাকে তবে আপনি তাকে খুঁজে বের করুন মিঃ ওয়ালেস। সেটাই হবে আপনার কাজ।

আমি সে কাজ নিশ্চয়ই করব মিসেস থরসেন। আপনার মেয়ের সম্পর্কে এখন কিছু খোঁজখবর আমার প্রয়োজন। ও কিভাবে সময় কাটায় সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে কি? যেমন ধরুন ও কি সাঁতার কাটে, টেনিস খেলে, নাচতে যায়?

জানি না। আমি আগেই বললাম যে আমাদের দুজনের খুব কমই সাক্ষাৎ হয়।

মিসেস থরসেনের ওপর আমার একধরনের বিতৃষ্ণা আসতে লাগল। মা হিসেবে ওকে কখনই আদর্শ বলতে পারবো না।

অ্যাঞ্জেলা কি আপনার একমাত্র মেয়ে?

মিসেস থরসেন একটু আড়ষ্ট হলেন, ওর দুচোখ যেন জ্বলে উঠল।

আমার একটি ছেলে ছিল কিন্তু ওকে নিয়ে আলোচনা করার কোন দরকার নেই। ওর সম্পর্কে এটুকুই বলছি যে বেশ কিছুদিন আগে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি বা কোন খবর পাইনি। এতে আমি খুব খুশি। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে যে সমস্যা, মনে হয় তার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

আমি মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই মিসেস থরসেন। আশাকরি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই?

একদম নয়, মিঃ অকল্যান্ডের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। সত্যিকথা বলতে কি, উনিই আমায় আপনার সাহায্য নেবার কথা বলেছিলেন। ওর সঙ্গে দেখা করুন।

আপনার মেয়েকেও আমার দেখা দরকার।

হ্যাঁ। আগামীকাল মাসের প্রথম তারিখ। ও নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে যাবে। মিঃ অকল্যান্ডকে বললেই উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন না। ওর সম্পর্কে যে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এটা অ্যাঞ্জেলাকে জানানো আমার ইচ্ছা নয়। আপনার এজেন্সী নিশ্চয়ই সবরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে?

আপনি সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন মিসেস থরসেন। আজ বিকেলেই আমি মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করব। দেবার মত কোনও খবর পেলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আমার এটুকু ভরসা আছে যে এ ব্যাপারে খুব বেশী সময় লাগবে না। তবে আপনার চার্জ বড্ড বেশি।

আমাদের হাতে অনেক কাজ জমে আছে মিসেস থরসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা আপনাকে কিছু খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।

সেই ভাল, তবে খবর দেবার আগে দয়া করে টেলিফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবেন কারণ আমি খুব ব্যস্ত জীবন যাপন করি। বলেই মিসেস থরসেন দরজার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, আপনি তাহলে আজ আসুন, দরজাটা নিজেই খুলে নিন। আমার বাটলার স্মেডলি যখন তখন মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকে তাই আমি ওকে সবসময় ডাকি না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি কি ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছেন মিসেস থরসেন?

ভুরুদুটো তুলে ঠাণ্ডা ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্মেডলি গত ত্রিশ বছর যাবৎ আমাদের পরিবারে আছে। আমার সব অভ্যেস ওর জানা আছে তাছাড়া ও রুপোর বাসনগুলোর যত্ন নিতে জানে। ওর অবস্থা যতদিন না খারাপ হয় ততদিন আমি ওকে বহাল রাখছি। বিদায় মিঃ ওয়ালেস।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির ভেতর দিয়েই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

একটা হামবার্গার দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। তারপর বিকেল তিনটে নাগাদ গাড়ি চালিয়ে

প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে হাজির হলাম।

ব্যাঙ্কের ভেতরের চেহারা দেখে বোঝা যায় যে এর মালিক সত্যিই ধনবান লোক। দুজন সিকিউরিটি গার্ড সবসময় ভেতরে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের চোখে সতর্ক দৃষ্টি। টেলার কাউন্টারের সামনে বুলেট প্রুফ কাচ। ভেতরে অসংখ্য ফুলদানিতে থরে থরে টাটকা মরশুমি ফুল সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু শব্দ।

আমি গার্ড দুজনের সতর্ক চোখ পেরিয়ে একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপর পতাকার মত একফালি কাপড়ে লেখা অভ্যর্থনা। টেবিলের সামনে এক বয়স্কা মহিলা বসে, যার চোখ দেখে বোঝা যায় লোকের গা শুঁকে বলে দিতে পারেন সে ধনী কিনা, সে শিক্ষাই তাকে দেওয়া হয়েছে যদিও আমার গা থেকে তেমন কোন টাকাপয়সার গন্ধ বেরোচ্ছিল না।

বলুন?

মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনার সঙ্গে কি ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

কথা না বাড়িয়ে ওয়ালেট থেকে আমার একটা কার্ড বের করে তার সামনে রেখে বললাম, এটা দেখালেই উনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ভদ্রমহিলা খুঁটিয়ে কার্ডখানা দেখে বললেন, মিঃ অকল্যান্ড এখন ব্যস্ত আছেন। আপনি কি দরকারে এসেছেন?

আপনার যখন এতই কৌতূহল মিসেস থরসেনকে টেলিফোন করে আমার কথা বলুন। তাহলেই উনি আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। তবে অন্যদিকে উনি এমন ব্যবস্থা নিতে পারেন যে হয়ত ভবিষ্যতে আপনার এখানে চাকরী করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এক গাল হেসে বললাম, চুপ করে বসে রইলেন কেন? একটা সুযোগ নিয়ে দেখুন না, ওকে টেলিফোন করুন।

আসলে মিসেস থরসেনের নাম শুনেই ওর আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে গেছে। আমার কার্ডখানা তুলে নিয়ে হেঁটে মিঃ অকল্যান্ডের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মিঃ অকল্যান্ড আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার ডানদিকের প্রথম দরজা, চলে যান।

ধন্যবাদ বলে ডানদিকের প্রথম দরজায় টোকা মেরে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে বিশাল টেবিল, তার ওপাশে বসে হোরেস অকল্যান্ড। ভদ্রলোক বেঁটে, মোটা, টাকমাথা এবং ভয়ঙ্কর দেখতে। কিন্তু তার সতর্ক বাদামী চোখের চাউনি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রথমেই তিনি কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললেন।

মিসেস থরসেন আমায় টেলিফোন করে আপনার কথা বলেছেন, মিঃ ওয়ালেস। লেসার রশ্মির মত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললেন, উনি বললেন আপনার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, মিঃ অকল্যান্ড, মেয়েটি সম্পর্কে আপনি কি আপনার অভিমত জানাবেন? ওর মা বলছেন যে ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয় বরং পিছিয়ে পড়া বললেই ঠিক হবে। আপনি কি মনে করেন?

সত্যি বলতে কি, আমি তা ঠিক জানি না। মেয়েটিকে দেখে তো খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, আর তাও অল্প কয়েক মিনিটের জন্য যখন ও টাকা তোলে। ওর পোশাকও বড্ড অদ্ভুত কিন্তু এখানকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই ওরকম অদ্ভুত পোশাক পরে। নিজস্ব মতামত দিতে আমি ঘাবড়াই না।

শুনেছি ওর একটা নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে যেখান থেকে প্রতিমাসে সুদ বাবদ পনেরো হাজার ডলার আয় হয়। ও যদি মারা যায় তখন ঐ টাকার কি হবে?

মিঃ অকল্যান্ড ভুরু কুঁচকে, মিঃ ওয়ালেস, ওর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

আপনার বয়স যাইহোক না কেন, আপনি দুর্ঘটনায় যে কোন সময় মরতে পারেন এটা তো ঠিক?

ও মারা গেলে ওর অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার মালিক হবে তখন ওদের এস্টেট।

টাকার পরিমাণটা কত?

মিঃ থরসেন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। ওর কত টাকা আছে তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

মিসেস থরসেন ওর স্বামীর টাকার উত্তরাধিকারিনী হয়েছেন। ওঁর মেয়ে মারা গেলে উনি তো আরও অনেক টাকার মালিক হবেন, তাই না?

হ্যাঁ, সম্পত্তির অন্য কোনও উত্তরাধিকারী নেই।

ওঁর একটি ছেলে আছে।

হ্যাঁ, টেরেন্স থরসেন। দুবছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এস্টেটের টাকার ওপর ওর কোন দাবী নেই।

তাহলে আর কেউ নেই?

মিঃ অকল্যান্ড আমার প্রশ্ন শুনে এমনভাবে নড়েচড়ে বসলেন বুঝলাম তিনি বিরক্ত হচ্ছেন।

ভাগীদার অনেক আছে। মিঃ থরসেন উইলে তাঁর বাটলার স্মেডলির নামেও বেশ কিছু টাকা রেখেছেন। মিসেস থরসেন মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হবে।

মিঃ অকল্যান্ড, আপনি কি মনে করেন যে প্রত্যেক মাসে মেয়েটি যে এভাবে দশহাজার ডলার তুলছে তা শুধু কোনও ব্ল্যাকমেলারকে চাপা দেবার জন্য।

মিঃ ওয়ালেস, গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি একটানা ব্যাঙ্কের কাজ করে যাচ্ছি। মিস থরসেনের বয়স মাত্র চব্বিশ আর আমার মনে হয় ও সব দিক থেকেই পুরোপুরি স্বাভাবিক। ওর টাকা নিয়ে যা খুশি করার অধিকার ওর আছে। কিন্তু হেনরী থরসেন আর আমি দুজনেই দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমরা পরস্পরকে খুবই বিশ্বাস করতাম। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম যে ওর কিছু ঘটলে অ্যাঞ্জেলার হাতে যখন এত টাকা আসবে তখন আমি যেন তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখি। মিসেস থরসেন নিজেও আমার একজন বন্ধু এবং আর্থিক ব্যাপারে তিনি আমার উপদেশ মেনেই চলেন। অন্যান্য নানারকম সমস্যায় আমি তাঁর পাশে দাঁড়াই, এজন্য উনি আমায় খুব বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অ্যাঞ্জেলার টাকা, তোমার কথা আমি ওকে বলতাম না। আমি পুরো দশটি মাস লক্ষ্য করছি। সুতরাং একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই মিসেস থরসেনকে সতর্ক করেছি। ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনাটা আমারই মাথায় এসেছিল, তাই ওকে তদন্ত করতে বলেছিলাম যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ অকল্যান্ড।

আপনাকে যা বললাম তা যেন পুরোপুরি গোপন থাকে। বুঝতে পেরেছেন?

নিশ্চয়ই মিঃ অকল্যান্ড। এবার মিস থরসেনকে আমি একটু নিজের চোখে দেখতে চাই। ওর মা বলে দিয়েছেন আমি যেন তার মেয়ের সঙ্গে কোনমতেই আলাপ না করি। কিভাবে ওর দেখা পাব?

ওর দেখা পাওয়া খুবই সহজ। আগামীকাল সকালে ও এখানে টাকা তুলতে আসবে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব যাতে ভেতরে ঢোকার আর বেরোবার সময় আপনি ওকে ভাল করে দেখতে পারেন। বাকিটা আপনার ওপর।

খুব ভাল কথা, আমি তাহলে কখন আসব?

ও সকাল দশটায় আসে। আপনি ঠিক পৌনে দশটায় চলে আসুন। এখানে লবিতে বসে অপেক্ষা করুন। আমি মিস বার্চকে বলে রাখছি যাতে ও ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর টেবিলের ওপর রাখা ইন্টারকমে শব্দ হল, হ্যাঁ মিস বার্চ। ঠিক তিন মিনিটের মধ্যে রিসিভার নামিয়ে রেখে আমায় বললেন, মাপ করবেন মিঃ ওয়ালেস হাতে আর সময় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে করমর্দন করে বললাম, আমি আজ তাহলে যাচ্ছি মিঃ অকল্যান্ড। আগামীকাল ঠিক পৌনে দশটায় আসব।

অফিসে ফিরে গ্রেন্ডা কেরীকে রিপোর্ট দিতে গিয়ে বললাম, মিসেস থরসেন এই ঝামেলাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে চান। উনি বলছেন, আমাদের চার্জ নাকি খুব বেশী।

গ্লেন্ডা শুকনো হেসে, সবাই ঐ একই কথা বলে তারপরেও সবাই আমাদের কাছেই আসে। বলুন, এরপর কি করবেন?

ব্যাঙ্কে যাব, অ্যাঞ্জেলার পিছু নেব। দেখব ও কার হাতে টাকাটা দেয়। তারপর যদি বরাত ভাল থাকে তো একটা ফটো নেব। আমি বিলকে থরসেন পরিবারের ইতিহাস বের করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

ঠিক আছে, কাজ চালিয়ে যান।

আমি আমার কামরায় ফিরে দেখি বিল তার রিপোর্ট খুব মনোযোগ দিয়ে টাইপ করছে। মিসেস থরসেন আর হোরেস অকল্যান্ডের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে তার সবটুকুই তাকে বললাম।

একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না যে মিসেস থরসেন। যিনি তার মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন, সে কেন মোটা টাকা খরচ করে জানতে চাইছেন কেউ অ্যাঞ্জেলাকে ব্ল্যাকমেল করছে কিনা। কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা দরকার। আর এখানেই আমি একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

বিল পাল্টা প্রশ্ন করল, তাতে তোমার বা আমার কি এসে যায়? মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কিনা জানার জন্য আমাদের ভাড়া করা হচ্ছে। এর পেছনে মিসেস থরসেনের যাই মোটিভ থাকুক না কেন তা জেনে আমাদের কোন দরকার নেই।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কেস। বিল আমি কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাঞ্জেলাকে বের করব। তুমি বাইরে গাড়িতে বসে থাকবে। ইঞ্জিন চালু রাখবে। আমি ওর পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসে ইশারা করলেই তুমি স্টার্ট দেবে। আমিও আমার গাড়ি নিয়ে ওর পিছু নেব। তুমি আগে থাকবে, মাঝখানে থাকবে অ্যাঞ্জেলা, আমি তার পেছনে থাকব। এভাবে ফলো করলে ও আমাদের ব্ল্যাকমেলারের কাছে ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। এবার বল হেনরী থরসেন সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছ?

হেনরী থরসেন শেয়ারের দালালী করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন। থরসেন অ্যান্ড চারটেরিস কোম্পানীর তিনি ছিলেন সিনিয়ার পার্টনার। নিউইয়র্কে ওদের একটা শাখা অফিস থাকলেও ব্যবসার সব কাজকর্ম এখানেই হয়। থরসেনের হাতে যাদুর ছোঁয়া ছিল। কোন্ শেয়ারের দর কেমন উঠবে বা পড়বে তা তিনি আগে থেকে টের পেয়ে যেতেন। শুধু মক্কেলদের জন্যে নয়, তিনি নিজের জন্যও প্রচুর টাকার শেয়ার কিনেছিলেন।

উনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ক্যাথলীন লিভিংস্টোনকে বিয়ে করেন। ক্যাথলীনের বাবা জো লিভিংস্টোন পেট্রলের খোঁজে তিনটে জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করছিলেন। তাতে তিনি খুব লাভবান হননি। তাই থরসেনের মত পয়সাওয়ালা লোককে বিয়ে করে ক্যাথলীন সৌভাগ্যবতী হতে পেরেছেন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মায়। ছেলের নাম টেরেন্স, মেয়ের নাম অ্যাঞ্জেলা। পুরনো কাগজে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকলেও মিসেস থরসেন কিভাবে তাঁর স্বামীর টাকা দুহাতে উড়িয়েছেন তার বিবরণ আছে। উনি এখানকার সেরা সোসাইটি লেডীজের একজন। সভাসমিতি আর পার্টিতে ওর চারপাশে সবসময় নানা ধরনের লোক ভীড় করে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই, কোনমতে ওর কৃপাদৃষ্টি পাওয়া।

মারা যাবার আগে থরসেন দশবছর যাবৎ হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতর ওকে অর্থ রোজগার করতে হয়েছে। গতবছর উনি নিজের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ ওর হার্ট অ্যাটাক হয়। সেবারের ধাক্কাটা উনি আর সামলাতে পারেন নি, লাইব্রেরীতেই উনি মারা যান। পরে সবাই ওকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পায়। সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাই ডাক্তারও ডেথ সার্টিফিকেট দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছিল। করোনার ডাঃ হীবার্ট ডসন মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে তার রগের কাছে একটা ছোট্ট ক্ষত দেখতে পেয়েছিলেন আর সেটাই তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলো। পুলিশ বাড়ির লোকেদের জেরা করেছিল, জেরার উত্তরে বহুদিনের পুরোনো বাটলার জোশ স্মেডলি বলেছিল যে সে লাইব্রেরী ঘরে ভারী কোন জিনিস পড়ে যাবার শব্দ শুনতে

পেয়েছিল, ছুটে এসে দেখেছিল তার মনিব টেবিলের ধার ঘেঁষে মেঝেয় পড়ে আছেন। ওদের পারিবারিক চিকিৎসকের মতে মিঃ থরসেন নিশ্চয়ই বুকের ব্যথায় ছটফট করতে করতে চে'ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। পড়ে যাবার সময় টেবিলের কোণায় তাঁর মাথাটা আছড়ে পড়েছিল আর তখনই তাঁর রগে ক্ষত হয়েছিল। করোনার ডঃ ডসন এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। এরপর মিসেস থরসেন তাঁর স্বামীর সব বিষয় সম্পত্তির মালিক হন। তার উইল অনুযায়ী অ্যাঞ্জেলার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা জমা পড়ে যা থেকে সে প্রত্যেক মাসের সুদ পায় পনেরো হাজার ডলার কিন্তু নিজের ছেলে টেরেন্সকে তিনি একপয়সাও দেননি। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন।

বাঃ তুমি খুব ভাল কাজ করেছো বিল। অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা সেটা বের করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া ঠিক নয়। তোমার এ সিদ্ধান্তটা আমি মেনে নিচ্ছি। অন্যদিকে থরসেন পরিবারের ইতিহাস আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওর ছেলে টেরেন্সের কথা বার বার আমার মনে আসছে। সেই বাটলার স্মেডলিকেও আমি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছি না। বেশ তাহলে কাজে লেগে যাও। থরসেন পরিবারের একটা ফাইল তৈরী করো। কর্নেল পার্নেলের স্বভাব তো জানাই আছে। ফিরে এসেই কিন্তু উনি জানতে চাইবেন আমরা কতটুকু এগিয়েছি, কি কি খবর যোগাড় করেছি।

আমিও তাই ভাবছি, বলে বিল টাইপ রাইটার টেনে নিল।

অফিসের কাজ সারতে সাড়ে ছটা বাজল। সুজি লংয়ের জন্য মনটা আনচান করতে শুরু করেছে। এই সময় সমুদ্রের ধারে আমাদের সেই পুরোনো রেস্তোরাঁটায় আমরা দেখা করি, তারপর সমুদ্রের বড় কাঁকড়া আর চিংড়িমাছের সুস্বাদু রান্না খেয়ে রাতের ডিনার শেষ করি। টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বললাম, বিল, আজ রাতে তুমি কি করছ?

হতাশার সুরে বিল বলল, কি আর করব। ঠেকে ফিরে রাত্রের খাবার জন্য চটপট যাহোক কিছু বানিয়ে নেব তারপর যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ টিভি দেখব।

ওভাবে বাঁচা যায় না বিল। আমার মত তুমিও একটা দেখতে ভাল গোছের মেয়ে জুটিয়ে নাও।

যে টাকাটা জমাচ্ছি তার কথা একবার ভেবেছো? তোমার পথে এগোলে দুদিনে সব উড়ে যাবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। চলি ডার্ক, আবার দেখা হবে। বলে সে বেরিয়ে গেল।

সমুদ্রের ধারে বস্তী এলাকায় একখানা দু কামরার অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে আমি থাকি। গাড়ি পার্ক করে নড়বড়ে লিফ্‌টে চেপে চারতলা পেরিয়ে আমার ডেরায় পৌঁছলাম। প্যারাডাইস সিটিতে আসবার পর এই আস্তানাটা খুব সস্তায় পেয়েছিলাম। ভেতরে দেয়ালের গায়ে বাদামী বার্নিশ। আসবাবপত্র খুবই পুরানো আর ব্যবহারের অনুপযোগী। খাটে চাপলেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। আর শোবার পর পিঠে এমন ব্যথা হয় যে বোঝা যায় তোষক অক্ষত নেই। আসলে এখানে বেশিদিন থাকবার ইচ্ছে ছিল না বলেই কম ভাড়ায় তখন সুখের স্বর্গটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সুজি এখানে প্রথমদিন এসে বেশ ঘাবড়ে গেল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, এটা আবার অ্যাপার্টমেন্ট নাকি? এতো শেয়ালের গর্ত। উঁহু এমন গর্তে তোমার থাকা চলবে না। আমি বললাম এখানকার ভাড়া খুব কম। শুনে সে বলল, ঠিক আছে, এবার দেখো আমি কি করি।

আমি এক সপ্তাহ বিলের ছোট্ট কামরায় রইলাম, আর সুজি তার বেলভিউ হোটেলের দুজন রাজমিস্ত্রীকে এনে এখানকার দেওয়ালগুলো হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দিল। সেই সঙ্গে হোটেলের কিছু বাতিল আসবাবপত্র জলের দরে কিনে আমার ডেরায় এনে তুলল। সে আস্তানার চেহারাই বদলে দিল। সেদিন আমার কি ভাল যে লাগছিল বলে বোঝাতে পারব না।

দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনের ফাঁকা দেয়ালে আমি একটা বুক সেলফ্‌ রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু সুজি বলল একটা বড় সাইজের ছবি লাগালে ঘরের ছিরি ফিরবে। শেষে বুঝলাম যে ওর মতই টিকবে।

কিন্তু আজ ঘরে ঢোকার পর সামনের দেয়ালটায় দেখলাম কে যেন বড় কালো অক্ষরে লিখে রেখেছে—

অ্যাঞ্জিওকে ঘাঁটালে মুশকিলে পড়বে...

লোকটা নিশ্চয়ই দরজার পেছনে ঘাপটি মেরে ছিল। সে খুবই চটপটে এবং ওস্তাদ লোক তাতে সন্দেহ নেই। কারণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পেছন থেকে সে ভারী কোন জিনিস দিয়ে আমার মাথায় এক ঘা মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লাম।

।। দুই ।।

আমি পরদিন ঠিক পৌনে দশটায় প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গেলাম। মিস বার্চের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ঠাণ্ডা চাউনিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, আপনি মিঃ ওয়ালেস তো, আমি এক্ষুনি মিঃ অকল্যান্ডকে খবর দিচ্ছি।

বাঃ ঠিক ধরেছেন মিস বার্চ। ও হো, আপনি মিস বার্চ তো?

মিস বার্চ দুচোখে আগুন ঝরিয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন।

মিঃ অকল্যান্ড মিঃ ওয়ালেস এসেছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিঃ অকল্যান্ড বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ অকল্যান্ড রিসেপশন টেবিলের কিছুটা দূরে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আমি মিস বার্চকে বলে রেখেছি, মিস থরসেন এলেই ও আপনাকে ইশারায় দেখিয়ে দেবে।

কা'ল রাত্রের চোটের ব্যথাটা প্রচণ্ড। সকালে পাঁচটা অ্যাসপ্রো খেয়েও ব্যথা কমেনি, চেয়ারে বসে আমি গতকালের কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। সুজি আমার খোঁজে এসে দেখেছিল সদর দরজা খোলা। সামনের দেয়ালে ঐ অদ্ভুত হুঁশিয়ারী। মেঝের ওপর আমি মুখ থুবড়ে পড়ে।

সুজি সেই দুর্লভ জাতের মেয়ে যারা প্রয়োজনের সময় মাথা ঠিক রাখে এবং সব কাজ ঠিক ঠিক করে যেতে পারে। সে হাত ধরে আমায় তুলে এনে ডান কানের পেছনটা ফুলে উঠেছে দেখে রান্নাঘর থেকে কিছুটা বরফ এনে সেখানে চেপে ধরল। দশ মিনিট পরে আমি একটু সুস্থ হয়ে হেসে বলেছিলাম, কিছু মনে কর না। একজন অচেনা অতিথি এসে আমার এই হাল করে ছেড়েছেন।

তুমি বিশ্রাম করো, সোনা। কথা বলো না। চলো তোমায় বিছানায় শুইয়ে দিই। সুজির সাহায্যে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়েছিলাম।

এবার বরফ দিয়ে একটা ডবল পেগ স্কচ আমায় দাও তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব।

উঁহু, অ্যালকোহল একদম নয়। আমি এক্ষুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

আরে আমি ঠিক আছি, ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি আমায় একটু স্কচ দাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজি গিয়ে স্কচ নিয়ে এসেছিল। আমায় স্কচ দিয়ে নিজেও একটু নিয়েছিল, তারপর খুব দুশ্চিন্তা ভরা চোখে আমায় দেখছিল।

আমি ঠিক আছি গো, ওভাবে আমার দিকে দেখো না।

তুমি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছো, ওঃ, ডার্ক এসব কি হচ্ছে বলো তো?

এসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি একটা নতুন কেস হাতে নিয়েছি। শত্রুরা পিছু নিয়েছে, তার অর্থ আমি ঠিক পথেই হাঁটছি।

ওঃ, বলে সুজি চুপ করল। কিছুক্ষণ উসখুশ করে ও শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল, অ্যাঞ্জি কে জানতে পারি?

না পারবে না, ব্যস এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়।

ঠিক। এবার আমি যাব, তার আগে তোমায় তিনটে ঘুমের বড়ি দেব, বলে তিনটে ঘুমের বড়ি এনে দিল। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত একটু ঘুমোও তো ডার্ক, একটা লম্বা ঘুম দরকার।

তার চেয়ে আজ আমার পাশেই শুয়ে পড়ো না। আমার রাতটুকু দিব্যি কেটে যাবে।

উঁহু, ওসব বলবে না। নাও, ওগুলো খেয়ে ফেল।

আমার মাথা দপ্‌দপ্ করছিল। বড়িগুলো খেয়ে ফেললাম।

কাল রং মিস্ত্রী নিয়ে নোংরা লেখাটা মুছে ফেলবে। কিন্তু লোকগুলো কিভাবে ঢুকল বলত?

তালাটা যে ভাবেই হোক খুলেছে।

আমি তালা সারানোর মিস্ত্রী নিয়ে আসব। সে তোমার নতুন তালা লাগিয়ে দেবে। আমি লেটার বক্সেও তালার ব্যবস্থা করছি, এই বলে চুমু খেল, এবার ঘুমাও লক্ষ্মীটি, এই বলে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

সকাল সোয়া নটায় বিলের কাছে গেলাম। রাতের ঘটনা শুনে সে বলল, দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা শুরু হল ডার্ক।

সে তো বটেই, আমাদের লাইনে ঝামেলা তো প্রতি পদে।

তা হলে অ্যাঞ্জেলাই ওদের কাছে অ্যাঞ্জি, আর কেউ নিশ্চয়ই ওসব লোককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে তুমি অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রাখছ। ওরা আগেভাগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে লোকটা কে?

সেটাই আমাদের বের করতে হবে। বিলকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম, ব্যাঙ্কের বাইরে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড পড়বার ভান করছি, আর সেই ফাঁকে আশেপাশের লোকেদের নজর রাখছি। হঠাৎ মিস বার্চ ব্যস্ত হয়ে একগাল হাসলেন, আমি যার অপেক্ষায় বসে আছি এবার তিনি আসছেন।

একটি মেয়ে ভেতরে ঢুকতেই দারোয়ান সেলাম ঠুকল। মেয়েটি আসতেই আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

পাট কাঠির মত চেহারা, সামনে পেছনে কোথাও মাংস নেই, সব ফ্ল্যাট, ফাঁকা মাঠের মত। মাথায় মেক্সিকান চাষীদের মত খড়ের টুপি, সেটা নামিয়ে দিয়েছে যাতে মুখটা ঢাকা পড়ে। চোখে বড় সানগ্লাস পরেছে। মেয়েটির পরনে টি-শার্ট, আর নীল জীন্‌সের ট্রাউজার্স, পায়ের নখগুলো রং করা হয়েছে। ওকে দেখলে মনে হয় অল্পবয়সী মেয়ে, কলেজের ছুটিতে বেড়াতে বেড়িয়েছে।

মিস বার্চ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অকল্যান্ডের কামরায় ঢুকলেন। আমি বাইরে বিলের কাছে গেলাম, ও ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসেছিলো।

আমার মনে হয়েছিল ঐ সেই লোক আমরা যাকে খুঁজছি। বিল বলল, সামনে দুটো গাড়ির আগে ভক্স ওয়াগন থেকে ওকে নামতে দেখেছি।

ঠিক আছে বিল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, বলে আমি দরজা খুলে বিলের পাশে বসলাম, মিনিট দশেকের মধ্যে ও ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল, হাতে প্লাস্টিকের ব্রীফ কেস। বোঝাই যায় মিঃ অকল্যান্ড এটা ওকে দিয়েছেন আর তার ভেতরে দশ হাজার ডলার আছে।

অ্যাঞ্জেলা গাড়িতে স্টার্ট দিতেই আমরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিলাম। প্রথমে বুলেভার্ড, তারপর বন্দরের ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকা, তারপর ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ল সে।

বন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে সকালবেলা। জেলেরা বার থেকে বীয়ার খেয়ে আবার মাছ ধরতে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী হিপি তরুণ তরুণীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কফি খাচ্ছে। একটা ফাঁকা জমিতে অ্যাঞ্জেলা গাড়ি রাখল। বিল তারই পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়িতে বসেই দেখলাম অ্যাঞ্জেলা পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা নোংরা চেহারার রেস্তোরাঁয় ঢুকল। বাইরে নাম লেখা ব্ল্যাক ক্যাসেট ; ডিস্কো ড্রিঙ্কস। চটপট তৈরী খাবার। রেস্তোরাঁর বাইরের দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়েছে, জানালার দরজার পাল্লা ভাঙ্গা, কোথাও কোন ছিরি ছাঁদও নেই। আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতে দেখি কাঁচের গায়ে লেখা ঃ

শুধু কালোদের জন্য ঃ

সাদাদের ঢোকা বারণ ঃ

বুঝলে?

আমি একটু চিন্তা করে গাড়িতে ফিরে বিলকে বললাম, এটা পুরোপুরি কালোদের জন্য। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। দেখো ও কতক্ষণ ভেতরে থাকে। আমি দেখি কিছু খবর যোগাড় করতে পারি কিনা।

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় নেপচুন ট্যাভার্নে ঢুকলাম। এখানকার স্থানীয় মস্তান হল অ্যালবার্নি, আমি তাকেই খুঁজছিলাম। ঢুকেই চোখে পড়ল অ্যাল একটা খালি বীয়ারের টিন হাতে নিয়ে নাড়ছে আর উদাস চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। অ্যাল বার্নি আমাদের অ্যাকমে এজেন্সীর অপারেটরদের গোপন খবরাখবর প্রায়ই সরবরাহ করে তার বিনিময়ে আমাদের অপারেটররা প্রচুর বীয়ার আর সসেজ খাওয়ায়।

অ্যাল আমাকে দেখেই হাসল, বীয়ারের টিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল ঃ আসুন মিঃ ওয়ালেস, মাইরী বলছি, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। বলেই পেটে হাত রেখে, খিদেও পেয়েছে। আপনি ব্রেকফাস্ট খাবেন?

নিশ্চয়ই। আমি তোমায় বীয়ার, ব্রেকফাস্ট সবই খাওয়াব।

অ্যাল ওয়েটারকে ডেকে ব্রেকফাস্ট আনতে বলল। এখানকার কফি খেতে বদখত তাই আমি বললাম, আমি এইমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়েছি এখন আর কিছু খাব না।

আপনার কি খবর মিঃ ওয়ালেস?

খবর সব ভাল তো? আপনাকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কর্নেল কেমন আছেন?

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, কর্নেল এখন ওয়াশিংটনে আছেন।

ওয়েটার একটা বড় ডিশে সসেজ আর বীয়ার আনল। একটা সসেজ মুখে দিয়ে সে হেসে বলল, বলুন মিঃ ওয়ালেস আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

তুমি ব্ল্যাক ক্যাসেট সম্পর্কে আমায় কতটুকু খবর দিতে পার?

ওটা কালোদের সস্তার রেস্তোরাঁ, সবাই আসে। পুলিশের ঝামেলাও নেই। এখানে যারা আসে তাদের বেশীরভাগ ভিয়েৎনামী নয়তো পোর্টেরিকান। এই রেস্তোরাঁয় কালোরা সবাই এসে জড়ো হয়ে মদ খায়। ফূর্তি করে, নাচে, গান গায়।

জায়গাটা কে কিনেছিল অ্যাল?

বীয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে, কে আবার কিনবে? এক হতচ্ছাড়া কালো। কোথা থেকে এটা কেনার ও টাকা পেল তাই ভেবেই অবাক হচ্ছি। পাঁচহাজার ডলার দিয়ে দশ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে। মনে হয় ওর বাবার কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছে যার সঙ্গে আমি একসঙ্গে মদ খেতাম। লোকটা বুড়ো হলেও মন্দ নয়।

অ্যাল দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে, সে এখানে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল, তারপর আমায় বীয়ার কিনে দিয়েছিল। সে বছর খানেক আগের কথা। তারপর আর ওকে দেখিনি। আমার একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছি।

মালিকের নাম কি?

হ্যাঁ, হ্যাংক স্মেডলি। ওকে নিয়ে একদম ঘাঁটতে যাবেন না মিঃ ওয়ালেস। ও পুরোপুরি গুণ্ডা, আর নোংরা বদমাইস লোক, কারও নাক গলানো বরদাস্ত করতে পারে না।

ওর বাবার নাম কি বলো?

জোশ স্মেডলি। লোকটা মিসেস থরসেনের কাজ করে। শুনেছি জোশ নাকি আজকাল দিনরাত মদ খেয়ে পড়ে থাকে। তা বেচারার ছেলে অমানুষ। নিজের বৌ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার ওপর আবার ওরকম এক বদখত্‌ মনিবানী। মদ না খেয়ে করবে কি?

ওর বৌ ওকে ছেড়ে চলে গেছে কেন?

বীয়ারে আরেক চুমুক দিয়ে অ্যাল বলল, আসলে ওর ছেলেই যত নষ্টের গোড়া। ওকে সামলাতে গিয়ে মিসেস স্মেডলি হিমসিম খেয়ে যেত। দিনরাত স্বামী-স্ত্রীতে খিটিমিটি তার কারণ হল ঐ ছেলে। জোশ কিন্তু ছেলেকে খুব ভালবাসত। শেষকালে মিঃ থরসেন মারা গেলেন আর ওদেরও ছাড়াছাড়ি হল, জোশের বৌ স্বামীকে ছেড়ে চলে গেল।

বেশ, থরসেনের মেয়ের সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

জানি বললে ঠিক হবে না। ও মেয়ের ইহকাল পরকাল সব গেছে। শুনেছি মেয়েটি ষোলয় পা দেবার পর হ্যাংক নানারকম চাপ দিয়ে ওর থেকে টাকা পয়সা আদায় করত। তবে সবই শোনা কথা তো কাউকে বলবেন না। আচ্ছা মিঃ ওয়ালেস! আপনি কি অ্যাঞ্জেলা থরসেনের

খোঁজখবর চাইছেন?

তার চাইতে হ্যাংক স্নেডলির সম্পর্কে কিন্তু বেশী খবর চাই।

মিঃ ওয়ালেস, হুঁশিয়ার। ও কি রকম বিপজ্জনক লোক তা আপনি জানেন না। একেবারে জানোয়ার আর সাপের মত বজ্জাত।

টেরেন্স নামে অ্যাঞ্জিওর একটি ভাই ছিল তার সম্পর্কে কিছু জানো?

অ্যালের প্লেট খালি হয়ে গেছে, সে চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝলাম ও কি বলতে চায়।

ঠিক আছে তুমি যত পার সসেজ চালাও।

অ্যালি ওয়েটারকে হুকুম দিতেই আরেক প্লেট সসেজ ও বীয়ার চলে এল। গপ্‌গপ্ করে মুখে পুরে, কয়েক ঢোক বীয়ার গলায় ঢেলে বলল, হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন?

টেরেন্স থরসেন সম্পর্কে তুমি কিছু জান কি?

কিছু জানি। ওদের বাপ আর ছেলের ভেতর একদম বনিবনা ছিল না। টেরি বাড়ি ছেড়ে গিয়ে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় একটা ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করে। শুনেছি ছেলেটা ভাল পিয়ানো বাজাতে পারত, কিন্তু আমি নিজের কানে কখনও শুনিনি। তারপর ও ডেড অ্যান্ড ক্লাব নামে এক নাইট ক্লাবে বাজাতে শুরু করে। ক্যারি বিচ ছিল সেখানকার মালিক। নিজের নাম পাল্টে ও নতুন নাম নেয় টেরি জিগলার। শুনেছি স্রেফ পিয়ানোর গরম সুর শুনিয়ে ও ক্লাবের ব্যবসা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা ওর বাজনার তালে তালে সেখানে পাগলের মত নাচত। রোজ রাত ন'টা থেকে দুটো পর্যন্ত ও বাজাত। তারপর হঠাৎ তিনমাস আগে ও উধাও হয়ে গেল। কেউ তাকে আর দেখতে পায়নি যদিও আমার কানে এসেছিল যে হ্যাংক নচ্ছারটা ওকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। জিগলার ব্ল্যাক ক্যাসেটে বাজাতে শুরু করলে সেটা খুব বড় খবর হত কিন্তু আদতে তা হয়নি।

এবার উঠে পড়া দরকার। ওয়ালেট খুলে একটা কুড়ি ডলারের নোট তার সামনে রাখলাম।

কান খোলা রেখো অ্যাল। হ্যাংক, টেরি এমন কি অ্যাঞ্জি এদের সম্পর্কে যখনই কিছু শুনবে আমায় জানাবে।

মিঃ ওয়ালেস আপনি তো আমার ঘাঁটি চেনেন, অ্যাল হাঙ্গরের মত হাসল, আমার কান খোলাই থাকে।

খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে সকালটা নষ্ট হয়নি।

বিল চুইংগাম চিবুচ্ছিল। আমি পাশে বসে বললাম, মেয়েটা বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, দশমিনিট আগে। ওকে ফলো করব না তোমার জন্য অপেক্ষা করব বুঝতে পারলাম না। ওর হাতে প্ল্যাস্টিকের বাক্সটা ছিল না। শহরের দিকে গেল।

ঠিক আছে, কিছু খবর যোগাড় করেছি, বলে অ্যাল বার্নির কাছ থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি সে সবই বিলকে বললাম। দুজনে বীয়ার খেয়ে গেলাম টেরেন্স ওরফে টেরি জিগলারের আস্তানার দিকে। খুঁজে দেখি সেখানে বস্তী এলাকার সেইসব শ্রমিক আর রোজ মজুরেরা, যার রুজির ধান্দায় রোজ শহরে যায়। গলির ভেতর ভিয়েৎনামী, পোর্টেরিকান আর কালোদের ভিড়। দু'চারজন সাদা মহিলাও চোখে পড়ল। শপিং ব্যাগ নিয়ে সস্তায় কেনাকাটা করছেন।

বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আমাদের প্রথমেই দেখা হল। আমি পুলিশি মেজাজে তাকে বললাম, আমি টেরি জিগলারকে খুঁজছি।

লোকটা পেল্লায় একখানা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, বেশতো, আপনি তাকে খুঁজুন। আমার হাতে এখন অনেক কাজ আছে।

ওকে কোথায় খুঁজে পাব?

আপনি কি পুলিশের লোক?

না, ওর কিছু পাওনা আছে তাই দিতে এসেছি।

লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অনেক টাকা!

সে আমি জানি না। অনেক কি কম তা আমায় বলেনি।

ওর খোঁজ দিলে আমায় কিছু পুরস্কার দেবেন?

গোটা কুড়ি ডলার দেওয়া যায়।

লোকটা একটু ভেবে বলল, টেরি জিগলার বললেন, তাই না? দেড়বছর আগে ও ছাদের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছিল। ঠিকমত ভাড়া দিত, কোনরকম ঝামেলা করত না। তারপর ঠিক দু'মাস আগে ও চলে গেল, বলল ও চলে যাচ্ছে। তারপর আর তাকে দেখিনি।

ও কোথায় গেল তা বলে যায়নি?

না, তা জেনে আমার কি দরকার? যখন যার দরকার হয় আসে দরকার ফুরোলে চলে যায়।

ওল্ড সমোবাইল গাড়ির নম্বরটা মনে আছে?

নিশ্চয়ই। এত সোজা নম্বর কেউ কি ভোলে? নম্বরটা পি সি ১০০০১।

ওর অ্যাপার্টমেন্ট আর কেউ ভাড়া নিয়েছে?

হ্যাঁ, জিগলার চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই একটা মেয়ে এসে ঘরখানা ভাড়া নিল। দুমাসের ভাড়া আগাম নিয়ে চাবি দিলাম।

মেয়েটার নাম কি?

ডলি গিলবার্ট, জানি না ওটাই ওর আসল নাম কিনা। মেয়েটা রাতের বেলায় কাজ করে এটুকু ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছু জানি না।

তারপরেই লোকটা এমনভাবে ঝাঁটা চালাতে লাগল যা দেখে বুঝলাম ওর কিছু তেল দরকার। ওয়ালেট খুলে একটা পাঁচ ডলারের নোট ওর চোখের সামনে নাচাতেই ও নোটটার দিকে তাকিয়ে, ওটা কি আমার জন্য?

হতে পারে যদি আমাদের আর একটু সাহায্য করো। টেরি জিগলারকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। এ বাড়ির কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওর খোঁজ দিতে পারবে?

মিস অ্যাঙ্গাস আপনাকে জিগলারের খোঁজ দিতে পারতেন। উনি ওর উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। ভদ্রমহিলার কি সুন্দর স্বভাবই না ছিল। বয়স প্রায় আশি। জিগলারের ঘরদোর উনিই সাফ করতেন, ওকে মাঝে মাঝে খাবার গরম করে দিতেন। হ্যাঁ, একমাত্র উনি পারতেন জিগলারের খোঁজ দিতে।

পারতেন মানে? উনি কি এখন আর নেই?

লোকটা কিছু না বলে নোটটার দিকে তাকাচ্ছিল। ওটা দিতেই সে সেটায় চুমু খেয়ে তারপর নিজের নোংরা ট্রাউজারের পকেটে চালান করল।

মিস অ্যাঙ্গাস চলে গেছে। একদম বরাবরের মত। উনি খুন হয়েছিলেন। জিগলার চলে যাবার তিনদিন পরই ওরই অ্যাপার্টমেন্টে কেউ এসে ওকে খুন করে যায়। মনে হয় উনি যেহেতু জিগলারের সঙ্গে কথা বলতেন তাই একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব জানা যে সে কোথায় বসে। আমার পক্ষে এর বেশী বলা সম্ভব নয়।

মিস অ্যাঙ্গাসের অ্যাপার্টমেন্ট কেউ ভাড়া নিয়েছে কি?

এখনও পর্যন্ত কেউ নেয়নি, কারণ ওর তিন বছরের ইজারা এখনো ফুরোয়নি, তাছাড়া ওর নিজের আসবাবপত্রও আছে। একজন উকিল ওর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করছে।

উকিলের নাম কি?

ছোকরা উকিল, নাম সলি লিউইস।

দরোয়ানের হাবভাবে বুঝলাম সে এর চাইতে বেশী তথ্য যোগাবে না।

ধন্যবাদ, পরে আরেকটা পাঁচ ডলারের নোট নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সে তো খুব ভালো কথা। যতবার খুশি আসবেন।

ফিরে এসে বিলকে সব বললাম, সলি লিউইস নামে একজন উকিলের ঠিকানা খুঁজে বের করো। আমি এক্ষুনি আসছি। তারপর সেই বাড়িতে ফিরে লিফ্‌টে চেপে একদম শেষ তলায় গিয়ে পৌঁছালাম। ডানদিকে আঁটা স্টিকারে নাম লেখা মিস ডলি গিলবার্ট।

পর পর তিনবার কলিংবেল টেপার পর দরজা খুলে গেল। যে মেয়েটিকে দেখলাম তার বয়স কুড়ির বেশী নয়। গায়ের রং ফর্সা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, মুখে মেকাপের পুরু প্রলেপ।

তার লালসা পুরু ঠোঁট আর চোখের কটাক্ষ দেখেই বোঝা গেল যে পতিতাবৃত্তিই তার প্রধান জীবিকা।

মেয়েটি বলল, দুঃখিত, ভেতরে লোক আছে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

এবার তাহলে আমি কি করব? বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে বললাম, আমার এক বন্ধু বলছিল তুমি আমার মন ভোলাতে পারবে। কথা বলছি বটে কিন্তু আমার নজর ঘরের দিকে। ভেতরের প্রায় সবটা পুরোন আসবাবপত্রে ঠাসা। ঘরের ভেতর একটা দরজা হয়তো সেটা শোবার ঘর। সেই দরজার পাল্লা অর্ধেকটা ভেজানো।

তা পারি বটে কিন্তু এক্ষুনি.....।

ওই শালাকে কেটে পড়তে বল।

শোবার ঘর থেকে বাজখাঁই গলায় কোন পুরুষ হেঁকে উঠল, চলে এসো আমরা দুজনে মিলে শরীরের সুখ করি। তুমি ভাবছো কি? আমার সময়ের দাম নেই?

সেই গলার আওয়াজে মেয়েটা কাঠ হয়ে গেলো, গলা নামিয়ে বলল, পালাও। দেখছো না একেবারে বুনো, পরে দেখা হবে। বলেই ও দরজাটা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিল।

ঐ রকম বাজখাঁই গলা যে একজন নিগ্রোর তা আমি হলপ্ করে বলতে পারি। মেয়েটা বলল লোকটা একেবারে বুনো।

হঠাৎ আমার মনে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। লিফ্‌টে চেপে নীচে নেমে বিলকে প্রশ্ন করলাম, ঠিকানাটা যোগাড় করতে পেরেছো?

হ্যাঁ, এই তো ৬৭, সিকোম্ব রোড।

ঠিক আছে, শোন বিল, আর কিছুক্ষণ পরে এক নিগ্রো এই বাড়ি থেকে নেমে আসছে। আমার ইচ্ছে তুমি ওর পিছু নাও। ওর সঙ্গে গাড়ি থাকলে তোমারও গাড়ির দরকার। তাই আমি গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। ওর পিছু নাও। আমি জানতে চাই এই লোকটা কি হ্যাংক স্মেডলি?

আর তুমি?

আমি সলি লিউইসের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। বলেই একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম।

।। তিন ।।

সলি লিউইসকে একটি ছোট ঘিঞ্জি বাড়ির শেষ তলায় খুঁজে পেলাম। তার সামনে একটা পুরোনো আধভাঙ্গা টেবিল, তোবড়ানো একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট। একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর টাইপরাইটার রাখা আছে। বুঝতে পারলাম টাইপের কাজটা ও নিজেই করে।

একটা পাতলা ফাইল নিয়ে টেবিলের সামনে ও বসেছিল। সে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বয়স পঁয়ত্রিশেক। মাঝারী লম্বা, মাথাভর্তি ঘন কালো চুল, একরাশ দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখখানা ঢাকা। পোশাক বেশ পুরোনো। আর এত রোগা যে মনে হয় সপ্তাহে একদিন হয়তো তার পেট পুরে খাওয়া জোটে।

বলুন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্য? বলে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। আমি আমার কার্ড বের করে তাকে দিলাম। সে কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখে আমাকে চেয়ারে বসতে বলল। চেয়ারটায় বসতে ভয় হল যদি ভেঙ্গে যায়।

আপনাদের এজেন্সী সম্পর্কে আমি সবকিছুই জানি। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমি জানতে পেরেছি আপনি মৃত মিস অ্যাঙ্গাসের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

টেরেন্স থরসেন বা টেরি জিগলার নামে কাউকে চেনেন বা ঐ নামটা আগে কখনও শুনেছেন?

টেরি জিগলার? হ্যাঁ নিশ্চয়ই শুনেছি।

আমি ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। মিস অ্যাঙ্গাসের ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল শুনেছি, তাই আশা করেছিলাম উনি আমায় ওর খোঁজ দিতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বেঁচে নেই। কাজেই মনে হল উনি বেঁচে থাকতে নিশ্চয় তার কথা আপনাকে বলে থাকবেন। সে কথা ভেবেই আমি আপনার কাছে এলাম।

আপনি ওকে খুঁজছেন কেন?

ওকে খুঁজে বের করার জন্য অ্যাকমে এজেন্সীকে ভাড়া করা হয়েছে। মক্কেল কে তা আমি জানি না। আমায় শুধু ওকে খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে।

তাহলে তো দেখছি আপনার আর আমার একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। লিউইস চেয়ারে গা এলিয়ে বলল, মিস অ্যাঙ্গাস ওঁর সব টাকাকড়ি জিগলারকে দিয়ে বসে আছেন। জিগলারকে যতক্ষণ খুঁজে বের করতে না পারছি ততক্ষণ আমি ওঁর সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করতে পারছি না এবং এখনও পর্যন্ত আমি সফল হইনি।

কিন্তু আমি যতদূর জানি মিস অ্যাঙ্গাসের অবস্থা ভাল ছিল না, উনি জিগলারের ঘরদোর সাফ করতেন। ওঁর সবকিছু উনি কিভাবে তাহলে ওকে উইল করে দিয়ে গেলেন?

ওঁর সম্পত্তির মোট পরিমাণ এক লাখ ডলারের মত। তাও করের আওতায় আসে না। সলি লিউইস বলল, আসলে উনি একটু ক্ষ্যাপা গোছের ছিলেন। উনি কখনও টাকা খরচ করতেন না, আগলে থাকতেন। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে এভাবে খামের ভেতর সব টাকা পুরে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্যে আমিই ওকে পীড়াপীড়ি করতাম। উনি শেষ পর্যন্ত আমার কথা শুনেছিলেন।

উনি ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, খোঁজ নিয়েই নিশ্চিত হয়েছি। খুন হবার চারদিন আগে উনি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন। ওখানকার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। জিগলারকে খুঁজে বের করাটুকু বাকি।

ওকে খুঁজে বের করতে আপনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

সবাই যা ব্যবস্থা নেয় তাই নিয়েছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। পুলিশে খবর দিয়েছি, মিসিং পার্সনাল বুরোকে জানিয়েছি। দুমাস হয়ে গেল জিগলারকে খুঁজে বার করতে পারিনি। কিন্তু আপনিও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি না পারলে আর কে পারবে?

ধরুন সে যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে? সে ক্ষেত্রে টাকাটা কি হবে?

মিস আঙ্গাস খুন হবার পর যদি ও মারা গিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওর পরে যে ভাই বোন আছে সে টাকাটার মালিক হবে। কিন্তু ও যে মারা গেছে সে সম্পর্কে আমায় নিশ্চিত হতে হবে।

আমি ট্যাক্সিতে চেপে অফিসে ফিরে টেবিলে বসে সবে টাইপ করতে শুরু করেছি, এমন সময় বিল ঘরে এসে ঢুকল।

চেয়ারে বসতে বসতে বিল বলল, বাপরে বাপ্‌। বাইরে বিশ্রী গরম।

কিছু পেয়েছো?

তুমি ঠিকই ধরেছিলে। তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে ভেতর থেকে একটা ধেড়ে বদখত গুণ্ডা টাইপের কালো লোক বেরিয়ে এলো। একটা সাদা ক্যাডিলাকে চেপে চলে গেল। আমিও তার পিছু নিলাম। ও ব্ল্যাক ক্যাসেট রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করালো। সে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা অল্পবয়সী কালো বেরিয়ে এসে সেই ক্যাডিলাকটা নিয়ে চলে গেল।

ঐ ধেড়ে বদখত গুণ্ডাটার চেহারার বর্ণনা দাও।

ও ব্যাটা যে গুণ্ডা তা তাকে একবার দেখলেই বোঝা যায়। লম্বায় প্রায় ছ ফুট দু ইঞ্চি, দু কাঁধের মাপ একগজের কম হবে না। ঘামে ভেজা জামার ভেতর থেকে ওর বুক ও পিঠের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল। লোকটার চাউনি ঠিক গোখরো সাপের মত। ওই যে হ্যাংক স্মেডলি সেটা নিশ্চিত।

দু ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। দু ঘণ্টা আগে ডলি গিলবার্টের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন সময় হয়েছে ওর সঙ্গে দেখা করার। আমার রিপোর্ট বিলকে দিয়ে ডলি গিলবার্টের আস্তানায় গেলাম।

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ডলি সামনেই দাঁড়িয়ে। তার মুখে সেই চিরন্তন মোহিনী হাসি। পৃথিবীর সবদেশের পন্যা মেয়েদের মুখে যা ফুটে ওঠে।

ভেতরে এসো নাগর। দেরী হয়ে গেল, কিন্তু কি করব বল। ও লোকটা যখনই আসে তখনই এমন সময় নেয়। ভয়ে কিছু বলতেও পারি না।

ডলির অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকেই সে সদর দরজার ছিটকিনি এঁটে দিয়ে আমায় তার শোবার ঘরে নিয়ে চলে এল।

আমার হাতে বড্ড সময় কম গো সোনা। পঞ্চাশ ডলার দাও তারপর যা করার করো। আমি কিছু না বলেই তার চোখের দিকে তাকাতেই সে অস্বস্তি বোধ করে চাপা গলায় বলল, ওরকম করে আমায় দেখছো কেন, তুমি কি ভয় পেয়েছো?

না, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ডলি, বলেই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। আমার লাইনের ব্যাপার স্যাপার একটু অন্যরকম, বলে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমার কার্ডখানা দেখালাম।

চাপা রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, হতচ্ছাড়া। গোয়েন্দাগিরি করার আর জায়গা পাওনি?

আমি একটা খবরের জন্য তোমার কাছে এসেছি। খবরটা দিলে একশো ডলার পাবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, টাকাটা দেখি।

ওয়ালেট থেকে একটা একশো ডলারের নোট বের করে তার নাকের সামনে একবার নেড়ে আবার ভাঁজ করে মুঠো করে রাখলাম।

কি ঠিক করলে? খবরটা দেবে?

ততক্ষণে ও জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়েছে। ডলির চেহারার চটক আছে, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, বুকের গড়নও সুন্দর, পেট আর কোমর চমৎকার। তবু কেন যেন আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

কি খবর চাও?

আমি টেরি জিগলারকে খুঁজছি।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও চাপা গলায় ডলি বলল, টেরির খোঁজ আমার কাছে পাওয়া যাবে এ ধারণা তোমার কি করে হল?

তোমার কাছে খোঁজ পাব কিনা জানি না। তবে আমি শুনেছি ও চলে যাবার কয়েকঘণ্টার মধ্যে তুমি এখানে আস্তানা গেড়েছো। ভেবেছিলাম ও হয়ত তোমায় বলেছিল যে এই আস্তানাটা ফাঁকা হচ্ছে। সেই কারণেই হয়ত তুমি জানো ও কোথায় আছে?

টাকাটা আমায় দেবে তো? ওটা এক্ষুনি আমায় দাও না।

আমায় খবরটা জানালেই এটা তোমায় দিয়ে দেব। ও যে এখান থেকে চলে যাবে সে কথা আগে তোমায় বলেছিল?

না, কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্ট ফাঁকা হচ্ছে সে খবর আগেই পেয়েছিলাম। টেরির সঙ্গে আমার মেলামেশা না থাকলেও এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।

টেরি জিগলারকে কোথায় খুঁজে পাব তা তুমি সত্যিই জানো না?

ও কি ঝামেলায় পড়েছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেছে।

না, ঝামেলায় পড়েনি। ও একজনের কাছে টাকা পায়। আমার কাজ ওকে খুঁজে বার করে টাকাটা ওর হাতে তুলে দেওয়া।

ডলি চোখ বড় করে বলল, কত টাকা?

সে আমি জানি না, জানার দরকারও নেই। টেরিকে কোথায় পাব তা তুমি বলবে কি বলবে না?

বিশ্বাস করো নাগর, ও কোথায় আছে আমি সত্যিই জানি না। ইস্, ঐ হতচ্ছাড়া হাতে কতগুলো টাকা পাবে। আচ্ছা, আমি যদি এরকম টাকা পেতাম।

টেরিকে হতচ্ছাড়া বলছ কেন?

আমি বহুবার ওকে দেখেছি। কোনদিন মুখ ফুটে একটা কথা আমায় বলেনি। এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত যেন আমি একটা আশ্চর্য চীজ, সত্যিই ও খুব ভাল পিয়ানো

বাজাত।

ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ছেলেটা পাগল না বদমাশ?

কি করে বলব, বল? এখানে যারা আছে তাদের সবার পেছনে কিছু না কিছু রহস্য আছে।

ধন্যবাদ, বলে আমি একশো ডলারের নোটখানা তাকে দিলাম। সে সেটা হাতে নিতেই আমি বললাম, হ্যাংক স্মেডলি কি এখানে প্রায়ই আসে?

ডলির মুখখানা আমার কথায় একেবারে সাদা হয়ে গেল।

ডলি চেঁচিয়ে উঠল, দূর হয়ে যাও। যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়। এক্ষুনি দূর হও বলছি।

ডলির মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেলাম।

হাজার প্রলোভন দেখিয়েও এখন ওর কাছ থেকে আর কিছু আদায় করতে পারব না, তাই বেরিয়ে লিফ্‌টে চড়ে নীচে নামলাম।

অফিসে ফিরে দেখি বিল তার টেবিলে বসে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে আমার রিপোর্ট মন দিয়ে পড়ছে।

ডলির কাছ থেকে যা জেনেছি তা ওকে বললাম। বিল বলল, দ্যাখো ডার্ক, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। টেরি থরসেন সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল কেন? আমাদের তো...

ঠিক কথা, কিন্তু আমরা কোন সূত্র পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যে টেরির খোঁজ নিলে ও আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। আর ঠিক সেই কারণেই ওকে খুঁজে বের করে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

হ্যাংক স্মেডলির ওপর কি আমাদের নজর রাখা উচিত না?

তার আগে টেরিকে আমাদের দরকার।

তুমি আমার ওপরওয়ালা, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। এবার কি করবে?

তুমি বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে চটপট শুয়ে পড়বে। আমি রিপোর্ট দেখা হয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব।

তুমি ঠিক আছ তো ডার্ক?

কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ো।

আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখলাম খুব মজবুত একটা নতুন তালা দরজায় লাগানো আর চাবিদুটো লেটার বক্সে রাখা ছিল। দেয়ালের সেই বিশ্রী হুঁশিয়ারী, সাদা রং দিয়ে ভাল করে মুছে ফেলা হয়েছে, ভেতরের সবকিছুই আবার আগের মত রয়েছে। সুজিকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বেলভিউ হোটেলে ফোন করে জানতে পারলাম ও একগাদা টুরিস্টকে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। দু ঘণ্টা পর হয়ত টেলিফোন ধরার ফুরসৎ পাবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভারটা রাখলাম।

পরদিন একটু সকাল সকাল অফিসে এসে রিপোর্ট টাইপ করছি তখন বিল এল।

বিল বলল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?

বিল, তোমায় একটা ওল্ডসমোবাইল গাড়ি খুঁজে বার করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি দরকার। গাড়ির নম্বরটা লিখে নাও, পি সি ১০০০১।

এক্ষুনি যাচ্ছি, বলেই বিল বেরিয়ে গেল।

আমি রিপোর্ট টাইপ শেষ করে গ্লেন্ডার কামরায় ঢুকলাম। ও সবে অফিসে এসে সেদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্রে চোখ বুলাচ্ছিল।

এই যে গ্লেন্ডা, মিসেস থরসেনের কেসের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

নতুন কিছু পেলেন?

যেটুকু জেনেছি সেটুকু গ্লেন্ডাকে জানালাম। সেই সঙ্গে এও বললাম, মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা থরসেন ঐ ব্ল্যাক ক্যাসেট রেস্তোরাঁয় কাউকে টাকা দিচ্ছে। সে লোক হ্যাংক স্মেডলি না অন্য কেউ বলতে পারছি না। অ্যাঞ্জেলা বা হ্যাংকের সঙ্গে কথা না বলে কোনও পথই খুঁজে পাব না মনে হচ্ছে। টেরিকে খুঁজে পেলে খুব কাজ হত। তবে এ কেসে সফল হতে সময় লাগবে।

আমরা মিসেস থরসেনের কাছ থেকে তদন্তের খরচ বাবদ প্রতিদিন তিন হাজার ডলার করে

নিচ্ছি। আপনি বরং তার সঙ্গে একবার দেখা করে জেনে নিন উনি কাজ চালিয়ে যাবেন কিনা। ওঁর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা একবার দেখে আসুন।

গ্লেন্ডা বাজে উপদেশ দেয়নি। এখন সকাল দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। আমি মিসেস থরসেনের বাড়িতে ফোন করলাম।

উল্টোদিক থেকে শোনা গেল বাটলার স্মেডলি ফোন ধরেছে।

মিসেস থরসেনের সঙ্গে কথা বলব, আমি মিঃ ওয়ালেস বলছি।

আপনি গোয়েন্দা ভদ্রলোক তো? একটু থেমে স্মেডলি জানতে চাইল।

ঠিক ধরেছো, এখন ওকে ফোনটা দাও।

মিসেস থরসেন বাড়ি নেই মিঃ ওয়ালেস, উনি সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। তারপর কাগজে কিছু লিখে বিলের টেবলে চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়িতে চেপে হাজির হলাম থরসেনের প্রাসাদে। মিসেস থরসেন বাড়িতে না থাকায় ভাল হয়েছে কারণ এই ফাঁকে আমি জোশ স্মেডলির সঙ্গে কথা বলতে পারব।

ঘণ্টা বাজাবার পর দরজা খুলল, মুখ বের করে স্মেডলি বলল, দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস, মিসেস থরসেন বেরিয়েছেন।

সে তো তুমি ফোনে বলেছ, বলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, জোশের কাঁধে হাত রেখে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার, জোশ।

মাপ করবেন মিঃ ওয়ালেস, জোশ স্মেডলি বিরক্তির সুরে বলল, আমি ব্যস্ত আছি।

ঠিক আছে, তোমার ঘরে চলোনা বাপু। আমি হাতখানা ধরে বন্ধুর মত বলি, কয়েকটা প্রশ্ন করব, ব্যস।

কিছুক্ষণ সে আমায় দেখল, তারপর একখানা বড় ঘরে নিয়ে এল। ভেতরে আর্মচেয়ার, একটা খাট, কয়েকটা আলমারী, বাথরুম সবই রয়েছে। জোশ স্মেডলি বিলাসিতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গলাটা শুকিয়ে আছে জোশ, একটু স্কচ ঢালো।

দেয়ালের আলমারী খুলে কুটি সার্কের বোতল আর দুখানা গ্লাস বের করল। দেখলাম আলমারীর ভেতরে আরও অনেক সাজানো আছে কুটি সার্কের বোতল।

আমায় গ্লাস দিয়ে একটা চেয়ারে বসল জোশ, এক চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল, বলুন মিঃ ওয়ালেস, আপনি কি জানতে চান?

অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা, করলে তার কারণ এবং কে সেই লোক তা খুঁজে বের করার জন্য মিসেস থরসেন আমায় ভাড়া করেছেন। আশা করি তোমার অজানা নয়।

সে মাথা নাড়াল।

এখানে যা ঘটেছে বা ঘটছে তার সবই তুমি জানো, তাই না জোশ?

আমি ত্রিশবছর যাবৎ মিঃ আর মিসেস থরসেনের সেবা করে আসছি, কিছুটা সতর্ক ভঙ্গিতে জোশ বলল।

বেশ, এবার বলত মিঃ থরসেন কি ধরনের লোক ছিলেন? ব্যাপারটা খুব গোপন জোশ, সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তা খেয়াল রেখো।

মিঃ থরসেন তো মারা গেছেন।

তা জানি জোশ, আমি জানতে চাইছি উনি কিরকম লোক ছিলেন?

মিঃ থরসেন কড়া ধাঁচের লোক ছিলেন, একটু চুপ করে জোশ বলল, উনি আমায় ভীষণ খাটাতেন। উনি পয়সার দিকে খুবই উদার। হ্যাঁ, মিঃ থরসেন খুব কড়া ধাঁচের লোক ছিলেন।

নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও কি উনি কড়া ব্যবহার করতেন?

মিঃ টেরির বেলায় কড়া ব্যবহার করতেন কিন্তু মিস অ্যাঞ্জেলার বেলায় ঠিক উল্টো অর্থাৎ নরম ব্যবহার। মিঃ টেরির পিয়ানো বাজানো ছিল ওঁর দুচোখের বিষ। হ্যাঁ, মিঃ টেরির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। পরে মিঃ টেরি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। জোশ স্মেডলি মুখ তুলে তাকাল, তার মুখখানা অদ্ভুত হাসিতে ভরে উঠল। মিঃ টেরি যতদিন ছিলেন

ততদিন অশান্তি লেগেই থাকত। উনি চলে যাবার পর সব ঠিক হয়ে গেল। মিঃ থরসেনও মারা গেলেন। তারপর আর এক মুশকিল হল। মিস অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে মা মিসেস থরসেনের প্রায়ই খিটিমিটি হতে লাগল। তাই শেষকালে মিস অ্যাঞ্জেলা বাড়ির বাইরে একটা বাংলোতে থাকতে শুরু করলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমার খিটিমিটি শুরু হল, তারপর সেও অ্যাঞ্জেলার কাছে চলে গেল, এখন ওরই দেখাশোনা করে।

এই দুই ভাইবোনকে তো তুমি ছেলেবেলা থেকে বড় হতে দেখেছো, টেরি সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?

জোশ গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, মিঃ টেরি খুব ভাল ছেলে ছিল মিঃ ওয়ালেস, ও প্রায়ই এখানে আসত এবং গল্প করত। আমার অতীত জীবনের আমার বাবা মা-র কথা সে মন দিয়ে শুনত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই জেনে সে খুবই দুঃখ পেয়েছিল। মিঃ টেরি আমায় বলেছিল যে ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মিঃ থরসেন অফিসে বেরিয়ে যেতেই মিঃ টেরি ওর ঘরে ঢুকে পিয়ানো বাজাতে শুরু করত। সত্যিই ছেলেটার প্রতিভা ছিল। যে কোন সুর একবার শুনলেই সে তা ঠিক তুলে ফেলত। ওর বাবার ওকে গান শেখানোর ইচ্ছে ছিল না, তেমনি দরকারও ছিল না। ও নিজের মনেই নিখুঁত বাজাত। প্রায় দু বছর আগে চলে যাবার সময় আমার কাছে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, জোশ কালকে আমি চলে যাচ্ছি। ও চলে যাবার পর আমি চিৎকার করে কেঁদেছিলাম।

তোমার গ্লাস খালি, জোশ, আরেকবার নাও না।

সে দেয়াল আলমারী থেকে কুটি সার্কের বোতল খুলে আরেকটু স্কচ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বসতেই বললাম, মিস অ্যাঞ্জেলার কথা বল শুনি। ও ছেলেবেলায় কেমন ছিল বল।

মিঃ ওয়ালেস, অ্যাঞ্জেলা ছেলেবেলায় সত্যিই খুব ভাল মেয়ে ছিল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বিশ্রী স্বভাব ওকে পেয়ে বসল। আমাকে দুচোখে দেখতে পারত না। মনে হয় এটা আমার বৌয়েরই কারসাজি। ও যা তা বলে এমন কান ভারী করে তুলেছে যে অ্যাঞ্জেলা বড় হবার পর তার সঙ্গে আমার একদম বনত না।

অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে ওর ভাইয়ের বনিবনা কেমন ছিল?

জোশ মাথা নেড়ে বলল, ওরা একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারত না। মিঃ টেরি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরই অ্যাঞ্জেলার স্বভাব কেমন যেন পাল্টে গেল। মনে হত ওর যেন কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই। মিঃ থরসেন মারা যাবার পর ও এ বাড়ি ছেড়ে বাংলোয় গিয়ে উঠল আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে শুরু করল। এখন আর ওকে চোখেই পড়ে না। জোশের মুখে যেন একটা দুঃখের ছাপ ফুটে উঠল।

মিঃ থরসেন হঠাৎ একবছর আগে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু কোন ব্যাপার ছিল না, বরং তাকে স্বাভাবিকই বলব।

কি বলতে চাইছো, জোশ?

মিঃ থরসেন ভোগী আর বদমেজাজী ছিলেন। আর বদমেজাজের চোট এসে পড়ল দুর্বল হার্টের ওপর। ওর হার্টের অবস্থা ছিল খারাপ। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছেন, কিন্তু উনি উপদেশ না নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চলতেন।

ওর স্বভাবের জন্যে তুমি অসুবিধায় পড়তে?

আমি নই, আমি চিনতাম, বহুবছর ধরে ওঁর সেবা করেছি, অন্য কিছু লোক...

কিন্তু ওর এই স্বভাব মানিয়ে নিতে পারতনা বলছ?

ঠিক তাই।

তাদের সঙ্গে ওর ঝগড়া হত?

ঝগড়া ঠিক নয়, কারণ তাদের সাথে তার ব্যবসা করতে হত। ঐসব লোকের টাকা উনি চালাকি করে খাটাতেন।

কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না তাই না?

হ্যাঁ।

ওদের সঙ্গে, তোমার সঙ্গে এমনকি মিস অ্যাঞ্জির সঙ্গেও তাই না?

হ্যাঁ, একবার মিঃ টেরিকে নিয়ে মিস অ্যাঞ্জির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল জোশ?

সেদিন...। বলে জোশ গ্লাসে আরেক চুমুক দিল।

তুমি কি ওদের ঝগড়া শুনেছিলে? মিস অ্যাঞ্জি গলা চড়িয়ে ওঁকে কিছু বলেছিলেন?

সে সব আমি শুনিনি। কানে এল মিস অ্যাঞ্জি খুব জোরে ওর ভাই মিঃ টেরির কথা বলছে। তারপর ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর মৃত্যুর দিনই এটা ঘটেছিল।

করোনারকে তুমি এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলে?

উনি জানতে চাননি, তাছাড়া পুরোপুরি পারিবারিক ব্যাপার তাই...।

আমি টেরিকে খুঁজছি। ওকে খুঁজে বের করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি জান ও কোথায় আছে?

স্মেডলি বলল সে জানেনা। চুপ করে থেকে বলল, ওর খোঁজ দিতে পারলে খুব খুশিই হতাম মিঃ ওয়ালেস। ওকে দেখতে, কথা বলতে খুব ইচ্ছে হয়। এখান থেকে যাবার পর কোন খবরই পাইনি।

ওর সঙ্গে দেখা করার গুরুত্ব তোমায় বলছি। এক বৃদ্ধা মহিলা মারা যাবার আগে ওকে একলাখ ডলার দিয়ে গেছেন। ওঁর নাম মিস অ্যাঙ্গাস, তিনি খুন হয়েছেন। যতক্ষণ না দেখা হচ্ছে, টাকাটা ওর হাতে পৌঁছোচ্ছে না। এক লাখ ডলার জোশ, পরিমাণটা খুব কম নয়।

কথা শেষ করে ওর হাবভাব দেখতে লাগলাম।

বৃদ্ধা মহিলা খুন হয়েছেন? আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, খুনি ভেবেছিল ওনার কাছেই টাকাকড়ি রেখেছেন। টেরিও থাকত সেখানে। খুনি যে টাকার খোঁজে এসেছিল সে সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত। কিন্তু টেরি এসে দাবী করলেই ব্যাঙ্ক তাকে সে টাকা দিয়ে দেবে।

মিঃ ওয়ালেস, ও কোথায় আছে তা জানিনা।

আমি চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, একটা কথা জোশ। হ্যাংক নামে তোমার একটি ছেলে আছে, এবং ব্ল্যাক ক্যাসেট ডিসকো ওই চালায়, তাই না?

জোশ থরথর করে কেঁপে উঠল।

হ্যাঁ, মিঃ ওয়ালেস, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এ বাড়িতে আমাকে তদন্তের কাজে ভাড়া করা হয়েছে, এ খবর তুমি টেলিফোনে তোমার ছেলেকে জানিয়েছিলে, তাই না?

জোশ কোন কথা বলতে পারল না, দুচোখ বুজে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল এমনকি হাতের গ্লাসের স্কচও কাঁপতে লাগল।

আমি এবার পুলিশী গলায় ধমকে উঠলাম, আমার কথার উত্তর দাও।

জোশ বিড় বিড় করে বলল, আমি আমার ছেলের সঙ্গে রোজই টেলিফোনে কথা বলি।

তুমি ওকে আমার কথা বলেছ?

এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে আমার ছেলে যথেষ্ট কৌতূহলী, এখানকার সবকিছু ও আমার কাছে জানতে চায়।

ঠিক আছে জোশ, বলে আমি বেরিয়ে এলাম। জোশ স্মেডলি তার ছেলে হ্যাংককে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল যে, অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রাখার জন্য আমায় ভাড়া করা হয়েছে। আর হ্যাংক সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাপার্টমেন্টে চড়াও হয়ে আমায় বেহুঁশ করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, দেয়ালে লিখেছিল অ্যাঞ্জির ব্যাপারে যেন নাক না গলাই।

অফিসে ফিরে দেখি বিলের টেবিলে আমার লেখা চিরকুটটা তখনও পড়ে আছে। জোশ স্মেডলির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে বসে বসে সেই রিপোর্ট টাইপ করলাম। বেলা সোয়া একটা বাজে, থরসেন ফাইলে রিপোর্টটা রাখছি, এমন সময় বিল এল। তার উত্তেজিত চোখমুখ দেখে বুঝলাম খবর আছে।

খিদে পেয়েছে বিল, চলো খেয়ে আসি।

খিদে আমারও পেয়েছে, আমি এখন একটা আস্ত হাতী খেয়ে ফেলতে পারি।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ভেড়ার মাংসের চপ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের অর্ডার দিলাম।

মাংসে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করলাম, নতুন কি খবর আছে বিল?

ওল্ডসমোবাইলটা হ্যাংক স্মেডলির নামে রেজিস্ট্রী করা হয়েছে, তিন মাস আগে ওর নামে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কি মনে হচ্ছে?

আলুভাজা চিবোতে চিবোতে বললাম, বলে যাও।

হ্যাংকের ঠিকানাও পেয়েছি। ৫৬, সিগ্রোভ রোড, সিকোম্ব। আমি ভেতরে ঢুকে একবার চারপাশ দেখে এসেছি। ছাদের ওপর হ্যাংকের আস্তানা। জায়গাটা সুন্দর, বেশ ছিরিছাঁদও আছে। এখান থেকে থানায় গিয়ে টম লেপস্কির সঙ্গে কথা বললাম। ওকে জানালাম যে হ্যাংক স্মেডলির গতিবিধি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। দেখলাম পুলিশ হ্যাংকের সবরকম খোঁজ খবর রাখে। ওর ফাইল খুলে দেখলাম যে বারো বছর বয়সেই হ্যাংকের নাম পুলিশের খাতায় উঠে গিয়েছিল। তিনবার কিশোর অপরাধী হিসেবে ও সংশোধনাগার থেকে ঘুরে এসেছে। চুরি করেছে, মারপিট করেছে, দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে। একটা পুরোপুরি নচ্ছাড় বলতে যা বোঝায় ও হল তাই। তারপর হঠাৎ ও ভদ্র সাজল। কিন্তু লেপস্কি তাতে একটুও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। ওর মন বলছে যে হয় হ্যাংকের আস্তানায় নয়ত ঐ ওর ব্ল্যাক ক্যাসেটে কোন অপরাধমূলক কারবার গোপনে চলছে, কিন্তু লেপস্কির হাতে তখনও কোন প্রমাণ আসেনি। ও নিজে বহুবার ঐ দুটো জায়গায় খানা তল্লাসী চালাতে চেয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সার্চ ওয়ারেন্ট পায়নি ব্যস, এই আমার খবর ডার্ক।

বেড়ে কাজ করেছো বিল, হ্যাংকের বাবাকে জেরা করে যেটুকু জেনেছি সেটুকু বিলকে বললাম। তাতে কাজ খুব একটা না এগোলেও একটা সন্দেহের ছায়া আমাদের মনে ঘুরপাক খেতে লাগল।

বিকেল সোয়া চারটে বাজল, মিসেস থরসেন নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন। ভাবলাম একবার ওর সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হয় না।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে রোদ উঠেছে। থরসেন ভিলার বাইরে গাড়ি পার্ক করে গেটের দিকে এগোতে গিয়ে চোখে পড়ল মিসেস থরসেন বাগানে এক বিশাল রঙীন ছাতার নীচে বসে চা খাচ্ছেন। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ঠাণ্ডা চাউনিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলেন।

মিঃ ওয়ালেস, এখানে আসবার আগে আপনাকে টেলিফোনে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছিলাম।

উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, আজ্ঞে টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু আপনি তখন বেরিয়েছিলেন। তাই দেরী না করে একেবারে চলেই এলাম।

কেন, কি ব্যাপার বলুন?

আপনার কেসে আমরা কতদূর এগিয়েছি তা আপনাকে জানাতে বলেছেন আমার ওপরওয়ালা। সেইসঙ্গে তারা জানতে চেয়েছেন যে আপনি এ কেসের তদন্ত চালাতে আর ইচ্ছুক কিনা?

কতদূর এগিয়েছেন আপনারা?

আপনার মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে সে লোকটিকে খুঁজে বের করতে আপনি আমায় ভাড়া করেছিলেন। আমি আপনার মেয়েকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে দেখেছি, তারপর তার পিছু নিয়ে বন্দরের ধারে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তী এলাকায় গিয়েছি। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে ব্ল্যাক ক্যাসেট ডিসকো নামে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে যেখানে সাদাদের ঢোকা নিষেধ। দশ মিনিট সেখানে কাটিয়ে যখন সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন তার সঙ্গে আর টাকা ছিল না।

আমার কথা শুনে যেন মিসেস থরসেন পাথর হয়ে গেলেন।

তিনি কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলেন, ব্ল্যাক ক্যাসেট? সেটা কি?

নামে রেস্তোরাঁ আগেই বলেছি, আসলে ওটা কালোদের নাইট ক্লাব। সাদাদের ওখানে ঢোকা বারণ।

আপনি বলছেন আমার মেয়ে সেখানে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, এবং নিশ্চয়ই সে ক্লাবের কাউকে দশহাজার ডলার দিয়ে এসেছে। তার মানে এই নয় যে সে কালোদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

তাহলে মানে কি দাঁড়ায়?

আমার ধারণা সে কালোদের কোনও তহবিলে দান করেছে যে সব কালো মানুষের বাঁধা ধরা আয় নেই। প্রচণ্ড দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে সবরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যারা কোনমতে বেঁচে আছে তাদের সে এভাবে সাহায্য করে। তবে আমি এটুকু জানি যে এ ক্লাবের মালিক হ্যাংক স্মেডলি। আর সে আপনার বাটলার জোশ স্মেডলির ছেলে।

বেশ বুঝতে পারলাম ভেতরে তিনি প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও বাইরে নিজেকে সংযত রাখছেন।

পুরো তিনটি মিনিট তিনি নিজের সুন্দর হাত দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, হ্যাংক স্মেডলি। বিড় বিড় করে বললেন, হ্যাঁ ও আমাদের বাগানে কাজ করত। ওর আর আমার মেয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। হ্যাংক আমার মেয়ের সঙ্গে খেলত। অ্যাঞ্জেলা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, ও একটু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচামেচি করে খেলতে ভালবাসত আর হ্যাংক ওর থেকে দশ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও ওকে উৎসাহ দিত। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। আমার স্বামীকে কথাটা বলাতে উনি হ্যাংককে তাড়িয়ে দেন। লক্ষ্য করতাম হ্যাংকের জন্য অ্যাঞ্জেলার প্রায়ই মন খারাপ হত। ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, যে অ্যাঞ্জেলা ওর সঙ্গে শুধু লুকিয়ে দেখাই করছে না, উল্টে তাকে টাকা দিতে শুরু করেছে, কি ভয়ানক!

দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আসল ঘটনাটা তো তেমন নাও হতে পারে।

এ ব্যাপারে বাটলারের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে, দুচোখে আগুন ঝরিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

মিসেস থরসেন আপনার উচিত সবার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলা।

মিসেস থরসেন তিক্ত হেসে, কার সঙ্গে কথা বলব? অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে? ও আমায় কিছুই বলবে না। আমি জানি ও আমায় ভীষণ ঘেন্না করে।

মিসেস থরসেন এ ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমি খামোকা আপনার টাকা নষ্ট করছি না। ঐ কেসে আরও তদন্ত চালানোর ব্যাপার পুরোপুরি আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনি একবার শুধু বলুন তারপর আমার এজেন্সী হয় আপনার ফাইল বন্ধ করে দেবে নয়তো যেমন চলছে তেমন চালিয়ে যাবে।

কি ধরনের জটিলতার কথা আপনি বলছেন?

হ্যাংক খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু নাইট ক্লাবে আসলে কি ঘটছে তা আমি জানতে চাই। পুলিশ বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু এগোতে পারেনি। আমি যদি অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ যোগাড় করতে পারি তাহলে ঐ লোকটাকে আমি জেলে পাঠিয়ে ছাড়ব। এখন আপনার মতামতের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবে দাঁতে দাঁত পিষে তিনি বললেন, ঐ অপদার্থ জেলে গেলে এর চাইতে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে না। বেশ, টাকা যত লাগে লাগুক, আপনারা তদন্ত চালিয়ে যান।

আমি তা করব, কিন্তু একটা শর্ত মিসেস থরসেন। এ ব্যাপারে আপনি আপনার মেয়ে বা বাটলারকে কোন প্রশ্ন করবেন না। কেমন, রাজী তো?

তিনি বিষ ঢালা গলায় বললেন, আমি সবকিছু আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি নিজে সব দায়িত্ব নিন।

বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

।। চার ।।

আমি গাড়ির ভেতর বসে ভাবছিলাম, তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে আমার গাড়ির ছাদে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে আমার মন চলে গেল মিসেস থরসেনের সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সেইদিকে। তদন্ত চালিয়ে যাবার সবুজ সংকেত তিনি আমায় দিয়েছেন। তার যখন টাকা খরচ হচ্ছে বিনিময়ে কিছু ফল পাওয়া দরকার।

থরসেনের এস্টেটের চারিদিক ঘেরা উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমার ডাইনে একটা সরু গলি পড়ল। পাঁচিলের গা ঘেঁষে আমি সেই গলির ভেতরে ঢুকলাম। যা আশা করেছিলাম তাই, এই গলি শেষ হয়েছে অ্যাঞ্জেলার বাংলোয়।

ভেজা ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করালাম। ম্যাকিন্টস গায়ে চাপিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগোলাম। বাংলো না বলে তাকে বড়সড় একটা কুঁড়ে বলাই ঠিক হবে। সম্ভবতঃ গোটা চারেক ঘর আছে ভেতরে। সামনেই দাঁড় করানো অ্যাঞ্জেলার মরচে পড়া বীটল গাড়িখানা।

বাংলোর বাইরে কোন বারান্দা নেই। কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছি।

এক হ্যাঁচকা টানে ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলল। তাকিয়ে দেখি বিশাল বাহু এক মাঝবয়সী কালো মহিলা যার চেহারা যেমন রুক্ষ তেমনি গায়েও প্রচণ্ড জোর মনে হল।

আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে সে কর্কশ সুরে বলল। এখানে কি চান মিস্টার?

মিস অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে।

কেটে পড়ুন মিস্টার। মিস অ্যাঞ্জেলা অচেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করেন না। যান, ভাগুন এখান থেকে।

কার্ড বের করে তাকে দেখিয়ে পুলিশি গলায় বললাম, ওঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আর এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? দেখছো না আমি ভিজে যাচ্ছি।

কার্ডটা পড়ে একনজর আমায় দেখে বলল, দাঁড়ান। বলেই শব্দ করে দরজা বন্ধ করল।

এই হল জোশের বৌ হান্না স্মেডলি। জোশের কথা ভেবে আমার কষ্ট হল, এই বয়সে বৌ ওকে ছেড়ে চলে গেছে, তা বেচারা মদ না খেয়ে কি করবে।

পুরো পাঁচ মিনিট ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে আবার কলিংবেলটা টিপলাম। মিসেস স্মেডলি হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, আসুন ভেতরে আসুন। ম্যাকিন্টসটা খুলে ফেলুন নয়ত ভিজে যাবে।

ম্যাকিন্টস আর টুপিটা খুলে লবিতে বৃষ্টির জলের মধ্যেই নামিয়ে রাখলাম। সে আরেকটা দরজা খুলে আমায় ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করল। ঘরটা বেশ বড়সড়, ঘরের ভেতর আছে কয়েকটা চেয়ার ও একটা বড় টি.ভি. সেট।

আমি ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম আমার পেছনের চেয়ারে আরাম করে বসে এক যুবতী, উৎসুক চোখে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল, অ্যাঞ্জেলা থরসেন।

তার চোখে এখন বড় সানগ্লাস নেই, মাথায় মুখ আড়াল করা সেই বেঢপ টুপিও নেই।

আমি একটু চমকে গেলাম। অ্যাঞ্জেলার মার কাছে শুনেছিলাম ওর মধ্যে এমন কিছু নেই যা পুরুষদের আকৃষ্ট করতে পারে। তবে কি মিসেস থরসেন তার মেয়েকে হিংসে করেন?

মেয়েটির দিকে তাকাতেই হলিউডের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অড্রে হেপবার্ন। প্রথম ফিল্মে তার যে চেহারা ছিল অ্যাঞ্জেলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবিকল সেরকম। সেই গড়ন, সেই কালোচুল, সেইরকম গভীর বাদামী চোখ। হ্যাঁ, ওর শরীরটা বড্ড রোগা, কিন্তু একবার ওর মুখের দিকে তাকালেই তীব্র যৌন আকর্ষণ চোখে পড়বে।

জোর করে ভেতরে ঢোকার জন্য মাপ চাইছি মিস থরসেন। আশা করছি আপনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

সে হেসে আমায় বসবার ইঙ্গিত করলো।

অ্যাঞ্জেলা বলল, আশা করছি পারব মিঃ ওয়ালেস। আপনি বসুন। কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

ধন্যবাদ, আমি কিছুই খাব না।

আপনি বেসরকারী গোয়েন্দা?
ঠিক ধরেছেন মিস থরসেন।
তাহলে তো আপনি পদে পদে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের মধ্যে কাটান। গোয়েন্দাদের
ুকারখানা তো থ্রিলার খুললেই পাওয়া যায়।
বাইরে যা পড়েন বাস্তবে বেসরকারী গোয়েন্দাদের জীবন কিন্তু তার চাইতে একদম আলাদা
থরসেন। আমার বেশীরভাগ সময়ই গাড়িতে বসে বা সেইসব লোকের সঙ্গে কথা বলে কাটে
রা সহযোগিতা করে না।
আবার হেসে অ্যাঞ্জেলা বলল, তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন? যাক কি ব্যাপার বলুন
ন?
আপনার ভাই টেরিকে খুঁজে বার করার জন্য আমায় ভাড়া করা হয়েছে।
ওর চোখে কৌতূহলী চাউনি।
আমার ভাই? টেরি?
ঠিক ধরেছেন, এক বৃদ্ধা মারা যাবার আগে ওর নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। এখন যতক্ষণ
কে খুঁজে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ টাকাটা ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকবে।
একজন বৃদ্ধা টেরির নামে টাকা রেখে গেছেন?
হ্যাঁ, মিস থরসেন।
চমৎকার মানুষ তো। তা তিনি কে?
গম্ভীর ভাবে বললাম, আমার বড়কর্তা শুধু টেরিকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটুকু আমায়
য়েছেন। বৃদ্ধার নাম আমায় জানাননি, কিন্তু এটুকু বলেছেন যে তিনি আপনার ভাইয়ের নামে
 লাখ ডলার ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। কাজেই আমি এত খোঁজ খবর নিচ্ছি।
সামনের দিকে ঝুঁকে অ্যাঞ্জেলা বলল, আপনি বলছেন একলক্ষ ডলার!
ঠিক তাই মিস থরসেন।
আবার হেসে বলল, কি চমৎকার লোক!
সত্যিই আশ্চর্য মহিলা, কিন্তু তাহলেও ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। আপনি কি সাহায্য
তে পারবেন?
পারলে খুব খুশিই হতাম। কতমাস হয়ে গেল ভাইটাকে দেখি না।
ও আপনাকে চিঠি লেখেনা বা টেলিফোন করেনা?
আমার বড় কষ্ট হয় মিঃ ওয়ালেস। একসময় আমার ভাই আর আমি দুজনে কত অন্তরঙ্গ ছিলাম
বলে বোঝাতে পারব না।
সে সত্যিকথা বলছে কিনা বুঝতে পারলাম না।
আপনি ওর কোন বন্ধুর নাম ঠিকানা দিতে পারেন যে ওর খোঁজ দিতে পারবে?
বিষাদের ভঙ্গিতে ও মাথা নাড়ল, ওর কোন বন্ধুকে আমি চিনি না।
আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ও ডেড এন্ড ক্লাবে পিয়ানো বাজাত। হঠাৎ একদিন ওখান থেকে
ল যায়।
সে অবাক চোখে তাকাল।
না, এটা আমার জানা ছিল না।
তাহলে আপনি আমায় কোন সাহায্যই করতে পারবেন না?
পারলে খুশি হতাম। আপনার কার্ড তো আমার কাছে রইল, টেরির খোঁজ পেলে আপনাকে
লিফোন করব।
আপনি টেলিফোনে খবরটা দিলে সত্যিই আমি খুশি হব। এটা খুব লজ্জার ব্যাপার, ব্যাঙ্কে
 মোটা সোটা টাকা পড়ে পচছে, এদিকে আপনার ভাই সে খবর জানেই না।
ঘাড় নেড়ে অ্যাঞ্জেলা বলল, সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর
 তখনই অ্যাঞ্জেলার মুখের ভাব ভাল করে লক্ষ্য করে আমি প্রশ্নটা করলাম যার সাহায্যে আমি
ব অ্যাঞ্জেলা সত্যি বলছে না কি মিথ্যা কথা বলতে সে একজন ওস্তাদ।

বলতে পারেন হ্যাংক স্মেডলিকে কোথায় গেলে পাব?

ওর চোখের পাতার দ্রুত কাঁপন আর নিমেষের জন্য দুচোখ জ্বলে ওঠা আমার চোখ এড়াল না। ওর সরল হাসিও যেন শুকিয়ে গেল। আমি বেশ বুঝলাম এবার ওকে বাগে পেয়েছি।

আবার সেই সরল হাসি তার ঠোঁটে। হ্যাংক স্মেডলি? আশ্চর্য! আপনি কি সেই কালো ছেলেটার কথা বলছেন যে একসময় আমাদের বাগানে কাজ করত?

ঠিক ধরেছেন, মিস থরসেন। আমি হ্যাংক অর্থাৎ মিসেস স্মেডলির ছেলের কথাই বলছি। আপনি বলতে পারেন কোথায় তার খোঁজ পাব?

আবার সেই হাসি, আমি বলতে পারব না। বহুদিন হল ওর সঙ্গে দেখা হয় না, ওর মার সঙ্গেও দেখা হয় না।

কি নির্লজ্জ মিথ্যা! হ্যাংকের মা মিসেস স্মেডলি স্বামীকে ছেড়ে দিনরাত ওর দেখাশুনা করছে, একটু আগেই সে আমায় দরজা খুলে দিল। অথচ মেয়েটা দিব্যি বলছে অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভেবেছে হ্যাংকের মাকে আমি চিনি না। কোনরকম খোঁজ খবর না নিয়েই আমি এখানে এসেছি। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে অনেক মেয়ে ঘেঁটেছি, কিন্তু এরকম ডাঁহা মিথ্যেবলা মেয়ে এর আগে দেখেনি যে হাসতে হাসতে দিনকে রাত করতে পারে।

মনে হচ্ছে আপনার ভাইকে খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হবে। তবু আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার এজেন্সী কোন কাজের জন্য টাকা নিলে সে কাজ পুরোপুরি শেষ না করে হাল ছাড়ে না। আমি জানি আপনার ভাইকে কখন খুঁজে পাব তা জানার জন্য আপনি ভেতরে ভেতরে ছটফট করবেন। ভয় নেই, সময় এলে আমিই আপনাকে সে খবর জানাবো।

আড়চোখে দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে কোন কথা না বলে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে লবিতে পড়ে থাকা আমার ম্যাকিন্টস তুলে গায়ে চাপালাম। টুপি থেকে জল ঝেড়ে পরলাম। তারপর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

ওর মা বলেছিল অ্যাঞ্জেলা মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয়। সত্যি কি?

যে মেয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই এমন বেমালুম মিথ্যে গল্প সাজাতে পারে তার বাকি জীবন তো পড়েই আছে। আর এও ঠিক যে হ্যাংকের কথা না তুললে ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকত না।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলা এবার কি করবে? ওর ভাইকে হুঁশিয়ারি করে দেবে? নাকি হ্যাংককে বলবে যে তার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে হুঁশিয়ার। হয়ত অ্যাঞ্জেলা তার কোনটাই করবে না।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সোজা হাইওয়ের দিকে চললাম।

অফিসে ফিরে দেখি বিল একমনে টাইপ করে চলেছে। সব কথা তাকে খুলে বললাম, এবার আমরা একটা খাঁটি চরিত্র পেয়েছি। কি চমৎকার মিথ্যে বলতে পারে সে তুমি নিজের কানে শুনলে তার তারিফ না করে পারবে না। তবে হ্যাঁ, মেয়েটার নার্ভ ইস্পাতের মত মজবুত, ব্যাটাছেলের মাথা ঘুরে যাবার মত যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। দিব্যি বলল ভাইয়ের খোঁজখবর ও পায় না, আর হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে দেখা হয় না।

বিল টাইপ করতে করতে বলল, রীতিমত পাখোয়াজ মেয়ে দেখছি। কিন্তু ওর ভাইকে কেন খুঁজছ তা আমার মাথায় ঢুকছে না। মনে হচ্ছে এ কেসের আসল লোক হ্যাংক, অন্য কেউ নয়।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে টেরিকে আমার খুব দরকার, রহস্যের চাবি ওর কাছেই আছে। তবে আমার ভুলও হতে পারে। যাকগে, আগে এই রিপোর্টটা টাইপ করা যাক।

টাইপ শেষ করতে করতে সাতটা কুড়ি বেজে গেল। রিপোর্টগুলো থরসেন ফাইলে ঢুকিয়ে বিল বলল, এবার কি করবে?

কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে ইটালিয়ান কোর্সে ডিনার খাব। তারপর সোজা হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে দেখা করব।

আবার ঐ কালোদের নাইট ক্লাবে যাবে?

ঠিক তাই।

খুব ভাল। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

টেবিলের নীচের ড্রয়ার খুলে পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবারটা নিয়ে চেম্বারটা ভাল করে দেখে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখলাম।

বিল তোমার রিভলবারটা নাও। ঝামেলা হতে পারে।

বিল ড্রয়ার খুলে একজোড়া পেতলের পাত্রও বের করল। দুহাতে ও দুটো পরে খুশীভরা চোখে সেগুলো দেখতে লাগল। তারপর বলল, তুমি তো রিভলবার নিয়েছো ডার্ক, তাহলে আমার আর দরকার নেই। আমার এতেই কাজ হবে।

ধমকে উঠলাম, কি হচ্ছে বিল? ওগুলো সঙ্গে রাখা যে বেআইনী তা জান না? ওগুলো গুণ্ডা বদমাশরা ব্যবহার করে। এখুনি ওগুলো খুলে ফ্যালো।

ঠিক বলেছো, ওগুলো বেআইনী আর গুণ্ডা বদমায়েশরা ব্যবহার করে। তা আমরাও তো একজন গুণ্ডার কাছেই যাচ্ছি। পাঞ্চ দুটো খুলে সে পকেটে রাখল। কালোদের সঙ্গে লড়াই করতে পাঞ্চের জুড়ি নেই।

কথাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমি জানি ঐ একটি পাঞ্চের সাহায্যে বিল এমন মোক্ষম ঘুঁষি মারার ক্ষমতা রাখে যা একটা হাতীকেও কাৎ করে দিতে পারে।

দাঁড়াও একটা ফোন করে নিই আমরা তারপরে বেরোবো। বলে বেলভিউ হোটেলের নম্বর ডায়াল করলাম। সুজি ডিউটিতেই ছিল। ওকে খুব ব্যস্ত মনে হল, একটা কথা বলেই ছেড়ে দিচ্ছি। দেয়ালে হোয়াইট ওয়াশ আর দরজার তালাটা সারিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যিই তোমার জুড়ি নেই সুজি।

থাক যথেষ্ট হয়েছে। আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। তুমি যে বীরপুরুষ তা আমার জানতে বাকি নেই। ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ো না। সামনের বুধবার দেখা হবে, রাখছি।

বিল ও আমি গাড়িতে উঠলাম। এখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সকোম্বের বড় রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে লুসিনো নামে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। রেস্তোরাঁর ভেতরটা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে, বেশি খদ্দের নেই। আমরা কোণের দিকে একটা টেবিলে বসলাম। কড়া ইটালিয়ান ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বিল বলল, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব?

যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি। অ্যাকমে এজেন্সীর বেসরকারী গোয়েন্দা হিসেবেই সেখানে ঢুকব। তারপর বলব যে হ্যাংকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। যদি কোন ঝামেলা না করেই হ্যাংক আমাদের সঙ্গে দেখা করে তো ওকে জিজ্ঞেস করব, যে টেরিকে খুঁজে বের করতে ও আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা। এবার দেখতে পাচ্ছো, এই তদন্তের ব্যাপারে টেরির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

তাই তো মনে হচ্ছে, বলল বটে কিন্তু গলা শুনে মনে হল সে এখনও আমার সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

ঠিক ধরেছো। তাহলে তুমি জানতে চাইছো তারপর আমরা কি করবো। সেটা নির্ভর করছে হ্যাংক আমাদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করে তার ওপর। তবে ও টেরির ব্যাপারে মুখ খুলবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই এর পরের কাজ হল অ্যাঞ্জেলাকে অনুসরণ করা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে।

বিল মাথা নেড়ে বলল, তুমি কি ভাবছো ঐ পথে এগোলে কিছু যোগাড় করতে পারবে?

জানি না তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

বিকেলে প্লেটে করে লুসিনো আমাদের জন্যে স্প্যাঘেটি এনে হাজির করল, ছোট অক্টোপাস কুটে টুকরো করে মুচমুচে করে ভেজে তার ওপর ছড়ানো, সঙ্গে কয়েক টুকরো মুর্গীর মাংস আর ছোট চিংড়িও আছে। আর টমেটোর সসভর্তি একটা বড় বাটি সে টেবিলের মাঝখানে রাখল।

আমাদের দুজনেরই প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। রাত সোয়া দশটা নাগাদ আমরা খেয়ে দেয়ে বেরোলাম। ওয়াটার ফ্রন্টের একপাশে গাড়ি রেখে দুজনে ডিসকোতে হেঁটে এলাম। ভেতরে ঢোকার আগে কোমরে হাত দিয়ে দেখলাম সেটা ঠিক আছে কিনা। বিলও তার ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢোকাল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি বিকট বারের চারিদিকে অসংখ্য টেবিল, চেয়ার, বেশ কিছু কালো বসে বীয়ার খাচ্ছে। সামনে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। তার ওপর তিনজন কালো দাঁড়িয়ে, প্রথমটির হাতে ট্রাম্পেট দ্বিতীয়টির হাতে স্যাক্রোফোন এবং তৃতীয়টির হাতে ড্রামের কাঠি, সামনে রাখা বিশাল ড্রামটিকে ঠিকমত বসাচ্ছে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই দশাসই চেহারার এক কালো এসে খেঁকিয়ে উঠলো, পড়তে পারো না? নোটিসে লেখা আছে দ্যাখোনি সাদাদের এখানে ঢোকা বারণ।

সরো এগোতে দাও। আমি হ্যাংকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সে জ্বলন্ত চোখে দাঁতে খিঁচিয়ে, এখানে কোন উল্লুক ঢুকতে পারে না।

আমার কার্ডখানা তার নাকের সামনে তুলে বললাম, লেখাপড়া কিছু শিখেছো? এটা পড়তে পারো? তাতে কাজ হল। বিড়বিড় করে সে পড়ল।

সে হেঁড়ে গলায বলল, তুমি কি পুলিশের লোক?

আমিও একটু চেঁচিয়ে বললাম, এই যে কালোমানিক, এই কার্ডটা নিয়ে হ্যাংককে দেখাও ওকে বলো যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে একটু ইতস্ততঃ করে ড্যান্সিং ফ্লোর ছেড়ে একটা দরজা খুলে ওপাশে চলে গেল। হলের ভেতর কয়েকজন কাল মেয়ে পুরুষ এই দিকে দেখল। মনে হয় ওরা সবাই আমাদের পুলিশের লোক বলেই ধরে নিয়েছে।

চলে এসো, বলে আমি বিলকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটা একটু আগে যে দরজাটা খুলে ওপাশে গিয়েছে সেই দরজার হাতলটা একটানে খুললাম। দরজা খুলতেই আরেকটা দরজা চোখে পড়ল করিডোরে এগোতেই দ্বিতীয় দরজাটা কে যেন ওপাশ থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। পরমুহূর্তে একটি লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল আর তার পা ও মাথা দেখেই বুঝতে পারলাম সে কে।

এর আগে বিল হ্যাংক স্মেডলির বর্ণনা দিয়েছিল, কিন্তু নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারিনি কি বিশাল শরীর। দেখলাম লম্বায় পুরোপুরি সাড়ে ছ'ফিট, আর তার কাঁধ এত চওড়া যে পাড়াগায়ের খামার বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে আর কেউ সে দরজা দিয়ে যেতে আসতে পারবে না বিল বলেছিল ওর মাথাটা ছোট, কথাটা ঠিকই। চোখের দিকে তাকালে যে কেউ আঁতকে উঠবে।

কি চাই তোমাদের? লক্ষ্য করলাম ওর দুহাত মুঠো পাকানো।

আপনিই মিঃ হ্যাংক স্মেডলি? আমি জানতে চাইলাম।

আমার কথা শুনে ও একটু ধাক্কা খেল। ওর দুহাতের মুঠো খুলে গেল।

হ্যাঁ। এখানে কি চাই?

মিঃ স্মেডলি আমি অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী থেকে আসছি। আস্তে বললাম, আশা করছি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

সন্দেহভরা চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর বলল, সাদাদের সাহায্য করি না। কেটে পড়ো, তোমার গায়ের গন্ধ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।

সাদা কালো বাদ দিননা মশাই। আমি বললাম, আমার পদবী ওয়ালেস, আপনি ঐ বলেই ডাকবেন, আমিও আপনাকে হ্যাংক বলে ডাকব। মনে হয় আমরা কথা বলতে পারব।

এমন ব্যবহার ও আমার থেকে আশা করেনি। দেখলাম ও ইতস্ততঃ করছে। কিছুতেই ও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

তবু দাঁড়িয়েই রইল।

আমি টেরি জিগলারের খোঁজে এসেছি। গলা নামিয়ে আস্তে কথাগুলো বললাম, যেমন বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে।

এতে কাজ হল। একটু সামনে ঝুঁকে কটমট করে আমার দিকে তাকাল।

ও হেঁড়ে গলায় বলল, ওকে দিয়ে কি দরকার?

উত্তর দেবার আগেই চোখে পড়ল হ্যাংকের পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে।

লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, ওকে একটু তফাতে যেতে বলো। ব্যাপারটা খুব গোপনীয়, সবার শোনার মত নয়।

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠলো, অ্যাই ভাগ এখান থেকে।

ধমক খেতেই লোকটা আমার পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি টেরিকে খুঁজছি। কারণ একজন মারা যাবার আগে ওর নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। যতক্ষণ না ওকে পাচ্ছি ততক্ষণ টাকাটা ব্যাঙ্কে পচবে।

এবার হ্যাংক শান্ত গলায় জানতে চাইল, কত টাকা?

লাখ খানেকের মত হবে, আমি ঠিক বলতে পারব না।

হ্যাংক অবাক হয়ে তাকিয়ে, লাখখানেক!

তাইত জানি। তবে টাকার পরিমাণ কত তা সঠিক বলতে পারব না। হয়তো বেশিও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?

ওকে পেলে কি করবেন?

তাহলে তো সব ভাবনা মিটেই গেল। আমি ওকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাব। সেখানে কয়েকটা ফর্মে সই করবে। তারপরেই সে টাকার মালিক হবে। খুব সোজা ব্যাপার।

মনে হল হ্যাংক কিছু একটা ভাবছে।

এক লাখ? সে তো অনেক টাকা। কোথায় আছে ঠিক জানি না তবে হয়ত খুঁজে বের করতে পারব। সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ও এখানে নেই অন্য কোথাও থাকতে পারে।

বেশ বুঝতে পারলাম যে ও মিথ্যে বলছে কিন্তু আমায় ধৈর্য বজায় রাখতেই হবে।

ঠিক আছে হ্যাংক। আমার কার্ডটা আপনার কাছে রেখে দিন। টেরির সঙ্গে কথা বলে দেখুন, যদি ঐ টাকাটা ও নিতে চায় তো আমাকে টেলিফোনে জানাবেন। কেমন ঠিক আছে?

হ্যাঁ সেই ভালো। বলেই বিলের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বেঁটে লোকটা কোথা থেকে এল?

ও আমার বডিগার্ড। গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে কারবার করতে হয় তাই ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

হ্যাংক বিশ্রীরকম খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ করে হাসল, ঐ বেঁটে বাঁটকুল আপনার বডিগার্ড। ওর এক ফোঁটাও দম নেই আপনার বডি গার্ড দেবে কি করে? এক ফুঁয়ে বীয়ারের গ্লাস থেকে ফেনা ফেলতে পারবে?

আড়চোখে দেখলাম বিলের দুহাত ট্রাউজারের দু পকেটে ঢুকিয়েছে। আমি জানি এক্ষুণি ওকে সরিয়ে না নিলে ওর দু পকেটে লুকানো দুটি পেতলের পাঞ্চ বিদ্যুতের বেগে আছড়ে পড়বে হ্যাংকের তলপেটে, চোয়ালে। আর ঐ ষণ্ডাটা কাটা কলাগাছের মত মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমি সতর্ক হলাম। বিলের ডানহাতের কব্জি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বললাম, চলো বিল। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যাক। বলে তাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। দরজার কাছে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললাম, তাহলে হ্যাংক, ঐ কথাই রইল। টেলিফোন করবেন।

তুমি আমায় সরিয়ে আনলে কেন? বাঁদরটাকে মনের সুখে প্যাঁদাতাম।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, ধৈর্য ধরতে শেখো। প্যাঁদানোর সুযোগ পরে অনেক পাবে। এখনও তার সময় আসেনি।

এবার কি করবে?

এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাবো। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, আমার এখনও মনে হচ্ছে এ কেসের সমাধানে টেরি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। দুটো ফাঁদ পাতলাম। অ্যাঞ্জেলা আর হ্যাংক দুজনেই জেনেছে যে টেরির দাম এখন এক লাখ ডলার। ওরা ঠিকই জানে টেরি কোথায় আছে। আশা করছি ওদের দুজনের মধ্যে একজন টেরিকে ঠিকই খবরটা দেবে, তারপর টাকার লোভে সে এসে হাজির হবে।

ধরো, টেরি কোথায় তা ওদের দুজনের একজনও জানে না। তখন কি হবে?

ওরা ঠিকই জানে টেরি কোথায় আছে। দেখা যাক। আগামীকাল সকাল ন টায় তাহলে দেখা

হবে।

খুব ভাল।

বিলকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে বেলভিউতে ফিরে এলাম। লবী পেরিয়ে রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছাতেই সুজি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

কিগো! আজ রাতে বেরোবে কি?

অসম্ভব ডার্ক। রাত তিনটের আগে আমার ছুটি মিলবে না। আর তখন আমার বেড়াতে যাবার মত অবস্থা থাকবে না। একটু ধৈর্য ধরো সোনা বুধবার সন্ধ্যায় বেরোব।

দুজন বয়স্ক মোটাসোটা লোক রিসেপসশন ডেস্কে এল। একগাল হেসে সুজি তাদের সঙ্গে কথা বলল।

অগত্যা আমি আমার আস্তানায় ফিরে এলাম। স্নান সেরে কিছুক্ষণ টিভি দেখলাম। তারপর গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়।

বিল আর আমি সকাল সাড়ে ন টায় বসে আছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে বললাম, ওয়ালেস কথা বলছি। কি খবর হ্যাংক, বলেই বিলকে ইঙ্গিত করলাম এক্সটেনশন রিসিভারটা কানে লাগাতে। আমার আর হ্যাংকের যা কথাবার্তা হবে সব ও শুনতে পাবে।

বলো কোনও খবর আছে?

হ্যাঁ, টেরিকে খুঁজে বের করেছি। ও, ওটা তাড়াতাড়ি পেতে চাইছে।

ওকে কোথায় খুঁজে পেলে?

তা আপনার জেনে দরকার নেই, ও কবে টাকাটা পাবে তাই বলুন।

চিন্তার কিছু নেই, হ্যাংক। আমি পরে আপনাকে ফোন করব। ও আমি পরে ঠিক সাজিয়ে নেব।

সাজিয়ে নেব বলতে আপনি কি বলতে চান?

ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা অ্যাপয়েনমেন্ট করতে হবে। মিঃ অকল্যান্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ওঁর সামনে টেরিকে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে, সেটা হয়ে গেলে টেরিকে কয়েকটা ফর্ম সই করতে হবে। কোন চিন্তা নেই, পরে আমি আপনাকে ফোন করব। বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

বিল রিসিভার নামিয়ে বলল, ব্যাটা পাজীর পাঝাড়া।

হতে পারে, যাকগে। এবার শোন তোমায় কি করতে হবে। ডেড এন্ড নাইট ক্লাবে গিয়ে হ্যারি রিচকে বলো যে টেরি ব্যাঙ্কে তার প্রাপ্য টাকা নিতে আসবে। সেখানে রিচ তাকে সনাক্ত করতে রাজি আছে কিনা। মনে হচ্ছে টেরিকে দেখবার জন্যে ও ঠিক ছুটে আসবে। তুমি এই কাজের ভারটা নাও। আমি অকল্যান্ডকে সামলাবার ভার নিচ্ছি।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্যাঙ্কে পৌঁছলাম। খবর দিতেই মিঃ অকল্যান্ড ডেকে পাঠালেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মিঃ অকল্যান্ড গীর্জার বিশপের মত প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

বলুন মিঃ ওয়ালেস, কাজকর্ম কি রকম এগোচ্ছে? বলে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ অকল্যান্ড যতদুর খোঁজ পেয়েছি ব্রেকার্স বিল্ডিংয়ে মিস অ্যাঙ্গাস নামে এক ভদ্রমহিলা থাকতেন। মারা যাবার আগে তিনি টেরেন্স থরসেন ওরফে টেরি জিগলারের নামে আপনার ব্যাঙ্কে এক লাখ ডলার রেখেছেন, তা খবরটা কি ঠিক?

সবটা ঠিক, মিঃ ওয়ালেস। মিস অ্যাঙ্গাসের উকিল সলি লিউইস বলেছেন যে যতক্ষণ উনি মিঃ থরসেনকে খুঁজে না পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকবে।

কিন্তু এর সঙ্গে আপনার তদন্তের কি সম্পর্ক?

মনে হচ্ছে টেরেন্স থরসেন আমাদের অনেক কাজে আসবে মিঃ আকল্যান্ড। ওর বন্ধুরা ওকে বলেছে যে ব্যাঙ্কে ওর নামে এক লাখ ডলার পড়ে পচছে। আমার ধারণা এবার টাকার জন্য ও ঠিক এসে হাজির হবে। ওর পাওনা হয়েছে তাই ওকে টেনে নিয়ে আসবে।

অকল্যান্ড নিজের মনে বললেন, চমৎকার!

আপনি আগে কখনও টেরেন্স থরসেনকে দেখেছেন?

একটু চমকে অকল্যান্ড বললেন, না, কখনও তাকে দেখিনি।

তাহলে কেউ এসে যদি বলে যে সেই টেরেন্স থরসেন তাহলে আপনি কোন বিশ্বাসে তাকে টাকা দেবেন?

তিনি উত্তেজিত ভাবে একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসে পড়লেন।

তাহলে বলছেন কোন আজেবাজে লোক এসে টাকাটা দাবী করতে পারে, যার উদ্দেশ্য প্রতারণা?

তা একলাখ ডলারের জন্য তেমন কাণ্ড ঘটা বিচিত্র নয়।

সে তো একশোবার মিঃ ওয়ালেস। টাকাটা দেবার আগে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে। টাকার দাবীদার যে সত্যিই টেরেন্স থরসেন, সে বিষয়ে আমায় নিশ্চিন্ত হতে হবে।

মিঃ অকল্যান্ড, সনাক্ত করার সব চাইতে ভালো লোক হল টেরির বোন অ্যাঞ্জেলা থরসেন। ওকে আপনি একবার আসতে বলুন। ও যদি নিজের ভাইকে সনাক্ত করে তাহলে কোন ঝামেলাই থাকে না।

এটা খুব ভাল বুদ্ধিই দিয়েছেন মিঃ ওয়ালেস।

তাহলে আজ দুপুরে টেরিকে আনানোর ব্যবস্থা করা যাক। কি বলেন?

এক মিনিট। মিঃ অকল্যান্ড তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক দেখে বললেন, তিনটে নাগাদ করা হোক।

তাহলে মিস থরসেনকে টেলিফোন করে একবার আসতে বলুন না? আমার তো মনে হচ্ছে এতদিন পরে উনি ভাইকে দেখে খুশিই হবেন।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। থরসেন পরিবারকে সাহায্য করতেই তো আমি চাই। দেখি ওকে পাই কি না, বলে মিঃ অকল্যান্ড সুইচ টিপে মিস থরসেনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন।

পাঁচ মিনিট পর অ্যাঞ্জেলার লাইন পাওয়া গেল।

হ্যালো। আমি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে হোরেস অকল্যান্ড বলছি। আপনাকে ডিসটার্ব করছি না তো?

উল্টোদিকের কথা আমি বুঝতে পারলাম না।

আপনি কি জানেন যে আপনার ভাই টেরেন্সের নামে এক ভদ্রমহিলা উইলে এক লাখ টাকা দিয়ে গেছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস যথেষ্ট সাহায্য করছেন। মিস থরসেন, এখন ব্যাপার হল যে যিনি ঐ টাকা দাবী করবেন তাঁর পরিচয় সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। আমি আপনার ভাইকে আগে কখনও দেখিনি, তাই চাই তাকে সনাক্ত করা হোক। আজ বিকেল তিনটেয় একবার আসুন না। এসে আমার পক্ষ থেকে আপনার ভাইকে সনাক্ত করে যান।

ও পক্ষের বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পারছি। আপনি অনেকদিন আপনার ভাইকে দেখেন নি। এতদিন বাদে তাকে দেখতে পেলে আপনিও খুব খুশি হবেন। তাহলে আপনি বিকেল তিনটেয় এখানে আসছেন। ধন্যবাদ, বলে মিঃ অকল্যান্ড রিসিভার রাখলেন।

উনি রাজী হয়েছেন। বলছেন আমাদের সাহায্য করতে পারলে খুব খুশি হবেন। আমি এর মধ্যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ অকল্যান্ডের জন্য দুঃখ হল। অ্যাঞ্জেলা যে কি চীজ তা উনি না জানলেও আমি জানি। ও মেয়েকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, খুব ভাল কথা। তাহলে আমি ঠিক তিনটের সময় আসব।

তাই আসুন মিঃ ওয়ালেস। মিঃ অকল্যান্ড করমর্দন করে বললেন, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমারও তাই ধারণা, আচ্ছা পরে দেখা হবে বলে বেরিয়ে এলাম।

প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ঠিক পৌনে তিনটেয় ঢুকলাম। মিস বার্চের কাছে গিয়ে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ হাসতেই তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, মিঃ অকল্যান্ড এখন ব্যস্ত আছেন।

ঠিক আছে, ওকে শুধু বলুন যে আমি এসেছি, বলে আমি চেয়ারে বসলাম।

আমি ও বিল কিছু হালকা খাবার খেয়ে লাঞ্চ সেরেছি। খেতে খেতে বিল বলছে যে শুধু হ্যারি রিচই নয় সেইসঙ্গে সে মিস লিজা ম্যানচিনি এক যুবতীর সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। টেরি নিখোঁজ হবার আগে পর্যন্ত লিজা নামে ঐ যুবতীটি ছিল তার বান্ধবী।

চমৎকার কাজ করেছ বিল। তদন্ত করতে করতে একদম ভেতরে ঢুকে যাওয়া একেই বলে। খুব সময় মত কাজটা করেছো।

হ্যামবার্গার চিবোতে চিবোতে বিল বলল, ভাবনার কিছু নেই। রিচ আসলে টেরির সঙ্গে কথা বলতে চায়। মতলব একটাই, সে হল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনমতে টেরিকে ওর নাইট ক্লাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাছাড়া শুধু হ্যারি নয় টেরির পাশে শোবে বলে লিজাও দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে। ওরা দুজনেই আসতে রাজি হয়েছে।

খুব ভাল কথা। তুমি ঠিক তিনটে কুড়ি নাগাদ ওদের ব্যাঙ্কে আনবে তার আগে নয় কিন্তু। আমি ওদের দুজনকেই একটু অবাক করে দিতে চাই।

মিস বার্চ দশ মিনিট পরে বললেন, মিঃ অ্যাকল্যান্ডের হাত খালি হয়েছে এবার। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

আকল্যান্ডের কামরায় ঢুকতেই তিনি যথারীতি করমর্দন করে গীর্জার বিশপের হাসি হাসলেন।

বুঝলেন মিঃ ওয়ালেস এটা খুব ইনটারেস্টিং ব্যাপার হবে। উল্টোদিকের চেয়ারে আমাকে বসার ইঙ্গিত করে, আসলে এমন ব্যাপার তো আর রোজ রোজ ঘটে না। দরকারী কাগজপত্র সব আমি আনিয়ে রেখেছি। মিঃ লিউইসের সঙ্গেও কথা বলেছি। মিস থরসেন ওঁর ভাইকে সনাক্ত করলেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।

আমি শুধু হেসে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসলাম। ঠিক তিনটে বাজতেই অকল্যান্ডের টেবিলের ওপরে রাখা ইন্টারকমটা বেজে উঠল। মিঃ অকল্যান্ড টিপতেই মিস বার্চের গলা শোনা গেল। মিঃ টেরি থরসেন এসেছেন।

ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। বলেই অকল্যান্ড বললেন, এটা ইন্টারেস্টিংয়ের চাইতেও বেশি কিছু।

সত্যিই তাই। পরক্ষণে দরজা ঠেলে বছর পঁচিশের একটি ছেলে ভেতরে ঢুকল। ছেলেটির গায়ে সাদা শার্ট, পরনে কালো ট্রাউজার্স, পায়ে মেক্সিকান বুট জোড়া। সেই বুটের ভেতর ট্রাউজার্সের তলার দিকটা গোঁজা। মাথার চুল কাঁধে এসে ঠেকেছে। ছেলেটার গড়ন খুবই পাতলা আর ছিপছিপে মুখখানা ঠিক ইঁদুরের মত আর দু চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছোঁয়া।

অকল্যান্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপনিই মিঃ টেরি থরসেন?

হ্যাঁ, ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি কে?

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার নাম ওয়ালেস মিস অ্যাঙ্গাসের অ্যাটর্নি মিঃ সলি লিউইসের পক্ষে আমি কাজ করছি।

ছেলেটি অকল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে, নিন, যা করবার চটপট করুন। আমার তাড়া আছে। টাকাটা কোথায়? তার গলা বেশ কর্কশ আর ব্যবহারও অভদ্র গোছের!

মিঃ অকল্যান্ড গম্ভীর ভাবে বললেন, টাকাটা দেবার আগে আপনাকে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে মিঃ থরসেন।

ছেলেটা তেরিয়া হয়ে বলল, সনাক্তকরণ? তার মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন?

আবার ইন্টারকম বেজে উঠল। মিস থরসেন এসেছেন মিঃ অকল্যান্ড, ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই তো আপনার বোন এসে পড়েছেন মিঃ থরসেন। এতদিন বাদে আপনি ওকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

অ্যাঞ্জেলা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। তার গায়ে সোয়েট শার্ট, পরনে নীল রংয়ের জিনস্, মেক্সিকান টুপি আর চোখে সানগ্লাস। অ্যাঞ্জেলা দুহাত বাড়িয়ে ছেলেটার দিকে এগোলো।

অ্যাঞ্জেলা উল্লাস ভরা গলায়, টেরি! কি অদ্ভুত ব্যাপার। কতদিন পর তোমায় কাছে পেলাম।

কিন্তু টেরির মধ্যে কোন আনন্দ বা উল্লাস নেই। উত্তাপহীন গলায় বলল, শোন, আমরা পরে কথা বলব। আগে টাকাটা আমার চাই। তারপর এই বাজে জায়গা থেকে বেরিয়ে যা বলার বলব।

সে তো একশোবার টেরি। অকল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলা বলল, এ হল আমার ভাই টেরি। ওকে টাকাটা কি এখন দেবেন? দিলে ভাল হয়। এতদিন বাদে দেখা হল অনেক কথা জমে আছে।

নিশ্চয়ই মিস থরসেন। তাহলে আপনি ওকে টেরেন্স থরসেন বলে সনাক্ত করছেন তো?

তীক্ষ্ণগলায় অ্যাঞ্জেলা বলল, আমি এক্ষুণি সেই কথাই বললাম। নয় কি? টাকাটা ওকে দিয়ে দিন। ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা জমা আছে।

মিঃ অকল্যান্ড কয়েকটা কাগজ ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলোতে সই করে দিন তারপর আমি আপনার টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করছি। বলুন, টাকাটা আপনি কিভাবে পেতে চান?

নগদ চাই, পুরোটা, বলেই অকল্যান্ডের হাত থেকে কলমটা ছিনিয়ে নিয়ে টিক দেওয়া জায়গায় সই করতে লাগল।

ওর সই করার ফাঁকে আমি বাইরে আসতেই দেখি দুই যুবক যুবতীকে নিয়ে বিল দাঁড়িয়ে। বুঝলাম এরাই হ্যারি রিচ আর লিজা ম্যানচিনি।

মিঃ রিচ আমার সঙ্গে একটু আসুন। বলে বিলকে ইঙ্গিত করলাম যেন লিজা ম্যানচিনিকে একটু আটকে রাখে। তারপর তাকে নিয়ে অকল্যান্ডের কামরায় ঢুকলাম।

অকল্যান্ড বললেন, ইনি কে?

এ ভদ্রলোকের নাম হ্যারি রিচ, ইনি একটি নাইট ক্লাবের মালিক। ওঁর নাইট ক্লাবে মিঃ থরসেন পিয়ানিস্টের চাকরী করত। মিঃ থরসেনকে সবাই টেরি জিগলার বলেই জানত। আমার মনে হয় টাকাটা দেবার আগে মিঃ রিচের একবার ওকে টেরি জিগলার বলে সনাক্ত করা দরকার।

অকল্যান্ড আমতা আমতা করে, কিন্তু মিস থরসেন তো আগেই ওকে সনাক্ত করেছেন।

রিচের দিকে তাকিয়ে বললাম। মিঃ রিচ দেখুন তো, এই ছেলেটিই কি টেরি জিগলার?

ছেলেটির দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে হ্যারি মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, ও টেরির মতই সাজগোজ করেছে বটে। কিন্তু ও টেরি নয়, ওকে আমি চিনি না। এটুকু বলতে পারি যে ও টেরি জিগলার নয়।

ঠিক বলছেন তো মিঃ রিচ?

আলবাৎ। বেশ কয়েক মাস টেরি আমার কাছে কাজ করেছে। প্রত্যেক হপ্তায় আমি নিজে হাতে ওকে প্রাপ্য বেতন দিয়েছি। আপনি কি করতে চাইছেন জানি না কিন্তু শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন মিঃ ওয়ালেস। বলে রিচ গটগট করে বেরিয়ে গেল।

একটা ধাক্কা অকল্যান্ড খেয়েছে বুঝতে পারছি কিন্তু তাঁকে কিছু সুযোগ না দিয়েই বাইরে থেকে মিস লিজা ম্যানচিনিকে ভেতরে নিয়ে এলাম।

ইনি হলেন মিস লিজা ম্যানচিনি। টেরি থরসেন ওরফে টেরি জিগলারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন। টেরির সঙ্গে দেখা হবে জেনে ছুটে এসেছে। দেখুন তো মিস ম্যানচিনি, এই লোকটিই টেরি জিগলার কি না?

একপলক তাকিয়েই মিস লিজা ভুরু কুঁচকে ঘেন্না জড়ানো গলায় বলল, এই উল্লুকটা টেরি হতে যাবে কোন দুঃখে? আপনি কি ভেবেছেন এতদিন বাদে টেরিকে দেখলে আমি চিনতে পারব না?

তাহলে আপনি বলছেন এ টেরি জিগলার নয়?

তাই বলছি। আপনি কি ভেবেছেন এই উল্লুকটার সঙ্গে আমি শুতে যাব? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হা ভগবান! ভেবেছিলাম সত্যিই এতদিন বাদে টেরির সঙ্গে আবার দেখা হবে।

বিল তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার হাতটা চেপে ধরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

কামরার ভেতরে কারও মুখে কোন কথা নেই। ছেলেটি কুলকুল করে ঘামতে লেগেছে, রাগে দুচোখ লাল। অ্যাঞ্জেলা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। অকল্যান্ডকে দেখে মনে হল তাঁর

শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে।

অ্যাঞ্জেলার গলায় রুক্ষতা, মিঃ অকল্যান্ড! আমি আবার বলছি যে ছেলেটি আমার ভাই। কোথাকার এক সস্তা নাইট ক্লাবের মালিক আর একটা রাস্তার বেশ্যা কি বলে গেল সেই কথা আপনি মেনে নেবেন?

নিশ্চয়ই না, মিস থরসেন। তবে কোথাও নিশ্চয়ই কোনও ভুল ভ্রান্তি হয়েছে।

চড়ালো গলায় অ্যাঞ্জেলা, ভুল ভ্রান্তি কিছুই হয়নি। টেরি টাকাটা পাক তা ওরা চায় না। ওরা জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আপনি আমার ভাইকে টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ অকল্যান্ডকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই ওঁর স্ট্রোক হবে। আমি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পুরনো পুলিশি মেজাজে বললাম, শুনুন মিস থরসেন, এই টাকাটা ওকে পাইয়ে দেবার কোনও অধিকার মিঃ অকল্যান্ডের নেই। মিস অ্যাঙ্গাসের উইল যার হেপাজতে আছে সেই মিঃ লিউইসের হয়ে আমি কাজ করছি। আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারি নি। আপনি বলছেন এই ছেলেটি আপনার ভাই। দুজন লোক যারা বেশ কিছুদিন ধরে আপনার ভাইকে দুবেলা দেখেছে তারা বলছে এ সেই লোক নয়। এই ছেলেটি আপনার ভাই সে বিষয়ে আমি যতক্ষণ না নিশ্চিন্ত হচ্ছি ততক্ষণ মিঃ অকল্যান্ডেরও এক লাখ ওকে দেবার অধিকার নেই।

অ্যাঞ্জেলা ঘুরে দাঁড়াল। ওর পাতলা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। আর তাই দেখেই আমি বুঝলাম ও কি সাংঘাতিক রেগে গিয়েছে।

অ্যাঞ্জেলা চাপাস্বরে বলল, আমি দাবী করছি আমার ভাইকে তার পাওনা টাকা দিয়ে দেওয়া হোক।

ভাবনার কিছু নেই। রাস্তার ওপরেই আছে ইডেন নাইট ক্লাব। চলুন সবাই মিলে একবার সেখানে যাওয়া যাক। ওখানকার মালিক আমার বন্ধু। আমি তাকে বলে আপনার ভাইকে পিয়ানোর সামনে বসতে বলছি। যদি ও সত্যিই ফ্যাটেস ওয়ালারের মত বাজাতে পারে তাহলে টাকা পাবার কোন অসুবিধেই হবে না। কেমন রাজি তো?

ছেলেটা আমার কথায় ক্ষেপে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল, তখনই জানতাম! বারবার ঐ কেলে উল্লুকটাকে বলেছিলাম এই মতলবে কাজ হবে না। আর তুই! সে অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোকেও বলেছিলাম রে মাগী! এতে কাজ হবে না। বলেই ও আমায় ঠেলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

তাহলে মিঃ অকল্যান্ড এই ব্যাপার, অকল্যান্ডের চুপসে যাওয়া বেলুনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হল। টেরি থরসেন ফিরে এলে আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেব। অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরে বললাম, চমৎকার খেলাটা খেললেন বটে মিস থরসেন। কিন্তু তেমন জমল না, এই দুঃখ।

আপনাকে এর জন্য পস্তাতে হবে। সত্যিই পস্তাতে হবে।

তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠুন মিস থরসেন। এখনও ছেলেমানুষ আছেন। টাকাই কিন্তু সব নয়। শান্তগলায় বলে আমি বেরিয়ে এলাম। অকল্যান্ডকে এখন এই বদমাশ মেয়েটাকে সামলাতে হবে। তার কথা ভেবে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে।

কামরার বাইরে এসে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি গাড়িও নেই বিলও নেই। অগত্যা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা অফিসে ফিরে এলাম। থরসেন কেসের ওপর একটা রিপোর্ট এখুনি লিখতে হবে।

অফিসে এসে বিলকে দেখতে পেলাম না। মিস অ্যাঙ্গাসের উকিল সলি লিউইসকে একটা ফোন করলাম।

আমি অ্যাকমের ওয়ালেস বলছি। আপনি কি ব্যস্ত আছেন?

না, কি ব্যাপার বলুন তো?

দয়া করে মন দিয়ে সব শুনুন, বলে ব্যাঙ্কে যা যা ঘটেছে সব বললাম।

মিঃ লিউইস সব শুনে বললেন। তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে টেরেন্স থরসেন আর টেরি জিগলার একই লোক।

ঠিক ধরেছেন। এবার একটা কথার জবাব দিন। টেরি জিগলার যদি মারা যায় তাহলে মিস অ্যাঙ্গাসের সেই একলক্ষ ডলারের কি গতি হবে?

সাময়িকভাবে কেউ পাবে না। পরে টেরির নিকট আত্মীয় টাকাটার মালিক হবেন।

নিকট আত্মীয় বলতে কাকে বোঝায়, মা না বোন?

এক্ষেত্রে মা।

ধন্যবাদ, আপনি একটা কাজ করবেন। মিঃ অকল্যান্ডকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন যে উপযুক্ত দাবীদারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত যেন টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কের ভল্টেই রেখে দেন।

আমি এক্ষুণি ফোন করে ওকে একথা বলছি। বলেই তিনি লাইন ছেড়ে দিলেন।

আজকের রিপোর্টটা টাইপ করা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিল এসে হাজির হল।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি তো ভাবলাম তুমি মরে গেছো।

দাঁড়াও আগে একটু ড্রিঙ্ক করে নিই, তারপর সব বলছি। খাটতে খাটতে জান কয়লা করে ফেলেছি সে খবর রাখো?

ছটা চল্লিশ বাজে। অফিসের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে জেনে আমি একটা স্কচের বোতল বের করলাম। অফিসের কাজের পর দরকার হলে আমরা খাই। হুইস্কিতে বরফ দিয়ে গ্লাসটা বিলের দিকে এগিয়ে দিলাম। বিল দু-চার চুমুক দিতে বললাম, এবার বলো তো এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

আর বলো কেন? অ্যাকল্যান্ডের কামরা থেকে ঐ ছোড়াটা রেগেমেগে বেরিয়ে যেতে আমি ওর পিছু নিলাম। ও একটা পুরনো হন্ডা মোটর সাইকেলে এসেছিল। আমি কিছুটা তফাৎ রেখে তার পেছনে যেতে লাগলাম। একসময় ও ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় যেতে আমি ভাবলাম ও নিশ্চয়ই সেই কালোদের নাইট ক্লাব ব্ল্যাক ক্যাসেটে যাবে। কিন্তু দেখলাম ওটার পাশ কাটিয়ে ব্যাটা অয়স্টার অ্যালির সামনে এসে দাঁড়াল। আমি গাড়ি পার্ক করে এসে দেখি একটা বাড়ির সামনে ওর হন্ডা দাঁড় করানো। মোটর সাইকেলের নম্বর নিয়ে আমি গাড়ি রেজিস্ট্রেশান অফিসে গেলাম। সেখানে জানতে পারলাম ছেলেটার নাম গেরেন্ডা। ৩ নম্বর অয়েস্টার অ্যালিতে ১০ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে আবার বলতে শুরু করল, তারপর ওখান থেকে গেলাম থানায়। সেখানে জো বিগলারের সঙ্গে কথা বললাম। জো জানতে চাইল লু গেরেন্ডা সম্পর্কে আমি এত কথা জানতে চাইছি কেন। আমি শুধু বললাম দরকার আছে। জো বলল, লু এখনও কোন অপরাধ করেনি কিন্তু পুলিশ ওর ওপর নজর রেখে চলেছে। কারণ ওর বাবা মাফিয়াদের হয়ে কাজ করতো। লু-র বয়স যখন পনেরো বছর তখন ওদের দলের লোকেরাই ওর বাবাকে খুন করে। তারপর লু ওয়াটার ফ্রন্টে ঠিকে মজুরের কাজ পায় এবং সেই টাকায় নিজের ও মায়ের পেট চালাতে শুরু করে। ওর মা বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছে। লু ছেলেটা জাতে সিসিলিয়ান তাই ওর ওপর বিগলারের সন্দেহ। কিন্তু তাকে হাতে নাতে ধরার মত এখনও কিছু পায় নি। ওয়াটার ফ্রন্টে চলে এলাম। সেখানে আমার কয়েকটা চেনা ছোকরার কাছে গেরেন্ডার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ওরা ঠিক জানে না ওর রোজগারের পথটা কি। এই হল আমার আজকের কাজের রিপোর্ট ডার্ক।

তুমি অনেকদূর এগিয়েছো বিল। আমি অ্যাল বার্নির সঙ্গে কথা বলব। হয়তো কোনও খবর দিতে পারে।

আমার টেবিলের ওপর ইন্টারকমটা বেজে উঠতেই সুইচ টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্নেলের সেক্রেটারী কেরীর গলা ভেসে এল।

ডার্ক, থরসেন ফাইলটা একবার নিয়ে আসুন।

বিলকে বললাম কি ব্যাপার হঠাৎ ফাইলের খোঁজ পড়ল কেন?

ফাইলটা নিয়ে গ্লেন্ডার কামরায় গিয়ে ফাইলটা টেবিলে রেখে বললাম, একদম আপটু ডেট করা আছে।

গ্লেন্ডা বলল, কর্নেল পার্নেল আগামীকাল সকালে ফিরছেন। ফিরে এসেই উনি এটা দেখতে চাইবেন। তবে তদন্তের কাজও এখানেই শেষ। মিসেস থরসেন একটু আগে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, যে এ কেস নিয়ে উনি আর মাথা ঘামাতে চান না। কাজেই উনি আর টাকাপয়সা

দেবেন না। অতএব থরসেন কেসের কথা ভুলে যান, ডার্ক।

তার মানে এত পরিশ্রম, এত ছোটাছুটি সব মিথ্যে হল। শুধু শুধু সময় নষ্ট?

মিসেস থরসেনের কেসটা নিয়ে আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছি। সময় নষ্ট একথা আমি বলব না।

ব্যাপারটা যখন ভালভাবে দানা পাকিয়ে উঠেছে তখনই কেসটা উনি থামিয়ে দিলেন। যাকগে এবার কি করব? পরের কাজ কি?

সেটা কর্নেল এসে ঠিক করবেন। কাল আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন।

ফিরে এসে বিলকে খবরটা দিতেই সে হতাশ হয়ে বলল, হায় ঈশ্বর!

বাদ দাও। কর্নেল আমাদের নতুন কোন কেস দেবেন। চলো সাতটা কুড়ি বাজে আমরা খেয়ে নিই। আজ আবার লুসিনোয় যাবে নাকি?

চমৎকার! চলো যাওয়া যাক।

টেলিফোন বেজে উঠতে একটু অধৈর্য ভঙ্গিতেই রিসিভারটা তুললাম। বলতে বাধা নেই আমার প্রচণ্ড ক্ষিদেও পেয়েছিল। সেইসঙ্গে থরসেন কেসের তদন্তের অকালে পরিসমাপ্তিতে যেন দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে এই টেলিফোন কল আমার গোটা জীবনধারাকে পাল্টে দিতে যাচ্ছে।

ডার্ক ওয়ালেস বলছি। আপনি কে বলছেন?

ওঃ ডার্ক তুমি! আমি বেটি স্টোয়েল বলছি।

বেটি স্টোয়েল সী-ভিউ হোটেলের তিন নম্বর রিসেপশনিস্ট। সুজির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। বেটি সুন্দর মেয়ে, তার একটি পুরুষবন্ধু আছে। তাকে বিয়ে করে সংসার পাতবার স্বপ্নে দিনরাত বিভোর হয়ে আছে সে।

কিন্তু একি! রিসিভারটা ভাল করে কানে চেপে ধরে শুনলাম বেটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হল বেটি? কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

ওঃ ডার্ক। তোমায় কি করে খবরটা দেব বুঝতে পারছি না।

সুজির কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ—ডার্ক, সুজি...সুজি আর নেই, ও মারা গেছে।

কি বলছ তুমি? সুজি মারা গেছে?

হ্যাঁ।

আমার নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটু চেঁচিয়েই বললাম।

কি হয়েছিল সুজির?

আমায় আর জিজ্ঞেস কোর না ডার্ক। পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে খোঁজ নাও। ওরাই বলে দেবে। বলেই বেটি লাইন ছেড়ে দিল।

আমি দুঃখিত ডার্ক। বেটির সঙ্গে কথাবার্তা কিছু শুনেছি ; বলেই বিল বেরিয়ে গেল।

পুলিশ হেডকোয়াটার্সে জো বিগলারকে ফোন করলাম।

জো, আমি ডার্ক ওয়ালেস বলছি।

ডার্ক, দপ্তর গুছিয়ে বাড়ি যাব। এমন সময় তুমি ফোন করলে। কালকে না হয় একবার ফোন কর।

সুজি লং কিভাবে মারা গেল জো? ওর কি হয়েছিল?

ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

ও আমার বান্ধবী ছিল জো। আমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করতাম।

হা ভগবান, এতো তাহলে খুব দুঃখজনক ব্যাপার।

ও কিভাবে মারা গেল জো?

মিস লং হোটেলে যাবার জন্য সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সেই সময় একটা গাড়ি এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন ওকে জিজ্ঞেস করে ওয়েস্টাবেরী ড্রাইভে যেতে হলে কোন রাস্তা ধরবে। মিস লংয়ের পাশ দিয়ে দুজন মাঝবয়সী মহিলা যাচ্ছিলেন।

লোকটির কথা তাদের কানে যায়। মিস লং কিছু বলার আগেই গাড়ির ভেতর থেকে কেউ অথবা সেই লোকটি তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। তারপর ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। মিস লং দুহাতে মুখ ঢেকে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছিলেন। এমন সময় একটা ট্রাক এসে চাকার নীচে ওর শরীরটাকে পিষে যায়।

সুজির মারা যাবার ঘটনা শুনে আমি কথা বলার ক্ষমতা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেললাম। বিগলার বলল, আমাদের লোকেরা তদন্ত করছে। কিন্তু সন্তোষজনক এখনও কিছু খুঁজে পায়নি। যে দুজন মহিলা সাক্ষীকে পেয়েছি তাঁরা বিশেষ কিছুই বলতে পারেন নি। গাড়িটার রং কি বা তার ভেতরের যে লোকটি মিস লংয়ের সঙ্গে কথা বলছিল তাকে দেখতে কেমন কিছুই বলতে পারছে না। তবে তাদের একজন বলেছেন, যে গাড়ির ড্রাইভার কালো ছিল তিনি নিশ্চিত। আশেপাশের সবাইকে জেরা করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্দেহজনক কেউ শিগগিরই গ্রেপ্তার হবে।

ড্রাইভারটি কালো ছিল। জো বিগলারের এই একটি কথা আমার মাথায় তোলপাড় করতে শুরু করল।

ওকে কোথায় রাখা হয়েছে জো?

বিগলার বলল, আপাততঃ মর্গে। শোন ডার্ক, ব্যাপারটা এখনকার মত ভুলে যাও, তুমি এ নিয়ে আর ভাবতে যেও না। হোটেলের স্টাফ ম্যানেজার মিস লংয়ের মৃতদেহ সনাক্ত করেছেন। আমরা ওর বাবাকে ট্রাঙ্কল করেছি। উনি প্লেনে চেপে রওনা হয়েছেন। আগামীকাল সকালে এসে মেয়েকে কবর দেবেন। আমার কথা শোন ডার্ক, তুমি মর্গে সুজিকে দেখতে যেয়ো না। অ্যাসিডে ওর মুখ ঝলসে গিয়েছিল যা দেখে তুমি সহ্য করতে পারবে না। আর ট্রাকে গোটা শরীরটা এমন থেঁতলে গিয়েছিল দেখা যায় না। তুমি আর ওকে শেষ দেখা দেখতে যেও না।

ধন্যবাদ জো, বলে আমি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। জো ঠিকই বলেছে। সুজির হাসিখুশি সুন্দর মুখখানাই আমার স্মৃতিতে ধরে রাখব। না, ওকে সমাধি দেবার সময় আমি যাব না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অসহায় ভাবে চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই একা অসহ্য ভাবটা আমার মনে এক অদ্ভুত জিঘাংসার জন্ম দিল, আমি মনে মনে সংকল্প করলাম, সুজির এই অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর হয়ে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে গেলাম।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে চাবি দিয়ে দরজা খুলতে যেতেই চোখে পড়ল এক টুকরো কাগজ দরজার গায়ে সেঁটে রয়েছে। তাতে লেখা—

তোমায় হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ভাল করে স্নান করে তারপর ব্যাঙ্কের পাশবুক খুলে দেখলাম আমার অ্যাকাউন্টে বারো হাজার ডলার পড়ে আছে। সুজিকে বিয়ে করে নতুন সংসার পাতব ভেবে ঐ টাকাটা এতদিন ধরে জমিয়েছি। সুজি নেই। এখন তাই নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন ঘুচে গেছে।

একটা স্পোর্টস সার্ট আর লিনেনের ট্রাউজার চাপিয়ে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। গাড়ি পার্ক করে বাইরে বেরিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ পরিষ্কার, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় টুরিস্টরা এসে ভীড় করেছে। দূর থেকে মাছধরা ছোট ছোট মোটর বোটগুলো এসে ভিড়েছে, কৌতূহলবশতঃ তারা সেগুলো দেখছে।

রাত সাড়ে নটা। হাঁটতে হাঁটতে নেপচুন সরাইয়ে গিয়ে ঢুকলাম। এখানে টুরিস্টরা আসে না। সাধারণতঃ স্থানীয় জেলেরাই এখানে খেতে আসে। ঘরের এককোণে একটি টেবিলে বসে আছে অ্যাল বার্নি আমার ইনফর্মার, তার সামনে বীয়ারের বোতল। আমি এগিয়ে তার মুখোমুখি বসতেই সে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আপনার কথাই ভাবছিলাম মিঃ ওয়ালেস। এসেছেন যখন দয়া করে কিছু খেয়ে যান।

এখানকার বার দেখাশোনার ভার যার উপর সেই স্যাম আমার পাশে দাঁড়াল ; সহানুভূতির সুরে বলল, একটা কর্নড বীফ স্যাণ্ডউইচ খান, মিঃ ওয়ালেস, ভাল লাগবে। সেইসঙ্গে আমার

আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

আমি বার্নির দিকে তাকাতেই ও বলল, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস, অ্যাসিড ছোঁড়ার খবরটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে সবাই দুঃখ পেয়েছে। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে সে বলল, আমি কি করতে পারি?

স্যাম একটা স্যান্ডউইচ আর আধগ্লাস স্কচ এনে আমার সামনে রাখল।

মিঃ ওয়ালেস খান, এই বলে চলে গেল।

মিঃ ওয়ালেস, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, বার্নি বলল। যারা আমার উপকার করে তাদের কখনও ভুলিনা। আপনি আমার আর স্যামের কথা ভেবে স্যান্ডউইচটা খান।

স্যান্ডউইচ আর স্কচে চুমুক দিলাম। বার্নি বলল, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?

অ্যাল, আমি বললাম, আগে আমার কিছু খবর দরকার।

খবরটা পেয়েই বুঝেছি আপনি কি ধরনের খবর চান।

লু গেরেন্ডা সম্পর্কে কিছু জানো?

গেরেন্ডা! বার্নি আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে আমার দিকে তাকাল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি কি বলতে চান এতে ও ব্যাটাচ্ছেলেও আছে!

ওর সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?

গেরেন্ডা জো ওয়ালিনস্কির কাছে কাজ করে। বার্নি বলল, জো-র একটি বড় ইয়াট আছে, ওয়ালিনস্কি বাইরে গেলে সে পাহারা দেয়, অন্যসময় ওয়ালিনস্কির গাড়ি চালায়।

তোমার কি মনে হয় হ্যাঙ্ক স্মেডলির সঙ্গে ওর যোগসাজস আছে?

থাকতে পারে, তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়।

জো ওয়ালিনস্কি লোকটা কে!

বার্নি চেয়ারে বসল, আপনি আমায় গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ওয়ালিনস্কি সম্পর্কে কোনরকম কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই।

বার্নির চোখেমুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বার্নি স্যামের দিকে ইঙ্গিত করতেই সে এক প্লেট বিশ্রী দেখতে সসেজ নিয়ে এল। বার্নির সামনে প্লেটটা রেখে আমায় বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি আর কিছু নেবেন? এক কাপ কফি বা আরেকটু স্কচ! আমার কাছে সবই পাবেন।

না, স্যাম ধন্যবাদ। স্যাম এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল।

গোটা তিনেক সসেজ একসঙ্গে মুখে পুরে বার্নি চোখ মুছে বলল, মিঃ ওয়ালেস আমি ওয়ালিনস্কি সম্পর্কে আপনাকে কোনও খবর দিয়েছি এটা যদি জানাজানি হয় তাহলে আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। একদিন ভোরবেলা বন্দরের জলে আমার গলাকাটা লাশটা ভেসে উঠবে।

তুমি যদি কাউকে না বলো, আর আমি যদি না বলি, তবে কে জানছে? জো ওয়ালিনস্কি কে?

আরও তিনটে সসেজ মুখে পুরে বার্নি বলল, ঠিক আছে মিঃ ওয়ালেস আমি সব বলছি। আর কেউ হলে এ ব্যাপারে মুখই খুলতাম না। কিন্তু আপনার জন্য...

জো ওয়ালিনস্কি কে?

ও পূর্ব উপকূলে মাফিয়ার টাকা যোগাড় করে। প্রত্যেক মাসের এক তারিখে ইয়াটে চেপে এখানে আসে। পুরো এক সপ্তাহ এখানে থাকে। ঐ এক সপ্তাহে সে প্রোটেকশনের টাকা, ব্ল্যাকমেলিং এর টাকা, আর ক্যাসিনোগুলোর তোলা আদায় করে। এই হল ওয়ালিনস্কি; এক কাপ বিষের মতই বিপজ্জনক আর মারাত্মক। গোটা ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকা জানে কি ঘটছে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় যে পুলিশ কনস্টেবলরা পাহারা দেয় তারাও সব জানে, কিন্তু কিছুই বলে না। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে রাত তিনটে নাগাদ সবাই যার যার নির্দিষ্ট তোলা নিয়ে যায়। ওয়াটার ফ্রন্টের পুলিশ কনস্টেবলরা ইচ্ছে করেই মুখ বুজে থাকে। ওয়ালিনস্কির সঙ্গে যার কারবার নেই এমন কোন ব্যাটাছেলে ঐ ইয়টের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। একজনও নয়।

ইয়াটটার কি নাম অ্যাল?

হার্মিস, ডানদিকে মাছধরা ট্রলারগুলোর ঠিক পাশেই আছে ওটা।

ওয়ালিনস্কির হয়ে যারা টাকা যোগাড় করে হ্যাঙ্ক স্মেডলি কি তাদের মধ্যে একজন?

আরও তিনটে সসেজ মুখে পুরে ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইল যে আমার অনুমান ঠিক।

আগে কখনও বার্নিকে এত ঘাবড়াতে দেখিনি। ওকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

আমি সত্যিই দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস। কিন্তু আপনি মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবেন না, এটাই আমার অনুরোধ।

আমি ঘাড় নেড়ে কাউন্টারে স্যামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি কি দামটা দিতে পারি?

মিঃ ওয়ালেস, আমিও বার্নির মতই আপনার জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত। না আপনাকে দাম দিতে হবে না। আপনার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

জেটির ধার দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। টুরিস্টেরা রাতের ডিনার খেতে হোটেলে ফিরে আসছে। দুটো পুলিশ কনস্টেবল মাছধরা ট্রলারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় পাহারা দেবার দায়িত্ব এদের ওপর। এরা জো ওয়ালিনস্কির মাফিয়া চক্রের সব খবর রাখে আর এদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য মোটা টাকা দেওয়া হয়। দুটো লোকই বেজায় মোটা, দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাতের লাঠি দোলাচ্ছে।

ছায়ার ভেতরে গা মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি এসে দাঁড়ালাম হার্মিস নামে ইয়াটটির ধারে। লম্বায় তা একশো ফিট হবে। ডেকের ওপরে থাকার মত কেবিন আছে। দেখলে বোঝা যায় একটা বিলাসিতার ছাপ আছে।

একটা তালগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইয়াটের ডেকের দিকে তাকালাম। অস্পষ্টভাবে একটা লোককে ডেকের উপর বসে থাকতে দেখলাম। তার সিগারেটের আগুন দেখতে পাচ্ছি। ইয়াটটির কোথাও আলোর চিহ্নটুকুও নেই। অনুমান করলাম ডেকের ওপরকার লোকটি লু গেরেন্ডা ছাড়া কেউ নয়। একা বসে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে।

সেখানে বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে আমার গাড়ির দিকে ফিরে চললাম। ব্ল্যাক ক্যাসেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেদিকে তাকালাম। নোংরা পাতলা ফিনফিনে পর্দা দিয়ে জানলাগুলো ঢাকা, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। নাচের তালে তালে বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। গাড়িতে উঠে সোজা বাড়ি চলে এলাম।

সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সুজির মিষ্টি মুখখানা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমাদের মধুর মুহূর্তগুলো ছবির মত ভাসতে লাগল আমার মস্তিষ্কের কোষের ভেতর। আমরা ভবিষ্যতকে ঘিরে যে সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম তাও বারবার মনে পড়তে লাগল।

রাত চারটে নাগাদ দুটো ঘুমের বড়ি মুখে পুরে চোখ বুজলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় অফিসে গিয়ে গ্লেন্ডা কেরীর কামরায় ঢুকলাম।

ডার্ক তুমি আসতে দেরী করেছো। কর্নেল তোমার খোঁজ করছিলেন। বলতে বলতে গ্লেন্ডা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার ডার্ক? তোমায় অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? শরীর ঠিক আছে তো?

কর্নেলের সঙ্গে এখন দেখা করা যাবে?

যাও না। ওঁর হাতে এখন কাজের চাপ কম আছে।

কর্নেল পার্নেল তাঁর কামরায় টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন। ষাটের ওপরে বয়স। এই প্রাক্তন সৈনিকটির চেহারা দৈত্যের মত।

খুঁদে খুঁদে দুটি নীল চোখের তীক্ষ্ণ চাউনিতে আমায় দেখতে দেখতে বললেন, সুপ্রভাত ডার্ক, বোস।

আমি চেয়ারে বসতেই কর্নেল বললেন, থরসেন ফাইলটা পড়লাম। কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং

আর তোমরা দুজনে চমৎকার কাজ করেছো। এখন মিসেস থরসেন পিছিয়ে গেছেন তাই আমাদের ঐ প্রসঙ্গে ইতি টানাই ভাল। তোমার আর অ্যান্ডারসনের জন্য খুব ভাল একটা কাজ রেখে দিয়েছি।

শান্তভাবে বললাম, আমার জন্য না কর্নেল আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।

ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিলাম ডার্ক। ভেবেছিলাম তুমি মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। সুজির খবর শুনে সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি ডার্ক। তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আর আমার প্রেমিকার যদি এই অবস্থা হত তাহলে ঐ বেজন্মাগুলোকে আমি উচিত শিক্ষা না দিয়ে শুধু শুধু ছেড়ে দিতাম না।

শান্তভাবে জবাব দিলাম, আমি নিজেও ঠিক তাই করব।

ঠিক। তোমায় চার সপ্তাহের ছুটি দিলাম। তুমি এইসময় ঠিক বেতন পেয়ে যাবে। তুমি ছুটি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অ্যান্ডারসন তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। কেমন ঠিক আছে?

আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ কর্নেল। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এই বদমাশগুলোর বিরুদ্ধে এমন এক যুদ্ধ শুরু করেছি যা আপনি জানতেও চাইবেন না। আমি খুন হয়ে যেতে পারি নয়তো জেলেও যেতে পারি। কাজেই আপনাকে কোনভাবেই জড়ানো চলবে না। উঠে দাঁড়াতেই থরসেন ফাইলটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, শেষবারের মত একটা উপকার করুন কর্নেল। ফাইলটা বগলদাবা করে বললাম, এই ফাইলটা আমার চাই।

তুমি বলতে চাও, সুজির মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার সঙ্গে থরসেন কেসের সম্পর্ক আছে?

সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কর্নেল, সব তথ্য এই ফাইলে নেই। সেগুলো আপনি জানতে চাইবেন না। ধন্যবাদ কর্নেল! আপনার কাছে চাকরী করার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। আমার কাছে তা একটা বিরাট ব্যাপার। তবে এভাবে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত।

কর্নেল চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই ঝামেলা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারো ডার্ক তাহলে জানবে যে এখানে তোমার চাকরী চিরকাল থাকবে।

করমর্দন করতে করতে বললাম, মনে হয় না এই ঝামেলা থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারব। আমি ওদের এমন মোক্ষম জায়গায় ঘা দেব যা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না।

বোকার মত কিছু করে বসো না ডার্ক।

ওদের এমন জায়গায় ঘা দেব যেখানকার ব্যথা চিরকাল থেকে যাবে। তারপর আজ হোক কাল হোক ওরা পাল্টা আঘাত হানবে। আমি আপনাকে আমার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আর বিলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে নতুন কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেয়।

অফিসে ঢুকে বিলকে বললাম, বিল আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। কর্নেল এক্ষুণি তোমায় ডাকবেন, এখন থেকে আমার কাজ তুমিই করবে।

বিল বলল, ভালই হল। আগের মতই দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারব। যাক কর্নেলের কাছে যাবার আগে পদত্যাগ পত্রটা টাইপ করে ফেলি।

তার মানে?

খুব সহজ ব্যাপার, তুমি চাকরী ছেড়ে দিলে আমিও ছেড়ে দেব।

তুমি কেন খামকা চাকরী ছাড়তে যাবে। গাধা কোথাকার! শোন বিল, আমি কোনরকম ঝামেলা বাড়াতে চাই না। এবার তুমি সব কাজ বুঝে নাও।

আমার সেরা বন্ধুর ভাবী বৌয়ের মুখে এখন কেউ অ্যাসিড মারে তখন আমার পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমরা একসঙ্গে চাকরী ছেড়ে ঐ বদমাশগুলোকে একবার দেখে নেব।

না।

আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো। যে কোন মুহূর্তে আমাদের দুজনেরই লাশ পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমরা ওদের নাজেহাল করে ছাড়ব।

চেঁচিয়ে উঠলাম, না বিল। যেচে এইভাবে বিপদের মুখে পা বাড়িয়ো না।

বিলও চেঁচিয়ে উঠলো, ভগবানের দোহাই ডার্ক...। আমার সিদ্ধান্তের কথা তোমায় জানিয়ে দিয়েছি। জেনে রেখো তুমি আমায় সঙ্গে না নিলেও আমি আলাদা ভাবে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা

করব।

বুঝলাম বিল সত্যিই মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাজার বোঝালেও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে ওকে টলানো যাবে না। আর তখনই মনে হল বিলকে সঙ্গে নিলে আমার লাভ বই লোকসান হবে না। একা ঐ শয়তানের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না।

বেশ, এত করে যখন বলছো তখন আমি আর তোমায় বাধা দেব না।

আমাদের দুজনের পদত্যাগপত্র দুটো নিয়ে বিল কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হাসতে হাসতে ফিরে এল। তখন আমি নিজের ব্যক্তিগত জিনিষ গোছাচ্ছি।

বিল বলল, কুছ পরোয়া নেই। কর্নেল প্রথমে আমায় ছাড়তে চাননি, অনেক বুঝিয়ে তাঁকে রাজি করালাম। উনি বললেন যে ঝামেলা মিটিয়ে ফিরে এলে আবার আমাদের চাকরীতে বহাল করবেন।

তোমার টেবিল পরিষ্কার করবে না?

আমার টেবিলে কিছু নেই পরিষ্কার করার মত। বিল বলল, আমার টেবিল পরিষ্কার থাকে। আমার খিদে পেয়েছে। বকবক না করে বাইরে গিয়ে খাওয়া যাক, খেতে খেতে কি করব ঠিক করা যাবে, কি বল?

ঠিক আছে, একবার গ্লেন্ডার কাছে যেতে হবে, ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, তারপর লুসিনোয় খেতে যাব। সাড়ে সাতটা বাজে তবু গ্লেন্ডা বাড়ি যায় নি। কামরায় ঢুকে বললাম, গ্লেন্ডা আমরা তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

ডার্ক, বিল ভেতরে এসো, বলে গ্লেন্ডা উঠে দাঁড়াল। সুজির মৃত্যুতে আমি নিজে কতটা আঘাত পেয়েছি তা বোঝাবার ভাষা জানা নেই। তোমার জায়গায় আমি থাকলে একই সিদ্ধান্ত নিতাম, বলে দুখানা মুখ বন্ধ খাম সে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কর্নেল তোমাদের একমাসের আগাম দিয়েছেন।

গ্লেন্ডা খামদুটো বিলের হাতে দিলেন, যাক সব ভালয় ভালয় মিটে গেলে আশা করছি আবার দেখা হবে।

ধন্যবাদ গ্লেন্ডা। দুজনে গ্লেন্ডার হাতে হাত মিলিয়ে বাইরে এলাম। নিচে এসে সোজা লুসিনোর ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয়। দেখতে পেয়ে লুসিনো ছুটে এল। তারপর একটা টেবিলে বসিয়ে দিল। বসার পর লুসিনো সহানুভূতির সুরে বলল, মিঃ ওয়ালেস সব শুনেছি, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই। লক্ষ্য করলাম লুসিনোর চোখে জল, আবহাওয়া সহজ করতে আলতো করে একটা চাপড় মারলাম।

ধন্যবাদ, তুমি সত্যিই আমার বন্ধু।

লুসিনো বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনার জন্য আজ স্পেশ্যাল মেনু বানাতে দিই, দয়া করে না বলবেন না। আজ আমি আপনাদের দুজনকে আমার নিজের খরচে খাওয়াব।

আমি রাজি না হয়ে পারলাম না, তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল।

বেশ তবে যা করার তাড়াতাড়ি করো। বন্ধুটির ভীষণ খিদে পেয়েছে।

লুসিনো দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে জোর গলায় তার দুজন রাঁধুনিকে স্পেশ্যাল মেনুর ফরমাশ দিল।

দুটো বড় বড় ট্রেতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাজা বড় কাঁকড়া আর একঝুড়ি মুচমুচে রুটি ওয়েটার আমাদের সামনে এনে রাখল। সেইসঙ্গে এক বোতল ঠাণ্ডা সাদা ওয়াইন।

আমি অল্পই খেলাম। বিল গোগ্রাসে চালাচ্ছে, জানি তার পেট না ভরা পর্যন্ত কথাবার্তা শুরু করা যাবে না। বিলের প্লেট খালি হতে আমার প্লেট থেকে কয়েকটা কাঁকড়া আর রুটি ওঁর প্লেটে ঢেলে দিলাম।

প্লেট খালি হতেই বিল বলল, আর কিছু নেই।

অধৈর্যভাবেই বললাম, জানি না। এবার মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমি কিছু টাকা জমিয়েছি। এখন আমাদের দুজনেরই টাকার দরকার হবে। তোমার হাতে জমানো কিছু টাকা কড়ি আছে?

বিল হাসল। ও নিয়ে চিন্তা নেই। আমি পঁচিশ হাজার ডলার আগেভাগেই জমিয়ে রেখেছি।

আমার টাকা তোমার কাজে লাগবে। তোমার টাকা আমার কাজে লাগবে।

এবার ওয়েটার এসে কিছু স্কচ আর দুটো বড় সমুদ্রের গলদা চিংড়ি আর সেইসঙ্গে একগাদা ফ্রেঞ্চফ্রাই আমাদের প্লেটে দিয়ে গেল।

বিল তার প্লেটখানা সামনে টেনে নিয়ে বলল, বাঃ। একেই বলে ডিনার। সত্যিই ডার্ক, তোমার বন্ধুভাগ্য দেখলে হিংসে হয়।

লাইস পাই আর কফি দিয়ে আমাদের স্পেশ্যাল মেনু ডিনার শেষ হল। এবার অ্যাল বার্নির কাছ থেকে যা যা জেনেছি সব বিলকে খুলে বললাম।

বিল ভাল করে ভেবে দ্যাখো আমরা মাফিয়াদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি। এর পরিণতি যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। ইচ্ছে করলে এখনও পিছিয়ে যেতে পারো।

মাফিয়া তাই না?

ঠিক তাই।

শোন ডার্ক। অ্যাসিড কেসটা নিয়ে ভাবতেই কথাটা আমার মাথায় এসেছিল। আমিও মাফিয়াদের গন্ধ পেয়েছিলাম। তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। দুজনে মিলে ওদের শায়েস্তা করা যাবে। তুমি যদি শুধু আমায় বলে দাও কি করতে হবে।

কিন্তু পরিণামটা একবার ভেবেছো? ধরো যদি দুজনেই খুন হয়ে যাই তাহলে?

বিল একটু ভেবে বলল, তাতে কি? একবারের বেশি দুবার তো মরব না। আমাদের প্রথম কাজ কি?

সবসময় দুজনকে একসঙ্গে থাকতে হবে একসঙ্গে কাজ করতে হলে। তোমার জিনিসপত্তর যা আছে সব নিয়ে এক্ষুণি আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। চাবিটা বের করে টেবিলে রাখলাম। আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

তুমি এক্ষুণি সব নিয়ে এসো, পরে কথা হবে। ডিনারের জন্য লুসিনোকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে সোজা হাজির হলাম থরসেনের বাড়িতে। গোটা বাড়ি অন্ধকার। শুধু জোশ স্মেডলির ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে।

গেটের বাইরে গাড়ি রেখে হেঁটে সদর দরজায় গিয়ে তিনবার ঘন্টা বাজাতেই দরজা খুলল। জোশ স্মেডলি ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকাল।

মিঃ ওয়ালেস? দুঃখিত, মিসেস থরসেন বাড়িতে নেই, উনি অপেরায় গেছেন।

আমি একরকম জোর করেই ভেতরে ঢুকে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, মিসেস থরসেন নয় জোশ। তোমাকেই আমার দরকার। তোমার ঘরে চলো।

ভক ভক করে জোশের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, তার পা টলছে। কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই সে আমায় তার ঘরে নিয়ে গেল।

টেবিলের ওপরে গ্লাস আর এক বোতল স্কচ হুইস্কি। বোতল থেকে তার গ্লাসে কিছুটা স্কচ ঢেলে বললাম, জোশ এবার কিন্তু তোমায় সত্যি কথা বলতেই হবে। তোমার ছেলে হ্যাংক কিন্তু সত্যিই বিপদে পড়েছে।

সে কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে, আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ ওয়ালেস।

তুমি কি জানো যে ও মাফিয়াদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

কান্নার গলায় বলল, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস, কিছুদিন আগে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। আমি ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। আমি জানি ও ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে।

পড়তে যাচ্ছে না জোশ। ইতিমধ্যে ও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো যে অ্যাঞ্জি নিজেও মাফিয়াদের দলে ভিড়েছে।

জোশ ঘাড় নেড়ে বলল, আমিও কথাটা শুনেছি। উনি হ্যাংকদের একজন খদ্দের। সে কথাও আমি জানি।

খদ্দের মানে? ব্ল্যাকমেলের খদ্দের?

জোশ শিউরে উঠে বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই মিঃ ওয়ালেস, মাফিয়ারা সাংঘাতিক লোক ওদের

নিয়ে কেউ ঘাঁটায় না।

মিস থরসেনকে ওরা কেন ব্ল্যাকমেল করছে?

আমি জানি না। জানতেও চাই না।

হ্যাংক জানে?

আমি বলতে পারব না। ও শুধু টাকা যোগাড় করে ওদের হাতে তুলে দেয়।

মিসেস থরসেন আমায় কেন ভাড়া করেছিলেন জানো? ওর মেয়েকে কে ব্ল্যাকমেল করছে তাকে খুঁজে বের করতে। উনি এখন আর তদন্ত চালাতে চাইছেন না। এর কারণ কি তা তুমি জানো?

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে জোশ ভাবলেশহীন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গলা চড়িয়ে বললাম, কারণটা কি?

জোশ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, একটা লোক মিসেস থরসেনকে টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছিল। আমি এক্সটেনসান রিসিভারে ওর হুমকি শুনেছিলাম। লোকটা মিসেস থরসেনকে বলছিল যে তদন্ত না থামালে সে এই বাড়ি পুড়িয়ে দেবে।

সেই লোকটা কে?

কে আর? মাফিয়াদের লোক। ওদের সবারই গলার আওয়াজ একরকম। কানে গেলে লোকের পিলে চমকে যায়। মিসেস থরসেন উত্তরে কিছু বলেননি। রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলেন, এর চাইতে বেশি কিছু জানি না।

কিন্তু তুমি এটা নিশ্চয়ই জানো যে ধরা পড়লে ব্ল্যাকমেলের টাকা আদায়কারী হিসেবে হ্যাংকের কম করে পনেরো বছর জেল হবে—তাই না?

পনেরো বছর?

পনেরো বছর জোশ। তার কম নয়।

আমি হ্যাংককে হুঁশিয়ার করেছিলাম কিন্তু ও হেসে উড়িয়ে দিল। আমি আর কি করতে পারি মিঃ ওয়ালেস?

মিস থরসেনকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে তা তুমি সত্যিই জানো না?

জানলে আপনাকে ঠিকই বলতাম। আমি সত্যিই জানি না।

টেরি থরসেন কোথায় আছে তুমি জানো? তিনবার বলার পর জোশ ঘাড় নাড়ল।

ওর কোনও খবর আমি পাইনি, মিঃ ওয়ালেস।

আজ যাচ্ছি জোশ। কিন্তু শিগগীরই হয়তো আবার তোমার কাছে আসতে হবে। বলেই বেরিয়ে গেলাম।

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় গাড়ি চালিয়ে এলাম। এখানে পাশাপাশি অনেক স্টলে নানারকম পশরা সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় দরিদ্র বাসিন্দারা। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা স্টলের সামনে দাঁড়ালাম। স্টলের মালিকটি জাতে আরবীয় নয়তো প্যালেস্তানীয় হতে পারে। আসলে ওদের চেহারার ফারাক আমি বুঝতে পারি না। নোনা মাংস থেকে শুরু করে হরেক রকমের পুরোনো জিনিস সে বেচে টুরিস্টদের কাছে।

আমি যতদূর জানি লোকটার নাম আলি হাসান। পুরোনো জিনিস বোঝাই একটা তাকের পেছনে মেঝের ওপরে বসে সে চুরুট টানছিল। পাশেই তার ভীষণ মোটা বউ বসেছিল। যাকে দেখলেই বড় বড় গ্যাস বেলুনের কথা মনে পড়ে যায়।

মোটা আলি হাসান ঢোলা আরবী জোব্বা পরে মাথায় আরবী বিড়ে চাপিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে দু একটি টুরিস্ট এসে এটা ওটা দরাদরি করছে। আমি বললাম, মিঃ হাসান, আমার নাম জো, আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু ব্যবসায়িক কথা বলতে চাই। দয়া করে একবার বাইরে আসবেন?

হাসান বলল, ব্যবসার গন্ধ পেলে আমি একপায়ে খাড়া, চলুন। কোথায় গিয়ে বসবেন?

হাসানের ছোট ছোট দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে সে নিশ্চয়ই মোটা দাঁও মারবার মতলব ভাঁজছে।

আমার গাড়িতে হাসানকে তুললাম। তার গায়ের বোঁটকা গন্ধ অসহ্য লাগায় সবকটা জানলার

কাঁচ নামিয়ে দিলাম।

মিঃ হাসান, নষ্ট করার মত সময় আপনার বা আমার হাতে নেই। আমার কাছে খবর আছে আপনি ভাল বোমা বানাতে পারেন। আমার একটা বোমা দরকার। আমি আপনাকে ভাল টাকা দেব। এখন বলুন বানিয়ে দিতে পারবেন কিনা?

চুরুট টানতে টানতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ভাল বোমা বানাতে পারি এ খবর আপনাকে কে দিল?

আপনার তা দিয়ে তো দরকার নেই। আমার বোমা দরকার, যদি না দিতে পারেন তো সাফ বলুন। আমি অন্য কোথাও খোঁজ করব।

কি ধরনের বোমা দরকার?

এমন ধরনের বোমা যা ফাটলে প্রচুর ক্ষতি হবে, কিন্তু আগুন লাগবে না।

আলি হাসান জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ ওয়াটার ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তেমন বোমা বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনি কত দেবেন?

আপনি কত নেন?

যা ফাটলে আগুন লাগবে না অথচ প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হবে এমন একটা ছোট্ট বোমা বানাতে পুরো তিন হাজার ডলার খরচ পড়বে।

আধঘণ্টা দরাদরি করে শেষপর্যন্ত আড়াই হাজার ডলার রফা হল।

ঠিক আছে মিঃ জো। আগামীকাল রাতে এইসময় আমার স্টলে এলেই মাল পেয়ে যাবেন কোনও চিন্তা নেই জোর আওয়াজ হবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে কিন্তু আগুন লাগবে না। এমন জিনিস চাইছেন তো? ও আমি বানিয়ে দেব। এখন কিছু আগাম দিন।

ওয়ালেট খুলে তাকে পাঁচশো ডলার দিলাম। টাকাটা সে আলখাল্লার মধ্যে গুঁজে রাখতে আমি বললাম, মিঃ হাসান বোমা বানানোয় আপনার সুনাম আছে জানি। দেখবেন সেই সুনাম যেন নষ্ট করবেন না। যদি করেন তাহলে আপনি কিন্তু বাঁচবেন না। আপনার জীবনের বাকি দিনগুলোর কিন্তু বারোটা বাজিয়ে দেব।

আপনি একদম ভাববেন না মিঃ জো, হাসান হাসল, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আমার কথা শুনে ওর বেশ অস্বস্তি শুরু হয়েছে। আর কিছু বললাম না, হাসান গাড়ি চালিয়ে ওর স্টলে ঢুকল

ওর বোঁটকা গন্ধটা দূর করতে গাড়ির ভেতরকার এয়ার কন্ডিশনারটা চালিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হলো আগামীকাল ব্ল্যাক ক্যাসেটের ব্যবসা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রতিশোধের এটাই হবে প্রথম ধাপ। কিন্তু যাই করি সুজির সেই উজ্জ্বল হাসি আর আমি দেখতে পাব না।

।। ছয় ।।

রাত এগারোটায় অ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছলাম। কলিংবেল বাজাতে বিল দরজা খুলে দিল। দেখলাম ও নিজের মালপত্র সব নিয়ে এসেছে।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জোশ স্মেডলির কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি সব বললাম।

মাফিয়াদের হুমকিতে ভয় পেয়েই মিসেস থরসেন তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। টেরির কোন খোঁজ পেলাম না। এখন হাতের সামনে পাচ্ছি শুধু হ্যাংককে। বোমা বানানোর জন্য নগদ পাঁচশো ডলার আমি আলি হাসানকে দিয়ে এসেছি।

হ্যাংকের বারোটা বাজিয়ে দেব এটুকু জেনো। বোমা মেরে আমি ওর নাইট ক্লাব গুঁড়িয়ে দেব। ওর গাড়িটা তছনছ করব তারপর ওর বাড়িটাও ভেঙ্গে দেব। ওর জীবনের সবটুকু শান্তি আমি ছিনিয়ে নেব। এখন একটা কথা আমাদের দুজনকেই মনে রাখতে হবে যে আমি ওর পেছনে লেগেছি এটা যেন হ্যাংক টের না পায়। ও টের পেলে ওর মাফিয়া দোস্তদের আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে। তাহলে আমরা সত্যিই মুশকিলে পড়ে যাব। কথাটা মনে রেখো বিল।

আমার কথাটা তার মনে ধরেছে মনে হল। আমার মাথায় একটা মতলব এল। রান্নাঘরে ঢুকে

অনেক খুঁজে একটুকরো কার্ডবোর্ড পেলাম। ফেল্ট পেন দিয়ে তাতে গোটা গোটা হরফে লিখলামঃ

কালোদের এখানে কেউ চায় না ঃ
ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যান

বিলকে কার্ডবোর্ডের টুকরোটা দেখিয়ে বললাম, এটা ওদের নাইট ক্লাবের দরজায় ঝুলিয়ে দেব। তাহলে ধরে নেবে যে আমি নই। কালোদের যারা দেখতে পারে না সেই ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যানের গুন্ডারাই ওর পেছনে লেগেছে। ওর গাড়ি ভেঙ্গে চুরে সেখানেও ওদের নাম লিখে আসব। তাহলে আমাদের আর সন্দেহ করতে পারবে না।

বিল বলল, বুঝতে পেরেছি।

তবে এটাও ঠিক যে মাফিয়াদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারব না। আজ হোক কাল হোক ওরা আমায় জানতে পারবে তখন ওরা আমায় মারবার তালে থাকবে। সেজন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। একবার খেলায় নামলে এরপর আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে। দেবার মত আমার জায়গা জানা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কেমন বিল, রাজি আছো তো?

তুমি রাজি থাকলে আমার আর বলবার কিছু নেই।

তাহলে তুমি অন্ততঃ এই বোমার ব্যাপারটা থেকে তফাতে থাকো, বিল। এটা আমায় একা করতে দাও।

একদম নয়। তুমি যখন যেখানে যাবে আমিও ছায়ার মত সেখানে গিয়ে হাজির হব।

তোমাকে আমার দরকার নেই। এটা একজনের কাজ।

যে কোন কাজ দুজন হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায়, বলে বিল তার শোবার ঘরে ঢুকল। বাথরুমে স্নান সেরে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আমার পাশে রাখা বালিশের ওপর হাত রাখলাম। সুজি এই বালিশের ওপর মাথা রেখে আমায় আদরে আদরে ভরিয়ে তুলেছে, কত রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। পরমুহূর্তে কান্নার একটা বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠল। সুজির মুখে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে রাস্তার ওপর ছোটাছুটি করছে। দুহাত মুখে ঢাকা থাকায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সেই সময় এক বিশাল দৈত্যের মত ট্রাক ব্রেক কষতে না পেরে ওর ঘাড়ে এসে পড়ল। তার নরম শরীর নিমেষে পিষে গেল। সেই দৃশ্য কল্পনা করায় আমার রাতের ঘুম বিদায় নিল। সারারাত জেগে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই অতীতের দিনগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম।

সারারাত জেগে ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে মাত্র একঘণ্টা ঘুমোলাম। কিন্তু তারই মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা বিশাল গরিলার সঙ্গে আমি লড়াই করছি। গরিলার মুখোমুখি হতেই দেখলাম সেটা হ্যাংক। তার গায়ে গরিলার চামড়া। তার বীভৎস মুখটা আমার কাছে এগিয়ে আসতেই ভয়াল আতঙ্কে জেগে উঠলাম। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে দেখলাম। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দাড়ি কামালাম, তারপর স্নান সেরে বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম।

বাইরে এসে দেখি বিল টোস্টে জ্যাম মাখিয়ে দুজনের ব্রেকফাস্ট তৈরী করেছে সঙ্গে দুকাপ কফি। দুজনে চুপচাপ ব্রেকফাস্ট সারলাম।

আর চুপ করে থাকতে পারল না বিল। তাহলে হ্যাংককে টিট করার পর কি করবে ভেবেছো?

জানি না বিল, এই ব্যাপারটা শেষ না করে কিছুই ভাবতে পারছি না।

বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার নিজের করার মত কি কিছুই নেই?

অধৈর্য ভাবে বললাম, ভগবান জানেন। তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছো। তোমায় আমার সঙ্গেই থাকতে হবে।

ঠিক আছে। আমি বাইরেটা একবার দেখে আসব। লাঞ্চ না হয় আজ এখানেই খাব। কি করবে বল?

রাত হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।

গাড়িটা নিতে পারি?

নিশ্চয়ই। আমি এখানেই থাকব। রাত তিনটেয় ওর গুদামের ঝাঁপ পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে।

অত ভেবো না ডার্ক। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবার চেষ্টা করো। বলে বিল চলে গেল।

এঁটো কাপপ্লেট ধুয়ে টেবিলটা সাফ করলাম। বড় ফোঁড়া পাকা ধরলে যেমন যন্ত্রণা হয় আমি ভেতরে ভেতরে তেমন যন্ত্রণা অনুভব করছি। ফোঁড়াটার নাম হ্যাংক স্মেডলি। সিগারেট খেতে খেতে সুজির কথা ভাবতে ভাবতে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। দুপুর একটা নাগাদ বিল ফিরে এল।

দুটো স্টেক কিনে এনেছি, বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। আমার কিন্তু খাবারের কোন উৎসাহ নেই।

দুটো প্লেটে দুটো স্টেক এনে বিল টেবিলে রাখল। আমরা বাদামী পাউরুটি দিয়ে সেগুলো শেষ করলাম।

বিল বলল, আমি ওয়াটার ফ্রন্টে গেছিলাম। রাত আড়াইটেয় হ্যাংকের নাইট ক্লাব ভেঙ্গে যায়। সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়। আমরা যখন ওখানে পৌঁছাবো তখন ধারে কাছে কেউ থাকছে না।

চমৎকার কাজ করেছো বিল, আধ খাওয়া স্টেকটা সরিয়ে রেখে বললাম। চমৎকার। তাহলে দুটো নাগাদ ওখানে গিয়ে কাজ করতে হবে। আমায় ভেতরে যেতে হবে তার ওপর ওয়াটার ফ্রন্টের কনস্টেবল দুজনের যাতে নজরে না পড়ি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিল জোর গলায় বলল, আমরা ওখানে যাব ডার্ক।

যাবার যখন সত্যিই ইচ্ছে তখন চলো। তোমার কাজে লাগবে।

ডার্ক তোমার মাথায় নিশ্চয়ই সব জট পাকিয়ে আছে। তাই না?

এই কালো বেজম্মাটাকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত সুস্থির হতে পারছি না। ওকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু ওকে আমি খুন করবো না, ওকে এমন শিক্ষা দেব যার কথা ও জীবনে ভুলবে না।

জানি সেকথা, তুমি আগেও আমায় তা বলেছো। তুমি বোমা মেরে ব্ল্যাক ক্যাসেট উড়িয়ে দেবে। খুব ভাল কথা কিন্তু হ্যাংককে শায়েস্তা করার পর কি করবে?

সে নিয়ে ভাববার মত যথেষ্ট সময় আছে। এখন বেরোচ্ছি। পরে দেখা হবে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই আমি হেঁটে সোজা পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে গেলাম। ডেস্ক সার্জেন্ট চার্লি ট্যানার আমার পরিচিত। তাকে বললাম যে সার্জেন্ট জো বিগলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

চার্লি বলল, আমি সব শুনেছি ডার্ক। সত্যিই আমি দুঃখিত। সোজা ওপরে চলে যান। জো ঐখানেই আছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে জো আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। বুঝলাম ও সহানুভূতি জানাতে চাইছে। কিন্তু এই সহানুভূতি আমার ভেতরের জ্বালাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

কোনও খবর আছে জো?

আছে। কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু নয়। একজন সাক্ষী যে গোটা ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ও গাড়িটার নম্বরও নিয়েছিল। আমরা সেই নম্বর ধরে খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম ওটা চোরাই গাড়ি। দুটো লোকেরই হাতে দস্তানা ছিল। কাজেই গাড়ির ভেতর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। গাড়ি যে চালাচ্ছিল সে কালো এটুকুই শুধু জেনেছি। তবে আমরা এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।

ড্রাইভার কালো ছিল এ সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী নিশ্চিত?

হ্যাঁ, সে শপথ করে তাই বলেছে।

তোমরা যথেষ্ট করেছো। যাক, আর তোমার সময় নষ্ট করবো না। বলেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে আমিও নিশ্চিত হলাম যে হ্যাংক ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত।

হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। হ্যাংক নিশ্চয়ই তার নাইট ক্লাবের নরকগুলজারের জন্য তৈরী হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে আমি ওয়ালিনস্কির ইয়াটটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনেক টুরিস্টকে দেখলাম প্লাস্টিকের মাকিন্টস গায়ে জড়িয়ে আমার মতই সেই দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের ভীড়ে মিশে গেলাম।

ইয়াটের ডেকের ওপর লু গেরাডা পায়চারী করছে আর মাঝে মাঝে টুরিস্টদের লক্ষ্য করে

গালি গালাজ করছে। মনে মনে বললাম হ্যাংককে শায়েস্তা করার পর এই ইয়াটটা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ছোট মাইন হলেই হবে। আলি হাসান সেটা যোগাড় করে দেবে। মোটা টাকা দিলে ও সবকিছুই দিতে পারবে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসে দেখি বিল বেরিয়েছে। হাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। ভাবতে লাগলাম আজ রাতে আমার আঘাত হানার পালা। পাল্টা আঘাত।

বিল রাত আটটায় ফিরল। তার এক হাতে একটা ব্যাগ আরেক হাতে একটা প্লাস্টিকের থলে।

ব্যাগ আর থলে নামিয়ে বিল বলল, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নিই, বলেই ও রান্নাঘরে ঢুকল। আমারও খিদে পেয়েছে। তবে সে খিদেটা পেটে নয় সর্বশরীরে। বদলা নেবার খিদেয় আমি জ্বলছি।

বিল দুটো প্লেটে নরম হ্যামবার্গার এনে টেবিলে রেখে বলল, চলে এসো ডার্ক, ভেবে ভেবে মাথাটা খারাপ কোর না।

হ্যামবার্গার মুখে পুরে বললাম, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বাইরে ঘুরছিলাম। শোন ডার্ক, আগে চলো হ্যাংককে শায়েস্তা করি তাহলে হয়তো তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।

তোমার ব্যাগে কি আছে?

বাঃ! হ্যাংকের নাইট ক্লাবে ঢুকতে হবে না? ওখানকার কাজ সেরে ওর গাড়িটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে হবে না ব্যাগের ভেতর সেইসব সরঞ্জাম আছে।

হ্যামবার্গার শেষ করে বললাম, বিগলারের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি বটে কিন্তু একজন সাক্ষী ওরা খুঁজে বার করেছে। সে লোকটা বলছে যে গাড়ির ড্রাইভার কালো ছিল।

সে আমরা কম বেশি সবাই জানি, বলে বিল রান্নাঘরে গিয়ে আরও দুটো হ্যামবার্গার নিয়ে এল। দেখি আটটা পঁয়ত্রিশ বাজে। সময় কিভাবে কেটে যায়।

খাওয়া শেষ হলে সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম।

নটা নাগাদ বিলকে বললাম বিল, আগে চলো বোমাটা যোগাড় করি।

আমি তো একপায়ে খাঁড়া আছি। আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই।

বিলকে গাড়িতে বসিয়ে হাসানের পুরোনো মালের দোকানে গেলাম। হাসান আমাকে দেখেই এগিয়ে এল।

চাপা গলায় বললাম, ওটা তৈরী করা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মিঃ জো। চমৎকার মাল বানিয়েছি। ঝেড়ে আরাম পাবেন। আপনার প্রত্যেকটা ডলার উসুল হয়ে যাবে।

তাহলে ওটা নিয়ে আসুন। আপনার দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।

এক্ষুণি আনছি মিঃ জো। ভাল করে শুনুন, ওটার মাথায় একটা সুইচ আছে সেটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলেই দশ মিনিটের মধ্যেই পুরো মালটা ফেটে যাবে। যতক্ষণ সুইচ না ধরছেন ততক্ষণ কোন ভয়ও নেই। সুইচ ঘুরিয়ে ওটা ফেলে দিতেও পারেন।

একটু আড়ালে গিয়ে বাকি টাকাটা হাসানকে দিলাম। সে সেগুলো গুণে কোমরে গুঁজল, তারপর স্টলের ভেতর থেকে একটা ছোট প্ল্যাস্টিকের থলে এনে আমাকে দিল। এই নিন। মাথার সুইচটা ডানদিকে ঘুরিয়ে দিয়েই দূরে সরে যাবেন। দশমিনিটের ভেতর ভীষণ জোরে আওয়াজ হবে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও হবে।

আমার আর একটা জিনিস দরকার। একটা মাল আমার দরকার যা একশো ফিট লম্বা একটা ইয়াটকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আপনার হাতে তেমন কিছু আছে?

এতে একটু বেশি খরচ পড়বে মিঃ জো। আমি ব্যবস্থা করতে পারি কিন্তু আমার একজন মেরিন সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। লোকটা একটু বেশি দর হাঁকে।

আপনি যোগাড় করতে পারবেন কিনা তাই বলুন?

টাকা পেলে সবকিছুই যোগাড় করা যাবে।

পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বলে আমি থলে হাতে করে গাড়িতে উঠলাম। পেছনের সীটে থলেটা রেখে স্টার্ট দিতেই বিল বলল, ঐ বুঝি সেই মাল?

হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

মাঝপথে ফাটবে না তো?

আরে না, সেই ভয় নেই।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে বিলকে বললাম এখনও পাঁচঘণ্টা সময় আছে। একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

নিশ্চয়ই, বলে বিল রান্নাঘরে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল দু কাপ কফি নিয়ে। আমার সামনে একটা কাপ রেখে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, বেরোবার আগে ডেকো কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে আমি কফির কাপে চুমুক দিলাম। রাত পৌনে দুটোয় বিলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললাম, ওঠো, সময় হয়েছে। আর দেরী করে লাভ নেই।

বোমা সমেত প্ল্যাস্টিকের থলে আর ক্লু ক্লুক্স লেখা নোটিশটা সঙ্গে নিয়ে বিল আর আমি গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় এসে হাজির হলাম। বৃষ্টি পড়ছে, ধারে কাছে লোকজন নেই। টুরিস্টরাও বহুক্ষণ আগে হোটেলে ফিরে গেছে। সেই কনস্টেবল দুটোকেও দেখতে পাচ্ছিনা। ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবের একশো গজ দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে পা টিপে টিপে নাইট ক্লাবের পেছনের দিকে এগোলাম। একটা জানলা খোলা দেখে ভেতরে উঁকি দিলাম। এটা রান্নাঘর। ভেতরে একটা কালো তার নোংরা অ্যাপ্রন খুলে রাখছে। আর একটা মনের সুখে একটা হট ডগ চিবোচ্ছে। আমি ফিরে এসে গাড়িতে ঢুকলাম।

যাক ভেতরে ঢোকার কোন অসুবিধে হবে না। পেছনে রান্নাঘরে একটা জানলা আছে।

রাত আড়াইটে নাগাদ ক্লাবের সব আলো নিভে গেল। হৈ-হৈ করতে করতে প্রায় গোটা ত্রিশেক কালো ছেলে মেয়ে নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটতে লাগল।

আরও আধঘণ্টা বাদে হ্যাংক স্মেডলি তার বিশাল গরিলার মত শরীরটা নিয়ে নাইট ক্লাব থেকে বেরোল। তার পাশে আরও একজন লোক সে কিন্তু কালো নয়। তার গায়ের রং বেশ সাদা। দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। লোকটার গায়ে সাদা রংয়ের জ্যাকেট আর মাথায় চওড়া কান ঢাকা দেওয়া টুপি। হ্যাংক নিজের হাতে নাইট ক্লাবের দরজায় তালা লাগাল তারপর সাদা লোকটিকে নিয়ে সামনে দাঁড় করানো ওল্ডসমোবাইলের দরজা খুলে ভেতরে বসল। তারপর গাড়ি চালিয়ে নিমেষের মধ্যে তারা অদৃশ্য হল।

বিল বলল, টুপিপরা লোকটা কে বলো তো? ওর গায়ের রং সাদা কিন্তু হ্যাংকের নাইটক্লাবে তো সাদাদের ঢোকার নিয়ম নেই।

আমার জেনেও কোনও দরকার নেই বিল। চলে এসো, নষ্ট করার মত আর এক মুহূর্তও সময় নেই আমার।

বিলের হাতে একটা বড় কাঁচভাঙ্গা রবারের হাতুড়ী। নাইট ক্লাবের পিছনে গিয়ে সেই হাতুড়ীর এক ঘা রান্নাঘরের জানলার পাল্লায় মারতেই একখানা কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল। সেই ভাঙ্গা পাল্লার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলল। তারপর খোলা জানালাপথে দুজনে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটা জোরালো টর্চলাইট ছিল। সেটা জ্বালিয়ে বিলকে বললাম, আমি বোমাটার ব্যবস্থা করছি। তুমি ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যান লেখা নোটিসটা নিয়ে সদর দরজায় এঁটে দিয়ে এসো।

বিল সদর দরজায় এগোলো, আমি রিভলবার বের করে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখলাম ভেতরে কেউ আছে কিনা। তারপর বারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোমার সুইচটা ডানদিকে ঘুরিয়ে সেটা একটা টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে টপকে দৌড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বিল আগেই গাড়িতে বসেছিল, আমায় দেখেই বলল, ডার্ক আমরা ঠিক দূরত্বে আছি তো?

তাই তো মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, দৃশ্যটা কেমন জমে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে ঘাড় ফিরিয়ে নাইট ক্লাবের দিকে তাকালাম। আর মনে মনে সেকেণ্ড গুনতে লাগলাম। সুজির মৃত্যুর বদলা নেবার এই হল প্রথম ধাপ। এক...দুই......তিন...চার...

দশ মিনিট একসময় পেরিয়ে গেল। কিছুই হল না। বিল বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যাৎ ওটা বোমা না কচু। একগাদা পয়সা নিয়ে তোমার হাতে একটা বাচ্চাদের খেলনা ধরিয়ে দিয়েছে।

দাঁড়াও চুপ! এত অধৈর্য হয়ো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ করে বোমাটা ফাটল। তার ধাক্কায় আমাদের গাড়িটাও কেঁপে উঠলো।

নাইট ক্লাবের সামনের জানলাগুলো ভেঙ্গে ছিটকে পড়ল ওয়াটার ফ্রন্টের রাস্তার ওপর। ছাদখানাও ভেঙ্গে খসে পড়ল। আরও শব্দে নাইট ক্লাবের ভেতরের দেওয়ালের কড়ি বরগা সব খসে পড়তে লাগল।

আমার চাওয়ার চাইতেও কিছুটা বেশিই ঘটল। এবার দমকল পুলিশ সব ছুটে আসবে। আর দাঁড়ানো উচিত নয়। ভেবে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম।

বিল বলল, নাঃ, বোমাটা সত্যিই ভাল জাতের। ব্ল্যাক নাইট ক্লাবের ব্যবসার বারোটা বাজল। এবার কি করবে?

হ্যাংকের গাড়ি কোন্ গ্যারেজে থাকে জানো?

নিশ্চয়ই।

তাহলে চলো এবার ওর গাড়িটা ভেঙ্গে দিয়ে আসি।

বিলের নির্দেশমত সীগ্রোভ রোডে পৌঁছে মাটির নীচে একটা গ্যারেজে ঢুকলাম। দুজনের হাতেই দুটো বড় হাতুড়ী। কেউ কোথাও নেই দেখে দুজনে একসঙ্গে হ্যাংকের ওল্ডসমোবাইল গাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি গাড়িটার জানালার দরজার কাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়ো করলাম আর বিল মোটর ও ইঞ্জিন ভাঙ্গল।

তারপর চারটে টায়ার ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে গাড়ির দরজার গায়ে লিখে দিলাম। কে কে কে—ক্লু ক্লক্স ক্যান।

এবার ফিরে এসে গাড়িতে বসে স্টার্ট দিতেই বিল বলল, কি এবার মন ভরেছে?

হ্যাঁ, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারব। ধন্যবাদ বিল।

সুজি মারা যাবার পর সত্যিই এই প্রথম আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান সারতে সারতে সোয়া এগারটা বেজে গেল।

বিল দুটো ডিম সেদ্ধ শেষ করে আরেকটা মুখে পুরতে পুরতে বলল, যাক, একটা আপদ বিদেয় হয়েছে।

তাইতো মনে হচ্ছে। হ্যাংক গাড়িটা ড্রাইভ করেছিল ঠিকই কিন্তু সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়েছিল অন্য লোক। সে ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

খাওয়া শেষ করে বিলকে নিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। ব্ল্যাক ক্যাসেটের একশো গজের ভেতর পুলিশের কর্ডন, চারপাশে লোকের ভীড়। ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবের দিকে তাকিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। দেখে মনে হয় বোমারু বিমান থেকে তার ওপর বোমা ফেলেছে। একপাশে একখানা দেওয়াল ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। দমকলের লোকেরা জঞ্জাল পরিষ্কার করছে। ভীড়ের ভেতর হঠাৎ চোখে পড়ল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর টম লেপস্কি দমকলের একজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছে। বিলকে গাড়িতে রেখে আমি লেপস্কির দিকে এগিয়ে গেলাম।

যে দুটো কনস্টেবল পাহারা দেয় একজন এগোতেই আমি লেপস্কির নাম ধরে ডাকলাম, অ্যাই টম! লেপস্কি আমার গলা শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে হাত নাড়তেই কনস্টেবল সরে গেল।

লেপস্কি নাইট ক্লাবের ভাঙ্গা দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে, দেখ কাণ্ড, এমন কাণ্ড এর আগে কখনও এখানে ঘটে নি।

ভেতরের খুশি ভাব গোপন রেখে বললাম, বোমা মেরে মনে হয় কেউ এটা করেছে।

লেপস্কি মুচকি হেসে বলল, ঠিক তাই। শালাদের বড্ড বাড় বেড়েছিল। একটু উচিত শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিল, যেই করে থাকুক কাজের কাজ করেছে।

ভুরু কুঁচকে বললাম, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আড়চোখে দেখলাম লেপস্কি তীক্ষ্নচোখে আমাকে বোঝবার চেষ্টা করছে।

লেপস্কি বলল, দরজায় ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যানের একটা নোটিশ আঁটা ছিল। কিন্তু ওটা যে পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আসলে এমন কেউ বোমাটা মেরেছে হ্যাংক স্মেডলির ওপর যার চাপা রাগ ছিল।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক। স্মেডলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

নিশ্চয়ই তাছাড়া শুধু এটাই নয়। সে ব্যাটা হ্যাংকের গাড়িখানাও ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিয়েছে। স্মেডলির শুধু পাগল হতে বাকি। বারবার আমাদের দপ্তরে গিয়ে চিৎকার করে বলছে, আমি জানতে চাই আপনারা আসল লোককে ধরবেন কিনা। আমরা আমাদের কাজ ঠিকই করে যাব। তবে ওর কথায় কিছু আসবে যাবে না। এটা ওর পাওনা ছিল। লেপস্কি আমার দিকে পুলিশি চোখে তাকিয়ে, ডার্ক, শুনলাম তুমি এজেন্সীর চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছো?

হ্যাঁ, সুজির ব্যাপারটার পর কাজে মন লাগাতে পারছিলাম না। হয়তো কিছুদিন পর আবার কাজে লাগব। আমার চাকরীটা ওখানে ঠিকই থাকবে। তা বলো টম, সুজির ব্যাপারে তোমাদের তদন্ত কতদূর এগোল?

তদন্ত এখনও চলছে। আমরা আরেকজন সাক্ষীকে খুঁজে বের করেছি। যে ব্যাটা সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল তার চেহারার বর্ণনা আমরা সেই সাক্ষীর কাছে পেয়েছি। তবে খুব একটা পরিষ্কার নয়। লোকটার নাকি চওড়া কাঁধ, গায়ে সাদা জ্যাকেট আর মাথায় বনাত দেয়া একটা টুপি ছিল। এই রকম বর্ণনার লোককে আমরা খুঁজছি।

মনে পড়ল গতকাল রাতে এইরকম বর্ণনা অনুযায়ী একটা লোককে হ্যাংকের পাশে হাঁটতে দেখেছিলাম। ওরা নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে গাড়িতে উঠেছিল।

এখনও লেপস্কি তীক্ষ্নচোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, শোন ডার্ক, হ্যাংকের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমরা আর এখানে ঝামেলা করতে চাই না। এখানে বোমা ফাটার খবর কিন্তু রেডিওতে বলা হয়েছে। জানো তো বড়লোকেরা বোমাকে ভীষণ ভয় পায়। সামনের মাসে এখানকার হোটেলগুলোতে যাদের আসবার কথা ছিল তারা সবাই বুকিং ক্যানসেল করেছে। আমরা এখানে আর কোন বোমাবাজি চাই না। ডার্ক আমি কি বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

আমায় এসব কথা বলে কি লাভ টম? যে বোমা ছুঁড়েছে তাকে ধরে বোঝাও গে। দেখো সে তোমার কথা শোনে কিনা।

তোমার যা খুশি করতে পার ডার্ক। সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি বলে রাখছি যে আর একটা বোমা ফাটলে আমরা কিন্তু বসে থাকব না। সে লোকটাকে ঠিক পাকড়াও করব। আর একবার ধরতে পারলে কম সে কম পনেরো বছরের জন্য জেলের ঘানিতে জুড়ে তবে ছাড়ব।

এসব তুমি তাকেই বলো গিয়ে, আমায় খামোকা শোনাচ্ছো কেন? চলি আবার দেখা হবে। বলে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম।

বিলকে আর কিছুক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গিয়ে নেপন সরাইখানায় ঢুকলাম। দুজন গগলস চোখে টুরিস্ট অ্যাল বার্নির ছবি তুলছিল। ছবি তোলা হতে তার হাতে দশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে তারা চলে গেল। আমি এবার গিয়ে বার্নির মুখোমুখি বসলাম।

কেমন আমদানি হচ্ছে অ্যাল? টুরিস্টদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি আসছে?

তা তো আসছে মিঃ ওয়ালেস। আগামী মাসে আরও কিছু টুরিস্ট আসবে। হ্যাংক স্মেডলির কারবারের তো বারোটা বেজেছে শুনেছেন নিশ্চয়ই। ব্যাটার এটা পাওনা ছিল।

অ্যাল, চওড়া কাঁধ, সাদা জ্যাকেট গায়ে, মাথায় চওড়া বনাত দেওয়া টুপি আছে এমন কাউকে তুমি চেনো?

বার্নি ভুরু কুঁচকে বলল, নুলা মিনস্কি। খুব সাবধান মিঃ ওয়ালেস। ওর ধারে কাছে ঘেঁষবেন না।

লোকটা কে?

বার্নি ভয়ে গলা নামিয়ে বলল, ও ওয়ালিনস্কির পোষা গুণ্ডাদের মধ্যে একজন। বিষাক্ত সাপের মত ভয়ঙ্কর।

ওকে কোথায় খুঁজে পাব?

এখানে এলে ও হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মাসের পয়লা তারিখে ও মাফিয়ার টাকা আদায় করতে এখানে আসে।

ধন্যবাদ অ্যাল। বলে বার্নির কাঁধে একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। বিল, পুলিশ কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে বোমাটা আমিই ছুঁড়েছি। লেপস্কি আমায় হুঁশিয়ার করেও দিল কিন্তু ওদের হাতে কোন প্রমাণ নেই।

বিল সীটে গা এগিয়ে বলল, হুম। নুলা মিনস্কিকে নিয়ে কি করবে?

সত্যি বলছি বিল, ওকে প্রাণে মারব না। কিন্তু এমন বেধড়ক ধোলাই দেব যাতে কোমরের নীচ থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত একখানা হাড়ও আস্ত না থাকে। আমার হাতে মার খেলে ওকে বাকি জীবনটা হুইল চেয়ারে বসে কাটাতে হবে। বলতে বলতে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম।

কবে ঠ্যাঙ্গাচ্ছো ওকে?

আজ রাতে। সাতটা নাগাদ আমরা হ্যাংকের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হানা দেব।

ওদের দুজনকে একসঙ্গে সামলানো কিন্তু আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে।

ঠিক আছে। আমরাও ওদের মুশকিলে ফেলব।

বিল বলল, তুমি মিনস্কিকে প্যাঁদাবে আমি প্যাঁদাব হ্যাংককে। ঐ শালার ওপর আমার রাগ জমেছে। আমার হাতদুটো নিসপিস করছে।

ভাল বুদ্ধি বাতলেছো বিল।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে বিল অস্থিরভাবে এ ঘর সে ঘর করতে লাগল। আমি সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলাম।

টেলিফোন বাজতেই আমি রিসিভার তুলে ধরলাম।

মিঃ ওয়ালেস? যুবতীর গলা ভেসে এল।

ঠিক ধরেছেন। আপনি কে?

আমি মিঃ ওয়ালিনস্কির সেক্রেটারী। মিঃ ওয়ালিনস্কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। দয়া করে আজ বিকেল পাঁচটায় স্প্যানীশ বে হোটেলে আসুন। আমি আপনার জন্য লবীতে অপেক্ষা করব তারপর আপনাকে নিয়ে মিঃ ওয়ালিনস্কির স্যুটে যাব।

উত্তর দেবার আগেই লাইন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে বিলকে সব বললাম।

বিল শুনে শিস দিয়ে উঠল। আমরা জানি যে পূর্ব উপকূলের এই এলাকায় স্প্যানীশ বে হোটেল হল সবচাইতে সেরা এবং বিলাস ও ব্যয়বহুল হোটেল।

বিল বলল, তা তুমি কি সত্যিই যাবে ওখানে?

হ্যাঁ আমি যাচ্ছি।

আমি স্প্যানীশ বে হোটেলে ঢুকলাম বিকেল পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট আগে। চারপাশে বিলাসের নানারকম আয়োজন ছড়ানো। তার মাঝখানে বড়লোক যাত্রীরা আসা যাওয়া করছে। রিসেপশান ডেস্কের পাশেই স্যান্ড্রা অপেক্ষা করছিল। লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারা, পিঠ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, সবুজ চোখের মণিতে দুর্বার জীবন যাপনের ছায়া। সে চোখে চোখ রাখলে যে কোন পুরুষের শরীর উত্তেজনা আর আতঙ্কে শিউরে উঠবে। স্যান্ড্রার পরনে একটা সাদা শর্ট কোট আর মানান সই শার্ট। এমন একটি যুবতীর দাম নিঃসন্দেহে কয়েক কোটি ডলার।

যুবতী এগিয়ে এসে বলল, মিঃ ওয়ালেস? আমার নাম স্যান্ড্রা। পদবী জেনে আপনার প্রয়োজন নেই। সবাই আমায় স্যান্ড্রা বলেই জানে।

পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, বলে আড়চোখে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলাম। স্যান্ড্রার উদ্ধত দুটি স্তন, সরু চাপা কোমর, চওড়া নিতম্ব আর একজোড়া লম্বা পা যে কোন পুরুষকেই আকৃষ্ট করবে। এক কথায় সে মোহিনী।

মিঃ ওয়ালিনস্কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান মিঃ ওয়ালেস। ওর সঙ্গে কথা বলতে হুঁশিয়ার!

উনি কি সাংঘাতিক টাইপের লোক তা সামনে থেকে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না।

আমায় নিয়ে স্যান্ড্রা লিফটে উঠল। সাততলায় পৌঁছে লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে চাবি দিয়ে একটা স্যুটের দরজা খুলতে খুলতে সে আবার বলল, খুব হুঁশিয়ার। দরজা খুলে আমায় ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করল। আমি ভেতরে পা রাখতেই সে গলা চড়িয়ে বলল, মিঃ ওয়ালিনস্কি, মিঃ ওয়ালেস আসছেন। বলে আমার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আবার বলছি মিঃ ওয়ালেস! হুঁশিয়ার! যান, সোজা এগিয়ে যান। উনি ব্যালকনিতে অপেক্ষা করছেন।

ব্যালকনিতে পা রাখতেই হতাশ হলাম। শুনেছিলাম ওয়ালিনস্কি এক নামজাদা মাফিয়া দলের সর্দার। তার ওপর ব্ল্যাকমেলার। ভেবেছিলাম তার চেহারাটাও হবে দেখবার মত।

কিন্তু আদৌ তা নয়। যেসব বেঁটে মোটা ব্যবসায়ীরা এখানে বেড়াতে আসে ওয়ালিনস্কি ঠিক তাদেরই মত দেখতে। গায়ের রং কিছুটা তামাটে। মাথায় টাক। পরনে নীল রংয়ের স্যুট। গোল মুখ, নাকখানা বেজায় ছোট। পাতলা ঠোঁট। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য। তার গোটা চেহারাকে আর সবার চাইতে আলাদা করেছে সে হল তার ফ্যাকাশে নীল চোখ জোড়া। সে দিকে তাকালে তার মনোভাব বোঝা যায় না।

আপনি এসে ভালই করেছেন মিঃ ওয়ালেস। বলতে বলতে সে হাত বাড়িয়ে দিল। একটু ইতস্ততঃ করে তার হাতে হাত মেলালাম।

বসুন, দেখে তো মনে হচ্ছে আরও বৃষ্টি হবে, এখানেই বসা যাক। বলে সে ব্যালকনির একপাশে রাখা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল। মাঝখানে ছোট একটা টেবিল। আমার মুখোমুখি সে বসল।

আমি বসতে বসতে বুঝলাম যে সে তার ধূসর নীল চোখ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখছে।

চায়ের সময় এখনও হয়নি। একটু কফি চলবে?

না, ধন্যবাদ।

তাহলে চা-ই খান।

বেশ। তাহলে কাজের কথাটা শুরু করা যাক। সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়।

জো ওয়ালিনস্কি বলল, মিস সুজি লংয়ের মৃত্যুর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মিঃ ওয়ালেস, বিশ্বাস করুন এই নিষ্ঠুর কাজটা আমায় পুরোপুরি না জানিয়ে করা হয়েছে। অবশ্য কাজটা যে করেছে সে আমারই অধীনস্থ লোক। লোকটার মনে দয়ামায়া বলে কিছু ছিল না। টাকার জন্য সে সব কিছু করতে পারত। ব্যাপারটার জন্য ওর কাছে যখন আমি কৈফিয়ত চাইলাম তখন ও বলল যে, ঐ কাজটার জন্য ও পাঁচ হাজার ডলার পেয়েছিল। আর এও বলল যে হ্যাংক স্মেডলি একজনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে ওকে দিয়েছিল, আর যে টাকাটা দিয়েছিল হ্যাংককে কাজটা সেই করতে বলেছিল। আমার লোকটা জানত না সে লোকটি কে। আমি একটু চাপ দিতেই সে বলেছিল এটা নিছক বদলা নেওয়ার একটা ব্যাপার।

আমার মন চলে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে ব্যাঙ্কে সেই ঘটনার দৃশ্যে যখন অ্যাঞ্জেলা থরসেন চলে যাবার আগে বলেছিল এর ফল আপনাকে পেতে হবে। হাড়ে হাড়ে পেতে হবে বলে শাসাচ্ছিল। সুজির মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য তাহলে কি অ্যাঞ্জেলাই হ্যাংককে লাগিয়েছিল? তাকে পাঁচহাজার ডলার দিয়েছিল?

ওয়ালিনস্কি বলল, মিঃ ওয়ালেস! আপনি স্মেডলির হিসেব চুকিয়ে দিয়ে ওর পাওনা পুরো বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমিও তেমনি লোকটিকে তার পাওনা হিসেব পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার দলের অন্যান্য লোকেরাই তার ব্যবস্থা করেছে। আমার দলের লোকেরা গোলমাল বা ঝামেলা জিইয়ে রাখে না। পুরোপুরি শেষ করে দেয়। এ লোকটিরও তাই করা হয়েছে। স্মেডলিকে আমি আর দলে রাখছিনা। আপনি চাইলে ওকেও জানে খতম করে দিতে পারি। বলুন, আপনি তাতে খুশি হবেন?

তার মানে, আপনি ইঙ্গিত করলেই আপনার দলের লোকেরা হ্যাংককে শেষ করে ফেলবে?

সোজা কথায় তাই বোঝায় মিঃ ওয়ালেস। কিন্তু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি রাজি কিনা একবার বলুন।

তাহলে ওকে বরং বাঁচিয়ে রাখুন।

আপনি সত্যিই মহান মিঃ ওয়ালেস। আপনি সত্যিই দয়ার শরীর নিয়ে আছেন। ওরা দুজনে মিলে আমার প্রেমিকার অমন দশা করলে আমি কিন্তু ক্ষমা করতে পারতাম না।

ওকে বাঁচতে দিন। আমি ওর পুরোপুরি বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।

সে তো একশোবার।

তার কথা শেষ হতেই স্যান্ড্রা ট্রেতে কফির পট আর কাপ সাজিয়ে নিয়ে এল। দুধ ছাড়া কালো কফি। কফি রেখে চলে যেতে আমি আড়চোখে তার দেহে মনে দোলা দেওয়া শরীরের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম ওয়ালিনস্কি তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই রসিয়ে রসিয়ে বলল, ও খুব কাজের মেয়ে। ওর বাবা একসময় আমার হয়ে কাজ করত। সে মারা যাবার পর ওকে আমার সেক্রেটারী করে রেখেছি। এখন আর ওকে ছাড়া আমার চলে না।

ওয়ালিনস্কি কফির কাপে চুমুক দিল। আমি চুপ করে রইলাম।

তাহলে কাজের কথায় আসা যাক মিঃ ওয়ালেস। আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। আমি আপনাকে খুশি করতে চাই। আমার দলের সে লোকটি আর বেঁচে নেই। স্মেডলিকে নিয়ে আপনি কি করবেন না করবেন তা পুরোপুরি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। এখন ব্যাপার হল, আপনি যে স্মেডলির নাইট ক্লাব বোমা মেরে ভেঙ্গে দিয়ে তাড়াতাড়ি বদলা নিয়েছেন তা আমার বুঝতে বাকি নেই। এই শান্ত শহরে কোথাও একবার বোমা ফাটলে ধনী লোকেরা সহজে পা দিতে চায় না। আমি নিজেও এখানে আর বোমাবাজী চাই না। আমি বড়লোকদের নিয়ে এখানে কাজ করি। আরও বোমাবাজি হলে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে। তার ফলে আমার ব্যবসার ভয়ানক ক্ষতি হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু একই সঙ্গে হয় তো আবার নতুন করে ঝামেলা পাকাবার ব্যাপারে আমি আপনাকে বলব দয়া করে এমন কাজটি করবেন না।

ওয়ালিনস্কির হাসি দেখে মনে হল একটা র‍্যাটেল সাপ হাসছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন মিঃ ওয়ালেস, যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে আমার দলের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে। কাজেই এই শহরে আর ঝামেলা পাকাবেন না। আপনাকে এটাই উপদেশ দিচ্ছি। যদি করেন তাহলে কিন্তু পরে অনুতাপ করতে হবে। কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

আপনার কথা আমার কানে গেছে। বলে উঠে দাঁড়িয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে স্যুটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। স্যান্ড্রা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দরজার হাতলে হাত রেখে ও আমার চোখে চোখ রাখল। এই রকম চেহারার মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি। ওর চেহারাকে কোন কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। কিন্তু সুজির মত ভালবাসা ওকে তেমনভাবে দেওয়া যায় না। ও আর সব মেয়ের চাইতে আলাদা। ওর সবুজ দুটি চোখে আকর্ষণ আর বিপদের ছায়া সমানভাবে ফুটে উঠেছে। স্যান্ড্রা দরজার হাতল টেনে পাল্লা খুলতেই আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেরোবার মুহূর্তে আমার কানে ও ফিসফিস করে বলল, আজ রাত ঠিক এগারোটায় থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় আসবেন, কথা আছে।

ওর কথায় বিশ্বাস হল না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ও মুখের ওপর দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল।

বেলা দুটোয় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। বিল আমার টেবিলে বসে থরসেন ফাইলের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। আমি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। বিল গ্লাস হাতে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। ওয়ালিনস্কির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সব ওকে খুলে বললাম।

বিল, মাফিয়ার কাজ নয়। আমার যতদূর ধারণা হ্যাংক আর মিনস্কি পাঁচহাজার ডলার পেয়ে এটা করেছে। মিনস্কিকে খুন করে এমন কোথাও ওরা পুঁতে রেখেছে যা কেউ খুঁজে পাবে না। আমাদের ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন বাকি রইল হ্যাংক...

হ্যাঁ, ঐ শালাকে প্যাঁদানো বাকি আছে।

শোন বিল, আমরা ওর সঙ্গে দেখা করব। অ্যাসিড ছুঁড়তে কে ওকে টাকা দিয়েছিল সেটা

আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা থরসেনই ওটা করিয়েছে। তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ও যদি বলে যে অ্যাঞ্জেলাই কাজটা করিয়েছে, তখন না হয় ওর ব্যবস্থা করা যাবে।

বিল ঘাড় নাড়ল। হুঁ, কিন্তু ঐ গরিলাকে দিয়ে আমরা কথা বলাবো কিভাবে?

তুমি ব্লো-টর্চ দিয়ে কখনও কাজ করেছো?

ওঃ বুঝেছি, আমরা ওর গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে কথা বের করে নেব। তাই তো? বিল গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, ওয়াল্লিনস্কিকে তোমার কেমন লাগল ডার্ক?

ভয়ঙ্কর লোক, বিষাক্ত সাপের মত বিপজ্জনক। ওর মত লোককে একদম ঘাঁটানো উচিত নয়। বলে আমি স্যান্ড্রার কথাও বিলকে জানালাম। বললাম যে আজ রাত ঠিক এগারোটায় সে আমায় দেখা করতে বলেছে।

তুমি কি সত্যিই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে না কি?

নিশ্চয়ই, কেন যাব না? ভালো কথা, থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁটা কোথায় বলো তো?

বিলের নখদর্পণে হোটেল রেস্তোরাঁর খবর। সে বলল, ওটা তো ওয়াটার ফ্রন্টে, ভাল রেস্তোরাঁ। তবে সব মালেরই দাম একটু বেশী নেয়। সলি জোয়েলের ঠেকের পাশেই, এবার মনে পড়েছে?

মনে পড়েছে। যাকগে বিল, এবার দেখো একটা ব্লো-টর্চ যোগাড় করতে পার কিনা। আমি টেলিফোনে হ্যাংকের সঙ্গে কথা বলছি।

বাড়ির দারোয়ানের কাছে নিশ্চয়ই থাকবে। বিল বাইরে বেরোলো। আমি আলমারী খুলে দুটো হাতকড়া বের করলাম। বাক্স থেকে রিভলবারটা বের করে দেখলাম গুলি আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে পকেটে পুরলাম। তারপর টেলি গাইড খুলে হ্যাংকের নম্বর বের করলাম।

বার কয়েক ডায়াল ঘোরানোর পর হ্যাংক রিসিভার তুলল, ঘোঁত ঘোঁত করে বলে উঠল, কে ফোন করছ?

মিঃ স্মেডলি? আমি বললাম, পুলিশ হেডকোয়ারটার্স থেকে ফোন করছি।

অ্যাঁ? হ্যাঁ তারপর বলুন, আমার নাইট ক্লাবে যে শুয়োরের বাচ্চা বোমা মেরেছে তাকে খুঁজে বের করেছেন?

ঐ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই মিঃ স্মেডলি, বেশী নয় কয়েকটা কথা। আমরা গোয়েন্দাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি কেমন?

ঠিক আছে, কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমি একঘণ্টার ভেতরে বেরিয়ে পড়ব। বলে হ্যাংক রিসিভার রাখল।

বিল ব্লো-টর্চ হাতে নিয়ে ফিরে এল, হাসতে হাসতে বলল, জিনিসটা নতুন আছে হে, কাজও ভাল দেবে।

ঠিক আছে, আমি বললাম। এবার চলো তাহলে যাওয়া যাক।

শোন ডার্ক, বিল বলল, এই গরিলাটাকে কিন্তু আমি একা শায়েস্তা করব।

তোমার পাঞ্চ দুটো কাজে লাগাবার জন্যে একদম ছটফটিয়ে মরছ তাই না? হেসে বললাম, চলো সুযোগ তুমি পাবে।

দশ মিনিটে সীগ্রোভ রোডে এসে পৌঁছলাম। শেষ তলায় উঠে বিল বলল, এবার যা করার তা আমি করব।

তাই করো, বলে রিভলবার নিয়ে আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, বিল কলিং বেল টিপল। কয়েক সেকেন্ডের পর হ্যাংক বেরিয়ে এলো। খালি গা, একটা আঁটো জিনসের ট্রাউজার্স পরনে। কটমট করে দুচোখ পাকিয়ে ও বিলের দিকে তাকাতে আমি ওর পা থেকে মাথা একপলক দেখে নিলাম। হ্যাংক শুধু স্বাস্থ্যবান নয়, তার শরীর পুরোপুরি পেশাদার বক্সারদের মত।

আপনারা কি পুলিশের লোক? বলেই হ্যাংক বিল আর আমাকে চিনতে পারলো, গরিলার মত ঘোঁতঘোঁত করে বলে উঠল, এবার তোমাদের চিনেছি। তোমরা সেদিন আমার নাইট ক্লাবে একলক্ষ ডলারের গল্প শোনাতে গিয়েছিলে না? ভাল চাও তো কেটে পড়, নয়ত তোমাদের

মাংসের কাবাব বানিয়ে ছাড়ব।

হ্যাংক কি বলল বিল ঠিক শুনতে পেলোনা। নীচু হয়ে ঘাড় ঝোঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে বিল তার ডান হাতে লাগানো পাঞ্চ দিয়ে হ্যাংকের বাঁ দিকের চোয়ালে এক আঘাত হানল। দুচোখ উল্টে হ্যাংক ধুপ করে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

এবার আমাদের পালা, বিল বলল, ডার্ক এবার হাতের সুখ করে নাও।

দুজনে হ্যাংকের বিশাল লাশখানা ভেতরে এনে মেঝের ওপর শুইয়ে রাখলাম। হ্যাংকের জ্ঞান ফেরেনি, এই ফাঁকে তার হাতদুটো পেছনদিকে নিয়ে হাতকড়া তার দুপায়ের গোড়ালীতে এঁটে দিলাম। থাকুক এইভাবে শুয়ে। বিল উঠে গিয়ে সদর দরজাটা ভেজিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল।

আমি বললাম, সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই, চোখে মুখে জল ছিটিয়ে শালার জ্ঞান ফেরাও।

বিল কোন কথা না বলে আধ বালতি জল এনে হ্যাংকের মাথায় ঢেলে দিল তারপর ব্লো-টর্চ জালিয়ে তার তাপ বাড়াতে লাগল।

জলের ছোঁয়ায় হ্যাংকের জ্ঞান আসতেই মাথা ঝাঁকিয়ে বসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁজরে খুব জোরে একটা লাথি কষালাম। উঠে সে টের পেল যে তার দুহাত আর দুপায়ে হাতকড়া পরানো হয়েছে। হ্যাংক উঠে বসতেই আমি ডান পা দিয়ে ওর কপালে চাপ দিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎ হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। ফাঁদে পড়া বন্দী বনবেড়ালের মত আমার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

আমার প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য কে তোমায় পাঁচহাজার ডলার দিয়েছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

উত্তর না দিয়ে হ্যাংক হাতকড়া দুটো খোলার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোলা হলনা। এই হাতকড়া বেশী ছটফট করলে আরো জোরে এঁটে বসে।

তুমি কি বলছো আমার মাথায় ঢুকছে না, ও বিড় বিড় করে বলল।

আমি বিলের দিকে তাকালাম। বিল ওকে এবার ছ্যাঁকা দাও, নয়ত মুখ খুলবে না।

আমি তাই চাইছি, বলে বিল পাম্প করে ব্লো-টর্চের তাপ বাড়ালো। তারপর হ্যাংকের খোলা বুকের ওপর বাগিয়ে ধরল। তাতে হ্যাংকের বুকের সব লোম পুড়ে যেতে লাগল। হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, তখন আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে ভয়।

ওটা সরিয়ে নাও। হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, আমি কথা দিচ্ছি বলব।

লোকটা কে? তার পাশে বসে আমি জানতে চাইলাম।

অ্যাঞ্জি, বলেই হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, দোহাই ওটা সরিয়ে নাও।

সব খুলে বলো, আমি ধমকে উঠলাম, একদম গোড়া থেকে। বিল আগুনের শিখাটা বুক থেকে সরিয়ে মুখের সামনে নিয়ে আসতেই হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল।

সব খুলে বলো বলছি। আমি এবার গলা চড়ালাম।

অ্যাঞ্জি আমার কাছে এসেছিল। ঐ একলাখ ডলার পেতে বাগড়া দিয়েছিলে বলে ও দারুণ চটে গিয়েছিল। মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার মতলবটা ওরই মাথা থেকে বেরিয়েছিল। সত্যিই ওর মাথা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ও পাঁচ হাজার ডলারের লোভ দেখাতে আমি হুলাকে ডেকে ব্যবস্থা করতে বললাম। তবে তোমার প্রেমিকাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না বিশ্বাস করো। ভেবেছিলাম মুখের এক পর্দা তুলে নিলেই হবে। ও যে দৌড়োতে গিয়ে ট্রাকের নীচে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। বিশ্বাস করো।

টাকাটা পেয়েছিলে? আমি ঘৃণাভরা সুরে জানতে চাইলাম।

নিশ্চয়ই, অ্যাঞ্জিও টাকা দেবে বলে কথা দিলে ঠিক দেয়। আমি অর্ধেক নিয়েছি, হুলা বাকি অর্ধেক নিয়েছে।

হুলা কোথায়?

জানিনা, কাল রাতে ওর ডাক এসেছিল। বলল কাজ আছে, বেরোচ্ছি। তারপর ও ফেরেনি।

হুলা কোথায় গেছে জানো?

না। হ্যাংক আঁতকে বলল, হুলাকে কোন প্রশ্ন করি না। ও কোথায় গেছে আমি জানি না।

ভাবলাম হ্যাংককে বলি যে ওয়ালিনস্কি হুলাকে খতম করে দিয়েছে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলাম।

এবার অ্যাঞ্জির প্রসঙ্গে আসা যাক, আমি বললাম, অ্যাঞ্জেলা থরসেন প্রত্যেক মাসে তোমায় দশহাজার টাকা দেয় তাই না?

হ্যাংক অস্বীকারের ভঙ্গি করতেই বিল তার মুখের কাছে ব্লো-টর্চের আগুনটা নিয়ে এল। ছটফটিয়ে হ্যাংক বলল ঃ ঐ টাকা ও আমায় দেয় না, কাজটা কি ভাবে হয় শোন বলছি। হুলা নানা ধরনের কাজে নাইট ক্লাবটাকে ব্যবহার করে, আর তার বদলে প্রত্যেক হপ্তায় ও আমায় পাঁচশো ডলার দেয়। আমি এতেই খুশি থাকি। অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হুলা নিজেই। ও শুধু আমায় থাকতে দেয়। এর বাইরে আমি কিছুই জানিনা, বিশ্বাস করো।

বলে যাও, থেমোনা, আমি বললাম। বিল হ্যাংককে আগুনের ছ্যাঁকা দিতেই ও তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

হ্যাংক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার কি দোষ। সবাই আমার নাইট ক্লাবে এসে আমার হাতে একটা করে খাম ধরিয়ে দিয়ে যায়। অ্যাঞ্জিও একটা ওয়ালেট দেয়, তাতে টাকা ভর্তি থাকে। আমি সে সব একটা থলেতে পুরে রাখি। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখ হুলা যখন আসে তখন ঐ থলেটা আমি দিই। ব্যস, তারপর আমি আর কিছু জানি না।

অ্যাঞ্জেলাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কেন?

আমি জানি না, শপথ করে বলছি আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না। হুলাই ঘুরে ঘুরে লোকের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী বের করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। অ্যাঞ্জিও হুলার পাল্লায় পড়েছে। ব্যাপারটা কি আমি জানি না। কিন্তু সেটা এমনই ব্যাপার যে তাকে প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিতে হয়। অ্যাঞ্জির মাথার ঠিক নেই। ওর মাথা বরাবরই খারাপ। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

মনে হল হ্যাংক সত্যিকথাই বলছে। হুলার মত একটা নিষ্ঠুর পশুর মত লোক ওর মত এক মোটামাথার লোককে কিছুই বলবে না এটাই স্বাভাবিক।

সব জানার পর হ্যাংককে আমার ভীষণ ঘেন্না করতে লাগল। ঘেন্না করল এই ঘর আর তার ভেতরের আবহাওয়া।

ঠিক আছে বিল। এবার ওর হাতকড়া দুটো খুলে দাও। রিভলবার হাতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই ফাঁকে বিল ব্লো-টর্চ নিভিয়ে হ্যাংকের হাত আর পায়ের হাতকড়া খুলে দিল। হ্যাংক উঠে বসে কব্জি দুটো রগড়াতে রগড়াতে আমার দিকে তাকাল।

মন দিয়ে শোন হ্যাংক। এই শহরে তোমার আর হুলার মনিবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। হুলা এখন কবরের নীচে। ওর সঙ্গে এ জীবনে আর তোমার দেখা হবে না। আমিও এ জীবনে আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। তোমায় বারোঘণ্টা সময় দিলাম, তারমধ্যে তুমি এ শহর ছেড়ে চলে যাবে। তারপরেও যদি তোমাকে দেখি তাহলে তোমার দুই হাঁটু তাক করে আমি দুটো গুলি ছুঁড়ব। তারপর তুমি জীবনে আর হাঁটতে পারবে না। যাও, আমার কথা বুঝতে পেরেছো?

ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে হ্যাংক বিড়বিড় করে বলল, আমার যাবার কোন জায়গা নেই। আমার কাছে টাকাকড়িও কিছু নেই।

হ্যাংক, আমি কিন্তু এই শেষবার তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। বারো ঘণ্টার পর তোমাকে এই শহরে দেখলে তোমার ঠ্যাং দুটো আর আস্ত থাকবে না। কথা শেষ করে আমি বিলকে বললাম, চলে এসো বিল। এই শুয়োরের বাচ্চার গায়ের গন্ধে আমার বমি পাচ্ছে।

লিফ্‌টে চেপে আমরা নীচে নেমে এলাম। বাইরে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। তারই ভেতর হেঁটে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

।। সাত ।।

থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় রাত এগারোটায় পা রাখতেই ওয়েটার আমায় শীততাপে নিয়ন্ত্রিত একটি

ছোট ডিনার কামরায় নিয়ে গেল। স্যান্ড্রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ তার পরনে গাঢ় লাল রংয়ের আঁট পোশাক, মাথার চুল পেছনদিকে মুক্তো বসানো ফিতে দিয়ে বাধা। তার উগ্র সাজসজ্জার দিকে চেয়ে নিজেই উত্তেজিত বোধ করলাম।

সে মৃদু হেসে বলল, আমার পুরো নাম স্যান্ড্রা উইলিস। কিন্তু এখন আর কোন কথা নয় কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।

প্লেটে ঝিনুক ভাজা আর ঠাণ্ডা সাদা ওয়াইন ওয়েটার এসে আমাদের টেবিলে রেখে গেল।

খেতে খেতে প্রশ্ন করলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে, কিন্তু কেন?

বলছি, আগে পেট পুরে খেয়ে নিই। ওয়ালিনস্কি থাকলে আজও খাওয়া জুটত না, এমন কাজের চাপ পড়েছে। উনি ক্যাসিনোতে গেছেন তাই এখানে আসতে পারলাম।

খাওয়ার পরে স্যান্ড্রা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এই যাচ্ছেতাই শহরে আপনিই দেখলাম একমাত্র লোক যার সাহস আছে। শিরদাঁড়া খাঁড়া করে যে শয়তানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

কি দেখে তোমার মনে হল যে আমার সাহস আছে?

ব্ল্যাক ক্যাসেটের মত একটা নোংরা জায়গা যিনি বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন, যিনি হ্যাংকের মত একটা বদমায়েশকে ভয় দেখিয়ে শহর থেকে খেদাতে পারেন তাঁকে সাহসী বলব না?

কি করে বুঝলে যে হ্যাংক এই শহর ছেড়ে চলে গেছে?

আধঘণ্টা আগে ও টেলিফোন করেছিল। ও জে. ডব্লিউ. অর্থাৎ ওয়ালিনস্কির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আমি ওর গলা শুনেই চিনতে পেরেছিলাম, বললাম যে জে. ডব্লিউ. ব্যস্ত আছেন যা বলার আমাকে বলতে পারেন। ও তখন বলল যে আপনি নাকি ওর ওপর খুব অত্যাচার চালিয়েছেন আর তার ফলেই ও বলতে বাধ্য হয়েছে যে অ্যাঞ্জেলা থরসেন টাকা খাইয়ে ওকে অ্যাসিড ছুঁড়তে বাধ্য করেছিল। হ্যাংক এও বলল যে আপনি ওকে শহর ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিয়েছেন তাই ও চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওর সঙ্গে টাকাকড়ি বিশেষ নেই। ওয়ালিনস্কি কি ওকে টাকা দিতে পারবেন?

সব শুনে হ্যাংককে বললাম যে ওর জন্য জাহান্নামের রাস্তা খোলা আছে সেখানে যেতে টাকাকড়ি কিছুই লাগে না। এই বলে আমি রিসিভার নামিয়ে রেখেছি। তারপর দলের লোকেদের কাছে জানলাম হ্যাংক স্মেডলি মিয়ামির দিকে রওনা হয়েছে।

চুপচাপ স্যান্ড্রার কথা শুনছিলাম। একটু দম নিয়ে সে বলল, অ্যাঞ্জেলা থরসেন সম্পর্কে ও আমায় যা যা বলেছে তা ওয়ালিনস্কিকে জানাইনি, কারণ ওঁর কাছে অ্যাঞ্জেলা খুব দামী খদ্দের। আর ওয়ালিনস্কি যদি জানতে পারে যে অ্যাসিড ছোঁড়ার মূলে অ্যাঞ্জেলা তাহলে সে ধরেই নেবে যে আপনি তাকেও ছাড়বেন না। আজ হোক কাল হোক অ্যাঞ্জেলাকে আপনি ঠিকই শায়েস্তা করবেন।

সে তো করবই। আমি অ্যাঞ্জেলাকে ছেড়ে দেব না।

এখন ডার্ক, গোটা ব্যাপারটাকে বুঝতে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কেন?

আগেই বলেছি যে আমি একজন সাহসী লোক চাই। আপনি এই মাফিয়া সংগঠনটির কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। এবার মন দিয়ে শুনুন। ওয়ালিনস্কি ফ্লোরিডায় তার মাফিয়া দলের বড়কর্তা। দলের হয়ে টাকা যোগাড় করাই তার কাজ। ফ্লোরিডায় টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। যার টাকা আছে তারই অতীতের কোনও না কোন কলঙ্কিত ইতিহাস আছে। এরকম হাজার হাজার লোককে ওরা ব্ল্যাকমেল করছে। বড় বড় দোকান, জুয়ার আড্ডা, হোটেল সবাই মাফিয়াদের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য তাদের হাতে মোটা টাকা তুলে দেয়। এই যে ওয়ালিনস্কি স্প্যানীশ বে হোটেলে থাকছেন তারও পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেখানকার কর্মচারীরা সব ওর কথায় ওঠাবসা করে। উনি আঙুল তুললেই সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবে। এই এলাকা থেকে ওয়ালিনস্কি পনেরো লাখ ডলার পান। ঐ টাকার পরিমাণ যাতে না কমে সে দিকে লক্ষ্য রাখাই তার কাজ। আর এখানেই ওর ভরাডুবি ঘটবে। টাকার পরিমাণ কমলেই দল ওয়ালিনস্কিকে সরিয়ে

এখানে অন্য কাউকে বসাবে। এই কারণেই উনি এই শহরে কোন ঝামেলা চান না। অ্যাঞ্জেলা থরসেনের কাছ থেকে উনি প্রত্যেক মাসে দশ হাজার ডলার পাচ্ছেন। এখন আপনি যদি ঝামেলা করেন তবে ওর মাসিক দশহাজার ডলার আয় কমে যাবে। আমি গোপনে জানতে পেরেছি যে দলের বড় কর্তারা ওঁর কাজে খুব খুশি নন। ওঁরা এই এলাকা থেকে আরও বেশী টাকা তুলতে চাইছেন। আর এখানে সবাই আপনাকে চেনে, পুলিশের সঙ্গেও আপনার দহরম মহরম আছে, তাই আপনি বেঁচে আছেন, ওরা আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাচ্ছেনা। ওঁর কাজকর্ম জানাজানি হয়ে যাক এটা ওয়ালিনস্কি চান না। আমার কথা বুঝতে পারছেন?

এসব আমায় বলে কি লাভ, স্যান্ড্রা? আমি বললাম, তুমি ওয়ালিনস্কির হয়ে কাজ করছো। তিনি তো তোমার জন্য যথেষ্ট করেছেন।

স্যান্ড্রা নিষ্ঠুর হেসে বলল, সে কথায় আসছি। উনি আপনাকে ডেকে বললেন যে আপনার বান্ধবীর মুখে হুলা আর হ্যাংক অ্যাসিড ছুঁড়েছে বলে তিনি খুব দুঃখিত, তাই না? আপনাকে উনি বেশ বুঝিয়ে দিলেন যে হুলা মিনস্কিকে খতম করে পুঁতে ফেলা হয়েছে। ওয়ালিনস্কি কি পরিমাণ মিথ্যেবাদী সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই। হুলা ওঁর ডানহাত, সে নিজের সাগরেদদের নিয়ে ধনীদের ব্ল্যাকমেলের ফাঁদ পেতে বেড়ায়। আমার কথা বিশ্বাস করুন, হুলা মিনস্কি এই মুহূর্তে বহাল তবিয়তে এই শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ হ্যাংক স্মেডলিকে উনি বাঁচিয়ে রাখবেন না, মিয়ামিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খতম করে দেওয়া হবে। কাজটা হুলা নিজেই করবে। গুম, খুন করতে ওর মত ওস্তাদ লোক দুটি নেই।

তার মানে? আমি ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলাম, যে বদমাশ ছেলে আমার বান্ধবীর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়েছিল, সে বেঁচে আছে এই কথাটাই তুমি বোঝাতে চাইছো?

ঠিক তাই।

স্যান্ড্রার কথা শুনে আমার একটা শীতল ক্রোধ মাথার দিকে উঠে গেল। হুলা মিনস্কিকে কোথায় খুঁজে পাব?

স্যান্ড্রা বলল, আপনি খুঁজে পাবেন না। ওকে কিরকম দেখতে তাই আপনার জানা নেই।

কে বলল জানা নেই? সে বেঁটেখাটো দেখতে, কাঁধ চওড়া, গায়ে একটা সাদা কোট থাকে আর মাথায় থাকে চওড়া বনাত দেওয়া টুপি।

তাতে কাজ কতদূর এগোবে? টুপি আর কোট খুলে ফেললে আপনি তাকে চিনতে পারবেন? কয়েক হাজার বেঁটে খাটো চওড়া কাঁধওয়ালা লোক এই শহরে চলাফেরা করে। আমি সাহায্য না করলে আপনি হাজার চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাবেন না।

কিন্তু তুমি কোন স্বার্থে আমায় সাহায্য করবে বলো তো?

বিষাক্ত সাপের মত হিসহিস করে স্যান্ড্রা বলল, কারণ সে আমার বাবাকে খুন করেছিল।

কেন?

ওঁর জায়গায় ওয়ালিনস্কিকে বসানোর জন্য। আমার বাবাই ছিলেন ফ্লোরিডায় মাফিয়ার কর্তা। এখানকার কাজকর্ম তিনিই চালাতেন। আমি ছিলাম আমার বাবার সেক্রেটারী, একটা সিগারেট দিন।

স্যান্ড্রা, তোমার বাবা মাফিয়া সর্দার ছিলেন?

সিগারেট ধরিয়ে স্যান্ড্রা বলল, হ্যাঁ। বাবা খুন হবার পর তাঁর মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করেছিলাম বদলা নেবো। আর এতদিন ধরে এমন একজনকে খুঁজছি যার সাহস আছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর প্রশ্ন করলাম, তুমি ওয়ালিনস্কির সেক্রেটারী হয়ে গেলে?

হ্যাঁ, ওয়ালিনস্কি নিজেই যে আমার বাবাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিলেন আর সেটা যে আমি জেনে ফেলেছি সেটা তিনি ধরতে পারেন নি। বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তার কিছুদিন পর বাবার নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি খুঁজে পাই। চিঠিটা আমাকে লেখা। তাতেই জেনেছিলাম যে ওয়ালিনস্কি তাকে সরিয়ে এখানকার দলের কর্তা হতে চাইছে। আর মিনস্কি ওঁকে খুন করার সুযোগ খুঁজছে। আমি পুরো তিনটি বছর আমার বাবার সেক্রেটারীর কাজ করেছি। দলের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়ালিনস্কির চাইতে অনেক বেশী খোঁজখবর আমার জানা

ছিল। আমি ওঁর সেক্রেটারীর কাজ করতে চাই শুনে ওয়ালিনস্কি খুব খুশি হলেন।

কিন্তু তুমি তা করতে গেলে কেন? ওয়ালিনস্কির অধীনে কাজ করতে তোমার একবারের জন্যও মনে ঘেন্না হল না?

বিষাক্ত হাসি হেসে সে বলল, প্রতিশোধ নেবার জন্য ডার্ক। দিনের পর দিন আমি সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। জানতাম একদিন সুযোগ আসবেই। এখন আপনি আর আমি দুজনেই প্রতিশোধ নিতে চাইছি। আমি চাই আমার বাবার খুনের বদলা আর আপনি চান আপনার বান্ধবীর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার বদলা। আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, ডার্ক।

তাহলে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে যে হুলা মিনস্কিকে খতম করতে পারলে ওয়ালিনস্কিকে ওপর ওয়ালারা এখান থেকে সরিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, কিন্তু মাফিয়াদের কাজ বন্ধ হবে না। ওয়ালিনস্কির জায়গায় আর কাউকে বসানো হবে। আবার হুলার জায়গাতেও নতুন কোনও বদমাশ আসবে। সে আবার নতুন করে ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফাঁদ পাততে শুরু করবে। মাফিয়াদের কাজকর্ম থামাতে না পারলে হুলা মিনস্কিকে আপনি আর আমি মিলে সরাতে পারব আর তার ফলে ওয়ালিনস্কি ডুববে এইটুকুই আমাদের লাভ। আমি অন্তত তাতেই খুশি হব।

স্যান্ড্রার পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। কিন্তু হাজার হলেও ও নিজে মাফিয়া দলের কর্মী, ওর বাবা ছিল এখানকার মাফিয়া সর্দার, তাই ওর সঙ্গে হাত মেলাতে মনে মনে ঘেন্না হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি হুলা মিনস্কিকে শেষ করতে পারি তবে সেটাই আমার লাভ।

ঠিক আছে স্যান্ড্রা তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পার। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু আমরা কিভাবে এগোবো?

প্রথমে হুলাকে খুঁজে বের করতে হবে। ও টেলিফোনে ওয়ালিনস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করে হুকুম নেয়। এতক্ষণে স্মেডলির কাছে থেকে ও নিশ্চয়ই সব জেনেছে কিন্তু ও যে এখনও বেঁচে আছে আর সেটা যে আপনি জানেন এটা ওর জানা নেই। এর ফলে ও অসাবধানী হবে। হুলা আর ওর পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবে না। এখানেই আবার কোথাও নতুন কোনও থাকার জায়গা ও ঠিক জুটিয়ে নেবে।

ওকি হার্মিস ইয়াটে থাকতে পারে?

স্যান্ড্রার মুখ শক্ত হল, কঠিন গলায় বলল, হার্মিসের খোঁজ আপনাকে কে দিল?

খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি। কার কাছে জেনেছি তা তোমার না জানলেও চলবে।

হুলা ওখানে যাবে না। ইয়াটে শুধু এখানকার লোকেরা গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। ওয়ালিনস্কি মাসের পয়লা তারিখে গিয়ে সেই টাকা হাতিয়ে মিয়ামির দিকে রওনা হয়। হুলা মিনস্কি কখনও ইয়াটে থাকতে যাবে না। ওর থাকার জন্য অনেকটা জায়গা দরকার।

ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পার?

পারি। একসময় ওয়ালিনস্কি টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে জানতে চেয়েছিল ডলি কেমন আছে। হয়ত ডলি নামে মিনস্কির কোনও বান্ধবী আছে।

ডলি! নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম, মনে পড়ে গেল ডলি গিলবার্ট নামের সেই বেশ্যা মেয়েটিকে। হ্যাংক স্মেডলির খবর তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আর নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠেছিল। ডলি যদি হুলার বান্ধবী হয় তাহলে হ্যাংক লুকিয়ে তার কাছে যেত আর হুলা তা জানতেও পারত না।

হ্যাংকের নাইট ক্লাবের তো বারোটা বেজে গেছে, তাহলে ব্ল্যাকমেলের আর প্রোটেকশানের টাকা এখন কোথায় কার কাছে জমা পড়বে বলতে পারো?

জানি না। তবে আমি খুঁজে সেটা ঠিক বের করতে পারব।

মাস শেষ হতে আর মাত্র আটদিন আছে স্যান্ড্রা, পয়লা তারিখে ব্ল্যাকমেলের টাকা হাতাতে মিনস্কিকে আসতেই হবে।

হ্যাঁ, ও আমি ঠিক খুঁজে বের করব, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব। আপনার নম্বর কত?

গাইডে পাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা স্যান্ড্রা, অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে বলতে পারো?

না, তা আমার জানা নেই। সে সব খবর মিনস্কির কাছে লেখা আছে। ওয়ালিনস্কি নিজেও জানেন না। উনি শুধু টাকা চান। আর কোনও কৌতূহল নেই।

সে কি? যে সব লোক ওঁকে প্রতিমাসে লাখ লাখ ডলার দিচ্ছে তাদের গোপন পাপের খবর উনি কিছুই রাখেন না?

কেন রাখতে যাবেন বলুন তো? উনি পুরোপুরি হুলা মিনস্কির উপর নির্ভর করেন। ওয়ালিনস্কির নিজের চোরাই মাদক ওষুধের ব্যবসা আছে। উনি তাই নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। ব্ল্যাকমেলের কাজকর্মের ব্যাপার পুরোপুরি হুলার ওপর। ওয়ালিনস্কির ফেরার সময় হয়েছে এবার আমায় যেতে হবে। আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, ডার্ক?

পারো।

এখানে আমার অ্যাকাউন্ট আছে, কাজেই আপনাকে দাম দিতে হবে না, বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র ঘৃণা আর জিঘাংসায় স্যান্ড্রার সবুজ চোখজোড়া ঝলসে উঠল, মিনস্কির দেখা পেলে তাকে খুন করবেন না যেন। ওটা আমার জন্য তুলে রাখবেন, বলে সে হাত নেড়ে বিদায় নিল।

রাত প্রায় একটায় থ্রী ক্র্যাব রেস্তোরাঁ থেকে বেরোলাম। আগামীকাল সকাল থেকে আমার আর কিছুই করার নেই, অগত্যা বাড়ি ফিরলাম। বিল আগেই শুয়ে পড়েছিল। তাই আমিও শুয়ে পড়লাম। বালিশে মাথা রেখে স্যান্ড্রার কথা ভাবতে ভাবতে কোনপথে এগোব তাই ভাবছিলাম। শেষকালে কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ভারী জলখাবার খেতে খেতে স্যান্ড্রার সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে সব বিলকে বললাম। সব শুনে সে বলল, এবার তাহলে কি করবে ঠিক করলে?

আগে মিনস্কি তারপর অ্যাঞ্জেলাকে টিট করব। আমার ইচ্ছে তুমি অ্যাঞ্জেলার ওপর বেশী নজর রাখ। ওর সম্পর্কে আমাদের আরও জানা দরকার। ওর সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকো বিল, ও কি করে, কোথায় যায় সব ভালো ভাবে লক্ষ্য রাখবে। ও নিশ্চয়ই সারাদিন একা বাড়িতে বসে থাকে না। অ্যাঞ্জেলা লুকিয়ে কার সঙ্গে দেখা করে, কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, এগুলো আমার জানা দরকার।

বুঝলাম, কিন্তু তুমি এখন কি করবে?

আমি এখন যাব ডলি নামে সেই বেশ্যা মেয়েটার কাছে। হয়ত মিনস্কি এখন ওর কাছেই থাকে। ঐ বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আবার কথা বলব। মিনস্কি যেখানে যাই করে বেড়াক না কেন আমি তার ওপর ঠিক নজর রাখব জেনো। ঠিক আছে বিল, তুমি তাহলে অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রেখো, রাতে আবার দেখা হবে। বলে বেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম ডলির বাড়ি। তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির একতলায় দারোয়ান তার ঝাঁটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমায় দেখেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আবার এসেছেন দেখছি। টেরি জিগলাবের খোঁজ পেলেন?

না, আপাততঃ আমি আরেকজনকে খুঁজছি। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা কোনও লোককে দেখেছো যে গায়ে সবসময় সাদা কোট আর মাথায় চওড়া বনাত দেওয়া টুপি পরে?

সে ভাবলেশহীন ভাবে বলল, সারাদিনে কত লোককেই এখানে আসা যাওয়া করতে দেখি।

আমি এমন একজনের খোঁজ করছি যাকে বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা দেখতে যে সবসময় সাদা কোট পরে আর মাথায় চওড়া বনাত দেয়া টুপি পরে।

আসে হয়ত। হয়ত আমি তাকে দেখেছি।

ওয়ালেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, দেখো তো মনে করতে পারো কিনা?

প্রায় ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে পকেটে পুরে বলল, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। লোকটা ডলির

দালাল। প্রায়ই এখানে আসে, এলোমেলো ভাবে ঝাঁট দিতে দিতে নিজের মনেই বলে, এখানে থেকে এখানকার লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর দেওয়াটা আমার পক্ষে উচিৎ নয় মশায়। ওরা এটা ভাল চোখে দেখবেন না।

তুমি নিজে থেকে কিছু না বললে কেউ জানতে পারবে না।

মনে হয় ঠিকই বলেছেন।

লোকটাকে কেমন দেখতে তাই বলো।

এসব আমি বলতে পারবো না মশাই। যার কথা জানতে চাইছেন তার সঙ্গে আমার ঝামেলা হোক আমি তা চাইনা।

বুঝলাম অল্পে তার পেট ভরেনি। সে আরো টাকা চায়। আরেকটা দশ ডলারের নোট বের করে মুঠোয় রেখে তার দিকে তাকালাম।

দারোয়ান বলল, ওটা কি আমার জন্য? আপনি একটু আগে যেমন বলেছেন লোকটাকে তেমনি দেখতে। বেঁটে কাঠখোট্টা চেহারা। আমি মাত্র দুবার তাকে দেখেছি, তাতেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় ছেলেবেলায় কেউ ওর নাক মুখ পায়ে মাড়িয়ে থেৎলে দিয়েছিল। চ্যাপ্টা নাক, ঢালু কপাল, এককথায় বলব যে ওর মুখ দেখলে যে কেউ ভয়ে আঁতকে উঠবে। আবার আমার হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে, এটা সত্যিই আমায় দেবেন তো?

ওর চুলের রং কেমন? কালো, না লাল, না সোনালী?

তা বলতে পারবো না, যতদূর মনে হয় ও আজকালকার ক্ষ্যাপা ছোড়াদের মতন মাথা কামায়, আর হয়ত সেজন্যেই ও মাথায় সবসময় টুপি পরে থাকে। ওর মাথাটা ডিমের মত চাঁচাছোলা। লোকটা ভুরুও কামায়।

ভাবলাম এবার একটা খাঁটি খবর পেয়েছি যার ওপর ভিত্তি করে আমি এগোতে পারি। নোটটা দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম। কতদিন পর পর ও এখানে আসে?

জানি না। ওপরে বেশীক্ষণ কাটানোর মত সময় আমার হাতে নেই। ও গতকাল রাতে এখানে এসেছিল। ময়লা ফেলার পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম এমন সময় ওকে ঢুকতে দেখেছিলাম। এখনও হয়ত ওর বেশ্যাটার কাছেই আছে।

ঠিক আছে পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বলে লিফটে চড়ে ডলির অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পা টিপে টিপে এগিয়ে দেখি তার সদর দরজার হাতলের সঙ্গে একটা নোটিশ ঝুলছে, তাতে লেখা ঃ

বিরক্ত করবে না

বন্ধ দরজায় কান রাখতে ভেতর থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর গলার আওয়াজ আবছাভাবে কানে এল। মনে হল শোবার ঘরে আছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে ঢুকে একখানা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর নিজের ওপরেই বিরক্ত হচ্ছিলাম। অবশেষে একটা চল্লিশ নাগাদ দেখলাম ডলি ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, তার পেছনে একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোক। ডলির পরনে কাগজের মত পাতলা একটা ইমিটেশান চিতাবাঘের চামড়ার কোট। মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধা। কিন্তু ডলি সম্পর্কে আমার উৎসাহ নেই। তার সঙ্গের লোকটির ওপর আমার মনোযোগ।

ডলির সঙ্গের লোকটির মাথায় ছুঁচলো বনাত দেওয়া টুপি, গায়ে কালো উইন্ডচিটার, আর পরনে সাদা স্ল্যাক্স। এই লোকটিই তবে হলো মিনস্কি। আর চাঁচাছোলা ঘাড় আর রগ দেখে বুঝলাম যে সে নিয়মিত মাথা কামায়, সেইসঙ্গে এও দেখলাম তার ভুরুও পরিষ্কার ভাবে কামানো। লোমহীন সেই ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকালে ভয়ে গা শিউরে উঠে। তার চওড়া কাঁধ, বেঁটে খাটো পেশীবহুল দুটি পা দেখলে মনে হয় সে বুঝি মানুষ নয়, সভ্যতার এই জঙ্গলে এক হিংস্র গরিলা রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। এই লোকটিই সুজির মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে নিজ হাতে তার সুন্দর মুখখানায় অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছিল। নিজের অজান্তেই আমার ডানহাতটা আমার বুকের সঙ্গে বাঁধা রিভলভারের বাঁটটা বারবার মুঠো করে ধরতে লাগল। কয়েকটা গুলিতে

আমি এই শয়তানের ন্যাড়ামাথাটা ফাঁটিয়ে চৌচির করতে পারি কিন্তু স্যান্ড্রার কাছে কথা দিয়েছি, হাতে পেলেও আমি মিনস্কিকে খুন করবো না। স্যান্ড্রা নিজে সেটা করবে বাবার খুনের বদলা নিতে, তাই অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম।

হুলা মিনস্কি কয়েক পা এগিয়ে ফুটপাতে দাঁড় করানো একটা সবুজ রংয়ের ক্যাডিলাকের দরজা খুলে স্টিয়ারিং ধরে বসল, ডলি তার পাশে বসল। জোর স্পীডে গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই আমি বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিলাম। অনেক রাস্তা, অনেক গলি পেরিয়ে এক ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর সামনে মিনস্কি গাড়ি দাঁড় করালো। রেস্তোরাঁর দারোয়ান এসে গাড়ির দরজা খুলে দিতেই ডলি ও হুলা দুজনে হাত ধরাধরি করে রেস্তোরাঁয় ঢুকল।

রাস্তার শেষে গাড়ি রেখে রাস্তার অন্যপ্রান্তে ফিরে এলাম। ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর ঠিক উল্টোদিকে একটা স্যান্ডউইচ বারে ঢুকে দুটো বীফ পিকেল স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলাম। এখান থেকে রেস্তোরাঁর দরজাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কফি খেতে খেতে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম তারপর দেখলাম রেস্তোরাঁর দরজা খুলে ডলি একা বেরিয়ে এল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ডলি সোজা উল্টোমুখে হাঁটতে লাগল। বুঝলাম সে এখন আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উল্টোদিকের রেস্তোরাঁর সামনে এলাম। সামনেই মিনস্কির সেই সবুজ ক্যাডিলাক। আড়চোখে নম্বরটা দেখে নিয়ে আমার গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরও আধঘণ্টা পর মিনস্কি সেই ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। এবার একটি নতুন লোককে তার পাশে হাঁটতে দেখলাম। লোকটি লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মাথাভর্তি লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে নেমেছে। চোখে সানগ্লাস, পরনে গলা খোলা শার্ট আর জিনস্‌। লোকটার মাথায় কালো টুপি, তার বনাত নামিয়ে দেবার ফলে তার মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

সেই সবুজ ক্যাডিলাকে দুজনে চাপল। মিনস্কি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কিছু দূর এগোতেই আমি তার পিছু নিলাম' কিন্তু সী ভিউ অ্যাভিনিউতে ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে পড়ে আমি মিনস্কির গাড়িটাকে হারিয়ে ফেললাম। অগত্যা ফিরে এলাম সেই পুরোনো ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় নেপচুন রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলাম আমার চর অ্যাল বার্নি একমনে বীয়ার খাচ্ছে।

তার চোখে মুখে হাসি ফুটল আমায় দেখে। ওয়ালেট থেকে একটা কুড়ি ডলারের নোট বের করে নোংরা ভেজা শার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম, চটপট বলে ফেলো তো অ্যাল, হুলা মিনস্কির সঙ্গে একটা লম্বা পাতলা ছিপছিপে লোক ঘুরে বেড়ায়। মাথায় কালো টুপি। চোখে সানগ্লাস, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। লোকটা কে?

বিষাক্ত সাপ মিঃ ওয়ালেস। ওর নাম সল হার্মাস, জো ওয়ালিনস্কির ইয়াটটা ঐ চালায়। অর্থাৎ ঐ ইয়াটের ক্যাপ্টেন। লোকটা বিষাক্ত সাপের মত ধূর্ত আর হিংস্র। ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকবেন ততই আপনার মঙ্গল।

ওকে কোথায় পাবো বলতে পার?

আপনি আমায় প্রাণে না মেরে রেহাই দেবেন না দেখছি। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, শুনুন সী ভিউ অ্যাভিনিউর শেষ বাংলোটায় মিনস্কি যখন থাকে তখন সল হার্মাস ওই বাংলোতে থাকে।

ধন্যবাদ অ্যাল। আমার আর কিছুর দরকার নেই। বলেই বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। সী ভিউ অ্যাভিনিউর একধারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা দলে দলে বালুর ওপর শুয়ে আছে। কেউ বা বিকিনি কিংবা সাঁতারের পোশাক পরে জলে ঝাঁপাচ্ছে। খুব আস্তে গাড়ি চালাতে চালাতে আমি রাস্তার ধারের শেষ বাংলোটার দিকে একনজর তাকালাম।

বাংলোটায় গোটা ছয়েক ঘর নিশ্চয়ই আছে। বাংলোর চারিদিক ঘিরে কাঁটাতারের মজবুত বেড়া আর সদর দরজার ঠিক মুখেই দুজন ষণ্ডা চেহারার লোক সাদা ড্রিলের ট্রাউজার্স আর স্পোর্টস শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে চুইংগাম চিবোচ্ছে। তাদের দুজনেরই কোমরেব বেল্টে রিভলভার ঝুলছে। কিছুদূর এগিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরালাম। ফেরার পথে আবার বাংলোর দিকে তাকাতে দেখলাম সদর দরজার পাশে একটা লোক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের

কাছে বেশ বড়সড় একটা শিকারী কুকুর শুয়ে থাবা চাটছে। এই জাতের কুকুর দিয়ে সাধারণতঃ পুলিশ বিভাগে অপরাধীদের খুঁজে বেড়ায়। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম মিনস্কি এই মুহূর্তে বাংলোতেই আছে। তাকে ধরতে হলে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বেলাভূমির ধারে গাড়ি রেখে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকলাম। স্প্যানীশ বে হোটেলের টেলিফোন নম্বর ডায়াল করে বললাম, মিস স্যাড্রাকে দিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্যাড্রার গলা ভেসে এল।

হ্যালো কে বলছেন?

এখন কথা বলা যাবে?

যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। ওয়ালিনস্কি বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকছে।

আজ কোথায় কখন দেখা করবে বলে দাও।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয়, বলেই সে হঠাৎ জোর গলায় বলল। দুঃখিত, আপনি ভুল নম্বরে ফোন করছেন। বুঝলাম ওয়ালিনস্কি ঘরে ঢুকেছে। রিসিভার নামিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বসে ভাবলাম। তারপর সোজা গেলাম পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর টম লেপস্কি তার টেবিলে বসে কাজ করছিল। আরো দুজন ডিটেকটিভ নিজেদের টেবিলে বসে রিপোর্ট লিখছিল।

এই যে টম, ব্যস্ত নাকি?

দুচোখে ঠাণ্ডা পুলিশী চাউনীতে আমার দিকে তাকিয়ে টম বলল, কাল মাঝরাতে তুমি কোথায় ছিলে ডার্ক?

কোথায় ছিলাম জানতে চাইছো? কাল মাঝ রাতে আমি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে গপ্‌গপ্‌ করে ইটালিয়ান খানা খেয়েছি।

বান্ধবী? কে সে, কি নাম তার?

কিছুটা গম্ভীর ভাবেই বললাম, তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে এসব প্রশ্ন করার এক্তিয়ার তোমার নেই। কাল মাঝরাতে কোথায় ছিলাম তাইবা তুমি জানতে চাইছো কেন?

শোন, মিয়ামি পুলিশ জানিয়েছে আজ ভোরবেলা তারা সেখানকার বন্দরের কাছে হ্যাংক স্মেডলির লাশ জল থেকে উদ্ধার করেছে। মাথার পেছন দিকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাংক খুন হয়েছে আঃ, কি সুসংবাদ। একটা গেছে এখন অ্যাঞ্জেলা আর হুলা মিনস্কি এই দুটো দুশমন বাকি।

হ্যাংককে কে খুন করতে পারে বলো তো?

যেই করুক, সে তুমি নও, এটাই বলতে চাইছো তাই না, ডার্ক?

ঠিক ধরেছো, যাকগে। ঐ বাঁদরটা মরেছে সেজন্য কারও কোনও ক্ষতি হবে না। আমি কিছু খবরের জন্য তোমার কাছে এসেছি। আগে জানতে চাই সুজির মুখে যারা অ্যাসিড মেরেছিল তাদের কোন খোঁজ পেয়েছ কিনা?

দুঃখিত ডার্ক, আমরা শুধু অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

সল হার্মিস সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

জো ওয়ালিনস্কির ইয়াটের ক্যাপ্টেনের কথা বলছো?

হ্যাঁ।

না, ওর বিরুদ্ধে আমার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি, কিন্তু ওর সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল কেন?

টম, সুজির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল, ওর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে আমি ভুলব না। আমি নিজেও খোঁজখবর নিচ্ছি। সবকিছু গুছিয়ে তারপর তোমার কাছে আসব।

কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে দাও, ডার্ক। তাহলেই আমরা কাজে নেমে যাব।

হার্মিস সম্পর্কে কতটুকু জানো?

রাজার হালে থাকে, এর বাড়ির চারপাশে গুলিভরা রিভলভার নিয়ে জো ওয়ালিনস্কির লোকেরা পাহারা দেয়। তবে ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

এবার বলো হুলা মিনস্কি সম্পর্কে কতটুকু জানো?

ঐ বেজন্মার সঙ্গে সুজির মারা যাবার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে টম, ঐ বেজন্মাটাই সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল। অন্ততঃ সাক্ষীদের বর্ণনা শুনে বুঝেছি এটা তারই কাজ। ওর অ্যাপার্টমেন্টে স্মেডলিকে থাকতে দিত। ওরা দুজনে মিলেই সুজিকে শেষ করেছে।

শুধু মুখের কথায় তো হবে না, প্রমাণ চাই। উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে?

তেমন প্রমাণ এখনও আমার হাতে আসেনি, পেলে নিশ্চয়ই তোমায় দেব।

শোন ডার্ক। কিসের মধ্যে পা বাড়াচ্ছ সে সম্পর্কে এখনও তোমার ধারণা হয়নি। মিনস্কি লোকটা কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক। জানি, সুজির মারা যাবার ব্যাপারটা তুমি ভুলতে পারছ না। তুমি যা বলছো আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না। হয়ত অ্যাসিড ছোঁড়ার কাজটা মিনস্কি করেছিল। ও এ ধরনের কাজ করে বেড়ায়, তাহলেও বলব লোকটা ভয়ানক ধূর্ত, ওর পেছনে লেগে তুমি কিছুই করতে পারবে না, তারচেয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাও। স্মেডলি খুন হয়েছে, তোমার কমবেশী শোধবোধ হয়ে গেছে। ভগবানের দোহাই এসব থেকে দূরে থাকো।

টম, তুমি কি জানো যে এই শহরের কয়েকশো বাসিন্দাকে প্রত্যেক মাসে ব্ল্যাকমেলের টাকা যোগাতে হয়? প্রত্যেক মাসে শুধু এই শহর থেকেই ওঠে মোট পনেরো লাখ ডলার? সেই খোঁজ রাখো? খোঁজ নেবার লোক আমার আছে। ওরা তোমায় কিছু না বললেও আমার কাছে কিছুই চাপা রাখে না। শোন, প্রত্যেক মাসের এক তারিখ যাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে তারা টাকা দেয়। বড় বড় পয়সাওয়ালা লোকেরা স্মেডলিকে টাকা দিত। আর যারা ছোটখাটো তারা রাত তিনটেয় ওয়ালিনস্কির ইয়াটে গিয়ে টাকা দিয়ে আসত। স্মেডলিও যা টাকাকড়ি পেত, সব হুলা মিনস্কিকে দিত। রাত তিনটের সময় ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় দুজন লোক ছাড়া আর কেউ ঘুরে বেড়ায় না। সেই দুজন লোক হল তোমাদের দুই কনস্টেবল, ওখানে অপরাধ দমন করা যাদের কাজ। আমি তোমায় বলছি ঐ দুই পেট মোটা শুয়োরের বাচ্চাও কিন্তু মাফিয়ার কাছ থেকে টাকা খায়। আর খেয়ে চোখ বুজে ঘুরে বেড়ায়। কে ব্ল্যাকমেলের টাকা কার কাছে জমা দিচ্ছে তা জানার কোনও কৌতূহল ওদের আর নেই। ঐ দুটো কনস্টেবলকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসো। তারপর চালাক-চতুর আর ঘুষ খায় না এমন দুটো ছেলেকে ওখানে পাহারা দেবার কাজে বহাল করো, যারা ওয়ালিনস্কির ইয়াটে রাত তিনটেয় যাকে উঠতে দেখবে তাকেই জেরা করবে। আমার কথা শুনে কাজ করে দ্যাখো, ভাল ফল পাবে।

কিন্তু স্মেডলির আড্ডা তো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তাহলে পয়সাওয়ালার দল কোথায় টাকা জমা দেবে?

তা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আবার নতুন আড্ডা গজিয়ে উঠবে। গজিয়ে উঠলে তোমায় খবর দেবো।

ওপরওয়ালার সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে।

আমিও তাই চাই টম। তুমি আগে ওঁর সঙ্গে কথা বল, তারপর কাজে হাত লাগাও। মাসের পয়লা তারিখ আসতে আর মাত্র সাতদিন বাকি, বলে উঠে দাঁড়ালাম।

লেপস্কি বলল, মিনস্কিকে ঘাঁটাতে যেও না। তুমি একা নও। আমাদের পক্ষেও ওকে সামলানো সহজ হবে না। এই শহরে অনেক পয়সাওয়ালা লোক আছে যারা নিজেদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবার চাইতে মাসে মাসে ব্ল্যাকমেলের টাকা জুগিয়ে যাবে। কথাটা মনে রেখো।

ভারী নতুন কথা শোনাচ্ছো যেন। যাক গে টম, তোমার লোকেরা এই ব্ল্যাকমেলের কারবার বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা সেটা বলো?

ডার্ক, এতবড় ব্ল্যাকমেলের কারবার বন্ধ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা জানি যে ওয়ালিনস্কি এই কারবার দেখাশোনা করে কিন্তু তাতে কিছুই আসবে যাবে না। ব্ল্যাকমেলের টাকা জোগাচ্ছে, এমন তিন চারজন লোক আমাদের কাছে এসে যদি নালিশ করে, শুধু তাহলেই আমরা কিছু করতে

পারব। কিন্তু সেখানেও ভয় আছে। হয়ত তেমন তিনচারজন লোক আমরা যোগাড় করলাম। কিন্তু তারপর একদিন দেখব হ্যাংক স্মেডলির মত তাদেরও লাশ বন্দরের জলে ভাসছে। কুকর্মের সাক্ষী রাখবে না ভেবে ওয়ালিনস্কির দলের লোকেরা তাদের খুন করবে। আর তখন আমরা পড়ব মুশকিলে, কারণ ওয়ালিনস্কিকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোন রাস্তাই থাকবে না।

তাহলে তোমরা সব জেনেশুনেও কিছুই করছো না, তাই না?

ঠিক বলেছো ডার্ক। আমরা কিছুই করছি না।

তাহলে অন্ততঃ ঐ ওয়াটার ফ্রন্টের কনস্টেবল দুটোকে সরাও। তাহলেও ওদের চাকে যথেষ্ট ঘা দেওয়া হবে।

দেখি, আমি ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।

চলি টম, বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিলকে দেখতে পেলাম না বাড়ি ফিরে। আন্দাজ করলাম ও অ্যাঞ্জেলা থরসেনের ওপর নজর রাখছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে গাড়ি চালিয়ে থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় হাজির হলাম। ছটা বাজে। ভেতরে ঢুকতেই খবর পেলাম স্যান্ড্রা আমার জন্য দোতলায় অপেক্ষা করছে। এই সময় খদ্দেরদের ভীড় বাড়বার ফলে রেস্তোরাঁয় বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়।

দোতলার নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে দেখি স্যান্ড্রা বসে, হাতে সিগারেট।

ডার্ক, খাবার দাবার যা আনবার তাড়াতাড়ি আনতে বলুন, ওয়ালিনস্কি বেরিয়েছে, ঠিক সাতটায় ফিরবে।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে স্যান্ড্রার দিকে তাকাতে মনে হল ও মানুষ নয় শিকারের পেছনে ছুটে বেড়ানো এক রক্ত লোলুপ বাঘিনী।

মিনস্কিকে দেখেছি স্যান্ড্রা। তার আড্ডার খোঁজও পেয়েছি।

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, দেখেছেন? কোথায়?

সংক্ষেপে সব কথা বললাম। সল হার্মাসের সঙ্গে তার বাংলোয় গিয়ে হুলা আশ্রয় নিয়েছে তাও বললাম।

ঠিকই ধরেছেন। ঐ বাংলোটাকে আমরা সবাই খামার বাড়ি বলি। আমার বাবার পরামর্শে ওয়ালিনস্কি ওটা বানিয়েছিল। ওখানে সবসময় কড়া পাহারা থাকে। মিনস্কি যতক্ষণ ঐ বাড়ির ভেতরে থাকবে ততক্ষণ কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না।

খুব ভাল কথা। আমরা অপেক্ষা করব। একসময় তো ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তখন আমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

স্যান্ড্রা বলল, মাসের শেষদিন ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। ঐ একমাত্র সুযোগ। কথা শেষ করে এক ভয়ঙ্কর হাসি হাসল যা দেখে আমি শিউরে উঠলাম। এর আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর হাসি আমি দেখিনি।

তুমি না দেখলেও আমি হুলাকে দেখেছি। ওকে সামনে পেলে তুমি কি করবে?

আগে ওকে জ্যান্ত পাই তারপর ভাবব। আমার বাবাকে খুন করার ফল ওকে পেতেই হবে।

কিন্তু হুলা মিনস্কিকে তো তুমি আর জালে ধরতে পারবে না। জ্যান্ত বাঘ ধরার মত ব্যাপার।

স্যান্ড্রা বলল, রাস্তা অনেক আছে। দেখি মাথা খাটিয়ে কিছু বের করা যায় কিনা। ওয়ালিনস্কি তিনদিনের জন্য নিউইয়র্ক যাবে। আপনি আগামী বৃহস্পতিবার আবার এখানে আসবেন তখন কথা হবে।

বৃহস্পতিবার অর্থাৎ মাসের পয়লা তারিখ। বেশ, তাই আসব।

খাওয়া শেষ করে স্যান্ড্রা কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল, আমার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে এক দুর্বোধ্য কঠিন নিষ্ঠুর হাসি হেসে সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আমিও নীচে চলে এলাম।

।। আট ।।

অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজায় চাবি ঘুরিয়ে রাত দশটার কিছু পরে বিল ঢুকল। হাতে স্কচ হুইস্কির গ্লাস নিয়ে আমি তখন একমনে ভাবছিলাম।

তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে সেই সঙ্গে সোঁ সোঁ বাদল হাওয়া বইছে। বিলের গায়ে ম্যাকিন্টস থেকে জল ঝরে পড়ছে দেখে আরেকটা গ্লাসে স্কচ ঢেলে এগিয়ে দিতেই সে খেঁকিয়ে উঠল।

খবরদার ডার্ক, এখন আমায় কোনও প্রশ্ন করবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আগে আমি পেট পুরে খাব, তারপর যা বলার বলব। তোমার টেবিলের মত একখানা বড়সড় জম্পেশ স্টেক না খেয়ে একটা কথাও আমি বলব না, চলো বেরোও।

অজানা নয় আমার বিলের স্বভাব। তাই ম্যাকিন্টস গায়ে চাপিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে তার পেছনে পেছনে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সে একখানা বড় স্টেক সাবাড় করল। সেইসঙ্গে একরাশ ভাজা পেঁয়াজ আর ফ্রাই। উল্টো দিকে বসে কাঁকড়ার স্যালাড নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, আমায় দেবার মত কোনও খবর আছে?

এখনও আমার পেট ভরেনি। সে ওয়েটারকে একটা অ্যাপেল পাইয়ের অর্ডার দিল, এই রাক্ষসের সঙ্গে চলতে হলে ধৈর্য না ধরে উপায় নেই, তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছিল। শুধু একটা হটডগ খেয়ে আধঘণ্টা বৃষ্টির ভেতর বসে থেকেছি।

কোনও খবর আছে কিনা জানতে চাই।

নিশ্চয়ই আছে, অনেক খবর। শোন আজ সকাল এগারোটা থেকে অ্যাঞ্জেলার আস্তানার ওপর নজর রেখেছি। কিন্তু একবারের জন্যও তাকে চোখে পড়েনি। তারপর বেলা বারোটা নাগাদ মিসেস স্মেডলি ঝুড়ি হাতে বাজার করতে বেরোলেন। তারও দশ মিনিট পর বাড়ির ভেতর থেকে অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে বাগানে এল। তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, তার ভেতর গাড়িতে বসে দেখলাম ও ভিজতে ভিজতে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজের মনে বক বক করছে। হঠাৎ দেখলাম ও রেগেমেগে কয়েকবার আকাশের দিকে তাক করে ঘুঁষি মারল। তারপর দুহাত মুঠো করে নিজের মাথায় কয়েকবার ঠুকল, মনে হল ওর মাথার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ ঐভাবে বক বক করতে করতে বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা এঁটে দিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে মিসেস স্মেডলি ঝুড়ি হাতে নিয়ে বাজার করে ফিরলেন। দুঘণ্টা আর কিছু দেখতে পেলাম না। ঠিক দুঘণ্টা পরে ঝামেলা শুরু হল। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়ে মানুষের গলার আর্তনাদ ভেসে এল। সে আর্তনাদ শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমি গাড়ি থেকে নেমে বসার ঘরের কাচের জানলায় উঁকি দিলাম। ভেতরে তখন রীতিমত নাটক শুরু হয়েছে। অ্যাঞ্জেলা হাতে একটা বড় বাঁকানো ছুরি নিয়ে মিসেস স্মেডলির দিকে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে আর তিনি এককোণে দাঁড়িয়ে ওকে শান্ত হতে বলছেন। হঠাৎ অ্যাঞ্জেলা চেঁচিয়ে উঠল, বেরো! কেলে কুত্তী! দূর হয়ে যা এখান থেকে। আমার টেরিকে এক্ষুণি চাই। মিসেস স্মেডলির চোখমুখ খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি দেয়ালের দিকে সেঁপিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এদিকে অ্যাঞ্জেলা ছুরি হাতে ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়াতে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে কলিং বেলের সঙ্গে শরীরটাকে চেপে ধরলাম। ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই হয়ত অ্যাঞ্জেলার চিৎকার থেমে গেল। মিসেস স্মেডলি এসে দরজা খুলে দেন। দেখলাম তিনি ঘামছেন। আমি বললাম, মাপ করবেন, আমি রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকার তরফ থেকে আসছি, ভাবছিলাম...। কথা শেষ করার আগেই উনি আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটু অপেক্ষা করে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার সামনে। এবার দেখলাম অ্যাঞ্জেলা বসে দুহাত মুঠো করে নিজের মাথায় মারছে আর হাতের ছুরিটা পড়ে আছে মেঝেয়। মিসেস স্মেডলি সেটা কুড়িয়ে রাখলেন। ফিরে অ্যাঞ্জেলাকে দুহাতে চেপে ধরলেন। ও বাধা দিতেই উনি এক থাপ্পড় কষালেন তার গালে আর তার চোটে ও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তখন উনি তাকে পাঁজাকোলা করে পাশের ঘরে গেলেন, তারপর আর কিছু ঘটেনি। এই হল ঘটনা, ডার্ক। এখন বুঝেছি অ্যাঞ্জেলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে।

ও কি এইভাবে ভাইয়ের নাম ধরে চেঁচাচ্ছিল?

ঠিক তাই।

হ্যাংকের বাবা জোশ বলেছিল যে টেরি অর্থাৎ ভাই চলে যাবার পরই ওর জীবনে আঁধার নেমে এসেছিল। কিন্তু ভাইয়ের কি হয়েছিল? সে কোথায়? আমার মনে হচ্ছে রহস্যের জট ছাড়াতে পারে শুধু একজন, সে হল অ্যাঞ্জেলার ভাই টেরি।

খুব ভাল কথা, তবে কি করছ?

আমি মিসেস থরসেনের সঙ্গে কথা বলব। শুধু উনিই পারেন বলতে অ্যাঞ্জেলা সুস্থ কিনা। খাঁটি খবর দিতে পারে দুজন, জোশ স্মেডলি ও বৌ হান্না স্মেডলি। আমি দুঃখিত বিল, তোমার ফিরে গিয়ে আবার অ্যাঞ্জেলার বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে। আমি যাচ্ছি মিসেস থরসেনের কাছে দেখি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা।

বিল বলল, বলছ যখন যাওয়া যাক। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোচ্ছি এমন সময় বিল বলল, কতক্ষণ নজর রাখব—সারারাত?

ওখানেই ঘোরাফেরা করো বিল, আমি বললাম, দ্যাখো ভিতরে কি হচ্ছে। মিসেস থরসেনের সঙ্গে দেখা করে তোমার কাছে যাব। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওখানে থেকো।

আমি আর বিল যার যার গাড়িতে থরসেনদের বাড়ির দিকে এগোলাম। গেট থেকে গজ দুয়েক দূরে গাড়ি পার্ক করলাম, আর বিল সরু পথ ধরে অ্যাঞ্জেলার বাড়ির কাছে গাড়ি পার্ক করল।

গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এগোতে চোখে পড়ল গোটা থরসেন প্রাসাদ নিকষ আঁধারে ডুবে আছে। শুধু জোশ স্মেডলির ঘরে আলো জ্বলছে। বুঝলাম মিসেস থরসেন বাড়িতে নেই। রাত সাড়ে নটা বাজে হয়তো মিসেস থরসেন একটু পরেই ফিরে আসবেন। ইতস্ততঃ করে স্থির করলাম জোশের সঙ্গে কথা বলব।

চারবার কলিংবেল টেপবার পর জোশ সদর দরজা খুলল এবং প্রশ্ন করল, আপনি সেই বেসরকারী গোয়েন্দা মিঃ ওয়ালেস তাই না? কিন্তু মিসেস থরসেন এখন বাড়ি নেই।

মিসেস থরসেন নয় জোশ, আমি তোমার সঙ্গেই কিছু কথা বলতে এসেছি, বলে তার পাশ কেটে একরকম জোর করেই ভেতরে ঢুকলাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোশ তার ঘরে নিয়ে গেল। তার মুখ থেকে স্কচ হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। ওর খাটের পাশে টেবিলের ওপর ছিল এক বোতল স্কচ হুইস্কি, তার পাশে গ্লাস।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই শুনেছো যে তোমার ছেলে হ্যাংক আর বেঁচে নেই। তাকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোশ বলল, শুনেছি মিঃ ওয়ালেস। আমি বহুবার তাকে সাবধান করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি, ও আমায় উপহাস করেছে। ভেবেছিল ওর দলের লোকেরা চিরকাল ওর দেখাশোনা করবে। যাক, ওর আত্মা শান্তি পাক, বাপ হিসেবে এই কামনাই করে যাব।

জোশ, তুমি একবার আমায় বলেছিলে যে টেরি আর অ্যাঞ্জেলা একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি ছিল, কতটা কাছাকাছি ছিল তা আমায় খুলে বল।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভাল করে ভেবে বল জোশ ওরা পরস্পরের কতটা কাছাকাছি ছিল।

অ্যাঞ্জেলা টেরিকে দেবতার মত ভক্তি করত। টেরি যখন গান বাজনার ঘরে গিয়ে পিয়ানো বাজাত সে সময় অ্যাঞ্জেলা দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে সেই বাজনা শুনতো। দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে জোশ গ্লাসের পানীয়ে চুমুক দিল, মিঃ টেরি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরই অ্যাঞ্জেলার মেজাজ পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছিল। আমার বৌ ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারত না।

জোশ আমার মনে হয় মিঃ থরসেনের খারাপ ব্যবহারে টেরি উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল আর শেষকালে তিনি যে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন তা অ্যাঞ্জেলা মেনে নিতে পারেনি। সে মন থেকে ধরেই নিয়েছিল যে টেরি আবার ফিরে আসবে। তুমি কি আমার ধারণার সঙ্গে একমত?

জোশ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, অ্যাঞ্জেলার মনে তখন কি বাসা বেঁধেছিল তা আমি বলতে পারব

না।

আমার মনে হয় অ্যাঞ্জেলা ইচ্ছে করেই ওর বাবা মিঃ থরসেনের সঙ্গে একদিন বিশ্রী ঝগড়া বাঁধিয়েছিল। যে ঝগড়া থেকে ওর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়, তারপর সেই অবস্থায় সে ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আর তারই ফলে টেবিলের কোণে মাথা ঠুকে গিয়ে উনি মারা যান।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও জোশের উত্তর না পেয়ে বললাম, আমার কথা নিশ্চয়ই তোমার কানে গিয়েছে জোশ। আমার মনে হচ্ছে ভাই যাতে বাড়ি ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যেই সে তার বাবাকে খুন করেছিল। সেই সময় কেউ নিশ্চয়ই তাকে দেখে ফেলেছিল আর সেই কারণেই সেই লোকটি তাকে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে, যে টাকা অ্যাঞ্জেলা তোমার ছেলে হ্যাংকের হাতে প্রত্যেক মাসে দিত।

আপনার ধারণা ভুল মিঃ ওয়ালেস। হ্যাঁ, মিস অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে মিঃ থরসেনের একটা ঝগড়া খুব বিশ্রী ঝগড়া হয়েছিল, তার মৃত্যুর সময় একমাত্র আমিই তার পাশে ছিলাম। বাবা আর মেয়ের সে ঝগড়াও আমি নিজের কানে শুনেছি। আমি ভেতরে ঢোকার আগেই মিস অ্যাঞ্জেলা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে দেখি হার্টে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মিঃ থরসেনের মুখ নীল হয়ে উঠেছে। এক হাতে বুক চেপে ধরে অন্য হাতে তিনি টেবিলের দেরাজ থেকে ওষুধের বড়িগুলোকে বের করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, যে বড়িগুলো হার্ট অ্যাটাকের সময় উনি খেতেন। আমি ঘরের ভেতর ঢুকতেই উনি আমায় দেখতে পান। আমিই এগিয়ে এসে দেরাজের ভেতর থেকে বড়িগুলো সরিয়ে নিই।

কি বলছ তুমি জোশ?

ঠিকই বলছি মিঃ ওয়ালেস, তারপর ওষুধ না খেয়ে তিনি জ্ঞান হারান। আর পড়ে যাবার সময় টেবিলের কোণায় ওর মাথাটা ঠুকে যায়, তার ফলে রগে ক্ষত সৃষ্টি হয়। আমি কিন্তু ওকে একবারের জন্যও ছুঁয়েও দেখিনি। কিছুক্ষণের জন্য লাইব্রেরী থেকে চলে যাই, ফিরে দেখি উনি মারা গেছেন। আব...আর এইভাবে আমি ওকে খুন করেছিলাম।

ওর স্বীকারোক্তি শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম, তারপর বললাম, তুমি যা বলছ তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তুমিই মিঃ থরসেনকে খুন করেছিলে।

হ্যাঁ তাই, আমি ওকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু কেন?

তাহলে এর আগের কয়েকটা ঘটনা আপনার জানা দরকার। প্রায় ত্রিশ বছর আমি মিঃ থরসেনের বাটলারের কাজ করেছি। মিসেস থরসেনের বিয়ের পর থেকেই আমি এখানে কাজে ঢুকেছিলাম। আমি খুব ভাল বাটলার ছিলাম। মিঃ থরসেন আমার কাজে খুব খুশি হতেন। তারপর আমার ছেলে হ্যাংকের জন্ম হল, তারপরেই শুরু হল ঝামেলা। হ্যাংক বড় হবার পর আমি মিঃ থরসেনকে বলে কয়ে বাগান দেখাশোনার কাজে ওকে লাগিয়ে দিই। মিঃ থরসেন ওকে সামান্য মাইনে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বাগানের কাজে হ্যাংকের মনটাও বেশ বসে গেল। ভাবলাম ভবিষ্যতের একটা হিল্লে হল। তারপর মিস অ্যাঞ্জেলা ওর মাথাটি খেল। তার বয়স তখন মাত্র তের আর হ্যাংকের চব্বিশ। আমার ছেলে কিন্তু ততটা খারাপ ছিল না, কিন্তু কচি মেয়েদের পাল্লায় পড়লে যা হয় আর কি। মিস অ্যাঞ্জেলা ওর সঙ্গে এমন কিছু নোংরামি শুরু করল যা অশ্লীল। একদিন ব্যাপারটা মিসেস থরসেনের চোখে পড়ে যায়। তিনি মিঃ থরসেনকে বলেন, তাতে হ্যাংকের চাকরী যায়। হ্যাংকের স্বভাবও ততদিনে খারাপ হতে চলছিল, বদ বন্ধু জুটিয়ে নানারকম কুকাজে হাত পাকাচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দিল। বিচারে তার ছ'মাসের জেল হয়।

গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে সে আবার বলতে লাগল, তারপর আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া হতে লাগল ছেলেকে নিয়ে। সবসময় খিটিমিটিতে আমার মনের শান্তি ঘুচে গেল। আর সবকিছু ভোলার জন্য আমি মদ ধরলাম। একদিন মিঃ থরসেন আমায় ডেকে বললেন, আমি অনেকদিন তাঁদের কাজ করছি। তাই উনি ওর উইলে আমার নামে পাঁচ হাজার ডলার লিখে দেবেন। কথাটা শুনে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। হ্যাংক জেল খেটে এসেও

নানারকম অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে লাগল। তারপর মিঃ থরসেন টের পেলেন যে আমি ফাঁক পেলেই মদ খাই। উনি রেগে গিয়ে বললেন যে মাস শেষ হলেই যেন আমার মাহিনা নিয়ে কাজ ছেড়ে দিই। আর এও বললেন যে ওর উইল থেকে আমার নামটা কেটে দেবেন। ওর কথায় আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এই সুন্দর বাগান ঘেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনার ঠিক দুদিনের মধ্যে হ্যাংক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ও আমায় বলল যে পাঁচ হাজার ডলার পেলে ও একটা নাইট ক্লাব চালু করতে পারে। আমি বললাম অতটাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। হ্যাংক শুনে বলল যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে পাঁচ হাজার ডলার সে যোগাড় করবে। ডাকাতি করে ধরা পড়লে ওর লম্বা মেয়াদের জেল হবে তাই ওকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললাম। আর তখনই বুদ্ধিটা আমার মাথায় এল। আমি ঠিক করলাম যে মিঃ থরসেন হঠাৎ মারা গেলে আমার চাকরিটাও বজায় থাকবে আর উইল অনুযায়ী আমি তখন হ্যাংককে পাঁচ হাজার ডলার দিতে পারব। মিসেস থরসেন অন্ততঃ আমায় কাজ ছেড়ে যেতে বলবেন না। আর ঠিক তাই হল। হাতের নাগাল থেকে ওষুধ সরিয়ে নেবার ফলে মিঃ থরসেন মারা গেলেন আর আমিও পাঁচ হাজার ডলার পেয়ে হ্যাংককে দিয়ে দিলাম। আমার চাকরীও আগের মতই বহাল থাকল। আজ হ্যাংক খুন হওয়ায় মনে হচ্ছে কাজটা আমি ভাল করিনি। মিঃ থরসেনকে ঐভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া আমার ঠিক হয়নি। আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। যত তাড়াতাড়ি আমি যেতে পারি ততই মঙ্গল।

জীবনে অনেক আঘাত খাওয়া এই বিধ্বস্ত মানুষটির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল, চেয়ার থেকে উঠে বললাম, জোশ, করোনার মিঃ থরসেনের পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে লিখেছিলেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওর মৃত্যু ঘটেছে। তুমি আমায় যা বলেছো তা কিন্তু মনে রাখিনি, রাখব না। বিদায় জোশ, আর কোনদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব না।

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে জোশ বসে রইল, বেরিয়ে আসার মুখে আমারও মনে হল সত্যিই এই হতভাগ্য প্রৌঢ়ের আর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, ঈশ্বর ওকে মুক্তি দিন। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে মনে হল হ্যাংকের মত এক অপদার্থ ছেলের জন্য পুত্র স্নেহান্ধ জোশকে শেষ পর্যন্ত তার মনিবকে খুন করতে হল। হ্যাঁ, এও একরকম খুন বৈকি।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যাব এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা সাইরেনের আওয়াজ এগিয়ে আসছে, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমার পাশ কাটিয়ে সেই বাড়ির দিকে ঢুকে গেল যেখানে অ্যাঞ্জেলা মিসেস স্মেডলির সঙ্গে থাকে। ভ্যানের পেছন পেছন একটা গাড়ি ছুটে গেল, তার মধ্যে দুজন লোক বসে আছে। বিল ওখান থেকে সবকিছু নজর রাখছে জানি তাই আমি আর এগোলাম না। গাড়িতে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর একটা রোলস রয়েসও সেদিকে ছুটে গেল। দেখলাম গাড়ির পেছনের সিটে মিসেস থরসেন এলিয়ে বসে আছেন। আরও আধঘণ্টা যেতে আবার সেই সাইরেনের শব্দ। অ্যাম্বুলেন্সটা এবার ফিরে যাচ্ছে তার পেছনে সেই গাড়িটা। আরোহীদের দূর থেকে দেখে ডাক্তার বলে মনে হল। মিসেস থরসেনকে নিয়ে সেই রোলস রয়েসখানা বেরিয়ে এসে থরসেন প্রাসাদের দিকে ছুটে গেল। এবার আমি অ্যাঞ্জেলার বাড়ির দিকে এগোলাম। বারবার হেডলাইট জ্বালিয়ে আর নিভিয়ে বিলকে আমার উপস্থিতির কথা জানাতে লাগলাম।

বাড়ির গেটের কাছে আসতেই দেখি বিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়ছে। গাড়ি থামতেই ও দরজা খুলে পেছনের সীটে বসল। মুখ না ফিরিয়েই বললাম, যা যা ঘটেছে সব খুলে বল।

উত্তেজিত ভাবে বিল বলল, ঘটেছে অনেক কিছুই। ঠিক সময়মত এসে পৌঁছেছিলাম। মিসেস স্মেডলি বসার ঘরে চুপ করে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে অ্যাঞ্জেলা ঘরে ঢুকল হাতে সেই ছুরিটা। ও পা টিপে টিপে স্মেডলির দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু মিসেস স্মেডলি চিন্তায়

এতই মগ্ন যে টেরই পায়নি। ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছিল অ্যাঞ্জেলাকে। মিসেস স্মেডলি খুন হতে যাচ্ছে দেখে আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। এমন সময় হঠাৎ মিসেস স্মেডলি বিপদের গন্ধ পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন তারপর একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাঞ্জেলার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিলেন আর এক ধাক্কা মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দিলেন। তারপর দুহাতে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক পর এ ঘরে ফিরে কাকে যেন টেলিফোন করলেন। অ্যাঞ্জেলার হাত পা বোধহয় তিনি বেঁধে রেখেছিলেন তাই ও চিৎকার করে বারবার বলল, টেরিকে ওর কাছে নিয়ে যেতে। তার কুড়ি মিনিট পর একটা অ্যাম্বুলেন্স এল...

জানি, তাদের আমি ঢুকতে দেখেছি। তারপর কি হল?

ওরা অ্যাঞ্জেলাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকাল আর তখুনি মিসেস থরসেন এসে হাজির হলেন। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ওরা অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে চলে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার পর মিসেস থরসেন ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথাবার্তা শুনতে না পেলেও মিসেস থরসেনের চোখমুখ দেখে মনে হল তিনি মিসেস স্মেডলির ওপর খুব রেগে গেছেন। এরপর তিনি ব্যাগ থেকে দুটো পাঁচশো ডলার খুলে টেবিলের ওপর রেখে মনে হয় ওকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে বিল, তুমি গাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো আমি মিসেস স্মেডলির সঙ্গে কথা বলছি। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক সময়েই এসেছি।

দরজা খোলাই ছিল। আমি পায়ে পায়ে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মিসেস স্মেডলি একটা আর্ম চেয়ারে বসেছিলেন, তিনি আমায় দেখে চিনতে পারলেন।

আপনি আবার এসেছেন? এবার কি মনে করে?

চেয়ারে বসে আমি বললাম, মিসেস থরসেন আপনাকে জবাব দিয়েছেন এটা কি ঠিক?

হ্যাঁ, আর এখান থেকে চলে যেতে পারলে আমার চাইতে বেশী খুশী আর কেউ হবে না। থরসেন পরিবার আমার সব সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছে। এবার আমি আমার আত্মীয়দের কাছে ফিরে যাব। কুড়ি বছর পর আজ মুক্তি পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব!

শুনে আমিও খুশি হলাম মিসেস স্মেডলি। যাবার আগে থরসেন পরিবারের লোকেদের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর যদি দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব। আচ্ছা, অ্যাঞ্জেলাকে এতদিন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কেন বলতে পারেন?

হ্যাঁ বলব, চলে যাবার আগে অন্ততঃ একজনকে সব কথা জানিয়ে যাওয়া দরকার। শুনুন মিঃ ওয়ালেস, আমাদের পরিবারে আমরা তিনবোন আর চার ভাই আছি। ওরা আমায় আনন্দের সঙ্গে থাকতে বলবে। আমাদের পরিবার খুব বড়। মিস অ্যাঞ্জেলার জন্যই এতদিন এখানে ছিলাম নয়ত কবে চলে যেতাম। অ্যাঞ্জেলা জন্মের পর থেকেই আমার কাছে বড় হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দানা বেঁধেছিল আর তা জেনেই আমি ওকে সব কাজে সব ব্যাপারে সাহায্য করতাম। মিসেস থরসেন অর্থাৎ ওর মা ওর জন্য কিছুই করেন নি। মিস অ্যাঞ্জেলা ওর ভাই টেরিকে দেবতার মত ভক্তি করত। বড় হবার পর দিনরাত ওর পাশে ঘুর ঘুর করত। ফলে টেরি অ্যাঞ্জেলার ওপর খুব বিরক্ত হত। আমি অ্যাঞ্জেলাকে অনেকবার হুঁশিয়ার করেছি কিন্তু ও শোনেনি। অ্যাঞ্জেলার উৎপাতে বাজনার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে তালা দিয়ে টেরি পিয়ানো বাজাত। অ্যাঞ্জেলা বাইরে বসেই ওর বাজনা শুনত। এরপর টেরির সঙ্গে ওর বাবা মিঃ থরসেনের খুব ঝগড়া হয়, তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। যাবার আগে টেরি বোনের কাছে বিদায় পর্যন্ত নেয়নি। ব্যাপারটায় অ্যাঞ্জেলা খুব ধাক্কা খায় তারপর থেকেই ওর পাগলামি বেড়ে যায়। ওকে সামলাতে আমার বেশ বেগ পেতে হত। তারপর মিঃ থরসেন হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাবার আগে মোটা টাকা আর এই বাড়ি উনি অ্যাঞ্জেলার নামে উইল করে দিলেন। অ্যাঞ্জেলা তার বাবার মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী পাওনা টাকাকড়ি নিয়ে এখানে এসে উঠল। নিজের মাকে চিরকাল ঘেন্না করে। সারাদিন অ্যাঞ্জেলা কোন কাজে হাত দিত না শুধু নিজের মনে বিড় বিড় করে বকে যেত। মাঝে মাঝে মিসেস থরসেনকে সব বলে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু শুধু অ্যাঞ্জেলাই নয় মিসেস থরসেনকেও আমি পছন্দ করতাম না। অ্যাঞ্জেলার মন ভালো

রাখার জন্য আমি ওকে বাগানের কাজকর্ম দেখাশোনা, নিদেন পক্ষে বাড়ির চারপাশে কিছু একটা দেখার কথা বলতাম কিন্তু ও কোন পাত্তাই দিত না। একদিন একটা লোক এসে ওর সঙ্গে দেখা করল।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে মিসেস স্মেডলি আবার বলতে লাগলো, সদর দরজা খোলাই ছিল তাই ঘণ্টা না বাজিয়ে লোকটা সোজা এই বসার ঘরে এসেছিল। আপনি এখন যে চেয়ারে বসেছেন সেখানে বসে সে অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে কথা শুরু করে। তখন আমি রান্নাঘরে রাতের ডিনার তৈরী করছিলাম। তার টুপি খুলতেই চোখে পড়ল তার মাথায় একটাও চুল নেই, ঠিক তরমুজের মত কামানো। তার ভুরুতেও চুল ছিল না তার ফলে তাকে ঠিক শয়তানের মত দেখাচ্ছিল। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি তাই রান্নাঘর থেকে বার বার বেরিয়ে তাদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ কানে এল লোকটা বলল, যে টেরি কোথায় আছে তা সে জানে। টেরির নাম শুনে অ্যাঞ্জেলা লাফিয়ে ওঠে। বারবার চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছিল টেরি কোথায় আছে। ঐ লোকটা তখন তাকে বলেছিল যে টেরি চায় না তার গোপন আস্তানার কথা সবাই জানুক। লোকটা এও বলল যে, টেরি পিয়ানো বাজিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছে।

শয়তানটা বলল যে টেরির দুশমনরা যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে তাই সে সবসময় তার ওপর নজর রাখছে। আমি শুধু শুধু তাকে বাঁচাতে যাব কেন। তাই বলছি ভালোয় ভালোয় প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবে গিয়ে দশ হাজার ডলার দিয়ে আসবে। যতদিন ঐ টাকা দেবে ততদিন কেউ তোমার ভাইয়ের একটা চুলও ছুঁতে পারবে না। কিন্তু টাকা দেওয়া বন্ধ করলে আমি আর তোমার ভাইকে বাঁচাতে পারবো না। তখন টেরির দুশমনরা এসে হাতুড়ি দিয়ে তার দুহাত ভেঙ্গে দেবে, সে আর জীবনে পিয়ানো বাজাতে পারবে না।

একটু থেমে দম নিয়ে মিসেস স্মেডলি বলতে লাগলেন, এ আজ থেকে দশ মাস আগের ঘটনা। মিস অ্যাঞ্জেলা লোকটির কথায় রাজী হল, লোকটা এও বলল যে অ্যাঞ্জেলার এক পুরোনো বন্ধু ঐ নাইট ক্লাবে থাকবে টাকাটা তার হাতে দিলেই চলবে। বুঝতেই পারছেন তার পুরোনো বন্ধুটি ছিল আমার হতভাগ্য ছেলে হ্যাংক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে তাকে আর জন্মাতে না হয়। তা ঐ লোকটি চলে যাবার পর অ্যাঞ্জেলাকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বললাম যে লোকটা বদ মতলব নিয়ে এসেছিল, সে নিজেই জানে না টেরি কোথায় আছে। আসলে ভাঁওতা দিয়ে প্রত্যেক মাসে দশ হাজার ডলার রোজগার কবাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা তা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করতে লাগল, বারবার বলল টাকা না দিলে টেরির দুশমনরা হাতুড়ি দিয়ে তার দুহাত ভেঙ্গে দেবে তখন আর সে পিয়ানো বাজাতে পারবে না। তারপর থেকে টানা দশ মাস এই খেলাই চলতে লাগল, প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার ডলার পেলে ও আমার অপদার্থ ছেলের হাতেই দিতে লাগল। মনে হয় টাকাটা এইভাবে দিয়ে ও মনে মনে শান্তি পায়। অন্ততঃ এর ফলে ওর পাগলামিটা কিছুটা কমল। আমার করার কিছুই ছিল না, সব দেখেশুনে তাই চুপ করে থাকতাম।

সেই ন্যাড়ামাথা লোকটা অল্প কিছুদিন পরে আবার এসে অ্যাঞ্জেলাকে বলল যে এক লাখ ডলার পেলে সে টেরির সঙ্গে অ্যাঞ্জেলার দেখা করিয়ে দিতে পারে। আর তার কয়েকদিন পর আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ অকল্যান্ডকে বললেন যে এক ভদ্রমহিলা টেরির নামে এক লাখ ডলার উইল করে দিয়ে গেছেন, টেরি যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকাটা দাবী করবে ততক্ষণ সেটা ব্যাঙ্কে পচবে। টেরিকে দেখবার জন্য অ্যাঞ্জেলা পাগলের মত হয়ে উঠেছিল, তাই সে স্থির করল যেভাবে হোক ব্যাঙ্ক থেকে ঐ একলাখ ডলার হাতাতে হবে। তখনই তার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এল। অ্যাঞ্জেলা জানত যে আপনি বা মিঃ অকল্যান্ড কেউই আগে টেরিকে দেখেননি। তাই টেরির বয়সী কোন ছেলেকে যদি টেরির মত সাজিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে তাকেই নিখোঁজ ভাই বলে সনাক্ত করা যায় তাহলে মিঃ অকল্যান্ড ঐ একলাখ ডলার তাকে দিয়ে দেবেন। অ্যাঞ্জেলা তার মতলব হ্যাংককে খুলে বলতেই সে ঐ বয়েসী ছেলেকে এনে হাজির করল। তারপরের ঘটনা তো সবই জানেন। টাকাটা না পেয়ে যেদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরল সেদিন তাকে মনে হয়েছিল এক হিংস্র চিতা বাঘিনী। ক্ষিদের সময় শিকার ফসকে যাওয়ায় সে ভয়ানক রেগে গেছে। আপনার উদ্দেশ্যে

বারবার গালি দিতে দিতে বলল যে, আপনার নিশ্চয়ই কোন বান্ধবী আছে, হ্যাংকের সাহাযে সে তার এমন ক্ষতি করবে যা আপনি চিরদিন মনে রাখবেন।

খানিকক্ষণ থেমে আবার বলতে লাগল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, ফিরল তিনচার ঘণ্টা বাদে শুধু বলল হ্যাংক তার কথায় রাজী হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজে আপনার বান্ধবীর কথা পড়ে আমার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। আমি দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস, কিন্তু অ্যাঞ্জেলার মাথার এখন ঠিক নেই। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ।

আমার চোখের সামনে একটা পুরোনো দৃশ্য ভেসে উঠল। অ্যাসিডে ঝলসানো মুখ দুহাতে ঢেকে সুজি রাস্তার ওপর ছুটছে। একটা ভারী ট্রাকের চাকার নীচে তার দেহটা পিষে থেঁতলে গেল।

তাহলে অ্যাঞ্জেলার এখন কি হবে?

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যে দুজন ডাক্তার এসেছিলেন তারা মিসেস থরসেনকে বললেন যে ওঁর অ্যাঞ্জেলাকে পাগলা গারদে নিয়ে রাখবেন, আর তাঁরা এও বললেন যে ওর মাথা আর এ জীবনে সুস্থ হবে না। দিনরাত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘরের ভেতর তালাবন্ধ করে ওকে রাখতে হবে। অর্থাৎ ধরেই নিতে হবে যে অ্যাঞ্জেলা বেঁচে নেই সে মৃত।

মিসেস স্মেডলি কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে নিসংকোচে তা আমায় বলুন। আমার গাড়িতে করে আপনাকে আপনার আত্মীয়দের বাড়ি পৌঁছে দেব কি?

থাক, আমার আর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই আমার আত্মীয়ের বাড়ি যেতে পারব।

কয়েক মিনিট বাগানে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, আবহাওয়াটা ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে হ্যাংক খুন হয়েছে। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে গেছে অর্থাৎ তিন দুশমনের মধ্যে দুজন ঘায়েল আর বাকি আছে হুলা মিনস্কি। জো ওয়ালিনস্কির ডানহাত সেই ন্যাড়া মাথা শয়তান যাকে দেখলে সবাই ভয়ে আঁতকে উঠে। মিনস্কির গুলিতেই যে হ্যাংক মারা গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নিশ্চয়ই জো ওয়ালিনস্কির হুকুমে হুলা তাকে খুন করেছে। আর হুলা মিনস্কিকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার মন কখনোই শান্ত হবে না। হ্যাঁ, তখনই আমার শোধ নেবার পালা শেষ হবে প্রতিশোধ নিলেও আমার সুজিকে কি ফিরে পাব?

বিল গাড়িতে অপেক্ষা করছিল, আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, এবার বাড়ি চলো।

বাড়ি গিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে মিসেস স্মেডলির মুখ থেকে শোনা সব কথা বিলকে খুলে বললাম, শুধু মিঃ থরসেনকে স্মেডলি কিভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়েছিল সেকথা চেপে গেলাম। জোশকে কথা দিয়েছি এই ঘটনা আমি ছাড়া কেউ জানবেনা।

এখন মিনস্কিকে খতম করা ছাড়া আমার মাথায় আর কোনও পরিকল্পনাই নেই বিল, বলে আমি খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম, থাই স্যান্ড্রার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ঘুম এল না। শেষকালে স্লিপিং পিল খেয়ে একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

সকালে উঠে স্নান সেরে জলখাবার খাচ্ছি এমন সময় বিল বলল, কে যেন টেলিফোনে কথা বলতে চায়।

হ্যালো, রিসিভার তুলে বললাম, আমি ডার্ক ওয়ালেস বলছি, আপনি কে?

আমি স্যাম বলছি মিঃ ওয়ালেস, উল্টোদিক থেকে চেনা গলা এল, নেপচুন রেস্তোরাঁ খালি। অ্যাল বার্নি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলছে খুব দরকারী।

অ্যাল কোথায় স্যাম?

এখানে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে, বলছে আপনার জন্য ও অপেক্ষা করছে।

ওকে বলো কুড়ি মিনিটের ভেতর আমি যাচ্ছি। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ, বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

বিল তুমি বাড়িতেই থাকো, আমি অ্যাল বার্নির সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসছি।

ওকথা বললে শুনছি না। বিল খেঁকিয়ে উঠল, বাড়িতে বসে থাকা পোষাবে না। আমিও যাবো,

বসে থাকতে হয় গাড়িতে থাকব।

কাপ প্লেট টেবিলে রেখে বিলকে নিয়ে হাজির হলাম নেপচুন সরাইয়ে। বিলকে গাড়িতে রেখে ভেতরে ঢুকলাম। বার্নি এককোণে বসে পাউরুটি চিবোচ্ছিল, আমি চেয়ারে বসলাম।

খাবার খাবেন মি ওয়ালেস? বার্নি জানতে চাইল।

না, আমি ব্রেকফাস্ট সেরেই এসেছি অ্যাল, ইচ্ছে হলে একটা বীয়ার খেতে পার আমি দাম দিয়ে দেবো।

কেউ চাইলে আমি না বলি না মিঃ ওয়ালেস, বলেই বার্নি স্যামকে ইঙ্গিত করল, আর সে একপ্লেট সসেজ আর বীয়ার এনে তার সামনে রাখল।

একসঙ্গে সসেজ ও বীয়ার গলায় ঢালল বার্নি। তারপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ ওয়ালেস, আমি কাউকে প্রশ্ন করিনা, সবসময় শুধু সব কথা শুনে যাই। মনে আছে নিশ্চয়ই যে আপনি টেরি জিগলার সম্পর্কে খোঁজখবর চাইছিলেন। ওর সম্পর্কে আপনার কৌতূহল আছে কি?

আছে অ্যাল, যা জানো আমায় বল।

অ্যাল বার্নি বলল, আপনাকে একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তার নাম চাক সলস্কি। একসময় ও বেআইনী হিরোইন ও চরস ছেলেদের কাছে বিক্রী করত, তারপর মাফিয়ারা ওর বাজার নষ্ট করে নিজেরাই শুরু করে। আমি জেনেছি টেরি জিগলার ওর বন্ধু ছিল। সলস্কির টাকা দরকার। আমার মনে হয় কিছু ডলার দিলে...চাক জিগলারের খবর দিতে পারে। দশনম্বর ক্ল্যাস আলির ছাদের চিলেকোঠায় চাক থাকে। এর চাইতে বেশী কিছু জানি না।

ধন্যবাদ অ্যাল, আমি ওয়ালেট বার করতেই সে আমার হাত চেপে ধরে বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি আমার বন্ধু, বন্ধুর কাছ থেকে আমি টাকা নিই না।

গাড়িতে ফিরে বিলকে সব বলতেই সে বলল, ক্ল্যাস আলি? কাছেই, এই ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকারই সবচেয়ে পুরোনো বস্তি ওটা। ওখানে কোন বাড়িতে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। যে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক আছে সেগুলো শীগগিরই ভেঙ্গে ফেলা হবে।

এসব খবর তুমি কোত্থেকে জানলে?

বিল হাসল, তোমার বার্নিই শুধু মাটিতে কান পেতে থাকে না, ডার্ক। আমিও তোমারই মত একজন গোয়েন্দা আর খবর বের করাই আমার কাজ তা ভুলে যেও না। গাড়িতে ওঠো, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমায় সেখানে পৌঁছে দেব।

অল্প কিছুক্ষণের ভেতরে বিল আমায় একটা পুরোনো বস্তির সামনে পৌঁছে দিল, গোটা চারেক পুরোনো পাঁচতলা বাড়ি এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ভেতরে একটি বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বিল বলল, ঐ তোমার দশ নম্বর ক্ল্যাস আলি।

বাড়িটার প্রত্যেকটি তলার কাঁচের জানালাগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, সদর দরজার পাল্লা ভেঙ্গে হেলে পড়েছে। একরাশ নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, বিল সঙ্গে এল। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখলাম, একতলা দোতলা তেতলা চারতলা সব খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কেউ নেই।

ছাদে উঠে দেখি সামনে চিলেকোঠার দরজা ভেজানো। দরজার গায়ে টোকা দিতে লাগলাম কিন্তু ভেতরে কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে পাল্লা খুলে গেল। সাবধানে ভেতরে ঢুকলাম। বিল বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি এর আগে পশ্চিম মিয়ামির বহু নিগ্রো বস্তি দেখেছি। কিন্তু এই গুদামঘরের তুলনায় সেগুলো স্বর্গ। ঘরের ভেতর একটা প্যাকিং কেসকে টেবিল বানানো হয়েছে। তার পাশে দুটো টুল, এককোণে একখানা ভাঙ্গা খাট। এঁটো খাবার দাবারের আবর্জনা আর খবরের কাগজের ডাঁই মেঝেতে পড়ে আছে। সে সবের গন্ধে আমার মাথা ঘুলিয়ে উঠল।

একটি লোক খাটের ওপর ময়লা চাদর পেতে ঘুমোচ্ছে। পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় বহুদিন তার ভাল খাওয়া জোটেনি। তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে জট পড়েছে। ঘন দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা পড়লেও তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। তার গায়ের দুর্গন্ধে বোঝা

যায় অনেকদিন সে স্নান করেনি।

তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম। অ্যাই চাক! ওঠো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সে চোখ পিটপিট করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল। আপনি কে? এখানে কি চান?

আমি তোমায় কিছু টাকা দিতে পারি কিন্তু তার বিনিময়ে আমার কিছু খবর চাই। বলে ওয়ালেট থেকে দুটো একশ ডলারের নোট দেখিয়ে বললাম, বল এ দুটো তোমার চাই?

বড় বড় চোখে সে নোট দুটোর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ফোর্ট নক্সের সরকারী সোনার বাঁট থরে থরে তার সামনে সাজানো।

হ্যাঁ, টাকার আমার বড্ড দরকার। বলতে বলতে সে তার নোংরা জট ধরা চুলে আঙ্গুল চালাতে লাগল।

বলেছি তো টাকা দেব কিন্তু তার বদলে আমার খবর চাই।

কি খবর চান?

তোমার মাথা ঠিক কাজ করছে তো? আমার সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে তো?

চাক মাথা নীচু করে নোংরা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। আমি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাই কারণ ঘুমানো ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই। ঘুমোবার সময় ভাবি হয়তো এই আমার শেষ ঘুম, ঘুমের ভেতরেই আমার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তা আর হয় না। আবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে তবু আধমরা হয়ে আজও বেঁচে আছি। চাক আমায় খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, কি খবর জানতে চান? আপনি কি পুলিশের লোক?

না, আমি এসেছি টেরি জিগলারের খোঁজে।

কেন? ওর খবর দিয়ে আপনার কি দরকার?

সে তোমার না জানলেও চলবে চাক। তুমি বলো দুশো ডলারের বদলে ওর খবর দেবে কিনা?

খবর পেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যাবেন না তো?

একটা একশো ডলারের নোট তার কোলের ওপর দিয়ে বললাম, এবার বিশ্বাস হলো তো? খবর দিলে বাকিটা পাবে। এবার মুখ খোল।

এমনভাবে সে টাকাটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল যেন সেটা একটা বাচ্চাদের খেলার পুতুল।

জানেন, গত তিনদিন ধরে আমার পেটে কিছু পড়েনি? খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। আপনি বসুন। সব কথা বলব।

প্যাকিং বাক্সের ওপর আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে চাক মুখ খুলল। সে এক বিচিত্র কাহিনী। ডেড এন্ড নাইট ক্লাবে টেরির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। চাক আগে থেকেই চোরাই মাদক ওষুধের কারবার করত। চাকের নিজের ছিল হিরোইনের নেশা, তার সঙ্গে মেলামেশার ফলে টেরিও ঐ নেশার কবলে পড়ল। চাকের একটা মুশকিল ছিল। সহজেই মাল যোগাড় করতে পারত কিন্তু তা ভাল করে কাটাতে পারত না। টেরি বলল চিন্তা নেই। সে তার সব মাল কাটিয়ে দেবে। বিকেলের দিকে বেরিয়ে টেরি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সব মাল বিক্রী করে দিত। নাইট ক্লাবে, তার বাজনার অনুরাগী কমবয়েসী ছেলেমেয়েদেরও অল্প সময়ের মধ্যে সে হিরোইনের খদ্দের বানিয়ে ফেলল। এইভাবে চাক আর টেরির হিরোইন কেনা বেচার কারবার ফুলে ফেঁপে উঠল। এক বুড়ো চীনার কাছ থেকে চাক মাল কিনত আর টেরি সে মাল কাটাত।

আমার মেয়েমানুষের নেশা ছিল না। আমি ভাল খেয়ে পরে দিনরাত রাজার হালে থাকতে ভালবাসতাম। কিন্তু টেরি লিকা নামে এক বান্ধবী জুটিয়েছিল। ওরা দুজনে একই সঙ্গে থাকত। আমাদের কারবার দাঁড়িয়ে যাবার পরই শুরু হল আসল ঝামেলা। এক সোমবার সকালে আমি সেই বুড়ো চীনার কাছে মাল কিনতে গেছি। সেখানেই হুলা মিনস্কিকে দেখলাম। আপনি মিনস্কিকে চেনেন?

চিনি। তুমি বলে যাও।

মিনস্কি আমার যোগানদারের টেবিলে বসে আছে দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। সে আমায় কারবার গুটিয়ে ফেলার হুকুম দিল। আর বলল সে-ই স্থানীয় খদ্দেরদের মাল যোগাবে। এও বলল যে টেরি যেন হিরোইন বেচা ছেড়ে এখান থেকে চলে যায়।

আমি জানতাম হুলা মিনস্কি কি সাংঘাতিক লোক। তার কথামত না চললে ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তাও আমার জানা ছিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে টেরিকে সব বললাম। কিন্তু ও বিশেষ পাত্তা দিল না। তবে সুটকেশ নিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে এল।এদিকে মালের অভাবে রোজগার বন্ধ। টাকাকড়ি যা জমিয়েছিলাম দুজনেই তার সব উড়িয়ে ফেলেছি। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ঘরভাড়া দেবার পয়সাও রইল না। টেরিকে বললাম অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে কারবার শুরু করব কিন্তু ও তাতে রাজি হল না। মিনস্কির হুকুমকে সে একদম গুরুত্ব দিল না। টেরি বলল যে অন্তত পঞ্চাশজন বাঁধা খদ্দের সে হারাতে চায় না। আর সত্যিই অল্পদিনের ভেতর আর কয়েকজন চীনা যোগানদার সে জুটিয়ে ফেলল। তার কাছ থেকে মাল কিনে সে আবার আগের মত খদ্দেরদের কাছে বেচতে লাগল। আমি কিন্তু তখনই বিপদের গন্ধ পেলাম। বুঝলাম মিনস্কি চুপ করে থাকবে না। তার হুকুম না মানার জন্য সে টেরিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। টেরির একার রোজগারের পয়সায় আমি ভাগ বসালাম না। দিনরাত ঘরে বসে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

দুজনে এক সপ্তাহ পর একদিন রাতে ঘরে বসে আছি। এমন সময় লাথি মেরে দরজা খুলে মিনস্কি তার দুই ষণ্ডামার্কা সাকরেদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। আমি দুহাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে উঁপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তাই কি হল তা দেখতে পেলাম না। কিন্তু থেকে থেকে মট মট করে হাড়গোড় ভাঙ্গার শব্দ আর টেরির আর্তনাদ আমার কানে আসছিল। কিছুক্ষণ পর আমার পাঁজরে এক লাথি মেরে বলল, তুই আমার কথা শুনে কারবার ছেড়েছিস তাই তোকে প্রাণে মারলাম না। তোর আর প্রাণের ভয় নেই কিন্তু তোর বন্ধুকে আর ফিরে পাবি না। তাকে আমরা নিয়ে চললাম বলে দরজা খুলে সাকরেদদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি চোখ খুলে আর টেরিকে দেখতে পেলাম না। টেরি তখন কোথায় জানতে চান? মিনস্কি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে আধমরা শরীরটা সিমেন্ট ভর্তি একটা বস্তায় পুরে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। টেরি আর কোনদিন ফিরে আসবে না। আমার হাতে তখন টাকাকড়ি নেই বাধ্য হয়েই এই ভাঙ্গা পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া আমার আর কিছু চাইবার নেই।

আমার মনে কিন্তু চাকের জন্য সামান্যও সহানুভূতি জাগল না। যে পাষণ্ড কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের কাছে হিরোইন বেচে পয়সা রোজগার করে তার এর চাইতেও বেশি শাস্তি হওয়া দরকার। আমি আরেকটা একশ ডলারের নোট তার বিছানায় রেখে সেই অন্ধকার গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিল গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ওর সব কথা শুনেছি। সত্যি থরসেন পরিবারে এই দুই ভাইবোন দুটি রত্ন।

হতেই পারে। মিঃ থরসেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন কেউই আদর্শ অভিভাবক ছিলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বিল বলল, হ্যাংক মরেছে। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে, টেরির মৃত্যু সংবাদ নিজেই শুনলে। তাহলে বাকি রইল শুধু মিনস্কি। তাই না?

হ্যাঁ, আর এও জেনো যে মিনস্কিকে খতম করাটা খুব সহজ হবে না। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্যান্ড্রার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ও কিভাবে মিনস্কিকে খতম করতে চায়, আমি শুনতে চাই, তবে যা হবার আজ রাতের মধ্যেই হবে। বলে গাড়ি স্টার্ট করলাম।

স্যান্ড্রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয়। দোতলার নির্দিষ্ট কেবিনে আমি ঢুকতেই সে বলল, আসুন ডার্ক আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি, বলেই সে ককটেলের বোতলের দিকে ইঙ্গিত করল।

এখন ওসব খাব না।

আজ স্যান্ড্রার পরনে ধপধপে রেশমী সাদা পোশাক। একরাশ ঘন কালো চুল তার ঘাড়ে

এক অদ্ভুত আর হিংস্র আনন্দে ঝলসে উঠছে তার চোখ দুটি। এরকম মূর্তিমতি সর্বনাশী কোন মেয়েকে দেখার সৌভাগ্য এর আগে আমার হয়নি।

নিজের গ্লাসে মার্টিনি ঢালতে ঢালতে স্যান্ড্রা বলল, চুপ করে আছেন কেন? আমায় কি আপনার কিছুই বলার নেই? এখানে ডেকে আনলেন কেন?

গম্ভীর গলায় বললাম, স্যান্ড্রা এবার থেকে ওয়ালিনস্কির মাসিক্ বরাদ্দের দশহাজার ডলার ঘাটতি পড়বে।

সে কি? কেন, কিভাবে?

অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে যে পাগলা গারদে নেওয়া হয়েছে সে সব সংক্ষেপে বললাম। সব শুনে কঠিন হাসি হেসে স্যান্ড্রা বলল, তাহলে ওয়ালিনস্কি এবার সত্যিই মুশকিলে পড়বে। ওর ওপরওয়ালা মাফিয়া সর্দাররা ওকে খতম করে সে জায়গায় নতুন লোক বসাবে।

ওয়ালিনস্কির জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। আমার দরকার হুলা মিনস্কিকে।

গম্ভীর ভাবে স্যান্ড্রা বলল, হ্যাঁ, ওকে আমি নিজের হাতে খুন করে বাবার খুনের বদলা নেব। কিন্তু লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সবসময় দেহরক্ষী নিয়ে চলে। তবে আমিও কম যাই না। আমার কাছে একটা অটোমেটিক পিস্তল আছে। তাই দিয়ে আমি ওর বুক থেকে পেট পর্যন্ত গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।

কিন্তু এতো আত্মহত্যার সামিল হবে। ওর দেহরক্ষীরা তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছো? মিনস্কি খুন হলে তার দেহরক্ষীরা তোমাকেও খুন করবে।

না ডার্ক, মিনস্কির দেহরক্ষীরাও আমার গায়ে হাত দেবার সাহস পাবে না। দলের সবাই জানে যে আমি ওয়ালিনস্কির ডান হাত। ওয়ালিনস্কি নিউইয়র্কে গেছে। আগামীকাল রাতে ফিরবে। ফিরে যখন জানবে যে আমি হুলা মিনস্কিকে খুন করেছি তখন সে আমায় খুন করার হুকুম দেবে। কিন্তু তার আগে আমি তার নাগালের বাইরে চলে যাব। আমার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করা হয়ে গেছে। মিনস্কিকে খতম করেই আমি কেটে পড়ব। আর কেউ আমায় খুঁজে পাবে না। কাজেই আপনি আর আমার প্রাণের জন্য চিন্তা করবেন না। নিজের ব্যবস্থাটুকু করার মত ক্ষমতা আমার আছে। শুনুন ডার্ক, আপনি শুধু মিনস্কিকে দেখিয়ে দেবেন। আপনি তাকে একবার দেখেছেন কিন্তু আমি নিজের চোখে তাকে দেখিনি। নিরীহ লোকের গায়ে আমি গুলি ছুঁড়তে পারি না।

বেশ তাই হবে স্যান্ড্রা।

স্যান্ড্রা মুচকি হেসে বলল, আপনি তো হ্যাংকের নাইট ক্লাব বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন ব্ল্যাকমেলের টাকা জমা পড়বে বুড়ো ফু চায়ের রেস্তোরাঁয়। আগামীকাল মাসের পয়লা তারিখ। তাই আজ রাত তিনটেয় মিনস্কি সেখানে আসবে। আমি আমার গাড়িতে চেপে আগেই ওখানে চলে যাব। আপনিও দুটো নাগাদ যাবেন।

ঠিক আছে, দুটো নাগাদ আমি সেখানে পৌঁছে যাব তোমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে এটাই আশা করছি।

গ্লাসে মার্টিনি ঢালতে ঢালতে ও বলল, আমার পরিকল্পনা সবসময় নির্ভুল হয়, ডার্ক। তাহলে রাত দুটোর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি মার্সিডিজে চেপে আসব, রেস্তোরাঁর পাশেই গাড়ি রেখে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। মিনস্কি এলে আপনি শুধু আমায় দেখিয়ে দেবেন। কেমন?

পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারো আমার ওপর। বলে নীচে নেমে এলাম। বিল গাড়ি স্টার্ট দিতেই বললাম, ফু চায়ের রেস্তোরাঁ চেনো?

চিনি। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকার পুবদিকের শেষ বাড়িতে ঐ রেস্তোরাঁ। আগে ভালই চলত; কিন্তু ওর মালিক ফু চায়ের বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। ঠিকমত দেখাশোনা করতে না পারার ফলে খদ্দেরদের ভিড় অনেক কমে গেছে। কিন্তু ঐ রেস্তোরাঁর খোঁজ করছ কেন?

বিলকে সংক্ষেপে স্যান্ড্রার পরিকল্পনার কথা বললাম। ব্ল্যাকমেলের টাকা এখন ওখানেই জমা পড়ছে। আজ রাত দুটোয় আমরা ঐ রেস্তোরাঁর পাশে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করব। তিনটে নাগাদ মিনস্কি এসে পৌঁছলে আমি তাকে চিনিয়ে দেব, তারপর স্যান্ড্রা নিজের হাতে তাকে খতম

করবে। তুমি রিভলবার নিয়ে আসবে। সব কিছু যদি ভালোয় ভালোয় মিটে যায় তো চিন্তার কিছু নেই। যদি না মেটে তাহলে দুপাশ থেকে গুলি ছুঁড়ে স্যান্ড্রাকে কভার করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সে দায়িত্ব আমাদের দুজনের।

বিল বলল, স্যান্ড্রা যদি মিনস্কিকে খুন করে পালিয়ে যায় তাহলে কি আমরা কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে আমাদের আগের চাকরীতে আবার যোগ দিতে পারব?

নিশ্চয়ই। মিনস্কি খুন হলে তুমি আর আমি দুজনেই আবার আমাদের চাকরীতে যোগ দেব।

চলো খেয়ে নিই। বলে বিল লুসিনোর রেস্তোরাঁয় গাড়ি দাঁড় করাল। বড় চিংড়ি আর স্টেক দিয়ে আমরা ডিনার সারলাম। কফির অর্ডার দিয়ে বিল প্রশ্ন করল, স্যান্ড্রা যে মতলবটা এঁটেছে তাতে তোমার কাজ হবে বলে মনে হয়?

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, মেয়েটা আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা বিল, কাজ হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যদি না হয়, যদি ওর গায়ে গুলি লাগে, তাহলে বাকি কাজটুকু আমিই সারবো। কিন্তু স্যান্ড্রা বলছে যে দেহরক্ষীরা ওকে গুলি করার সাহস পাবে না। সবই ওর ওপর নির্ভর করছে।

চলো, বাড়ি ফেরা যাক। হাতে এখনও পুরো তিনঘণ্টা সময় আছে। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে।

ওয়াটার ফ্রন্টের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখলাম আগের সেই পুরোনো কনস্টেবলের বদলে দুজন নতুন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। দুজনেই বয়সে যুবক, মুখে কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার ছাপ। যাক, আমার উপদেশ মত লেপস্কি তাহলে সত্যিই এখানে নতুন লোক বসিয়েছে। এরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে ওয়ালিনস্কির ব্ল্যাকমেলের কারবার একদিনে বন্ধ করে দিতে পারে।

বিল বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। রিভলবার দুটো পরিষ্কার করে গুলি ভরে আমিও কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিলাম। দেড়টা বাজতে বিলকে তুলে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে ফু চায়ের রেস্তোরাঁ থেকে ত্রিশ গজ দূরে গাড়ি পার্ক করে স্যান্ড্রার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। গাড়িতে বসে দেখলাম বহুলোক রেস্তোরাঁয় ঢুকছে। তাদের মধ্যে কিউবান, চীনা, আমেরিকান সব জাতের লোক আছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা আবার বেরিয়ে আসছে। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে এরা সবাই ব্ল্যাকমেলের শিকার।

একটা ছোট মার্সিডিজে চেপে দুটোর পর স্যান্ড্রা এলো। বিল ঐ যে স্যান্ড্রা এসেছে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ওর কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে এখান থেকে গুলি করে কভার করবে।

বিল প্রশ্ন করল, ডার্ক, যদি ঝামেলা হয় তাহলে গুলি করে সবকটাকে শেষ করব?

একশোবার, নইলে ওদের গুলিতে আমরাই শেষ হয়ে যাব।

গাড়ির দরজা খুলে স্যান্ড্রার পাশে বসলাম। অন্ধকারে ওকে ঠিক পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। হালকা দু একটা কথা বলে চুপ করে যেতে বুঝলাম ও কথা বলতে চাইছে না।

চুপচাপ বসে আধঘণ্টা কেটে গেল। আরও আধঘণ্টা পর তিনটে নাগাদ স্যান্ড্রা ফিসফিসিয়ে বলল, ঐ যে ওরা আসছে। একটা বড় ক্যাডিলাক এসে রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়াল। চারজন স্বাস্থ্যবান যুবক রিভলবার বাগিয়ে গাড়ি থেকে নামল। পেছনে নামল হুলা মিনস্কি। লম্বা চওড়া আর স্বাস্থ্যবান দেহরক্ষীদের মাঝখানে তাকে বেঁটে বামনের মত লাগছিল।

ঐ যে হুলা মিনস্কি। ঐ বাঁটকুল বেজন্মা বদমাশটাই তোমার বাবাকে খুন করেছিল। যা করবার তাড়াতাড়ি করে ফেল।

ধন্যবাদ ডার্ক, বলে গাড়ি থেকে নেমে স্যান্ড্রা মিনস্কির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দে তার চার দেহরক্ষী চমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু স্যান্ড্রাকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্যান্ড্রা চাঁচাছোলা গলায় সেই শয়তানের নাম ধরে ডাকল, মিনস্কি? আমি স্যান্ড্রা। জো ওয়ালিনস্কির কাছ থেকে একটা দরকারী খবর তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। বলতে বলতে স্যান্ড্রা

রেস্তোরাঁর বারান্দায় আলোর নীচে মিনস্কির মুখোমুখি দাঁড়াল। আমি নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মিনস্কি আর চারজন দেহরক্ষীর ওপর নজর রাখলাম।

স্যান্ড্রার নাম শুনে মিনস্কির দেহরক্ষীরা সবাই পিছনে সরে গিয়েছিল। স্যান্ড্রার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একপলক দেখে মিনস্কি বলল, তুমিই স্যান্ড্রা? জো ওয়ালিনস্কির হঠাৎ আমাকে কি দরকার পড়ল?

রুক্ষ জোরালো গলায় স্যান্ড্রা বলল, উনি তোমার জন্য বিশেষ জরুরী খবর পাঠিয়েছেন।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু খবরটা কোথায়?

ওটা এর ভেতরে রেখেছি। বলে স্যান্ড্রা তার ব্যাগটার জিপ খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল। সে ব্যাগ খুলতে চার দেহরক্ষী আরও পিছিয়ে গেল। স্যান্ড্রার প্রত্যেকটি কথা বলার ভঙ্গি, তার পদক্ষেপ এত পেশাদার আর নিখুঁত যে মিনস্কি সন্দেহ করতেই পারল না। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্যান্ড্রার দিকে। আর সেই ফাঁকে বিদ্যুতের বেগে স্যান্ড্রা অটোমেটিক পিস্তল বের করল। মিনস্কি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই পিস্তলের অনেকগুলো বুলেট বিঁধে গেল তার বুকে ও পেটে। নিদারুণ যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে গেল দুহাতে পেট চেপে মিনস্কি মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল

পুতুলের মত মিনস্কির দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইল। পদমর্যাদায় স্যান্ড্রা মিনস্কির চাইতে বড়, হয়তো তাই পাল্টা গুলি চালাতে তারা সাহস পেল না।

স্যান্ড্রা ওপরওয়ালার মত মেজাজে তাদের বলল, শোন সবাই। ওয়ালিনস্কির ইচ্ছেতেই ওকে খতম করতে হল। এবার পুলিশ আসার আগে ওর লাশটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

আপনি যখন বলছেন তখন তাই করব মিস স্যান্ড্রা।

মিনস্কির মৃতদেহটার দিকে স্যান্ড্রা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে তারপর পেছন ফিরে কোন ব্যস্ততা না দেখিয়ে যেন নিতান্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটেছে এমনি ভাবে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে বসল। ঠাণ্ডা মাথায় এই অনুষ্ঠানটি দেখে আমার মত ঝানু গোয়েন্দাও তাজ্জব হয়ে গেল।

স্যান্ড্রা বলল, দেখলেন তো ডার্ক। এবার পুলিশ আসার আগে এখান থেকে কেটে পড়ুন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, তাহলে আপনার আর আমার দুজনেরই শোধবোধ হয়ে গেল। কেমন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

মার্সিডিজ গাড়ি স্টার্ট নিল। তার হাসিমাখা কথা কানে এল।

এই আমাদের শেষ দেখা ডার্ক। এরপর আর হয়তো কখনও দেখা হবে না।

হুঁশিয়ার স্যান্ড্রা মাফিয়ার হাত কিন্তু খুব লম্বা। যেখানেই যাও না কেন ওরা ঠিক তোমার পেছন পেছন ধাওয়া করবে।

আমার পা দুটো খুব লম্বা ডার্ক। আমি ওদের চেয়ে বেশি জোরে দৌড়তে পারি, বিদায়! বলেই নিমেষে মিলিয়ে গেল গাড়ি।

পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শোনা যেতেই মিনস্কির চার দেহরক্ষী তার মৃতদেহটা গাড়ির পেছনে ক্যারিয়ারে নিয়ে তুলল। আমার প্রয়োজন মিটেছে ভেবে দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিল আগেই ভেতরে বসেছিল। সে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। অনেকগুলো গলি ঘুপচির ভেতর দিয়ে একসময় বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। এখন আমাদের লক্ষ্য সোজা বাড়ি।

অ্যাঞ্জেলা, হ্যাঙ্ক, মিনস্কি তিনজনেই তাদের পাওনা বুঝে পেয়েছে। শোধ নেবার মত আর কিছু এখন মাথায় আসছে না। কিন্তু সুজির কথা বহুদিন আমি ভেবে যাব এই শোধ নেওয়ার পরেও। জীবনীশক্তি আর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আমার সেই প্রিয়বান্ধবী, ভয়ঙ্কর মৃত্যু যাকে বরণ করতে পেরেছে। যাই করি না কেন, ওর শূন্যস্থান আর কেউ পূর্ণ করতে পারবে না।

বাড়ির সদর দরজা ভাল করে এঁটে আমি আর বিল দুজনে বসলাম। বাপরে। মেয়ে বটে একখানা। মিনস্কিকে খুন করার দৃশ্য ভোলার নয়। এমনভাবে এগিয়ে এসে গুলী ছুঁড়ল যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়, ঠিক পেশাদার খুনীদের মত। চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক।

বিল ঘড়ি দেখে বলল, পাঁচটা বাজে। ভাল করে ঘুমিয়ে উঠে সকালে ভারী ব্রেকফাস্ট খেয়ে

তারপর আমরা কর্নেলের কাছে গিয়ে বলব, স্যার। আমরা বদলা নিয়েছি। আমাদের আবার কাজে বহাল করুন।

ঠিক আছে বিল তাই হবে।

বিল কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ডার্ক, এবার দুঃখের পুরনো স্মৃতি ভুলে যাও। অতীতকে আঁকড়ে ধরে কেউ বাঁচতে পারে না। সবাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বেঁচে থাকে। আগামীকাল সকালে আবার নতুন দিন শুরু হবে। নতুন জীবনও। চলো, আমরা শুতে যাই।

বড় মোড়াখাটের বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকেছে, সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে। হ্যাংক আর মিনস্কি দুজনেই খতম হয়েছে। পাশের বালিশে আদর করার মত আলতো হাতে বোলালাম। এই বালিশে সুজি মাথা রেখে কত রাত আরামে ঘুমিয়েছে।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। সূর্যের সোনালী আলোয় ঘরটা ভরে উঠেছে।

ঠিকই বলেছে বিল। অতীতকে আঁকড়ে ধরে আমি বাঁচতে পারব না। আগামী কাল সকালে আবার নতুন দিন শুরু হবে, তার ঐ কথাটা আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।

সুজির সেই বালিশের ওপর হাত রেখে ভাবতে ভাবতেই শেষকালে সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

অ্যালোন ইন নাইট

রাস্তাটির নাম চার্চ রোড। লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে রয়েছে এই রাস্তাটি। আমরা তখন থাকতাম ঐ রাস্তায়। রাস্তাটি বেশ খোলামেলা এবং সেখানে কোনো শহরের ভীড় নেই। আনন্দেই ছিলাম আমরা এখানে।

তবুও আমাদের ছাড়তে হল এই রাস্তাটি, ঐ সুন্দর এলাকাটা আমরা দুঃখের সঙ্গে ছাড়লাম। এই বিশ্রী বাড়িটার জন্য আমাদের সেখানটা ছাড়তে হল। তখনও এই বাড়িটা ছিল না, যখন আমরা এ পাড়ায় এলাম। এই জায়গাটা ফাঁকাই ছিল।

আমাদের বাড়িটা আর্ল স্ট্রীটের মোড়ে চার্চ রোডের একেবারে শেষ মাথায়। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গায় একখানা চৌকোনো বাড়ি উঠল, বাড়িটি চোখ দুটিকে পীড়িত করে। কারণ বাড়ির গড়নে কোনো শিল্প সুষমা নেই, এটি অত্যন্ত কুদর্শন। এমন বিশ্রী বাড়ি কে তৈরী করল এত টাকা খরচ করে?

কয়েকজন ঝি-চাকর নিয়ে মিস স্পেনসার নামে এক ভদ্রমহিলা সেই বাড়িতে থাকতে এলেন। আপনজন কেউ ছিল না ভদ্রমহিলার। অনেক কিছুই জানলাম ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কারণ এই নতুন প্রতিবেশিনীকে লক্ষ্য করার অনেক সুযোগ ছিল আমার।

বাড়ির পাশের একটি দরজা দিয়ে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে আসতেন রোজ সকালে। মিশ স্পেনসারের চেহারা লম্বা, দোহারা, চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে যা তাঁর হাঁটা চলার মধ্যে ফুটে উঠত এবং পোশাক—পরিচ্ছদ ছিল বেশ সুরুচিপূর্ণ এবং তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চার্চ রোডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন।

তিনি যখন চলতেন রাস্তার পাশের গাছের ছায়ায়, তখন আমার বেশ ভাল লাগত। ভদ্রমহিলার আর কোনো পরিচয় জানতাম না কেবল নামটুকু ছাড়া। সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান। গাড়িখানা বেশ দামী ভদ্রমহিলার। তাঁর যে অর্থের অভাব নেই তা বেশ বোঝা যেত। তিনি গাড়ি করে বেরোতেন রোজ সকালে। তাঁর জীবন ছিল একক নিঃসঙ্গ কারণ তিনি সকালে যখন হেঁটে যেতেন বা বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরোতেন তখন একাই থাকতেন।

আমার মনে হত যে তাঁর কি কোনো আপনজন নেই। তাঁকে দেখে আমার সমবেদনা হত।

আমি একদিন বললাম চায়ের টেবিলে বসে, 'ও রকম একলা থাকাটা খুব একঘেয়ে এবং অত বড় বাড়িতে মিস্ স্পেনসারের নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। খুবই একঘেয়ে ব্যাপার ঐ একলা থাকাটা।'

আমার স্বামী খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন "তুমি ঠিকই বলেছ, এই ভদ্রমহিলার জীবনে কোনো বৈচিত্র নেই" বেশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না এবং সুন্দরী এই মহিলা, দেখলেই অভিজাত বংশের বলে উনি মনে হয়।

'আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?' স্বামী একটু থেমে বললেন।

আমি বলে উঠলাম, 'কি কাজ।'

স্বামী বললেন, 'আমি বলছিলাম যে তুমি গিয়ে ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ কর, অবশ্য যদিও এক সুন্দরী আরেক সুন্দরীকে সহ্য করতে পারে না।'

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হত না, যদি না সেইদিন একটা সামান্য ছোট্ট ঘটনা হত।

চার্চ রোডে আমি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম আমাদের পোষা কুকুর কার্লোকে নিয়ে। মিশ স্পেনসারকে দূরে দেখলাম কারণ তিনি এদিকেই আসছেন। কার্লোর গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল আনন্দের ডাক। সে আমার চারপাশে ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ তার কি হল, মিস্ স্পেনসারের দিকে দাঁত বের করে হিংস্র ভাবে তীব্র বেগে ছুটে এল এবং এমন জোরে ধাক্কা দিল যে তিনি

পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন। ওঁর দিকে আমি ছুটে গেলাম এবং বারবার ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা চাইলাম কুকুরটার আচরণের জন্য।

সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে ভদ্রমহিলা। তিনি কোমল গলায় আমাকে বললেন, 'আপনি এত অপ্রস্তুত হবেন না, আমি নিজে কুকুর ভালবাসি, আমি কিছু মনে করিনি।

আমার পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কার্লো, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে সে অন্যায় করেছে। মিস্ স্পেনসার আদর করবার জন্য তার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে পিছিয়ে গেল। ওর এরকম আচরণের কারণ বুঝতে না পারলেও, এটা বুঝলাম যে ও ভীষণ রেগে গিয়েছে।

মিস্ স্পেনসার কার্লোর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, আপনার কুকুরটা খুব সুন্দর।

কার্লোর গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল এবং সে হিংস্রভাবে গর্জন করতে লাগল যেটা খুবই অবাক ব্যাপার।

বিষণ্ণ গলায় মিস্ স্পেনসার বলে উঠলেন, 'আমাকে মোটেই পছন্দ করছে না দেখছি আপনার এই কুকুরটি।'

আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী। ওঁর আপনার প্রতি এই আচরণের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

মিস্ স্পেনসার বলে উঠলেন, 'প্রতিবেশী'!

—'আপনার বাড়ির উল্টোদিকের বাড়িতে আমি থাকি।'

—'ঠিক।'

তাঁর বাড়িতে আমি যেতাম, এই বলে আমি নিজের পরিচয় দিলাম। ভদ্রমহিলার মুখ খুশিতে ভরে গেল, তিনি বলে উঠলেন—খুবই আনন্দের কথা। আমার বাড়িতে আপনি কালকেই আসুন না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

এই বলে আমি তখনকার মত বিদায় নিলাম।

মিস্ স্পেনসারের বাড়িতে গেলাম এবং আমার তাঁকে খুব পছন্দ হল। আমাকেও ভাল লাগল এই ভদ্রমহিলার। ভদ্রমহিলা বিদুষী এবং সুরুচি সম্পন্না, তাই আলাপের পর প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতাম। তাঁর একটা প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আছে। তাই তিনি সঙ্গী হিসাবে চমৎকার। তাঁর এই আকর্ষণী শক্তিই আমাকে অভিভুত করত। সেই শক্তি আমায় টানত, যখন আমি তাঁর কাছে থাকতাম না। আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না যে আমার সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব কি? আমার মনের এক কোণে একটি ক্ষীণ বিরূপ ভাব ছিল যদিও আমি তাঁকে ভালবাসতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম।

আমার এটি যে কেন হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। এই বিরূপতা সৃষ্টির জন্য কিন্তু ভদ্রমহিলার আচার-আচরণে এমন কিছু দেখা যায় নি। এসব জটিল মনস্তত্ত্বের কথা এখন থাক। ভদ্রমহিলার প্রতি আমার মনোভাব আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে যারা তাঁর কাছাকাছি আসতেন, তাদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, কারণ তাঁর বয়স চল্লিশের কম নয়। তাঁর এই রূপের কাছে অভিজাত সমাজের সুন্দরীর পছন্দ ম্লান হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন সমাজকে, নিঃসঙ্গ জীবনই ছিল তাঁর কাম্য। কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই তাঁর কিছুটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

আমি তাঁর বাড়ি গেছি অনেকবার কিন্তু তাঁকে আমার বাড়ি আসবার কথা বললেই তিনি এড়িয়ে যেতেন। তবে তিনি আমার বাড়ি এলেই অস্বস্তি বোধ করতেন। নিজের বাড়ির মত সহজ হতে পারতেন না। কার্লোর এই আচরণই হয়তো তাঁর অস্বাভাবিকতার কারণ থাকতে পারে। কুকুরটা ওঁকে দেখলে যে কেন এরকম করত, তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমাদের ঘরে উনি এলেই কার্লো সোফার তলায় ঢুকে পড়ত এবং এমন অস্বাভাবিক আচরণ করত যে ভদ্রমহিলা বিব্রত হয়ে পড়তেন। ভদ্রমহিলার অজ্ঞান হবার অবস্থা। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কি অস্বস্তিকর ব্যাপার সেটি।

মিস্ স্পেনসার জোর করে তাঁর মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন। 'আমার যে কি হয়

মাঝে মাঝে, দেখুন কি কাণ্ড। সামান্য ঘটনাতেই ভয় পেয়ে যাই, নিজের বাড়ি ছাড়া সহজ হতে পারি না এবং স্বস্তিও পাই না। এই কথা তিনি ম্লান হেসে বললেন।

আমি ভদ্রমহিলার অপ্রস্তুত ভাব কাটানোর জন্য বললাম, তাতে কি হয়েছে। হঠাৎ অসুস্থ মানুষ মাত্রেই হতে পারে।

মিস্ স্পেনসার বললেন, 'কোনো লৌকিকতার দরকার নেই। আপনি আমার বাড়ি চলে আসবেন, যখনই আপনার সুবিধা হবে। আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তাই আপনিই বেশী আসবেন।

এই বলে তিনি হাসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসলাম।

আমি প্রায়ই যেতাম তাঁর বাড়িতে, আমার মনে এক অদম্য কৌতূহল ছিল তাঁর সম্বন্ধে। একটা রহস্যের আবরণ ছিল ভদ্রমহিলার মধ্যে। দুর্ভেদ্য আবরণ ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি কখনই তাঁর বাবা, মা, ভাই, বোন, প্রেমিক বা বন্ধুবান্ধবের কথা তুলতেন না। আলাপ করবার সময় তাঁর এই কারণটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তাঁর জীবন, বিশেষ করে অতীতের কথা তিনি কিছু বলতেন না। আমাদের মধ্যে কেবল সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচিত হত। অতীতের স্মৃতির রোমন্থন কোনোদিন মিস্ স্পেনসারকে করতে দেখিনি। আমি একবার সোজাসুজি প্রশ্ন করতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বাবা মা কেউ নেই। আমি তাঁকে ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন করিনি কারণ আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে যে নিষেধের ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে সেটা দেখেই।

টাকার কোনো অভাব ছিল না মিস্ স্পেনসারের। তিনি যে প্রচুর অর্থের অধিকারিনী তা তাঁর দামী পোশাক—পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার ধরণ দেখে মনে হত। তাদের ঝি চাকরদের মাইনেপত্তর দেখে মনে হয় খুব ভাল এবং তারা বেশ খানদানী প্রকৃতির। ইংরেজ ঝি এবং রাঁধুনী ছিল তাঁর এবং ফরাসী ছিল খানসামা লুই। লুই তাঁর সঙ্গে থাকত যখন মিস্ স্পেনসার গাড়ি নিয়ে বেরোতেন। মিশ স্পেনসারের চিঠি নিয়ে মাঝে মাঝে লুই আমার কাছে আসত। তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাবারও আমন্ত্রণ থাকত চিঠিতে। আমি খুব খুশি মনেই সেই বেড়াবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম, কারণ আমাদের কোনো গাড়ি ছিল না, তাই গাড়ি করে বেড়াবার লোভে।

আমাকে মিস্ স্পেনসারের আমন্ত্রণপত্র একবার এক সপ্তাহে দু-দু'বার প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। পরে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, হয়তো উনি অভদ্র ভাবছেন একথা ভেবেই। ভাবলাম ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে বলব কেন দু-দিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। উনি নিশ্চয় ভালো করে বললে ব্যাপারটা বুঝবেন। সেই ঘটনারও অবসান হবে যদি তাঁর মনে আমার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ ধারণা থাকে।

কিন্তু ভদ্রমহিলাকে খুব বিচলিত দেখলাম। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন একটি চাপা উত্তেজনায়।

সে কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলাম যে কেন দু-দিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাইনি। তিনি কোনো কাহিনী না শুনেই বললেন, একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার বাড়িতে, বলুন দেখি তিনি কে?

—মিঃ মার্শাল যিনি গীর্জার যাজক, তিনি এসেছিলেন বোধ হয়।

—কথাটা ঠিকই, গীর্জার এলাকায় পড়ে এমন সব বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যাজক মশায় দেখা করতে যান। এটা তিনি নিয়মিত করেন, আমার মনে হয় কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে আর দেখা করতে আসবেন না।

এই বলে মিস্ স্পেনসার হাসলেন মৃদু।

আমার যে ধর্মের ব্যাপারে একটা নিজস্ব মতামত রয়েছে এবং সেটাই যে আমার মনের কথা তা আমি স্পষ্ট ভাবেই বলেছি। আমি কোনোদিন কোনো গীর্জায় যাইনি।

—'কি বললেন, যাজক মশাই? আমার যাজক মশায়ের আতঙ্কে ভরে যাওয়া মুখখানি মনে পড়ে বেশ মজাই লাগছিল।'

—'আমার মনে হল উনি অনেক কথাই ভাবলেন কিন্তু তেমন খুব একটা কিছু বললেন না। পুরুষ মানুষের পক্ষে ধর্মের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে চিন্তাভাবনা করা বিরাট অপরাধ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এর কোনো ক্ষমা নেই।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে যে আমি একাধিক বার মিস্ স্পেনসারকে গীর্জায় যেতে দেখেছি। তাই বলে উঠলাম, 'কিন্তু আপনি তো ধর্মায়তনের প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে নন'। একথা যদি তিনি অস্বীকার করেন তো কিছুই করার নেই, কারণ এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি বলতেও চাই না।

তারপর একদিন মিস্ স্পেনসারের বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে উনি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বাইবেল পড়ছেন। আমাকে তিনি স্বাগত জানালেন, আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম, মিস্ স্পেনসার আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'কেইন আর অ্যাবেল'-এর কাহিনী আপনি নিশ্চয় বাইবেলে পড়েছেন।

তিনি যেন সদ্য প্রকাশিত কোনো উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন, এই ভেবেই যেন প্রশ্নটা করলেন।

বাইবেলের এ গল্প তো সকলকার জানা যে আদিম মানব মানবী আদম আর ইভের পুত্র কেইন তার ভাই অ্যাবেলকে হত্যা করে।

মিস্ স্পেনসারের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পড়েছি।'

—পৃথিবীর প্রথম খুনীর মুখে যে কলঙ্ক ফুটে উঠেছিল, তার কথা কি আপনি কখনও ভেবেছেন।

আমি বললাম—'মাঝে মাঝে ভেবেছি এই কথা। মিস্ স্পেনসার তাঁর কালো চোখের দৃষ্টিতে অতলান্ত গভীরতা এবং অনির্দেশ্য রহস্যময়তা নিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার এই বিষয়ে মত কি?'

—খুবই শক্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা। এ ব্যাপারে অনুমান ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

—'কৌতূহলের ফলে আসতে পারে শুধুই অপমান। এটা আপনি ঠিকই বলেছেন, এবং এটা খুবই কৌতূহলজনক।

মিস্ স্পেনসার বললেন—এই কলঙ্ক চিহ্ন কি সবসময়েই থাকত। এই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ফুটে উঠত এই চিহ্নগুলো।

—'আমি এটা বলতে পারব না, কারণ আমি এ সম্বন্ধে কোনো দিন ভাবিনি। এটা সত্যিই যে এই ধরনের চিন্তা ভাবনাই একেবারে নতুন আমার কাছে।'

মিস্ স্পেনসারের কণ্ঠে শোনা গেল বিষণ্ণতার সুর।

'কেইনের কি দরকার, কলঙ্ক চিহ্ন আছে কি নেই। এই ধরনের চিন্তা ভাবনাই আমার কাছে নতুন এটাই সত্যি কথা। কেইনের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপে ভরে গিয়েছিল তার মন। সে। নিজে তো জানত যে কি প্রচণ্ড অন্যায় সে করেছে এবং কি মহাপাপ সে করেছে। আকুল ভাবে পাপ স্খলনের জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের শাস্তিস্বরূপ কি নিদারুণ কলঙ্ক চিহ্ন তাকে বহন করতে হয়েছে তার নিজের শরীরে এটা সে জানত এবং এটাই তার খুবই দুর্ভাগ্য। এটাই তার শাস্তি।

মিস্ স্পেনসার মানসিক যন্ত্রণায় হাত কচলাতে লাগলেন। কেইনের মত একজন নৃশংস হত্যাকারীর উপর মিস্ স্পেনসারের সহানুভূতি দেখে আমি বললাম, 'কিন্তু কেইন তার নিজের ভাইকে হত্যা করে মহাপাপ করেছিল। যে মহাপাপ সে করেছে তার জন্য তার ওরকম শাস্তিই পাওয়া উচিত। ওর উপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই।'

মিস্ স্পেনসার আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, না আপনি ওইরকম বলবেন না।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল, তাঁর চোখের দিকে চোখ পড়তেই।

আমি তাঁর চোখে কি দেখলাম তা বলতে পারব না। এটা একটা ভাবান্তর। তার আগেকার

শান্তভাব ফিরে এল মুহূর্তের মধ্যেই। ক্ষণিকের জন্য একটা মুখোশ খুলে পড়েছিল।

'হিংসা হচ্ছে মানুষের প্রথম অপরাধ, হিংসা প্রবৃত্তিই মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে তাকে বিভিন্ন অপরাধের মধ্য দিয়ে। মহা অমঙ্গল হচ্ছে হিংসা। মানুষের উপর একটি শয়তানের প্রভাবের ফল হিংসা। শয়তান ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নষ্ট করে দিতে চায়। মানুষকে প্রলুব্ধ করে নানাভাবে সে তার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দিয়ে।' এই বলে মিস্ স্পেনসার থামলেন।

—'খারাপ খুবই ব্যাপারটা।' এরকম কথা ভাবতেই ভাল লাগেনা যে, মানুষ হিংসাকে তুচ্ছ অজুহাত হিসাবে দেখে তার ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে খুন করবে।

—'একথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে একজন মানুষ তার ভালবাসার পাত্রীকে খুন করতে পারে।'

—'আমি বিশ্বাস করি না একথা।'

—মিস্ স্পেনসার ব্যগ্রভাবে এই প্রশ্ন করলেন।

—ভালবাসার হত্যা কখনো হয় না। অন্য প্রবৃত্তি মানুষের অশুভ কামনাকে জাগিয়ে তোলে। অপরাধ করে মানুষ অন্ধ আবেগের তাড়নায়, আত্মত্যাগ শেখায় ভালবাসা, দুঃখ, বেদনা নিয়ে আসে হিংসা আর ভালবাসা? প্রিয়জনের সুখের জন্য যে নিজেকে নিঃশেষে, সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে পারে, সেই মানুষকে ভালবাসে। প্রেমের পাত্রকে সর্বসময়ই সুখী করতে চায় ভালবাসা।

মিস্ স্পেনসার আমার দিকে তাকিয়ে স্থির দৃষ্টিতে বললেন।

আপনি জানেন না যে প্রলোভনের শক্তি কি প্রচণ্ড। আপনি জানেন না যে, প্রলোভনের শিকার হয়ে মানুষ অনেক খারাপ কাজ করতে পারে। আমার ধারনার বাইরে, যে মানুষ কত নীচে নামতে পারে। মিসেস থোপ, আপনি খুব ভালোমানুষ এবং সরল। সত্যি বলছি আমি খুব আনন্দ পাই আপনি এলে।

ওখানেই শেষ হল সেদিনকার কথাবার্তা। খানসামা লুই আমার কাছে এল কয়েকদিন পর মিস্ স্পেনসারের চিঠি নিয়ে। আমি সেদিন তাঁর সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যেতে পারব কিনা, তা মিস্ স্পেনসার জানতে চেয়েছেন। মিস্ স্পেনসার আরো জানতে চেয়েছেন যে দুপুরের খাওয়াটা আমি ওখানে সারতে পারব কিনা।

আমার খেতে বা বেড়াতে যে কোনো অসুবিধা নেই তা আমি লুইয়ের মারফৎ জানিয়ে দিলাম।

মিস্ স্পেনসারের গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বেলা প্রায় বারটায়। আমি তৈরী হয়েছিলাম তাই গাড়ি আসতে বেরিয়ে পড়লাম।

গাড়ি করে বেরোলাম দুপুরের খাওয়া সেরে। খানসামা লুই আমার সঙ্গে ছিল যথারীতি।

ঘোরার ঘণ্টা দুই পর এল আমাদের ঘরে ফেরবার পালা। আমরা ফিরছিলাম বড় রাস্তা ধরে। একটা টুপির দোকানে এসে আমরা দাঁড়ালাম, বাড়ি তখনও দুই মাইল দূরে। এ দোকানে নানারকম মেয়েদের টুপি পাওয়া যায়, একটা ফোটো তোলবার স্টুডিও রয়েছে পাশে।

গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিলেন মিস্ স্পেনসার। টুপির দোকানের সামনে গাড়িটা থামল। ভদ্রমহিলা হয়তো টুপি কিনবেন, এই কথা ভাবলাম। স্টুডিওর সামনে গাড়িটা থামল।

দরজা খুলবার জন্য নামল খানসামা লুই। হাত রেখে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজা না খুলেই। দুশ্চিন্তার ছাপ দেখলাম ওঁর চোখে মুখে এবং খুবই অবাক হলাম এটা দেখে।

লুই 'মাদাম' বলে ডেকে উঠল এবং ঐ একটা শব্দেই ঝরে পড়ল একরাশ মিনতি, নিষেধের রেখা ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। মিস্ স্পেনসারের দুটি চোখ যেন ঝলসে উঠল বিদ্যুতের মত, 'দরজা খোল' এই বলে তিনি হুকুম দিলেন।

আদেশ অমান্য করা অসম্ভব, এই শীতল অথচ দৃঢ়কণ্ঠের।

নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম লুই-এর। করুণ দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার দিকে। লুই যেন কিছু বলতে চায়, ওর ভাব দেখে আমার মনে হল। সাহস নেই কথা বলবার ওর। এর কথার অর্থ কী বুঝতে পারলাম না কিছুই।

গাড়ি থেমেছে স্মিথের স্টুডিওর সামনে। স্মিথের খুব নাম-ডাক আমাদের এ শহরতলীতে ভালো ফটোগ্রাফার হিসাবে। এখান থেকে কয়েকবার ফোটো তুলেছি আমি এবং আমার স্বামী।

স্মিথ ছবি তুলেছে খুব যত্ন করে। খুব সুন্দর হয়েছে ছবি।

আমাদের ঢুকতে দেখে অল্পবয়সী একটি মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

—'আপনারা কি ছবি তুলবেন?'

মিস্ স্পেনসার বললেন, 'নিশ্চয়'।

—'আসবার কথা ছিল কি আপনাদের?'

—'আসবার কথা ছিল আমাদের দুটোর সময়', নিজের নাম বললেন মিস্ স্পেনসার।

—ছবি তুলবার জায়গায় মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল,—আসুন ভেতরে আসুন—এই বলে। ডার্ক চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন স্মিথ।

'কি রকম ছবি তুলবেন মিসেস থোপ'— একটু হেসে আমাকে দেখে বললেন স্মিথ।

জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্পেনসার।

—'ছবি আমি তুলব না, তুলবে আমার বান্ধবী।' এই বলে আমি জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মিস্ স্পেনসার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন, ফটোগ্রাফার স্মিথ চমকে উঠলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে।

চমকাবারই কথা সত্যি ভদ্রমহিলার মুখে কি অদ্ভুত পরিবর্তন, এই মহিলার সঙ্গে কতই না গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা করছিলাম মাত্র দশ মিনিট আগে। চোখ দুটো বসে গিয়েছে মিস্ স্পেনসারের। এক বিন্দু রক্ত নেই, সেই পাণ্ডুর মুখে। কেমন যেন লম্বাটে হয়ে গিয়েছে সুন্দর গোল মুখখানা। এক অসহনীয় যন্ত্রণার নির্ভুল ইঙ্গিত ফুটে উঠছে তাঁর মুখের রেখায়। অমানুষিক যন্ত্রণায় ভদ্রমহিলা কষ্ট পাচ্ছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। একটু জল আনুন না কেউ।'

মিস্ স্পেনসার অদ্ভুত গলায় বললেন, 'না জলের কোনো প্রয়োজন নেই,' তারপর ছবি তোলবার জন্য স্মিথকে ইঙ্গিত করলেন। কালো পর্দার কোণায় গিয়ে ঢুকল স্মিথ তাড়াতাড়ি। স্মিথ মিস্ স্পেনসারের বসার ভঙ্গী ঠিক করে দেয়নি। এমন কি একটা কথাও বলেনি এর সম্পর্কে যা আমার পরে মনে হয়েছিল।

—'ছবি তোলার কি দরকার—বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দু'খানা ঘষতে ঘষতে মিস্ স্পেনসারের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আমি বললাম এবং আরো বললাম, আপনার শরীরের অবস্থা এখন ফোটো তোলার মত নয়। আপনি অসুস্থ, ছবিতে উঠবে না আপনার আসল চেহারা, মৃত মানুষের ছবি বলে এটা দেখে মনে হবে।'

এক অমানুষিক দুঃসহ আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা চিরে। ঐ তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা ধরা পড়ল। দাঁতে দাঁত আটকে গেল, চেয়ারের হাতলটা ধরল তাঁর ডান হাতখানা। কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠছে। তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে একটা প্রচণ্ড ভয়। সেই মহাভয়ের সঙ্গে তিনি যুঝে চলছেন প্রবল ইচ্ছা শক্তি দিয়ে।

আমার দারুণ ভয় হল—আমি কাঁপতে লাগলাম ভদ্রমহিলার এই অবস্থা দেখে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, ভদ্রমহিলাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'আসুন—আপনি চলে আসুন।'

বাধা দিলেন মিস্ স্পেনসার। ফ্যাস ফ্যাস করে তিনি বললেন ভাঙা গলায়, আপনি আমার কাছে থাকুন। আমাকে একটু সাহায্য করুন।

নিজের মুখ দু-হাত দিয়ে ঢেকে আমি স্পেনসারের পাশে বসলাম। আমি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাবার। আমি যেন বিয়োগান্তক নাটকের কোনো একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি বলে আমার মনে হল। আমার ভয় যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, এটি কিসের জন্য তা না জানায়।

কেটে যাচ্ছে সময়। অভিভূতের মতো বসে রইলাম, সময় কারোও জন্য অপেক্ষা করে না, ফটোগ্রাফার স্মিথের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কালো কাপড়ে ঘেরা এই জায়গাটার মধ্যে।

'খুবই দুঃখিত ম্যাডাম, আপনার ফোটো তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'—স্মিথের এই কথায়

আমি চমকে উঠলাম।

চেয়ার থেকে উঠে মিস্ স্পেনসার নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, একটাও কথা না বলে। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখে নিদারুণ হতাশার ছাপ।

দু'জনে কোন কথা হল না। তিনি আমাকে এই প্রথম জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে বললেন, 'বিদায়—চির বিদায় মিসেস থোপ।' যখন আমাদের বাড়ির সামনে তাঁর গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাঁর কথাও খুবই বিষণ্ণ শোনাচ্ছিল।

দু-চোখ জলে ভরে এসেছিল আমার। কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল গলার ভিতর থেকে। তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না কোনো কথা কান্নাভরা গলায়। ভাবলাম তিনি নিশ্চয় আমাকে যথাসময়ে খুলে বলবেন সব কথা।

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী ফিরলে স্টুডিওর ভিতর যা ঘটেছিল, তা তাকে সব বললাম। বাদ দিলাম না কোনো কথা। ব্যাপারটা হালকা ভাবেই নিলেন আমার স্বামী। তিনি বললেন, এটি একপ্রকার স্নায়ু দোষ, একে খেয়ালী মনের উৎকট বিলাসও বলা যেতে পারে। সেই কারণেই এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

আমি তাঁকে প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'এটা কখনই নয়, মিস্ স্পেনসারের পাল্টে যাওয়া মুখ যদি তুমি দেখতে, তাহলে তুমি কখনই একথা বলতে পারতে না।'

পরিচারক কথা শেষ কবার আগেই বলে উঠল, 'গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে চান ফটোগ্রাফার স্মিথ।'

আমি বললাম, 'নিয়ে এস ওঁনাকে।'

আমার স্বামী মিঃ স্মিথ ঘরে এলে বললেন, 'কি সব রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার আপনার স্টুডিওতে ঘটছে মিঃ স্মিথ। একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন আমার স্ত্রী আপনাব স্টুডিওতে গিয়ে।'

—'আমি নিজেই ঘাবড়ে গেছি, সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, যে ভদ্রমহিলা মিসেস থোপের সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা, মিসেস থোপের বন্ধু হলেও তিনি স্বাভাবিক নন। ওর জীবনের সঙ্গে কোনো একটি অদ্ভুত ব্যাপার জড়িয়ে পড়েছে। অলৌকিক এবং অপ্রাকৃতিক ব্যাপার এটি।

'এরকম ধারণার কারণ কি আপনার?'

—'সম্ভব নয় এই ভদ্রমহিলার ছবি তোলা।'

আমার স্বামী অবজ্ঞার সুরে বললেন—শুধু এই কারণেই আপনার এই ধারণা হল।

—শুধু আজ নয়, মিস্ স্পেনসারকে আমি আগেও দেখেছি। একটি বিখ্যাত কোম্পানীর ফটোগ্রাফার ছিলাম আমি বছর পাঁচেক আগে। সেখানে গিয়েছিলেন উনি ফোটো তুলতে। আমি ওঁর ফটো তুলতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে ওঁর ছবি তোলা সম্ভব নয়।

আমার স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি অসম্ভব কেন?'

—এর নেগেটিভ গুলি অসংখ্য দাগে ভরা। আমি প্রথমে ওনার মুখ দেখতে পাইনি কারণ উনি জানলার দিকে মুখ করে ছিলেন। আমার দিকে ঘুরতেই ওঁর শঙ্কা-বিহ্বল মুখ দেখেছিলাম। তখনই ওনাকে চিনতে পারলাম। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম ওঁর ফটো তোলবার জন্য কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

উত্তেজনায় থরথর গলায় আমি প্রশ্ন করলাম—কেন?

—একইরকম ফল। দু-খানা 'নেগেটিভ' আমি প্রিন্ট করেছি আপনাদের দেখাবার জন্য। দেখুন এর কি ফল। আপনি আগে দেখুন মিঃ থোপ।'

দু-খানা ফটো ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে আমার স্বামীর হাতে মিঃ স্মিথ দিলেন। আমার স্বামীর মুখের চেহারা পাল্টে গেল এই ফটো দেখে। আমার তর সইছিল না, আমি কৌতূহল আর উৎকণ্ঠায় ফটো চাইলাম। আমি তাকালাম ফটোগুলোর দিকে।

'হায়, এ কি দৃশ্য।' আমার থর থর করে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। দাগে ভরে গিয়েছে সমস্ত ছবি। একটি করে মুখের ছাপ প্রতিটি দাগে, একদম পরিষ্কার এবং নিখুঁত।

মৃত মানুষের মুখের ছাপ।

শিউরে উঠলাম দারুণ আতঙ্কে। অন্ধকার, চারপাশে শুধুই অন্ধকার, অন্ধকারের সমুদ্র আমায় গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম মেঝেতে, আর আমার কিছু মনে নেই।

ও বাড়ি থেকে পরদিন আমার স্বামী আমায় অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন।

পনের দিন পরে বেরিয়ে দেখলাম সামনের বাড়িটা খালি। মিস্ স্পেনসারের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তিনি চলে গিয়েছেন। ভবিষ্যতেও দেখা হবে না। তিনি যতবড় অপরাধই করে থাকুন না কেন তাকে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে।

তার মনে অহরহ অনুতাপ ও অনুশোচনা হচ্ছে কারণ তিনি মহাপাপ করেছেন। এ পাপের কোনদিনই মুক্তি নেই।

আমার সমস্ত মন দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই সহানুভূতি। তাঁর জন্যে আমি সমবেদনা বোধ করি।

ব্লাড শেডেড ডার্কনেস

আমার বোধগম্য হয় না জিম শর্টহার্ডস কি ভাবে ব্যক্তিগত সচিবের পদ পেয়েছিল। বছর কয়েব সে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিল ও ব্যাঙ্কে কিছু টাকা পয়সাও জমিয়েছিল।

শর্টহার্ডস বুঝেছিল তার মনিব যখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে তখন নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কাজ আছে। কারণ মনিবের মাথায় হঠাৎ হঠাৎ খেয়াল চাপে। এই খেয়ালিপনারই ডাক এটা।

শর্টহার্ডসকে মনিব বললে, যদিও তোমার সাহস ও মনের জোর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই তবুও আন্দাজ করতে পারি তুমি একজন সাহসী মানুষ। উত্তরে শর্টহার্ডস বলল যে তার ভয় ভীতি কমই আছে তবে এই সাহসটা কিসের, দৈহিক নির্যাতনের কিনা, এবং তার উত্তরে জানল, কতকটা তাই। সে তার পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে বলল সব বিপদকেই সে অগ্রাহ্য করে যদি বিবেকের সায় পায়। কিন্তু মনে হচ্ছে কোন গোয়েন্দা সুলভ কাজের ভার পাচ্ছি।

কাজটা বেশ গোপনীয় বলে সাইড বোথাম অর্থাৎ তার মনিব আস্তে কথা বলতে বললেন। এবং পুরোন পার্টনার জোয়েল গার্ভির চিঠি তুলে ধরলেন এবং বললেন এর কথা তুমি শুনেছ।

শর্টহার্ডস এ বিষয়ে অবগত। সে জানে কোম্পানি শিকাগোর বাজারে গার্ভি অ্যান্ড সাইড বোথামের পরিচিতি আছে। যেমনি অকস্মাৎ তারা ধনী হয়েছিল সেরকম অকস্মাৎ ভাবেই হারিয়ে যায়। তারা দু'জন পার্টনার ছিল। একে অপরের মৃত্যু কামনা করত। এবং আর একটা বিষয় দু'জনেই দুজনের দুর্বলতার খবরাখবর রাখত। সাইড বোথাম তাকে বোঝালেন এটা ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যাপার। গার্ভির সই করা গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি কাগজ সাইড বোথামের কাছে আছে আর ঐ কাগজগুলি পরস্পরের কাছে বেশ মূল্যবান। এবং অধিকারও সমান। সেই কাগজগুলো থেকে গার্ভি তার নিজের সইগুলি কেটে দিতে ইচ্ছুক। সেই কাগজগুলি তোমার হাতে পাঠাবো তুমি সইগুলি কাটিয়ে কাগজগুলি আমাকে ফেরৎ দেবে।

গার্ভি সাইড বোথামের উপর যে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছে তা শর্টহার্ডসের অগোচরে রইল না। সাইড বোথাম শর্টহার্ডসকে কাগজগুলি পড়তে বারণ করলেন। পৃষ্ঠার শেষে সইগুলি শুধু কাটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কাগজগুলি তার হাতে যেন না যায়।

শর্টহার্ডসের কাছে কাজটা খুব মুশকিলের বলে মনে হলো না। মোট কথা মিঃ গার্ভির কাছে কাগজগুলো সই কাটিয়ে ফেরৎ আনা।

বিগত কুড়ি বছরে গার্ভির সঙ্গে সাইড বোথামের দেখা হয়নি। তবে কিছু কিছু গুজব তার কর্ণগোচর হয়েছে যে সে কেমিষ্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করে। মাঝে মাঝে সে পাগলামি করে থাকে তবে মারধোর করবে বলে মনে হয়না। তবে সাবধান থেক এবং একটি পিস্তল দিলেন। শর্টহার্ডস সেটা ট্রাউজারের পকেটে গুজে রাখল এবং বেরিয়ে গেল।

গার্ভির বাসস্থান স্টেশন থেকে ছ-মাইল দূরত্বে। জায়গাটা নোংরা। রুক্ষ আবহাওয়া। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তুষার ছাওয়া। মাঝে মাঝে দু-একটা গোল বাড়ি। গার্ভি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। গারোয়ান নীরবতাই ভালোবাসে। অগত্যা শর্টহার্ডস নিজের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে রইল। তার ফেরার গাড়ি সাতটা পনেরতে কিন্তু গাড়োয়ান তাকে পৌঁছে দিতে রাজী না হওয়ায় তাকে পায়ে হেঁটেই ফিরতে হবে। অগত্যা কাজ সেরেই ব্রুকলিন থেকে রওনা দেবে। আসল দলিলটার মত দেখতে এক বান্ডিল কাগজ সে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য নকল দলিল দিয়ে আসল দলিলটা ফেরৎ আনা। গাড়োয়ান মিঃ গার্ভির গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে বাড়িটা তাকে দেখিয়ে দিল। ভাঙা গেটের সামনে গাড়িটাকে আনতে বলায় গাড়োয়ান রাজি হলো না। কেননা সে ঝুকি নিতে রাজি

নয়। পয়সা পেয়েই গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

শর্টহার্ডস গেট পেরিয়ে এগিয়ে চললো। প্রাণহীন একটা বাড়ি। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। কখনো বাড়িটা সাদা ছিল। এখন একদম জরাজীর্ণ, বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ বাড়িটায় প্রবেশ করুক এটা সে চায়না। শুধু বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছে। শর্টহার্ডস দরজার হাতল খুঁজে পেল না। তাই লাঠি দিয়ে দরজায় ঘা দিল। সেই ঘায়ের আওয়াজ শুধু প্রতিধ্বনিত হলো। দুঃসাহসী শর্টহার্ডস চমকে উঠল। একটা বাতাস বয়ে গেল। কারো কোন পায়ের শব্দ পাওয়া গেলনা। পরপর কয়েক বার ধাক্কা দেওয়ার পরও দরজা খুলল না। অগত্যা শর্টহার্ডস দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। সে দেখতে পেল দরজার ওপারে হলঘরে কোন আলো নেই। অস্পষ্ট ভাবে একজোড়া চোখ দেখা গেল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করল তাকে, মিঃ গার্ভি এখানে থাকেন নাকি? আমি মিঃ সাইড বোথামের ব্যক্তিগত সচিব। এবং লোকটির হাতে একটি কার্ড দিল এবং বলতে বলল যে সে মিঃ সাইড বোথামকে যে কাজের জন্য তিনি লিখেছিলেন সেই কাজের জন্য এসেছে সে। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে লোকটি কার্ড নিয়ে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে দরজাটা খুলে গেলে প্রবেশ করল সে। লোকটির হাতে একটি মাত্র কম্পমান আলো। তাইতেই শর্টহার্ডস দেখল লোকটি ইহুদি। লোকটি মাঝ বয়সী। বেঁটে চকচকে চোখ। সে পা পর্যন্ত একটি কালো আলখাল্লা পরে আছে। এবং বাড়িটির সাথে লোকটি বেশ মানানসই।

রুক্ষ স্বরে লোকটি জানালো-মিঃ গার্ভি এখুনি আসবেন। একটি বেশ আলোকিত ঘরে লোকটি শর্টহার্ডসকে নিয়ে গেল। ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। বই ভর্তি দেওয়াল আলমারি। ঘরের মাঝখানে রয়েছে মেহগনি কাঠের চেয়ার ঘেরা ডেস্ক। ফায়ার-প্লেসে বেশ আগুন জ্বলছে। এই ঘরে এসে শর্টহার্ডসের মন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সে দেখল ইহুদিটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

শর্টহার্ডস বলল যে সে কম সময় হাতে নিয়ে এসেছে। মিঃ গার্ভি যেন তাকে বসিয়ে না রাখেন।

লোকটি নিঃশব্দে চলে গেল। ডেস্কের টেবিল ল্যাম্পটা স্পর্শ করে শর্টহার্ডস বুঝল একটু আগেও এই আলোটা জ্বলছিল কেননা সেটা গরম ছিল। শর্টহার্ডসের কেমন যেন মনে হল তাকে কেউ এ ঘরে অন্তরীক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে। কারো যেন উপস্থিতি এই ঘরের মধ্যে অনুভব হল। পনের মিনিট পর বইয়ের আলমারির দরজা খুলে মিঃ গার্ভি এলেন।

শর্টহার্ডসের ধারণা ছিল মিঃ গার্ভি হয়ত তৃষ্ণার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তার ধারণা ভুল। মিঃ গার্ভি একজন সুন্দর-সুপুরুষ বয়স্ক ভদ্রলোক। শর্টহার্ডসকে বসিয়ে রাখার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। মিহি গলায় কথা বললেও তার মুখে হাসির বিন্দু মাত্রও নেই। তিনি বললেন, রসায়নের একটি সমস্যায় মগ্ন থাকার জন্য তিনি আসতে দেরী করেছেন। কাজটি শেষ করে তবেই আসতে পারলেন। এবং শর্টহার্ডসকে বসতে বলতে শর্টহার্ডস ওভার কোটটা খুলে বসল। সে বুঝতে পারল ভদ্রলোক মিথ্যা কথা বললেন, কিন্তু কারণটা তার বোধগম্য হলো না। ফায়ার-প্লেসের উল্টোদিকের চেয়ারে তিনি বসলেন। গার্ভিকে দেখে শর্টহাউসের অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। সে তার হাতের কাগজগুলি দেখিয়ে তাকে সই করে দিতে বলায় গার্ভি জানালেন তার পরীক্ষাগারে কিছু কাগজ পরীক্ষা করে দেখার আছে। এবং ঘর থেকে তখন বেরিয়ে গেলেন। নিরুপায় হয়ে শর্টহার্ডস বসে রইল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গার্ভি ফিরে এলেন। তখন শর্টহার্ডসের ফেরার গাড়ির আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকি।

বিলম্বের জন্য পুনরায় গার্ভি দুঃখ প্রকাশ করলেন। এবং শর্টহার্ডসের জন্য কি করতে পারেন তা জিজ্ঞাসা করলেন। এবং বললেন, এ ধরনের কাজে সাবধানতার প্রয়োজন। তাছাড়া শর্টহার্ডস নিশ্চয়ই জানেন তার পুরোন পার্টনারের মাথায় যখন নেই।

শর্টহার্ডস বুঝল তিনি তাকে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু শর্টহার্ডস নিরুত্তর রইল। সতর্কতার সঙ্গে গার্ভি উক্তি করলেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সাবধানের মার নেই। তিনি জানতে চাইলেন

যে শর্টহার্ডস-এর সাইড বোথামকে সামাল দিতে কি ভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। তিনি জানতে চাইলেন সাইড বোথামের মধ্যে এখনও তার প্রতি কোন বিদ্বেষ আগের মত আছে কিনা? শর্টহার্ডস কোন উত্তর না দিয়ে দলিলটা গার্ভির দিকে এগিয়ে দিল। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার জন্য।

গার্ভি আবার বললেন, সাইড বোথাম তাকে মারধোর করে কিনা? উত্তরে শর্টহার্ডস জানালো না একদম না।

তিনি বললেন, ভালোই। এবার কাজটা শেষ করে ডিনার হোক। কথা বলেই নিজের সইটা কেটে নিয়ে আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, কুড়ি বছর আগে এই সইটা করেছিলাম।

সুযোগ পেয়ে আসল দলিলটা পকেটে রেখে দিল শর্টহার্ডস। আর ব্যাগে রাখল নকলটা। আর ঠিক তখনই গার্ভি তার দিকে ফিরলে সে বলল পকেটে কাগজগুলো রেখে দিলাম। উত্তরে গার্ভি বলল, ঠিক আছে ওগুলো দিয়ে আমি কি করব? মনে হল এই দলিল পাল্টানোটা তিনি দেখেননি। শর্টহার্ডসকে ওভার কোটটা গায়ে দিতে দেখে তিনি বললেন, নিউইয়র্ক নিশ্চয়ই শর্টহার্ডস আজ যাবে না?

শর্টহার্ডস বলল, একটু চেষ্টা করলে সাতটা পনের-র গাড়ি ধরতে পারবো। গার্ভি বললেন, অনেকক্ষণ ছটা বেজে গেছে। ঐ গাড়িটা পাওয়া সম্ভব না। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম আজ এখানেই থাকবে তুমি। দেওয়ালের ঘড়িটা হাতের ঘড়িটার সাথে মিলিয়ে দেখল দেওয়াল ঘড়িটা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। হয়তো ইচ্ছে করেই ঘড়িটা পিছিয়ে রাখা হয়েছে। অগত্যা এই অন্ধকারে ছ-মাইল পথ হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় কখনই ভেবে বলল আপনার এখানেই থেকে যেতে হবে রাতটা।

উত্তরে গার্ভি বললেন এখানে বড় একটা লোকের দেখা পাওয়া যায় না। আপনি থাকছেন শুনে খুশী হলাম। আর বাইরে ঝড়ও হচ্ছে। গার্ভির মুখের আন্তরিকতা দেখে শর্টহার্ডস-এর ভয় কেটে গেল। ওভার কোটটা খুলে দু'জনে আগুনের সামনে গিয়ে বসল।

শর্টহার্ডসকে গার্ভি বললেন, আপনার মনে যে সংশয় হচ্ছে তা আমি জানি। সাইড বোথাম নিজেকে ছাড়া সকলকেই পাগল বলে। সে আমার সম্বন্ধে আপনার মনে নিশ্চয়ই ভুল ধারনা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখনও কি সেই ধারণাই পোষণ করে?

গাঢ়ভাবে চিন্তা করে শর্টহার্ডস বলল, যে কোন মানুষেরই ভুল হতে পারে তবে কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই ভেবে-চিন্তে কথা বলা উচিত।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর গার্ভি উঠে দাঁড়ালেন শোওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। এবং বললেন আমার ইচ্ছে আপনি ভাল ধারণা নিয়ে যান। তাই আপনার রাতটা যাতে আরামে কাটে সেটার বন্দোবস্ত করি। যাওয়ার আগে গার্ভি দরজাটা বন্ধ করে গেলেন। শর্টহার্ডসের গার্ভির সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হলনা গার্ভি কোন অস্বাভাবিক মানুষ। বরং তার সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্য তার কুণ্ঠাবোধ হল। মনে হল সাইডবোথামের সাবধান বাণীর কোন মানে হয়না। খালি পেটে ছ-মাইল রাস্তা হেঁটে যাওয়ার চেয়ে রাত্তিরটা আরামে ঘুমানো বরং ভাল। গার্ভি ফিরে এসে একটু হুইস্কি খাওয়ার প্রস্তাব করলেন, বললেন খেলে খিদে বাড়বে। শর্টহার্ডসও রাজি হয়ে গেল।

গেলাস নামিয়ে রাখার সময় গার্ভির দিকে নজর পড়ায় তার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য সুর শুনে শিউরে উঠল শর্টহার্ডস। এক প্রকার আশ্চর্য আলো তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখময় কঠিনতার প্রলেপ পড়ল এবং এটা তার স্নায়ুর উপরে বেশ চাপ দিল। একটা ধোঁয়াটে ভাব তার চোখের সামনে নেমে এলো আর তারই সঙ্গে মনে হল যেন বন্য জন্তুর মত তাকিয়ে আছে। একটু আগের সুন্দর ধারণাটা উবে গেল। কিন্তু আতঙ্কিত শর্টহার্ডস হাসিমুখেই বলল, হুইস্কিটা বেশ সুন্দর।

শর্টহার্ডসের কথা শুনে গার্ভি খুশী হলেন এবং কিভাবে এটা সংগ্রহ করা হয়েছে তা বলতে লাগলেন। ঠিক তখনই মার্ক্স বলল ডিনার তৈরী।

অন্ধকার পথ দিয়ে খাবার ঘরে যেতে হবে। সেখানেও একটি মাত্র আলো জ্বলছে। গৃহকর্তার

জন্যে শুধু স্যুপ কিন্তু তার জন্যে খাবার সরঞ্জাম সাজানো।

গার্ভি বললেন যে তিনি সারাদিনে একবার খান। সে যেন ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করে।

মার্ক্স নামক ইহুদি ভৃত্যটির উপস্থিতি শর্টহার্ডসের একদম ভাল লাগছিল না। তবু (। যখন স্যুপের বাটিটি তার সামনে রাখল তখন শর্টহার্ডস সেটি কোনরকমে পান করল। সে দেখল গার্ভি তাকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে।

শর্টহার্ডস আরো খানিকটা স্যুপ খেতে খেতে গৃহকর্তার দিকে নজর রাখছিল। দেখল ক্রমে তার মুখে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। দ্রুত তাঁর নড়াচড়া লক্ষ্য করল, চোখ বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। গলার স্বরও কাঁপছিল। বেশ নার্ভাস লাগছিল।

গার্ভি বললেন, আপনার সঙ্গে খেতে বসলে ভাল লাগত কিন্তু একটি বিশেষ জিনিস ছাড়া আমি খাই না।

শর্টহার্ডসের এই বিশেষ জিনিস খাওয়া নিয়ে মনে মনে কৌতূহলী হলেও মুখে সে কিছুই বলল না। কিন্তু দেখল গৃহকর্তা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এবং সেটা দেখে মনে মনে ভাবল হেঁটে স্টেশনে চলে গেলেই বরং ভাল হত।

গার্ভি বললেন, আপনি দেখছি মার্ক্স-এর সামনে কথা বলেন না। সেটা অবশ্য ভালই। মানুষ ও ভালোই কিন্তু একটা বাজে অভ্যেস ওর আছে।

শর্টহার্ডস বলল, সেটা কি পানদোষ?

গার্ভি উত্তর দিলেন, আরও খারাপ দোষ। শর্টহার্ডস বলল, দোষ সব ভৃত্যেরই থাকে।

গার্ভি বললেন, আপনি যদি ভয় না পান তবে আস্তে আস্তে বলি। বলে তিনি বলতে লাগলেন, কেননা শর্টহার্ডস জানিয়েছে সে ভয় পায়না।

গার্ভি বললেন আমিই মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যাই শুনে শর্টহার্ডস নিরুত্তর থাকল, কিন্তু তার হৃদযন্ত্র ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গার্ভি বলতে থাকলেন, গর্তের ভিতরে আশ্রয় নেওয়ার ওর একটা ঝোঁক আছে।

শুনে শর্টহার্ডস অবাক হয়ে গেল বলল, কি গর্ত?

সেইসব গর্তে নেমে যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে, ডেকে সাড়া পাওয়া যায়না। কী যে করে জানিনা।

আশ্চর্য! শর্টহার্ডস প্রশ্ন করল সেখানে সে কি করে হাওয়া বদলায়?

তিনি বললেন আমার কথা, তাই জানি কি ভাবে শয়তানটা গর্তে থাকে।

শর্টহার্ডস-এর প্রশ্ন, কোনদিন ওকে অনুসরণ করে দেখা হয়েছে কিনা।

গার্ভি বললেন না। সেই গর্তে দু'জনে যাওয়া যায় না বলেই মার্ক্স নিশ্চিন্ত। তার কোন ভয় নেই। শর্টহার্ডসের মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। ভয়ে কথা আটকে গেল। চোখের পলক পড়ল না। দেহমন সব মনে হল সাড়হীন হয়ে গেছে। সে দেখল, গার্ভির মুখে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিশ্রী কুৎসিত প্রাণীর ছায়া।

আবার একটু পরেই সেই ছায়া সরে গেল। মনের কুয়াশাও অপসারিত হল। যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে গার্ভি বলল অনেকদিন এই সব ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। তার বুক ধড়ফড় করছিল। মনে হচ্ছিল বুকের উপরে কিছু একটা ভারি বস্তু চাপা রয়েছে।

গার্ভি বললেন, তার এসব ব্যাপার নিয়েই কৌতূহল। এসব নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন।

পায়ের শব্দ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলে গার্ভির মুখ উত্তেজনায় ভরে গেল। টেবিল শক্ত করে ধরে বললেন আমার খাবার আসছে। তার মুখ এক বন্য জন্তুর মত হয়ে গেল। নেকড়ের মত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করল শর্টহার্ডস। ওপরের ঠোঁটের জায়গায় চক্‌চকে দাঁত বেরিয়ে এলো। সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

দরজা খুলে মার্ক্স খাবার ভর্তি একটা ডিস গার্ভির সামনে রাখতেই শর্টহার্ডস দেখল সেটা থেকে সদ্য নিহত প্রাণীর তাপের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই মাংস তুলে গার্ভি খেতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁট ও চোয়াল রক্তে ভরে গেছে। শর্টহার্ডস আর সহ্য করতে পারল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আতঙ্কিত হয়ে শর্টহার্ডস এই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।

একসময় গার্ভি স্বাভাবিক ভাবে তাকে বললেন—আপনি এ খাবার নিশ্চয়ই খেতেন না। আপনার খাওয়া আশাকরি পরিতৃপ্তি সহকারেই হয়েছে। মার্ক্স এখুনি আসবে। সে গর্তের মধ্যে চলে গেছে কিংবা আমাদের কথা শুনেছে নিশ্চয়ই।

শর্টহাউস প্রশ্ন করল গার্ভির কাছে মার্ক্স-এর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কিনা।

উত্তরে তিনি বললে অন্যদিন সে চলে গেলেও আজ সে চলে যায়নি। কেননা তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গর্ত বলতে গার্ভি কি বলছেন শর্টহার্ডস তা বুঝতে পারল না। গর্ত মানে কি মদ রাখার কুঠুরি। সে দেখল, মার্ক্স জল ও তোয়ালে নিয়ে এলে পশুর আদর খাওয়ার কায়দায় গার্ভি মুখ এগিয়ে দিলেন। গার্ভি এবার শর্টহার্ডসকে লাইব্রেরিতে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। এবং শর্টহার্ডস তাঁর পিছু পিছু এগিয়ে চলল। গার্ভি তৎক্ষণাৎ বললেন ব্যাগে কি কাঁচা মাংস আছে যে ওটা সবসময় আপনার সঙ্গ নিচ্ছে।

শর্টহার্ডস জানে ব্যাগের মধ্যে কি আছে তা জানতে পারলে গার্ভি তার উপর হামলা করবে, তাই সহজ সুরে বলল না ওর মধ্যে কাগজপত্রই আছে। কিন্তু গার্ভি নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। ব্যাগটা পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। গার্ভি সেই সময় শর্টহার্ডসের হাত এমন জোরের সঙ্গে চেপে ধরেছিল যে তার হাতটা বেশ ব্যথা করতে লাগল। এবং ব্যাগটা মাটিতে পড়ে গেল। গার্ভি তখনই তার দিকে ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু অবিলম্বেই শর্টহার্ডস নিজেকে সামলে নিয়ে তার দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে রইল।

ফায়ার-প্লেসের সামনে দু'জনে গিয়ে বসে কফি খেতে লাগল। এবং এই গনগনে আগুনের তাপটা তার কাছে বেশ আরামদায়ক লাগল। কফি ও চুরুট খেতে খেতে সে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলল।

খানিকক্ষণ বসে থাকার পর গার্ভি বললেন তাকে মাংস খেতে দেখে শর্টহার্ডসের নিশ্চয়ই অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। দিনে মাত্র একবার। এছাড়া তিনি আর কিছুই খাননা। শর্টহার্ডস এই কথার জের টানতে চাইছিলেন না। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে আমিষ বা নিরামিষ খাবারের গুন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু গার্ভির তাতে কোন উৎসাহ ছিল না।

তার কথা শেষ হতেই গার্ভি বললেন খিদে পেলে নিজেকে তার সামলানো মুশকিল। তখন কাঁচা মাংস চাই-ই তার। সে যে প্রাণীই জুটুক না কেন। তিনি বললেন বছর খানেক আগে মার্ক্স-এর অনুপস্থিতিতে এমন খিদে পেয়েছিল তার যে তিনি নিজেকেই কামড়াতে থাকতেন। একসময় খিদে অসহ্য হয়ে উঠতেই ঠিক সেই মুহূর্তেই পোষা কুকুরটা সোফার তলা থেকে বেরোতেই তার খিদের সমস্যা মিটিয়ে ফেললেন। মার্ক্সকে তিনি অনেক বার কামড়েছেন তবে মার্ক্সের গা খুব তেতো। তিনি বললেন হয়তো বা সেই জন্যই মার্ক্স গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়।

এসব কথা বলার পর বিকট ভাবে তিনি হাসতে লাগলেন। অগ্নিস্থানে শর্টহার্ডস শিক দিয়ে আগুনটাকে একটু খুঁচিয়ে দিল এমনভাবে মনে হয় জীবনটা তার এর উপরেই নির্ভরশীল। যাইহোক শর্টহার্ডস গার্ভির কাছ থেকে শুতে যাওয়ার অনুমতি চাইল তাকে তার বিশ্রামের ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলল কেননা সে বড়ই ক্লান্ত। গার্ভি সম্মত হয়ে টেবিলের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে বললেন মার্ক্স এখন গর্তে চলে গেছে তাকে ডাকার প্রয়োজন নেই। তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা সুন্দর ঘরে শর্টহার্ডসের শোওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঘরটা ভাল করে দেখার পর শর্টহার্ডসের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। বিছানার পায়ের কাছে দুটো মোমবাতি ছিল সে দুটো গার্ভি জ্বেলে দিলেন। গনগনে আগুন রয়েছে। ঘরের বিপরীতে দরজার মত দুটো জানালা খোলা। ঘরে কয়েকটি ছবিও আছে। দোর গোড়ায় গার্ভি দাঁড়িয়ে বললেন আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস সবই এখানে আছে, তও যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে ঘণ্টা বাজাবেন। মার্ক্স শুনতে না পেলেও গবেষণাগার থেকে আমি শুনতে পাব। আমি ওখানে সারারাত কাজ করি। এই কথা বলার পর তিনি প্রস্থান করলেন। আর তখনই এক আশ্চর্য কাণ্ড করল শর্টহার্ডস। পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে জানলার দিকে ধরে আধ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তারপরেই পিস্তলটা দরজার চাবির গর্তের মুখে ঢুকিয়ে ধরে থাকল খানিকক্ষণ।

তার পরেই চলা ফেরার আওয়াজ হল দরজার বাইরে। এবং ক্রমশঃ আওয়াজটা পিছু হটতে লাগল। শর্টহার্ডস নিজের মনেই যা ভেবেছিল ঠিক তাই। হাঁটু পেতে দরজার চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বসেছিল। ফুটো দিয়ে বন্দুকের নল দেখে পিছু হটে চলে গেল। ক্রমশঃ পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করার সময় শর্টহার্ডসের নজরে পড়ল চাবির ফুটোর উপরে আর একটা চাবির গর্ত তখনই সেটা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিল। এবং ভাল ভাবে সবটা পরীক্ষা করে সন্দেহ হবার মত কিছুই সে দেখতে পেলনা। ঘরের ভিতর কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করল।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল গরাদহীন জানলার নীচে একটা বারান্দা। নীচে থেকে সেটা প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। বেশ বড়সড় বিছানাটা আরামপ্রদ। ফায়ার প্লেসের পাশে দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার। কিন্তু ক্লান্ত শর্টহার্ডস ঠিক করল শোবেনা। সে সতর্কতা মেনে চলবে। একটি চেয়ারে বসে সে উপলব্ধি করল কেউ যেন তার প্রতি নজর রাখছে। কিন্তু কি ভাবে তাকে আঘাত করবে বুঝতে না পেরে নিজের মনের ওপর জোর খাটাতে চেষ্টা করল। ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে চলল। নিস্তব্ধ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের দাপটও কমে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে জানলায় তুষারের ঝাপটা এসে লাগতে লাগল। বোঝা গেল দুর্যোগ এখনো শেষ হয়নি।

ক্রমে তার নিদ্রা আসছে আর বর্তমানে যে আতঙ্ক তাকে ঘিরে রয়েছে তা শিথিল হয়ে আসছে। তবে এই পরিবর্তনটা তার গোচরে আসছে না। তার মনে হচ্ছে বিপদ সম্বন্ধে সে অবগতই আছে। শর্টহার্ডস মনে জোর আনবার চেষ্টা করছে।

জোর করে মনের কোণে জেগে থাকা কুৎসিত দৃশ্যগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। আর ঘুম ক্রমশঃ আঁকড়ে ধরছে তাকে। গনগনে আগুন আর বিছানা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসতে আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ঠিক ঘুমিয়ে পড়বার আগেই সে বিপদের সংকেত পেল। মনে হল কে যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। লাফ দিয়ে শর্টহার্ডস উঠে পড়ল আর এক লাফে দরজার চাবির গর্ত আড়াল যাতে না হয় এমন ভাবে ঘরের বিপরীত কোণে গিয়ে দাঁড়ালো।

ধীর পায়ে সাবধানের সঙ্গে যে আসছিল সে মনে হল দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে শর্টহার্ডস পকেট থেকে পিস্তল বার করে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালো ঠিক তখনই পায়ের আওয়াজ একেবারে থেমে গেল। বোঝা গেল লোকটা দরজার কাছে থেমে গেছে। চাবির গর্ত দিয়ে ঘরের ভিতর লক্ষ্য করছে। শর্টহার্ডস ভীতু প্রকৃতির নয় যথেষ্ট মনোবল আছে ওর। কিন্তু এই রহস্যজনক ঘটনায় সে একটু চিন্তিত হয়েছে মাত্র। তার মনে হচ্ছে পশুভাবাপন্ন গার্ভি ও ইহুদি ভৃত্যটির সম্মুখীন হওয়ার থেকে একপাল নেকড়ের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাল। শর্টহার্ডস দেখল কি একটা জিনিস দরজা ছুঁয়ে এগিয়ে এল। শর্টহার্ডস শিহরিত হল। সে ঘামতে লাগল। শক্ত হাতে পিস্তলটা চেপে ধরল। দরজা খুললেই ঐ ব্যক্তি তার পিস্তলের সামনে পড়বে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জানে দরজা ভিতর থেকে চাবি বন্ধ করা। কাজেই দরজা খোলা মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে চাবির গর্তে গোঁজা কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। যেটা দিয়ে সে কাগজের টুকরোটাকে ফেলেছিল সেটা শর্টহার্ডসের নজরে পড়ল।

বুঝতে কষ্ট হলোনা বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি ঐ গর্ত দিয়ে ভেতরে নজর রাখছে। সঙ্গে সঙ্গে শর্টহার্ডসের মনে হল প্রতিশোধ নেবার সেই ইচ্ছেয় গর্তের পাশে সজোরে হাত ঠুকলো। সেই শব্দ মনে হয় দরজার পাশে থাকা ব্যক্তির কানে সজোরে আওয়াজ সৃষ্টি করেছে। সে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। তখনই দরজার কাছে কেউ আছে সে বুঝল। আর ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে গেলো। তবে এবার দু'জন এসেছিল। গর্তের মধ্যে কাগজটা গুঁজে দিয়ে অগ্নিস্থানের দিকে শর্টহার্ডস ফিরে আসতে গিয়ে চোখ পড়ল জানলার উপরে। সেখানে একটা সাদা মুখ। বরফের জন্যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ভালো করে দেখবার আগেই মুখটা সরে গেল। বুঝতে পারল শর্টহার্ডস দু-দিক দিয়েই তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। যেন তেমন কোন ঘটনাই হয়নি এমনভাবে শর্টহার্ডস আগুনটা উস্কে দিয়ে জানলার কাছে গেল এবং দৃঢ় ভাবে জানলাটা খুলে বারান্দায় গেল সে। কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল ঝড় বুঝি থেমে গেছে কিন্তু বারান্দায় এসে বুঝল তার ধারণা ভুল। ঝড়ের ঝাপটা এসে ঘরের মোমবাতি নিভিয়ে দিল। বৃষ্টি এসে মুখময় ভিজিয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকারে

সে কিছুই দেখতে পেলনা। শর্টহার্ডস গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মনে হল এখানে কেউ নেই। ক্রমে তার চোখে অন্ধকার ধাতস্থ হয়ে গেল। তখন সে অন্য জানলা দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পেল। সেই জানলার কাছে পৌঁছবার জন্যে যেখানে বারান্দায় সে দাঁড়াল সেখানে শর্টহার্ডসের গায়ে একটা আলোর টুকরো ওর গায়ের উপর পড়ে থাকায় নীচের থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওপর থেকে যে শর্টহার্ডসকে দেখা যায় তা শর্টহার্ডস ভাবতে পারেনি। খেয়াল হতেই দেখল তার মাথার ওপরে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। দেখল একটা মোটা কালো দড়ি কে যেন উপর থেকে টেনে তুলে নিল। শর্টহার্ডস যেন মাথায় রক্তচাপ অনুভব করল। শর্টহার্ডসের মনে হল ঘরের সব জায়গাতেই যেন অনেক ইহুদির কুৎসিত ছায়া তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শর্টহার্ডসের দৃষ্টি পড়ামাত্র তারা সরে যাচ্ছে। কিন্তু অনুভব করছে সে এখন দুর্বলতা প্রকাশ করলেই তারা আবার এগিয়ে আসবে। কেননা তাঁর মনে হয় তার অজ্ঞাতসারেই একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সে সদা জাগ্রত থাকল। এবং ঘুমকে এড়ানো মুশকিল হয়ে গেল। এই কারণেই সে পেনসিল দিয়ে ঘরের ফার্নিচারের ছবি আঁকতে লাগল ও নকল করা শুরু করল প্রতিটি ছবির। বেশ ভালভাবেই এ বিষয়টি তাকে মুগ্ধ করায় ঘুম চলে গেল। এবং দেখল প্রত্যেকটি ছবি খুব সুন্দর ভাবে আঁকা।

আলোর স্বল্পতার জন্য সে এখন অগ্নিস্থানের ছবিগুলোই আঁকতে লাগল। আর বারবার জানলার দিকে নজর দিচ্ছিল। কিন্তু সেই মুখটি আর দেখা গেলনা। মাঝে মাঝেই দরজায় গিয়ে কান পেতে ও কোন আওয়াজ পেলোনা। এবার সে আক্রমণের ভয় থেকে নিশ্চিন্ত হল। বারান্দায় গিয়ে দেখল উপরের জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ; তুষার ঝড় বইছে। বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে চলে এলো। বেশ কয়েক ঘণ্টা এইরকম করেই কেটে গেল। আগুনটা নিভে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। দুটো মাথা স্কেচ করতে করতে ক্লান্তি বোধ করল সে। রাত প্রায় তিনটের সময় উঠে দাঁড়ালো সে। এবং সে নির্ভয়ে ঐ পোশাকেই ব্যাগটা পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত হয়েই। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তাকে স্পর্শ করেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সে নিশ্চিত হয়ে দেখল, না কোটের পকেটে কাগজগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো ঘরের মধ্যে পরিবর্তন দেখে। ঘরের জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধ কিন্তু দরজাটা ভিতর থেকেই খোলা এবং বারান্দায় পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সে পিস্তলটা বার করে বিছানার থেকে নেমে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের শব্দও থেমে গেল। সে আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করে থাকল, সে ঘরে প্রবেশ করল।

আর লুকোচুরির অবকাশ নেই। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে দেখতে না পেয়ে মোমবাতির আলো জ্বাললো। মনে মনে শর্টহার্ডস ভেবেছিল এখনই সে আঘাত পাবে কিন্তু তা হলো না। আলো জ্বেলে কাউকে দেখতে পেলো না। কেবল দেখল ব্যাগটা নেই। শর্টহার্ডসের আর ঘুম হলোনা। রাত এখন চারটে। ভোর হতে আরও তিন চার ঘণ্টা বাকি। অগত্যা সে আবার ছবি আঁকতে লাগল। নতুন করে আবার লোকটির মাথা আঁকায় মন দিল সে। কিন্তু বার বার সে ব্যর্থ হতে লাগল। এরকম কেন হচ্ছে পরিষ্কার সে বুঝতে পারল না। মনে হল চোখ দুটোই তার কারণ। পেন্সিল নিয়ে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল নাক আর চোখের দূরত্বের আন্দাজ করতে।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে গেছে, আরো আশ্চর্য হয়ে সে দেখল তার সামনেই আবার চোখের পাতা দুটো খুলে গেল। এবং তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুঝতে কষ্ট হলো না ছবির চোখ দুটো কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে জীবন্ত মানুষের চোখ চেয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভয় দূরীভূত হয়ে ক্রোধের জন্ম নিল। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছবিটার উপরে ঝাপিয়ে পড়তেই চোখদুটো সরে গিয়ে ছবিটা পড়ে গেল মাটিতে। শর্টহার্ডস বাঁ হাতে একটা পা টেনে নিয়ে এসে ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। টেনে এনে লোকটাকে দেখল সে ইহুদি চাকরটা। শর্টহার্ডসের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সেই সময় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে গার্ভি এসে দু'জনের মধ্যিখানে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করে উঠলেন ওকে মারবেন না। গার্ভি মার্ক্সকে ধরে কুকুরের মত ঝাঁকাতে লাগলেন, এইটাই তোর গর্ত? তোকে সারারাত ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি আমি। এইবার তোকে ঠিক ধরেছি। বলতে বলতে গার্ভি উপরের ঠোঁট তুলে দাঁত বার করলেন। মার্ক্সও তাই দেখে

ভীষণ চিৎকার আরম্ভ করল, আর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

শর্টহার্ডসের সামনে যেন একটা অধ্যায় শেষ হল। তৎক্ষণাৎ গার্ভির মুখে সেই ছায়াটাও দেখা গেল। এখুনি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখে মার্ক্স পিস্তল সামনে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। শর্টহার্ডস দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে দেখল মার্ক্সকে গার্ভি তখনও ঝাঁকিয়ে চলেছেন। ততক্ষণে শর্টহার্ডস সিঁড়ির ধাপে এসে পড়েছে। প্রচণ্ড রাগে পশুর মত মুখ গার্ভি আর মার্ক্স ভয়ে আতঙ্কিত। কিন্তু এবার দু'জনেই শর্টহার্ডসের দিকে ধেয়ে এলেন রাগে। সেই মুহূর্তেই শর্টহার্ডস তাদের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। দৌড়ে সিঁড়ির নীচে ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আর মার্ক্স ও গার্ভি তাকে অনুসরণ করে ধাওয়া করে গেল। সুযোগ বুঝে শর্টহার্ডস সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে ওদের অগোচরে শোওয়ার ঘর অতিক্রম করে জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম বালির উপর। এবং দৌড়তে দৌড়তে ওদের চিৎকার শুনতে পেল। কয়েক ঘণ্টা পরে বাড়ি পৌঁছে জানল সাইড বোথাম তার মাইনে বাড়িয়ে কোট ও শার্টও নতুন করে বানিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কট ইন ফিয়ার

বাড়ি ফিরছি কলেজের প্রথম শেষনের পড়া শেষ করে। অস্বাভাবিক রকমের বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন ধরে। ভরা জোয়ারের একটু আগে বা পরে ছাড়া খেয়া পার হওয়া অসাধ্য। কারণ নদীর জল বাড়তে বাড়তে হেলেস্‌মন্টে পৌঁছে গেছে, এমনকি প্রতিটি নালা ও খালের জল তীর ছাপিয়ে গেছে।

আমি সরাইখানায় আটকে রইলাম, পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত। কারণ যেমন বৃষ্টি তেমনই ঝড় চলছে সারাদিন ধরেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এল খেয়া ঘাট পৌঁছানোর আগেই। মাঝরাতের আগে পারাপারের উপযুক্ত জোয়ার পাবার কোন আশা নেই। কোনো উপায় নেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া। খেয়ার মাঝি খুবই বৃদ্ধ এবং অথর্ব বলে বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম, রাতের বেলায় সাধারণতঃ নৌকা চালায় তার ছেলে ডিক্, রাতে নদী পার হয়ে কোনো যাত্রীরই আসার আশা নেই। কারণ আকাশের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

নোঙর করা একটি দড়ির সাহায্যে নৌকাটাকে এপার-ওপার করা যায়, সেই কারণেই এখানে ডিকের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন ছিল না। যাত্রীরা নিজেরাই যাতে অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তাই আরও একটি দড়ি এপার থেকে ওপারে টেনে দেওয়া হয়েছে স্রোত বেশী থাকলে। আমার একটা হাত ঝুলিয়ে বাঁধা থাকায় আমার পক্ষে এ কাজ সহজ না হলেও যারা করে তাদের কাছে এ কাজটি খুবই সহজ।

একটি চটপটে সুদর্শন গ্রামের ছেলে ঘরে ঢুকল, মাঝি আর তার বৌ, যারা অগ্নিকুণ্ডের পাশে ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। তার সঙ্গে একজন আসন্ন প্রসবা তরুণী এবং মাথায় একটি পালকযুক্ত টুপি। তাদের জানানো হল খেয়ার অবস্থা। খেয়ার অবস্থা জানিয়ে তাদের বলা হল যে ডিক্ ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। অথবা তারা নৌকাটি টেনে নিয়ে যেতে পারে।

তাদের বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন আগে। তারা রেজিমেন্টে যোগ দিতে চলেছে। রাল্‌ফ্ নক্টন ছেলেটির নাম, সে হল নবনিযুক্ত সৈনিক। গ্রাম্য গীর্জার পুরোহিতরা সেদিনই তাদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে যেদিন তারা সেনাদলে ভর্তি হয়েছিল। অল্প কয়েক মিনিট পরেই মেয়েটি ছেলেটির প্রতি অপ্রসন্ন এবং রুক্ষ হয়ে উঠল এবং ছেলেটিও যে তার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন নয় তা বোঝা গেল, যদিও তাদের আগেকার ভালবাসা বা ঘনিষ্ঠতা কতদূর কি ছিল তা জানি না।

মেয়েটি ছেলেটিকে বারবার তিরস্কার করছে, তার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, এবং সামান্য কথাই বলছে, তাতে যা শোনাচ্ছে তা হল, যে ক্ষমতা থাকলে সে কখনই স্বামীর কাছ ছেড়ে দূরে চলে যেত না এবং আরো এই বলে তিরস্কার করছে সে সেনাদলে তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়েছে তাকে ও তার অজ্ঞাত সন্তানকে ছেড়ে চলে যাবার জন্য।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে মেয়েটির অসামান্য রূপ এবং ব্যক্তিত্ব আছে এবং একটি কলহপ্রিয়তাও আছে। নক্টন তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করেছে এ কথা যখন আমি শুনলাম তখন আমি বিস্মিত হইনি খুব একটা। এই বেচারিকে সারাজীবন একজন দুর্ভাগাকে বয়ে বেড়াতে হবে। গ্রাম্য গির্জার লোকগুলি এমনই সহানুভূতিহীন এবং বিবেকহীন। অথচ গ্রাম্য গীর্জার ঘাড়েও সে তার অজ্ঞাত সন্তানের ভার চাপিয়ে দিতে পারবে না। এই ভেবেই আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। তারা যেন তাদের ভাগ্যকে মেনে নেয় এই বলে খেয়ার মাঝি ও তাঁর স্ত্রী তাকে অনেক ভাবে বুঝিয়েছিল। কিছুটা উদার ও বেপরোয়া স্বভাবের ছিল এই নবনিযুক্ত সৈনিকটি। তাকে কিছুটা শান্ত বলে মনে হলেও তার সঙ্গিনীটি ছিল খিটখিটে এবং খেয়ালী প্রকৃতির। সে রাতে আর এক পাও নড়বে না এই কথা সে কোনো ভদ্রতা বা ভব্যতার পরোয়া না করেই চীৎকার করে বলল, কারণ জলের

একটা প্রচণ্ড ঝাপটা জানালার গায়ে এসে আছড়ে পড়েছিল।

'কাল সকালেই সেনাদল যাত্রা শুরু করবে, মেরী তুমি যাই কর আমাকে যেতেই হবে, ক্যাপ্টেন আমাকে এত বেশী সময় শহরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন সেহেতু তুমি আমার সঙ্গে যাবার জন্য গোছগাছ করে নিতে পার'—এই কথা নক্টন বলে উঠল।

এটা একটা নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিচ্ছে যে তার এই অবস্থায় আর এই আবহাওয়ার মধ্যে তাকে জোর করে পথে বার করা হয়েছে। এই কথা মেয়েটি তীব্র ভাষায় বলে উঠেছিল।

নক্টন তার হাসিখুশি স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতে কিছু একগুঁয়েমির সুরে জানিয়ে দিল, 'বৌয়ের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে আমাকে সেনাদলে যেতে আটকে দেবে।' সে তার বৌয়ের কোনো কথাতেই কান দিল না।

সে বাইরে কিছুক্ষণ একলা কাটিয়ে ফিরে এল। তার উজ্জ্বল চোখ, ছাইয়ের মতো বিবর্ণ মুখ নিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না মেরি। নৌকা প্রস্তুত, বৃষ্টি থেমে গেছে। নদীও তত ভয়ঙ্কর নয়।' এই কথা বলার সময় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

ছেলেটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, যদিও মেয়েটি বৃথাই প্রতিবাদ করল। একলা এখানে পড়ে থাকা বা স্বামীর সঙ্গে যাওয়া এছাড়া মেয়েটির আর কোন তৃতীয় পথ খোলা নেই। নদীতে সবে জোয়ার এসেছে, সৈনিকটিকে কিভাবে দড়ি ধরে এগোতে হবে, সেই সম্বন্ধে বুড়ো মাঝি তাকে কিছু নির্দেশ দিল, এবং তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নৌকায় চড়তে সাহায্য করল।

'সব সময়ে সুন্দরীদের জন্য করুণা জমা রেখে কেন যে ছেলেগুলোকে দোষ দেওয়া হয়।' একথা মাঝি তার বৌকে রসিকতা করে বলল।

বিদ্যুতের একটা ঝলকানির সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বজ্রের গর্জন হল যা আমি আগে শুনিনি, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই বৃষ্টি ও ঝড়ের শন্‌শন্‌ ঝরঝর শব্দ ছররা গুলির মত এসে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর।

একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। বুড়ো বলে উঠল, 'একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল না?' সেই শব্দটি কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শোনা গেল না। নদীর জলোচ্ছ্বাস এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া দরজার কাছে ছুটে গিয়ে আর কোন শব্দ পেলাম না।

ডিক্ বাড়ি ফিরল একটু বাদেই। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নৌকায় উঠলাম কারণ নৌকাটা আগের জায়গায় ফিরে এসেছে ইতিমধ্যেই। হঠাৎ একটি অজ্ঞাত ত্রাসে আমি কাঁপতে লাগলাম। একটি আকস্মিক দুর্বোধ্য আতংক আমাকে পেয়ে বসল। সেইমাত্র আমি আমার মাথাটা বালিশের ওপরে রেখেছি। আমি অনেক কষ্টে আমার বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে রাখা থেকে প্রবৃত্ত করলাম। কারণ আমার মনে হল যে আমার চারপাশে অদৃশ্য কেউ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ফলে ঘুম ভাল হল না, অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। স্বপ্নে দেখলাম, মুখ খোলা কবর, ফাঁসির দড়ি যা বাতাসে দোদুল্যমান, মুখ খোলা কবর এবং একটি সৈনিকের ভয়ঙ্কর মূর্তি যা একটি নারীকে হত্যা করছে। আমার স্মরণে এরকম দ্বিতীয় কোনো রাতের কথা আসে না।

আমার মন থেকে সব মেঘ সরে গেল যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খুশী মনে যাত্রা শুরু করলাম। তাদের কথা আর মনেই এল না। যারা ছিল সেই নবনিযুক্ত সৈনিক এবং তার বৌ। সকাল বেলার উজ্জ্বল উদয় সূর্যের আলোর মধ্যে।

আমার উপর একটা অকারণ মনের ভাব পরের বছর সেই একই দিনে আমাকে চেপে বসল। মনটা যেন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, আজ সেই ভাবকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও তা পারলাম না।

অনেক চেষ্টা করেও এই প্রকার অস্বস্তিকে কাটাতে পারলাম না যেমন করে শরীর থেকে জ্বর চেষ্টা করলেও ছাড়ে না। এক সময় মনমরা অস্বস্তিতেও ঘুমিয়ে পড়লেও মধ্যরাতে একটি বীভৎস ও অবর্ণনীয় আতঙ্কে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একই ধরনের সেই অভিজ্ঞতা হল যা পূর্বেও একবার ঘটেছিল। এক অদৃশ্য অতিথি আমার চারপাশে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেই মুহূর্তে আমার নক্টন ও মেরি ব্লেকের কথা মনে পড়ে গেল। এই অসুখী দম্পতি যেন পরস্পরের ওপর দোষারোপ

করছে এই অপচ্ছায়া ছাড়া কিছু দেখছি না।

হতভাগিনী বধূটি আমার দিকে যেন ঘুরে দেখল। যখন চোখের দৃষ্টি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাকালাম আরেকবার। আমি কেমন করে যে আতংকের কথা বর্ণনা করব একদিন যে রক্তিম সুন্দরীকে দেখেছিলাম তার পরিবর্তে একটি কংকালের মূর্তি। বাড়ির লোক আলো হাতে নিয়ে ছুটে এল আমার ভয়ার্ত কণ্ঠের চিৎকার শুনে। আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না। একটি দুঃস্বপ্নের ঘাড়ে সবকিছু চাপিয়ে দিলাম থামবার চেষ্টা করে।

একটি খনিজ জলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছিল। বোর্ডিং হাউসে আমি ছিলাম কয়েকজন অপরিচিত লোকের মধ্যে। সেখানে একজন বুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, পাণ্ডুর মুখ সম্পন্ন এবং আকর্ষণীয় দেহ গঠন সম্পন্ন একজন জার্মান। অসাধারণ চাতুর্য সম্পন্ন ছিলেন তিনি। দলের অন্য সকলের থেকে একটু দূরে যাবার জন্য তিনি প্রাতঃরাশের টেবিল থেকে উঠে বাড়ির সামনের লনে আমায় নিয়ে গেলেন। তারপর আমায় বললেন—

'মশাই একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছি আপনাকে, দুঃস্বপ্ন কিছু কি কাল রাতে আপনি দেখেছিলেন, যা দেখে আপনার ভয় হয়েছিল?'

—'আপনার প্রশ্নের আমি খোলাখুলি জবাব দেব, এ প্রশ্নের অর্থ কী?'

—'এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ, প্রকৃতি কোন্ রহস্য মূর্তিতে দেখা দেবে সেই কল্পনা শক্তি আমি আমার এক চিত্রকর বন্ধুর ছিল যা আমি আর কারো মধ্যে তেমনটি দেখি নি। আমার চিত্রকর বন্ধুর একটি ছবির বিষয়বস্তু ছিল যে ব্রুটাসের অশুভ প্রতিভা যখন ফিলিপিনসে নিয়ে যাওয়া হয় সেই দৃশ্যটি এবং আমার চেহারার সঙ্গে বেশ মিল আছে ব্রুটাসের। কাল সকালে যখন আপনার ঘরে ঢুকলাম, তখন আমাকে এতটাই ব্রুটাসের মত লাগছিল যে একটা ভূত দেখেই আপনি চমকে উঠেছিলেন একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

সেই সব কথা তাকেও বললাম যা তোমাকে বলেছি। 'এটা খুবই আশ্চর্য যে, একটি ধারণাতীত সহানুভূতি আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছে এই সব দুঃখী মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে। স্বপ্নের অপচ্ছায়ার বাইরেও বেশী কিছু অবশ্যই আছে এইসব নতুন আবির্ভাবের মধ্যে।

আমাকে ছোবল মারল এই সমস্ত অস্বস্তিকর কথাগুলি যেন একটি ভয়ের অনুভূতি নিয়ে। সবকিছু সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম অচিরেই সেই ভাবটা কেটে যাবার পর।

সেই মনের ভার ও অকারণ ত্রাস তখনও ছিল যখন আবার এল বছর ঘুরে সেই দিনটি। আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল প্রথমবার ঘুমের পরে দ্বিতীয়বার সেই রহস্যময় সন্ত্রাসের অনুভূতি এবং বিভিন্ন প্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল বিছানায় শুতে যাবার আগে। একটা অন্যরকম দৃশ্য দেখেছিলাম, পাণ্ডুর অবস্থা, নতুন কাগজের মোড়ক থেকে খোলা স্কন্ধত্রাণ পড়ে পাণ্ডুর অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে কেবলমাত্র নক্টন।

এই যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি সাত বছর ধরে। মেরি ব্রেককে কোনোদিনও দেখিনি যদিও প্রতি বছর বছর নতুন ধরনের দৃশ্য দেখি আমি। ভোজ উৎসবের দ্রব্যাদি সাজানো একটি টেবিলের সামনে এড্-ডি-রংয়ের পোশাক পরে বসে রয়েছে নক্টন। যা কেবল আয়নায় দেখা যায়, তা আমি দেখেছিলাম চতুর্থ বছরে।

মেরি যেন একটি তরবারি হাতে নিয়ে কামানশ্রেণীর প্রাচীর বেয়ে উঠছে যা আমি পঞ্চম বছরে দেখলাম। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পিছনদিকে। সব ছায়া মূর্তি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে, যাতে রয়েছে গম্বুজ এবং প্যাগোডা। ছবিটি একটি হলেও সেটি ছিল খুবই স্পষ্ট এবং জীবন্ত প্রকৃতির।

রোগে শায়িত অবস্থায় কিন্তু আঘাতের ফলে নয় এরকম অবস্থায় তাকে একটি কোচে দেখলাম ষষ্ঠ বছরে, বুকে একটি তারকা লাগিয়ে বসে রয়েছে একজন পদস্থ অফিসার তার পাশে। যে অফিসারটির সঙ্গে কথা বলে খুবই খুশি হচ্ছে এই রকম নিস্তেজ অবস্থাতেও।

এরপর রণক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে তাকে দেখলাম সপ্তম বছরে। তার মুখে একটি তরবারি আঘাত করছে, রক্ত ঝরছে তার সামরিক পরিচ্ছদের উপর থেকে এবং এটি দেখলাম আমি তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই।

আর কোনো অশরীরী আত্মা এসে হানা দিল না এবং বছরের পর বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। সুস্থ অবস্থা ফিরে এল আমার মন ও স্মৃতিতে। বন্ধুদের কাছে বলি, অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় ঘটনা হিসাবে প্রতি বছর তাদের ফিরে দেখার গল্প এবং মাঝে মাঝেই মনে পড়ে নক্টন ও মেরি ব্রেকের কথা।

এটি একটা অদ্ভুত যোগাযোগের কথা আমার জার্মান বন্ধুটি যেখানেই হাজির থাকেন সেখানেই আমি আমার এই স্বপ্নটির কথা বলে থাকি। আমার স্মৃতি তখন বেশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে বলে আমি অনেক সময় আর অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরও দিতে পারি না। সেরকম ঘটনা ঘটেনি তার বেলায়। স্বপ্নের মধ্যে আমি যা কিছু বলেছি, বা আমি নিজে যা কিছু দেখেছি তিনি লিখে রেখে গেছেন তার সমস্ত বিবরণও। তিনি অনেককাল ধরে নির্জন জীবন-যাপন করেছেন, তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিনয়ী প্রকৃতির মানুষ আমি তাঁর নাম উল্লেখ করতে চাইছি না। তিনি এতই উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী যে তার নাম করলেই সম্মুখীন হতে হবে অনেক অবাঞ্ছিত কৌতূহলের। যাক্ এখন আমি আবার গল্পে ফিরে যাই।

এরপর থেকে ঠিক চৌদ্দ বছর পর, যার মধ্যে সাত বছর কেটেছে আমার ভয় এবং আতঙ্কে এবং আর বাকী সাত বছর কেটেছে খুবই নিরুপদ্রবে। আমার সেই জার্মান বন্ধুটি একদিন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন ঠিক চৌদ্দ বছর পরে। নানা দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত তাই তার সঙ্গে সারাদিন আমার বেশ ভালভাবেই কাটল। আমি দেখিনি কোনোদিন তার মত গূঢ় বিদ্যায় এত পারদর্শী মানুষ।

তাঁর মতে জ্যোতিষশাস্ত্র ছিল একটি বিজ্ঞান, এটি কোনো ভাঁওতাবাজী নয়। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জ্যোতিষী। তাঁর ধারণা খুবই সুন্দর ছিল তিনি ফলাফলের কথা বলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় কোনোরকম কারণ বা অনুসন্ধানের মধ্যে না গিয়ে। তিনি আমাকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলতেন কিভাবে সমুদ্রের জোয়ারের সঙ্গে চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন কলার সাদৃশ্য রয়েছে। নিউটনের মতকে তিনি চাঁদের পরিবর্তন সম্পর্কে স্বীকার করেন না। রাশিচক্রের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন সূর্য কখন মেষরাশিতে প্রবেশ করে তা তিনি আমায় বুঝিয়ে বলতেন। বিভিন্ন প্রকার প্রভাব, যেমন রোগ ও অনুভূতি, বিভিন্ন জন্তু ও মানুষের আবেগ, গাছ ও ফুল প্রভৃতির ব্যাখ্যা করতেন। তিনি পাগলের প্রলাপ বলে মনে করতেন সেই ধারণাকে যে নক্ষত্রগুলি সৌরজাগতিক ঘটনার চাইতে কিছু বেশী।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সমান প্রগাঢ় ছিল স্পর্শমনি তত্ত্ব সম্পর্কে রসায়নগত বিষয়ে। তিনি নীতিশাস্ত্রের মূল কথা বলে মনে করেন পরশ পাথরের পৌরাণিক তথ্যকে এবং মৃতসঞ্জীবনীর কল্পনায় তাঁর হাসি পায়। একটি রূপক বলে মনে করেন তিনি মৃতসঞ্জীবনীকে। তাঁর মতে খ্যাতি অর্জনের মূল উপাদান হল অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সদিচ্ছা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

পরশ পাথর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সুন্দর। রোসি-ক্রসীয়ের কথা তিনি উল্লেখ করে থাকেন সেই বিষয়ে, কৃত্রিম প্রতীকের সাহায্যে এরা সমস্ত গোপন তত্ত্বকেই প্রকাশ করতে পারত। বাকিরা মূর্খ ছিলেন না সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের। যে কোনো যুবকের ক্ষেত্রে সম্পদ ও সম্মান অর্জন করার জন্য, আত্মত্যাগ, ধৈর্য, বিনয় এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন বলে তার মনে হয়।

আমি অবাক হয়ে গেছি তার নানা বিচিত্র বিষয়ের উপর স্পষ্ট আলোকপাত এবং সব কথাকে অত্যন্ত সরলভাবে বোঝাবার ক্ষমতা দেখে। তার বেশীর ভাগ বিদ্যাই দার্শনিক বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেমন মুখ দেখে চরিত্র নির্ণয়ের বিদ্যা, হস্তরেখাঙ্কন বিদ্যা, যাদুবিদ্যা এমনকি ডাইনী বিদ্যাও।

আলোচনা চলতে লাগল এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। সুদক্ষ একজন সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি সুর ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং গম্ভীর এবং তার মূর্ত আবেগ দেখা যেত পিয়ানো বাজানোয় তাঁর বাজনার সরলতায় যদিও এতে তাঁর চর্চার অভাব দেখা যেত।

মাঠেই কাটল সারাটা দিন। জ্যোতিষ চক্রের অনেক তথ্য তিনি আমাকে বোঝালেন, গাছপাতা, লতাপাতা এবং ঋতুচক্র প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে। একটি অলৌকিক সঙ্গীত তিনি আমাকে শোনালেন সন্ধ্যাবেলায়। তিনি সেই বিরল মানুষ বলে আমার মনে হল, যিনি পারেন দত্যিদানদের ওপর প্রভুত্ব করতে এবং আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। এইভাবেই ক্রমশঃ রাত বাড়তে

থাকল।

খেয়ার মাঝির ছেলে ডিক্ সেই সময় এসে ঠিক হাজির হল যে সময় আমরা রাতের খাবার খেতে বসতে যাব। বুড়ো মাঝি মারা গেছে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। আমার সঙ্গে সেই সময় গোপনে কিছু কথা বলতে চাইল ডিক্। বহুদূর থেকে একজন অফিসার ভদ্রলোক খেয়া পার হয়ে এসেছেন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়। সে একথা জানাল প্রথমে, তার পরে বলল সরাইখানা খেয়াঘাটে অবস্থিত সেখানে আমি ওঁর থাকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারিনি।'

ডিক্ আরো বলল 'আমি জানি আপনি ওর শোবার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন, কারণ সরাইখানাটা অনেক দূরে। তাছাড়া লোকটি খোঁড়া এবং ওর উরুতে একটি হাঁ করা ঘা। তিনি ভারতবর্ষের সব চাইতে একজন সাহসী অফিসার এই কথাই তার চাকরটি আমায় বলেছে।'

অসম্ভব ছিল তার সেই আবেদনকে উপেক্ষা করা। এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে, অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রলোক ঠিক সেখানেই। আমার বাড়িতে তার আরামের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে আমি খুব খুশি হব, একথা তাকে আমি খুব আন্তরিক ভাবেই জানালাম।

যেখানে তাকে নিয়ে গেলাম সেখানে আমার সেই জার্মান বন্ধুটি রয়েছে। আমি তার আচরণ ও ভদ্রতা এবং সরলতায় খুবই খুশী হলাম।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি ছিল বেশ সুদর্শন। তার মুখশ্রী ক্ষতের ফলে বিকৃত এবং সামঞ্জস্যহীন হয়ে গেছে যদিও তিনি একসময় স্বাস্থ্যবান ছিলেন এবং তার মুখশ্রীও সুন্দর ছিল। বিশেষ কোনো বুদ্ধির ছাপ ছিল না তাঁর কথাবার্তায়। তাঁর সঙ্গে হালকা কথা বলে আমার ভালই লাগল যেহেতু দার্শনিক সঙ্গীটির সঙ্গে সারাটা দিন উচ্চ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় আমি ব্যস্ত ছিলাম। আগে কোথাও তাকে দেখেছি মনে হলেও ঠিক কোথায় তা আমার মনে এল না।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্মৃতির পাতা খুঁজতে খুঁজতে একাধিকবার। তিনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন তখনই বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম তার কথা বলতে বলতে দুই চোখ অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে এসেছে। তার কাছে বেশী কিছু জানতে চাওয়া যে আতিথেয়তার বিরুদ্ধে সে কথা বুঝতে পারলাম বলে আর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

হঠাৎ দেখলাম, আমাদের সামনের বন্ধুটি প্রথমে আগ্রহ সহকারে আমাদের দু'জনের দিকে নজর রাখলেও পরে তাঁর আগ্রহ কমে গেল। এবং তিনি চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। আমাকেই তখন অতিথি আপ্যায়নের চেষ্টা করতে হল। অনেক বছর তিনি ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন সে কথা বললেন তার কর্মসুখ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে।

'আমার মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে গেছে' তিনি বলে উঠলেন। 'আট বছর আগে আমি বরপটনায়ের যুদ্ধে এই সময়তেই নিযুক্ত ছিলাম'। আমার হঠাৎই মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার জার্মান বন্ধুটির দিকে চোখ পড়তেই। কারণ সেই মুহূর্তে নবনিযুক্ত সৈনিক নক্টন ও মেরী ব্রেকের কথা মনে পড়ে গেল। আমার কছে সেটাই দৈববাণী বলে মনে হল যখন জার্মান বন্ধুটি তার সঙ্গে ভাবা ভাবা ভাবে কথা বলতে লাগলেন। তিনি কোনো রকম অসদুদ্দেশ্য ছাড়াই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা কথা বলতে লাগলেন এবং বারবার একটা কথাতেই ফিরে যেতে লাগলেন যে তাঁরও একটা আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল সেই একই দিনে।

তিনি বলে চললেন, 'একটা খাতায় আমি এসব ধরনের ঘটনা সবকিছু লিখে রেখেছি, খাতাটা এই বাড়িতেই আছে। আমি সেটি নিয়ে আসছি। আপনার ভাগ্যের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো মিল আছে কিনা তা আমি মিলিয়ে দেখছি। এই দিনটিতে আপনার ও আমার অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে।'

ভদ্রলোকের এই সব কথা শুনে মুখখানি ম্লান হয়ে গেল বলে আমি বেশ বুঝতে পারলাম তিনি তাঁর বিচলিত ভাব ওপরে প্রকাশ করলেন না। কিন্তু নির্বিকার ভাবেই বললেন যে সকালে সেটা দেখবেন। নাছোড়বান্দা ছিল দার্শনিক বন্ধুটি। তাঁকে খাতাটা আমি নিয়ে আসতে বললাম কারণ আমার যে তখন কি মনে হয়েছিল। অতীতে অনেকবার সে আশ্চর্য আতঙ্কের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেই ভাবই যেন আমাকে ভর করছে, এবং সেইটাই যেন আমাকে প্ররোচিত করছে খাতাটা আনতে। আবার এই ঘটনাই ভদ্রলোককে প্ররোচিত করেছে, এবং বিচলিতও করছে। আমাকে এই

ঘটনাই যেন সেই কারোর দিকে ঠেলে দিতে চাইছে যার ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য অনেক বছর ধরে একটি যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

নবাগত লোকটি যদিও স্বস্তিও বোধ করছেন না তথাপি তিনি বাধা দিলেন না সেহেতু আমরা দু'জনেই এটা চাইছি। তিনি এমন কী শুতে যাবারও প্রস্তাব দিলেন কারণ তাঁর অস্বস্তি এতই বেড়ে উঠল, তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না যখন তাকে আমি ঠাট্টা করে অপেক্ষা করতে বললাম।

খাতা নিয়ে অচিরেই ফিরে এলেন বন্ধুটি। খাতাটা খুবই অদ্ভুত, এটিতে একটি তালা লাগানো, এটি চামড়া দিয়ে বাঁধানো এবং তিনটে পিতলের আঙটা দিয়ে এতে আটকানো থাকে। খাতাটা ঐন্দ্রজালিক। প্রাচীন প্রকৃতির এবং এটি দেখতে খুবই অদ্ভুত। খাতার মাঝখানে একটি আয়না বসানো যাতে টিউটানিক ভাষায় লেখা 'আমি তোমাকে দেখাব তোমার সত্তাকে' এবং এটির কোণ গুলি পিতলের বোতাম দিয়ে আটকানো রয়েছে। বন্ধুটি খাতাখানা প্রথমে নিয়ে নবাগতের হাতে দিলেন। তার প্রস্থানের কিছু কিছু প্রতীক চিত্রকে ব্যাখ্যা করলেন। বিশেষ করে আয়নার চারি দিকগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন এবং অবশেষে তালাটি খুললেন।

আমার বন্ধুর ব্যাখ্যাগুলি খুবই রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মনে হল তা প্রতীকগুলোর প্রয়োজনেই হোক বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই থাক।

অনেক কষ্টে অপরিচিত লোকটি সংযত রাখলেন নিজেকে কারণ তিনি নিজে খুবই বিচলিত বোধ করছেন। একটি বিকৃত বীভৎসতা ফুটে উঠল তার মুখে এবং তার মুখের সব রং মুছে গেল। তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল যখন তিনি খাতাটা ফিরিয়ে দিলেন। খাতাটা নিয়ে দার্শনিক তখন তাকে বললেন :

এ খাতায় যা লেখা আছে তার অর্থ যারা না বুঝবে তাদের কাছে এটি কেবল অর্থহীন চিহ্ন বলেই মনে হবে, এতে এমন অনেক কিছু আছে যা চোখে পড়বে না সকলের।

তিনি এরপর খাতাখানা খুলে ফেললেন চাবি ঘুরিয়ে তালার। আমার নবাগত অতিথিটি শ্বাস টানছেন ঘন ঘন তা বুঝতে পেরেছিলাম। চামড়ার কাগজের পাতাগুলি সযত্নে উল্টে দেখতে লাগলেন জার্মান ভদ্রলোক। তিনি উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করে দিলেন। আমার সর্বশেষ অপচ্ছায়া দেখার বিবরণটি যখন খুঁজে পেলেন। এটি একটি ভুলে যাওয়া ছবির স্থির চিত্র বলা যেতে পারে। এতে অনেক কিছুই ছিল, আমি নক্টনকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম তার বিবরণ ছাড়াও অন্য কিছুর সঙ্গে তারও একটা সুন্দর বিবরণ ছিল যে সেনাপতিটিকে আমি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

'এ বিবরণ আপনি কোথায় পেলেন, এ যে বৃদ্ধ ত্রিপ্‌লটন স্বয়ং। এর চুলের সিঁথিও ছিল ঠিক ওইরকম বাঁকানো। একথা আমি শপথ করে বলছি।'

আমার সারা শরীরকে শিহরিত করে তুলল এক ভয়ঙ্কর কাঁপুনি। আমি পাথরের মূর্তির মত একেবারে নিশ্চল হয়ে এবং কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

এরপর আমার ষষ্ঠ অপচ্ছায়া এই দর্শকের বিবরণটি তিনি খুঁজে পেলেন, খাতার উপর চোখ রেখে। সেই সংবাদের বিবরণই সেখানে লেখা ছিল, সে যুদ্ধে তার মুখে যে আঘাত পেয়েছিল। তার মুখের বিবরণ সহজেই নজরে পড়ল। যদিও তিনি এতে আগের চাইতে কম বিচলিত হয়েছিলেন।

দর্শনের বিবরণ আরো সুস্পষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি করল এই পঞ্চম অপচ্ছায়া। বিবরণটি ছিল সুস্পষ্ট, অতি মাত্রায় এতে ছিল তরবারি হাতে নক্টনের আবির্ভাব, দুর্গ প্রাচীরে জীবন্ত চিত্র, উজ্জ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্য যা গম্বুজ ও প্যাগোডা শোভিত এই সবই ফুটে উঠেছিল শঙ্কুচিত্রের মধ্যে দিয়ে শিল্পীর আঁকা ছবির মত। নবাগত লোকটি তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনে খুশি হয়ে উঠলেন, সমস্ত উৎকণ্ঠাকে ভুলে গিয়ে।

নক্টনকে এড্‌-ডি-রংয়ের পোশাকে ভোজের টেবিলে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে চতুর্থ অপচ্ছায়ার বিবরণ দিতে গিয়ে।

'জার্মান সেনাপতির সঙ্গে ডিনার খাবার সম্মান আমি প্রথম লাভ করেছিলাম সেই রাতেই,' তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, তাঁর নিজের কথার অর্থ না বুঝেই।

দর্শকের বিবরণ দার্শনিক পড়তে লাগলেন যা আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'পাণ্ডুর মুখে আবৃত অবস্থায় নক্টন টান টান হয়ে শুয়ে রয়েছেন এবং তাঁর গায়ে নতুন স্কন্ধত্রাণ পরানো।' এটাই ছিল সেই নক্টনের বিবরণ। 'এই পুঁথি তো জীবনের' লোকটি হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন।

মেরি ব্রেকের সমাধিস্থ চেহারা দেখে আমার নিজের মনোভাবের বর্ণনাই জার্মান ভদ্রলোক দ্বিতীয় দর্শনের পাতাটা উল্টে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সুতীব্র হাহাকারের মত আতঙ্কের সঙ্গে নবাগত লোকটি বলে উঠলেন। 'তার আত্মা এসে আমাকে যেন তিরস্কার করছে, সেই রাতে আমার শিবিরে বসে এ কথাও আমার মনে হয়েছিল।'

আমার জার্মান বন্ধুটি এরপর আসন থেকে উঠে বাঁ-হাতে খাতাটিকে স্পর্শ করলেন এবং তারপর কঠিন দৃষ্টিতে নবাগতের দিকে তাকালেন এবং বলতে শুরু করলেন এমন সময়ে, যখন আমার মুখে কোনো কথা ছিল না। কথাগুলি হল, 'আপনিই র্যাল্‌ফ্ নক্টন, আপনি সাত দু'গুণে চৌদ্দ বছর আগে ঠিক এই রাতেই মেরি ব্রেককে খুন করেছিলেন। এই কথাই আমার খাতায় এবং আপনার বিবেকের পাতায় লেখা রয়েছে।'

আতংকে চীৎকার করে উঠে নবাগত লোকটি তাঁর সংযম হারিয়ে ফেললেন।

এ কথাটিই ঠিক, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। সেই সময় বৃষ্টি এবং ঝড় এল ধেয়ে নদীতেও গর্জন উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল। আমি তাকে নৌকা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, সে বজ্রের গর্জন তার অভিসম্পাতের মতই ভয়ঙ্কর নয়।

তিনি এই কথা বলে তারপর টলতে টলতে সেখান থেকে পা বাড়াবার চেষ্টা করলেন, আব ঠিক সেই মুহূর্তেই মেঝের ওপর ঢলে পড়ে মারা গেলেন তার সমস্ত আত্মদোষ স্বীকৃতির কোনো কিছু জবাব দেবার আগেই।

এ মার্ডার ইন ওয়েস্ট

অঞ্চলটি ছিল গণিকা অধ্যুষিত ইস্ট এন্ড এর হোয়াইট চ্যাপেল পল্লী। সেটা ছিল কুয়াশা আচ্ছাদিত ধোঁয়াটে এক রাত। কুয়াশার মধ্য দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি হেঁটে যাচ্ছিল। টহলদারী পুলিস দেখেই সে বাড়িতে লুকিয়ে পড়েছি। কোন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়। হঠাৎ দেখা গেল লোকটি চোখের পলকে ঢুকে পড়লো ডানদিকের বক্স রো নামক ক্ষুদ্র এক গলিতে। অতঃপর নিঃশব্দ পায়ে সে একটা বাড়ির অন্ধকার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলো ঠিক শিকারী বিড়ালের মতো।

রাত ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভোরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। লোকটি তেমনি ভাবে অপেক্ষা করে আছে, বলা যায় ওঁৎ পেতে আছে অসীম ধৈর্যে। রাত একটা.. দুটো...তিনটি বেজে গেল ক্রমে। তারপর সহসা সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

রাত তখন ঠিক তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারিখটা ছিল আঠারশো অষ্টআশি খ্রীস্টাব্দের একত্রিশে আগস্ট। ঠিক সেই মুহূর্তে ইতিহাসের জঘন্যতম খুনী 'জ্যাক দি রিপার' আবার এক নৃশংস আঘাত হানলো। মাত্র কয়েক মিনিটের ঘটনা। সেই মুহূর্তে এক টহলদার পুলিস সেই গলিপথে এসে পড়েছিল। তার নজরে পড়লো একটি স্ত্রীলোক অন্ধকার রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে। সে ভাবলো হয়তো কোনো গণিকা অত্যধিক মদ্যপানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

লোকটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে তুলতে গেল। পরক্ষণেই ভয়ে-বিস্ময়ে আতঙ্কে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। মেয়েটার দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে পুলিসটি লক্ষ্য করল মেয়েটির স্কার্টটি কোমর পর্যন্ত তোলা, তলায় কোন অন্তর্বাস নেই, সুপুষ্ট শ্বেত শুভ্র দুটি জঙঘা স্বল্পালোকে উন্মুক্ত। নারীটির নিম্নাঙ্গের সর্বত্র প্রচুর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। গলাটি তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ফালি করে কাটা। পুলিসটি মেয়েটিকে তুলতে যেতেই তার মুণ্ডটি অতি নগণ্য সূত্রে পিছন দিকে ঝুলে পড়লো।

পুলিস অফিসারের বুঝতে আর বাকি রইলো না যে নিহত রমণী অবশ্যই এক দেহ পসারিনী। হয়তো লাইনে নবাগতাই হবে। দরদস্তুর শেষে অকুস্থলেই হয়তো সে শয্যাগ্রহণ করেছিল দেহদান মানসে আর সেই অবস্থাতেই ঘাতকের ছুরি নেমে এসেছে। না হলে এমন নিখুঁত নারী হত্যার আর কি বা ব্যাখ্যা হতে পারে। আসাধারণ শীতল মস্তিষ্কসম্পন্ন পাকা ওস্তাদ সেই কষাই একটি আঘাতেই মেয়েটির গলা কেটে শেষ করেছে। অতঃপর ক্ষ্যাপার মত গনিকাটির নিম্নাঙ্গে বারে বারে ছুরিকাঘাত করে গেছে।

পুলিসটির চীৎকারে পাড়া জেগে উঠলো। ঘটনাস্থলে এসে সবাই স্তম্ভিত, একটা আতঙ্ক সবার মনে। চকিতে এই লোমহর্ষক সংবাদ সারা লন্ডনে ছড়িয়ে পড়লো। সর্বনাশ! জ্যাক-দি-রিপার আবার চরম আঘাত হেনেছে। আশ্চর্য কাণ্ড, কেউ বলতে পারে না এই রিপার-এর আসল নাম বা সঠিক পরিচয় কি, জানে না সে কোন্ দেশের মানুষ, সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার যেটি, সেটি হল ঐ হত্যাকারীর এইসব হত্যাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই বা কি সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। সে কোন বস্তু অপহরণ করছে না, শুধুই নিছক হত্যা করে চলেছে।

এবারকার নিহত গণিকাটির নাম অ্যান নিকলস।

এর আগে এই ধরনের বীভৎস নারীহত্যা বারে বারেই হচ্ছিল। তারপর একসময় সহসা একেবারে নীরব হয়ে গেল। এটাই বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীতে এক চরম অনুদ্ঘাটিত রহস্য বিশেষ।

পূর্ববর্ণিত ঘটনাটি তৃতীয় নারীহত্যা। প্রথমটি ছিল একই এলাকায় এম্মা এলিজাবেথ স্মিথ নাম্নী

অপর এক ভ্রষ্টা নারীর। ঐ বছরই তেসরা এপ্রিল শেষ রাত্তিরে তাকেও বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয় একই কুখ্যাত অঞ্চলে।

দ্বিতীয় নারীটির নাম মার্থা ট্যারবাস। সাত আগস্ট তারিখে একটি বা দুটি নয় পুরো তিনটি ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করা হয় সেই বক্স রো-তেই। যেখানে মৃত্যুর পক্ষে একটি আঘাতই যথেষ্ট ছিল সেখানে এতগুলি আঘাতের ঘটনায় মনে হয় হত্যাকারী একজন সাংঘাতিক হিংস্র উন্মাদ।

চতুর্থ যে গণিকাটি নিহত হল তার নাম অ্যানি চ্যাপম্যান। মেয়েটির স্বামী ছিল। কিন্তু অত্যধিক মদ্যাসক্ত মেয়ে মানুষ ছিল সে। কখনও অর্থের বিনিময়ে কখনও বা স্রেফ একটু মদ্যপানের বিনিময়ে সে অক্লেশে দেহ দান করে বেড়াত। একেও অতীব নিপুণ শল্য চিকিৎসকের মত অপারেশনের কায়দায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে রিপার।

অদ্ভুত কাণ্ড ভাবাই যায় না। শেষ রাত হলেও অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় নিঃশব্দে এভাবে মানুষ মারা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। অ্যানির টাকা-পয়সা আংটি ঘড়ি কিছুই খোয়া যায়নি। দেহে কোনো ধর্ষণের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অবশ্য একটি বড় বস্তুই খোয়া গেছে। তার নিম্নাঙ্গ থেকে তার জরায়ুটি নিখুঁতভাবে কেটে বের করে নিয়ে গেছে সেই অজ্ঞাত ঘাতক। অতএব পুলিসের ধারণা হলো খুনীটি হয় নিপুণ সার্জন নয়তো কোনো পাকাপোক্ত কষাই।

লন্ডনবাসীদের মনে একটি ধারণা খুব প্রবল হয়ে উঠলো যে কোন ইংরেজ এমন জঘন্য কাজ কিছুতেই করতে পারে না। এ নিশ্চয়ই বিদেশী ঘাতকের কাজ, যেহেতু কুখ্যাত অঞ্চলে নানা ধরনের বিদেশী কষাই ও সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ বসবাস করে। এই রকম সংশয়ান্বিত ধারণাই গেঁথে গেল স্থানীয় জনসাধারণের মনে।

বলা বাহুল্য দুর্ধর্ষ পুলিস বিভাগ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও তৎপর হয়ে উঠলো। পুলিস দপ্তরে রাশি রাশি সত্য মিথ্যা খবর পৌঁছতে লাগল কিন্তু কোনো সঠিক হদিশ মিলল না।

জনৈক প্রাবন্ধিক তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ কতে চাইলেন যে এই খুনী আদৌ কোনো পুরুষ মানুষ নয়। এ হল একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ রমণী। রাত-বিরেতে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে তাকে যাতায়াত করতে হয়। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে তার পক্ষেই এ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে কি খুনীটি 'জ্যাক' না হয়ে 'জেন-দি-রিপার?

এরপর ঘটনার চমক শতগুণ বেড়ে গেল যখন দেখা গেল ত্রিশশে সেপ্টেম্বর রাত্রে এক ঘণ্টার ও কম সময়ের ব্যবধানে জ্যাক-দি-রিপার ডবল খুন করে বসল।

এই দুজনও ছিল গণিকা। একজনের নাম এলিজাবেথ লংলিজ আর অপরজনের নাম ক্যাথারি। এডাওজঃ। এই দুজনকেও যখন হত্যা করা হয় কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। এই দুজন নারীর খোয়া গেছে কিডনী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ নারীহত্যা এইভাবে সমাধা হলো।

লন্ডনবাসীদের মনে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল। ঐ এলাকায় সন্ধ্যের পরে ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেল বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।

হোয়াইট চ্যাপেল ও পার্শ্ববর্তী স্পিটাফিল অঞ্চলের কিছু ভদ্র ধনী ও অভিজাত মহিলা একযোগে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমীপে লিখিত আবেদনে আর্জি জানালো যে তিনি যেন অনুগ্রহ করে যাবতীয় গণিকালয় অবিলম্বে বন্ধ করাব আদেশ দেন।

এদিকে ভিজিলেন্স কমিটি গঠন হয়ে গেল। ইস্ট এন্ড অঞ্চলে টহলদারী পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে জ্যাক-দি-রিপার নাকি অনতিদীর্ঘ ছিপছিপে ধরনের মাঝবয়সী মানুষ, হাতে তার ডাক্তারী ব্যাগ, মাথায় উঁচু সিল্কের টুপী, একটা বিষয়ে সবাই একমত যে লোকটার কথাবার্তায় নাকি বিদেশী টান রয়েছে।

রহস্যজনক ভাবে খুনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ কোন কিনারা করা যাচ্ছে না, তাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে।

জোড়া খুনের ছয় সপ্তাহ পরে সপ্তম আঘাত এলো মেরী জেন কেলি নাম্নী অপর এক রূপোপজীবিনীর ওপর, বয়স পঁচিশ, পূর্ণ যুবতী। এর হত্যাকাণ্ড হয়েছে ইনডোরে।

দরদস্তুরান্তে এর ভাড়া করা ঘরে গিয়ে জ্যাক একে ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে হত্যা করে। ঘরে

কোনো আলো না থাকায় ঘাতক কাগজ ও মেয়েটার পোশাকে অগ্নিসংযোগ করে তার আলোয় বীভৎস শল্যকর্ম চালিয়ে কেলিকে খুন করে।

এই ঘটনায় লন্ডনে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। জনসাধারণ সহ চতুর পুলিস বিভাগও দেখা গেল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়। সময় বয়ে যেতে লাগল। উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় শংকায় শিহরণে মানুষ দিন কাটাতে লাগলো।

কিন্তু আশ্চর্য বেশ কিছুকাল ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হলো না। জ্যাক-দি-রিপার যেমন হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেল।

লন্ডনবাসীদের ইতিহাসে এটি এক অনুদঘাটিত অপার রহস্যরূপেই রয়ে গেল। শুধু একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে রইল জ্যাক-দি-রিপার নামটি। কুখ্যাত পল্লীর গণিকারা আজও সেই ভয়াবহ কালকে স্মরণ করে চমকে ওঠে।

তারপর বহুকাল পরে, উক্ত ঘটনাকাল থেকে পুরো আটষট্টি বছর বাদে উনিশ'শ ছাপ্পান্ন খ্রীস্টাব্দে ঘটল সেই বিস্ময়কর উন্মোচনটি, অকল্পনীয় সে উদঘাটন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ডন উইল্কি। যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বহুবার বহু গোপন গুপ্তচরীয় ব্যাপারে ইউরোপে চষে বেড়িয়েছিলেন, তিনি আবাল্য কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিশ্বের রক্তাক্ত এক ক্লাসিক ক্রাইমের রহস্যময় নামক সেই 'জ্যাক-দি-রিপারের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হলেন।

শার্লক হোমস্-এর মত দক্ষতায় তদানীন্তন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফাইল ও সংবাদপত্র, লন্ডন টাইমস্-এর সংবাদাদি ও মন্তব্য বারে বারে পাঠ বিচার ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি যে কাহিনীর উদঘাটন করলেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। বলতে গেলে অলৌকিক এক ঘটনারই বিস্তৃত বিবরণ সেটি। পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি প্রয়োগের এক পরম আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

ডন উইল্কির গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ পায় ঃ

পর পর সাত সাতটি গণিকা হত্যাকারী সেই নরপিশাচ একদা দম্ভ ভরে পুলিস দপ্তরে একটি মেয়ের কর্তিত কিডনী পাঠিয়ে দিয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে চকখড়ি আর নিহত গণিকাদের রক্ত দিয়ে তার অপরাধ কাহিনী দম্ভভরে লিখে রাখত। আর একবার এক সংবাদপত্র অফিসে লিখে পাঠিয়েছিল ঃ এটি হলো আমার চতুর্থ হত্যাকাণ্ড। আমি আরও ষোলটি স্ত্রীলোক বধ করে তবে অবসর নেব। ইতি জ্যাক-দি-রিপার।

সর্বপ্রথম নিহত এম্মা এলিজাবেথ স্মিথের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কিন্তু আদৌ ছাপা হয়নি লন্ডন টাইমস-এ। দ্বিতীয় মার্থা ট্যারবাসের বিষয়ে টাইমস্ সর্বপ্রথম মুখ খোলে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে, সন্দেহাতীতভাবে এ হত্যাকাণ্ডটি একটি বীভৎস অপরাধ।

গণিকাপল্লীতে সাধারণত মারধোর খুন জখম প্রায় সংঘটিত হয় বলে হয়তো কাগজে প্রথমটা একে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু তৃতীয় মেরি অ্যান নিকলস্-এর হত্যার পরই সবার টনক নড়ল।

সংবাদপত্রেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। সারা শহর ভয়ে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠলো। এই রকম বিপর্যস্ত অবস্থায় ঘটনামঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন অলৌকিক শক্তিধারী সেই মানুষটি যার কাজকর্ম দেখে পুলিস বিভাগ তাজ্জব হয়ে গেল।

সেই মানুষটির নাম ছিল রবার্ট জেম্‌স লীস। তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত দিব্যদর্শী অলৌকিক শক্তিধর এক ব্যক্তি। যীশুখ্রীস্টের মানবতাবোধে বিশ্বাসী এই ধার্মিকপ্রবর ছিলেন উচ্চশ্রেণীর একজন মানব প্রেমিক। রবার্ট জেমস্ লীস-এর ব্যক্তিগত যাবতীয় অর্থাদি হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলে দুঃস্থ দরিদ্র নিপীড়িত বাসিন্দা কল্যাণার্থে ছিল উৎসর্গীকৃত।

এ হেন লীস-এর একদা এক বিচিত্র স্বপ্নদর্শন হলো।

সকালবেলা লীস দেখলেন যে, স্বপ্নের ঘটনাটা হুবহু তাঁর নিজের হাতের লেখায় লিখিত হয়ে বিছানার পাশে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। তিনি জ্ঞাতসারে ঐ রকম লিখেছেন বলে কিছুতেই

স্মরণ করতে পারলেন না।

তাঁর এই স্বপ্নে দেখা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ এক পত্রে এই বিবরণ জানিয়ে দিলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে। কিন্তু সে সময় হাজার হাজার সব উদ্ভট পত্র পুলিস দপ্তরে বন্যার মত আসতে থাকায় তারা ঐ পত্রের কোনো প্রাপ্তি স্বীকার করল না।

চতুর্থা নারী অ্যানি খুন হলো আটই সেপ্টেম্বর, স্থান হাম বারি স্ট্রীট। এবার প্রমাণিত হলো খুনীর হাতিয়ার ছিল তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সরু ব্লেডের ছয় থেকে আট ইঞ্চি' দীর্ঘ এক ছুরিকা। আঘাত ও কাটাকাটির ধরন-ধারন দেখে স্পষ্টতই মনে হলো শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে খুনীটির অগাধ জ্ঞান বর্তমান।

এই খুনটি কিন্তু হুবহু লীস-এর স্বপ্নদর্শনমত স্থানের অতি কাছাকাছি সংঘটিত হল। এবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে দুজন পুলিস ইনস্পেক্টর সরাসরি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল। লীস-এর কথা, তাঁর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। পুলিস ইনস্পেক্টরটি লীসকে অনুরোধ জানিয়ে গেল, তিনি যেন সর্বদা তার পরবর্তী মনস্তাত্বিক স্বপ্নগুলি নিয়মিত ভাবে পুলিসের গোচরে আনেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে জানলেন যখন তিনি বৈঠকখানায় বসে ছিলেন, সেই সময় সহসা তাঁর নজরে পড়ল দুজন মানুষ, একজন নারী অপরজন পুরুষ, বড় রাস্তা দিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল। লীস তাঁর মনশ্চক্ষে তাদের অনুসরণ করতে থাকলেন, দেখলেন সেই দুজন নরনারী একটি সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল...তার পাশেই আলো ঝলমল একটা মদ্যশালা অবস্থিত...দেখলেন, মেয়ে ও পুরুষটি পরিপূর্ণ স্বাভাবিক, লোকটির পরণে ছিল স্কচ, টুইডের গাঢ় স্যুট, বাহুতে তার হাল্কা ওভারকোট ঝুলছিল, মাথায় ছিল হ্যাট, তার নীলাভ চোখ দুটি থেকে যেন পাশব রশ্মি ঠিকরে পড়ছিল।

লোকটা এরপর তার হাল্কা ওভার কোট আস্তে করে মাটিতে পেতে দিয়ে তার ওপর হাতের ছড়িটা রেখে দিল, অতঃপর আচমকা মেয়েটার মুখ একহাতে চেপে ধরে কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা দীর্ঘ ছুরি বের করে মুহূর্তে স্ত্রীলোকটির গলা কেটে ফেলল। যতক্ষণ পর্যন্ত না মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল ততক্ষণ সে তার মুখ চেপে ধরে রইল।

এবার লোকটা অনেকবার ছুরিকাঘাত করল স্ত্রীলোকটার দেহে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লোকটার শার্টের সম্মুখভাগ ভিজিয়ে দিল...প্রতিটি আঘাত করল নিখুঁত বৈজ্ঞানিক নিপুণতায়। এরপর সে মেয়েটার পোশাকের অংশবিশেষ ছিঁড়ে নিয়ে শার্টের রক্তের দাগ ঢাকতে কোটের বোতামগুলো এঁটে দিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব নিয়ে সে ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে অকুস্থল ত্যাগ করে গেল।

আশ্চর্যের ব্যাপার পঞ্চম হত্যাকাণ্ডটি হল হুবহু লীস-এর লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী। 'লং লিজ' নাম্নী মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই রিপার সেই সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে ঢুকে হত্যা করে। লীস-এর বর্ণনায় যেটা ছিল ঝলমলে মদ্যশালা আসলে সেটি হল আলো ঝলমল সোসালিস্ট ক্লাবের মিটিং-এর হলঘর।

এ ব্যাপারে পুলিস যেমন বিস্মিত হল, তেমন স্বয়ং লীসও ততোধিক বিচলিত হল। জ্যাক-দি-রিপার পুনরায় আর এক আঘাত হানলো।

ষষ্ঠ নারী ক্যাথারিন এডাওজ-এর গলা কাটা ক্ষত-বিক্ষত মুখাবয়ব ও দেহের নিম্নাঙ্গে অবর্ণনীয় আঘাতপ্রাপ্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল ত্রিশশে সেপ্টেম্বর মিটার স্কোয়ার নামক স্থানে।

পুলিস বিভাগ ও সংবাদপত্র অফিসে জ্যাক-দি-রিপার-এর স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি চিঠি এসে পৌঁছল। সে সব চিঠির ভাষা ও ভঙ্গী দিয়ে মনে হলো অজ্ঞাত খুনীটি অকল্পনীয় জানোয়ার বিশেষ।

একটি কার্ড ও চিঠি সে পাঠিয়েছিল সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সিতে, সে পত্র তারা পুলিসের হাতে অর্পণ করে। পত্রে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। পরে সে লিখেছে পরবর্তী কার্যের দ্বারা সে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে ভবিষ্যতে নিহতা নারীটির কান কেটে নিয়ে তা নিউজ এজেন্সীতে আনন্দের প্রীতি উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে। পত্রে একটি অনুরোধ ও সে জানিয়েছে : আরও কয়েকটি কার্য সমাধা না হওয়া পর্যন্ত এজেন্সী যেন অনুগ্রহ করে তার পত্রটি প্রকাশিত না করে।

চারদিন বাদে আবার জ্যাক-দি-রিপার এর স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত পত্রটি পাওয়া গেল : ডিয়ার বস্, আমি মোটেই চাল মারছি না। কাল আপনি এই শর্মার কাজের একটি সংবাদ পাবেন। এবার

ডবল অনুষ্ঠানের। প্রথম মেয়েটা কিছু চিঁ চিঁ চিৎকার করেছিল, তাই সরাসরি তাকে খতম করতে পারিনি। যাই হোক তা সত্ত্বেও সে আমার হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই ঝামেলার জন্যে তার কান কেটে পুলিসের কাছে পাঠাবার সময় পাইনি। চিঠিটা আমার অনুরোধ মতো চেপে রাখবার জন্যে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।—জ্যাক-দি-রিপার। এই পত্রের তারিখ ছিল পয়লা অক্টোবর।

দু-সপ্তাহ বাদের ঘটনা। হোয়াইট চ্যাপেল ভিজিলেন্স কমিটি এই কেস-এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট সদস্য মিঃ লাস্ক ছোট একটি কার্ডবোর্ড বাক্স সহ একটি চিঠি পেল রিপারের কাছ থেকে।

চিঠিতে লেখা ছিল ঃ নরক থেকে বলছি। হে মিঃ লাস্ক! স্যার, স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে কেটে নেওয়া কিডনীর অর্ধেকটা পাঠালাম। এ বস্তুটি আপনার জন্যেই রেখেছিলাম। যদি কিছুদিন আরো অপেক্ষা করেন তো যার দ্বারা এটাকে কেটেছি সেই রক্তাক্ত ছুরিটাও উদাহরণ স্বরূপ পাঠাতে পারি। যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে ধরার চেষ্টা করতে পারেন মাননীয় মিঃ লাস্ক।

কিছুটা ভীত ও উত্তেজিত লাস্ক সেই কুৎসিত মাংসখণ্ডটিকে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায় ওটা লম্বালম্বি ফালি দেওয়া চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা কোন নারীর কিডনী। নারীটি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করতো। তার দেহ থেকে সপ্তাহ তিনেক আগে এটাকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

এই বিবরণ মিলে যায় এডাওজ নাম্নী গণিকাটির হত্যার ব্যাপারে। মহিলাটির বাঁদিকের কিডনী সত্যিই অপহৃত হয়েছিল।

এরপর একদা সেই দিব্যদর্শী লীস যখন তাঁর বন্ধু শ' এবং বেক-এর সঙ্গে বসে নৈশাহার করছিলেন সহসা তিনি পেশীর আক্ষেপজনিত নিদারুণ এক বেদনায় পেট চেপে ধরে নুয়ে পড়েন। বন্ধুরা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যায়। লীস তখন তাদের জানায় যে জ্যাক-দি-রিপার এই মুহূর্তে আবার একটি খুন করে ফেললো।

বন্ধু শ' নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো রাত তখন সাতটা-উনপঞ্চাশ মিনিট।

তিনজনে মিলে ছুটে গেলো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসে। তারা সেখানে এই ঘটনার বর্ণনা সবে শুরু করেছে এমনসময় খবর এলো একজন কনস্টেবল সাতটা-পঞ্চাশ মিনিটের সময় মিলার্স কোর্ট-এ মেরী জেন কেলি নামক একটি ভ্রষ্টা মেয়ের নগ্ন মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে।

এই দুঃসংবাদ শোনবার পর লীস ও তার সঙ্গীদ্বয় পুলিসের সঙ্গে সোজা ঘটনাস্থলে চলে যায়। সেই অন্ধকার জায়গায় পৌঁছানোমাত্র লীস বলে ওঠে, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অন্ধকার দেওয়ালে একটা আলো ফেলা হলো। দেখা গেলো সেখানে চকখড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে ঃ সতেরো, জ্যাক দি রিপার।

সতেরো! তবে কি সাতের বদলে সতেরটি খুন করেছে শয়তানটা। সেই মুহূর্ত থেকে লীস সর্বক্ষণের জন্য খুনীর সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করলো। তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠলো, যে করেই হোক এই রহস্যজনক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা। খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।

একদিন লীস সস্ত্রীক বাস-এ চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিল। নটিং হিল-এ হাতে হালকা ওভারকোট নিয়ে টুইড স্যুট পরা এক ব্যক্তি বাস-এ উঠল। সহসা লীসের মনের মধ্যে ঠাণ্ডা স্রোতের এক ভাবাবেগ বয়ে গেল। মার্বেল আর্ট স্টপ-এ সেই লোকটা বাস থেকে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লীস স্ত্রীকে ফেলেই বাস থেকে নেমে গিয়ে লোকটিকে অনুসরণ করলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই লোকটি ভাড়া গাড়ি ডেকে তাতে উঠে পিকাডিলির পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোঝা গেল 'রিপার' তার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পথে ক্রমশই উন্মত্ত ও হিংস্রতম হয়ে চূড়ান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার রক্তলোলুপতা সীমাহীন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আরও বেশি হত্যাকাণ্ডের আশংকায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত দিব্যদর্শী লীসকেই আঁকড়ে ধরল, তারই শরণ নিল।

আরম্ভ হল এক আজব পদযাত্রা। বিচিত্র পথপরিক্রমা। এমন ঘটনার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়বার পাওয়া যায়নি।

লীস ধ্রুব নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক শক্তি' উক্ত স্যাডিস্টিক নারীঘাতকের লুক্কায়িত অজ্ঞাত বাসস্থানের সন্ধানে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবে।

একদিন সকালে পুলিসবাহিনী লীস্ এর নেতৃত্বে তাঁরই পিছনে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দিব্যদর্শী লীস পথপরিক্রমা করতে লাগলো।

রাত তখন চারটে। অকস্মাৎ লীস এসে থেমে পড়লেন ওয়েস্ট এন্ড ম্যানসন নামক এক অট্টালিকার গেট-এর সামনে, আবছা আলো আসা একটি জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুকনো কণ্ঠে বলে উঠলেন লীস, ঐখানে আপনাদের প্রার্থিত ব্যক্তিটি রয়েছে। ঢুকে যান গ্রেপ্তার করুন তাকে।

পুলিস ইনস্পেক্টর এবার সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে গেল। কি বলছেন আপনি! এ বাড়ির মালিক কে জানেন? তিনি হলেন শল্য চিকিৎসক প্রখ্যাত এক সার্জন শুধু তাই নয় শোনা যায় ইনি ইংলন্ডের রাজ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রেও আবদ্ধ। আপনি এ কি বলছেন?

ঠিকই বলছি অফিসার, দিব্যদর্শী আচ্ছন্নের মত বলেন ঠিক আছে। পুলিসের অনুরোধে তিনি বাড়ির হলঘরেরও এক সুন্দর বর্ণনা দেন।

পুলিস বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো সত্যিই হুবহু লীস্-এর বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেলো।

ড্রইংরুমে বসে ইনস্পেক্টার ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। ভদ্রমহিলা জানালেন, হ্যাঁ, তাঁর স্বামী তথাকথিত জ্যাক-দি-রিপার-এর প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সময় বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্বামী নাকি নানা ব্যাপারে তাঁকে ভয় দেখাতেন।

দীর্ঘকায় নীলনয়ন, কঠোর চরিত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রখ্যাত ডাক্তার, তাঁর প্রথম নাম হলো জন। তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রশ্নাদি করা হলো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি ইন্সপেক্টরকে জানালেন যে প্রায়ই নাকি তিনি নিজেকে হসপিটাল ও চেম্বার থেকে বহু দূরে কোন এক অচেনা স্থানে আবিষ্কার করতেন। কি ভাবে কোথায় কখন গেলেন এলেন তা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারতেন না। দু'বার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পর তিনি দেখেছেন যে তিনি সশরীরে নিজের ঘরের মধ্যেই বসে রয়েছেন। যেন এতক্ষণ ঘোরের মধ্যেই ছিলেন। চৈতন্য ফিরে আসতে তিনি দেখেছেন তাঁর শার্টের সামনেটা লাল রক্তে ছোপানো, আর সারা মুখ তাঁর আঁচড়ানো খিমচানো, বিস্মৃতির অন্তরালেই এসব ঘটনা ঘটে গেছে বলেই তিনি জানান।

বাড়ি সার্চ করা হলো। তাতে পাওয়া গেল, স্কচ টুইডের স্যুট, হালকা নরম ফেল্ট হ্যাট এবং একটা হালকা ওভারকোট—সব কিছুই মিলে যাচ্ছে। এরপর আরও কিছুক্ষণ জেরা করার পর অবশেষে ডাক্তার তার কৃত অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসারকে আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে সহসা বলে ওঠেন, আমাকে এক্ষুনি হত্যা করে ফেলুন। আমি নিজের মধ্যে একটা দানব নিয়ে এভাবে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না।

দিব্যদর্শী লীস এক অপার্থিব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলো ডাক্তার আসামীর দিকে।

ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁর অতীতের রেকর্ডপত্র বারে বারে খতিয়ে দেখা হলো। তাতে প্রকাশ পেলো তিনি যখন গাইজ হাসপাতালে এক্স মেডিক্যাল স্টুডেন্ট তখনই দেখা গেছে তাঁর সর্বাধিক পছন্দের সাবজেক্ট ছিল জীবিত প্রাণী ব্যবচ্ছেদ কর্মটি। মানুষ হোক বা প্রাণী হোক তাদের ব্যথা বেদনা তাকে অসীম আনন্দ দিত। বোঝা গেল এ লোকটি শুধু ম্যাসোচিস্টই নয় স্যাডিস্টও বটে।

অ্যালিয়েমিস্ট কমিশনের কাছে সাক্ষী দেওয়ার সময় ডাক্তার পত্নী জানান যে, ডাক্তার স্বাভাবিক অবস্থায় খুবই ভালোমানুষ কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় তাঁকে একেবারেই চেনা যায় না। একদিন নাকি ডাক্তার একটা জীবন্ত বেড়ালকে নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোর ওপর ধরে পোড়াচ্ছিলেন আর সেই বিড়ালের চীৎকারে ডাক্তার পত্নী সেখানে উপস্থিত হয়ে ঐ অস্বাভাবিক দৃশ্য লক্ষ্য করেন।

কমিশনের যাবতীয় সদস্য একবাক্যে রায় দিলেন যে, ডাক্তার একজন ভয়ঙ্কর রকমের বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হবে। সেখানে একশ চব্বিশ নং বেড চিহ্নিত হলো।

ডন উইঙ্কির উপরোক্ত এই থিয়োরীসমূহ সংগৃহীত হয় আঠারশো অষ্টআশি খ্রীস্টাব্দের লন্ডন টাইমস এবং দিব্যদর্শী লীস-এর মৃত্যুর বছর একত্রিশ এর ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে। ডন

উইল্কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিস রিপোর্ট এবং অজস্র কন্‌ফিডেন্সিয়াল ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে গবেষণারত ছাত্রদের মত এসব তথ্য সংগ্রহ্ করেন।

ভয়ঙ্কর খুনী জ্যাক-দি-রিপারের ঐসব গণিকাদের প্রতি কিসের আক্রোশ ছিল বোঝা যায় উইল্কির সিদ্ধান্ত থেকে। 'জ্যাক' বোধ করি কোন সময় গণিকা গমনের ফলে মারাত্মক সিফিলিশ রোগে আক্রান্ত হয়। সে যুগে ঐ কালব্যাধি নিরাময়ের কোন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বোধ হয় এই নিদারুণ প্রতিশোধের ইচ্ছা।

ডন উইল্কির গবেষণায় আর একটি সংবাদ জানা যায়।

জ্যাক দি-রিপারকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তারে সাহায্য করবার জন্য সরকার পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

ইতিপূর্বে ইতিহাসে এমন কোন খবর প্রকাশ পায়নি যে ঐ পুরস্কারের টাকা কাউকে দেওয়া হয়েছিল বা কেউ দাবী করেছিল সে সময়।

অতঃপর দিব্যদর্শী লীস-এর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় যে তাকে নাকি একাধিকবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমীপে তাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হতে দেখা গেছে। এ গুজবও প্রচলিত ছিল যে লীসকে রাজকীয় প্রি ভি পার্স পেনসন হিসেবে বাৎসরিক প্রায় আটশো পাউন্ড করে বহু বৎসর ধরে দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম খুনী রহস্যময় জ্যাক-দি-রিপারের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখানে আশ্চর্য ব্যাপার হলো কি বিজ্ঞান হার মানলো দৈবশক্তির কাছে।

এ হোর ইন দ্য ইডেন

নিউইয়র্কের সেকেন্ড ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট লোকে লোকারণ্য, তিলধারনের জায়গা নেই। সেই আদালতে চরম চাঞ্চল্যকর এবং বড় মজার এক মামলা উঠেছে। সময়টা হলো আঠেরশো অষ্টআশি খ্রীস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর। আসামীকে দেখে ঘরময় এক চাপা কৌতূকের হাসির রোল উঠলো। আসামীর নাম আলফ্রেড ডাগস। পেশায় নাবিক। বেঁটেখাটো চেহারা, বয়স আটত্রিশ। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, এ নাকি কোন এক দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে একটি উলঙ্গ অন্ধ যুবতীকে পাহাড়ের টিলা থেকে ধাক্কা মেরে সমুদ্রে ফেলে হত্যা করে গত আগস্টে।

কৌতুকের হাসি উত্থিত হয়েছিল এই কারণে যে, এইরকম একটা হাঁদাগঙ্গারাম আকৃতির লোক বিশ্বের সেরা নয়জন সুন্দরী যুবতী নাচিয়ে গাইয়ে উচ্চস্তরের শো গার্লদের সঙ্গে পাঁচটা বছর এক জনমানবশূন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপে কাটিয়েছে। নয় নায়িকা এক নায়ক। এই বসবাসের ফলে সেই বিন্দুসম সিন্ধুদ্বীপে একটি দুটি নয়, লোকটি ষোলটি সন্তানের পিতৃত্ব লাভ করেছিল ঐ নয়টি বিশ্বসুন্দবীর সৌজন্যে।

গত সতেরই সেপ্টেম্বর মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ 'রচেষ্টার' ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে নির্বাসিত দ্বীপ থেকে। দেশে আসার পর এই মামলা শুরু হয়।

ডাগস নাকি গীতা মার্স নামক এক একুশ বছরের সুইডেনবাসী যুবতীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

সারা দুনিয়'র সংবাদপত্রে হৈ হৈ করে এই চাঞ্চল্যকর মামলা ও তার অন্তর্নিহিত কাহিনী সাড়ম্বরে ছাপা হতে থাকে। ঘটনাটা এইভাবে আরম্ভ হয় ঃ

জুন মাসের দোসরা তারিখে 'জেনট' নামক এক জাহাজ খোল ভর্তি সূতি বস্ত্র এবং রাম-মদ্য আর সাঁইত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে আমেরিকার পানামা থেকে অস্ট্রেলিয়াব উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যাবে সিডনী বন্দরে।

প্রথম তিরিশ দিন নিবাপদে চলেছে ঊনসত্তর টন জাহাজ। শান্ত সমুদ্র, উষ্ণ পশ্চিমী বাতাস, আর ক্যাপ্টেন জোনাসেন বার্ডলের সুদক্ষ নৌ-চালানো। তেসরা জুলাই সকাল থেকেই সমুদ্র-আকাশ কালো ভয়ঙ্কর মেঘে ছেযে গেল। পাহাড় সমান ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজে গায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো প্রলয়। সামনেব দুটি খোলে হু হু করে জল এসে ঢুকতে লাগলো।

জাহাজে পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। যাত্রীদেব মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলো লাইফ বোটে ওঠার জন্য। এই গোলমালের মধ্যে ডাগস অপর নাবিক মেট হারম্যান-এর সাহায্যে কোনক্রমে একটি বোট নামিয়ে ফেললে জাহাজের পেছনের উল্টো দিকে। হঠাৎ কানে এলো উপবের জাহাজে আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীদের প্রবল আর্ত চীৎকার, তার মধ্যে দড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল চমৎকার মোজা পরা দুটি পা, পরে সশরীরে এক পরম রূপবতী যুবতীকে। তারপর একে একে নেমে এলে আটজন সেরা সুন্দরী মেয়ে। বাধ্য হয়ে সেই সুন্দরী মেয়েদের অনুরোধে দু-চারজন মেয়েকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে নৌকায় নামাতে সাহায্য করতে হল তাকে।

এদিকে দেখা গেল অনেক যাত্রীই আতঙ্কে সমুদ্র জলে লাফিয়ে পড়েছে। এবং অচিরেই তলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরে জাহাজে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে লাইফ বোটকে জাহাজ থেকে বিযুক্ত করে নেওয়া হলো। আর মুহূর্তের মধ্যে জাহাজটা প্রচুর ফেনা তুলে সমুদ্রগর্ভে লীন হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে বেশিরভাগ মেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

এবার আমরা দেখবো যে এই মেয়েরা কারা। বার জন মেয়ে সহ এই অ্যালিসিয়া ভেনেবেলস। জল্স ট্রুপটি যাচ্ছিল মিউজিক হল টুর-এ। এরা সব উচ্চ পর্যায়ের উপার্জনশীলা অতি দক্ষ গায়িকা

ও নর্তকী। এরা এদের কলাকুশল দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় ধনীকুলের মনোরঞ্জন করে ফিরতো। এসব দেমাকী গরবিনীরা জাহাজের সাধারণ মানুষদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল তারা যেন ভুলেও এই সব উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার স্পর্ধা না দেখায়। মেয়েদের এই অবজ্ঞা ডাগসকে আদৌ স্পর্শ করলো না। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সে বিশাল ঢেউয়ের ওপর নৌকা চালাতে লাগলো।

ডাগস এর মনে এতটুকু খেদ নেই। কেননা সে চিরকালই মেয়েদের দিক থেকে এই ধরনের ঘৃণিত ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে সে আদালতে বলে গেল যে এটা তাদের বংশেরও নিয়তি বলা যায়।

রূপসী অভিজাত নতর্কীরা ওর সঙ্গে কথা বললো শুধু মাত্র ওকে ভর্ৎসনা করবার জন্যেই, যেন তাদের বর্তমান দুর্দশা ওর জন্যেই হয়েছে। তারা ক্ষুধার্ত হলো, তৃষ্ণার্ত হলো এবং তার জন্যও তারা ডাগসকেই দায়ী করলো।

আর এতো সব কটুবাক্য ভর্ৎসনা অভিযোগ সব কিছু নীরবে সহ্য করে গেল শান্ত বোকা ও ভীরু স্বভাবের ডাগস। ছোটো নৌকাটিতে ছিল মাত্র দু ব্যারেল পানীয় জল আর তিন টিন প্লেন বিস্কুট। সমুদ্রপীড়া কমে এলে মেয়েগুলি খাদ্য ও পানীয় দাবী করে বসলো। প্রথম প্রথম তারা আপত্তি করলেও শেষে সেই অতি সাধারণ বিস্কুটগুলো প্রচণ্ড খিদের তাড়নায় শান্ত মনে খেয়ে নিল।

চতুর্থ দিনে দেখা গেল এই সামান্য নাবিকটাকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। গরমের জ্বালায় তারা পুরুষের সামনেই দেহ থেকে মোজা, পেটিকোট, সেমিজ ও বক্ষবন্ধনী খুলে ফেলে শীতল সমুদ্র জল সর্বাঙ্গে সিঞ্চন করে চলেছে।

ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিক্‌চক্রবালে তাদের চোখে পড়লো ঐ দ্বীপের ডাঙা।

—ঐ তো অস্ট্রেলিয়া। সমস্ত মেয়েগুলি আনন্দে কলকলিয়ে উঠলো যেন।

দ্বীপের তীরভূমিতে কোন জনমানব ছিল না. নাবিক জীনের অভিজ্ঞতায় ডাগস যদিও বুঝতে পেরেছে এটা মোটেই অস্ট্রেলিয়া নয়, তবুও সে সেই অপ্রিয় সত্যি উচ্চারণ করে মেয়েগুলির বিরাগভাজন হতে চাইল না। নীরবে দাঁড় টেনে সে দ্বীপের দিকে এগোতে লাগলো। মেয়েগুলি দ্রুত পোশাক পরে নিল।

দ্বীপে পা রেখে মেয়েদের আশা ভঙ্গ হলো। দ্বীপের তীরভূমিতে কোনো জনমানব ছিল না। দীর্ঘকায় পামগাছের সারি তাদের দশ ফুট পাতা দুলিয়ে তীরভূমির শোভা বর্ধন করছে। তীরের কাছে এক জলাতে নৌকো বাঁধা হলো। অতঃপর প্রতিটি মেযেকে জল বাঁচিয়ে প্রায় কাঁধে করে ডাঙায় পৌঁছে দিতে বেচারা ডাগস-এর ঘাম ছুটে গেল।

মেয়েদের অজস্র প্রশ্নে তার পাগল হয়ে যাবার দাখিল হল। কাছাকাছি শহর বন্দর কতদূর? হোটেল পাবে তারা কখন সে তাদের কোথায় নিয়ে এলো, কোথায় তারা বিশ্রাম করবে? দ্রুত সব কিছুর ব্যবস্থা না করলে দেশে ফিরে গিয়ে তাকে জেলে ঢোকাতে হবে বলে শাসানো হলো।

মেয়েগুলোকে পৌঁছে দিয়ে চরম ক্লান্ত হয়ে এদের একটি প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে পঞ্চাশগজ দূরে শ্বেতশুভ্র বালুকা ভূমির ওপর শুয়ে পড়ে অনতিবিলম্বে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো।

বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে তার ঘুম ভেঙে গেলো। তখন কত রাত কে জানে। তারকাচ্ছাদিত আকাশে একফালি চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। সফেন ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জলাগুলোর ওপর দিয়ে বালুকা বেলায়। ডাগস চোখ কচলে উঠে বসলো।

তার চোখে পড়লো প্রায় দশ গজ দূরে বৃত্তাকারে ঘন হয়ে বসে রয়েছে নয়জন রূপসী। যেই তারা দেখলো যে সে জেগে উঠেছে অমনি তাদের বাক্যের গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। তাদের খিধে পেয়েছে তেষ্টা পেয়েছে, তারা ভীষণ ক্লান্ত ইত্যাদি।

অকস্মাৎ এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসে গেল আলফ্রেড ডাগস-এর মনে। সে আদালতে স্পষ্ট ভাষায় বললো আর ভয় ভীতি লজ্জা নয়, এবার রুখে দাঁড়াতে হবে। চিরজীবন কি শুধু আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস হয়ে থাকবো। কি যে হলো আমার। কঠোর মনোভাব এসে গেল। কঠোর কণ্ঠেই বলে উঠলাম, চুপ করুন! মুখ বন্ধ করেই আমার কথা শুনুন। ভদ্রমহিলাগণ, যদি আপনারা কিছু খেতে

চান তাহলে আমি বলবো, ঐ জঙ্গলের কাছে গিয়ে খুঁজে দেখুন, খাবার মত ফল-টলকোন না কোন গাছে পেয়ে যাবেন।

এই কথাগুলো বলে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। নিজেকে যেন এবার প্রকৃতই একজন পুরুষ বলে মনে হতে লাগলো।

ডাগসের এই কথা শুনে মেয়েরা খুব অবাক হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে একে অন্যে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। অবশেষে জনৈকা দীর্ঘাঙ্গী স্বর্ণকেশী মেয়ে ইংরাজিতে বললে, শোন হে ভালো মানুষের ছেলে, তুমিই এনে দেবে আমাদের খাবার। আমরা তোমার কোনো বাজে কথা শুনতে রাজি নই।

শুনে প্রথমটা একটু থতমত খেলেও ডাগস আবার কঠোর মনোভাব ধারণ করে, কোন কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেল কোথায়। সে ঘন বনে গিয়ে দেখলো গাছে আম পেকে রয়েছে। তার দুটো পেড়ে নিয়ে সে খোসা ছাড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলো।

সে বললো, আমি যে অমন সাহসের পরিচয় দিয়ে অমনভাবে বলতে সক্ষম হব এ-কথা ভেবে সত্যি সত্যিই খুব অবাক হচ্ছি।

ডাগসের কথা শুনে গুরু-গম্ভীর বিচারপতিও কিঞ্চিৎ মুচকি না হেসে পারলেন না।

অন্যতম সুন্দরী মারীয়া স্যান্টোস-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সেই সময় থেকে ডাগস নয়টি কন্যার দরকার-অদরকারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেল। সে শুধু নিজের খাবার আর শোবার ব্যবস্থা করে নিল মেয়েদের কথা ভাবলো না।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা ঐ নয় কন্যার এক কন্যা বেটি জর্জ অন্য কথা বলেছিলো, সে জানালো ডাগস তাদের কি করতে হবে অবশ্যই তা বলেছিল।

আমার মনে হয় ডাগস যে ব্যবহার করেছে তার জন্য তাকে মোটেই দোষী করা যায় না। কেননা, আমরা নৌকায় ওর প্রতি যে ধরনের অভদ্র ও জঘন্য ব্যবহার করেছি তার তুলনা হয় না। এত কিছু সত্ত্বেও ডাগস আমাদের সঙ্গে কি ভালো ব্যবহারই না করে গেছে।

ডাগস একটা স্থান নির্বাচনের জন্য প্রায় আধমাইল হেঁটে গিয়ে সমুদ্র বেলায় একটি সুন্দর জায়গা পেল। বালুকা বেলার সামনে একটা প্রবাল লেগুন। দীর্ঘ পাম গাছের সারিতে খর রৌদ্রে স্নিগ্ধ ছায়া নেমেছে। লেগুনের কাছে দাঁড়িয়ে একটি উঁচু ধূম্রবর্ণের টিলা যেন সামনেকার জলাভূমির শান্ত জলকে অদূরে বাইরে অশান্ত সমুদ্র থেকে রক্ষা করে চলেছে।

একটা তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ডের মাথায় গাছের ডাল কেটে প্রস্তরের তলা থেকে চাল-এর মত করে নিল। পরে পাতার ছাউনি দিল। সরু ডাল ও বড় পাতার সাহায্যে দেওয়াল দিয়ে সুন্দর একটি কুটির করে নিল। কাজ শেষ হলে সে চুপচাপ বেলাভূমিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন তার নজরে পড়লো নয়টি মেয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এক মারিয়া স্যান্টোস ছাড়া মনে হল অন্য মেয়েগুলি যেন বশ্যতা স্বীকার করতে চায়।

ডাগসের বুকটা একথা ভেবে ফুলে উঠলো যে, এতদিনকার ভীরু জীবনে সে একবার অন্তত রুখে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছে। পরবর্তী তিনদিন সে নিজের খাবার সংগ্রহ করে খেয়েছে এবং নিজ কুটিরে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়েছে। মেয়েগুলো তার কুটিরের খুব কাছাকাছি তালগোল পাকিয়ে শুয়ে থেকেছে, এবং নিজেরাই বন থেকে কলা আম ও নারকেল সংগ্রহ করে খেয়েছে।

দ্বীপে পদার্পণ করবার চতুর্থ দিনের শেষ রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ডাগস টের পেল কে যেন তাকে দু-হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সে চোখ মেলে চাইতে দেখলো একটি মেয়ে ওর ঠোঁটে নরম আঙুল চাপা দিয়ে চুপ করে থাকতে বলছে। এ হলো স্বর্ণকেশী সরু কোমর সমন্বিতা মেয়েটি, বিনা বাক্যব্যয়ে এস শুয়ে পড়ল ওর পাশে, মুখে মৃদু হাসি,—ওরা সব ঘুমিয়ে আছে, মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বলে।

মেয়েটি অনন্যসাধারণ সুন্দরী কি অবিশ্বাস্য নরম দেহ মেয়েটির। পাছে নড়লে চড়লে মেয়েটি চলে যায় এই ভয়ে ডাগস সাগ্রহ প্রতীক্ষায় মরার মত পড়ে রইল।

মেয়েটি হেসে ডাগসের বিহ্বল ও বিস্মিত চাউনীর মধ্যে তার ঠোঁটে দীর্ঘ এক প্রেম চুম্বন এঁকে দিল।

ডাগসের বিবৃতির ঠিক এই সময় প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নী এই বলে আপত্তি করল যে এর দ্বারা

কোন নির্দোষী মেয়ের সুনাম নষ্ট হয় এটা সে চায় না। জজ কিছু নির্দেশ দেবার আগেই স্যালি ক্র্যামার নামক সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে বলে যায়, ইয়োর অনার ও যা বলছে তা সবই সত্যি। এ বিবৃতির দ্বারা আমি মোটেই লজ্জিত হচ্ছি না, আমি বলছি বেচারা আলফ্রেডকে দোষী করে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। ও একটা মাছিকে পর্যন্ত আঘাত দিত না, কোন মানুষকে খুন করা দূরে থাক। আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীকে বলেছি এটা ঐ নারীটির কর্ম। বলে অদূরে মারিয়া স্যান্টোস-এর পানে আঙুল নির্দেশ করলো।

জজ-এর নির্দেশে ডাগস তার বিবৃতি চালিয়ে যেতে লাগলো।

ডাগস স্যানিকে নিয়ে আধ মাইল দূরের এক আম বাগানে দিন কাটালো। দু'জনে সেখানে এক শয্যায় ঘুমোলো।

ডাগসের অ্যাটর্নি জেরা করে একথা প্রমাণ করবার চেষ্টায় রইলো যে, গীতা মার্সকে হত্যার উদ্দেশ্য তার মক্কেলের আদৌ ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল অন্য একজনের যার কথা পরে উন্মোচিত হবে—ডাগসের প্রতি সেই মেয়েটির অনুরাগই তৃতীয় একজনের হত্যাকাণ্ড জাগিয়েছিল। স্যালি ক্র্যামারও সায় দিয়ে জানালো ডাগসের কোন দোষ নেই—সে নিজেই উপযাচিকা হয়ে তাকে ভুলিয়েছে। পর পর চারদিন তারা ঝোপে-জঙ্গলে বিহার করে বেড়িয়েছে। দু'জনের খাবার ও পানীয় সংগ্রহ করত সে। তারপর প্রেম প্রণয়ান্তে দু'জনে আলাদা আলাদা ফিরে আসতো সমুদ্র বেলায়।

সপ্তম দিনের শেষ রাত্রে আবার ডাগস জেগে উঠলো এক ঝাঁকুনিতে। এবার এল অন্য মেয়ে। এই গ্রীক কন্যাটির নাম লাম্বা ইউমেনডেস, প্রচণ্ডভাবে এক চুম্বন দিতে দিতে সে ও প্রথমার এর মত বলে উঠলো, চুপ কর, কথা বলো না। যেজন্য সে এসেছে সে কাজে অবিলম্বে সে মেতে উঠলো। অদূরে পঞ্চাশ গজ দূরে অপর মেয়েগুলি তখন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। এই মেয়েটি নানা কলাবতী।

কিন্তু চরম বিপত্তি শুরু হল অল্পক্ষণ বাদেই। গ্রীক কন্যা পুলকিত ও তৃপ্ত দেহমনে কুটির থেকে বেরিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই একটা গলা ফাটানো চিৎকার শোনা গেল—কোথায় গিয়েছিলি তুই?

ডাগস মুখ তুলে দেখলো প্রথমা সেই স্যালি ক্র্যামার বাঘিনীর মত লাফিয়ে এসে গ্রীক মেয়েটির কালো চুলের গোছা দু-হাতে ধরে মল্লযুদ্ধে মেতে উঠলো।

ইতিমধ্যে বাকি মেয়েরা সেখানে এসে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এই চাঞ্চল্যকর লড়াই দেখতে লাগলো।

প্রায় আধঘণ্টা লড়াই চললো। শেষে দু'জনেই চরম ক্লান্ত হয়ে বালির ওপর শুয়ে হাঁপাতে লাগলো। দু'জনের দেহই নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত। মুখ চেনা যায় না।

এই ঘটনাতেই ডাগস বুঝে ফেললো যে ঐ দীর্ঘাঙ্গী স্বর্ণকেশী মেয়ে মারিয়া স্যান্টোসের দিক থেকে কি ধরনের শত্রুতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে। এ লড়াইটা দেখতে বেশ মজা লাগলেও তাকে বেশ চিন্তিত করে তুললো সন্দেহ নেই। তাই লড়াই শেষে সে মেয়েদের হুঁশিয়ার করে দিল এই বলে যে 'এ ধরনের জঘন্য গুণ্ডাপনা কিন্তু সে ভবিষ্যতে কখনোই সহ্য করবে না। কেননা তাদের সবাইকেই হয়তো বাকি জীবন এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে কাটাতে হবে। অতএব ঝগড়া-ঝাটি সহ্য করা হবে না। এখানে যখন আমাদের জীবন কাটাতেই হবে তখন যতটা সম্ভব আমোদ আহ্লাদ ফূর্তিতেই কাটানো উচিত বলে মনে হয়।

ডাগস আরো জানায় যে অবিলম্বে সে একটা বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থা করবে। তারপর মেয়েদের কাজ ভাগ করে দেবে। কেবলমাত্র মারিয়া ছাড়া আর আটজন মেয়ে তার কথা আদেশ স্বরূপ মেনে নিল।

কিছু আলোচনার পর আটটি মেয়ে ডাগসের বশ্যতায় রাজি হয়ে গেল।

কোন কোন দ্বীপের আদিবাসীদের ধরনে ডাগস, বাড়ি তৈরী করল। ছাদ করলো মোটা পুরু গাছের ছাল দিয়ে। ঘর হল দুটো, একটা বড়, তাতে মেয়েদের। লাগোয়া ঘর ডাগস্-এর। পরবর্তীকালে পছন্দ মত মেয়ে আসতো ওর কাছে রাত্রিকালের জন্য। প্রথমে সে স্যালিকে রাজি করায় তার ঘরে বসবাস করার জন্য একটানা। যদিও গ্রীক কন্যা লাম্বাকে মুখ বন্ধের জন্য সপ্তাহে দু-দিন তার কাছে আসতে দিতে হতো। ওদিকে মারীয়া নিজের একটা কুটির করে নিয়েছিল। তীরভূমি বরাবর কয়েক'শ গজ দূরে।

ওরা সবাই মিলে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতো নারকেল, বাদাম, ব্রেডফ্রুট, কলা, আম আরও

বহু প্রকার জংলী ফল ও শাকসব্জী। ডাগস ঐ প্রবাল লেগুনে ঘণ্টা দুই মাছ ধরতো। এবং ফিজি দ্বীপবাসীদের মত কী-মা নামক উনানে রৌদ্র কিরণে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড বা বালির দ্বারা খাদ্য দ্রব্যকে রোস্ট করে নিত।

মাসখানেক কাটাবার পর সাহস সঞ্চয় করে ডাগস সরাসরি মেয়েদের মিলিত করে বলেই ফেললো তার মনোগত বাসনা। অর্থাৎ শুধু স্যালি বা লাম্বা নয়, তার খুশিমত যখন যাকে ইচ্ছে সে ডেকে নিয়ে শয্যাসঙ্গিনী করবে এরপর থেকে। এতদিন ওর বশ্যতা স্বীকার করে চলা সত্বেও এ প্রস্তাবে মেয়েরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসে উঠল। বলতে লাগলো আজ ফাঁদে পেয়ে সে যে ধরনের অপমান করে যাচ্ছে, এর শোধ নেবে তারা সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে ওকে ফাঁসী কাঠে লটকে।

গ্রীক কন্যা লাম্বা খাঁচার মধ্যে বন্দি জন্তুর মত অস্থির পদচারণা করতে লাগলো। প্রত্যেকটি মেয়ে ওকে গালাগালি করতে লাগলো।

একে একে প্রত্যেকেই ওকে নিয়ে পড়লো। ওর মনে হল মেয়েগুলির আসল উদ্দেশ্য ওর প্রতি যত না ক্রোধ তার চেয়ে বেশি হল নিজেদের মধ্যে একে অপরের কাছে সতী সাজা।

ওদের বাক্যবাণ ছোঁড়া শেষ হলে ডাগস ঠাণ্ডা গলায় বললে, কেন মেয়েরা রাগ করছে। এত শুধু তার ব্যক্তিগত নয় ওরাও মজা পাবে। যৌন জীবন ওদের কি প্রয়োজন নেই?

মেয়েরাও ভাবলো তাদের বাকি জীবন এই একটি মাত্র পুরুষকে অবলম্বন করেই কাটাতে হবে।

অতএব ডাগস প্রকৃতই নবাবী জীবন যাপন করতে লাগলো। কখনও জল বিহার কখনও স্থল বিহার, কখনও শয্যা বিহার, এই রকম অদ্ভুত জীবন ওদের চললো পরবর্তী চার বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মেয়ের গর্ভে ষোলটি শিশু জন্মালো।

একদিন সকালে ওরা সবাই মিলে গেল দ্বীপের শেষ প্রান্তের এক লেগুন-এ সাঁতার কাটতে। ডাগস-এর বারণ সে ওখানে হাঙরের লেজ ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। কিন্তু ওর কথা কেউ মানলো না। এই ভাবেই ডাগস-এর চাঞ্চল্যকর নারীঘটিত জীবনযাত্রার আকস্মিক ও নৃশংস পরিসমাপ্তি ঘটে গেল।

আদালতের সামনে স্যালি ক্র্যামারই সেই ট্রাজেডির বর্ণনা দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর কানে এলো গ্রীকের মর্মভেদী আর্তনাদ। যখন টের পেলাম তখন অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। দেখলাম গ্রীক জলে ডুবে গেল, তারপর জল তোলপাড়, কিসে যেন ঝাপটা মারছে, গ্রীক একবার ভেসে উঠে আবার ডুবে গেলো। তখনই দেখা গেল ওকে একটা কালান্তক হাঙর-এ ধরেছে। আমরা ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। একমাত্র মারীয়াই দেখলাম ধীর স্থির রয়েছে। সে সাঁতার কেটে চলে গেল গ্রীকের কাছে। এতোক্ষণে হাঙরটা বোধ হয় পালিয়েছে। গ্রীক তখন একবার ডুবছিল একবার ভাসছিল। মারীয়াই গিয়ে ওকে ধরে টেনে এনে পাড়ে তুললো।

গ্রীকের মুখটাকে হাঙরটা দু-ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে, ওর দুটি চোখই নেই।

সংবাদ পাওয়া মাত্র ডাগস্ চলে আসে, কিন্তু মারীয়া স্যান্টোস ওকে তার কুটিরে প্রবেশ করতে দেয়নি। সে নিজেই নাকি গ্রীকের সেবা-শুশ্রূষা করবে। ডাগস্ জোর করে কুটিরে ঢুকতে গেলে মারীয়া ওর মাথায় একটি পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত করে।

ডাগস মাটিতে পড়ে যায়, কান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। ডাগস দাঁড়িয়ে উঠে এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিয়ে ওর পেটে এক লাথি মেরে ধরাশায়ী করে। পরক্ষণেই সেই মেয়ে উঠে আসে বিরাট এক পাথরের টুকরো নিয়ে, সে সময় তিনজন মেয়ে এসে ওকে ধরে না ফেললে ডাগস হয়তো সে আঘাতে প্রাণে বাঁচতো না। গ্রীকের ভার তার ওপরই রইলো।

চারমাস অক্লান্ত সেবা করে গ্রীককে সে ভালো করে তুললো। গ্রীক ভালো হল বটে তবে সে পুরোপুরি অন্ধ হলো এবং তার মুখটা হল বীভৎস বিকৃতদর্শন।

আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজ রচেস্টার উক্ত দ্বীপ থেকে সাতাশেই সেপ্টেম্বর ওদের উদ্ধার করবার বেশ কিছুদিন আগে গ্রীকের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

মারীয়া ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন লুথার ওয়েবকে যে কাহিনী বলে তাতে বলা হয়েছে যে মারীয়ার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে ডাগস্ নাকি তার কুটিরে এসে গ্রীককে নিজের ঘরে নিয়ে যাবার

জন্যে চেষ্ট করে। যখন গ্রীক তাতে অস্বীকার করে তখন ডাগস নাকি তাকে মারধোর করতে থাকে। গ্রীক ভয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে সমুদ্র তীরে টিলার ওপর চলে যায়। তখন ডাগস নাকি তাকে ঠেলে সমুদ্রে ফেলে দেয়। শিলাসংকুল লেগুনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকের মৃত্যু হয়। এই হলো মারীয়া স্যান্টোসের কাহিনী।

আসামী পক্ষের অ্যাটর্নী মারীয়ার এই কাহিনীকে অন্যান্য মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নাটক করবার চেষ্টা করে এই ভাবে যে এইসব মেয়েরা জানায় গীতার তথাকথিত হত্যাকাণ্ডের সময়ে ডাগস তাদের কাছে ছিল। কিন্তু মুস্কিল হল যে হত্যার সঠিক সময় বহু চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে পারেনি সে।

মামলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এমন কি সংবাদপত্রের রিপোর্টাররাও ডাগস্ এর নির্দোষিতায় আর আস্থা রাখতে পারছিল না। মারিয়া জানিয়েছে সে নিজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার, অতএব ডাগস-এর দণ্ডভোগ ছাড়া উপায় নেই।

আঠেরশ উননব্বই খ্রীস্টাব্দের চব্বিশে জানুয়ারী এ মামলা এক বিস্ময়কর ও আকস্মিক বাঁক নিল। আসামী পক্ষের অ্যাটর্নী কোর্টের অনুমতি চাইলো ইংরেজ মেয়ে মিস পাম রাদারফোর্ডকে সাক্ষী হিসাবে কাঠগোড়ায় তুলবার।

মেয়েটি ভয়ে আশংকায় ফ্যাকাশে এবং নার্ভাস হয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো।

মেয়েটির কাহিনী সাদা সরল ও সংক্ষিপ্ত ঃ—

যেদিন গ্রীক মার্স-এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় মিস্ পাম রাদার ফোর্ড সেদিন সকালে মারীয়া স্যান্টোসের কুটিরে যায়। সে নাকি প্রায়ই এই সুন্দরীর কুটিরে যায়।

কুটিরে গিয়ে সে শুনতে পায় গ্রীক এবং মারীয়ার প্রবল বাদানুবাদ ও কলহ।

গ্রীক চীৎকার করে বলে চলেছে যে মারীয়ার সঙ্গে বসবাস তার কাছে চরম অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে কিছুতেই আর একসঙ্গে থাকবে না।

মারীয়া নাকি গর্জন করে বলছে কোনক্রমেই গ্রীকের ডাগস-এর কাছে ফিরে যাওয়া চলবে না। মারীয়া যখন এইভাবে হুঁশিয়ার করে ভীতিপ্রদর্শন করছিল তখন অন্ধ মেয়ে গ্রীক এক পা দু-পা করে বাইরের দিকে চলতে শুরু করেছিল। গ্রীক ঐ শিলা সংকুল সমুদ্র তীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এই সময় মারীয়া ভীষণ রেগে বলে যাচ্ছিল যে তাকে ছেড়ে গ্রীককে পৃথিবীর অপর কোন পুরুষের কাছে কিছুতেই সে যেতে দেবে না। গ্রীক তবু অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে গিয়ে টিলাটার শেষ প্রান্তে প্রায় পৌঁছল, তখন সে বালুকা বা অন্য কিছুর স্পর্শে বুঝি বারেক থেমে পড়ল। আমি চীৎকার করে ওকে সাবধান করে দিলাম আর যেও না পড়ে মরবে যে। আমার কথা শুনে গ্রীক ফিরে আসতে উদ্যোগী হয়েছিল কিন্তু মারীয়া পাগলের মতো ছুটে গিয়ে গ্রীককে ধাক্কা মেরে টিলা থেকে জলে ফেলে দিল। আমি অবাক হয়ে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম।

এরপর মারিয়া আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো ভালোই হলো নিজ চোখে তুমি ঘটনাটা দেখলে তবে সাবধান। আমাকে ছেড়ে গেলে তোমারও এই পরিণতি হবে।

* * *

এইসব কথা শুনে আদালতে সাংঘাতিক চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সাংবাদিকরা তাদের পূর্ব রচনা পরিবর্তন করতে নিজ নিজ অফিসে ছুটে গেল।

আঠেরশ উননব্বই খ্রীস্টাব্দে চাব্বিশে জানুয়ারী সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন নারীর দ্বারা গঠিত জুরিবৃন্দ ডাগসকে নিরপরাধ ঘোষণা করল।

দু'দিন পরে মারীয়া স্যান্টোসকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জে গ্রেপ্তার করা হলো। পাঁচ মাস বাদে ফাঁসীর হুকুম হল তার। সে বছর চৌঠা মে ওর ফাঁসীর দিন নির্দিষ্ট হলো।

মুক্তি পাবার কুড়ি দিন বাদে ডাগস স্যালি ক্র্যামারকে বিয়ে করল। চমৎকার জায়গাতে ওদের বিয়ে হলো। স্থানটি ছিল বোস্টন শহরে জজ কার্কল্যান্ডের প্রাইভেট চেম্বার।

বিলিভ নট

আমি আরম্ভ করতে যাচ্ছি যে কাহিনী তার মধ্যে কোনো মতবাদ উপস্থিত করা, বা বিরোধিতা করা বা তাকে সমর্থন করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমি জানি বার্লিনের পুস্তক বিক্রেতার ইতিহাস, ভালভাবে আমি অনুধাবন করেছি স্যর ডেভিড ব্রুস্টার লিখিত জনৈক পরলোকগত রাজ জ্যোতিষীর পত্নীর ঘটনাটিও। বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করেছি অনেক রকম ভৌতিক দর্শনের ঘটনা নিয়ে। একটি প্রসঙ্গ বলে নেওয়া দরকার এই সর্বশেষ ঘটনাটি প্রসঙ্গে। তিনি আমার কোনরকম দূরতম আত্মীয়া নন যিনি ভৌতিক দর্শনের শিকার হয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডের একটি হত্যাকাণ্ড অনেককাল আগেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। হত্যাকাণ্ড অনেকই ঘটে, একটি হত্যাকাণ্ড গুরুত্বের দিক থেকে অন্যান্য অনেক হত্যাকাণ্ডকে ছাড়িয়ে যায়। সেই নরপশু যার স্মৃতিকে আমি সম্পূর্ণ ভুলেই যেতাম, কারণ তার মৃতদেহ নিউগেট জেলের কবরে শুয়ে আছে। কোনরকম ব্যক্তিগত পরিচয় তার আমি ইচ্ছা করেই দিচ্ছি না। প্রথম যখন আবিষ্কৃত হয় এই হত্যাকাণ্ডটি, তখন পরবর্তীকালে যে লোকটির বিচার হয়েছিল তার ওপর কোনো সন্দেহই পড়েনি। তখনকার সংবাদপত্রে এর কোনো বিবরণ প্রকাশিত হয়নি কারণ সংবাদপত্রে এর কোনো উল্লেখমাত্র ছিল না। মনে রাখা দরকার এই কথাটি।

হত্যাকাণ্ডের প্রথম বিবরণটি আমার নজরে পড়েছিল সকালে প্রথম খবরের কাগজটি খুলতেই। যেহেতু ঘটনাটি খুবই আকর্ষনীয় সেহেতু খুবই মনোযোগ সহকরে পড়লাম। তিনবার পড়িনি কিন্তু দু'বার পড়েছিলাম। একটি শোবার ঘরে খুনটি আবিষ্কৃত হয়। চকিতে একটি ঘটনা ঘটে গেল, সেইমাত্র খবরের কাগজটা নামিয়েছি, তখন কি যে বলব তা বুঝতে পারছি না। চকিতে বিদ্যুৎচমকের মত বা জলস্রোতের মত সেই শোবার ঘরটা যেন আমার ঘরের ওপর দিয়ে চলে গেল এবং এটা যেন ছিল ঠিক একটা ছবির মত, যা খরস্রোতা নদীর বুকে আঁকা। আমি সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যতই ছবিটা দ্রুত সরে যাক না কেন। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং বুঝতে পারলাম যে বিছানার ওপর কোনো মৃতদেহই নেই।

কোনো রোমান্টিক পরিবেশে নয়, পিকাডিলির একটি বাসায় সেন্ট জেমস্ স্ট্রীটের মোড়ে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল জায়গাটি। একটি আরাম কেদারায় তখন শুয়েছিলাম আমি। অনুভূতিটা আমাকে সাড়া জাগানোর সময় কেদারাটা সামান্য নড়ে গিয়েছিল চেয়ার সহজেই সরে যায় ক্যাস্টর পালিশ করা মেঝেতে এটা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনতলার ঘরে যাতে দুটো জানালা ছিল তার মধ্যে একটি জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম চলমান সবকিছু দেখে চোখ দুটিকে একটি তাজা করে নিতে। খুশির মেলা ঝলমল রাস্তায় হেমন্তের উজ্জ্বল সকালে; বাতাস বইছে খুব জোরে।

প:র্কের ভেতর থেকে কিছু ঝরাপাতা এসে একটি ঘোরানো স্তম্ভ হয়ে গেল এটা দেখলাম যখনই আমি বাইরে তাকালাম। পাতাগুলো সরে গেল এবং তারপর স্তম্ভটাও ভেঙে পড়ল। রাস্তার ও পাশে দুটি লোক পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে। একজন আর একজনের পেছনে সামনের লোকটি। পেছনে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে। দ্বিতীয় লোকটি ত্রিশ পা দূর থেকে তাকে অনুসরণ করছে বিপজ্জনক ভঙ্গীতে ডান হাতটা তুলে। সেদিকে কোনো লোকেরই নজর পড়ছে না এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার।

লোকটা যেভাবে অনায়াসে অন্য যাত্রীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তা ঠিক অন্য পথচারীর সঙ্গে খাপ খায় না। আমি এখান থেকে যতদূর দেখতে পাচ্ছি তা থেকে বলতে পারি কোনো যাত্রীই তাকে পথছেড়ে দিচ্ছে না বা স্পর্শ করছে না বা তাদের দিকে কোন ক্রমেই তাকাচ্ছে না। তারা দু'জনই আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল জানলার নীচ দিয়ে যখন তারা চলে গেল। এতই স্পষ্ট

দেখলাম দু'জনের মুখ যে এদেরকে যদি অন্য কোনো জায়গায় দেখি তাহলে অনায়াসে চিনতে পারব।

তাদের মুখে কিন্তু আমি উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুরই লক্ষণ দেখতে পেলাম না ; অস্বাভাবিক রকমে ঝুঁকে চলেছে শুধু সামনের লোকটি পেছনের লোকটির মুখের রং ভেজাল মোমের মত।

অকৃতদার আমি। খানসামা এবং তার স্ত্রীকে নিয়েই আমার সংসার গড়েছি। আমি চাকরি করি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে একটি শাখা ব্যাংকে, আমি খুশি হতাম যদি আমার কাজের চাপটা আর একটু হাল্কা হত। চাকরির খাতিরে আমি হেমন্তকালটা শহরেই কাটিয়েছি। যদিও আমার মধ্যে বায়ু পরিবর্তনের ইচ্ছা একটু ছিল। আমি ঠিক সুস্থ ছিলাম না তবে আমার কোনো রোগ ছিল না। আমার একঘেয়ে জীবনযাত্রায় আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম কারণ আমার বিখ্যাত ডাক্তারটির মতে আমি ঈষৎ পেট রোগা। জনসাধারণের মন সংযোগ খুব বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছিল যতই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছিল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি। আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছি এই সার্বিক ঘটনাটি সম্পর্কে।

খুনীর বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং বিচারের জন্য তাকে নিউগেটে চালান করে দেওয়া হয়েছে এটাই আমি জানতাম। কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালতে মামলার বিচার এক সেশনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে। সাধারণ অসুবিধা এবং আসামী পক্ষের সময়ের অভাবের জন্য এটা আমি ভাল করেই জানতাম। আমার জানা উচিত ছিল যে মুলতবি মামলার বিচার ঠিক কোন সময় নাগাদ শুরু হবে, কিন্তু আমি সেটা জানতাম না এটা ছিল আমার বিশ্বাস। একই তলায় অবস্থিত আমার সাজ ঘর, বসার ঘর এবং শোবার ঘর। সাজঘরে আসার জন্য শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ছাড়া কোন নেই এবং একটি দরজা দিয়ে আগে যাওয়া হত সিঁড়িতে।

দরজাটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে কারণ আমি স্নানঘরে একটি নতুন আসবাব বসিয়েছি। সেই সময় দরজাটা পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং তারপর চট দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে।

একদিন শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে চাকরকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলাম। সাজ ঘরের বন্ধ দরজার দিকেই আমার মুখটা করা ছিল। দরজার দিকে ছিল চাকরের মুখটা। দরজাটা খুলতেই দেখলাম কথা বলতে বলতে, আমাকে একটি লোক ডাকল এবং রহস্য- জনক ইঙ্গিতে। সাজঘরের দরজা খুলে ভেতরে তাকালাম। ঠিক যতটুকু সময় লাগে শোবার ঘর পেরিয়ে যেতে। একটি জ্বলন্ত মোমবাতি আমার হাতে ছিল আগে থেকেই : কাউকে সাজঘরে দেখতে পেলাম না এবং সাজঘরে কাউকে দেখবার প্রত্যাশা আমার ছিলও না। চাকরটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, "ঠাণ্ডা মাথায় তুমি কি বিশ্বাস করবে ডেরিক আমি কি দেখতে পেলাম! চাকরটি চমকে উঠল এবং ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল, তার বুকের ওপর আমার হাতটা রাখতেই, "হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ প্রভু, আপনাকে ইশারায় ডাকল একটি মরা মানুষ।"

আমার কাছে চাকরি করছে এই জন ডেরিক বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাকে না ছোঁয়া পর্যন্ত এই মূর্তিটি আমার মনের মধ্যে অনুভূতি জাগিয়ে ছিল এটা আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যখন তাকে ছুঁলাম তখন সে এমন ভাবে চমকে গিয়েছিল যে আমার মনে হল কোনো অলৌকিক অনুভূতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল আমি তাকে ছোঁয়া মাত্রই।

এরপর জন ডেরিককে ব্রান্ডিটা আনতে বললাম। তাকে ঘুণাক্ষরেও কিন্তু বললাম না সে রাতের ঘটনার আগে কি ঘটনা ঘটেছিল। পিকাডিলিতে একবার ছাড়া সে মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি। ওটা আমার নিশ্চিত ধারণা হল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে। তার মুখের চেহারার তুলনা করলাম যখন সে দরজা থেকে ইশারায় আমাকে ডাকছিল। প্রথমবারে দর্শনেই সে আমার মনে এমনভাবে দাগ কেটেছে যে তাকে যদি দ্বিতীয়বার দেখি সেই ব্যবস্থাও সে পাকা করে ফেলেছে।

রাতটা আমার খুব অস্বস্তি লাগল, জানি না কেন আমার বিশ্বাস হয়েছিল মূর্তিটা আর ফিরে আসবে না।

আমি গভীর ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়লাম দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে। জন ডেরিক নিজে এসে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে আমার সে ঘুম ভাঙাল।

তখন আমার মনে হল পত্রবাহক ও আমার চাকরের মধ্যে কিছু বাদানুবাদ হয়েছে এই কাগজখানা নিয়ে। কাগজখানা তারই সমন আমি যাতে জুরি হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারি ওল্ড বেখলিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালতের আসন্ন অধিবেশনে। জন ডেরিক সেটা ভালভাবেই জানে যে আমি আগে কখনও জুরি হবার ডাক পাইনি। প্রথমে সে সমনটা নিতে অস্বীকার করেছিল কারণ তার মনে হয়েছিল যে জুরিতে যাদের ডাকা হয় তারা আমার চেয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীর মানুষ। গুণের দিক থেকে তা কারণেই হোক বা অকারণেই হোক। সে ব্যাপারটাকে শান্তভাবে নিয়েছিল যে সমন জারি করেছিল। সে বলেছিল, সমনটা রইল কিন্তু জুরিতে আমার উপস্থিত থাকাটা কিছু আসে যায় না। এই ঝুঁকিটা তার নয়। এটা আমার একটা ঝুঁকি।

দু-একদিনে সেটা স্থির করতে পারলাম না যে সে ডাকে সাড়া দেব কি দেব না। আমার মনে বিশেষ কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ ছিল না এই ব্যাপার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত জীবনযাত্রার একঘেয়েমি ভাবটা কাটাতে হবে এটা ভেবে নিলাম তাই ঠিক করলাম যে জুরিতে উপস্থিত থাকব।

নভেম্বর মাসের একটি বাজে সকালে, ঘন বাদামী কুয়াশা নেমেছে পিকাডিলি জুড়ে, ঘন কালো হয়ে চেপে বসেছে টেম্পল বারের পূবদিকটা। আদালত কক্ষের মতই আদালত গৃহ ও বারান্দা ও সিঁড়ি গ্যাসের আলোয় স্বল্পালোকিত। সেখানকার ভিড়টা আমি নিজের চোখে দেখলাম। যখন অফিসাররা আমাকে নিয়ে ওল্ড কোর্টে পৌঁছে দিল, এটা আমার ধারণা, খুনীর বিচার যে সেইদিনেই হবে তা আমি আগে জানতাম না।

আমাকে ওল্ড কোর্টে হাজির করা হল যথেষ্ট কষ্ট করে, আমার হাতের সমন দুটো আদালতের কোনটাতে নিয়ে যাওয়া হবে তা আমি জানতামই না। এ ব্যাপারে আমি নিজে খুব নিশ্চিত নই বলে আমার এই কথাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না। নির্দিষ্ট জায়গায় আসন গ্রহণ করলাম যেটা অপেক্ষমান জুরিদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তারপর আদালতের বাইরে কুয়াশার মেঘ ও বাতাসের ভিতর দিয়ে আদালতের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম যতটা ভালভাবে সম্ভব। কালো বাষ্প অন্ধকার পর্দার মত ঝুলছে বড় বড় জানালার বাইরে ; একটি চাকার চাপা শব্দ ভেসে আসছে, রাজপথে ছড়ানো খড় ও কাঠের টুকরোর ওপর দিয়ে।

গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে সমবেত লোকের আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে যা বুক চিরে ভেসে আসছে তা হল তীক্ষ্ণ শিস্ এবং উচ্চকণ্ঠের ডাকাডাকির শব্দ। দুজন জজ তাদের আসনে এসে বসলেন কিছুক্ষণ পর। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল আদালতের গুনগুনানি। হুকুম হল খুনীকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসার জন্য। হাজির হল সে। আমি চিনতে পারলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে যাদের আমি পিকাডিলির রাস্তা ধরে হাঁটতে দেখেছিলাম সেই দুই জনের মধ্যে একজন।

নামটা যদি তখনই আমার ডাকা হত, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে যে জবাবটা আমার শোনা যেত কিনা। ষষ্ঠ বা অষ্টম জুরি হিসাবে আমায় ডাকা হল। আর সেই সময় 'এখানে' বলে আমি কোনো রকমে জবাব দিতে পারলাম। শুনুন তার পরের ঘটনা, বন্দী হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে অ্যাটর্নিকে ডাকল যখন আমি কাঠগড়ায় এগিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকল কারণ আমার কাজে বাধা দিতে বন্দীর ইচ্ছাটা খুবই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেল। অ্যাটর্নি তার মক্কেলের সঙ্গে কাঠগোড়ায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল এবং মাথা নাড়তে থাকল। জেনেছিলাম পরে সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে, সভয়ে বন্দীই তাকে বলেছিল, "লোকটাকে বাধা দিন এবং তার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে হয় নিন।" সে কোনো যুক্তি দেখায়নি কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে, আমার নাম শোনার আগে যে সে আমার নাম জানত না তা সে আগেই স্বীকার করেছে এবং সেই কারণেই তার কথামত কাজ করা হয় নি।

জুরির মুখপাত্র হিসাবে নির্বাচিত করা হল আমাকে। আমি দারুণ অসুবিধায় পড়লাম। দ্বিতীয় দিন, দুঘণ্টা সাক্ষ্য গ্রহণের পর, যখন সহযোগী জুরিদের দিকে চোখ পড়ল তখন তাদের সংখ্যা। বারবার গুনতে গিয়ে দেখলাম একই অসুবিধা হচ্ছে কারণ প্রত্যেকবারই এক জন করে বেশি হয়ে যাচ্ছে।

"যে জুরিটা আমার ঠিক পাশে বসেছিল, কানে কানে তাকে আমি বললাম," দয়া করে গুণে দেখুন আমরা ক'জন আছি। তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই প্রশ্ন শুনে তবু মাথা ঘুরিয়ে গুনতে

লাগল্লেন। "আমরা তো তেরো, কিন্তু তা হতে পারে না, আমরা বারো" এই কথা তিনি বলে উঠলেন হঠাৎই। এক সঙ্গে গুনতে গেলে একজন বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেদিন আমার গণনা অনুসারে একজন একজন করে ঠিক গুনেছি। কোনো হিসাব বা ব্যাখ্যা এর কিন্তু পাওয়া গেল না। প্রতিবারে এসে হাজির হতে লাগল একটি মূর্তি, সেই মূর্তিটি আমার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়ে উঠছে।

লন্ডন টাভার্নে বাসা দেওয়া হয়েছিল জুরিদের। আলাদা আলাদা টেবিল রয়েছে যাতে আমরা সকলে ঘুমিয়েছি একটি বড় ঘরে। আমাদের ওপর নজর রাখতেন একজন অফিসার, আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য। কোনো কারণ আমি দেখি না অফিসারটির আসল নাম চেপে রাখার। তিনি শহরের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং সেবাপরায়ণ। (শুনে খুব খুশী হয়েছি) তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ঈর্ষা করার মত গোঁফ এবং সুন্দর দুটি চোখ সব সময়ই স্বাগত। মিঃ হার্কার তার নাম।

মিঃ হার্কারের বিছানা পাতা হল দরজা বরাবর। রাত বারোটা নাগাদ আমরা যখন বিছানায় শুতে গেলাম, আমি মিঃ হার্কারের পাশে গিয়ে বসলাম তাকে বিছানায় বসতে দেখে নস্যির ডিবেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম যেহেতু দ্বিতীয় দিন রাতে শুতে যাবার ইচ্ছা হল না।

মিঃ হার্কারের হাত আমার হাত স্পর্শ করল যখন আমার ডিবে থেকে তিনি এক টিপ নস্যি নিলেন। হঠাৎ তিনি 'ও কে' এই বলে শিউরে উঠলেন।

আবার সেই প্রত্যাশিত মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম মিঃ হার্কারের দৃষ্টি অনুসরণ করে, সেই দ্বিতীয় জন যে পিকাডিলির রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেলাম হঠাৎ উঠে মিঃ হার্কারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। অবিচলিতভাবে তিনি হাসতে লাগলেন এবং বলে উঠলেন, "একজন ত্রয়োদশ জুরি এখানে ছিলেন, বিছানা না থাকলেও মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, চাঁদের আলোয় কিন্তু এখন সেটা আমি দেখছি।"

দেখার ইচ্ছা হল মূর্তিটি। অনুরোধ করলাম মিঃ হার্কারকে কোনো কথা না বলে আমার সঙ্গে ঘরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যেতে। আমার এগারো জন সহযোগী জুরির পাশে এসে কয়েক মিনিট ধরে দাঁড়াল সে বিছানার ডানদিক ধরে গেল প্রতিবারই এবং সেটাকে পার হতে লাগল পরবর্তী বিছানাটার পায়ের দিক দিয়ে। সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে শায়িত মূর্তির দিকে তাকাচ্ছে, একথা মনে হল তার মাথার ভঙ্গী দেখে। মিঃ হার্কারের বিছানার সবচাইতে কাছে ছিল আমার বিছানাটা। তার দৃষ্টি ছিল না কিন্তু আমার দিকে বা আমার বিছানার দিকে। যেখান দিয়ে সে বেরিয়ে গেল একটা উঁচু জানালা দিয়ে সেখানে চাঁদের আলো পড়েছে। বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল এটা মনে হল যেন। আমি ও মিঃ হার্কার ছাড়া আর বাকি সকলেই গত রাতেই নিহত লোকটিকে স্বপ্নে দেখেছে একথা আমার মনে হল পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের সময়।

পিকাডিলি ধরে যাওয়া দ্বিতীয় লোকটিই যে খুন হয়েছিল সে বিষয়ে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হল। কিন্তু পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ঘটনার জন্য আমি কোনোদিনই প্রস্তুত ছিলাম না।

নিহত লোকটির একটি ছোট ছবি প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হল বিচারের পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হওয়ার মুখে। লোকটি তার শোবার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায় খুনের খবর জানার পর এবং সেখানকার একটি গুপ্ত স্থানে খুনীকে মাটি খুঁড়তে দেখা গেছে। সেখানকার গুপ্ত স্থানে পাওয়া গিয়েছে একটি মৃতদেহ। আদালতের হাতে ছবিটি তুলে দেওয়া হল সাক্ষী সনাক্ত করার পর এবং জুরিদের কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখান থেকে। পিকাডিলির রাস্তা ধরে আমার দিকে যখন সেটি নিয়ে আসছিল কালো গাউন পরা অফিসারটি, তখন পিকাডিলির রাস্তায় সে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই দ্বিতীয় লোকটি ভিড়ের ভিতর থেকে উঠে এল এবং আমার হাতে দিল অফিসারের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে। দেওয়ার পর সে নীচু এবং ফাঁকা গলায় বলল—

"আমার মুখটা এত রক্তশূন্য ছিল না যখন আমি ছোট ছিলাম।" মূর্তিটি তখন আমার ও তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল আমার পরবর্তী যে জুরিকে ছবিটা আবার আমাকে এনে দিল এইভাবে সকলের হাত ঘুরিয়ে। এই ব্যাপারটা অবশ্য তারা কেউই ধরতে পারল না।

আমরা সকলে বন্ধ ঘরে মিঃ হার্কারের হেফাজতে এসে জমায়েত হলাম যখন টেবিলে ফিরে

এলাম। মামলার দৈনন্দিন বিবরণ নিয়ে প্রথম থেকেই আমরা প্রচুর আলোচনা করতাম। সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল ঘটনার একটি মোটামুটি চেহারা। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আমাদের আলোচনা। একজন গির্জার লোক আমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অকাট বোকা, এবং তিনি সব অদ্ভুত আপত্তি তুলতেন অতি পরিষ্কার সব প্রমাণ সম্পর্কে। আরও দুজন তাঁর পাদরি সমর্থক ছিলেন। এই তিনমূর্তি যারা একই জেলা থেকে আসত তারা সারাক্ষণ এমন হৈ চৈ করত যে তাদের বিচার হওয়া উচিত পাঁচশ খুনের দায়ে। মাঝরাত নাগাদ গলা একেবারে সপ্তমে চড়ালেন এই তিন অপদার্থ নির্বোধ। আমি আবার সেই নিহত লোকটিকে দেখতে পেলাম। যখন আমাদের কেউ কেউ বিছানা পাততে শুরু করেছেন।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ইশারাতে ডাকল। তাদের কাছে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিতেই সে অদশ্য হয়ে গেল। তখন থেকে সেই লম্বা ঘরটায় পর পর তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। যখনই জুরীর তাদের মাথাগুলোতে একত্র করে আলোচনায় মেতে ওঠে তখনই আমি সহযোগী জুরীদের মাঝখানে সেই নিহত লোকটার মাথা দেখতে পাই। যখনই তাদের মতামত তার বিপক্ষে যায় সে গম্ভীর ভাবে আমাকে ইশারায় ডাকত।

এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে বিচারের পঞ্চম দিনে ছবিটা হাজির করার আগে পর্যন্ত এই মূর্তিটি আদালতে দেখা যায়নি। আসামী পক্ষের সওয়াল আরম্ভ হতেই তিনটি পরিবর্তন হল। ।

একসঙ্গে উল্লেখ করব তার মধ্যে প্রথম দুটিকে। মূর্তি যে সওয়াল করেন তাকে লক্ষ্য করেই কথা বলে এবং সেখানে আমাকে কিছু বলে না। অথচ তাকে অনবরত আদালতে দেখা যাচ্ছে।

বলা যায় এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ গলাটা সরাসরি কেটে ফেলা হয়েছিল নিহত লোকটির। নিহত লোকটি তার গলাটা নিজেই কেটে থাকতে পারে এবং এটিই বক্তৃতার গোড়াতেই বলা হয়েছিল। গলাকাটা বক্তার হাতের কাছে দাঁড়িয়ে মূর্তিটি বক্তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল একবার ডানহাত এবং একবার বাঁ হাতে এপাশ-ওপাশ দেখিয়ে কোনো হাত দিয়েই এরকম ক্ষত সৃষ্টি করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত আরও একটি জনৈক সাক্ষী যখন বলল, বন্দীর মত ভাল মানুষ হয় না তখন মূর্তিটি বন্দীর কুৎসিত মুখটাকে দেখিয়ে দিল মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটা হাত এবং একটা আঙুল বাড়িয়ে।

আমার কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্ব পূর্ণ বলে মনে হয়েছে তৃতীয় পরিবর্তনটাই। কোনো মতবাদ তৈরী করতে আমি চাইনা, আমি ছেড়ে দিচ্ছি এটা কেবলমাত্র সঠিক বিবরণ দিয়েই।· মূর্তিটি অজ্ঞাত কোনো নিয়মের জন্য অপরের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না একথা আমার মনে হয়।

সে নীরবে তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে স্বয়ং অদৃশ্য থেকে। আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা তুললেন আসামী পক্ষের সুদক্ষ কৌসুলি। ভয়ঙ্কর ভাবে করাত চালানোর ভঙ্গীতে নিজের কাটা গলাটা দেখালে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে কৌসুলি থতমত খেয়ে গেলেন যখন মূর্তিটা বিজ্ঞ ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এই ঘটনাটা দেখাল। আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেললেন কৌসুলি এবং তারপর রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন এবং তিনি অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন। আরও দুটি দৃষ্টান্ত দেখালেই এটি যথেষ্ট হবে জজদের আসার একটু আগে অন্য জুরিদের নিয়ে আমি আদালতে ফিরে এলাম, বিচারের অষ্টম দিনে দুপুরের কয়েক মিনিট বিশ্রাম এবং জলযোগের বিরতির পরে। মূর্তিটি সেখানে যে নেই একথা আমার মনে হল চারদিকে তাকিয়ে। একটি সুদর্শনা নারীর গায়ে ভর দিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা আমি দেখলাম আমার গ্যালারীর দিকে যখনই চোখ পড়ল, জজরা তাদের আসন গ্রহণ করেছে কিনা একথা সে যেন নিশ্চিত ভাবে জানতে চাইছে। মহিলাটি আর্তনাদ করে উঠলেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং বাইরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে।

তার বেলায়ও তাই ঘটল যে শ্রদ্ধেয়, প্রাজ্ঞ ও ধৈর্যশীল জজসাহেব বিচার পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কাগজপত্র নিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন বিচারের পর, ঠিক সেই সময় জজের দরজা দিয়ে ঢুকে লর্ডশিপের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল নিহত লোকটি এবং তিনি কি লিখছেন সামনের কাগজে তা দেখার জন্য তাকাল তার কাঁধের দিকে। লর্ডশিপের হাত থেমে গেল এবং লর্ডশিপের মুখটা কেমন যেন বদলে গেল। দেহে খেলে গেল তার অদ্ভুত একটি শিহরণ। আমি

ভাল করেই চিনি তার সেই শিহরণ। তিনি বললেন কাঁপা গলায় আমাকে ক্ষমা করুন ভদ্রমহোদয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমার কষ্ট হচ্ছে এখানকার দূষিত বাতাসে।" এক গ্লাস জল না খাওয়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন না।

একঘেয়েমির মধ্যে অন্তহীন দশ দিনের মধ্যে দুটি দিন কাটল—সেই একই বিচারক আদালতে সেই একই লোকজন, একই খুনী সেই কাঠগড়ায়, সেই উকিলের দল একই কাঠগড়ায় এবং সেই একই প্রশ্নোত্তর আদালতে ছাদ ফাটিয়ে দেওয়া, খস্‌মস্‌ সেই একই আওয়াজ জজদেব কলমের, আসা যাওয়া একই লোকজনের, একই সময়ে একই আলো জ্বালানো যদিও দিনের আলো রয়েছে।, কুয়াশার পর্দা টাঙানো রয়েছে জানালার বাইরে যদি কুয়াশা পড়ে, ঝিরঝির শব্দ বৃষ্টিরও সেই একই রকম, একই তালা খোলার লোক দিনের পর দিন একই করাতের গুঁড়োর উপর এবং বন্দী সেই একই পায়ের দাগ, চাবি লাগানো ও খোলা সেই একই রকম ভারী দরজা—আমি যেন অনেককাল ধরে জুরিদের মুখপাত্র হয়ে আছি সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে আমার মনে হতে লাগল, ব্যাবিলনের সমসাময়িক হয়ে জেগে উঠেছে যেন পিকাডিলি, নিহত লোকটির স্পষ্টতা আমার চোখে একটুকু বা কোন সময়ই তাকে অন্য সকলের চাইতে কম স্পষ্ট মনে হয়নি। একটা কথা স্পষ্ট করে বলতেই হয় : একটি বারও খুনীব দিকে তাকাচ্ছে না সেই মূর্তিটি যাকে আমি নিহত লোক বলে ভাবছি। ভেবেছি অবাক হয়ে বার বার, "তাকাচ্ছে না কেন সে?" কখনও কিন্তু তাকায় নি সে।

রাত দশটা বাজতে সাত মিনিট আগে আলোচনার জন্য আমরা সকলে একত্রে বললাম। গির্জার সেই বোকা লোকটি আর তার সহযোগীরা এমন অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগল যে জজ সাহেবের বক্তব্য নতুন করে পড়ে শোনাবার জন্যে আমাকে দু-বার করে আদালতে যেতে হল। আমাদের মধ্যে ন'জন একমত হয়েছিলাম কিন্তু বাকী তিনজন কারো কারোই আপত্তি তুলল। বাধা দেওয়া ছাড়া ওদের আর কোন কাজ ছিল না।

আমাদের মতানুসারে বারোটা বেজে দশ মিনিট আগে জুরীর আদালতে চলে গেল।

আদালতের অন্যদিকে জুরিদের আসনের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল প্রিয় লোকটি। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ সন্তুষ্ট মনে হল তাকে এই প্রথম সে একটি বড় মাপের ধূসর অবগুণ্ঠন হাতের উপর নিয়ে এসেছিল এই প্রথম। নিজের মাথা ও শরীর সে ঢেকে দিল সেটা দিয়ে ধীরে ধীরে। যখন আমি "দোষী" বলে রায় ঘোষণা করলাম তখন তাঁর অবগুণ্ঠন খসে পড়ল, তার জায়গাটা ফাঁকা, সব উধাও হয়ে গেল।

মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে তার কিছু বলার আছে কিনা তা জজসাহেব খুনীকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর প্রথানুসারে। সে কিছু বলল বিড় বিড় করে এবং পরদিন প্রধান সংবাদপত্রে তার যে ব্যাখ্যা ছিল তাতে বলা হল, সে কাটা কাটা অসংলগ্ন ভাবে যা বলেছে তাতে জানা যায় যে বিচারকরা তার প্রতি বিরূপ ছিলেন তাই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। সে যে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি বলেছিল তা হল,

মাই লর্ড, জুরীদের মুখপাত্র যখন তাঁর আসনে বসলেন তখনই আমি জানি যে মৃত্যু অনিবার্য। রাতে বিছানায় পাশে এসে উনি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন আর একটি দড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন আমার গলাতে।

লাস্ট ফর ডেথ

পাগলাগারদ ক্রিকেট মাঠে পৌঁছলাম তখন চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন। যখন আমি তল্পিতল্পা নিয়ে বাড়িতে উঠেছি। সেখানে তার সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, 'আমি ল্যাম্পটন টিমের হয়ে কেবল আপ রান লিখব। (আগের সপ্তাহে আমার একটা আঙুল ভেঙেছে উঁচু নীচু পিচে উইকেট রক্ষা করতে গিয়ে) তিনি বললেন সবকিছু শুনে, 'ওহো আপনি একজন মজার সঙ্গী পাবেন তো তাহলে।'

আমি শুধোলুম, 'অপর কে রান লিখবে।'

জবাব দিলেন ডাক্তার, 'সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন এই ক্রসলি পাগলাগারদের মধ্যে, খুব ভাল দাবা খেলেন, অনেক পড়াশুনা করেছেন লোকটি এবং লোকটির আরো অনেক গুণ রয়েছে। তাকেই এখানে পাঠানো হয়েছে মতিচ্ছন্নতার জন্য। তিনি নিজেকে একজন খুনী বলে মনে করেন এটি তার সব চাইতে গুরুতর মতিচ্ছন্নতা।

তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে দুটি পুরুষ এবং নারীকে খুন করেছেন একথা সকলকে বলে বেড়ান। তার আরো ধারণা তার আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই মতিচ্ছন্নতা আরো হাস্যকর, এই কথাটির যে কী অর্থ তা কেউ জানে না। আমাদের মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন তিনি, বড়দিনের থিয়েটারে আমাদের রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করেন, তিনি কিছু মৌলিক যাদুর খেলাও দেখালেন সেদিন। তাকে আপনার ভাল লাগবে।

পরিচয় হল তার সঙ্গে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বয়স হল তখন ক্রসলির। আমার কিছুটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল রান লিখিয়েদের বক্সে তার ঠিক পাশে বসে। আমার বড় বেশী কাছে রয়েছে তার লোমশ হাত দুটো। আমি ভয় করি না কোনো দৈহিক আক্রমণের। একটা আসাধারণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী মানুষ যে আমার পাশে বসে রয়েছে সেটাই শুধু আমার মনে হয়েছে।

স্কোরিং বক্সটা বেশ গরম। বড় জানলা থাকা সত্ত্বেও ক্রসলি বলে উঠলেন, মাস্টারি গলায়, 'আমাদের মত রোগীর আচরণ আরও বেশী অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে এ ধরনের ঝড়ো আবহাওয়ায়।

কোনো রোগী খেলছে কিনা সেটা আমি জানতে চাইলাম। 'প্রথম জুটির এই দু'জন, দু'জন খেলছে। তিন বছর আগে ঢ্যাঙা ধরনের বি. সি. ব্রাউন হ্যান্ট দলের হয়ে খেলেছে। বেশ ভালোই খেলে আর অপরজন ক্লাবের হয়ে। সাধারণতঃ আমাদের হয়েই খেলে প্যাট স্লিংসবি—আপনি চেনেন তো অস্ট্রেলিয়ার এই ফাস্ট বোলারকে। কিন্তু তাকেও আমরা বসিয়ে দিয়েছি আজ। ব্যাটস্‌ম্যানের মাথা লক্ষ্য করেই সে হয়তো বল ছুঁড়ে বসবে এ ধরনের আবহাওয়ায়। সে অসম্ভব রকমের বদমেজাজী, তবে তাকে ঠিক পাগল বলা চলে না। তার কিছুই করতে পারে না ডাক্তাররা।

ডাক্তারের কথা তারপরই বলতে শুরু করে দিল ক্রসলি। 'মনটা খুবই ভাল ডাক্তারের, ডাক্তার হিসাবে বেশ ভালই পড়াশুনা করেছেন এবং করেনও। তিনি মানসিক হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি পড়াশুনা করেন বিষণ্ন মনস্তত্ত্ব নিয়ে একেবারে গত পরশু পর্যন্ত তিনি সব খবরাখবর রাখেন আমার। খুব মজা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি পড়েন না জার্মান বা ফরাসী, আমি সবসময় কিছুটা এগিয়ে থাকি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে ; তাকে তো অপেক্ষা করতে হয় ইংরাজি অনুবাদের জন্য। আমি তাকে ব্যাখ্যা করতে বলি নতুন নতুন স্বপ্ন তৈরী করে। আমার রোগটা আসলে "anti Paternal fination" বলে তার ধারণা।

ক্রুসলি তারপরই জানতে চাইল, 'তার একটা গল্পের দিকে আমি কান দিতে পারব কিনা স্কোর লিখতে লিখতে। তা পারব, আমি বলে উঠলাম। বেশ ঢিমে তালে চলছিল ক্রিকেট খেলাটা।

সে বলে উঠল, 'আমার প্রতিটা কথাই সত্য, খুবই সত্য। আমি মাঝে মাঝে গল্পের চরিত্রগুলো এমনকী চরম পরিণতিগুলোকে পাল্টে দিই। গল্পটা নতুন অথবা সতা হয়ে ওঠে এই পরিবর্তনের ফলেই। গল্পটা অচিরেই একঘেয়ে ও মিথ্যা হয়ে যেত যদি একই ফর্মূলাকে ব্যবহার করতাম সবসময়। গল্পটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। প্রতিটি কথাই সত্য এর এবং এটি একটি সত্য গল্প। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গল্পের লোকটিকে চিনি। ল্যাম্পটনের মানুষ এরা সকলেই।

আমি শুধু রান ও অতিরিক্ত রানের হিসাব রাখব। এটাই স্থির হল। ক্রুসলি বোলিং-এর বিশ্লেষণ ছাড়াও পরস্পরের লেখা থেকে বাকিটা টুকে নেবে উইকেট পতনের পরে। গল্পটা বলা সম্ভব এই ব্যবস্থার ফলেই।

রিচার্ড র‍্যাচেলকে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলল, 'একটা স্বপ্ন, কি অস্বাভাবিক।'

র‍্যাচেল বলে উঠল, 'লক্ষ্মীটি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে বলবে, কারণ তোমাকে আমি বলতে চাই আমার স্বপ্নটাও।'

রিচার্ড বলে উঠল, 'একজন খুব বুদ্ধিমান, (অনেকজন কি? কারণ মাঝে মাঝেই বদলে যাচ্ছিল চেহারাটা তার) লোকের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। পরিষ্কার মনে আছে যে যুক্তিগুলো দিয়েছিল সেই যুক্তিগুলি, সর্ব প্রথম স্বপ্নে শোনা কোন যুক্তিকে আমি স্মরণ করতে পারছি এই। এতই আলাদা আমার স্বপ্নগুলি জাগ্রত অবস্থা থেকে যে এটা বর্ণনা করতে গেলে আমাকে বলতে হয়, আমি চিন্তা করছি এবং বেঁচে আছি একটা গাছের মত বা একটা ঘণ্টার মত বা মধ্যবর্তী C এর মত বা পাঁচ পাউন্ড নোটের মত, আমি মানুষ যেন ছিলাম না কোনোদিনই।'

'একই অবস্থা আরে আমারও তো' র‍্যাচেল বলে উঠল। 'আমি তো একটা পাথর হয়ে যাই, একথা মনে হয় ঘুমের মধ্যে। আমার মধ্যে তখন জেগে ওঠে পাথরের মতো স্বাভাবিক ক্ষুধা ও প্রত্যয়।' এটি একটি প্রবাদবাক্য যে, 'যদিও একটি পাথর বোধবিহীন হয় তবু একটি পাথরের মধ্যে নরনারীর চাইতেও বেশী বোধ, বেশী ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং বেশী আবেগ থাকতে পারে।

রবিবারের সকাল। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে সময়ের তোয়াক্কা না করে। তাদের প্রাতঃরাশও অপেক্ষা করতে পারে যেহেতু তাদের কোনো কাজ নেই। সেই সময় স্বামী বলে উঠল স্ত্রীকে, সেই লোকটি বা লোকগুলির সঙ্গে সে স্বপ্নের মধ্যে সেই বালিয়াড়িতে হাঁটছিল, সেই সময় বলে উঠল তাকে লোকগুলি বা লোকটি।'

এখানকার যে বালিয়াড়িগুলি রয়েছে তা আমাদের কোনো দূরবর্তী পাহাড় শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত নয়, বা সম্মুখস্ত সমুদ্রের অংশ বা পিছনকার বালিয়াড়ির অংশও নয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ তারা নিজেরাই। যে কোনো মানুষ বাতাসের ঘ্রাণ থেকেই বুঝতে পারে যে সে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। সে অনন্তকাল ধরে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকতে পারে যদি সে না খেয়ে, না কথা বলে, না পান করে, না ঘুমিয়ে বা কোনো ভাবনাচিন্তা না করেই থাকতে পারে। মৃত্যু নেই এবং জীবন নেই এই বালিয়াড়ির মধ্যে। সবকিছুই ঘটতে পারে সেখানে।'

'তাড়াতাড়ি বাজে কথা রেখে যুক্তিটা বল' র‍্যাচেল বলে উঠল।

রিচার্ড জানাল, আমার গতিবিধি সম্পর্কে যুক্তিটা ছিল, সেটা মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে তার তাড়া খেয়ে। লোকটি প্রথমে ছিল জাপানী এবং তারপর ইতালীয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি ক্যাঙারু হয়ে গেল সেটা মনে আছে।

স্বপ্ন-কাহিনী তার স্ত্রীও তাকে পাল্টা শোনাল। 'অনেক খরগোশ ছিল এরকম একটি বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম। তার সঙ্গে মিলছে কি জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে লোকটি যা বলছে। আমি দেখলাম হাতে হাত ধরে হেঁটে আসছ তুমি এবং সেই লোকটি, তোমাদের দু'জনের কাছ থেকে দৌড়ে সরে যাচ্ছি আমি, একটি কালো রুমাল বাঁধা তার মাথায়। আমার পিছনে দৌড়াতে লাগল সেও, জুতোর বক্‌লস খুলে গেল আমার, আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে পারলাম না সেটা তুলে নেবার জন্য। সে উপুড় হয়ে বক্‌লসটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।'

স্বামী বলল, 'তুমি কি করে বুঝলে লোকটি যে একই' স্ত্রী বলে উঠল হেসে, 'তার পরণে ছিল একটা নীল কোট যেটি ছিল ক্যাপ্টেন কুকের ছবির মতই এবং কালো ছিল তার মুখটা। বালিয়াড়ির ব্যাপার তো ছিল এটাও।'

স্ত্রীর গলায় চুম্বন করে স্বামী বলে উঠল, 'আমরা একত্রে বাস করি। একত্রে ঘুমোই এবং একত্রে কথা বলি শুধু নয়, স্বপ্নও দেখি একত্রে।'

তারা হাসতে লাগল এই কথা বলার পর।

এরপর স্ত্রীর প্রাতঃরাশ স্বামী উঠে গিয়ে এনে দিল। স্ত্রী বলল, সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটু বাইরে থেকে ঘুরে এস লক্ষ্মীটি, ঠিক একটায় ডিনার, সময়মত বাড়ি ফিরো এবং এমন কিছু নিয়ে এস ফিরবার সময় ভাবনাচিন্তা করতে পারি যা নিয়ে।

সকালবেলা বেশ গরম কারণ এটি মে মাসের মাঝামাঝি। স্বামী উপকুলের পথ ধরল জঙ্গল পার হয়ে। ল্যাম্পটন সেখান থেকে আধঘণ্টা হাঁটলেই। ক্রসলি শুধাল, ভাল চেনেন কি আপনি ল্যাম্পটন, 'আমি এখানে শুধু ছুটি কাটাতে এবং বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে আসি।'

সে ল্যাম্পটন ছাড়িয়ে পাহাড়ের নীচে পুরনো গির্জাটায় পৌঁছে গেল অনেক হেঁটে এবং অনেক পথ ঘুরে। প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে সকালবেলাকার। গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে নরম ঘাসের উপর দিয়ে সকলে দুয়ে দুয়ে কিংবা তিনে তিনে। ছেলেমেয়ে খেলা করছে একদল। রেক্টর বাইরে বেরিয়ে এল এবং বলটা পকেটে পুরতে পুরতে বলল, তাদের মনে রাখা উচিত যে এটা রবিবার। এই বলে চলে গেল রেক্টর। তাকে ভেংচি কাটতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

ইতিমধ্যে একটি লোক রিচার্ডের পাশে এসে বসার অনুমতি চাইল। এরপর আলাপ শুরু হল দু'জনের মধ্যে। এসেছিল লোকটি গির্জার কাছে। তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল সে, সেখানে যা শুনে এসেছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মা বাস করে পরপর—কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে প্রচারের সেই বাণীকে। আত্মা মস্তিষ্ক, ফুসফুস, পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড বা মন বা কল্পনা নয়, স্বতন্ত্র থাকে সে সবকিছুতেই। দেহের ভেতরে কেন থাকবে এটি দেহের বাইরে না থেকে। সে বলল, 'আমরা তো কোনো সঠিক মুহূর্ত বলতে পারিনা জন্ম বা মৃত্যুর এবং এটি ঠিক কোন সময়ে হয়। জাপানে তো আমি গিয়েছি। জন্মমুহূর্তেই সেখানে একবছর গণনা করা হয় নবজাতকের। বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি চলুন কারণ হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে আমি অনেক আরাম পাই, সম্প্রতি ইতালিতে একটি মৃত মানুষ—'

ভয় পেয়ে গেল রিচার্ড একথা শুনে। সে আরো ভয় পেল কালো রেশমী রুমাল দিয়ে লোকটিকে কপাল মুছতে দেখে। তাদের ছেলেমেয়েগুলো তাদের কানের কাছে বিকট চীৎকার করে উঠল হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তেই এবং হেসে উঠল হো হো করে। ভীষণ রেগে গেল নবাগত লোকটি। মুখ খুলল গালাগালি দিতে, দাঁত বেরিয়ে গেল মাড়ি পর্যন্ত। চীৎকার করে পালিয়ে গেল তিনটি ছেলে। এল্সি বলে যাকে তারা ডাকছিল সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভয় পেয়ে পড়ে গিয়ে। মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল ডাক্তার কারণ সে কাছেই ছিল। মেয়েটি বলছে দু'জনেই শুনতে পেল, 'শয়তানের মত ওর মুখটা লাগছে।'

হেসে উঠল আগন্তুক ভাল মানুষের মত, 'আমি শয়তান ছিলাম না কিছুদিন আগেও। উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে ঘটনা ঘটেছিল, বিশ বছর কাটিয়েছি সেখানে কালো মানুষের সঙ্গে। যে মর্যাদা আমায় দিয়েছিল তারা সেখানে তর্জমা করলে ইংরাজী ভাষায় সেটা 'Devil' বা শয়তান হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ নৌবাহিনীর একটা পোশাকও ইউনিফর্ম হিসাবে তারা আমায় দিয়েছিল। বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে চলুন আপনাকে পুরো গল্পটাই বলব। আমার হাঁটতে খুব ভাল লাগে বালিয়াড়িতে। আমার নাম চার্লস, আমি এজন্যই এসেছি এ শহরে।'

'ধন্যবাদ', রিচার্ড বলে উঠল। 'আমাকে কিন্তু ডিনারে যোগ দিতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে।'

'বাজে কথা রাখুন', চার্লস বলে উঠল। একটু পরে খেলেও চলবে ডিনার, আমিও আপনার সঙ্গে ডিনারে বসতে পারি যদি আপনি বলেন, শুক্রবার থেকে আমি কিছু খাই নি। পয়সা কিছু নেই পকেটে।'

অস্বস্তিবোধ করতে লাগল রিচার্ড, ভয় পাচ্ছে সে চার্লসকে। ডিনারে যোগ দিতে বলার ইচ্ছাও তার নেই ঐ স্বপ্ন। বালিয়াড়ি এবং রুমালের কথা ভেবে, আবার শুক্রবার থেকে কিছু খায়নি বলছে, লোকটি কিন্তু বুদ্ধিমান এবং শান্তশিষ্ট। র‍্যাচেল তো হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেবে যদি সে জা- পারে যে তাকে একবেলা খাওয়াতে অস্বীকার করছে। ঠাট্টা করে র‍্যাচেল তো রেগে গেলেই বলে 'ফাদার মাদার ওয়ান হাউস'। 'বেশ তো আসুন না ডিনারে' সে বলে উঠল। 'ছোটো মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে এখন, সান্ত্বনা দিন না একটু ওকে।'

ইশারায় চার্লস মেয়েটিকে কাছে ডাকল। একটি মাত্র কথা বলল তাকে 'দুধ' যা অষ্ট্রেলিয়ার একটি যাদু শব্দ। চার্লসের হাঁটুর ওপর বসল এল্‌সি এবং তার ওয়েস্ট কোটের বোতাম নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। চার্লস তাকে নামিয়ে দিল পরে।

'আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে একটি' একথা রিচার্ড বলে উঠল।

চার্লস জবাব দিয়ে উঠল 'আমি ভালবাসি ছেলেমেয়েদের। আমি চমকে উঠেছিলাম ওদের চীৎকার শুনে। আমি আনন্দিত এজনাই যে সেটা আমি করে ফেলিনি মুহূর্তের জন্য যা করার লোভ আমার হয়েছিল।'

রিচার্ড শুধাল 'ঘটনাটা কি?'

চার্লস বলে উঠল, রিচার্ড বলে উঠল মনের মত খেলা পেত বলে তাদের ভালোই লাগত।

চার্লস মন্তব্য করে আমি যদি চীকাৎকার করে উঠতাম তাহলে তারা সর্বদা পাগল হয়ে যেতো।

'ড্রাগন জাতীয় কোন বিশেষ যাদুকর নিশ্চয় ছিল সে' চার্লস বলে উঠল, 'হ্যাঁ মিলে যাচ্ছে কারণ ক্যাঙারু জাতির অন্তর্ভুক্ত আমি।

তারা বাড়ি ফিরল একটার সময়। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল র‍্যাচেল। তৈরী করাই ছিল ডিনার। রিচার্ড বলল, 'ইনি মিঃ চার্লস র‍্যাচেল। আমি একে ডিনারে আমন্ত্রণ করেছি। মস্তবড় পর্যটক ইনি।'

র‍্যাচেল চোখের ওপর হাত রাখল রোদটাকে আড়াল করবার জন্য। চুমো খেল তার হাত ধরে চার্লস, র‍্যাচেল অবাক হয়ে গেল এই ঘটনায়।

ক্রসলি বলল, 'আপনার ভাল লাগবে র‍্যাচেলকে। কারণ সে মাঝে মাঝে আসে।' কিছু বলা হল চার্লসের সম্পর্কে, তার মাঝারী বয়স, সে লম্বা, তার চুল পাকা, চোখ দুটি বড় বড় এবং উজ্জ্বল। যা কখনও হলুদ, বাদামী বা ধূসর। বিষয়বস্তু অনুসারে গলার স্বর বদলে যায় কথা বলার সময়। নখ সযত্ন রক্ষিত, হাত দুটি বাদামী এবং নীচের দিক লোমশ। রিচার্ড একজন শক্তিমান নয় কিন্তু ভাগ্যবান সঙ্গীত শিল্পী। ভাগ্যই তার শক্তি বলে মনে হয়।

একসঙ্গে বাসনপত্র ধুয়ে ফেলল রিচার্ড এবং চার্লস তাদের ডিনারের পরে। না হলে সম্ভবতঃ তারা মারাই যেত।'

বোকার মত একটু হাসি হাসল রিচার্ড। রিচার্ড ঠিক বুঝে ওঠেনি তার হাসা উচিত কিনা কারণ চার্লস এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল। সে বলে উঠল, 'আমাকে একটু শোনান তো, সেটা আবার কিরকম চীৎকার। শোনান তো আমাকে একটু'—

'ছোটরাই যে আমার চীৎকারে আঘাত পায় তা কিন্তু নয় চার্লস বলে উঠল। 'ঘোর পাগল হয়ে যেতে পারে তা শুনে বড়রাও। মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে এ শুনে অতি শক্তিমান মানুষও। যাদু চীৎকার একটা এটা। আমি এটা শিখেছি উত্তর দেশের প্রধান শয়তানের কাছ থেকে। এটাকে রপ্ত করেছি আঠারো বছর ধরে। মোট পাঁচবারের বেশী এটা ব্যবহার করিনি এই সময়ের মধ্যে।

'ব্যাপারটা একটু দেখাবেন,' রিচার্ড বলে উঠল।

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায় এটা আমি দেখছি' চার্লস বলে উঠল। 'ভয় দেখানো হুংকার কি আপনি আগে কখনও শোনেননি।'

রিচার্ড কিছুক্ষণ ভেবে নিল, তারপর বলে উঠল, 'শত্রুপক্ষের সৈন্যরা শুনে ছুটে চলে যেত প্রাচীন আইরিশ যোদ্ধারা এমন বীরত্বব্যঞ্জক হুংকার দিত।' আর ভয়ংকর হুংকার ছাড়ত ট্রয়ের মহাবীররা। হঠাৎ জোর চীৎকার শোনা যেত গ্রীসের জঙ্গলে। মানুষ ভয়ে পাগল হয়ে যেত বন্যদের প্যাকের সেই চীৎকার শুনে ইংরাজী "Panic" শব্দটা এসেছে এই উপকথা থেকেই। একটা হুংকারের কথা পড়েছি 'মোবেনিজিয়ন' এর লুড ও লাঙলির গল্পেও। হুংকার শোনা যেত

প্রতি মে ইভ্ এ। ভয়ে পুরুষদের মুখ শুকিয়ে যেত। ঢোক গিলে রিচার্ড বলল, 'হুঙ্কারটা কি জোরালো না কর্কশ ধরনের? লোক পাগলই বা হয় কী করে, বা এটা কেমন ভাবেই হয়।

চুপ করে রইল চার্লস, রিচার্ড বলতে লাগল বোকার মত হেসে, 'অদ্ভুত জিনিষ হল একটা শব্দ। আমি যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম মনে পড়ে, সন্ধ্যাকালীন পাঠটা পড়াবার তখন কিসে একবার কলেজে পালা পড়েছিল। একটা আর্তনাদ শোনা গেল যখন সে দশটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ধুলোবালি, কাঠ ঝরতে শুরু করল এবং ক্যাঁচ-কোঁচ একটা শব্দ উঠল। সে পড়া না থামিয়ে দিলে ছাদটাই হয়তো ভেঙে পড়ত। বেহালায় একটা সুর বাজিয়ে আপনি মদের গ্লাসকে ভেঙে ফেলতে পারেন?'

জবাবে চার্লস বলল, 'স্বরক্ষেপণ বা বায়ুর প্রকম্পনের ব্যাপার আমার হুংকারে নয়, এটা ঠিক বোঝানো যাবে না এমন একটা কিছু। একান্তই ক্ষতিকর এই হুংকার। নির্দিষ্ট কোন সরগমের স্কেলে এটা বাঁধা নয়। ভয়ের ব্যাপার এটা একান্তভাবেই। আপনাকে হুংকার শোনাতে আমি আপত্তি করতাম আমার নিজের কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে এটা বলাই বাহুল্য।

স্বভাববশতঃ রিচার্ড ভীতিপ্রবণ। সে আরো ঘাবড়ে গেল হুংকারের নতুন বিবরণ শুনে। বিছানায় শুয়ে থাকলে ভাল ছিল এটা তার মনে হল, চার্লস যদি দুই মহাদেশ জুড়ে থাকত তো সেটা তার পক্ষে আরো ভালা হত। আকর্ষণ আরও বাড়ছে তার।

রিচার্ড ভয় পেয়ে গেল আরো র‍্যাচেলকে সাহস করে সে বলতে পারল না। কালো রেশমী রুমাল বা বালিয়াড়িতে হাঁটতে যাবার ডাক। মাথাটা ঘুরিয়ে সে বলে উঠল, অনেক কিছুই জানে চার্লস, কিছু মনে যদি না কর তুমি। তাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব কাল ভোরে। আমার খুব দরকারী প্রাতঃভ্রমণটা।

র‍্যাচেল বলল, 'বেশ তো যাব আমি।' আপত্তি করতে পারল না রিচার্ড। তার বেড়াতে যাবার কথাটা বলা ভুল হয়েছে এটা রিচার্ড বুঝল। সে বলে উঠল, 'ভোর ছটায় ঠিক। এতে খুব খুশি হবে, চার্লস।

ঘুম থেকে উঠল রিচার্ড ঠিক ছ'টায়। ঘুমের ঘোর থাকায় র‍্যাচেল তাদের সঙ্গে যেতে পারল না কারণ তার মদের নেশা ছিল। চুম্বন করে বিদায় দিল স্বামীকে। চার্লসকে নিয়ে তার স্বামী বেরিয়ে পড়ল।

রিচার্ডের ভালো কাটেনি রাতটা। স্বপ্ন দেখেছে সে আজে বাজে। তার মনে হয়েছে সে যেন অনেক দূরে চলে গেছে র‍্যাচেলের কাছ থেকে। তাকে যেন কুরে কুরে খেয়েছে হুংকারের আতংক। তার শীত করছে খুব এবং খুব খিদেও পেয়েছে। তীব্র হাওয়া একটা বইছে সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে। বৃষ্টি হয়েছে কয়েক পশলা। তাই কথা নেই চার্লসের মুখে। সে দ্রুত হাঁটছে একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে রিচার্ডের। চার্লসকে সে একমিনিট দাঁড়াতে বলল। সে বলল, 'আমার বাঁদিকে চার্লসকে হঠাৎ হুংকারটা একসময় রিচার্ড শোনাতে বলল, সেটা না শোনা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

বাসন মোছা ন্যাকড়াটা হাতে নিয়ে চার্লস বলে উঠল, যেমন ইচ্ছা আপনার। আপনাকে তো আগেই আমি সাবধান করে দিয়েছি এ হুংকার সম্পর্কে। এমন একটা নির্জন স্থানে হুংকার করার ইচ্ছা হলে করতে হবে যেখানে কেউ হুংকার শুনতে পারবে না। দ্বিতীয় ডিগ্রীর হুংকারের ফল নিশ্চিত মৃত্যু তাই দ্বিতীয় ডিগ্রীর হুংকার করব না। প্রথম ডিগ্রী হুংকার আমি প্রথমে শোনাব সেটার ফলে কেবল আতঙ্ক হয়। আপনার দুই হাত দুই কানে চেপে ধরবেন যখনই আপনি থামাতে চাইবেন।'

রিচার্ড 'ঠিক আছে' এই কথা বলে উঠল।

দিইনি চার্লস বলে উঠল 'আমি হুংকার দিচ্ছি নিছক কৌতূহল মেটাবার জন্য। আমি হুংকার দিয়েছি কালো বা সাদা যে কোনো শত্রুর হাতে জীবন বিপন্ন হলে তবেই ' তখন হুংকার ছাড়ছিলাম যখন মরুভূমিতে একলা ছিলাম, তখন কেবলমাত্র খাদ্য ও পানীয়ের জন্য বাধ্য হয়ে হুংকার ছাড় ছিলাম।

রিচার্ড মনে মনে ভাবল, 'আমি ভাগ্যবান তাই আমার ভাগ্য ভাল হবে অবশ্যই এ ব্যাপারে।' চার্লসকে সে বলে উঠল, 'ভয় পাচ্ছি না আমি।'

'আমি কাল ভোরে অন্য কেউ ওঠার আগে বালিয়াড়িতে চলে গিয়ে হুংকার ছাড়ব' ভয় পাবেন না আপনি তো বলছেনই।'

আসলে কিন্তু ভয় পেয়ে গেল রিচার্ড। যে র‍্যাচেল এই কারণে বলতে পারল না কথাটা তাই সে ভয় তার আরও বেড়ে গেল। এই কথাটা শুনলে র‍্যাচেল নিয়ে যেতে দেবে না অথবা নিজে সঙ্গে যাবে। এই ভয় ও ভীরুতা চিরকাল কষ্ট দেবে র‍্যাচেল। হুংকার যদি না শোনা যায় তাহলে আবার সঙ্গে গেলে ঠাট্টা করার একটা অজুহাত খুঁজে পাবে র‍্যাচেল আবার পাগলও হয়ে যেতে পারে হুংকার শোনা না গেলে। রিচার্ড এই কারণে কিছুই বলল না তাকে।

রাতটা কুটীরে থাকল চার্লস এবং অনেক রাত অবধি তারা গল্প করল দু'জনে। মদ খায় না র‍্যাচেল। তবে সেদিন দু-গ্লাস খেয়ে বকতে লাগল আজে বাজে। বলে উঠল, লক্ষ্মীটি তোমায় তো ভুলেই গেছি বলতে। সকালে যখন জুতো জোড়া পরতে গেলাম তখন দেখলাম বক্‌লস নেই এক জোড়া জুতোর। মিঃ চার্লসের পকেটেই বক্‌লস ছিল বলে আমার ধারণা। ঐ লোকটিকেই আমরা আবার স্বপ্নে দেখেছি। এটা আমার নিশ্চিত ধারণা। মোজার ভিতর দিয়ে পায়ে বিঁধছে ঘাসের ডগা। ভিজে উঠছে মোজা।

ন্যাড়া বালিয়াড়ির ওপর পৌঁছেছে এবার তারা। উঁচু ঢিবিটা থেকে চার্লস চারদিকে তাকাল। দু-মাইল বা তার বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত। কাউকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন নাড়াচাড়া করছে চার্লস তার পকেট থেকে বার করে। অন্য আঙুলের ডগায় নিল এক আঙুলের ডগা থেকে, হাতের পিছনে নিয়ে গেল একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলে সেটাকে ধরে। এটা র‍্যাচেলের জুতোর বক্‌লস।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, এবং বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল রিচার্ডের। বমি করার অবস্থা প্রায় তার। ঘাম হচ্ছে, আবার শীতে কাঁপছে। সমুদ্রের একটা খোলা জায়গায় তারা পৌঁছল সমুদ্রের ধারে। কিছু শেওলা ও সামান্য ঘাস জমেছে উঁচু তীরের উপর। পাথর ছড়িয়ে আছে চারদিকে, সমুদ্রের ঢেউয়ে অনেক বছর আগে পাথরগুলি এখানে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

চার্লস বলল, 'আপনি কি প্রস্তুত?'

ঘাড় নাড়ল রিচার্ড।

একটা সাগর বালিয়াড়ির ঈগল উড়তে লাগল ডাকতে ডাকতে।

রিচার্ড শুকনো গলায় বলে উঠল, 'সবুজ শেওলার উপর আপনি দাঁড়ান। একটু দূরে পাথরগুলোর উপর আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনি হাত তুলবেন আমি হুংকার ছাড়লে আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবেন কানে আঙুল দিলেই।'

চার্লস শেওলার দিকে এগিয়ে এল বিশ পা হেঁটেই। রিচার্ড তার চওড়া পিঠ ও পকেট থেকে দেখতে পেল কালো রেশমী রুমাল তার মনে পড়ল এল্‌সির ভয় পাওয়ার কথা স্বপ্নের কথা এবং জুতোর বক্‌লসের কথা। মানসিক দৃঢ়তা ভেঙে পড়ল তার, ভাঙা মোমবাতির দুটো টুকরো নিল এবং তারপর সে দুটি কানে গুঁজে দিল। চার্লস দেখতে পেল না সেটা।

সে ঘুরে দাঁড়াল এবং রিচার্ড হাত তুলে সংকেত জানাল তাকে। চার্লসের দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল এবং সামনে সে ঝুঁকল অদ্ভুত ভাবে। রিচার্ড আগে কখনও দেখেনি মানুষের মুখের এমন ভয়ার্ত দৃষ্টি। প্রস্তুত ছিল না এর জন্য সে। চার্লসের মোমের মত অনিশ্চিত নরম ও পরিবর্তনশীল· মুখটা পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। মুখ প্রথমে সাদা, লাল হতে শুরু করল তারপর সবশেষে কালো হয়ে দমবন্ধ হবার উপক্রম হল। সম্পূর্ণ মুখটা ধীরে ধীরে খুলে গিয়ে অবশেষে উপুড় হয়ে পড়ে গেল রিচার্ড দুই হাতে কান চেপে ধরে।

তখন সে পাথরগুলোর ওপর একলা পড়ে আছে যখন তার জ্ঞান ফিরে এল। উঠে বসে ভাবতে লাগল সে যে কতক্ষণ পড়ে আছে। শরীরের চেয়ে বড় ধরনের কাঁপুনি ধরেছে বুকের মধ্যে, দুর্বল এবং অসুস্থ লাগছে খুব তার। ভাবতে সে কিছুই পারছে না। সে উঠতে গেল হাতের উপর ভর করে। একটা অন্য পাথরের চাইতে বড় পাথরের ওপর হাত পড়ল। অন্যমনস্কভাবে

সে হাত বুলোতে লাগল পাথরের উপর। চিন্তা এল অনেকরকম মনে। জুতো তৈরী করার কথা মনে এলেও সে সেই কাজের কিছুই জানে না। তার পরিচিত বলে মনে হল এখন সবরকম মুচির কাজই। 'আমি একজন মুচি' একথা সে গলা খুলে বলতে পারত।

সংশোধনী করে সে বলল—আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী। পাগল হয়ে যাচ্ছি কি আমি।' ছুঁড়ে মারল সে পাথরটাকে। পাথরে লেগে সেটা ছিটকে পড়লো।

প্রশ্ন করল নিজেকেই, আমি একজন মুচি, আচ্ছা একথা কেন বললাম। এখন দেখছি কিছুই জানি না অথচ একটু আগে মনে হয়েছিল জুতো তৈরীর সবরকমই আমি জানি। কেন এভাবেই বেরিয়ে এলাম, র‍্যাচেলের কাছে ফিরে যাব এখনই।'

চোখে পড়ল তারপরই। বালির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে শ'খানেক গজ দূরে চার্লস সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কানে হাত দিয়ে দেখল মোমের টুকরো দুটো কানের মধ্যে পড়ে আছে। এটাই প্রমাণ যে সে ভয় পেয়েছিল। একটা খরগোশ পড়ে কাতরাচ্ছে বালির উপর এবং একটা ঘূর্ণি উঠছে। রিচার্ড যেতেই ঘূর্ণিটা লেগে গেল আর মরে গেল খরগোসটা বিশ পা যাবার আগেই।

বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে পাখিটা বোকার মত। তাকে দেখে উড়ে না গিয়ে ধপ্ করে পড়ে মারা গেল।

রিচার্ড জানে না কেমন করে বাড়ি পৌছল। খিড়কীর দরজা খুলে হাতে পায় হামাগুড়ি দিয়ে কোতলার উঠে গেল বিবর্ণ মুখ এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে র‍্যাচেল বিছানায় বসে আছে।

সে বলে উঠল, 'তুমি যে ফিরে এসেছ এটাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যদিও তুমি ফিরে এসেছ কিন্তু আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি এবং সেটা একটা দুঃস্বপ্ন। এত খারাপ ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন জীবনে দেখেনি। পাথর হয়ে গেছি আমি কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি বসে রয়েছ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি। ভয়ঙ্কর কিছু তোমার বেলায় না ঘটে আমার বেলায় ঘটল। কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করে আছ তুমি। তোমাকে বলতে পারব না সেটা যে কি। আমার সবগুলি স্নায়ু একসঙ্গে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।

আমাকে খান খান করে কেটে ফেলল একটা তীব্র অশুভ আলোর রেখা। তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এল শরীরের ভিতরটা, ঘুমটা ভেঙে গিয়ে ধড়ফড় করতে লাগল এমন বুকটা যে শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম বলে কি মনে হয় তোমার? তাতেও ঐরকম হয় একথা লোকে বলে। লক্ষ্মীটি তুমি ছিলে কোথায় এবং কোথায় মিঃ চার্লস?'

রিচার্ড হাত বাড়িয়ে দিল বিছানায় বসে। সে বলে উঠল 'খুব একটা খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমারও। সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম চার্লসের সঙ্গে। আমি মূর্ছিত হয়ে কতকগুলো পাথরের ওপর পড়ে গেলাম এগিয়ে গিয়ে সবচাইতে উঁচু বালির ঢিবির উপর উঠতে। ভয়ে ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম। ঘটনাটা ঘটেছে সম্ভবতঃ আধঘণ্টা আগে। তাই বাড়ি ফিরে এলাম ছুটতে ছুটতে। এর বেশী সে কিছু বলল না র‍্যাচেলকে।

'আমি অসুস্থ তোমার মতই' র‍্যাচেল বলে উঠল। তাদের দু'জনের মধ্যে সমঝোতা আছে একটা যে রিচার্ডকে সুস্থ থাকতেই হবে র‍্যাচেল অসুস্থ হলে।

'তুমি অসুস্থ নও' একথা বলেই রিচার্ড মূর্চ্ছা গেল।

র‍্যাচেল ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তাকে কোনরকমে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে।

গন্ধ নাকে এল কফি ও শূকরের মাংসের। র‍্যাচেল ভারী খুশী হল প্রাতঃরাশের ঝঞ্ঝাট এড়াতে পেরে।

তার ফলে বিচলিত হয়ে সে চার্লসকে ধন্যবাদ দিল এবং তাকে, লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করল। গম্ভীর ভাবে চার্লস চুম্বন করে তার হাতটা চেপে ধরল। চার্লস ট্রেতে করে প্রাতঃরাশ নিয়ে হাজির হল। র‍্যাচেলের পছন্দ মতোই ট্রেম্পনি লাস্ট ফর ডেথ ফের হয়েছে ডমটাকে ভেজেছে দুদিকেই এবং কফিটাও কড়া হয়েছে।

র‍্যাচেল চার্লসের প্রেমে পড়ে গেল। সে অনেকবার প্রেমে পড়েছে, সেটা কিন্তু বিয়ের পর। র‍্যাচেল এবং রিচার্ড এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরস্পরকে বলে দেয়। তাতে কোনো ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না যদিও মনের অবরুদ্ধ আবেগ প্রকাশিত হতে পারে। কারণ র‍্যাচেল বলে (পূর্ণ স্বাধীনতা

আছে রিচার্ডের এ ব্যাপারে) 'অমুকের প্রেমে পড়লেও আমি কেবল তোমাকেই ভালবাসি।' যদিও অতীতে এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে কিন্তু এবারেব ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে রিচার্ডকে আর ভালবাসে না তাই চার্লসের প্রেমে যে সে পড়েছে তা রিচার্ডকে বলতে পারল না। রিচার্ডকে মুখে বলে 'অলস অকর্মন্য' এবং সে ঘৃণা কবে রিচার্ডকে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার জন্য। রিচার্ড উঠে বসল দুপুর নাগাদ, শোবার ঘরেই ঘুরতে লাগল। র‍্যাচেল এসে তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

র‍্যাচেলকে সাহায্য করে চার্লস, সব রান্না অবধি করে দেয়। রিচার্ডকে যেহেতু ওপবে উঠতে বলা হয়নি তাই সে ওপরে ওঠে না। রিচার্ড চার্লসকে ফেলে পালিয়ে এসেছে বলে র‍্যাচেল লজ্জা পেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। চার্লস বলেছে সে এটাকে অপমান বলে মনে করেনি। তার কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছে এই সকালটা। বাতাসে কি এক অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল যখন তারা বালিয়াড়িতে গিয়ে পৌঁছল। একই ধরনের অনুভূতি তার হয়েছিল একথা র‍্যাচেলও বলেছিল।

একথা পরে সে শুনল ল্যাম্পটনও সেই একই কথা বলে বেড়াচ্ছে।

পরে সে শুনল যে একটা মৃদু ভূকম্প হয়েছে একথা ডাক্তার বলেছে কিন্তু শয়তান এই পথে চলে বেড়াচ্ছে একথা গ্রামের লোকেরা বলছে। শয়তান এসেছিল শিকাররক্ষক সলমন মোন্স এর কালো আত্মাকেই নিয়ে যেতে, তার নিজের ঘরেই এই সকালেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তার বালিয়াড়ির পাশে।

র‍্যাচেল রিচার্ডকে মুচির কাছে পাঠাল জুতোর বক্‌লস আনতে যখন রিচার্ডের একটু হাঁটার ক্ষমতা হয়েছিল। সে বাগানের নীচে পর্যন্ত গেল স্বামীব সঙ্গে। রাস্তাটা চলে গেছে তার খাড়া তীর বরাবর। রিচার্ড অসুস্থ বোধ করল এবং সে হাঁটতে হাঁটতে গোঙাতে লাগল। র‍্যাচেল কিছুটা রেগে এবং কিছুটা তামাশা করে তার স্বামীকে ঠেলে দিল। সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল কাঁটা ঝোপ এবং পুরনো লোহার মধ্যে। হো হো করে হেসে দৌড়ে র‍্যাচেল আবার বাড়িতে ফিরে গেল।

রিচার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁটা ঝোপের ভেতর থেকে জুতো বের করে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রথমে ফটকটা পেরোল এবং তারপর তীর বেয়ে প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতে লাগল।

ধপাস্ করে বসে পড়ল মুচির বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে। মুচি খুশি হল তাকে দেখে এবং এও বলল যে 'খুব খারাপ লাগছে তোমাকে।'

রিচার্ড বলল ঃ ঠিক কথাই। শুক্রবার সকালে একটু মাথা ঘুরে গেছে, একটু ভাল আছি এখন।

গলা ছেড়ে বলে উঠল মুচি, 'তোমার মাথা ঘুরেছিল, আর আমাব কেউ যেন ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। যে রকম লোকে একটা পাথর নিয়ে করে সেবকম আমার আত্মাকে নিয়ে কেউ যেন লোফালুফি করছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপরই আমাকে। আমি কোনোদিন ভুলব না গত শুক্রবারের সকালটার কথা।'

মুচির কথা শুনে রিচার্ডের মাথায় অদ্ভুত একটা ধারণা ঢুকল। পাথরের মত তবে কি মুচির আত্মাকেই সে নাড়াচাড়া করেছিল? সে ভাবল ঃ ল্যাম্পটনের প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশুর আত্মাই সেখানে হয়তো পাথর হয়ে গিয়েছিল।' সে একটা বক্‌লস নিয়ে বাড়ি চলে গেল মুচিকে কিছু না বলেই।

বাড়িতে কোনো সুখ নেই কারণ পাকাপাকি ভাবে বসে গেছে চার্লস। তাই এতে কিছুই বলার নেই।

র‍্যাচেল যখন স্বামীকে গালাগালি দেয় তখন চার্লস র‍্যাচেলের পক্ষই নেয় কারণ কঠোর পরিশ্রমী এবং মৃদুভাষী চার্লস। র‍্যাচেল তার কোন প্রতিবাদ করে না এবং সেটাই সবচেয়ে দুঃখজনক।

ক্রস্‌লি বলল, 'হাসির খোরাক হবে গল্পের বাকি অংশটুকু। রিচার্ড বালিয়াড়ির পাথরের স্তূপের মধ্যে ডাক্তার ও রেক্টরের আত্মা দুটিকে চিহ্নিত করল। হুইস্কির বোতলের মত গড়ন অনেকটা ডাক্তারের আত্মা আর আদিম পাপের মতই কালো র‍্যাচেলের আত্মা। তার ধারণা কল্পনামাত্র নয়, এইভাবেই সে প্রমাণ করে দিল। এইসব বিবরণের মধ্যে আর গেলাম না। রিচার্ডকে র‍্যাচেল আবার ভালবাসতে শুরু করে দিল আগের মতই।

চার্লস বাড়ি গেছে, সে যে কোথায় গেছে, তা কিন্তু কেউ জানে না।

রিচার্ড সুস্থ হল দু-একদিনের মধ্যেই, আবার আগের মত চলতে লাগল সবকিছু। একদিন বিকালে হঠাৎ দরজায় চার্লসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

সে ঘরে ঢুকল, কোনো কথা না বলে টুপিটাকে ঝুলিয়ে রাখল সে পেরেকের সঙ্গে।

'রাতের খাবার কখন তৈরী হবে?

র‍্যাচেলের দিকে রিচার্ড তাকিয়ে বুঝল যে র‍্যাচেল মজে গেছে এই লোকটাকে দেখেই।

সে বলে উঠল ঃ ঠিক আটটায় রাতের খাবার তৈরী হবে। রিচার্ডের একজোড়া চটি র‍্যাচেল এগিয়ে দিল রিচার্ডের কাদামাখা জুতো জোড়া খুলে দিয়ে।

চার্লস বলে উঠল ঃ 'এখন সাতটা বাজে ঠিক আছে আর একঘণ্টা বাদেই রাতের খাবার প্রস্তুত হবে। অগ্নিকুণ্ডের লোকটি ন'টার সময় সান্ধ্য পত্রিকা দিয়ে গেল। দশটার সময় আমি আর তুমি এক সঙ্গে ঘুমাব র‍্যাচেল।

চার্লসের মনে হল রিচার্ড যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। র‍্যাচেল শান্ত গলায় জবাব দিল। 'নিশ্চয় নিশ্চয়'। র‍্যাচেল রিচার্ডের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিল এবং তারপর বলে উঠল, 'দূর হয়ে যাও তুমি এখান থেকে বেঁটে মানুষ।'

রিচার্ড হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল এবং গালে হাত বুলোতে লাগল। সে নিজে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে একথা বিশ্বাস হল কিন্তু চার্লস পাগল হয়ে গেছে একথা তার কিছুতেই বিশ্বাস হল না। রিচার্ড এবং র‍্যাচেলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে যে কোনো একজন যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় তবে অপরজন তাতে বাধা দেবে না। তারা জীবনে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। অনুষ্ঠানের চাইতে ভালবাসার বন্ধনকেই যথাসাধ্য বেঁধে রাখা শান্ত গলায় রিচার্ড বলে উঠল। 'আমি তোমাদের দু'জনকে একত্রে রেখে চলে যাব র‍্যাচেল।'

রিচার্ডের দিকে এক পাটি বুট ছুঁড়ে চার্লস বলে উঠল এক হুংকারে তোমায় কান দুটোতে ছিঁড়ে ফেলব। তুমি প্রাতঃরাশের সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে নাক গলাবে না।

পরিষ্কার মাথায়, শান্ত চিত্তে, ভয় নেই এরকম ভাব দেখিয়ে রিচার্ড বেরিয়ে গেল। গলিপথ ধরে সে মাঠে নেমে এল ফটক পার হয়ে। এখনও তিন ঘণ্টা বাকী রয়ে গেছে সূর্যাস্তের। ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে স্কুলের মাঠে। হাসি ঠাট্টা করল প্রথমে তাদের সঙ্গে এবং এরপর র‍্যাচেলের কথা মনে পড়তেই চোখে জল এসে গেল তার। তারপর সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে আমার মন্দ ভাগ্য, আমি পাগল হয়ে গেছি।

পাথরগুলির কাছে শেষ পর্যন্ত সে এল। সে পাথরগুলিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, আমার আত্মাকে আমি এই পাথরের টুকরোর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করব এবং তারপর হাতুড়ি দিয়ে সেটাকে একশোটা টুকরো করে দেব। কারণ তার সঙ্গে তার হাতুড়িটা ছিল। এটাকে সে নিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে বেরোবার সময়।

নিজের আত্মাকে সে খুঁজতে লাগল এবার। নিজের আত্মাকে কেউ চিনতে পারে না যদিও অন্য স্ত্রী এবং পুরুষের আত্মাকে চেনা যায়। রিচার্ড নিজের আত্মাকে চিনতে পারল না কিন্তু র‍্যাচেলের আত্মাকে দেখেই চিনতে পারল (সবুজ পাথর যেটি স্ফটিক খচিত)। গায়ে তার লেগে রয়েছে আরও একটি পাথর যার রঙ বাদামী এবং কুৎসিত গড়নের ও গায়ে ফুটকি ফুটকি রয়েছে। রিচার্ড প্রতিজ্ঞা করল, 'এটা নিশ্চয় চার্লসের আত্মা এবং এটাকে আমি ধ্বংস করব।

সে তার দুটি ঠোঁটেই চুমো খেল র‍্যাচেলের আত্মাকে। হাতুড়িটা তুলে সে চার্লসের আত্মাকে বলল, 'এটাকে আমি ভেঙে পঞ্চাশটা টুকরো করে ফেলব।

তার মনে খটকা লাগল তাই সে থেমে গেল। র‍্যাচেলের ভালবাসাকে সে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য কারণ র‍্যাচেল তার চাইতেও বেশী ভালবাসে চার্লসকে। চার্লসের পাথরের পাশেই পড়েছিল একটি তৃতীয় পাথর। (তার নিজের আত্মা নিশ্চয়ই এটি)। একটা ক্রিকেট বলের মত বড় মসৃণ ধূসর গ্রানাইট পাথর। সে নিজের মনেই বলে উঠল, 'টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলব আমি আমার নিজের আত্মাকে, আমার অবসান তাহলেই হবে।' চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল এবং পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখের সামনে। তার মূর্ছিত হবার মত অবস্থা হল, সে সামলে

নিয়ে তীব্র চীৎকার করল প্রথম এবং তার পর কয়লা ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে ধূসর পাথরটার ওপরে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল।

পাথরটা চার টুকরো হয়ে তা থেকে বারুদের মত গন্ধ বেরোতে লাগল, রিচার্ড হো হো করে হেসে উঠল যখন দেখল যে সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। সে পাগল হয়ে গেল একেবারে পাগল, হাসির পর হাসি হাসতে লাগল, সে ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল একসময় হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে যখন জাগল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে ভাবতে লাগল বাড়ি যেতে যেতে 'র‍্যাচেল নিশ্চয় আমাকে এই খারাপ স্বপ্ন থেকে উদ্ধার করতে পারবে।'

ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে একদল লোক কথা বলছে উত্তেজিতভাবে। সে শহরের প্রান্তে যখন পৌঁছল তখন দেখল, একজন এদের মধ্যে বলছে, 'আটটা নাগাদ এই ঘটনাটা ঘটেছে।' হ্যাঁ তাই-তাই আর একজন বলছে। 'বদ্ধ পাগল ও' তৃতীয়জন বলে উঠল। সে বলে, 'আমাকে ছুঁলেই আমি হুংকার দিয়ে উঠব এবং আমি যদি আরেকবার হুংকার দিই তাহলে গোটা পুলিশ বাহিনীই অজ্ঞান হয়ে যাবে। তোমরা পাগল হয়ে যাবে আমার হুংকার শুনে।' ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'তোমাকে এতদিনে বাগে পেয়েছি ক্রস্‌লি, তুমি এবার তোমার হাত দুটি তোল। তখন সে বলল, 'এই একটা শেষ সুযোগ, আমাকে এখানে রেখে চলে যাও, নইলে আমি তোমাদের মেরে কাঠ বানিয়ে দেব এক হুংকারে।'

রিচার্ড দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাদের কথাবার্তা শুনে। সে বলে উঠল, 'সেই নারী কি বলল এবং ক্রস্‌লিরই বা কি হল।' ইন্সপেক্টরকে বলল, সেই নারী, 'আপনি চলে যান খ্রীষ্টের দোহাই, আপনাকেও মেরে ফেলবে নইলে।'

'কি হুংকার আর দিল লোকটি।'

'কোনো হুংকার সে দেয়নি। সে কেবল মুখটা কুঁচকে শ্বাস টেনেছে মুহূর্তের জন্য। জীবনে এরকম মুখ আমি দেখিনি হে পরমেশ্বর। তিন চার পেগ ব্রান্ডি খেতে হয়েছিল পরে আমাকে। গুলি করল ইন্সপেক্টর রিভলবার বাড়িয়ে কিন্তু গুলি কারোর গায়েই বিঁধল না। হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল ক্রসলি নামক লোকটির মধ্যে। সে বুকের উপর সশব্দে হাত রাখল। চকচক করতে লাগল মুখটি। সে হাসতে শুরু করল প্রথমে এবং তারপর নাচতে শুরু করল সে। এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল সে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্ত্রীলোকটি বিশ্বাস করতে পারছিল না সে নিজের চোখকেই। তাকে নিয়ে চলে গেল পুলিশটি। যদি লোকটি একেবারে শান্তশিষ্ট এবং নিরীহ ছিল পাগলও সে হয়ে থাকে। পুলিশকে কোনোরকম ঝামেলাই পোহাতে হয়নি তাকে নিয়ে। তাকে রাজকীয় পশ্চিমাঞ্চলে উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে গেল রিচার্ড। যদিও বেশী কিছু বলার ছিল না তবুও র‍্যাচেল এবং সে কল বলতে শুরু করল।

স্ত্রী বলল, 'সে রিচার্ডকে বিরক্ত করার জন্যই করেছিল, সে আসলে চার্লসের প্রেমে পড়েনি। সে চার্লসকে কিছু বলতে শোনেনি এবং নিজেও কিছু বলেনি। স্বপ্ন তার সবটাই। স্বামীকে সে চিরদিনই ভালবেসেছে যদিও তার স্বামীর কিছু দোষ ক্রটি রয়েছে। তার অন্য কোনো দোষ নেই, তবে তার কৃপণতা, বাচালতা আর অপরিচ্ছন্নতা আছে। চুপচাপ রাতের খাবারও খেয়েছিল চার্লস।

যখন সে তাকে নাচতে ডাকছিল এবং তার সঙ্গে খুনসুটি করছিল ঠিক তখনই দরজায় একটি টোকা পড়ল। চীৎকার করে বলল ইন্সপেক্টর, ওয়াল্টার চার্লস ক্রস্‌লি, আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি। জর্জ গ্রান্ট, হ্যারি গ্রান্ট ও আভা কোলম্যানকে খুন করার প্রতিবাদে।' বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে চার্লস। জুতোর বক্‌লস পকেট থেকে বের করে বলে উঠল, 'এই নারীকে বেঁধে রাখ আমার হয়ে।' পুলিশকে যেতে বলল তারপর। যদি পুলিশ না যায় তবে সে তাদের হুংকার দিয়ে মেরে ফেলবে। তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল ভয়ঙ্করভাবে মুখ ভেংচে উঠে। 'খুব ভাল ছিল কিন্তু লোকটি, আমার বড় ভাল লেগেছিল। আমার ওর জন্য বড় দুঃখ হয়।

ক্রস্‌লি শুধোলো, 'আপনার কি ভাল লেগেছে গল্পটা।'

রান লিখতে তখন ব্যস্ত আমি, লিখতে লিখতেই জবাব দিলাম আমি, 'একটি সেরা মাইলেসীয়

গল্প এটি, আপনাকে অভিনন্দন জানাই লুসিয়াস এপুলিয়াস।' আমার দিকে ক্ষুব্ধ মুখে ঘুরে বসলেন ক্রস্‌লি। কাঁপছে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি। তিনি বললেন, প্রতি শব্দটাই এর সত্যি। আমি পাগল হয়ে গেলাম আর ক্রস্‌লির আত্মা চারটুকরো হয়ে গেল। একটা হুংকারের ক্ষমতাই শুধু এখন আমার আছে।'

কালো মেঘ কখন যে সূর্যকে ঢেকে অন্ধকার করে ফেলেছে তা আমি জানতেই পারিনি কারণ প্ল্যান লিখতে তখন আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম। একটা বিদ্যুৎ চমক ঝলসে দিল এবং কানে এল বজ্রের হুংকার।

সব গোলমাল হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বৃষ্টি নামল মুষলধারে, আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল খেলোয়াড়রা। চীৎকার চেঁচামেচি করতে করতে পাগলরা শুরু করে দিল লড়াই। সেই বি. সি. ব্রাউন যে ছিল ঢ্যাঙা যুবক সে তার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে দিল এবং উলঙ্গ হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা একটি যুবক বজ্রের মত প্রার্থনা আরম্ভ করল, সে ছিল স্কোরিং বক্স-এর বাইরে।

সে শুরু করে দিল তৎক্ষণাৎ 'ব্যা ব্যা'।

চোখ দুটি সগর্বে ঘুরতে লাগল ক্রস্‌লির। আঙুল বাড়িয়ে বললেন, আকাশের দিকে, 'হুংকারটা ঠিক এই রকম।' হঠাৎ মুখটা নামিয়ে নিলেন তিনি এবং তার মুখে একটা শিশুসুলভ দুঃখ এবং বিরক্তি দেখা দিল। তিনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'ক্রসলি আবার হুংকার দেবে আমাকে লক্ষ্য, করে জমিয়ে ছাড়বে আমার মজ্জা পর্যন্ত।'

তার কথা আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। কারণ টিনের ছাদের উপর বৃষ্টি এত জোরে পড়ছিল আরো জোরে, আবার একটি বিদ্যুতের ঝিলিক দিল। বজ্রের হুংকার একটি। কানে কানে বললেন তিনি আমার, 'দ্বিতীয় ডিগ্রীর হুংকার তো এটি। প্রথম ডিগ্রী হুংকারেই আমি কেবলমাত্র মানুষ খুন করতে পারি।'

আরও বললেন তিনি, 'আপনি বুঝতে পারছেন না।' বোকার মত হাসলেন তিনি। 'আমিই রিচার্ড এখন আর ক্রস্‌লি আমাকে খুন করবে।'

দুই হাতে ক্রিকেট স্টাম্প ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে লোকটি, এক কুৎসিত দৃশ্য সেটি, সে কেবলই চীৎকার করছে 'বা বা বা' এবং তার পিঠে জল গড়িয়ে পড়ছে বুড়োর উল্টোনো টুপি থেকে।

'সব বাজে কথা' আমি বললাম। ক্রস্‌লি 'আপনি মনে রাখবেন, মনে সাহস আনুন আপনি, সমানে লড়তে পারেন একডজন রিচার্ডের সঙ্গে। রিচার্ডের ভাগ্য ভাল ছিল বলে আপনি একবার হেরেছেন, এখন আপনার আয়ত্তে হুংকার আছে।

কেমন যেন পাগল পাগল বলে আমার মনে হচ্ছিল নিজেকে। স্কোরিং বক্সে ছুটে এসে ঢুকলেন পাগলা গারদের ডাক্তার। জল ঝরছে তাঁর ফ্লানেলের পোশাক থেকে। প্যাড আর ব্যাটিং গ্লাভস রয়েছে তাঁর পরনে। কোথায় ছিটকে পড়ে গেছে তাঁর চশমা। কানে গিয়েছিল তিনি হুকুম দিলেন, 'ক্রস্‌লির হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে, 'এখুনি তোমার ডর্মিটারিতে চলে যাও ক্রস্‌লি।'

সগর্বে বললেন ক্রস্‌লি, 'যাব না আমি, সাপ ও আপেলওয়ালা মানুষ তবে রে।'

তাকে ঠেলে বের করে দিতে চেষ্টা করল ডাক্তার তার কোটটা চেপে ধরে।

এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলেন ক্রস্‌লি। চোখ দুটি জ্বলছে তার। 'যাও বেরিয়ে যাও, একা থাকতে দাও আমাকে, আমি হুংকার দিয়ে উঠব নইলে। শুনতে পাচ্ছ হুংকার দেব আমি। সবাইকে মেরে ফেলব তোমাদের। পাগলা গারদটাই ভেঙে পড়বে আমার হুংকারে। আমি হুংকার দেব, সব ঘাম শুকিয়ে যাবে।' তার মুখটা বেঁকে যেতে লাগল তীব্র ত্রাসে। একটা লাল দাগ ফুটে উঠল চোয়ালের উপর এবং ক্রমশঃ তা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

স্কোরিং বক্স থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে। যেই আমি বিশ গজ ছুটেছি একটা আগুনের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আমাকে তালগোল পাকিয়ে দিল।

অবশ দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম কোনো মতে। আমার ভাগ্যটা গল্পের রিচার্ডের মতই ভাল। ক্রস্‌লি এবং ডাক্তার দু'জনেই মারা

গেলেন সেই বিদ্যুতের স্পর্শে।

ডাক্তারের শরীরটা এককোণে গুঁড়ি মেরে পড়েছিল। তার কান ঢাকা ছিল দুই হাতে। কেউ বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। তাদের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতের সঙ্গেই। কানে আঙুল দেবার মত লোক ডাক্তার নন বজ্রের হুংকার শুনে।

মোটেই সন্তোষজনক নয় এই গল্পের উপসংহারটুকু। র‍্যাচেল ও রিচার্ড এই দুই বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম। এবং খুবই সঠিক বিবরণ ক্রস্‌লি তাদের দিয়েছিল। তাদের বললাম পরে, 'যখন বজ্রাহত হন তাদের বন্ধু সেই ডাক্তারটি, একইভাবে বজ্রাহত হয়ে মারা গেছে তখন চার্লস ক্রস্‌লি। তারা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিল ক্রস্‌লির মৃত্যুটিকে। উদাস দৃষ্টি রিচার্ডের। র‍্যাচেল বলে উঠল, 'আমার ধারণা ক্রস্‌লি একজন অস্ট্রেলীয় যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে কিছু যাদুর খেলা দেখিয়েছিল, বেশী যন্ত্রপাতি ছিল না একখানা কালো রেশমী রুমাল ছাড়া। আমার খুব ভাল লেগেছিল তার মুখটা, কিন্তু আহারে' তাকে মোটেই ভালো লাগেনি রিচার্ডের।'

'আমি মোটেই বরদাস্ত করিনি লোকটা সারাক্ষণ যেভাবে তোমার দিকে তাকিয়েছিল,' রিচার্ড বলে উঠল।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত